৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিকপত্র

প্রথমবর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ—জ্যৈষ্ঠ

১৩২০-২১

সম্পাদক

শ্রীজলধর সেন, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতবর্ষ—সূচি

[উত্তরার্দ্ধ—পৌষ ১৩২০ হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৩২১]

বিষয়নির্ব্বিশেষে পত্রাঙ্কানুক্রমিক

প্রবন্ধ-মালা

শিল্প—কৃষি—বিজ্ঞান—বাণিজ্য

আলোচনা

['সাহিত্য—জীবনী—কাব্য—পুরাণ—সঙ্গীত—ঋদ্ধি—ধর্ম্ম—সমাজ—সামুদ্রিক তথ্য—বিজ্ঞান ইত্যাদি]

প্রসঙ্গ

দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব

সমাজ-তত্ত্ব

ইতিহাস—প্রত্নতত্ত্ব

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

সাহিত্য

ভাষা-রহস্য

শিক্ষা

ধারাবাহিক উপন্যাস

ক্ষুদ্র উপন্যাস

গল্প—কাহিনী—উপাখ্যান

কবিতা

ব্যঙ্গ কবিতা

বিবিধ

—সম্পাদকগণ

সমালোচনা

—সম্পাদকগণ

সঙ্গীত—স্বরলিপি

সাহিত্য-সংবাদ

ভারতবর্ষ-সূচি

[উত্তরার্দ্ধ—পৌষ ১৩২০ হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৩২১]

লেখকগণের বর্ণমালানুক্রমিক নামানুসারে

প্রবন্ধ-মালা

চিত্রাবলী

মনস্বীবর্গের প্রতিকৃতি

স্থানীয় দৃশ্যাবলী

প্রবন্ধ-ব্যাখ্যাপক অন্যান্য চিত্রের সূচী দেওয়া অনাবশ্যক বিধায় প্রদত্ত হইল না।

পৃষ্ঠাব্যাপী

বহুবর্ণ ও একবর্ণ চিত্র

ভ্রম-সংশোধন

৩৩৭ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ৬ পংক্তি "জনসংজ্ঞ্য" স্থলে, "জনসঙ্ঘে" হইবে।

৩৪৬ „ ২য় „ ৬ „ "বৃষভদ্দিষু" স্থলে, "বৃষভাদিষু" হইবে।

৩৪৭ „ ১ম „ ৩১ „ "প্রাবৃট্" ইত্যাদি স্থলে, "প্রাবৃট্ শুচির্নভা জ্ঞেয়ৌ শরদূর্জ্জঃসহাঃ পুনঃ।" হইবে।

৩৪৭ „ ২য় „ ১-২ „ "অগ্রহায়ণ ও পৌষ" স্থলে, "কাত্তিক ও অগ্রহায়ণ" হইবে।

৩৬১ „ ২য় „ ২৯ „ "যেন উপগ্রহ" স্থলে, "তীর ভূমি গেহ" হইবে।

৫৪১ „ ১ম „ ২৯-৩০ „ "আর একটি জাতি উল্লেখ-যোগ্য। মুসলমান আক্রমণে ইহুদির সহিত তুলনায় ইত্যাদি" স্থলে,—"ইহুদির সহিত তুলনায় আর-একটি জাতিও উল্লেখযোগ্য। ইত্যাদি" হইবে।

৫৮৩ „ ২য় „ ৩৩ „ 'Confideracy' স্থলে, 'Confederacy' হইবে।

৫৪৫ „ ২য় „ ১০ „ 'ধর্ম্মবুদ্ধি সাধিত' স্থলে, 'ধর্ম্মবুদ্ধি চালিত' 'অপর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য' স্থলে, 'আপনার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য' হইবে।

৫৪৬ „ ২য় „ ১৩ „ "অভিমান" স্থলে, "অভিষান" হইবে।

৭৯৩ „ ১ম „ ১০ „ 'routerne' স্থলে, 'routier' হইবে।

৭৯৩ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ২০ পংক্তি "পারিশ্রমিক হিসাবে" কথ উঠিয়া যাইবে।

৭৯৪ „ ২য় „ ২০ „ 'night' স্থলে, 'wight' হইবে।

৭৯৫ „ ১ম „ ৩৪ „ 'Sedon' স্থলে, 'Sedan' হইবে।

৭৯৭ „ ১ম „ ৬ „ 'Weimanism' স্থলে, 'Weimarism' হইবে।

ঐ „ ১ম „ ২৪ 'Nihilis in' স্থলে, 'Nihilism' হইবে।

ঐ „ ১ম „ ২৭ „ "Hegel কর্ত্তৃক weima ism" স্থলে, "Romantikerগণ ও Hegel-ক Weimarism" হইবে।

৭৯৮ „ ১ম „ ৭ „ "জার্ম্মান সাহিত্য" স্থলে, "জার্ম্মান-সমাজ সাহিত্যে" হইবে।

ঐ „ ১ম „ ২০ „ "ages and those" স্থলে "ages to those" হইবে।

ঐ „ ২য় „ ৩১ „ "বস্তর" স্থলে, "বাস্তব" হইবে।

৭৯৯ „ ১ম „ ১১-২২ „ উল্টাইয়া গিয়াছে; উ এইরূপ হইবে—"অথবা উচ্ছৃঙ্খল নহে, ইহার কারণ বাস্তব জগতে অভাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না কি নিজেদের কল্পনার তৃপ্তিসাধন"।
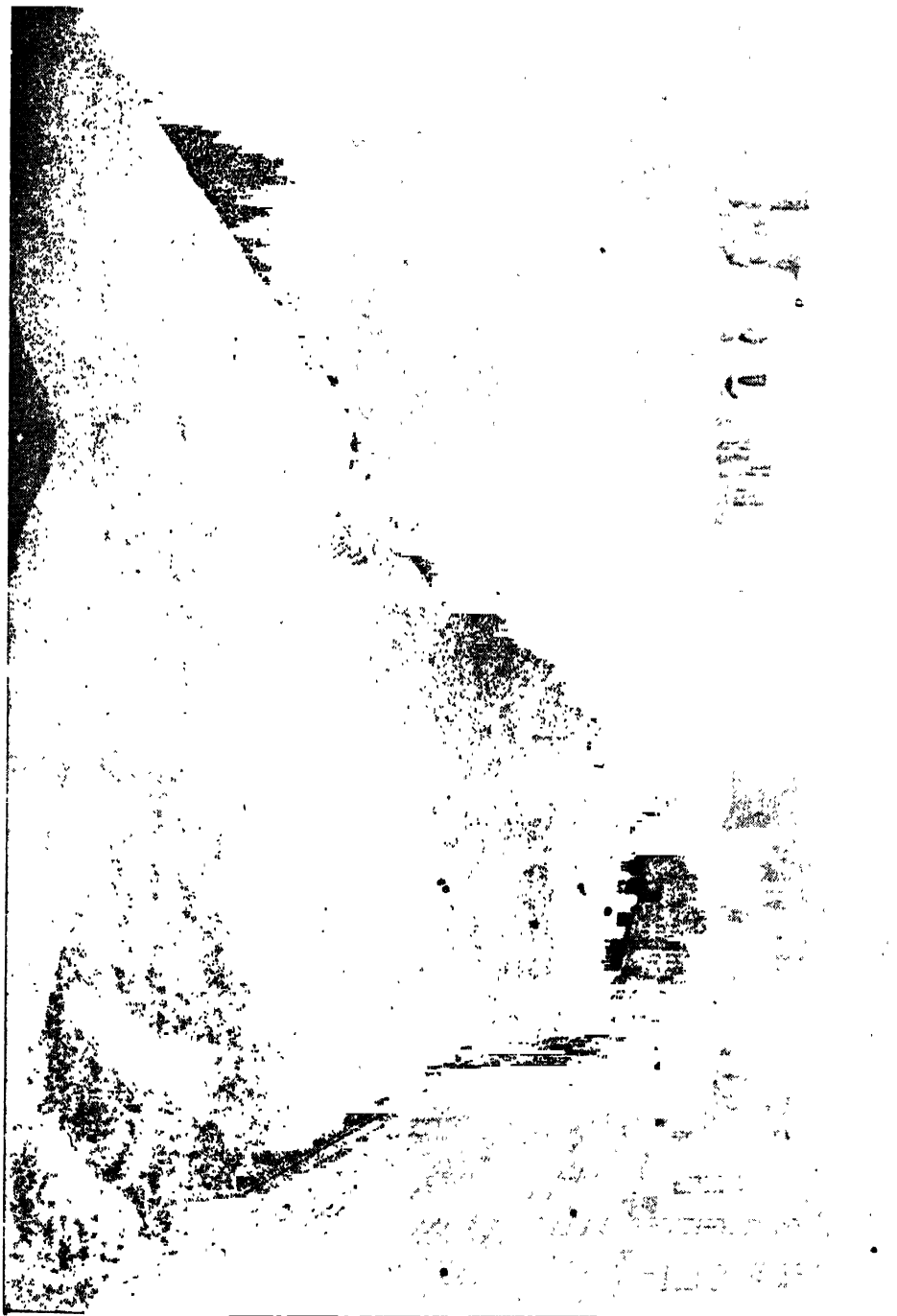
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাড়ী।

লীডেন-হল ষ্ট্রীট (১৭২৬)

The Emerald Ptg. Works, Calcutta.

বংশী-শিক্ষা।

চিত্রশিল্পী—শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র ঘোষ।

ভারবাহী।

একখানি প্রাচীন চিত্র হইতে।

The Emerald Ptg. Works, Calcutta.

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

চিত্রশিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ

১ম বর্ষ
দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩২০

দ্বিতীয় খ
১ম সংখ্যা

জননী-বঙ্গ

[৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ভারতবর্ষ"—সুর]

রচিল ধর্ম্ম-প্রয়াগ তীর্থ যা'র ভগবান্ 'পরমহংস',
বেদের বার্ত্তা আনিল ফিরা'য়ে যা'র 'রায়' 'সেন' 'ঠাকুর'বংশ ;
'বিদ্যা করুণা তেজের সাগর' ভরিল অঙ্ক দানের রত্নে,
'বঙ্কিম' যা'র রঞ্জিল পদ বুকের রুধিরে প্রাণের যত্নে ;
যাহার চরণ, জীবনমরণে শরণ, সে তুমি জননী-বঙ্গ ।—
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ ।

'ভূদেব' 'রমেশ' 'দীনবন্ধু'র অর্ঘ্যে পদারবিন্দে দীপ্তি
যা'র 'মধু' 'হেম' 'নবীন' 'রজনী' সুধাদানে ক্ষুধা করেছে তৃপ্তি।
'গিরীশ' 'দ্বিজেন' সমাজধর্ম্ম জাগা'ল আবার নটের দৃশ্যে,
ঋষি 'ব্রজেন্দ্র' তত্ত্বজ্ঞানের ঘৃতদীপ তুলি' ধরিল বিশ্বে,
যাহার চরণ জীবনমরণে শরণ, সে তুমি জননী-বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ ।

যা'র দানবীর 'রাসবিহারী'র কণ্ঠে ধ্বনিত ন্যায়ের বিশ্ব
'মহীন' 'তারক' 'ব্রজ' 'মণীন্দ্র' বলির ধর্ম্মে হয়েছে নিঃস্ব ।
'আশুতোষ' আর 'হরিনাথ' যার শোভিল বাণীর স্নেহের অঙ্ক,
নব সাধনার পুরোহিত 'সুর' বাজাল বিশ্বনিনাদী শঙ্খ ।
যাহার চরণ জীবনমরণে শরণ, সে তুমি জননী-বঙ্গ ।—
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ ।

যা'র 'মহেন্দ্র' 'গঙ্গাধরের' ভৃঙ্গার-জলে বাঁচিল সৃষ্টি
হোতা 'প্রফুল্ল' নব রসায়ন-হোমানলে করে হবির বৃষ্টি।
ধরে 'গুরুদাস' পুণ্যচরিত্র সত্ত্বনিষ্ঠা শুভ্র ছত্র,
যোগী 'জগদীশ' তাড়িতাক্ষরে লিখিল যাহার বিজয়পত্র,
যাহার চরণ জীবনমরণে শরণ, সে তুমি জননী-বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

সত্ত্বরজের মিলনমন্ত্র ঘোষিল বিশ্বে 'বিবেকানন্দ,'
'দিগ্‌জয়ী কবি' সিন্ধুর কূলে গাহিল আবার সামের ছন্দ;
পুত্র যাহার সত্যের লাগি—বরিছে শীর্ষে অশনি বর্ষ
দেশের কর্ম্মে, সেবার ধর্ম্মে জনমে যা'দের ত্যাগের হর্ষ;
যাহার চরণ জীবনমরণে শরণ, সে তুমি জননী বঙ্গ
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

শ্রীকালিদাস রায়

কাব্যের অস্ফুট সৌন্দর্য্য

(প্রথম প্রস্তাব)

প্রকৃতির প্রিয়সেবক সুকবিগণের কাব্যাবলীতে একটা ব্যাপার দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইতে হয়। সৌন্দর্য্যে হৃদয় ভরিয়া যায়। সে ব্যাপার কবির ইচ্ছাকৃত কি না, তাহা জানি না, অথবা জানিয়া সৌন্দর্য্যের অঙ্গহানি করিতে ইচ্ছাও করি না। কোকিল ডাকে কেন, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই, তাহার স্বরে কর্ণকুহর ভরিয়া যায়। এইটুকুই শ্রোতার পক্ষে প্রচুর। যখন ভাবের আবেশে কবির প্রাণ, বহিঃপ্রকৃতির গণ্ডি ছাড়াইয়া আপনাতেই অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে, অনির্ব্বচনীয় অন্তর্মুখীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কবির তখনকার অবস্থা বড়ই সুন্দর। সমাধিমগ্ন যোগীতে আর কবিতে তখন কোনই প্রভেদ থাকে না। কবি তখন কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন, তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন না। যে কাব্যরচয়িতার হৃদয়ে এইরূপ সমাধি হয়, তাঁহার কাব্যেই ঐ লুক্কায়িত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। কবির অজ্ঞাতসারে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আসিয়া সেই সৌন্দর্য্য মাজিয়া ঘসিয়া আরও স্ফুটতর করিয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সৌন্দর্য্য যত প্রচ্ছন্ন থাকিবে, ততই ইহার মাধুরী বৃদ্ধি পাইবে। আবরণই ইহার প্রকৃত বিকাশ।

শকুন্তলায় দেখি, এক বনবাসী তাপসের অনুরোধে রাজা দুষ্মন্ত আসিয়া মালিনীতীরে, কণ্বের আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন,—এখনও আশ্রমে প্রবেশ করেন নাই, সুন্দর আশ্রমের স্নিগ্ধশ্যামলা মূর্ত্তিতে ভারতেশ্বরের হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, চক্ষু জুড়াইয়া গিয়াছে, তিনি এদিক্ ওদিক্ মিটাইয়া দেখিয়া লইতেছেন। ক্ষণকাল পরে যেমন আ[illegible] প্রবেশ করিলেন, অমনই তাঁহার দক্ষিণ বাহু কাঁ[illegible] উঠিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যমুগ্ধ রাজার মনে, যেন এ[illegible] তাড়িতের স্পন্দন অনুভূত হইল, নিমেষের জন্য র[illegible] বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া গেলেন। কালিদাসের দুষ্মন্ত এই[illegible] তপোবনের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,—আর নি[illegible] মনে বলিতেছেন,—"এ ত উপবন নয়, এ যে শান্ত তপো[illegible] এখানে দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হয় কেন?" কালিদা[illegible] দুষ্মন্তের আশ্রমদ্বারে দাঁড়ান এবং বাহুস্পন্দন অপে[illegible] এই প্রশ্ন সুন্দর; কিন্তু ইহাতে একটা কথা অ[illegible] মানুষ একটা প্রশ্ন লইয়া বেশী সময় সন্দিহান্ হ[illegible] কাটাইতে পারে না। সে বড় যন্ত্রণা। মানুষ চায় [illegible] খানিকে আপনার মনের অনুকূল করিয়া লইতে। যে[illegible] প্রশ্নই মনে উদিত হউক না কেন, কোনরূপে, ত[illegible] একটা সমাধান না করিতে পারিলে মানব সুস্থির হ[illegible] পারে না। বরং অনভিপ্রেত বা প্রতিকূল বিষয়ের মনে উদিত হইলে, তাহা দুইহাতে ঠেলিয়া বাহির ক[illegible] দিয়া মনের কবাট বন্ধ করিয়া রাখাও চলে, কিন্তু অ[illegible] বা অভিপ্রেত বিষয়ের প্রশ্নে সেরূপ খাটে না। যে[illegible] হউক, তাহার একটা সমাধান করিয়া লইয়া [illegible] কাননের জীব নানা কল্পিত সজ্জায় আপনার হৃদয়খা[illegible] সাজাইয়া রাখিতে বড়ই ভালবাসে। দুষ্মন্ত দেবতা

...শালী মানুষ; মানুষের পথ ছাড়িয়া চলা তাঁহার ...ক সম্ভব নহে। "বাহুস্পন্দিত হয় কেন?"—এ প্রশ্ন ...য়া মনের ভিতর, প্রাকৃত জনের ন্যায় তোলাপাড়া ...রিবার লোক যদিও তিনি নহেন, তথাপি তপোবনে ...কম্পনের ফল কোথায়? এই নৈরাশ্য লইয়া আশার ...পুত্র দুষ্মন্ত থাকিতে পারেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশ্নের ...ধান করিয়া নিজেই বলিলেন, "অথবা যাহা হইবার ...হা সকল স্থানেই হইতে পারে। ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই ...ক্ত।"

রাজা দুষ্মন্ত আপনার আশাকাতর মনকে এইরূপে ...বাধ দিয়া যখন শান্ত করিতেছিলেন, আপনার মনে ...পনিই কখন ভাঙ্গিতেছিলেন, কখন গড়িতেছিলেন,—...বীর অধিপতি হইয়াও আপনাকে, কোথায় এক জনহীন ...র কোণে লইয়া গিয়া ছায়াবাজীর পুতুল-খেলা ...তেছিলেন, তখন অদূরে কোথায় যেন শব্দ হইল,—"...দো ইদো সহীও" "এই দিকে, এই দিকে, সখি"—... তপোবনের স্নিগ্ধ সমীরণে ভাসিতে ভাসিতে সে ...নি রাজার কাণে পৌছিল।

অথবা রাজার

"কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

এই স্থলে দুইটি কথা দেখিতে পাইতেছি। একটি ...ার, অপরটি যেন অন্য কা'র। একটি কথার শেষ—"...মুক্ত"—অপরটির আরম্ভ "এই দিকে,এই দিকে"—রাজা ...কথা ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন এবং দু'এক ... যাইতে না যাইতেই, ঐ অমৃতময়ী ভাষার যিনি উৎস, ...াকে দেখিলেন। বাহুকম্পনের ফল হাতে হাতে ...লেন। এইটুকু কাব্যের দৃষ্ট বা বহিঃসৌন্দর্য্য। এই ...ন্দর্য্য-সৃষ্টির পশ্চাদ্ভাগে আর এক অতি মনোহর ... আছে,—তাহা দৃষ্ট নহে, অদৃশ্য। দেখিয়া সে চিত্রের ...তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। দৃষ্টি যেখানে পৌছিতে ... না, তথায় দূরবীক্ষণের দ্বারা দেখিতে হয়। এখানেও ...কে স্থূল নয়ন ছাড়িয়া সূক্ষ্ম নয়নের সাহায্য লইতে ...।

যে পটের উপর চিত্র আঁকিতে হয়, তাহার জমিটা আগে ভাল করিয়া প্রস্তুত না করিলে তাহাতে অঙ্কিত চিত্রের সৌন্দর্য্য উত্তমরূপে ফুটে না। সুনীল আকাশের মধ্যস্থলে উদিত হন বলিয়াই চাঁদ অত সুন্দর। তিমিরবসনা প্রকৃতির ঘনকৃষ্ণ তরুকুন্তলে ঝিকিমিকি করে বলিয়াই খদ্যোতমালা অত মনোহারিণী। জমির উৎকর্ষের তারতম্য অনুসারে চিত্রসৌন্দর্য্যেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। শিল্পী কালিদাস, শকুন্তলার প্রারম্ভ-ভাগে, মূল চিত্র অপেক্ষাও যেন জমি ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন; তাই জমির গুণে, মূলচিত্রখানি যত দেখা যাইতেছে, ততই বেশী সুন্দর বলিয়া মনে হইতেছে।

যাঁহারা দর্শক,তাঁহাদিগকে লইয়াই দৃশ্যকাব্য। দর্শক বাদ দিলে দৃশ্যকাব্যের অনুপায়। নিজে নিজে একাকী বসিয়া পড়িবার এবং পড়িয়া পড়িয়া রসানুভব করিবার জন্য দৃশ্য-কাব্য নহে। সে উদ্দেশ্যে শ্রব্যকাব্য লিখিত। রসাত্মক কাব্যের রসের উৎপত্তির স্থল, দৃশ্যকাব্যের সম্বন্ধে দর্শকগণের হৃদয়, শ্রব্যকাব্যের সম্বন্ধে পাঠকগণের হৃদয়। দর্শকগণের অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত সংজ্ঞা "সামাজিক"। অলঙ্কারে বলে, "সামাজিকে রসোৎপত্তিঃ।" যাঁহারা অভিনয় দর্শনার্থী, তাঁহা-দের মধ্যেই রসের উৎপত্তি এবং পরিপাক হইয়া থাকে।

শকুন্তলাভিনয়ের দর্শকগণের কর্ণে পরপর দুইটি কথা ধ্বনিত হইল। একটি দুষ্মন্তের অপরটি অন্য কা'র। দুষ্মন্তের কথার শেষাংশ "অথবা ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত।" আর এই কথার শেষ হইতে না হইতেই "এই দিকে, এইদিকে সখি!"—দর্শকগণ অবিশ্রান্তভাবে এই কথা দুইটি শুনিলেন—অর্থাৎ "ভবিতব্যের দ্বার উন্মুক্ত এই দিকে, এই দিকে, সখি!"—

রাজা, যে ভবিতব্যের দ্বার খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, তাঁহার সৌভাগ্যরাজ্যের সে তোরণদ্বার এই দিকে এই দিকে উন্মুক্ত, একেবারে খোলা রহিয়াছে। দর্শকগণ চমকিয়া উঠিলেন,—"কোন্ দিকে দ্বার উন্মুক্ত?" তাঁহারা শশব্যস্তে চাহিলেন—যাহা দেখিলেন, তাহাতে দুষ্মন্তের সহিত তাঁহাদেরও চোক্ জুড়াইয়া গেল। এইটুকুই হইল, দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক শকুন্তলা-দর্শন-চিত্রের জমি। দুষ্মন্ত নিজে নিজের বাহুকম্পনের কথা কহিতেছেন, শকুন্তলা নিজে নিজের সখীদ্বয়কে ডাকিতেছেন, সেই শকুন্তলার

মধুর কণ্ঠস্বরে দুষ্মন্ত সেই দিক্ ধরিয়া যাইতেছেন, কলের পুতুলের মত যাইতেছেন, অথবা "যাইতেছেন" বলি কেন, ঐ স্বরলহরী যেন তাঁহাকে টানিয়া লইতেছে, এ সমুদয় হইল নাটকের প্রকৃত বা মুখ্য অংশ। এই প্রকার, শকুন্তলা "এই দিকে এই দিকে" বলিয়া যে ডাকিতেছেন, ইহাও নাটকের মুখ্য অংশ। আর অপরটুকু—"উন্মুক্ত এই দিকে এই দিকে"—অর্থাৎ "তোমার বাহুকম্পনের ফল এই দিকে এই দিকে,—তোমার ভবিতব্যের দ্বার উন্মুক্ত এই দিকে এই দিকে,"—এই সমস্তই হইল—নাটকের গৌণ অংশ। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার উক্তিগুলি মূলচিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আর ঐ গৌণ অংশটুকু সেই চিত্রের জমি। সহৃদয় সামাজিকগণ ঐ সুন্দর জমিতে সুন্দরতর দুষ্মন্ত-শকুন্তলার চিত্র দেখিতে লাগিলেন, জমির গুণে, সে চিত্রের একগুণ শোভা শতগুণ হইয়া দর্শকদিগকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। কাব্যের এই অস্ফুট সৌন্দর্য্যে স্ফুট সৌন্দর্য্য ক্রমে আরও স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া উঠিল।

এমন অনেক স্থল আছে, যেখানে প্রকাশ অপেক্ষা অপ্রকাশ সুন্দর, উন্মোচন অপেক্ষা আবরণ মনোহর। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার চিত্রের অনাবৃত সৌন্দর্য্য ঐ আবৃত সৌন্দর্য্যের সমবায়ে বড়ই নয়নরঞ্জন হইল। চিত্রকর-চূড়ামণি কালিদাস তাঁহার প্রিয় দর্শকদিগের চক্ষুতে এই প্রকারে আবৃত সৌন্দর্য্যের কজ্জল পরাইয়া, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বাড়াইয়া লইলেন। দর্শকবৃন্দ সেই পরিষ্কৃত ও নবীন দৃষ্টিশক্তি লইয়া যতই দেখিতেছেন, ততই যাহা এক আনা, তাহাকে ষোল আনা মনে হইতেছে। কবিসৃষ্টির ইহা চরম উৎকর্ষ। দর্শকদিগকে এমন মনের মত করিয়া গড়িতে কালিদাসের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন কি না, জানি না।

যন্ত্রে সুর বাঁধিতেই যা কষ্ট, একবার সুর বাঁধিয়া লইতে পারিলে, আর কথা থাকে না, যেমনই বাজাও না কেন, খারাপ লাগিবে না। কালিদাস গোড়ায় পালা আরম্ভ হইবার উপক্রমে, সুর বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিলেন, যে গানই এখন গাও না কেন,—জমিয়া যাইবে, আর বেসুর লাগিবে না, কাণে বাজিবে না। পাকা ওস্তাদের ইহাই হইল প্রধান কসরত্।

কোনও একটা সুন্দর ফুল দেখিলেই প্রাণ পুলকিত হয়, সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। সেই ফুলে যদি আবার গন্ধ থাকে, তবে ত আর কথাই নাই। সৌরভ উপভোগের সামগ্রী, উহা দেখা যায় না। দর্শনই তৃপ্তির একমাত্র কারণ নহে, দর্শনের অভাবও তৃপ্তির অন্য একটা কারণ। কাব্যের অস্ফুট সৌন্দর্য্যও ঠিক সৌরভের মত। দেখা যায় না, অনুভব বা উপভোগ করা যায়। সৎকাব্যরূপ অম্লান-কুসুমের উহা পরম উল্লাসকর সৌরভ। ঐ সৌরভ যে কাব্যে যত অধিক, সে কাব্য তত মনোজ্ঞ, তত প্রাণস্পর্শী। নিপুণ মহাকবি, ঐ প্রাণস্পর্শিনী সম্পদে তাঁহার অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সর্ব্বত্র বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

আদর্শ কবিতা

সম্পাদক মহাশয়,

আমি অনেক কবিতা পড়িয়াছি, কিন্তু আমার নিজের কবিতা পড়িয়া সে সব আর পড়িতে ইচ্ছা হয় না। সম্প্রতি প্রেমের কবিতাতে একটু ভাঁটা পড়িয়াছে, এখন অধিকাংশ কবিতাই আধ্যাত্মিকভাবে ওতপ্রোত। 'মলয়' 'জ্যোৎস্না' 'ফুল' 'চাঁদ' একটু বিশ্রাম লভিতেছেন। 'ধ্যান' 'সমাধি' 'তপ' 'বিভু' 'প্রভু' 'বঁধু' এখন আসর জমাইতেছেন। আমি মৌলিকতার পক্ষপাতী, আমার প্রত্যেক কবিতাই উৎকট মৌলিকতায় পূর্ণ। অনুবাদে আমি সিদ্ধহস্ত। 'ভাব' আমার দাস, ভাষা আমার দাসী। হাস্যরসে আমি অদ্বিতীয়। এ সকল কথা না বলিলেও চলিত, কারণ আপনারা পরোক্ষে যাই বলুন, সম্মুখে একথা স্বীকার করিতে বাধ্য। আমার দুইটি অপূর্ব্ব কবিতা আপনার পত্রিকায় দয়া করিয়া পাঠাইতেছি, প্রকাশ করিয়া ধন্য হইবেন।

বাঘ

(১)

ব্যাঘ্র আমার সোণার ব্যাঘ্র
　　হিংস্র তুমি ত নওরে,
গুপ্ত প্রণয়ে মধু চুম্বনে
　　পরাণ চুমিয়া লওরে।
　আশ্রয় করি বনধার
　আশাপথ চাহি থাক তার,
　শুধু বিজয়ার মধু কোলাকুলি
　　দেখিলেই তুমি দাওরে।

(২)

কাহার বিরহে শার্দ্দূলবর
　　হয়েছ এমন উদাসী।
গুপ্ত প্রেমের দারুণ জ্বালায়
　　দন্ত উঠে কি বিকাশি!
　প্রণয়ে থাকিয়া থাকিয়া,
　নিশীথে উঠ কি ডাকিয়া,
　নিশার শান্তি ভেঙ্গে দাও সখা
　　উচ্চ কণ্ঠে বিহাসি।

(৩)

গাজনের শেষে ছিন্ন ঢক্কা
　　সম, ও কণ্ঠ সুমধুর,
কর্কশ তারে যে বলে বলুক
　　বাজে তাহে শুধু প্রেমসুর
　কাননে বসিয়া হে ঋষি,
　কাটাইবে আর ক' নিশি,
　কখন্ ফলিবে সাধনা তোমার
　　সুধাই প্রেমিক সুচতুর?

(৪)

হৃদিকন্দরে কতই যাতনা
　　লুকায়ে রেখেছ কুহকি!
প্রাণের মাঝারে জ্যোছনা বিছায়ে
　　রচিয়া রেখেছ ব্যূহ কি?
　গড়ায়ে গণ্ড আঁখিজল
　পরশে কি কভু ভূমিতল?
　পঞ্চবাণের বিন্ধনে কভু
　　বলিয়া উঠনা উঁহু কি?

(৫)

ব্যাঘ্র তুমি হে পরমহংস
　　কোন ন্যাটা নাই আহারে,
তোমার ও পূত জিহ্বা পরশে
　　প্রীতি ক'রে দাও সবারে।
　মাংস খাইতে যত লুণ
　চাহিনে এটা কি কম গুণ?
　তুমি হে সাধক তুমি হে তাপস
　　মহাযোগী তুমি বাহারে!

(৬)

নেচে উঠে প্রাণ হৃদে জাগে গান
তোমার ও নাম স্মরিয়া,
সুন্দরবর ঘাড়ের উপর
চড়িওনা কৃপা করিয়া।
হে বঁধু, হে প্রিয়, সখা হে
করিতে এসনা দেখা হে।
দূর হতে প্রেম অতি মনোরম
কাছে এলে যায় উড়িয়া।

এ কবিতাটিতে অপূর্ব্ব রৌদ্র মেঘ, আলো ছায়া, হাসি অশ্রুর সমাবেশ, ভীতি আশ্বাসের মধুর সুমিশ্রণ। কবিতাটি পরস্পর বিরোধী ভাবের গোধূলি-লগ্ন। নিম্নে আমার হাসির গানের একটি নমুনা পাঠাইলাম।

মেলা

(কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণে)

আমরা দাদা এবার একটা খুলব নূতন মেলা
ভবের মাঝে খেলব একটা নূতনতর খেলা।
দিনের বেলা মোটরকারে
পুরুষ যাবে 'বোরকা' পরে
সারা দিনটা জ্বলবে আলো আঁধার রাতের বেলা।
টিকিট বেচবে বুদ্ধিমতী
তিলোত্তমা, রম্ভা, রতি,
শচী বেচবে ফ্যান্সী রুমাল চক্ষে হাসির খেলা।
আমরা দাদা এবার একটা খুলব নূতন মেলা।
আসবে সেথা কিসের দোকান?
রম্ভা বসে বেচবে যে পান
বিস্কুট বেচবেন উর্ব্বশী যে করবে কে আর হেলা;
বেচবে এসেন্স বরুণ আসি
কৃষ্ণ বেচবেন বাঁশের বাঁশী
শম্ভু বেচবেন সেণ্ট জর্জ্জ স্বদেশীর কি ঠেলা;
আমরা দাদা এবার একটা খুলব নূতন মেলা।
কোনো জিনিষ যাবে না বাদ
পাদ্রী বেচবে মহাপ্রসাদ,
চন্দ্র সুধার টাবলয়েড এই ভবপারের ভেলা।
আমরা দাদা এবার একটা খুলব নূতন মেলা।
ফায়ার ওয়ার্ক করবেন ব্রহ্মা
ক্ষুর বেচিবেন বিশ্বকর্ম্মা
যম দেখাবেন বায়স্কোপ আর মারবে ভূতে ঢেলা;
ছুঁচো দাসের সঙ্গে সর্ত্ত
গাইবেন কীর্ত্তন বিহীন অর্থ
মারবে উঁকি নিরাকার আর বহুৎ পড়বে পেলা।
আমরা দাদা এবার একটা খুলব নূতন মেলা।

কপিঞ্জল

বিলাতে ভূগর্ভে প্রাচ্য-কীর্ত্তি

লণ্ডন হইতে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে সমুদ্রবক্ষে মারগেট্ নামক একটি ক্ষুদ্র নগরী; উত্তর-সাগর যেন একখানি বন্ধুর শিলাখণ্ডের সঙ্গে তিনদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করিতেছে; স্বাভাবিক প্রকৃতি-দেবীর লীলানিকেতন, আবার এই পাশ্চাত্য-জাতির স্বভাব-সুলভ হাতগড়া সৌন্দর্য্যেও তেমনই হাসিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ এই গ্রীষ্মকালে সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের উপর সাগর-সমীরণের বিমল তরঙ্গলীলা, আর পথের দুপাশে বনফুলের মনোরম শোভা, এ দেখিয়া যার প্রাণে সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাঙলার কথা জাগিয়া না উঠে, সে বাঙ্গালীই নয়? সহরের সে ভীষণ কোলাহল

গোলে অন্ধবধির শ্রবণেন্দ্রিয়কে কিয়ৎকালের জন্য শ্রাম দিতে হইলে ক্লিফ্‌টন-পল্লীর লবণাম্বুবিধৌত শৈল-ন্তে বসিয়া সম্মুখে সেই প্রশান্তগম্ভীর স্থিরসৌন্দর্য্য, আর চাতে দিগন্তপ্রবাসী প্রকৃতিদেবীর সে শ্যামল অঞ্চলের ভা উপভোগ করার ন্যায় আর কিছু শান্তিপ্রদ আছে না সন্দেহ। পাহাড়ের উপর হইতে Wilderness Hill ক যে রাস্তা ডেন-উদ্যান অভিমুখে নামিয়া গিয়াছে, হার পশ্চিম পার্শ্বেই 'গ্রোটোহিল্' (Grotto Hill)। ই সুপ্রাচীন সুড়ঙ্গপথ হইতেই এ রাস্তার নামকরণ দেখিতে পাওয়া যায়, এগুলির কারুকার্য্যও ঠিক তাহারই মত; কতকগুলি ঠিক একটি লতিকার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়া ত্রিধা বিভক্ত হইয়া পুষ্পগুচ্ছভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে; আবার কতকগুলি ঠিক অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের ন্যায় সলজ্জভাবে প্রাচীরের এক পার্শ্বে হেলিয়া রহিয়াছে; দুপার্শ্বে প্রাচীর-গাত্রে এইরূপ কারুকার্য্য দেখিয়া ইংরেজ দর্শক-মাত্রেই বিস্ময়াকুল হইয়া চাহিয়া থাকে—তাহাদের নিকট আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে 'এ সুন্দর শুক্তি-শম্বুক-খচিত দৃশ্যাবলী কি?'—কারণ ইহারা কখনও
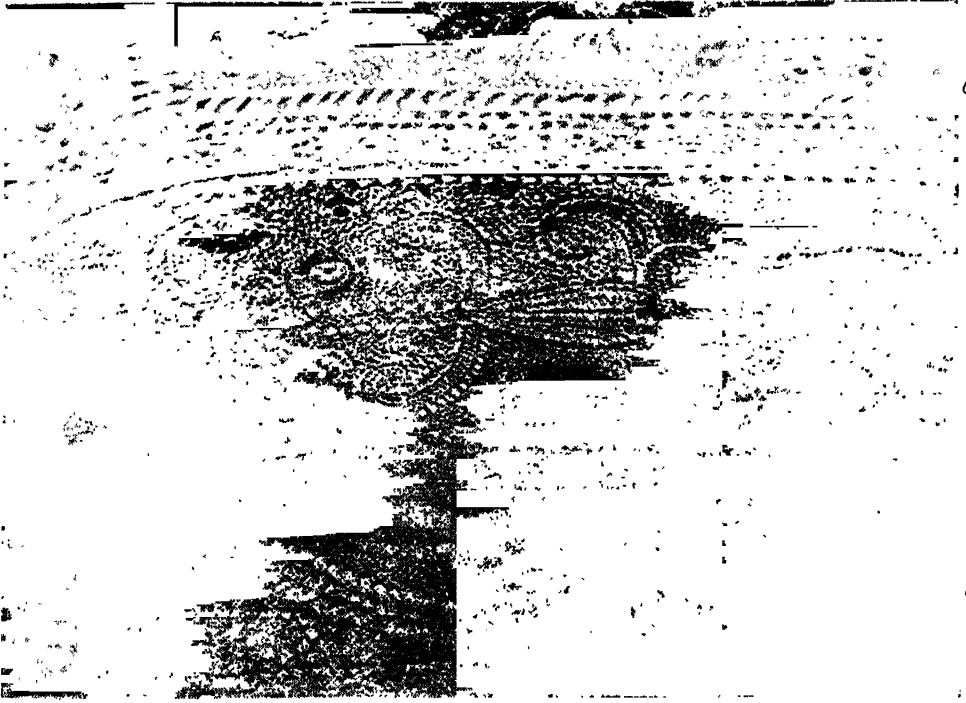
প্রাচীর-গাত্রে কারুকার্য্য

য়াছে; এইখানেই সেই বিস্ময়কর, আর্য্যকীর্ত্তি, যাহাকে রা এখানে গ্রোটো আখ্যা দিয়া থাকে। সুড়ঙ্গপথ অন্ধকারে ধরণীগর্ভে শঙ্কিত-চিত্তে অবতরণ করিতে তে শুভ্র মন্দিরাকৃতি একটি ক্ষুদ্র কুটীর দেখিতে পাওয়া। সম্মুখ দরজায় প্রবেশ করিয়াই প্রাচীরের গায়ে শুভ্র রাজির আশ্চর্য্য সমাবেশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে বার মাসে তের পার্ব্বণে বা বিবাহোৎসবে বাঙ্‌লার গৃহ-প্রাঙ্গণে অথবা বরের পিঁড়িতে যেরূপ শুভ্র 'আল্‌পনা' 'আল্‌পনা' দেখে নাই; কিন্তু আমার নিকট এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল যে, এই পাতাল-পুরীতে এরূপ সুন্দর দেবমূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের বালকগণ খেলাচ্ছলে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে এটি আবিষ্কার করে এবং মাষ্টার মহাশয়কে দেখায়। মাষ্টার মহাশয় স্বীয় জ্ঞানগরিমা বজায় রাখিবার জন্য ইহাকে গ্রোটো আখ্যা দিয়া ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দেন; এবং এটি স্কুলগৃহে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। সেই হইতে কত

কত অনুসন্ধিৎসু পুরাতত্ত্ববিৎ এই প্রাচীন তত্ত্ব মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কেহই কোন স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না; তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, এটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে একটি বুদ্ধোপাসক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মের (Religion) আইনের ও সাধারণের উপদ্রব কোন চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় আড়াই হাত চওড়া সিঁড়ি দিয়া অন্ধকারে অবতরণ করিয়া সর্পাকৃতি একটি সুড়ঙ্গ পথে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়; দুধার দিয়া ঘুরিয়া এই পথটি Rectangular কুটীরের দ্বারদেশে গিয়া উপনীত হয়; রাস্তার দুপার্শ্বের কারুকার্য্য সম্যক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বসমেত প্রায় ৩০ প্রকারের

উপাসনা-কুটীর।

হইতে আত্মরক্ষার জন্য খুব গোপনে মৃত্তিকাগর্ভে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। উপাসনা-কুটীরের দ্বারদেশে উচ্চে সুগঠিত বুদ্ধমূর্ত্তি। এটি যে বুদ্ধোপাসকের কীর্ত্তি তাহা প্রমাণিত করে, আর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন প্রকার কাগজে বা দলিল পত্রে বা জনরবে এ সম্বন্ধে সামান্য মাত্রও কিছু উল্লেখ না থাকায় এবং মৃত্তিকাগর্ভে এত সন্তর্পণে নির্ম্মিত হওয়ায় ইহাই বুঝা যায় যে, এই মন্দিরের নির্ম্মাণকারিগণ আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিতেই সচেষ্ট ছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে কতকগুলি শুক্তিগঠিত ছবির বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে, এবং কতকগুলি শম্বুকশুক্তিও এ প্রদেশে একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে।

সমস্ত মন্দিরটিই মৃত্তিকাভ্যন্তরে; বাহির হইতে ইহার শম্বুক ও শুক্তির সাহায্যে এই অপূর্ব্ব আল্‌পনা চিত্রিত হইয়াছে; মাঝে মাঝে দেয়ালের গায়ে কএকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত আছে, তাহাতে বোধ হয় যে দেবমূর্ত্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তারপর কএকটি প্রকাণ্ড পদ্মে প্রাচীরের একাংশ সুশোভিত; এখানে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মস্তিষ্কের বা হস্তের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের পবিত্রকুসুম সুচারুকমল দল কৃষ্ণবর্ণমৃণালে ও শুভ্র ক্ষুদ্র বৃহৎ শম্বুকশুক্তির সমাবেশে মনে কি যেন এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়। আর একটি 'আল্‌পনার' নাম পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন—'Tree of Life' অর্থাৎ 'জীবন-তরু'—জানি না বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত জীবনতরুর বা জীবন-লতিকার কিছু সম্পর্ক আছে কি না

টি ক্ষুদ্র দাড়িম্ববৃক্ষে সুন্দর পাটনাই দাড়িম্ব ঝুলিয়া আছে; অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতেরাও এটিকে বহুদিন পূর্ব্বেই দাড়িম্ব-বৃক্ষ বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের সত্যের একখানা প্রশংসাপত্র দিতে পারি। ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ Pomegranate বা দাড়িম্ব-গাছ আছে কি না বলিতে পারি না। একজন লেখক বলেন 'It is so unlike any known work of the kind, that the imagination readily flies to the East in the attempt to classify it; and with considerable support from much of the ornament.' অর্থাৎ আর আর এ প্রকারের কারুকার্য্যের সঙ্গে এটির এত প্রভেদ যে, এটি দেখিলে প্রাচ্যদেশের কথাই আমাদের মনে হয় এবং শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

তারপরেই সেই উপাসনা-মন্দির, যাহাকে Rectangular chamber বলে; প্রবেশদ্বার Gothic প্রণালীতে নির্ম্মিত। মন্দিরের কারুকার্য্য আরও সুন্দর; পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রাচীরে দুইটি সুবৃহৎ শুক্তির ছবি, একটি উদীয়মান অপরটি অস্তোন্মুখ সূর্য্য—নীলাম্বুর ও নীলাকাশের সম্মিলনস্থলে সূর্য্যরশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে। আর একটির নাম পণ্ডিতেরা বলেন, 'The star of India,' 'ভারতের নক্ষত্র'; ইহার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিলাম না; সুধীজনের বিবেচ্য। আর কতকগুলি কারুকার্য্য (Heart-shaped) হৃদয়াকৃতি—তাসের হরতনের মত চেহারা; malcomb Fraser তাঁহার 'England's catacomb' নামক প্রবন্ধে এই হৃদয়ের আলোচনায় বলিয়াছেন যে, এই অপূর্ব্ব মন্দিরের নির্ম্মাণকারিগণ যে অর্থ বা খ্যাতির জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তাহার কোন সন্দেহ নাই; এটি 'work of Love'। এই আশ্চর্য্য লোকগুলি কত বৎসর ধরিয়া শম্বুকশুক্তি রাখিয়াছিল এবং কত অর্থব্যয় করিয়াছিল—তাহাদের হৃদয়ের সেই তৃষিত প্রেম আজও তাহাদের এই মন্দিরের দেয়ালে প্রতিভাত। সুলেখিকা মারি করেলি ১৮৮৮ সালে 'one of the world's wonders' নামক প্রবন্ধে এই চা চিংড়ির দেশ মারগেটে এই অপূর্ব্ব মন্দিরের গুপ্তত্ব, শিল্পনৈপুণ্যে ও সৌন্দর্য্যে বিস্ময়বিমুগ্ধা হইয়া ইহার অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। অনেকে মন্দিরের নির্ম্মাণ-প্রণালী, গম্বুজ (Dome), ছাদ (ceiling) ও প্রস্তরের উপরে শম্বুকাদি গাঁথিবার কৌশল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু কেহই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, বরং অনেক প্রকারের যুক্তিতর্ক আরম্ভ করিয়া শেষকালটায় সব গণ্ডগোল করিয়া ফেলিয়াছেন।

ডোভারের (Dover) 'Pharo's Tower' এর নির্ম্মাণ-কৌশলের সঙ্গে এই গ্রোটোর নির্ম্মাণ-কৌশলের সাদৃশ্য-দর্শনে অনেকে মনে করেন যে, এটি রোমক জাতির কার্য্য; বিশেষ রোমকগণ ইংলণ্ডে আসিয়া এই প্রদেশেই একরকম বাসা বাটী করিয়াছিল, এবং ইটালির Pompeiiর উন্মুক্ত ঝরণার চিত্রে 'হৃদয়াকৃতি' চিহ্ন ও Florence এর 'বোবোলি-উদ্যানের কারুকার্য্যে এইরূপ শক্তি ও শম্বুকের সমাবেশ—এইগুলি একত্র করিলে এই যুক্তির সারবত্তা অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। এই যুক্তিতে কেহ কেহ ইহার বয়স দুহাজার বৎসরের উপর বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। অনেকে ভার্সেলের নিকটস্থ গ্রোটোর সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য-দর্শনে এটি যে তাহারই অনুকরণে নির্ম্মিত, তাহাতে কোন সন্দেহ করেন না। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে রোমকগণ এটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইহার বিচার করিতে গিয়া কে এক পণ্ডিত যেন একটি সুন্দর বাগ্‌বাজারী কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রিয়জন-বিয়োগ হইলে তাহাদের মৃতদেহের কবিত্বপূর্ণ সমাধির উদ্দেশ্যে এই সুন্দর কারুকার্য্যের অবতারণা, এবং এমন কি প্রাচীরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে দুএকটি কঙ্কাল দেখিবার আশাও তিনি করেন। এ স্থলে শম্বুক ও শুক্তিগুলি সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ বাক্‌লাণ্ড্‌ সাহেবের কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তিনি বলেন যে, প্রাচীর গ্রথিত করার সময়ে এগুলি জীবিতাবস্থায় নির্ম্মল জলে ধুইয়া একটি একটি করিয়া সিমেণ্টে গ্রথিত করিতে হইয়াছিল, নচেৎ এগুলি এ অবস্থায় দেখা যাইত না। আজ কাল গ্যাসের আলোকে এগুলি নাকি ক্যাল্‌সিয়ম্ হইয়া যাইতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিয়া বিশেষ লাভ নাই। এই অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত প্রাচীন প্রস্তরগঠিত ভগ্নাবশেষ বুদ্ধমূর্ত্তি—যেটি আজকাল পাণ্ডতেরা নিঃসন্দেহ বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া-

ছেন—সমস্ত জল্পনা-কল্পনার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাইয়া দেয়। আগাগোড়া মন্দিরের কারুকার্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন চিহ্নের অত্যন্তাভাব ; এমন কি একটি ক্রস (cross) পর্য্যন্তও নাই। অপরদিকে,ধর্ম্মে, কল্পনায়, কবিত্বে,সংগোপন-প্রবৃত্তিতে,কারুকার্য্যে ও ধৈর্য্যে পুরাতন ভারতের গন্ধ বড় স্পষ্ট অনুভূত হয়।

গোপনে রাস্তায় বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য যে একটি গুপ্তদ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেটি আজকাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ সে দ্বারের এখন আর কোন প্রয়োজন নাই। এই দ্বার উন্মুক্ত হইলে ঠিক গ্রোটোহিলের পার্শ্বদেশে গিয়া পৌছান যায়। মন্দিরের দুইপার্শ্বে দুটি প্রস্তরনির্ম্মিত বেদি, সে দুটি এখন ভগ্নদশায়, এবং বিশ্বলোকের আসন না হইয়া এখন গ্যাসালোকের আসনে পরিণত হইয়াছে। এককালে বোধ হয় ইহারই উপরে আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত মাষ্টার মহাশয় বসিয়া ছেলেদের মস্তিষ্কে বিদ্যাবীজ বপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে মাষ্টার মহাশয়ও নাই, সে ছাত্রদলও নাই ; যাহাদের মস্তিষ্কে এই অপূর্ব্ব মন্দির-গঠনের আশ্চর্য্য কল্পনা উদিত হইয়াছিল এবং যাহাদের করে সুবিন্যস্ত শুক্তিগুলি সৌন্দর্য্যের আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল তাহারা কেহই আজ নাই ; আছে শুধু সেই অজানা সম্প্রদায়ের অমীমাংসিত কীর্ত্তিমন্দির।

ভূগর্ভস্থ এই অসীমরহস্যময় শুক্তিমন্দির ; হিন্দুকুললক্ষ্মীগণের 'আল্পনা,' পদ্মকাটা আর প্রশান্ত দেবমূর্ত্তি বুদ্ধদেবের বিলাত আগমন সম্বন্ধে আমরা আর কোন সংবাদই জ্ঞাত নহি। কি করিয়া কোথা হইতে ইংলণ্ডে 'Far from the madding crowd' সেই নির্জ্জন পাতালপুরীতে এই বিস্ময়জনক মন্দিরের আবির্ভাব হইল.—কালে তাহার সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে, কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে নিতান্তই অজ্ঞ রহিয়া গেলাম। প্রবেশ করিয়া নির্নিমেষনয়ন দর্শকবৃন্দের বিস্ময়বিমুগ্ধ আনন পর্য্যবেক্ষণ করিতে এক বিশেষ আনন্দ ; তাহাদের নয়ন শুধু শ্বেত শুক্তিসমূহের সুচারু-বিন্যস্ত সৌন্দর্য্যরাশির উপরেই পড়িয়া রহিয়াছে—তাহাদের চিন্তা সে পুরাতন মীমাংসার ব্যর্থ চেষ্টার দিকে মোটেই ধাবিত হইতেছে না। বিস্ময়কর কারুকার্য্যের দিকে সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। যাত্রীদিগকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং পরিশেষেও ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বিদায় লইতেছেন। যে দেশে সেক্সপীয়রের প্রপিতামহের শয়নাগার পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, যে দেশে কত সামান্য সামান্য পুরাতন আবিষ্কারের জন্য লোকে অক্লান্ত অধ্যবসায়, অসীম অর্থব্যয় করিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে, সে দেশে এ পর্য্যন্ত এ অদ্ভুত মন্দির সম্বন্ধে কলহ কোলাহল ছাড়া একটা কিছু স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া উঠিল না এটি কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

স্কুল মাষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত এই জমি চারিবার হস্তান্তরিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটী বা গভর্ণমেণ্ট কেহই এ পর্য্যন্ত এটি স্বায়ত্ত করিবার সুযোগ পান নাই ; আজকাল একটি রমণী ইহার অধিকারিণী। প্রবেশ করিতে হইলে পূর্ব্বে এক আনা দিতে হইত। তৎপরে দু-আনা ক্রমে আজকাল দক্ষিণা ছয় আনায় পরিণত হইয়াছে। প্রণামী বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, নির্ব্বোধের দল আসিয়া গণ্ডগোল করে, মন্দিরগাত্রে পেন্সিলে স্বকীয় নাম ধামাদি বিকৃত অক্ষরে সুশোভিত করে, এবং শম্বুকাদি খুলিয়া পকেটস্থ করিতে চেষ্টা করে ; সেই সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিবারণার্থ এইরূপ ধনাগমপন্থা প্রসারিত করা হইয়াছে। পাণ্ডাঠাকুরাণী বেশ মিষ্টভাষিণী ; ছাতাছড়ি কাগজপত্র তাঁহার জিম্মায় রাখিয়া সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিতে হয় ; এবং ফিরিবার কালে কর্ম্মচারী মহাশয়কেও কিছু প্রণামী দিয়া আসিতে হয়। যদিও এখানে কোন প্রকার শারীরিক জুলুম নাই, তথাপি এদেশের প্রজাপদ্ধতির, আচার ব্যবহারের জুলুম বড় কড়া ; একটুও এদিক্ ওদিক্ হইবার যো নাই।

যতক্ষণ মন্দিরে ছিলাম ততক্ষণ মন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে তন্ময় হইয়াছিল, বাহিরে আসিয়া পথের জন-কোলাহলেও সে প্রাচীন গরিমময় স্বপ্নাবেগ ভাঙ্গিতে পারে নাই। যাঁর মুখ হইতে 'মোক্ষদ্বার' মুক্ত করিতে সেই অমরবাসী 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' উচ্চারিত হইয়া 'গান্ধার হ'তে জলধিশেষ' ছাইয়াছিল, 'আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধজগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর' তাঁহার দেবমূর্ত্তি মানসনয়নে রাখিয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করিলাম—আর রক্তবিমণ্ডিত নিষিদ্ধ মাংসপিণ্ড স্পর্শে লজ্জায় কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত নটরাজ শিবমূর্ত্তি

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে "ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন" পত্রে 'বাঙ্গালায় নটরাজ' শিব সম্পর্কে সামান্যতঃ আলোচনা করিয়াছিলাম। ঐ আলোচনার পর নটরাজ সম্বন্ধে বিবিধ গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া এক বিক্রমপুর হইতেই পাঁচটি নটরাজ শিবের সন্ধান পাইয়াছি। আমার বিশ্বাস যে, বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানেও অনুসন্ধান করিলে নটরাজ শিবের সন্ধান মিলিতে পারে।

এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নটরাজ শিবের পূজা প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের ত কথাই নাই। বাঙ্গালাদেশেও যে এক সময়ে নটরাজ শিবের পূজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, আমার আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলি হইতে তাহা আংশিকরূপে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে। বাঙ্গালাদেশে কোন্ সময়ে নটরাজ শিবের পূজার প্রচলন হয় তাহার ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য। আমরা এ প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব। ঐতিহাসিক আলোচনার পূর্ব্বে পৌরাণিক কাহিনীর সহিত পাঠক-সাধারণকে পরিচিত করিয়া লওয়া ভাল। এজন্যই সর্ব্বাগ্রে পৌরাণিক কথা বলিতেছি। মৎস্যপুরাণ, শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ, ও স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি পুরাণ-গ্রন্থে নটরাজ শিব সম্পর্কে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। 'কালিকাপুরাণে' শিবের নাম কেন নটরাজ হইল তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, যথা—

'নদীশত সমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্।
তস্য পীঠস্য বায়ব্যানৈসত্যাং মধ্যভাগতঃ॥
ঐশান্যাঞ্চ তথাগ্নেয্যাং মধ্যে পার্শ্বে শঙ্করঃ।
স্বমাশ্রমপদং কৃত্বা ষট্‌সু স্থানেষু শোভনম্॥
নিত্যং বসতি তত্রাপি পার্ব্বত্যা সহ * *
মধ্যে দেবীগৃহং তত্র তদধীনস্তু শঙ্করঃ॥
নীলাখ্যে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে পার্ব্বতী তত্র তিষ্ঠতি।
ঐশান্যাং নাটকে শৈলে শঙ্করস্য মহাশ্রমঃ॥
নিত্যং বসতি তত্রেশস্তদধীনা চ পার্ব্বতী॥
তত্রাস্তি সরসী রম্যা সুসম্পূর্ণমনোহরা।
সর্ব্বদা স্বচ্ছসলিলা প্রফুল্লকমলোৎপলা॥
তস্যাস্তীরে তু বিপুলঃ সুমনোজ্ঞো হরাশ্রমঃ।
সর্ব্বদা দানবৈর্দেবৈঃ কিন্নরৈঃ প্রমথৈস্তথা॥
রক্ষ্যতে নৃপশার্দ্দূল নৃত্যবাদনতৎপরৈঃ।
যস্মান্নটতি তত্রেশো নিত্যং কৌতুকতৎপরঃ॥
তস্মান্নাটকনাম্নাসৌ শৈলরাজঃ প্রগীয়তে।
ছত্রকারস্তুতং শৈলং মনোজ্ঞং শঙ্করপ্রিয়ম্॥

দ্বাদশভুজ নটরাজ শিবমূর্ত্তি (রাণীহাটিতে প্রাপ্ত)

"নাটকশৈলে চিরনির্ম্মল সলিলপূর্ণ প্রফুল্ল কমল-কুল বিরাজিত, সুদীর্ঘ পরম রমণীয় একটি সরোবর আছে, তাহার তীরেই প্রশস্ত অতি মনোহর এক মহাশ্রম দেখিতে পাইবে। হে নরশার্দ্দূল! সেইখানে দেব দানব কিন্নর প্রমথাদি সর্ব্বদা নৃত্য ও বাদ্য করিতেছেন। ইঁহাদিগের নৃত্যবাদনাদিহেতুক মহাদেবও সে স্থলে কৌতুকপর হইয়া নিত্যই নৃত্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের নটন হেতুই সেই আশ্রম নাটক-শৈল নামে পরিচিত হইয়াছে। এই নাটক-শৈল, ছত্রাকার শঙ্করপ্রিয় ও সুদৃশ্য।" মহাদেব

এইরূপ নৃত্য করিয়া থাকেন বলিয়াই তিনি নটেশ, নর্ত্তকেশ্বর, নটরাজ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার এইরূপ নৃত্যের নাম তাণ্ডব। হাভেল সাহেব নটরাজ-মূর্ত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"Siva, as the supreme deity of the saivaites, is generally known as Mahadeva, the Great God. In sculpture he appears sometimes as the great Yogi, wrapt in meditation like the Buddha, sometimes in terrific aspect as Bhairava. One of the most inspired conceptions of Hindu art is that of Siva as the Universal Lord, or the soul, if the Universe manifesting itself in matter, in his mystic dance of creation, which He makes, controls, destroys and renews at will."

বিক্রমপুর রাণীহাটিতে প্রাপ্ত বরাহাবতার মূর্ত্তি।

নটরাজ শিবের মূর্ত্তি দশভুজ, দ্বাদশভুজ এবং অষ্টাদশ-ভুজ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা বিক্রমপুরে এ পর্য্যন্ত দশভুজ ও দ্বাদশভুজ এই উভয় শ্রেণীর মূর্ত্তিই দেখিতে পাইয়াছি। 'মৎস্যপুরাণে' ও 'কালিকাপুরাণে' নটরাজের মূর্ত্তি দশভুজ হইবে এইরূপ লিখিত আছে। যথা,—'নৃত্যান্ দশভুজঃ কার্য্যো গজচর্ম্মধরস্তথা' অর্থাৎ তিনি (মহাদেব) যখন বৃষারূঢ় হইয়া নৃত্যাভিনয়ে নিযুক্ত থাকিবেন তখন তাঁহার গজচর্ম্মযুক্ত দশভুজ জানিবে।' ধ্যানেও দশভুজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

ধ্যানং বক্ষ্যামি শৃণুতং * * *
'পঞ্চ বক্ত্রং মহাকায়ং জটাজুটবিভূষিতম্।
চারুচন্দ্রকলাযুক্তং মূর্দ্ধ্নি বালৌঘভূষিতম্॥
বাহুভির্দশভির্যুক্তং ব্যাঘ্রচর্ম্মবরাম্বরম্।
কালকূটধরং কণ্ঠে নাগহারোপশোভিতম্॥
কিরীটবন্ধনং বাহুভূষণঞ্চ ভুজঙ্গমান্।
বিভ্রতং সর্ব্বগাত্রেষু জ্যোৎস্নার্পিতসুরোচিষম্॥
ভূতিসংলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গমেকৈক স্ত্রিত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
নেত্রৈস্ত পঞ্চদশভির্জ্যোতিস্মিদ্ভির্বিরাজিতম্।
বৃষভোপরি সংস্থস্ত গজকৃত্তিপরিচ্ছদম্॥
সদ্যোজাতং বামদেবমঘোর বক্তৃততঃপরম্।
তৎপুরুষং তথেশানং পঞ্চবক্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥
সদ্যোজাতং ভবেচ্ছুক্লং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্।
পীতবর্ণং তথা সৌম্যং বামদেবং মনোহরম্॥
নীলবর্ণমঘোরস্ত দংষ্ট্রাভীতিবিবর্দ্ধনম্।
রক্তং তৎপুরুষং দেবং দিব্যমূর্ত্তিং মনোহরম্॥
শ্যামলঞ্চ তথেশানং সর্ব্বদৈবশিবাত্মকম্।
চিন্তয়েৎ পশ্চিমেত্বাদ্যং দ্বিতীয়ন্তু তথোত্তরে।
অঘোরং দক্ষিণে দেবং পূর্ব্বে তৎপুরুষং তথা॥
ঈশানং মধ্যতোজ্ঞেয়ং চিন্তয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ।
শক্তিত্রিশূলখট্বাঙ্গবরদাভয়দং শিবম্॥
দক্ষিণেষথ হস্তেষু বামেষ্বপি ততঃ শুভম্।
অক্ষসূত্রং বীজপুরং ভুজঙ্গডমরূৎপলম্॥
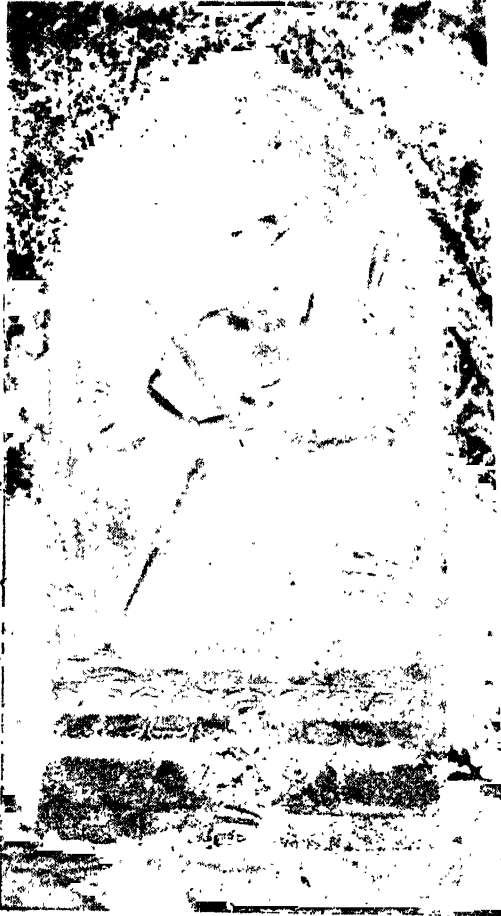
অষ্টৈশ্বর্য্যসমাযুক্তং ধ্যায়েত্তু হৃদগতং শিবম্।
এবং বিচিন্তয়েদ্ধ্যানে মহাদেবং জগৎপতিম্॥

"এক্ষণে ধ্যান বলি, শ্রবণ কর। পঞ্চমুখ, মহাকায়, জটাজুট-বিভূষিত, চারুচন্দ্রকলাশোভী, অহিগণপরিবেষ্টিত-মস্তক, দশহস্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী, বিষপূর্ণকণ্ঠ, ফণিভূষণ, এক একটি বক্তে্র তিনটি তিনটি নেত্র; অতএব পঞ্চদশ নেত্র-শোভী, ষড়্জ্যোতিঃপূর্ণবৃষবাহন, হস্তিচর্ম্মাচ্ছাদিত। তাঁহার পাঁচটি মুখের নাম,—সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, ঈশান। (এই পঞ্চমুখের স্বরূপ কথন) নির্ম্মল স্ফটিক সদৃশ সদ্যোজাত। বামদেব পীতবর্ণ অথচ সৌম্য ও মনোহর। অঘোর, নীলবর্ণ ভয়জনক দন্তবিশিষ্ট। তৎপুরুষ রক্তবর্ণ দেবমূর্ত্তি ও মনোরম। ঈশান, শ্যামবর্ণ নিত্য শিবরূপী। পশ্চিমদিকে সদ্যোজাত, উত্তরে বামদেব, দক্ষিণে অঘোর, পূর্ব্বে তৎপুরুষ সর্ব্ব মধ্যে ঈশান, এইরূপ ক্রমে ভক্তির সহিত ধ্যান করিবে। দক্ষিণদিকের পাঁচ হস্তে শক্তি, ত্রিশূল, খট্বাঙ্গ, বরদ, অভয় এই পাঁচটি রহিয়াছে। বামদিকের পাঁচ হস্তে অক্ষসূত্র, বীজপুর, ভুজঙ্গ, ডমরু, উৎপল এই পাঁচটি রহিয়াছে। অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যযুক্ত মহাদেবের এইরূপ মূর্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করিবে।" ঠিক্ এই ধ্যানের অনুরূপ একটি সুবৃহৎ নটরাজ-মূর্ত্তি রামপালের কোনও এক কৃষকের বাড়ীতে মৃত্তিকা-খননে পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমার নিকট সে মূর্ত্তির আলোকচিত্র প্রস্তুত না থাকায় এ সঙ্গে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আমরা এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে নটরাজ-মূর্ত্তিটির চিত্র প্রকাশ করিলাম, ইহা বিক্রমপুর আউটসাহী গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ গুপ্ত বি, এ, মহাশয়ের বাড়ীতে আছে। উক্ত গ্রামের 'রাণীহাটি' নামক পল্লীর একটি প্রাচীন পুষ্করিণী খনন করিবার সময় এই মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছিল। এ নটরাজ শিবমূর্ত্তিটি দ্বাদশভুজযুক্তা মূর্ত্তির উর্দ্ধাংশে বক্রাকারে বিবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত। নটনাথ তাঁহার শিরোপরি নাগরাজকে ধনুকাকারে ধারণ করিয়াছেন। উহা অর্দ্ধ নর ও অর্দ্ধ সর্পাকারে খোদিত। মহাদেবের তাণ্ডব-নর্ত্তনে তাঁহার বিরাট্ জটা উর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত, সে ব্যোমকেশ, ব্যোমকেশ আবার উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত দ্বিভুজ দ্বারা ধারণ করিয়াছেন। পদদ্বয় নর্ত্তন-ভঙ্গীতে খোদিত। দক্ষিণদিকের প্রথম হস্তে জটাধৃত, দ্বিতীয় হস্তের করাঙ্গুলি তানপুরাবাদনে নিযুক্ত, তৃতীয় হস্তে পরশু, চতুর্থ হস্তে অক্ষসূত্র, পঞ্চম হস্তে বীজপুর, ষষ্ঠ হস্তে অভয়-মুদ্রা; আর বামদিকের প্রথম হস্ত দ্বারা জটাধৃত, দ্বিতীয় হস্তের করাঙ্গুলি তানপুরা বাদননিরত, তৃতীয় হস্তে ত্রিশূল, চতুর্থ হস্তে ভুজঙ্গ, পঞ্চম হস্তে ডমরু, ষষ্ঠ হস্তে অমৃত-ভাণ্ড। মহাদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে মকরবাহনা গঙ্গা, হস্তে সুধার কলসী। বামদেবের বামপার্শ্বে উমা। উমা সিংহবাহিনী। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দর্পণ, বাম করে সম্পুটক। পদনিম্নে বৃষ। বৃষ গ্রীবা উত্তোলন করিয়া দেবাদিদেবের নৃত্য ও সঙ্গীত উপভোগ করিতেছে। পাদপীঠে ভক্তগণ ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য সম্ভারে অর্চ্চনানিরত। মহাদেবের কণ্ঠভূষণ বলয়, কর্ণভূষা মুকুট ইত্যাদি ভাস্করের কলা-নৈপুণ্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বিক্রমপুর রাণীহাটিতে প্রাপ্ত গণেশমূর্ত্তি।

যে স্থানে এই মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছিল, সে স্থানের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আউটসাহীগ্রাম রামপালের অনতিদূরবর্ত্তী গ্রাম। উক্ত গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বলুই নামক পল্লীর একটি স্থান 'রাণীহাটি' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। কেন এ স্থানের নাম রাণীহাটি হইল সে বৃত্তান্ত এখন সম্পূর্ণ অন্ধতমসাচ্ছন্ন, বহু চেষ্টাতেও তেমন প্রমাণোপযোগী কোন বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এ স্থানের একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইলে একযোগে কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলি নানা বিভিন্ন শ্রেণীর ছিল, যেমন, বিষ্ণু, গণেশ, বরাহাবতার, পরশুরাম, নটরাজ ইত্যাদি। এস্থানে বিষ্ণু, বরাহাবতার, গণেশ প্রভৃতি মূর্ত্তির চিত্রও প্রকাশ করিলাম, উহা হইতেই পাঠকবর্গ অনুমান করিতে পারিবেন, প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-ময় রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরের অধিবাসী ভাস্করগণ কিরূপ অনিন্দ্য-সুন্দর দেবমূর্ত্তি গঠন করিতে পারিতেন। এই পুষ্করিণী-খননে একটিও বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই, সব কয়টিই হিন্দুমূর্ত্তি। এখনও রাণীহাটির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির যে কোন স্থান খনন করিলেই প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাজি দেখিতে পাওয়া যায়। কে বলিতে পারে ঐস্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তরে কোন্ অতুল্য রত্নরাজি নিহিত না আছে? আমাদের বিশ্বাস এস্থানে বর্ম্মবংশের কোনও রাণীর প্রতিস্থাপিত দেবমন্দির ও একটি ক্ষুদ্র নগরবৎ পল্লী ছিল—তন্নিবন্ধন অদ্যাপি এস্থান রাণীহাটি নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহা শুধু অনুমান মাত্র, প্রামাণিক কিছুই নহে। অধিকাংশ মূর্ত্তিই বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের বলিয়াই এইরূপ অনুমান করা হইতেছে।

এখন ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করা যা'ক। আমাদের বিশ্বাস সেনরাজগণের সময় হইতেই বঙ্গদেশে বিশেষ তাঁহাদের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে নটরাজ শিবমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত হয়, ইহা শুধু অনুমান নহে কতকটা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে সেনরাজগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিশেষ বিক্রমপুর অঞ্চলে পালরাজ-বংশ, বর্ম্মরাজ-বংশ, রাজা চন্দ্রদেবের বংশ প্রভৃতি বিবিধ রাজ-বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে পাল-বংশ, রাজা চন্দ্রদেবের বংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বিক্রমপুরে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের কিরূপ প্রচার হইয়াছিল বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত ঐ সকল দেবদেবীর মূর্ত্তিসমূহ হইতেই তাহা সুস্পষ্ট সপ্রমাণ হয়। এ পর্য্যন্ত বিক্রম-পুর হইতে দ্বিভুজ লোকেশ্বর, দ্বাদশভুজ লোকেশ্বর, মারীচী, অমোঘশক্তি, ধ্যানিবুদ্ধ, ত্রৈলোক্যবিজয়, চুণ্ডারেষণী, ত্রৈলোক্য মহাভয়ঙ্কর প্রভৃতি বহুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অদ্যাপি বিক্রমপুরের বহুস্থলে বৌদ্ধ মূর্ত্তিসমূহ হিন্দু দেব-দেবী রূপে ভ্রমক্রমে পূজিত হইতেছে। বিক্রম-পুর এক সময় বৌদ্ধগণের অতি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র-স্থল ছিল। ভারত-গৌরব জগৎপূজ্য দীপঙ্কর অতিশশ্রীজ্ঞান বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিক্রম-পুরে বৌদ্ধদিগের একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বিক্রম-পুরে অর্থাৎ শ্রীবিক্রমপুর নামক সুবৃহৎ রাজধানীর সন্নিকটবর্ত্তী বজ্রযোগিনী গ্রামে অতিশশ্রীজ্ঞান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এ কথা যখন আমি মৎপ্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' লিখিয়া-ছিলাম তখন অনেকেই উহা সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, এমন কি আমার গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক পরম শ্রদ্ধাসম্পদ সুহৃদ 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য-চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও লিখিয়াছিলেন "বিক্রমপুর অদ্বিতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি। তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষী তখন ভারতবর্ষে ও তিব্বতে ছিল না। তিনি ৯৮০ খ্রীঃ অব্দে গৌড়ীয় রাজবংশে বিক্রমপুরে জন্ম-গ্রহণ করেন। * * *

তিব্বত হইতে সময় সময় বৌদ্ধগণ দীপঙ্করের জন্মভূমি দর্শনেচ্ছায় বিক্রমপুরে আসিয়া থাকেন। কিন্তু বিক্রমপুরে কোন্ স্থানটি তাঁহার জন্মস্থান তাঁহারা তাহার মীমাংসা বিষয়ে বড়ই গোলযোগে পড়েন। সম্প্রতি * * যোগেন্দ্রবা বজ্রযোগিনীকেই দীপঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের এ বিষয়ে যাথার্থ্য-নির্ণয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত।" এই বিষয়টি লইয়া এবং আমার লিখিত 'বাঙ্গালায় নটরাজ' শীর্ষক প্রবন্ধ লইয়া একটু আন্দোলনের পর দীপঙ্কর অতিশশ্রীজ্ঞানকে আমি কোন্ কোন্ প্রমাণবলে বজ্রযোগিনীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহানুভব পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়

* বিক্রমপুরের ইতিহাস—১৬ পৃষ্ঠা।

যুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং পরে 'বিক্রমপুরের অন্যান্য গ্রাম হইতে আরও কএকটি নটরাজ-মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়া সে বিষয় এবং দীপঙ্কর অতিশশ্রীজ্ঞানের সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় জানিতে চাহিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি আমায় লিখিয়াছেন যে—"I am glad to hear that you have discovered two images of Nataraja from Eastern Bengal. Your discovery confirms my theory that the worship of Nataraja was very common in early times but has almost disappeared from Bengal at the present day. As regards Dipankara, I long ago gave out my view that he was a native of *Vajrajogini* in Vikrampur. He flourished during the reign of the Pal kings and belonged to the Vajra sect of the Mahajan Buddhists. That sect still exists in Tibet. Their Tantrik practice called Mahasiddhi requires the company of women called Yoginis. * * There Lamas from Tibet came to invite Dipankara at Vikrampur where they resided for two years. *There was a Buddhist University at Vikrampur.*

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় "ভারতবর্ষের" প্রথম সংখ্যায় 'বুদ্ধগয়া'-শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথমভাগে বুদ্ধদেবের যে চিত্রটি প্রকাশ করিয়াছেন সেই মূর্ত্তিটির চিত্র 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনের' প্রথম বর্ষে 'বিক্রমপুরে বৌদ্ধপ্রভাব'-শীর্ষক প্রবন্ধের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহা বজ্রযোগিনী গ্রামের একটি পুষ্করিণী-খননে পাওয়া গিয়াছিল।

বিক্রমপুর হইতে আরও দু'টি ধ্যানিবুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছি। তন্মধ্যে একটি মূর্ত্তি রামপালের নিকটবর্ত্তী মহাকালী নামক গ্রামের একটি বহুপ্রাচীন পুষ্করিণী-খননে পাওয়া গিয়াছিল। এই মূর্ত্তিটির শীর্ষদেশে মহাবোধি-মন্দিরের অনু-কৃতি গঠিত। মূর্ত্তিটি নীলপ্রস্তরে গঠিত। উহা যে ভাস্কর্য্যের অনিন্দ্যসুন্দর আদর্শ পাঠকবর্গ চিত্র হইতেই তাহার আভাষ পাইবেন। 'ধান ভাঙ্গিতে অনেকটা শিবের গীত' গায়িয়া ফেলিয়াছি। এখন পুনরায় নটরাজ শিবসম্বন্ধেই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই।

বৌদ্ধ রাজা চন্দ্রদেবের অভ্যুদয় সেন রাজবংশের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয়, এ বিষয়ে এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুযোগ হয় নাই, কারণ বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্, এ মহোদয় অতি অল্পদিন হইল বিক্রমপুর পঞ্চসার হইতে রাজা চন্দ্রদেবের একখানা তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়া 'সাহিত্য'-পত্রে তাঁহার পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। কেবলমাত্র একখানা তাম্রশাসনের উপর নির্ভর করিয়া কোনও একটা রাজবংশ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন নহে।

তাম্রশাসন-লিখিত বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেনরাজগণ সম্রাট্ প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য হইতে গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। এই বংশের এ পর্য্যন্ত যত তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক তাম্রশাসনই তাঁহাদের বিজয়-শ্রী-মণ্ডিত প্রিয়তম স্কন্ধাবার (রাজধানী) শ্রীবিক্রমপুর হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। সেনবংশের প্রথম প্রকৃত রাজা বিজয় সেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লালসেন। বল্লালসেনই সেনবংশীয় রাজন্যবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সীতাহাটি গ্রামে প্রাপ্ত বল্লালসেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনের উপরিভাগে সদাশিবের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। উক্ত তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই লিখিত আছে :—

১। "ওঁ নমঃ শিবায়॥ সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সন্নিধান-বিলসন্নান্দী-নিনাদোর্ম্মিভিনির্ম্মর্য্যাদর।

২। সার্দ্ধবো দিশতু বঃ শ্রেয়োঽর্দ্ধ নারীশ্বরঃ। ইত্যাদি। সেন রাজগণের প্রত্যেক তাম্রশাসনেই সর্ব্বাগ্রে দেবাদিদেবমাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন জীবনের শেষভাগে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বন করিলেও জীবনের প্রথমভাগে যে পিতা ও পিতামহের ন্যায় শিবভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতেই সপ্রমাণ হয়। সেনরাজগণ শৈব ছিলেন, অতএব তাঁহারা

নটরাজ শিবের পূজা বঙ্গদেশে প্রচলন করিয়াছিলেন, ইহা স্বাভাবিক। আমাদের এ উক্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রমাণ-সমূহ উপস্থাপিত করিতেছি।

রাণীহাটিতে প্রাপ্ত বিরাট্‌-বিষ্ণুমূর্ত্তি

১। দাক্ষিণাত্যে বহুদিন হইতেই নটরাজ শিব-পূজার প্রথা প্রচলিত। অদ্যাপি তথায় নটরাজ শিবের পূজা হয়। দাক্ষিণাত্যের বাদামীগুহার (১নং) বহির্ভাগে শিব-তাণ্ডবের যে খোদিত মূর্ত্তি আছে তাহার সহিত আমাদের প্রকাশিত নটরাজ-মূর্ত্তির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। ঐ গুহা খ্রীঃ ৫৭৫ হইতে ৬৮০ খ্রীঃ অঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ফার্গুসন-প্রমুখ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। * সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন, অতএব তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে-বিশেষরূপে প্রচলিত নটরাজ শিবের পূজা বঙ্গ-দেশে বিশেষ স্বীয় রাজধানী ও রাজ্য মধ্যে বিশেষরূপে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

২। বিক্রমপুরে 'নাটেশ্বর' নামক গ্রামে এখনও একটি অত্যুচ্চ দেউলবাড়ী আছে। বিক্রমপুরের অন্য কোথাও এত বড় দেউল-বাড়ী নাই। 'নটরাজ-মূর্ত্তি' প্রতিস্থাপিত ছিল বলিয়াই এ স্থানের নাম নাটেশ্বর হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত। এ পর্য্যন্ত এখান হইতে কেবল-মাত্র বিষ্ণুমূর্ত্তিই আবিষ্কৃত হইয়াছে—সম্প্রতি আমি এ স্থান হইতে একটি ক্ষুদ্র নটরাজমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছি। মূর্ত্তিটি অর্দ্ধভগ্ন—আমার নিকটেই আছে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্, এ মহাশয় অনুমান করেন, নাটেশ্বরের দেউলবাড়ী পূর্ব্বে বর্ম্মরাজগণের সময় ইহা বিষ্ণু-মন্দির ছিল, পরে সেনরাজগণ উহা শৈব-মন্দিরে পরিণত করেন। আমরা ইহা বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে অসমর্থ। সে যাহা হউক এক সময়ে বিক্রমপুরে নটরাজ শিব-পূজা যে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল তাহা এই নাটেশ্বরের দেউলবাড়ী হইতেই সপ্রমাণ হয়। এই সুবৃহৎ দেউলবাড়ীটি খনন করিলে বহু পুরাতত্ত্বের অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যাদি আবিষ্কারের আশা করা যায়।

৩। এ পর্য্যন্ত বিক্রমপুর ব্যতীত বঙ্গ-দেশের অন্যত্র মাত্র ২।১টি নটরাজ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এরূপ শ্রুত আছি। শ্রীবিক্রমপুর সেনরাজগণের রাজধানী ছিল বলিয়াই বিক্রমপুর হইতে যতগুলি নটরাজ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বঙ্গদেশের অন্য কোথাও তাহা হয় নাই। বর্ম্মরাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই বিক্রমপুরে বহু বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। যে রাজবংশ যে ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাঁহারা তদনুযায়ী স্বীয় ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাল-রাজগণ ও রাজা চন্দ্রদেব বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া বিক্রমপুরে যেরূপ বিবিধ বৌদ্ধদেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ

* প্রবাসী পৌষ ১৩২০ বাদামীগিরিগুহা-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রাজবংশ বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া বহু বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং রাজগণ শৈব ছিলেন বলিয়া বহু বিরাট্ শিবলিঙ্গ এবং দেবের বিবিধ প্রকারের মূর্ত্তি, বিক্রমপুরের নানাগ্রামে হয়।

৪। সেনরাজগণ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বঙ্গ-শে প্রকৃতভাবে আগমন করেন। অতএব সেই সময় তেই বঙ্গদেশে নটরাজ-মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত হইয়াছিল রূপ অনুমান করা যাইতে পারে এবং তাহাই প্রামাণ্য লিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে বিশেষরূপ আপত্তির কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বল্লালসেন যে অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন তাহা তাঁহার তাম্রশাসনে লিখিত শ্লোক হইতেই জানিতে পারা যায়। আমরা বিক্রমপুর হইতে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্দ্ধ-ভগ্ন অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তিও আবিষ্কার করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের অন্য কোন স্থান হইতে কোন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। আমার আবিষ্কৃত এ মূর্ত্তির বিস্তৃত পরিচয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। ঐ মূর্ত্তির পরিচয় প্রদানকালে শ্রীবিক্রমপুরই যে সেনরাজগণের প্রধান রাজধানী ছিল তাহাও সপ্রমাণ করিব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

আঁধারে

সারা দিন গৃহ-কোণে মগ্ন হ'য়ে স্বার্থ-চিন্তা মাঝে,
নিরত ছিলাম শুধু সংসারের শত মিথ্যা কাজে।
সন্ধ্যা যবে ঘনাইয়া এল ধীরে, চমকি' তখন
সর্ব্ব চিন্তা পরিহরি' কর্ম্ম-ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে
অন্ধকার সৌধ-ছাদে একা আসি' করিনু শয়ন।
—তিমিরে আচ্ছন্ন চারিধার!

ঊর্দ্ধে দেখিলাম চেয়ে—
অনন্ত অম্বর-পটে কি বিরাট্, প্রশান্ত মহিমা;
সংখ্যাহীন তারাপুঞ্জ দীপ্যমান একি দিব্য তেজে!
কি মহান্, মৌন দৃশ্য,—বিস্ময়ের নাহি আর সীমা!
এহি দীন, স্বার্থ-লিপ্সু, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, মূঢ় হৃদয়ে যে
এল আজি অসীমের অনুপম অমৃত-সংবাদ!
শিহরিয়া উঠিলাম লভি' এহি শুভ আশীর্ব্বাদ।

এত লোক নিখিল-নিলয়ে? এত দীর্ঘ জীবনের গতি?
কোন্ টানে, কা'র পানে ছুটায়েছে অদৃষ্টনিয়তি
এ অখিল ব্রহ্মাণ্ডেরে?

কেন তবে বৃথা অবিরাম
তুচ্ছ সুখ-আশে সদা কাঁদে মূর্খ মানবের হিয়া?
কেন তবে পরস্পরে করে সবে সতত সংগ্রাম
রুধির-রঞ্জিত করি' শ্যাম বিশ্বে, লক্ষ্য বিস্মরিয়া?
আছে যদি জীবনের এ আশার আরো পরিণতি,
কেন তবে এ জগতে এত দ্বন্দ্ব, এত হিংসা-দ্বেষ?
কেন তবু হাহাকার, কেন তরে হেন অধোগতি?

দেহ ওগো জ্যোতির্ম্ময়, এ ভ্রান্তি-তিমির অপসারি';—
পুণ্যপূর্ণ হোক্ পৃথ্বী, নন্দিত হউক নর-নারী!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

বিরাজবৌ

(১)

হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে দুই ভাই নীলাম্বর ও পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী বাস করিত। ও অঞ্চলে নীলাম্বরের মত মড়া পোড়াইতে, কীর্ত্তন গায়িতে, খোল বাজাইতে এবং গাঁজা খাইতে কেহ পারিত না। তাহার উন্নত, গৌরবর্ণ দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল, গ্রামের মধ্যে পরোপকারী বলিয়া তাহার যেমন খ্যাতি ছিল, গোঁয়ার বলিয়া তেমনই একটা অখ্যাতিও ছিল। কিন্তু, ছোট ভাই পীতাম্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। সে খর্ব্বকায় এবং কৃশ। মানুষ মরিয়াছে শুনিলেও তাহার সন্ধ্যার পর গা ছম্ ছম্ করিত। দাদার মত অমন মূর্খও নয়, গোঁয়ারতুমির ধার দিয়াও সে চলিত না। সকাল বেলা ভাত খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া হুগলির আদালতের পশ্চিম দিকের একটা গাছতলায় গিয়া বসিত এবং সমস্ত দিন আর্জ্জি লিখিয়া যা উপার্জ্জন করিত, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সে গুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া ফেলিত। রাত্রে ঘরের দরজা জানালা স্বহস্তে বন্ধ করিত, এবং স্ত্রীকে দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করাইয়া লইয়া তবে ঘুমাইত। আজ সকালে নীলাম্বর চণ্ডীমণ্ডপের একধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহার অনূঢ়া ভগিনী হরিমতি নিঃশব্দে আসিয়া পিঠের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া আন্দাজ করিয়া একহাত তাহার বোনের মাথার উপর রাখিয়া সস্নেহে কহিল, "সকাল বেলাই কান্না কেন দিদি?" হরিমতি মুখ রগড়াইয়া পিঠময় চোখের জল মাখাইয়া দিতে দিতে জানাইল যে, বউদি' গাল টিপিয়া দিয়াছে এবং 'কাণী' বলিয়া গাল দিয়াছে। নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, "তোমাকে কাণী বলে? অমন দুটি চোক থাক্‌তে যে বলে সেই কাণী! কিন্তু, গাল টিপে দেয় কেন?" হরিমতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মিছিমিছি।" "মিছিমিছি? আচ্ছা, চল ত দেখি" বলিয়া বোনের হাত ধরিয়া ভিতরে আসিয়া ডাকিল—"বিরাজ বৌ?"

বড়বধূর নাম বিরাজ। তাহার নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, সকলে বিরাজ-বৌ বলিয়া ডাকিত। এখন তাহার বয়স উনিশ কুড়ি। শাশুড়ীর মরণের পর হইতে সেই গৃহিণী। বিরাজ অসামান্যা সুন্দরী। চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়া আঁতুড়েই মরিয়াছিল, সেই অবধি সে নিঃসন্তান। রান্না ঘরে কাজ করিতেছিল, স্বামীর ডাকে বাহিরে আসিয়া ভাই বোন্‌কে একসঙ্গে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "পোড়ামুখি, আবার নালিশ কত্তে গিয়েছিলি?" নীলাম্বর বলিল, "কেন যাবে না? তুমি 'কাণী' বলেচ, সেটা তোমার মিছে কথা। কিন্তু তুমি গাল টিপে দিলে কেন?"

বিরাজ কহিল, "অত বড় মেয়ে, ঘুম থেকে উঠে চোখে মুখে জল দেওয়া নেই, কাপড় ছাড়া নেই, গোয়ালে ঢুকে বাছুর খুলে দিয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চে। আজ এক ফোঁটা দুধ পাওয়া গেল না। ওকে মারা উচিত।"

নীলাম্বর বলিল, "না। ঝিকে গয়লা বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু, তুমি দিদি, হঠাৎ বাছুর খুলে দিতে গেলে কেন? ও কাজটাত তোমার নয়।"

হরিমতি দাদার পিছনে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আমি মনে করেচি দুধ দোয়া হয়ে গেছে।" "আর কোন দিন মনে ক'র" বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, "তুমিও এক দিন ওর বয়সে মায়ের পাখী উড়িয়া দিয়েছিলে। খাঁচার দোর খুলে দিয়ে মনে করেছিলে খাঁচার পাখী উড়তে পারে না। মনে পড়ে?" বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসি-মুখে বলিল, "পড়ে; কিন্তু, ও বয়সে নয়—আরও ছোট ছিলাম" বলিয়া কাজে চলিয়া গেল।

হরিমতি বলিল, "চল না দাদা বাগানে গিয়ে দেখি আম পাক্‌ল কি না!

"তাই চল দিদি!"

যদু চাকর ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, "নারাণ ঠাকুরদা ব'সে আছেন।" নীলাম্বর একটু অপ্রতিভ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এর মধ্যেই এসে ব'সে আছেন?" রান্নাঘরের ভিতর হইতে বিরাজ এ কথা শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া

চাইয়া বলিল—"যেতে ব'লে দে খুড়োকে।" স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "সকাল বেলাতেই যদি ওসব খাবে ত আমি মাথা খুঁড়ে মরব। কি সব হচ্ছে আজ কাল!" নীলাম্বর জবাব দিল না, নিঃশব্দে ভগিনীর হাত ধরিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া বাগানে চলিয়া গেল।

এই বাগানটির এক প্রান্ত দিয়া শীর্ণকায়া সরস্বতী নদীর দৃঢ় স্রোতটুকু গঙ্গাযাত্রীর শ্বাস প্রশ্বাসের মত বহিয়া যাইতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ শৈবালে পরিপূর্ণ; শুধু মাঝে মাঝে গ্রামবাসীরা জল আহরণের জন্য কূপ খনন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারই আশে পাশে শৈবালমুক্ত গভীর জলদেশের বিভক্ত শুক্তিগুলি স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া অসংখ্য মাণিক্যের মত সূর্য্যালোকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তীরে একখণ্ড কাল পাথর সমীপস্থ সমাধিস্তূপের প্রাচীরগাত্র হইতে কোন্ এক অতীত দিনের বর্ষার খরস্রোতে স্খলিত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীর বধূরা প্রতিসন্ধ্যায় তাহারই একাংশে মৃতাত্মার উদ্দেশে দীপ জ্বালিয়া দিয়া যাইত। সেই পাথরখানির একধারে আসিয়া নীলাম্বর ছোট বোন্‌টির হাত ধরিয়া বসিল। নদীর উভয় তীরেই বড় বড় আমবাগান এবং বাঁশ ঝাড়, দুই একটা বহুপ্রাচীন অশ্বত্থ, বট, নদীর উপর পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া শাখা মেলিয়া দিয়াছে। ইহাদের মাথায় কতকাল কত পাখী নিরুদ্বেগে বাসা বাঁধিয়াছে, কত শাবক বড় করিয়াছে, কত ফল খাইয়াছে, কত গান গাহিয়াছে; তাহারই ছায়ায় বসিয়া ভাই বোন ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ হরিমতি দাদার ক্রোড়ের কাছে আরও একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, "আচ্ছা, দাদা, বৌদি' কেন তোমাকে বোষ্টম ঠাকুর ব'লে ডাকে?" নীলাম্বর গলায় তুলসীর মালা দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, "আমি বোষ্টম ব'লেই ডাকে।"

হরিমতি অবিশ্বাস করিয়া বলিল—"যাঃ—তুমি কেন বোষ্টম হবে? তারা ত ভিক্ষে করে। আচ্ছা, ভিক্ষে কেন করে দাদা?" "নেই ব'লেই করে।" হরিমতি দাদার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু নেই। তাদের ঘর নেই, বাগান নেই, ধানের গোলা নেই—কিচ্ছুটি নেই?" নীলাম্বর সস্নেহে হাত দিয়া বোন্‌টির মাথার চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া বলিল—"কিচ্ছুটি নেই দিদি, কিচ্ছুটি নেই—বোষ্টম হলে কিচ্ছুটি থাক্‌তে নেই।" হরিমতি বলিল—"তবে, সবাই কেন তাদের কিছু কিছু দেয় না?" নীলাম্বর বলিল, "তোর দাদাই কি তাদের দিয়েছে রে?"

"কেন দাওনা দাদা, আমাদের ত এত আছে।"

নীলাম্বর সহাস্যে বলিল, "তবুও তোর দাদা দিতে পারে না। কিন্তু, তুই যখন রাজার বউ হবি দিদি, তখন দিস্।" হরিমতি বালিকা হইলেও কথাটায় লজ্জা পাইল। দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "যা।—" নীলাম্বর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিল। মা বাপ মরা এই ছোট বোন্‌টিকে সে যে কত ভালবাসিত তাহার সীমা ছিল না। তিন বছরের শিশুকে বড় বউ-ব্যাটার হাতে সঁপিয়া দিয়া তাহাদের বিধবা জননী সাত বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করেন। সেই দিন হইতে নীলাম্বর ইহাকে মানুষ করিয়াছে। সমস্ত গ্রামের রোগীর সেবা করিয়াছে, মড়া পোড়াইয়াছে, কীর্ত্তন গাহিয়াছে, গাঁজা খাইয়াছে; কিন্তু জননীর শেষ আদেশটুকু এক মুহূর্ত্তের জন্য অবহেলা করে নাই। এমনই করিয়া বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিল বলিয়াই, হরিমতি মায়ের মত অসঙ্কোচে দাদার বুকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অদৃশ্যে পুরাতন ঝির গলা শুনা গেল। পুঁটি, "বউমা ডাক্‌চেন, দুধ খাবে এস।" হরিমতি মুখ তুলিয়া মিনতির স্বরে বলিল, "দাদা, তুমি ব'লে দাও না, এখন দুধ খাব না।"

"কেন খাবে না দিদি?" হরিমতি বলিল, "এখনও আমার একটুও ক্ষিদে পায়নি।" নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, "সে আমি যেন বুঝলুম, কিন্তু, যে গাল টিপে দেবে সেই বুঝবে না।" দাসী অলক্ষ্যে থাকিয়া আবার ডাক দিল, "পুঁটি!" নীলাম্বর তাহাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া দিয়া বলিল, "যা, তুই কাপড় ছেড়ে দুধ খেয়ে আয় বোন্, আমি ব'সে আছি।

হরিমতি অপ্রসন্ন-মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সেইদিন দুপুরবেলা বিরাজ স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমিই ব'লে

দাও, আমি কি দিয়ে রোজ রোজ তোমার পাতে ভাত দি? তুমি এ খাবে না, ও খাবে না, সে খাবে না —শেষ কালে কি না মাছ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলে!"

নীলাম্বর খাইতে বসিয়া বলিল—"এই ত, এত তরকারি হয়েচে।"

"এ ত কত? ঐ থোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড়! এ দিয়ে কি পুরুষ মানুষ খেতে পারে? এ সহর নয়, যে সব জিনিস পাওয়া যাবে;—পাড়া-গাঁ, এখানে সকলের মধ্যে ঐ পুকুরের মাছ—তাও কি না তুমি ছেড়ে দিলে? পুঁটি, কোথায় গেলি? বাতাস করবি আয়—সে ত হবেনা—আজ যদি একটি ভাত প'ড়ে থাকে ত তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।" নীলাম্বর হাসিমুখে নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল। বিরাজ রাগিয়া বলিল, "কি হাস, আমার গা' জ্বালা করে! দিন দিন তোমার খাওয়া ক'মে আস্‌ছে—সে খবর রাখ? গলায় হাড় বেরোবার যো হচ্চে, সে দিকে চেয়ে দেখ?"

নীলাম্বর বলিল, "দেখেচি, ও তোমার মনের ভুল।" বিরাজ কহিল—"মনের ভুল? তুমি গুণে একটি ভাত কম খেলে আমি ব'লে দিতে পারি, রতি পরিমাণ রোগা হলে আমি গায়ে হাত দিয়ে ধ'রে দিতে পারি, তা জান? যা ত পুঁটি, পাখা রেখে রান্নাঘর থেকে তোর দাদার দুধ নিয়ে আয়।" হরিমতি একধারে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে সুরু করিয়াছিল, পাখা রাখিয়া দুধ আনিতে গেল। বিরাজ পুনরায় কহিল, "ধম্মকম্ম করবার ঢের সময় আছে। আজ ও বাড়ীর পিসীমা এসেছিলেন; শুনে বল্লেন, এত কম বয়সে মাছ ছেড়ে দিলে চোখের জ্যোতি ক'মে যায়, গায়ের জোর ক'মে যায়—না না সে হবে না—শেষকালে কি হ'তে কি হবে, তোমাকে মাছ ছাড়তে আমি দেব না।" নীলাম্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—"আমার হয়ে তুই বেশী করে খাস্, তা' হলেই হবে।" বিরাজ রাগিয়া গিয়া বলিল, হাড়িকেওরার মত আবার তুইতোকারি!" নীলাম্বর অপ্রতিভ হইয়া গিয়া বলিল,"মনে থাকে না রে। ছেলেবেলার অভ্যাস যেতে চায় না—কত তোর কাণ ম'লে দিয়েচি,মনে আছে?" বিরাজ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "মনে আমার নেই? ছোটটি পেয়ে আমার ওপর কম অত্যাচার করেচ তুমি! বাবাকে লুকিয়ে মাকে লুকিয়ে আমাকে দিয়ে তুমি কম তামাক সাজিয়েছ! কম সয়তান লোক তুমি!" নীলাম্বর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"আজও সেই সব মনে আছে? কিন্তু, তখন থেকেই তোকে ভাল বাসতাম।" বিরাজ হাসি চাপিয়া বলিল, "জানি। চুপ কর, পুঁটি আস্‌চে।" হরিমতি দুধের বাটী পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। বিরাজ উঠিয়া গিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া স্বামীর সন্নিকটে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমাকে পাখাটা দে পুঁটি—যা তুই খেল্‌গে যা—" পুঁটি চলিয়া গেলে বিরাজ বাতাস করিতে করিতে বলিল, "সত্যি বল্‌চি—অত ছোটবেলায় বিয়ে হওয়া ভাল নয়।" নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিল,"কেন নয়? আমি ত বলি মেয়েদের খুব ছোটবেলায় বিয়ে হওয়াই ভাল।" বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল—"না। আমার কথা আলাদা, কেন না, আমি তোমার হাতে পড়েছিলাম। তা ছাড়া, আমার দুষ্টু বজ্জাত যা ননদ ছিল না—আমি দশ বছর বয়স থেকেই গিন্নী। কিন্তু, আর পাঁচজনের ঘরেও দেখ্‌চি ত। ঐ যে ছোটবেলা থেকে বকাঝকা মারধোর সুরু হয়ে যায়—শেষে বড় হলেও সে দোষ ঘোচে না—বকাঝকা থামে না। সেই জন্যেই ত আমি আমার পুঁটির বিয়ের নামটি করিনে—নইলে, পরশুও রাজেশ্বরীতলার ঘোষালদের বাড়ী থেকে ঘট্‌কী এসেছিল। সর্ব্বাঙ্গে গয়না—হাজার টাকা নগদ—তবুও আমি বলি, না, আরও দুবছর থাক্।" নীলাম্বর মুখ তুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তুই কি পণ নিয়ে মেয়ে বেচ্‌বি না কি রে!" বিরাজ বলিল,"কেন নেব না? আমার একটা ছেলে থাক্‌লে টাকা দিয়ে মেয়ে ঘরে আন্‌তে হ'ত না? আমাকে তোমরা তিনশ টাকা দিয়ে কিনে আননি? ঠাকুর পোর বিয়েতে পাঁচশ টাকা দিতে হয়নি? না না, তুমি আমার ও সব কথায় থেক না—আমাদের যা নিয়ম, আমি তাই করব।" নীলাম্বর অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমাদের নিয়ম মেয়ে বেচা—এ খবর কে তোকে দিলে? আমরা পণ দি' বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে এক পয়সাও নিইনে—আমি পুঁটিকে দান করব।"

বিরাজ স্বামীর মুখ চোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,"আচ্ছা আচ্ছা, তাই ক'র—এখন

খাও—ছুতো ক'রে যেন উঠে যেও না।" নীলাম্বরও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—"আমি বুঝি ছুতো ক'রে উঠে যাই?" বিরাজ কহিল—"না—এক দিনও না। ও দোষটি তোমার শত্তুরেও দিতে পারবে না। এ জন্যে কতদিন যে আমাকে উপোস ক'রে কাটাতে হয়েচে, সে ছোট বৌ জানে। ও কি, খাওয়া হয়ে গেল না কি?" বিরাজ ব্যস্ত হইয়া পাখাটা ফেলিয়া দিয়া দুধের বাটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"মাথা খাও, উঠ না—ও পুঁটি শীগ্‌গীর যা—ছোট বোয়ের কাছ থেকে দুটো সন্দেশ নিয়ে আয়—না না, ঘাড় নাড়লে হবে না—তোমার কখ্‌খন পেট ভরেনি—মাইরি বল্‌চি, আমি তা' হ'লে ভাত খাব না—কাল রাত্তির একটা পর্য্যন্ত জেগে সন্দেশ তৈরি করেচি।" হরিমতি একটা রেকাবিতে সবগুলো সন্দেশ লইয়া ছুটিয়া আসিয়া পাতের কাছে রাখিয়া দিল। নীলাম্বর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমিই বল, এতগুলো সন্দেশ এখন খেতে পারি?" বিরাজ মিষ্টান্নের পরিমাণ দেখিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল—গল্প কর্‌তে কর্‌তে অন্যমনস্ক হয়ে খাও—পারবে।" "তবু খেতে হবে?" বিরাজ কহিল—"হাঁ। হয়, মাছ ছাড়তে পাবে না, না হয়, এ জিনিসটা একটু বেশী ক'রে খেতেই হবে।" নীলাম্বর রেকাবীটা টানিয়া লইয়া বলিল, "তোর এই খাবার জুলুমের ভয়ে ইচ্ছে করে বনে গিয়ে ব'সে থাকি।" পুঁটি বলিয়া উঠিল—"আমাকেও দাদা—" বিরাজ ধমক দিয়া উঠিল—"চুপ কর্‌ পোড়ামুখি—খাবি নে ত বাঁচ্‌বি কি ক'রে? এই নালিশ করা বেরুবে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে।"

(২)

মাস দেড়েক পরে, পাঁচ দিন জ্বর-ভোগের পর আজ সকাল হইতে নীলাম্বরের জ্বর ছিল না। বিরাজ বাসি কাপড় ছাড়াইয়া, স্বহস্তে কাচা কাপড় পরাইয়া দিয়া মেঝেয় বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছিল। নীলাম্বর জানালার বাহিরে একটা নারিকেল বৃক্ষের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। ছোট বোন হরিমতি কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিল। অনতিকাল পরেই স্নান করিয়া বিরাজ সিক্ত চুল পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া ঘরে ঢুকিল। সমস্ত ঘর যেন আলো হইয়া উঠিল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ও কি?" বিরাজ বলিল, "যাই, বাবা পঞ্চানন্দের পুজো পাঠিয়ে দিইগে"—বলিয়া শিয়রের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত দিয়া স্বামীর কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, "না, জ্বর নেই। জানিনে এ বছর মার মনে কি আছে। ঘরে ঘরে কি কাণ্ড যে সুরু হয়েছে—আজ সকালে শুন্‌লাম আমাদের মতি মোড়লের ছেলের সর্ব্বাঙ্গে মা'র অনুগ্রহ হয়েচে—দেহে তিল রাখ্‌বার স্থান নেই।" নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মতির কোন্‌ ছেলের বসন্ত দেখা দিয়েচে?" "বড় ছেলের। মা শীতলা, গা ঠাণ্ডা কর মা!—আহা ঐ ছেলেই ওর রোজগারী। গেল শনিবারের শেষ রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ তোমার গায়ে হাত পড়ায় দেখি, গা' যেন পুড়ে যাচ্চে। ভয়ে বুকের রক্ত কাঠ হয়ে গেল। উঠে ব'সে অনেকক্ষণ কাঁদলুম, তার পরে মানস করলুম, মা শীতলা, ভাল যদি কর মা, তবেই ত তোমার পুজো দিয়ে আবার খাব দাব, না হলে অনাহারে প্রাণত্যাগ করব" বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া দুফোঁটা জল পড়িল।

নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "তুমি কি উপোস ক'রে আছ না কি?" হরিমতি কহিল, "হাঁ দাদা, কিচ্ছু খায় না বৌদি—কেবল সন্ধ্যাবেলায় এক মুঠো কাঁচা চাল আর এক ঘটি জল খেয়ে আছে—কারও কথা শোনে না।" নীলাম্বর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "এইগুলো তোমার পাগ্‌লামি নয়?"

বিরাজ আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "পাগ্‌লামি নয়? আসল পাগ্‌লামি! মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে ত বুঝ্‌তে স্বামী কি বস্তু! তখন বুঝ্‌তে এমন দিনে তাঁর জ্বর হ'লে, বুকের ভেতরে কি করতে থাকে!" বলিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, দাঁড়াইয়া বলিল, "পুঁটি, ঝি পুজো নিয়ে যাচ্চে, সঙ্গে যাস্‌'ত যা, শীগ্‌গীর ক'রে নিগে।" পুঁটি আহ্লাদে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "যাব বৌদি'!"

"তবে দেরি করিসনে, যা। ঠাকুরের কাছে তোর দাদার জন্যে বেশ ক'রে বর চেয়ে নিস্‌। পুঁটি ছুটিয়া চলিয়া গেল। নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, "সে ও পারবে। বরং তোমার চেয়ে ওই ভাল পারবে। বিরাজ হাসিমুখে

ঘাড় নাড়িল। বলিল, "না মনে ক'র না। ভাই বল আর বাপ মাই বল, মেয়ে মানুষের স্বামীর বড় আর কেউ নয়। ভাই বাপ মা গেলে দুঃখ কষ্ট খুবই হয়, কিন্তু স্বামী গেলে যে সর্ব্বস্ব যায়! এই যে পাঁচদিন না খেয়ে আছি, তা, দুর্ভাবনার চাপে একবার মনে হয়নি যে উপোস ক'রে আছি—কিন্তু, কৈ, ডাকত তোমার কোন্ বোন্‌কে দেখি কেমন—" নীলাম্বর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—"আবার!" বিরাজ বলিল, "তবে বল কেন? পাগ্‌লামি করেচি সে আমি জানি, আর যে দেবতা আমার মুখ রেখেচেন, তিনিই জানেন। আমি ত তা হ'লে একটি দিনও বাঁচতুম না—সিঁথের এ সিঁদূর তোলবার আগে এ সিঁথে পাথর দিয়ে চেঁচে ফেল্‌তুম। শুভযাত্রা ক'রে লোকে মুখ দেখবে না, শুভ কর্ম্মে লোকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে না, এ দুটো শুধু হাত লোকের কাছে বার করতে পারব না, লজ্জায় এ মাথার আঁচল সরাতে পার্‌ব না, ছি ছি, সে বাঁচা কি আবার একটা বাঁচা! সে কালে যে পুড়িয়ে মারা ছিল, সেই ছিল ঠিক কাজ! পুরুষ মানুষে তখন মেয়ে মানুষের দুঃখ কষ্ট বুঝ্‌ত;—এখন বোঝেনা।

নীলাম্বর কহিল, "না, তুই বুঝিয়ে দিগে।" বিরাজ বলিল, "তা পারি। আর শুধু আমিই কেন, তোমাকে পেয়ে যে কেউ তোমাকে হারাবে, সেই বুঝিয়ে দিতে পার্‌বে—আমি একলা নয়। যাক্, কি সব ব'কে যাচ্ছি,"—বলিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আর একবার স্বামীর বুকের উত্তাপ হাত দিয়া অনুভব করিয়া বলিল, "গায়ে কোথাও ব্যথা নেইত? নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।" বিরাজ বলিল, "তবে আর কোন ভয় নেই। আজ আমার ক্ষিদে পেয়েছে—যাই একবার দুটো রাঁধিবার জোগাড় করিগে—সত্যি বল্‌চি তোমাকে, আজ কেউ যদি আমার একখানা হাত কেটে দেয়, তা হলেও বোধ করি রাগ হয় না।" যদু চাকর বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, "মা, কবিরাজ মশাইকে এখন ডেকে আন্‌তে হবে কি?" নীলাম্বর কহিল, "না না, আর আবশ্যক নেই।" যদু তথাপি গৃহিণীর অনুমতির জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল, "না, যা ডেকে নিয়ে আয়, একবার ভাল ক'রে দেখে যান্।"

দিন তিনেক পরে আরোগ্য লাভ করিয়া নীলাম্বর বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াছিল, মতি মোড়ল আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল, "দা' ঠাকুর, তুমি একবার না দেখ্‌লে ত আমার ছিমন্ত আর বাঁচে না। একবার পায়ের ধুলো দাও দেব্‌তা, তা হ'লে যদি এ যাত্রা সে বেঁচে—।" আর সে বলিতে পারিল না—আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, "গায়ে কি খুব বেশী বেরিয়েচে মতি?" মতি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিল—"সে আর কি বল্‌ব! মা যেন একেবারে ঢেলে দিয়েচেন। ছোট জাত হয়ে জন্মেচি ঠাকুদ্দা, কিছুইত জানিনে কি কর্‌তে হয়—একবার চল" বলিয়া সে দুই পা জড়াইয়া ধরিল। নীলাম্বর ধীরে ধীরে পা ছাড়াইয়া লইয়া কোমলস্বরে বলিল, 'কিছু ভয় নেই মতি, তুই যা, আমি পরে যাব।' তাহার কান্নাকাটির কাছে সে নিজের অসুখের কথা বলিতে পারিল না। বিশেষ, সকল রকম রোগের সেবা করিয়া এ বিষয়ে তাহার এত অধিক দক্ষতা জন্মিয়াছিল যে, আশপাশের গ্রামের মধ্যে কাহারও শক্ত অসুখ বিসুখে তাহাকে একবার না দেখাইয়া, তাহার মুখের আশ্বাস বাক্য না শুনিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা কিছুতেই ভরসা পাইত না। নীলাম্বর এ কথা নিজেও জানিত। ডাক্তার কবিরাজের ঔষধের চেয়ে, দেশের অশিক্ষিত লোকের দল, তাহার পায়ের ধুলা, তাহার হাতের জল-পড়াকে যে অধিক শ্রদ্ধা করে, ইহা সে বুঝিত বলিয়াই কাহাকেও কোন দিন ফিরাইয়া দিতে পারিত না। মতি চাঁড়াল আর একবার কাঁদিয়া, আর একবার পায়ের ধূলার দাবী জানাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল, নীলাম্বর উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার দেহ তখনও ঈষৎ দুর্ব্বল ছিল বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। সে ভাবিতে লাগিল বাড়ীর বাহির হইবে কি করিয়া। সে বিরাজকে অত্যন্ত ভয় করিত, তাহার কাছে এ কথা সে মুখে আনিবে কি করিয়া। ঠিক এই সময়ে ভিতরের উঠান হইতে হরিমতির সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক আসিল, "দাদা,—বৌদি,' ঘরে এসে শুতে বল্‌চে—"। নীলাম্বর জবাব দিল না। মিনিট খানেক পরেই হরিমতি নিজে আসিয়া হাজির হইল—"শুন্‌তে পাওনি দাদা?" নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।' হরিমতি কহিল—"সেই চারটি খেয়ে ব'সে আছ—বৌদি

লচে আর ব'সে থাক্‌তে হবে না,একটু শোওগে।" নীলাম্বর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি কর্‌চে রে পুঁটি ?" হরিমতি কহিল, "এইবার ভাত খেতে বসেচে।" নীলাম্বর আদর করিয়া বলিল, "লক্ষ্মী দিদি আমার, একটি কাজ করবি ?" পুঁটি মাথা নাড়িয়া বলিল, "করব।" নীলাম্বর কণ্ঠস্বর আরও কোমল করিয়া কহিল, "আস্তে আস্তে আমার চাদর আর ছাতিটা নিয়ে আয় দেখি।" "চাদর আর ছাতি ?" নীলাম্বর কহিল "হুঁ।" হরিমতি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "বাপ্‌রে! বৌদি' ঠিক এই দিকে মুখ ক'রে খেতে বসেচে যে।" নীলাম্বর শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, "পারবিনে আন্‌তে ?" হরিমতি অধর প্রসারিত করিয়া দুই তিনবার মাথা নাড়িয়া বলিল—"না দাদা, দেখে ফেল্‌বে; তুমি শোবে চল।" বেলা তখন প্রায় দুইটা, বাহিরের প্রচণ্ড রৌদ্রের দিকে চাহিয়া সে শুধু মাথায় পথে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিল না, হতাশ হইয়া ছোট বোনের হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। হরিমতি কিছুক্ষণ অনর্গল বকিতে বকিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। নীলাম্বর চুপ করিয়া মনে মনে নানারূপে আবৃত্তি করিয়া দেখিতে লাগিল, কথাটা ঠিক কি রকম করিয়া পাড়িতে পারিলে খুব সম্ভব বিরাজের করুণা উদ্রেক করিবে।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল। বিরাজ ঘরের শীতল ও মসৃণ সিমেণ্টের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বুকের তলায় একটা বালিশ দিয়া মগ্ন হইয়া মামা ও মামীকে চার পাতা জোড়া পত্র লিখিতেছিল। কি করিয়া এ বাড়ীতে কেমাত্র মা শীতলার কৃপায় মরা বাঁচিয়াছে, কি করিয়া যে যাত্রা তাহার সিঁথার সিঁদুর ও হাতের নোয়া বজায় রহিয়া গিয়াছে, লিখিয়া লিখিয়া ক্রমাগত লিখিয়া ও সে কাহিনী শেষ হইতেছিল না, এমন সময় খাটের উপর হইতে নীলাম্বর হঠাৎ ডাকিয়া বলিল, "একটি কথা রাখ্‌বে বিরাজ ?" বিরাজ তারাতের মধ্যে কলমটা ছাড়িয়া দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "কি কথা ?" "যদি, রাখ ত বলি।" বিরাজ কহিল, "রাখ্‌বার মত হলেই রাখ্‌ব—কি কথা ?" নীলাম্বর মুহূর্ত-কাল চিন্তা করিয়া বলিল, "ব'লে লাভ নেই বিরাজ, তুমি যা আমার রাখ্‌তে পারবে না।" বিরাজ আর প্রশ্ন করিল না, কলমটা তুলিয়া লইয়া পত্রটা শেষ করিবার জন্য আর একবার ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু চিঠিতে মন দিতে পারিল না—ভিতরে ভিতরে কৌতূহলটা তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আচ্ছা বল, আমি কথা রাখ্‌ব।" নীলাম্বর একটুখানি হাসিল, একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে বলিল, "দুপুর বেলা মতি চাঁড়াল এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিল—তাদের বিশ্বাস আমার পায়ের ধুলো না পড়্‌লে তার ছিমন্ত বাঁচবে না—আমাকে একবার যে'তে হবে।" তাহার মুখপানে চাহিয়া বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, "এই রোগা দেহ নিয়ে তুমি যাবে ?"

কি করব বিরাজ, কথা দিয়েচি—আমাকে একবার যেতেই হবে।"

"কথা দিলে কেন ?" নীলাম্বর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, বিরাজ কঠিনভাবে বলিল, "তুমি কি মনে কর তোমার প্রাণটা তোমার একলার, ওতে কারও কিছু বল্‌বার নেই ? তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার ?" নীলাম্বর কথাটা লঘু করিয়া ফেলিবার জন্য হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার হাসি আসিল না। কোনমতে বলিয়া ফেলিল, "কিন্তু তার কান্না দেখলে—।" বিরাজ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, "ঠিক ত! তার কান্না দেখলে!—কিন্তু আমার কান্না দেখ্‌বার লোক সংসারে আছে কি!" বলিয়া চারপাতা জোড়া চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল--"উঃ! পুরুষ মানুষেরা কি! চারদিন চার রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটালুম—ও হাতে হাতে তার প্রতিফল দিতে চল্‌ল। ঘরে ঘরে জ্বর, ঘরে ঘরে বসন্ত—এই রোগা দেহ নিয়ে ও রুগী ঘাঁটতে চল্‌ল—আচ্ছা যাও,আমার ভগবান্ আছেন"—বলিয়া আর একবার বালিশে বুক দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। নীলাম্বরের ওষ্ঠাধরে অতি সূক্ষ্ম, অতি ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল; ধীরে ধীরে বলিল," "সে ভরসা কি তোদের আছে বিরাজ, যে কথায় কথায় ভগবানের দোহাই পাড়িস্!" বিরাজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া ক্রোধের স্বরে বলিল, "না, ভগবানের উপর ভরসা শুধু তোমাদের একচেটে, আমাদের নয়। আমরা কীর্ত্তন গাইনে, তুলসীর মালা পরিনে, মড়া পোড়াইনে, তাই

আমাদের নয়,—একলা তোমাদের।" নীলাম্বর, তাহার রাগ দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "রাগ করিস্‌নে বিরাজ, সত্যিই তাই। তুই একা নয়—তোরা সবাই ওই! ভগবানের ওপর ভর্‌সা ক'রে থাক্‌তে যতটা জোরের দরকার ততটা জোর মেয়ে মানুষের দেহে থাকে না—তাতে, তোর দোষ কি ?"

বিরাজ আরও রাগিয়া বলিল, "না দোষ কেন, ওটা মেয়ে মানুষের গুণ। কিন্তু, গায়ের জোরেরই যদি এত দরকার ত বাঘ ভালুকের গায়েওত আরও জোর আছে। আর জোর থাক ভাল না থাক ভাল এই রোগী দেহ নিয়ে তোমাকে আমি বার হতে দেব না—তা তুমি যত তর্কই করনা কেন!" নীলাম্বর আর কথা কহিল না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। বিরাজও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া "বেলা গেল যাই" বলিয়া উঠিয়া গেল। ঘণ্টা খানেক পরে দীপ জ্বালিয়া ঘরে সন্ধ্যা দিতে আসিয়া দেখিল স্বামী শয্যায় নাই, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিয়া বলিল, "পুঁটি, তোর দাদা কইরে? যা, বাইরে দেখে আয় ত।" পুঁটি ছুটিয়া চলিয়া গেল, মিনিট পাঁচেক পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কোথাও নেই—নদীর ধারেও না।" বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল 'হুঁ'। তারপরে রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

(৩)

বছর তিনেক পরের কথা বলিতেছি। মাস দুই পূর্ব্বে হরিমতি শ্বশুর ঘর করিতে গিয়াছে; ছোট ভাই পীতাম্বর এক বাটীতে থাকিয়াও পৃথগন্ন হইয়াছে। বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় সন্ধ্যার ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সেইখানে নীলাম্বর একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বিরাজ নিঃশব্দে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "হঠাৎ বাইরে যে ?" বিরাজ একধারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে এসেছি।" "কি ?" বিরাজ বলিল, "কি খেলে মরণ হয় ব'লে দিতে পার ?" নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল। বিরাজ পুনরায় কহিল, "হয় ব'লে দাও, না হয়, আমাকে খুলে বল কেন এমন রোজ রোজ শুকিয়ে যাচ্ছ ?" "শুকিয়ে যাচ্ছি কে বললে ?" বিরাজ চোখ তুলিয়া এক মুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, "হাঁ গা, কেউ ব'লে দেবে তবে আমি জান্‌ব, একি সত্যিই তোমার মনের কথা ?" নীলাম্বর একটুখানি হাসিল। নিজের কথাট সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না রে তা' নয়। তবে তোর নাকি বড় ভুল হয় তাই জিজ্ঞেস কচ্চি একি আর কেউ বলেচে, না নিজেই ঠিক করেচিস্।" বিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন বিবেচনা করিল না। বলিল, "কত বল্লুম তোমাকে পুঁটির আমার এমন জায়গায় বিয়ে দিওনা—কিছুতেই কথা শুন্‌লেনা। নগদ যা' ছিল গেল, আমার গায়ের গয়নাগুলো গেল, যদু মোড়লের দরুণ ডাঙ্গাটা বাঁধা পড়ল, দুখানা বাগান বিক্রী কর্‌লে, তার ওপর এই দু'সন অজন্মা। বল আমাকে, কি করে তুমি জামাইয়ের পড়ার খরচ মাসে মাসে যোগাবে ? একটা কিছু হলেই পুঁটিকে খোঁটা সইতে হবে—সে আমার অভিমানী মেয়ে, কিছুতেই তোমার নিন্দে শুন্‌তে পারবে না—শেষে কি হতে কি হবে ভগবান্ জানেন—কেন তুমি অমন কাজ কর্‌লে ?"

নীলাম্বর মৌন হইয়া রহিল। বিরাজ বলিল, "তা ছাড়া পুঁটির ভাল করতে গিয়ে দিনরাত ভেবে ভেবে যে শেষে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করবে, সে হবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর, দু পাঁচ বিঘে জমি বিক্রী ক'রে শ-পাঁচেক টাকা যোগাড় ক'রে গলায় কাপড় দিয়ে জামাইয়ের বাপকে বলগে 'এই নিয়ে আমাদের রেহাই দিন মশাই—আমরা গরীব, আর পারব না।' এতে ভাল মন্দ পুঁটির অদৃষ্টে যা হয় তা হোক্" তথাপি নীলাম্বর মৌন হইয়া রহিল। বিরাজ মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "পারবেনা বল্‌তে ?" নীলাম্বর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পারি, কিন্তু সবই যদি বিক্রী ক'রে ফেলি বিরাজ, আমাদের হবে কি ?" বিরাজ বলিল, "হবে আবার কি ! বিষয় বাঁধা দিয়ে মহাজনের সুদ আর মুখনাড়া সহ্য করার চেয়ে এ ঢের ভাল। আমার একটা ছেলেপিলে নেই যে তার জন্যে ভাবনা—আমরা দুটো প্রাণী—যেমন করে হোক চ'লে যাবেই। নিতান্ত না চলে, তুমি বোষ্টম ঠাকুর ত আছই, আমিও না হয় বোষ্টমী হয়ে পড়ব—দুজনে বৃন্দাবন ক'রে বেড়াব।" নীলাম্বর একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তুই কি করবি, মন্দিরে বাজাবি ?" 'হুঁ'

জাব। নেহাত না পারি, তোমার ঝুলি ব'য়ে বেড়াতে পারব ত? তোমার মুখের কৃষ্ণ নাম শুনে পশু পক্ষী স্থির হয়ে দাঁড়াবে, আমাদের দুটো প্রাণীর খাওয়া চলবে না? যাক্, ঘরে চল, অন্ধকারে তোমার মুখ দেখ্‌তে পাচ্চিনে।" ঘরে আসিয়া বিরাজ স্বামীর মুখের কাছে প্রদীপ তুলিয়া আনিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল, "না সাহস হয় না। এমন বোষ্টমটিকে আর পাঁচজন বোষ্টমীর সাম্‌নে প্রাণধ'রে বার করতে পার্‌ব না—তার চেয়ে এখানে শুকিয়ে মরি সে ভাল।"

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, "ওরে সেখানে শুধু বোষ্টমীই থাকে না;—বোষ্টমও থাকে।"

বিরাজ বলিল, "তা যা'ক্। একজন দুজন কেন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ থাক্"—বলিয়া প্রদীপটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "আচ্ছা, শুনি সংসারে সতী অসতী দুইই আছে—অসতী মেয়েমানুষ কখন চোখে দেখিনি—আমার বড় দেখ্‌তে সাধ হয় তারা কি রকম। ঠিক আমাদের মত, না আর কোন রকম! তারা কি করে, কি ভাবে, কি খায়, কেমন ক'রে শুয়ে ঘুমায়—এই সব আমার দেখ্‌তে ইচ্ছা করে—আচ্ছা, তুমি দেখেচ?" নীলাম্বর বলিল, "দেখেছি।" "দেখেচ? আচ্ছা, এই আমি যেমন করে ব'সে কথা কইচি তারা কি এম্‌নই করে বসে যার তার সঙ্গে কথা কয়?" নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, "তা বল্‌তে পারিনে—আমি ততটা দেখিনি।" বিরাজ ক্ষণকাল নির্নিমেষ চোখে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া তাহার সর্ব্বশরীর বারংবার শিহরিয়া উঠিল। নীলাম্বর দেখিতে পাইয়া বলিল, "ওকিরে?" বিরাজ বলিল—"উঃ—কি তারা! দুর্গা! দুর্গা! সন্ধ্যেবেলা কি কথা উঠে পড়ল—কৈ সন্ধ্যে কর্‌লে না?" নীলাম্বর বলিল, "এই উঠি।" "হাঁ, যাও, হাত পা ধুয়ে এ'স—আমি এই ঘরেই আসন পেতে ঠাঁই ক'রে দিচ্চি।"

দিন পাঁচ ছয় পরে রাত্রি দশটার সময় নীলাম্বর বিছানায় বসিয়া চোখ বুজিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া ধূমপান করিতেছিল। বিরাজ সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া শুইবার পূর্ব্বে মেঝের বসিয়া নিজের জন্য খুব বড় করিয়া একটা পান সাজিতে সাজিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, শাস্তরের কথা কি সমস্ত সত্যি?"

নীলাম্বর নলটা একপাশে রাখিয়া স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"শাস্ত্রের কথা সত্যি নয়ত কি মিথ্যে?" বিরাজ বলিল, "না, মিথ্যে বল্‌চিনে, কিন্তু সেকালের মত একালেও কি সব ফলে?" নীলাম্বর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি পণ্ডিত নই বিরাজ, সব কথা জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয় যা সত্যি তা সেকালেও সত্যি, একালেও সত্যি।" বিরাজ বলিল, "আচ্ছা মনে কর সাবিত্রী-সত্যবানের কথা। মরা স্বামীকে সে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, একি সত্যি হ'তে পারে?" নীলাম্বর বলিল, "কেন পারে না? যিনি তাঁর মত সতী, তিনি নিশ্চয়ই পারেন।" "তা হলে আমিও ত পারি?" নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তুই কি তাঁর মত সতী নাকি? তাঁরা হলেন দেবতা!" বিরাজ পানের বাটাটা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "হলেনই বা দেবতা! সতীত্বে আমিই বা তাঁর চেয়ে কম কিসে? আমার মত সতী সংসারে আরও থাকৃতে পারে, কিন্তু মনে জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী আর কেউ আছে এ কথা মানিনে। আমি কারও চেয়ে একতিল কম নই, তা তিনি সাবিত্রীই হ'ন্ আর যেই হ'ন্।" নীলাম্বর জবাব দিল না। তাহার মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। বিরাজ প্রদীপ সুমুখে আনিয়া পান সাজিতেছিল, তাহার মুখের উপরে সমস্ত আলোটাই পড়িয়াছিল, সেই আলোকে নীলাম্বর স্পষ্ট দেখিতে পাইল কি এক রকমের আশ্চর্য্য দ্যুতি বিরাজের দুই চোখের ভিতর হইতে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে। নীলাম্বর কতকটা ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল, "তা'হলে তুমিও পার্‌বে বোধ হয়।" বিরাজ উঠিয়া আসিয়া হেঁট হইয়া স্বামীর দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—"এই আশীর্ব্বাদ কর, যদি জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত এই দুটি পা ছাড়া সংসারে আর কিছু না জেনে থাকি, যদি যথার্থ সতী হই, তবে যেন অসময়ে তাঁর মতই তোমাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি—তার পরে, এই পায়ে মাথা রেখে যেন মরি—যেন, এই সিঁদুর এই নোয়া নিয়েই চিতায় শুতে পাই।" নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কি হয়েছেরে

বিরাজ আজ ?" বিরাজের দুই চোখে জল টল্ টল্ করিতে-ছিল, তৎসত্বেও তাহার ওষ্ঠাধরে অতি মৃদু, অতি মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "আর একদিন শু'ন, আজ নয়। আজ শুধু আশীর্ব্বাদ কর, মরণকালে যেন এই দুটি পায়ের ধুলো পাই, যেন তোমার কোলে মাথা রেখে তোমার মুখের পানে চেয়ে মরতে পারি"। সে আর বলিতে পারিল না। এইবার তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। নীলাম্বর ভয় পাইয়া তাহাকে জোর করিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "কি হয়েছেরে আজ ? কেউ কিছু বলেছে কি ?" বিরাজ স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল ; জবাব দিল না। নীলাম্বর পুনরায় কহিল, "কোন দিন ত তুই এমন করিস্ নি বিরাজ—কি হয়েচে বল্।" বিরাজ গোপনে চক্ষু মুছিল, কিন্তু মুখ তুলিল না। মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আর একদিন শু'ন।" নীলাম্বর আর পীড়াপীড়ি করিল না, তেমনই ভাবে বসিয়া থাকিয়া তাহার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিয়া নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সে ক্ষমতার অতিরিক্ত খরচ পত্র করিয়া ভগিনীর বিবাহ দিয়া কিছু জড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংসারে আর পূর্ব্বের সচ্ছলতা ছিল না। উপর্য্যপরি দুই সন অজন্মা ;—গোলায় ধান নাই, পুখুরে জল নাই, মাছ নাই—কলা বাগান শুকাইয়া উঠিতেছে,—লেবু বাগানের কাঁচা লেবু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার উপর উত্তমর্ণেরা আসা যাওয়া সুরু করিয়াছিল, এবং পুঁটির শ্বশুরও ছেলের পড়ানর খরচের জন্য মিঠে-কড়া চিঠি পাঠাইতে ছিলেন। এত কথা বিরাজ জানিত না। অনেক অপ্রীতিকর সংবাদই নীলাম্বর প্রাণ-পণে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এখন সে উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, বুঝি এই সমস্ত কথাই কেহ বিরাজকে শুনাইয়া গিয়াছে। সহসা বিরাজ মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিল ; কহিল, "একটি কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি জবাব দেবে ?" নীলাম্বর মনে মনে অধিকতর শঙ্কিত হইয়া বলিল,—"কি কথা ?" বিরাজের সমস্ত সৌন্দর্য্যের বড় সৌন্দর্য্য ছিল তাহার মুখের হাসি, সে সেই হাসি আর একবার হাসিয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি কাল' কুচ্ছিত নইত ?" নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না।" "যদি কাল' কুচ্ছিত হতুম, তা হলে আমাকে কি ক'রে এত ভালবাস্‌তে ?" এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া যদিও সে কিছু বিস্মিত হইল, তথাপি একটা গুরুতর ভার তাহার বুকের উপর হইতে যেন সহসা গড়াইয়া পড়িয়া গেল। সে খুসি হইয়া হাসিয়া বলিল, "ছেলেবেলা থেকে একটি পরমা সুন্দরীকেই ভালবেসে এসেছি—কি ক'রে বল্‌ব এখন, সে কাল' কুচ্ছিত হলে কি করতুম ?" বিরাজ দুই বাহুদ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আরও সন্নিকটে মুখ আনিয়া কহিল,—"আমি বল্‌ব, "তাহলেও তুমি আমাকে এমনই ভালবাস্‌তে।" তথাপি নীলাম্বর নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, বিরাজ বলিল, "তুমি ভাব্‌চ, কি করে জান্‌লুম ? না ?" এবার নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল, "ঠিক তাই ভাব্‌চি—কি করে জান্‌লে ?" বিরাজ গলা ছাড়িয়া দিয়া বুকের একধারে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া উপর দিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল,—"আমার মন বলে দেয়। আমি তোমাকে যত চিনি তুমি নিজেও নিজেকে তত চেন না, তাই জানি আমাকে তুমি এমনই ভালবাস্‌তে। যা অন্যায়, যাতে পাপ হয় এমন কাজ তুমি কখন কর্‌তে পার না—স্ত্রীকে ভাল না বাসা অন্যায়, তাই আমি জানি, যদি আমি কাণা খোঁড়াও হতুম, তবু তোমার কাছে এমনই আদর পেতুম।" নীলাম্বর জবাব দিল না। বিরাজ এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া সহসা হাত বাড়াইয়া আন্দাজ করিয়া স্বামীর চোখের কোণে আঙুল দিয়া বলিল,—"জল কেন ?" নীলাম্বর তাহার হাতটি সযত্নে সরাইয়া দিয়া ভারী গলায় বলিল, "জান্‌লে কি ক'রে ?" বিরাজ বলিল, "ভুলে যাও কেন যে, আমার নবছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ? ভুলে যাও কেন যে তোমাকে পেয়ে তবে তোমাকে পেয়েচি ? নিজের গায়ে হাত দিয়েও কি টের পাওনা যে আমিও ঐ সঙ্গে মিশে আছি ?" নীলাম্বর কথা কহিল না। আবার তাহার নিমীলিত চোখের দুই কোণ বহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বিরাজ উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "ভেব না, মা মরণকালে তোমার আমার হাতে পুঁটিকে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই পুঁটির ভাল হবে ব'লে যা ভাল বুঝেচ তাই করেচ—স্বর্গে থেকে মা আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন। তুমি শুধু এখন সুস্থ হও, ঋণমুক্ত হও—যদি সর্ব্বস্ব যায় তাও যাক্।"

নীলাম্বর চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধস্বরে কহিল, "তুই জানিস্‌নে বিরাজ আমি কি করেচি—আমি তোর—" বিরাজ বলিতে দিল না। মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, "সব জানি আমি। আর জানি, না জানি, ভেবে ভেবে তোমাকে আমি রোগা হতে দিতে যে পারব না সেটা নিশ্চয় জানি। না, সে হবে না—যার যা পাওনা দিয়ে দাও, নিশ্চিন্ত হও, তার পরে মাথার ওপর ভগবান্ আছেন, পায়ের নীচে আমি আছি।" নীলাম্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

(৪)

আরও ছয়মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। হরিমতির বিবাহের পূর্ব্বেই ছোট ভাই বিষয় সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিল। নীলাম্বরের নিজের ভাগে যাহা পড়িয়াছিল তাহার কিয়দংশ সেই সময়েই বাঁধা দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল,—বলা বাহুল্য পীতাম্বর এক কপর্দ্দক দিয়াও সাহায্য করে নাই। অবশিষ্ট জমি জমা যাহা ছিল, তাহাই একটির পর একটি বন্ধক দিয়া নীলাম্বর বিবাহের সর্ত্ত পালন করিয়া ভগিনীপতির পড়ার খরচ যোগাইতে লাগিল এবং সংসার চালাইতে লাগিল। এইরূপে দিন দিন নিজেকে সে ক্রমাগত শক্ত করিয়া জড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু মমতা-বশে কোন মতেই পৈতৃক সম্পত্তি একেবারে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিল না। আজ বৈকালে ও-পাড়ার ভোলানাথ মুখুয্যে আসিয়া বাকী সুদের জন্য কএকটা কথা কড়া করিয়াই বলিয়া গিয়াছিল, আড়ালে দাঁড়াইয়া বিরাজ তাহা সমস্তই শুনিল এবং নীলাম্বর ঘরে আসিতেই, সে রান্নাঘর হইতে নিঃশব্দে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের পানে চাহিয়াই নীলাম্বর মনে মনে প্রমাদ গণিল। ক্ষোভে অপমানে বিরাজের বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া জ্বলিতেছিল, কিন্তু সে ভাব সংযত করিয়া হাত দিয়া খাট দেখাইয়া দিয়া প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—"ঐখানে ব'স।" নীলাম্বর শয্যার উপর বসিতেই সে নীচে পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, হয় আমাকে ঋণমুক্ত কর, না হয়, আজ তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করব। নীলাম্বর বুঝিল সে সমস্ত শুনিয়াছে, তাই অত্যন্ত ভয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া জোর করিয়া টানিয়া তুলিয়া পাশে বসাইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ছি বিরাজ, সামান্যতেই আত্মহারা হ'স্‌নে—" বিরাজ মুখের উপর হইতে তাঁহার হাতটা সরাইয়া দিয়া, বলিল, "এতেও মানুষ যদি আত্মহারা না হয়, কিসে হয় বল শুনি?" নীলাম্বর কি জবাব দিবে হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।' বিরাজ বলিল, "চুপ ক'রে রইলে কেন?" জবাব দাও।" নীলাম্বর মৃদু কণ্ঠে বলিল, "জবাব দেবার কিছুই নেই বিরাজ—কিন্তু—।" বিরাজ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "না, কিন্তুতে হবে না। আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে লোকে তোমাকে অপমান ক'রে যাবে, কাণে শুনে আমি সহ্য ক'রে থাকব—এ ভরসা মনে ঠাঁই দিও না। হয় তার উপায় কর, না হয়, আমি আত্মঘাতী হব।" নীলাম্বর ভয়ে ভয়ে কহিল, "একদিনেই কি উপায় করব বিরাজ।"

"বেশ, দুদিন পরে কি উপায় করবে তাই আমাকে বুঝিয়ে বল।" নীলাম্বর পুনরায় মৌন হইয়া রহিল। বিরাজ বলিল, "একটা অসম্ভব আশা ক'রে নিজেকে ভুল বুঝিয়ো না—আমার সর্ব্বনাশ ক'রনা।— যত দিন যাবে ততই বেশী জড়িয়ে পড়বে,—দোহাই তোমার— আমি ভিক্ষে চাইচি, তোমার দুটি পায়ে ধরচি, এইবেলা যা হয় একটা পথ কর" বলিতে বলিতে তাহার অশ্রুভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—ভুলু মুখুয্যের কথাগুলো তাহার বুকের ভিতরে শূল হানিতে লাগিল। নীলাম্বর হাত দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "অধীর হলে কি হবে বিরাজ? একটা বছর যদি ষোল আনা ফসল পাই, বার আনা বিষয় উদ্ধার করে নিতে পারব, কিন্তু বিক্রী করে ফেললে আর ত হবে না—সেটা ভেবে দেখ।" বিরাজ আর্দ্রস্বরে বলিল, "দেখচি; কিন্তু আসচে বছরেই যে ষোল আনা ফসল পাবে তারই বা ঠিকানা কি? তার ওপর সুদ আছে, লোকের গঞ্জনা আছে। আমি সব দুঃখ সইতে পারি, কিন্তু তোমার অপমান ত সইতে পারিনে!" নীলাম্বর নিজে তাহা বেশ জানিত তাই কথা কহিতে পারিল না। বিরাজ পুনরায় কহিল, "শুধু এই কি আমার সমস্ত দুঃখ? দিবা রাত্রি ভেবে ভেবে তুমি আমার চোখের

সাম্‌নে শুখিয়ে উঠচ, এমন সোণার মুর্ত্তি কালী হয়ে যাচ্চে—আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে তুমিই বল এও সহ্য করবার ক্ষমতা কি আমার আছে? আর কতদিন যোগীনের পড়ার খরচ যোগাতে হবে?"

"আরও একটা বছর। তা হলেই সে ডাক্তার হ'তে পারবে।" বিরাজ এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, "পুঁটিকে মানুষ করেচি—সে আমার রাজরাণী হ'ক্, কিন্তু সে হ'তে আমার এত দুঃখ ঘট্‌বে জান্‌লে ছোট বেলায় তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতুম—এমন করে নিজের মাথায় বাজ হানতুম না। হা ভগবান্! বড় লোক তারা, কোন কষ্ট কোন অভাব নেই, তবুও জোঁকের মত আমার বুকের রক্ত শুষে নিতে তাদের এতটুকু দয়া মায়া হচ্চে না!" বলিয়া একটা সুগভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পরে বিরাজ মুখ তুলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, চারিদিকে অভাব, চারিদিকে আকাল, গরীব দুঃখীরা ত এরই মধ্যে কেউ উপোস কেউ একবেলা খেতে সুরু করেচে, এমন দুঃসময়েও আমরা পরের ছেলে মানুষ করব কেন? পুঁটির শ্বশুরের অভাব নেই, সে বড় লোক—সে যদি নিজের ছেলেকে না পড়াতে পারে আমরা পড়াব কেন? যা হয়েচে তা হয়েচে, তুমি আর ধার করতে পাবে না। নীলাম্বর অতি কষ্টে শুষ্ক হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে টানিয়া আনিয়া বলিল, "সব বুঝি বিরাজ, কিন্তু শালগ্রাম সুমুখে রেখে শপথ করেচি যে! তার কি হবে?" বিরাজ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "কিচ্ছু হবে না। শালগ্রাম যদি সত্যিকারের দেবতা হন, তিনি আমার কষ্ট বুঝবেন। আর আমি ত তোমারই অর্দ্ধেক, যদি কিছু এতে পাপ হয়, আমি আমার নিজের মাথায় নিয়ে জন্ম জন্ম নরকে ডুবে থাক্‌ব; তোমার কিছু ভয় নেই—তুমি আর ঋণ ক'রনা।" নীলাম্বর কাতর দৃষ্টিতে একটিবার মাত্র স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া পরক্ষণেই নিরুপায়ের মত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। ধর্ম্মপ্রাণ স্বামীর অন্তরের নিদারুণ দুঃখের লেশমাত্রও তাহার অগোচর ছিল না; কিন্তু সে আর সহিতে পারিতেছিল না। যথার্থই স্বামী তাহার সর্ব্বস্ব ছিল। সেই স্বামীর অহর্নিশি চিন্তাক্লিষ্ট শুষ্ক অবসন্ন মুখের পানে চাহিয়া তাহার বুক ফাটিতেছিল। এতক্ষণ কোন মতে সে কান্না চাপিয়া কথা কহিতেছিল, আর পারিল না। সবেগে স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নীলাম্বর তাহার দক্ষিণ হস্ত বিরাজের মাথার উপরে রাখিয়া নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ কান্নার পরে তাহার দুঃখের অসহ তীব্রতা মন্দীভূত হইয়া আসিলে সে তেমনই মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ছেলে বেলা থেকে যতদূর আমার মনে পড়ে কোন দিন তোমার মুখ শুক্‌ন দেখিনি, কোন দিন তোমার মুখ ভার কর্‌তে দেখিনি, এখন তোমার পানে চাইলেই আমার বুকের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বল্‌তে থাকে—তুমি নিজের পানে না চাও, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ! সত্যিই কি শেষকালে আমাকে পথের ভিখারিণী কর্‌বে? সে কি তুমিই সইতে পার্‌বে?" নীলাম্বর তথাপি উত্তর দিতে পারিল না, অন্যমনস্কের মত তাহার চুলগুলি লইয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে লাগিল। এমনই সময়ে দ্বারের বাহিরে পুরাণ ঝি সুন্দরী ডাকিয়া বলিল, "বৌমা উনুন জ্বেলে দেব কি?" বিরাজ ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী পুনরায় কহিল, "উনুন জ্বেলে দেব?" বিরাজ অস্পষ্টস্বরে বলিল "দে, তোদের জন্যে রাঁধ্‌তে হবে—আমি আর কিছু খাব না।" ঝি বড় গলায় নীলাম্বরকে শুনাইয়া বলিল, "তুমি কি, মা, তবে রাত্তিরে খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে! না খেয়ে খেয়ে যে একেবারে আধখানি হয়ে গেলে?" বিরাজ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া রান্না ঘরের দিকে লইয়া গেল।

জ্বলন্ত উনুনের আলো বিরাজের মুখের উপর পড়িয়াছিল। অদূরে ব'সিয়া সুন্দরী হাঁ করিয়া সেইদিকে চাহিয়াছিল। হঠাৎ বলিল, "সত্যি কথা মা তোমার মত রূপ আমি মানুষের কখন দেখিনি—এতরূপ রাজা রাজড়ার ঘরেও নেই।" বিরাজ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিল, "তুই রাজা রাজড়ার ঘরের খবর রাখিস্?" সুন্দরীর বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। রূপসী বলিয়া তাহারও এক সময়ে খ্যাতি ছিল,—সে খ্যাতি আজিও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। সে ব'লিত, "কবে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কবে বিধবা হইয়াছিল, কিছুই মনে পড়ে না, কিন্তু সধবার

সৌভাগ্য হইতে সে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই, তাহাদের গ্রাম কৃষ্ণপুরে এ সুখ্যাতিও তাহার ছিল। এখন হাসিয়া বলিল, "রাজা রাজড়ার ঘরের খবর কতকটা রাখি বৈ কি মা! না হলে সেদিন তাকে ঝাঁটা পেটা কত্তুম।" এবার বিরাজ রীতিমত রাগ করিল; বলিল, "তুই যখন তখন ঐ কথাই বলিস্ কেন সুন্দরি? তাদের যা খুসী বলেচে, তাতে তুই বা ঝাঁটা পেটা করবি কেন? আর আমাকেই বা নাহক শোনাবি কেন? উনি রাগী মানুষ, শুন্‌লে কি বল্‌বেন বলত?" সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বাবু শুন্‌বেন কেন মা? এও কি একটা কথার মত কথা?"

"কথার মত কথা নয় সে কথা কি তুই আমাকে বুঝিয়ে বল্‌বি? তা ছাড়া যা হয়ে বয়ে চুকে শেষ হয়ে গেছে সে কথা তোলবার দরকারই বা কি? সুন্দরী মুখ করিয়া বলিল—"কোথায় চুকে বুকে শেষ হয়েছে মা? কালও যে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে—

বিরাজ রাগিয়া উঠিল; বলিল, "তুই গেলি কেন? তুই আমার কাছে চাকরি করবি আর যে ডাকবে তার কাছে ছুটে যাবি? তুই নিজে না বল্‌লি সেদিন তাঁরা সব কলকাতায় চ'লে গেছেন?" সুন্দরী বলিল, "সত্যি কথাই বলেছিলুম মা। মাস দুই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন, আবার দেখ্‌চি সব আসচেন। আর যাবার কথা যদি বল্‌লে মা, পিয়াদা ডাক্‌তে এলে না বলি কি করে? তাঁরা এ মুল্লুকের জমিদার, আমরা দুঃখী প্রজা—হুকুম অমান্যি করি কি ভরসায়?" বিরাজ ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তাঁরা এ মুল্লুকের জমিদার নাকি?"

সুন্দরী সহাস্যে বলিল, "হাঁ মা, এ মহালটা তাঁরাই কিনেচেন—বাবু তাঁবু খাটিয়ে আছেন—তা' সত্যি মা, রাজপুত্তুর ত রাজপুত্তুর! কি বা মুখ চোখের—।" বিরাজ সহসা থামাইয়া দিয়া বলিল, "থাম্ থাম্ চুপ কর। ওসব কথা তোকে জিজ্ঞেস করি নি—কি তোকে বল্‌লে তাই বল্।" সুন্দরী এবার মনে মনে বিরক্ত হইল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "কি কথা আর হবে মা, কেবল তোমারই কথা।" বিরাজ 'হুঁ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। এইবার কথাটা বুঝাইয়া বলি। বছর দুই পূর্ব্বে এই মহালটা কলিকাতার এক জমিদারের হস্তগত হয়; তাঁহার ছোট ছেলে রাজেন্দ্রকুমার অতিশয় অসচ্চরিত্র এবং দুর্দ্দান্ত। পিতা তাহাকে কাজ কর্ম্মে কতকটা শিক্ষিত ও সংযত করিতে, এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিবার অভিপ্রায়েই কাছাকাছি কোন একটা মহালে প্রেরণ করিতে চাহেন। গত বৎসর সে এইখানে আসে। রীতিমত কাছারি বাটী না থাকায় সে সপ্তগ্রামের পরপারে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা আমবাগানে তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতেছিল। আসিয়া অবধি একটি দিনের জন্যও সে কাজ কর্ম্ম শিখিবার ধার দিয়া চলে নাই। পাখী শিকার করিতে ভালবাসিত,—হুইস্কির ফ্লাস্ক পিঠে বাঁধিয়া বন্দুক ও চার পাঁচটা কুকুর লইয়া সমস্ত দিন নদীর ধারে বনে বনে পাখী মারিয়া বেড়াইত। এই অবস্থায় মাস দু'এক পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোধূলির স্বর্ণাভামণ্ডিত সিক্তবসনা বিরাজের উপর তাহার চক্ষু পড়ে। বিরাজের এই ঘাটটি চারিদিকের বড় বড় গাছে আবৃত থাকায় কোন দিক্ হইতে দেখা যাইত না; বিরাজ নিঃসঙ্কোচচিত্তে গা ধুইয়া পূর্ণ কলস তুলিয়া লইয়া উপরদিকে চক্ষু তুলিতেই এই অপরিচিত লোকটির সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল। রাজেন্দ্র পাখীর সন্ধান করিতে করিতে এদিকে আসিয়াছিল, অদূরস্থিত সমাধি-স্তূপের উপরে দাঁড়াইয়া সে বিরাজকে দেখিল। মানুষের এত রূপ হয়, সহসা এ কথাটা যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু, আর সে চোখ ফিরাইতেও পারিল না। অপলক দৃষ্টিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই অতুল্য অপরিসীম রূপরাশি বিভোর হইয়া দেখিতে লাগিল। বিরাজ আর্দ্র বসনে কোনমতে লজ্জানিবারণ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, রাজেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে গেল কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল। এই অরণ্য-পরিবৃত, ভদ্র-সমাজ-পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের মধ্যে এত রূপ কেমন করিয়া কি করিয়া আসিল। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ীর পরিচয় সে সন্ধান করিয়া সেই রাত্রেই জানিয়া লইল এবং তখন হইতেই এই একমাত্র চিন্তা ব্যতীত তাহার আর দ্বিতীয় চিন্তা রহিল না। ইহার পরে আরও দুইবার বিরাজের চোখে চোখে

পড়িয়াছিল। বিরাজ বাড়ীতে আসিয়া সুন্দরীকে ডাকিয়া বলিল, "যা'ত সুন্দরী ঘাটের ধারে—কে একটা লোক পীরস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—মানা করে দিগে যেন আর কোন দিন আমাদের বাগানে না ঢোকে।" সুন্দরী মানা করিতে আসিল, কিন্তু নিকটে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিল, "বাবু আপনি!" রাজেন্দ্র সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে চেন নাকি?" সুন্দরী বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ বাবু, আপনাকে আর কে না চেনে?" "আমি কোথায় থাকি জান?" সুন্দরী কহিল, "জানি।" রাজেন্দ্র বলিল, "আজ একবার ওখানে আস্‌তে পার?" সুন্দরী সলজ্জ হাস্যে মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবু?" "দরকার আছে একবার যেও" বলিয়া রাজেন্দ্র বন্দুক কাঁধে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ইহার পরে অনেকবার সুন্দরী গোপনে ও নিভৃতে ও পারের জমিদারী কাছারিতে গিয়াছে, অনেক কথা বিরাজের সমক্ষে উত্থাপন করিতে সাহস করে নাই। সুন্দরী নির্ব্বোধ ছিল না; সে বিরাজ-বৌকে চিনিত। বাহিরে হইতে এই বধূটিকে যতই মধুর এবং কোমল দেখাক্ না কেন, ভিতরের প্রকৃতি যে তাহার উগ্র এবং পাথরের মত কঠিন ছিল, সুন্দরী তাহা ঠিক জানিত। বিরাজের দেহে আরও একটা বস্তু ছিল, সে তাহার অপরিমেয় সাহস—তা' সে মানুষ জনই হ'ক আর সাপ খোপ ভূত প্রেতই হ'ক—ভয় কাহাকে বলে ইহা সে একেবারেই জানিত না। সুন্দরী কতকটা সে কারণেও এতদিন তাহার মুখ খুলিতে পারে নাই।

বিরাজ উনুনের কাঠটা ঠেলিয়া দিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা সুন্দরি তুই ত অনেকবার সেখানে গিয়েছিস এসেছিস, অনেক কথাও কয়েছিস্ কিন্তু, আমাকেত একটি কথাও বলিস্ নি?" সুন্দরী প্রথমটা কিছু হত-বুদ্ধি হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া কহিল, "কে তোমাকে বল্লে মা, আমি অনেক কথা কয়ে এসেচি?" বিরাজ বলিল, "কেউ বলেনি, আমি নিজেই জানি। আমার কপালের পেছনে আরও দুটো চোখ কাণ আছে। বলি, কাল ক'টাকা বক্‌সিস নিয়ে এলি! দশ টাকা?" সুন্দরী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার মুখের উপরে একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়িল, উনুনের অস্পষ্ট আলোকেও বিরাজ তাহা দেখিল এবং সে যে কথা খুঁজিয়া পাইতেছে না তাহাও বুঝিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সুন্দরি, তোর বুকের পাটা এত বড় হ'বে না যে, তুই আমার কাছে মুখ খুল্‌বি; কিন্তু, কেন মিছে আনাগোনা ক'রে, টাকা খেয়ে শেষে বড় লোকের কোপে পড়্‌বি? কাল থেকে এ বাড়ীতে আর ঢুকিস্‌নে—তোর হাতের জল পায়ে ঢাল্‌তেও আমার ঘেন্না করে। এতদিন তোর সব কথা জানতুম না, দুদিন আগে তাও শুনেচি। কিন্তু যা, আঁচলে যে দশ টাকার নোট বাঁধা আছে ফিরিয়ে দিগে, নিয়ে দুঃখী মানুষ দুঃখ ধান্ধা ক'রে খেগে—নিজে বয়সকালে যা করেচিস সে ত আর ফিরবে না, কিন্তু আর পাঁচজনের সর্ব্বনাশ করতে যাস্‌নে।" সুন্দরী কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার জিভ মুখের মধ্যে আড়ষ্ট রহিল। বিরাজ তাহাও দেখিল, দেখিয়া বলিল, "মিথ্যে কথা ব'লে আর কি হ'বে? এ সব কথা আমি কাউকে বল্‌ব না। তোর আঁচলে বাঁধা নোট কোথা থেকে এল সে কথা আমি আগে বুঝিনি, কিন্তু, এখন সব বুঝ্‌তে পাচ্চি। যা আজ থেকে তোকে আমি জবাব দিলুম—কাল আর আমার বাড়ী ঢুকিস্‌নে।" সে কি কথা! নিদারুণ বিস্ময়ে সুন্দরী বাক্‌শূন্য হইয়া বসিয়া রহিল। এ বাটীতে তাহার কাজ গেল, এমন অসম্ভব কথা সে মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতেও পারিলনা। সে যে অনেক দিনের দাসী!—সে বিরাজের বিবাহ দিয়াছে, হরি-মতিকে মানুষ করিয়াছে, গৃহিণীর সহিত তীর্থদর্শন করিয়া আসিয়াছে—সে ও যে এ বাটীর একজন! আজ তাহাকেই বিরাজবৌ বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল! ক্ষোভ এবং অভিমান তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল—এক মুহূর্ত্তে বড় রকমের জবাবদিহি, কত রকমের কথা তাহার জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিল, কিন্তু মুখ দিয়া শব্দ করিতে পারিল না—বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। বিরাজ মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু সেও কথা কহিল না। মুখ ফিরাইয়া দেখিল হাঁড়ির জল কমিয়া গিয়াছে। অদূরে একটা পিত্তলের কলসিতে জল ছিল, ঘটি লইয়া তাহার কাছে আসিল; কিন্তু কি ভাবিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া থাকিয়া ঘটিটা রাখিয়া

দিয়া বলিল, "না, তোর হাতের জল ছুঁলেও ওঁর অকল্যাণ হবে—তুই ওই হাত দিয়ে টাকা নিয়েচিস্।" সুন্দরী এ তিরস্কারেও উত্তর দিতে পারিল না। বিরাজ আর একটা প্রদীপ জ্বালিয়া কলসিটা তুলিয়া লইয়া এই রাত্রে সূচিভেদ্য অন্ধকার আমবাগানের ভিতর দিয়া একা নদীতে জল আনিতে চলিয়া গেল। বিরাজ চলিয়া গেল, সুন্দরীর একবার মনে হইল সেও পিছনে যায়, কিন্তু সেই অন্ধকারে সঙ্কীর্ণ বনপথ, চারিদিকের প্রাচীর সপ্তগ্রামের জানা অজানা সমাধিস্তূপ, ঐ পুরাতন বটবৃক্ষ—সমস্ত দৃশ্যটা তাহার মনের মধ্যে উদিত হইবামাত্র তাহার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া চুল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। সে অস্ফুটস্বরে "মাগো!" বলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

(৫)

দিন দুই পরে নীলাম্বর বলিল, "সুন্দরীকে দেখ্‌চিনে কেন বিরাজ?" বিরাজ বলিল, "আমি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েচি।" নীলাম্বর পরিহাস মনে করিয়া বলিল, "বেশ করেচ। বলনা, কি হয়েচে তার?" বিরাজ বলিল, "কি আবার হবে, আমি সত্যিই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েচি।" নীলাম্বর তথাপি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অতিশয় বিস্মিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, "তাকে ছাড়িয়ে দেবে কি করে? আর সে যত দোষই করুক, কতদিনের পুরণ লোক তা জান? কি করেছিল সে?" বিরাজ বলিল, "ভাল বুঝেছি, তাই ছাড়িয়ে দিয়েচি।" নীলাম্বর বিরক্ত হইল, বলিল, "কিসে ভাল বুঝ্‌লে তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।" বিরাজ স্বামীর মনের ভাব বুঝিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি ভাল বুঝেচি—ছাড়িয়ে দিয়েচি, তুমি ভাল বোঝ ফিরিয়ে আনগে" বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। নীলাম্বর বুঝিল বিরাজ রাগিয়াছে, আর কথা কহিল না। সে ঘণ্টা খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু ছাড়িয়ে যে দিলে, কাজ কর্‌বে কে?" এবার বিরাজ মুখ ফিরাইয়া হাসিল। তাহার পরে বলিল, "তুমি।" নীলাম্বরও হাসিয়া বলিল, "তবে, দাও এঁটো বাসনগুলো মেজে ধুয়ে আনি।" বিরাজ হাতের খুন্তিটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া হাত ধুইয়া কাছে আসিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিল, "যাও তুমি এখান থেকে। একটা তামাসা করবার যো নেই—তা হলেই এমন কথা ব'লে বস্‌বে যে, কাণে শুন্‌লে পাপ হয়।" নীলাম্বর অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "এও কাণে শুন্‌লে পাপ হয়? তোর পাপ যে কিসে হয় না, তা ত বুঝিনে বিরাজ।" বিরাজ বলিল, তুমি সব বোঝ। না বুঝ্‌লে এত কাজ থাক্‌তে এঁটো বাসনের কথা তুল্‌তে না—যাও, আর বেলা ক'রনা, স্নান করে এস —আমার রান্না হয়ে গেছে।" নীলাম্বর চৌকাটের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "সত্যি কথা বিরাজ সংসারের কাজ কর্ম্ম কর্‌বে কে?" বিরাজ চোখ তুলিয়া বলিল, "কাজ আবার কোথায়? পুঁটি নেই, ঠাকুরপোরা নেই, আমিইত কাজের অভাবে সারাদিন ব'সে কাটাই। বেশত, কাজ যখন আট্‌কাবে তখন তোমাকে জানাব।" নীলাম্বর বলিল, "না বিরাজ, সে হবে না, দাসী চাকরের কাজ আমি তোমায় কর্‌তে দিতে পার্‌ব না। সুন্দরী কোন দোষ করেনি, শুধু খরচ বাঁচাবার জন্যে তুমি তাকে সরিয়েচ, বল সত্যি কি না?" বিরাজ বলিল, "না, সত্যি নয়। সে যথার্থই দোষ করেচে।" "কি দোষ?" "তা আমি বলব না। যাও, আর ব'সে থেক না, স্নান করে এস" বলিয়া বিরাজও দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া নীলাম্বরকে এইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "কৈ গেলেনা? এখনও ব'সে আছ যে!" নীলাম্বর মৃদুস্বরে বলিল, "যাই--কিন্তু, বিরাজ, এত আমি সইতে পারব না, তোমাকে উঞ্ছবৃত্তি কর্‌তে দেব কি ক'রে?" কথাটা শুনিয়া বিরাজ খুসি হইল না, ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কি কর্‌বে শুনি?" সুন্দরীকে না চাও আর কোন লোক রাখি—তুমি একাই বা থাক্‌বে কি ক'রে?" "যেমন ক'রেই থাকি না কেন আমি আর লোক চাইনে।" নীলাম্বর বলিল,—"না, সে হবে না। যতক্ষণ সংসারে আছি ততদিন মান অপমানও আছে; পাড়ার লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে?" বিরাজ অদূরে বসিয়া পড়িয়া "পাড়ার লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে, এইটাই তোমার আসল ভয়। আমি কি ক'রে থাক্‌ব, আমার দুঃখ কষ্ট হ'বে এ কেবল তোমার একটা ছল—" নীলাম্বর ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া

বলিল—"ছল ?" বিরাজ বলিল, "হাঁ, ছল। আজ কাল আমি সব দেখেচি। আমার মুখের দিকে যদি চাইতে, আমার দুঃখ ভাবতে, আমার একটা কথাও যদি শুনতে, তা হ'লে আজ আমার এ অবস্থা হ'ত না।" নীলাম্বর বলিল, "তোমার একটা কথাও শুনিনি ?" বিরাজ জোর দিয়া বলিল, "না, একটাও না। যখন যা বলেচি, তাই, কোন-না-কোন ছল করে উড়িয়ে দিয়েচ—তুমি কেবল ভেবেচ নিজের পাপ হবে, মিথ্যে কথা হবে, লোকের কাছে অপযশ হবে—একবারও ভেবেচ কি আমার কি হবে ?" নীলাম্বর বলিল,"আমার পাপ কি তোমার পাপ নয়, আমার অপযশে কি তোমার অপযশ হবে না ?" এবার বিরাজ রীতিমত ক্রুদ্ধ হইল। তীক্ষ্ণভাবে বলিল, "দেখ ও সব ছেলেভুলান কথা—ওতে ভোলবার বয়স আমার আর নেই।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—"কেবল তুমি নিজের কথা ভাব আর কিছু ভাবনা। অনেক দুঃখে আজ আমাকে এ কথা মুখ দিয়ে বার কত্তে হল—আজ নিজের ঘরে আমাকে দাসীবৃত্তি করতে দিতে তোমার লজ্জা হচ্চে, কিন্তু কাল যদি তোমার একটা কিছু হয়, পরশু যে আমাকে পরের ঘরে গিয়ে দুটো ভাতের জন্যে দাসীবৃত্তি ক'রে বেড়াতে হবে। তবে একটা কথা এই যে, সে তোমাকে চোখে দেখ্‌তেও হবে না, কাণে শুনতেও হবে না—কাজে কাজেই তাতে তোমার লজ্জা ত হবেনা। ভাবনা চিন্তে করবারও দরকার নেই—এই না ?"

নীলাম্বর সহসা এ অভিযোগের উত্তর দিতে পারিল না। মাটির দিকে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"এ কক্ষণ তোমার মনের কথা নয়। দুঃখ কষ্ট হয়েচে বলেই রাগ ক'রে বলচ। তোমার কষ্ট আমি যে স্বর্গে বসেও সইতে পারব না। এ তুমি ঠিক জান।" বিরাজ বলিল, "তাই আগে জানতুম বটে, কিন্তু কষ্ট যে কি, তা' কষ্টে না পড়লে যেমন ঠিক বোঝা যায় না, পুরুষ মনুষের মায়া দয়াও তেমনই, সময় না হ'লে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু, তোমার সঙ্গে এই দুপুর বেলায় আমি রাগারাগি কর্ত্তে চাইনে—যা বলচি তাই কর, যাও নেয়ে এস।" নীলাম্বর 'যাচ্চি' বলিয়াও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিরাজ পুনরায় কহিল, "আজ দুবছর হ'তে চল্ল পুঁটির আমার বিয়ে হয়েচে, তার আগে থেকে আজ পর্য্যন্ত সব কথা সে দিন আমি মনে মনে ভেবে দেখ্‌ছিলুম—আমার একটি কথাও তুমি শোন নি। যখন যা' কিছু বলেচি সমস্তই একটা একটা ক'রে কাটিয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছায় কাজ ক'রে গেছ। লোকে বাড়ীর দাসী চাকরেরও একটা কথা রাখে, কিন্তু তুমি তাও আমার রাখ নি।" নীলাম্বর কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই বিরাজ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "না-না, তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কত বড় ঘেন্নায় যে আমি ইষ্টিদেবতার নাম করে দিব্যি করেচি তোমাকে আর একটি কথাও বলতে যাব না, সে কথা তুমিও শুনতে পেতে না, আজ যদি না কথায় কথা উঠে পড়ত। এখন হয়ত তোমার মনে পড়বে না, কিন্তু ছেলেবেলায় একদিন আমি মাথার ব্যথায় ঘুমিয়ে পড়ি; তোমাকে দোর খুলে দিতে দেরী হয়েছিল ব'লে মারতে উঠেছিলে, আমার অসুখের কথা বিশ্বাস করনি, সেই দিন থেকে দিব্যি করেছিলুম অসুখের কথা আর জানাব না—আজ পর্য্যন্ত সে দিব্যি ভাঙিনি।" নীলাম্বর মুখ তুলিতেই দুজনের চোখো চোখি হইয়া গেল, সে সহসা উঠিয়া আসিয়া বিরাজের হাত দুটি ধরিয়া ফেলিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে বলিয়া উঠিল, "সে হবেনা বিরাজ, কক্ষণ তোমার দেহ ভাল নেই। কি অসুখ হয়েছে বল—বলতেই হবে।' বিরাজ ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ছাড়—লাগচে।" "লাগুক—বল কি হয়েচে ?" বিরাজ শুষ্কভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিল, "কই, কিছুইত হয় নি—বেশ আছি।" নীলাম্বর অবিশ্বাস করিয়া বলিল, "না কিছুতেই তুমি বেশ নেই। নাহ'লে, কখন তুমি সেই কত বৎসরের পুরাণ কথা তুলে আমার মনে কষ্ট দিতে না—বিশেষ যার জন্তে কতদিন, কত মাপ চেয়েচি।"

"আচ্ছা, আর কোন দিন ব'লব না" বলিয়া বিরাজ নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া ঈষৎ সরিয়া বসিল। নীলাম্বর তাহার কথার অর্থ বুঝিল; কিন্তু আর কিছু বলিল না। তারপর মিনিট দুই তিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

রাত্রে প্রদীপের আলোকে বসিয়া বিরাজ চিঠি লিখিতে-ছিল। নীলাম্বর খাটের উপর শুইয়া নিঃশব্দে তাহাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সহসা বলিয়া উঠিল, এ জন্মে তোমার ত কোন দোষ অপরাধ শক্রতেও দিতে পারে না, কিন্তু তোমার পূর্ব্বজন্মের পাপ ছিল, না হ'লে কিছুতেই এমন হ'ত না।" বিরাজ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ত না ?" নীলাম্বর কহিল, "তোমার সমস্ত দেহ মন ভগবান্ রাজ-রাণীর উপযুক্ত ক'রেই গড়ে-ছিলেন—কিন্তু"। "কিন্তু কি ?" নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল। বিরাজ এক মুহূর্ত্ত উত্তরের আশায় থাকিয়া রুক্ষ-স্বরে বলিল, "এ খবর কখন্ তোমাকে ভগবান্ দিয়ে গেলেন ?" নীলাম্বর কহিল, "চোখ কাণ থাক্‌লে ভগবান্ সকলকেই খবর দেন।" বিরাজ "হুঁ" বলিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল। নীলাম্বর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, "তখন বল্‌ছিলে আমি কোন কথা তোমার শুনিনে, হয়ত তাই সত্যি, কিন্তু তা কি শুধু একলা আমারই দোষ ?" বিরাজ আবার মুখ তুলিয়া চাহিল—বলিল, "বেশ ত আমার দোষটাই দেখিয়ে দাও।"

নীলাম্বর বলিল, "তোমার দোষ দেখাতে পার্‌ব না ; কিন্তু, আজ একটা সত্যি কথা বল্‌ব। তুমি নিজের সঙ্গে অপরের তুলনা ক'রেই দেখ। কিন্তু এটা ত একবার ভেবে দেখ না, তোমার মত ক'টা মেয়েমানুষ এমন নির্গুণ মূর্খের হাতে পড়ে ? এইটেই তোমার পূর্ব্বজন্মের পাপ, নইলে তোমার ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার কথা নয়।" বিরাজ নিঃশব্দে চিঠি লিখিতে লাগিল। বোধ করি সে মনে করিল ইহার জবাব দিবে না ; কিন্তু থাকিতে পারিল না। মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি মনে কর, এই সব কথা শুন্‌লে আমি খুসি হই ?"

"কি সব কথা ?" বিরাজ বলিল, "এই যেমন রাজ-রাণী হ'তে পার্‌তুম—শুধু তোমার হাতে প'ড়েই এমন হয়েছি, এই সব ; মনে কর, এ শুন্‌লে আমার আহ্লাদ হয়, না, যে বলে তার মুখ দেখ্‌তে ইচ্ছা করে ?" নীলাম্বর দেখিল বিরাজ অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা এরূপ হইয়া দাঁড়াইবে সে আশা করে নাই, তাই মনে মনে সঙ্কুচিত এবং কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল ; কিন্তু কি বলিয়া প্রসন্ন করিবে, সহসা তাহাও ভাবিয়া পাইল না। বিরাজ বলিল, "রূপ, রূপ, রূপ ! শুনে শুনে কাণ আমার ভোঁতা হয়ে গেল। আর যারা বলে, তাদের না হয় এইটেই সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে, কিন্তু, তুমি স্বামী, এতটুকু বয়স থেকে তোমাকে ধ'রে এত বড় হয়ে উঠেচি, তুমিও কি এর বেশী আমার আর কিছু দেখ না ? এইটেই কি আমার সব চেয়ে বড় বস্তু ? তুমি কি ব'লে এ কথা মুখে আন ? আমি কি রূপের ব্যবসা করি, না, এই দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চাই ?" নীলাম্বর অত্যন্ত ভয় পাইয়া থতমত খাইয়া বলিতে গেল—"না না"—বিরাজ কথার মাঝেই বলিয়া উঠিল "ঠিক তাই। সেই জন্যেই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম আমি কাল কুচ্ছিত হ'লে ভালবাস্‌তে কি না ! মনে পড়ে ?" নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "পড়ে, কিন্তু তুমিই ত তখন বলেছিলে—" বিরাজ বলিল, "হাঁ বলেছিলুম, আমি কাল' কুচ্ছিত হ'লেও ভালবস্‌তে, কেন না, আমাকে বিয়ে করেচ। গেরস্তর মেয়ে, গেরস্তের বউ, আমাকে এ সব কথা শোনাতে তোমার লজ্জা করে না ? এর পূর্ব্বেও আমাকে তুমি একথা বলেচ" বলিতে বলিতে তাহার ক্রোধে অভিমানে সহসা দুই চোখে জল আসিয়া পড়িল, এবং সেই জল প্রদীপের আলোকে চক্ চক্ করিয়া উঠিল। নীলাম্বর দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল। বিরাজ নিজেই একদিন বলিয়া দিয়াছিল, তিনি হাত ধরিলে আর তাহার রাগ থাকে না। নীলাম্বর সেই কথা হঠাৎ স্মরণ করিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার ডান হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া পার্শ্বে উপবেশন করিয়া চুপ করিয়া রহিল। বিরাজ বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

সেই রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নিঃশব্দে জাগিয়াছিল। এক সময়ে নীলাম্বর সহসা স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আজ কেন এত রাগ বিরাজ ?"

বিরাজ জবাব দিল,—"কেন তুমি ওসব কথা বল্‌লে ?"

নীলাম্বর বলিল, "আমি ত মন্দ কথা বলিনি।" বিরাজ আবার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, অধীরভাবে বলিল, "তবু বল্‌বে মন্দ কথা নয় ? খুব মন্দ কথা, অত্যন্ত মন্দ কথা।

ওই জন্যেই সুন্দরীকে " সে আর বলিল না, চুপ করিয়া গেল। নীলাম্বর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল—"শুধু এই দোষে তাকে তাড়িয়ে দিলে? বিরাজ "হুঁ" বলিয়া চুপ করিল। নীলাম্বরও আর প্রশ্ন করিল না। তখন বিরাজ নিজেই বলিল, "দেখ, জেরা ক'র না—আমি কচি খুকি নই—ভাল মন্দ বুঝি। তাড়াবার মত দোষ করেছে ব'লেই তাড়িয়েছি। কেন, কি বৃত্তান্ত, এত কথা তুমি পুরুষমানুষ নাই শুনলে!"

"না আর অত শুন্‌তে চাইনে" বলিয়া নীলাম্বর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইল।

পৃথগন্ন হইবার দুই চারিদিন পরেই ছোট ভাই পীতাম্বর বাটীর মাঝখানে দরমা ও ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া নিজের অংশ আলাদা করিয়া লইয়াছিল। দক্ষিণ দিকে দরজা ফুটাইয়া এবং তাহারই সম্মুখে একটি ছোট বৈটকখানা ঘর করিয়া সর্ব্বরকমে নিজের বাড়ীটিকে বেশ মানান সই ঝরঝরে করিয়া লইয়া মহা আরামে জীবন যাপন করিতেছিল। কোন দিনই প্রায় সে দাদার সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা বলিত না, এখন সমস্ত একেবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এদিকে বিরাজকে প্রায় সমস্ত দিন একলাটি কাটাইতে হইত। সুন্দরী যাওয়ার পর হইতে শুধু যে সমস্ত কাজ কর্ম্ম তাহাকেই করিতে হইত, তাহা নহে; যে সব কাজ পূর্ব্বে দাসীতে করিত, সেইগুলা লোকলজ্জা বশতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালেই তাহাকে সমাধা করিয়া লইবার জন্য অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হইত। এমনই একদিন কাজ করিতেছিল, অকস্মাৎ ওবাড়ী হইতে বেড়ার ফাঁক দিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাক আসিল "দিদি?" রাত অনেক হইয়াছিল। বিরাজ চমকিয়া মুখ তুলিল। তেমনই মৃদুস্বরে আবার ডাক আসিল—"দিদি, আমি মোহিনী।" বিরাজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কে ছোটবৌ? এত রাত্তিরে?" "হাঁ দিদি, আমি, একবারটি কাছে এস।" বিরাজ বেড়ার কাছে আসিতেই ছোটবৌ চুপি চুপি বলিল, "দিদি, বট্‌ঠাকুর ঘুমিয়েচেন?" বিরাজ বলিল, "হাঁ।" মোহিনী বলিল, "দিদি, একটা কথা আছে, কিন্তু বল্‌তে পাচ্চিনে" বলিয়া সে চুপ করিল। বিরাজ তাহার কণ্ঠস্বরে বুঝিল ছোটবৌ কাঁদিতেছে; চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল "কি হয়েচে ছোটবৌ?" ছোটবৌ তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না, বোধ করি, সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল, এবং নিজেকে সংবরণ করিতে লাগিল। বিরাজ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল "কি ছোটবৌ?" এবার সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল, "বট্‌ঠাকুরের নামে নালিশ হয়েচে—কাল শমন না কি বার হবে, কি হবে দিদি?" বিরাজ ভয় পাইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল—"শমন বার হবে—তার আর ভয় কি ছোটবৌ?" "ভয় নেই দিদি?" বিরাজ বলিল, "ভয় আর কি? কিন্তু, নালিশ কর্‌লে কে?" ছোটবৌ বলিল, "ভুলু মুখুয্যে" —বিরাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল, "থাক্ আর বল্‌তে হবে না—বুঝেচি মুখুয্যে মশাই ওঁর কাছে টাকা পাবেন, তাই বোধ করি নালিশ করেচেন; কিন্তু তাতে ভয়ের কথা কিছু নেই ছোট বৌ।" তারপর উভয়েই মৌন হইয়া রহিল। খানিক পরে ছোটবৌ কহিল, "দিদি কোন দিন তোমার সঙ্গে আমি বেশী কথা কইনি—কথা কইবার যোগ্যও আমি নই—আজ ছোট বোনের একটি কথা রাখ্‌বে দিদি?" তাহার কণ্ঠস্বরে বিরাজ আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, এখন অধিকতর আর্দ্র হইয়া বলিল, "কেন রাখ্‌ব না, বোন্?"

"তবে, একবারটি হাত পাত।" বিরাজ হাত পাতিতেই একটি ক্ষুদ্র কোমল হাত বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া তাহার হাতের উপর একছড়া সোণার হার রাখিয়া দিল। বিরাজ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"কেন ছোট বৌ? ছোট বৌ কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া বলিল, "এইটে বিক্রী ক'রে হ'ক, বাঁধা দিয়ে হ'ক্ ওর টাকা শোধ ক'রে দাও দিদি।" এই আকস্মিক অযাচিত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব সহানুভূতিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরাজ অভিভূত হইয়া পড়িল—কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু 'চল্লুম দিদি' বলিয়া ছোট বৌ সরিয়া যায় দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া উঠিল, "যেও না ছোট বৌ, শোন"; ছোট বৌ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কেন দিদি?" বিরাজ সেই ফাঁকটা দিয়া তৎক্ষণাৎ অপর দিকে হারটা ফেলিয়া দিয়া বলিল,"ছি এ সব কর্‌তে নেই।" ছোট বৌ তাহা তুলিয়া লইয়া ক্ষুব্ধস্বরে প্রশ্ন করিল, "কেন কর্‌তে নেই?" বিরাজ বলিল, "ঠাকুরপো শুন্‌লে কি বল্‌-

বেন ?" "কিন্তু তিনি ত শুন্‌তে পাবেন না।" আজ না হ'ক্ দুদিন পরে শুন্‌তে পারেন, তখন কি হবে ?" ছোট বৌ বলিল, "তিনি কোন দিন জান্‌তে পারবেন না, দিদি। গত বছর মা মরবার সময় এটি লুকিয়ে আমাকে দিয়ে যান, তখন থেকে কোনদিন পরিনি, কোনদিন বার করিনি—তোমার পায়ে পড়ি দিদি এটি তুমি নাও।" তাহার কাতর অনুনয়ে বিরাজের চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে স্তব্ধ হইয়া এই নিঃসম্পর্কীয়া রমণীর আচরণের সহিত সহোদরের আচরণ তুলনা করিয়া দেখিল। তারপর হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আজকের কথা মরণকাল পর্য্যন্ত আমার মনে থাক্‌বে বোন্, কিন্তু আমি এ নিতে পার্‌ব না। তা'ছাড়া স্বামীকে লুকিয়ে কোন মেয়ে মানুষের কোনও কাজই উচিত নয় ছোটবৌ! তাতে তোমার আমার দুজনেরই পাপ। ছোট বৌ বলিল, "তুমি সব কথা জান না তাই বল্‌চ;—কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম আমারও ত আছে দিদি,—আমিই বা মরণ কালে কি জবাব দেব'?" বিরাজ আর একবার চোক মুছিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "আমি সকলকেই চিনেছিলুম ছোট বৌ, শুধু তোমাকেই এতদিন চিন্‌তে পারিনি; কিন্তু তোমাকে ত মরণকালে কোন জবাব দিতে হবে না, সে জবাব এতক্ষণ তোমার অন্তর্যামী নিজেই লিখে নিয়েছেন। যাও—রাত হ'ল শোওগে বোন্" বলিয়া বিরাজ প্রত্যুত্তরের অবসর না দিয়াই দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

কিন্তু সেও ঘরে ঢুকিতে পারিল না। অন্ধকার বারান্দার একধারে আসিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার নালিশ মোকদ্দমার কথা মনে হইল না, কিন্তু ওই স্বল্পভাষিণী ক্ষুদ্রকায়া ছোটজায়ের সকরুণ কথাগুলি মনে করিয়া প্রস্রবণের মত তাহার দুই চোখ বহিয়া নিরন্তর জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আজ সব চেয়ে দুঃখটা তাহার এই বাজিতে লাগিল যে, এতদিন এত কাছে পাইয়াও সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, চিনিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নাই, সাক্ষাতে তাহার নিন্দা না করিলেও একটি দিনও তাহার নিয়া কখন ভাল কথা বলে নাই। সুতীক্ষ্ণ বাজের আলো একমুহূর্ত্তে যেমন করিয়া অন্ধকার চিরিয়া ফেলে, আজ ছোট বৌ তেমনই করিয়া তাহার বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেন চিরিয়া দিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কখন এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ কাহার হস্ত স্পর্শে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল, নীলাম্বর আসিয়া তাহার শিয়রের কাছে বসিয়াছে। নীলাম্বর সংক্ষেপে বলিল, "ঘরে চল রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।" বিরাজ কোন কথা না বলিয়া স্বামীর দেহ অবলম্বন করিয়া নিঃশব্দে ঘরে আসিয়া নির্জীবের মত শুইয়া পড়িল।

(৬)

এক বৎসর কাটিয়াছে। এ বৎসর দু-আনা ফসলও পাওয়া যায় নাই। যে জমিগুলা হইতে প্রায় সারা বছরের ভরণপোষণ চলিত তাহার অনেকটাই ও-পাড়ার মুখুয্যে মশাই কিনিয়া লইয়াছেন। ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে, ছোটভাই পীতাম্বর তাহা গোপনে নিজের নামে ফিরাইয়া লইয়াছে—তাহাও জানা জানি হইয়াছে। হালের একটা গরু মরিয়াছে, কুকুর রোদে ফাটিতেছে—বিরাজ কোন দিকে চাহিয়া আর কূলকিনারা দেখিতে পাইল না। দেহের কোন একটা স্থান বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিলে একটা অসহ্য অথচ অব্যক্ত মন্দ যাতনায় সর্ব্ব দেহটা যে রকম করিয়া ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া আসিতে থাকে সমস্ত সংসারের সহিত সম্বন্ধটা তাহার তেমনই হইয়া আসিতে লাগিল। আগে সে যখন তখন হাসিত, কথায় কথায় ছল ধরিয়া পরিহাস করিত, কিন্তু এখন বাড়ীর মধ্যে এমন একটি লোক নাই যে কথা কহে। অথচ কেহ দেখা করিতে আসিলে সংবাদ লইতে আসিলেও সে ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়। অভিমানী প্রকৃতি তাহার, পাড়ার লোকের একটা কথাতেও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সংসারের কাজে তাহার যে আর লেশমাত্র উৎসাহ নাই, তাহা তাহার কাজের দিকে চোক ফিরাইলেই চোখে পড়ে। তাহার ঘরের শয্যা মলিন, কাপড়ের আল্‌না অগোছান, জিনিসপত্র অপরিচ্ছন্ন - সে ঝাঁট দিয়া ঘরের কোণে জঞ্জাল জড় করিয়া রাখে—তুলিয়া ফেলিয়া দিবার মত জোরও সে যেন নিজের দেহের মধ্যে আর খুঁজিয়া পায় না। এমনই করিয়া দিন কাটিতেছিল। ইতোমধ্যে নীলাম্বর ছোট বোন্ হরিমতিকে দুইবার আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা পাঠায় নাই। দিন পনর হইল একখানা

চিঠি লিখিয়াছিল, হরিমতির শ্বশুর তাহার জবাব পর্য্যন্ত দেয় নাই। কিন্তু বিরাজের কাছে তাহার নামটি পর্য্যন্ত করিবার যো নাই। সে একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠে। পুঁটিকে মানুষ করিয়াছে, মায়ের মত ভালবাসিয়াছে; কিন্তু তাহার সমস্ত সংশ্রব পর্য্যন্ত আজকাল তাহার কাছে বিষ হইয়া গিয়াছে। আজ সকালে নীলাম্বর গ্রামের পোষ্ট আফিস হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বিমর্ষ মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, পুঁটির শ্বশুর একটা জবাব পর্য্যন্ত দিলে না—এ পূজাতেও বোধ করি বোন্‌টিকে একবার দেখ্‌তে পেলেম না। বিরাজ কাজ করিতে করিতে একবার মুখ তুলিল। কি একটা বলিতে গেল, কিছুই না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। সেইদিন দুপুর বেলা আহারে বসিয়া নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল,—"তার নাম কর্‌লেও তুমি জ্বলে ওঠ—কিন্তু সে কি কোন দোষ করেছে?" বিরাজ অদূরেই বসিয়াছিল, চোখ তুলিয়া বলিল, "জ্বলে উঠি কে বল্‌লে?"

"কে বলবে আমি নিজেই টের পাই।"

বিরাজ ক্ষণকাল স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "পেলেই ভাল" বলিয়াই উঠিয়া যাইতেছিল; নীলাম্বর ডাকিয়া বলিল, "আচ্ছা আজ কাল এমন হয়ে উঠ্‌ছ কেন? এ যেন একেবারে বদ্‌লে গেছ!" বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কথাটা মন দিয়া শুনিয়া বলিল, "বদলাইলেই বদলাতে হয়" বলিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহার দুই তিন দিন পরে অপরাহ্ণ বেলায় নীলাম্বর বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে একা বসিয়া গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছিল; বিরাজ পিছনে আসিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বর মুখ তুলিয়া বলিল, "কি?" বিরাজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, জবাব দিল না। নীলাম্বর মুখ নীচু করিতেই বিরাজ রুক্ষস্বরে বলিল, "আর একবার মুখ তোল দেখি?" নীলাম্বর মুখও তুলিল না, জবাবও দিল না—চুপ করিয়া রহিল। বিরাজ পূর্ব্ববৎ কঠিনভাবে বলিল, "এই যে চোখ রাঙা হয়েছে! আবার ঐগুলা থেতে সুরু করেছ?" নীলাম্বর কথা কহিল না। ভয়ে চোখ নীচু করিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। একেত চিরদিনই সে তাহাকে ভয় করে, তাহাতে কিছু দিন হইতে বিরাজ এমনই একরাশি উত্তপ্ত বারুদের মত হইয়া আছে যে, কথন্ কি ভাবে জ্বলিয়া উঠিবে তাহা আন্দাজ পর্য্যন্ত করিবার যো ছিলনা। বিরাজও কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "সেই ভাল। গাঁজা গুলি খেয়ে বোম্ ভোলা হয়ে ব'সে থাক্‌বার এই ত সময়" বলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। সে দিন গেল, পর দিন গেল, নীলাম্বর আর থাকিতে না পারিয়া সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সকাল বেলা পীতাম্বরকে বাহিরের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, "পুঁটির শ্বশুর ত একটা জবাব পর্য্যন্ত দিলে না—তুই একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌না যদি বোন্‌টিকে দুটো দিনের তরেও আন্‌তে পারিস্!" পীতাম্বর দাদার মুখ পানে চাহিয়া বলিল,—"তুমি থাক্‌তে আমি আবার কি চেষ্টা করব?" নীলাম্বর তাহার শঠতা বুঝিয়া ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইল; কিন্তু, সে ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া বলিল, "তা হ'ক্, যেমন আমার, তোরও ত সে তেমনই বোন্। না হয় মনে কর্‌না আমি ম'রে গেছি—এখন, তুই শুধু একলা আছিস্।" পীতাম্বর কহিল, "যা' সত্যি নয়, তা' তোমার মত আমি মনে কর্‌তে পারিনে। আর তোমাকে চিঠির জবাব দিলে না, আমাকেই বা দেবে কেন?" নীলাম্বর ছোট ভাইএর এ কথাটাও সহ্য করিয়া বলিল, "যা' সত্যি নয়, তাই আমি মনে করি! আচ্ছা, তাই ভাল, এ নিয়ে তোর সঙ্গে আমি ঝগড়া কর্‌তে চাইনে, কিন্তু আমার চিঠির জবাব দেয় না এই জন্যে ত তোকে ডাকিনি—যা' বল্‌চি তাই পারিস্ কি না তাই বল্।" পীতাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, বিয়ের আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?"

"কর্‌লে কি হ'ত?" পীতাম্বর বলিল, "ভাল পরামর্শ ই দিতুম।" নীলাম্বরের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল, তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল, তবুও সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল,—"তা হলে পার্‌বিনে?" পীতাম্বর বলিল—"না। আর, পুঁটির শ্বশুরও যা' নিজের শ্বশুরও তাই—এঁরা গুরুজন। তিনি যখন পাঠাতে ইচ্ছে করেন না, তখন তাঁর বিরুদ্ধে আমি কথা কইতে পারিনে—ও স্বভাব আমার নয়।" তাহার কথা শুনিয়া নীলাম্বরের একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া লাথি মারিয়া উহার ঐ মুখ গুঁড়া করিয়া ফেলে, কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"যা' যেয়'—যা' আমার সাম্‌নে থেকে।"

পীতাম্বরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, "খামকা রাগ কর কেন দাদা? না গেলে তুমি কি আমাকে জোর ক'রে তাড়াতে পার?" নীলাম্বর দরজার দিকে হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, "বুড়া বয়সে মার খেয়ে যদি না মরতে চাস্, চ'লে যা আমার সুমুখ থেকে!" তথাপি পীতাম্বর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু, নীলাম্বর বাধা দিয়া বলিল,—"বাস্! একটি কথাও না—যাও।" গোঁয়ার নীলাম্বরের গায়ের জোর প্রসিদ্ধ ছিল, পীতাম্বর আর কথা কহিতে সাহস করিল না, আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। বিরাজ গোলযোগ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "ছি; সমস্ত জেনে শুনে কি ভাইএর সঙ্গে কেলেঙ্কারি করতে আছে?" নীলাম্বর উদ্ধতভাবে জবাব দিল,—"জানি ব'লে কি ভয়ে জড় সড় হ'য়ে থাকব? আমার সব সহ্য হয় বিরাজ, ভণ্ডামি, সহ্য হয় না।" বিরাজ বলিল, "কিন্তু তুমি ত একা নও, আজ হাত ধ'রে বার ক'রে দিলে কাল কোথায় দাঁড়াবে, সে কথা একবারও ভাব কি?" নীলাম্বর বলিল, "না। যিনি ভাব্‌বার তিনি ভাবেন, আমি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাইনে।" বিরাজ জবাব দিল, "তা ঠিক! যার কাজের মধ্যে খোল্ বাজান' আর মহাভারত পড়া—তার ভাবনা চিন্তে মিছে!" কথাগুলা বিরাজ মধুর করিয়া বলে নাই, নীলাম্বরের কাণেও তাহা মধুবর্ষণ করিল না, তথাপি সে সহজভাবেই বলিল, ওগুলা আমি সব চেয়ে বড় কাজ ব'লেই মনে করি। তা ছাড়া, ভাব্‌তে থাক্‌লেই কি কপালের লেখা মুছে যাবে?" বলিয়া সে একবার কপালে হাত দিয়া বলিল,—"চেয়ে দেখ্ বিরাজ, এইখানে লেখা ছিল ব'লে অনেক রাজা মহারাজাকে গাছতলায় বাস করতে হয়েচে—আমি ত অতি তুচ্ছ!" বিরাজ অন্তরের মধ্যে দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, বলিল, "ও সব মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নয়! তা ছাড়া, তুমিই না হয় গাছতলায় বাস করতে পার, আমি ত পারিনে! মেয়ে মানুষের লজ্জা সরম আছে,—আমাকে খোসামোদ ক'রে হ'ক্, দাসীবৃত্তি ক'রে হ'ক্ একটুখানি আশ্রয়ের মধ্যে বাস করতেই হবে। ছোট ভাইএর মন যুগিয়ে থাকতে না পার, অন্ততঃ হাতা-হাতি ক'রে সব দিক্ মাটি ক'র না" বলিয়া সে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

স্বামী-স্ত্রীতে ইতঃপূর্ব্বে অনেকবার অনেক কলহ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর তাহা জানিত, কিন্তু, আজ যাহা হইয়া গেল তাহা কলহ নহে—এ মূর্ত্তি তাহার কাছে একেবারেই অপরিচিত। সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কএক মুহূর্ত্ত পরেই বিরাজ আবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—"অমন হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বেলা হয়েচে—যাও স্নানক্রিয়া ক'রে দুটো খাও—যে ক'টা দিন পাওয়া যায়, সেই ক'টা দিনই লাভ।" বলিয়া আর একবার সে স্বামীর বুকে শূল বিঁধিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। এই ঘরের দেয়ালে একটি রাধা-কৃষ্ণের পট ঝোলান ছিল, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া নীলাম্বর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল; কিন্তু পাছে কেহ জানিতে পারে এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

আর বিরাজ? সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলই তাহার চোখে যখন তখন জল আসিয়া পড়িতে লাগিল। যাঁহার এতটুকু কষ্ট সে সহিতে পারিত না, তাঁহাকে এত বড় শক্ত কথা নিজের মুখে বলিয়া অবধি তাহার দুঃখ ও আত্মগ্লানির সীমা ছিল না। সমস্ত দিন জলস্পর্শ করিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিছামিছি এঘর ওঘর করিয়া ফিরিল, তার পর সন্ধ্যার সময় তুলসী তলায় দীপ জ্বালিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়াই একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সমস্ত বাড়ী নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। নীলাম্বর বাড়ী নাই, তিনি দুপুর বেলা একটিবার মাত্র পাতের কাছে বসিয়াই উঠিয়া গিয়াছিলেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই,—বিরাজ কি করিবে, কোথায় যাইবে, কাহার কাছে কি বলিবে—আজ কোন দিকে চাহিয়া কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া সে সেইখানে অন্ধকার উঠানের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কেবলই বলিতে লাগিল,—"অন্তর্যামী ঠাকুর; একটিবার মুখ তুলে চাও! যে লোক কোন দোষ, কোন পাপ করতে জানে না তাকে আর কষ্ট দিওনা ঠাকুর—আর আমি সইতে পার্‌ব না।"

রাত্রি তখন ন'টা বাজিয়া গিয়াছিল, নীলাম্বর নিঃশব্দে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া পায়ের কাছে বসিল। নীলাম্বর চাহিয়াও দেখিল না, কথাও কহিল না। খানিক পরে বিরাজ স্বামীর পায়ের উপর একটা হাত রাখিতেই তিনি পা সরাইয়া লইলেন। আরও মিনিট

পাঁচেক নিস্তব্ধে কাটিল,—বিরাজের লুপ্ত অভিমান আবার ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল, তথাপি সে মৃদুস্বরে বলিল, "সমস্ত দিন যে খেলে না, এটা কার ওপর রাগ ক'রে শুনি?" ইহাতেও নীলাম্বর জবাব দিল না। বিরাজ বলিল, "বলনা শুনি?" নীলাম্বর উদাসভাবে বলিল, "শুনে কি হ'বে?" বিরাজ বলিল, "তবু শুনিই না!" এবার নীলাম্বর অকস্মাৎ উঠিয়া বসিল, বিরাজের মুখের উপর দুই চোখ সুতীক্ষ্ণ শূলের মত উদ্যত করিয়া বলিল, "তোর আমি গুরুজন বিরাজ,—খেলার জিনিষ নয়!" তাহার চোখের চাহনি, গলার শব্দ শুনিয়া বিরাজ সভয়ে চমকিয়া, স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন আর্ত্ত, এমন গভীর কণ্ঠস্বর সে ত কোন দিন শুনে নাই!

(৭)

মগ্‌রার গঞ্জে কএকটা পিতলের কজার কারখানা ছিল। এ পাড়ার চাঁড়ালদের মেয়েরা মাটির ছাঁচ তৈরি করিয়া সেখানে বিক্রী করিয়া আসিত। অসহ্য দুঃখের জ্বালায় বিরাজ তাহাদেরই একটি মেয়েকে ডাকিয়া ছাঁচ তৈরি করিতে শিখিয়া লইয়াছিল। সে তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী এবং অসাধারণ কর্ম্মপটু, দু'দিনেই এ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু প্রস্তুত করিতে লাগিল। ব্যাপারীরা আসিয়া এ গুলি নগদ মূল্য দিয়া কিনিয়া লইয়া যাইত। রোজ এমনই করিয়া সে আট আনা উপার্জ্জন করিতেছিল, অথচ, স্বামীর কাছে লজ্জায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে, অনেক রাত্রে নিঃশব্দে শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া এই কাজ করিত। আজ রাত্রেও তাহাই করিতে আসিয়াছিল, এবং ক্লান্তি বশতঃ কোন এক সময়ে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নীলাম্বর হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া শয্যায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজের হাতে তখনও কাদা-মাখা, আশেপাশে কএকটা তৈরি ছাঁচ পড়িয়া আছে এবং তাহারই একধারে হিমের মধ্যে ভিজা মাটির উপরে পড়িয়া সে ঘুমাইতেছে। আজ তিন দিন ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা ছিল না। তপ্ত অশ্রুতে তাহার দুই চোখ ভরিয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া বিরাজের ভূলুণ্ঠিত সুপ্ত মাথাটি সাবধানে নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল। বিরাজ জাগিল না, শুধু একটিবার নড়িয়া চড়িয়া পা দুটি আরও একটু গুটাইয়া লইয়া ভাল করিয়া শুইল। নীলাম্বর বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিয়া অপর হাতে অদূরবর্ত্তী স্তিমিত দীপটি আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া একদৃষ্টে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ কি হইয়াছে! কৈ, এতদিন সে ত চাহিয়া দেখে নাই! বিরাজের চোখের কোণে এমন কালী পড়িয়াছে! ভ্রূর উপর, সুন্দর সুডৌল ললাটে দুশ্চিন্তার এত সুস্পষ্ট রেখা ফুটিয়াছে! একটা অবোধ্য, অব্যক্ত, অপরিসীম বেদনায় তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল, এবং অসাবধানে এক ফোটা বড় অশ্রু বিরাজের নিমীলিত কেশের পাতার উপর টপ্ করিয়া পড়িবামাত্রই সে চোখ চাহিয়া দেখিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, তারপর দুই হাত প্রসারিত করিয়া স্বামীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইল। নীলাম্বর সেইভাবে বসিয়া থাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ কাটিল —কেহ কথা কহিল না। তারপর রাত্রি যখন আর বেশী বাকি নাই, পূর্ব্বাকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে, তখন নীলাম্বর নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া স্ত্রীর মাথার উপর হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিল, "আর হিমে থেক না বিরাজ, ঘরে চল।" 'চল' বলিয়া বিরাজ উঠিয়া পড়িল, এবং স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সকাল বেলা নীলাম্বর বলিল, "যা, তোর মামার বাড়ী থেকে দিন কতক ঘুরে আয় বিরাজ—আমিও একবার কল্‌কাতায় যাই।" "কল্‌কাতায় গিয়ে কি হবে?" নীলাম্বর কহিল, "কত রকম উপার্জ্জনের পথ সেখানে আছে, যা হ'ক্ একটা উপায় হ'বেই—কথা শোন্ বিরাজ, মাস কএক সেখানে গিয়ে থাক্‌গে।" বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিনে আমাকে ফিরিয়ে আনবে?" নীলাম্বর বলিল, "ছ'মাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনব। তোকে আমি কথা দিচ্চি।" "আচ্ছা" বলিয়া বিরাজ সম্মত হইল।

দিন চার পাঁচ পরে গরুর গাড়ী আসিল, মামার বাড়ী যাইতে আট দশ ক্রোশ এই উপায়েই যাইতে হয়। অথচ বিরাজের ব্যবহারে যাত্রার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল

। নীলাম্বর ব্যস্ত হইতে লাগিল, তাগিদ দিতে লাগিল, বিরাজ কাজ করিতে করিতে বলিয়া বসিল—"আজত আমি যাব না—আমার অসুখ কচ্চে।" নীলাম্বর অবাক্ হইয়া গিয়া বলিল, "অসুখ কচ্চে কি রে?" বিরাজ বলিল, "হাঁ অসুখ কচ্চে—বড্ড অসুখ কচ্চে" বলিয়া মুখ ভার করিয়া পিতলের কলসীটা কাঁকালে তুলিয়া লইয়া নদীতে জল আনিতে চলিয়া গেল। সে দিন গাড়ী ফিরিয়া গেল। রাত্রে অনেক সাধাসাধি, অনেক বোঝানর পর সে দুদিন পরে যাইতে সম্মত হইল। দুদিন পরে আবার গাড়ী আসিল, নীলাম্বর সংবাদ দিবামাত্রই বিরাজ একেবারে বাঁকিয়া বসিল,—"না, আমি কক্ষণ যাব না।"

নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "যাবিনে কেন?"

বিরাজ কাঁদিয়া ফেলিল, "না, আমি যাবনা। আমার গয়না কৈ, আমি দীন দুঃখীর মত কিছুতেই যাবনা।" নীলাম্বর রাগিয়া বলিল, "আজ তোর গয়না নেই সত্যি, কিন্তু যখন ছিল, তখন ত একদিন ফিরেও চাস্‌নি?" বিরাজ চুপ করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। নীলাম্বর পুনরায় কহিল, "তোর ছল আমি বুঝি। আমার মনে মনে সন্দেহ ছিলই, তবে ভেবেছিলাম, দুঃখে কষ্টে বুঝি তোর হুঁস হয়েচে—তা' দেখ্‌চি কিছুই হয় নি। বেশ, তুইও শুকিয়ে মর, আমিও মরি" বলিয়া সে বাহিরে গিয়া গাড়ী ফিরাইয়া দিল।

দুপুর বেলায় নীলাম্বর ঘরের ভিতরে ঘুমাইতেছিল, পীতাম্বর নিজের কাজে গিয়াছিল, ছোটবৌ বেড়ার ফাঁক দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিল, "দিদি, অপরাধ নিও না, তোমাকে আমি আর বোঝাব কি, কিন্তু, দুদিন ঘুরে এলেনা কেন?" বিরাজ মৌন হইয়া রহিল। ছোটবৌ বলিল, "ওঁকে বন্ধ ক'রে রেখ' না দিদি, বিপদের দিনে উঠিবার বুক বাঁধ, ভগবান্ দুদিনে মুখ তুলে চাইবেন।" বিরাজ আস্তে আস্তে বলিল, "আমি ত বুক বেঁধেই আছি, ছোটবৌ!" ছোটবৌ, একটু জোর দিয়া বলিল, "তবে দিদি, ওঁকে পুরুষমানুষের মত উপার্জ্জন করতে দাও—আমি বল্‌চি তোমার প্রতি ভগবান্ দুদিনে প্রসন্ন হবেন। বিরাজ একবার মুখ তুলিল, কি কথা বলিতে গেল, তারপর মুখ হেঁট করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, "পারবে না যেতে?" এবার বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল—"না। ঘুম ভেঙে উঠে ওঁর মুখ না দেখে' আমি একটা দিনও কাটাতে পারব না। যা' পারব না ছোটবৌ, সে কাজ আমাকে ব'ল না" বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই ছোটবৌ হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হইয়া ডাকিয়া বলিল, "যেওনা দিদি, শোন, তোমাকে দিন কতক এখান থেকে যেতেই হবে—না গেলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।" বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইল, এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, "ও বুঝেচি—সুন্দরী এসেছিল বুঝি?" ছোটবৌ মাথা নাড়িয়া বলিল, "এসেছিল।" "তাই চ'লে যেতে বল্‌চ?" "তাই বল্‌চি দিদি—তুমি যাও এখান থেকে। বিরাজ আবার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল; তারপরে বলিল, একটা কুকুরের ভয়ে বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাব?" ছোটবৌ বলিল, "কুকুর পাগল হ'লে তাকে ভয় ত করতেই হয় দিদি। তা ছাড়া, তোমার একার জন্যেও নয়, ভেবে দেখ, এই নিয়ে আরও কত কি অনিষ্ট ঘটতে পারে!" বিরাজ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর উদ্ধতভাবে মুখ তুলিয়া বলিল, "না, কোন মতেই যাবনা" বলিয়া ছোটবৌকে প্রত্যুত্তরের অবসর মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

কিন্তু তাহার যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। তাহাদের ঘাটের ঠিক পরপারে দুদিন হইতে আড়ম্বর করিয়া একটা স্নানের ঘাট এবং নদীতে জল না থাকা সত্ত্বেও মাছ ধরিবার মঞ্চ প্রস্তুত হইতেছিল। বিরাজ মনে মনে বুঝিল এ সব কেন। নীলাম্বরও একদিন স্নান করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওপারে ঘাট বাঁধ্‌লে কারা বিরাজ?" বিরাজ হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি কি জানি?" বলিয়াই দ্রুতপদে সরিয়া গেল। তাহার ভাব দেখিয়া নীলাম্বর অবাক্ হইয়া গেল। কিন্তু সেই দিন হইতে সে যখন তখন জল আনিতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। হয় অতি প্রত্যূষে, না হয় একটুখানি রাত্রি হইলে তবে সে নদীতে যাইত, এ ছাড়া সহস্র কাজ আটকাইলেও সে ওমুখো হইত না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘৃণায় লজ্জায় ক্রোধে তাহার প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতে লাগিল

অথচ এই অত্যাচার ও অকথ্য ইতরতার বিরুদ্ধে সে স্বামীর কাছেও সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারিল না। দিন চারেক পরে নীলাম্বরই একদিন ঘাট হইতে আসিয়া হাসিয়া বলিল, "নূতন জমিদারের সাজ সরঞ্জাম দেখেচিস্ বিরাজ ?" বিরাজ বুঝিতে পারিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, "দেখ্‌চি বৈকি !" নীলাম্বর পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিল, "লোকটা পাগল না কি আমি তাই ভাবচি। নদীতে দুটো পুঁটি মাছ থাকবার জল নেই, লোকটা সকাল থেকে একটা মস্ত হুইল বাঁধা ছিপ ফেলে সারাদিন ব'সে আছে।" বিরাজ চুপ করিয়া রহিল, সে কোন মতেই স্বামীর হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। নীলাম্বর বলিতে লাগিল, "কিন্তু এ ত ঠিক নয়। ভদ্রলোকের খিড়কির ঘাটের সাম্‌নে সমস্ত দিন ব'সে থাক্‌লে মেয়েছেলেরাই বা যায় কি ক'রে ? আচ্ছা তোদের নিশ্চয়ইত ভারি অসুবিধে হচ্চে।" বিরাজ বলিল, হ'লেই বা কি করব ?" নীলাম্বর ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তাই হবে কেন ? ছিপ নিয়ে পাগলামি করবার কি আর জায়গা নেই ? না না কাল সকালেই আমি কাছারিতে গিয়ে ব'লে আসব—সখ হয়, উনি আর কোথাও ছিপ নিয়ে ব'সে থাকুনগে ; কিন্তু আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে ওসব চল্‌বে না।" স্বামীর কথা শুনিয়া বিরাজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না না তোমাকে ওসব বল্‌তে যেতে হবে না ; নদী আমাদের একলার নয় যে তুমি বারণ ক'রে আস্‌বে ! নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুই বলিস্ কি বিরাজ ? নাই হ'ল নদী আমার ; কিন্তু লোকের একটা ভাল-মন্দ বিবেচনা থাক্‌বে না ? আমি কালই গিয়ে ব'লে আসব, না শোনে নিজেই ঐ সব ঘাট ফাট টানমেরে ভেঙ্গে ফেল্‌ব, তারপরে যা' পারে সে করুক।" শুনিয়া বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি যাবে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ কর্‌তে ?" নীলাম্বর কহিল, "কেন যাব না ? বড়লোক ব'লে যা ইচ্ছে অত্যাচার কর্‌বে, তাই সয়ে থাক্‌তে হবে ?"

"অত্যাচার কর্‌চে তুমি প্রমাণ কর্‌তে পার ?" নীলাম্বর রাগিয়া বলিল, "আমি এত তর্কের ধার ধারিনে। স্পষ্ট দেখ্‌চি অন্যায় কর্‌চে, আর তুই বলিস্ প্রমাণ কর্‌তে পার ? পারি, না পারি সে আমি বুঝ্‌ব !" বিরাজ এক মুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "দেখ, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর। যাদের দু'বেলা ভাত জোটে না, তাদের মুখে একথা শুন্‌লে লোকে গায়ে থুথু দেবে। কিসে, আর কিসে, তুমি চাও জমিদারের ছেলের সঙ্গে লড়াই করতে !" কথাটা এতই রূঢ়ভাবে বিরাজের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল যে, নীলাম্বর সহ্য করিতে পারিল না, সে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, "তুই আমাকে কি কুকুর বেরাল মনে করিস্ যে, যখন তখন সব কথায় ঐ খাবার খোঁটা তুলিস্ ! কোন্ দিন তোর দু'বেলা ভাত জোটেনা ?" দুঃখে কষ্টে বিরাজের সেই পূর্ব্বের ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা ছিল না, সেও জ্বলিয়া উঠিয়া জবাব দিল—"মিছে চেঁচিও না। যা' ক'রে দুবেলা ভাত জুটচে, সে তুমি জাননা বটে, কিন্তু জানি আমি, আর জানেন অন্তর্যামী। এই নিয়ে কোন কথা যদি তুমি বল্‌তে যাও ত আমি বিষ খেয়ে মরব।" বলিয়াই মুখ তুলিয়া দেখিল নীলাম্বরের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার দুই চোখে একটা বিহ্বল হতবুদ্ধিদৃষ্টি—সে চাহনির সম্মুখে বিরাজ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। সে আর একটি কথাও না বলিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। সে চলিয়া গেল, তবুও নীলাম্বর তেমনই করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার প্রচণ্ড ক্রোধ না বুঝিয়া একটা অত্যুচ্চ স্থানের মধ্যে সজোরে মাথা তুলিতে গিয়া তেমনই সজোর ধাক্কা খাইয়া যেন একেবারে নিস্পন্দ অসাড় হইয়া গেল। কানে তাহার কেবলই বাজিতে লাগিল বিরাজের শেষ কথাটা—কি করিয়া সংসার চলিতেছে !' এবং, কেবলই মনে পড়িতে লাগিল সে দিনের সেই অন্ধকারে গভীর রাত্রে, ঘরের বাহিরে তৃণশয্যায় সুপ্ত বিরাজের শ্রান্ত অবসন্ন মুখ। সত্যইত ! দিন যে কি করিয়া চলিতেছে এবং কেমন করিয়া যে তাহা ওই অসহায় রমণী একাকিনী চালাইতেছে, সে কথা আর ত তাহার জানিতে বাকী নাই ; অনতিপূর্ব্বে বিরাজের শক্ত কথা, শক্ত তীরের মতই তাহার বুকে আসিয়া বিঁধিয়াছিল, কিন্তু যতই সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়ের সেই ক্ষত, সেই ক্ষোভ শুধু যে মিলাইয়া আসিতে লাগিল, তাহা

...হ, ধীরে ধীরে শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইয়া দেখা ...তে লাগিল। তাহার বিরাজ ত শুধু আজকের বিরাজ ..., সে যে কতকাল, কত যুগ-যুগান্তের। তাহার বিচার ত ... দুটো দিনের ব্যবহারে দুটো অসহিষ্ণু কথার উপরে ...া চলে না! সে হৃদয় যে কি দিয়া পরিপূর্ণ সে কথা ত ...র চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না! এইবার তাহার দুই ...োখ বহিয়া দরদর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে ...কস্মাৎ দুই হাত জোড় করিয়া উর্দ্ধমুখে রুদ্ধস্বরে বলিয়া ...ঠিল, "ভগবান্, আমার যা' আছে সব নাও, কিন্তু আমার ...কে নিওনা!" বলিতেই একটা প্রচণ্ড ইচ্ছার বেগ ...েই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রিয়তমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ...রিবার জন্য তাহাকে যেন একেবারে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। ...ে ছুটিয়া আসিয়া বিরাজের রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া ...াড়াইল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ, সে ঘা' দিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "বিরাজ!" বিরাজ মাটির উপর ...পুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল, চমকিয়া উঠিয়া বসিল। নীলাম্বর বলিল, "কি কচ্চিস্ বিরাজ—দোর খোল্।" বিরাজ ...য়ে নিঃশব্দে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বর ...স্ত হইয়া বলিল—"খুলে দেনা বিরাজ!" এবার বিরাজ ...াঁদ-কাঁদ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি মারবেনা বল?" ...ারব?" কথাটা তীক্ষ্ণধার ছুরির মত নীলাম্বরের হৃৎ-...ণ্ডে গিয়া প্রবেশ করিল, বেদনায়, লজ্জায় অভিমানে ...হার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সে সংজ্ঞাহীনের মত একটা ...কাট আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ তাহা ...খিল না, সে না জানিয়া ছুরির উপর ছুরি মারিয়া কাঁদিয়া ...ল—"আর আমি এমন কথা কবনা—বল, মার্‌বে না?" ...াম্বর অস্ফুটস্বরে কোন মতে একটা 'না' বলিতে পারিল ...। বিরাজ সভয়ে ধীরে ধীরে অর্গল মুক্ত করিবামাত্রই ...াম্বর টলিতে টলিতে ভিতরে ঢুকিয়া চোক বুজিয়া ...্যার উপর শুইয়া পড়িল। তাহার নিমীলিত চোখের ... কোণ বাহিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। স্বামীর ...ন মুখ ত বিরাজ কোন দিন দেখে নাই, সমস্ত বুঝিল। ...রের কাছে উঠিয়া আসিয়া পরম স্নেহে স্বামীর মাথা ...জের ক্রোড়ের উপর তুলিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া ...ত লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার ঘরের মধ্যে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল, তথাপি উভয়ের কেহই মুখ খুলিল না। তাহাদের কথা বোধ করি শুধু অন্তর্যামীই শুনিলেন।

(৮)

তবুও নীলাম্বর ভাবিতেছিল এ কথা বিরাজ মুখে আনিল কি করিয়া? সে তাহাকে মারধর করিতেও পারে, তাহার সম্বন্ধে এত বড় হীন ধারণা তাহার জন্মিল কেন? একে ত সংসারে দুঃখ কষ্টের অবধি নাই, তাহার উপর প্রতিদিন এ কি হইতে লাগিল? দু'দিন যায়না, বিবাদ বাধে। কথায় কথায় মনোমালিন্য, চোখে চোখে কলহ, পদে পদে মতভেদ হয়। সর্ব্বোপরি তাহার এমন বিরাজ দিন দিন এমন হইয়া যাইতে লাগিল—অথচ, কোন দিকে চাহিয়া সে এই দুঃখের সাগরের কিনারা দেখিল না। নীলাম্বরের ভগবানের চরণে অচলা ভক্তি ছিল, অদৃষ্টের লেখায় অসীম বিশ্বাস ছিল, সে, সেই কথাই ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও মনে মনে দোষ দিল না, কাহারও নিন্দা করিল না—চণ্ডী-মণ্ডপের দেয়ালে টাঙান রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির সুমুখে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "ভগবান্, যদি এত দুঃখেই ফেল্‌বে মনে ছিল, তবে এত বড় নিরুপায় ক'রে আমাকে গড়লে কেন?" সে যে কত নিরুপায়, সে কথা তাহার অপেক্ষা বেশী আর ত কেহই জানে না! লেখা পড়া শিখে নাই, কোন রকমের কাজ-কর্ম্ম জানিত না,– জানিত শুধু দুঃখীর সেবা করিতে, শিখিয়াছিল শুধু ভগবানের নাম করিতে। তাহাতে পরের দুঃখ ঘুচিত বটে, কিন্তু অসময়ে আজ নিজের দুঃখ ঘুচিবে কি করিয়া? আর তাহার কিছুই নাই—সমস্ত গিয়াছে। তাই, দুঃখের জ্বালায় কতদিন সে মনে মনে ভাবিয়াছে, এখানে আর থাকিবেনা, বিরাজকে লইয়া যেখানে দুচোখ যায় চলিয়া যাইবে; কিন্তু এই সাত পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া কোন্ দেব-মন্দিরের দ্বারে বসিয়া, কোন্ গাছের তলায় শুইয়া সে সুখ পাইবে! এই ক্ষুদ্র নদী, এই গাছপালায় ঘেরা বাড়ী, এই ঘরে বাহিরে আজন্ম-পরিচিত লোকের মুখ—সমস্ত ছাড়িয়া সে কোন্ দেশে, কোন্ স্বর্গে গিয়া একটা দিনও বাঁচিবে! এই বাটীতে তাহার মা মরিয়াছে, এই চণ্ডীমণ্ডপে সে তাহার মুমূর্ষু পিতার শেষ সেবা করিয়া গঙ্গায় দিয়া আসিয়াছে—এই

খানে সে পুঁটিকে মানুষ করিয়াছে. তাহার বিবাহ দিয়াছে—এই ঘর বাড়ীর মায়া সে কেমন করিয়া কাটাইবে! সে, সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আর এই কি তাহার সব দুঃখ? তাহার বোন্‌টিকে সে কোথায় দিয়া আসিল, তাহার একটা সংবাদ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না, কতদিন হইয়া গেল তাহার মুখ দেখে নাই, তাহার সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের 'দাদা' ডাক শুনিতে পায় নাই—পরের ঘরে সে কি দুঃখ পাইতেছে, কত কান্না কাঁদিতেছে, কিছুই সে জানিতে পারে নাই। অথচ বিরাজের কাছে তাহার নামটি পর্য্যন্ত করিবার যো নাই। সে তাহাকে মানুষ করিয়াও এমন করিয়া ভুলিতে পারিল, কিন্তু সে ভুলিবে কি করিয়া? তাহার মায়ের পেটের বোন্, হাতে কাঁধে করিয়া বড় করিয়াছে, যেখানে গিয়াছে সঙ্গে করিয়া গিয়াছে—সে জন্য কত কথা কত উপহাস সহ্য করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই পুঁটিকে কাঁদাইয়া রাখিয়া ঘর ছাড়িয়া এক পা যাইতে পারে নাই। এ সব কথা শুধু সে জানে, আর সেই ছোট বোন্‌টি জানে। বিরাজ জানিয়াও জানে না, একটা কথা পর্য্যন্ত বলে না। পুঁটির সম্বন্ধে সে যেন পাষাণমূর্ত্তির মত একেবারে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছে। সে যে মনে মনে তাহার সেই নিরপরাধা বোনটিকে অপরাধী করিয়া রাখিয়াছে, এ চিন্তা তাহাকে শূলের মত বিঁধিত; কিন্তু এ সম্বন্ধে একবিন্দু আলোচনার পথ পর্য্যন্ত ছিল না। কোনও একটা কথা বলিতে গেলেই বিরাজ থামাইয়া দিয়া বলে—"ও সব কথা থাক্—সে রাজরাণী হ'ক্, কিন্তু তার কথায় কাজ নেই।" এই 'রাজরাণী' কথাটা বিরাজ এমনভাবে উচ্চারণ করিয়া উঠিয়া যাইত যে, নীলাম্বরের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতে থাকিত। পাছে, তাহার উপর গুরুজনের অভিসম্পাত পড়ে, পাছে কোন অকল্যাণ হয়, এই আশঙ্কায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিত, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিত, লুকাইয়া 'হরির লুঠ' দিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিত এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল।

দুর্গা পূজা আসিয়া পড়িল। সে আর থাকিতে না পারিয়া গোপনে কএকটা টাকা সংগ্রহ করিয়া একখানি কাপড় ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া সুন্দরীকে গিয়া ধরিল। সুন্দরী বসিতে আসন দিল, তামাক সাজিয়া দিল, নীলাম্বর আসন গ্রহণ করিয়া তাহার জীর্ণ মলিন উত্তরীয়ের ভিতর হইতে সেই কাপড়খানি বাহির করিয়া বলিল, "তুই ত তাকে মানুষ করেছিস্ সুন্দরি, যা একবার দেখে আয়।" সে আর বলিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া চাদরে চোখ মুছিল। সুন্দরী ইহাদের কষ্টের কথা জানিত। গ্রামের সকলেই জানিত। কহিল, "সে কেমন আছে বড় বাবু?" নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল 'জানিনে'। সুন্দরীর বুদ্ধি বিবেচনা ছিল, সে আর প্রশ্ন করিল না। পরদিন সকালেই যাইবে জানাইতে নীলাম্বর কিছু পাথেয় দিতে গেল, সুন্দরী তাহা গ্রহণ করিল না, কহিল, "না বড় বাবু, তুমি কাপড় কিনে ফেলেচ, না হ'লে এও আমি নিয়ে যেতাম না—তোমার মত আমিও যে তাকে মানুষ ক'রেচি।" নীলাম্বরের চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল, সে মুখ ফিরাইয়া ক্রমাগত চোখ মুছিতে লাগিল।—এমন একটা সমবেদনার কথা সে কাহারও কাছে পায় নাই। সবাই কহে, সে ভুল করিয়াছে, অন্যায় করিয়াছে, পুঁটি হইতেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! উঠিবার উদ্যোগ করিয়া সে সুন্দরীকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল যেন এই সব দুঃখকষ্টের কথা পুঁটি কোন মতে না জানিতে পারে। নীলাম্বর চলিয়া গেল, সুন্দরীও এইবার এক ফোঁটা চোখের জল আঁচলে মুছিল। এই লোকটিকে মনে মনে সবাই ভালবাসিত, সবাই ভক্তি করিত।

সেদিন বিজয়ার অপরাহ্ণ, বিরাজ শোবার ঘরে ঢুকিয়া দোর দিল। সন্ধ্যা না হইতেই কেহ 'খুড়ো' বলিয়া বাড়ী ঢুকিল, কেহ 'নীলুদা' বলিয়া বাহির হইতে চীৎকার করিল। নীলাম্বর শুষ্কমুখে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যথারীতি প্রণাম কোলাকুলির পর তাহারা বৌঠানকে প্রণাম করিবার জন্য ভিতরের দিকে চলিল। নীলাম্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেখিল বিরাজ রান্না ঘরেও নাই, শোবার ঘরেরও দ্বার রুদ্ধ। সে করাঘাত করিয়া ডাকিল, 'ছেলেরা' তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে বিরাজ। বিরাজ ভিতর হইতে বলিল, "আমার জ্বর হয়েছে—উঠ্‌তে পারব না।" তাহারা চলিয়া যাইবার খানিক পরেই আবার দ্বারে ঘা পড়িল। বিরাজ জবাব

দিল না। দ্বারের বাহিরে মৃদুকণ্ঠে ডাক আসিল, "দিদি আমি মোহিনী—একবারটি দোর খোল!" তথাপি বিরাজ কথা কহিল না। মোহিনী কহিল, "সে হবে না দিদি, সারা রাত এই দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়, সেও থাকব, কিন্তু আজকের দিনে তোমার আশীর্ব্বাদ না নিয়ে যাব না।" বিরাজ উঠিয়া কপাট খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, মোহিনীর বাঁ হাতে এক চুপড়ি খাবার, ডান হাতে ঘটিতে সিদ্ধি-গোলা। সে পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া দুই পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর দিদি যেন তোমার মত হ'তে পারি—তোমার মুখ থেকে আমি আর কোন আশীর্ব্বাদ পেতে চাই নে।" বিরাজ সজল চক্ষু আঁচলে মুছিয়া নিঃশব্দে ছোট বধূর অবনত মস্তকে হাত রাখিল। ছোটবৌ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই, কিন্তু, সে কথা ত তোমাকে বল্‌তে পারলুম না দিদি; তোমার দেহের বাতাসও যদি আমার দেহে লেগে থাকে, ত, সেই জোরে ব'লে যাচ্ছি, আস্‌চে বছরে এমনই দিনে সে কথা বল্‌ব।" মোহিনী চলিয়া গেলে বিরাজ সেই সব ঘরে তুলিয়া রাখিয়া স্থির হইয়া বসিল। মোহিনী যে অহর্নিশ তাহাকে চোখে চোখে রাখে, এ কথা আজ সে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিল। তার পর কত ছেলে আসিল, গেল, বিরাজ আর ঘরে দোর দিল না, এই সব দিয়া আজিকার দিনের আচার পালন করিল।

পরদিন সকাল বেলা সে ক্লান্তভাবে দাওয়ায় বসিয়া শাক বাছিতেছিল, সুন্দরী আসিয়া প্রণাম করিল। বিরাজ আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে বলিল। সুন্দরী বসিয়াই বলিল, কাল রাত্তির হ'য়ে গেল, তাই, আজ সকালেই বল্‌তে এলুম। কিন্তু যাই বল বৌমা, এমন জান্‌লে আমি কিছুতেই যেতুম না।" বিরাজ বুঝিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল। সুন্দরী বলিতে লাগিল, "বাড়ীতে কেউ নেই—বাবুরাই গেছেন পশ্চিমে হাওয়া খেতে। আছে এক বুড়ো দাসী, তার শক্ত শক্ত কথা কি বৌমা, বলে, ফিরিয়ে নিয়ে যা। জামায়ের পর্য্যন্ত একখানা কাপড় পাঠায়নি, শুধু একখানা সুতোর কাপড় নিয়ে পূজোর তত্ত্ব কত্তে এসেচে! তারপর ছোট লোক, চামার, চোখের চামড়া নেই—এ যে কত বল্‌লে, তা' আর ব'লে কি হবে!" বিরাজ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কে কাকে বল্‌লে রে!" সুন্দরী বলিল, "কেন, আমাদের বাবুকে।" বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল। সে কিছুই জানিত না, কিছুই বুঝিল না। কহিল, "আমাদের বাবুকে কে বল্‌লে তাই বল্।" এবার সুন্দরীও কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তাইত এতক্ষণ বল্‌চি বৌমা। পুঁটির বুড়ো পিস্‌শাউড়ির কি দপ্প, কি তেজ মা, কাপড়খানা নিলেনা, ফিরিয়ে দিলে", বলিয়া কাপড়খানি সে আঁচলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিল। এবার বিরাজ সমস্ত বুঝিল। সে একদৃষ্টে বস্ত্রখানির দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার অন্তরে বাহিরে আগুন ধরিয়া গেল।

নীলাম্বর বাহিরে গিয়াছিল, কতবেলায় আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, সুন্দরী অপেক্ষা করিতে পারিল না, চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা নীলাম্বর আহার করিতে বসিয়াছিল, বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া অদূরে সেই কাপড়খানা রাখিয়া দিয়া বলিল, "সুন্দরী ফিরিয়ে দিয়ে গেল।" নীলাম্বর মুখ তুলিয়া দেখিয়াই একেবারে ভয়ে ম্লান হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা যে এমন ভাবে বিরাজের গোচরে আসিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। এখন কোন প্রশ্ন না করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। বিরাজ কহিল, "কেন তারা নিলেনা, কেন গালি গালাজ ক'রে ফিরিয়ে দিলে, সব কথা সুন্দরীর কাছে গেলেই শুন্‌তে পাবে।" তথাপি নীলাম্বর মুখ তুলিল না কিংবা একটি কথাও শুনিতে চাহিল না। বিরাজও চুপ করিল। নীলাম্বরের ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে চলিয়া গিয়াছিল, সে ভীত অবনত মুখে কেবলই অনুভব করিতে লাগিল,—বিরাজ তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং সে দৃষ্টি অগ্নি বর্ষণ করিতেছে।

সন্ধ্যাবেলা সুন্দরীর ঘরে গিয়া সব কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া নীলাম্বর কহিল, "পশ্চিমে যখন বেড়াতে গেছে, তখন সে নিশ্চয় ভালই আছে, না সুন্দরি?" সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"ভাল আছে বৈ কি বাবু।" নীলাম্বরের মুখ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল, কহিল, "কত বড়টি হয়েচে দেখ্‌লি?" সুন্দরী হাসিয়া বলিল, "দেখাত হয়নি বাবু!" নীলাম্বর নিজের প্রশ্নে লজ্জিত হইয়া বলিল, "তা' বটে, কিন্তু দাসী

চাকরের কাছেও শুন্‌লি ত?" "না বাবু। তার পিস্‌শাউড়ী মাগীর যে কথাবার্ত্তা, যে হাত পা নাড়া, তাতে আর জিজ্ঞেস কর্‌ব কি, পালাতেই পথ পাইনি।" নীলাম্বর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ক্ষুব্ধ মুখে কহিল, "আচ্ছা, পুঁটি আমার রোগা হ'য়ে গেছে, কি একটু মোটাসোটা হ'য়েচে—তোর কি মনে হয়?" প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সুন্দরী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সংক্ষেপে কহিল, "মোটাসোটাই হ'য়ে থাক্‌বে।" নীলাম্বর আশান্বিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, "শুনে এসেচিস্‌ বোধ করি, না?" সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না বাবু, শুনে কিছুই আসিনি।" "তবে জান্‌লি কি ক'রে?" এবার সুন্দরী বিরক্ত হইল, কহিল, "জান্‌লুম আর কোথায়? তুমি বল্‌লে আমার কি মনে হয়, তাই বল্‌লুম, হয়ত বেশ মোটাসোটা হয়েচে।" নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তা' বটে।" তারপর কএক মুহূর্ত্ত সুন্দরীর মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আজ তবে যাই সুন্দরী, আর একদিন আস্‌ব।" সুন্দরী মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বস্তুতঃ তার অপরাধ ছিল না। একেত বলিবার কিছুই ছিল না, তাহাতে ঘণ্টা দুই হইতে নিরন্তর এক কথা একশ রকম করিয়া বকিয়া বকিয়াও সে নীলাম্বরের কৌতূহল মিটাইতে পারে নাই। তাড়াতাড়ি কহিল, "হাঁ বাবু রাত হ'ল, আজ এস, আর একদিন সকালে এলে সব কথা হবে।" এতক্ষণে নীলাম্বর সুন্দরীর উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততা লক্ষ্য করিল, এবং "আসি" বলিয়া চলিয়া গেল। সুন্দরীর উৎকণ্ঠার একটা বিশেষ হেতু ছিল। এই সময়টায় ও-পাড়ার নিতাই গাঙ্গুলি প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া তাহার সংবাদ লইতে পায়ের ধুলা দিয়া যাইতেন। তাঁহার এই ধুলাটা পাছে মনিবের সাক্ষাতেই পড়ে এই আশঙ্কায় সে মনে মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। যদিও নানা কারণে এখন তাহার কপাল ফিরিয়াছে, এবং জমিদারের অনুগ্রহে লজ্জা গর্ব্বেই রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছে, তথাপি এই নিষ্কলঙ্ক সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের সুমুখে হীনতা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনায় সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। নীলাম্বর চলিয়া গেলে সে পুলকিতচিত্তে দ্বার বন্ধ করিতে আসিল। কিন্তু সুমুখে চাহিতেই দেখিল নীলাম্বর ফিরিয়া আসিতেছে। সে দোর ধরিয়া বিরক্ত মুখে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তাহার মুখে দ্বাদশীর চাঁদের আলো পড়িয়াছিল। নীলাম্বর কাছে আসিয়া একবার ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর চাদরের খুঁট খুলিয়া একটি আধুলি বাহির করিয়া সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তোর কাছে বল্‌তে ত লজ্জা নেই, সুন্দরি—সবই জানিস্‌—এই আধুলিটি শুধু আছে, নে।" বলিয়া হাত তুলিয়া দিতে গেল। সুন্দরী জিভ্‌ কাটিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বর বলিল, "কত কষ্ট দিলাম—যাওয়া আসার খরচ পর্য্যন্ত দিতে পারিনি"। আর সে বলিতে পারিল না। কান্নায় তাহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল। সুন্দরী একমুহূর্ত্ত কি ভাবিল, পরক্ষণে হাত পাতিয়া বলিল, "দাও। তুমি যাই হও, আমার চিরদিনের মনিব—আমার 'না' বলা সাজে না।" বলিয়া আধুলিটি হাতে লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "তবে আর একবার ভেতরে এস" বলিয়া ভিতরে চলিয়া আসিল। নীলাম্বর পিছনে পিছনে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী ঘরে ঢুকিয়া মিনিটখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া নীলাম্বরের পায়ের কাছে একমুঠা টাকা রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "অমন ক'রে চেয়ে থাকলে ত হবে না বাবু, আমি চিরকালের দাসী, শূদ্দুর হ'লেও এ জোর শুধু আমারই আছে" বলিয়া হেঁট হইয়া টাকাগুলি তুলিয়া লইয়া চাদরে বাঁধিয়া দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এ তোমারই দেওয়া টাকা বাবু, তীর্থ কর্‌ব ব'লে দেবতার নামে তুলে রেখেছিলুম—আর যেতে হ'ল না—দেবতা নিজে ঘরে এসে নিয়ে গেলেন।" নীলাম্বর তখনও কথা কহিতে পারিল না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া সে বলিল, "বৌমা একলা আছেন, আর না, যাও—কিন্তু এ কথা তিনি যেন কিছুতেই না জান্‌তে পারেন।" নীলাম্বর কি একটা বলিতে গেল, সুন্দরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"হাজার বল্‌লেও শুন্‌ব না বাবু। আজ আমার মান না রাখ্‌লে আমি মাথা খুঁড়ে মর্‌ব।" তাহার হাতের মধ্যে তখনও চাদরের সেই অংশটা ধরা ছিল, এমন সময়ে 'কি হচ্চে গো' বলিয়া নিতাই গাঙুলি খোলা দরজার ভিতর দিয়া একেবারে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী চাদর ছাড়িয়া দিল। নীলাম্বর

বাহির হইয়া চলিয়া গেল। নিতাই ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিল, "ও ছোঁড়াটা নীলু না?" সুন্দরী মনে মনে রাগিয়া উঠিল, কিন্তু সহজভাবে বলিল, "হাঁ, আমার মনিব।"

"শুনি, খেতে পায় না—এত রাত্তিরে যে?"

"কাজ ছিল, তাই এসেছিলেন।"

"ওঃ—কাজ ছিল?" বলিয়া নিতাই মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। ভাবটা এই যে, তাঁহার মত বয়সের লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ সহজ কর্ম্ম নয়। সুন্দরীও হাসির অর্থ স্পষ্ট বুঝিল। নিতাইএর বয়স পঞ্চাশের উপরে গিয়াছে, মাথার চুল বার আনা পাকিয়াছে,—তাহার গোঁফ দাড়ি কামান, মাথায় শিখা, কপালে সকালের চন্দনের ফোঁটা তখনও রহিয়াছে—সুন্দরী তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে চাহনির অর্থ বোঝা নিতাইএর পক্ষে সম্ভব ছিল না; তাই সে কিছু উত্তেজিত হইয়াই বলিয়া উঠিল, "অমন ক'রে চেয়ে আছ যে!"

"দেখ্‌চি।"

"কি দেখ্‌চ?"

"দেখ্‌চি, তোমরাও বামুন, আর যিনি চ'লে গেলেন তিনিও বামুন, কিন্তু, কি আকাশ পাতাল তফাৎ।" নিতাই কথাটা বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, "তফাৎ কিসে?" সুন্দরী একটুখানি হাসিয়া বলিল, "বুড়ো মানুষ আর হিমে থেক না, দাওয়ায় উঠে ব'স। মাইরি বল্‌চি গাঙুলি মশাই, তোমার দিকে চেয়ে ভাবছিলুম আমার মনিবের পায়ের এক ফোঁটা ধূলো পেলে তোমাদের মত কতগুলি গাঙুলি কত জন্ম উদ্ধার হ'তে পারে!" তাহার কথা শুনিয়া নিতাই ক্রোধে বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। সুন্দরী একটা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে অত্যন্ত সহজভাবে বলিতে লাগিলেন, "রাগ কর'না ঠাকুর, কথাটা সত্যি। আজ ব'লে নয়, বরাবরই দেখে আস্‌চি ত, আমার মানবের পৈতে গাছটার দিকে চোখ পড়্‌লে চোখ যেন ঠিক্‌রে যায়—মনে হয়, ওঁর গলার ওপরে যেন আকাশের বিদ্যুৎ খেলা ক'রে বেড়াচ্চে, কিন্তু তোমাদের দেখ,—দেখ্‌লেই আমার হাসি পায়।" বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রথম হইতেই নিতাই ঈর্ষ্যায় জ্বলিতেছিল, এখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দুই চোখ আগুনের মত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"অত দর্প করিস্‌নে সুন্দরী—মুখ প'চে যাবে।" সুন্দরী কলিকাটায় ফুঁ দিতে দিতে কাছে আসিয়া সহাস্যে বলিল, "কিচ্ছু হবেনা—নাও তামাক খাও। বরং, তোমার মুখই ম'লে পুড়বেনা—আমার দুঃখী মনিবকে দেখে ঐ মুখে হেসেচ।" নিতাই কলিকাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী তাহার উত্তরীয়ের এক অংশ ধরিয়া ফেলিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"ব'স ব'স মাথা খাও—।" ক্রুদ্ধ নিতাই নিজের উত্তরীয় সজোরে টানিয়া লইয়া—"গোল্লায় যাও—গোল্লায় যাও—নিপাত যাও—" বলিয়া শাপ দিতে দিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। সুন্দরী সেইখানে বসিয়া পড়িয়া খুব খানিকটা হাসিল, তারপর উঠিয়া আসিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল—"কিসে আর কিসে! বামুন বলি ওঁকে। এত দুঃখেও মুখে হাসিটি যেন লেগে রয়েচে, তবু চোখ তুলে চাইতে ভরসা হয় না—যেন আগুন জ্বল্‌চে!"

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চন্দন ও মানব

চন্দন মানবে কহে—রোষভরে কেন,
ক্ষীণতনু কর মোরে ঘ'সে ঘ'সে হেন?
মানব চন্দনে বলে—কেন দোষ হয়,
অবশেষে রাখিনা কি দেবতার পায়!

শ্রীমতী প্রভাবতী ঘোষ

শনিগ্রহ

"ছায়ায়াঃ গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং।
নীলাঞ্জন চয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহং॥"

পুরাণাদি শাস্ত্রে শনিগ্রহ সূর্য্যের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শনির জন্মকথা পুরাণে যে প্রকার লিখিত হইয়াছে আমরা প্রথমতঃ সে কথা বলিব। প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা সংজ্ঞা নাম্নী কন্যা ভগবান্ সূর্য্যদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কন্যা সূর্য্যদেবের প্রচণ্ড তেজ সহ্য করিতে অশক্তা হইয়া পিতৃগৃহে গমন করেন। যাইবার সময়ে তিনি ছায়া নাম্নী কন্যাকে স্বামিগৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম হয়। অপর মতে প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যদেবকে তেজঃ হ্রাস করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব তেজঃ কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিলে তাহাতে প্রথমতঃ এক চক্র নির্ম্মিত হইয়াছিল।

"শাতিতং চাস্য যত্তেজ স্তেন চক্রং বিনির্ম্মিতং"

এই প্রকারে শনির উৎপত্তি হইয়াছিল। রবিসুত, ছায়াপুত্র, মন্দ, নীলবাস, ভাস্করি, বক্র প্রভৃতি শনির নাম কথিত আছে। সকলের মতেই শনি ক্রূরগ্রহ; উনি দৃষ্টি করিলে জীবের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, শনি আপন পত্নীর শাপপ্রভাবে ক্রূর দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত শনিকে সকল দেবতাই ভয় করেন। গণেশকে দেখিয়াছিলেন, এই জন্য গণেশের মস্তক উড়িয়া গিয়াছিল। ভগবান্ নারায়ণ শনির দৃষ্টি এড়াইবার জন্য অনেক দিন গণ্ডকী নদীমধ্যে লুকাইয়া শালগ্রাম শিলা সকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শনিবারও ভাল নহে; অনেক সময় বারবেলা ও কালরাত্রি ভোগ হয়।

পূর্ব্বকালে কি নিমিত্ত যে শনিগ্রহ এমন নিন্দনীয় হইয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না, কিন্তু যে কারণেই হউক, সর্ব্বদেশেই অতি পুরাতন কাল হইতেই লোকের বিশ্বাস এই প্রকার ছিল (এখনও আছে) যে, শনিগ্রহ হইতেই আমাদের অনেক কষ্ট পাইতে হয়। লোকব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শনিবারে কোনও শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না। ইহুদী জাতীয় লোকেরা শনিবারে কোনও বৈষয়িক কর্ম্ম করেন না। চসার (Chaucer) নামক প্রচীন ইংরেজ কবি তাঁহার কৃত কাব্যে শনিকে দেবতা কল্পনা করিয়া এই প্রকার উক্তি করাইয়াছেন,—

"আমার পথ বহুদূরে সত্য বটে, এবং আমাকে অনেক কাল ধরিয়া সেই পথে ভ্রমণ করিতে হয়, তথাপি আমি যে ক্ষমতা রাখি তাহা কি আর কাহারও আছে? আমিই ঝড় বৃষ্টি করিয়া সমুদ্রকে তোলপাড় করিয়া নাচাই; আমার প্রভাবেই লোকের উদ্বন্ধন অথবা ফাঁসী হইয়া যায়; আমার কটাক্ষেই সতত রাজবিদ্রোহ হয়, এবং প্রজাসকল ক্ষেপিয়া উঠে; যত হৃদয়বিদারক ক্রন্দন, যত গুপ্ত বিষপ্রয়োগ, যত প্রতিহিংসা, অথবা যত দণ্ড আমার প্রভাবে হয়, এত অপর গ্রহের দৃষ্টিতে হয় না; প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভূমিসাৎ হয়, বড় বড় দুর্গ যে বিপক্ষে অধিকার করে, সুদৃঢ় প্রাচীর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়;—এ সকলই আমার কর্ম্ম। সর্দ্দি, কাশি, বাত এবং মহামারী আমার দৃষ্টিমাত্রে ঘটে।"

যেমন আমরা ইংরেজ কবিকে শনিগ্রহের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখি, সেইরূপ রুষিয়ার একজন বড় দর্শনতত্ত্ববিদ্ কবিকেও মানব-অবস্থার উপর শনিগ্রহের অদ্ভুত প্রভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে দেখি। তিনি বলিয়াছেন, "যেখানে শনিগ্রহ সেইখানেই দুর্দ্দশা।" শনির নাম করা পর্য্যন্ত মহাপাপ বলিয়া তাঁহার নাকি ধারণা।

পৃথিবীস্থ সর্ব্বজাতি শনিগ্রহকে ঐ প্রকার অনিষ্টের মূল বলিয়া ভয় করেন। ইহার কারণ কি? এই গভীর রহস্য ভেদ করিতে আমরা অসমর্থ।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা শনিগ্রহকে দেখিলেও এই সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ হইতে বিভিন্ন দেখায়। ইহার নয়টি চন্দ্র আছে, এবং এই গ্রহের বিষুবণের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি চক্র আছে। যতই ঐ চক্রগুলির ব্যাপার পর্য্যালোচনা করা যায় ততই উহা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। এই সৌরজগতে যে সকল গ্রহ আছে, বুধ এবং শুক্র ভিন্ন আর সকল গ্রহের এক বা ততোধিক চক্র আছে, কিন্তু শনিগ্রহের মত চক্র অন্য কোনও গ্রহেই দৃষ্ট হইতেছে না।

জ্যোতিষিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Astronomical Telescope) দ্বারা শনিগ্রহকে দেখিলেই ঐ চক্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ চক্র মধ্যে কতক অংশ সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ এবং উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ চক্রের কতক অংশ অর্দ্ধস্বচ্ছ এবং ছায়াযুক্ত।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের যে প্রকার দূরত্ব তাহার সাড়ে নয়গুণ দূরে, অর্থাৎ ৯০৯০০০০০০ নব্বই কোটি নব্বই লক্ষ মাইল দূরে শনির কক্ষা অবস্থিত। পৃথিবী হইতে বৃহস্পতি গ্রহের যে প্রকার দূরত্ব, প্রায় তাহার দ্বিগুণিত দূরে শনিগ্রহ অবস্থিত। এই পৃথিবী হইতে আমরা সূর্য্যের যে আকার দেখি শনিগ্রহের উপরিভাগ হইতে সূর্য্যের আকৃতি তাহার শতাংশের একাংশ মাত্র অর্থাৎ প্রায় নক্ষত্রের মত সূর্য্যের আকৃতি দৃষ্ট হয়। সূর্য্যের উত্তাপও সেই পরিমাণে কম হইবার সম্ভাবনা।

দৃষ্টিবিজ্ঞান এবং আলোকতত্ত্বের নিয়মানুসারে আমরা বুঝিতে পারি যে, বিপ্রকৃষ্টত্ব বশতঃ দূরের বস্তু ছোট দেখায়, এবং সেই কারণেই উত্তাপও কম হইবে। অতএব অঙ্কশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে আমাদের সহায়। আমরা সকল কথা অঙ্কশাস্ত্র ব'লেই বুঝিতে পারিতেছি। শনিগ্রহ সূর্য্য হইতে যে প্রকার বহুদূরে অবস্থিত তাহাতে শনিগ্রহের উপরিভাগ হইতে যদি কেহ সূর্য্যকে দেখেন, তিনি সূর্য্যকে নিশ্চয়ই নক্ষত্রের মত ক্ষুদ্রাকার দেখিবেন। এই প্রমাণকে অনুমান বলিতেই হয়।

দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে, বেশ সুস্পষ্টভাবেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শনিগ্রহ সূর্য্যের রশ্মিদ্বারাই জ্যোতিষ্মান্; কারণ সর্ব্বদেশ হইতেই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, শনিগ্রহের উপরিভাগে চক্রটির ছায়া পড়িয়া থাকে। আবার কোনও সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় গ্রহ-পিণ্ডের ছায়া চক্রের উপরও পড়িয়াছে। আমরা যে অবস্থায় উহা পরীক্ষা করিয়াছি, সেই সময়ে গ্রহপিণ্ডের ছায়া চক্রের উপর দেখাইয়াছিল।

এক্ষণে সহজেই এই প্রশ্ন পাঠকের মনে হইতে পারে অঙ্কশাস্ত্র এবং দৃষ্টিবিজ্ঞানের মতে শনিগ্রহ হইতে সূর্য্যের আকৃতি নক্ষত্রাকার দেখায়, ইহা যদিও অনুমানসিদ্ধ, কিন্তু দূরবীক্ষণ দ্বারা চক্রের ছায়া গ্রহপিণ্ডের উপর অথবা গ্রহপিণ্ডের ছায়া চক্রের উপর যেরূপ সুস্পষ্ট দেখায়, যদি প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যকে নক্ষত্রাকার দেখাইত, তাহা হইলে সেই নক্ষত্রাকার সূর্য্যের স্বল্পজ্যোতি: শনিগ্রহের উপরে ঐ প্রকার ছায়াপাত করিতে পারিত না। আমাদের এই পৃথিবীতে কোনও নক্ষত্রের আলোকে ঐ প্রকার ছায়াপাত হইতে দেখা যায় না। প্রাকৃতিক তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই ব্যাপার লইয়া অনেক চিন্তা করিয়াছেন। নক্ষত্রাকার সূর্য্য কি প্রকারে শনিগ্রহপিণ্ড ও চক্রটিকে ঐ প্রকার তীব্র আলোকে সমুদ্ভাসিত করিতে পারিতেছেন, ইহা বর্ত্তমান কালেও একটা বিষম বৈজ্ঞানিক সমস্যা হইয়া রহিয়াছে।

স্বচ্ছ কাচখণ্ড হইতে যে লেন্স প্রস্তুত হয়, ঐ প্রকার লেন্স দ্বারা আলোকের গতি কুঞ্চিত, প্রসারিত, বর্দ্ধিত অথবা সমান্তর করিতে পারা যায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা আমরা বহুদূরস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলগুলির যে বর্দ্ধিত আকার দেখি, তাহা কেবল যন্ত্রমধ্যস্থিত কয়খানি লেন্সের গুণেই দেখা যায়। বায়ুমণ্ডল কাচের অপেক্ষাও পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ, সুতরাং শনিগ্রহের বায়ুমণ্ডল যদি লেন্সের আকারেই গঠিত হইয়া থাকে, তবে নক্ষত্রাকার সূর্য্যকে শনিগ্রহের উপরিভাগ হইতে আবশ্যকমত বৃহদাকার এবং তেজোময় দেখাইতে পারে,—বিশ্বদেব আমাদের এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেহের দৃষ্টিজ্ঞানের নিমিত্ত চক্ষুর মধ্যেও কয়খানি জলের লেন্স করিয়া দিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, শনিগ্রহ সূর্য্য হইতে বহুদূরে থাকায়, সেই অনন্ত বিজ্ঞানের অনন্ত বৈজ্ঞানিক শিল্পী উহার বায়ুমণ্ডলটি লেন্সের আকারেই প্রস্তুত করিয়াছেন। *

শনিগ্রহের কক্ষাও ইলিপ্‌স্ আকার। ঐ কক্ষার একটি ফোকসে সূর্য্য অবস্থিত রহিয়াছেন। আপন কক্ষায় পরিভ্রমণকালে শনিগ্রহ কোনও সময়ে সূর্য্যের নিকটে আসে,

---

* ইহা লেখকের অনুমান মাত্র। এ পর্য্যন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক এ কথা বলেন নাই। শনিগ্রহের চক্রসমষ্টি যে কারণে শনিগ্রহের মধ্যভাগে অবস্থিত, শনিগ্রহের বায়ুমণ্ডল নিশ্চয়ই ঐ চক্রসমষ্টির উপরেও অবস্থিত, সুতরাং উহা পার্থিব বায়ুমণ্ডলের মত চক্রাকার না হইয়া কোনও প্রকার Concavo-convex লেন্সাকার হওয়ারই কথা।—লেখক।

এবং কোনও সময়ে অপেক্ষাকৃত দূরে যায়। যখন নিকটে আসে, তখন সূর্য্য হইতে ৮৫৮,০০০,০০০ মাইল, এবং দূরস্থ হইলে ৯৬০,০০০,০০০ মাইল ব্যবধান হয়। ২৯ বৎসর, ৫ মাস, ১৭ দিবসে শনিগ্রহ একবার সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া থাকে।

পৃথিবী হইতে আমরা শনিগ্রহকে প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল দেখি; সূর্য্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইয়াও শনিগ্রহের উজ্জ্বল প্রভা সাধারণতঃ একটু বিস্ময়ের কারণ সন্দেহ নাই, এবং সেই কারণেই উহার অবস্থা জ্যোতির্ম্ময় বলিয়াও সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে কোনও সময়ে দেখা যায়, গ্রহের ছায়া চক্রের উপরে পড়িয়াছে। আবার সূর্য্যের অবস্থানানুসারে কোনও সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চক্রসমষ্টির ছায়া গ্রহের উপরে পড়িয়াছে। শনিগ্রহ অথবা উহার চক্রটি দীপ্তিমান্ হইলে ঐ প্রকার ছায়া দেখাইত না। সূর্য্যের জ্যোতিঃ শনিগ্রহের উপর হইতে প্রতিভাত হইলেই উহাকে জ্যোতিষ্মান্ বোধ হয়। পৃথিবীর ন্যায় শনিও আপন মেরু অবলম্বন করিয়া ঘুরে; সেই জন্য উহাতেও দিবা রাত্রি হইয়া থাকে। দশ ঘণ্টা, উনত্রিশ মিনিট, এবং সতের সেকেণ্ড্ সময়ে শনিগ্রহ আপন অঙ্গাবর্ত্ত সমাপ্ত করে; সুতরাং দিবারাত্রির পরিমাণ পাঁচ ঘণ্টা মাত্র।

এই গ্রহের উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্রস্থান বিশেষ চাপা বোধ হয়। শনির মধ্য প্রদেশের ব্যাস, এবং কেন্দ্রস্থানের ব্যাস তুলনা করিলে ৬৮৩০ মাইলের প্রভেদ দেখা যায়। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, শনিগ্রহের কেন্দ্রচাপ $\frac{১}{৩০৮}$ মাত্র, কিন্তু শনিগ্রহের কেন্দ্র চাপ $\frac{১}{১১}$ অংশ। শনিগ্রহের কেন্দ্রস্থানীয় পরিধি ২১৪,০০০ মাইল, এবং বিষুব রেখার পরিধি ২৩৬,০০০ মাইল। কিন্তু উহার পদার্থসমষ্টির আণবিক গুরুত্ব পার্থিব পদার্থ-সমষ্টির গুরুত্ব অপেক্ষা কম। এমন কি উহা জলের অপেক্ষাও কম।

শনিগ্রহের মধ্যপ্রদেশে মেখলার ন্যায় ছায়াযুক্ত কতকগুলি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ চিহ্নগুলির স্থান বিশেষের আবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া দেখা যায়, ঠিক ১০ ঘণ্টা, ২৯ মিনিট, ১৭ সেকেণ্ড সময়ে চিহ্নিত স্থানগুলি ঘুরিয়া আসিতেছে। এই লক্ষণ দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা শনিগ্রহের আহ্নিক গতি বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই গ্রহপিণ্ডের আকৃতি বিশাল হইলেও মঙ্গল, পৃথিবী, শুক্র অথবা বুধ গ্রহাপেক্ষা উহার আহ্নিক গতির দ্রুত বেগ রহিয়াছে। আমাদের এই পৃথিবীর ৩৬৫ দিবারাত্রিতে এক বৎসর সমাপ্ত হয়, শনিগ্রহের ২৪,৬৩১ আবর্ত্তন হইলে, উহার এক বৎসর সমাপ্ত হইয়া থাকে।

বৃহস্পতিগ্রহের মেরু এবং বিষুবরেখা পরস্পরের সমকোণে অবস্থিত বলিয়া, ঐ বিশালগ্রহের শীত ও গ্রীষ্মকালের উত্তাপের বড় অধিক পার্থক্য হয় না। শনিগ্রহের বিষুবরেখার সহিত মেরুর ৬০০°.১০´.৩২″ কোণ দেখা যায়, এ নিমিত্ত উহাতে শীত ও গ্রীষ্মকালের উত্তাপের বিশেষ তারতম্য হইয়া থাকে।

শনিগ্রহের গ্রীষ্ম ঋতু পার্থিব সাত বৎসরের অধিক, সেই পরিমাণেই শরৎ, শীত, এবং বসন্ত ঋতু হইয়া থাকে। ১৫ বৎসর (কিছু কম) অন্তর উহার দিবারাত্রি সমান হয়, এবং ১৫ বৎসর অন্তরই উহার অয়নান্ত (Solstices) হয়। এই সকল অপূর্ব্ব ব্যাপারের সহিত শনিগ্রহের বিশাল চক্রসমষ্টি, এবং চক্রকয়টির কথা ভাবিলে, কি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী শোভারই আভাস পাওয়া যায়!

ঐ গ্রহের বার্ষিক গতি অনুসারে কোনও সময় উহার উত্তর কেন্দ্র, এবং কোনও সময় উহার দক্ষিণকেন্দ্র সূর্য্য কর্ত্তৃক আলোকিত হয়; সেই জন্যই উহার চক্রটি পৃথিবী হইতে নানাপ্রকার দেখায়। যে সময়ে সূর্য্য শনিগ্রহের বিষুবরেখার উপর থাকে, সেই সময়ে পৃথিবী হইতে উহার চক্রটি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ছোট ছোট দূরবীক্ষণে উহা আদৌ পরিলক্ষিত হয় না, খুব বৃহদাকার যন্ত্রেও ভাল করিয়া দেখা যায় না, গ্রহের দুই পার্শ্বে দুইটি সুসূক্ষ্ম জ্যোতিঃ রেখামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গ্যালিলিও যে সময়ে শনিগ্রহের চক্র দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখন উহা সম্ভবতঃ অয়নান্ত সমীপবর্ত্তী ছিল। ইহার কএক বৎসর পরে গ্যালিলিও তাঁহার ক্ষুদ্রাকৃতি দূরবীক্ষণ যন্ত্রে শনির চক্রটি দেখিতে না পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন! কিন্তু পরবর্ত্তী ত্রিংশবৎসরের মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বিশেষ যত্ন এবং অধ্যবসায় সহকারে দেখিয়া চক্রবিষয়ক সকল কথাই স্থির করিতে পারিয়াছেন। আমরা ক্রমে সেই সকল কথাই লিখিব।

মধ্যমাকার দূরবীক্ষণে দেখিলেও চক্রটির তিনটি বিভাগ

...ত হয়। গ্রহপিণ্ড হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে যে চক্রটি ...য়াছে, তাহার বর্ণ ঈষৎ মলিন বোধ হয়, মধ্যস্থ চক্রটি সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, এবং গ্রহের নিকটস্থ চক্রটি সর্ব্বাপেক্ষা মলিন এবং ছায়াযুক্ত দেখা যায়। স্যর্ জন হারসেল্ ঐ কৃষ্ণবর্ণ চক্রটির মধ্য দিয়া শনিগ্রহের একটি চন্দ্র দিখিতে পাইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ ঐ চক্রটি কোন স্বচ্ছ বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত।

ইহার কিছু পরে এমেরিকান জ্যোতির্ব্বিদ্ বণ্ড্ তাঁহার বৃহৎ দূরবীক্ষণে শনিগ্রহের সন্নিকটস্থ কৃষ্ণবর্ণের চক্র দেখিতে পান। তাঁহার পরে ডয়েজ নামক ইংরেজ জ্যোতির্ব্বিদ্ও ৬½ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণেও ঐ অর্দ্ধস্বচ্ছ চক্রটি দেখিতে পাইলেন। ঐ চক্রটির মধ্য দিয়াও শনিগ্রহের পার্শ্বরেখা (outline) বেশ সুস্পষ্ট দেখা যায়।

শনিগ্রহের এই কাল'বর্ণের চক্রটি ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সময়ে বণ্ড্ এব ডয়েজ-নামা দুইজন জ্যোতির্ব্বিদ্ উহা দেখিয়াছিলেন, তখন উহা খুব উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ না হইলে দেখিতে পাওয়া যাইত না; উৎকৃষ্ট যন্ত্রেও অনেক কষ্ট করিয়া উহা দেখিতে হইত। এক্ষণে উহা ৪ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণেও দেখা যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা বহিঃস্থ চক্রটির ব্যাস ১৭৩,৫০০ মাইল, উহার অভ্যন্তরস্থ ব্যাস ১৬৩,৫০০ মাইল, সুতরাং ঐ চক্রটির বিস্তার ১০,০০০ মাইল। মধ্যবর্ত্তী চক্রটির বহির্ব্যাস ১৫০,০০০ মাইল, অভ্যন্তর ব্যাস ১১৩, ১৪০, বিস্তার ১৮,৩০০ মাইল। এই দুই চক্রের মধ্যস্থলে যে ...বর্ণের রেখা দেখা যায়, উহা দুই চক্রের ব্যবধান মাত্র, ...র বিস্তার ১,৭৫০ মাইল। ছায়াযুক্ত চক্রটি মধ্যম চক্রের ...ত যুক্ত। উহা হইতে শনিগ্রহপিণ্ডের ব্যবধান ১০,১৫০ ...ল, সুতরাং শেষোক্ত চক্রটির বিস্তার ৯,০০০ মাইল।

ঐ প্রকার বিশালাকৃতির তিনখানি চক্র কি প্রকারে ...ান হইয়া রহিয়াছে? পূর্ব্বে বলিয়াছি শনিগ্রহ দ্রুত ...তিতে আপন অক্ষাবর্ত্ত সমাপ্ত করিতেছে, এবং প্রায় সাড়ে ...ত্রিশ বৎসরে আপনার দূরবর্ত্তী কক্ষায় সূর্য্যকেও বেষ্টন ...রিতেছে। এই দুই প্রকার গতিসত্ত্বেও চক্রগুলি যে একটুও ...লিত অথবা স্থানভ্রষ্ট হইতেছে না, ইহা অতীব বিস্ময়-...র ব্যাপার। ...
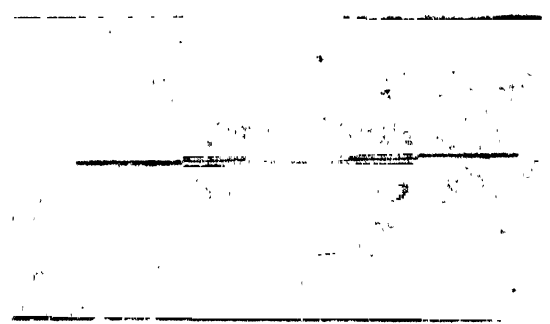
১৮৪৮ অব্দের ২২শে নভেম্বর তারিখে শনিগ্রহের আকৃতি পৃথিবী হইতে যে প্রকার দেখায়

গ্যালিলিও প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে, শনিগ্রহের দুইপার্শ্বে দুইটি তারকা আছে; কিন্তু তাহা তারকা নহে, যে সময়ে ঐ গ্রহের বিষুবন্ অর্থাৎ দিবারাত্রি সমান হয়, সেই সময়ে উহার চক্রটি পৃথিবী হইতে রেখার মত দৃষ্ট হয়।

ক্রমশঃ শনি আপন কক্ষায় ঘুরিয়া সূর্য্য হইতে যতই দূরে যাইতে থাকে, ততই উহার চক্রটি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৫৫ অব্দে (সাতবৎসর পরে) চক্রটিকে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত দেখা যায়।
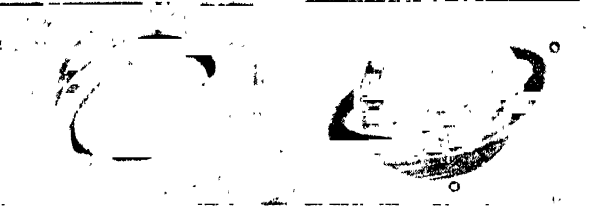
১৮৫৫ অব্দ ১৮৬৯ অব্দ

এই সময়ের পর হইতে আবার চক্রটি ফিরিতে থাকে, পুনর্ব্বার সাত বৎসর পরে (১৮৬২ অব্দে) শনিগ্রহের বিষুবনে সূর্য্য থাকায়, চক্রটি আবার অদৃশ্য হয়। ১৮৬৯ অব্দে চক্রটিকে অপরদিকে বিস্তৃত দেখা গিয়াছিল। ইহা ১৮৫৫ অব্দের বিপরীত অবস্থা।

পার্থিব হিসাবের ২৯ বৎসর ৫ মাস ১৭ দিবসে শনিগ্রহ সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, এজন্য ১৮৭৮ অব্দে ঐ গ্রহের চক্রটি ১৮৪৮ অব্দের মতই দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিবার সময় দুইবার সূর্য্যের সহিত ঐ চক্রটির সমসূত্রপাত ঘটে; একারণ ১৪ বৎসর,

৮ মাস, ২৩ দিন ১২ ঘণ্টা অন্তর ঐ চক্রটি আমাদের পৃথিবী হইতে রেখার মত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১৯০৭ অব্দ

১৯০৭ অব্দের সেপ্‌টেম্বর মাসের ২৬ তারিখে ঐ চক্রটি অদৃশ্য (অর্থাৎ রেখা মাত্র) হইয়াছিল। ঐ তারিখের পর হইতে চক্রটির ক্রমশঃ বিস্তার হইতেছে। ১৯১৫ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী ঐ চক্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত দেখা যাইবে। ১৮৫৫ সালের মতই উহা শনিগ্রহপিণ্ডের বামদিকে হেলিয়া রহিয়াছে, বোধ হইবে। ১৯১৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে শনিগ্রহ সূর্য্যের ঠিক বিপরীত অবস্থায় (৭ম স্থান) আসিবে। অতএব ঐ সময়ে রাত্রিকালে শনিগ্রহের চক্রটি দেখিবার বড়ই সুবিধা হইবে।

চক্রগুলি সময়ে সময়ে রেখার আকারে দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, ঐ চক্রগুলি দলে পুরু অতি অল্প। সকল চক্রগুলির একত্রে ব্যাস ১৭৩, ৫০০ মাইল হইলেও দলে উহা ১০০ মাইলের অধিক নহে।

ঐ পাতলা অথচ অতি বৃহদাকার কতকগুলি চক্র কোন্ শক্তিবলে শনিগ্রহকে বেড়িয়া রহিয়াছে, অধিকন্তু উহা স্থানচ্যুত হইতেছে না, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গ্রহপিণ্ডের উপর পড়িতেছে না, ইহা কি অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার নহে?

লাপ্‌লাস নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিক প্রথমতঃ এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ প্রকার পাতলা একখানি চক্র কোনও মতেই থাকিতে পারে না; একারণ তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অনেকগুলি পৃথক্ চক্র সমকেন্দ্রস্থ হইয়া (concentric) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শনিগ্রহকে বেষ্টন করিতে পারে। লাপ্‌লাস্ আরও বলেন যে, ঐ চক্রগুলিরও দশঘণ্টার কিছু অধিক সময়ে একটা আবর্ত্ত হওয়া আবশ্যক। নচেৎ মূলগ্রহের প্রচণ্ড আকর্ষণে উহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইত। লাপ্‌লাস্ অঙ্কশাস্ত্রবলে যে দুইটি বিষয় নিতান্ত আবশ্যক ভাবিয়াছেন, পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ দুই অবস্থাই শনিগ্রহের চক্রগুলিতে বিদ্যমান্ রহিয়াছে। অর্থাৎ ঐ চক্রগুলি ১০ ঘণ্টা ৩২ মিনিটকালে একবার ঘুরিতেছে; এবং এক্ষণকার বৃহদাকার দুরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এক কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি চক্র রহিয়াছে।

কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কথা আছে। লাপ্‌লাস্ যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাতেও অনেক বিপত্তি ঘটিতে পারে। ঐ প্রকার কতকগুলি চক্র, মধ্যস্থ প্রকাণ্ড গ্রহের আকর্ষণে থাকিয়া ভ্রাম্যমান্ থাকিলে, অতি অল্পকাল মধ্যেই চক্রগুলির গতিবিপর্য্যয় হইবার কথা, এবং শীঘ্রই চক্রগুলির সহিত মূলগ্রহের একটা ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হইবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। ঐ প্রকার সংঘর্ষ হইলে, চক্রটি একেবারেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, অপরপক্ষে উহা মূল শনিগ্রহেরও যথেষ্ট অনিষ্ট করিতে পারে।

লাপ্‌লাস্ এই পর্য্যন্তই ভাবিয়া চিন্তিয়া গিয়াছেন। পরে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহার ঐ সকল কথার উপর আর কেহ বড় উচ্চবাচ্য করেন নাই। লাপ্‌লাসের উপর

কথা কহিতে কাহারও সাহসে কুলাইয়া উঠে নাই,—কাজে কাজেই ও কথা অনেকদিন পর্য্যন্ত যবেস্থবেই থাকে।

১৮৫০ অব্দের নভেম্বর মাসে বণ্ড্ নামা জ্যোতির্ব্বিদ্ আমেরিকার হারভার্ড মানমন্দির হইতে প্রথমে দেখিতে পাইলেন যে, অভ্যন্তরস্থ বেগুনিয়া বর্ণের চক্রমধ্যে অল্প আলোক দেখা যাইতেছে। পর-রাত্রিকালে ঐ আলোকটি আরও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়া তিনি বুঝিলেন, উহা অপর একটি ছায়াময় অর্দ্ধস্বচ্ছ চক্র। ঐ বৎসর ২৫ নভেম্বরে ইংলণ্ড হইতে ডয়েস্-নামা জ্যোতির্ব্বিদ্ও ঐ ছায়াময় চক্রটি দেখিতে পান। তারপরে পৃথিবীস্থ অপরাপর জ্যোতির্ব্বিদ-গণও উহা দেখিতে পাইলেন। ছায়াময় চক্রটি পূর্ব্বে ছিল না, উহা একটা নূতন ব্যাপার, এই প্রকার ধারণা অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের হইয়াছে।

ইহার পরে পিয়ার্স এবং ম্যাক্সওয়েল্-নামা পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, ঐ চক্রগুলি কোনও প্রকার কঠিন অথবা তরল পদার্থে গঠিত নহে। আরও একটা কথা স্থির হইয়াছে যে, ঐ চক্রগুলির আকার ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে।

সর্ব্বপ্রথমে হাইঘেনস্ (Huyghens) নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ মাপিয়া স্থির করেন যে, চক্রগুলির বিস্তার ২৩,৬৬৭ মাইল। ইহার পরে হার্সেল মাপিয়া দেখিয়াছেন, ২৬,২৯৭ মাইল। আজকাল উহা মাপিয়া ২৮,৩০০ মাইল পাওয়া যাইতেছে। এই সকল পরিমাণ স্বীকার করিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতি বৎসরে শনির এই চক্রগুলির আয়তন ২৯ মাইল করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে।

শনির ঐ চক্রসমষ্টি কোন্ পদার্থে নির্ম্মিত ? পূর্ব্বে বলিয়াছি, লাপ্লাস্ ঐ চক্রগুলিকে কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, এবং অনেকগুলি পাতলা পাতলা চক্র একত্র আছে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। অঙ্কশাস্ত্র মতে এপ্রকার কতকগুলি চক্র, কিছুকাল ঐ ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারে; কিন্তু মূলগ্রহের গতি,আকর্ষণ,চক্রসমষ্টির গতি এবং পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি লইয়া অবস্থা এমন জটিল ও বিপজ্জনক হইবে যে, অল্পকাল মধ্যেই ঐ চক্রগুলি অথবা মূলগ্রহের পরস্পর সংঘর্ষে একটা প্রলয় কাণ্ড কোনও সময়েই ঘটিতে পারে।

প্রাকৃতিক ব্যাপার সকল পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হয় এই বিশ্বমধ্যে ঐ প্রকার দুর্ঘটনা অতি বিরল। মহাপ্রলয় প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে লিখিত থাকিলেও তাহা অনন্তকাল পরে কদাচিৎ হইতে পারে। কিন্তু যাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রলয়াশঙ্কা করিতে হয়, এমন কোনও অবস্থা প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ। এই সকল বিচার করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, শনিগ্রহের চক্রসমষ্টি কোনও কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত নহে।

বণ্ড্ নামক জ্যোতির্ব্বিদ অনুমান করিয়াছিলেন যে, অভ্যন্তরস্থ ছায়াময় চক্রটি, অথবা সকল চক্র কোনও প্রকার তরল বস্তুর দ্বারা গঠিত। বণ্ড্ মনে করিয়াছিলেন যে, আমরা এই পৃথিবীতে থাকিয়া যাহা চক্রাকার দেখিতে পাই, উহা হয়ত বহুবিস্তৃত জলসমুদ্র চক্রাকারে গ্রহটিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে ; ঐ জলরাশি ক্রমশই গ্রহপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। পরে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই মতও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

চক্রগুলি কঠিন পদার্থ নহে, তরলও নহে। তবে উহা কি ?—এই প্রশ্ন অনেক দিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদিগের মনে উদিত ছিল।

আর একটা অবস্থা বিবেচনা করিতে বাকী আছে,—অর্থাৎ অসংখ্য ছোট ছোট খণ্ড একত্র হইয়া ঐ চক্রসমষ্টি নির্ম্মিত হইয়াছে। রাত্রিকালে আকাশমণ্ডলে যে সকল উল্কাপিণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ প্রকার অসংখ্য উল্কাপিণ্ড একত্র হইয়া ঐ সকল চক্রের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশেষে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঐ ছোট ছোট টুকরাগুলি কঠিন অথবা তরলাকার হইতেও পারে অথবা ঐ সকল খণ্ড কোনও প্রকার বাষ্প দ্বারা আচ্ছন্নও হইতে পারে। প্রত্যেক টুকরা স্বাধীনভাবে আপন গতিতে গ্রহপিণ্ডকে বেষ্টন করিতেছে। এই মতে কোনও আপত্তি হয় না।

১৮৮৬ অব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে একটি পুরস্কার প্রদত্ত হয়। ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল-নামা বৈজ্ঞানিক লিখিত প্রবন্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, এবং তিনিই ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্র দ্বারা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পৃথক্

পৃথক্ অসংখ্য খণ্ড শনগ্রহের আকর্ষণে অবস্থিত হইলে সকলগুলি একত্র হইয়া ঐ প্রকার চক্রসমষ্টি গঠিত হইতে পারে। ঐ সকল টুকরা যে স্থানে খুব ঘন হইয়া রহিয়াছে সেই স্থান হইতে সূর্য্যের আলোক প্রতিভাত হইয়া অধিকতর সমুজ্জ্বল দেখায়। যে স্থানে ঐ প্রকার টুকরা নাই তাহা কৃষ্ণবর্ণের দেখা যায়। আর যে স্থানে ঐ প্রকার খণ্ড খুব অল্প, তাহা ঘোরবর্ণের দেখায়।

শনিগ্রহের দুই কেন্দ্র অপেক্ষা মধ্য প্রদেশে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অধিক, এই জন্যই ঐ টুকরাগুলি গ্রহের মধ্যস্থলেই চক্রাকারে রহিয়াছে।

পূর্ব্বকালে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ শনিগ্রহের আটটি চন্দ্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঐ আটটি চন্দ্রের প্রচলিত নাম শনিগ্রহ হইতে প্রত্যেক চন্দ্রের দূরত্ব এবং উহাদের পরিভ্রমণকালের তালিকা প্রদত্ত হইল।

চন্দ্রের নাম।	দূরত্ব। (মাইল)	পরিভ্রমণ-কাল। দিন	ঘণ্টা	মিঃ	সেঃ
মিমাস	১১৭,০০০	০	২২	৩৭	৫
এন্সিলাডস	১৫০,০০০	১	৮	৫৩	৭
টেথিস্	১৮৬,০০০	১	২১	১৮	২৬
ডায়োন	২৩৮,০০০	২	১৭	৪১	১০
রিয়া	৩৩২,০০০	৪	১২	২৫	১২
টিটান	৭৭১,০০০	১৫	২২	৪১	২৭
হাইপারিয়ন্	৯৩৪,০০০	২১	৬	৩৮	২৪
ইয়াপেটস	২,২২৫,০০০	৭৯	৭	৫৬	২৩

১৯০৪ অব্দে প্রোফেসর ই, সি পিকারিং শনিগ্রহের নবম চন্দ্রের আবিষ্কার করেন। ঐ চন্দ্রের নাম হইয়াছে, "ফিবি"। উহা প্রায় দেড় বৎসরে একবার শনিগ্রহের চারিদিকে ঘুরে এবং উহা শনিগ্রহ হইতে ৮০০০,০০০ আশী লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত।

আমাদের পার্থিব হিসাবে প্রায় পনর বৎসর কাল শনিগ্রহের উত্তরদিকে সূর্য্য থাকেন। সুতরাং শনিগ্রহের কেন্দ্রস্থানের দিবারাত্রির পরিমাণও ঐ প্রকার। যে সময় শনিগ্রহের উত্তরকেন্দ্রে পনর বৎসর দিবা সেই সময়ে উহার দক্ষিণকেন্দ্রে পনর বৎসর রাত্রি হয়। পরবর্ত্তী পনর বৎসরে উত্তরকেন্দ্রে রাত্রি এবং দক্ষিণকেন্দ্রে দিবা হইয়া থাকে।

শনিগ্রহের বায়ুমণ্ডল খুব ঘন সন্দেহ নাই। উহার চক্রের সন্নিকট গ্রহাঙ্গে যে মেঘলার ন্যায় কতকগুলি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নিশ্চয়ই সেগুলি মেঘমালা; ঐ সকল মেঘের উপর সূর্য্যকিরণ উচ্ছ্বিত হইয়াই সমুজ্জ্বল মেখলার ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা শনিগ্রহের যে বিবরণ দিলাম পৃথিবীর প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ সকলেই উহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এক্ষণে আমরা ঐ সকল তত্ত্বের পুনরালোচনা করিব। শনিগ্রহে বর্ত্তমানকালে যে অবস্থা সেই প্রকার অবস্থায় উহাতে এখন সমুদ্রের অবস্থান সম্ভব নহে। ঐ গ্রহের জল সমস্তই মেঘাকারে আকাশমণ্ডলে ভাসমান রহিয়াছে এবং ঐ গ্রহের এখনও খুবই তরুণ অবস্থা। সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেই বলিয়া থাকেন যে, এখনও গ্রহপিণ্ডটি অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ রহিয়াছে। অতএব ঐ বিশাল গ্রহটিতে বৃক্ষ, লতা, তৃণ, অথবা কোনও প্রকার জীবোৎপত্তি এখনও হয় নাই। এই পৃথিবী যখন জুড়াইয়া একেবারে শীতল হইবে এবং চন্দ্রের মত জল ও বায়ু শূন্য হইয়া জীবহীন হইবে সেই সময়ে হয়ত শনিগ্রহ জীবনিবহের বাসোপযোগী হইতে পারিবে।

শনিগ্রহের পদার্থসমষ্টির আণবিক গুরুত্ব প্রায় জলের মত। এই নিমিত্ত কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন যে পৃথিবী হইতে আমরা শনিগ্রহের যে আকার মাপিয়া দেখিতে পারিতেছি তাহা নিশ্চয়ই উহার মেঘমালা সমেত আমরা দেখি। আসল গ্রহপিণ্ড দৃশ্যমান মেঘ সমেত আকৃতি অপেক্ষা অনেক ছোট হইবারই খুব সম্ভাবনা। এই কারণেই উহার গুরুত্ব কিছু কম দেখা যাইতেছে। বোধ হয় পার্থিব হিসাবে বহু যুগযুগান্তকাল অতীত হইলে শনিগ্রহের উপরিভাগে সমুদ্রসকলের অবস্থান হইবে। সেই সময়ে পৃথিবীর মতই উহা নানা প্রকার জীবের আবাসভূমি হইতে পারিবে; বৈদিক মহর্ষিগণ ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা ভাবিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে বলিয়াছিলেন, "ক অদ্ধা বেদ?—" অর্থাৎ কে বলিতে পারে?—আমরাও উহার বেশী আর কিছু বলিতে পারিনা। বিশ্ব অনন্ত, মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমা আছে। সেই জন্যই আমরা যতই জ্ঞানলাভ করি, ততই ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য-প্রণালীর অপার মহিমা দেখিতে পাই, এবং মানুষ আমরা যে কত ক্ষুদ্র, তাহা ভাবিয়া হতাশ হই।

শ্রীআদীশ্বর ঘটক

ভারতের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী

'ভারতবর্ষের' পাঠকপাঠিকাদিগকে প্রথমেই অভয় প্রদান করিতেছি, আমি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিবার আয়োজন করিতেছি না। সে দুষ্কর্ম্ম জীবনে এক আধবার করিয়াছি, এখন আর সে পথে পদার্পণ করিতে সাহসে কুলায় না। আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিরা সে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রমণকাহিনী কত অভিনব তথ্যে পরিপূর্ণ; তাঁহাদের লিপিকুশলতা সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়। এ অবস্থায় আমার মত একপ্রকার সেকেলে মানুষে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিলে পড়িবেই বা কে; আর আমিই বা জানিয়া শুনিয়া এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যাইব কেন?

অতএব সকলে আশ্বস্ত হউন, আমি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতেছি না। আমি যাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছি, তাহা 'বৃত্তান্ত' বটে, কিন্তু 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' নহে। ভ্রমণ করিলে ত তাহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিব। ঘরে বসিয়া পুস্তক পড়িয়া নাকি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে পারা যায় বলিয়া শুনিয়াছি; কিন্তু সে চেষ্টা কোন দিন করিয়া দেখি নাই; মনে হয় সে চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আমার পক্ষে বড়ই কম। সুতরাং আমি সে পথেই যাইতে প্রস্তুত নহি।

আমি যে কথা বলিবার জন্য এতক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা করিলাম, তাহা গভীর গবেষণামূলক নহে; তাহার মধ্যে বিশেষ চেষ্টা করিলেও আধ্যাত্মিকতার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাণুও মিলিবার সম্ভাবনা নাই। তাহা খাঁটি, নির্ভেজাল গল্প অর্থাৎ তাহা ভারতের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা কি প্রকার কঠোর সাধনা করিয়া থাকেন, তাহারই দুই চারিটা দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। অতএব আপনারা যথাযোগ্য 'অধৈর্য্য সম্বল করিয়া' আমার কথা কয়টি শ্রবণ করুন।

এমন দিন ছিল যখন এ দেশের শিক্ষিত লোকেরা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর কথা শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন; তাঁহাদিগের নিকট সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় একদল বুজরুগ, ভণ্ড বলিয়া অভিহিত হইতেন। কিন্তু তখনও আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলের নরনারী সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে ভক্তিভরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, তাঁহাদের সেবার ব্যবস্থা করিতেন। গৈরিক বসন ও জটাভস্ম ভারতের নরনারীদিগকে মোহাবিষ্ট করিত। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে দেশ যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কমিয়া গেলেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

এ কালে আমাদের দেশে সাধু সন্ন্যাসীদিগের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। সত্য বটে, আজ কাল যত্র তত্র অনেক ভণ্ড সাধু দেখিতে পাওয়া যায়। ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা। তাহারা জানে 'ভেখ না লইলে ভিখ্ মিলে না'। তাই তাহারা সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। এই সকল সাধু দেখিয়াই আমাদের দেশের শিক্ষিত-সমাজ সাধু সন্ন্যাসিদলের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন; এখনও অনেকে সে শ্রদ্ধা ফিরিয়া পান নাই। কিন্তু এই ব্যাপার হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশের লোকের সাধু সন্ন্যাসীর উপর কেমন শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়াই ত অসৎ লোকে দুই পয়সা উপার্জ্জনের জন্য এই পরম পবিত্র সন্ন্যাসকে ব্যবসায়ের বৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে।

কিন্তু আজকাল একটু বাতাস ফিরিয়াছে; এখন আমাদের শিক্ষিত-সমাজের অনেকে সাধু সন্ন্যাসীর উপর ভক্তিমান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণও সহজে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেশের শিক্ষিত-সমাজ মনে করেন যে, য়ুরোপ যাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন, তাহা সত্য না হইয়া যায় না। এ ভাবটা মধ্যে আমাদের দেশে বড়ই প্রবল হইয়াছিল। সেই সময়ে আমাদের ব্রহ্ম-বিদ্যা 'থিয়জফি' নাম ধারণ করিয়া যখন য়ুরোপ হইতে নূতন বেশে জাহাজে চড়িয়া এ দেশে আমদানী হইল, তখন শিক্ষিত-সমাজ বলিলেন, "হাঁ, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই সত্য আছে। ইহা বুজরুগি নহে।" তখন ধীরে ধীরে আমরা অনেকে এই তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলাম, সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মা প্রভৃতির উপর শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করি-

লাম। সাধু সন্ন্যাসীরা যে সকলেই ভণ্ড নহে, তাঁহাদের মধ্যেও যে প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী আছেন, আমরা একটু একটু করিয়া স্বীকার করিলাম। তাঁহারা যে অকারণ কৃচ্ছ্রসাধন করেন না, তাহাও যেন আমরা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলাম।

আমাদের দেশে যাহারা সন্ন্যাসীগিরিটিকে ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু লোকালয়ের বাহিরে—পর্ব্বতে, অরণ্যে, নদীতীরে—মনুষ্যসমাগমশূন্য স্থানে যাঁহারা সন্ন্যাসি-জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহারা ত ব্যবসায়ের খাতিরে—ভিক্ষা-লাভের আশায়—দুই পয়সা উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেন নাই? সেই জনশূন্য স্থানে তাঁহাদের কে ভিক্ষা দিবে? সেখানে তাঁহারা কি পার্থিব লাভের আশায় বসিয়া আছেন? নর্ম্মদাতীরে, বিন্ধ্যগিরির নিভৃত উপত্যকায়, হিমালয়ের দুর্গম গিরিকন্দরে এখনও কত সাধুসন্ন্যাসী ভগবানের উপাসনায় জীবনের দিনগুলি অনাহারে অনিদ্রায় অতিবাহিত করিতেছেন, সংসারের কীট আমরা তাহার কি কোনও সন্ধান রাখি? হিমালয়ের অরণ্যসঙ্কুল নিভৃত তপোবনে প্রবেশ করিলে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও ঊর্দ্ধবাহু সাধু বাম হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দণ্ড ধারণপূর্ব্বক পদ্মাসনে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। কাহারও উভয় বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলিত; মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গুলির নখরগুলি বর্দ্ধিত হইয়া করতল ভেদ করিয়াছে; উভয় বাহুর চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া অস্থির উপর আঁটিয়া বসিয়াছে। তাঁহার মস্তকে জটাভার, বক্ষ-বিলম্বিত শ্মশ্রুরাজি; আহারে প্রবৃত্তি নাই; নয়নে নিদ্রা নাই; ধ্যান ভঙ্গ হইলে, শিষ্যেরা যদি কিছু মুখে তুলিয়া দেন, তবেই তাহা আহার করেন। এমন সন্ন্যাসী আমি কত দেখিয়াছি। এখনও এতকাল পরে সেই সকল দৃশ্যের কথা স্মরণ হইলে প্রাণের মধ্যে যে কেমন করিয়া উঠে, তাহা স্বর্গভ্রষ্ট, মহাপাতক আমি কি বলিয়া বুঝাইব, কেমন করিয়া তাহা প্রকাশ করিব!

কঠোর সাধনা ভিন্ন সংসারে সিদ্ধিলাভ হয় না। বিদ্যা, ধন, মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সকলই সাধনা-সাপেক্ষ। কঠোরতর সাধনা ভিন্ন ভগবানের কৃপাবিন্দু লাভ করা যায় না—ভগবান্ অনায়াস-লভ্য নহেন। বহু তপস্যার ফলে ভগবৎ-কৃপা লাভ হয়—বহু সাধনার ফলে ভগবদ্দর্শন-লাভ হয়। তাই সাধুসন্ন্যাসীরা এত কঠোর সাধনা করিয়া থাকেন। সংসার-বিরাগী, মুমুক্ষু ভারতীয় সাধু সন্ন্যাসীদিগের অনুষ্ঠিত সাধনার তুলনা পৃথিবীর আর কোন দেশে মিলে কি না জানি না।

সন্ন্যাসধর্ম্ম ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার করিবার শক্তি বা সামর্থ্য আমার নাই, এবং আমি সে কথা বলিতে বসিও নাই। আমি কেবল কঠোরসাধন-নিরত কএকটি সাধু সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর চিত্র পাঠকপাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

ঐ দেখুন একজন শ্বেতশ্মশ্রু প্রাচীন সাধু বৃক্ষকাণ্ড-বিলম্বিত রজ্জুপ্রান্তে আবদ্ধ দণ্ডমধ্যে নিজদেহ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া কি কঠোর তপস্যায় রত আছেন! তাঁহার অদূরে আর একজন সাধু সুতীক্ষ্ণ কণ্টকের আসনে যুক্তজানু উভয় হস্তে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন। তীক্ষ্ণ কণ্টকে পদতল বিদীর্ণ করিতেছে; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। আরও কিছু দূরে একজন সাধু মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত

হিমালয়ের উপত্যকায় যোগনিরত সাধুসম্প্রদায়

শীত্র উপেক্ষা করিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া পঞ্চতপা করিতেছেন। এ সকল দেখিলে কি বিস্ময় জন্মে না? সত্য সত্যই এই সকল দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, মা ভারতভূমি আজ তোমার যতই অধঃপতন হউক, তোমাতে যাহা আছে, পৃথিবীর কোন দেশে তাহা নাই। আধ্যাত্মিকতার যে পর্ব্বত-শিখরে তুমি অধিষ্ঠিতা আছ, অন্যের পক্ষে তাহা দুরধিগম্য। পৃথিবীকে তুমি আজও যাহা দিতে পার, তাহা আর কোন বংশের কোন ভাণ্ডারে নাই।

আমি যোগশাস্ত্র পাঠ করি নাই। কথাটা বোধ হয় ঠিক বলা হইল না, কারণ এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমি যোগশাস্ত্র পড়ি নাই বটে, কিন্তু অন্য শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি। আমার কিন্তু তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে। আমি সরল ও সত্য কথায় বলিতে পারি যে, আমি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ি নাই বলিলেই হয়—তা, কি যোগশাস্ত্র আর কি অন্য শাস্ত্র। আজ কালকার এই গীতার যুগে দ্বাদশ বৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশুও গীতার শ্লোক 'কোট' করিয়া থাকে; আমি তাহাও পারি না। এ অবস্থায় যোগশাস্ত্র বা যোগসাধন-প্রণালী সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমি সে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে মোটেই রাজী নহি। যোগ-সাধন-প্রণালী যে সকল পুস্তকে লিখিত আছে, তাহার একখানি হাতের কাছে লইয়া বসিলে কত রকম 'মুদ্রা' হইত। কিন্তু যাহার ক, খ পর্য্যন্তও জানি না, যাহার একটি কথাও জানিবার জন্য কোন দিন চেষ্টা করি নাই বা আগ্রহ প্রকাশ করি নাই, কার্য্যকালে তাহাকে আনিয়া খাড়া করা একেবারেই অসম্ভব। তাই আমি যোগের কথা—'মুদ্রার' কথা বলিতে পারিলাম না। তবে হিন্দু সন্ন্যাসিগণ যে নানা বিভিন্ন ভঙ্গীতে উপবেশন পূর্ব্বক তপস্যা করিয়া থাকেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, কিন্তু কোন দিন অনুসন্ধান করি নাই;—আমার উদাস দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া এমন কত দৃশ্য কত সময়ে চলিয়া গিয়াছে; তাহার অনেক-গুলিই আমার হৃদয়ে কোন দাগ বসাইয়া যাইতে পারে নাই। যাক্, সে কথা। সাধুসন্ন্যাসীরা যে প্রকার নানা ভাবে আসন করিয়া থাকেন, তাহার বর্ণনা দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাঁহাদের আসন করিতে যে প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হয় তাহার যথাযথ বর্ণনা দিতেও সেই প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হয়। আমার সে সাধ্য আর এখন নাই। তাই আমি একটা সহজ ও সুগম পন্থা বাহির করিলাম। আমি এইস্থানে একখানি চিত্র প্রকাশিত করিলাম, তাহা দেখিলেই পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন যে, এই সকল আসন করা, বা যোগের ভাষায় যাহাকে 'মুদ্রা' বলে তাহা অভ্যাস করা কত কঠিন, কত সময়-সাপেক্ষ।
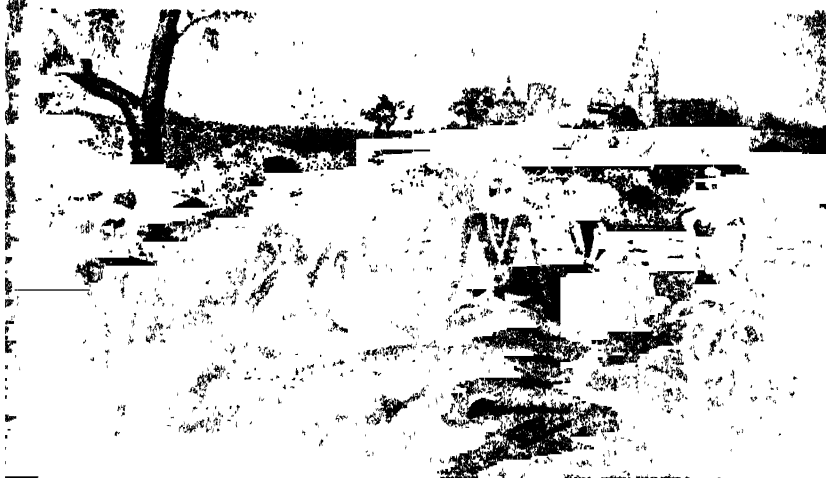
গঙ্গোত্রী-তীরে ধ্যানরত সাধুসম্প্রদায়

ছে, তাহার একটা বিবরণ দিতে পারিলে বেশ একটুখানি বিদ্যাও প্রকাশ করা হইত, প্রবন্ধটাও একটু জাঁকাল

আমাদের পাঠক পাঠিকা-গণের অনেকেই ঊর্দ্ধমুখী সাধুর গল্প শুনিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে, কয়জনের এই সকল সাধু সন্দর্শন লাভ হইয়াছে বলিতে পারি না; কারণ এই সকল সন্ন্যাসী লোকালয়ের দিকে—সহর বাজারের দিকে আসেন না—আসিতে চাহেন না। তাঁহাদের ত আর "সের ভর আটা দেলায়ে দে রাম" নাই। তাঁহারা হিমালয়ে নিভৃত প্রদেশে বা ঐ প্রকার নির্জ্জনস্থানে তপশ্চরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই

সমস্ত স্থানে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন-লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ভ্রমণ-কারী মহাশয়গণের মধ্যে দুই দশজন ব্যতীত আর সকলেই দিল্লী, লাহোর, আগরা, লক্ষ্ণৌ ভ্রমণকারী। সুতরাং 'ভারত বর্ষের' অধিকাংশই পাঠক-পাঠিকাই উর্দ্ধমুখী সন্ন্যাসী দেখেন নাই, একথা ধরিয়া লওয়াটা আমার পক্ষে অপরাধের কার্য্য হয় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সকলের বর্ণনা আমি দিব না, আমি সহজ পন্থা পাইয়াছি। বহু পরিশ্রমে এবং অর্থব্যয়ে এই প্রকারের কএকখানি চিত্র আমি সংগ্রহ করিয়াছি। সেই চিত্র প্রদর্শন করিলেই আমার কার্য্য সুগম হইবে, এবং পাঠক-পাঠিকাগণও আমার বাগাড়ম্বর শুনিয়া শেষে "দুগ্ধ কেমন—না বকের মত"
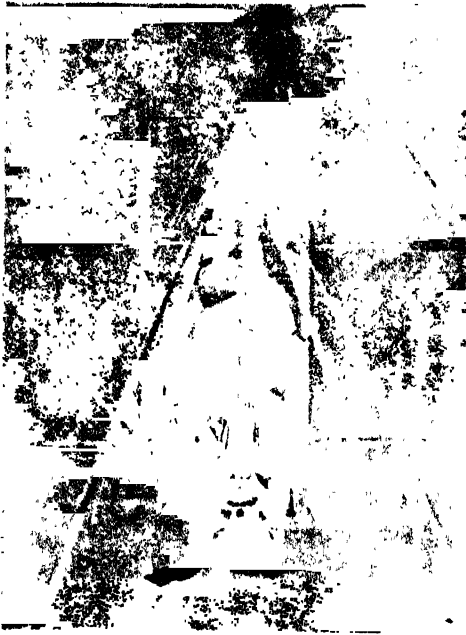
উর্দ্ধমুখী সাধুর যোগ-সাধনা।

বুঝিয়া যাইবেন না। সেইজন্য এইস্থানে আমি একটি উর্দ্ধমুখী সাধুর প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিলাম। উর্দ্ধ-মুখী সাধুরা এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তপস্যা করেন। কএক বৎসর পূর্ব্বে লাহোরের 'রতনচাঁদের তলাও' নামক সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকার সন্নিকটে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে একজন উর্দ্ধমুখী সাধুকে তপস্যা করিতে দেখা গিয়াছিল। তিনি কি ভাবে তপস্যা করিতেন এবং তাঁহার তপস্যা প্রণালী কিরূপ কৌতুকাবহ তাহা যদি পারি তবে পরে কথঃ বলিবার চেষ্টা করিব।

হরিদ্বার প্রয়াগ সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি হিন্দুর প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে এক এক সময়ে কোন যোগ উপলক্ষে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। আমার অদৃষ্টে একবার এই পবিত্র দৃশ্য-দর্শন ঘটিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা; সাল মনে নাই। সেবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইয়াছিল। তত বড় কুম্ভযোগ নাকি শীঘ্র আর হইবে না। তাহার পরেও আর একবার কুম্ভমেলা হরিদ্বারে হইয়াছিল। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে, আমরা যে মেলা দেখিয়াছিলাম তেমন যোগ না কি বহুদিন হয় নাই। সেই সময় একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন যে, আর ১২৮ বৎসরের মধ্যে এমন যোগ হইবে না। আমি তখন হরিদ্বারের নিকটেই থাকিতাম; সুতরাং এমন যোগ যখন আসিয়াছিল এবং আমারও যখন সুযোগ ছিল তখন এত বড় মেলাটা দেখিবার প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারি নাই। সে যে কি দৃশ্য তাহা আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব। কত সাধু সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী আসিয়াছিলেন—কত হাজার! আমার মনে হয় সংখ্যা হাজার ছাড়াইয়া গিয়াছিল, লক্ষের ঘরে পৌঁছিয়াছিল। অসংখ্য অগণ্য সন্ন্যাসীর দল। আর তাহাদের মধ্যে অনাচ্ছাদিত অগ্নির মত কি যে সব সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর মূর্ত্তি! তখন কি আর জানিতাম যে, আমাকে এই সকল কথা বলিতে হইবে, এই সকল দৃশ্যের বর্ণনা করিতে হইবে? তাহা হইলে সেই সময়ে হরিদ্বারের সেই পবিত্র দৃশ্যের দুইচারিখানি ছবি নিজে তোলাইতে না পারি, অন্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। তখন ত সে কথা একবারও মনে হয় নাই। এখন অনুসন্ধান করিয়া হরিদ্বারের সেই কুম্ভমেলার কোন বিশ্বাসযোগ্য ছবি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। একখানি ছবি পাইয়াছি, তাহা হরিদ্বারের সমাগত সাধু সন্ন্যাসীদিগের ছবি কি না, তাহা এতকাল পরে আমি ঠিক বলিতে পারিতেছি না। আমি সেই ছবিখানি এই স্থানে দিলাম, ইহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর কএকটি সাধুর প্রতিকৃতি রহিয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের মহিমা য়ুরোপীয়গণও আজকাল উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন; কর্ণেল অলকট্ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এবং থিয়সফিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ খৃষ্ট শিষ্যগণের সংখ্যা একালে একান্ত বিরল নহে। এই ত সেদিন একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রের সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি পণ্ডিত হিসাবে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই; প্রকৃত তান্ত্রিকের মতে শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়াই তিনি এই গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন; এবং আমার ত মনে হয় যে, তিনি হাতে কলমে অনেক তান্ত্রিক অনুষ্ঠানবিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সম্পন্ন করিয়া তাহার পর এই পুস্তক লিখিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ মহাশয়গণ যে য়ুরোপে আছেন এবং এখনও হইতেছেন, ইহা তাহারই একটি প্রমাণ। আমি এই স্থানে একটি সাহেব সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিলাম। ইহার নাম শার্ল-দে-রশেত। ইনি জাতিতে ফরাসী। বাল্যকালে রশেত মহোদয় খৃষ্টান ছিলেন—গোঁড়া খৃষ্টানের বংশেই ইঁহার জন্ম। সিমলা শৈলে বিশপ কটন স্কুলে ইনি বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয়। অবশেষে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম আলিঙ্গন করেন; এবং সংসারে উদাসীন হইয়া সাধুর বেশে দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল; তাহা তিনি তাঁহার ভগিনীকে প্রদান করিয়াছিলেন। রশেত কি কারণে খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের অনুষ্ঠিত নিয়মাদির অনুসরণ করিতেন; সমাজচ্যুত হইলেও তিনি স্বকৃত কর্ম্মের জন্য কোন দিন অনুতপ্ত হন নাই। তিনি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বেশভূষা সাধারণ সন্ন্যাসীদিগের মত ছিল না। সিমলা অঞ্চলের অনেক লোকই তাঁহাকে দেখিয়াছেন;

হরিদ্বারে সন্ন্যাসি-মেলা

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ফরাসী সাধু শার্ল দে রশেত

এবং হিন্দুগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। হিন্দু সন্ন্যাসীরা তাঁহার সহিত অসঙ্কোচে মিশিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন বিশেষ বিবরণ আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

এইবার আর একটি সাধুর কথা বলিব। ইনি ভিন্ন-প্রকৃতির সাধু; ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রতিহিংসা-বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনই না কি ইঁহার সন্ন্যাস অবলম্বনের কারণ। এই শ্রেণীর যোগীদিগের সাধনাও অল্প কঠোর নহে। এইরূপ একটি যোগীর প্রতিকৃতি আমরা এই স্থানে প্রকাশিত করিলাম। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের লাহোর অঞ্চলে এই যোগীকে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়

'শঙ্কলওয়ালা' সাধু

অনেক ইংরেজি ও দেশীয় সংবাদপত্রে এই যোগীর প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল। পঞ্জাব প্রদেশে ইনি 'শঙ্কলওয়ালা' (শৃঙ্খলধারী) যোগী নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হয় নাই। কঠোর সাধনায় তিনি ক্ষীণাঙ্গ হইয়াছিলেন। গুরুভার শৃঙ্খল-বহনে তিনি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অনেক সময়ই তিনি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন—বসিতে বা দাঁড়াইতে পারিতেন না। কোন ভদ্রলোক অনেক সাধ্য-সাধনায় তাঁহাকে দণ্ডায়মান করিয়া তাঁহার যে 'ফটো' তুলিয়াছেন, তাহাই আমরা প্রকাশিত করিলাম। শঙ্কল-ওয়ালা যোগী সর্ব্বাঙ্গে যে শৃঙ্খল বহন করিতেন, তাহার ওজন না কি ছয় মণ দশ সের।

তাঁহার এই গুরুভার লৌহশৃঙ্খল-বহনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছিল যে, কোন ক্ষমতাশালী দুষ্ট লোক তাঁহাকে বড়ই উৎপীড়িত করিয়াছিল। তিনি এই অত্যাচারের প্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া কঠোর আত্ম-নির্যাতন-ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার কঠোর নির্যাতনে সদয় হইয়া পরমেশ্বর দুষ্কৃতিকারীদের প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিবেন। যোগিবরের এই কামনা পূর্ণ হইয়াছিল কি না, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কএক দিন লাহোরে অবস্থিতি করিয়াই তিনি অদৃশ্য হন। আমি তাঁহাকে দেখি নাই; ইহা আমার শোনা বা পড়া কথা। এই প্রস্তাবের মধ্যে পড়া কথা দুই চারিটি আছে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অমৃতসরের সুবর্ণ-মন্দির-সান্নিধ্যে আর একজন যোগীর আবির্ভাব হইয়াছিল। এই যোগী বিভূতিভূষিতাঙ্গ, জটা-ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী নহেন। তাঁহার গায়ে জামা, মাথায় পাগড়ী;—তথাপি তিনি বড় সাধারণ যোগী নহেন। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজ দলীপসিংহ এই যোগীর পিতা। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরাজ দলীপসিংহের রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিলে দলীপসিংহ ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ইংরেজ-ললনার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যোগী অমৃতসরে আসিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে দলীপ সিংহের ঔরসে ইংলণ্ডেই তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার নাম যুবরাজ বীরভানু সিংহ। সাধারণতঃ তিনি বীরসিংহ নামেই পরিচিত; কিন্তু মহারাজ দলীপ সিংহের ভিক্টর দলীপ সিংহ

ব্যতীত অন্য কোন পুত্র ছিল, ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বীর-ভানুসিংহ অল্প বয়সে এ দেশে আসিয়া কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তাহার পর তিনি সন্ন্যাসি-বেশে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার সঙ্গে দুইজন চেলা থাকিত। বীরভানু সিংহ ও তাঁহার চেলা-দ্বয়ের ফটো এইস্থানে প্রদত্ত হইল। চিত্রের মধ্যস্থলে যিনি উপবিষ্ট, তিনিই যুবরাজ ভানু-সিংহ। এই যোগীর সম্বন্ধে আর কোন কথা এখন জানা যায় না।

পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের পৌত্র—সন্ন্যাসী বীরভানুসিংহ

সাধ্বী শ্রীমতী পণ্ডিতা মাঈ জীবন মুকুট

এইবার একজন সন্ন্যাসিনীর পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সন্ন্যাসিনীর নাম পণ্ডিতা মাঈ জীবন-মুকুট। কাশ্মীরের জম্মু-নগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গুরুমুখী ও হিন্দী ভাষায় সুপণ্ডিতা ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। যোগিনী হইলেও স্ত্রী-শিক্ষায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি প্রথম যৌবনে তাঁহার বাসগ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহদানের জন্য গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য তাঁহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সন্ন্যাসিনীর বেশে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। পঞ্জাবের অনেক স্থলেই তিনি ব্রহ্মচারিণী-বেশে বক্তৃতা করিতেন; পুরুষ ও রমণী-সমাজ তাঁহার বক্তৃতা সমান আগ্রহে শ্রবণ করিতেন এবং সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।

আমার প্রবন্ধ এবার এইস্থানেই শেষ হইল। যদি পারি তবে ভারতের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগের কথা পুনরায় বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীজলধর সেন

ভারতবর্ষ

শ্যামল আমার মায়ের অঞ্চল,
প্রসন্ন জাহ্নবী বহে ঢল ঢল,
মলয় সমীর বহিছে শীতল
পরশি জননী-কায় ;

ধুইয়া চরণ লুটিছে সাগর,
মাথায় উপরে শান্ত নিশাকর,
উত্তরে হিমাদ্রি ভেদিয়া অম্বর,
ধরিত্রীর পানে চায় ;

শিশু-কোলাহলে পূর্ণ সব গেহ
হাসিভরা মুখ ধূলা-মাখা দেহ,
ঘিরিয়া সবারে জননীর স্নেহ
আকাশ নীলিমা তুল।

পাখী-কলরবে মুখরিত কুঞ্জ,
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মধুকর-গুঞ্জ,
নিশীথ আকাশে তারকার পুঞ্জ
কাননে কাননে ফুল।

পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে চলে নারীগণ,
ছলকে নাগরী বাজিছে কাঁকন,
অলক্তক-রাগে রঞ্জিত চরণ
বাজিছে মায়ের কোলে ;

পাছে ছেড়ে গ্রাম মাঠে চলে ধেনু,
থেকে থেকে বাজে রাখালের বেণু,
বাতাসেতে ঘুরে উড়ে রজ-রেণু,
সঙ্গীত আকাশে দোলে।

মঙ্গল সন্ধ্যায় মায়ের আরতি,
মন্দিরে মন্দিরে মায়ের মূরতি,
নাহিক বিরাম নাহিক বিরতি
উঠে শঙ্খ ঘণ্টা-রব !

যুগে যুগে যুগে হাসিবে জননী,
আকাশে ধ্বনিবে সুমঙ্গল-ধ্বনি,
বন্দিবে চরণে দেবের রমণী,
উল্লাসে পূরিবে ভব !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের ন্যায়নিষ্ঠা

'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' আক্‌বর শাহের পরলোক-গমনের অব্যবহিত পরেই যুবরাজ সেলিম পাতশাহ 'নুর-উদ্দীন জাহাঙ্গীর' খেতাব গ্রহণপূর্ব্বক ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বর রূপে অভিষিক্ত হইলেন। জাহাঙ্গীর শাহের অভিষেক-কার্য্য আগ্রা নগরে মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হয়। 'মহা সমারোহ' শব্দ দ্বারা সেই বিরাট্ মহোৎসবের ধারণা হয় না, কারণ একালে বৃটিশ সম্রাটের অধীন একজন সামান্ত মিত্র-রাজের অভিষেক-কার্য্যও 'মহা সমারোহে' সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

কোনও নূতন সম্রাটের রাজ্যাভিষেকে সে কালে উৎসব ও আনন্দ যেরূপ দেশব্যাপী হইত, একালে পৃথিবীর প্রায় কোনও দেশেই সেরূপ হয় না। প্রজা-সাধারণের হিতানুষ্ঠানই সেকালে রাজা মহারাজগণের অভিষেকোৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের অভিষেকে প্রজার মঙ্গল-সাধনের জন্য যেরূপ বিপুল অর্থ ব্যয় করা হইয়াছিল, অন্য কোন্‌ও সম্রাট্ স্বীয় অভিষেক-মহোৎসব স্মরণীয় করিবার জন্য তত অধিক অর্থব্যয় করেন নাই।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের অভিষেক-ক্রিয়া যথারীতি সুসম্পন্ন হইলে আগ্রার সম্রাট্-দরবারে সম্রাট্ দূত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "আমাদের সম্রাট্-জাহাঙ্গীর পৃথিবীপতি হউন। সম্রাট্ তাঁহার এই অধম ভৃত্যকে এ কথা ঘোষণা করিতে আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার অভিষেক স্মরণীয় করিবার জন্য রাজ্য মধ্যে এক লক্ষ ইদারা খনন করা হইবে, এবং পান্থগণের সুখস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনের নিমিত্ত প্রধান প্রধান পথের ধারে পঞ্চাশ সহস্র পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইবে। শুল্ক আদায়ের জন্য ভবিষ্যতে কোনও পণ্যদ্রব্যের গাঁট খুলিবার প্রথা রহিত হইল। ছয় মাস কাল প্রজাবর্গকে কোনও প্রকার রাজকর প্রদান করিতে হইবে না। দরিদ্র ও রুগ্ন প্রজাগণের চিকিৎসার জন্য সম্রাটের ব্যয়ে চিকিৎসকগণকে নিযুক্ত করা হইবে। মদ্যবিক্রয় করা রহিত হইল। ছয় মাস কাল ধরিয়া দিবারাত্রি দীন-দরিদ্রগণকে অন্নদান করা হইবে। সম্রাট্ আমাকে এ কথাও ঘোষণা করিতে আদেশ দান করিয়াছেন যে, যাহারা অন্য কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইবে বা যাহাদের কোনও প্রকার অভিযোগ থাকিবে—তাহারা যদি প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া সম্রাটের প্রাসাদ-বহির্ভাগে সংরক্ষিত স্বর্ণ-নির্ম্মিত ঘণ্টার রজ্জু আকর্ষণ করে তাহা হইলে সম্রাটের নিকট তাহারা সুবিচার লাভ করিবে। আসুন আমরা সকলে প্রার্থনা করি, সম্রাটের রাজত্বকাল সমুজ্জল গৌরব-রবি-করে ভাস্বর হউক, এবং বিজয়-নক্ষত্র সমগ্র পৃথিবীর উপর তাহার আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করুক।"

সাম্রাজ্যের আবালবৃদ্ধবণিতা সম্রাটের এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল। তাঁহার ঘোষণা যে স্তোকবাক্য মাত্র ইহা কাহারও মনে করিবার কারণ ছিল না। পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্রাট্ জাহাঙ্গীর প্রত্যহ দিবসের অধিকাংশ কাল প্রজাবর্গের অভিযোগ শ্রবণ করিতেন; তিনি ন্যায় বিচার বিতরণে কোনও দিন কুণ্ঠিত ছিলেন না। ধনী দরিদ্র সকলেই যাহাতে অবাধে তাঁহার নিকট বিচারপ্রার্থী হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে তিনি প্রাসাদ-বহির্ভাগে সুবর্ণময় ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ঘণ্টার রজ্জু আকর্ষণ করিলেই ঘণ্টাধ্বনি হইত, সম্রাট্ অভিযোগ-কারীকে আহ্বান করিয়া স্বকর্ণে অভিযোগ শ্রবণ করিতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলে এই রজ্জু স্পর্শ করিতে পাইত না; রজ্জু আকর্ষণপূর্ব্বক সম্রাটের মনোযোগ আকৃষ্ট করা দূরের কথা, দরিদ্রেরা সেখানে ঘেঁসিতেও পাইত না। সম্রাটের প্রাসাদ-সংলগ্ন ঘণ্টা, তাহার রজ্জু আকর্ষণ করিবার সাহসও সকলের ছিল না। এই রজ্জু-আকর্ষণ জন্য অভিযোগকারিগণকে রীতিমত তদ্বির করিতে হইত। তদ্বিরের ব্যবস্থা চিরকালই আছে—রীতিমত তদ্বির ভিন্ন একালেই বা কয়জন লোক মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারে? তবে দেশভেদে, কালভেদে তদ্বিরের প্রকার-ভেদ হয়, একথা যথার্থ।

বিনা তদ্বিরে প্রাসাদরক্ষিগণকে যথারীতি পূজা না যোগাইয়া, কেহ ঘণ্টার রজ্জু স্পর্শ করিতে পারিত না বটে, কিন্তু দীন দরিদ্রেরা যে কখনও সম্রাটের নিকট বিচারপ্রার্থী হইতে পারিত না, এরূপ নহে। দরিদ্রের অভিযোগও তিনি কিরূপ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন তাহার প্রতি-পক্ষ প্রবল প্রতাপান্বিত মহা সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী হইলেও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি অব্যর্থ বজ্রের ন্যায় কি ভাবে রাজদণ্ডের প্রয়োগ করিতেন, তাহার একটি কৌতূহলো-দ্দীপক লোমহর্ষণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সম্রাট্ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তিনি আমোদপ্রিয় উন্মার্গগামী ব্যসনাসক্ত যুবক ছিলেন বলিয়া তাঁহার যতই দুর্নাম থাকুক, সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর নিরপেক্ষ-ভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় তাঁহার ত্রুটি ছিল না। একদিন ধীরভাবে বিশেষ মনোযোগ-সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, এমন সময় প্রাসাদসংলগ্ন ঘণ্টা ঠুন্ ঠুন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। রাজকার্য্যে অভিনিবিষ্ট সম্রাটের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণমাত্র তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট একজন অমাত্যকে আদেশ করিলেন, "যাও বাহিরে গিয়া দেখ কে ঘণ্টা বাজাইল! যদি কোনও প্রজা উৎপীড়িত হইয়া আসিয়া থাকে তাহাকে আমার সম্মুখে হাজির কর।"

সম্রাটের আদেশ শ্রবণমাত্র অমাত্য গাত্রোত্থান করিয়া বহির্দ্দেশে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে একটি বৃদ্ধকে তাহার বৃদ্ধা পত্নীসহ সম্রাট্সদনে উপস্থিত করিলেন। তাহারা অতি দরিদ্র, পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র, তাহাদের

দেহ অস্থি চর্ম্মসার, কোটরগত চক্ষু জ্যোতিহীন। তাহাদের মুখ বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন; তাহাদের নিদারুণ অন্তর্বেদনা শোণিতসম্পর্কশূন্য পাণ্ডুর মুখে প্রতিফলিত হইতেছিল। তাহারা কম্পিতপদে সম্রাটের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার অভয়প্রদ সিংহাসনের পুরোভাগে লুটাইয়া পড়িল, এবং ভূমি চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে কাতরকণ্ঠে বলিল,"শাহান্‌শাহ, এই হতভাগ্যদের প্রতি প্রসন্ন হউন, দয়া করুন, বিচার-প্রার্থনায় আমরা বহুদূর হইতে আসিয়াছি।"

সম্রাট্ বলিলেন, "তোমাদের কোনও ভয় নাই, শান্ত হও, উঠ, বল তোমাদের অভিযোগ কি। আমি তোমাদের অভিযোগ শুনিয়া সুবিচার করিব।"

বৃদ্ধ অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া উঠিল, এবং দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "জাঁহাপনা চিরজীবী হউন।"—বৃদ্ধের মুখে আর কোনও কথা সরিল না, সে স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। বোধ হয় অভিযোগ করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সে কাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আসিয়াছে—সে কথা স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধকে নীরব দেখিয়া একজন দরবারী বলিলেন, "তোমার কি নালিশ সংক্ষেপে বল; সম্রাটের অধিক কথা শুনিবার অবসর নাই।"

কিন্তু তথাপি বৃদ্ধের মুখে কথা বাহির হইল না, ভয়ে সে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"শাহান্‌শাহ, আমরা যে কথা বলিতে আসিয়াছি, সে কথা বলিতে আমাদের সাহস হইতেছে না! যিনি আমাদের প্রতি উৎপীড়ন করিয়াছেন, আমাদের অন্ধের নয়ন প্রাণাধিক পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন, তিনি অসাধারণ ব্যক্তি; তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা আমাদের পক্ষে কিরূপ 'গোস্তাকি', তাহা বুঝিয়া আমাদের মুখে কথা সরিতেছে না।"

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর সুস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "কাহার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ আছে? নির্ভয়ে বল; তোমাদের উৎপীড়নকারী যদি আমার পুত্রও হয়, তাহা হইলেও ন্যায় বিচারে আমি কুণ্ঠিত হইব না।"

সম্রাটের নিকট আশ্বাস পাইয়া বৃদ্ধার ভয় ও সঙ্কোচ অনেকটা দূর হইল; সুবিচার পাইবে বুঝিয়া সে আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "শাহান্‌শাহ, আমরা বহুদূর দেশ হইতে আসিয়াছি, বাঙ্গালা মুলুকে বর্দ্ধমানে আমাদের নিবাস, আমরা বড় গরীব, যানবাহন কোথায় পাইব? তাই মাসের পর মাস ধরিয়া পায়ে হাঁটিয়া এখানে আসিয়াছি, নিঃসম্বল অবস্থায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে করিতে আসিয়াছি; আমরা এরূপ দরিদ্র যে, আমাদের সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই! সুবিচার পাই এই আশায় এত কষ্ট করিয়া রাজধানীতে আসিয়াছি!"

বৃদ্ধা ক্ষণকাল নীরব হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "জাঁহাপনা, আমরা দরিদ্র হইলেও সুখেদুঃখে কোন রকমে আমাদের দিনপাত হইতেছিল। দেশে আমাদের একখানি ঘর আছে, সামান্য কিছু জমিও আছে; আমাদের একটি শিশুপুত্র ছিল, সে আমাদের অন্ধের নয়ন, খঞ্জের যষ্টির মত ছিল; তাহার মুখ দেখিয়া, তাহার মধুমাখা কথা শুনিয়া আমরা হাসিমুখে সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করিতাম; দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করিতাম না। অর্থকষ্টেও আমরা কাতর হইতাম না। আহা, তাহার আমার কত রূপ, সেই ছেলে বয়সেই তাহার কত গুণ, বাছার মিষ্ট কথাগুলি এখনও আমার কাণে বাজিতেছে!"

শোকে বৃদ্ধার মুখে আর কথা সরিল না, তাহার উভয় চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইয়া তাহার শুষ্ক গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিল।

বৃদ্ধার সকরুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া সদাশয় সম্রাটের হৃদয় করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। সভাসদবর্গ নীরব। সম্রাট্ বৃদ্ধাকে পুনর্ব্বার কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধা আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "জাঁহাপনা, আমার শিশুপুত্র একদিন রাজপথে খেলা করিতেছিল, সেই সময় আমাদের দেশের সুবাদার সৈয়ফ উল্লা বাহাদুর হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগর-দর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। বালক পথে খেলা করিতেছে তাহা দেখিয়াও তিনি দেখিলেন না, আমার শিশুপুত্রের উপর দিয়া হাতী চালাইয়া দিলেন। হাতী আমার ছেলেকে পদতলে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল! আমরা শোকে দুঃখে অধীর হইয়া হস্তীর পশ্চাতে ধাবিত হইলাম, কাতরস্বরে সুবাদার সাহেবের নিকট বিচার প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত

রিলেন না। সুবাদার সাহেবের সঙ্গে যে সকল ওমরাহ গরভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদিগকে পহাস করিলেন, অশ্রাব্য কটুবাক্যে আমাদিগকে গালি লেন। একে নিদারুণ পুত্রশোক, তাহার উপর এই কার দুর্ব্বাক্য; আমার বড় রাগ হইল, আমি জ্ঞানহারা হয়া সুবাদার সাহেবকে গালি দিলাম। সুবাদার আমাদের তি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের জমীজমা ঘর সমস্তই সরকারে জেয়াপ্ত করিয়া আমাদিগকে নগর হইতে তাড়াইয়া দিবার াদেশ করিলেন; সর্ব্বস্ব হারাইয়া আমরা পথে দাঁড়াইলাম, ন্তু সুবাদারের অত্যাচারে সেখানেও আমাদের স্থান হইল । নগরের পথ হইতেও আমরা বিতাড়িত হইলাম।"

বৃদ্ধা আর কোনও কথা বলিতে পারিল না। শোকে থে অবসাদে সে সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার ামী তাহার পার্শ্বেই দণ্ডায়মান ছিল, সে বৃদ্ধার মাথা কোলে লিয়া লইয়া তাহার মূর্চ্ছা-ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই শোচনীয় দৃশ্যে সম্রাটের হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে আলো-ত হইয়া উঠিল। তিনি সক্রোধে বলিলেন, "আমার সাম্রাজ্যে দন অন্যায় কর্ম্ম করিতে কাহার সাহস হইল? আমি ই অত্যাচারের প্রতিবিধান করিব।" অনন্তর তিনি কজন অমাত্যকে আদেশ করিলেন, "অবিলম্বে হুকুম নামা াখ, আর এই দু'জনকে দশ মোহর খোরাকী দাও।"

অমাত্য তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করি-ান; বৃদ্ধ প্রথমে তাহা লইতে সম্মত হইল না, সে সুবিচার ার্থনায় সম্রাট্-সকাশে আসিয়াছিল, সম্রাট্ অনুগ্রহ পূর্ব্বক হার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন, ইহাই তাহার পরম ৌভাগ্য, ইহার উপর আবার খোরাকীর ব্যবস্থা! কিন্তু সম্রাটের এই দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। হের কয়টি তাহাকে লইতে হইল। অনন্তর অমাত্য াটের হুকুমনামা লিখিতে বসিলেন।

সম্রাটের আদেশে অমাত্য লিখিতে লাগিলেন,

"সুবে বাঙ্গালার সুবাদার সৈয়ফ উল্লাকে এতদ্বারা জ্ঞাত া যায় যে, তিনি স্বেচ্ছায় এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার পুত্রকে হত্যা য়াছেন, এবং তাহাদিগকে গৃহহীন করিয়াছেন;—এজন্য ্যতি ও যথাযোগ্য শাস্তিই তাঁহার আচরণের উপযুক্ত ফল। কিন্তু এবার তাঁহার অপরাধ আমরা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি, তবে আমাদের আদেশ এই যে, সুবাদারের হস্তীর যে মাহুত এই অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহাকে তাহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দান করিবে, এবং এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার যে সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, তাহা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে; আর তাহাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ করিবে। আমার এই হুকুম তামিল করিতে বিলম্ব না হয়।"

হুকুমনামা লিখিত হইলে অমাত্য তাহা পাঠ করিয়া সম্রাট্‌কে শুনাইলেন। হুকুমনামায় যথারীতি সহি ও মোহর করা হইলে তাহা বৃদ্ধার হস্তে প্রদান করা হইল। বৃদ্ধার তখন চেতনা সঞ্চার হইয়াছিল। এই হুকুমনামা লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহা সুবাদারের হস্তে প্রদানের আদেশ করিয়া সম্রাট্ তাহাদিগকে আরও কিছু অর্থ প্রদান করিলেন, বলিলেন, এই টাকায় তাহাদের যান-বাহন সংগ্রহের সুবিধা হইবে।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়া সম্রাট্‌কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক দরবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; এবং গাড়ী ভাড়া করিয়া যথা-সময়ে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইল। তাহারা সুবাদারের নিকট সম্রাটের হুকুমনামা প্রেরণ করিল।

সুবাদার নবাব সৈয়ফ উল্লা সম্রাটের 'ফারমান' পাঠ করিয়াই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। সম্রাটের হুকুমনামা তিনি তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন; তাহাদিগকে জ্ঞাপন করা হইল, সম্রাটের নিকট অভিযোগ করিয়া তাহারা যে 'গোস্তাকি' করিয়াছে সে জন্য যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করিবে এবং তাঁহার প্রদত্ত দণ্ডই সঙ্গত দণ্ড বলিয়া স্বীকার না করিবে—ততদিন তাহাদিগকে মুক্তি দান করা হইবে না।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে কারাগারের একটি অন্ধকারপূর্ণ নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখা হইল। কারাধ্যক্ষ প্রত্যহ প্রভাতে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি-তেন—তাহারা অপরাধ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে কি না, সর্ব্বশক্তিমান্ সুবাদারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্ফল, ইহা তাহারা বুঝিয়াছে কি না। কিন্তু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা

উভয়েই অবিচল, দুঃসহ নানা যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তাহারা 'নরম' হইল না, ভ্রমস্বীকার করিল না। তখন সুবাদার তাহাদিগকে অনাহারে রাখিবার আদেশ দিলেন। একে নিদারুণ কারাক্লেশ, তাহার উপর অনাহারের কষ্ট। বন্দিদ্বয় এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিল না, ত্রুটী স্বীকার করিয়া তাহারা সুবাদারের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। তখন সুবাদার তাহাদিগকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিলেন।

কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারা বর্দ্ধমানের সন্নিহিত কোনও পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইল। তখন তাহারা গৃহহীন, আশ্রয়হীন, বৃক্ষতলবাসী; একমুষ্টি অন্নেরও সংস্থান নাই। কিন্তু ভগবান্ গৃহহীন নিরাশ্রয় অনাথকে ত্যাগ করেন না। তাঁহারই অপার যাতনায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা সেই গ্রামের অধিবাসগিণের সহায়তা লাভ করিল, মহাপরাক্রান্ত সুবাদার যাহার শত্রু--তাহাকে অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়-দানে তাহারা কুণ্ঠিত হইল না। গ্রামবাসিগণের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহাদের সেবা-শুশ্রূষায় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা কিছু দিনের মধ্যে সুস্থ হইল; এবং পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার উপযুক্ত বল লাভ করিয়া, তাহারা একদিন প্রত্যুষে গ্রাম ত্যাগ করিল। পুনর্ব্বার তাহারা আগ্রা নগরে যাত্রা করিল।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা উভয়েই বোধ হয় অত্যন্ত সরল, অথবা অত্যন্ত নির্ব্বোধ। গ্রামবাসিগণের করুণায় তাহাদের জীবন-রক্ষা হইল, অথচ গ্রাম ছাড়িয়া তাহারা কোথায় যাইতেছে এ কথা তাহাদের অসময়ের বন্ধুগণের নিকট গোপন করিবে—ইহা অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক মনে করিয়া তাহারা তাঁহাদের গুপ্ত অভিসন্ধির কথা কাহারও কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছিল। সে কথা কেহ বিশ্বাস করিয়াছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু তাহারা গ্রাম হইতে প্রস্থান করিলে ক্রমে সে কথা সুবাদারের কর্ণগোচর হইল। তখন সুবাদার সাহেব তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চারিদিকে সোয়ার পাঠাইলেন; বর্দ্ধমান হইতে আগ্রা যাইবার পথে অশ্বারোহী সৈনিকেরা হাতিয়ারবদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে বন্দী করিবার জন্য জুটিল। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় বাধা দেওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত। কেহই বৃদ্ধ বৃদ্ধার সন্ধান পাইল না; তাহারা যেন ইন্দ্রজালপ্রভাবে কোথায় অদৃশ্য হইল! ব্যর্থমনোরথ হইয়া অশ্বারোহীরা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল। সুবাদার নবাব সৈয়ফ উল্লা নিষ্ফল আক্রোশে অধর-দংশন করিতে লাগিলেন। ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু আসামী ফেরার, তিনি আর কি করিবেন? তখন তাঁহার মস্তিষ্কে যে ফন্দীর উদ্ভব হইল তদনুসারেই কাজ করিলেন। আগ্রায় সম্রাট্-দরবারে তাঁহার বন্ধুবান্ধব, উজীর ওমরাহের অভাব ছিল না। তিনি বঙ্গের সুবাদার, তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিবে কে? তিনি আগ্রাবাসী বন্ধুগণকে অনুরোধ করিলেন, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যেন কোনও উপায়ে সম্রাট্‌সদনে উপস্থিত হইতে না পারে। সম্রাটের সহিত তাহাদের সাক্ষাতের সকল পথ যেন রুদ্ধ করা হয়।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বহুকষ্টে দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রমপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আগ্রা নগরে উপস্থিত হইল। কিন্তু বঙ্গের সুবাদারের ষড়্‌যন্ত্রে সম্রাটের দরবারে প্রবেশের অনুমতি পাইল না; প্রহরীরা তাহাকে ঘণ্টার রজ্জু স্পর্শ করিতে দিল না। দুঃখ ক্ষোভ ও নিরাশায় তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইল।

কিন্তু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার প্রতিজ্ঞাও অটল; অত্যাচারের প্রতিকার না করিয়া তাহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না, সঙ্কল্প করিল। তাহারা প্রত্যহ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাসাদের সম্মুখস্থ পথপ্রান্তে সম্রাটের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত!

কিন্তু সম্রাটের সহিত দীনদরিদ্রের সাক্ষাৎলাভের আশা সুদূরপরাহত; সম্রাট্ যে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেন না এমন নহে, কোনও দিন তিনি অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া মৃগয়া করিতে যাইতেন; যদি পথিমধ্যে কোনও সুযোগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় এই আশায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা দূর হইতে তাঁহার অনুসরণ করিত। সম্রাট্ কোনও দিন বা ওমরাহদিগকে সঙ্গে লইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নগর-দর্শনে বাহির হইতেন, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সম্রাটের হস্তীর পশ্চাতে ধাবিত হইত; কিন্তু সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের কোনও উপায় হইল না।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তথাপি নিরাশ হইল না। প্রতিহিংসাই তাহাদের জীবনের ব্রত; সে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তাহারা কোনও দিন অনাহারে থাকিয়া, কোনও দিন বা ভিক্ষান্ন

অন্নে এক বেলা মাত্র আহার করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় ছয় মাস অতীত হইল।

প্রায় ছয় মাস পরে একদিন সম্রাট্ জল-ভ্রমণে বাহির হইলেন। সুসজ্জিত সুদৃশ্য তরণী-সমূহে আগ্রা-নগরীর প্রান্ত-বাহিনী নির্ম্মলসলিলা যমুনা তন্বী নাগরীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যথাসময়ে সম্রাট্ নদীকূলে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার দেহরক্ষী সৈন্যদল নদীতীরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর পারিষদবর্গের সহিত তাঁহার সুসজ্জিত তরণীতে আরোহণ করিতেছেন, এমন সময় নদীতীরস্থ লতাগুল্মের অন্তরাল হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সম্রাটের ভাউলিয়ার সম্মুখে আসিয়া জানু নত করিয়া উপবেশন করিল, এবং কাতরস্বরে বলিল, "মুলুকের মালিক খোদাবন্দ, বিচার করুন; আমরা সুবিচার-প্রার্থনায় পুনর্ব্বার আঁহাপনার চরণতলে উপস্থিত হইয়াছি।"

ভাউলিয়া হইতে সম্রাট্ তাহাদের কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিলেন; তিনি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন; তাঁহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। মাঝিরা দাঁড় ফেলিয়া ভাউলিয়া মধ্য নদীতে লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল; তিনি তাহাদিগকে নৌ-পরিচালনে নিষেধ করিলেন, এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সম্রাটের পদতলে নিপতিত হইয়া তাহাদের অভিযোগ নিবেদন করিল; অশ্রুধারায় তাহারা ধরাতল সিক্ত করিল। সম্রাট্ তাহাদের উৎপীড়নকাহিনী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে ক্ষোভে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল; তিনি মধুর বাক্যে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বঙ্গের সুবাদারের নিকট এক পরোয়ানা প্রেরণ করিলেন; আদেশ হইল, সুবাদার অবিলম্বে আগ্রায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার দরবারে হাজির হইবেন। অনন্তর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য কর্ম্মচারীদের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইল।

বঙ্গের সুবাদার নবাব সৈয়ফ উল্লা যথাসময়ে সম্রাটের আদেশলিপি প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট্ কি জন্য তাঁহাকে আগ্রা-নগরে আহ্বান করিয়াছেন সুবাদার তাহা বুঝিতে পারিলেন না; সম্রাট্ও তাঁহার অভিপ্রায় কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং সম্রাটের অভিসন্ধি নবাব সুবাদার সাহেবের জানিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সম্রাট্ কোনও বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন মনে করিয়া, সুবাদার সৈয়ফ উল্লা মহা সমারোহে আগ্রানগরের সন্নিহিত হইলেন এবং যমুনা নদীর অপর পারে শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আদেশ করিলেন, পরদিন প্রত্যূষে একটি মত্ত হস্তীকে সুসজ্জিত করিয়া পথে বাহির করিতে হইবে। বৃদ্ধ-দম্পতিও সেই সময় রাজপথে উপস্থিত থাকিতে আদিষ্ট হইল।

সম্রাট্ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া রাজপথে বহির্গত হইলেন; এবং বৃদ্ধবৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া যমুনাপারে উপনীত হইলেন। তাঁহার আদেশে সুসজ্জিত মত্ত হস্তীও যমুনার পরপারে নীত হইল। তখন সম্রাট্ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে সেই হস্তীতে আরোহণ করাইয়া বঙ্গেশ্বরের শিবিরাভিমুখে তাহা পরিচালিত করিবার আদেশ দিলেন, এবং স্বয়ং সসৈন্য সেইদিকে অগ্রসর হইলেন।

সুবাদার সৈয়ফ উল্লার তখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই; যমুনাতীরস্থ সুদৃশ্য বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরে সুশীতল সমীরণ-প্রবাহে তিনি সুখনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময় সম্রাট্ সসৈন্য সুবাদারের বস্ত্রাবাসে উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত সুবাদারের হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

ভারতেশ্বরের আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। নবাব সৈয়ফ উল্লা নিদ্রাভঙ্গে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন না, আর চেষ্টা করিলেও তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইত না। তিনি ভীতিবিহ্বলনেত্রে সম্রাটের মুখের দিকে চাহিলেন; সম্রাট্ সেই মত্ত হস্তীর পৃষ্ঠে অবস্থিত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। নবাব তৎক্ষণাৎ সকলই বুঝিতে পারিলেন, ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল।

অনন্তর সম্রাটের আদেশে নবাবকে সেই অবস্থায় প্রান্তরে নিক্ষেপ করা হইল। মত্ত হস্তীর মাহুত সম্রাটের ইঙ্গিতে সেই হস্তীকে নবাবের দেহের উপর দিয়া পরিচালিত

করিল। হস্তীর পদতলে পিষ্ট হইয়া হতভাগ্য সুবাদার নবাব সৈয়ফ উল্লা প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপ লোমহর্ষণ বর্ব্বর-প্রথায় ন্যায়ের সম্মান রক্ষিত হইল!

নবাব সৈয়ফ উল্লা সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের বাল্য-সহচর ছিলেন, তাঁহার প্রতি সম্রাটের স্নেহ ও অনুগ্রহের অভাব ছিল না; তথাপি তাঁহার অত্যাচারের এই কঠোর প্রতিফল প্রদত্ত হইল। বাল্য-সহচর ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নবাব সৈয়ফ উল্লার মৃত্যুর পর সম্রাট্ ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে আগ্রা-নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং যথাযোগ্য সমারোহের সহিত মৃত নবাবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিলেন। সুবাদারের মৃতদেহ অত্যন্ত জাঁকের সহিত সমাহিত হইল। দরবারীগণ দুই মাস কাল শোকচিহ্ন ধারণের আদেশ পাইলেন।

অনন্তর সম্রাট্ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সভাসদ্গণকে বলিলেন, "আমি উহাকে স্নেহ করিতাম, কিন্তু রাজার হস্ত ন্যায়ের শৃঙ্খলে আবদ্ধ; রাজা ন্যায়বিচার করিতে বাধ্য, তাহার অন্যথা করিবার উপায় নাই। সিংহাসনের ছায়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই সমান; তাই হতভাগ্য সুবাদার স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিল।"

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়

আমি

সিন্ধুমাঝে বিম্ববিন্দু—এই আমি, এই নাই;
মায়ার অনিলে উঠে', সলিলে মিলায়ে যাই।
কার সুখে হাসিতেছি,
কার দুঃখে কাঁদিতেছি,
কাহারে পৃথক্ করি কারে 'আমি' বলিতেছি,
কাহারে নয়নে হেরি কারে আমি ভুলিতেছি?
কাহার কৌমার বলি',
কাহার যৌবনে ঢলি',
কাহার জরায় আমি ম্রিয়মাণ হ'য়ে যাই,
কার রোগে রুগ্ন আমি, কার ভোগে ভোগ পাই?
কার আশা ছুটাতেছে,
ভালবাসা বাঁধিতেছে,
কার মায়া করিতেছে কারে এত বিজড়িত?
কার জন্ম মরণেতে কার কাল নিয়মিত,
সূতকের শঙ্খরোল,
অন্তিমের হরিবোল,
কাহারে বরণ করে, কাহারে বিদায় দেয়,
কাহারে আনিছে কাল, কাহারে ফিরায়ে নেয়?

জননী-জঠরে কে সে
মৃণালে উঠিল ভেসে,
কাঁদিল ভূমিষ্ঠ হ'য়ে এসে এ অজ্ঞাত দেশে,
অজ্ঞাতে আপন ক'রে বেড়ায় অজ্ঞাত বেশে?
ওই রবি চন্দ্র তারা,
ওই মন্দাকিনী-ধারা,
অনিল, অচল-পুঞ্জ, নিকুঞ্জ-মঞ্জুল ধরা
রূপ রস গন্ধ শব্দে কাহারে করিছে ভরা?
সরস হৃদয়াধার,
পরশ শিহরে কার,
এ অনন্ত উপাদান ল'য়ে কে সে ক্রীড়া করে,
এ বিচিত্র চারু চিত্রে কে এ মহাপ্রভুত্ব ভরে?
সে কি আমি, মোহ যার,
বাহু যার মমতার
এমনে বেড়িয়া আছে যাহারে আমার বলি;
'আমার' অমিয় মাঝে এমনে গিয়াছে গলি'?
না, সে আমি আমি নই;
আমি যে ত্রিকালজয়ী,

বিকাশ-বিলয়হীন, ত্রিলোক-ত্রিসীমাতীত,
ঘনিষ্ঠ নির্লিপ্ত ব্যাপ্তি চিদানন্দে সমাহিত।
সেথা রবিচন্দ্র তারা
হ'য়ে আছে আত্মহারা,
সেথা মন্দাকিনী-ধারা মিশে' আছে পারাবারে,
আরাধনা কৃপাকণা বাঁধা আছে একধারে।
সেথা সমীরণ-ভরে
নাহি পত্র মরমরে,
ষড়্-ঋতু সনে সিন্ধু নাহি নাচে তালে তালে,
চিরমুক্ত নীলাম্বর ঢাকে না জলদজালে।
সেথা মধ্যাহ্নের স্ফূর্ত্তি,
নিশীথের সৌম্যমূর্ত্তি,
অনন্ত গুঞ্জন করে নীরবের মুখরতা,
প্রেমের প্রশান্ত হৃদে প্রস্ফুটিত পবিত্রতা।
কেমনে চিনিব আমি
আমার সে অন্তর্যামী ;
নয়নের চেনা নিয়ে মরমের চেনা দাও,
সে নূতন পরিচয়ে নিকেতন মাঝে নাও।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র

পিতৃতর্পণ

স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তি-বিরচিত গ্রন্থাবলীর ...য় খণ্ড তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্বর্গীয় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

সম্পাদিত হইয়া সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি হাতে করিলে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িয়া যায়। কবির জ্যেষ্ঠ-পুত্র যে এতদিন পরে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও এই ভাবে পিতৃতর্পণে প্রয়াসী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া বাস্তবিকই আনন্দ হয়।

অবিনাশচন্দ্র যখন কচি শিশু তখন তিনি তাঁহার পিতার হৃদয়ে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট পরিচয় এই পুস্তকের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। 'ঝটিকা সম্ভোগ' নামক কবিতায় দেখিতে পাই যে ঝড় উঠিয়াছে; রুদ্ধকক্ষে কবি, কবিজায়া ও নিদ্রিত শিশু অবিনাশচন্দ্র ; কবি বলিতেছেন—

এই যে প্রেয়সী তুমি বসেছ উঠিয়ে,
চুপ কোরে থাক, বড় বহিতেছে ঝড়,
অবিন্ এখনো বেশ আছে ঘুমাইয়ে,
চমকিয়া উঠে পাছে করে ধড়ফড়।
* *
এ ভয় কেবল নয় আপনার তরে,
যেই আমি চেয়ে দেখি অবিনের পানে
বুকের ভিতর অগ্নি ওঠে ছ্যাঁৎ ক'রে,
একেবারে কিছু আর থাকে না ক' প্রাণে।

বাছারে দুদের ছেলে অবিন্ আমার,
কিছুই জান না যাদু কি হয় বাহিরে,
ঘোরঘটা কোরে ঝড়ী শিয়রে তোমার,
গর্জ্জিয়া রাক্ষসী যেন বেড়াইতেছে ফিরে।

ইহারই একটু পূর্ব্বে কবিজায়া শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া সুপ্তা ছিলেন; সেই রুদ্ধ কক্ষে কবি একাকী জাগ্রত; বাহিরে প্রবল ঝড়; কবি বলিলেন,

তবু আহা প্রেয়সীর কোল আলো করি,
ঘুমায় আমার যাদু অবিনাশ মণি!
দেখোরে পবন এই উগ্রমূর্ত্তি ধরি,
করো না বাছার কাণে কোলাহল ধ্বনি!

"প্রিয়তমা" নাম্নী কবিতার গোড়াতেই দেখিতে পাই—

ওরে অবিনাশ, বাছারে আমার,
ননীর পুতুল দুদের ছেলে,
স্নেহেতে মাখান কোমল আকার,
নয়ন জুড়ায় সমুখে এলে।

* * *

ম'রে যাই লয়ে বালাই বাছারে,
আকুলি ব্যাকুলি কেন অমন!
আমি ভালবাসি যেমন তোমারে,
তুমিও আমারে বাস তেমন?

পিতাপুত্রের এই ভালবাসা পুত্রের প্রথম বয়সেই পর্য্যবসিত হয় নাই। কবি তাঁহার ছেলেটির হাত ধরিয়া তাঁহাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার নিজের পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন। সে দৃশ্যটিও কম মধুর নহে। আজ সে কথা স্মরণ করিলে আমাদেরই মনে পুলক-সঞ্চার হয়। কবি বিহারীলালের পশ্চাতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের চিত্তে তখন সবেমাত্র

কুহকিনী কল্পনার ইন্দ্রজালময়ী ছবি
অন্তরে অন্তরে
প্রতিপলে নবমূর্ত্তি নবীন অমৃতধারা
জাগ্রত সুখের স্বপ্ন, স্বর্গের নন্দন ছায়া
সুখে ভাসিছে!

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল

তখন সবেমাত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিহৃদয়-নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে; তাঁহার চারিদিকের জগৎ সহসা রূপান্তরিত হইয়া গেল।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন?

একটি পাখীর আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন!
জগৎ দেখিতে হইব বাহির,
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে!
আমি—ঢালিব করুণা-ধারা!
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিবরে পরাণ ঢালি!
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
যাইব বহিয়া যাইব বহিয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব' প্রাণ ব'হে যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ!
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর!"

এত আশা লইয়া রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরিণী পাষাণকারা ভেদ করিয়া বাহির হইলেন; কবিসখা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী সাগর-সঙ্গতা "অভিমানিনী নির্ঝরিণীর" প্রাণের কথা শুনিলেন—

মহান্ জলধিজলে প্রাণ ঢেলে দিব ব'লে
সুদূর পর্ব্বত হ'তে আসিনু বহিয়া,
পুরাতে প্রেমের সাধ, না গণিয়া পরমাদ
কত বাধা কত বিঘ্ন দাপটে ঠেলিয়া
এই ত সাগরজলে মিশিনু আসিয়া!
কিন্তু—কিন্তু—তবে কেন, আশাতে নিরাশ হেন,
কিছুই আশার মত হ'ল না ত হায়,—
যাহার আশ্রয় পেলে থাকিব রে হেসে খেলে
কইরে! সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়।

*   *   *

পর্ব্বতে মায়ের কোলে ছিনু যবে শিশুকালে
কে জানিত ভাগ্যে ছিল হেন অভিশাপ,
হ'ল সার অশ্রুঢালা, নিরাশ মরমজ্বালা,
দিবা নিশি কুলু কুলু আকুল বিলাপ।

*   *   *

তবে কি মায়ের কোলে, উজানে যাইব চ'লে
সুখ সাধ, সুখ আশা করি বিসর্জ্জন?
সহিতে পারি না আর, প্রণয়েতে অত্যাচার
মরমে ঢাকে না আর জ্বলন্ত যাতন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত যেন তাঁহারি জীবনের ধ্রুবতারার সন্ধান পাইয়া বলিতেছেন,—

জীবনযামিনী শেষে
যাইব নবীন দেশে,
হেরিব নবীন উষা গগনে ;
কুতূহলে মেলি আঁখি,
হরষে চাহিয়ে থাকি,
তুমি সে প্রভাত তারা উদিবে নয়নে !

নগেন্দ্র বাবু যখন নবীন উষা ও প্রভাত-তারার কল্পনায় বিভোর, তখন নীহারিকা কেমন করিয়া শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের "জীবনের মূল ধরি" নাড়া দিয়া গেল ;—

তুষার অঙ্গুলি দিয়া মর্ম্মস্থান কাঁপাইয়া
শিরদেশে স্থিরনেত্রে রজনী আমার,
পড়িছে নিঃশ্বাস মুখে, শূন্য এ উদাস বুকে,
আঁধার আঁধার তার করিছে সঞ্চার !
সেই আঁধারের কোলে, হৃদয় পড়িল ঢুলে,
রজনীর রাজ্যে আমি করিনু প্রবেশ ;
উদাস অনিল ধীরে, কি মন্ত্র বলিল মোরে,
জাগিনু গেল না তবু নিদ্রার আবেশ।

ইঁহাদিগের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন শ্রীযুক্ত অবিনাশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিনি গান গায়িতে চাহেন, কিন্তু ভয় হয়।

পাছে কেহ হাসে কথা শুনে,
পাছে কেহ উপহাস করে,
একটি হাসির উপেক্ষায়
একেবারে যাই যে গো ম'রে।

নিভৃতে আপনার হৃদয়ের বিজন কক্ষে বসিয়া কবি বলিতেছেন,—

ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো !
আমার কানের কাছে, আমার প্রাণের মাঝে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো !
গাও তুমি বিরামের গান,
গাও তুমি মরণের গান,
শুনি আমি ধীরে ধীরে ধীরে
চিরতরে মুদিয়া নয়ান।

কুসুমের কানে কানে শীতের দুরন্ত বায়
জান নাক কি যে গান গায় !
যে গান শুনিলে পরে, দিশেহারা ফুলগুলি
একেবারে শুখাইয়া যায়।

জান যদি সেই গান, জান যদি সেই তান
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো !
আমার কানের কাছে, আমার প্রাণের মাঝে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো

ইতোমধ্যে তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহার অবসাদগ্রস্ত হৃদয়কে ঝাঁকাইয়া সজীব করিবার প্রয়াস পাইলেন। পুত্র কবিতা লেখেন, পিতা তাহার শিরোদেশে এক একটি motto বসাইয়া দেন। আবার হয় ত একটি কবিতার প্রথমাংশটি অবিনাশচন্দ্র রচনা করিলেন, বিহারীলাল তাহা শেষ করিতেন ; উভয়ের রচনা সুন্দর খাপ খাইয়া যাইত ! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "মায়াদেবী" কবিতাটির একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

(১)

সাগর-তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াই
দুরন্ত ঝটিকা-বালারে খেলাই,
কখন আকাশে কখন পাতালে
নিমেষে চলিয়া যাই ;
ঘোর ঘোরতর দুর্দ্ধর্ষ সমরে
কাঁপে রণাঙ্গন বীরপদভরে,
এক হুহুঙ্কারে স্তব্ধ চরাচর,
হরষে দেখিতে পাই।

(২)

হুঙ্কারে বিদরে অনন্ত আকাশ,
ছুটিয়া পালায় দুর্দ্দান্ত বাতাস,
কোটি কোটি সূর্য্য ভেঙে চুরমার
কে কোথা ছড়িয়ে পড়ে ;
বীর শৃঙ্গ সব হিমালয় হতে
ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছোটে শূন্যপথে,
আকুল ব্যাকুল ধায় উভরায়
জীমূত প্রলয় ঝড়ে।

(৩)

অলকা অমরা কাঁপে থরথরি,
চন্দ্রলোক ভেঙে পড়ে ঝরঝরি,
শূন্যে শূন্যে ধরা ঘুরিতে ঘুরিতে
কোথায় চলিয়া যায় ;
প্রলয়পিনাক ঘোর ঘন রব,
ভয়ে জড় সড় যক্ষ রক্ষ সব ;
ধেই ধেই ধেই নাচিয়া বেড়াই
দৃক্‌পাত করি কায় ?

এতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়া অবিনাশচন্দ্র ছাড়িয়া দিলেন ; বিহারীলাল কলম ধরিলেন,

(৪)

দিগ্‌দিগঙ্গনা আড়ষ্টের প্রায়,
বিকট দামিনী কট মট চায়,
ঘোর ঘর্ঘর উদগ্র অশনি
পদাগ্রে পড়িছে লুটে ;
হো হো ! পৃথিবীতটে তিষ্ঠিতে পারে না,
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উগারিছে ফেনা
লাফায়ে লাফায়ে পাগল সাগর
আকাশে চলেছে ছুটে।

(৫)

ঘোর কোলাহল, গর্জ্জে নীল জল,
ছুলিব অম্বরে দেহ টলমল,
ছড়াইয়া দিব কাল' কেশরাশি
বিজলী বেড়াবে তায় ;
জলন্ত তারকা মালিকা গলায়,
উরজে লুটায়ে উরসে গড়ায়,
ধায় ধূমকেতু দীঘল অঞ্চল
গোমুখী নির্ঝর ভায়।—ইত্যাদি।

এমনই করিয়া বিহারীলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; আজ সেই পুত্র পিতৃতর্পণ করিতে বসিয়াছেন।

কিন্তু শুধু বিহারীলালের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিলেই কি তাঁহার আত্মার পরিতৃপ্তি হইবে ? উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি যে কবিপ্রতিভাকে লাভ করিয়াছিলেন তাহার সম্যক্ বিকাশ হইল কই ? তাঁহার কবি-সহচরেরা সকলেই কিছু না কিছু কাজ করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার বড়ালের যে কবিতার কএকটি ছত্র উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহার একস্থানে দেখিতে পাই—

একটি তরঙ্গ আজি হয়েছিল অনুকূল
হয়েছে মিলন !
একটি তরঙ্গ রোষে আসিবে,—পড়িব দূরে
সহস্র যোজন !
এই স্বপনের দেখা এই স্বপনের কথা
এখনি ফুরাবে।
অনন্ত আঁধারাকাশে কক্ষভ্রষ্ট তারাটুকু
এখনি লুকাবে।

মিলন হইয়াছিল। এখন উভয়ের মধ্যে সহস্র যোজনেরও অধিক ব্যবধান। মিলনের দিনে বাঙ্গালীর পর্ণকুটীরে ঝিল্লীমুখর সন্ধ্যায় কবির শঙ্খ বাজিয়াছিল, আজ তিনি প্রৌঢ় বয়সে কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সন্ধ্যায় অনন্ত আঁধার-আকাশে কক্ষভ্রষ্ট লুপ্ত তারাটুকুর জন্য চঞ্চল না হইয়া আর একবার "এষা"র সহিত পুনর্মিলনে"র প্রতীক্ষায় শান্ত হইয়া দিন গণিতেছেন।

আর রবীন্দ্রনাথের কবিতানির্ঝরিণী ?—স্বপ্নভঙ্গের পর যে উল্লাসে নৃত্য করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, আজও কি তাহার পর্য্যবসান হইয়াছে ? ওগো এখনও—

এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর !

হায় আজ যদি অক্ষয়চন্দ্রচৌধুরী জীবিত থাকিতেন ! আজ মহামানবত্বের সাগর-সঙ্গমে রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরিণীর কথা যদি তিনি কাণ পাতিয়া শুনিতেন ! শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন তাহা শুনিতেছেন ; শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীও শুনিতেছেন। নগেনবাবু ও প্রিয়নাথ বাবু

সাময়িক গল্প সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু অবিনাশ সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন; আজ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন

তাহার স্বর্গীয় পিতার কবি-প্রতিভার জয়পত্র ললাটে বাঁধিয়া আবার তিনি সাহিত্যপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ; কিন্তু আমার বড় আপশোষ হয় যে এই গ্রন্থাবলীর প্রকাশকও যে এক সময়ে সুকবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন তাহার কোনও সংবাদই আজকালকার পাঠক-পাঠিকাদের রাখিবার সময় নাই।

তাই বলিতেছিলাম যে এই পুস্তকখানি হাতে করিলে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িয়া যায়।

এইবার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি। ভূমিকায় আছে, "ইহাতে বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধুবিয়োগ, প্রবাহিনী, স্বপ্নদর্শন ও সঙ্গীতশতক এই ছয়খানি পুস্তক ... হইয়াছে। বঙ্গসুন্দরী-কাব্যের প্রথম সর্গের নাম ...'র'। কাহাকে উপহার?

(২)

৩রা কার্ত্তিক (১৩২০) পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্বর জলধর সেন মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া পূজ্যপাদ আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কএকটি কথার পর পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"বেহারীর কবিতাগুলির নূতন সংস্করণ তাহার ছেলেরা বাহির করিয়াছে; তাহাতে আমার একটি সার্টিফিকেট আছে। বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই। অবিনাশের শরীর খারাপ থাকার দরুণ সম্পাদকীয় অধ্যক্ষতা ব্যাপারের কতকটা অসদ্ভাব রহিয়া গিয়াছে এই দেখ, বইয়ের ১১ পৃষ্ঠায় আমি কি লিখিয়া রাখিয়াছি।" বইখানি আমার হাতে দিলেন; দেখিলাম, বড় বড় অক্ষরে এই টিপ্পনীটুকু তিনি স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন—
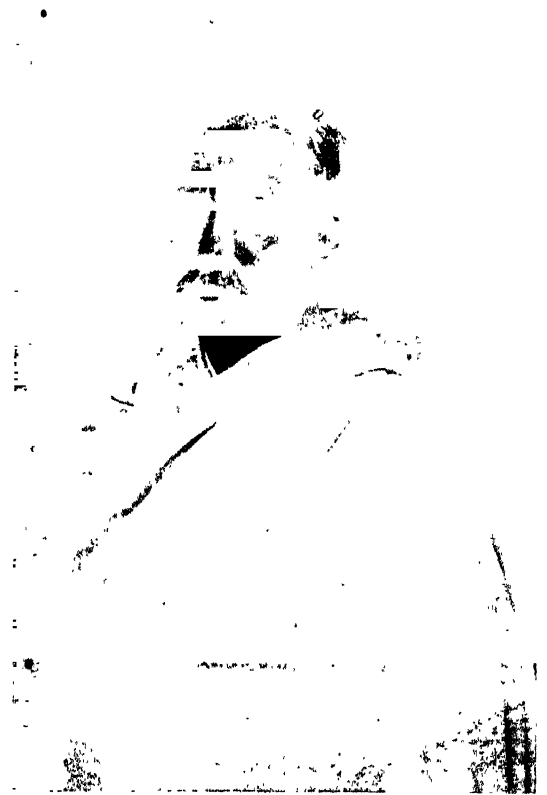
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

এই সখা তাঁহার বাল্যকালের বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। এই কএকটি পদ্যপঙ্‌ক্তি কৃষ্ণকমল নিজের certificateএর মত জ্ঞান করেন এবং value করেন। বেহারীর পদ্য যদি স্থায়ী হয়, কৃষ্ণকমলের নামটাও টেঁকে যাবে, এই লোভে কৃষ্ণকমল এই টিপ্পনীটি সংযোজন করিয়া রাখিলেন।

টিপ্পনীটুকু পাঠ করিয়া আমি বলিলাম—"আপনি এ কথা আগে বলেন নাই কেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"সব কথা কি সব সময়ে মনে আসে? আচ্ছা, তুমি একবার কবিতাটি পড় দেখি!" আমি পড়িতে লাগিলাম—

প্রিয়তম সখা সহৃদয়!
প্রভাতের অরুণ উদয়,
হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়।

আহা কিরে প্রসন্ন বদন!
তারা-যেন জ্বলে ভুনয়ন;
উদার হৃদয়াকাশে,
বুদ্ধি বিভাকর ভাসে,
স্পষ্ট যেন করি দরশন।

অমায়িক তোমার অন্তর,
সুগম্ভীর সুধার সাগর;
নির্ম্মল লহরীমালে,
প্রেমের প্রতিমা খেলে,
জলে যেন দোলে সুধাকর।

সুধাময় প্রণয় তোমার,
জুড়াবার স্থান হে আমার;
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলে পরে,
উলে যায় হৃদয়ের ভার।

যখন তোমার কাছে যাই,
যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই;
অতুল আনন্দ ভরে
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই।

নূতন রসেতে রসে মন,
দেখি ফের্ নূতন স্বপন;
পরিয়ে নূতন বেশ,
চরাচর সাজে বেশ,
সব হেরি মনের মতন।

ফিরে আসে সেই ছেলেবেলা,
হেসে খুসে করি খেলা দেলা,
আহ্লাদের সীমা নাই,
কাড়াকাড়ি ক'রে খাই,
ব্রজে যেন রাখালের মেলা।

নিরিবিলে থাকিলে দুজন,
কেমন খুলিয়া যায় মন;
ভোর হয়ে বসে রই,
অন্তরের কথা কই,
কত রসে হই নিমগন।

আ! আমার তুমি না থাকিলে,
হৃদয় জুড়ায়ে না রাখিলে,
নিজ কর করবাল
নিবাতো প্রাণের আলো,
ফুরাত সকল এ অখিলে।

তুমি ধাও আপনার ঝোঁকে,
সুদূর "দর্শন" দ্যুলোকে;
যার দীপ্ত প্রতিভায়,
তিমির মিলায়ে যায়,
ফোটে চিত্ত বিচিত্র আলোকে।

পোড়ে যার প্রখর ঝলায়,
কত লোক ঝলসিয়া যায়,
তুমি তায় মনসুখে,
বেড়াও প্রফুল্লমুখে,
দেবলোকে দেবতার প্রায়।

আমি ভ্রমি কমল-কাননে,
যথা বসি কমল-আসনে,
সরস্বতী বীণা-করে,
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে,
গান গান সহাস আননে।

করি সে সঙ্গীত-সুধা পান,
পাগল হইয়ে গেছে প্রাণ ;
দৃষ্টি নাই আসে পাশে,
সম্মুখেতে স্বর্গ হাসে,
ভুলে আছে তাতেই নয়ান।

পরস্পর উন্নতির কাজে,
পরস্পরে ব্যথা নাহি বাজে,
চোখে যত দূরে আছি,
মনে তত কাছাকাছি,
ঈর্ষার আড়াল নাই মাঝে।

বুদ্ধি আর হৃদয়ে মিলন,
বড় সুশোভন, সুঘটন ;
বুদ্ধি বিদ্যুতের ছটা,
হৃদয় নীরদ ঘটা,
শোভা পায়, জুড়ায় দুজন।

হেরি নাই কখন তোমার,
পদের অসার অহঙ্কার ;
নিস্তেজ নচ্ছার যত,
পদগর্ব্বে জ্ঞান হত,
ঠ্যাকারেতে হাসায় দোধার।

তোষামোদ করিতে পারনা,
তোষামোদ ভালও বাসনা,
নিজে তুমি তেজীয়ান,
বোঝ তেজীয়ান মান,
সাধে মন করে কি মান না ?

দাঁড়াইলে হিমালয় পরে,
চতুর্দ্দিকে জাগে একস্তরে,
উদার পদার্থ সব,
শোভা মহা অভিনব,
জনমায় বিস্ময় অন্তরে।

প্রবেশিলে তোমার অন্তর ;
মাণিকের খনির ভিতর ,
চারিদিকে নানা স্থলে,
নানাবিধ মণি জ্বলে,
কি মহান্ শোভা মনোহর !

শুনিলে তোমার গুণগান,
আনন্দে পূরিয়ে ওঠে প্রাণ,
অঙ্গ পুলকিত হয়,
দুনয়নে ধারা বয়,
ভাসে তায় প্রফুল্ল বয়ান।

ওহে সখা সরল সুজন !
করি আমি এই নিবেদন,
যে ক'দিন প্রাণ আছে,
থেকো তুমি মোর কাছে,
ফাঁকি দিয়ে ক'র না গমন।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "এই দ্বিতীয় খণ্ডে লিখি[illegible] অধিকাংশ কবিতাই বাস্তবিক এক এক ব্যক্তিবিশেষ[illegible] উপলক্ষ করিয়াই রচিত হইয়াছিল। 'বন্ধুবিয়োগ' কবি[illegible] টিতে কবি নিজেই সেই সকল ব্যক্তির নাম লিখিয়া দি[illegible] ছেন ; তন্মধ্যে কৈলাস, পূর্ণচন্দ্র এই দুই বন্ধুর বিষয়ে ক[illegible] নিজে যাহা লিখিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য পরিচয় দিবার বড় কিছু নাই ; কিন্তু বিজয় নামক বন্ধুটির সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দে[illegible] বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"সেকালের অনেকেই জানেন যে মুর্শিদাবাদের নবা[illegible] ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান প্রসন্ন নারায়ণ দেব কলিকাতার এক[illegible] মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। বিজয় তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পু[illegible] অল্পবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আমি বেহারীর মুখে বি[illegible] য়ের বিশেষ গুণকীর্ত্তন ভূয়োভূয়ঃ শুনিয়াছি। যদিও [illegible] মানুষের ছেলে, তথাপি ধনের অহঙ্কার তাহার বিন্দুবি[illegible] ছিল না ; ইহা ব্যতীত ধনী সন্তানদিগের যৌবনে যে স[illegible] 'আয়েব' ঘটিয়া থাকে, তাহার লেশমাত্র বিজয়ের স্বভা[illegible] কখনও প্রকটিত হয় নাই। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় [illegible] এরূপ একটি ধনীসন্তান অল্পবয়সে লোকলীলা সম্ব[illegible] করিলেন।

"এই বইখানিতে 'স্বপ্নদর্শন' নামক একটি গদ্য র[illegible] আছে। রচনাটি পাঠ করিলে পাঠকের প্রতীতি হই[illegible]

পারিবে যে কবি বিহারীলাল রীতিমত গদ্যের অনুশীলন করিলে একজন উন্নত লেখক হইতে পারিতেন।

"বেহারীর কবিতার চমৎকার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা ত তুমি তোমার "পুরাতন প্রসঙ্গে" সন্নিবেশিত করিয়াছ। ইংরাজি সাহিত্যে পোপ কবির আবির্ভাবের পর কবিতা-সাম্রাজ্যে যে একটা পেশাদারি ভাব বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল, ক্রাব ও কাউপারের আবির্ভাবে সেইটি খণ্ডিত হইল, পরে কীট্স, বায়রন, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই পেশাদারি ভাবের খণ্ডনব্যাপারের চূড়ান্ত করিয়া দেন। আমার মনে হয় যে বঙ্গকবিতারাজ্যে বেহারীর আবির্ভাব কতকটা তদ্রূপ। পেশাদারি কবিতার লেশমাত্র তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না। যাহা তিনি নিজে দেখিতেন, শুনিতেন, অনুভব করিতেন, যেন কোন এক দুর্দ্দম প্রবৃত্তি তাঁহাকে সেইগুলি কবিতাকারে লিপিবদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিত। যে শব্দটি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মনের ভাবের প্রখরতাব্যঞ্জক হইত, এবং আপনা হইতেই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত, সেই শব্দটি ভাষা হউক, অপভাষা হউক, সংস্কৃত হউক অপভ্রংশ হউক, তিনি প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অথচ তাঁহার শ্লোকগুলি পড়িয়া দেখ, এমন খাটি বাংলা আজকাল কুত্রাপি পাইবে না। অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল হইতে 'হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি মুখস্থ, আবৃত্তি করিয়া গদ্‌গদ হইয়া বলিতেন 'দেখ দেখি, কেমন ঝরঝরে বাংলা; ইহাও তোমার পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে; বেহারীর কবিতার বিষয়েও আমরা তদ্রূপ বলিতে পারি, এরূপ ঝরঝরে বাংলা বড়ই বিরল, অথচ ভাবগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। 'সঙ্গীতশতকে'র মধ্যে এমন গান অনেক আছে যাহার নিসর্গবর্ণনা এত চমৎকার যে ভাবুকব্যক্তিমাত্রই উল্লাসে পুলকিত হইবেন।

"'বঙ্গসুন্দরী' নামক কাব্যের মধ্যে যে কয়েকটি মহিলাকে উপলক্ষ করিয়া কবি পদ্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে হয় ত কেহ স্বসম্পর্কীয়া, কেহ কেহ বা অদ্যাপি জীবিত আছেন; তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় প্রকাশরূপে দেওয়া এখন উচিত মনে করি না; তদ্বিষয়ে আলোচনা করা এখন বিহিত হইবে না, আর কবিতাগুলির চমৎকারিতা উপলব্ধি করিবার জন্য সে পরিচয়ের আবশ্যকতাও নাই।

"'নারীবন্দনা' কবিতাটি ব্যক্তিবিশেষমূলক নহে। সর্ব্বসাধারণে নারীমাত্রের পক্ষে এই বন্দনা সঙ্গত হইবে। আমার মনে হয় যে কোৎ (Comte) যদি এইটি পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মানবধর্ম্মের গাথাসমূহমধ্যে (hymns) ইহাকে তিনি সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে অগ্রসর হইতেন।"

পণ্ডিত মহাশয় একটু চুপ করিলেন। একটু পরে জলধর বাবুকে বলিলেন—"আপনি 'হিমালয়' পুস্তকে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, সে সমস্তই কি সত্য ঘটনা?" উত্তর হইল—"আজ্ঞে, হাঁ, সমস্তই সত্য।" প্রশ্ন হইল—"আপনি কি মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িতেন? আপনার বইয়ের মধ্যে নবীন পণ্ডিতের কথা আছে।" উত্তর হইল—"আজ্ঞে, আমি জেনারল আসেম্ব্লি কলেজে পড়িতাম, মেট্রোপলিটানে পড়ি নাই।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"আপনার লেখা আমার বেশ মিষ্টি লাগে।" জলধরবাবু তাঁহার পদধূলি লইলেন।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যায় ইংরেজের আগমন

"According to the legend, the English established factories at Pipli in 1638, at Hugli in 1640 and at Balasor in 1642. The truth is that the English never had any factory at Pipli except in the imagination of the Historians." (The early annals of the English in Bengal : Wilson).

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মছ্‌লিপট্টমে কাপড়ের অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। কোম্পানীর তত্রস্থ কর্ম্মচারী এই অভাব-স্থান পূরণ করিবার জন্য গঙ্গা-তীরবর্ত্তী বন্দরাদি হইতে বস্ত্র আমদানীর জন্য কএকজন কর্ম্মচারীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তদনুসারে আটজন ইংরেজ মছ্‌লিপট্টম হইতে দেশীয় নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া উড়িষ্যার অন্তর্গত পটুয়া নদীর তীরবর্ত্তী হর্ষপুর বা হরিষপুরে পৌছিলেন। তথা হইতে পদব্রজে যাত্রা করিয়া বালিকুড় ও হরিহরপুর হইয়া তাঁহারা কটকে পৌছিলেন।

মছ্‌লিপটম হইতে কটক যাত্রা :—

আজ মছ্‌লিপট্টম হইতে কটক পৌছান অত্যন্ত সহজ-সাধ্য ব্যাপার। ইংরেজের সুশাসনে ও সুবন্দোবস্তে এক্ষণে দ্বাদশবর্ষীয় বালকও নিরাপদে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারে। কিন্তু, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে যে এরূপ ব্যাপার কষ্টসাধ্য ও দুরূহ ছিল, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তখনকার দিনে "টুপী-ওয়ালাকে" কেহই ভালচক্ষে দেখিতেন না। এক বৎসর পূর্ব্বে শাজাহানের আদেশে পর্ত্তুগীজদিগের হুগলীর কুঠী তিনমাস অবরোধের পর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, পর্ত্তুগীজগণও ইংরেজদিগকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। পর্ত্তুগীজগণ বারংবার ইংরেজের নিকট পরাজিত হইয়া সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শ্বেতদ্বীপবাসী বণিক্‌গণ কালে অপর বৈদেশিক বণিক্‌কে পদদলিত করিয়া ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি হইবেন। তাই তাঁহারা ইংরেজকে দুই চক্ষের বিষের ন্যায় দেখিতেন এবং পদে পদে তাঁহাদের প্রতিবন্ধ ঘটাইতে ত্রুটী করিতেন না। বলা বাহুল্য, মছ্‌লিপট্টমের ইংরেজ দলও এই ক্ষেত্রে অব্যাহতি পান নাই। যাহা হউক পথিমধ্যে নানারূপ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বড়বাড়ি দুর্গে পৌছেন।

মহানদী ও কাটজুড়ির সঙ্গম-স্থলে বড়বাড়ি দুর্গ অবস্থিত ছিল। এককালে ইহা খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। সার্দ্ধ এক মাইল স্থান লইয়া এই দুর্গ চতুষ্পার্শ্বের শত্রুর ভীতি উৎপাদন করিত। ইংরেজদিগের এতদ্দেশে আসিবার অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে উড়িষ্যার শেষ হিন্দুরাজা বীরবর মুকুন্দদেব এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সুবাদার সুলেমান শা কেরাণী কালা পাহাড়কে উড়িষ্যা-বিজয়ে প্রেরণ করেন। বীরবর মুকুন্দদেব যুদ্ধ করিতে করিতে জাজপুর ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

বড়বাড়ি দুর্গ।

সে অনেক দিনের কথা। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন মোগলের প্রতিনিধি আগা মহম্মদ জামান সেই দুর্গে বাস করিতেছিলেন। ইংরেজগণ তথায় পৌছিবামাত্র সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সসম্মানে দরবারে লইয়া যাওয়া হইল। যখন তাঁহারা দরবারে পৌছিলেন, তখন রাজপ্রতিনিধি তথায় উপস্থিত ছিলেন না। বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হইল।

সকলেই সাগ্রহে এই নবাগতপ্রার্থীদিগকে দেখিতে লাগিল। যদিও ইতঃপূর্ব্বে ইংরেজগণ দিল্লির দরবারে গমন করিয়াছিলেন, তত্রাপি এই দেশে ইংরেজ-দর্শন সৌভাগ্য অনেকের ঘটিয়া উঠে নাই। "সাত সমুদ্র তের নদীর" দূরবর্ত্তী বণিক্‌গণকে দেখিতে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ, ইংরেজের খ্যাতি প্রতিপত্তি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কি করিয়া তাঁহারা সুরাটে পর্ত্তুগীজ সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কি প্রকারে ইংরেজ-দূত দিল্লীতে সম্রাটের সুদৃষ্টি ও প্রাধান্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই সকল সংবাদ কাহারও অবিদিত ছিল না। অধিকন্তু, বড়বাড়ীরই পথে, পর্ত্তুগীজগণকে পরাজিত করিতে সম

হওয়াতে, সকলেই ইংরেজের বীরত্বে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, অবশেষে নবাব আসিতেছেন এই সংবাদ পৌঁছিল। সংবাদ পৌঁছিবামাত্র, দরবারস্থল মূল্যবান কার্পেটে আচ্ছাদিত হইল। এই কার্পেট যাহাতে স্বস্থানচ্যুত না হয়, তজ্জন্য তাহার চতুষ্পার্শে সুবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ স্থাপিত হইল এবং মধ্যস্থলে রাজপ্রতিনিধির আসন রক্ষিত হইল। এই সকল আয়োজন শেষ হইলেই ভ্রাতৃবর্গ এবং অদ্ধ শত সভাসদ সহ নবাব দরবার-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

আগামহম্মদ জামান—

নবাব দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র সমবেত জনবৃন্দ নত হইয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন। নবাব উপস্থিত হইয়া, ইংরেজদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দরবারের অন্যতম ওমরাহ মির্জা মমিন তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিলে, নবাব অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি মস্তক-সঞ্চালনে ইংরেজদিগের তৎকালীন দলপতি কার্টরিটকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজ পাদুকা কার্টরিটকে চুম্বনার্থ প্রদান করিলেন। যদিও সেই সময়ে এই প্রথাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হইত, তথাপি কার্টরিট দুইবার এই প্রকার পাদুকা চুম্বনে অস্বীকার করিলেন। পরে, না করিলে যদি সকল কার্য্য পণ্ড হয়, এই আশঙ্কায় কার্টরিট নিজ মস্তক অবনত করিয়া পাদুকা চুম্বনের ভাণ করিলেন।

এই ব্যাপার শেষ হইলে, নবাব এবং দরবারের অন্যান্য সকলে আসন পরিগ্রহ করিলেন। ইংরেজ বণিক্‌গণ তাঁহাদের আনীত উপহার উপস্থিত করিয়া বাণিজ্যাধিকার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কার্টরিটের বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই নমাজের সময় উপস্থিত হইল এবং পশ্চিম-গগনস্থ আরক্তিম সূর্য্যের দিকে চাহিয়া মুসলমানগণ নমাজে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরবার-ক্ষেত্র সহস্র সহস্র প্রজ্বলিত বর্ত্তিকায় সুশোভিত হইল।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে ইংরেজগণ পুনর্ব্বার দরবারে উপস্থিত হইলেন। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। ইংরেজদিগের বিপক্ষগণ উৎকোচ-প্রদানে দরবারস্থ একজন প্রধান ওমরাহকে বশীভূত করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজগণ বালেশ্বরের এই শাসনকর্ত্তাকে হস্তগত করিয়া,

শত্রুর চক্রান্ত।

যখনই দ্বিতীয় দিনে ইংরেজগণ বাণিজ্যাধিকার প্রার্থনা করিলেন, তখনই ইনি ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলেন। ইংরেজগণ পথিমধ্যে যে ক্ষুদ্র পর্ত্তুগীজ জাহাজ অধিকার করিয়াছিলেন সেই জাহাজের কর্ম্মচারীর পক্ষাবলম্বন করিয়া এই ওমরাহ, কি ক্ষমতায় ইংরেজ শাহানশার রাজ্যে অপরের জাহাজ অধিকার করিয়াছেন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কার্টরিট ইহার সদুত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। পর্ত্তুগীজগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং আত্মরক্ষার্থ তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, তিনি যখন দেখিলেন যে, পর্ত্তুগীজগণ তাঁহার যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহার কোনও প্রতিবিধান হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি নবাবকে অভিবাদন না করিয়া এবং তাঁহার নিকটে বিচার গ্রহণ করিয়াই ক্রোধান্ধ হইয়া দরবার পরিত্যাগ করিলেন।

"রাগনালক্ষ্মী" চলিত কথাটি অনেক সময়ে সত্য বলিয়া বোধ হয়। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। মুষ্টিমেয় ইংরেজ-বণিকের প্রতিনিধি সামান্য একজন কর্ম্মচারী অপমানিত হইবার আশঙ্কায় নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যে প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল বাদশাহের প্রতিনিধির দরবার পরিত্যাগ করিতে সাহসী হইলেন, ইহা দেখিয়া নবাব ও তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দ স্তব্ধ ও বিস্মিত হইলেন। ইংরেজের এইরূপ অকুতোভয়ে, নবাব ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, সন্তুষ্ট হইয়া তৎপর দিবসে স্বয়ং কার্টরিটকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কার্টরিট দরবারে উপস্থিত হইলে, নবাব তাঁহার ক্রোধের কারণ এবং দরবারের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কার্টরিট নির্ভয়ে বলিলেন যে, বলপূর্ব্বক নবাব কোম্পানির ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চাহিতেছেন বটে, কিন্তু ইহা কখনও কোম্পানী সহ্য করিবেন না। নবাব এই উত্তর শুনিয়া পারস্য ভাষায় সভাসদ্‌গণের নিকট কোম্পানীর ক্ষমতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সভাসদ্‌গণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উত্তর প্রদান করিলেন; কিন্তু, দরবারস্থ পারস্যদেশীয় বণিকগণ নবাবকে নিবেদন করিলেন যে, ইংরেজ কোম্পানী অত্যন্ত ক্ষমতাবান্ এবং ইংলণ্ডাধিপ ইচ্ছা করিলে এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাহাজকেই যুদ্ধে পরাভূত করিতে পারেন এবং ইংরাজ কোম্পানীকে

অপমান করিলে ভারতীয় বাণিজ্যের ও মক্কাগমনকারী যাত্রীগণের প্রভূত ক্ষতি হইবে।

পারসিক বণিকগণের এইরূপ উত্তরে সুফল ফলিল।

বাণিজ্যাধিকার।

নবাব ইংরেজদিগকে নিম্নলিখিত সর্ত্তে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন।

"যদি ইংরেজের জাহাজ কোন সময়ে বাদশাহ বা বাদশাহের অধীন কোন জাহাজ বা নৌকা ঝড়ে বা শত্রুর হস্তে নিপতিত দেখে, তবে ইংরেজের জাহাজ যেন ক্ষমতানুযায়ী বাদশাহী জাহাজকে সাহায্য করে এবং আবশ্যক হইলে নবাবের জাহাজকে কাছি, নোঙ্গর, খাদ্য অথবা অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা ইংরেজ জাহাজ বা ইংরেজ সাধ্যানুসারে সাহায্য করিবেন।

সন্ধি-সূত্র।

"ইংরেজ বাদশাহের কোন জাহাজ অধিকার করিবেন না।

"মুসলমানের অধিকৃত বন্দরে, নদীতে অথবা রাজপথে ইংরেজের শত্রুর কোন জাহাজাদি অধিকার করিবেন না; তবে ইংরেজ তাহার শত্রুর জাহাজাদি সমুদ্রে অধিকার করিবেন।"

কার্টরিট এই সকল প্রস্তাবে সম্মত হইলে, নবাব নিম্নলিখিত সর্ত্তে ইংরেজ কোম্পানীর সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

"বাদশাহ শাজাহানের প্রতিনিধি স্বরূপে আমি বণিক্ রালফ্ কার্টরিটকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য, ক্রয়, বিক্রয়, রপ্তানি চালান প্রভৃতির অনুমতি দিতেছি।"

"লাভের জন্য এক কুঠী হইতে অন্য কুঠিতে পণ্যাদি প্রেরণ করিবার সময় কোন শাসনকর্ত্তা, শুল্ক-গ্রহীতা অথবা অন্য কোন কর্ম্মচারী ইংরেজ বণিকের নিকট হইতে কোন প্রকার শুল্ক গ্রহণ করিতে পারিবে না।"

"আমি ইংরেজদিগের সুবিধার জন্য তাঁহাদিগেরই সুবিধামত স্থানে গৃহ-নির্ম্মাণের আদেশ এবং ক্ষমতা দিতেছি।"

"ইংরেজ বণিককে আমি ক্ষুদ্র বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণের অনুমতি দিতেছি এবং আবশ্যক হইলে কোম্পানী জাহাজ মেরামতও করিতে পারিবেন। শ্রমিকদিগের বেতন ব্যতীত ইংরেজকে তজ্জন্য কোনরূপ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে না।"

"ইংরেজ বণিককে আমার অধীন কোন কর্ম্মচারী কোন প্রকারে অনিষ্ট করিবে না। করিলে কর্ম্মচারী দণ্ডনীয় হইবে। ইংরেজ-বণিকের ভৃত্যদিগেরও কেহ কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

"যদি ইংরেজ ও অধীবাসিবৃন্দের কোনপ্রকার বিবাদ হয়, তবে সে বিবাদ দরবারে আমিই নিষ্পত্তি করিব।"

এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারেই হরিহরপুরে এবং বালেশ্বরে ইংরেজ কোম্পানীর কুঠী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় ইংরেজ কোম্পানীর প্রভাব হইতে থাকে এবং ১৬৩৩ ও ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে যে প্রভাতের সূত্রপাত হয়, কালে তাহাই সমগ্র বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

হরিহরপুর ও বালেশ্বরকুঠী।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

ছুটীর দুইটি দিন

ছুটী আসিতেছে। পনরদিন আগে হইতে স্ত্রীকে তাড়া দিতেছি—ওগো গুছাইয়া লও। কন্যাপুত্রকে গুণ্ডীচাগৃহে অর্থাৎ মাসীর বাড়ী রাখিয়া যাইতে হইবে। পুত্রের নাম [illegible] দোষ হয় নাই। পূজার কাপড় চোপড় একটু আগে হইতে কিনিয়া আমি তৈয়ার, যত দেরী করিতেছেন ঐ আমার স্ত্রী। প্রতিবৎসরই য[illegible] আমাদের বাড়ী তাহার স্ত্রীকে লইয়া আসিয়া পূজাবকাশ যাপন করিয়া গিয়াছে; এবারে সে বড় জেদ করিয়া লিখিয়াছে

যে, যদি আমি আমার স্ত্রীকে (যতীনের বাল্যসহচরীকে) লইয়া তাহার গৃহে পদার্পণ না করি ত সে কখনও আমাদের এখানে আসিবে না। এমন অবস্থায় যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমি তাড়া দিই, আমার স্ত্রী যেন গা-ই করেন না। অবশেষে যাত্রার দিন আগত। এখানে বলা উচিত যে, আমি অল্প ইংরেজি ভাবাপন্ন, আমার মুখে সর্ব্বদা চুরুট, আমার তিন বেলা চার দরকার, তবে আর অধিক দূর অগ্রসর হই নাই। বোধ হয় স্ত্রীর ভয়ে। আর যতীন — সে ইহাদের ধার ও ধারেই না, অধিকন্তু খাটি গোঁড়া হিন্দু। আর তাহার স্ত্রী? সেও যতীনের মনের মত। যতীনের শিক্ষায় শিক্ষিত। গৃহকার্য্যে নিপুণা, বিদ্যাবতী, হাস্যরসে সদামগ্না, আর কোনও একখানা অভিধান খুলিয়া বাছা বাছা কতকগুলি বিশেষণ বসাইয়া দিলে যা হয় তাই। আমাদের অর্দ্ধাঙ্গিনীরা আমাদের সামনে অন্ন কাপড় রাখিয়া বাহির হন। আমার নিজের স্ত্রীর কথা কিছু বলা হইল না যে? সে বড় দুষ্ট, কোন্দলকারিণী ইত্যাদি—তা আমার স্ত্রী পড়িয়া রাগই করুন আর যাই করুন, ঠোটই ফোলান আর ফোঁৎ ফোঁৎ করিয়া বসনাঞ্চলে নাকই পুঁছুন—আমি সত্যের দাস—কতকগুলা মিথ্যা কথা লিখি কি বলিয়া? সমুদায় ঠিক ঠাক। বাসার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া শ্যালীপতি ও শ্যালিকার হস্তে আমাদের আদরের "কন্যারত্নং কমারাশ্চত্রীনুদারান্ মহাযশাঃ" সমর্পণ করিয়া আমরা গাড়্যারোহণ করিলাম। এ স্থলে যাহা শ্যালী ভিন্ন "অপর করে নয় আদর চিহ্ন" এমন কোনও কর্ণ-বিমর্দ্দন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে যে হইল না এটা আমার পরম সৌভগ্য। তারপর (Smack went the whip, round went the wheels) সপাং করিয়া চাবুকের শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে চক্রের ঘূর্ণন আরম্ভ। আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কতদিন বাদে আবার গিয়া বন্ধুর হস্তে হস্তবদ্ধ হইয়া নানা কথার আলাপনে দিন কাটিয়া যাইবে।

ষ্টেশনে পঁহুছিয়া যথারীতি টিকিট কিনিয়া বাষ্পীয় শকটের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। গাড়ী আসিলে স্ত্রীকে মেয়ে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া জিনিষ পত্র লইয়া আমি পাশের গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে বড় ভিড়। আবার অনেকে ঘুমাইতে শুইয়া পড়ায় অনেকের বসিবার জায়গা পাওয়া দায়। মিনতি করিয়া উঠিতে বলায় কেহ কেহ পাশ ফিরিয়া শুইলেন, যেন কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। তিন তিনবার অনুরোধেও যখন ফল হইল না তখন আস্তিন গুটাইয়া দুই জনকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিলাম। ঘুমের এমন বিঘ্নকারীকে কি কেহ ক্ষমা করিতে পারেন? দুইটা খাইতেও হইল। আমি ইতিমধ্যে কামরায় যে কয়জন লোক আছে তাহা গণিয়া দেখিলাম। অতঃপরং আর যাহারা আসিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলাম। অনেক চেচামেচি হইল, গার্ড সাহেব আসিয়া আমায় দ্বার ছাড়িয়া দিতে বলিলেন—আমি বলিলাম, দ্বার ছাড়িয়া দিব কিন্তু লোক ঢুকিতে দিব না। ফলে আমার নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া নোট বহিতে লিখিতে যাইতেছেন—আমি বলিলাম ও-সব কিছু করিতে হইবে না, আমার কার্ড লউন। এই বলিয়া তাঁহাকে আমার একখানি কার্ড দিলাম। আর বলিলাম, গাড়ীতে ২৭ জন বসিবার কথা ২৭ জনই আছে—আর একটিকেও আমি প্রবেশ করিতে দিব না—আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আমার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া গার্ড নিরস্ত হইলেন। আমাদের নিজের স্বত্ব যদি রক্ষা করি, যদি অন্যায় কিছু না করি ত ভয় কিসের? তদনন্তর সকলের জিনিস পত্র দুই বেঞ্চির মধ্যে বেঞ্চির সমান উঁচু করিয়া দিয়া বেশ শুইবার বন্দোবস্ত করিলাম ও সকলকে শুইতে জায়গা করিয়া দিলাম। আপনারা একজোট হইয়া অন্যান্যের স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিলে সব দিক্ বজায় থাকে—বেশ সুবিধা হয়, তা না করিয়া আমরা কেবল আপনার আপনার সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও সুবিধা খুঁজি। পরের জন্য আদৌ ভাবিতে শিখি নাই। আমরা সে রাত্রি এত স্বচ্ছন্দে শুইয়া আসিয়াছিলাম। অবশ্য পা না ছড়াইয়া যে তাহা বলা যায় না। আর চতুর্থ শ্রেণীর রেল গাড়ী নাই বলিয়া যে দিন হইতে আমাদের রাজা মহারাজ, জমিদার, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিবেন সেদিন হইতে, এই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের যাহাদের নিকট হইতে সকল রেল কোম্পানীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা উপার্জ্জন করেন, সকল অভাব অভিযোগের প্রতীকার ও গাড়ীতে ঠাসিয়া তুলিয়া দেওয়ার অত্যাচার ও কঠোরতা মন্দীভূত হইবে।

সমুদায় রাত্রি গাড়ীতে কাটিয়া গেল। যে সব ষ্টেশনে গাড়ী বেশীক্ষণ দাঁড়ায় সেই সেই ষ্টেশনে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। নতুবা মনে হয় যেন শিশুর দোলায় শুইয়া দোল খাইতেছি। ঘুম ভাঙ্গিলেই নামিয়া দেখি মেয়ে গাড়ীতে মেয়েদের কোনও অসুবিধা হইতেছে কি না, অথবা কোনও নিরক্ষর লোক মেয়ে গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে দেখিলে তাহাকে বারণ করিয়া বুঝাইয়া অন্য গাড়ীতে উঠাইয়া দিই। দেখিতে দেখিতে সকাল হইল। চিত্ত-প্রফুল্লকর প্রভাত বায়ু সেবনে মনও বেশ স্ফূর্ত্তিযুক্ত বোধ হইতে লাগিল। এমন সময় আমরা গন্তব্য ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। জিনিষ পত্র নামাইতে ব্যস্ত—এদিকে আমার বন্ধু মেয়ে গাড়ী হইতে তাঁহার খেলার সাথিনী (?)কে নামাইয়া ঘোড়ার গাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন। আমরাও পরে গাড়ীতে উঠিলাম। যথাসময়ে বাড়ীতে পঁহুছিলাম। বন্ধুপত্নীর সাদর আহ্বান ও অভ্যর্থনা কিন্তু আমার মনের অবস্থা Yarrow visitedএর উল্টা হইয়া গেল।

And is this—Yarrow—This the stream
of which—my fancy cherished ?
so faithfully a waking dream ?
An image that hath perished ! &c &c.

আমার ধারণা ছিল যে, গোঁড়া হিন্দু শুধু জপতপ লইয়া বুঝি থাকেন। বাড়ীতে দুই চারিখানি পাঁজি পুঁথি দেখিব। স্থানে স্থানে আবর্জ্জনার রাশি থাকিবে—দেওয়ালে সিকনি থুতু নেপা থাকিবে!! তা নয়। আমার নিজের বাড়ী বড় পরিচ্ছন্ন বলিয়া যে একটা গর্ব্ব সর্ব্বদা অনুভব করিতাম তাহা খর্ব্ব হইয়া গেল। বাটির বাহিরে একটি ছোট্ট বাগান, গাছপালা যে অনেক তাহা নহে—তবে এমন সুন্দরভাবে সাজান ও এমন পরিষ্কার করিয়া রাখা যে, দেখিয়া মনে হয় যেন কোনও সাহেবের বাড়ীতে বুঝি ঢুকিলাম। ঘাস পালা আদৌ নাই—ফটকের ভিতরকার রাস্তার দুই ধারে কোন উঁচু করিয়া ইট পোতা আর রাস্তাগুলি লাল সুরকি দিয়া ঢাকা। বাহিরের বারান্দায় নানাপ্রকার পাতার গাছ (ক্রোটন) থরে সাজান—সুন্দরভাবে ছাঁটার জন্য গাছগুলির বিচিত্র গঠন মনোরম। ঘরের দেওয়ালে সুন্দর [illegible] ছবি—সবগুলি দেশী—দেওয়ালগুলিতে আদৌ ঝুলটুল কোথাও নাই—দেখিয়া মনে হয় যেন আজই অথবা কালই যেন চুনকাম করা হইয়াছে। কাঠের আলমারি, সিন্দুক, খাট ইত্যাদির পালিশ এত চকচকে রহিয়াছে যেন আজই নূতন দোকান হইতে ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে। ঘরের মেঝে এমন পরিষ্কার ঝাঁট দেওয়া যে, সিঁদুরটুকু পড়িলেও তুলিয়া লওয়া যায়। জিনিষ পত্র খুব অনেক নহে—তবে যাহা আছে—তাহা রাখিবার গুণে যেন নূতন রহিয়াছে।—ধূলা কোথাও একটুও দেখা যায় না—আমি ত অবাক্ হইয়া দেখিতেছি—আমার ধারণাই ছিল না যে, হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়া এমন পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা করা যায়। বাড়ীতে একটি চাকর ও একটি মালী। অন্য লোক নাই। জিনিষপত্র নামাইতে এই দুইজন আসিল। তাহাদেরও কাপড় চোপড়, ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহাদের কিছু বলিয়া দিতে হইল না—সব নামাইয়া গুছাইয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে তুলিয়া লইয়া—গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া দিল। আমি বিছানা আনিয়াছি দেখিয়া যতীন বলিল "এটা আনার কি প্রয়োজন ছিল, অনর্থক বোঝা বহিয়া মরা। এখানে কয়দিন বিছানা পাইতে না? না পরিবার কাপড় পাইতে না? ঝাড়া হাত পা চলিয়া আসিতে পারিতে। ছেলে মেয়েদের আনিলে আমাদের যে সুখ হইত, বিছানা ও এক তোড়ঙ্গ কাপড় আনায় আমাদের সে সুখ হইবে না।

হিন্দুর ঘর! বাপ্‌রে। কাপড় চোপড় ছাড়িয়া—শুচি হইয়া লইলাম—যদিও ও-রকম করা আমার অভ্যাস কোনও কালেই ছিল না। স্থানভেদে আবার অভ্যাস ভেদ করিয়া লইলাম। আমার Adaptability কি ভয়ানক! চাকরে চা দিয়া গেল। সঙ্গে গরম ভাজা লুচি, কপির তরকারি ও বাড়ীতে তৈয়ারী একটি মিষ্টান্ন লইয়া—(দুইখানি রেকাবীতে করিয়া) গৃহিণী আসিয়া দুইখানি আসনের সাম্নে রাখিয়া দুইটি গেলাসে ঢাকা সমেত জল আনিয়া রাখিয়া আমাদের জলযোগে উপবেশনের জন্য হুকুম বল হুকুম, অনুরোধ, মিনতি করিলেন। আর ছেলে মেয়েদের না আনার জন্য বাপ অভিমান দুঃখ করিতে লাগিলেন ও কাহার পরামর্শে তাহাদের মাসীর বাড়ী রাখিয়া আসা হইয়াছে জানিবার জন্য জেদাজিদি করিতে লাগিলেন। আমি নীরবে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সম্পাদনে মনোযোগী হইলাম।

আসল কথা বলিলে লঙ্কাকাণ্ড হইয়া যায়। কোপে—হয় আমার উপর নয় আমার তাঁর উপর পড়িবে। এ সময়ে বোবার শত্রু নাই—যাহা অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলাম। বাড়ীর গৃহিণী হাল ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে নব অভ্যাগতার আদর আপ্যায়নে মনোযোগী হইতে গেলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রাণের কি কি খোলাখুলি কথা হইল তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব। তাহাদের মধ্যে যদি কেহ লেখনী ধারণ করেন তবেই তাহা জানা যাইবে, নতুবা দ্বিজুর মত "তবে তালুদেশে চড়াৎ করিয়া নেমে এস মা ভারতি, অর্জ্জুনের সাধ্য হ'ত যুদ্ধ করা কৃষ্ণ না থাকিলে সারথি" শ্রীশ্রীভারতী কর্ত্তৃক Inspired হইলেও আমি তাহা বর্ণনে অক্ষম।

অতঃপর আমরা দুই বন্ধুতে মিলিয়া কত সুখ দুঃখের কথা কহিলাম। যথাসময়ে চাকর আসিয়া আমাদের তৈল-মর্দ্দন ও অভ্যঙ্গ করিয়া দিয়া গেল। আমার গরম জলে স্নান করা অভ্যাস, তাহাও পাওয়া গেল। আমি চাকরের কার্য্যতৎপরতা দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার চাকরটি ত বেশ; কত মাহিয়ানা দাও?" খোরাক পোষাক বাদে ৬।০ দিতে হয় ও প্রতি বৎসর ।০ হিসাবে বাড়িয়া ১২৲ পর্য্যন্ত হইবে। দুই টাকা মাহিয়ানাতে নিযুক্ত হইয়া আজ ১৭ বৎসর চাকরী করিতেছে। পেন্সনেরও ব্যবস্থা আছে। ও পেন্সন বলিতে পারে না, বলে 'বাবুর বাড়ী নোকরী করিলে আমি পেন্সিল লইব।' ও-হতে আমার বাড়ীতে চুরি নাই। কোনও মূল্যবান জিনিষ যদি অসাবধানে কোথাও ফেলিয়া আসি, তা তাহাও এ চাকরের সতর্কদৃষ্টি এড়াইতে পারে না। আর চাকরের অসুখ বিসুখের খরচ সব আমার। বাড়ীর গিন্নী বলেন, 'আমি মনে করি, চাকরেরা ছেলেদের চেয়ে অধিক দয়ার পাত্র, ছেলেরা তোমার আমার কাছেই থাকে; যখন যা চায় তখন তাই পায়। ছেলেদের ব্যারাম হইলে, তুমি আমি কাছ ছাড়া হই না। চাকরেরা পীড়ার যাতনায় অধীর হইয়া "বাবাগো" "মাগো" করিয়া চীৎকার করে; উহাদের বাবাই বা কোথায়, মাই বা কোথায়? তুমি আমি ওদের বাপ মা। তুমি চাকরকে বড় বিশ্বাস করিলে ত তাহার হাতে বাক্সের চাবিটি দিলে, কিন্তু চাকর তোমারই দয়ার উপর আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া রহিয়াছে।' চাকর ব্যারামে পড়িলে আমার গিন্নীই যতদূর সম্ভব তাহার কাজ করিয়া লন। ছুটী লইলেও চাকরের মাহিনা কাটিবার যো নাই।" আমি বলিলাম, "তবে আর চাকর মিথ্যাবাদী হইবে কেন, আর বাজারের পয়সা চুরিই বা করিবে কেন?"

এমন সময় হাসিতে হাসিতে ঝগড়া করিতে করিতে যতীনের ছেলে মেয়ে আসিয়া আবদার ধরিল, "দাও সন্দেশ কাকাবাবু, আমরা সবাই খাই, কাকাবাবু আসছে শুনি ছুটে এলাম তাই।" আজ সকালে স্কুল ছিল, তাই ইহাদের এতক্ষণ দেখা পাই নাই। ছেলেমেয়ের হাসি হাসি মিষ্টি কথা শুনিয়া কর্ণ জুড়ায়।

ভাইভগিনীতে গাঢ় প্রণয়। ছেলেদের স্কুল অনেকটা দূর হইলেও যতীন ছেলেকে বাবু হইতে দেয় নাই। হাঁটিয়া যায়। কাপড় চোপড় সাদাসিদে মোটামুটি। যে নিজে মোটা চালে চলে সে ছেলেকে বাবুয়ানা শিখায় না—আর বালককাল হইতে ইহারাও ময়লা টয়লা দেখিতে পারে না—ছেলে মেয়ে দুই জনেই মা বাপের কথা শুনিতে অভ্যস্ত। মেয়েটি স্কুলে যায়। স্কুলকালে যতীনই তাহার তত্ত্বাবধান করে। আমার কাছে বসিয়া খানিক আমোদ করিয়া তাহারা স্নানাগার করিতে গেল। চাকরকে দুইজনেই "দাদা" বলে—

"ওগো জায়গা হ'য়েছে এস। খেয়ে দেয়ে একটু জিরোও, তারপর যত পার গল্প করিও"—বলিয়া আসিয়া গৃহিণী দাঁড়াইলেন। আমরা দুই জনে গিয়া আসনে বসিলাম। আড়ম্বর কিছুই নহে। বাঙ্গালীর আহার সুক্তা, মোচা, মাছের ঝোল, মুগের ডাল, মানকচু ভাতে, দুই তিন রকম ভাজা, ডালনা, চড়চড়ি ইত্যাদি যাহা আমরা নিত্য নিত্যই খাই। বাড়ীর গরুর দুধ উপরে খুব পুরু হইয়া ঈষৎ হলদে রংএর সর পড়িয়াছে। ঘরে তৈরী দুইটি করিয়া সন্দেশ। আমাদের বাড়ী গেলে যতীনকে খাওয়াইবার জন্য যে বিপুল আয়োজন করিতাম—ইহা তাহার দিক দিয়াও না। আমি করিয়াছি, সুতরাং তাহাকেও উলটাইয়া তদ্রূপ আয়োজন করিতে হইবে, এমন ভাবিয়া কার্য্য করা হয় নাই। আমার ওখানে গেলে যতীন বোতল বোতল সোডা জল খাইত।

কেননা গুরু পাক জিনিষ হজম সহজে হয় না। যখন একে একে এই সমুদায় ব্যঞ্জন রসনাস্পর্শ করিতে লাগিল, তখন আবার সেগুলি অমৃততুল্য বোধ হইতে লাগিল। আমাদের বামুনের রান্না খাওয়া অভ্যাস, আমাদের জানাই নাই যে, এই সামান্য তরিতরকারিতে যদি পরিমিত মশলা সংযুক্ত হয় ত এত উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার হইতে পারে। আমরা আমাদের গৃহিণীদের 'গান বাজনা শিখাই—বায়ু-সেবনে অভ্যস্ত করি, কৃত্রিম আলাপ ও শিষ্টাচার শেখাই, গলার স্বরটি মিহি করিতে শেখাই, আরও কত কি করি—আর তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের একাধিপত্য রাজত্ব হরণ করিয়া খোট্টা বা উড়িয়া ব্রাহ্মণকে দান করি। আমার নিজের বাসায় যদি এই সব উপকরণ দিয়া ভাতের আয়োজন হইত তাহা হইলে আমি আধপেটা খাইয়া উঠিয়া যাইতাম ও কতকগুলা জল খাবার অথবা যা তা দিয়া কিছু পরে উদরের গহ্বরটা পূর্ণ করিতাম। অদ্য পরম পরিতোষ সহকারে, চাহিয়া চাহিয়া লইয়া অনেক আহার করিলাম। আমার আহার দেখিয়া যতীন ও তাহার পত্নী বলিলেন, "তোমাকে খেতে না দিয়েই এত রোগা করিয়া ফেলিয়াছে।……ভারি অন্যায়। না খেতে পেলে লোকে বাঁচিবে কেমন করিয়া? খাটবেইবা কেমন করিয়া? বন্ধুর সাথিনী অভিমানভরে বলিলেন, "যত দোষ সব আমার; ও সব জিনিষ বুঝি উনি ছোন। এখানে সব মিষ্টি লাগছে। সেখানে গেলে যেকে সেই হবেন। আমি বুঝি হাঁড়ি ধরতে কাতর? মাথার দিব্যি দিয়া কে বারণ করে, 'ওগো রান্নাঘরে যেওনা' তোমার বর্ণ কাল'ঝুল হইয়া যাইবে। ইত্যাদি।' এখানে বুঝি আমার নিন্দা করবার জন্য আসা হ'য়েছে? তবে সব কথা খুলে ব'লে দেব?" এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথনে, আবার মাঝে মাঝে "হাঁ হাঁ দেয়ং হুঁহুঁ দেয়ং দেয়ং তর্জ্জনকম্পনে, শিরঃ-কম্পেঽসি দাতব্যং ন দেয়ং বাগ্রঝম্পনে"র মধ্যে আহারাদি শেষ হইয়া গেল। থড়্কে ইত্যাদি না চাহিতেই পাওয়া গেল। খাসা চাকর। তদনন্তর হুঁকার নলটি মুখে দিয়া "রোহিণীর" চিন্তা করিতে লাগিলাম কি আর কিছু করিতে লাগিলাম তাহা পাঠক অনুধাবন করিবেন। ঘুম আসিবার পূর্ব্বে আমি যতীনকে বলিলাম, "ভাই তোমার গিন্নী ত এত-সর্ব্বদা ত আমাদের কাছেই থাকিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন—কাপড় চোপড়ে হলুদের দাগটাগ কিছুই লাগিল না—এ সব করেন কেমন করিয়া?" উত্তরে যতীন বলিল, "যিনি বাদী এবং বিবি উভয়ই হইতে পারেন, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই সম্পত্তি এবং শোভা উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।"

বেলা সাড়ে তিনটার সময় যতীন আসিয়া আমার গা ঠেলিয়া তুলিল। শুনিলাম সে গা ঠেলিতেছে ও বলিতেছে "আর ঘুমাও না চাহ চক্ষু মেলি" ইত্যাদি। চোখে মুখে জল দিয়া উঠিয়া বলিলাম—এখন কি করিতে হইবে? অবেলায় ঘুমাইলে শরীরটা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে তাই উঠাইলাম। চল আমাদের পুস্তকালয়ে লইয়া যাই। আমার এখানে কিন্তু সব বাঙ্গালা বই। পুস্তকগৃহে উপনীত হইয়া দেখি কত বই সংগ্রহ করিয়াছে—আজ পর্য্যন্ত যত বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া প্রায় সমুদায় ভাল বইগুলিই আছে। বইগুলি সুন্দর বাঁধান ও সোনার জলে নাম লেখা—মাসিক-পত্র সেটপুরা করা অনেকগুলি দেখিলাম। পুরা সেট্ নাই এখনও অনেকগুলি রহিয়াছে। কতকগুলি আবাঁধা রহিয়াছে; সেগুলির বৎসরের বার সংখ্যা নাই; অপ্রাপ্ত সংখ্যাগুলি পাইলে তবে বাঁধান হইবে। এখন দড়ি দিয়া বৎসর বৎসর ভাগ করিয়া বাঁধা আছে। ঘরের মধ্য ভাগে একখানি লম্বা টেবিল, তাহার চারি পার্শ্বে চেয়ার সুরক্ষিত। একদিকে ঢালা বিছানা। ঘরের আর এক অংশে সতরঞ্চি বিছান আছে। এখানে সাহিত্য-সম্মিলন হয়। চেয়ারে বসার ব্যবস্থা তখন রহিত হয়। সকলে মেঝে ফরাসের উপর বসিয়া বক্তৃতা ইত্যাদি শুনেন। অন্যান্য সময়ে শুইয়া বসিয়া, বা আরাম কেদারায় হেলান দিয়া ইচ্ছামত পুস্তক অথবা সাময়িক পত্র পড়িবার সুচারু বন্দোবস্ত আছে। আলো সেই পুরাতত্ত্ববিদ্গণের অনুসঙ্গের রেড়ির তেলের পিদীপ (প্রদীপ)। বই লইয়া গেলে একখানি খাতায় গ্রহীতার নাম ও লইবার তারিখ লিখিয়া দিয়া যাইতে হয়। পুস্তক ফেরত দিলে ফেরতের তারিখও ঐ খাতায় লিখিত হয়। ফেরত তারিখ প্রবেশিত (Entered) না হইলে পুস্তক ফেরত আসে নাই বুঝিতে হইবে। ঘরের দেওয়ালের গায়ে ভূদেব, রামমোহন, বঙ্কিম, রমেশ দত্ত,

ইত্যাদির ছবি টাঙ্গান আছে। কথায় কথায় আমি বলিলাম বাঙ্গালা ভাষায় পড়িবার মত বেশী কি আছে? বাজে চুটকি গল্প আর কি? যতীন বলিল, তার বেশী আর কি থাকতে পারে? তোমাদের মত সুশিক্ষিত লোকেরা ত বাঙ্গালা শিখিবে না—বাঙ্গালায় কি বই আপনা হইতে লেখা হইয়া যাইবে? আমাদের মধ্যে যে দুই পাতা ইংরেজি পড়িলেন—তিনি আর বাঙ্গালায় কথা কহিতে চাহেন না। আর সুশিক্ষিত দেশী লোকেরা ইংরেজি ভিন্ন লেখাপড়া বা কথা কহা করিবেন না। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় কি থাকিবে আশা কর। তবু যা হ'য়েছে এই আশ্চর্য্য। "তোমার এই পুস্তকাগার হইতে পুস্তক লইয়া গিয়া বাবুরা পড়েন?" তা যদি কাবতেন ত আমি শ্রমসার্থক জ্ঞান করিতাম। আমার যে এতটা টাকা এই পুস্তক খরিদে বিনিয়োজিত করিয়াছি তাহার সুদ আদায় হইতেছে বুঝিতাম। বই ত আমি অমনিই পড়িতে দিই তাহাতেই এই। অল্প বিস্তর চাঁদার বন্দোবস্ত থাকিলে বোধ হয় শতহস্তেন বাজিবৎ অথবা মণিনাভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ বুঝিয়া পরিহর্ত্তব্য ভাবিয়া এদিকে ভুলেও মাড়াইতেন না। আমার লাইব্রেরীর পাঠক যত পুরস্ত্রীরা! ওঃ এই মতলবে তবে করা? তা যাই বল, পুরমহিলারা আমার এই বই গুলিকে অতি স্নেহচক্ষে দেখেন ও পড়েন। তাও একটা সুলক্ষণ। আর যেদিন আমাদের বাবুরা আসিয়া ইহার পেট্রন হইবেন সে দিন আমাদের বাঙ্গালা ভাষার কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ থাকিবে? আজ কাল দুই একজন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিতেছেন। কালে বাঙ্গালা ভাষা অতি গৌরবের জিনিষ হইয়া উঠিবে। তা যাই বল ভাই এবারে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় আমাদের বাঙ্গালা ধাতুর স্বরূপ যা বাহির করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে, ওরূপ আজগুবি নূতন কিছু না করিলেই ভাল হইত। আমরা চিরকালটা শুনিয়া আসিলাম Verb To be = হওয়া, to eat = খাওয়া, to cause to do = করান, to feed = খাওয়ান; আজ আমাদের নূতন করিয়া শিখিতে হইবে To be = হ, eat = খা, cause to do = করা, feed = খাওয়া—বলিহারি বাবা যা হউক। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, উত্তম পুরুষের "ই" বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহাই ধাতুমূল। আমি ত এমতে মত দিতে পারিলাম না।" বিদ্যানিধি মহাশয় না বুঝিয়া কিছু আবল তাবল একটা যা হয় কিছু লেখেন নাই—এ বিষয়ে অবশ্য আলোচনা হইবে। মতভেদ না হইলে তর্ক করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত অসম্ভব। আমিও বিদ্যানিধি মহাশয়ের সব কথাই যে ঠিক, তাহা বলি না। তাঁহার নূতন প্রকাশিত শব্দকোষে যে সকল ব্যুৎপত্তি লেখা আছে তাহাও মানিনা, তবে তাঁহার দ্বারাই এ বিষয়ে এই প্রথম উদ্যম, সুতরাং আলোচনা করিয়া তাঁহার সাহায্য করা উচিত। কাউর বা অন্ততঃ তিনি মনে করেন কামরূপ হইতে উৎপন্ন। আমি এ উৎপত্তি আদৌ মনে স্থান দিতে পারিতাম না। গড় :- গোড় হইতে, গড় পড়তা) অবশ্য এ দুই স্থলেই বিদ্যানিধি মহাশয় নিঃসন্দেহ নহেন। এইরূপ দশজন করিতে করিতে আসল ব্যুৎপত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। "তোমার পুস্তক রাখিবার ধরণে বইগুলি লইতে ইচ্ছা করে। অন্যান্য পুস্তকালয়ে বইগুলি যেন তেন অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হয়। আমাদের ওখানেও সেই দশা, তুমি নিজে সেক্রেটারি হইয়াই দুরবস্থা ঘুচাওনা কেন? তোমরা কাজে অগ্রণী হইলে—রোজ পাঠাগারে আসিলে—তোমাদের দেখাদেখি অন্য লোকও আসিবে—আর আজকাল স্কুল কলেজের ছেলেরা যাহারা প্রধানতঃ পাঠাগারের স্থাপনে উদ্যোগী, তাহারা বল পাইবে।" "আমাদের দেশের লোকের আর একটা মহা দোষ আছে।" "সে দোষটা কি?"—"পুস্তক লইয়া গেলে আপনা হইতে সে পুস্তক ফিরিয়া দিতে চাহে না।" আস্তে আস্তে সব শুধরাইবে। আমাদের যাহাতে আরও অধিক সংখ্যক লাইব্রেরী স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলেই দেখিবে অনেক নূতন নূতন লেখক বাঙ্গালা ভাষায় লেখনী ধারণ করিবেন। যদি আমার জানা থাকে যে, ভাল কিছু লিখিতে পারিলে অন্ততঃ ৫০০ খণ্ড সেই পুস্তক বিভিন্ন ৫০০ পাঠাগারের সত্বাধিকারিগণ ক্রয় করিবেন তাহা হইলে যথেষ্ট উৎসাহ পাওয়া গেল। তারপর যদি শিক্ষিত ভদ্র-মহোদয়গণ আপনাদের নিজের জন্য আর পাঁচশত খণ্ড ক্রয় করেন ত খুবই ভাল। আমরা এখন এক জায়গায় একখণ্ড পুস্তক ক্রয় করিলে ১০০ জন মিলিয়া সেখানি পড়ি। ঐ একখণ্ডের স্থলে দুইখণ্ড বিক্রয় হইতেছে দেখিলেই বুঝিতে

হইবে ক্রেতা বাড়িতেছে—বাঙ্গালা ভাষার সুদিন সমুপস্থিত অদূরবর্ত্তিনীং সিদ্ধিং রাজন্ বিগণয়াত্মমঃ। আমাদের দেশের লোকে একটু একটু serious literatureএর আদর করিতেছে দেখিলেই বড় আনন্দ পাই। তা অধুনা তেমন serious বই একখানিও বাহির হয় নাই।" তবে তুমি যাইবার সময় তিনখানি বই লইয়া যাইও। দাম অবশ্য যে হয় একজন দিবে।" ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এডুকেশন গেজেটখানি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সাপ্তাহিক পত্র এখনও উহা বর্ত্তমান আছে। গবর্ণমেণ্ট ঐ পত্রিকায় মাসে প্রথম প্রথম ৩০০৲ পরে ২০০৲ সাহায্য করিতেন। অধুনা ঐ সাহায্য বন্ধ করা হইয়াছে। ৺মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ-ফণ্ডে যায়। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত যে, ঐ বহু পুরাতন এডুকেশন গেজেটখানি যেন না উঠিয়া যায়। "আচ্ছা আমি তাঁহার পুস্তক লইব ও এডুকেশন গেজেটের গ্রাহক হইব। গেজেটখানির কিন্তু অনেক বিষয়ে নব কলেবর ধারণ করা দরকার। সেই সাবেক চালে চলিলে হইবে না। সময়ের অনুরাগী হইয়া চলিতে হইবে। ৺ভূদেব বাবুর নাম কে না জানেন? তিনি আমাদের যে একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। অমন লোক আর জন্মে নাই।"

রাত্রে আমরা আহারাদি করিয়া শয়ন করিলে যতীনের মেয়ে আসিয়া আমায় কত কবিতা (বেশীভাগ মহাভারত হইতে) আবৃত্তি করিয়া শুনাইল। তাহার উচ্চারণ অতি চমৎকার। মেঘনাদ-বধ কাব্যেরও কতকাংশ ইহার মুখস্থ আছে দেখিলাম। ছেলেটির অঙ্ক কষিবার মাথা আছে। স্মরণশক্তিও বেশ। ছেলে বাপের কাছে শোয়। আজ আমি ও যতীন একত্র শুইলাম। আমাদের কথা কি আর ফুরায়। মেয়েটি মাথায় হাত বুলায় আবার গায়ে হাত বুলায় আর বাতাস করে। আমি যে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িলাম স্মরণ নাই।

আর একদিনের কথা মাত্র বলিয়া ছুটির কাহিনী শেষ করিব। বড় লাগিয়াছিল বলিয়াই লিখিলাম নতুবা কি কাজ এ সব লেখার? বন্ধুর তরফ হইয়া যদি পক্ষপাতিতা করিয়া লিখিয়া থাকি ত তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমি। এখন দ্বিতীয় দিনের কথা শুনুন:—

একদিন দেখি বাজার হইতে অনেক তরকারি ও জিনিসপত্র আসিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় যতীন বলিল, কএকজন লোক খাইবে কি না? কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে জানিতে চাহিলে বলিল কাল দেখিও। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি মহাযজ্ঞের আয়োজন। কএকজন ব্রাহ্মণ রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত। জিনিসপত্র আন্দাজ ১০০-১২৫ জনের উপযুক্ত। আয়োজন প্রচুর না হইলেও জিনিষপত্র অতি উত্তম। যাহারা রাঁধিতেছে তাহারা পাকা রাঁধিয়ে। বেলা আন্দাজ ১০॥ কি ১১টার সময় বাড়ীর অপরাংশে প্রায় ৫০।৬০ জন পুরুষ আসিয়া বসিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে পাতা দেওয়া হইয়াছে, মাটীর গ্লাসে জল ও নুন দেওয়া হইয়াছে। অনন্তর পরিবেশন আরম্ভ হইল। যতীন নিজে পরিবেশন থালা ধরিল। বলিল, আপনি হাতে করিয়া খাওয়াইলে যে সুখ হয় অন্যের দ্বারা পরিবেশন করাইয়া সে সুখ হয় না। খানিক দেখিয়া আমিও গায়ের জামা খুলিয়া থালা ধরিলাম। আমিও পরিবেশন করিতে লাগিলাম। শেষে এমন হইল যে, আমরা দুইজনে অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশনের দায় হইতে অব্যাহতি দিলাম। পরিবেশন করিতে করিতে যতীন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তোমার অমুক অমুক আসে নাই কেন? অন্ন পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া মিষ্টান্নের সরা আমন্ত্রিতগণের হাতে দিয়া যতীন সকলকেই তাহা বাড়ী লইয়া যাইতে বলিল। আচমনের পর যেন তাহারা সকলে একবার বসবার ঘরে যায়, এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল। সেখানে বৃদ্ধ ও যুবকগণের জন্য এক একখানি মিলের ধুতি ও চাদর রাখিয়াছিল, আর আর ছেলেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রংএ ছোপান জামা ও কাপড় ছিল। সকলকে তাহা দেওয়া হইলে তাহারা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

'চল একবার ভিতরে গিয়া দেখি' বলিয়া আমরা দুইজনে ভিতরে গিয়া দেখি যে, দুই বাড়ীর দুই গৃহিণী আমাদেরই মত মেয়েদের খাওয়াইতেছে। আমার স্ত্রীকে কখনও মেহনতের কাজ করিতে দিই নাই। কিন্তু তাহার পরিবেশনে হাত সাফাই দেখিয়া বড় তৃপ্তি বোধ হইল। যতীনের পরিবার পরিবেশন করিতেছে, অথচ কাপড় চোপড় কেমন বাহিয়া পরিয়াছে, কাপড় একটুও ময়লা হয় নাই। আর

আমার স্ত্রীর কাপড় জড়ান ভাল করিয়া হয় নাই,—গায়ে কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গে তরকারী লাগিয়া গিয়াছে। যতীনের ছেলে ও মেয়ে এই ব্যাপারে তুল্য উৎসাহী; পান, জল, নুন, পরিবেশনে তাহারা মহাব্যস্ত। আহারান্তে সিমন্তিনীগণ বস্ত্র ও সিন্দুর পাইলেন; বিধবাগণকে থান কাপড় দেওয়া হইল। আমন্ত্রিত এই লোকগুলি যতীনের প্রতিবেশী ও অনুগত। তাহাদের সকলের মোড়ল যতীন। আমরা সংবৎসর পেট ভরিয়া খাই, ওদের বৎসরকার দিনে পেট পুরিয়া খাওয়াইলাম। আজ বিজয়া দশমী।

ছেলে ও মেয়ে পয়সা লইয়া ভাসান দেখিতে গেল। তাহারা আজ নূতন কাপড় পরিয়া বেশ ভূষা করিয়াছে। এ দিকে আকস্মাৎ যতীন গান ধরিল। তখন সন্ধ্যা (যতীনের গলা ভাল জানা ছিল, সে কিন্তু বিশেষ পীড়া পীড়ি করিয়া না ধরিলে কদাচ গাহিত না) একটু আশ্চর্য্য হইলাম, পরে কারণ বুঝিলাম। গানটি এই:—

বোল অসকালে　　দেখিনু ভালে
　　এদিকে আসিছে সে।
জুড়ায় কেবল　　নয়ন যুগল
　　চিনিতে নারিনু কে॥
　　সেইরূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা　　বসন শোভা
　　পাসরিতে নারি তারে।
বাম অঙ্গুলিতে　　মুকুর সহিতে
　　কনক কটোরি হাতে।
সীতায় সিন্দুর　　নয়নে কাজর
　　মুকুতা শোভিত নথে॥
নীল সাড়ী　　মোহিতকারী
　　উছলিছে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে　　সোপিনু চরণে
　　দাস করি মনে আশ। ইত্যাদি।

আমাদের দুই মনোমোহিনী একই বেশে সজ্জিত হইয়া আসিয়া উপস্থিত। অতি সুন্দর নীলবর্ণের ঢাকাই সাড়ী দুইজনের অঙ্গ শোভিত করিতেছে। প্রত্যেকের হাতে আমাদের জন্য এক একখানি কোঁচান কাঁচির ধুতি। দুইজনে আসিয়া আমাদের দুইজনের পায়ের নিকট প্রণতা হইলেন। যতীন হাসিতে হাসিতে বলিল এইবার, বলেন আর কি:—

নিবেদন শুনহ ঠাকুর দয়ানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥

তা হচ্চে না। যতীনের স্ত্রী রাগিয়া উঠিল। বলিল আজকার দিনটা না হয় একটু কম রসিকতা করিতে। আমরা অবশ্য কাশীরাম দাস লিখিত ভদ্রা ও শ্রীবৎসের মিলন অভিনয় Rehearse করিলাম না। তাহাতে যে কুরুচির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমরা সাদরে তাহাদের হাত ধরিয়া উঠাইলাম। আমি যতীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যে এঁরা আসিয়া প্রণাম করিলেন এখন কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে? আশীর্ব্বাদের আবার রকম আছে নাকি? স্ত্রীলোকের পক্ষে আছে সধবাকে এক রকম আশীর্ব্বাদ করিতে হয়—পুত্রবতীকে অন্যরূপ—

যতীনের স্ত্রী বলিল, আমাকে শিগ্‌গির মর বলিয়া আশীর্ব্বাদ কর।

যতীন বলিল, সে আশীর্ব্বাদ আমি কাহাকেও করি না, তবে কয়টা আশীর্ব্বাদের মিকশ্চার ব্যবস্থা করিলে হয়।

১। আশীর্ব্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে সেইদিন যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয় (সূর্য্যমুখীর আশীর্ব্বাদ)।

২। স্বামীর চরণে যেন মাথা রাখিয়া হস্তের বলয় ও সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখিয়া তোমার মৃত্যু হয়।

৩। যমরাজের এক ফাঁদারে যেন তোমার ও তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় (ভূদেব বাবুর বড় ইচ্ছা ছিল)।

৪। সাবিত্রীসমানা ভব।

এই চারিটি আশীর্ব্বাদ একত্র মিশাইয়া একশিশিতে পুরিয়া শিশির গায়ে ছয় দাগ দিয়া দাও। যখনই কোন সধবা স্ত্রী স্বামীকে আন্তরিক ভক্তি সহকারে নমস্কার করিবে তখনই তাহাকে এক দাগ খাইতে দিবে। বৎসরে ছয় দাগের বেশী যেন না খাওয়ান হয়। বলা বাহুল্য যে আমাদের স্ত্রীর দুইখানি অত্যুত্তম নীল ঢাকাই যতীনের প্রদত্ত উপহার। সকলকে পরাইয়া খাওয়াইয়া আপনাদের নূতন কাপড় পরিয়া কত সুখ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বোলপুর সংবর্দ্ধনা

রবীন্দ্রনাথ

জয় কবীন্দ্র জয়,
বঙ্গবাণীর পূজা মন্দির
যশোদুন্দুভিময় !
দুর্লভতম গৌরব-হারে
মণ্ডিত তুমি সিন্ধুর পারে,
দীপ্ত মুকুটে ধ্রুব সম্মান,
পুণ্য অরুণোদয়,
ধন্য হে গুণী মনীষা তোমার
ধন্য বঙ্গালয় !
তুলনা তোমার নাই,
বিশ্বভাষার বিশাল আসনে
বাঙ্‌লার হ'ল ঠাঁই।
গরবে বক্ষ উঠিছে ফুলিয়া,
দেশ দেশান্তে পতাকা তুলিয়া
ফিরিয়াছ রথী—কি ছন্দে তব
বন্দনাগীতি গাই ?
কি দিয়ে সাজাব পূজার পশরা
হেন নিধি কোথা পাই ?

কবি-নন্দন-বনে
তব মুরলীর কল-আলাপন
ঝঙ্কৃত মৃদুছনে !
স্পন্দিয়া ওঠে মন্দাকিনীর
স্বর্ণ-নলিনী-সুবাসিত নীর,
মণি-সৈকতে কোন্ মাধবীর
নম্র নূপুর সনে,
হরিচন্দন-পারিজাত-ঝরা
পরিমল-বরিষণে !
"আকাশে পাতিয়া কাণ,"
যুগ যুগান্ত শুনিতেছে যার
গভীর আরতি-তান,
হের আজি সেই কীর্ত্তি-কমলা,
ফেন-কৌমুদী-বিলোলাঞ্চলা,
এনেছে বরণ-বাসরের মালা
পর' গলে গরীয়ান্,
সাধনা তোমার রতন-বেদীতে
র'বে দেদীপ্যমান।

চেয়ে সুদূরের প্রতি
ধ্বনিতে উতল' সুনির দোলায়
বিরাট্ তারার জ্যোতিঃ,
কোথায় উদার সীমানাবিহীন,
জগৎ-অতীতে বাজে মহাবীণ্‌!
সুদূর সুষমা উৎসের পানে
ধাও নির্ম্মল-মতি,
গীত-সাগরের অতল-পরশে
ডুবে যায় লাভ ক্ষতি।
সরল সুপথ ধরি'
কল্পপ্রদীপে আনন্দ ধূপ
গন্ধে লয়েছ ভরি'—
ভুবন-বন্ধু চির-সুন্দর-
চরণ-ধূলিতে লভিয়াছ বর,
জপিছ মন্ত্র পরম ধ্যানের,
আপনারে বিস্মরি'—
ফুটায়ে ফুল্ল অমর মুকুল
কালের বৃন্ত 'পরি!

হৃদি-রঞ্জন লাগি'
নিবেদিলে তব 'গীত-অঞ্জলি'
তিমির-রজনী জাগি';
পার হয়ে নীল আকাশ-পাথার
পঁহুছিল সুর শ্রীপদে তাঁহার,
হে স্বভাব কবি, অমৃত-কণ্ঠ
হে সুধার অনুরাগী,
বিঘ্ন-বিপদ্-তরঙ্গ-শেষে
প্রসাদ-রস-ভাগী।
ভকতি-অশ্রুজলে
তিতিয়া এ দীন দাঁড়াইল তব
বিজয়-তোরণ-তলে;
ক্ষুদ্র এ মোর জীবন-নদীর
চঞ্চল এই পিয়াসার নীর
পথহারা তব ভাবের অতলে
অবগাহি' কুতূহলে,
নব গৌরবে গরীয়ান্ মোরা
তব তপস্যাফলে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুর সামাজিক আদর্শ

দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যা যখন নানা কারণে মন্দীভূত হইয়া আসিল, স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী ও উন্নতিকামিগণের মধ্যে অনেকের দৃষ্টি রাষ্ট্র ছাড়িয়া সমাজের উপর পতিত হইল। সমাজের সম্বন্ধে ইঁহারা বা ইঁহাদের অগ্রগামিগণ যে ইতঃপূর্ব্বে ভাবেন নাই তাহা নহে; কিন্তু এখন তাঁহাদের উদ্যম ও উৎসাহ, একাগ্রতা ও সমবেতচেষ্টা যেরূপভাবে প্রকটিত হইতে লাগিল, ইতঃপূর্ব্বে সেরূপ কখনও হইয়াছিল বলিয়া ত মনে হয় না। আর তাহা বিচিত্রও নহে। আত্মোন্নতির যে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক আন্দোলনে অভিব্যক্ত হইতেছিল, এখন সামাজিক সংস্কারচেষ্টায় তাহাই আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। অনিষ্টকর কুপ্রথাসমূহ দূর করিয়া সমাজহিতের অনুকূল ব্যবস্থাদির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং অসার নির্জীব হিন্দুসমাজে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পথ সুগম করিয়া দিতে হইবে—ইহাই দেশহিতৈষী সমাজ সংস্কারকের লক্ষ্য হইল।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনই ঘোর বিড়ম্বনা এবং অবস্থার এমনই নির্ম্মম পরিহাস যে, রাজনীতিক আন্দোলনে তাঁহারা যেমন বৈদেশিক পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন, সমাজসংস্কারেও তেমনই পাশ্চাত্য সমাজই তাঁহাদের আদর্শস্থল হইয়া দাঁড়াইল। ইহার জন্য তাঁহাদের বোধ হয় দোষও দেওয়া যায় না। কারণ অবস্থার কঠিন শাসনে আমরা

আমাদের স্বাতন্ত্র্য প্রায় হারাইতে বসিয়াছি; আমরা আমাদের মনকেও আমাদের নিজের করিয়া রাখিতে পারি নাই। আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, ধ্যান, ধারণা কিছুই আমাদের নিজস্ব নহে; এ সমস্তই বিদেশ হইতে আসিয়া আমাদের হৃদয় মন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সুতরাং আমাদের চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালী যে বৈদেশিক প্রথানুমোদিত হইবে তাহাও অনেকটা স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যসত্যই কি আমরা এত মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি যে, স্বাধীনভাবে চিন্তা, বিচার ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা আমাদের একটুও নাই? রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য আমরা যে সকল আন্দোলন করি তাহাতে হয় ত পাশ্চাত্য প্রণালী অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই; কারণ রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির বোঝাপড়া করিতে হইলে উভয়ের মধ্যে প্রণালীগত সাদৃশ্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু যখন আমরা এমন কোন কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, যাহা ঐ রাজনীতিক্ষেত্রসুলভ দ্বন্দ্বভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, অর্থাৎ যাহা রাজশক্তিনিরপেক্ষ হইয়া একান্তভাবে আমাদেরই প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে, তখনও কি আমাদের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য অন্ধভাবে বিদেশের দিকে চাহিতে হইবে? সমাজের সংস্কারচেষ্টা যে এইরূপ একটি কার্য্য তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এখানে আমরা ইচ্ছা করিলে নিজ মনোমত পথ ধরিয়া আপনাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা সাধ্যমত করিতে পারি; অবস্থার যে কঠিন শৃঙ্খল আমাদের চিন্তা ও ধারণাকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, ইচ্ছা করিলে হয় ত একটা প্রবল চেষ্টায় তাহা ছিন্ন করিয়া এই সমাজক্ষেত্রে মানসিক স্বাধীনতার আনন্দ, গৌরব ও সুফল ভোগ করিতে পারি। ইচ্ছা করিলে হয় ত সমাজকে আমাদের প্রাচীন জাতীয় আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্ত্তমান অনর্থকর চঞ্চলতা হইতে মুক্ত করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইতেছে না কেন? তাহার কারণ আর কিছুই নহে:—আমরা অতীতের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি।

তাই আমাদের মধ্যে যাঁহারা সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইতেছেন, তাঁহারা যতদূর সম্ভব অতীতকে ছাড়িয়া নূতন আদর্শে সমাজকে গঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন আদর্শ, পুরাতন বিধিব্যবস্থা প্রাচীন কালেরই উপযোগী ছিল; এখন আমাদের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সুতরাং সামাজিক বিধিব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। মোটামুটি যে এ কথাটা সত্য তাহা এক রকম স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন দেখি তাঁহারা প্রাচীন আদর্শকে এরূপ ভাবে পদদলিত করিতেছেন যে, আমাদের অতীতের সহিত যোগের ক্ষীণ সূত্রটি ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠি। আমাদের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির সামাজিক স্বাতন্ত্র্য যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আমরা যে শোচনীয় দশায় উপনীত হইব তাহা ভাবিতেও হৃদয়মন অবসন্ন হয়।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, আমাদের সমাজসংস্কার পূর্ণমাত্রায় শাস্ত্রানুমোদিত না হইলে জাতির মঙ্গল নাই। প্রতিপদে শাস্ত্রের দোহাই দিলে যে এখন আর চলিবে না তাহা সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু এক দিকে যেমন আবশ্যকমত কখনও কখনও শাস্ত্রের স্থানে ন্যায় যুক্তিকে অধিষ্ঠিত করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না, অপর দিকে তেমনই আবার আমাদের প্রাচীন জাতীয় আদর্শের দিকে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিয়াই সংস্কারকার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় এই আদর্শ ব্যতীত আমাদের গৌরব করিবার আর কি আছে? এই ভারতীয় আদর্শ যেমন উদার ও উন্নত তেমনই আমাদের জাতীয় জীবন-বিকাশের সহায়। ভারতের সভ্যতা যে আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, ভারতের সাহিত্য যাহার অভিব্যক্তি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া সংস্কারকগণ যখন বৈদেশিক ভাবের বশ্যতা স্বীকার করেন, তখন স্বতই মনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করিতে ইচ্ছা হয়। আর আমাদের আদর্শের বিশেষত্ব কি এবং শ্রেষ্ঠত্ব কিসে, তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে এইরূপ আলোচনার আবশ্যকতা আছে। আর যতদিন আমরা তাহা ভাল করিয়া না বুঝিব ততদিন আমাদের অনেক উদ্যম, অনেক উৎসাহ বৃথা আন্দোলনে ও বিফল চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইবে।

যাঁহারা হিন্দুর জাতিভেদের নিন্দা করেন, তাঁহারা ভুলিয়া

ন্যায় যে পাশ্চাত্য সমাজসমূহেও ভিন্ন আকারে জাতিভেদ বর্ত্তমান আছে। শুধু ভারতীয় সমাজেই যে উচ্চ নীচ জাতি আছে তাহা নহে, য়ুরোপ ও আমেরিকাতেও সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রভেদ এই যে, হিন্দুর জাতি-ভেদ জন্মগত ও তাহার শাস্ত্র-বিধান-নির্দ্দিষ্ট (অন্ততঃ ইহাই ইহার বর্ত্তমান প্রকৃতি), আর পাশ্চাত্য সমাজের শ্রেণী-বিভাগ অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে উচ্চ জাতিসম্ভূত কোন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি দরিদ্রাদপি দরিদ্র হইলেও সেই জাতিরা ধনিগণের ন্যায়ই সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়; আর য়ুরোপে যাহার যত অধিক অর্থ সে সেই পরিমাণে সমাজের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত। এখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদ নাই; কিন্তু সেখানে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিষম দুরতিক্রমণীয় ব্যবধান তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। এখানে ধনীর সহিত নির্ধনের বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধের পথে কোন বাধা নাই; কিন্তু সেখানে এরূপ ব্যাপার প্রায় একেবারে অসম্ভব বলিলেই হয়।

ইহাই যে প্রকৃত ব্যাপার তাহা ইংরেজগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। কএক বৎসর পূর্ব্বে মৈথিল কন্‌ফারেন্সের সভাপতির আসন হইতে দ্বারবঙ্গের মহারাজ উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করায়, এতদ্দেশীয় কোন দেশীয়-পরিচালিত ইংরেজি সংবাদ-পত্রে তাহার এক বিরুদ্ধ সমালোচনা বাহির হয়। তদুত্তরে ইংরেজ-সম্পাদিত Empire পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ দিলাম;—"সমালোচক বলিতেছেন যে, বিলাতে একজন লর্ড একটা কুলির সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আহার করিতে পারেন, সমাজ কি ধর্ম্মের কোন নিয়ম তাঁহাকে বাধা দিবে না। ইহা একটা নূতন সংবাদ বটে। কেহত কখনও শুনে নাই যে, একজন ডিউক কোন রাজমিস্ত্রীর মজুরের সঙ্গে একত্র আহার করিয়াছেন। আমরা না হয় সে কথা ধরিলাম না। কিন্তু যখন লেখক বলিতেছেন যে, কোন সামাজিক নিয়ম ডিউকের এইরূপ আচরণের প্রতিকূল নয়, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ইংরেজ-সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ সামান্য জ্ঞানও নাই যাহা ইংরেজি উপন্যাস মাত্র পাঠ করিয়া লাভ করা যায়। আইনের কাছে তাহারা উভয়েই সমান বটে, এবং এ সম্বন্ধে ভারতে ও বিলাতে কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু সমাজে কি অন্য কোন ভাবে তাহাদের এরূপ সাম্য নাই। আমেরিকাতেও এইরূপ, বরং মাত্রায় একটু বেশী। * * * * দ্বারবঙ্গের মহারাজ বলিয়াছেন যে জাতিভেদ সমগ্র সভ্য জগৎ জুড়িয়া আছে, তাহা সম্পূর্ণ সমীচীন।" *

সেদিন দেখিতেছিলাম, বিলাতের কোন বিখ্যাত সংবাদ-পত্রে জামসাহেব রণজিৎ সিংহের চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন যে, রণজিৎসিংহই প্রথমে খেলোয়াড়গণের মধ্যে পৃথক্‌ভাবে আহারের প্রথা রহিত করিয়া একত্র ভোজনের ব্যবস্থা প্রচলিত করেন, এবং আমাদের মধ্যেও যে জাতিভেদ আছে তাহা এইরূপে দেখাইয়া দেন। অতঃপর লেখক জাতিভেদ সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন,—'ভারতের জাতিসমূহ অন্ততঃ কোন প্রাচীন প্রথা এবং সনাতন ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে ও সমাজে যে জাতিভেদ আছে তাহার প্রতিষ্ঠা অর্থের উপর। যদিও ভারতে উচ্চজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ না করিলে কেহ কোন মতেই জামসাহেবের সমপদস্থ হইতে পারিবে না; কিন্তু এখানে তুমি যদি ব্যবসাদ্বারা ধনবান্ হইয়া উঠ, তাহা হইলে প্রাচীন অভিজাত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগস্থাপন করিতে পার। জামসাহেবের স্বদেশের জাতি-

* "In England," says the critic, "a nobleman is at liberty to dine with a coolie, and no social and religious laws restrain him." This needs indeed. We attach comparatively little importance to the fact that there is no case on record of a Duke's entertaining a brick-layer's man to dinner; but when the writer says that no social law restrains him from doing so, he betrays the want of even a nodding acquaintance with a high life which a careful study of Anthony Trollope or E W. Norris would give him. * * Before the law they are both equal, in India as in England; but they are not so socially, and in every other considera-tion. The same is the case in America, only a little more so. Even in Saxony which boasts of the most exclusive court circle in the world, it is not so difficult to get into "Society" as in America. * * The Maharaja of Durbhanga is absolutely justified in main-taining that the caste pervades the entire civilisation of the world to-day. * * These are notorious facts, but it would be ridiculous to deny them.—The Empire, Jan. 11. 1911.

ভেদের জন্য আমাদের দুঃখ-প্রকাশ করা অপেক্ষা হয়ত আমাদের ভেদপ্রথা সংশোধন করিবার বেশী অধিকার তাঁহারই আছে। *

সুতরাং জাতিভেদ পাশ্চাত্য দেশেও আছে, প্রভেদ কেবল প্রকার-ভেদে। সেখানে ধন বড়, আমাদের দেশে ধন কিছুই নহে, জাতি মর্য্যাদাই সব। এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট আমাদের সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ইহারা সমাজে কিরূপ ফল-প্রসব করিয়াছে তাহার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যেখানেই ভেদের অস্তিত্ব, উচ্চ নীচ শ্রেণী-বিভাগ বর্ত্তমান, সেইখানেই যে জাতিতে জাতিতে একটা ব্যবধান থাকিবে তাহা অবশ্যম্ভাবী। এরূপ একটা ব্যবধান যে আমাদের জাতি-সমূহের মধ্যে আছে তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা পরস্পরকে হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণা করিয়া থাকে? হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসে কি এমন একটিও দৃষ্টান্ত আছে যে, এক জাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে, কিংবা বিপৎকালে একজাতি অপর জাতিকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইয়াছে? জাতিভেদ যে একতার বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়াছে, বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে যে ভ্রাতৃভাব থাকিতে পারে না এবং তাহারা পরস্পরের শত্রুতা-সাধনেই তৎপর, এরূপ ধারণা কেবল আমাদের সংস্কারকগণের কল্পনাতেই বর্ত্তমান, বাস্তবের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কি সহরে, কি গ্রামে, যেখানেই যাও, দেখিতে পাইবে কেমন বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়াতে এই ব্যবস্থাগত ভেদের বাহ্য আবরণ অপসৃত হইয়া গিয়াছে এবং উচ্চ নীচ জাতিসমূহ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতেছে। সহরে শিক্ষা দ্বারা এই একীকরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে; গ্রামে সহানুভূতিমূলক স্বাভাবিক বৃত্তি বিভিন্নজাতি-সমূহের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে যে, অনেক সময়ে একখানি সমগ্র গ্রাম একটি সুবৃহৎ পরিবারে পরিণত হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম যে কুত্রাপি নাই তাহা বলিতেছি না। কিন্তু সেইজন্য জাতিভেদকে সকল সামাজিক অনিষ্টের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা কি যুক্তিসঙ্গত?

এইবার বিলাতের সামাজিক অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করা যাক। ধনই যেখানে বড়, দরিদ্রতা যেখানে অপরাধ মধ্যে গণ্য, সেখানে যে সকলেই ধনী হইয়া সমাজের উচ্চ স্তরে থাকিতে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টিত হইবে, তাহাই স্বাভাবিক। ফলে, ভীষণ প্রতিযোগিতামূলক এক আসুরিক বাণিজ্য নীতি পাশ্চাত্য-সমাজে মহান্ অনর্থ সংঘটিত করিতেছে। যাহারই কিছু মূলধন আছে, অথবা কোনরূপে তাহা সংগ্রহ করিতে পারে, সে-ই ক্যাপিটালিষ্ট সাজিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিতেছে, আর যে হতভাগ্যের কোনরূপ সঙ্গতি নাই তাহাকে বাধ্য হইয়া ঐ ক্যাপিটালিষ্টের অধীনে সামান্য শ্রমজীবীর কার্য্য করিতে হইতেছে। কার্লাইল এই বাণিজ্যনীতি, এই তথাকথিত Industrialismকে Enlightened Selfishness বা 'ভদ্রভাবের স্বার্থপরতা' আখ্যা দিয়াছেন কেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। একদিকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি কল কারখানা ও শ্রমজীবি সাহায্যে অতুল সম্পদের অধীশ্বর হইয়া উঠিতেছে, আর অপরদিকে অসংখ্য শ্রমজীবী দারিদ্র্যের ভীষণ তাড়নায় অস্থির হইতেছে। একদিকে ধনসম্পদ্ ও বিলাসিতার চূড়ান্ত, আর একদিকে নিরন্ন হতভাগ্যের করুণ আর্ত্তনাদ! ইহাই কি বর্ত্তমান বাণিজ্যজগতের সাধারণ দৃশ্য নহে? এই অন্যায় ব্যবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে মানবসমাজ যে একেবারে উৎসন্নপ্রায় হইয়া যাইতে পারে, তাহা দূরদর্শী ব্যক্তিও বুঝিতে পারে। কিঞ্চিদূর্দ্ধ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বিলাতে যখন শ্রমজীবিগণের মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, সহস্র সহস্র শ্রমজীবী উদরের তাড়নায় উন্মত্ত হইয়া Chartism-রবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতেছিল, তখন সর্ব্বপ্রথমে

* "The castes of India have at least some basis in great traditions and fundamental ideas. The caste system of our own Cricket field as of our own society has only a basis in riches. You cannot be a Runjeet Singh * * * unless you have the blood of the Lion race in your veins; but you may join the old nobility of England if you have made a brilliant speculation in rubber or have exploited the oils of Baku or gold of Transvaal. Perhaps, after all the Jam Sahib has more right to correct the caste traditions of our land than we have to deplore the Caste System of his own."—Quoted in the 'Bengalee,' Oct. 8, 1912

কার্লাইল-প্রমুখ মনীষিগণের দৃষ্টি এই বাণিজ্যনিহিত মহানিষ্টকর কুব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং তখন তাঁহারা এই মহানর্থকারী নীতিকে যে কিরূপভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তির অবিদিত নাই। তারপর বহুবৎসর গত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু হতভাগ্য অনশনক্লিষ্ট শ্রমজীবিকুলের দুর্দশা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। একদিন যদি বিলাতের কারখানাগুলি বন্ধ থাকে, তাহা হইলে যে কত সহস্র শ্রমজীবীকে উপবাস করিতে হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এখন তাহারা প্রায়ই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; ধর্ম্মঘট করিয়া তাহাদের প্রভুদিগকে এবং সেই সঙ্গে দেশবাসিগণকে বিপন্ন করিয়া তুলে; এবং এইরূপে তাহাদের অসন্তোষের দীপ্ত বহ্নি সমাজকে ছারখার করিবার জন্য সদাই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

যে সমাজে এত গলদ তাহাই যে ধীরে ধীরে আমাদের আদর্শকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, তাহা বিচিত্র না হইলেও পরিতাপের বিষয় নহে কি? অথচ আমাদের বিধিব্যবস্থাগুলি আমাদের সমাজে যে সুচারুরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছে তাহা অনেক ইংরেজও স্বীকার করিয়া থাকেন। স্বদেশীর যখন ঘোর আন্দোলন তখন 'পায়োনীয়র' পত্রে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল;—'নব আশায় অনুপ্রাণিত ভারতবাসী মনে করিতে পারে যে, তাহারা ব্যাবহারিক রাজনীতিক ও সামাজিক জ্ঞানে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অন্ততঃ সমকক্ষ, এবং তাহা হইতেও পারে। পাশ্চাত্য দার্শনিক ও রাজনীতিককে অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে, যুরোপের দেশসমূহে এমন কি স্বাধীনতর আমেরিকাতেও, সমাজজীবনে এমন অনেক সমস্যা আছে যেগুলি সমাধানের কোন উপায় আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। বৃদ্ধ বয়সে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি যে সকল প্রতিকার নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কেবল মনকে চোখ ঠেরান হয় মাত্র এবং সেগুলিতে ইহাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নয়। আবার আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিরও এরূপ সংস্কার হইতেছে যাহাতে শ্রমশীল ও বুদ্ধিমান বালকবালিকাগণের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার পথই উন্মুক্ত হয়। কিন্তু ফলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বাড়িয়া যাইতেছে এবং তাহা আরও ভীষণতর হইতেছে; আর যাহারা এই প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইতেছে, তাহাদের ভাগ্যে ছিন্নবাস, অনশন ও সমাজের নিম্নতম স্তরে অধঃপতন। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পূর্ব্ব-বৈষম্য ত থাকিয়া যাইতেছেই, বরং আরও যেন বৃদ্ধি পাইতেছে।*

হিন্দুর জাতিভেদের কুফল কি কখনও এত ভয়ঙ্কর হইয়াছে? পক্ষান্তরে, শান্তি ও সন্তোষই কি আমাদের সামাজিক জীবনকে সাধারণতঃ সুখময় করিয়া রাখে নাই? কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সমাজ-সংস্কারক বলিতেছেন, এই জাতিভেদই তোমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ইহাকে উঠাইয়া দিয়া একদিকে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত কর, অপরদিকে সকলকে স্বাধীনভাবে স্ব স্ব মনোমত পথে বিচরণ করিবার অবসর দাও। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের এই চেষ্টার ফলে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হওয়া ত দূরের কথা, পাশ্চাত্য সমাজের দোষগুলি ধীরে ধীরে অলক্ষিতে আমাদের মধ্যেও প্রবেশ করিতেছে। রস্কিন (Ruskin) তাঁহার দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের "ভদ্র" হইবার হাস্যকর চেষ্টার মূলে তাহাদের যে a panic horror of the inexpressively pitiable calamity of living a ledge or two

* 'In the new hopefulness which stirs the veins of young India, our Indian fellow-subjects are apt to believe that they are at least the equals of Europeans in practical, in political, and in social wisdom. So may it be. The European Philosopher and Statesman must humbly admit that the social life of European Countries, and even of the freer and less embarassed communities of the New World, display many problems which at present seem insoluble. Old age pension and such devices, extravagantly expensive as they are, are but sops to Cerberus, a mere laying out of 'Conscious money,' a reluctant admission that the present system is not wholly equitable * * * Our educational System is being recast so as to give a chance to all clever and industrious boys and girls to better their social and economical states. But that merely extends the area of competition and makes it fiercer and those who fail meet with the old penalty of rags, destitution and degradation. The old contrast of rich and poor remains and indeed seems accentuated.'

lower on the molehill of the world সমাজস্তরে তাহাদের দু'এক ধাপ নীচুতে থাকায় বিষম অপমান ও ভীতি—লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা যেন আমাদেরও তথাকথিত নিম্ন জাতিগণের মন ক্রমশঃ অধিকার করিতেছে। ফলে কেবল তাহাদের মধ্যে অশান্তি ও অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যাঁহারা জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সাম্যস্থাপনে বদ্ধপরিকর, তাঁহারা কি একবার ভাবিয়া দেখেন যে, পৃথিবীর কুত্রাপি যাহা নাই, তাহাকে জোর করিয়া আমাদের সমাজে আনিতে চেষ্টা করিলে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে? বৈষম্যই যেমন গতিশীল যন্ত্রমাত্রের শক্তির মূল, তাপের তারতম্য না হইলে যেমন সৌরজগৎও চলিতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যসমাজে ও উচ্চনীচস্তরভেদ না থাকিলে সমাজযন্ত্র নিশ্চল হইয়া যায়। আর এই স্তরভেদ বা জাতিভেদ যে পরিমাণে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাসম্মত, সেই পরিমাণে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষের আশঙ্কাও অল্প।

অতঃপর আমরা স্ত্রীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের এই আদর্শ-গত বিভিন্নতা বুঝিতে চেষ্টা করিলে আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতিসংক্রান্ত যে সকল সংস্কার প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃতি বুঝা যাইবে। রমণী আমাদের দেশে মাতৃস্বরূপিণী, পাশ্চাত্যে পুরুষের সখী; স্ত্রীজাতিকে সম্মান অর্থে আমরা বুঝি মাতার ন্যায় তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব হৃদয়ে পোষণ করা; পাশ্চাত্যে পুরুষ রমণীর মনস্তুষ্টি-সাধন করিতে পারিলেই তাহার যথেষ্ট সম্মান করা হইল মনে করে। আমরা স্ত্রীজাতিকে দেবতার পাদপীঠে অধিষ্ঠান করাইয়া পূজা করি; তাহারা রমণীকে বিলাসমন্দিরে ক্রীড়নকরূপে পরিণত করে। * তারপর সতীত্বের আদর্শের কথা। সীতাসাবিত্রীপদরেণু-পূত ভারতে সতীত্বের আদর্শ কি তাহা কি হিন্দুকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? আমাদের সতীরমণীর আদর্শ সীতা; যিনি শুধু যে স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত বনবাস বরণ করিয়া লইয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু রাক্ষসগৃহে বাস হেতু দোষক্ষালণের জন্য অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন; আমাদের পতিব্রতার আদর্শ সাবিত্রী যিনি অল্পায়ুঃ সত্যবানের পরিবর্ত্তে অন্য পতি মনোনীত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পিতাকে বলিয়াছিলেন—

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপিবা।
সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্‌॥

তারপর এই সুখলালিতা রাজকন্যা সংবৎসর কাল বনমধ্যে কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত পালন করিয়া পরিশেষে স্বামীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; আমাদের সাধ্বীর আদর্শ সতী যিনি পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আর কত প্রাচীন মহিলার নাম করিব! যাঁহারা সতীত্বের গৌরবে আজ পর্য্যন্ত হিন্দু রমণীর কণ্ঠহারস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন!—আর ভগবান্‌ করুন যেন এমন দিন কখনও না আসে যখন হিন্দু স্ত্রী এই মহোন্নত আদর্শ হইতে বিচ্যুতা হইবেন। আমাদের আশঙ্কারই বা কারণ কি? এই সেদিনও ত রাজস্থানে শত শত রমণী সমরানলে স্বামীদের আহুতি দিয়া জহর ব্রতে মহাগৌরবে হাসিতে হাসিতে সতীত্বের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন; আজও ত চক্ষের উপর দেখিতেছি, কত পতিপ্রাণা হিন্দু রমণী সমস্ত বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করিয়া স্বামীর সহিত অনুমৃতা হইতেছেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত লাঞ্ছিত-জীবন হিন্দু এখনও পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতির দিকে চাহিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারে—

'কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে পতিমুখ চেয়ে মধুমাখা
সরমে!
'হিন্দু' কুলবধূ বিনা মধু কোথা
কুসুমে?'

কিন্তু, হায়! সংস্কারের নিষ্ঠুর কৃপায় আমাদের এই গৌরবময় আদর্শ যে ক্ষুণ্ণ হইবার একেবারেই কোন আশঙ্কা নাই, তাহাই বা মনে করি কেমন করিয়া? তাঁহারা আমাদের স্ত্রীজাতি-সংক্রান্ত যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তন

* একথা নিরপেক্ষ ইংরেজ স্বীকার করিয়া থাকেন। ১৯১০ সালে নভেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত E. Willis লিখিত 'The Cult of the mother & of the Maiden' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতীয় আদর্শকে পদদলিত করিয়া তাঁহারা পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া আছেন। বিধবা-বিবাহ আমাদের দেশে কখনও প্রচলিত হয় নাই; সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তাহা হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। তবে যে বিধি ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তদনুসারে কখনও কার্য্য হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না; সুতরাং এরূপ বিধির কোন মূল্য নাই। আর যুবতী-বিবাহও কখনও আমাদের দেশে সাধারণ নিয়মরূপে পরিগৃহীত হয় নাই;—প্রাচীন কালেও না। সীতার বিবাহ অতি শৈশবে হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন পঞ্চদশ বর্ষমাত্র। বিশ্বামিত্র মুনি যজ্ঞরক্ষার্থ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিলে রাজা দশরথ অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

উণষোড়শবর্ষো মে রাম
রাজীবলোচনঃ।

আর কবি ভবভূতি 'উত্তর-চরিতে' একটি শ্লোকে সদ্যোবিবাহিতা শিশু সীতার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। বীরবর অভিমন্যু ষোড়শবর্ষ বয়সে সপ্তরথী কর্ত্তৃক হত হন বলিয়া বর্ণিত আছে। তৎপূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার দ্বাদশ বর্ষীয়া পত্নী উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের জন্ম হয়। আবার যৌবন-বিবাহের দৃষ্টান্ত যে নাই তাহা নহে। সাবিত্রী ও শকুন্তলা প্রভৃতি প্রাচীন মহিলা যৌবনস্থা হইলে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু সাবিত্রী যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন অথচ তাঁহার বিবাহ হইতেছে না দেখিয়া পিতা অশ্বপতির ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও চিন্তাকুলতা হইতে মনে হয় যে, এইরূপ বিবাহ তৎকালীন সাধারণ নিয়ম ছিল না। সে যাহা হউক, সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে বিবাহ-বয়সের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না, এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নয়। অন্ততঃ কোন কালেই যে পঞ্চবিংশতি ষোড়শী বিবাহের জন্য ছাত্রগণকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত না তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু সমাজ-সংস্কারক বলিতেছেন যে, আদর্শের মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকিলে এখন আর চলিবে না। 'সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে' এই বিধি শুনিতে বেশ বটে; কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার অবসর আছে কি না সন্দেহ। হিন্দু বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ নানা কারণে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; আর যুবতী-বিবাহ প্রবর্ত্তিত না হইলে দেশটা উৎসন্ন যায়। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, এমন কি প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে যে, আমাদের সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এমন এক সমাজের অনুরূপ করিয়া তুলিতে হইবে যেখানে প্রতি দশটা বিবাহে অন্ততঃ একটি বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে? যেখানে পারিবারিক সুখ বলিয়া জিনিসটা একেবারেই দুর্লভ, যেখানে রমণী নারীসুলভ কমনীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া ভীষণ রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে পুরুষের নিকট রাষ্ট্রীয় অধিকার আদায় করিয়া লইতে চায়, যেখানে স্ত্রীজাতি মাতার ন্যায় সমাজকে ধারণ করিয়া রাখার গৌরব বুঝে না? আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে; তাই আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়াছি।

একটা গল্প আছে যে, কোন কৃষক তাহার সদ্যোজাত সন্তানের ব্রহ্মতালুর স্বাভাবিক স্পন্দনে ভীত হইয়া গ্রামের মণ্ডলের নিকট গমন করে এবং সন্তানের এই 'রোগ' যাহাতে শীঘ্র দূরীভূত হয়, তাহার ব্যবস্থা প্রার্থনা করে। সুবিজ্ঞ মণ্ডল মহাশয় শিশুর মস্তকে লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করিতে উপদেশ দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই কৃষক ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে ছেলেটি মারা গিয়াছে। তখন মণ্ডল মহাশয় বলিলেন, 'আরে বেটা, মরেছে ত কি হয়েছে? মাথার ধুকধুকনি ত সেরেছে!'

আমাদেরও অধিকাংশ সমাজ-সংস্কারই কি ঐ রকমের নয়? অনেক সময়ে আমাদের কোন সামান্য সামাজিক দোষ দূর করিতে গিয়া সামজাদর্শেরই মূলে কি কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইতেছি না? জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে চাহিতেছি; কিন্তু কেমন ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যের ধনাহঙ্কার আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে তাহা আমরা দেখিতেছি না। আমরা বাল্য-বিবাহ নিবারণ ও বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি; কিন্তু এদিকে যে পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিয়া বহু সম্বন্ধবিশিষ্ট হিন্দু পরিবারের স্বার্থশূন্য একান্নবর্ত্তিতা ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম

করিতেছে, সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। রমণী-সতীত্বের প্রাচীন আদর্শের কথা না হয় তুলিলাম না। কালের প্রভাবে আদর্শের পরিবর্ত্তন যে অনেকটা অবশ্যম্ভাবী তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু যে স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন স্বাধীন জাতির পক্ষে মঙ্গলকর, তাহা আমাদের ন্যায় হীন জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অনুকূল না হওয়াই সম্ভব। কারণ অবস্থার বৈষম্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ একই হইতে পারে না। সুতরাং এই পরিবর্ত্তনের স্রোত যাহাতে আমাদের জাতীয় আদর্শগুলিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে না পারে, তদ্বিষয়ে আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজ যে নিশ্চল হইয়া থাকিবে, তাহা নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রবল সংঘাত এখন নিত্য আসিয়া ইহার উপর পড়িতে থাকিবে, তখন ইহা পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন যাহাতে আমাদের জাতীয় অভিব্যক্তির বিশেষ ধারাটিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া পরিণতির পথে লইয়া যায়, অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাত যাহাতে আমাদের সমাজবন্ধনগুলি শিথিল করিয়া আরও বেশী দৃঢ় করিয়া তুলে, আমাদের লক্ষ্য সেইদিকে রাখিতে হইবে। কিন্তু সংস্কারকগণ যদি আমাদের প্রাচীন আদর্শের প্রতি অনাস্থা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রচেষ্টা দেশোন্নতির সহায় না হইয়া পরিপন্থী হইবে। আমাদের হিন্দুসমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয় যে বহু সহস্র বৎসর হিন্দুজাতি যে অটল আশ্রয়ে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার স্থানে নূতন আর কিছু গড়িয়া উঠিবে কি না, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কিরূপে নির্ভরতা দিতে পারিবে, তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে আমাদের যাহা আছে, নিশ্চিন্তমনে তাহার বিনাশ-দশা দেখিতে পারিব না।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

ছিন্নহস্ত

(শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত)

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—ব্যাঙ্কার মঃ ভরজারস বিপত্নীক। এলিস তাঁহার একমাত্র কন্যা, ম্যাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভিগ্‌নরী খাজাঞ্চি, রবার্ট সেক্রেটারী, ভেন্‌লিজ্যাও দ্বারবান্, ম্যালিকম মালখানা-রক্ষক এবং জর্জ্জেট বালক ভৃত্য। তাঁহার যে বাটীতে বাস, তাহাতেই ব্যাঙ্কও স্থাপিত। একদিন তাঁহার বাটীতে নিশা-ভোজ। ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম এক সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া দেখে খাজাঞ্চিখানার বিচিত্র কল-কৌশল-সমন্বিত লৌহ-সিন্দুকে কোন রমণীর মূল্যবান্ ব্রেস্‌লেট্-পরিহিত ছিন্ন বামহস্ত সংবদ্ধ রহিয়াছে। এ ঘটনা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর না করিয়া ম্যাক্সিম ঐ সদ্য ছিন্ন হস্তের অধিকারিণী-নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

রবার্ট এলিসের পাণি-প্রার্থী; বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার কিন্তু তাহার বিরোধী। রবার্টের অভিজাত-বংশে জন্ম বলিয়া তাঁহার ব্যবসায়বুদ্ধি সম্বন্ধে ভরজারস্ সন্দিহান্ ছিলেন। তিনি ভিগ্‌নরীকে জামাতৃপদে বরণ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তিনি কন্যার সহিত কথোপকথনে বুঝিয়াছিলেন যে এলিস্ রবার্টের প্রতি অনুরক্ত। তাই তিনি রবার্টকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য তাহাকে স্বীয় মিশরস্থিত কার্য্যালয়ের ভার দিয়া পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। সে দিন রবার্ট সে কথার উত্তর দিলেন না; কিন্তু বন্ধু ভিগ্‌নরীকে বলিলেন যে, তিনি মিশরে যাইবেন না— দেশত্যাগী হইবেন।"

কর্ণেল বোরিসফের ১৪ লক্ষ টাকা ও মূল্যবান্ দলিলাদি সমেত একটি বাক্স ভরজারসের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিবস আসিয়া বলেন যে, পরদিন তাঁহার কিছু টাকার প্রয়োজন।

ম্যাক্সিম্ সায়াহ্নে ভিগ্‌নরীকে জানাইল যে, ছিন্ন-হস্ত সম্বন্ধে পুলিস অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। পরে দুই বন্ধু রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করিতে গেল। সেখান হইতে মধ্যরাত্রিতে ফিরিয়া ভিগ্‌নরী রবার্টের এক পত্র পাইলেন; তাহাতে লেখা ছিল যে, তিনি সেই রাত্রিতেই দেশত্যাগ করিয়া চলিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কর্ণেল বোরিসফ টাকার জন্য আসিলেন।

ভিগ্‌নরী তাঁহাকে বলিলেন লৌহ-সিন্দুক কে খুলিয়াছে, বোধ হয় টাকাকড়ি অপহৃত হইয়াছে। তখনই ভরজারসকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কারণ সিন্দুকের চাবি তাঁহার নিকট থাকে। শেষে সিন্দুকের টাকাকড়ি গণিয়া দেখা গেল যে, ৫০ হাজার টাকা নাই এবং কর্ণেলের দলীলের বাক্সও নাই। সকলেরই সন্দেহ হইল রবার্ট এই কার্য্য করিয়াছেন। পুলিসে সংবাদ দিবার প্রস্তাব হইল, কর্ণেল তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তাহার পর যখন রবার্টের অনুসন্ধান করিবার কথা হইল, তখন ভিগনরী বলিল যে, তিনি বিগত রাত্রিতে সহর ছাড়িয়া গিয়াছেন। সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। ভরজারস্ তাহার পরই গৃহমধ্যে গিয়া এলিস্‌কে এই সংবাদ দিল; তাহার প্রণয়পাত্র যে চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে এ কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না; সে পিতার কোলে মুখ লুকাইয়া আবেগে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল।

দুই বন্ধু জুলস্ ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম্ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, ম্যাক্সিম সেই ছিন্নহস্তের অধিকারিণী রমণীর অনুসন্ধান করিবেন। ম্যাক্সিমের দৃঢ় বিশ্বাস যে, রবার্ট এ চুরীর কিছুই জানেন না। ম্যাক্সিম সেই দিনের কুড়াইয়া পাওয়া ব্রেস্‌লেট নিজের হাতে পরিয়া বাহির হইয়াছিলেন। পথে তাঁহার পরিচিত এক ডাক্তারের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ডাক্তার তাঁহাকে সুন্দরী একটি যুবতীকে দেখাইলেন; ম্যাক্সিম এমন সুন্দরী অতি কমই দেখিয়াছেন। তাহার পর ম্যাক্সিম কৌশলে সেই রমণীর সহিত পরিচয় করিলেন। রমণী ম্যাক্সিমের প্রকোষ্ঠে ব্রেস্‌লেট দেখিয়াছিলেন এবং তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় ম্যাক্সিম রমণীকে তাঁহার গৃহে পৌছাইয়া দিবার জন্য তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রমণী গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ম্যাক্সিমকে ভিতরে ডাকিলেন না, নিজে প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ম্যাক্সিমের মনে এই রমণী-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি সেই জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া বাড়ীটি ভাল করিয়া দেখিলেন, দুইটি লোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কি বলাবলি করিতেছে। জনশূন্য স্থানে এই লোক দুইটিকে দেখিয়া তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন কোথা হইতে তাঁহার বালক ভৃত্য জর্জ্জেট সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার দ্বারা একখানি গাড়ী ডাকাইয়া আনিয়া তিনি গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পরদিবস সায়াহ্নে ব্যাঙ্কারের গৃহে একটা প্রীতি ভোজ হয়। তাহার পর ম্যাক্সিম আসিয়া এলিসের সহিত রবার্টের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহেন। এলিসের বিশ্বাস রবার্ট নির্দ্দোষ—এলিস্ ম্যাক্সিমকে তাহার প্রণয়-পাত্রের নির্দ্দোষিতা প্রমাণে সাহায্য করিতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার ভগিনীর কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সময় বৃদ্ধ ভৃত্য গোপনে রবার্টের এক পত্র আনিয়া দেয়। ম্যাক্সিম এলিসের অনুরোধে তাহা পাঠ করেন। এদিকে রবার্ট এই ঘটনার পরদিন কফির দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—সেখানে এক কোম্পানির বিজ্ঞাপন সংবাদ-পত্রে পড়িয়া আমেরিকায় ব্যবসা করিবার জন্য সেই কোম্পানির আফিসে উপস্থিত হ'ন। কর্ণেল বোরিসফ ছদ্মবেশে তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন এবং তাঁহাকে চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মূলধন ৫০০০০ টাকা তাঁহাকে দিতে বলেন। বোরিসফ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আবার রবার্টের সহিত দেখা করিয়া ব্যাঙ্কারের টাকা ও বাক্স চুরীর কথা বলেন। রবার্ট চুরীর কথা অস্বীকার করায় তাঁহাকে একটি গৃহে বন্দী করিয়া রাখেন এবং বলেন বাক্সটি কোথায় আছে যখনই বলিবেন তখনই তাঁহাকে স্বাধীনতা দান করা হইবে।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ম্যাক্সিম এলিসের নিকট বিদায় লইয়া চিন্তিতমনে গৃহে ফিরিলেন। রবার্টের সহিত এলিসের সাক্ষাৎকার কিরূপে বন্ধ করিবেন, সেই চিন্তা প্রতিক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি তাঁহার ভালরূপ নিদ্রা হইল না।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া ম্যাক্সিম জর্জ্জেটের পিতামহীর সহিত দেখা করিতে চলিলেন। এলিসের সহিত রবার্ট অপরাহ্নে দেখা করিবেন। ততক্ষণে তিনি অপরিচিতা সুন্দরীর অনুসন্ধান ও জর্জ্জেটের পিতামহীর সহিত দেখা করিয়া আসিতে পারিবেন।

গতপূর্ব্ব রজনীতে তিনি অপরিচিতা সুন্দরীর সহিত যে পথে গিয়াছিলেন, ম্যাক্সিম সেই পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। মনোমোহিনী যুবতীর উজ্জ্বল কটাক্ষ, কোমল করতলের মধুর স্পর্শ তখনও তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যেন অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। উপরে বাতায়ন রুদ্ধ। বাড়ীটা যেন জনশূন্য। ম্যাক্সিম ভাবিলেন, সুন্দরী তবে মিথ্যা বলেন নাই। সত্যই তিনি প্যারী ত্যাগ করিয়াছেন।

কিন্তু গৃহরক্ষার ভার কি কাহারও উপর দিয়া যান নাই? ম্যাক্সিম ভাবিলেন, একবার তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। একটি টাকা হাতে লইয়া তিনি দরজার কাছে গিয়া ঘণ্টা বাজাইলেন। তিন বার ঘণ্টাধ্বনির পর এক ব্যক্তি দরজা খুলিল। তাহার শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল ও আকৃতি দেখিলে সাধারণ ভৃত্য বলিয়া বোধ হয় না।

ম্যাক্সিম বলিলেন, "এই বাড়ীটা বিক্রয় হইবে?"

"বিক্রয়ও হইবে না, ভাড়ায় দেওয়াও হইবে না।" লোকটা তখনও দরজায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এমনই অভিপ্রায়, যদি কেহ প্রবেশ করিতে চাহে, তখনই দ্বার বন্ধ করিয়া দিবে।

"ভারী আশ্চর্য্য কথা! আমি শুনিয়াছি, এই বাড়ীর অধিকারী ইহা বেচিবেন। বাড়ীর নম্বর আমার ভুল হইল না কি? ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট ত এই বাড়ীতে থাকিতেন?"

ম্যাক্সিম তখন দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

"ও-নামের কাহাকেও আমি জানি না।"

"অসম্ভব! আমি মহিলাটিকে অনেকবার দেখিয়াছি। একদিন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এই বাড়ীতেই গিয়াছিলাম। তিনি আমায়—"

"আমি ব'লছি, মহাশয়, 'ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট'কে, তাহা আমি জানি না। অন্য বাড়ীতে খোঁজ' করুন।"

লোকটা তৎক্ষণাৎ দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। ম্যাক্সিম পুনঃপুনঃ ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই আসিল না। ম্যাক্সিম তখন দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া রাস্তার অপরপার্শ্বস্থ এক অট্টালিকার দ্বারে একটি ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যাক্সিমের উত্তেজিত ভাবে সে বিস্মিত হইয়াছিল। যুবক ধীরে ধীরে তাহার কাছে গেলেন। প্রতিবেশী ভৃত্যের নিকট হইতে হয়ত কিছু সংবাদ জানা যাইতে পারিবে। ভৃত্য ম্যাক্সিমকে কোন উচ্চদরের লোক ভাবিয়াছিল। তাঁহার হাতের টাকাটাও সে দেখিয়াছিল। লুব্ধনেত্রে ম্যাক্সিমের দিকে চাহিয়া সে টুপি খুলিয়া সেলাম করিল।

"লোকটা বড়ই অভদ্র।"

ভৃত্য বলিল "আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ প্রুসিয়ানটা।"

"লোকটা প্রুসিয়াবাসী না কি?"

"কোথাকার যে লোক, তা ঠিক জানি না। সকল ভাষাতেই সে কথা বলে। আমরা উহার নাম দিয়াছি প্রুসিয়ান্। ঐ বাড়ীটা ও চৌকী দেয়।"

"আর কেহ ও-বাড়ীতে থাকেন?"

"না মহাশয়, আর কেহ নাই। আমি ত আর কাহাকে কখনও ও-বাড়ীতে দেখি নাই।"

"আমি ভাবিয়াছিলাম, ওখানে একটি মহিলা বাস করেন।"

"ভদ্রমহিলা!—অসম্ভব! ওখানে জনপ্রাণীকেও আসিতে দেখি না। কেবল ঘরগুলি সাজান আছে, আর ঐ লোকটা থাকে। তার সঙ্গে মিশিবার এত চেষ্টা করা গেছে, কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে চায় না।"

"আমি ভাবিয়াছিলাম, ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট ঐ বাড়ীতে বাস করেন।"

"ও-নামে একটি বৃদ্ধা আছে বটে; সে ত ভদ্রমহিলা নয়—দোকানদার।"

"আমি যাঁহাকে খুঁজিতেছি, তিনি নন। তিনি সুন্দরী, যুবতী।"

"তা হ'লে হয় ত তিনি আপনাকে ভুল ঠিকানা দিয়াছিলেন।"

ম্যাক্সিম টাকাটা ভৃত্যের হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "রহস্যের উপর রহস্য ঘনীভূত হইতেছে। "রমণী নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছেন। কিন্তু বাড়ীর চাবী তিনি কি করিয়া পাইলেন? নিশ্চয়ই প্রুসিয়ানটার সঙ্গে তাঁহার জানাশোনা আছে। এ পল্লীর কেহ তাঁহাকে চেনে না, সেই বা কি রকম? দেখা যাক্, আমিও ছাড়িতেছি না। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবই। জৰ্জ্জেটকে ঐ বাড়ীটার উপর নজর রাখিতে বলিব।"

চিন্তা করিতে করিতে তিনি রুকার্ডনেটে উপনীত হইলেন। জর্জ্জেটের পিতামহীর গৃহ খুঁজিয়া বাহির করিতে অধিক সময় লাগিল না। দরিদ্রপল্লী; শ্রমজীবীরাই সে পল্লীতে বাস করে।

নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর দ্বারে আসিয়া তিনি আঘাত করিলেন। প্রথমতঃ কেহ সাড়া দিল না। কিন্তু ঘরের ভিতরে কাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কে যেন চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এমনই একটা শব্দ হইল। তার পর শব্দ থামিয়া গেল। একটি স্ত্রীমূর্ত্তি কাচ-বাতায়নের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যাক্সিম দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। রমণী সম্মুখের পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাহাকে খোঁজেন, মহাশয়!"

"ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ কোথায়?"

"আমিই ম্যাডাম্ পিরিয়াক্। আপনার নাম কি মহাশয়?"

ম্যাক্সিম রমণীর মার্জ্জিত ভাষা শ্রবণে বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, রমণীর কেশরাশি শুভ্র হইলেও দেহে বিগত-যৌবনের সমস্ত স্মৃতি এখনও যায় নাই। এক কালে রমণী সুন্দরী ছিল।

"আমি মসিয়ে ভরজারসের ভ্রাতুষ্পুত্র।"

ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কএক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সসম্মানে বলিল, "আসুন, ভিতরে আসুন। দরিদ্রের কুটীরে আপনাদের বসিবার যোগ্য আসনও নাই।"

ম্যাক্সিম গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। কক্ষটি বৃহৎ, সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন। সাধারণ শ্রমজীবীদিগের গৃহ এত সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন থাকে না।

"বসুন মহাশয়, আমার পৌত্র আপনার কথা প্রায়ই বলে।"

ম্যাক্সিম আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "একদিন সে আমার বড় উপকার করিয়াছিল, সে কথা আপনাকে বলিয়াছে?"

"না, মহাশয়!

"আমি তাহার ব্যবহারে আরও সন্তুষ্ট হইলাম। তাহাকে আমি কিছু পুরস্কার দিতে চাই, কিন্তু সে ছেলেমানুষ বলিয়া—"

বিধবা বলিল, "ধন্যবাদ। কিন্তু টাকা আমি লইতে পারিব না। আমার নাতি যথেষ্ট রোজগার করে। আমিও অলস নই। সুতরাং অপরের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন। আশা করি, মহাশয় এ বিষয়ে অধিক পীড়াপীড়ি করিবেন না।"

ম্যাক্সিম বুঝিলেন, "তিনি ভুল করিয়াছেন।"

"জ্যেঠামহাশয়কে বলিয়াছি, তিনি শীঘ্রই জর্জ্জেটের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারও তাহাকে দেওয়া হইবে।"

"এ জন্য মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমার ইচ্ছা, আমার নাতিটি তাহার পিতার ন্যায় হয় সৈনিক, না হয় নাবিক হউক। শীঘ্রই সে নৌ-বিভাগে প্রবেশের চেষ্টা করিবে। ব্যাঙ্কের চাকরী করে, এ ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না।"

"জ্যেঠামহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি, কাউণ্টেস্ ইয়াল্টার অনুরোধেই জর্জ্জেট ব্যাঙ্কে চাকরী পাইয়াছে। কাউণ্টেসের সঙ্গে কি আপনার সর্ব্বদা দেখা হয়?"

ম্যাডাম পিরিয়াক্ ত্বরিতে বলিলেন, "না। রুসিয়ায় আমার পুত্রের সহিত কাউণ্টেসের প্রথম পরিচয়। তখন কউণ্টেসের বয়স খুব কম। প্যারীতে আসিয়াই তিনি জর্জ্জেটের খোঁজ করিয়া তাহাকে লইয়া যান্। তার পর এই চাকরী তাহার হয়। জর্জ্জেট আপত্তি করে নাই। আমিও তখন বাধা দিই নাই। কিন্তু আমি শীঘ্রই কাউণ্টেসকে লিখিব যে, জর্জ্জেট নৌ-বিভাগে প্রবেশ করিতে চায়। তিনি যেন অনুমতি করেন।"

রমণীর ব্যবহার ম্যাক্সিমের নিকট অত্যন্ত বিস্ময়কর বোধ হইল। সে যেন সাধারণ রমণী অপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীর। ম্যাক্সিম বলিলেন, "জর্জ্জেট আমার জীবনরক্ষা-কল্পে সাহায্য করিয়াছিল, এ জন্য আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। রুজোক্রয় পল্লীর কোনও বাড়ীর সম্মুখে আমি মহাবিপদে পড়িয়াছিলাম। ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট নাম্নী কোন রমণীকে আপনি চেনেন?"

আসন ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'না মহাশয়, আমি কোথাও যাই না। রুজোক্রয় পল্লী কোথায়, তাহাও জানি না। ম্যাডাম সার্জ্জেণ্টকে আমি চিনি না। আমার বাড়ীতে বড় একটা কেহ আসেন না; আমিও কোথাও যাই না।"

ম্যাক্সিম বুঝিলেন, এইবার বিদায় লইবার সময় আসিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আপনার সময় নষ্ট করিলাম বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। আমি যখন আসি, সেই সময় আপনি কাহারও সহিত যেন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন—"

"আমি একা ছিলাম, কেহ আমার ঘরে ছিল না।"

"একা ছিলেন! আমি অপর কাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি।

"আপনার ভুল হইয়াছে। আমার নাতির প্রতি আপনার দয়া আছে, সে জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ করিতেছি। কিন্তু আমরা কাহারও সাহায্য চাহি না।"

ম্যাক্সিম কুণ্ঠিতভাবে বিদায় লইলেন। বৃদ্ধার সম্মুখে যেন তিনি এতটুকু হইয়া গেলেন। রাজপথে আসিয়া তিনি ভাবিলেন, ম্যাডাম পিরিয়াক্ নিশ্চয়ই কাউণ্টেস্ ইয়াল্টার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বৃদ্ধার কথা আমি বিশ্বাস করি না। রহস্যটা আমায় ভেদ করিতে হইবে। জর্জ্জেটের সহায়তা আমার প্রয়োজন। তাহাকে ভুলাইয়া কথা বাহির করিয়া লইতে হইবে।"

ম্যাক্সিমের ক্ষুধাবোধ হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী কোনও হোটেলে গিয়া তিনি কিছু ভোজন করিবেন, স্থির করিলেন। পথটুকু হাঁটিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। কিছুদূর গমনের পর দেখিলেন, একখানি সুসজ্জিত ব্রুহামগাড়ী আসিতেছে। তিনি দাঁড়াইলেন। গাড়ীর ভিতরে দুইটি লোক বসিয়াছিলেন। ম্যাক্সিম চাহিবামাত্র দেখিলেন, এক ব্যক্তি আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছে। মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে তিনি রবার্ট কারনোয়েলকে চিনিতে পারিলেন।

"ব্যাপার কি? রবার্ট এখানে আছে শুনিয়াছি। গাড়ী চড়িয়া সে যে এমনভাবে বেড়াইতেছে, এ সন্দেহ ত আমার হয় নাই। বোরিসফ উহার উপর ঠিক সন্দেহই করিয়াছেন। বড় বড় লোকের সঙ্গে উহার ঘনিষ্ঠতা আছে দেখিতেছি। রবার্টের পক্ষাবলম্বন করিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি। এখন এলিস্‌কে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। রবার্টের ব্যবহার ঘোরতর সন্দেহজনক।"

ম্যাক্সিম একটি হোটেলে প্রবেশ করিলেন। আহার্য্য উপস্থিত হইলে তিনি একখানি সংবাদপত্র চাহিয়া লইলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি সংবাদপত্রের স্তম্ভে আকৃষ্ট হইল, তিনি পড়িলেন—

"ঘোরতর রহস্য।"

"গত কল্য অপরাহ্ণে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে! যে ছিন্ন হস্তখানি প্রদর্শনের জন্য শবব্যবচ্ছেদ-আলয়ে সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে। কে চুরী করিল, কেমন করিয়া অপহৃত হইল, এখনও পর্য্যন্ত তাহার কোন সূত্র পাওয়া যায় নাই।"

ম্যাক্সিম চমৎকৃত হইলেন। নিজেরও যে আসন্ন বিপদ্ সে আশঙ্কাও তাঁহার হইল। ব্রেসলেটটি হস্তগত করিবার চেষ্টাও তাহারা নিশ্চয় করিবে। ইহারা সাধারণ লোক নহে। সকল সংবাদ ইহাদের নখাগ্রে। তখন ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট, রাত্রিকালে আক্রান্ত হইবার ঘটনা, সমস্তই যুগপৎ ম্যাক্সিমের মনে পড়িল। হস্ত ব্যবচ্ছিন্ন হইবার পরই অবশ্য কেহ প্রকাশ্যস্থলে স্কেট ক্রীড়া করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট নামধারিণী অপরিচিতা চোর নহেন। তিনি নিশ্চয়ই দলের কেহ হইবেন। ম্যাক্সিম ভাবিলেন, "এখন হইতে আমি খুব সতর্ক হইব। কোনও সুন্দরী রমণীকে আর বিশ্বাস করিব না।"

ম্যাক্সিম ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় ডাক্তার ভিলাগস কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহাস্যবদনে প্রসারিত করে ডাক্তার ম্যাক্সিমের কাছে আসিয়া করমর্দ্দন

করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ম্যাক্সিম বলিলেন, "ক্লাবে আর আপনাকে দেখিতে পাই না কেন ?"

ক্লাবে আর আপনাকে দেখিতে পাই না কেন ?

ডাক্তার বলিলেন, "আজ তিন চারিদিন একটি রোগী লইয়া বড়ই বিব্রত আছি। সেজন্য কোথাও যাইতে পারি নাই। যাহা হ'ক এখন তিনি আরোগ্য-লাভ করিতেছেন। আজ হইতে ক্লাবে যাইব।"

"আজিকার সকালের কাগজ পড়িয়াছেন ?"

"না। সংবাদপত্র আমি বড় একটা পড়ি না। রাজনীতি কিছু বুঝি না, ভালও লাগে না। আর সংবাদ—তা আমি ডাক্তারী করিতে করিতে এত নূতন সংবাদ জানিতে পারি যে, কাগজ পড়িয়া আর জানিবার প্রয়োজন হয় না। আমার রোগীরা অধিকাংশই রমণী। স্ত্রীজাতি গল্পে শতমুখ।"

"তাহা হইলে শবব্যবচ্ছেদালয় হইতে ছিন্নহস্ত অন্তর্ধানের কথা শুনিয়াছেন ?"

"হ্যাঁ, শুনিয়াছি। বড়ই অদ্ভুত ঘটনা! জেলের ভয় না করিয়া একটা সামান্য জিনিস চুরী করা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার! কিন্তু চোরের কাছে কিছুই অসম্ভব নহে।"

"এ ঘটনাটায় আপনার কি মনে হয় ?"

"রহস্য উদ্ঘাটনে আমার আদৌ শক্তি নাই। তা ছাড়া ও সব ব্যাপারে আমার কৌতূহলও অল্প। ভাল কথা, সে দিন প্রণয়ব্যাপারের পরিণাম কি হইল ? আমি ত সূচনা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তার পর গড়াইল কতদূর ?"

"পরিণাম সুবিধাজনক নহে।"

"বাস্তবিক! সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে আপনি ত চলিয়া গেলেন, দেখিলাম।"

"সুন্দরীকে তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমাকে আর ভিতরে লইয়া গেলেন না। শুধু তাই নয়। পথিমধ্যে তিনজন গুণ্ডা আমায় আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে জেঠামহাশয়ের একটি বালক-ভৃত্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হইলে বড় বিপদেই পড়িতাম।"

"ঘটনাটা আমার সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইতেছে। আমার বোধ হয়, রমণীর সহিত গুণ্ডাদের যোগাযোগ ছিল।"

"আমারও তাই সন্দেহ হইতেছে। কিন্তু রমণীর আকৃতি ও ব্যবহার রাজ্ঞীর ন্যায়।"

"চেহারা দেখিয়া সব সময় লোক চেনা যায় না। বিশেষতঃ ফরাসী রমণীর ব্যবহার বড়ই রহস্যময়। অনেক সময় ভ্রমে পড়িতে হয়। রমণী তাঁহার নাম বলিয়াছিলেন কি ?

"একটা মিথ্যা নাম বলিয়াছিলেন বটে। ম্যাডাম সার্জ্জেন্ট বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। সত্যই ডাক্তার, এই নারীর ব্যবহার গভীর রহস্যজালে জড়িত। আজ

কয়দিন যে কতই বিচিত্র ঘটনার কথা শুনিতেছি! আপনি হয় ত বিশ্বাস করিবেন না, যে বালক-ভৃত্য আমাকে সাহায্য করিয়াছিল, সে কাউণ্টেস ইয়ালটার তত্ত্বাবধানে আছে। কাউণ্টেস্‌কে আপনি বোধ হয় চেনেন?"

"নিশ্চয়। আমি তাঁহার বাড়ীর ডাক্তার। তিনি আজ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আহারের পরই সেখানে যাইব।"

"বা! জ্যেঠামহাশয়ের কাছে শুনিলাম, তিনি এখন নাইল নগরে বেড়াইতে গিয়াছেন!"

"যাত্রা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাল আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। বোধ হয় এখন পর্য্যটন তাঁহার সহিল না। তাই হয় ত আমায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

"আপনি যখন তাঁহার বাড়ীর ডাক্তার, তখন নিশ্চয় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা আপনার জানা আছে। আমি লোকের মুখে কাউণ্টেসের সম্বন্ধে এত রকমের গল্প শুনিয়াছি যে, তাঁহাকে আরব্য উপন্যাসের রাজকন্যার মত বোধ হয়।"

"সে কথা বড় মিথ্যা নয়।"

"পৃথিবীর কোন্ অংশে তাঁহার রাজধানী?"

"অত সংবাদ জানি না। তবে এইমাত্র জানি যে, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী ও চঞ্চলা। এক স্থলে বেশীদিন তিনি থাকিতে ভালবাসেন না।"

"প্রত্যেক রুসের প্রকৃতি একই প্রকার।"

ডাক্তার বলিলেন, "কিন্তু আমার মনে হয় না যে, তিনি রুস।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "কিন্তু আমি জানি, কাউণ্টেস রুসিয়ায় আমাদের বালক-ভৃত্যের পিতাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।"

"বাল্যকালে কাউণ্টেস হয় ত রুসিয়ায় থাকিতেন। কিন্তু তিনি রুস নন। আমার বিশ্বাস, তিনি সুলতানের প্রজা। কোনও গ্রীক রাজকুমারের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়; কিন্তু আজ তিন বৎসর হইল তাঁহার স্বামিবিয়োগ হইয়াছে।"

"কাউণ্টেসের বয়স এখন কত?"

"সে কথা আমি তাঁহাকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। বোধ হয় ত্রিশের কাছাকাছি হইবে।"

"খুব সুন্দরী কি? দূর হইতে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাহাতে ভাল বোঝা যায় না।"

"তিনি সুন্দরী, কি কুৎসিত, তাহা বলিতে পারি না। তবে যে কেহ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন তিনিই যে মুগ্ধ হইয়াছেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।"

"বড় খামখেয়ালী নয়?"

"পুরুষোচিত সকল প্রকার ব্যায়াম তিনি ভালবাসেন। শিকার, তরবারিক্রীড়া প্রভৃতি বিষয়ে সুদক্ষ। কিন্তু তাই বলিয়া নারী-সুলভ শালীনতাও যে নাই, তাহা নহে। তাঁহার পরিচ্ছদপারিপাট্য অসাধারণ। প্যারীর বিলাসিনীরা এ বিষয়ে তাঁহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন না। সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পে তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা আছে। ইচ্ছা করিলে অতি সুন্দর নাটক রচনা করিতে পারেন। এমন সুশিক্ষিতা রমণী আমি অল্পই দেখিয়াছি। বড় বিস্ময়ের বিষয়, আপনি এতদিন তাঁহার সহিত পরিচিত হন নাই। আপনার বন্ধুবর্গ সকলেই তাঁহাকে ভাল রকম চেনেন।"

"তাঁহার গৃহে বল-নাচের সময় অনেকে যান বটে, কিন্তু আমার ও-রকম আমোদপ্রমোদে যোগদান করিবার বাসনা নাই। জনতা ভাল লাগে না।"

"লোকজনের যখন ভিড় থাকে না, তখন ত যাইতে পারেন। যদি আপনার কোনও আপত্তি না থাকে, আমি তাঁহার সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিতে পারি।"

"কোন্ অধিকারে?"

"বন্ধুত্বের অধিকারে। আপনি কি আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করেন না? কাউণ্টেস্ আমায় বিশ্বাস করেন। তিনি জানেন যে, আমি কোন নির্ব্বোধ বা মূর্খকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইব না। আপনার লোকরঞ্জনের ক্ষমতা আছে। বিশেষতঃ সর্ব্বদা যদি আপনি তাঁহার কাছে যান, তিনি খুবই আহ্লাদিত হইবেন। সম্প্রতি সাহচর্য্যের অভাবে তিনি অত্যন্ত পীড়িত।"

"বলেন কি ডাক্তার? তাঁহার মত বিদুষী, সম্ভ্রান্ত ও ধনবতী মহিলার সাহচর্য্যের অভাব? তাঁর কি প্রণয়পাত্র কেহ নাই?"

ডাক্তার গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি যতদূর জানি, কাউণ্টেস্ জীবনে কাহাকেও ভালবাসেন নাই। আপনাকে

বলিতে দোষ নাই, ভগবান্ তাঁহাকে সবই দিয়াছেন, কেবল হৃদয়টুকু দেন নাই। হৃদয় থাকিলে তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্না ও আদর্শ রমণী হইতেন।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "প্রত্যেক নারীরই হৃদয় আছে, তবে কাহারও কাহারও হৃদয় আছে কি না, প্রথমে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু কোনও না কোনও সময়ে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবেই।"

"আমি কাউণ্টেস্‌কে রীতিমত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তাঁহার কল্পনার দৌড় খুব, কিন্তু অনুভূতি শক্তি বিন্দুমাত্র নাই। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে এ রোগের ঔষধ নাই। যাহা হউক আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, আপনি যদি তাঁহার সহিত প্রেমচর্চ্চা করিতে যান, তবে সে আশা বৃথা। শুধু সময় নষ্ট হইবে।"

"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চন্ত থাকুন। প্রেমচর্চ্চার অবসর আমার বড় নাই। তিনি সুন্দরী; আমি সুন্দরকে বড় ভালবাসি, প্রশংসা করি, এই পর্য্যন্ত। তাঁহার সহিত পরিচয়ের উদ্দেশ্য কৌতূহল চরিতার্থ করা। আরও একটা উদ্দেশ্য আছে, যে বালকটিকে তিনি প্রতিপালন করিতে চাহেন, তাহার সম্বন্ধে কএকটি সংবাদ জানিবার ইচ্ছা আছে।"

"বেশ। তা হলে কবে যাইবেন বলুন?"

"যখন ইচ্ছা। আগামী সপ্তাহে।"

"ততদিনে হয় ত কাউণ্টেস্ আমেরিকা কিংবা কনস্তান্তিনোপলে যাত্রা করিতে পারেন। কাল তিনি কি করিবেন, আজ তাহা কেহ বলিতে পারে না। নিজেই তাহা জানেন না। আজ কেন আমার সঙ্গে চলুন না? অতর্কিত আলাপেই তাহার অধিক আনন্দ।"

"আজ বেলা দুইটার সময় আমার একটি কাজ আছে।"

"ততক্ষণ আপনি স্বাধীন? এখনও বারটা বাজে নাই। গাড়ী করিয়া কাউণ্টেসের ওখানে যাইতে কত সময় লাগিবে?"

"কি বলেন, ডাক্তার! আমি প্রাভাতিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছি। আর কাউণ্টেস্ হয় ত এখনও শয্যা হইতে উঠেন নাই।"

"আপনি তাঁকে জানেন না কিনা। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই তিনি শয্যাত্যাগ করেন। আমরা যখন সেখানে যাইব, তখন হয় ত দেখিব তিনি কোনরূপ ব্যায়ামে রত।

"তবে চলুন, কিন্তু দুইটার সময়ে আমার এক স্থানে যাইবার কথা আছে, সেটা মনে রাখিবেন।"

একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া উভয়ে কাউণ্টেসের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আকাশ তখন ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। অল্প অল্প তুষারপাতও হইতেছিল।

ম্যাক্সিম ভাবিলেন, এমন দুর্যোগে শিক্ষয়িত্রী কখনই এলিস্‌কে আসিতে দিবেন না। এলিস্ও একা আসিতে সাহস করিবে না। সে ভালই হইবে। কারনোয়েল নিশ্চয় এলিসের উপর চটিয়া যাইবে। আমিও তাহাকে বুঝাইয়া বলিব, জন্মের মত তাহার এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া উচিত।

সহসা ডাক্তার বলিলেন, "আপনার জ্যেঠামহাশয় না কাউণ্টেসের ব্যাঙ্কার?"

"হাঁ; শুনিয়াছি কাউণ্টেসের অনেক টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে।"

"তাঁহার অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কাউণ্টেস পাইবেন না। আপনাদের ব্যাঙ্কের খুব সুনাম আছে।"

"হাঁ; বৈদেশিকগণ সকলেই আমাদের ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন। বিশেষতঃ রুস ভদ্রলোকেরা। কর্ণেল বোরিসফের নাম শুনেছেন?"

"শুনেছি বই কি। তিনি রুস গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।"

"গুপ্তচর।"

"তা জানি না। তবে তিনি রুসিয়ার রাজসেনাদলের একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী। শুনিয়াছি তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। রুস গভর্ণমেণ্টের কোনও গোপনীয় কার্য্যভার লইয়া এখানে আসিয়াছেন।"

"কাউণ্টেস্ ইয়ালটা বোধ হয় তাঁহাকে চিনেন?"

"দেখিলে চিনিতে পারেন। এই রুস ভদ্রলোকটিকে তিনি শত্রু বলিয়া জানেন। এই যে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি।"

একটি ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট তাঁহারা অবতীর্ণ হইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "আমি কাউণ্টেসের সঙ্গে দেখা করিতে

আসিলে এই পথেই যাই, এটা খুব নিকট হয়। তা ছাড়া সদর দরজা দিয়া গেলে অনেক হাঙ্গামা আছে। কার্ড পাঠাও, বসিয়া থাক, তবে কাউন্টেসের সঙ্গে দেখা হবে।"

ডাক্তার তিন বার ঘণ্টা বাজাইলেন। অমনই দ্বার খুলিয়া গেল। উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র আবার দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "রঙ্গালয়ের মত ব্যবস্থা দেখিতেছি। দরজা আপনি খুলে, আবার আপনি বন্ধ হয়। এক রকম ভাল, চাকর চাকরাণীর হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না।"

ম্যাক্সিম্ বুঝিলেন, কাউন্টেস্ ইয়ালটার প্রাসাদে ডাক্তারের অবারিতদ্বার। তিনি ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে পারেন। ডাক্তার ম্যাক্সিম্‌কে রম্য উপবনের মধ্য দিয়া প্রাসাদের দিকে লইয়া চলিলেন। চারিদিকে নানাবিধ বৃক্ষ ফলভরে অবনত। গাছে গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ম্যাক্সিম্ চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "কাউন্টেস্ বোধ হয় এখন বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন।"

"বলেন কি! তিনি বিলিয়ার্ড খেলা জানেন?"

"সব রকম খেলায় তিনি পণ্ডিত। দাবা খেলায় তিনি সিদ্ধহস্তা। আমি মন্দ খেলি না; কিন্তু আমি তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠি না।"

"এইবার বুঝেছি, তাঁহার প্রণয়পাত্র কেহ নাই কেন? সময় পান না বলিয়া তাঁহার প্রেমচর্চ্চা হয় না। কিন্তু আমায় কোথায় নিয়ে চ'লেছেন, ডাক্তার? এ যেন যাদুঘরে এসেছি!"

"বাড়ীর ভিতরটা এমনই ভাবে সাজান যে, সব রকম জিনিস আছে। তরবারিক্রীড়ার গৃহ, পিস্তলযুদ্ধের কক্ষ, ছবির ঘর, সব রকম এখানে দেখিতে পাইবেন।"

"কিন্তু এই সব জিনিস এরূপ অরক্ষিত অবস্থায় আছে কেন? এই বাড়ী দেখিয়া যেন মনে হইতেছে, আমরা নিদ্রিতা রাজকন্যার মায়াপুরীতে আসিয়া পড়িয়াছি।"

"কিন্তু এখানকার রাজকন্যা কাউন্টেস্ ঘুমাইয়া নাই। শুনুন।" ডাক্তার ম্যাক্সিম্‌কে একটি কাচের দরজার পাশে দাঁড় করাইলেন। অস্ত্রঝনৎকার শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ডাক্তার বলিলেন, "অস্ত্রশিক্ষকের সহিত কাউন্টেস এখন তরবারিক্রীড়া করিতেছেন। আপনি তরবারিক্রীড়া জানেন?"

"কিছু কিছু জানি। তরবারিক্রীড়া আমার বড় ভাল লাগে।"

"বেশ হয়েছে। কাউন্টেস্ উপযুক্ত সমজদারের কাছে অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।"

ম্যাক্সিম্ আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সহিত কাউন্টেস্ অস্ত্রক্রীড়ার বেশে সাক্ষাৎ করিবেন, ইহা কখনই শোভন নহে। কিন্তু ডাক্তার দরজা খুলিয়া ম্যাক্সিম্‌কে লইয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কাউন্টেস্ ইয়ালটা তখন তরবারিক্রীড়ার উপযোগী বেশ ধারণ করিয়া ছিলেন (১০৩ পৃষ্ঠা

কাউন্টেস্ ইয়ালটা তখন তরবারিক্রীড়ার উপযোগী বেশ ধারণ করিয়া ছিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল মুখসে আবৃত, সুতরাং তিনি সুন্দরী কি না, তাহা বুঝিবার তখন উপায় ছিল না।

"নমস্কার ডাক্তার, একটু অপেক্ষা করুন, এই প্যাঁচের পর আপনার সহিত কথা কহিব।" কাউন্টেস্ ম্যাক্সিমকে যেন লক্ষ্যই করিলেন না।

ক্রীড়াশেষে শিক্ষককে বিদায় দিয়া কাউন্টেস্ অগ্রসর হইলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "নমস্কার কাউন্টেস্, বাতে দেখিতেছি আপনার তরবারিক্রীড়া বন্ধ হয় নাই।"

"আপনি ঔষধ এনেছেন কি? বাতটা বাম হস্তেই বেশী। ঔষধ দিন, তিন দিনে আমার রোগ আরাম হওয়া চাই।" বলিতেবলিতে কাউন্টেস্ মুখস খুলিয়া ফেলিলেন। ম্যাক্সিম্ চমৎকৃত হইলেন। বর্ণ তুষারশুভ্র, ওষ্ঠাধর আরক্ত ও পুষ্ট। নাসিকা গ্রীকশিল্পীর ক্ষোদিত প্রস্তরমূর্ত্তির নাসিকার ন্যায় সমুন্নত ও সুন্দর। নয়নযুগল সুন্দর, পরিবর্ত্তনশীল, কখনও আকাশের ন্যায় গাঢ় নীল, কখনও ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় নীলাভ, আবার কখনও শীতের আকাশের ন্যায় ধূসর জ্যোতিবিশিষ্ট। ভাববৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে নয়নের বর্ণ-পরিবর্ত্তন হয়।

ম্যাক্সিম্ সত্যই বিস্মিত ও অভিভূত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, সাধারণ নারীর অপেক্ষা কাউন্টেস্ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

ডাক্তার বলিলেন, "আমার কথামত আপনি চলুন। তাহা হইলেই রোগ আরাম হইবে। মনটাকে সর্ব্বদা অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত করা প্রয়োজন। অস্ত্রচালনা খুব ভাল ব্যায়াম। আমি আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে মজলিসী ও জনপ্রিয় ম্যাক্সিম্ ভরজারসকে আপনার কাছে আনিয়াছি।"

ম্যাক্সিম্ সময়োপযোগী দুই একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তখন কথা যোগাইল না। কাজেই শুধু অভিবাদন করিয়াই কাজ সারিয়া লইলেন।

কাউন্টেস্ বলিলেন, "ডাক্তারের বন্ধুজন আমারও বন্ধু। ব্যাঙ্কার মসিয়ে ভরজারসের কি আপনি আত্মীয়?"

"আমি তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র।"

"তাহা হইলে আপনি অপরিচিত নহেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় আছে। আমার স্নেহভাজন একটি বালকের প্রতিপালনের ভার লওয়ায় আমি আপনার জ্যেষ্ঠতাতের নিকট কৃতজ্ঞ।"

আলাপের সুযোগ দেখিয়া আনন্দিতমনে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "জর্জ্জেটের কথা বলিতেছেন?"

"আপনি তাহাকে জানেন দেখিতেছি?"

"খুব চিনি। একবার সে আমার অত্যন্ত উপকার করায় তাহার কাছে আমি ঋণী আছি।"

"ক্ষুদ্র বালক আপনার কি উপকার করিল?"

"কতিপয় দুষ্টলোক আমাকে মারিয়া ফেলিয়া টাকাকড়ি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বালকের সহায়তায় সে যাত্রা প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।"

"উহার পিতা আমার পিতার জীবন-রক্ষা করিয়াছিল। পরের জীবন রক্ষা করা যেন উহাদের বংশগত কাজ।"

"জ্যেঠামহাশয়ের কাছে আমি কিছু কিছু শুনিয়াছি।"

"বালকটির জন্য আমি কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। সে খুব বুদ্ধিমান্। আমি ভাবিতেছি, তাহাকে একটা ভাল চাকরী করিয়া দিব।"

"তাহার ঠাকুরমার ইচ্ছা জর্জ্জেট সেনাবিভাগে প্রবেশ করে, বোধ হয় তিনি সে কথা আপনাকে বলিয়াছেন।"

"না। আমি প্যারীতে আসিয়া লোক পাঠাইয়াছিলাম; তিনি জর্জ্জেটকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে একবারও আসিয়া দেখা করেন নাই।"

"বৃদ্ধার প্রকৃতি অদ্ভুত।"

"তাঁহার সঙ্গে আপনার দেখা হইয়াছে?"

"আজ সকালে আমি সেখানে গিয়াছিলাম। আমার বোধ হয়, ম্যাডাম পিরিয়াক্ নিশ্চয় কোনও ছদ্মবেশিনী রাজকুমারী।"

"সেই জন্যই বোধ হয় তিনি আমার সহিত দেখা করেন নাই। যাক্, এখন জর্জ্জেটের কথা থাক্। আপনি তরবারিক্রীড়া করেন?"

"মাঝে মাঝে।"

"তাহা হইলে আপনি আমায় শিখাইবেন? আমার অস্ত্রশিক্ষকের আর বিদ্যা নাই, সে সব শিখাইয়াছে। আমি

তাহাকে একেবারে বিদায় দিব। আপনি বোধ হয় আমায় হারাইয়া দিবেন।"

এই অপ্রত্যাশিত অনুরোধ কিরূপে এড়াইবেন, ম্যাক্সিম তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। ডাক্তার তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে ব্যায়াম করিতে বলিয়াছি বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সব সময়েই ব্যায়াম করিবেন না যেন। বাতরোগীর পক্ষে এক ঘণ্টা ব্যায়ামই যথেষ্ট।"

"আমি ক্লান্ত হই নাই, ডাক্তার! আপনি আমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" কাউণ্টেস্ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

"কাউণ্টেস্, আপনি যদি আমার কথামত না চলেন, তাহা হইলে কিরূপে আপনার রোগ আরোগ্য করিব? বিশেষতঃ বন্ধুবর ভরজারস্ তরবারিক্রীড়ার উপযোগী পরিচ্ছদ পরিয়া আসেন নাই।"

"তাহাতে কোনও ক্ষতি হইবে না। একটা মুখস ও দুই হাতে দস্তানা পরিয়া লইলেই চলিবে। দুই একটা চক্র ফিরিলেই উঁহার ক্রীড়াকৌশল বুঝিয়া লইব।"

ম্যাক্সিম দেখিলেন, আর উপায় নাই। কাউণ্টেস্ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, এখন তাঁহার অনুরোধ পালন না করিলে অত্যন্ত অভদ্রতা হইবে। বিশেষতঃ কাউণ্টেস্ দেখিতে কুৎসিতা নহেন। ম্যাক্সিম্ মুখস ও দস্তানা পরিয়া কাউণ্টেসের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।"

"ধন্যবাদ! রমণীর অনুরোধ কেমন করিয়া পালন করিতে হয়, আপনি তাহা জানেন দেখিতেছি।" দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি ম্যাক্সিম্‌কে আক্রমণ করিলেন।

ম্যাক্সিম রমণীর নিকট যুদ্ধকৌশল দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অস্ত্রশিক্ষক সুন্দরীকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ভ্রম শীঘ্রই দূরীভূত হইল। ম্যাডাম ইয়ালটার শিক্ষাকৌশল বিচিত্র। আত্মরক্ষার যথেষ্ট চেষ্টা ও বহু কৌশল সত্ত্বেও ম্যাক্সিম্ কাউণ্টেসের তরবারিস্পর্শ অনুভব করিলেন।

তরবারি নত করিয়া ম্যাক্সিম বলিলেন, "আমার হার হইয়াছে।"

কাউণ্টেস বলিলেন, "না, না। ও ঠিক হয় নাই। আমার আক্রমণকৌশল জানিবার সময় আপনি পান নাই। উভয়ের শিক্ষা এক প্রণালী মত নহে। আমার অপেক্ষা আপনার অস্ত্রচালনাকৌশল উৎকৃষ্ট। শেষে আপনারই জয় হইবে।"

উভয়ের অস্ত্রক্রীড়া পুনরায় আরম্ভ হইল। ম্যাক্সিম ভাবিলেন, এবার কাউণ্টেস্‌কে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করিয়া দিবেন; কিন্তু তাঁহার অনুমান ঠিক হইল না। সহসা ম্যাডাম ইয়ালটার তরবারি ম্যাক্সিমের মণিবন্ধের উপর পড়িল। কোটের হাতের মধ্যে তরবারির অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়াছিল। কাউণ্টেস বলপূর্ব্বক যেমন তরবারী টানিয়া লইলেন, অমনই ব্রেসলেটটাও খুলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ম্যাক্সিম এত বিস্মিত হইলেন যে, পুনরাঘাত করিতে ভুলিয়া গেলেন। কাউণ্টেস্ মুখস খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আপনার আঘাত লাগিয়াছে কি?"

যুবক বলিলেন, "না, তা নয়।"

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, "উঁহার হৃদয় আহত হইয়া থাকিবে। কাউণ্টেস্, আপনার তরবারি মসিয়ে ভরজারসের ব্রেস্‌লেট কাটিয়া ফেলিয়াছে। উহা কোনও রমণীর প্রণয়চিহ্ন বলিয়াই মনে হয়।"

এই বলিয়া ডাক্তার ব্রেসলেটটা তুলিয়া লইয়া কাউণ্টেসের হাতে দিলেন।

অলঙ্কারটি পরীক্ষা করিতে করিতে কাউণ্টেস বলিলেন, "কোনও মহিলা বুঝি ইহা আপনাকে দিয়াছেন?"

কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ম্যাক্সিম বলিলেন, "আমি যদি বলি দোকান হইতে কিনিয়াছি, সে কথা হয় ত আপনার বিশ্বাস হইবে না।"

"আপনার প্রণয়িনী বুঝি, অলঙ্কারটি সর্ব্বদা হস্তে ধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন?"

"না।"

"আমি আপনাকে একটা উপদেশ দিতেছি। যত্নে ইহা রক্ষা করিবেন। ধরুন, আমি যদি ব্রেসলেটটা আমার কাছে রাখি, আপনি কি করিবেন?

ম্যাক্সিম বড়ই বিপদে পড়িলেন। কিন্তু সহসা তাঁহার মনে একটা কথার উদয় হইল। তিনি চকিতে বলিলেন,

আপনি যদি রাখেন, তবে মনে করিব, আপনি প্রণয়জ্ঞাপন করিতেছেন। কোনও পুরুষের অতীত জীবনের ঘটনাবলী শুনিয়া যাহার মনে ঈর্ষার উদয় হয়, তিনি নিশ্চয় সেই পুরুষকে ভালবাসেন।"

কাউণ্টেস চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নে এক অপূর্ব্ব আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখনও ব্রেসলেটটি তাঁহার হাতে ছিল। ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। ম্যাক্সিমের হৃদয় অশান্ত হইয়া উঠিল। ডাক্তার অতীব আগ্রহে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

অবশেষে কাউণ্টেস বলিলেন, "আপনার কথাই ঠিক। আপনার মনে ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু আমি কাহারও জন্য লালায়িত নহি। তাহার প্রমাণস্বরূপ এই নিন আপনার ব্রেসলেট।"

ম্যাক্সিম দ্বিরুক্তি না করিয়া উহা অমনই পকেটে রাখিলেন। ডাক্তার ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "কাউণ্টেসের দয়া অসীম। আমি হইলে মসিয়ে ভরজারসকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইতাম যে, তিনি একমাস প্রত্যহ আমায় অস্ত্র অথবা অশ্বারোহণবিদ্যা শিক্ষা দিবেন।"

ম্যাক্সিম প্রফুল্লভাবে বলিলেন, "সে ত আনন্দের কথা।"

কাউণ্টেস বলিলেন, "তা' হ'লে আপনার কথাই থাক। আপনি রোজ আসিবেন। আপনার বন্ধুত্ব আমার প্রার্থনীয়।" তার পর মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, চলুন আজ হ্রদের ধারে বেড়াইয়া আসি। শুনিয়াছি হ্রদের জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। সেখানে স্কেটক্রীড়া করা হইবে।

ম্যাক্সিম বলিলেন, "আজ আমায় ক্ষমা করিবেন। আমার একজনের সহিত সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন।"

"ব্রেসলেটদাত্রীর সঙ্গে নাকি ?"

"না, তা নয় ; কিন্তু—"

ডাক্তার বলিলেন, "উনিও, 'বোয়া'-হ্রদের ধারে যাবেন বলেছিলেন, সেইখানেই উঁহার প্রয়োজন।"

"তবে আর আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আমিও সেই দিকে যাইব। আমার গাড়ীতে আপনিও যাইবেন। হ্রদের কাছে গিয়া আপনি যখন ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। এক ঘণ্টা আপনি আমার। ডাক্তার, মসিয়ে ভরজারসকে লাইব্রেরী ঘরে লইয়া যা'ন। আমি কাপড় ছাড়িয়া শীঘ্রই আসিতেছি।"

ম্যাক্সিম পুনরায় আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু কাউণ্টেস তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন, তাঁহাকে কথা কহিবার অবসরমাত্রও দিলেন না।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার রোগিণীটিকে কেমন দেখিলেন ?"

"এখন তাঁহাকে মনোহারিণী বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"ইহার অর্থ, প্রথমতঃ তাঁহাকে কুৎসিতা ভাবিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই কাউণ্টেস লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু অল্পক্ষণ আলাপেই যে কোনও বুদ্ধিমান্ লোক মোহিত হইয়া যান। কাউণ্টেস আপনার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার চক্ষু দেখিয়া আমি তাহা বুঝিয়াছি।"

উভয়ে লাইব্রেরী অভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে ভীমকায়, সুবেশধারী একটি ভৃত্যের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। সে অভিবাদনপুরঃসর পথ ছাড়িয়া দিল। ম্যাক্সিম দেখিলেন, প্রতি কক্ষের দ্বারপার্শ্বে এক একজন পদাতিক দণ্ডায়মান। ম্যাক্সিম বিস্মিত হইলেন। যেন কোনও রাজপ্রাসাদের মধ্যে তিনি বিরাজ করিতেছেন।

লাইব্রেরীকক্ষে প্রবেশ করিয়া ম্যাক্সিম চারিদিকে দেখিতেছেন, এমন সময় কাউণ্টেস বেশপরিবর্ত্তন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ম্যাক্সিম দেখিলেন, রমণীর পরিচ্ছদে কাউণ্টেসকে অতি সুন্দর দেখাইতেছে।

উভয়ে ডাক্তারের নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। কাউণ্টেস অশ্ববল্গা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

"এখন আপনার সহিত আলাপ করা যা'ক্। আপনার জ্যেঠামহাশয়ের কথা এখন বলুন।"

ম্যাক্সিম সহসা এ প্রশ্নে বিচলিত হইলেন। এরূপ প্রশ্নের অবতারণা তিনি আদৌ প্রত্যাশা করেন নাই।

ম্যাডাম ইয়ালটা বলিলেন, "তাঁহার একটি কন্যা আছে না ?"

"হাঁ ?"

"খুব সুন্দরী, কেমন নয় ? এক দিন তাঁহাকে আমি

ব্যাঙ্কারের সহিত বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম। এতদিন তাঁহার বিবাহ হয় নাই কেন?"

"তাহার বয়স সবে উনিশ।"

"আপনি নিশ্চয় তাঁহাকে ভালবাসেন?"

"না, কাউণ্টেস্।"

"তাহা হইলে জর্জ্জেট আমাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা সত্য?"

(ক্রমশঃ)

পুরী উপকণ্ঠে

(বিদায়ে)

(১)

বিদায় হৃদয় রাজ,
নয়নের জলে এ দীন কাঙাল
বিদায় মাগিছে আজ।
লয়ে অতি ক্ষীণ ভকতির কণা
বহু দূর হ'তে এসেছে এ জনা,
অপার কৃপায় দিয়াছ যে ঠাঁই
তব ভবনের মাঝ।

(২)

মন্দির বায়ু শত ভকতের
ভরা অনুরাগ মাখা,
ভকতি নম্র অক্ষয় বট,
ছায়াময় শাখী শাখা,
তৃষিত অযুত আঁখির আলোক,
ভকত হিয়ার অধীর পুলক
দেবতা চরণ চিহ্নিত পথ
মরমে রহিল আঁকা।

(৩)

দুর্ব্বল হিয়া কাঁপে দুরু দুরু
দাঁড়াইতে তব আগে,
ও বিশাল আঁখি হেরি পাপ তাপ
সভয়ে বিদায় মাগে।
বেদী পরশিতে শিহরে যে বুক,
পূত শঙ্কায় শুকায় এ মুখ
পাষাণ হৃদয় হয় বিগলিত
গলে যায় অনুরাগে।

(৪)

রেখে গেনু দেব আঁখির পিয়াসা
আরতির দীপে তুলি'
হিয়ার ভকতি রেখে গেল দাস
পাদ্য সলিলে গুলি'।
ছড়ায়ে গেলাম হে রাজাধিরাজ,
কাতর কামনা পথধূলি মাঝ
তোমার প্রসাদে ভিখারীর আজ
পূর্ণ হয়েছে ঝুলি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

টিশিয়ান

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমস্ত ইতালী পুনর্জ্জন্মের আলোকে ভরিয়া গিয়াছিল। এই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৪৭২ কি ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে) কাদোরে পর্ব্বতশ্রেণীর

টিশিয়ান

মধ্যস্থ পিয়েভে নগরে টিশিয়ানের জন্ম হয়। তিনি তাঁহার আজন্মসহচর টাইরোলের শৈলশ্রেণীর মতন দৃঢ় ও স্থিরধী। তাঁহার ব্রঞ্জ প্রতিমূর্ত্তি ভিনিশের দিকে ফিরিয়া আজও যেন সেই দেম্যানের লাল-ভিনিশ নির্নিমেষ চক্ষে দেখিতেছে। টিশিয়ানের পিতার নাম গ্রেগরিও ভেচেলি। ছেলেবেলা হইতেই ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক দেখিয়া তাহার পিতা সেই সময়ের বিখ্যাত ভিনিশীয় চিত্রকর জিয়ান বেলিনির হাতে ছেলের চিত্রবিদ্যা শেখার ভার দেন। বেলিনির চিত্রাগারে জর্জিওনের সঙ্গে টিশিয়ানের আলাপ হয়। জর্জিওনের শিল্প-প্রকৃতির একটু বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে কেমন এক সুকুমার ললিতভাব কাব্যের সৌন্দর্য্যের মত ফুটিয়া উঠিত। প্রথম সাক্ষাতেই জর্জিওনের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিবার ইচ্ছা টিশিয়ানের মনে হয়। কথিত আছে শৈশবে একদিন রঙিন ফুলের রস দিয়া টিশিয়ান একটি ছবি আঁকিয়াছিলেন; সেই ছবির বর্ণ-বিন্যাস দেখিয়া অনেকে তখনই বুঝিয়াছিল যে, কালে এই নবীন চিত্রকর রংএর বিশেষত্ব যে তাহা অনেক প্রবীণকে বুঝাইয়া দিবে। জর্জিওনের কাছে আসিয়া টিশিয়ানের প্রচ্ছন্ন-বিশেষত্ব আকার ধারণ করিল। রংএর লীলায় এক নূতন সৌন্দর্য্য (রোমান্স) সৃষ্টি টিশিয়ানের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইল।

প্রতিভা-সম্পন্ন লোকের মতন অপরের বিশেষত্বকে নিজের করিয়া লইবার ক্ষমতা ও চেষ্টা টিশিয়ানের যথেষ্ট ছিল। বেলিনির চিত্রাগারে তাঁহার শিক্ষকপ্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গে জর্জিওনের নূতন ধাঁচের শিল্প-কাব্য ও রোমান্স তিনি বেশ আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। পরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনীষা ও অভিজ্ঞতা তাঁহার শিল্পদেবতাকে পরিপূর্ণ করিয়া লোক লোচনের গোচর করিয়া দিল। যে অনুকরণের কৃত্রিমতা কুয়াশার মতন তাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য্য ঢাকিয়া ছিল, সে কৃত্রিমতা সরিয়া দাঁড়াইল। এতদিন পরে টিশিয়ান নিজেকে নিজে চিনিতে পারিলেন। টিশিয়ানের শিল্পবিকাশের আর একটি সুবিধা হইয়া দাঁড়াইল! দুর্ভাগ্যবশতঃ জর্জিওনে অনেক অসমাপ্ত ছবি রাখিয়া অল্প বয়সেই প্লেগে মারা যান। টিশিয়ান সেইগুলির উপর নিজের প্রতিভার উজ্জ্বল রশ্মি-সম্পাতে সেইগুলিকে সম্পূর্ণ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, কল্পনা-চাতুর্য্যে তিনি ভিনিসে অদ্বিতীয়।

জর্জিওনের মৃত্যুর এক বৎসর পরে টিশিয়ান পাদুয়াতে গমন করেন। সেখানে দনাতেলো ও অন্যান্য টস্কান চিত্রকরের কাছে নূতন কিছু শিখিবার নাই দেখিয়া অল্প দিনের মধ্যেই আবার ভিনিশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজচিত্রকর পদ প্রার্থী হন; কিন্তু সে পদে তাঁহার প্রথম শিক্ষক জেন্‌টিলে জোভেনি বেলিনি প্রতিষ্ঠিত হন। এই জোভেনি বেলিনিও দিনকতক টিশিয়ানকে ছাত্রাবস্থায় ছবি আঁকা শিখাইয়াছিলেন। নিজের শিক্ষকের বিরুদ্ধে পদপ্রার্থী হওয়ায় অনেকে টিশিয়ানের উপর অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে জোভানির মৃত্যুর পর টিশিয়ানকেই রাজ-চিত্রকর করা হয়। তাঁহার অর্থ-পিপাসা কিছু বেশী ছিল। রাজ-চিত্রকর পদ পাইয়াও অন্যান্য লোকের প্রতিকৃতি আঁকিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাতেই তাঁহার অধি-

উর্ব্বিনোর ডাচেশ্

নিরাশ-অলস-ভ থাকিলেও আশার শে রশ্মি লোপ পায় নাই। ছবিখানিতে জর্জিওনের প্রভাব বিশেষরূপে দেখা যায়। চিত্রখানি যেন জগতের প্রথম প্রভাত সূচিত করিতেছে। তরুণ সূর্য্যের আলোক, তপ্ত জলরাশির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাতাসের স্তরে স্তরে অবিরাম ঘূর্ণির চাঞ্চল্য রহিয়াছে। বিশ্ব নৃত্য এখনও বড় থামে নাই। প্রকৃতির নূতন ব্যস্ততা মহাপুরুষদিগের চিন্তাযুক্ত চক্ষুতেও প্রতিফলিত। এ ছবিখানি বর্ণ-খচিত কবিতা (Idyl)।

এই রকম Idyl রচনা-সাফল্যে টিশিয়ানের সাহস বাড়িয়া গেল। তিনি খ্রীষ্টান-জগতে পেগান ছবির প্রভাববিস্তারে নিযুক্ত হইলেন। যে মুক্ত বাতাসের স্বাধীনতা কোন কৃত্রিম অবরোধ সহ্য করিতে পারে না—সেই নির্ভীক উদ্দাম বায়ুপ্রবাহ যেন তাঁহার চিত্রচরিত্রের উপাদান স্বরূপ হইয়া উঠিল।

কাংশ সময় কাটিতে লাগিল। কিন্তু চিত্রশিল্পের সৌভাগ্য বশতঃ শীঘ্রই টিশিয়ান বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল অর্থ লালসায় ছুটিয়া বেড়াইলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য একান্তই বিফল হইবে। তাই তিনি 'মহাপুরুষদের পরামর্শ' নামে একখানি ছবি আঁকিলেন। এ চিত্রখানিতে নবীন চিত্রকরের কল্পনার বিকাশ দেখিয়া অনেকে আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের নামে পবিত্র মন্দির কলুষিত হইতেছে। কি করিয়া মানুষকে অসতের পথ হইতে ফেরান যায় তাহারই পরামর্শ করিতে মহাপুরুষগণ ব্যস্ত। একের পর এক অবতার পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াও পাপের প্রস্রবণ রোধ করিতে পারিলেন না। এখন উপায় কি? মহাপুরুষ মণ্ডলী বিশেষ ভাবনাযুক্ত,

বিখ্যাত জর্ম্মাণ সঙ্গীতাচার্য্য রিক্টারের কথায় একজন লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন তান হয়দ্নায়ের এক এক

যায়গায় ঈষৎ দ্রুত সঙ্গীত সঙ্কেতে দণ্ড উত্তোলন করেন, তখন বোধ হয় যেন কোন দূর দেশের পাইন শ্রেণীর মধ্য দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া বাতাসের শব্দ কাণে আসিতেছে। টিশিয়ানের এক এক খানি উন্মুক্ত প্রকৃতির নগ্ন শোভাব্যঞ্জক ছবিতেও তান হয়জায়ের সঙ্গীতের মতন স্বভাবের সুরভঙ্গী যেন বিভিন্ন আকারে তরঙ্গিত। যে বালক টাইরোলের পাহাড়ের নীল আলোকে বড় হইয়াছিল, সে জীবনের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নরনারীর অঙ্গসৌষ্ঠবে প্রকৃতির খোলা হাওয়ার কথা স্মরণ করাইতে বিস্মৃত হয় নাই।

ফ্লোরা

শীঘ্রই টিশিয়ানের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ভিনিশ, মান্তুয়া, উরবিনো প্রভৃতি বড় বড় সহরে টিশিয়ানের নাম আর কাহারও অজানা থাকিল না। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র দেখিবার জন্ম রোমের পোপ, ইস্তাম্বুলের সুলতান টিশিয়ানকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস্ নিজের প্রতিকৃতি আঁকিবার জন্ম টিশিয়ানকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন তাঁহার আদর বাড়িতে লাগিল। তারপর সৌভাগ্যমণ্ডিত হইয়া টিশিয়ান ৯৯ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

উর্ব্বিনোর ডাচেশ্।

ফ্লরেন্সের উফ্‌ফিৎজি চিত্রাগারে এই ছবিখানি আছে। ইহা অঙ্কিত হওয়ার পর অনেকদিন ধরিয়া উরবিনোতে ছিল। বর্ণসমাবেশ এ ছবিখানির একটি বিশেষত্ব। ডাচেশের প্রতিকৃতিতে বড় বেশী জড়ত্ব, যেন জীবন্ত ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ডাচেশ্ উরবিনো যে নিতান্তই সাধারণ রমণী তাহাই টিশিয়ান রংএর সাহায্যে দেখাইয়াছেন। জর্জিওনে প্রায় সকল প্রতিকৃতিতেই কবিত্বের ঈষৎ আভাস আনিয়া ফেলিতেন। টিশিয়ান এরূপ অনাবশ্যক কবিত্বপ্রিয় ছিলেন না। তাই জর্জিওনের বিশেষত্ব অন্য ধারায় প্রবাহিত করিতে পারিয়াছিলেন। ডাচেশের মনে তাহার বংশ গরিমার, তাহার সৌভাগ্য সম্পদের কথাই অনেকবার আসিতেছে। জগতের বিশালত্ব তাহার পদমর্য্যাদার কাছে যেন সঙ্কীর্ণ। বেলাভূমির উপর জোয়ারের জল আসিয়াছে, আকাশে মেঘের স্তরে স্তরে রকমারি রং ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেদিকে ডাচেশের ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি তাঁহার ড্রয়িংরুম ও কুকুরটির কথা ভাবিতেছেন। টিশিয়ান তাঁহার প্রতিভা বলে জর্জিওনে প্রবর্ত্তিত রোমান্টিসিজম্‌এর পরিবর্ত্তে এক নূতন ভাবপ্রকাশক প্রণালী Impressionism প্রচলিত করেন। সেই ভাববোধ ডাচেশের প্রতিকৃতি অঙ্কনের সময় চিত্রিতের চরিত্রের বিশেষত্বটুকু ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা

ভিন্ন অন্য চেষ্টা অবরুদ্ধ করিয়াছিল। ডাচেশ নিশ্চেষ্ট অসাড় 'নিবাতনিষ্কম্পমিবপ্রদীপং'। ভিনিশের পুনর্জন্ম যে রাজা প্রজা সকলের কাছে সমানভাবে দেখা দেয় নাই, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ডাচেশ উর্ব্বিনো।

ফ্লোরা

এখানিও উফ্‌ফিৎজি চিত্রাগারে রক্ষিত। ১৫১৫
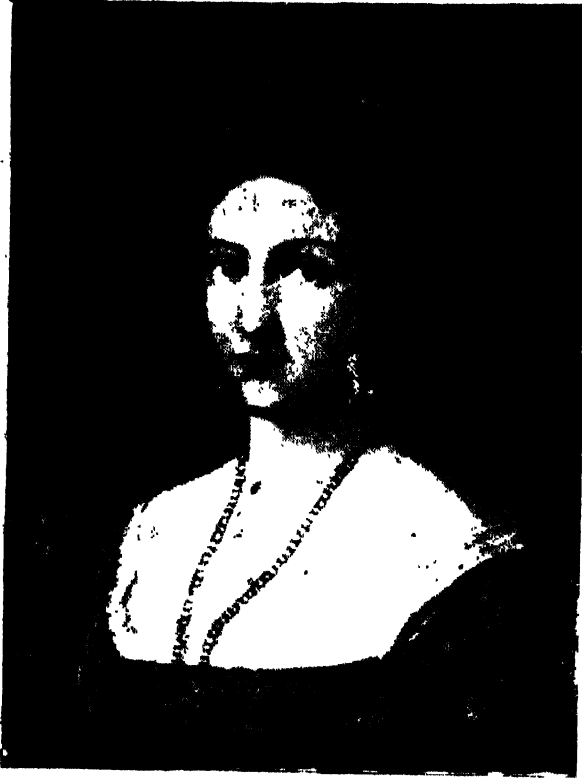
সুন্দরী

খ্রীষ্টাব্দে এই ছবি আঁকা হয়। ইহার আকর্ষণী শক্তি এত অধিক যে,আড়াই শত বৎসর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফ্লরেন্সের বড় দুঃসময়েও অনেকে দেশের কথা না ভাবিয়া এই ছবির কথা ভাবিবার অবসর পাইয়াছিল। টিশিয়ানের প্রতিভা সৌন্দর্য্যপ্রবণ। যদিও তিনি যখন চিত্রবিদ্যালয় ছাড়িয়া জগতের বিদ্যালয়ে আদর্শ খুঁজিতে আরম্ভ করেন, তখন ইটালীতে পুনর্জ্জন্মের প্রভাব অনেক আকারে নিজেকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল, তথাপি সে আশা উদ্বেগ,সে mysticism, সে ঘৃণা সঙ্কোচ, সে জ্ঞানপিপাসা তাহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি পুনর্জ্জন্মের উত্তেজনায় শুধু সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দিকে গিয়াছিলেন।

ফ্লোরা আদর্শ সুন্দরী; কিন্তু সে আদর্শ টিশিয়ানের। সৌন্দর্যের বিশেষত্ব যে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যায় না, টিশিয়ানের ফ্লোরা সেই কথাটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছে। কলা-শিল্পের প্রধান অঙ্গ পরিপূর্ণতা। যখন চিত্রিত প্রতিকৃতি, প্রকৃতির মত সুষমাসম্পন্ন হইয়াছে তখনই তাহাতে পরিপূর্ণতার বিকাশ আরম্ভ। পেটার এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, প্রকৃত শিল্প-কলা বিশ্বের সকল বোধকে যেন সজীব প্রাণময় করিয়া তোলে। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতেও সেই প্রাণপ্রবণতা না থাকিলে আদর্শ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বিফল হইয়া যায়। টিশিয়ান জর্জিওনের চিত্র শিল্প দেখিয়া বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, যদিও কবিতা, গান, চিত্র-বিদ্যা এই তিনই কল্পনা ও ভাবের সমাবেশ সাপেক্ষ তথাপি ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব শুদ্ধ ভাববোধক শব্দ, সুর বা রং লইয়াই নহে। কারণ প্রত্যেক শিল্প-কলা সম্পূর্ণ নূতন ভাববোধক mediumএর মত।

শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী।

যূরোপে তিনমাস

ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রাবস্থায় ৺রমেশচন্দ্র দত্তের "ইউরোপে তিন বৎসর" পাঠের সময় বর্ত্তমান প্রবন্ধের সূচনা—আজ সমাপ্ত।

রুশো বা গলিভারের ভ্রমণ-কথা অপেক্ষা রমেশবাবুর ...স্তক তখনকার ছাত্রদিগের চিত্তাকর্ষক হইত এবং অনেকে ...াস্তব অথবা কল্পনায় তৎপ্রদর্শিত পথের পথিক হইত। ...য়াসিংটন আর্ভিংএর "স্কেচবুক" তখন পাঠ্যপুস্তকরূপে ...র্দ্ধারিত হইত—ইদানীং আবার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ...য়ার স্কুলের প্রথিতনামা ছাত্রবৎসল শিক্ষক স্বর্গীয় নীলমণি ...ক্রবর্ত্তী মহাশয় গুরুগম্ভীর স্বরে "Voyage" হইতে "Shoals ...f porpoises" এর সজীব চিত্র যখন মানসপটে চিরাঙ্কিত ...রিয়া দিতেন তখন অনেকেরেই সদ্য বিলাতবাস বর্ণনা ...াগিয়া উঠিত। আমেরিকানিদের সহিত ইংরেজের যে সম্পর্ক ...াধুনিক ভারতবাসীর সহিত ইংরেজের ঠিক সে সম্পর্ক নয়। ...ন্তু যে আকর্ষণে ওয়াসিংটন আর্ভিং আকৃষ্ট হইয়া ইংলণ্ডে ...াসিবার উপলক্ষে 'Voyage' রচনা করিয়াছিলেন, ইংরেজি শিক্ষিত অনেক ভারতবাসীর পক্ষে সে কারণ ও সে আকর্ষণ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল, রহিয়াছে ও রহিবে। রামায়ণ মহাভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বহু পূর্ব্বে সেক্সপীয়র মিলটনের আংশিক পরিচয় ইহার জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। আরও যে যে কারণে ইংলণ্ড-প্রবাসী ইংরেজ শিক্ষার অনুকূলে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে ও করিবে তাহার বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

কারণ বা উত্তেজনা যাহাই হউক বিলাত যাইবার ইচ্ছা অনেকের হয়, আমারও ছিল। নানাকারণে ছাত্রজীবনে তাহা ঘটে নাই। ঘটিলে আর কি অঘটন ঘটিত তাহা বিধাতাপুরুষের পক্ষ হইতে সেটেরা পূজার দিন নির্দ্ধারিত হয় নাই।

নিজের যাওয়া ঘটুক বা না ঘটুক আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব পরিচিতের মধ্যে যে বিলাত যাইত তাহার ব্যবস্থা বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিয়া কখন কখন মনের আক্ষেপ নিবারণ করার রোগও অনেক দিন চলিয়াছিল। কখন না কখন বিলাত যাওয়া ঘটিবেই ঘটিবে, কোথা হইতে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। দৈবজ্ঞ ঠাকুরও এ কথায় সায় দিতেন; "পঞ্চাশোর্দ্ধে" অনুমানও দিতেন। রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সদর্পে বলিতেন, "বিলাত যাইতেই হইবে কিন্তু পঞ্চাশের কাছাকাছি।" আবেদন আন্দোলন আলোচনার ফলে সিবিল সার্ব্বিসের বয়স পঞ্চাশের উপর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তোলা যাইতে পারিবে এ দুরাশা কখন মনে স্থান পায় নাই। অতএব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আশ্বাস-বাক্য-মরীচিকায় বিশেষ উপকার হইত না। কিন্তু কোথা হইতে কি করিয়া এ ঘটনাটা ঘটিয়া গেল সে কথাটা বিশেষজ্ঞদিগের বিবেচ্য।

এইরূপে যাহাদের বিলাত যাওয়া প্রসঙ্গে নিজের মনঃসাধ কথঞ্চিৎ পূরণ করিতে হইত, তাহার মধ্যে উত্তরকালে স্বনামধন্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একজন। প্রফুল্লচন্দ্র ও তাহার মধ্যম সহোদর হেয়ার স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে আমার সতীর্থ ছিলেন। রোগে পড়িয়া তাঁহাকে মধ্যে এলবার্ট কলেজের আশ্রয় কিছুদিন লইতে হয়। তারপরে কলেজ অবস্থায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পুনরায় দেখা শুনা হয়। গিলক্রাইস্ট

স্কলার্সিপ পাইয়া প্রফুল্ল যখন বিলাত যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ করে, তখন আমি তাঁহার একজন উদ্যোগী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার মিষ্টার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তখন নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছেন, বোধ হয় ইংরেজি ১৮৭৮ কি ১৮৭৯ সাল হইবে। মিষ্টার ঘোষের বাড়ীতে প্রফুল্লকে লইয়া বিলাত বার্ত্তা বিজ্ঞাপন, চাঁদনীর বাজারে কলার টাই খরিদ, কাঁটা চামচ ধারণ-প্রণালী আবিষ্কার এবং শেখান এবং Anchor line জাহাজের Stewardকে লাট সাহেব ভাবিয়া সেলাম করার অর্ব্বাচীনতা প্রভৃতি বিবিধ নিগূঢ় তথ্যের আমি প্রফুল্লচন্দ্রের স্বয়ং শিক্ষাগুরু। গুরুর নিজের সাধনা বহুকাল পরে যখন ঘটিল তখন ভূতপূর্ব্ব শিষ্য জগৎ-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে পুনশ্চ বিলাত-যাত্রার ব্যাপারে শিষ্য গুরুপদ অধিকার করিল এবং গুরু আমাদের সহিত শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

সেই কথাই এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে অবতারণা করিব।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার সুরধাম বাটীতে গত বৎসরে যে শেষ পূর্ণিমা মিলনের উদ্যোগ করেন আমার তাহাতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ভারতবর্ষ প্রচারকল্পে ভগ্ন-স্বাস্থ্য দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাহার সহৃদয় বন্ধুগণ অমিতবলে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সাহিত্য রসে বঞ্চিত ও সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত জানিয়াও দ্বিজেন্দ্র বাবু এই বিলাত-বাস-বার্ত্তা 'ভারতবর্ষে' প্রচার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। লেখকের মনেও আস্পর্দ্ধা হইল যে, প্লিনি, ম্যার্কোপোলের পর এমন অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী বুঝি আর কাহারও নয়ন-গোচর হইবে না। দ্বিজেন্দ্র বাবুর আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে সে সব চাপা পড়িয়া অব্যাহতির দ্বার প্রশস্ত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সম্পাদক মহোদয়গণের সানুগ্রহ আহ্বানে ভারতবর্ষের পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির যে কারণ হইয়াছে, সে বিষয় বর্ত্তমান লেখক সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

ভারতবর্ষের কেন সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত গুরুতর ব্যাপারই সভা সমিতির সাহায্যে চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। নৈমিষারণ্যে ঋষি সমাবেশ, ত্রিপিটক সংগ্রহ, বল্লালসেনের কৌলীন্য প্রচার-সভা বা কায়স্থের একযাই আমাদের ন্যাশানেল কংগ্রেস, সাহিত্য-সম্মিলনে, বা মুসলমানদের Library ও Educational conferenceএর সুজাত বংশধর Pan Islamic League সকলই একই নিয়মের বশবর্ত্তী। বাক্যবাগীশ বাঙ্গালীর বক্তৃতা-স্পৃহার যাহারা উচ্চতম বিরোধী,যাহাদের Parliament,Election meeting, County Council, Company meeting এবং সহস্র প্রকারের সাহিত্য বিজ্ঞান বাণিজ্য ও শিক্ষা প্রচারিণী সভার কার্য্য মূক ভাষায় সম্পন্ন হয় না। "বাক্য—কথন—ভাষার" প্রয়োজনীয়তা তাহারা প্রত্যাখ্যান বা খণ্ডন করিতে পারেন না। এ সকল "সহস্রাধিক" সভা সমিতিতেও কুলায় না। সময়ে সময়ে সাময়িক মহাসভা আহ্বানের প্রয়োজন হয়। Chicago Parliament of Religion of the World, London Universal Race Conference প্রভৃতি ইহার পরিচয় ও প্রমাণ।

ইদানীং যাহা University অথবা বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত বর্ত্তমান সভ্য জগতে লোক শিক্ষার তাহা এক প্রধান উপায়। মতান্তরে ইহার প্রধান অন্তরায়। কিন্তু সে কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষে লর্ড ক্যানিংএর মাহাত্ম্যে মেকেল চিরবাঞ্ছিত University প্রণালীর প্রচলন হয়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রথম ইউনিভারসিটির স্থাপন হয়। পরে লাহোর এবং এলাহাবাদে নবীন দুই ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ম্মা, বেহার ও নাগপুর, ঢাকার অপর অপর ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠার অল্প বিস্তর সম্ভাবনা রহিয়াছে। ক্রমশঃ গৌহাটীতেও না হইবার কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না।

ফ্রান্সের বোলোন ও প্যারিসের দৃষ্টান্তে এবং স্পেনের সেবিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের প্রতিষ্ঠা বহুদিন হইয়াছে এবং শুধু ইংরেজ-জগতে কেন সমস্ত সভ্য জগতে তাহার বিজ্ঞান সাহিত্য ও সুকুমার কলাবিদ্যার কেন্দ্রস্থল বলিয়া বহুদিন সম্মান পূজা পাইয়া আসিতেছে। তারপর এবার্ডিন, সেণ্ট এণ্ড্রুস, এডিনবর্গ, ডবলিন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নবীন ইউনিভারসিটির উদ্ভব হয়। পরে গ্লাসগো, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, লীডস, বৃষ্টল প্রভৃতি আরও নবীনতর ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধিকাংশস্থলের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় সাহিত্য

বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যে সকল কলেজ আছে তাহার সমষ্টি এবং সেই সকল শাখার কোন কোন শাখার শিক্ষা নিজ তত্ত্বাবধানেও দিয়া থাকে। নবীনতর ইউনিভারসিটিগুলি নামে ইউনিভারসিটি। সেগুলি বাস্তবিক এক একটি প্রকাণ্ড কলেজ মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্য বিজ্ঞান-শিক্ষা একই কলেজের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়। পুরাতন প্রেসিডেন্সী কলেজের কথা যাহাদের মনে আছে, তাহাদের সহজে এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পুরাতন প্রেসিডেন্সী কলেজে এক অধ্যক্ষের অধীনে একই বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে গণিত সাহিত্য ইতিহাস দর্শনশাস্ত্র যেমন শিক্ষা দিতেন, সেইরূপ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আইন শিক্ষাও দিতেন। ইংলণ্ডের নবীন ইউনিভারসিটি সকল এই পুরাতন প্রেসিডেন্সী কলেজ-শ্রেণীর এক এক কলেজ; কিন্তু নামে ইউনিভারসিটি। বর্ত্তমান কলিকাতা ইউনিভারসিটি বিলাতী পুরাতন শ্রেণীর ইউনিভারসিটি, অর্থাৎ ইহার অধীনে ও সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র কলেজও আছে এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহার তত্ত্বাবধানে ভিন্ন ভিন্ন শাখার শিক্ষাও এখন দেওয়া হয়।

লণ্ডন ইউনিভারসিটির অনুকরণে কলিকাতা ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষা এবং সেই উপায়েই বিদ্যাপ্রচার কলিকাতা ইউনিভারসিটির প্রথম কাজ ছিল। ক্রমশঃ কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের অনুকরণে ভিন্ন ভিন্ন শাখার অধ্যাপনা ও ইহার নিজ তত্ত্বাবধান হইতেছে ও অন্যান্য অনেক উন্নতিও হইয়াছে।

নব্য শ্রেণীর অনেক ইউনিভারসিটি অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ইংরেজ সাম্রাজ্যে ৫৬টি নূতন পুরাতন ইউনিভারসিটি আছে। সকল ইউনিভারসিটিতেই এক শ্রেণীর এক ধরণের শিক্ষা এক রকম দেওয়া হইবে, ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। স্থান কাল পাত্র, সমাজনির্ব্বিশেষে ও সমাজগত পার্থক্যের বশবর্ত্তী হইয়া শিক্ষা ও প্রণালী-পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী; অথচ শিক্ষাসংক্রান্ত মূলসূত্রগুলির মর্য্যাদা যথেষ্ট রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। এই সকল বোঝাপড়ার জন্য Universities Congress of the Empire নামে ১৯১২ সালের মে মাসে লণ্ডনে এক মহাসভার আহ্বান হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্য মধ্যে যেখানে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহাদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। মুসলমান দলপতি ইংলণ্ডেশ্বরের প্রিভীকাউন্সেলের প্রথম ভারতীয় সভ্য আমীর আলি সাহেব ও ডাক্তার ব্রস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হ'ন। তাঁহারা উভয়েই তখন ইংলণ্ডে।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং আমি উক্ত মহাসভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অপর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হই।

ইহাই বিলাতযাত্রার উপলক্ষ। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৈবগণনা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ফলিল। বাধা বিঘ্ন যথেষ্ট ঘটিতে লাগিল। আত্মীয় স্বজনের আপত্তির অভাব ছিল না। আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য যাইবার কিছু বিলম্ব হওয়াতে ডাক্তার রায় আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, একাকীই চলিয়া গেলেন। পারিবারিক ও সামাজিক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ও কাজ কর্ম্মের লোকসান করিয়া বিলাত যাওয়ার সাধ্য আমার নাই। এমনই একটা সুনামও সঙ্গে সঙ্গে প্রচার হইয়া গেল। অনেকের নানা বিষয়ে এরূপ সুনাম ঘটে এবং সুনাম প্রচারের বিশেষ ভার গ্রহণ করা এক শ্রেণীর লোকের সংক্রামক রোগ বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম। মহারাজাধিরাজ বৰ্দ্ধমানাধিপতির ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবর্ষের পূর্ব্বসংখ্যায় এমনই একটা কথা পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়। রোগ শয্যায় পড়িয়া P & O কোম্পানীর প্রাসাদ-তুল্য Mantua জাহাজে স্যর রাজেন্দ্রনাথ ও লেডী মুখার্জ্জীর ন্যায় সহযাত্রীর ও আবাল্য বন্ধু ডাক্তার পি সি রায়ের সঙ্গ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইলাম। তারপর Egypt জাহাজের সাহায্য যাত্রা করিয়া তাহাও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। পরের জাহাজখানি Arabia, তারপর Persia, তারপর India. রোগ ভোগ উপলক্ষ করিয়া মানে মানে বিলাত-যাত্রা অব্যাহতির পথ অন্বেষণ করিতেছি এমন সুনাম যাঁহারা রটাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভৌগোলিক রসিকতারও অভাব ছিল না; তাঁহারা বলিলেন, Mantua তারপর Egypt, তারপর Arabia তারপর Persia তারপর India; এই সব পরে পরে সপ্তাহক্রমে P&O জাহাজগুলির যাত্রা-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট

আছে; প্রথমগুলিতে যাত্রা হইতে পারে শেষটিতে অর্থাৎ Indiaতে গমন অথবা স্থিতিই স্থির।

ভৌগোলিক রসিকতা কাজে লাগিল না। Mantua, Egypt ত্যাগ করিতে হইল বটে; Arabia জাহাজে দুই হাতে দুই লাঠিতে ভর করিয়া উঠিলাম। ধুতি চটী জুতা পরিয়া বিলাত যাইবার জন্য কেহ বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন কিনা প্রত্নতত্ত্বে তাহার প্রকাশ নাই। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক এই বেশে যখন হাওড়ায় গাড়ীতে উঠিলাম, আমার ইংরেজ সহযাত্রীর সে দৃশ্য মনঃপূত হইল না। যাঁহারা বিদায় দিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দেশীয় ব্যারিষ্টার ও দুই একজন উর্দ্ধতন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী ছাড়া সকলেরই ধুতি চাদর পরা; ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীর উপস্থিতিতেও সে দোষের খণ্ডন হইল না। আমাদের সহযাত্রী, ষ্টেশন মাষ্টারের সাহায্যে নিজের তল্পিতল্পা অপর গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়ায় উভয়েরই বেশ সুবিধা হইল। সাহেবটির নাম গাড়ীর রিজার্ভ টিকিটই আমার নামের নীচে লেখা ছিল। তিনিও Hon'ble তবে সাধারণ Hon'ble নহেন; তাঁহার পিতা বিলাতের Lord; ভারতবর্ষের কোন সওদাগর আপিসের তিনি অংশীদার। Lordএর পুত্র বলিয়া নিম্নশ্রেণীর ইংরেজসুলভ বাঙ্গালী বিদ্বেষের হাত এড়াইতে পারেন নাই।

গোটা গাড়ীখানার এইরূপ অসম্ভাবিত এক চেটিয়া দখল পাইয়া সুবিধা বই অসুবিধা হইল না। শরীর ও মন উভয়ই অসুস্থ; ভ্রমণ প্রারম্ভে নির্জ্জনতা এরূপ সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী।

সাহেবটির দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি জাহাজেও আমার সহযাত্রী ছিলেন। জাহাজে বার জন Knight ছিলেন সকলেই আমার পরিচিত, সকলেই জাহাজে আমায় বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদর আপ্যায়ন আমার সহযাত্রীকে নব চক্ষু প্রদান করিয়াছিল এবং উপযাচক হইয়া তিনি ক্রমশঃ আমার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন। আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। এ শ্রেণীর লোক এরূপ অবস্থায় সময়ে সময়ে ভারতবাসীকে আপ্যায়িত করিতে স্বয়ং বাধ্য হয় ইহা মন্দ নয়।

সকল ইংরেজ যাত্রীই এ শ্রেণীর নয়। মধ্যরাত্রে হাজারীবাগে বন্দুক তোষদান লইয়া একজন সৈনিক কর্ম্মচারী সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইল। তাহাকে ধুতি চটী জুতা দেখিবার যথেষ্ট অবকাশ ও সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও সে ব্যক্তি কক্ষান্তর গমন প্রয়াসের চিহ্নমাত্রও দেখাইল না। ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখাইতে তিনি কৃপণতা করেন নাই, সমস্ত পথ বাইবেল পড়া, ভগবদারাধনা ও সদালাপ ছাড়া তাহার অন্য কাজ ছিল না। অপর শ্রেণীর ইংরেজ ইতর ব্যবহারে ইংরেজ-সুনাম ও ইংরেজ-শাসনের যে দারুণ ক্ষতি করে এই শ্রেণীর ইংরেজের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও প্রায়শ্চিত্ত হয়—অন্ততঃ হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় রেল ও জাহাজ যাত্রীদিগের মধ্যে ইতর-ব্যবহারের অপ্রতুল নাই। ব্যক্তিবিশেষের কি সম্প্রদায়-বিশেষের অপরাধ ও ত্রুটীর জন্য সমস্ত জাতিকে অপরাধী করিলে উভয় জাতিরই ক্ষতি। সমাজ সংসার সবই ভাল মন্দ মিশাইয়া। কোন গতিকে সব চালাইয়া লইয়া মোটের উপর যৎকিঞ্চিৎ সুফল যিনি দাঁড় করাইতে পারেন তিনিই মানুষ। গোলাপ বাগানে বাস করিলেও কাঁটা আছে, শুকনা পাতা আছে। এ ধ্রুব সত্য যিনি জীবনে উপলব্ধি করিতে এবং তদনুসারে কিয়ৎপরিমাণে কাজ না করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার সমাজে বা সংসারে থাকা কঠিন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সাবিত্রী গায়ত্রী

হে গায়ত্রী মূর্ত্তিমতী, সবিতার মণ্ডলবর্ত্তিনি,
কি ভাস্বর গ্রহবৃন্দ তোমার ও মহিমা-ছটায়!
কোটি রবি কোটি শশী তোমার মঙ্গল স্তুতি গায় ;—
কোটি বুধ, কোটি শুক্র, কোটি তারা অয়ি তেজস্বিনি,
রচে'ছে সোপানমালা তব লাগি! উষা সুহাসিনী,
নামে যথা লীলাপদ্ম করে লয়ে অপূর্ব্ব লীলায়,
মেঘে মেঘে রাখি তার রাঙ্গা পাদুখানি,- চন্দ্রমায়
শনৈশ্চরে দিয়া ভর, নামিতেছ, অয়ি হেমাঙ্গিনি!
জয় জয় বিশ্বরমে, জয় বিশ্বকল্যাণকারিণি!
হস্তে মুদ্রা বরাভয়, কণ্ঠে রবি—কিরণের মালা,
নিমীলিত যুগ্মনেত্রা, ধ্যান-মগ্না, জ্যোতির্ম্ময়ী বামা,
চিন্ময়ি, আনন্দময়ি, জয় জয় ত্রিলোক-ধারিণি!
কোন্ কৃষ্ণ, কোন্ সীতা, কোন্ দিব্য বহ্নি মুখ দিয়া,
কোটি সৌদামিনী প্রভা, তেজরূপা, এলে বাহিরিয়া?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মন্ত্রশক্তি

[পূর্ব্বাবৃত্তি—রাজনগরের জমিদার, কুলদেবতা গোপীকিশোরের প্রতিষ্ঠাতা উইল সূত্রে তাঁহার বিশাল জমিদারী দেবত্র এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি ও তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে সেবায়েৎ নিযুক্ত করেন। তর্কচূড়ামণি মৃত্যুকালে তাঁহার নবাগত ছাত্র অম্বরনাথকে স্বীয় পদে মনোনীত করিয়া যান। এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ টোল ছাড়িয়া সেই গ্রামস্থ দূর-সম্পর্কিত জ্ঞাতি বৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। বৃন্দাবন অতি ভাল মানুষ, তুলসীমঞ্জরী তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী ভার্য্যা। আদ্যনাথ তুলসীর দ্বারা জমিদার-কন্যা বাণীর নিকট অম্বরনাথের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করিলে, সে সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করে না। আদ্যনাথ গোড়া হইতেই অম্বরনাথের উপর বিরক্ত ছিল, এই নিয়োগে সে তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। অম্বরনাথ কিন্তু হৃদয়বান্ পরোপকারী; সেই জন্য আর সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। পুরোহিত নিযুক্ত হইয়া সে যখন প্রথম দিন পূজা করিতে গেল, তখন দেবতার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইল—"দেবতার নামে এ ঐশ্বর্য্যের খেলা কেন?" ভাবিয়া সে আকুল হইল। জমিদার হরবল্লভ বাবুর একমাত্র পুত্র রমাবল্লভ; বাণী রমাবল্লভের একমাত্র কন্যা। বাণীর বিবাহ দিবার জন্য ঠাকুরদাদা যে বর স্থির করিলেন, তাহা বাণীর পিতার মনোমত হইল না। হরবল্লভ রাগ করিয়া নাতিনীর বিবাহ-প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন। তাহার কিছু দিন পরেই হরবল্লভ মারা গেলেন; তিনি উইল করিয়া গেলেন যে, ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে বাণী যদি উপযুক্ত বরে সমর্পিত না হয় তাহা হইলে দেবত্র সম্পত্তি ব্যতীত আর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বাণী হইবে; আর তাহা যদি না হয়, তবে বিষয় দূর সম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি পাইবে, রামবল্লভ কেবল মাসিক বৃত্তি পাইবে। কিন্তু উপযুক্ত বরও মেলে না, বাণীরও বিবাহ হয় না, তবে ষোল বৎসর বয়স হইবার বিলম্ব আছে। বাণী গোপীকিশোর-বিগ্রহের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। বালক—পুরোহিত অম্বরনাথের পূজা তাহার মনের মত হইত না, সে বিরক্ত হইত, কিন্তু পুরোহিতকে সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিত না, কারণ সে বিশেষ কোন ত্রুটি দেখিতে পাইত না।

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তুলসীমঞ্জরী বাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নানা কথার পর পুরোহিতের কথা তুলিলেন। বাণীর সে সম্বন্ধে মঞ্জরীর সহিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মঞ্জরী বার বার ঐ কথা বলাতে বাণী এমন দুই একটি কথা বলিলেন, যাহাতে মঞ্জরী বুঝিয়া গেলেন যে, অম্বরনাথের আসন টলমল করিতেছে।

তাহার পর স্নানযাত্রা আসিল। এই সময়ে একমাস ধরিয়া পুরোহিত অম্বরনাথকে কথকতা করিতে হইবে। অম্বরনাথ বড়ই বিপদে পড়িলেন, তিনি ত কখন কথকতা করেন নাই। কিন্তু উপায় নাই। তিনি কথকতা আরম্ভ করিলেন; তাহা কাহারও তেমন ভাল লাগিল না। সকলেই এমন কি বাণীও নিন্দা করিতে লাগিলেন। জমিদার মহাশয় অম্বরনাথকে ডাকাইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত কথকতা করিবার উপদেশ দিলেন। অম্বরনাথ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া প্রায় পনরদিন কথকতা করিল; কিন্তু তাহা শুনিয়া কেহই সন্তুষ্ট হইল না।

তাহার পর একদিন অম্বরনাথ পূজা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন বাণী পূজার স্থানে গিয়া দেখেন, ঠাকুরের পাদমূলে রক্তজবা ফুল পড়িয়া রহিয়াছে। সর্ব্বনাশ! তাহার পর তিনি আদ্যনাথকে ডাকিয়া কথকতা করিতে বলিলেন। আদ্যনাথ স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

মধ্যাহ্নে রমাবল্লভের তলবে অম্বর হাজির হইলে তিনি অম্বরের পূজার্চ্চনার ত্রুটির জন্য অভিযোগ করায় পুরোহিতকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত জমিদারের ক্রোধ কিছু কমিয়া গেল। তিনি পুরোহিতকে ভাল করিয়া পুঁথি দেখিয়া পূজা করিতে বলিলেন। অপরাহ্নে অম্বর ঠাকুর কাছে আসিয়া দেখে যে তাহার আসন আদ্যনাথ কর্ত্তৃক অধিকৃত। আদ্যনাথ মধুর সঙ্গীতে ও সুন্দর কথকতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। শেষে নূতন পুরোহিত আদ্যনাথ সকলকে শান্তি জল দিয়া বাণীকে শান্তি জল দিতে দিতে তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করিল। অম্বর ক্ষুণ্নমনে মলিন বস্ত্রে আপনার পুঁথিগুলি বাঁধিয়া চিত্র রেখায় বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল। পরদিন পূজা করিতে যাইবার সময় মহেশ মণ্ডল অম্বরকে কদলীপত্রে আবৃত কএকটি জবা ফুল লইয়া যাইতে অনুরোধ করিল। অম্বর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ফুলগুলি লইয়া পূজা করিতে গেল। মন্দিরে আসনের পার্শ্বে বাণী দাঁড়াইয়াছিল। "আবার ফুল কেন" জিজ্ঞাসা করায় অম্বর, মহেশের কথা বলিল। শূদ্রের ফুল শুনিয়া বাণী চটিয়া তখনই আদ্যঠাকুরকে ডাকাইতে পাঠাইল। অম্বর উদ্দেশে দেবচরণে প্রণাম করিয়া নূতনের জন্য আসন ছাড়িয়া দিয়া বড়লোকের পুরোহিত হইবার সাধ ছাড়িয়া দিল।

সেই দিন দ্বিপ্রহরে যখন অম্বরনাথ চতুষ্পাঠীতে বসিয়া পুরাতন পুঁথির পাতা উল্টাইতেছিল, সেই সময় সুধাকর নামে একটি ছাত্র আসিয়া দর্শনের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে দুই একটা প্রশ্ন করিল—দুইজনে আলোচনাও চলিতে লাগিল। এমন সময় নবীন আসিয়া সহসা উপস্থিত হওয়ায় উভয়েই থতমত খাইয়া গেল। নবীনমাধব অম্বরনাথের তর্কের দু'একটা কথা লইয়া চটিয়া অম্বরকে দু'কথা শুনাইয়া দিল! সুধাকরও রাগিয়া দু'কথা বলিল।

সেইদিন রমাবল্লভ অম্বরনাথকে বলিলেন, "আমি একা আর

তাহার সহিত যুঝিব, তার চেয়ে উইলের নিয়মানুসারে অন্য লোক নিয়োগ করাই ভাল, কি বল ?" নত মুখে অম্বর বলিল "যে আজ্ঞা"]।

একাদশ পরিচ্ছেদ

উদ্যানের মধ্যে দ্বিতল অট্টালিকা বিচিত্র সাজে সজ্জিত ; দ্বিতলের মুক্ত বাতায়ন হইতে উজ্জ্বল দীপালোক অন্ধকার গৃহোদ্যানে অস্ফুট জ্যোৎস্নালোকের ন্যায় বিকীর্ণ হইয়াছে। সেই আলোকটুকুতে স্থানে স্থানে সুগন্ধি ফুলের ফুলভরা গাছের, কোথাও বা পাতার বাহার দৃষ্ট হইতেছিল। আবার মধ্যে মধ্যে কক্ষমধ্যস্থ লোকজনের উঠা বসা চলা ফেরার চলন্ত ছায়ায় সে আলোটুকু নিমিষে অন্তর্হিত হইতেছিল। যেন অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের খেলা চলিতেছিল। কক্ষমধ্যে ঢালা বিছানা, গিদ্দা, বালিস, ঝাড়ের আলো, টানা পাখার হাওয়া কিছুরই অভাব ছিল না। এক পাশে একটা আস্তরণযুক্ত ও বিবিধ সাজসরঞ্জামপূর্ণ টেবিল ছিল। তাহার দুই পাশে দুচারিখানা কেদারা সাজান আছে। গৃহভিত্তি চিত্রমণ্ডিত, পুষ্প ও পুষ্পসার সুরভি গন্ধে কক্ষ-বায়ু অতিভারগ্রস্ত ; এসরাজ ও বেহালার মধুর রাগে গৃহাকাশ প্রতিধ্বনিত। সেই শিক্ষিত হস্তের সম্মিলিত যন্ত্রস্বরের সহিত অতি মিষ্ট কণ্ঠস্বর মিশাইয়া জহরা বাই গাহিতেছিল, "যমুনাকি তীর-তুয়া কালা বাঁশরী বাজাবে হো।"

গৃহমধ্যস্থলে মোটা তাকিয়ার উপর হেলিয়া গৃহস্বামী মৃগাঙ্কমোহন বন্ধুপারিষদবেষ্টিত হইয়া একাগ্রচিত্তে গান শুনিতেছিলেন। বন্ধুরা কেহ তালি দিয়া, কেহভূমে চরণাঘাত দ্বারা তাল দিতেছিলেন কেহবা ভাবাবেশে সঙ্গে সঙ্গে মস্তকান্দোলন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে আলবোলায় অম্বরী তামাকু পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইতেছিল।

যমুনাকি তীর-তুয়া কালা বাঁশরী বাজাবে হো।

অনেক রাত্রে নৃত্য গীত বন্ধ হইল, পান ভোজন সমাপ্ত হইল, এবার বিশ্রামের পালা। বন্ধুগণ স্বানীয়, যে যাহার গৃহে ফিরিয়া গেলেন। দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া বাইজী ওস্তাদ সমভিব্যাহারে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গৃহস্বামী স্ফূর্ত্তিযুক্তচিত্তে গুণগুণ করিয়া খাম্বাজ রাগিণীর একটা সুখের গান গাহিতে গাহিতে অন্দরমহলে প্রবেশ করিল।

'বাহিরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তন' বলিয়া যে কথাটা লোকশিক্ষা প্রচলিত আছে, অনেক সময়েই সেই শাস্ত্রার্থটা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ; কিন্তু এ বাড়ীতে সেটুকু যেন আরও সুপ্রত্যক্ষ। বাহিরে

যত আলো যত আড়ম্বর যত আনন্দ, ভিতরে তেমনি অন্ধকার অনাড়ম্বর নিরানন্দ। সহসা দেখিলে মনে হয় বুঝি এখানে কোন মানুষ বাস করে না। মৃগাঙ্কমোহন বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, 'দিদি'; কেহ উত্তর দিল না। একটা চামচিকা সেই শব্দে চকিত হইয়া কড়িকাঠের ফাটাল হইতে উড়িয়া গেল। বাহিরে গাছের মধ্যে একটা কালপেঁচা কর্কশ শব্দে ডাকিয়া উঠিল। যেন তাহারা দুজনেই একসঙ্গে বলিতে চাহিতে ছিল রাত্রের এই নিভৃত অবসর শুধু আমাদের জন্য, এখানে এখন তুমি কেন? কিন্তু মানুষ সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব। তাহার আধিপত্য সকল সময় এবং সবার উপর সে ঐ যুক্তিটুকুতেই নিবৃত্ত হইবে কেন? পঞ্চমের স্বর সপ্তমে উঠাইয়া সে ডাকিল, "দিদি, ও দিদি, শোন।"

এবারও কেহ সাড়া দিল না। কিন্তু একটু পরেই খট করিয়া একটা ঘরের খিল খোলার শব্দ শোনা গেল ও সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ মুক্ত দ্বার পথে গৃহমধ্যস্থ প্রদীপালোক সেই নিবিড় অন্ধকার জমাটের উপর তীক্ষ্ণধার ছুরিকার ন্যায় মুহূর্ত্তে পতিত হইয়া তাহার অখণ্ড বপু ঈষৎ ভিন্ন করিয়া দিল। মৃগাঙ্কমোহন মুহূর্ত্তে সেইদিকে ফিরিয়াছিল, দ্বারের দিকে চাহিতেই তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া অপ্রসন্নতায় পরিণত হইয়া আসিল; কিন্তু একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সে সেই দিকেই অগ্রসর হইল। বোধ হয় মনের মধ্যে তখন বিরক্তি ও লজ্জা দুইই এক সঙ্গে জাগিতে চাহিতেছিল।

ঘরখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, গৃহসজ্জাও দারিদ্রব্যঞ্জক নহে। খাটের উপর অব্যবহৃত শয্যা বিস্তৃত, ঘরের মেজের মাদুরের উপর একখানা পুস্তক খোলা রহিয়াছে, তাহার নিকটেই পিতলেরপিলসুজের উপর মৃন্ময় দীপ তৈলাভাবে ম্রিয়মাণ। মৃগাঙ্কমোহন দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া চারি দিকে চাহিতে চাহিতে দেখিতে পাইল একপাশে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। সে তাহাকে বলিল, "দিদি ঘুমাইয়াছেন, তাঁকে বলিও আমি ভোরের গাড়ীতেই বাহির হইয়া যাইব, তাঁর সঙ্গে দেখা হইবে না বলিয়া তিনি যেন রাগ না করেন।"

গৃহমধ্যবর্ত্তিনী অল্পবয়স্কা, বয়স ষোল সতের বৎসরের অধিক হইবে না, দেখিতে সুন্দরী, সচরাচর এমন সুন্দরী চোখে পড়ে না, সে এই অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কিছুই বলিল না, কথাটা কানে গিয়াছে কি না এমন চিহ্নও প্রকাশ করিল না। সে যেমন তেমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কেবল তাহার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের সমতাল সহসা দ্রুত হইয়া উঠিয়াছিল। সে একটু ঘাড় নাড়িয়া একটা স্বীকারোক্তি করিলেই সহজে চুকিয়া যাইত; কিন্তু তাহার অভাবে বক্তাকে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইল। আসল কথা, দিদি লোকটিকে একটু ভয় রাখিতে হয়, না জানাইয়া চলিয়া গেলে ফিরিবার কালের দুর্দ্দশা কি হইবে? কাজেই বিরক্তি ঈষৎ ক্রোধে পরিণত হইলেও সেই তাচ্ছিল্যকারিণীর দ্বারের ত্রিসীমা ছাড়িয়া প্রস্থান করা সহজ বোধ হইল না। বিরক্তস্বরে পুনরায় বলিল, "শুন্‌তে পাচ্চো, দিদিকে বল্‌তে ভুলো না, আমি বিশেষ দরকারে যাচ্ছি, ফিরে এসে সব বল্‌বো, সন্ধ্যে বেলা খবর পেলাম তাই তাঁকে জানাতে পারিনি, বলো, ভুলে যেও না।" এবার সে নারী কথা কহিল; রুক্ষ চুলের গুচ্ছ ললাট হইতে অপসারিত করিয়া সে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাবে?"

এ অপ্রত্যাশিতপ্রশ্নে মৃগাঙ্ক কিছু বিস্মিত হইয়াছিল। বিস্ময় দমন করিয়া সে সেই ক্ষীণালোকে দেখিল, কুঞ্চিত কেশরাশি মধ্যে লুপ্তপ্রায় মেঘ ঢাকা চাঁদের মত মুখ, অচপল অতি স্নিগ্ধ স্থিরদৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন সংসারের সকল তাপ দাহ জুড়াইয়া দিতে সমর্থ। সে দৃষ্টি নিমেষে ফিরাইয়া লইল। মৃদুস্বরে বলিল, "একটা কাজে যাইব।"

"কোথায়?"

"সে এক জায়গায়"।

"কোথায়?" স্বরে তীব্রতা নাই, কৌতূহলও নাই; কিন্তু দৃঢ়তা ছিল।

শ্রোতা ইহাতে বিরক্তি এবং বিপত্তি দুইই বোধ করিল। সক্রোধে সে উত্তর করিল, "তুমি কি পৃথিবীর সকল জায়গার খবর জানো? না তোমার কাছে আমার সব কাজের হিসাব দাখিল করিতে আমি বাধ্য?"

রমণীর সূক্ষ্ম অধরে ঈষৎ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"ও সেই কথা! দায়ে পড়িয়া তোমায় আমি বিবাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রিতেই ত আমি তোমায় সব কথা বলিয়াছিলাম, তুমিও স্বীকার করিয়াছিলে, কখনও আমার কাছে স্ত্রীর অধিকারের দাবী তুলিবে না, তবে আবার এখন সে কথা কেন?"

সহসা গৃহ মধ্যস্থ দীপালোকে বাহিরের হাওয়া আসিয়া লাগিলে, তাহা যেমন মুহূর্ত্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া পরক্ষণে গৃহকে ঘোর অন্ধকারে আবৃত করিয়া ফেলে, মৃগাঙ্কমোহনের শেষ কথাটা—তাহার দায় পড়িয়া বিবাহ করা—স্ত্রীর মুখের উপরে তেমনি একটা মুহূর্ত্তের উজ্জ্বলতা আনিয়া পরক্ষণেই ঘনীভূত অন্ধকার জমাইয়া তুলিল। সে অন্ধকারে লজ্জা, অভিমান এবং ক্রোধ যুগপৎ মিশ্রিত ছিল। সে ক্রোধটা নিজের উপর। সে কিছু না বলিয়া নত হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের সলিতা উস্কাইয়া দিতে নিযুক্ত হইল; কিন্তু তাহার কম্পিত অধরের ঈষৎ স্ফুরণ ও নেত্রপল্লবের আকস্মিক নিম্নাবতরণ দ্রষ্টার অজ্ঞাত ছিল না। সে কিছুক্ষণ নীরবে রহিল; যেন কি একটা দ্বিধার ভাব মনে জাগিতেছিল, কিন্তু অল্প পরেই জোর করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "রাগ হ'লো না কি? কেন অজ্ঞা তোমাতে আমাতে তো রাগ অভিমানের সম্বন্ধ নয়! মনে আছে সেই ফুলশয্যার রাত্রেই আমি তোমায় সব কথাই ত বলেছিলাম! মা বাবা মারা গেলে দিদিই আমায় মানুষ করেন, সংসারে আমি তাঁকেই একমাত্র ভালবাসি—তাঁর একান্ত ইচ্ছা আমার বিবাহ দেন; কারণ, বিশ্বাস তা হ'লে আমি আর বওয়াটে হইতে পারিব না, আমার বিবাহে তৃষ্ণা নাই, একটা ক্ষুদ্র বালিকাকে জীবনের অবলম্বন করিয়া সংসারের সকল সাধে জলাঞ্জলি দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়। নিতান্তই যখন বিবাহ করিতেই হইল, তখন মনে করিলাম যে, এই পর্য্যন্তই থাক, দিদি বউ চান, তাঁহাকে বউ আনিয়া দিলাম, তোমার কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব বাপ কম খরচায় দায় উদ্ধার হইলেন; আর কি বেশি চাই? আমি স্বাধীন থাকিলে আর কাহার কি ক্ষতি? তুমি খাও পর ঘর সংসার দেখ, আমিও তোমার সঙ্গে কিছু মন্দ ব্যবহার করিতেছি কি? বন্ধুর মত দেখা সাক্ষাৎ হয়, অথচ কেহ কাহারও কাছে কিছু দাবী দাওয়া করা যায় না। দুজনেই বেশ আছি, না? আচ্ছা তা হ'লে দিদিকে সব বুঝিয়ে বলো, আর তুমি নেহাৎ যদি শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে কোথায় যাইব তবে না হয় শোন। বন্ধু তুমি আমার। তোমার মনে কি কষ্ট দিতে পারি? যা ভাবিয়াছ তা নয়, কলিকাতায় আমোদ করিতে যাইতেছি

মৃগাঙ্কমোহন শীষ দিতে দিতে প্রফুল্লচিত্তে চলিয়া গেল, বেশিক্ষণ অপ্রফুল্ল থাকা তাহার স্বভাব নয়। সে চলিয়া গেলে অজ্ঞা প্রদীপের উপর হইতে মনোযোগ ফিরাইয়া মাথা তুলিল। তাহার আকর্ণ ললাট লজ্জা ও ঘৃণায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস অপমানের ক্রোধে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়া সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। আত্মধিক্কারে পূর্ণ হইয়া নিজের প্রতি তিরস্কার করিয়া কহিল, "ছিঃ এমন আমি, আমার মনে এতটুকু সম্মানবোধ নাই? কেন ওকথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল! এবার সাবধান থাকিতে হইবে, আর কখনও এমন না হয়। আমার বাপ মা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইয়াছেন, আমার আইবুড় নাম খণ্ডন হইয়াছে, যথেষ্ট। আর কে কি চাহে?"

ক্লান্তভাবে সে বিছানার উপর আসিয়া বসিল। দীপ নির্ব্বাপিতপ্রায়। অর্দ্ধ গৃহ ইতোমধ্যেই অন্ধকারের রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বাকি অদ্ধাংশও গৃহসজ্জার দীর্ঘ ছায়ায় পূর্ণ। সেই জনহীন অর্দ্ধরাত্রে স্তিমিতালোক-গৃহে শয্যাতলে বসিয়া পূর্ণবয়স্কা সুন্দরী মনে মনে বলিল, "জগতে বৈধব্যকেই স্ত্রীলোকের পক্ষে সব চেয়ে দুঃখ বলা হয়; কিন্তু আমার চেয়ে কোন্ বিধবার কষ্ট বেশি? তাদের স্মৃতির সুখও হয়ত এক ফোঁটা না এক ফোঁটা আছে, আমার কি আছে?"

মৃগাঙ্কমোহন মানুষটা চিরদিনই নিজের খেয়ালের বশে কাজ করিতে অভ্যস্ত। তাহার ডাকসাইটে দিদিটিও তাঁহার শাসন-বজ্রনিক্ষেপে এ মৈনাকের পক্ষচ্ছেদন করিতে পারেন নাই। পড়াশোনা এক রকম সে করিয়াছিল, কিন্তু সুযোগসত্ত্বেও কাজকর্ম্ম কিছুই করিল না; সুবক্তা বলিয়া নামার্জ্জন করিতে না করিতে ছাত্রসভা হইতে নাম কাটাইয়া লইল। ইংরেজি সংবাদপত্রে একবার একটা প্রবন্ধ লিখিয়াই তাহার লেখার সাধ মিটিয়া গেল! তারপর হইতে আর কোন ভাল কাজের মধ্যে তাহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই। কখনও বা নিজের বাড়ীতে, কখনও বা বন্ধুগৃহে নাচ গান আমোদ প্রমোদে সন্ধ্যাযাপন ও দীর্ঘ দিবা নিদ্রায় কালক্ষেপ করিতেই দেখা গিয়াছে। দিদি প্রসন্নময়ী কঠোর নীতি অবলম্বনেই ভাইকে মানুষ করিয়া আসিয়াছেন। এখন

মন্ত্রবীর্য্য সর্পের ন্যায় ফুঁসিতেছিলেন; এমন সময় দৈবক্রমে তাঁহার সেই আভ্যন্তর তাপ বাহির করিবার এক পাত্র জুটিল। তিনি তখন তাহার জন্য ভাল সম্বন্ধ খুঁজিতে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই সময় সে সহসা এক কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার কাতরতায় গলিয়া গিয়া একটা শুভ বা অশুভ লগ্নে অজ্ঞাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল, কিন্তু স্বভাববশে সেই সঙ্গে নিজে গৃহবাসী হইতে পারিল না। ফুলশয্যার রাত্রে কিশোরী পত্নীকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া এবং বিবাহিত জীবনের গণ্ডগোল হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার ইচ্ছায় তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বলিল, "গহনা কাপড় যখন ইচ্ছা হইবে চাহিও, সাধ্যমত 'না' বলিব না কিন্তু দোহাই তোমার আমায় চাহিওনা। কেমন রাজী আছ ত?"

নববধূ নিতান্ত বালিকা নয়, সে এই প্রথম স্বামী সম্ভাষণে চমৎকৃত হইল; কিন্তু আহত নারীত্বের গর্ব্বে নিবিড় অভিমানের মধ্য হইতে সে দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মত আছে। মৃগাঙ্ক কহিল, 'বাঁচা গেল, বিবাহ মানেই স্বাধীনতা হারান, কিন্তু ছোটবেলা হইতেই পুস্তকে পড়িয়া আসিয়াছি, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে!" ও জিনিষটা বড়ই ভয় করি। এই দেখনা এই জন্যই চাকরী করি না। তা এসর্ত্তে ভাবিয়া দেখিলে তোমারও উপকার আছে; আচ্ছা মনে করিয়া দেখ দেখি কত সুবিধা। তোমায় চাকরী করিতে হইবে না, পরে তোমার ভরণপোষণ করিবে, আইবুড় থাকিলে লোকে নিন্দা করিত, সিন্দূর পরিতে পারিতে না, আরও কত যে কি নিষেধ থাকিত এখন সে সবই পারিবে, অথচ কাহারও হুকুম খাটা নাই, ঝগড়াঝাঁটি নাই, কি সুখের জীবন! ভাল লাগিবে মনে হইতেছে না?"

নববধূ আবার সগর্ব্ব শিরঃসঞ্চালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। মনে মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ হইতে দিল না! সেই দিন হইতে এই দম্পতি স্বামী-স্ত্রীর পরিবর্ত্তে বন্ধু; কিন্তু বিধাতা অসমপ্রাণীমধ্যে বন্ধুত্ব বন্ধন লেখেন নাই বলিয়া তাহাদের এই অভিনব বন্ধুত্ব ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। পুরুষ মানুষ মৃগাঙ্ক নিজের কেন্দ্রের মধ্যে ঘুরিতে থাকে, অজ্ঞা গৃহকর্ম্মের প্লাবনে হাবুডুবু খায়, তা ভিন্ন তাহার ননন্দা তাহাকে বড় একটা চোখের আড়াল হইতে দেয় না। এক একজন মানুষ ছেলের বিবাহ দেয়, কিন্তু ছেলে পাছে বধূর বশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে সদা শঙ্কিতচিত্তে তাহার হৃদয় রাজ্যের দ্বারে দ্বারে প্রহরা দিয়া ফিরিতে ছাড়ে না। মৃগাঙ্ক-মোহনের দিদিও সেই প্রকৃতির লোক। তিনি যখন দেখিলেন নববধূর অতুল রূপযৌবনের সজ্জিত অর্ঘ্য তাঁহার স্বামী দেবতা পদাঙ্গুলিস্পর্শেও পবিত্র করিল না, তখন মুখে তিনি তাহাকে ধমক চমক করিলে কি হইবে? মনে মনে খুসী হইয়া বলিলেন, "এই দেখ কি রকম ভাই হ'তে হয়! পাছে আমার উপর টান কমে, তাই বউটোর দিকে চাহিয়াও দেখিল না। ছেলে তো আমার মৃগু!" সংসারে যাহার একজনের কাছে আদর আছে, জগতের সকল স্থানেই তাহার সেই আদর বৃদ্ধি পায়। এ জিনিষটা যেন মূলধনের মত থাকিলেই সুদ ও তস্য সুদে বাড়িয়া চলে, না থাকিলে শূন্যের ঘরে জমা বসে না। স্বামীপ্রেমবঞ্চিতা অজ্ঞা, ননন্দা এবং পরিজনবর্গের ঝাল ঝাড়িবার পাত্র হইয়া রহিল। এই জন্য স্বামী হারাইয়া রতি বলিয়াছিল "নলিনীং ক্ষত সেতু বন্ধনে জল সংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ।"

একদিকে স্বামীটি যেমনি অদ্ভুত খেয়ালি অপর পক্ষে স্ত্রীটি তেমনি মর্য্যাদাজ্ঞানশীলা ধৈর্য্য ও কোমলতার আধার। মনুষ্যত্বহীন স্বামীর প্রতিও তাহার ভক্তিভালবাসার অভাব ছিল না। সে যে বৎসরাধিক কাল এ বাড়ীতে এই অনাদৃত অপমানিত জীবন সহ্য করিতেছে। সে শুধু তাহার সেই অসাধারণ আত্মমর্য্যাদা ও সহিষ্ণুতারই সহায়তায় পারিয়াছে। নহিলে হয় ত কোনদিন কান্নাহাটি করিয়া না খাইয়া বাপকে মরিবার ভয় দেখাইয়া এ বাড়ী হইতে জন্মের মত বাহির হইয়া যাইত। বাহিরে নিত্য নিত্য নূপুর নিক্কণ গ্লাসের ঠুনঠান শব্দ উঠিয়া তাহার স্থির হৃদ্‌পিণ্ডের গতি অস্বাভাবিক করিয়া তোলে, কত রাত্রিশেষে গৃহে অনুপস্থিত ভাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রসন্নময়ী তাঁহার সাধা গলা অষ্টমে তুলিয়া গালি বর্ষণ করিতে করিতে অনুসরণার্থ লোক খুঁজিতে থাকেন, সে দন্ত দ্বারা তীব্র আক্ষোভে অধর চাপিয়া শোণিতাক্ত করিয়া ফেলে। মনে গভীর আত্মগ্লানি তখন কঠোর স্বরে তিরস্কার করিয়া বলে কেন তুই না বুঝিয়া

প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলি, স্ত্রী হইয়া স্বামীকে আদরে যত্নে ও ভালবাসায় সব চেয়ে বশ করিতে পারিবার ক্ষমতা-টুকুও রাখিলি না! কিন্তু এখন আর উপায় কি? সে সমস্ত নীরবে সহিয়া যাইবে। কখনও একটু প্রতিবাদ করিবে না, ইহা স্থির। তথাপি সেদিন অলক্ষে দুটা কথা বাহির হইয়া গিয়াছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফলও ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। সংসারে মানুষের অনেক রকম দুঃখ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মন্দিরে এখন আর বিদ্রোহ বিপ্লব নাই; শান্তি এখন শান্তিময়ের ধামে তাহার আসন পাতিয়াছে। পুরাতনের স্থান আবার নূতনের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মলোক হইতে নরলোক অবধি এইরূপ পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। নৃত্যশীলা প্রকৃতির প্রতি নর্ত্তনতালে এ বিশ্ব তাহার কোটি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহাদির সঙ্গে নিয়ত সৃষ্ট ও অস্তমিত হইতেছে। অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের বক্ষে সেই ভাঙ্গা গড়া, উঠা-নামার নাম নব যুগ, ও যুগান্তর। সেই যুগের মধ্যেও আবার সেই উদয়-অস্তের খেলা, কালসমুদ্রের লীলা-লহরী বৎসর মাস পক্ষ ও দিবা রাত্রি রূপে বিভক্ত। ইহারা সকলেই সঞ্চরণশীল, সকলেই গত হয়—আবার তাহাদের স্থল আর একজন আসিয়া পূর্ণ করে। যাহা কালসাগরে মিশিতে চলিয়া যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। কেবল তাহার পরিচয়টুকু তাহার হাসিকান্নার স্মৃতি মানবচিত্তের মাঝখানে অঙ্কিত করিয়া যায়; কিন্তু তাহার মধ্যে আবার একটা বিশেষত্ব আছে, যে স্মৃতি তীব্র দুঃখে অথবা গভীর সুখে বিজড়িত তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল; অপরাপর ক্ষুদ্র স্মৃতির কণাগুলা শীত প্রত্যুষের হিম-কণিকার ন্যায়ই নবরবিকিরণসম্পাতে মরণশীল।

অম্বরনাথের স্বল্প কয়মাসের অধিকারের মধ্যে সে রকম কোন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই, যাহাতে এই নিয়মচারী পূজারির একচ্ছত্র রাজত্বের কালে সে কাহারও স্মৃতির মন্দিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। বাণী এখন নিশ্চিন্ত-চিত্তে ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা গাঁথিতেছে, কুসুমস্তবক দিয়া দেবালয় সজ্জিত করিতেছে; নব-পুরোহিত তাহার স্বহস্ত-প্রস্তুত সেই সকল ফুলের রাশি দেবতার উপর চাপাইয়া, আরও ফুল চাহিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিতেছেন। কন্যাকে প্রফুল্ল দেখিয়া পিতামাতাও সন্তুষ্ট, আবার পুরোহিত মহাশয় তাহাদের গৃহ ত্যাগ করায় তুলসীমঞ্জরী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত। একটি অতি নিরীহ যুবকের বিদায়ে দেশে একসঙ্গে এতগুলি চিত্তে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, একি কম কথা? তাছাড়া ছাত্রের দল ত খুবই সন্তুষ্ট।

কিন্তু বিধাতা মানুষের জন্য শান্তি লেখেন নাই। খৃষ্টান-দিগের ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে মানবজাতির আদি পিতামাতার পাপের জন্য সমস্ত মানবজাতি অভিশপ্ত হইয়াছিল। আমরা অনন্ত পাপপুণ্য মানি না, তাই এই অনন্ত শাস্তির কথায় হিন্দু আমাদের মনে সন্দেহ আসে; তথাপি শান্তিহীনতা মানবের ভাগ্যফল ইহা আমরা যথেষ্ট দেখিয়া আসিতেছি, কাজেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রমাবল্লভের মনের অশান্তি এতদিন শুধু তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীকেই পোড়াইতেছিল, এখন তাহা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়া আরও একটি জীবনের শান্তি—হরণে লেলিহান হইয়া উঠিল। একদিন অকস্মাৎ বাণী শুনিল আর এক মাসের মধ্যে তাহার বিবাহ হইবে, অন্যথা হইবে না। সম্মুখে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইলেও মানুষ যত না স্তম্ভিত হয়, এই সংবাদটা তাহা-পেক্ষাও বাণীকে অধিকতর স্তম্ভিত করিল। প্রথমে শুনিয়া সে বজ্রাহত হইয়া রহিল, তাহার পর মার কাছে গিয়া কাঁদিতে বসিল, বলিল আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বিবাহ করিব না। মা যখন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সে রাগ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল দিল। কিন্তু যাহার একটুকু ম্লানমুখ এ সংসার-তরণীর কর্ণকে মুহূর্ত্তে বিপরীত মুখে ফিরাইয়া দেয়, আজ তাহার সকল আব্দার উপেক্ষিত হইয়া গেল। স্ত্রীর মুখে সংবাদ পাইয়া রমাবল্লভ তাহাকে ডাকাইয়া আসল কথাটা খুলিয়া বলিলেন, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ত বড় হইয়াছ আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমিই বল এখন কি করিব? এই পৈতৃক ঘর বাড়ী ধনমান সমুদয় ত্যাগ করিব, না তোমার কথা রাখিব? বাবা আমার হাত বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।'

মহা সমস্যা! এ সমস্যা পূরণ কে করিবে? একদিকে এই বিপুল ঐশ্বর্য্য, সবার উপর এই মন্দির, হৃদয়শোণিততুল্য

প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ওই দেবমূর্ত্তি; আর একদিকে!—সেও এমনই ভয়ানক, তাহার এই দেবোদ্দেশে উৎসর্গিত মনপ্রাণ কোন্ এক ক্ষুদ্র মানব-চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে--শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত এ জীবন যৌবন নরভোগ্য করিয়া তবেই এ আশৈশবের আশ্রয় ক্রয় করিতে হইবে। তাহার সর্ব্বশরীর যেন একটা বিস্ময়পূর্ণ আতঙ্কে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল"এ কি ভয়ানক অবস্থা আমার! আমার নিজের পৈতৃকগৃহে, আমার—এমন কি আমার বাপের দাঁড়াইবার স্থান আমায় আজ বিক্রয় করিয়া কিনিতে হইবে? অন্যথা এই বংশানুক্রমিক মানসম্ভ্রম সমস্ত হইতে বাবা আমার জন্যই বঞ্চিত হইবেন? দাদাবাবু! তোমার সেই গভীর স্নেহ কি এমনই করিয়াই প্রতিদান করিল? এখান হ'তে চলে গেল! এখানের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ফুরায় জানি, কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বেই কি তোমার মনের সেই অসীম ভালবাসা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল?" সহসা তাহার জীবনে এ কি সীমাহীন অকূল পাথার দেখা দিয়াছে! নিশ্চিন্ত নির্ভরতা পূর্ণ যে সুখের জীবন সে এতদিন উপভোগ করিতেছিল, সহসা আজ কার মন্ত্রবলে তাহার জীবন হইতে সে সুখ অদৃশ্য হইয়া গেল?

বাণী ভাবিল-না, এত ভয়ই বা কিসের? এই ঐশ্বর্য্য সে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত পরিত্যাগ করিবে, তবু এ দেহ কাহাকেও দান করিতে পারিবে না, অসম্ভব! কোথাকার কে একটা মানুষ-শ্রীবিষ্ণুঃ! সে তাহার মালিক হইয়া বসিবে? সে এবং তাহার মা বাবা, আর সেই একজন যিনি স্বর্গে গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইবার যোগ্য লোক এ পৃথিবীতে কেহ আছে না কি?

এ বিসর্জ্জনের মন্ত্র কিন্তু সে বেশীক্ষণ জপ করিতে পারিল না, মন্দিরের দৃশ্য মনে আসিতেই মনটা কেমন কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হইল,—সে এতক্ষণ কেবল নিজের কথাই ভাবিয়াছে, পিতার কষ্ট ও অপমান সে তা কল্পনাও করে নাই। তাঁহার পিতৃ পিতামহের এই জন্মমৃত্যুলীলাপূর্ণ পবিত্র গৃহে আর মাসাবধিকাল পরেই কোথাকার কে একটা লোক মৃগাঙ্কমোহন সে আসিয়া বাস করিবে। আর তাহারা? কোন অচেনা নগরপ্রান্তে ভাড়াকরা একখানা সামান্য গৃহে সামান্য গৃহস্থভাবে সারাজীবন দারুণ দুঃখে কাটাইয়া কোন অপরিচিত শ্মশান-শয্যায় ঘুমাইয়া দুর্ব্বিসহ জীবনের ভার নামাইয়া দিবে। হায় চিত্ররেখা! তোমার ওই বাঁধা ঘাটের পাশে ওই শুভ্র বালুকার বিছানা যে এ বংশের সন্তানের চির প্রলোভনের বস্তু! সে নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিয়া মনে মনে বলিল, "বাবার কষ্ট দেখিতে পারিব না। করি কি!"

মৃগাঙ্কমোহন আসিয়াছে। সে বহুদিন পূর্ব্বে আরও দুএকবার এখানে আসিয়াছিল, সেইজন্য সকলেই চিনিত, সকলের নিকট সেও পরিচিত ছিল।

এবারে আসিয়া সে বাণীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল; কৃষ্ণপ্রিয়াকে ডাকিয়া বলিল, "কিগো মামি রাধুর বিয়ে দিচ্ছ কবে, ওটা যে মস্ত হয়ে গেছে।"

কৃষ্ণপ্রিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সেই ভাবনায় ত অস্থির হয়ে উঠেছি বাবা; তারই একটা পরামর্শ করিতেই তোমায় ডাকা।" "বটে বটে, সেই জন্য ডেকেচ, আচ্ছা আমি পরামর্শ দিচ্চি বিয়ে দিয়ে ফেল।" কৃষ্ণপ্রিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, "ও রকম পরামর্শ সবাই দিতে পারে, এর জন্য তোমায় ডাকা হয়নি।"

মৃগাঙ্ক যেন সচকিত হইয়া উঠিল, "তাও ত বটে; এর জন্য ডাকার ত কোন দরকারই ছিল না। তা সত্য! ওটা আমার খেয়াল হয় নাই। তবে কি রকম পরামর্শ চাও বল দেখি?" বাণী তাহার বিবাহের ভাবনা এই আগন্তুককেও ভাবিতে আরম্ভ করিতে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণপ্রিয়া মৃগাঙ্কমোহনকে বসিতে বলিয়া তাঁহাদের বিপদের কথা সমুদয় খুলিয়া বলিলেন, কেবল স্বামীর নির্দ্দেশমত বাণীর পরিবর্ত্তে তাঁহার শ্বশুরের সম্পত্তি যে মাসার্দ্ধমাত্র পরে তাহাকেই অর্শিবে সেই খবরটা আপাততঃ উহ্য রাখিয়া দিলেন। শোনার পর শ্রোতা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, সে কহিল উইলের কথা কে কে জানে জিজ্ঞাসা করি? "শুনেছি বেশি লোকে জানে না—উকিল শুধু জানেন"; "তবে আর কি, তাঁকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে দাও—কে জানবে?" কৃষ্ণপ্রিয়া এই অনায়াস মন্তব্যে শিহরিয়া উঠিলেন, "তাকি হয়! এ ধর্ম্মের সংসার এতবড় অধর্ম্ম করিলে থাকিবে কেন?" মৃগাঙ্ক বলিল, "অধর্ম্ম কিসে?

কর্ত্তা মশায়ের বৃদ্ধ বয়সে 'বাহাত্তুরে' ধরিয়াছিল, নহিলে এমন উইল কেউ করে ?"

কৃষ্ণপ্রিয়া কয় মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিলেন, "না বাবা তিনি যা ভাল বুঝিয়াছিলেন করিয়াছেন, আমরা তাঁর বিচার করিবার অধিকারী নই, আদেশ পালন করিতে বাধ্য ; এখনও উপায় আছে সে তোমার হাতে।"

"বলেন কি! আমার হাতে? আমি আবার এর কোন্ খানটায় হাত দিতে পারি মামি! একবার এক— যা'ক্, মন্দা পনের দিনের মধ্যে বিবাহের শেষ লগ্ন, সেই লগ্নে এক নিকষ কুলীন সন্তান তোমার চাই না হইলে পরদিন মামামহাশয়কে দেশত্যাগী করা। তা নিকষ কুলীন শুধু হলেই ত হবে না, মেলটেল ঢের নেঠা আছে যে। আজকাল পাশ বিক্রী হচ্ছে, কুল বিক্রী ত হচ্চে না। হুকুম দিলে পোনে সাত গণ্ডা বি এ এনে হাজির করিয়া দিতে পারি, কিন্তু ও-জিনিষটা আজকাল বড় দুষ্প্রাপ্য।"

কৃষ্ণপ্রিয়া সহসা কহিয়া ফেলিলেন, "কেন বাবা তুমি ত আছ।"

"আমি"। মৃগাঙ্ক এবার যথার্থই চমকিয়া উঠিয়াছিল, "বল কি মামি, আমি আছি? আমি যে নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া মামি! আমায় নিয়ে কি করবে তোমরা? নেহাৎ যাদের মেয়ের দর নেই তারা এই আমাদের তল্লাস করবে, তোমরা কিসের দুঃখে এ কথা মুখে আনিলে? অ্যাঁ!"

কৃষ্ণপ্রিয়া দুঃখের হাসি হাসিলেন, শুন মৃগাঙ্ক, জগতে কোন জিনিষের দাম নেই বলে পড়ে থাকে, কারও বা বড্ড বেশি দর বলে বিকায় না। আমরা এখন সেই সব 'দর নেই মেয়ের মা বাপের বেহদ্দ হয়েছি। তোমার অমত কিসের? আমরা যখন নিজেরা দিতে চাইচি?"

মৃগাঙ্ক হাসিয়া উঠিল, "আমার অমত কিসের? হরি হরি! মতই বা কিসের! তোমার ভাগ্নে আছি জামাই হব বল কি তুমি—? একি সাহেব বাড়ী? ভাই বোনে বিয়ে? আরে রাম"—"তাতে বাধেনা কুলীনের ঘরে এ রকম আখ্‌সার হইয়া থাকে, আমি কত দেখিয়াছি।" কৃষ্ণপ্রিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। "অমত করলে আমরা পথের ভিখারী হব বলিয়াছি ত এখন তোমার বিবেচনা যা হয়; জানত আমার শ্বশুর অনেক পূর্ব্বেই এ বিয়ে দিতে চাহিয়াছিলেন।" "তা জানি, তখন আমি বওয়াটে হইব বলিয়া দাও নাই—তা যা'ক্! সে যে বড় বিশ্রী হবে মামি! আমার কিন্তু বড় হাসি পাবে, তুমি যখন আমায় বরণ করিতে দাঁড়াইয়া কড়ি দিয়ে কিনলুম বলে ভ্যা করিতে বলিবে, আমি কিন্তু সে সময় হাসিয়া ফেলিব। আর বাণীটাকে ছোটবেলা কত কোলে পিঠে করিয়াছি, এখন সেইটে ঘোমটা দিয়া আমার সঙ্গে শুভদৃষ্টি করিবে! থিয়েটার হইলে সতিার চাইতে ঢের বেশি মানাইত!" কৃষ্ণপ্রিয়া তাহার কথার ধরণে উদ্বেগের মধ্যেও হাসি চাপিতে পারিলেন না, হাসিয়া কহিলেন, "তা না হয় হাসিও, তবে আমি উঁহাকে বলিয়া আসি তুমি বিয়ে করিতে সম্মত আছ? ভাবনায় উনি যে কি হইয়া গিয়াছেন বলিবার নয়।" কৃষ্ণপ্রিয়া উঠিয়া গেলেন, মৃগাঙ্ক তাঁহাকে কিছু বলিলনা, সে তখন কি একটা ভাবিতেছিল, কিছুক্ষণ পরে একটু হাসিল।

সেই দিন তুলসীমঞ্জরী বাড়ার দাসীদের নিকট কি একটা অস্পষ্ট গুজবের আভাষ পাইয়া সন্দেহকে নিশ্চিন্ত করিবার উদ্দেশ্যে জমিদার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাণীর আজকাল কিছুই ভাল লাগে না; সে ঠাকুর-পূজার সময় ভিন্ন বড় একটা ঘরের বাহির হয় না। রেশম পশম সূচকার্য্য সমস্ত জড় করিয়া একপাশে ফেলিয়া রাখিয়া সে বিছানায় শুইয়া অথবা জানালার নিকট বসিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। মন ভাল নাই একথা অবশ্য বাহিরে অপ্রকাশ; কাহার ঘাড়ে দুইটা মস্তক আছে যে একথা বলিতে সাহস করিবে, কাজেই সবাই বলিতেছে তাহার শরীর ভাল নাই। সে নিজে কিছুই বলে নাই। কোন অনভিজ্ঞ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সবেগে উত্তর দেয়, "কোথায় আবার কি হয়েচে?" যেন প্রশ্নকর্ত্তার দৃষ্টিরই সব দোষ; সে কেন তাহার উপর নজর রাখিতে আসিল?

আজ মঞ্জরী আসিয়া তাহাকে বিছানার মধ্যেই গ্রেপ্তার করিল—হাসিয়া বলিল "ওগো বাণি! আজ একি শুনি? ওকি অমন করে মুখ ফেরান হ'ল যে? সই তবে একটা গান গাই শোন, "কেন গো ফিরালে আঁখি কেন এত অভিমান? ওগো……"

বাণী তখন উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল,

তর্জ্জনের সহিত বলিল, "থাম থাম, আমার গান ফান ভাল লাগিতেছে না, তোর সকল সময় যেমন রঙ্গ,আমি মরিতেছি, উনি গান গায়িতে বসিলেন।"

পাংশু অধরে মৃদু হাসিও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে তখনই হাসিয়া বলিল, "আজ নয় দশদিন পরে।" "দশদিন! বড় বেশি দেরি হ'বে না? এদিকে মাল্‌পো, মালসা ভোগের লোভও ছাড়িতে পারিনে, কাজেই থাকিয়া যাইতে হইবে. তা হ'লে একটু বসাই যা'ক্।" কিছুক্ষণ পরে মঞ্জরী চলিয়া গেল। তখন মৃগাঙ্ক আসিয়া সে গৃহে প্রবেশ করিল।

বাহিরে যথাসাধ্য শান্ত ভাব ধারণ করিলেও বাণীর মনের ঝড় থামে নাই, সে মৃগাঙ্কের আত্মীয় ভাবে অপ্রসন্ন হইল; কিন্তু মনের এমন অবস্থা নাই যে কোন কারণেও অহেতুক বাক্য ব্যয় করে। বিরক্তি-জ্ঞাপনের চেষ্টায় নিজের আঁচলের ছিলাগুলা টানিয়া ছিন্ন করিতে লাগিল। মৃগাঙ্ক একটা আসন টানিয়া বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে প্রশংসাসূচক স্বরে কহিয়া উঠিল "বাঃ ঘরখানি সুন্দর সাজিয়েছিস্ ত! জানলার ধারে বাহিরের দিক হইতে লতাগুলি ফুটন্ত ফুল বুকে করিয়া ভিতরে আসিবার চেষ্টা করায় আরও চমৎকার হইয়াছে। তুই যখন শ্বশুর বাড়ী যাবি তখন এদের দশা কি হইবে?" রাজনগরের জমিদারকন্যা শ্বশুর বাড়ী যাইবে? সে সবেগে মুখ তুলিল "আমি কোথাও যাইব না" তখন তাহার ললাট হইতে কণ্ঠ অবধি আবির মাখা হইয়া উঠিল। মৃগাঙ্ক সকৌতুকে তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, তাহার সগর্ব্ব উত্তর শুনিয়া সে আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল,"বিয়ে হইলে তারা ছাড়িবে কেন? তবে বিবাহ হইবে না।" এ উত্তরের জন্য সময় লাগে নাই। "মামা মামী শুনিবেন?" "না শুনিবেন না বই কি!" বাণীর অধরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠিন হাসি ফুটিয়া

ওগো বাণি! আজ একি শুনি? ওকি অমন করে' মুখ ফেরান হ'ল যে? (১২৩ পৃষ্ঠা)

"বলিস্ কি সই! এমন খবরেও একটু রঙ্গ করিব না তবে কবে করিব? আচ্ছা কবে বিয়ের দিন হয়েছে ভাই? এখন ঠিক হয় নাই বোধ হয়?" বাণী বলিল, "হয়েছে বই কি ২৪শে ফাল্গুন ডাকের শেষ দিন"। "ডাকের শেষ দিন"? অর্থাৎ? "শেষ দিনের অর্থ শেষদিন" বলিয়া একটু বসিল; "বাড়ীতে আজ কি বাণি লোকজন খাইবে? কোন পার্ব্বণ নাকি?" বাণী এতক্ষণে উঠিয়া বসিয়া দারুণ মানসিক চাঞ্চল্য তাহার গর্ব্বিত দৃঢ়চিত্তে চাপিয়া ফেলিতে যত্ন করিতে-ছিল। সমস্ত শরীরের শোণিতবহ শিরাগুলা উষ্ণ প্রস্রবণের মত ভিতরে ভিতরে ফুটিতেছিল, কিন্তু বাহিরে তাহার

উঠিল; সে হাসির অর্থ, তুমি আমায় চিননা, তাই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছ। দুজনে একটু নীরব থাকিয়া সহসা দুজনে হাসিল; বাণী হৃদয়োত্থিত ক্রোধ-দমনের চেষ্টায় মৃগাঙ্কের কৌতুক হাস্যে যোগ দিয়া ছিল মাত্র, তাহার মনে হাসির লেশমাত্রও ছিল না; অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের মত তাহা কেবল ধূমায়িত হইতেছিল।

সহসা মৃগাঙ্ক বলিয়া উঠিল, "তা হইলে তোর বিয়ে হ'বে না, বাণি! লোকে বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ঘরে আনিবে না এমন মূর্খ কেহ জগতে নাই। আমার মত লোকেও যা করিতে প্রস্তুত নয়, আর কে তাহা স্বীকার করিবে।" ঘোর অবিশ্বাসের সহিত বাণী হাসিয়া বলিল, "তেমন মূর্খ সংসারে অনেক আছে, নিজেকে সকলের সেরা ভাবিয়া বড়াই করিও না। তোমার বিয়ে হইয়াছে মৃগু দা?"

"বিয়ে! কেন বল্‌দেখি? আমার মতে পুরুষ মানুষের বিয়ে হওয়া ভাল নয়।"

"আর মেয়ে মানুষের হইবে?" "নিশ্চয়! শাস্ত্র বলিয়াছে স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার, পরে স্বামীর, তৎপরে পুত্রের অধীন থাকিবে, তাহার স্বাধীন থাকা বিধি নাই।"

"খুব এক চোখো শাস্ত্র ত! মেয়ে পুরুষে এত তফাৎ! কিন্তু তা বলিয়া শাস্ত্রের এমন আদেশ নয় যে পুরুষ অবিবাহিত ও মেয়েরা বিবাহিত হইবে? সে যে সোণার পাথর বাটি।" "ঠিক তাই? কিন্তু কেন তা হইবে না? মনে কর, যদি আমি কাহাকেও বিবাহ করি তার পর তাহার সঙ্গে স্ত্রী সম্বন্ধ ছাড়িয়া বন্ধুত্ব পাতাই, তবে সে আমার স্ত্রী হইল না, বন্ধু হইল ত; অথচ তাহার বিবাহ হইয়াছে কে না বলিবে?"

সমুদ্রে নিমজ্জনোন্মুখ বিপন্নের সম্মুখে কে যেন একখানা ভারসহ কাষ্ঠখণ্ড ফেলিয়া দিল। চমকিত হইয়া বাণী তাহার দিকে দুই নেত্র বিস্তৃত করিয়া চাহিয়া বলিল, "তাকি হয় মৃগুদাদা? তেমন কেউ আছে?" মৃগাঙ্ক হাসিয়া বলিল, "কেন এই আমিই আছি" "তুমি! তোমার বিয়ে হইয়াছে নাকি?" হইয়াছে বই কি, কন্যাদায় ঘাড়ে যে অনেকেরই, এ জিনিষটা নামাইতে স্থান অস্থান বিবেচনা চলে না, যেখানে হউক ফেলিতে পারিলে লোক বাঁচিয়া যায়। আমার মত আস্তাকুঁড়েও এ রত্ন ছড়াইতে বাধে না।"

বাণী শেষ কথাগুলা মন দিয়া শুনেও নাই, সে তখন ভাবিতেছিল যদি নিতান্ত বিবাহ করিতেই হয়, তবে এই রকম সর্ত্তেই, নতুবা এ জীবন লইয়া অন্যের দাসী হইতে পারিব না। মৃগাঙ্ক বলিতে লাগিল, "মেয়েদের বিবাহ না দিলে কেমন করিয়া চলিবে বল, কারণ একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন, মেয়েমানুষের আত্মা নাই, কাজেই পুরুষ মানুষের গলায় তাহাদের গাঁথিয়া দিতেই হইবে, তাহারা তাহাদের সেবা যত্নে খুসী করিলে সেই ফলে আত্মাবান্ পুরুষের কৃপায় ইহারা স্বর্গাদিলাভ পর্য্যন্ত করিতে পারে, নতুবা এ সংসারে তাঁহাদের কাণাকড়ির মূল্য নাই।"

বাণীর নেত্রে ক্রোধের ছায়া পতিত হইল, সে বলিল, "এই জন্যই বিবাহে বিতৃষ্ণা হইয়া যায়, সাধ করিয়া কি বলি বিবাহের নামই দাসীত্ব!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী

শান্তিনিকেতনে একদিন

"নিখিলের প্রিয় রবি কবি যার
চরণে লুটায় আনি।"

কবির বাক্য সার্থক হইয়াছে। আজ আমাদের রবীন্দ্রনাথ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহার কাব্য নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়া জগৎকে তিনি উন্নততর করিতে সাহায্য করিয়াছেন। অশান্তি ও বিরোধের লীলাভূমি পাশ্চাত্যকে শান্তি ও প্রেমের গানে মুগ্ধ করিয়া তিনি তথায় নূতন যুগের বারতা বহন করিয়া আনিয়া

দিয়াছেন। বিগত বৎসরে জগতের অন্য কোন সাহিত্যে নিত্যনবরূপী সত্যশিবসুন্দর এমন পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই। তাই আজ পাশ্চাত্য জগৎ তাঁহার শিরে যশের মুকুট পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিশ্ব-সাহিত্যের বিপুল-ভাবের রাজ্যে বরণ করিয়া লইল। ইহাই রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারলাভের অর্থ।

আজ বাঙ্গালীর কি আনন্দ! শুধু বাঙ্গালী কেন, সমগ্র ভারতবাসী কি বাঙ্গালীর এই গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না? আর য়ুরোপ আজ যাঁহাকে সম্মানিত করিল, তিনি ত কেবল বাঙ্গলার কি ভারতের নন, তিনি যে এসিয়ার বরেণ্য কবি—Poet Laureat of Asia.

যখন শুনিলাম যে ৭ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা হইতে পাঁচ শত লোক স্পেশাল ট্রেণে করিয়া বোলপুরে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিতে যাইবেন, তখন আমরা সাতজন ভাগলপুর সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপ সেই অভিনন্দনোৎসবে যোগ দিতে মনস্থ করিলাম। নিজেদের আনন্দ নিবেদন করিতে গিয়া সে দিন যে হৃদয়ভরা আনন্দ সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছি তাহা চিরকাল ঐদিনকে আমাদের নিকট স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

পূর্ব্বরাত্রে লুপমেলে আমরা ভাগলপুর হইতে রওনা হইলাম। হাস্যরসিক সত্যসুন্দর বাবু ও সুরেন্দ্র বাবুর উৎপাতে নিদ্রাদেবী আমাদের নিকটে আসতে পারেন নাই। কামরায় আর যে কয়জন ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহারা যে আমাদের এই হাস্যোচ্ছ্বসিত রহস্যালাপে বড় আপ্যায়িত হইয়াছিলেন তাহা মোটেই বোধ হইল না; কিন্তু আমাদের তাহা ভাবিবার অবসর ছিল না; হৃদয়ে যে "আনন্দেরই সাগর থেকে" বান আসিয়াছিল তাহা এইরূপে হাস্য-তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

শেষরাত্রে আমরা বোলপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। সঙ্গে যে সামান্য জিনিষপত্র ছিল তাহার জন্য কুলির সন্ধান করিতেছি, এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক আমাদের নিকট আসিয়া আমরা কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমাদের গন্তব্যস্থান শান্তিনিকেতন শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, তাঁহারা কএকজনে আমাদের সেইখানে লইয়া যাইবার জন্যই ষ্টেশনে আসিয়াছেন। তাঁহারাই আমাদের পেঁটরা প্রভৃতি বহন করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু আমরা বাধা দেওয়াতে একটা কুলির মাথায় তাহা চাপাইয়া দিয়া আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। সেদিন অপ্ মেল আসিতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দেরী হইয়াছিল; ওভারব্রিজ পার হইয়া গিয়া দেখি যে কলিকাতার মেল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং সেই গাড়ীতেও কএকজন শান্তিনিকেতন-যাত্রী আসিয়াছেন। আমাদের জন্য দুইখানা ঘোড়ার গাড়ী প্রস্তুত ছিল, কিন্তু যাত্রিসংখ্যা বেশী হওয়ায় আমরা জিনিষপত্রগুলি গাড়ীতে রাখিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলাম।

তখনও বিলক্ষণ অন্ধকার পথের দুই পার্শ্বের বিস্তীর্ণ প্রান্তর ঢাকিয়া ছিল। কিন্তু আমাদের পথ চলিতে কোন কষ্ট হইতেছিল না, কারণ অন্ধকার ক্রমেই তরল হইয়া আসিতেছিল। প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা শান্তিনিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের একটি ঘর আমাদের কএকজনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আমরা তখন আর সেখানে না বসিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। এদিকে পূর্ব্ব দিক ধূসর-বর্ণ ধারণ করিতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই ঊষার লোহিতরাগ ফুটিয়া উঠিল। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। তখন বিদ্যালয়ের বালকগণ জাগিয়া উঠিয়াছে। আশ্রম-চিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী রায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আমরা শান্তিনিকেতন ও বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিক দেখিতে চলিলাম। কএক পদ অগ্রসর হইতেই এক অভিনব দৃশ্য আমাদের চক্ষে পতিত হইল। দেখিলাম দিল্লী সেণ্ট্ ষ্টিফেন্স্ কলেজের অধ্যাপক সুলেখক শ্রীযুক্ত সি, এফ্, এণ্ড্রুজ পুরা মাত্রায় বাঙ্গালী সাজিয়া পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন; তাঁহার পরণে ধুতি, গায়ে একটা কামিজের উপর একখানা লাল র‍্যাপার জড়ান। বিনোদবাবু তাঁহার সহিত আমাদের সকলের পরিচয় করাইয়া দিলেন; তিনি সস্মিতমুখে দু'একটি সৌজন্যপূর্ণ কথা কহিয়া আমাদিগকে প্রীত করিয়াছিলেন।

তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া আমরা শান্তিনিকেতন সংলগ্ন একটি উদ্যানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সেখানে তখন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রাতর্ভ্রমণ করিতেছিলেন। বিনোদবাবু তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমরা আগেই শুনিয়াছিলাম যে, এই সময় তিনি যে শুধু ভ্রমণ করেন তাহা নহে, ইহা তাঁহার চিন্তার সময়; আর আমরা যখন গিয়াছিলাম তখনও তিনি গভীর চিন্তায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন বলিয়া বোধ হইল। তাই আমরা তখনই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম।

ইতোমধ্যে বালকগণ সেদিনকার উৎসবের আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। ছয় বৎসরের শিশু হইতে তরুণবয়স্ক বালক পর্য্যন্ত আশ্রমের যত ছাত্র ছিল সকলেই তখন শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রমুখাৎ শিক্ষকগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া নানা কার্য্যে নিয়োজিত ছিল। শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই নগ্নপদ,—ইহাই সাধারণতঃ আশ্রমের নিয়ম। প্রায় দুই শত ছেলে এক সঙ্গে কাজ করিতেছে, অথচ একটুও কোলাহল নাই, এরূপ দৃশ্য আমি এই প্রথম দেখিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ঘণ্টা পড়িল। বালকগণ তৎক্ষণাৎ কোদাল, সাবোল ফেলিয়া চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে হস্তপদ ধৌত করয়া একখানি করিয়া আসন লইয়া বাহির হইয়া আসিল, তারপরে আশ্রম-সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ মাঠে যাহার যেখানে ইচ্ছা বসিয়া উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিল। ধ্যান সমাপন করিয়া তাহারা সকলে এক স্থানে সমবেত হইল এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্বরে 'সমবেত উপাসনা' আরম্ভ করিল। ইহা শেষ করিয়া তাহারা আবার স্ব স্ব কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমরা তখন বিনোদবাবুর সঙ্গে আশ্রমের দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তুসমূহ দেখিতে লাগিলাম। যে সপ্তপর্ণীতলে ধ্যান করিয়া মহর্ষি ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছিলেন সেখানে আরও কএকটি সপ্তপর্ণী এবং অন্যান্য বৃক্ষ স্থানটিকে কুঞ্জের ন্যায় মনোরম করিয়া রাখিয়াছে।

শুনিলাম দেবেন্দ্রনাথ কার্য্যব্যপদেশে একদা এই স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে এই ছাতিম গাছের তলায় উপবেশন করেন এবং এই স্থানটি তাঁহার এত ভাল লাগে যে, তিনি এইখানে উপাসনার জন্য আশ্রম নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়া শান্তিনিকেতনের পত্তন হইল। যে উচ্চস্থান হইতে মহর্ষি প্রত্যহ সূর্য্যোদয় দেখিতেন তথায় আরোহণ করিলাম। তথা হইতে নামিয়া আমরা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আড়ম্বরহীন গৃহগুলি দেখিতেছিলাম এমন সময়ে প্রাতরাশের জন্য আহ্বান হইল। আমরা অন্যূন পঞ্চাশ জন অভ্যাগত একটি ঘরে একত্র বসিয়া চা লুচি ও পায়সদ্বারা প্রাতর্ভোজন সমাপন করিলাম।

আহারান্তে আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। কলিকাতা হইতে আগত কএকজন বন্ধুও আমাদের সঙ্গী হইলেন। এবার আমাদের গাইড্ হইলেন শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। আশ্রম অতিক্রম করিয়া মাঠে মাঠে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, তখন দেখিলাম যে রবীন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া পদচারণা করিতেছেন। আমরা গিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি আমাদের আমন্ত্রণ করিয়া উপরে তাঁহার বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন।

* * *

আমরা প্রায় পনরজনে রবীন্দ্রনাথকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘিরিয়া বসিলাম। কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারি অমূল্যবাবু ও তাঁহার কএকজন বন্ধুও সেখানে ছিলেন। সকলে উপবেশন করিলে রবিবাবু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুকে (ইনি শিক্ষার জন্য বিলাতে দুই বৎসর ছিলেন) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি অক্সফোর্ডে পড়িয়াছিলেন?'

প্রেমসুন্দর বাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ, ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে।'

রবিবাবু বিলাতে অবস্থানকালে ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে গিয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে জানাইলেন। তারপর তিনি ভাগলপুর সাহিত্য পরিষদের অবস্থা কিরূপ তা জিজ্ঞাসা করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র রায় বলিলেন যে তাহা এখন বেশ চলিতেছে।

অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার দাদা আবার কোথায় পুরাতন প্রসঙ্গের উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন না কি?'

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে হাঁ, কৃষ্ণনগরে শ্রীযুক্ত উমে

চন্দ্র দত্তের নিকট গিয়াছিলেন। অনেক তথ্য সংগ্রহও করিয়া আনিয়াছেন।'

রবিবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, 'সেই সঙ্গে কৃষ্ণনগরের জরটাও সংগ্রহ করিয়া আনেন নাই ত ?'

'আজ্ঞে না, তিনি তিনদিন মাত্র সেখানে ছিলেন ; আর উমেশবাবু নিজেই জরের আশঙ্কায় তাঁকে বেশী দিন থাকিতে দেন নাই।' এই কথা বলিয়া আমি তাঁহাকে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' কেমন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলাম।

রবিবাবু বলিলেন, 'বেশ হইয়াছে। গৌরহরি বাবুও নাকি গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে লিখিতেছেন ?'

'আজ্ঞে হাঁ। তিনি গুরুদাস বাবুর মুখ থেকে তাঁহার জীবন-স্মৃতি শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছেন ; 'মানসী'তে বাহির হইতেছে। আমার দাদাও 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' নাম দিয়া আবার একটা প্রসঙ্গ বাহির করিতেছেন। রামেন্দ্র বাবু ইহার বক্তা।'

রবিবাবু বলিলেন, 'হাঁ, আমি তাহা দেখিয়াছি ; কতকটা যেন monologueএর মতন বলিয়া বোধ হয় ; সামাজিক বিষয় লইয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে।'

'ভারতবর্ষ' পত্রের প্রসঙ্গটা সামাজিক বিষয় লইয়া বটে, কিন্তু 'মানসী'তে পুরীর মন্দিরগাত্রের erotic figures অবলম্বন করিয়া প্রসঙ্গের আরম্ভ হইয়াছে।'

রবিবাবু বলিতে লাগিলেন, 'পুরাতনের আলোচনা করিলে সমাজ যে কেমন দ্রুত গতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সকল 'প্রসঙ্গে' সেই rapid changeটাকে cinematographএর ছবির মত ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে। একটা পরিবর্ত্তন খুব স্পষ্টই উপলব্ধ হয়, তাহা বর্ত্তমানকালে আমাদের মধ্যে সামাজিকতার অভাব। আগে কেমন পাঁচজন লোক একত্র হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিত ; এখন আর সে বৈঠকি মজলিস্ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার নিজের life-time-এই এই পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। ইহার প্রধান কারণ সময়ের অভাব বলিয়া আমার মনে হয়।'

নীরদবাবু বলিলেন, 'অন্নচিন্তা ও রোগও বোধ হয় ইহার অন্যতম কারণ।'

রবিবাবু বলিলেন, 'শুধু তাহাই নয়। আগে যাত্রা গান প্রভৃতিতে লোকে যতটা আমোদ উপভোগ করিত এখন আর ততটা করে না। আগে আড্ডায়, মজলিসে লোকে অপরকে হাসাইবার চেষ্টা করিত ; কিন্তু এখন হইয়াছে professional humourists, তাহারা টাকা লইবে তবে লোককে হাসাইবে।'

'এখন শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধানটা আগের চেয়ে অনেক বেশী হইয়া পড়িয়াছে।'

রবিবাবু বলিলেন, 'তাহা সত্য ; কিন্তু এই ব্যবধানটা ক্রমশঃ দূর হইয়া একটা সাম্যভাব স্থাপিত হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। যে শিক্ষা এখন অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ তাহা কালক্রমে নিম্নস্তরেও সংক্রামিত হইবে। ইহা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মুখে এখন এমন অনেক নূতন নূতন ভাব-প্রকাশক কথা শুনিতে পাওয়া যায় যাহা কিছুদিন পূর্ব্বে তাহারা একেবারেই জানিত না। জল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে, তরঙ্গিত হইয়া উপর নীচে এক হইয়া যাইবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি বলেন যে, এই European culture আমাদের সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সংক্রামিত হইবে ?'

রবিবাবু বলিলেন, 'এই cultureটা আমাদের কাছেই কি এখনও সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে ? আমরা কি ইহার ঠিক স্বরূপ ধরিতে পারিয়াছি ? পুঁথির মধ্য হইতে ইহাকে যেরূপ পাইয়াছি, সেইরূপ লইয়াছি, সত্য বস্তুর সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে একেবারে চেষ্টিত হই নাই। আমরাই যদি western cultureটাকে সত্য বস্তুরূপে পাইলাম না, তাহা হইলে যাহারা আমাদের নিকট হইতে ভাবগ্রহণ করিবে সেই নিম্নশ্রেণীর লোক ইহার কি বুঝিবে ? আর তাহাদের বুঝাইতে যাওয়ার সমস্ত চেষ্টাই যে ব্যর্থ হইবে! এই ব্যর্থ চেষ্টার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে কংগ্রেস। বৎসরে তিনটি মাত্র দিন ধরিয়া খুব একটা সোরগোল হইল, কিন্তু বাকী সারা বছরটা আর কোন সাড়াশব্দ নাই ; ইহাতে যদি দেশের জনসাধারণ কংগ্রেস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে, তাহা হইলে তাহা-

দিগকে দোষ দেওয়া যায় না। এই কংগ্রেস ব্যাপারটি ই যদি একটা সত্যবস্তুরূপে তাহাদের সম্মুখে ধরিতে পারা যাইত, তাহা হইলে হয় ত ভিন্নরূপ ফল ফলিতে পারিত। মহেন্দ্রলাল সরকার Science Association গঠন করিলেন, কিন্তু দেশের লোক তাঁহার আহ্বানে কোন সাড়া দিল না। সাড়া দিবে কোথা হইতে? তাহাদের ভাগ্যে ত সত্যবস্তুর দর্শনলাভ ঘটে নাই! বিলাতের সহিত তুলনাটা স্বতঃই মনে আসে। সেখানে দেখুন যখনই কোন একটা movement হয়, তখন দেশের আপামরসাধারণ তাহাতে interest লয়, তাহাতে প্রাণ ঢালিয়া দেয়। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল আন্দোলনের সহিত তাহাদের নাড়ীর যোগ রহিয়াছে।

'আমাদের এই শোচনীয় অবস্থার কারণও আছে। প্রথমতঃ, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বড় সঙ্কীর্ণ; দৈনিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু করিতে হয়, তাহাই সাধারণতঃ আমাদের একমাত্র কর্ম্ম। আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার নাই, সুতরাং আমরা মনে করি যে, সেদিকে আমাদের কিছু করিবারও নাই। এই প্রতিকূল অবস্থা আমাদের চরিত্রগত ঔদাসীন্যের জন্য কতকটা দায়ী। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের জীবিকাসংগ্রহ আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয়, সর্ব্বাপেক্ষা সত্য বস্তু, হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহার যাহা জীবিকার্জ্জনের উপায়, একমাত্র তাহাই তাঁহার কাছে সত্যরূপে আসিয়াছে। সেই বিষয় সম্বন্ধেই তিনি কথা কহিতে ভালবাসেন, অন্য কোন প্রসঙ্গ তাঁহার বড় ভাল লাগে না। উকীল মুন্সেফ প্রভৃতি সকলে সাধারণতঃ তাঁহাদের ব্যবসায় ও চাকরি লইয়াই আলাপ করিয়া থাকেন, তদতিরিক্ত কোন বিষয়ের ধার তাঁহারা বড় ধারেন না। কোথায় কি আন্দোলন হইতেছে, কে কি নূতন কথা বলিল, এ সব বিষয়ের কোন খোঁজ তাঁহারা রাখেন না।

'সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের সাহিত্যকে সমাজের সর্ব্বসাধারণের প্রাণের বস্তু করিয়া দিয়াছেন। ইহাই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব। তাঁহার সময় হইতেই শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজি মোহ ত্যাগ করিয়া মাতৃভাষার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কাহারও যদি কিছু বলিবার থাকে তাহা হইলে তিনি এখন তাহা ইংরেজিতে না বলিয়া বাঙ্গালাতেই বলিয়া থাকেন; কিন্তু এখনও আমাদের লেখকগণ সত্যকে দৃঢ়রূপে ধরিতে পারেন নাই।'

রবিবাবু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম, 'লেখকদের একটা মস্ত অসুবিধা যে তাহাদের রচনার নিরপেক্ষ সমালোচনা হয় না। 'সাধনা'তে বহুপূর্ব্বে আপনি এই অনুযোগ করিয়াছিলেন।'

রবিবাবু বলিলেন, 'এ কথা সত্য; কিন্তু তাহারা যে একেবারে criticised হয় না তাহা নহে। তবে সে criticism এর কোন মূল্য নাই। কারণ সে সকল সমালোচনা আমাদের অন্তস্তল হইতে নহে, আমাদের প্রাণ হইতে বাহির হয় না। সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা কেবল পুস্তকের বুলি আওড়াই, পুস্তক হইতে নজির দিই। তাহাতে কোন কাজ হয় না। আবার তার সমালোচনাও ভাল নহে। গাছে অসংখ্য বোল হয়, শেষে অধিকাংশ আপনিই ঝরিয়া যায়, সে জন্য কোন আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। এখন সৃষ্টি হইতে থাক্, সমালোচনার যুগ আমাদের দেশে এখনও বোধ হয় ঠিক আসে নাই।'

'কিন্তু তাহা হইলেও লেখকদের প্রতি indifference কি ভাল?'

রবিবাবু বলিলেন, 'লেখকেরা যাহা বলে তাহা যদি তাহাদের প্রাণের কথা না হয়, তাহা হইলে পাঠকের প্রাণ তাহাতে সাড়া দিবে কেন, তাহারা তাহাতে interest লইবে কেন? আমাদের লেখকগণ বাঁধা সংস্কারের অন্ধ-অনুবর্ত্তী; যে সকল মত তাহাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাই তাহারা নিতান্ত ভাল ছেলের মত নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে এবং তাহাতেই তাহারা বাহাদুরী লইতে চায়;—একবার চাহিয়া দেখিবে না, ভাবিবে না, বিচার করিবে না, চারিদিক থেকে—ভিন্ন ভিন্ন standpoint থেকে বিষয়টিকে examine করিয়া দেখিবার চেষ্টাটিমাত্র করিবে না! শিশুর হাতে ঘড়ি দিলে সে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার করে, তারপর তাহার ভিতর কি ছিল তাহা দেখিয়া লয়। আমাদের মধ্যে এই শিশুর ভাব কবে আসিবে? আমরা কি চিরবৃদ্ধ হইয়া থাকিব? আমাদের দেশে কি কখনও বসন্ত আসিবে না? যৌবনের

উদ্দামভাব আমাদিগকে কি কখনও চঞ্চল করিয়া তুলিবে না ? কবে আমাদের লেখকগণ সংস্কারবন্ধনহীন, লোক-মত-নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে প্রাণের কথা বলিতে শিখিবে ?

আমি বলিলাম, 'আমাদের রাষ্ট্রীয় অবস্থার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাই ফলিতেছে, আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি। বর্ত্তমান অবস্থায় কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাহা সব সময়ে বুঝিতে পারিবার শক্তি এখন আমাদের কোথায় ? আপনার 'অচলায়তন' কিরূপভাবে সমালোচিত হইয়াছিল তাহা ত আপনি অবগত আছেন !

রবিবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, 'কিন্তু আমার সমালোচকগণ বড়ই ভুল বুঝিয়াছিলেন, আমি কোন সমাজের উপর কোনরূপ কটাক্ষ করি নাই। আর তাঁহারা যে বিষয়টাকে এত ক্ষুদ্র করিয়া দেখিবেন তাহাও ভাবি নাই।

এ প্রসঙ্গ আর বেশী অগ্রসর হইতে না দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি মেটারলিঙ্কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ?

রবিবাবু বলিলেন, 'না, আমার ফ্রান্সে যাওয়া হয় নাই, যদিও সেখানে যাইবার নিমন্ত্রণ ছিল ; জর্ম্মাণি ও সুইডেনেও যাইতে পারি নাই।' তারপর তিনি প্রেমসুন্দর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি ফিরিবার সময় জার্ম্মাণি হইয়া আসিয়াছিলেন ?'

প্রেমসুন্দর বাবু বলিলেন, 'হাঁ, আমি জার্ম্মাণি গিয়াছিলাম। আপনার কি অয়কেনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?'

রবিবাবু বলিলেন, 'হাঁ, তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে ; বৃদ্ধকে বেশ লাগিল। তিনি আমাকে বলিলেন, বড় বড় ভাবের কথা কেবল হিন্দু ও জর্ম্মাণরাই বুঝে, আর কোন জাতি বড় বুঝে না।'

প্রেমসুন্দর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার স্কুলে একটা Technological Department খোলা হইবে শুনিয়াছিলাম, তাহা কি সত্য ?'

রবিবাবু বলিলেন, 'হাঁ, তাহার ত চেষ্টা হইতেছে। আমেরিকা থেকে প্যাটাভাল সাহেবও ত এই ডিপার্টমেন্টের চার্জ্জ লইবার জন্য এখানে আসিতেছেন। তিনি আমেরিকা ছাড়িয়াছেন অনেক দিন, এতদিনে বোধ হয় কলম্বোয় আসিয়া পৌছিয়াছেন।'

প্রেমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিন্তু আপনার স্কুলের spirit-এর সঙ্গে কি সাহেবের মতের মিল হইবে ?'

রবিবাবু বলিলেন, 'আমারও ঠিক ঐ আশঙ্কা হয়। শেষে তিনি হয়ত আমাদের এই সামান্য আয়োজন দেখিয়া নিরাশ হইয়া যাইবেন। তবে আমি ত তাঁহাকে আমাদের অবস্থাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, আর তিনিও জিদ্ করিয়া আসিতেছেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আর কোন সাহেব কি আপনার স্কুলে কাজ করিতে আসিতেছেন ?"

রবিবাবু বলিলেন, 'দিল্লী থেকে পিয়ার্সন সাহেব আসিবেন! তিনি একজন আদর্শ পুরুষ,—একজন প্রকৃত ভক্ত। তাঁর মতন উন্নত চরিত্রের লোক আমি খুব কম দেখিয়াছি। তিনি কেম্ব্রিজের বি, এ ; দিল্লীতে এক ধনাঢ্যের গৃহে শিক্ষকতা করেন। তিনি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে বড় ভালবাসেন। তিনি যাঁহাদের বাড়ীতে কাজ করেন তাঁহারা ত কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িতে চায় না। তিনি যখন তাঁহাদের বলিলেন যে, একটি খুব ভাল কাজ পাইয়াছেন তখন তাঁহারা ভাবিলেন যে, তিনি বুঝি বেশী মাহিনাতে অন্য কোথাও যাইতেছেন, তাহারা মাইনে বাড়াইয়া দিতে চাহিল ; কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিলেন না। এখানে তিনি আমাদের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা মাত্র লইবেন, ইহাতেই তাঁহার নিজের খরচ চলিয়া যাইবে বলিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালাও শিখিতেছেন ; আমাকে বাঙ্গলায় একখানা চিঠি দিয়াছেন।"

আমরা উঠিলাম। নীচে নামিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন, 'আজ আমাদের বোলপুরে আসা সার্থক হইয়াছে।'

* * * *

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে অন্যান্য অভ্যাগত ভদ্র মহোদয়গণ এবং বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র স্নান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তখন বেলা সাড়ে দশটা। আমরা আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই স্নানকার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিলাম। তারপর সুরেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে লইয়া

একটি ছায়াশীতল আম্রবৃক্ষের তলে উপবিষ্ট হইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত কথোপকথনের 'নোট' লইতে লাগিলাম। প্রেমসুন্দর বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবু আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন এবং চারিজনের স্মৃতি শক্তির সাহায্যে নোট-যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া তোলা হইল। এই সময় আরও কএকজন ভদ্রলোক এবং হল্যাণ্ড ও মিলবার্ণ সাহেব কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদের আহারের জন্য ডাক পড়িল। গিয়া দেখি একটা বড় ঘরে দুই সারি বালক এবং দুই সারি ভদ্রলোক বসিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ বালকেরই পরিধানে গেরুয়া এবং গায়ে আল্‌খাল্লা। আমরা বসিয়া পড়িলাম। আহার এখানে পুরামাত্রায় সাত্ত্বিক রকমের, সম্পূর্ণ নিরামিষ; কিন্তু তাহা হইলেও অতি পরিপাটি। আহারান্তে বালকগণ স্ব স্ব গেলাস ও বাটি লইয়া উঠিয়া গেল, এবং যখন তাহাদের স্বহস্তে সেগুলি মাজিতে দেখিলাম, তখন সেই স্বাবলম্বনমূলক শিক্ষার শত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। হায়, কবে ধনিদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালী নিজ নিজ সন্তানদিগকে বিলাসিতা পরিহার করিয়া এইরূপ স্বাবলম্বনপ্রিয় হইতে শিক্ষা দিবেন?

এইবার ষ্টেসনে যাইবার ধুম পড়িয়া গেল। কএকজন শিক্ষক ও অন্যান্য ভদ্রলোকের নেতৃত্বে একদল আল্‌খাল্লা-ধারী বালক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্পেশাল ট্রেনের অভ্যাগতগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশন অভিমুখে চলিয়া গেল। আর একদল সকলের পুরোবর্ত্তী হইয়া গান গাহিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইহাদের নেতৃত্বে রহিলেন শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবিবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত অজিত-কুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। ইহারা সকলেই আশ্রমনিয়মানুসারে নগ্নপদ এবং গৈরিক উত্তরীয় ধারী। আমরা এই দলভুক্ত হইতে মনস্থ করিলাম, কিন্তু তখনও তাহাদের বাহির হইতে বিলম্ব আছে জানিয়া, কবিবরকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য কিরূপ আয়োজন ও ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা দেখিতে গেলাম। দেখিলাম আশ্রমের এক অংশ সুন্দররূপে পরিষ্কৃত হইয়া সভাস্থলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনেকগুলি আম্রবৃক্ষ সেই স্থানটি ছায়ানিবিড় করিয়া রাখিয়াছে। তাহার একপার্শ্বে একটি অনতিক্ষুদ্র মৃন্ময় বেদিকা প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার চারিদিকে মাটির উপর খুব বড় বড় পদ্মের পাপড়ি অঙ্কিত হইয়াছে; এবং তদুপরি অনেকগুলি পদ্মপত্র এরূপ ভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সমগ্রটি এক সুবৃহৎ পদ্ম বলিয়া মনে হয়। ইহাই কবিবরের আসন হইয়াছে। প্রায় সমস্ত স্থানটি বিবিধ বর্ণের আলিপনায় অনুলিপ্ত। কবির আসনের সম্মুখেই একখানি প্রস্তরাসন সভাপতির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আরও দুই তিনখানি প্রস্তরাসন সংবেজ অভ্যাগতগণের জন্য রক্ষিত হইয়াছে, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর বসিবার জন্য সতরঞ্চি বিছান'।

ইতোমধ্যে গায়কের দল চলিয়া গিয়াছিলেন। অনতি-দূরবর্ত্তী ভুবনডাঙ্গা নামক স্থানে তাঁহাদের অপেক্ষা করিবার কথা ছিল। সুগায়ক সত্যসুন্দর বাবু আগেই তাঁহাদের দলে জুটিয়া গিয়াছিলেন। আমরা কয়জনে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। আশ্রম হইতে যে সরু পথটি বড় রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছে, তাহার দুইধারে বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া আম্রপত্র গ্রথিত রজ্জুদ্বারা রেলিঙ্গের মত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহী, গন্ধ, ঘৃত, তণ্ডুল, কজ্জল, কদলী, ধূপ, ধূনা শঙ্খ প্রভৃতি ত্রয়োবিংশ প্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্য এই সকল প্রোথিত বংশদণ্ডের নিম্নে এক একটি করিয়া পদ্মপত্রে রক্ষিত হইয়াছিল। দেখিলাম যত কিছু আয়োজন সমস্তই বৈদিক আচার অনুসারে অনুষ্ঠিত। আশ্রমের প্রবেশপথে যে পত্রপল্লব-শোভিত তোরণদ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে 'আয়াহি মন্ত্র' (হে আনন্দদাতা, আগমন করুন) এই বৈদিক মন্ত্র লিখিত ছিল। বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যে সজ্জিত, পত্র-পল্লব সুশোভিত এবং ধূপ ধুনায় সুরভিত সেই শান্তিনিকেতন তখন সত্য সত্যই আমাদের মনে বৈদিক যুগের ঋষি-আশ্রমের আভাস আনিয়া দিতেছিল।

আমরা ভুবনডাঙ্গায় আসিয়া দেখিলাম যে, সকলে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া কলিকাতা হইতে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রায় আড়াইটার সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, তাঁহারা আসিতেছেন। বালকগণকে তৎক্ষণাৎ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাঁড় করান

হইল। অবিলম্বে সকলে আসিয়া পড়িলেন। বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, প্রিন্সিপাল সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক মহলানবিশ ও ললিতকুমার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাক্তার চুনীলাল বসু, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ও ইন্দুমাধব মল্লিক, ভারতবর্ষ-সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও ভারতবর্ষ-সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, কবি করুণানিধান ও সত্যেন্দ্রনাথ, সুলেখক শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন ও ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মৌলবী আব্দুল কাসিম প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছিলেন। অনেকগুলি মহিলাও স্পেশাল ট্রেণে আসিয়াছিলেন। এণ্ড্রুজ সাহেব ধুতি চাদর পরিয়া (এখন তিনি র‍্যাপার ছাড়িয়া চাদর লইয়াছিলেন) সকলের অভ্যর্থনা করিতেছিলেন।

সকলে একত্র সমবেত হইলে আশ্রমের বালকগণ রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সেই দিনকার জন্য রচিত এই গানটি গায়িতে গায়িতে অগ্রসর হইল—

আমাদের "শান্তিনিকেতন"
আমাদের সব হতে আপন।
তার আকাশভরা কোলে,
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন।
মোদের তরুমূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগমাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকী-কানন।
আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলেছে একতানে
মোদের ভায়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে এক মন।

শান্তিনিকেতন

শোভাযাত্রা যখন তোরণমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সকলের কপাল চন্দনচর্চ্চিত করিয়া দেওয়া হইল; ভিতর হইতে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সকলে সভাস্থলে গিয়া উপবেশন করিলে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর প্রস্তাবে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সভাপতি-পদে বৃত হইলেন। অতঃপর এণ্ড্রুজ প্রভৃতি কএকজনে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথকে আনিতে গমন করিলেন। ইত্যবসরে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত কবিবরকে যে অভিনন্দন দেওয়া হইবে তাহা পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলকে শুনাইলেন। রবীন্দ্রনাথ সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার শঙ্খ বাজিয়া উঠিল; মহিলাগণ পরমেশ-বন্দনা গাহিতে আরম্ভ করিলেন। সভাপতি মহাশয় কবিবরের কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিলেন। সঙ্গীত থামিলে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রেশমী কাপড়ে লিখিত নিম্নলিখিত অভিনন্দন পাঠ করিয়া কবিবরের করকমলে অর্পণ করিলেন—

যাঁহার কাব্যবীণায় বিকাশোন্মুখ শিশু-হৃদয়ের প্রভাতী কাকলী হইতে অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত প্রৌঢ় বৈরাগ্যের বৈকালী সুর পর্য্যন্ত নিখিল রাগিণী নিঃশেষে ধ্বনিত হইয়াছে, যাঁহার নব-নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার অজস্র কিরণ সম্পাতে বঙ্গীয় নরনারীর দৈনন্দিন জীবন আজ সমুজ্জ্বল, যিনি বিশেষভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় কবি হইয়াও সার্ব্বভৌমিক গুণিগণের গণনায় জগতের কবিসভায় সম্মানের মহোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই ভাব ও জ্ঞান-রাজ্যের বর্ত্তমান সম্রাট ধ্যানরসিক স্বদেশের প্রিয়তম কবি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে

বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দনে

অভিনন্দিত করিতেছে।

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

অভিনন্দন পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য উপাসনা করিলেন। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের পক্ষে হইতে, মিলবার্ণ ও হল্যাণ্ড সাহেব ভারতীয় খৃষ্টান ও ইংরেজ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে, রায়বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দ্রনাথ নাহর জৈন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে, মৌলবি আবুল কাসিম মুসলমান সম্প্রদায়ের তরফ হইতে এবং অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভ্যগণের পক্ষ হইতে কবিবরকে অভিনন্দিত করিলেন। শ্রীযুক্ত এস ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় চিত্র-শিল্পিগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে একখানি সুন্দর স্বর্ণচিত্র উপহার দিলেন। মিলবার্ণ সাহেব বক্তৃতাকালে বলিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনা দ্বারা শুধু বঙ্গসাহিত্যের নয়, ইংরেজ সাহিত্যেরও উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার গীতাঞ্জলির কএকটি গীত বিশপস্‌ কলেজের খৃষ্টান ছাত্রগণ প্রাত্যহিক উপাসনার সময় ব্যবহার করিতে আদিষ্ট হইয়াছে। হল্যাণ্ড সাহেব বলিলেন, রাডিয়ার্ড কিপলিঙ্গের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া রবীন্দ্রনাথ আজ পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে সম্মিলিত করিলেন, আর সেই মিলন হইয়াছে ভগবানের মন্দিরে, যে মন্দির মানব হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ উঠিলেন। অতি মৃদুস্বরে তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই:—আজ আপনারা আমাকে যে সম্মান প্রদান করিলেন আমি তাহার অযোগ্য জানিয়া মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি। আমি সম্মানের জন্য কখনও কিছু লিখি নাই। এ অভিনন্দন আমি দেশের সর্ব্বসাধারণের প্রদত্ত বলিয়া মনে করিতেছি না। আমি জানি, এবং আপনারাও জানেন যে, আমার কবিতা সকলের ভাল লাগে না। আর ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সাধারণতঃ কাব্যের তিন শ্রেণীর পাঠক দেখিতে পাওয়া যায়; এক শ্রেণীর সহৃদয় পাঠক থাকেন, কবির কাব্য যাঁহাদের হৃদয়ে সহানুভূতির ঝঙ্কার তোলে; আর এক শ্রেণীর পাঠক আছেন যাঁহারা সেই কবির কাব্যপাঠে কখনও আনন্দিত হন কখনও হন না; এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর পাঠকের হৃদয়ে সেই কাব্য আনন্দের পরিবর্ত্তে বেদনা আনিয়া দেয়। সুতরাং আমার কবিতা যে সকলকে আনন্দ দান করিতে পারে নাই তাহা বিচিত্র নহে। আজ আপনারা আমাকে অভিনন্দিত করিতেছেন, কিন্তু কালই হয় ত আপনাদের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। যখন জোয়ার আসে, তখন নদীর তলদেশস্থ কর্দ্দম ও পঙ্ক পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠে; আবার জোয়ার চলিয়া গেলে সব স্থিরভাব ধারণ করে। আমি ইহা জানি বলিয়া এই সম্মান আমার মনে মত্ততা আনিয়া দিতে পারিবে না।

পুরাকালে মদ্য দিয়া কবিদের সংবর্দ্ধনা করিবার রীতি ছিল। কবি সেই মদ্যপূর্ণ পাত্র লইয়া ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া রাখিয়া দিতেন, পান করিতেন না; আমিও আজ আপনাদের এই সম্মানমদিরা ওষ্ঠ পর্য্যন্তই গ্রহণ করিলাম, কিন্তু গলাধঃকরণ করিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করিলে সুকবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হইল।

*   *   *

কলিকাতা হইতে যাঁহারা স্পেশালে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সভাভঙ্গের অব্যবহিত পরেই ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলেন। রবীন্দ্রনাথও সেই সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আমাদের ট্রেণের সময় ছিল রাত্রি এগারটা; কাজেই আমরা তখন রহিয়া গেলাম।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা সন্ধ্যার পর এণ্ড্রুজ্‌ সাহেবের 'দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের অবস্থা' সম্বন্ধে বক্তৃতা। শান্তিনিকেতনের দোতলায় বারাণ্ডা-সংলগ্ন একটি চত্বরে সতরঞ্চি বিছাইয়া আমরা কুড়ি পঁচিশজন শ্রোতা উপবিষ্ট হইলাম। এণ্ড্রুজ্‌ সাহেব আমাদের মতই বসিয়া যে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন তাহার সারমর্ম্ম দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি বলিলেন,—'আজ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আপনারা ক্লান্ত; কিন্তু এই সময়েই আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসিদিগের সম্বন্ধে দু'একটি কথা আপনাদিগকে বলিতে চাই। কারণ আপনারা নিজে যখন ক্লান্ত, অবসন্ন, তখন সুদূর আফ্রিকায় আপনাদের নির্যাতিত ভ্রাতাভগিনীগণ যে কত ক্লান্ত, কত অবসন্ন তাহা বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বীরত্বের যে দৃষ্টান্ত জগৎ সমক্ষে দেখাইতেছেন, তাহা অতুলনীয় এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা স্বদেশকে যশের শিখরে তুলিতেছেন। তাঁহাদের নেতা গাঁধি, পত্নীও পুত্রের সহিত কারারুদ্ধ হইয়াছেন। এই গাঁধি কি রকম চরিত্রের লোক আপনারা জানেন কি? শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন তখন একদিন দেখিলেন যে, গাঁধি পথিপার্শ্বস্থ একটি রুগ্ন কাফির শিশুকে কোলে করিয়া স্বগৃহে আনিলেন এবং নিজ সন্তানের ন্যায় তাহার শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিলেন। প্রথমে তিনি ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন তিনি তত্রত্য ভারতবাসিগণের মুখে শুনিলেন, যে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এইরূপ পরোপকার কার্য্য তাঁহার জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা তখন তিনি গাঁধির মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন। আজ সেই মহাপ্রাণ গাঁধি কারাগারে এবং তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত অসংখ্য ভারতবাসী তাঁহার সহিত কারাক্লেশ বরণ করিয়া লইয়াছেন। আপনারা এই দুঃস্থ ভ্রাতাভগিনীদের সাহায্যকল্পে কি করিতে পারেন? আমার একটি প্রস্তাব আছে, এবং তাহা গুরুদেবকে(রবীন্দ্রনাথকে)বলায় তিনি অনুমোদনও করিয়াছেন। প্রস্তাবটি এই:—আপনাদের আশ্রমের হাঁসপাতালটি বাড়াইবার কথা হইতেছে। আপনারা নিজেই স্বহস্তে এই নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিন। তাহা হইলে আপনারা প্রত্যেক ইষ্টকখানি বসাইবার সময় দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় শ্রমজীবিগণের কষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। আর আপনাদের নির্ম্মিত সেই গৃহ, নিপীড়িত, নির্যাতিত ভ্রাতাভগিনীদের প্রতি সমবেদনার একটি চিরস্থায়ী নিদর্শন স্বরূপ এখানে বিরাজ করিবে। তাহা নির্ম্মাণের জন্য মজুর মিস্ত্রীদের যাহা মজুরি দিতে হইত, তাহা আপনাদিগকে দেওয়া হইবে। আপনারা তাহা দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইয়া দিবেন।

এণ্ড্রুজ্‌ সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে আমরা উঠিলাম। অতঃপর আহারাদি করিয়া যথাসময়ে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলাম। আমাদের দুইজন কিন্তু সে রাত্রি সেখানে রহিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

আমার য়ুরোপ ভ্রমণ

য়ুরোপে গিয়াছি ভ্রমণ করিবার জন্য; নানাস্থান, নানা দ্রব্য দেখিবার জন্য! ঘরের মধ্যে ইজি চেয়ারে বসিয়া থাকিলে ত তাহা হয় না। কাজেই আহারাদি শেষ করিয়া মধ্যাহ্নের পরেই আবার বাহির হইলাম। আমাদের পথ-প্রদর্শক মহাশয় খুব জানা শুনা মানুষ; য়ুরোপের কোথায় কি আছে, তিনি তাহার সমস্তই জানেন—ভ্রমণকারীদিগকে দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইয়া বেড়ানই তাঁহার কাজ—সেই জন্যই তিনি তাঁহার কোম্পানীর নিকট বেতন পান; সুতরাং তাঁহার আলস্য নাই। তিনিও তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলেন।

আমরা প্রথমেই ভোমেরো শৈলের উপরে নির্ম্মিত সেণ্ট মার্টিণো যাদুঘর দেখিতে গেলাম। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সে দিন আকাশে একটুও মেঘ ছিল না। আমরা সেই জন্য এই শৈলের উপর হইতে অদূরে নেপল্‌স্ সহর ও বিসুবিয়স্ পর্ব্বত বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

এই যাদুঘরে বিখ্যাত চিত্রকরগণের চিত্রিত বহুমূল্য সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিলাম। তাহার মধ্যে একখানি চিত্র অতি সুন্দর; তাহার নাম "খৃষ্টের ক্রস হইতে অবতরণ (Descent from the Cross) এখানি ইটালীর প্রখ্যাত-নামা চিত্রকর ষ্ট্যানজিওনির অঙ্কিত। চিত্রখানির স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ এই যে, সেই সময়ের আর একজন বিখ্যাত চিত্রকর রহিবেরা ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া এই চিত্রখানি এমন করিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন। রহিবেরার উৎকৃষ্ট চিত্র এই যাদুঘরে রহিয়াছে দেখিলাম! আর এক-খানি চিত্র দেখিলাম; তাহার নাম 'জুডিথ্' (Judith) এখানি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর লুকা গিওরডানো ৭২ বৎসর বয়সের সময় আটচল্লিশ ঘণ্টায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল যে সপ্ততিপর বৃদ্ধ আটচল্লিশ ঘণ্টায় এমন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তিনি বহুদিন পূর্ব্বে যদি বেশী সময় লইয়া অন্য কোন চিত্র অঙ্কিত করিতেন, তাহা হইলে সে চিত্র না জানি কেমনই হইত।

এই যাদুঘরের একটি প্রকোষ্ঠে কতকগুলি আসবাব-পত্র দেখিলাম। এ গুলি নানা কারণে বহুমূল্য। একে ত জিনিসগুলিই উৎকৃষ্ট ও সুন্দর; তাহার পর সেগুলির সহিত অনেক পুণ্যশ্লোক মহাত্মার স্মৃতি জড়িত আছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নেপল্‌স্ সহর যখন ইটালী রাজ্যের অন্তর্গত হয়, সেই সময়ে ভিক্টর ইমানুয়েল, গারিবল্ডি ও ম্যাট্‌সিনি যে গাড়ীতে চড়িয়া নগর প্রবেশ করেন, সেই গাড়ীখানি এই যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। এই যাদুঘরটি পূর্ব্বে ভজনালয় ছিল। ভিক্টর ইমানুয়েল এই দেশ জয় করি-বার পর এখানে যাদুঘর সংস্থাপিত হইয়াছে। এই যাদু-ঘর দেখিতে দেখিতেই অপরাহ্ন কাটিয়া গেল, আর কোথাও যাওয়া হইল না। তাই কি এই যাদুঘরের সমস্ত জিনিস দেখিতে পাইলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া আমরা বিসুবিয়স্ পর্ব্বত দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। পথে পোটিসি ও রেসিনা নামক দুইটি ক্ষুদ্র গ্রাম অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাহার পর পাগ্‌লিয়ানো নামক স্থানে গমন করিয়া আমরা গাড়ী ছাড়িয়া ইলেক্ট্রিক ট্রামে আরোহণ করিলাম। কিন্তু আমরা এই ট্রামে অধিক দূর যাইতে পারিলাম না, কারণ সেবারকার এপ্রিল মাসে বিসুবিয়সের যে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল, তাহাতে খানিকটা পথ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ট্রামে যাইতে এক এক স্থান এমন উচ্চ যে মনে হইতে লাগিল, গাড়ী হয় ত পড়িয়া যাইবে। আমরা পর্ব্বত-পার্শ্বে যেখানে নামিলাম, সেইস্থান হইতে সেবারকার অগ্ন্যুৎপাতের কাণ্ড বেশ দেখিতে পাইলাম। চারিদিকে প্রায় দশ পনর ফিট পুরু হইয়া ভস্মরাশি পড়িয়া রহিয়াছে। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য না লইয়াও আমরা দেখিতে পাইলাম যে, তখনও বিসুবিয়-সের শিখরদেশ হইতে গলিত ধাতু নিঃসৃত হইয়া পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া পড়িতেছে। আমরা দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই দেখিলাম যে, পর্ব্বতের শিখর হইতে হঠাৎ ধূম-রাশি ও অগ্নিশিখা উঠিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে একটা বড় আমোদজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া বিসুবিয়স্ দেখিতেছিলাম, তাহা-

রই নিকটে একদল আমেরিকাবাসী ভ্রমণকারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মাষ্টার, আপনি কি এক-জন ভারতীয় রাজা ?" এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলাম, কারণ আমি এই ভ্রমণপথে কোথাও কাহারও নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করি নাই ; জিজ্ঞাসা করিলে সোজাসুজি বলিয়াছি আমি একজন ভারতবাসী মাত্র, দেশভ্রমণে আসিয়াছি ; কিন্তু এই ভদ্রলোকটি যে ভাবে আমাকে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে আমার আত্মগোপন করা সম্ভবপর হইল না ; আমি তাঁহাকে আমার পরিচয় প্রদান করিলাম। তাহার পর তিনি যাহা বলিলেন, তাহা বড় কৌতুহলজনক। তিনি বলিলেন, "শুনুন মহাশয়, ভারতীয় কোন রাজার সহিত করমর্দ্দন করিবার সুযোগ লাভ করিবার জন্য আমি কত চেষ্টা করিয়াছি। এইটি আমার জীবনের বড় সাধ। মহাশয় কি আমাকে আপনার কর-মর্দ্দন করিবার গৌরবলাভ করিতে দিবেন ?" ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া আমার হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়িল। যাহা হউক, তিনি যে ভাবে এবং যে প্রকার বিনয় সহকারে কথা কয়টি বলিলেন, তাহাতে তাঁহার "জীবনের বড় সাধ" পূর্ণ করিতে আমি ক্রটী করিলাম না। আমি মনে করি-লাম, এই স্থানেই বুঝি এ পর্ব্বের শেষ ; কিন্তু তাহা হইল না। ভদ্রলোক তখন সেই দল হইতে তাঁহার ভ্রাতা, কএকটি ভাগনী এবং পাঁচ সাতটি খুড়া খুড়ী, দাদা দিদিকে আনিয়া আমার সহিত পরিচিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কি করা যায়, আমি সকলের সহিত করমর্দ্দন করিয়া এবং তাঁহাদের পরিচিত হইয়া যে বিশেষ আনন্দিত হইলাম, এই প্রকার দুই একটি শিষ্টাচার সম্মত কথা বলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলাম।

গ্রোটো

এইস্থান হইতে বাহির হইয়া আমরা বিসুবিয়সের মান-মন্দির (observatory) দেখিতে গেলাম। সেখানে পুর্ব্ব-তন অগ্ন্যুৎপাতের স্মৃতিচিহ্ন সকল রক্ষিত হইয়াছে। এই মানমন্দিরের সুপারিণ্টেনডেণ্ট অধ্যাপক ম্যাটুসি বড় ভাল লোক। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেখাইলেন এবং অনেক জিনিসের বৃত্তান্ত বলিলেন। তিনি বলিলেন যে,

বিগত অগ্ন্যুৎপাতের সময় যখন সকলেই স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তখন তিনি এই মানমন্দির ত্যাগ করিয়া যান নাই; একাকী এই স্থানে ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, সে সময় থাকিয়া থাকিয়া কামান-গর্জ্জনের মত শব্দ হইতে লাগিল এবং গলিত ধাতুদ্রব্য সকল কামানের গোলার মতই মানমন্দিরের চারিদিকে এবং ঐ অট্টালিকারও উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। আমি এখানে বিশেষ আগ্রহের সহিত একটি দ্রব্য পরিদর্শন করিলাম। এই মানমন্দিরে ভূমিকম্পের বিষয় অবগত হইবার সমস্ত যন্ত্রের সন্নিবেশ দেখিলাম। অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন যে,পৃথিবীর যেখানে যত সামান্য ভূমিকম্পই হউক না কেন, এখানে তাহা এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। তিনি বলিলেন যে, এই সকল সুন্দর যন্ত্রের সাহায্যে তিনি, বিগত এপ্রিল মাসে যে অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহার সংবাদ অনেকদিন পূর্ব্বেই দিয়াছিলেন এবং স্থানীয় লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর যে কয়বার অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের অগ্ন্যুৎপাতই ভীষণ ও প্রবল। এবার যে ভাবে এবং যে প্রকার প্রবলবেগে ধাতুনিঃস্রাব আরম্ভ হইয়াছিল এবং ভস্মরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যদি সেইপ্রকার বেগে আর ২৪ ঘণ্টা ধাতুনিঃস্রাব এবং ভস্মরাশি বিক্ষিপ্ত হইত, তাহা হইলে এইবারই সেই সেকালের পম্পিয়াইয়ের দশা নেপ্‌ল্‌সের অদৃষ্টে ঘটিত।

আজ আমরা সারাদিন বেড়াইব বলিয়াই হোটেল হইতে বাহির হইয়াছিলাম; তাই এ'রিমো নামক স্থানে কুক কোম্পানীর একটি হোটেলে আহারাদি কার্য্য শেষ করিয়া পম্পিয়াই দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। যাইতে যাইতে যে সমস্ত গ্রাম দেখিলাম এবং যে সকল রাস্তা দিয়া গেলাম, সে সকল স্থানই ভস্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে। তাহার পরই আমরা সেই ভস্মস্তূপে সমাহিত মহানগরীতে প্রবেশ করিলাম। তখনও নগরের এক পার্শ্বে খননকার্য্য চলিতেছে; প্রতিদিনই নূতন নূতন, পথ ঘাট বাড়ী ঘর লোকলোচন-পথবর্ত্তী হইতেছে। পম্পিয়াই নগরীর পুরাতন সমৃদ্ধ এবং বর্ত্তমান অবস্থার কথা পাঠকগণ অবগত আছেন; কত লেখক কত ভ্রমণকারী, কত ঔপন্যাসিক তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মাস দুই পূর্ব্বে এই 'ভারতবর্ষ' পত্রে পম্পিয়াইয়ের সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং আমি আর সে সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিব না। পাঠকপাঠিকাগণ সেই বৃত্তান্ত পাঠ করিলে সেই সকল চিত্র দেখিলেই পম্পিয়াই নগরীর কথা সমস্ত জানিতে পারিবেন। পম্পিয়াই নগরী দর্শন করিয়া এবং ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিষাদভারে অবনত হইল। মানুষের চেষ্টা, যত্ন, সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য, বিলাসিতার নশ্বরত্ব মনে হইয়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমি মনে করিলাম, এই ত এত বড় নগরীর দশা। ইহারই জন্য এত মারামারি এত কাটাকাটি, এত হিংসা দ্বেষ, এত পরশ্রীকাতরতা। কয়দিনের জন্য এ সকল? অথচ এই লইয়া কত দর্প, কত অহঙ্কার। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমরা পম্পিয়াই নগরীর নিকট বিদায়-গ্রহণ করিয়া নেপল্‌সে ফিরিয়া আসিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পর হোটেলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম ভীষণ-দর্শন বিসুবিয়স তখন অগ্নিময় মুকুট মাথায় দিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; তখনও চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিস্ফুরিত হইতেছে। কি অলৌকিক দৃশ্য! সে রাত্রিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পম্পিয়াই নগরীর কথাই মনে হইতে লাগিল; মনে হইল—

"The paths of glory lead but to the grave"

"নর-গরিমার শেষ শ্মশান শয্যায়।"

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা সন্নিহিত কাপ্রী দ্বীপ দেখিতে গিয়াছিলাম। নেপল্‌সের খাড়ি হইতে ছোট ছোট ষ্টীমারে দর্শকগণ এই দ্বীপ দেখিতে যান। ষ্টীমারখানি একেবারে ঐ দ্বীপের বন্দরে লাগে না, একটু বাহিরে থাকে। এই দ্বীপের একটি প্রধান, অথবা একমাত্র দ্রষ্টব্য স্থান একটি গহ্বর। আমরা ষ্টীমার হইতে নৌকাযোগে সেই গহ্বরের নিকট উপস্থিত হইলাম। বাহির হইতে তেমন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সেই গুহার মুখের পরিসরটা খুব প্রশস্ত নহে। নৌকা লইয়াই সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সমুদ্রের জল একটু বেগে সেই গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; যাওয়ার সময় তেমন কষ্ট

হয় না ; কিন্তু বাহির হইবার সময় বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় ; সমুদ্রের ঢেউ এবং জলের স্রোতে নৌকাকে উজান ঠেলিয়া আসিতে হয়। গুহায় প্রবেশকালে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইয়াছিল ; গুহার মুখ এমন অপরিসর যে নৌকার উপর সোজা হইয়া বসিয়া থাকিলে উপরের পাহাড় মাথায় ঠেকিয়া যায় ; সেই জন্য নৌকার উপর উবু হইয়া থাকিয়া গুহায় প্রবেশ করিতে হয়। ভিতরটা কিন্তু তেমন অপ্রশস্ত নহে। গুহার মধ্যভাগ তেমন অন্ধ-ছিল। ইতিহাস বলে যে, উপরিউক্ত মহানুভব সম্রাট্ দয়াপরবশ হইয়া বন্দীদিগকে এই কাপ্রীর পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া তাহাদিগের ভবযন্ত্রণা শেষ করিয়া দিতেন। ইতিহাস আরও বলে যে, বিশ্ববিশ্রুত সম্রাট্ নিরো না কি এই কাপ্রীর পাহাড়ের উপর হইতে পূর্ব্বোক্ত গুহায় যাইবার জন্য একটি সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সুড়ঙ্গ-পথে নামিয়া তিনি ঐ গুহার জলে স্নান করিতেন। উপরের সেই সুড়ঙ্গপথ এখন বন্ধ হইয়া

সান এল্মো দুর্গ।

কার নহে, গুহার মধ্যের জলরাশি কেমন সবুজবর্ণের। সেই জলের বর্ণ চারিপাশের গুহাগাত্রে প্রতিফলিত হইয়া অতি সুন্দর দেখায়। আমরা গুহার মধ্যে কিছুক্ষণ থাকিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। অদূরেই আমাদের ষ্টীমার ছিল ; কিন্তু সকল যাত্রী ষ্টীমারে না উঠিলে সে ত আর নেপল্সে যাইতে পারিবে না। ইহাই মনে করিয়া আমরা যে নৌকায় গুহা-প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই নৌকা লইয়াই কাপ্রী সহর দেখিতে গেলাম। বন্দরে পৌছিয়া আমরা একখানি ফিটন ভাড়া করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই সহরে রোমান আমলের অনেক ভগ্নস্তূপ আছে ; তাহার মধ্যে সম্রাট্ টাইবিরিয়সের স্নানাগারও গিয়াছে। এই কাপ্রী সহর এক সময়ে ইংরেজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। তাহার পর সম্রাট্ নেপোলিয়নের আদেশে তাঁহার সেনাপতি মুরাট ইংরেজের সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বাধা জন্মাইবার জন্য এই স্থান অধিকার করেন। এই সকল দেখিতে দেখিতেই অনেক বেলা হইয়া গেল ; তখন একটা হোটেলে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া আমরা ষ্টীমারে ফিরিয়া আসিলাম এবং সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই নেপল্সে উপস্থিত হইলাম। সে দিনের মত বিশ্রাম।

এইস্থানে নেপল্স্ সহর সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা বলিয়াই আমরা এখানকার ভ্রমণ-কথা শেষ করিব। নেপল্স্ সহর দেখিলেই মনে হয় যে, এটা ভজনালয়ের সহর, কারণ আমি

বোধ হয় কম করিয়া হইলেও প্রায় তিন শত ভজনালয় এই সহরে দেখিয়াছি। এখানকার লোকে এখনও রোমের পোপের আধিপত্য স্বীকার করিয়া থাকে। এই সহরের প্রত্যেক গলিরই একজন করিয়া সেণ্ট বা পীর আছেন, এবং সেই সকল পীরের সম্মানার্থ প্রত্যেক গলিতেই গীর্জ্জা। তাহা ছাড়া কুমারী মেরী মাতার মন্দিরেরও অবধি নাই। আর এখানে পর্ব্ব ত লাগিয়াই আছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে বলে "বারমাসে তের পার্ব্বণ"; এখানে বার মাসে তিন তেরং উনচল্লিশ পার্ব্বণ। আর তাহা হইবারই কথা; প্রত্যেক সেণ্ট বা পীরের আবির্ভাব তিরোভাব উপলক্ষে পার্ব্বণের অনুষ্ঠান আছে। তাহা ছাড়া মেরী-মাতা, ও খৃষ্টের উপলক্ষে মহাসমারোহে শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকে। যে দিন সে দিনই শুনিতে পাওয়া যায়, আজ অপরাহ্নকালে বা সন্ধ্যার পর অমুক সেণ্টের শোভাযাত্রা বাহির হইবে; সুতরাং এই সহরে মহোৎসব লাগিয়াই আছে। তাহার পর দেশে বৃষ্টি হইতেছে না; পুরোহিতেরা ঘোষণা করিলেন যে, অমুক সেণ্টের অশ্রু-পাতেই এই অনাবৃষ্টি। তখনই পুরোহিতেরা পাঁতি দিলেন যে, অমুক অমুক সেণ্টের ষোড়শোপচারে পূজা দিতে হইবে, এই প্রকার সমারোহে মহোৎসব ও শোভাযাত্রা করিতে হইবে। দেশের লোকেরা তখনই তাহার আয়োজনে লাগিয়া গেল। তাহার পর যদি বৃষ্টি হইল, তখন আবার পূজা, আবার মহোৎসব, আবার মহা আয়োজনে শোভাযাত্রা। আমি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছি না; আমি এই ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধাও করি না; কিন্তু ইটালীর দক্ষিণাংশের এই সকল ব্যাপার দেখিয়াও আমার মনে হইয়াছিল যে, এ দেশের লোককে সুশিক্ষা-প্রদানের চেষ্টা মোটেই হইতেছে না। ইহারা অন্ধভাবে পুরোহিতগণের কথাতেই চালিত হইতেছে। কোথায় পুরোহিতগণ দেশের লোককেও উচ্চ ধর্ম্মভাব শিক্ষা দিবেন, যাহাতে তাহারা জ্ঞানী ও উন্নত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন; তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা সেই সনাতন প্রথারই প্রচার করিতেছেন এবং অশিক্ষিত লোকেরা সেই একভাবেই চালিত হইয়া আসিতেছে। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। পাঠকগণ শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে, ইটালীর দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা এখনও ডাইনীর দৃষ্টিকে এত ভয় করে, যে, তাহারা সেই দৃষ্টি এড়াইবার জন্য কত তুকতাক করে, গৃহদ্বারে গরুর শিং বাঁধিয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস যে, দ্বারে গরুর শিং ঝুলান থাকিলে ডাইনীরা গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এমন কি অনেকে তাহাদের ঘড়ির চেনের সঙ্গে একটুকরা শিং সোণা কি রূপার দ্বারা বাঁধাইয়া ঝুলাইয়া রাখে; ইহাতে ডাইনীর দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় বলিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে, ইটালীর প্রধান রাজনৈতিক ক্রিস্পী মহাশয় যখন রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিপক্ষদল কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যে পরাজিত হইলাম, তাহার কারণ আছে। আজ আমি আমার সেই শৃঙ্গ সম্বলিত চেনটা পরিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" অন্যে পরে কা কথা!

এ দেশের রাস্তায় অকর্ম্মা লোক এবং দুষ্ট ছেলে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা যে বিশেষ কোন কাজকর্ম্ম করে, তাহা ত বোধ হয় না। কোন বিদেশীয় লোক, বিশেষতঃ ভারতবাসী কালা আদ্‌মী দেখিলে, এই দুষ্ট ছেলেরা তাহাদিগকে নানা প্রকারে বিরক্ত করিয়া থাকে। কেহ যদি বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহা হইলে ইহারা তাহাকে আরও পাইয়া বসে; আর কেহ যদি তাহাদের এই দুষ্ট ব্যবহার হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, তবে তাহারা নিরস্ত হয়। এত নিষ্কর্ম্মা দরিদ্র লোক এখানে কেন, আমি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। এখানে লোকে নিজেদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি না করিয়াই বিবাহ করিয়া থাকে; সুতরাং দরিদ্রের পাল বাড়িতে থাকে। আর একটি কারণ আছে, এখানে মেয়েদের অতি বাল্যকালে বিবাহ হইয়া থাকে। আমি এখানকার পথে দেখিয়াছি, আঠার উনিশ বৎসর বয়সের মেয়ে পাঁচছয়টি ছেলে মেয়ে লইয়া বিব্রত। ইহাতে দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইবে না কেন? আর পথে ঘাটেই বা এত নিকর্ম্মা ভবঘুরে ছেলের পাল থাকিবে না কেন?

এখানকার অনেক বাড়ীতেই দেখিলাম, দ্বার জানালা-গুলি দৃঢ় গরাদে দ্বারা আবদ্ধ। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, এখানে বোধ হয় চোরের ভয় অত্যন্ত অধিক,

তাই গৃহসকল এই প্রকারে সুরক্ষিত। তাহার পর শুনিলাম যে, এ প্রকার সুরক্ষিত গৃহের কারণ তাহা নহে। এখানে অপরের পত্নী বা কুমারী কন্যা লইয়া পলায়নের সংখ্যা নাকি অত্যন্ত অধিক। সুযোগ পাইলেই যুবকগণ কাহারও সুন্দরী কুমারীকে ভুলাইয়া লইয়া প্রস্থান করিয়া থাকে। ইহাই নিবারণের জন্য জানালা দরজা এমন করিয়া সুরক্ষিত করা হইয়া থাকে। কথাটা শুনিয়া আমি হাস্যসংবরণ করিতে পারিলাম না; আর যাহা ভাবিলাম; তাহা আর বলিয়া কাজ নাই। এখানে এই প্রেমের খেলা উপলক্ষে সর্ব্বদাই মারামারি, কাটাকাটি নরহত্যা প্রভৃতি হইয়া থাকে। তাহার বিশেষ বিবরণ আর বলিয়াও কাজ নাই, শুনিয়াও কাজ নাই।

পরদিনই আমরা নেপল্‌স্ ত্যাগ করিয়া রোমের দিকে অগ্রসর হইলাম। রোমের কথা আগামী সংখ্যায় বলিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্ মহতাব্

প্রবাদ-প্রসঙ্গ

[১]

আমাদের দেশে স্মরণাতীতকাল হইতে বহুতর প্রবাদ-বাক্য জন-সমাজে প্রচলিত আছে। উহাদের রচয়িতা কে, কোন্ কালে কি উপলক্ষে কোন্‌টি রচিত, তাহা বর্ত্তমান কালে নিঃসংশয়রূপে নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। কিন্তু প্রবাদ-বাক্যগুলি সর্ব্বশ্রেণীর সকল লোকের নিকট এতই সুপরিচিত এবং স্থান বিশেষে প্রযুক্ত হইলে এতই হিতকর ও শিক্ষাপ্রদ বলিয়া বোধ হয় যে, তাহা সুদীর্ঘ বক্তৃতা-শ্রবণে বা প্রকাণ্ড গ্রন্থ পাঠ দ্বারা হইতে পারে না। প্রবাদ গুলি আমাদের সাধারণ জনসমাজে উপদেষ্টার কার্য্য করিয়া থাকে। এমন লোক নাই, যিনি অন্ততঃ ২।৪টি প্রবাদ-বাক্য না জানেন, বা সময়-বিশেষে কথাবার্ত্তায় তাহা প্রয়োগ না করেন।

প্রবাদগুলিকে দুইশ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক খাঁটি প্রবাদ, আর প্রবচন। কোন বিশেষ ঘটনা-বিজড়িত ও বহুলোক-পরিজ্ঞাত বাক্যগুলিই প্রবাদ এবং যাহা কোন পণ্ডিতের উর্ব্বরমস্তিষ্কপ্রসূত হইয়া গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ ও পরে একটু উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাকেই আমি প্রবচন বলি। অবশ্য কোন প্রবচন অতি সুপরিচিত হইয়া উঠিয়া প্রবাদের তালিকাভুক্ত হইতে পারে—এবং প্রকৃত প্রস্তাবে হইয়াছেও তাহাই, কিন্তু প্রবাদ প্রবাদই রহিয়া গিয়াছে, সে আর প্রবচনের গণ্ডীতে প্রবেশের চেষ্টা করে নাই। ফলে প্রবাদ গুলি উচ্চ নীচ সর্ব্বশ্রেণীর লোকের এজমালী সম্পত্তি, কিন্তু প্রবচনগুলি শিক্ষিত—নেহাৎ না হয় শুদ্ধ বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট লোকদিগের একচেটিয়া বিষয়। তজ্জন্য প্রবাদসমূহ বহু-বিস্তৃত এলাকা লইয়া ভ্রমণ করে, প্রবচনগুলি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে শৃঙ্খলিত। সংস্কৃত অভিধানে প্রবচনের অর্থ—প্রকৃষ্ট বচন, অর্থানুসন্ধান পূর্ব্বক কথন * প্রভৃতি লিখিত আছে। অমর-কোষে দেখিতে পাওয়া যায়—

"অনুচানঃ প্রবচনে সঙ্গেঽধীতী গুরোস্তু যঃ।
লব্ধানুজ্ঞঃ সমাবৃত্তঃ সুত্বা ত্বভিষবে কৃতে॥"

মুণ্ডকোপনিষদে আছে,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।"

সুতরাং সোজা কথায় বলা যাইতে পারে, বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক ও বিশেষ বিবেচনা সহকারে প্রবচনগুলি বুধমণ্ডলীর মস্তিষ্ক হইতে সঞ্জাত হইয়াছে।

প্রবাদের সাধারণ অর্থ—জনশ্রুতি, জনরব বা জন-সমাজে প্রচলিত প্রসিদ্ধ বাক্য। অলঙ্কারকৌস্তুভে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

---

* প্রবচনের অপর এক অর্থ বেদাঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়,—
"অঙ্গাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ।" মনুসংহিতা।

"প্রেয়াং স্তেহহং ত্বমপি চ মমপ্রেয়সীতি প্রবাদ-
স্ত্বংমে প্রাণা অহমপি তবাস্মীতি হন্তপ্রলাপঃ।
ত্বংমেতেহস্মামহপি চ যত্তচ্চনো সাধুরাধে।
ব্যবহারে পৌনতি সমুচিতে যুষ্মদস্মৎ প্রয়োগঃ॥"

প্রবচন অপেক্ষা প্রবাদের প্রচলন ও প্রসিদ্ধিই সমধিক। আমি প্রায় ১০।১২ বৎসর হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত প্রবাদ বাক্যগুলি সংগ্রহ করিতেছি এবং সাধ্যানুসারে তাহার মূলানুসন্ধান করিয়াছি। উহার কতকগুলি আমার সম্পাদিত 'উৎসাহ' ও 'আলোচনা' পত্রিকায় এবং কতকগুলি 'বীরভূমি' 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় ১৩০৭।১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়। অবশিষ্টগুলি এক্ষণ পর্য্যন্ত আর প্রকাশ করা হয় নাই। এক্ষণে 'ভারতবর্ষের' স্বত্বাধিকারী মহোদয়ের অনুরোধে আমার সংগৃহীত প্রায় সহস্র প্রবাদবাক্য এই পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রবাদ-বর্ণিত 'ঘটনা' সম্বন্ধে যদি কোনও পাঠকের বিভিন্নতর গল্প জানা থাকে, তবে কৃপা করিয়া জানাইলে অনুগৃহীত হইব। প্রবাদগুলির মূল ও ঘটনা উদ্ধার করিতে পারিলে, দেশের প্রাচীন আচার, নিয়ম, সামাজিক ব্যবহার, এমন কি সামান্য সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনাও জানা যাইতে পারে। সুতরাং প্রবাদগুলির বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

(১) অন্ন চিন্তা চমৎকারা।

মহাকবি কালিদাসকে বিচারে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে একদা বররুচি প্রভৃতি নবরত্নগণ কালিদাসের পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আমরা কিছুতেই কালিদাসকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারি নাই। অদ্য কালিদাস যখন রাজসভায় যাত্রা করিবেন, তখন আপনি তাঁহাকে "ঘরে অন্ন নাই" মাত্র এই কথা তিনটি বলিলে আমরা অনুগৃহীত হইব। কালিদাস-পত্নী স্বীকৃতা হইলে রত্নগণ প্রস্থান করিলেন। পরে কালিদাস উত্তরীয়-বসন লইয়া রাজসভায় যাইতে উদ্যত হইলে, তদীয় পত্নী আসিয়া এক গাল হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"ঘরে অন্ন নাই—চা'ল বাড়ন্ত!"

কালিদাস চিন্তাকুলিত চিত্তে রাজসভায় উপনীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে একটি শ্লোক পূরণ করিতে বলিলে, কালিদাস বলিলেন,—

দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্ব্বে ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নিবৎ।
অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ॥

মহারাজ! দরিদ্রব্যক্তির গুণসমূহ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ প্রকাশ হইতে পারে না। অন্নচিন্তা অতি চমৎকার; দরিদ্রের কবিতা স্ফুরণ কেমন করিয়া হইবে?

নবরত্নগণের মনোবাসনা পূর্ণ হইল, তাঁহারা কালিদাসের এই পরাভবে মহা আনন্দিত হইলেন। কিন্তু কালিদাস যে মহামূল্য বচনটি বলিলেন, তাহার মর্ম্ম তখন তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তাই রাজার সভাসদ্ ঘটকর্পূর বলিয়াছেন,—

(২) দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।

দরিদ্রব্যক্তির সকল গুণই ঢাকা থাকে।

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্যদোষোগুণরাশিনাশী॥

যাহারা বলেন যে, চন্দ্রের কলঙ্ক চন্দ্রের গুণরাশিতে ঢাকিয়া থাকে। আমার মতে তাহারা কিছুই দেখেন না। কারণ একটিমাত্র মহদোষে সমস্ত গুণরাশি বিনষ্ট হয়,—যেমন একমাত্র দারিদ্র্য-দোষে সমস্ত গুণরাশি নষ্ট হয় অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তির গুণরাজি প্রকাশিত হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না।

কালিদাস কিন্তু কুমার-সম্ভবে একটি প্রবচনে ইহার বিপরীত উক্তি করিয়াছেন।

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥
"নিমজ্জিত ক্ষুদ্র দোষগুণের ভিতর,
চন্দ্রের কলঙ্ক যথা কিরণে বিলীন।"

তাই দেখিয়া মনে হয়—

(৩) কাঠ পাথরে বিশেষ কি?

সমান গুণবাচক দুইটি পদার্থের তুলনায় লোকে বলিয়া

থাকে, "কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?" এই প্রবাদের সৃষ্টি-কর্ত্তা কে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন। আমরা নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাঠক-গণের গোচরীভূত করিতেছি।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ রসসাগরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—'কাঠপাথরে বিশেষ কি ?'

রসসাগর তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি-বলে উত্তর দিয়াছিলেন,—

রামচন্দ্রের বনবাসকালে তাঁহার পদরেণু-স্পর্শে পাষাণী-ভূতা অহল্যা মানবী হইয়াছিলেন, এই কথা শ্রবণে অনে-কেই বিস্মিত হন। কিয়দ্দিবস পরে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যের নদী অতিক্রম-মানসে এক পারাণির নৌকায় আরোহণ করিলে, মাঝি বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে তাঁহার মুখপানে দৃষ্টিপাত করিয়া সকাতরে বলিয়াছিল,—

"মানুষীকরণরেণুরস্তিতে, পাদয়োরিতি কথা প্রথায়সী।
ক্ষালয়ামি তব পাদপঙ্কজে, নাথ দারুদৃষদণ্ডকান্তিদা॥"

আমাদের কোন কবি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন,—

"আমার চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো,
পরের বাড়ী হবিষ্যি।
আমার নাহি লক্ষ্মী দীনদুঃখী,
কতকগুলিন শিষ্যি।
তোমার ঠেক্‌লে পা, ঘুচাব না (নৌকা),
না হয়ে যাবে মনিষ্যি ;
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
'কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?"

(৪) দশচক্রে ভগবান্ ভূত।

কোন এক রাজার ভগবান্ শর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ মোসাহেব ছিল। ভগবান্ রাজাকে এতদূর বশীভূত করিয়াছিল যে, সে যাহা বলিত রাজা ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া তদ্দণ্ডেই তাহা প্রতিপালন করিতেন,—যেন ভগ-বান্‌ই রাজা, প্রকৃত রাজা কেহ নয় অথবা কর্ম্মচারী মাত্র। ক্রমে ভগবানের প্রতাপ এতই বর্দ্ধিত হইল যে, দ্বারবান হইতে দেওয়ানজি পর্য্যন্ত, এমন কি স্বয়ং রাণীও উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, রাজবৈদ্য রাজসমীপে উপনীত হইয়া জ্ঞাপন করিবে যে, ভগবান্ সহসা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া কাল-কবলে কবলিত হইয়াছে। যুক্তি স্থির হইল, প্রধান কর্ম্মচারী, প্রতিহারী ও অপরাপর যাবতীয় রাজভৃত্যকে আজ্ঞা করি-লেন যে, ভগবান্ যেন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে এবং কোন প্রকারে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইতে না পারে। সকলেই ভগবানের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ব্যথিত ক্লিষ্ট ও হইয়াছিল, সুতরাং কেহই তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিল না। অনন্তর কএক দিবস ভগবান্‌কে দেখিতে না পাইয়া, রাজা তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বৈদ্য এবং অপর সকলে তাঁহাকে ভগবানে মৃত্যুর কথা জানাইয়া শোক প্রকাশ করিল। এদিকে ভগবান্ রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিবার জন্য প্রত্যহ দুইবেলা দৌবারিকের পাদ সংবাহনে প্রবৃত্ত হইল। প্রহরীরাও তাহাকে হাতে পাইয়া তাহার উপর চোখ ঘুরাইতে এবং সতেজ বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।

যাহা হউক্ ভগবান্ রাজদর্শনের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একদিন সুযোগও মিলিল। সে শুনিতে পাইল রাজা নগর-পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছেন। কিন্তু পথে দাঁড়াইয়া রাজাকে তাহার দুর্দ্দশার কথা বলা সহজ নহে, (কারণ রাজানুচরগণ পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে দূরান্ত-রিত করিতে সচেষ্ট ছিল) বিবেচনা করিয়া ভগবান্ পথ-পার্শ্ব-স্থিত একটি উচ্চ বৃক্ষশিরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজা তরুমূলে উপনীত হইবামাত্র, ভগবান্ উচ্চৈঃস্বরে নিজ দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল। রাজা ভগবানের পুন-রাবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পারিষদগণ রাজাকে বুঝাইল যে, ভগবান্ মরিয়া ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজাও কৈফিয়তে তুষ্ট হইয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। তখন ভগবান্ সখেদে বলিতে লাগিল—

চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যঃ ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ।
অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাৎ ভগবান্ ভূততাং গতঃ॥

হায়! দশে কি না করিতে পারে? বীরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু সপ্তরথীর হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। অবশেষে ক্ষুদ্র আমি —আমিও দশচক্রে ভূত হইলাম!

তাই কথায় বলে——

(৫) দশে মিলে করি কাজ,
হারি জিতি নাহি লাজ।

দশজনে যুক্তি পরামর্শ পূর্ব্বক কার্য্য করাই কর্ত্তব্য, তাহাতে কার্য্য পণ্ড হইলেও বিশেষ পরিতাপের কারণ থাকে না। দশজনের মধ্যে যদি কেহ নীচ বা নগণ্য ব্যক্তি থাকে, তবে তাহাকেও অগ্রাহ্য করা উচিত নয়; কারণ ঐরূপ দশটি নগণ্য মিলিয়াই বৃহৎ কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। তাই নীতিকার বলিয়াছেন,—

(৬) তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।

এক ভদ্রসন্তানের প্রতি মা ষষ্ঠীর বড়ই কৃপাদৃষ্টি ছিল। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রাতাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। প্রত্যহই তাহারা মারামারি গালাগালি করিত। পিতা তাহাদিগকে কত ভাল কথায় বুঝাইতেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চরিত্র সংশোধন হইল না। তখন তিনি ভাবিলেন, কথায় উপদেশে ত কিছু হইল না, এখন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদের জ্ঞান-নেত্র ফুটাইতে পারি কি না দেখি।

এইরূপ চিন্তা করিয়া একদা তিনি পুত্রগণকে ডাকিয়া কতকগুলি কঞ্চি দিয়া আঁটী বাঁধিতে বলিলেন। আঁটী বাঁধা হইলে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে বলিলেন,—"বাপু হে! তুমি এই কঞ্চির আঁটীটা ভেঙ্গে ফেল ত দেখি?" সে বিস্তর চেষ্টা করিল, অশেষ পরিশ্রম করিল, কিন্তু আঁটীটা ভাঙ্গা ত দূরের কথা একটু বাঁকাইতেও পারিল না! ভদ্রলোকটি তৎপরে একে একে সকল পুত্রকেই আঁটীটা ভাঙ্গিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু কেহই সমর্থ হইল না। অবশেষে পিতা আঁটী খুলিয়া একখানি কঞ্চি জ্যেষ্ঠপুত্রের হস্তে দিয়া তাহা ভাঙ্গিতে বলিলেন। পুত্র অক্লেশে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন পিতা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —"দেখ বৎসগণ! যতদিন তোমরা মিলে মিশে একত্র থাকবে, ততদিন শত্রুপক্ষ তোমাদের কিছুই করতে পারবে না, কিন্তু পৃথক্ হ'লেই তোমরা উচ্ছন্ন যাবে। ভায়ে ভায়ে সদ্ভাবে একত্র থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

"অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥"

যাঁহারা কারণে অকারণে ভিন্ন হইতে চান—একটুতেই তফাতে সরিয়া পড়েন, তাঁহারা এই অপূর্ব্ব নীতিবাক্যটি স্মরণ রাখিলে এবং তদনুসারে কার্য্য করিলে অকারণ লাঞ্ছনার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন। নতুবা—

(৭) বার রাজপুতের তের হাঁড়ি।

বার রাজপুত্রের তের হাঁড়ির ন্যায় পদে পদেই প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে এবং পরিশেষে ঋণজালে জড়িত হইয়া পরিবারবর্গের সহিত মনস্তাপ ও দারিদ্র্যযন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে।

(৮) ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

সেকাল আর নাই—এক্ষণে ঠাঁই ঠাঁই হইতে গেলেই দেশ ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হইয়া বিস্মৃতির অতল গহ্বরে চির নিমজ্জিত হইতে হইবে। ভগবান্ করুন, আমরা দেশবাসী সকলে যেন একতাবদ্ধ হইয়া দশের সেবা করিতে পারি।

(৯) গোদের উপর বিষফোড়া।

পর্ব্বতরাজপুত্র মলয়কেতু চাণক্যের কুটিল নীতিজালে বিভ্রান্ত হইয়া অমাত্য রাক্ষসকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া, একে একে সমস্ত দোষের উল্লেখ পূর্ব্বক যখন বলিলেন,—

"তীব্র বিষ সুবিষম, বিষকন্যা করিয়া প্রয়োগ
বিশ্বস্ত পিতায় তুমি করিলে নিধন।
গৌরবের মন্ত্রী পদে, শত্রুমনে দিয়া এবে যোগ
বেচিতেছ আমা-সবে মাংসের মতন।" *

তখন রাক্ষস মনে মনে চিন্তা করিল,—একে ত মহারাজের অলঙ্কার বিক্রয়, মুদ্রাদান প্রভৃতি অপরাধে দোষী বিবেচিত হইয়াছি, তদুপরি মহারাজের বধের নেতা বলিয়া

* মুদ্রা-রাক্ষস। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত।

কুমারের মনে সংস্কার জন্মিয়াছে। এ যে দেখি 'গণ্ডের উপর বিস্ফোট,'—তাৎপর্য্য এই যে, গণ্ডই একে যন্ত্রণাদায়ক, তাহার উপর বিষফোড়া—মহা অনিষ্টকর ও পীড়াদায়ক। সুতরাং আমার যে দেখি, দায়ের উপর দায় সমুপস্থিত। ভগবানের একি লীলা!

(১০) দৈবী-বিচিত্রা গতিঃ।

এক ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলে, এক বৃক্ষসমারূঢ়া কপোতী, ব্যাধ ও শ্যেনপক্ষীকে অবলোকন করিয়া ব্যাকুলিত চিত্তে তদীয় স্বামী কপোতকে বলিতেছে,—"হে নাথ! আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত! ঐ দেখ, নিম্নে ধনুর্ব্বাণ লইয়া ব্যাধ দণ্ডায়মান, আর ঐ দেখ অম্বরে শ্যেনপক্ষী পরিভ্রমণ করিতেছে। এরূপ স্থানে জীবনের আশা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।"

ব্যাধ শর ত্যাগ করিবে, এমন সময় একটি সর্প তাহাকে দংশন করিল। দষ্ট হইবামাত্র তাহার হস্তের শরও নিক্ষিপ্ত হইয়া শ্যেনপক্ষীর উদরে প্রবিষ্ট হইল। তাহারা উভয়েই তৎক্ষণাৎ ছিন্নদ্রুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ইহাই দেখিয়া কবি বলিলেন,—

কান্তং ব্যক্তি কপোতিকাকুলতয়া কান্তান্তকালোধুনা।
ব্যাধো ভো ধৃতচাপনি শিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রামাতি॥
ইত্থং সত্য মহিনা স দষ্ট ইষুণা শ্যেনোঽপি তেন হত।
স্তূর্ণং তৌ তেষামালয়ম্পরিগতৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ॥

দৈবের কি বিচিত্রা গতি। সত্যই—

(১১) ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র
ন বিদ্যা' ন চ পৌরুষম্।

অদৃষ্টই প্রধান। অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। সমুদয় দেবগণ মিলিয়া সমুদ্রমন্থন করিলেন, কিন্তু—

সমুদ্রমন্থনে লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরেবিষম্।
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষম্॥

বিষ্ণুর কপালে লক্ষ্মীলাভ হইল, আর ভোলানাথের কপালে তীব্র হলাহল মিলিল। তাই—

(১২) কপালং কপালং কপালং মূলং

কপালই মূল। তাই নীতিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

"স্বয়ম্ভূঃ শিবশক্তিবিষ্ণুঃ
কপালদুঃখং ন করোতি দূরম্।
অতঃপরো জীবঃ স্বকর্ম্মভোগী
কপালঃ কপালঃ কপালঃ মূলঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল

ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ

প্রমাণের চলিত অর্থ যাহা, সে অর্থে ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ সম্ভব নহে। জ্ঞাত বস্তু হইতে অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান লাভ করার নাম প্রমাণ। ঈশ্বর অজ্ঞাত বস্তু নহেন। পরন্তু তিনিই একমাত্র জ্ঞাতবস্তু। আমরা যাহা কিছু জানি তাহাই স্বরূপতঃ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ, সর্ব্ববিধ জ্ঞানের একমাত্র বিষয় ব্রহ্ম। সুতরাং প্রমাণের চলিত অর্থে ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ সম্ভব নহে। আর আমরা যে সকল বস্তু জানিতেছি সেই সকলকে স্বরূপতঃ ঈশ্বর না ভাবিয়া যদি সেই সকলের অস্তিত্ব হইতে কোন অজ্ঞাত বস্তু, কোন অজ্ঞাত কারণ, অনুমান করি, সেই বস্তু বা কারণ কদাচ ঈশ্বর হইতে পারে না; কারণ তাহা অবশ্যই সসীম হইবে। যাহা হইতে তাহা অনুমান করিব—তাহা জড়ই হউক বা চেতনই হউক—তাহা দ্বারা সেই বস্তু সীমাবদ্ধ—তাহার অতিরিক্ত হইবে, সুতরাং সেই বস্তু অতি বৃহৎ হইলেও তাহা সসীম বলিয়া ঈশ্বর ব্রহ্মনামের উপযুক্ত হইবে না। যাহা হউক

ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ অসম্ভব হইলেও বোঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণের বাহিরে নহে, প্রমাণের ভিতরে। চলিত ভ্রান্ত সংস্কারের বিষয়ীভূত বস্তুগুলি প্রমাণের বাহিরে ; অর্থাৎ সেগুলির প্রকৃত প্রমাণ নাই, সেগুলি কেবলই বিশ্বাসের বিষয়, কল্পনার বিষয়। ঈশ্বরাস্তিত্ব তাদৃশ নহে। সর্ব্বময়, সর্ব্বব্যাপী, অনাদি, অনন্ত বস্তু প্রতিপদেই জ্ঞাত হইতেছেন, জ্ঞানের বিষয়রূপে, জ্ঞানের বিষয়ীরূপে, প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রকাশিত হইতেছেন, তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই, আর তাঁহার অতিরিক্ত এমন কোন বস্তুও নাই যাহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সপ্রমাণ করা যাইবে, এই অর্থেই তাঁহার প্রমাণ সম্ভব নহে। তিনি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণাতীত।

কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞানের একমাত্র বস্তু হইলেও তাঁহাকে আমরা চিনি না। যাঁকে জানা যায়, দেখা যায়, তাঁকেই যে সকল সময় চেনা যায় তাহা নয়। একটি শিশুর পিতা শিশুর শৈশবেই বিদেশে গিয়াছিলেন। শিশু যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, পুত্র পিতাকে দেখিল, কিন্তু পিতা বলিয়া চিনিতে পারিল না। জগৎপিতা সম্বন্ধেও আমাদের এই দশা। আমরা তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্তরে বাহিরে দেখি, কিন্তু চিনিতে পারি না। যখন তাঁহাকে বাহিরে দেখি, তখন তাঁহাকে না চিনিয়া বলি,—'ইহা জড় জগৎ'। যখন তাঁহাকে অন্তরে দেখি, তখনও তাঁহাকে না চিনিয়া বলি,—'ইহা আমি, ইহা সসীম চৈতন্য'। আমরা আপাত-সসীমের মধ্যে বস্তুতঃ অসীমকেই দেখি, কিন্তু অসীমকে চিনি না। অসীমকে চিনাবার কোন প্রণালী আছে কি ? আছে, আর সেই প্রণালীর নামই 'ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ'। আমি এই প্রবন্ধে সেই প্রণালীর কিছু পরিচয় দিব।

পাশ্চাত্য ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহে ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ চতুর্ব্বিধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্থূলদর্শী ব্রহ্মবাদীরা এই সকল প্রমাণকে পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং ব্যক্তিগত জ্ঞান ও রুচি অনুসারে কেহ বা একটি, কেহবা অপরটিকে প্রবল বলিয়া অবলম্বন করেন। প্রকৃত কথা এই যে, এই সকল প্রমাণ একটিমাত্র প্রমাণের ভিন্ন ভিন্ন সোপানমাত্র। স্বতন্ত্ররূপে অবলম্বন করিলে কোনটি দ্বারাই ঈশ্বর সপ্রমাণ হন না—পরিচিত হন না। সোপানরূপে অবলম্বন করিলে দেখা যায়, প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু না কিছু ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপকরণ রহিয়াছে। উপকরণগুলি একত্র করিলে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্রহ্মবিজ্ঞান দাঁড়ায়। আমি সংক্ষেপে এই কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণচতুষ্টয় এই :—(১) কারণবাদের প্রমাণ (Causal or Cosmological Argument), (২) সৃষ্টিকৌশলের প্রমাণ (Teleological Argument), (৩) অস্তিত্ববাদের প্রমাণ (Ontological Argument), ও (৪) বিবেকের প্রমাণ (Moral Argument)। এই চারিটি প্রমাণ মানববুদ্ধির চারিটি চিন্তাস্তরের পরিচায়ক। মানবের মন যতদিন জড়বিজ্ঞানের স্তরে আবদ্ধ থাকে, জড়ের গতি ও পরিবর্ত্তনই ভাল বুঝে, আর কিছু ভাল বুঝে না, ততদিন কারণবাদের যুক্তিতেই সে সন্তুষ্ট হয়, আর কোন যুক্তির মূল্য বুঝে না। জড়বিজ্ঞানের উপরে প্রাণীবিজ্ঞান। মানবচিন্তা এই স্তরে উঠিলে আর কার্য্য-কারণ তত্ত্বে সন্তুষ্ট হয় না, উচ্চতর তত্ত্বের আলোচনা করে, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিকৌশলের যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করে। প্রাণীবিজ্ঞানের উপরে মনোবিজ্ঞান। এই স্তরে উঠিয়া মানবমন আত্মতত্ত্বের আলোচনা করে, এবং আত্মতত্ত্বের সাহায্যে পরমাত্মতত্ত্বে উপনীত হয়। কিন্তু এই পরমাত্মতত্ত্ব কেবল 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্' এইমাত্র, অথবা সমাধিযোগে 'আনন্দরূপম্ অমৃতম্' এত দূরই যাওয়া গেল। ইহার উপরে আর এক স্তর আছে, সেই স্তর নীতিবিজ্ঞান। এই স্তরে উঠিলে দেখা যায় ঈশ্বর 'শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্,'—তিনি 'সত্যং শিবং সুন্দরম্।' এখন আমি ব্রহ্ম-প্রমাণ-বিজ্ঞানের এই সোপানগুলি কিছু সূক্ষ্মরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(১) কারণবাদের প্রমাণ। এই প্রমাণের অবলম্বন জড়বিজ্ঞানে অবলম্বিত কার্য্যকারণতত্ত্ব। জড়বিজ্ঞানে 'কারণ' দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থে কার্য্যের কারণ কার্য্য—এক কার্য্যের কারণ অপর কার্য্য, দ্বিতীয় অর্থে কার্য্যের কারণ শক্তি। 'খ'এর কারণ 'ক,' ইহার এক অর্থ এই যে, 'ক' নামক কার্য্য বা কার্য্যাবলী ঘটিলে নিয়তই 'খ' নামক কার্য্য বা কার্য্যাবলী ঘটে। এরূপ কারণের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা 'নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা'। অগ্নিসংস্পর্শে

দাহ নিয়তই ঘটে, অগ্নিসংস্পর্শে দাহের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা, এই অর্থে অগ্নি সংস্পর্শ দাহের কারণ। কিন্তু অগ্নি কি? অগ্নি কি কেবল কতিপয় ঘটনাবলী না অগ্নি একটা শক্তি? হিউম্ ও কোম্‌ৎ প্রমুখ দার্শনিকগণ মনে করেন যে, আমরা ঘটনাপরম্পরা ছাড়া আর কিছু জানি না; সুতরাং তাঁহারা কারণের উপরিউক্ত সংজ্ঞায়ই সন্তুষ্ট। কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিকই বিশ্বাস করেন ঘটনাপরম্পরার পশ্চাতে কারণরূপিনী শক্তি বর্ত্তমান। তাঁহাদের মতে অগ্নি কেবল একটি ঘটনাপরম্পরা নহে, ইহা একটি শক্তি, এবং এই শক্তিই দাহের প্রকৃত কারণ। সুতরাং কারণের দ্বিতীয় অর্থ—'শক্তি।' হিউম্ প্রমুখ দার্শনিকগণের মতে, শক্তিতে বিশ্বাস অতি দৃঢ় বিশ্বাস হইলেও এই বিশ্বাস অমূলক। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়বোধই আমাদের সমুদায় জ্ঞানের আকর। প্রত্যক্ষ যখন 'শক্তি' বলিয়া কোন বস্তু জানে না, শক্তি যখন দৃশ্য নয়, শ্রবণীয় নয়, স্পৃশ্য নয়, আঘ্রাণ ও আস্বাদনের বিষয় ও নয়, তখন শক্তিতে বিশ্বাস একান্তই অহেতুক। আমরা যে সিদ্ধান্তে যাইতেছি, সে সিদ্ধান্ত এড়াইবার এই একমাত্র উপায়। এই উপায় ছাড়িয়া দিলে আর আমাদের সিদ্ধান্ত এড়াইবার যো নাই। একটা মধ্য পথ আছে, অনেক লোকে, বিশেষতঃ স্পেন্‌সার-প্রমুখ দার্শনিকগণ, সেই পথই অবলম্বন করেন, কিন্তু সেই পথ প্রকৃতপক্ষে পথই নহে। সেই পথ অবলম্বন করাতে কেবল স্থূলদর্শিতাই প্রকাশ পায়। যাহা হউক, কথাটা এই, যে শক্তি বা কর্ত্তৃত্ব যদি ইন্দ্রিয়গোচর ব্যাপার না হয়, অথচ যদি তাহা বিশ্বাসযোগ্য তত্ত্ব হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহা মানসগোচর তত্ত্ব, উহার পরিচয় আমরা অন্তর-রাজ্যে পাইয়া থাকিব। প্রকৃতপক্ষে আমরা অন্তর-রাজ্যে, মনোরাজ্যে বা আত্মজগতে, নিজ নিজ কার্য্যচেষ্টার মূলে, শক্তি বা কর্ত্তৃত্বের পরিচয় পাই। হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা এবং চিন্তা, কল্পনা, প্রয়াস প্রভৃতি মানসিক কার্য্যের মূলে আমরা আত্মার শক্তি, কর্ত্তৃত্ব বা ইচ্ছা দেখিতে পাই। শক্তি বা কর্ত্তৃত্ব ইচ্ছার নামান্তরমাত্র। আর ইচ্ছামাত্রই জ্ঞানময়ী, জ্ঞানছাড়া ইচ্ছা অসম্ভব। জ্ঞানময়ী শক্তি ছাড়া অন্য শক্তি আমরা জানিও না, কল্পনা করিতেও পারি না। শক্তি ভাবিতে গিয়া আমরা জ্ঞানময়ী শক্তিই ভাবি, কেবল স্থূলদর্শিতা বশতঃ, মানসিক বিশ্লেষণশক্তির ক্ষীণতানিবন্ধন, কল্পনা করি শক্তি বলিতে না-জড় না-চেতন এমন কিছু কিম্ভুতকিমাকার বস্তু মানিতেছি। সুতরাং বিচিত্র জগৎকার্য্যের কারণরূপে আমরা যে নিয়ত কার্য্যশীলা শক্তিতে বিশ্বাস করি, সে সম্বন্ধে দুইটিমাত্র সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত। প্রথমটি এই যে, এই বিশ্বাস অমূলক, শক্তি বলিয়া কোন বস্তু নাই। দ্বিতীয়টি এই যে, সেই শক্তি জ্ঞানময়ী,—এক বা বহু জ্ঞানময় পুরুষের শক্তি। আর একটি যে সিদ্ধান্ত আছে, অর্থাৎ, সেই শক্তি অচেতন বা অজ্ঞেয়, সেই সিদ্ধান্ত একান্তই অযৌক্তিক। অচেতন বা অজ্ঞেয় শক্তি জানাও যায় না, ভাবাও যায় না।

কারণবাদের যুক্তির সংক্ষিপ্ত আকার এই। ইহাতে আমরা ব্রহ্মবিজ্ঞানের একটি মূল্যবান্ উপকরণ পাইলাম। সেটি এই যে কার্য্যমাত্রেরই কারণ ইচ্ছা। কার্য্য যতই সামান্য হউক না কেন, তাহাতে যদি জ্ঞানের বিশেষ কোন পরিচয় নাই থাকে, তাহা যদি কেবল একটি জড় পরমাণুর গতিমাত্র হয়, তাহা হইলেও তাহা ইচ্ছাছাড়া হইতে পারে না। এই জ্ঞানকণিকাটুকু ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা বীজমাত্র, বৃক্ষ নহে। এই যুক্তিতে ঈশ্বরাস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল না। জগৎকার্য্যের মূলশক্তি এক কি বহু তাহা স্থির হইল না। শক্তি জড়ের উপর কার্য্য করে, জড় সৃষ্ট কি অসৃষ্ট, তাহা অনিশ্চিত রহিল। জীবাত্মা সৃষ্ট কি অসৃষ্ট, তাহাও এই যুক্তি নির্ণয় করিতে পারে না। এমন কি, আমাদের নিজকর্ত্তৃত্বের রাজ্যছাড়া, বহির্জগতে শক্তি আছে কি না, তাহাও নিশ্চিতরূপে জানা গেল না। বহির্জগতে আমরা দেখি কার্য্য মাত্র; কার্য্যের কারণ যে শক্তি, তাহা প্রত্যক্ষ দেখি না, বিশ্বাস করি মাত্র। বহির্জগৎকে যতদিন বাহিরের জগৎ বলিয়া বোধ হয়, অন্তর্জগতের সহিত এক বলিয়া বোধ হয় না, ততদিন বহির্জ্জগতে শক্তির অস্তিত্ব বিশ্বাসের আকারেই থাকে, জ্ঞানে পরিণত হয় না।

(২) সৃষ্টিকৌশলের প্রমাণ। কারণবাদের প্রমাণে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে যতটা প্রভেদ বোধ থাকে, এই প্রমাণে ততটা থাকে না। এই প্রমাণের অবলম্বন উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ। উদ্ভিদ্ ও প্রাণিবিজ্ঞানকে একত্র করিয়া প্রাণিবিজ্ঞান Biology বলা যায়। প্রাণিবিজ্ঞানে কার্য্য-

কারণতত্ত্ব যথেষ্ট নহে; কারণ, কারণতত্ত্ব বহিঃশক্তি যোগে পরমাণুসমূহের আকর্ষণ ও যোগ ব্যাখ্যা করে। যে শক্তিতে জড়পরমাণুগুলি একত্র হইয়া বায়ু, জল, ধাতু প্রভৃতি বস্তু নির্ম্মিত হয়, সে শক্তি পরমাণুগুলির বাহিরে। প্রাণিজগতেও উপকরণের সংগ্রহ আছে। উদ্ভিদ্ বা প্রাণীবীজ উপকরণ সংগ্রহ দ্বারাই পুষ্ট হয়, কিন্তু এস্থলে সংগ্রহকারিণী শক্তি বীজের বাহিরে নহে, ভিতরে। বীজের অভ্যন্তরস্থ শক্তিই নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহদ্বারা নিজের পুষ্টিসাধন করে। এই উপযোগিতাতে মনোনয়নের ভাব স্পষ্টতঃ বর্ত্তমান। পারিপার্শ্বিক অসংখ্য বস্তু হইতে বীজ নিজের উপযোগী উপকরণই সংগ্রহ করে, অন্য সমুদায় বর্জ্জন করে। আম্রবীজ মিষ্টরস সংগ্রহ করে, তেঁতুলের বীজ অম্লরস সংগ্রহ করে। তারপর, বৃক্ষদেহের মূল, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতির সম্বন্ধ, আর প্রাণীদেহের হস্ত, পদ, পাকস্থলী, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্বন্ধ, ইহার মধ্যে নিঃসন্দিগ্ধরূপে অভিপ্রায় বর্ত্তমান। দেহের প্রত্যেক অংশ সর্ব্বশরীরকে এবং অপর অংশকে পোষণ ও সাহায্য করে। সমুদায়ের মধ্যে আশ্চর্য্য একতা—বিচিত্রতার মধ্যে একতা, ভেদের মধ্যে অভেদ—বর্ত্তমান। এই একতায় বোঝা যাইতেছে যে, দেহের বিচিত্রতা বীজের একতার ভিতরেই নিহিত ছিল, প্রচ্ছন্ন ছিল; কিন্তু ভৌতিক অর্থে ত একতায় বিচিত্রতা ছিল না, থাকিতে পারে না। বীজকে বিশ্লেষণ করিয়া ত তাহাতে দেহের বিচিত্রতা পাওয়া যায় না। নিহিত বা প্রচ্ছন্ন থাকার অর্থ তবে এই যে, দেহের বিচিত্রতা অভিপ্রায়রূপে উদ্দেশ্যরূপে, জগদাত্মার চিন্তায় বর্ত্তমান ছিল, আর সেই অভিপ্রায়ই, উদ্দেশ্যই, বীজের সমুদায় কার্য্যকে চালিত করিয়াছে। অচেতন জগতে বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যৎ জন্মে, কারণ হইতে কার্য্য জন্মে। প্রাণীজগতে এক অর্থে বিপরীত ব্যবস্থা। এখানে ভবিষ্যৎ হইতে বর্ত্তমান জন্মে; অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে বিচিত্র দেহ হইবে তাহা দ্বারা বর্ত্তমান বীজের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ কার্য্যকলাপদ্বারা কারণরূপী বীজ নিয়ন্ত্রিত হয়। ভবিষ্যৎ-কার্য্য, জগদাত্মার চিন্তায় বর্ত্তমান না থাকিলে, বর্ত্তমান-কারণরূপী বীজ কখনও এরূপ কার্য্য করিতে পারিত না। প্রাণীদেহের হস্ত, পদ, হৃদয়, পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র, এবং চক্ষুকর্ণাদি, ইন্দ্রিয় যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেহকে রক্ষা করিতেছে, স্পষ্টতঃ এই সকল কার্য্যসাধনের অভিপ্রায়েই ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাদের উৎপত্তি কদাচ অন্ধ অভিপ্রায়শূন্য নিয়মের কার্য্য হইতে পারে না। আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি ভৌতিক নিয়ম যতই অলঙ্ঘনীয় হউক না, এই সকল নিয়ম কখনও এরূপ বিচিত্র উদ্দেশ্য উপায় সম্বলিত অসংখ্য প্রাণীদেহ উৎপাদন করিতে পারে না। এই সমুদায় দেহ ভৌতিক নিয়মে হইয়াছে এই বলা, আর 'এই সকল দেহ আকস্মিকভাবে হইয়াছে' এই বলা, দুই সমান। শৃঙ্খলা, উদ্দেশ্য, উপায়, এই সমস্ত আকস্মিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সমুদয়কে আকস্মিক বলা, আর এই সমুদয়ের কোন কারণ নির্দ্দেশ না করা, দুই সমান। আর এই সমুদায়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলেই বিচিত্র অভিপ্রায়যুক্ত জগৎস্রষ্টা মানিতে হইবে। যে প্রাণীবিজ্ঞান তাহা না মানে, সে বিজ্ঞান প্রাণীবিজ্ঞান নহে। সে বিজ্ঞান ভৌতিক বিজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। মানবের কার্য্যকলাপ সমস্তই অলঙ্ঘনীয় ভৌতিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অথচ আমরা সে সকল কার্য্যকে কেবল ভৌতিক নিয়মদ্বারা ব্যাখ্যা করি না। সেই সকল কার্য্যের ভিতরে এমন কিছু আছে—শৃঙ্খলা, উদ্দেশ্য, উপায় প্রভৃতি যাহা কেবল স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ঈদৃশ লক্ষণ—যাহা কেবল স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে—জগৎ কার্য্যে অসংখ্যরূপে বর্ত্তমান।

কিন্তু এরূপ লক্ষণ কেবল উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগতে আবদ্ধ নহে। আমরা যে প্রাণীজগতেই এই সকল লক্ষণ দেখাইলাম তাহার কারণ জড় ও প্রাণীজগতের ব্যাবহারিক প্রভেদ। আমরা না কি প্রথম হইতে জগৎকে চেতন ও অচেতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করি, সুতরাং যাকে আমরা চেতন জগৎ বলি তাহাতেই প্রথমে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে, প্রকৃত পক্ষে অচেতন জগৎ বলিয়া কোন জগৎ নাই, সমুদয় জগৎই সচেতন। চিন্তার এই দ্বিতীয় স্তরেই আমরা কতক পরিমাণে এই সত্য বুঝিতে পারিব। জড় ও চেতনের পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা কারলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাণীজগৎ যেমন চিন্তা ও অভিপ্রায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, জড়জগৎও তেমনি চিন্তাও অভিপ্রায়দ্বারা চালিত,—'ভৌতিক নিয়ম'গুলি জ্ঞানময়ের কার্য্য-

প্রণালীমাত্র! জল ও বায়ুকে আপাততঃ একান্তই জড়বস্তু, জড়পরমাণুর সমষ্টি বলিয়া বোধ হয়; মনে হয় প্রাণের সঙ্গে ইহাদের একান্ত প্রভেদ। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই প্রভেদ-কল্পনা অনেক পরিমাণেই অমূলক বলিয়া বোঝা যায়! প্রাণের সহিত জল ও বায়ুর সম্বন্ধ কি আকস্মিক? কেবলই ভৌতিক নিয়মের ফল? কোন্ ভৌতিক নিয়ম এই সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারে? শরীরের সহিত রক্ত, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি শরীরযন্ত্রের সহিত জল-বায়ুর কি আশ্চর্য্য উপযোগিতা! কি অদ্ভুত উদ্দেশ্য উপায়ের সম্বন্ধ! জলবায়ু ভৌতিক আকর্ষণে শরীরে আসে, না শরীর নিজ প্রয়োজনে উহাদিগকে টানিয়া আনে? এই রূপে আলোক, উত্তাপ, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদয় জড়বস্তুর সহিত প্রাণের সম্বন্ধ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, জগৎ অন্ধনিয়মে চালিত একটি যন্ত্র নহে, ইহা অসংখ্য আত্মার আশ্রয় পরমাত্মার বিশ্বরূপ। ছায়াপথ বা নক্ষত্র-রাজ্যের সহিত ইহার অন্তর্ভূত সূর্য্য ও সৌরজগৎ সমূহের সম্বন্ধ চিন্তা করিলে দৃষ্ট হইবে, ইহারা স্ব স্ব প্রধান নহে, ইহারা মহান্ বিশ্বদেহের এক একটি অঙ্গস্বরূপ।

(৩) অস্তিত্ববাদের প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে যে একতার আভাস পাওয়া যায়, এই প্রমাণে তাহা পরিস্ফুট হয়। এই প্রমাণ মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত, কিন্তু সকল মনোবিজ্ঞানবিৎ ত ইহার সংবাদ রাখেন না, ইহা অবলম্বন করেন না। ইহার কারণ এই যে, সকল মনোবিজ্ঞানবিৎ মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত ভূমিতে আরোহণ করেন না। আমরা যেমন দেখিয়াছি যে, কোন কোন জড়বিজ্ঞানবিৎ শক্তিদ্বারা জড়ের কার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াও শক্তির প্রকৃত স্বরূপ জানেন না, কোন কোন প্রাণীবিজ্ঞানবিৎ প্রাণের বিকাশ ব্যাখ্যা করিয়াও এই বিকাশের মূলীভূত অভিপ্রায় ও চিন্তার সংবাদ জানেন না; তেমনি চিন্তার এই তৃতীয় স্তরেও কোন কোন মনোবিজ্ঞান-লেখক মনোবিজ্ঞান বা জীবাত্মবিজ্ঞানকে পরমাত্মবিজ্ঞান বা দর্শন হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে চান। কোন বিজ্ঞানই পরমবিজ্ঞান বা দর্শন হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। কিন্তু মনোবিজ্ঞানকে তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শন হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার চেষ্টার বিফলতা সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে বোঝা যায়। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু ভাব ও ইচ্ছা জ্ঞান-সাপেক্ষ, জ্ঞানের আশ্রিত; সুতরাং মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয় জ্ঞান। এই জ্ঞানের ভূমিতে দাঁড়াইলে দেখা যায়, কোন বস্তুই এই ভূমির—এই জগতের—বাহিরে নহে, সকলই ইহার ভিতর। পাঠক এই প্রবন্ধ পড়িতে গিয়া যে কাগজ, কালি প্রভৃতি বস্তু দেখিতে-ছেন, সে সকল বস্তু শরীরের বাহিরে বটে, কিন্তু জ্ঞানের বাহিরে নহে। যাহা কিছু জ্ঞানের গোচর হইয়াছে, হই-তেছে ও হইবে, সমুদায়ই জ্ঞানের ভিতর, এবং এই অর্থে মনের ভিতর, আত্মার ভিতর, মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। এই কথাটি যে পাঠক বুঝিতে পারেন না, তিনি মনোবিজ্ঞান লইয়া নাড়াচাড়া করিলেও মনোবিজ্ঞানের ভূমিতে (Stand-pointএ) উঠিতে পারেন নাই। দৃশ্য, স্পৃশ্য, শ্রবণীয়, আঘ্রেয়, আস্বাদনীয়—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—যাহা কিছু স্মরণীয়, চিন্তনীয়, বিশ্বসনীয়,—সমুদায়ই জ্ঞানের ভিতর, মনের ভিতর, আত্মার ভিতর। সমুদায়ের মধ্যেই আত্মজ্ঞান 'আমি জানিতেছি' এই ভাব ব্যাপ্ত, অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে! সুতরাং আমরা প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় কেবল আত্মাকেই জানি, আত্মাতিরিক্ত কিছুই জানি না। জ্ঞানের ভিতরে বিষয়-বিষয়ী, এই একটা ভেদ করি বটে, কিন্তু এই ভেদটা ভেদ-মাত্র, বিভাগ নহে,—বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, জ্ঞানের অন্তর্গত, আত্মার অন্তর্গত, পদার্থসমূহের একটা সম্বন্ধ মাত্র। আত্মা এই সম্বন্ধের কর্ত্তা এবং এই সম্বন্ধ যে ভেদ বুঝায়, সেই ভেদের অতীত। আমরা প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় এক অখণ্ড বিষয়-বিষয়ী-সম্বন্ধযুক্ত অভেদ আত্মবস্তুকে অবগত হই। এই আত্মা ব্যষ্টি কি সমষ্টি? ব্যক্তিগত কি সার্ব্বভৌমিক? সসীম কি অসীম? সাধারণ মনোবিজ্ঞান বলে, 'এই আত্মা ব্যষ্টি, ব্যক্তিগত, সসীম, বহু'। সমষ্টি, সার্ব্বভৌমিক, অসীম ও অদ্বিতীয় আত্মার সংবাদ ইহা জানে না, অথবা জানিতে চায় না। কিন্তু প্রকৃত মনোবিজ্ঞান বলে, 'শেষোক্ত আত্মাকে না জানিয়া পূর্ব্বোক্তকে জানাই যায় না'। ফলতঃ ব্যষ্টি ও সমষ্টি, সসীম ও অসীম, এই দুই প্রকার আত্মা আছে, তাহা নহে; একই অখণ্ড আত্মাতে ব্যষ্টিভাব ও সমষ্টিভাব, সসীমভাব ও অসীম-ভাব বর্ত্তমান। পাঠক সম্মুখের বস্তুটিকে জানিতে গিয়া

প্রকৃতপক্ষে কি জানিতেছেন? সাধারণ মনোবিজ্ঞানবিৎ বলিবেন, তিনি নিজ ব্যষ্টি আত্মাকে এবং বিস্তৃতি, বর্ণ,স্পর্শ-রূপী কতিপয় মানসিক অবস্থা বা বিজ্ঞানকে (Ideas or Sensations) জানিতেছেন। কিন্তু ব্যষ্টি আত্মার বিজ্ঞান, দেশে কালে আবদ্ধ হইবে ; তাহার আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত দেশে কালে সসীম হইবে। কিন্তু পাঠক যাহা জানিলেন তাহা কি এরূপ সীমাবদ্ধ? তা ত নয়। পাঠক জ্ঞাত বস্তুটিকে ভুলিলেন এবং নিজে সুনিদ্রায় মগ্ন হইলেন। এই অবস্থায় পাঠকের জ্ঞাত বিষয়টি ও আত্মজ্ঞান উভয়ই একেবারে নষ্ট হইবার কথা, কারণ 'জ্ঞানের বিষয় অজ্ঞেয় হইয়া থাকা' এবং 'জ্ঞানের বিষয়ী অজ্ঞান হইয়া থাকা' এই সকল বাক্য স্ববিরোধী কথার কথা মাত্র। যে মনোবিজ্ঞানবিৎ বলেন যে, এই সকল ব্যাপার আমাদের অজ্ঞানাবস্থায় জ্ঞানের নিম্নদেশে থাকে, Sub-conscious regionএ থাকে, তিনি কেবল ইহাই প্রমাণ করেন যে, তিনি মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত স্তরে উঠিতে পারেন নাই, জড়বিজ্ঞান বা প্রাণবিজ্ঞানের স্তরেই আছেন এবং ঐ সকল বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব লইয়া মনোবিজ্ঞান গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। মনোবিজ্ঞানের ভূমিতে দাঁড়াইয়া বলিবার যো নাই যে, জ্ঞানের নিম্নে কিছু আছে। হয় বলিতে হইবে কিছু নাই, অথবা বলিতে হইবে তাহা জ্ঞানে আছে—জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া আছে। মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত সমস্ত পদার্থেরই একমাত্র আশ্রয় জ্ঞান—আত্মজ্ঞান। কিন্তু ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিলয়াবস্থায় বিষয় থাকে না, বা আত্মজ্ঞান থাকে না, তা ত বলিবার যো নাই। আপনি সজ্ঞান হইয়া বলিলেন, 'এই ত সেই বস্তু যাহা আমি নিদ্রার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম।' নিদ্রার পূর্ব্বের আত্মজ্ঞান ও জ্ঞাত-বিষয় উভয়ই, সম্বদ্ধভাবে ফিরিয়া আসিল, পুনঃ প্রকাশিত হইল। না থাকিলে ত আর পুনঃ প্রকাশিত হইতে পারিত না, সুতরাং নিশ্চয় ছিল। কি ভাবে ছিল? ব্যষ্টিভাবে, বিশেষ দেশ কালে বদ্ধ হইয়াছিল কি? তাহা হইলে আর অজ্ঞানতা ও নিদ্রা সম্ভব হইত না। ব্যষ্টিভাবই অজ্ঞান ও নিদ্রিত হইয়াছিল, সমষ্টিভাব সজ্ঞান ও জাগ্রত ছিল। সমষ্টিভাব সজ্ঞান সজাগ থাকাতেই বিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান উভয়ের পুনঃপ্রকাশ সম্ভব হইল। সুতরাং আত্মার সমষ্টিভাব সার্ব্বভৌমিক ভাব, দেশ কালের অতীত ভাবই মৌলিক, সমষ্টিভাব অবান্তর! অন্য কথায়, আমরা প্রত্যেক জ্ঞান ক্রিয়ার এক অখণ্ড সার্ব্বভৌমিক আত্মাকে নিজ আত্মা-রূপে অবগত হই। সেই আত্মাতে বিষয় বিষয়ীর ভেদ, দেশের ভেদ, কালের ভেদ, সমুদায় ভেদেই অভেদভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং তিনি অখণ্ড, অনন্ত, অদ্বিতীয়, তাঁহার বাহিরে, তাঁহার অতিরিক্ত, কিছুই নাই। আমার প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ায় যাহা জানি—তাকে বিষয়ই বলি, আর বিষয়ীই বলি—তাকে আপাততঃ সসীম বলিয়া বোধ হয়, মনে হয় ইহার বাহিরে আরও বস্তু আছে। বাহিরে বস্তু আছে বটে, কিন্তু কার বাহিরে? যে অখণ্ড জ্ঞানবস্তুর জ্ঞানক্রিয়ায় ব্যষ্টিভাবে প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যষ্টিভাবের বহিরে আরও বস্তু আছে বটে, কিন্তু তাহার সমষ্টিভাবের বাহিরে কিছুই নাই। তাহার সমষ্টিভাবের বাহিরে কিছুই কল্পনা করা যায় না, কিছুই বিশ্বাস করা যায় না। অনন্ত দেশ ও দেশস্থিত অসংখ্য বস্তু, অনন্তকাল ও কালে সংঘটিত অসংখ্য ঘটনা, এই সমুদায়কেই জ্ঞানবস্তু বা আত্মবস্তুর আশ্রিত, অন্তর্গত, বলিয়া ভাবিতে হয়—যাকে আমরা নিজ নিজ আত্মা বলি, তারই অন্তর্গত বলিয়া ভাবিতে হয়। সুতরাং যাকে আমরা ব্যষ্টি-আত্মা, ব্যক্তিগত আত্মা বলি, তাকে প্রকৃতপক্ষে আমরা অনন্ত বলিয়াই ভাবি, অনন্ত বলিয়াই বিশ্বাস করি। চিন্তা ও বিশ্বাস সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এরূপ চিন্তা, এরূপ বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিন্তা বা বিশ্বাস সম্ভবই নহে! এইরূপে মনোবিজ্ঞান নিজেকে বুঝিতে গিয়া তত্ত্ববিদ্যায় পরিণত হয়। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, যাঁহাকে আমরা প্রত্যেকে নিজ ব্যক্তিগত আত্মা বলি, তিনিই জগদাত্মা, তিনিই সমষ্টি হইয়া ব্যষ্টিরূপে প্রকাশিত হন, এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হন,—"একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।" তিনি সত্যস্বরূপ তিনিই একমাত্র স্বাধীন, পরনিরপেক্ষ সত্য। দেশ কাল ও দেশকালের অন্তর্গত পদার্থসমূহ আপেক্ষিক সত্যমাত্র, তাঁহার আশ্রিত সত্যমাত্র। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি যে আমাদের ন্যায় দেশে কালে আবদ্ধ হইয়া জ্ঞানী হন তাহা নহে, তিনি অনন্তদেশ কাল ধারণ করিয়া জ্ঞানস্বরূপ হইয়াই আছেন। তিনি অনন্ত; যে দেশকালের দ্বারা সীমা সম্ভব হয়, তিনি সেই দেশ কালের আশ্রয়, সুতরাং

বিভাগের অতীত। আর তিনি অনন্ত বলিয়াই অদ্বিতীয়। দুটি অনন্ত থাকিতে পারে না, অনন্ত হইতে স্বতন্ত্র, অনন্তের অতিরিক্ত কিছুই থাকিতে পারে না।

(৪) বিবেকের প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরের স্বরূপলক্ষণ—যাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা দার্শনিক লক্ষণ বলেন,তাহাই—সপ্রমাণ হইল। এই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ—যাকে পাশ্চত্য ব্রহ্মবিদেরা নৈতিক লক্ষণ বলেন, তাই সপ্রমাণ হইবে। প্রবন্ধের অতিদীর্ঘতা পরিহারের জন্য এই যুক্তি অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব। নীতি বা ধর্ম্মসাধনে নিবিষ্টচিত্ত না থাকিলে এই যুক্তি সন্তোষকর বোধ হয় না। জগৎ একটি ধর্ম্মরাজ্য, একটি ধর্ম্মচক্র, এই যাঁর বোধ, তাঁর কাছে এই প্রমাণ অকাট্য বলিয়া বোধ হইবে। আমাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক আমাদের প্রত্যেকের সম্মুখে একটি পূর্ণ মঙ্গলের আদর্শ—প্রেম পুণ্যের আদর্শ আনয়ন করে। এই আদর্শে সত্য, ন্যায়, দয়া, ক্ষমা, কোমলতা, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণের সমাবেশ থাকে। মানব ধর্ম্মসাধনে যত অগ্রসর হয়, এই আদর্শ ততই পূর্ণ ও উজ্জ্বল হয়। এই আদর্শ দ্বারা আমরা নিজের ও অন্যের চিন্তা, ভাব ও ব্যবহারের বিচার করি। এই আদর্শ মনে না থাকিলে কোন প্রকার নৈতিক বিচার বা নৈতিক মত সম্ভব হইত না। কিন্তু এই আদর্শ কেবল আদর্শ নহে, ইহা একটি ছিন্নসত্তা (abstract) কল্পনা মাত্র নহে। আমরা যখন প্রেমপুণ্য প্রভৃতির আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করি, এই আদর্শের নিকট যখন আমরা অবনতমস্তক হই, তখন আমাদের আত্মা পূর্ণ প্রেমপুণ্যের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়। আর এই আত্মা কে, এই আত্মা যে জগদাত্মা তাও ত আমরা দেখিয়াছি; সুতরাং এই প্রেমপুণ্যের আদর্শ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রকাশ। ইহা দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার নৈতিক পূর্ণতার পরিচয় পাইতেছি। আত্মার সাক্ষাৎ পরিচয় কেবল আত্মাতেই সম্ভব। যেমন আমাদের জ্ঞানেই ঐশ্বরিক জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রকাশ, তেমনি যাকে আমরা আমাদের প্রেমপুণ্য বলি, তাতেই সেই প্রেমপুণ্যের সাক্ষাৎ প্রকাশ। কেবল কার্য্য দেখিয়া যেমন শক্তিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনি কেবল কার্য্য দেখিয়া নৈতিক চরিত্রেরও সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যায় না। জগতের সুখকর কার্য্যদ্বারা ঈশ্বরের প্রেম সপ্রমাণ হয় না, এবং দুঃখকর কার্য্যদ্বারাও অপ্রেম প্রকাশিত হয় না। প্রেম এবং অন্যান্য নৈতিক গুণের প্রমাণ ভিতরে,—বিবেকে, ধর্ম্মজীবনে। মানবে প্রকাশিত জ্ঞান বিস্মৃতি ও নিদ্রায় বিলীন হইয়া গেলেও, যেমন মূল জ্ঞান অব্যাহত থাকে, তেমনি মানবের ধর্ম্মবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইলেও এবং তজ্জনিত পাপের উদয় হইলেও ঐশ্বরিক পূর্ণতা অব্যাহত থাকে। যেমন ব্যষ্টিজ্ঞান তিরোভাবান্তে পুনঃপ্রকাশিত হইয়া এই প্রমাণ করে যে, তাহা তিরোধানকালেও সমষ্টি আকারে বর্ত্তমান ছিল, তেমনি পাপীর হৃদয়ে আত্মগ্লানি ও পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা পুনরুদিত হইয়া ইহাই সপ্রমাণ করে যে, তাহার অন্তরস্থিত পরমাত্মা সকল সময়েই, তাহার ঘোর পাপাচরণের সময়েও, নির্ম্মল নিষ্কলঙ্কই থাকেন। সুতরাং চিন্তার তৃতীয় স্তরে যেমন আমরা এই প্রমাণ পাই যে, ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানম্, অনন্তম্, অদ্বৈতম্" তেমনি চিন্তার এই চতুর্থ স্তরে আমরা এই প্রমাণ পাই যে, তিনি "শিবম্, শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্, সুন্দরম।" প্রমাণগুলি এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইল।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলী

টেনিসন,সুইনবোরন কিংবা ব্রাউনিংএর মৃত্যুর পর ইংরেজি সাহিত্যে একটা ভাঁটা আসিয়াছিল। প্রত্যেক সাহিত্যেই যে এইরূপ জোয়ার ভাঁটার খেলা আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। টেনিসনের মৃত্যুর পর যে সকল লেখক সাহিত্য-জগতে মাথা তুলিতে প্রয়াস পাইলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ব্যর্থ অনুকরণ-প্রিয়।

আর তাঁহারা সাহিত্য-বীণায় যে সুরের ঝঙ্কার দিলেন তাহার সুর অত্যন্ত পুরাতন, বর্ত্তমান যুগের সহিত সে সুরের মিল ছিল না। ইংরেজি সাহিত্যের এই অধঃপতনে অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকেরা ইঙ্গিতে একটু হাসিয়া লইলেন, এবং পরে তাহাদের উপহাসচ্ছটা বেশ প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই ইঙ্গিতের হাসিটা ইংরেজ জাতির অন্তঃকরণে গভীর বেদনা আনিয়া দিল; কিন্তু যে দেশে সেকস্‌পিয়র ও মিল্টন জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন সে দেশের সাহিত্যের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য, কতকগুলি উদীয়মান সাহিত্যিক বদ্ধপরিকর হইলেন। একজন লেখক North American Review (September, 1913) এ বলিতেছেন "The reproach against the age was taken as a challenge by dozens of young adventurers, who resolved to prove in their own persons that the twentieth century was not without poets." সত্য সত্যই এই উদীয়মান সাহিত্যিকদিগের চেষ্টা ও আশা বিফল হয় নাই। জন মেস্‌ফিল্ড, এলফ্রেড্‌ নোয়েস, উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্‌স্‌ ও ডেভিসের কবিতা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ইংরেজি সাহিত্যের এক নূতন যুগ ফিরিয়া আসিবার সময় হইয়াছে। এই সকল কবির কাব্য পাঠ করিয়া একজন ইংরেজ লেখক বলিতেছেন, "Poetry has now become a mentionable subject in decent Society."

আমরা সংক্ষেপে প্রধান প্রধান ইংরেজ সাহিত্যিক-দিগের বিবরণ প্রদান করিয়া ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সাহিত্য-সংবাদের আভাসমাত্র দিব। ডাক্তার রবার্ট ব্রিজেসের নাম সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য, তিনিই এখন ইংলণ্ডের রাজকবি (Poet-Laureate); তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর। প্রথমে "ইটনে" পড়িয়া পরে অক্সফোর্ড হইতে এম, বি উপাধি লাভ করিয়া ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং Great Northern Hospitalএর ডাক্তার নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন ও ১৮৭৬ সালে "Awakening of Love" নামক কাব্য মুদ্রিত করিয়া বন্ধুবর্গের মধ্যে বিতরণ করেন। কাব্যে এই ৬:টি 'সনেট' আছে। তারপর ১৮৯০ সালে "ক্ষুদ্র কবিতাগুচ্ছ" প্রকাশ করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৮৪ সালে বিবাহ করিয়া তিনি কাব্য ও সাহিত্য-চর্চ্চাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বুয়র যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর তিনি এক "Peace Poem" লেখেন; এই কবিতায় উন্মাদনার ভাব থাকা সত্ত্বেও শান্তির বিমল আলোকে উদ্ভাসিত; কেহ কেহ বলেন এই সঙ্গীত তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট রচনা। তারপর "ইউলিসিসের প্রত্যাবর্ত্তনে" (Return of Ulysses) তিনি যে শব্দ-যোজনা-কৌশল দেখাইয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। তাঁহার Milton's Prosody বইখানি ইংরেজি কাব্যের ছন্দ সম্পর্কীয় পুস্তকের মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। তাঁহার বীণায় নূতন যুগের নূতন বাণী ঝঙ্কৃত না হইলেও একটা শান্ত মৌনতা আছে—"কূলতট বিপ্লাবীনি ধূসর তরঙ্গ" নাই। যাহা হউক তিনি যে ইংলণ্ডের সর্ব্বজনপ্রিয় কবি নন, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা পাঠ করিলে কতকটা বুঝা যাইবে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র T. P's. Weeklyর সম্পাদক, বর্ত্তমান সময়ে কাহাকে "রাজ-কবি" নিযুক্ত করা উচিত এই বিষয়ে পাঠকদিগের মধ্যে 'ভোট' গ্রহণ করেন; তাহার ফলে দেখা যায়:—

রবার্ট ব্রিজেস্‌

	কবিদের নাম।		ভোটের সংখ্যা।
১।	কিপলিং	...	২২,৬৩০
২।	শ্রীমতী এলিস মেনেল	...	৫,৫৯৮
৩।	জন মেস্‌ফিল্ড	...	৩,২৬৭
৪।	টমাস্‌ হার্ডি	...	২,১৭০
৫।	উইলিয়ম ওয়াটসন	...	১,০৮৬
৬।	হেনরি নিউবোল্ট	...	৮২১
৭।	চেষ্টারটন্‌	...	৭৭৭
৮।	রবার্ট ব্রিজেস (বর্ত্তমান রাজকবি)		৭১০

জন মেসফিল্ডের নাম খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজি-সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। তাঁহার বাল্যজীবন বড় দুঃখময়। তাঁহার কবিতায় ইহার বেশ আভাস পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের স্রপ্‌শায়ারে তাঁহার জন্ম হয়, বাল্যকালে পড়াশুনায় তাঁহার আদৌ মন ছিল না। তাই বাল্যকালে অর্থ উপার্জ্জনের আশায় তিনি আমেরিকায় পলায়ন করেন; নিউইয়র্কে যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি একেবারে রিক্তহস্ত। নিউইয়র্কের জনসমুদ্রের মধ্যে আসিয়া দেখিলেন একদিকে বিলাসিতা উর্ণনাভের জালের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে; আর একদিকে দারিদ্র্যের নির্ম্মম নিষ্পেষণে অসংখ্য নরনারী নরকের মুখে চলিয়াছে। তারপর তিনি কার্য্যের অনুসন্ধানে নিউইয়র্কে ঘুরিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যখন তাঁহাকে শতছিন্ন জামাটি পর্য্যন্ত বাঁধা রাখিতে হইল। অবশেষে কলকারখানায় ও রুটীর দোকানে কাজ করিয়া একটি বড় হোটেলের খানসামা নিযুক্ত হইলেন। এই স্থানেই তাঁহার কবি-প্রতিভার উন্মেষ।

জন্ মেস্‌ফিল্ড

দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি মানুষ হইয়াছেন, তাই তাঁহার প্রত্যেক কবিতা দরিদ্রের সুখদুঃখে ও স্নেহ-মমতায় মণ্ডিত। এই দারিদ্র্য-নিপীড়িত জনসঙ্ঘ কি করিয়া সুখের পথে আসিবে তাহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয়; তাই তিনি আজ সমাজ-তন্ত্রের (Socialism) প্রধান উপাসক; এবং 'Poet of Poverty' বলিয়া সভ্যজগতে পরিচিত।*

এই কঠিন জীবন সংগ্রামের যুগে বড় বড় গাথা লিখিয়া খ্যাতি লাভ করা সহজসাধ্য না হইলেও, তাঁহার ভাগ্যে সম্ভবপর হইয়াছে। তাঁহার "Everlasting Mercy, Dauber এবং The Daffodil Fields" সকলের প্রিয় বস্তু। তিনি কএকখানি নাটক লিখিয়াছেন এবং তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে "Streets of to-day" সুখপাঠ্য।

আলফ্রেড নোয়েস বর্ত্তমান ইংরেজ কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক, তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর; কিন্তু অল্পবয়স্ক হইয়াও সাহিত্যের নিকষে যেরূপ উজ্জ্বলভাবে সুবর্ণ রেখা টানিয়া দিয়াছেন, তাহা অনেক প্রবীণ সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহার কবিতার বিশেষত্ব এই যে, তিনি কখনও জীবনকে দুঃখময় বলিয়া অনুভব করেন নাই। দুঃখের মধ্যেও সুখ অনুভব করা তাঁহার মতে, মানব-জীবনের ধর্ম্ম। যে সকল কবি চিরন্তনকাল হইতে করুণসুরে দুঃখের কাহিনী গান করিয়া সাহিত্যকে অশ্রুসিক্ত করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের সহিত নোয়েসের কোন সম্বন্ধ নাই। তাই একজন ইংরেজ লেখক বলিতেছেন, "We have founded at last a poet to whom this world is not a twilit vale of tears, but a valley shimmering all

আলফ্রেড নোয়েস্

* এই সম্বন্ধে একজন আমেরিকার সাহিত্যিক লিখিতেছেন :—
"He (Masefield) is bringing a message which might well rouse his day and generation to an understanding of and a sympathy with life's disinherited—the over-worked masses"—New York 'Outlook'.

dewy to the dawn, with a lark song over it." তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানবজীবনকে ধর্ম্মভাবাপন্ন করাই কবিতার প্রকৃত ধর্ম্ম ; এবং এই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক-যুগ শেষ হইয়া গেলে ভবিষ্যৎ যুগ কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জগতে নূতন আনন্দ আনয়ন করিবে। ২১ বৎসর বয়সে নোয়েস "The Loom of Years" নামক কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার অনেক কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

উইলিয়ম বট্‌লার ইয়েট্‌সের নাম আমাদের সকলের নিকট পরিচিত। ইনিই সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-পাঠে মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজি সাহিত্যজগতে বেশ সুপরিচিত করিয়া দিয়াছেন। ১৮৬৫ সালে তাঁহার জন্ম হয় এবং চিত্রকলা শিক্ষালাভের আশায় ডাবলিনের কোন বিখ্যাত চিত্রশালায় প্রবেশ লাভ করেন; কিন্তু চিত্রকলা শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই ২১ বৎসর বয়সে তিনি সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত হন। রাজনীতিক্ষেত্রে আয়রলণ্ডকে ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য Issac Butt এবং Parnell যেরূপ জাতীয়-আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ ইয়েট্‌স্ আইরিশ সাহিত্যের ও নাট্যকলার জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার জন্য এক নূতন আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। আয়রলণ্ডের জাতীয় বিশিষ্টতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্যে Lady Gregory, অর্থসাহায্যে ডাবলিন সহরে আইরিশ জাতীয় নাট্যশালা (Irish National Theatre), স্থাপন করেন। ইংলণ্ডের অভিনয়প্রণালী হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আইরিশ অভিনেতা ও অভিনেত্রী দ্বারা জাতীয় নাট্যসকল এই স্থানে অভিনীত করাই এই নাট্যশালার উদ্দেশ্য। ইয়েট্‌সের প্রথম নাটক "Cathleen Ni Hoolihan" এইস্থানে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" (Post Office), এই নাট্যশালায় সেদিন অভিনীত হইয়া গিয়াছে। ইয়েট্‌সের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে—Wonderings of Oisin, The Celtic Twilight, A book of Irish Verse, The Secret Rose, The Wind among the Reeds, The shadowy Waters এবং Where There is Nothing. আইরিশ জাতীয় নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী Lady Gregory'ও আইরিশ জীবনের নাট্য রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইঁহার The Full Moon, Dawer's Gold এবং Mcdonough's Wife যথেষ্ট খ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছে।
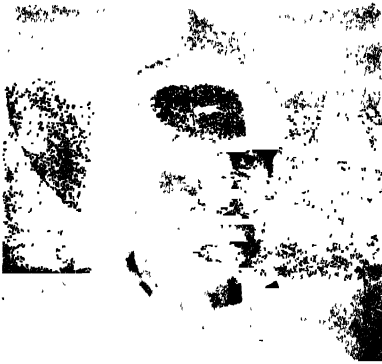
উইলিয়ম বট্‌লার ইয়েট্‌স্

Elizabeth Barret Browningএর মৃত্যুর পর যে সকল মহিলা কাব্য-রচনায় নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করেন, তন্মধ্যে মিসেস্ এলিস্ মেনেলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাজকবি আলফ্রেড অষ্টিনের মৃত্যুর পর তাঁহাকে রাজকবি করিবার জন্য একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাঁহার Preludes, The Rhythm of Life, The Colour of Life, The Children এবং The Spirit of Peace বেশ সুখপাঠ্য।

এলিস্ মেনেল

Monthly Review নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রের সম্পাদক হেনরী নিউবোল্ট নৌ-যুদ্ধ সম্বন্ধে উত্তেজনা-পূর্ণ কবিতা লিখিয়া বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইঁহার "Drake's Drum" এবং "Admiral's All" নৌসেনাদের

খুব প্রিয়। 'Modred' নামক একখানা বিয়োগান্ত নাটকও ইঁহার আছে।

হেনরী নিউবোল্ট

বৃদ্ধ কবি অষ্টিন ডব্‌সনের গদ্য ও পদ্য রচনায় যথেষ্ট সুনাম আছে; ইঁহার কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, উৎকট-নীতিবাদীরা খুঁজিয়া পাতিয়া দুর্নীতির দুর্গন্ধ বাহির করিতে পারিবেন না। "ট্রিয়লেট" ও 'রণ্ডেল' রচনায় বর্ত্তমান যুগে ইঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। ডব্‌সনের Ballard of; Leaw Brocade, Old World Idyls, The Sign of Lyre প্রভৃতি কবিতাপুস্তক কাব্যরসে ভরপুর। ইঁহার William Hogurth এর জীবন-কাহিনী অত্যন্ত মনোহর Goldsmith, Horace Walpole ও Fielding এর জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া চরিতাখ্যায়করূপে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। Four French Women নামক পুস্তকে শার্লট কর্ডে, ম্যাডাম রোলাণ্ড প্রভৃতি চারিটি ফরাসী বিপ্লবের নায়িকাদের জীবন-বর্ণনা করিতে গিয়া বিপ্লবের যে রুদ্র ও বিভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নিপুণ কলাকুশলতার পরিচায়ক। নিবন্ধগুলির যবনিকার অন্তরালে কবির গভীর সহানুভূতি নিহিত থাকিয়া ঐ গুলিকে মুক্তামালার মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

অষ্টিন্ ডবসন

গ্রীক ট্রেজিডির অনুকরণে The Death of Hippolytus নামক নাটক রচনা করিয়া কবি মুরিস ইউলেট সাহিত্য জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। The Agonists নামক সুন্দর নব-প্রকাশিত ট্রাইলজিটি বেশ সুখপাঠ্য।

একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, দার্শনিক, জীবনচরিতাখ্যায়ক ও নিবন্ধ-লেখকরূপে জি, কে, চেষ্টারটন ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। ইঁহার লেখার ভঙ্গীতে বেশ ঝাঁজ আছে এবং চিন্তাপ্রণালীও অভিনব। অনায়াস-স্বচ্ছন্দগতিতে লিখিতে লিখিতে বক্তব্য বিষয় হইতে তিনি অনেক সময় অবান্তর বিষয় আলোচনা করেন, তথাপি ইঁহার কলাচাতুর্য্য ও চিন্তার অভিনবত্ব পাঠকের মনে বিরক্তির উৎপাদন করে না। রঙ্গনাট্যে অতি অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কথাগুলি গুছাইয়া এমন স্থানে প্রয়োগ করেন যে, সেগুলি যে নেহাৎ অসম্ভব ও একেবারে কিম্ভূতকিমাকার তাহা সহজে কল্পনায় আসে না। The Ballard of White Horse ও The Ballard of King Alfred নামক গাথা কবিতায় দেশপ্রাণতা উপভোগ্য।

ইংলণ্ডের সকল কবি এখন নূতনের সহিত সুর মিলাইয়া কাব্যবীণার ঝঙ্কার দিতেছেন, কেবলমাত্র উইলিয়ম ওয়াটসন, এডমণ্ড গস্ নূতনের মাদকতা হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া Milton এবং Wordsworth এর সুরে কবিতা লিখিতেছেন। বাঙ্গলার মহিলা কবি কুমারী তরুদত্ত ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে ইংলণ্ড সাহিত্য-সমাজে পরিচিত করাইয়া কবি এডমণ্ড গস্ বঙ্গবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

উইলিয়ম ওয়াটসন্

এখন ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ঔপন্যাসিকদিগের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ইংলণ্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যে ভাব ছিল তাহা অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন ব্যাপারে আইরিশ ঔপন্যাসিক জর্জ্জ বার্নার্ড্‌শএর হাত কম নহে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান যুগের তিনিই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও অদ্বিতীয় প্রতিভাবান্ কবি। অহেতুকী কঠোর সমাজবন্ধন, মানবের কি ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, ভোগ-বিলাসগত সভ্যতা যে কি পরিমাণ অশান্তি আনিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিবার

মানসে শ তাঁর ব্যঙ্গপূর্ণ নাটকসকল রচনা করিয়া বর্ত্তমান সমাজপতিগণের পৃষ্ঠে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। তীব্র সমালোচনা সচরাচর কাহারও মুখরোচক হয় না; কিন্তু তাঁহার রচনাগুলি যেরূপ তীব্রতার সহিত সমাজ ব্যাধির আবরণ নগ্নভাবে উন্মোচন করিয়াছে তাহা সকলকেই আকৃষ্ট করে।

জর্জ্জ বর্নার্ড শ

বিকৃতাবস্থাপন্ন সমাজকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে হাসির গান রচনা করিয়াছেন, আমাদের দেশের দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ব্যতীত আর কেহই তেমন পারেন নাই। শ এর নাটকে একদিকে হাসির ছটা যেমন অবাধগতিতে রহিয়াছে, তেমনই অপরদিকে গাম্ভীর্য্য থাকিয়া এক অপূর্ব্ব রসমাধুরীর সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার এই অদ্ভুত তীব্রতা যাহা সমাজকে, ধর্ম্মকে ও সাহিত্যকে আক্রমণ করিয়া জর্জ্জরিত করিয়াছে, তাহা দেখিয়া সাধারণে তাঁহাকে মানববিদ্রোহী বলিয়া থাকেন; কিন্তু যিনি তাহার পুস্তকগুলি ভাল করিয়া পাঠ করিবেন তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে তিনি একজন প্রগাঢ় বিশ্বপ্রেমিক। প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইব্‌সেন এবং সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক নিট্‌ঝের প্রভাব ইঁহার রচনায় বেশ সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। 'Cashel Byron's Profession' 'Man and Superman' Candida, 'Doctor's Dilemma' 'John Bull and Other Island' প্রভৃতি পুস্তক তীব্রব্যঙ্গপূর্ণ অথচ বেশ চিত্তহারী। ইঁহার 'Mrs. Warren's Profession' নামক নাটকখানি যখন প্রকাশিত হয়, তখন সত্য সত্যই দুর্ব্বলচিত্ত ধর্ম্মযাজকেরা ভীত হইয়া পড়েন এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে, সমাজ ব্যাধিগুলিকে গুপ্ত আবরণে ঢাকিয়া রাখা অসম্ভব।

আধুনিক ইংলণ্ডীয় নাট্যকারদিগের মধ্যে কেবল মাত্র বার্ণাড শ এবং গ্যালসওয়ার্দি কৃত্রিম রীতিনীতির (Convention) বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। বার্ণাড শর 'Man and Superman' এবং গ্যালসওয়ার্দির 'The Silver Box' ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সমাজে মারী করেলির নাম সর্ব্বজনবিদিত। সকলেই জানেন সাহিত্য সচরাচর হয় বস্তুকে, না হয় কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হয়; কাজে কাজেই উপন্যাস জগতে এই দুই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের একদল বাস্তবাদর্শাবলম্বী (Realistic) ও অপর দল কল্পনাদর্শাবলম্বী (Idealistic)। মারী করেলীর প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসে
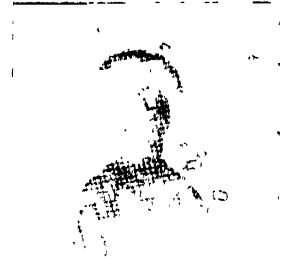
মারী করেলী

এই আদর্শেরই অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। ১৮৬৪ সালে ইটালী দেশে করেলীর জন্ম হয়। তিনি ইংরেজ না হইয়াও ইংরেজি সাহিত্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে তাহা দুর্লভ। অল্প বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য ফরাসী দেশস্থ কোন ক্যাথলিক মঠে প্রেরিত হন। এইখানে তাঁহার কবি-প্রতিভার উন্মেষ। প্রথম বয়সে তিনি 'সনেট' লিখিয়া অল্পবিস্তর খ্যাতিলাভ করেন; কিন্তু তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'Romance of the Two Worlds' তাঁহাকে সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত করিয়া দেয়। বর্ত্তমান জড়বাদের যুগে অনেকেই আত্মার অমরত্বে আস্থা-

হীন, কিন্তু করেলি এই 'Romance' এ আত্মার অবিনশ্বরতা-স্থাপন প্রয়াসী হন। নূতন আলোকে খৃষ্টধর্ম্মকে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি 'Sorrows of Satan','Barabbas', 'Master Christian' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া গোড়া পাদ্রী সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হন। তাঁহার 'Thelma'এবং 'Vendetta' নামক Romance বর্ণনাচাতুর্য্যে, কল্পনা-বৈচিত্র্যে, চরিত্রবিশ্লেষণে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও ভাষা-মাধুর্য্যে অপরূপ। তাঁহার 'Free Opinions Freely Expressed' নামক পুস্তকে তিনি নির্ম্মমভাবে অথচ সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় য়ুরোপীয় সমাজের দোষগুলি সকলের সম্মুখে উন্মোচন করিয়াছেন। তিনি আজ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা; মহাকবি সেক্সপিয়রের প্রতি অনুরাগবশতঃ মহাকবির জন্মভূমি Stratford-on-Avon এর শান্ত শোভা-বেষ্টিত একটি উদ্যানবাটিকায় বাস করেন।

বর্ত্তমান সাহিত্যসমাজে হল কেনের আদর বড় কম নহে। ইনিও জাতিতে ইংরেজ নন। Isle of Man এ ইঁহার জন্ম। লিভারপুলে তিনি গৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালী শিখিতে আসেন; কিন্তু কোন দিন গৃহ-নির্ম্মাণ ব্যবসায়ে নিযুক্ত না হইয়াই গৃহ-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে এই বৈজ্ঞানিক রচনা পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় ব্যাপৃত হন। ইঁহার উদ্দাম কল্পনা দেশের আচার ব্যবহার রীতিনীতি ও সামাজিক আদর্শের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া নূতন সামাজিক আদর্শসৃজনে ব্যাপৃত আছে। ইঁহার নবপ্রকাশিত উপন্যাস 'Woman thou gavest me' বিবাহ-চ্ছেদ প্রভৃতি গভীর সামাজিক লইয়া রচিত। ইনি সুদান যুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা 'White Prophet' নামক উপন্যাসে প্রকাশিত করিয়া অনেকের—বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদীদের—বিরাগভাজন হইয়াছেন। কবিচিত্রকর রোশেটির সহিত ইঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ইঁহার 'Bondman' 'Scape-goat' 'Manxman' 'Prodigal Son' ও 'Deemster' সর্ব্বজন-আদৃত। তাঁহার 'Eternal City' ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় উপর্য্যুপরি অভিনীত হইয়া তাঁহার নাটকীয় প্রতিভাকে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়াছিল।

হল কেন

বর্ত্তমান উপন্যাস-জগতে এচ্, জি, ওয়েল্‌স্ সামাজতন্ত্রের (Socialism) প্রধান-পুরোহিত। ইঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলি বাস্তবতন্ত্রকে, এবং বৈজ্ঞানিক উপন্যাসগুলি কল্পনাকে যথাসম্ভব আশ্রয় করিয়া বিকশিত হইয়াছে। প্রথমে সাহিত্য-আসরে নামিয়া পৃথিবীর ভবিষ্য সুখের জীবনের কল্প চিত্র আঁকিয়া ভাবপ্রবণতার পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে Tono Bungay নামক উপন্যাস লিখিয়া বাস্তবাদর্শের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। ইঁহার 'New Machiavelli' এই বাস্তবাদর্শের জন্য সর্ব্বজন-সমাদৃত। সমাজমধ্যে বিবাহিত-জীবন অতিবাহিত করাই যে সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণাকে এড়াইবার একমাত্র উপায়, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে ইঁহার 'Marriage'নামক উপন্যাস কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার সদ্যঃপ্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'Passionate Friends.'

এচ্, জি, ওয়েল্‌স

ইহুদী সাহিত্যিকদিগের মধ্যে ইস্রায়েল জ্যাঙ্গউইলের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। বাল্যকালে তিনি কাহারও সাহায্য না লইয়া আপনার শিক্ষা আপনি সমাপ্ত করেন। সংবাদপত্র লেখকরূপেই তিনি সাহিত্য আসরে দেখা দেন। ইহুদিদিগের দুঃখকষ্ট লোকচক্ষুর গোচর করিবার জন্য "Children of the Ghetto' প্রভৃতি ছোট ছোট গল্প প্রকাশ করেন। সমস্ত পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত ইহুদীজাতিকে একত্র করিয়া এক রাষ্ট্রীয় মণ্ডলী গঠিত করিবার প্রয়াসী। তাঁহার 'Six Persons' 'Moment of Death' ও 'Revolted Daughter' প্রভৃতি নাটকগুলিই য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছে। তাঁহার বিখ্যাত নাটক 'War

God'এ বিখ্যাত কূটরাজনৈতিক বিষমার্ক ও শান্তিপ্রয়াসী টলষ্টয়ের অনুকরণে দুইটি চরিত্রের সৃষ্টি দ্বারা শান্তি প্রয়াসীর জয় দেখাইয়া জগতে শান্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। তিনি রমণীর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং তজ্জন্য তিনি অনবরত যুদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডের মহিলা-সমাজের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।

ইংলণ্ডের জন-সাধারণের প্রিয় ঔপন্যাসিক Rider Haggard, A. T. Quiller Couch, Arthur Conan Doyle এবং J. M. Barrie সাহিত্য-সাধনার ফলে Knight উপাধিলাভ করিয়াছেন।

আমেরিকার আধুনিক সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমতী এলা হুইলার উইলকক্সের লেখনীর উপর পতিত হয়। ভারতের চিরন্তন ভাবের ধারাটি ইঁহার জীবনে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, ভাবরাজ্যে ইঁহার দান সম্পূর্ণ ভারতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার পরিবারের আবহাওয়া ধর্ম্মের বড় অনুকূল ছিল না; কিন্তু অতি অল্প বয়সেই তিনি ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। ইনি Theosophy সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও খৃষ্টের প্রতি (Personality of Christ) ইঁহার অচলা ভক্তি। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে তিনি বেদান্ত-দর্শনের অনুরাগী হইয়া উঠেন। স্বামীজির "মায়া" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, প্রেরণার বশে 'মায়ার' ভাব ব্যক্ত করিয়া "God and I alone in Space" নামক যে কবিতা লেখেন তাহা যুরোপীয় চিন্তাপ্রণালীর এত বিরোধভাবাপন্ন ছিল যে, প্রথমে কোন পত্রিকাসম্পাদক তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন নাই; পরিশেষে "London Athenium" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের আদৃত হয়; এই কবিতা লেখিকার মতে ইহাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। ইঁহার কবিতাগুলি সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় যে, আমেরিকার রাস্তা ঘাটে এই কবিতাগুলির আবৃত্তি শুনা যায়, তাঁহার Poems of Love, Poems of Passion, Poems of Sentiment ও Chapbook প্রভৃতি কাব্যগুলি তাঁহাকে সাহিত্য-জগতে অমর করিয়া রাখিবে।

রাইডার হ্যাগার্ড

মিসেস্ এলা হুইলার উইলকক্স্

দার্শনিকপ্রবর William Jamesএর ভ্রাতা হেনরী জেমস্ আমেরিকার বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক ও সন্দর্ভকার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার মনের সুনিপুণ বিশ্লেষণ ইঁহার উপন্যাসের প্রাণ। ভ্রমণবৃত্তান্ত ও ছোট গল্প রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার A passionate Pilgrim, Transatlantic Sketches, The Europeans, Bundle of Letters, Siege of Lon-

হেনরী জেমস্

don, Partial Portraits, The Tragic Muse এবং The Outcry তাঁহার অসংখ্য উপন্যাসের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

উইলিয়াম ডিন হাওয়েলস উপন্যাস, কবিতা, নাটক ও সমালোচনা লিখিয়া আমেরিকার সাহিত্যে বেশ প্রতিপত্তি-লাভ করিয়াছেন।

পিয়ের লোটি, আনাটোল ফ্রান্স, মেটারলিঙ্ক, হঁারি ব্রাগসেঁা, এবং এমিল ভারহারেন, এই পাঁচজনই বর্ত্তমান ফরাসী

মরিস্ মেটরলিঙ্ক

সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মেটারলিঙ্কের ন্যায় ভারহারেনেরও পিতামাতা বেলজিয়মবাসী। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়মের অন্তর্গত Anturp সহরে ভারহারেনের জন্ম হয়। Ghent সহরে বিদ্যালাভ করিতে গিয়া মেটারলিঙ্ক এবং সাহিত্যাচার্য্য লেমগিয়ারের সহিত পরিচিত হন। ফরাসী কবিতার পুরাতন ছন্দোবন্ধ ভাঙ্গিয়া নিজস্ব ছন্দের সৃষ্টি করিয়াই ইনি যশস্বী হইয়াছেন। পদলালিত্য, শব্দ-মাধুর্য্য, ঝঙ্কার এবং হৃদয়াবেগের প্রবলতাই ইঁহার কাব্যকে স্থায়ী করিয়া রাখিবে। ইঁহার কল্পনার গভীরতা, বিশিষ্টতা ও প্রসার, ফরাসী-সাহিত্যের সম্পদ্। তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয়াবেগ কোমলকান্ত ফরাসী ভাষাকে একটা নূতন প্রচণ্ড গতি প্রদান করিয়াছে কিন্তু ভাষার গতিকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার ভাবের গভীরতা নবযুগের নূতন সভ্যতা ভারহারেনের প্রাণে প্রগাঢ় রসানুভূতি উদ্রিক্ত করিয়াছে এবং তাহার গ্রন্থাবলীতে এই ভাবের অভিব্যক্ত স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃষ্টি, বরফপড়া, শীতের বাতাস প্রভৃতি কবিতা সূক্ষ্ম বর্ণনা ও শব্দঝঙ্কারে পাঠকের চক্ষের সম্মুখে একটি সুস্পষ্ট ছবি ফুটাইয়া তুলে। কবি ভারহারেণ মানবতার পূজক। Adam and Eve, Hercules, Persens, Martin Luther, Michael Angelo প্রভৃতি পুস্তকে তিনি মানবতার পূজা করিয়াছেন। ধ্রুবদর্শনের (Positivism) মানবতার ন্যায় তাঁহার মানবতা নীরস শুষ্ক নহে। পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের প্রেম, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি মানবকে পবিত্র মহা্ করিয়া তুলিয়াছে। ভারহারেণ মানবের সেই মহত্ত্বের পূজক। ইঁহার কাব্যের আর একটি বিশিষ্টতা এই যে, তাহা প্রেম সঙ্গীত বিবর্জ্জিত।

পিয়েরলেটি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারী রোসফোর্ত্তে (Rochefort) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নৌসেনাবিভাগে যোগ দেন। গত বৎসর ইঁহার রচিত Pelerin d' Angkor নামক উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ পর্য্যন্ত এই জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের ২৭ খানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে।

হঁারি ব্রাগসেঁা

হঁারি ব্রাগসেঁা—বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের মৃত্যুর পর য়ুরোপে যে দুইজন দার্শনিক আপনাদের বহুমুখী প্রতিভায় বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছেন তন্মধ্যে হঁারিবর্গসেঁা একজন। অপর ব্যক্তি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত

প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ দার্শনিক রুডল্‌ফ অয়কেন। বার্গসোঁ অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন, এবং অঙ্কের জটিল সমস্যা সামাধান করিতে করিতে সুনিবদ্ধ প্রণালীতে চিন্তা করিবার শক্তি লাভ করেন। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবিদ্যায় নির্গুণব্রহ্মকে (absoluteকে) সৃষ্ট পদার্থের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার জন্য (in terms of reality) প্রয়াসী হইয়া ইনি নূতন প্রণালী দ্বারা আধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচার করেন।

ইঁহার মতে মানব সুখান্বেষী নহে; মানব দক্ষতা-লাভের জন্য ব্যাকুল। আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিবশে আমরা সৃষ্টি করিয়া থাকি। ক্ষুদ্র হইতে মহতের সৃজনই ক্রম-বিকাশের ধারা; মানবের-সৃজন ইচ্ছা, সেই ধারাকেই অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। সৃষ্টির অন্তরালে সৃষ্টির যে তৃপ্তি আছে তাহাই মানবকে আনন্দ প্রদান করে। বিশ্বে একটা নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার আনন্দই মানব কোন না কোন রূপে লাভ করিতে চায়। এই মতটি তাঁহার দর্শনে বেশ পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন। ইনি বলেন, "যে অবিশ্বাসী সেই সপ্রমাণ করুক আত্মা বিনশ্বর। অবিনশ্বর যাহা তাহারও যে ধ্বংস নাই, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, এবং হইতেও পারে না; কেননা তাহা সময় এবং কালের অতীত। কাল এবং সময় শেষ হইয়া গেলেও যদি যাহা অবিনশ্বর তাহার অস্তিত্ব থাকে, তবেই তাহার অবিনশ্বরতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সময় এবং কাল যখন সীমা এবং অন্তহীন, তখন সে চেষ্টা বৃথা। কিন্তু যাহা বিনশ্বর তাহা কাল এবং সময়ের মধ্যে আবদ্ধ। কাজেকাজেই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভব। আত্মার বিনশ্বরতায় যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিন।"

ইঁহার "Matter & Memory" "Laughter" "Evolution" এবং "Metaphysics" নামক পুস্তক য়ুরোপের ভাব-জগতে এক প্রবল তরঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে।

জার্ম্মাণীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সুডারমান প্রসিদ্ধ দিনেমার ঔপন্যাসিক ইবসেনের শিষ্য। মানবজীবনে প্রতিনিয়ত যে সকল প্রবৃত্তির সংঘর্ষ চলিতেছে এবং সেই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে পাপ অথবা পুণ্য পরস্পরের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া মানবকে কি প্রকারে নরকে অথবা স্বর্গে লইয়া যাইতেছে—উদ্দাম পৈশাচিকতার সহিত তাহার নগ্নচিত্র উজ্জ্বলভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া ইনি কাব্য-সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার অঙ্কিত মানবচরিত্র-গুলি পাঠকের মনে এমন গভীর ভাবের উদ্রেক করে যে, পাঠকের চিন্তাশীলতা স্বভাবতঃই জীবনসমস্যা সমাধানের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। ১৮৫৭ খৃঃ অঃ হারমান সুডারমান Matzicken সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি Konigsberg এবং Berlin বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন ১৮৮১ খৃঃ অঃ Deutsches Reichesblatt নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার অসংখ্য উপন্যাস, নাটক ও ছোট গল্পের মধ্যে এই কএকখানি—

The end of Sodom, Ghon, The War, Mori turi, Mr. Sorge এবং Katzensteg অত্যধিক প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে।

জাপানের সাহিত্যক্ষেত্রে মহিলা কবি আকিকো ইয়োসানো শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন। একজন মহিলার পক্ষে এত উচ্চ স্থান লাভ করা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। ইনি "সুখতারা" নামক মাসিকের সুযোগ্য সম্পাদক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ইয়োসানোর পত্নী। শ্রীমতী ইয়োসানো আহোটরী বংশসম্ভূত জনৈক অবস্থাপন্ন বণিকের দুহিতা। ইনি ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে সাকাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। জাপানের প্রথানুসারে ১৫ বৎসর বয়ক্রমে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও ইনি গৃহে সাহিত্য-চর্চ্চায় ব্যাপৃত হন। ইঁহার জ্ঞানপিপাসা দর্শনে ইঁহার পিতা দেশাচারকে উপেক্ষা করিয়া ইহার বিবাহ স্থগিত রাখেন। এই সময়ে "সুখতারা" নামক জাপানী মাসিক-পত্রিকায় জাপানের কবিদিগের সম্বন্ধে একটি সুন্দর সন্দর্ভ প্রকাশিত

আকিকো ইয়োসানো

হয়। সেই সন্দর্ভ-পাঠে শ্রীমতী ইয়োসানো, শ্রীযুক্ত ইয়োসানোর কবিতার ভক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার কবিতা শ্রীমতীকে কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করে। ইনি কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়া "সুখতারা"তে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দেন। এই সূত্রে আকিকোর সহিত ইয়োসানোর সদ্ভাবের সূচনা হয়। পরিচয়ের ফলে উভয়ে উভয়ের অত্যন্ত অনুরাগী হওয়াতে ইঁহারা উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হন। আকিকোর পিতা বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে প্রথমে এই বিবাহে অসম্মত হইলেও পরিশেষে বাধ্য হইয়া বিবাহে সম্মতি প্রদান করেন। 'তান্‌কা' ছন্দে কবিতা-রচনায় ইনি অদ্বিতীয়; "সীস্তাইসী" ছন্দ-রচনাতেও ইঁহার যথেষ্ট সুনাম আছে। ইঁহার কাব্যে চলিত কথার ভূরি ব্যবহার থাকিলেও, সেইগুলিকে বসাইবার গুণে কবিত্বের কিছুই হানি হয় নাই; বরঞ্চ কবিতাগুলি আরও শ্রুতিমধুর হইয়া উঠিয়াছে। ইনি ফরাসী সাহিত্যের খুব অনুরক্ত এবং তজ্জন্যই বোধ হয় ইঁহার কাব্যে ফরাসী কবি Mallarme এবং Bandelaireএর প্রভাব দেখা যায়। নাটক ও উপন্যাস রচনাতেও ইঁহার বহুমুখী প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছে। ইনি রমণীর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং নারীর পক্ষ সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইঁহার কবিতাপাঠে জনৈক জাপানী সাহিত্যিক মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন যে, "যিনি এরূপ সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারেন তিনি কখনই মানুষ নহেন। স্বয়ং বাগ্দেবী নিশ্চয়ই শ্রীমতী ইয়োসানো রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

ইঁহার "স্রোতের ফুল" "এলাইত কুন্তল" এবং "গ্রীষ্মের আগমন" নামক কবিতা পুস্তক ইঁহাকে অমর করিয়াছে।

জাপানে স্বদেশপ্রীতির (Patriotism) অভাব নাই; কিন্তু প্রতীচ্যের সংঘাতে জাপান দেশপ্রাণতা (Nationalism) ভুলিয়া পাশ্চাত্যের মোহগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যক্তিত্ব, সমাজপ্রবণতা, দেশপ্রবণতা এবং বিশ্বমানবতা এ সকলের মধ্যেই বিচিত্ররূপে মনুষ্যত্ব আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। মানবের পক্ষে সমাজ ও দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্ববোধ এবং বিশ্বপ্রেম আত্মজ্ঞান ও আত্ম চরিতার্থতার মধ্য দিয়াই সার্থকতা লাভ করিবে। ব্যক্তিগতভাবে যেমন ব্যক্তির একটা প্রাণ আছে, সমষ্টিগতভাবে দেশেরও তেমনই একটা প্রাণ আছে। বিদেশীয় ভাব-সংঘাত যখন আমাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন আমাদের দেশপ্রাণতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। দেশপ্রাণতার অভাব থাকিলে শুধু স্বদেশপ্রীতি, জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

জাপান বিদেশের মোহে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া দেশপ্রাণতাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছিল। প্রখরতা ও গভীরতাশূন্য জাপানী চিন্তা পরানুকরণে আপনাদের তৃপ্তি সাধন করিতেছিল। এই অধঃপতনের গ্লানি জাপানের প্রাণে তীব্র ভাবে জাগিয়াছে, তাই ইহা হইতে জাপানকে রক্ষা করিতে মনীষিবর্গ আজকাল প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন। ইয়োন নগুচি এই সকল মনীষিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইনি বলেন যে, পাশ্চাত্যের আক্রমণে আমাদের জাতীয় জীবনে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য দেখা দিয়াছে। আমরা যাযাবর জাতিদিগের মত এদেশ-ওদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে জাপানকে রক্ষা করিয়া আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে।

এইবার রুমেনীয়ার রাণীর কথা :—ইনি সাহিত্যের দরবারে 'কারমেন সিলভা' নামে পরিচিত। য়ুরোপের সিংহাসনে যতগুলি রাণী বসিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বিদুষী ও তাঁহার লেখনী সাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। ইনি শিশুসাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁহার এই শিশুসাহিত্যগুলি মাতৃহৃদয়ের স্নেহাবরণে মণ্ডিত এবং এইগুলি ইউরোপের শিশুজগতের প্রধান খোরাক। তাঁহার কবিতায় সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রবল আস্বাদন পাওয়া যায়। তাঁহার Thoughts of a Queen, Shadows of Life's Dial এবং A real Queen's fairy book য়ুরোপীয় সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

উপরে আমরা সংক্ষেপে বর্ত্তমান য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানের সাহিত্যরথিদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম; অতঃপর আমরা এইরূপ কএকজন সাহিত্যসেবীর বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব যাঁহারা কোন মহৎ পারিতোষিক প্রাপ্ত না হইয়াও

সাহিত্য-জগতে যুগান্তর আনিয়া দিয়া গিয়াছেন।

কাউণ্ট টলষ্টয়

এই কএকজন মহাপুরুষের মধ্যে কাউণ্ট লিও টলষ্টয় সর্ব্ব-প্রধান। টলষ্টয় তাঁহার যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ও ভাবুক এবং নব্য-রুষীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণকর্ত্তা। এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও একদল লোকের দ্বারা তিনি সয়তানের অবতার রূপে বিবেচিত হইতেন। তাহার প্রধান কারণ, তিনি স্বার্থপর রাজশক্তি, সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়, অন্যায়কারী ও অত্যা-চারীর যম ছিলেন। তাঁহার বিরাট্ ব্যক্তিত্বের নিকট রুষ রাজশক্তির অনেক সময় হার মানিতে হইয়াছে। টলষ্টয়ের জন্মকালে রুষিয়ার অবস্থা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; দুর্দ্দমনীয় রাজশক্তি নির্ম্মমভাবে অসহায় প্রজাশক্তিকে নিষ্পেষিত করিতে তখন নিযুক্ত; চিরতুষারাবৃত সুদূর সাই-বিরিয়ার কারাগার তখন অসংখ্য সত্যপ্রিয়, ধর্ম্মভীরু প্রজা-বৃন্দের আবাস স্থল ছিল। এইরূপ সময়ে কোন এক ধনীর গৃহে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে টলষ্টয় জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু বাল্যকালে পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় এক নীচমনা আত্মীয়ার হস্তে তাঁহাকে পড়িতে হয়। এই আত্মীয়ার প্রভাবে বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠে। তার-পর তিনি রুষের কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ না করিয়াই সামরিক বিভাগে প্রবেশ করেন; আর্ম্মেনিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি তথায় প্রেরিত হন, এবং যুদ্ধে সম্মান লাভ করিয়া সামরিক বিভাগ ত্যাগ করেন। তাঁহার পর তাঁহার জীবনে এক গভীর পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দিন হইতে তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় ও অসংখ্য ভাগ্যহীন প্রীতি বঞ্চিত মানুষকে উন্নত করিবার আশায় আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিলেন। নিজের বিলাসিতাকে বিসর্জ্জন দিয়া এবং সামান্য কৃষকের মত মিতব্যয়ী হইয়া আপনার সমস্ত অর্থ জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন।

খৃষ্ট ধর্ম্মে তাহার বিশ্বাস ছিল; কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা, ক্রিয়াকাণ্ড ও অনুষ্ঠানকে তিনি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় যে সকল গর্হিত কার্য্য করেন, তাহা টলষ্টয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল; এই জন্যই ধর্ম্মনেতাগণ তাঁহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া উপহাস করিত এবং তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলিকে আইনের দ্বারা বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিত। তিনি মন্দিরে প্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টীয় সমাজ হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কোন পুরোহিত তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণের জন্য উপাসনা করে নাই;—এই উপাসনার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভার লইয়াছিল—রুষের দরিদ্র কৃষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। টলষ্টয় রুষীয়ায় ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে প্রচলিত রাজতন্ত্র, ধর্ম্মতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও, চরমপন্থী বিদ্রোহীদিগের সহিত এক মতে মিলিতে পারেন নাই। এই সকল চরমপন্থীরা এই ত্রিতন্ত্রকে ভাঙ্গিতে আসে, কিন্তু তাহারা ভাঙ্গিতেও পারে না, গড়িতেও পারে না; কেবল মাত্র দলের সৃষ্টি ও পৃথিবীতে নূতন উপদ্রব আনিয়া উপস্থিত করে। য়ুরোপের কর্ম্ম-জগতে অনেক দিন হইল সমাজতন্ত্রের (Socialism) ধুয়া উঠিয়াছে; এই সমাজপন্থীরা (Socialist) পৃথিবীর দরিদ্রদিগকে ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে বলিতেছে; কিন্তু টলষ্টয় সে কথা না বলিয়া বলিলেন, 'হে সমাজ-

পন্থী, ধনী, দরিদ্র, সৌখীন লেখক ও মিথ্যা কলাপ্রণালীর (False Art) উপাসক, তোমরা মিথ্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হও।' টলষ্টয়কে বুঝিতে হইলে দুই বিভিন্ন দিক হইতে দেখিতে হইবে। প্রথমে সংস্কারকরূপে ও শেষে কলা-উপাসক রূপে। এই কলা-উপাসকরূপে তিনি যে অপূর্ব্ব গল্প রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি উপন্যাস, সামজিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও অর্থ-নৈতিক বিষয়ে যে সকল পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা, রুশীয় সাহিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার War and Peace, Anna Karenina, The Kreutzer Sonata, What is Art এবং Resurrection সকলেরই পাঠ করা উচিত।

এইবার সুইডেনের ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ষ্ট্রীণ্ডবার্গের কথা; ইনি 'নোবেল' প্রাইজ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ১৮৪৯ সালে ষ্টকহলম সহরে তাঁহার জন্ম হয়; দরিদ্রের সন্তান বলিয়া অল্প বয়স হইতেই তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। নানাপ্রকার ধর্ম্মের পেষণে যখন তিনি জর্জ্জরিত হইয়া উঠিতেছিলেন তখন বিপ্লববাদী দার্শনিক নীটঝের (Neitsche) সমাজসংহারিণী মতগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠেন।
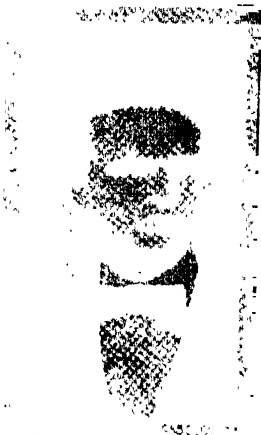
ষ্ট্রীণ্ডবার্গ

ফরাসী বিপ্লবের প্রবল বন্যা যখন সুইডেনদেশে আসিয়া পড়ে তখনই ষ্ট্রীণ্ডবার্গ জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য তাঁহার পুস্তকে যে, মনীষার উদ্দাম গতি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তাঁহার লেখনীতে বাস্তবকলার (Realistic Art) পূর্ণ বিকাশ—কিন্তু সে বাস্তবকলা একেবারে উদ্দাম ও নগ্ন। সেই জন্য অনেকে তাঁহাকে "Prophet of Grim Realism" আখ্যা দিয়াছেন। সমাজে যে সকল পৈশাচিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা আছে তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ষ্ট্রীণ্ডবার্গের বাস্তবকলা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। টলষ্টয় কিংবা মেটারলিঙ্কে বাস্তবকলার যে শান্ত মূর্ত্তি আছে তাহা ষ্ট্রীণ্ডবার্গে নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে, সমাজের এই পৈশাচিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিতে হইলে সাহিত্যে বিদ্যুতের খেলা, কিংবা বজ্রাঘাতের ভীমভৈরব নির্ঘোষের আবশ্যক আছে কি না? যদি সে আবশ্যকতা থাকে, তবে সাহিত্যে ষ্ট্রীণ্ডমার্গের স্থান অতুলনীয়।

এইবার সংক্ষেপে তাঁহার জীবন-চরিত আলোচনা করা যাউক; কারণ তাহা হইলে আমরা তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভার বিশেষত্ব ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিব। ষ্ট্রীণ্ডবার্গ তিনবার বিবাহ করেন; কিন্তু ঘটনা বিপর্য্যয়ে তিন পত্নীর কাহারও চরিত্র ভাল ছিল না। এই জন্যই বোধ হয় নারী-জাতির প্রতি তাঁহার এক বিজাতীয় ঘৃণা জন্মায়। একজন ইংরেজ লেখক এই কথার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "Strindburg imagines a necessary and inevitable conflict between Man and Woman." আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কএকখানি উপন্যাসে তিনি কেবল যৌন সম্বন্ধ (sexual relation) লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার "Miss Julia" নামক উপন্যাসের বিষয় হইতেছে—একটি বিদুষী নারী আপনার গৃহের চাকরের সহিত প্রেমে পড়িতেছেন। এবং তিনিও একস্থানে বলিয়াছেন, It is so pleasant to be an animal for a while! যাহা হউক পাপের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও পতিতের প্রতি প্রাণভরা সহানুভূতি তাঁহার ছিল—আর ছিল অপূর্ব্ব মনীষার বিদ্যুৎ-বিকাশ। সেই জন্য লণ্ডনের "Times" ষ্ট্রীণ্ডবার্গকে Brutal and Savage Poet বলিয়াছে কিন্তু তত্রাচ বলিতে বাধ্য হইয়াছে,"Yet this violent brutal being had the soul of a poet" আর বিশ্ববিশ্রুত লেখক ইবসেন বলিয়াছেন, "Here is one who is greater than mine." বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলা, জর্ম্মাণ দার্শনিক নিটঝে এবং দিনেমার লেখক ব্রাণ্ডিস, ষ্ট্রীণ্ডবার্গের লেখনীর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। যে সকল পাঠকেরা এই উদ্দাম বাস্তবকলা ভালবাসেন তাঁহারা ষ্ট্রীণ্ডবার্গের Red Room, Madmoiselle Julia, The

Father, The New Kingdom, Dance of the Death, The Link, Coofession of a Fool, Damascus এবং The Growth of Soul প্রভৃতি পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন।

যেকল সাহিত্যরথ আপনার অলোক-সামান্য প্রতিভা দ্বারা জগতের সাহিত্যকে আলোকিত করিয়াও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কোন মহৎ পুরস্কার প্রাপ্ত হন নাই আমরা উপরে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিলাম। এক্ষণে আমরা সে সকল সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের পর 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতে পাইবেন বলিয়া আশা করা যায় সেই সকল সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিব। * বর্ত্তমান সময়ে ইতালীয় কবি ডি, এনাঞ্জিও (D Annanzio), ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি এবং রুষীয় লেখক ম্যাক্সিমগোরকি ও Dostoievsky সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট নোবেল পুরস্কার লাভ করিতে পারেন এবং আমরা আশা করি তাঁহারা ভবিষ্যতে এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

প্রকৃতির লীলাভূমি ইতালী, কাব্য ও চিত্রকলায় যে গৌরবান্বিত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি ? যে দেশে দান্তে ও পেত্রার্কার মত কবি-প্রতিভা জন্মলাভ করে, সে দেশ কখনও রত্নশূন্য হইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান জড়বাদের যুগে ভাবপ্রবণতার তেমন আদর নাই, তাই ভয় হইতেছিল ইতালীর এই কবি-প্রতিভা বোধ হয় আর তেমন ফুটিয়া উঠিবে না। কিন্তু ইতালীর বর্ত্তমান কবি ও সাহিত্যিক ডি এনাঞ্জিও এ ভয় দূর করিয়া দিয়াছেন। কবি কার্দ্দুচির মৃত্যুর পর তিনিই ইতালীয় সাহিত্য-জগতের একচ্ছত্র সম্রাট্। † ইতালী দেশের ভাষার বন্ধন কঠোর এবং শ্রতিকটু হইয়া উঠিতেছিল; সেই কঠোরতাকে মুক্ত করিয়া এনাঞ্জিও সাহিত্যে বিদ্যুৎবেগ ও ভাবের অনাহত গতি আনয়ন করিয়া ইতালীর নব জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা-কিরণে ফুলের মুখে হাসি ফুটে, কোকিলপাপিয়া-কণ্ঠ কলহাস্যে উচ্ছলিত হইয়া উঠে, এবং ফোয়ারার জল নিত্য উৎসারিত হইয়া থাকে। তাঁহার কাব্যকানন বনফুলে শোভিত; জ্যোৎস্নায় প্লাবিত ও তরুণীর কলহাস্য কৌতুকে মুখরিত।

তাঁহার কাব্যে মেঘ-রৌদ্র খেলার রহস্য পাঠককে ভাবের রাজ্যে লইয়া যায়। তাঁহার কাব্য সকল মনকে সৌন্দর্য্য-সুষমায় পূর্ণ করিয়া তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া দেয়;—নবভাবের উদ্বোধনে অন্তর তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। তাঁহার নিজস্ব রচনা-ভঙ্গিটি খুব তরল—পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত; এবং তাঁহার সমস্ত লেখায় অল্পবিস্তর চলিত কথা থাকিয়াও কবিত্ব সম্পদে উজ্জ্বল। তাঁহার এই ইন্দ্রিয়সম্পর্কজনিত সৌন্দর্য্য-বোধ তাঁহার অনেক শত্রু সৃষ্টি করিয়াছে; তাহার মধ্যে প্রধান শত্রু হইতেছেন রোমের পোপ। পোপের আদেশে তাঁহার পুস্তকসকল পাঠনিষিদ্ধ (Index Expuigatorious) তালিকার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ইহার পর হইতে তিনি ফ্রান্সে বাস করেন এবং গত বৎসর তাঁহার নাটক "The Martyrdom of St. Sebastian" ফরাসী সমাজে বেশ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার Triumph of Death, The Innocent, The Child of Pleasure, Il Fuoco, The Flame of Life, The Dead City, Golconda, এবং Frances cad a Reimini সকলের সুখপাঠ্য।

এখন ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির কথা বলিব; অনেকের মতে ইনিই এখন ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সাহিত্যিক। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম এবং বাল্যেই স্থাপত্য বিদ্যার দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল, এবং সেই স্থাপত্য বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন; পরে এই বিদ্যায় বিশেষ পার-দর্শিতা লাভ করিয়া Royal Institution of British

* "রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার" প্রাপ্তির পর প্রয়াগের Pioneer লিখিয়াছে "Englishmen may perhaps be permitted to regret that Thomas Hardy has not yet received recognition, and Russians will probably consider that the claims of Dostoievsky and Gorki are becoming too strong to be ignored much longer."

† "Gabriele D'Annunzio stands now, as for many years he has stood, on a supereminent pinnacle in the range of an literature" —**Edinburgh Review.**

Architects হইতে পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু কি জানি কেন স্থাপত্য বিদ্যা ত্যাগ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তিনি সকলের নিকট "ওয়েসেক্সের কবি (Poet of Wessex) বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; তাহার কারণ হইতেছে তিনি তাঁহার প্রায় প্রত্যেক কবিতায়, গানে এবং প্রত্যেক উপন্যাসে এই ওয়েসেক্স প্রদেশকে পূজা করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসের স্থান ওয়েসেক্সে অবস্থিত এবং ওয়েসেক্সবাসীর জীবন লইয়াই তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার জন্মভূমি" ও রবীন্দ্রনাথের "আমার সোণার বাংলা" যেরূপ, টমাস হার্ডির নিকট ওয়েসেক্স সেইরূপ। তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব হইতেছে, বাস্তবতা (Realism)। কিন্তু তাঁহার এই বাস্তবতায় উদ্দামের ভাব নাই, তাহা প্রকৃতির শান্ত ভাবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া বিকশিত হইয়াছে। ১৮৭৪ সালে তিনি তাঁহার Far from the Madding Crowd প্রকাশিত করিয়া ইংরেজি সাহিত্যে নবীনতার ভাব আনয়ন করেন; এবং সেই হইতে তিনি সাহিত্যজগতে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি অধিকাংশ সময়ে কবিতা লিখিয়া থাকেন। তাঁহার A pair of Blue Eyes, Return of the Native, The Woodlanders, Wessex Tales এবং Wessex Poems প্রভৃতি সাহিত্যে আদরের বস্তু। তাঁহাকে ১৯১০ সালে Order of Merit উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে।

টমাস হার্ডি

এইবার রুষিয়ার লেখকদ্বয় ডসটইভেস্কি ও ম্যাক্সিম গোরকির একটু আলোচনা করা যাউক। ডসটইভেস্কি The House of the Dead (or the Prison Life in Siberia) নামক উপন্যাসখানি লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই পুস্তকখানিতে মানবহৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাত এমন জীবন্তভাবে ফুটিয়াছে যে, ইহা মনে একটি গভীর দাগ রাখিয়া যায়। ডসটইভেস্কি গণতন্ত্রের (Democracy) উপাসক;—তিনি মুক্তিমন্ত্র প্রচার করিতে গিয়া উত্তেজনার মাদকতায় এমন প্রমত্ত হইয়া উঠেন যে, তাঁহার মুক্তিমন্ত্র যথেচ্ছাচারতন্ত্রে পরিণত হইয়া সমাজবন্ধন ছিন্ন করিবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল মনীষার তাণ্ডব লীলা দেখিয়া আমাদের মনে বেদনা আনে, কিন্তু তাঁহার ভাবাতিশয্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। তাই মনে মনে ভয় হয়, সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই গণতন্ত্রতা (Democracy) স্থাপন করিয়া যদি আমাদের চিরন্তন সুন্দরভাবগুলি ভাসিয়া যায়—ভয় হয়, যদি এই ধ্বংসলীলার অবসানে সমাজ কেবল ভগ্ন দৈত্যপুরীর মত শূন্য প্রান্তরে পড়িয়া থাকে। কিন্তু ডসটইভেস্কি এত বড় ধ্বংসের উপাসক হইয়াও বিশ্বপ্রেমিক (Humanitarian)। পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। একদিকে যেমন তাঁহার প্রলাপের আতিশয্যে অবাক্ হইয়া যাই, অপর দিকে ভালবাসার আধিক্য দেখিয়া আমরা তাহার প্রগাঢ় ভক্ত হইয়া পড়ি। অন্যতম রুষীয় লেখক ম্যাক্সিম গোরকি ডসটইভেস্কির মত গণতান্ত্রিক কিংবা সমাজপন্থীও নহেন; তিনি একেবারে বিপ্লববাদী (Revolutionist)। রাজশক্তি প্রপীড়িত রুষিয়ার বিপ্লব দ্বারা তিনি গণতন্ত্রমূলক শাসন-স্থাপন প্রয়াসী। পৃথিবীতে এখন যতগুলি প্রধান সাহিত্যিক আছেন, তাঁহাদের কাহাকেও বোধ হয় গোরকির মত দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হয় না—তিনি নিজের জীবনকে এইরূপভাবে ভাগ করিয়াছেন;—"১৮৭৮ সাল—মুচির কর্ম্মে নিযুক্ত; ১৮৭৯ সাল—নক্সা কারক; ১৮৮০ সাল—একটি ক্ষুদ্র ষ্টিমারে বাসন মাজার চাকর; ১৮৮৩ সাল—একটি রুটীর কারখানায় কার্য্যগ্রহণ; ১৮৮৪ সাল—একজন সামান্য কুলী; ১৮৮৫ সাল—রুটি নির্ম্মেতা ও বিক্রেতা; ১৮৮৬ সাল—একটি ব্যঙ্গ নাট্যমঞ্চে সঙ্গীতের "ঘুড়ি"; ১৮৮৭ সাল—রাস্তায় আপেল ফল বিক্রেতা; ১৮৮৮সাল—দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা; ১৮৯০ সাল—একটি উকিলের কেরাণী; ১৮৯১ সাল—পদব্রজে রুষিয়া

পরিত্যাগ এবং ১৮৯২ সালে বিভিন্ন রেল কোম্পানীর সামান্য মুটিয়ার কার্য্য ও সর্ব্বপ্রথম পুস্তক প্রকাশ। পরে ম্যাক্সিম গোরকি রুষিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া গুপ্তভাবে সাধারণ লোকদিগকে প্রচলিত রাজ্য-প্রণালীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজধানীতে বিপ্লবের সৃষ্টি করেন এবং বিখ্যাত ফাদার গেঁপনের সহিত মিশিয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে অসংখ্য প্রজাবৃন্দকে সম্মিলিত করেন। কিন্তু ভীষণ কশাক সৈন্যের অত্যাচারে সে বিপ্লব ভাঙ্গিয়া যায়। পরে ১৯০৫ সালে বিপ্লববাদী বলিয়া অভিযুক্ত হওয়ায় তিনি কারারুদ্ধ হন। এইবার তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কথা। তিনি একজন বাস্তব-আদর্শের লেখক এবং তাঁহার পুস্তকসকল দীন দুঃখীর কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এই বাস্তব-আদর্শ ভাবপ্রবণতা লাভ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহার একটি ছোট গল্প স্নেহ মমতায় মণ্ডিত হইয়া ঠিক নিশান্তের অরুণ-রেখার মত ফুটিয়াছে। তিনি প্রত্যেক মানুষের বিশিষ্টতায় (Individualism) বিশ্বাস করেন এবং পুস্তকে এই বিশিষ্টতা-বাদকে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত Songs of the Falcon, About The Devil, The Reader, Out-casts, এবং Individualist য়ুরোপীয় সাহিত্যের আদরের বস্তু।

Jacques Anatole Thibaut France, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল প্যারী-নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি French Academyর সদস্য। ইঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৬। Laire (১৮৯০), Les Poems Dores (১৮৭৩), Le Jongleur de Notre-Dame, (১৮৯৬), Histoire de Jeanne d' Arc (১৮০৮) য়ুরোপের সর্ব্বত্র সমাদৃত।

সাহিত্যে নোবেল-পুরস্কার।

মাইকেল, হেম, নবীন, রঙ্গলাল যখন পাশ্চাত্য ভাবের পসরা লইয়া আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে উপস্থিত হইলেন, তখন ভূদেব প্রমুখাৎ মনীষীরা আমাদের সনাতন ভাবগুলিকেও আমাদের নয়নগোচর করিয়া দিতে লাগিলেন। এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব-সম্মিলন-ফলে বঙ্কিমচন্দ্র ভাব ও ভাষায় নব প্রয়াগের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। তৎপরে রবীন্দ্রনাথ কথা, কাহিনী কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, ধর্ম্মালোচনায় ভাষা-জননীর বরবপু সজ্জিত করিয়া জগতের সাহিত্যের নিকট বাঙ্গলা সাহিত্যের ন্যায্য দাবী আদায় করিবার জন্য তৎপর হইলেন।
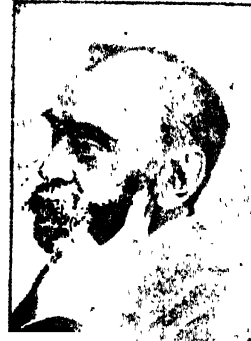
নোবেল

তাই যখন রবীন্দ্রনাথের বিলাত-প্রবাসের কথা শুনা গেল, তখন মন হইতে সংশয়কে একেবারে দূর করিতে পারিলাম না; ভাবিতেছিলাম আমাদের এই স্ফুটনোন্মুখ সাহিত্য যদি প্রস্ফুটিত বিশ্ব-সাহিত্যের নিকট নিতান্ত ম্লান হইয়া পড়ে! সাম্রাজ্যবাদ-মন্ত্রে দীক্ষিত ইংলণ্ড যদি "জগৎ-কবি-সভার মাঝে" রবীন্দ্রনাথকে ও আমাদের সাহিত্যকে উপযুক্ত স্থান-দান করিতে কুণ্ঠিত হয়! তাঁহাদেরই না একজন সাম্রাজ্যবাদের গুরু গর্ব্বোন্মত্তভাবে বলিয়াছিলেন :—

East is East and West is West,
And the Twain shall never meet ;

তাই যে দিন কবি গায়িলেন :—

"মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে—
তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে—"

তখন কে ভাবিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ আমাদের শাশ্বত-সভ্যতা ও সাহিত্যের প্রতিভার অন্তর্নিহিত কনকরেখা য়ুরোপের সাহিত্য নিকষে এইরূপভাবে যাচাই করাইতে পারিবেন?

ইংলণ্ডে রবীন্দ্রসংবর্দ্ধনার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, মুগ্ধ হইয়াছিলাম। পরে যখন বিশ্বদূত রয়টারের সংবাদে জানিতে পারিলাম, রবীন্দ্রনাথ এই বৎসরের সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট "নোবেল" পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন আর আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না।

এতদিন পরে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত বিশ্ব-সাহিত্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। আর আমাদের মনে

হয় এই বিংশতি শতাব্দীতে য়ুরোপে যে নবভাবের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়া যুগযুগান্তব্যাপী নিদ্রার অলসতা ও নৈরাশ্যকে দূর করিয়া দিবে।

যে মহানুভব সদাশয়ের দানে জগতের সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাঁহার প্রদত্ত নোবেল-পুরস্কার সম্বন্ধে এইবার দুই একটি কথা বলিব। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আলফ্রেড বার্ণাড নোবেল সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলম্ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার 'টর্পেডো' জাহাজ ও গুলি বারুদ প্রস্তুতের কারখানা ছিল; এই কারখানায় তিনি বাল্যকালে প্রবেশ লাভ করেন। প্রতিভার দ্বারা তিনি নানা প্রকার স্ফোরক পদার্থ ও ডিনামাইট প্রস্তুত করিবার এক নূতন ও সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার বিশাল সম্পত্তি আপনার আত্মীয় স্বজনকে না দিয়া—জগতের কল্যাণার্থ ব্যয় হইবে, এই মর্ম্মে এক উইল করিয়া যান।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রদত্ত সম্পত্তির মূল্য ২,৬২, ৫০০০০, দুইকোটী বাষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ইহার বাৎসরিক আয় ছয় লক্ষ টাকা। তাঁহার উইল অনুযায়ী, এই টাকা প্রতি বৎসর (১) পদার্থ-বিজ্ঞান; (২) রসায়ন-শাস্ত্র (৩) চিকিৎসাশাস্ত্র বা শরীরতত্ত্ব ; (৪) সাহিত্য ও (৫) পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনোদ্দেশে লিখিত রচনা সম্বন্ধে জগতের মধ্যে যে সকল মনীষীদের রচনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহারাই এই পুরস্কার সমানভাবে প্রাপ্ত হইবেন। কার্য্য-পরিচালন ভার সুইডিস গবর্ণমেণ্ট একটি সমিতির হস্তে দান করিয়াছেন; এই সমিতি আবার বিচারভার Swedish Academy of Literature ও পাঁচজন পার্লামেণ্টের সভ্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। প্রতি পুরস্কারের মূল্য ন্যূনাধিক ৮০০০ পাউণ্ড। ধর্ম্ম ও জাতি-নির্ব্বিশেষে এই পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে। তবে যে ব্যক্তি নোবেল-পুরস্কার-প্রার্থী হইবেন তাঁহার নাম বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোন বিশেষজ্ঞ লিখিয়া প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবেন। এইরূপ প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিকট প্রতিবৎসর ১লা ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে পৌঁছান চাই। পুরস্কার প্রতি বর্ষের ১০ই ডিসেম্বর প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই পুরস্কারের জন্য যে সমিতি আছে তাহার নাম English Nobel Prize Committee. লর্ড আভেবেরি পূর্ব্বতন সভাপতি এবং Herbert Thting বর্ত্তমান সম্পাদক। এই পুরস্কারসমিতি যাহাতে তাহার শক্তির অপব্যবহার করিতে না পারে, তজ্জন্য ষ্টকহল্‌মে একটি 'বোর্ড আছে—বোর্ডে ৫জন সভ্য এবং সুইডেনরাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন সভাপতি থাকে। নোবেল-পুরস্কারের সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে হইলে Nobel Stiftelsen, Stockholm এ পত্র লিখিতে হয়।

১৯০১ সালে ফরাসী কবি সুলী প্রুদোম্ (Sully Prudhomme) সর্ব্বপ্রথম এই পুরস্কার পান। ইনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম "সিয়াঁস এ পোএম্" (Sciences et Poems)। ১৯০২ সালে জর্ম্মাণ ঐতিহাসিক তেওডোরে মমসেনকে এই পুরস্কার (Theodore Momsen) প্রদান করা হয়। ১৮১৭ সালে ইঁহার জন্ম হয়। মমসেন-রচিত রোমের ইতিহাস সাহিত্য-জগতে এক অমূল্য বস্তু। ইতিহাসের শুষ্ক ঘটনাগুলি ভাষা-লালিত্যে সরস করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত; অথচ ঐতিহাসিক সত্য হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই। জার্ম্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনা করিয়া ১৮৭৩ সালে মমসেন বার্লিন সাহিত্য-পরিষদের আজীবন কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইনি বিখ্যাত জার্ম্মাণ রাজনৈতিক বিসমার্কের শাসনপদ্ধতির সমালোচনা করিবার জন্য আদালতে অভিযুক্ত হন; কিন্তু বিচারে সসম্মানে মুক্তিলাভ করেন।

১৯০৩ সালে নরওয়ের কবি বোরনসন এই পুরস্কার পান। ইনি নরওয়ের সর্ব্বপ্রধান কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। ১৮৩২ সালে বোরনসনের জন্ম হয় এবং Christenia বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করেন; কিন্তু কোন উপাধি না লইয়াই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া খবরের কাগজ লিখিতে আরম্ভ করেন। দেশে যাহাতে নাট্যকলা

উৎকর্ষ লাভ করে, তজ্জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন এবং নরওয়ের বিখ্যাত Bergen নাট্যশালার পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি বহুভাষাবিদ্ এবং পৃথিবীর বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। A Happy Boy, Bridal March, Fisher Lass, In god's way, এবং The Heritage of the Kurts তাঁহার প্রধান রচনা।

ফ্রেডারিক মেস্‌ট্রাল

১৯০৪ সালে ফ্রান্সের কবি মেষ্ট্রাল ও স্পেনের নাট্যকার একেগারে এই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। মেষ্ট্রাল ১৮৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কলেজে পাঠ শেষ করিয়া তিনি ব্যবহারাজীবী হইবার আশায় আইন পাঠ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু আইনের শুষ্ক মরুতে বাস করিয়া সাহিত্য সেবা অসম্ভব, তাই আইন পাঠ ত্যাগ করিয়া সাহিত্য-আলোচনা অবলম্বন করিলেন। ১৮৫৯ সালে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক Mireso প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র ফরাসী সাহিত্য-পরিষদ তাঁহাকে বহু সম্মানে ভূষিত করেন। ১৮৭৮ সালে ফ্রান্সের প্রাদেশিক (Provencal) ভাষায় একটি বৃহৎ শব্দকোষ প্রণয়ন করেন। ইহা তাঁহার অমানুষিক পরিশ্রমের ফল। নাট্যকার একেগারে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে জন্মগ্রহন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। একজন গণিতাধ্যাপকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যপুরস্কার পাওয়া আশ্চর্য্য নহে কি? কিন্তু প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে সমস্তই সম্ভব। বৈজ্ঞানিক বলিয়াও তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল। ১৯০৫ সালে পোলাণ্ডের উপন্যাসলেখক সিঙ্কিভিচ এই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইনি রুসিয়ার Warshaw বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করেন। রুসিয়ার সহিত রাজনৈতিক সংস্পর্শে পোলাণ্ড যাহাতে আপনার জাতীয় বিশেষত্ব ও সাহিত্য না হারাইয়া ফেলে তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস "Quo Vadisএ" তিনি রোমরাজ্যের অধঃপতনের যে দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের নাম Children of the Soil, Monte Carlo, Sketches in charcoal, এবং Fire and Sward। ১৯০৬ সালে ইতালির কবি কার্দ্দুচি এই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮৩৫ সালে Val-di-castells নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা মাইকেল কার্দ্দুচি একজন উদারচেতা পুরুষ ছিলেন; তাঁহার চরিত্রপ্রভাবে কার্দ্দুচি অল্প বয়সেই সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইনি অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। 'Poesie' 'New Poesie' 'Hymsto Satan' 'Odi Barbari' প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক বেশ চিত্তাকর্ষক।

১৯০৭ সালে ইংরেজ কবি কিপলিং এই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮৬৫ সালে বোম্বাই সহরে ইঁহার জন্ম হয়। প্রথম লাহোরের Civil and Military Gazetteএ ও পরে এলাহাবাদের Pioneerএ সহকারী সম্পাদকরূপে লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সংবাদপত্রের লেখাগুলি পাঠ করিয়াই ইংলণ্ডের জনসাধারণ মুগ্ধ হয়। কিন্তু আমাদের মতে গর্ব্বস্ফীত শূন্যগর্ভ রচনার জন্যই তিনি বিখ্যাত। কিপলিংএর কবিতায় স্নেহগম্ভীর মাধুর্য্য নাই। আছে শুধু অট্টহাস্য, ঢক্কানিনাদ ও গর্ব্বোন্মত্ততা; স্বজাতির দোষগুলি গুণরূপে চিত্রিত করিতে সিদ্ধহস্ত; আরও ভারতবাসীর সামান্য দোষকে অতিরঞ্জিত করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি একজন সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) গুরু; তাঁহার সাম্রাজ্যবাদের অর্থ দুর্ব্বল-দমন ও বজ্রশাসন। যাহা হউক রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" পাঠে অনেক ইংরেজের

এই কিপলিং মোহ কাটিয়া গিয়াছে। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, কিপলিংএর কবিতার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের
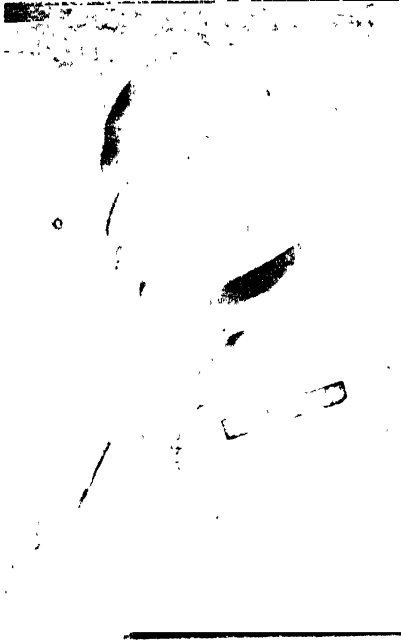
রডিয়ার্ড কিপলিং

যে মাদকতা আছে, তাহা বোধ হয় অন্য কোন কবির মধ্যে নাই। তিনি কবিতা লিখিয়াই কেবল ক্ষান্ত নহেন; তাঁহার উপন্যাসসমূহকে অনেক সময়ে তাঁহার কাব্য অপেক্ষা উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। তাঁহার Plain Tales from the Hills, Wee Willie Winkie, Life's Handicap, the Light that failed, Barrack-room Ballads, The Jungle Book, Kim, The Five Seas এবং A School History of England ইংরেজ পাঠকদিগের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে তিনিই সর্ব্বসাধারণের প্রিয় কবি ও সাহিত্যিক।

১৯০৮ সালে প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক অয়কেন এই পুরস্কার পাইয়াছেন। তিনি এখন জার্ম্মাণীর জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁহার দর্শন-সম্বন্ধীয় নূতন মতগুলি সমস্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের ভিতর একটা নূতন চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। তাহার মতে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ও প্রতিকূলের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমরা সকলে এক বাস্তব আধ্যাত্মিকতা (Rational Spirtuality) লাভ করিবে"—ইঁহাকে Philosopher of "Modernity" বলা হয়।

১৯০৯ সালে সুইডেনের বিখ্যাত উপন্যাস-লেখিকা লাজেরফ এই সম্মানলাভ করেন। 'নোবেল' পুরস্কার তালিকায় তিনিই একমাত্র নারী। ১৯১০ সালে জার্ম্মাণ ঔপন্যাসিক পল হেয়াসি এই পুরস্কার প্রাপ্ত হন; ১৮৩০ সালে তাঁহার জন্ম হয়; বিয়োগান্ত কাব্য রচনায় তিনি অদ্বিতীয়; তাঁহার Francesca Da Rimini বিয়োগান্তক কাব্যের চরম উৎকর্ষ। তাঁহার অনেক কবিতাও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইতালীর সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার কএকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে। ১৯১১ সালে নাট্যকার মেটারলিঙ্ক এই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইনি ১৮৬২ সালে বেলজিয়মের অন্তর্গত Ghent সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামাতা উভয়েই বেলজিয়মবাসী। কিন্তু ইনি অল্প বয়সেই আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন ওকালতী করেন। কিছুদিন পরে সাহিত্য-সাধনার জন্য আইন ব্যবসা ছাড়িয়া ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারি সহরে আসিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করেন। Swedenborg Novlis, Boehme Ruysbroeek প্রভৃতিই য়ুরোপীয় Mystic দিগের পুস্তক পড়িয়া 'অনাগত অরূপে' বিধুরতা মেটারলিঙ্কের প্রাণে জাগিয়া উঠে। বিশ্বনিয়ন্তাকে রসরূপে প্রাণের আনন্দরূপে অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা মেটারলিঙ্কের রচনায় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। অসীমের আহ্বান শুনিবার জন্য তিনি ব্যস্ত। তাঁহার মনের এই অবস্থাটি তিনি রূপকের আচ্ছাদনে তাঁহার কাব্যে মূর্ত্তি দিয়াছেন।

রুডল্ফ্ অয়কেন্

The Princess Maliene ইঁহার প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। ইহা ১৮৯০ খৃঃ অঃ প্রকাশিত হয়। সেই বৎসর

"The Sightless এবং The Intruder প্রকাশিত হয়।

১৮৯২ সালে Pellas and Meli Sanda প্রকাশিত হওয়াতে তাঁহার যশঃ য়ুরোপময় ছড়াইয়া পড়ে। 'Death of Lintagalis' 'Seven Princess' 'Agla Vaine and Selsysette' 'Blue bird' 'Voyzelle' 'Mouna Vauna' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহাকে যশোমণ্ডিত করিয়াছে। ইনি বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানবাদের মধ্যেও ভক্তিতত্ত্ব প্রচার মানসে 'Life of the Bee' 'Buried Temple' 'Double Garden' 'The Intelligence of flowers' নামক কএকখানি কবিত্বময় বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করেন। সকল বস্তুর মধ্যেই সজীব চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া ইঁহার বিশ্বাস।

১৯১২ সালে প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ নাট্যকার হপম্যান এই পুরস্কার পাইয়াছেন। প্রথম বয়সে তিনি কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন; কিছুদিন পরে শস্যক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সামাজিক নাট্যরচনায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সমাজের সুখ দুঃখ ও দোষ গুণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার The Weavers' 'Before Dawn' এবং 'The conflagration' 'সুখপাঠ্য'। শার্লমেন (Charlemagne) এবং নেপোলিয়ানকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে দুইখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন, তাহাতে চরিত্রদ্বয় সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের পুরস্কার আমাদের কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রদত্ত হইয়াছে।

উপরে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে 'নোবেল' পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যরথিদিগের জীবনের দুএক কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীপ্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার

শান্তিজল

কাব্য-পরিচয়

গীতিকাব্য

সেবার কবি 'ঝরাফুলে' ডালি ভরিয়া আনিয়াছিলেন, এবারে আনিয়াছেন 'শান্তিজল'। নাম সম্বন্ধে কবি এবার সত্য কথা বলিয়াছেন, 'শান্তিজল' অন্বর্থনামা হইয়াছে—'ঝরাফুল' ত' ঝরাফুল নয়; সে যে সদ্য-আহৃত মল্লিকা যূঁই ও চামেলির মালা।

আমাদের দেশে যাঁহারা বিশেষভাবে সাহিত্য-সমালোচনার ভার লইয়াছেন, যাঁহারা শিশু কবির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, এবং সারস্বত-প্রাঙ্গণের আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কই ভাল জিনিষের ত' আদর করেন না! এই কবিতার লোণা-জলের মধ্যে স্থানে স্থানে মধুর উৎসও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সম্বন্ধে কেহ ত' কিছুই বলেন না! সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত অট্টহাস্যে বাঙ্গলায় বাণীপীঠ প্রেতভূমিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে।

'ঝরাফুল'এর কবি 'শান্তিজল' আনিয়াছেন,—যেমনটি আশা করা যায় তেমনটিই হইয়াছে। রূপের মধু কবির প্রাণপাত্রটি ভরিয়া তুলিয়াছে—তাহা 'ঝরাফুলে' দেখিয়াছি; আবার রূপ-মধুর মাদকতা হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার চেষ্টাও 'ঝরাফুলে' আছে; অসংযম উচ্ছৃঙ্খলতা কোথায়ও নাই—ক্রন্দন এবং হাস্য উভয়ই স্তিমিত; বর্ণ, গন্ধ, সুর, ঝঙ্কার যেখানে পুরিয়া উঠিয়াছে, সেখানেও কবির কণ্ঠস্বর আবিষ্টের গুঞ্জরণের মত; একটা ধ্যান প্রবণতা, শান্ত অথচ তীব্র সৌন্দর্য্যানুভূতি তাঁহার কবিতাগুলিকে অভিষিক্ত করিয়াছে—রক্তরাগ নহে, জ্যোৎস্নাকাশতলে আবীর ও কুঙ্কুমোৎসবের মত একটা মধুর ও কোমল লোহিতরাগ তাঁহার কাব্য অনুরঞ্জিত করিয়াছে। 'ঝরাফুলে'র প্রথম ও শেষ কবিতার মধ্যে কবি যে সাধনার ইঙ্গিত করিয়াছেন 'শান্তিজলে' তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। ঝরাফুলে যেটুকুও উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল, শান্তিজলে তাহা নাই। কবিকুঞ্জ এখানে ধ্যানবেদিকায় পরিণত হইয়াছে। এ আশ্রম একেবারেই শান্তরসাস্পদ। কবি এখানে পূজারত,—বিগ্রহের নাম শিবসুন্দর; এখানে উদাত্ত গম্ভীরস্বরে দেবতার মঙ্গলারতি হয় এবং মুরজ মন্দিরা-রবে ভক্তকণ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু পূজার একটি বিশেষত্ব এই যে, এ পূজার পুরোহিত কবি। অত এব জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ নাই। কবি সুন্দরকে সুন্দর দিয়া পূজা করিয়াছেন—এ পূজায় করবী যেমন, গোলাপও তেমনি স্থান পাইয়াছে।

এইবার কএকটি কবিতার পরিচয় দিব। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটির নাম 'চিরসুন্দর'। ইহাতে কবি, যাঁহার রূপ সুন্দর সেই অরূপসুন্দরকে আহ্বান করিয়াছেন। রূপ ক্ষণবিলাসি, রূপ বিচিত্র,

অথচ এই রূপই, এই অচির-সুন্দরই চির-সুন্দরের আভাস দেয়। Nature half conceals and half reveals the Soul within, এই জন্য কবির মধ্যে যে মানব প্রাণ রহিয়াছে সকল মানবের হইয়া সেই প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে :—

কুসুম-হারে সুতার সম
লুকিয়ে আছ অপ্রমাণ,
পাপ্‌ড়ি যখন পড়্‌বে ঝরে'
হেরব তোমায়, বিশ্বপ্রাণ।

রূপ মদিরা পান করিয়া তাঁহার পিপাসা মিটে নাই, তাই প্রত্যহ অন্ধ মন নবীন নেশার অন্বেষণ সুরু করে। কিন্তু—

যৌবনে নেই নিন্দ্‌ প্রমোদ,
ক'দিন রূপে মন ভোলে।
সাম্‌নে নাচে ছিন্ন-মস্তা
কাম-রতিকে পা'য় দলে'।
এ তৃষা, এ অতৃপ্তি কিসে যায়
প্রহেলিকার গোলোক-ধাঁধায়
ক্রোশের পরে ক্রোশ চ'লে,
রহস্যময় পরশমণি
ভরবে কখন অঞ্জলি!

ইহার একমাত্র উপায় আছে, সেই সত্য-শিব-সুন্দরকে আপনার করা। কিন্তু সে ত' সহজ নয়। "তুমি যারে বরণ কর, এই জীবনে সেই তরে।" তার পর কবি যে প্রার্থনা করিয়াছেন, ভাষা, ভাব ও অর্থ-গৌরবে বঙ্গসাহিত্যে তাহা অপূর্ব। আমি বারংবার তাহা উচ্চারণ করিয়াছি, প্রতিবারেই কণ্ঠ ভাবে ভক্তিতে ও কল্পনামাধুর্য্যে গদ্‌গদ হইয়া উঠিয়াছে।

আকুল সরিৎ সমুদ্রে ধায়
করতে জীবন বিসর্জ্জন,
পথের মাঝেই উজান জোয়ার
দেয় তারে প্রেম-আলিঙ্গন
কোন মোহানায় তেম্‌নি আমায়
আগ্‌ বাড়ায়ে লইবে নাথ?
কোন্‌ লগনে করবে পরশ
এই বিরহীর রিক্ত হাত
ফুরিয়ে যাবে মরু নদীর,
ভুবন হবে বৃন্দাবন,
সকল সলিল গঙ্গা সলিল
জীবের আনন চন্দ্রানন;
জাগ্‌বে চোখে প্রসূন তোমার
হৃদয় হবে হরিদ্বার,
ভুল্‌ব তোমার মোহন মোহে
জান্‌ব তোমায় সারাৎসার।

'হিমাদ্রি' শীর্ষক কবিতাটিতে কবির কবিত্বশক্তি অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। মহান্‌ ও মধুরের এমন সমাবেশ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে (Syllabic metre) বড় একটা দেখা যায় না। ভাব যেন শব্দে পরিণত হইয়াছে; যেখানে যেমন ভাবের ব্যঞ্জনা, সেখানে ভাষা ও সুর তদনুরূপ হইয়াছে। 'হিমাদ্রি'—কবিতার আর একটি সার্থকতা আছে! কবি এই কবিতায় হিমাদ্রির ন্যায় উত্তুঙ্গ এবং অটল অবিচলিত আর্য্য-সাধনার মহিমা-শিখরকে বরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য-মনীষা এবং ক্ষাত্র-বীর্য্য উভয়েরই একটি মহিমান্বিত আভাস-চিত্র, ভাবভক্তি-কল্পনায় আমাদের মানস সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। কবি যখন "পিতৃগণের দিব্য প্রতিভা"—ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অঞ্জলি দান করিলেন তখন ভক্তি ও শ্রদ্ধায় হৃদয় স্ফীত, স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিল। সমগ্র কবিতাটি একটি মধুর গম্ভীর স্তোত্রগীতি।

এই কাব্যে দুইটি প্রেমের গীত আছে। প্রেম কবিদিগের চিরন্তন কল্পনার উৎস, শত কবির কণ্ঠে শতবার শতরূপে এই প্রেমের গান ধ্বনিত হইয়াছে। এ সুর চিরপুরাতন ও চিরনবীন। প্রেমের সহিত তপ্ত নিঃশ্বাস ও অশ্রু চিরসম্বদ্ধ। প্রেম মরজগতে ক্ষণপ্রভা—"প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার"। তাহাকে স্বর্গের চির-জ্যোৎস্নারূপে পরিণত না দেখিলে হৃদয় আশ্বস্ত হয় না। শান্তিজলের কবি প্রেমকে এই দুই রূপেই বন্দনা করিয়াছেন—একরূপ 'মর্ম্মর-স্বপ্নে', আর একরূপ 'চণ্ডীদাসে'। মর্ম্মরস্বপ্নের প্রেম কবিকল্পনার অমরী-সৌন্দর্য্যে অনুপ্রাণিত, এবং জীবন ও মৃত্যুর আধ' আলো আধ' অন্ধকারে তাহা যেন রূপকথার রাজকন্যার মত দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত পালঙ্কে স্বপ্ন-মদিরায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। কবি তাঁহার কল্পনাদীপটি অতি সন্তর্পণে তাহার শিয়রের উপর ধরিয়াছেন; সে আলোকে তাহার অর্দ্ধ-বিযুক্ত ওষ্ঠাধর যেন ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিতেছে, মল্লী-মুকুল-তুল্য অধরে যেন মুহূর্ত্তের জন্য গোলাপ আভা ফিরিয়া আনিয়াছে, এবং নয়নপল্লবের ঘন পক্ষ্মান্তরালে অর্দ্ধনিমীলিত কৃষ্ণতারকা বারেকমাত্র চঞ্চল হইয়াছে। সৌন্দর্য্য, প্রেম, এবং মৃত্যু এই তিনটি অতি পেলব, অতি মধুর ও অতি গভীর ভাব যেন এই কবিতার ত্রিবেণী সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। ইহাই 'শান্তিজলের' একটিমাত্র কবিতা, যেখানে কবি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। রূপক ছাড়িয়া অরূপে পৌঁছান' বড় কঠিন। প্রেম এখানে রূপবর্জ্জিত নহে। প্রেমের আরতি এবং রূপের আরতি এক প্রদীপেই হইয়াছে। তথাপি রূপ এখানে মরে নাই, প্রেমে অমর হইয়া আছে। মমতাজ মরে নাই—

বঁধুর পরশে ঘুমায় হরষে
মমতাজ সুন্দরী।
ভালবাসা তা'র গোলাপ শয়ন,
কেশর পরাগে করিয়া বয়ন
জেগে বসে' আছে শিয়রের কাছে
যুগ যুগান্ত ভরি'।

—সেরূপ শুভ্র পারিজাত পুষ্পরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে। এমনি করিয়া আর্ট মরণশীলকে অমর করে; জগতের অনিত্যতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কবি-হৃদয় এই জন্য আর্টের শরণাপন্ন হয়—আপনার কল্পনাবলে অমৃত-লোক বিরচন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করে। কবি এখানে যে রূপের উদ্বোধন করিয়াছেন তাহা পার্থিব-অপার্থিব—তাহা সেই অমৃত-লোকে স্থান লইয়াছে। মানুষের শিল্প-চাতুরী তাহার গন্ধটুকুমাত্র ধরিয়া রাখিয়াছে; কবি সেই গন্ধ হইতে ফুলের রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি তন্দ্রার কিনারায় সে রূপ-তুফান দেখিয়াছেন ও ভাষায় এবং ছন্দে তাহাকে মূর্ত্তি দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি শান্ত হইতে পারেন নাই, শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন—

"এই না জীবন! মানব-জীবন!
ফুল ফোটা, ফুল ঝরা!
সমুখে হাস্য পিছনে অশ্রু,
শয্যা-শায়িনী জরা!—"

কবিতাটি রূপরসে টল টল করিতেছে। 'মর্ম্মর-স্বপ্নের' পর 'চণ্ডীদাস'—দ্রাক্ষারসের পর দেবতার চরণামৃত। ভাবে ও ভাষায় এ কবিতা অমর। মর্ম্মর স্বপ্নে কবি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়াছি, এ কবিতায় তিনি আপনাকে ছাড়িয়া উঠিয়াছেন। এ যে প্রেমের গান, সে প্রেমে

'দিগ্বিজয়ীর বুকের রুধির' অলোক-সুন্দরীর চরণতলে ঝরিয়া পড়ে না। ইহাতে দরিদ্র দ্বিজকবির হৃদয়ানুভূতি লাভ করিয়া এক সামান্যা নারীর অলকপ্রান্ত অপরূপতম জ্যোতিঃতে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। এখানে রূপের গৌরব নাই।

নিম্নে কএকটি বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য-চিত্র উদ্ধৃত করিয়া কাব্য-পরিচয় সমাপ্ত করিলাম—

স্বপন দেখিছে ভূর্জ্জ বনানী
　　সবুজ টোপর পরি',
ঝর্ণা-তলায় ঝরিছে কাহার
　　রতনের সাতনরী।
　*　　*　　*　　*
হেরিব ধবল কৈলাস-মূলে
　　রাবণ হ্রদের জলে,
মানস-রমার অনামিকা চুমি'
　　সোণার নলিন দোলে।
　　　　—হিমাদ্রি।

না জানি কোথায় অতল-পরশে-
　　অরুণ-প্রবাল-হর্ম্ম্যে,
বারুণী রূপসী বেণী-রচনায়
শঙ্খ-ধবল কঙ্কতিকায়
ভাঙ্গে অর্ব্বুদ জল-বুদ্বুদ,
　　বিলাস-মুকুর-নর্ম্মে।　　শ্রীক্ষেত্রে।

শ্বেত বিজুলি নিথর হ'য়ে
ঘুমিয়েছে ওই মূর্ত্তি ল'য়ে'—
　　শিথানে তা'র উজল ঢেউএর সারি;
ছাড়িয়া ওই উষার তারা
সাম্‌নে নেমে আস্‌ছে কা'রা?
　　কটাক্ষেতে স্ফটিক হ'ল বারি।
　　　　—কাঞ্চন-জঙ্ঘা।

শাঙনের ঝরামেঘে জলধনু এপার ওপার,
কালিন্দীর নীল নীরে শিহরিত প্রতিবিম্ব তা'র—
কোন্ ঘাটে ভরা তরী ভিড়াতেন পারের কাণ্ডারী,
বনফুলে কানুবনে সাজাইত ব্রজের কুমারী।
　　　　—শ্রীবৃন্দাবনে।

কত না আদরে　　প্রেমের পেয়ালা
　　আধেক করিয়া খালি,
মল্লী-মুকুল-　　তুল্য তোমার
　　অধরে দিত কে ঢালি'?
রাঙ্গিয়া উঠিত ফুল্ল কপোল
চুম্বন-রাগে বিলোল বিভোল,
আনার-আঙ্গুর-রসে পরিপূর
　　মোহ-উপহার ডালি।
　　　　—মর্ম্মর স্বপ্ন।

বিস্মৃত কোন্ তূর্য্য-ধ্বনি
　　গর্জ্জে বুকের পঞ্জরে,
পথ হারায়ে ঝঞ্ঝা ফিরে
　　রুদ্র গহন সুন্দরে—
ছিন্ন কেতু উঁচে ধরি'
[illegible] একা [illegible] যাবি
নীল অশনি [illegible] গেছে
　　[illegible]কাননের অন্তরে।
　　　　—তন্দ্রাপথে।

কাব্য-পরিচয় শেষ হইল, এইবার সংক্ষেপে কবির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

শান্তিজলের [illegible] কবিতা [illegible]। কবি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক [illegible] করিয়া তাঁহার ভাব [illegible] যে সকল চিত্র [illegible], সংক্ষেপে [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যদিও সকলগুলি [illegible] একই [illegible] করিয়াছে, তথাপি [illegible] কাব্যকলার সম্মান [illegible] পাইয়াছে, [illegible]। মধ্যে [illegible] কবির একটি বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় [illegible] বাঙ্গালাতে যাহাকে বলে The Picturesque [illegible] in Nature, কবি তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছেন। '[illegible]' কবির [illegible] চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, 'শান্তিজলের' সুপ্রশস্ত পটে তাহা আরও স্বাধীন ও সবল [illegible] বিকশিত হইয়াছে। তাহার 'ওয়াল্টেয়ারে' নামক কবিতাটি [illegible] বলিয়া বোধ হয়।

তাহার [illegible] সাধারণ দৃশ্য হইতেও তাহার অসাধারণ [illegible] বাহির করিতে পারেন। যেখানে [illegible] তাহার [illegible], 'শান্তিজলের' সর্ব্বত্র তিনি এই সৌন্দর্য্য, [illegible] ভাষায় অনুবাদ করিবার ক্ষমতা, [illegible] করিবার শক্তি, তাঁহার অসাধারণ। [illegible] দেখিয়া মনে হয়, সৌন্দর্য্য বিভোরতাই তাঁহার কবিস্বভাবের প্রধান লক্ষণ। [illegible] সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সকল রস অনুভব করাতেই তাহার আনন্দ [illegible]।

এইস্থলে [illegible] প্রয়োজন। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে, [illegible] তাহার মধ্যে অন্য কোনও সত্যের অন্বেষণ করিতে গেলে যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হইবে, তাহার পরিণামে কবির আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে সত্য, কিন্তু কাব্য কলার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। "A thing of beauty is a joy for ever." সুন্দর হইলেই হইল, তাহাই [illegible]আনন্দের [illegible]। তাহার মধ্যে অন্য কোনও অর্থের অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু এই ব্রাহ্মণের দেশে ব্রাহ্মণ-কবির পক্ষে তাহা কি সম্ভব? তাহার প্রাণ [illegible]কের মত কিছু [illegible]। সান্তের অনন্ত স্বরূপ না দেখিলে, তাঁহার সৌন্দর্য্য-পিপাসু হৃদয় তৃপ্ত হয় না। তাহার হৃদয়ে সান্ত ও অনন্তের এই দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে। 'শান্তিজল' সেই দ্বন্দ্বের ইতিহাস। তিনি বারবার আপনার হৃদয়কে আশ্বস্ত করিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে [illegible] বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। '[illegible]' নামক কবিতায় কবি এই দ্বন্দ্বে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। 'মর্ম্মর স্বপ্নে' আপনাকে ভুলাইয়া দিয়াছেন। 'চণ্ডীদাসে' তিনি একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছেন। [illegible] এই দ্বন্দ্বের ফলে কবির হৃদয়-চন্দন স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব সৌরভ বিকীর্ণ করিয়াছে।

কিন্তু এ দ্বন্দ্বের অবসান হইবে না, অন্ততঃ যতদিন কবির শক্তি থাকিবে ততদিন হইবে না—আশা করি। কবিকে আমরা শান্তিলাভ করিতে দিব না। তাঁহার শান্তিজল আমাদিগের জন্য, তাঁহার নিজের জন্য নহে।

তথাপি আমার বোধ হয়, কবির হৃদয়ে এ দ্বন্দ্ব না ঘটিলেই ভাল হইত।

নিশ্চিন্ত সৌন্দর্য্য-বিভোরতাই যেন তাঁহার কবি-প্রতিভার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কিন্তু সে জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহার প্রতিভা আপনার গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লইবে। 'প্রতিধ্বনি'তে কবির শক্তি-বৃদ্ধির বিশিষ্ট পরিচয় আছে।

মধুব্রত

মাস-পঞ্জী

(আশ্বিন)

১লা বিখ্যাত সোসিয়ালিষ্ট মিঃ কেয়ার্‌হার্ডির মৃত্যু হয়।

২রা নিউইয়র্কের গভর্ণর মিঃ সলজারের "ইম্পিচমেণ্ট" আরম্ভ।

" তুর্কীদিগের সহিত বুলগেরিয়ানদিগের "সীমানা" ঘটিত গোলযোগ মিটমাট্ হয়।

" —মার্কিনসেনেট "কারেন্সিবিল" পাস করেন।

৩রা পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া "অনির্দ্দিষ্ট দিনের" জন্য কারবার বন্ধ করে। ইহাতে ভারতের নানাস্থানে সোরগোল পড়ে।

" নদীয়ার মহারাজা বাহাদুরের মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়।

"—পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট লাহোরের বিজ্ঞান ইণ্ডিয়া প্রেসের জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, শুনা গেল।

৫ই বাঁকিপুরে এডুকেসন কনফারেন্স আরম্ভ হয়। মিঃ খোদাবক্স সভাপতি ছিলেন।

৬ই জোহানেসবার্গের চারি জন "লেবর লিডার", মেসার্স ক্লার্ক, কেনডাল, ওয়াটারটান, ও ওয়েড্ রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হন। ইহাতে তথায় হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

" সিমলার রেলওয়ে কনফারেন্স্ এসোসিয়েসনের বাৎসরিক সভা বসে। মিঃ মিয়র হেড্ সভাপতি ছিলেন।

"—ভাইস্‌এড্‌মিরাল স্যর জন্ ফেলোজ্, লর্ড ডি ফ্রেনী, ও স্যর এল্‌বার্ট ডি রুট্‌ দেলের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়।

৭ই—লাহোরের "জমিদার" পত্রের নিকট হইতে ১০,০০০৲ টাকার জামিন চাওয়া হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই পত্রের পূর্ব্ব প্রদত্ত ২০০০৲ জামিন সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন।

৭ই—"বেহার নিউজের" প্রতিষ্ঠাতা বাবু মুরলীধরের মৃত্যু হয়।

৮ই—বিখ্যাত স্যোসালিষ্ট মিঃ প্যাট্রিকফোর্ডের মৃত্যু হয়।

"—কেপ্‌কলনীর ভূতপূর্ব্ব গভর্ণার স্যর হেলী হচিনসনের মৃত্যু হয়।

"—অলষ্টার কি ভাবে হোমরুলের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে তাহা স্থির করিবার জন্য ৫০০ শত প্রতিনিধি বেলফাষ্টের অলষ্টার হলে এক সভা করেন। ডিউক অফ্ আবারকর্ন প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

"—কলিকাতার "হাবলুল মাতিন" প্রেস পুলিশ খানাতল্লাসি করেন, ও "হাবলুল মাতিন" পত্রের জামিন সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করেন।

"—ব্যাঙ্ক অফ পেসোয়ার লেন দেন বন্ধ করে।

১০ই—বিখ্যাত নট মিঃ পেলিসিয়ারের মৃত্যু হয়।

১১ই স্যর এডওয়ার্ড কারসন অলসটার ভলনটীয়ারগণকে কুচ কাওয়াজ্ করান।

১১ই—চায়না জাপানের নিকট কোন তথাকথিত অপরাধের জন্য মাপ চায়। তাহাতে এই দুই শক্তির মধ্যে যে যুদ্ধের সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা দূর হয়।

"—বোম্বায়ে ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বার ও ব্যুরোর বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

১৩ই—হরিপদ দে নামক জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারীকে কলেজস্কোয়ারে কোন আততায়ী গুলিদ্বারা মারিয়া ফেলে।

" তুর্কীর সহিত বুলগেরিয়ার সন্ধি হয়।

১৪ই—মুঙ্গেরে বেহারী ছাত্রসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি ছিলেন।

"—করাচীর হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক কারবার বন্ধ করে।

" কোন আততায়ী ময়মনসিংহের পুলিস ইন্‌সপেক্টার শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরীকে নিহত করে।

১৪ই—অল্‌সটারের "প্রাভজর্ণেল" গবর্ণমেণ্টের প্রথম অধিবেশন হয়।

১৫ই—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারসিপের তালিকা বাহির হয়।

১৭ই—করাচীর ক্রেডীট্ ব্যাঙ্ক ফেল হয়।

"—ফয়জাবাদে ইউনাইটেড্ প্রভিন্স কনফারেন্সের ৭ম বাৎসরিক অধিবেশন হয়। ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন।

"—কলিকাতায় এক প্রেস এসোসিয়েসন গঠিত হয়।

১৮ই—সিমলার রেলওয়ে কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন শেষ হয়।

"—বোম্বায়ের ক্রেডীট্ ব্যাঙ্ক ফেল হয়।

"—বোম্বায়ের "টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া" পত্রিকার সম্পাদক মানহানি দায়ে অভিযুক্ত হন।

১৯এ—টালার বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়।

২০এ—মসকটের সুলতানের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়।

"—ইউনসিকাই চায়নার "প্রেসিডেণ্ট" নির্ব্বাচিত হ'ন।

"—জৌনপুরে "অল্ ইণ্ডিয়া সিয়া কন্‌ফারেন্সের" বাৎসরিক অধিবেশন হয়। মাননীয় সৈয়দ মামুদ সভাপতি ছিলেন।

২১এ—বোম্বে ব্যাঙ্কিং কোং ফেল হয়।

২৪এ জাপানের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী প্রিন্স কাটসুরার মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়।

"—চায়নার প্রেসিডেণ্ট্ ইউয়েন সিকাইকে হত্যা করার চেষ্টা অভিযোগে "মাউণ্টেড্" পুলিসের অধ্যক্ষ চেনকে পাকড়াও করা হয়।

"—প্রফেসার আর এলিসের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়।

২৫এ—মাইসোরের "রেপ্রেসেনটেটিভ্ এসেম্ব্লীর অধিবেশন আরম্ভ হয়।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

চন্দ্রশেখর বসু

গত ৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ৭॥০ টার সময়ে অশীতি বৎসর বয়সে বঙ্গের লোকপূজ্য দার্শনিক পণ্ডিত নীরবকর্ম্মী

৺চন্দ্রশেখর বসু

পরোপকারী সধর্ম্মনিরত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়া তিনি বিশাল দ্বারভাঙ্গা রাজ্যের প্রধান ম্যানেজার হইয়াছিলেন। ১১ বৎসর হইল তিনি মহারাজ স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ প্রদত্ত মাসিক বৃত্তি পাইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর বিস্তর রচনা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি "ভারতবর্ষে" প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীইন্দ্রভূষণ দে।

করাচী কংগ্রেস

একবার করাচীতে ভারতীয় জাতীয় অষ্টবিংশতি মহাসভার বিপুল আয়োজন মহাসমারোহে চলিতেছে। মান্দ্রাজ হইতেই এবার পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি এবং পঞ্জাব হইতে শ্রীযুক্ত লাজপতরায়ও যাইতেছেন! ইতোমধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবার করাচীতে যাইতেছেন না—ইহা সম্পূর্ণ অলীক। একমাত্র গোখ্‌লে ব্যতীত কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবর্গের মধ্যে সকলেই এবার করাচী কংগ্রেসে যোগ দিতেছেন। সমিতির ভার দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিবার মানসে উহা শ্রীযুক্ত গোলাম আলি জী চাকলা উপর প্রদত্ত হইয়াছে।

গোলামআলি জী চাক্‌লা

নবাবী সৈয়দ অহম্মদ সভাপতিরূপে ২৭শে ডিসেম্বর করাচী পৌঁছিবেন, এবং তাঁহার সম্মানার্থ ১০ ঘটিকার সময় শোভাযাত্রা বাহির হইবে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি

রাগিণী ইমণ—তাল তেওরা।

জগৎ আকাশ উজল ক'রে কিরণ তোমার ছুটে ;—
সেই আলোকে মোদের হৃদয় পুলকভরে লুটে!
পেয়ে তাহার একটু কণা,—
হ'য়ে গেছে অনেক দেনা ;
পড়ে' আছি হেথায় মোরা কৃতজ্ঞতার মুটে!
নানান্ বেশে নানা জনের হৃদয় ক'রে জয়,—
আসন পাতা হ'ল তোমার বিশ্বহৃদয় ময়!
মাথায় দিয়ে চরণ রেণু,—
করব পূত মোদের তনু ;
ধন্য হ'ব যদি দু'টি আশীষবাণী জুটে!

শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

স্বরলিপি

কথা ও সুর স্বরলিপি,—

শ্রীঅমরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
II র্সা র্সা -া | না -া | ধা পা I না না -া | ধা -া | পা -া I ঙ্ক্মা গা ধা |
জ গ ৎ আ ০ কা শ্ উ জ ল্ ক' ০ রে ০ কি র ণ্

২´ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
| পা -া | পা -া I সা রা গা | গা -া | -া -া I রা -া গা | রা -া |
তো ০ মা র্ ছু ০ ০ টে ০ ০ ০ সে ই আ লো ০

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
| সা -া I রা গা -া | পা -া | রা -া I গা ক্মা -া | পা -া | ধা -া I
কে ০ মো দে র্ হৃ ০ দ য়্ পু ল ক্ ভ ০ রে ০

১´ ২ ৩
I র্সা র্গা র্রা | ধা না | র্সা -া II
লু ০ ০ টে ০ ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
II পা ধা পা | র্সা না | র্গা -া I র্রা র্গা র্রা | র্সা -া | র্সা -া I না ধা -া |
পে য়ে ০ তা ০ হা র্ এ ক্ টু ক ০ ণা ০ হ' য়ে ০
মা থা য় দি ০ য়ে ০ চ র ণ রে ০ ণু ০ ক র বো

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
| না - । | র্রা - । I র্সা র্রা র্সা | না ধা | পা - । I পা পা - । | হ্মা গা |
গে ০ ছে ০ অ নে ক্ দে ০ না ০ প ড়ে’ • আ •
পূ ০ ত ০ মো দে র্ ত ০ ন্ন ০ ধ ০ ন্য হ’ ০

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
| রা - । I গা পা - । | ধা - । | না - । I র্সা র্সা র্গা | র্রা - । | র্সা - । I
ছি • হে থা য়্ মো ০ রা ০ কৃ ত ০ জ্ঞ ০ তা র্
ব ০ য দি ০ দু ০ টি ০ আ শী ষ্ বা • ণী ০

১´ ২ ৩
I পা ধা না | ধা না | র্সা - । II
মু ০ ০ টে ০ ০ •
জু ০ ০ টে ০ • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১
II র্সা ধা - । | সা - । | রা - । I গা গা - । | গা - । | গা রা I হ্মা হ্ম - । |
না না ন্ বে ০ শে ০ না না • জ ০ নে র্ হৃ দ য়্

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
| হ্মা - । | গহ্মা পা I পা - । - । | - । - । | - । - । I ধা পা - । | হ্মা গা |
ক’ ০ রে ০ জ ০ ০ ০ ০ ০ য়্ অ-স ন্ পা •

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
| হ্মা - । I পা পা র্সা | র্সা - । | র্সা - । I না - । ধা | পা - । | হ্মা - । I
তা ০ হ’ ল ০ তো ০ মা র্ বি ০ শ্ব হৃ ০ দ য়্

১ ২ ৩
I গা - । - । | - । - । | - । - । I
ম ০ ০ ০ ০ • য়্

সাহিত্য-সংবাদ

এলাহাবাদের সুবিখ্যাত "পানিনি কার্য্যালয়" হইতে হিন্দুসমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। লেখক অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। প্রথম খণ্ড যন্ত্রস্থ—ফাল্গুনে বাহির হইবে। এইখণ্ডে হিন্দুদিগের (১) আকর বিজ্ঞান, খনিজতত্ত্ব ও রত্নতত্ত্ব, (২) উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, উদ্যানতত্ত্ব ও কৃষিতত্ত্ব (৩) প্রাণী-বিজ্ঞান, অশ্বশাস্ত্র, পশুচিকিৎসা ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সাহিত্য পর্য্যন্ত সকল যুগের সংস্কৃত সাহিত্য হইতে প্রমাণ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থ ইংরেজীতে সুলিখিত। বঙ্গভাষায় ইহার প্রচার হইবে না কি?

কবি-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংবর্দ্ধনার জন্য প্রায় পাঁচশত সাহিত্য-সেবী কলিকাতা হইতে স্পেশেল ট্রেণযোগে বোলপুরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে রবীন্দ্র বাবুকে অভিনন্দন করা হয়।

সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বারিষ্টার মহাশয়ের সুরঞ্জিত, সচিত্র কবিতা পুস্তক "সাগর-সঙ্গীত" প্রকাশিত হইয়াছে। এমন সুদৃশ্য ও সুশোভিত পুস্তক বহুদিন প্রকাশিত হয় নাই।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন এই বড় দিনের সময় পাবনায় হইবার কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু এখনও ত তাহার কোন উচ্চবাচ্য শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। তবে কি বড় দিনে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে না?

কলিকাতায় যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন আগামী গুড-ফ্রাইডের ছুটিতে হইবার দিন স্থির হইয়াছে, তাহার আয়োজন এখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এখনও সভাপতি কে হইবেন, তাহা স্থির হয় নাই।

সুলেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, এম. এ, মহাশয়ের নূতন কবিতা পুস্তক "কুবলয়" ও ছোট গল্পের বই "পাষাণী" প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দ্বয়কে উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করি। তাহার জন্য যে কনভোকেশনের অধিবেশন হইবে, তাহাতে আমাদের সর্ব্বজনমান্য বড়লাট শ্রীযুক্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া উপাধি দান করিবেন, এবং এই অধিবেশন সিনেট হলে না হইয়া লাট-প্রাসাদে হইবে।

বৈষ্ণব-কুলতিলক ভক্তচূড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদনে "শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ" গ্রন্থ বহুদিন পরে সাধারণ্যে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইলে শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনের পঞ্চম বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীমন্মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ব্যয়ে এই অমূল্য পুস্তকের ১০০০ খণ্ড সাধারণে বিতরিত হইয়াছে; আর সামান্য কএকশত পুস্তক বিক্রয়ার্থ অবশিষ্ট আছে; আশা করি এই অমৃতোপম "শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ" শীঘ্রই বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের গৃহে গৃহে বিরাজ করিবে।

বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিকল্পে, চৈতন্য লাইব্রেরির কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি-শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়ের নিকট একশত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই টাকা "বিশ্বম্ভর সেন পারিতোষিক" নামে প্রদত্ত হইবে। চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় বিশেষ বিবরণ জ্ঞাতব্য।

"একটি ফুল, 'অশ্রুবিন্দু' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত নূতন সামাজিক উপন্যাস 'মাতৃমূর্ত্তি' যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, মহাশয়ের "শতদলের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কবির নূতন কবিতাগ্রন্থ "বীথি" যন্ত্রস্থ।

কএক দিন হইল জব্বলপুর বাঙ্গালা লাইব্রেরির বাৎসরিক অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র, সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের "অর্থনীতি" "অর্থশাস্ত্র" বঙ্গদেশীয় স্কুলসমূহে লাইব্রেরী পুস্তক রূপে ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক সরকারী গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে।

সুলেখক শ্রীযুক্ত কুলভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শীঘ্রই "মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। ইহাতে কএকখানি চিত্রও থাকিবে।

---

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট "প্যারাগন প্রেস" হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।
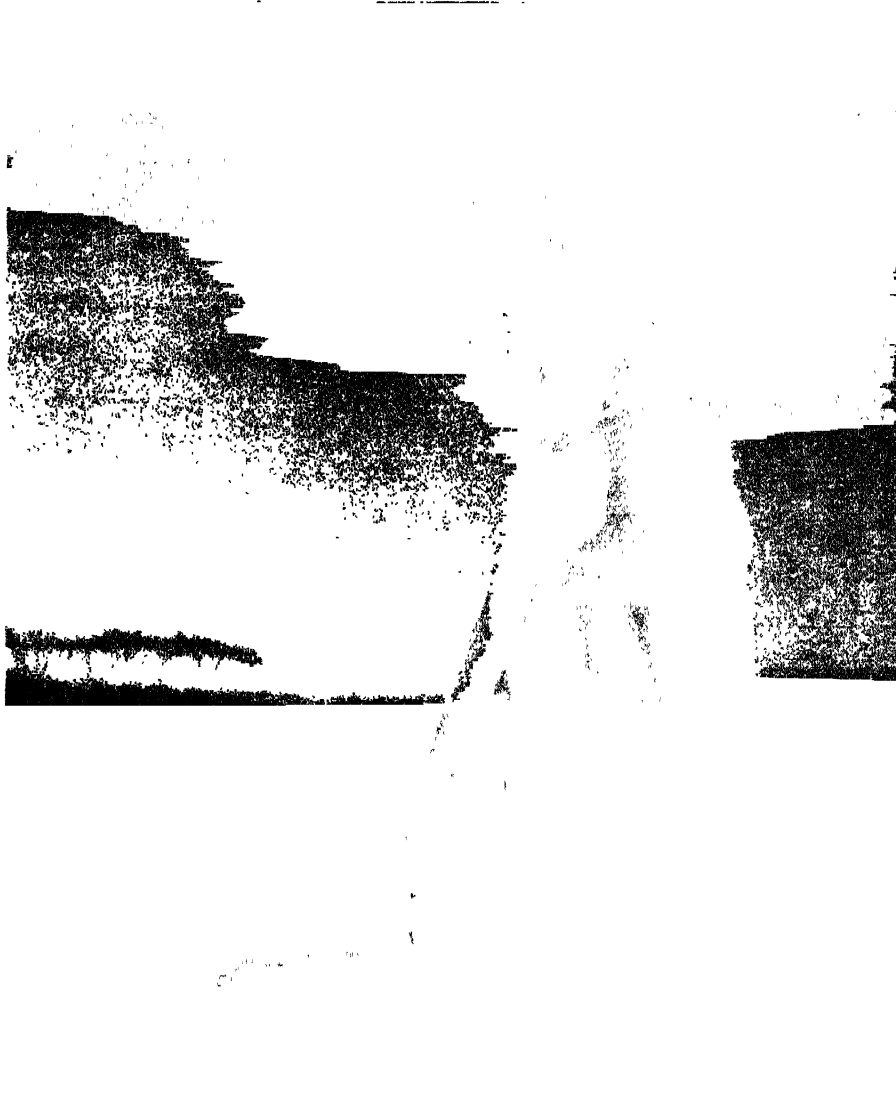
১ম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড	মাঘ, ১৩২০।	দ্বিতীয় খণ্ড ২য় সংখ্যা

হিন্দু

লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম, হই আমি যেন হই গো হিন্দু!
যার দেবালয় শ্যামল পাহাড়, যার দেবাসন সুনীল সিন্ধু।
দেবতার নামে হয় নিশি ভোর, দেবতার নাম প্রভাত হয়,
দেবতার নামে শত্রু মিত্র, পুত্র কন্যা, প্রভু ও ভৃত্য।
তীর্থ যাহার নদ-নদী-কূলে, অতল সাগরে, অচল শৃঙ্গে,
হরিনাম যার কুঞ্জে কুঞ্জে গায় প্রতিদিন বিহগ ভৃঙ্গে।
যোগবলে লভি' বিপুল শক্তি, চাহে না যে বাঞ্ছা চরণ ভিন্ন,
দেবতা যাহার বহেন বক্ষে, নিয়ত ভকত চরণ চিহ্ন।
দেবময় যার অনল, অনিল, প্রখর তপন, শীতল ইন্দু,
লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম, হই যেন আমি হই গো হিন্দু!

ভবনে যাহার আসে দশভুজা, শ্যামল শরৎ সেফালি গন্ধে,
আগমনী গান গাহে কবিকুল, পুরাতন চির নূতন ছন্দে।
হরি-রাস-দোলে পূত পূর্ণিমা, পূত অমানিশি শ্যামার বর্ণে,
শ্যামের আভায় নভ ঘন নীল, মাখা শ্যামরূপ বিটপী পর্ণে।
জোছনা নিশিতে শ্যামের বাঁশিতে উজান যাহার বহায় বক্ষে,
আঁধার রাশিতে শ্যামার হাসিতে ভীষণ শ্মশান প্রকটে চক্ষে।
প্রকৃতি যাহার দেবে দেবময়ী, পুষ্প যাহার দেবের ভোগ্য,
ভক্তি যাহার বিতরে মুক্তি চণ্ডালে করে দেবের যোগ্য।
দেবময় যার অনল, অনিল, প্রখর তপন, শীতল ইন্দু,
লভি যদি পুনঃ মানব-জন্ম, হই যেন আমি হই গো হিন্দু!

৩

যার চোখে এই বিপুল বিশ্ব দেবের মিলনে সতত রম্য,
দেবতা যাহার মাতা পিতা সখা, নহে অদৃশ্য অনধিগম্য ।
কর্ম্মে যাহার অধিকার শুধু, ফল যার দেব-চরণে ন্যস্ত,
নিষ্কাম যার ধর্ম্ম-সাধনা, সংযমে যার দেবতা ত্রস্ত ।
ব্রাহ্মণে যার অতুল ভক্তি, গাভীরে যে গণে জননী তুল্য,
সন্ন্যাসি-পদে লুটায় নৃপতি, বিভবের যেথা নাহিক মূল্য ।
নামে রুচি, আর জীবে দয়া যার, গুরুর দত্ত প্রথম দীক্ষা,
রাজা চাহে যার ব্রজের পথেতে কাঁধে ঝুলি লয়ে করিতে ভিক্ষা ।
মোক্ষ না পাই দুঃখ আমার, নাহিক তাহাতে নাহিক বিন্দু,
লভিয়া ভক্তি, হৃদয়ে শক্তি, হই যেন আমি হই গো হিন্দু !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ।

বিচিত্র প্রসঙ্গ

[২]

আজ কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া কথোপকথন আরব্ধ হইল। অপরাহ্ণ-কাল। আকাশ অল্প মেঘাচ্ছন্ন।

আমি।—আসুন, আমরা ইহুদিজাতির ইতিহাসের আলোচনা করি। জগতের সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে হিব্রুদিগের মত করুণ tragedy আর কোথাও বোধ হয় সংঘটিত হয় নাই। অনেকগুলা স্বতন্ত্র দলবদ্ধ যাযাবর-সম্প্রদায় কেমন করিয়া একটা জাতিতে পরিণত হইল, এবং সেই জাতি জগৎকে কিছু দিয়া গেল কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কেমন করিয়া সে নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল; কেমন করিয়া সে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত বিরোধ করিতে বাধ্য হইয়াও একটা সামঞ্জস্য-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল; কেমন করিয়া বিভিন্ন হিব্রু tribe গুলি সংহত হইয়া একটা নেশনে পরিণত হইতে গিয়া বিচ্ছিন্ন (disintegrated) হইয়া গেল; জীববিদ্যার (Biology) মৌলিক তত্ত্বগুলির সূত্র ধরিয়া আপনি এই কথার আলোচনা করুন।

রামেন্দ্র বাবু।—জীববিদ্যার সাহায্যে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই গোটা কতক সাধারণ সত্য ধরিয়া লইতে হইবে। সমাজদেহ ও জীবদেহ উভয়েই যন্ত্রবদ্ধ পদার্থ। উভয়েরই কতকটা স্বাতন্ত্র্য আছে। একটা সমাজদেহকে অন্যান্য সমাজদেহ হইতে এবং তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিতে হইবে; কারণ, জীবনের উদ্দেশ্য, ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করিয়া লইয়া সেই স্বাতন্ত্র্যকে পুষ্ট করা; সেই স্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ দেখিয়া আমরা জীবনের সফলতার পরিমাপ করি। সমাজদেহ

কাহাকে বলিব? পাঁচজন লোক এক জায়গায় দল বাঁধিয়া বসিলেই কি তাহাকে সমাজ বলিব? গোটা সমাজটার সঙ্গে তার ব্যষ্টির কি সম্বন্ধ? Societyর জন্য Individual, না Individual এর জন্য Society? জীববিদ্যায় কি এ প্রশ্ন উঠে? দেহের অঙ্গগুলি (organs) তাহার কোনও না কোনও কাজে লাগে; নহিলে তাহাদের কোনও সার্থকতা নাই। কিন্তু সমাজে যে individual কোনও কাজে এল না, তাহাকে কি উচ্ছেদ করিতে হইবে? জীববিদ্যায় আর সমাজবিদ্যায় কি প্রভেদ নাই? জীববিদ্যায় দয়ামায়ার স্থান নাই; সমাজবিদ্যায়ও কি অকেজো ব্যক্তির প্রতি দয়ামায়ার লেশ-মাত্র থাকিবে না? উন্নত সমাজে কি এরূপ মনে করা চলে? জীবদেহে প্রত্যেক কোষের স্বাতন্ত্র্য নাই; কিন্তু সমাজদেহের প্রত্যেক ব্যক্তিরও কি স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না? সমাজবিদ্যার এত বড় কথাটা সম্বন্ধে জীববিদ্যা খাঁটি উত্তর দিতে পারিবে না। উত্তর পাইতে হইলে আরও অন্য scienceএর সাহায্য লইতে হইবে—যথা চারিত্রদর্শন (moral science); কিন্তু এই moral scienceএর সহিত biologyর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। হক্‌স্‌লি এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন যে, জীবজগতে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, সে সমুদয় সম্পূর্ণ রূপে moral scienceএর বহির্ভূত;—moral ও (সুনীতি-মূলক) নহে; immoral ও (দুর্নীতি-মূলক) নহে; একেবারে unmoral (অনীতিমূলক)। তাই বলিতেছি, ঐতিহাসিক আলোচনায় জীববিদ্যার তত্ত্বগুলি একটু সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

আরও অনেক প্রশ্ন উঠিতে পারে। মনে করুন মানিয়া লওয়া গেল যে, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য খর্ব্ব করিয়া সমাজরক্ষা করা সমাজবিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়। তখনই প্রশ্ন উঠে সমাজের গোড়ার unit কি,—Individual না Family?

আমি।—Family, Tribe, Clan প্রভৃতি কএকটি শব্দের বাঙ্গালা পরিভাষা করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয় না?

রামেন্দ্র বাবু।—Family'র পরিবর্ত্তে আমি 'গৃহ' শব্দটি ব্যবহার করিতে চাই। 'পরিবার' শব্দটা আমাদের এই প্রসঙ্গে বোধ হয় ঠিক যে জিনিসটি আমরা চাই তাহা বুঝাইবে না। 'গৃহ' শব্দটা আমাদের নিজস্ব জিনিস। বৈদিক যুগে Head of the family কে 'গৃহপতি' বলা হইত; যে অগ্নি তিনি জ্বালিয়া রাখিতেন, তাহাকে গার্হপত্য বলা যাইত। ব্রাহ্মণ যতদিন গুরুগৃহে থাকিতেন ততদিন তিনি গৃহী নহেন, ব্রহ্মচারী। গুরুগৃহপরিত্যাগের পর সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইলে তিনি স্নাতক; তখন তাঁহার বিবাহে অধিকার জন্মিয়াছে; বিবাহান্তে সস্ত্রীক যে অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় তাহাই গার্হপত্য অগ্নি; শ্রৌত অগ্নি স্থাপনের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আরব্ধ; তখন সেই ব্রাহ্মণ,—গৃহী বা গৃহস্থ, সেই গৃহের গৃহপতি; পত্নী হইলেন—গৃহিণী। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে যখন বলা হইল, তখন পত্নী বড় হইয়া গেলেন। শ্রৌত, স্মার্ত্ত এবং communal বা personal, যে কোনও কাজ করিতে হইবে, তাহা সস্ত্রীক করা চাই; শ্রীরামের স্বর্ণসীতা আবশ্যক হইয়াছিল। পতি ও পত্নী উভয়ে কর্ম্মফলে তুল্যরূপে ভাগী হইবেন।

Clan কে গোত্র বলিব, না গোষ্ঠী বলিব? শব্দ দুইটির ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ কিন্তু বড় বেশী তফাৎ নহে। আদিম আর্য্যদিগের প্রধান সম্পত্তি ছিল গোধন; সেই গরুগুলিকে যতটা জায়গার মধ্যে বেড়া দিয়া রক্ষা করা হইত, সেই বেড়া বোধ করি গোত্র, এবং সেই জায়গায় যে কয়টি পরিবার থাকিতেন, তাঁহারা সগোত্র; একটি গোষ্ঠের চারিদিকে যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহারা একই গোষ্ঠীভুক্ত। হিন্দু-সমাজে গোত্র খুব বড় জিনিস। বেদের ব্রাহ্মণসাহিত্যে গোত্রপ্রবর্ত্তক কএকজন ঋষির নাম আছে; আধুনিক হিন্দুসমাজের সকলেই যে সেই কয়জন ঋষির বংশধর এরূপ মনে করা যায় না। কালক্রমে অনেক গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিকে খাড়া করা হইয়াছে। কোনও কোনও যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানে যজমানের গোত্রভেদে মন্ত্রের তারতম্য হইত। এখনও আমাদের কোনও অনুষ্ঠানেই নিজের গোত্রপরিচয় না দিলে চলে না। এক এক গোত্রের বংশগুলি চারিদিকে এত ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, গোত্র এখন Clan অপেক্ষা বড় জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোষ্ঠী বরং অনেকটা সঙ্কীর্ণ-সীমাবদ্ধ। গোষ্ঠী শব্দটা গ্রহণ করিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না।

Tribeএর ঠিক বাঙ্গালা পরিভাষা পাওয়া কঠিন।

'কুল' শব্দটি Tribe অর্থে এদেশে প্রচলিত আছে; ছত্রিশকুল রাজপুতের কথা শুনিতে পাই। আমাদের ঐতিহাসিক আলোচনায় Tribeএর পরিবর্ত্তে 'কুল' শব্দটি ব্যবহার করিলে যে বিশেষ সুবিধা হইবে এমন ত বোধ হয় না। হঠাৎ নূতন নূতন পরিভাষা চালাইতে চেষ্টা করিলে গোলযোগের সম্ভাবনা আছে। এখন আমরা ইহুদিদিগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে বসিয়া যদি আমরা হিব্রু tribe গুলাকে হিব্রুকুল বলিয়া অনুবাদ করিয়া চালাইতে চেষ্টা করি,তাহা হইলে আমাদের নিজেরই কেমন কেমন ঠেকিবে। অতএব পরিভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে একটু স্বাধীন না থাকিলে চলিবে না।

এইবার আসুন, হিব্রুদিগের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখি। প্রথমটা কি দেখিতে পাই? অনেকগুলি স্বতন্ত্র Tribe। কোথা হইতে তাহারা আসিল কেহ তাহা বলিতে পারে না; আরবের মরুভূমিতে বা মেসোপটেমিয়ার উর্ব্বর-ভূমিতে তাহাদের জন্ম কি না, সে রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। সহসা কতকগুলি যাযাবর Tribe আমাদের নয়ন-গোচর হয়। তাহারা সকলেই এব্রাহামের পুত্র, ইস্রায়েলের বংশধর বলিয়া পরিচিত ছিল; তাহাদের কৌলিক ইতিহাসের ধারা সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে একইভাবে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; সকলেই এক ভাষায় কথা কহিত; একই দেবতা এলোহিমকে পূজা করিত, অথচ প্রত্যেক tribeএর স্বতন্ত্র কৌলিক দেবতাও ছিল; কাহারও নির্দ্দিষ্ট আবাসভূমি ছিল না। এই সকল যাযাবর দল হয় ত 'মিশরদেশে গিয়াছিল; মূসার নেতৃত্বাধীনে হয় ত তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমি।—হয়ত বলিতেছেন কেন? মূসা নামধেয় কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু Exodus সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে কি?

রামেন্দ্র বাবু।—অনেকে ত সন্দেহ করিয়া থাকেন। আমরাই বা ঐ ব্যাপারটিকে অভ্রান্ত ,ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইব কেন? তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া গেল যে হিব্রুদলগুলি মিসর দেশ হইতে পলাইয়া আসিল। প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাইনে (Sinai) পাহাড়ের উপর মূসার ভগবদ্দর্শন ঘটে। কেনাইট (Kenite) নামক একটি নূতন tribeএর সহিত তাঁহারা মিলিত হইলেন; ইহারা জাভে (Jahve) নামক দেবতার পূজা করিত। মূসা এই (Jahve) দেবতাকে হিব্রুদিগের প্রাচীন দেবতা এলোহিমের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; Jahveর নিকট হিব্রুরা চুক্তিবদ্ধ (Covenant) হইল যে, তাহারা একমাত্র জাভের পূজা করিবে, এবং অন্য সমস্ত দেবতার উপাসকদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবে। এই Jahve দেবতার পূজার বার্ত্তা বহন করিয়া মূসা হিব্রুদিগকে প্যালেষ্টাইনে প্রেরণ করিলেন। জাহবেকে সোজা করিয়া বলিলে জেহোবা হয়।

আমি।—হিব্রুদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মে ত আর একটা covenant ছিল?

রামেন্দ্র বাবু।—হাঁ, ছিল বটে, ভগবানের সঙ্গে Noahর Covenant। যাহাকে Ark of the Covenant বলা হইত, সেটি একটি বাক্সবিশেষ; হিব্রুরা মূসার অনুজ্ঞাক্রমে সেই বাক্সটি ঘাড়ে করিয়া ঘুরিত। এই Arkটিও একটি ঐতিহাসিক রহস্য; কখন্ ইহার প্রথম আবির্ভাব এবং কখন্ ইহার তিরোভাব হইল,কেহ তাহা ঠিক বলিতে পারে না। বাইবেলে আছে জেহোবার সহিত মূসার চুক্তিবন্ধনের পর এই বাক্স নির্ম্মিত হইয়াছিল। জেহোবা এই বাক্সের উপর আবির্ভূত হইয়া আদেশ দিতেন। সে যাহা হউক, মূসা তাঁহার নূতন দেবতাকে লইয়া নূতন দেশে আগমন করিলেন। কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল।

১। একমাত্র Javeh কে পূজা করিতে হইবে।

২। ছুন্নৎ (Circumcision) অনুষ্ঠিত হইল।

৩। পশুবলি প্রবর্ত্তিত হইল।

৪। Javehর পৌরোহিত্য মূসার ভাই Aaron এর বংশধর ভিন্ন আর কেহ করিতে পাইবে না। অন্য কেহ সেই পূজার বিধিব্যবস্থা অবগত ছিলেন না। এমনই করিয়া একটা স্বতন্ত্র পুরোহিত-বংশ সৃষ্ট হইল।

যখন তাঁহারা প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারা আর যাযাবর রহিলেন না; Canaanএ নির্দ্দিষ্ট জমি দখল করিয়া বসিলেন। আশে পাশে অনেক tribe ছিল,—Moabite, Philistine Amalekite ইত্যাদি।

তাহাদের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, কারণ, তাহারা অন্যান্য দেবতার ভক্ত উপাসক ছিল; তাহাদিগের উচ্ছেদ-সাধন না করিলে হিব্রুদিগের সত্যরক্ষা হয় না।

Exodusএর কাল-নিরূপণ কঠিন; আন্দাজ খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

আমি।—তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে হিব্রুদিগের মধ্যে মূসাই সর্ব্বপ্রথম একেশ্বরবাদ প্রচারিত করিলেন?

রামেন্দ্রবাবু।—সাধারণতঃ এই রকমই বলা হয় বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু মজা আছে। মিশর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যে দিন হইতে তাহাদিগের মধ্যে মূসা জাভেকে (Javeh) প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার প্রধান চেষ্টা দাঁড়াইল যে, সমগ্র দেশের মধ্যে একমাত্র Javeh-কেই সকলে যেন পূজা করেন। অন্যান্য tribe এর অন্যান্য দেবতা ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা হইত না; সেই সকল দেবতার উপাসককে নির্ম্মূল করিতে হইবে; এই মর্ম্মে জাভের সঙ্গে গোড়া হইতে একটা সর্ত্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্য tribe এর দেবতাকে নষ্ট করিয়া আমার tribe এর দেবতাকে উপাস্য করিতে হইবে,—ইহাকে monotheism বলিতে হয় বলুন। এ রকম monotheism ত আশে পাশের tribe গুলির মধ্যেও দৃষ্ট হয়; তাহাদেরও স্ব স্ব কৌলিক দেবতাকে সকলেরই উপাস্য করিবার প্রয়াস ছিল। তাহারা যদি বলবত্তর হইত, যদি তাহারা নেশন কিংবা রাষ্ট্র গঠিত করিতে পারিত, তাহা হইলে হিব্রুদিগের এই একেশ্বরবাদের কথা এমন ভাবে জাহির হইয়া পড়িত কি না বলা যায় না। কানানের (Canaan) আদিম অধিবাসী Moabite দিগের কথাই ধরুন। তাহাদের ত নিজের দেবতা ছিল,—চেমশ্‌। হিব্রুদিগের প্রতি জাভের যেরূপ আদেশ, মোআবাইটদিগের প্রতি চেশমেরও আদেশ তদ্রূপ কঠোর ছিল। হিব্রুজাতির সম্পর্কে একমাত্র উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহাকে বলে Moabite Inscription; প্যারিস নগরে উহা রক্ষিত হইতেছে। তাহাতে কি দেখিতে পাই? Moab এর রাজা তাঁহার দেবতা চেমশের তুষ্টিসাধনের জন্য ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে নিহত করিয়াছেন। মেশা নামে Moab এর এক রাজা ছিলেন; তাঁহার প্রজাপুঞ্জের উপর দেবতা চেমশের কোপদৃষ্টি নিপতিত হইল; সেই দেবরোষের ফল হইল এই যে, ইস্রায়েলের রাজা ওম্রি Moabite দিগকে বিধ্বস্ত করিল; ওম্রির পুত্রও ঐ পন্থা অবলম্বন করিবেন এই রূপ বুঝা গেল; অমনই Moabite এর দেবতা চেমশ্‌, ইস্রায়েলের উপর রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; মোআবের রাজা সাতহাজার জেহোবাপূজককে নিহত করিয়া দেবতাকে পরিতুষ্ট করিলেন। উৎকীর্ণ-লিপির ইংরেজি অনুবাদ এই দেখুন,—

Omri was king of Israel, and oppressed Moab for a long time because Chemosh was angered against his people. The son of Omri also wished to oppress Moab. Chemosh said to me 'I will cast my eyes on him and over his house, and Israel shall perish for ever.' I, Mesha, king of Moab, accordingly took the town of Ataroh and killed all the people in honour of Chemosh. I killed all, 7000 men, for they had been interdicted, in honour of Chemosh. I carried away the people of Javeh, and I dragged them along the ground before Chemosh.

এখন বলুন দেখি, ইস্রায়েলের দেবতা Javeh আর মোআবাইটের চেমশ স্ব স্ব উপাসকদিগের প্রতি প্রায় একই প্রকার আদেশ জাহির করিয়াছিল কি না? মূসার হিব্রুদলগুলি কালক্রমে তাহাদের দেবতা জাভেকে কেন্দ্র করিয়া আপনাদিগকে একটা নেশনে পরিণত করিল, একটা State গড়িয়া তুলিল; মোআবাইটরা তাহা পারিল না; ইস্রায়েলের জয় হইল; সেই সঙ্গে ইস্রায়েলের দেবতাও সর্ব্বত্র আপনাকে জাহির করিবার অবসর পাইল। Javehর পসার প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন হিব্রু tribe গুলা তাহাদের কৌলিক দেবতাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই; বর্জ্জন করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া কৌলিক দেবতা পূজা হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা হইত; এই প্রকার ভয় প্রদর্শনের জন্যই নবীদিগের (Prophets) আবির্ভাব। তাঁহারা কটূক্তি করিয়া,

বিভীষিকা দেখাইয়া জনসাধারণের মন Javeh র দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। ইহুদির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, মূসাপ্রবর্ত্তিত জেহোবা দেবতার পূজা ব্যতিরিকে অন্যান্য ছোট খাট দেবতাও হিব্রুদিগের পূজা পাইত।

সে যাহা হউক, তাঁহারা নূতন ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর তাঁহাদের জাতীয় জীবন সংহত করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন; ধীরে ধীরে বিভিন্ন tribe গুলি জমাট বাঁধিবার দিকে অগ্রসর হইল; প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া সুফীদিগের (Judges) নেতৃত্বে কৌলিক স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একটা বড় গোছ নেশনে সংহত হইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

আমি।—Canaan এ মোটা মোটি বারটা tribeই ত আসিয়া বসিল; তথনও তাহাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বতোভাবে পরিহৃত হয় নাই; আমি গোড়ায় যে tragedy র কথা বলিলাম, এইবার তাহার প্রথম অঙ্ক আরম্ভ হইল।

রামেন্দ্রবাবু।—সুফীদিগের নেতৃত্বে এই ১২টা tribe জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; সকলেই বাহিরের tribe গুলিকে ঘৃণা করিত; তাহাদের সহিত যুদ্ধ হইত; কথনও কিন্তু সব tribe গুলা এক জনের নেতৃত্বে চালিত হইতে রাজী হইত না; সুতরাং সব সময়ে যুদ্ধে জয় হইত না। আবার নিজেদের স্বতন্ত্র কৌলিক দেবতাগুলিকে তাহারা সকলে ছাড়িতে পারে নাই; সুফীরা এই সকল দেবতা-পূজকদিগকে শাস্তি দিবার চেষ্টা করিত। এইরূপে দিন যায়। পরিশেষে একজন সুফীর আবির্ভাব হইল, তাঁহার নাম স্যামুয়েল (Samuel)। তিনি দেখিলেন যে, এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলে সফলতা লাভ করা যাইবে না। তথাপি একজন রাজা প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু জনসাধারণ বলিল,—আমাদের রাজা চাই; প্রথমে তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু শেষে ভাবিলেন রাজা আবশ্যক। তিনি সলকে (Saul) খুঁজিয়া বাহির করিয়া anoint করিয়া রাজা করিয়া দিলেন।

আমি।—দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে দুইশত বৎসর কতটুকু! সুফী চলিয়া গেলেন; রাজা আসিলেন।

রামেন্দ্রবাবু।—রাজা আসিলেন; তিনি যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, সে কার্য্যে তিনি prophet-দিগের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন; এই prophet সম্প্রদায়কে স্যামুয়েল একটি যন্ত্রবদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়াছিলেন। এই নবী-সম্প্রদায় (prophet এর হিব্রু পরিভাষা—নবী) জাভের অনুগৃহীত; জাভের দিকে সমস্ত tribe গুলির মন আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন।

সলের (Saul) পর দায়ুদ (David); দায়ুদের পর সলোমন (Solomon the magnificent) রাজা হইলেন। দায়ুদ রাষ্ট্রের কেন্দ্র-স্বরূপ রাজধানী জেরুসালেম স্থাপিত করিলেন। সলোমন জাভের পূজার জন্য Mount Zion এর উপর দেবমন্দির গঠিত করিলেন। হিব্রুরা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে জানিত না; টায়র (Tyre) হইতে মিস্ত্রী আনাইয়া লেবেননে (Lebanon) দেবদারু (cedar) বৃক্ষ কাটিয়া মন্দির তৈয়ারী করা হইল। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল,যে সকলে ছোট ছোট গ্রাম্য কৌলিক দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া এই বড় মন্দিরে আসিয়া পূজা করিবে। মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ ছিল না; মূসার সেই অতিপ্রাচীন সনাতন বাক্সটি (Ark of the Covenant) সযত্নে রক্ষিত হইল। পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত-বংশ ছিল; নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল।

হিব্রুজাতি এখন একটা রাষ্ট্রে পরিণত হইল। রাজার একেশ্বরপ্রভুত্ব, অখণ্ড প্রতাপ। রাজ্যের বাহিরে Moabite প্রভৃতি দলগুলা তথনও কৌলিক অবস্থা (tribal stage) হইতে উন্নত হইতে পারে নাই। দূরে বড় বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল,—আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, মিশর। আবার টায়র (Tyre), সিডন্ (Sidon) প্রভৃতি কএকটি প্রবল ফিনীসিয় নগর ছিল। ইহাদিগের মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে হইবে; পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে; সেই সঙ্গে জাভে পূজাকে কেন্দ্রে রাখিয়া সমাজ-দেহে সংহতি রক্ষা করিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত বিরোধ ও

সন্ধি করিয়া চলিতে হইয়াছিল। ফিনীসিয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া ইহারা তাহাদের জাহাজে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল; রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। সলোমনের অতুল ঐশ্বর্য্য; তিনি বিদেশের বহু রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন; তাঁহার নাকি এক সহস্র মহিষী ছিল। সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হইল। সংহত সমাজ ভাঙ্গিবার (disintegrated) লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

সে পরে বলিতেছি। সল্, দায়ূদ ও সলোমন প্রায় শত বর্ষ রাজত্ব করিলেন। সলোমনের মৃত্যুর পর গোলযোগ বাধিয়া গেল। সমাজের প্রবীণ গৃহপতিরা মিলিয়া স্যামুয়েলকে সমস্বরে বলিয়াছিলেন,—আমাদের রাজা চাই; তাঁহারা রাজা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। সলের মৃত্যু হইলে তাঁহারা দায়ূদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; রাষ্ট্র জমাট হইয়া বাঁধিয়া উঠিল; সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পাইলেন; কবিবর নবীন সেনের ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহাদের তখন "এক রাজ্য, এক ধর্ম্ম, এক নারায়ণ।" রাজা দায়ূদ জাভের উপাসনায় যে একাগ্রতার, তন্ময়তার, উন্মাদনার ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের আনন্দের সীমা থাকিত না। মন্দিরের সম্মুখে তিনি নৃত্য করিতেন, ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন, গায়ে কাদা মাখিতেন। রাজা সলোমনের মতি গতি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ। বিদেশিনী রাজকন্যা সলোমনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; সেই সঙ্গে টাঁরিয়, আসীরিয়, মিশরীয় দেবতারা Canaan এ শুভাগমন করিলেন। সহস্রমহিষীপরিবেষ্টিত রাজা সলোমন অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া নবাগত দেবতাদিগকে তন্মধ্যে স্থাপিত করিলেন। হয়ত ভারতবর্ষে আকবর শাহের মত সলোমন উদারধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হইবার বাসনা করিয়াছিলেন। চেমশ্, আষ্টার্ট মোলক প্রভৃতি দেবতা Canaan এ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

প্রবীণ গৃহপতিরা প্রমাদ গণিল। এ কি হইল? মূসা জাভের সহিত যে সর্ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষিত হইল না কেন? তিনি ত নিশ্চয় রুষ্ট হইবেন; তাঁহার কোপ হইতে হিব্রু-জাতিকে কে রক্ষা করিবে? এখনও মূসার Ark of the Covenant জাভের মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে; রাজা কি তাহা ভুলিয়া গেলেন? অন্যজাতির দেবতা আসিয়া আমাদের দেবতার পূজায় ভাগ বসাইতে আসিল কেন? জাভের পুরোহিতগণ বিচলিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ Aaron এর কথা স্মরণ হইল। মনে পড়িল সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনার প্রথম যুগের কথা, যখন মূসার সম্মুখে জাভে আবির্ভূত হইয়া মূসাকে আদেশ করিলেন,—"একমাত্র আমাকে পূজা করিতে হইবে; যদি করিতে পার, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব; আমি একমাত্র তোমাদেরই পূজা গ্রহণ করিব; তোমরাই আমার chosen people; কিন্তু তোমরা অন্য দেবতার উপাসকদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবে; তাহাদের দেশে যেন কোনও প্রাণী জীবিত থাকে না।" মূসা আসিয়া Aaron কে বলিলেন, সমবেত হিব্রু দলপতিদিগকে বলিলেন, জাভের আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইবে। তাঁহার প্রস্তাব সকলে অনুমোদন করিলেন। তখন হইতেই ত জাভের পূজা চলিয়া আসিতেছে। তাই কি? পুরোহিতের মনে পড়িল Aaron এর পদস্খলনের কথা; লজ্জায় পুরোহিত মাথা হেঁট করিলেন। সেই এক মুহূর্ত্তের বিশ্বাসঘাতকতার ফল কি আজ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে? তিনিও কি আজ Aaron এর মত কর্ত্তব্যচ্যুত হইবেন? Aaronএর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দেবতা ক্ষমা করিয়াছিলেন। একমাত্র তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা জাভের উপাসনায় পৌরোহিত্য করিতে পারিবেন, ইহা প্রথম হইতেই স্থির হইয়াছিল। পুরোহিতেরা ভাবিলেন, Canaanএ অন্য দেবতার পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া রাজা কি অনর্থের সূত্রপাত করিলেন!

নবীগণ (Prophets) ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। হিব্রুসমাজ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে জাভের আদেশ কেমন করিয়া বিস্মৃত হইবেন! মূসা যখন দ্বিতীয়বার আদিষ্ট হইয়া জেহোবা দর্শনাভিলাষে পাহাড়ে চলিয়া যান, দলপতিরা তাঁহার পথ চাহিয়া রহিয়াছিল; দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল, তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না। সকলে মনে করিল, তিনি আর ফিরিবেন না; হয় ত' তিনি জীবিত নাই। Aaron বলিলেন,—"মূসা নাই; জাভের প্রত্যাদেশ ত ভাল করিয়া বুঝা গেল না; এস আমরা আমাদের সনাতন মূর্ত্তিপূজায় মন দি।" এই বলিয়া তিনি একটি স্বর্ণবৃষ

গড়িয়া তুলিলেন। দেবতাকে বৃষরূপে পূজা করিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময়ে মূসা সহসা উপস্থিত হইলেন। সকলকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"আর এমন কাজ করিও না। জাভে ক্রুদ্ধ হইলে তোমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে। তাঁহার প্রত্যাদেশ পাইয়াছি। তাঁহার সহিত চুক্তির নিদর্শনস্বরূপ একটি কাষ্ঠের বাক্স নির্ম্মাণ করিতে হইবে,—আড়াই ফুট লম্বা, দেড় ফুট চওড়া, দেড় ফুট খাড়াই; সেইটিই Ark of the Covenant।" এত দিন ধরিয়া সেই Arkটি কে কেন্দ্রে রাখিয়া হিব্রুসমাজ ঘন হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে; আজ তাহার বুকের উপরে অন্য দেবতা চাপিয়া বসিল।

জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সলোমনের মৃত্যুর পরে তাঁহার রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হইল। উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য আবির্ভূত হইল। উত্তরের নাম হইল—ইস্রায়েল (Israel); দশটা tribe সেখানকার অধিবাসী হইয়া রহিল। দক্ষিণের নাম হইল—যুডা (Judah); দুইটি tribe মাত্র সেখানে রহিল।

আমি।—"এক ধর্ম্ম, এক নারায়ণে"র জন্য "এক রাজ্য" রহিল না। শতবর্ষ কাটিয়া গেল। দুইটা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য লইয়া হিব্রুর জাতীয় জীবনের ট্র্যাজেডির তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল।

রামেন্দ্র বাবু।—ইস্রায়েল দুইশত বৎসর স্বীয় রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল; এই দুই শতাব্দীর মধ্যে যুডার সহিত অনেকবার তাহার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। "এক রাজ্য" ত রহিলই না; পরন্তু দুইটা খণ্ডিত অংশের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। Canaanএ রাষ্ট্রীয় জীবন যাত্রার যে পাথেয় লইয়া তাহারা চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হইতে না হইতেই তাহারা দুইখণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। একটা পুরুভুজ যেমন দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র দুইটি পৃথক্ পুরুভুজে পরিণত হয় ও হয়ত পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে; তেমনই দুইটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মভাবকে কেন্দ্রে রাখিয়া হিব্রুজাতি দুইটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইল।

ইস্রায়েলের প্রথম রাজা জেরোবোয়াম জাভেকে বৃষরূপে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। নূতন পুরোহিত-সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল। নবী আহিয়া (Prophet Ahijah) এই মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া রাজার প্রতি কঠোর বাক্য-প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী রাজারা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। ষষ্ঠ রাজা ওম্রি (Omri), সামারিয়াতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই ওম্রির সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত Moabite Inscriptionএ উল্লেখ রহিয়াছে। সপ্তম রাজা, আহাব (Ahab) টায়র (Tyre) নগর হইতে বেয়ালের (Baal) পূজা আমদানি করিলেন। Baalএর সহিত Javehর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল; লোকবিশ্রুত নবী ইলাইজা (Elijah) ও তাঁহার শিষ্য ইলাইশা (Elisha) পুনঃপুনঃ অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। দশম রাজা, কিন্তু Baal এর উপাসকদিগকে উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন; অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য জাভের জয় হইল। পঞ্চদশ রাজা, জেরোবোয়াম (Jeroboam II) বেশ শান্তিতে রাজত্ব করিলেন; দেশের শ্রী ফিরিল; বহু দেবতাপূজার উপর নবীগণের অভিশাপ বর্ষিত হইল। উনবিংশ রাজা হোশিয়ার রাজত্ব কালে একেবারে সব ফুরাইল।

আসীরিয়াধিপতি দ্বিতীয় সার্গন্ (Sargon II) সামারিয়া দখল করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত নরনারীকে য়ুফ্রেটিস নদীর পরপারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। ইস্রায়েল আসীরিয়সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

আমি। তা'র পর?

রামেন্দ্র বাবু। তা'র পর যাহা ঘটিল তাহার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া যায় কি? দশটা tribe একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল; জগতে কুত্রাপি তাহাদের একটু চিহ্নমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। তাহাদের কি হইল সে সম্বন্ধে ইতিহাস একেবারে মূক। এমন tragedy বোধ হয় আর কোথাও অভিনীত হয় নাই। পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন; বুঝিতে পারি যে তিনি ক্ষত্রিয়কুল, নির্ম্মূল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন; তাহাও দু এক বারে পারেন নাই, একুশ বার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই দশটা হিব্রু tribe এর কি হইল তাহা যে জানিতেই পারা গেল না। তাহাদের জাতীয় জীবনের চতুর্থ অঙ্কের উপর যে যবনিকা পড়িল, তাহা এখন

পর্য্যন্ত উত্তোলিত হইল না; চিরন্তন রহস্যই রহিয়া গেল।

ইস্রায়েলের রাষ্ট্রীয় জীবনের স্থিতিকাল দুইশত বৎসর খৃঃ পূঃ ৯৩০ হইতে খৃঃ পূঃ ৭২২ পর্য্যন্ত।

আমি।—ইস্রায়েল গেল। দক্ষিণের যুডারাজ্য কিন্তু আরও কিছু দিন ত টিকিয়া গেল। প্রথম রাজা রেহোবোয়ামের পর—

রামেন্দ্র বাবু।—রেহোবোয়ামের (Rehoboam) পর কেন, তাঁহারই রাজত্বকালে ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল; বহু দেবতার পূজা হইতে লাগিল; ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইল; কোনও প্রকারেই রাষ্ট্রশক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না। আসীরিয়া যখন ইস্রায়েলকে গ্রাস করিল, যুডা তাহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাঁচিয়া গেল। অতিকষ্টে কিছুদিন তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল।

এমন সময়ে আসীরিয়ার সৌভাগ্যসূর্য্য সহসা অস্তমিত হইল। সদ্যোত্থিত ব্যাবিলনের প্রচণ্ডশক্তি আসীরিয়ার মহাশ্মশানের উপর দিয়া যুডার সিংহাসন কম্পিত করিল। সম্রাট নেবুকাড্‌নেজর (Nebuchadnezzar) জেরুসালেম অধিকার করিয়া বসিলেন (খৃঃ পূঃ ৫৯৭); অনেকগুলি বন্দী লইয়া ব্যাবিলনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

আরও দশ বৎসর কাটিয়া গেল। সম্রাটের দ্বিতীয় অভিযান হইল। যুডার দুইটা tribe এর সমস্ত নর নারীকে বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। এই Babylonish captivityতেই তাহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিসমাপ্তি হইল।

আমি।—ট্র্যাজেডির পঞ্চমাঙ্কের উপর যবনিকা পতিত হইল।

রামেন্দ্র বাবু।—হইল বটে, কিন্তু এই ট্র্যাজেডির একটি after-piece আছে; কপালকুণ্ডলা শেষ হইল, কিন্তু মৃন্ময়ী আছে; Three musketeers শেষ হইল, কিন্তু Twenty years After আছে; হিব্রুনেশনের ইতিহাস শেষ হইল, কিন্তু Judaism এর ইতিহাস এইবার সুরু হইবে।

* * *

পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গেল। ব্যাবিলনের হিব্রু বন্দীদিগের দিনগুলি কেমন করিয়া কাটিতে লাগিল কে জানে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইল; আর কি দেশে ফিরিবার আশা আছে? নবী এজেকীয়েল (Ezekiel) বলিলেন, আশা আছে; নিরুৎসাহ হইলে চলিবে কেন? তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, কেন তাঁহাদের এই সর্ব্বনাশ হইল? জাতীয় জীবনের পুরাতন কথাগুলি একে একে মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল কেমন করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চলিয়া গিয়াছিল; সত্যভ্রষ্ট হইয়া দেবতাকে ভুলিয়াছিল; তাই জাভে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন না। পুরুষানুক্রমে যে শাপ সঞ্চিত হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বৈ কি। দেবতা কি প্রসন্ন হইবেন না? এতবড় প্রকাণ্ড ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে তাহারা কি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিবে না! সম্রাট্ ত তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করেন না। ধর্ম্মের অনুশাসন মানিতে হইবে। মুসাপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্র নূতন করিয়া রচিত হইল; সমস্ত আচার ব্যবহার রীতি নীতি পূজা পদ্ধতি পুনরুজ্জীবিত হইল। পঞ্চাশৎ বৎসরব্যাপিনী অগ্নিপরীক্ষার পর দেবতা প্রসন্ন হইলেন। পারস্যাধিপতি সাইরাস (Cyrus) ব্যাবিলন সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া হিব্রু বন্দীদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

কিন্তু এতকালের বাস কি সহজে উঠাইয়া দেওয়া যায়? হিব্রুরা অল্পে অল্পে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্যালেষ্টাইন তখন পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত। নূতন করিয়া জাভের মন্দির গঠিত করা হইল। ব্যাবিলন হইতে কিছু দিন পরে নবী এজ্রা (Ezra) আসিয়া সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই কয় বৎসরের মধ্যে অনেক হিব্রু যুবক বাহিরের tribe হইতে কন্যা আনিয়া বিবাহ করিয়াছিল। নবী এজ্রা বলিলেন, এ কি হইয়াছে? অজ্ঞাতকুলশীলা কন্যার সংস্পর্শে আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। উহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হউক। তাহাই হইল। স্বীয় শিশুসন্তানদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া বিদেশিনীরা চিরদিনের মত চলিয়া গেল?

নেহেমিয়া (Nehemiah) ব্যাবিলন হইতে আসিয়া ধর্ম্মের অনুশাসন প্রচারিত করিলেন। প্রত্যেক ইস্রায়েল সন্তান এখন হিব্রুধর্ম্মের রীতি নীতি আচার ব্যবহার পূজা পদ্ধতি অবগত হইল। নবী নেহেমিয়া নূতন করিয়া Covenant করিলেন ;—অন্য জাতির সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইব না ; সপ্তাহের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট দিন (Sabbath) কাজ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিব। মানুষের প্রথম সন্তান, গৃহপালিত পশুর প্রথম শাবক, ও বৎসরের প্রথম শস্য ও ফল দেবতাকে সমর্পণ করিতে হইবে ; পুরোহিতদিগের ও তাঁহাদের আজ্ঞাকারী Levite দিগের ভরণ পোষণের জন্য কর দিতে হইবে।

এই নবীন হিব্রুধর্ম্মের (Judaism) মধ্যে একটি নূতন জিনিষ দেখিতে পাই ; যথা angel প্রভৃতি দেবযোনি অপদেবতা, ও সয়তানে বিশ্বাস ; এবং মৃতের পুনরুত্থানে বিশ্বাস। এ গুলি পারস্য দেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছিল।

সে যাহা হউক,এমনই করিয়া হিব্রুজাতি আপনাদিগকে এক দুর্ভেদ্য অচলায়তনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতীয়-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইল। সমস্ত আচার ব্যবহারকে সে আঁকড়াইয়া ধরিল। দেবতাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য পশুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল ; মেষ বৃষ ছাগশিশুর যথারীতি বলি হইতে লাগিল, প্রথম পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর এক মাস অতিবাহিত হইলে, তাহাকে দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করা হইত ; তৎক্ষণাৎ আবার কিছু মূল্য দিয়া তাহাকে দেবতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লওয়া হইত। সপ্তাহের সপ্তম দিবস Sabbath বলিয়া গণ্য করা হইত। ছয় বৎসর অন্তর পুরা এক বৎসর পৃথিবীর Sabbath হইত। সে বৎসর, ভূমিকর্ষণ, খাল খনন, বৃক্ষছেদ নিষিদ্ধ ছিল ; যে সকল খাদ্যদ্রব্য আপনা আপনি জন্মিত, সে গুলি ভূস্বামী দীন দুঃখী দিগের মধ্যে অধিকাংশই বণ্টন করিয়া দিতেন। হিব্রুসঙ্ঘের অচলায়তন দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। যাজকতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্রের স্থান অধিকার করিল।

* * *

দুই শত বৎসর কাটিয়া গেল। ম্যাসিডনের দিগ্বিজয়ী বীর পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যুডা বহুকাল গ্রীক টলেমিদের অধীন ও পরে গ্রীক সীরিয়ারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রহিল। সে কি বিষম দিন যখন আন্তিওকস (Antiochos Epiphanes) যুডার যাজকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া হিব্রুজাতিকে নির্দ্দয়ভাবে নিপীড়িত করিল। আদেশ প্রচারিত হইল যে, হিব্রুভাষার অনুশীলন করিতে দেওয়া হইবে না, গ্রীসীয় ক্রীড়ারঙ্গে (Games) যুডার নরনারী যোগদান করিতে বাধ্য হইবে ; মন্দিরে জাভেপূজার পরিবর্ত্তে গ্রীকদেবতার পূজা করিতে হইবে ; Zeus দেবের মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে স্থাপিত হইবে ; ছুন্নদনুষ্ঠানের জন্য মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ক্ষিপ্ত হিব্রুজাতি মাক্কাবিয়সের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পঁচিশ বৎসর তাহারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। সীরিয়ার রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। তাহারা নামমাত্র তাঁহার অধীন হইয়া রহিল।

কিন্তু যুডার মধ্যেই যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর একটি সম্প্রদায় মাথা তুলিল; তাহারা ফ্যারিসী (Pharisee) নামে পরিচিত হইল। সমাজের মধ্যে এই অন্তর্বিদ্রোহের ফলে একদল রোমের সাহায্য প্রার্থনা করিল। পম্পি (Pompey) আসিলেন। রোমের কর্ম্মচারী Procurator ইহুদিজাতির প্রভু হইয়া বসিল।

* * *

রোমের সম্রাট্ বলিলেন, আমাকে দেবতার মত পূজা করিতে হইবে। হিব্রু বলিল, "আমরা সীজরের Cæsar প্রাপ্য সীজরকে দিব ; জাভের প্রাপ্য জাভেকে দিব।" সীজরের ভ্রুকুটি দেখিয়া হিব্রু শিহরিল না। অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। নানা সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল। একদল (Zealots) ধর্ম্মের নামে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা নরহত্যা করিতে আরম্ভ করিল, আর একদল (Sadducees) গ্রীসীয় হিব্রু ধর্ম্মের (Hellenistic Judaism) দিকে প্রবণতা প্রদর্শন করিল ; Phariseeগণ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান গোড়া হিব্রু বলিয়া পরিচিত হইবার প্রয়াস পাইল ; খৃষ্টান সম্প্রদায় বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা ঘোষণা করিল ; এসীনি ও থেরাপিউট সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল ; খৃষ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী সাইমন)

(Simon the Magus) হেলেন নাম্নী রমণীকে লইয়া তান্ত্রিক উপাসনা আরম্ভ করিলেন। সম্রাট্ Vespasion এবং টিটস্ (Titus) আসিয়া জেরুসালেম ধ্বংস করিয়া দিলেন। যাজকতন্ত্র হিব্রুজাতির ইতিহাস শেষ হইয়া গেল।

কিন্তু হিব্রুজাতি মরিয়াও মরিল না। তাহারা উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সর্ব্বত্রই সে তাহার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নিজেকে অচলায়তনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রবল খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যে থাকিয়া প্রায় দুই সহস্র বৎসর সে আপনাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে কি না সহ্য করিতে হইয়াছে! খৃষ্টানের উৎপীড়নে, মুসলমানের অত্যাচারে সে এক দিনের জন্যও আচারভ্রষ্ট হয় নাই। যুরোপের রাজন্যবর্গ, রোমের পোপ তাহার নিকট কত ঋণী!

কোথায় গেল আসীরিয়, ব্যাবিলনীয়, মিসরীয়, পারস্য, ম্যাসিডোনীয়, রোমক সাম্রাজ্য, কোথায় গেল বোগদাদের ও কর্ডোভার খলিফা সাম্রাজ্য! কোথায় গেল মোআবাইট্, আমালাকাইট্ কুলসমূহ!

কিন্তু হিব্রু এখনও বাঁচিয়া আছে; স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বাঁচিয়া আছে। তাহার দেবতা, তাহার আচার অনুষ্ঠান লইয়া বাঁচিয়া আছে। শুধু যে বাঁচিয়া আছে তাহা নহে; সর্ব্বত্রই সে নিজের শির উন্নত করিয়া চলিতেছে। ড্রেফু-ব্যাপারে সে বিচলিত হয় না; Pogrom এ উৎসন্ন যায় নাই। তাহার সমাজের এই জীবনীশক্তি কোথায় সঞ্চিত, পুঞ্জীভূত হইয়া আছে?—তাহার অচলায়তনে।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

বিরাজবৌ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঠিক কাহার অনুগ্রহে ঘটিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু কথাটা বিকৃত হইয়া বিরাজের কাণে উঠিতে বাকি থাকিল না। সে দিন আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন, ওবাড়ীর পিসীমা। বিরাজ সমস্ত মন দিয়া শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল,—"ওঁর একটা কাণ কেটে নেওয়া উচিত পিসীমা।" পিসীমা রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিতে বলিতে গেলেন,"জানি ত ওকে—এমন ফাজিল মেয়ে গাঁয়ে আর দুটি আছে কি!" বিরাজ স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, "কবে আবার তুমি সুন্দরীর ওখানে গেলে?" নীলাম্বর ভয়ে শুষ্ক হইয়া গিয়া জবাব দিল,—"অনেক দিন আগে; পুঁটির খবরটা নিতে গিয়েছিলাম" "আর যেওনা। তার স্বভাব চরিত্র শুন্‌তে পাই ভারী মন্দ হয়েচে" বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

তারপর কতদিন কাটিয়া গেল। সূর্য্যদেব ওঠেন এবং অস্ত যান,তাঁকে ধরিয়া রাখিবার যো নাই বলিয়াই বোধ করি শীত গেল, গ্রীষ্মও যাই-যাই করিতে লাগিল। বিরাজের মুখের উপরে একটা গাঢ় ছায়া ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া পড়িতে লাগিল, অথচ চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত এবং খরতর। যে কেহ তাহার দিকে চাহিতে যায়, তাহারই চোখ যেন আপনি ঝুঁকিয়া পড়ে। শূল-বিদ্ধ দীর্ঘ বিষধর শূলটাকে নিরন্তর দংশন করিয়া করিয়া, শ্রান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়া যে ভাবে চাহিয়া থাকে, বিরাজের চোখের দৃষ্টি তেমনই করুণ অথচ, তেমনই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা তাহার প্রায়ই হয় না। তিনি কখন্ চোরের মত আসেন যান্, সে দিকে সে যেন দৃষ্টিপাতই করে না। সবাই তাহাকে ভয় করে, শুধু করে না ছোটবৌ। সে সুযোগ পাইলেই যখন তখন আসিয়া উপদ্রব করিতে থাকে। প্রথম প্রথম বিরাজ ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারিয়া উঠে নাই। চোখ রাঙাইলে সে গলা জড়াইয়া ধরে, শক্ত কথা বলিলে পা জড়াইয়া ধরে।

সে দিন দশহরা। অতি প্রত্যুষে ছোটবৌ লুকাইয়া আসিয়া ধরিল, "এখনও কেউ ওঠেনি দিদি, চল না একবার নদীতে ডুব দিয়ে আসি।" ওপারে জমিদারের ঘাট তৈরি হওয়া পর্য্যন্ত তাহার নদীতে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

দুই জাএ স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে জল হইতে উঠিয়াই দেখিল, অদূরে একটা গাছতলায় জমিদার রাজেন্দ্রকুমার দাঁড়াইয়া আছে। সে স্থানটা হইতে তখনও সমস্ত অন্ধকার চলিয়া যায় নাই, তথাপি দুজনেই লোকটাকে চিনিল। ছোটবৌ ভয়ে জড়সড় হইয়া বিরাজের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজ অতিশয় বিস্মিত হইল। এত প্রভাতে লোকটা আসিল কিরূপে? কিন্তু, পরক্ষণেই একটা সম্ভাবনা তাহার মনে উঠিল; হয় ত, সে প্রত্যহ এমন করিয়াই প্রহরা দিয়া থাকে! মুহূর্ত্তের এক অংশ মাত্র বিরাজ দ্বিধা করিল, তারপর, ছোট জাএর একটা হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "দাঁড়াস্‌নে ছোটবৌ, চ'লে আয়।" তাহাকে পাশে লইয়া দ্রুতপদে দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া হঠাৎ সে কি ভাবিয়া থামিল, তারপর ধীরপদে ফিরিয়া গিয়া রাজেন্দ্রের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল, অস্পষ্ট আলোকেও সে দৃষ্টি রাজেন্দ্র সহিতে পারিল না, মুখ নামাইল। বিরাজ বলিল, "আপনি ভদ্র-সন্তান, বড় লোক, এ কি প্রবৃত্তি আপনার!" রাজেন্দ্র হত-বুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল—জবাব দিতে পারিল না, বিরাজ বলিতে লাগিল,—"আপনার জমিদারী যত বড়ই হউক্, যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা আমার।" হাত দিয়া ওপারের ঘাটটা দেখাইয়া বলিল,"আপনি যে কত বড় ইতর, তা এদের সবাই জানে, আমিও জানি। বোধ করি আপনার মা বোন্ নেই। অনেক দিন আগে আমার দাসীকে দিয়ে এখানে ঢুকতে নিষেধ করেছিলাম, তা আপনি শোনেন নি।" রাজেন্দ্র এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তখনও কথা কহিতে পারিল না। বিরাজ বলিল, "আমার স্বামীকে আপনি চেনেন না, চিন্‌লে কখনই আস্‌তেন না। তাই, আজ ব'লে দিচ্চি, আর কখনও আস্‌বার পূর্ব্বে তাঁকে চেন্‌বার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বেন",বলিয়া বিরাজ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বাড়ীতে ঢুকিতে যাইতেছে, দেখিল পীতাম্বর একটা গাড়ু হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বহুদিন হইতেই তাহার সহিত বাক্যালাপ ছিল না, তথাপি সে ডাকিয়া বলিল, "বৌঠান, যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইছিলে সে ওই জমিদার বাবু, না?" চক্ষের নিমিষে বিরাজের চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে 'হাঁ' বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া নিজের কথা সে তখনই ভুলিল, কিন্তু ছোট-বৌ'র জন্য মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কেবলই ভাবিতে লাগিল, কি জানি, তাহাকে ঠাকুরপো দেখিতে পাইয়াছে কি না! কিন্তু, অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, মিনিট দশেক পরেই ও বাড়ী হইতে একটা মারের শব্দ ও চাপা কান্নার আর্ত্তস্বর উঠিল। বিরাজ ছুটিয়া আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া পড়িল। নীলাম্বর এই মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়া মুখ ধুইতেছিল; পীতাম্বরের তর্জ্জন ও প্রহারের শব্দ মুহূর্ত্তকাল কাণ পাতিয়া শুনিল, এবং পরক্ষণেই বেড়ার কাছে আসিয়া লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ও-বাড়ীতে গিয়া দাঁড়াইল। বেড়া ভাঙার শব্দে পীতাম্বর চমকিয়া মুখ তুলিয়া সুমুখেই যমের মত বড় ভাইকে দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া থামিল। নীলাম্বর ভূশায়িতা ছোট বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ঘরে যাও মা, কোন ভয় নেই।" ছোটবৌ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গেলে নীলাম্বর সহজভাবে বলিল,—"বৌমার সামনে আর তোর অপমান কর্‌ব না, কিন্তু, এই কথাটা আমার ভুলেও অব-হেলা করিস্‌নে যে, আমি যতদিন ও-বাড়ীতে আছি, ততদিন এ সব চল্‌বে না। যে হাতটা তুই ওঁর গায়ে তুল্‌বি, তোর সেই হাতটা ভেঙে দিয়ে যাব।" বলিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, পীতাম্বর সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাড়ী চ'ড়ে মার্‌তে এলে, কিন্তু কারণ জান?" নীলাম্বর ফিরিয়া দাঁড়া-ইল, বলিল, "না, জান্‌তেও চাইনে।" পীতাম্বর বলিল, "তা' চাইবে কেন! আমাকে দেখ্‌চি তা হ'লে নিতান্তই ভিটে ছেড়ে পালাতে হ'বে!" নীলাম্বর তাহার মুখপানে অল্পক্ষণ চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, "ভিটে ছেড়ে কা'কে পালাতে হ'বে, সে আমি জানি;—তোকে মনে করে দিতে হবে না। কিন্তু, যতক্ষণ তা' না হচ্চে' ততক্ষণ তোকে সবুর ক'রে থাক্‌তেই হবে। সেই কথাটাই তোকে জানিয়ে গেলাম", বলিয়া আবার ফিরিবার উপক্রম করিতেই পীতাম্বর সহসা সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "তবে, তোমাকেও

জানিয়ে দিই দাদা! পরকে শাসন করবার আগে ঘর শাসন করা ভাল।" নীলাম্বর চাহিয়া রহিল, পীতাম্বর সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, "ও পারের ঘাটটা কার জান'ত? বেশ। আমি সেই থেকে ছোটবৌকে ঘাটে যেতে মানা করে দিই। আজ রাত থাক্‌তে উঠে বৌঠানের সঙ্গে নাইতে গিয়াছিলেন—এমনই হয় ত,রোজই যান,কে জানে!" নীলাম্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এই দোষে গায়ে হাত তুল্‌লি?" পীতাম্বর বলিল, "আগে শোন। ওই জমিদারের ছেলের—কি জানি, রাজন বাবু না, কি নাম ওর—দেশ বিদেশে সুখ্যাতি ধরে না। আজ যে, বৌঠান তার সঙ্গে আধঘণ্টা ধরে গল্প কর্‌ছিলেন, কেন?" নীলাম্বর বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "কে কথা কইছিল রে? বিরাজ বৌ?"

"হাঁ, তিনিই"

"তুই চোখে দেখেছিস?" পীতাম্বর মুখের ভাবটা হাসিবার মত করিয়া বলিল, "তুমি আমাকে দেখ্‌তে পার না, জানি,—আমার সে বিচার নারায়ণ করবেন—কিন্তু—" নীলাম্বর ধম্‌কাইয়া উঠিল, "আবার ওই নাম মুখে আনে! কি বল্‌বি বল্‌।" পীতাম্বর চমকাইয়া উঠিয়া ঈষৎ থামিয়া রুষ্টস্বরে বলিতে লাগিল,—"চোখে না দেখে কথা কওয়া আমার স্বভাব নয়। ঘর শাসন না কর্‌তে পার, পরকে তেড়ে মার্‌তে এস না।" নীলাম্বরের মাথার উপর অকস্মাৎ যেন বাড়ি পড়িল। ক্ষণকাল উদ্‌ভ্রান্তের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে প্রশ্ন করিল, আধ ঘণ্টা ধরে গল্প কর্‌ছিল, কে, বিরাজবৌ? তুই চোখে দেখিচিস?" পীতাম্বর দু' এক পা ফিরিয়া গিয়াছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "চোখেই দেখেচি। আধ ঘণ্টার হয় ত বেশী হ'তেও পারে।" আবার নীলাম্বর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "ভাল, তাই যদি হয়, কি করে জান্‌লি তার কথা কইবার আবশ্যক ছিল না?" পীতাম্বর মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "সে কথা জানি নে। তবে আমারও মার-ধর করা উচিত হয়নি, কেননা ঘাট তৈরি ছোটবৌর জন্য হয় নি।" মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় নীলাম্বর দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াই থামিয়া পড়িল, তারপরে পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুই জানোয়ার, তাতে ছোট ভাই। বড় ভাই হয়ে আমি আর তোকে অভিসম্পাত কর্‌ব না, আমি মাপ করলুম, কিন্তু আজ তুই যে কথা গুরুজনকে বল্‌লি, ভগবান্ হয়ত তোকে মাপ করবেন না—যা—" বলিয়া সে ধীরে ধীরে এ ধারে চলিয়া আসিয়া ভাঙা বেড়াটা নিজেই বাঁধিয়া দিতে লাগিল। বিরাজ কাণ পাতিয়া সমস্ত শুনিল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিতে ছিল, একবার ভাবিল সাম্‌নে গিয়া নিজেই সব কথা বলে, কিন্তু, পা বাড়াইতে পারিল না। তাহার রূপের উপর পরপুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছে, স্বামীর সুমুখে একথা নিজের মুখে সে কি করিয়া উচ্চারণ করিবে! বেড়া বাঁধিয়া দিয়া নীলাম্বর বাহিরে চলিয়া গেল। দুপুর বেলা ভাত বাড়িয়া দিয়া বিরাজ আড়ালে বসিয়া রহিল, রাত্রে স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলে নিঃশব্দে শয্যায় আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং প্রভাতে তাঁহার ঘুম ভাঙিবার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গেল।

এমনই করিয়া পলাইয়া বেড়াইয়া যখন দু'দিন কাটিয়া গেল, অথচ, নীলাম্বর কোন প্রশ্ন করিল না, তখন আর এক ধরণের আশঙ্কা তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল। স্ত্রীর সম্বন্ধে এত বড় অপবাদের কথায় স্বামীর মনে কৌতুহল জাগে না, ইহার কোন সঙ্গত হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না; কিংবা ঘটনাটায় তিনি বিস্মিত হইয়াছেন এ সম্ভাবনাও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। এ দুইদিন একদিকে যেমন সে গা ঢাকিয়া ফিরিয়াছে, অপর দিকে তেমনই অনুক্ষণ আশা করিয়াছে, এইবার কথা উঠিবে এইবার তিনি ডাকিয়া ঘটনাটি জানিতে চাহিবেন, তাহা হইলেই সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিয়া স্বামীর পায়ের নীচে তাহার বুকের ভারী বোঝাটা নামাইয়া ফেলিয়া সুস্থ হইয়া বাঁচিবে, কিন্তু, কৈ কিছুই যে হইল না! স্বামী নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

একবার সে ভাবিবার চেষ্টা করিল। হয়ত, কথাটা তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু এই তাহার সম্পূর্ণ আত্মগোপন করাটাও কি তাঁহার চোখে পড়িয়া সংশয় উদ্রেক করিতেছে না!

অথচ, যাহা এত দিন পর্য্যন্ত সে গোপন করিয়া আসিয়াছে, তাহা নিজেই বা আজ যাচিয়া বলিবে কিরূপে? সে দিনটাও এমনই করিয়া কাটিল। পরদিন সকালে

ভয়ার্ত্ত, ভারাতুর হৃদয় লইয়া সে কোন মতে ঘরের কাজ করিতেছিল, হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কথা তাহার বুকের গভীর তলদেশ আলোড়িত করিয়া ঘূর্ণাবর্ত্তের মত বাহির হইয়া আসিল,—"আর যদি তিনি ঠাকুরপোর কথা বিশ্বাস করিয়াই থাকেন, তা' হলে ?"

নীলাম্বর আহ্নিক শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছিল, সে ঝড়ের মত সুমুখে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। বিস্মিত নীলাম্বর মুখ তুলিতেই বিরাজ সজোরে নিজের অধর দংশন করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কেন, কি করেচি ? কথা কও না যে বড় !" নীলাম্বর হাসিল। বলিল, পালিয়ে বেড়ালে কথা কই কার সঙ্গে ?"

"পালিয়ে বেড়াচ্চি ! তুমি ডাকতে পারনি একবার ?"

নীলম্বর বলিল, "যে লোক পালিয়ে বেড়ায় তাকে ডাক্‌লে পাপ হয়।"

"পাপ হয় ! তা'হলে ঠাকুরপোর কথা তুমি বিশ্বাস করেচ বল ?"

"সত্যি কথা বিশ্বাস কর্‌ব না ? বিরাজ রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল, "সত্যি নয়—ভয়ঙ্কর মিছে কথা ! কেন তুমি বিশ্বাস কর্‌লে ?"

"তুমি নদীর ধারে কথা বলনি ?" বিরাজ উদ্ধতভাবে জবাব দিল "হাঁ বলেচি।" নীলাম্বর বলিল, "আমি ঐ টুকুই বিশ্বাস করেচি।" বিরাজ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল,"যদি বিশ্বাসই করেচ, তবে ওই ইতরটার মত শাসন কর্‌লে না কেন ?" নীলাম্বর আবার হাসিল। সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত নির্ম্মল হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। ডান হাত তুলিয়া বলিল, "তবে কাছে আয়, ছেলে বেলার মত আর একবার কাণ মলে দিই।" চক্ষের পলকে বিরাজ সুমুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল, এবং পরক্ষণেই তাঁহার বুকের উপর সজোরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নীলাম্বর কাঁদিতে নিষেধ করিল না। তাহার নিজের দুই চোখও জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল, সে স্ত্রীর মাথার উপর নিঃশব্দে ডান হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণে কান্নার প্রথম বেগ কমিয়া আসিলে সে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "কি তাকে বলেছিলুম জান ?" নীলাম্বর সস্নেহ মৃদুস্বরে বলিল, "জানি; তাকে আস্‌তে বারণ করে দিয়েচ।" "কে তোমাকে বল্‌লে ?" নীলাম্বর সহাস্যে কহিল, "কেউ বলেনি। কিন্তু, একটা অচেনা লোকের সঙ্গে যখন কথা কয়েচ, তখন অনেক দুঃখেই কয়েচ। সে কথা ও ছাড়া আর কি হতে পারে বিরাজ !" বিরাজের চোখ দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল। নীলাম্বর বলিতে লাগিল, "কিন্তু কাজটা ভাল করনি। আমাকে জানান উচিত ছিল, আমিই গিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতাম। আমি অনেক দিন পূর্ব্বেই তার মনের ভাব টের পেয়েছি, কতদিন সকালে বিকালে তাকে দেখ্‌তেও পেয়েছি, কিন্তু তোমার নিষেধ মনে ক'রেই কোন দিন কিছু বলিনি।"

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশে মেঘ করিয়া টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে বিছানায় শুইয়া আবার কথা উঠিল। নীলাম্বর বলিল, "আজ সারাদিন তাঁকে দেখ্‌বার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।" বিরাজ ভীত হইয়া উঠিল, —"কেন ?" "কেন ?" দুটো কথা না বল্‌লে ভগবানের নিকট অপরাধী হয়ে থাক্‌তে হ'বে—তাই।"ভয়ে উত্তেজনায় বিরাজ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "না, সে হবে না—কিছুতেই হবে না। এই নিয়ে তুমি তাকে একটি কথাও বল্‌তে পাবে না।" তাহার মুখ-চোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া নীলাম্বর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি স্বামী, আমার কি একটা কর্ত্তব্য নেই ?" বিরাজ কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই বলিয়া বসিল, "স্বামীর অন্য কর্ত্তব্য আগে কর, তার পরে এ কর্ত্তব্য কর্‌তে যেও।"

"কি ?" বলিয়া নীলাম্বর ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া, অবশেষে মৃদুস্বরে "আচ্ছা" বলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইল। বিরাজ তেমনই ভাবে স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল,—এ কি কথা সহসা তাহার মুখ দিয়া আজ বাহির হইয়া গেল !

বাহিরে বর্ষার প্রথম বারিপাতের মৃদু শব্দ খোলা জানালার ভিতর দিয়া ভিজামাটির গন্ধ বহিয়া আনিতে লাগিল, ভিতরে স্বামী স্ত্রী নির্ব্বাক্ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে নীলাম্বর গভীর আর্ত্তকণ্ঠে কতকটা যেন নিজের মনেই

বলিল, "আমি যে কত অপদার্থ, বিরাজ, তা' তোর কাছে যেমন শিখি, তেমন আর কারও কাছে নয়।"

বিরাজ কি কথা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া শব্দ ফুটিল না। বহুদিন পরে আজ এই অসহ্য দুঃখদৈন্য-পীড়িত দম্পতিটির সন্ধির সূত্রপাতেই আবার তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

(১০)

মধ্যাহ্নে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া ছোটবৌ বিরাজের পায়ের নীচে কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল। স্বামীর অপরাধের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এই দুই দিন ধরিয়া সে অনুক্ষণ এই সুযোগটুকুর প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কাঁদিয়া বলিল, "শাপ সম্পাত দিওনা দিদি, আমার মুখ চেয়ে ওঁকে মাপ কর, ওঁর কিছু হ'লে বাঁচ্‌বনা।" বিরাজ হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বলিল, "আমি অভিসম্পাত দেবনা বোন্, আমার অনিষ্ট করবার সাধ্যও ওর নেই, কিন্তু, তোর মত সতীলক্ষ্মীর দেহে বিনা দোষে হাত তুল্‌লে মা দুর্গা সহ্য কর্‌বেন না যে!" মোহিনী শিহরিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া বলিল, "কি কোর্‌ব দিদি, ঐ তাঁর স্বভাব। যে দেবতা ওঁর দেহে অমন রাগ দিয়েছেন তিনিই মাপ করবেন। তবুও এমন দেব-দেবতা নেই যে, এ জন্যে মানত্ করিনি, কিন্তু, মহা-পাপী আমি আমার ডাকে কেউ কাণ দিলেন না,—এমন একটা দিন যায় না দিদি—" বলিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল। বিরাজ এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই যে, ছোট বৌর ডান রগের উপর একটা বাঁকা গাঢ় কাল দাগ পড়িয়াছে, সভয়ে বলিয়া উঠিল, "তোর কপালে কি মারের দাগ না কি রে?" ছোটবৌ লজ্জিত-মুখ হেট করিয়া ঘাড় নাড়িল।

"কি দিয়ে মার্‌লে?" স্বামীর লজ্জায় মোহিনী মুখ তুলিতে পারিতেছিল না, নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "রাগ হলে ওঁর জ্ঞান থাকে না দিদি।" "তা'জানি, তবু কি দিয়ে মার্‌লে?" মোহিনী তেমনই নতমুখে থাকিয়াই বলিল, "পায়ে চটি জুতা ছিল—" বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—তাহার দুই চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। খানিক পরে চাপা বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "জুতা দিয়ে মার্‌লে! কি করে সহ্য করে রইলি ছোট বৌ?" ছোট বৌ একটুখানি মুখ তুলিয়া বলিল, "আমার অভ্যাস হয়ে গেছে দি'দি।" বিরাজ সে কথা যেন কাণেই শুনিতে পাইল না, তেমনই বিকৃত গলায় বলিল, "আবার তারই জন্যে তুই মাপ চাইতে এলি?" ছোট বৌ বড় জার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "হাঁ দিদি। তুমি প্রসন্ন না হলে ওঁর অকল্যাণ হবে।" আর, সহ্য করার কথা যদি বল্‌লে দিদি, সে তোমার কাছেই শেখা - আমার যা' কিছু সবই তোমার পায়ে—" বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল,—"না, ছোট বৌ, না মিছে কথা বলিস্ নে—এ অপমান আমি সইতে পারিনে।" ছোট বৌ একটু খানি হাসিয়া বলিল, "নিজের অপমান সইতে পারাটাই খুব বড় পারা দিদি? তোমার মত স্বামিসৌভাগ্য সংসারে মেয়ে মানুষের অদৃষ্টে জোটেনা, তবুও, তুমি জা' সয়ে আছ, সে সইতে গেলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাই। তাঁর মুখে হাসি নেই, মনের ভিতরে সুখ নেই, তোমাকে রাতদিন চোখে দেখ্‌তে হচ্চে; অমন স্বামীর অত কষ্ট সহ্য কর্‌তে তুমি ছাড়া আর কেউ পার্‌ত না দিদি।"

বিরাজ মৌন হইয়া রহিল, ছোট বৌ খপ্ করিয়া হাত দিয়া তাহার পা দুটো চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বল, ওঁকে ক্ষমা কর্‌লে? তোমার মুখ থেকে না শুন্‌লে আমি কিছুতেই পা ছাড়্‌ব না—তুমি প্রসন্ন না হ'লে ওঁকে কেউ রক্ষে করতে পার্‌বে না দিদি!" বিরাজ পা সরাইয়া লইয়া হাত দিয়া ছোট বৌর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া বলিল, "মাপ করলুম।" ছোট বৌ আর একবার পায় ধূলা মাথায় লইয়া আনন্দিত মুখে চলিয়া গেল, কিন্তু বিরাজ অভিভূতের মত সেইখানে বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কে যেন বারংবার ডাক দিয়া বলিতে লাগিল, "এই দেখে শেখ্ বিরাজ!"

সেই অবধি অনেকদিন পর্য্যন্ত ছোট বৌ এ বাড়ীতে আসে নাই, কিন্তু, একটি চোখ, একটি কান এই দিকেই পাতিয়া রাখিয়াছিল। আজ বেলা একটা বাজে, সে অতি সাবধানে এ দিকে ওদিকে চাহিয়া এ বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিরাজ গালে হাত দিয়া রান্নাঘরে দাওয়ায় একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, তেমনই করিয়া রহিল, ছোটবৌ কাছে বসিয়া, পায়ে হাত দিয়া নিজের মাথায়

স্পর্শ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "দিদি, কি পাগল হ'য়ে যাচ্চ?" বিরাজ মুখ ফিরাইয়া তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল, "তুই হ'তিস্‌নে?" ছোট বৌ বলিল, "তোমার সঙ্গে তুলনা করে আমাকে অপরাধী ক'রনা দিদি, এই দু'টি পার ধূলার যোগ্যও ত আমি নই, কিন্তু তুমি বল, কেন এমন হচ্চ? কেন, বঠ্‌ঠাকুরকে আজ খেতে দিলে না?"

"আমি ত খেতে বারণ করি নি!" ছোট বৌ বলিল, "বারণ কর্‌নি সে কথা ঠিক, কিন্তু, কেন একবার গেলে না? তিনি খেতে বসে কতবার ডাক্‌লেন, একটা সাড়া পর্য্যন্ত দিলে না। আচ্ছা, তুমিই বল, এতে দুঃখ হয় কি না? একবারটি কাছে গেলে ত তিনি ভাত ফেলে উঠে যেতেন না।" তথাপি বিরাজ মৌন হইয়া রহিল। ছোট বৌ বলিতে লাগিল, "হাত জোড়া ছিল", বলে আমাকে ত ভুলাতে পারবে না দিদি! চিরকাল সমস্ত কাজ ফেলে রেখে তাঁকে সুমুখে ব'সে খাইয়েচ—সংসারে এর চেয়ে বড় কাজ তোমার কোন দিন ছিল না আজ—" কথা শেষ না হইবার পূর্ব্বেই বিরাজ উন্মাদের মত তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিল, "তবে দেখ্‌বি আয়" বলিয়া টানিয়া আনিয়া রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল,—"ঐ চেয়ে দেখ্‌!" ছোট বৌ চাহিয়া দেখিল একটা কাল পাথরে অপরিস্কৃত মোটা চালের ভাত এবং তাহারই একধারে অনেকটা কলমি শাক সিদ্ধ, আর কিছু নাই। আজ, কোন উপায় না দেখিয়া বিরাজ এইগুলি নদী হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া সিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে ছোট বৌর দুই চোখ বহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, কিন্তু, বিরাজের চোখে জলের আভাস মাত্র নাই। দুই জা'তে নিঃশব্দে মুখোমুখি চাহিয়া রহিল। বিরাজ অবিকৃতকণ্ঠে বলিল, "তুইও ত মেয়ে মানুষ, তোকেও রেঁধে স্বামীর পাতে ভাত দিতে হয়, তুই বল্‌, পৃথিবীতে কেউ কি সুমুখে বসে স্বামীর ওই খাওয়া চোখে দেখ্‌তে পারে? আগে বল্‌, বলে, যা' তোর মুখে আসে, তাই বলে আমাকে গাল দে, আমি কথা ক'ব না।" ছোট বৌ একটি কথাও বলিতে পারিল না, তাহার চোখ দিয়া তেমনই অঝোরে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বিরাজ বলিতে লাগিল, "দৈবাৎ রান্নার দোষে যদি কোন দিন তাঁর একটি ভাতও কম খাওয়া হয়েচে, ত, সারাদিন বুকের ভেতরে আমার কি ছুঁচ বিঁধেচে, সে আর কেউ না জানে ত, তুই জানিস্‌ ছোট বৌ, আজ তাঁর ক্ষিদের সময় আমাকে ঐ এনে দিতে হয়—তাও বুঝি আর জোটে না"—আর সে সহ্য করিতে পারিল না, ছোট জার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার পর, সহোদরার মত এই দুই রমণী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিল, বহুক্ষণ ধরিয়া এই দুটি অভিন্ন নারীহৃদয় নিঃশব্দ অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তার পর বিরাজ মাথা তুলিয়া বলিল, না তোকে লুকাব না, কেননা, আমার দুঃখ বুঝ্‌তে তুই ছাড়া আর কেউ নেই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমি স'রে না গেলে ওঁর কষ্ট যাবে না। কিন্তু, থেকে ত ও মুখ না দেখে একটা দিনও কাটাতে পার্‌ব না। আমি যা'ব, বল্‌ আমি গেলে ওঁকে দেখ্‌বি? ছোট বৌ চোখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাবে?" বিরাজের শুষ্ক ওষ্ঠাধরে কঠিন শীতল হাসির রেখা পড়িল, বোধ করি একবার সে দ্বিধাও করিল, তারপরে বলিল, "কি করে জান্‌ব বোন্‌ কোথায় যেতে হয়, শুনি ওর চেয়ে পাপ নাকি আর নেই, তা সে যাই হোক এ জ্বালা এড়াব ত!" এবার মোহিনী বুঝিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, "ছি ছি, ও-কথা মুখেও এননা দিদি! আত্ম-হত্যার কথা যে বলে তার পাপ, যে কাণে শোনে তার পাপ, ছি ছি, কি হ'য়ে গেলে তুমি!"

বিরাজ হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, "তা' জানিনে। শুধু জানি, ওঁকে আর খেতে দিতে পার্‌ছিনে। আজ আমাকে ছুঁয়ে কথা দে তুই, যেমন করে পারিস দুই ভায়ে মিল করে দিবি।" "কথা দিলুম" বলিয়া মোহিনী সহসা বসিয়া পড়িয়া বিরাজের পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তবে, আমাকেও আজ একটা ভিক্ষে দেবে বল?" বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি?' "তবে, এক মিনিট সবুর কর, আমি আস্‌ছি" বলিয়া সে পা জড়াইতেই বিরাজ আঁচল ধরিয়া ফেলিয়া বলিল "না যাস্‌ নে। আমি একটি তিল পর্য্যন্ত কারু কাছে নেব না।" "কেন, নেবে না?" বিরাজ প্রবলবেগে মাথা

নাড়িয়া বলিল "না, সে কোন মতেই হবে না, আর আমি কারও কিছু নিতে পার্‌ব না।"

ছোটবৌ ক্ষণেকের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে বড় জার আকস্মিক উত্তেজনা লক্ষ্য করিল, তারপর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল,"তবে শোন দিদি! কেন জানিনে,আগে তুমি আমাকে ভালবাস্‌তে না, ভাল ক'রে কথা কইতে না, সে জন্য কত যে লুকিয়ে ব'সে কেঁদেচি, কত দেব-দেবীকে ডেকেছি, তার সংখ্যাই নাই, আজ তাঁরাও মুখ তুলে চেয়েছেন, তুমিও ছোট বোন ব'লে ডেকেচ। এখন একবার ভেবে দেখ, আমাকে দে'খে কিছু না কর্‌তে পেলে তুমি কি রকম ক'রে বেড়াতে?" বিরাজ জবাব দিতে পারিল না—মুখ নীচু করিয়া রহিল। ছোটবৌ উঠিয়া গিয়া অনতিকাল পরে একটা বড় ধামায় সর্ব্ব প্রকার আহার্য্য পূর্ণ করিয়া আনিয়া নামাইয়া রাখিল। বিরাজ স্থির হইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু, সে যখন কাছে আসিয়া তাহার আঁচলের একটা খুঁট তুলিয়া লইয়া একখানা মোহর বাঁধিতে লাগিল, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া সজোরে ঠেলিয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—"না, ও কিছুতেই হবে না—ম'রে গেলেও না।" মোহিনী ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "হবে না কেন, নিশ্চয় হবে। এ আমার বট্‌ঠাকুর আমাকে বিয়ের সময় দিয়েছিলেন।" বলিয়া আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া আর একবার হেঁট হইয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

(১১)

মগ্‌রার এত দিনের পিতলের কন্সার কারখানা যে দিন সহসা বন্ধ হইয়া গেল, এবং এই খবরটা চাঁড়ালদের সেই মেয়েটি বিরাজকে দিতে আসিয়া ছাঁচ বিক্রীর অভাবে নিজের নানাবিধ ক্ষতি ও অসুবিধার বিবরণ অনর্গল বকিতে লাগিল, বিরাজ তখন চুপ করিয়া শুনিল। তারপর একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র। মেয়েটি মনে করিল তাহার দুঃখের অংশী মিলিল না, তাই ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গেল। হায়রে অবোধ দুঃখীর মেয়ে; তুই কি করিয়া বুঝিবি সেটুকু নিঃশ্বাসে কি ছিল, সে নীরবতার আড়ালে কি ঝড় বহিতে লাগিল! শান্ত নির্ব্বাক্ ধরিত্রীর অন্তঃস্তলে কি আগুন জ্বলে, সে বুঝিবার ক্ষমতা তুই কোথায় পাইবি!

নীলাম্বর আসিয়া বলিল, "সে কাজ পাইয়াছে। আগামী পূজার সময় হইতে কলিকাতার এক নামজাদা কীর্ত্তনীর দলে সে খোল বাজাইবে।" খবর শুনিয়া বিরাজের মুখ মৃতের মত পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাহার স্বামী গণিকার অধীনে, গণিকার সংস্রবে সমস্ত ভদ্র-সমাজের সম্মুখে গাহিয়া বাজাইয়া ফিরিবে! তবে, আহার জুটিবে! লজ্জায় ধিক্কারে সে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া নিষেধ করিতেও পারিল না—আর যে কোন উপায় নাই! সন্ধ্যার অন্ধকারে নীলাম্বর সে মুখের ছবি দেখিতে পাইল না—ভালই হইল।

ভাঁটার টানে জল যেমন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষয়-চিহ্ন তটপ্রান্তে আঁকিতে আঁকিতে দূর হইতে সুদূরে সরিয়া যায়, ঠিক তেমনই করিয়া বিরাজ শুকাইতে লাগিল;—অতি দ্রুত, অতি সুস্পষ্টভাবে ঠিক তেমনই করিয়া তাহার দেহ-তটের সমস্ত মলিনতা নিরন্তর অনাবৃত করিয়া দিয়া তাহার দেব-বাঞ্ছিত অতুল্য যৌবনশ্রী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতে লাগিল। দেহ শুষ্ক, মুখ ম্লান, দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল,—যেন, কি একটা ভয়ের বস্তু সে অহরহ দেখিতেছে। অথচ, তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। ছিল শুধু ছোটবৌ; সে ত মাসাধিক কাল ভায়ের অসুখে বাপের বাড়ী গিয়াছে। নীলাম্বর দিনের বেলা প্রায়ই ঘরে থাকে না। যখন আসে তখন রাত্রির আঁধার। তাহার দুই চোক প্রায়ই রাঙা, নিঃশ্বাস উষ্ণ বহে। বিরাজ সবই দেখিতে পায়, সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু কোন কথাই বলে না—বলিতে ইচ্ছাও করে না। তাহার সামান্য কথাবার্ত্তা কহিতেও এখন ক্লান্তি বোধ হয়।

কএকদিন হইতে বিকাল হইতেই তাহার শীত করিয়া মাথা ধরিয়া উঠিতেছিল, এই লইয়াই তাহাকে স্তিমিত সন্ধ্যা দীপটি হাতে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইত। স্বামী বাড়ী থাকেন না বলিয়া, দিনের বেলা আর সে প্রায়ই রাঁধিত না, রাত্রে রাঁধিত, কিন্তু তখন তাহার জ্বর। স্বামীর খাওয়া হইয়া গেলে হাত পা ধুইয়া শুইয়া পড়িত। এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল। ঠাকুর দেবতাকে বিরাজ

আর মুখ তুলিয়া চাহিতেও বলে না, পূর্ব্বের মত প্রার্থনাও জানায় না। আহ্নিক শেষ করিয়া গলায় আঁচল দিয়া যখন প্রণাম করে, তখন শুধু মনে মনে বলে—ঠাকুর যে পথে যাচ্চি, সেই পথে যেন একটু শীগ্‌গীর করে যেতে পাই।

সে দিন শ্রাবণের সংক্রান্তি। সকাল হইতে ঘনবৃষ্টি-পাতের আর বিরাম ছিল না। তিন দিন জ্বর-ভোগের পর বিরাজ ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সন্ধ্যার পর বিছানায় উঠিয়া বসিল। নীলাম্বর বাড়ী ছিল না। পরশু, স্ত্রীর এত জ্বর দেখিয়াও তাহাকে শ্রীরামপুরে এক ধনাঢ্য শিষ্যের বাটীতে কিছু প্রাপ্তির আশায় যাইতে হইয়াছে, কিন্তু কথা ছিল কোন মতেই রাত্রিবাস করিবে না, যেমন করিয়া হউক সেই দিনই সন্ধ্যা নাগাদ ফিরিয়া আসিবে। পরশু গিয়াছে, কাল গিয়াছে, আজও যাইতে বসিয়াছে তাঁহার দেখা নাই। অনেক দিনের পর আজ সমস্ত দিন ধরিয়া বিরাজ যখন-তখন কাঁদিয়াছে, অনেক দিনের পর আজ সে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পায় মানত করিতে করিতে তাহার সমস্তই নিঃশেষ করিয়াছে। আর কিছুতেই শুইয়া থাকিতে না পারিয়া, সন্ধ্যা জ্বালিয়া দিয়া একটা গামছা মাথায় ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বর্ষার অন্ধকারের মধ্যে যতদূর পারিল চাহিয়া দেখিল, কিন্তু, কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে, ভিজা চুলে, চণ্ডীমণ্ডপের পৈঁঠায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ পরে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কি জানি তাঁর কি ঘটিল! একে দুঃখে কষ্টে অনাহারে দেহ তাঁহার দুর্ব্বল, তাহাতে পথশ্রম—কোথায় অসুখ হইয়া পড়িলেন, না গাড়ী ঘোড়া চাপা পড়িলেন, কি হইল, কি সর্ব্বনাশ ঘটিল,—ঘরে বসিয়া সে কি করিয়া বলিবে—কেমন করিয়া কি উপায় করিবে! আর একটা বিপদ্ বাড়ীতে পিতাম্বরও নাই, কাল বৈকালে সে ছোটবধূকে আনিতে গিয়াছে, সমস্ত বাড়ীর মধ্যে বিরাজ একেবারে একা। আবার সে নিজেও পীড়িত। আজ দুপুর হইতে তাহার জ্বর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘরে এখন এতটুকু কিছু ছিল না যে সে খায়। দুদিন শুধু জল খাইয়া আছে। জলে ভিজিয়া তাহার শীত করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে কোন মতে হাতে পায় ভর দিয়া পৈঠা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে ঢুকিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

সদর দরজায় ঘা পড়িল। বিরাজ একবার কাণ পাতিয়া শুনিল, দ্বিতীয় করাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই 'যাই' বলিয়া চোখের পলকে ছুটিয়া আসিয়া কপাট খুলিয়া ফেলিল। অথচ, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে উঠিয়া বসিতে পারিতেছিল না।

যে করাঘাত করিতেছিল, সে ওপাড়ার চাষাদের ছেলে। বলিল, "মা ঠাক্‌রুণ, দা' ঠাকুর একটা শুক্‌না কাপড় চাইলে—দাও।" বিরাজ ভাল বুঝিতে পারিল না, চৌকাটে ভর দিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কাপড় চাইলেন—কোথায় তিনি? ছেলেটি জবাব দিল,—"গোপাল ঠাকুরের বাপের গতি করে এই সবাই ফিরে এলেন যে।"

"গতি করে?" বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। গোপাল চক্রবর্ত্তী তাহাদের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। তাহার বৃদ্ধ পিতা বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন, দিন দুই পূর্ব্বে তাঁহাকে ত্রিবেণীতে গঙ্গাযাত্রা করান হইয়াছিল, আজ দ্বিপ্রহরে তিনি মরিয়াছেন, দাহ করিয়া এইমাত্র সকলে ফিরিয়া আসিয়াছে। ছেলেটি সব সংবাদ দিয়া শেষকালে জানাইল, দাঠাকুরের মত এ অঞ্চলে কেহ নাড়ী ধর্‌তে পারে না, তাই তিনিও সেইদিন হইতে সঙ্গে ছিলেন। বিরাজ টলিতে টলিতে ভিতরে আসিয়া তাহার হাতে একখানা কাপড় দিয়া, শয্যা আশ্রয় করিল।

জনপ্রাণিশূন্য অন্ধকার ঘরের মধ্যে যাহার স্ত্রী একা, জ্বরে, দুশ্চিন্তায়, অনাহারে মৃতকল্প, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যাহার স্বামী বাহিরে পরোপকার করিতে নিযুক্ত, সেই হত-ভাগিনীর বলিবার, কি করিবার আর কি বাকী থাকে? আজ তাহার অবসন্ন বিকৃত মস্তিষ্ক তাহাকে বারংবার দৃঢ়-স্বরে বলিয়া দিতে লাগিল,—"বিরাজ, সংসারে তোর কেউ নেই। তোর মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই—স্বামীও নেই। আছে শুধু যম। তাঁর কাছে ভিন্ন তোর জুড়াবার আর দ্বিতীয় স্থান নেই। বাহিরে বৃষ্টির শব্দে, ঝিল্লীর ডাকে, বাতাসের স্বননে কেবল 'নাই' 'নাই' শব্দই তাহার দুই কাণের মধ্যে নিরন্তর প্রবেশ করিতে লাগিল। ভাঁড়ারে চাল নাই, গোলায় ধান নাই, বাগানে ফল নাই, পুকুরে মাছ নাই,—সুখ নাই, শান্তি নাই, স্বাস্থ্য নাই—ও

বাড়ীতে ছোট বৌ নাই—সকলের সঙ্গে আজ তাহার স্বামীও নাই। অথচ, আশ্চর্য্য এই, কাহারও বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ক্ষোভের ভাবও তাহার মনে উঠিল না। এক বৎসর পূর্ব্বে স্বামীর এই হৃদয়হীনতার শতাংশের একাংশও বোধ করি তাহাকে ক্রোধে পাগল করিয়া তুলিত; কিন্তু, আজ কি এক রকমের স্তব্ধ অবসাদ তাহাকে অসাড় করিয়া আনিতে লাগিল।

এমনই নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকিয়া সে কত কি ভাবিয়া দেখিতে চাহিল, ভাবিতেও লাগিল, কিন্তু, সমস্ত ভাবনাই এল'মেল'। অথচ, ইহারই মধ্যে অভ্যাসবশে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল,—"কিন্তু সমস্ত দিন তাঁর খাওয়া হয়নি যে!" আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, ত্বরিত-পদে বিছানা ছাড়িয়া প্রদীপ হাতে করিয়া ভাঁড়ারে ঢুকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল রাঁধিবার মত যদি কোথাও কিছু থাকে! কিন্তু কিছু নাই,—একটা কণাও তাহার চোখে পড়িল না। বাহিরে আসিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপর হাতের প্রদীপ ফুঁ দিয়া নিবাইয়া রাখিয়া খিড়কির কবাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। কি নিবিড় অন্ধকার! ভীষণ স্তব্ধতা, ঘনগুল্মকণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল পথ, কিছুই তাহার গতিরোধ করিল না। বাগানের অপর প্রান্তে বনের মধ্যে চাঁড়ালদের ক্ষুদ্র কুটীর, সে সেইদিকে চলিল। বাহিরে প্রাচীর ছিল না, বিরাজ একেবারে প্রাঙ্গণের উপরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, 'তুলসী!' ডাক শুনিয়া তুলসী আলো হাতে বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল—"এই আঁধারে তুমি কেন মা?" বিরাজ কহিল, "চাট্টি চাল দে।"

"চাল দেব?" বলিয়া তুলসী হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। এই অদ্ভুত প্রার্থনার সে কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইল না। বিরাজ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নে, তুলসী, একটু শীগ্‌গীর ক'রে দে।" তুলসী আরও দু' একটা প্রশ্নের পর চাল আনিয়া বিরাজের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "কিন্তু, এ মোটা চালে কি কাজ হবে মা?" এ ত তোমরা খেতে পার্‌বে না।" বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"পার্‌ব।' তারপর তুলসী আলো লইয়া পথ দেখাইতে চাহিলে বিরাজ নিষেধ করিয়া বলিল, "কাজ নেই, তুই একা ফিরে আস্‌তে পার্‌বিনে" বলিয়া নিমিষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। আজ চাঁড়ালের ঘরে সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, ভিক্ষা করিয়া লইয়া গেল, অথচ এত বড় অপমান তাহাকে তেমন করিয়া বিঁধিল না—শোক, দুঃখ, অপমান, অভিমান কোন বস্তুরই তীব্রতা অনুভব করিবার শক্তি তাহার দেহে ছিল না।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল নীলাম্বর আসিয়াছে। স্বামীকে সে তিন দিন দেখে নাই, চোখ পড়িবামাত্রই দেহের প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত উদ্দাম হইয়া উঠিয়া একটা দুর্নিবার আকর্ষণ প্রচণ্ড গতিতে ক্রমাগত ঐ দিকে টানিতে লাগিল, কিন্তু, এখন আর তাহাকে এক পা টলাইতে পারিল না।

তীব্র তড়িৎ-সংস্পর্শে ধাতু যেমন শক্তিময় হইয়া উঠে, স্বামীকে কাছে পাইয়া চক্ষের নিমিষে সে তেমনই শক্তিময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত আকর্ষণের বিরুদ্ধে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

নীলাম্বর একটিবারমাত্র মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিয়াছিল, সেই দৃষ্টিতেই বিরাজ দেখিয়াছিল তাঁহার দুই চোখ জবার মত ঘোর রক্তবর্ণ—মড়া পোড়াইতে গিয়া তাহারা যে এই তিনদিন অবিশ্রাম গাঁজা খাইয়াছে, সে কথা তাহার অগোচর রহিল না। মিনিট পাঁচ ছয় এই ভাবে থাকিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়া হয়নি?"

নীলাম্বর বলিল,—"না।" বিরাজ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল, নীলাম্বর সহসা ডাকিয়া বলিল, "শোন', এত রাত্তিরে একা কোথায় গিয়েছিলে? বিরাজ দাঁড়াইয়া পড়িয়া এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—'ঘাটে।' নীলাম্বর অবিশ্বাসের স্বরে বলিল, "না, ঘাটে তুমি যাও নি।" "তবে যমের বাড়ী গিয়েছিলুম" বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে ভাত বাড়িয়া যখন সে ডাকিতে আসিল, নীলাম্বর তখন চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছিল। অত্যধিক গাঁজার মহিমায় তাহার মাথা তখন উত্তপ্ত এবং বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া পূর্ব্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি স্বরূপে কহিল, "কোথা গিয়েছিলে?" বিরাজ নিজের উদ্যত জিহ্বাকে সজোরে দংশন করিয়া নিবৃত্ত করিয়া শান্তভাবে বলিল, "আজ খেয়ে শোও,

সে কথা কাল শুন'।" নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আজই শুনব। কোথায় ছিলে বল ?" তাহার জিদের ভঙ্গি দেখিয়া এত দুঃখেও বিরাজ হাসিয়া বলিল,—"যদি, না বলি ?"

"বল্‌তেই হবে। বল।"

"আমি ত কিছুতেই বল্‌ব না। আগে খেয়ে শোও তখন শুন্‌তে পাবে। নীলাম্বর এ হাসিটুকু লক্ষ্য করিল না, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া মুখ তুলিল—সে চোখে আর আচ্ছন্ন ভাব নাই, হিংসা ও ঘৃণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, ভীষণ কণ্ঠে বলিল, "না, কিছুতেই না, কোন মতেই না। না শুনে তোমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত আমি খাব না।" বিরাজ চম্‌কাইয়া উঠিল, বুঝি কালসর্প দংশন করিলেও মানুষ এমন করিয়া চম্‌কায় না।

সে টলিতে টলিতে দ্বারের কাছে পিছাইয়া গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কি বল্‌লে ? আমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাবে না ?"

"না, কোন মতেই না।"

"কেন ?" নীলাম্বর চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "আবার জিজ্ঞেস কচ্চ, কেন ?" বিরাজ নিঃশব্দ স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে বলিল—"বুঝেচি। আর জিজ্ঞেস করব না। আমিও কোনমতে বল্‌ব না, কেননা, কাল যখন তোমার হুঁস হবে, তখন নিজেই বুঝ্‌বে—এখন তুমি তোমাতে নেই।"

নেশাখোর সব সহিতে পারে, পারে না শুধু তাহার বুদ্ধি ভ্রষ্টতার উল্লেখ সহিতে। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, "গাঁজা খেয়েচি, এই বল্‌চিস ত ? গাঁজা আজ আমি নূতন খাইনি যে, জ্ঞান হারিয়েছি। বরং জ্ঞান হারিয়েচিস তুই ! তুই আর তোতে নেই।" বিরাজ তেম্‌নই মুখের পানে চাহিয়া রহিল, নীলাম্বর বলিল,—"কার চোখে ধূলা দিতে চাস্‌ বিরাজ ? আমার ? আমি অতি মূর্খ তাই সেদিন পীতাম্বরের কোন কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু সে ছোট ভাই যথার্থ ভায়ের কাজই করেছিল। নহিলে, কেন তুই বল্‌তে পারিস্‌ নে কোথা ছিলি ? কেন মিছে কথা বল্‌লি, তুই ঘাটে ছিলি ?" বিরাজের দুই চোক এখন ঠিক পাগলের চক্ষুর মত ধক্‌ ধক্‌ করিতে লাগিল, তথাপি সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া জবাব দিল,—"মিছে কথা বল্‌ছিলুম এ কথা শুনলে তুমি লজ্জা পাবে, দুঃখ পাবে—হয়ত তোমার খাওয়া হবে না, তাই,—কিন্তু, সে ভয় মিছে—তোমার লজ্জা সরমও নেই, তুমি আর মানুষও নেই। কিন্তু, তুমি মিছে কথা বলনি ? একটা পশুরও এত বড় ছল কর্‌তে লজ্জা হ'ত, কিন্তু, তোমার হ'ল না। সাধু পুরুষ রোগা স্ত্রীকে ঘরে একা ফেলে রেখে কোন্‌ শিষ্যের বাড়ীতে তিন দিন ধ'রে গাঁজার ওপর গাঁজা খাচ্ছিলে, ব'ল ?" নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না। 'বল্‌চি', বলিয়া হাতের কাছের শূন্য পানের ডিবাটা বিরাজের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। বদ্ধ ডিবা তাহার কপালে লাগিয়া ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া খুলিয়া নীচে পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের কোণ বহিয়া, ঠোঁটের প্রান্ত বহিয়া রক্তে মুখ ভাসিয়া উঠিল। বিরাজ বাঁ হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"আমাকে মার্‌লে ?" নীলাম্বরের ঠোঁট মুখ কাঁপিতে লাগিল, বলিল—"না, মারিনি। কিন্তু দূর হ' সুমুখ থেকে—ও মুখ আর দেখাস্‌ নে—অলক্ষী, দূর হয়ে যা !"

বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বলিল, "যাচ্চি।" এক পা গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিন্তু সহ্য হবে ত ? কাল যখন মনে পড়্‌বে জ্বরের ওপর আমাকে মেরেচ—তাড়িয়ে দিয়েচ, আমি তিন দিন খাইনি, তবু এই অন্ধকারে তোমার জন্যে ভিক্ষা ক'রে এনেচি—সইতে পার্‌বে ত ? এই অলক্ষ্মীকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে ত ?" রক্ত দেখিয়া নীলাম্বরের নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল—সে মূঢ়ের মত চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, বিরাজ আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিল,—"এই এক বছর যাই যাই ক'র্‌চি কিন্তু, তোমাকে ছেড়ে যেতে পারে নি। চেয়ে দেখ দেহে আমার কিছু নেই, চোখে ভাল দেখ্‌তে পাইনে, এক পা চল্‌তে পারিনে—আমি যেতুম না ; কিন্তু স্বামী হয়ে যে অপবাদ আমাকে দিলে, আর আমি তোমার মুখ দেখ্‌ব না। তোমার পায়ের নীচে মর্‌বার লোভ আমার সব চেয়ে বড় লোভ,—সেই লোভটাই আমি কোন মতে ছাড়্‌তে পারছিলুম না—আজ ছাড়লুম" বলিয়া কপাল মুছিতে মুছিতে খিড়কির খোলা দোর দিয়া আর একবার অন্ধকার বাগানের মধ্যে মিলাইয়া গেল। নীলাম্বর কথা কহিতে চাহিল, কিন্তু জিভ

নাড়িতে পারিল না। ছুটিয়া পিছনে যাইতে চাহিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না; কোন্ মায়ামন্ত্রে তাহাকে অচল পাথরে রূপান্তরিত করিয়া দিয়া বিরাজ অদৃশ্য হইয়া গেল। আজ একবার ওই সরস্বতীর দিকে চাহিয়া দেখ ভয় করিবে। বৈশাখের সেই শীর্ণকায়া মৃদুপ্রবাহিনী শ্রাবণের শেষ দিনে কি খরবেগে দুই কূল ভাসাইয়া চলিয়াছে! যে কাল পাথর-খণ্ডটার উপর এক দিন বসন্ত-প্রভাতে দুইটি ভাই বোন্‌কে অসীম স্নেহসুখে এক হইয়া বসিতে থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সেই কাল' পাথরটার উপর বিরাজ আজিকার আঁধার রাত্রে কি হৃদয় লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে গভীর জলরাশি সুদৃঢ় প্রাচীরভিত্তিতে ধাক্কা খাইয়া আবর্ত্ত রচিয়া চলিয়াছে, সেই দিকে একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পায়ের নীচে কাল পাথর, মাথার উপর মেঘাচ্ছন্ন কাল আকাশ, সুমুখে কাল জল, চারিদিকে গভীর কৃষ্ণ, স্তব্ধ বনানী,—আর বুকের ভিতর জাগিতেছে তাদের চেয়ে কাল আত্ম-হত্যা-প্রবৃত্তি। সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া নিজের আঁচল দিয়া দৃঢ় করিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া নিজের হাত পা বাঁধিতে লাগিল।

(১২)

প্রত্যুষে আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, টিপি টিপি জল পড়িতেছিল। নীলাম্বর খোলা দরজার চৌকাটে মাথা রাখিয়া কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা তাহার সুপ্ত-কর্ণে শব্দ আসিল, "হাঁ গা, বিরাজবৌমা!"

নীলাম্বর ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। হয়ত, শ্যাম নাম শুনিয়া এমনই কোন এক বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে শ্রীরাধা এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া বসিতেন। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, উঠানে দাঁড়াইয়া তুলসী ডাকিতেছে। কাল সমস্ত রাত্রি বনে বনে প্রতি বৃক্ষতলে খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে শ্রান্ত ও ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দোর গোড়ায় বসিয়াছিল, তার পর কখন ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায় বাবু?" নীলাম্বর হতবুদ্ধির মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তুই তবে কাকে ডাক্‌ছিলি?" তুলসী বলিল, "বৌ মাকেই ত ডাক্‌ছি বাবু। কাল এক পহর রেতে কোথাও কিছু নেই এই আঁধারে মা গিয়ে আমাদের বাড়ী মোটা চাল চেয়ে আন্‌লেন, তাই সকালে দোর খোলা পেয়ে জান্‌তে এলুম সে চেলে কি কাজ হ'ল?" নীলাম্বর মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু কথা কহিল না। তুলসী বলিল, "এত ভোরে তবে খিড়কি খুললে কে? তবে বুঝি বৌমা ঘাটে গেছেন" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

নদীর ধারে ধারে প্রতি গর্ত্ত, প্রতি বাঁক, প্রতি ঝোপ ঝাড় অনুসন্ধান করিতে করিতে সমস্তদিন অভুক্ত, অস্নাত নীলাম্বর সহসা একস্থানে থামিয়া পড়িয়া বলিল, "এ কি পাগ্‌লামি আমার মাথায় চাপিয়াছে! আমি যে সারাদিন খাই নাই, এখনও কি একথা তাহার মনে পড়িতে বাকী আছে? এর পরেও সেকি কোথাও কোন কারণে এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে? তবে, এ কি অদ্ভুত কাণ্ড সকাল হইতে করিয়া ফিরিতেছি!" এ সব চোখের সাম্‌নে এম্‌নই সুস্পষ্ট হইয়া দেখাদিল যে, তাহার সমস্ত দুশ্চিন্তা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল, সে কাদা ঠেলিয়া, মাঠ ভাঙিয়া, নালা ডিঙাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ঘরের দিকে ছুটিল। বেলা যখন যায় যায়, পশ্চিমাকাশে সূর্য্যদেব ক্ষণকালের জন্য মেঘের ফাঁকে রক্তমুখ বাহির করিয়াছেন, সে তখন বাড়ী ঢুকিয়া সোজা রান্নাঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। মেঝে তখনও আসন পাতা, তখনও গতরাত্রির বাড়াভাত শুকাইয়া পড়িয়া আছে—আরশলা ইঁদুরে ছিটাছিটি করিতেছে—কেহ মুক্ত করে নাই। সে ভোরের আঁধারে ঠাহর করে নাই, এখন ভাতের চেহারা দেখিয়াই বুঝিল ইহাই তুলসীর মোটা চাল, ইহাই অভুক্ত স্বামীর জন্য বিরাজ জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে অন্ধকারে লুকাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল, ইহারই জন্য সে মার খাইয়াছে, অশ্রাব্য কটুকথা শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারে বর্ষার দুরন্ত রাতে গৃহত্যাগ করিয়াছে। নীলাম্বর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেয়ে মানুষের মত গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে যখন, এখনও ফিরিয়া আসে নাই, তখন আর আসিবার কথাও ভাবিতে পারিল না। সে স্ত্রীকে চিনিত। সে যে কত অভিমানী, প্রাণ গেলেও সে যে পরের ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া এই কলঙ্ক প্রকাশ করিতে চাহিবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে-ছিল বলিয়াই তাহার বুকের ভিতরে এত সত্বর এমন হাহা-

কার উঠিল। তারপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই বাহু সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া অবিশ্রাম আবৃত্তি করিতে লাগিল—"এ আমি সইতে পারব'না বিরাজ, তুই আয়।"

সন্ধ্যা হইল, এ বাড়ীতে কেহ দীপ জ্বালিল না, রাত্রি হইল, রান্নাঘরে কেহ রাঁধিতে প্রবেশ করিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখমুখ ফুলিয়া গেল, কেহ মুছাইয়া দিল না, দু'দিনের উপবাসীকে কেহ খাইতে ডাকিল না, বাহিরে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল, ঘনান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুতের শিখা তাহার মুদিত চক্ষুর ভিতর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দুর্য্যোগের বার্ত্তা জানাইয়া যাইতে লাগিল, তথাপি সে উঠিয়া বসিল না, চোখ মেলিল না, একভাবে মুখগুঁজিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন সকাল। বাহিরের দিকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, দরজায় একটা গো-শকট দাঁড়াইয়া আছে, ব্যস্ত হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই ছোটবৌ ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া নামিয়া পড়িল। অগ্রজের প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ করিয়া পীতাম্বর ওধারে সরিয়া গেল। ছোটবৌ কাছে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই নীলাম্বর অস্ফুটস্বরে কি একটা আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতে গিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিস্মিত ছোট-বৌ হেঁট মাথা তুলিতে না তুলিতে সে দ্রুতপদে কোন্ দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ছোটবৌ জীবনে আজ প্রথম স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল। অশ্রু-ভারাক্রান্ত রক্তাভ চোখ দুটি তুলিয়া বলিল, "তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরি? দুঃখে কষ্টে দিদি আত্মঘাতী হ'লেন, তবুও আমরা পর হ'য়ে থাকব? তুমি থাক্‌তে পার থাকগে, আমি আজ থেকে ও বাড়ীর সব কাজ করব। পীতাম্বর চম্‌কাইয়া উঠিল,—"সে কি কথা?" মোহিনী তুলসীর কাছে যতটুকু শুনিয়াছিল এবং নিজে যাহা অনুমান করিয়াছিল কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কহিল। পীতাম্বর সহজে বিশ্বাস করিবার লোক নয়, বলিল, "তাঁর দেহ ভেসে উঠ্‌বে ত! ছোটবৌ চোখ মুছিয়া বলিল, "না উঠ্‌তেও পারে। স্রোতে ভেসে গেছেন, সতী-লক্ষ্মীর দেহ মা গঙ্গা হয়ত বুকে তুলে নিয়েচেন। তা ছাড়া, কেবা সন্ধান করেচে, কেবা খুঁজে বেড়িয়েচে বল?" পীতাম্বর প্রথমটা বিশ্বাস করিল না, শেষটা করিল, বলিল, 'আচ্ছা, আমি খোঁজ করাচ্চি।' একটু ভাবিয়া বলিল, 'বৌঠান মামার বাড়ী চ'লে যান্ নি ত?' মোহিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, ককখন' না। দিদি বড় অভিমানী, তিনি কোথাও যান নি, নদীতেই প্রাণ দিয়েচেন।" "আচ্ছা, তাও দেখ্‌চি" বলিয়া পীতাম্বর শুষ্কমুখে বাহিরে চলিয়া গেল। বৌঠানের জন্য আজ হঠাৎ তাহার প্রাণটা খারাপ হইয়া গেল। লোকজন নিযুক্ত করিয়া, একজন প্রজাকে বিরাজের মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া জীবনে আজ সে প্রথম পুণ্যের কাজ করিল। স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "যদুকে দিয়ে উঠানের বেড়াটা ভাঙিয়ে দাও, আর যা' পার কর। দাদার মুখের পানে চাইতে পারা যায় না," বলিয়া গুড় মুখে দিয়া একটু জল খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া কাজে চলিয়া গেল। চার পাচ দিন কামাই হওয়ায় তাহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

কাজ করিতে করিতে ছোটবৌ ক্রমাগত চোখ মুছিয়া ভাবিতেছিল, ইনি যে মুখের পানে চাহিতে পারেন নাই সে মুখ না জানি কি হইয়া গিয়াছে!

নীলাম্বর চণ্ডীমণ্ডপের মাঝখানে চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সুমুখের দেওয়ালে টাঙান' রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তির পট। এই পটখানি নাকি জাগ্রত। যখন রেল গাড়ী হয় নাই তখন তাহাদের পিতামহ পায়ে হাঁটিয়া এখানি বৃন্দাবন হইতে আনিয়াছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সহিত পটখানি মানুষের গলায় কথা কহিত, এ ইতিহাস নীলাম্বর তাহার জননীর কাছে বহুবার শুনিয়াছিল। ঠাকুর-দেবতা জিনিষটা তাহার কাছে ঝাপ্‌সা ব্যাপার ছিল না। তেমন করিয়া ডাকার মত ডাকিতে পারিলে এঁরা যে সুমুখে আসেন, কথা ক'ন, এ সমস্ত তাহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য ছিল। তাই, ইতঃপূর্ব্বে গোপনে গোপনে এই পটখানিকে কথা কহাইবার কত প্রয়াস সে যে করিয়াছে তাহার অবধি নাই, কিন্তু, সফল হয় নাই। অথচ, এই নিষ্ফলতার হেতু সে নিজের অক্ষমতার উপরেই দিয়া আসিয়াছে; এমন সংশয় কোন দিন মনে উঠে নাই পট সত্যই কথা কহে কি না! লেখাপড়া সে শিখে নাই। বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, তারপর, বিরাজের কাছে রামায়ণ.

নীরব ভাষা

"শুধু করে কর ধ'রে,
শুধু পরস্পরে হেরে।"—ঈশান।

The Emerald Ptg. Works, Calcutta

মহাভারত পড়িতে এবং এক আধটু চিঠি পত্র লিখিতে শিখিয়াছিল—শাস্ত্র বা ধর্ম্মগ্রন্থের কোন ধার ধারিত না, তাই ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা তাহার নিতান্তই মোটা ধরণের ছিল। অথচ এ সম্বন্ধে কোন যুক্তি তর্কও সহিতে পারিত না। ছেলেবেলায় এই সব লইয়া কখনও বা পীতাম্বরের সহিত, কখন বা বিরাজের সহিত মার পিট হইয়া যাইত।

বিরাজ তাহার অপেক্ষা মাত্র চার বছরের ছোট ছিল—তেমন মানিত না। একবার সে মার খাইয়া নীলাম্বরের পেট কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। শাশুড়ী উভয়কে ছাড়াইয়া দিয়া বিরাজকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "ছি, মা, গুরুজনকে অমন করে কামড়ে নিতে নেই।" বিরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল,—"ও আমাকে আগে মেরেছিল।" তিনি পুত্রকে ডাকিয়া শপথ দিয়াছিলেন, বিরাজের গায়ে কখন যেন সে হাত না তোলে। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর, আজ প্রায় ত্রিশ হইতে চলিয়াছে,—সেই অবধি মাতৃভক্ত নীলাম্বর সে দিন পর্য্যন্ত মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই।

আজ শুদ্ধ হইয়া বসিয়া পুরাতন দিনের এই সব বিস্মৃত কাহিনী স্মরণ করিয়া প্রথমে সে মায়ের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিয়া তাহার জাগ্রত ঠাকুরকে দুটা সোজা কথায় বিড়বিড় করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছিল—অন্তর্যামী ঠাকুর! তুমি ত সমস্তই দেখ্‌তে পেয়েচ। সে যখন এতটুকু অপরাধ করেনি, তখন সমস্ত পাপ আমার মাথায় দিয়ে তাকে স্বর্গে যেতে দাও। এখানে সে অনেক দুঃখ পেয়ে গেছে, আর তাকে দুঃখ দিওনা।" তাহার নিমীলিত চোখের কোণ বহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ তাহার ধ্যান ভাঙিয়া গেল। "বাবা!" নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন ছোট-বধূ অদূরে বসিয়া আছে। তাহার মুখে সামান্য একটু ঘোমটা, সে সহজকণ্ঠে বলিল,—"আমি আপনার মেয়ে, বাবা! ভেতরে আসুন স্নান ক'রে আজ আপনাকে দুটি খেতে হ'বে।" প্রথমে নীলাম্বর নির্ব্বাক্‌ হইয়া চাহিয়া রহিল—কত যুগ যেন গত হইয়াছে তাহাকে কেহ খাইতে ডাকে নাই, ছোট বউ পুনরায় বলিল,—"বাবা, রান্না হয়ে গেছে।" এইবার সে বুঝিল, একবার তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল, তারপর সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—রান্না হয়ে গেল মা!

গ্রামের সবাই শুনিল, সবাই বিশ্বাস করিল বিরাজবৌ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, বিশ্বাস করিল না শুধু ধূর্ত্ত পীতাম্বর। সে মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল, এই নদীতে এত বাঁক, এত ঝোপ ঝাড়, মৃত দেহ কোথাও না কোথাও আট্‌কাইবে। নদীতে নৌকা লইয়া, ধারে ধারে বেড়াইয়া, তট-ভূমের সমস্ত বন জঙ্গল লোক দিয়া তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও যখন শবের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না, তখন তাহার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হইল, বৌঠান আর যাই করুক নদীতে ডুবিয়া মরে নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে একটা সন্দেহ তাহার মনে উঠিয়াছিল, আবার সেই সন্দেহটাই মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল। অথচ কাহারও কাছে বলিবার যো নাই। একবার মোহিনীকে বলিতে গিয়াছিল, সে জিভ কাটিয়া কাণে আঙুল দিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হ'লে ঠাকুর দেবতাও মিছে, রাতও মিছে, দিনও মিছে" দেয়ালে টাঙান' অন্নপূর্ণার ছবির দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি ওঁর অংশ ছিলেন। এ কথা আর কেউ জানুক আর না জানুক আমি জানি" বলিয়া চলিয়া গেল। পীতাম্বর রাগ করিল না—হঠাৎ, সে যেন আলা'দা মানুষ হইয়া গিয়াছিল।

মোহিনী ভাসুরের সহিত কথা কহিতে সুরু করিয়াছে। ভাত বাড়িয়া দিয়া একটুখানি আড়ালে বসিয়া একটু একটু করিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া লইল। সমস্ত সংসারের মাঝে শুধু সেই জানিল কি ঘটিয়াছিল, শুধু সেই বুঝিল কি মর্ম্মান্তিক ব্যথা ওঁর বুকে বিঁধিয়া রহিল। নীলাম্বর বলিল, "মা, যত দোষই করে থাকি না কেন, জ্ঞানে ত করিনি, তবে কি ক'রে সে মায়া কাটিয়ে চ'লে গেল? আর সইতে পারছিল না, তাই কি গেল মা?"

মোহিনী অনেক কথা জানিত। একবার ইচ্ছা হইল বলে, দিদি যাবে বলিয়াই একদিন স্বামীর ভার তাহার উপরে দিয়াছিল; কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

পীতাম্বর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি দাদার সঙ্গে কথা কও?" মোহিনী জবাব দিল, "বাবা বলি, তাই কথা কই।" পীতাম্বর হাসিয়া কহিল, "কিন্তু লোকে শুন্‌লে

নিন্দে কর্‌বে যে!" মোহিনী রুষ্টভাবে বলিল,—"লোকে আর কি পারে যে কর্‌বে? তাদের কাজ তারা করুক, আমার কাজ আমি করি। এ যাত্রা ওঁকে যদি বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারি ত লোকের নিন্দে আমি মাথায় পেতে নেব," পরে কাজে চলিয়া গেল।

(১৩)

পনর মাস গত হইয়াছে। আগামী শারদীয়া পূজার আনন্দ-আভাস জলে স্থলে আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অপরাহ্ন বেলায় নীলাম্বর একখানা কম্বলের আসনের উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছে। দেহ অত্যন্ত কৃশ, মুখ ঈষৎ পাণ্ডুর, মাথায় ছোট ছোট জটা, চোখে বৈরাগ্য ও বিশ্বব্যাপী করুণা। মহাভারত খানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মা, পুঁটিদের বোধ করি আজ আর আসা হ'ল না।' শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা নিরাভরণা ছোটবৌ অনতিদূরে বসিয়া এতক্ষণ মহাভারত শুনিতেছিল, বেলার দিকে চাহিয়া বলিল, "না বাবা, এখনও সময় আছে—আস্‌তেও পারে।" দুর্দ্দান্ত শ্বশুরের মৃত্যুতে পুঁটি এখন স্বাধীন। সে স্বামী পুত্র দাস দাসী সঙ্গে করিয়া আজ বাপের বাড়ী আসিতেছে, এবং পূজার কয়দিন এখানেই থাকিবে বলিয়া খবর পাঠাইয়াছে। আজিও সে কোন সংবাদই জানে না। তাহার মাতৃসমা বৌদিদি নাই—ছয়মাস পূর্ব্বে সর্পাঘাতে ছোট দাদা মরিয়াছে, কোন কথাই সে জানে না।

নীলাম্বর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না এলেই বোধ করি ছিল ভাল, এক সঙ্গে এতগুলা সে কি সইতে পার্‌বে মা!" প্রিয়তমা ছোট ভগিনীকে স্মরণ করিয়া বহুদিন পরে আজ তাহার শুষ্ক চক্ষে জল দেখা দিল। যে রাত্রে পীতাম্বর সর্পদষ্ট হইয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, "আমার কোন ওষুধ পত্র চাই না দাদা, শুধু তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় মুখে দাও, এতে যদি না বাঁচি ত আর বাচ্‌তেও চাইনে", বলিয়া সর্ব্বপ্রকার ঝাড় ফুঁক সজোরে প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্রমাগত তাহার পায়ের নীচে মাথা ঘষিয়াছিল, এবং বিষের যাতনায় অব্যাহতি পাইবার আশায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পা ছাড়ে নাই, সেই দিন নীলাম্বর তাহার শেষ কান্না কাঁদিয়া চুপ করিয়াছিল, আজ আবার সেই চোখে জল আসিয়াছে। পতিব্রতা, সাধ্বী ছোটবধূ নিজের চোখের জল গোপনে মুছিয়া নীরব হইয়া রহিল।

নীলাম্বর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, সে জন্যেও তত দুঃখ করিনে মা; আমার পীতাম্বরের মত বিরাজকেও যদি ভগবান্ নিতেন ত আজ আমার সুখের দিন। সে ত হল না। পুঁটি এখন বড় হয়েচে, তার জ্ঞান বুদ্ধি হয়েচে, তার মায়ের মত বৌদি'র এ কলঙ্ক শুন্‌লে বল ত মা, তার বুকের ভেতরে কি কর্‌তে থাক্‌বে! আর ত সে মুখ তুলে চাইতে পারবে না।"

সুন্দরী আত্মগ্লানি আর সহ্য করিতে না পারিয়া মাস দুই পূর্ব্বে নীলাম্বরের কাছে কবুল করিয়া ফেলিয়াছিল সে রাত্রে বিরাজ মরে নাই, জমীদার রাজেন্দ্রের সহিত গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সে নীলাম্বরের মনঃকষ্টও আর দেখিতে পারিতেছিল না। মনে করিয়াছিল, এ কথায় সে ক্রোধের বশে হয়ত দুঃখ ভুলিতে পারিবে। ঘরে আসিয়া নীলাম্বর এ কথা বলিয়াছিল। সেই কথা মনে করিয়া ছোট বৌ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, ঠাকুরঝিকে জানিয়ে কাজ নেই।"

"কি ক'রে লুকাবে মা? যখন জিজ্ঞেস কর্‌বে বৌদি'র কি হয়েছিল, তখন কি জবাব দেবে?"

ছোট বৌ বলিল, "যে কথা সকলে জানে, দিদি নদীতে প্রাণ দিয়েচেন—তাই।"

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া কহিল, "তা' হয় না মা। শুনেচি, পাপ গোপন কর্‌লেই বাড়ে, আমরা তার আপনার লোক, আমরা তার পাপের ভরা আর বাড়িয়ে দেব না।" বলিয়া সে একটুখানি হাসিল। সে টুকু হাসিতে কত ব্যথা, কত ক্ষমা তাহা ছোটবৌ বুঝিল। খানিক পরে ছোট বৌ অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে, মৃদুস্বরে বলিল,—"এ সব কথা হয়ত সত্যি নয়, বাবা।"

"কোন্ সব কথা মা? তোমার দিদির কথা?"

ছোটবৌ নতমুখে মৌন হইয়া রহিল। নীলাম্বর বলিল, —"সত্যি বই কি মা—সব সত্যি। জানত, মা, রেগে গেলে সে পাগলীর জ্ঞান থাক্‌ত না। যখন এতটুকুটি ছিল, তখনও তাই, যখন বড় হ'ল, তখনও তাই। তাতে, যে

অত্যাচার, যে অপমান আমি করেছিলাম সে সহ্য করতে বোধ করি স্বয়ং নারায়ণও পারতেন না—সে ত মানুষ।” নীলাম্বর হাত দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, “মনে হ'লে বুক ফেটে যায় মা, হতভাগী তিনদিন খায় নি, জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে আমার জন্যে ছুটি চাল ভিক্ষে করতে গিয়েছিল, সেই অপরাধে আমি—”আর সে বলিতে পারিল না, কোঁচার খুঁট মুখে গুঁজিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন সবলে নিরোধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। ছোটবৌ নিজেও তেমনই করিয়া কাঁদিতেছিল, সেও কথা কহিল না। বহুক্ষণ কাটিল। বহুক্ষণে নীলাম্বর কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া চোখ মুখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, “অনেক কথাই তুমি জান, তবু শোন মা। কি ক'রে জানিনে, সেই রাতেই সে অজ্ঞান উন্মত্ত হয়ে সুন্দরীর বাড়ীতে গিয়ে ওঠে, তার পরে—উঃ—টাকার লোভে সুন্দরী, পাগলীকে আমার সেই রাতেই রাজেন বাবুর বজরায় তুলে দিয়ে আসে”—তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মোহিনী নিজেকে ভুলিয়া, লজ্জা সরম ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—“কক্ষণ সত্যি নয় বাবা, কক্ষণ সত্যি নয়। দিদির দেহে প্রাণ থাকতে এমন কাজ তাঁকে কেউ করাতে পারবে না। তিনি যে সুন্দরীর মুখ পর্য্যন্ত দেখতেন না।”

নীলাম্বর শান্তভাবে বলিল, “তাও শুনেচি। হয়ত, তোমার কথাই সত্যি মা, দেহে তার প্রাণ ছিল না! ভাল ক'রে জ্ঞান বুদ্ধি হ'বার পূর্ব্বেই সেটা সে আমাকে দিয়েছিল, সে ত নিয়ে যায় নি, আজও ত আমার কাছে আছে,” বলিয়া সে চোখ বুজিয়া তাহার হৃদয়ের অন্ত-স্তম স্থান পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিতে লাগিল। ছোটবৌ মুগ্ধ হইয়া সেই শান্ত, পাণ্ডুর নিমীলিত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে মুখে ক্রোধ বা হিংসা-দ্বেষের এতটুকু ছায়া নাই,—আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা ও অনন্ত ক্ষমার অনির্ব্বচনীয় মহিমা। সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে মনে মনে বলিল, “দিদি চিনেছিল, তাহাতেই একটি দিনও ছেড়ে থাকতে চাইত না।”

দীর্ঘ চার বৎসর পরে পুঁটি বাপের বাড়ী আসিয়াছে, এবং বড়-মানুষের মতই আসিয়াছে। তাহার স্বামী, ছয় মাসের শিশু পুত্র, পাঁচ ছয় জন দাস দাসী, এবং অগণিত জিনিস পত্রে সমস্ত বাটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ষ্টেসনে নামিয়াই যদু চাকরের কাছে খবর শুনিয়া সে সেইখান হইতে কাঁদিতে সুরু করিয়াছিল, উচ্চ রোলে কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া রাত্রি এক প্রহরের পর বাড়ী ঢুকিয়া দাদার ক্রোড়ে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। সে রাত্রে নিজে জলস্পর্শ করিল না, দাদাকেও ছাড়িল না; এবং মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই সে একটু একটু করিয়া সমস্ত কথা শুনিল। আগে বৌদি'কে বরঞ্চ সে ভয় করিত, সঙ্কোচ করিত, কিন্তু দাদাকে ঠিক পুরুষ মানুষও মনে করিত না, সঙ্কোচও করিত না। সমস্ত আব-দার উপদ্রব তাহার দাদার উপরেই ছিল। শ্বশুর বাড়ী যাইবার পূর্ব্বের দিনও সে বৌদি'র কাছে তাড়া খাইয়া আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়া-ছিল। তাহার সেই দাদাকে যাহারা এতদিন ধরিয়া এত দুঃখ দিয়াছে, এমন জীর্ণ শীর্ণ এমন পাগলের মত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতি তাহার ক্রোধ ও দ্বেষের পরিসীমা রহিল না। তাহার দাদার এত বড় দুঃখের কাছে পুঁটি আপনার সমস্ত দুঃখকেই একেবারে তুচ্ছ করিয়া দিল। তাহার শ্বশুরকুলের উপর ঘৃণা জন্মিল, ছোটদা'র সর্পাঘাত তাহাকে বিঁধিল না, এবং তাহার দুঃখিনী বিধবার দিক্ হইতে সে একেবারে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

দু'দিন পরে সে তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, “আমি দাদাকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যা'ব, তুমি এই সব লট বহর নিয়ে বাড়ী ফিরে যাও। আর যদি ইচ্ছে হয়, না হয়, তুমিও সঙ্গে চল।” যতীন অনেক যুক্তি তর্কের পর শেষ কাজটাই সহজসাধ্য বিবেচনা করিয়া আর একবার জিনিষ পত্র বাঁধা বাঁধির উদ্যোগে প্রস্থান করিল। যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। পুঁটি, সুন্দরীকে এক-বার গোপনে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল কিন্তু, সে আসিল না। যে ডাকিতে গিয়াছিল তাহাকে বলিয়া দিল, এ মুখ দেখা-ইতে পারিব না এবং যাহা বলিবার ছিল বলিয়াছি, আর কিছু বলিবার নাই। পুঁটি ক্রোধে অধর দংশন করিয়া মৌন হইয়া রহিল। পুঁটির নিদারুণ উপেক্ষা ও

ততোধিক নিষ্ঠুর ব্যবহার ছোটবৌকে যে কিরূপ বিঁধিল, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ জানিল না। সে হাত জোড় করিয়া মনে মনে বড়জা'কে স্মরণ করিয়া বলিল, "দিদি, তুমি ছাড়া আমাকে আর কে বুঝ্‌বে! যেথানেই থাক, তুমি যদি আমাকে ক্ষমা ক'রে থাক সেই আমার সর্ব্বস্ব। চিরদিনই সে নিস্তব্ধপ্রকৃতির; আজিও নীরবে সকলের সেবা করিতে লাগিল, কাহাকেও কোন কথাটি বলিল না। ভাসুরকে খাওয়াইবার ভার পুঁটি লইয়াছিল, এ কয়দিন সেখানেও বসিবার তাহার আবশ্যক হইল না।

যাইবার দিন নীলাম্বর অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তুমি যাবে না মা?" ছোটবৌ নীরবে ঘাড় নাড়িল। পুঁটি ছেলে কোলে করিয়া দাদার পাশে আসিয়া শুনিতে লাগিল। নীলাম্বর বলিল, "সে হয় না মা। তুমি একলাটি কেমন ক'রেই বা থাক্‌বে, আর থেকেই বা কি হ'বে মা? চল।" ছোটবৌ তেমনই হেঁট মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না বাবা, আমি কোথাও যেতে পার্‌ব না।" ছোটবৌ'র বাপের বাড়ীর অবস্থা খুব ভাল। বিধবা মেয়েকে তাঁরা অনেকবার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে কিছুতেই যায় নাই। নীলাম্বর তখন মনে করিত, সে শুধু তাহারই জন্য যাইতে পারে না, কিন্তু, এখন শূন্য বাটীতে কি হেতু একা পড়িয়া থাকিতে চাহে, কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কোথাও যেতে পার্‌বে না মা?" ছোট বৌ চুপ করিয়া রহিল।

"না বল্‌লে ত আমারও যাওয়া হ'বে না মা!" ছোটবৌ মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আপনি যান আমি থাকি।" "কেন?" ছোটবৌ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া মনে মনে একটা সঙ্কোচের জড়তা যেন প্রাণপণে কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তারপর ঢোক গিলিয়া অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল, কখনও দিদি যদি আসেন—তাই আমি কোথাও যেতে পার্‌ব না বাবা।" নীলাম্বর চমকিয়া উঠিল। খর বিদ্যুৎ চোখ মুখ ধাঁধিয়া দিলে যেমন হয়, তেমনই চারিদিকে সে অন্ধকার দেখিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। মুহূর্ত্তেই নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া অতি ক্ষীণ একটুখানি হাসিয়া কহিল, "ছি, মা, তুমিও যদি এমন ক্ষ্যাপার মত কথা বল, এমন অবুঝ হ'য়ে যাও, তাহ'লে আমার উপায় কি হ'বে?" ছোটবৌ চোখের পলকে চোখ বুজিয়া নিজের বুকের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, পরক্ষণে সংশয়লেশহীন, স্থির মৃদুস্বরে বলিল, "অবুঝ হইনি বাবা। আপনাদের যা' ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু যতদিন চন্দ্রসূর্য্য উঠ্‌তে দেখ্‌ব, ততদিন কা'রও কোন কথা আমি বিশ্বাস কর্‌ব না।" ভাই বোন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, সে তেমনই সুদৃঢ় কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরণের বর দিদি আপনার কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন, সে বর কোন মতেই নিষ্ফল হ'তে পারে না। সতীলক্ষ্মী দিদি আমার নিশ্চয় ফিরে আস্‌বেন,—যতদিন বাঁচ্‌ব, এই আশায় পথ চেয়ে থাক্‌ব—আমাকে কোথাও যেতে বল্‌বেন না বাবা," বলিয়া এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা কহার জন্য মুখ হেঁট করিয়া হাঁপাইতে লাগিল। নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না, যে কান্না তাহার গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, কোথাও একটু আড়ালে গিয়া তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। পুঁটি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর কাছে আসিয়া তাহার ছেলেকে পায়ের নীচে বসাইয়া দিয়া আজ প্রথম সে এই বিধবা ভ্রাতৃজায়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"বৌদি', কখন তোমাকে চিন্‌তে পারিনি বৌদি'—আমাকে মাপ কর!" ছোটবৌ হেঁট হইয়া ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে মুখ দিয়া অশ্রু গোপন করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

(১৪)

বিরাজের মরাই উচিত ছিল, কিন্তু মরিল না। সেই রাত্রে, মরিবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাহার বহুদিন ব্যাপী দুঃখদৈন্য-পীড়িত দুর্ব্বল বিকৃত মস্তিষ্ক, অনাহার ও অপমানের অসহ্য আঘাতে মরণের পথ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে পা বাড়াইয়া দিল। মৃত্যু বুকে করিয়া যখন আঁচল দিয়া হাত পা বাঁধিতেছিল, তখন কোথায় বাজ পড়িল, সেই ভীষণ শব্দে চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া তাহারই তীব্র আলোকে, ওপারের সেই স্নানের ঘাট ও সেই মাছ ধরিবার কাঠের মাচা তাহার চোখে পড়িয়া গেল। এগুলা এতক্ষণ ঠিক যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া তাহারই দৃষ্টি অপেক্ষা করিয়াছিল, চোখোচোখি হইবামাত্রই ইসারা করিয়া ডাক

দিল, বিরাজ সহসা ভীষণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "সাধু পুরুষ আমার হাতের জল পর্য্যন্ত খাবেন না, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ খাবে ত! বেশ!"

কামারের জাঁতার মুখে জ্বলন্ত কয়লা যেমন করিয়া গর্জ্জিয়া জ্বলিয়া ছাই হয়, বিরাজের প্রজ্বলিত মস্তিষ্কের মুখে ঠিক তেমনই করিয়া তাহার অতুল্য অমূল্য হৃদয়খানি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সে স্বামী ভুলিল, ধর্ম্ম ভুলিল, মরণ ভুলিল, এক দৃষ্টে প্রাণপণে ওপারে ঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। আবার কড়্ কড়্ করিয়া অন্ধকার আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল, তাহার বিস্ফারিত দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিল, একবার মুখ বাড়াইয়া জলের পানে চাহিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া বাড়ীর দিকে দেখিল, তাহার পর লঘুহস্তে নিজের বাঁধা বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়া চক্ষের নিমিষে অন্ধকার বনের মধ্যে মিশিয়া গেল। তাহার দ্রুত পদশব্দে কত কি সর্ সর্, খস্ খস্ করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া গেল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না—সে সুন্দরীর কাছে চলিয়াছিল। পঞ্চাননঠাকুরতলায় তাহার ঘর, পূজা দিতে গিয়া কতবার তাহা দেখিয়া আসিয়াছে। এ গ্রামের বধূ হইলেও শৈশবে এ গ্রামের প্রায় সমস্ত পথ ঘাটই সে চিনিত, অল্প কালের মধ্যেই সে সুন্দরীর রুদ্ধ জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

ইহার ঘণ্টা দুই পরেই কাঙালী জেলে তাহার পান্‌সি খানি ওপারের দিকে ভাসাইয়া দিল। অনেক রাত্রেই সে পয়সার লোভে সুন্দরীকে ওপারে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, আজও চলিয়াছে, আজ শুধু একটির পরিবর্ত্তে দুটি রমণী নিঃশব্দে বসিয়া আছে। অন্ধকারে বিরাজের মুখ সে দেখিতে পাইল না, পাইলেও চিনিতে পারিত না। তাহাদের ঘাটের কাছে আসিয়া দূর হইতে অন্ধকার তীরে একটা অস্পষ্ট দীর্ঘ ঋজু দেহ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া চোখ বুজিয়া রহিল।

সুন্দরী চুপি চুপি আবার প্রশ্ন করিল, "কে অমন ক'রে মারলে বৌমা?" বিরাজ অধীর হইয়া বলিল, "আমার গায়ে হাত তুলতে পারে, সে ছাড়া আর কে সুন্দরী, যে বারবার জিজ্ঞেস কচ্চিস!" সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

আরও ঘণ্টা দুই পরে একখানি সুসজ্জিত বজ্‌রা নোঙর তুলিবার উপক্রম করিতেই বিরাজ, সুন্দরীর পানে চাহিয়া বলিল, "তুই সঙ্গে যাবিনে?" "না বৌমা, আমি এখানে না থাক্‌লে লোকে সন্দেহ কর্‌বে; যাও মা ভয় নেই, আবার দেখা হ'বে"। বিরাজ আর কিছু বলিল না। সুন্দরী কাঙালীর পান্‌সিতে উঠিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

জমিদারের সুশ্রী বজ্‌রা বিরাজকে লইয়া তীর ছাড়িয়া ত্রিবেণীর অভিমুখে যাত্রা করিল, দাঁড়ে শব্দ ছাপাইয়া বাতাস চাপিয়া আসিল, দূরে একাধারে মৌন রাজেন্দ্র নতমুখে বসিয়া মদ খাইতে লাগিল, বিরাজ পাষাণমূর্ত্তির মত জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আজ রাজেন্দ্র অনেক মদ খাইয়াছিল। মদের নেশা তাহার দেহের রক্তকে উত্তপ্ত এবং মগজকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া আনিতেছিল, বজ্‌রা যখন সপ্তগ্রামের সীমানা ছাড়িয়া গেল, তখন সে উঠিয়া আসিয়া কাছে বসিল। বিরাজের রুক্ষ চুল এলাইয়া লুটাইতেছে, মাথার আঁচল খসিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে,—কিছুতেই তাহার চৈতন্য নাই। কে আসিল, কে কাছে বসিল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না।

কিন্তু রাজেন্দ্রের একি হইল? একাকী কোন ভয়ঙ্কর স্থানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে ভূত প্রেতের ভয়ে মানুষের বুকের মধ্যে যেমন তোলপাড় করিয়া উঠে, তাহারও সমস্ত বুক জুড়িয়া ঠিক তেমনই আতঙ্কের ঝড় উঠিল। সে চাহিয়াই রহিল, ডাকিয়া আলাপ করিতে পারিল না।

অথচ, এই রমণীটির জন্য সে কি না করিয়াছে! দুই বৎসর অহর্নিশ মনে মনে অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে, নিদ্রায় জাগরণে ধ্যান করিয়াছে, চোখের দেখা দেখিবার লোভে আহার নিদ্রা ভুলিয়া বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াছে—তাহার স্বপ্নের অগোচর এই সংবাদ আজ যখন সুন্দরী ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহার কাণে কাণে কহিয়াছিল, সে ভাবের আবেশে অভিভূত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এ সৌভাগ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

সুমুখে নদী বাঁকিয়া গিয়া উভয় তীরের দুই প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাড়, বহু প্রাচীন বট ও পাকুড় গাছের ভিতর দিয়া গিয়াছিল, স্থানে স্থানে বাঁশ, কঞ্চি ও গাছের ডাল জলের উপর পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া সমস্ত স্থানটাকে নিবিড় অন্ধ-

কার করিয়া রাখিয়াছিল, বজ্‌রা এইখানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণে রাজেন্দ্র সাহস সঞ্চয় করিয়া, কণ্ঠের জড়তা কাটাইয়া কোনমতে বলিয়া ফেলিল,—"তুমি—আপনি—আপনি ভেতরে গিয়ে একবার বসুন—গায়ে ডাল পালা লাগ্‌বে।" বিরাজ মুখ ফিরাইয়া চাহিল। সুমুখে একটা ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতে ছিল, তাহারই ক্ষীণ আলোকে চোখোচোখি হইল। পূর্ব্বেও হইয়াছে, তখন দুর্বৃত্ত পরের জমির উপর দাঁড়াইয়াও সে দৃষ্টি সহিতে পারিয়াছিল, কিন্তু, আজ নিজের অধিকারের মধ্যে, নিজেকে মাতাল করিয়াও সে এ চাহনির সুমুখে মাথা সোজা রাখিতে পারিল না—ঘাড় হেঁট করিল। কিন্তু, বিরাজ চাহিয়াই রহিল। তাহার এত কাছে পরপুরুষ বসিয়া, অথচ, মুখে তাহার আবরণ নাই, মাথায় এতটুকু আঁচল পর্য্যন্তও নাই। এই সময়ে বজ্‌রা ঘন ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের মধ্যে ঢুকিতেই দাঁড়িরা দাঁড় ছাড়িয়া হাত দিয়া ডাল-পালা সরাইতে ব্যস্ত হইল, নদী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ভাঁটার টান ও এখানে অত্যন্ত প্রখর ; "ওরে, সাবধান!" বলিয়া রাজেন্দ্র দাঁড়িদের সতর্ক করিয়া দিয়া তাহাদেরই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিরাজের উদ্দেশে—"লাগ্‌বে—ভেতরে আসুন" বলিয়া নিজে গিয়া কামরায় প্রবেশ করিল। বিরাজ, মোহাচ্ছন্ন, যন্ত্র-চালিতের মত পিছনে আসিয়া ভিতরে পা দিয়াই অকস্মাৎ 'মা গো' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল! সে চীৎকারে রাজেন্দ্র চম্‌কাইয়া উঠিল। তখন, অস্পষ্ট দীপালোকে বিরাজের দুই চোখ ও রক্তমাখা সিঁথার সিঁদুর চামুণ্ডার ত্রিনয়নের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে—মাতাল সে আগুনের সুমুখ হইতে আহত কুক্কুরের ন্যায় একটা ভীত ও বিকৃত শব্দ করিয়া কাঁপিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মানুষ না জানিয়া অন্ধকারে পায়ের নীচে ক্লেদাক্ত, শীতল ও পিচ্ছিল সরীসৃপ মাড়াইয়া ধরিলে যে ভাবে লাফাইয়া উঠে, তেমনই করিয়া বিরাজ ছিট্‌কাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল,—একবার জলের দিকে চাহিল, পরক্ষণে, "মা গো! একি কল্লুম মা!" বলিয়া অন্ধকার অতল জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

দাঁড়ি মাঝিরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, ছুটাছুটি করিয়া বজ্‌রা উল্টাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল,—আর কিছুই করিতে পারিল না। সবাই প্রাণপণে জলের দিকে চাহিয়াও সে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। শুধু রাজেন্দ্র একচুল নড়িল না। নেশা তাহার ছুটিয়া গিয়াছিল, তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ স্রোতের টানে বজ্‌রা আপনি বাহিরে আসিয়া পড়ায় মাঝি উদ্বিগ্ন মুখে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু, কি করা যা'বে? পুলিসে খবর দিতে হ'বে ত?" রাজেন্দ্র বিহ্বলের মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "কেন জেলে যাবার জন্যে? গদাই যেমন ক'রে পারিস্ পালা।" গদাই মাঝি পুরাণ' লোক, বাবুকে চিনিত,—সবাই চিনে—তাই, ব্যাপারটা আগেই কতক অনুমান করিয়াছিল, এখন এই ইঙ্গিতে তাহার চোখ খুলিয়া গেল। সে অপর সকলকে একত্র করিয়া চুপি চুপি আদেশ দিয়া বজ্‌রা উড়াইয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কলিকাতার কাছাকাছি আসিয়া রাজেন্দ্র হাঁফ ছাড়িল। গত রজনীর সুগভীর অন্ধকারে মুখোমুখি হইয়া সে যে চোখ মুখ দেখিয়াছিল, স্মরণ করিয়া আজ দিনের বেলায় এতদূরে আসিয়াও তাহার গা ছম্‌-ছম্ করিতে লাগিল। সে মনে মনে নিজের কাণ মলিয়া বলিল, ইহজীবনে ওকাজ আর নয়। কিসের মধ্যে যে কি লুকান থাকে কেহই জানে না। পাগ্‌লী যে কাল চোখ দিয়া পৈতৃক প্রাণটা শুষিয়া লয় নাই, ইহাই সে পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিল, এবং কোন কারণে, কখনও যে সে ওমুখো হইতে পারিবে সে ভরসা তাহার রহিল না। মূর্খ কুলটা লইয়াই এতাবৎ নাড়াচাড়া করিয়াছে, সতী যে কি বস্তু তাহা জানিত না। আজ পাপিষ্ঠের কলুষিত জীবনে প্রথম চৈতন্য হইল, খোলস লইয়া খেলা করা চলে, কিন্তু জীবন্ত বিষধর অত বড় জমীদারপুত্রেরও ক্রীড়ার সামগ্রী নয়।

(১৫)

সে দিন অপরাহ্নে যে স্ত্রীলোকটি বিরাজের শিয়রে বসিয়াছিল ; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিরাজ জানিল, সে হুগলির হাঁসপাতালে আছে। দীর্ঘকাল বাত-শ্লেষ্মা বিকারের পর যখন হইতে তাহার হুঁস হইয়াছে, তখন হইতেই সে ধীরে ধীরে নিজের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একে একে অনেক কথা মনেও পড়িয়াছে।

একদিন বর্ষার রাত্রে স্বামী তাহার সতীত্বের উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তাহার পীড়ায় জর্জ্জর, উপবাসে অবসন্ন, ভগ্ন দেহ, বিমল মন, সে নিদারুণ অপবাদ সহ্য করিতে পারে নাই। দুঃখে দুঃখে অনেক দিন হইতেই সে হয়ত পাগল হইয়া আসিতেছিল, সেদিন অভিমানে ঘৃণায়, আর তাঁহার মুখ দেখিবে না বলিয়া সব বাঁধন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া নদীতে মরিতে গিয়াছিল—কিন্তু, মরে নাই।

তার পর বিকারের ঝোঁকে বজ্‌রায় উঠিয়াছিল, এবং অর্দ্ধপথে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছিল, ভিজা মাথায় ভিজা কাপড়ে সারারাত্রি একাকী বসিয়া জ্বরে কাঁপিয়াছিল, শেষে কি করিয়া না জানি, এক গৃহস্থের দরজায় শুইয়া পড়িয়াছিল। এতটাই মনে পড়ে। কে এখানে আনিয়াছে, কবে আনিয়াছে, কতদিন এমন করিয়া পড়িয়া আছে—মনে পড়ে না। আর মনে পড়ে সে গৃহত্যাগিনী কুলটা—পরপুরুষ আশ্রয় করিয়া গ্রামের বাহির হইয়াছিল।

ইহার পরে আর সে ভাবিতে পারিত না—ভাবিতে চাহিত না। তারপর ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতে লাগিল, উঠিয়া বসিয়া একটু একটু করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু, ভবিষ্যতের দিক্ হইতে নিজের চিন্তাকে সে প্রাণপণে বিশ্লিষ্ট করিয়া রাখিল। সে যে কি ব্যাপার, তাহা তাহার প্রতি অণুপরমাণু অহর্নিশ ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেছিল সত্য, কিন্তু যে যবনিকা ফেলা আছে, তাহার এতটুকু কোণ তুলিয়া দেখিতেও ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া যাইত, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া মূর্চ্ছার মত বোধ হইত।

একদিন অগ্রহায়ণের প্রভাতে সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাহাকে কহিল,"এখন সে ভাল হইয়াছে, এইবার তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে।" বিরাজ 'আচ্ছা' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে স্ত্রীলোকটি হাঁসপাতালের লোক। সে বুঝিয়াছিল, এই পীড়িতার আত্মীয়স্বজন সম্ভবতঃ কেহ নাই, কহিল, "রাগ ক'রনা বাছা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যাঁরা তোমাকে রেখে গিয়েছিলেন তাঁরা আর কো'ন দিন ত দেখ্‌তে এলেন না, তাঁ'রা কি তোমার আপনার লোক নয়?"

বিরাজ বলিল, "না, তাঁদের কখনও চোখেও দেখিনি। একদিন বর্ষার রাত্রে আমি ত্রিবেণীর কাছে জলে ডুবে যাই। তাঁরা বোধ করি দয়া ক'রে এখানে রেখে গিয়েছিলেন।" "ওঃ জলে ডুবেছিলে? তোমার বাড়ী কোথা গা?" বিরাজ মামার বাড়ীর নাম করিয়া বলিল, "আমি সেইখানেই যা'ব, সেখানে আমার আপনার লোক আছে।" স্ত্রীলোকটির বয়স হইয়াছিল, এবং বিরাজের মধুর স্বভাবের গুণে একটা মমতাও জন্মিয়াছিল, দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "তাই যাও বাছা। একটু সাবাধানে থে'ক, দুদিনেই ভাল হয়ে যা'বে"। বিরাজ একটুখানি হাসিয়া বলিল, "আর ভাল কি হ'বে মা? এ চোখও ভাল হ'বে না, এ হাতও সার্‌বে না।" রোগের পর তাহার বাঁ চোখ অন্ধ এবং বাঁ হাত পড়িয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, কহিল, "বলা যায় না বাছা, সেরে যেতেও পারে।"

পরদিন সে নিজের একখানি পুরাতন শীতবস্ত্র এবং কিছু পাথেয় দিয়া গেল, বিরাজ তাহা গ্রহণ করিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সহসা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমি নিজের একবার মুখ দেখ্‌ব—একটা আর্‌সী যদি—"

"আছে বৈকি, এখনই এনে দিচ্চি" বলিয়া অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া একখানি দর্পণ বিরাজের হাতে দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল; বিরাজ আর একবার তাহার লোহার খাটের উপর ফিরিয়া গিয়া আর্‌সী খুলিয়া বসিল।

প্রতিবিম্বটার দিকে চাহিবামাত্রই একটা অপরিমেয় ঘৃণায় তাহার মুখ আপনি বিমুখ হইয়া গেল। দর্পণটা ফেলিয়া দিয়া সে বিছানায় মুখ ঢাকিয়া গভীর আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। মাথা মুণ্ডিত—তাহার সেই আকাশভরা মেঘের মত কাল চুল কই? সমস্ত মুখ এমন করিয়া কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল? সেই পদ্মপলাশ চক্ষু কোথায় গেল? অমন অতুলনীয় কাঁচা সোনার মত বর্ণ কে হরণ করিল? ভগবান্! এ কি গুরু দণ্ড করিয়াছ! যদি কখনও দেখা হয় এ মুখ সে কেমন করিয়া বাহির করিবে!

যতদিন এ দেহে প্রাণ থাকে, ততদিন আশা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া মরে না। তাই, তাহারও হয়ত অতিক্ষীণ

একটু আশা অন্তঃসলিলার মত অতি নিভৃতঅন্তঃস্থলে তখনও বহিতেছিল, দয়াময়! সেটুকু শুকাইয়া দিয়া তোমার কি লাভ হইল?

তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পরে রোগশয্যায় শুইয়া স্বামীর মুখ যখন উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত, তখন কখন বা সহসা মনে হইত, যাহা সে করিয়াছে সে ত অজ্ঞান হইয়াই করিয়াছে, তবে কি সে অপরাধের ক্ষমা হয় না? সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, শুধু কি ইহারই নাই? অন্তর্যামী ত জানেন, যথার্থ পাপ সে করে নাই, তথাপি যেটুকু হইয়াছে, সেটুকুও কি তাহার এতদিনের স্বামিসেবায় মুছিবে না? মাঝে মাঝে বলিত, "তাঁর মনে ত রাগ থাকে না, যদি হঠাৎ গিয়া পায়ের উপর পড়ি, সব কথা খুলে বলি, আমার মুখের পানে চেয়ে কি করেন তা হ'লে?" তাহা হইলে সম্ভবতঃ কি যে করেন, এই কল্পনাটাকে সে যে কত রঙে, কত ভাবে ফুটাইয়া দেখিবার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইত, ঘুম পাইলে উঠিয়া গিয়া চোখে মুখে জল দিয়া আবার নূতন করিয়া ভাবিতে বসিত—হা, ভগবান্! তাহার সেই বিচিত্র ছবিটাকে কেন এমন করিয়া দুই পায়ে মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া দিলে! সে তার স্বামীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কোন্ লজ্জায় আর এ মুখ তুলিয়া তাঁর মুখের পানে চাহিবে!

ঘরে আর একজন রোগিণী ছিল, সে বিরাজের কান্না দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল,—"কি হ'ল গা? কেন, কাঁদ্‌চ?" সে বিরাজের কান্নার হেতু জানিতে চায়!

বিরাজ তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বসিল, এবং কোন দিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সেইদিন লোকপরিপূর্ণ শব্দমুখর রাজপথের এক প্রান্ত বাহিয়া যখন সে তাহার অনভ্যস্ত ক্লান্ত চরণ দুটিকে সারা জীবনের অনুদ্দিষ্ট যাত্রায় প্রথম পরিচালিত করিল, তখন বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে মনে মনে বলিল, "ভগবান্! হয়ত ভালই করিয়াছ। আর কেহ চাহিয়া দেখিবে না,—এই মুখ, এই চোখ, হয়ত, এই যাত্রারই উপযুক্ত! গ্রামের লোক জানিয়াছে সে গৃহত্যাগিনী কুলটা! তাই, যে মুখ খুলিয়া তাহার গ্রামের মুখ, তাহার স্বামীর মুখ দেখা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে মুখ হয়ত এমনই হওয়াই তোমার মঙ্গলের বিধান!" বিরাজ পথ চলিতে লাগিল।

(১৬)

কত দিন গত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে সে দাসীবৃত্তি করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভগ্ন দেহ অসমর্থ হইল—গৃহস্থ বিদায় দিলেন।

তখন হইতে ভিক্ষাই তাহার উপজীবিকা। সে পথে পথে ভিক্ষা করে, গাছতলায় রাঁধিয়া খায়, গাছতলায় শোয়। এই বর্ত্তমান জীবনে, অতীতের তিলমাত্র চিহ্নও আর বিদ্যমান নাই। তাহার শতছিন্ন বস্ত্র, জটবাঁধা রুক্ষ একটুখানি চুল, মলিন ভিক্ষালব্ধ একখানি ছোট কাঁথা গায়ে। তাহার তেমনই দেহ, তেমনই বর্ণ,—তেমনই সব। অথচ, এই তাহার পঁচিশ বৎসর মাত্র বয়স, এই দেহেরই তুলনা একদিন স্বর্গেও মিলিত না। অতীত হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া ভগবান্ তাহাকে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। সে নিজেও সব ভুলিয়াছে। শুধু, ভুলিতে পারে নাই দুটা কথা। 'দাও' বলিতে এখনও তাহার মুখে রক্ত ছুটিয়া আসে—আজও কথাটা গলা দিয়া স্পষ্ট বাহির করিতে পারে না। আর ভুলিতে পারে না যে, তাহাকে অনেক দূরে গিয়া মরিতে হইবে। মরণের সেই স্থানটুকু তাহার কোন্ দেশান্তরে তাহা জানে না বটে, কিন্তু, এটা জানে তাহা বহু দূরে। সেই সুদূরের জন্যই সে অবিশ্রাম পথ চলিয়াছে। সে যে কোনমতেই এ দশা তাহার স্বামীর দৃষ্টিগোচর করিতে পারিবে না, এবং দোষ তাহার যত অপ্রমেয়ই হউক এ অবস্থা চোখে দেখিলে তাঁহার যে বুক ফাটিয়া যাইবে, তাহা এক মুহূর্ত্তের তরেও বিস্মৃত হইতে পারে নাই বলিয়াই নিরন্তর দূরে সরিয়া যাইতেছিল।

একটা বৎসর পথ হাঁটিতেছে। কিন্তু, কোথায় তাহার অপরিচিত গম্যস্থান? কোথায় কোন্ ভূমিশয্যায় এই লজ্জাহত তপ্ত মাথাটা পাতিয়া এই লাঞ্ছিত জীবনটা নিঃশব্দে শেষ করিতে পাইবে?

আজ দুইদিন হইতে সে একটা গাছতলায় পড়িয়া আছে—উঠিতে পারে নাই। আবার ধীরে ধীরে রোগে ঘেরিয়াছে

—কাশী, জ্বর, বুকে ব্যথা। দুর্ব্বলদেহে শক্ত অসুখে পড়িয়া হাঁসপাতালে গিয়াছিল, ভাল হইতে না হইতে এই পথশ্রম, অনশন ও অর্দ্ধাশন। তাহার বড় সবল দেহ ছিল বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে, আর বুঝি থাকে না। আজ চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিল, এই বৃক্ষতলই কি সেই গম্যস্থান? ইহার জন্যই কি সে এত দেশ, এত পথ অবিশ্রাম হাঁটিয়াছে? আর কি সে উঠিবে না? বেলা অবসান হইয়া গেল। গাছের সর্ব্বোচ্চ চূড়া হইতে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রক্তাভা কোথায় সরিয়া গেল, সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি গ্রামের ভিতর হইতে ভাসিয়া তাহার কাণে পৌঁছিল, সেই সঙ্গে তাহার নিমীলিত চোখের সুমুখে অপরিচিত গৃহস্থ বধূদের শান্ত মঙ্গল মূর্ত্তিগুলি ফুটিয়া উঠিল। এখন, কে কি করিতেছে, কেমন করিয়া দীপ জ্বালিতেছে, হাতে দীপ লইয়া কোথায় কোথায় দেখাইয়া ফিরিতেছে, এইবার গলায় আঁচল দিয়া নমস্কার করিতেছে, তুলসী তলায় দীপ দিয়া, কে কি কামনা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিতেছে—এ সমস্তই সে চোখে দেখিতে লাগিল, কাণে শুনিতে লাগিল। আজ অনেকদিন পরে তাহার চোখে জল আসিল। কত সহস্র বৎসর যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, সে কোন গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে পায় নাই, কাহারও মুখ মনে করিয়া ঠাকুরের পায়ে আয়ু ঐশ্বর্য্য মাগিয়া লয় নাই। এই সমস্ত চিন্তাকে সে প্রাণপণে সরাইয়া রাখিত, কিন্তু, আজ আর পারিল না। শাঁখের আহ্বানে তাহার ক্ষুধিত-তৃষিত হৃদয় কোন নিষেধ না মানিয়া গৃহস্থ বধূদের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনশ্চক্ষে প্রতি ঘরদোর, প্রতি প্রাঙ্গণপ্রান্তর, বাঁধান তুলসীবেদী, প্রতি দীপটি পর্য্যন্ত এক হইয়া গেল—এ যে সমস্তই তাহার চেনা; সবগুলিতেই এখন যে তাহারই হাতের চিহ্ন দেখা যাইতেছে! আর তাহার দুঃখ রহিল না, ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিল না, পীড়ার যাতনা রহিল না, সে তন্ময় হইয়া নিরন্তর বধূদের অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। যখন তাহারা রাঁধিতে গেল, সঙ্গে গেল, রান্না শেষ করিয়া যখন স্বামীদের খাইতে দিল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, তারপর সমস্ত কাজ কর্ম্ম সমাধা করিয়া অনেক রাত্রে যখন তাহারা নিদ্রিত স্বামীদের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সেও কাছে দাঁড়াইতে গিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিল—এ যে তারই স্বামী! আর তাহার চোখের পলক পড়িল না, এক দৃষ্টে নিদ্রিত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। গৃহ ছাড়িয়া পর্য্যন্ত এমন করিয়া একটি রাত্রিও ত তাহার কাছে আসে নাই! আজ তাহার ভাগ্যে একি অসহ সুখ! নিদ্রায় জাগরণে, তন্দ্রায় স্বপনে, একি মধুর নিশাযাপন! বিরাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বসিয়াছে। তখনও পূর্ব্বগগন স্বচ্ছ হয় নাই, তখনও ধূসর জ্যোৎস্না শাখা ও পাতার ফাঁকে ফাঁকে নামিয়া বৃক্ষতলে, তাহার চারিদিকে শেফালি পুষ্পের মত ঝরিয়া রহিয়াছে, সে ভাবিতেছিল, সে যদি অসতী, তবে, কেন তিনি আজ এমন করিয়া দেখা দিলেন? তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইয়াছে, তাহাই কি জানাইয়া দিয়া গেলেন? তবে ত, এক মুহূর্ত্তও কোথাও সে বিলম্ব করিতে পারিবে না। সে উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। আজিকার রাত্রি সহসা তাহার রুদ্ধ দৃষ্টি সজোরে উদ্‌ঘাটিত করিয়া সমস্ত হৃদয় আনন্দে মাধুর্য্যে ভরিয়া দিয়া গিয়াছে। আর দেখা হউক বা না হউক, আর ত তাহাকে এক নিমেষের জন্যও স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না! এমন করিয়া তাঁহাকে যে পাবার পথ ছিল, অথচ, সে বৃথায় এতদিন স্বামীছাড়া হইয়া দুঃখ পাইয়াছে, এই ত্রুটিটা তাহাকে গভীর বেদনায় পুনঃ পুনঃ বিঁধিতে লাগিল। আজ কি করিয়া না জানি, তাহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, তিনি ডাকিতেছেন। বিরাজ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "ঠিক ত! এই দেহটা কি আমার আপনার যে তাঁর অনুমতি ভিন্ন এমন করিয়া নষ্ট করিতেছি! আমার বিচার করিবার অধিকার আমার নয়—তাঁর। যা করিবার তিনিই করিবেন, আমি সব কথা তাঁর পায়ে নিবেদন করিয়া দিয়া ছুটি লইব।" বিরাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আজ তাহার দেহ লঘু, পদক্ষেপ যেন কঠিন মাটির উপর পড়িতেছে না, মন পরিপূর্ণ, কোথাও এতটুকু গ্লানি নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে সে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিল, এ কি বিষম ভুল! একি অহঙ্কার তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল! এই কুরূপ কুৎসিত মুখ বিশ্বের সুমুখে বাহির করিতে লজ্জা হয় নাই, শুধু লজ্জা হইয়াছিল তাঁর কাছে, যাঁর কাছে প্রকাশ করিবার একমাত্র অধিকার তাহার নয় বৎসর বয়সে বিধাতা স্বয়ং নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

(১৭)

পুঁটি দাদাকে মুহূর্ত্তের বিশ্রাম দেয় না। পূজার সময় হইতে পৌষের শেষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত নগরের পর নগর, তীর্থের পর তীর্থে টানিয়া লইয়া ফিরিতেছে। তাহার অল্প বয়স, সুস্থ সবল দেহ, অসীম কৌতূহল, তাহার সহিত সমানে পা ফেলিয়া চলা নীলাম্বরের সাধ্যাতীত—সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ, কোথাও বসিয়া একটুখানি জিরাইয়া লইবার ইচ্ছা না হইয়া কেন যে, সমস্ত দেহটা তাহার ঘরের পানে চাহিয়া অহর্নিশ পালাই পালাই করিতেছে, ভারাক্রান্ত মন দেশে ফিরিবার জন্য দিবানিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া নালিশ জানাইতেছে, ইহাও সে বুঝিতে পারিতেছে না। কি আছে দেশে? কেন, এমন স্বাস্থ্যকর স্থানে মন বসে না? ছোটবৌ মাঝে মাঝে পুঁটিকে চিঠি দেয়, তাহাতেও এমন কোনও কথা থাকে না, তথাপি সেই বন জঙ্গলের অবিশ্রাম টানে তাহার শীর্ণ দেহ কঙ্কালসার হইয়া উঠিতে লাগিল। পুঁটি চায় দাদা সব ভুলিয়া আবার তেমনই হয়। তেমনই সুস্থ সদানন্দ, তেমনই মুখে মুখে গান, তেমনই কারণে অকারণে উচ্চহাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার। কিন্তু, দাদা তাহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল করিতে বসিয়াছে। আগে সে এমন করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই। হতাশ হয় নাই, মনে করিত আরও দু'দিন যা'ক্। কিন্তু, দু'দিন করিয়া চার পাঁচ মাস কাটিয়া গেল, কৈ কিছুই ত হইল না। বাড়ী ছাড়িয়া আসিবার দিনে, মোহিনীর কথায় ব্যবহারে বিরাজের উপর তাহার একটা করুণার ভাব আসিয়াছিল, তাহার কথাগুলা বিশ্বাসও করিয়াছিল। দাদা ভাল হইয়া গেলে ছেলে বেলার কথা মনে করিয়া সে হয়ত, মনে মনে তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতেও পারিত। বস্তুতঃ ক্ষমা করিবার জন্য, সেই বৌদিকে একটুখানি মাধুর্য্যের সহিত স্মরণ করিবার জন্য এক সময়ে সে নিজেও ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগ তাহার মিলিতেছে কৈ? দাদা ভাল হইতেছে কৈ? একে ত, সংসারে এমন কোনও দুঃখ, কোনও হেতু সে কল্পনা করিতেও পারে না, যাহাতে এই মানুষটিকে এত দুঃখে ফেলিয়া রাখিয়া কেহ সরিয়া দাঁড়াইতে পারে, বৌদি ভাল হউক, মন্দ হউক, আর পুঁটি ভ্রূক্ষেপ করে না, কিন্তু, ত্যাগ করিয়া যাইবার অমার্জ্জনীয় অপরাধে যে স্ত্রী অপরাধিনী, তাহার প্রতি বিদ্বেষেরও তাহার যেমন অন্ত রহিল না, সেই হতভাগিনীকে প্রত্যহ স্মরণ করিয়া, তাহার বিচ্ছেদ এমন করিয়া মনে মনে লালন করিয়া, যে মানুষ নিজেকে ক্ষয় করিয়া আনিতেছে, তাহারও প্রতি তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না।

একদিন সকালে সে মুখ ভার করিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা, বাড়ী যাই চল।" নীলাম্বর কিছু বিস্মিত হইয়াই বোনের মুখের পানে চাহিল, কারণ, মাঘ মাসটা প্রয়াগে কাটাইয়া যাইবার কথা ছিল, পুঁটি দাদার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল,—"একটা দিনও আর থাক্‌তে চাইনে—আমি কালই যা'ব।" তাহার রুষ্ট ভাব অবলোকন করিয়া নীলাম্বর একটুখানি বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিল, "কেনরে পুঁটি?" পুঁটি এতক্ষণ জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়াছিল, এবার কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, —"কি হ'বে থেকে? তোমার ভাল লাগ্‌চে না, তুমি যাই যাই ক'রে প্রতিদিন শুকিয়ে উঠ্‌চ, না, আমি কিছুতেই এক দিনও থাক্‌ব না।" নীলাম্বর সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল,—"ফিরে গেলেই কি ভাল হয়ে যা'বরে? এ দেহ সারবে ব'লে আর আমার ভরসা হয় না পুঁটি—তাই চল্‌ বোন্ যা'হবার ঘরে গিয়েই হউক্।"

দাদার কথা শুনিয়া পুঁটি অধিকতর কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, —"কেন তুমি সদা সর্ব্বদা তাকে এমন ক'রে ভাব্‌বে? শুধু ভেবেই ত এমন হয়ে যাচ্চ।"

"কে বল্‌লে আমি তা'কে সদা সর্ব্বদা ভাবি?"

পুঁটি তেমনই ভাবে জবাব দিল—"কে আবার বল্‌বে? আমি নিজেই জানি।"

"তুই তা'কে ভাবিস্‌নে?"

পুঁটি চোখ মুছিয়া উদ্ধতভাবে বলিল—"না, ভাবিনে। তাকে ভাব্‌লে পাপ হয়।"

নীলাম্বর চমকিত হইল—"কি হয়?" "পাপ হয়। তা'র নাম মুখে আন্‌লে মুখ অশুচি হয়, মনে আন্‌লে স্নান করতে হয়," বলিয়াই সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল দাদার স্নেহ-কোমল দৃষ্টি এক নিমিষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর বোনের মুখের দিকে চাহিয়া কঠিন স্বরে বলিল,—

"পুঁটি!" ডাক শুনিয়া ভীত ও অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে দাদার বড় আদরের বোন্, ছেলেবেলাতেও সহস্র অপরাধে কখনও এমন চোখ দেখে নাই, এমন গলা শোনে নাই, এমন বড় বয়সে বকুনি খাইয়া তাহার ক্ষোভে ও অভিমানে মাথা হেঁট হইয়া গেল।

নীলাম্বর আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলে সে চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দুপুর বেলা দাদার আহারের সময় কাছে গেল না, অপরাহ্নে দাসীর হাতে খাবার পাঠাইয়া দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল। নীলাম্বর ডাকিল না, কথাটি বলিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর আহ্নিক শেষ করিয়া সেই আসনেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে, পুঁটি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া পিছনে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠের উপর মুখ রাখিল। এটা তাহার নালিশ করার ধরণ। ছেলে বেলায় অপরাধ করিয়া বৌদির তাড়া খাইয়া এমনই করিয়া সে অভিযোগ করিত। নীলাম্বরের সহসা তাহা মনে পড়িয়া দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল, মাথায় হাত দিয়া কোমল স্বরে বলিল—"কি রে?"

পুঁটি পিঠ ছাড়িয়া দিয়া কোলের উপর উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে পুঁটি কান্নার সুরে বলিল, "আর ব'লবনা দাদা।" নীলাম্বর হাত দিয়া তাহার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "না, আর ব'ল না।" পুঁটি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, নীলাম্বর তাহার মনের কথা বুঝিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "সে তোর গুরুজন। শুধু সম্পর্কে নয়, পুঁটি, তোকে মায়ের মত মানুষ ক'রে তোর মায়ের মতই হয়েচে। অপরে যা ইচ্ছে বলুক, কিন্তু, তোর মুখের ও-কথায় গভীর অপরাধ হয়।" পুঁটি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "কেন সে আমাদের এমন ক'রে ফেলে রেখে গেল?"

"কেন যে গেল পুঁটি, সে শুধু আমি জানি, আর যিনি সর্ব্বযামী তিনি জানেন। সে নিজেও জান্ত না—তখন সে পাগল হয়েছিল, তার এতটুকু জ্ঞান থাক্‌লে সে আত্মহত্যাই ক'রত, এ কাজ ক'রত না।" পুঁটি আর একবার চোখ মুছিয়া ভাঙা গলায় বলিল, "কিন্তু—এখন, তবে কেন আসে না দাদা?"

"কেন আসে না? আসবার যো নেই ব'লেই আসে না দিদি," বলিয়া সে নিজেকে জোর করিয়া সংবরণ করিয়া লইয়া ক্ষণকাল পরেই বলিল, "যে অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে গেছে, তার এতটুকু ফেরবার পথ থাক্‌লে, সে ফিরে আসত,—একটা দিনও কোথাও থাক্‌ত না। একথা কি তুই নিজেই বুঝিস্‌নে পুঁটি?" পুঁটি মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বুঝি দাদা।" নীলাম্বর উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, "তাই বল বোন্। সে আস্‌তে চায়, পায় না। সে যে, কি শাস্তি পুঁটি, তা' তোরা দেখতে পাস্‌নে বটে, কিন্তু, চোখ বুজলেই আমি তা' দেখি। সেই দেখাই আমাকে নিত্য ক্ষয় ক'রে আন্‌চেরে, আর কিছুই নয়।" পুঁটি কাঁদিয়া ফেলিল। নীলাম্বর হাত দিয়া নিজের চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল,—"সে তার দুটো সাধের কথা আমাকে যখন—তখন ব'ল্‌ত। এক সাধ, শেষ সময়ে আমার কোলে যেন মাথা রাখ্‌তে পায়, আর সাধ, সীতা সাবিত্রীর মত হয়ে মরণের পরে যেন তাদের কাছেই যায়। হতভাগীর সব সাধই ঘুচেচে।" পুঁটি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল, নীলাম্বর রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "তোরা সবাই তার অপরাধ দিস্—বারণ কর্‌তে পারিনে ব'লে, আমিও চুপ ক'রে থাকি, কিন্তু ভগবান্‌কে ফাঁকি দিই কি ক'রে বল দেখি? তিনি ত দেখ্‌চেন, কার ভুল, কার অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সে ডুবে গেল। তুই বল্, আমি কোন্ মুখে তার দোষ দিই, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ না ক'রে কি ক'রে থাকি! না, বোন্, সংসারের চোখে সে যত কলঙ্কিনীই হ'ক্, তার বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ নেই। নিজের দোষে এ জন্মে তাকে পেয়েও হারালুম, ভগবান্ করুন যেন পরজন্মেও তাকে পাই।" সে আর বলিতে পারিল না, এইখানে তাহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল। পুঁটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া দাদার চোখ মুছাইয়া দিতে গিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিল। সহসা তাহার মনে হইল দাদা যেন কোথায় সরিয়া যাইতেছে। কাঁদিয়া বলিল, "যেখানে ইচ্ছে চল দাদা, কিন্তু, আমি তোমাকে একটি দিনও কোথাও

একলা ছেড়ে দেব না।" নীলাম্বর মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল।

বিরাজ জগন্নাথের পথে ফিরিয়া আসিতেছিল। এই পথ ধরিয়া যখন সে অনুদ্দিষ্ট মৃত্যুশয্যার অনুসন্ধানে গিয়াছিল, সেই যাওয়ায় আর এই আসায় কি প্রভেদ! এখন সে বাড়ী যাইতেছে। তাহার দুর্ব্বল দেহ পথে যতই সকাতরে বিশ্রাম-ভিক্ষা চাহিতে লাগিল, সে ততই ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কোনও কারণে কোথাও বিলম্ব করিতে সে সম্মত নয়। তাহার কাশী যক্ষ্মায় পরিণত হইয়াছে, ইহা সে টের পাইয়াছিল, তাই আশঙ্কার অবধি ছিল না, পাছে যাওয়া না ঘটে। ছেলেবেলা হইতে একটা বিশ্বাস তাহার বড় দৃঢ় ছিল, দেহ নিষ্পাপ না হইলে কেহ স্বামীর পায়ে মরিতে পায় না। সে, এই উপায়ে, মরণের পূর্ব্বে একবার নিজের দেহটাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়—তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সে নির্ভয়ে, মহানন্দে জীবনের পরপারে দাঁড়াইয়া তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। কিন্তু দামোদরের এধারে আসিয়া তাহার হাত পা ফুলিয়া উঠিল, মুখ দিয়া অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে লাগিল—আর কিছুতেই পা চলিল না। সে হতাশ হইয়া একটা গাছতলায় ফিরিয়া আসিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। একি ভয়ানক অপরাধ যে, এত করিয়াও তাহার শেষ আশা মিটিল না! তাহার এ জন্ম গেল, পরজন্মেও আশা নাই, তবে সে আর কি করিবে! আশা নাই, তবুও সে গাছতলায় পড়িয়া সারাদিন হাত জোড় করিয়া স্বামীর পায়ে মিনতি জানাইতে লাগিল।

পরদিন তারকেশ্বরের কাছাকাছি কোথায় হাটবার ছিল, প্রভাত হইতে সেই পথে গরুর গাড়ী চলিতে লাগিল, সে সাহসে ভর করিয়া এক বৃদ্ধ গাড়োয়ানকে আবেদন করিল। বুড়া মানুষ তাহার কান্না দেখিয়া সম্মত হইয়া গাড়ী করিয়া তারকেশ্বরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। বিরাজ স্থির করিল, এই মন্দিরের আশে পাশে কোথাও সে পড়িয়া থাকিবে। এখানে কত লোক আসে যায়, যদি কোন উপায়ে একবার ছোটবৌর কাছে সংবাদ পাঠাইতে পারে।

(১৮)

কঠিন ব্যাধিপীড়িত কত নর-নারী, কত কামনায় এই দেবমন্দির ঘেরিয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, তাহাদের মধ্যে আসিয়া বিরাজ অনেক দিনের পর একটু শান্তি অনুভব করিল। তাহাদের মত তাহারও ব্যাধি আছে, কামনা আছে, সে, তাই লইয়া এখানে নীরবে পড়িয়া থাকিতে পাইবে, কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, কাহারও অর্থহীন কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইবে না মনে করিয়া এত দুঃখের মাঝেও আরাম পাইল। কিন্তু রোগ দ্রুত বাড়িয়া চলিতে লাগিল। মাঘের এই দুর্জ্জয় শীতে ও অনাহারে ছয় দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু আর কাটিবে বলিয়াও আশা হইল না, কেহ আসিবে বলিয়াও ভরসা রহিল না। ভরসা রহিল শুধু মৃত্যুর,—সে, তা'রই জন্য আর একবার নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, অপরাহ্ণ না হইতেই আঁধার বোধ হইতে লাগিল। ও-বেলায় তাহার মুখ দিয়া অনেকখানি রক্ত উঠায় মৃত-কল্প দেহটা যেন একেবারে নিঃশেষে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সে মনে মনে বলিল, "বুঝি, আজই সব সাঙ্গ হইবে;" এবং তখন হইতেই মন্দিরের পিছনে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের পূজা হইয়া গেলে অন্য দিনের মত উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিতে পারিল না—মনে মনে করিল। এতদিন স্বামীর চরণে সে শুধু মিনতি জানাইয়াই আসিয়াছে। সে অবোধ নয়, যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে এ জন্মের কোন দাবী রাখে নাই, শুধু পরজন্মের অধিকার না যায় ইহাই চাহিয়াছে। না বুঝিয়া অপরাধ করার শাস্তি যেন, এ জন্ম অতিক্রম করিয়া পরজন্ম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত না হইতে পায়, এই ভিক্ষাই মাগিয়াছে; কিন্তু বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তার ধারা সহসা এক আশ্চর্য্য পথে ফিরিয়া গেল। ভিক্ষার ভাব রহিল না, বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। সমস্ত চিত্ত ভরিয়া এক অপূর্ব্ব অভিমানের সুর অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে বাজিয়া উঠিল। সে তাহাতেই মগ্ন হইয়া কেবলই বলিতে লাগিল,—"কেন তবে তুমি বলেছিলে!" অজ্ঞাতসারে কখন তাহার পঙ্গু বাঁ হাতখানি স্খলিত হইয়া পথের উপর পড়িয়াছিল, টের

পায় নাই, সহসা তাহারই উপর একটা কঠিন ব্যথা পাইয়া সে অস্ফুটস্বরে কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। এটা যাতায়াতের পথ। যে ব্যক্তি না দেখিয়া এই অবশ শীর্ণ হাতখানি মাড়াইয়া দিয়াছিল, সে অতিশয় লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আহা হা—কে গা এমন ক'রে পথের ওপর শুয়ে আছ? বড় অন্যায় করেচি—বেশী লাগে নি ত?" চক্ষের পলকে বিরাজ মুখের কাপড় সরাইয়া চাহিয়া দেখিল, তা'রপর আর একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া চুপ করিল। এই ব্যক্তি নীলাম্বর, সে একবার একটু ঝুঁকিয়া দেখিয়া সরিয়া গেল।

কিছুক্ষণে সূর্য্য অস্ত গেল। পশ্চিম দিগন্তে মেঘ ছিল না, চক্রবাল-বিচ্ছুরিত স্বর্ণাভা মন্দিরের চূড়ায়, গাছের আগায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, নীলাম্বর দূরে দাঁড়াইয়া পুঁটিকে কহিল, "ওই রোগা মেয়েমানুষটিকে বড় মাড়িয়ে দিয়েচি বোন্, দেখ দেখি যদি কিছু দিতে পারিস্—বোধ করি ভিক্ষুক।" পুঁটি চাহিয়া দেখিল স্ত্রীলোকটি একদৃষ্টে তাহাদেরই দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের কিয়দংশ বস্ত্রাবৃত, তথাপি মনে হইল এ মুখ সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তোমাদের বাড়ী কোথায়?" "সাত গাঁয়" বলিয়া সে হাসিল। বিরাজের সব চেয়ে মধুর সামগ্রী ছিল তাহার মুখের হাসি; এ হাসি সমস্ত সংসারের মধ্যে কাহারও ভুল করিবার যো ছিল না।

"ওগো, এ যে বৌ'দি" বলিয়া সেই মুহূর্ত্তে পুঁটি সেই জীর্ণ শীর্ণ দেহের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মুখে মুখ দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কথাবার্ত্তা শুনিতে না পাইলেও সমস্ত বুঝিল। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলিল, "এখানে কাঁদিস্‌নে পুঁটি, ওঠ্" বলিয়া ভগিনীকে সরাইয়া দিয়া স্ত্রীর শীর্ণ দেহ ক্ষুদ্র শিশুটির মত বুকে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিয়া গেল।

* * * *

চিকিৎসার জন্য, উত্তম স্বাস্থ্যকর-স্থানে যাইবার জন্য বিরাজকে অনেক সাধ্য সাধনা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনমতেই রাজী করান যায় নাই। আর ঘর ছাড়িয়া যাইতে সে কিছুতেই সম্মত হইল না। নীলাম্বর পুঁটিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া দিল,—"আর ক'টা দিন বোন্? যেখানে যেমন ক'রে ও থাক্‌তে চায়, দে। আর ওকে তোরা কেউ পীড়াপীড়ি করিস্ নে।"

তারকেশ্বরে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সে প্রথম আবেদন জানাইয়াছিল, তাহাকে ঘরে লইয়া চল, তাহার নিজের শয্যার উপরে শোয়াইয়া দাও। ঘরের উপর, ঘরের প্রতি সামগ্রীটির উপর এবং স্বামীর উপর তাহার কি যে ভীষণ তৃষ্ণা, তাহা যে কেহ চোখে দেখে, সেই উপলব্ধি করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। দিবা রাত্রির অধিকাংশ সময়ই সে জ্বরে আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে, কিন্তু একটু সজাগ হইলেই ঘরের প্রতি বস্তুটি তন্ন তন্ন করিয়া চাহিয়া দেখে। নীলাম্বর শয্যা ছাড়িয়া প্রায়ই কোথাও যায় না, এবং, প্রায়ই সজল চক্ষে প্রার্থনা করে, "ভগবান্, অনেক শাস্তি দিয়াছ, এইবার ক্ষমা কর। যে লোক পরলোকে যাত্রা করিয়াছে, তাহার ইহলোকের মোহ কাটাইয়া দাও।" গৃহত্যাগিনীর এই নিদারুণ গৃহের আকর্ষণ দেখিয়া সে মনে মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিতে থাকে। দুই সপ্তাহ গত হইয়াছে। কাল হইতে তাহার বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। আজ সারাদিন ভুল বকিয়া কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সন্ধ্যার পর চোখ মেলিয়া চাহিল। পুঁটি কাঁদিয়া কাঁটিয়া পায়ের কাছে পড়িয়া ঘুমাইতেছে. ছোটবৌ শিয়রের কাছে বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'ছোটবৌ না?' ছোটবৌ মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,—"হাঁ দিদি, আমি মোহিনী।"

"পুঁটি কোথায়?" ছোটবৌ হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, "তোমার পায়ের কাছে ঘুমাচ্ছে।" "উনি কৈ?" "ও-ঘরে আহ্নিক ক'চ্চেন।" "তবে, আমিও করি" বলিয়া সে চোখ বুজিয়া মনে মনে জপ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ডান হাত ললাটে স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিল, তারপর ছোটবৌ'র মুখের পানে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "বোধ করি, আজই চল্লুম বোন্, কিন্তু, আবার যেন দেখা হয়, আবার যেন তোকেই এমনই কাছে পাই।" বিরাজের সময় যে একেবারে শেষ হইয়া আসিয়া-

ছিল কাল হইতে তাহা সকলেই টের পাইয়াছিল, তাহার কথা শুনিয়া ছোটবৌ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। বিরাজের বেশ জ্ঞান হইয়াছে। সে কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া চুপি চুপি বলিল, "ছোটবৌ, সুন্দরীকে একবার ডাক্‌তে পারিস্?" ছোটবৌ রুদ্ধস্বরে বলিল, "আর তাকে কেন দিদি? সে আস্‌বে না।"

"আস্‌বে রে, আস্‌বে। একবার ডাকা—আমি তা'কে মাপ ক'রে, আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই। আর আমার কারও ওপর রাগ নেই, কারও ওপর কোনও ক্ষোভ নেই। ভগবান্ আমাকে যখন ক্ষমা করেচেন, আমিও তখন সকলকে ক্ষমা ক'রে যেতে চাই।"

ছোটবৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এ আর ক্ষমা কি দিদি? বিনা অপরাধে এত দণ্ড দিয়েও তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল না—তিনি তোমাকেও নিতে বসেছেন। একটা হাত নিলেন, চোখ নিলেন, তবুও যদি তোমাকে আমাদের কাছে ফেলে রেখে দিতেন—"

বিরাজ হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"কি কর্‌তিস্ আমাকে নিয়ে? পাড়ায় দুর্নাম রটেছে—আমার বেঁচে থাকায় আর ত লাভ নেই বোন্" ছোটবৌ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "আছে দিদি। তা' ছাড়া ও ত মিথ্যে দুর্নাম,—ওতে আমরা ভয় করিনে।"

"তোরা করিস্‌নে, আমি করি। দুর্নাম মিথ্যে নয়, খুব সত্যি। আমার অপরাধ যত টুকুই হ'য়ে থাক্, ছোটবৌ, তারপরে আর হিঁদুর ঘরের মেয়ের বাঁচা চলে না। তোরা 'ভগবানের দয়া নেই বল্‌চিস্,' কিন্তু—" তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুঁটি উচ্ছ্বসিত কান্নার সুরে চেঁচাইয়া উঠিল—"ওঃ ভারী দয়া ভগবানের!" এতক্ষণ সে চুপ করিয়া কাঁদিতেছিল আর শুনিতেছিল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া অমন করিয়া উঠিল। কাঁদিয়া বলিল,—"তাঁর এতটুকু দয়া নেই, এতটুকু বিচার নেই। যারা আসল পাপী তাদের কিছু হ'ল না—আর আমাদেরই তিনি এমনই ক'রে শাস্তি দিচ্ছেন।" তাহার কান্নার দিকে চাহিয়া বিরাজ নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। কি মধুর, কি বুক-ভাঙ্গা হাসি! তারপর কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে বলিল,—"চুপ্ কর পোড়ামুখি চেঁচাস্‌নে।" পুঁটি ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"তুমি মর্'না বৌ'দি, আমরা কেউ সইতে পার্‌ব না। তুমি ওষুধ খাও—আর কোথাও চল—তোমার দুটি-পায়ে পড়ি বৌ'দি, আর দু'টা দিন বাঁ'চ।" তাহার কান্নার শব্দে আহ্নিক ফেলিয়া নীলাম্বর ত্রস্তপদে দ্বারের কাছে আসিয়া শুনিতে লাগিল, পুঁটির যা' মুখে আসিল সে তাই বলিয়া ক্রমাগত অনুনয় করিতে লাগিল। এইবার বিরাজের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িল। ছোটবৌ সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিয়া পুঁটিকে টানিয়া লইতেই সে তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া, সকলকে কাঁদাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে বিরাজ অবনত ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—কাঁদিস্‌নে পুঁটি, শোন্।" নীলাম্বর আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল, বিরাজের চৈতন্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে, তাহা সে বুঝিল। বিরাজ বলিতে লাগিল,—"না বুঝে তাঁর দোষ দিস্‌নে পুঁটি। কি সূক্ষ্ম বিচার, তবু, কত যে দয়া, সে কথা আজ আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। মরাই আমার বাঁচা, সে কথা আমি গেলেই তোরা বুঝ্‌বি। আর বল্‌চিস্—একটা হাত আর একটা চোখ নিয়েচেন, সে তা দু'দিন আগে পাছে যেতই। কিন্তু এইটুকু শাস্তি দিয়ে তিনি তোদের কোলে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েচেন, সেটা তোরা কি ক'রে ভুল্‌বি পুঁটি?" "ছাই ফিরিয়ে দিয়েচেন" বলিয়া পুঁটি কাঁদিতেই লাগিল। ভগবানের দয়া বা সূক্ষ্ম বিচারের একটা বর্ণও সে বিশ্বাস করিল না, বরং, সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে গভীর অত্যাচার ও অবিচার বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

খানিক পরে বিরাজ বলিল, "পুঁটি, অনেকক্ষণ দেখিনি-রে, তোর দাদাকে একবার ডাক্।" নীলাম্বর আড়ালেই ছিল, কাছে আসিতেই ছোটবৌ বিছানা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বর শিয়রে বসিয়া স্ত্রীর ডান হাতটা সাবধানে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া নাড়ী দেখিতে লাগিল। সত্যই বিরাজের আর কিছু ছিল না। সে যে জ্বরের উপর এত কথা বলিতেছে, এবং ইহারই অবসানের সঙ্গে খুব সম্ভব সমস্ত শেষ হইবে, তাহা সে পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল, এখন তাহাই বুঝিল। বিরাজ বলিল, "বেশ হাত

দেখ—" বলিয়াই হাসিল। সহসা সে মর্ম্মান্তিক পরিহাস করিয়া ফেলিল। এই উপলক্ষ করিয়াই যে এত কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা সকলেরই মনে পড়িয়া গেল। বেদনায় নীলাম্বরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিরাজও বোধ করি তাহা দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "না না, তা' বলিনি—সত্যিই বল্‌চি আর কত দেরী" বলিয়া চেষ্টা করিয়া নিজের মাথা স্বামীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া বলিল, "সকলের সুমুখে আর একবার তুমি বল, আমাকে মাপ করেচ ?" নীলাম্বর রুদ্ধস্বরে "করেচি" বলিয়া হাত দিয়া চোখ মুছিল। বিরাজ ক্ষণকাল চোখ বুজিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "জ্ঞানে, অজ্ঞানে, এতদিনের ঘরকন্নায়, কতই না দোষ ঘাট করেচি—ছোট-বৌ তুমিও শোন', পুঁটি, তুইও শোন্ দিদি, তোমরা সব ভুলে আজ আমাকে বিদেয় দাও—আমি চল্লুম" বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া স্বামীর পদতল খুঁজিতে লাগিল। নীলাম্বর মাথার বালিশটা এক পাশে সরাইয়া দিয়া উপরে পা তুলিতেই বিরাজ হাত দিয়া ক্রমাগত পায়ের ধূলা মাথায় দিতে দিতে বলিল, "আমার সব দুঃখ এতদিনে সার্থক হ'ল—আর কিছু বাকী নেই। দেহ আমার শুদ্ধ নিষ্পাপ —এইবার যাই, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি গে।" বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল,—"এমনই ক'রে আমাকে নিয়ে থাক, কোথাও যেওনা" বলিয়া নীরব হইল। সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সকলেই শুষ্ক মুখে বসিয়া রহিল। রাত্রি বারটার পর হইতে আবার সে ভুল বকিতে লাগিল। নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ার কথা—হাঁসপাতালের কথা—নিরুদ্দেশ পথের কথা—কিন্তু, সব কথার মধ্যেই অত্যুগ্র, একাগ্র পতিপ্রেম। মুহূর্ত্তের ভ্রম কি করিয়া যে সতী সাধ্বীকে দগ্ধ করিয়াছে শুধুই তাই।

এ কয়দিন তাহারই সুমুখে বসিয়া নীলাম্বরকে আহার করিতে হইত; সে দিন মাঝে মাঝে সে পুঁটিকে ডাকিয়া, ছোটবৌকে ডাকিয়া বকিতে লাগিল। তারপর, ভোর বেলায় সমস্ত ডাকা-ডাকি দমন করিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিল। আর সে চাহিল না, আর কথা কহিল না, স্বামীর দেহে মাথা রাখিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখিনীর সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া গেল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

তরঙ্গ-ভঙ্গে নাচিছে পদ্মা
সহস্র-শির-নাগিনী,
কল কল কল, ছল ছল ছল,
তুমি বুঝ তার রাগিণী।
শরৎ এসেছে সেফালী গন্ধে,
তব উপহার সাজায়ে,
নবীন ধানের মঞ্জরী লয়ে
কাশের গুচ্ছ দোলায়ে।

আমরা দাঁড়ায়ে সঙ্কোচ ভরে
তোমার সেবক দল,
কিবা উপহারে তোষিব তোমায়ে
কিবা আছে সম্বল!
দেবতার পূজা করে যথা, নর
দেবতার গড়াফুলে,
তোমারি সৃজিত পুষ্প ঢালিব
তোমারি চরণ-মূলে।

তোমারি ভাষ্য, তোমারি ভাব,
মোদের ভকতি-সাজি,
জাহ্নবী পূজা জাহ্নবী জলে
করিব আমরা আজি।

২

স্থান নাই পদে, স্থান নাই পদে,
কোথায় ঢালিব ফুল।
সাগর-পারের বিচিত্র ফুলে
ঢাকা যে চরণমূল!
কণ্ঠে, ও কি ও? স্থান রাখ নাই?
মালা পরাইব কোথা?
রাশি রাশি মালা কণ্ঠ ছাড়া'য়ে
ছুঁইয়াছে প্রায় মাথা!

বহুকাল পরে পেয়েছি তোমায়,
আসিয়াছি মোরা ধেয়ে,
আশা ছিল—সবে এই ফুলে দিব
তোমার চরণ ছেয়ে।
ফিরিব না—ওই প্রসাদী কুসুম
নিব মোরা ভাগ ক'রে,
আমাদের এই পুষ্প ঢালিব
তোমার চরণ প'রে।
চক্ষে, বক্ষে কণ্ঠে, বাহুতে,
ঢালিব সকল গায়,
পায় যেন স্থান সকল পুষ্প
তোমার রাজীব-পায়।

শ্রীহীরালাল সেনগুপ্ত।

লৌহ-সেতু

প্রচলিত ভাষায় "খিলান" (arch) কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন, এবং তাহা কিরূপে তৈয়ারী হয় তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা প্রথমে রোমীয়গণ কর্তৃক (Romans) আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মন্দিরের বেদী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে খিলান ব্যবহৃত হইত—কিন্তু সেতু-নির্ম্মাণে এবং ইমারত প্রস্তুত করণে ইহা কবে প্রথম ব্যবহৃত হয়, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। রোমের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল, আজিও তাহারা অনেক স্থলে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া নির্ম্মাতার কৌশলের পরিচয় দিতেছে। গত শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত স্থায়ী ও শক্ত সেতু নির্ম্মাণে ইট এবং পাথরের "খিলান"ই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শতাব্দীতেও অনেকগুলি সুন্দর সেতু পাথরের "খিলানে"ই প্রস্তুত হইয়াছে। Thamesএর উপর যে London Bridge ও Waterloo Bridge—আছে তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাদের প্রত্যেকটিতে অনেকগুলি বড় পরিসরের (span) খিলান আছে; ইহাদের পরিসর প্রায় ১৫২ ফুট ও ১২০ ফুট। ২০০ ফুটের অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আর কোন পাথরের খিলান নাই। গত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঢালাই (cast) লৌহ খিলান-আকৃতিতে গঠন করিয়া খিলানের জন্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু পিটাই (wrought) লোহার আমদানী হওয়ার পর হইতে সেতু নির্ম্মাণে এক নূতন যুগ আসিয়াছে। লোহা (পিটা এবং ঢালাই) সেতু নির্ম্মাণে কিরূপে সাহায্য করে তাহা বুঝিতে হইলে তাহার দ্রব্যগুণ (Properties of matter) সম্বন্ধে কএকটি কথা জানা প্রয়োজন। 'খিলান' যে কিরূপ কার্য্যে আসে তাহা মোটামুটি হিসাবে অনেকটা বুঝিয়া লওয়া যায়, কিন্তু তাহার আকৃতি (curvature) এবং গঠনপ্রণালী (architectural peculiarities) বিশেষ করিয়া বুঝিতে গেলে উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। তাহা নিষ্প্রয়োজন এবং সে সম্বন্ধে কেহ এখন বিশেষ যত্নবান্ ন'ন।—আমাদের

দেশে রাজমিস্ত্রিরা অভ্যাসবশতঃ কতকগুলি বাঁধা আকারে খিলান প্রস্তুত করে; এবং ইহার শক্তি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া লয়। কিন্তু তাহার মধ্যে যথেষ্ট বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সম্বন্ধে আর বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলাম না।

সেতু-নির্ম্মাণে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করা হয়—তাহাদের দুইটি গুণ থাকা দরকার। সমস্ত যন্ত্র নির্ম্মাণে এই গুণের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই গুণ দুইটির মধ্যে প্রথমটি স্থিতি-স্থাপকতা, (Elasting tenacity) এবং আর একটি ভার সহ্য করিবার ক্ষমতা (compressibility)। একটি দড়ীতে অথবা লোহার তারে যদি কতকগুলি ভার (weights) ঝুলান হয় তবে দড়ীটি একটু লম্বা হয়, এবং ভারগুলি ক্রমশঃ বেশী করিলে তাহা শেষে ছিঁড়িয়া যায়, যে ভারে (Breaking weight) এই দড়ীটি ছিঁড়িয়া যাইবে তাহার দ্বারা দড়ীর স্থিতিস্থাপকতার (Tenacity) পরিচয় পাওয়া যাইবে। একখানি ইটের উপর যদি সেইরূপে ক্রমশঃ ভার চাপান যায়, তবে যে ভারে ইহা গুঁড়া হইয়া যাইবে তদ্দ্বারা ইহার ভার সহ্য করিবার ক্ষমতা জানা যাইবে। কিন্তু ইটের এই ক্ষমতা এত অধিক যে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চের উপর যদি ১০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চাপ (pressure) পড়ে তাহাতে তাহার কিছু হইবে না। একটি বড় চিম্‌নির নিম্ন স্তরের ইটগুলি কিরূপে সমগ্র ভার সহ্য করে, তাহা দেখিলেই ইহা বোঝা যাইবে। কিন্তু ইটের স্থিতি-স্থাপকতা (Tenacity, টান পড়িলে দড়ীর মত তাহার সহ্য করিবার ক্ষমতা) খুবই কম। সেই জন্য খিলান প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে ইট ব্যবহার করিতে অনেক অসুবিধা হয়। ঢালা (cast) লোহা ইটের ন্যায় ভার সহ্য করিতে সমর্থ; কিন্তু উহা বেশী টান (Tension) সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু পিটাই (Wrought) লোহা টান (Tension) সহ্য করিতে পারে; তবে সেই অনুপাতে ভার সহ্য করিতে পারে না। এই সব কারণে ভাল সেতু নির্ম্মাণ করিতে এই তিন রকম পদার্থই ব্যবহৃত হয়—থাম প্রভৃতি করার জন্য ইট—রাস্তা প্রভৃতির জন্য (যেখানে ভার বেশী পড়ার সম্ভব) ঢালা লোহা—এবং নানাবিধ সংযোগ প্রভৃতি করার জন্য (যেখানে টান পড়ার সম্ভব বেশী) পিটাই লোহার ব্যবহার হয়।

কার্য্যকালে যখন এই সব দ্রব্য ব্যবহৃত হয় তখন ইহাদের উপর সোজাভাবে চাপ ও টান ভিন্ন, বিবিধ দিক্ হইতে বিবিধ শক্তি (forces) ক্রিয়া করে। তবে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সমগ্র শক্তিগুলিকে চাপ একদিকে ও টান অন্য দিকে (rectangular directionsএ) পর্য্যবসিত করে। অধিকন্তু অপর একপ্রকার শক্তি তাহার উপর ক্রিয়া করে। এইরূপ ক্রিয়ার ফল অনেকটা পাশ হইতে স্ক্রুপের মত 'মোচড়' খাওয়ার মত (wrench on a screw); ইংরেজিতে ইহাকে Twist বা Tension বলে। এই সব শক্তির ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে জিনিষটি (যাহার উপর ক্রিয়া করে) বক্র হইয়া যাইতে পারে (curved, bent), অথবা তাহার কিয়দংশ আর কতক অংশের উপর সরিয়া (slide) যাইতে পারে; এরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়া ভাঙ্গিয়াও (Rupture) যাইতে পারে। শক্তির ক্রিয়া অনুসারে সেতুকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—

(১) Arched Bridges—'খিলান'-সমন্বিত সেতু; সোন নদীর উপর যে সেতু আছে তাহা ও মহানদীর উপর যে সেতু আছে (?) তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা সাধারণতঃ ইট ও পাথরের খিলান দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাদের উপর চাপ-শক্তির (Pressure) ক্রিয়া বেশী।

(২) ঝুলান সেতু—Suspension Bridges. উদাহরণ যথা,—ঢাকার বুড়ী গঙ্গার সেতু Cliften Bridge, Brooklyn Bridge প্রভৃতি। রাস্তার ও তাহার উপরের দ্রব্যাদির ভার দড়ীর ও তারের টান রূপে পরিবর্ত্তিত (Transformed) হইয়া যায়।

(৩) Girder Bridges—এইগুলি অনেক প্রকারের—Tubular, Trussed; Latticed ইত্যাদি; নানারূপ লোহদণ্ড ও বর্গার সংযোগে এইগুলি রাস্তাকে দৃঢ় করিয়া থাকে। এইগুলিতে চাপ, টান, 'মোচড়ান' সব রকম শক্তিরই ক্রিয়া হইয়া থাকে।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, যে সব স্থলে ইট ও পাথরের পরিবর্ত্তে লোহাকে "খিলান" আকারে বসান হয়, সেখানেও
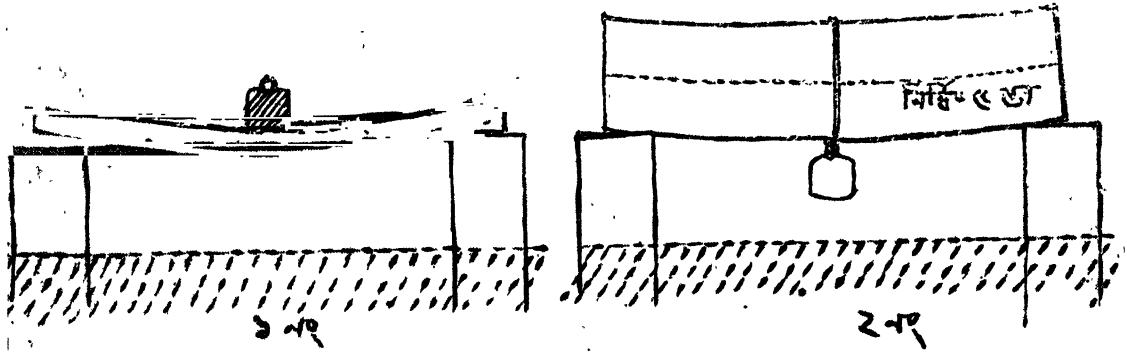
শুধু চাপ ও টান ভিন্ন আরও অন্যান্য শক্তি ক্রিয়া করে। ইহাও সেতু-নির্ম্মাণে একটি বিবেচ্য বিষয়।

তৃতীয় শ্রেণীর সেতুতে কিরূপ দ্রব্যের উপর শক্তির ক্রিয়া হয় তাহা সহজে দেখান যায়। বাস্তবিক শক্তি (force) অণুর (particle) উপর ক্রিয়া করে সে জন্য যেখানে অণুসমষ্টি একত্র হইয়া একটি পদার্থ হয় সেখানে পদার্থের উপর শক্তির ক্রিয়া, অণুগুলির উপর যে ক্রিয়া করে সেইরূপ হইবে। তবে প্রভেদ এই যে, শক্তির জন্য অণুর গতি হয়; কেননা গতিই শক্তির ধর্ম্ম (forces tend to produce motion)। পদার্থের উপর শক্তির ক্রিয়া

হইলে তজ্জন্য তাহার আকার পরিবর্ত্তিত হয় (a change of configuration)। মনে করুন (পার্শ্বের ১ নং ছবি দ্রষ্টব্য) ২টি দণ্ডের (standএর) উপর একখানি তক্তা সমান্তরাল ভাবে (flat) রাখা হইয়াছে। এই তক্তাটি নিজের ভারে আপনিই মধ্যস্থলে একটু নুইয়া (Bent in the middle) পড়িবে। তাহার মধ্যখানে একটি ভার রাখিলে তাহার এই বক্রভাব আরও স্পষ্ট হইবে। পার্শ্বের চিত্র হইতে দেখা যাইবে যে, তক্তাটি বক্র হওয়ার জন্য তাহার নিম্নস্তরগুলি (lower layers) প্রসারিত হইয়াছে, এবং উপরের ভাগটি সঙ্কুচিত হইয়াছে। কাজেই উপরি ভাগে ও নিম্নভাগে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া হইতেছে—উপরে চাপশক্তি (Resistance to compression) এবং নিম্নে টান শক্তি (tension of fibres)। তক্তার মাঝামাঝি স্থানে একটি স্তর (সূক্ষ্ম বিন্দুনির্ম্মিত রেখাদ্বারা দেখান হইয়াছে) আছে, সেটি আদৌ সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয় নাই। শুধু বক্র হইয়াছে—ইহাকে আমরা 'নির্ব্বিকার' স্তর (neu-

tral layer) বলিব। এই নির্ব্বিকার স্তরের আকার (curvature) এবং স্থিতির (distance from the ends) উপর শক্তির ক্রিয়ার তারতম্য নির্ভর করে। তক্তাটি ওরূপ না রাখিয়া যদি সোজাভাবে (vertical) রাখা যায় তাহা হইলেও তক্তার মধ্যে এই সব শক্তির ক্রিয়া, ও স্তরের অবস্থা (arrangement of layers) বিদ্যমান থাকিবে। তবে তাহার বক্রভাবটি কিছু কম হইবে মাত্র। ২নং চিত্র হইতে দেখা যাইবে যে, এখানে নির্ব্বিকার স্তরটি দুই ধার হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু দূরে অবস্থিত। সেই জন্য যে চাপে ১নং ছবির তক্তাটি ভাঙ্গিয়া যায়, তদনুরূপ বা তদপেক্ষা বেশী চাপ পড়িলেও এবার তাহা সহ্য করিতে পারিবে। ইহার জন্য বিশেষ কিছু প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়াও ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে। ৩নং চিত্রে যে vertical তক্তার sectional view দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে আমরা কএকটি তথ্য পাইতে পারি। নির্ব্বিকার স্তরের উপর নিজের চাপ (weight, superincumbent weight) ভিন্ন আর কোন শক্তি ক্রিয়া করে না। কাজেই ইহা যদি প্রস্থে (Breadth)এ সহজেই অনুমিত হইতে পারে (৪নং চিত্র লোহার বর্গার আকৃতি)। লোহার বর্গার আর একটি বিশেষত্ব আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ইহার নিম্নভাগটি উপরিভাগ হইতে দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় গুণ বড়। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, বর্গা সাধারণতঃ ঢালাই (cast) করা হয়, এবং ঢালা লোহার চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার টান শক্তি অপেক্ষা ছয় গুণ অধিক। নিম্নে যে টান পড়িবে এবং উপরে চাপ পড়িবে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বর্গার উপরিভাগ যদি মোটা করা যায় তবে বর্গাটি একটু দুর্ব্বল হওয়া সম্ভব। কারণ মোটা ভাগের ওজন নিম্নভাগের উপর টান-শক্তির সহায়তা করিবে এবং তজ্জন্য বর্গাটি অপেক্ষাকৃত বেশী সহ্য করিতে পারিবে না। ৫নং চিত্রে রেলের লাইনের উপরিভাগ মোটা; ইহার কারণ বোধ হয় যে, লাইনের নীচের কাঠের (sleepers) মধ্যে ব্যবধান কম—নীচের স্তরের সহিত কাঠের সংযোগ আছে বলিয়া, তাহার টানশক্তি সহ্য করিতে কাঠ অনেক সাহায্য করে। এই সকল কারণে লাইনের (Rails) নিম্নভাগ বেশী মোটা না হইলেও
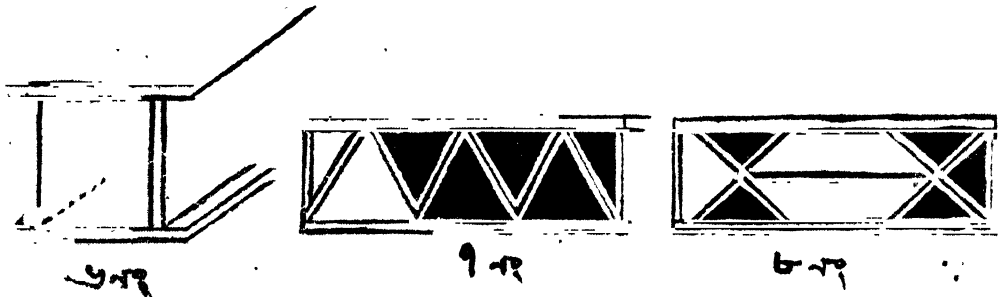
সূক্ষ্ম হয় তাহাতে তক্তাটির উপর শক্তি ক্রিয়ার কোন ক্ষতি হইবে না। উপরিভাগ ও নিম্নভাগ সংযুক্ত থাকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া নির্ব্বিকার স্তরের পার্শ্বস্থ কাঠখানিকে বাদ দিয়া দিতে পারি। (৩নং চিত্রে সূক্ষ্ম রেখাতে তাহার সীমা দেখান হইয়াছে; রেখাবহুল (shaded) স্থানটি বাদ দেওয়া যাইতে পারে)। লোহার বর্গা সাধারণতঃ যে আকৃতির দেখা যায় তাহার কারণ ইহা হইতে ক্ষতি নাই। উপরে শুধু চাপ সহ্য করিতে হইবে বলিয়া সেই অংশটি মোটা হওয়া আবশ্যক। বাক্স আকৃতিতে (৬ নং চিত্র) যদি বর্গা সংযোগ করা যায়, তবে নিম্নভাগের উপর ভার পড়িলে তাহা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইবে এবং সহজেই বর্গা তাহা সহ্য করিতে পারিবে। -পিটাই লোহা নানারূপ বর্গা আকৃতিতে করা হয়; এবং বাক্স আকারে বর্গা সজ্জিত করিয়া সেতু নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অনেক Tubular Bridge এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে।

কিরূপে বর্গাগুলিকে বিভিন্নভাবে সজ্জিত করা হয় এবং শক্তির ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের সংযোগ ও গঠন কিরূপে দেখিতে হয়,তাহা ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে। এখন কএকটি বিখ্যাত সেতুর বিবরণ ও তাহার কল-কৌশলের যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) Girder Bridges.

৭ নং চিত্রে লোহার বর্গার যেরূপ সংযোগ দেখান হইয়াছে, তাহাকে 'Girder' বলে। এই গার্ডারসংযোগ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। ছবিতে তাহার ২।১টি দেখান গেল। (৮ ও ৯ নং চিত্র)

আজকাল প্রায় সকল সেতুই এই প্রণালীতে (arrangement of Girders) প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখন সারা-সময় তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহার অন্যান্য বিশেষত্ব দূর হইতে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন কি না জানি না। তবে কিরূপে গার্ডারগুলি বসান হইতেছে তাহাও বোধ হয় তাঁহারা দেখিয়াছেন। যাহা হউক, এই সেতু-নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে দেখিতে কিরূপ হইবে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। গার্ডার-সেতুর ছোট একটি উদাহরণ বুঝিলে বোধ হয়, উহার প্রস্তুত করার কৌশল অনেকটা বুঝা যাইবে। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের আসাম লাইনে তিস্তা ষ্টেশনের নিকট তিস্তা নদীর উপর যে সেতু আছে, তাহা বোধ হয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। কথিত আছে যে, এই সেতুতে এখানে প্রথম পিটাই লোহার (wrought iron) গার্ডার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা লম্বায় প্রায় ১ মাইলের কিছু কম হইবে। ১২টি থাম

৯ নং

৮ নং
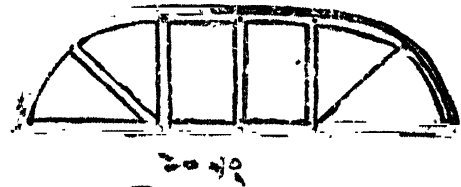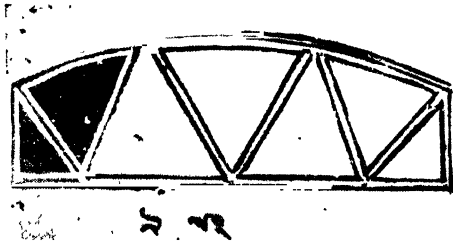
ঘাট ও দামুকদিয়া ঘাটের মধ্যে পদ্মার উপর যে বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাও এইরূপ গার্ডার সম্বলিত। অনেকে হয় ত পার ঘাটের ষ্টীমারে যাতায়াত করিবার জল হইতে উঠিয়াছে এবং তাহার দুই থামের মধ্যে যে গার্ডার আছে, তাহাও সাদাসিদে রকমের। সেতুর রাস্তাটি corrugated iron দ্বারা মণ্ডিত।

১১ নং
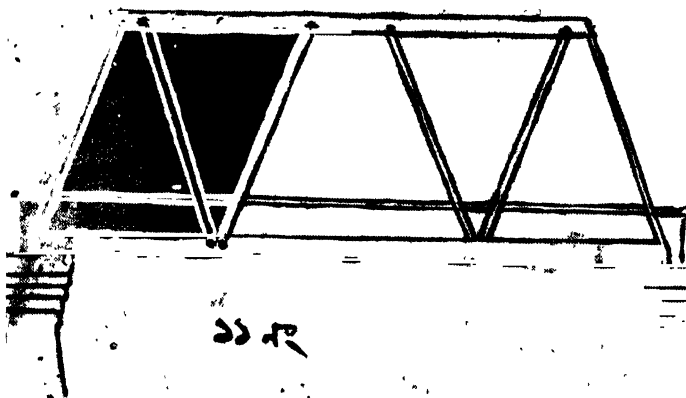
উপরে দুই পার্শ্বের গার্ডার নানারূপ দণ্ড দ্বারা (cross rods and horizontal rods) সংযুক্ত আছে। রাস্তার নীচেও বর্গাগুলি (supporting beams) সেইরূপ শক্ত করিয়া গ্রথিত আছে। ছবি হইতে দেখা যাইবে যে, নীচের বর্গার উপর ট্রেণ যাইবার সময় যে চাপ পড়ে তাহা সংযুক্ত বর্গাগুলিতে টান ও চাপ ভাবে প্রকাশিত হয়, এবং উপরকার বর্গাটি এবং পার্শ্বের দুইটি দণ্ড সমস্ত গার্ডার ভার বহন করে এবং connecting rods এর টান ও চাপের সহায়তা করে। সারাঘাটের সেতুতে যে গার্ডার নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার প্রতিকৃতি ১২ নং ছবিতে দেওয়া গেল।
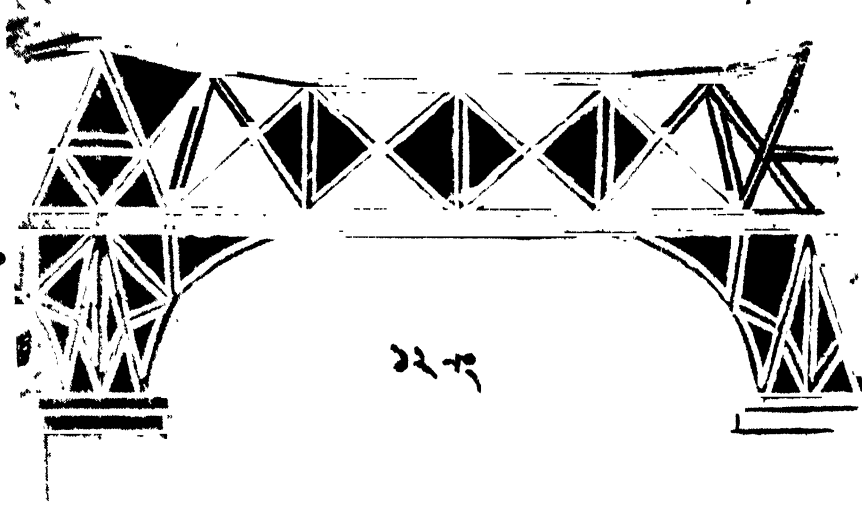
ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইবার সুবিধা না হওয়ায় অনেকটা আন্দাজে frameworkটি অঙ্কিত হইল। আশা করি, তজ্জন্য কেহ ত্রুটি লইবেন না। বোধ হয় সারার সেতুটি ফোর্থ নদীর উপর যে বৃহত্তম সেতু আছে, তাহারই মত Cantilever Principleএ তৈয়ারী হইবে। নানা রকমের গার্ডার সেতুর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। তবে একটি বিষয় এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল। গার্ডারের মত বর্গার সংযোগ না করিয়া যদি উপরের বর্গা ও নীচের বর্গা পাত ইস্পাত (Sheet rion) দ্বারা সংযোগ করিয়া দেওয়া যায়, তবুও এই Girder Principle অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সেই জন্য অনেক সেতুতে (উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে E. B. S. Ryএর আলমডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকট যে একটি সুন্দর সেতু অল্প দিন হইল তৈয়ারী হইয়াছে) শুধু দুইধারে দুইটি বৃহদায়তনের steel joist আছে এবং তাহার সহিত নানারূপ Rivetment দ্বারা নীচের রাস্তাটি দৃঢ় আবদ্ধ আছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে এই Beamএর Principle হইতে Girder Principle উদ্ভূত হইয়াছে অথবা Girder হইতে Beam উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক Girder principleএর আর কএকটি দৃষ্টান্ত বোধ হয় পাঠকের বিরক্তিজনক হইবে না।

(১) Britannia Bridge.—ইহার Section চতুষ্কোণবিশিষ্ট নলের মত, অথবা একটি বাক্সের দুইপাশ যদি খুলিয়া ফেলা হয়, তবে যেরূপ দেখিতে হয় সেরূপ। ইহার উপরে, নীচে, পার্শ্বে অসংখ্য horizontal beams সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে নদীর মধ্য হইতে তিনটি থাম (Pillar and tower) উঠিয়াছে। নদীর তীরে পাথরের সুদৃঢ় গাঁথনী রহিয়াছে। এই সেতুর frame work আগে মাটীতে তৈয়ারী করা হয়, পরে hydraulic pressureএ তাহাকে উপযুক্ত স্থানে বসান হয়। সেই জন্য ইহা প্রস্তুত করিতে অনেক কৌশল লাগিয়াছে। সে সব বিশদভাবে এখানে বুঝান নিষ্প্রয়োজন। নিম্নে তাহার চিত্র প্রদত্ত হইল।
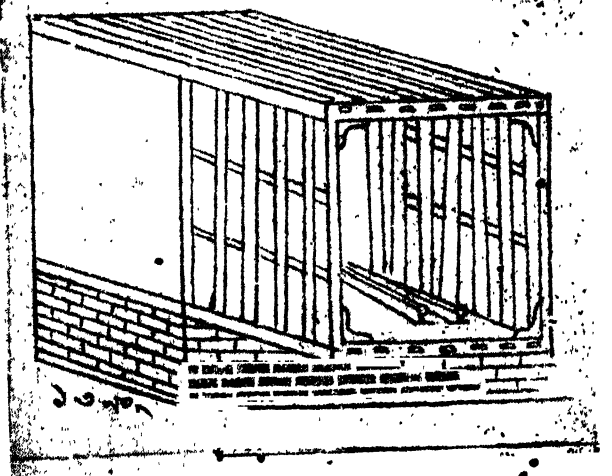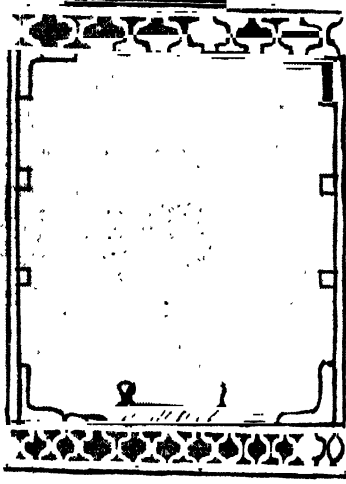
(২) Cantilever Bridges :—Scotlandএ ফোর্থ নদীর উপর যে সেতু আছে, তাহা অপেক্ষা বৃহদায়তন (wide spanned) সেতু পৃথিবীতে আর নাই। ইহাতে প্রথম Cantilever principle এবং Central girder principle ব্যবহৃত হয়। ইহার পূর্ব্বে যে তাহা হয় নাই, তাহা বলা যায় না, কারণ অনেক স্থলে কাঠের সেতুতে এই Principle ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে। এই Principleটি সুন্দরভাবে উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। মনে করুন (১৫ নং চিত্র) দুইজন লোক পাশাপাশি দুইখানি চেয়ারে বসিয়া আছে। তাহারা দুই হাতে দুইটি দণ্ড ধরিয়া আছে। দণ্ডগুলি চেয়ারের সহিত আবদ্ধ আছে। তাহাদের প্রসারিত হস্তদ্বয়ের মধ্যে ক, খ চিহ্নিত যদি একটি দণ্ড ঝুলাইয়া রাখা যায়, তবে সমস্ত বিষয়টি Cantilever principleএর উদাহরণ হইবে। মানুষ দুইটি যেরূপভাবে বসিয়া ও দণ্ড ধরিয়া আছে, তাহাকে (চ, ছ চিহ্নিত অংশ হইতে ক, খ চিহ্নিত পর্য্যন্ত) Cantilever বলে এবং মধ্যে যে দণ্ডটি, ঝুলিতেছে তাহাকে Central girder বলে। মধ্যের গার্ডারটি শুধু ঝুলিতেছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ছবিটি দেখিলে বুঝা যাইবে যে, তাহার উপর যেরূপ চাপই পড়ুক না কেন, তাহা সর্ব্বশেষে Cantilever arrangementএর উপরই পড়িবে। এই Cantilever arrangement হইতে কিরূপে Cantilever Bridge উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা ১৬ নং চিত্র দর্শনে সহজেই বুঝা যাইবে

ফোর্থ নদীর উপর এই সেতু লম্বায় প্রায় ৮১০০ ফুট (প্রায় ১৷৷০ মাইল)। ইহাতে তিনটি Cantilever ও দুইটি Central girder আছে। ইহার sectional আকৃতি অনেকটা ১৬নং চিত্রের ন্যায়। নদীর তীরে কিছু দূর পর্য্যন্ত viaduct (মোটা থামের উপর রাস্তা বসান) আছে। ইহার আরও অনেক বিশেষত্ব আছে, সেগুলি বেশী technical বলিয়া উল্লেখ করিলাম না; ছবিতেই দেখা যাইবে যে, Cantileverটি দেখিতে তত symmetrical নয়। তাহার কারণ এই যে, এক দিকে যেমন Central girderএর ওজন Cantileverকে বহন করিতে হইয়াছে, সেইরূপে তাহাকে Stable করার জন্য অন্য দিকে Structureটি একটু বেশী করা হইয়াছে এবং তাহা মাটীতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত আছে।

১৬ নং
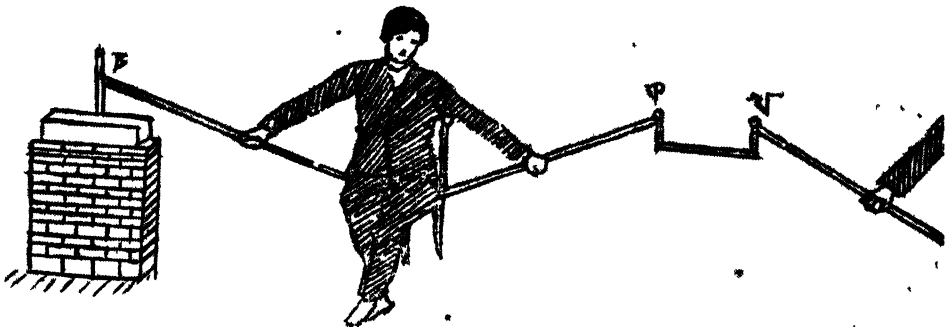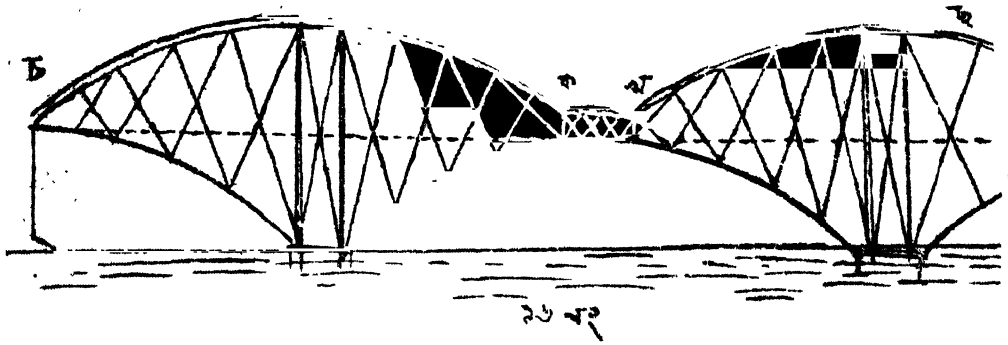
ইহার থামগুলি কিরূপে জল হইতে তৈয়ারী করা হইয়াছে, girder jointsগুলি কিরূপে প্রস্তত হইয়াছে এবং তাহাদের বিশেষত্ব কি, সে সব এখানে বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। রাস্তাটি সেতুর সহিত দৃঢ় আবদ্ধ না থাকিয়া Cantilever হইতে ঝুলানভাবে সংযুক্ত আছে। তাহার কারণ উত্তাপের জন্য গার্ডারগুলি প্রসারিত হইবে, তাহাতে যেন রাস্তার কোন ক্ষতি না হয়। এই Cantilever সেতুর বিশেষত্ব এই যে, ইহার Span ইচ্ছামত বড় করা যায় এবং যে সব স্থানে নদীতে বেশী থাম তৈয়ারী করা কঠিন, সেখানে এইরূপ সেতু করাই প্রশস্ত। আজকাল আমেরিকার বৃহৎ সেতুগুলি এই Principleএ তৈয়ারী হইতেছে এবং একজন Engineer দেখাইয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে Srait of Doverএ একটি Cantilever Bridge হইতে পারে; তাহাতে ৭০টি span থাকিবে, এবং তৈয়ারী করিতে খরচ প্রায় ৩৪০ লক্ষ পাউণ্ড পড়িবে। নানারূপ অন্তর্জাতিক সমস্যা (international questionsএর) জন্য আপাততঃ ইহা স্থগিত আছে।

(৩) The Tower Bridge London :—লণ্ডনে টেম্‌স্ নদীর উপর দৈনিক এত লোক চলাচল করে যে, ষ্টীমার ও জাহাজের যাতায়ত বন্ধ না করিয়া কিরূপে লোক-চলাচল অক্ষুণ্ণ রাখা যায়,তাহারই চেষ্টাতে অনেক রকম সেতু করার প্রস্তাব হইয়াছিল। নানারূপ গবেষণার পর স্থির হয় যে, এখন যেরূপ Tower Bridge আছে, তাহাই নির্ম্মিত হউক। ইহার বিশেষ বিবরণ দ্বারা আর প্রবন্ধ দীর্ঘ করিতে ইচ্ছা করি না। ইহার বিশেষত্ব এই যে, জলের মধ্যে দুই বৃহৎ পাথরের Tower তৈয়ারী করা হয়; দুই দিকে তীর হইতে একটি Tower পর্যান্ত ঝুলান সেতু—তীরে খানিক দূর খিলান সেতু (খিলানের মধ্য দিয়া রাস্তা) এবং দুই Towerএর মধ্যে ৩ইটি সেতু থাকে। একটি জলের কিছু উপরে (প্রায় ৩১ ফুট),—draw-bridge বা Bascule-ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। ষ্টীমার যাওয়ার সময় তাহা ভাঙ্গিয়া Towerএর গাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া যায় এবং আর একটি সেতু (Girder Structure)—Towerগুলির উপরিভাগে সংলগ্ন রহিয়াছে। যখন Draw-bridge মুড়িয়া রাখা হয়,তখন উপরের সেতুটি ব্যবহৃত হয়। Draw-bridge মুড়িয়া রাখার জন্য নানারূপ কল-কৌশল আছে। খুব অল্প সময়েই তাহা জুড়িয়া দেওয়া অথবা মুড়িয়া রাখা যায়। Towerএর দুই পাশে তীর পর্য্যন্ত যে ঝুলান সেতু (Suspension Bridge) আছে, তাহা একটি শক্ত গার্ডার হইতে নানারূপ তার দ্বারা ঝুলান। আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে যথা সম্ভব Engineering Skillএর সহিত architectural beautyর সংযোগ হইয়াছে। নিম্নে ইহার (১৭ নং চিত্র) 'Elevation' আকৃতি দেওয়া গেল। চিত্র হইতে ইহার অনেক বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে; বিশেষ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। এই Tower Bridge ভিন্ন Londonএ আরও অনেক সেতু আছে। Westminister Bridge, London Bridge, Waterloo Bridge, ইত্যাদি।

(৪) Pontoon Bridge :—ইহা ঠিক Girder Principleএর উদাহরণ নয়। বরং নদীর মধ্যে থাম না দিয়া বা খিলান না করিয়া কাঠের দণ্ড ও বর্গা দ্বারা সেতু-টিকে স্থানানুযায়ী রাখা হইয়াছে। কলিকাতা ও হাবড়ার
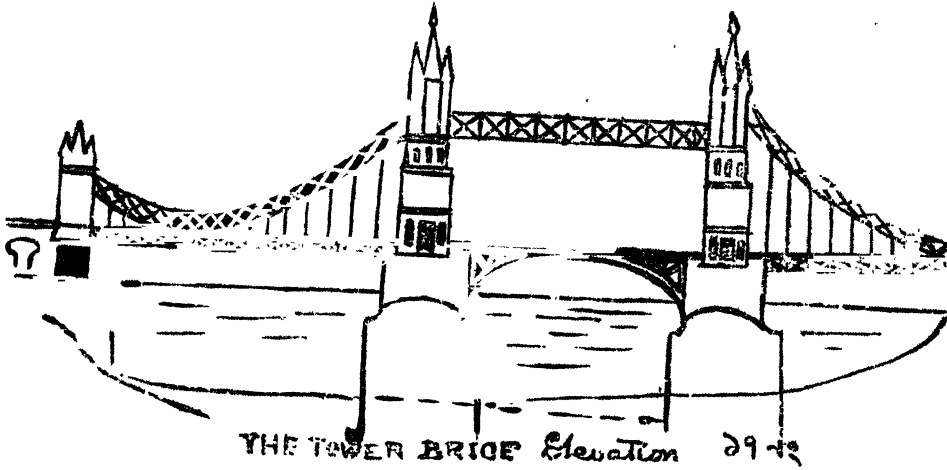
মধ্যে যে সেতু আছে, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সে জন্য Pontoon Bridgeএর আর কোন বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। নৌকার আকৃতি করিয়া কতকগুলি বয়া (Buoy) তৈয়ারী করা আছে। তাহার উপর সেতুটি দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদিগকে Pontoon বলে। ইহা দেখিতে বেশ সুন্দর; কারণ সেতুর নিম্নভাগে যত অপরিষ্কার কাঠের frame থাকে সেতুর উপর বেশ পরিষ্কৃত। তবে ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, জোয়ারের সময় অথবা বর্ষাকালে Pontoonগুলি জলের উপরিভাগে থাকাতে সেতুটি ধনুকাকৃতি হয়, এবং গাড়ী-চলাচলের পক্ষে অনেক সময় বিপজ্জনক হয়। আরও, ধনুকাকৃতি হয় বলিয়া সেতুটি দৃঢ় হইতে পারে না। এই সকল কারণে হাবড়ার পুলটি বদ্‌লাইয়া একটি Girder Principle ও draw-Bridge সমন্বিত সেতু করার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার design ও contract সম্বন্ধে এখন কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

(৫) Mathematical bridge—ইহার সাধারণ নাম কি, তাহা আমি জানি না। ইহা সাধারণতঃ Drawbridge সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, এবং ছোট ছোট কাজের জন্য দরকার হয়। ইহার বেশী প্রচলন নাই। তবে অঙ্কশাস্ত্র হিসাবে ইহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। সে জন্য এখানে তাহা উল্লেখ করিলাম। পার্শ্বের ছবিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, একটি Girder structure একটি horizontal pivotএর উপর ঘুরিতে পারে এবং অন্যদিকে দড়ী লাগাইয়া তাহা কপিকল দ্বারায় একটি ভারের সহিত যুক্ত আছে (১৮নং চিত্র); এই ভারটি একটি mathematical curve of the fourth degreeর উপর সহজে চলিতে পারে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, সেতুর উপরে যত ভারই পড়ুক (within limits) না কেন, সেতুটি আপনা আপনি Stable Equilibrium অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ইহা বেশী বড় আয়তনের করা যায় না।

২—ঝুলান সেতু (Suspension Bridges) ছোট ছোট Culverts প্রস্তুত করিতে অনেক সময় দুইটি স্থানে শুধু একটি তক্তা দ্বারা সংযোগ করিতে দেখা যায়। তক্তাটি মধ্যে খানিক নুইয়া পড়ে। সমান উঁচুতে দুইটি স্থান যদি একটি শক্ত দড়ি দ্বারা সংযোগ করা যায়, তবে এই দড়ী হইতে উপরোক্ত তক্তাখানি ঝুলাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করা যাইতে পারে; কিন্তু দড়ি নিজের ভারে নিজে বক্রভাব (Catenary form) ধারণ করে, এবং তাহাকে সোজাভাবে (horizontal) টাঙ্গান যাইতে পারে না। দড়ীর দ্বারা রাস্তাটি ঝুলাইলে তাহার বক্রভাব রাস্তার উপর কোন প্রতিবন্ধক ক্রিয়া করিবে না। ঝুলান সেতুতে সেইজন্য দুইটি উচ্চ স্থান হইতে দুইটি শক্ত তার (সাধারণতঃ লোহার অনেকগুলি তার দড়ীর আকারে পাকাইয়া লওয়া হয়) টাঙ্গান হয় এবং তাহা হইতে নানারূপ তার দ্বারা রাস্তাটি ঝুলাইয়া রাখা হয়। সেতুর নীচে কোনরূপ থামের প্রয়োজন হয় না। তার আটকাইয়া
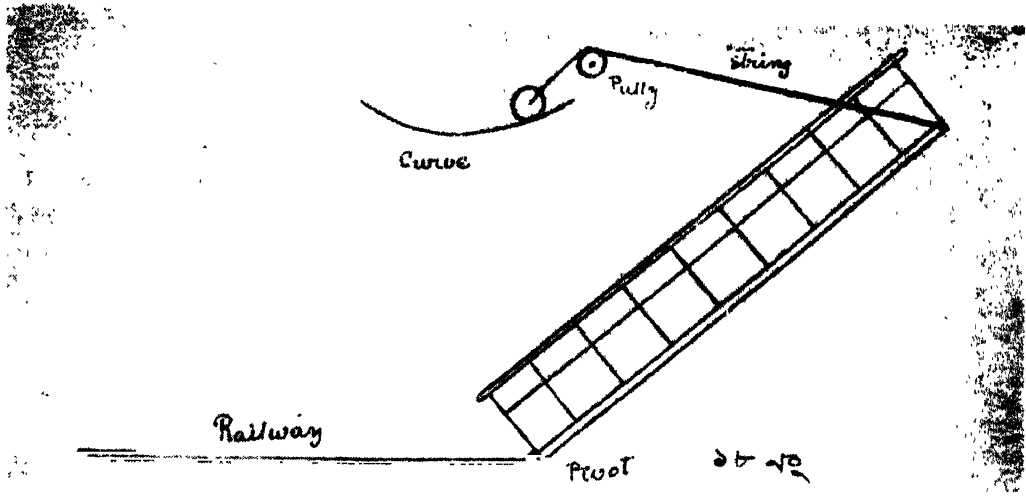
রাখিবার জন্য একেবারে শেষে দুইধারে পাথরের Tower তৈয়ারী করা হয়। তারগুলিকে শক্তভাবে আটকাইয়া রাখিবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। সেতুটির সমগ্রভার তারের উপর পড়ে, তবে তাহার শক্তি কিছু কমাইবার জন্য সেতুটি একটু বক্রভাবে করা হয়। তাহাতে রাস্তার ভার সেতুর শেষভাগে চাপরূপে কিছু পরিণত হয়। নায়েগ্রা প্রপাতের উপর এবং Brooklyn নদীর উপর যে ঝুলান সেতু আছে, তাহা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঝুলানসেতুর সবগুলির আকার প্রায় একই রকম। নীচে তাহার একটি প্রতিকৃতি দেওয়া গেল। ১৯নং চিত্রে মোটামুটী Principle বুঝাইবার জন্য এবং ২০ নং চিত্রে Brooklyn bridgeএর একটি Elevation দেওয়া গেল। আশা করি, চিত্র হইতে ইহার মোটামুটী কার্য্যকলাপ বুঝিতে পারা যাইবে। যে সব স্থলে নদীতে থাম প্রোথিত করা যায় না, বা তাহা প্রোথিত করা জাহাজ প্রভৃতির জন্য সুবিধাজনক নয়, সে সব স্থলে এইরূপ সেতুই প্রশস্ত। দুইটি পাহাড়ের মধ্যে এই সেতু প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এইরূপ সেতুর এক অসুবিধা এই যে, বেশী ঝড় সেতুটিকে নীচু হইতে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, কাজেই সেতুটি রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। ঝড়ের শক্তি নিবারণ করিবার জন্য অনেকরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে। তবুও অন্যান্য সেতু অপেক্ষা ইহা এ বিষয়ে একটু দুর্ব্বল।

৬—Arched bridges and hydrostatic bridge পাথরের বা ইটের খিলান প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর রাস্তা বসাইয়া যে সেতু হয়, তাহার দৃষ্টান্ত কিছু বিরল নহে। ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল লোহা ও ভাল রকমের Steel Joistএর আবিষ্কার হওয়ায় এই খিলানপ্রথা অনেকটা পুরাতন
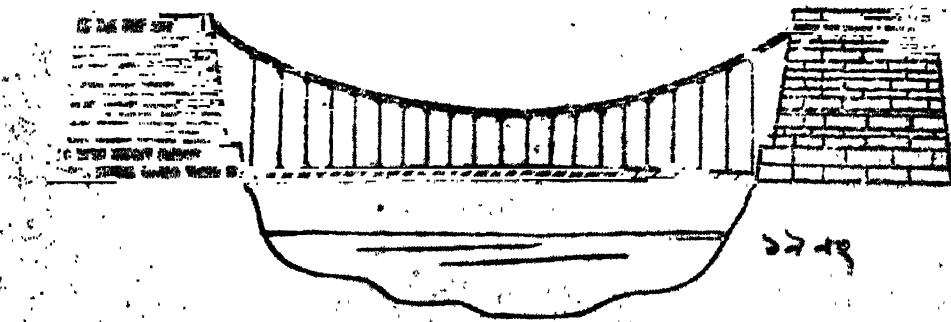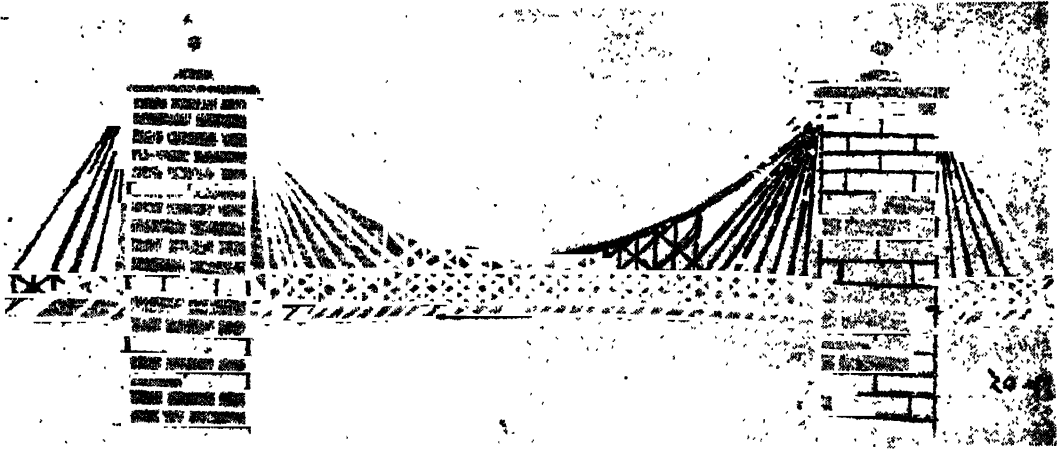
হইয়া গিয়াছে। তবে এই সব খিলানসেতু এক বিষয়ে একটু দুর্ব্বল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইটের Tensile Strength কিছু কম ; সে জন্য ইহা টান শক্তি তত বেশী সহ্য করিতে পারে না। এখন যে নদীর উপর সেতু আছে, তাহাতে যদি একবার বন্যা হয়, তবে একপাশে জলের বেগ এত বেশী হইতে পারে যে সেতুটি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া শেষে ভাঙ্গিয়া যাইবে। মহানদীর উপর যে সেতু আছে, তাহা এরূপ খিলান সম্বলিত বলিয়া বন্যায় ভাঙ্গিয়া যাইত। এখন খিলান দৃঢ় করিয়া রাখার অনেক রকম চেষ্টা হইয়াছে। অনেকস্থলে এই দুর্ব্বলতার জন্য খিলান না দিয়া শুধু থামের উপর রাস্তা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইটের খিলান না করিয়া লোহাকে খিলানের আকৃতি দেওয়া যাইতে পারে তাহাতে সেতুর কোন ক্ষতি হইবে না—এরূপও অনেক স্থলে হইয়াছে। এরূপ লোহা বক্রভাবে রাস্তার নিম্নে ভার সহ্য করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বক্রাকার হইতে আর একটি তথ্য বুঝিতে পারা যায়। মনে করুন (২১নং চিত্র) এরূপ আকৃতিবিশিষ্ট লোহার দুইটি Span করিয়া রাস্তার নীচে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে অনেকটা
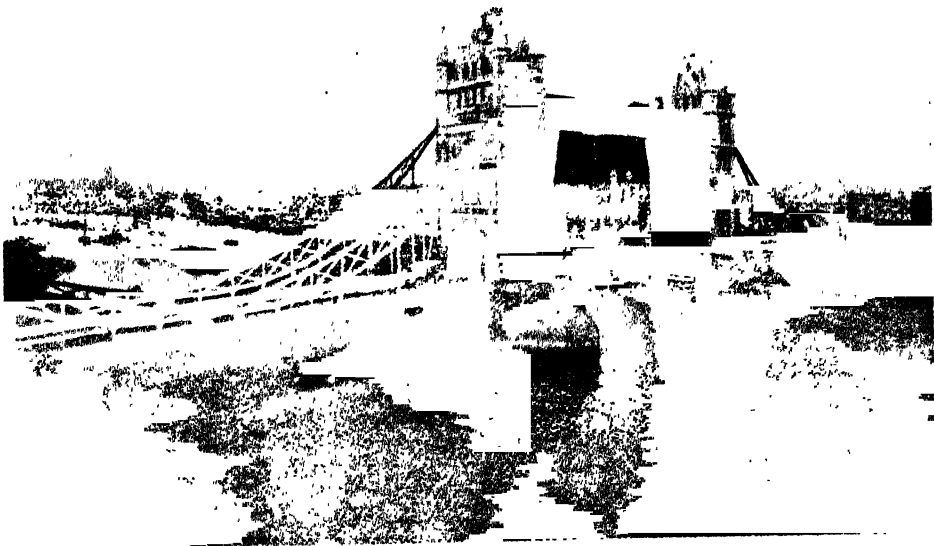
Springএর মত ক্রিয়া হইবে। রাস্তার উপর ভার পড়িলে তাহা লোহার archএর মধ্যে longitudinal tension ভাবে প্রকাশ পাইবে। এরূপ tensionএর ফল এরূপ দাঁড়াইবে যে, দুইটি archএর সংযোগে ক চিহ্নিত অংশটুকু একটু নীচে নামিয়া পড়িবে এবং তাহার দুইধার হইতে সমান্তরাল চাপ
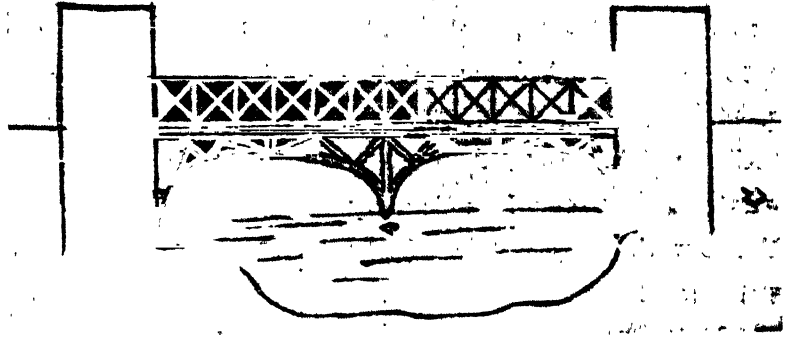
(horizontal pressure) পড়িবে। সকলেই জানেন যে জলের চাপে archটির curvature বদলাইয়া যাইতে চাহিবে। এখন archটির যদি এরূপ আকৃতি হয় যে তাহাতে জলের চাপে শুধু Longitudinal tension হইবে কোনরূপ horizontal বা vertical force ক্রিয়া করিবে না, তবে 'ক' চিহ্নিত স্থানে দুইদিক্ হইতে চাপ পড়িবে এবং তাহা একটু নামিয়া যাইতে চাহিবে। আবার জলের উপরিভাগ (level) যেমন উঠিবে, তেমনই সমস্ত সেতুটিকে উপরদিকে ঠেলিবে। সমস্ত অংশগুলি উপযুক্ত মত করিলে এই দুই শক্তির ক্রিয়াতে সেতুটি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং জল বাড়িলে বা কমিলে শুধু ক চিহ্নিত স্থানে দুইধারে চাপ পড়িবে, সেটা লৌহ অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবে। এরূপ আকৃতিবিশিষ্ট লোহাকে hydrostatic arch বলে। নৈহাটীতে গঙ্গার উপর যে সেতু আছে তাহা শুনিয়াছি এই principleএ প্রস্তুত। ইহার শুধু মধ্যস্থলে (মাটিতে প্রোথিত করা) একটি দণ্ড আছে। কিন্তু উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতে জানা যাইবে তাহা নিষ্প্রয়োজন। বলিতে পারি না Engineer মহাশয় অশিক্ষিত লোকদের মনে সেতুর দৃঢ়তা সম্বন্ধে বিশ্বাস করাইবার জন্য ওরূপ দণ্ড রাখিয়াছেন কি না। এরূপ arch অনেকগুলি পাশাপাশি রাখা যাইতে পারে। তবে সেতুর সমগ্র ওজন এই সব jointগুলি সহজে সহ্য করিতে পারে, এরূপ দেখিতে হইবে। ইহার গুণ এই যে মাটির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। জলের উপরিভাগের উপর ইহার অবস্থিতি নির্ভর করে।

এখন সেতু প্রস্তুত করা সম্বন্ধে মোটামুটি কএকটি কথা বলা যাইতে পারে। উপরোক্ত উদাহরণগুলি দেখিয়া সেতুর সাধারণ গঠন সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু ধারণা হইয়াছে। প্রথমে নদীর তীর বাঁধিয়া রাখা দরকার। পাথর ফেলিয়া নদীর বেগ কিছু কম করা হয়, তারপর ক্রমশঃ ইটের গাঁথনী অথবা লোহার structure তৈয়ারী করা হয়। নদীর মধ্যে থাম প্রোথিত করার কৌশল একটু অদ্ভুত। প্রথমে একটি খুব বড় লোহার চোঙ্গ (cylinder) জলে নামাইয়া দেওয়া হয়; ইহা নিজের ভারে নিজেই ডুবিতে থাকিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্দ্দম (Clayey soil) না পায় ততক্ষণ নামিবে। তারপর সেই চোঙ্গের মধ্য হইতে জল pump করিয়া ফেলিতে হয়, অথবা উপরে বাতাস free করিয়া দিয়া ভিতর হইতে জল বাহির করিয়া দিতে হয়। জল বাহির হইয়া গেলে সেই চোঙ্গের মধ্যে পাথরের গাঁথনী অথবা বড় পাথরের slabs অথবা শীশা গরম করিয়া (molten lead) তাহার মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে চোঙ্গাটি ক্রমশঃ বসিয়া যাইতে থাকে। যতক্ষণ rocky soil না পায় ততক্ষণ এরূপ চলিতে থাকে; তারপর যখন চোঙ্গাটি স্থির হয় তখন বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে ভিতরে ইটের বা পাথরের গাঁথনী আরম্ভ করে। এরূপে থাম প্রস্তুত হয়। অনেক সময় চোঙ্গাটির ভিতরে ও বাহিরে এরূপ করা হয়। অনেক স্থলে চোঙ্গাটি ঠিক সোজা না করিয়া একটু inclined ভাবে গাঁথা হয়। একস্থানে এরূপ দুইটি অথবা চারিটি চোঙ্গা প্রোথিত করা হয়। তাহার উপরে সেতু নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। চোঙ্গাটিতে সাধারণতঃ এরূপ পন্থা থাকে যে high water level হইতে প্রায় ১০ ফুট উঁচুতে থাকে। তাহার উপর সেত কতখানি উঁচুতে হইবে তাহাও বিবেচনা করিয়া রাখিতে

হয়। থাম স্থির করার পর তাহার উপর কিরূপ structure নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহা কাঠের দ্বারা (frame) প্রস্তুত করা হয়। সেই frame দেখিয়া লোহা ঢালাই অথবা পিটাই করিয়া বিভিন্ন অংশ যোড়া লাগান হয় (Rivetment) এই জন্য সেতু প্রস্তুত করিবার নিকট কএকদিনের জন্য একটি Iron Foundry করিতে হয়। Frame work ঠিক হইলে কপিকল (crane) প্রভৃতির দ্বারা তাহা স্থান মত বসান হয়। এরূপে ক্রমশঃ সমস্ত সেতুটি নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মিত হওয়ার পর সেতু কিরূপ দৃঢ় হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিতে হয়। সেতু-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে একটি model সেতুনির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর রাস্তা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর model railway চালান হয়। Model Railway Experimentএ কিরূপে Theory of proportional dimensions ব্যবহৃত হয় এবং কার্য্যকালে সেতু কিরূপ দৃঢ় হইবে, তাহা পূর্ব্বে স্থির করা হয়। এখানে তাহা বোঝান কঠিন হইবে। যাহা হউক, সেতু নির্ম্মাণ করিবার পর তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমে কতকগুলি Engine অথবা একখানি Ballest train ধীরে ধীরে তাহার উপর দিয়া যায়; নানারূপ যন্ত্রাদির সাহায্যে সেতুর কোন স্থানে কতখানি নামিয়া গেল কি না সে সব দেখা হয়। তারপর কিছুদিন Ballest train যাতায়াত করিয়া লাইনটি ও সেতুটি "set" করান হয়। সেতু পরীক্ষা করার আর একটি নিয়ম আছে। যেমন একটি বলকে তার দিয়া ঝুলাইয়া তাহাতে আঘাত করিলে (সময় ব্যবধান রাখিয়া) বলটি ক্রমশঃ বেশী দুলিতে থাকে, সেরূপ সেতুটিকে যদি উপর হইতে আঘাত করা যায়, তবে তাহা দুলিতে থাকে। ইহার priod of vibration ও amptitude দেখিতে হয়। তাহা দ্বারা ইহার শক্তি অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে বাহির করিতে হয়। সাধারণতঃ সেতু-নির্ম্মাণ শেষ হইলে তাহার উপর একদল সৈন্যকে march করিয়া যাইতে দেওয়া হয়। ইহার সময়োপযোগী পাদক্ষেপে সেতুটি বেশ দুলিতে থাকে। যদি দেখা যায় যে, সেতুটি ভীষণ দুলিতেছে তবে সৈন্যগুলিকে Pellmell যাইতে আদেশ করা হয়, এবং তাহাতে সেতুটি শীঘ্রই থামিয়া যায়। এরূপে তাহার period ও amptitude of vibration লক্ষ্য করা হয়; শুধু উপরের চাপ দেখিয়াই সেতুর পরীক্ষা হইয়া থাকে। তাহার উপর ঝড় বহিয়া গেলে কত চাপ পড়িবে এবং তাহা সহ্য করিতে পারিবে কি না তাহাও দেখিতে হইবে। জলের বেগ ও মাপ করিতে হইবে। এ সব ত আর (Experiment) পরীক্ষা করিবার উপায় নাই। সে জন্য ঝড়ের কত অধিক বেগ হইতে পারে, তাহার মোটামুটী ধারণা করিয়া লইয়া এবং সেতুটিকে পাশদিক্ হইতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কত জোর লাগিবে এসব একটু মোটামুটি রকমে ধরা হয়। যদি খুব বেশী পার্থক্য (wide margin) থাকে তবে সেতুটি দৃঢ় বলিয়া ধরা হয়। Cyclone, Tornada এ সব সাধারণতঃ হয় না; তাহার বেগ বিবেচনা করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ট্রেণ যখন চলিয়া যায় তখন তাহার সমগ্র ভারটি লাইনের উপর পড়ে না; অর্থাৎ যখন ট্রেণখানি দাঁড়াইয়া থাকে তখন লাইনের উপর যে ভার পড়ে, তাহা অপেক্ষা ট্রেণ চলিয়া যাইবার সময় তাহার কিছু কম ভার পড়ে। এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। সেই জন্য পরীক্ষা করিবার সময় ট্রেণখানি ধীরে চালাইতে হয়। উত্তাপের জন্য গার্ডারগুলি কিরূপ হইবে তাহাও বিবেচনা করিতে হয়।

একটি সেতু নির্ম্মাণে যে কত দিকে লক্ষ্য করিতে হয় তাহা এ প্রবন্ধে বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে ইহা পড়িয়া যদি কেহ বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া এ বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন, তবে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

শ্রীকালিদাস বাগ্চী।

জাহ্নবী

(৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ভারতবর্ষ"-অনুসরণে)

(১)

সে কোন্ পুণ্য-প্রভাতে জননি আসিলে নামিয়া ভারতবক্ষে,
স্বর্গবাসীর বন্দনা-গানে, মর্ত্ত্যবাসীর আকুল হর্ষে।
দ্যুলোক, ভূলোক, আলোকি' জাগিল তোমার চরণ-কমল-দীপ্তি
শোকহত যত লভিল শান্তি, তৃষাতুর যত লভিল তৃপ্তি !
জাহ্নবী তুমি, ভাগীরথী তুমি,—উচ্ছল-চল-কল-তরঙ্গে,
বিপুল-পুণ্য-পুলক-বাহিনী, ত্রিলোকপালিনী তুমি মা গঙ্গে !

(২)

কণ্ঠে ধ্বনিত অভয় বার্ত্তা, হাস্য নধর অধরে চক্ষে !
আসিলে যেদিন ভারতে তুমি মা, ধরিল সে তোমা আদরে বক্ষে !
কুঞ্জে কুঞ্জে বিহগ-পুঞ্জ বন্দিল তোমা নবীন ছন্দে,
জীমূত-মন্দ্রে সুনীল সিন্ধু উছসি' উঠিল মিলনানন্দে !
জাহ্নবী তুমি, ভাগীরথী তুমি,—উচ্ছল-চল-কল-তরঙ্গে,
বিপুল-পুণ্য-পুলক-বাহিনী, ত্রিলোকপালিনী তুমি মা গঙ্গে,

(৩)

সৈকতে তব কিবা শ্যাম-শোভা বিটপি-গহন-কানন কুঞ্জে,
সে কি মা গরিমা নগরীমালায়, সে কি মা মহিমা তীর্থ-পুঞ্জে।
অযুত-ভকত সন্তান তব চরণ-পরশে হইল ধন্য,
শতেক পাতকী লভিল মুক্তি, পিয়ে সে তোমারি পীযূষস্তন্য !
জাহ্নবী তুমি, ভাগীরথী তুমি,—উচ্ছল-চল-কল-তরঙ্গে,
বিপুল-পুণ্য-পুলক বাহিনী, ত্রিলোকপালিনী তুমি মা গঙ্গে !

(৪)

জনমে জনমে জনমি যেন মা তোমারি অভয়-চরণ-প্রান্তে,
লভি' যেন মাগো করুণা তোমার, কিবা এ জীবনে কি জীবনান্তে !
অন্তিমে যবে করিব শয়ন, পাশরি' সকল বাসনা সজ্জা,
সে দিন তোমারি অঞ্চলছায়ে বিছায়ে দিও মা সে সুখ-শয্যা !
জাহ্নবী তুমি, ভাগীরথী তুমি,—উচ্ছল-চল-কল-তরঙ্গে,
বিপুল-পুণ্য-পুলক-বাহিনী, ত্রিলোকপালিনী তুমি মা গঙ্গে !

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

ছিন্নহস্ত

(শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত)

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—ব্যাঙ্কার মঃ ভরজারস বিপত্নীক। এলিস তাঁহার একমাত্র কন্যা, ম্যাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভিগ্নরী খাজাঞ্চি, রবার্ট সেক্রেটারী, ভেন্‌লিভ্যাও দ্বারবান্, ম্যালিকম মালখানা-রক্ষক এবং জর্জেট বালক ভৃত্য। একদিন তাঁহার বাটীতে নিশা-ভোজ। ভিগ্নরী ও ম্যাক্সিম এক সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া দেখে খাজাঞ্চিখানার বিচিত্র কল-কৌশল-সমন্বিত লৌহ-সিন্দুকে কোন রমণীর মূল্যবান্ ব্রেসলেট্-পরিহিত ছিন্ন বামহস্ত সম্বদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা এ ঘটনা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর করিল না।

রবার্ট এলিসের পাণি-প্রার্থী; বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার কিন্তু তাহার বিরোধী। তিনি ভিগ্নরীকে জামাতৃপদে বরণ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তিনি কন্যার সহিত কথোপকথনে বুঝিয়াছিলেন যে এলিস্ রবার্টের তিনি অনুরক্ত। তাই তিনি রবার্টকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য তাহাকে স্বীয় মিশরস্থিত কার্য্যালয়ের ভার দিয়া পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন।

কর্ণেল বোরিসকের ১৪ লক্ষ টাকা ও মূল্যবান্ দলিলাদি সমেত একটি বাক্স ভরজারসের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিবস আসিয়া বলেন যে, পরদিন তাঁহার কিছু টাকার প্রয়োজন।

ম্যাক্সিম্ সায়াহ্নে ভিগনরীকে জানাইল যে, ছিন্ন-হস্ত সম্বন্ধে পুলিস-অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রিতে রবার্টের পত্র পাইলেন; তিনি সেই রাত্রিতেই দেশ ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কর্ণেল বোরিসক টাকার জন্য আসিলেন। ভিগ্নরী তাঁহাকে বলিলেন, লৌহ-সিন্দুক কে খুলিয়াছে, বোধ হয় টাকা কড়ি অপহৃত হইয়াছে। তখনই ভরজারসকে সংবাদ দেওয়া হইল। শেষে টাকাকড়ি গণিয়া দেখা গেল যে, ৫০ হাজার টাকা নাই এবং কর্ণেলের দলীলের বাক্সও নাই। সকলেরই সন্দেহ হইল রবার্ট এই কার্য্য করিয়াছেন। পুলিসে সংবাদ দিবার প্রস্তাব হইল, কর্ণেল তাহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন।

দুই বন্ধু জুলস্ ভিগ্নরী ও ম্যাক্সিম্ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, ম্যাক্সিম সেই ছিন্নহস্তের অধিকারিণী রমণীর অনুসন্ধান করিবেন। ম্যাক্সিম্ সেই দিনের কুড়াইয়া পাওয়া ব্রেস্‌লেট নিজের হাতে পরিয়া বাহির হইয়াছিলেন। পথে তাঁহার পরিচিত এক ডাক্তারের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ডাক্তার তাঁহাকে সুন্দরী একটি যুবতীকে দেখাইলেন; ম্যাক্সিম কৌশলে সেই রমণীর সহিত পরিচয় করিলেন। রমণী ম্যাক্সিমের প্রকোষ্ঠে ব্রেস্‌লেট দেখিয়াছিলেন, এবং তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় ম্যাক্সিম রমণীকে তাঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাঁহার সঙ্গী হইলেন।

এলিসের বিশ্বাস রবার্ট নির্দ্দোষ—এলিস্ ম্যাক্সিমকে তাহার প্রণয়-পাত্রের নির্দ্দোষিতা প্রমাণে সাহায্য করিতে অনুরোধ করায়

তিনি তাঁহার ভগিনীর কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হ'ন। এদিকে রবার্ট এক কোম্পানির বিজ্ঞাপন সংবাদ-পত্রে পড়িয়া আমেরিকায় ব্যবসা করিবার জন্য সেই কোম্পানির আফিসে উপস্থিত হ'ন। কর্ণেল বোরিসফ ছদ্মবেশে তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন এবং চুরীর কথা বলেন। রবার্ট চুরীর কথা অস্বীকার করায় তাঁহাকে একটি গৃহে বন্দী করিয়া রাখেন এবং বলেন, বাক্সটি কোথায় সংবাদ দিলেই তিনি খালাস পাইবেন।

এদিকে ম্যাক্সিমও শুনিলেন শবব্যবচ্ছেদাগার হইতে ছিন্নহস্তখানি চুরি গিয়াছে, তিনি বুঝিলেন ব্রেসলেটখানিও চুরীর চেষ্টা হইবে। তিনি সাবধান হইলেন। একদিন তাঁহার বন্ধু ডাক্তারের বাড়ীতে সেই সুন্দরীর সহিত ম্যাক্সিমের দেখা হইল। তাঁহার বিশেষ পরিচিত হইলেন। ম্যাক্সিম এই সুন্দরীর গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিল।]

ম্যাক্সিমের কথা শুনিয়া মাডাম ইয়ালটা বলিলেন, "সে কি বলিয়াছিল?"

"আপনার জ্যেঠামহাশয়ের কোনও কর্ম্মচারীর প্রতি তিনি আসক্ত।"

"কি! দুষ্ট বুঝি—"

"তাহার উপর রাগ করিবেন না। দোষ আমার। সময়ে সময়ে আমি তাহার কাছ হইতে অনেক কথা শুনিয়া লই। কাল আমার কোনও কাজ ছিল না। তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়াছিলাম। বর্ত্তমান চাকরীতে সুখে আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এই সব কথা জানিতে পারিয়াছি। আপনার জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ীর অনেক কথাই আমি জানি। জর্জ্জেট বলিয়াছে, আপনি সেখানে বড় একটা যান না। আপনার ভগিনীর সম্বন্ধে সে যে সব কথা বলিয়াছে, তাহাতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে যে, একদিন কুমারী ভরজারসকে আমার এখানে লইয়া আসি।"

"আমার ভগিনী বড় একটা কোথাও যান না।"

"তাহা হইলে একদিন মসিয়ে ভরজারসকে অনুরোধ করিব। তাঁহার কন্যার সহিত তাঁহারই বাড়ীতে আলাপ পরিচয় হইবে। জর্জ্জেট এমন সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে আপনাদের বাড়ীর বর্ণনা করিয়াছে যে, আমি যেন সব চক্ষে দেখিতেছি। ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী খুব ভদ্রলোক। সেক্রেটারী বনেদি ভদ্রবংশোদ্ভব, কএক দিন হইল ব্যাঙ্কার তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। তাঁহার চাকরী গেল কেন বলুন ত?"

ম্যাক্সিম বিচলিত হইলেন; বলিলেন, "কারণ ঠিক আমি জানি না। সম্ভবতঃ কারনোয়েল স্বেচ্ছায় চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছেন। জ্যেঠামহাশয় তাঁহাকে মিশর দেশে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হ'ন নাই, তাই বোধ হয় কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

"কারনোয়েল! নামটা আমার পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে। সেণ্টপিটার্সবর্গে ফরাসী দূত নিবাসে ঐ নামে একজন উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্ম্মচারী ছিলেন না?"

"তিনি রবার্টের পিতা।"

"কি রকম হইল? তাঁহার পুত্র—"

"কেন ব্যাঙ্কের চাকরী গ্রহণ করিলেন? রবার্টের পিতা কিছু রাখিয়া যান নাই।"

"যুবক খুব সৎসাহসী দেখিতেছি। পরিশ্রম দ্বারা অবস্থার উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ ন'ন। তিনি দেখিতে সুন্দর কি?"

সুপুরুষ না হইলেও সুন্দর, গুণবান্ ও বুদ্ধিমান্। তাঁহার সহিত আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা নাই।"

"কেন আপনাকে এ সব প্রশ্ন করিতেছি জানি না। আপনি হয় ত আমাকে বড় কৌতুহলী বলিয়া ভাবিতেছেন!"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "না না, তা ভাবিব কেন?"

কাউণ্টেস বলিলেন, "আপনার ভগিনী ও সেক্রেটারী সম্বন্ধে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন, তাহার কারণ শুনিতে চা'ন? জর্জ্জেটের কাছে গল্প শুনিয়া আমার অনুমান হইয়াছে যে, আপনার ভগিনী কারনোয়েলকে ভালবাসেন। তিনিও আপনার ভগিনীর অনুরক্ত।"

ম্যাক্সিমের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

কাউণ্টেস বলিলেন, "আমার অনুমান তবে সত্য। আমার বিশ্বাস, আপনার জ্যেঠামহাশয় উভয়কে বিচ্ছিন্ন করায় উভয়েই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন। এ কথা যদি সত্য হয়, আমার মনে কি হইতেছে জানেন, আপনার ভগিনীর পক্ষাবলম্বন করিয়া আমি কারনোয়েলকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই। তারপর কারনোয়েলের প্রতি ভরজারস যাহাতে সদয় হ'ন তাহার চেষ্টা

করি। আমার কথা বুঝি আপনার ভাল লাগিতেছে না ?"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "তা ঠিক নয়। তবে আপনি সমস্ত সংবাদ জানেন না। আমি যদি জানিতাম, করনোয়েলের সহিত বিবাহে আমার ভগিনী সুখী হইবেন, তাহা হইলে আমি আপনার প্রস্তাবিত পথ অবলম্বন করিতাম। কিন্তু আমি বাধ্য হইয়া বলিতেছি আপনি যদি এই যুবকের পক্ষাবলম্বন করেন তাহা হইলে আপনি ন্যায়সঙ্গত কাজ করিবেন না।"

"কেন, তিনি কি কোনও অভদ্রোচিত কাজ করিয়াছেন ?"

ম্যাক্সিম দেখিলেন, তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। যতটা বলা উচিত, তাহার অপেক্ষা বেশী বলিয়া ফেলিয়াছেন। সংক্ষেপে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি ত তাহা বলিতেছি না।"

"সম্ভবতঃ তিনি কোনও গর্হিত কাজ করিয়া থাকিবেন।" কি অন্যায় কাজ তিনি করিয়াছেন ?"

"না, কোনও অন্যায় করেন নাই। তবে তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত বিসদৃশ। অন্তরঙ্গ বন্ধু জুল্‌স ভিগরীর নিকট হইতেও বিদায় না লইয়া সহসা তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার বিবেক অপরাধী নয়, তিনি কখনও এমন কাজ করেন না।

কাউন্টেস কোন কথা বলিলেন না। ম্যাক্সিম অকস্মাৎ কাউন্টেসের মৌনাবলম্বনে বিস্মিত হইলেন।

গাড়ী হ্রদের ধারে পৌছিল। অনেকগুলি দর্শক ও স্কেটক্রীড়ক ইতোমধ্যে তথায় সমবেত হইয়াছেন। কাউন্টেস অশ্ববেগ সংযত করিলেন। সহসা ম্যাক্সিম নৈশ সঙ্গিনী সেই সুন্দরীকে তথায় দেখিলেন। সেই রজনীতে তিনি যে পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন, আজও সেই বেশ তাঁহার অঙ্গে রহিয়াছে। রমণী তবে মিথ্যা বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিদেশে যাইতেছেন। ম্যাক্সিম এই প্রতারণার অর্থ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু রমণী তাঁহাকে বোধ হয় দেখিতে পান নাই। তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

কাউন্টেস বলিলেন, "কখন আপনার কাজ ?"

"বেলা তিনটার সময়। রুদে বোলোতে আমায় যাইতে হইবে।"

"এখান হইতে সে স্থান কিছু দূর বটে; কিন্তু চলুন আপনাকে রাখিয়া আসিতেছি।

ম্যাক্সিম দেখিলেন, অদূরে একখানি গাড়ী আসিতেছে। তিনি বুঝিলেন উহা তাঁহার জ্যেঠামহাশয়ের গাড়ী। গাড়ীর দরজা উন্মুক্ত। এলিসের স্বর্ণপ্রভ কেশরাশি দেখা যাইতেছিল। জোসেফ গাড়ী হাঁকাইতেছিল। ম্যাক্সিমকে সে দেখিতে পাইয়া জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। ম্যাক্সিম বলিলেন, "কাউন্টেস আমাকে ছাড়িয়া দিন; আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

"বুঝিয়াছি ঐ গাড়ীতে আপনার ভগিনী যাইতেছেন। আপনি উহার অনুসরণ করিতে চা'ন।"

"তা নয়।"

"কেন আপনি লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। রুদে বোলোতে আপনি যাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চান, তিনি ঐ গাড়ীতে। আপনি যদি হাঁটিয়া যান, তিনি আপনার পূর্ব্বেই পৌছিবেন। এই বিলম্ব বশতঃ হয় ত তিনি বিরক্ত হইবেন।"

"আমার ভগিনী আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন না। আমি শপথ করিয়া তাহা বলিতে পারি। আমি—"

কাউন্টেস বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি আমার গাড়ীতে চলুন। আমার ঘোড়া খুব দ্রুতগামী। উহাদের অগ্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমরা পৌছিব। তা'র পর আপনার যেখানে ইচ্ছা যাইবেন।"

ম্যাডাম ইয়াল্‌টা বাধা দিবার অবসর মাত্র না দিয়া দ্রুত বেগেই গাড়ী চালাইলেন।

ম্যাক্সিম কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "এ যেন ঠিক পলায়ন।"

নীরসকণ্ঠে কাউন্টেস বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে আমার কোনও স্বার্থ নাই। যে রমণীকে আপনি ভালবাসেন তাহারই চরণতলে আপনাকে পৌছিয়া দিতেছি।"

"আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। এলিস আমার ভগিনী, তাহা ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ নাই।"

"আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না। প্রমাণ করুন যে আপনি তাঁহার জন্য যাইতেছেন না। যদি তাঁহাকে না ভালবাসিবেন, তবে তাঁহার কাছে যাইবার জন্য আপনার এত আগ্রহ হইবে কেন ?"

"যদি তাই হয়, আমি ছাড়াও ত ঢের লোক তাহাকে ভালবাসে।"

"আপনি কি আমায় বুঝাইতে চা'ন যে, কোনও বন্ধুর পক্ষাবলম্বন করিয়া আপনি এখানে আসিয়াছেন?"

"না। আমি উহাদের মিলনে বাধা দিবার জন্য আসিয়াছি।"

"কথাটি ভাল করিয়া খুলিয়া বলুন।"

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছিল। কাউণ্টেসের অদ্ভুত প্রশ্নে ম্যাক্সিম চমকিত হইলেন। রমণীর ব্যবহারে ম্যাক্সিম অনুমান করিলেন, যেন তিনি ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন। এলিসকে যে তিনি ভালবাসেন না,অন্য রমণীর প্রতিও যে তিনি আসক্ত ন'ন, এ কথাটা বুঝাইবার জন্য ম্যাক্সিম ব্যাকুল হইলেন। তিনি বলিলেন, "কোনও যুবককে এলিস ভালবাসে, আমি কিন্তু তাঁহাকে আমার ভগিনীর উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করি না। আশা করি,এই গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবে না।"

"সেই যুবক মসিয়ে কারনোয়েল, কেমন নয়?"

ম্যাক্সিম চমকিত হইলেন; কিন্তু তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, আর অস্বীকার করা চলে না। মৃদু গুঞ্জনে তিনি বলিলেন, "আপনার অনুমান যথার্থ।"

"কিন্তু কারনোয়েল এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন যে, আপনি তাঁহাকে কুমারী ভরজারসের অযোগ্য প্রণয়পাত্র মনে করেন?"

"তিনি অত্যন্ত সন্দেহজনক অবস্থায় জ্যেঠামহাশয়ের গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন।"

"তবে প্যারীতে তিনি এখনও আছেন কেন?"

"আমার ভগিনীর সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এখনও চলিয়া যা'ন নাই। তিনি চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, রুদে বোলোতে এলিসের প্রতীক্ষা করিবেন। সে পত্র এলিস আমায় দেখাইয়াছেন। অবশ্য সে সময়ে শিক্ষয়িত্রী উপস্থিত থাকিবেন, সুতরাং পরিণাম ততটা মন্দ হইবে না; কিন্তু এই সময়ে আমি উপস্থিত থাকিব সংকল্প করিয়াছি। কারনোয়েলকে এমন ভাবে বুঝাইয়া দিব যে, ভবিষ্যতে তিনি যেন আর কখনও এলিসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা না পান। ম্যাডাম, এখন আপনি সমস্তই শুনিলেন।"

উভয়ের কেহ আর কোন কথা বলিলেন না। ম্যাক্সিম সবিস্ময়ে দেখিলেন, কাউণ্টেস অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। অতঃপর ইয়াল্টা বলিলেন, "আপনার মত মহৎ ও উদারহৃদয় আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। আমার আশা আছে ভবিষ্যতে আপনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্থান গ্রহণ করিতে পারিবেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আপনি যাইতে পারেন। কাল আপনি আসিতেছেন? বেলা তিনটার পর আমি আপনার প্রতীক্ষা করিব। তখন আর কেহই থাকিবে না।"

ম্যাক্সিম ব্যগ্রভাবে বলিলেন যে, তিনি আগামী কল্য নিশ্চয়ই যাইবেন। গাড়ী থামিলে তিনি নামিলেন। কাউণ্টেস ইয়াল্টা দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। ম্যাক্সিম কএক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজিকার সকাল হইতে কত অপূর্ব্ব ঘটনাই ঘটিতেছে! তখনও তিনটা বাজিতে পনর মিনিট বিলম্ব আছে দেখিয়া ম্যাক্সিম অগ্রসর হইলেন। এলিসের গাড়ী তখনও পৌঁছায় নাই। ম্যাক্সিম ভাবিলেন, রবার্ট এতক্ষণ যথাস্থানে আসিয়া হয় ত দাঁড়াইয়া আছেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া কিন্তু, তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কারনোয়েলের কোনও চিহ্নই নাই! "ব্যাপার কি বুঝিতেছি না। এলিস আসিয়া কারনোয়েলের প্রতীক্ষা করিবে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। কিন্তু আমার মনে হয়, ভালই হইয়াছে। উভয়ের দেখা না হওয়াই ভাল। এলিস রবার্টের ব্যবহারে নিশ্চয়ই দুঃখিত ও বিরক্ত হইবে। আমিও এই অবসরে তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইব। কিন্তু কারনোয়েল আসিলেন না কেন? তাঁহার মনের গতি হয় ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হয় ত ভাবিয়াছেন, দেখা করিয়া কোন ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যে গাড়ীতে চড়িয়া রবার্ট যাইতেছিলেন, সম্ভবতঃ উহা তাঁহাকে রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া গিয়াছে। এ রকম সুদৃশ্য গাড়ীতে চড়িয়া বেড়ানর অর্থ ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দলে তিনি মিশিয়াছেন।"

ম্যাক্সিম এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একখানি গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। জ্যেঠামহাশয়ের গাড়ী তাঁহার নয়নগোচর হইল। পাছে জোসেফ তাঁহাকে দেখিতে

পাইয়া এলিসকে বলিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় ম্যাক্সিম একটা গাছের অন্তরালে আত্মগোপন করিলেন।

গাড়ী নিকটে আসিয়া থামিবামাত্র বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া ম্যাক্সিম সহসা গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

"নমস্কার ম্যাডাম মার্টিনিউ, নমস্কার এলিস। রাগ করিও না এলিস, সব কথা শুন।"

এলিসের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। শিক্ষয়িত্রীর ভীতিব্যঞ্জক ব্যবহারে ম্যাক্সিমের হাস্যোদ্রেক হইল; কিন্তু তিনি অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিলেন। জোসেফও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

এলিস উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "তোমার সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে?"

"না, আমার সহিত দেখা হয় নাই। তোমার ন্যায় আমিও কারনোয়েলের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি আসেন নাই। আসিবেনও না।"

যুবতী আশঙ্কামিশ্রিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার কোনও বিপদ্ ঘটিয়াছে।"

"সম্ভবতঃ নয়। না আসিবার অবশ্য সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে। আমি দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু কথা কহিবার অবকাশ হয় নাই। তিনি ট্রামে চড়িয়া যাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া আত্মগোপনেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

আত্মবিস্মিতভাবে এলিস বলিলেন, "কোথায় যাইতেছিলেন?"

"কে জানে? বোধ হয় ট্রেণ ধরিবার জন্য।"

"অসম্ভব! আমার সহিত দেখা না করিয়া তিনি কোথাও যাইবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।"

"বোধ হয় তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। আমার ধারণা কি শুনিতে চাও?—এই ব্যক্তির জন্য তুমি আত্মোৎসর্গ কর, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। রবার্ট তোমার যোগ্য ন'ন। অবশ্য তিনি যে দোষী, সে কথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে সন্দেহ জন্মিবার যথেষ্ট কারণ আছে। গাড়ীতে চড়িয়া বেড়ানর অর্থ আত্মগোপন। তোমার পিতৃগৃহ যখন তিনি ত্যাগ করিয়া যান, তখন তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। আমরা সকলেই জানিতাম, তিনি দরিদ্র। তুমি হয় ত বলিবে গাড়ী অন্য লোকের। সে কথা সত্য; কিন্তু কাহার? তাঁহার যে কোনও ধনী বন্ধু আছেন, সে কথা আমরা কোন দিন শুনি নাই। চাকরীত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়ায় সন্দেহের পর্য্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান। ম্যাডাম মার্টিনিউ আমার কথা যেন বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে।"

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "ঠিক কথা। এলিস, তোমার দাদা যাহা বলিতেছেন, সব সত্য। এই যুবকের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তোমার অনেকটা জ্ঞান জন্মিল; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আর চিন্তা করা তোমার উচিত নয়।"

এলিস শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। অবশেষে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শপথ করিয়া বল, তুমি তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস কর।"

দ্বিধাশূন্য মনে ম্যাক্সিম বলিলেন, "সত্যই আমি তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া মনে করি।"

এলিসের মুখমণ্ডল মরা মানুষের মত শাদা হইয়া গেল; কিন্তু তিনি আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছ। আমি তোমাদের কথাই শুনিব। জোসেফকে বল, সে গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যা'ক্।"

ম্যাক্সিম বলিলেন, "জোসেফ গাড়ী বাড়ী লইয়া যাও।" জোসেফ দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ী চলিয়া গেলে, ম্যাক্সিম ভাবিলেন, "কাজটা ভালই হইয়াছে। যা'ক্, এখন আমার নিজের কাজ দেখা যাউক। নৈশসঙ্গিনী বোধ হয় এখনও হ্রদের ধারে বেড়াইতেছেন। তাঁহার অনুসরণ করা যা'ক।"

ম্যাক্সিম দ্রুতবেগে হাঁটিতে লাগিলেন। কিন্তু হ্রদের ধারে পৌঁছিয়া ম্যাডাম ইয়াল্টা অথবা ম্যাডাম সার্জ্জেণ্ট কাহারও দেখা পাইলেন না। অগত্যা তিনি বিষণ্নমনে গৃহে ফিরিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যখন ম্যাক্সিম ভরজারস এলিসের প্রতীক্ষায় রুদে বোলোতে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তখন রবার্ট কারাকক্ষের মধ্যে

উন্মত্তবৎ পাদচারণা করিতেছিলেন। অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য যদি মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন! নির্দ্দিষ্ট সময়ে এলিসের সহিত শুধু একবার দেখা করিবার জন্য তিনি দশ-বার আত্মজীবন বিপন্ন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু হায়! উপায় নাই! বাড়ীটি চারিদিকে সুরক্ষিত। গৃহদ্বার রুদ্ধ; বাহিরে প্রহরী পাহারা দিতেছে। কক্ষতল হইতে বাতায়ন দশহাত ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তথায় পৌঁছান অসম্ভব। যদিও বা কোনরূপে কেহ বাতায়নসমীপে পৌঁছায়, নামিবে কিরূপে? বাহিরে—উদ্যানের চারি পার্শ্বে পর্ব্বতপ্রমাণ সমুন্নত প্রাচীর। রবার্ট দেখিলেন, এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমন সময় টং টং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। হতাশভাবে রবার্ট বসিয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট মস্তক ঢলিয়া পড়িল।

দ্বারোদ্ঘাটন-শব্দে তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন রজনী সমাগতা। দুইটি ভীমদর্শন বলিষ্ঠ ভৃত্য আহার্য্য লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রবার্ট সলম্ফে উঠিয়া বসিলেন। ইচ্ছা হইল, তাহাদিগকে বলেন, যেন তাহারা তাঁহাকে বিরক্ত না করে। কিন্তু তিনি থামিয়া গেলেন। ভাবিলেন, তাহারা আদেশ পালন করিতেছে মাত্র। তিনি বলিলেও তাহারা শুনিবে না। তবে শুধু বৃথা বাক্যব্যয় কেন?

সত্য কথা বলিতে গেলে তাঁহার ক্ষুধাবোধও খুব হইয়াছিল। সমস্ত দিন একরূপ অনাহারেই আছেন। বিশেষতঃ আহার না করিলে কি উপকার হইবে? আজই হউক অথবা দুই দিন পরেই হউক, উদর পূর্ত্তি করিতেই হইবে। উদরের জ্বালা বড় ভয়ানক; সুতরাং ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। শয্যা লইয়া আরও দুইটি ভৃত্য প্রবেশ করিল। দুইজন সৈনিকবেশধারী ভৃত্য দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। রবার্ট ভাবিলেন, কর্ণেল মনে করিয়াছেন, দীর্ঘকাল আমায় বন্দী করিয়া রাখিবেন; কিন্তু তাহার মস্ত ভুল! আমি হয় পলায়ন করিব, নয় ত মরিব।

ভৃত্য সসম্মানে আহারে বসিবার জন্য রবার্টকে অনুরোধ করিল। খাদ্যের কি বিপুল আয়োজন! নানা-রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্য, বহু প্রকার উৎকৃষ্ট সুরা আনীত হইল। কিন্তু রবার্ট শরীরধারণের উপযুক্ত পরিমাণ আহার করিলেন মাত্র। সুরা স্পর্শও করিলেন না।

আহার শেষ হইলে দরজা খুলিয়া গেল। কর্ণেল বোরিসফ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহাস্য মুখে বলিলেন, "আপনার কোনও কষ্ট হয় নাই ত? অনেকক্ষণ আপনি একা আছেন। বিশেষ কাজের জন্য সমস্ত দিন দেখা করিতে পারি নাই; কিন্তু আপনি যে আমার অতিথি, সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই। আজ এখনই আবার বাহিরে যাইব। তাই আপনার সহিত একবার দেখা করিতে আসিলাম।"

ক্রোধে রবার্টের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি অপমানসূচক কোনও কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সময় খুঁজিয়া পাইলেন না। কর্ণেল একখানি আসনে বসিয়া সিগার ধরাইয়া লইলেন।

"আজ এক সদাগর বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণ। যদি মসিয়ে ভরজারস্ ও তাঁহার কন্যার সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে আজ আমি সেখানে যাইতাম না।"

রবার্ট বলিলেন, "ব্যাঙ্কারের সঙ্গে দেখা হইলে আপনি কিরূপ অভদ্রোচিত উপায়ে আমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন সে কথা বলিবেন ত?"

রবার্টের কথায় কর্ণেল বিচলিত হইলেন না। প্রশান্ত-স্বরে বলিলেন, "আপনি বৃথা ক্রোধোদ্রেকের চেষ্টা করিতেছেন। রাগের মাথায় আপনি যাহাই কেন বলুন না, আমি কখনই রাগিব না। অবশ্য আমার মেজাজ বড় ঠাণ্ডা নয়। অন্য সময় হইলে আমি কখনই সহ্য করিতাম না; কিন্তু এখন বিশেষ স্বার্থের অনুরোধে আমাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। কি বলিতেছেন?—হঁ্যা মসিয়ে ভরজারসের সহিত আজই আমার দেখা হইয়াছে।"

"তাহা হইলে তিনি সমস্তই জানেন?—"

"তিনি কিছুই জানেন না। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, আপনার দেখা পাইলাম না। প্যারী নগরেই আপনি আছেন, কিংবা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।"

"তিনি এখনও আমাকে দোষী ভাবিতেছেন?"

"পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে। প্রথমতঃ কিছু কিছু সন্দেহ ছিল; এখন আর কোনও সন্দেহই

নাই। কিন্তু আপনার দোষ থাক্ বা নাই থাক্, তাহাতে তাঁহার বড় একটা আসে যায় না। আপনি এদেশ হইতে চলিয়া যান, ইহাই তাঁহার বাসনা।"

"তিনি কি আশঙ্কা করেন, আবার আমি তাঁহার সিন্দুক খুলিয়া টাকা চুরী করিব?"

"না। পাছে তাঁহার কন্যার সহিত আপনার সব মিটমাট হইয়া যায়, এই আশঙ্কা।"

"কুমারী ভরজারসকে এ বিষয়ে জড়িত করিতে আপনাকে নিষেধ করিয়াছি, তবু আপনি শুনিবেন না?"

বিদ্রূপহাস্যে কর্ণেল বলিলেন, "আপনি নিষেধ করিতেছেন! এখানে আমি শুধু আদেশ করিব; আর সকলে পালন করিবে। শুনুন, তিনি আমায় বলিয়াছেন যে, আপনি তাঁহার কন্যার প্রতি আসক্ত, এ কথা জানিতে পারিয়াই তিনি আপনাকে তফাৎ করিয়া দিয়াছেন। এ কথা কি সত্য?"

"হঁা, এক বর্ণও মিথ্যা নয়।"

"তিনি যখন অনুমান করিলেন, আপনি এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন সত্যই তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন আপনি এখানেই আছেন শুনিয়া তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছেন, আপনি তাঁহার কন্যার সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায়েই প্যারীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ব্যাঙ্কারের কন্যাও আপনার সহিত দেখা করিতে সম্মত। ব্যাপার দেখিয়া বোধ হইতেছে, তিনি আপনাকে ভুলিতে পারেন নাই, আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণের জন্য এখনও তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা আছে।"

"বৃদ্ধ স্বয়ং এ কথা আপনাকে বলিয়াছেন?"

"নিশ্চয়! তিনি আশা করিতেছেন, সময়ে তাঁহার কন্যার মতপরিবর্ত্তন ঘটিবে। কিন্তু আপনি এখানে থাকিলে তাহা ঘটিবে না। কোনও দিন না কোনও দিন উভয়ের মধ্যে মিটমাট হইয়া যাইতে পারে। কুমারী জানেন, আপনি এখানে আছেন। আপনার পত্রও বোধ হয় পাইয়াছেন। কারণ বৃদ্ধ বলিতেছিলেন, আজ মধ্যাহ্নের পর শিক্ষয়িত্রীসহ তাঁহার কন্যা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সে কথা শুনিয়া আমার মনে হইল আপনিও কএক ঘণ্টার জন্য মুক্তি চাহিয়াছিলেন। সুতরাং আপনার উৎকণ্ঠার কারণ এখন আমি বুঝিলাম। কেমন, আমি ঠিক ধরি নাই কি?"

রবার্ট সংক্ষেপে বলিলেন, "হঁা।"

কর্ণেল বলিলেন, "আপনাদের উভয়ের মধ্যে আসক্তি অত্যন্ত প্রবল দেখিতেছি। আপনি ব্যাঙ্কারের কন্যাকে বিবাহ করিতে চান। কিন্তু তাহাতে একটু সামান্য বাধা দেখিতেছি। বৃদ্ধকে কোন রকমে যদি বুঝাইতে পারা যায় যে, আপনি নির্দ্দোষ—অন্যায়রূপে আপনার স্কন্ধে এত বড় গুরুতর অপরাধ চাপান হইয়াছে তাহা হইলে বৃদ্ধ নিজেই আপনাকে কন্যাসম্প্রদান করিয়া নিজের অন্যায় আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।"

'আপনি কি বলিতেছেন?"

"আমি আপনার এই স্বপ্নটিকে সত্য করিয়া দিতে পারি। শুধু আমারই ইচ্ছার উপর আপনাদের মিলন নির্ভর করিতেছে।"

"কেমন করিয়া?"

"এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়া রাখি যে, জগতের চক্ষে আপনার মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ আছে। তিন চারিজন লোক ছাড়া এ চুরীর ব্যাপার আর কেহ জানে না। তাহারা সকলেই স্বার্থের অনুরোধে ইহা গোপন রাখিতেছেন। সুতরাং যদি মসিয়ে কারনোয়েল মসিয়ে ভরজারসের সেক্রেটারীপদে পুনরায় নিযুক্ত হ'ন, তাহা হইলে কাহারও মনে কোনপ্রকার সন্দেহ জন্মিতে পারিবে না। তার পর যখন সকলে জানিতে পারিবে, ব্যাঙ্কারের কন্যার সহিত আপনার বিবাহ হইবে, তখনও কাহারও মনে কোন রূপ সন্দেহের কারণ থাকিবে না। কারণ এরূপ বিবাহ সর্ব্বত্রই ঘটিতেছে।"

"মসিয়ে ভরজারস সে প্রকৃতির লোক ন'ন। তাহার যে কথা সেই কাজ।"

"হইতে পারে; কিন্তু আমি আপনাকে বলিতেছি, সে ভার আমার উপর। আমি যদি বলি যে চোরের সন্ধান পাইয়াছি; কিন্তু তিনি আপনার সেক্রেটারী ন'ন—"

রবার্ট বাধা দিয়া বলিলেন, "এ কথাও আপনি বলিবেন?"

"শুধু তাই কেন? আমি আরও বলিব যে, ভদ্রলোকের উপর সন্দেহ করিয়া আমরা গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। তাঁহাকে এ জন্য পুরস্কৃত করা উচিত। এইরূপ ভাবে যদি

আমি বলি তিনি কি আমার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ?

"তা জানি না। কিন্তু আমি বুঝিতেছি, ন্যায়পথে আপনি চলিতে পারিবেন না। আপনার ব্যবহার ইহার বিরোধী।"

"সত্যই আমি বলিব। তা ছাড়া যে টাকা চুরী গিয়াছে, তাহাও তাহাকে ফিরাইয়া দিব; কিন্তু আপনাকে বলিতে হইবে আমার বাক্স কোথায়, অথবা কে লইয়াছে ?"

"আবার সেই মিথ্যা অপবাদ !"

"আমি ফিরাইয়া দিতে বলিতেছি না। কারণ বাক্স এখন আপনার কাছে নাই। তাহা আমি বুঝিয়াছি। যাহারা উহা সংগ্রহের জন্য উৎকণ্ঠিত তাহাদের হাতেই গিয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে; আমি কেবল জানিতে চাহি, তাহারা কাহারা ? নাম বলুন, যদি জানিতে পারি আপনি ঠিক বলিয়াছেন, আমি তৎক্ষণাৎ আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

"তাহাদের নামই যদি বলিতে পারিতাম তাহা হইলে আমিই ত তাহাদের সহকারী।"

"আমার ধারণা কি শুনিবেন ? কোনও রমণী নিশ্চয় এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছে। আমি তাহার অনুসন্ধান করিতেছি। খুব সম্ভব শীঘ্রই আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব। কাগজপত্রগুলি সরকারী, এ কথা আপনার কাছে গোপন করিব না। বিদেশে আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ যে সব গুপ্ত আয়োজন করিতেছে, তাহাই লক্ষ্য করার ভার আমার উপর। সে কথা আপনাকে বলিতে এখন কোন বাধা নাই। আমাদের শত্রুপক্ষ অর্থশালী ও সম্প্রদায়ের উচ্চস্তরে অবস্থিত। তাহাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বসম্প্রদায়ের বিলোপসাধন। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাহারা চৌর্য্য ও রক্তপাতেও পশ্চাৎপদ নহে। আমাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্পও তাহাদের আছে। সে জন্য আমি সাবধানে থাকি। কাগজপত্র তজ্জন্যই বিশ্বস্ত ব্যাঙ্কারের কাছে রাখিয়াছিলাম। ঐ দলে সম্ভ্রান্ত রমণীও আছেন। সম্ভবতঃ এইরূপ কোনও রমণীর প্রেমে আপনি পড়িয়া থাকিবেন। অবশ্য এখন আপনার সে ভাব নাই। কিন্তু প্রথম যৌবনে যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার প্রভাব একেবারে যায় না। সম্ভবতঃ তিনি আপনাকে নানা উপায়ে ভুলাইয়া এই কার্য্যে লওয়াইয়াছেন। হয়ত ব্যাঙ্কারের কন্যার নিকট পত্র লিখিয়া আপনার প্রথম যৌবনের ভ্রান্তির কথা বলিয়া দিবারও ভয় দেখাইয়া থাকিবেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে দোষ দিব না। অনেকেই এ অবস্থায় পড়িলে ঐরূপ কাজ করিয়া থাকেন। আপনি ভাবিয়াছিলেন সিন্দুক খুলিবার সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া, ও চাবী অর্পণ করায় বিশেষ কোন পাপ নাই। সম্ভবতঃ এই রমণীই টাকাও চুরী করিয়া থাকিবেন। তিনি জানিতেন, আপনি রাত্রেই প্যারী ত্যাগ করিবেন; সুতরাং চুরীর অপরাধ আপনারই ঘাড়ে পড়িবে। আপনি এদেশে আর ফিরিবেন না। এই রমণী তার পর কোনরূপে হয়ত জানিতে পারিয়াছেন যে, আপনি প্যারীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাই বেনামী পত্রের সহিত টাকাটা আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং দেখুন আপনি প্রকৃতপক্ষে অপরাধী ন'ন। শুধু একটু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র; আমি আপনাকে চোর ভাবিলে কখনই এরূপ ব্যবহার করিতাম না। অতএব সব কথা এখন প্রকাশ করিয়া বলুন। এই রমণীর নাম বলুন। তাহা হইলে তিন মাসের মধ্যে ব্যাঙ্কারের কন্যার সহিত আপনার পরিণয় হইয়া যাইবে।"

রবার্ট পূর্ণদৃষ্টিতে কর্ণেলের পানে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার কল্পনাশক্তি প্রখরা; কিন্তু অলীক উপন্যাস রচনায় আপনার ইচ্ছা ফলবতী হইবে না। যদি কোনও রমণী এই চুরীর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকেন, তবে জানিয়া রাখুন, আমি তাঁহাকে চিনি না। এ বিষয়ে কোনও কথাই আমার বলিবার নাই।"

'তবে দেখিতেছি, জুলস্ ভিগনরী ব্যাঙ্কার-কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন !"

বিবর্ণমুখে রবার্ট বলিলেন, "ভিগনরী !—বলেন কি ?"

"হাঁ। ভিগনরী এলিসকে ভালবাসেন। ব্যাঙ্কারেরও বরাবর ইচ্ছা, তাঁহারই সহিত কন্যার বিবাহ দেন।"

"ভিগনরী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি তাঁহার কাছে আমার প্রেমের কাহিনী প্রকাশ করিয়াছি। তিনি আমার সব কথাই জানেন। কিন্তু তিনি যদি এলিসকে ভালবাসিয়া থাকেন, তবে আমায় বলেন নাই কেন ? আপনার কথায়

তাৎপর্য্য, ভিগনরী আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন ?"

"নিশ্চয়ই নয়। তিনি আপনার সপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন।"

"তা আমি জানিতাম।"

ব্যাঙ্কার আজ সকালে ভিগনরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাও ?" কিন্তু ভিগনরী তাহার উত্তরে বলেন যে, কুমারী এলিস তাঁহাকে পছন্দ করিবেন না। ব্যাঙ্কার সে কথার উত্তরে বলেন যে, কালে এলিস তাঁহাকে ভালবাসিবে। ভিগনরী কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করেন নাই। অবশেষে যখন তিনি ভিগনরীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি অন্য কোনও রমণীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন কি না, তদুত্তরে তিনি স্বীকার করেন যে, কুমারী এলিসকে তিনি অনেক দিন হইতে মনে মনে ভালবাসেন। কিন্তু রবার্টে উপর কুমারীর আসক্তি আছে জানিয়া তিনি নিজের ব্যর্থ প্রেমের কথা ঘুণাক্ষরেও কাহাকেও জানিতে দেন নাই। বৃদ্ধ বলেন যে, সে তিনি বুঝিয়া লইবেন, কন্যাকে তিনি বুঝাইয়া বলিবেন। অবশ্য ভিগনরী এ কথায় প্রতিবাদ করেন নাই। এখন বুঝুন ব্যাপার কতদূর গড়াইয়াছে। আপনি অপরাধীর নাম প্রকাশ করিয়া বলিলে সব দিক্ বজায় থাকিবে।"

রবার্ট বলিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে। আপনার সব কথা আমি শুনিলাম। কিন্তু আপনি জানিয়া রাখুন, আমার সংকল্প অটল। ও চুরীর বিষয় আমি কিছুই জানি না। জানিলেও আমি আপনাকে উহার বিষয় প্রকাশ করিতাম না। নিজের দোষ ক্ষালনের জন্যও নহে। কিন্তু সত্যই বলিতেছি, আমি কিছুই জানি না। আমাকে যন্ত্রণা দিলেও আপনি কোনও কথা জানিতে পারিবেন না।"

"এই কি আপনার শেষ কথা ?"

"হঁা।"

"তা' হ'লে যদি কিছু ঘটে আমার কোনও দোষ নাই।"

"আর কি ঘটিবে ? আমি আপনার বন্দী। কিন্তু চিরকাল আমি বন্দী থাকিব না। আজই হউক কিংবা দুই দিন পরেই হউক বিচারালয়ে আমাকে পাঠাইতেই হইবে। তখন আমি যাহা জানি বলিব।"

অট্টহাস্যে কর্ণেল বলিলেন, "ও! আপনি ভাবিয়াছেন আমি বুঝি আপনাকে একদিন মুক্তি দিব ? তাহা হইবে না। আপনাকে অবৈধ অবরোধ করার জন্য আমি দেশের আইনের অমর্য্যাদা করিয়াছি। সে অপরাধে আমার গুরুতর শাস্তি হইতে পারে।"

রবার্ট স্থিরনেত্রে কর্ণেলের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তবে আমায় হত্যা করিবেন না কি ?"

ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "ছি! ভদ্রলোকের সে কাজ নয়। দীর্ঘকাল বদ্ধ করিয়া রাখিলেই শেষে আপনি অপরাধ স্বীকার করিবেন।"

"যদি আমি তথাপি কিছুই না প্রকাশ করি ?"

"তখন সাইবেরীয়ার মরুভূমিতে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিব। গাড়ীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও অনুচরবর্গ আপনাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইবে। ছাড়-পত্র দেখাইলে কেহ গাড়ী খুলিয়া পরীক্ষা করিবে না। সেখানে একবার গেলে আর জীবনে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একমাস আপনাকে সময় দিব। যদি ততদিনে আপনি স্বীকার না করেন, তখন বাধ্য হইয়াই আমাকে এ কাজ করিতে হইবে।"

"এক মাস কেন, দশ বৎসরেও আপনি একটি কথাও আমার নিকট হইতে বাহির করিতে পারিবেন না।"

"দশ বৎসরের প্রয়োজন নাই। এক মাসেই হইবে। এক মাস পরে আপনার সমস্ত আশা ভরসাই লুপ্ত হইবে। কারণ তখন কুমারী এলিস, ভিগনরীর পরিণীতা পত্নী হইবেন। আমিও এ বিবাহ যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহারই চেষ্টা করিব। প্রত্যেক দিনের ঘটনা আপনাকে জানাইব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আশা থাকিতে আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।"

"বলিয়া যা'ন। যত প্রকার নিষ্ঠুরতা আছে, সব আবিষ্কার করিয়া প্রয়োগ করিতে থাকুন। আমার ধৈর্য্য কিন্তু বিলুপ্ত হইবে না।"

"আর অধিক কিছু বলিবার নাই। আমি এখন চলিলাম।"

রবার্ট নীরবে বসিয়া রহিলেন। ব্যর্থ-রোষ তাঁহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইতেছিল। নিষ্ঠুর যোদ্ধিসকের একটি

কথায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। ভিগনরী—তাঁহার প্রিয়তম সুহৃদ্ এলিসকে ভালবাসে—তাহার পাণিপ্রার্থী! মসিয়ে ভরজারস্ যেরূপ জামাতা চা'ন, ভিগনরীতে সে সকল গুণ বিদ্যমান। যুবতীর মনোরঞ্জনের গুণও তাহার যথেষ্ট আছে। সে রূপবান্, বুদ্ধিমান্ ও বিনয়ী। জীবনে সে কোনও কুকার্য্য করে নাই।

"আমি তাহার নিকট ঋণী। কিন্তু তাহারই জন্য এলিসকে আমি হারাইতে বসিয়াছি। এলিস তাহাকেই বিবাহ করিবে। পিতৃ-আজ্ঞা কেন সে লঙ্ঘন করিবে? আমার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি-বশতঃ সে তাহার শপথ ভুলিয়া যাইবে। এখনই হয় ত সে বুঝিতে পারিয়াছে, আমি সত্যই অপরাধী। সে বোধ হয় যেন আমায় ঘৃণা করিতেছে!"

দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া রবার্ট অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে প্রগাঢ় নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। নিজের দুর্ব্বলতায় রবার্ট লজ্জিত হইলেন। "আমাকে এ স্থান ত্যাগ করিতেই হইবে। নয় ত মরিব। যদি উদ্ধারের কোনও উপায় না থাকে, ঘরে আগুন দিব।"

কিন্তু অগ্নি-সংযোগের বাসনা তিনি ত্যাগ করিলেন। কর্ণেলের ভৃত্যগণ সতর্কভাবে পাহারা দিতেছে। আগুন ত নিঃশব্দে জ্বলে না! তাহারা জানিয়া ফেলিবে। রবার্ট উঠিয়া দাঁড়াইলেন, লাইব্রেরীঘরটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। উপরে তিনটি জানালা আছে বটে, কিন্তু কাচ দ্বারা সেগুলি আবদ্ধ। একবার জানালার কাছে যাইতে পারিলে তিনি পলায়নের কোনও উপায় আছে কি না, ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু তত ঊর্দ্ধে উঠিবার উপায় কি? এই ঘরটি কোন্ দিকে অবস্থিত, তাহাও তিনি ভাল করিয়া জানেন না।

বাতিদান তুলিয়া লইয়া রবার্ট সন্তর্পণে ঘরের চারিদিকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। লাইব্রেরীগৃহটি অত্যন্ত দীর্ঘ ও প্রশস্ত। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি এক স্থলে আসিয়া একটা সিঁড়ি দেখিতে পাইলেন। সিঁড়ি দিয়া উপরের গ্যালারীতে যাওয়া যায়। রবার্ট উপরে উঠিলেন। জানালার কাছে গিয়া আলোকটি দূরে সরাইয়া রাখিলেন। দেখিলেন বাহিরে সুবৃহৎ উদ্যান,—প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজীতে পূর্ণ। উদ্যানের উন্নত প্রাচীরও তাঁহার নয়নে পড়িল। প্রাচীরের সন্নিকটে কিন্তু একটিও বৃক্ষ নাই। কোথাও জনপ্রাণীও নয়নগোচর হইল না। ভূমিতলে শুভ্র তুষার জমিয়া রহিয়াছে। তুষারের উপর মনুষ্যপদচিহ্ন আদৌ দেখা গেল না। রবার্ট অনুমান করিলেন, সেখানে কোনও রক্ষক নাই। বাতায়ন হইতে ভূমিতল ত্রিশ ফুট নিম্নে অবস্থিত; সুতরাং কেহ যদি লাফাইয়া পড়ে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। রবার্ট মনোযোগসহকারে চারিদিক্ দেখিতেছেন, সহসা তাঁহার বোধ হইল, উদ্যান-প্রাচীরের উপরে কোনও পদার্থ নড়িতেছে। বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন, সঞ্চরণশীল পদার্থ—কোনও মনুষ্যের মস্তক ও স্কন্ধদেশ।

লোকটি ওখানে কি করিতেছে? প্রাচীর বাহিয়া ও কেন উঠিয়াছে? কেমন করিয়াই বা ওখানে আরোহণ করিল? রবার্ট প্রথমতঃ ভাবিলেন, কোনও প্রহরী কর্ণেলের আদেশে লুক্কায়িতভাবে ওখানে পাহারা দিতেছে। কিন্তু এমন অসুবিধাজনক স্থলে প্রহরীই বা থাকিবে কেন? যে কোনও গুপ্তস্থলে দাঁড়াইয়া সে পাহারা দিতে পারে। বিশেষতঃ কোন মই অথবা আরোহণীও ত দেওয়ালে দেখা যাইতেছে না। প্রাচীরের অপর পার্শ্ব হইতে লোকটা দেওয়ালের উপর উঠিয়াছে। তাহা হইলে প্রাচীরের অপর পার্শ্বে নিশ্চয় রাজপথ। লোকটা কি উদ্দেশ্যে ওখানে উঠিয়াছে। চুরী?—হইতে পারে! কিন্তু রাত্রি এখনও গভীর হয় নাই। সন্ধ্যার সময় যে চুরী করিতে আসে, তাহার সাহস কম নয়!

"বাহির হইতে কোনও সাহায্য পাইবার আশা দুরাশা। তবু চেষ্টা করিয়া দেখা যা'ক্। লোকটাকে সঙ্কেত করিলে হয় না? হয় ত সে পলাইয়া যাইবে। চেষ্টা করায় ক্ষতি কি?"

রবার্ট প্রজ্বলিত বাতি তুলিয়া লইলেন। মাথার উপর উঁচু করিয়া ধরিয়া বাতায়নের নিকটে সরিয়া গেলেন। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার, সুতরাং আলোকশিখা নিশ্চয়ই লোকটির চক্ষে পড়িবে। রবার্ট প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মূর্ত্তি কিন্তু সরিয়া গেল না। বরং কনুয়ের উপর ভর দিয়া আরও একটু উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল। রবার্ট সাহসে ভর করিয়া আলোকটি নীচে নামাইলেন। তার পর ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য—মূর্ত্তি যেন বুঝিতে পারে, তাহারই উদ্দেশে

সঙ্কেত করা হইতেছে। মূর্ত্তি বোধ হয় ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল, সে প্রাচীরের উপর উঠিয়া বসিল।

রবার্ট এখন তাহার সমস্ত দেহটাই দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তি যেন একটি বালকের। এতদূর হইতে আকৃতি স্পষ্ট দেখা যায় না। বালক বাহু তুলিয়া নিজের বুক দেখাইল, তাহার অর্থ "আমাকে ইঙ্গিত করিতেছেন ?"

রবার্ট আলোক সঞ্চালন করিয়া নিজের মুখের কাছে ধরিলেন। বালক যেন মনোযোগ-সহকারে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল, তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপি খুলিল। রবার্ট ভাবিলেন, "বোধ হইতেছে বালক যেন আমায় চিনিতে পারিয়াছে। কিন্তু আমায় কোথায় সে দেখিয়াছে ? বালকটি নামিয়া যাইতেছে দেখিতেছি। আমায় হাত নাড়িয়া যেন বলিতেছে, ভয় নাই, আমি আবার ফিরিয়া আসিব।" বালকের কোটের বোতাম সহসা রবার্টের চক্ষে পড়িল। "জর্জ্জেট! নিশ্চয়ই জর্জ্জেট!"

তখন সহসা তাঁহার মনে পড়িল, সকালে কর্ণেলের বাড়ী আসিবার সময় পথের ধারে জর্জ্জেটকে যেন খেলা করিতে দেখিয়াছিলেন! কারনোয়েল জর্জ্জেটকে অত্যন্ত স্নেহচক্ষে দেখিতেন। জর্জ্জেটও তাঁহাকে ভালবাসিত। কর্ণেলের গৃহে রবার্টকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বালক বিস্মিত হইয়াছিল। সে কারনোয়েলের পরিণাম জানিবার জন্য সম্ভবতঃ ব্যগ্র হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে কেমন করিয়া জানিল, কর্ণেল বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ? কিন্তু তাহার মনে যদি সে সন্দেহ না হইবে তবে সে প্রাচীর বাহিয়া উঠিবে কেন ? প্রাণের মায়া কি তাহার নাই ? নামিয়া যাইবার সময় সে ইঙ্গিতে আবার যেন বলিল, "আমায় বিশ্বাস করুন, অপরের সাহায্যে আপনাকে উদ্ধার করিব।"

রবার্ট অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তমনে শয্যায় শয়ন করিলেন। যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্যরশ্মি বাতায়নপথে গৃহমধ্যে পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল। বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। ব্রায়ার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"কি চাই আপনার ?"

"আপনার নিদ্রা হইয়াছিল কি ?"

রবার্ট কোনও উত্তর করিলেন না। ব্রায়ার বলিলেন, "আপনার পকেটবহি বৃথা অন্বেষণ করিতেছেন। ওখানে পাইবেন না।

"তবে আপনি তাহা চুরী করিয়াছেন ?"

"হাঁ, আমি উহা রাখিয়াছি বটে, কিন্তু আপনি সত্য কথা বলিবামাত্র, উহা ফেরত পাইবেন।"

রবার্টের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। অর্থের জন্য তিনি কাতর ন'ন। তাঁহার নির্দ্দোষিতার সাক্ষ্যস্বরূপ পত্রখানি যে শত্রুহস্তগত হইল, ইহাই বিশেষ বিপদের কথা।

"আপনার মনিবকে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহার সহিত আমার কথা আছে।"

ব্রায়ার প্রশান্তভাবে বলিলেন, "তাঁহার শরীরটা আজ অসুস্থ আছে। তিনি আপনার সহিত দেখা করিতে পারিবেন না। আমার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিবামাত্র আপনি মুক্তি পাইবেন।"

রবার্ট কোনও কথা বলিলেন না। মনে ভাবিলেন, "হাঁ এস্থান ত্যাগ করিব বটে; কিন্তু বোরিসফ যে ঘৃণিত প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে সম্মত হইয়া মুক্তি লাভ করিব না।"

(ক্রমশঃ)

বংশীধ্বনি

কি রবে কি জানি কোথা বাজিল কাহার বাঁশী ?
জীবনের সব সাধ, সকল আনন্দরাশি
আছে যেন সেই রবে ;
যেন শুনিয়াছি কবে,
কোন শুভক্ষণে, কোন সুখ-স্বপনের মাঝে ;
যেন চিনিয়াছি সেথা লুকান হৃদয়-রাজে।

জানি না কেমনে হ'ল—কেমনে এ পরিবর্ত্ত,
অমরা হ'য়েছে যেন আমার এ হীন মর্ত্ত্য ;
সেই গৃহ, সেই আমি,
কে যেন অন্তরযামী
যামিনীতে জুড়াইল আমার কঠোর দিবা,
দিকে দিকে ছড়াইল মধুর চন্দ্রিকা কিবা !

সেই গৃহ, সেই পথ, সেই পরিচিত ভূমি ;
মোহন বরণে কে গো এ অপরিচিত তুমি ?
ও নীল আকাশ আজি,
নব নীলিমায় সাজি,
হ'য়েছে নবীন কত নবীন নয়নে মম ;
নয়নে বুলা'ল কে এ অমৃত-অঞ্জন সম ?

শ্যামতৃণ ভূমি 'পরে এ কি নব শ্যামলতা,
কালিন্দীর কাল জলে কি মধুর প্রগাঢ়তা,
সমীরে কি সুপরশ,
দিশি দিশি নবরস,
ছায়ামাঝে কি আলোক, আলোকেতে এ কি ছায়া,
মায়াভরা একি কায়া, কায়াহরা এ কি মায়া ?

আকাশ হাসিছে যেন চাহিয়া ধরণীর পানে,
ধরণী ছুটিছে যেন কা'র কি লুকান টানে,
যেন গিরি চূড়া তুলে
কি দেখে র'য়েছে ভুলে,
যেন ওই বনফুলে কা'র অঙ্গ-পরিমল,
যেন ওই শতদলে, কা'র আঁখি ঢলঢল !

কি রবে কি জানি কোথা বাজিল বাঁশরী কা'র ?
সুরে সুরে কাছে দূরে ভাসিছে কি ছায়া তার !
ধ্বনিতেছে গৃহপাশে,
নিনাদিছে মহাকাশে,
মর্ম্মরিছে তরুমাঝে, গুঞ্জরিছে তারকায়,
সরিৎ কল্লোলে চলে, সিন্ধুর নির্ঘোষে ধায়।

অন্তরে লুকান ছিল যেন কি মধুর নাম,
রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, ওই রবে ধ্বনিছে তা' অবিরাম ;
বাঁশী কি মোহিনী জানে,
আসিয়া বাজিছে প্রাণে,
মরমে তরঙ্গ তুলি' উঠিছে অনন্ত তান,
আমার হৃদয় যেন হ'য়েছে তাহারি গান।

বাঁশী কি মোহিনী জানে, কহিছে সবার ভাষা ;
মিটাতে এসেছে যেন সবার সকল আশা ;
গৃহের তুলসীদলে,
বনে বনফুল ফলে,
পরিবৃত পরিজনে, নিভৃতের নিরজনে,
আভাসিয়া তুলিতেছে কি রূপ আমার মনে !

জানি না ইহা কি সুখ, জানি না ইহা কি দুখ,
সেই রবে হারায়েছি সকল সুখের সুখ,
গিয়াছে দুঃখের দুখ,
আছে শুধু জাগরূক
হৃদয়ের চিরবাঞ্ছা সেই বংশীধারী তরে ;
বারেক হেরিতে চাহি সে বাঁশরী সেই করে।

নির্ম্মল শরদাকাশে কৌমুদী কি নিরমল,
নির্ম্মল যমুনাজলে নির্ম্মল কুমুদ দল ;
এ প্রসন্ন শুভক্ষণে,
প্রসন্ন বাঁশরী-স্বনে,
ও নীল যমুনাজলে প্রসন্ন কুমুদপ্রায়,
কি অনন্ত নীলজলে হৃদয় ভাসিতে চায় !

প্রশান্ত শারদনিলে প্রশান্ত কি চারিদিক,
প্রশান্ত তারকাকুল চাহিছে কি অনিমিক ;
পবিত্র অনিলে ভাসি
পবিত্র আনন্দরাশি—
আসিছে পরশ যেন সুপবিত্র কি অঙ্গের ;
এ বাণী কি ব্যক্ত বাঞ্ছা সে পবিত্র মানসের ?

হে অজ্ঞাত ! এ হৃদয় পবিত্র নির্ম্মল কর ;
দিনশেষে পাই যেন সে পদ হৃদয় 'পর ;
যেন কলুষের রেখা
সেথা নাহি যায় দেখা ;
তাহ'লে যে বাঞ্ছাময় ! মনোবাঞ্ছা পুরিবে না,
পঙ্কিল সলিলে সেই সরোজ ত' ফুটিবে না !

তুমি বল, গৃহে রব ; তুমি বল, যাব বনে ;
যেখানে রাখিবে তুমি, থাকিব হরষমনে ;
দেখা দাও কাছে রব ;
নহিলে ও নাম লব ;
ওই নামে যদি ফোটে সে রূপের এ আভাস,
সুগন্ধ-সন্ধানে যদি পাই সে কুসুমরাশ ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ।

বিহারে বৌদ্ধকীর্ত্তি

শুভক্ষণে, আমাদের দেশে চৈনিক পরিব্রাজকগণের আগমন হইয়াছিল। তাঁহারা এতদ্দেশে আসিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র-সংগ্রহ, রীতিনীতি-শিক্ষায় ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রিয়তম তীর্থস্থান দর্শনে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। যথাযথ বর্ণনাদক্ষ পর্য্যাটকগণের কৃপায় আজ আমরা প্রাচীন-ভারতের সমুজ্জ্বল দৃশ্য দেখিতে সমর্থ হইতেছি। প্রত্নতাত্ত্বিক-গণের গভীর গবেষণায় যে সকল বিষয় অবগত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, একমাত্র ঐ সকল তীর্থযাত্রিগণের অনুগ্রহে তাহা অনায়াসলব্ধ হইয়াছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বিষয়ই তাঁহাদের বর্ণনা হইতে বাদ পড়ে নাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বহু পুরাতন কিংবদন্তী লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহাও তাঁহাদিগেরই কৃপায় অনায়াস-লব্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

ঐতিহাসিক ও সাধারণ পাঠকদিগের নিকট চৈনিক পরিব্রাজকগণের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা, বহুমূল্যবান্ হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকট পরিব্রাজক-বর্ণিত তীর্থস্থান-গুলির আলেখ্য সমধিক মূল্যবান্। আমরা আজ কএকটি তীর্থের আলোকচিত্র সহ পরিব্রাজকগণের বর্ণনা ও তৎসহ সেই সকল স্থানের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় যৎসামান্য আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

রাজগৃহ বৌদ্ধগণের নিকট পরম পবিত্র তীর্থস্থান। বুদ্ধদেব বহু বর্ষ এইস্থানে অতিবাহিত করেন। রাজগৃহের সন্নিকটস্থ নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালে বিশ্ববিশ্রুত ছিল। পঞ্চশৈলবেষ্টিত উপত্যকাই বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহ ছিল। এই স্থানেই সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের সহিত উপসেনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রাজগৃহেই নিগ্রন্থ বিষ দ্বারা বুদ্ধদেবের প্রাণবধের বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই স্থানেই দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু মদোন্মত্ত হস্তী দ্বারা বুদ্ধ-

—নিধুবনে—

চিত্রশিল্পী···শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা।

দেবকে হত্যা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; এই স্থানেই জীবক বিহার নির্ম্মাণ করিয়া সশিষ্য বুদ্ধদেবকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নিকটেই গৃধ্রকূট পর্ব্বতে গৌতম সুরঙ্গম সূত্র প্রচার করিয়াছিলেন। সন্নিকটেই করণ্ড, বেণুবন, কিঞ্চিদ্দূরেই শ্রোতপর্ণ বা সপ্তপর্ণী গুহা। এই স্থানেই প্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘ আহূত হইয়াছিল। আর রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের মৃত্যুও এইস্থানে সংঘটিত হয়; তাই রাজগৃহ বৌদ্ধগণের পরম পবিত্র তীর্থস্থান। আমরাও তাই এই প্রবন্ধে প্রথমে রাজগৃহের বর্ণনা করিব।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ লাসেন-প্রমুখ (Lassen) ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ রামায়ণোক্ত গিরিব্রজ ও রাজগৃহকে একই বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ-যুগের গিরিব্রজ, মহাভারতোক্ত গিরিব্রজ ও বৌদ্ধযুগের রাজগৃহ এক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে মহাভারতীয় গিরিব্রজও বৌদ্ধগণের তীর্থ রাজগৃহ একই স্থান বলিয়া অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মহাভারতে দেখা যায় যে জরাসন্ধের বধোদ্দেশে নরনারায়ণ ভীমসেন সহ কুরুদেশ হইতে অগ্রসর হইয়া কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া রমণীয় পদ্ম-সরোবরে গমন করেন। তৎপরে কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী প্রভৃতি নদী উত্তীর্ণ হইলেন। মনোরমা সরযূ উত্তীর্ণ হইয়া, তথা হইতে পূর্ব্ব-কোশল দেশ, ও মিথিলা হইয়া, ক্রমে ক্রমে মালা, চর্ম্মন্বতী, গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা কুশাম্ব দেশের বক্ষঃস্থল স্বরূপ মগধ-রাজ্যের প্রান্তে উপনীত হইলেন। মগধের রাজধানী বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "সুদৃশ্য প্রাসাদাদি সুশোভিত, সলিল-সমাকীর্ণ, গোধন-পূর্ণ ও মনোহর বৃক্ষবিশিষ্ট নগরী, পরস্পর-সংযুক্ত বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক শৈল দ্বারা পরিবেষ্টিত।"

বায়ু-পুরাণেও গিরিব্রজের উল্লেখ আছে। তবে, বায়ু-

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার
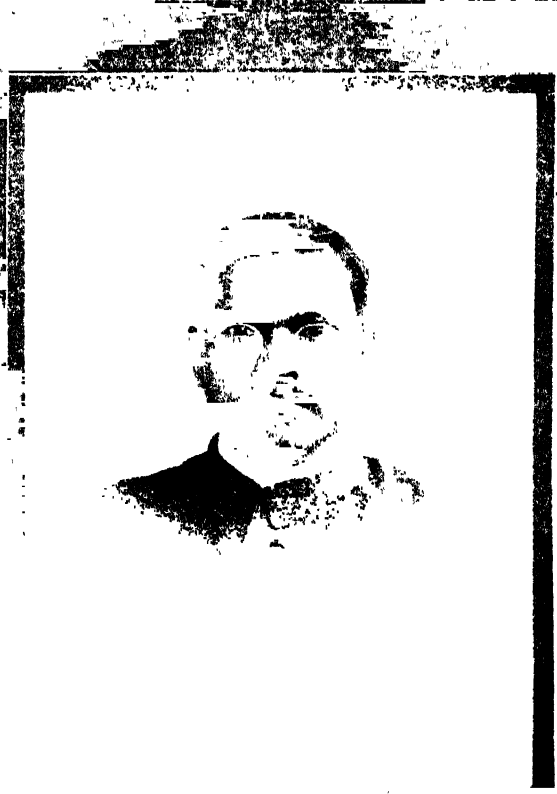
পুরাণে উক্ত পঞ্চ পর্ব্বতের নামের বিভিন্নতা আছে। বৈভার, বিপুল, রত্নকূট, গিরিব্রজ ও রত্নাচল বলিয়া পর্ব্বতগুলি উল্লিখিত হইয়াছে।

ফা-হিয়ানও রাজগৃহের স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "পঞ্চ পর্ব্বত-বেষ্টিত চক্রাকার উপত্যকা দেখিলে মনে হয় যেন ঐ পঞ্চ পর্ব্বত কোন নগরের উপকণ্ঠের প্রাচীর।" ফা-হিয়ান রাজা বিম্বিসারের পুরাতন রাজগৃহ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৫।৬লি এবং উত্তর দক্ষিণে ৭।৮লি বিস্তৃত বলিয়াছেন। অন্যতম পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াং বলিয়াছেন যে, রাজগৃহ চক্রাকারে ২০লি।

ফা-হিয়ান-বর্ণিত উপত্যকার স্থান-নির্দ্দেশকল্পে কোনরূপ অসুবিধা হয় না। রাজগৃহের পঞ্চ-পর্ব্বত-বেষ্টিত স্থানই চৈনিক পরিব্রাজকগণের উল্লিখিত স্থান। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধার্ম্মিক উভয়ের নিকটেই এই স্থান অত্যন্ত মূল্যবান্।
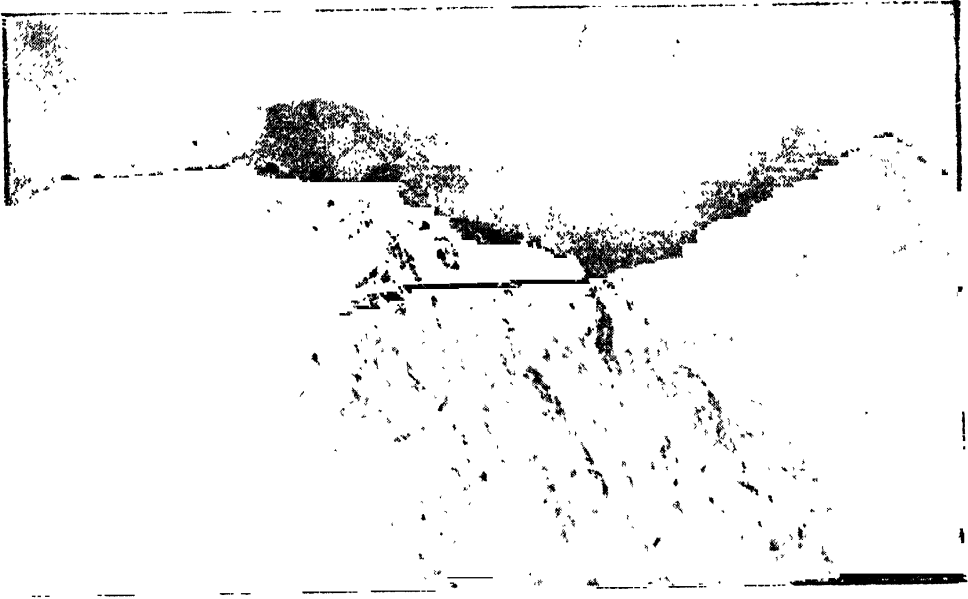
রাজগৃহ (বামে যষ্টিবন)

কিংবদন্তী এইরূপ যে, এই স্থানেই জরাসন্ধের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল ; এই স্থানেই মহাভারতের ভীম ও জরাসন্ধের যুদ্ধ হইয়াছিল। বহু শতাব্দী পরে ইহাই তথাগতের লীলা বাস করিতেন। আর বর্ত্তমান কালেও ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে সমাগত জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যাত্রিবৃন্দ একত্র হইয়া থাকেন।
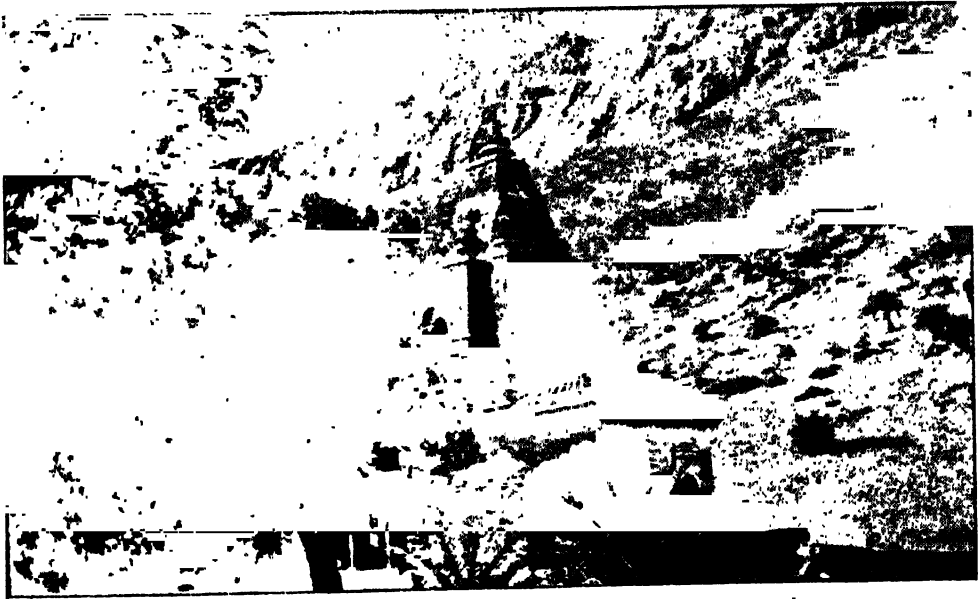
রাজগৃহ—তপোবন (এইস্থানে হিউয়েনসিয়াং-বর্ণিত উষ্ণ-প্রস্রবণ ছিল)।

ক্ষেত্র হইয়াছিল এবং বিহারে মুসলমান রাজত্বের সময়ে এই স্থানেই মকদুম সরফ-উদ্দীন নামক মুসলমান পীর উপত্যকার পাদধৌত করিয়া দুইটি স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইতেছে—উভয়েরই নাম সরস্বতী। গিরিশঙ্কটের দক্ষিণে

কিয়দ্দূরেই ইহারা একত্রীভূতা হইয়াছে। পর্ব্বতগুলি ও উহাদের পাদদেশস্থ সমতলভূমি জঙ্গলাকীর্ণ—মধ্যে মধ্যে ইষ্টক ও প্রস্তরের ভগ্নাবশেষ—স্তূপের ও প্রাচীন রাজগৃহের দুর্গপ্রাচীরের নিদর্শনের অভাব নাই। খুব সম্ভব এই সকল প্রাচীর দ্বারা একটি পঞ্চকোণ-বিশিষ্ট স্থান আবৃত হইয়াছিল। সরস্বতীর পশ্চিম তীর হইয়া একটি প্রাচীর, দ্বিতীয়টি সোনাগিরি পর্য্যন্ত, তৃতীয়টি উদয়গিরি ও রত্নগিরির মধ্যবর্ত্তী, চতুর্থটি উভয় সরস্বতীর সংযোগ-স্থল পর্য্যন্ত এবং পঞ্চম প্রাচীর প্রথম ও চতুর্থ প্রাচীরদ্বয়কে একত্র করিয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিঙ্‌হাম পর্ব্বত-পঞ্চকের পরস্পর দূরত্ব নিম্নরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

বৈভার হইতে বিপুল	...	১২,০০০ ফিট
বিপুল হইতে রত্নগিরি	...	৪,৫০০ ফিট
রত্নগিরি হইতে উদয়গিরি	...	৮,৫০০ ফিট
উদয় গিরি হইতে সোনাগিরি	...	৭০০০ ফিট
সোনাগিরি হইতে বৈভার	...	৯০০০ ফিট
	একুনে	৪১,০০০ ফিট

কানিঙ্‌হাম এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এ হিসাবে ইহার বিস্তৃতি আট মাইলের কম হয়; কিন্তু পর্ব্বতে আরোহণ ও অবতরণ ধরিলে পরিব্রাজকবর্ণিত হিসাব এক প্রকার ঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

পরিব্রাজক হিউয়েন-সিয়াং উষ্ণ-প্রস্রবণের উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও বিপুল গিরি ও বৈভার গিরির পাদদেশে ও তপোবনে উষ্ণ-প্রস্রবণ রহিয়াছে।* হিউয়েন সিয়াং বলিয়াছেন যে, "যষ্টিবনের দক্ষিণপশ্চিমে প্রায় ১০লি দূরে একটি বৃহৎ পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে দুইটি উষ্ণ-প্রস্রবণ রহিয়াছে; ইহার জল অত্যুষ্ণ। পুরাকালে তথাগত এই জলে অবগাহন করিয়াছিলেন। অবহিতভাবে এই জল এখনও প্রবাহিত হইতেছে। নিকটস্থ ও দূরবর্ত্তী যাত্রিগণ এই স্থানে স্নানার্থ আগমন করে। পীড়িত ব্যক্তি এই জলে স্নান করিলে আরোগ্যলাভ করে।"

১৮১২ সনের জানুয়ারী মাসে ডাঃ বুকানান্ নামক এক পর্য্যটক এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলি দেখিতে আসিয়া চারিটি প্রস্রবণ ও তাহাদের উষ্ণতার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :—

সূর্য্যকুণ্ড	১১৬	(তাপমান যন্ত্রের পরিমাণ)
সীতাকুণ্ড	১০০	"
ব্রহ্মকুণ্ড	১০২	"
চর্ম্মকুণ্ড	১১২	"

উহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে পাটনা কলেজের অধ্যাপক মিঃ জ্যাকসন্ ঐ কুণ্ডচতুষ্টয়ের উষ্ণতা নিম্নের তালিকানুরূপ নির্দ্দেশ করেন।

নাম	জানুয়ারী, ১৮১২ (বুকাননের প্রদত্ত তাপ)	ডিসেম্বর, ১৯০৮ (অধ্যাপক জ্যাকসনের গৃহীত তাপ)	হ্রাস বা বৃদ্ধি
সূর্য্যকুণ্ড	১১৬	১১২	—৪
সীতাকুণ্ড	১০০	৯১	—৯
ব্রহ্মকুণ্ড	১০২	১০১	—১
চর্ম্মকুণ্ড	১১২	১১০·৫	—১·৫

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইহাদের উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

হিউয়েন সিয়াং দুইটি প্রস্রবণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তপোবনস্থ উক্ত চারিটি উষ্ণ প্রস্রবণের দুইটি প্রকৃত উষ্ণ, অন্য দুইটির জল ঈষদুষ্ণ।

তপোবনের সন্নিকটস্থ উষ্ণ-প্রস্রবণ ব্যতীত রাজগৃহেই কএকটি উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। এগুলির জলে নানারূপ উৎকট চর্ম্মরোগের উপশম হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস; এ কারণে এখানে অনেক যাত্রিসমাগম হইয়া থাকে। ফা-হিয়ান এই সকল প্রস্রবণের উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু হিউয়েন

* যষ্টিবন সম্বন্ধে হিউয়েনসিয়াং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "পুরাকালে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; শাক্য বুদ্ধ ষোড়শ ফিট দীর্ঘ শুনিয়া এই ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হ'ন। ষোড়শ ফিট বংশদণ্ড সাহায্যে ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের পরিমাপার্থ চেষ্টা করিলে বুদ্ধদেবের দেহ তদপেক্ষা দীর্ঘ হইল। ব্রাহ্মণও দীর্ঘতর বংশদণ্ড ব্যবহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শাক্যমুনির দেহও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাতে ব্রাহ্মণ বংশদণ্ড নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন; কিন্ত, দণ্ড এইস্থানে প্রোথিত রহিল। রাজা অশোক এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন।"

সিয়াং বলিয়াছেন যে, "প্রচলিত প্রবাদ এই যে, বিপুল গিরির উত্তর দিকে পাঁচশত উষ্ণ-প্রস্রবণ ছিল; এক্ষণে দশটিমাত্র প্রস্রবণ রহিয়াছে। এই স্থানে সকল দেশের লোক সমবেত হয় ও অবগাহন করে। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এই সকল প্রস্রবণে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হয়।"

ডাক্তার বুকানান্ হ্যামিল্টন ১৮১২সনের ১৯এ জানুয়ারী রাজগৃহের উষ্ণ-প্রস্রবণগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি বিপুলগিরির পাদদেশে পাঁচটি এবং বৈভারগিরিতে একটি প্রস্রবণ দেখিতে পান। ১৮৪০ সালে গবর্ণমেণ্টের সার্ভেয়ার লেফ্‌টেনাণ্ট সেরউইল এই স্থানে আসিয়া উনবিংশটি প্রস্রবণ দেখিতে পান।

১৮৬২ সালে সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিঙ্‌হাম্ এই স্থানে আসিয়া বিপুলগিরির পাদদেশে ছয়টি এবং বৈভার-গিরিতে সাতটি প্রস্রবণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দশ বৎসর পরে মিঃ ব্রডলী বিপুল গিরিতে ছয়টি প্রস্রবণ দেখিতে পান।

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে রাজগৃহে গিয়া আমরা উষ্ণ-প্রস্রবণে অবগাহন করিয়া আসিয়াছি। রাজগৃহে পাঁচটি প্রস্রবণ এখনও সতেজ আছে।

কুক্কুটপাদগিরি

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিগণের অন্য একটি দর্শনীয় স্থান কুক্কুট-পাদগিরি বা গুরুপাদগিরি। ফা-হিয়ান কুক্কুটপাদকে বৌদ্ধ গয়া হইতে তিন লি দূরে অবস্থিত বলিয়াছেন। তিন লি স্থলে প্রকৃতপক্ষে তিন যোজন বা একবিংশ মাইল দূরে বৌদ্ধ গয়া অবস্থিত। অনেকে অনুমান করেন যে, লিপিকর-প্রমাদে এইরূপ ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। হিউয়েন সিয়াংএর মতে সপ্তদশ মাইল দূরে অবস্থিত। বৌদ্ধ গয়া হইতে কুক্কুটপাদ পৌঁছিতে যে দুইটি নদী অতিক্রম করিতে হয়, উহা এই সপ্তদশ মাইলের সহিত যোগ করিলে উনবিংশ মাইল হয়। ইহার প্রকৃত দূরত্ব কুড়ি মাইল।

কুক্কুটপাদের অন্যতম নাম গুরুপাদগিরি। মহাকশ্যপ এই স্থানেই মৈত্রেয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং মৈত্রেয়ের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিঙ্‌হাম্ সর্ব্বপ্রথমে কুক্কুটপাদ যে, বর্ত্তমান কুরকিহার গ্রাম তাহাই সপ্রমাণ করেন। কুরকিহার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ত্তৃত্বে খনিত হইতেছে।

কুক্কুটপাদগিরি

আমরা কুরকিহারের মন্দিরপ্রাঙ্গণের একটি আলোকচিত্র প্রদান করিলাম।

আমরা উপরে লিখিয়াছি যে, বৌদ্ধধর্ম্মানুযায়ী মহাকশ্যপ এই স্থানে মৈত্রেয় বোধিসত্বের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। হিউয়েন সিয়াং এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, শাক্যসাহায্যে তিনি দক্ষিণপশ্চিমস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গে উপনীত হ'ন। এই স্থান হইতে আর তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ঘনসন্নিবিষ্ট জঙ্গল মধ্যে কষ্টে প্রবেশ করিয়া তিনি উত্তর পূর্ব্ব দিকে পৌছান। তৎপরে, তিনি বুদ্ধদেবের চীরবাস গ্রহণ করিয়া সংকল্প করিবামাত্র, পর্ব্বত তাঁহাকে স্বীয়বক্ষে

মন্দির-প্রাঙ্গণ কুরকিহার

বুদ্ধের নির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি মহাকশ্যপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমি বহুকল্প ব্যাপিয়া কঠোর পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমার নির্ব্বাণকাল উপস্থিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে আমি তোমাকে ধর্ম্মপিটকের ভার প্রদান করিতেছি। আমার মাতৃস্বসা আমাকে যে কষায়বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তুমি গ্রহণ কর। যখন মৈত্রেয় বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন এই বস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিবে।"

বুদ্ধদেবের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, কশ্যপ তথাগতের নির্ব্বাণের পরে এক বৌদ্ধসঙ্ঘ আহ্বান করেন। সঙ্ঘাধিবেশনের পরে, কশ্যপ সংসারের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া দেহান্তের জন্য কুক্কুটপাদ-পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। পর্ব্বতের উত্তর দিকে আরোহণ করিয়া এবং ঘূর্ণায়মান পথআশ্রয়দান করিল। ভবিষ্যৎকালে মৈত্রেয় এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া ত্রিপিটক প্রচারান্তর, কশ্যপ বুদ্ধদেবের কৌষেয়বাস মৈত্রেয়কে দান করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন।

ফা-হিয়ানও তাঁহার গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে মহাকশ্যপের কুক্কুটপাদ বা গুরুপাদে প্রবেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন।

গিরিয়ক

ফা-হিয়ান তাঁহার পর্য্যটন কালে পাটলিপুত্র হইতে নয় যোজন দক্ষিণপূর্ব্বে একটি নির্জ্জন পর্ব্বতে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে এই স্থানেই দেবতাধিপতি শক্র বুদ্ধদেবকে বিয়াল্লিশটি প্রশ্ন করেন; এবং বুদ্ধদেব এই সকল প্রশ্নের সমাধান করেন। অন্যতম পর্য্যাটক হিউয়েন-সিয়াং তাঁহার গ্রন্থের নবমখণ্ডে বলিয়াছেন যে,

গিরিয়ক

ইন্দ্রশিলাগুহ নামক স্থানে বুদ্ধদেব শক্রের প্রশ্নোত্তরে বিয়াল্লিশটি উত্তর, পর্ব্বতে উৎকীর্ণ করেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, এই প্রশ্ন ও সমাধান একই স্থানে হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মতে গয়া হইতে ছত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী পঞ্চাল নদীতীরস্থ গিরিয়ক গ্রামের পর্ব্বতেই এই ব্যাপার ঘটে। এই পর্ব্বতের বস্তুতঃই দুইটি শৃঙ্গ। একটি শৃঙ্গের ঊর্দ্ধদেশেই "জরাসন্ধের বৈঠক" অবস্থিত এবং পশ্চিমদিকস্থ অন্যটিই গিরিয়ক নামে খ্যাত। বর্ত্তমানকালেও এই শৃঙ্গোপরি ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিঙ্-হাম্‌ই সর্ব্বপ্রথমে গিরিয়ককে পরিব্রাজক-বর্ণিত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গিরিয়ক, অর্থাৎ গিরিএক অর্থাৎ একমাত্র গিরি। ইহার সহিত ফা-হিয়ান-বর্ণিত নির্জ্জন পর্ব্বতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

হিউয়েন-সিয়াং বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়েও পর্ব্বত-গাত্রে বুদ্ধদেবের অঙ্কিত চিহ্নাদি দৃষ্ট হইত।

বারান্তরে আমরা বিহারের আরও কএকটি স্থানের বর্ণনা দিবার প্রয়াস পাইব। *

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

* এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি পাটনা কলেজের অধ্যাপক প্রত্নতত্ত্ববিৎ জ্যাকসন্ সাহেব মৎসম্পাদিত "সমসাময়িক ভারতের" জন্য তুলিয়া ও এই প্রবন্ধের সহিত ব্যবহার করিতে দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

নদীয়া

১

প্রেম-অবতার নিমাই যাহার বক্ষ করিল আলা,
সে প্রেম-পাথার পরশে পবিত্র যাহার পথের ধূলা,
প্রচারিত যা'র ভবনে প্রথম প্রেমের ধর্ম্ম নব,
ব্রাহ্মণ দিল চণ্ডালে কোল স্তম্ভিত হ'ল ভব,
যেথা হরি জীবে দিলা হরিনাম জাতি-কুল নাহি গণি,
স্বর্গ হইতে নামিল যেথায় ভক্তির সুরধুনী,
হরি-প্রেমরস-বাদর-প্লাবিত ধন্য নদীয়া তুমি,
ধরণীরে তুমি ধন্য করেছ, বঙ্গের ব্রজভূমি।

২

অঙ্গন হরিনাম-মুখরিত, ভবনে তনয় মৃত,
হরি-বন্ধনে ভব-বন্ধন যাহার ছিন্নীকৃত,
সেই 'শ্রীনিবাস' রচেছিল বাস তোমার বক্ষ মাঝে,
হেরি গোরামুখ যা'র শতদুখ লুকাইত ভয়ে লাজে,
হরি ধ্যান-জ্ঞান-ভজন-সাধন, গোরা-প্রাণ নরহরি,
যাহার ধূলার প্রেমাবেশে হায় দিয়াছেন গড়াগড়ি,
হরি-প্রেমরস-বাদর-প্লাবিত ধন্য নদীয়া তুমি,
ধরণীরে তুমি ধন্য করেছ, বঙ্গের ব্রজভূমি।

৩

অতি পাষণ্ড জগাই মাধাই যেথা দিত নিতি হানা,
নিত্যানন্দে মারিল সজোরে ছুড়িয়া কলসীকানা ;
লৌহ-হৃদয় কাঞ্চন হ'ল পরশি পরশমণি
শুষ্ক বিটপী মুঞ্জরে যেথা পাষাণ হয় গো ননী।
এসেছি তোমার দুয়ারে জননি তাপিত হৃদয় বহি'
শত অপরাধ ভঞ্জন কর, উদ্ধার' দয়াময়ি !
হরি-প্রেমরস-বাদর-প্লাবিত ধন্য নদীয়া তুমি,
ধরণীরে তুমি ধন্য করেছ, বঙ্গের ব্রজভূমি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মিনিয়া

(আদর্শ ছোট গল্প)

হায় মিনিয়া তুমি কোথায়! এস্রাজের মিঠা করুণ ঝঙ্কারের মত সহসা এ কাহার স্বর আমার শ্রবণগোচর হইল। সম্মুখে কণারকের বিশাল সূর্য্যমন্দির, অদূরে অকূল অনন্ত সমুদ্র, এ দুর্গম প্রদেশে কোথা হইতে এ মধুর স্বর আসিল। বাঙ্গালীর পরিচিত স্বর শুনিয়া চমকিত হইলাম। বিরলে সাগরতীরে বসিয়া, লহরীর সনে মর্ম্মকথা কহিতে সংসারতাপতপ্ত কোন আকুল হৃদয় হয় ত এখানে আসিয়াছে। হায় কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

"দেহের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার।"

বড় আগ্রহ হইল, সেই অশরীরী বাণীর অনুসরণ করিয়া চলিলাম। চারিদিকে ধূ ধূ বালুকা ; মাঝে মাঝে দুই একটা বন্য ঝাউ ও অর্দ্ধশুষ্ক কেতকীর ঝাড়। এখানে এ মধুর স্বরলহরী কোথা হইতে আসিতেছে? হঠাৎ দুইটি তুষারশুভ্র পারাবত দলবদ্ধ স্বর্ণ-পিঞ্জরের মৃদু নিক্কণে নীলাকাশ মুখরিত করিয়া ঊর্দ্ধে, বহু ঊর্দ্ধে উড়িয়া গেল। আকাশের নীলবর্ণে শুভ্রকণা ধীরে মিলাইল।

তখন সূর্য্যদেব সাগরস্নান করিয়া অস্তাচলে গমন করিতেছেন। সহস্র কিরণের কনকরশ্মিতে সমুদ্রে তখন একটা আলোকতুফান পড়িয়াছে। আমি অনন্যমনে সেই শোভাসাগরে অবগাহন করিতেছি, এমন সময় দেখি এক কমনীয়-কান্তি যুবা একদৃষ্টে সেই মজ্জমান স্বর্ণ-থালার পানে চাহিয়া আছেন। এই বিজন কূলে মনুষ্য সমাগম দেখিয়াই আনন্দিত হইলাম। ধীরে অতি ধীরে তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম। এমন অনিন্দ্য-মূর্ত্তি, এমন অনবদ্য রূপ কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এমন উজ্জ্বল নয়ন এমন সৌম্য বদন দেবতাতেই সম্ভবে।

সে মধুর স্বর যে এই যুবারই তাহা স্থির করিতে বিলম্ব হইল না। এমন কণ্ঠ ভিন্ন তেমন স্বর থাকিতে পারে না। এমন কুসুম ভিন্ন সে সুরভি দুর্ল্লভ। এক একবার মনে হইল, এ কোন্ পথহারা দেবতা! এমন লাবণ্য কখনও ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অথচ মুখখানি যেন কতকাল চেনা। যেন যুবা আমার কত

অন্তরঙ্গ, কত আপনার। সাহসে ভর করিয়া নিকটে গিয়া বসিলাম। তাঁহার সুরভি-নিঃশ্বাসে সমীরণ আমোদিত। তাঁহার অঙ্গের জ্যোতিঃতে বেলাভূমি পবিত্র।

আজ পূর্ণিমা, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, শশাঙ্ক-সমাগমে আজ সাগর উন্মত্ত। উচ্ছ্বসিত নীললহরী পাণ্ডু সৈকতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। যুবক একটি তারকাপানে চাহিয়া আছেন। যুবকের পাটল অধরপুট যেন তারকার সমস্ত সান্দ্র সুষমা চুমিয়া লইতেছে। ভাবিলাম ইনি সত্যই দেবতা, সুধাপান করিতেছেন।

বহু বহুক্ষণ পরে যুবা আমার পানে চাহিলেন, সে অপার্থিব ভুবন-ভুলান চাহনি, জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না। সে স্ফুটনোন্মুখ মন্দারকলিকার শোভা কি ভুলিতে পারি? আমার আঁখি-পাখী পলক না পড়ে, অনন্ত কাল ধরিয়া চাহিয়া থাকি।

যুবা সমুদ্রতীরে কতকগুলি ঝিনুক কুড়াইয়া শিশুর ন্যায় সাগরে ফেলিয়া খেলা করিতেছিল। কোন কথা কহিল না, আমি কিন্তু কথা কহিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্রথম কথা কহিলাম। সে তেমনই অমৃতনিষ্যন্দিনী ভাষায় উত্তর দিল। সে ভাষা যুগ যুগ শুনিলেও হৃদয় তৃপ্ত হয় না। যুবক আবার তারাটির পানে চাহিতে লাগিল।

তাহার এমনই একটা আকর্ষণীশক্তি যে সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে তাহা বুঝিতেই পারি নাই। শুনিয়াছিলাম কণারকের মন্দিরশীর্ষে এমন এক প্রকাণ্ড চুম্বক ছিল, যাহা দ্বারা সুদূর পোতরাজি আকর্ষিত হইত! আজ কণারকে আমার হৃদয়-তরীরও বুঝি সেই দশা হইল। এ যে—

"পুরুষ প্রকৃতি ভাবে
কাঁদিয়া আকুল গো
নারী বা কেমনে প্রাণ ধরে।"

যুবাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া আমি গুণগুণ করিয়া গাহিতে লাগিলাম—

"বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।
মধু নিশি পূর্ণিমার,
আসে যায় বারে বার,
সে কভু ফেরে না আর
যে গেছে চলে॥"

গীতশেষে ফিরিয়া দেখি যুবক নাই, আমার চক্ষে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। হায়! নিমেষের জন্য হৃদয় মোহিত করিয়া দেবতা কোথায় লুকাইল। সেই গভীর রাত্রিতে সেই অনন্তের বেলাভূমিতে উন্মত্তের ন্যায় সেই মূর্ত্তির অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিলাম। কোন সাড়া-শব্দ নাই, কেবল সমুদ্রের সেই অশান্ত কল্লোল। প্রাণে একটা দারুণ বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। হায়! ভাল করিয়া দেখা হইল না, বহু পুণ্যে দেবতার দর্শন পাইয়াছিলাম, কেন ভাল করিয়া দেখিলাম না।

উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সহসা একটা দ্রব্য আমার চক্ষে পড়িল। তুলিয়া দেখি একখানা গোলাপী বর্ণের খাম। মনে আশার সঞ্চার হইল, ইহাতে সেই যুবার কোনও সন্ধান পাইলেও পাইতে পারি। বহুমূল্য রত্নের ন্যায় সেই পত্রখানি বক্ষে করিয়া মন্দিরে ফিরিলাম, নিদ্রিত গাড়োয়ানকে জাগাইয়া প্রদীপ জ্বালিলাম, প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে কম্পিতকরে পত্রখানি পড়িতে লাগিলাম :—

"বঁধু গেল মধুপুরে হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী কী মালা॥"

প্রাণাধিক প্রিয়!

তুমি এখন কোথায়? আমরা ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি, এমন করিয়াই কি দেরী করিতে হয়? একবার এস, তোমার বিহনে মঙ্গল আজ অমঙ্গলে পূর্ণ। পিতাঠাকুর দিবানিশি তোমার সন্ধানে ব্যগ্র। এমন সংবাদপত্র নাই, যাহাতে তোমার সংবাদের জন্য তিনি পুরস্কার ঘোষণা করেন নাই। যদি তোমার তরণী তুষারশৈলে আবদ্ধ হইয়া থাকে, সেই জন্য তুষার কর্ত্তকদল দিগ্‌বিদিকে প্রেরিত হইয়াছে, তোমার নাবিকেরা পাছে দিগ্‌ভ্রম করে

মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন

"মুখ খানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে,
বিম্ব বিড়ম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে।"—নয়নানন্দ

(চিত্রশিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ)

The Emerald Ptg. Works, Calcutta.

চন্দ্রাপীড় ও মহাশ্বেতা

—প্রথম সন্দর্শন—

[শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ বাগচী]

সেই জন্য তোমার প্রাসাদ-উদ্যানের নীলবর্ণের আকাশ-দীপটি অত্যুজ্জ্বল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তোমার অদর্শনকালের মধ্যে কত ঘটনাই ঘটিয়াছে। তোমার বিরামকুঞ্জের পার্শ্বে যে দিগন্তব্যাপী তুষার-ক্ষেত ছিল, তাহা কর্ষিত হইয়াছে এবং শ্যামল শস্যপূর্ণ হইয়াছে। তুষার-শৈল হইতে সলিলবহনোপযোগী পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু একের অভাবে সবই আঁধার,—তোমার অভাবে সব নীরব,—সঙ্গীতশালায় আর সঙ্গীত নাই, পরী-বালিকারা আর নৃত্য করিতে আসে না। তুমি যেখানেই থাক, এই আমার পালিত বিশ্বদূত পারাবত তোমার সন্ধান করিবে, ইহার সহিত তোমার কুশল-সংবাদ পাঠাইবে। আমি তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।

পদাশ্রিতা—
মিনিয়া।

পত্র পড়িয়া আমি বিস্মিত! পুলকিত!—ভাবিলাম, হায়! কি সৌভাগ্য, দেববালার প্রেমপত্র পড়িতে পাইলাম। যে মঙ্গল-গ্রহ লইয়া এত তর্ক, এত আন্দোলন অনায়াসে আজ তাহার মীমাংসা হইল। কি আনন্দ! তাহার অধিবাসীর সহিত সাক্ষাৎ!—যাহা যুগ-যুগ তপস্যা করিয়া হয় না, তাহাও হইল। শুধু কি তাই? এই অমূল্য দুর্ল্লভ পত্র,—এ যে বৈজ্ঞানিকগণের পরশমণি—মোহমুদ্গর। এ পত্রের প্রকাশে যে পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিবে।—হায় নীলবর্ণের আলো!—তুমি প্রেমিকের প্রমোদবনের আকাশ-দীপ, তাহা এতদিন কে জানিত? হায় শুষ্ক পরিখা!—তোমায় কত বৈজ্ঞানিক কত ভাবেই দেখিয়াছে। বিপুল আনন্দে ও উৎকণ্ঠায় তখনই শকট পুরী-অভিমুখে চালাইতে হুকুম দিলাম। কণারক, তুমি ধন্য! তোমার পাষাণবক্ষে অশোকের শিলালিপি দেখিতে আসিয়াছিলাম;—তুমি আমাকে নূতন জগতের সংবাদ আনিয়া দিলে। ধন্য মিনিয়া! ধন্য তোমার প্রেম!—তুমি স্বর্গমর্ত্ত্য এক করিয়া দিলে! তোমার বাঞ্ছিতে তুমি ফিরিয়া পাও, তোমার প্রণয় অক্ষয় হউক। তোমার প্রেমপত্র রহস্য-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল।

পুরীতে ফিরিয়াই বন্ধুবরকে এই নবাবিষ্কারের কথা জানাইলাম। তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভ্য,—মঙ্গলগ্রহের জীব বাঙ্গালায় কথা কয়, বাঙ্গালায় পত্র লেখে, দেখিয়া আনন্দে অধীর। বন্ধু পত্রখানি পড়িয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন; তাহারপর আমার হৃদয়ে নবীন আলোক প্রদান করিলেন। বলিলেন,—"যে যুবকটির সহিত দেখা হইয়াছিল, তাহাকে চিনিতে পারিয়াছ কি?" আমি বলিলাম, "না"। বন্ধু বলিলেন,"সেই যুবা স্বয়ং পুণ্ডরীক,আর মহাশ্বেতা মঙ্গল-গ্রহে মিনিয়া নাম গ্রহণ করিয়াছেন।" আমি শুনিয়াই বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় বসিয়া পড়িলাম—

অহো সত্যই—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তু,
তৎ চেতসা স্মরতি নূনমবোধ পূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।"

—তাই সে যুবাকে এমন চিরপরিচিত মনে হইতেছিল। হা হতোস্মি মন্দভাগ্য!—

"ভাল করি পেখন না ভেল,
মেঘমালা সঙে তড়িতলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

—কপিঞ্জল।

মন্ত্রশক্তি

[পূর্ব্বাবৃত্তি—রাজনগরের জমিদার কুলদেবতা গোপীকিশোরের প্রতিষ্ঠাতা উইলসূত্রে তাঁহার বিশাল জমিদারী দেবত্র এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি ও তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে সেবায়েত নিযুক্ত করেন। তর্কচূড়ামণি মৃত্যুকালে নবাগত ছাত্র অম্বরনাথকে পুরোহিত-পদে অভিষিক্ত করেন; বহুদিনের ছাত্র আদ্যনাথ ইহাতে রাগ করিয়া টোল ছাড়িয়া ঐ গ্রামেই তাহার দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতার বাড়ীতে আশ্রয় লয় এবং অম্বরের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে থাকে। সে তাহার ভ্রাতার পত্নী তুলসীমঞ্জরীর সাহায্য-লাভের চেষ্টা করে; তুলসীর সহিত বর্ত্তমান জমিদার-কন্যা বাণীর সখীত্ব ছিল। বাণীর পিতামহ পৌত্রীর বিবাহ দিবার জন্য যে বর স্থির করেন, সে বর বাণীর পিতা পছন্দ করিলেন না। বাণীর পিতামহ তাই রাগ করিয়া উইল করিয়া গেলেন যে, ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে বাণী যদি উপযুক্ত বরে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে দেবত্র সম্পত্তি ব্যতীত আর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বাণী হইবে; আর যদি তাহা না হয় তাহা হইলে বিষয় দূরসম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি পাইবে; বাণীর পিতা রমাবল্লভ কেবল মাসিক বৃত্তি পাইবেন। রমাবল্লভ ভাল ছেলে আর খুঁজিয়া পান না। তিনি গোপীকিশোরের সেবার ভার বাণীর উপর দিলেন।

এদিকে বালক অম্বরনাথের পূজায় বাণীর মন উঠে না; ছেলে মানুষ—পূজা বোধ হয় ঠিক হয় না; অথচ কোন্ খানটায় ঠিক হয় না, তাহাও ধরিয়া দিতে পারে না। দশজনেও পূজায় সন্তুষ্ট নহে। স্নানযাত্রার সময় পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে অম্বরনাথকেই কথকতা করিতে হইল। সে কখনও এ কার্য্য করে নাই, তাই, কেমন থতমত খাইতে লাগিল, সকলে অসন্তুষ্ট হইল, বাণীও অসন্তুষ্ট হইলেন। শেষে কথকতার ভার আদ্যনাথ পাইল। তাহার কথকতার জয়জয়কার হইল,—অম্বরনাথ এতটুকু হইয়া গেল। তাহার পর একদিন পূজার সময় বাণী দেখিল, পূজার পাত্রে রক্তজবা; দেখিয়াই পিতার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিল, এবং সেইদিনই অম্বরনাথের পৌরহিত্য পদ ঘুচিয়া গেল। অম্বরনাথ এতদিনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বাণীর পিতার মৃগাঙ্ক নামে এক অতি দূরসম্পর্কীয় ভাগ্নে ছিল। ছেলেটা সকল দোষের আকর, গুণের মধ্যে বড় কুলীন। মৃগাঙ্ক জমিদারবাড়ী আসিয়া আসর জমাইত। জমিদার-পত্নী তাহারই সহিত বাণীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; আর ১৫ দিনের মধ্যে বিবাহ না দিলে যে রমাবল্লভের কিছুই থাকে না। স্বামীর প্রস্তাব শুনিয়া মৃগাঙ্ক সম্মত হইল। বাণী শুনিয়া মস্তকে করাঘাত করিল।]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দাসীত্বই হউক আর যাহাই হউক এবার কিন্তু বাণী মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিল যে, সে বন্ধন অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই। কৃষ্ণপ্রিয়া যখন তাহাকে মৃগাঙ্ক-মোহনের সহিত সহজভাবে মেলামেশা করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে এবং সে এখনও খবর পায় নাই বুঝিয়া কি ছলে সংবাদটা জানাইবেন তাহাই মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছেন, এমন সময় সে আপনি আসিয়া বলিল, "আমায় যদি নেহাৎ—আমি কিন্তু এবাড়ীর বাহিরে একপাও নড়িব না।" কন্যার মতি ফিরিতেছে দেখিয়া খুসী হইয়া কৃষ্ণপ্রিয়া উত্তর করিলেন, "নড়িতে কে তোকে বলিল?" "আর কেউ এখানে থাকিবে সেও হ'বে না।" "সে আবার কি?" "এ না হ'লে বিয়ে হ'তেই পারবে না।" কৃষ্ণপ্রিয়া ঈষৎ রাগ করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "কি যে সব বলিস্, মানেই বোঝা যায় না! মৃগাঙ্ক আমাদের এখানেই থাকিবে; তুই আবার কোথায় যাবি!" মা যেমন মেয়ের কথা অসংলগ্ন বলিয়া অনুযোগ করিলেন; মেয়েও মাতাকে সেই কারণই দর্শাইয়া বলিল, "ও এখানে থাকিয়া কা'র কি উপকার করিবে মা?" কৃষ্ণপ্রিয়া এবার যথার্থ রাগিয়া গেলেন, কহিলেন, "মৃগু যখন আমার জামাই হ'বে, তখন ও এখানে না থেকে কোথায় থাকতে যা'বে? তোর সকলই অনাসৃষ্টি আবদার যে বাণী!"

শুনিয়া প্রথমে বাণী বুঝিতে পারিল না যে, সে সত্যই এই কথাগুলা শুনিল কি না! তাই কিছুক্ষণ মায়ের মুখের দিকে বিহ্বলনেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া যখন বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল, তখন সবিস্ময়ে কহিয়া ফেলিল "এ আবার কি ব'ল্চ। আমি বুঝিতে পার্‌চিনে,—ওঃ! সে কিন্তু হ'তেই পারে না।" "সে কি!" "নাঃ! সে হ'বে না,—আমি তা'হ'লে মোটেই বিয়ে ক'র্‌ব না। মেয়েমানুষের উপরে ওর যা শ্রদ্ধা! না—কখন না।" কৃষ্ণপ্রিয়া সক্রোধে বলিলেন, "যা জান কর, আমি কিছু জানি নে, বাছা।"

রাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া মেয়ের নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন, "এবাড়ীর সব সমান! যেমন জেদি বংশের মেয়ে, তেমনই ত হইবে! আমাদের বাপু অতশত ছিল না; যে যা বলে এখনও ভাল মনে করিয়াই মানিয়া লই, নিজের প্রতি অত বিশ্বাস, মেয়েমানুষের পক্ষে বড় খারাপ! মেয়ের বাপ যাহা বোঝেন্—করুন্; আমি নির্ব্বোধ মানুষ, আমার একপাশে স'রে থাকাই ভাল।"

এই মনে করিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। একবার ভাবিলেন স্বামীকে ডাকিয়া সব কথা বলেন, আবার পরক্ষণে অভিমানের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এই ভাবটা ভাসিয়া আসিল যে, "দূর হউক—আমার কি!"

বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়াছে শুনিয়া, তুলসীমঞ্জরী এক দিন বাণীর নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল,—"বেশ হয়েচে! আচ্ছা ভাই, এখন কেমন মনে হচ্চে বল্ দেখি। বলি নাই কি, যে একমাঘে শীত পালায় না?" বাণী মনের অবস্থা গোপন করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "খুব ভাল। তোর যেমন হ'য়েছিল, তেমনই।" "আমার!" বলিয়া মঞ্জরী একটু সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল,"তা ঠিক নয়। আমার, সত্যি কথা বল্‌তে কি, বিয়ের কথায় একটুও ভাল লাগে নাই।" "কেন?" "কেন? বুঝিয়া দেখ!" "কি? বুড় বর?" "তাই।" মঞ্জরীর উভয়গণ্ডে শোণিত-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। বাণী তাহাকে ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া সহাস্যমুখে অথচ কোপ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "দূর'হ হতভাগী! আমি যদি অমন একটি বুড় পাইতাম, ত বর্ত্তাইয়া যাইতাম।" মঞ্জরী হাসিয়া উঠিল, "নেনা কেন?" "সে হয় না।" "কেন?" "আমার সতীন থাকিবার হুকুম নাই।" "মানা করিল কে?" বাণী কথাটা ফিরাইয়া লইল— "বিধাতা! আচ্ছা এখন তোর কি মনে হয় যে, বুড়র সঙ্গে বিয়ে না হইলে ভাল হইত?" "দূর্! তা কেন? এখন মনে হয়, ওঁকে না হ'লে আমার চলিতেই পারিত না। সত্য ভাই—এমন নিরীহ মানুষ কোথা পাইতাম, যে আমার মত স্ত্রীকে সহ্য করিত?" বাণী সে কথার উত্তর দিল না, কি একটা ভাবিয়া সে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহাকে বিমনা দেখিয়া তুলসী কথা ফিরাইয়া বলিল, "যা'ক্ ভাই, এখন পচা পুরাণ কথা রেখে তাজা তাজা খবর দাও দেখি আগে;—সয়াটি কেমন?" "সয়া?—তা খুব ভাল"। মঞ্জরী এ সংবাদে আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে সাগ্রহে বলিল, "ভাল ত হ'বেই। ভাল না হইলে আর তোর মা বাবা মত করিয়াছেন! এতদিন পরে তাহ'লে তোর বিয়ের ফুল ফুটিল! বড় লোকের ছেলে ত? কোথায় বাড়ী?" "বড়লোকের ছেলে কি না জানি না, নিজে খুবই বড়লোক, আর বাড়ী? এমন স্থান নাই যেখানে তাঁর বাড়ী নয়।" "ওঃ!—তাহ'লে মস্তলোক! খুব ভাগ্যবান্ পুরুষ বল্! এবার তোমায় পেয়ে যথার্থই ভাগ্যবান্ হ'বেন;—নাম কি তাঁর?" "যম"! "বাঃ!—যা মুখে আসে তাই বলিস্!" তুলসী রাগ করিয়া উঠিয়া গেল, এবং একটুখানি পরে মান খোয়াইয়া নিজেই ফিরিয়া আসিল,—"তোর সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে না; আচ্ছা শুধু একটা কথা বল্,—বার তের দিন পরেই বিয়ে, তা' ঘটা টটা ত কিছু দেখ্‌চি না। আমি সইমার কাছে যাই, সবই জান্‌তে পারব।"

বাণী হাসিয়া বলিল, "কি আবার জানিতে বাকি আছে? ঘটার ভাবনা কি;—হরিসংকীর্ত্তন,ঠাকুর নাটমন্দিরে হাজির, উঠানে তুলসীমঞ্চ, ঘরে তুলসীমঞ্জরী—"মঞ্জরী এবার যথার্থই রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে বাণী ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বুঝিল, বাড়ীতে বিবাহের ঘটা আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই। ধামাধামা বড়ির দাল দাসীরা নদীর ঘাটে ধুইতে চলিয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ পাত্রে কাটিবার জন্য সুপারি ভিজান হইল। বাণীর শুভ্রমুখ আরক্ত হইয়াই এবার একেবারে পাংশু হইয়া গেল, দন্ত দিয়া ক্ষুব্ধরোষে অধর-দংশন করিয়া কোন-মতে সে নিজেকে শুধু সকলকার সম্মুখে খাড়া রাখিয়াছিল। দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। ক্ষোভে রোষে তাহার সূক্ষ্ম ধমনীর রুদ্ধ শোণিত-স্রোত, ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গের মত তাহার সর্ব্বশরীরকে আলোড়িত করিতে লাগিল।—দেবতা বা মানব কেহ তাহাকে রক্ষা করিল না!

মৃগাঙ্কমোহনও বাড়ীতে যে বিবাহের উদ্যোগ চলিতেছিল, তাহা বেশ বুঝিল। অসচ্চরিত্র হইলেও বিবেক তখনও তাহাকে একেবারে ত্যাগ করে নাই। বিবেকের দংশনে সে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইল যে, সে এ বিবাহ কিছুতেই ঘটিতে দিবে না— মামীর কাছে সত্য করিয়া বলিবে সে বিবাহিত।

চিন্তাক্লিষ্ট মনে আপনার ঘরে যখন কৃষ্ণপ্রিয়া একান্ত-মনে কন্যার অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতার প্রশ্রয়দাতা কন্যার পিতার অপরাধের পরিমাপ করিতেছিলেন, তখন মৃগাঙ্কমোহন আসিয়া বলিল, "সুবিধা করিতে পারিলাম না; মামি, মাপ করিও।"কৃষ্ণপ্রিয়া সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কি সুবিধা করিতে পারিলে না বাবা?" "এই তোমার জামাই হওয়ার—না মামি,যা আছি এই ভাল; বেশি আদর সহ্য

হইবে না। তা'ছাড়া তোমার মেয়েটিকে ছোট বোনের মত আদর আপ্যায়ন করিয়া যাওয়াই ভাল;—ওকি সতীন সইতে পারিবে? আমি বন্ধুই বলি, আর যাই বলি, ওত মনে করিবে সতীন!" অকস্মাৎ ছাদ ফুঁড়িয়া গৃহে বাজ পড়িলে মানুষ যেমন স্তম্ভিত হইয়া যায়, কৃষ্ণপ্রিয়াও সেইরূপ হইয়া গেলেন! বলিলেন, "সতীন! তোমার বিয়ে হইয়াছে নাকি?" মৃগাঙ্কের মুখে কৌতুকহাস্য উথলিয়া উঠিল, "লোকে তাই বলিবে বটে; যদিও আমি জানি, আমি সাতপাকে জড়াইয়া একটি বন্ধু ঘরে আনিয়াছি।" কথার সুরে ও ভাবে কৃষ্ণপ্রিয়ার মনে ঈষৎ সন্দেহ জন্মিতেছিল। এই মাত্র যে কন্যার বিবাহের কথায় থাকিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ইহারই মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া, এই সংবাদের তীব্রতায় একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন মৃগাঙ্কের হাসিমুখ দেখিয়া একটুখানি আশান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি বলিতেছ?" সে কহিল, "মিথ্যা বলিয়া আমার লাভ কি? একবার মনে করিয়াছিলাম বটে, যে মিথ্যা বলি;—সেই বন্ধুর খবরটা উহ্যই থাক। কিন্তু সেটা পোষাইল না; আমি লক্ষীছাড়া বটে,—তা' ব'লে জুয়োচোর নই, মামি! তবে আমি এইটুকু করিতে পারি, আমাদের ওখানে একটি ছেলে নূতন একটি চতুষ্পাঠী খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন; ছেলেটি বড় ভাল—আমার মত হতচ্ছাড়া নয়—আমি জানি সে আমাদেরই ঘর। যদি বল, ত তা'কেই তোমার জামাই ক'রে দিতে পারি।"

রাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া মেয়ের নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন (২৫১ পৃষ্ঠা)

কৃষ্ণপ্রিয়ার গভীর কৃতজ্ঞতার নির্ঝর বাষ্পাকারে দুই নেত্রে উদ্ভূত হইয়া চারিদিকটা ঝাপ্‌সা করিয়া দিল। সাগ্রহে ভাগিনেয়ের হাত ধরিয়া কহিয়া উঠিলেন, "তা হ'লেত বাঁচাও বাবা!—কে সেই ছেলেটি?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "তার নাম অম্বরনাথ।"

কথাটা শুনিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া স্বামীর নিকট গিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখের বিরক্তির চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "ইহাতে দোষ কি? কুলীনের ঘরে চিরকাল ধরিয়াই এই প্রকার হইতেছে। বিক্রমপুর হইতে তাঁহার পিসীদের জন্য যে পাত্র আসিয়াছিল, তাহারা কি অম্বরের চেয়ে কোন অংশে ভাল! মেয়ের যোগ্য ত হইবেই না, তা আর কি করা যাইবে! মৃগাঙ্কের চেয়ে অম্বর শতগুণে শ্রেষ্ঠ! সে না হয় গরীব, তা হইলই বা!—মেয়ে কি শ্বশুর-ঘর করিবে, যে তাহার

ধন থাকা প্রয়োজন? বেশ হইবে।—ঘর-জামাই করিতে হইলে এইরূপই ভাল! ইংরেজি বিদ্যা শিক্ষা করে নাই?—তাহা হউক,—একটা বিদ্যাও ত তা' জানে? তাঁ'র পূজা করিতে না জানা যদি এতই অপরাধ মনে করিয়া থাক, তবে তুমিও তা' জান না? হিন্দুঘরের মেয়ে, বাপ্‌মা যাহাকে দিবেন তাহাকেই ভক্তি শ্রদ্ধা করবে। আর কি জান না, সন্তানের সকল আব্‌দার শোনায় তাহার সর্ব্বনাশ করা হয়।—অতটা বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নয়। মেয়ে বলেন, মেমেদের মত আইবুড় থাকিব!—অমনই তোমারও সেই সাধ হইল না কি? আর এখন ত সে পথই নাই,—সেই ভয়েই ঠাকুর এমনটা করিয়া গিয়াছেন। আর খুঁৎ খুঁৎ করিবার সময় নাই।—মন ঠিক করিয়া ফেল।"

রমাবল্লভ কিন্তু কিছুতেই মন বাঁধিতে পারিলেন না;—একেবারে এতবড় দণ্ডটা পিতা হইয়া তিনি তাহাকে কেমন করিয়া দিবেন? কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডবল অনার পাশ সুসভ্য ধনী-সন্তান,—আর কোথায় অযোগ্যতার জন্য বিতাড়িত তাঁহারই কর্ম্মচারী—অবজ্ঞেয় অম্বর! কোন্ সাহসে একথা তিনি বাণীর কর্ণগোচর করিবেন!

সাগ্রহে ভাগিনেয়র হাত ধরিয়া কহিয়া উঠিলেন তা হ'লেত বাঁচাও বাবা; কে সেই ছেলেটি?" (২৫২ পৃষ্ঠা)

বাণী কিন্তু এ সংবাদটা শীঘ্রই পাইল।—প্রথমে সে ইহা নিষ্ঠুর পরিহাস মনে করিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছিল; পরে যখন যথার্থ বলিয়া জানিতে পারিল, তখন একটা দুর্দ্দমনীয় মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল। যে অম্বর তাহার পিতার বেতন-ভোগী ভৃত্য মাত্র ছিল,—তাহার মন্দিরের অযোগ্য পুরোহিত বলিয়া এই সেদিন মাত্র সে যাহাকে অক্ষমতার জন্য তিরস্কার করিয়া বিদায় দিয়াছে,—সেই ব্যক্তিরই তাহার পায়ে ধরিয়া তাহার পিতা তাহাকে দান করিবেন!—আর তাহার দেব-চরণে উৎসর্গিত শরীর, সেই তৎকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ভিখারীকে সমর্পণ করিতে হইবে। বাণী ভাবিল এ কথা শুনিয়া পূর্ব্বে সে মরিল না কেন?

কৃষ্ণপ্রিয়া তখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন; বাণী তাঁহার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল, "মা! তোমাদের জ্বালায় আমি বাড়ি ছেড়ে বনে চলিয়া যাইব; আমি না থাকিলে দাদাবাবুর উইল ত আর মানিতে হইবে না?" "কেন কি হইয়াছে?" "তুমি নিশ্চয়ই সব জা'ন,—এ বাবার পরামর্শ নয়, তোমারই এ পরামর্শ! যেখানে যত হাবাতে হতচ্ছাড়া আছে, খুঁজে খুঁজে তুমিই ত বার ক'রচ।" কৃষ্ণপ্রিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "অবাক্ করিলি বাণি! ব্রাহ্মণ-সজ্জনকে গাল দিচ্ছিস্ কোন্ সাহসে, বল্ দেখি? এতদিন পূজা-জপ করিয়া তোর এই বিদ্যা হইল?" ঘোর অবজ্ঞায় বাণী রাঙ্গা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "ভারি ব্রাহ্মণ! বড় সজ্জন! বলে কিনা আত্মা আর পরমাত্মা এক! তার মানেই

ও ঈশ্বর না মানা। তারই নাম ত নাস্তিক? নৈলে হরিপূজায় জবা ফুল দেয়? তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে, ও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নয়!—ব্রাহ্মণের ঘরে কচি-ছেলেটিরও এ জ্ঞান থাকে। ছোট মেয়েরাও তুলসী দিয়া শিবপূজা, জবা দিয়া বিষ্ণুপূজা করে না। সেদিন আদু ঠাকুর যখন আসিয়া খবর দিলেন,—নতুন ঠাকুর টোলে বসিয়া বৌদ্ধ-মতের প্রচার করিতেছেন, তখনই বুঝিলাম যে উনি কি! এমন স্পর্দ্ধা ওর—পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হইতে চায়! আর স্বচ্ছন্দে দাদাবাবুর চতুষ্পাঠীতে বসিয়া নাস্তিক-মত প্রচার করিতে সাহস করে! অনেক করিয়া বিদায় করিয়াছি।—রক্ষা কর মা! দোহাই তোমাদের, সে পাপকে আর ডাকিয়া আনিও না!"

কৃষ্ণপ্রিয়া অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।—এতবড় বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধ করা কি উচিত হইবে? বাণী মাকে নীরব দেখিয়া রাগে চলিয়া গেল। দুঃখে অভিমানে অপমানে তাহার চোখ ফাটিয়া আগুন বাহির হইতেছিল। যাইবার সময় একজন দাসী "দিদিমণি, শোন"—বলিয়া হাসিমুখে কি একটা খবর দিতে আসিতেছিল, সে তখন তাহাকে যাহাখুসী বলিয়া অন্তর্দাহের সামান্য একটু ঝাল মিটাইল। সে অকারণে এতখানি লাঞ্ছিত হইয়া বুঝিল, দিদিমনির মন ভাল নাই; ইহাও বুঝিল যখন ঝাঁঝ কমিয়া যাইবে, সে তখন এই বকুনি খাওয়ার ফলে কিছু পুরস্কতও হইতে পারে;—তাই সে আশার সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। লোকের সামান্য ত্রুটি ধরা এবং নিজের ত্রুটির দণ্ড দেওয়া দুইই বাণীর স্বভাব।

তালছন্দে গ্রথিত পরস্পরের সহিত সমঞ্জস বাক্য-প্রবাহের নাম সঙ্গীত এবং তদ্‌বিপরীতই কোলাহল। জগতের প্রারম্ভ হইতে আজিকার এই মুহূর্ত্তাবধি যে, কিছু কার্য্য চলিতেছে, তাহা তাহাদের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট তালে ও ছন্দেই সম্পন্ন হইতেছে। পৃথিবীর গতি, গ্রহনক্ষত্রাদির বিচরণ, জাগতিক বস্তুসমূহের বিবর্ত্তন, নদীর স্রোত, জীব-ধমনীর উত্থান পতন,—সমস্তই এক অছিন্ন তালছন্দে নিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে;—ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট ছন্দ ও তাল আছে; তাহা তাহাদের স্ব-ছন্দ। স্বভাব ও স্বছন্দ একই পর্য্যায়ভুক্ত। যে সংসারে সকলেই সঙ্গীতপরায়ণ অর্থাৎ স্বছন্দচিত্ত, সে সংসারে সুখের সীমা নাই—সেই সংসারই স্বর্গ। আর যে, সংসারে সঙ্গীত ফুরাইয়াছে, সকলেই নিজ নিজ ছন্দভ্রষ্ট হইয়া কোলাহল-পরায়ণ হইয়াছে, সেখানে কাহারও সুখের আশা নাই; অস্বচ্ছন্দ সেখানে আধিপত্য-বিস্তার করিবেই করিবে। রমাবল্লভের সংসারের ছন্দভ্রষ্ট-সঙ্গীত তাল কাটিয়া ছিল, তাই সেখানে পিতা পুত্রী জননী সকলেই অসুখী। কৃষ্ণপ্রিয়া স্বামীর অত্যধিক সন্তানবাৎসল্যে বিরক্ত। বাণী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রমাবল্লভ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়; কিন্তু বিপদ সব চেয়ে বেশী রমাবল্লভের। কৃষ্ণপ্রিয়ার মন ভাল; তিনি মন্দটাকেও ভালভাবে গ্রহণ করিয়া ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে জানেন বলিয়া, কোন অবস্থাতেই বড় একটা দুঃখভোগ করেন না। বাণী সহজেই কষ্ট পায়, কিন্তু সে একা একা এত ক্লেশ মোটেই ভোগ করিতে রাজী নয়; রাগিয়া, কাঁদিয়া, অভিমান করিয়া, মাকে আবদারে অস্থির করিয়া তুলিয়া, সেক্ষতির শোধ তুলিয়া ছাড়ে। কিন্তু পুরুষ রমাবল্লভ, গৃহিণীর সহিষ্ণুতা ও বালিকার আব্‌দারের কথা কিছুই জানিতেন না। তিনি জমিদার-সন্তানের স্বভাবসিদ্ধ আত্মা-ভিমান, ও নিজশিক্ষার ঈষৎ গর্ব্ব লইয়া একপাশে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, তাই তাঁহার একটিও বন্ধু নাই। বড়লোকের ছেলেদের অনেক আমোদের সঙ্গী থাকে, প্রকৃত বন্ধু থাকেই না,—আমোদপ্রমোদে বীত-স্পৃহ চরিত্রবান্ রমাবল্লভ তাই চিরদিনই নিঃসঙ্গ। একমাত্র সুখ দুঃখভাগিনী কৃষ্ণপ্রিয়াই তাঁহার চিরসঙ্গিনী; কিন্তু আজ কাল এই কন্যা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা মতভেদ চলি-তেছে; কৃষ্ণপ্রিয়া মা হইয়াও যতদূর না মোহের বশীভূত, তিনি তদপেক্ষা শতগুণে অপত্যস্নেহের অন্ধমায়ায় জ্ঞানশূন্য। তাঁহার প্রথম হইতেই ইচ্ছা ছিল, মেয়েকে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় গড়িয়া তুলেন; পিতার জন্য তাহা সম্পূর্ণ করিতে না পারায় বরাবরই দুঃখিত। তারপর আবার তাঁহার পছন্দে একটা অযোগ্য বিবাহ দিয়া তাহার চিরজীবন বিষময় করিতে তাঁহার বুক ফাটিতেছিল। রমাবল্লভ বড় সাধ করিয়াছিলেন, মেয়ের যোগ্য বর বাঙলা দেশ পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াও বাহির না হয়, সে বরং চিরকুমারী ব্রত লইয়া স্বচ্ছন্দে জীবনাতিবাহিত করিতে থাকুক, তবু এক তিল খুঁৎ থাকিতে কেহ তাঁহার বাণী পাশে দাড়াইবার অধিকার পাইবে না। মেয়েও চিরদিন বাপের মুখে এই আভাষ পাইয়া আসিতেছে। তাই সে আবার তাহার সুর আর একগ্রাম চড়াইয়াছিল; সে স্থির করিয়াছিল তাহার যোগ্য বর এ ভারতবর্ষে—এখনকার অধঃপতনের দিনে জন্মায় না। একমাত্র গোপীবল্লভই তাহাকে লাভ করিবার যোগ্য। তাই সে বড় নিশ্চিন্ত ছিল যে, পূর্ব্বে যেমন হইত একদিন বড় ঘটা পটা করিয়া সে এই গোপীবল্লভের গলায় মালা পরাইয়া দিয়া সিঁতায় সিঁদুর পরা আরম্ভ করিয়া দিবে।

কেবল একটা বাধার কথা ভাবিয়া সে মধ্যে মধ্যে মনে মনে হাসিত। "বাবা বলিয়াছেন, সতীনের হাতে দিবেন না। রাধা ঠাকুরাণী যে পাশে দাঁড়াইয়া আছেন, বাবা রাজী হইলে হয়।" কথাটা এইবার মাকে জানাইবে, ভাবিতেছিল। ঠিক এমন সময়ে অম্বরের পৌরহিত্য এবং তাহার পরই এই পাপ-গ্রহস্বরূপ উইলের সংবাদপ্রাপ্তি ঘটায় সব গোলমাল হইয়া গেল।

সেদিন এই মহা সঙ্কটের সংবাদে রমাবল্লভ যখন বিহ্বল-চিত্তে আকাশ পাতাল ভাবিয়া অস্থির হইতেছেন, এমন সময় ঝড়ের বেগে দ্বার খুলিয়া জ্বলন্ত উল্কার মত তাঁহার আদরিণী মেয়ে আসিয়া ডাকিল, "বাবা! এ কি রকম কথা উঠেছে! তার চেয়ে আমায় চিত্রার জলে ভাসিয়ে দিতে পার্‌তে না?"

তাঁহার মন তখন অগ্নিদগ্ধ লৌহের মত লাল হইয়া জ্বলিতেছিল। রমা-বল্লভ ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া বলিলেন,

"বাবা এ কি রকম কথা উঠেছে! তার চেয়ে আমায় চিত্রার জলে ভাসিয়ে দিতে পার্‌তে না?"

"বাণি! মা আমার! সর্ব্বস্বধন আমার! এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! তোর চেয়ে এতে কি আমারই বেশী অপমান নয়?"

পিতার চোখে জল দেখিয়া বাণী আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। অশনীবর্ষী মেঘের মধ্য হইতে হিম করকা বর্ষিত হইয়া গেল; বলিল, "বাবা তবে না হয় যা হয় হউক; কিন্তু তুমিও প্রতিজ্ঞা কর, সে এখানে থাকিতে পাইবে না! আমি যেমন আছি ঠিক এমনই থাকিতে পাইব। জন্মের মত সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে?"

রমাবল্লভ যেন অকস্মাৎ পথ দেখিতে পাইলেন; বলিলেন, "বাণি! আমায় বাঁচালি মা। আচ্ছা, তাহাই হইবে। এই কথাই বলিব।"

কত তপস্যায় তোমার মত বাপ পাওয়া যায় বাবা? দাদাবাবু কখনও আমায় এত ভালবাসিতেন না। তাহ'লে কি এমন করিয়া—বাবা, দেখ ভুলিয়া যেও না কিন্তু।"

রমাবল্লভ সস্নেহনেত্রে তাহার জলদজালসন্নিভ কেশ-রাশিবেষ্টিত মুখের আকস্মিক উজ্জ্বলতা লক্ষ করিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন, ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নারে না, একি ভুলিয়া যাইবার কথা?"

তাই বলিয়াছিলাম—মেঘ বৃষ্টি-ধারা ঢালে নাই, করকা-পাত করিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গোল পাতায় ছাওয়া দু তিনখানি মেটে ঘর; সম্মুখে লাল-মাটির নিকান আঙ্গিনা; চারিদিকে রাঙ্গচিত্রায় বেড়া বাঁধা

অধ্যয়নশীল যুবকের চারিপাশে আসিয়া কেহ পিঠের উপর পড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিল।

এবং তাহার বাহিরে অদূরে ঘেঁটু, কালকাসন্দা প্রভৃতির ঘন ঝোপে শ্বেত-হরিদ্রাবর্ণ বন্য পুষ্প ফুটিয়া আছে; এদিক্ ওদিকে দু একটা বাঁশঝাড় বাতাসে শন্ শন্ করিয়া উঠিতেছে। অঙ্গনপার্শ্বে একটি ঘোড়ানিমের গাছ ঝিরঝিরে বাতাসে শাখা দোলাইয়া মধ্যে মধ্যে গন্ধ ছড়াইতেছিল ও পুষ্প-বর্ষণ করিতেছিল, তাহার উপরে দুএকটা পাখী কিচ্‌মিচ্ শব্দে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। অঙ্গনে দুএকটা মেলেরিয়া-শীর্ণ উলঙ্গ শিশু একখানা কাঠের তক্তায় দড়ি বাঁধিয়া গাড়ি গাড়ি খেলিতেছিল, তাহাদের অর্দ্ধবয়সী জননী রন্ধনের চালায় পাকশাক করিতে ব্যাপৃত আছেন, আর অন্য একখানা কুটিরাঙ্গনে একখানা ছেঁড়া কম্বলের উপর বসিয়া এক গৌরবর্ণ সুদর্শনকান্তি যুবা কতকগুলি পুঁথিপত্র লইয়া পড়াশোনা করিতেছিল। বইগুলির চেহারা হইতেই বোঝা যাইতেছিল সেগুলি ধর্ম্ম-পুস্তক; অতিজীর্ণ,—প্রায় গলিত। যুবা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে পেন্সিল লইয়া পুঁথির গায়ে দাগ টানিতেছিল, কি লিখিয়া রাখিতেছিল। সেই সকল শব্দ সাধারণের বোধ্য নয়। ইহাতে 'প্রমাতা', 'প্রমেয়', 'জহাতি', 'অজহাতি' প্রভৃতি প্রমাণ প্রয়োগাদি বিবিধ জটিল তর্কজাল ছড়ান ছিল।

ক্রমে প্রথম গ্রীষ্মের প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মি সরিয়া সরিয়া আঙ্গিনায় ক্রীড়াশীল শিশু-দলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিল। শিশুরা অপরিচিতের আগমন না সহিতে পারিয়াই হউক আর শ্রান্ত হইয়াই হউক, খেলা ছাড়িয়া অধ্যয়নশীল যুবকের চারিপাশে আসিয়া জড় হইল। তখন কেহ তাহার পিঠের উপর পড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিল, কেহ তাহাকে বলিল, 'একটা গল্প বল'না,' কেহ পুঁথিপত্রগুলা টানিয়া অপরকে কহিল, 'আয় ভাই ছবি দেখি'।

পাঠরত যুবক এ সকলে মন না দিয়া দুরূহ বিষয় সকল সহজ-করণের চেষ্টায়ই ব্যাপৃত রহিয়াছিলেন; কিন্তু অল্পপরেই একটা পরিচিত শব্দ শুনিলেন। সকলের ছোট ছেলেটি কোথা হইতে হামা দিয়া আসিয়া তাহার একখানি পুঁথি দখল করিয়াছিল। এখন তাহা ছিন্ন করিতে লাগিয়া গিয়াছে। "কি করিল" বলিয়া তাড়াতাড়ি ছিন্ন পুস্তকখানা তাহার হাত হইতে টানিয়া লইল! যাহা গেল তাহা আর পাওয়া যাইবে না। হৃদয়শোণিত-তুল্য প্রিয়, বড় দুঃখে সংগৃহীত 'মহাভাষ্য'খানি জন্মের মত গেল! এক মুহূর্ত্ত সে ব্যথিতনেত্রে সেই গলিতপত্র খণ্ডিত-মূর্ত্তি বইখানির দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর একটা অতি মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রন্দনশীল শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টিত

হইল। অন্য ছেলেরা ভাইয়ের কার্য্য দেখিয়াছিল ; তাহারা মহা কোলাহলে জননীকে সংবাদ দিতে ছুটিল,—'খোকা অম্বর কাকার বই ছিঁড়েচে'। অম্বর, যুবক অম্বরনাথ! সে ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ওরে না, না,—তোরা থাম্ ; ও কি জানে?" সে জানিত তাহার বৌদি' এ অপরাধে শিশুর অজ্ঞতা মাপ করিতে রাজী হইবেন না। এমন সময় সহসা সেই গোলমাল সমস্ত একসঙ্গে থামিয়া গেল, ছেলেগুলা মুখ শুকাইয়া যেখানে যে দাঁড়াইয়া গেল, গৃহিণী তৎক্ষণাৎ ব্যঞ্জনচালনার খুন্তিহাতে দ্বারের বাহিরে আসিয়া 'কই সে হতভাগাটা কোথায় গেল রে' বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন। তিনিও বামহস্তের কব্‌জি দ্বারা কোনমতে মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অম্বর বুঝিল গৃহস্বামী গৃহে ফিরিয়াছেন। সেও একটু সন্ত্রস্তভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ক্রন্দনপরায়ণ শিশুটিও ইতোমধ্যে তাহার রাশভারি পিতার আগমন-প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

অম্বরের ভ্রাতৃ-সম্পর্কিত গঙ্গারাম শর্ম্মা গ্রামের পুরোহিত। যজমান সাধিয়া তিনি ঘরে ফিরিয়াছিলেন। অন্যদিন এ সময় নৈবেদ্য দক্ষিণার স্বল্পতায় ও গৃহের মধ্যে পরিবারবর্গের প্রাচুর্য্যে তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া থাকিত। সে সময় সম্মুখে যে ছেলে মেয়েটা পড়িত, তাহার উপরে অনেকখানি মানসিক ঝাঁজ বাহির হইয়া পড়িতে ত্রুটি হইত না। তাই পিতৃসন্দর্শনে শাসনভীত সন্তানেরা দণ্ডভীত অপরাধিদলের মত মুহূর্ত্তে তটস্থ হইয়া পড়িত। অম্বর ইহা দেখিত, এবং সে ইহাতে মনে মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিত। অন্তরালে সে ইহা স্মরণ করিয়া অনাহত শিশুগুলিকে তাহার স্নেহতপ্ত হৃদয়ের করুণাধারা ঢালিয়া দিয়া বুকে টানিয়া লইত,—সম্মুখে চুপ করিয়া দেখিত ও সহিত। আজ গঙ্গারামের মেজাজে ঝাঁজ ছিল না। দারিদ্র্যের উৎপীড়নে উৎখাত চিত্তের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ স্বাভাবিক অপ্রসন্ন মুখ আজ বড় প্রসন্ন, রন্ধনগৃহের দ্বারের নিকট গিয়া উত্তরীয় সমেত নৈবেদ্যাংশ প্রভৃতি স্থাপনপূর্ব্বক গৃহিণীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ওগো এই তোমার সামগ্রীপাতি দেখিয়া শুনিয়া লও।" তারপর দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে অম্বরের ক্রোড়স্থ অশ্রুচিহ্নিত ছেলেটাকে সহাস্যে কহিলেন "কিরে নিতে, কাকার কোলে চ'ড়ে কান্না হচ্ছিল যে, ওহে অম্বর! তোমার পূর্ব্বমনিব রমাবল্লভ বাবু আজ একপত্র লিখিয়াছেন,—তোমায় অবিলম্বে একবার সেখানে পাঠাইতে অনুরোধ ; আর তোমায় যদি সেখানে পাঠাইতে পারি, তবে আমাকে মাসিক একটা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিবেন, এমনও আভাষ আছে। কেন, ব্যাপার কি বল দেখি!" শুনিয়া অম্বর অবাক্ হইয়া গেল!—তাহাকে ডাকিয়াছেন?—তাহাকে!—কি প্রয়োজনে?—কেন ডাকিলেন?—সে ত তাহাদের একটুকুও প্রয়োজনীয় ছিল না। তবে আজ তাহারা কি কার্য্য খুঁজিতেছেন?—সে কি করিতে পারে?

তাহাকে নীরব দেখিয়া গঙ্গারামের মনে একটু খট্‌কা লাগিল ;—তবে কি সে যাইতে ইচ্ছুক নয়? অবশ্য বিশেষ কোন কারণ আছেই,—নহিলে অতবড় একটা লোক তাহার মত সামান্য একজন লোককে এত মিনতি করিয়া কেন পত্র লিখিবেন? আবার পাঠাইতে পারিলে পুরস্কার! তবে হয় ত পাঠানটা খুব সহজ নয়। ব্যগ্রভাবে তাহার মুখের ভাব পর্য্যবেক্ষণচেষ্টা করিয়া কহিয়া উঠিলেন,—"তুমি যাইবে ত?" অম্বর তাঁহার কথা শুনিতে পায় নাই। সহসা সে চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।—কেন ডাকিয়াছেন?—সত্য সত্যই কি ডাকিয়াছেন?—না, দাদার বুঝিবার ভুল! সে কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া সংশয়াকুলচিত্তে গঙ্গারামের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন ত?" গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"—"আমাকেই যাইতে আদেশ করিয়াছেন?"—"হাঁ! নিশ্চয়! তোমাকেই ; তুমি যাইবেনা নাকি?" গঙ্গারাম রুদ্ধশ্বাসে উত্তর শুনিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অম্বর ঈষৎ বিচলিতভাবে একবার বাহিরের দিকে তাকাইল। বাতাসে তখন ঘোড়ানিমের ফুলের গন্ধ ভাসিতেছিল ; খর করজালে চারিদিক্ উজ্জ্বল করিয়া গ্রীষ্মের প্রভাদীপ্ত সূর্য্য আকাশের মধ্যপথে গড়াইয়া আসিতেছিলেন ; বিদ্যুতের মত তীব্র আলোয় গাছের পাতাগুলা নূতন পালিস-করা অলঙ্কারের মতই চকমক্ করিতেছিল। ফুলের গন্ধে কোন্-সে-এক পরিচিত স্থানের কথা মনে জাগে।—সে যেন এক স্বপ্নলোক!—সেখানে স্মৃতি ব্যথা পায়, তবু আকর্ষণ ছাড়াইতে পারে না। সে মৃদু

নিঃশ্বাস ফেলিল। কুণ্ঠিত চিত্তকে সহজ করিয়া লইয়া উত্তর দিল, "যাইব বই কি!—তিনি প্রভু। যখন ডাকিয়াছেন, তখন যাইতেই হইবে।—কি বলেন?"

ব্রাহ্মণ মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,"যাওয়া ত চাইই,নহিলে অকৃতজ্ঞতা-পাপে পাপী হইতে হইবে যে!—শাস্ত্রে অন্ন-দাতাকে পিতার সমান সম্মান দিয়াছে।"

অম্বর রাজনগরে ফিরিয়া আসিল। সেই দুইপার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণী-ছায়াশীতল সুপ্রশস্ত রাজপথ, শস্যবোঝাই গো-শকটের সেই অবি-শ্রাম যাতায়াত, সহরের বুকে সেই বিবিধ দ্রব্যজাতে সজ্জিত বিপণি, পার্শ্বে গ্রামের পাঠ-শালে সেই পরিচিত গুরুমহাশয় বিবিধ মুখ-ভঙ্গী সহকারে অনুনাসিক ও তালব্যবর্ণো-চ্চারণ শিক্ষা দিতেছেন। সেদিন হাটবার; বেচাকেনার কোলাহলে মৎস্য-গন্ধে মক্ষিকা-ভন্‌ভনানিতে স্থান মুখরিত। অম্বর স্নেহপূর্ণ-নেত্রে সেই সকল পরিচিতদের দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বন্ধু যেন বন্ধুর নিকটে ফিরিয়া আসিতেছিল। অদূরে ঐ বাগেদের খিড়কির পুকুর,ঐ মহেশ মণ্ডলের পাতাছাওয়া ঘরের পাশে জবার গাছ—গাছ ভরিয়া ফুল ফুটিয়া, একটি শোণিতকরের লিখিত স্মৃতির মত তাহার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এইবার বৃক্ষব্যবচ্ছেদপথে গ্রামের সীমানায় সরিষাপুষ্পে আলো-করা ক্ষেতগুলি গ্রামজননীর বিস্তৃত অঞ্চলের ন্যায় মৃদু বাতাসে দুলিয়া উঠিয়াছে। চিত্ররেখার সলিল-রেখাটুকু তাহারই স্বল্পদূরে জননীর বক্ষোনিঃসৃত ক্ষীরধারার ন্যায় সন্তা-নের কণ্ঠ আর্দ্র করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর অভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে। হয় ত পরাণে আজও সেই তাহার ছোট ডিঙ্গিখানি ভাসাইয়া মাছ ধরিয়া বেড়ায়, সে এখনও জানে না তাহার দাদাঠাকুর আবার তাহাদের পাশে ফিরিয়া আসিয়াছে! অম্বরের বক্ষের মধ্যে হর্ষের সহিত একটা বিষণ্ণ সংশয় জাগিতেছিল,—'কেন এ আবাহন?—কে করিয়াছে?—

এইবার বৃক্ষব্যবচ্ছেদপথে গ্রামের সীমানায় সরিষাপুষ্পে আলো-করা ক্ষেতগুলি গ্রাম-জননীর বিস্তৃত অঞ্চলের ন্যায় মৃদু বাতাসে দুলিয়া উঠিয়াছে।

জমিদার নিজে?—অথবা আর কেহ?—আদ্যনাথ ভাল আছেন ত? কে জানে!' শেষ ভাবনাটার সঙ্গে সঙ্গে ধমনীর মধ্যে রক্তসঞ্চালন মৃদু হইয়া আসিল।

পথে চেনা-পরিচিত দু একজন, 'কে—ভট্টাচার্য্য না?' বলিয়া সবিস্ময় অভ্যর্থনা করিয়া গেল। কেহ দাঁড়াইয়া 'কবে আসিলে?—কেন আসিলে?—কোথা থাকা হইয়া-ছিল' ইত্যাদি আবশ্যক অনাবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গেল। সে কাহাকেও আদ্যনাথ বা জমিদার-বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা করিল না।—কি জানি পাছে তাহারা দুঃসংবাদ দান করিয়া বসে।

প্রভাত সূর্য্যালোকে অপূর্ব্ব দীপ্তিশালী মন্দিরচূড়া

অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টি ঝল্‌সাইয়া দিল। প্রচুর শুভ্র মেঘপুঞ্জের ন্যায় নির্ম্মলনীলের মাঝখানে সে মন্দির তেমনই অচল হইয়া আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে তখন ঘণ্টা কাঁসর শঙ্খ বাজিতেছিল, বাহিরে নাট্যমন্দিরে করতাল-সহযোগে বৈরাগিগণ নাচিয়া গায়িতেছিল—"শচী মা! দেখ্ চেয়ে ঐ এলো গোরা,
ওমা উঠে যা মা, ছুটে যা মা, মুছে যা মা নয়ন-ধারা,
তোর আঁধারঘরে মাণিক জ্বেলে দেখ্ চেয়ে ঐ এলো গোরা।"

অম্বরের বক্ষের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া আরও স্থির হইয়া আসিল। এই কোলাহলময় মন্দির-পূজার মাঝখানে এক একনিষ্ঠচিত্ত আপনার ভক্তিভাবে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহার নিষ্ঠার মধ্যে সকল ত্রুটি ফলিত হইতে সমর্থ। সে মন্দিরের দিকে এক পা অগ্রসর হইতে গিয়া ফিরিয়া আসিল, এবং সেইখানেই দাঁড়াইয়া দেবতাকে প্রণাম করিল।

আবার সেই বৃহৎ কক্ষের জাজিমপাড়া বিছানায় তাকিয়ার সারি, মধ্যস্থলে পুরু গদির উপর বকপক্ষ-শুভ্র বিছানায় জমিদার আসীন। অম্বর নত-মস্তকে নমস্কার করিয়া সেইখানে দাঁড়াইল। বেলা পড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকের জানালাদ্বার মুক্ত। তিনদিকের দ্বারের মধ্য দিয়া গৃহোদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন অংশত্রয় দেখা যাইতেছে। সম্মুখেই মর্ম্মর-উৎসে শেষ বেলার সূর্য্যকিরণের সঙ্গে জলের খেলা ও সেই সমুজ্জ্বল জলধারার নির্ঝরাকারে সঙ্গীতময় পতনশব্দ অস্ফুটভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া দর্শককে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। ইহা ভিন্ন বাগান ভরিয়া ফুলের বাহার, বারান্দায় খাঁচায় বদ্ধ পাখীর সহিত গাছের ডালের স্বাধীন বিচরণশীল পাখীদের সম্মিলিত গানের সুর, সেও কম মিষ্ট নয়। রমাবল্লভ কিন্তু এ সকল কিছুই দেখিতে বা শুনিতে ছিলেন না। তাঁহার মনের যে অবস্থা, সে অবস্থায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পৃথিবীকে গ্রসনশীল বিকটাকার কুম্ভীরের মত ও তাহার সমস্ত শোভা-সম্পদ্‌কে সেই তাহারই ব্যাদিত বদনের আভ্যন্তরিক তীক্ষ্ণধার দশন-শ্রেণীবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে। তখন নিরাশা সহ্য হয় না, কিন্তু আশা করিতেও সাহসে কুলায় না, এমনই অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিলে মানুষ হয় মরিয়া যায়, না হয় পাগল হইয়া যায়। ধনীর এ দুঃখ দরিদ্রে বুঝিবে না, তাহাদের অনেক দুঃখ আছে; কিন্তু এ দুঃখের আস্বাদ তাহারা পায় নাই। মানসিক যন্ত্রণার এই চরম অবস্থায় যদি কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে পারে, তাহা হইলে রোগীর তাহার প্রতি মনের কি যে ভাব হয়, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলিয়া যায়। মূর্ত্তিমান্ আশার ন্যায় অম্বর রমাবল্লভের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, আনন্দে রমাবল্লভ সহসা যেন কি এক রকম হইয়া গেলেন! —আসিয়াছে!—তবে সে রাগ করিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে নাই! আজ তিনি তাহার নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন না, ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন। বিস্মিত স্তম্ভিত অম্বর ব্যাপারটা ধারণা করিবার পূর্ব্বে তাহাকে আরও বিহ্বল করিয়া, তাহার পূর্ব্বপ্রভু কহিয়া উঠিলেন, "এসেছ!—আঃ আমায় বাঁচিয়েচ তুমি, আমি সন্দেহে মরিয়াছিলাম।" অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলে দুজনেই কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিলেন। রমাবল্লভের মনে এখনও একটা বড় সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে, তাহা এই,—যদি অম্বর বাণীর ব্যবহার-স্মরণে তাহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হয়! অম্বর ভাবিতেছিল,—আবার তাহার উপরে পূজার ভার পড়িবে;—আশুনাথের বোধ হয় জবাব হইয়া গিয়াছে!—কিন্তু কেন?

অবশেষে সঙ্কোচ সরাইয়া রমাবল্লভ কহিলেন, "তোমায় কেন ডাকিয়াছি?—আমার সর্ব্বস্ব আজ তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে!" অম্বর পূর্ণ অবিশ্বাসে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। রামবল্লভ তাহা বুঝিলেন, বলিলেন—"তুমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, সহসা কেই বা একথা বিশ্বাস করিতে পারিবে? কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, তোমার দয়ার উপরই আজ আমার মানসম্ভ্রম সব নির্ভর করিতেছে! বাধা দিও না, সবই বলিতেছি। আগে তুমি বল—এখন কি করিতেছ, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ভাবিয়াছ?"

অম্বরের বিস্ময় বর্দ্ধিত হইতেছিল। এত ঘনিষ্ঠভাব কেন? কিন্তু প্রভুর প্রশ্নে সে প্রতিপ্রশ্ন করিতে পারে না, তা ভিন্ন সেরূপ স্বভাবও তাহার নয়। সে একটু ঢোঁক গিলিয়া উত্তর করিল, "গঙ্গারাম দাদার ওখানে আছি, তাঁর অবস্থা ভাল নয়, শীঘ্রই চলিয়া যাইব। আমার গুরুদেবের, দীক্ষা গুরুর অমৃতলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তিনি আসামের ওদিকে কুমিল্লা—য় ও আরও দুএকস্থানে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন, আমায় সেই চেষ্টাভার দিয়া-

গিয়াছেন। তাই সেখানে গিয়া কি করিতে পারি দেখিব, মনে করিতেছি।"

রমাবল্লভ একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, "খুব ভাল মতলবই করেছ। দেশে সংস্কৃত চর্চ্চা না হইলে সম্যক্ জ্ঞান পাওয়া যাইবে না। দেব-ভাষা, ওথেকে দেবতার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়। আচ্ছা, আমি তোমার কাজের জন্য বাৎসরিক" একটু হিসাব খতাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "প্রায় দুহাজার টাকা আয় করিয়া দিতে পারি।" অম্বর আবার সেইরূপ বিস্ময়দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, একি! একটা নাট্যাভিনয় চলিতেছে না কি? রমাবল্লভ কহিতে লাগিলেন—"টাকা নহিলে সংসারে কিছুই হয় না, টাকা হাতে থাকিলে কত ভাল ভাল কাজ করা যাইতে পারে। তোমার চতুষ্পাঠীর জন্য বাৎসরিক ছয় হাজার টাকা আয় হইলে কত কাজ হইবে ভাব দেখি?" বড় প্রলোভনের কথা! শ্রোতা যেন ভবিষ্যৎ সফলতার পূর্ণ চিত্র সেই মুহূর্ত্তে অঙ্কিত দেখিল। স্বভাবসিদ্ধ মৃদুতাপেক্ষা একটু ব্যস্তভাবে কহিল, "আপনি মহৎ ব্যক্তি!"

রমাবল্লভ মৃদু হাসিলেন,—বিষণ্ণ অথচ জয়ের হাসি হাসিয়া কহিলেন—"কিন্তু তোমায় এজন্য আমার একটি উপকার করিতে করা হইবে।"—সত্য! তাহার এতটা আনন্দ ও আশা উচিত হয় নাই, এখনও আসল কথাটা শুনিতে বাকি রহিয়াছে যে! জমিদার ত আর তাহাকে হাত গণিয়া বৃত্তি দিতে ডাকেন নাই। সে ঈষৎ মানসিক চাঞ্চল্য বোধ করিয়া কেবল কহিল, "আদেশ করুন।"

"আমার পিতা আমার উপর রাগ করিয়া উইল করিয়া গিয়াছেন যে, ষোল বৎসর বয়সের মধ্যে আমার কন্যা যদি আমাদের সমশ্রেণীর পাত্রে না বিবাহিতা হয়, তবে সেই বৎসরের শেষ দিনে আমার সমুদয় সম্পত্তি, দেব-সেবাধিকার পর্য্যন্ত যাহা কিছু সবই, আমাদের একজন দূরসম্পর্কীয় কুটুম্বকে গিয়া অর্শিবে। বাবা সেই ছেলেটিকে বড় ভালবাসিতেন। ইচ্ছা ছিল ইহার সহিত রাধারাণীর বিবাহ দেন, কিন্তু ছেলেটির চরিত্রগত দোষের কথা জানিয়া আমিই ইহাতে অমত করি। ইহাকেই শেষ পথরূপে ধরিতে পারিব, এইরূপ স্থির করিয়াই বোধ হয় ইহাকে উত্তরাধিকার দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। সে এখন বিবাহিত, এখন আর কোন উপায় নাই কেবল এক—"

অম্বর বিচিত্র উপাখ্যানের ন্যায় বিস্ময়কৌতূহলে এই কাহিনী শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার মনে কত ভাবের কত তরঙ্গই উঠিয়া মিলাইতেছিল, তাহা কে বুঝিবে? ইহার মধ্যে সহানুভূতি ছিল, বিস্ময় ছিল, কিন্তু সব চেয়ে বেশি একটা সূক্ষ্ম বেদনা তাহার স্থিরচিত্তে সূচিকাবৎ বিঁধিতেছিল। শুধু যাহাকে সেই মন্দির-মধ্যে নিষ্ঠাবতী দেবসেবিকারূপেই কল্পনা করিতে ভাল লাগে, রক্ত-মাংসের শরীরী মানবীর ন্যায় সাংসারিক দুঃখসুখের সঙ্গে আজ তাহারই এ ঘনিষ্ঠ যোগ কেন? এ যেন সহ্য করা যায় না, মানায় না!—সহসা বক্তা থামিয়া গেলে শ্রোতার হুঁস হইল। তখন সে আশ্চর্য্যে তাঁহার দ্বিধাগ্রস্ত মুখের দিকে চাহিয়া নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি করিতে পারি, আমায় আদেশ করুন।" "তুমি,-তুমিই এক কথায় সব পার। আমাদের স্বঘর পাত্র কোথায়ও মিলে নাই, সময় আর মোটে সাত দিন। এ অবস্থায় আমায় নিরাশ করিও না,—তুমি আমাদের পালটিঘর, তুমি রাধারাণীকে বিয়ে কর।" এ কথা যদি এ পৃথিবীতে অন্য কোনও প্রাণী উচ্চারণ করিত, তবে অম্বর,-এমন কি অম্বরের মত এমন সংযতচিত্ত ভাল মানুষও হয় ত তাহার দিকে ঘুষি পাকাইয়া দু পা অগ্রসর না হইয়া থাকিতে পারিত না! কিন্তু যে ব্যক্তি এই শব্দ কয়টা উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এ রকম মর্ম্মান্তিক শব্দজাল বোধ হয় জগতে আর কিছুই ছিল না,--এ প্রকার পরিহাস তাঁহার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই শ্রোতা ইহা শুনিয়া তাড়িত-স্পৃষ্টের মত চমকিয়া শুধু নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল!--তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত হইল না! রমাবল্লভ তাহার মনের ভাব বুঝিয়াছিলেন, বুঝিলেন বলিয়াই সহসা বড়লোকের স্বভাবজাত তীব্র আত্মাভিমান তাঁহার মনকে দুই হাতে নাড়া দিয়া উঠিল! ব্যাপারটা এমনই অসঙ্গত যে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না! -কিন্তু এসব কথা এখনকার নয়,-যাহা লইয়া এই বুকের মধ্যে মানমর্য্যাদা সিংহাসনাসীন ভূপতির গৌরবে বসিয়া আছে, সেই ভিত্তিমূলই যে আজ কম্পিত! তিনি কহিলেন, "বুঝিলে অম্বর, তোমাকে এই কাজটি করিতে হইবে, নহিলে

আমার সব যায়।"—কথাটা এমনইভাবে বলিলেন যেন তাহাকে একটা জিদের মোকর্দ্দমায় সাক্ষী মানিতেছেন,—আর এমন কিছুই নয়।

অম্বর তেমনই করিয়াই কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সে চোখ নামাইয়া ধীরস্বরে উত্তর করিল, "আমায় ক্ষমা করুন,—আমি পারিব না।"

"পারিবে না!—কেন অম্বর?"

এ হতাশার বিলাপযুক্তস্বর নারীকণ্ঠেই শোভা পায়! অম্বর ইহাতে আহত হইল, কিন্তু সে কি বলিবে কিছু খুঁজিয়া পাইল না;—তাই একবার ঘরটার চারিদিকে স্তম্ভিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজেও স্তব্ধ রহিল। কেন?—কেমন করিয়া সে বলিবে যে কেন! কারণ ত একটা নয়,—কত অশোভনতা অসামঞ্জস্য যে সমুদ্রতলবাসী পুরুভুজ নামক জীব-বিশেষের ন্যায় শতবাহু বেষ্টন করিয়া এই 'কেন' প্রশ্নের কারণ-গুলাকে তাহার নিকট হইতে অতল সমুদ্রেরই ব্যবধান করিয়াছিল,—তাহা বুঝাইতে যাওয়ার মত হাস্যকর আর কিছুই নাই!—সে কোন্‌টা এই রাক্ষসের শোষণশীল বাহু হইতে মুক্ত করিয়া দেখাইবে! অথচ কিছু না বলিলেও নয়। আবার সেই উদ্বেগব্যাকুল প্রশ্ন ফিরিয়া আসিল, "কেন অম্বর?" অম্বর যে যুক্তিটা দেখাইল, শত বিরুদ্ধ-যুক্তির মধ্যে সেইটার মত হাল্কা যুক্তি বোধ হয় আর একটাও ছিল না।—ইহা ভিন্ন যদি সে আর যে কোনটি দাখিল করিত, তবে তাহার ওজন লইয়া জমিদার মহাশয়ের পাল্লা সমান করিতে কিছু সময় খরচ হইত। কিন্তু সে প্রধান বাধাগুলার সম্বন্ধে নিজের জিভ খুলিতেই পারিল না, তাই ছোট দেখিয়াই একটা কারণ দর্শাইতে গেল, বলিল, "আমি যে কর্ম্ম লইয়াছি, তাহাতে বিবাহে কাজে বাধা পড়িবে।" মজুর প্রাপ্ত মোটটা মাথায় তুলিতে গিয়া যদি দেখে সেটা মোটে ভারি নয়—একমোট তুলামাত্র—সে যেমন খুসী হয়, অম্বরের কথায় রমাবল্লভের মনের উপরকার প্রকাণ্ড মোটটা তেমনই হঠাৎ তুলার মত হাল্কা হইয়া গেল! একটা বড় নিঃশ্বাস লইয়া ও তাহা পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বাধা আর কি? বরং তুমি আমাদের কাছে অনেক সাহায্য পাইতে পারিবে, তা ছাড়া আমার কন্যা—" রমাবল্লভ যে কথাটা বলিতে যাইতে ছিলেন, মধ্যপথে আপনিই সে কথাটাকে উবিয়া যাইতে দিয়া ফিরাইয়া কহিলেন, "আমার মেয়ে বিয়ে করিলে, তোমার সাহায্য করিবার লোকজনের অভাব থাকিবে না। বাৎসরিক ছয় হাজার টাকা আমি তোমায় দানের জন্য দিব, তাহা তুমি যেরূপ খুসী সেই প্রকার খরচ করিতে পারিবে, তা'ছাড়া তোমার খরচ স্বতন্ত্র। একটি কেন, পাঁচ সাতটি চতুষ্পাঠী তুমি ইচ্ছা করিলে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।"

অম্বর নীরব রহিল! তাহার অনিচ্ছাসঙ্কুচিত চিত্ত ধীরে ধীরে একটা আশার তুলিকা বড় উজ্জ্বল বর্ণ চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে কিছুক্ষণ সেই আশার লিখন প্রত্যক্ষ করিল। তাহার মুখে চোখে সেই রঙ্ ফলিয়া উঠিতে আরম্ভও করিয়াছিল, এমন সময় একটা তদপেক্ষাও চকচকে অভ্র ছবি তাহার মানসদর্পণে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার আশা-প্রদীপ্ত মুখখানাকে একেবারে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া দিল! সে ম্লাননেত্র অতি ধীরে প্রভুর মুখে স্থাপন করিয়া কহিল "আমায় প্রলুব্ধ করিবেন না, ইহা আমার অসাধ্য,—আরও অনেক বাধা আছে, সে সব আমি বলিতেও পারিব না।"

বারবার প্রত্যাখ্যান! একটা ক্ষুদ্র পুরোহিত তাঁহার এ প্রস্তাবে হাতে চাঁদ পাইয়াছে, এমনই করিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিবে!—তাহা না করিয়া সে রাজার মত তাঁহার প্রস্তাব তুচ্ছভাবে ঠেলিয়া ফেলিতে চায়! অপমানে রমাবল্লভের আকর্ণ ললাট শোণিতবর্ণ ধারণ করিল, তীব্ররোষ একটা কঠিন বাক্যকে ঠেলিয়া কণ্ঠে পাঠাইতেছিল, কিন্তু নিজের অবস্থার ত্বরিতস্মৃতি সেটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া ভিতরে প্রেরণ করিয়া শান্ত সংযতভাবে বাহির হইয়া আসিল, "অবিচার করিও না অম্বর,—প্রলোভন কেন বলিতেছ? আমার জামায়ের সম্মানরূপেও ত ধরিতে পার? না হয়, সৎকর্ম্মে আমার দানই মনে ভাব!" অম্বর নিজের মনে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করিল,—দান যে ইহা নহে, এ তর্ক তোলা তাহার পক্ষে সম্ভবই নয়। সে অগত্যা হতাশভাবে উত্তর করিল, "আমি গুরুদেবের এই কার্য্যভার লওয়ার সময় তাঁহাকে স্মরণ করিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি, যতদিন না যথার্থ সফলতা দেখা যাইবে, সে স্থান ত্যাগ করিব না; কিন্তু সে স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। সামান্য দিনের জন্যও সেখানে কেহ পরিবারবর্গ সঙ্গে রাখিতে সাহস করে না! অথচ আমাকে হয় ত অনেক দিনই সেখানে থাকিতে হইবে।"

রমাবল্লভের মুখের উপর আবার একটা শোণিতোচ্ছ্বাস ঢেউ খেলিয়া গেল,—নেত্রতারকার দীপ্তি চূর্ণ-গর্ব্বের ক্ষুব্ধ-রোষে অনলকণা ছড়াইয়া দিল। মনের সে ভাবটা চাপিতে ঠোঁটের উপর দশন চাপিয়া অনেকক্ষণ অবধি বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইল। কি সাহস! জমিদার রমাবল্লভের কন্যা তাহার দরিদ্র স্বামীর সহিত কুটীরে যাপন করিবে! এই অগাধ সুখসৌভাগ্য ছাড়িয়া তাহার সহিত সেই দূরপ্রবাসে যাইবে! তখন বাহিরে আকাশ পৃথিবী তপনের সহিত সন্ধির শান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। উহাদের উপর হইতে সমস্ত সূর্য্যকিরণ ঝরিয়া পড়িয়াছে, পৃথিবীর বুকের শান্তিতে চরাচরের তপ্ত নিঃশ্বাস শীতল হইয়া গিয়াছিল। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া রমাবল্লভের বুকের তাপ ঈষৎ জুড়াইয়া আসিল। উত্তর বাতাস যখন জোরে বহিতে থাকে, তখন উত্তাপ সহজেই নিজের স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া ভয়াবহ পরধর্ম্মে আপনাকে বিলাইয়া দিতে বাধ্য হয়। রমাবল্লভ বিরক্তিপ্রচ্ছন্ন হাস্যের সহিত ফিরিয়া জবাব দিলেন, "না হয় ততদিন সে আমার কাছেই থাকিবে, ত'াতে ক্ষতি কি? একটা কথা শুধু শুনিতে চাই; রাধারাণী এক সময় তোমার কাজের ভুল ধরিয়া তোমার কিছু ক্ষতির কারণ হইয়াছিল, তাহার জন্য তা'র প্রতি তোমার বিরক্তি স্বাভাবিক। কিন্তু যদি এ বিবাহ হয়,—যদি কি, এ বিবাহ তোমায় করিতেই হইবে, তা ভিন্ন ত উপায় নাই, অবশ্য তা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ; নহিলে তোমায় আমি লজ্জার খাতিরেও ডাকিতাম না।—হ্যাঁ যা' বলিতেছিলাম, তুমি সে সব ভুলিয়া যাইবে ত?"

এই প্রশ্নটা অম্বরের বুকে বজ্রবলে গিয়া বিঁধিল, সেই আঘাতে এক মুহূর্ত্তে তাহার শোণিতসঞ্চয়-স্থান সবেগে আলোড়িত—পাণ্ডুমুখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল, সে মাথা তুলিয়া বলিল, "তাই বলিতেছিলাম কাজ নাই, আমার সম্বন্ধে আপনাদের যখন এ রকম ধারণা"—"তা থাক্—তুমি বলিলেই সেটা যাইবে। আমি তোমায় একেবারে না চিনি তাহাও নয়,—তোমার কথার দর আছে, এটা আমি বিশ্বাস করি। শোন অম্বর, আমার যা বলিবার ছিল বলা হইয়াছে। এখন তোমার ইচ্ছা না হয় তুমি বিবাহ করিও না। পাঁচদিন মাত্র সময় আছে, তারপরে আমরা পথের ভিখারী হব। তোমার সাহায্য তখন আমাদ্বারা হওয়া সম্ভবই হইবে না।"

এই বলিয়া রমাবল্লভ গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরব হইলেন। কথাগুলা একান্ত মর্ম্মস্পর্শী। অম্বরের স্বভাবকোমল বক্ষে তাহা বাজিতেছিল, সেই সঙ্গে একটা চিরপূর্ণস্থানের শূন্য দৃশ্য তাহার মানসদৃষ্টিকে খোঁচা দিতে লাগিল। সে তখন নিজের নত দৃষ্টি উন্নমিত করিল, আবার সম্মুখস্থ প্রৌঢ়ের হতাশাঙ্কিত মুখের উপরকার রেখাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিল, তারপর দৃষ্টি আবার নত করিয়া সে কহিল, "আমায় ভাবিবার সময় দিন।"—"বেশ কাল সকালে উত্তর দিও,—কিন্তু এইখানে আর একটি কথা আছে। বিবাহের পর আমার কন্যা অবশ্য আমার গৃহেই থাকিবে, তাহার ইচ্ছা; আর তুমিও ত বিবাহে ইচ্ছুক নও। কেবলমাত্র আমাদের উপকারার্থই বিবাহ করিতেছ, সে জন্য ইহাতে তোমারও অসম্মতির কারণ না থাকাই সম্ভব যে, বিবাহের পর উভয়ে স্বতন্ত্র বাস কর। যেখানে বলিবে তোমায় আমি সেইখানে বাড়ী করিয়া দিব, খরচ ত দিবই; কিন্তু আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহের পর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, ইহাতে স্বীকৃত আছ?"

অম্বরের ললাটের শান্ত শিরা ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিল। সে মুখ তুলিয়া উত্তর করিল, "না।"—"না! কেন! তুমি ত বিবাহে ইচ্ছুক নও।" এই বলিয়া রমাবল্লভ চুপ করিলেন।—"বিবাহে আমার ইচ্ছা নাই, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য! কিন্তু যদি তাহা করিতেই হয়, শাস্ত্রশাসন ত্যাগ করিতে পারিব না। বিবাহ-মন্ত্র আমায় অগ্নিদেবতা ব্রাহ্মণ-সাক্ষাতে কোন্ প্রতিজ্ঞা পাঠ করাইবে? আমায় ইহ এবং পরজীবনের জন্য যে পবিত্র বন্ধন স্বীকার করিতে হইবে,—যাহার সমুদয় সুখ-দুঃখের সহিত এক হইলাম বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে হইবে, বিবাহের সে সমুদয় উদ্দেশ্য পালন করিব না, মনে রাখিয়া মুখে আমি সেই সকল পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিব! পিতৃতুল্য আপনি—অন্নদাতা পিতা, আপনি আমায় এ আদেশ করিবেন না,—এত বড় মিথ্যাচরণ আমি করিতে পারিব না, ক্ষমা করুন।"

তখন উদ্যানসীমার শেষে উচ্চশির দেবদারুর মাথায় অস্ত-গত সূর্য্যের যে ক্ষীণ রক্তচ্ছটাটুকু অন্তিম নিদ্রায় ঘুমাইয়া আসিতেছিল, তাহারই একটুখানি আলো অম্বরের ললাটে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার শান্ত অথচ দৃঢ় মুখের দিকে

চাহিয়া রমাবল্লভের আর একদিনকার কথা মনে পড়িল,—যেদিন সে গুরুর আদেশ বলিয়া তাঁহার আসন গ্রহণকরিয়াছিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলে, তিনি অপ্রকৃতিস্থভাবে উঠিয়া বহুক্ষণ গৃহের মধ্যেই পাইচারি করিয়া বেড়াইলেন, তারপর সহসা এক গঠিত মূর্ত্তিবৎ স্তব্ধ অম্বরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধের উপর করতল রক্ষা করিয়া বলিলেন, "অম্বর! যা বল্‌চ, সব সত্য; কিন্তু এর সঙ্গে এইটুকু মনে কর যে আমি বিপন্ন; তোমার কাছে আজ সাহায্যপ্রার্থী। তোমার মন উচ্চ। পরের জন্য নিজেকে আজ বাদ দিতে পারিবে না কি? দেখ স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য-পালন যদি বল, এর চেয়ে আর কোন্ রকমে বেশী কে পারে? তার এই বিষয় সম্পত্তি—মা-বাপের মান-রক্ষা—সবই ত তুমিই তাকে দিবে!—এতে কি তোমার ধর্ম্ম থাকিবে না?"

অম্বর কথা কহিল না, নড়িল না,--বহুক্ষণ তাঁহার ব্যাকুল দৃষ্টিরতলে তেমনই করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে তখন যে কি মিশ্রভাবের তরঙ্গ বহিতেছিল, তাহা বলিবার নয়। তারপর সে তাঁহার দিকে না চাহিয়াই সহসা সন্দেহ বেদনা-ভয় বিজড়িত কণ্ঠে বজ্রের মত কহিয়া ফেলিল,"আমায় আজ রাত্রিটা ভাবিতে দিন।" রমাবল্লভ কথা কহিলেন না। সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রমাবল্লভ দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখেই সন্ধ্যার নির্ম্মল আকাশে গোধূলির স্বর্ণরশ্মিরেণু চারিদিকে ছড়ান, বাতাস মৃদুশান্ত। দ্বারের উপর উজ্জ্বল ফ্রেমে বাঁধান হরিবল্লভের বৃহৎ তৈলচিত্র। রমাবল্লভ সেই চিত্রের জ্যোৎফুল্ল নেত্রের উপরে নিজের খর্ব্ব-হৃদয়ের বিষাদজ্বালাপূর্ণ দুই নেত্র স্থির করিলেন।-সে দুষ্ট যেন তাঁহাকে তিরস্কারপূর্ণ উপহাস করিয়া বলিল, "রমাবল্লভ দেখ, আমিই জিতিলাম, বড় যে তখন তেজ দেখাইয়াছিলে।—সে তেজ রাখিতে পারিলে না।"

রমাবল্লভ সহসা সেইখানে ভূমে বসিয়া পড়িলেন। চিত্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার হৃদয় মন যেন গভীর একটা অবসাদপূর্ণ বিষাদে ডুবিয়া আসিল। চিত্রমূর্ত্তি যেন সজীব বলিয়া মনে হইতে লাগিল; মৃদু বিলাপপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "বাবা এমনই ক'রেই কি তুমি তোমার রাধারাণীকে সুখী করবে ভেবেছিলে? আজ যদি জান্‌তে আমাদের মনে কত যন্ত্রণা।—কি অপমান আজ সইতে হচ্চে!—কার কাছে মাথা নীচু কর্‌চি, যদি দেখ্‌তে পেতে!"

সন্ধ্যাবধূ ধূসর কৌষেয় বসনের প্রান্তটি মাথায় টানিয়া আকাশপথে তারার প্রদীপ জ্বালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় বাণী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল। আরতির বিলম্ব আছে, মন্দির জনশূন্য; ঊর্দ্ধে স্ফটিক-ঝাড়ে বাতির স্নিগ্ধ আলো জ্বলিতেছে,--সেই আলোকে ও প্রতিমার পার্শ্বস্থ আধারের আলোকে গৃহ দিনের মতই আলোকিত। সে বিগ্রহের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া ম্লান নেত্রতারকা উন্নমিত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে সেই চিরহাস্যাধার প্রসন্ন মুখকান্তি দেবতার পানে চাহিতেই তাহার আবর্ত্তময় হৃদয়ের ফেনিল তরঙ্গ সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার দুই জ্বালাপূর্ণনেত্র দিয়া তপ্ত অশ্রু আকারে ছুটিয়া আসিতে চাহিল।

সে ত কিছু চাহে নাই! তাহার পাশের ঐ ধূপটুকুর মতই সে নিজের সমস্ত ওই দেবচরণে উৎসর্গ করিয়াছে, নিজের সুখ শুধু নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দেওয়াতেই। তবে কেন সে সুখে সে বঞ্চিত হইবে? কেন এ সার্থকতাটুকুও তাহার মিলিল না? হরি কি পাপে তাহাকে এত বড় দণ্ড দিলেন? একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাপূর্ণ অভিমানে তাহার বুক ফাটিতে চাহিল।—"আমি তোমার কাছে জানিয়া ত কোন দিন অপরাধ করি নাই। তবে বলিয়া দাও কিসের জন্য আমায় তোমার দাসীত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া মনুষ্যকীটের সেবায় নিযুক্ত করিতেছ?—জান না কি আমি তোমারই—শুধু তোমার, আর কাহারও হইতে পারিব না!"

দেবতা হাসিলেন, বর্ত্তিকালোকে সে স্নিগ্ধ হাস্যচ্ছটা শত চন্দ্র সূর্য্যকিরণস্ফূর্তি প্রকাশ করিল। মহাপ্রকৃতি রাধা স্মিতমুখে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "পাপিষ্ঠা! প্রকৃতি স্বয়ং পুরুষের দাসী, তুই এমনই কি যে, ঠাকুরাণী হইয়া থাকিবি,—দাসী হইবি না? গুমর ছাড়িয়া সবাই যা করিতেছে, তাহাই করিতে যা।"

তখন অশ্রুপরিপ্লুত-নেত্রে যুক্তপাণি বাণী দেবতার উদ্দেশে কহিল, "তুমি কি শুনিতেছ আমি অন্য কাহাকেও স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না? তুমি যদি আমার পণ না রাখ, আমি নিজেই রাখি। যদি বিবাহ করিতেই

হয়, তবু এ দেহপ্রাণ তোমায় দিয়াছি, এ কেবল তোমারই থাকিবে। এগুলা বাদ দিয়া যদি কেহ শুধু স্বামী নামটা নিতে রাজী থাকে, তবেই তা দিতে পারিব, না হ'লে আমার ভাগ্যে পথে দাঁড়ান ভিন্ন উপায় নাই।"

দেবতার মধুরাধরে আবার অতি অমৃতময় হাস্য আলোকের ক্রীড়ারূপে বহিয়া গেল! সে হাসি আশ্বাসের কি অবিশ্বাসের, তাহা কিছুই বুঝা গেল না!

এমন সময় দ্বারের রৌপ্যশৃঙ্খল ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। যেন কোন সঙ্কোচপীড়িত-হস্ত অতি ধীরে তাহা স্পর্শ করিয়া দ্বার খুলিবে কি না ভাবিতেছে।--ঐ যে নিঃশব্দে দ্বারও খুলিয়া গিয়াছে।—কে ভিতরে আসিতেছে? না, ও অম্বরনাথ নয় ত? সর্ব্বনাশ! বাণীর চোখে জল না? এদৃশ্য এ জগতে কেউ না দেখিয়া ফেলে! সে ত্রস্ত উঠিয়া মুখ ফিরাইল, মুহূর্ত্তে শুভ্র শুক্তি হইতে স্থূল মুক্তাগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল।—সে দেখে নাই ত? মুখ ফিরাইয়া দেখিল, কে প্রবেশোদ্যত হইয়াছিল।—সে বোধ হয় অম্বরনাথ নয়, কারণ প্রবেশ না করিয়াই সে চলিয়া যাইতেছে। অম্বরনাথ হইলে অতটা শান্তভাবে আসিত না, এবং চলিয়াই বা যাইবে কেন?—তবে কি আগন্তুক তাহার আত্মবিহ্বল অবস্থা দেখিতে পাইয়াছে? তাই তাহার এ শোকোচ্ছ্বাসে বাধা দিবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল?—লোকগুলা মনে করে কি? সে কি এতই সকলের করুণার্হ। স্থির হইয়া বসিয়া সে ডাকিয়া বলিল, "ফিরিতেছ কেন? ঠাকুর প্রণাম করিতে আসিয়া থাক ত প্রণাম করিয়া যাও!"—স্বরে পূর্ণ বিরক্তি প্রকাশ পাইল! যে ফিরিতেছিল সে আর ফিরিল না, সেইখানেই দাঁড়াইল।—এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া যেন একটু ইতস্ততঃ করিল, তারপর ধীরভাবে সে মন্দিরে প্রবেশ করিল। তথন বাণী চিনিল,—সে অম্বরনাথ!

ঐ যে নিঃশব্দে দ্বারও খুলিয়া গিয়াছে-কে ভিতরে আসিতেছে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ

রোম

এমন আমরা রোমে যাইতেছি, পৃথিবীর ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি, সর্ব্বপ্রথমে রোমের কথা পড়িয়াছি,—রোমের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা—রোমের প্রবল প্রতাপের কথা—রোমের শোভাসৌন্দর্য্যের কথা—রোমের পোপের কথা—রোমের ইতিহাসে যখন পড়িয়াছি তখন মনে মনে যে আদর্শ কল্পনা করিয়াছিলাম, এতদিন পরে সেই রোমে যাইতেছি। এককালে এই রোমই য়ুরোপের সম্রাজ্ঞী—একদিন এই রোমের পোপই সমস্ত খৃষ্টানমণ্ডলীকে শাসন করিতেন—খৃষ্টানসম্প্রদায় এই রোমের পোপের আদেশ পালন করিতে পারিলে কৃতার্থ হইত। সত্য বলিতে কি, যখন আমাদের গাড়ী রোমের নিকটবর্ত্তী হইল তখন আমার মনে যে কি ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল, কেমন একটা আনন্দ আমাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। বাল্যকাল হইতে যে রোমের কথা পড়িয়াছি, যে রোমের অসংখ্য মন্দির, অগণ্য সৌধমালার চিত্রদর্শনে পুলকিত হইয়াছি, সেই রোম আজ দেখিব—পৃথিবীর ইতিহাসের অনেকটা অংশ যে রোম অধিকার করিয়াছিল, সেই রোম-নগরীতে আজ প্রবেশ করিব—রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানের প্রধান তীর্থ আজ দর্শন করিব—মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। ভ্রমণের ইহাই পুরস্কার!

রোম-নগরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া আমি বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম; তখন প্রথমেই এপিয়ান ওয়ের (Appean way) ধ্বংসাবশেষ আমার দৃষ্টিগোচর হইল, তাহার পরেই অদূরে দেখিলাম সেণ্টপিটার মন্দিরের উচ্চ চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রোমে আমার পরিচিত কেহই ছিল না; সুতরাং ষ্টেশনে যে কেহ আমার জন্যে অপেক্ষা করিবেন এ কথাও আমি ভাবি নাই। কিন্তু আমাদের গাড়ী যখন ষ্টেশনে পৌঁছিল তখন দেখিলাম, দুইটি মিসনরী ভদ্রলোক আমার জন্য ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁহারা রোমের ইংলিশ কলেজের অধ্যাপক; একজনের নাম মুসো জিলেস্‌ ও অপর ভদ্রলোকটির নাম মুসো প্রায়র। দারজিলিঙ্গের লোরেটো কন্‌ভেণ্টের একটি ধর্ম্মপরায়ণা সন্ন্যাসিনীর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধু মিসনরীদ্বয়কে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করেন; সেই জন্যই এই সহৃদয় বন্ধুদ্বয় আমার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। দারজিলিঙ্গের সেই সন্ন্যাসিনী মহোদয়াই পত্রাদি লিখিয়া আমার সহিত রোমের মহামান্য পোপের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

মিসনরী বন্ধুদ্বয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা রোমের গ্রাণ্ড হোটেলে উপস্থিত হইলাম। এ কয়দিন এই সুন্দর ও সুব্যবস্থিত হোটেলেই আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম যে, রোমে পৌঁছিয়া আমরা অনর্থক সময় নষ্ট করিব না, কারণ রোমে দেখিবার মত এত স্থান ও এত দ্রব্য আছে যে, আমরা যে কয়দিন এখানে থাকিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে সমস্ত দেখিয়া উঠাই অসম্ভব; তাহার পর যদি আবার আরাম-বিশ্রামে সময় ব্যয় করি, তাহা হইলে কিছুই দেখা হইবে না। সেই জন্য হোটেলে দ্রব্যাদি রাখিয়া আমরা নগর-দর্শনে বাহির হইলাম। আমরাও জানিতাম এবং আমাদের পথপ্রদর্শক মহাশয়ও বলিলেন যে, রোমে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই সেণ্ট পিটারের ভজনালয় দেখিতে হয়—তাহাই বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রধান দর্শনীয় বস্তু। আমরা সেণ্টপিটার-ভজনালয় দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। পথেই রাজভবন দেখিলাম; এই স্থানে পূর্ব্বে মহামান্য পোপ-মহোদয়েরা বাস করিতেন; তাঁহারা এখন আর এ স্থানে থাকেন না। তাহার পরই দেখিলাম ট্রাজানের স্তম্ভ (Trajan's column)। এই স্তম্ভগাত্রে অনেক যুদ্ধের ছবি খোদিত দেখিতে পাইলাম। এই স্তম্ভের উপর পূর্ব্বে রোমের সম্রাটের মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল, এখন তৎপরিবর্ত্তে সেণ্ট পিটারের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পরেই আমরা সেণ্ট পিটারের চত্বরে উপস্থিত হইলাম। এই চত্বরের এক পার্শ্বে অভ্রভেদী সুন্দর ভজনালয় এবং তাহার পর পিয়াজার উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নির্ম্মিত স্তম্ভশ্রেণী। আমার যেন মনে হইতে লাগিল, আমরা হঠাৎ
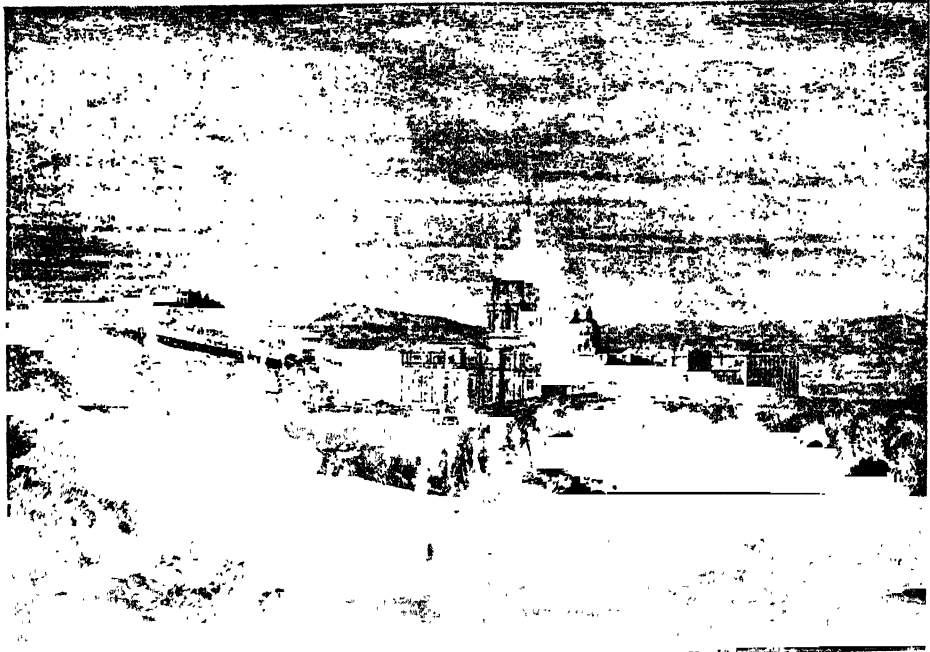
সেণ্টপিটার ও ভ্যাটিকেনের দৃশ্য (২৬৫ পৃষ্ঠা)

আমাদের তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসী-ধামে উপস্থিত হইয়াছি—সত্য সত্যই আমাদের যেমন কাশী, রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান-দিগের নিকট তেমনই এই রোম ;—তাহার মধ্যে আবার এই সেণ্ট পিটারের মন্দির তাহাদের নিকট অতি পবিত্র স্থান। মন্দিরগুলির শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যেখানে যাহা উৎকৃষ্ট ছিল, মহার্ঘ ছিল, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া এই মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং দেশের প্রধান স্থপতিগণ তাঁহাদের সমস্ত কল কৌশল এই মন্দির-নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মন্দিরের এত ঐশ্বর্য্য এত ধনসম্পদ্ আমার কল্পনারও অতীত ছিল।

পিয়াজা (২৬৫ পৃষ্ঠা)

মহাত্মা সেণ্ট পিটার ধর্ম্মের জন্য, তাঁহার প্রভুর আদেশ-পালনের জন্য,জীবনদান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তিনি কি একদিনও ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেই

টাজানের স্তম্ভ (২৬৫ পৃষ্ঠা)

সাধারণ মনুষ্যের উচ্চতার সমান বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু ইহা পনর ফিটেরও অধিক উচ্চ। যত ছত্রী এই মন্দিরে আগমন করে, তাহারা এই মূর্ত্তির পদ-চুম্বন করিয়া থাকে; যুগযুগান্তর হইতে ক্রমাগত চুম্বিত হইয়া ধাতুনির্ম্মিত পদও অধিক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; তাই এক খণ্ড মার্ব্বল পাথর দ্বারা পদদ্বয় আবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন যাত্রিগণ সেই মার্ব্বলখণ্ড চুম্বন করিয়াই পদচুম্বনের ফললাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে মন্দির ছিল, মধ্যযুগের অগ্নিকাণ্ডে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং মাইকেল এঞ্জেলো এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের নানা স্থানে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মন্দিরের নাম ও তাহার বিবরণ লিখিত আছে। এই প্রকার লেখার উদ্দেশ্য এই যে, যাত্রীরা জানিতে পারুক যে, এইটিই পৃথিবীর প্রধান ধর্ম্ম-মন্দির; পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের পাঁচ সাতটা বড় বড় ধর্ম্মমন্দির এক যোগে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিতে পারে। এ কি কম গৌরবের কথা?

ধর্ম্মভাব, তাঁহার সেই আত্মত্যাগ, তাঁহার সেই অভয়-র এত পরিণতি হইবে ও তাঁহার পরবর্ত্তী ধর্ম্মযাজকগণ ভাবে কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে ডুবিয়া যাইবেন, মধ্যযুগে র নামে কত অধর্ম্ম কত পৈশাচিকতার অভিনয় হইবে, থা কি সেই মহাপুরুষ কখনও মনে করিতে পারিয়া-ন!

এই বিশ্ববিশ্রুত ভজনালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ভ্রম উপস্থিত হয়। ভিতরে সমস্তই ছোট বোধ হয়; কি মহাত্মা সেণ্ট পিটারের ধাতুময় মূর্ত্তি উচ্চতায়

সেণ্টপিটারস্ মন্দির হইতে বাহির হইয়া ইটালিয়ান কবি ট্যাসোর সমাধিমন্দির দেখিলাম। তাহার পরই জানিকুলাম পাহাড়ের উপর উঠিয়া মহানগরীর দৃশ্য দেখিলাম। পাহাড় হইতে নামিবার সময় আমরা এক ভদ্রলোকের বিস্তৃত ও মনোহর উদ্যানের মধ্য দিয়া আসিলাম। এই উদ্যানের অধিকারীর নাম প্রিন্স ডোরিয়া; তিনি প্রতি শুক্রবার এই উদ্যান সকলকে দেখিতে গিয়া থাকেন।

পর দিন ৮ই মে প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ
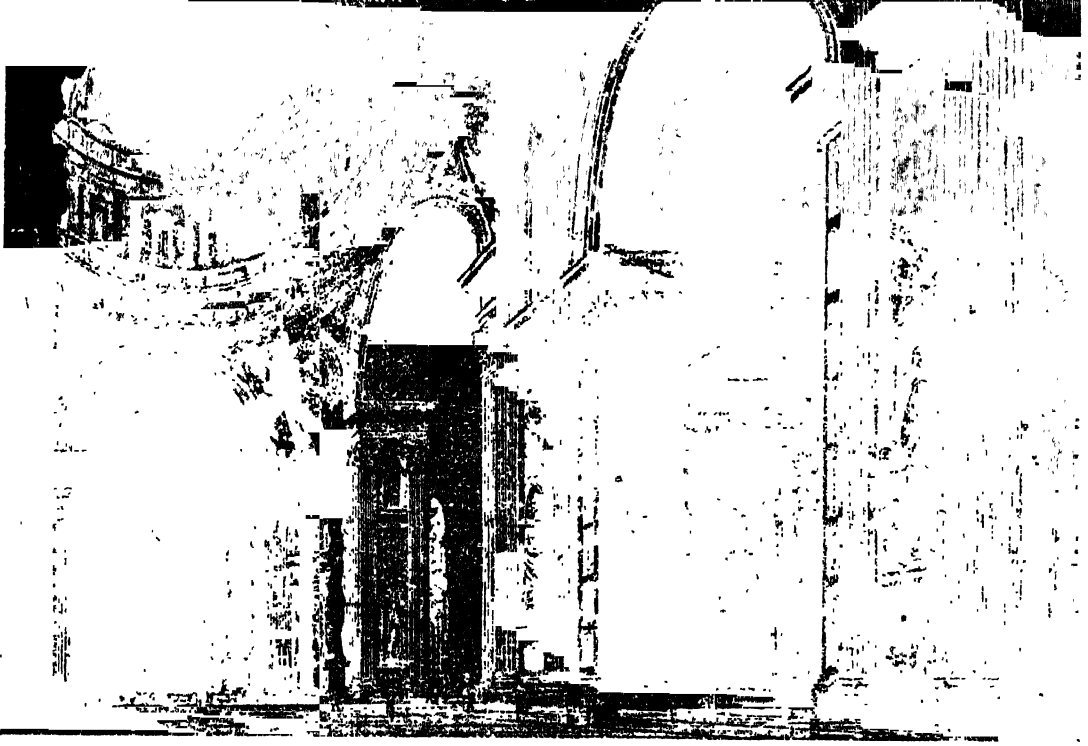
সেণ্টপিটার মন্দির (২৬৭ পৃষ্ঠা)

শেষ করিয়া আমরা আবার ভ্রমণে বাহির হইলাম। আজ আমরা রোমের অতীত-গৌরবের ভস্মস্তূপ দেখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আমরা প্রথমেই প্রসিদ্ধ থাম্মাটাইল কারাগারের স্থানে উপস্থিত হইলাম। খৃষ্টীয় যুগের প্রথম সময়ে এই কারাগারে প্রচলিত ধর্ম্মদ্বেষী বা ধর্ম্মবিরোধীদিগকে প্রথমে কারারুদ্ধ করা হইত, তাহার পর সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া যাজকগণের আদেশে তাহাদিগকে পরলোকের পথে প্রেরণ করা হইত। এই কারাগারের অপ্রশস্ত অন্ধকারময় কক্ষগুলি দেখিলে এখনও প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়। যে প্রস্তরখণ্ডে মহাত্মা সেণ্ট পিটার ও তাঁহার শিষ্যগণকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল এবং কারাগারে অবস্থানকালে যে কূপের জলদ্বারা সেণ্টপিটার বন্দী রোমানদিগকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাহা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে—এখনও তাহা দেখিলে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে মস্তক অবনত হয়। ইহারই নিকটে সেই কলোসিয়ম যেখানে দলে খৃষ্টান নরনারী বালক-বালিকাদিগের উপর অমানুষী অত্যাচার আরম্ভ হইত, আর যাহার পরিসমাপ্তি হইত অদূরবর্ত্তী এম্ফি থিয়েটারে—এই রঙ্গাঙ্গনে তাহাদের সকল যন্ত্রণার অবসান হইত। কি তাহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা! ধর্ম্মের জন্য কেমন তাহাদের আত্মোৎসর্গ! এইখানে দাঁড়াইয়া মনে হইল যাহারা এই সকল অত্যাচার করিত, তাহারা কি আমাদের মত মানুষ, আর যাহারা নীরবে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিত তাহারাও কি আমাদের মত মানুষ!

এথানে আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলাম না, ধীরে ধীরে প্যালাটাইন পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলাম। সেখানেও কতকগুলি ভগ্নস্তূপ দেখিলাম, সেগুলি রোমনগরী স্থাপয়িতা রোমুলসের নির্ম্মিত। পাহাড়ের উপর হইতে ম্যাক্সিমাস্ সারকাশের বেশ দেখিতে পাইলাম। এই স্থানে সেকালে অলিম্পিক ক্রীড়া হইত, এখন এই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে কলের চিমনি সকল বড় বড় গুদাম ঘরের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরই আমরা ফোরাম দেখিতে গেলাম; ইহা ভগ্নস্তূপের মধ্যে একেবারে সমাহিত হইয়াছিল। কিছু দিন হইতে এই স্থান উদ্ধারের
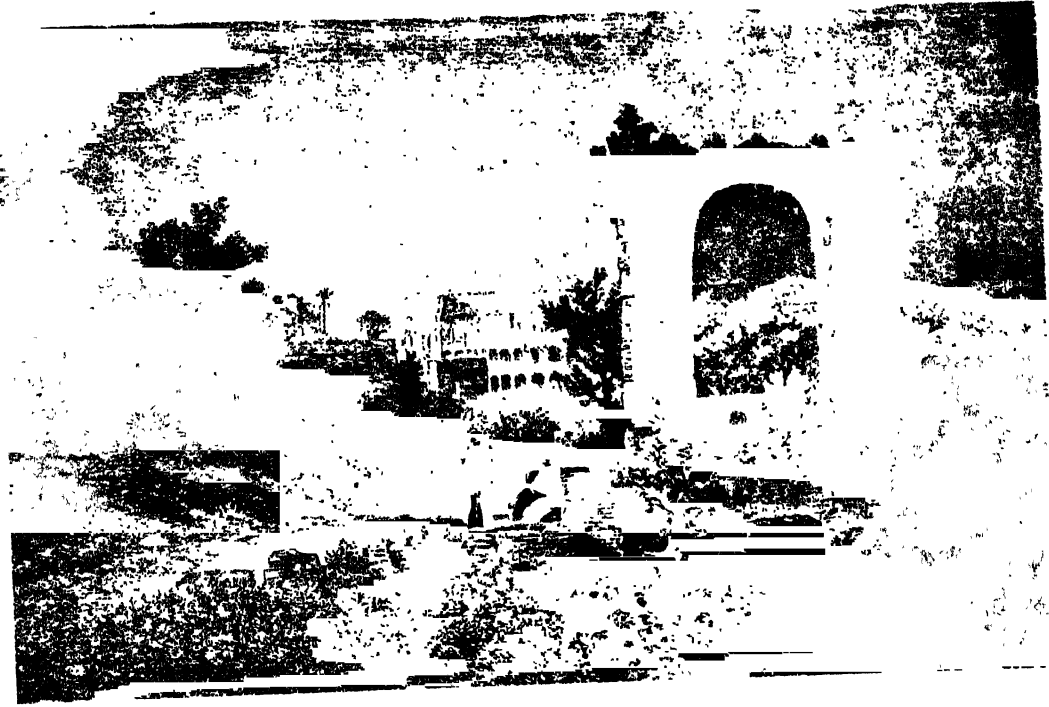
প্যালেটাইন পর্ব্বত (২৬৮ পৃষ্ঠা)
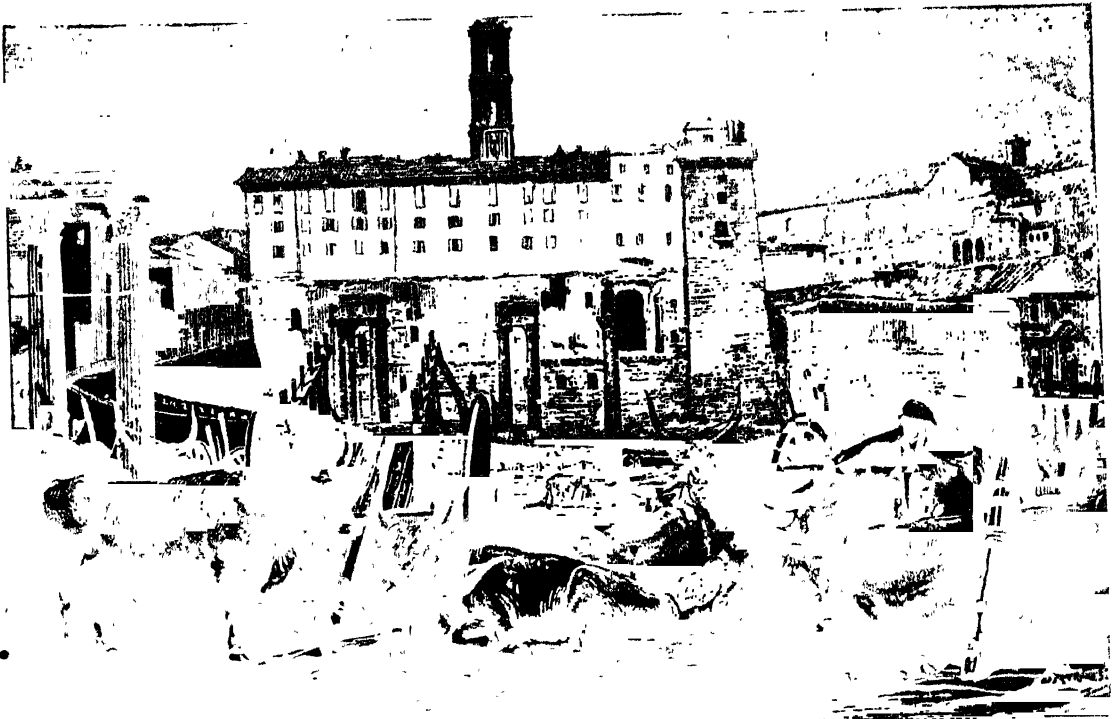
ফোরম্ (২৬৮ পৃষ্ঠা)
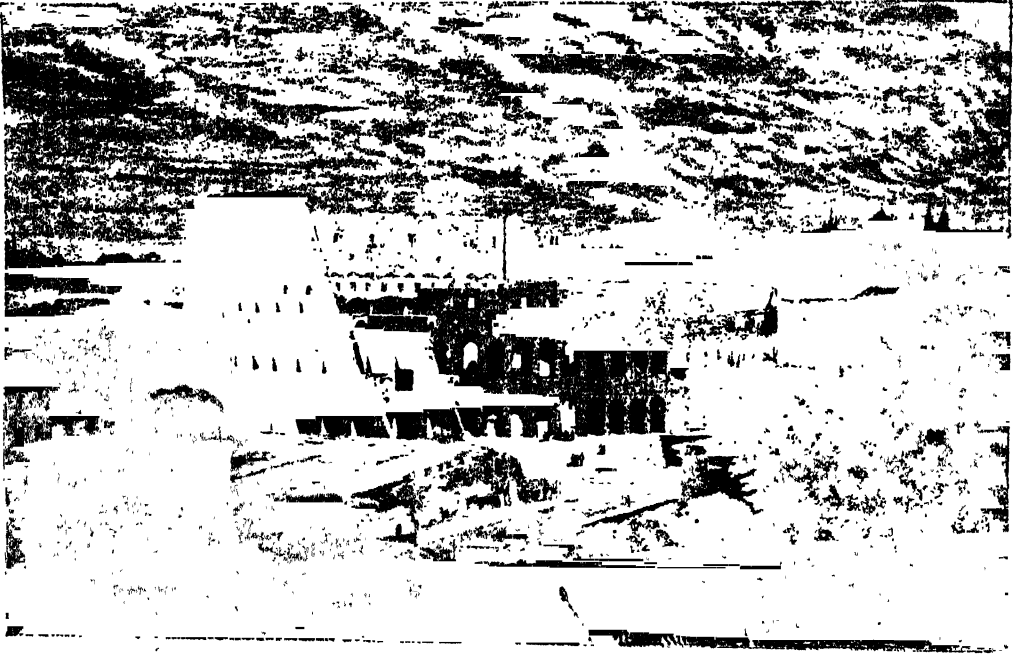
কোলিজিয়ম্।

চেষ্টা হইতেছে। যতদূর এখন পাওয়া যায় তাহাতে এখানে দেখিবার ও বলিবার অনেক জিনিস রহিয়াছে। আমার এই স্থানে গমনের অল্পদিন পূর্ব্বেই একটি সমাধি-মন্দির বাহির হইয়াছিল; তাহা রমুলাসের সমাধিমন্দির বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ফোরাম দেখিয়াই আমরা কলোসিয়ম দেখিতে গেলাম—পৃথিবীতে এমন রঙ্গচত্বর নাকি কখনও নির্ম্মিত হয় নাই—এমন পৈশাচিক দৃশ্যের অভিনয়ও পৃথিবীর আর কোন্ রঙ্গাঙ্গনে হয়! পাঠক স্মরণ করুন, এইস্থানে দলে দলে খৃষ্টানদিগকে কাষ্ঠখণ্ডের সহিত দৃঢ়বদ্ধ করা হইত। তাহাদের এই দেহ তৈলাক্ত বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হইত, অবশেষে তাহাদের দেহ অগ্নিসংযুক্ত করা হইল; চারিদিকে হাহাকার আর্ত্তনাদ উঠিত—আর সম্রাট্ নামধারী এক নরশার্দ্দূল মহাহর্ষে এই মৃত্যু-যন্ত্রণা দর্শন করিত। কখনও কখনও সম্রাটের আদেশে অগ্নিক্রীড়া হইত না, তৎপরিবর্ত্তে রঙ্গাঙ্গনে হিংস্র পশুদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তাহারা এই সকল হতভাগ্য খৃষ্টানগণের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিত। এ দৃশ্যের আর বর্ণনা করিয়া কাজ নাই।

আমি দেখিলাম সে সময়ে রোমের গৃহ বা মন্দির সকলের ছাদ নির্ম্মিত হইত না। আমাদের দেশের শামিয়ানার মত আচ্ছাদন ব্যবহৃত হইত। এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিলে পরবর্ত্তী পোপ-মহোদয়গণের উপর যথেষ্ট ভক্তি-সঞ্চার হয় না; কারণ আমরা বেশ দেখিতে পাইলাম যে, এই সকল স্থান রক্ষা করার পরিবর্ত্তে তাঁহারা এখানে যাহা কিছু ভাল দেখিয়াছেন তাহাই ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়া শুধু খৃষ্টীয় মন্দির বা ভজনালয়ের শোভা ও সৌষ্ঠব সাধন করেন নাই। নিজেদের গৃহ প্রমোদবাটিকা, সুসজ্জিত করিয়াছেন এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকেও লুণ্ঠনের ভাগ দিয়াছেন। পোপ অষ্টম ইনোসেণ্ট বারবেরিণি বংশীয় ছিলেন। তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্য লইয়া গিয়াছিলেন। এই কারণে রোমে একটি প্রবাদ কথা প্রচলিত আছে যে, বারবেরিণি (Barberini) পুরাতন রোমের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন,বারবেরিণিরা (Barberinis অসভ্য) তাহার সামান্য অংশও করিতে পারে নাই। এখন কিন্তু ইটালিয়ান গভর্ণমেণ্ট এই সকল রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

এবার এই স্থানেই রোমের কথা অৰ্দ্ধপথে শেষ করিলাম। আগামী সংখ্যায় অবশিষ্ট কথাগুলি বলিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্ মহ্তাব্।

শীতের প্রতি

ওগো জ্ঞানী,—ওগো বৃদ্ধ - স্তব্ধ ধ্যানী হে শীত মহান্
আড়ম্বর-আন্দোলন-শূন্য চিত্ত গম্ভীর ধীমান্।
করেছে নিবিড় চিন্তা তব শিরে খালিতা প্রকট
চর্ম্মে চিহ্ন রেখে গেছে—জীবনের সহস্র সঙ্কট
ইন্দ্রিয়ের দুর্গগুলি চূর্ণ করি সমরে আকুলি
পরীক্ষারা এঁকে গেছে ও ললাটে বলীরেখাগুলি ;
পেলব কামনারাজি তব আজি পলিত গলিত
ব্রহ্মচর্য্য-দৃঢ় আর যোগজয়ী যা ছিল ললিত
আজি নাই দৃপ্ত কণ্ঠে বজ্র গর্জ্জ ঘোর ঘনদলে
বিদ্যুৎ ভ্রূকুটি রোষে, আঁখিপুটে আজি নাহি জ্বলে
তরঙ্গের চললাস্যে আজি নাই যৌবন বিলাস ;
কুজনের কলহাস্যে নাহি আজি প্রমত্ত উল্লাস
অশোক কদম্ব চম্পা কুমুদ্বতী কমলের মালা
শুকায়েছে উপবনে শূন্য আজি প্রেমোৎসব-শালা ;
তোমার দেউল শূন্য, পূর্ণ শুধু শুষ্ক পত্রহারে
দশা-তৈলহীন দীপে শূন্য কুম্ভে ধূপ ভস্ম ভারে
একে একে শেষ এবে জীবনের পর্ব্ব পূজা সব
শূন্য দোল রাসমঞ্চ থেমে গেছে শঙ্খ-ঘণ্টা-রব
গৃহ ধর্ম্ম করি শেষ ওগো ত্যাগি চিত্ত করি স্থির
আচার্য্যের দর্ভাসনে বসিয়াছ বস্তুজয়ী বীর
ললিত শ্যামল মোহে, তব জ্ঞান-আঁখি মেলে চাও
দুখের নীহার দিয়া ঝরাইয়া উড়াইয়া দাও—
টুটাইয়া দাও তুমি যৌবনের সোণালী স্বপন
ঘুমও আঁখির পুটে পুষ্পাসবে রক্তিম বরণ
অপূর্ণেরে পূর্ণ করি অপক্কেরে পক্ক করে তুলি
পরিণত করো তুমি অপুষ্ট যা চিত্তবৃত্তিগুলি
ঝরাইয়া দিয়া ভ্রান্তি কুসুমের চিত্রবর্ণ দল
বাহির করিয়া আনো তার মাঝে সত্য তত্ত্ব ফল ;

ভোগমগ্ন গৃহীজনে তেয়াগিতে ফুল ধূলি খেলা,
ডেকে বলো, 'দিন যায় শেষ প্রায় জীবনের বেলা',
উচ্ছৃঙ্খলে শান্ত করি, বিশৃঙ্খলে গুছায়ে জমায়ে
ছিন্নে ভিন্নে শৃঙ্খলিয়া উদ্ধতের গতিটি কমায়ে
শেষ দিবসের কথা শ্মশানের ভৈরব সংবাদে
গর্ব্বেরে কাঁপায়ে তুলো, কাঁদাইয়া দাও অপরাধে।
ভাবাও,—নীরব কর্ম্মী কর বিশ্বে, ওগো দার্শনিক !
হট্টগোল, কোলাহল, তর্ক দ্বন্দ্বে, দাও শত ধিক্।
কুন্দশুভ্র কর আজি তমোময় পাপিষ্ঠের মন
হউক বিস্ময়ে ভয়ে লোধ্রপাণ্ডু অবিশ্বাসী জন।
শস্য-দূর্ব্বা-শুভাশীষে আশ্বাসিত হোক অনুতাপ
কৃচ্ছ্র-কণ্টকিত-বৃন্তে ফুটে রোক ভক্তির গোলাপ
সত্য বটে হবি দিয়া কে কোথায় নিবাবে অনল ?
প্রবৃত্তির পরিপাকে যে নিবৃত্তি তাহাই অটল
প্রকৃতির গতি পথ ধরি শেষে আসুক কাননে,
অবশ্য ডাকিবে তুমি ভোগক্লান্ত অধিকারী জনে।
মিটিয়াছে সব তৃষা ভোগে তাপে অলস মন্থর
এখনো সংসারে তবু জড়াইয়া রেখেছে অন্তর
তাহাকে ডাকিতে হবে। পুন জন্মে কি হ'বে তাহার
সঞ্চিত প্রাক্তন তপ কিছু যদি নাহি থাকে তার ?
ধুতুরা ফুলের পাত্রে পান করি নীহারের নীর
ভক্ষিয়া গলিত পত্র আজি তারা হোক্ তপোবীর
নিঃশেষিয়া রসপাত্র মোহরাজ্যে ক্লান্ত মায়াভ্রমে,
ব্যসনী সে নিক দীক্ষা তত্ত্বশিক্ষা তোমার আশ্রমে
অন্তঃপুর হতে ডাক ভোগরত বৃদ্ধ মহারাজে
যোগব্রত আচরিতে আসে যেন জটাচীর সাজে
জ্ঞান কাণ্ড ধর্ম্মতথ্য কহ যোগী, দাও যোগবল,
বসুক তোমারে ঘেরি যত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর দল।

শ্রীকালিদাস রায়।

সাধক কমলাকান্ত

শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে এমন একজন সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার সঙ্গীতসুধায় পাষাণ-প্রাণও বিগলিত হইত; তাহা আজ কয়জন জানে? সাধকশ্রেষ্ঠ কমলাকান্ত সাধনার যে মার্গে উপনীত হইয়াছিলেন, একা রামপ্রসাদ ব্যতীত আর কোন শাক্ত ভক্ত ততদূর যাইতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তিনি এক সময়ে আমাদের জাতিকে ভক্তির বন্যায় ভাসাইয়াছিলেন, তিনি তেমন অধিক সংখ্যক গান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া যে তাঁহাকে আমরা বিস্মৃতিসাগরে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি তাহা কি ঘোর পরিতাপের বিষয় নহে? শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার বিখ্যাত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকেও এই মহাত্মার প্রতি সুবিচার করেন নাই। এই পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এই:—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অম্বিকা-কালনা হইতে বৰ্দ্ধমান কোটালহাট নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন; ইনি বৰ্দ্ধমানাধিপ তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত ও গুরু হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত শ্যামা-বিষয়ক পদাবলী রামপ্রসাদের গানগুলির মত মধুর।

এ কথা সত্য বটে যে, তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না; কিন্তু উপরে উদ্ধৃত দুই ছত্র হইতে যে তাঁহার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পাঠকের কিছুই ধারণা হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। কএকটি প্রবাদ গল্প এখনও তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া থাকে; তাঁহার রচিত প্রসঙ্গে ঐ সকল প্রবাদের উল্লেখ আমরা একান্ত আবশ্যক মনে করি।

গ্রীক পুরাণে পড়িয়াছিলাম যে, অপূর্ব্ব গায়ক এরিয়ন সিসিলিতে সঙ্গীত দ্বন্দে-অন্যান্য সকল গায়ককে পরাজিত করিয়া যখন বহুমূল্য পুরস্কার সহ তথা হইতে করিন্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথে তাঁহার জাহাজের নাবিকগণ ঐ সকল পুরস্কার-দ্রব্যের লোভে তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। তিনি নিজের আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া দুর্বৃত্তদের নিকট হইতে এইমাত্র অনুমতি পাইলেন যে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সাধের বীণা-বাদন করিয়া একটি গান গায়িবেন। সঙ্গীত শেষ হইলে দস্যুগণ তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিবে। এদিকে সেই সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া কতকগুলি বৃহদাকার ডলফিন্ মৎস্য তাঁহার জাহাজের নিকট আসিয়া জুটিয়াছিল এবং এরিয়ন যখন সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তখন একটা মাছ তাঁহাকে বহন করিয়া তীরে লইয়া গেল। ইহা একটি কল্পিত উপাখ্যান মাত্র; আর সঙ্গীতের প্রভাব দ্যোতন করিবার জন্যই বোধ হয় ইহার সৃষ্টি; কিন্তু এই উপাখ্যানে দেখিতেছি যে, যে সঙ্গীতে ইতর প্রাণী মুগ্ধ হইয়াছিল তাহা লোভোপহত মানুষের পাষাণ-মন দ্রব করিতে পারে নাই। মানুষের মন এতই কঠিন!

কিন্তু যে নির্ম্মম মানবমন অসামান্য শক্তিসম্পন্ন পৌরাণিক গায়কের সঙ্গীতে করুণারসে সিক্ত হয় নাই, তাহা ভক্ত কমলাকান্তের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য পুরাণকারের কল্পনায় যাহা আসে নাই। আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে তাহাই বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। কমলাকান্ত অনেকটা এরিয়নের মত অবস্থাতেই পড়িয়াছিলেন। একদিন রাত্রে তিনি 'ওড়-গাঁয়ের ডাঙ্গা' নামক মাঠ দিয়া একাকী যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কতগুলি দস্যু আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর কোন উপায় না দেখিয়া নির্ভীক সাধক উচ্চৈঃস্বরে রামপ্রসাদী সুরে গান ধরিলেন—

আর কিছু নাই শ্যামা,
    কেবল তোমার দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
    অতে'ব হ'লেম সাহসভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা,
    সুখের সময় সবাই তারা,
কিন্তু বিপৎকালে কেউ কোথা নেই,
    ঘড় বাড়ী ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে যদি রাখো,
    করুণা নয়নে দ্যাখো,
নইলে জপ করিয়ে তোমায় পাওয়া
    সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।

কমলাকান্তের কথা,
মায়ে বলি মনের ব্যথা,
আমার, জপের মালা ঝুলি কাঁথা
জপের ঘরে রইল টাঙ্গা ॥

নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া সেই নরপশুগণ সঙ্গীতসুধা পান করিতেছিল। ঘোর পাতকের যে জগদ্দল পাষাণ তাহাদের হৃদয়ের আদিম দেবভাবটিকে চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন কোন্ মন্ত্রবলে সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল, আর সেই মুক্তহৃদয় হইতে ভক্তির উৎস প্রবাহিত হইয়া অশ্রুর আকারে সেই মহাত্মার পদধৌত করিতে লাগিল! ক্ষণকাল পূর্ব্বে যাহারা তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা তাঁহার পদতলে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল!

শোক তাপ, দুঃখ কষ্ট কমলাকান্তকে একটুও বিচলিত করিতে পারিত না। তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে, ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তিনি তখন নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন,—

'কালি, সব ঘুচালি লেটা।'

তাঁহার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাকে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরস্থ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। মুমূর্ষু কমলাকান্ত তখন সকলকে বাধা দিয়া বলেন,

কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব?
আমি, কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে,
বিমাতার কি শরণ ল'ব?

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র কোটালহাট গ্রামে ইঁহার বাসের নিমিত্ত সুন্দর বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এইখানে কমলাকান্ত প্রতিবৎসর মহা সমারোহে কালীপূজা করিতেন। পূজার দিন আপামর সাধারণ সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার সঙ্গীত-পীযূষ পান করিত। আমরা তাঁহার একটি গান দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

রামকেলী—একতালা।

জাননারে মন, পরম কারণ,
শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয় ॥
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া,
ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতী
কখন রামের জানকী হয়।
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি
দানবচয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়া বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন
করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপন মায়ায় আপনি বাঁধা
আপন মহিমা আপনি গায় ॥
যে রূপে যে জন করয়ে ভজন
সেই রূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদিসরোবরে
কমল মাঝারে হয় উদয়।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

অনন্ত-রূপিণী প্রকৃতি।

প্রকৃতি-রাণী অনন্ত লীলাময়ী। তাঁর রূপ অনন্ত;—মূর্ত্তি নিখিল-ভুবনময়। আদিম মানব এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, নিদ্রাভঙ্গের পর শিশুর মত যেদিন প্রেমময় স্তুতি-গানে স্নেহময়ীর সংবর্দ্ধনা করিয়াছিল, সেইদিন হইতে মানবের প্রেম ধারা নানা আকারে নানা দিক্ দিয়া সেই কল্যাণময়ীর অনুসন্ধানে নিশিদিন আকুল প্রাণে ছুটিয়া চলিয়াছে। তিনি কখনও অরুণ-কিরণ-ভাতিতে আপনাকে মিশাইয়া দিয়া পরম জ্যোতিরূপে আমাদের দৃষ্টিকে জাগাইয়া তুলিতেছেন; কখনও বা সুস্নিগ্ধ মলয়রূপে বুকভরা সুগন্ধ লইয়া আমাদের দেহ-মন-প্রাণকে মোহিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছেন; আবার কখনও বা বিগলিত-করুণারূপিণী স্রোতস্বিনীর ধারায় আমাদিগের জীবনে রস-সঞ্চার করিয়া বহিয়া যাইতেছেন। মাতৃরূপে পিতৃরূপে, কুটুম্ব, সন্তান, জায়া বা ভগিনীরূপে, —এবং এ সমুদয়ের একীভূত ও একাত্মমূর্ত্তি —দেশ-মাতৃকারূপে,—কত ভাবে, কত আকারে অসীম সুষমাময়ী আমাদের জীবনকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন; ইঁহার তত্ত্ব ভাবিতে গিয়া চিন্তা পরাস্ত হয়, ইঁহার অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যের প্রতি কল্পনা-দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করিলে, সমগ্র গুণগ্রাহিণী বৃত্তি নীরব মূক হইয়া রহে।

প্রথম চিত্রের প্রতিপাদ্য অপ্সরীর কল্পনায় ভাস্কর প্রকৃতি-রাণীর সুনির্ম্মল আদিম রূপটি অতিশয় চিত্তহারী ভাবে প্রতিফলিত করিয়াছেন। ইহাতে মানবের পরিণত বুদ্ধি-বৃত্তি-মূলক গবেষণার প্রাচুর্য্য বা জটিলতা নাই। ইহার দেহখানি যেন স্বপ্ননির্ম্মিত; কল্পনাময় কবিত্বের স্বচ্ছ-সলিলে স্বপ্নময়ী যেন মীনের মত বিচরণ করিতেছেন। প্রকৃতির এই শান্ত-স্নিগ্ধ আদর্শটি অতীব পুরাতন, মানবের বুদ্ধি-বৃত্তির

অপ্সরী

প্রতিধ্বনি

শৈশবাবস্থায় উহা কল্পিত হইয়াছিল। আজ আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে উহা লাভ করিয়াছি এবং অতি যত্নে আমাদের সকল কথায় গাথায়, সাহিত্যে সঙ্গীতে, কাব্যে শিল্পে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছি।

দ্বিতীয় চিত্র "প্রতিধ্বনি"তে ঐ পরিকল্পনাটি আরও ঘনতর আকৃতি পরিগ্রহ করিয়াছে। ক্রীড়াময়ী তখন স্থির-সংযত প্রাণে যেন কাহার আশায় বসিয়া, কাহার মধুর বংশী-রব শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। নিজ নাভি-গন্ধে মত্তমৃগের মত আপন-হৃদয়-নিহিত মুরলী-ধারীর প্রাণ-মাতান বংশীরবে পাগল হইয়া প্রতিধ্বনির সন্ধান লইতে ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছেন; ইহাতে প্রেম ধনের অপূর্ব্ব এবং চির-আকাঙ্ক্ষিত অনুভূতির পূর্ব্বাভাস সূচিত হইতেছে। প্রিয়ের সন্ধানে সমগ্র হৃদয়ের চঞ্চল আকুলতাকে প্রেরণ করিয়া তাহারই আশায় পথ চাহিয়া রহিলে যে আনন্দপূর্ণ

হৃদিদ্বার-উদ্ঘাটন
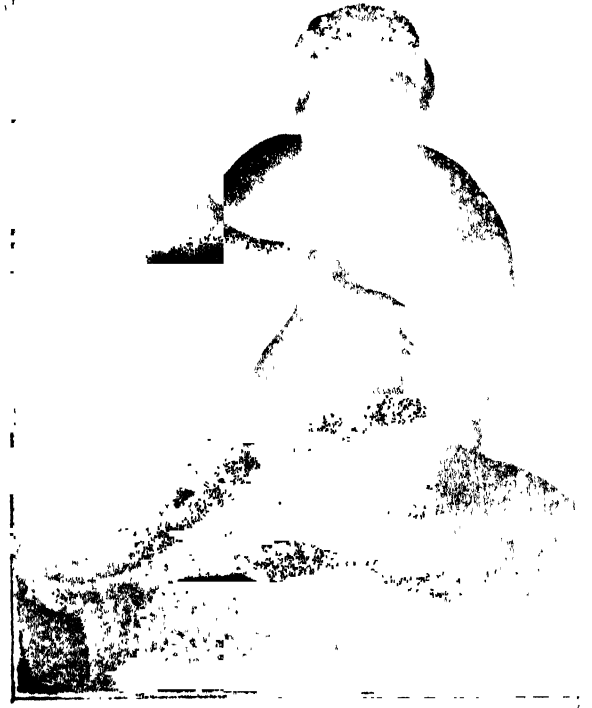
আশ্রিতের সংরক্ষণ

সৌন্দর্য্য আসিয়া দেহে আবির্ভূত হয়, এই প্রসন্নবদনার মূর্ত্তিতেও সেই গভীর আনন্দ-ভাব উছলিয়া পড়িতেছে।

তৃতীয় চিত্র "হৃদি-দ্বার-উদ্ঘাটনে"—ধনী প্রেমাস্পদের আগমনের আভাস পাইয়া দ্বার উন্মোচন করিয়া বাঞ্ছিতকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইতেছেন। এস্থলে আর প্রতীক্ষার ভাব দেখা যায় না। দেহের সমগ্র অণু-পরমাণু সমস্বরে উন্মুক্ত প্রাণে যেন ডাকিতেছে এস—এস—প্রাণে। ভাস্কর ইহাতে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ধনীর মুখের ভাব এবং বক্ষোপরি ভ্রমররূপী নাগরের প্রতি একাগ্র দৃষ্টি,—সর্ব্ব-সন্তোষের প্রতিমূর্ত্তি কি মধুর কবিত্বময়! উদ্ঘাটিত হৃদি-ফুলবনে প্রাণের প্রাণকে সংবর্দ্ধনা করিয়া লইতে গিয়া আপনার একটি তন্ময়তার যে ভাব সমগ্রদেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে উহা কি মধুর!

চতুর্থ চিত্র "আশ্রিতের সংরক্ষণের" কল্পনার ভাবটি

আরও অধিকতর ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। একদিকে যেমন চিরবাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া হৃদয়ে আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে, তেমনই আকাঙ্ক্ষিতকে প্রাপ্ত হইবামাত্র আবার সঙ্গে সঙ্গে "পাছে হারাইয়া ফেলি" "যদি বা হৃদয়-নিধি হৃদিপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া উড়িয়া পালায়" এরূপ একটা কাল্পনিক আশঙ্কার ভাব আসিয়া মনকে অধিকার করিয়াছে; এই আশঙ্কামূলক আনন্দের ভাব রমণীর বদনমণ্ডলে কেমন উজ্জ্বলভাবে ক্রীড়া করিতেছে। প্রেমবংশীরব-শ্রবণে পাগল পারা হইয়া প্রতীক্ষা করিবার পর হৃদিদ্বার উন্মোচন করিয়া নাগরকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এখন একেবারে সকল বৈষম্যের সম্মুখে নিজেকে স্থাপন করিয়া মনচোরকে হৃদয়ে বন্দী করিয়া যেন বলিতেছে, "তারে আর কি ছাড়িয়া দিব—হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ সেখানে রাখিয়া দিব"। ইহাই নিগূঢ় যোগ। পুরুষ-

প্রথম স্নান

সংকল্পময়ী জোয়ান অব্ আর্ক

প্রকৃতির এই মিলনই বাৎসল্যোৎপত্তির নিদান। তখনই অনিলে সলিলে, ব্যোমে বিমানে মাতৃগাথা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে; আকাশের হাওয়া, ফুলের সুগন্ধ, স্রোতস্বিনীর কল্লোল তখন মা মা বলিয়া সংসার-নন্দনবনে নাচিয়া বেড়ায়।

পঞ্চম চিত্র "প্রথম স্নানের প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রকৃতি-রাণী প্রসন্ন-বদনা বিশ্বজনয়িত্রী দয়াময়ী"-রূপে পরিণতা। এ স্থলে মা সন্তান-বাৎসল্যে ভরপুর হইয়া সমগ্র বিশ্বটাকে টানিয়া বক্ষে তুলিয়া ল'ন। অসীম ব্রহ্মাণ্ড তখন তাঁর নয়নে সুশোভন ও লোভনীয় আকার ধারণ করে, তখন তিনি যথার্থই সন্তানের উল্লাসময় ব্যাদিত বদনে ত্রিভুবন দেখিতে পান।

ষষ্ঠ চিত্র "জোয়ান অব আর্কের" সংকল্পময় দৃঢ়তায় প্রকৃতি বা নারী-মূর্ত্তির আরও পরিণত-ভাব লক্ষ্য করা

যায়। এ স্থলে প্রকৃতি-রাণী অপ্সরোবেশে আর দৃষ্টি-সমক্ষে অধিষ্ঠিত নহেন। এখানে তিনি একেবারে সংসারের রাণীরূপে বিরাজিতা। সামাজিক নানা প্রকার অপটু এবং অপরিণত বিবিধ ব্যবস্থার ফলে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া যখন নরনারীর জীবনকে দুর্ব্বিসহ যাতনায় অধীর করিয়া তোলে, তখন স্নেহশালী আপন সন্ততির ব্যথিত জীবনের করুণ আর্ত্তনাদ কি আর স্থির হইয়া বসিয়া শুনিতে পারেন? তাঁহাকে তখন বাধ্য হইয়া সেই বিগ্রহ অপনোদনে যত্নবান্ হইতে হয়। এই পরিকল্পনায় ভাস্কর, সন্তানের ক্লেশে ব্যথিতপ্রাণা প্রকৃতির মাতৃভাবের সংকল্পময় আদর্শটি কেমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন! জগৎপ্রসবিনী জগন্মাতা প্রকৃতি যখন অসুরনাশিনীরূপে অমঙ্গল-বিনাশে উদ্যত হ'ন, তখন ব্রহ্মাণ্ড বিলোড়িত হইয়া উঠে; গ্রহ উপগ্রহে, নক্ষত্র তারকায় সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, অসুর-নাশিনীর বিপুল প্রতাপে শিবকেও ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে হয়। মানবের পুঞ্জীভূত নানারূপ দুষ্কৃতি যখন সমাজকে অসুস্থ এবং বাসের অনুপযোগী করিয়া তোলে, তখনই আমরা প্রকৃতির এরূপ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিতে পাই। যোয়ান অব আর্কের আত্মজ্ঞান বা দুর্গাবতীর বীরত্ব এসকলই মানব-সমাজে বিশ্বজননীর মাতৃত্বের এক একটি ক্ষুদ্র বিকাশ। সন্তানের করুণ ক্রন্দনে মায়ের আসন যখন টলে তখন আর রক্ষা নাই, প্রবল স্রোতের মুখে তৃণের মত সকল বাধা বৈষম্য নিমেষে ভাসিয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়; দুষ্কৃতির ঘৃণ্য অস্তিত্ব সুকৃতির উজ্জ্বলালোক-প্রভাবে বিলুপ্ত হয়। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ব্যথিতের বেদনা নদী-উৎসের পুঞ্জীভূত জলকুণ্ডের মত প্রবল-বেগে আলোড়িত হইয়া প্রলয়কারী ভীষণ স্রোতে ধাবমান হয়—সমাজের সকল আবর্জ্জনা বিধৌত হইয়া যায়।

প্রলয়ের বা দুষ্কৃত-নিধনের প্রাক্কালে ৭ম চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মত মাতৃভাব তখন জগতের মূল কারণের প্রতি শক্তি-সঞ্চয়-কল্পে আশীষপ্রার্থিনী হ'ন। অসাধ্য-সাধন-মানসে সর্ব্বলোক সাধনধনের সহকারিতা অবশ্যলভ্য। প্রকৃতির এই মূল কারণের অন্বেষণে শরণাগতের ভাব হইতেই আমরা সর্ব্বমঙ্গলের অস্তিত্বের

আশীষ-প্রার্থিনী যোয়ান অব আর্ক

প্রমাণ পাই। প্রিয়ের উদ্দেশে সমগ্র প্রকৃতির এই প্রতীক্ষাপরায়ণ ভাবটি যখন হইতেই মানব-প্রাণে উপলব্ধ হইয়াছে সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতেই মানব এ যবনিকার অন্তরালবর্ত্তী লীলাময়ের সন্ধানে তৎপর হইয়াছে। মানব বাল-সূর্য্যে সুবর্ণকিরণে উদ্ভাসিত বদন লইয়া করযোড়ে শুধাইয়াছে "এ জ্যোতির অন্তরালে পূর্ণজ্যোতির্ম্ময় কে তুমি" সংসারে বনে গহনে একই প্রাণের অনন্তরূপ ও অনন্তলীলা সন্দর্শন করিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে 'কে তুমি' 'কোথা তুমি' বলিয়া বালকের মত কাঁদিয়া বেড়াইয়াছে। মানবের এই প্রেমপূর্ণ ব্যাকুলতা হইতেই বেদ-বেদান্ত বাইবেল কোরাণের জন্ম। এই প্রেম কত দেশে, কত কালে, কত ভাবে, কত আকারে আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া, আমাদের সকলের প্রাণের প্রাণ যিনি, তাঁহারই পীঠ-মন্দিরের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এমন যে ধন,— সংসারের সন্তানবাৎসল্য, পিতার স্নেহ, প্রিয়ার প্রেম, এবং পুঞ্জীভূত করুণারূপিণী মাতৃভূমির প্রেম যে প্রেম-

ধনের বিশ্বপ্লাবী স্নেহের এককণাও বহন করে না, এমন যে "সব সুখ-দুঃখ হৃদি-মন্থনধন"—অসময়ে তাঁহার আশীষ বিনা কি সাফল্য-লাভ সম্ভবে? তাই আশীষপ্রার্থিনী মুদিত-নয়নে সমাহিত-প্রাণে মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদ ও শক্তি ভিক্ষা করিতেছে। সাধু উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া প্রাণ যখন অসাধ্য-সাধনে ব্রতী হয়, তখন সমগ্র হৃদয়বৃত্তি এমনই করিয়াই সর্ব্বশক্তি-উৎসের দিকে বল-লাভের জন্য ধাবিত হয়।

অনন্তরূপিণী প্রকৃতিরাণী মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া একদিন বঙ্গে রামপ্রসাদের নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন। এমনই করিয়া মাকে কেহ কবে চিনিয়াছে, কিংবা ডাকিয়াছে কি না, জানি না। প্রেম যখন সরলতার সঙ্গে পূর্ণ আবেগে মণ্ডিত হইয়া উঠে, তখন সম্প্রদায়গত, আচারগত বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বৈষম্য শিথিল হইয়া স্নেহপাশানুবন্ধনে পরিণত হয়; ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা স্নেহমণ্ডিত হইয়া উঠে; স্নেহ-প্রেম দয়া ঘন হইতে ঘনতর হইয়া সকলকে সমভাবে প্রসারিত-বক্ষে আগ্রহভরে টানিয়া লয়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মন্ (লণ্ডন)।

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ

(১) সাধ্য-প্রেম-চন্দ্রিকা।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুঁথি। দেশীয় তুলট কাগজের ১৪×৮ ইঞ্চি পরিসরের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত বারটি পত্রে এই পুস্তিকার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। প্রতি পৃষ্ঠায় আটটি করিয়া পংক্তি আছে; ইহার মোট শ্লোক সংখ্যা ১৮২টি।

ভক্তবীর মহাত্মা নরোত্তম দাস ঠাকুর এই পুস্তকের রচয়িতা। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের—"গ্রন্থভাগে অনুল্লিখিত পুঁথির তালিকায়" এই পুস্তিকার নামোল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধীয় কোনও বিবরণ লিখেন নাই। এস্থলে তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা হইবে।

পুঁথির স্থানে স্থানে ভণিতায় গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। যথা,—

(১) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥

(২) শ্রীগুরুর পাদপদ্ম মনে করি আশ।
সাধ্য-প্রেম-চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইত্যাদি।

এই মহাপুরুষ ১৪৫৩ কি ১৪৫৪ শকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং গ্রন্থের শক নিশ্চিতরূপে জানিবার সুবিধা না থাকিলেও ইহা যে সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন জিনিস, মোটামুটি রকম এ কথা সাব্যস্ত করা যাইতে পারে।

গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অগ্রে গ্রন্থকারের পরিচয়সূচক দুই একটি কথা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকগণের তাহা অরুচিকর হইবে না।

নরোত্তম ঠাকুর রামপুর বোয়ালীয়ার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোদ্ভব। পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ, মাতা নারায়ণী। কৃষ্ণানন্দ রাজা উপাধিকারী সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন।

নরোত্তমের বাল্যকালেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মিয়াছিল। বিপুল ধনভাণ্ডার, সুবিশাল রাজ্য, পিতামাতার অপরিমিত স্নেহ, বিলাসিতার চিত্তোন্মাদক প্রলোভন, কিছুতেই নরোত্তমের হৃদয়কে আকৃষ্ট করিল না। রাজপুরীতে বাস এবং সমৃদ্ধি উপভোগ তাঁহার বিষের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল। ষোল

বৎসর বয়সের কালে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবীন বালক, আজীবন রাজভোগে প্রতিপালিত, হাঁটিবার অভ্যাস মোটেই ছিল না, সঙ্গে সাহায্যকারী দ্বিতীয় লোক নাই, সুতরাং সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীধামে পৌছিতে তাঁহাকে অপরিসীম কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, প্রেম-বিলাস গ্রন্থে এই দারুণ পথশ্রান্তির কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে,—

"আহারের চেষ্টা নাহি সকল দিবসে।
ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে॥
পথের চলনে পায়ে হইল যে ব্রণ।
বৃক্ষতলে পড়ি রহে হয়ে অচেতন॥"

শ্রান্ত ক্লান্ত রাজকুমার ধর্ম্মোদ্দেশে এবংবিধ অসহনীয় কষ্ট স্বীকার করিয়া, ধীর মন্থরগতিতে পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। এদিকে তাঁহার সন্ধানের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল। তাহাদের একদল আসিয়া পথিমধ্যে শ্রান্ত ক্লান্ত নরোত্তমের দেখা পাইল। তাহারা রাজকুমারকে বাড়ীতে ফিরাইয়া লইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। বালকের ধর্ম্ম প্রবণতার প্রবল স্রোতোমুখে তাহাদের অনুনয় বিনয় ও সর্ব্ববিধ যত্ন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল।

নরোত্তম বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর শরণাপন্ন হইলেন এবং ক্রমে অন্যান্য গোস্বামী মহাপুরুষগণের দর্শনলাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিতে লাগিলেন। লোকনাথ গোস্বামীকে দর্শন করা মাত্রই তিনি ভক্তিরসে আপ্লুত ও তাঁহার শিষ্যত্ব-গ্রহণে অভিলাষী হইলেন। এই মহাপুরুষ নরোত্তমকে এক বৎসরকাল পরীক্ষার পর দীক্ষা-দানে ধন্য করিয়াছিলেন।

নরোত্তম জীব-গোস্বামীর নিকট শাস্ত্র-অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। তিনি গুরুর কৃপায় এবং অসীম প্রতিভাবলে অল্পকালের মধ্যেই ভক্তিশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া "ঠাকুর মহাশয়" আখ্যা লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্যামানন্দ নরোত্তমের সঙ্গী হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য ও গদাধরের পরবর্ত্তীকালে পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষত্রয় তাঁহাদের সম্মানিত আসন অধিকার করিয়াছিলেন। এমন কি, শ্রীনিবাস ও নরোত্তম মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে পূজা পাইয়াছেন।

নরোত্তম কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ধর্ম্মপ্রভাবে অনেক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বসন্তরায় ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হরিশ্চন্দ্র রায় ও চাঁদ রায় প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ এই ধর্ম্মবীর মহাপুরুষের কৃপালাভে সাধু ও বৈষ্ণবরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, কোনও ভক্তকবি বলিয়াছেন,—

"মলয় বাতাস ছুঁইয়া যেমন মালতী ফুটেরে বনে।
(তেমি) সাধুর গায়ের বাতাস পেয়ে নাম ফুটেরে মনে॥

এই মহাবাক্যের দৃষ্টান্ত ভক্তিমার্গে অনেক আছে। পূর্ব্বকালের কথা তুলিব না, মহাপ্রভুর প্রাদুর্ভাব-কালেও জগাই মাধাইর উদ্ধার-সাধন ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। মহাপুরুষ নরোত্তমের অঙ্গের পবিত্র বাতাসে হরিশ্চন্দ্র ও চাঁদরায়ের ন্যায় প্রবল দস্যু সাধু ও ধার্ম্মিক হইয়াছিল, ইহা উপরিউক্ত বাক্যের অন্যতর দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম বহুসংখ্যক বৈষ্ণব-গ্রন্থ লইয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের নিয়োজিত দস্যু কর্ত্তৃক ঐ সকল গ্রন্থ লুণ্ঠিত হওয়ায় শ্রীনিবাস গ্রন্থের সন্ধানে নিযুক্ত রহিলেন, শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন এবং নরোত্তম খেতুরীতে যাইবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় নরোত্তমের জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। নরোত্তম দাসের বড়্‌বিগ্রহস্থাপনোপলক্ষে ১৫০৪ শকে সন্তোষ দত্ত খেতুরীতে মহাসমারোহে এক মহোৎসব করেন; এই উৎসবে তদানীন্তন সমস্ত বৈষ্ণব মহাজন উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনাটি বৈষ্ণব-সমাজে চিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

'সাধ্যপ্রেম-চন্দ্রিকা' ভক্তবীরের প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের প্রতিবিম্ব, সুতরাং আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা অনেক বৃহদাকারের গোস্বামী গ্রন্থ অপেক্ষা সারবান্।

কি উপায়ে সাধ্য-প্রেমলাভের অধিকারী হওয়া যাইতে পারে, ভক্তসমাজে তাহা প্রচার করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য। সাধ্যপ্রেমের ভাব ও লক্ষণ দুই চারি কথায় বলিবার বিষয় নহে। নিম্নোদ্ধৃত বাক্য দ্বারা তাহার মোটামুটি আভাস পাওয়া যাইতে পারে,—

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনা ভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদিসাধ্যতা॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—পুঃ বিঃ,—২য় লঃ—২ শ্লোক।

ইহার ভাব এই—ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যাহাদ্বারা ভাব সাধন করা যায়, তাহার নাম সাধন-ভক্তি। স্বভাবজাত নিত্যসিদ্ধ কতকগুলি ভাব আছে, সেইগুলি হৃদয়ে উদিত হইলেই তাহাকে সাধন কহে।

এই বাক্য অবলম্বন করিয়া পরম ভাগবত কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন,—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥
চৈতন্য-চরিতামৃত—মধ্যলীলা।

যিনি এই নিত্যসিদ্ধ প্রেমের অধিকারী, তিনি মহাপুরুষ —তাঁহার স্থান সাধারণ মানবসমাজ হইতে অনেক উচ্চে। কিন্তু এই দুর্লভ রত্ন ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত লাভ করা যাইতে পারে না, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা অসম্ভব। সুতরাং চেষ্টার দ্বারা—সাধনার দ্বারা প্রেম ও ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে হয়। কি উপায়ে সাধনার বলে প্রেম-ভক্তিরত্ন লাভ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয় বর্ণনা করাই 'সাধ্যপ্রেম-চন্দ্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য।

মীরা বলিয়াছেন—"বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।" প্রেমের অধিকারী না হইলে ভগবান্‌কে লাভ করা যাইতে পারে না। তিনি প্রেম-শৃঙ্খল ব্যতীত অন্য শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েন না। শ্রীগুরুর কৃপা এবং সাধু সঙ্গই এই মহাবস্তু-লাভের প্রধান উপায়। এ বিষয় ভক্তদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত গ্রন্থকার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন। সাধনায় সিদ্ধি-লাভ হয়। সাধক ও সিদ্ধের কর্ত্তব্য-বিষয়ে এই গ্রন্থে অনেক কথা লিখিত আছে। ইহার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে,—

"সাধক সিদ্ধের যত করণ কারণ।
সংক্ষেপে কহি এ কথা শুন সর্ব্বজন॥"

কি উপায়ে সাধনা হয়, সাধক কবি অল্প কথায় তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন,—

"নিদ্রাতে পড়িলে যেন বাক্য শ্রুতি নাই।
তেন মতে আরোপতে থাকিবে সদাই॥
উপাসনা আরোপ যে একতা করিয়া।
তবে সে সাধন হবে দেখহ ভাবিয়া।"

স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে,—

"আর কোন যোগে দেখা না পায় কৃষ্ণেরে।
মনেতে একতা হৈলে মিলিব তাহারে॥"

'মনের একতা'ই সাধনার প্রধান সূত্র। কিন্তু প্রেম ভিন্ন আর কিছুতেই মনের সেই 'একতা' জন্মিতে পারে না। ভালবাসার পাত্র কিংবা প্রিয় বস্তুর উপর মন যেমন আকৃষ্ট হয়, অন্য কিছুতে তেমন হয় না। আমরা যাহাকে যতটুকু ভালবাসি, তাহার প্রতি সেই পরিমাণে মনের একাগ্রতা জন্মিয়া থাকে। ইহা কেবল সাংসারিকের কথা নহে, উপাসকের পক্ষেও এই কথা খাটিবে। বৈষ্ণব মহাজনগণ শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর (প্রেম) এই পঞ্চরসের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও পঞ্চভাবে সাধনার পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। মনের একাগ্রতা সাধনের নিমিত্ত এই সকল পদ্ধতির উপাসনা বিশেষ উপযোগী। ইহার মধ্যে আবার মধুর ভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক। এই সকল ভাবের প্রাবল্য দ্বারা 'ভগবান্‌কে' লাভ করা যত সহজ— তাঁহাকে 'ভগবদ্-জ্ঞানে লাভ করা তত সহজ নহে। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। এস্থলে সংক্ষেপতঃ দুই একটি কথার আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অর্জ্জুন শ্রীভগবান্‌কে সখারূপে (সখ্যভাবে) পাইয়া এমনই আপনার করিয়া তুলিয়াছিলেন, সকলে জানিত কৃষ্ণার্জ্জুন এক আত্মা—ভিন্নদেহ। অর্জ্জুন জানিতেন— শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয়, উভয়ের মধ্যে কোন অংশে প্রভেদ নাই! তখন সখ্যভাবে অর্জ্জুনের হৃদয় এতই আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাবের

গন্ধও সে হৃদয়ে প্রবেশলাভের অধিকার পাইত না ; সুতরাং ভগবান্‌কে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আপনার বলিয়া—এমন কি, আপনার আত্মা বলিয়া জানিতেন। কিন্তু যখন ভগবান্ বিরাট্‌মূর্ত্তিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন অর্জ্জুনের সেই চিরপোষিত ভাব তিরোহিত হইল। তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে ভীত ও চমকিত হইয়া, সসম্ভ্রমে, সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন; এবং ভয়বিহ্বলস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"তোমার বিরাট্‌মূর্ত্তি-দর্শনে আমি বড়ই ভীত হইয়াছি, শীঘ্র এ মূর্ত্তি সংবরণ কর।" এই ভাবের পরিবর্ত্তনে তিনি ভগবান্ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িলেন। এতকাল যাঁহাকে সখা জ্ঞানে অভেদ মনে করিতেন, আজ তাঁহাকে উপাস্য-দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের পূজায় আর এ পূজায় অনেক তফাৎ!

রাখাল-বালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপে পাইয়া কতই আপনার করিয়াছিলেন ; তখন তাঁহারা ভগবান্‌কে শাসাইয়া বলিয়াছেন,—

"কাল কাননে খেলায় হে'রে, ব'য়েছিলে কাঁধে ক'রে,
সে কথা কি মনে ক'রে বসিয়ে রয়েছ ঘরে ?
এ তোমার অন্যায় ভারি আমরা ত ভাই খেলায় হারি,
দশ দিন তোরে কাঁধে করি, না হয় একদিন তোর কাঁধে চ'ড়েছি ?"

ইহা সখ্যভাবের খাঁটি চিত্র! ভগবান্ ও আপনার মধ্যে প্রভেদ-জ্ঞানের গন্ধও নাই। কিন্তু যখন তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাবের ছায়া রাখালগণের স্বচ্ছ সরল হৃদয়ে পতিত হইল, তখন আর তাঁহার সে ভাব বজায় রাখিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অসামান্য এবং সম্মানের পাত্র। এই ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে নানাবিধ বিতর্ক উদিত হইতে লাগিল। শ্রীদাম সন্দিগ্ধ-চিত্তে বলিতে লাগিলেন,—

"তাই ভেবে কি ভাইরে সুবল ছেড়ে গিছে প্রাণের কানাই,
আমরা সামান্য ভে'বে কখন মান্য করি নাই।"

এস্থলে, আপনাতে ও ভগবানে সমজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায়, ভগবান্ হইতে অনেক অন্তরে সরিয়া পড়িতে হইয়াছে।

যশোদার হৃদয় বাৎসল্যরসের আধার। তিনি ভগবান্‌কে পুত্ররূপে পাইয়া কত আপনার করিয়াছিলেন। কত আদর যত্ন করিতেন—কত আব্‌দার পালন করিতেন, কত মারিতেন, কত বাঁধিতেন! এক কথায় বলিতে গেলে তিনি সমস্ত স্নেহ-মমতা সহ প্রাণমন শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে আপনার জ্ঞানে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু যে দিন তিনি সন্তানের বদনগহ্বরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেন, সেদিন আর চিরপোষিত বাৎসল্যভাব বজায় রাখিতে পারিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণকে কোলে টানিয়া লওয়ার পরিবর্ত্তে বরং দশ হাত অন্তরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন বুঝিলেন,—ইনি অসামান্য, উপাস্য। সুতরাং ভগবানের সহিত সে আত্মীয়তা আর রহিল না।

এজন্যই বৈষ্ণব মহাজনগণ বলিয়াছেন,পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতভাবের সাধনাদ্বারা ভগবানের প্রতি মনের যেরূপ একাগ্রতা জন্মিবে, অন্য কোন উপায়ে তাহা জন্মিতে পারে না। আমাদের আলোচ্য 'সাধ্য-প্রেম-চন্দ্রিকায়' দাস্য ও মধুর ভাবের উপাসনার কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, সেবাব্রত (দাস্যভাব) দ্বারা মনের একাগ্রতা এবং হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তির সঞ্চার হয় ; সুতরাং সেবাব্রতই প্রকৃষ্ট সাধনা। তিনি যে ভাবে এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অভিলাষী, নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় পংক্তি আলোচনায় তাহা বুঝা যাইবে,—

সিন্ধুরা রাগ।

রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
জীয়নে মরণে আর গতি নাহি মোর॥
কালিন্দীর তীরে কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর 'পর বসাব দুইজন॥
শ্যাম-গৌরীর অঙ্গে দিব চন্দনের বিন্দু।
চামর ঢুলাব কবে হেরি মুখ-ইন্দু॥
ললিতা বিশাখা আদি আর সখীবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥"

ভক্ত গ্রন্থকার স্বাধীনভাবে সেবার অধিকারী হইতে সাহসী কিংবা অভিলাষী ন'ন। ললিতা, বিশাখা সখীগণের আজ্ঞার অধীন থাকিয়া সেবা করিতে পারিলেই তিনি পরিতৃপ্ত! ইহাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুমোদিত ব্যবস্থা।

নমুনা স্বরূপ আরও দুইটি পদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে,—

"প্রাণের হরি প্রাণের হরি
হেন দশা হবে কি আমার।
দুঁহু মুখ নিরখিব, দুঁহু অঙ্গ পরশিব,
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব দোঁহার গলে।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব দোঁহার বদনে।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন কবে পাব দরশন,
তাহা বিনে অন্য নাহি মনে॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু; অধমজনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
প্রভু মোরে কর দয়া, দেও মোরে পদ-ছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥"

যথা রাগ

হরি হরি আর কি এমন দশা হবে।
টাময়া বাঁধিবে চূড়া, নবগুঞ্জা তাহে বেড়া,
নানা ফুলে হার গাঁথি দিবে॥
পীতবসন অঙ্গে, পরাব সখীর সঙ্গে,
বদনে তাম্বুল দিব আর।
সেইরূপ মনোহারী, দেখিব নয়ন ভরি,
হেন কবে হইবে আমার॥
রতনের জাদ আনি, বাঁধিব বিচিত্র বেণী,
নানাফুলে চূড়ার টালনী।
হেন সাধ করে মন, সদা দেখি শ্রীচরণ,
এই মনে করি অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেয় মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস॥

এই সকল পদ দেখিয়া কেহ পুঁথিখানিকে পদাবলী গ্রন্থ মনে করিবেন না। প্রয়োজন মতে ভাব-স্ফুটনের অভিপ্রায়ে মধ্যে মধ্যে পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে অন্যের রচিত দুই একটি পদও উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ ব্যতীত নরোত্তম ঠাকুরের রচিত আরও অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' 'সাধন-ভক্তি-চন্দ্রিকা' 'হাটপত্তন' 'স্মরণ-মঙ্গল' ও 'প্রার্থনা' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত ৮০টি পদ একাল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আলোচ্য প্রতিলিপির শেষভাগে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি লিখিত আছে,—

"যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং। লেখকে নাস্তি দোষকং॥ ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমং হরিস্মরণ-মাত্রেণ সর্ব্ব দুঃখ নিরাপদ॥ স্বাক্ষর শ্রীকৃষ্ণমোহন দেবশর্ম্মা। ইতি সন ১২৪৭ ত্রিপুরা, তাং ৯ই ভাদ্র। শকাব্দা ১৭৫৯॥

কৃষ্ণমোহন দেবশর্ম্মা এই পুঁথির নকল করিয়াছেন। নকলকারীর পরিচয় বর্ত্তমান কালে পাওয়া অসম্ভব। ত্রিপুরা সন ব্যবহৃত হওয়ায়, রাজধানী আগরতলায় এই প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল। ১২৪৭ ত্রিপুরাব্দে ইহা লিখিত হইয়াছে, এখন ১৩২৩ ত্রিপুরাব্দ চলিয়াছে। সুতরাং এই প্রতিলিপি পঁচাত্তর বৎসরের পুরাতন জিনিস। লেখক নিশ্চয়ই কালের অনন্ত কুক্ষিতে লীন হইয়াছেন; কিন্তু পুঁথির কূট অক্ষর ও বর্ণাশুদ্ধির জন্য পাঠ উদ্ধার করা এতই কষ্টসাধ্য হইয়াছে যে, পরলোকগত লেখককে ধরিয়া আনিয়া তাহা পড়াইয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছিল।

পুঁথিখানা ছাপাইবার উপযুক্ত। ইহা আগরতলার যাদুগৃহে সযত্নে রক্ষা করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের কৃপাকটাক্ষপাতে এই কার্য্য অনায়াসেই সংসাধিত হইতে পারে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

আমেরিকায় হোমিওপ্যাথী-শিক্ষা

হোমিওপ্যাথী-শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া আমেরিকার নাম সর্ব্বত্র পরিচিত। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা সামুয়েল হানিমান্ জার্ম্মাণীতে হোমিওপ্যাথীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মহাত্মা হেরীং, লিপি প্রভৃতি চিকিৎসকগণ এই মহা সত্য আমেরিকায় প্রচার করিয়া ইতিহাসে এক নবীন যুগ আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য এই সভ্য দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহারাই এই দেশবাসীকে দেখাইয়াছিলেন যে, হোমিওপ্যাথীই একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপদ্ধতি।

হোমিওপ্যাথী-আবিষ্কারের পর বহু বর্ষ চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে বহু ছাত্র আমেরিকায় শিক্ষিত হইয়া এই মহা সত্য প্রচার করিতেছেন। আমেরিকা অযাচিতভাবে এই সত্যের শিক্ষা-দান করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বোষ্টন্ ইউনিভার্সিটি ভেষজ-বিদ্যালয়

হেরীং, লিপি প্রভৃতি মহাত্মগণ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia) সহরে একটি হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন; ইহাই আমেরিকার প্রথম হোমিওপ্যাথিক কলেজ। ক্রমে ক্রমে আমেরিকার বিভিন্ন অংশে বহু হোমিওপ্যাথিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। এই সমুদয় কলেজের উপর বহু ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে। অধুনা নিম্নলিখিত কলেজগুলি আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

১। Iowa state University, Homeopathic department, Iowa city, Iowa.

২। Boston University School of Medicine East concord, St. Boston. Mass.

৩। Michigan University Homeopathic department Ann Arbor, Michigan.

৪। The Hannemann Medical college and Hospital of Chicago, cottage grove ave, Chicago Ill.

(Illinois state universityর হোমিওপ্যাথিক বিভাগ হইবার সম্ভাবনা)।

৫। New York Homeopathic Medical College and Flower Hospital, New York. 63rd 64th st. N. Y.

৬। New York Medical College and Hospital for women, 17 19 w. 101 st st, New York

(New York state universityর অন্তর্গত)।

৭। Hahnemann Medical College and Hospital, Philadelphia 226 N. Broad st. Pa.

৮। Hahnemann Medical College and Hospital, of the Pacific, San Francisco, Cal.

৯। Kansas city university Hahnemann College and Hospital, 915-916 Tracy ave Kansas city, Mo.

১০। Clevland-pulte Medical college, 710 Huron Road, Clevland, Ohio.

(Ohio universityর সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনা)

ভারতবর্ষে আমেরিকায় শিক্ষিত চিকিৎসকগণের তত সুনাম নাই। আমেরিকা ভারতবর্ষের নিকট মিথ্যা উপাধি (Bogus degree) প্রদানের স্থান বলিয়া পরিচিত। ভারতবর্ষে একদিন একদল লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহারা আমেরিকার নামে মিথ্যা উপাধি গ্রহণ করিয়া আমেরিকার উজ্জল নামকে ভারতবর্ষে হেয় করিয়াছিলেন, সেদিন প্রায় চলিয়া গিয়াছে। এখন আর কাহারও নামের শেষে মিথ্যা M. D. উপাধি দেখা যায় না। আমেরিকায় শিক্ষিত চিকিৎসকগণ ভারত-সমক্ষে আমাদের প্রতিভা প্রকাশ করিয়া আমেরিকার দুর্নাম ঘুচাইতেছেন। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে গুণীর আদর করিতে সমর্থ হইতেছেন।

আমেরিকার পুর্ব্বোল্লিখিত কলেজগুলিতে প্রবেশ করিতে হইলে নিম্নলিখিত Preliminary education প্রয়োজন।

প্রথম দুই বৎসর কলেজ-শিক্ষা—অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট-স্থাপিত universityর intermediate পরীক্ষায় উত্তীর্ণদিগের শিক্ষা। বাদ বাকি সমুদয়গুলি আগামী বৎসর (১৯১৪ খৃঃ) হইতে একবৎসর কলেজে শিক্ষা—অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট-স্থাপিত universityর অন্তর্গত collegeএ প্রথম বৎসর (first year) সমুদয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণদিগের শিক্ষা।

আমাদের দেশের অনেক ছাত্র ভুল সংবাদ পাইয়া এখানে আসিয়া অত্যন্ত বিপদে পড়েন। যাঁহাদের preliminary education নাই, তাঁহাদের কলেজে ভর্ত্তির কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমাদের দেশের ২।১টি হোমিওপ্যাথিক স্কুল বা কলেজ তাঁহাদের credit এবং certificate এখানে গ্রাহ্য হয় বলিয়া ছাত্রগণের ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেন। কএকটি ছাত্রকে এই লইয়া বিপদেও পড়িতে হইয়াছে। এখানে কোথাও হোমিওপ্যাথিক কলেজ বা স্কুলের certificate গ্রাহ্য হয় না। গত কএক বৎসর এখানে Campbell স্কুল এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট-স্থাপিত ঐ শ্রেণীর স্কুলের certificate কোন কোন কলেজে গ্রাহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এই বৎসর হইতে নিয়ম হইয়াছে যে, ইঁহারা-ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট-স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মেডিকেল কলেজ ব্যতীত অন্য কোন কলেজ বা স্কুলের certificate গ্রাহ্য করিবেন না। ইঁহারা ২।১ টি ভারতবর্ষীয় ছাত্রের প্রতারণায় এখন অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। পুর্ব্বলিখিত স্বর্ত্ত সমুদয় পুরণ না করিলে এখানে কোন কলেজে প্রবেশের উপায় নাই।

এখানে সেপ্টেম্বর মাসে কলেজ আরম্ভ হয়। প্রায় সমুদয় মেডিক্যাল কলেজে চারি বৎসর পড়িতে হয়। আগামী বৎসর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে অনেক কলেজ, তাঁহাদের পাঁচ বৎসর জন্য পাঠের ব্যবস্থা করিতেছিল।

ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়রলণ্ডে ৫।৬ বৎসর ধরিয়া যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে,তাহাই বেলা ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া ৪ বৎসরে সমাপ্ত করা হয়।

অনেকের ভুল ধারণা যে, এখানে হোমিওপ্যাথিক কলেজে একমাত্র হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগেরই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে Allopathic collegeএর সহিত Homeopathic collegeএর কোন তফাৎ নাই। হোমিওপ্যাথিক কলেজে হোমিওপ্যাথিক Materia Medica এবং Therapeutics এবং আলোপ্যাথিক কলেজে আলোপ্যাথিক Materia Medica এবং Therapeutics শিক্ষা দেওয়া হয়। উভয় কলেজেই Anatomy, Physiology, Chemistry, Embryology, Bacteriology, Pathology, Surgery, Obstetrics, Gynecology, প্রভৃতি সমান ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথিক অস্ত্রচিকিৎসক (surgeon) বিরল। এখানে বহু প্রধান অস্ত্রচিকিৎসকই হোমিওপ্যাথ Dr. Drett যিনি orificial surgery আবিষ্কার করিয়া অস্ত্রচিকিৎসকগণের মহোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন তিনি Chicago Hahnemann Medical collegeএর ছাত্র, হোমিওপ্যাথির ভক্ত, এবং Chicagoর হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহার বাৎসরিক দাতব্য চিকিৎসা (free clinic) দেখিবার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্র Medical centre
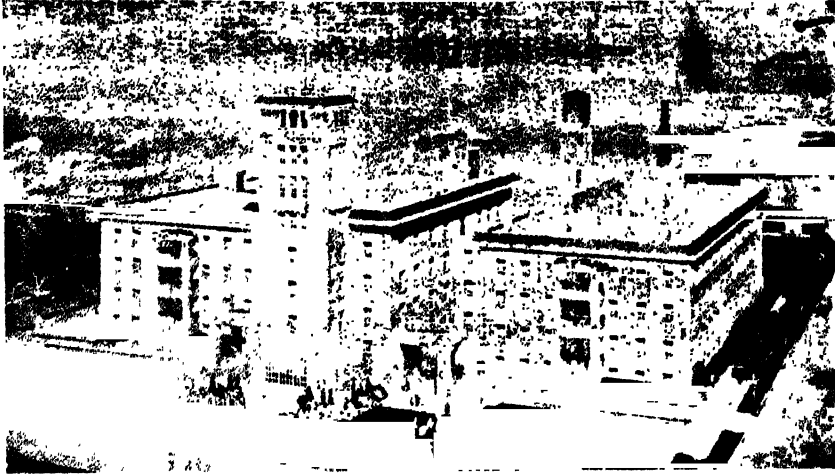
চিকাগো হানিমান কলেজ-সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল

হইতে বহু বিচিত্র চিকিৎসকের সম্মিলন হইয়া থাকে।

এখানে বর্ত্তমান প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের নাম সর্ব্বত্র পরিচিত। ডাক্তার ন্যাশ তাঁহার হোমিও-প্যাথিক গ্রন্থসমুদয় প্রকাশ করিয়া নিজ প্রতিভা-বলে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছেন। ডাক্তার কেণ্ট তাঁহার হোমিওপ্যাথিক রেপোরটারা প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা সর্ব্বত্র পরিচিত। দীর্ঘকাল সিকাগোর হোমিওপ্যাথিক কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বৃদ্ধ বয়সে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বিখ্যাত ডাক্তার কাউপারস্ওয়েট সিকাগো হানিমান কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুলেখক ডাক্তার বরিক San Fransisco Hahnemann Collegeর সহিত দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট। ডাক্তার Dewey মিচিগান University র হোমিওপ্যাথিক বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট, ইঁহার ভারতবর্ষের বেশ সুনাম আছে। উদীয়মান চিকিৎসক-গণের মধ্যে ডাক্তার Copland, Tompagen, J. H. Allen, Boger, Rabe প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বর্গগত ডাক্তার H. C. Allenএর নাম সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি ভারতবর্ষীয়গণের অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয়ে নিম্নে সংক্ষেপে একটি হোমিও কলেজের schedule দিলাম।

প্রথম বৎসর (Freshman year)	ঘণ্টা
Anatomy, Histology, Embryology	৮২৮
Organic and inorganic Chemistry	২০০
Physiology	১৮০
Materia Medica and Pharmacy	৩৬
Philosophy	১৮
Biology	৩৬
২য় বৎসর	ঘণ্টা
(Sophmore year)	
Anatomy	১৬২
Physiology	১৪৪
Physiological chemistry	১৮০
Materia Medica and Pharmacology	৭২
Bacteriology	১৮০
Pathology	৩২৪
Hygiene	৭২
Physical diagnosis	৩৬
৩য় এবং ৪র্থ বৎসর	
(Junior and senior year)	
Materia Medica	৫৭৮
Theory and practice	৫০৮
Surgery	৮০৬
Obstetrics	১৮০
Eye, ear, nox, and throat	২১০
Medical Jurisprudence	৮০

Gyneology	২১৬
Therapeutics including electrical	১৩২
Dermatology (alone)	৫৪
Clinical Microscopy and autopsy	৯০
Toscicology	৩৬

প্রথম দুই বৎসর প্রত্যেক বিষয়ের (subject) সহিত laboratory work করিতে হয়। এ দেশের laboratory গুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। Practical এবং theoretical শিক্ষার এরূপ সুবিধা অন্য দেশে খুব কমই দেখা যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে theoretical (didactic) পাঠের সহিত clinic, হাঁসপাতাল, এবং laboratoryর সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। প্রত্যেক কলেজের সংলগ্ন একটি নিজস্ব হাঁসপাতাল আছে। ইহাতে প্রায় ২০০।৩০০ স্থান (bed) আছে। ছাত্রগণ এই সমুদয় রোগীর পরীক্ষা দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করেন। কলেজের নিজস্ব হাঁসপাতাল ব্যতীত আরও অনেক হাঁসপাতালে ছাত্রগণকে যাইতে হয়।

New York Metropolitan hospital পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল। ইহাতে ২৮৯০ হাজার রোগীর স্থান আছে, এবং ইঁহারা আরও ২০০০ স্থান বাড়াইতেছেন। এখানে সর্ব্বত্র ষ্টেটহাঁসপাতালে সমান Allopathic এবং হোমিওপ্যাথিক স্থান (bed) আছে। হাঁসপাতালের চিকিৎসকগণের মধ্যে Allopath ও হোমিওপ্যাথ উভয়ই সমানভাবে আছেন। আমেরিকার প্রত্যেক ৬৪০ জন লোকের প্রতি ১জন Allopathic এবং প্রত্যেক ৫৩৩৩ জন লোকের প্রতি ১ জন Homeopathic ডাক্তার আছেন।

এখানে কোন ছাত্রের কিছু না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া পাশ করিবার উপায় নাই। প্রত্যহ ক্লাসে এবং laboratoryতে প্রশ্নোত্তর করিতে হয়। ইঁহারা ছাত্রকে যথার্থ শিখাইতে চান। পরীক্ষায় ফেল করাই ইহাদের উদ্দেশ্য নয়। ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ এখানে যথেষ্ট সমাদর পাইয়া থাকেন। আমি বহু শিক্ষকের নিকট বহু ভারতবর্ষীয় ছাত্রের সুখ্যাতি শুনিয়াছি।

এখানে অধিকাংশ কলেজেই ছাত্র এবং ছাত্রীর সমান
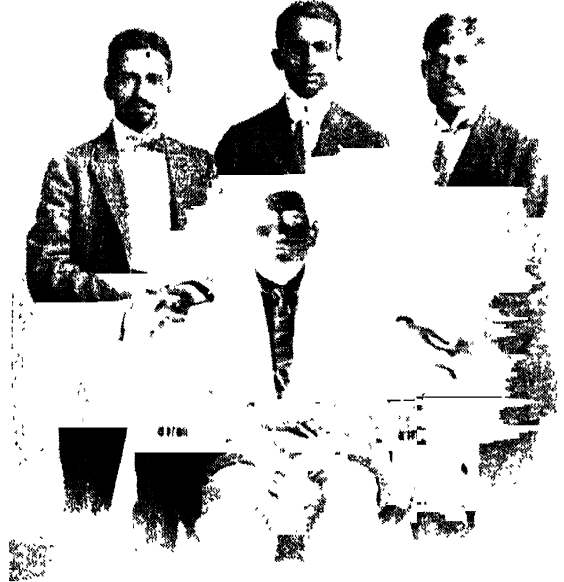
আমেরিকা প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্র চতুষ্টয়।

ভাবে প্রবেশ অধিকার আছে। Newyorkএ ছাত্রীগণের জন্যও একটি স্বতন্ত্র কলেজ আছে।

ছাত্রদের এখানে স্বাবলম্বী হওয়া অসম্ভব না হইলেও কষ্টকর। প্রাতঃকাল ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত কলেজে হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর বাড়ীতে সমুদয় পাঠ প্রস্তুত করিয়া ভীষণ শীতে এই তুষারাবৃত দেশে যে কোন কার্য্য করা অসম্ভব তাহা বলা বাহুল্য। তবে গ্রীষ্মের ছুটীতে কার্য্যের সুবিধা হইয়া থাকে। আমার কএক জন ভারতবর্ষীয় (Medical student) বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া নিম্নে ছাত্রের একটি খরচের হিসাব দিলাম।

Boarding, lodging, and incidental expenses (monthly) 25 to 30 dollars (১ ডলার আমাদের দেশীয় প্রায় ৩৲ টাকা)

Books (yearly)	20 to 30 dollars
Dress (yearly)	30 to 40 dollars.

খরচ পত্র ছাত্রের রুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এখানে কলেজের মাহিনা প্রতি বৎসর প্রায় ১২৫ডলার হইতে ১৭৫ ডলার পর্য্যন্ত। কোন কোন State universityতে কিছু কম। যিনি কোন সংবাদ জানিতে চান, তিনি সেই কলেজের Registrarকে সমুদয় খুলিয়া লিখিলে উত্তর পাইবেন। পত্রে কাহার কোন universityর কি কি credit আছে লেখাই বাঞ্ছনীয়। এখানে নিম্নলিখিত ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণও আনন্দের সহিত অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহাদের কলেজের ঠিকানায় পত্র লেখাই প্রয়োজন। আমেরিকায় বর্ত্তমান ছাত্রগণ নিম্নলিখিত ভারতবর্ষীয় হোমিওপ্যাথী পড়িতেছেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ—Iowa state University Homeopathic department (senior year)

বিজয়কুমার বসু—Kansas city University Hahnemann senior year) college & hospital.

গিরীন্দ্রনাথ ওদেদার—　　　　(senior year)

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(Freshman year)

পশুপতি শর্ম্মা—(Sophmore year) Hahnemann medical college and hospital, Chicago.

আমেরিকায় অধিকাংশ ছাত্রই দেশভক্তি ও democratic spirit এই স্বাধীন দেশবাসীর নিকট শিক্ষা করেন। তাঁহাদের ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসা সকলের নিকট আদর্শ। ভারতবর্ষ হইতে বহু শিক্ষিত ছাত্রের আমেরিকায় আসা প্রয়োজন। আমেরিকাই নিস্বার্থভাবে ভারতবর্ষকে শিক্ষা দিতেছেন।

শ্রীপশুপতি শর্ম্মা।

সার্থকতা

যে পবনে ফুটে আঁখি প্রসূন-কলির,
সেই বায়ুভরে পুনঃ পড়ে সে ঝরিয়া;
যে তপন-করে হাসে প্রভাত-শিশির,
তাহে ধীরে ধীরে সে-ই যায়হে মিশিয়া;
তেমনি লো প্রিয়তম, তোমারি প্রভায়,
বিকশিয়া উঠিয়াছি উজ্জ্বল, নবীন;
তোমারি প্রীতির মাঝে—এ মধু-জ্যোৎস্নায়—
আনন্দ-বুদ্বুদ সম হইতে বিলীন!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

য়ূরোপে তিনমাস

এ সকল কথার বিশেষ অবতারণার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কাহারও কাহারও সন্দেহের সম্ভাবনা বলিয়া দুই একটা কৈফিয়তের প্রয়োজন। বিলাতে গিয়া যাঁহারা ভাল সমাজে মিশিবার সুবিধা ও অবকাশ পাইয়াছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ও ঘোষণা করিবেন যে, ভদ্র ইংরেজের —কি স্ত্রী কি পুরুষ—অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গীনভদ্রতা সর্ব্বত্র সহজে দেখা যায় না। সামাজিক ভদ্রতায় আচার-ব্যবহারে আতিথ্যে এ শ্রেণীর লোককে পরাস্ত করা আয়াসসাধ্য। ভারতবাসীর আতিথেয়তা সর্ব্বত্র চির-প্রসিদ্ধ। কিন্তু যথাস্থানে ইংরেজি আতিথেয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবাসীরও তাঁহাদের নিকটে এ বিষয়ে শিখিবার অনেক জিনিস আছে। কিন্তু শিখিবার সুযোগ সুবিধা ত ক্রমশঃ কম হইয়া আসিতেছে; ইহা উভয় সমাজের দুর্ভাগ্য, লোক-সাধারণের দুর্ভাগ্য এবং শাসনকর্ত্তা-দিগের ও শাসন-প্রণালীর দুর্ভাগ্য। পরস্পর যথেষ্ট জানাশুনা মেশামিশির সুবিধা না হইলে পরস্পরের সহিত যথেষ্ট বোঝাপড়া কঠিন এবং যথার্থ সহানুভূতির সৃষ্টি অসম্ভব। শুধু বক্তৃতা ও রেজোলিউশনে সহানুভূতির আধিক্যে মঙ্গল অপেক্ষা অধিক মন্দফল হইতেছে। কারণ খাঁটি জিনিসের অভাব ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যথার্থ উচ্চশ্রেণীর সহৃদয় ইংরেজ এদেশে আসিয়া সার সত্যের আলোচনা অনুধাবনা করিলে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে অনেক কুজ্ঝটিকা কাটিয়া যায় এবং সহৃদয় ভারতবাসী বিলাতে গিয়া সেই শ্রেণীর লোকের সহিত সমমর্য্যাদায় মেশামিশি করিলেও তাহাদের ধারণা কাটিয়া আসে যে ভারতবর্ষে বম্ব, কেউটে, কলেরা, বাঘ ও প্লেগ ছাড়া আরও গ্রহণীয় বস্তু আছে।

এভাবে মেশামিশির প্রয়োজন যত বাড়িতেছে সুবিধা তত কমিতেছে। ইহা যথার্থ উন্নতির প্রধান বিঘ্ন। কিসে এ অন্তরায়ের তিরোধান হইতে পারে তাহার চিন্তা ও উপায় উদ্ভাবন ভাবুক ভারতপ্রেমিক মাত্রের প্রথম কর্ত্তব্য। অনেকে বিলাতে যান অথবা ভারতবর্ষে আসেন যাঁহাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন বা অধিকার নাই। সে যাওয়া আসায় কুফল বই সুফল অসম্ভব। আবার অনেকের যাওয়া এবং আসা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহাদের ও আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিতেছে না। শাগ্র ঘটিবে বলিয়াও বোধ হয় না। অতএব যাঁহারা যান কিংবা আসেন তাঁহাদের কর্ত্তব্যভার গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। সেই গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র ইঙ্গিত করা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য। বিলাতযাত্রী ও বিলাতবাসী ভারতবাসী বিদেশী-মাত্রেরই নিকট ভারতমাতার প্রতিনিধি ও দূতস্বরূপ তাহাদের ব্যবহার সুনাম কুনামের উপর মাতার সুনাম কুনাম কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। ভারতপ্রবাসী ইংরেজগণ মাত্রের সম্বন্ধেও একথা সম্পূর্ণরূপে খাটে। একজন উদ্ধত দুশ্চরিত্র ও দুর্ব্বিনীত ইংরেজ সমগ্র জাতির ও শাসনতন্ত্রের কি ভয়ানক অযশ ও ক্ষতি করে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিলে তাহাদের সাবধান হইবার সম্ভাবনা থাকিত এবং তাহাদের প্রতি সময়ে সময়ে কখন যে অযথা সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইত তাহারও হ্রাস হইত।

কলিকাতা হইতে বম্বের পথ, বম্বে হইতে মার্সেলেসের পথ, মার্সেলেস্ হইতে লণ্ডনের পথ নিপুণ সাহিত্য-শিল্পিগণ বহুবার বর্ণনা করিয়াছেন। নূতন বলিবার কথা বড়ই কম। তবে সকলের চক্ষে সকল জিনিস সমানভাবে লাগে না। এই রূপান্তর প্রকারান্তরের তারতম্য অনুসারে দুইচারি কথা যাহা মনে হইয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। সমান নম্বরের চশমা যাঁহারা ব্যবহার করেন কাহারও কাহারও চক্ষে দুই একটা কথা একভাবে লাগিতে পারে। ভিন্ন নম্বর চশমা ব্যবহারীর সহিত দৃষ্টি-সামঞ্জস্য-প্রয়াস বৃথা।

"চাটুয্যে মহাশয়" আমার সহিত দেখা করিতে বেনারস হইতে মোগলসরাই আসিয়াছিলেন। কাশীধামের অন্যান্য বন্ধুবর্গও বিদায় দিবার জন্য সদলে মোগলসরাই পর্য্যন্ত কষ্ট করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা পরম আনন্দ ও শ্লাঘার কথা।

সর্ব্বদেবতার নির্ম্মাল্য ও আশীর্ব্বাদ লইয়া চাটুয্যে মহাশয় আসিয়াছিলেন, পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সান্যাল মহাশয়, যিনি সেবারাম কাশীকিঙ্কর নামগ্রহণ করিয়া কাশীধামে গৃহস্থ সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ হইয়া বাস করিতেছেন, যাঁহার গভীর ধর্ম্মানুরাগ আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অপূর্ব্ব বক্তৃতাশক্তি ভক্তগণের ভক্তি আকর্ষণ

ইংরাজ রাজ-দূত শার্লি

—১৬২৭ খৃষ্টাব্দে পারস্যে শা আব্বাসের দরবারে প্রেরিত—

(তুর্কী চিত্রশিল্পী তারুবীবেগের অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে)

The Emerald Ptg. Works, Calcutta.

করে তিনি চাটুর্য্যে মহাশয়ের দ্বারা স্বহস্ত-লিখিত অশীর্ব্বাদ-পত্র পাঠাইয়াছেন। খুকীর কথায়, খুকীর অগণন আত্মীয়-আত্মীয়ার কথায় গতিশীল রেলগাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। জগৎ খুকীময়—খুকীর আত্মীয়া আত্মীয়ময় হইয়া উঠিল; মনে হইল কঠোর কর্ত্তব্য-অনুরোধে এই সৌন্দর্য্য, এই শান্তি ছাড়িয়া যাইতেছি। ভগবৎকৃপায় যখন আবার ইহাদের মধ্যে স্থান পাইব তখন পুনরায় শান্তিলাভ হইবে।

চটিজুতা ধুতি পরা বিলাত-যাত্রীর সহিত কাশীর "দাড়ি বাবার" সোৎসাহ কথার কলকল ধ্বনিতে গাড়ী পূর্ণ করাতে সমভিব্যাহারী কাপ্তেন সাহেব কি মনে করিতে লাগিলেন জানি না। তবে রাজা মাধোলালের কর্ম্মচারীর সহিত এই ধুতি-চটিজুতা-পরিহিত অপূর্ব্ব-দর্শন জীবটি ইংরেজিতে কথাবার্ত্তা কহাতে কাপ্তেন একটু "চেঁচিয়ে চাহিলেন"; এবং তারপরে গরম হাওয়া ইলেকট্রিক পাখা ইত্যাদি খরতর প্রসঙ্গ লইয়া প্রথমতঃ কথা বলিয়া আলাপ চলিল। সকল সাহেব সমান নয়। মধ্যে মধ্যে এক একজন বেশ ভাল দেখা যায়। এ লোকটিও তাই সমস্ত দিনই তাঁহার বাইবেল পাঠ প্রার্থনা ও আরাধনাতে কাটিল। পরদিন বম্বে প্রেসিডেন্সীর একটি বিপরীত দৃশ্য দেখিলাম। সে কথা এখানে শেষ করিয়া রাখি। দুইজন রেলের বড় কর্ম্মচারী আমাদের গাড়ী আক্রমণ করিলেন। মিস্ চক্রবর্ত্তী—ইঁহার কথা পরে লিখিব—ভয়ে ও খাতিরে ধুতি ছাড়িয়া প্যাণ্টুলন পরিয়াছিলাম; তাই এই বিপদ ঘটিল। নতুবা ধুতিপরা কুলী গাড়ীতে দেখিলে এই সাহেব পুঙ্গবেরা গাড়ীতে পদার্পণ করিতেন না; সাহেবদের একজন বিবাহ করিতে বিলাতে যাইতেছিলেন। বিস্তর দেশীয় কর্ম্মচারী মঙ্গল-কামনা করিতে সেইখানে আসিয়াছিলেন। মালা,তোড়া নমস্কারের আদানপ্রদান খুব ধুমধামের সহিত হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিবার পর আলাপপরিচয় স্থলে আমিও মঙ্গল-কামনা প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় সাহেব অবতারদ্বয় রেলগাড়ী ষ্টেশন ছাড়িবার এক মিনিট পরেই ঘৃণা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সহিত মালা তোড়া ও সোণার তারে বিজড়িত মঙ্গল চিহ্ন সকল দ্রুত নিক্ষেপ করিয়া একবারে গাড়ীর বাহির করিয়াদিলেন। মনে হইল সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আমার দেশকে, আমার আত্মীয়গণকেও যেন নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহা ত নয়। শীঘ্র পুনরায় এই দেশের অন্নে প্রতিপালিত হইতেই ফিরিয়া আসিবেন। এই সকল নরাকার বর্ব্বরগণের দোষেই দেশীয় ও ইংরেজগণের মধ্যে সদ্ভাব হয় না; রাজরাজেশ্বর বক্তৃতায় সহানুভূতির ও আশার অনেক কথা কহিয়াছেন কিন্তু পথে ঘাটে এই সকল দুর্দ্দান্তের দমন না হইলে সাধারণের মনে আসল কথা বসিবে না।

এক্ষণে আসল কথা ছাড়িয়া আমরা অনেক দূর আসিয়াছি। চাটুর্য্যে মহাশয়কে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের জন্য তাঁহার পরিচয় এখানে দিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা না জানেন তাঁহাদিগকেও পরিচয় দিবার প্রয়োজনেও কোন ফল নাই। তিনি বহুদিন কাশীবাস করিতেছেন। ৮২ বৎসর বয়সেও বালকের সরলতা, যুবার অদম্য উৎসাহ ইঁহাতে বর্ত্তমান। দুই বৎসর হইল পদব্রজে কেদারনাথ দর্শন করিয়া গত বৎসর নেপালের পশুপতিনাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আমাদের বংশের ও পরিবারের চিরহিতৈষী,পিতার অকৃত্রিম আজন্ম-সুহৃদ চাটুর্য্যে মহাশয়কে না দেখিয়া গেলে বিলাত যাত্রার বিদায়-আশীর্ব্বাদ সম্পূর্ণ হইত না বলিয়া মোগোল-সরাই পথে আবার বম্বে যাত্রা করিলাম। সম্পদে বিপদে পিতার অভিন্ন-সুহৃৎ শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দেখা না করিয়া গেলে তিনি বম্বে যাইয়া দেখা করিতেও প্রস্তুত ছিলেন, সুখ দুঃখ সম্মান-অসম্মান,সমভাবে ভোগ করিয়াছেন। পিতার পত্রগুলি বেদ পুরাণের ন্যায় যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছেন। পিতৃত্যক্ত একগাছা লাঠী আমায় দিয়াছেন—তাহা আমার বিলাতের সহযাত্রী। আমাদের বিবাহে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে সুখ দুঃখের কোন কাজে চাটুর্য্যে মহাশয় উপস্থিত না থাকিলে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। পিতার শেষমুহূর্ত্তে নিজের হৃদয়ের উত্তেজনায় চিঠি টেলিগ্রামের অপেক্ষা না করিয়া আমাদের পূর্ব্বে মধুপুরে পিতার শেষ শয্যার শিওরে তিনি ছিলেন; শ্মশানে তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, মধুপুরের শ্মশান ঘাট-নির্ম্মাণে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। চাটুর্য্যে মহাশয়ের আগ্রহ এবং উৎসাহে মধুপুর আমাদের তীর্থ হইয়াছে। আমার বিদেশ অবস্থানকালে পরিবারবর্গকে লইয়া সান্ত্বনা

দিয়াছিলেন চাটুর্য্যে মহাশয়। সেই চাটুর্য্যে মহাশয় আমার বিলাত-যাত্রার একটা প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আশীর্ব্বাদক। আমি বেঙ্গল নাগপুর পথে যাইলে দেখা হইবে না,এই চিন্তার কএক সপ্তাহ তিনি অত্যন্ত চিন্তান্বিত ছিলেন। অতএব তাঁহাকে দেখিতে ও দেখা দিতে মোগল সরাই পথে আসিতে হইয়াছে। সেস্থলে দুই চারি কথা কহিয়া আশা মিটিবে না বলিয়া স্বয়ং টাকা খরচ করিয়া মৃজাপুর পর্য্যন্ত মেল গাড়ীতে কথা কহিবার অনুরোধে টিকিট খরিদ করিয়াছিলেন। পরে টিকিটের দামটি আমি দেওয়াতে যেন তাঁহার কষ্ট বোধ হইল। যেন তাঁহার সব সুখটা নিজের হইল না বলিয়াগ্লানি বোধ হইল। ভাবিলাম এই সকল সুখ-স্নেহের মধ্যে আবার কত দিনে ফিরিব?

মৃজাপুর পৌছিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। চাটুর্য্যে মহাশয়কে নানা পরিচয়ের সহস্রাংশের এক অংশ দিবার পূর্ব্বে গাড়ী মৃজাপুরে পৌছিল; তখন কাতর-নয়নে চাটুর্য্যে মহাশয় বিদায় লইলেন।

সৌভাগ্যক্রমে—এখন দুর্ভাগ্য বলিব না—তখন গরম খুব পড়িয়াছে। ক্যাপ্তেন রোজের অনুমতি লইয়া সব জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া অন্তঃ-প্রেক্ষণের সুবিধা ও অবকাশ পাইলাম। আকাশ পাতাল পৃথিবী সব চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল। খুকীর রাজ্য, খুকীর জগৎ, খুকীর অধিকার সর্ব্বত্র বিস্তৃত। শুনিয়াছিলাম কোন বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি এই অবস্থায় পড়িয়া দ্বিতীয় বিলাত-যাত্রার অকাল-মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। সেটা তাঁহার প্রথম যাত্রা বলিয়াই জানা ছিল। সম্প্রতি তাঁহার আত্মকাহিনীতে দেখিয়াছি সেটা প্রথম নয় দ্বিতীয় যাত্রা। যে দিন আমার আত্মীয়ের সহিত বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে শেষ দেখা হয়, তিনি আধ রাগ আধ স্নেহস্বরে বলিয়াছিলেন, "তুই বাবু বম্বে হইতেই ফিরিয়া আসিস্।" কলিকাতায় সকলকে ভয় দেখাইয়া ধমক দিয়া কএকদিন ধরিয়া যে বাঁধ দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেম গৃহত্যাগী বৈরাগী সন্ন্যাসী কাশীবাসী পিতৃবন্ধু সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া পলায়ন করিলেন।

গরম ক্রমশঃ যাহা বাড়িতে লাগিল তাহা বলিবার নয়। ইলেট্রিক পাখা দুইখানা যেন অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। আবার একখানা বন্ধ হইয়া গেল। ক্যাপ্তেন সাহেব ও আমি ধরাধরি করিয়া কাঁচির সাহায্যে মেরামত করিলাম। এরূপ আত্মনির্ভর বহুদিন করিবার প্রয়োজন হয় নাই। সময়ে সময়ে দারুণ অগ্নি-উদ্গীরণ নিবারণ করিবার জন্য পাখা বন্ধ করিতে হইল। বহুকাল যে বরফ স্পর্শ করি নাই, দুইবার তাহা আনিতে হইল; সন্ধ্যার পর গরম আরও বাড়িল। জানালা খুলিয়া দিয়াও পরিত্রাণ নাই। ধূলা ও কয়লার অত্যাচারে তাহাও বন্ধ করিতে হইল।

বাতগ্রস্ত পায়ে রেশমের রুমাল বাঁধিয়া ছিলাম বলিয়া তাহা ফেলিয়া দিতে হইল। নিদ্রার নাম ত নাই; সাহেব কিন্তু অকাতরে ঘুমাইতেছে। বাতি নিবাইয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়া পূর্ণ মাত্রায় বাঙ্গালী হওয়ার সুবিধা হইল তাই রক্ষা, সাহেবটিকে যা বলিতেছি তাহাই করিতেছে। মাটির কুঁজার জল বরফের অপেক্ষাও শীতল। আহারের মধ্যে সন্দেশ ফল যতক্ষণ চলে ততক্ষণ চালাইলাম।

সন্ধ্যার সময় জব্বলপুরে গাড়ী পৌছিল। বাহির হইতে সহরের বড় পারিপাট্য দেখিলাম।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

বাণী-বন্দনা

জয় কুন্দ-ধবল-দল শ্রীচরণ পরিমল
স্নিগ্ধ অতলতল মানস তব ;
জয় সুন্দর লোচন বিশ্ব-মানব-মন
মোহিত ঝঙ্কৃত বীণার রব ।
জয় মরাল-মৃণাল-দল বেষ্টিত পদতল
পুস্তক-ধৃত-কর নমামি বাণি !
জয় কবিগণবন্দিতা, বাদয় মধু বীণা
বিশ্ব-বিশোভিতা বীণাপাণি !

জয় শ্বেতভুজ আসীনা বাদয় মধু বীণা
প্রসাদ দেহি, এ ভকতগণে ;
জয় মধুকর মুখরিত পল্লব দল-গীত
আহৃত ধরাতলে কমল বনে ।
জয় পুণ্য-আশীষ রাশি কলুষ কালিমা নাশি
শুভ্র বদনে হাসি বিশ্বজনে ;
জয় দীন-ভকত প্রাণে সম্পদ-বারি দানে
ধন্য জনম মম পরম ধনে ।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় ।

দোঁহা

তুমি

১

তুমি ছিলে, বিশ্ব ছিল স্বজন-আগার,
তুমি বিনা জগতের সব নিরাকার ।

২

তুমি ছিলে, চিত্ত ছিল গীতে ভরপুর,
তুমি বিনা বাজেনা ক জীবনের সুর ।

৩

তুমি ছিলে বসুধার সবটুকু ভরি,
তুমি গেছ ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ খালি করি ।

তুমি ছিলে আনন্দের অনন্ত নির্ঝর,
তুমি গেছ থামিয়াছে সুধা কলস্বর

৫

তুমি ছিলে নেত্রপথে ভাস্কর আলোক,
তুমি-হারা হৃদয়ের অন্ধকার শোক ।

৬

তুমি ছিলে প্রাণময় আশ্বাস বচন,
তুমি-হারা ভূলোকের সুধুই ক্রন্দন ।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত Cape Colonyতে সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। তথাকায় জল বায়ু কিন্তু য়ুরোপীয়দিগের অনুকূল না হওয়ায়, এবং আদিমবাসীদিগের সহিত ক্রমাগত সংঘর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের কতকগুলি সভ্য, আফ্রিকাতে যাহাতে আর নূতন ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপন না হয়, এই মর্ম্মে পার্লিয়ামেণ্টে প্রস্তাব উত্থাপন করেন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে আজ আফ্রিকার প্রায় প্রত্যেক স্থান য়ুরোপের প্রভাবে কিংবা অধীনে অবস্থিত। এই সময় কেপকলনিতে কাফ্রী ও ওলন্দাজদিগের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ ও বিবাদ চলিতেছিল। বর্ত্তমান বুয়ার জাতি এই ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকগণের বংশ-সম্ভূত। কাফ্রী ও বুয়ারদিগের বিবাদের প্রধান কারণ,—ইংরেজগণ কেপকলোনির রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সমস্ত ঔপনিবেশিকগণকে সমান রাজনীতিক অধিকার দান করিলেন; কিন্তু ইংরেজের এই সাম্যনীতি বুয়ারগণ মোটেই পছন্দ করিলেন না; তাঁহারা সর্ব্বদা কাফ্রীদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে চান। অতএব ইংরেজদিগের এই উদার শাসননীতিতে বিরক্ত হইয়া কেপকলোনির বুয়ারগণ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নিজেদের জিনিসপত্র সহ উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন, এবং নেটাল ও Orange River Free State নামক দুইটি উপনিবেশ স্থাপন করিলেন; কিন্তু ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সৈন্য নেটালে প্রবেশ লাভ করিয়া নেটালকে ইংরেজশাসনের অধীনস্থ করিয়া লয়। নেটাল হস্তচ্যুত হইলে বুয়ারগণ পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া Vaal এবং Limpopo নদীর মধ্যস্থিত Transvaal এ নূতন উপনিবেশ স্থাপন করেন। যাহা হউক কিমবারলিতে (Kimberley) হীরকখনি ও ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভালে প্রচুর স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় বিদেশ হইতে, বিশেষতঃ ইংলণ্ড হইতে, অসংখ্য ব্যবসায়ী এই সকল উপনিবেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই অযাচিত আগমন বুয়ারগণ মোটেই পছন্দ করিলেন না। তাহার কারণ—প্রথমতঃ, তাঁহারা কোন বিদেশীকে এই প্রচুর স্বর্ণ ও হীরকের ভাগ দিতে রাজী ছিলেন না; দ্বিতীয়তঃ, কাফ্রীদিগকে তাঁহারা যে অন্যায় ও নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করিতেছেন তাহা যেন বিদেশীরা না জানিতে পারে। এই সময়ে (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে) ট্রান্সভালের আর্থিক ও রাজনীতিক অবস্থা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল : বিশেষতঃ জুলুরাজ Cetewayoর সহিত ক্রমাগত যুদ্ধে অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়াছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ট্রান্সভাল সুশাসনের জন্য ইংরাজরাজ উক্ত রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন। ইংরেজের এই হস্তক্ষেপে অসন্তুষ্ট হইয়া বুয়ারগণ Kruger এবং Joubertকে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন; কিন্তু তাঁহারা ইংলণ্ডে কোন সুব্যবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। বুয়ারদিগের আশা তখন ফলবতী না হইলেও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে তাহারা ইংলণ্ডের নিকট হইতে স্বায়ত্ব শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ইহার কএক বৎসর পরে তাঁহাদিগকে এমন কতকগুলি শাসনক্ষমতা দেওয়া হয় যাহাতে বুয়ারগণ নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীনজাতি বলিয়া বিবেচিত করেন। এই সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বুয়ারগণ পুনরায় বিদেশীদিগের উপর (বুয়ারগণ ইংরেজদিগকেও 'বিদেশী' বলিয়া অভিহিত করিত) অন্যায় আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা বিদেশীয়ের নিকট হইতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহাদের উপর বেশী শুল্ক ধার্য্য করিলেন। এইরূপ বুয়ার ও বিদেশীদিগের মধ্যে বিবাদ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে বিখ্যাত হীরক বণিক Cecil Rhodes এর প্রযত্নে ইংরেজরাজ বিদেশীয়দিগের—বিশেষতঃ ইংরেজ ও ভারতীয় বিদেশীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া বুয়ারদিগের অন্যায় আইনগুলি উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। ইংরেজরাজের এই চেষ্টা যখন বিফল হইল, তখন বিদেশীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার ও অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা হইল।

বুয়ার যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর কেপকলোনি, নেটাল, অরেঞ্জিয়া, ও ট্রান্সভাল লইয়া বুয়ার ও ইংরেজ সম্মিলিত South African Government স্থাপিত হইল। দক্ষিণ

আফ্রিকার ইংরেজগণ বিদেশীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া যেরূপ ন্যায়বিচারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন তাহাতে আশা হইয়াছিল যে, স্বায়ত্ব-শাসন স্থাপন হইবার পর ভারতীয় প্রজাবৃন্দেরা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে। কিন্তু বুয়ারদিগের স্বার্থপরতায় ভারতীয়দিগের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। কিন্তু সুখের বিষয় নিপীড়িত ভারতবাসীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া আমাদের মহানুভব লর্ড হার্ডিঞ্জ যেরূপ আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, * এবং বিলাতে Lord Ampthil-প্রমুখ সহৃদয় ইংরাজগণ যেরূপ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ আফ্রিকার এই বিষম বর্ণ-সমস্যার সমাধান হইবে।

আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় উপনিবেশ সংস্থাপনের বিবরণ প্রদান করিব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় সকল প্রদেশেই স্বর্ণ,

মিঃ গান্ধীর অন্যতম সহচর মিঃ এচ্, এস্, এল্, পোলাক্।

হীরক, ও কয়লার খনি আছে এবং চায় ও আকের খেতও অনেক আছে। এই সকল ব্যবসা বাণিজ্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য অনেক মজুরের আবশ্যক। য়ুরোপ হইতে মজুর আনিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করা এক প্রকার অসম্ভব; কারণ য়ুরোপীয় মজুরদের থাকিবার খরচ অন্যদেশীয় মজুর অপেক্ষা অনেক বেশী; এই জন্য ব্যবসায়ে লাভবান হইবার আশা কম, এবং সেখানকার জল বায়ু য়ুরোপীয় স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। এইজন্য প্রথমতঃ আফ্রিকার আদিম অধিবাসী কাফ্রীদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু কাফ্রীরা আশানুরূপ মিতাচারী ও সচ্চরিত্র নহে এবং সময়ে সময়ে সামান্য কারণে তাহারা একজোট হইয়া এই সকল খনি ও ক্ষেত্রের মালিকগণের অশেষ ক্ষতি করে; এ কারণ মালিকগণের দৃষ্টি মিতাচারী, পরিশ্রমী, শান্ত ও সচ্চরিত্র ভারতীয় মজুরগণের দিকে পড়িল।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে নেটালের য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীগণ প্রতি বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক ভারতীয় মজুর আবশ্যক এই মর্ম্মে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। এই সকল ব্যবসায়ীর উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট এই আবেদন মঞ্জুর করেন; এবং প্রতি বৎসর কুলি আইন অনুসারে ভারতীয় মজুর প্রেরিত হইতে লাগিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় মজুর নেটালে পদার্পণ করে। সেই সময় হইতে তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র নেটালে ৬৫০০ জন ভারতবাসী গমন করে; এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ১৯০৭ সালে ১১৫,০০০ জন হয়, এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের গণনায় নেটালে ভারতবাসীর সংখ্যা ১২২,০০০ জন হইয়াছে। এই ১২২,০০০ জনের মধ্যে ৪২,০০০ ভারতবাসী কুলি আইন অনুসারে মজুরী কর্ম্ম করিতে বাধ্য; এবং ৬২০০০ জন পূর্ব্বে যাহারা মজুর হইয়া আফ্রিকায় গিয়াছিল তাহাদের সন্তান সন্ততি অথবা প্রথম চুক্তি হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় কুলি হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৮,০০০ জন স্বাধীনভাবে আফ্রিকায় গমন করিয়া বিভিন্ন ব্যবসায় নিযুক্ত আছে। ভারতীয় মজুরগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার অশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইয়াছে; তাহাদের প্রযত্নে স্বর্ণখনির আয় প্রতিবৎসর গড়ে ৪॥০ কোটি টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং ১৯১২ সালের মোট আয় ৫৬ কোটি টাকা।

যাহা হউক ভারতীয় মজুরেরা যখন কুলি আইনের

* মান্দ্রাজে অবস্থানকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিয়াছেন "They [South African Indians] have violated, as they intended to violate, those laws with full knowledge of the penalties involved and ready with all courage and patience to endure those penalties. In all this they have the sympathy of India, deep and burning, and not only of India but also those who like myself without being Indians themselves have feelings of sympathy for the people of this country".

নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করিয়া দিল, তখনই বুয়ারদিগের স্বার্থে প্রবল আঘাত লাগিল। * অল্পে তুষ্ট, কর্ম্মঠ ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের প্রতিযোগিতায় বুয়ার ব্যবসায়ীগণ দিন দিন পরাস্ত হইয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের বানিজ্য নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে তাঁহাদিগকে দেশ হইতে দূর করিবার মানসে নূতন নূতন "আইন" সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহারা ভারতবাসীকে কেবল মাত্র কুলিরূপেই চা'ন; কিন্তু সেইখানে ভারতবাসীর স্বাধীন অবস্থান তাঁহাদের নিকট নিতান্ত অসহ্য। তাহাদের মতলব কবির ভাষায় বলিতে গেলে,—

"খনির তলে খাটুক কুলি,—অবসরে চিবাক্ চানা,
কিন্তু কুলির আফ্রিকাতে কন্যা জায়া আন্‌তে মানা।"

গত সেপ্টেম্বর মাসে South African Agricultural Union সভায় Sir Thomas Hyslop স্পষ্টই বলিয়াছেন, "The effect of the licence (£3 tax) is to prevent Indians from settling in the country. * * * We want Indians as indentured labourers, but not as freemen"

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের আগমনের পর তাঁহাদের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইবার ও দেশ হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য, আজ পর্য্যন্ত যতগুলি আইন ও নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল। নিম্নে ভারতবাসীর প্রতি প্রযুজ্য কএকটি আইন ও নিয়ম লিপিবদ্ধ করা গেল :—

১। Immigration Restriction Act of 1903 অনুসারে প্রত্যেক ভারতবাসী যে কোন একটি য়ুরোপীয় ভাষায় দস্তখত লিখিতে না পারিলে, তাহার নেটালে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

২। Act 2 of 1907 এবং act 36 of 1908 অনুসারে ভারতবাসী উপরোক্ত লিখন-পরীক্ষা হইতে মুক্ত হইলে তাহাকে পুনরায় আফিসে নিজের নাম রেজিষ্টারি করিয়া প্রবেশের পাশ লইতে হয়, এবং সাধারণ কয়েদীর মত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিতে হয়।

৩। বাৎসরিক £3 tax অনুসারে প্রত্যেক চুক্তি-মুক্ত ভারতীয় মজুরকে, (Ex-indentured labourers) এবং ১৬ বৎসর বয়স্ক বালক ও ১৩ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে ৪৫ টাকা করিয়া টেক্স দিতে হয়। মনে করুন একজন চুক্তি-মুক্ত ভারতীয় কুলি সস্ত্রীক ও একটি পুত্র ও কন্যা লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিতেছে। তাহাকে স্ত্রী, কন্যা পুত্র ও নিজের জন্য বৎসরে ১৮০ টাকা টেক্স দিতে হইবে। যাহারা দীন দুঃখী ভারতবাসীর দৈনিক অবস্থা জানেন, তাহারা এই অমানুষিক আইনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। এই আইনের নির্যাতনে কত ভারতীয় নারী নিজের সতীত্ব বিক্রয় করিয়াছে, এবং কতশত পুরুষ স্ত্রীকন্যা পুত্র ত্যাগ করিয়া পালাইয়া গিয়াছে।

৪। সকলেই জানেন হিন্দু মুসলমানগণের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষমতা আছে। কিন্তু যদি কোন হিন্দু কিংবা মুসলমান একাধিক বিবাহ করেন, তাহা হইলে দক্ষিণ আফ্রিকার নূতন আইন অনুসারে সে বিবাহ অবৈধ; এবং ঐ বিবাহোৎপন্ন তাঁহাদের সন্তান সন্ততিও জারজ।

৫। দক্ষিণ আফ্রিকায় সকল স্থানে ভারতবাসী জমি ক্রয় করিতে পারে না। কএকটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহারা ভূমি ক্রয় করিতে পারে।

৬। য়ুরোপীয়দিগের আবাস হইতে দূরে সহরের একপ্রান্তে ভারতবাসীর আবাসস্থান স্থির হইয়াছে।

৭। Pretoria এবং Johannesburgh সহরের মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে ভারতবাসী ফুটপাতে কিংবা ট্রামে ভ্রমণ করিতে পারে না।

৮। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করেন না।

৯। ভারতবসীর পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমন আইন অনুসারে নিষিদ্ধ।

এই সকল অমানুষিক 'আইন' দক্ষিণ আফ্রিকার নির্যাতন সহিষ্ণু ভারতবাসী অকাতরে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন;

* Indentured labour-system অনুসারে প্রত্যেক ভারতীয় মজুর পাঁচ বৎসর কুলিগিরি করিতে বাধ্য। পাঁচ বৎসর পরে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করে। তবে ইচ্ছা করিলে তাহারা এই পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় কুলিগিরি করিতে পারে।

নেটাল চা-ক্ষেত্রে চয়নকার্য্য-নিরত ভারতীয় নরনারী।

কিন্তু ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে; এই সকল নির্যাতন-কাহিনী ব্রিটিশরাজকে জ্ঞাপন করিয়া একটি সুমীমাংসা লাভ করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন স্বদেশপ্রেমিক নেতার আবশ্যক হইল। এই সময়ে কোন একটি মোকদ্দমা সংক্রান্তে কর্ম্মবীর গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া উপস্থিত হ'ন।

শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃপুরুষগণ বংশানুক্রমে পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। গান্ধির পিতা পোরবন্দরে ২৫ বৎসর দেওয়ানি করিয়া কঠিবার রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত হ'ন, এবং বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনে তিনিও কঠিবার 'রাজস্থানিক' সভার সভ্য নিযুক্ত হ'ন। গান্ধির মাতা ধর্ম্মশীলা হিন্দুরমণী ছিলেন, এবং তাঁহার প্রভাব কনিষ্ঠ পুত্র গান্ধির জীবনে বেশ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। কঠিবারে গান্ধির বিদ্যারম্ভ হয়, এবং বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার মাতা নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলে, গান্ধি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি বিলাতে অবস্থান কালে কখনও মদ্য, মাংস কিংবা স্ত্রী সংসর্গ করিবেন না; তখন গান্ধির মাতা সম্মত হন; এই প্রতিজ্ঞা তিনি এখন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষালাভের পর গান্ধি Inner Temple হইতে আইনশিক্ষা করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে কিছুদিন ব্যারিষ্টারি করেন; পরে একটি মোকদ্দমা চালাইবার জন্য নেটালে যান। ইংরাজের উদারতায় ও য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া তিনি য়ুরোপীয় ন্যায়নিষ্ঠতার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া তাঁহার সে মোহ একেবারে কাটিয়া গেল। তখনও "£3 tax" ইত্যাদি আইন প্রচলিত হয় নাই বটে, কিন্তু ভারতীয় মজুরদের দুর্দ্দশা ও তাহাদের প্রতি অত্যাচার দেখিয়া তিনি সহজেই ভবিষ্যতের ভীষণ সংগ্রাম ও শোচনীয় অবস্থার কথা অনুভব করিতে পারিলেন। Natal Supreme Courtএ যখন তিনি আইন ব্যবসা করিবার অধিকার প্রার্থনা করিলেন, তখন তথাকার বুয়ার আইনব্যবসায়ীগণ এই প্রস্তাবে অনেক আপত্তি উত্থাপন করেন; কিন্তু সুখের বিষয় Supreme Court এ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া গান্ধির প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। ১৮৯৪খৃষ্টাব্দে তাঁহার চেষ্টায় সমগ্র প্রবাসী ভারতবাসীদেরমধ্যে একতা স্থাপনের জন্য Natal Indian Congress স্থাপন হয়, এবং তাঁহারই প্ররোচনায় গভর্ণমেণ্ট Asiatic Exclusion Act প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। ১৮৯৬খৃষ্টাব্দের শেষে জনসাধারণকে ভারতবাসীদিগের দুরবস্থা জ্ঞাপন

করিবার জন্য তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিয়া চারিদিকে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সার অংশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছিয়া বুয়ারদিগের মধ্যে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। যাহা হউক কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় সস্ত্রীক দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করেন; কিন্তু ডারবানে জাহাজ লাগিবামাত্র শুনিতে পাইলেন যে, স্থানীয় বুয়ারেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিবার মনস্থ করিয়াছে। অনেকে এই জন্য তাঁহাকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জাহাজে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন—কিন্তু য়ুরোপীয় ন্যায়নিষ্ঠার উপর তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল; এই বিশ্বাস-বশে বন্ধুদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন; তখনই একদল বুয়ার তাঁহাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু সেই স্থানের Police Superintendentর স্ত্রীর সাহায্যে তিনি প্রাণরক্ষা করিয়া একটি বন্ধুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার জন্য পাছে বন্ধুটি বুয়ার কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হন এই ভাবিয়া গান্ধি পুলিসের ছদ্মবেশে সেই স্থান হইতে পলাইয়া যান, এবং কিছুদিন পরে উত্তেজনার অবসান হইলে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বুয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র গান্ধি একটি Indian Ambulance crops গঠন করিলেন। যুদ্ধে আহত সৈন্যদিগের সেবা করাই এইদলের প্রধান কার্য্য। গান্ধির নেতৃত্বাধীনে প্রায় এক হাজার ভারতবাসী ইংরেজদিগের পক্ষে থাকিয়া অগ্নিবৃষ্টির মধ্য হইতে আহত যোদ্ধাদিগকে খাটিয়া করিয়া বহন করিয়া আনিত। লর্ড রবার্টসের একমাত্র পুত্র যখন রণক্ষেত্রে নিহত হন, তখন ইঁহারাই তাঁহার মৃত দেহ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের অক্লান্ত উৎসাহ ও সাহস দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং এই সৎকার্য্যের জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট গান্ধিকে War Medal উপহার দেন।

১৯০১ সালে স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন, এবং পুনরায় বোম্বাই হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেন; সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় নূতন আইন পাশ হইবার সম্ভাবনা হওয়ায় এবং বিখ্যাত ইংরাজ রাজনীতিক Chamberalinর আগমনে সুমীমাংসা লাভের আশায়—ভারতবাসীগণের নিতান্ত অনুরোধে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে,ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য Asiatic Law Amendment পাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। গান্ধির সমস্ত বাধা বিপত্তি বিফল হইল। শতবার আবেদন নিবেদনে পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক মহতী সভায় ভারতবাসীদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইয়ালন যে, যতদিন এই সকল অন্যায় আইনগুলি উঠাইয়া না দেওয়া হইবে ততদিন তাঁহারা এইগুলিকে অমান্য করিয়া কারাগারে যাইতে প্রস্তুত থাকিবেন। ইহাই গান্ধির নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ (pssive resistance)। ইহার পর ইংলণ্ডে গমন করিয়া যখন তিনি কোন প্রতীকার পাইলেন না, তখন স্বেচ্ছায় এই সকল অমানুষিক আইন অমান্য করিয়া কারাগারে গমন করিলেন। *

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কারাগারে গমন করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তানটি কঠিন পীড়ায় মৃতপ্রায়; তাহাকে দেখিতে যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভারতবাসীকে সেবা করাই তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক—ঈশ্বরের হস্তে তাঁহার মৃতপ্রায় সন্তানটীকে দান করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তারপর দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হইবার সময় সংবাদ আসিল, তাঁহার-পত্নী অত্যন্ত পীড়িত। এমন কি ম্যাজিষ্ট্রেট গান্ধিকে সামান্য জরিমানা দিয়া পীড়িত পত্নীর সহিত মিলিত হইতে বলিলেন; কিন্তু অসংখ্য ভারতবাসী যখন অকাতরে জেলে যাইতেছে, তখন কি করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন? তাই তিনি স্বেচ্ছায় কারাগারে গেলেন। তাঁহার ১৭ বৎসর বয়সের বালকটী যাহাতে দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়া মানুষ হইতে পারে,এ আশায় তিনি তাহাকে এই নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ ব্যাপারে যোগদান করাইয়া-

---

* "I might fairly claim that during my whole career I have been actuated by the desire to help government... ...inspite of breach of lawsl claim to be a law-abiding citizen"—Gandhi.

ছেন। তাহার পর এই নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ-মন্ত্রে ভারতবাসিগণকে দীক্ষিত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"Remember that we are descendants of Prahlad and Sudhanva, both passive resisters of the purest type.······They suffered extreme torture, neither of them inflicted suffering on their persecutors."

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে গান্ধি যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-প্রথা অবলম্বন করেন, তাহা ভারতবাসীদিগের উপর অশেষ ক্লেশ আনিয়া দেয়। এই সংগ্রামের ফলে ৩৫,০০০ ভারতবাসী কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, শত শত পরিবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ও কত অসহায়া রমণী ও শিশুসন্তানগণ পথের ভিখারী হইয়াছে; কিন্তু সুখের বিষয় তাঁহারা যে জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা চিরকাল ভারতবাসীকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে।

যাহা হউক এই সময়ে সম্রাটের রাজ্যাভিষেক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং General Smutsএর অনুরোধে গান্ধি কিছুদিনের জন্য এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট গান্ধির সহিত সন্ধি করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ট্রান্সভালে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যে অন্যায় আইন আছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের স্বাধীনতায় কোনরূপ-হস্তক্ষেপ করা হইবে না; কিন্তু এই সন্ধি-প্রস্তাব কেবল মাত্র ট্রান্সভালের পক্ষেই খাটিবে। কিছুদিন পরে গান্ধি জানাইলেন যে, ভারতবাসীর কষ্টের লাঘব করাই যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে যেন দক্ষিণ আফ্রিকার চারিটি প্রদেশেই এই সন্ধি-প্রস্তাব কার্য্যকর হয়। গান্ধির এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া সেই সময়ের Colonial Secretary লর্ড ক্রু ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৩রা তারিখে লিখিলেন, এই সন্ধি-প্রস্তাব যদি দক্ষিণ-আফ্রিকার সমস্ত প্রদেশে স্থান না পায়, তবে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট এ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যাহা হউক এই কথা অনুসারে দক্ষিণ-আফ্রিকা-গভর্ণমেণ্ট একটি সন্ধি-প্রস্তাব প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের পার্লিয়ামেণ্টে পেশ করেন, কিন্তু স্বার্থান্ধ বুয়ার শত্রুদিগের চেষ্টায় সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

গান্ধী, তাঁহার সেক্রেটারী ও কেলেনব্যাক্

এদিকে মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলে ভারতীয় শ্রমজীবীদের দুঃখক্লেশের অবসান করিবার আশায় বড়লাটের আইন-সভায় প্রস্তাব করেন যে, নেটালে বুয়ারদিগের স্বার্থের জন্য আর ভারতীয় মজুর পাঠান হইবে না। সুখের বিষয় আমাদের মহানুভব লর্ড হার্ডিঞ্জ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, কিন্তু সেখানে ভারতীয় কুলি না হইলে বুয়ারদের ব্যবসা-বাণিজ্য অচল। তাই শ্রীযুক্ত গোখলের এই আইন প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য তাঁহারা ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট আবদার করিতেছেন।*

যাহা হউক দক্ষিণ-আফ্রিকা-গভর্ণমেণ্ট যখন উপরোক্ত

* "As you are aware we forbade indentured emigration to Natal in 1911 and the fact that the Natal planters sent a delegate over to India to beg for a reconsideration of that measure shows how hardly it hit them."

—Lord Hardinge at Madras.
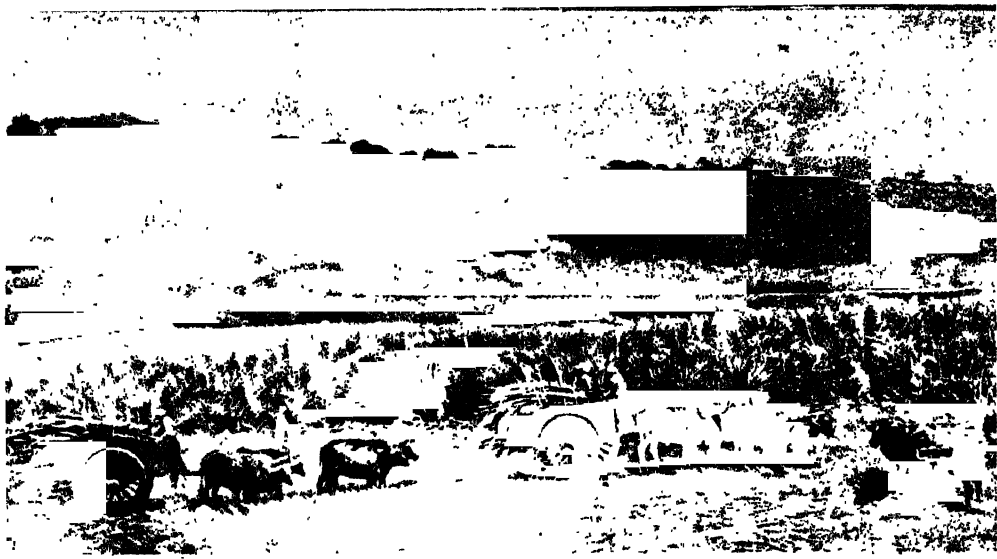
নেটাল ইক্ষু-ক্ষেত্রে কার্য্যনিরত ভারতীয় কুলী।

সন্ধি-প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না, তথন শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে কোন নূতন সুব্যবস্থা করিবার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাত্রা করিলেন। সেখানে তিনি তিনজন মন্ত্রী General Botha, General Smuts এবং Mr. Fischerএর সহিত দেখা করিলেন। স্থির হইল দক্ষিণ-আফ্রিকা-গভর্ণমেণ্ট "তিন পাউণ্ড কর" ও অন্যান্য আইন উঠাইয়া দিবেন; কিন্তু যথন শ্রীযুক্ত গোখ্‌লে ভারতে ফিরিয়া আসিলেন, তথন দক্ষিণ-আফ্রিকা-গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব একেবারে ভুলিয়া গেলেন। নব-নির্ব্বাচিত বুয়ার-পার্লিয়ামেণ্ট সম্মিলিত হইলে ভারতবাসীর দুঃখ দূর করিবার কোন চেষ্টা হইল না।

General Smutsএর সহিত কথাবার্ত্তার পর গান্ধি যে নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ বন্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু ৩।৪ বৎসর অপেক্ষা করিয়াও যথন কোনও সুব্যবস্থা হইল না, অধিকন্তু অত্যাচার উত্তরোত্তর বাড়িতে চলিল দেখিয়া তথন তিনি বিগত অক্টোবর মাস হইতেই নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ-পন্থা পুনরায় আরম্ভ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গান্ধি ও তাহার অনুচরগণ ঠিক করিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিয়া যে আইন আছে তাহা অহারা অমান্য করিয়া কারারুদ্ধ হইবেন। নেটাল প্রদেশের অন্তর্গত গান্ধির নিবাসভূমি Charlestown হইতে ট্রান্সভালের অন্তর্গত Johanesburg সহরের নিকট ভারতসুহৃদ্ Kallenbach সাহেবের আবাসাভিমুখে প্রায় আড়াই হাজার ভারতবাসী যাত্রা করিলেন। এই বিরাট্ যাত্রা-ব্যাপারে উদ্যোগী হইলেন ভারতবন্ধু Polak, Kallenbach, Ritch আর West এই সকল মহানুভব য়ুরোপীয়গণের সাহায্য না পাইলে গান্ধি তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপনে সমর্থ হইতেন কি না সন্দেহ। নভেম্বর মাসের প্রথমেই বিরাট্ অভিযান আরম্ভ হইল। গান্ধি ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলেই Volkurst সহরে গান্ধিকে অভিযুক্ত করা হয়। কুলিদিগকে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অভিযানে যোগ দিতে উৎসাহিত করার অপরাধে গান্ধিকে অভিযুক্ত করা হয়। গান্ধিকে ধৃত করা হইলে, অভিযানে গন্তব্য পথাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া গান্ধি, Kallenbach সাহেবের সহিত ট্রান্সভালের অন্তর্গত Paardekraal সহরের নিকটে যাত্রীদিগের সহিত পুনরায় যোগদান করেন। "এইস্থানে আসিয়া তিনি পরিশ্রান্ত নারীদিগকে উৎসাহিত করিয়া একটি বক্তৃতা দিলেন। যাত্রীদিগের অধিকাংশই কুলি

মজুর; প্রায় সকলেই হয় কয়লার খনি না হয় আখের খেতে মজুরী করে। তাহারা অশিক্ষিত হইলেও যে জলন্ত আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়! তাহাদের পরিধানে জীর্ণবস্ত্র, অর্দ্ধাহারে অনিদ্রায় মৃতপ্রায়, কিন্তু তাহারা প্রফুল্লচিত্তে সকল দুঃখ সহ্য করিয়া কর্ত্তব্য-পথে অবিচলিতচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গান্ধি বলিতেছেন, এই সকল যাত্রীদিগের দৈনিক যাত্রার খরচ প্রায় ৩৫০০ হাজার টাকা এবং প্রত্যেক যাত্রীর আহারের জন্য গড়ে আধ সের রুটি ও ১ছটাক চিনি লাগিত। Paardekoot নামক স্থানে যাত্রিগণ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ায় তথাকার একজন ভারতীয় ব্যাবসায়ীর ব্যয়ে ২০০০ হাজার পেয়ালা চা ও প্রত্যেকের জন্য কিঞ্চিৎ খাবার দেওয়া হয়। তাঁহারা গান্ধিকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত এবং সকলেই তাহাকে "বাপু" বলিয়া সম্বোধন করে।

আইন ভঙ্গ করার এবং লোকদিগকে বে-আইনী কার্য্যে উৎসাহিত করার অপরাধে গান্ধিকে পুনরায় অভিযুক্ত করা হয়, এবং ১১ই নভেম্বর Dundee সহরের magistrate Mr. Crossএর বিচারে গান্ধির নয় মাস কারাদণ্ড অথবা ৯০০ শত টাকা জরিমানার আদেশ হয়। গান্ধি জরিমানা না দিয়া কারাগারে যাইবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "He was certain without suffering, it was not possible for them to get their grievance remedied."

ভারতবন্ধু Polak এবং Kallenbach য়ুরোপীয় হইয়াও এই যাত্রীর সাহায্য করার জন্য অভিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে তিন মাসের কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।* নেতৃবিহীন হইয়াও যাত্রিগণ জোহান্সবার্গে পৌঁছিয়াছিলেন; কিন্তু সকলকেই জেলে যাইতে হইল। সাধারণ কারাগারে স্থান না হওয়ায় খনিগুলির মধ্যে এই সকল ন্যায়নিষ্ঠ ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল; ইচ্ছামত বেত্রাঘাতে আজ তাহারা জর্জ্জরিত। অভিযুক্ত নরনারীদিগের মধ্যে গান্ধির পত্নীর কারাবাসের আদেশ হয়। গান্ধির পত্নী এবং শ্রীমতী মোভাব হাসিতে হাসিতে জেলে গিয়াছিলেন। সকলেই কারারুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মঘট চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল; অত্যাচারের মাত্রাও দিন দিন বাড়িয়া চলিতে লাগিল; কিন্তু একরূপ অত্যাচার বেশী দিন চলা সম্ভবপর নহে। ইংলণ্ডের সদাশয় মহানুভব শাসনকর্ত্তাদিগের দৃষ্টি এবং আমাদের মহানুভব শাসনকর্ত্তা Lord Hardingeএর তীব্র বক্তৃতা বুয়ারদিগের কিঞ্চিৎ চৈতন্য উৎপাদন করিয়াছে। তাই এই গণ্ডগোল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি Commission বসিয়াছে। দুই পক্ষের মতামত যাহাতে সম্পূর্ণরূপ গ্রহণ করা হয়, তাহার সুবিধার জন্য গান্ধি, Polak, Kallenbach ও শ্রীমতী গান্ধিকে সাক্ষ্য দিবার জন্য মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই Commissionএর সভ্যরূপে জন কএক নিরপেক্ষ য়ুরোপীয় ও দুই একজন ভারতবাসীকে গ্রহণ জন্য গান্ধি আবেদন করেন; কিন্তু সে আবেদন মঞ্জুর হয় নাই। ভারত-গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মধ্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা Sir Benjamin Robertson এই Commissionএর কার্য্য-কলাপ অবলোকন করিবার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকায় গমন করিয়াছেন। এদিকে ভারতবাসী জনসাধারণের পক্ষ হইতে সকল তথ্য অবগত হইবার ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ভারত-সুহৃদ্ Rev. C. F. Andrews ও Rev. Pearson দক্ষিণ-আফ্রিকায় গিয়াছেন। এই কমিশনের ফল কি হইবে তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। ফলাফল যাহা হউক আশা করা যায় যে, প্রত্যেক সভ্য বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিক Joshep Chamberlainএর এই মহতী বাণী মনে রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন:—

The United Kingdom owns as its brightest and greatest dependency that enormous Empire of India with 300,000,000 of subjects, who are as

* Polak জেলে যাইবার পূর্ব্বে আদালতে বলিয়াছেন,—

As a Jew, it is impossible for me to associate myself, even passively with the persecution of any race or nationality. My co-religionists to-day, in certain parts of Europe are undergoing suffering and persecution on racial grounds, and finding the same spirit of persecution in this country, directed against the Indian people, I have felt impelled to protest against with every fibre of my being.

loyal to the Crown as you are yourselves. And among them there are hundreds and thousands of men who are every whit as civilised as we are ourselves who are if that be anything better born, in the sense that they have older traditions and older families, who are men of wealth, men of cultivation, men of distinguished valour, men who have brought whole armies and place them at the service of the Queen and have in times of great difficulty and trouble saved the empire by their loyalty. I say, you who have seen all this cannot be willing to put upon these men a slight which I think is absolutely unnecessary for your purpose and which would be calculated to provoke ill-feeling, discontent, irritation, and would be most unpalatable to the feelings not only of her Majesty the Queen but of all her people.

কমিশনের ফল যাহাই হউক, আমাদের আশা, মহানুভব লর্ড হার্ডিঞ্জের চেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে ইহার একটি সুমীমাংসা হইয়া গান্ধির জীবনব্যাপী সাধনাকে সফল করিয়া তুলিবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার,
শ্রীপ্রভাতীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

চণ্ডালগড় (চুণার) দুর্গ।
[শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভের আলোকচিত্র হইতে]
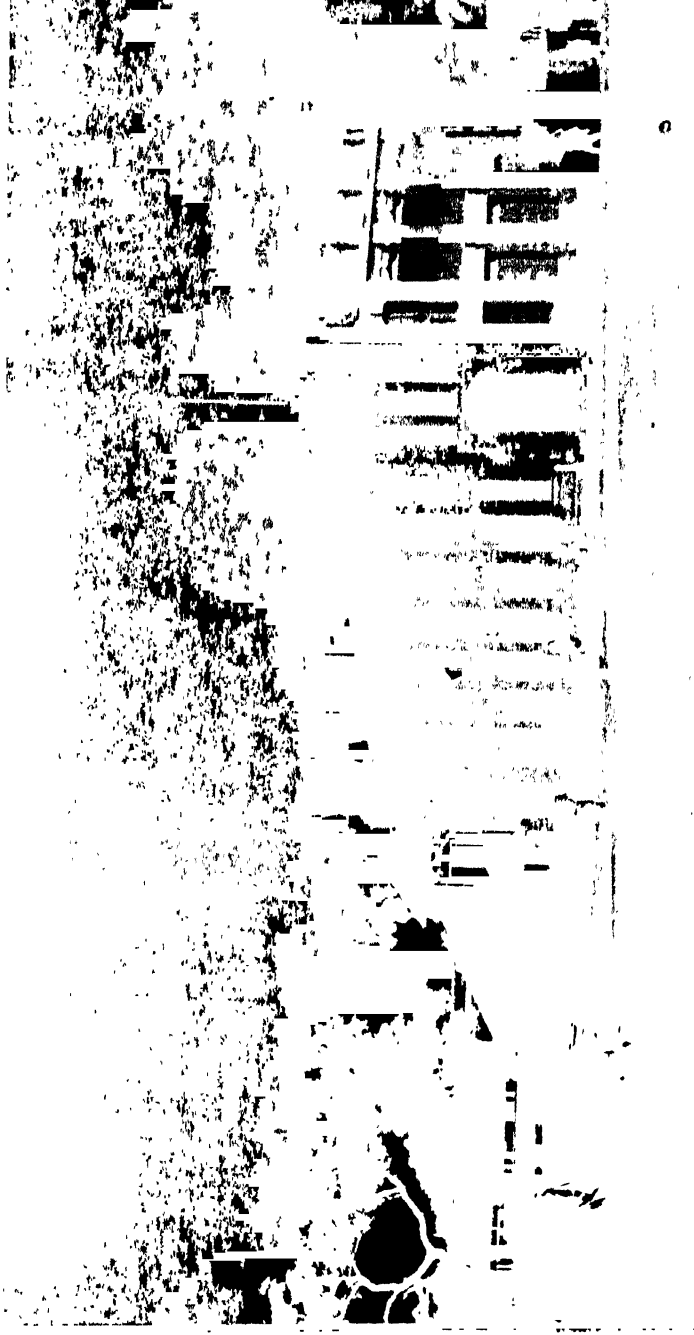
রামমোহন লাইব্রেরী।

(চিত্রশিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল-কর্ত্তৃক গৃহীত আলোক-চিত্র হইতে)

The Emerald Ptg. Works, Calcutta.

বিবিধ-প্রসঙ্গ

রামমোহন-স্মৃতি-পুস্তকালয

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা নগরীর কএকজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের চেষ্টা ও যত্নে একটি সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার স্থাপিত হয়। তাঁহারা মহাত্মা রামমোহন রায়ের নামে এই পুস্তকালয়ের নামকরণ করেন। ইহা অপেক্ষা সুন্দর নামকরণ আর হইতে পারে না। যাঁহারা এই পুস্তকালয় স্থাপিত করেন, তাঁহারা যে দেশের একটি কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন, এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। রাজা রামমোহন রায়ের নিকট শুধু বাঙ্গলা দেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ যে কতদূর ঋণী, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বলিতে গেলে তিনিই এ দেশে ইংরেজিশিক্ষা-প্রবর্ত্তনের উৎসাহদাতৃগণের অন্যতম। সেই মহাত্মার স্মৃতিরক্ষার জন্য কেবল কলিকাতা নগরীতে কেন, বাঙ্গলা দেশের জেলায় জেলায়, সহরে সহরে, স্মৃতি-পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে সেই মহাপুরুষের প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়।

রামমোহন লাইবেরী অধিক দিন স্থাপিত হয় নাই। এই অল্পদিনের মধ্যেই ইহার কার্য্যক্ষেত্র এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে, যাঁহারা ইহার প্রতিষ্ঠাতা তাঁহারা সকলেই লাইব্রেরীর একটি গৃহের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কিছুতেই লাইবেরীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছিল না। তখন এই লাইব্রেরীর উৎসাহী সদস্যগণ ভিক্ষাপাত্র হস্তে কৃতবিদ্য বাঙ্গালী মহোদয়গণের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। যাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সাধু, ভগবান্ তাঁহাদিগের সহায়। যথোপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইতে বিলম্ব হইল না। মাণিকতলায় ২৬৭নং অপার সার্কুলার রোডে গৃহ-নির্ম্মাণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এইস্থানে যে সুন্দর দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার প্রতিকৃতি আমরা প্রকাশিত করিলাম। গত ৯ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার মহাসমারোহে এই সুন্দর গৃহে পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠাকার্য্য বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন। এই স্মৃতি-কমিটির সভাপতি প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব মিঃ এস, পি, সিংহ মহাশয়ের অনুপস্থিতি নিবন্ধন সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বঙ্গেশ্বরকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাস্থলে লইয়া যান। সভার কার্য্যারম্ভেই সম্পাদক মহাশয় কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, এই গৃহ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে ও আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে অন্যূন ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ১৭২৫০ টাকা মাত্র চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। আরও
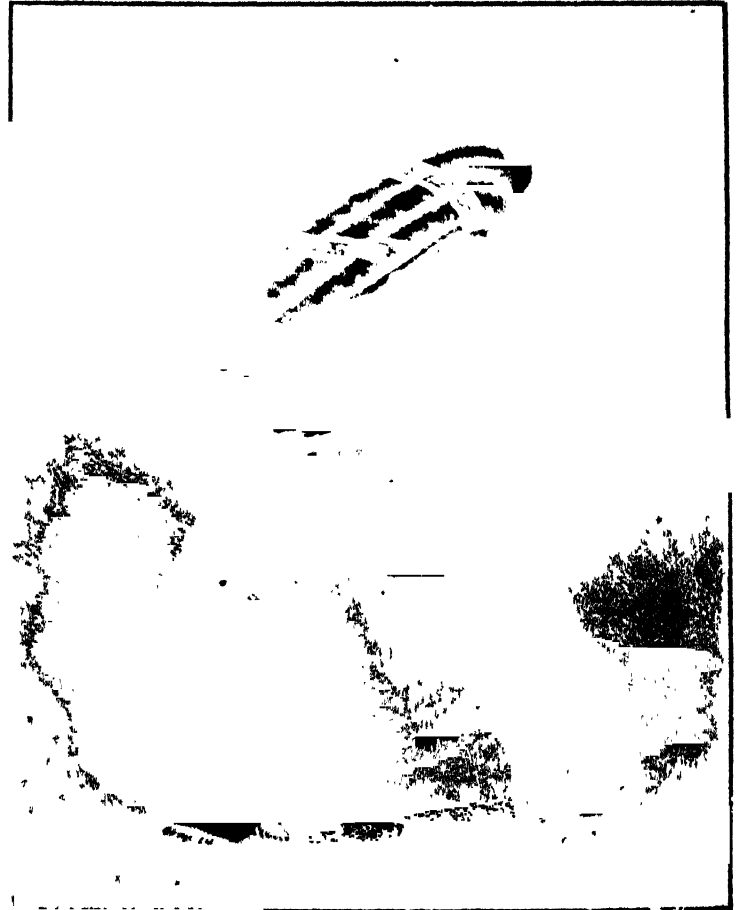
স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়

চারি পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা প্রতিশ্রুত হইয়াছে। তাহা হইলেও প্রায় দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। কার্য্যবিবরণ-পাঠ শেষ হইলে বঙ্গেশ্বর বাহাদুর একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তদুপলক্ষে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন এবং এই পুস্তকালয়ের সার্থকতার কথা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া বলেন যে, এই পুস্তকালয়ের জন্য তিনি স্বয়ং আড়াই হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তৎপরে মাননীয় শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্বে এই গৃহ-নির্ম্মাণকালে যাহা দান করিয়াছিলেন, তদতিরিক্ত আরও এক হাজার টাকা তিনি দান করিবেন। এই প্রকার সহানুভূতি লাভ করিলে রামমোহন লাইব্রেরীর সমস্ত অভাব দূর হইয়া যাইবে। তাহার পর মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহা, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাক্তার জে, টি, সণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করেন। সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

নবদ্বীপে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী

বিগত ১৯এ অগ্রহায়ণ হইতে ২২এ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে ও সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কাশিমবাজারাধিপতি অনারেবল শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মহোদয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে নূন্যাধিক ৪০,০০০ মুদ্রা ব্যয়ে চারিদিন ধরিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই আনন্দ-বিতরণ করা হইয়াছিল। ১৯এ তারিখের অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় সম্মিলনীর কার্য্য আরম্ভ হয়। তিনস্তম্ভের অতি প্রকাণ্ড তাম্বুতে বহু সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। প্রারম্ভেই উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করেন। এবার সম্মিলনীর ৫ম বর্ষ অতীত হইল। এবারের প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল—শ্রীচৈতন্য-দেবসম্মত বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতিকল্পে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। বক্তা ছিলেন দুই শ্রেণীর—এক শ্রেণী প্রাচীন প্রণালীর পক্ষপাতী আচার্য্য, আর এক দল আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর পরিপোষক পাশ্চাত্য শিক্ষিত। নিম্নলিখিত কএকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—পণ্ডিত শ্রীমুরলী-মোহন গোস্বামী, অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম্পা-দক ললিতবাবু, সহকারী সম্পাদক শ্রীবামাচরণ বসু, রায় বাহাদুর শ্রীরসময় মিত্র এম, এ, বাবু ভূষণচন্দ্র দাস এম, এ, বাবু রামতারণ মুখোপাধ্যায় বি, এল, পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র কাব্যপুরাণতীর্থ, বাবু রাধাকৃষ্ণ বসু, এম, এ, মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, বাবু পরেশচন্দ্র দত্ত এম, এ, বি এল, পণ্ডিত শ্রীরাধারমণ গোস্বামী, পল্লীবাসী-সম্পাদক শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত দামোদর দাস মহান্ত এবং পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ। গঙ্গাচরণ ঘোষ নামক এম, এ ক্লাশের একটি ছাত্র সম্পাদকের অনুমতি লইয়া বর্ত্ত-মান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। বাগ্মীশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ

নবদ্বীপে বৈষ্ণব-সম্মিলন।

গোস্বামী মহাশয় অসুস্থ থাকিলেও লোকের আগ্রহাতিশয্যে শিক্ষা-মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অতি মধুর বক্তৃতা করেন এবং সভাস্থলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত সাক্ষিগোপাল বড়ালের প্রস্তাবে কলিকাতাতেই প্রথমে মূল বিদ্যামন্দির-সংস্থাপনের কথা স্থির হয়। দ্বিতীয় দিনে "প্রেম পঞ্চমপুরুষার্থ" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভাগবতভূষণ প্রমুখ কএকজন সুধী বক্তা বক্তৃতা করেন। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয় এবং মধ্যে মধ্যে সুকণ্ঠ শচীনন্দন দাস বাবাজী এবং বৃন্দাবন দাস বাবাজীর মধুর সঙ্গীতে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। বেদাধ্যাপক Dr. Straus ও পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা জয়দেবের গান শুনিয়া এবং শ্রীযুক্ত ললিতবাবুর লিখিত সভায় বিতরিত in surrounding darkness নামক ইংরেজি পুস্তক পড়িয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

নবদ্বীপে কয়দিন অবিচারে প্রসাদ বিতরণের দৃশ্য দেখিলে নবদ্বীপধামকে পুরীধাম বলিয়া মনে হইয়াছিল। তৃতীয় দিবস (২২ অগ্রহায়ণ তারিখে) ধূলট হয়। সঙ্কীর্ত্তনের দল যে কত হইয়াছিল কে গণিবে? সর্ব্বাগ্রে নদীয়া-নাগরীভাবে বিভাবিত সিতিকণ্ঠ মধুর নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন, আর মহারাজা বাহাদুর প্রসাদী মাল্য-চন্দন-ভূষিত হইয়া ছত্র-চামর লইয়া চলিয়াছেন, সর্ব্বশেষে রামদাস প্রেমের বন্যায় সব ডুবাইয়া দিতেছেন, আবার মধ্য-ভাগে অপূর্ব্ব প্রেমের প্রবাহ ছুটিয়াছে, ললিত বাবুকে বেড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত এক শিক্ষিত-সম্প্রদায় লাজমান ছাড়িয়া প্রেমে ভরপুর হইয়া নাচিতেছেন আর গায়িতেছেন "তুলি কোটি কণ্ঠে তান গাওরে গৌরাঙ্গ-গুণগান" সমগ্র নবদ্বীপ সেদিন গৌরপ্রেমের হিল্লোলে নাচিতেছিল। বেলা ২টার সময় সুবৃহৎ পটমণ্ডপে "প্রেমধন বিলায়ে আমার গৌর এলো ঘরে" গান উঠিল। তৎপরে দধিমঙ্গল হইল।

এবার সম্মিলনীর কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত (প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত উৎকৃষ্ট সংস্করণ, এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (প্রভুপাদ শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামি সম্পাদিত, সুন্দর সংস্করণ), শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত (শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু প্রণীত) এবং Light in surrounding darkness সকলকে বিতরণ করা হইয়াছে। অধিবেশনে শেষে স্থির হয় যে, আগামী বর্ষে রাজসাহীতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

গঙ্গাবক্ষ হইতে নবদ্বীপ-বৈষ্ণব-সম্মিলন।

কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ
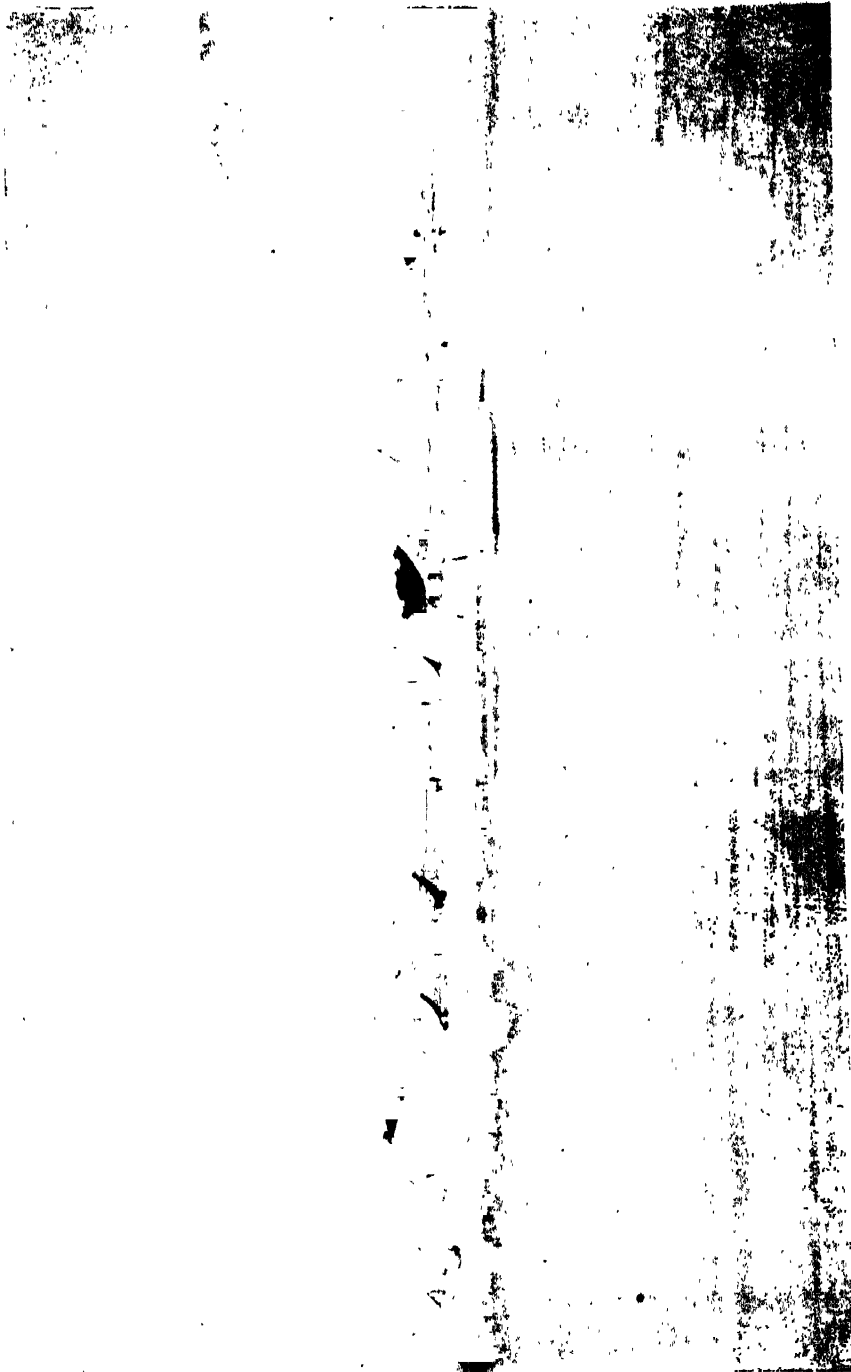
কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ বা কচ্ছপের খোলা এ দেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং মূল্যও সাতিশয় সুলভ; কিন্তু আমাদের দেশে অতি সামান্য পরিমাণেই ইহা কারুকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অথচ আমাদের মনে হয় যে, বর্ত্তমানকালে ইহা যেরূপ সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তদপেক্ষা ইহা আরও অনেকবিধ ব্যবহারে প্রযুজ্য হইতে পারে। ফলে, ইহা দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি অতি সুন্দর, অথচ সুলভ হয়, এবং ব্যবসার হিসাবে ইহা প্রয়োজনে লাগাইতে পারিলে এতদ্দ্বারা বিশেষ লাভবান্ হইবার সম্ভাবনা। বিলাতে এতদ্দ্বারা নানাবিধ সৌখীন দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ইহাকে কারুকার্য্যে প্রয়োগ করিবার উপযোগী করিবার কএকটি প্রকরণ আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ পরিষ্করণ-প্রণালী এইরূপ:—কূর্ম্ম পৃষ্ঠগুলি, বিশেষতঃ ছোটগুলি, অসমতল; সেগুলি সমান করিতে হইলে প্রথমে ফুটন্ত জলে কিয়ৎকালের জন্য ডুবাইয়া রাখিয়া উত্তোলন করিয়া একটি কপিইং প্রেস্, বা তদ্রূপ অপর কোন চাপ দিবার যন্ত্রের মধ্যে স্থাপিত করিয়া স্ক্রু দ্বারা চাপ দিয়া ফুটন্ত জলে খানিকক্ষণ চাপিয়া রাখিলে, সেগুলি সমতল হইয়া যাইবে। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, অধিক উচ্চতাপ বা অধিক ক্ষণ যাবৎ তাপ দিলে উহার সৌন্দর্য্যহানি ঘটে। সমতল হইলে ভগ্ন কাঁচখণ্ড বা স্ক্র্যাপর্ দ্বারা চাঁচিয়া ফেলিয়া, তৈলাক্ত-পদার্থ-শূন্য একটুকরা পশমী বস্ত্র দ্বারা কয়লার সূক্ষ্ম চূর্ণ জলে আর্দ্র করিয়া ঘষিতে হইবে। এইরূপে সুমসৃণ হইলে খোলাটির উপর সামান্য সির্কা সিক্ত করিয়া সামান্য জলযুক্ত পরিষ্কার খড়ি চূর্ণ বা হোয়াইটিং দ্বারা পশমী বস্ত্রযোগে পুনরায় ঘষিলে সুচিক্কণ হইবে, তখন হস্ততালুতে হোয়াইটিং বা পচা পাথর চূর্ণ লইয়া তদ্দ্বারা ঘষিয়া পালিশ করিতে হয়।

কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ জুড়িবার উপায়:—দুই খণ্ড খোলা পরস্পরের সহিত সুসংযোজিত করিতে হইলে তাহাদের সেই দুই স্থান পরস্পর বিপরীতভাবে ঢালু করিয়া ঘষিয়া এমনটি করিতে হইবে যেন একটির উপর অপরটি বসাইলে বেমালুম সংযুক্ত হয়। ঠিক সেইভাবে লাগাইয়া ঐ জুড়িবার স্থানের দুইদিক্ এক খণ্ড কাগজ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। একটি চিমটা উত্তপ্ত করিয়া লাল হইলে, তদ্দ্বারা এক টুকরা কাগজ ধরিয়া দেখিবে, যদি কাগজ না জুড়িয়া উঠে তাহা হইলে, তদ্দ্বারা ঐ জুড়িবার স্থান চাপিয়া ধরিয়া অধিকতর চাপ দিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। শীতল হইলে বেশ জুড়িয়া যাইবে। প্রকারান্তরে, যে দুইটি খোলা একত্রিত করিতে হইবে, সেই দুইটির সেই দুই ধার পরস্পর উল্টাভাবে সিকি ইঞ্চি হইতে উখা বা অন্য কোন শাণিত অস্ত্র দ্বারা ঢালু করিয়া কর্ত্তিত কর। পরে ঐ দুই অংশ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া একটি কপিইং প্রেসের ন্যায় লৌহপ্রেসে চাপিয়া ফুটন্ত জলমধ্যে বসাইয়া রাখ। জল শীতল হইলে তুলিয়া লও। এইরূপে খণ্ড খণ্ড কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ জুড়িয়া প্রকাণ্ড একখানি করা যাইতে পারে। কৌশলে একটু মুন্সীয়ানা করিয়া ধারগুলি কাটিয়া এইরূপে জুড়িলে জোড়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না। টুক্‌রা খোলা এইরূপে জুড়িয়া লওয়া যায় বলিয়া ইহার অণুমাত্রও নষ্ট হয় না। খোলার সাতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা ও উখার গুঁড়াগুলিও গরম জলে নরম করিয়া একত্রে ধাতব ছাঁচ বিশেষে পুরিয়া তাহার উপর হাইড্রলিক্ চাপ দিলে জমাট বাঁধিয়া যথেচ্ছামত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা যায়। শৃঙ্গাদির টুক্‌রাও এইরূপে জোড়া যায়। শৃঙ্গাদিতে লিখিবারও এই প্রথাই প্রকৃষ্ট।

১। কৃত্রিম কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ। শৃঙ্গাদি কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের অনুকরণে রঞ্জিত করিবার জন্য জলে নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার দ্রব করিয়া উহার সহিত গঁদ এবং সামান্য পরিমাণ রেড লেড্ মিশাইয়া ব্রুশদ্বারা শৃঙ্গের পাতের উপর কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় বিচিত্র করিয়া লাগাও। ঘণ্টাখানেক রাখিয়া দিয়া পরিশ্রুত জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। পরে তুলিয়া যথাবিহিত পালিশ কর। নাইট্রেট অব্ মার্কারি চূণের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে ঘোর ধূসর বর্ণ উৎপাদিত হয়।

২। সমভাগ বাখারি চূণ এবং রেড লেড্, ক্ষার জল দিয়া একত্রিত করিয়া কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের দাগগুলির অনুকরণে শৃঙ্গখণ্ড রঞ্জিত করা যায়। শুষ্ক হইলে পুনঃ পুনঃ দুই তিন বার ঐরূপ করিতে হয়।

৩। হরিতাল (yellow arsenic sulphide) চূণের জলে গুলিয়া ব্রশদ্বারা লাগাইলে ঘোর পীতাভবর্ণ উৎপন্ন হয়।

৪। কতকগুলি ধঞ্চে অথবা খড় জ্বালিয়া আগুন করিয়া তাহার উপর শৃঙ্গটি ধরিতে হইবে; নরম হইলে উহার একধার তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রভাগ দ্বারা চিরিয়া চেষ্টা করিয়া চিমটা দিয়া খুলিয়া দুই খণ্ড পুরু এবং ভারি লৌহপাত চর্ব্বি দ্বারা রঞ্জিত করিয়া তাহার মধ্যে উহা স্থাপিত করিয়া চাপ দিতে হইবে; শীতল হইলে শৃঙ্গের পাত প্রস্তুত হইবে। তাহার পর জলে উত্তমরূপে ভিজাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা চিরিয়া পাতলা পাতলা পাত করা যায়। পরে ক্ষার জলে ভিজাইয়া কয়লা চূর্ণ এবং হোয়াইটিং ঘষিয়া পালিশ করিতে হইবে। এক্ষণে এক আউন্স লিথার্জ এবং অর্দ্ধ আউন্স বাখারি চূর্ণ একত্রে মাড়িয়া প্রয়োজনানুরূপ দ্রব পটাশিয়ম কার্ব্বনেট মিশাইয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা শৃঙ্গের পাত কৃষ্ণ পৃষ্ঠের মত রঞ্জিত করা হয়।

শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়।

কাব্য-সমালোচনা

গৈরিক

গাথা, গীতিকা, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি কাব্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের নূতন গীতিকাব্য 'গৈরিক' প্রকাশিত হইয়াছে। প্রমথনাথ কাব্যামোদী বাঙ্গালী পাঠকের অন্যতম প্রিয় কবি। তাঁহার পিককণ্ঠ এবারে কিছু দীর্ঘকাল মৌন অবলম্বন করিলেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বসন্তরাগ বিস্মৃত হয় নাই। আমরা পূর্ণমাত্রায় তাঁহার কাব্যের মধুরস উপভোগ করিয়াছি, প্রথমে সেই কথাই বলিব।

'গৈরিকে' প্রমথনাথের কাব্যলক্ষ্মী পার্ব্বতী সাজিয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থের নামকরণ সে জন্য সুষ্ঠু হইয়াছে। কবি এ কাব্যে সাধারণ বাঙ্গালীর অপরিচিত পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যের নিঝর খুলিয়া দিয়াছেন—তাহাতে আমাদের হৃদয় বিস্ময়ানন্দে পরিপ্লুত হইয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্গে হিমালয়ের শোভা এবং কাশ্মীরের নন্দন-সুষমা এ কাব্যের প্রতি ছত্র অনুরঞ্জিত করিয়াছে। আবার 'সিংহলের স্মৃতি'তে সমুদ্রের, ও 'মরুভূমি' শীর্ষক কবিতায় মরুভূমির ভাবময় সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণে কাব্যখানি বিচিত্র হইয়াছে। 'হিমালয়' শীর্ষক কবিতার আরম্ভেই ভাব ও ভাষা কি মধুর এবং গম্ভীর!—

> নীলে ধবলের চূড়া! মৃত্যুত্থিত জীবনের মত
> দৃশ্য এক দেখিলাম, সসম্ভ্রমে হইনু প্রণত।

আবার,

> বুঝিনু, শৈলাদ্রি, তুমি জীবনের বিজয়-বাজনা,
> মরণত্রাসিত বিশ্বে অমৃতের অভয়-ঘোষণা।

অথবা,

> এ কি নিসর্গের পিতা, যাহা হ'তে প্রথম প্রকাশ
> জড় জগতের—হ'ল কঙ্কালের লাবণ্য বিকাশ?
> তার পর এল বুঝি ধরণীর জীবজন্তু-মেলা,
> সুখ-দুঃখ, আশা-ভয়, জীব-জন্মে যত লীলা-খেলা।
> জন্ম-মরণের মাঝে দাঁড়াইয়া অমর পাষাণ
> মহা-মিলনের লাগি' রচিছে কি পারের সোপান?

—চমৎকার! ভূস্বর্গের বর্ণনায় কাশ্মীরের ত্রিদিব দুর্লভ রূপরাশি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

> চারিদিকে নীল পাহাড়ের ঢেউ,
> কুমুদ কহ্লার-ছাওয়া হ্রদের বেণী,
> পায়ে তাহার শালীধানের ক্ষেত,
> বাদাম, পেস্তা, আখ্‌রোট গাছের শ্রেণী।
> *　　*　　*
> ফলে' আছে গুচ্ছে গুচ্ছে আঙ্গুর,
> ডালিম-বাগে জোয়ার লেগেই আছে,
> পিচের শাখায় নূতন কুঁড়ির শোভা,
> রাঙ্গা রাঙ্গা আপেল ঝোলে গাছে!
> পেয়ারা পিয়ার পাশাপাশি পেকে,
> উড়াচ্ছে কি মিঠে একটা সৌরভ,
> ন্যাশপাতি, সেউ ঝাঁকে ঝাঁকে ফলে'
> ছড়াচ্ছে কি মেওয়া-বাগের গৌরব!
> এলাচ-মুকুল আধ আধ ফোটা,
> মধুর-গন্ধে কুঞ্জ আমোদ করে,
> কিস্‌মিসগুলি পাতার আড়াল থেকে
> বঙ্গবাসী পথিকের মন হরে।

দু'দিক দিয়ে লতা-গুল্মের বেড়া,
চলে' গেছে মাঝে সরু বীথি,
শ্যামলার শ্যাম যুগল বেণীর মাঝে
শোভা পাচ্ছে শুভ্র একটী সিঁথি!
দুর্লভ সুখের মত কচিৎ কোথা
চোখে পড়ে পল্লীপথে যেতে
পাকা সোণার কেশর শোভা বুকে,
জাফ্‌রাণ-কলি ফুট্‌ছে ক্ষেতে ক্ষেতে।
লাদাক্ হ'তে চামর-পুচ্ছ ঘোড়ায়
কস্তুরীভার আসে যেমন নেমে,
চিত্রল হ'তে দুধের মত ধারা
তেমনি নেমে গেছে হেথায় থেমে।

'মেঘরাজ্যে'র প্রথমেই,

সপ্ত হাজার ফিট উচায় চড়ে' ঘাড়টা কল্লাম খাড়া
নীচের দিকে হেলায় চেয়ে গোঁফে দিলাম চাড়া
ঠেকল নীচুটা যতই নীচু যতই নাকি দূর
মনে হ'তে লাগ্‌ল নিজকে ততই বাহাদুর

—প্রভৃতির মধ্যে ভাবের স্বাভাবিকতা ও সরলতা বড়ই উপভোগ্য। বস্তুতঃ কাব্যখানির মধ্যে ভাবের স্বচ্ছতা, সূক্ষ্মতা, ও মৌলিকতা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। কবিত্বও বন্যপ্রকৃতির অযত্নবিন্যস্ত পুষ্প-সম্পদের মত চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বোবা যেমন রূপের স্বপন দেখে
—বুক ফাটে তার প্রকাশ নাহি জানি'
"আমরা মরি জ্ঞানের বোঝা বয়ে'
সহজ সত্য সরল প্রাণেই ফোটে,
প্রজাপতি জেঁকেই বসেন ফুলে,
মধু যা' তা' কালো ভোমরাই লোটে।"
"ঝড়ে মরা একটা বিভীষিকা
জ্যোৎস্না রাতে মরণ একটি সুখ"
"দেখার সাধ শোনায় মেটে কবে?
রসনার ত' নেই রূপের স্বাদ,
ভাষার ত নাই সহস্র লোচন,
মানস পদ্মের মধু মনই লোটে,
প্রাণের চোখেই ধরা পড়ে স্বপন!"
"কোথাও পাহাড় কঠিন-নীলের ছবি
তরল-নীরে মুখ বাড়িয়ে দ্যাখে
সিন্ধুর হো হো গানের ফাঁকে ফাঁকে
প্রপাতের রব লম্পের মত ঠ্যাকে।"

"মনে আছে সেদিন পৌর্ণমাসী
ছাদে গিয়ে বস্‌লাম চুপটি করে'
পুব, পশ্চিম দুই আকাশের গোড়ায়
ধীরে ধীরে আগুন উঠ্‌ল ধ'রে!"
"পেছন থেকে হঠাৎ ছাপিয়ে চোখ
হাতটুকু তার মুঠার মধ্যে রাখি
সদ্য-ধরা বুনো পাখীর মত
ছট্‌ফট্ সে করে থাকি' থাকি'।

'কবিপ্রয়াণ সঙ্গীত' নামক কবিতাটি ভাবে ও ভাষায় অনবদ্য।

"অমৃত পোড়াতে গিয়ে শ্রান্ত শুধু চিতা,
মরিয়া অমর হয় কবি ও কবিতা।"

কি সত্য! কি সুন্দর!

'মরুভূমি' শীর্ষক কবিতাটি মৌলিকতা ও ভাবগৌরবে কবিশক্তির সম্যক্ পরিচয় দিতেছে। 'তুষার হইতে বিদায়' বর্ণনাসৌন্দর্য্যে ও কবিজনোচিত আন্তরিকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

কাব্যখানির দুইটি প্রধান দোষ আছে। প্রথম, লিপিকর প্রমাদ। ছাপা, কাগজ, মলাট এত সুন্দর না হইয়া যদি বর্ণাশুদ্ধি কম থাকিত, তাহা হইলে গ্রন্থের প্রকৃত গৌরব বৃদ্ধি হইত। দ্বিতীয় দোষটি, কবির নিজের অসাবধানতা। কাব্যখানির অধিকাংশ ভাগ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা, অথচ কবি মাত্রার quantity সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন।

কাটিয়েছিলাম লম্বা একটা ঝিল,
সারসগুলো বেড়াত সে ঝিলে
শানবাঁধা ঘাট থেকে 'জলি' বোট
জল খেল্‌তে ডাক্‌ত সন্ধ্যা প্রাতে।
ঝিলের পারে পারে মসৃণ 'লন';
শ্যামল কোমল মখমল যেন পাতা
উদ্ভিদ্ রাজার গ্রীণ রঙ্গের তাঁবু—
ঝোপ, ধরতো জল বৃষ্টিতে ছাতা।

উপরি উদ্ধৃত অংশে বেশ দেখা যাইতেছে,পদগুলি 'দশমাত্রিক (decasyllabic); কিন্তু সকল স্থলে মাত্রার পরিমাণ সমান নাই। একারণে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, ও অষ্টম পদ শ্রুতিকটু হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে মিলও নাই। এইরূপ অসাবধানতা অনেক স্থলে সুকবিতার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

এখানে দেখিতে হইবে 'গৈরিক' কাব্যে কবির কোন্ পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহার ভাববধূর কোনরূপ আমরা দেখিতে পাই। কবির কাব্যসৃষ্টির বিশেষত্ব কি? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয় যে, কাব্যে একটু অধিক

মাত্রায় কবির ব্যক্তিত্ব-প্রকাশ আছে; কাব্যখানিকে কবির journal বলিলেও হয়। তাহাতে কবি বিশেষভাবে আপনার জগতটির মধ্য হইতে, আপনার সংসারটির মধ্য হইতে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। কল্পনায় নিজকে একটুও ছাড়িয়া উঠিতে পারেন নাই— তাঁহার বাগানটি, তাঁহার 'জলি'-বোটখানি, তাঁহার বাড়ির শাশিগুলি পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই;—ছেলে মেয়েদের ত কথাই নাই। কবি নিজেই বলিতেছেন,—

"ক্ষমা কর, পাঠক, কথা বেড়েই শুধু যায়,
পিতা আমি, পিতা যারা, বুঝবে তারা আমায়।
সাতটি নয় পাঁচটি নয়, আমার তিনটি ধন,
এদের কথা বল্‌তে বল্‌তে হয়ে যাই কেমন!
বুঝি, এটা দুর্ব্বলতা! পরের এত কথা,
শুনতে কার বা দায় পড়েছে, এতই মাথাব্যথা।
তবু এটা অতি সত্য, আমার গোলাপ গাছে
তিনটি কুঁড়ি আলো করে' শোভা করে' আছে।"

কবি এখানে শুধু কবিরূপে নহে, মানুষরূপে আপনাকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; এমন কি, স্থানে স্থানে ভাবের সরলতায় আপনার প্রাণটিকে একেবারে নিরাবরণ করিয়া দেখাইবার অতিমাত্র আগ্রহে ফল বরং বিপরীত হইয়াছে, তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাহা হউক এ সকল হইতে আমাদের একটি লাভ হইয়াছে কবির কবিত্বই শুধু উপভোগ করি নাই, কবির মর্ম্মস্থানটিরও পরিচয় পাইয়াছি।

পরিচয় পাইয়াছি, তাঁহার কল্পনা অতিমাত্রায় সৌখীন। তিনি সুখের কবি। সুখের কবি বলিতে আমি Browning এর মত Optimist কবি বা, আরও নিকটে—দেবেন্দ্রনাথের মত সদানন্দ, সৌন্দর্য্য-বিভোর কবি বলিতে পারিলাম না। 'গৈরিক' পড়িয়া মনে হয়, তিনি ফুলের মধু ও গন্ধ লুটিয়াছেন, কাঁটার ব্যথা পান নাই। তাঁহারই ভাষায় তাঁহার—

"জগৎ যেন সুখের একটি 'ফটো'
প্রাণটা যেন শুধুই জ্যোৎস্নারাশি।"

ভাবগুলিকে তিনি "ভাষার পোষাক পরিয়ে ফুল বাবুটির মত" বাহির করিতে চান। তিনি দুঃখ হইতে সুখের নির্য্যাস বাহির করিতে পারেন নাই। জগতের সকল দুঃখদৈন্যের উপর আনন্দ-রস সেচন করাই মহাকবির কাজ। তাহা না পারিলেও জগতের দুঃখগুলিকে আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া, অশ্রুময় সঙ্গীতে মানবের প্রাণে প্রাণে তীব্র সহানুভূতির উদ্রেক করাও কবিদিগের পুণ্যব্রত। দুঃখের ভাগ সকলে লইতে পারে; দুঃখকে সুখের রূপে ধরিলেও মানব সান্ত্বনা লাভ করে; কিন্তু কোনও বিশেষ অবস্থায় কবি যে বিশেষ সুখ ভোগ করেন, ঠিক সেই অবস্থায় না পড়িলে অপরে সে সুখের ভাগ লইতে পারে না। যে সুখ বা দুঃখ সার্ব্বজনীন নহে, কাব্যে তাহার স্থান অল্পই। বিলাসীর ennui যে দুঃখ, বা কবি তাঁহার কল্পনায় যে দুঃখের উদ্বোধন করেন তাহাও প্রকৃত দুঃখ নহে। 'গৈরিক' কাব্যে যে দুঃখের আভাস আছে, তাহা অধিকাংশ স্থলে সুখের মৃদু শ্বাস, দুঃখের দীর্ঘ শ্বাস নহে; যে সুখের সুর আছে তাহা Drawing room এর সুখচিত্র— সারাদিবসের কর্ম্মক্লান্তির পর সে সুখের আস্বাদ পাওয়া যায় না।

'গৈরিকে'র কবি তাঁহার কবিজীবন সম্বন্ধে নানাস্থানে নানা আভাস দিয়াছেন। কোথাও বলিতেছেন,

"আর কিছুর বা ধারি নাই রে ধার,
কাব্যলেখা চল্‌ছে বারোমাস;"

আবার কোথায়ও,—

"দেখেছিলাম ছবির মত দেশ
কবিজন্ম করেছিলাম সফল"
" 'ডল'—হ্রদে 'শিকারা'—ডিঙ্গায়
বাচ লাগিয়ে যেতাম দিনের মত।"

এ সব শুনিলে, বাস্তবিক হিংসা হয়, এবং পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের মত কবি হইতে বড়ই সাধ যায়। কবি অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন,

"ছেড়ে দাও হে প্রকৃতি লোকালয়ে ফিরিব এ বেলা,
স্বার্থ যেথা পরমার্থ রূপচর্য্যা তুচ্ছ ছেলেখেলা।"

ইহার টীকার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি এ কাব্যে আপনাকে একেবারেই ঢাকেন নাই।

আর একটিমাত্র কবিতার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব—সেটির নাম 'আমার বাগান'। কবিতাটি পড়িতে পড়িতে Tennyson এর Palace of Art. মনে পড়ে, এবং কবি যেন এ কবিতায় প্রকারান্তরে আপনার সমালোচনা আপনি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কবি একটি বাগান রচনা করিয়াছিলেন; প্রকৃতি এবং শিল্পকলা তাহাকে মর্ত্তের নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছিল; কবি তাহার মধ্যে দিবারাত্র রূপচর্য্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। মালীর একটি "টোপাগালী, ঝাঁকড়া চুলী সাত বছরের মেয়ে"—"লাল গোলাপের রাঙ্গা হাসির মত সোণা মেয়ে," —তাঁহার কবি-হৃদয় কাড়িয়া লইল। বাগানের সৌন্দর্য্য-দেবতা যেন এই দেহ ও প্রাণ অবলম্বন করিয়া তাঁহার রূপচর্য্যার পুরস্কার দিতে আসিল। প্রাণ যখন ভরপুর, তখন ঘটনাক্রমে সেই সোণা মেয়ে পাহাড় হইতে পড়িয়া গিয়া ঝটিকাহত বনবিহঙ্গীর মত মরিয়া গেল। কবি বাগান পরিত্যাগ করিলেন; যাহা সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন ছিল, তাহা সর্পসঙ্কুল লতাগুল্মকণ্টকে ভরিয়া উঠিল, উৎসব প্রাঙ্গণ বিষাদের আগারে পরিণত হইল। ইহাই প্রকৃতির পরিশোধ। নিছক রূপচর্য্যা মানব-প্রাণের স্বাস্থ্যহানি করে,—তাহার মধ্যে যদি সত্যের সাধনা না থাকে তবে তাহা আধ্যাত্মিক কল্যাণকর হয় না। অসুন্দরকে ত্যাগ

করিয়া শুধু সুন্দরকেই বুকে টানিলে বুক শীতল হয় না,—সুন্দর এবং অসুন্দর, উভয়কেই সমান আদরে গ্রহণ করিতে হইবে—এই দুই'এর সমন্বয় যিনি করিতে পারেন, তিনিই নিত্যসুন্দরের দেখা পান এবং তাঁহার রূপচর্য্যাই সার্থক হয়। লোকালয় হইতে দূরে, কুৎসিতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আপনার চতুষ্পার্শ্বে সৌন্দর্য্যের প্রাচীর তুলিয়া রূপচর্য্যা করিলে, বহির্জগতের হাহাকার হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না—জড়-সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রাণকে চাপিয়া রাখিলে, শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতি মালীকন্যারূপেও প্রতিশোধ লইতে আসিবে—প্রাণটাকে ছিঁড়িয়া সচেতন করিয়া দিবে। এই অর্থে—"আমার বাগান" কবিতাটি মনোরম হইয়াছে। কবিতাটি কবির হৃদয় দিয়া লেখা।

কবি প্রমথনাথ শক্তিশালী লেখক বলিয়া আমরা এত কথা বলিলাম—আমরা তাঁহার পরিণত লেখনী হইতে অনেকআশা করি। তাঁহার মত কবি যদি 'অবশেষে Album poet রূপে কবি-জন্ম সফল করা শ্রেয় মনে করেন, তবে তাহা অপেক্ষা আর অধিকতর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে!

উজানি।

'বনতুলসী' 'শতদল' প্রভৃতির পরিচিত কবি শ্রীযুক্ত কুমদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের 'উজানি' কাব্য পাঠ করিয়া নূতন আনন্দলাভ করিয়াছি। কুমুদরঞ্জন বাবুর লেখাতে আধুনিক কবিকুলের আর্ট্‌সর্ব্বস্ব অনুকরণলাঞ্ছিত প্রতিভার প্রভাব নাই; তাহাতে চিন্তার লূতিকা জাল ও Idealism এর বাড়াবাড়ি নাই। কবির উদ্দেশ্য দূর হইতে সৌন্দর্য্য অন্বেষণ নহে, তিনি আত্মীয়, পরিচিত, প্রতিবেশী, স্বগ্রামবাসী মানব-মানবীর মধ্যে আপনার সহৃদয়তা দ্বারা মর্ম্মস্থানটি অন্বেষণ করিয়াছেন—সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখ—Familiar matter of to-day—তিনি আপনার হৃদয়নিহিত প্রেমের সাহায্যে পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া বাণীর চরণে অঞ্জলি দান করিয়াছেন। বহিঃপ্রকৃতি তাঁহার আর্টের বিষয়ীভূত নয়, তিনি মানুষের হৃদয়খানির উপরে আপন হৃদয়ের আলোকপাত করিয়াছেন এবং কোনও খানে সে আলোক ব্যর্থ হয় নাই। তিনি যে মানবহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সনাতন মানবহৃদয়, নহে, তাহা নাগরিক সভ্যতা-গর্ব্বে গর্ব্বিত হৃদয় নহে। এ কাব্যে অসংযত কল্পনার অবাধ প্রশ্রয় নাই। প্রেমের প্রলাপ নাই এবং আড়ষ্ট ছন্দের বিভীষিকাময়ী তাণ্ডব লীলাই ইহার শ্রেষ্ঠ গৌরব নহে।

'উজানি'র কবি তাঁহার পল্লীমাতার নামেই কাব্যের নামকরণ করিয়াছেন। কবির অকৃত্রিম স্বগ্রামপ্রীতি কবিতাগুলির মধ্যে অতি স্নিগ্ধ নির্ম্মল ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃত্রিমতা-কলুষিত নাগরিক জীবনের সৌখীন কল্পনা ও সৌখীন হা-হুতাশের 'কাব্যি' হইতে এই কাব্য একেবারেই নির্ম্মুক্ত। এ জন্য কবিতাগুলি পাঠ করিবার কালে যেন স্বাভাবিক মানব-হৃদয়কে আপনার হৃদয়ে ফিরাইয়া পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। অতি ক্ষুদ্র সুখ দুঃখও ক্ষুদ্র নহে, তাহাদিগকে বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য idealising fancyর প্রয়োজন নাই; ভক্তি, প্রীতি, ও প্রেমই ভুখণ্ডগুলিকে স্বর্গীয় মহিমায় মণ্ডিত করে, কবি এই তত্ত্বটি আপনার সমবেদনাপ্রবণ পল্লীজীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া আমাদের হৃদয়ে অতি সুন্দর সরস রচনা দ্বারা মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাকে যে ধন্যবাদ দিতেছি, তাহা সমালোচকসম্প্রদায়বিশেষের নিত্যকৃত্য হিসাবে নয়, প্রাণের আবেগে এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। তাঁহার কবিতাগুলির অধিকাংশই অশ্রুসিক্ত, কিন্তু সে অশ্রু দেবদুর্লভ স্নেহ ভক্তি প্রীতি ও সহানুভূতির অরুণকিরণে সমুজ্জ্বল। সে অশ্রুর পাশে যে হাসি আছে, তাহা পবিত্র; একটি মহান্ লয়ের মধ্যে সকল বেদনার ঝঙ্কারের অবসান হইয়াছে। তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে মস্তিষ্কের মধ্যে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হয় না, অতি সুমধুর ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়। এই সকল গুণেই কাব্যখানি নূতনত্ব ও বিশিষ্টতার দাবী করিতে পারে।

তথাপি কবির রচনারীতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা উচিত মনে করি। 'উজানি'র কবিতাগুলির মধ্যে সাধারণতঃ কোথায়ও ভাবের তাল কাটে নাই বটে, কিন্তু ভাষা, ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে কবির আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মিলের খাতির তিনি অনেক স্থলেই রাখেন নাই, ছন্দ সর্ব্বত্র সুনির্ব্বাচিত হয় নাই, এবং ভাষা স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ ও দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয়। বলিবার কথা যতই মধুর হউক, ভাব যতই অকৃত্রিম হউক, সৌন্দর্য্য-পরিণতির জন্য ভাষা ও ছন্দের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতেই হয়। প্রকাশের ক্ষমতাই কবির শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা, এবং তাহার জন্য ভাষা, ছন্দ ও মিলের দিকে দৃষ্টি রাখিতেই হইবে। অবশ্য 'উজানি'র কবির যে সে দৃষ্টি একেবারে নাই, তাহা নহে; বরং আছে বলিয়াই, যেখানে নাই, সেখানে বেশী করিয়া চোখে পড়িয়াছি। কুমুদবাবু বাণীর সাধনায় সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এখন তাঁহাকে উপদেশ দিবার সময় আর নাই, তথাপি গুণমুগ্ধের নিবেদন অগ্রাহ্য হইবে না,এরূপ আশা করিতে পারি।

মধুব্রত।

বিল্বদল—(কাব্য) শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত। আজকাল কাব্য পাঠ করিতে হইলেই মনে একটা আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়; ভাব ও ভাষার অভিব্যঞ্জনার একটা উৎকট চিত্র দেখিতে হইবে মনে হয়; কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাহার কিছুই দেখিতে না পাইয়া আনন্দিত হইয়াছে। প্রথমপর্বের 'প্রেমান্ধ' ক্ষুদ্র কবিতাটি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে, আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"আপনা বিলাতে বিশ্বে নদী ছুটে যায়,
তট রহে সাথে সাথে তার,
সে ভাবে তাহারি নদী বাঁধা বাহুযুগে
এ জগতে নহে কারো আর!"

অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত গাথা 'রূপ' সুন্দর হইয়াছে; ভাষার উপর কবির যে অধিকার আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়; এক স্থলে কবি বলিতেছেন,—

"ওগো রূপ, জয় তোর জয় চিরদিন!
এ জগত মুগ্ধ হ'য়ে তোর পানে চাহি
রবে জানি চির-নির্নিমেষ। প্রতিদিন
গোপন মঞ্জুষা তোর মুগ্ধের নয়নে
খুলিয়া দেখিবে কত চারু নবীনতা!
হাতে লয়ে তোরে যবে বাঁশীর মতন
যৌবন-দেবতা বসি বাজাবে লীলায়,
কত শত প্রেমগান পড়ি যাবে ধরা।

যখন রূপের মোহকে প্রেমের পূজ্য আসনে বসাইয়া মানব রূপ-মদিরায় বিহ্বল হইয়া থাকে, তখন সে উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারে না। কবির ভাষায় বলি,—

'প্রেম? হারে মূর্খ
প্রেম তুমি কহ কারে?—সে ত নহে পাখী,
উড়ে যাবে ভেঙ্গে গেলে নীড়খানি তার!
সে যে মোহ! রূপে বেড়ি জেগে বসেছিল
চিত্ত তব এত কাল।'

রূপের নেশা না টুটিলে প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় পর্বে 'রজনীর দান' 'রাত্রিশেষ' "বর্ষাকথা' ও তৃতীয় পর্বে 'আরম্ভ," প্রাণভিক্ষা ও 'স্বাস্থ্য কবিতাগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। প্রাণ ভিক্ষায় কবি বলিতেছেন,—

"দাও লক্ষ দুখ শোক,
লক্ষ লাজ ভয়,
দাও দৈন্য প্রতিদিন
নব বিস্ময়,
তুচ্ছ বলি সবে আমি
করিব গেয়ান,
শুধু চাই প্রাণ!"

প্রাণ না পাইলে, সহানুভূতি না পাইলে সংসারে ত চলা যায় না—শুধু গান গাহিয়া দুঃখদৈন্যের মোচন হয় না—গানের পশ্চাতে প্রাণ থাকা চাই—

"গান সেথা শক্তিহীন
কথারি তুফান,
চাহিনা চাহিনা গান,
দাও দাও প্রাণ।"

"স্বাস্থ্য" কবিতাটি আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি; যে কথা একদিন আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাই কবি সুন্দর ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস অনুশীলন করিলে কালে ইনি সুকবি হইতে পারেন। পুস্তকের পত্রাঙ্ক ৮৬। ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

পুস্তক পরিচয়

পুষ্পহার।—শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী প্রণীত, বাঙ্গালী মহিলাদিগের মধ্যে যাঁহারা ছোট গল্প লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, বর্ত্তমান গল্পলেখিকা তাঁহাদের অন্যতমা। সাতটি ছোট গল্পে এই পুষ্পহার গ্রথিত। ইহার কএকটি

আমরা পূর্ব্বেই মাসিক পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম। গল্পের দুই চারিটি ইংরেজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত, মৌলিক গল্পও আছে। স্পষ্ট অনুবাদে, বা বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে বাঙ্গালা গল্প লিখিলে কোনও দোষ নাই; কিন্তু লোকের কেমন মতি যে তাঁহারা সেই কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিতে চান না। লেখিকা এ দোষ করেন নাই। তাঁহার লেখা বেশ সরল ও সুন্দর, কোন রকম ভাষার মারপেঁচ নাই, কতকগুলি শব্দকে যদৃচ্ছ ব্যবহার করিয়া একটা অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি করিয়া বর্ণনার বাহাদুরী দেখাইবার নিষ্ফল প্রয়াস এই গল্প কয়টিতে নাই। বেশ একটানে পড়িয়া ফেলা যায়। লেখিকা মহোদয়া প্রচলিত রীত্যনুসারে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কএক খানি ত্রিবর্ণ ও একবর্ণের ছবিও দিয়াছেন।

পদ্মিনী।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। লেখক মহাশয় বাঙ্গালী পাঠকগণের অপরিচিত নন; তাঁহার প্রণীত 'কুল-লক্ষ্মী' 'সাবিত্রী সত্যবান্' 'শৈব্যা'—এই তিনখানি পুস্তকই বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে; তাঁহার 'সাবিত্রী-সত্যবান' পুস্তকখানিরও বহুল প্রচার হইয়াছে; এবং আমাদের বিশ্বাস সমালোচ্য পুস্তক 'পদ্মিনী' সাবিত্রী সত্যবানের ন্যায়ই আদর লাভ করিবে। ভীমসিংহ-মহিষী পদ্মিনীর জীবনকথা, অপূর্ব্ব-নারী-গর্ব্বের অবসান, জহর-ব্রত, চিতোরের সর্ব্বনাশের কাহিনী অনেকেই পাঠ করিয়াছেন; কবিবর রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান পূর্ব্বে সকলেই পড়িতেন, সকলেই রঙ্গলালের অপূর্ব্ব কবিতা আবৃত্তি করিতেন। তাহার পর যাত্রায়, নাটকে, নানা ভাবে এই পবিত্র কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে; সুরেন্দ্রবাবুও সেই সতীর কথা লিখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন; তাঁহার বর্ণনাকৌশল সুন্দর, ভাষাও ভাল। তাহার পর পুস্তক খানির ছবি ছাপা, কাগজ ও বাঁধাইয়ের কথা। দেড়টাকা মূল্যের একখানি বাঙ্গালা পুস্তককে এমনভাবে সুশোভিত ও সুসজ্জিত হইতে পূর্ব্বে দেখি নাই। ত্রিবর্ণ ও একবর্ণের চিত্রে পুস্তকখানি পরিপূর্ণ; আবার চিত্রগুলিও যেমন তেমন নহে, সব কয়খানিই সুপরিকল্পিত ও সুচিত্রিত, দেখিবার মত—ছবি বলিয়া কালীঘাটের পটের সমাবেশ নহে। পুস্তকে চিত্র দিতে হইলে এই প্রকার সুন্দর চিত্রই দিতে হয়। পুস্তকের ছাপা ঝরঝরে, কাগজ অতি উৎকৃষ্ট, আর বাঁধাই—তাহা এদেশের বাঙ্গালী দপ্তরী যাহা করিতে পারে, তাহার সর্ব্বোচ্চ নিদর্শন। সুরেন্দ্রবাবু বইখানির জন্য যত্ন চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই; তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে।

নানান নিধি।—৩০টি নিবন্ধ একত্র করিয়া প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। সাহিত্য-সংসারে তিনি সুপরিচিত, তাঁহার পরিচয় দিবার কোনরূপ আবশ্যকতা নাই। পুস্তকের পূর্ব্বভাষে গোস্বামী মহাশয় বিনয় সহকারে বলিয়াছেন,—"খাদ্য দ্রব্যের ভিতর ভাল মন্দ—কটু—তিক্ত—অম্ল মধুর সব রকমই ত থাকে, তবু লোকে যেমন বলে—নানান্ নিধি, আমার এ নানান্ নিধি তেমনই। ইহাতেও কটু—তিক্ত অম্ল—মধুর প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃত রসের সমাবেশ আছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই অপ্রাকৃত রসের ছিটা ফোঁটাও আছে। বলা বাহুল্য অপ্রাকৃত-রস বলিতে আমি ভগবদ্ভক্তি রসকেই লক্ষ্য করিয়াছি।" আমরা কিন্তু পুস্তকখানি বহুবার পাঠ করিয়াও কটু—তিক্ত—অম্ল রসাস্বাদন করিতে পাই নাই—পাইয়াছি কেবল মধুর-মধুর রস। পুস্তকখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের বাস্তবিকই অমূল্যনিধি। আমাদের বিশ্বাস 'রাম-কৃষ্ণকথামৃত' বা 'কাঙ্গাল হরিনাথের উপদেশের' পর এমন সুন্দর সহজ সরল ভাষায় বিবৃত চারিত্র ও নীতিপূর্ণ উপদেশা-বলী, আর বাহির হয় নাই। ধর্ম্মের নামে সংকীর্ণতার প্রচার কোথাও নাই। পুস্তকের ভাষা কবিত্বময়ী—ভাবসম্পদ্ অনবদ্য। 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম' 'পিঞ্জরের কোকিল' 'বায়সকোপ' 'জালিবোট' 'বন্যা' 'ফুটবল' 'আলারম সিগনেল' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পাঠ করা উচিত। হোলিহায় প্রবন্ধে তাঁহার প্রত্নতত্ত্বানুরাগ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এক্ষণে এখানে দু একটি নিধির উদ্ধার করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না:—বর্ণা-শ্রম ধর্ম্ম প্রবন্ধে গোস্বামী মহাশয় লিখিতেছেন,—"যাহার যেমন অধিকার সে সেইরূপ ধর্ম্মই আচরণ করিবে। এ

দেশের ধর্ম্ম প্যাটেণ্ট ঔষধ নয়। যদি অধিকারী হইয়া থাক, সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানকে চিনিতে পারিয়া থাক ত, সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ কর, ক্ষতি নাই। আর না হইয়া থাক,—অল্পাধিকারী তুমি সাধনরাজ্যের শিশু তুমি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই তোমার শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়। চলচ্ছক্তিহীন শিশুর পক্ষে জননীর অঙ্কই উৎকৃষ্ট আশ্রয়, তথায় থাকিয়া বলসমৃদ্ধ হও,—তারপর বাহিরে যাইলেও পড়িবার ভয় থাকিবে না। পায়ের বল জন্মাইতে না জন্মাইতে মায়ের কোল ছাড়া হইলে পদে পদে পতন-যাতনা সহ্য করিতেই হইবে।

অপুষ্ট অজাতসার বৃক্ষের জন্যই বেষ্টনের ব্যবস্থা। তখনই ত ছাগল গরুর ভয়। আলগা পেলেই তারা এসে গাছটিকে মুড়িয়ে খেয়ে যাবে। কিন্তু বেড়ার ভিতরে থাকিলে গাছের আর সে ভয় থাকে না। সে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে। তাহার অন্তরে সার জন্মায়। তখন বেড়া থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে বড় এসে যায় না। তখন শত সহস্র ছাগল গরুতে আর তাহার কিছু করিতে পারিবে না। গাছের ভিতরে সার জন্মিলেই গুঁড়ি মোটা হয়, বেড়াও আপনা আপনি ভেঙ্গে যায়; তখন আর যত্ন করে ভাঙতে হয় না! বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ধারণাটাও তাই; এই ধাতের।"

অন্যত্র "গাছের বেগুণটা পুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তাহার মুখের ফুলটি খসাইয়া ফেলা কি লাভজনক? খিলানটার আঁট বাঁধিয়া গেলে কালবুত ভাঙ্গিয়া ফেল, ক্ষতি নাই। * * * বেগুণটা সুস্পষ্ট হইলে মুখের ফুল আপনা আপনি খোসে পোড়্বে।"

'সে কালের নন্দোৎসব' ও 'মায়ের বোধন' প্রবন্ধে যে সকল সামাজিক আনন্দোৎসবের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়, তাহা অধুনা বিরল। তখন সমাজে একটা নিরাবিল আনন্দ ছিল, আজ সেগুলি সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!

এ পুস্তকখানি আমরা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গৃহপঞ্জিকার মত বিরাজিত থাকিতে দেখিলে আনন্দিত হইব। পুস্তকখানির পত্রসংখ্যা ২১৬।

বুকের বোঝা—পত্রোপন্যাস। শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। জনৈক ব্যর্থ-প্রেমিক নিষ্ফল প্রণয়ের জ্বালা দূর করিবার জন্য সংসারবিরাগী হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রকৃতির কোলে আশ্রম বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার বুকের বোঝা নামাইবার জন্য তাঁহার বন্ধুকে যে সকল পত্র দিয়াছিলেন, সেইগুলি একত্র করিয়া 'বুকের বোঝা' বাহির হইয়াছে। এ শ্রেণীর পুস্তক বাঙ্গালায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল বলিয়া আমাদের ধারণা। মহাকবি গেটের Sorrows of Werter পুস্তকের ছায়াবলম্বনে বোধ হয় এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। পত্রগুলি মর্ম্মস্পর্শী করুণ কাহিনীর জ্বলন্ত গাথা—ইহাতে অরুন্তুদ যাতনার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগম আছে—আবার শান্তির বিমল ছায়াও আছে, সুখ দুঃখের, জীবন মরণের—এপার ওপারের দার্শনিক তত্ত্বগুলির সুমীমাংসাও আছে। পুস্তকখানির ভাষা উচ্ছ্বাসময়ী—পার্ব্বত্য নদীর অবাক্ত মধুর কুলু কুলু ধ্বনির ন্যায় তর তর বেগে ছুটিতেছে। তবে দু একস্থলে উচ্ছ্বাসের মাত্রা যে একটু অধিক হইয়াছে, তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম। উষার সমুদয় স্তোত্রগুলি শ্রুতি হইতে উদ্ধার না করিলে ভাল হইত। ১৮৭ পৃষ্ঠায় স্বপ্নের দার্শনিক তত্ত্ব যাহা তিনি বিবৃত করিয়াছেন, তাহা সাধারণ পাঠকের দুর্ব্বোধ্য; আবার ৯৪ পৃষ্ঠায় তিনি মৃত্যুর সংজ্ঞা দিয়াছেন, "অমৃতময়ের ব্যষ্টি-চৈতন্যকে চৈতন্য সমষ্টিতে মিলিত হইবার নির্দ্দিষ্ট আহ্বান।" কথাটা আর একটু বিশদভাবে বুঝাইলে ভাল হইত। আলোচ্য গ্রন্থে উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের ছায়াও মাঝে মাঝে পড়িয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্যে, ভাবের আবেগে, প্রকৃতির চারু বর্ণনায় শব্দকুশলতায় এখানিকে কাব্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একটি কথা আমরা লেখক মহাশয়কে বলিতে চাই—করুণার স্মৃতি ভুলিয়া বঙ্গবালা যমুনার প্রতি যদি তাঁহার নায়কের মন টলিল, বাস্তবতার দোহাই দিয়া যদি অবৈধ প্রণয়ের চিত্রটি অঙ্কিত করিতে হইল, তবে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আত্মহত্যার চিত্র না আঁকিলেই বোধ হয় ভাল হইত—সকল প্রেমের আধার ভগবানে ব্যর্থ-প্রেম সমর্পণ করিয়া নায়ক ধন্য হইতে পারিত। পরিশেষে লেখক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি Sorrows of Wereter এর নায়ক লেখক স্বয়ং গেটে—এ গ্রন্থের নায়ক কে? তিনি না বলিলে বোধ হয় সময় সকল রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে। ছাপা কাগজ বাঁধাই ভাল; কিন্তু প্রেসের ভূতের দৌরাত্ম্য বড় বেশী।

পাষাণী—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম, এ প্রণীত। এখানি ছোট গল্পের বই। প্রথম গল্পের নাম হইতে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৮টী গল্প আছে। কৃষ্ণবাবু একজন উদীয়মান লেখক। তাঁহার প্রথম পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। গল্প রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব আছে। যে কলা-কৌশল অবলম্বন করিলে ছোট গল্প রচনায় সিদ্ধকাম হওয়া যায়, তাহার পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে বেশ পাওয়া যায়। যত্ন করিলে কালে হান সাহিত্য-ক্ষেত্রে গল্পলেখকদিগের মধ্যে সুপরিচিত হইতে পারিবেন। কৃষ্ণবাবুর গল্পগুলির মধ্যে 'পাষাণী' 'ছিন্নমুকুল' 'ভিখারী' 'পুণ্য রঞ্জন' 'ছবির দাম' বিয়োগান্ত, এগুলিতে করুণ-রসের একটা প্রবাহ আছে। দেশে আজকাল এমন একটা আবহাওয়া আসিয়াছে যে, গল্পগুলি বিয়োগান্ত না করিলে লেখক মহাশয়েরা মনে করেন যে,

পাঠকের মনোরঞ্জন করা যায় না। এ কথাটা কিন্তু খুব সত্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। মানবের নানা বিষয়িণী চিত্তবৃত্তির উন্মেষ করিয়া চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইতে পারে। পরিশেষে লেখক মহাশয়কে একটা কথা বলিতে চাই। 'পাষাণী' গল্পে রমেশের প্রতিহিংসার মাত্রা আমাদের বোধ হয় একটু বেশী হইয়াছে।

কুবলয়—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম, এ প্রণীত। ইহাতে ৫০টি ছোট ছোট কবিতা আছে। 'কবি''জ্যোতিষী' 'গান' 'পাষাণী' 'কুটিরে' 'পাতালে' 'অরলিকা' 'দানে দীন' প্রভৃতি কবিতাগুলি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। ভাব ও ভাষা কোনখানে আড়ষ্ট হইয়া নাই। 'কুটীরে' কবিতাটিতে দুঃখ দৈন্যের ভিতর বাঙ্গালী কৃষাণের যে ভগবানে নির্ভরতা ও ভগবদ্ভক্তির যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিকই মর্ম্মস্পর্শী। কৃষাণীর ভবিষ্যৎচিত্র—"কৃষাণের প্রতিশ্রুতি পঁইচা রূপার" চিত্র সুন্দর। নিম্নে আমরা একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"এ জগত মাঝে
মাথা রাখিবারে শুধু এইটুকু আছে—
তা'ও বুঝি যায় আজ, এ ঘোর দুর্য্যোগে!
ভ্রূক্ষেপ নাহি তাহে, শুধু মনে জাগে
হর্ষোৎফুল্ল হৃদি-মাঝে ভক্তিপূর্ণ বাণী
ঠাকুর শুনেছে আজ সে প্রার্থনাখানি।
পাঠায়েছে আশীর্ব্বাদ বৃষ্টি-ধারাটিরে,
ভবিষ্যের শত আশা বুকে জাগে ধীরে।

'দানে দীন' কবিতায় একদিন প্রেম-বিহ্বল হাফেজ প্রেয়সীরে ডাকিয়া বলিল,—

"রক্ত কপোলে যে তিল ফুটিয়া
ও তিলের তরে দিতে পারি আমি
বোখরা—সমরখন্দে,—"

কথাটা যখন সম্রাট্ তৈমুরশাহের কাণে উঠিল, তখন তিনি কবিকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন কবির ভাষায় বলি :—

"ওগো বাদশাহ রাজ!
যাহা কিছু আছে দামী,
সুন্দর তরে খরচ করিয়া
চিরকাল ফিরি আমি;
হ'য়ে গেছে এই আমার স্বভাব,
তাই ত দৈন্য মেটেনা অভাব,
শোভার লাগিয়া সন্ন্যাসী তাই—
ফিরি সে দিবস যামী।"

এই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কবিবর দেবেন্দ্রনাথ 'তিল' লিখিয়াছেন, আর সুকবি করুণানিধানেরও 'কাণের পিঠের তিলটি তোমার এড়ায়নিকএ মুগ্ধ চোখ; কিন্তু কবি কৃষ্ণচন্দ্র হাফেজের মুখে বলাইয়াছেন, কবি তিলের জন্য বোখরা সমরখন্দ দিতে, সর্ব্বস্ব দিতে, প্রস্তুত। কৃষ্ণচন্দ্র বাস্তবিকই সৌন্দর্য্যের উপাসক।

কবির অনুবাদে যে হাত আছে, তাহা 'গান' ও 'পাষাণী' হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। 'উৎসব'হইতে আরম্ভ করিয়া যে কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে, সেগুলি 'আধ্যাত্মিক' কবিতা। অনেক স্থলে রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা ও ছন্দের অনুকৃতি ও ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণবাবুর দুইখানি পুস্তকেরই ছাপা ও কাগজ ভাল।

গীতা—শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী সম্পাদিত। গীতার এই অভিনব সংস্করণটি পাইয়া আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি। অনেকে বলেন, গীতার সামান্যার্থ ব্যতীত অন্য এক গূঢ় অর্থ আছে। এই দ্বিতীয় অর্থ যোগবিষয়ক—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পথের সংঘর্ষদ্যোতক। গোস্বামী মহাশয়ের গীতার সেই অর্থও বেশ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই গীতাখানির আরও কএকটি বিশেষত্ব আছে। যিনি সংস্কৃত জানেন না, তিনি গোস্বামী মহাশয়ের অন্বয় ও তৎসঙ্গে সন্ধিবিচ্ছেদ এবং সংস্কৃত শব্দের ভাবার্থ দেখিয়া অনুবাদ না পড়িয়াও অনায়াসে মূল হইতেই শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন। গোস্বামী মহাশয় অতি সরল ভাষায় শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক গীতাতেই দেখা যায় সহজ কথাগুলি আরও জটিল করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আলোচ্য গীতায় সে দোষ আদৌ কোথাও দেখিতে পাই নাই। গীতার এরূপ সুন্দর সংস্করণের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কবিতানুবাদ—কঠোপনিষৎ।—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ মহাশয় সম্প্রতি একখানি অমূল্য গ্রন্থ বঙ্গভাষাকে উপহার দিয়াছেন। দুরূহ শাস্ত্রতত্ত্বপূর্ণ উপনিষৎ সাধারণতঃ যেরূপ জটিল ও দুর্ব্বোধ্য করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের নিকট উপস্থিত করা হয়, তাহাতে বঙ্গানুবাদ পড়িলে মূলগ্রন্থের রসগ্রহণে পাঠক বঞ্চিত থাকেন। যিনি পড়েন, তিনি পড়িয়াও তৃপ্তিলাভ করেন না; কিন্তু অনুবাদ যদি অনুবাদ বলিয়া মনে না হয়, মূলের অনুকূল ভাব লইয়া যদি অনুবাদ পাঠকের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই অনুবাদই সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভের যোগ্য। যোগীন্দ্রবাবু যেরূপ সহজ সরল পদ্যে কঠোপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি তাহা প্রত্যেক

অধ্যাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর তৃপ্তিবিধান করিবে। কঠোপনিষদের মূল ও বঙ্গানুবাদ একত্র পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। যোগীন্দ্রবাবুর অনুবাদের একটু নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ

হংসঃ, শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্—
হোতা, বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমস—
দব্জা, গোজা, ঋতজা, অদ্রিজা, ঋতং বৃহৎ ॥

"তিনিই আকাশচারী
দেবতা তপন
অন্তরীক্ষ-বাসী
তিনি দেব সমীরণ,
অগ্নি তিনি
বেদী মধ্যে বসতি তাঁহার,
তিনি সোমরস
স্থিত কলস মাঝার।
নররূপে, দেবরূপে
তিনি বিরাজিত,
কিবা যজ্ঞে কিবা ব্যোমে
তিনি প্রতিষ্ঠিত।
মুকুতা, মকর তিনি
সাগরের জলে,
তিনি ব্রীহি, যব
যাহা জন্মে ধরাতলে
তিনি নদী, জলময়ী,
পাষাণ-বাহিনী,
তিনি সত্য, সুমহান
সত্যময় তিনি।"

গীতার গল্পাংশ

১। কুরুক্ষেত্রে কৌরব, পাণ্ডব এবং সঞ্জয়।

শান্তি-স্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে বলিলেন যে, আমি সাম, দান এবং ভেদনীতি প্রয়োগ করিয়াও দুর্য্যোধনের সহিত তোমাদের সন্ধি-স্থাপন করিতে সমর্থ হই নাই, অতএব এখন চরম-নীতি দণ্ডের প্রয়োগ ব্যতীত অন্য উপায় দেখিতে পাইতেছি না। তেজস্বী পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা

শুনিয়া অবিলম্বে আপনাদিগের সংগৃহীত সপ্ত-অক্ষৌহিণী সেনা সহ কুরুক্ষেত্রের জনহীন পশ্চিমপ্রদেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পুরাণ ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই দারুণ প্রান্তরে দুর্য্যোধনাদির অগ্রেই পাণ্ডবগণ প্রবেশ করিলেন, এবং ঐ প্রান্তরের যে স্থান দিয়া হিরণ্বতী নদী প্রবাহিত ছিল তাহার নিকটস্থ সুশীতল, তৃণ কাষ্ঠ-প্রচুর সমতল প্রদেশে পরিখা খনন করিয়া রণভূমির নেপথ্য রচনা করিলেন। তৎপর পাণ্ডবগণ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া আপনাদিগের শিবির-সমূহ স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিত হইলে রাজা দুর্য্যোধন মহাড়ম্বরে বিশ্ববিজয়ী মহারথিগণের চালিত একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ পাণ্ডবগণের কল্পিত রণাঙ্গণের সম্মুখে আসিয়া স্বপক্ষের শিবির সকল প্রস্তুত করিলেন! দুর্য্যোধন হস্তিনাপুর হইতে কুরুক্ষেত্র প্রান্তর-স্থিত আপনাদের শিবির পর্য্যন্ত সমতল ও সুরক্ষিত—এক প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই পথে রসদ, পানীয় এবং প্রয়োজন মত অন্যান্য সামগ্রী শিবিরে আনীত হইত, এবং শিবির হইতে সঞ্জয় নামক তাঁহার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্রুতগামী অশ্বযানে সময় সময় হস্তিনাপুরে গমন করিয়া ছন্নমতি, বৃদ্ধ রাজা, ধৃতরাষ্ট্রকে সমর বিবরণ শুনাইতেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে মহামতি ব্যাস হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের বিবেক, তেজ এবং বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত সঞ্জয়কে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে আদেশ করেন। গীতায় আমরা সঞ্জয়ের মুখে শুনিতে পাই।

এ পরম গুহ্য যোগ ব্যাসের কৃপাতে
যোগেশ কৃষ্ণের মুখে শুনেছি সাক্ষাতে।১৮৷৭৫

দূরদর্শী ব্যাসের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন বলিয়া সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের বাক্য ব্যাসের কৃপায় শুনিয়াছিলেন বলিতেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মের পতনের পর সঞ্জয় হস্তিনাপুরে আগমন করিলে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডবে
কি করিলা হে সঞ্জয় মিলিয়া আহবে। ১।১

এই প্রশ্নের উত্তরে গীতার কথা আরম্ভ হইল। সেই কথা বড়ই অদ্ভুত। শত শত বৎসর তাহা শ্রবণ করিয়াও সমগ্র জগৎ যেন সঞ্জয়ের ভাষায় কহিতেছেন,—

কৃষ্ণ ও পার্থের কথা পবিত্র অদ্ভুত,
ভাবিতে ভাবিতে হই সদা হর্ষযুত। ১৮।৭৬

২। দুর্য্যোধনের কপটতা।

পিতামহ ভীষ্ম দ্বাপরযুগের প্রথিত-নামা সেনাপতি। তাঁহার সৈনাপত্য ও বলবীর্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী তৎকালে আর কেহই ছিল না। রাজা দুর্য্যোধন আপনার সাগরোপমা সেনা সেই মহাপুরুষের অধীনে স্থাপন করিয়া আপনাকে ভারত-যুদ্ধে জয়ী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। মহাঝড়ের প্রাক্কালে যেমন ধরণী ক্ষণকালের জন্য নিবাত ও নিঃশব্দ হয়, সেই দারুণ প্রান্তরে একত্র, সমস্ত ভারতবর্ষের বলবীর্য্য-রূপিণী অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী সেনাও তেমনই ক্ষণকালের জন্য স্থির ও নিস্তব্ধ হইয়াছিল; কিন্তু পর-পীড়ক ও পর-ধন-লোভী রাজা দুর্য্যোধন এই ক্ষণিক শান্তিকেও অসহ্য বিবেচনা করিলেন। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া বিজয়লক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য আচার্য্য দ্রোণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দুর্য্যোধন মহাবীর ভীষ্মকে যথাবিধি সেনাপতি-পদে বরণ করিয়াছিলেন এবং একা ভীষ্মই যে তাঁহাকে জয়শ্রী প্রদান করিতে পারেন, তাহাও তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। এমন অবস্থায় যে দুর্য্যোধন সেনাপতির সহিত স্বপক্ষ ও বিপক্ষের বলাবলের আলোচনা না করিয়া আচার্য্য দ্রোণের সহিত তাহার আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার কারণ এই যে, উপস্থিত স্বজন-বিরোধ সেনাপতির অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ হওয়াতে দুর্য্যোধন মনে মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, মহাতেজা ভীষ্ম হয় ত যুদ্ধে আপনার সমগ্র বল-বীর্য্য প্রয়োগ করিবেন না। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পিতামহকে উত্তেজিত করিবার জন্য তাঁহার শ্রুতি-গোচরে আচার্য্যকে উপলক্ষ করিয়া কপট বাক্যে বলিলেন—

দুর্ব্বল মোদের সেনা ভীষ্মের রক্ষিত,
মহাবল সৈন্য কিন্তু ভীমের আশ্রিত।
সর্ব্ব ব্যূহ মুখে থাকি নির্দ্দেশিত স্থলে
ভীষ্মকেই রক্ষা সদা করুন সকলে। ১।১০—১১

সে কালের সেনাগণের কর্ত্তব্য ছিল সেনাপতিকে ব্যূহ করিয়া ঘিরিয়া রাখা। সেনাপতি নিজ অস্ত্রবলে আপন সৈন্যগণকে রক্ষা করিতেন ও শত্রুপক্ষকে বধ করিতেন; সুতরাং সেনাগণকে দুর্ব্বল বা অসমর্থ বলিলে সেনাপতিকেই দুর্ব্বল বা অসমর্থ বলা হয়। প্রকাশ্যে ত বোধ হয় যেন দুর্য্যোধন তাঁহার দুর্ব্বল বৃদ্ধ পিতামহকে রক্ষা করিবার জন্য দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণকে অনুরোধ করিতেছেন। ভীষ্ম তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আপনার বীরত্বের অভিমানে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন; এবং ভাবিলেন যে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বলিয়া দুর্য্যোধন আমাকে দুর্ব্বল ও অন্যের রক্ষণীয় বিবেচনা করিতেছেন। ভীষ্ম জগতে সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবল বীর্য্যত্যাগ করেন নাই। হীন-বীর্য্যতার সন্দেহও তাঁহার অসহ্য হইল। সুতরাং—

তোষি তাঁরে তবে ভীষ্ম বৃদ্ধ বীর্য্যবান্,
সিংহ-নাদে, শঙ্খ-ঘোষ করিলা মহান্। ১।১২

এই প্রকারে রাজ্য-লোলুপ কপট দুর্য্যোধন, বৃদ্ধ হইলেও বীর্য্যবান পিতামহ ভীষ্মকে দুর্ব্বল বলিয়া উত্তেজিত করিয়া সেই আত্মঘাতী কাল সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

৩। অর্জ্জুনের উদারতা।

পাণ্ডবগণ পিতামহের সিংহ-নাদ ও শঙ্খ-ঘোষ শুনিয়া প্রতিধ্বনি করিলেন, এবং অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, আমার রথ উভয় পক্ষের সৈন্যগণ-মধ্যে স্থাপন কর, কোন্ ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্য, তাহা আমি স্থির করিয়া লই। শ্রীকৃষ্ণ তদনুসারে রথ-স্থাপন করিলে অর্জ্জুন দেখিলেন যে কুরু-কুলের প্রধান প্রধান সমস্ত বন্ধুগণ যুদ্ধে কৃত-নিশ্চয় হইয়া সমবেত হইয়াছেন। তখন সেই উদার-চেতা কুরু-প্রবীর বলিলেন,—

জীবনে, রাজত্বে, ভোগে, কিবা প্রয়োজন?
রাজ্য, ভোগ, সুখ চাই যাদের কারণ
প্রাণ-ধন তুচ্ছ করি সেই বন্ধু কুল
পিতা, পিতামহগণ আচার্য্য, মাতুল
সম্বন্ধী, শ্বশুর, শ্যালা, পুত্র পৌত্র যত
সংগ্রামে হেথায় সবে এবে সমাগত।
মারিলেও না মারিব এই সব নরে
সামান্য পৃথিবী রাজ্য, ত্রিভুবন তরে। ১।৩২-৩৪

স্বাভাবিক উদার হৃদয়, স্বজন-বৎসল অর্জ্জুন বন্ধুগণের নাশভয়ে যুদ্ধকে অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। তাঁহার সমস্ত উক্তির মর্ম্ম নিম্নের কএকটি শ্লোকে নিবদ্ধ আছে—

সেই বন্ধুগণে পার্থ দেখি উপস্থিত
পরম কৃপায় ক'ন হয়ে বিষাদিত। ১।২৭
সংগ্রামে স্বজন-বধে শ্রেয় তো দেখি না
বিজয়, রাজত্ব, সুখ কিছুই চাহি না। ১।৩১
পাই যদি নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজত্ব
আর স্বরগের যদি পাই আধিপত্য
তথাপি না দেখি কিছু এমন সংসারে
ইন্দ্রিয়-শোষক শোক যাহাতে নিবারে। ২।৮
এই সব আততায়ী করিলে সংহার
পাপ মাত্র আমাদের হইবেক সার;
সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্র বধযোগ্য নয়
স্বজন-হননে কেহ সুখী নাহি হয়। ১।৩৬

অর্থাৎ আত্মীয়গণকে দেখিয়া মহাত্মা অর্জ্জুন যুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন না, বরং কৃপা-পরবশ হইয়া বিষাদে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনটি আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তিনি কহিলেন যে, আমি যুদ্ধ করিব না—যে হেতু যুদ্ধে—প্রথমতঃ আমার স্বজনগণের মৃত্যু হইবে, তাহাতে আমি শোকে মগ্ন হইব; দ্বিতীয়তঃ আমার শ্রেয়ঃ হইবে না, কারণ যুদ্ধে স্বর্গ বা পৃথিবীরাজ্য যাহাই পাইনা কেন, বন্ধুনাশ-শোকে তাহা ভোগ করিতে পারিব না; তৃতীয়তঃ আমার পাপ হইবে।

৪। প্রশ্নত্রয়।

এই তিন প্রশ্ন কেবল যে যুদ্ধকালে পার্থের মনে উদিত হইয়াছিল, তাহা নহে। প্রতি নিয়তই মনুষ্যগণ প্রত্যেক কর্ম্মের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই তিন অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় অথবা কেবল দ্বিতীয় প্রশ্নের বিচার করিয়া আসিতেছেন। যে ব্যক্তি একেবারে সঙ্কীর্ণচেতা, সে কেবল দ্বিতীয় প্রশ্নের বিচার করে—সে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অনুসন্ধান করে, ঐ কার্য্য করিলে তাহার কি পরিমাণ ধন-মানাদি লাভ হইবে। যে ব্যক্তি তদপেক্ষা উদার-হৃদয়, তিনি প্রথম প্রশ্নেরও বিচার করেন অর্থাৎ কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তিনি জানিতে চেষ্টা করেন, ঐ কার্য্য করিলে তাঁহার কোন আত্মীয়ের পীড়া বা মৃত্যু হইতে পারে কি না। আর যিনি তদপেক্ষাও উদার-হৃদয়, তিনি তৃতীয় প্রশ্নেরও বিচার করেন অর্থাৎ কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে তিনি অনুসন্ধান করেন, ঐ কর্ম্ম করিলে তাঁহার কোন পাপ বা পরকালের উন্নতির বাধা হইবে কি না। সংকীর্ণ-চেতা মনুষ্যগণ নিজের দেহ ভিন্ন আর কাহাকেও আপন বলিয়া জানে না। তাহারা কেবল সেই দেহেরই ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তা করে; সুতরাং দ্বিতীয় প্রশ্ন ভিন্ন আর কোন প্রশ্নের বিচার আবশ্যক মনে করে না। রাজা দুর্য্যোধন এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। যাঁহারা দুর্য্যোধনাদির অপেক্ষা উদার-হৃদয় মনুষ্য, তাঁহাদের আত্ম-বোধ স্বজন বা প্রভুতেও দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাঁহারা আপনার কল্যাণের সহিত স্বজন বা প্রভুর কল্যাণও চিন্তা করেন। আর যাঁহারা ইঁহাদের অপেক্ষাও উদার হৃদয়, তাঁহারা পরকালেও বিশ্বাসী সুতরাং; তাঁহারা কেবল ইহকালের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কর্ম্ম করেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং অর্জ্জুন এই প্রকার লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এই প্রশ্নত্রয়ের অন্তর্গত বিষয় সকলকে যতদূর বিস্তৃত বলিয়া জানিতেন শ্রীকৃষ্ণের বিবেচনায় ঐ সকল বিষয় আরও অধিক বিস্তৃত ছিল। তাঁহাদের নীতি বা হিতৈষণা স্বজন বা প্রভু পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল মাত্র; শ্রেয়ঃ বলিতে তাঁহারা পার্থিব ও স্বর্গীয় ধনজনাদি বুঝিতেন এবং পাপ সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণাও তৎকালের প্রচলিত নানা প্রকার সংস্কারে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন স্বজন ও প্রভু-হিতৈষণা লোকসংগ্রহ, লোকনীতি বা সমাজকে সন্মার্গে রাখিবার কর্ম্মপ্রণালীর বিরুদ্ধ হয়, তখন যে স্বজনহিতৈষণাকে ত্যাগ করিয়া লোক-নীতি-রক্ষার্থ কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা অর্জ্জুন প্রভৃতির জানা ছিল না। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ লোক-নীতি-রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল। রাজা দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের বিরুদ্ধ ছিলেন—তিনি ছলে বলে অপরের ধনসম্পত্তি অপহরণ ও কুলবধূর অপমান করিতেছিলেন এবং একচ্ছত্র মহাভারত-স্থাপনের অযোগ্য ছিলেন। যখন কোন প্রকারেই তাঁহার মনের গতি ফিরাইতে পারা গেল না, তখন তাঁহার বিনাশ ভিন্ন মহাভারত ও লোকনীতি-প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকিল না। বন্ধুহিতৈষণা হইতে লোকহিতৈষণাই শ্রীকৃষ্ণের মতে প্রকৃত আর্য্যজনোচিত আচার। তাহার তুলনায় বন্ধুহিতৈষণা ক্লীবোচিত কাতরতা, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা এবং ইহ-পরকাল-নাশক মোহ মাত্র। তাই তিনি অর্জ্জুনকে উদ্বোধন করিতেছেন—

কেন তব এ সঙ্কটে অনার্য্য সেবিত
অস্বর্গ, অকীর্ত্তিকর মোহ সমুত্থিত?
ক্লীবোচিত কাতরতা যোগ্য তব নয়
তুচ্ছ হৃদি-দৈন্য ত্যজ শত্রু কর জয়। ২।২-৩

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কহিয়াছেন—

পূজনীয় ভীষ্ম-দ্রোণে আঘাতিয়া শরে
যুদ্ধ কার আরম্ভন! কি লাভের তরে?
সে মহাত্মা গুরুগণে না করি নিধন
নিশ্চয় যাপন শ্রেয় ভিক্ষান্নে জীবন।
গুরুগণ নাশে শুধু অর্থ কামান্বিতা
রুধির-প্লাবিত ভোগ হইবে অর্জ্জিত।
যাহাদিগে বধ করি না চাহি জীবন
সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সম্মুখে এখন,
আমাদের জয় কিম্বা তাহাদের জয়
বুঝিতে না পারি কিবা গৌরবের হয়।

স্বভাবের দৈন্য হেতু কর্ত্তব্য না বুঝি
তোমাকেই সন্দেহের প্রশ্ন সব পুছি,
তোমারি আশ্রিত শিষ্য আমি হৃষীকেশ
যাহাতে নিশ্চয় শ্রেয় কর উপদেশ। ২।৪-৭

অর্থাৎ অর্জ্জুন কহিলেন যে (১) 'আমি পিতামহ ও আচার্য্যকে বধ না করিয়া ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করিতে চাহিতেছি, তাহা কি প্রকারে অনার্য্য ব্যবহার হইতে পারে; (২) আমি ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ করিয়া গুরুগণরুধির-প্লাবিত ভোগ ত্যাগ করিতেছি, তাহা কি প্রকারে অস্বর্গ ও অকীর্ত্তি-কর হইতে পারে; (৩) আমি আত্মতুল্য দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে বধ করিতে চাহিতেছি না, আত্মহত্যা ত্যাগ কি প্রকারে ক্লীবোচিত কার্য্য হইতে পারে; (৪) তবে একথা সত্য যে আমার অন্তর প্রকৃতির মলিনতা হেতু কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং সেই জন্য তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি। আমি তোমার আশ্রিত শিষ্য, আমাকে উপ-দেশ দিয়া যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বুঝাইয়া দেও। 'গুরুগণকে পূজ্য জ্ঞান করা, স্বজনগণে আত্ম-বোধে, নিজের স্বভাবের দীনতার অনুভব এবং উন্নত জীবন পাইবার জন্য মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ এই কএকটি অর্জ্জুনের স্বাভাবিক উদারতা; কিন্তু গুরু ও স্বজনগণ হইতেও সমাজ অতি মহান্ এবং পূজনীয়। যখন গুরু, স্বজনগণ প্রভৃর প্রতি কর্ত্তব্য সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধ হয়, তখন যাহা সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, তাহাই পালনীয়। এই জন্য ভীষ্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

সংসিদ্ধি কর্ম্মেই পান জনকাদি সবে
লোকনীতি স্থাপিতেই যোগ্য তুমি ভবে। ৩.২৫

সংসিদ্ধি শব্দের অর্থজ্ঞানের পরানিষ্ঠা বা পরম-সমাপ্তি। আর্য্য-শাস্ত্রের শাসন অনুসারে কর্ম্ম করিতে করিতে বিবেক, ব্রহ্মতেজ, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান, পরাভক্তি এবং প্রজ্ঞা নামক অন্তঃকরণের অবস্থা সকল উৎপন্ন হয়। এইগুলি সাত্ত্বিকী বৃত্তি। ইহাদের সাধারণ নাম জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাই জ্ঞানের পরমা সমাপ্তি বা চরমান্ত। প্রজ্ঞার উদয়ে মনুষ্য বিশ্বব্যাপী জীবন্ত নিত্যানন্দ বা পরম কল্যাণকে আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হন। এই সংসিদ্ধি বা নৈষ্কর্ম্মের উদয় হইলে পর মনুষ্য গুণাতীত হন অর্থাৎ জ্ঞান বা অজ্ঞান কিছুই তখন তাঁহার কর্ম্মের প্রেরক হয় না। তখন তিনি কেবল পরম কল্যাণময় পুরুষের তেজে কর্ম্ম করেন। জনকাদি মহাত্মগণ কর্ম্মের দ্বারা ক্রমে জ্ঞানের পরানিষ্ঠা প্রজ্ঞাকে পাইয়া আত্মাকে বিশ্বময় দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মত বিশ্বের কল্যাণে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু যাহাদের স্বজনগণে মাত্র আত্ম-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে, তাহারা বিশ্বকে আত্মজ্ঞান করিয়া কর্ম্ম করিতে পারে না। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ [illegible]

অর্জ্জুন! তুমি স্বজনগণে আত্মবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া এখন সমগ্র সমাজের উপর সেই বুদ্ধিকে বিস্তৃত করিবার যোগ্য হইয়াছ; অতএব সমাজকে সৎপথে রাখিবার জন্য কু-আদর্শ দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া নিজে সকলের হিতকর কর্ম্মের দ্বারা সু-আদর্শ প্রদর্শন কর এবং এই প্রকারে কার্য্যতঃ আত্মবোধকে ক্রমশঃ বিস্তৃত করিলে তুমিও জনকাদির মত সংসিদ্ধি পাইবে।

৫। প্রশ্নত্রয়ের উত্তর।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন তিনটি সমগ্র গীতাগ্রন্থের ভিত্তিভূমি। প্রথম প্রশ্নের উত্তর নিত্য ও অনিত্য বস্তু এবং আনন্দ ও শোক-সংক্রান্ত। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ইহ পরকালের লাভ-সংক্রান্ত। আর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর আদর্শ কর্ম্মপ্রণালী সংক্রান্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোক হইতে এই সকল প্রশ্নের উত্তর আরম্ভ হইয়াছে। ১১ হইতে ৩০ শ্লোকে প্রথম প্রশ্নের ৩১ হইতে ৩৮ শ্লোকে দ্বিতীয় প্রশ্নের এবং ৩৯ হইতে ৫৩ শ্লোকে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে তোমার স্বজনগণ এমন বস্তু যাহা মরে না। বস্তু সকল দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। যাহা অনিত্য তাহার পারমার্থিক সত্তা নাই, আর যাহা নিত্য তাহাই সত্য, চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে, কখনও মরিবে না। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, বাল্য, জরা, যৌবন, দেহ এবং দেহান্তর-প্রাপ্তি সকলই অনিত্য সকলই মরে, কিন্তু প্রকৃত তুমি, আমি আর এই নরপতিগণ অমৃতস্বরূপ সত্য পদার্থ। আমরা চিরকাল আছি, চিরকাল থাকিব, কখনও মরিব না। অতএব শোকের কোন কারণ নাই, যুদ্ধ কর।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে যুদ্ধই তোমার শ্রেয়ঃ হইবে। তুমি ক্ষত্রিয়-স্বভাব মনুষ্য, তোমার দৃঢ়সংস্কার আছে যে যুদ্ধ হইতে পলায়ন নিতান্ত হেয় এবং অকীর্ত্তিকর। তুমি এখন ক্ষমা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ আশা করিলেও স্থির থাকিতে পারিবে না। যখন লোকে তোমার প্রতি ভীরুতা প্রভৃতি আরোপ করিবে, তখন অত্যন্ত দুঃখে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।

'যুদ্ধ করিব না' গর্ব্বে ভাবিতেছ মনে
সে ইচ্ছা হইবে বৃথা প্রকৃতি-প্রেরণে।
অনিচ্ছ হলেও মোহে করিবে অবশে
নিজ-স্বভাবজ কর্ম্মে আসক্তির বশে। ১৮।৫৯-৬০

সুতরাং তুমি যুদ্ধ কর, তাহাতে তোমার ইহ পরকালে শ্রেয়ো লাভ হইবে।

আর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন যে পাপ হইবে বলিয়া কর্ম্ম-ত্যাগ করিও না; কারণ আমি

তোমাকে দুর্য্যোধনের মত হিংসাদির বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতে বলিতেছি না। আমার উপদেশ এই যে তুমি যোগে কর্ম্ম কর। যে ব্যক্তি যোগে কর্ম্ম করে, সে ক্রমে প্রজ্ঞাকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে পরম কল্যাণরূপে বিশ্বময় দর্শন করে এবং পাপ-পুণ্যের অতীত হইয়া নিত্যানন্দের অধিকারী হয়।

সংশয় ছিঁড়িয়া জ্ঞানে কর্ম্ম স্থাপি যোগে
আত্ম-জ্ঞানী কর্ম্ম করি বন্ধন না ভোগে।
জ্ঞানাসিতে নাশি তাই মোহজ সংশয়
হে ভারত উঠ কবি যোগের আশ্রয়।৪.৪১-৪২

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রশ্ন সকলের উত্তর সাধারণভাবে দিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে এক একটি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই আলোচিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত সকল সংক্ষেপে বলিয়াছেন।

৬। গীতার অধ্যায়গুলি।

গীতার পর পর অধ্যায়সমূহকে বড় চমৎকার আধ্যাত্মিক নিয়মে সজ্জিত করা হইয়াছে। মনুষ্য যখন কোন কঠোর কর্ম্মের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন সে সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারে, তাহার স্বভাবের বল কত। যাহার হৃদয়ে মোহ প্রবল, সে নিতান্ত দীনভাবে সেই কর্ম্ম ত্যাগ করে। যাহার হৃদয়ে হিংসা প্রবল, সে পর-পীড়ার জন্য সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। আর যাহার হৃদয়ে জ্ঞান প্রবল, সে জগতের কল্যাণের জন্য সেই কর্ম্ম কর্ত্তব্য হইলে করে। দুর্য্যোধনের হৃদয়ে হিংসা প্রবল ছিল সে পাণ্ডবগণকে নির্ম্মূল করিবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অর্জ্জুনের হৃদয়ে জ্ঞানেরই কিঞ্চিৎ প্রাধান্য ছিল। স্বজনাসক্তির মোহ কিছু কমিলে সে শ্রীকৃষ্ণকে বলিল যে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, যদি তুমি আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি যুদ্ধ করিব। ইহাই প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাংশ। বুদ্ধি বিশুদ্ধ না হইলে নিঃসংশয়ে কর্ত্তব্য বুঝিতে পারা যায় না। বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য বস্তুসকলের স্বরূপ আলোচনা করিতে হয়। বস্তু দ্বিবিধ— নিত্য ও অনিত্য। এই নিত্যানিত্যের আলোচনায় বিবেক বা শুদ্ধবুদ্ধির উদয় হয়। বিবেকের দ্বারা পরমেশ্বর, জগৎ ও কর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় এবং হৃদয় তেজোময় ও অনিত্যের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত হয়। ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়। মনুষ্য কিছু আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। সে সর্ব্বদাই অনিত্য অথবা অনিত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। অনিত্যকে আশ্রয় করিবার প্রবৃত্তি সকলের নাম সঙ্গ, কাম, ক্রোধ, মোহ এবং ভ্রম। নিত্যকে আশ্রয় করিবার প্রথম প্রবৃত্তির নাম শ্রদ্ধা। বিবেক-তেজো-বৈরাগ্যযুক্ত মনুষ্য শ্রদ্ধাবশে আপনাকে পরমেশ্বরের সেবক এবং সংসারের সকল কর্ম্মকেই সেই মহাপ্রভুর কর্ম্ম বলিয়া অবধারণ করে। প্রভুর অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য সে আহার বিহার যুদ্ধবিগ্রহাদি সর্ব্ববিধ কর্ম্মই করে। ইহাই তৃতীয় অধ্যায়। সচরাচর মনুষ্য সঙ্গাদি অকল্যাণ বৃত্তির নিয়োগে কর্ম্ম করে। কল্যাণপ্রদ কর্ম্ম করিতে হইলে শ্রদ্ধাদিবৃত্তিকে কর্ম্মের প্রেরক করিতে হয়। সেই বৃত্তি-গুলির নাম জ্ঞানবৃত্তি। এই জ্ঞানকেই কর্ম্মের প্রেরক করিয়া যখন মনুষ্য কর্ম্ম করে, তখন সেই কর্ম্মকে যোগ বলে। জ্ঞানপ্রেরিত কর্ম্ম একপ্রকার কৌশল; কারণ ইহাতে সংসারও ত্যাগ করিতে হয় না, অথচ মনুষ্য পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়। চরম জ্ঞানবৃত্তি প্রজ্ঞা কর্ম্মের প্রেরক হইলে পর মনুষ্য পরমেশ্বরের সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়। এই ব্যক্তির নাম অবতার। ইহাই চতুর্থ অধ্যায়। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ প্রকৃত সন্ন্যাস নহে। সঙ্গ-কামাদি ত্যাগ করিয়া লোকহিতের জন্য কর্ম্ম করাই প্রকৃত সন্ন্যাস। পরমেশ্বর আত্মা যেমন সঙ্গ কামাদি শূন্য হইয়া কর্ম্ম সকল করিতেছেন, সেইরূপে কর্ম্ম করাই সন্ন্যাস এবং পরমেশ্বরই আদর্শ সন্ন্যাসী। ইহাই পঞ্চম অধ্যায়। বহিরঙ্গ কর্ম্মের দ্বারা ভ্রম, মোহ, ক্রোধ, এবং কামকে প্রশমিত করা যায়, কিন্তু কামমূল সঙ্গকে উৎপাটন করা যায় না। বিষয় হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া স্থির করিতে পারিলে পরম অকল্যাণ বৃত্তিসঙ্গকে নির্ম্মূল করা যায়। সেই জন্য শ্রদ্ধা সহকারে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা মনস্থৈর্য্যের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য; কারণ তাহাই ব্রহ্মের সহিত মানবের মহামিলনের ভিত্তি। ইহাই ষষ্ঠ অধ্যায়। মনের মলা যতই কাটিতে থাকে, মনুষ্যের শ্রদ্ধা ততই বিশুদ্ধ হয়। এই প্রকারে শ্রদ্ধা সম্পূর্ণরূপে সাত্ত্বিকীবৃত্তি হইয়া উদিত হইলে পর প্রভুতে আশ্রয় বুদ্ধিরূপ ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তির উদয়ে তুচ্ছ-অনিত্য-ময় সকল সংসার মায়ার সৌন্দর্য্যে ভরিয়া যায়। ইহাই সপ্তম অধ্যায়। ভক্তি নামক আসক্তি প্রগাঢ় হইলে ধ্যানে পরিণত। ভক্ত ধ্যানে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিযজ্ঞ, অধিদৈব সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি বিষয়কে অলৌকিকভাবে অনুধাবন করিতে পারেন এবং ব্রহ্মের ন্যায় পবিত্র হন। ইহাই অষ্টম অধ্যায়। ধ্যানের পরিপাকে রাজবিদ্যা বা পরা-ভক্তির উদয় হয়। পরাভক্তির দ্বারা ব্রহ্ম যাহা ও যেরূপ, তাহা তত্ত্বতঃ বুঝিতে পারা যায়। ইহাই নবম অধ্যায়। এই পরাভক্তিকে পরিপুষ্ট করিতে পারিলে বুদ্ধিযোগের চরম পরিণাম প্রজ্ঞাকে পাওয়া যায়। তাহা

পাইলে অজ্ঞান-অন্ধকার নিঃশেষে অপসারিত হয়; কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত একান্ত চেষ্টা-সহকারে পরমেশ্বরের বিভূতি ভাবনা না করিলে মনঃস্থৈর্য্য পরিপুষ্ট লাভ করিতে পারে না। ইহাই দশম অধ্যায়। পৃথক্ পৃথক্ বস্তুতে পরমেশ্বরের বিভূতি ভাবনা করিয়া মনঃস্থৈর্য্যে পটুতা লাভ করিলে তাঁহার ঐশ্বররূপ দেখিবার যোগ্য হওয়া যায়। এই জগৎ-সংসারই ভগবানের ঐশ্বররূপ এবং ইহার ক্ষয় ও পরিপূর্ণতাই তাঁহার ঐশ্বরভাবের কার্য্য। এইরূপ ভাবকে যখন মনুষ্য বুঝিতে পারে, তখন সে তাঁহার মহিমায় অভিভূত হয় ও বিশুদ্ধ শ্রদ্ধাকে লাভ করে। পরমেশ্বরের স্থূলরূপে মনোনিবেশ করিতে পারিলে তাঁহার তত্ত্বরূপ বুঝিবার যোগ্যতা জন্মে। ইহাই একাদশ অধ্যায়। বিশ্বরূপের ভাবনা পরিপুষ্ট হইলে অব্যক্ত অক্ষর বা ভগবানের মায়া-শক্তিকে জানি পারা যায়। মায়াকে জানিতে পারিলে মনুষ্য ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন; কিন্তু মনকে স্থির করিতে না পারিলে মায়া কিংবা ব্রহ্মাকে জানিতে পারা যায় না। সেই জন্য সর্ব্বপ্রথমে মনকে স্থির করিতে চেষ্টা করা উচিত, যদি মনে বিশ্বরূপকে মনুষ্য ধ্যানে ধরিতে পারে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার একান্ত ভক্তির উদয় হইয়াছে। যদি তাহা করিতে না পারে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার ভক্তি একান্তা হয় নাই; সুতরাং ভক্তিকে একান্তা করিবার চেষ্টাই তাহার কর্ত্তব্য। আনন্দ-স্বরূপকে প্রিয়জন বিবেচনা করিয়া প্রেমভরে তাঁহার কর্ম্ম করাই ভক্তিকে ঐরূপ করিবার কৌশল তাহা করিতে না পারিলে বুঝিতে হইবে যে বিশুদ্ধ শ্রদ্ধাই উদিত হয় নাই। সুতরাং শ্রদ্ধাকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য পরমেশ্বরকে প্রভু জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবকরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাই দ্বাদশ অধ্যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ধ্যান ও পরাভক্তির দ্বার বিজ্ঞেয় জ্ঞান, জ্ঞেয়, দেহ, আত্মা, প্রকৃতি এবং পুরুষের শক্তি আলোচনা আছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে জ্ঞান ও অজ্ঞানের মূল গুণত্রয় কি, কোথায় জন্মে এবং কি করিয়া কি করে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ধ্যানগম্য জগৎ, জীব, আধ্যাত্ম, আত্মা পরস্পরে কিরূপ সম্বন্ধ যুক্ত তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ষোড়শ অধ্যায়ে অসুরস্বভাব ঈশ্বরবিমুখী মনুষ্যের কথা আলোচিত হইয়াছে। সকল মনুষ্যেরই শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু অনুশীলন অভাবে তাহা সচরাচর মলিন দেখা যায়। শ্রদ্ধার মলিনতাই মনুষ্যের ঈশ্বরবিমুখিতার কারণ। সেই মলিন শ্রদ্ধাকে কি প্রকারে পরিষ্কার করিয়া ঈশ্বরমুখী করিতে হয় তাহা সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে। অষ্টাদশে পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলির আলোচিত বিষয়ের সিদ্ধান্তসকল সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীঅভয়গোবিন্দ মৈত্র

সাহিত্য-সংবাদ

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক "ভীষ্ম" প্রকাশিত হইয়াছে।

সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় একখানি সুন্দর ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন; সেখানি অল্পদিনের মধ্যেই ছাপা হইবে। তাঁহার গ্রন্থাবলি-প্রকাশেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের 'কিশোর' নামে একখানি নূতন গল্পপুস্তক যন্ত্রস্থ। এই গল্পপুস্তকখানি কিশোরদিগের জন্যই লিখিত। গল্পগুলি বহুচিত্রশোভিত হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পাষাণের কথা' যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। মাসিক-পত্রাদিতে যে পাষাণের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, এই পুস্তকে তদতিরিক্ত অনেক নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'মিলন-মন্দির' নামক গার্হস্থ্য উপন্যাসের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের "নবযৌবন" মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে, পুস্তকও শীঘ্রই বাহির হইবে।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "বিরাজ-বৌ" উপন্যাস শীঘ্রই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "রূপের মূল্য", প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কবিবর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের আর একখানি কবিতা-পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তাঁহার 'সাগর সঙ্গীতের' ন্যায় এই পুস্তকেও অনেকগুলি সাগরগীতি ও অন্যান্য কবিতা থাকিবে।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের 'অজন্তা' নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই সুন্দর পুস্তকে অজন্তা-গুহা সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। চিত্রগুলিও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।
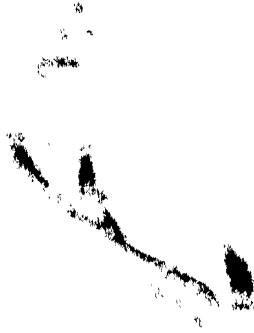
সঙ্কেত-বর্ত্তিকা
('রাজস্থান' হইতে পরিকল্পিত)

চিত্রশিল্পী···শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র ঘোষ।

প্রথম বর্ষ | ফাল্গুন ১৩২০ | দ্বিতীয় খণ্ড
৩য় সংখ্যা

আরতি

[ছায়ানট—সুরফাঁকতাল]

জয় চক্রধর, দেব বিশ্বম্ভর, ত্রিভুবন-পরিপালক ওঁ।
তব মঙ্গল-শঙ্খ বাজে, বাজে অনাহত সুরনরলোক-মাদন ওঁ॥

গদা তব কৌমোদকী দুষ্টদলন শিষ্টপালন ওঁ।
কোটি জগত মাঝে রাজে, রাজে তব কুশল-শাসন ওঁ॥

তব শ্রীকরগতপঙ্কজ-পরিমল-লুব্ধ ভক্তজনগণ ওঁ।
পিয়ে মকরন্দ গাঁজে, গাঁজে প্রমত্ত ভৃঙ্গমন ওঁ॥

কিবা প্রাণমনঃ-স্নিগ্ধকর করুণোজ্জ্বলাবলোকন ওঁ।
কিবা মনোমোহন সাজে, সাজে প্রেমচন্দনচর্চ্চিত-চরণ ওঁ॥

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

মুদ্রারাক্ষস

দেশে যখন যে ভাবটি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তাহাই সাহিত্যে স্থান পায়। দেশের যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধি, ভগবৎ-প্রেম, সুখ, দুঃখ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছে। সাহিত্য দেশের ইতিহাস; ইতিহাস হইতে ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যায় বলিয়া সাহিত্যকে আমরা ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শকও বলিতে পারি। কালিদাস শুধু আমাদের চক্ষে একটা শান্তিময়, আনন্দপূর্ণ দেশের প্রতিচ্ছবি রাখিয়া যান নাই,—তাঁহার কাছে যে আনন্দ নানা মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা যে শুধু একটা বিশিষ্ট দেশের, বিশিষ্ট সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহা নয়, —তাহা আমাদের ভাবিতে শিখাইয়াছে, আমাদের চোখ ফুটাইয়াছে, ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে আলোকময়, মনোরম পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

যে সাহিত্য শুধু সাময়িক অচিরস্থায়ী বিশিষ্ট ভাব বা ঘটনা বিষয়ীভূত করিয়া লয়, তাহা কখনই চিরন্তন আনন্দ দান করিতে পারে না; এই জন্য এই শ্রেণীর সাহিত্য অল্পক্ষণের জন্য মানুষের মনে একটা উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। সাহিত্য চিরকালের বিশ্বমানবের সামগ্রী। তাহাকে কোন একটা বিশিষ্ট সময় বা বিশ্বের কোন একটি বিশিষ্ট অংশে আবদ্ধ করিলে তাহার ধ্বংসের সম্ভাবনা।

এই জন্য যে সাহিত্য উচ্চ, তাহাতে শুধু একটা সাময়িক ভাব বা উত্তেজনা স্থান পায় না; যাহা এই পৃথিবীর মজ্জাগত, যাহা বিশ্বযন্ত্রের তারে তারে নিয়ত কাঁপিয়া উঠিতেছে, যাহা একজনের সুর নয়, বিশ্ব যে সুরে তাহার আকুল গান গায়িয়া উঠিতেছে, তাহাই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সাহিত্য-সমুদ্রে কত বুদ্বুদ উঠিয়া বিলীন হইয়াছে, কিন্তু রামায়ণ মহাভারত এখনও নষ্ট হয় নাই। নানা কারণে কত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কালিদাস, ভবভূতির রচনা চিরকালই অমর।

মুদ্রারাক্ষস একখানি নাটক, রচয়িতার নাম বিশাখদত্ত। একবার পড়িলে বোধ হয় বইখানি ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট সময়, বিষয়, ঘটনা অবলম্বন করিয়া লেখা। ইহার একটু ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক মূল্য ভিন্ন আর কিছুই নাই; সুতরাং উচ্চ সাহিত্যে ইহাকে স্থান দেওয়া যায় না। যাঁহারা রাজনীতির আলোচনা করিতে চান, তাঁহারা মুদ্রারাক্ষস পড়ুন।

শকুন্তলা, উত্তরচরিত বা মৃচ্ছকটিক পড়িলে এ প্রশ্ন মনে উদিত হয় না, কারণ তাহাতে বিশ্বের প্রণয় বা শোকের কথা লিপিবদ্ধ আছে; সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক জিনিস আছে যাহা সকল পাঠককেই মুগ্ধ করিয়া দেয়; কেবল কৌটিল্যের সাম, দান, ভেদ বা দণ্ডের নীতি তাহাদিগকে শুষ্ক, নীরস করিয়া দেয় নাই। সকলেই তাহাদের রস আস্বাদন করিতে পারে।

মুদ্রারাক্ষসে কুটিল কর্ম্ম যন্ত্রের ঘর্ঘর ছাড়া আর বড় কি শোনা যায় না। নাটকখানিতে প্রেমের কথা নাই বলিলেই হয়। যে স্ত্রীচরিত্র আছে, তাহা না থাকিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। অন্য নাটকে একটা বিদূষক বা ঐরূপ কোন একটি চরিত্র থাকে, ইহাতে তাহাও নাই। গ্রন্থকার সাত অঙ্কে কেবলই যুদ্ধ, বিগ্রহ, ভেদের কথা লিখিয়াছেন। কোন লোককেই বড় দেখিতে পাওয়া যায় না; রাজারা নির্জীব নিষ্প্রভ হইয়া আছেন। দেখা যায় কেবল দুই মন্ত্রীকে; তাঁহারা কেবলই নিজের মতলব কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; এ ছাড়া আর কোন ভাবনা তাঁহাদের মাথায় আসে না। চাণক্য ভাবিতেছেন—কেমন করিয়া রাক্ষসকে বশে আনিব, আর রাক্ষস ভাবিতেছেন—কি করিলে নন্দ রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও মুদ্রারাক্ষসের সম্বন্ধে কতগুলি কথা বলিবার আছে। আমরা যথাস্থানে তাহা প্রকাশ করিব। এখানি কোন্ শ্রেণীর নাটক তাহাই প্রথমে দেখা যাউক।

(২)

মুদ্রারাক্ষস বীররসাত্মক, চাণক্য ধীরোদ্ধত নায়ক। গল্পাংশ বুঝিতে হইলে আমাদের পূর্ব্বের কথা জানিতে হইবে।

নন্দবংশে সর্ব্বার্থসিদ্ধি রাজার দুই মহিষী ছিলেন। একজনের গর্ভে নয়টি ও আর একজনের গর্ভে একটি পুত্র-সন্তান উৎপন্ন হয়। রাজা এক মহিষীর গর্ভজাত নয়টি পুত্রের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া ও অন্য মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মৌর্য্যকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

উক্ত নয়টি পুত্র নন্দ নামে খ্যাত। তাহাদের সন্তানাদি ছিল না। মৌর্য্যের একশত পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তই পরাক্রান্ত ছিলেন। নন্দেরা মৌর্য্য ও তাঁহার পুত্রদিগকে ক্ষমতাপন্ন হইতে দেখিয়া ভীত হইলেন ও সকলকে কারারুদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের জন্য যৎসামান্য আহার নির্দ্দিষ্ট হইল। অবশেষে বন্দীরা স্থির করিলেন যে, তাঁহারা সমস্ত আহার্য্য চন্দ্রগুপ্তকে দান করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন, ; কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে এই মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। লঙ্কাধিপতির প্রেরিত একটি সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত কারামুক্ত হন।

এই সময় চাণক্য নামে এক জন রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দদিগের সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। একদিন নন্দদিগের কোনও একটা উৎসবে যোগদান করিয়া চাণক্য সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশন করেন। নন্দেরা তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। সেই সময় হইতেই চাণক্য তাঁহাদের বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। রাক্ষস নামে একজন ব্রাহ্মণ সর্ব্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রী ছিলেন। এখন তিনি নন্দদিগকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইলেন। চাণক্য, রাক্ষসের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য, ক্ষপণককে নিযুক্ত করিয়া ম্লেচ্ছরাজ পর্ব্বতককে নন্দদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহ দান করিলেন। পর্ব্বতক, নন্দদিগকে পরাজিত করিলে, তাহাদের রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পাইবেন, এ আশাও তাঁহাকে দেওয়া হইল। অবশেষে একটি যুদ্ধে নন্দগণ পরাজিত হইলেন, রাজধানী কুসুমপুর চন্দ্রগুপ্ত ও পর্ব্বতকের হস্তগত হইল। রাক্ষস, সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে একটি নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, চাণক্যের বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করিতে লাগিলেন। চাণক্যের কিছুই হইল না, বরং তাঁহার অনুমতিক্রমে সর্ব্বার্থসিদ্ধি নিহত হইলেন। রাক্ষস, চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিবার জন্য, যে বিষকন্যাকে প্রেরণ করিলেন, সে চাণক্যের কৌশলে পর্ব্বতকের প্রাণসংহার করিল। পর্ব্বতকের পুত্র মলয়কেতু শুনিলেন, চাণক্যই তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে। তখন তিনি চাণক্যের ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। রাক্ষস, তাঁহার মন্ত্রী হইয়া, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মগধ আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইখানে নাটকের আরম্ভ। প্রথম অঙ্কে চাণক্য আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের সচিবরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাই নাটকের বীজ। এই অঙ্কে গুপ্তচর নিপুণক চাণক্যের নিকট আপনার কার্য্যের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিল, প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের অনুরক্ত; কিন্তু ক্ষপণক, জীবসিদ্ধি, শকটদাস ও চন্দনদাস রাক্ষসের পক্ষপাতী। চাণক্য জানিতেন, ক্ষপণক, জীবসিদ্ধি তাঁহারই গুপ্তচর। তাহারা রাক্ষসের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এই জীবসিদ্ধি, চন্দ্রগুপ্তের নিকট প্রেরিত বিষকন্যাকে পর্ব্বতকের প্রতি প্রয়োগ করে। চাণক্য এই দুইজনের কথায় কাণ দিলেন না, শকটদাসকেও তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে, রাক্ষস তাহার স্ত্রীপুত্রকে চন্দনদাসের গৃহে রাখিয়াছেন, তখন তিনি বুঝিলেন যে, চন্দনদাস রাক্ষসের পরম বন্ধু। নিপুণক, চাণক্যের হস্তে একটি অঙ্গুলিমুদ্রা রাখিয়া, বলিল—ইহা আমি চন্দনদাসের গৃহে পাইয়াছি। চাণক্য দেখিলেন, মুদ্রায় রাক্ষসের নাম অঙ্কিত আছে। তাহার পর মুদ্রাপ্রাপ্তির বিবরণ শুনিয়া তিনি বুঝিলেন, রাক্ষসের স্ত্রীপুত্র নিশ্চয়ই চন্দনদাসের গৃহে আছে। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি পর্ব্বতকের পারলৌকিক উপলক্ষে উক্ত মৃত রাজার অলঙ্কারগুলি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে চান। চাণক্য বলিলেন যে, তিনিই সদ্‌ব্রাহ্মণ বাছিয়া পাঠাইয়া দিবেন। চাণক্য শকটদাসকে রাজার দান গ্রহণান্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাকে দিয়া একখানি পত্র লিখাইয়া আনাইলেন। তাহার পর তাহাতে রাক্ষসের মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া সিদ্ধার্থককে বলিলেন, "তুমি এই পত্রখানি ঘাতকদিগকে দেখাইবে। যখন তাহারা ইতস্ততঃ করিবে, তখন শকটদাসকে লইয়া তুমি রাক্ষসের নিকট পলায়ন করিবে। রাক্ষস সন্তুষ্ট হইয়া যদি তোমায় কিছু দান করেন, তাহা গ্রহণ করিও।" তাহার পর জীবসিদ্ধি রাক্ষসের পরামর্শে পর্ব্বতককে বিষকন্যার দ্বারা হত্যা

মুদ্রারাক্ষস

দেশে যখন যে ভাবটি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তাহাই সাহিত্যে স্থান পায়। দেশের যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধি, ভগবৎ-প্রেম, সুখ, দুঃখ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছে। সাহিত্য দেশের ইতিহাস; ইতিহাস হইতে ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যায় বলিয়া সাহিত্যকে আমরা ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শকও বলিতে পারি। কালিদাস শুধু আমাদের চক্ষে একটা শান্তিময়, আনন্দপূর্ণ দেশের প্রতিচ্ছবি রাখিয়া যান নাই,—তাঁহার কাছে যে আনন্দ নানা মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা যে শুধু একটা বিশিষ্ট দেশের, বিশিষ্ট সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহা নয়, —তাহা আমাদের ভাবিতে শিখাইয়াছে, আমাদের চোখ ফুটাইয়াছে, ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে আলোকময়, আরাম পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

ক অচিরস্থায়ী বিশিষ্ট ভাব বা
তাহা কখনই চিরন্তন আনন্দ
স্ত এই শ্রেণীর সাহিত্য অল্প-
টা উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া
। সাহিত্য চিরকালের বিশ্ব-
কোন একটা বিশিষ্ট সময় বা
অংশে আবদ্ধ করিলে তাহার

তাহাতে শুধু একটা সাময়িক
জ্ঞাগত,
হ, যাহা
গাহিয়া
উচিত।
, কিন্তু
যণে কত
না চির-

াথদত্ত।
বিশিষ্ট
একটু

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক মূল্য ভিন্ন আর কিছুই নাই; সুতরাং উচ্চ সাহিত্যে ইহাকে স্থান দেওয়া যায় না। যাঁহারা রাজনীতির আলোচনা করিতে চান, তাঁহারা মুদ্রারাক্ষস পড়ুন।

শকুন্তলা, উত্তরচরিত বা মৃচ্ছকটিক পড়িলে এ প্রশ্ন মনে উদিত হয় না, কারণ তাহাতে বিশ্বের প্রণয় বা শোকের কথা লিপিবদ্ধ আছে; সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক জিনিস আছে, যাহা সকল পাঠককেই মুগ্ধ করিয়া দেয়; কেবল কৌটিল্যের সাম, দান, ভেদ বা দণ্ডের নীতি তাহাদিগকে শুষ্ক, নীরস করিয়া দেয় নাই। সকলেই তাহাদের রস আস্বাদন করিতে পারে।

মুদ্রারাক্ষসে কুটিল কর্ম্ম যন্ত্রের ঘর্ঘর ছাড়া আর বড় কিছু শোনা যায় না। নাটকখানিতে প্রেমের কথা নাই বলিলেই হয়। যে স্ত্রীচরিত্র আছে, তাহা না থাকিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। অন্য নাটকে একটা বিদূষক বা ঐরূপ কোন একটি চরিত্র থাকে, ইহাতে তাহাও নাই। গ্রন্থকার সাতটি অঙ্কে কেবলই সন্ধি, বিগ্রহ, ভেদের কথা লিখিয়াছেন। কোন লোককেই বড় দেখিতে পাওয়া যায় না; রাজারা নির্জ্জীব, নিষ্প্রভ হইয়া আছেন। দেখা যায় কেবল দুই মন্ত্রীকে, তাঁহারা কেবলই নিজের মতলব কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; এ ছাড়া আর কোন ভাবনা তাঁহাদের মাথায় আসে না। চাণক্য ভাবিতেছেন—কেমন করিয়া রাক্ষসকে বশে আনিব, আর রাক্ষস ভাবিতেছেন—কি করিলে নন্দ রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও মুদ্রারাক্ষসের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিবার আছে। আমরা যথাস্থানে তাহা প্রকাশ করিব। এখানি কোন্ শ্রেণীর নাটক তাহাই প্রথমে দেখা যাউক।

(২)

মুদ্রারাক্ষস বীররসাত্মক, চাণক্য ধীরোদ্ধত নায়ক। গল্পাংশ বুঝিতে হইলে আমাদের পূর্ব্বের কথা জানিতে হইবে।

নন্দবংশে সর্ব্বার্থসিদ্ধি রাজার দুই মহিষী ছিলেন। একজনের গর্ভে নয়টি ও আর একজনের গর্ভে একটি পুত্র-সন্তান উৎপন্ন হয়। রাজা এক মহিষীর গর্ভজাত নয়টি পুত্রের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া ও অন্য মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মৌর্য্যকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

উক্ত নয়টি পুত্র নন্দ নামে খ্যাত। তাহাদের সন্তানাদি ছিল না। মৌর্য্যের একশত পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তই পরাক্রান্ত ছিলেন। নন্দেরা মৌর্য্য ও তাঁহার পুত্রদিগকে ক্ষমতাপন্ন হইতে দেখিয়া ভীত হইলেন ও সকলকে কারারুদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের জন্য যৎসামান্য আহার নির্দ্দিষ্ট হইল। অবশেষে বন্দীরা স্থির করিলেন যে, তাঁহারা সমস্ত আহার্য্য চন্দ্রগুপ্তকে দান করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন, ; কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে এই মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। লঙ্কাধিপতির প্রেরিত একটি সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত কারামুক্ত হন।

এই সময় চাণক্য নামে এক জন রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দদিগের সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। একদিন নন্দদিগের কোনও একটা উৎসবে যোগদান করিয়া চাণক্য সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশন করেন। নন্দেরা তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। সেই সময় হইতেই চাণক্য তাঁহাদের বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। রাক্ষস নামে একজন ব্রাহ্মণ সর্ব্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রী ছিলেন। এখন তিনি নন্দদিগকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইলেন। চাণক্য, রাক্ষসের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য, ক্ষপণককে নিযুক্ত করিয়া ম্লেচ্ছরাজ পর্ব্বতককে নন্দদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহ দান করিলেন। পর্ব্বতক, নন্দদিগকে পরাজিত করিলে, তাহাদের রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পাইবেন, এ আশাও তাঁহাকে দেওয়া হইল। অবশেষে একটি যুদ্ধে নন্দগণ পরাজিত হইলেন, রাজধানী কুসুমপুর চন্দ্রগুপ্ত ও পর্ব্বতকের হস্তগত হইল। রাক্ষস, সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে একটি নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, চাণক্যের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। চাণক্যের কিছুই হইল না, বরং তাঁহার অনুমতিক্রমে সর্ব্বার্থসিদ্ধি নিহত হইলেন। রাক্ষস, চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিবার জন্য, যে বিষকন্যাকে প্রেরণ করিলেন, সে চাণক্যের কৌশলে পর্ব্বতকের প্রাণসংহার করিল। পর্ব্বতকের পুত্র মলয়কেতু শুনিলেন, চাণক্যই তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে। তখন তিনি চাণক্যের ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। রাক্ষস, তাঁহার মন্ত্রী হইয়া, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মগধ আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইখানে নাটকের আরম্ভ। প্রথম অঙ্কে চাণক্য আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের সচিবরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাই নাটকের বীজ। এই অঙ্কে গুপ্তচর নিপুণক চাণক্যের নিকট আপনার কার্য্যের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিল, প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের অনুরক্ত; কিন্তু ক্ষপণক, জীবসিদ্ধি, শকটদাস ও চন্দনদাস রাক্ষসের পক্ষপাতী। চাণক্য জানিতেন, ক্ষপণক, জীবসিদ্ধি তাঁহারই গুপ্তচর। তাহারা রাক্ষসের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এই জীবসিদ্ধি, চন্দ্রগুপ্তের নিকট প্রেরিত বিষকন্যাকে পর্ব্বতকের প্রতি প্রয়োগ করে। চাণক্য এই দুইজনের কথায় কাণ দিলেন না, শকটদাসকেও তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে, রাক্ষস তাহার স্ত্রীপুত্রকে চন্দনদাসের গৃহে রাখিয়াছেন, তখন বুঝিলেন যে, চন্দনদাস রাক্ষসের পরম বন্ধু। চাণক্যের হস্তে একটি অঙ্গুলিমুদ্রা রাখিয়া, বলিল— চন্দনদাসের গৃহে পাইয়াছি। চাণক্য রাক্ষসের নাম অঙ্কিত আছে। তাহার শুনিয়া তিনি বুঝিলেন, রাক্ষসের স্ত্রীপুত্র গৃহে আছে। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া পর্ব্বতকের পারলৌকিক অলঙ্কারগুলি ব্রাহ্মণদি বলিলেন যে, তিনিই চাণক্য শকটদাসকে সাক্ষাৎ করিতে আ পত্র লিখাইয়া আন রাক্ষসের মুদ্রা অঙ্কিত এই পত্রখানি যা ইতস্ততঃ করিবে, নিকট পলায়ন ক দান করেন, রাক্ষসের পরাম

মুদ্রারাক্ষস

দেশে যখন যে ভাবটি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তাহাই সাহিত্যে স্থান পায়। দেশের যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধি, ভগবৎ-প্রেম, সুখ, দুঃখ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছে। সাহিত্য দেশের ইতিহাস; ইতিহাস হইতে ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যায় বলিয়া সাহিত্যকে আমরা ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শকও বলিতে পারি। কালিদাস শুধু আমাদের চক্ষে একটা শান্তিময়, আনন্দপূর্ণ দেশের প্রতিচ্ছবি রাখিয়া যান নাই,—তাঁহার কাছে যে আনন্দ নানা মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা যে শুধু একটা বিশিষ্ট দেশের, বিশিষ্ট সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহা নয়, —তাহা আমাদের ভাবিতে শিখাইয়াছে, আমাদের চোখ ফুটাইয়াছে, ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে আলোকময়, মনোরম পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

যে সাহিত্য শুধু সাময়িক অচিরস্থায়ী বিশিষ্ট ভাব বা ঘটনা বিষয়ীভূত করিয়া লয়, তাহা কখনই চিরন্তন আনন্দ দান করিতে পারে না; এই জন্য এই শ্রেণীর সাহিত্য অল্প-ক্ষণের জন্য মানুষের মনে একটা উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। সাহিত্য চিরকালের বিশ্ব-মানবের সামগ্রী। তাহাকে কোন একটা বিশিষ্ট সময় বা বিশ্বের কোন একটি বিশিষ্ট অংশে আবদ্ধ করিলে তাহার ধ্বংসের সম্ভাবনা।

এই জন্য যে সাহিত্য উচ্চ, তাহাতে শুধু একটা সাময়িক ভাব বা উত্তেজনা স্থান পায় না; যাহা এই পৃথিবীর মজ্জাগত, যাহা বিশ্বযন্ত্রের তারে তারে নিয়ত কাঁপিয়া উঠিতেছে, যাহা একজনের সুর নয়, বিশ্ব যে সুরে তাহার আকুল গান গায়িয়া উঠিতেছে, তাহাই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সাহিত্য-সমুদ্রে কত বুদ্বুদ উঠিয়া বিলীন হইয়াছে, কিন্তু রামায়ণ মহাভারত এখনও নষ্ট হয় নাই। নানা কারণে কত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কালিদাস, ভবভূতির রচনা চির-কালই অমর।

মুদ্রারাক্ষস একখানি নাটক, রচয়িতার নাম বিশাখদত্ত। একবার পড়িলে বোধ হয় বইখানি ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট সময়, বিষয়, ঘটনা অবলম্বন করিয়া লেখা। ইহার একটু ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক মূল্য ভিন্ন আর কিছুই নাই; সুতরাং উচ্চ সাহিত্যে ইহাকে স্থান দেওয়া যায় না। যাঁহারা রাজনীতির আলোচনা করিতে চান, তাঁহারা মুদ্রারাক্ষস পড়ুন।

শকুন্তলা, উত্তরচরিত বা মৃচ্ছকটিক পড়িলে এ প্রশ্ন মনে উদিত হয় না, কারণ তাহাতে বিশ্বের প্রণয় বা শোকের কথা লিপিবদ্ধ আছে; সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক জিনিস আছে, যাহা সকল পাঠককেই মুগ্ধ করিয়া দেয়; কেবল কৌটিল্যের সাম, দান, ভেদ বা দণ্ডের নীতি তাহাদিগকে শুষ্ক, নীরস করিয়া দেয় নাই। সকলেই তাহাদের রস আস্বাদন করিতে পারে।

মুদ্রারাক্ষসে কুটিল কর্ম্ম যন্ত্রের ঘর্ঘর ছাড়া আর বড় কিছু শোনা যায় না। নাটকখানিতে প্রেমের কথা নাই বলিলেই হয়। যে স্ত্রীচরিত্র আছে, তাহা না থাকিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। অন্য নাটকে একটা বিদূষক বা ঐরূপ কোন একটি চরিত্র থাকে, ইহাতে তাহাও নাই। গ্রন্থকার সাতটি অঙ্কে কেবলই যুদ্ধ, বিগ্রহ, ভেদের কথা লিখিয়াছেন। কোন লোককেই বড় দেখিতে পাওয়া যায় না; রাজারা নির্জীব, নিষ্প্রভ হইয়া আছেন। দেখা যায় কেবল দুই মন্ত্রীকে, তাঁহারা কেবলই নিজের মতলব কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; এ ছাড়া আর কোন ভাবনা তাঁহাদের মাথায় আসে না। চাণক্য ভাবিতেছেন—কেমন করিয়া রাক্ষসকে বশে আনিব, আর রাক্ষস ভাবিতেছেন—কি করিলে নন্দ-রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও মুদ্রারাক্ষসের সম্বন্ধে কতক-গুলি কথা বলিবার আছে। আমরা যথাস্থানে তাহা প্রকাশ করিব। এখানি কোন্ শ্রেণীর নাটক তাহাই প্রথমে দেখা যাউক।

(২)

মুদ্রারাক্ষস বীররসাত্মক, চাণক্য ধীরোদ্ধত নায়ক। গল্পাংশ বুঝিতে হইলে আমাদের পূর্ব্বের কথা জানিতে হইবে।

নন্দবংশে সর্ব্বার্থসিদ্ধি রাজার দুই মহিষী ছিলেন। একজনের গর্ভে নয়টি ও আর একজনের গর্ভে একটি পুত্র-সন্তান উৎপন্ন হয়। রাজা এক মহিষীর গর্ভজাত নয়টি পুত্রের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া ও অন্য মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মৌর্য্যকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

উক্ত নয়টি পুত্র নন্দ নামে খ্যাত। তাহাদের সন্তানাদি ছিল না। মৌর্য্যের একশত পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তই পরাক্রান্ত ছিলেন। নন্দেরা মৌর্য্য ও তাঁহার পুত্রদিগকে ক্ষমতাপন্ন হইতে দেখিয়া ভীত হইলেন ও সকলকে কারারুদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের জন্য যৎসামান্য আহার নির্দ্দিষ্ট হইল। অবশেষে বন্দীরা স্থির করিলেন যে, তাঁহারা সমস্ত আহার্য্য চন্দ্রগুপ্তকে দান করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন, ; কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে এই মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। লঙ্কাধিপতির প্রেরিত একটি সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত কারামুক্ত হন।

এই সময় চাণক্য নামে এক জন রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দদিগের সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। একদিন নন্দদিগের কোনও একটা উৎসবে যোগদান করিয়া চাণক্য সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশন করেন। নন্দেরা তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। সেই সময় হইতেই চাণক্য তাঁহাদের বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। রাক্ষস নামে একজন ব্রাহ্মণ সর্ব্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রী ছিলেন। এখন তিনি নন্দদিগকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইলেন। চাণক্য, রাক্ষসের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য, ক্ষপণককে নিযুক্ত করিয়া ম্লেচ্ছরাজ পর্ব্বতককে নন্দদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহ দান করিলেন। পর্ব্বতক, নন্দদিগকে পরাজিত করিলে, তাহাদের রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পাইবেন, এ আশাও তাঁহাকে দেওয়া হইল। অবশেষে একটি যুদ্ধে নন্দগণ পরাজিত হইলেন, রাজধানী কুসুমপুর চন্দ্রগুপ্ত ও পর্ব্বতকের হস্তগত হইল। রাক্ষস, সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে একটি নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, চাণক্যের বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করিতে লাগিলেন। চাণক্যের কিছুই হইল না, বরং তাঁহার অনুমতিক্রমে সর্ব্বার্থসিদ্ধি নিহত হইলেন। রাক্ষস, চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিবার জন্য, যে বিষকন্যাকে প্রেরণ করিলেন, সে চাণক্যের কৌশলে পর্ব্বতকের প্রাণসংহার করিল। পর্ব্বতকের পুত্র মলয়কেতু শুনিলেন, চাণক্যই তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে। তখন তিনি চাণক্যের ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। রাক্ষস, তাঁহার মন্ত্রী হইয়া, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মগধ আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইখানে নাটকের আরম্ভ। প্রথম অঙ্কে চাণক্য আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের সচিবরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাই নাটকের বীজ। এই অঙ্কে গুপ্তচর নিপুণক চাণক্যের নিকট আপনার কার্য্যের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিল, প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের অনুরক্ত ; কিন্তু ক্ষপণক, জীবসিদ্ধি, শকটদাস ও চন্দনদাস রাক্ষসের পক্ষপাতী। চাণক্য জানিতেন, ক্ষপণক, জীবসিদ্ধি তাঁহারই গুপ্তচর। তাহারা রাক্ষসের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এই জীবসিদ্ধি, চন্দ্রগুপ্তের নিকট প্রেরিত বিষকন্যাকে পর্ব্বতকের প্রতি প্রয়োগ করে। চাণক্য এই দুইজনের কথায় কাণ দিলেন না, শকটদাসকেও তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন ; কিন্তু যখন শুনিলেন যে, রাক্ষস তাহার স্ত্রীপুত্রকে চন্দনদাসের গৃহে রাখিয়াছেন, তখন তিনি বুঝিলেন যে, চন্দনদাস রাক্ষসের পরম বন্ধু। নিপুণক, চাণক্যের হস্তে একটি অঙ্গুলিমুদ্রা রাখিয়া, বলিল—ইহা আমি চন্দনদাসের গৃহে পাইয়াছি। চাণক্য দেখিলেন, মুদ্রায় রাক্ষসের নাম অঙ্কিত আছে। তাহার পর মুদ্রাপ্রাপ্তির বিবরণ শুনিয়া তিনি বুঝিলেন, রাক্ষসের স্ত্রীপুত্র নিশ্চয়ই চন্দনদাসের গৃহে আছে। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি পর্ব্বতকের পারলৌকিক উপলক্ষে উক্ত মৃত রাজার অলঙ্কারগুলি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে চান। চাণক্য বলিলেন যে, তিনিই সদ্‌ব্রাহ্মণ বাছিয়া পাঠাইয়া দিবেন। চাণক্য শকটদাসকে রাজার দান গ্রহণান্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাকে দিয়া একখানি পত্র লিখাইয়া আনাইলেন। তাহার পর তাহাতে রাক্ষসের মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া সিদ্ধার্থককে বলিলেন, "তুমি এই পত্রখানি ঘাতকদিগকে দেখাইবে। যখন তাহারা ইতস্ততঃ করিবে, তখন শকটদাসকে লইয়া তুমি রাক্ষসের নিকট পলায়ন করিবে। রাক্ষস সন্তুষ্ট হইয়া যদি তোমায় কিছু দান করেন, তাহা গ্রহণ করিও।" তাহার পর জীবসিদ্ধি রাক্ষসের পরামর্শে পর্ব্বতককে বিষকন্যার দ্বারা হত্যা

মুদ্রারাক্ষস

দেশে যখন যে ভাবটি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তাহাই সাহিত্যে স্থান পায়। দেশের যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধি, ভগবৎ-প্রেম, সুখ, দুঃখ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছে। সাহিত্য দেশের ইতিহাস ; ইতিহাস হইতে ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যায় বলিয়া সাহিত্যকে আমরা ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক ও বলিতে পারি। কালিদাস শুধু আমাদের চক্ষে একটা শান্তিময়, আনন্দপূর্ণ দেশের প্রতিচ্ছবি রাখিয়া যান নাই,—তাঁহার কাছে যে আনন্দ নানা মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা যে শুধু একটা বিশিষ্ট দেশের, বিশিষ্ট সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহা নয়, —তাহা আমাদের ভাবিতে শিখাইয়াছে, আমাদের চোখ ফুটাইয়াছে, ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে আলোকময়, মনোরম পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।

যে সাহিত্য শুধু সাময়িক অচিরস্থায়ী বিশিষ্ট ভাব বা ঘটনা বিষয়ীভূত করিয়া লয়, তাহা কখনই চিরন্তন আনন্দ দান করিতে পারে না ; এই জন্য এই শ্রেণীর সাহিত্য অল্প-ক্ষণের জন্য মানুষের মনে একটা উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। সাহিত্য চিরকালের বিশ্ব-মানবের সামগ্রী। তাহাকে কোন একটা বিশিষ্ট সময় বা বিশ্বের কোন একটি বিশিষ্ট অংশে আবদ্ধ করিলে তাহার ধ্বংসের সম্ভাবনা।

এই জন্য যে সাহিত্য উচ্চ, তাহাতে শুধু একটা সাময়িক ভাব বা উত্তেজনা স্থান পায় না ; যাহা এই পৃথিবীর মজ্জাগত, যাহা বিশ্বযন্ত্রের তারে তারে নিয়ত কাঁপিয়া উঠিতেছে, যাহা একজনের সুর নয়, বিশ্ব যে সুরে তাহার আকুল গান গায়িয়া উঠিতেছে, তাহাই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সাহিত্য-সমুদ্রে কত বুদ্বুদ উঠিয়া বিলীন হইয়াছে, কিন্তু রামায়ণ মহাভারত এখনও নষ্ট হয় নাই। নানা কারণে কত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কালিদাস, ভবভূতির রচনা চির-কালই অমর।

মুদ্রারাক্ষস একখানি নাটক, রচয়িতার নাম বিশাখদত্ত। একবার পড়িলে বোধ হয় বইখানি ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট সময়, বিষয়, ঘটনা অবলম্বন করিয়া লেখা। ইহার একটু ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক মূল্য ভিন্ন আর কিছুই নাই ; সুতরাং উচ্চ সাহিত্যে ইহাকে স্থান দেওয়া যায় না। যাঁহারা রাজনীতির আলোচনা করিতে চান, তাঁহারা মুদ্রারাক্ষস পড়ুন।

শকুন্তলা, উত্তরচরিত বা মৃচ্ছকটিক পড়িলে এ প্রশ্ন মনে উদিত হয় না, কারণ তাহাতে বিশ্বের প্রণয় বা শোকের কথা লিপিবদ্ধ আছে ; সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক জিনিস আছে, যাহা সকল পাঠককেই মুগ্ধ করিয়া দেয় ; কেবল কৌটিল্যের সাম, দান, ভেদ বা দণ্ডের নীতি তাহাদিগকে শুষ্ক, নীরস করিয়া দেয় নাই। সকলেই তাহাদের রস আস্বাদন করিতে পারে।

মুদ্রারাক্ষসে কুটিল কর্ম্ম-যন্ত্রের ঘর্ঘর ছাড়া আর বড় কিছু শোনা যায় না। নাটকখানিতে প্রেমের কথা নাই বলিলেই হয়। যে স্ত্রীচরিত্র আছে, তাহা না থাকিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। অন্য নাটকে একটা বিদূষক বা ঐরূপ কোন একটি চরিত্র থাকে, ইহাতে তাহাও নাই। গ্রন্থকার সাতটি অঙ্কে কেবলই যুদ্ধ, বিগ্রহ, ভেদের কথা লিখিয়াছেন। কোন লোককেই বড় দেখিতে পাওয়া যায় না; রাজারা নির্জ্জীব, নিষ্প্রভ হইয়া আছেন। দেখা যায় কেবল দুই মন্ত্রীকে, তাঁহারা কেবলই নিজের মতলব কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন ; এ ছাড়া আর কোন ভাবনা তাঁহাদের মাথায় আসে না। চাণক্য ভাবিতেছেন—কেমন করিয়া রাক্ষসকে বশে আনিব, আর রাক্ষস ভাবিতেছেন—কি করিলে নন্দ-রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও মুদ্রারাক্ষসের সম্বন্ধে কতক-গুলি কথা বলিবার আছে। আমরা যথাস্থানে তাহা প্রকাশ করিব। এখানি কোন্ শ্রেণীর নাটক তাহাই প্রথমে দেখা যাউক।

(২)

মুদ্রারাক্ষস বীররসাত্মক, চাণক্য ধীরোদ্ধত নায়ক। গল্পাংশ বুঝিতে হইলে আমাদের পূর্ব্বের কথা জানিতে হইবে।

নন্দবংশে সর্ব্বার্থসিদ্ধি রাজার দুই মহিষী ছিলেন। একজনের গর্ভে নয়টি ও আর একজনের গর্ভে একটি পুত্র-সন্তান উৎপন্ন হয়। রাজা এক মহিষীর গর্ভজাত নয়টি পুত্রের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া ও অন্য মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মৌর্য্যকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

উক্ত নয়টি পুত্র নন্দ নামে খ্যাত। তাহাদের সন্তানাদি ছিল না। মৌর্য্যের একশত পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তই পরাক্রান্ত ছিলেন। নন্দেরা মৌর্য্য ও তাঁহার পুত্রদিগকে ক্ষমতাপন্ন হইতে দেখিয়া ভীত হইলেন ও সকলকে কারারুদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের জন্য যৎসামান্য আহার নির্দ্দিষ্ট হইল। অবশেষে বন্দীরা স্থির করিলেন যে, তাঁহারা সমস্ত আহার্য্য চন্দ্রগুপ্তকে দান করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন, ; কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে এই মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। লঙ্কাধিপতির প্রেরিত একটি সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত কারামুক্ত হন।

এই সময় চাণক্য নামে এক জন রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দদিগের সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। একদিন নন্দদিগের কোনও একটা উৎসবে যোগদান করিয়া চাণক্য সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশন করেন। নন্দেরা তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। সেই সময় হইতেই চাণক্য তাঁহাদের বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। রাক্ষস নামে একজন ব্রাহ্মণ সর্ব্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রী ছিলেন। এখন তিনি নন্দদিগকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইলেন। চাণক্য, রাক্ষসের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য, ক্ষপণককে নিযুক্ত করিয়া ম্লেচ্ছরাজ পর্ব্বতককে নন্দদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহ দান করিলেন। পর্ব্বতক, নন্দদিগকে পরাজিত করিলে, তাহাদের রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পাইবেন, এ আশাও তাঁহাকে দেওয়া হইল। অবশেষে একটি যুদ্ধে নন্দগণ পরাজিত হইলেন, রাজধানী কুসুমপুর চন্দ্রগুপ্ত ও পর্ব্বতকের হস্তগত হইল। রাক্ষস, সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে একটি নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, চাণক্যের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। চাণক্যের কিছুই হইল না, বরং তাঁহার অনুমতিক্রমে সর্ব্বার্থসিদ্ধি নিহত হইলেন। রাক্ষস, চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিবার জন্য, যে বিষকন্যাকে প্রেরণ করিলেন, সে চাণক্যের কৌশলে পর্ব্বতকের প্রাণসংহার করিল। পর্ব্বতকের পুত্র মলয়কেতু শুনিলেন, চাণক্যই তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে। তখন তিনি চাণক্যের ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। রাক্ষস, তাঁহার মন্ত্রী হইয়া, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মগধ আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইখানে নাটকের আরম্ভ। প্রথম অঙ্কে চাণক্য আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের সচিবরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাই নাটকের বীজ। এই অঙ্কে গুপ্তচর নিপুণক চাণক্যের নিকট আপনার কার্য্যের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিল, প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের অনুরক্ত ; কিন্তু ক্ষপণক, জীবসিদ্ধি, শকটদাস ও চন্দনদাস রাক্ষসের পক্ষপাতী। চাণক্য জানিতেন, ক্ষপণক, জীবসিদ্ধি তাঁহারই গুপ্তচর। তাহারা রাক্ষসের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এই জীবসিদ্ধি, চন্দ্রগুপ্তের নিকট প্রেরিত বিষকন্যাকে পর্ব্বতকের প্রতি প্রয়োগ করে। চাণক্য এই দুইজনের কথায় কাণ দিলেন না, শকটদাসকেও তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন , কিন্তু যখন শুনিলেন যে, রাক্ষস তাহার স্ত্রীপুত্রকে চন্দনদাসের গৃহে রাখিয়াছেন, তখন তিনি বুঝিলেন যে, চন্দনদাস রাক্ষসের পরম বন্ধু। নিপুণক, চাণক্যের হস্তে একটি অঙ্গুলিমুদ্রা রাখিয়া, বলিল—ইহা আমি চন্দনদাসের গৃহে পাইয়াছি। চাণক্য দেখিলেন, মুদ্রায় রাক্ষসের নাম অঙ্কিত আছে। তাহার পর মুদ্রাপ্রাপ্তির বিবরণ শুনিয়া তিনি বুঝিলেন, রাক্ষসের স্ত্রীপুত্র নিশ্চয়ই চন্দনদাসের গৃহে আছে। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি পর্ব্বতকের পারলৌকিক উপলক্ষে উক্ত মৃত রাজার অলঙ্কারগুলি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে চান। চাণক্য বলিলেন যে, তিনিই সদ্‌ব্রাহ্মণ বাছিয়া পাঠাইয়া দিবেন। চাণক্য শকটদাসকে রাজার দান গ্রহণান্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাকে দিয়া একখানি পত্র লিখাইয়া আনাইলেন। তাহার পর তাহাতে রাক্ষসের মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া সিদ্ধার্থককে বলিলেন, "তুমি এই পত্রখানি ঘাতকদিগকে দেখাইবে। যখন তাহারা ইতস্ততঃ করিবে, তখন শকটদাসকে লইয়া তুমি রাক্ষসের নিকট পলায়ন করিবে। রাক্ষস সন্তুষ্ট হইয়া যদি তোমায় কিছু দান করেন, তাহা গ্রহণ করিও।" তাহার পর জীবসিদ্ধি রাক্ষসের পরামর্শে পর্ব্বতককে বিষকন্যার দ্বারা হত্যা

করিয়াছে, এই কথা রটাইয়া তিনি তাহাকে রাজ্য হইতে দূর করিবার ব্যবস্থা করিলেন; শকটদাসেরও বধাজ্ঞা প্রচারিত হইল। তৎপরে তিনি চন্দনদাসকে ডাকাইয়া অনেক কথা বলিলেন। চন্দনদাস কোন মতেই স্বীকার করিল না যে, রাক্ষসের স্ত্রীপুত্র তাহার নিকট আছে। তখন তিনি চন্দনদাসকে কারারুদ্ধ করিলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল—বধ্যভূমি হইতে শকটদাসকে লইয়া সিদ্ধার্থক, ভাগুরায়ণ ও অন্যান্য কএকজন পলায়ন করিয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে সাপুড়িয়ার বেশে গুপ্তচর বিরাধগুপ্ত রাক্ষসের নিকট কুসুমপুরের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন। রাক্ষস বুঝিলেন—তাঁহার সকল চেষ্টা চাণক্যের চাতুর্য্যে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; চন্দ্রগুপ্তকে বিপন্ন করিবার জন্য তিনি যাহাদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে; ক্ষপণক, জীবসিদ্ধি, শকটদাস ও চন্দনদাস দণ্ডিত হইয়াছে। এমন সময় শকটদাস সিদ্ধার্থকের সহিত তাঁহার নিকট উপনীত হইল। মলয়কেতু রাক্ষসকে প্রসাদস্বরূপ যে অলঙ্কার দান করিয়াছিলেন, রাক্ষস সেগুলি সিদ্ধার্থককে দান করিলেন। সিদ্ধার্থকের হস্তে রাক্ষসের সেই নামমুদ্রা ছিল। সিদ্ধার্থক তাহা চন্দনদাসের গৃহের নিকট কুড়াইয়া পাইয়াছে, রাক্ষস তাহা শুনিলেন এবং মুদ্রাটি শকটদাসের হস্তে দিয়া বলিলেন, "তোমার কাজের সময় এই মুদ্রা ব্যবহার করিও।" এই সময় বিরাধগুপ্ত সংবাদ দিল যে, মলয়কেতুর পলায়নের পর হইতে চাণক্য নানা বিষয়ে অবাধ্য হওয়ায় চন্দ্রগুপ্তের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছেন।

তৃতীয় অঙ্কে চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের মধ্যে একটা মিথ্যা কলহের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কলহের পর দেশের লোক জানিতে পারিল যে, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে সদ্ভাব নাই।

চতুর্থ অঙ্কে রাক্ষসের গুপ্তচর করভক আসিয়া বলিল—চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের মধ্যে একটা মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। রাক্ষস মলয়কেতুকে বলিলেন—এই সময় চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত।

পঞ্চম অঙ্কে ক্ষপণক, জীবসিদ্ধির নিকট মলয়কেতু শুনিলেন—রাক্ষসই বিষকন্যার দ্বারা তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে। মলয়কেতু বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এমন সময় হস্তপদবদ্ধ সিদ্ধার্থক সেখানে আনীত হইল। তিনি ছাড়পত্র না লইয়া রাক্ষসেরই কোনও একটা কাজে শিবির ত্যাগ করিয়াছিলেন, এই তাঁহার দোষ। অনুসন্ধানের পর সিদ্ধার্থকের নিকট হইতে একখানা চিঠি ও একটি গহনার বাক্স বাহির হইল। দুইটি জিনিসেই রাক্ষসের নামমুদ্রা অঙ্কিত ছিল। মলয়কেতু বুঝিলেন, গহনাগুলি তাঁহারই—এগুলি তিনি রাক্ষসকে দান করিয়াছিলেন। পত্রে যাহা লেখা ছিল, তাহা হইতে তিনি অনুমান করিলেন—রাক্ষস বিশ্বাসঘাতক। তৎক্ষণাৎ তিনি রাক্ষসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মলয়কেতুর সহিত দেখা করিতে আসিবার সময় শকটদাস যে তিনখানি অলঙ্কার ক্রয় করিয়াছিল, তাহারই একটা পরিয়াছিলেন। এই অলঙ্কার যে পর্ব্বতকের, মলয়কেতু তাহা চিনিতে পারিলেন। তাঁহার সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া আসিল। পাঁচজন রাজা রাক্ষসের এই ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত আছে জানিয়া মলয়কেতু তাহাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন।

ষষ্ঠ অঙ্কে বুঝা যায়, মলয়কেতুর এই হঠকারিতা দেখিয়া অন্য যে সকল রাজা তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভীত হইলেন। ভাগুরায়ণ প্রভৃতি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস স্থির করিলেন—তিনি পাটলিপুত্রে গিয়া চন্দনদাসকে রক্ষা করিবেন।

সপ্তম অঙ্কে চন্দনদাসকে বধ্যভূমিতে আনা হইয়াছে; এমন সময় রাক্ষস সেখানে উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। চাণক্য তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সমস্ত রহস্য প্রকাশ করার পর রাক্ষস সুস্থ হইলেন। তখন চাণক্য বলিলেন, "আপনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করুন, তাহা না হইলে চন্দনদাস রক্ষা পাইবে না।" রাক্ষস অনিচ্ছাস্বত্বেও তাহা গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। মলয়কেতু তাঁহার পিতার রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন।

৩

গ্রন্থকার একটি শ্লোকে মন্ত্রী ও নাটককারের কষ্টসাধ্য কাজটির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে বীজ বপন করিতে হইবে, তাহার পর সেই বীজের বিস্তার হওয়া আবশ্যক, তাহার পর ফলের সূচনা ও বীজের অধিকতর বিস্তার করিতে হইবে, শেষে সকল কাজকেই ফলপ্রাপ্তির

দিকে সংহরণ করা চাই। * মুদ্রারাক্ষসে মন্ত্রীর কাজের বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রীর কাজের সঙ্গে সঙ্গে নাটকখানিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার বীজবপন হইতে ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া নাটক সম্বন্ধে আপনার কথা ঠিক রাখিয়াছেন; মন্ত্রী চাণক্যের কাজেও সে কথা নিরর্থক হয় নাই।

কেমন করিয়া নাটকের বস্তু বর্ণনা করিতে হয় তাহা অলঙ্কারশাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে বলা আছে। অনেক নাটককার সেই কথাগুলি বেদবাক্যের মত মানিয়া চলেন; বিশাখদত্তও তাহা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কাজে কিছু মৌলিকতা আছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের বাঁধাধরা নিয়মগুলি অপরিণত নাটককারের মত তিনি বর্ণে বর্ণে মানিতে চান নাই; সেই নিয়মগুলিকে তিনি আপনার অধীনে আনিয়াছেন, আপনার বুদ্ধির প্রাধান্য সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইয়াছে। বীজ হইতে ফলপ্রাপ্তি পর্যান্ত, সমস্ত ঘটনাকে একদিকে সংহরণ করিয়া নাটকখানিকে গড়িয়া তুলিতে তাঁহার যে আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি একাধিক স্থলে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। নাটকের বস্তু সাজাইতে গেলে কতটা কৃতিত্বের প্রয়োজন, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। যে ঘটনা অতি সামান্য, যাহার প্রতি পাঠকের লক্ষ্য মোটেই থাকে না, শেষ অঙ্কে তাহারও সার্থকতা পরিস্ফুট হইয়াছে। স্থানে স্থানে ঘটনার পুনরুক্তি হইয়াছে, কিন্তু নাটকে তাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য।

নাটকরচনায় দীর্ঘকালের ঘটনা বর্ণনা না করাই উচিত, কেননা যাহা দুই চারি ঘণ্টায় অভিনয় করিতে হইবে, তাহাতে সাত আট বৎসর ধরিয়া যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা দেখাইতে গেলে গ্রন্থকারের চেষ্টা সফল হয় না। তবে দুই চারি ঘণ্টায় ঘটিয়াছে এমন অভিনয়যোগ্য ঘটনা খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়; আর সকলেই যদি তাহার জন্য লালায়িত হইতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত সাহিত্যে শকুন্তলা, উত্তররামচরিতের মত নাটক থাকিত না; বিলাতেও সেক্সপীয়রের লেখনী নিশ্চল হইয়া থাকিত। কাজেই অনেক নাটককারকে এ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে। তবে যাঁহারা এ নিয়মটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যুগব্যাপী ঘটনার অবতারণা করেন না, তাঁহাদের আমরা প্রশংসা করি; পুরাতনের নিয়মের প্রতি এইটুকু শ্রদ্ধা এখনও আছে।

এখন দেখা যাউক বিশাখদত্ত সেই পুরাতন নিয়ম কতটা মানিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্কে মলয়কেতু বলিতেছেন, "অগ্য দশমোমাসস্তাতস্তোপরতস্য।" ইহার কিছুদিন পরেই নাটকের ঘটনা শেষ হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে জানিতে পারা যায়—পর্ব্বতকের মৃত্যুর কিছুদিন পরে নাটকের ঘটনার আরম্ভ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নাটকের ঘটনা শেষ হইতে এক বৎসরও লাগে নাই।

আখ্যানবস্তু এমন ভাবে সাজান হইয়াছে যে, কোথাও সময়ের আধিক্য বা অল্পতার জন্য অসঙ্গতি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ঘটনাগুলি ঠিক বায়োস্কোপের মত—একটির পর একটি করিয়া আসিয়াছে। শেষ পর্যান্ত কোথাও একঘেয়ে নীরস হয় নাই। আখ্যানবস্তু যতই শেষের দিকে গিয়াছে, ততই তাহার চিত্তাকর্ষণ করিবার শক্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে; দৃশ্যের পরিবর্ত্তন কোথাও দর্শকের দুর্ব্বোধ্য হয় নাই।

নাটকখানিতে শান্তির চিত্র কোথাও নাই; দাম্পত্য-প্রণয়ের কথা একস্থানে একটু আছে, সেখানেও কর্ত্তব্যের কঠোরতায় তাহা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। শোকের কথা আছে, কিন্তু হাসির কথা একটুও নাই। কেবলই কর্ম্মযন্ত্রের ঘর্ঘর সংঘর্ষের কলরোল ছাড়া আর বড় কিছু শোনা যায় না।

৪

গোড়াতেই দেখিতে পাই মুক্তশিখা স্পর্শ করিতে করিতে চাণক্য সক্রোধে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেছেন। নানা বিপদ্ দূরীভূত করিয়া নন্দদিগের উচ্ছেদসাধনের পর তিনি চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—এই গৌরবের কথা তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। সেদিন পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ। কে বলিয়াছিল, "আজ কেতু চন্দ্রকে অভিভূত করিবে"—চাণক্য মনে করিয়াছিলেন, কেহ বুঝি চন্দ্রগুপ্তকে অভিভূত করিবার কথা কহিতেছে, তাই তাঁর এত ক্রোধ। এখনও চন্দ্রগুপ্তের সমস্ত বিপদ্ কাটিয়া যায় নাই, চাণক্যেরও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয় নাই; তাই তাঁহার শিখা এখনও মুক্ত।

---

* কার্য্যোপক্ষেপমাদৌ তনুমপি রচয়ংস্তস্য বিস্তারমিচ্ছন্
বীজানাং গর্ভিতানাং ফলমতিগহনং গূঢ়মুদ্ভেদয়ংশ্চ।
কুর্ব্বন্‌বুদ্ধ্যা বিমর্শং প্রসৃতমপি পুনঃ সংহরন্ কার্য্যজাতং
কর্ত্তা বা নাটকানামিমমনুভবতি ক্লেশমস্মদ্বিধো বা।

এত ক্রোধের মধ্যেও তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ হয় নাই, তাঁহার উদ্দেশ্য তিনি ভুলিয়া যান নাই। এমন সময়েও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসকে সুখ্যাতি করিতেছেন, ভাবিতেছেন—"কথমসৌ বৃষলস্য সাচিব্যগ্রহণেন সানুগ্রহঃ স্যাৎ।"

তাহার পর চাণক্যের নীতিকুশলতা ও অন্যান্য সচিবগুণের পরিচয় আছে; আমরা তাহার আর পুনরুক্তি করিতে চাই না। তাঁহার গুপ্তচর নিয়োগ করা ও বিপক্ষদিগের সমস্ত রহস্যটুকু অবগত হইবার কৌশলে যে কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিলে "কৌটিল্যঃ কুটিলমতিঃ"—এ কথা সার্থক বলিয়া বোধ হয়। কুটিলমতি বলিয়া তিনি যে প্রতিকাজে সতর্কতার দোহাই দিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করেন, তাহা নয়; আপনার কাজের উপর তাঁহার একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে, বড় বড় সমস্যা নিমেষের মধ্যে তিনি মীমাংসা করিয়া ফেলেন, একটা কাজ করিয়া তখনই তিনি তাহার সুদূর পরিণাম নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তিনি নির্ভীক; যেখানে অন্য সচিবেরা ইতস্ততঃ করেন, সেখানে তিনি অবিচলিত। অসাধারণ কৌশলে তিনি কেমন করিয়া রাক্ষসের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়াছিলেন ও চন্দ্রগুপ্তের সমস্ত বিপদ্ দূরীভূত করিয়া রাজ্যলক্ষ্মীকে তাঁহার দিকেই টানিয়া আনিয়াছিলেন, সে কথা দ্বিতীয় অঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে। রাক্ষস নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার "একমপি নীতিবীজং বহুফলতামেতি।" অন্যত্র তাঁহার নীতিকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—

"মুহুর্লক্ষ্যোদ্ভেদা মুহুরধিগমাভাবগহনা
মুহুঃ সংপূর্ণাঙ্গী মুহুরতিকৃশা কার্য্যবশতঃ।
মুহুর্নশ্যদ্বীজা মুহুরপি বহুপ্রাপিতফলে-
ত্যহো চিত্রাকারা নিয়তিরিব নীতির্নয়বিদঃ॥"

রাক্ষস আবার বলিয়াছেন, "অয়ং দুরাত্মা অথবা মহাত্মা কৌটিল্যঃ আকরঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং রত্নানামিব অব্ধিঃ গুণৈর্ন পরিতুষ্যামি যস্য মৎসরিণো বয়ম্॥"

চাণক্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ক্রোধী, অথচ শান্ত। যেখানে দোষ, তাহা তিনি একেবারে উচ্ছেদ করেন না; তাহার যে অংশটুকু গ্রহণ করা যায়, তাহা ত্যাগ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়; ধ্বংস করা তাহার অভিপ্রেত নয়; রক্ষণই তাঁহার নীতির মূলমন্ত্র। তিনি আগাছাটুকু বাদ দিতে চান, তাহার সহিত আসলের কিয়দংশ যাহাতে বাদ না যায়, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি আছে।

নন্দেরা তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিল, তাই চাণক্য তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু এ নাটকের আরম্ভ যে সময়ে, তখন সে প্রতিশোধ লওয়া শেষ হইয়াছে। রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের সচিব করিতে হইবে, এই এক উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টা নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং, শুধু নাটকে বর্ণিত এই উদ্দেশ্যটুকু ধরিলে, বলিতে হইবে চাণক্য নিঃস্বার্থ। এত কাজের মধ্যে তিনি আপনার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তবে যখন পূর্ব্ব কথার উল্লেখ আছে, তখন বলিতে হইবে তাঁহার মনের গ্লানি একেবারে মুছিয়া যায় নাই। বিশেষতঃ যখন তিনি বলিয়াছেন, "অথবা অগৃহীতে রাক্ষসে কিমুৎখাতং নন্দবংশস্য কিংবা স্থৈর্য্যমুৎপাদিতং চন্দ্রগুপ্তলক্ষ্ম্যাঃ", তখন একথাও বলিতে পারা যায়—নাটকে বর্ণিত কাজগুলি নন্দবংশের সমূল উচ্ছেদের জন্যই সম্পন্ন হইয়াছে;—রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের সচিবরূপে নিযুক্ত করা গৌণ উদ্দেশ্য। কিন্তু নাটকখানি আগাগোড়া পড়িলে, ও পূর্ব্ব ইতিহাস মনে না রাখিলে, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে টানিয়া আনাই যে চাণক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি যে "যেন তেন প্রকারেণ স্বকার্য্যসাধনং কুরু" এই ন্যায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। দুইএকটা কাজে তাঁহার নির্ম্মমতা প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু যথেচ্ছাচারিতা বা হিংস্রস্বভাব প্রকাশ পায় নাই; তাঁহার প্রত্যেক কাজটির ফল গুরুতর, কাজেই কোনও কাজটিকে বাদ দেওয়া যায় না। তাঁহার অভিসন্ধি রাক্ষসও অনেক সময় বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃপ্ত স্বভাব রাজাকে পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে। ভৃত্যেরা তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে, মান্য করিয়াছে, আবার কেহ কেহ অসাক্ষাতে তাঁহার প্রতি কম শ্রদ্ধারও পরিচয় দিয়াছে। তাঁহার অখণ্ড প্রভুত্বের ভাব অস্বাভাবিক নয়, কেন না চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শিষ্য, চন্দ্রগুপ্তকে তিনি পুত্রের মত পালন করিতেছেন। তিনি কর্ম্মী,—অদৃষ্টের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা কম, তাঁহার মতে পুরুষকারই শ্রেষ্ঠ। এই বুদ্ধিমান্ তেজস্বী চাণক্য রাজার দক্ষিণ হস্ত হইয়াও আপনার সুবিধার প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই। এইবার মন্ত্রীর গৃহের বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করি—

"উপলশকলমেতদ্ভেদকং গোময়ানাং বটুভিরুপহৃতানাং

বর্হিষাং স্তূপমেতৎ। শরণমপি সমিদ্ভিঃ শুষ্যমাণাভিরাভি-র্বিনমিতপটলান্তং দৃশ্যতে জীর্ণকুড্যম্।" *

এই নিঃস্বার্থতা ছিল বলিয়াই তিনি চন্দ্রগুপ্তকে "বৃষল" বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছিলেন।

(৫)

"অতো রাক্ষসস্য নন্দবংশে নিরতিশয়ো ভক্তিগুণঃ। স খলু কস্মিংশ্চিদপি জীবতি নন্দান্বয়াবয়বে বৃষলস্য সাচিব্যং গ্রাহয়িতুং শক্যতে"—চাণক্যের এই কথাতেই রাক্ষসের প্রভুভক্তি ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। চাণক্যের হাতে চন্দ্রগুপ্তের যে অবস্থা, রাক্ষসের হাতে মলয়কেতুর সে অবস্থা নয়। রাক্ষসের বিনয় ও নম্রতা চাণক্যে নাই। দুইজনেই নীতিবিৎ; চাণক্য নিজেই রাক্ষসের নীতিকুশলতার প্রশংসা করিয়াছেন, লোকেও সেই কথা বলে। তবে নাটকে আমরা রাক্ষসের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেই দেখিয়াছি। নাটককার কোথাও তাঁহাকে জয়ী করান নাই। হারিতে হারিতে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার দিন কাটিয়াছে। বাস্তবিক চাণক্য যে রাক্ষসকে প্রশংসা করিয়াছেন কেন, কেনই বা তিনি তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের যোগ্য সচিব স্থির করিলেন, তাহার কারণ একমাত্র রাক্ষসের প্রভুভক্তি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আমাদের বোধ হয় রাক্ষসের উপর নাটককার কিছু নিৰ্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি গোড়া হইতেই চাণক্যের পথ সরল করিয়া রাখিয়াছেন। এক স্থানেও চাণক্যের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। অদৃষ্ট যেন চাণক্যেরই হাতধরা। সিদ্ধার্থক শকটদাসকে বধ্যস্থান হইতে রাক্ষসের নিকট লইয়া আসিল। মলয়কেতু সেই সময় রাক্ষসকে কতকগুলি অলঙ্কার দান করিয়াছিলেন, রাক্ষস ঠিক সেই অলঙ্কারগুলি সিদ্ধার্থককে পারিতোষিকস্বরূপ দান করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত পর্ব্বতকের অলঙ্কার ব্রাহ্মণকে দান করিতে চাহিলেন। চাণক্যের নির্ব্বাচিত ব্রাহ্মণ সেই অলঙ্কার রাক্ষসের নিকট বিক্রয় করিল। রাক্ষস মলয়কেতুর সহিত দেখা করিবেন,—মলয়কেতু এই মাত্র তাঁহাকে কতকগুলা অলঙ্কার দান করিয়াছেন, এখন মলয়কেতুর সহিত দেখা করিতে গেলে সেই অলঙ্কার পরিয়া যাওয়াই উচিত। যে অলঙ্কার ক্রয় করা হইয়াছে, রাক্ষস তাহাই পরিয়া চলিলেন। সিদ্ধার্থকের নিকট আপনার ও রাক্ষসের নিকট পিতার অলঙ্কার দেখিয়া মলয়কেতু যে সন্দেহ করিলেন, তাহাতেই চাণক্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। এই সকল ঘটনা সংগ্রহ করায় নাটককারের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সমস্ত জিনিসটা স্বাভাবিক হয় নাই। চাণক্য কোথাও একটু বাধা পান নাই, আর রাক্ষস গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, অথচ রাক্ষসের সুখ্যাতি চাণক্যের মুখে লাগিয়াই আছে।

রাক্ষস নন্দবংশের পুরাতন সচিব। মলয়কেতু তাঁহাকে সম্মান করিয়াছেন, সম্মানের প্রতিদানও পাইয়াছেন। রাক্ষস স্বার্থপর, একথা বলা যায় না। নীতিতে মনোযোগ করিবার কারণ, তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন—

"নেদং বিস্মৃতভক্তিনা ন বিষয়ব্যাসঙ্গরূঢ়াত্মনা
প্রাণপ্রচ্যুতিভীরুণা ন চ ময়া নাত্মপ্রতিষ্ঠার্থিনা।
অত্যর্থং পরদাস্যমেত্য নিপুণং নীতৌ মনোদীয়তে
দেবঃ স্বর্গগতোপি শাত্রববধেনারাধিতঃ স্যাদিতি॥" *

চাণক্য উদ্ধত,—রাক্ষস ধীর, শান্ত। মলয়কেতু যখন রাক্ষসকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া স্থির করিলেন, তখন তিনি যে সংযম ও শিষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন, চাণক্য তাহা কখনই দিতে পারিতেন না। ভৃত্যদের প্রতি রাক্ষসের ব্যবহার অতি সুন্দর, ভৃত্যদের প্রতি তাঁহার বিশ্বাসও আছে। যাহার হৃদয় দয়ার্দ্র, স্নেহপ্রবণ—তাঁহার সন্দিগ্ধচিত্ততা না থাকাই সম্ভব। রাক্ষসের তাহাই হইয়াছিল, একজন বন্ধু বা ভৃত্যকে সন্দেহ করিতে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইত। তিনি চাণক্যের মত কর্ম্মী নন, একথা সত্য। চাণক্য যেখানে পুরুষকারের দোহাই দেন, রাক্ষস সেখানে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেন। চাণক্য যেখানে বাঘের মত লাফাইয়া পড়েন, রাক্ষসকে সেখানে ইতস্ততঃ করিতে হয়। কে কেমন মানুষ, একথা বিবেচনা করিতে

* গোময় ভেদ করিবার জন্য উপলখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, বটুরা কুশরাশি আহরণ করিয়া স্তূপীকৃত করিয়াছে। গৃহের দেওয়ালগুলি জীর্ণ। ছাদের উপর সমিৎ শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। তাহার ভারে ছাদের শেষ অংশ বিনমিত।

* পূর্ব্বপ্রভুর প্রতি ভক্তিশূন্য হই নাই, বিষয়েও আমার মন অনাকৃষ্ট, মৃত্যুভয় নাই, আত্মপ্রতিষ্ঠাও ইচ্ছা করি না। যদি আমার স্বর্গগত প্রভু শত্রুবধে পরিতৃপ্ত হন, সেই জন্যই আমি নীতিতে মন দিয়াছি।

গেলে রাক্ষসকেই বেশ ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হয়। চন্দনদাসকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

রাক্ষস ধীর, বুদ্ধিমান্, দূরদর্শী। অবশেষে তিনি চন্দ্রগুপ্তের সাচিব্য গ্রহণ করিলেন; মলয়কেতুর প্রতি বীতরাগ হইয়া নয়, চন্দনদাসকে রক্ষা করিবার জন্য। তখন আর নন্দকুলের প্রতিষ্ঠার আশা নাই। কাজেই চন্দ্রগুপ্তের সহায় হইয়া চন্দনদাস ও মলয়কেতুর প্রাণভিক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় তিনি দেখিতে পাইলেন না।

(৬)

তাহার পর দেখিতে পাই দুই রাজাকে। মলয়কেতুর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত না থাকিলে নাটকের বিশেষ ক্ষতি হইত বলিয়া বোধ হয় না। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের কথা ছাড়া এক পা চলেন না। রাক্ষস ঠিকই বলিয়াছিলেন, "চন্দ্রগুপ্তস্তু দুরাত্মা সচিবায়ত্তসিদ্ধাবেব স্থিতশ্চক্ষুর্বিকল ইবাপ্রত্যক্ষলোকব্যবহারঃ কথমিব স্বয়ং প্রতিবিধাতুং সমর্থঃ স্যাৎ।" মলয়কেতু সন্দিগ্ধচিত্ত, অদূরদর্শী, তাহা হইলেও তাঁহার প্রাণ আছে। নাটকে তিনি মরার মত, একথা কেহ বলিতে পারিবে না। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত প্রাণহীন, এক জায়গায় তাঁহাকে সজীব বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু নাটককার সেখানে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, "এ প্রাণের লক্ষণ কিছুই নয়, এ সবই মিথ্যা।" কাজেই আমরা চন্দ্রগুপ্তের অবস্থা সঙ্গীন ভাবিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি।

নাটককার যদি ঐ স্পষ্ট কথাটুকু না বলিতেন, যদি আমরা বুঝিতাম, চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের কলহটা মিথ্যা নয়, তাহা হইলে বোধ হয় নাটককারের কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ হইত না। চন্দ্রগুপ্তকে ত সজীব বলিয়া বোধ হইতই, তাহার উপর নাটককার রাক্ষসের প্রতি অন্যায় করিয়াছেন, এ কথাও বলিতে পারিতাম না। রাক্ষসের একটা চেষ্টাও সফল হইত, তিনি যে চাণক্যের প্রশংসার যোগ্য তাহাও দেখান হইত; চাণক্যের গৌরবহানির সম্ভাবনাও থাকিত না; বাধার মুখে অগ্রসর হইয়া তিনি একটা নূতন কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন। চন্দ্রগুপ্তের যে চাপল্য প্রকাশ পাইত তাহা মার্জ্জনা করিয়া, অজ্ঞাতে তাহার উপকার করিতে গিয়া—তিনি ক্রোধী বলিয়া যে অপবাদ পাইয়াছেন, তাহাও কতক পরিমাণে কমাইতে পারিতেন। নাটকের মধ্যে কোথাও কিছু গোলযোগ আছে বলিয়া বোধ হইত না, চরিত্রগুলিও বেশ ফুটিয়া উঠিত।

চন্দনদাস বন্ধুপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ভাগুরায়ণ মলয়কেতুর সহিত দিন কতক এক সঙ্গে থাকিয়া বেশ সংযত সূক্ষ্মদর্শী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

বিশাখদত্ত এই যে কয়টি চরিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। মানুষের মনটিকে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, কাজেই তাঁহার চিত্রে অনেক স্থলে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রগুলির মধ্যে আগাগোড়া বেশ সামঞ্জস্য আছে। শেষ অঙ্কে নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের যে পরিণাম দেখান হইয়াছে তাহা সার্থক হইয়াছে। চাণক্যের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে তাঁহাকে লইয়া সংসার করা দায়। কখন্ যে তাঁহার ক্রোধ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবে, তাহা কে বলিতে পারে? তাহার পর, যে উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কাজ করিতেছিলেন তাহাও সিদ্ধ হইয়া গেল। রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সময় নানা রকমের গোলযোগ হইয়া থাকে, সেই গোলযোগ যখন শেষ হইয়া গেল, তখন আর চাণক্যের প্রয়োজন নাই। কাজেই চাণক্য সচিবের পদ ছাড়িয়া দিলেন। নাটককার তাঁহাকে আর অপ্রয়োজনীয় করিয়া রাখিতে চাহিলেন না। হঠকারী মলয়কেতুর যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হইল। রাক্ষসের মত ভাল মানুষের যে কাজ করা উচিত ও তাহার যে ফল পাওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়াছে। সচিবের কৌশল তিনি পূর্ণমাত্রায় দেখাইতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহাকে কাজ ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। সেই জন্য তাঁহার পরিণামও সুনির্ব্বাচিত বলিয়া বোধ হয়। মানবচরিত্র সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান খুব বর্দ্ধিত হইয়াছে তিনিই এইরূপ একখানি নাটক এত সুন্দররূপে সাজাইয়া তাহার এত সুন্দর পরিণাম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

(৭)

প্রাচীন গ্রন্থগুলি পড়িবার সময় সময়ে সময়ে আমরা নিজেদের আসনকে বড়ই উচ্চ করিয়া ফেলি। এমন কথাও বলি যে, প্রাচীন সাহিত্য আজকালকার মাপকাটি দিয়া না মাপাই উচিত। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা আজ বাঁচিয়া থাকিলে কি করিতেন তাহা ভাবিয়া তাঁহাদের গ্রন্থের সমালোচনা করা বাঞ্ছনীয়। একজন সমালোচক হাজলিট্

কীট্সের কবিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'কীট্স্ যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা দেখিব না, তাঁহার রচনায় যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস আছে, তিনি দীর্ঘজীবী হইলে কি করিতেন, তাহাই দেখিব।' আমরা বলি, প্রখ্যাত লেখকদের প্রতি এ সদয় দৃষ্টি দান করিয়া তাঁহাদের অবমাননা না করাই উচিত।

আমরা বিংশ শতাব্দীর লোক ; তাই বলিয়া কি প্রাচীন গ্রন্থকারেরা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি শুধু একটা মৌখিক সম্মান দেখাইয়া, আজ তাঁহারা কি করিতে পারিতেন তাহা ভাবিয়া, আমরা তাঁহাদের পূজা করিব? কেন, যাহা তাঁহারা দিয়াছেন, তাহা কি কিছুই নয়? যে দিন নিরপেক্ষ-সমালোচক মহাকাল অতীতের জীর্ণ স্তূপ হইতে পুরাতন খাতাপত্র বর্ত্তমানের রেশমে বাঁধা বইগুলির সহিত একত্র করিয়া বিচার-আসনে বসিবেন, সে দিন তিনি দেখিবেন, সাহিত্যকে কে কতটুকু দান করিয়াছে ;— কে কত দিত, সে কথা একবারও তাঁহার মনে আসিবে না।

কালিদাস-ভবভূতি কি করিতে পারিতেন, তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহাই সমালোচ্য। বিংশ শতাব্দীর কোলে বসিয়া পুরাতন শতাব্দীর মা-হারা ছেলেটিকে অবজ্ঞা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, কেন না ত্রিংশ শতাব্দীতে আমাদের শতাব্দীর খ্যাতি না থাকিতে পারে; কিন্তু পুরাতন শতাব্দীটি মরিয়াও তখন যে বাঁচিয়া থাকিবে, এ কথা অনুমান করা যায়। ব্যাস-বাল্মীকি বা কালিদাস-ভবভূতি অতীত, বর্ত্তমান ও সমগ্র ভবিষ্যৎকে ব্যাপিয়া আছেন, কোন কালে আমরা তাঁহাদের ছাড়াইয়া যাইতে পারিব কি?

কাজেই কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি সাহিত্যক্ষেত্রে যাহা দান করিয়াছেন, তাহার প্রতি দয়া করিবার স্পর্দ্ধা না থাকাই ভাল। সাহিত্য-হিসাবে তাহার সমালোচনা কর, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহারা যে বীজ রোপণ করিয়াছেন, তাহার শক্তি মাপ করিয়া দেখ, আজও তাহাতে নূতনত্ব দেখিবে ; কেন না যাহা সাহিত্যের জিনিস, তাহা চিরকালই আনন্দ দিবে। দোষ-গুণ সকলেরই আছে এবং সে দোষ-গুণ প্রকাশ করিবার অধিকার সব সময়েই থাকিবে।

এই মনে করিয়া আমরা সমালোচ্য নাটকখানির দোষ-গুণ দুই-ই বাহির করিয়া দেখাইয়াছি। মুদ্রারাক্ষস সম্বন্ধে আরও কএকটি কথা আছে। সে গুলি বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

গ্রন্থকার যে মানুষের চরিত্রটুকু বিশেষরূপ দেখিয়াছেন, গ্রন্থের একাধিক স্থলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চরিত্র-অঙ্কনে গ্রন্থকারের এ কৃতিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, একথা আমরা বলিয়াছি। এখন আমরা তৃতীয় অঙ্কের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কথা সপ্রমাণ করিব।

রাক্ষসের কথামত বৈতালিকেরা চন্দ্রগুপ্তের নিকট শরতের বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়া ফেলিল, "ভূষণাদ্যুপভোগেন প্রভুর্ভবতি ন প্রভুঃ। পরৈরপরিভূতাজ্ঞস্ত্বমিব প্রভুরুচ্যতে॥" *

চাণক্য বুঝিলেন, তিনি অনেক সময়ে চন্দ্রগুপ্তের মঙ্গলের জন্য তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন না। এই বিষয়টাকেই রাজার কাছে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বৈতালিকেরা রাক্ষসের কথায় এই শ্লোক পাঠ করিতেছে।

রাজা বলিলেন, "বৈতালিকদের শতসহস্র সুবর্ণ দান করা হউক।"

চাণক্য বলিলেন, "অপাত্রে অর্থদান করিয়া লাভ কি?"

রাজা সক্রোধে বলিলেন, "আপনি কেবলই আমায় এমনই করিয়া বাধা দেন, রাজ্য আমার কাছে যেন বন্ধনের মত হইয়াছে।"

চাণক্য। যে রাজা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন, তাঁহার এই দশাই হইয়া থাকে। আমার স্বাতন্ত্র্য যদি সহ্য না হয়, তুমি নিজে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পার।

রাজা। বেশ, তাহাই হউক।

চাণক্য। বেশ, আমিও আমার কাজ করি।

রাজা। তাহা হইলে আপনি কেন এই কৌমুদী-মহোৎসব বন্ধ করিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

চাণক্য। কৌমুদী-মহোৎসবে প্রয়োজন কি আমিও শুনিতে চাই।

রাজা। আমার আজ্ঞা পালন করা চাই।

চাণক্য। কৌমুদী-মহোৎসব বন্ধ করার প্রথম কারণ— তোমার আজ্ঞা অবহেলা করা।

* ভূষণাদি উপভোগ করিলেই প্রভুর প্রভুত্ব আসে না। পরে যাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করে না, তাঁহাকেই প্রভু বলি।

যিনি মনস্তত্ত্ব ভাল করিয়া জানিয়াছেন, তিনিই, এই কথাবার্ত্তায় যে একটা সংযমবদ্ধ ক্রোধ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারেন। কিন্তু এ বর্ণনা প্রাণহীন; কেননা ঘটনাটা মিথ্যা,—আগাগোড়া সাজান,—স্বাভাবিক নয়। যাহাই হউক, এই মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য, গ্রন্থকার তাঁহার অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চম অঙ্কে ভাগুরায়ণ রাক্ষসের পক্ষে থাকিয়া কিরূপ শক্রতাচরণ করিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে গ্রন্থকারের রচনা-কুশলতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আর বেশী উদাহরণ দিয়া আমরা প্রবন্ধটি ভারাক্রান্ত করিতে চাই না। পাঠকমাত্রেই বুঝিবেন, গ্রন্থকারের মনস্তত্ত্বজ্ঞান সামান্য নয়। বোধ হয় এমন করিয়া মনের কথা বলিতে সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোন গ্রন্থকার উদ্যোগ করেন নাই।

গ্রন্থকারের ভাষা প্রাঞ্জল; কথার ভঙ্গী চমৎকার! কোথাও বাহুল্য নাই; সর্ব্বত্র ভাবের একটা অবাধগতি আছে। স্থানে স্থানে কবিত্বের আড়ম্বর যে একেবারে নাই, তাহা বলা যায় না। বিষয়টি যেমন কম্মবহুল, ভাষাটিও তেমনই বেগবতী; সুতরাং বিষয়ের উপযোগী সংস্কৃত করিয়া, সাধারণতঃ একটু ভাষার কায়দা দেখাইতে গিয়া, ভাবের ক্ষতি করিয়া বসেন, বিশাখদত্ত কোথাও সে চেষ্টা করেন নাই। তবে যেখানে দুই প্রকার অর্থ রাখা আবশ্যক, সেখানে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সে চেষ্টা করিতে হইয়াছে। নান্দীতে, কাব্যার্থ-সূচনায় ও গুপ্তচরদিগের কথায়, দুই অর্থ প্রকাশ করিতে গ্রন্থকার এই চেষ্টা ব্যক্ত করিয়াছেন।

তাহারপর, বিশাখদত্তের কবিতা। নাটক গদ্যে পদ্যে লেখা চলে; কিন্তু গদ্যে অভিনয় খুব স্বাভাবিক হয় বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে নাটককারেরা গদ্যই ব্যবহার করিয়াছেন। তবে যেখানে ভাবের উচ্ছ্বাস আছে, বা একটি সম্পূর্ণ ভাব কবিতায় নিবদ্ধ করা যায়, সেখানে পদ্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই পদ্য ব্যবহার করার একটা বাধা ধরা নিয়ম আছে কি না জানি না,—থাকিলেও সব সময় যে তাহা ঠিক মানিয়া চলা হয়, এ কথা স্বীকার করা অসঙ্গত। দেখিতে পাই, সেক্স্‌পীয়র ও অন্যান্য নাটককারেরাও স্থানে স্থানে এ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন।

নাটকের মধ্যে যে কবিতা থাকে, তাহা এত বিচ্ছিন্ন যে, তাহাদের মধ্যে একটা অখণ্ড কাব্যের স্রোত অনুভব করা যায় না। এক একটি শ্লোক অধিকাংশ স্থলেই সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। লেখক বীররসই বেশী করিয়া ফুটাইয়াছেন। বীররস-প্রধান শ্লোকগুলিতে ভাব ও ধ্বনি এক সঙ্গে মিশিয়া বক্তব্যটিকে জ্বলন্ত করিয়া তুলিয়াছে;—

"তে পশ্যন্তি তথৈব সংপ্রতি জনা নন্দং ময়া সান্বয়ং
সিংহেনেব গজেন্দ্রমদ্রিশিখরাৎ সিংহাসনাৎ পাতিতম্"
"নিস্ত্রিংশোঽয়ং সজলজলদব্যোমসংকাশমূর্ত্তি-
র্যুদ্ধশ্রদ্ধাপুলকিত ইব"

প্রভৃতি কথায় খুব তেজ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাণ আছে একথা স্বীকার করিব না। ভবভূতি তাঁহার নাটকে বীররস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কর্ম্মের ব্যাকুলতা তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে শুধু বাক্যাড়ম্বর নয়, বীরত্বের জীবন্ত ছবি। বিশাখদত্তের বীররস শুধু ভাষাকেই অবলম্বন করিয়া আছে, পাঠকের ভাবকে তাহা বড় আঘাত করে না।

অলঙ্কারশাস্ত্রে যাহাকে স্বভাবোক্তি বলে তাহার উদাহরণগুলি চমৎকার;—

"শনৈঃ শ্যানীভূতাঃ সিতজলধরচ্ছেদপুলিনাঃ
সমন্তাদাকীর্ণাঃ কলবিরুতিভিঃ সারসকুলৈঃ।
চিত্রাশ্চিত্রাকারৈর্নিশি বিকচনক্ষত্রকুমুদৈ-
র্নভস্তঃ স্যন্দন্তে সরিত ইব দীর্ঘা দশ দিশঃ॥" *

এমন উপমা, এমন ভাব সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। দশ দিক্ দশটি নদীর মত বিগলিত হইতেছে—এ চিত্র যিনি দেখিতে পান, তিনি যে প্রকৃত কবি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"আকাশং কাশপুষ্পচ্ছবিমভিভবতা ভস্মনা শুক্লয়ন্তী
শীতাংশোরংশুজালৈর্জলধরমলিনাং ক্লিশ্নতী কৃত্তিমৈভীম্
কাপালীমুদ্বহন্তী স্রজমিব ধবলাং কৌমুদীমিত্যপূর্ব্বা
হাস্যশ্রীরাজহংসা হরতু তনুরিব ক্লেশমৈশী শরদ্বঃ॥" †

---

* (বর্ষার পর) শুভ্র মেঘখণ্ড ক্রমশঃ কৃশীভূত পুলিন নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহার চারিদিকে সারসের মধুর ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। রাত্রে নক্ষত্রগুলি নানা আকারের কুমুদ-পুষ্পের মত শোভা-ধারণ করাতে দশ দিক্ দশটি নদীর মত আকাশ হইতে স্খলিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

† শুভ্র ভস্মের মত কাশপুষ্পে আকাশ শুক্ল করিয়া গজাসুরের

শরৎ-ঋতুকে শিবের বিভূতিলাঞ্ছিত দেহের সহিত তুলনা করিয়া গ্রন্থকার যে ভাব জাগাইয়াছেন তাহা পবিত্র—মনোরম। এই তৃতীয় অঙ্কের সংক্ষিপ্ত শরদ্বর্ণনায় কালিদাস বা ভারবির সূক্ষ্মদর্শন বা ভাষা ও ভাবের গতিশীল মাধুর্য্যের প্রমাণ না থাকিলেও, তাহাতে যে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব বিকশিত হইয়াছে, তাহাতে কে না মুগ্ধ হয়? মলয়কেতু চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন। তাঁহার বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করি :—

"পাদাগ্রে দৃশমমবধায় নিশ্চলাঙ্গীঃ শূন্যত্বাদপরিগৃহীত তদ্বিশেষাং। বক্রেন্দুং বহতি করেণ দুর্ব্বহাণাং কার্য্যাণাং কৃতমিব গৌরবেণ নম্রম্ ॥" *

যেন একখানি ছবি। এই সব বাদে আর অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে; তবে অধিক স্থলেই যে তাহার বিকাশ হয় নাই, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। গ্রন্থকার নীতিবিৎ; রাজা-প্রজার অবস্থা তিনি বেশ বর্ণনা করিতে পারেন। যেখানে নীতির কথা হইয়াছে, সেইখানেই বিশাখদত্তের বহুদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যেখানে সন্ধি-বিগ্রহ লইয়া কারবার, সেখানে কবিত্বের অবকাশ বড় পাওয়া যায় না, কিন্তু রাজনীতি ও রাজা-প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে গোটাকতক এমন শ্লোক আছে, যাহা ভুলিবার সামগ্রী নয়।

অনেকে বলেন—মুদ্রারাক্ষসে পাপেরই জয় দেখান হইয়াছে। আমরা একথা স্বীকার করিতে পারি না। যে গ্রন্থকার রাক্ষস ও চন্দনদাসের অপূর্ব্ব বন্ধুপ্রীতি দেখাইয়াছেন, যিনি গ্রন্থের অনেক স্থলে আপনার সংযম ও বহুদর্শিতার প্রমাণ দিয়াছেন, তিনি যে লোককে কুশিক্ষা দিবেন, একথা মনেই আসে না।

চাণক্য কৌশল করিয়া রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের অধীনে আনিয়াছেন, একথা সত্য। কিন্তু তিনি এ অন্যায় আচরণ করিলেন কেন?—তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিয়াছেন, তাহার নিন্দা কেহই করিতে পারিবে না।—রাক্ষসকে নিজের দলে লইবার চেষ্টা না করিয়াও তিনি বেশ সুচারুরূপে রাজ-কার্য্য চালাইতে পারিতেন, আপনার স্বার্থও বজায় থাকিত; কিন্তু তিনি নিজের স্বার্থের দিকে ফিরিয়া চান নাই। চন্দ্রগুপ্ত, শিষ্যের মত, তাঁহাকে চিরকাল মানিয়া আসিতেছেন; তাহার একটা প্রতিদান চাই। আর চাণক্যের মত সচিব যাহার সহায়, তাহার সুবিধা হওয়াও আবশ্যক; এই জন্য যে প্রতিদান তাহার মতে খুব ভাল, চাণক্য তাহাই চন্দ্রগুপ্তের জন্য নির্ব্বাচিত করিলেন। তারপর, কি উপায়ে তাহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, তিনি তাহাই ভাবিলেন।

তখন তিনি এমন একটি উপায় ঠিক করিলেন, যাহাতে বেশী রক্তপাত না হয়, অথচ সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। মিছামিছি দেশের মধ্যে একটা দারুণ অশান্তি আনিয়া তিনি সকলকে বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিলেন না। রাক্ষসকে তিনি কৌশলে হস্তগত করিলেন। এ কৌশলে নিশ্চয়ই একটা প্রকাশ্য যুদ্ধের চেয়েও মন্দ ফল প্রদান করে নাই, প্রকাশ্য যুদ্ধে যে ক্ষতি হইত এবং এই কৌশল অবলম্বন করিয়াই যে চাণক্য বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন, একথা গ্রন্থকার এক স্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন।

আর একটা কথা—শেষ অঙ্ক পড়িলে এমন বোধ হয় না যে, পুণ্য পাপের কাছে হারিয়া গিয়াছে। নন্দেরা পাপী,—তাহারা যদি সমূলে বিনষ্ট হইল, তাহা হইলে পাপই জয়ী হইয়াছে একথা বলা যায় না। এখন রাক্ষসকে হস্তগত না করিলে নন্দবংশ সমূলে বিনষ্ট হওয়া না হওয়া সমান, একথা গ্রন্থকারই বলিয়াছেন। কাজেই রাক্ষসের অধীনতা পাপেরই ফল,—পুণ্যের নয়। মলয়কেতুর পরিণামও খুব মন্দ কি?

রাক্ষসকে এমন ভাবে হস্তগত করা হইয়াছে যে, তাহাতে তাহার গৌরবহানি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তিনি হারিয়াও জিতিয়া আছেন। নাটককার গ্রন্থের শেষেও অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। রাক্ষসকে যদি অসহায় অবস্থায় পশুর মত অধীনতা স্বীকার করান হইত, তাহা হইলে বলিতাম পুণ্যের অবমাননা হইয়াছে, কিন্তু যখন রাক্ষস মনুষ্যত্বের চরম শিখরে, তখন তাঁহার অধীনতার কালিমা মনুষ্যত্বের উজ্জ্বলতায় কাটিয়া গিয়াছে। তিনি তাহার পুণ্যের ফলে যে গৌরব লাভ করিলেন, তাহার কাছে এই অধীনতাটুকুর প্রতি লক্ষ্যই থাকে না। আর গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন,—রাক্ষসের কাছে এ অধীনতা অধীনতা নয়, একটা বড়

চর্ম্মের মত জলধরের মলিনতাকে চন্দ্র-কিরণে উদ্ভাসিত করিয়া কপাল-মালার মত 'শুভ্র' কৌমুদী বহন করিয়া, হাস্যশ্রীর মত রাজহংসশ্রেণী লইয়া শরৎ, শিবের মত, তোমাদের দুঃখ দূর করুক।

* মলয়কেতুর নিশ্চল শূন্য দৃষ্টি পাদাগ্রে নিবদ্ধ। দুর্ব্বহ কার্য্য-ভারে অবনত মুখ হাতের উপর রাখিয়া তিনি বসিয়া আছেন।

উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়। সে উদ্দেশ্য চন্দনদাস ও মলয়-কেতুর পরিত্রাণ। এখানেও রাক্ষস কর্ম্মী,—নিরাশ অকর্ম্মা নয়। গ্রন্থকার শেষ অঙ্কে যে কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত,—অপূর্ব্ব।

মুদ্রারাক্ষসে শুধু একটা সাময়িক উত্তেজনার কথা নাই। গ্রন্থকার উঁচুদরের শিল্পী। শুধু রাজনীতির কথা আছে বলিয়া বিশিষ্ট লোকেরাই যে এ গ্রন্থের আদর করিবেন, তাহা নয়; গ্রন্থকার যে রচনা-কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা সকলকেই মুগ্ধ করিবে। সকলেই যাহাতে ইহার রস উপভোগ করিতে পারে, সে ব্যবস্থা নাটককার করিয়াছেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের সর্ব্বনাম

কিছুকাল ধরিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী নাড়াচাড়া করিতেছি। এই সদামৃত-পানে কত সুখ তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহার মধ্য হইতে বাঙ্গালা ব্যাকরণের কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়া টুকিয়া রাখিয়াছিলাম। পুরাতন-সাহিত্য-চর্চ্চা ব্যতিরেকে বাঙ্গালাব্যাকরণ-রচনা বা Historical outlines of Bengali accidence প্রণয়ন হওয়া অসম্ভব। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সহায়তা হইতে পারিবে ভাবিয়া, বাঙ্গালায় সর্ব্বনামের রূপ যাহা যাহা পাইয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহাই আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিলাম।

উত্তম পুরুষ

'অস্মদ্' শব্দ রূপ করিলে এইরূপ হয়;—

১মা অহম্ আবাম্ বয়ম্।

১। 'অহম্' হইতে "অ" বাদ দিলে 'হম্' থাকে। উচ্চারণ-ভেদে 'হাম'। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, তিন জনেই এই দুই পদ ব্যবহার করিয়াছেন। আজকাল হিন্দীতেও 'হম্' = আমি অর্থাৎ বক্তা। উক্ত তিন জনেই ব্রজবুলি বা মৈথিল-ভাষা ব্যবহার করায় হম বা হাম বাঙ্গালা ভাষায় স্থান পাইয়াছে। দাশরথি রায় "অহম্" ব্যবহার করিয়াছেন। চণ্ডীদাসে ব্রজবুলি খুব কম; তথাপি তিনি সুযোগ পাইলে 'হম', 'হাম' ব্যবহার করিতে ছাড়েন নাই;—

'অহমতি হীনবুদ্ধি গ্রন্থমধ্যে বর্ণাশুদ্ধি
থাকে দূষ্য শাস্ত্রবহির্ভূতা।'—দাশরথি

'হাম অভাগিনী, তাতে একাকিনী
নহিল দোসর জনা।'—চণ্ডীদাস

'মদন-বেদন হম সহই (সহিতে) ন (না) পার (পারি)'।—বিদ্যাপতি

'নাহই (নাহিয়া) উঠলু (উঠিলাম) হম কালিন্দী-তীর।'—বিদ্যাপতি

'অলখিতে আওল ধনি।
হাম তব বঙ্কবয়ান॥'—জ্ঞানদাস

২। হাম হইতে 'আম' ও পরে আমি। অথবা 'অহম্'-এর "হ্" বাদে "অম্" হইতে আমি। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'আহ্মি' পাওয়া যায়। তাহা হইতে আমি হওয়া সম্ভব।

৩। হম্ ও হাম্ হইতে যথাক্রমে সম্বন্ধ-পদ হমর ও হামার। (হিন্দী)

'আপন মালতীমালা হিয়াসে (হৃদয় হইতে) উতারি (খুলিয়া)
কণ্ঠে পহিরাওল যতনে হমারি।'—বিদ্যাপতি

দ্রষ্টব্য :—হিন্দীতে হামারা, মেরা, হামারি, হামারে এই কয়টিই আছে।

'দীপ কর লই, মুগ্ধ মাধব,
আওল হমর পাশ।'—বিদ্যাপতি
'সো অব বিসরল হামর অভাগি।'—ঐ
'সসরি (সরিয়া) খসল (পড়িল) চীর হামার।'
—বিদ্যাপতি

চণ্ডীদাসে হামারি পাওয়া যায়। 'হমরি (আমার) বিনতি সখি কহবি মুরারি।'—বিদ্যাপতি

৪। আমি স্থলে "মুই" এখনও অনেক জেলায় প্রচলিত

আছে। [উর্দ্দু "মৈঁ" বা "ম্যয়"-এর সহিত সম্পর্ক আছে বলিয়া অনুমান হয় কি ?]

'—মুই পরাণ দিতে পারবো—ধর্ম্ম দিতে পারবো না।'
—দীনবন্ধু

ভারতচন্দ্র "মুই" স্থানে 'মুহি', লিখিয়াছেন ;—'তুমি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।'—ভারতচন্দ্র

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসে "মুই"-এর বানান 'মুঞি'।

'মুঞি কুলবতী মেয়ে যদি কিছু বলে নেয়ে
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।'—জ্ঞানদাস

'হেন অমূল্য ধন, মঝু পদে গড়ায়ল, কোপে মুঞি ঠেলিনু পায়।'—চণ্ডীদাস

বিদ্যাপতিতে 'মুই' স্থানে 'মোহি' পাওয়া যায়।

'সখি হে আজ জাএব মোহি।'

৫। 'মুই' স্থলে বিদ্যাপতিতে "মঞ" পাওয়া যায়। যথা :—

'মঞ (আমি) দূতি মতি (বুদ্ধি) মোর আব হরাস (অল্প)।'
অথবা "মোঞে"। পরে "মোয়ে"।
'মোয়ে অভাগনী নহি জানল রে।'—বিদ্যাপতি

৬। হিন্দী "হমে" = আমি।

'রয়নি (রজনী) ভরমে (ভ্রমে) হমে সাজু (সাজি লাম) অভিসার।'—বিদ্যাপতি

'হমে যুবতী পতি গেলাহে বিদেশ। হমে এক সখি পিয়তম নহি পাশ।'

বহুবচনে—প্রথমা আমরা। "রা" বহুবচনান্ত। আমি স্থানে 'আম', তুমি স্থানে 'তোম', তিনি স্থানে 'তাঁ' বা 'তাঁহা', যিনি স্থানে 'যাঁ' বা 'যাহা', কিনি বা কে স্থানে 'কাঁ' বা 'কাঁহা' প্রভৃতি একই সূত্রে নিষ্পন্ন হয়। বহুবচনে অপর রূপ "মোরা।" এইরূপ সর্ব্বত্র প্রচলিত। বংশীদাস আমির বহুবচনে "আমি-সব" করিয়াছেন। যথা 'তোমার দাসের যোগ্য আমিসব নই।'

কাশীদাস "মোরা সবে" ব্যবহার করিয়াছেন।

৭। সংস্কৃত "মম" মাত্র বাঙ্গালায় আছে।

'বৃথায় জনম মম বৃথায় যৌবন।'—দীনবন্ধু
'মম দূত হ'য়ে তুমি যাহ পুনর্ব্বার।'—কাশীদাস

৮। হিন্দী "হামার" হইতে 'আমার' হইয়াছে।

'আমার বন্ধুর যত অমঙ্গল সকল যাউক দূরে।'—চণ্ডীদাস
'ভুলেও কি একদিন আমার ঘরে যেতে নেই ?'
—দীনবন্ধু

'আমার এমন হ'চ্চে যে, পৃথিবী দুভাগ হ'লে আমি এখনি প্রবেশ করি।'—মধুসূদন

৯। 'আমার' দুই এক স্থলে শুধু ষষ্ঠ্যন্ত পদ নহে ; আমার = আমার তরফে, আমার পক্ষ হইতে।

'থাকিলে তোমায় দিতে বাধা কি আমার।'
—দীনবন্ধু

'তুই ভাই আমার হইয়া দুএকটা কথা বল্‌না কেন ?'
—মধুসূদন

১০। "মঝু" = আমার।

'কত সুখে আওল পিয়া মঝু লাগি।'—বিদ্যাপতি
'হেন অমূলধন মঝু পদে গড়ায়াল।'—চণ্ডীদাস
'আমাধিক পাপী নাহি কহিলাম দঢ়া।'—কাশীদাস

১১। "আমা" = আমার।

'তুরিত গমনে, এস আমা সনে।'—চণ্ডীদাস
'অরুণ-নয়ানি কোণে চাঞাছিল আমা পানে।'
—জ্ঞানদাস

'আমা হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি।'—ভারতচন্দ্র

'সেই অবধি অমলা যে অর্থব্যয় করিয়া তোমার দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন করিয়া আসিতেছে, তাহা আমা হইতে প্রাপ্ত।'

'থাকিবেক আমা পথ চেয়ে।'—(কৃত্তিবাস)। এখানে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস যদি ধরা হয় ত "র"র লোপ বলা যায় ; কিন্তু 'আমা হ'তে' কেমন করিয়া সিদ্ধ ? সর্ব্বত্র পদ্যে 'আমা' ষষ্ঠী বুঝায়।

১২। "মোরা" আমার (বোধ হয় ভুল, মেরা হইবে)

'পুনু পুনু ডোরা
পরসে কুচ মোরা।'—বিদ্যাপতি। অন্যত্র, "মোরি।"
'মোরি অবিনয় যত, পরলি ক্ষমিবে তত
চিতে সুখ রবি মোরি নাম।'

১৩। আমার—স্নেহোক্তিতে অনাবশ্যক ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

'মার আমার রক্তকমলের মত রং, একটু ছড় লেগেছে—যেন রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে।'—দীনবন্ধু

১৪। 'মোর'—(ক) আমার ; সাধারণতঃ পদ্যেই বেশী ব্যবহার হয়—কথাবার্ত্তায়ও অনেকানেক স্থলে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

(খ) "১৩"র আমার মত অর্থ প্রকাশ করে।

'দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর।'—ভারতচন্দ্র

'আমার কপাল রে!' এই আক্ষেপোক্তির আমার বাদ দিলে কোনই হানি হয় না।

১৫। 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।'—দ্বিজেন্দ্রলাল

এই এক ছত্রের মধ্যে চারিটি আমার আছে। ইহার সার্থকতা—যে কথাটির পূর্ব্বে বা পরে "আমার" বসিয়াছে, তৎপ্রতি বক্তার বা উচ্চারণকারীর কতটা ভালবাসা আছে, তাহাই বুঝাইতেছে—যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এই "আমার" কথাটি প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহাকে যেন আঁকাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়—অপরে উহা আমার বলিলে যেন অসহ্য বোধ হয়। ভ্রমর অতি দুঃখে কষ্টে অতিশয় জোর করিয়া বলিয়াছিল, "তুমি আমার—রোহিণীর নও।" আর গোবিন্দলাল বলিয়াছিল, "আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আমার প্রতীক্ষার জানালায় বসিয়া থাকিবে। এমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।" এখানে এই "আমার" কতটা মানে বুঝাইতেছে? সে সম্পূর্ণ ভাবে আমাতে রত, আমাকে আত্ম নিবেদন করিয়াছে; আর যাহার সহিত মিশিয়া আমি আত্মহারা হইয়া যাই। অথবা ৺ভূদেব বাবুর কথায়—"আমার নিজে হাতে গড়া গায়ে মাথা, মনে ধরা জিনিস ..(যাহার সহিত) ছেলেবেলা মিশিয়াছিলাম, আমি যাহাকে আমার মনের মত করিয়া তুলিয়াছিলাম, আর নিজেও যাহার মনের মত হইয়া গিয়াছিলাম।" এই "আমারটি" শুধু সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিয়া ক্ষান্ত হয় না, মনের ভাব "উজাড় করিয়া দিয়া" অসহ্য শোক, দুঃখ, অভিমান ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

১৬। দেখা যায়, "মোর" সঙ্কুচিত হইয়া "মো" হয়।

'সুপহুক (সুপ্রভুর) বচন বজর সম মো (আমার) হিঅ (হিয়া) রেখ (রেখা) লেল (লইল) ভান।'
—বিদ্যাপতি

১৭। "মোরে" = আমার।

'উঠিলা নাগরী বসন সম্বরি
কহে কি লাগিবে মোরে।'—চণ্ডীদাস

আমরা কথাবার্ত্তায় বলি, 'আমার এত টাকা লাগিবে?' উপরে ঐ মোরে এইরূপ প্রয়োগ। 'ও পুঁটি দিদি, মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে (আমার) বড় ডর লাগে।'—মধুসূদন

১৮। "মোয়" = আমার।

'জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে
সাপিনী লাগয়ে মোয়।'—চণ্ডীদাস

১৯। "মো" = আমার।

'মো বিনু পিয়াসে পানি নাহি পীব।'—বিদ্যাপতি

এখানে মো = আমাকে মানে করা উচিত; কেননা, "পৃথগ্‌বিনাভ্যাং দ্বিতীয়াতৃতীয়ে চ।"

'মো বিষয়ে অনুরাগ যাহার জন্ময়।'—ভক্তমাল।

১৯। ক। মোহি = আমার। 'তেঁ (তেঁহ) মোহি (আমার) তরতম (দ্বিধা) দেইতে (দিতে) ঠাম (স্থান),
—বিদ্যাপতি

১৯। খ। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে একস্থলে 'মোহর' 'আমার' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২০। বহুবচনে ঃ—আমাদের ; আমাদিগের ; মোদিগের, মোসবার ; মোদের ; আমাসবাকার। আমাগের, মোগর।

সবগুলিই Double Possessive. আমার + দের, আমার + দিগের, মো + দিগের, ইত্যাদি।

'হতভাগী মো সবার ভাগ্যে আছে দুখ।'—ভারতচন্দ্র

'আর যত বীর আছে মো সবার ভার।'—কৃত্তিবাস

'মো সবার সঙ্গে তুমি থাক নরবর।'—কাশীদাস

'পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়োলো (আসিয়াছিল)।'—দীনবন্ধু

'আমাদিগের বিবাহকালে, নয়ন আবৃত হইয়াছিল।'
—বঙ্কিমচন্দ্র

'মোগর পোচিঘর ঘর এত কেঁপে উঠ্‌তেছে।'—মধুসূদন

'আমা সবা মধ্যে বিন্ধে নাহি হেন জন।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া তারে বলে নারায়ণ।
আমা সবাকার ইথে নাহি প্রয়োজন।'—কাশীদাস

'মোদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে।'—চণ্ডীদাস

'আমার আদমী একথা টের পেলে, আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে।'—মধুসূদন

২১। বংশীদাস সকলের চেয়ে সহজ উপায়ে 'আমরা'র ষষ্ঠ্যন্তপদ "আমরার" করিয়াছেন।

'গোদা সবে বলে কন্যা সুখে চলি যাও।
যা বলিছি ক্ষেম, তুমি আমরার (আমাদের) মাও (মা)।'

২২। হিন্দী "হম্‌কো" = বিদ্যাপতির নিকট 'হম্‌কে' (আমাকে হম্ + বাঙ্গালা দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে') হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'রাখব আপন পরাণ।
হম্‌কে করব জল দান।'—বিদ্যাপতি

২৩। "মুঝে"—আমাকে। চণ্ডীদাস অন্যত্র মুঝে স্থানে 'মোঝে' লিখিয়াছেন।

'তাহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান।'—চণ্ডীদাস
'শুনাইয়া মোঝে আর কাকে ডাকে।'—চণ্ডীদাস

২৪। "মোয়" = আমাকে।—'একথা কহবি মোয়।'
—চণ্ডীদাস

২৫। "মোরে"—১। আমাকে।

'আর না কহিও মোরে।'—চণ্ডীদাস
'কতহুঁ যতনে মোরে কোরে বসাই।'—বিদ্যাপতি
'কে মোরে জানিবে কে মোরে চিনিবে
ভারত ভাবিয়া ভোর।'—ভারতচন্দ্র

২। আমার প্রতি।

'পিয়া মোর বিদগধি, বিহি মোরে বাম।'—বিদ্যাপতি

২৬। আমারে—১। আমাকে।

'সে ধন আমারে দেহ।'—চণ্ডীদাস

২। আমার সম্বন্ধে বা বিষয়ে।

'তেমনি আমারে...পুরুষ সহিত ভেট।'—ভারতচন্দ্র

৩। আমার প্রতি।

'বন্ধুর কল্যাণে দেহ নানা দানে
আমারে সদয় বিধি।'—চণ্ডীদাস
'ভৈমী বলে এত যদি করুণা আমারে।'—কাশীদাস

৪। আমার অদৃষ্টে বা সম্বন্ধে

'আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ।'—ভারতচন্দ্র

৫। আমার নিকট।

'আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।'—ভারতচন্দ্র

'মালুম' (জ্ঞাত) বিশেষ্য নহে, তবে কাহার সহিত সম্বন্ধ?

২৭। মোহে | মোহি — আমাকে। চণ্ডীদাসে নাই।

'মোহে জগায়ল, তহি নিদ গেল।'—বিদ্যাপতি
'মোহে ভেটল কানু।' ঐ

২৮। আমায় আমাকে।

'নাগকেশরের মালা মজালে আমায়।'—দীনবন্ধু
'এখনি যাইতেছি, আমায় মারিও না।'—বঙ্কিমচন্দ্র

২৯। আমা - আমাকে।

'সাধু হয়ে দিন কত থাক আমালয়ে।'—ভারতচন্দ্র

৩০। মোকে = আমাকে।

'তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্ বল্!'
—মধুসূদন

'কহে পুণ্যশ্লোকে রক্ষা কর মোকে
পুড়ি আমি অগ্নি মাঝ।'—কাশীদাস

'মোর আদমী আস্ছে, এখনি মোকে (আমাকে না আমার?) খোঁজ করবে—মুই যাই ভাই।'—মধুসূদন

৩১। আমা - আমার প্রতি

'যদি আমা বল ধর পদ্মার দোহাই।'—বংশীদাস

৩১। ক। ৪র্থী আমাকে—'এই ভিক্ষাটি আমাকে দাও।'
২য়া——'আমাকে বল্লে।'

৩২। বহুবচনে:—আমাদিগকে, আমাদিগে, মোদিগে, মোসবে, আমাসবে, আমাদের।

'দেখহ দুর্দ্দৈব আজি দ্রুপদ রাজার।
আমাসবে নাহি মানে করে অহঙ্কার।'—কাশীদাস
'আমাদের (আমাদিগকে) সঙ্গে যাচ্চি ব'লে আবার কোথায় গেল।'—মধুসূদন

৩২। (ক) হিন্দী স্নেহসূচক 'মেরি' (আমার) বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনীতে পাওয়া যায়। 'দে পেয়ালা! মেরি পিয়ারি।'

৩২। (খ) তোমায় আমায় = তোমার সহিত আমার সহিত। 'আমি বলিতেছিলাম, (দেশত্যাগ করিব) সে লজ্জায়। আপনি বলেন কেন? তোমায় আমায় আর দেখা শুনা না হয়।'—বঙ্কিমচন্দ্র

৩৩। আমাতে—১। আমার অন্তরমধ্যে বা আমার ভিতরে।

'আমার সুখদুঃখ আমাতেই থাক্।'

'তোমার ভাল তোমাতে থাক্।'

২। শরীর অভ্যন্তরে।

'এই কথা শুনিয়া আমি আর আমাতে নাই।'

৩। আমি মিলিয়া।

'তোমাতে আমাতে।'

৪। আমার সঙ্গে।

'তোমাতে আমাতে—সেই যে ক'লকাতায় গেলুম—তার পর এই আট বছরে আর কৈ দেখা হয়েছিল ?'

৩ ও ৪ প্রায় একরূপ।

৫। আমার মধ্যে।

'তোমাতে আমাতে দূর লক্ষৈক যোজন।
তুমি ক্ষিতিতলে থাক আমি ব্যোমচর।'

৬। আমাকে লইয়া।

'আমাতে আপনার কি প্রয়োজন ?'

৩৪। মোতে = আমাতে।

প্রথমে দেখান হইয়াছে যে, দাশরথী "অহং" ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙ্গালায় "অহং জ্ঞান" তার অহংটা এখনও যায় নাই ও অহঙ্কার, অহঙ্কার করা, অহঙ্কৃত এই কয়টিতে সংস্কৃত অহং আছে। আসল "অস্মদ্" দুই একস্থলে দেখা যায়। যথাঃ—

'মদ্‌অস্মদাদির পক্ষে অতি অনিষ্টকর, সেই বিবেচনায় ত্যাগ করেছি।'—দীনবন্ধু

'অস্মদ্দেশে "মোগল পাঠান" নামক একটি যুদ্ধানুকরণ-ক্রীড়া প্রচলিত আছে, সকলেই জানেন।'—ভূদেব।

সংস্কৃত "ময়া" ও বাঙ্গালা আমাদ্বারা বা কর্ত্তৃক স্থানে বাঙ্গালায় "মৎ" হইয়া যায়। মৎ-প্রণীত, মৎকর্ত্তৃক; মদ্দত্ত।

সর্ব্বশেষে বাঙ্গালায় "মদীয়" = আমার এই বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত "মহ্যম্"-এর উচ্চারণ মহিয়ম্, মাহিয়ম্; ইহা হইতে বিদ্যাপতির 'মাহি' হয় নাই ত ? "মহ্যম্"-এর বাঙ্গালা উচ্চারণ "মঝ্‌ঝম্"—ইহা হইতে মুঝে, মোঝে ইত্যাদির উদ্ভব, কল্পনা করা কি সঙ্গত নয় ?

'আমাকে যেতে হবে' ইত্যাদিতে "আমাকে" কোন্ বিভক্তি ?

যতদূর সম্ভব সর্ব্বনামের ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। এখন এই রূপগুলি কবে, কোন্ সময়ে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিল এবং কে কতদিন বাদে অদৃশ্য হইল, তাহার নির্ণয়ের চেষ্টায় আছি। এখনও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নাই—সে জন্য সে সব এখন থাকিল। *

শ্রী——

* মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় (রায় সাহেব) বিদ্যানিধি মহোদয় বঙ্গীয় শব্দকোষে "আমি" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অত্র উদ্ধৃত হইল।—'আমি—সর্ব্বনাম (সং—অহম্ প্রাচীন বাঙ্গালা আহ্মি, পূর্ব্ববঙ্গে গ্রামে মুই, উড়িয়া ভাষায় মু, আহ্মে (সম্মানে), হিন্দী, মৈ, হম্, মরহাট্টী মী,) বিভক্তিযোগ হইলে আমি স্থানে আমা হয়। যথা—আমাকে, আমা দ্বারা, আমার, আ-মারা, আমরা; প্রাচীন বাঙ্গালা ও পদ্যে আ-মরা, মোরা, মুরা। আমার—প্রাচীন বাঙ্গালা ও পদ্যে মোর।'

সাধককবি নীলকণ্ঠের প্রতি

জনমেছ পল্লীভূমে পল্লীকবি, পল্লীমা'র উল্লাসী দুলাল,
তোমার সে শিক্ষাভূমি ঐ পল্লীবৃন্দাবন। কদম্ব তমাল,
শাওনের ঘনঘটা পল্লীকুঞ্জ, স্ফুট-পদ্ম শ্যামসরোবর,
তোমারে করেছে কবি ;—কূজনগুঞ্জন-ধ্বনি নদীকলস্বর
শিখা'ল গায়িতে তোমা। নগরের জনসঙ্ঘ পাওনি আসন ;
রাজার সভায় বসি অনুমতিমত বীণা করনি বাদন ;
তবু তুমি শ্রেষ্ঠকবি। হওনিক কবি তুমি লিখিয়া পড়িয়া,
গায়িয়া উঠেছ তুমি ওগো ভক্ত আত্মহারা দেখিয়া শুনিয়া ;
গ্রন্থ রচি' বিশ্বজনে খণ্ডে খণ্ডে বেচি তাহা করনি প্রচার,
অযুতভক্তের মাঝে লভনিক অর্ঘ্যমাল্য,—জয়জয়কার ;
অথবা সে জয়ডঙ্কা নিজ করে আঘাতিয়া করনি ঘোষণা ;
বিচলিত নহে আত্মা শুনিবারে স্তুতি-নিন্দা-গ্লানি-উপাসনা,
তবু তুমি শ্রেষ্ঠ কবি ;—দেশবন্ধু, বঙ্গমা'র পরাণের ধন,
হৃদয়ের প্রতিবাসী, আড়ম্বরশূন্য কবি, একান্ত আপন।
যোগায়নি ভৃত্য তব নিত্য নিত্য কবিত্বের সামগ্রীসম্ভার ;
তোমারি আঙিনা-তলে চিরমুক্ত প্রকৃতির সুষমা-ভাণ্ডার।
নহ তুমি শিল্পিকবি,—অনুশীলনের ফল করনি সম্বল ;
অকৃত্রিম বনফুল গীতি তব, ভাব-মধু যাহে ঢলঢল।
দেশের বিপ্লব, আর জাতিধর্ম্ম-সমাজের উত্থানপতনে,
তোমার কাব্যের রাজ্য অচঞ্চল,—চমকেনি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
জগতের মহাযজ্ঞে—মহোৎসবে করনিক তুমি যোগদান ;
একতারা হাতে বসি নদীতীরে করিয়াছ হরিনামগান।
মাননি শাসননীতি, রীতি তব ছন্দঃশাস্ত্র অলঙ্কার ছাড়া
আছে ভক্তি—আছে প্রাণ, লাবণ্য সে অনবদ্য, সর্ব্বভূষাহারা।
হিমাংশুর রাজ্ঞীগণসম নাহি অঙ্গে তার ভূষণ সম্ভার—
কাঙাল সে ভিখারীর প্রিয়াসম আছে রূপ-সতীতেজ আর ;
মহাসমিতির মাঝে গীতি তব শতকণ্ঠে হয়নি উদ্গীত ;
নগরের নাট্যশালা-রঙ্গমঞ্চ তব কাব্যে হয়নি ধ্বনিত ;
তবুও সঙ্গীত তব কোলাহলে পল্লীপ্রান্তে যায়নিক ডুবে—
যদিও সে গীত শুধু গোপীযন্ত্রে বাঁশী আর 'গাব্‌গুবাগুবে'
পল্লীবাটে মাঠে ঘাটে ইক্ষুক্ষেত্রে জেলেদের তালডিঙ্গি'পরে,
ওগো কণ্ঠ ! কণ্ঠ তব শুনা যায় একগ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে।
প্রেমিক সে সাড়া দেয় মাঠ হ'তে, তব গানে, প্রেমিকারে তার ;
সন্ধ্যামুখে কৃষিজীবী ও-গীতি-সলিলে ধোয় কর্ম্ম-ক্লান্তিভার।
সর্ব্বভীতিহরা গীতি গায়ি পান্থ জানায় সে গ্রামের প্রবেশ,
ভিখারী-সম্বল গান দূরিল হৃদয় হ'তে চিন্তা চেষ্টা লেশ।
ওগো কণ্ঠ ! কণ্ঠ তুমি বঙ্গমা'র চিরমুক্ত সর্ব্ববাধাহারা—
সহজ সরল লঘু পরাণের ক্ষরে যাহে আনন্দের ধারা।
সমগ্র এ বঙ্গভূমে করিয়া রেখেছ তুমি চির-বৃন্দাবন,
'কানু বিনা গীত নাই'—কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরে ঘুরে নন্দের নন্দন।
নীলকণ্ঠ কণ্ঠে তুমি ধরিয়াছ দুখতাপ বেদনাগরল,
আমাদের দিয়ে গেছ শুধু স্নিগ্ধ আনন্দের অমিয়া তরল।
হে বিশ্বরাজার সভা গায়ক মহান্ কবি ! বন্দি হে চরণ,
তোমার অমর কণ্ঠে শুনি আমি এ বঙ্গের হিয়ার স্পন্দন।

শ্রীকালিদাস রায়।

রমণার কালীবাড়ী

(ঢাকা)
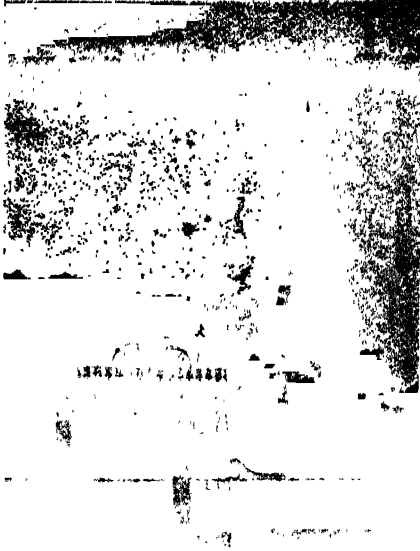
ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালার তান্ত্রিক সমাজে সিদ্ধপুরুষ ব্রহ্মানন্দগিরির নাম সবিশেষ পরিচিত ছিল। ঢাকা সহরের উত্তরে জঙ্গলাকীর্ণ রমণার কালীবাড়ীতে ইনি দীক্ষা লাভ করেন। ইঁহার দীক্ষাস্থান বলিয়া রমণাও বাঙ্গালার মন্দির-স্তূপের ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কখন্ এবং কোন্ মহাপুরুষ কর্ত্তৃক এই কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। রমণার বর্ত্তমান মঠটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। মহারাজা রাজবল্লভ ইহার সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন। বিগত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে উহার উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেলে, সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট উহার পুনঃসংস্কার করেন। বর্ত্তমান মঠের কিছু উত্তরে কতকগুলি ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ ইহাই মূলমন্দিরের শেষ চিহ্ন। বহুকাল হইতে এই কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে দশনামী সন্ন্যাসীদের মঠ আছে। মূল-মন্দির ভগ্ন হইবার পর দেবী-মূর্ত্তি এই মঠেই স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। প্রস্তর-নির্ম্মিত এই মূর্ত্তিখানি চতুর্ভুজা ভদ্রকালীর; ইহার উচ্চতা সাড়ে চারি ফিট হইবে। এক খানি সুন্দর রৌপ্য-নির্ম্মিত চৌকির উপর মূর্ত্তিটি স্থাপিত। কালীমূর্ত্তির এক পার্শ্বে চামুণ্ডা-মূর্ত্তি। মন্দির-সংলগ্ন পুষ্করিণীটি ভাওয়ালের স্বর্গগতা রাণী বিলাসমণি দেবীর ব্যয়ে খনিত হইয়াছিল। মন্দিরাভ্যন্তরের প্রাচীন তন্ত্র * ও প্রাঙ্গণস্থিত প্রায় দেড়মণ ওজনের একখানি বিশাল প্রস্তর কালীবাড়ীর অমূল্য সম্পদ্। এই প্রস্তরের ইতিহাসই রমণা কালীবাড়ীর পূর্ণ ইতিহাস,—ইহা ভিন্ন এই মন্দিরের অন্য কোন তত্ত্ব আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই। সুদূর ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত কোন শিলালিপি অথবা তাম্রশাসন হইতে রমণার কালীবাড়ী ও মঠের একটা পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক ইতিহাস অবগত হওয়া যাইবে কি না কে বলিবে!

রমণার কালীবাড়ীর প্রস্তর খানির গল্পটা এই রকমের,—অনুমান ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় ব্রহ্মানন্দগিরির জন্ম হয়। ইঁহার বাল্যজীবন কলঙ্ককালিমায় অনুলিপ্ত; সেই কাহিনী প্রবাদের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। একদিনের ঘটনায় ব্রহ্মানন্দগিরির হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হয়;—জননীর কলঙ্ক কথা তাঁহার হৃদয়কে সাধনা ও সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। তিনি গৃহাশ্রম ছাড়িয়া রমণার মঠে দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত (?) হইয়া তান্ত্রিক সিদ্ধি-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। রমণায় তিনি বহুকাল নানাবিধ তান্ত্রিক উপাসনা করিয়াও সিদ্ধিলাভে কৃতকার্য্য না হইয়া কাশীধামে গিয়া মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। তথায় এক যোগিনীর সহিত তাঁহার দেখা হয়। এই যোগিনী মহামায়ার পার্শ্ববর্ত্তিনী ডাকিনী যোগিনীদের অন্যতম। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন,—'মা, আমি অনেকদিন

* পুরাতন ঢাকার ইতিহাস সংগ্রহে অন্যতম উৎসাহী বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন,—"আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যখন তাঁহার প্রসিদ্ধ 'হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস' লেখেন, তখন তিনি এই হস্তলিখিত তন্ত্র হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন।"—প্রতিভা, বৈশাখ, ১৩১৮।

কাশীতে মন্ত্র জপ করিতেছি, কই আজিও ত আমার সিদ্ধিলাভ হইল না। ইহার কারণ কি?' উত্তরে যোগিনী বলিলেন,—'আচ্ছা, আগামী কল্য তোমাকে ইহার সদুত্তর দিব।' পর দিন যোগিনী আসিয়া ব্রহ্মানন্দের বীজমন্ত্র বিল্বপত্রে লেখাইয়া লইলেন। কথিত আছে, গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রে কি একটা ভুল ছিল, প্রকৃত সেই জন্যই ব্রহ্মানন্দের সিদ্ধিলাভ হইতেছিল না। ভগবতীর নেত্র-কজ্জলদ্বারা সংশোধিত মন্ত্রটি যোগিনী সাধককে আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—'তুমি এই শুদ্ধ মন্ত্র জপ কর। অশুদ্ধ মন্ত্র জপ করিলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।' কিন্তু সাধক তাহা শুনিলেন না। তিনি জানিতেন, গুরু-প্রদত্ত মন্ত্র কখন অশুদ্ধ হইতে পারে না। তিনি তাহাই অত্যধিক সংযমের সহিত জপ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে তিনি আকাশ-বাণী সংযোগে জানিতে পারিলেন, কামাখ্যায় মন্ত্র জপ করিলে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইবে। তদনুসারে তিনি কামাখ্যা-শৈলে গিয়া মায়ের ধ্যানে ডুবিয়া রহিলেন। কোন কালেই ভগবান্ সাধককে বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া সহজে দেখা দেন না। ব্রহ্মানন্দগিরি নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শন করিতে লাগিলেন। নানা দিক্ হইতে তাঁহার উপর কত অত্যাচার হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি নিরুপায় হইয়া সাধনার জন্য ব্রহ্মপুত্র নদের গর্ভে, বিস্তীর্ণ বালুকামধ্যে পতিত একটি মৃত হস্তীর উদরে প্রবেশ করিলেন। সাধকের এই অপূর্ব্ব সংযম ও জপে পরিতুষ্ট হইয়া, এইবার মা ভগবতী ব্রহ্মানন্দকে দেখা দিলেন। দেবী বলিলেন,—"বৎস! তুমি কি চাও, আজ তোমাকে তোমার অভীপ্সিত বরদান করিব।"

সাধক ব্রহ্মানন্দ বলিলেন,—

'ব্রহ্মানন্দগিরিগিরীন্দ্রতনয়াবক্ত্রামৃতং বাঞ্ছতি।'

সাধকের কামনা অদ্ভুত রকমের বটে, তিনি ত্রিলোক-সুন্দরী গিরিরাজ-কন্যাকে পত্নীরূপে পাইতে সমুৎসুক! "সিদ্ধ-জীবনী" গ্রন্থকার বলেন,—'ব্রহ্মানন্দ বুঝিয়াছিলেন, যে মহাশক্তির প্রেরণায় বা ইঙ্গিত অনুসারে, জগতের তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, উল্লিখিত দুষ্কার্য্য ও তাঁহারই প্রেরণায় সম্ভূত। সেই মহাশক্তি যদি তাঁহাকে মাতৃগামী করিয়াছেন, তবে তাঁহারও সতীনাম ঘুচাইয়া ব্রহ্মানন্দ তাঁহার মর্ম্মবেদনার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। মহামায়াকে শুধু তিনি যে পত্নীরূপে চাহিয়াছিলেন তাহা নয়, তাঁহার নিকট মুক্তি-ভিক্ষাও করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবী তাঁহার সাধন প্রণালীর উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে মুক্তিদানে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। তখন সাধক বলিলেন,—'তোমাকে আমি চাই না, তুমি অন্যত্র গমন করিতে পার।' দেবী দর্শন নিষ্ফল হয় না। তিনি বলিলেন,—'আমার নিকট হইতে তোমাকে বর অথবা অভিশাপ, ইহার একটি গ্রহণ করিতেই হইবে।' সাধক দেবীর উদ্দেশ্য অন্তরে অনুভব করিয়া বলিলেন, 'মহামায়া! তুমি আমাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছ, আমিও তোমাকে সহজে ছাড়িব না। ঐ যে আমার যোগাসনের প্রস্তর খানা দেখিতেছ, উহা মস্তকে লইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে সর্ব্বত্র ঘুরিতে হইবে।' দেবী বলিলেন,—'আচ্ছা, তাহাই হইবে। আমি উমা ও তারা এই দুই মূর্ত্তিতে প্রস্তর বহন করিয়া, তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচরণ করিব। কিন্তু যেদিন তুমি আমাকে প্রস্তর নামাইতে বলিবে সেই দিনই আমি তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।' জনশ্রুতি এই যে, অনেকেই ঐ প্রস্তরখানা শূন্যের উপর দিয়া ব্রহ্মানন্দগিরির সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। প্রায় দ্বাদশ বৎসর দেবী প্রস্তরখণ্ড মাথায় লইয়া ব্রহ্মানন্দগিরির অনুগমন করিয়াছিলেন। বহুবৎসর নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে একদা ব্রহ্মানন্দগিরি গুরুধাম রমণায় আসিয়া উপস্থিত হন। প্রস্তর-বাহিনী-দেবীকে গুরুসন্নিধানে উপস্থাপিত করা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তিনি দেবীকে প্রস্তর নামাইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতে বলিলেন, এবং নিজে গুরুসন্দর্শনে মন্দিরা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এদিকে দেবী, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইল বলিয়া, প্রস্তরখণ্ড মন্দির-প্রাঙ্গণে রাখিয়া অন্ত-র্হিতা হন। প্রস্তরখানা আজিও রমণার কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে মৃত্তিকায় অর্দ্ধ প্রোথিতাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তৈল, সিন্দূর ও পুষ্প সংযোগে লোকে ইহার পূজা করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন রমণার দশনামী মঠের আর কোনও ইতিহাস অনেক খুঁজিয়াও পাওয়া যায় নাই। কাহারও মতে, এই প্রস্তরখণ্ড ব্রহ্মানন্দগিরির কোনও শিষ্য, গুরুর যোগাসন বলিয়া, কামাখ্যা হইতে ঢাকায় আনিয়া দশনামী মঠে উহার প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়েরা

শেষোক্ত মতই অধিকতর সমীচীন বলিয়াই মনে করেন। প্রস্তরবাহিনী দেবীর উপাখ্যান যথাযথ সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, এমন ভক্তের সংখ্যাও আমাদের দেশে দুর্লভ নয়।

মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ও আয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। ব্রহ্মানন্দগিরির কোনও শিষ্যের নিকট শ্রীহট্টজেলার অন্তর্গত মাদার কান্দি (হবিগঞ্জ মহকুমা) গ্রামনিবাসী কালী-ভট্টের পুত্র শ্রীনাথ ভট্ট মহাশয় এই বিষয় সম্পত্তি উইল সূত্রে প্রাপ্ত হন। ইনি বৈদিক ব্রাহ্মণ। ইঁহার গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দগিরি। ইনি বিবাহিত। ইনিই এখন মন্দিরের স্বত্বাধিকারী। বরিশাল, ভাওয়াল ও কুমিল্লায় মায়ের ব্রহ্মোত্তর জমিদারী আছে। ইহারই আয়ে মায়ের পূজা ও স্বত্বাধিকারীর ভরণপোষণাদি নির্ব্বাহিত হয়। নবাবপুরের বসাক-বংশীয় শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক মহাশয়, পূজা ও মন্দির-সংরক্ষণের জন্য বিস্তর সাহায্য করিয়া থাকেন। পৌষমাসের শনি ও মঙ্গলবারে এই মন্দিরে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। মন্দিরের বহির্ভাগে একজন নানকপন্থী সন্ন্যাসী থাকেন। *

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

* বিগত ৬ই মাঘ, ১৩১৯, বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শিউলী

অশরণ তরুণ রাজা,—হৃদয় তাহার প্রেম-প্রবণ। কিন্তু হায়, কোথায় তার সে প্রেমের দেবী!—যার উদ্দেশ্যে সে তার অন্তর-ভাণ্ডার শূন্য করিয়া সকল রত্নরাজী নিবেদন করিয়াছিল, তাহাকে ত মিলিল না! তিনটি নবোদ্ভিন্না কুসুম-পেলব-চরণা তরুণী তাহার মণিমণ্ডিত অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠে অলক্তক-রঞ্জিত-চরণে খেলিয়া বেড়াইত। তাদের সুকোমল বিম্বাধরে, ললিত-বাহুর বিলাস-ভঙ্গীতে, অস্থূল সুগোল অবয়বে সৌন্দর্য্যের লহরী খেলিয়া বেড়াইত। কিন্তু কই—অশরণের হৃদয়ের তৃষা তাতে মিটিল কই?

জ্যোৎস্নাময়ী "বালা" তাহার অনিন্দিত মৃণালবাহুতে স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার কাণে কাণে কহিত, "আমি তোমারই—তুমি 'নীলিমা'র হৃদয়-শোণিতে আমার চরণ রঞ্জিত করিয়া দাও—আমি তোমাকে একা ভোগ করিব।" নীলিমা তার ফুল্লাধরে একরাশ শুভ্র হাসি লইয়া যখন রাজার কর্ণে প্রেমের কাহিনী গুঞ্জন করিত, তখন তাহার ভিতরে "বালা"র মৃত্যু-কামনা সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিত! আর "সুষমা" আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি মত্ত, "বালা" ও "নীলিমা"র সৌন্দর্য্য যে তাহার চরণ-সেবারও যোগ্য নহে, এমনই কতকগুলি উচ্ছ্বসিত গর্ব্বিত বাণী সুষমার মুখে লাগিয়াই থাকিত।

হতভাগ্য অশরণ কোন্ স্বপ্নলোকের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আনন্দের মাদকতা মিশাইয়া এক দেবী-প্রতিমা কল্পনা করিত!—কোথায় সে সুষমাবরণী তন্বী—নয়নে তার সান্ধ্য শারদাকাশের নীলিমা—কণ্ঠে তার দূরাগত বীণার ঝঙ্কার—তার রক্তিম ওষ্ঠাধরের হাস্যে ফুলের শোভা বিকশিত; তার রাঙ্গাচরণের সুকোমল স্পর্শে ধরণীর শ্যামল অঙ্গে ফুল ফুটিয়া উঠে—কোথায় সে?—অশরণ তাহা ত জানে না!

দিনের পর দিনগুলি কত জ্যোৎস্নার হাসি, কত পাখীর অস্ফুট কলরব, কত নির্ঝরের সঙ্গীত-ধারা লইয়া অতীতের অঙ্গে মিশাইয়া গেল, কিন্তু কই তার প্রেমের একনিষ্ঠ একাগ্র সাধনার দেবী ত মিলিল না!

ফুলের গন্ধ গায়ে মাখিয়া নববসন্তের মলয়-বায়ু বিহগ-কুলকে প্রমত্ত—প্রকৃতিকে বিবশ করিয়া তুলিয়াছে!—বন-লক্ষ্মীর চারু অঙ্গে নানা ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক দিন রাজ-প্রাসাদে এক সন্ন্যাসী আসিলেন। তাঁর অঙ্গ বিভূতি-ভূষিত—প্রশস্ত ললাট চন্দন-চর্চ্চিত—কেশভার জটা-সংহত—দীর্ঘবাহু মাংসল—নয়নে প্রেমের জ্যোতিঃ—মুখে প্রসন্ন হাসি। নিখিল বিশ্বকে তিনি আপনার করিয়া—জগৎকে ভালবাসিয়াই যেন পরিতৃপ্ত। অশরণ তাঁহার পাদবন্দনা ও

যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া বলিল,—"কে তুমি সন্ন্যাসী? তুমি নিশ্চয়ই দেবতার দূত! তুমি বলিয়া দাও, কোথায় আমার সে মানসরাণী—যার জন্য আমার হৃদয়ের সকল দ্বার উদ্‌ঘাটিত; আমার হৃদয়ের পূজার অর্ঘ্য যাহার জন্য সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে—সে প্রেমের দেবী কোথায়? সন্ন্যাসীর প্রসন্ন-আননে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইল; তিনি বলিলেন, "কে জানে কোথায় সে দেবী?—কে জানে কাহাকে তুমি ভালবাসিবে?—ভালবাসা তড়িৎ-প্রভার মত; মানুষের সাধ্য নাই ইহার গতিরোধ করে। হয়ত কাহাকেও সে গ্রাহ্য করিবে না—আবার কেহ হয়ত উহার তাড়নায় সংসারের সকল প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া অন্ধের মত অদৃশ্য অনন্তে উধাও হইয়া যাইবে! ভালবাসা সন্ধ্যার মত—বড় শীঘ্র আসে! দিবসের মত—চকিতে মিলাইয়া যায়! কে বলিবে কখন্ ইহা মানুষকে স্পর্শ করে? নিবিড় অরণ্যে বিচরণ কর না কেন—ঘন পত্রদল-চ্যুত সূর্য্য-কিরণরেখার মত সে তোমাকে খুঁজিয়া লইবে! একমুহূর্ত্তে—নিমেষের স্পর্শে সকল বৃত্তি সরস করিয়া, নরনারীর হৃদয়-যুগলকে এক গূঢ়-আকর্ষণে সম্বদ্ধ করিয়া দিয়া সে চলিয়া যায়। কোথা হইতে আসে—কোথায় যায়—কেহ তাহা বলিতে পারে না!" রাজার মুগ্ধ দৃষ্টিপথ হইতে সন্ন্যাসী কখন্ চলিয়া গেলেন, অশরণ তাহা জানিতেও পারিল না।

ভগ্নমন্দিরপার্শ্বে কে ঐ অপরূপ নারীমূর্ত্তি?

প্রভাত-প্রকৃতির শীতলতা তখনও অপগত হয় নাই—রাজার কাননে পুষ্পগন্ধ-বিহ্বল পাখীসব কলরব করিয়া উঠিয়াছে! অশরণ ধীরে ধীরে অশ্বশালা হইতে আপন দ্রুতগামী অশ্ব সজ্জিত করিয়া তদারোহণে লক্ষ্যহীন—অনির্দ্দিষ্ট ভ্রমণে বহির্গত হইল। চারিদিকে অরণ্যের বৃক্ষরাজী অসংখ্য সশস্ত্র পদাতিকের মত শ্রেণী-বদ্ধভাবে দণ্ডায়মান! রাজার চিত্তে একটা অজ্ঞাত কামনা উদ্দীপিত—সে জানে না সে কোথায় চলিয়াছে! মধ্যাহ্নের দীপ্তসূর্য্য, অরণ্যানীর নিবিড় পত্রদলের ভিতর দিয়া, উজ্জ্বল কিরণরেখায় অশরণের রত্নমুকুটে প্রতি-ফলিত হইতেছিল। সম্মুখে নীলহ্রদের স্বচ্ছসলিলে রাশি রাশি পদ্ম শোভমান। শ্রান্ত অশরণ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হ্রদের তীরে বসিল; ধীরে ধীরে তাহার নয়ন-পল্লব মুদিত হইল।

যখন সে জাগিল—চোখে তার জল; তার সুপ্তি-শ্লথ শ্রবণ দুয়ারে কোন্ নারী-কণ্ঠের ক্ষীণ কাকলী গুঞ্জিত হইতেছিল;—দূরাগত সঙ্গীতের মৃদুমধুর ঝঙ্কার তখনও তাহার কর্ণে অমৃত-সেচন করিতেছিল!

হ্রদের অপর পার্শ্বে পুষ্পিতা লতাবেষ্টিত ভগ্ন-মন্দিরের পার্শ্বে কে ঐ অপরূপ নারীমূর্ত্তি?—মুহূর্ত্তে তার হৃদয়ে সহস্র বীণা ঝঙ্কার করিয়া উঠিল!—হাঁ ঐ-ই বটে! এক আঘাতে তাহার হৃদয় উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে! কে ঐ অনবদ্যাঙ্গী অনিন্দিতা রূপসী! তপ্তকাঞ্চন-সুন্দর দেহ—অংসে পৃষ্ঠে ললাটে লীলায়িত কুন্তলের রাশি—শ্লথ মলিনাম্বরা কে এই রমণী? বালিকার পলক-বিহীন দৃষ্টি অশরণের চোখের উপর পড়িয়াছে। বালিকা

বিস্ময়-বিমূঢ়া, অপূর্ব্ব অনুভূতিতে বিবশা! বালিকা—কবে যে সে পুষ্পিত-যৌবনের মধুর উদ্যানে পদক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা সে জানে না—বিকচোন্মুখ যৌবনে এই তার প্রথম পুরুষ-সন্দর্শন! বালিকা ভাবিতেছে—এ কি স্বপ্ন!—এ স্বপ্ন কি সুখময়!

অধীর যুবকের কম্পিতাধরে একটি অস্ফুট চীৎকার ফুটিয়া উঠিল—বালিকা শিহরিয়া উঠিল! হাতের মৃৎকলসী পড়িয়া শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল! অশরণ বালিকার সন্নিহিত হইলেন—দুইটি বিদ্যুৎ-ভরা হৃদয়, চারিটি নীল আঁখির ভিতর দিয়া, পরস্পরের চিত্ত খুঁজিয়া চূর্ণ কলসীখণ্ড আহরণ করিতে লাগিল। হঠাৎ বিস্মিত যুবক, গাঢ় অনুরাগে, মুগ্ধা বালিকার হাত চাপিয়া ধরিল; বলিল,—"কে তুমি বালা? বল—তুমি স্বপ্ন, না সত্য!" মৃদুগুঞ্জনে বালিকা অস্ফুটস্বরে বলিল, "হয়ত স্বপ্নের মধ্যে এ আর এক সুখ-স্বপ্ন! কারণ, আমার পক্ষে তুমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন!" অশরণ অধীরভাবে উচ্চকণ্ঠে বলিল,—"না-না,—স্বপ্ন দৃষ্ট কি এমন শরীরী হয়? আমার বুকে হাত দিয়া দেখ।—স্বপ্নে কি কেহ এমন করিয়া বাহু বেষ্টন করিতে পারে? আমাকে স্পর্শ করিয়া দেখ—আমি স্বপ্ন নহি—সত্য!" বালিকা কম্পিতদেহে পিছু হটিয়া গেল; পুষ্প-ভারাবনত লতার মত তাহার সুকোমল তনু অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নত হইয়া পড়িল।

বালিকার চরণতলে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া যুবক তাহাকে পার্শ্বে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। বালিকার কম্পিত সুগোল সুন্দর মৃণালহস্ত দু'খানি নিজ হস্তে বন্দী করিয়া, তার বদনে আপন নেত্র স্থাপিত করিয়া, অস্পষ্টস্বরে বলিল,—"শোন সুন্দরী, ভালবাসা কখন্ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আসিয়া স্পর্শ করে—কেহই বলিতে পারে না। নারীর দর্শনে কোন দিন আপনাকে এত দুর্ব্বল ত অনুভব করি নাই!—বল, তুমি কে?—আমার কথার উত্তর দাও; তোমার কলকণ্ঠ-ধ্বনি আমার হৃদয়ে অমৃত-সেচন করে! নয়নে তোমার দিব্য তৃপ্তি ঝরে!"

"কে তুমি যুবক?—আমার মুগ্ধ আঁখির মধুর স্বপ্ন! এই সুগভীর নির্জ্জন অরণ্যের ভগ্নমন্দিরে আমার মৌনব্রত বৃদ্ধ পিতার তাপস-মূর্ত্তিই আজীবন দেখিয়াছি।—আজ তোমার প্রতি চাহিয়া আনন্দে আমি বিহ্বল হইয়াছি!"

"শোন বালা, তুমি এই জনহীন কাননের ফুটন্ত ফুল;—গত জন্মে তুমি আমারই কণ্ঠহার ছিলে।—তোমাকে আমি বিশ্বময় খুঁজিয়াছি! ভগবানের অভিপ্রায়, তাই তোমায় আমায় এই অপূর্ব্ব মিলন! তাই আজ আমি স্বতঃ আকৃষ্ট হইয়া এখানে উপস্থিত! এস বালা, এস আমার বাহুবন্ধনে ধরা দাও! আমায় বল—তোমার আর কে আছেন?"

শিউলী তার নাম। কতদিনের এই ভগ্নমন্দির,—এই পুষ্পিত সরোবর, এই অরণ্যের শ্যামল শোভা,—ইহাই তার বিশ্বজগৎ। ইহার বাহিরের সে আর কিছুই জানে না; এই অরণ্যের পশুগণ বালিকার সঙ্গে ক্রীড়া করে—তার প্রদত্ত খাদ্য উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করে—তার স্নেহের আহ্বানে তারা ছুটিয়া আসে। অশরণ বুঝিল—আজও সে অরণ্যচারী প্রাণীর মত বনাংশের গণ্ডীমধ্যে বন্দী! ক্রমে শিউলীর প্রকৃতিসুলভ ভীরুতা দূর হইল। বনচারিণী নির্দ্দোষ বালিকা বলিল,—"বল যুবক, তোমার পরিচয় বল—তুমি কে?"—"আমার নাম অশরণ"।—"বাবা বলেন, সেত রাজার নাম!" "হাঁ, আমিই সেই রাজা—বল তোমার হৃদয়-রাজ্যেও আমায় রাজা করিবে!"

"—সে ত তুমি জান"। যুবক দুই হাতে বালিকাকে আরও নিকটে আকর্ষণ করিয়া লইল।—তখন পশ্চিম আকাশে গোধূলির স্বর্ণচ্ছটা প্রকাশ পাইয়াছে—অদূরে ক্ষণ-পরেই আরতির শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।—অশরণ বলিল, "সুন্দরী, আজিকার মত বিদায় দাও।" বালিকা আপনার সুকোমল ভুজবল্লী দ্বারা যুবকের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সঙ্কোচ-স্বরে বলিল,—"পিতা কএক দিন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আজ তুমি আমাদের ঐ ক্ষুদ্র—ভগ্ন কুটীর পবিত্র করিবে না কি?" প্রলুব্ধ অশরণের হৃদয়ে একটি গুপ্ত আশা জাগিয়া উঠিল!—"প্রিয়তমে! তুমি জান—প্রেম কি?" "আমি সুধু জানি প্রেমে এই জগৎ নিয়ন্ত্রিত—সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে প্রেমের আবাস!—এই নিবিড় কৃষ্ণহ্রদের সুগভীর অন্তস্তলে যদি ভালবাসা নিমগ্ন থাকিত, আমি তোমাকে দেখিয়া জলে ডুবিতাম! ভালবাসা যদি সাগর হয়—আমি তাতে ডুবিয়া থাকিব। প্রেম যদি আগুন হয়—আমি তাতে পুড়িয়া মরিব। ভালবাসা যদি বাতাস হয়—আমি তার পিছনে ছুটিয়া চলিব। ভালবাসা যদি

ধূলিকণা হয়—আমি তবে চরণরেণু হইয়া থাকিব।” “তুমি তবে ভালবাসার আস্বাদন পাইয়াছ! আমি তোমাকে ভালবাসি—তবু এই প্রকৃতির বৃন্ত হইতে তোমাকে ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া পত্নীরূপে ভালবাসিতে—দেবীরূপে পূজা করিতে—তোমার কাছে আসিব।”

“পত্নী! আমার হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইতেছে। বল,—আমি তোমার স্ত্রী?” স্নিগ্ধ যামিনী! নীল আকাশ! চন্দ্র-কিরণে সরোবরে কুমুদ-কহ্লার ফুটিয়া উঠিয়াছে! বন্যপুষ্পের মিশ্র গন্ধে বাতাস ভরপূর। সব চেয়ে শিউলীর সুরভি নিঃশ্বাস সুন্দরতম! মধুরতম!

অশরণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল, বলিল,—“আমার হাতে হাত দাও। আমি তোমায় বিবাহ করিব! বল—‘অশরণ, তোমাকে আমি স্বামী বলিয়া বরণ করিলাম।’” “গান্ধর্ব্ব মতে?”—“হাঁ, গান্ধর্ব্ব মতে!” সুদূর আকাশের কোলে বিকট বজ্র-গর্জ্জন শ্রুত হইল—দূরে ভীত শৃগালের দল ঘন চীৎকারে অরণ্যভূমির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল!

অশরণের প্রেমের আকাশে সুখ সূর্য্য দীপ্যমান্—তার তীব্র কিরণে তার হৃদয় প্লাবিত। স্বর্ণ সিংহাসনের নয়—তার হৃদয়-আসনের একমাত্র রাণী—বন্যবালিকা শিউলী! সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া দিনের পর দিন সে তার অরণ্য-ঘেরা প্রেমের কুঞ্জে ছুটিয়া আসে। রাজ প্রাসাদের তিন রাণী—কেহই জানে না, কোথায় সে যায়! কি মধুর সে দিনগুলি—কি সুন্দর সে জ্যোৎস্না ধৌত মিলন রজনী! বট-বৃক্ষের ছায়া-তলে সুগভীর প্রণয়ের কতই অফুরন্ত কথা!—অশরণ তার প্রণয়িনীর অধরযুগল হইতে নিত্য নিত্য কতই প্রেমের কুসুম চয়ন করিত! বটের শাখাস্থ মুখর-কোকিলকণ্ঠে তত মধু নাই—দুইটি প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয়-গুঞ্জনে যত মধু! নিস্তব্ধ রজনীতে শুধু তাদের কণ্ঠস্বর, বীণা-ঝঙ্কারের মত, বনস্থলী পুলকিত করিত! শিউলী তাহার তরুণ জীবনের সকল সম্পদ্ অকাতরে যুবকের পায়ে ঢালিয়া দিল। অশরণ তাহাকে ভালবাসিত; মণিমুক্তাকাঞ্চনখচিত বিচিত্র পরিচ্ছদ আনিয়া দিত। শিউলী তার মর্ম্ম বুঝিত না, মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রস্তরান্তরালে তাহা সযত্নে রক্ষা করিত; অবসরমত তাহা লইয়া ক্রীড়া করিত। অশরণ দু’এক দিন তাহাকে সর্ব্বাভরণে ভূষিত করিয়া তাহার রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তি দর্শন করিত। বালিকা যুবকের আনন্দে বিগলিত হইয়া যাইত।—এমনই করিয়া এক জ্যোৎস্না পক্ষ তাহারা কাটাইয়া দিল।

এক দিন সন্ধ্যায় পল্লপত্র বাজনরতা শিউলীর সুখ স্বপ্ন হঠাৎ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল—অদূরে তার বৃদ্ধ তপস্বী পিতার ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি! বহুবৎসর সন্ন্যাসী মৌনব্রতী; আজ তাঁহার মুখে কথা ফুটিল! তিনি বলিলেন, “শিউলী!—একি? তোমার পার্শ্বে কে ও যুবক?” শিউলী অশরণের পার্শ্বে আরও সরিয়া বসিয়া, তাহার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া, বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে উত্তর করিল,—“আমার স্বামী!” সন্ন্যাসীর রক্তনেত্রের সম্মুখে যুবকের প্রসন্ন হাসি মিলাইয়া গেল, সন্ন্যাসী তীব্রস্বরে বলিলেন,—“বল, কিসে সে তোমার স্বামী!” “গান্ধর্ব্ব মতে আমি যুবকের পরিণীতা পত্নী!” “গান্ধর্ব্ব মতে?—জান, যুবক এই নগরীর অধিপতি?” “জানি,—আমি তাঁর রাণী।” “তবে তুমি তার প্রাসাদে যাও না কেন? জিজ্ঞাসা কর, এ প্রশ্নের উত্তরে যুবকের কি বলিবার আছে?” শিউলী প্রশ্ন করিল, উত্তরে যুবক বলিল,—“প্রিয়তমে! সে অসম্ভব! তুমি আমার পত্নী, কিন্তু ‘রাণী’ হইবার উপযোগী রাজরক্ত তোমার শরীরে কোথায়? তোমার আমার মধ্যে এই যে দুর্লঙ্ঘ্য সাগর—তাহা লঙ্ঘন করিবার শক্তি আমার নাই।” শিউলীর মুখ তুষারের মত হইয়া গেল! “অশরণ—অশরণ! বল, আমি—আমি তোমার কে?” যুবক ঊর্দ্ধে বাহু উত্তোলন করিয়া উত্তর করিল,—“সকল দেবতা সাক্ষী, তুমি আমার একমাত্র পত্নী!”

তারপর উপকূলবিধ্বংসী নদীস্রোতের মত সন্ন্যাসীর মুখ হইতে অনর্গল অভিশাপ নির্গত হইতে লাগিল; শিউলী চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল! অশরণ নতমস্তকে তরবারির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—“দুর্ভিক্ষে তোমার দেশ শ্মশান হইবে;—অনাবৃষ্টিতে তোমার রাজ্যে কূপসকল শুষ্ক হইয়া যাইবে;—তোমার রাজ্য, রাজসম্পত্তি ধ্বংস হইয়া যাইবে;—তুমি নিজে অচিরে জ্বরকম্পিতদেহে জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে।” কিছুক্ষণ সকলেই নীরব—কেবল থাকিয়া থাকিয়া শিউলীর অস্ফুট কাতরধ্বনি ব্যক্ত হইতেছিল। বন-লতার ফুলগুলি বুঝি ম্লান হইয়া গেল! বৃক্ষশাখায় বিহগের কাকলীও যেন নীরব!

আবার যুবক কথা কহিল, বলিল,—"আমাকে ধিক্! হে সন্ন্যাসী, তোমার রুদ্র অভিশাপ আমার সকল সুখ-কল্পনা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! হায়, সাধুর রোষাগ্নি হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে!" তার পর সে সোহাগে শিউলীর হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইয়া বলিল,—"প্রিয়তমে! তোমার নয়ন হইতে অশ্রু মুছিয়া ফেল। আমিই অপরাধী—রাজ্য ছাড়িয়া অরণ্যে তোমাকে অনুসন্ধান করা আমারই ভুল! যদি গ্রহণ করিয়াছিলাম—জগতের সম্মুখে তোমাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলাম না কেন! যা'ক্, তবু তুমি আমারই—আমরা পরস্পরকে ভালবাসিয়া অনন্ত প্রেমরাজ্যে আমাদের স্থান করিয়া লইয়াছি।—আজ আমায় বিদায় দাও।" শিউলীর সুন্দর মুখ অশ্রুসিক্ত হইল; অঞ্চলে নয়নের জল অপসারিত করিয়া সে বলিল,—"বল, আর কি তুমি ফিরিয়া আসিবে না?"—"প্রিয়তমে, যদি আমি আর ফিরিয়া না আসি,—আমার মিনতি তুমি আমায় খুঁজিয়া লইও!"—"নিশ্চয় প্রভু—নিখিল বিশ্বের তুমি যেখানে থাক, দাসী তোমার সঙ্গিনী হইবে!" তখন অশরণ একবার সতৃষ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে শিউলীর দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল। হৃদয়ে তার দুর্ব্বহ বিষাদ! জগৎ তাহার চক্ষে এক নিষ্ঠুর মরীচিকা! শিউলী তাহার স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া পিতার পদধূলি মস্তকে লইয়া মন্দিরে ফিরিয়া গেল।

দিনের পর দিন চলিয়া গেল।—কোথায় অশরণ! তাদের সেই বিচিত্র প্রেমালাপ বনস্থলী আর শুনিতে পায় না। লতায় ফুল তেমনই ফোটে—বাতাসে দোলে, সরোবরে শুভ্র কমলের হাসিরাশি তেমনই শোভা পায়; কিন্তু তারা তেমন হাসি বুঝি আর হাসে না। কোকিলকণ্ঠে যেন একটা অরুন্তুদ হুতাশ কাননে নৈরাশ্য ছড়াইয়া সুদূর পাহাড়ে মিলাইয়া যায়।

সাত দিন শিউলীর চোখে ঘুম নাই। অষ্টম দিবসে সে তাহার বিষাদ-ভার লইয়া ধ্যানস্তিমিতনেত্র পিতার পদতলে পড়িয়া বলিল,—"পিতঃ, বল আমার স্বামী কোথায়?"—"রাজা অশরণ আর ইহজগতে নাই। আগামী কল্য তাঁর রাজদেহ অগ্নিতে সমর্পণ করা হইবে। জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাজ-পরিবারের প্রথানুসারে তাঁহার তিন সুন্দরী রাণী তাঁহার অনুগমন করিবে। কেমন শিউলী, তুমি সেখানে যাইবে?" হৃদয়ের রুদ্ধ-বেদনা গোপন করিয়া শিউলী অবিচলিত-কণ্ঠে উত্তর করিল,—"হাঁ পিতঃ, আমি সেখানে যাইব; আমি তাঁহাকে একবার দেখিতে চাই!" উত্তরে সন্ন্যাসী তাহাকে বিদ্রূপ করিল,—"অসম্ভব! এক দিবসে তত পথ চলা তোমার পক্ষে অসম্ভব;—সেখানে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তোমার মৃত্যু নিশ্চিত!" বালিকা মন্দিরে ফিরিয়া গেল!

"সত্যই আমার স্বামী আর এ জগতে নাই! কোথায় তিনি?—আমি বলিয়াছিলাম, আমি তোমাকে খুঁজিয়া লইব। অশরণ! প্রভু! স্বামী! আমাকে পথ বলিয়া দাও। আমি তোমার কাছে যাইব! আমি অবলা; তুমি আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লও!" মন্দিরতলে মাথা লুটাইয়া শিউলী দেবতাকে ডাকিল।—এই মন্দিরে সে আশৈশব কাটাইয়াছে। আজ এই আবাল্যপরিচিত মন্দির তাহার নিকট প্রবাসের মত বোধ হইতে লাগিল।—অবশেষে সে গাত্রোত্থান করিল;—প্রস্তরান্তরাল হইতে তাহার স্বামীর প্রদত্ত রত্নালঙ্কার সকল বাহির করিয়া সর্ব্বাঙ্গে পরিধান করিল; কেশে সুরভি তৈল মাখিল!—বহুমূল্য হীরক-মাণিক্য সর্ব্বাঙ্গ জ্যোতির্ম্ময় করিল; কাল' চুল বেড়িয়া রত্নরাজী ঝল্‌মল্ করিল; কণ্ঠে মুক্তার কণ্ঠহার দুলিল। সর্ব্বোপরি সে একখানি মলিন বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিল; ভয়—পাছে বন্য তরু-কণ্টকে তাহার রাজাভরণ ছিন্ন হইয়া যায়!

সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ গরিমা মিলাইয়া দিন চলিয়া গেল।—নক্ষত্র-মালিনী অসংখ্য পুষ্পসৌরভস্নিগ্ধা যামিনীরও অবসান হইল। পূর্ব্বাকাশে প্রভাত-সূর্য্য যখন দেবদারু-শিখরে স্বর্ণকিরীট পরাইয়া দিল, বালিকা তখন বনসীমা অতিক্রমণ করিয়া রাজ্য-প্রান্তে উপনীত!—দেবতা তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে!

এ দিকে রাজপ্রাসাদে সুন্দরী রাণীত্রয় স্বর্ণ-পালঙ্কে বিনিদ্র বিভাবরী কাটাইয়াছে।—তাদের শ্রান্ত তনু শিথিল-শয্যায় ম্লানপুষ্পের মত শোভা পাইতেছে! আজ রাজার সঙ্গে তাদের সহমরণ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে!—সেই চিন্তায় তাদের প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতেছে! মহিষী "বালা" তার সুকোমল সুগোল বাহু প্রসারিত করিয়া তার ভগিনী-দ্বয়কে দেখাইয়া বলিল, "হায়! অগ্নির লেলিহান্ রসনা আমার এই অনিন্দ্যসৌন্দর্য্য গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আর কিছু পরে দগ্ধ অস্থি-ভস্ম ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না!" "নীলিমা"

চীৎকার করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীরনিম্নে সমাহিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল! "সুষমা" বলিতে লাগিল—"বাঁচিয়া থাকিতে রাজার চিত্তে আমাদের স্থান ছিল না—কেন আমরা মরণে তাঁর অনুগমন করিব? কে জানে কে তাঁর হৃদয়ের রাণী! নিশ্চয়ই 'বালা!' তুমি নও—'নীলিমা'ও নহে, আমিও নহি! তবে কে? বাঁচিয়া থাকিতে রাজার সঙ্গে মরা হইবে না। এযে ঘোর অপমান! তার চেয়ে মৃত্যুর সহজ পন্থা আমি জানি—আমার হস্তের এই ঔষধ পান করিব—তারপর অনন্ত নিদ্রা! অনন্ত শান্তি! সৌন্দর্য্য-অপহারী অগ্নিকে ভয় করি বলিয়া মৃত্যুকে আমরা ভয় করি না। এস ভগিনীগণ! আজ এই অর্গলবদ্ধ রুদ্ধকক্ষে আমাদের জীবন লীলার শেষ অভিনয় সম্পন্ন করি! পুরবাসী গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিবে—মরণের কোলেও আমরা কি সুন্দর! তাহারা আমাদের পুষ্পের মত সৌন্দর্য্য-মহিমা দেখিয়া মুগ্ধ হইবে!" সকলেই সম্মত হইল। বিশাল দর্পণে তাহাদের অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইল; তাহারা নানা আভরণে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিল; তারপর প্রত্যেকে বিষপূর্ণ স্বর্ণপাত্র মুখের কাছে ধরিল।—তারপর সব শেষ! তিনটি ফুটন্ত পুষ্পের মত হাসিভরা মুখ শ্বেতশয্যার উপরে ঢলিয়া পড়িল—আর উঠিল না!

দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত পড়িল; কেহই সাড়া দিল না! দ্বার ভগ্ন করিয়া রাজ-পুরোহিতেরা এই দৃশ্য দেখিলেন। উত্তরীয় প্রান্তে নয়নজল অপসারিত করিয়া মলিনমুখে তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন। একমাত্র রাজদেহ অগ্নিতে সমর্পণ করা হইবে—রাজবংশের ইতিহাসে এমন অপমানজনক ঘটনা আর কখন ঘটে নাই! সমবেত জনতার কাতর আর্ত্তনাদে শ্মশান কোলাহলময় হইয়া উঠিল। তারপর মন্দিরের পার্শে রাজদেহ চিতায় সংস্থাপিত হইল। অগ্নি ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল। রাজপুরোহিতেরা এবং পুরললনারাই শুধু জানিল—আজ এই সনাতন সম্মানের পরিবর্ত্তে সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা অভিমানিনী রাজ্ঞীরা স্বেচ্ছাকৃত অপমানজনক মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে।

শোকোন্মত্ত বিশৃঙ্খল জনতা ভেদ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে কে ঐ নারী! তার ললাট অপূর্ব্ব মহিমায় উজ্জ্বল! নয়নে দিব্য জ্যোতিঃ! সর্ব্বাঙ্গে রত্নরাজী ঝলমল্ করিতেছে! বিস্মিত নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত জনমণ্ডলী পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। কে এই অপূর্ব্ব রূপসী!—যেন রাজ-রাজেশ্বরী! শিউলীর কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। প্রস্তর-কণ্টকে তার চরণ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে; ভূমির উপরে শোণিতের অলক্তকচিহ্ন মুদ্রিত করিয়া চিতার পার্শ্বে সে দাঁড়াইল। চিতার উপরে একমাত্র রাজদেহ—তাহার জীবনে-মরণে স্বামী। সে তখন চীৎকার করিয়া বলিল,—"হাঁ, প্রভু, সত্যই বলিয়াছিলে, আমিই তোমার জীবনে মরণে একমাত্র পত্নী।" তারপর অগ্নি

'হাঁ প্রভু, সত্যই বলিয়াছিলে, আমিই তোমার জীবনে মরণে একমাত্র পত্নী!"

প্রদক্ষিণ করিয়া শিউলী চিতায় আরোহণ করিল। অগ্নির শত শিখা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল; শিউলীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য-মহিমা উজ্জ্বলতর হইল। শ্মশান-বহ্নি গৰ্জ্জিয়া উঠিল, সহস্র কণ্ঠ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল! শিউলী মরণেও তাঁহাকে খুঁজিয়া লইয়াছে!

শ্রীহীরালাল দাসগুপ্ত।

ঋতু-বিচার

শাস্ত্রে তিন প্রকার ঋতু বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদে রস-নিষ্পত্তি ও শরীর-শোধনার্থ দুই প্রকার ঋতু কল্পিত হইয়াছে। মহর্ষি কাশ্যপ দেশভেদে ঋতু-বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন।
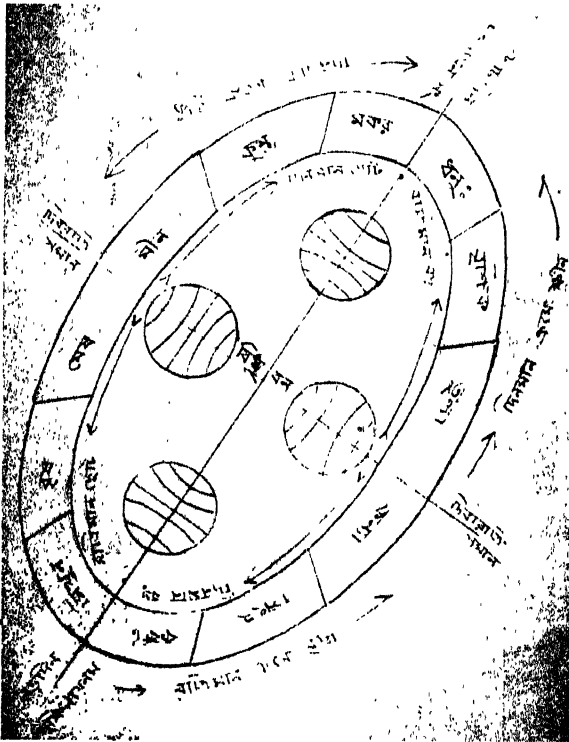
ঋতুর বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে, প্রথমে আমাদের বর্ষচক্রের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতির গতি অনুসারে সৌর, চান্দ্র, নাক্ষত্র প্রভৃতি নানা প্রকার বর্ষগণনা করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সৌর সংবৎসর অনুসারে ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; সুতরাং আমরা সৌরবর্ষ অবলম্বন করিয়া কিছু বলিব। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহাকে বিষুব-সংক্রমণ বলিয়া থাকি, বস্তুতঃ তাহা বিষুব-সংক্রান্তি কি না প্রথমে তাহাই বিচার্য্য।

বিষুব-সংক্রমণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের মত এই,—

"যদা মেষতুলয়োর্ব্বর্ত্ততে তদা অহোরাত্রাণি সমানানি ভবন্তি। যদা বৃষভাদিষু পঞ্চসু চ রাশিষু চরতি তদাহান্যেব বর্দ্ধন্তে। হ্রসতি চ মাসি মাস্যেকৈকা ঘটিকা রাত্রিষু ॥ ৪ ॥
যদা বৃশ্চিকাদিষু পঞ্চসু রাশিষু বর্ত্ততে তদাহোরাত্রাণি বিপর্য্যয়াণি ভবন্তি ॥ ৫ ॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবত—স্কন্ধ ৫। অধ্যায় ২১।

'সূর্য্য মেষ ও তুলা রাশিতে উপস্থিত হইলে দিবারাত্রি-মান সমান হইয়া থাকে। বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা রাশিতে অবস্থান পর্য্যন্ত দিবামান বড়, এবং বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন রাশিতে থাকা পর্য্যন্ত রাত্রিমান বড় থাকে।'

অমরসিংহ বলিতেছেন,—

"সমরাত্রিন্দিবে কালে বিষবন্‌ বিষুবঞ্চ তৎ।"

'যখন দিবারাত্রি সমান হয়, তখনই বিষুব সংক্রমণ হইয়া থাকে।'

আমরা উল্লিখিত প্রাচীন প্রমাণসমূহ হইতে বুঝিতে পারি যে, পূর্ব্বে বিষুব-সংক্রমণের গণনা যেরূপ হইত, এখন আর সেরূপ হয় না। এখন ৩০এ চৈত্র মহাবিষুব-সংক্রমণ পঞ্জিকায় লিখিত হইলেও, দিবারাত্রি সমান হয় ১০ই চৈত্র; জলবিষুব-সংক্রমণ ২০এ আশ্বিন লিখিত থাকিলেও, দিবারাত্রি সমান হয় ১০ই আশ্বিন।

সূর্য্যের গতি অনুসারে বর্ষপ্রবেশ অন্য প্রকারও হয়। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি হইতেও বর্ষগণনার নিয়ম আছে। ইহা সূর্য্যের অয়ন অনুসারে গণিত হইয়া থাকে। অয়ন দুইটি—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। সূর্য্য যখন ধনুরাশি ছাড়িয়া মকরে প্রবেশ করে, তখন তাহার নাম হয় মকর-সংক্রমণ। এই মকর-সংক্রমণ হইতে বড়দিন আরম্ভ হইবার কথা; কিন্তু এখন বড় দিন হইতেছে ১০ই পৌষ, আর মকর-সংক্রমণ হয় পৌষ মাসের শেষ দিনে। মকর-সংক্রমণ

হইতে সূর্য্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। এই দিন হইতে সূর্য্য উত্তর দিকে যাইতে থাকে। কর্কট-সংক্রান্তি হইতে সূর্য্য পুনরায় দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে। এই দক্ষিণায়নকালে দিন ক্রমে ছোট হইতে থাকে। দিবামান হ্রাসের প্রথম দিন ১০ই আষাঢ়। এইটি কর্কট-সংক্রান্তির প্রকৃত দিন হইলেও, এখন পঞ্জিকায় আষাঢ় মাসের শেষ তারিখটিই কর্কট-সংক্রান্তি বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে।

উপরে যে দুটি বর্ষারম্ভের বিষয় বর্ণিত হইল, তাহাই আয়ুর্ব্বেদের বিচার্য্য। আমি আয়ুর্ব্বেদ অবলম্বন করিয়াই আমার প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছি। এইবার ঋতুর কথা বলিব। ঋতু বিভাগ সূর্য্যের গতি অনুসারেই হইয়া থাকে। এস্থলে কেহ যেন না মনে করেন যে, আমি পঞ্জিকায় নূতন প্রকারের একটা বিপ্লব উপস্থিত করিতে চাই। পঞ্জিকা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নির্দ্দেশমত তদুপযোগিভাবেই গঠিত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং তৎপ্রতি আমার কটাক্ষ করিবার উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্রও নাই।

উল্লিখিত নিয়মে বর্ষ-বিভাগ করিলে,—
অয়ন-সংক্রমণ অনুসারে হইতেছে—মাঘাদি বর্ষ;
বিষুব-সংক্রমণ অনুসারে হইতেছে—বৈশাখাদি বর্ষ।
ঋতু-বিভাগে এই দুই প্রকার বর্ষই আলোচিত হইবে।

ঋতু-বিভাগ।

চরকের মতে ঋতু-লক্ষণ হইতেছে—শীত, উষ্ণ ও বর্ষণ। শীত-লক্ষণ ঋতুর নাম—হেমন্ত, উষ্ণ-লক্ষণ ঋতুর নাম—গ্রীষ্ম এবং বর্ষণ-লক্ষণ ঋতুর নাম—বর্ষা। ইহাদের মধ্যে সাধারণ দুইটি লক্ষণযুক্ত আরও তিনটি ঋতু আছে। উষ্ণ ও বর্ষণ লক্ষণযুক্ত ঋতু—প্রাবৃট্,* বর্ষণ ও শীত লক্ষণযুক্ত ঋতু—শরৎ, এবং শীত ও উষ্ণ লক্ষণযুক্ত ঋতু—বসন্ত। (চরক—৮ম বিমান)।

এই ঋতু-বিভাগের ক্রম এইরূপ—
"প্রাবৃট্ শুক্র নভৌ জ্ঞেয়ৌ শরদূর্জ্জঃসহ্বাঃ পুনঃ
তপস্তশ্চ মধুশ্চৈব বসন্তঃ॥"—(সিদ্ধি ৬ অঃ)।

অর্থাৎ আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস প্রাবৃট্ ঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস শরৎ ঋতু, ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্ত ঋতু। অতএব বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম, ভাদ্র ও আশ্বিন বর্ষা এবং পৌষ ও মাঘ হেমন্ত ঋতু।
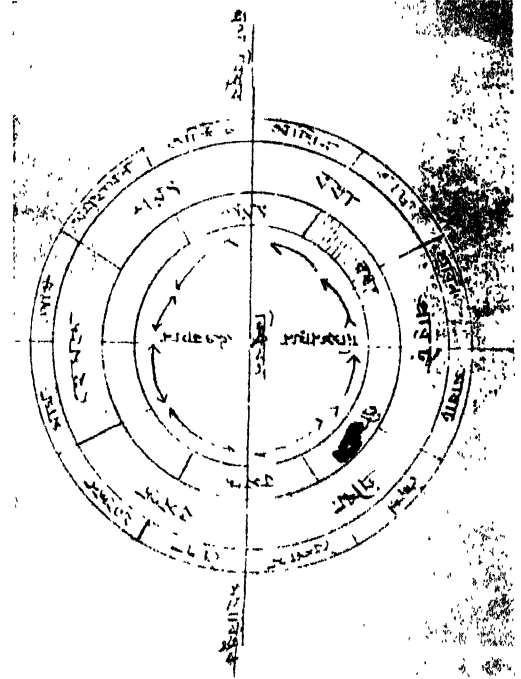
উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে গমনের শেষ দিন। সেই দিনটিকে মধ্য-দিন ধরিলে বুঝা যায়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ও তৎপরবর্ত্তী মাসদ্বয়ে সূর্য্যের প্রতাপ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম থাকে এবং এই সময়েই শীত খুব প্রবল হয়। এইরূপ দক্ষিণায়ন-সংক্রমণ (কর্কট-সংক্রান্তিতে) সূর্য্যের উত্তরদিকে গমনের শেষ দিন। এই সংক্রমণ দিনটিকে মধ্য-দিন ধরিলে বুঝা যায়, তাহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী মাস দুইটিতে সূর্য্যের প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল থাকে; সুতরাং তাহাতে শীতের বিপরীত উষ্ণতার আধিক্য হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই সময়ে সূর্য্য মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত না থাকিলে উষ্ণতা অত্যন্ত প্রবল হয়। তবে এই সময়ে প্রথম বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে এবং মেঘের দ্বারা সূর্য্যের প্রখরতার হ্রাস হয় বলিয়া, এই ঋতু প্রাবৃট্ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এই ঋতুটি সাধারণ, অর্থাৎ ইহাতে গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই দুই ঋতুর লক্ষণই বিদ্যমান থাকে।

* "প্রাবৃট্ প্রথমঃ প্রবৃষ্টেঃ কালঃ।"—(চরক—৮ম বিমান)।

মহাবিষুব-সংক্রমণে (মেষ-সংক্রমণে) দিবা ও রাত্রি সমান হয় এবং সেই দিন হইতে দিবামান বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের প্রতাপ ও তৎসঞ্জাত উষ্ণতার বৃদ্ধি হয়। মেঘোদয় ও বর্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই উষ্ণতার বিরাম হয় না। এইরূপ প্রায় দুই মাস কাল পর্য্যন্ত থাকে। বৎসরের মধ্যে এই দুই মাসে উষ্ণতার আধিক্যই গ্রীষ্মঋতুর বৈশিষ্ট্য।

জলবিষুব-সংক্রমণে দিবারাত্রি সমান হয়। তাহার পর হইতে দিনমান ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে। এই সময় সূর্য্যের প্রতাপ হ্রাস পাইতে থাকে। সূর্য্য এই দিন মধ্যস্থানে আসিয়া পরে দক্ষিণ দিকে হেলিয়া পড়ে। চরক ইহাকে শরৎ-ঋতু বলিয়াছেন। এই ঋতুর প্রচলিত নাম হেমন্ত। চরকে, এই স্থলের হেমন্তের প্রচলিত নাম, শিশির। এই শরৎ-ঋতুটি সাধারণ। ইহাতে বর্ষা ও হেমন্তের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

সূর্য্যের উত্তরায়ণ আরম্ভের পর এক মাস পর্য্যন্ত শীত প্রবল থাকে। তৎপর দুই মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের প্রতাপ মধ্যাবস্থায় থাকে। এই দুই মাসের নাম বসন্ত-ঋতু। বসন্তে হেমন্ত ও গ্রীষ্ম উভয়ের লক্ষণই বিদ্যমান্ থাকে ; এই জন্য ইহা সাধারণ ঋতু।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে দিনমান বড় থাকিলেও, তখন প্রবল বর্ষণ দ্বারা পৃথিবী জলপূর্ণা হয় এবং আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে ; এই জন্য সূর্য্যের প্রতাপ তত থাকে না। এই ঋতুর প্রধান লক্ষণ বর্ষণ ; এই জন্য ইহার নাম বর্ষা। এই ঋতুর প্রচলিত নাম শরৎ।

শারীর দোষত্রয়ের (বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার) প্রকোপ ও প্রশম এবং তাহাদের সাধারণ চিকিৎসা—সংশোধন লক্ষ্য করিয়া চরকের এই ঋতু-বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে।* সুশ্রুতেও ইহার অনুবাদ দৃষ্ট হয়।†

আয়ুর্ব্বেদে অন্য এক প্রকার ঋতু-বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। এই ঋতু-বিভাগ অয়ন অনুসারে স্বীকৃত হইয়াছে। সূর্য্যের দুইটি অয়ন। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি হইতে ছয় মাস উত্তরায়ণ, এবং দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তি হইতে ছয় মাস দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে তিনটি ঋতু,—শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ; এবং দক্ষিণায়নে তিনটি ঋতু,—বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত। মাঘাদিমাসক্রমে এই ঋতু-বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব—

মাঘ ও ফাল্গুন —শিশির	উত্তরায়ণ
চৈত্র ও বৈশাখ—বসন্ত	
জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—গ্রীষ্ম	
শ্রাবণ ও ভাদ্র—বর্ষা	দক্ষিণায়ন
আশ্বিন ও কার্ত্তিক—শরৎ	
অগ্রহায়ণ ও পৌষ—হেমন্ত	

এই ঋতু বিভাগ অমরকোষ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থেরও সম্মত। চরক ও সুশ্রুতে যে ঋতুর লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, তাহা এই ক্রম অনুসারেই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এই বিভাগ অনুসারে দ্রব্যের রস-নিষ্পত্তি, ঋতু-লক্ষণ এবং জীবগণের বলের প্রাকৃতিক উপচয় ও অপচয়ের ক্রম স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন—উত্তরায়ণ আদান-কাল ; এই সময়ে ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় করদ্বারা জগতের স্নেহ আকর্ষণ করেন ; এই জন্য দ্রব্যসমূহ নিঃসার, অল্পবীর্য্য ও জীবগণ উত্তরোত্তর বলহীন হইয়া থাকে। দক্ষিণায়ন বিসর্গ-কাল ; এই সময়ে ভগবান্ সোম বলবান্ থাকেন ; এই জন্য দ্রব্যসমূহ বীর্য্যবান্ হয় এবং জীবগণের বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আদান-কালে তিক্ত, কটু ও কষায় রস বলবৎ থাকে ; বিসর্গ-কালে অম্ল, লবণ ও মধুর রস বলবৎ থাকে।

প্রকৃত পক্ষে এই ঋতু বিভাগই সর্ব্ববাদি-সম্মত এবং যে দেশে বসিয়া এই সমুদায় গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, সেই সকল দেশের অনুযায়ী। বস্তুতঃ দেশভেদে যে ঋতুর বিভিন্নতা হইয়া থাকে, এবিষয়ে প্রাচীন প্রমাণও আছে। মহর্ষি কশ্যপ বলেন,—(চরকের চক্রপাণি টীকা—৮ম বিমান)

"ভূয়ো বর্ষতি পর্জ্জন্যো গঙ্গায়া দক্ষিণে জনে।
তত্র বর্ষাপ্রাবৃড়াখ্যৌ ঋতূ তেষাং প্রকল্পিতৌ।"

'গঙ্গার দক্ষিণ জনপদে মেঘ সর্ব্বদা বারিবর্ষণ করে, এই জন্য সেই স্থানে বর্ষা ও প্রাবৃট্ এই দুইটি মাত্র ঋতু কল্পিত হইয়া থাকে।'

---

* 'এবমেতে সংশোধনমধিকৃত্য ষট্ বিভজ্যন্তে ঋতবঃ।'
—(চরক—৮ম বিমান)

† 'ইহতু বর্ষা শরদ্ধেমন্তবসন্তগ্রীষ্মপ্রাবৃষঃ
ষড়্ ঋতবো ভবন্তি দোষোপচয়প্রশমনিমিত্তং।'
—(সুশ্রুত সূত্র ৬ অঃ)

"তস্যা এবোত্তরে দেশে হিমবদ্ধিমসঙ্কুলে।
ভূয়ঃ শীতমতস্তেষাং বসন্তশিশিরাবৃতূ॥"

'সেই গঙ্গার উত্তরজনপদ সর্ব্বদা হিমালয়ের হিমদ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, সেই স্থলে শীতের প্রাচুর্য্য অধিক। এই জন্য তথাকার লোকে, শিশির ও বসন্ত এই দুইটি মাত্র ঋতুর কল্পনা করিয়া থাকে।'

শব্দকল্পদ্রুমে যে স্মৃতির মত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ আছে ঃ—

"স ত্রিবিধোঽপি কার্ত্তিকাগ্রহায়ণপৌষমাঘাঃ শীতঃ ১ ফাল্গুনচৈত্রবৈশাখজ্যৈষ্ঠাঃ গ্রীষ্মঃ ২ আষাঢ়শ্রাবণ-ভাদ্রাশ্বিনাঃ বর্ষাঃ। দ্বিবিধোঽপি কার্ত্তিকাদিষণ্মাসাঃ শীতঃ ১ বৈশাখাদিষণ্মাসাঃ গ্রীষ্মঃ ২।—ইতি স্মৃতিঃ।"

(শব্দকল্পদ্রুম—'ঋতু' শব্দ)

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের টীকাকার অরুণদত্ত দ্বিবিধ ঋতুর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—"ষট্কং চাতুর্মাসিকমৃতুং কৃত্বা শীতোষ্ণবৃষ্টিলক্ষণান্ হেমন্তগ্রীষ্মবর্ষাখ্যাংস্ত্রীন্ ঋতূনিচ্ছন্তি।"

ঋতু সম্বন্ধে যতই মতদ্বৈধ থাকুক না কেন, আমাদের বঙ্গদেশে কিন্তু ছয়টি ঋতুই উপভোগ করা যায়।—এই ছয়টি ঋতু, বৈশাখাদি ক্রমেই স্ফুট হয়। আমি যতদূর লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে সমবারিন্দিবকাল মহাবিষুব সংক্রমণ হইতে বৈশাখ মাস ধরিয়া লইয়া ঋতুবিভাগ করিলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে এসম্বন্ধে সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীদুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী।

ভক্তি

(তুলসীদাসের দোঁহাবলী হইতে)

ভক্ত কহিল গুরুর চরণে
　　　　'একি হ'ল মম দায়,
যত কিছু আমি করি গো সাধনা—
　　　　সকলি বৃথায় যায়!
আমার হাতের পূজা-উপহার
কেমনে ঢালিব চরণেতে তার?
পরাণ শিহরি উঠে বার বার
　　　　ঢালিতে প্রভুর পায়!'
ভক্ত কহিল গুরুর চরণে—
　　　　'সকলি বৃথায় যায়!'
'যত কিছু আমি করি আয়োজন
　　　　প্রভুর পূজার তরে;
সঁপিতে তাঁহার চরণ-কমলে—
　　　　পরাণ নাহি যে সরে!
কলঙ্কিত স'বি মনে সদা হয়;
সাজির পুষ্প সাজিতেই রয়,
চরণে ঢালিতে মনে হয় ভয়;—
　　　　মরি গো বেদনাভরে!
সঁপিতে তাঁহার চরণ-কমলে—
　　　　পরাণ নাহি যে সরে!'
'বনে যাই যবে ফুল-আহরণে
　　　　প্রভুর পূজার তরে;
দেখি গিয়া আমি ভ্রমরা সেথায়
　　　　সুখে মধু পান করে।
ভুক্ত ফলের বৃথা উপহার,
কেমনে ঢালিব চরণেতে তার;
কাঁদিয়া পরাণ উঠে বার বার
　　　　বিষম বেদনাভরে।—
ভুক্ত ফলের উপহার দিতে—
　　　　পরাণ নাহি যে সরে!'
'গভীর গহনে যাই আমি যবে
　　　　চন্দন-আহরণে,
গিয়া যাহা দেখি—কহিতে সে কথা
　　　　ভয় হয় মম মনে,—
গিয়া দেখি সেথা, অজগর ফণী
বেড়িয়া রয়েছে সেই গাছ খানি,

সেই শাখা হ'তে চন্দন আনি—
পুষ্পরেণুর সনে
তাহার চরণে দিতে উপহার
ভয় হয় মম মনে!'
'বাছিয়া বাছিয়া নূতন দূর্ব্বা
তুলিবারে যবে যাই,
দেখি গিয়া সেথা মাড়ায়ে গিয়াছে—
রাজ্যের যত গাই।
দলিত দূর্ব্বা কেমন করিয়া
পারিব সঁপিতে পরাণ ধরিয়া;
হস্ত আমার আসে যে সরিয়া,
যত বার দিতে যাই।

এ জগত মাঝে সবি কলঙ্কিত,—
পবিত্র কি কিছু নাই?'
হাসিয়া তখন কহিলেন গুরু,
'অতি নিকটেই আছে;
খুঁজিয়া দেখিলে এখনি মিলিবে
তব অন্তরের মাঝে।
হইবে সকল সাধনা তোমার;
পার যদি দিতে সেই উপহার;
পরাণ ধরিয়া চরণেতে তাঁর;
সকল কাজের মাঝে।'
গুরু বলিলেন—'যাহা কহিলাম,—
নিকটেই তব আছে।'

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

দক্ষিণাপথে

আমরা বাঙ্গালী জাতি, পরের খবর বড় রাখি না; ঘরের খবরও সম্পূর্ণ রাখি কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। আমাদের দাম্ভিক বিচারে যাহারা "উড়ে", "মেড়ো", "খোট্টা", তাহারা কিন্তু আমাদের গুণে মুগ্ধ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস; আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষের অতি দূরপ্রান্তেও বাঙ্গালীর যশের গাথা গীত হইতেছে!—এ বিশ্বাস একদিন আমারও ছিল। কিন্তু যেদিন আমার বন্ধু এথিরাজ মুদেলিয়ার তাঁহার একজন আত্মীয়ের সহিত আমাকে পরিচিত করাইয়া চিঙ্গলপট্টে যাইবার সহচর জুটাইয়া দিলেন, সেদিন আমার প্রাচীন বিশ্বাসের গায়ে বিষম ধাক্কা লাগিয়াছিল।

মাদ্রাজের এগ্‌মোর ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর, যখন আমার সহচর নূতনবন্ধু সঙ্গের ফলমূলের টোক্‌নাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐ সকল খাদ্য বঙ্গদেশে পাওয়া যায় কি না, তখন আমি হাস্য-সংবরণ করিয়া আমাদের দেশে উহার অতি-প্রচুরতার কথা জানাইলাম। নববন্ধু পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ সকল ফলমূল কি মাদ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে যায়?" বঙ্গদেশে যে লেবু, কলা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে, সে কথা শুনিয়া নববন্ধু যেন একটু চমকিত হইলেন! ইনি অল্প-শিক্ষিত এবং দূর-পল্লী-প্রবাসী; কাজেই মাদ্রাজ দেশটিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া ভাবা তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। অন্য প্রদেশ সম্বন্ধেও কি আমাদের অল্পবিস্তর ঐরূপ ধারণা নাই? তাহার পর যখন একটি বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, তখন তিনি একখানি গ্রামের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, সেই গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বাস, এবং সেখানে এমন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আছেন যে, তাঁহার মত পণ্ডিত পৃথিবীতে আর নাই। কথাটা আমি নির্ব্বিবাদে হজম করিতে পারিতাম; কিন্তু যখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ বলিয়া জাতি আছে কি না, তখন হাসিব—কি রাগ করিব, বুঝিতে পারিলাম না। আমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ-সন্তান; কিন্তু নিজে এখন ব্রাহ্মণ্যের ধার ধারি না, তাই নিজের দৃষ্টান্ত না দিয়াই বঙ্গে ব্রাহ্মণের অস্তিত্বের কথা জানাইলাম। মনে পড়িল যে, সম্বলপুরের আদালতে কোন অন্ধ্রদেশের অধিবাসীকে এজাহার করাইতে হইলে জাতির স্থানে কেবল 'তেলেঙ্গা' লিখিয়া লওয়া হয়। এক

সময়ে বাঙ্গালী উপস্থিত হইলেও হাকিমেরা জাতির ঘরে কেবল 'বাঙ্গালী' লিখিয়া লইতেন। তেলেঙ্গাদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণশূদ্রাদি থাকিতে পারে, একথা এখনও বড় কেহ ভাবিতে পারেন না। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে প্রস্ফুটতর জ্ঞানের কথা চিঙ্গলপট্টে গিয়া আরও জানিতে পারিলাম।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন গ্রামোফোনের সবেমাত্র নূতন আমদানি হইয়াছে। আমার নববন্ধুর মাতুলের গৃহে যখন গ্রামোফোনে তামিল গানের রক্ষাপত্র (Record) জুড়িয়া কলের গান আরব্ধ হইল, তখন একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—আমাদের দেশে গান বলিয়া জিনিসটা আছে কি না, এবং এই গ্রামোফোন আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যখন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, তখন একজন গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, কলিকাতায় যখন ইংরেজেরা রাজধানী পাতিয়াছে, তখন গ্রামোফোন এবং ইংরেজি গান হয়ত আমাদের নিকট অপরিচিত নয়। কিন্তু তামিল ছাড়া বাঙ্গালা ভাষায় যে গান হইতে পারে, অথবা বাঙ্গালা গানের যে রক্ষাপত্র প্রস্তুত হইয়াছে, একথা তাহাদের স্বপ্নের মধ্যেও ছিল না। আমি তাহাদিগের জন্য নূতন স্বপ্নের সৃষ্টি করিয়া দিলাম, এবং আমার মনের প্রাচীন বিশ্বাসের স্বপ্নও অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বৌদ্ধযুগের অক্ষয়-কীর্ত্তি সপ্তমন্দির দর্শনের জন্য চিঙ্গলপট্টে গিয়াছিলাম। এই অতীত গৌরবের সাক্ষী চিঙ্গলপট্ট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সমুদ্রকূলে মহাবলীপুরম্ নামক স্থানে অবস্থিত। খাস চিঙ্গলপট্টে শৈলমালার প্রাকৃতিক শোভা বড় রমণীয়; এবং শৈল-নিঃসৃত জলধারা সুরক্ষিত হইয়া যে সরোবরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও দর্শনীয়। সরোবরটি দৈর্ঘ্যে ২ মাইল এবং বিস্তারে ১ মাইল; এবং উহার সুস্বাদু নীলজল স্বচ্ছবক্ষে সর্ব্বদাই গিরিশ্রেণীর প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে। ঝট্‌কা নামক গোরুর গাড়ীতে চড়িয়া মহাবলীপুরে যাইতে হইলে প্রায় ৭ঘণ্টা অঙ্গসঞ্চালনের কষ্ট অনুভব করিতে হয় বলিয়া, প্রাচীন দুর্গদর্শনের পর, মাদ্রাস হইতে নৌকাযাত্রার ব্যবস্থা করা গেল।

চিত্রে মহাবলীপুরের সমুদ্রকূলবর্ত্তী মন্দিরের যে প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল, উহা হইতে হয়ত কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইবে না। যেখানে উচ্চ পাহাড়গুলি কাটিয়া কাটিয়া মন্দিররূপে পরিণত করা যাইতে পারে, সেইখানেই পাহাড়ের
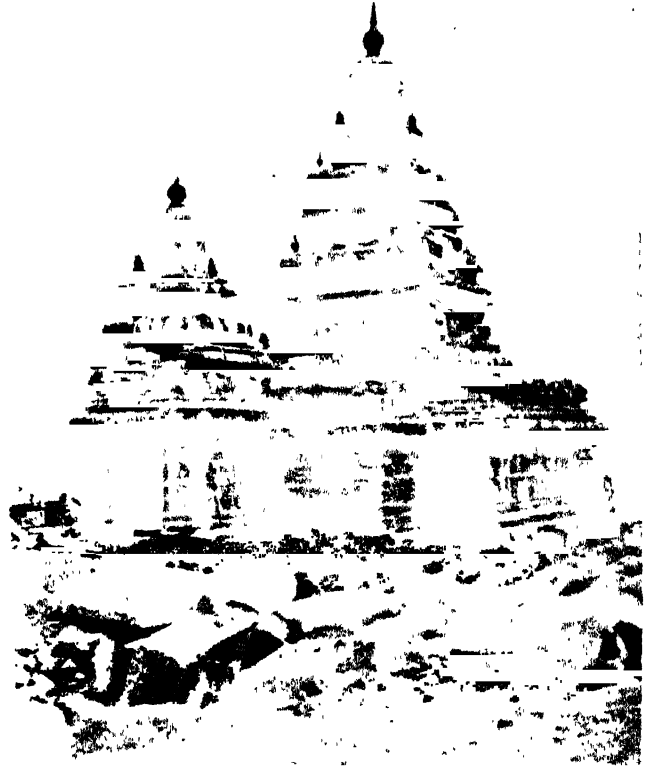
মহাবলীপুরম।

উপর মন্দিরের সৃষ্টি হইয়াছে। মন্দিরের অনুরূপ করিয়া বহির্ভাগ কাটিয়া লইবার পর পাথর খোদাই করিয়া অভ্যন্তরের কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমুদ্রকূল হইতে দেখিলে এই মন্দিরগুলির সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য যেরূপে অনুভূত হয়, তাহা বর্ণনার সামগ্রী নহে। যে কবিত্ব-বোধে এই স্থান-নির্ণয় এবং মন্দিরের রচনা হইয়াছিল, প্রাচীন শিল্পবিদ্যার লোপের সহিত সে অনুভূতিও চলিয়া গিয়াছে। দেশের লোকে মনে করে যে, এক সময়ে বিশ্বকর্ম্মার দ্বারাই এই অসাধ্য কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যাহারা মন্দিরদর্শন করিতে আসিয়াছে, তাহারা যেমন

করিয়া মন্দিরের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতেছে, তেমন করিয়া নীলসিন্ধুর শোভার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না! মত্বরার সরোবরের মধ্যস্থিত টেপ্‌পোকোলম্-মন্দির স্বচ্ছজলে ছায়া বিস্তার করিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিয়াছে বটে; কিন্তু

টেপপোকোলম্-মন্দির।

সৌন্দর্য্য-অনুধ্যানের পরিবর্ত্তে, অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত দেবতার প্রতি ভীতিজড়িত ভক্তি হৃদয়ে স্থানলাভ করিয়াছে! সেই দ্বীপস্থ দেবকুল (টেপ্‌পোকোলমের এই অর্থ) মহাবলীপুরের সপ্তায়তনের সহিত কিছুতেই তুলিত হইতে পারে না। দেশের সাধারণ লোকের চক্ষে কিন্তু মত্বরার দৃশ্যই অধিকতর মনোহর।

মত্বরার দৃশ্য।
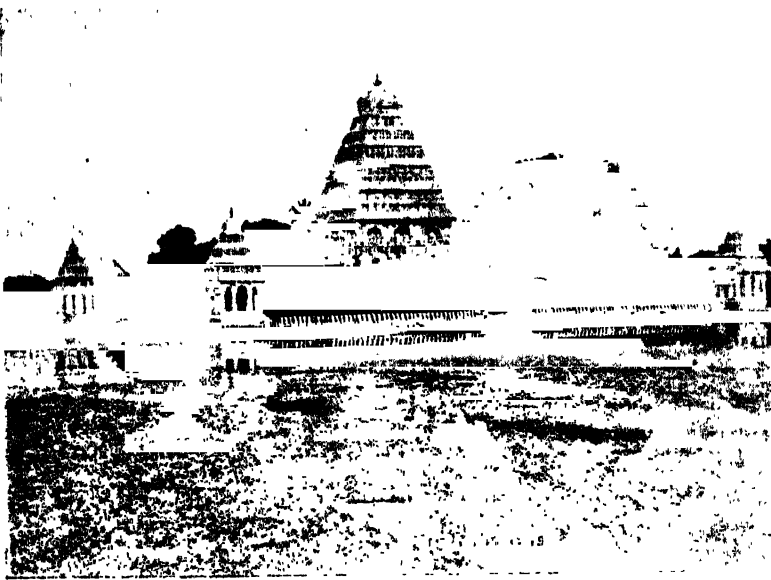
মত্বরায় পাণ্ড্যরাজাদিগের অনেক গৌরবস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ এবং মীনাক্ষি মন্দিরের পরিচয় দিয়াছি,—এবার টেপ্‌পো-কোলমের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। মত্বরা সহর হইতে দূরে, ঐ জেলার মধ্যেই, তিরুপারান কুন্দ্রম্ নামক স্থানেও রাজাদিগের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি রহিয়াছে। এই নগরীতে স্কন্দ-মলই বা স্কন্দ-পর্ব্বতে এক সময়ে দুর্গ, মন্দির, জলাশয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। পাহাড়ের উপরে শিব-মন্দিরের অনতিদূরে যে কৃত্রিম হ্রদ রচিত হইয়াছিল, এখনও তাহা পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হইতেছে। এই পর্ব্বত-পৃষ্ঠের কৃত্রিম জলাশয়ের মধ্যে যে তেপ্‌পোকোলম্‌ সৌন্দর্য্যে বড় মনোহর, পাঠকেরা তাহা চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন। একসময়ে মুসলমানেরা আসিয়া এই পর্ব্বতের সানুদেশে মস্‌জিদ স্থাপন করিয়াছিল। সে মস্‌জিদ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু সেখানে মুসলমান-প্রভাব কিছুমাত্র নাই।

প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তি মাদ্রাজ-বিভাগের মধ্যভাগে এবং পূর্ব্বকূলে যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিল, পশ্চিমকূলে তেমন পারে নাই। কি কারণে পারে নাই, সে ইতিহাস বলিতে গেলে পাঠকেরা ধৈর্য্য হারাইবেন। পশ্চিমকূলে ব্রাহ্মণ্য যথেষ্ট বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল বটে; কিন্তু এক দিকে সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন অধিবাসিগণ নিজেদের ধর্ম্ম এবং আচার-ব্যবহার অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে, এবং অন্যদিকে অতি প্রাচীনকাল হইতেই আরব প্রভৃতি দেশের লোকেরা বাণিজ্য করিতে আসিয়া বিদেশীয় প্রথা-পদ্ধতি বজায় রাখিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিয়া আসিয়াছে। মলবরের শ্লথ বিবাহ বন্ধন, তারোয়াদ সম্পত্তির বিশিষ্টতা, ব্রাহ্মণ-নায়ার-সংস্রবের নূতনত্ব, পরিধেয়-বস্ত্রে রমণী-শরীরের অসমগ্র আবরণ-বিধান তামিল-ব্রাহ্মণাদির নিকট উপহাসের জিনিস।

সমগ্র ভারতবর্ষেই আর্য্যদ্রবিড়-মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে, এ কথা হয়ত উত্তর-ভারতের সকল জাতীয় লোকেরাই অস্বীকার করিবেন, এবং দক্ষিণ-প্রদেশেও তেলেগু তামিল ব্রাহ্মণেরা বলিবেন যে, তাঁহারা কেবল "বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ"; কিন্তু কোন দ্রবিড়-সংস্রবে দুষ্ট নহেন। যাঁহারা যাহা মনে করিয়া সুখী হ'ন, তাঁহারা তাহাই মনে করুন; কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর দ্রবিড়-জাতিরা দেহ-সৌষ্ঠবে এবং মানসিক প্রভাবে হীন নহেন, এ কথা বলিতে পারি। হাইকোর্টের জজ শঙ্করন্‌ নায়ার প্রভৃতির বিদ্যাবুদ্ধির কথা আমরা সকলেই জানি। প্রদর্শিত নায়ার-কুমারীদ্বয়ের চিত্রে কেহ সৌষ্ঠবের অভাব দেখিতে পাইবেন, মনে হয় না;

নায়ার-কুমারী।

এবং নারী-সুলভ মাধুর্য্য এবং শ্লীলতাও দৃষ্টি-ভঙ্গি হইতে উপলব্ধ হইবে। তবে ইঁহারা আর্য্য-প্রথার অননুরূপ
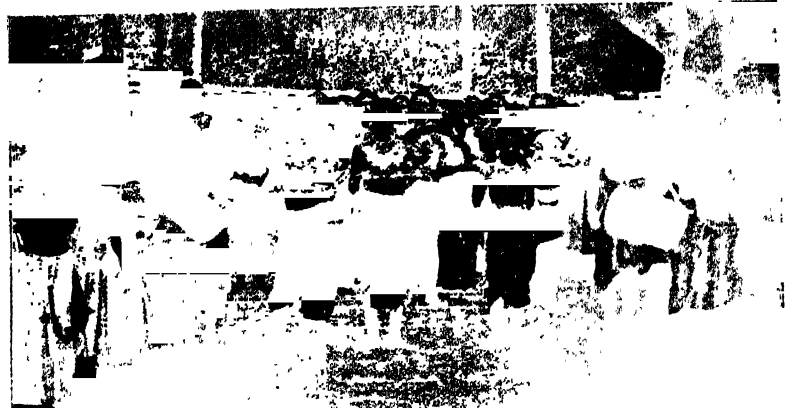
মন্দির-প্রদক্ষিণ।

অসমগ্রবসনা বটেন। যেথানে মন্দির-প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে গীতবাদ্যের উৎসব করিয়া দেব-নৈবেদ্য লইয়া রমণীগণ ভক্তিভরে অগ্রসর হইতেছেন, সে চিত্রেও যখন

নায়ার-গৃহের চিত্র।

বসনাধিক্য দৃষ্ট হইবে না, তখন পাঠকেরা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, যাহা আমরা ব্রীড়াজনক বলিয়া মনে করি, তাহা যেথানে সেইরূপ ভাবে বিচারিত হয় না, সেথানে শ্রীলতার কোন অভাব ঘটে না।

নায়ারেরা এবং নম্বুথিরি ব্রাহ্মণেরা যে পরিচ্ছন্নতার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে বলিয়াছি। য়ুরোপীয়েরা যখন প্রথমে আসিয়া দক্ষিণ ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহারা নায়ারদিগের ঘর-দুয়ারের সৌন্দর্য্য এবং পরিচ্ছন্নতার কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। নায়ারগৃহের চিত্র এবং নম্বুথিরি ব্রাহ্মণের ইল্-লম্ বা গৃহের ছবি দেখিলেই এ কথার যাথার্থ্য সম্পূর্ণ অনুমিত হইতে পারিবে।

মাদ্রাজ প্রদেশের প্রাচীন দেবমন্দিরগুলি যে ভারতবর্ষে স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যে অতুলা, এ কথা এ প্রবন্ধেও বলিয়াছি এবং সর্ব্বত্রই ইহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মলবর-প্রদেশে মদুরা, ত্রিচিনাপল্লী প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের অনুরূপ কিছু স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু এই মলবরে যে শ্রেণীর মন্দির দেখা যায়, তাহার উৎপত্তির ইতিহাস আবিষ্কার করিবার জন্য প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বিবিধ চেষ্টা করিয়াছেন। পাঠকেরা পেরুমানম্-মন্দিরের যে চিত্র দেখিতে পাইবেন, উহা যে নেপালের প্রাচীন সময়ের মন্দিরের অনুরূপ, তাহা হয় ত অনেকে জানেন না। পূর্ব্বপ্রকাশিত "কাবেরী-তীরে" নামক প্রবন্ধে গৌড় ব্রাহ্মণদিগের কথায় বলিয়াছিলাম যে, ঐ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আদিম গৌড় অর্থাৎ অযোধ্যার গোণ্ডা প্রদেশ হইতে দক্ষিণাপথে গিয়াছিলেন, এ বিষয়ে প্রবাদ এবং প্রমাণ দুইই পাওয়া যায়। এই প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া অনেকে অনুমান করেন যে, যে মন্দির-নির্ম্মাণ-প্রথা ভারতের উত্তরসীমায় এবং দক্ষিণতম সীমায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার উৎপত্তি একই জাতির প্রাদেশিক বিশিষ্টতা হইতে হইয়াছে।

নম্বুথিরি ব্রাহ্মণের ইল্-লম্ বা গৃহের ছবি
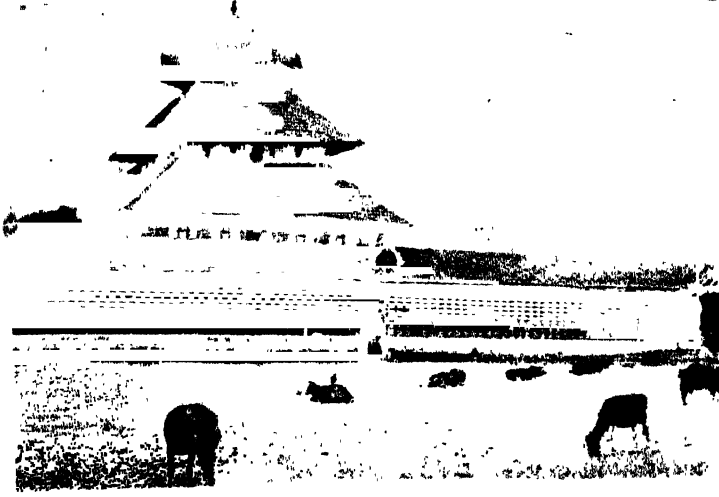
পেরুমানম্‌-মন্দির।

আমি এ পর্যন্ত পাঠকদিগকে মাদ্রাজ প্রদেশের বাহ্য পরিচয়ই দিয়াছি; আভ্যন্তরিক অবস্থার কথা বলিতে পারি নাই। বাহ্য বিষয়ের কোন চিত্র না দিয়া কেবল অন্তরের চিত্র প্রতিফলিত করিয়া এক দিন সে কথা পাঠকদিগকে বলিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বিদেশে

(১)

চোক ফেটে মোর জল যে আসে,
হৃদয় ছুটে সুদূর পানে;
আধ-ভোলা ওই মেঠো-গানে।
বিদেশীর এই গীতের ছাঁদে
উদাসীনের প্রাণ যে কাঁদে,
শুষ্ক কুঞ্জে ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
ঝরা ফুলের গন্ধ আনে।
আধ-ভোলা ওই মেঠো-গানে।

(২)

আমারি সেই সোণার গাঁয়ে
'শ্রীমন' সে আজ নাইক বেঁচে,
গাইত এ গান 'আইল' পথে
শুনে হৃদয় উঠত নেচে'।
কচি ধানের শ্যামল খে'তে
লহররাজি উঠত মেতে,
ডুবত রবি আকাশ গাঙে
সিঁদূর-রাঙা শোভার বানে
আধ-ভোলা ওই মেঠো-গানে।

(৩)

আশায় ভরা বুক যে তখন
পরীর মহল নিখিল ধরা,
পলক সবে নিত্য ন'বে
শিশু-হিয়ার কনক-ঘড়া।
কতই স্মৃতি, কতই কথা,
কতই হাসি, কতই ব্যথা,
জাগছে আজি এ সুর সাথে
সে সব কেবল মনই জানে।
আধ-ভোলা ওই মেঠো-গানে।

(৪)

কাছ-ছাড়া সব সুহৃদ জনে
বুকের মাঝে ডাকছে কে রে।
সুখগুলা সব দুঃখ হয়ে
দেখছি এ সুর সাথেই ফেরে।
যে সব ব্যথা যাচ্ছে ঘুচে,
যে সব ছবি ফেলছি মুছে,
সে সব যে আজ উঠছে ফুটে
স্মৃতির দারুণ তুলির টানে।
আধ-ভোলা ওই মেঠো-গানে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

গুলিস্তানের গল্প

(মূলানুবাদ)

১

এক রাজা কোন বন্দীর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন। সেই কথা শুনিয়া বন্দী জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া রাজাকে নিজ ভাষায় গালি দিতে লাগিল। যাহার বাঁচিবার আশা থাকে না সে, মুখে যাহা আসে, তাহাই বলে;

'জীবনের আশা যদি একেবারে যায়,
মানব তখন বলে যা আসে জিহ্বায়।
বড় কুকুরের সহ দ্বন্দ্ব যদি হয়,
বিড়ালো তাহার ঘাড়ে পড়ে সে সময়।
রণ হতে পলায়ন করা নাহি যায়,
বাঁচিবার নাহি থাকে যখন উপায়।
তখন অসির অগ্রভাগ নিজ করে
বিচার-বিমূঢ় লোক অকাতরে ধরে।'

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কি বলিতেছে?" একজন শান্তস্বভাব মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! এ বলিতেছে যে, যাহারা ক্রোধ সংবরণ করিতে পারে ও অপরাধীকে মার্জ্জনা করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে ভালবাসেন।" এই কথা শুনিয়া রাজার দয়া হইল এবং তিনি বন্দীর রক্তপাত করিতে বিরত হইলেন। আর একজন মন্ত্রী, যাহার স্বভাব কিছু ক্রূর, তিনি বলিলেন—"আমাদের উচিত রাজার সম্মুখে সত্য ভিন্ন আর কিছু না বলা; এ ব্যক্তি রাজাকে গালি দিয়াছে ও অশ্রাব্য কথা ব্যবহার করিয়াছে।" রাজা শুনিয়া ভ্রূকুটি করিলেন ও বলিলেন, 'আমার নিকট প্রথম মন্ত্রী যদি মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন, তাহা আপনার সত্য কথা অপেক্ষা অনেক ভাল; প্রথম মন্ত্রীর উদ্দেশ্য মহৎ, আপনার উদ্দেশ্য নীচ।" পণ্ডিতদিগের মতে যে সত্য কথা হইতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে, তদপেক্ষা যে মিথ্যা কথার শুভ উদ্দেশ্য সে মিথ্যা কথাও ভাল (১);

'রাজা যদি কার্য্য করে মন্ত্রণার মত,
সে স্থলে কুমন্ত্র দান অতি অসঙ্গত।'

ফারিদুনের প্রাসাদ-তোরণে এই কথা লেখা ছিল:—

'চিরদিন তরে ভ্রাতঃ! এ সংসার নয়,
সে কারণ মন যেন, ভগবানে রয়।
সংসারের ধন-মানে ক'র না বিশ্বাস,
তব সম কত নৃপ হয়েছে বিনাশ।
পবিত্র জীবন যবে করিবে প্রয়াণ,
ভূমিশয্যা, সিংহাসন—উভয় সমান।'

২

খোরাসান দেশের এক রাজা এক দিন সুবাক্তজিনের পুত্র সুলতান্ মামুদকে স্বপ্নে দেখিলেন। সুলতানের মৃত্যু হইয়াছিল একশত বৎসর পূর্ব্বে; সুতরাং তাঁহার শরীরের সমস্ত অংশ ধূলায় পরিণত হইয়াছিল। কেবল চক্ষু দুটি অবিকৃত থাকিয়া কোটরাভ্যন্তরে ঘুরিতেছিল এবং চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিল। বিজ্ঞ লোকেরা কেহই এই স্বপ্নের অর্থ স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে এক দরবেশ বলিলেন—'নিজ রাজ্য পরহস্তগত বলিয়া সুলতানের চক্ষু এখনও চারিদিকে দেখিতেছে;

'কত শত মহাবীর আগে জনমিল,
তাহাদের যশে দিক্ দিগন্ত পূরিল;
কিন্তু আজি তাহাদের কোন চিহ্ন নাই,
ধূলায় বিশাল ভবে বিলীন সবাই।
সুবিচার নুষিরান করিত বলিয়া,
কেহ যায় নাই তাঁর নামটি ভুলিয়া।
যত দিন দেহে রবে অমূল্য জীবন,
করিবে পরের হিত যতনে সাধন;
তবে ত মরণ কালে কাঁদিবে সকলে;
বলিবে, এমন লোক নাহি ধরাতলে।'

৩

এক রাজার কতিপয় পুত্র ছিল। তন্মধ্যে সকলেই দীর্ঘকায় ও রূপবান্; কেবল একজন খর্ব্বাকৃতি ও কুৎসিত। রাজা তাঁহার কুরূপ রাজপুত্রকে একদা ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত দেখিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ রাজপুত্র রাজার ভাব

---

(১) 'যথার্থকথনং যচ্চ, সর্ব্বলোকসুখপ্রদম্।
তৎ সত্যমিতি বিজ্ঞেয়মসত্যং তদ্ বিপর্য্যয়ম্॥'—(পদ্মপুরাণ)

বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—'পিতঃ! বুদ্ধিমান্ লোক খর্ব্বাকৃতি হইলেও দীর্ঘাকার মূর্খ অপেক্ষা ভাল; আয়তনে কম হইলেও দ্রব্যের মূল্য অধিক হইতে পারে। ক্ষুদ্রকায় মেষ পবিত্র—কিন্তু পর্ব্বতায়তন হস্তী অপবিত্র;

'পর্ব্বতের মধ্যে ক্ষুদ্রতম যে সিনাই,
সম্মানে তাহার সম অন্য গিরি নাই।
আরব-ঘোটক কৃশ কিন্তু মূল্যবান্,
এক পাল গাধা নহে তাহার সমান।'

এই কথা শুনিয়া রাজা হাসিতে লাগিলেন; সভাসদেরাও সেই কথার অনুমোদন করিল। কেবল রাজপুত্রের ভ্রাতারা বিরক্ত হইলেন;

'যাবৎ প্রকাশ্যে কেহ কথা নাহি কয়,
তাবৎ তাহার গুণ অবিদিত রয়।
প্রতি শর-বনে ব্যাঘ্র বাস নাহি করে,
এমন ভাবনা কভু ক'র না অন্তরে;
হ'লেও হইতে পারে আছে হেন বন,
যথা অলক্ষিতে ব্যাঘ্র করিছে শয়ন।'

এই সময়ে রাজার সহিত এক পরাক্রান্ত শত্রুর বিগ্রহ উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষের সৈন্য সমরে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে যখন পরস্পরাভিমুখীন হইল, রাজপুত্র সবেগে অশ্ব-চালনা করিয়া বলিলেন—

'করিব না কভু রণ ছাড়ি পলায়ন
রক্তস্রোতেই মাথা দিব করিয়াছি পণ।
সমরে যুঝিলে নিজ প্রাণের সংশয়,
পলাইলে সর্ব্বসৈন্য-বিনাশের ভয়।'

এই বলিয়া রাজপুত্র শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিলেন এবং বড় বড় যোদ্ধাদিগকে পরাজিত করিলেন; পরে পিতার নিকট আসিয়া ভূমিচুম্বন পূর্ব্বক পিতাকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন—

'কৃশ, খর্ব্ব তনু মম হইলে কি হয়?
অতি স্থূল দেহে কোন গুণ নাহি রয়।
কৃশ অশ্ব হ'তে রণে কত উপকার,
হৃষ্ট পুষ্ট ষণ্ড রণে কে করে ব্যাভার।'

শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের সংখ্যা রাজ-সৈন্য অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। রাজ-সৈন্যের একদল পলায়নোন্মুখ হওয়াতে রাজপুত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"সৈনিকগণ! রণোন্মত্ত হও! স্ত্রীজনোচিত ব্যবহার করিও না।" এই কথায় অশ্বারোহিগণ উত্তেজিত হইয়া সমকালে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিল ও সে দিনকার রণে জয়লাভ করিল। রাজা আনন্দে রাজপুত্রের চক্ষু ও শির চুম্বন করিলেন ও প্রেম ভরে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সেই দিন হইতে পুত্রের প্রতি অনুরাগ বাড়িতে লাগিল ও শেষে সেই পুত্রই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে এই স্থির করিলেন। রাজপুত্রের ভ্রাতৃগণ হিংসাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার আহারের সহিত বিষ মিশ্রিত করিলেন। উপরের গৃহ হইতে এক ভগিনী এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া গৃহদ্বারে এমন আঘাত করিলেন যে, রাজপুত্র সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া বিষমিশ্রিত খাদ্য স্পর্শ না করিয়া মনে করিলেন—'গুণবান্ লোক মরিবে ও নিগুর্ণ তাহার পদ অধিকার করিবে—ইহা অসম্ভব;

'সবংশে বিনষ্ট হয়া হলেও ধরায়,
তবু পেচকের ছায়া কেহ না মাড়ায়।'

বিমাত্রেব কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে, তিনি রাজপুত্রদিগকে ডাকাইয়া যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন। শেষে তাহাদিগের প্রত্যেককে রাজ্যের প্রান্তস্থিত এক একটি প্রদেশ দান করিলেন। এইরূপে সকল বিবাদ বিসংবাদ প্রশমিত হইল। লোকে বলে দশ জন দরবেশ একখানি কম্বলে শয়ন করিতে পারে, কিন্তু দুই জন রাজা এক বিশাল রাজ্যেও বাস করিতে পারে না;

'ঈশ্বরে যে মন প্রাণ করেছে অর্পণ,
ভিক্ষুকে অৰ্দ্ধেক অন্ন দেয় সেই জন।
সপ্ত রাজ্য থাকিলেও রাজা আরো চায়,
স্বপনেও আশা তার কভু না মিটায়।'

৪

একদল আরবীয় দস্যু কোন পর্ব্বতের শিখরে আশ্রয় লইয়া তথা হইতে বণিক্‌দিগের যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়াছিল। নিকটবর্ত্তী প্রদেশের লোকসমূহ তাহাদের চৌর্য্য-কৌশল দেখিয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। সুলতানের সৈন্যগণ তাহাদিগকে কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না। কারণ তাহারা পর্ব্বতের নিভৃত দুর্গম শিখরে বাস করিত। দস্যুগণ আর কিছু কাল এইরূপে স্বীয় চৌর্য্যবৃত্তির অনুসরণ করিলে পরে তাহাদিগকে কিছুতেই দমন করা যাইবে না,

এই ভাবিয়া অশান্তি দূরীকরণাভিপ্রায়ে তৎপ্রদেশ-সমূহের শাসনকর্ত্তারা মিলিত হইয়া কি উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত করিবে, সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিল ;

'অল্প দিন তরুমূল বসিলে ভূমিতে,
একজনে পারে তারে উপাড়ি ফেলিতে।
কিন্তু যদি কিছু কাল বাড়িতে সে পায়,
কলে, বলে, আর তারে উঠান না যায়।
ছোট বাধে ক্ষীণ স্রোত থামাইতে পারে,
বন্যা হলে গজপৃষ্ঠে পার হতে নারে।'

অবশেষে তাহারা একজনকে চর নিযুক্ত করিয়া দস্যুগণের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে আদেশ করিল ও তাহারা নিজে অবসরের প্রতীক্ষায় রহিল। একদিন সংবাদ পাইল, দস্যুগণ তাহাদের আবাস ত্যাগ করিয়া এক স্থলে লুণ্ঠন করিতে গিয়াছে। এই অবসরে প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা একদল যুদ্ধকুশল ও বহুদর্শী সৈন্য পর্ব্বতের কোন সঙ্কীর্ণ পথে লুক্কায়িত থাকিতে আদেশ করিল। রাত্রিতে দস্যুগণ নিজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র ও লুণ্ঠিত দ্রব্য রাখিয়া অনতিবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইল।

রজনী এক প্রহর অতীত হইলে সেই সাহসী সৈন্যদল নিভৃত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া নিদ্রিত দস্যুগণকে আক্রমণ করিল ও প্রত্যেকের হস্ত পশ্চাদ্দিকে বন্ধন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে রাজসভায় উপস্থিত হইল। রাজা সকলের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। দস্যুদলের মধ্যে যে সর্ব্বকনিষ্ঠ তাহাকে যুবক বলিলেও বলা যায়, বালক বলিলেও বলা যায়। সে কেবলমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিল। তাহার মুখমণ্ডল বসন্তের প্রারম্ভে অর্দ্ধস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সুন্দর। একজন মন্ত্রী রাজসিংহাসনের পাদদেশ চুম্বন পূর্ব্বক অবনত-মস্তকে রাজাকে বলিলেন, "এই বালক জীবনের ভাল মন্দ এখনও কিছুই জানে না, যৌবনের কোন সুখই ভোগ করে নাই, মহারাজ, যদি দয়া করিয়া ইহার জীবনদান করেন, তাহা হইলে এ দাস চিরবাধিত হইবে।" রাজা ইহা শুনিয়া ভ্রূকুটি করিলেন ; কারণ এই প্রস্তাব তাঁহার বিবেচনায় ভাল বলিয়া বোধ হয় নাই ;

'নীচকুলে জনমিলে নীচতা না যায়,
ভদ্রসঙ্গে থাকিলেও ভদ্রতা না পায়।
যে জন ইতর তারে বৃথা শিক্ষাদান,
গম্বুজ উপরে ফেলা কন্দুক সমান।'

এই পাপিষ্ঠ দস্যুদের সমূলে উচ্ছেদ করাই শ্রেয়স্কর, অগ্নি নির্বাপিত করিয়া তাহার কণামাত্র রাখা ও সর্প বিনাশ করিয়া তাহার শাবকের পরিপোষণ করা—বুদ্ধিমানের কার্য্য নয় ;

'আকাশ ভাঙ্গিয়া বারি হলেও পতন,
কণ্টক হইতে ফল না হয় কখন।
শিখাতে নিকৃষ্ট জনে দিও না সময়,
বেতস হইতে কভু শর্করা না হয়।'

মন্ত্রী এই কথা শুনিয়া রাজার বুদ্ধির বহু প্রশংসা করিলেন ও বলিলেনঃ—'মহারাজ, আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা সত্য, তাহার উত্তরে আর কিছু বলিবার নাই। তবে এক কথা এই যে, এ বালক যদি অসৎসঙ্গে বহু দিন থাকিত, তাহা হইলে ইহার চরিত্র কলুষিত হইত। কিন্তু এ এখনও শিশু, দস্যুদিগের স্বভাব কিছুই পায় নাই। কোরাণে বলে—বালক সাধু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, পরে পিতা মাতার শিক্ষানুসারে সে ইহুদি কিংবা খৃষ্টান, অথবা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে ;

'নোয়ার সন্তান দেখ কুসঙ্গে মিশিয়া,
ভবিষ্যদ্‌বাণী বলা যাইল ভুলিয়া।
কুকুর সাধুর সঙ্গে শিখে' সদাচার,
শেষে ভাগ্যবলে পেলে নরের আকার।'

এই কথায় অন্যান্য মন্ত্রিগণ যোগ দিলেন ও তাঁহারা সকলেই রাজার নিকট সেই বালকের জীবন-ভিক্ষা করিলেন। রাজা বালকের প্রাণদণ্ড করিতে বিরত হইলেন, কিন্তু বলিলেন—'আমি মার্জ্জনা করিলাম বটে, কিন্তু এ কাজ ভাল বলিয়া আমার বোধ হয় না ;

'রুস্তমকে বলেছিলে জাল এক দিন,
ভাবিও না শত্রু তব সহায়-বিহীন।
ক্ষীণ স্রোত দিন দিন বাড়িয়া বাড়িয়া,
লয়ে যায় ভারসহ উষ্ট্রকে টানিয়া।'

মন্ত্রী সেই বালককে পরম যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন ও তাহার শিক্ষার জন্য বিচক্ষণ পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। সাধারণ লোকের সহিত ও রাজসভায় কিরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে হয় ও রাজার অধীনে থাকিলে কিরূপ

ব্যবহার করিতে হয়, এ সকল বিষয়ে শিক্ষক মহাশয় তাহাকে উপদেশ দিলেন। ক্রমে যুবক সকলের প্রিয় হইল। এক দিন মন্ত্রী কথাপ্রসঙ্গে রাজার নিকট যুবকের কোন কোন গুণের পরিচয় দিয়া বলিলেন—"সৎশিক্ষার গুণ কিয়ৎ-পরিমাণে যুবকে দৃষ্ট হইতেছে। তাহার অন্তর হইতে মূঢ়তা দূরীভূত ও তাহার স্বভাব বিজ্ঞলোকের মত হইয়া উঠিতেছে।" রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন ;—

'নরশিশু সঙ্গে তুমি হয়েছ পালিত,
নরমাতৃদুগ্ধে তনু হয়েছে বর্দ্ধিত।
তুমি যে ব্যাঘ্রের শিশু জানিলে কেমনে ?
একথা শুনিলে তুমি কাহার সদনে ?
অথবা বিচিত্র কিছু নাহিক ইহায়,
যার যে স্বভাব কভু তাহা নাহি যায়।
কোনো ফল নাহি হয় শত শিক্ষাদানে,
যে মন্দ সে মন্দ থাকে কিছুই না মানে (১)।
মনুষ্যের সহ বাস করিলে কি হয়,
ব্যাঘ্রশিশু শেষে ব্যাঘ্র হইবে নিশ্চয়।'

দুই এক বৎসর গত হইলে এক দল যথেচ্ছাচারী দস্যু সেই যুবকের সহিত মিলিত হইয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত করিল। ক্রমে অবসর বুঝিয়া তাহারা সেই মন্ত্রী ও তাঁহার দুই পুত্রকে হত্যা করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। অবশেষে দস্যুগণ যুবককে তাহার পিতার স্থানে দলপতি করিয়া সেই পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে লাগিল, যুবকও রাজ-বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। এই সংবাদ শুনিয়া রাজা আশ্চর্যান্বিত হইয়া নিজ ওষ্ঠ দংশন করিলেন ও বলিলেন ;—

'তীক্ষ্ণ অস্ত্র নাহি হয় নিকৃষ্ট লোহায়,
নীচ নাহি হয় উচ্চ সহস্র শিক্ষায়।
সমভাবে সর্ব্বস্থলে পড়ে বৃষ্টি জল,
কোথাও আগাছা জন্মে, কোথাও কমল।
লোনা দেশে জনমে না কুসুম্ভ কখন,
বৃথা বীজ করিও না তথায় বপন।

দুর্জ্জনে করিলে হিত হয় বিপরীত,
সেই হিত হ'তে হয় সজ্জন বঞ্চিত।'

৫

তাতার-দেশীয় বিখ্যাত সমর বিজয়ী জান্‌গিস খাঁর পুত্রের প্রাসাদদ্বারে আমি একদা এক সৈন্যাধ্যক্ষের পুত্রকে দেখিয়াছিলাম। তাহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রাখর্য্য, অসামান্য ও বর্ণনাতীত। বাল্যকাল হইতেই তাহার ললাটে মহত্ত্বের ও হৃদয়ে প্রতিভার চিহ্ন দেদীপ্যমান ছিল ;

'উজ্জ্বল তারকা সম শিরে তার জ্বলে,
ভাবি অভ্যুদয় চিহ্ন বিদ্যা বুদ্ধি বলে।'

সেই যুবা ক্রমে সুলতানের সুনয়নে পড়িল, কারণ তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক উৎকর্ষ উভয়ই ছিল। পণ্ডিতেরা বলেন,—"বিদ্যাবুদ্ধিতেই ধন, স্বর্ণরৌপ্যে নয় ; জ্ঞানেই মহত্ত্ব, বয়সে নয়।"

জ্ঞানেতে প্রবীণ যদি বালকেতে হয়,
বুদ্ধিমান্ বড় বলি তাহাকেই কয়।

যুবকের সঙ্গিগণ তাহার পদোন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইল ও তাহার বিরুদ্ধে রাজবিদ্রোহের অভিযোগ করিল এবং বৃথা তাহার প্রাণদণ্ডের বহু চেষ্টা করিল ;

'সহস্র শত্রুতে তার কি করিতে পারে ?
সর্ব্বক্ষণ মিত্রজনে রক্ষা করে যারে।'

রাজা এক দিন যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষের কারণ কি ?" যুবক বলিল—'আমি মহারাজের ছায়ার আশ্রয়ে আছি, মহারাজ চিরকাল সুখে রাজ্য করুন। হিংসকগণ ব্যতিরেকে আমার প্রতি সকলে তুষ্ট। তাহারা যত দিন না আমার পতন হয়, ততদিন কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না। আমার ভয় নাই, মহারাজের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হউক !

'আমি ত দিব না ব্যথা কাহার অন্তরে,
তুষিব কেমনে কিন্তু বল ঈর্ষাপরে ?
সে যে নিজে মনঃকষ্ট আনে আপনার,
মরণই একমাত্র ঔষধ তাহার !
সকল যন্ত্রণা যদি এড়াইতে চাও,
পরশ্রীকাতর ! তবে যমালয়ে যাও।
ভাগ্যহীন মনে মনে করে অভিলাষ,
সমৃদ্ধিশালীর যেন, হয় সর্ব্বনাশ।

(১) স্বভাবো যাদৃশোযস্য ন স ত্যজ্যতি কর্হিচিৎ।
অঙ্গারঃ শতধৌতোঽপি মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥

দিবসে পেচক যদি দেখিবারে নারে,
তাহাতে কেহ কি দোষী করে দিবাকরে ?
সহস্র সহস্র অন্ধ—তাও সহা যায়,
ঘনাবৃত দিবাকর কেহ নাহি চায়।'

৬

পারস্যদেশের এক রাজা এত অত্যাচারী ও উৎপীড়ক হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বহুসংখ্যক প্রজা যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। প্রজার সংখ্যা হ্রাস ও রাজস্বের ক্ষতি হওয়ায়, কোষাগার শূন্য হইল এবং চারিদিক্ হইতে শত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিতে লাগিল ;

'বিপদ্ সময়ে চায় যে জন সহায়,
সম্পদে সে যেন দয়া ভুলে নাহি যায়।
চির অনুগত দাসে করিও যতন,
নহিলে তোমাকে সেও করিবে বর্জ্জন।
সকলের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ,
অজ্ঞাতও হবে তব অনুগত দাস।'

* * *

রাজভবনে এক দিন শাহনামা হইতে জোহাক্ নরপতির অবনতি ও ফারিদুন রাজার কথা পাঠ হইতে ছিল। এক জন মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফারিদুনের ধন ছিল না, সৈন্যসামন্তও ছিল না, কেমন করিয়া তিনি রাজ্যলাভ করিলেন ?" রাজা বলিলেন—"আপনি ত শুনিয়াছেন যে অনেক লোক তাঁহার পক্ষে ছিল, তাহাদেরই সাহায্যে তিনি রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন।" মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজ! যদি প্রজাপুঞ্জে বেষ্টিত হইলে রাজ্যলাভ হয়, তাহা হইলে আপনার প্রজাদিগকে আপনি দূর করিয়া দিতেছেন কেন ? আপনি বোধ হয় রাজ্য করিতে ইচ্ছা করেন না ;

'সৈন্যগণ প্রাণসম করিবে পালন,
সৈন্য লয়ে নৃপ! রাজ্য করুন শাসন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সৈন্যগণ ও প্রজাগণ রাজার যে এত অনুগত হয়, তাহার কারণ কি ?" মন্ত্রী বলিলেন—'রাজা সুবিচার করিলে প্রজাগণ অনুগত হয়, রাজা দয়ালু হইলে ছায়ার ন্যায় অনুগামী হইয়া প্রজারা তাঁহার রাজ্যে সুখে বাস করে ; আপনার এই দুই গুণের কোনটিই নাই' ;

'অত্যাচারী রাজা, দেশ না পারে শাসিতে,
ব্যাঘ্র নাহি পারে মেষ কখন পালিতে।
প্রজাপীড়নের বীজ যে করে বপন,
তাহার রাজ্যের হয় সমূলে পতন।'

মন্ত্রীর এই সদুপদেশ রাজার ভাল লাগিল না, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে কারাগারে বদ্ধ করিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই রাজার পিতৃব্য-পুত্রগণ তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গ-হস্ত হইয়া তাঁহাদের পিতার রাজ্যের অংশ দাওয়া করিলেন। যে সকল প্রজা রাজার অত্যাচারে দেশ ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাহারা আসিয়া রাজপুত্রদিগের সহিত মিলিত হইল ও তাঁহাদের সাহায্যে উহারা রাজ্যলাভ করিলেন ;

'বল বীর্য্য দর্পে প্রজা যে করে পীড়ন,
দুর্দিনে তাহার শত্রু হয় আপ্তজন।
শত্রু হতে কোন ভয় রাখিতে না চাও,
তবে নিজ প্রজাগণে সুখ শান্তি দাও।
ধর্ম্মভাবে প্রজাগণে করিলে পালন,
তাহারা রাজার হয় রক্ষার সাধন।'

৭

কোন রাজা পারস্যদেশীয় এক জন ক্রীতদাসকে লইয়া একদা অর্ণবযানে গমন করিতেছিলেন। সে ব্যক্তি কখন সমুদ্র দেখে নাই, সুতরাং সে ভয়ে ক্রন্দন করিতে ও কাঁপিতে লাগিল। সকলে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সে আশ্বস্ত হইল না। ইহাতে রাজার আহ্লাদের বিঘ্ন ঘটিল। রাজা কি করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। সেই জাহাজে এক জন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি রাজাকে বলিলেন,—"মহারাজ! আপনি অনুমতি করিলে আমি এই লোকটিকে চুপ করাইতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে।" ইহা শুনিয়া পণ্ডিত সেই লোকটিকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া বারংবার নিমজ্জন করিতে আদেশ করিলেন। কিছুকাল এইরূপ করিয়া তাহারা তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক জল হইতে উত্তোলন করিয়া অর্ণবপোতের নিকটে আনিল। ক্রীতদাস দুই হস্তে হাল ধরিয়া কোন মতে জীবনরক্ষা করিয়া জাহাজের উপর উঠিয়া এক পার্শ্বে স্থির হইয়া বসিল। তদ্দৃষ্টে রাজা সন্তুষ্ট

হইয়া পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহার কারণ কি ?" পণ্ডিত বলিলেন—'এই লোক জলে মগ্ন হইলে কত কষ্ট, তাহা জানিত না, ও জাহাজের উপর নিরাপদে থাকা যে কত সুখের, তাহা জানিত না। যে বিপদে পড়িয়াছে, সে সম্পদের মূল্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারে ;

'রসনার তৃপ্তি যার হয়েছে সাধনা,
সে কি আর করে কভু শক্তুর কামনা ?
যে নারী কুরূপা অতি তোমার নয়নে,
তাহাকেই ভাল বাসি আমি প্রাণপণে।
অপ্সরীর কাছে মর্ত্ত নরক সমান,
নরকনিবাসী মর্ত্তে করে স্বর্গ জ্ঞান।
প্রেয়সী আসিবে ব'লে, পথ পানে চেয়ে চেয়ে
দিবস রজনী যার গত,—
আর যে আনন্দ-ভরে, প্রেয়সীকে বক্ষে ধরে,—
দুজনের মধ্যে ভেদ কত ?'

৮

নুষিরুয়ানের পুত্র হুরমুজকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আপনার পিতার মন্ত্রিবর্গকে, আপনি কি দোষ দেখিয়া, কারাবদ্ধ করিয়াছেন ?" তিনি বলিলেন—'কোন দোষ দেখি নাই। কিন্তু অন্তরে তাহারা আমাকে অতিশয় ভয় করে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম ; এবং আমার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং আমি মনে করিলাম যে,—পাছে তাহাদের কোন বিপদ্ ঘটে এই আশঙ্কায় তাহারা আমার মৃত্যুর ষড়্যন্ত্র করিতে পারে। সেই হেতু, বিজ্ঞদিগের নীতি অনুসারে আমি এই কার্য্য করিয়াছি ;

'যে জন তোমাকে ভয় করে মহাশয় !
তাহাকেও তুমি ভয় করিও নিশ্চয়।
যদিও তাহার মত শত্রু এক শত,
একাকী করিতে পার যুদ্ধে পদানত,—
হইলে বিড়াল ক্রুদ্ধ কিছু নাহি ডরে,
শার্দ্দূলের চক্ষু সেও উপাড়িতে পারে।
কৃষকের পদে সর্প করে যে দংশন,
এক মাত্র ভয় হয় তাহার কারণ,—
মনে মনে ভাবে কবে কৃষকের হাতে,
মস্তক তাহার চূর্ণ হবে লোষ্ট্রাঘাতে।'

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।

আমি

দোঁহা

১

অতীতে ছিলাম আমি স্নেহ কল্পতরু,
বর্ত্তমানে শুষ্কপ্রাণ শাহারার মরু।

২

অতীতে ছিলাম আমি বসন্ত-প্রকৃতি,
বর্ত্তমানে পত্রহীন হেমন্ত-আকৃতি।

৩

অতীতে ছিলাম আমি মধুর স্বপন,
বর্ত্তমানে অনিদ্রার কণ্টক-শয়ন।

৪

অতীতে ছিলাম আমি শারদ রজনী,
বর্ত্তমানে নিদাঘের তপ্ত বায়ুধ্বনি।

৫

অতীতে ছিলাম আমি বরিষার ধার,
বর্ত্তমানে চাতকের তৃষ্ণা হাহাকার।

৬

অতীতে ছিলাম আমি ধরণীর কেন্দ্র,
বর্ত্তমানে পথহারা—যেন উপগ্রহ।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল

হরিচরিত-প্রণেতা চতুর্ভুজ ১৪১৫ শকে বা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য শেষ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

"গ্রামোত্তমোঽস্তামলমঞ্জু গুণৈকপুঞ্জঃ
শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমোবরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপদপ্রবীণাঃ
সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণাঃ স্ম বসন্তিবিপ্রাঃ॥
কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ
শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽবতীর্ণঃ।
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং
জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্ম্মপালাৎ॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, "পুরাকালে বরেন্দ্রী মণ্ডলে, করঞ্জনামে সুপরিচিত গ্রামে, শ্রুতিস্মৃতিপুরাণকাব্যনিপুণ বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। স্বর্ণরেখ সেই গ্রামখানি "ধর্ম্মপাল"-নামক নৃপতির নিকট হইতে "শাসন" রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" সুতরাং স্বর্ণরেখ ধর্ম্মপাল দেবের সমসাময়িক ছিলেন। এই ধর্ম্মপাল কে?

স্বর্ণরেখ বারেন্দ্র শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের উর্দ্ধতন পুরুষ। ধর্ম্মপালের নিকট করঞ্জ গ্রাম পাইয়া ইনি করঞ্জ-গ্রামী হইয়াছিলেন। হরিচরিত-প্রণেতা কবি চতুর্ভুজ এই স্বর্ণরেখের অধস্তন পুরুষ। চতুর্ভুজ প্রদত্ত বংশাবলী এইরূপ—

স্বর্ণরেখ
|
(তদন্বয়ে)
ভৃন্দু
|
দিবাকর আচার্য্য
|
নিত্যানন্দ কবীন্দ্র
|
শিবদাস
|
নারায়ণ | মাধব | ভানু শর্ম্মা | চতুর্ভুজ
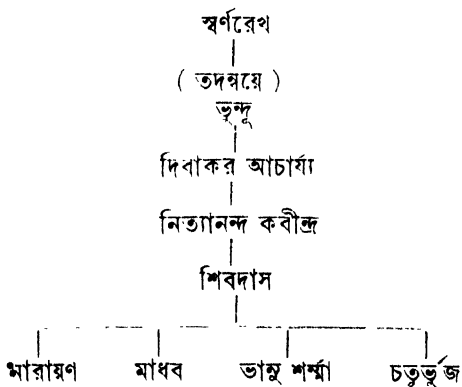
সুতরাং চতুর্ভুজ করঞ্জগ্রামী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তিনি স্বর্ণরেখ-বংশোদ্ভূত তাঁহার উর্দ্ধতন চারি পুরুষের মাত্র নাম দিয়াছেন। স্বর্ণরেখ তাঁহার নিকট জনশ্রুতি মাত্র!

বল্লাল সেন ১১১৯ হইতে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার (১৪৯৩ – ১১৬৯ =)৩২৪ বৎসর পরে চতুর্ভুজ বর্ত্তমান ছিলেন। প্রতি চারি পুরুষে এক শত বৎসর গণনা করিলেও ৩২৪ বৎসরে ১৩ পুরুষ হইবে, অর্থাৎ বল্লালের সময় চতুর্ভুজের উর্দ্ধতন ত্রয়োদশ বা দ্বাদশ পুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। কুলশাস্ত্র প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হউক আর নাই হউক, কুলশাস্ত্র কেহ ফেলিয়া দিন আর যাহাই করুন, এই কুলশাস্ত্র ব্যতীত আর কোথাও স্বর্ণরেখ হইতে অধস্তন পুরুষের নাম পাইবার উপায় নাই। কুলশাস্ত্র-লিখিত বংশাবলী এইরূপ—
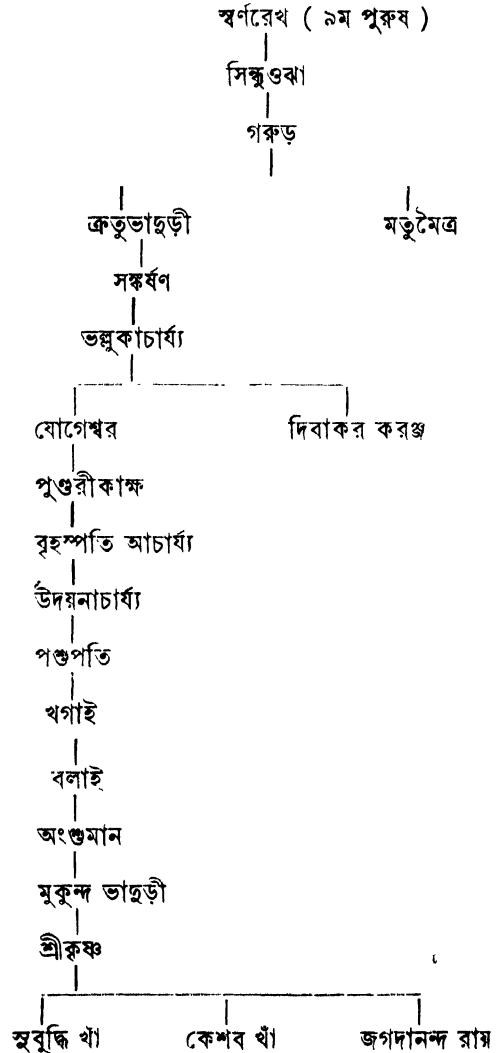
চৈতন্যদেব, ১৪০৭ শক বা, ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে, হরিচরিত রচনা সময়ে, তাঁহার বয়স ৮ বৎসর মাত্র। চৈতন্যদেবের সময় অদ্বৈতাচার্য্য প্রৌঢ় ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ-প্রপিতামহের নাম নরসিংহ লাড়ুলী। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী, নরসিংহ লাড়ুলী, মধু মৈত্র, ধেয়াই বাগ্‌ছি, মঙ্গল ওঝা, ময়ূর ভট্ট, কুল্লুক ভট্ট, ইঁহারা সকলেই সমসাময়িক।

অদ্বৈতাচার্য্য হইতে নরসিংহ লাড়ুলী ৪ পুরুষ উর্দ্ধে। ৪ পুরুষে ১০০ বৎসর ধরিলে, ১৪৮৫—১০০ = ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিলেন, পাওয়া যাইতেছে।

১৩৮৫—১১৬৯ = ২১৬ বৎসর হয়; সুতরাং উদয়নাচার্য্যের প্রায় ২১৬ বৎসর পূর্ব্বে বল্লাল সেন ছিলেন। এখানেও ৪ পুরুষে ১০০ বৎসর ধরিলে, ২১৬ বৎসরে ৯ পুরুষ হয়। তবেই স্বর্ণরেখ, উদয়নাচার্য্য হইতে ৯ পুরুষ উর্দ্ধে হইতেছেন। কিন্তু আমরা কুলশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বল্লাল সেনের কৌলিন্য-প্রথা প্রবর্ত্তনের সময় ক্রতু ভাদুড়ী ও মতু মৈত্রেয় কৌলিন্য পাইয়াছিলেন। ক্রতু হইতে স্বর্ণরেখ ৩ পুরুষ উর্দ্ধে, সুতরাং স্বর্ণরেখ, বল্লালের সমসাময়িক হইতে পারেন না।

কুলশাস্ত্র ব্যতীত বল্লালের কৌলিন্য-প্রথা-প্রবর্ত্তনের আর কোন প্রমাণ নাই। বল্লাল সেনের তাম্র-শাসন, লক্ষ্মণ সেনের ৩ খানি তাম্র-শাসন, তৎপুত্র কেশব সেন প্রভৃতির তাম্র-শাসন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন খানিতেই কৌলিন্য-প্রথা-প্রচলনের উল্লেখ নাই। সেই জন্য বল্লাল সেন কৌলিন্য-প্রথা প্রচলন করিয়াছেন, একথা এখনকার বৈজ্ঞানিক ইতিহাস-লেখকেরা বিশ্বাস করিতে চান না। কিন্তু উদয়নাচার্য্য প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রদিগকে কৌলিন্য মর্য্যাদা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং কৌলিন্য-প্রথা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন শ্রোত্রিয়গণ কুলীন-কন্যা বিবাহ করিতে পারিত। উদয়নাচার্য্য এই প্রথা রহিত করিয়াছিলেন। কুলীনগণই পরস্পর আদান-প্রদান করিবেন, এই ব্যবস্থা তাঁহারই কৃত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্বে কৌলিন্য-প্রথা ছিল। হরিচরিত মতে স্বর্ণরেখ করঞ্জ গ্রাম পাইয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি, করঞ্জগ্রামিগণ শ্রোত্রিয়, এবং ভাদুড়ী ও মৈত্র গ্রামী কুলীন। অতএব স্বর্ণরেখের সময় কৌলিন্য-প্রথা ছিল না। তাঁহার পরে যখন করঞ্জ-ভাদুড়ী ও মৈত্র-গ্রামী হইয়াছে, তাহার পর কৌলিন্য-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

একজন ক্ষমতাশালী রাজা ব্যতীত কুলমর্য্যাদা স্থাপিত হইতে পারে না। আমরা কুলশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, লক্ষ্মণ সেনের সময় কুলীনগণমধ্যে শ্রেষ্ঠতা লইয়া গোলযোগ আরম্ভ হইয়া আদান-প্রদান বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া ছিল। আমাদের বোধ হয়, লক্ষ্মণ সেন এ গোলযোগের সুমীমাংসা করিতে না পারিয়া, সমীকরণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন —অর্থাৎ, সকলকেই সমান বলিয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে ইতিহাস মূক—এখনও এমন কোন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার দ্বারা ইহা প্রমাণীকৃত হইবে। সুতরাং, কুলশাস্ত্রের প্রমাণ স্বীকার করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। কিন্তু কুল-শাস্ত্র হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, লক্ষ্মণ সেনের সময় কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। কৌলিন্য-প্রথা যে রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আছে, কুলশাস্ত্র ব্যতীত ইহা আর কোথাও লিখিত নাই। বিশেষতঃ ভোজ বর্ম্মার নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে "কুর্ব্বন্ শ্রোত্রিয়মাচ্ছ্রিয়ং"—অর্থাৎ, "শ্রোত্রিয়গণকে ধনরত্ন প্রদান করিয়া"—লিখিত থাকায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, তখনও "শ্রোত্রিয়" অর্থে বেদপাঠী ব্রাহ্মণ বুঝাইত। কৌলিন্য ও শ্রোত্রিয় মর্য্যাদা স্থাপিত হইলে শ্রোত্রিয় শব্দের যে অর্থ হইয়াছিল, তখনও তাহা বুঝায় নাই। সুতরাং, তখনও (একাদশ খৃষ্ট শতাব্দীর মধ্যভাগেও) কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত হয় নাই। বল্লাল সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, অর্থাৎ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে, রাজা হইয়াছিলেন। জাত বর্ম্মা, বল্লাল সেনের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী মাত্র! জাত বর্ম্মা ও স্বর্ণরেখ সমসাময়িক। ভোজ বর্ম্মার তাম্রশাসন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং, এই সময় পর্য্যন্তও কৌলিন্য-প্রথা প্রচলিত হয় নাই,—শ্রোত্রিয় শব্দে বেদপাঠী অর্থই ছিল। বল্লাল সেন ১১২৯ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর জয় করিয়াছিলেন; তৎপরে—অর্থাৎ, ১১২৯ হইতে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে—কোন সময় কৌলিন্য-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যতদিন ইহার বিপরীত প্রমাণ সংগৃহীত না

হইবে, ততদিন যে বল্লাল সেনই কৌলিন্য-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, একথা মানিয়া লইতে হইবে।

কুলশাস্ত্রমতে ভল্লকাচার্য্যের পুত্র দিবাকর করঞ্জ গ্রাম পাইয়াছিলেন, কিন্তু হরিচরিতমতে স্বর্ণরেখ করঞ্জ গ্রাম পাইয়াছিলেন। তবে, হরিচরিত প্রামাণ্যগ্রন্থ বলিয়া, আমরা সেই মতই গ্রহণ করিলাম। আর ভল্লকাচার্য্য যখন ক্রভু-ভাভড়ীব পৌত্র, তখন তিনিত কুলীনই; তাঁহার পুত্র দিবাকর শ্রোত্রিয় হইতে পারে না। হরিচরিত না পাইলে মনে করিতাম,—দিবাকর বিবাহ দ্বারা শ্রোত্রিয় হইয়া করঞ্জ গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, সেই হইতে করঞ্জ-গ্রামীর সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে হরিচরিতের প্রমাণে নিঃসংশয়ে জানা গেল,—স্বর্ণরেখ করঞ্জ গ্রামী ছিলেন, দিবাকর করঞ্জ তাঁহার বংশের করঞ্জ-গ্রামীর বংশজাত অধস্তন পুরুষ মাত্র। কুলজ্ঞ-গণ হয় ত 'ভূন্দু' ও 'ভল্লকে' গোলোযোগ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ক্রভুর পিতা গরুড়, তৎপিতা সিন্ধু, তৎপিতা স্বর্ণরেখ; সুতরাং স্বর্ণরেখ ক্রভুর ঊর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ। এখানেও ৪পুরুষে ১০০ বৎসর ধরিলে (১১৬৯—১০০)১০৬৯ খৃষ্টাব্দ স্বর্ণরেখের সময় পাওয়া যায়। এই সময় ধর্ম্মপাল স্বর্ণরেখকে করঞ্জ গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা যাউক, এই ধর্ম্মপাল কে?

গৌড়ের পাল-বংশের দ্বিতীয় রাজার নাম "ধর্ম্মপাল"। প্রথমেই মনে হয়, এই ধর্ম্মপালই বুঝি স্বর্ণরেখকে করঞ্জ গ্রাম দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ তিনি ৭৮৫ হইতে ৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন, আর স্বর্ণরেখ ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব অন্য এক ধর্ম্মপাল,—যিনি ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে, বা একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনিই—যে স্বর্ণরেখকে করঞ্জ গ্রাম দিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি, গৌহাটি নগরের অনতিদূরে ধর্ম্মপাল দেবের এক তাম্র-শাসন পাওয়া গিয়াছে।—এই তাম্র-শাসন-খানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।—ইনি কামরূপপতি ছিলেন। ঐ তাম্র-শাসন খানিতে "শ্রী বারাহ পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্ধর্ম্ম পাল দেব" লিখিত আছে। পাল-বংশীয় ধর্ম্মপালের খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্র-শাসনে লিখিত আছে,—"পরমেশ্বরঃ পরম ভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মপালদেবঃ।" তিনি "শ্রী বারাহ" শব্দ ব্যবহার করেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে,—এই দুই ধর্ম্মপাল যে একব্যক্তি নহে, তাহা স্থির।

আলোচ্য ধর্ম্মপালের পিতার নাম হর্ষপাল, এবং পিতামহের নাম গোপাল দেব। রাজা ব্রহ্মপালের বংশে ইঁহার জন্ম।

বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যায় (VOL. LXVI) ডাক্তার হর্ণলি (Dr. Hoernle) সাহেব ইন্দ্রপালের গৌহাটি-তাম্র-শাসন আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ১০৫০ খৃষ্টাব্দে উক্ত তাম্রশাসন খোদিত হইয়াছে। এই তাম্র-শাসন অনুসারে ইন্দ্রপালের পিতার নাম পুরন্দর পাল, তৎপিতা রত্নপাল, তৎপিতা ব্রহ্মপাল। এই ব্রহ্ম-পালের বংশেই ধর্ম্মপালের জন্ম হইয়াছে। অতএব এই দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল ১০৬৯ খৃষ্টাব্দে বা তৎসন্নিহিত সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং তিনিই স্বর্ণরেখকে করঞ্জগ্রাম দিয়াছেন। তবে ধর্ম্মপাল, ইন্দ্রপালের পর তৃতীয় পুরুষ হইলে, অন্ততঃ ৭৫ বৎসর পরবর্ত্তী হওয়া উচিত। কিন্তু ১০৬৯—১০৫০—১৯ বৎসর মাত্র পরবর্ত্তী হইতেছে। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমরা স্বর্ণরেখের সময় নির্ণয়ের যেরূপ অবলম্বন পাইয়াছি, হর্ণলি সাহেব, ইন্দ্রপালের সময় নির্ণয় করিবার জন্য সেরূপ কোন অবলম্বন পান নাই,—কেবল অক্ষর-বিচার করিয়া সময়-নির্ণয় করিয়াছেন। অক্ষর-বিচারে (৭৫—১৯=)৫৬ বৎসর অগ্র-পশ্চাৎ হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং (১০৬৯—৭৫=) ৯৯৪ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রপাল বর্ত্তমান ছিলেন বলিলে অন্যায় হয় না। অতএব এই দ্বিতীয় ধর্ম্ম-পালই স্বর্ণরেখকে করঞ্জগ্রাম দিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, পাবনা জেলার ইচ্ছামতী নদীর তীরে বেড়ার নিকট করঞ্জগ্রাম!—কামরূপপতি এখানে আসিলেন কিরূপে?

রঙ্গপুরের অন্তর্গত ডিম্‌লার কিঞ্চিৎ নিম্নে তিস্তানদীর যে প্রকাণ্ড বাঁক দৃষ্ট হয়, তাহার প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কামরূপের রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্রের সহিত সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনা ও পদুনার বিবাহ হইয়াছিল। জামাতার সাহায্য জন্য হরিশ্চন্দ্র

তিস্তানদীতীরে ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিস্থান অদ্যাপি ঐ স্থানে দেখা যায়; তাহাতেই বোধ হয়, এই যুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরে ধর্ম্মপাল (২য়) বগুড়ার মধ্য দিয়া সাভার পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন; বোধ হয়, এই সময়েই স্বর্ণরেখকে করঞ্জগ্রাম দান করিয়াছিলেন। শূর-বংশীয় অনুশূর এই সময় দক্ষিণ-বরেন্দ্রের রাজা ছিলেন। ১০৭২ খৃষ্টাব্দে অনুশূরের মৃত্যুর পর, বিজয় সেন দক্ষিণ বরেন্দ্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাই বিজয় সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে লিখিত আছে—

"গৌড়েন্দ্র মদ্রবদপাকৃত কামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥"

ধর্ম্মপাল বগুড়ার মধ্য দিয়া আসিবার সময় পাল রাজ্যের কিয়দংশও অধিকার করিয়াছিলেন, জাত বর্ম্মা তাঁহাকে পরাভব করিয়া ('পরিভবং স্তাং কামরূপশ্রিয়ং') ঐ অংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন।* ইন্দ্রপাল দেবের তাম্র-শাসন, কামরূপপতি ধর্ম্মপালের নূতন প্রাপ্ত তাম্র-শাসন, ভোজ বর্ম্মার তাম্র-শাসন এবং বিজয় সেনের প্রস্তরলিপি ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের জনশ্রুতি অবলম্বনে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

পত্রাবলী

(ফরাসী হইতে ভাষান্তরিত)

[লিও লেসপেস, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুন ফ্রান্সের অন্তর্গত বোনচেনে জন্মগ্রহণ করেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই দিবসেই ওয়াটার্লুর যুদ্ধ হয়। লেসপেস অনেক দিবস যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়া, পরে Petit Journal নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। লেসপেসের গল্পের জন্যই এই পত্রিকা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।]

(১)

প্রিয়তম! তুমি আমাকে পত্র লিখিতে বলিয়াছ! কিন্তু, তুমি কি জান না আমি অন্ধ! তুমি কি বোঝ না যে, আমার হস্ত অন্ধকারে কম্পিত হয়! তোমার কি মনে জাগে না যে, আমার দুর্ব্বল লেখনী কত কাতর কথা জানাইতে চায়! অন্ধের মনে যে কত নিষ্প্রভ চিন্তা উদিত হয়, তাহা ত তোমরা বুঝিতে পার না!

প্রিয়তম আনেস্! তুমি কত সুখী; কারণ, তুমি দেখিতে সক্ষম! আঃ,—সে কি সুখ! কি হর্ষ! কি আহ্লাদ! নীল নভোমণ্ডল, প্রখর সূর্য্য, এ সকল দেখায় কি আনন্দ! সত্য, আমিও এককালে এ সকলই দেখিতে পারিতাম, ভোগ করিতাম; কিন্তু, আমি যখন অন্ধ হই, তখন আমি মাত্র দশ বৎসরের। আর, এখন আমার বয়স পঁচিশ। অমাবস্যার অন্ধকারের ন্যায় আজ পঞ্চদশ বৎসর আমি এই নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিতেছি।—বৃথা আমি স্বভাবের সৌন্দর্য্যের কথা মানসপটে অঙ্কনের চেষ্টা করি! আমি স্বভাবের অনুপম সৌন্দর্য্য—তাহার অতুলনীয় বর্ণচাতুর্য্যের কথা—মনেও আনিতে পারি না। আমি গোলাপের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারি; স্পর্শ করিয়া ইহার আকারও অনুমান করিতে পারি; কিন্তু, ইহার বর্ণ—যাহার সহিত সকল সুন্দরী স্ত্রীর বর্ণের তুলনা করা হয়—আমি দেখিতে পাই না, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না—তাহা আমার মনে নাই। অনেক সময় এই ভীম অন্ধকারের মধ্যে, বিদ্যুতের ন্যায়, ক্ষণস্থায়ী আলোকরশ্মি আমার চক্ষের মধ্যে প্রবাহিত হয়। চিকিৎসকেরা বলেন, হয়ত কোন সময় আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিতে পারে!—বৃথা আশা! বৃথা কল্পনা!—পনর বৎসর যাহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছে, এতদিন পরে পুনর্ব্বার তাহা ফিরাইয়া পাওয়ার আশা করাও অন্যায়।

---

* ভোজ বর্ম্মার তাম্র-শাসন, ৮ম শ্লোক।

সেদিন একটু নূতন ধরণের ঘটনা ঘটিয়াছিল। অন্ধকারে আমার কক্ষমধ্যে হাতড়াইতে হাতড়াইতে একটি জিনিসে আমার হাত পড়ে। সেটি কি বুঝিতে পারিতেছ কি? একখানি দর্পণ! দর্পণের সম্মুখে আমি আমার কেশ বিন্যস্ত করিয়াছিলাম। দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইবার জন্য আমি কি না দিতাম! আমি সুন্দরী কি না—আমার ত্বক্ যেরূপ কোমল, সেইরূপ শ্বেত কি না—আমার চক্ষু 'পটল-চেরা' কি না—এই সকল জানিবার জন্য, দেখিবার জন্য, আমি কত উৎসুকই হইয়াছিলাম!

তুমি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছ, এবং যাহা এই মাত্র আমাকে পড়াইয়া শোনান হইয়াছে, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে ব্যাঙ্ক্ ফেল হওয়াতে আমার মাতাপিতার সর্ব্বনাশ হইয়াছে কি না?—আমি ত এ সম্বন্ধে কিছুই শুনি নাই!—না-না! তাঁহারা ধনীই আছেন।—আমার যে অভাব হয়, তাহাই তাঁহারা পূরণ করেন।—যেখানে আমি হাত দিই, সেইখানেই যে ভেল্‌ভেট্ ও সিল্ক্ রহিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারি। আহারের সময় প্রচুর ও মূল্যবান্ আহার্য্য পাই এবং যে সকল দ্রব্যে আমি সুখী হই, সেই সকল দ্রব্যই আমাকে সরবরাহ করা হয়।—না-না!—আমার পূজনীয় মাতাপিতার কোন অভাবই নাই।

(২)

প্রিয়তম বাল্যসখি! আমি এ পত্রে তোমাকে যাহা লিখিতেছি, তাহাতে তুমি নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। হয়ত তুমি মনে করিবে যে, আমি পাগল হইয়াছি!—তুমি স্থির করিবে যে, দৃষ্টিশক্তি লোপের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার বুদ্ধিও হারাইয়াছি!—আমাকে একজন ভাল-বাসিয়াছেন!

সত্য কথাই লিখিতেছি। এই অন্ধের একজন প্রেমিক জুটিয়াছে। শুনিয়াছি ভালবাসার যে দেবী আছেন, তিনি অন্ধা। তাই এই অন্ধারও একজন ভালবাসার পাত্র জুটিয়াছে!

কেমন করিয়া তিনি আমাদের মধ্যে আসিলেন, তাহা আমি জানি না।—তিনি যে এখানে কি করিবেন, তাহাও আমি জানি না।—এই মাত্র বলিতে পারি যে, আহারের সময় তিনি আমার বাম দিকে বসিয়াছিলেন এবং আমাকে বিশেষ যত্ন করিতেছিলেন।

"ইতঃপূর্ব্বে আপনার সহিত সাক্ষাতের সম্মানলাভ আমার ঘটে নাই।"

তিনি উত্তর করিলেন, "সত্য; কিন্তু আমি আপনার মাতাপিতার সহিত পরিচিত এবং আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান করি।"

"আপনি যখন তাঁহাদিগকে—আমার পরমপূজনীয় মাতা-পিতাকে—সম্মান করেন, তখন আমি আপনাকে স্বাগত অভ্যর্থনা করিতেছি!"

"কেবল তাঁহারাই যে একমাত্র আমার শ্রদ্ধা ও ভাল বাসার পাত্র—তাহা নহে।"

"তবে,—আপনি আর কাহাকে ভালবাসেন?"

"আপনাকে।"

"আমাকে?—আপনি কি বলেন!"

"আমিত বলিয়াছি,—আমি আপনাকে ভালবাসি!"

"সর্ব্বনাশ!—আপনি আমাকে ভালবাসেন?"

"সত্য বলিতেছি! আমি আপনাকে প্রকৃতই ভালবাসি।"

এই কথাতে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, "ইহা বড়ই অপ্রত্যাশিত!"

"ঠিক!—কিন্তু, আমার মনের ভাব আমার প্রতি কার্য্যেই প্রতীয়মান্ হয়।"

"হইতে পারে; কিন্তু আমি অন্ধ। অন্যান্য বালিকার সহিত যে ভাবে প্রণয় করিতে হয়, অন্ধবালিকার সহিত অবশ্য অন্যভাবে করিতে হয়।"

"আমি দৃষ্টিশক্তির অভাবের জন্য কিছুই মনে করি না। আপনার চোখ না থাকিলেই বা কি?—আপনি দেখিতে সুন্দর, আপনার কেশরাশি দীর্ঘ, আপনার চর্ম্ম উজ্জ্বল লাল বর্ণের এবং আপনার মুখখানি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায়।"

"আপনার উদ্দেশ্য কি?"

"আমি—আপনাকে বিবাহ করিতে চাই।"

এ প্রস্তাবে আমি হাস্য-সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলাম, "আপনি কি পাগল হইয়াছেন?—আপনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে আমি অন্ধ? —না! না!—আমি এ অদ্ভুত প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না। আমার অর্থের অভাব নাই! আমি একমাত্র সন্তান; আমার দিন কাটিয়া যাইবে।—আমি আপনার গলগ্রহ হইতে চাহি না।"

তিনি আর কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। যাহা হউক,—আমি আজ একটি নূতন কথা শুনিলাম—আমি সুন্দরী।—আমি তাঁহাকে একটু ভাল না বাসিয়া পারিলাম না। দর্পণকে কেইবা না ভালবাসে?

(৩)

প্রিয়তম! তোমাকে একটি নিদারুণ সংবাদ দিতেছি। তোমাকে এই পত্র লিখিবার সময় আমি আমার চোখের জল নিবারণ করিতে পারিতেছি না।

আমার দর্পণ—সেই অপরিচিত ব্যক্তিটির সহিত কথোপকথনের কএকদিবস পরে, আমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আমি উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। এমন সময়ে, হঠাৎ একজন পরিচারিকা কিছু ব্যস্তভাবে মাকে ডাকিতে আসিল। তাহার কথায়, কি জানি কেন, আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল! আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে, মা?"—মা বলিলেন "ও কিছুই নয়!—সম্ভবতঃ কোন ধনী অতিথি আসিয়াছেন; সেই জন্য পরিচারিকা অত ব্যস্ত হইয়াছে।"

মা আর সেখানে থাকিলেন না।—আমার কপোলদেশে দুইবার চুম্বন করিয়া তিনি দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

মা'র প্রস্থানের পরেই আমি দুইটি প্রতিবেশীর কথোপকথন শুনিতে পাইলাম।—তাঁহারা অনুচ্চস্বরেই কথা কহিতেছিলেন; কিন্তু, এক শক্তির অভাব হইলে জগদীশ্বর অন্য শক্তির প্রখরতা দেন,—তাই আমার শুনিতে কোন কষ্ট হইতেছিল না।—একজন বলিতেছিলেন, "কি কষ্ট!—আবার দালাল আসিয়াছে।"—অপর ব্যক্তি বলিলেন "কিন্তু, বালিকা কিছুই জানে না। সে কখন স্বপ্নেও মনে করে না যে, সে অন্ধ বলিয়া, তাহার মাতাপিতা সহস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহার সুখস্বচ্ছন্দতার বিধান করেন!"—"সে কি রকম?"—"কেন!—তা কি তুমি জান না?—আহারকালে তাহাকে সকল প্রকার সুখাদ্য দেওয়া হয়; কিন্তু, সে মনেও করিতে পারে না যে, একই টেবিলে বসিয়া তাহার মাতাপিতা সামান্য শুষ্ক রুটী খাইয়া প্রাণধারণ করেন।"

সর্ব্বনাশ!—প্রিয়তম! একথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমার—তাঁহাদের অন্ধ সন্তানের—জন্য তাঁহারা এ কি করিতেছেন! অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া আমি কিছুই জানিতে পারি না!—কি অগাধ স্নেহ! কি সন্তান-বাৎসল্য! পৃথিবীর যাবতীয় রত্নেও এ ঋণ পরিশোধনীয় নহে।

(৪)

প্রিয়তম! সেদিন প্রতিবেশিদ্বয়ের কথোপকথনে আমি যে গোপনীয় বিষয় জানিতে পারিয়াছি, তাহা কাহাকেও বলি নাই।—আমি ইহা জানিয়াছি, এই সংবাদ মাতাপিতা শুনিলে তাঁহাদের কষ্টের অবধি থাকিবে না।—আমি পূর্ব্বেরই ন্যায় ব্যবহার করিতেছি; কিন্তু তাঁহাদের উদ্ধার করিতে আমি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

আমার সেই "দর্পণ" মহাশয় আমাকে আবার দেখিতে আসিয়াছিলেন।—আজ আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। সামান্য কথোপকথনের পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আমাকে আজও সেইরূপ সুন্দরী মনে করেন?"

"নিশ্চয়!—বিশেষতঃ আপনি নিজের সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিতা নহেন বলিয়া আপনাকে আরও সম্মান করি এবং ভাল বাসি।"—"বলেন কি?—আমি কি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায়?"—"শুধু দেখিতে নয়।—গুণেও গোলাপের ন্যায়।"

আমি খুব হাসিয়া ফেলিলাম! তিনি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "ইহাতে হাসিবার কি আছে?" আমি উত্তর করিলাম, "আমার মনে হইতেছে, আপনি আমার 'দর্পণ'!—কারণ, আপনার কথাতে আমি আমাকে প্রতিবিম্বিত দেখি।"

"প্রিয়তম! যাহাতে বরাবরই এরূপ হইতে পারি, তাহাই আমার ইচ্ছা।"

"আপনি কি তাহা হইলে সত্যই আমাকে বিবাহ করিতে চান?" "নিশ্চয়!—আর একটি কথা; আমার আর কেহ নাই! আমার কিছু অর্থ আছে। সুতরাং, তুমি তোমার মাতাপিতার নিকটেই থাকিতে পারিবে এবং আমি তাঁহাদের পুত্রের ন্যায় থাকিয়া তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা ও কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিব।"

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। তিনি বলিলেন, "একটি কথা।—আমি একে কুরূপ; তাহাতে বসন্তদেবী আমার মুখে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, তুমি অন্ধ হইলেও, তোমার ন্যায় সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া আমি স্বার্থপরতাই দেখাইতেছি।"

আমি, আমার হস্ত প্রসারণ করিয়া, তাঁহার হস্ত গ্রহণ

করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি আপনার রূপের কথা অতিরঞ্জিত করিতেছেন কি না জানি না; কিন্তু, আমার মনে হয়, আপনি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সাধু!—তবে, আপনি যাহাই হউন না কেন, আমি চিরকালই আপনাকে ভক্তি করিব।"

কি করিলাম বুঝিতে পারি না! তবে, আমার চিরারাধ্য মাতাপিতার কষ্ট দূরীভূত হইবে ত!—আর অধিক কিছুই চাহি না।

(৫)

প্রিয়তম! তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি!—তুমি যে আমার ভবিষ্যৎ সুখের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছ, তজ্জন্য ভগবান্ তোমাকে সুখে রাখুন!

দুইমাস আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এবং আমি প্রকৃত সুখী হইয়াছি।—আমার কিছুরই অভাব নাই। স্বামী আমাকে খুব ভালবাসেন। আমার মাতাপিতার সকল কষ্ট দূরীভূত হইয়াছে; সুতরাং, আমি আর কিছুই চাহি না!

(৬)

আনেস্! আমি সন্তানবতী হইয়াছি। আমার একটি কন্যা জন্মিয়াছে, কিন্তু, কি পরিতাপের বিষয়, আমি তাহাকে দেখিতে পাই না! সকলেই বলিতেছেন যে, সে দেখিতে খুব ভাল হইয়াছে। মাতা, পিতা, স্বামী—সকলেই বলেন যে, সে দেখিতে ঠিক আমার ন্যায় হইয়াছে। কিন্তু, আমি ত তাহাকে দেখিতে পাই না! আমি যে অন্ধ!—আমি সুনীল আকাশের শোভা ভোগ করিতে পাই না; আমি প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না; যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের দেখিতে পাই না;—এ সকল কষ্টই আমি সহ্য করিয়াছি ও করিতেছি!—কিন্তু, আমি যে আমার সোনার চাঁদকে দেখিতে পাই না, একষ্ট আমি সহ্য করিতে পারি না। একবার,—একমুহূর্ত্তের জন্যও যদি তাহাকে দেখিতে পাইতাম! লোকে যেরূপ বিদ্যুৎ দেখিতে পায়,—চক্ষের পলকের ন্যায় যদি একবার দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে জীবনে আর কোন আকাঙ্ক্ষা আমার থাকিত না।

প্রিয়তম! এখন,—এবার আর আমার স্বামীর কথায় মন ভুলিতেছে না। তিনি বলিতেছেন যে, শিশুর—আমার সোনারচাঁদের—চুলগুলি কুঞ্চিত, তাহার বিম্বাধরে কি মধুর হাসি, তাহার মুখখানি দেবতার ন্যায়। কিন্তু, এবার আর "দর্পণের" কথায় আমার শান্তি হইতেছে না! আমার সোনারচাঁদ যখন আমার কাছে আসিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে, তখন আমি তাহাকে দেখিতে পাই না!—এ আক্ষেপ রাখিবার স্থান আছে কি?

(৭)

প্রিয়তম!—আমার স্বামী দেবতা!—তিনি কি করিতেছেন, জান কি?—আমার অজ্ঞাতসারে গত বৎসর ধরিয়া আমি যাহাতে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতেছেন!—শুনিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, তিনি নিজেই চিকিৎসক! এতদিন ধরিয়া তিনি কেবল আমারই ভবিষ্যৎ সুখের জন্য চক্ষুরোগ সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন!

গতকল্য তিনি আমাকে বলিলেন,—"প্রিয়তম! আমি কি আশা করিতেছি জান? তোমার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে তোমার চক্ষুর উপর অস্ত্র-চিকিৎসার জন্যই ঐ সকল প্রয়োগ করা হইতেছিল।—তোমার চক্ষুর ছানিতে অস্ত্র করিব।"

আমি উত্তর করিলাম, "ইহা কি সম্ভব?"

"নিশ্চয়!"

"তোমার হস্ত ঠিক থাকিবে ত?"

"আমার মনের বল আছে; সেজন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না।"

আমি তদ্গতচিত্ত হইয়া বলিলাম, "তুমি মানুষ নও,—তুমি দেবতা!" স্বামী উত্তর করিলেন,—"তুমি কিছুদিন পরে তাহা স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবে।"

"কি রকম!"

"দেখিবে, তোমার স্বামী অত্যন্ত কদাকার।"

প্রত্যুত্তরে বলিলাম, "স্বামিন্!—যদি তুমি মনে কর যে, তোমাকে কদাকার দেখিলে তোমার প্রতি আমার ভক্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইবে, তাহা হইলে তুমি ইহা হইতে বিরত হও।"

তিনি কিছুই বলিলেন না। কেবল আমাকে চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শেষ পত্র

প্রিয়তম আনেস! এ পত্রের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িও।—একেবারেই শেষের দিকে পড়িও না।

পক্ষাধিক কাল হইল আমার অস্ত্রচিকিৎসা হইয়া গিয়াছে!—আমি যন্ত্রণায় মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়াছিলাম; তৎপরে, একমুহূর্ত্তের জন্য আমার সম্মুখে যাহা আমি এই দীর্ঘকাল দেখি নাই, তাহারই ছবি প্রতিফলিত হইয়াছিল। পরক্ষণেই আমার চক্ষের উপর এক বন্ধনী স্থাপন করা হয়। আমার স্বামী আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন!

কিন্তু, আমি একটি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলাম। আমার সোণারচাঁদকে সেদিন আমার কাছে আনা হয়। পরে যখন সে ঝাঁপ দিয়া আমার কোলে আসিয়া আধ-আধ স্বরে 'মা' বলিয়া ডাকিল, আমি ডাক্তারের—স্বামীর—আদেশ অমান্য করিয়া চোখের বন্ধনী খুলিয়া ফেলিলাম।—সে কি দেখিলাম!—আমার সোণারচাঁদ খুকীকে দেখিলাম।—আমার সকল আশা পূর্ণ হইল!

তৎক্ষণাৎ আমার চক্ষের উপর আবার বন্ধনী দেওয়া হইল; কিন্তু, সেই হাসিমুখখানির কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার সকল অন্ধকার কাটিয়া গেল।

গতকল্য পূজনীয়া মাতৃদেবী আমাকে মনোরম পোষাক, পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া আমার বন্ধনী খুলিবার আদেশ দিলেন। ঘরে মা, বাবা, আর আমার খুকী ছিল। আমি মা, বাবাকে প্রণাম করিয়া, খুকীকে আবেগভরে বক্ষে করিলাম। বাবা বলিলেন, "কেবল তোমার স্বামী ব্যতীত তুমি সকলকেই দেখিতেছ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কোথায়?" মা উত্তর করিলেন, "তিনি তোমার সম্মুখে আসিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন।"

আমার তখন তাঁহার কদাকার, তাঁহার পক্ককেশ, তাঁহার বসন্তের দাগবিশিষ্ট মুখমণ্ডলের কথা মনে পড়িল! আমি কিন্তু আমার দেবতাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছিলাম।—"তিনি যতই কদাকার হউন না কেন, তিনি আমার স্বামী—আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই।"

মা, আমাকে কক্ষস্থ দর্পণের সম্মুখে গিয়া নিজের রূপ দেখিতে আদেশ দিলেন। দেখিলাম, দর্পণখানির পশ্চাতে কে একজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দেখিলাম তিনি যুবক, সুন্দর; তাঁহার কোটের উপর সম্মানের চিহ্ন রহিয়াছে। মা, এই নবাগত যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, বলিলেন—"দর্পণে তোমার প্রতিবিম্ব কেমন সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় দেখাইতেছে।"

অপরিচিতের সম্মুখে এরূপ সম্ভাষণে আমি মা'র উপর বিরক্ত হইলাম। মা ও বাবা তাহা বুঝিতে পারিলেন। মা বলিয়া উঠিলেন, "পাগলি! এই তোর স্বামী।"

কি!—আমার স্বামী!—এই!—আমারই জন্য আমার স্বামী সকলকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, সকলেই যেন বলে—তিনি বৃদ্ধ, কদাকার। আমি তাঁহার মহত্ত্বে আপ্লুত হইয়া নতজানু হইয়া তাঁহার পদ চুম্বন করিলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

গুরুকুল বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়

সেবার গ্রীষ্মের বন্ধে হরিদ্বার দর্শন করিয়া 'গুরুকুল' দেখিতে যাই। আমার সঙ্গী ছিলেন একজন শিক্ষক। তথাকার শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিয়া শিক্ষকের আদর্শ ও কর্ত্তব্য কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্যই আমরা সেখানে গিয়াছিলাম। কনখলের দক্ষেশ্বরের মন্দির-পার্শ্ববর্ত্তী সেতু সাহায্যে আমরা হরিদ্বারের খরস্রোতা গঙ্গা পার হইয়া, বালুকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড-সমাচ্ছন্ন সুবিস্তৃত প্রান্তর-মধ্যে গঙ্গার আরও তিনটি তীব্রবেগা ধারা অতিক্রম করিয়া অবশেষে মৃত্তিকার উপর পা ফেলিয়া বাঁচিলাম। শুনিলাম, প্রবল

বর্ষায় এই চারিটি স্রোতস্বতীই এক হইয়া যায়। জানি না, তখনকার দৃশ্যে ভীতি ও প্রীতি কিরূপ ভাবে জড়িত থাকে! বেগের প্রাখর্য্য এখনকার তুলনায় অনুমান করাও কঠিন।—তখন নাকি, খালি কাঠের পিপার ছিদ্র-মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া, তাহার উপর চড়িয়াই এই নদী পারাপারের ব্যবস্থা!

গুরুকুলের মাঠ ও বিগত দোলোৎসবের সময়ে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নির্ম্মিত তোরণাদি দূর হইতে দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধহৃদয়ে আমরা ক্রমশঃ কৃষি উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। ইহা হইতে উৎপন্ন শাকতরকারী গুরুকুলাশ্রমের জন্য ব্যয়িত হয়। পাবস্থ প্রণালী সাহায্যে একজন লোকের দ্বারাই কূপ হইতে জল তুলিয়া এত অধ্যাপক-আগন্তুক-বিদ্যার্থীর ব্যবহারার্থ সমস্ত জলের সরবরাহ হইয়া থাকে। সায়ংকালীন স্নানার্থ বহির্গত ছাত্রগণের পুনঃ পুনঃ 'নমস্তে' বচনে অভ্যর্থিত হইয়া, আমরা তথাকার শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ ব্যবহার-সৌষ্ঠবে (discipline) আনন্দিত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। উদ্যানের পরই গুরুকুলের গৃহশ্রেণীর আরম্ভ। সম্মুখে উহার কার্য্যালয় (office) দেখিয়া একজন কর্ম্মচারীর নিকট আমাদিগের গুরুকুলদর্শনের অভিলাষ বিজ্ঞাপিত হইল; তিনি বিদ্যালয়ের জনৈক তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) মহাশয়কে সমস্ত দেখাইয়া দিতে বলিলেন। ভদ্রলোকটি অতি বিনীতভাবে আমাদিগকে বলিলেন, সেদিনের মত বালকদিগের বিদ্যালয়ের পাঠ হইয়া গিয়াছে;—সেদিন যদি আমরা তাঁহাদিগের আতিথ্য-স্বীকার করি, তাহা হইলে পরদিন বিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী সুচারুরূপে দেখিবার অবসর পাইব। পরদিনই আমাদিগকে হৃষীকেশ, লছমনঝোলা দেখিয়া হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে বলিয়া আমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া, সেদিনই যে টুকু সম্ভব সেই টুকুমাত্র দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন। অঙ্গনমধ্যেই প্রবেশ করিয়া দেখি, পর্ণাচ্ছাদিত যজ্ঞ-শালা বা হোমকুণ্ড রহিয়াছে। ইহাতে এখানকার ছাত্রমণ্ডলী নিত্য হোম করিয়া থাকে। অঙ্গনের এককোণে একখানি প্রকাণ্ড উচ্চাবচ ভূচিত্র (relief map) নির্ম্মিত রহিয়াছে। ভূগোলের পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই এখানি বিদ্যালয়-কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইতেছে। আমরাও বিদ্যালয়ে ভূগোল পড়াইয়া থাকি, এইরূপ একখানি মানচিত্রের অত্যাবশ্যকতা এখন উপলব্ধি করিলেও পূর্ব্বে কখন ধারণাই করিতে পারি নাই। শুধু তাহাই নহে, প্রাথমিক তিনটি শ্রেণীতে ছাত্রগণের হস্তনৈপুণ্য ও অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিলাম, তাহাও আর কোন বিদ্যালয়ে আছে কি না সন্দেহ। তাহাদিগের চেটাই, কাগজের বাক্স প্রভৃতি নির্ম্মাণ-বিষয়ে শিক্ষাপদ্ধতি দেখিয়া বিদ্যালয়ের পরিচালকগণের শিক্ষাভিজ্ঞতার বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। হায়, আমাদিগের শিক্ষাদান কত অসম্পূর্ণ,—শিক্ষকের কার্য্যে কি গুরু-দায়িত্ব! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমরা বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, এক এক শ্রেণীর ছাত্র এক কক্ষেই বাস করেন। প্রত্যেকের জন্য উপবেশন ও শয়ন করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার পার্শ্বেই তাহার অধিকারী ছাত্রের নাম লেখা। মধ্যে মধ্যে সুন্দর সংক্ষিপ্ত নীতিবাক্যও লেখা আছে। এক এক জন শিক্ষক এক এক শ্রেণীর নিরীক্ষক,—তিনি সর্ব্বদা বিদ্যার্থিগণের সহিতই শয়নভ্রমণাদি যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকেন। শয়নাগার ও অধ্যয়ন-কক্ষের (dormitory and class room) এরূপ সুন্দর সামঞ্জস্য আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।* ছাত্রাবাস-সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয়ের (residential University) জন্য যে উচ্চ চীৎকার সুদূর ঢাকা হইতে পাটনায় পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া, সুদূর নাগপুরে পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে, কই তাহার ফলে ত বিশেষ নূতন কিছুই উন্নতি-চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না!—দেশীয় বিদেশীয় প্রধান প্রধান ধুরন্ধরগণের মস্তিষ্কপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা ও আলোচনার ফলে দেশের অশেষ কল্যাণকর কার্য্যকরী-শিক্ষার প্রচলন ত হইতেছে না—শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' রহিয়াছি। আরও দেখিলাম, প্রত্যেক শ্রেণী-কক্ষের সম্মুখস্থ অঙ্গনভূমিটুকু

* এ সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুরের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:—'If the essential principles of Hostel-life are duly observed, and the first of them is that residence in the hostel is to include supervision by resident teachers, then, I believe that, the expansion of the system will do more for student-life in India, and will exercise a more profound influence upon the future of the race than any other reform that can be conceived'—LORD CURZON'S Dacca Speech.

সেই সেই শ্রেণীর ছাত্রগণেরই ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট। তাহাতে, দেখা গেল, তাহারা পুষ্পবৃক্ষাদি রোপণ করিয়া সৌন্দর্য্য-বোধ ও নিসর্গপ্রীতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে! শ্রেণীকক্ষের নির্দ্দিষ্ট আসন হইতে সমস্ত দ্রব্যই তাহারা আপনার করিতে করিতে—অঙ্গন অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ বিদ্যালয়ে, পরে মহাবিদ্যালয়ে, তাহার পরে সম্ভবতঃ সমস্ত দেশময় এই আত্মীয়তার প্রসার বৃদ্ধি করিয়া গুরুকুলের প্রতিষ্ঠাতৃগণের এই মহান্ উদ্যোগ জয়যুক্ত করিয়া দিতে সমর্থ হইবে! আমরা আপাততঃ কেবল সেই অস্ফুট আশাটুকু হৃদয়ে পোষণ করিয়াই তৃপ্ত হইলাম। শুনিতে পাইতেছি, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও না কি ছাত্রাবাস থাকিবে। তাহার উদ্যোক্তাদিগকে আমরা গুরুকুলের এই সুনিয়ন্ত্রিত ছাত্রাবাস-প্রথার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য টেবিল বেঞ্চের আয়োজন নাই;—গৃহতলে কম্বলাদি আসনে উপবেশন ও সম্মুখে ডেক্সের ন্যায় ক্ষুদ্র চৌকির উপরেই লিখনাদির ব্যবস্থা দেখিলাম। শিক্ষার্থিগণকে ভারতের প্রাচীন আদর্শের ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত যথাসাধ্য পালন করিতে হয়; অতএব তাহাদিগের পক্ষে ঐরূপ ব্যবস্থাই বিশেষ উপযোগী।—শয়নের জন্য কাঠের তক্তার কঠিন চৌকির উপর কম্বলের শয্যা।—পরিধানের জন্য কৌপীন ও উত্তরাসঙ্গের রূপান্তর ল্যাঙোট্ ও মোটা জামা; ল্যাঙোট্ অধোবাসের আবরণে ঢাকা থাকে। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, 'এখানে একটি তাঁত খোলা হইয়াছে; ব্রহ্মচারিগণ তাহার প্রস্তুত কাপড়ই পরিধান করিয়া থাকেন।' আমরা গুদামে থান কাপড় স্তূপীকৃত দেখিলাম; সম্ভবতঃ সেগুলি দেশীয় কলে প্রস্তুত। ব্রহ্মচারিগণের পায়ে খড়ম্;—নিতান্ত অসুস্থ না হইলে কাপড়ের জুতা পরাও নিষিদ্ধ।

রাত্রিশেষে অধিকবয়স্ক বালকগণ ৪ ঘটিকার ও অল্প বয়স্কেরা ৪॥০ ঘটিকার সময় আশ্রমের ঘণ্টানিনাদের সহিত সুপ্তোত্থিত হইয়া শয্যা গুটাইয়া রাখিয়া গঙ্গাতীরে স্নানার্থ উপনীত হয়। স্নানের পূর্ব্বে ব্যায়ামাদিরও ব্যবস্থা আছে। অধিকাংশ বালকই গঙ্গাস্নান-সময়ে শিক্ষকগণের সহিত সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। প্রাতে সাড়ে পাঁচ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত সন্ধ্যা ও অগ্নিহোত্র সমাপন করিয়া, দুগ্ধপান বা সামান্য কিছু জলযোগান্তে তাহারা সওয়া ছয় ঘটিকা হইতে সাড়ে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অধ্যাপক-সমীপে পাঠ গ্রহণ করে। তাহার পর ব্রহ্মচর্য্যানুকূল আহারাদি সমাপন করিয়া লঘু পাঠ ও বিশ্রামলাভের পর, পুনরায় পৌনে তিন ঘটিকা হইতে সওয়া পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক-সমীপে অধ্যয়ন করে। তাহার পর ক্রীড়ার অবকাশ।—ক্রীড়াক্ষেত্রে 'ক্রিকেট্' 'হকি' প্রভৃতি বৈদেশিক খেলারও ব্যবস্থা দেখিলাম! তাহার পর পুনরায় স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া সায়ংসন্ধ্যা ও হোম করিবার নিয়ম। অতঃপর আহার ও পাঠাভ্যাসের পর রাত্রি ৯ ঘটিকারই সময় শয়নের ব্যবস্থা। কলেজের ছাত্রগণের প্রতি নিয়মের কড়াকড়ি নাই, তাহারা স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়াই উহা পালন করেন।

গুরুকুলের এই জাতীয় ব্যবস্থা সৌষ্ঠব দেখিবার জন্য যে, কেবল ভারতীয় বিদ্যোৎসাহিগণই তথায় গিয়া থাকেন তাহা নহে;—য়ুরোপীয় বিদ্বদ্বর্গের আকর্ষণও বেশ আছে। সম্প্রতি যুক্ত-প্রদেশের ছোটলাট মেষ্টন্ বাহাদুর গুরুকুল সন্দর্শন করিয়া চা'র পরিবর্ত্তে ব্রহ্মচারিগণ-প্রদত্ত তুলসী-পাতার ক্বাথ সাদরে পান করিয়া, তত্রত্য শিক্ষাপ্রণালীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

মহাবিদ্যালয় বা কলেজ-সংশ্লিষ্ট পুস্তকালয় ও পাঠাগারটি সুবৃহৎ, বিজ্ঞানাগারটিও মন্দ নহে। তথায় আপাততঃ কেবল রসায়ন-বিদ্যাভ্যাসেরই ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত য়ুরোপীয় দর্শন ও ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান অনুশীলনেরও বেশ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাববশতঃ এগুলির অধ্যাপনা কিয়ৎ-পরিমাণে ইংরেজি পুস্তকের সাহায্যে সমাহিত হইলেও গুরুকুলে,—কি বিদ্যালয়ে, কি মহাবিদ্যালয়ে,—ইংরেজির স্থান গৌণ। প্রধানতঃ সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ এবং সংস্কৃত সাহিত্য-দর্শনাদির শিক্ষা স্বতন্ত্রনিয়মে দিবার জন্যই গুরুকুলের সৃষ্টি।* সুতরাং সংস্কৃতানুশীলন ব্যতীত যাবতীয় শিক্ষা হিন্দীভাষার

---

* 'The Gurukula has been started with the object of producing scholars, that have been bred in an atmosphere free from the taint of unwholesome intellectual bondage.'

সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। বিদ্যালয়ের শেষ-বিভাগ পর্য্যন্ত হিন্দীতেই অন্যান্য সমস্ত শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। এটিও গুরুকুলের একটি অনুকরণীয় বিশেষত্ব। তাঁহারা হিন্দী-ভাষার বৈদেশিক গন্ধটুকুর পর্য্যন্ত 'শুদ্ধি'-সাধন করিয়া 'আর্য্যভাষা' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দীভাষাই এখানকার শিক্ষাদানে একমাত্র অবলম্বন (medium হওয়ায়, পঞ্জাব-প্রান্তবাসীর সহিত যুক্ত প্রদেশের উপর দিয়া বেহার ও মধ্য-প্রদেশ-বাসীর এক মহাসম্মিলন-সুযোগের সূত্রপাত হইয়াছে। ইহাতে কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা, আরা, আগ্রা ও কলিকাতার হিন্দীপ্রচারক অনুষ্ঠানগুলি, হিন্দীভাষা ও নাগরী-বর্ণমালার সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তন ও প্রচারকল্পে চেষ্টা করিয়া যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন, প্রাদেশিক ভেদভাব পরিহার করিয়া হিন্দীকে ভারতের মহাদেশ-ব্যাপক ভাষা-জ্ঞানে তাহার সেবা ও প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়া গুরুকুলের উদ্যোক্তা তাহা অপেক্ষা কম সফলকাম হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সকলের মুখেই শুদ্ধ হিন্দীভাষায় আলাপ শুনিয়া, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাঁহারা এ প্রদেশের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন, শুদ্ধ হিন্দীতে কথোপকথন কত কঠিন। 'সরস্বতী'র ন্যায় উচ্চ অঙ্গের মাসিকপত্রিকাও উর্দ্দু শব্দাদির প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারে নাই। গুরুকুল এই সাধন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ভারতবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছে।

মহাবিদ্যালয় বা কলেজ-গৃহটি সুনির্ম্মিত, গঙ্গার নীল-ধারা নামক শাখার অনতিদূরেই দণ্ডায়মান; কিয়দ্দূরে হিমালয়ের শৈলমালা। বিদ্যালয়ভবন আজও স্থায়ি-ভাবে নির্ম্মিত হয় নাই। তাহার ব্যায়ামশালার জন্যও অর্থসংগ্রহ হইতেছে। পাকশালা ও রোগিশুশ্রূষাগারের (hospital) ব্যবস্থা স্বাস্থ্যনিয়মের সর্ব্বথা অনুমোদিত বলিয়াই বোধ হইল। মক্ষিকাদি বীজানুবাহী কীট নিবারণ জন্য দুগ্ধাদিরক্ষার স্থানগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট জালদ্বারা আচ্ছাদিত দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, বালকেরা সকলেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে একত্র বসিয়াই ভোজন করে। যে কোন বর্ণেরই বালক ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইলে, তাহাকে উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা দ্বিজ করিয়া লওয়া হয়। 'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে' এই প্রবচনই তাঁহা-দিগের এতাদৃশ ব্যবহারের প্রতিপোষক প্রমাণ; সুতরাং পাচকও যে ব্রাহ্মণ-সন্তান হইবে, তাহারও কোন বাঁধাবাঁধি নাই। রোগিশুশ্রূষাগারে ঔষধ প্রস্তুত করিবার গৃহ, রোগীর অবস্থান প্রভৃতিও বেশ সুব্যবস্থিত। সমীপবর্ত্তী গ্রামবাসিগণকেও এখান হইতে ঔষধাদি বিতরণ করা হইয়া থাকে। ইঁহাদিগের একটি নিজস্ব গোশালাও আছে, তাহা হইতে প্রাপ্ত দুগ্ধেই সমস্ত গুরুকুলের সঙ্কুলান হইয়া থাকে। একটি সীবনাগার ও মুদ্রাযন্ত্রও আছে। 'বৈদিক পত্রিকা' (Vedic Magazine) একখানি উচ্চ অঙ্গের মাসিকপত্র, গুরুকুলের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলীর প্রচার-কল্পে এখান হইতেই ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। এগুলি ছাড়া গুরুকুলের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যে সংস্কৃত-উৎসাহিনী সভা, বাগ্বর্দ্ধিনী সভা, সাহিত্য-পরিষদ্, অধ্যাপক-সভা প্রভৃতি কতকগুলি সভা-সমিতিও আছে।

গুরুকুল, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রবর্ত্তিত ও আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হইলেও, হিন্দুর জাতিভেদে ও সাকার-উপাসনায় যাঁহাদিগের আস্থা নাই, এমন ভারতবাসীমাত্রই স্ব স্ব ৬ হইতে ৮ বৎসর বয়স্ক আত্মীয়গণকে গুরুকুল-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইতে পারেন; কিন্তু এই বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দান করিবার ক্ষমতা পঞ্জাবের আর্য্য-প্রতিনিধি-সভার উপর ন্যস্ত। সভা-প্রবর্ত্তিত সর্ত্তগুলির মধ্যে অভিভাবক, ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ছাত্রের বিবাহ দিতে ও তাহাকে গুরুকুল হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না বলিয়া স্বীকার না করিলে কোন ছাত্রকেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিবার অনুমতি পান না। বিদ্যালয়ের দশটি, এবং মহাবিদ্যালয়ের চারিটি, শ্রেণীতে ১৬ বৎসরের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'অধিকারী'-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয়ের পাঠসমাপনান্তে, ছাত্রগণ মহাবিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় 'স্নাতক'-উপাধি লাভ করেন। তৎপরে বিষয়-বিশেষে অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিলে ব্রহ্মচারী 'বাচস্পতি' নামক অন্তিম উপাধিভূষায় ভূষিত হন। আপাততঃ আশ্রমে সর্ব্বসমেত অনধিক দুইশত ব্রহ্মচারীর স্থানসমাবেশ হইতে পারে। শুনিলাম, ইতঃপূর্ব্বে দুইটি বাঙ্গালী-বিদ্যার্থী গুরুকুলবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দী-ভাষায় বেশ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। অতএব, উদারনীতিক বাঙ্গালীর পক্ষেও আশ্রম-প্রবেশে কোন

অনতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধক নাই। অন্ত্যবর্ণ-জাতিই হউক অথবা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণই হউক, সকল জাতির বালকেরই গুরুকুলে সমান অধিকার। সকলেই উপবীতধারী—একত্র ভোজনোপাসনাধিকারী আপাততঃ কোন মুসলমান বিদ্যার্থী নাই, আসিলেই 'শুদ্ধি'-বিধানে তাহাকে 'আর্য্য' করিয়া লইয়া যজ্ঞসূত্র দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারিবর্গের নগরাদি-গমন নিষিদ্ধ,—অপরিহার্য্য কারণ-ব্যতিরেকে কাহাকেও লোকালয়ে যাইতে দেওয়া হয় না। যাইবার আবশ্যকতাও নাই, কারণ গুরুকুলই একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ-বিশেষ। তথায় ব্রহ্মচারীর প্রয়োজনোপযোগী কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। হরিদ্বার এখান হইতে তিন ক্রোশ ও কনখল দেড় ক্রোশমাত্র হইলেও, গুরুকুলবাসীদিগের সহিত এই উভয় নগরের সম্বন্ধ যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। মধ্যবর্ত্তী চারিটি স্রোতস্বতীও, এইরূপ ব্যবধানে থাকার পক্ষে অল্প সহায়তা করে নাই। কাংড়ী নামক জনবিরল গ্রামেই আশ্রমটি অবস্থিত। গ্রামটি মুন্‌শী আমনসিংহ মহোদয় গুরুকুলের প্রতিষ্ঠাকল্পে দান করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন! তাঁহার সহিত ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুন্‌শী রাম মহোদয়ের যশও কম নহে!—তাঁহারই অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমেই গুরুকুলকে আমরা উপস্থিত অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি; সুতরাং তিনিও ভারতবাসীমাত্রেরই আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। এই জন্যই তিনি আর্য্যসমাজ-সম্প্রদায়ে 'মহাত্মা' নামে পরিচিত। অতএব গুরুকুলের প্রাণস্বরূপ সেই মহানুভব ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভ না করা পর্য্যন্ত গুরুকুল-দর্শন অসম্পূর্ণ মনে করিয়া, তাঁহার একান্তস্থিত আশ্রমোচিত আবাসের দিকে চলিলাম;—দেখিয়া ও আলাপ করিয়া বুঝিলাম, তিনি বাস্তবিকই একজন মহাপ্রাণ মহাত্মা! আমাদিগকে বারাণসীস্থ হিন্দুকলেজ-সংশ্লিষ্ট জানিয়া, তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কথা তুলিলেন, পরে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন, 'অন্ততঃ পক্ষে পাঁচজন মহানুভব ব্যক্তি সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনন্যকর্ম্মা হইয়া না খাটিলে, কিরূপে এতবড় একটা বৃহদ্-ব্যাপার কার্য্যে পরিণত হইতে পারে!' যিনি গুরুকুলের জন্য জীবন-উৎসর্গ করিয়া জীবনান্ত পরিশ্রমে উহাকে সাফল্যের পথে তুলিয়া দিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মুখোচ্চারিত এরূপ একটি কথার মূল্য অনেক অধিক মনে হইল!—বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠাতৃগণ একজন প্রকৃত কর্ম্মীর এই ক্ষুদ্র মন্তব্যটি স্মরণ রাখিবেন কি? বিদায়গ্রহণকালে পুনরায় তাঁহাদ্বারা গুরুকুলের আতিথ্য গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইলে, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে সময়োপযোগী করিয়া যে আর্য্যশিক্ষামন্দিরটি গঠিত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক-ভাব বহন করিলেও, তাহার প্রতি আমরা পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতার চক্ষে চাহিতে চাহিতে হরিদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করি। পথে আসিতে আসিতে ভাবিতেছিলাম,—বর্ণবিভাগ প্রভৃতিকে অর্ব্বাচীন বুদ্ধিতে উড়াইয়া দিবার জন্য এরূপ কঠোর কুঠারাঘাতে তাহার মূলোচ্ছেদে বদ্ধপরিকর না হইয়া, অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিলে, অনুষ্ঠাতৃগণ, প্রাচীন মনিঋষিদিগের আশ্রমের ন্যায়, গুরুকুলের প্রতিও ভারতীয় সাধারণের সার্ব্বজনীন শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তা আকর্ষণে নিশ্চয়ই সমর্থ হইতেন।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

শীতের দিনে পল্লীগ্রামে

(পল্লীচিত্র)

দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটাইয়া বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে যে দিন আমার পল্লীবাসে উপস্থিত হইলাম—সেই দিনটি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য এই চিত্রের অবতারণা।

গরুর গাড়ী সুদীর্ঘ নয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যখন গ্রামের সন্নিহিত হইল, তখন পৌষের রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। সন্ধ্যার পর রেলের ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া এই গরুর গাড়ীতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছি। গাড়ীর 'ফড়ের' উপর নূতন আমন ধান্যের 'বিচালি' পুরু করিয়া বিছান, তাহার উপর বিছানা; আমার সর্ব্বাঙ্গ একখানি বিলাতী কম্বলে আবৃত, আমি 'চোদ্দ পোয়া' লম্বা হইয়া গাড়ীতে নিদ্রা যাইতেছিলাম। গরুর গাড়ীর নাম শুনিয়া যাঁহাদের হৃৎকম্প হয়, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন,—সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমার সুখনিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই।

এই রকম শীতের রাত্রিতে যে গরুর গাড়ীতে চড়িয়া আরাম আছে—ভুক্তভোগীরা এ কথা অস্বীকার করিবেন না। অন্ধকারে সমস্ত প্রকৃতি সমাচ্ছন্ন, সম্মুখের পথ দেখা যায় না, সুদীর্ঘ পথে—এই অন্ধকার শীতের রাত্রে—জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই, কেবল ঊর্দ্ধে নৈশাকাশে লক্ষ লক্ষ উজ্জ্বল নক্ষত্রের শুভ্র-দীপ্তি! সপ্তর্ষি-মণ্ডল স্নেহোজ্জ্বল নত নেত্রে ধরণীর দিকে চাহিয়া আছেন—যুগ যুগ ধরিয়া এমনই ভাবেই চাহিয়া আছেন! চর অপরিবর্ত্তনীয় ভাব! শৈশবের সুখের কথা মনে পড়িল, যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়িল, অবশেষে জীবনের এই নিদারুণ মধ্যাহ্নে ছুটাছুটি করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছি! মাথা তুলিয়া গাড়ীর এ পাশে ওপাশে চাহিলাম, ইষ্টকবদ্ধ পথে গাড়ী হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে, গাড়োয়ান পেল্লাদ সেখ তামাক খাইবার জন্য পোয়ালের 'বুঁদিতে' আগুন জ্বালিয়া ফুঁ দিতেছে, বুঁদির আগুনের আভা তাহার কাল' মুখে পড়িয়া মুখ খানাকে রাঙ্গা করিয়া তুলিতেছে; সে কল্‌কেয় তামাক সাজিয়া জলহীন হুঁকায় কএকবার কসিয়া দম দিল। কলিকার উপর বুঁদির আগুন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।—কলিকার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে পেল্লাদ কলিকার ছাই ও গুল পথে ঢালিয়া ফেলিয়া, হুঁকা কলিকা তাহার গেঞ্জের ভিতর রাখিল। তাহার পর, বলদ দুটির লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া জোরে গাড়ী চালাইয়া দিল, এবং কম্বলখানা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া তাহার মেঠো সুরে গায়িল;—

"আক্কেল গুড়ুম হয় গো আল্লা, তোমার 'বিচের' শুনে,
খাজ্‌না দ্যায় রহিম 'স্যাক্,' 'ব্যাল' পেড়ে খায় ফণে।"

—তাহার সতেজ সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পথের দুই পাশে আম, কাঁটাল, তেঁতুল গাছ, কোথাও বাব্‌লা গাছের সারি, কোথাও বাঁশবন। অন্ধকারে সমস্তই ভীষণাকার প্রেতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; অসংখ্য জোনাকী পুঞ্জীভূত হইয়া বৃক্ষগুলির পত্রান্তরালে মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সুন্দর শোভা! কোন গাছের শাখায় বসিয়া একটা পেচক সশব্দে পাখা নাড়িল;—বাদুড়ের দল নিঃশব্দ-পক্ষ-সঞ্চারে এক একটা গাছের উপর আসিয়া ঝপ্ করিয়া বসিয়া পড়িতেছে, আবার তখনই উড়িয়া যাইতেছে;—দূর বনে দুইটি 'হুতম প্যাঁচা' মুখোমুখী বসিয়া প্রেমালাপ করিতেছে। কি গভীর কর্কশ স্বর!—সে স্বরে বনদেবতার বক্ষঃস্থল যেন স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের ভিতর হইতে একটা শিয়াল বাহির হইয়া পথের ধারের নয়ঞ্জুলির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, মাথা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ডাকিল—"হুয়া!" আর চারিদিক্ হইতে 'হুয়া' 'হুয়া' শব্দের 'কোরস্' আরম্ভ হইল; প্রায় পাঁচ মিনিট পরে ঐক্যতান-ধ্বনি নীরব হইলে—দূর প্রান্তরে—গ্রাম-প্রান্তে আর একদল শৃগাল ডাকিয়া উঠিল! মাঠের ভিতর দিয়া এক একবার শীতল বায়ু-প্রবাহ অরহর-কুঞ্জের শীর্ষদেশ আন্দোলিত করিয়া করিয়া সন্‌সন্ শব্দে দূরে চলিয়া গেল;—সেই উগ্র শীতল বায়ু-হিল্লোল চোখে মুখে লাগিয়া বুকের মধ্যে কম্পন উপস্থিত করিল। ভাল

করিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া শুইলাম।—তাহার পরে যে নিদ্রা—রাত্রিশেষে গ্রামপ্রান্তে আসিয়া সেই নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

নিদ্রাভঙ্গে মুখ খুলিয়া মাথা তুলিয়া দেখিলাম, অদূরে আমাদের গ্রাম!—ঊষালোকে গ্রামের চিহ্ন-স্বরূপ গাছগুলি দেখা যাইতেছে;—ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাগান,—ঐ দেদার বক্স পেয়াদার কলা-বাগান, বেগুণের ক্ষেত!—পূর্ব্বাকাশ সবে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। শুকতারা ক্রমে ম্লান-জ্যোতিঃ হইয়া ঊষার রক্তিম আলোক-আস্তরণের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। দূর মাঠের ধূসর গাছগুলি শুভ্র কুজ্ঝটিকার অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়াছে। মাঠে কোথাও সর্ষপ ও 'সূকর গোঁজার' ক্ষেত, পীতবর্ণের ফুলে মাঠ আলোকিত করিয়াছে, তাহার উপর ঊষার আলোক পড়িয়া শিশিরবিন্দু সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। ঈষৎ প্রভাত-বায়ুতে ছোলা ও গমের নব কিশলয় কম্পিত হইতেছে, গাছের পাতা হইতে শিশিরকণা ঝরিয়া পড়িতেছে; অদূরে পাটকাটি দিয়া ঘেরা একখানি কড়াইয়ের ক্ষেতে একটা কাল' ষাঁড় নত মুখে 'গো গ্রাসে' খন্দ খাইতেছে। সেকালে ধর্ম্মের ষাঁড়ের, সাত খুন মাপ ছিল, কিন্তু একালে মিউনিসিপালিটীর আমলে তিনি ময়লার গাড়ী টানিয়া পরহিতব্রতের মাহাত্ম্য-প্রচার করিতেছেন;—তাঁহার স্বাধীনতার অভাবে—পল্লীগ্রামের গোবংশ নির্ব্বংশ-প্রায়!

মোড় ঘুরিয়া গাড়ী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রামের পথে দুই ধারে দোকান, কোন দোকান 'কাচা'—কোন খানি 'পাকা'; দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। একটা ময়রার দোকানের এক কোণে ছাইয়ের গাদা,—একটা কুকুর তাহার উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। একখানি বড় কাপড়ের দোকানের প্রান্তবর্ত্তী বটগাছের তলায় কএকখানি গরুর গাড়ী। গাড়োয়ান গরুগুলির পিঠে চট চাপাইয়া গাড়ীর অদূরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে,—কোনটা দাঁড়াইয়া কোনটা শুইয়া উদাসীন ভাবে 'জাবর' কাটিতেছে; সম্মুখে খালি 'টুকরা' পড়িয়া আছে।—গাড়োয়ান রাত্রে এই 'টুকরায়' বলদের জন্য 'সানি' মাখিয়া দিয়াছিল,—সেই জন্যই প্রভাতে তাহাদের এমন রোমন্থনের ঘটা! গাড়োয়ানেরা ময়লা কাঁথায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া গাড়ীর 'ছৈ'এর মধ্যে সুখ-নিদ্রায় অভিভূত। কেবল একখানা বোঝাই গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ীর নীচে মাটিতে পড়িয়া কাঁথা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। তাহার গাড়ীতে খেজুরে গুড়ের 'নাগরী' বোঝাই। খাঁচার মধ্যে 'পোয়াল' বিছান, তাহারই উপর গুড়পূর্ণ মৃৎকলসগুলি (নাগরী) থরে থরে সজ্জিত। গাড়োয়ান সারা পথ গুড় বহিয়া আনিয়া স্নানাভাবে গাড়ীর নীচে পড়িয়া ঘুমাইতেছে।—এই দারুণ শীতে মাটিতে পড়িয়াও ঘুম হয়! আবার খট্টাঙ্গে দুগ্ধফেননিভ শুভ্র শয্যায় শয়ন করিয়া পক্ষিপালকগর্ভ লেপে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়াও অনেকের নিদ্রা হয় না। নিদ্রাদেবীও বুঝি, প্রণয়-দেবতার মত, অন্ধ!

গাড়ী হালদারদের পুষ্করিণীর ধার দিয়া আমার বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল; পুষ্করিণীর তীরে কতকগুলি নারিকেল গাছ—আর কতকগুলি খেজুর গাছ। এখন খেজুর রসের সময়; 'গাছী' গাছে উঠিয়া ঠিলি খুলিতেছে, এই ঠিলিতে সমস্ত রাত্রি রস সঞ্চিত হইয়াছে। কোন ঠিলির মুখে শ্যাকুলের কাঁটা;—রাত্রে গাছে বেঁজী উঠিয়া, এমন কি, ছোট ছোট গাছে শিয়াল পর্য্যন্ত উঠিয়া, রস খায়—তাহা নিবারণের জন্যই এই উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। আবার পথের ধারের খেজুর গাছের উপর রাখালদের অধিক দৃষ্টি,—দিনের বেলা তাহারা ঠিক করিয়া রাখে—কোন্ কোন্ গাছে সে দিন 'জিরেন কাট' হইয়াছে;—সন্ধ্যার সময় তাহারা দল বাঁধিয়া রস চুরি করিতে আসে। তিন দিন বিশ্রাম দিয়া যে দিন প্রথম গাছ কাটা হয়; সেই দিনের রসকে 'জিরেন কাটের' রস বলে,—এই রস সুমিষ্ট, সুস্বাদ ও সুপেয়। কিন্তু গাছীরা তাহাদের অভিসন্ধি জানে;—জিরেন কাটের দিন তাহারা ঠিলিতে অধিক মাত্রায় মানকচুখণ্ড রাখিয়া দেয়;—মানকচুর রসমিশ্রিত খেজুর রস পান করিলে কি আর রক্ষা আছে?—অশেষ যন্ত্রণার পর মুখ ফুলিয়া 'ঢাক' হইবে! কিন্তু এই বিভীষিকা সত্ত্বেও গ্রাম্য বালকগণ ও রাখালেরা মানকচুমাখা রসপানের লোভ ছাড়ে না।—ইহারা চিতা-গাছের বল্কলের নল প্রস্তুত করিয়া সেই নল লইয়া গাছে উঠে এবং ঠিলির রসে সেই নল স্পর্শ করাইয়া, তাহার অন্য দিকে মুখ লাগাইয়া ধীরে ধীরে রস শোষণ করে।—মানকচুমিশ্রিত রস কলসীর নিম্নে থাকে; উপরের রস অবিকৃত থাকায় তাহা পান করিলে মুখ চুলকায় না।

একটা বাঁকের • দুইদিকে দশ বারটা রসপূর্ণ ঠিলি

ঝুলাইয়া গাছী নবীন সর্দ্দার ব্যগ্রভাবে অন্য গাছের রস খুলিতে চলিয়াছে।—পুকুরের ধারে একটা অল্প পরিসর লম্বা ফুলের বাগান, বাগানে নানা রকম রঙ্গদার ফুল।—কণ্টক-গুল্মের বেড়ার ধারে—প্রথমেই ক্রোটনের বাহার, তাহার পর গাঁদা গাছের লম্বা লম্বা মাথা, অগণ্য 'হাজরা' গাঁদা ফুটিয়া আছে,—তাহার পাশেই 'কাশি' গাঁদার সারি—বেগুণে চক্রের ভিতর পীতের সোণালী আভা, বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। বড়গাছে স্থলপদ্ম ফুটিয়া আছে, থোকা থোকা স্থলপদ্ম ;—বনলক্ষ্মী কোমল চরণ দুখানি রাখিবেন বলিয়াই বুঝি প্রকৃতি-দেবীর এ আয়োজন। থোকা থোকা লাল স্থলপদ্ম দেখিয়া মায়ের সেই অলক্তকলাঞ্ছিত পা দুখানিই মনে পড়ে। দেখিলাম, বাচস্পতি মহাশয় পাতলা নামাবলী খানিতে দেহ আবৃত করিয়া পুষ্পচয়নে বাহির হইয়াছেন,—তাঁহার বাম হস্তে সাজি, দক্ষিণ হস্তে একখানি ছোট আঁকুশি। বাচস্পতি গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, শীর্ণ, বৃদ্ধ,—মস্তকে কেশরাশি তুষার-শুভ্র, মুখখানি দাড়িগোঁফবর্জ্জিত, মুখে সর্ব্বদা সরল মিষ্টি হাসি, যেন শিশুর মত ভাব, বয়স প্রায় সত্তর!—কিন্তু এই ঘোর জীবন-সংগ্রামের দিনেও তাঁহার মুখে সন্তোষ ও শান্তির অভাব নাই ;—তিনি চশ্‌মা না লইয়াও তাঁহার চির-আদরের 'আহ্নিককৃত্যম্' পাঠ করিতে পারেন,—তাঁহার তালপাতের পুঁথিগুলিও তিনি বিনা চশ্‌মায় অনর্গল পাঠ করিয়া যান,—তাঁহার একটি দন্তও স্থানচ্যুত হয় নাই! তিনি নিরামিষ-ভোজী, সর্ব্বদাই পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন,—এক জোড়া চটি জুতা, বা এক জোড়া খড়ম, তাঁহার শ্রীচরণ-কমলের অবলম্বন। কলিকাতায় দাঁত বাঁধাইবার দোকান আছে, এবং লোকে সেখানে গিয়া দাঁত বাঁধাইয়া আনে, শুনিয়া বাচস্পতি মহাশয় হাসিতে হাসিতে বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাঁহার কাছা খুলিয়া গিয়াছিল! আর একবার তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়াছিলাম ; একটা বার বছরের ছেলে চশ্‌মা চোখে দিয়া সিগারেট্ টানিতে টানিতে যাইতেছিল,—দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাসিয়াই আকুল! আমাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এঁ্যা! এ দিন দিন হ'ল কি?—এই সকল ইঁচড়ে পাকা বালখিল্যের নাতিরা নিশ্চয়ই বেগুণ গাছে আঁকুশি দিয়া বেগুণ পাড়িবে!"

যাহা হউক,—উহাদের নাতিরা আঁকুশি দিয়া বেগুণ পাড়ুক আর নাই পাড়ুক,—তিনি আঁকুশি দিয়া স্থলপদ্ম পাড়িতে লাগিলেন।—গাঁদা ফুলে—স্থলপদ্মে—জবা ফুলে তাঁহার সাজি ভরিয়া গেল।

ঘুরিতে ঘুরিতে নদীর ধারে উপস্থিত হইলাম ;—সঙ্কীর্ণ নদী,—নদীর জল অধিকাংশ স্থলেই শৈবাল-সমাচ্ছন্ন। নদীতীর বহুদূর পর্য্যন্ত শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ, তাহার উপর কএকটা বক বসিয়া এই প্রত্যূষে শিকার-সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নদীর জলের উপর শুভ্র বর্ণের কুয়াসা ভাসিতেছে। নদীকূলে কএকখানি জেলে ডিঙ্গি বাঁধা রহিয়াছে। স্নানের ঘাট জনহীন। দেয়াড়ের জমি ঢালু হইয়া ক্রমে জলে গিয়া মিশিয়াছে, নদীর ধার পর্য্যন্ত আবাদ হইয়া গিয়াছে ;—কেহ গম, কেহ ছোলা, কেহ বা অরহর বপন করিয়াছে। নদীকূলে দুই তিনটি পুরাতন ইটের পাঁজা,—পাঁজার উপর কালকাসিন্দা, লালভেরেণ্ডা ও ভাঁটের জঙ্গল। নদীর ধারে দুইটি প্রকাণ্ড ঝাউ গাছ, ক্রমাগত সন্ সন্ শব্দ হইতেছে—এক সময়, এই নদীতীর প্রকাণ্ড গঞ্জ ছিল, হাটের দিন কি লোকসমারোহই হইত! নদী ভরাট হইয়া বুজিয়া গিয়াছে ; ম্যালেরিয়ায় ও বিসূচিকায় গ্রাম শ্মশান হইয়াছে! গ্রামে কেবল ভদ্রাসনের ঢিপি—জঙ্গলে আবৃত। এক একটা ঢিপির পাশে—এক একটি বেল গাছ। সহজেই বুঝিতে পারা যায়—এগুলি বোধন-পূজার গাছ। সে কতদিন পূর্ব্বেকার কথা!—যখন এই সকল ঢিপি গ্রাম্য গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, সেখানে প্রতি বৎসর সমারোহে দুর্গোৎসব হইত, আর চণ্ডীমণ্ডপ-প্রান্তবর্ত্তী ঐ বোধন-গাছের তলায় শারদ ষষ্ঠীর দিন কত ধুম! ধূপ-ধুনার গন্ধে চণ্ডীমণ্ডপ পূর্ণ।—সন্ধ্যায় ঘৃতের প্রদীপের কি মৃদু আলোক!—যেন মায়ের স্নেহ গলিয়া—করুণার ধারা হইয়া—ঐ দীপের আলোকচ্ছটাকে এমন মোহময় করিয়া তুলিয়াছে!—কুশাসনে বসিয়া পণ্ডিতগণ চণ্ডীপাঠ করিতেছেন,—মা কমলা গৃহে গৃহে বিরাজিতা!—লক্ষ্মীর মত মেয়ের দল—শিউলী-ফুলে ছোপান পীত বসন পরিয়া—পূজার দালানে মাকে প্রণাম করিতে উঠিতেছে ; তাহাদের মুখে কেমন হাসির ভাব, হৃদয়ে কত আশা! মনে কত সুখ!—কোথায় সে সকল বালিকা?—তাঁহারা কত জন এখন যুবকের পিতামহী ;—তাঁহাদের শৈশবের কথা এখন তাঁহাদেরই স্বপ্ন মনে হয়। বাচস্পতি মহাশয়

বলেন, যখন তিনি তাঁহার মায়ের কোলে চড়িয়া পূজা দেখিয়াছেন—তখন গ্রামে ৮০।৯০ খানি দুর্গোৎসব হইত। তখন টাকায় আট সের তেল, আড়াই সের ঘি, বত্রিশ সের দুধ ছিল। তিনি বলেন, যে বৎসর চাউলের মন আঠার আনা হইতে পাঁচ সিকায় উঠিয়াছিল, সেই সময় তাঁহার পিতা টোলে গিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আর চাল কিনে সংসার প্রতিপালন করিতে পারিব না, পাঁচ সিকে চালের মণ ইহাও দেখিতে হইল!"—আমরা কি দেখিতেছি, তাহা বোধ হয় তাঁহারা কল্পনা করিতেও পারিতেন না।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া, আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। তখন সূর্য্যদেব পূর্ব্ব গগনে উদিত হইতেছেন,—প্রভাতের স্বর্ণালোক আম বাগানের উপর দিয়া আমার শিশিরসিক্ত গৃহ প্রাঙ্গণে পড়িয়া হাসিতেছিল,—নারিকেল গাছের পাতার প্রাতঃ-সূর্য্যালোক চিক্ চিক্ করিতেছিল,—এবং একটি মেটে ঘরের 'মটকার' উপর বসিয়া একটা দয়েল পাখী পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া নাচিতেছিল, আর সুমিষ্ট স্বরে গান করিতেছিল। আমার গৃহের সম্মুখবর্ত্তী রাজপথে তখনও পথিকের সমাগম হয় নাই,—কোনদিকে শব্দ মাত্র নাই, এই নিস্তব্ধ প্রভাতে দয়েলের এই সুমিষ্ট সঙ্গীত শুনিয়া মনে হইল,—সে আমাকে আমার পল্লী-ভবনে দীর্ঘকালের পর অভ্যর্থনা করিতেছে!

অবিলম্বে আমার আগমন-সংবাদে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।—বালকবালিকারা আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমার ছোট ছেলেটি তাহার লাল র‍্যাপার খানা মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা আমাল বন্দুক!"—তাহার একটি বন্দুকের ফরমাইস ছিল। ছোট বন্দুক নহে—বড় বন্দুক, যে বন্দুক দিয়া হনুমান্ মারা যায়।—আমাদের এ দিকে হনুমান নাই, মধ্যে মধ্যে দুই একটা যূথভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া পড়ে। খোকা কাহার মুখে শুনিয়াছিল—বন্দুক দিয়া হনুমান্ মারিতে পারা যায়। সেই সময় হইতে তাহার সখ—সে বন্দুক লইবে।

সুদীর্ঘ প্রবাসের পর মিলনানন্দে কএক ঘণ্টা কাটিয়া গেল!—আজ বড় দিন, একটু ভাল করিয়া বাজার করিতে হইবে ভাবিয়া নিধেকে সঙ্গে লইয়া বেলা প্রায় নয়টার সময় বাজারে বাহির হইলাম। বাজারটি বড় নহে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত,—একটি মেছো বাজার, অন্যটি তরকারীর বাজার। একটা ছাদের নীচে বাজার বসে। গ্রামের জমীদার এই 'ইষ্টকচন্দ্রাতপ' প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বাজারের অদূরে গ্রামদেবতা সর্ব্বমঙ্গলার ঘর। বাজারের তোলা তুলিয়া সেবাইৎগণ মায়ের ভোগ দেন। শনি মঙ্গল বারে অনেকে জোড়া ঢাক ও জোড়া পাঁঠা দিয়া মায়ের পূজা দিয়া যায়। বাজারে অনেকগুলি দোকান, কাপড়ের দোকানই অধিক।—অবশিষ্ট মনোহারীর দোকান, বেনে মসলার দোকান, পান তামাক, 'মণিহারী'র দোকান, ডাক্তারের দোকান, ময়রার দোকান, এমন কি, গাঁজা মদ আফিংএর আবগারি দোকানখানিও বাজারের এক প্রান্তে হংসমধ্যে বকের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

তরকারীর বাজারে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বে আমাদের এই পল্লী-অঞ্চলে বেগুন কখন সের দরে বিক্রয় হইত না, এখন এই পৌষ মাসেও এক সের বেগুনের দাম চারি পয়সা,—বড় বেগুন এক সেরে দুইটির অধিক ধরে না। পূর্ব্বে মূলা বিক্রয় হইত, এক পয়সায় পাঁচ সাতটি; তাহার উপর দুই তিনটি ফাউ পাওয়া যাইত। এখন তরকারী বিক্রেতা 'ফড়ে'রা বুদ্ধিমান্ হইয়াছে, দুই তিনটি মূলো এক সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে, নগদ মূল্য এক পয়সা,—তাহার উপর ফাউ চলে না। একটা লাউয়ের দাম পাঁচ পয়সা,—'সুখা' কুমড়ো আট দশ পয়সার কম দামে পাওয়া যায় না। পল্লীগ্রামের বাজারে পূর্ব্বে কখন লাউ কুমড়া কাটিয়া 'ফালি দিয়া' বিক্রয় হইত না,—এখন এক এক ফালি লাউ কুমড়া এক এক পয়সায় কিনিতে হয়। মেটে আলু, ওল, পুঁই শাক পর্য্যন্ত পল্লীগ্রামের বাজারে পড়িতে পায় না,—"অপরং বা কিং ভবিষ্যতি!"

দশ বার পয়সার তরকারী না কিনিলে একটি ছোট খাট পরিবারের দিন চলে না!—মাছের অবস্থা আরও শোচনীয়! মেছো বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মথরা মৎস্য-নারীরা সারি সারি বসিয়া মাছ বিক্রয় করিতেছে,—কেহ ঝুড়ি বোঝাই কুঁচো চিংড়ি বিক্রয় করিতেছে, চুপড়ীর পাশে এক রাশি কচুর পাত।—কোন জেলেনীর কোলে ছয় মাসের ছেলে, সে ছেলেকে স্তন্যপান করাইতেছে, ডালার উপর কতকগুলা আধপচা খয়রা বা পুঁটি মাছ।—বন্‌বন্ করিয়া মাছি উড়িতেছে, জেলেনী কোলের কাছে

এক বাটি জল লইয়া বসিয়া আছে, সেই জলে মধ্যে মধ্যে মাছগুলির গা পরিষ্কার করিতেছে, আর ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলিতেছে "আমার এ টাট্‌কা মাছ, ছ'আনা সের পাকী।"—আশ্চর্য্য! পুঁটি মাছ, খয়রা মাছও সের ছয় আনা দরে কিনিতে হইতেছে!—কই মাছ, খল্‌সে মাছ, সিঙ্গি মাছ কলিকাতাতেও ওজন দরে বিক্রয় হয় না,—পল্লী-অঞ্চলে তাহার মূল্য প্রতিসের আট আনা! দেখিলাম, একজন মেছুনী দাঁড়িপাল্লার একদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত 'বাটখারা' ও অন্য দিকে একটা কাঁসার বাটী চাপাইয়া সেই বাটীতে কৈ মাছ তুলিয়া বিক্রয় করিতেছে—জীবন্ত কই বাটী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কাণে হাঁটিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতেছে, ক্রেতা ও বিক্রেত্রী উভয়েই বিব্রত!

মেছোবাজারে দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সুবিখ্যাত জেলেনী পঞ্চার মা মাছের ঝোড়া মাথায় লইয়া বাজারে প্রবেশ করিল।—তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম, তাহার ঝুড়িতে ভাল মাছ আছে। দশজন ক্রেতা দূর হইতে তাহার অনুসরণ করিয়া—সে তাহার ঝোড়া নামাইবা মাত্র,—তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; সেই বূহভেদ করিয়া পঞ্চার মার সম্মুখে অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য?—বহু কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম—পঞ্চার মা আট দশটা বড় বড় গল্লা চিংড়ী আনিয়াছে।—পূর্ব্বে এক একটা বড় গল্লা চিংড়ীর দাম ছিল—ছয় পয়সা। এখন আর তাহা 'থাওকো' বিক্রয় হয় না।—শুনিলাম আজকাল আট আনা সের বিক্রয় হইতেছিল, এক সেরে তিনটির বেশী ধরে না। ক্রেতার অসম্ভব জনতা ও আগ্রহ দেখিয়া পঞ্চার মা হাঁকিল—"দশ আনা সের লইব!" গরজ বড় বালাই, স্থানীয় মুন্‌সেফী আদালতের তুই এক জন কর্ম্মচারী বাজারে ঘুরিতেছিলেন,—তাঁহাদের উপরি পয়সা। কেহ একটি কেহ তুইটি চিংড়ী মাছ ওজন করাইয়া দশ আনা হিসাবেই দাম ফেলিয়া দিলেন।—এমন সময় বকাউল্লা মণ্ডল সেই রঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশ করিয়া অবশিষ্ট গল্লা চিংড়ীগুলির ঠ্যাং চাপিয়া ধরিল, এবং সবগুলি ওজন করিতে বলিল। পঞ্চার মা—"বার আনা সের দিতে পার ত লও, তার কমে হবে না—" বলিয়া চিংড়ীর ল্যাজ ধরিয়া টানিতে লাগিল।—মিঞা সেই দরেই রাজী হইয়া সবগুলি কিনিয়া লইয়া গেল! মিঞার নবাবী চাল দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম, কারণ কিছু দিন পূর্ব্বেও তাহার সংসারিক অবস্থা ছিল—"নুন আন্‌তে পান্‌তা ফুরায়, পান্‌তা আন্‌তে নুন!"—কিন্তু এবার তাহার ক্ষেত্রে প্রায় বিশ মণ পাট হইয়াছে, প্রতিমণ পাট সে নগদ বার টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে, সুতরাং সে আর পয়সাকে পয়সা জ্ঞান করিতেছে না!—স্থানীয় জমীদার পতিত পাবন বাবু বিখ্যাত ঔদরিক, উদর-দেবের সেবার জন্যই তাঁহার ক্ষুদ্র জমীদারীটুকু বন্ধক পড়িয়াছে,—জমীদারী বন্ধক দিয়া তিনি ঘি তুধ পাকা মাছ ও গল্লা চিংড়ী ভোজন করেন, তিনি অনেকক্ষণ হইতে তুই একটি চিংড়ী কিনিবার প্রত্যাশায় একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন; শিকার হাত-ছাড়া হইল দেখিয়া তিনি ক্ষোভে তুঃখে বলিয়া উঠিলেন,—"ছোট লোকের হ'য়েছে পয়সা,—আমাদের দেখ্‌ছি না খেয়ে মর্‌তে হ'বে।"

নগদ সাড়ে চৌদ্দ আনা খরচ করিয়া যৎসামান্য 'বাজার' সংগ্রহপূর্ব্বক বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় বাড়ী ফিরিলাম। তাহার পর ঘরের দাওয়ায় বসিয়া উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দনপূর্ব্বক নদীতে স্নান করিতে চলিলাম।

আমাদের বাড়ী হইতে সোজা পথে নদী এক পোয়া হইবে।—সঙ্কীর্ণ বনপথ, পথের উভয় পার্শ্বে ভাঁট, আশ্‌-শ্যাওড়া ও কাল কাসিন্দার জঙ্গল, আম-কাঁটালের বাগান, বাঁশের ঝাড়, তেঁতুল গাছ। 'মালো-পাড়া'র ভিতর দিয়া আমাদিগের স্নানের ঘাটে যাইতে হয়, পথের ধারেই মালোদের বাড়ী,—কাহারও বাড়ীতে একখানি, কাহারও বাড়ীতে তুই খানি 'মেটে ঘর' মাটীর দেওয়াল, উপরে উলুখড়ের চাল। কোন কোন মালো উঠানে বাঁশ পুঁতিয়া তাহাতে প্রকাণ্ড জাল শুকাইতে দিয়াছে, কেহ উঠানের কোণে 'চেটাই' বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া একমনে জাল বুনিতেছে। মালোনীরা কেহ লোহার হাতায় অন্য বাড়ী হইতে এক হাতা আগুন লইয়া আসিতেছে, কেহ পিতলের 'ঘড়া' লইয়া নদীতে স্নান করিতে যাইতেছে;—তাহার কাঁধে গামছা, গামছার এক কোণে ঘুঁটের ছাই—স্বদেশী 'টুথ পাউডার'—ঘড়ার মুখে তৈলের ছোট বাটী, বাটীতে একটু তেল; কাহারও কোলে একটি ছেলে, একটা উলঙ্গ মেয়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। পল্লী-রমণীরা স্নানশেষে 'সিক্তবাস লিপ্ত দেহে' কলসীকক্ষে গৃহে ফিরিতেছেন, এবং ষষ্ঠী-তলায় আসিয়া কলসীর একটু জল বৃক্ষমূলে

ঢালিয়া ষষ্ঠী-ঠাকুরাণীকে প্রণাম পূর্ব্বক গৃহমুখে অগ্রসর হইতেছেন।

স্নানের ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঘাটের দুর্দ্দশার সীমা নাই! গ্রাম্য মিউনিসিপালিটীর দৃষ্টি কখন কোন ঘাটের দিকে পতিত হয় না। ট্যাক্স-আদায় ও কুপোষ্য-প্রতিপালন আমাদের 'পল্লী-পলিটিক্সের' মূল-মন্ত্র।

স্নানের ঘাটে এখন এক-বুকের অধিক জল নাই—এক-হাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া সেই জলে নামিতে হয়। দশ-বার হাত স্থান ব্যাপিয়া লোকে স্নান করে—জলের মধ্যে সেই টুকুই কিছু পরিষ্কার; তাহার চারিদিকে টোপাপানা ও শ্যাওলার জঙ্গল। টোপাপানায় জলরাশি সমাচ্ছন্ন।—মেয়েদের ঘাটের অবস্থা আরও শোচনীয়, তাই সাধারণ গৃহস্থের মেয়েরা অগত্যা এই পুরুষদের ঘাটেই স্নান করিতে আসে। দেখিলাম, কোন বর্ষীয়ান্ স্নান-শেষে আবক্ষ জলে দাড়াইয়া আহ্নিক করিতেছেন; দুই একটা দুষ্ট ছেলে এই দারুণ শীতের দিনেও মহা উৎসাহে জলক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে—ডুব-সাঁতার দিয়া, জল ঘোলা করিয়া স্নানার্থিগণের স্নানের ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেছে। কোন রমণী অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়াই—উভয় কর্ণবিবরে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া—'ভুস্ ভুস্' করিয়া ডুব দিতেছে, তাহার পিত্তলের ঘড়াটি পরিধেয় বস্ত্রের প্রসারিত অঞ্চলে আহত হইয়া কিছু দূরে ভাসিতেছে।—কোন রমণী কতকগুলি ময়লা কাপড় ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া একখানা কাঠের পিঁড়ির উপর রাখিয়া তাহা কাচিতেছে, কেহ বা জলমধ্যস্থিত একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া তৈল মাখিতেছে।—জলের ধারে ছোট ছোট ঝরণা, ঝরণার মুখ হইতে শীতল জল ও কাল বালি উদ্গত হইতেছে,—আর দুই তিনটি ছেলে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ঝরণার ভিতর পা পুরিয়া দিতেছে; ঝরণার মধ্যে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিলে, তাহারা উভয় হস্তে মাটী ধরিয়া পা দু'খানি টানিয়া তুলিতেছে।—দুই তিনটি ঘোড়া নদীর ধারে নামিয়া কল্মীলতা ভক্ষণ করিতেছে, ঘোড়াগুলির সম্মুখের দুই পা দড়ি দিয়া বাঁধা।—স্নানের ঘাটের কিছু দূরে দুই তিন জন ধোপানী পাটে ময়লা কাপড় আছড়াইতেছে, কেহ কেহ বা ঢালু চরের উপর কাপড় শুকাইতে দিতেছে।—একজন জেলে খ্যাপ্‌লা জাল ফেলিয়া পুঁটি, চ্যালা, কাঁক্‌লে প্রভৃতি মাছ ধরিতেছে। একখানি জেলে-নৌকার মাস্তুলের উপর বসিয়া একটা শঙ্খচিল—রোদ পোহাইতেছে, আর 'চী-ঈ' চী-ঈ' শব্দ করিতেছে; একটা চারি বৎসরের ছেলে নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—"শঙ্খচিলের ঘটিবাটি—গোদা চিলের মুখে নাথি।"

এইরূপ বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে স্নান শেষ করিয়া মহাপঙ্ক অতিক্রম পূর্ব্বক কম্পিত-দেহে গৃহে ফিরিলাম। এই দারুণ শীতেও অবগাহন স্নানে শরীর স্নিগ্ধ হইল।—নদী হইতে বাড়ী আসিবার সময় পথিপ্রান্তে নবীন সদ্দারের খেজুরে গুড়ের বাইনের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল! নবীনের চারিচালা মেটে ঘরের পাশে কএক গজ স্থান খেজুর পাতার 'টাটি' দিয়া ঘেরা,—তাহারই মধ্যে গুড়ের 'বাইন', অর্থাৎ খেজুরের রস জ্বাল দিবার স্থান। নবীন ও তাহার পুত্র সেখানে গুড় প্রস্তুত করিতেছিল।—প্রকাণ্ড দুইটি উনান, তাহার উপর দুইখানি 'খোলা', অর্থাৎ মৃণ্ময় ডেক্‌চি; খোলায় রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে। পল্লীগ্রামের পথেঘাটে যে সকল আশ্‌শ্যাওড়া, ভাঁট প্রভৃতি গুল্ম দেখিতে পাওয়া যায়—নবীন ও তাহার পুত্র অবসর-মত সেই সকল কাটিয়া রাখিয়া আসে—তাহা শুষ্ক হইলে একত্র করিয়া, দড়ি বাঁধিয়া, স্তূপাকারে বাড়ী লইয়া আসে। গুড় জ্বাল দিবার জন্য সেই শুষ্ক আগাছা ব্যবহৃত হয়। কএক ঘণ্টা ধরিয়া রস জ্বাল দেওয়া হইলে, রস গাঢ় হইয়া, গুড়ে পরিণত হয়। গুড় প্রস্তুত হইলে নবীন এক খোলা গুড় বিক্রয়ের জন্য কলসীতে ঢালিয়া রাখিল; এই গুড় কিছু অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইলে পাইকারী দরে সে তাহা বিক্রয় করিবে,—আর যাহাদের গাছ 'কাটে', তাহাদিগকে খাজনা দিবে। প্রত্যেক খেজুর গাছের খাজনার পরিমাণ তিন আনা;—যাহারা নগদ পয়সা না লয়, তাহাদিগকে তিন সের গুড় দিতে হয়। কার্ত্তিকমাস হইতে ফাল্গুনমাস পর্য্যন্ত গাছ 'কাটিয়া' রস সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক গাছে এই কয় মাসে ন্যূনকল্পে ত্রিশ সের গুড় হয়, তাহার খাজনা নগদ তিন আনা—বা তিনসের গুড়! আবার গুড় যখন খুব সস্তা হয়, তখনই 'গাছি' বা খাজনা দেয়, তাহার পূর্ব্বে দেয় না। সুতরাং, ইহা যে বেশ লাভের ব্যবসায়—একথা না বলিলেও চলে।—পল্লী-অঞ্চলে অনেক জমী অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে,

তাহা জমা লইয়া যদি গৃহস্থেরা খেজুরগাছের আবাদ করেন, এবং স্বয়ং লোক রাখিয়া গুড় প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অল্পায়াসেই তাঁহারা বেশ লাভবান্ হইতে পারেন। এমন কি—যাহাদের বড় বড় বাগান আছে, তাহারা বাগানের চারিদিকে দুই চারিশত খেজুর গাছ রোপণ করিয়া—গুড়ের কারবারে—অল্পদিনেই বাগান প্রস্তুতের ব্যয় তুলিয়া লইতে পারেন। কিন্তু সেদিকে পল্লী-অঞ্চলের অধিক লোকের দৃষ্টি নাই; 'গাছী'দের গাছ জমা দিয়া প্রত্যেক গাছে তিন সের গুড় লইয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট!—নবীনের মত কষ্ট-সহিষ্ণু 'গাছী'রা এই কএক মাসে বেশ দু' টাকা লাভ করে। দেখিলাম, সে এক খোলা গুড় দ্বারা 'গুড়সরা' প্রস্তুত করিল। সহরাঞ্চলে জিনিসটি সাধারণতঃ 'গুড়ের পাটালি' নামে অভিহিত। —গুড় জ্বাল দিয়া বেশ ঘন হইলে তাহা নামাইয়া সেই খোলায় 'বীজ' নিশ্রিত করা হয়। এই 'বীজ' দলা গুড় ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বীজ, খোলার গুড়ে মিশাইয়া, তাড় দিয়া ক্রমাগত নাড়িতে নাড়িতে জমাট বাধিয়া যায়। রস-সংগ্রহের জন্য যে সকল কলসী থাকে—তাহা শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখিয়া—তাহাদের মধ্যে একখানি কাপড় প্রসারিত করিয়া, নবীন তৎপরতার সহিত খোলার গুড় কলসীর মুখস্থিত বস্ত্র খণ্ডের উপর ঢালিয়া যাইতে লাগিল, আর সেই গুড় শীতল হইয়া জমিয়া শক্ত হইল। কএক মিনিট পরে সেই গুড় তুলিয়া লইলেই 'সরাগুড়' হইল। এক একখানি 'সরাগুড়' কাঁচি আধ পোয়ার অধিক নহে, তাহার মূল্য এক এক পয়সা।—গাছীরা এক এক দিনে এক খোলায় এইরূপ আট দশ গণ্ডা সরাগুড় প্রস্তুত করে, বাজারে লইয়া যাইবামাত্র তাহা বিক্রয় হইয়া যায়! অনেকে গৃহস্থ বাড়ীতেও তাহা ডালায় করিয়া বিক্রয় করিতে যায়। পল্লীরমণীগণ তাহা কিনিয়া, হাঁড়ীতে পূরিয়া, কুটুম্ববাড়ী 'তত্ত্ব' পাঠান।—কোন কোন সৌখিন ব্যক্তি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বন্ধুবান্ধবদের উপহার প্রদানের জন্য ফরমাইস্ দিয়া যে সরাগুড় প্রস্তুত করাইয়া লন, তাহাতে কর্পূর, ছোট এলাচের গুঁড়া প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়। তাহার আস্বাদনও বড় মধুর!—সকলের গুড় সমান ফর্সা হয় না; কেহ কেহ সরাগুড় এরূপ 'ফর্সা' করিতে পারে—যে তাহা চিনির প্রস্তুত বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাদের গুড়ের আদরও খুব বেশী। নবীন বলিত, "কর্ত্তা, সকলেই কি সরাগুড় কর্‌তে জানে? ওর এমন তাক্ আছে যে, আধা ছানার কাঁচা গোল্লা ফেলে আপনি গুড়ই খাবেন।—তবে কথা কি জানেন কর্ত্তা, মেহন্নতের মজুরী দেয় কে? সকলেই সস্তা খোঁজে, খদ্দেররা মুড়ী মিছরীর একদর করে, কাজেই বেগারে রকমের কাজ করতে হয়।"—দেখিলাম নবীনের খোলার কাছে পাড়ার এক ঝাঁক ছেলে জুটিয়াছে, তাহারা 'জামাল কোটা'র পাতা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে! নবীন কাহাকেও বঞ্চিত করিল না,—তাহার 'খোলা' হইতে এক 'ওড়ং' (বংশদণ্ডবিশিষ্ট নারিকেল-মালার হাতা) গুড় তুলিয়া শিশু-অতিথিগণের মধ্যে বিতরণ করিল। শিশুর দল সেই গুড় চাটিতে চাটিতে মহাহর্ষে গৃহে চলিল!

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর কএক ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম। শীতের বেলা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। অপরাহ্নে ভ্রমণে বাহির হইলাম। গ্রামের বাহিরে মাঠ, গ্রাম্য পথ অতিক্রম পূর্ব্বক, আমকাঁটালের বাগানের ভিতর দিয়া মাঠে প্রবেশ করিলাম। মুক্ত প্রকৃতির কি মনোহর দৃশ্য,—দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল মাঠ, গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী প্রান্তর এখন নানা শস্যে পূর্ণ, চারিদিকেই রবি শস্যের আবাদ হইয়াছে। কোথাও ইক্ষু, কোথাও অড়হর, কোথাও বা ছোলা, মটর, শর্ষপ, গোধূম। দেখিলাম মুক্ত প্রান্তরে দলেদলে স্ত্রীলোক—কেহ বড় বড় ঝোড়ায়, কেহ বস্তায়—ঘুঁটে কুড়াইতেছে; এই ঘুঁটে জ্বালাইয়া তাহারা ভাত রাঁধিবে।—গরীব লোক, পয়সা দিয়া কাঠ কিনিতে পারে না, কাঠও দিন দিন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। আমকাঁটালের প্রাচীন বাগানগুলি নির্ম্মূলপ্রায়। যাহাদের দুই একটি বাগান আছে—অথচ আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল নহে—তাহারা গাছগুলি কাটিয়া বিক্রয় করিতেছে; পূর্ব্বে যেখানে বড় বড় বাগান ছিল—এখন সেখানে খোলা-মাঠ! পূর্ব্বে এক টাকায় একগাড়ী কাঠ মিলিত, এখন দুই টাকাতেও পাওয়া যায় না,—আধ গাড়ী কাঠ এক গাড়ী বলিয়া গাড়োয়ানেরা বিক্রয় করিয়া যায়!—ক্রেতা যদি অসন্তোষ প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ বলে, "কর্ত্তা, সাত টাকা চা'লের মণ!—কোত্থেকে সস্তা দিই?—আপনার না পোষায়, আপনি নেবেন না!"—কিন্তু না পোষাইলেও লইতে হয়—নতুবা যে উনান জ্বলে না।

এই সকল তত্ত্বকথার আলোচনা করিতে করিতে, কএক

বন্ধুতে যখন মাঠ হইতে গ্রামের দিকে ফিরিলাম—তখন সূর্য্য অস্তগমন করিয়াছেন। অস্তমিত তপনের লোহিত রশ্মি জালে পশ্চিম গগন সুরঞ্জিত। গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী বাগানগুলি দূর হইতে গাঢ় মেঘের মত ধূসর দেখাইতে লাগিল,—তাহার উপর পশ্চিমাকাশে হিরণ্ময় বর্ণচ্ছটা, যেন বহুদূরবর্ত্তী অসমান গিরিশৃঙ্গগুলি গগনপ্রান্ত চুম্বন করিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল। মাঠের ভিতর স্থানে স্থানে আমন ধানের 'খোলা।' খোলার নিকট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিচালীর স্তূপ,—কৃষকেরা ধান কাটিয়া সেখানে 'পালা' দিয়া রাখিয়াছে। সমস্তদিন বিচালী হইতে খোলায় ধান ঝাড়িয়াছে, সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তাহারা গৃহে বস্তায় পুরিয়া গরুর গাড়ীতে তুলিতেছে। দারুণ শীতে একটু গরম হইবার জন্য কেহ কেহ খোলার অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়াছে। চারি পাঁচ জন কৃষক ও রাখাল বালক অগ্নিকুণ্ডের চারি দিকে চক্রাকারে বসিয়া অগ্নিসেবন করিতেছে,—আর তাহাদের শান্তিপূর্ণ সরল পল্লীজীবনের সুখদুঃখের গল্প বলিতেছে!—কেহ কেহ তামাক সাজিয়া ডাবা হুঁকায় ধূমপান করিতে করিতে নিবিষ্টচিত্তে সেই সকল গল্প শুনিতেছে, আর সংক্ষেপে দুই একটি মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে।

ক্রমে আমরা মাঠ ছাড়িয়া পথে আসিলাম,—দেখিলাম এক একজন রাখাল এক এক পাল গরু চরাইয়া মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। তাহাদের হাতে 'পাচন' পায়ে 'নাদা', কাহারও কোঁচড়ে কতকগুলি লঙ্কা মরিচ, কেহ বা গোটাকত 'আহরী'র (অড়হর) ডাল ভাঙ্গিয়া তাহার কাঁচা দানা চিবাইতে চিবাইতে গরুর পাল তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। কোন কোন রাখাল বালকের পালে পাঁচ সাতটা মহিষ,—রাখাল সেই মহিষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 'গোঠ' হইতে গৃহে ফিরিতেছে। গো-মহিষের ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে সন্ধ্যার আকাশ ধূসরিত। রাখাল বালকের মেঠোগানে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। একটি দুইটি করিয়া ক্রমে অনেক গুলি নক্ষত্র আকাশে ফুটিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম প্রান্তে আমকাঁটালের বাগানের অন্তরালে কৃষক কুটীরে মৃৎ-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল; ঘন বৃক্ষপত্রের ব্যবধান-পথে সেই সকল প্রদীপের আলোক বহুদূর হইতে দেখা যাইতে লাগিল। গরুগুলি আমাদের আগে আগে যাইতেছিল, উড্ডীয়মান ধূলি পটলের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া আমরা তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইলাম। পুরু কোটের উপর র‍্যাপার, তথাপি পৌষের শীতে [illegible] কিন্তু ঐ সকল গৃহ প্রত্যাগত রাখাল বালকের নগ্ন দেহ, কেহবা কাপড়ের 'খুঁড়' টুকু গায়ে জড়াইয়াছে মাত্র, কিন্তু শীত তাহাদের নিকট ঘেঁসিতে পারিতেছে না। শীতের প্রতাপ তুচ্ছ করিয়া তাহারা কেমন হাসিয়া খেলিয়া গরু লইয়া পথে চলিয়াছে। গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া কোন কোন পয়স্বিনী গাভী 'খোয়াড়ে' অবরুদ্ধ বৎসের জন্য হাম্বা রব করিতে লাগিল,—সে স্বরে কি আগ্রহ, কি বেদনা মিশ্রিত!—তাহা কেবল অনুভব যোগ্য। দুই একটা ছোট বৎস পথভ্রষ্ট হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া 'বা'—'বা' করিতে লাগিল। রাখাল দৌড়াইয়া গিয়া তাহাদিগকে পালের মধ্যে লইয়া আসিল! মাঠে বাঘের ভয় বড় বেশী, সন্ধ্যার সময় তাহারা আম-কাঁটালের বাগানে, অড়হর ক্ষেতে, বা বাঁশের ঝাড়ে 'ওৎ' পাতিয়া বসিয়া থাকে,—কোন বাছুর দলভ্রষ্ট হইলেই ব্যাঘ্র মহাশয় তাহাকে আক্রমণ করিয়া দূর বনে টানিয়া লইয়া যা'ন!

আমরা গ্রামে প্রবেশ করিবার কিছু পরে, প্রায় এক পোয়া পথ দূরে, বনের মধ্যে একটি গাভীর আর্ত্তনাদ শুনিলাম!—সে দিকে বাগান, বাগানে হাতী লুকাইতে পারে এমন জঙ্গল;—একটি রাখাল বলিল, "বাবু চারপেয়েতে গরু ধরেছে।"—'চারপেয়ে' অর্থাৎ বাঘ, রাখাল কৃষাণেরা সন্ধ্যার পর বাঘের নাম করে না, 'চারপেয়ে' বলে। রাখালের কথা শেষ হইতে না হইতেই বাঘের হুঙ্কার শুনিতে পাইলাম! যে দিক হইতে বাঘ-গর্জ্জন শ্রুত হইল, সেই দিকে—বাগানের পাশেই—বাগ্দী-পাড়া। পাড়ার লোকেরা বাঘের সাড়া পাইয়া টিন্ বাজাইতে ও 'হুলুই দিতে' (সমস্বরে চীৎকার করিতে) লাগিল!—বাঘে গরু বাছুর ধরিলে, বাঘ তাড়াইবার জন্য, তাহারা এই উপায় অবলম্বন করে—ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র কিন্তু এই প্রকার 'সাত্ত্বিক' ভয় প্রদর্শন বড় গ্রাহ্য করে না! এমন কি, সন্ধ্যার পর লোকের ঘরে প্রবেশ করিয়াও বাছুর, ছাগল, ভেড়া মুখে করিয়া লইয়া যায়!—গোলমাল শুনিয়াও বাঘ গরুটিকে ছাড়িল না, তিন চারিবার গরুটির আর্ত্তনাদ শুনিলাম,—তাহার পর সব স্থির! পর দিন

শুনিতে পাইলাম, ব্যাঘ্রবর গরুটিকে মারিয়া একটি পুকুরের ধারে লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিয়াছেন! একটি বন্ধু বলিলেন, কএক দিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিবেশী পাল্‌জীর একটি বড় বাছুর বাড়ীর বাহিরে চরিতেছিল,—পালজী মনে করিয়াছিল, একটু বেশী রাত্রে শয়নের সময় তাহাকে গোয়ালে তুলিবে। রাত্রি দশটার সময় পাল্‌জী আহারে বসিবে—এমন সময় সে হঠাৎ 'ঝপ্' শব্দ শুনিতে পাইল!—তাহার পরই তাহার বাছুর 'গ্যাঙ্‌য়াইয়া' (আর্ত্তনাদ করিয়া) উঠিল!—পাল্‌জী আলো ও লাঠি লইয়া বাহিরে আসিয়া বাছুরের চিহ্নও দেখিতে পাইল না—অনুসন্ধানে কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না!—পর দিন সকালে দেখা গেল, অদূরবর্ত্তী শর্ষপ ক্ষেত্রে—একটা তালগাছের নীচে—বাছুরটির অর্দ্ধভুক্ত দেহ পড়িয়া আছে!—দুই বৎসরের বাছুরটিকে মুখে তুলিয়া বেড়া লাফাইয়া এতদূরে লইয়া যাওয়া অল্প শক্তির কাজ নয়! বাঘে ছাগল বা বাছুরের গলা কামড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে পিঠে ফেলিয়া দৌড়াইতেছে,—এমন দৃশ্য আমাদের পল্লী অঞ্চলে এই শীতকালে সন্ধ্যার পর অনেকেই দেখিয়াছে!

সন্ধ্যা ছয়টার পর গোপপল্লীর ভিতর দিয়া গৃহে ফিরিলাম। গোয়ালারা গোয়ালঘরে সাঁজাল দিয়াছে, ধূমে চতুর্দ্দিক পূর্ণ। যে সকল গোয়ালা বেশ মাতব্বর—তাহারা বাড়ীর সম্মুখে খানিকটা জায়গা বাঁশ দিয়া ঘিরিয়া 'খোঁয়াড়' প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে;—সেই খোঁয়াড়ে পনের কুড়িটা গাই বলদ—কোনটা শুইয়া কোনটা দাঁড়াইয়া আছে; অগ্নিকুণ্ডে গণ্ গণ্ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, আর আট দশ জন গোপ সেই অগ্নিকুণ্ডের চারি ধারে বসিয়া আগুন 'পোহাইতেছে',—গল্প করিতেছে,—কেহ কেহ তামাক খাইতেছে!—কাহারও গায়ে একখানি ছেঁড়া কাঁথা, কাহারও গায়ে মার্কিনের ময়লা চাদর, বা একটা গেঞ্জি। কোন কোন অবস্থাপন্ন সৌখীন গয়লার গায়ে অল্পমূল্যের কম্বল, বা কাবুলীদের নিকট ধারে কেনা র‍্যাপারও, দেখা গেল। কাবুলীরা ইহাদের কাছে পাঁচ সিকা দামের গায়ের কাপড় 'বড় সরেশ মাল' বলিয়া সাড়ে চারি টাকায় গতাইয়া যায়, এবং চৈত্রমাসে ঘাড়ে লাঠি লইয়া আসিয়া টাকা আদায় করে। দেখিলাম, কোন কোন গোপবধূ গৃহ-প্রাঙ্গণে উনান কাটিয়া তুষের আগুনে ধান সিদ্ধ করিতেছে,—আর তাহার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা অন্ধকারের মধ্যেই লুকোচুরী খেলা করিতেছে; তাহাদের কলহাস্যে গৃহ পূর্ণ। গৃহ-প্রাঙ্গণের ক্ষুদ্র গোলাটি ধানে পূর্ণ,—পাশে প্রকাণ্ড 'বিচালী'র গাদা,—গোশালায় পাঁচ ছয়টি দুগ্ধবতী গাভী। গোপবধূরা অসন্তোষ বা অশান্তি কাহাকে বলে জানে না। হাতে এক জোড়া রূপার পৈঁছে, নাকে একটা সোনার নথ পাইলেই তাহারা মনে করে, তাহাদের জীবনের সকল পূর্ণ উচ্চাভিলাষ হইয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ়তর হইল।—তাঁতি-পাড়ায় খোল করতালের ধ্বনি উত্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ত্তনের সুর বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।—স্থানীয় সখের যাত্রার দলের বাড়ীতে 'রিহার্স্যাল্,' আরম্ভ হইল। সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর গ্রাম্য শ্রমজীবির দল এই রিহার্স্যালে যোগদান করিয়াছে,—রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত তাহাদের বক্তৃতা ও গান চলিল।

রাজপথ অন্ধকার পূর্ণ,—সন্ধ্যার পর পথে অধিক লোক চলে না।—দত্ত-পাড়ার সাধু ধুনুরী লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে শ্রীবাস ঘরামীর বাড়ী 'দশপঁচিশ' খেলিতে চলিয়াছে; সে গান করিতে করিতে যাইতেছে,—

"কার সাধ্য ও মা সীতে, তোমার রন্ধন দূষিতে,
তুমি সীতে—তুমি অসীতে, তুমি অন্নদা কাশীতে—

তাহার তাল-লয়-হীন সুর দূরাগত মৃদঙ্গধ্বনি ও 'রিহার্স্যালে'র গান ডুবাইয়া দিল!—বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তুলসীতলায় মাটির প্রদীপটি মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে; একটা শৃগাল উঠানে দাঁড়াইয়া রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া আছে—তাহার সন্ধান পাইয়া ভুলো কুকুরটা বীর-দর্পে তাহার অনুসরণ করিল। ঘরের মধ্যে বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা ঠাকুর-মাকে ঘিরিয়া বসিয়া 'ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী'র গল্প শুনিতেছে,—দেখিয়া শৈশবকালের বহু পুরাতন এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়িয়া গেল!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভারতের অসিদ্ধ-ধন

সকল দেশেরই সমাজ-তন্ত্র এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, সমাজভুক্ত এক শ্রেণী বিনাশপ্রাপ্ত বা বিনষ্ট-প্রায় হইলে সামাজিক অন্যান্য শ্রেণীও তৎ-ফলভোগী হয়। আমাদের দেশে কলাজীবীর সংখ্যা যে হ্রাস হইয়াছে—দেশীয় কলার যে অধোগতি ঘটিয়াছে, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। শিল্প-বিস্তার-কল্পে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ১৯০৩ সালে যে কমিশন্ নিযুক্ত করেন, তাহার বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, তাৎকালিক সমগ্র ভারতের ২৪ কোটি অধিবাসীর মধ্যে—

তুলার কার্য্যে	৫৮ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল	
বেত্রবংশাদির ব্যবসায়ে	১২ „	„
ধীবর ...	২৩	জন ছিল
চর্ম্মকার ...	২১	„ „
সূত্রধর ...	২০	„ „
কুম্ভকার ...	১৬	„ „
তৈলকার ...	১৫	„ „
স্বর্ণকার ...	১৩	„ „
কর্ম্মকার ...	১২	„ „

অর্থাৎ, এই প্রধান ৯ প্রকার শিল্প-কার্য্যে লিপ্ত ছিল মোট ১,৯০ লক্ষ অধিবাসী; অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিল—অধিবাসীর সংখ্যা হিসাবে মোটের উপর প্রায় শতকরা ১০ হইতে ১২ জন লোক। অবশিষ্ট অধিবাসী, অধিকাংশই কৃষিজীবী ও মসীজীবী। একপ্রকার কার্য্যে সমধিক লোক ব্যাপৃত থাকিলে, তাহার আয় স্বতঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।—ঘটিয়াছেও তাহাই! এই কারণেই বর্ত্তমানকালে কৃষিজীবী এবং মসীজীবিগণের পর্য্যন্ত দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। আবার কৃষিজীবী অপেক্ষা মসীজীবীর সংখ্যা অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হওয়ায়, মসীজীবীদিগের অবস্থাই অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে!

কলাজীবী যে এদেশে নাই, তাহা নহে—যখন সমাজ রহিয়াছে তখন অল্প-বিস্তর কলাজীবী অবশ্যই থাকিবে; আবার কলাজীবী ও কৃষিজীবী আছে বলিয়াই সমাজ রহিয়াছে—লোকের গ্রাসাচ্ছাদন, বসন-ভূষণ সরবরাহ-কার্য্য প্রভৃতি চলিতেছে! কিন্তু অধিবাসি-সমষ্টির তুলনায় কলাজীবীর সংখ্যা যে নিতান্তই অল্প—পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

সমাজে শ্রেণী-বিভাগ অনিবার্য্য।—সমাজবদ্ধ জাতিমাত্র উন্নত হইলেই, সে এক একটা শ্রেণীকে এক এক রকম বিশেষ কাজে নিযুক্ত করে। জাতি উন্নতির দিকে অধিকতর অগ্রসর হইলে, এই কাজগুলি বংশানুক্রমিক হইবার প্রবণতা জন্মে। প্রত্যুত:, বর্ণ-বিভেদ-প্রথা শ্রেণী বিশেষের নির্দ্ধারিত কার্য্যাবলীর ভিত্তির উপর গঠিত; বহুপুরুষানুক্রমে একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিরত থাকিলে সেই কার্য্য বা ব্যবসায় সম্বন্ধে সেই বংশজাত ব্যক্তি একটা উৎকর্ষ লাভ করে। আমাদের দেশের অনেকানেক কলা লুপ্ত-প্রায় হইলেও,—কলাজীবীদিগের বংশধরবিশেষ কালেক্টরের পদাভিষিক্ত হইলেও—কোনও কলাই প্রকৃতপক্ষে এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। দৈববিড়ম্বনায় কলাজীবি-বিশেষ কিছুদিন আত্মবিস্মৃত হইলেও, তাহার পিতৃপুরুষ-উপার্জ্জিত ধর্ম্ম তাহাকে ত্যাগ করে নাই। সে ধর্ম্ম, পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইয়া, বর্ত্তমান কলাজীবি-বংশধরের মস্তিষ্ক ও হস্তে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান আছে। যত্ন চেষ্টা করিলে—পুনরায় অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে—আবার সহজে সে সকল সহজ-সংস্কার পূর্ণমাত্রায় প্রকাশমান হইতে পারে।

দেশের কলার বিস্তার-কল্পে সর্ব্বপ্রথমে—(১) দ্রব্য-উৎপাদন, এবং (২) উৎপন্ন-দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, এতদুভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—যেখানে সমাজ আছে, সেইখানেই কলা আছে। উৎপন্ন-দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যোৎপাদিকা শক্তিও বর্দ্ধিত হয়। আমাদের দেশে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই, নানাবিধ কলা প্রচলিত আছে। বৈদিক কালে,—ঋগ্বেদ প্রভৃতিতে কুঠার, বর্ষা, ছুরিকা, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ আছে।* ঋভুগণ কাষ্ঠ ও ধাতব দ্রব্য-নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যে ত্বষ্টাকে পরাভূত—লজ্জিত—করিয়াছিলেন! নৌ-নির্ম্মাণ, রজ্জু-প্রস্তুত-করণ,

* ঋগ্বেদ—১ ঋক্ ১২৭, ৩ সূক্ত; ৬ ঋঃ ৩, ৫ সূঃ; ১০ ঋ, ৫৩, ৯ সূঃ ইত্যাদি।

চর্ম্ম-দ্রব্যাদি-প্রণয়ন প্রভৃতির বিষয় ঋগ্বেদে বারংবার উল্লেখিত আছে।* তদ্ব্যতীত বর্ম্ম, বিচিত্র ও মূল্যবান্ পরিচ্ছদাদি, শতশতস্তম্ভসমন্বিত সহস্রদ্বার দেব প্রাসাদ, স্বর্গবাসীদিগের রত্নালঙ্কার প্রভৃতির বর্ণনা দৃষ্টেও স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ঋষিগণ সেই সকল কারুকার্য্যাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন।

মনুসংহিতাকারের কালে সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ নব-কারুকলার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাৎকালিক আর্য্যগণ তাম্র, লৌহ, পিত্তল, কাংস্য, টিন্, সীসক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত বিবিধ তৈজস পাত্র; চর্ম্ম, বেত্র, শৃঙ্গ, শুক্তি, কূর্ম্মপৃষ্ঠ, দ্বিরদ-রদ প্রভৃতি নির্ম্মিত দ্রব্য; বহুমূল্য রত্নরাজি-নির্ম্মিত আভরণ, বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিতেন; এবং সুগন্ধি দ্রব্য, মধু, লৌহ, নীল, লাক্ষা, বিবিধ ভেষজ দ্রব্য, মোম, চিনি, উপকরণ দ্রব্য (মসলা) প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিতেন।† পট্ট, কার্পাস, কৌষেয় ও পশুলোম-জাত বস্ত্র প্রভৃতিও তখন সুপ্রচলিত ছিল।‡ মনুসংহিতায় সাধারণ 'যানের' মধ্যে দ্বিচক্র ও চারিচক্র-বিশিষ্ট শকট, এবং 'নৌকার' ভূরি ভূরি উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মুসলমান রাজত্বকালে শাল, শিরস্ত্রাণ, শাটিন, মখমল, কিংখাব, মস্‌লিন, ক্যালিকো, বিবিধ ছিট, সাল্ প্রভৃতি রঙিন সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র, গৃহসজ্জার বিবিধ আসবাব, বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট মিনার কাজ করা বিবিধ দারুময় ও ধাতব তৈজসাদি, এবং সোরা প্রভৃতির প্রস্তুত-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়।

ফলে, ভারতে ইংরেজ-আগমনের পূর্ব্ব হইতেই উপরি উক্ত যাবতীয় কারুকার্য্য এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে যে পণ্যগুলি আর তেমন বিক্রয় হয় না, সেই গুলির উৎপাদন কার্য্য ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। এক সময়ে যে মস্‌লিন শিল্প-গৌরবে—চারু-শিল্পে—ভারতবর্ষকে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল, অধুনা সেরূপ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মস্‌লিন আর প্রস্তুত হয় না!—কারণ, অধিক মূল্যে আর কেহ সেরূপ বস্ত্র ক্রয় করেন না!—প্রসঙ্গতঃ একটা সত্যঘটনা মনে পড়িল, উপযোগী বিবেচনায় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না! আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে, হাতুয়ার মহারাজা ঢাকা—নবাবপুরের মোহন নামধেয় জনৈক তন্তুবায়কে একখান 'মল্‌মল্ আব্বি' প্রস্তুত করিতে হুকুম দেন। থানটি ২০ গজ দীর্ঘে, ১ গজ প্রস্থে এবং সাড়ে সাত ভরি ওজনে;—হস্তনির্ম্মিত সূতায় প্রস্তুত করিতে ৫ মাস কাল লাগিয়াছিল! তন্তুবায়-কুলতিলকের দুরদৃষ্টক্রমে থানখানি প্রস্তুত সমাধা হইবার পূর্ব্বেই মহারাজার মৃত্যু হইল! মোহনের সে থানখানির আর খরিদ্দার জুটিল না!—ফলতঃ মূল্যাধিক্যবশতঃ,—এবং দেশীয় দ্রব্যের অনুকরণে প্রস্তুত বিলাতী কৃত্রিম দ্রব্যের মূল্যের অল্পতাপ্রযুক্ত ঐ সকল দ্রব্যের বহুল প্রচলন হওয়ায়—এতদ্দেশীয় অনেক শিল্প-কলাই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে!

সকল দ্রব্য সকল স্থানে উৎপন্ন হয় না; য়ুরোপীয়েরা সহস্র চেষ্টা-যত্নেও এক কণিকা চাউল, এক গাছি পাট উৎপাদন করিতে পারেন না,—এতকাল চেষ্টা যত্ন করিয়াও তাঁহারা 'চীনা-সিন্দূর' প্রস্তুত করিতে পারিলেন না! আবার সকল দ্রব্য সকল স্থানে উৎপাদিত হইলেও তেমন লাভ থাকে না! পুটল (এনামেল্ড) লৌহ পাত্রাদি ইংলণ্ডে প্রস্তুত হইলে তেমন লাভ থাকে না; কাচ, সুঁচ, আলপিনের এত অধিক কাটতি, কিন্তু আমাদের দেশে প্রস্তুত হইলে লাভজনক হয় না! আবার সকল দেশে সকল দ্রব্যের ক্রেতাও জুটে না! নানা স্থানে উৎপন্ন দ্রব্য-জাত যথোপযুক্ত ক্রেতার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া, সেই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে বিক্রয় করা, বিক্রেতার অবশ্য-করণীয়। বিক্রেতার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক ও যে সকল কার্য্য করিলে বিক্রয়াধিক্য হইতে পারে আমাদের দেশে সে সকল গুণ-সম্পন্ন বিক্রেতার একান্ত অভাব। আবার এখানে অধিকাংশ বিক্রেতা বিদেশী—তাঁহারা স্বদেশ-জাত পণ্যাদি বিক্রয়েই তৎপর।—সুতরাং, এতদ্দেশীয় কলাজাত দ্রব্যসমূহ, উপযুক্ত বিক্রেতার অভাবেও অনেকটা নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে!

সত্য বটে ক্রেতাই, বিক্রেতা ও উৎপাদকের উত্তেজক কিন্তু অপরপক্ষে ইহাও স্থির যে, গুণী কার্য্য-কুশল বিক্রেতা আবার ক্রেতার সৃষ্টি করিয়া লন। ইহার যাথাং

---

* ঋগ্বেদ—১ ঋক্ ৮৫, ৫ সূঃ; ১ ঋঃ ১১৬, ৩; ৭ ঋঃ ৪২, ৩ [সূঃ ইত্যাদি।

† মনু—৫ অঃ, ১১২-১১৪; ৫ অঃ, ১১৯, ১২১; ৭ অঃ ২৩০; ১০ অঃ, ৮৬—৮৯।

‡ মনু—১০ অঃ, ৮৭; ৫ অঃ ১২০, ইত্যাদি।

য়ুরোপীয় ও মার্কিন বণিকগণের ব্যবসা-কৌশল দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয়।

আর এক কথা, অধুনা—বিদেশীয় সংঘর্ষে বা সংসর্গে—আমরা দেশীয় আদর্শ, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যজ্ঞান, হারাইয়াছি বলিয়াও দেশীয় শিল্পকলার অনেকাংশে ধ্বংস ঘটিয়াছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, পুরাতন-শিল্পীরা—যাঁহারা এখনও বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের প্রাচীন, দেশীয় সৌন্দর্য্য-বোধ এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ফলে, এই নিরক্ষর শিল্পীরাই এযাবৎ যাবতীয় প্রাচ্য সৌন্দর্য্যের আদর্শ—সৌন্দর্য্যের ধারা—অনেকটা রক্ষা করিয়া আসিতেছে!

অদ্যাপি আমাদিগের নিত্য-প্রয়োজনীয় অনেকানেক দ্রব্য এদেশে উৎপন্ন হয়—কোন কোন দ্রব্য বা এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, তাহাদের কিয়দংশ বিদেশেও প্রেরিত হইতেছে; কিন্তু সেগুলির সংখ্যা ও পরিমাণ সাতিশয় অল্প! এ দেশ হইতে অসিদ্ধ-পণ্য বা কাঁচা মাল প্রভূত পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। কাঁচা মাল রপ্তানী করিলে দেশের সমুচিত লাভও হয় না, দেশীয় শিল্পিগণও তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হয়! বস্তুতঃ এই সকল কাঁচা মাল হইতে এ দেশের একান্ত প্রয়োজনীয় অনেক রকম পণ্য প্রস্তুত হইতে পারে, এবং প্রস্তুত হইলে প্রভূত পরিমাণে বিক্রয় হইবারও বিশেষ সম্ভাবনা। কেবল আমাদের উদ্যম, অধ্যবসায়, যত্ন, উদ্যোগের অভাবে তাহা হয় না—আর এই জন্যই দেশের এত দুর্দ্দশা! এদেশে যেমন কোন কোনও দ্রব্য আমাদের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তেমনই আবার কোন কোন দ্রব্য এত অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, আমাদের অভাব পূরণের জন্য সে সকল দ্রব্যের অধিকাংশ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়; যেমন লৌহাদি ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্য। এ সকল চিরকালই যে বিদেশ হইতে আনীত হইত, তাহা নহে; পুরাকালে এদেশে লৌহ-ইস্পাতাদি এত উৎকৃষ্ট ও এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইত যে, সে সময়ে ভারতবর্ষীয় ইস্পাতের তুলনা জগতের আর কোথাও মিলিত না। দিল্লীর পৃথ্বীরাজ-স্তম্ভ, পুরীর অরুণ-স্তম্ভ ও কোণার্কের লৌহ-স্তম্ভ ও কড়ি এখনও বৈজ্ঞানিকদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে! প্রকৃতির অত্যাচারেও এ গুলিতে মরিচা ধরে নাই। ডামাস্কস্ টোলিডো-জাত জগদ্বিখ্যাত অস্ত্রশস্ত্র এতদ্দেশজ ইস্পাত হইতেই নির্ম্মিত হইয়া একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানী হইত; এবং সর্ব্বত্র এ সকলের সমাদর ছিল, কিন্তু কর্ম্মদোষে আমাদিগকে এক্ষণে এই সকল দ্রব্যের জন্য বিদেশী বণিকের আশাপথ চাহিয়া থাকিতে হয়!

এতদ্ভিন্ন কাপড়, লবণ, চিনি প্রভৃতি এমন কতকগুলা জিনিস আছে, যে গুলির উৎপাদকগণ তাঁহাদের পণ্যের এদেশে বিক্রয়ের সুবিধা করিতে পারেন না বলিয়া, সেগুলি যথাসম্ভব বিদেশে প্রেরণ করেন; অথচ আবার সেই সকল দ্রব্যের জন্যই আমাদিগকে বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এখানে বলিতে হইবে যে, উপযুক্ত বিক্রেতার অভাবেই এরূপ ঘটিয়াছে। এই সকল দেশীয় বস্ত্র লবণ-শর্করাই যখন বিদেশে রপ্তানী হইয়া ইহাদের বেশ কাট্‌তি হয়, অথচ আমরাও যখন বিদেশজাত এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে নিত্য ক্রয় করি, তখন দেশীয় এই সকল দ্রব্য আমাদিগের মধ্যে সুপ্রচারিত হইবার অন্তরায় কি আছে? যদি বলেন যে, অর্থনীতিই এক্ষেত্রে একমাত্র ও প্রধান অন্তরায়—বিদেশী অপেক্ষা দেশী জিনেষের মূল্যাধিক্যই এগুলির প্রচলন-পথের কণ্টক—তাহা হইলে আমরা উত্তরে বলিব, দ্রব্য কাট্‌তিতেই সস্তা হয়। কার্য্যকুশল বিক্রেতা যদি ঐকান্তিক যত্ন ও প্রাণপণ চেষ্টায় এদেশে এ সকল দ্রব্যের সমধিক ক্রেতা স্থির করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেই দ্রব্যের মূল্য সস্তা হইয়া পড়িবে; সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদকগণও প্রোৎসহিত হইয়া সমুন্নত পদ্ধতিক্রমে—বিজ্ঞান-সঙ্গত যন্ত্রাদি সাহায্যে—অল্প মূল্যে ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদন করিতে সচেষ্ট ও সক্ষম হইবেন।

বিদেশ হইতে সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্য আমদানী, এবং যে সকল দ্রব্য এদেশ হইতে রপ্তানী হয়, নিম্নে তাহার যথাসম্ভব একটা তালিকা প্রদত্ত হইল,

সাধারণ আমদানী-পণ্য—

কার্পাস—বস্ত্র ও সূত্র	চিনি, লবণ
ছুরি, কাঁচি	পশমী বস্ত্রাদি
তৈয়ারী পোষাক	কাগজ ও পেষ্টবোর্ড
দিয়াশলাই	লিখন-সজ্জা
রেশমী বস্ত্রাদি	স্বর্ণ রৌপ্যাদি
খেলা ও খেলনা	সাবান
সিগারেট্	বিবিধ খাদ্যদ্রব্য

মদ্য	কল
বাতি	ঘড়ি
ঔষধ	কেরাসিন
কাপড়ের রং	কাষ্ঠ ও লৌহের রং
লৌহ ও ইস্পাত	স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি
রাসায়নিক দ্রব্য	কাচের দ্রব্যাদি ও কাচ
কাপড় সেলাইর সূত্র	কার্পাস-সূতার মোজা

পুটল (এনামেল্ করা) লৌহপাত্র
চর্ম্মনির্ম্মিত জুতা ও অন্যান্য দ্রব্য
বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি
মাটীর ও চীনামাটীর বাসন

সাধারণ রপ্তানী-পণ্য—

তুলা	তিন্তিড়ী
রেশম	হরিদ্রা
পশম	সিন্‌কোনা
পাট	কেরাসিন তৈল
শণ	কুঁচিলা
তন্তু	লোঃবান্
চিনি	আইজিং গ্ল্যাস্
লবণ	মৃগনাভি
বিবিধ তৈলদ বীজ	সোরা
তৈল	সোহাগা
খইল ও সার	নীল
শুণ্ঠী	কুসুম ফুল
কায়া (coir)	হরীতকী
চাউল	লাক্ষা
দাইল	পাথুরে কয়লা
চা	গজদন্ত
কাফি	শুক্তি
চর্ম্ম	শৃঙ্গ
রবার	অস্থি
মোম	

শস্য (তণ্ডুল, গোধূম, যব ইত্যাদি)
বিবিধ মশলা (লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ, মরিচ ইত্যাদি)
স্বর্ণ, রৌপ্য, ম্যাঙ্গেনিজ, লৌহ, অভ্র প্রভৃতি।

এতদ্দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, আমদানী দ্রব্যের মধ্যে কাচের ও চিনামাটীর দ্রব্য, কল-কব্জা ও যন্ত্রাদি, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য, ঘড়ি প্রভৃতি ছাড়া অপর সকল জিনিসই এদেশে উৎপন্ন হইতেছে বা সহজেই হইতে পারে ; উপরন্তু আমদানী-পণ্যের উৎপাদনের অধিকাংশ উপকরণ আমরাই এদেশ হইতে সরবরাহ করি।

এতদ্দেশ হইতে যে সকল অসিদ্ধ-ধন দেশান্তরে রপ্তানী হয়, সেগুলির সমবায়ে যত প্রকার বিভিন্ন কলাজাত পণ্য উৎপাদিত ও নূতন কলা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর, যথাসাধ্য তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—বলাবাহুল্য যে, এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে ; স্বতঃই যেগুলি মনে উদিত হইল, সেই গুলিরই এখানে বর্ণমালাক্রমে নামোল্লেখ করা হইয়াছে ;—

১। অঙ্গার (জান্তব) প্রস্তুত করণ।
২। অক্ষর বা হরপ ঢালাই।
৩। অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ।
৪। অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ।
৫। অস্থি-শিল্প।
৬। আইজিং গ্ল্যাস্ বা মৎস্যের শিরিষ প্রস্তুত।
৭। আচার (বিবিধ ফলাদির) প্রস্তুত।
৮। আতর (বিবিধ উদ্ভিজ্জের), অর্থাৎ উদ্বায়ী তৈল ও নির্য্যাসাদি প্রস্তুত।
৯। আয়না, অর্থৎ, কাচ রৌপ্য-রঞ্জিত করণ।
১০। আলকাতরা ও তাহা হইতে উদ্ভূত বিবিধ বর্ণ ও নানাবিধ দ্রব্যোৎপাদন।
১১। আলোক-চিত্রণ বা ফটোগ্রাফীর বিবিধ মাল মশালা ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত।
১২। ইক্ষু-শর্করা প্রস্তুত ও পরিষ্করণ প্রভৃতি।
১২। ইস্পাত প্রস্তুত।
১৩। ইষ্টকাদি।
১৪। এনামেল বা ধাতুদ্রব্যাদি পুটল বা মিনা করণ।
১৫। এরারুট প্রস্তুত।
১৬। (বিবিধ) এসিড প্রস্তুত।
১৭। ঔষধ দ্রব্য—এলোপ্যাথিক্ ও হোমিওপ্যাথিক্ ইত্যাদি—প্রস্তুত।
১৮। কর্ম্মকার-কার্য্য।

১৯। কয়লা—কোক্ প্রস্তুত।
২০। কয়লা (পাথুরে) হইতে বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন বা নিষ্কাষণ।
২১। কলাই-কার্য্য।
২২। কলকব্জা ও যন্ত্রাদির অংশাদি নির্ম্মাণ।
২৩। কর্জ্জলি কাগজ প্রস্তুত।
২৪। (বিবিধ প্রকার) কাগজ ও কার্ড-বোর্ড প্রস্তুত
২৫। কাচ প্রস্তুত ও রঞ্জিত-করণ।
২৬। কাচের দ্রব্য নির্ম্মাণ।
২৭। ক্যাম্বিশ্ প্রস্তুত।
২৮। কিমিয়া বিদ্যা-বিষয়ক—আতস বাজী ইত্যাদি প্রস্তুত।
২৯। কাষ্ঠময় বিবিধ আসবাব ও তৈজস নির্ম্মাণ।
৩০। কাষ্ঠ রঞ্জিত করণোপযোগী বিবিধ রং প্রস্তুত।
৩১। কাষ্ঠের উপর মিনা ও খোদাই।
৩২। কার্পেট প্রস্তুত।
৩৩। কালি—লিখিবার ছাপিবার, চর্ম্মরঞ্জনের, প্রতি-লিপির প্রভৃতি—প্রস্তুত।
৩৪। কুম্ভকারের কার্য্য।
৩৫। কুন্দযন্ত্র-যোগে ধাতু প্রভৃতি কুঁদা।
৩৬। কূর্ম্মপৃষ্ঠ দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত।
৩৭। কেওলিন্ প্রস্তুত।
৩৮। কেলিকো প্রস্তুত।
৩৯। খনির কার্য্য।
৪০। খাদ্য—বিবিধ প্রকার সংরক্ষিত—প্রস্তুত।
৪১। খোদাই—কাষ্ঠ, অস্থি, গজদন্ত, ধাতু, প্রস্তর ইত্যাদি।
৪২। খেলেনা প্রস্তুত।
৪৩। গজদন্ত-শিল্প।
৪৪। গজদন্ত (কৃত্রিম) প্রস্তুত।
৪৫। গিল্টী করা।
৪৬। ঘড়ি—ট্যাঁক ও ধর্ম্ম—নির্ম্মাণ।
৪৭। ঘোড়ার সাজ প্রস্তুত।
৪৮। চট প্রভৃতি বয়ণ।
৪৯। চর্ম্ম, সংস্করণ, রঞ্জন ইত্যাদি।
৫০। চর্ম্ম-দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত।
৫১। চরকা নির্ম্মাণ।
৫২। চা, পণ্যরূপে পরিণত করণ।
৫৩। চাবি-কুলুপ নির্ম্মাণ।
৫৪। চিত্রাঙ্কন।
৫৫। চিত্র বাঁধাই, খোদাই ইত্যাদি।
৫৬। চিরুণী প্রস্তুত।
৫৭। চিনি, ইক্ষু, খর্জ্জুর প্রভৃতি হইতে—প্রস্তুত, পরিষ্করণ।
৫৮। চুম্‌কি প্রভৃতি।
৫৯। চুরুট ও সিগারেট্।
৬০। চূণ।
৬১। চুয়ান—গন্ধ ও ঔষধ দ্রব্যাদি।
৬২। চেঁচাড়ির বিবিধ তৈজস।
৬৩। চৈন মৃত্তিকাদ্বারা তৈজসাদি নির্ম্মাণ।
৬৪। ছড়ি, লাঠি।
৬৫। ছাতা।
৬৬। ছিট।
৬৭। ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি।
৬৮। জড়োয়া কাজ, (ধাতু দ্রব্য) ও বস্ত্রের উপর।
৬৯। জল, বিবিধ প্রকার (সুবাসিত)।
৭০। জরি।
৭১। জাল (টেনিস্ প্রভৃতি খেলার)।
৭২। জুতা প্রভৃতি তৈয়ারী।
৭৩। জেলাটিন্।
৭৪। ঝিনুকের নানাবিধ দ্রব্য।
৭৫। টাট বা চিনিপক্ক ফল।
৭৬। টেলিগ্রাফীর যন্ত্রপাতি।
৭৭। টিন্।
৭৮। ট্রেসিং কাপড়, কাগজ ইত্যাদি।
৭৯। ঢালাই কার্য্য, ধাতু প্রভৃতি।
৮০। তবক—স্বর্ণ প্রভৃতির।
৮১। তবলকি।
৮২। তড়িৎ সমবায়ে বিবিধ শিল্প-প্রকরণ প্রভৃতি।
৮৩। তালপত্রাদির তৈজস।
৮৪। তাঁত।
৮৫। তার—বিবিধ ধাতুর।

৮৬। তার-নির্ম্মিত দ্রব্যজাত।
৮৭। তাস।
৮৮। তাম্রকুট,—চাক্তি, সূক্ষ্মাকারে কর্ত্তিত, সুর্ত্তি, গুড়াকু।
৮৯। তৈজস ও মূর্ত্তি—প্রস্তর, দারুময়, ধাতব ইত্যাদি।
৯০। তৈল, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব।
৯১। তৈল—(সুবাসিত) রঞ্জন, পরিষ্করণ [কলে, ঘড়ি ইত্যাদিতে প্রয়োগার্থ]।
৯২। তৃণ-শিল্প।
৯৩। ত্রিপল।
৯৪। দন্ত, কৃত্রিম।
৯৫। দ্রাবক, আসব, সার প্রভৃতি।
৯৬। দিয়াশলাই।
৯৭। দোবরা চিনি।
৯৮। ধাতব দ্রব্যাদি।
৯৯। ধাতু—বিবিধ বিমিশ্র।
১০০। ধাতু—কলাই বা হল অর্থাৎ গ্যাল্‌ভ্যানাইজ করা।
১০১। ধাতুর পেণ্ট্‌ বা রঙ্‌।
১০২। নিব্‌।
১০৩। নীল।
১০৪। নকাসি কার্য্য।
১০৫। নৌ-নির্ম্মাণ।
১০৬। পনীর।
১০৭। পমেটম্‌।
১০৮। পফ্‌ ইত্যাদি, পালকের।
১০৯। পশম, পরিষ্করণ ইত্যাদি।
১১০। পশমী বস্ত্রাদি।
১১১। পক্ষীর পালক-জাত দ্রব্যাদি।
১১২। পক্ষীর পালক—পরিষ্করণ, রঞ্জন ইত্যাদি।
১১৩। পার্চ্চমেণ্ট।
১১৪। পাউডর, কারি, অর্থাৎ ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুতোপযোগী।
১১৫। পাউডর, (বিবিধ) মুখ-রঞ্জনার্থ।
১১৬। পাউডর, অর্থাৎ সূক্ষ্ম চূর্ণ, বিবিধ ধাতু।
১১৭। পাটী।
১১৮। পার্ফ্যুমারী বা সুগন্ধদ্রব্য।
১১৯। পাড় তোলা, বস্ত্রাদিতে।
১২০। পাইপ—ধাতু, মৃৎ, প্রস্তর প্রভৃতির।
১২১। পাইপ—তাম্রকুট সেবনের, কলের জলের, গ্যাস প্রভৃতির।
১২২। পাজা।
১২৩। প্রস্তর, খোদাই, মূর্ত্তি, তৈজসাদি গঠন।
১২৪। কৃত্রিম প্রস্তর।
১২৫। প্লাষ্টার অব্‌ প্যারিস্‌।
১২৬। পুঁতি।
১২৭। পিন্‌।
১২৮। পুতুল-নির্ম্মাণ।
১২৯। পুস্তক বাঁধাই।
১৩০। পেন (কুইল্‌ বা পালকের)।
১৩১। পেন-হোল্ডার, (কাষ্ঠ, বা ধাতুর)।
১৩২। পেন্সিল, (লেড্‌, ও শ্লেট্‌)।
১৩৩। পেরেক ইত্যাদি।
১৩৪। পোত-নির্ম্মাণ।
১৩৫। পালিশ—ধাতু, কাষ্ঠ, অস্থি, (প্রস্তর প্রভৃতি রঞ্জনের)।
১৩৬। ফ্রেম্‌-মোল্ডিং।
১৩৭। ভার্দ্রিগ্রিস্‌।
১৩৮। ভাটি (সুরা, আসব প্রভৃতি চুয়াইবার)।
১৩৯। ভাস্কর্য্য।
১৪০। ভূষা।
১৪১। মদ্য (মিশ্রিত ও চুয়ান)।
১৪২। মাদুর।
১৪৩। মধুমক্ষিকা পালন ও মধুসংগ্রহ।
১৪৪। মণিকারের কার্য্য।
১৪৫। মাণিকাদি উজ্জ্বলীকরণ, কর্ত্তন ইত্যাদি।
১৪৬। মার্ম্মালেড্‌, জেলি ইত্যাদি।
১৪৭। মুদ্রণকার্য্য।
১৪৮। মিনা।
১৪৯। মিষ্টান্ন, বিলাতী পছন্দসই।
১৫০। মুক্তা-উজ্জ্বলীকরণ প্রভৃতি।
১৫১। মুক্তা (কৃত্রিম)।

১৫২। মুক্তা-খচিত দ্রব্যজাত।
১৫৩। মৃণ্ময় দ্রব্য, মূর্ত্তি প্রভৃতি।
১৫৪। মৃণ্ময় দ্রব্যাদি এনামেল্, বা উজ্জ্বলীকরণ।
১৫৫। মোজা বুনন (কার্পাস, পশম ইত্যাদি দ্বারা)।
১৫৬। মোম পরিষ্করণাদি।
১৫৭। মোমের মূর্ত্তি প্রভৃতি গঠন।
১৫৮। মোমজাম।
১৫৯। মৎস্য-সংরক্ষণ।
১৬০। মৎস্য হইতে তৈলাদি প্রস্তুত।
১৬১। মৎস্য-পালন।
১৬২। মোরব্বা (বিবিধ ফলের)।
১৬৩। যান-নির্ম্মাণ (নানাবিধ)।
১৬৪। যন্ত্র পাতি।
১৬৫। রং (বিচিত্র), জলে মিশ্রণোপযোগী, (Water colors).
১৬৬। রং তৈলে মিশ্রণোপযোগী, নানাবিধ (Oil colors).
১৬৭। রজ্জু, কাছি ইত্যাদি।
১৬৮। রবার ও তৎমণ্ডিত বস্ত্রাদি।
১৬৯। রবার শিল্প।
১৭০। রবার হইতে এবনাইট্, ভলকানাইট্ প্রভৃতি প্রস্তুত।
১৭১। রসায়ন।
১৭২। রাঙ্‌তা।
১৭৩। রেশম-বিজ্ঞান।
১৭৪। রেশম রঞ্জিতকরণ, শুভ্রীকরণ।
১৭৫। রৌপ্য দ্রব্যাদি।
১৭৬। লজেঞ্জেস প্রভৃতি।
১৭৭। লাক্ষা জাত, ও তৎসমন্বয়ে বিবিধ দ্রব্য।
১৭৮। লাক্ষার রং।
১৭৯। ল্যাম্প নির্ম্মাণ।
১৮০। লিথোগ্রাফি।
১৮১। লেস্ নির্ম্মাণ।
১৮২। লোম-নির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য।
১৮৩। লৌহ-শিল্প।
১৮৪। বস্ত্র-শিল্প।
১৮৫। বংশ-শিল্প।
১৮৬। বয়ন ও তাঁত।
১৮৭। 'ববিন্', 'বেল্টিং' ইত্যাদি প্রস্তুত।
১৮৮। বাদ্‌লা দানা।
১৮৯। বাদ্য যন্ত্রাদি।
১৯০। বালি।
১৯১। বাতি (মোম, গালা, ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত)।
১৯২। ব্যাট, বল্, ব্যাড্‌মিংটনাদি।
১৯৩। বার্নিশ (বিবিধ দ্রব্যের উপযোগী, বিচিত্র বর্ণের)।
১৯৪। ব্রুশ, (বিবিধ)।
১৯৫। বোতাম, (বিবিধ উপাদানের)।
১৯৬। বেত্র শিল্প।
১৯৭। ব্রোঞ্জ চূর্ণ।
১৯৮। ব্রোঞ্জের উপর রং করণ।
১৯৯। শস্য পরিষ্করণ, চূর্ণী-করণ ইত্যাদি।
২০০। শিরীষ প্রস্তুত করণ।
২০১। শুভ্রীকরণ (বিবিধ দ্রব্য) (Bleaching).
২০২। শৃঙ্গ-শিল্প।
২০৩। স্বর্ণকার বৃত্তি।
২০৪। স্থপতি বিদ্যা।
২০৫। সালু প্রস্তুত।
২০৬। সলমা চুম্‌কি।
২০৭। সাবান প্রস্তুত।
২০৮। সির্কা প্রস্তুত।
২০৯। সির্কি ও সর কাঠির দ্রব্য।
২১০। সিন্দুর।
২১১। সূচ, আল্‌পিন্।
২১২। সুরাসার বা এলকোহল, বিশোধিত সুরা বা রেক্টিফায়েড্ স্পিরিট্ প্রস্তুত করণ।
২১৩। স্ক্রু।
২১৪। সিমেণ্ট।
২১৫। সুগন্ধি (সুবাসিত) জল বা তৈল।
২১৬। সূত্র প্রস্তুত, রঞ্জন, বয়ন।
২১৭। সূত্রধরের কার্য্য।
২১৮। সোডা, পটাশ্।
২১৯। হল করা (Gilding)

২২০। হোয়াইট লেড্‌।

২২১। হরিদ্রা বর্ণ বা ক্রোম ইয়েলো।

২২২। সিরাপ্‌, ও কম্পাউণ্ড সিরাপ্‌।

২২৩। সার, (বিবিধ পদার্থ হইতে)।

এই সকল দ্রব্যজাতের মধ্যে অধিকাংশই আমরা এযাবৎ বিদেশীয় ব্যবহার করিতাম—কারণ অনেকগুলি এদেশে প্রস্তুত হইত না, আর যাহাও হইত, তাহা তেমন সুদৃশ্য বা সুলভ ছিল না।

উৎপন্ন দ্রব্যের সাধ্যমত বাহ্য-সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধন করা প্রত্যেক কলাজীবীর কর্ত্তব্য; দুঃখের বিষয়, এদেশের কলাজীবিগণ একথা আদৌ বুঝে না! বহিঃসৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য দুইটি কার্য্য করা প্রয়োজন,—প্রথম, প্রিয়দর্শন পরিকর্ম্ম, দ্বিতীয়, যথোপযুক্ত সুদৃশ্য আবরণ বা সম্পুটক মধ্যে কলাজাত দ্রব্যটি স্থাপন। সাধারণতঃ লোকে রূপের দাস—বাহ্যসৌন্দর্য্য দৃষ্টে স্বতঃই প্রলুব্ধ হয়। কথায় বলে, "আগে দর্শন ডারি, পরে গুণ বিচারি।" আমাদের দেশোৎপন্ন দ্রব্যগুলি কেবল উপযুক্ত পরিকর্ম্মের অভাবেই জন-সমাজে তেমন সমাদৃত হয় না,—বিদেশীয় দ্রব্যজাতের তুলনায় পরাভূত হয়!—ছুরি, চিরুণী প্রভৃতি দ্রব্যই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কাজ কঠিন নহে, অর্থ থাকিলে সাধারণ কারিগরেরা সহজেই এ কার্য্য করিতে পারে—কেবল উপযুক্ত উপকরণের অভাবে ও সঙ্গতিহীনতায়, সফলকাম হইতে পারে না। পরিকর্ম্ম একটু ব্যয়সাধ্য, পরিকর্ম্মীকৃত দ্রব্যের মূল্য কাজেই অপেক্ষাকৃত অধিক; কিন্তু ক্রেতারা তাহা দিতে কাতর নহে। আর আবরণাদি, স্বকৃত পণ্যের প্রতি কলাজীবীর আদরের পরিচায়ক। উৎপাদক নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি আদর না করিলে অন্যে করিবে কেন? তজ্জন্য প্রত্যেক শিল্পীরই কর্ত্তব্য,—সঙ্গতি, রুচি ও শোভন-দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উৎপন্নদ্রব্য যথাযোগ্য সমুদ্গকাদি মধ্যে স্থাপন করিয়া ক্রেতার সমক্ষে উপস্থিত করা। বস্তুতঃ অনেক স্থলে আবরণের গুণে পণ্যবিশেষের সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধিত হয়, অথচ পণ্যটি সুরক্ষিত ও অব্যাহত থাকে। সত্য বটে সম্পুটকাদিরও একটা ব্যয় আছে, কিন্তু সে ব্যয়টা পণ্য দ্রব্যের মূল্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মূল্যনির্দ্ধারণ করিলেই চলে। সুখের বিষয়, অধুনা কলাজীবিগণের এই উভয় দিকেই কতকটা দৃষ্টি পড়িয়াছে; তৎফলে, দেশীয় পণ্যের বিক্রয়ও বৃদ্ধি পাইতেছে।

আবার, অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী দ্রব্যগুলির মধ্যে যেগুলি মাত্র বিলাসিতার জন্য ব্যবহৃত হয়—সেগুলি আমাদের ব্যবহার না করাই উচিত। কিন্তু এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যেগুলি আমাদের একান্ত প্রয়োজন, সেগুলি ত ব্যবহার করিতেই হইবে। তবে, তাহাদের মধ্যেও এমন কতকগুলি আছে, যেগুলি চেষ্টা করিলে এদেশে উৎপাদিত হইতে পারে। কিন্তু কথা এই যে, যেগুলি চেষ্টা করিলে এদেশে উৎপাদিত হওয়া সম্ভবপর, সেগুলি সুলভে উৎপাদনের জন্য যেরূপ বিস্তৃত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহাতে কেবলমাত্র এ দেশের কাটতির পরিমাণোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিলে কারবার চলে না;—সেগুলি সমধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া দেশান্তরে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিলে বিদেশীদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাভবান্‌ হইতে পারা যায়। কারণ, এদেশের কারিগরদিগের পারিশ্রমিক অত্যন্ত কম, এবং উপকরণ-দ্রব্যের মূল্যও সুলভ; সুতরাং উৎপন্ন-দ্রব্যের পড়্‌তাও অন্য দেশের অপেক্ষা কম পড়ে। কাজেই মনে হয়, এই সকল দ্রব্য অন্য দেশে চালান করিলে লাভ হইতে পারে। ফলে, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের আবশ্যক যে সকল পণ্যোৎপন্ন-দ্রব্য এখানে সহজে সুলভে প্রস্তুত হইবে না, সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুতোপযোগী অসিদ্ধ-উপকরণগুলিই কেবল বিদেশে প্রেরণ করা উচিত। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশসুলভ অপর সকল অসিদ্ধ-উপকরণযোগে যথাযথভাবে এদেশেই, দেশীয় শিল্পকারগণের সাহায্যে, বিদেশী যন্ত্রকলের দ্বারা, আমাদের আবশ্যক সর্ব্ববিধ সামগ্রীচয়ের যতপ্রকার পণ্য প্রস্তুত করা সম্ভব, সেইগুলি উৎপাদনে মনোযোগী হওয়াই একান্ত বিধেয়। আর যে সকল সহজ-প্রাপ্ত, কৃষি-কর্ম্মোৎপন্ন কাঁচা-মাল আমাদিগের অভাব পূর্ণ করিয়াও উদ্বৃত্ত হয়, সেই উদ্বৃত্ত অংশমাত্র রপ্তানী করাই যুক্তিসিদ্ধ। তবে, ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কর্ত্তব্যজ্ঞান-সম্পন্ন দেশীয় বিক্রেতাও উদ্ভূত হওয়া প্রয়োজন; কারণ, এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষে তাঁহারাই প্রধান অঙ্গস্বরূপ।

কৃষিজাত দ্রব্যের যেমন মহাজন থাকে, এদেশে অধিকাংশ কলাজাত দ্রব্যের সেরূপ মহাজন—অর্থাৎ, কলাজাত দ্রব্য-

গুলির উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে অন্য বিক্রেতা নাই। কলাজীবীর পক্ষে ইহা বড় কম অসুবিধার বিষয় নহে ; ফলে, এই কারণেও এ দেশের অনেক কলার দুরবস্থা ঘটিয়াছে ! কলাজীবিগণ অনেকেই দিন-আনে দিন-খায় ;—সমধিক পরিমাণ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঘরে মজুত রাখিবার অর্থ-সামর্থ্য তাহাদের নাই। অধিককাল সে সকল জিনিস ঘরে সঞ্চিত রাখিতে হইলে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন, অথচ প্রায়ই তাহাদের এতদূর অর্থাভাব, যে সময়ে সময়ে তাহারা—পারিবারিক কোনও বিশেষ প্রয়োজনাদিকো —অথবা পরিবারবর্গের ক্ষুৎপিপাসা-তাড়নায়—উপযুক্ত মূল্যাপেক্ষা কম দামে ঐ গুলি বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়! উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে বিক্রেতা-স্বরূপ মহাজন থাকিলে, শিল্পিগণ সহজেই এমন সকল দায় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।—উৎপাদক যতই কেন দ্রব্য উৎপন্ন করুক না, বিক্রেতা নিয়তই তাহার নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট ন্যায্য মূল্যে গ্রহণ করিয়া বিক্রয় চেষ্টা করিবেন ;—এরূপ হইলে কলাজীবীকে আর অন্ন-চেষ্টায় বিব্রত হইতে হইবে না, বা নিরর্থক বসিয়া থাকিতে হইবে না! পেটের ভাতের সংস্থিতি থাকিলে সে তখন অনায়াসে স্বকীয় কলার উন্নতি-বিধানে—স্বীয় পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে, ও সেই গুলি সুগঠনে মনঃসংযোগ করিতে পারিবে। বস্তুতঃ শিল্পী যখন বুঝিবে যে, হস্তচালনার ন্যায় মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি চালনারও মূল্য আছে, তখনই দেশীয় শিল্প-কলাক্ষেত্রে উদ্ভাবনা-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে ;—এইরূপে শিল্পীরও অবস্থার উন্নতি হইতে থাকিবে। অথচ বিক্রেতা চেষ্টা ও যত্ন করিয়া, যথোপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া, সমূহ লাভবান্ হইতে পারিবেন। ইহাতে শ্রম-বিভাগও হইবে, সামাজিক পারস্পরিক সাহায্য-সাধন-নীতিও প্রসারিত হইবে, অথচ উভয়েরই যথোচিত অর্থলাভ ঘটিবে। প্রকৃত-পক্ষে মহাজন, বা মধ্যবর্ত্তী বিক্রেতার, অভাবে এদেশে শিল্প-বিস্তারেরও যেমন ক্ষতি হইয়াছে, উপরোক্ত ভাবে কলাজীবীর পারিশ্রমিকের ক্ষতি হওয়ায়, এবং অবকাশের অভাব ঘটায়, শিল্প-কৌশলেরও তদ্রূপ অবনতি সাধিত হইয়াছে। "অন্ন-চিন্তা চমৎকারা"—অন্ন চিন্তাতেই যদি কলাজীবী অস্থির হইয়া ফিরিবে, স্বহস্ত-নির্ম্মিত পণ্য যথোপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়-চেষ্টায় যদি সে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তবে শিল্প কৌশল প্রদর্শনের আর তাহার অবকাশ রহিল কোথায়?—রহিয়া বসিয়া উপযুক্ত হাটে বাজারে কলাজাত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলে যে কারুকর সমধিক লাভবান্ হয়, একথা সকলেই জানেন ; কিন্তু অর্থের অনটন হইলে সেরূপ করা ঘটে না। আবার উদর পূর্ণ না থাকিলে মনে শান্তি থাকে না। মনের শান্তি ভিন্ন শিল্পচর্চ্চা কেন?—কোন চর্চ্চাই হয় না!—উদর শীতল থাকিলেই মস্তিষ্ক শীতল থাকে ; মস্তিষ্ক শীতল থাকিলেই শোভন-দর্শন কারু কৌশল সমন্বিত শিল্প-রচনা সম্ভবপর হয়। জগৎ সৌন্দর্য্যময় ;—বহিঃ প্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়, অন্তঃ-প্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়। বহিঃ-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। মনোহর, নয়নাভিরাম, চিত্তরঞ্জক সৌন্দর্য্য-সমন্বিত দ্রব্য দর্শনে মানব-মন স্বতঃই মুগ্ধ হয়—মানবের স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয় তাহার তাহাতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে—লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ ; সুতরাং সৌন্দর্য্য সমন্বিত পণ্যমাত্রেরই বহুল প্রচার সম্ভাবনা ; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য বিস্তারিতভাবে লোক-চক্ষুর গোচরীভূত হইলে তবেই না তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে? কার্য্যকুশল বিক্রেতার কার্য্যই তাহাই। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

বস্তুতঃ আমাদের দেশে উদ্যোগী, উপযুক্ত বিক্রেতার অভাবেই অনেক দেশীয় পণ্যের আশানুরূপ বিক্রয়ের—বিস্তারের প্রধান অন্তরায়।—আর বিক্রয় না হওয়ায় উৎপাদকবর্গের উৎসাহবৃদ্ধিও হয় না!—এইরূপেই ত এদেশীয় কলাসমূহ স্ফূর্ত্তি না পাইয়া ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে!

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছিন্নহস্ত

(শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত)

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—ব্যাঙ্কার মঃ ভরজারস্ বিপত্নীক। এলিস্ তাঁহার একমাত্র কন্যা, ম্যাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভিগ্‌নরী খাজাঞ্চি, রবার্ট কার্ণোয়েল্ সেক্রেটারী, জর্জ্জেট্ বালকভৃত্য। একরাত্রে তাঁহার বাটীতে ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম্ নিশাভোজে আসিয়া দেখে মালখানার লৌহসিন্দুকের বিচিত্র কলে কোন রমণীর সদ্য-ছিন্ন বামহস্ত সম্বদ্ধ! একথা তৃতীয় ব্যক্তিকে না জানাইয়া ম্যাক্সিম্ সেটা নিজের কাছে রাখিল।

রবার্ট, এলিসের পাণি-প্রার্থী; এলিস্‌ও তদনুরক্ত। বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার কিন্তু ভিগ্‌নরীকে জামাতা করিতে ইচ্ছুক। তাই তিনি রবার্টকে মিশরস্থিত স্বীয় কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন। রবার্ট তাহাতে অসম্মত—সেই রাত্রে ভিগ্‌নরীকে মনোভাব জানাইয়া তিনি দেশত্যাগ করিলেন।

রুশরাজের বৈদেশিক শত্রু-পরিদর্শক কর্ণেল বোরিসফের ১৪ লক্ষ টাকা ও সরকারী কাগজপত্রের একটি বাক্স্ এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিন বলেন, পরদিন কিছু টাকা চাই।

কথামত কর্ণেল্ প্রাতেই টাকা লইতে আসিলেন—ভিগ্‌নরী দেখেন, খাজানার সিন্দুক খোলা! ভরজারসকে সংবাদ দেওয়া হইল তিনি আসিলে দেখা গেল—৫০ হাজার টাকা ও কর্ণেলের বাক্সটি নাই!—সন্দেহটা পড়িল রবার্টের ঘাড়ে। কর্ণেলের পরামর্শে পুলিশে এ সম্বন্ধে সংবাদ না দিয়া গোপনে অনুসন্ধান করা স্থির হইল।

ম্যাক্সিম্, ভিগ্‌নরীর সহিত মতলব করিয়া সেই ছিন্নহস্তের অধিকারিণীকে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছিন্নহস্তে এক খানি ব্রেস্‌লেট্ ছিল—ম্যাক্সিম্ তাহা নিজের হাতে পরিয়া, ছিন্নহস্ত নদীতে ফেলিয়া দেন। হাতখানি পুলিস উদ্ধার করে, কিন্তু পরে তাহা চুরি যায়। অতঃপর, একদিন পথে এক পরিচিত ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ—ডাক্তার তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখাইলেন, ম্যাক্সিম্ অচিরে কৌশলে যুবতীর সহিত আলাপ করিলেন। ম্যাডাম্ সার্জ্জেন্ট, তাঁহার প্রকোষ্ঠে ব্রেস্‌লেট্ দেখিয়া একটু রহস্য করিলেন। কথা-বার্ত্তায় বেশী রাত্রি হওয়ায় তিনি রমণীকে তাঁহার বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিলেন।

এলিস্ শুনিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কের চুরি সম্পর্কে সকলেই রবার্টকে সন্দেহ করিয়াছে। তাঁহার কিন্তু ধারণা সে নির্দ্দোষ। তিনি রবার্টকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য ম্যাক্সিম্‌কে অনুরোধ করিলে, ম্যাক্সিম্ প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে রবার্ট, দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার এলিসের সাক্ষাৎকার-মানসে প্যারীতে প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহাকে গোপনে সেই মর্ম্মে পত্র লেখেন। যে দিন দেখা করিবার কথা, সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে কর্ণেল ছলক্রমে তাঁহাকে এক বাটীতে আনিয়া বন্দী করিলেন। ম্যাক্সিম্ রবার্টের এই পত্র দেখিয়াছিলেন—তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, উহাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। কার্য্যগতিকে তাহাই ঘটিল।

কর্ণেলের বিশ্বাস, রবার্টের নিয়োজিত কোনও রমণীদ্বারা ব্যাঙ্কের চুরি ঘটিয়াছে। তিনি বন্দী রবার্টকেও সেইরূপ বলিলেন, ও জানাইলেন যে, রবার্ট সন্দেহমুক্ত না হইলে ভিগ্‌নরীর সহিত এলিসের বিবাহ ঘটিবে। আরও বলিলেন, চুরীর গুপ্ততথ্য ব্যক্ত না করিলে তাঁহাকে আজীবন বন্দী থাকিতে হইবে। রবার্ট রাত্রে মুক্তির পথ খুঁজিতেছেন, এমন সময় প্রাচীরের উপরে জর্জ্জেট্‌কে দেখিতে পাইলেন। সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে মুক্তির আশা দিয়া প্রস্থান করিল।]

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রবল তুষারপাত সত্ত্বেও সেই রজনীতে রঙ্গালয়গুলি খোলা ছিল।—শ্রান্ত-ক্লান্ত-ভাবে ম্যাক্সিম্ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি পুনরায় গৃহের বাহির হইলেন;—ভিগ্‌নরীকে দিনের ঘটনাগুলি বলিতে হইবে। অবশ্য এলিস্ যে কারনোয়েলের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, সে কথাটা চাপিয়া যাইতে হইবে। রু-দে সুবেস্‌নিতে পৌছিয়া তিনি শুনিলেন, জ্যেঠামহাশয় এলিসের সহিত নিমন্ত্রণে বাহির হইয়াছেন—বল্‌নাচের মজলিসে আজ তাঁহাদের নিমন্ত্রণ। সংবাদটা শুভ। এলিস্ বল্‌নাচে কখনও যান নাই;—আজ যখন গিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভিগ্‌নরীর সন্ধানে গিয়া ম্যাক্সিম্ জানিতে পারিলেন, সেও নিমন্ত্রণে গিয়াছে।

তখন ম্যাক্সিম্ ভাবিলেন, তিনি থিয়েটার দেখিতে যাইবেন। আজ আনন্দ করিবার দিন। রঙ্গালয়ে যখন তিনি প্রবেশ করিলেন, তখন অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। ম্যাক্সিম্ চারিদিকে চাহিলেন, কিন্তু কোনও পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলেন না। একা একা অভিনয় দর্শন বড় কষ্টকর। ম্যাক্সিম্ চারিদিকে চাহিতেছেন, সহসা রঙ্গমঞ্চের দক্ষিণ-

পার্শ্বস্থ বক্সের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনটি রমণী হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছিলেন।

ম্যাক্সিম্ চিনিলেন, স্কেট্‌ক্রীড়াক্ষেত্রে যে তিনটি রমণীর সহিত কথাবার্ত্তায় পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহারাও আজ অভিনয়-দর্শনে আসিয়াছেন। রমণীত্রয় হাতছানি দিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। ম্যাক্সিম্ অভিবাদন করিয়াই মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

অর্কেষ্ট্রার বামভাগে তাঁহার আসন। তাঁহার পার্শ্বস্থ দুইটি বক্সে লোক আছে কি না, ম্যাক্সিম্ বুঝিতে পারিলেন না। পর্দ্দা ফেলা ছিল। ম্যাক্সিমের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তিনি সম্মুখে সরিয়া বসিলেন। একটি মহিলার স্কন্ধদেশের একাংশমাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন। বোধ হইল, রমণী একা নহেন,—যেন মাঝে মাঝে কাহার সহিত তিনি কথা কহিতেছিলেন। ম্যাক্সিম্ আবার ঘুরিয়া বসিলেন। যে বক্সে ডলফিন্ ও তাঁহার বন্ধুগণ বসিয়াছিলেন, সেই দিকে আবার চাহিলেন—দেখিলেন, তাঁহার তাচ্ছিল্যভাব সত্ত্বেও তাঁহারা বেশ স্ফূর্ত্তি-সহকারে তাঁহাকে কি ইঙ্গিত করিতেছেন। বার্থা তাঁহাকে পার্শ্বস্থ বক্সের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিতে কি বলিলেন। ম্যাক্সিম্ বুঝিলেন,—বার্থা যেন বলিতেছেন, "এখানে আসুন, একটা মজা দেখিতে পাইবেন।—ওখানে থাকিলে দেখিতে পাইবেন না।"

ম্যাক্সিম্ ভাবিলেন, "পাশের বক্সের অধিকারিণীকে আমি চিনি,—বার্থা তাহাই বলিতেছেন।—দেখা যাক্ না কেন!"

যুবক রমণীত্রয়ের কাছে উঠিয়া গেলেন।

বার্থা বলিলেন, "এতক্ষণ পরে আসিলেন—দেখিতেছি।"

ডলফিন্ বলিলেন, "আপনি আজ আমাদের সঙ্গে ভারী বেয়াদবি করিয়াছেন।—আমরা ডাকিতেছি, আর আপনি পিঠ ফিরাইয়া বসিলেন!"

"আমি আসিলে পাছে আপনাদের অসুবিধা হয়, তাই আসি নাই।"

কোরা বলিলেন, "বাঃ!—আপনি ত জানেন, বক্সে চারিটি আসন থাকে। অবশ্য অভিনয় এখান হইতে ভাল দেখা যায় না বটে;—কিন্তু আমরা অভিনেতা বা অভিনেত্রী-দিগকে দেখিবার জন্য আপনাকে ডাকি নাই।"

"তবে কি?"

বার্থা বলিলেন, "আপনাকে কিছু না দেখানই ভাল।—আমরা এত ডাকিতেছি,—তবু আপনি নড়িতে চান না!"

"ঐ মহিলাটিকে দেখিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন বুঝি,—ঐরূপ স্কন্ধদেশ আমি যেন কোথায় দেখিয়াছি!"

"তবে ভাল করিয়া দেখুন।—আমার অপেরা গ্লাস্‌টা লইবেন?"

"কি দরকার?—দেখিতেছি সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে, নক্ষত্র এখন অন্তর্হিত!"

"আবার এখনই দেখা দিবে।—ততক্ষণ উপগ্রহটিকে দেখুন।"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, এক ব্যক্তি মুখ বাহির করিয়া অভিনয় দেখিতেছেন। লোকটাকে যেন তিনি কোথায় দেখিয়াছেন। ব্যক্তিটি খুব লম্বাচওড়া। চেহারা কদর্য্য; কিন্তু পরিচ্ছদপারিপাট্য দেখিলে মনে হয়,—যেন কোনও বৈদেশিক প্রিন্স।

"ইহাকে দেখিবার জন্যই আমায় ডাকিয়াছেন না কি? উঁহাকে চেনেন?"

"আদৌ না।—জীবনে এই প্রথম দেখিলাম।"

"তাহা হইলে মহিলাটিকে বুঝি চেনেন?"

"সম্ভবতঃ।"

"কে বলুন ত?"

"অনুমান করুন।"

"বাঃ! আমি চেহারাই ভাল করিয়া দেখিলাম না,—তা অনুমান করিব কিরূপে?"

"তাঁহার স্বামীকেও চেনেন না?"

"মোটেই না।"

"উত্তম।—আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম। আপনি যদিও আমায় বলিয়াছিলেন বটে; কিন্তু আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, রমণীটি বিবাহিতা।"

"আমি ব'লেছিলাম?—আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছেন বুঝি?"

"ঠাট্টা করিব কেন? এই শ্মশ্রুল দৈত্যটি কখনই তাঁহার স্বামী নয়।—আপনি ত প্রায়ই রমণীর কাছে যান; সুতরাং আপনারই ভাল রকম জানা উচিত।"

"বার্থা !—এ ভাবে যদি আমার সঙ্গে আপনি বিদ্রূপ করেন, তাহা হইলে আমি চলিয়া যাইব।"

"আপনাকে বিদায় দেওয়াই উচিত ;—কিন্তু অতটা নিষ্ঠুর আমি হইব না।—ব্রেস্‌লেট্‌টা এখনও আপনার কাছে আছে ?—তাহা হইলে, যে মহিলা আপনাকে উহা উপহার দিয়াছেন, তাঁহাকে আপনি এখনও ভালবাসেন দেখিতেছি ! আমি আপনাকে তাঁহার নাম বলিব বলিয়াছিলাম না ?"

"হাঁ,—আপনি আরও বলিয়াছিলেন, এই সম্ভ্রান্ত মহিলা অতি বিচিত্র প্রকৃতির।"

"ঠিক্।—যদি সে সময়ে সেই ডাক্তারটি না আসিয়া পড়িতেন, আপনি অনেক কথা জানিতে পারিতেন।"

"কিন্তু আজ ত আর কেহ নাই,—সুতরাং গল্পটা শেষ করিয়া ফেলুন।"

"বেশ।—একদিন আপনার স্বপ্নরাজ্যের এই মহিলাটির সহিত আমি একত্র একটি হোটেলে আহার করিয়াছিলাম।"

"আপনি ?—বলেন কি !"

"আপনি ভাবিতেছেন, আপনার প্রণয়িনী খুব সম্ভ্রান্ত মহিলা, আর আমি তা নই,—কেমন না ? কিন্তু মহাশয়, আপনার বড়ই ভ্রম ;—আপনার প্রণয়িনীও সম্ভ্রান্ত মহিলা ন'ন। এক মাস পূর্ব্বে তিনি কোনও বিদেশী ভদ্রলোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন, সেই বিদেশী ভদ্রলোক আবার অপর একটি বিদেশীর বন্ধু। আবার এই বিদেশী ভদ্রোলোকটি আমারও বন্ধু ছিলেন।—ভাষাটা একটু ঘোরাল করিয়া বলিলাম বটে, কিন্তু অবস্থাটা অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন।—একদিন ঘটনাক্রমে এই দুই বিদেশী ভদ্রলোক এই থিয়েটারেই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন।—দুই জন অবশ্য একসঙ্গে আসেন নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই নিজ নিজ সঙ্গিনীও আসিয়াছিলেন। তার পর, অভিনয় শেষ হইলে, দুই দলই এক সময়ে পিটার্স হোটেলে আহার করিতে যান।"

"তাঁহার নামটি কি,—দেখিতে কেমন,—সব বলুন।"

"নাম তিনি আমায় বলেন নাই।—কিন্তু রমণীটি খুব বিনয়ী।—তবে ভাবে বোধ হইল, তিনি তাঁহার সঙ্গীর নিকটও সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেন নাই। তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি নাই বটে ; তবে বুঝিলাম,—রুষ, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের লোকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা। তাঁহাকে তার পর আর দেখি নাই। আপনার হাতের ব্রেস্‌লেট্‌ দেখিয়া তাঁহার কথা আমার মনে পড়িল। তখন সব ঘটনাটা মনে পড়ে নাই। পিটার্স হোটেলে একদিন আহার করিতে বসিয়া হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। সেইখানেই তিনি আমায় ঐরূপ একখানা ব্রেস্‌লেট্‌ দেখাইয়াছিলেন। উহার একখানা পান্না হারাইয়া গিয়াছিল,—তিনি উহা মেরামত করিতে চাহেন।—কোনও ভাল জহুরীর নাম জিজ্ঞাসা করায়, আমি আপনার জহুরীর নাম বলিয়া দিয়াছিলাম।"

"তার পর তাঁহার সহিত আর আপনার দেখা হয় নাই ?"

"না।—আজ এখন তাঁহাকে দেখিতেছি।—ঐ বক্সে তিনি আছেন।"

"অসম্ভব !"

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি।—আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও খারাপ হয় নাই। সত্যই আমি স্পষ্ট তাঁহাকে দেখিয়াছি।—তিনিও আমায় দেখিয়া থাকিবেন। বোধ হয়, আমার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই,—তাই পর্দ্দার আড়ালে রহিয়াছেন !"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "আমি একবার তাঁহাকে দেখিতে চাই।—কিন্তু এখানে বসিলে যখন দেখা পাওয়া যাইবে না, তখন আপনাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইতে হইতেছে।"

যবনিকা তুলিবার উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া ম্যাক্সিম্ ত্বরিতপদে প্রথম-পঙ্‌ক্তিতে আসন গ্রহণের জন্য উঠিলেন। বক্স্ হইতে বাহির হইবার পথ সেইখান দিয়া। যথাস্থানে বসিয়া ম্যাক্সিম্ ভাবিতে লাগিলেন, "বার্থার কথাই ঠিক। জহুরীর কথার সহিত তাহার কথা মিলিতেছে।—কিন্তু হস্তব্যবচ্ছেদের পনের দিনের মধ্যে রমণী কি করিয়া অভিনয় দেখিতে আসিলেন ?—অন্য কেহ হইলে শয্যাশায়ী থাকিত। —উহার সঙ্গীটিও আহাম্মুখ নয় কি ?—রমণীর একখানি হাত নাই, তাহা কি লক্ষ্য করে নাই ?—অথবা উভয়ে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া সিন্দুক খুলিতে গিয়াছিল !—যাহা হউক, এখন উহাদিগকে নজরবন্দী রাখিতে হইবে।—একবার রমণীর সহিত আলাপ করিলে হয় না !"

ভাবিতে ভাবিতে ম্যাক্সিম্ অন্যমনস্ক হইয়াছেন। বক্সের দিকে ফিরিয়া চাহিবামাত্র দেখিলেন, পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া

হইয়াছে।—পুরুষটি সেখানে নাই!—রমণীটিকেও দেখা যাইতেছে না!

"তাহারা পলায়ন করিতেছে!—আমিও ছাড়িব না।"—ম্যাক্সিম্ উন্মত্তের ন্যায় দ্রুতবেগে ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিলেন। দর্শকেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল।—দরজার কাছে পৌছিয়া তিনি দেখিলেন, পুরুষটি ওভারকোট্ গায়ে দিতেছেন। তিনি যেন একাই আসিয়াছিলেন। ম্যাক্সিম্‌কে তিনি যেন দেখিতেই পাইলেন না।—ম্যাক্সিম্ তাঁহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহার এ মূর্ত্তি পূর্ব্বে যেন কোথায় দেখিয়াছেন!

"কোথায় ইঁহাকে দেখিয়াছি! যাক্, রমণী ত এখন একা আছেন,—এইবার তাঁহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব। তিনি ত জানেন না যে, আমি তাঁহার ব্রেস্‌লেট্ পাইয়াছি।—লোকটাকে চিনিতে পারিয়াছি।—আজ সকালে রু জো-ফ্রয়ে যে লোকটা আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল,—সেই লোকটাই বটে! তাহা হইলে রমণীটি,—দেখাই যাক্ না কেন!"

বার্থা তখন ইঙ্গিতে তাঁহাকে যেন বলিতেছিল, "ওখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ?—পথ মুক্ত, এইবার যাও।"

ম্যাক্সিম্ সবিস্ময়ে দেখিলেন, বক্সের সম্মুখে স্কেট্‌প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদৃষ্টা রমণী—সেই নৈশসঙ্গিনী-বসিয়া আছেন। ম্যাক্সিম্ নিজের চক্ষুকে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু বাস্তবিক সেই সুন্দরীই বটে,—উজ্জ্বল গ্যাসালোকে তাঁহার অবয়ব স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

"অসম্ভব! বার্থা নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে!—যে চুরী করিতে গিয়াছিল, সে এক-হস্তহীনা। কিন্তু এ রমণীর দুই হস্তই আছে!—তবে, একখানি হাত কৃত্রিম হইতে পারে; অস্ত্রবিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।—কিন্তু তাহা অসম্ভব! রমণী বামহস্ত স্বাভাবিকভাবেই চালনা করিতেছেন। যাহা হউক,—একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইল।"

রমণী চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন,—সহসা উভয়ের দৃষ্টিবিনিময় হইল। সুন্দরী তাঁহাকে সহাস্যে অভিবাদন করিলেন। ম্যাক্সিম্ আর বিলম্ব করিলেন না, দর্শকদিগকে ঠেলিয়া রমণীর আসন-অভিমুখে চলিলেন।—ম্যাক্সিমের পুনঃপুনঃ গমনাগমনে দর্শকেরা বিরক্ত হইয়াছিলেন, সকলেই ঘোরতর আপত্তি করিতে লাগিলেন। একটা গোলমাল উঠিল। অভিনেতারা অভিনয় বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক্ হইতে চীৎকার উঠিল, "লোকটাকে তাড়াইয়া দাও।"—পুলিশ মধ্যবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ম্যাক্সিম্ ইহাতে দমিয়া যাইবার লোক নহেন। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি ক্ষমা চাহিতেছি;—তাহাও যদি পর্য্যাপ্ত মনে না করেন, তবে আমি আমার কার্ড আপনাদের দিতে পারি!"

ক্রুদ্ধ দর্শকেরা দ্বন্দ্বযুদ্ধের সূচনা দেখিয়া সহজেই থামিয়া গেলেন।—ম্যাক্সিম্ অক্লেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন।

রমণী ম্যাক্সিম্‌কে হাত বাড়াইয়া দিলেন। করমর্দ্দনে ম্যাক্সিম্ বুঝিলেন, হাত কাষ্ঠময় নহে।

প্রফুল্লভাবে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "আপনি আমায় খুঁজিতেছিলেন?"

"হাঁ।—সৌভাগ্যবশে আবার দেখা হইল।—আপনার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, আমাকে যেন আপনার অনেক কথা বলিবার আছে।"

"তা' ত আছেই।—আপনি প্যারী ছাড়িয়া যাইতেছেন, এ কথা বলিয়া আমায় প্রতারিত করিয়াছিলেন কেন?"

"আমার নিষেধ না মানিয়া আপনি আজ সকালে রু জো-ফ্রয়ে গিয়াছিলেন কেন?"

"আপনি তাহা কেমন করিয়া জানিলেন?"

"আমি জানিলাম কি করিয়া?—বাঃ, সে জন্য আমায় কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে!"

"বাস্তবিক!—আমি আজ বেলা তিনটার সময় আপনাকে হ্রদের ধারে বেড়াইতে দেখিয়াছি।"

"আমার যখন শরীর ও মন অসুস্থ হয়, তখন হ্রদের ধারে বেড়াই।—আমাকে যদি দেখিলেন, তবে আলাপ করিলেন না কেন?"

"আমি একা ছিলাম না।"

"কোনও ভদ্রমহিলা বুঝি সঙ্গে ছিলেন?"

"কিছুকাল আগে আপনিও ত একটি ভদ্রলোকের সহিত বসিয়াছিলেন।"

"সে কথা ঠিক।"

"অত কাতর হইলেন কেন?—ভদ্রলোকটি কি আপনাকে কষ্ট দেন?"

"তাঁহার জন্য আমি দিবানিশি মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতেছি।"

"সহ্য করেন কেন ?"

"সে আমার অদৃষ্ট।"

"উনি কি আপনার স্বামী ?"

"না-না !—সর্ব্বস্ব দিলেও উঁহাকে বিবাহ করিব না।"

"বাঃ!—তবে তিনি কোন্ অধিকারে পীড়ন করেন ?"

রমণী যেন উচ্ছ্বসিত কলহাস্য অতি কষ্টে সংবরণ করিলেন। হাত-পাখার অন্তরালে মুখ লুকাইয়া তিনি বলিলেন, "আপনি বুঝি আমাকে সেই রাত্রে ভদ্রমহিলা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন ?"

"আপনার হাবভাব—কথাবার্ত্তা সমস্তই ভদ্রমহিলার অনুরূপ বলিয়া, আমার তাহাই বিশ্বাস হইয়াছিল।"

"এখন তাহা হইলে বিরুদ্ধ ধারণা মনে জন্মিয়াছে ?"

"আমি সত্যই বলিব,—আমার পরিচিতা জন বার্থা ভেরিয়ার নাম্নী একটি রমণী—তিনি ঐ বক্সে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছেন,—আপনাকে চেনেন। এক দিন আপনি একটি বিদেশী ভদ্রলোকের সহিত হোটেলে বসিয়া ভোজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে আপনাদের আলাপ-পরিচয় হয়।"

"বার্থার কথা যথার্থ।"

"আপনি তাহার সহিত অপরিচিতার ন্যায় ব্যবহার করিলেন কেন ?"

"সত্য বলিতে কি, আমি এখন পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তি-দিগের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতেছি।—যাহাদের বদনাম আছে, এমন লোকের সহিত মিলিতে আমার ঘৃণা বোধ হয়।"

"আপনি সে প্রকৃতির রমণী নন ?"

"না।—তাহাদের মত আমি নই। এই ধরুন না কেন, সে দিন আমি ব্যায়াম করিবার জন্য স্কেট্‌প্রাঙ্গণে গেলাম, একটি ভদ্রলোক আমার পেছু লইলেন।—আমি কিন্তু তাঁহাকে ডাকি নাই, অথচ তিনি আমাকে জয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।"

হাসিতে হাসিতে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, আপনি অকস্মাৎ তাঁহাকে ফেলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যদি তিনি আজ থিয়েটারে না আসিতেন, তাহা হইলে ত আর দেখাই হইত না !"

"এক পক্ষকাল অপেক্ষা করিলেই তিনি আমার দেখা পাইতেন।"

"এত দিন বিলম্বের কারণ কি ?"

"আমার বর্ত্তমান মনিব ততদিনে চলিয়া যাইতেন।"

"তা আমাকে তখন খুলিয়া বলিলেই হইত।—আমি অত তাড়াতাড়ি করিতাম না।—কিন্তু কি বিপদ্! লোকটা নিজেই দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। আমি তাহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছি!—আমি আগে ভাবিয়াছিলাম, সে বুঝি আপনার বাড়ীর চাকর।"

"বাস্তবিক, লোকটা অত্যন্ত কদাকার।"

"ভয়ানক সন্দিগ্ধ ও ঈর্ষাপরায়ণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।—আজ সে আমাকে থিয়েটারে দেখিয়াছে ; কিন্তু তবু চলিয়া গেল কেন ?"

"সে আপনাকে দেখে নাই। আমার জন্যই সে পাগল। যদি সে চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে অন্য কারণ আছে। সেটা ঈর্ষা নয়।—লোকটা ভয়ানক জুয়ারী। জুয়ার আড্ডায় যখন যায়, তখন আমি একটু হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচি। এখন জুয়া খেলিতে গিয়াছে, আজ আর শীঘ্র ফিরিবে না।"

"কাল সকাল পর্য্যন্ত তাহা হইলে আপনি স্বাধীন ?

"সম্ভব।—আমি ঠিক বলিতে পারি না।—লোকটা অত্যন্ত অর্থপিশাচ।—কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার সম্বন্ধে এত সংবাদে আপনার কি প্রয়োজন ?"

"সে অনুমান আপনি নিজেই করুন।"

"আপনি হয় ত বলিবেন,—আমায় আপনি ভালবাসেন। কিন্তু সেটা মিথ্যা কথা।—আমি বেশ জানি, আপনি আমায় ভালবাসেন না।—তা ছাড়া, আপনি যে অন্যের প্রণয়াসক্ত, সে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ আছে।"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, ব্রেস্‌লেটের প্রসঙ্গ উত্থাপনের সুযোগ উপস্থিত!—কিন্তু তিনি তখন সে কথা বলিলেন না। তিনি বিশেষভাবে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। রমণী অবলীলা-ক্রমে বামহস্ত ব্যবহার করিতেছিলেন।—উহা যে কৃত্রিম, তাহা ম্যাক্সিমের আদৌ বোধ হইল না।

তিনি বলিলেন, "আপনি যখন বিশ্বাস করিবেন না,

তখন আমার ভালবাসার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব না।—তবে এ কথা ঠিক, আমি এখনও কাহাকেও হৃদয় দান করি নাই।"

"আপনি কি রু জো-ক্রয়ে গিয়া আমার সহিত দেখা করিতে চাহেন?—তাহা হইলে আমার সঙ্গী আমাকে খাইয়া ফেলিবে।"

"তা আমি করিব না।—যত দিন লোকটি না চলিয়া যায়, তত দিন আমি অপেক্ষা করিব।—কিন্তু আজ ত সে জুয়ার আড্ডায় গিয়াছে, চলুন না, এই অবসরে একটা হোটেলে বসিয়া কিছু আহার করা যাক্।"

"আমাকে দ্বিপ্রহরের মধ্যে বাসায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

"ওঃ! তা বেশ যাইতে পারিবেন।"

"বার্থাকে সঙ্গে লইবেন না ত?"

"না—না।—আমরা দু'জনে যাইব।"

"বেশ কথা।—যখন ইচ্ছা, বলিবেন;—আমি প্রস্তুত আছি।"

ম্যাক্সিম্ ভাবেন নাই,—রমণী এত সহজে সম্মত হইবেন। কিন্তু সম্প্রতি সুন্দরীর সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব ধারণা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।—তিনি বলিলেন,"আপনি একটু বসুন, আমি গাড়ী ঠিক করিয়া আসি।"

"কি দরকার! আমি তুষারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে ভালবাসি।—কারণ আমার পদচিহ্ন দেখিলেই বন্ধুগণ চিনিতে পারিবেন যে, আমি সেই পথে গিয়াছি। এ একটা আমার খেয়াল।"

"আজ তুষারপাতে পথে চলা বড় কষ্টকর হইবে। তাই বলিতেছিলাম যে—"

"কিছু প্রয়োজন নাই।—নিকটে যে হোটেল আছে, চলুন সেইখানেই যাই। সে বেশী দূর নয়। বিশেষতঃ আমার সঙ্গী জানোয়ারটি আমাকে সেখানে কখনই খুঁজিতে যাইবে না।—দোতালায় কএকটি চমৎকার ঘর আছে।"

ম্যাক্সিম্ ভাবিলেন, "ইনি দেখিতেছি সমস্ত হোটেলই চিনেন।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তবে তাই হউক।"

উভয়ে তাড়াতাড়ি থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িলেন।—পথ জনবিরল।—হোটেল বহু দূরে নয়। হোটেলে পৌছিয়া ম্যাক্সিম্ একটি নির্জ্জন কক্ষ চাহিলেন। মাডাম্ সার্জ্জেন্ট্ একটি বাতায়নবিশিষ্ট কক্ষ মনোনীত করিলেন। আহার্য্যের আয়োজন হইল। ম্যাক্সিম্ কৌতূহল-পূর্ণ নেত্রে দেখিলেন, অপরিচিতা উভয় হস্তের দস্তানা খুলিয়া ফেলিলেন। তিনি একে একে রমণীর উভয় করপদ্ম চুম্বন করিলেন।—একটিও কৃত্রিম হস্ত নহে!—রমণী তাঁহার এই উচ্ছ্বাসে বাধাদান করিলেন না।

ম্যাক্সিম্ বুঝিলেন, এ রমণী ছিন্নহস্তা নহেন;—সুতরাং সিন্দুকের চাবী খুলিবার চেষ্টা যে স্বয়ং তিনি করেন নাই, ইহা নিশ্চিত।—কিন্তু তিনি চোরের সহকারিণী হইতে পারেন,—অথবা, হয় ত, কে চুরিব্যাপারে লিপ্ত,—তাহাও অবিদিত নহেন।—সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইবার এই শুভ অবসর!—কিন্তু অকস্মাৎ আক্রমণ করাটা সঙ্গত নহে।

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "জীবনটা দুর্ব্বহ নহে। অবশ্য সমস্ত দিনটাই আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়াছি বটে,—কিন্তু এখন তাহার পুরস্কার পাইতেছি। প্যারীর সুন্দরীশ্রেষ্ঠার সহিত নির্জ্জনে—"

রমণী হাসিয়া বলিলেন, "ও কথা বলিবেন না, তাহা হইলে আমি জানালা খুলিয়া দিব।—প্রথমতঃ প্যারীর মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নহি; কিংবা আপনার সহিত প্রেমালাপ করিতেও আসি নাই।—আমি শুধু আহার করিতে আসিয়াছি।"

"শুধু কি তাই?"

"হাঁ,—আমি আজ এক মাস উৎকৃষ্ট খাদ্য চক্ষে দেখি নাই।—আমার মানুষটি ভারী কৃপণ। নিজে কোনও ভাল জিনিস খায় না, কাউকে খাইতেও দেয় না!"

"সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার রাজত্বের শীঘ্রই অবসান হইবে।"

"না,—তা কি করিয়া হইবে?—সে আমাকে কোনও জঙ্গলা দেশে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চায়!"

"আপনি তাহাতে সম্মত হইবেন?"

"আমি এখনও কিছু স্থির করি নাই।—তবে যদি জীবনটা নিতান্তই নিঃসঙ্গ হইয়া পড়ে তখন আর না গিয়া কি করিব?"

"আপনি কিরূপ আমোদপ্রমোদ চান?—আমায় বলুন, আমি তাহাই করিব।"

"আমাকে আমোদিত করিতে চান?—আপনি নিজের

আমোদই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। বার্থা ভেরিয়ারের কাছে যান, সে অত আমোদ-পেয়ারা নয়।"

"আপনি ভুল বুঝিতেছেন;—বাহির হইতে আমাকে দেখিতে যতটা নীরস, আমি ততটা নই।"

"ঠিক্ বটে,—ভুলিয়া গিয়াছিলাম।—ব্রেস্‌লেটের কথাটা আমার মনেই ছিল না! সে দিন আপনি বলিয়াছিলেন, উহা আপনার পিতৃপুরুষদিগের স্মৃতিচিহ্ন!—আমি অবশ্য আপনার কৈফিয়তে বিশ্বাস করি নাই।"

"আপনার কথাই ঠিক; উহা আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের নহে।—অথচ, কোনও রমণীর নিকট হইতেও আমি উহা পাই নাই।"

"আপনি কি বলিতে চান,—ব্রেস্‌লেট্‌টা কুড়াইয়া পাইয়াছেন?"

"সত্যই তাই!"

"অথচ আপনি উহার প্রকৃত অধিকারিণীর নিকট উহা প্রত্যর্পণের চেষ্টা করেন নাই!—আপনার কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।"

"ব্রেস্‌লেটের একটা বিচিত্র কাহিনী আছে।"

"গল্পটা বলুন শুনি,—এই-ই ঠিক সময়।"

"জিনিসটা কি আপনি দেখিয়াছেন?"

"দেখিব কেমন করিয়া,—আপনি ত দেখান নাই!"

ম্যাক্সিম্ ব্রেস্‌লেট্ বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।—রমণীর মুখের কোনও পরিবর্ত্তন হয় কি না, তাহাও লক্ষ্য করিলেন।

"তেমন সুদৃশ্য নয় ত!"

"বার্থার মন্তব্যের সহিত আপনার মন্তব্যের সাদৃশ্য আছে।—বার্থা এ ব্রেস্‌লেট্ কাহারও হস্তে দেখিয়াছেন।"

ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্ বলিলেন, "থামুন,—আমিও যেন কোথায় ইহা দেখিয়াছি!—বাঃ! এক মাস পূর্ব্বে এই জিনিসটা আমারই হাতে ছিল!—বার্থা ঠিক বলিয়াছেন। যে দিন রাত্রে আমরা একত্র এক হোটেলে পানভোজন করি, সে দিন আমি ব্রেস্‌লেট্ পরিয়া আসিয়াছিলাম!"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "বলেন কি!—জিনিসটা আপনার?"

প্রশান্তভাবে রমণী বলিলেন, "হাঁ।—আমার পূর্ব্ব-পরিচিত বিদেশী-বন্ধু জিনিসটা আমায় উপহার দেন। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমি উহা পরিতাম। আমার মনে পড়ে, ব্রেস্‌লেটের কএকটা পান্না হারাইয়া গিয়াছিল। একটি বড় জহুরীর দোকানে উহা মেরামত করিতে দিই। তার পর বন্ধুটি চলিয়া গেলে আমি উহা বেচিয়া ফেলিবার চেষ্টা করি। অনেক চেষ্টার পর একজন দালাল্ তেত্রিশ টাকায় উহা কিনিয়া লয়।—এখন আপনার কাহিনী বলুন।"

ম্যাক্সিম্ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমার গল্পটি একান্তই শুনিতে চান?"

"নিশ্চয়ই!"

"যে রমণীর হাতে এই কঙ্কণ ছিল,—তিনি চুরী করিয়াছেন।"

"শুধু চুরী?—অত্যন্ত তুচ্ছ ও সাধারণ ঘটনা।—খুন করে নাই?—সামান্য চুরী?"

"সামান্য নহে,—এ চুরী অসাধারণ!"

"হইতে পারে।—তাই বুঝি চোর ধরিবার অভিপ্রায়ে মহাশয় তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন?—অতি অদ্ভুত ইচ্ছা বটে!"

"যে যাহার নিজের খেয়াল মত কাজ করে।—আপনি তুষারের উপর দিয়া হাঁটিতে ভালবাসেন;—আমি সমস্যা-পূরণ করিতে ভালবাসি!"

"ওঃ!—আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি।—আপনি আমাকেই চোর ভাবিয়াছিলেন?"

রমণী উচ্চহাস্যে কক্ষ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

"আমি শপথ করিয়া বলি——"

"অস্বীকার করিবেন না।—আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি। বার্থা আমার হাতে ব্রেস্‌লেট্ দেখিয়াছিল; সে আপনাকে বলে যে, উহা আমার। আপনি তখন আমার নিকট হইতে কথা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রেস্‌লেট্‌টি টেবিলের উপর রাখার সময় আপনি হয় ত ভাবিয়াছিলেন, আমি মূর্চ্ছা যাইব।—কি বেজায় ব্যাপার!—আপনি না হইয়া আমি হইলে, এতক্ষণ পুলিশ ডাকিতাম।"

ম্যাক্সিম্ প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হাসিয়া হাসিয়া অপরিচিতা সুন্দরীর দমবন্ধ হইবার উপক্রম ঘটিল।—"কি! আপনি আমায় পুলিশে দিবেন না?—আমি চোর নই, আপনি বিশ্বাস করিতেছেন?—বেশ, তাহা

হইলে আরও কিছু খাবার আনান, আর জানালা খুলিয়া দিন।—এত হাসিয়াছি যে, প্রায় আমার দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে।"

ম্যাক্সিম্ একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন।—তিনি জানালা খুলিয়া দিলেন। পুনরায় খাদ্য আনিবার আদেশ করিলেন। তার পর, নিজের আসনে আসিয়া বসিলেন। রমণী তখনও ব্রেস্‌লেট্‌টা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিলেন। ম্যাক্সিম্ রমণীকে অপরাধী ভাবিয়াছিলেন বলিয়া মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইলেন। সুন্দরী বলিলেন, "আমারই কঙ্কণ, কোনও সন্দেহ নাই।—এই যে পাথরখানি দেখিতেছেন, এই খানি আমি নূতন করিয়া বসাইয়াছিলাম। কি ভয়ঙ্কর!—এই কদর্য্য অলঙ্কারখানির জন্য আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি!"

ম্যাক্সিম্ কি যেন বলিতে যাইবেন, এমন সময় দরজার চাবী খোলার শব্দ হইল। কর্কশকণ্ঠে কেহ বলিল, "আমি ভিতরে যাইব,—তুমি বাধা দিও না বলিতেছি।"

ম্যাডাম্ সার্জ্জেন্ট্ আতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ! সে আসিয়াছে,—এইবার গেলাম।"

ম্যাক্সিমের মনে তখন রমণীকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। ইহা স্বাভাবিক। তিনি দরজার দিকে দৌড়িয়া গেলেন।—তখনই দ্বার মুক্ত হইল। ম্যাক্সিম্ দেখিলেন,—সেই অসভ্য লোকটা সম্মুখে দাঁড়াইয়া! তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন, সে কি উদ্দেশ্যে সেখানে আসিয়াছে। ম্যাক্সিম্ দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তুমি কি চাও?"

লোকটা দুই পা হটিয়া গিয়া বলিল, "ঐ মেয়েমানুষটা আমার,—আমি উহাকে চাই।"

"এখানে কোনও মেয়ে মানুষ নাই।—তুমি জাহান্নমে যাও। যদি তাতেও সন্তুষ্ট না হও, আমার কার্ড লইতে পার।"

ক্রুদ্ধ লোকটা ম্যাক্সিমের হাত হইতে কার্ড লইল। "বেশ, কাল আমার সহকারী তোমার কাছে আসিবে। আমার বাড়ী তুমি জান, কারণ আজ সকালে সেখানে তুমি গিয়াছিলে।—কিন্তু শুধু কার্ডে হইবে না;—মেয়েমানুষটিকে আমি চাই।"

"ভিতরে আসিও না বলিতেছি। যদি আসিবার—"

ম্যাক্সিম্ কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না। একজন সহসা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া বাহিরে দৌড়িয়া গেল। ম্যাক্সিম্ দেখিলেন,—সে ম্যাডাম্ সার্জ্জেন্ট্!—লোকটাও তাহার পশ্চাতে দৌড়িল। ম্যাক্সিম্ বিস্ময়াভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন!—উহাদের পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া রাস্তায় একটা মারামারি করা আদৌ শোভন নহে।—রমণী নিশ্চয় তাঁহাকে কোনরূপে সংবাদ পাঠাইবে, সুতরাং অনাবশ্যক গণ্ডগোলের প্রয়োজন নাই। বাতায়নের কাছে গিয়া তিনি দেখিলেন, উভয়ে গাড়ীতে উঠিতেছে!—তখন সহসা ব্রেস্‌লেটের কথা ম্যাক্সিমের মনে পড়িল!

ব্রেস্‌লেট্ নাই!—ম্যাডাম্ সার্জ্জেন্ট্ হয় ত ভ্রমবশতঃ উহা লইয়া গিয়া থাকিবেন।—এত ভ্রম? নিজের গলাবন্ধ, হাতের দস্তানা, কিছুই ত ফেলিয়া যান নাই!—চোর ধরিবার একমাত্র নিদর্শন হারাইয়া গেল!—কোন লাভই হইল না!—শুধু শুধু এক জনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন হইয়া রহিল মাত্র।—দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহার কোন আশঙ্কাই নাই।—আত্মশক্তির উপর তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। লোকটাকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে রমণী নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন। তখন পুরস্কারস্বরূপ ব্রেস্‌লেট্‌টি আমাকে ফিরাইয়া দিবেন।

ম্যাক্সিম্ এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় হোটেলের ভৃত্য সম্মুখে আসিল।—দাম চুকাইয়া দিয়া তিনি হোটেল হইতে বাহির হইলেন।

ম্যাক্সিম্ তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধের দুইজন সহকারী নির্ব্বাচন করিবার জন্য ক্লাবে চলিলেন। আজিকার সমস্ত ঘটনাটা তিনি একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলেন।—লোকটা তাঁহাদের সন্ধান পাইল কি করিয়া?—বার্থা কখনই তাহাকে বলিয়া দেয় নাই।—সম্ভবতঃ লোকটা থিয়েটারে ম্যাক্সিম্‌কে দেখিতে পাইয়া থাকিবে। তাই বাহিরে আসিয়া কোথাও লুকাইয়া ছিল। তার পর তাঁহারা হোটেলে পৌছিলে সেও তথায় গিয়াছিল। তার পর যখন তিনি জানালা খুলিয়া দেন, তখন সে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ঘরে দৌড়িয়া গিয়াছিল।—তাহাই সম্ভব। কিন্তু অমন সুন্দরী একটা জানোয়ারের এত বাধ্য কেন!—লোকটা বোধ হয় খুব ধনী।—ব্রেস্‌লেট্‌টা আর পাওয়া যাইবে না। সঙ্গে সঙ্গে চোর ধরিবার আশাও লুপ্ত হইল।—রমণী কাহার

নিকট অলঙ্কারটা বিক্রয় করিয়াছিলেন,—সেটা না জানিয়া লওয়া নির্ব্বোধের কাজ হইয়াছে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ম্যাক্সিম্ ক্লাবে পৌছিলেন। তখন অনেকেই গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের কেহই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সহকারী হইবার উপযুক্ত ন'ন। কি করিবেন,—ম্যাক্সিম্ ভাবিতেছেন,—এমন সময় সেই হঙ্গেরীর ডাক্তার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ম্যাক্সিম্ আনন্দিত ভাবে বলিলেন, "ডাক্তার! কাল একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ আছে,—আপনি আমার সহকারী হইবেন?"

"কার সঙ্গে যুদ্ধ?"

"সে একজন বৈদেশিক।—আপনারই পরিচিত কোনও রমণীকে লইয়া যুদ্ধের সূত্রপাত! রমণীটির সহিত আমার থিয়েটারে দেখা হয়। উভয়ে হোটেলে বসিয়া পানভোজন করিতেছি, অমনই সেই লোকটা বলপূর্ব্বক ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।"

"ঘটনাটি আমি যেন চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। লোকটি ঘরে ঢুকিবামাত্র আপনি তাহাকে আপনার কার্ড দিলেন। তিনি সুন্দরীর সহিত কার্ড লইয়া চলিয়া গেলেন।—কেমন? আমি বাজি রাখিতে পারি, সে ভদ্রলোককে আপনি আর কখনও দেখিতে পাইবেন না। এসব লোক প্যারীতে আমোদ করিতেই আসিয়া থাকেন, যুদ্ধ করিতে আসেন না।"

"বেশ!—সে যদি না আসে,—আমি তাহাকে খোঁজ করিয়া বাহির করিয়া, ভদ্রতা সম্বন্ধে উচিত শিক্ষা দিব।"

"কি দরকার!—লোকটি ত আপনার গায়ে হাত দেয় নাই, বা রমণীটির প্রতিও আপনার প্রেম জন্মে নাই,—তবে আপনি যাচিয়া কেন গোল করিতে চাহেন? আমার মতে থামিয়া যাওয়াই ভাল। তিনি যদি নিজে আসিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা বলেন, তখন আপনি যাহা হয় করিবেন।"

"আচ্ছা, তাই করিব।—কিন্তু আপনি আমার সহকারী হইবেন ত?"

"কএক দিন আমি বড়ই ব্যস্ত থাকিব।—কাউণ্টেসের পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়াছে।—আমায় ক্ষমা করিবেন।"

"বলেন কি?—কাউণ্টেসের কি অসুখ হইল?"

"অসুখ কি, এখনও ঠিক ধরিতে পারি নাই!—কিন্তু তিনি এত অসুস্থ যে, শয্যাশায়িনী হইয়াছেন। আমি আপনার সন্ধানেই এখানে আসিলাম। তিনি আমায় বলিয়া দিয়াছেন যে, কাল তাঁহার সহিত আপনার দেখা হইবে না।—কবে তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন, তাহাও এখনও ঠিক করিয়া বলা যায় না।"

ম্যাক্সিম্ সত্যই কাউণ্টেসের জন্য চিন্তিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ডাক্তার,—আপনি তাঁহাকে আরাম করিতে পারিবেন ত?"

"নিশ্চয়।—তবে কথা হইতেছে, আমার আদেশমত তাঁহাকে চলিতে হইবে। কএক দিন জ্বরে তাঁহাকে শয্যাশায়িনী থাকিতেই হইবে।—তার পর একটু সারিলেই হয়ত তিনি ঘোড়ায় চড়া বা অন্যরূপ ব্যায়াম করিতে চাহিবেন;—সেটি হইবে না। কারণ, কোনরূপ উত্তেজনা তাঁহার পক্ষে মারাত্মক! এইজন্য তাঁহার বন্ধুবর্গ—আপনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম—যতদিন না কাউণ্টেস্ সারিয়া উঠেন, ততদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিলেই মঙ্গল।"

"অবশ্য,—তিনি কেমন থাকেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার আবাসে যাইতে পারি ত?"

"নিশ্চয়ই।—আমি স্বয়ং আপনাকে সংবাদ দিব। কারণ, এখন হইতে প্রাসাদেই আমি অবস্থান করিব। আপনাকে সংবাদ দিবার কথা ছিল, সে কাজ শেষ হইয়াছে;—এখন আমি বিদায় লইতেছি।—আবার বলি, কৃষ্ণনয়না সুন্দরীর জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত হইবেন না।—মনে রাখিবেন, তাহার মত রমণীর জন্য ভদ্রলোকের জীবন বিপন্ন করা উচিত নয়।—নমস্কার।"

ম্যাক্সিম্, কাউণ্টেসের পীড়ার সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইলেন।—সহকারীর কথা আর মনে উদিত হইল না। সে দিনের সমস্ত ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে তিনি গাড়ী চড়িয়া নিজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ভারত-বর্ষ

পৃথিবীতে নয়টি বর্ষ, * ভারত-বর্ষ তাহার অন্যতম—প্রথম বর্ষ। "ভারতবর্ষ" শব্দটি নাদবিন্দু উপনিষদে সর্ব্বপ্রথম দেখা যায় † এবং রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রয়োগ আছে। সুতরাং, "ভারতবর্ষ" শব্দটি আর্য্যঋষিগণেরই পরিভাষিত; অতএব উহার বিষয় যাহাকিছু আর্য্যশাস্ত্রানুসারেই আলোচিত হওয়া সমীচীন।—উহার লক্ষণ, পরিমাণ, সীমা, আচার, ধর্ম্ম ও বর্ণাদিও আর্য্যশাস্ত্রানুসারেই নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।

বিদেশীয় মনীষিগণ এই ভারতবর্ষকে "ইণ্ডিয়া" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতের যে লক্ষণ ও সীমাদি নির্ণয়, সে সকল আর্য্যশাস্ত্রের অত্যন্ত বিসদৃশ; এস্থলে ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য যোগী ও ঋষিগণ ভারতের লক্ষণ ও ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেইরূপেই ইহার আলোচনা করা বোধ হয়, ভারতবর্ষ-পত্রের পাঠক পাঠিকা-বর্গের অনভিপ্রেত হইবে না।

—যৌগিক অর্থ—

"ভারতবর্ষ" এই শব্দটির যৌগিক অর্থ দুই প্রকার। মৎস্যপুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রে এইরূপ—

"ভরণাৎ প্রজনাচ্চৈব মনুর্ভরত উচ্যতে।
নিরুক্তবচনৈশ্চৈব বর্ষং তদ্ভারতং স্মৃতম্॥" (১১৪।৫)

অর্থ—'প্রজার উৎপাদন ও পোষণের জন্য মনুকেই ভরত কহে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি-প্রযুক্তই ইহার নাম "ভারতবর্ষ" হইল।'

অপরাপর পুরাণে এইরূপ—

"হিমাদ্রের্দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় দদৌ পিতা।
তস্মাচ্চ ভারতং বর্ষং তস্য নাম্না মহাত্মনঃ॥"

অর্থ—'পিতা দুষ্মন্ত হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্বস্থ বর্ষ ভরতকে দিয়াছিলেন, এজন্য ভরতের শাসিত বর্ষ তাঁহার নামানুরূপ "ভারত বর্ষ" হইল।'

পৃথিবীতে যত বর্ষ আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'এই ভারতবর্ষ সাগর-পরিবেষ্টিত, দক্ষিণ ও উত্তরে সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্বপ্রান্তে কিরাত, কুকী প্রভৃতি, পশ্চিমে ম্লেচ্ছ-যবনাদি, এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি বাস করে। ইহারা নিজ নিজ জপ, তপস্যা, প্রজাপালন, বাণিজ্য, এবং সেবাদি ধর্ম্মদ্বারা ঐহিক পারত্রিক সুখসমৃদ্ধি ভোগ করে।'—(মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, ৫৮।১)

ইত্যাদি-রূপে সমস্ত পুরাণ, স্মৃতি, ও মহাভারতাদি ইতিহাস-গ্রন্থে ভারতবর্ষের এক বাক্যে প্রশংসা করিয়াছে।

—আকার, সীমা ও দেশসন্নিবেশ—

"জ্যোতিস্তত্ত্ব" মতে ভারতের আকার, সীমা ও দেশ-সন্নিবেশ এইরূপ—

"প্রাঙ্মুখো ভগবান্ দেবঃ কূর্ম্মরূপী ব্যবস্থিতঃ।
আক্রম্য ভারতং বর্ষং নবভেদং যথাক্রমং॥
মধ্যে সারস্বতা মৎস্যাঃ শূরসেনাঃ সমাথুরাঃ।
পঞ্চাল-শাল্ব-মাণ্ডব্য-কুরুক্ষেত্র-গজাহ্বয়াঃ॥
মরুনৈমিষবিন্ধ্যাদ্রিপাণ্ড্যঘোষাঃ সযামুনাঃ।
কাশ্যযোধ্যা প্রয়াগশ্চ গয়া বৈদেহকাদয়ঃ॥
প্রাচ্যাং মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রী গৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমানতমোলিপ্তপ্রাগ্জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ॥
আগ্নেয্যামঙ্গবঙ্গোপবঙ্গ ত্রৈপুরকোশলাঃ।
কলিঙ্গৌড্রান্ধ্রকিষ্কিন্ধ্যা বিদর্ভশবরাদয়ঃ॥
দক্ষিণেঽবন্তিমাহেন্দ্রমলয়া ঋষ্যমূককাঃ।
চিত্রকূটমহারণ্য কাঞ্চীসিংহলকোঙ্কণাঃ॥
কাবেরী তাম্রপর্ণী চ লঙ্কা ত্রিকূটকাদয়ঃ॥
নৈর্ঋতে দ্রবিড়ানর্ত্ত মহারাষ্ট্রাশ্চ রৈবতঃ।
যবনঃ পহ্লবঃ সিন্ধুঃ পারসীকাদয়ো মতাঃ॥
পশ্চিমে হৈহয়াস্তাদ্রি ম্লেচ্ছবাসশকাদয়ঃ॥
বায়ব্যে গুর্জ্জরাটশ্চ নাটজালন্ধরাদয়ঃ।
উত্তরে চীননেপালহূণকৈকয়মন্দরাঃ॥
গান্ধারহিমবৎক্রৌঞ্চগন্ধমাদনমালবাঃ॥
কৈলাসমদ্রকাশ্মীর ম্লেচ্ছদেশাঃ খশাদয়ঃ।
ঈশানে স্বর্ণভৌমশ্চ গঙ্গাদ্বারশ্চ টঙ্কনঃ॥
কাশ্মীরব্রহ্মপুরককিরাতদরদাদয়ঃ॥"

* ১ ভারতবর্ষ, ২ কিংপুরুষবর্ষ, ৩ হরিবর্ষ, ৪ ইলাবৃতবর্ষ, ৫ কুরুবর্ষ, ৬ হিরণ্ময়বর্ষ, ৭ রম্যকবর্ষ, ৮ ভদ্রাশ্ববর্ষ, ৯ কেতুমালবর্ষ।
—(মহাভারত ও ভাগবতাদি পুরাণ)।

† "স রাজা ভারতে বর্ষে।"—(নাদবিন্দূপনিষৎ। ১২)।

'অর্থ—'ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বপশ্চিমে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ কূর্ম্মের আকৃতিতে এই ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়া পূর্ব্বমুখে অবস্থিত আছেন। উক্ত কূর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গভেদে ভারতবর্ষ যথাক্রমে নয় ভাগে বিভক্ত ;—

'কূর্ম্মচক্রের মধ্য—পৃষ্ঠভাগের দেশ ; যথা—সারস্বত (হস্তিনাপুরের উত্তর-পশ্চিম), মৎস্যদেশ (বিরাট—রাজপুতানার নিকট), শূরসেন (১) ও মথুরা, পঞ্চাল (কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমে ইন্দ্রপ্রস্থের উত্তর), শাল্ব (সৌভপুরী), মাণ্ডব্য, কুরুক্ষেত্র, হস্তিনা (পরীক্ষিতগড়—মিরাট্), মরু (২), নৈমিষারণ্য, বিন্ধ্যাচল, পাণ্ড্যঘোষ (দ্রবিড়ের দক্ষিণাংশ তিরুবাঙ্কো—কোচিনের পূর্ব্ব, মান্নাউপসাগরের উত্তর), যামুন (যমুনার তীরবর্ত্তী ভূমি), কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, গয়া, বৈদেহক (ত্রিহুৎ) প্রভৃতি দেশ।

'কূর্ম্মের মুখস্থিত—অর্থাৎ, পূর্ব্বদিকের দেশ ; যথা—মাগধ (৩) (বিহারের উত্তর), শোণভদ্র নদ, বারেন্দ্রী (রাজসাহী প্রভৃতি), গৌড় (৪), রাঢ় (বঙ্গের পশ্চিম), বৰ্দ্ধমান, তমোলিপ্ত (তমলুক), প্রাগ্জ্যোতিষ (আসাম, কামরূপ প্রভৃতি) এবং উদয়াচল।

'কূর্ম্মের দক্ষিণপাদস্থিত—অর্থাৎ, অগ্নিকোণের দেশ ; যথা—অঙ্গ (ভাগলপুর, মুঙ্গের, রাজগৃহ প্রভৃতি), বঙ্গ (৫), উপবঙ্গ (বঙ্গের নিকট—পূর্ব্বদক্ষিণ), ত্রৈপুর (ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি), কোশল, (৬), কলিঙ্গ (৭) (দক্ষিণে বৈতরণী নদীতীর হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত), ওড্র (উড়িষ্যা প্রভৃতি), অন্ধ্র (৮) (উড়িষ্যার দক্ষিণ—তলিঙ্গানা প্রভৃতি নিকৃষ্ট লোকের বসতিস্থান), কিষ্কিন্ধ্যা, বিদর্ভ (৯) (বড় নাগপুর) এবং শবরাদি দেশ (যে দেশে এক সময়ে লোকে বৃক্ষের পত্রাদি পরিধান করিত)।

'কূর্ম্মের দক্ষিণ কুক্ষিস্থ—অর্থাৎ, ভারতের দক্ষিণদিকের দেশ ; যথা—অবন্তী (উজ্জয়িনী), মহেন্দ্র-পর্ব্বত, মলয়-পর্ব্বত, ঋষ্যমুক-পর্ব্বত, চিত্রকূট-পর্ব্বত (প্রয়াগ—ভরদ্বাজাশ্রমের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে চিতরকোট নামে খ্যাত), মহাবন, কাঞ্চী (শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী), সিংহল-দ্বীপ, কোঙ্কণ (কেরল, তুলম্ব, সৌরাষ্ট্র, করহাট, কর্ণাট, বর্ব্বর (১০) এবং কোঙ্কণ, এই সাতটি মহাদেশকেই কোঙ্কণ বলে), কাবেরী নদী (কুরগরাজ্যে ব্রহ্মগিরি হইতে নির্গত, মহীশূর ও মাদ্রাজ হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে), তাম্রপর্ণী নদী ('ত্রিণবল্লী' প্রদেশে—মাদ্রাজী নাম "পরুকৌ"), লঙ্কা (রাবণের রাজধানী) এবং ত্রিকূটাচল প্রভৃতি দেশ।

'কূর্ম্মের দক্ষিণ-পাদস্থিত—অর্থাৎ' ভারতবর্ষের নৈঋ্ঋত কোণের দেশ ; যথা—দ্রবিড়, আনর্ত্ত (দ্বারকা), মহারাষ্ট্র, রৈবতক-পর্ব্বত, যবন (আরব, রোম, মক্কা, মদিনা প্রভৃতি), পহ্লব (শ্মশ্রুধারিযবনদিগের দেশ), সিন্ধু বা সৈন্ধব (১১), পারসীক (পারস্য) দেশ প্রভৃতি।

'কূর্ম্মের পুচ্ছস্থ—অর্থাৎ, ভারতের পশ্চিমদিক্স্থ দেশ ; যথা—হৈহয় (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের দেশ), অস্তাচল, ম্লেচ্ছাবাস (তুরুষ্কাদি), শক (মস্তকের অর্দ্ধভাগ মুণ্ডিত ম্লেচ্ছের দেশ)।

'কূর্ম্মের বামপাদস্থিত—অর্থাৎ, বায়ু-কোণের দেশ ;

(১) "মগধাদক্ষভাগে তু বিন্ধ্যাৎ পশ্চিমতঃ শিবে।
শূরসেনাভিধোদেশঃ সূর্য্যবংশপ্রকাশকঃ ॥"
—(শক্তিসঙ্গমতন্ত্র—৭ম পটল)

(২) "গুর্জ্জরাৎ পূর্ব্বভাগে তু দ্বারকাতো হি দক্ষিণে।
মরুদেশো মহেশানি উষ্ট্রোৎপত্তিপরায়ণঃ ॥"—(ঐ)

(৩) "ব্যাসেশ্বরং সমারভ্য তপ্তকুণ্ডান্তগং শিবে।
মগধাখ্যো মহাদেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতি ॥"—(ঐ)

(৪) "বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং প্রিয়ে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ ॥"—(ঐ)

(৫) "রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং প্রিয়ে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ ॥" (ঐ)

(৬) "তৈরভুক্তাৎ পশ্চিমে তু মহাপুর্য্যাশ্চ সর্ব্বতঃ।
মহাকোশলদেশশ্চ সূর্য্যবংশপরায়ণঃ ॥"—(ঐ)

(৭) "জগন্নাথাৎ পূর্ব্বভাগাৎ কৃষ্ণতীরান্তগং শিবে।
কলিঙ্গদেশঃ সংপ্রোক্তো বামমার্গপরায়ণঃ ॥"—(ঐ)

(৮) "জগন্নাথাদূর্দ্ধভাগমর্ব্বাক্ শ্রীভ্রমরাম্বিকাৎ।
তাবদন্ধ্রাভিধো দেশঃ।"—(শক্তিসঙ্গম—৭ম পটল)

(৯) "ভদ্রকালী মহাপূর্ব্বে রামদুর্গাচ্চ পশ্চিমে।
শ্রীবিধর্ভাভিধো দেশো বৈদর্ভী যত্র তিষ্ঠতি ॥"
—(ঐ)

(১০) "মায়াপুরং সমারভ্য সপ্তশৃঙ্গান্তথোত্তরে।
বর্ব্বরাখ্যো মহাদেশঃ সৈন্ধবং শৃণু সাদরম্ ॥"—(ঐ)

(১১) "লঙ্কা-প্রদেশমারভ্য মকান্তং পরমেশ্বরি।
সৈন্ধবাখ্যোমহাদেশঃ পর্ব্বতে তিষ্ঠতি প্রিয়ে ॥"—(ঐ)

যথা—গুর্জ্জরাট (গুজরাট্), নাট (১), জালন্ধর (ত্রিগর্ত্ত দেশ,—চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী দোয়াবের উপরিস্থিত স্থান) প্রভৃতি দেশ।

'কূর্ম্মের বাম কুক্ষিস্থ—অর্থাৎ, উত্তর-ভারতীয় দেশ; যথা—চীন (কাশ্মীর হইতে কামরূপের পশ্চিম, মানস-সরোবরের দক্ষিণ), নেপাল, হূণ (আফ্‌গানিস্থানের উত্তর "নোরি খোর-সোম্") (২), কৈকয় (৩), মন্দর-পর্ব্বত, গান্ধার (কাবুল—কান্দাহার), হিমালয়পর্ব্বত, ক্রৌঞ্চপর্ব্বত, গন্ধমাদনপর্ব্বত, মালব (৪), কৈলাসপর্ব্বত, মদ্র (উত্তর মদ্র,—প্রাচীন মিডিয়া রাজ্য), কাশ্মীর (৫), ম্লেচ্ছ দেশ, এবং খশ (খাশিয়া রাজ্য,—বর্ত্তমান গাড়বাল ও তিব্বতের মধ্য)।

'কূর্ম্মের সম্মুখের বামপাদস্থিত—অর্থাৎ, ঈশান-কোণস্থ দেশ; যথা—স্বর্ণভৌম, গঙ্গাদ্বার, টঙ্কন, কাশ্মীর, ব্রহ্মপুরক (বর্ম্মা), কিরাত (কুকী, শ্যাম প্রভৃতি) এবং দরদ ম্লেচ্ছ দেশ প্রভৃতি (৬)।'

—অধিবাসী ও সীমান্তবাসিগণ—

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়-পুরাণাদিতে এইরূপ লিখিত আছে—

"পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাদয়ঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তঃস্থিতা ইহ॥"
—(মার্কণ্ডেয়—৫৭।৮)

অর্থ—'ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে কিরাত, এবং পশ্চিম-প্রান্তেও যবনাদি ম্লেচ্ছজাতি। ইহার মধ্যস্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি জাতি বাস করে।'

ভারতের পূর্ব্ব-সীমায় প্রাগ্‌জ্যোতিষাদিতে যে পার্ব্বত্য ম্লেচ্ছজাতির বাস ছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত কূর্ম্মচক্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিকোণের প্রান্তে শবরাদি ম্লেচ্ছের বাস। উহার দক্ষিণপ্রান্তে লঙ্কা প্রভৃতিতে নরমাংসভোজী রাক্ষস জাতির বাস। নৈর্ঋতকোণের প্রান্তে পারসীকাদি, পশ্চিম-প্রান্তে শকাদি, বায়ু-কোণের প্রান্তে যবনাদি, উত্তরপ্রান্তে খশাদি, ঈশানকোণের প্রান্তে কিরাত, দরদ প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতির বাস। কেবল ভারতের মধ্যভাগেই ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বাস (৭)। এতদ্ব্যতীত ভারতের প্রান্তসীমায় আর্য্যজাতির যে বাস তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

—জাতি-সংস্থাপন—

আর্য্যাধ্যুষিত ভারতবর্ষের জাতি-সংস্থাপন অনুসারে আর্য্যঋষিগণ গ্রামেরও জাতি-সন্নিবেশ ব্যবস্থিত করিয়াছেন। গ্রামের মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে অম্বষ্ঠাদি অনুলোম বর্ণ (৮), তৎপরে সূতাদি বিলোম বর্ণ (৯), এবং গ্রামের সর্ব্বান্তে চাণ্ডাল ও ম্লেচ্ছাদির বসতি। যদিও কোন কোন গ্রামে ইহার ব্যত্যয়ও দেখিতে পাওয়া যায় বটে,—তাহা অনার্য্যজাতির প্রাধান্য-কাল হইতেই সংঘটিত হইয়াছে।

যাহা হউক, অতি পুরাকাল হইতেই ভারতবর্ষে, উক্ত কূর্ম্ম-চক্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-ভেদে, দেশ এবং গ্রামের সংস্থাপন করা হইয়া আসিতেছে। ইহা মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, তন্ত্রশাস্ত্র, এবং বৃহৎসংহিতা, সিদ্ধান্ত-শিরোমণি প্রভৃতি জ্যোতিঃশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে।

আবার উক্ত শাস্ত্রেই এই ভারতবর্ষের অন্তর্গতই "ম্লেচ্ছদেশ", "ম্লেচ্ছাবাস" ইত্যাদি শব্দদ্বারা কতকগুলি অগম্য নিন্দিত দেশ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

—ম্লেচ্ছ—

এখন ম্লেচ্ছ, এবং ম্লেচ্ছদেশ অর্থে কি বুঝা যায়, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

---

(১) "অবন্তীতঃ পশ্চিমে তু বৈদর্ভাদ্দক্ষিণোত্তরে।
নাটদেশঃ সমাখ্যাতো বর্ব্বরঃ শৃণু পার্ব্বতি॥"—(শক্তিসঙ্গম—৭)

(২) "হিঙ্গুপীঠং সমারভ্য মক্কেশান্তং সুরেশ্বরি।
খুরসানাভিধোদেশো ম্লেচ্ছমার্গপরায়ণঃ॥"—(ঐ)

(৩) "ব্রহ্মপুত্রাৎ কামরূপান্মধ্যভাগে তু কৈকয়ঃ॥"—(ঐ)

(৪) "অবন্তীতঃ পূর্ব্বভাগে গোদাবর্য্যাস্তথোত্তরে।
মালবাখ্যো মহাদেশঃ ধনধান্যপরায়ণঃ॥"—(ঐ)

(৫) "সারদামঠমারভ্য কুঙ্কুমাদ্রিতটান্তকং।
তাবৎকাশ্মীরদেশঃ স্যাৎ পঞ্চাশদ্‌যোজনাত্মকম্॥"—(ঐ)

(৬) উপরে দেশের নির্ণয় 'বিশ্বকোষ' ও 'শক্তিসঙ্গম তন্ত্র' অনুসারে (লিখিত হইয়াছে)।

(৭) "দ্বীপোহ্যুপনিবিষ্টোহয়ং ম্লেচ্ছৈরন্তেষু সর্ব্বশঃ।
যবনাশ্চ কিরাতাশ্চ তস্যান্তে পূর্ব্বপশ্চিমে॥"—(মৎস্য-পুঃ—১১৪।১১)

(৮) "ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে॥"—(মনু ১০।৮)

(৯) "ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ॥" —(মনু ১০।১১)

ম্লেচ্ছের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন—

"গোমাংসখাদকো যস্ত বিরুদ্ধং বহুভাষতে।
সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥"

"—(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে" বৌধায়ন)

অর্থ—'যাহারা গোমাংস ভোজন করে, যাহারা বেদ-বিরুদ্ধ কথা বলে, এবং যাহারা সকল প্রকার আচার-ভ্রষ্ট, তাহারাই "ম্লেচ্ছ" নামে অভিহিত হয়।'

অর্থাৎ,—শকজাতি, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, কোল, সর্প, মহিষ, দর্ব্ব, চোল এবং কেরল জাতি;—(১) ইহারা সকলেই "ম্লেচ্ছ" (২)। ইহারা সকলেই স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ম্লেচ্ছজাতিতে পরিণত হইয়াছে। উক্ত ম্লেচ্ছগণ যে চাণ্ডাল জাতির তুল্য, ইহাও দেবল ঋষি বলিয়াছেন (৩)। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, যে যেস্থানে 'চাণ্ডালে'র উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থানে বিধি বা নিষেধস্থলে ম্লেচ্ছজাতিকেও বুঝিতে হইবে; এবং যে যে স্থানে 'ম্লেচ্ছে'র প্রসঙ্গ আছে, সেই সকল স্থানেও চাণ্ডাল বুঝিতে হইবে।

—ম্লেচ্ছদেশ—

এখন "ম্লেচ্ছদেশ" বলিতে কি বুঝিব? এতদ্বিষয়ে বিবিধ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। যথা—ম্লেচ্ছের দেশই ম্লেচ্ছদেশ। ম্লেচ্ছের দেশই বা কিরূপ? কি—ম্লেচ্ছের সত্ত্ববিশিষ্ট দেশ যদি ম্লেচ্ছদেশ হয়, তবে ভারতবর্ষ মুসলমানের রাজত্বের সময় হইতেই ম্লেচ্ছদেশ হইয়া গিয়াছে!—আর যদি ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক শাসিত দেশকেই ম্লেচ্ছ-দেশ বলা যায়, তাহা হইলেও, একই ফল!—ভারতবর্ষে এখন আর আর্য্যদেশ নাই বলিলেই হয়!—আর যদি বলা যায় যে, যেদেশে ম্লেচ্ছজাতি বাস করে, সে দেশকেই ম্লেচ্ছ-দেশ বলা যায়, তাহা হইলেও যে দেশে ২।৪।১০ জন ম্লেচ্ছ বাস করে, সেও ম্লেচ্ছ দেশ হইয়া যায়; আর্য্যদেশ কোথাও থাকে না!

তবে "ম্লেচ্ছদেশের" অর্থ কি?—ম্লেচ্ছবহুল দেশই ম্লেচ্ছ-দেশ, অর্থাৎ যে দেশে ম্লেচ্ছের সংখ্যাই বহুতর—কেবল ম্লেচ্ছই যে দেশের অধিবাসী,—তাহাকেই ম্লেচ্ছদেশ বলা যায়।

এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে,—গঙ্গা বা যমুনা বলিলে যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট নদীকে বুঝায়, যেমন দার্জ্জিলিং বা মসুরি বলিলে নির্দ্দিষ্ট একটি পর্ব্বতকে বুঝায়, "ম্লেচ্ছ-দেশ" বলিলে তেমনই একটা নির্দ্দিষ্ট দেশকে বুঝায় না। পরন্তু—ঘটনাক্রমে বা কালক্রমে যেমন নদীমাতৃক দেশও (১) দেবমাতৃক (২) হইয়া যায়, আবার দেবমাতৃক দেশও নদীমাতৃক হইয়া যায়, তেমনই কোনও কারণে ম্লেচ্ছদেশও আর্য্যদেশ, এবং আর্য্যদেশও ম্লেচ্ছদেশ হইতে পারে। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি ইহাই বলিয়াছেন—যথা—

"কৃষ্ণসারস্ত চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরম্॥"

—(মনু, ২।২৩)

অর্থ—'কৃষ্ণসার নামক মৃগ-বিশেষ যে দেশে স্বভাবতঃ—নৈসর্গিক নিয়মে বিচরণ করে, (অর্থাৎ যে দেশে কুশ, কাশ, বল্লজ, শর, বীরণ ও দূর্ব্বাদি যজ্ঞিয় তৃণ প্রচুর পরিমাণে স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে, সেই দেশেই উক্ত তৃণ-ভোজী কৃষ্ণসার মৃগ আপনা আপনিই বিচরণ করিতে আসিবে) তাহাকেই যজ্ঞিয় অর্থাৎ হিন্দুর বৈদিক ধর্ম্মের অনুকূল দেশ বলিয়া জানিবে। ইহা ব্যতীত অপরাপর সকল দেশই ম্লেচ্ছদেশ।'

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আর্য্যেরা যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুরোধে প্রায়ই যে দেশে সমিধ্, কুশ ও উপাদেয় জল সুলভ দেখিতেন, সেই দেশেই বাস করিতেন। তাহা না হইলে, সুধু কৃষ্ণসার মৃগ থাকিলেই যে যজ্ঞের উৎকৃষ্ট দেশ হইবে, তাহা না থাকিলে হইবে না, এমন অর্থ নহে।

---

(১) "শকা যবনকাম্বোজাঃ পহ্লবাঃ পারদাস্তথা।
কোলিঃ সর্পাঃ সমহিষা দার্ব্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥"—
(প্রায়শ্চিত্তে—'হরিবংশ')

(২) "তে চাত্মধর্ম্মত্যাগান্ ম্লেচ্ছত্বং যযুঃ।"—(বিষ্ণুপুঃ—প্রায়শ্চিত্ত)

(৩) "দাসীকৃতোবলান্ ম্লেচ্ছৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ।
মাসোষিতে দ্বিজাতৌ চ প্রাজাপত্যং বিশোধনম্॥"—
(প্রায়শ্চিত্তে—দেবল)

(১) "দেশো নদ্যম্বুবৃষ্ট্যম্বুসম্পন্নব্রীহিপালিতঃ।
স্যান্নদীমাতৃকো দেবমাতৃকশ্চ যথাক্রমম্॥" (অমর)

অর্থ—যে দেশ নদী-জল দ্বারা জাত ধান্যাদি দ্বারা পালিত হয়, তাহা নদীমাতৃক, আর যে দেশ বৃষ্টি-জল দ্বারা জাত ধান্যাদিদ্বারা রক্ষিত হয়, সে দেশকে দেবমাতৃক কহে।

এইরূপেই ম্লেচ্ছদেশ বুঝিতে হইলে, বুঝিতে হইবে—আর্য্যদের মত ম্লেচ্ছদের প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা-বন্দনাদি, যজ্ঞাদির আবশ্যকতা নাই; সুতরাং তাহারা যে দেশে কুশকাশাদিও উত্তম নদী প্রভৃতি না থাকে, সেই দেশে বাস করিতে তাহাদের অসুবিধা নাই; এখানেও ম্লেচ্ছদের স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তির কথাই বলা হইয়াছে;—তাহা না হইলে, কৃষ্ণসার মৃগ বা কুশকাশাদি না থাকিলেই সেই দেশ ম্লেচ্ছদেশ হইবে, আর থাকিলে হইবে না, এমন কথা নহে।

ফলে,—যে দেশে উক্ত কুশাদি যজ্ঞোপকরণ না থাকিলেও অধিবাসীদের কোনরূপ অসুবিধা নাই, সেই দেশ স্বভাবতঃই ম্লেচ্ছেরা আশ্রয় করিয়া থাকে।

মনুর ভাষ্যকার কুল্লুকভট্ট এই কথাই যুক্তিযুক্ত করিয়া বলিয়াছেন, যথা—

"যচ্চোক্তং ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপর ইতি এষোঽপি প্রায়িকোঽনুবাদ এব। প্রায়েণ হোষু দেশেষু ম্লেচ্ছা বসন্তি। ন ত্বনেন দেশসম্বন্ধেন ম্লেচ্ছা বক্ষ্যন্তে। স্বতস্তেষাং প্রসিদ্ধে ব্রাহ্মণাদিজাতিবৎ। অথার্থদ্বারেণায়ং শব্দঃ প্রবৃত্তো ম্লেচ্ছানাং দেশ ইতি—তত্র যদি কথঞ্চিদ্ব্রহ্মাবর্ত্তাদিদেশমপি ম্লেচ্ছা আক্রমেয়ুস্তত্রৈবাবস্থানং কুর্য্যুর্ভবেদসৌ ম্লেচ্ছদেশঃ। তথা যদি কশ্চিৎক্ষত্রিয়াদিজাতীয়ো রাজা সাধ্বাচরণো ম্লেচ্ছান্ পরাজয়েত চাতুর্ব্বর্ণ্যং বাসয়েৎ ম্লেচ্ছাংশ্চার্য্যাবর্ত্তশ্চাণ্ডালানিব নির্ব্বাসয়েৎ তদা সোঽপি স্যাদ্ যজ্ঞিয়ঃ। যতো ন ভূমিঃ স্বতো দুষ্টা সংসর্গাদ্ধি সা দুষ্যতি অমেধ্যোপহতেব। অত উক্ত দেশব্যতিরেকেণাপি সতি সামগ্র্যে ত্রৈবর্ণিকেণামৃগচরণোঽপি দেশো যষ্টব্য এব তস্মাদনুবাদোঽয়ম্॥"

অর্থ—'উক্ত মনুবচনে দেখিতে পাওয়া যায় "ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ", অর্থাৎ অন্যদেশ ম্লেচ্ছদেশ—অর্থাৎ যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ বা কুশকাশাদি না থাকে, তাহা ছাড়া;—অন্য সমুদায়ই ম্লেচ্ছদেশ। এই যে একটা কথা মনু বলিয়াছেন, এটা স্বতঃ-সিদ্ধ; কেন না প্রায়ই ঐ সকল দেশে ম্লেচ্ছেরাই বাস করিয়া থাকে এবং যাহারা ঐ সকল দেশে গিয়া বাস করে, প্রায়ই তাহারাও ম্লেচ্ছ হইয়া যায়। এ কথা বলাতে কেবল সেই দেশে থাকিলেই ম্লেচ্ছ হইবে, সে দেশ হইতে অন্য দেশে গেলে সে আর ম্লেচ্ছ থাকিবে না, এরূপ অর্থ করা সঙ্গত হয় না। কেন না ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণাদি জাতির মত একটা প্রসিদ্ধ জাতি।' "ম্লেচ্ছদেশ" এই শব্দটি যৌগিক অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে; যথা—ঐ দেশ ম্লেচ্ছের, সেইটা ম্লেচ্ছের দেশ ইত্যাদি। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, যদি কখনও কোন প্রকারে ব্রহ্মাবর্ত্ত বা আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি হিন্দুস্থানকেও ম্লেচ্ছেরা আসিয়া আক্রমণ করে এবং সমস্ত হিন্দুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ম্লেচ্ছেরা তথায় বসবাস করে, তবে তখন এই হিন্দুস্থান—আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশকেও অবশ্যই ম্লেচ্ছদেশ বলা যাইবে।

আর যদি কোন নিষ্ঠাবান্ স্বধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়াদি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ম্লেচ্ছদেশে গিয়া, ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিয়া, ঐ দেশ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, তথায় ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণকে সংস্থাপন করেন, তবে তখন ঐ ম্লেচ্ছ দেশকেও যজ্ঞোপযুক্ত আর্য্যদেশ বলিতে হইবে। কেননা, ভগবতী বসুন্ধরাদেবী স্বভাবতঃ দূষিতা—অপবিত্রা নহে, কিন্তু অপবিত্র বিষ্ঠা-মূত্রাদি-সংস্পৃষ্টা হইলেই অপবিত্রা হন।

অতএব কৃষ্ণসার-মৃগরহিত দেশেও যদি হিন্দুত্ব-রক্ষার উপযোগী তুলসী, বিল্বপত্র, কুশকাশাদি যজ্ঞিয় সামগ্রী থাকে, তবে সেই দেশকেও ব্রাহ্মণাদি জাতির বাসোপযোগী যজ্ঞিয় দেশই বলা যাইবে;—সেই দেশে জপ, তপস্যা, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিবে, ইহা বুঝিতে হইবে। এই হেতু "কৃষ্ণসারস্তু চরতি" এই বচনটি স্বতঃসিদ্ধের বিবরণমাত্র বুঝিবে।

"কৃষ্ণসারস্তু চরতি" এই বচন দ্বারা মনু যজ্ঞিয় দেশ নির্দ্দেশ করিয়া হিন্দুর বাসস্থান পরবচন দ্বারা বিধান করিতেছেন; যথা—

"এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তিকর্ষিতঃ॥"

—(মনু, ২।২৪)

অর্থ—'অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ পূর্ব্ববচনোক্ত যজ্ঞিয়দেশকে বিশেষ-যত্ন-সহকারে আশ্রয় করিবে; কিন্তু শূদ্রগণ যদি দ্বিজাতির সেবায় অর্জ্জিত ধনদ্বারা পোষ্যবর্গের ভরণপোষণে অসমর্থ হয়, তবে যজ্ঞিয় দেশ ছাড়া অপরাপর দেশে গিয়াও ধনার্জ্জন করিতে পারিবে;—তবে হিন্দুর অগম্য ম্লেচ্ছদেশে যাইতে পারিবে না।'

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

বিমান-বিহার

১

"রাসেলাস্"—গ্রন্থে মনস্বী জনসন্ যে কল্পনা সূচিত করিয়াছেন—"Round the Earth in 80 days" গ্রন্থে জুলস্ ভার্ণে Rofur এর Clipper of the Clouds নামক যানে যে উদ্দাম কল্পনার পরিস্ফূরণ দেখাইয়াছেন—অধুনা সেই কল্পনা যে কার্য্যে পরিণত-প্রায়, তাহা সকলেই দেখিতেছেন! দেখিয়া শুনিয়া এখন মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিবার বৈহায়স্-যান অমূলক কবি-কল্পনা নহে!—যে বৈজ্ঞানিক বিদ্যার চরম পরিচয় প্রাচ্য ভারতবাসিগণ মানবজাতির আদিমকালে প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই বৈজ্ঞানিক শিল্প-সাধনার জন্য পাশ্চাত্য-দেশবাসী এখনও চেষ্টা যত্ন করিতেছেন মাত্র! ফলে, অচিরে যে পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সাহায্যেও সেইরূপ বৈহায়স্‌যান গঠিত হইবে, এমন আশা এখন সুদূর-পরাহত নহে।

বহুকাল হইতেই মানুষের খেচরের ন্যায় উড়িবার সাধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য পেটেণ্ট্ আফিসের প্রতিবৎসরের বিবরণী পাঠে জানা যায়, অনেক দিন হইতেই এ সম্বন্ধে যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের—উড়িবার একটা কল আবিষ্কারের একান্ত চেষ্টা, যত্ন চলিতেছে। প্রত্যেক আবিষ্কর্ত্তাই নিজ নিজ আবিষ্কার-সম্বন্ধে এমন পূর্ণবিশ্বাসে ও বিশদভাবে স্ব স্ব উদ্ভাবিত কলের প্রত্যেক অংশের বিবরণ প্রদান করেন যে, তাহা পড়িলেই মনে হয়, বুঝি তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রটিই বেশ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ—নির্দ্দোষ—উপযোগী। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যখন তাহা পরীক্ষিত হয়, তখন প্রত্যেক অংশেরই দোষ পরিলক্ষিত হয়! হায়! এমন কত শত পক্ষ—(Pulley) 'কপিকল'

বায়ুপূর্ণ থলি—প্রভৃতি বিচিত্র কল-কৌশল-সমন্বিত যন্ত্রপাতি উদ্ভূত ও বিলুপ্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে এই সকল উদ্ভাবন-কার্য্যে ব্রতী যে শত শত অদ্ভুতশক্তিশালী বৈজ্ঞানিক এই চেষ্টাতেই জীবনপাত করিলেন—তাঁহাদের অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও সাধনার বিষয় স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়!

আমরা এখানে যে উড্ডয়ন-যন্ত্রটির চিত্র দিলাম, তাহা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে W. J. Quimby কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার দুইপার্শ্বে দুইখানি পক্ষ এবং নিম্নদিকে একখানি পক্ষ এবং সর্ব্বপ্রকারের সন্ধি ও বন্ধনী প্রভৃতির যাবতীয় কলকব্জা এরূপ ভাবে সংস্থিত ছিল যে, দেহের প্রত্যেক মাংসপেশীর সঞ্চালনেই ইহার কোন না কোনও অংশ সুচারুরূপে কার্য্যকর হইতে পারিত। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু ইহা উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হইল না!—তথাপি তাহাতে তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। পাঁচ বৎসর পরে তিনি উন্নত

প্রণালীতে আর একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন—উপরোক্ত চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল। ইহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, লোকে সন্তরণকালে হস্তপদাদি যে ভাবে উৎক্ষেপণ-বিক্ষেপণ করে, সেইরূপ করিলেই এতৎ-সাহায্যে উড্ডীয়মান হওয়া সম্ভবপর হইবে;—কিন্তু কার্য্যকালে ইহা দ্বারাও ফল পাওয়া গেল না।

অতঃপর কুইম্বি নৈরাশ্যপীড়িত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন অথবা আশান্বিত হৃদয়ে পুনর্ব্বার অপেক্ষাকৃত সমুন্নত প্রণালীর কোনও উড্ডয়ন-যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, পেটেণ্ট আফিসের বিবরণী হইতে সে সম্বন্ধে কোনও কথা অবগত হওয়া যায় না।
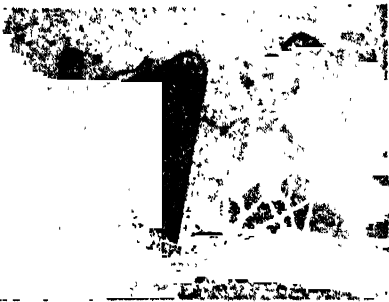
David Thayer নামক আর এক জন উদ্ভাবনকারী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ঘুঁড়ি, কএকটা বেলুন, একখানি শকট ও একখানি পোত এবং কতকগুলি রজ্জু-সমন্বিত একটি আশ্চর্য্য যান-সমন্বয় পেটেণ্ট করেন; ইহা দ্বারা জলে, স্থলে, নভোদেশে—সর্ব্বত্রই যথেচ্ছ-ভ্রমণ সম্ভবপর বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। পরীক্ষাকালে কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল! আমরা নিম্নে থেয়রের বিচিত্র যানের একখানি চিত্র দিলাম।
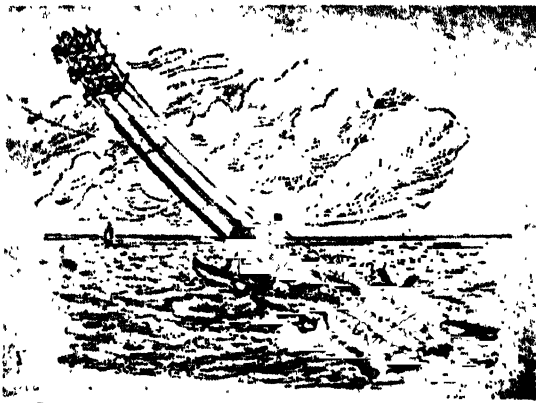
ইহার কিছু দিন পরেই একটা গুজব উঠে যে, অধ্যাপক ল্যাঙ্গলে (Proff. Langley) ঠিক চুরুটাকৃতি একখানি ব্যোম-ইঞ্জিন্ প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই সময়ে ইহার প্রত্যেক অংশের বিশদ বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছিল—লোকে ভাবিয়াছিল, এইবার বুঝি মানুষে বাস্তবিকই গগনচারী হইতে পারিবে! কিন্তু এই সময়ে একদিন, অধ্যাপক স্বয়ং, একটি প্রকাশ্য সভায় বলেন যে, 'মানুষের পক্ষে ব্যোমপথে ইচ্ছামত বিচরণ করা সম্ভবপর কি না, তিনি তৎসম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা করিতেছেন মাত্র—প্রকৃতঃ, তখনও তিনি কোনও কল আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কালে মানুষ নভোদেশে স্বচ্ছা-বিহার করিতে পারিবে।—তবে লোকে যত শীঘ্র তাহা ঘটিবে মনে করিতেছে, তাহা হইবে না।'

প্রাচ্য প্রদেশে Francis Lana সর্ব্বপ্রথম ব্যোমযানের কথা কল্পনা করেন, তিনি ১৬৭০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত রচিত একখানি পুস্তকে এই বিষয়ের আলোচনা করেন। তাহার ধারণা ছিল যে, যদি এমন সূক্ষ্ম পাত দ্বারা কতকগুলি ধাতব গোলক নির্ম্মাণ করা যায়, যাহাতে তাহার গর্ভস্থ বায়ুর গুরুত্ব অপেক্ষা আবরণটির ভার লঘুতর হয় এবং এইগুলি একটি নৌকার তলদেশে সম্বদ্ধ করিয়া তাহাকে উড়াইতে পারা যায়, তাহা হইল ব্যোমবিহার সম্ভবপর হইতে পারে। এ বিষয়ে সে সময়ে কিন্তু কেহ পরীক্ষা করিতে প্রয়াসী হয় নাই। ব্যোমযানের সর্ব্বপ্রথম উদ্ভবকর্ত্তা Joseph de Montgolfier—তিনি লিয়ঁার (Lyon) নিকটবর্ত্তী আনোনে (Annonay) জনপদে কাগজের ব্যবসায় করিতেন। Cavendish যখন স্থির করিলেন যে, উদজান বাষ্প (Hydrogen gas) বায়ু অপেক্ষা লঘু, তখন ডাঃ ব্ল্যাক্ স্থির করিলেন যে,—যেকোনও পদার্থ নির্ম্মিত পাত্র এই বাষ্প দ্বারা পূর্ণ করিলে তাহার স্বতঃই এবং সহজেই বায়ুমার্গে উদ্ধগতি হইবে—অর্থাৎ তাহা ক্রমেই উচ্চে উঠিতে থাকিবে। ১৭৮২ অব্দে Cavallo এই বিষয়ে পরীক্ষা করেন, কিন্তু তিনি এই উপায়ে সাবানের বুদ্বুদ্ ব্যতীত অপর কোনও গুরু দ্রব্য উড়াইতে পারেন নাই! অতঃপর কাগজের ছিদ্রহীন সম্পুটকে উদজান বাষ্পপূর্ণ করিবার জন্য নানা পরীক্ষা করা হয়, কিন্তু তাহা সফল হইল না—কাগজ সাস্থব, উহার সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে চালক-রজ্জুর নিম্ন "খুঁট" যোগে বাষ্প নির্গত হইতে লাগিল! তাপদ্বারা বিরলীকৃত বায়ু পূর্ণ করিয়া ব্যোমযান প্রস্তুত সম্ভবপর কি না, তৎসম্বন্ধে ১৭৮৩ সালের ৫ই জুন তারিখে সর্ব্বপ্রথম সাধারণ সমক্ষে একবার পরীক্ষা হয়। বিস্তর কাগজ ভাঁজ করিয়া ১১ ফীট আয়তন একটি বেলুন নির্ম্মিত হইল; তাহার মোট ওজন ৫০০ পৌণ্ড, (প্রায় সওয়া ছয় মণ) এবং তাহাতে ২২০০০ ঘন ফীট্ গ্যাস্ ধরে। ইহার নীচে উত্তাপ দিতেই ব্যোমযানটি উঠিতে লাগিল—কাগজের ভাঁজগুলি ক্রমে প্রসারিত হইয়া গোলকাকৃতি ধারণ করিল—এবং অবশেষে দ্রুতবেগে উত্থিত হইয়া ১০ মিনিটে কিঞ্চিদূন দেড় মাইল উর্দ্ধে উঠিল।—এইরূপ তরলীকৃত বায়ুযোগে যে সকল ব্যোমযান উড্ডয়ন করা হইত, সেগুলিকে Montgolfier বলা হইত। ইহার অব্যবহিত পরেই উদজানযোগে ব্যোমযান উড্ডয়ণ-প্রথা পরীক্ষিত হয়। উক্ত বৎসরেই প্যারী নগরীতে রবর্-নির্ম্মিত কয়েকটি ব্যোমযান প্রদর্শিত হয়। এই গুলিতে একটি মেষ, একটি কুক্কুট ও একটি হংস

সম্বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদে বহু-উর্দ্ধে আরোহণ অবতরণ করে। মানবের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মুক্ত-বেলুনে ব্যোমপথে বিচরণ করেন, মঃ Pilatre de Rozier এবং তাঁহার সহচর Marquis Ariandes—ইঁহারা কিন্তু অধিক উর্দ্ধে উঠিতে সাহস করেন নাই।—৩০০০ ফীট উচ্চ পথে ২৫ মিনিটে প্রায় ৬ মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই M. Charles ২৬ ফীট্ ব্যাস আকৃতির একটি উদজানপূর্ণ বেলুনে Tuilleries রাজবাটী হইতে প্রায় দুই মাইল উর্দ্ধে আরোহণ করেন।

১৭৮৪ সালের ১৯এ জানুয়ারী তারিখে ১২৬ ফীট উচ্চ এবং ১০২ ফীট ব্যাস আকৃতির, তরলীকৃত বায়ুপূর্ণ একটি ব্যোমযানে ৭ ব্যক্তি আরোহণ করিয়াছিল। ১৮০৪ সালে গে-লুসাক্ এবং বায়ট্, বৈজ্ঞানিক নানাবিধ পরীক্ষা করিবার জন্য বিবিধ পশু পক্ষী, পতঙ্গ প্রভৃতি, কতকগুলি যন্ত্র ও অপরাপর উপকরণ সঙ্গে লইয়া বেলুন-বিহার করেন। ঐ বৎসরেই ১৩ই আগষ্ট প্রাতে ১০ ঘটিকার সময়ে ফরাসী রাজধানী প্যারী নগর হইতে তাঁহারা আর একবার ব্যোমযানে আরোহণ করেন,এবং মেঘরাজ্য ভেদ করিয়া প্রায় ১৩০৫০ ফীট উত্থিত হন। পরে বিবিধ বিষয়ের পরীক্ষা করিতে করিতে ৩।০ ঘণ্টা আকাশপথে পরিভ্রমণান্তে প্যারী হইতে ২২ ক্রোশ দূরে মেরিমিল্ গ্রামে অবতরণ করেন। ঐ বৎসরেই ১৫ই সেপ্টেম্বর, গে-লুসাক্ একাকী পুনরায় অন্তরীক্ষে প্রায় ২ ক্রোশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। এবার পরীক্ষাদ্বারা তিনি জানিতে পারেন যে, উপরকার বায়ু এত শীতল যে, তাঁহার হস্তদ্বয় ক্রমে অবশ হইয়া আসিল, এত লঘু যে নিঃশ্বাস ত্যাগে বিশেষ কষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল, এবং এত পরিশুষ্ক যে রুটী পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। তবে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, পৃথিবীর সমীপস্থ বায়ুতে যত ভাগ অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন্ আছে, উপরিস্থ বায়ুতেও ঠিক তাহাই আছে;—অর্থাৎ সর্ব্বস্থানের বায়ুরই প্রকৃতি একইরূপ। অতঃপর, নেপল্‌সের রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত Charlo Brioschi এবং Signor Andreani অধিকতর উচ্চপ্রদেশে উত্থিত হইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু বায়ুবিরল স্থানে পঁহুছিবামাত্র ব্যোমযানটি বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

আধুনিক সমুন্নত বিজ্ঞানমতে উদজান অপেক্ষা সাধারণ কয়লার বাষ্প ব্যোমযানের পক্ষে অধিকতর কার্য্যকর—ইহাতে ব্যয় অল্প অথচ ইহা সহজে নির্গত হয় না বলিয়া বহুক্ষণ যাবৎ উর্দ্ধ প্রদেশে অবস্থান করা সম্ভবপর হয়। দূর প্রয়াণের জন্য চালক-রজ্জু (guide-rope)টি বিশেষ কার্য্যকর; সমুদ্র প্রভৃতি উত্তরণ করিবার জন্য তাম্রনির্ম্মিত ভেলা ব্যোমযানের সহিত সংলগ্ন থাকাও আবশ্যক।

গ্রান্ নামে একব্যক্তি ১৮৩৬ খৃঃ পর্য্যন্ত ২২৬ বার ব্যোমযান যোগে গগনমণ্ডলে আরোহণ করেন। ঐ সালে ৭ই নবেম্বর বেলা ১।০ ঘটিকার সময় তিনি হলণ্ড্ ও ইক্ মেসন্ নামক দুইজন সহচর সমভিব্যাহারে লণ্ডন হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে অপেক্ষাকৃত অধোপথে গমন করিতে থাকেন। তাঁহারা ৪টা ৪৮ মিনিটের সময় ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া চলিলেন—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে ক্রমে ফরাসী দেশের উপরিভাগে উপনীত হইলেন। পরে সারারাত্রি নিস্তব্ধ ব্যোমপথে ভ্রমণ করিলেন। নিশীথে এরূপ ভীষণ শীতভোগ করিতে হইয়াছিল যে, তাঁহাদের জল, কাফি, তৈল পর্য্যন্ত জমিয়া কঠিন হইয়া গেল! নিশাবসানে তাঁহারা একবার উর্দ্ধগামী হইয়া সূর্য্যোদয়-শোভা অবলোকন করেন—পুনরায় অধোদিকে অবতরণ করিয়া ঘোর অন্ধকারে বিচরণ করেন।—এইরূপ এক দিনে দিবাকরকে তিন বার উদয় ও দুই বার অস্তগত হইতে দেখিয়াছিলেন। এইরূপে ২২০ ক্রোশ নভোমণ্ডলে যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে জর্ম্মাণির অন্তঃপাতী নাসো উইল্ বর্গ্ নামক স্থানে অবতীর্ণ হ'ন।

ফরাসী রাজ্য-বিপ্লব উপলক্ষে ১৭৯০ সালে ফিউরস্ নামক স্থানে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদিগের সহিত ফরাসী সেনাপতি জোর্ডানের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে কর্ণেল কুতেল্, একজন সাংগ্রামিক কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া একদিনে দুইবার ১৩০০ ফীট্ পর্য্যন্ত উত্থিত হন এবং অন্তরীক্ষ হইতে বিপক্ষ সেনার গতিবিধি দর্শন করিয়া, তথা হইতে জোর্ডানকে ইঙ্গিত দ্বারা সমুদায় বিদিত করেন। জোর্ডান্ তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বিপক্ষ দল প্রথমবার তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখিতে পাইয়া কামানের গোলাদ্বারা নিহত করিবার চেষ্টা করে। সৌভাগ্যের বিষয়, গোলা কিছুতেই ততদূর না উঠায়, তাঁহারা বাঁচিয়া যা'ন।

১৮৭০ সালে ফরাসীদের সহিত প্রুসিয়দের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে অনেকবার ব্যোমযানের ব্যবহার হইয়াছিল।

বহুকালাবধিই ইচ্ছানুরূপ যেকোনও দিকে ব্যোমযান চালনা করিবার চেষ্টা চলিতেছে।—১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো নগরে এক বণিক্-সম্প্রদায় একটি বাষ্পীয় বিমান-যান নির্ম্মাণ, ও ইচ্ছামত তাহাকে নানাদিকে পরিচালনা করেন। বাষ্পীয় পোতের ন্যায় ইহা বাষ্পের শক্তিতে চালিত এবং কর্ণধারা বিভিন্নদিকে পরিচালিত হইত।

বর্ত্তমানকালে বৈহায়স্যান প্রস্তুত বিষয়ে পরীক্ষাকারীদিগের মধ্যে দ্বিবিধ-মতাবলম্বী লোক দৃষ্ট হয় ;—এক শ্রেণীর পরীক্ষাকারিগণ বেলুন, বা বেলুনের মত বায়ু অপেক্ষা লঘুতর বাষ্পপূর্ণ যান, উদ্ভাবন প্রয়াসী ;—Santos Dumont, Zeppelein, Roze প্রমুখ মনস্বী এই দলভুক্ত। অপর শ্রেণীর পরীক্ষাকারীদের বেলুন প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতি সেরূপ আস্থা নাই, তাঁহারা বাষ্পীয় শক্তি-সমন্বয়ে চিল, বাজ প্রভৃতি পক্ষীদিগের অনুকরণে বায়ুবেগ পরাজয়ক্ষম উড্ডয়নযন্ত্র উদ্ভাবনে রত ;—Sir Hiram Maxim, Proffr. S. P. Langley, Mr Lawrence Hargrave প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ এই দলভুক্ত। ইঁহাদের কার্য্যকলাপের এবং বিমানযানের ক্রম-বিবর্ত্তনের বিবরণ পরবর্ত্তী প্রবন্ধে প্রকটিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়।

অপরিচিতা

হেরি তোমা মনে হয়, লো অপরিচিতে !
কোথা যেন দেখেছি ও মু'খানি তোমার !
কবে যেন—কোন্ জন্মে—সুদূর অতীতে,
ছিলে তুমি কেহ মম অতি আপনার !
মোর অন্তরের মাঝে, এতকাল বুঝি
লুকায়ে আছিলে বসি নিভৃত-নিরালে—
যুগযুগান্তের পরে অকস্মাৎ আজি
ধরিয়া মানসী-মূর্ত্তি বাহিরিয়া এলে !

তাই গো পরাণ মোর, হেরিয়া তোমারে,
ফাটি' বাহিরিতে চায় হ'য়ে ব্যাকুলিত—
(হৃদি-চ্যুত চন্দ্রমায় নেহারি অম্বরে
যেমতি বারিধি-বক্ষ হয় বিক্ষোভিত) !
নয়ন যদিও কভু হেরেনি তোমারে—
হৃদয়ের তুমি তবু অতি-পরিচিত !

শ্রীমনোজমোহন বসু।

আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ

(রোম)

গতবারেও রোমের কথা বলিয়াছি, এবারেও সেই কথাই বলিব।—রোম-নগরীতে আমি যে সমস্ত পুরাকীর্ত্তি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিতে হইলে ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে তাহার স্থান হয় না—একখানি বৃহদাকার পুস্তক লিখিতে হয়। সে অবকাশ আমার জীবনে কখনও হইবে না! তাই, অতি সংক্ষেপে অনেক দৃশ্যের কথার উল্লেখমাত্রও না করিয়া আমি রোমের কথা বলিতেছি। পৃথিবীর ইতিহাসে রোম যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, আমার এই সামান্য বর্ণনায় তাহার কিছুই উপলব্ধ হইবে না,—ইহা বুঝিতে পারিয়াও, আমি এই অসম্পূর্ণ বিবরণ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। ইংরেজিতে একটি প্রবচন আছে—Rome was not built in a day—রোম একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই!—কথাটি বড়ই সত্য। রোমের ন্যায় নগরী নির্ম্মাণ করিতে বহুকাল অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল; রোম তখন সভ্য-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই সুদূর অতীতের ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তির ভগ্নস্তূপ বক্ষে ধারণ করিয়া রোম এখনও দাঁড়াইয়া আছে,—এখনও সে পূর্ব্ব-গৌরবের স্পর্দ্ধা করিতে পারে,—এখনও ইতিহাস তাহার ঐশ্বর্য্য-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে,—এখনও তাহার জীর্ণ বক্ষঃপঞ্জরের মধ্যে কত শোভা, কত সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত রহিয়াছে! সেই রোমের কথা কি সংক্ষেপে বলা যায়?

সম্রাট্ কারাকালা-প্রতিষ্ঠিত স্নানাগার।

আমরা চারিদিক্ ঘুরিতে ঘুরিতে একটি ছোট গির্জ্জার নিকট উপস্থিত হইলাম। এই গির্জ্জাটির নাম সেণ্ট পিট্রো ইন্-ভিন্‌কোলি অর্থাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ সেণ্ট-পিটার্। মৃত্যুর পূর্ব্বে সেণ্ট পিটার্‌কে মামার্টাইন্ কারাগারে যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই শৃঙ্খল এই গির্জ্জায় রক্ষিত হইয়াছে। এই গির্জ্জায় মাইকেল এঞ্জিলো-নির্ম্মিত মোজেস্ বা মুসার প্রতিমূর্ত্তিও দেখিলাম।

প্রাতঃকালে আর অধিক দেখিতে পারিলাম না। বেলা অধিক হইয়া গেল দেখিয়া আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম; কিন্তু আমাদের বিশ্রাম নাই।—যে কয়দিন এখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, সে কয়দিন দিবারাত্রি ঘুরিয়া দেখিলেও যে সব দেখা শেষ হয় না! তাই, আহারাদির পরই আবার আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। এ বেলা সবপ্রথমেই আমরা থার্ম্মি অব্ ক্যারাকালা (Thermæ of Caracalla) দেখিতে গেলাম। সেকালে রোমে যে সাতটি সুবৃহৎ স্নানাগার ছিল, ইহা তাহাদেরই অন্যতম।

দেখিলাম স্থানটি এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই; গরম জল, শীতল জল প্রভৃতির ঘর এখনও তেমনই আছে। এ স্নানাগার ছোট নহে;—ইহাতে একই সময়ে ষোল শত লোক স্নান করিতে পারিত। সম্রাট্ কারাকালা এই স্নানাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নামের সহিত সম্রাটের নাম সংযুক্ত হইয়াছে। আমি সুবৃহৎ সাতটি স্নানাগারের কথা বলিয়াছি; কিন্তু ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, সে সময়ে রোমে এই কয়টি ব্যতীত আর স্নানাগার ছিল না,—তাহা নহে; তখন রোমের পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে স্নানাগার ছিল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, ষাট হাজার নাগরিক একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্নানাগারে স্নান করিতে পারে, এমন ব্যবস্থা ছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রোমের লোকেরা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিত।

রাজ-কুমারী বর্গিসের উদ্যানের ভগ্নাবশেষ।

স্নানাগার দেখিবার পরই আমরা মৃত-রোমানগণের চিতা-ভস্ম-রক্ষণাগার দেখিতে গেলাম। এই আগারগুলির নাম কলম্বারিয়া (columbaria); ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহের দেওয়ালের কুলুঙ্গি-মধ্যে এই সকল ভস্মাধার রক্ষিত হইয়াছে। এ ব্যবস্থা আমার নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হইল। য়ুরোপের অনেক স্থানের লোকেরা এখন যেমন কবর দেওয়া অপেক্ষা মৃতদেহ সংকার করিবার পক্ষপাতী হইতেছেন, তেমনই তাঁহাদের উচিত যে, তাঁহারা রোমান-দিগের এই ভস্মরক্ষা ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার করেন। সেকালে রোমের প্রত্যেক সম্পন্ন—ধনি-পরিবারেরই এক একটা পৃথক কলম্বারিয়াম্ ছিল।

এই চিতা-ভস্ম-রক্ষণাগারগুলি দেখিয়া আমরা ডোমিনে কুও ভাডিস (Domine Quo Vadis) দেখিতে গেলাম। ইহাও একটি গির্জ্জা। এখানে যিশু খৃষ্টের পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। কিম্বদন্তী এই যে, এই স্থানে যিশুখৃষ্ট সেণ্ট্ পিটারকে দর্শন দেন। নীরোর অত্যাচার দৃষ্টে সেণ্ট্ পিটার রোম ত্যাগ করিতেছিলেন বলিয়া, যিশুখৃষ্ট তথায় প্রবেশে উদ্যত হয়েন। তাঁহাকে দেখিয়া সেণ্ট্ পিটার উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, "Domine Quo Vadis"—"কুত্র গচ্ছসি?" সেই সময়ে এই স্থানে যিশুখৃষ্টের পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়। আমি অশ্রদ্ধা বা অসম্মান করিয়া বলিতেছি না,—কিন্তু আমার মনে হয়, মৃত মহাত্মা না-হয় তাঁহার শিষ্যকে এই সমস্তার সময় দর্শন দিলেন, কিন্তু অশরীরীর

পদচিহ্ন কেমন করিয়া অঙ্কিত হইল, তাহা আমি কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না!—যাক্ সে কথা!

এই স্থান হইতে আমরা ক্যাটাকুম্ অব্ সেণ্ট্ কালিক্স্‌টাস্ (Catacombs of St. Calixtus) দেখিতে গেলাম। পুরাকালে ভূগর্ভস্থ এই গৃহসমূহে রোমের আদিম-অধিবাসীদিগের সমাধি হইত। ভূগর্ভস্থ এই সমাধি-স্থান ছোট নহে, লম্বায় ১২ মাইল। সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া এই স্থানে প্রবেশ করিতে হয়। সেকালে শবাধারগুলি মৃত্তিকায় প্রোথিত হইত না; দেওয়ালের কুলুঙ্গি-মধ্যে সেগুলি রক্ষিত হইত এবং তাহার সম্মুখভাগ আবৃত করিয়া দিয়া তাহার উপর স্মৃতি-ফলক বসাইয়া দেওয়া হইত। দেখিতে দেখিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আমরা তখন সেণ্ট-পলের গেটের মধ্য দিয়া নগরের দিকে ফিরিলাম। নগরে উপস্থিত হইয়া কএকটি দোকান ঘুরিয়া হোটেলে গেলাম।—তাহার পর, সে দিনের মত বিশ্রাম।

পরদিন প্রাতঃকালে পোপের ভ্যাটিকান্ (Vatican) দেখিতে গেলাম। সেখানে অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি ও চিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। আমার মনে হইল, বহুদিন ধরিয়া দেখিলে তবে ইহার সকলগুলির বর্ণনা করা যায়; কিন্তু আমার সে সময় ছিল না; আমি তাড়াতাড়ি চিত্র ও প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলির উপর চক্ষু বুলাইয়াই চলিয়া গেলাম। তাহার পরেই এই স্থানের প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় দেখিলাম। ভ্যাটিকান
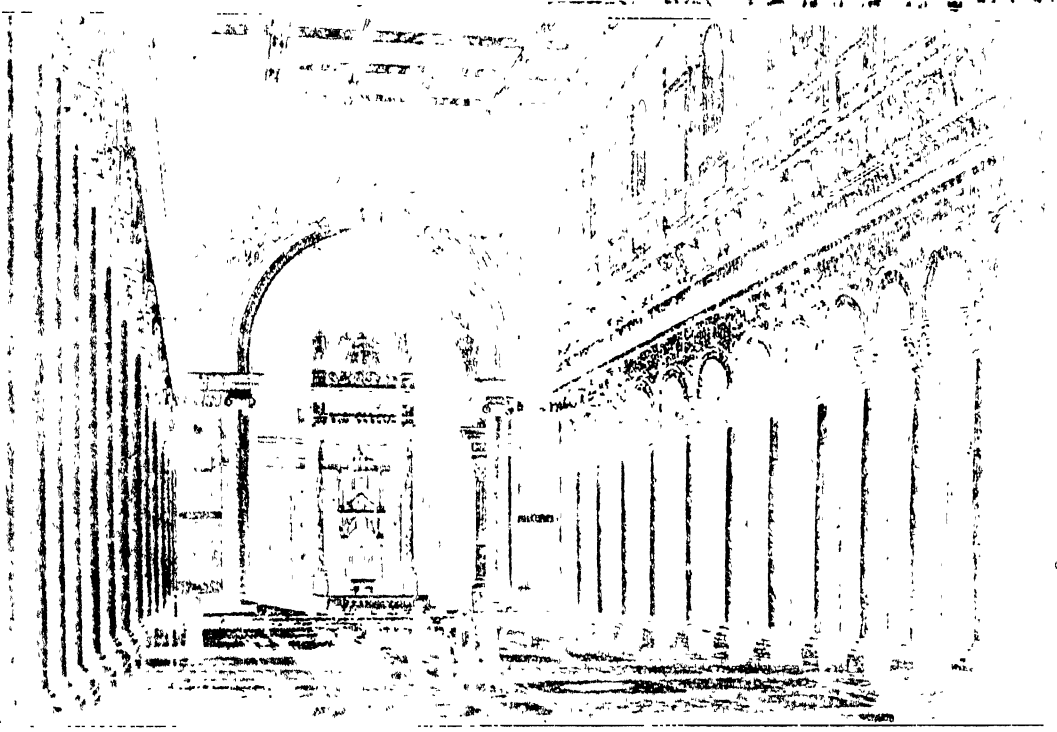
সেণ্ট পলের মন্দির—অভ্যন্তর-ভাগের দৃশ্য।

তাহার পরেই আমরা সেণ্ট্ পলের গির্জ্জা দেখিলাম। এই স্থানে সেণ্ট্ পল সমাহিত হইয়াছিলেন। ইহার অনতিদূরে একটি গির্জ্জাঘরে কতকগুলি চিত্র দেখিলাম; এই চিত্রগুলি রোমের পোপদিগের প্রতিকৃতি। সেণ্ট্ পিটার হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ লিয়ো পর্য্যন্ত, সকল পোপেরই চিত্র এই স্থানে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তকালয়ে সত্যসত্যই অনেক দুষ্প্রাপ্য পুঁথি রহিয়াছে; পৃথিবীতে বুঝি এমন পুস্তকাগার আর নাই!—লাটিন্, গ্রীক্, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান্ এবং আমাদের দেশেরও অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এই থানে রক্ষিত হইয়াছে। সকলে এখানে পুস্তক পড়িতে পায় না; পোপমহাশয় যাহাদিগকে অনুমতি-পত্র প্রদান করেন, তাহারাই এখানে বসিয়া পুস্তক

পড়িতে পায়। আমার মনে হয়, এই পুস্তকালয়ের পুস্তকাবলী পাঠ করিবার অধিকার সকলকেই দেওয়া উচিত,—পোপের নিকট আবেদন করিয়া অনুমতি পাওয়া ত সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না!

আজ মধ্যাহ্ন-কালে রোমের পোপ-মহোদয়ের সহিত আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমি পৌনে বার-টার সময় ইংলিশ্ কলেজের একজন অধ্যাপক, মুসোঁ প্রায়রের সহিত পোপের সেই প্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। সে একটা স্মরণীয় দিন! আমরা একে একে কএকটি সুশোভিত কক্ষ অতিক্রম করিয়া যে কক্ষে পোপ-মহোদয় ছিলেন, সেই কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলাম। আমি দেখিলাম, এই প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষেই একটি করিয়া ক্রস বিলম্বিত রহিয়াছে। রোমান্ কাথলিক্ খৃষ্টানদিগের প্রধান-আচার্য্যের গৃহে ইহা শোভন বলিয়াই মনে হইল। যে কক্ষে তিনি সাধারণতঃ ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, প্রথমে আমরা সেই কক্ষদ্বারে উপস্থিত হই; কিন্তু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এ কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।—তিনি যে
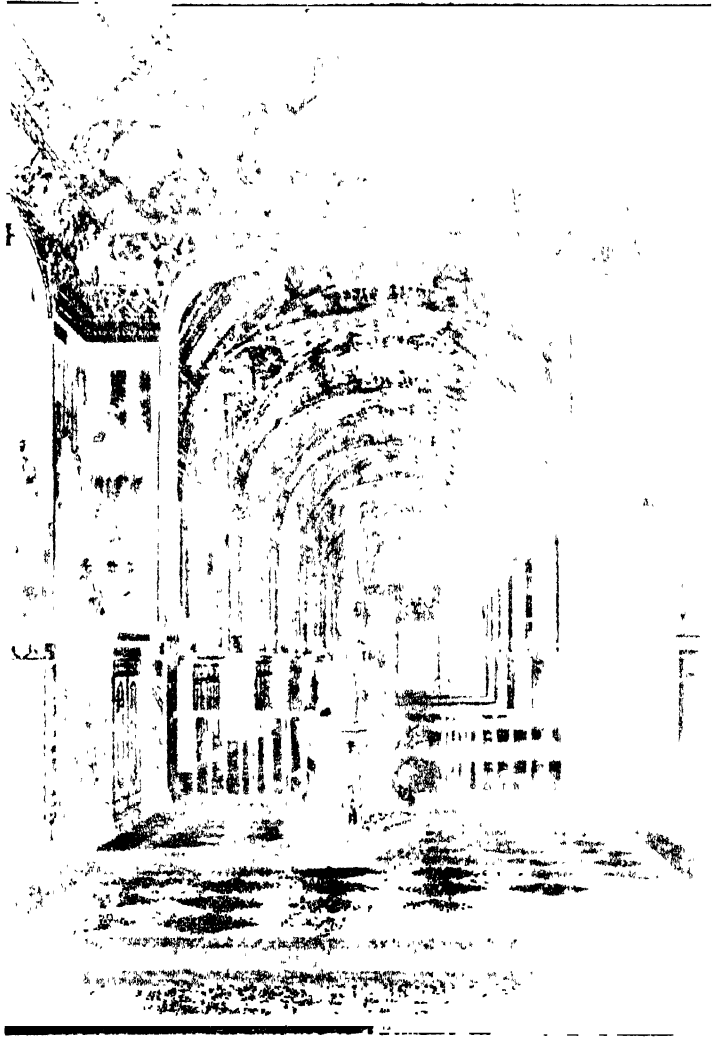
ভ্যাটিকান্—শৈলশিখরস্থিত পোপের প্রাসাদ ও সুবৃহৎ গ্যালারির দৃশ্য।

ভ্যাটিক্যান প্রাসাদ।

কক্ষে বসিয়া পড়াশুনা করেন, সেই স্থানেই আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছিল।—আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, খৃষ্টানধর্ম্মের প্রধান-পুরোহিত মহোদয় একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন; তাঁহার সম্মুখে একখানি বড় টেবিল। সেই টেবিলের উপর কএকখানি পুস্তক এবং একরাশি ফিতা-বাঁধা কাগজ-পত্র রহিয়াছে। পোপ দশম পায়স্ আমাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমি ফরাসী ভাষাও জানি না, ইটালিয়ান্ ভাষাও জানি না,—পোপ-মহাশয়ও ইংরেজি ভাষা জানেন না। সুতরাং আমাদের কথাবার্ত্তার জন্য একজন দ্বিভাষীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। পোপ-মহাশয় ইটালিয়ান্ ভাষাই ভাল জানেন; শুনিলাম, তিনি ফরাসীভাষায় তেমন

অভিজ্ঞ ন'ন। তাঁহার সহিত আমার প্রায় পনর মিনিট কথা-বার্ত্তা হইল। আমি বিদায়-গ্রহণ করিবার সময়, তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত একখানি ফটো-গ্রাফ উপহার দিলেন। পোপ-মহোদয়কে দেখিয়া সত্য সত্যই

এপিয়ান্ ক্লডিয়স্-নির্ম্মিত রোমের পোর্টোক্যাপেনা হইতে ক্যাপুয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ-পথ।

আমার মনে ভক্তির উদয় হইয়াছিল; তিনি অতিশয় ধীর ও শান্ত; তাঁহার মুখ দেখিলেই তাঁহাকে বড়ই সৌম্য-প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়। আমার সঙ্গে যে সমস্ত লোক গিয়াছিলেন, তাঁহারাও পোপ মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। আমরা কেহই পোপমহোদয়ের হস্ত-চুম্বন করি নাই; তিনি যখন আমার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন, আমি তখন তাঁহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া আমার মস্তকে স্থাপন করিলাম। পোপ-মহোদয়কে দেখিয়া আমার মনে হইল যে, তিনি সুখী ন'ন।—তিনি এক প্রকার বন্দী বলিলেই হয়; তাঁহার কোন প্রকার স্বাধীনতা নাই! তিনি ধর্ম্মযাজকগণের ভয়ে সর্ব্বদাই অধীর; তাঁহারাই পোপকে যদৃচ্ছা পরিচালিত করিয়া থাকেন;—এমন কি তিনি সহরের যেখানে-সেখানে ভ্রমণ করিতে যাইতেও পারেন না। এমন অবস্থাকে বন্দীর অবস্থা ব্যতীত আর কি বলিব?—পোপ-মহোদয়ের সম্বন্ধে আমার এইরূপই ধারণা জন্মিয়াছিল। অবশ্য সামান্য কএক মিনিট মাত্র তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; কিন্তু আমার বোধ হয়, এই কএক মিনিটে তাঁহার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহা অপ্রকৃত নহে। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পোপ, ত্রয়োদশ লিয়ো, প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ ও ধর্ম্মযাজকদিগকে শাসনে ও বশে রাখিতে জানিতেন; কিন্তু এই ভালমানুষটি কর্ম্মচারীদিগের হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছেন!—ইঁহার কোন ক্ষমতা পরিচালনেরই সাহস নাই। আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে, রোমান্ কাথলিক্ ধর্ম্মের কি দুরবস্থা হইয়াছে,—ধর্ম্মযাজকগণ যে কি প্রকার ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য সকল করিতেছেন,—কুসংস্কারে যে লোক কি পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—ধর্ম্মের নামে যে কত কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তাঁহাকে একবার ভ্যাটিকানের বাহিরে যাইতে অনুরোধ করি! বলিতে কি, কথাগুলি আমার ওষ্ঠপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল;—কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমি সে প্রলোভন সংবরণ করিলাম। আমার মনে হইল, আমি রোমান্ কাথলিক্ খৃষ্টান্ নহি,—আমি দশ মিনিটের জন্য পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি,—আমার এ সকল অনধিকারচর্চ্চা করা কর্ত্তব্য নহে।—তাই আমি সামলাইয়া গেলাম। আমার এই কথাগুলি পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি রোমান্ কাথলিক্ ধর্ম্মের বিরোধী। প্রকৃতই তাহা নহে;—আমি য়ুরোপের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে সত্যসত্যই মনে ব্যথা পাইয়াছি; তাই—অপ্রিয় হইলেও—সত্য কথাই বলিতে বাধ্য হইয়াছি।
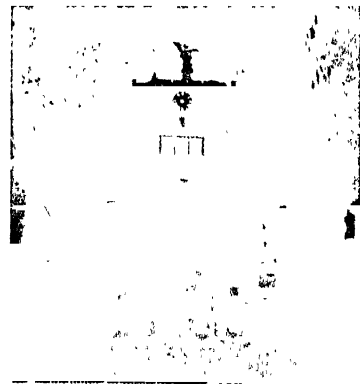
হেড্রিয়ান্-নির্ম্মিত স্যান্ এঞ্জিলো।

ভ্যাটিকান্ হইতে বাহির হইয়াই আমরা মন্‌সেরেটোর ইংলিশ্ কলেজ দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানকার অধ্যাপকদ্বয়ের চেষ্টাতেই আমার সহিত পোপ-মহোদয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। এই কলেজের লাইব্রেরীটি অতি

সুন্দর। এখান হইতে আমরা ইংলিশ্ কনভেণ্ট্ দেখিতে গিয়াছিলাম,—এই ছোট কনভেণ্ট্‌টি আট বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। কনভেণ্টের মহিলাগণ আমাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং সমস্ত স্থান দেখাইয়াছিলেন। আমি এই কনভেণ্টের ছেলেমেয়েদের মিষ্টান্ন খাইবার জন্য কিছু দান করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম।

অপরাহ্ণ কালে আমরা রোমের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহ দেখিতে গিয়াছিলাম। এই প্রাসাদতুল্য গৃহে একটা চিত্রশালা দেখিলাম; সেখানে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট-চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রাসাদের নাম (Palazzo Rospigliosi) পালাজো রসপিগ্‌লিয়োজি।

এই দিন সন্ধ্যার সময় পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত আমরা ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। রোমের ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির নাম সার এড্‌উইন্ ইগারটন্। ইনি ও ইঁহার পত্নী আমাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রবাসভবন দেখিতে অতি সুন্দর। সার এড্‌উইন্ এখানে নিজহস্তে একটি অতি উৎকৃষ্ট উদ্যান প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে ভাল ভাল গোলাপ-গাছ রোপণ করিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে চা-পানের জন্য অনুরোধ করিলেন, আমিও সাহ্লাদে স্বীকৃত হইলাম। চা-পানের পর, তাঁহারা টেনিস-খেলা করিবার আয়োজন করিতে গেলেন, আমরাও তাঁহাদের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলাম।

এইবার আমরা আরও কএকটি গির্জ্জা দেখিলাম। তাহাদের নামই বলি,—বর্ণনা দিবার আর স্থান হইবে না। গির্জ্জা কয়টির নাম,—সাণ্টে মেরিয়া ডেগ্‌লি এঞ্জেলি, সাণ্টা মেরিয়া মাগোর, স্কালা সাণ্টে সান্ জিয়োভানি, সেণ্ট্

ধীবরদিগের দেবতা সাধু পিটারের গুহা বা সমাধি-মন্দির।

সিসিলিয়া গির্জ্জা ও জেস্যুইট্ গির্জ্জা। ইহার মধ্যে সাণ্টা মেরিয়া মাগোর গির্জ্জায় প্রসিদ্ধ সেণ্ট্ ম্যাথুর সমাধিমন্দির আছে। স্কালা সেণ্টা বা পবিত্র সোপানাবলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। দেখিলাম, - এই গির্জ্জার সোপানাবলি বস্ত্রাচ্ছাদিত, পাছে যাত্রীদিগের গমনাগমনে সোপানগুলি নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য এই সোপানগুলি আবৃত রাখা হইয়াছে। এই সিঁড়ি দিয়াই যিশুখৃষ্টকে পাইলেটের সম্মুখে বিচারার্থ লইয়া গিয়া, সেখানে দণ্ডাজ্ঞা হইয়া গেলে, আবার এই সিঁড়ি দিয়াই তাঁহাকে নামাইয়া, বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। যাত্রীরা এই সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় প্রত্যেক সিঁড়িতে উঠিয়াই প্রণাম করে। সেণ্ট্ পিটারের মন্দির এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বড়গির্জ্জা হইলেও সান্ গিয়োভানি গির্জ্জারই প্রসার-প্রতিপত্তি অধিক, কারণ স্বয়ং পোপ মহোদয় এই গির্জ্জার প্রধান-পুরোহিত।

এইবার আমরা মোটরে চড়িয়া নগরের বাহিরে টিভোলি দেখিতে গিয়াছিলাম। পথের মধ্যে ভিলা হেড্রিয়ানের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। এখানকার বহুমূল্য দ্রব্য সকল নগর-মধ্যে নীত হইয়াছিল। এখন ইটালীয়ান্ গভর্ণমেণ্ট্

ভেষ্টাদেবীর মন্দির।

এই স্থানের পুরাকীর্ত্তি-রক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।

টিভোলির পূর্ব্বে যথেষ্ট সমৃদ্ধি ছিল, তখন এখানে দেখিবার জিনিসও অনেক ছিল। এখন আর বেশী কিছু নাই,—সুধু পুরাতন-গৌরবের ভগ্ন-প্রস্তর-স্তূপ ও দুই চারিটি জীর্ণ অট্টালিকা ও সিংহদ্বার বক্ষে লইয়া এই স্থান হাহাকার করিতেছে! এখানে যে সমস্ত প্রস্তরমূর্ত্তি ও শিল্পের আদর্শ ছিল, তাহা সমস্তই রোম ও অন্যান্য স্থানে নীত হইয়াছে। টিভোলি দেখিয়া সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরিয়া দেখি, আমার একজন বাঙ্গালী বন্ধু হোটেলে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এ বন্ধু আর কেহই নহেন, বাঙ্গালীর গৌরব আমার বিশিষ্ট বন্ধু **হরিনাথ দে মহাশয়**! তিনি ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছেন। আমি তাঁহাকে পাইয়া যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু কে জানিত যে, সেই অতুল প্রতিভার পরিসমাপ্তি এত শীঘ্র

৺হরিনাথ দে।

হইবে!—কে জানিত যে বাঙ্গালীর গৌরব, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু হরিনাথ দে মহাশয়কে এত শীঘ্রই হারাইব! সে দিন সেই সুদূর রোমের হোটেলে তাঁহাকে অকস্মাৎ পাইয়া আমার হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, আজ সেই কথা লিখিতে বসিয়া,—সেই দিনের কথা মনে করিয়া,—আমার নয়ন অশ্রুপরিপূর্ণ হইতেছে! হরিনাথ যে এত অল্প বয়সে, সকল কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া এত শীঘ্র সাধনোচিত ধামে চলিয়া যাইবেন,—সে কথা ত কখনও মনে হয় নাই!—আজ সেই পরলোকগত বন্ধুর জন্য একবিন্দু অশ্রুবিসর্জ্জন করিলাম!

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট ২৪ পরগণার অন্তর্গত এঁড়িয়াদহ গ্রামে হরিনাথের জন্ম হয়, আর মৃত্যু ঘটে ১৯১১

প্যালেটীন্ শৈল-শিখরস্থ শোভনোদ্যান।

প্যালা কোলি (অর্থাৎ, দৈবক্রমে নাজারেথ হইতে রোমে স্থানান্তরিত কুমারী মেরীর আবাস বাটী)
এইখানেই যীশুর বধ-দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল।

সালের সেই আগষ্ট মাসেই! তাঁহার পিতার নাম রায় ভূতনাথ দে, এম-এ, বি-এল বাহাদুর। অল্প বয়সেই হরিনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটে; কিন্তু তাঁহার জননী এখনও জীবন্মৃতা হইয়া আছেন। হরিনাথ রায়পুর হইতে মধ্য প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়া মাসিক ৫৲ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তদবধি নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরাবরই বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। ১৮৯২ সালে ১৪ বৎসর বয়সে সেণ্ট্ জেভিয়র কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ সালে এফ-এ পরীক্ষায় ইংরেজী ও ল্যাটিনে সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করেন। ১৮৯৫ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৯৬ সালে বি এ, ও এম এ, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি পাইয়া ১৮৯৭ সালে বিলাত-যাত্রা করেন এবং ইংলণ্ডে অবস্থানকালেই গ্রীক্ ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ, ফ্রান্সের সোর্‌বোর্ণ, জর্ম্মাণীর মার বর্গ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, নানাভাষায় সসম্মানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ পদ্যরচনার প্রতি-যোগিতায় অসামান্য প্রশংসা-লাভ করিয়া ইংলণ্ডের R.A.

সোসাইটির সভ্য হন। এইরূপে অসাধারণ শিক্ষা-গৌরবে মণ্ডিত হইয়া ১৯০১ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ষ্টেট্ সেক্রেটারির নিয়োগানুসারে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৪ সালে ঢাকা হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলী হন এবং ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সি হইতে হুগলি কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা-কালে তিনি সংস্কৃত, আরবী ও উড়িয়া ভাষায় উচ্চ পরীক্ষা দিয়া যথাক্রমে ২০০০, ২০০০ ও ১০০০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ১৯০৬ সালে পালি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিদ্যানুশীলনের জন্য—জ্ঞানার্জ্জনের জন্য এই সময় তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড-যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে পিসেল, রিস্ ডেভিড্ প্রভৃতি সহৃদয় পণ্ডিতগণের নিকট বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে যখন দেশ-ভ্রমণে রত ছিলেন, সেই সময়েই আমার সহিত রোমে তাঁহার সাক্ষাৎ।—যাহা বলিতেছিলাম, সে দিন অপরাহ্নকালে একখানিও ভাড়াটিয়া গাড়ী পাওয়া গেল না;—তাহারা সেদিন ধর্ম্মঘট করিয়াছিল।

টিভোলির রাজপথ

বিশ্ব-বিশ্রুত সিস্‌টীন্ ভজনালয়।
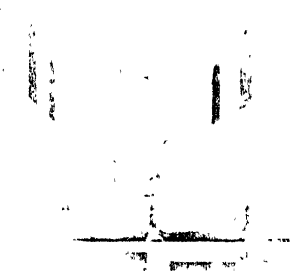
আমরা অগত্যা মোটর্ লইয়াই বাহির হইলাম। আমরা প্রথমে ক্যাপিটল্ পাহাড়ে গিয়া যাদুঘর দেখিলাম। তাহার পর সাণ্টামেরিয়ার গির্জ্জা দেখিলাম। তৎপরে, এদিক-ওদিক ঘুরিয়া, সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরিয়া

টাইবেরিয়ান্-নির্ম্মিত প্যালেটাইন্-প্রাসাদে সম্মুখবর্ত্তী পাতাল-পথ।

আসিলাম। পরদিন প্রাতঃকালেই আমরা রোম ত্যাগ করিয়া ফ্লোরেন্সে যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মহতাব।

মন্ত্রশক্তি

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[পূর্ব্বাবৃত্তি :--রাজনগরের জমিদার হরিবল্লভ, কুলদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া, উইলসূত্রে তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অধিকাংশ দেবত্র, এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণিকে ও পরে তৎকর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে পূজক নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুকালে তর্কচূড়ামণি নবাগত ছাত্র অম্বরকে পুরোহিত নিযুক্ত করেন,—ইহাতে পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ রাগে টোল ছাড়িয়া অম্বরের বিপক্ষতাচরণের চেষ্টা করে। হরিবল্লভের উইলে আর একটি সর্ত্ত ছিল যে, পুত্র রমাবল্লভ যদি তাঁহার একমাত্র কন্যা বাণীকে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে সুপাত্রে অর্পণ করেন, তবেই সে দেবত্র ভিন্ন অপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে;—নচেৎ, এক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি ঐ সকল বিষয় পাইবে—রমাবল্লভ মাসিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিমাত্র পাইবেন।—রমাবল্লভ কিন্তু মনের মতন পাত্র পাইতেছেন না।

কুলদেবতার সেবার ব্যবস্থা বাণীই করিত। নবীন অম্বরের পূজা বাণীর মনঃপূত হয় না—অথচ তাহার খুঁৎ কোথায়, ঠিক তাহা ধরিতেও পারে না! স্নানযাত্রায় 'কথা' হয়—পুরোহিতই সে কথকতা করেন। কথকতা করিতে গিয়া অনভ্যস্ত অম্বর থতমত খাইতে লাগিলেন—ইহাতে বাণী ও অপর সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। ফলে, অতঃপর আদ্যনাথ সে কার্য্যভার পাইল। অনন্তর একদিন পূজার পর বাণী দেখিলেন, কুলদেবতা গোপীকিশোরের পুষ্পপাত্রে রক্তজবা!—আতঙ্কিতা বাণী পিতাকে একথা জানাইলেন।—অম্বর পদচ্যুত হইলেন। টোলে অদ্বৈতবাদ শিখাইতে গিয়া, সে অধ্যাপক পদও ঘুচিয়া গেল—তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বাণীর বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণপ্রায়! ১৫ দিনের মধ্যে তাহার বিবাহ না হইলে বিষয় হস্তান্তরে যায়। মৃগাঙ্ক রমাবল্লভের দূর সম্পর্কীয় ভাগিনেয়—সকল দোষের আকর, গুণের মধ্যে মহাকুলীন! অগত্যা তাহারই সহিত বাণীর বিবাহের প্রস্তাব হইল—মৃগাঙ্ক প্রথমে সম্মত হইলেও পরে বিবেকের দংশনে অসম্মত হইল। সে অম্বরের কথা উত্থাপন করিল। রমাবল্লভ ও বাণীর এ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি,—অবশেষে, বিবাহান্তে অম্বর জন্মের মত দেশত্যাগ করিবেন এই সর্ত্তে, বাণী অম্বরের সহিত বিবাহে সম্মত হইলেন। রমাবল্লভ পত্রযোগে অম্বরকে আনাইয়া এইরূপ প্রস্তাব করিলে, তিনি সে রাত্রিটা ভাবিবার সময় লইলেন।]

অদৃষ্টের এত বড় নিষ্ঠুর খেলা আর কখনও কেহ কল্পনা করে নাই! গল্পে পড়া যায়,--কাল যে ভিখারী ছিল, আজ সে দেশের রাজা। তবে জগতে ঠিক এমনটা হইতে প্রায় সকল সময় দেখা যায় না। কিন্তু বাণীর অদৃষ্টে তাহাই হইয়াছিল। এই মন্দিরে সাত মাস পূর্ব্বে সে যাহাকে তিরস্কার করিয়া বিদায় দিয়াছে, আজ, এই কএকটা দিনের চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তের সঙ্গে, তাহারই অবস্থা কি অভাবনীয়রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! যে কাল প্রভু ছিল, সে আজ প্রভু ত নাইই, উপরন্তু সেই আজ সেই লাঞ্ছিতের কৃপাভিখারিণী!—অহল্যার মত সে যদি এই মুহূর্ত্তে পাষাণে পরিণত হইতে পারিত, তবে বুঝি তাহার শান্তি হইত!

কিন্তু এ পরিতাপ বৃথা!—নিয়মের ঘোর পরিহাস, এবং সর্ব্বাপেক্ষা-কঠোরহৃদয় দাদামহাশয়ের অলঙ্ঘ্য বিধান, তাহাকে মান্য করিতেই হইবে। কিন্তু এমন্দির সে মরণের পূর্ব্বেও ত্যাগ করিতে পারিবে না,—এযে তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। আর, একথাটাও সত্য,—তার শরীরটা সে বেচিতে পারিবে না।

একটু বিপন্নভাবে থমকিয়া থাকিয়া অম্বরনাথ দেবপ্রণাম করিল এবং চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া পিছন ফিরিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা কথা শুনিয়া নিজের কাণদুটাকে সে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না! সে শুনিল,—"একটা কথা আছে!"

ধক্ করিয়া তাহার বুকের মধ্যে একটা তাড়িতের ঘা পড়িল—বেগবান্ নদীস্রোতের অকস্মাৎ স্রোত বন্ধ হইয়া গেলে যেরূপ নিথর হইয়া পড়ে, অম্বরও সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল! সে মুখ তুলিল না, ভাল করিয়া ফিরিতেও পারিল না, সঙ্কোচে সে যেন মরিয়া যাইতেছিল। বাণীরও চোখমুখ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল,—তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত সর্ব্বাঙ্গে যেন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। কোনমতে না বলিয়া ফেলিলে আর বলা হইবে না, অথচ না বলিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইতে যেটুকু বাকি থাকিতে পারে তাও আর থাকিবে না!—তাই, সে ক্রোধ-ক্ষোভ সমস্ত একসঙ্গে মনের মধ্যে চাপিয়া বলিয়া ফেলিল, "বাবার সঙ্গে বোধ হয় দেখা হইয়াছে?" অম্বর মাথা হেলাইয়া জানাইল—"হাঁ"।—আবার ধিক্কারের সহিত তীব্রজ্বালা হৃদয়ের মধ্যে সবেগে উথলাইয়া উঠিতে চায়!

"তাঁকে উত্তর দেওয়া হইয়া গিয়াছে ?" অম্বর যেন অপরাধীর মত এতটুকু হইয়া গেল ;—সে বলিল, "কাল দিব বলিয়াছি !"

বাণীর মুখ অকস্মাৎ কাল হইয়া উঠিল।—'কাল দিবে বলিয়াছে ? - কাল, কেন ?- এই প্রশ্নের উত্তরে তাহার পক্ষে ভাবিবার বুঝিবার কিছু আছে না কি ?—সে কি কৃতার্থ হইয়া যায় নাই !'—অম্বর যেমন পূর্ব্বে ছিল, সেইরূপ দাঁড়াইয়া রহিল। চলিয়া যাইবে, কি আরও কিছু শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিবে,—ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। বাণী আপনার বিস্ময় দমন করিয়া লইল ; তাহার মনে পড়িল এখনই আদ্যনাথ আসিয়া পড়িবে। একেই এ বিবাহের কথায় দেশে, আত্মনাথের দলে, যে কেমন ঢেউ উঠিয়াছে তাহা বলিবারই নয় ! তাহার উপর এই অবস্থায় তাহার চোখে পড়া,—সে কোনমতেই সহিতে পারিবে না। তাই একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমার একটা কথা ছিল,—" একটু খানি থামিয়া আবার বলিল "এই সময় বলা ভাল, যদি—বাবা যা বলিতেছেন তাই করিতে হয়, তবে বিবাহের দিন হইতেই আমি স্বতন্ত্র থাকিতে ইচ্ছা করি।—সেইদিন ব্যতীত এজন্মে আর উভয়ের মধ্যে দেখাশুনা হইবে না, উভয়ের কেহ কাহারও খোঁজ খবর লইব না,—এই আমার ইচ্ছা।"

বাণী বলিল, "প্রতিজ্ঞা কর—এই মন্দিরের মধ্যে শপথ কর—"

সেই বাতির আলোকে অকস্মাৎ অম্বরের মুখখানা পাংশু হইয়া গেল ! এতবড় নিষ্ঠুর সর্ত্তে কেহ কি কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে ? সে জোর করিয়া সেই সুগন্ধভারাকুল মন্দির-বায়ু হইতে একটা শ্বাস গ্রহণ করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে উত্তর করিল,—"আচ্ছা।"

শুনিয়া বাণী একটু প্রীত হইল ; বলিল, "প্রতিজ্ঞা কর—এই মন্দিরের মধ্যে শপথ কর,—বিবাহের দিন হইতে—"

সহসা সম্মুখে বজ্র-পতন হইলে মানব যেরূপ স্তম্ভিত হইয়া পড়ে অম্বরনাথের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। বাণীর কথার ভাব বুঝিয়া সে তন্মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "না—সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর হইতে,—"

বাণীর উজ্জ্বলচক্ষে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। 'সেদিনের সেই মূক-লাঞ্ছিত, আজ তাহার কথার দৃঢ় প্রতিবাদ করিতে আসে !—সেকি এখন হইতেই তাহার প্রভু হইয়া বসিল ? ভাগ্যে 'মৃগুদা' সেই কথাটা বলিয়াছিলেন, তাই এই আত্মরক্ষার উপায়টুকু মনে হইল,—নহিলে সর্ব্বনাশ হইয়াছিল আর কি !'

সে পেলব-অধর দশনে চাপিয়া—কোনমতে বলিল "তাই-ই,—বিবাহের পর হইতে উভয়ের সহিত পরস্পরের কোনও সম্বন্ধই থাকিবে না।" অম্বর কহিল, "হাঁ শপথ করিলাম।"

সে রাত্রে কৃষ্ণপ্রিয়া আহার-কালে কন্যাকে না দেখিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার নির্ব্বাপিতালোক রুদ্ধকক্ষের দ্বারে গিয়া ডাকিলেন। কতক্ষণ পরে উত্তর আসিল,—"আমি খাব না।" এব্যাপার আজকাল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিকের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"রোজ রোজ খাবিনে কেন ?—হইয়াছে কি ?"

কি হইয়াছে! এর চেয়ে আবার কি হইতে পারে?

উত্তর না পাইয়া কৃষ্ণপ্রিয়া পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন, "উঠে আয় বাণি,—আর জ্বালাস্‌নে।" বাণী উঠিল না, ক্রন্দনের তীব্রস্বরে সে মায়ের উপর মনের সমস্ত ঝাল ঝাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আমি তোমাদের আপদ্ হয়েচি।—আমি মরিলে তোমরাও বাঁচ, আমিও বাঁচি।—এতলোক মরে, আমারই মরণ নাই!" 'ষাট্' বলিয়া কৃষ্ণা জননী মামষ্ঠীকে স্মরণ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ঘরের জানালা খোলা। নিকটে একটা দীপ জ্বলিতেছে। সম্মুখে একখানা পুস্তকের পাতা খুলিয়া রাখিয়া জমিদারের ভূতপূর্ব্ব-পুরোহিত গভীর চিন্তামগ্ন।—ইতোমধ্যেই গুজব্‌টা বিস্তৃত হইতেছিল। জমিদার নিজে হলধর চক্রবর্ত্তী নায়েবকে ডাকিয়া তাহার আদর-আপ্যায়নের ভার দিয়া বলিয়া দিয়াছেন,—কোন বিষয়ে ত্রুটি না হয়। মৃগাঙ্কমোহন নায়েবখানায় আসিয়া চুপিচুপি কি কথা বলিয়া, তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। খিড়কিদ্বারের দিকেই তাহাকে যাইতে দেখা গিয়াছিল। সেই সময় পরাণে চাকর অন্দর মহলের বাতি জ্বালাইয়া ফিরিতেছিল। সে দেখিয়াছে রান্না-বাড়ীর একটা পড়োঘরের দ্বারের নিকট অশ্রু মুছিতে মুছিতে বাড়ীর গৃহিণী সেই মুখচোরা পুরুৎ-ঠাকুরের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন,—সুরে ও ভাবে বোধ হইয়াছিল, ঠাকুরমশাই ব্রতের দক্ষিণার পাঁচসিকা দাবী করিয়া যুক্তি দেখাইতেছেন না—এক্ষেত্রে গৃহিণীই যেন তাঁহার কাছে প্রার্থী!—ঘরের দাসীরাও কেহ কেহ এ দৃশ্য দেখিয়াছিল। বেশির ভাগ শুনিয়াছিল, গৃহিণী বলিতেছিলেন, "বাবা তোমাভিন্ন আমাদের আর গতি নাই,—পাগ্‌লি মেয়ে বাণীর কথা কিছু মনে রাখিও না বাবা—সে তোমার সঙ্গে একটু অসঙ্গত ব্যবহার করিয়াছে,—তা সেকথা নিজগুণে ভুলিয়া আমাদের এ বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলের কাজ কর।" অম্বরনাথের সে সময়ের অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইত যে, ঐ সকল কথার অধিকাংশই তাহার কর্ণে পৌঁছায় নাই। কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া, সেকথার উত্তর না দিয়া, সে কৃষ্ণপ্রিয়াকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসে।

অম্বরনাথ যখন একাই নায়েবখানায় ফিরিয়া আসিল, তখন মুহুরী, সরকার, খানসামা ও অবস্থাপ্রতিপালা বেকার কুটুম্বগণ মিলিয়া সেখানে বড় রকম একটা সভা ফাঁদিয়া বসিয়াছিল। সভার কার্য্য ইসারা-ইঙ্গিত, ফিস্‌ফাস ও মুচ্‌কি হাসি দ্বারা চলিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া একটুখানি সকৌতুক হাস্য ভিন্ন আর সব বন্ধ হইয়া গেল। সেই মলিন বস্ত্র, মলিন উত্তরীয়ে, অর্দ্ধাচ্ছাদিত অঙ্গে বোধ হয় কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়া থাকিবে!—সংসারে সকল জিনিসেরই রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। মৃত্তিকা যখন ঘটরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তখন তাহার প্রয়োজনীয়তা বর্দ্ধিত হয় ও ঘটরূপ, মৃত্তিকারূপের চেয়ে সুন্দর দেখায়,—আবার যখন সেই ঘট দেবোদ্দেশে ব্যবহৃত হয়, তখন ভক্তের নিকট তাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই!—গরীব পুরোহিত অম্বরনাথ রমাবল্লভের জামাতৃ-রূপে মনোনীত হইয়া যেন অধিকতর সুন্দর হইয়াছে!

অম্বর কিন্তু চারিদিকের এই সহজ চাঞ্চল্যোদ্রেকনা লক্ষ্য করে নাই। আজ পূর্ব্বাহ্ণ হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত তাহার জীবনে যে সকল অভূতপূর্ব্ব ঘটনা পরম্পরা ঘটিতেছিল, সে তাহারই অভিনবত্বে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে! প্রথমবার রাজনগরে প্রবেশ হইতে আজিকার এই অতীত-প্রায় সায়াহ্ন মুহূর্ত্ত অবধি, সবটাই যেন কেমন একটা হেঁয়ালি বলিয়া তাহার বোধ হইল। সে ভাবিতে লাগিল,—সে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান; জ্ঞাতির দয়ায় কোন মতে প্রতিপালিত। আপনার চেষ্টায় কাশীধামে এক দয়ালু পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছিল—এমন সময় সেই পণ্ডিতের মৃত্যু ঘটে। পণ্ডিত বেদান্তসিদ্ধান্তে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তিনি বেদান্তবিদ্ হওয়ার দুর্ল্লভ সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই,—কয়জনই বা এ সংসারে তাহা পারেন! তাই, সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহারও গোঁড়ামীর অভাব ছিল না। তিনি দেবমূর্ত্তি দেখিয়া উপহাস পর্য্যন্ত করিতে ছাড়িতেন না, দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে তর্কস্থলে অনেক সময় প্রমাণরূপে লাঠি-প্রয়োগ করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না!—অম্বর বুঝিল, তখনও তাহার নিজের শিক্ষা উপযুক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।—তাই, সে দেশে ফিরিবার পর জ্ঞাতিভ্রাতার পরিচয়পত্রের বলে রাজনগরে 'ন্যায়' পড়িতে আসিয়াছিল।

আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র থাকিলেও যদি তাহার নীচে

মেঘের স্তর জমাট বাঁধিয়া থাকে, তবে উপরের আলো সেই অস্বচ্ছ আবরণ ভেদ করিয়া নীচে নামিতে পায় না!—মর্ত্তে বসিয়া মর্ত্তবাসীরা কেবল বাহিরের কাল মেঘটাই দেখিতে পায়। অম্বরের মধ্যে পাণ্ডিত্য ছিল, সে বেদান্ত-শাস্ত্রটা তাহার শিক্ষাগুরুর চেয়ে অর্গবোধ করিয়া পড়িয়াছে। তা ছাড়া তাহার চিত্তে "দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" এই বৈদান্তিক ভাবটি—পূর্ণমাত্রায় নাই হউক, কিঞ্চিন্মাত্রও—বর্ত্তমান থাকায় স্বভাববশেই সে কতকটা বৈদান্তিক। কিন্তু গুরুর কাছে আবাল্য শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার দেবমূর্ত্তি-আরাধনার বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাবটি যে কতকটা সে পায় নাই, একথা বলা যায় না।—কাজেই এইখানে সে প্রকৃত বৈদান্তিক হইতে পারে নাই। তবে এ কথাটা সে বুঝিত, নিত্য-ক্রিয়াকলাপ সে যাহাই করুক না কেন, সবই সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানের উদ্দেশেই সে করিয়া থাকে। 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' সে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিত বলিয়া,জগতের সকল দ্রব্যই—সকল প্রাণীই—তাহার প্রিয় ছিল। কিন্তু সকলে তাহার উদার প্রাণটার ঠিক পরিচয় পাইত না! বাহিরের দীন-নম্রতা তাহার এই অন্তরের আলোককে মেঘের মত ঢাকিয়া রাখিয়াছে বলিয়া লোকে তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় নাই,—সকলেই এই নগণ্য দরিদ্র-মূর্ত্তিকে, সঙ্কুচিত স্বভাবের জন্য চিরদিন উপহাস-অবহেলা করিয়া আসিয়াছে! জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে নিরীহ-স্বভাব লইয়া যে এক পাশে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার উচ্চনীচ কোনও জীব-জগতেই সুখসম্প্রাপ্তি ঘটে না।

তা হউক, তাহাতে সে কোন দিন ত কাতর ছিল না। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবার পর যাহার মা-ই যাহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ-সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, আজন্ম অভ্যস্ত অবহেলাটাই সকল অবস্থার চেয়ে তাহার নিকট অধিক পরিচিত। ছোটবেলায় পাঁচজনের ফরমাস্ খাটিয়া, তামাকু সাজিয়া, ছেলে-কোলে করিয়া কাটিয়াছে; তৎপরে গুরুগৃহে গুরুর অপরাপর শিষ্যগণের ও সতীর্থবর্গের সেবা করিয়া পাইয়াছে শ্লেষবিদ্বেষ, অবহেলা;—তার পর পৌরোহিত্যে পাইয়াছে বাণীর ভর্ৎসনা ও লোকের অবমাননা!—এ অবস্থায় এই যে আদর-আপ্যায়ন, এটা যে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস!—ইহাদের সহিত জীবনে ত তাহার কখন পরিচয় হয় নাই! করতলন্যস্ত কপোলে সে বহুক্ষণ সঘন ঝিল্লীমন্দ্রিত কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারমাখামাখি বাহিরের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল।—বায়ুহীন গুমোটে গাছপালা স্তব্ধ।—উচুনীচু গাছের মাথাগুলা যেন একটা সুবিস্তৃত কষ্টিপাথরের পাহাড়ের মত দেখাইতেছে। জগতে একটি প্রাণী কোথাও জাগিয়া আছে, এমন একটু সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। সে ভাবিতে লাগিল,—'জীবনে আজ একি সমস্যা!' ভগবানের নিকট কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিল,—'প্রভো! হৃদয়ে বল দাও—তোমার কৃপায় যেন পথভ্রষ্ট না হই!—বলিয়া দাও প্রভো, এ সঙ্কটে আমার কর্ত্তব্য কি?'

রমাবল্লভের ব্যাকুল অনুরোধ, কৃষ্ণপ্রিয়ার অশ্রুপূর্ণ মিনতি, তাহার স্বভাব-কোমল চিত্তকে বন্যার বেগে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। সে কতটুকু,—যে তার উপর এত নির্ভর ও আগ্রহ! তারপর সে তাঁহাদের অন্নগ্রহণ করিয়াছে, তাঁহারা প্রভু—সে ধরিতে গেলে ভৃত্য! এ দিকে যাঁহার অন্নগ্রহণ করা যায়, তিনি পিতা; তাঁহার জন্য প্রয়োজন হইলে প্রাণোৎসর্গ করাও শাস্ত্রীয় বিধি। সে তাঁহাদের জন্য এইটুকুও পারিবে না!—কিন্তু এইটুকুই যে বড় কঠিন! সেই রাজরাজেন্দ্রাণী-মূর্ত্তিতে যে মর্ম্মরমন্দিরে বিরাজিতা, যাহাকে দেখিলেই—সম্ভ্রমে, কি ভয়ে—সহসা তাহার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে নয়নের দৃষ্টি নত হইয়া পড়ে,—কেমন করিয়া সে তাহাকেই সখী, বা সেবিকা, অথবা সহধর্ম্মিণীরূপে কল্পনা করিবে?—সে কেমন করিয়া তাহার সঙ্কোচপূর্ণ—সম্ভ্রমজনিত—আনত নেত্র, বাণীর প্রদীপ্তাভ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল নয়নের উপর স্থাপন করিবে,—চারি-চক্ষুর মিলন কিরূপে হইবে! অসম্ভব! যে ভক্তি-নিষ্ঠাপূর্ণা, দেবমূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া, তাহার মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধ-চিত্ত সংযত—তাহার ভ্রান্তি অপনোদন—করিয়াছে,—যে মূর্ত্তির প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া সে এখন বুঝিয়াছে, মূর্ত্তিপূজা—পৌত্তলিকতা—মহিমময় রাজরাজেশ্বরের আকুল আহ্বান, তাহাতে সাধকের উপকার ভিন্ন অপকার হয় না।—মূর্ত্তি হইতে ত দূরেই থাকিতে হয়—ক্ষুদ্রের মধ্যেও বিশাল-সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়!—সে কেমন করিয়া সেই কল্পনার দেবীকে মানবীরূপে নিজের পাশে দাঁড় করাইবে!—এ অসম্ভব! যাহার একনিষ্ঠ ভক্তি ও আরাধনায় সে প্রীত হইয়া তিরস্কারকে পুরস্কার বোধ করিয়া-ছিল, সেই দেব-পার্শ্বচারিণীকে সে বেদ-মন্ত্রে কিরূপে স্বীকার

করাইবে যে,—একমাত্র সে-ই তাহার ধ্যান, দেবতা, আশ্রয়,—আজি হইতে সে তাহার দেহমনের সর্ব্বতোভাবে অন্তবর্ত্তিনী! অসম্ভব!—অসম্ভব!

চিন্তাক্লিষ্ট অম্বরনাথ তাই ব্যাকুলনেত্রে ভগবানের নিকট কাতরকণ্ঠে বলিল, 'বলিয়া দাও প্রভু,—আমি কি করিব? আমার কর্ত্তব্য কি দেখাইয়া দাও।—শুধু মনের দুর্ব্বলতায় আসল জিনিস যেন ভুলিয়া না যাই।' সহসা মনে পড়িল, আর পাঁচ দিন পরে রমাবল্লভ, তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার-হারা হইবেন—মন্দিরও যাইবে! সে ঈষৎ চমকিয়া উঠিল,—এ মন্দির গেলে বাণী প্রাণে বাঁচিবে না—এ মন্দির যে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয়!—আমিও ত প্রাণ থাকিতে তাহা সহিতে পারিব না! তবে তাই হউক—বাণীর কথাই রক্ষা করিব—বিবাহান্তে দূরে থাকিব! তবু ত তাহাকে দারিদ্র্য হইতে—অপমান হইতে—দারুণ মনঃকষ্ট হইতে—উদ্ধার করিতে পারিব—সুখ-সম্মানের অধিকারিণী করিতে পারিব।—এও কি আমার একটা কর্ত্তব্য নয়? তাহার সঙ্গ-সুখে বঞ্চিত হইয়াও যদি তাহাকে সুখী করিতে পারি,—সে আনন্দ হইতেই বা বঞ্চিত হইব কেন?—আমার সঙ্কোচ লইয়া থাকায় ফল কি?

একটা বড় নক্ষত্র বিবিধবর্ণ বিস্তার করিতে করিতে জ্বলিতেছিল,—সহসা সেটা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া যেন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল—মৃদু বাতাসে গগনচুম্বী দেবদারুর শির কাঁপাইয়া উঠিল!—অম্বরনাথের মনে হইল, যেন ইহা দেবতার আশীর্ব্বাদ!—সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আবার ভাবিতে লাগিল,—এও বিষম-সমস্যা! বিবাহের পরদিনে, বিবাহের অনুষ্ঠান-শেষেই, জন্মের মত বিবাহিতাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে! নিজের মনের দিক্ হইতে দেখিলে তাহার এ সর্ত্তে কিছু আপত্তি নাই, বরং—হাঁ, যথার্থ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা কি, বরং—এই সর্ত্ত ভিন্ন তাহার পক্ষে একাজ করা আরও কঠিন হইত!—বিবাহের পরই গৃহজামাতৃরূপে যদি তাহাকে এই বাড়ীতে বাণীর নিকটে বাস করিতে হইত, তবে হয় ত সে কিছুতেই এ বিবাহে স্বীকার হইতে পারিত না। তথাপি, কর্ত্তব্যের দিক্ দিয়া দেখিলেও, এইখানে গুরুতর একটা বিরোধ বাধিয়া উঠে!—মনের মধ্যে সেই তত বড় একটা সংকল্প রাখিয়া পত্নীর অঞ্চল ধরিয়া থাকিলেও ত চলিবে না! আবার ভাবিল, দেব-ব্রাহ্মণের সমক্ষে—অগ্নি-সাক্ষ্য করিয়া—বেদমন্ত্র লইয়া বিবাহ করিয়া শাস্ত্রানুসরণ না করিলে যে পাপ হইবে,—সে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান—এ বিবাহে অসম্মতি-প্রদান! অম্বর উঠিয়া একধারে রক্ষিত নিজের পুঁটুলিটা খুলিল,—তাহাতে কএকখানা অৰ্দ্ধ-মলিন ও ধৌত বস্ত্র, থানকএক পুঁথিপত্র, একটি বনাতের বটুয়ায় ব্রত ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা-লভ্য দু'চারটি টাকাপয়সা মাত্র ছিল।—সে একখানি পুঁথি লইয়া আলোর নিকট বসিল।

একি মন্ত্র!—প্রতি বর্ণে কি গাম্ভীর্য্য,—কি কঠিন প্রতিজ্ঞার পাশে আপনাকে বাঁধিয়া দেওয়া,—অপরকে বদ্ধ করা! এ বিবাহ বন্ধন কি কখনও খুলিতে—জীবন মরণে কি শিথিল হইতে—পারে! সম্মুখে ক্ষুদ্র শালগ্রাম শিলামধ্যে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' 'সহস্রাক্ষ,' সহস্রশীর্ষ বিরাট্ পুরুষ, বহ্ন-রূপী অগ্নি, ও ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী—ঊর্দ্ধে অচপল ধ্রুব-তারা—ইঁহাদের সমক্ষে বেদ-মন্ত্র রূপা মহাশক্তি দুই জনের সংযোগসাধনে আবির্ভূতা!—এস্থানে হৃদয়ভরা কপটতা লইয়া দাঁড়ান চলে না! হায়! যে কার্য্য করিলে সেই দেব-মন্দির-গত-প্রাণাকে তাহার সার সুখ দান করিতে পারা যায়, তাহাও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়!

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। বাহিরে নিশাচর পক্ষীর কর্কশ স্বর, ও তাহাদের অকস্মাৎ আক্রমণে ঘুমন্ত পক্ষীনীড়ে বিপন্ন পক্ষী-শাবকের আর্ত্ত চীৎকার,—প্রায় একসঙ্গে স্তব্ধ রাত্রিকে চকিত করিয়া তুলিতেছিল।—জানালার মধ্য দিয়া সেই নক্ষত্রটা সেইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অম্বরের চিন্তাজরাতুর মুখের দিকে চাহিয়া যেন কি বলিল!—অকস্মাৎ সে চমকিয়া উঠিল,—সেই দৃষ্টিতে কোন্ অতীতের কাহার স্নিগ্ধ জ্যোতি-ভরা স্থির-দৃষ্টির আভাস! সে আর সেদিকে চাহিতে পারিল না। সেই সমুজ্জ্বল তারকার মত নেত্রাভাস যেন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছিল, 'এত মূর্খ তুমি,—এত হীন তুমি,—তাহা ত জানিতাম না!'—সত্যই সে হীন!—হীনাপেক্ষাও হীন,—শরণাগতাকে সে রক্ষা করিতে সাহস করে না!—সত্যই ত তাহার ন্যায় ভীরু জগতে নাই।

অম্বরনাথ নিজের শরীরে ও মনে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করিল। সেই পাষাণমূর্ত্তিবৎ রহস্যময়ী উজ্জ্বলে-মধুরে—সেই দেবপ্রতিমার নিত্যসঙ্গিনী দেবীকে সে তাহার ঈপ্সিত দান না করিয়া থাকিতে পারিবে না।—মনের অগোচর পাপ

নাই—যে নিষ্ঠাবতীর একনিষ্ঠ দেব-প্রেমে সে তাঁহাকে অকুণ্ঠ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিয়াছে, আজ সন্ধ্যায় সেই সুদূরবর্ত্তিনী যখন তাহার অতি নিকটে আসিয়া বরদারূপে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন—হায়! তখন তাহার অনুদ্বিগ্ন—নিশ্চিন্ত হৃদয় যে কি একটা তীব্র অনুভূতিতে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে ত বেশ বুঝিতে পারিয়াছে! অম্বরনাথ সবেগে নিজের বুকখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, তারপর অবসন্ন-ভাবে নিকটস্থ শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। সে চির-সহিষ্ণু, চির-উপেক্ষিত;—কখনও কোন কামনা তাহার চিত্ত অধিকার করে নাই।—আজ এ কি অননুভূত সুখ-দুঃখের সুপ্ত লহরী তাহার শান্ত হৃদয়-তলে অকস্মাৎ জল-কল্লোলের গম্ভীরস্বরে জাগিয়া উঠিয়াছে!

শেষ-রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাসে বাহিরে তখন পুষ্প-মুকুল ফুটিয়া সুরভি তরঙ্গ তুলিতেছিল;—অম্বরনাথ প্রাতঃকৃত্যের জন্য উষালোকে নদীতীরের দিকে চলিয়া গেল। সে ভাবিল, —'বিবাহ মন্ত্র পত্নীকে অভিন্নাত্মরূপে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়—আজ আমি বুঝিতেছি,—তাহা আমার পক্ষে অসম্ভব নয়!—দ্বিতীয়তঃ, যাবজ্জীবনের ভরণপোষণাদির ভার,—এই বিষয় রক্ষা হইলে আংশিকভাবে,—সে প্রতিজ্ঞা-পালন হইতে পারে!—জমিদার-মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা একেবারে অসঙ্গতও নয়।' অম্বরনাথ ভাবিতে লাগিল, 'এই ভাবে কার্য্য করিলে কি নিতান্তই মিথ্যাচারী হইব?'

পথে যাইতে যাইতে ধূসরাকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে রক্তিম-রেখার দিকে চাহিয়া সে মৃদুনিঃশ্বাস ফেলিল।—একাত্মরূপে, আর চারি দিন পরে, সে তাহার এই তুচ্ছ জীবনের মধ্যে তাঁহাকে লাভ করিবে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে!—ইহাতেই বা ক্ষতি কি!—সে এখন অনায়াসে বলিতে সমর্থ, "যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম"। তারপর এজীবনের মত দুজনে এ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকুক না,—তাহাতে ক্ষতি কি? সে তাঁহাকে তাহার পত্নী—সহধর্ম্মিণী—রূপে কখনও কার্য্যাবসরে চিন্তা করিবে এবং এ জীবনে এই মনের ভাব যেন কেহ কখনও জানিতে না পারে, তাহারই জন্য সচেষ্ট থাকিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

পায়ণ-প্রকরণ

অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে, উহা পরিষ্কৃত করিয়া, ধারের মুখে, মৃত্তিকার সহিত লবণ অথবা অন্য কোন ক্ষার সুমিশ্রিত করিয়া জল দিয়া গুলিয়া প্রলেপ দিয়া, সেই ধারটা অগ্নিতে পুড়াইতে হয়;—যখন বেশ লাল হইয়া উঠে, সেই সময় সেটাকে জল, কিংবা অন্যকোন প্রকার তরল দ্রব্য পান করানকে পায়ণ, বা পাইন দেওয়া, বলে। অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য বলেন, অস্ত্রকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য পান করাইতে হয়, যথা—

'শ্রীবৃদ্ধি-প্রার্থী শস্ত্রের ধার দগ্ধ করিয়া তাহাকে রুধির পান, গুণবান্ পুত্রপ্রার্থী শস্ত্রকে ঘৃত পান, অক্ষয় ধন-প্রার্থী জল অথবা উষ্ট্রের দুগ্ধ বা হস্তিনীর দুগ্ধ, এবং—হস্তিশুণ্ডচ্ছেদনেচ্ছু মৎস্যের পিত্ত, মৃগীর দুগ্ধ, কুক্কুরের দুগ্ধ বা ছাগীর দুগ্ধ পান করাইবেন।—প্রস্তরে প্রহার করিয়াও অস্ত্রের ধার অব্যাহত রাখিতে হইলে প্রথমে আকন্দের আঠা, ছড় বিষাণ (?), কয়লা, পারাবত ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্রে মর্দ্দন করিয়া তৈল ম্রক্ষিত শস্ত্রের ধারে প্রলেপ দিবে, পরে উপরোক্ত যে কোন দ্রব্য পান করাইয়া শেষে সুশাণিত করিবে।—লৌহ বা প্রস্তর কর্ত্তনোপযোগী করিবার জন্য অস্ত্রে কদলীবৃক্ষ-ক্ষার ম্রক্ষিত করিয়া একদিন ও একরাত্রি রাখিয়া, পরে পূর্ব্বে লিখিত যে কোনও দ্রব্য পান করাইয়া উত্তমরূপে শাণিত করিবে।—এতদ্ভিন্ন সদ্য-প্রাণহন্ত্রী করিবার জন্য অস্ত্রকে বিষ বা বিষবৎ দ্রব্য পান করাইতে হয়।

'পাইন দিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গন্ধ নির্গত হয়, সেই গন্ধদ্বারা অস্ত্রের ভাবী শুভাশুভ ফল নির্ণীত হয়, যথা—অস্ত্র শস্ত্রে পান ধরাইবার সময় যদি করবী, উৎপল, হস্তিমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম, কুঁদফুল, বা চাঁপা ফুলের ন্যায় সুগন্ধ নির্গত হয়, তাহা হইলে সেই অস্ত্র বিশেষ শুভকর।

'আর, যদি গোমূত্র, পঙ্ক ঘটুন, কূর্ম্ম, বসা, রক্ত, কিম্বা ক্ষারতুল্য দুর্গন্ধ নির্গত হয়, তবে সে অস্ত্র অশুভকর।

'পান দিবার পূর্ব্বে' অস্ত্র হইতে—দাহকালে যদি বৈদূর্য্য, কনক, বা বিদ্যুৎবৎ প্রভা বহির্গত হয়—তাহা হইলে সে অস্ত্র জয় ও আরোগ্য (স্বাস্থ্য) বৃদ্ধি সূচক; অন্যথায় অশুভকর হয়।

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য।

যুগল সাহিত্যিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

শুভ সংবাদ

সন্ধ্যার পর কলিকাতার কোনও একটি সুপ্রশস্ত ত্রিতল গৃহের বৈঠকখানায় বসিয়া, চায়ের পেয়ালা সম্মুখে লইয়া, তিনটি যুবক কথোপকথন করিতেছিল।

যেটি গৃহস্বামী, তাহার নাম রাজেন্দ্রনাথ বসু। বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ—মাথার চুলগুলি বেশ বড় বড়, মাঝে চেরা-সীঁথি, দিব্য নধর-কান্তি সুপুরুষ। দেশে জমিদারী আছে, কলিকাতায় আরও দুই খানি বাড়ী আছে, কোনও অভাব নাই,—চাকরি বা কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয় নাই। অপর দুইজন প্রতিবেশী বন্ধু,—একজনের নাম অধরচন্দ্র, অপরের নাম শরদিন্দু।

পাড়ার আরও দুইজন যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। পার্শ্বের কক্ষে চায়ের জন্য জল ফুটিতেছে—গৃহস্বামীর আজ্ঞায়, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভৃত্য আরও দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া আনিল। সন্ধ্যার পর রাজেন্দ্রনাথের বাড়ীতে চায়ের সদাব্রত—যেই আসুক, তাহারই জন্য চা প্রস্তুত।

গল্প করিতে করিতে রাজেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ঘড়ির পানে চাহিতেছে। বাহিরে পদশব্দ শুনিলেই দ্বারের পানে চাহিয়া দেখে। তাহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া শরদিন্দু বলিল,—"আজ তিনকড়ি বাবু এখনও এলেন না?"

রাজেন্দ্র বলিল,—"হ্যাঁ—তাই ত ভাবছি। আজ এখনও এল না কেন? আটটা বাজে প্রায়!"

আটটা বাজিবার পূর্ব্বেই তিনকড়ি আসিয়া প্রবেশ করিল। আজ তাহার মুখখানি বেশ হাসি হাসি।

রাজেন্দ্র বলিল,—"কি হে—আজ এত দেরী যে?"

তিনকড়ি একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল—"আজ আপিস্ থেকে বেরুতেই দেরী হয়ে গেল।—আজ একটা শুভসংবাদ আছে ভাই।"

সকলে উৎসুক হইয়া তিনকড়ির মুখের পানে চাহিল। রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—"কি?—বল, বল।"

"আমার মাইনে বেড়েছে।"

রাজেন্দ্রনাথ সজোরে টেবিল চাপড়াইয়া বলিল,—"হুর্‌রে—কত?—কত বাড়্‌ল'?"

তিনকড়ি বলিল,—"২৫৲ বেড়েছে।"

রাজেন্দ্রনাথের মুখে আনন্দজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। বলিল,—"ব্রাভো—এস আজ আর এক এক পেয়ালা ক'রে চা খাওয়া যাক্।—ওরে—রামধনিয়া—আওর চা লে আও।"

উপস্থিত সকলেই আনন্দ করিতে লাগিল। শরদিন্দু বলিল,—"শুধু চা খেয়েই কি আমরা ছাড়্‌ব?—রীতিমত খাওয়া চাই। তিনকড়ি বাবু—খাওয়াচ্ছেন্ কবে বলুন।"

রাজেন্দ্র বলিয়া উঠিল,—"তিনকড়ির হ'য়ে আমিই খাওয়াব।—কবে খাবেন্ বলুন্।"

অধর বলিল,—"সুমুখের এই শনিবারে।"

"বেশ্—তাই হবে।"

নূতন পেয়ালা চা-পান করিতে করিতে, মহা-উৎসাহের সহিত ভোজ-সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতে লাগিল।

মাসের ত্রিশটি দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনকড়ি রাজেন্দ্রের সঙ্গেই বসিয়া কাটায়। আপিস্ হইতে ফিরিয়া হাতমুখ ধুইতে যে দেরী—তার পরই এখানে ছুটিয়া আসে। এই খানেই সে প্রতি সন্ধ্যায় চা-পান করে—জলযোগও এই খানেই সম্পন্ন হয়।—এই নিয়মই বহুবৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বাল্যকাল হইতেই রাজেন্দ্রনাথ ও তিনকড়ির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। রাজেন্দ্র যদিও ধনীর সন্তান এবং তিনকড়ির পিতা সামান্য চাকুরিজীবী ছিলেন—তথাপি উভয়ের বন্ধুত্বে কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। দুইজনে প্রায় সমবয়সী, বাল্যকালে একই বিদ্যালয়ে পাঠ করিত—একসঙ্গেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের পাঠ আরম্ভ করে। বি-এ পড়িবার সময়, কএক দিন অগ্রপশ্চাৎ উভয়েরই বিবাহ হয়। তখন হইতেই উভয়ের বন্ধুত্ব আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। নিজ নিজ নবীনা প্রেয়সীর গুণগান পরস্পরের কর্ণে অবিশ্রাম গুঞ্জন করিয়া কিছুতেই ইহাদের তৃপ্তি হইত না, এবং উক্ত মহাশয়াগণের পিতৃগৃহে অবস্থানকালীন কাহারও একখানি প্রেমলিপি আসিলে,

যতক্ষণ সেখানি সে বন্ধুকে না দেখাইতে পারিত, ততক্ষণ ছট্‌ফট্ করিতে থাকিত!

এই সময় হইতেই এ দুইজনের বন্ধুত্বের নিবিড়তার আরও একটি কারণ উপস্থিত হয়,—উভয়েই কবিতা-রচনা আরম্ভ করে। একজন একটি কবিতা-রচনা করিলেই, অপরকে সেটি দেখাইবার জন্য ছুটিত। সে সব দিনে, কবিতা প্রকাশের চেষ্টাও যে ইহারা না করিয়াছিল এমন নহে। উভয়েই, অনেকগুলি করিয়া কবিতা, কএকটি মাসিকপত্রে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি, সম্পাদকের পর সম্পাদক, ধন্যবাদের সহিত ফেরৎ দিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র বলিল,—'মাসিকের সম্পাদকগণ কাব্যবিচার সম্বন্ধে নিতান্তই অপটু,—তাহাদের কবিতা পাঠান, বেণাবনে মুক্তা ছড়ানর মতই নির্ব্বুদ্ধিতা।'—পরামর্শ হইয়া রহিল—যখন সময় আসিবে, উভয়েই পুস্তকাকারে কবিতাগুলি প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-জগৎকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া দিবে! রাজেন্দ্র এতদিন কোন্‌কালে তাহার কাব্য ছাপাইয়া উক্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু তিনকড়ির অর্থাভাব—বহি ছাপাইবার সঙ্গতি তাহার ছিল না—সে রাজেন্দ্রের নিকট অর্থসাহায্য গ্রহণ করিতেও অসম্মত—সেইজন্য বাধ্য হইয়া এতাবৎকাল সাহিত্য-জগৎকে বঞ্চিত রাখিতে হইয়াছে।

চা-পান শেষ করিয়া, ভোজের পরামর্শ পাকাপাকি করিয়া, অভ্যাগতগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করিল। রহিল কেবল তিনকড়ি।

দুইজনে একা হইলে রাজেন্দ্র বলিল,—"যাক্ এতদিন পরে তবু একটু স্বচ্ছল হ'ল। ততটা টানাটানি ত আর থাক্‌বে না!"

তিনকড়ি বলিল,—"হঁ্যা ভাই। এমনি অবস্থা ছিল, কোনও মাসে একটি পয়সা রাখ্‌তে পার্‌তাম না!—এবার একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ব'।"

রাজেন্দ্র বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। শেষে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

তিনকড়ি বলিল—"হাস্‌লে যে?"

"একটা কথা ভাব্‌ছি।"

"কি?—বল না।"

"মনে পড়ে?—একদিন আমরা বলেছিলাম—বই ছাপিয়ে আমাদের কবিতা বের্ কর্‌ব।"

"খুব্ মনে পড়ে।—আর, আমার বই-ছাপানর ক্ষমতা ছিল না বলেই, তুমিও নিজের বই এতদিন ছাপাওনি—তাও আমি জানি।"—বলিয়া তিনকড়ি বন্ধুর পানে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

রাজেন্দ্র বলিল,—"না—না—তা নয়। আচ্ছা,—বই ছাপাতে কত খরচ্ পড়ে?"

কিরূপ ছাপাইতে কত খরচ,—কিরূপ কাগজেরই বা কত দাম,—তিনকড়ি অনেক দিন হইতেই এ সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল।

রাজেন্দ্রকে সমস্ত হিসাব দিয়া বলিল,—"ছবি দেবে? আমার ক্ষমতায় অবিশ্যি কুলবে না—তোমার বইয়ে খান্ দুই রঙীন্, আর খান্ চারেক্ এক বর্ণের ছবি দিতে পার। আজকাল্ সকলেই বইয়ে ছবি দিচ্ছে।"

ছবি দিতে হইলে কত খরচ তাহাও রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—ছবি দিবার প্রলোভনটি তাহার মনে বিলক্ষণই ছিল। কিন্তু খরচের ফর্দ্দ শুনিয়া রাজেন্দ্র বুঝিতে পারিল, তিনকড়ির পক্ষে তাহা সাধ্যাতীত হইবে। সুতরাং সে প্রলোভন মনেই দমন করিয়া বলিল,—"না,—ছবিতে কাজ নেই।—অমনিই ভাল।"

সমস্তই ঠিক হইয়া গেল। একই প্রেসে, একই রকম কাগজে, দুইজনের বহি মুদ্রিত হইবে।

রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া তিনকড়ি উঠিল। রাজেন্দ্র বলিল,—"তা হলে আর দেরী কর না।—পাণ্ডুলিপিটে শীগ্‌গির্ তৈরি করে ফেল।"

তিনকড়ি বলিল,—"হঁ্যা—কাল্ সকালেই আমি সুরু করে দেব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড়ভাই ও ছোটভাই

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে করিতে তিনকড়ির মনে কিন্তু বড়ই দ্বিধা উপস্থিত হইল। পুরাতন কবিতাগুলি যতই সে পড়ে, ততই তাহার মনে হয়,—ছি—ছি—এ ছাপাইয়া কি হইবে! দুই বৎসর পূর্ব্বে নিজের এই কবিতাগুলিই তাহার কাছে উচ্চদরের বলিয়াই মনে হইত,—এখন কিন্তু সেগুলি নিতান্তই বিশেষত্ববর্জ্জিত ও সাধারণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পর রাজেন্দ্রের বাড়ী গিয়া সে ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল,—"ভাই, তুমি বই ছাপাও—আমি ছাপাব না।"

রাজেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন?—হঠাৎ আবার কি হইল?"

"আমার ও ছাই-পাস্ ছাপিয়ে কি হ'বে?—শুধু লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া বৈ ত নয়!"

রাজেন্দ্রের মনে প্রথমাবধিই ধারণা, তাহার নিজের কবিতা তিনকড়ির অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর। আর্ট বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা তাহার কবিতায় আছে—তিনকড়ির কবিতায় নাই। তিনকড়ি, তাহার বন্ধুর মনের এই ভাবটি অবগত ছিল; কিন্তু স্নেহবশতঃ কখনও তাহার প্রতিবাদ করে নাই। খোসামোদ করিবার অভিপ্রায়ে নয়,বন্ধুর প্রীতি-কামনা করিয়াই, সে বরং মাঝে মাঝে এ ভ্রান্তবিশ্বাসটুকুর পোষকতাই করিত।

রাজেন্দ্র বলিল,—"না—না,—হাস্যাস্পদ হ'তে হ'বে কেন?—পাণ্ডুলিপিটে শেষ হ'লে তুমি আমার কাছে দিও—আমি বেশ ক'রে দেখে শুনে, যেখানে যা পরিবর্ত্তন আবশ্যক, ক'রে,দাঁড় করিয়ে দেব এখন।"

এই আশ্বাস তিনকড়ির কাছে সমধিক ভীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইল। সে বলিল,—"জোড়া-তালি দিয়ে কি আর হয় ভাই?—সে কাজ নেই।"

রাজেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; শেষে বলিল,—"তুমি না ছাপালে আমারও ছাপান হয় না!"—তাহার স্বর ভারি নৈরাশ্যযুক্ত।

তিনকড়ি বলিল,—"তোমার ভাল কবিতা,—তুমি কেন ছাপাবে না, ভাই।—ছাপাও।"

"না,—সে কিছুতেই হ'বে না।"—বলিয়া রাজেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া শেষে তিনকড়ি বলিল,—"আচ্ছা, না হয় আমিও ছাপাব।—কিন্তু বেশী বড় বই নয়, ভাই। ওরই মধ্যে খুব বেছে গুছে,গুটিকতক্ কবিতা দিয়ে, একখানি বই ছাপাব।"

রাজেন্দ্র বলিল,—"আমার বইখানি হ'বে বড়—তোমার খানি হবে ছোট?"

তিনকড়ি স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল,—"আমিও যে ছোট। তোমার বইখানি হ'বে বড়ভাই, আমার খানি ছোটভাই। তোমার চেয়ে আমার বইখানি সকল বিষয়েই ছোট হ'বে; আকারেও ছোট,—কবিত্বেও ছোট।"

শেষের কথাটিতে রাজেন্দ্রের ত কোন সন্দেহই ছিল না। হাসিয়া বলিল,—"আচ্ছা, তাই হউক্। এবার থেকে, বুঝেছ তিনু, তুমি এক কায্ ক'রো।—কোনও একটা কবিতা তোমার মাথায় এলেই, আমায় প্রথমে ব'ল। ঠিক্ কি রকম ছাঁচে ফেল্লে সেটির বেশ্ খোল্-তাই হবে,—আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব। তারপর, তুমি সেটি লিখ্‌বে। কিছু ভেবনা তিনু,—আমি বেশ্ জানি, তোমার ভিতরে পদার্থ আছে। তোমার শুধু একটু উপদেশ দরকার। আমি তোমায় ঠিক তৈরি করে তুলব';—তখন দুই ভাই দিগ্বিজয়ে বেরুব।"

'যথাসময়ে' বলা যায় না—অনেক বিলম্বে, বিস্তর টাল-মাটাল করিয়া, ছাপাখানা অবশেষে বহি দুইখানি শেষ করিয়া দিল। রাজেন্দ্রের পুস্তকের নাম হইয়াছে—"**প্রসূনাঞ্জলি**", তিনকড়ির পুস্তকের নাম—"গুঞ্জরণ।"

বহিগুলি আসিবামাত্র, সর্ব্বপ্রথমখণ্ড উভয়ে উভয়ের করকমলে অকৃত্রিম প্রণয়োপহার-স্বরূপ অর্পণ করিল।

তাহার পর প্রথম কার্য্য, প্রধান অপ্রধান সমস্ত সম্পাদককে এক এক খণ্ড বহি সমালোচনার্থ প্রেরণ করা। সারাদিন এই কার্য্যে অতিবাহিত হইল।

তিনকড়ি বলিল,—"এবার সম্ভবতঃ মাসিক-সম্পাদকেরা কবিতার জন্যে তোমায় ধ'রে পড়্‌বে।—তোমার উপর খুব জুলুম্ আরম্ভ হ'বে।"

রাজেন্দ্রনাথ উদারভাবে বলিল,—"নিতান্ত পীড়াপীড়ি করে, দেওয়া যাবে দু একটা।—তোমার খাতা থেকে বেছেও দুই একটা পাঠান যাবে।"

তিনকড়ি বলিল,—"আরে রাম,—আমার লেখা কেউ চাইবেও না, ছাপ্‌বেও না।"

রাজেন্দ্র বলিল,—"কি!—ছাপ্‌বেনা?—তাদের ঘাড় ছাপ্‌বে!—তোমার লেখাও ছাপ্‌তে হ'বে, এই কড়ারে তবে আমি লেখা দেব। যে সম্পাদক তোমার কবিতা ছাপ্‌তে নারাজ—তিনি আমার লেখাও পাবেন না—মাথা কুটে মর্‌লেও না।"—তিনকড়ির পিঠ ঠুকিয়া রাজেন্দ্র আবার বলিল,—"আমরা দুই ভাই।—বড়ভাই যেখানে, ছোটভাই

সেখানে।—ছোটভাইটিকে যিনি আদর না করবেন, বড়-ভাইকেও তিনি পাবেন না।”

স্নেহে,—আনন্দে তিনকড়ির চক্ষু সজল হইয়া আসিল। হায়, হতভাগ্যগণ!—কি কুক্ষণে তোমারা বহি ছাপাইয়াছিলে!

সম্পাদকগণের নামে বহি পাঠান শেষ হইলে, অন্যান্য সকলকে উপহার দিবার ধুম পড়িল। রাজেন্দ্রের বহি, তাহার শ্বশুরবাড়ীতেই প্রায় ত্রিশখানা খরচ হইয়া গেল। এমন কি, উক্ত ‘মধুপুরী’তে, সামান্য বাঙ্গালা লেখা-পড়া জানা একজন খানসামা ছিল সেও একখণ্ড জামাইবাবুর বহি বখ্‌শিস্ পাইল। রাজেন্দ্রের বৈঠকখানা-বিহারী সান্ধ্য-চা-পায়িগণ প্রত্যেকে উভয়গ্রন্থই পাইল। পাড়ার মাতব্বর ব্যক্তিগণের, অন্যান্য বন্ধুবর্গের, করকমলও বঞ্চিত রহিল না। যে সকল আত্মীয়-বন্ধু বিদেশে থাকিতেন, সকলের নামেই এক এক খানি বহি গেল। বঙ্গের খ্যাতনামা সুধিবৃন্দ, প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণ,—সকলেরই নামে ডাকযোগে বহি প্রেরিত হইল! তাহার পর কিছুদিন ধরিয়া—দুইজনে দেখা হইলেই—কাহাকেও বহি পাঠাইতে ভুল হইয়া গিয়াছে কিনা, তাহারই আলোচনা হইত। “ওহে—অমুককে ত আমি এখনও বই পাঠাই নি—তুমি পাঠিয়েছ?”—“না ভাই, আমারও ভুল হয়ে গেছে। ছি—ছি, কি মনে করবে বল দেখি?”—ইত্যাদি প্রকার কথাবার্ত্তা প্রায়ই হইতে লাগিল। ত্রুটি-সংশোধনে তিলমাত্র বিলম্ব হইল না।

বিক্রয়ার্থ, পুস্তকের দোকানে দোকানেও, বহি পাঠান হইল। তবে দোকানদারেরা অধিকসংখ্যক বহি একসঙ্গে লইতে চাহিল না,—বলিল আমাদের গুদামে স্থানাভাব।

রাজেন্দ্র অনেকগুলি মাসিকপত্রের গ্রাহক ছিল। সমালোচনা কবে বাহির হইবে,—কবে বাহির হইবে—করিয়া দুইজনে অস্থির হইয়া উঠিত, এবং মাসিকপত্র আসিলেই খুলিয়া আগে সমালোচনার স্তম্ভটা দেখিত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনকড়ি আসিয়া দেখিল, রাজেন্দ্র কিছু বিমর্ষ। বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কি হয়েছে?”

রাজেন্দ্র কোনও উত্তর না দিয়া, দেরাজ খুলিয়া একখানি নূতন মাসিকপত্র বাহির করিল।

তিনকড়ি উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল,—“বঙ্গ-প্রভা নাকি? সমালোচনা বেরিয়েছে?—দেখি—দেখি।”

রাজেন্দ্র একটা স্থান খুলিয়া তিনকড়ির হাতে কাগজখানি দিল।

তিনকড়ি দেখিল, প্রাপ্ত-পুস্তকের সংক্ষিপ্ত-সমালোচনার স্তম্ভে তাহার গুঞ্জরণের সমালোচনা। রুদ্ধশ্বাসে সেটি পাঠ করিল। বেশী কিছু নয়—বর্জ্জাইস্ অক্ষরে বারো চৌদ্দ লাইন মাত্র। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থের আকার, পৃষ্ঠা-সংখ্যা, প্রেস, প্রকাশক কে, মূল্য কত, ইত্যাদি সংবাদেই চারি পাঁচ ছত্র ব্যয় হইয়া গিয়াছে—বাকি কয় ছত্র সমালোচনা। তা, বহিখানিকে ভালই বলিয়াছে। লিখিয়াছে,—“এই নব্য-কবির ভাষায় ঝঙ্কার আছে, ভাবে নূতনতা ও গভীরতা আছে, তাঁহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। সাহিত্যের আসরে তিনকড়ি বাবুকে আমরা সাদরে বরণ করিয়া লইতেছি।”

পড়িয়া তিনকড়ি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—“বাঁচা গেল।—নিন্দা করে নি।”

রাজেন্দ্র বলিল,—“নিন্দা কেন করবে?—বেশ সুখ্যাতিই ত করেছে।”

কাগজখানি উল্টিয়া পাল্টিয়া তিনকড়ি বলিল,—“প্রসূনাঞ্জলির সমালোচনা ত নেই!—কেন বল দেখি?”

রাজেন্দ্র নিরাশভাবে বলিল,—“কি করে জানব ভাই?”

“তাইত!”—বলিয়াই গুঞ্জরণের সমালোচনাটি অভিনিবেশ সহকারে সে দ্বিতীয়বার পাঠ করিতে লাগিল। এই সামান্য কএকটি প্রশংসাবাক্যেই তাহার অন্তর-প্রদেশে পুলকের হিল্লোল বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। সহসা রাজেন্দ্র একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল—তাহা শুনিয়া তিনকড়ি যেন চমকিয়া, একটু লজ্জিত হইয়া উঠিল। কে যেন তাহার অন্তরে কষাঘাত করিয়া কহিল—স্বার্থপর!

তিনকড়ি বলিল,—“আমার ত বোধ হয়,—গুঞ্জরণকেই যখন এ কথা ব’লেছে, তখন প্রসূনাঞ্জলির আরও ভাল সমালোচনা করবে।”

রাজেন্দ্র বলিল—“দেখা যাক্—কি বলে!”

চা আসিল।—পান করিতে করিতে দুই জনে গল্প-গুজব করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অধরচন্দ্র আসিল। রাজেন্দ্র তাহাকে সমালোচনাটি পড়িতে দিল। সে পড়িয়া

বলিল,—"এই দশ লাইন সমালোচনা না করলেই নয়!—যদি কল্লি বাপু, ত একটু বড় ক'রেই কর্।"

তিনকড়ি বলিল,—"যে যেমন বই তা'র তেমনি সমালোচনা হ'বে ত! ভাল-বইয়ের সমালোচনা বেশ বড় বড় ক'রেছে,—দেখ না।"

প্রসূনাঞ্জলির সমালোচনা নাই শুনিয়া অধর মতপ্রকাশ করিল,—"সেখানার সমালোচনা বোধ হয় একটু বড় ক'রেই লিখ্‌বে—হয়ত এ মাসে স্থানাভাব হ'য়েছিল।"

তিনকড়ি বলিল,—"আমারও তাই মনে হয়।"

উঠিবার সময়, তিনকড়ির ইচ্ছা হইল স্ত্রীকে দেখাইবার জন্য কাগজখানি চাহিয়া লইয়া যায়,—কিন্তু বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। রাজেন্দ্রের সেই দীর্ঘ-নিঃশ্বাসটি তাহার মনে পড়িতে লাগিল। 'যদি দুইখানি বহিরই সমালোচনা থাকিত—সে কেমন আনন্দ হইত!—না—এই আধ্‌খানা আনন্দে কোনও সুখ নাই!'

তিনকড়ি প্রস্থান করিবার মিনিট কুড়ি পরে রাজেন্দ্র আহারার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।—দেখিল, ভোজনকক্ষের বারান্দায় তিনকড়ির বাড়ীর ঝি বসিয়া আছে।

ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিতেই তাহার স্ত্রী বলিলেন,—"হ্যাগা, তোমার কাছে এ মাসের 'বঙ্গপ্রভা' আছে?"

"কেন?"

"কিরণ আমায় চিঠি লিখে চেয়ে পাঠিয়েছে—ব'লেছে কাল্ সকালেই আবার ফিরে পাঠাবে।"— কিরণবালা তিনকড়ির স্ত্রীর নাম।

রাজেন্দ্র আসনে বসিতে যাইতেছিল,—এই কথা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।—ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল। তাহার পর, জুতা পায়ে দিয়া থট্‌মট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল;—"বঙ্গপ্রভা" খানি আনিয়া, স্ত্রীর পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

স্ত্রী, অবাক্ হইয়া, স্বামীর মুখের পানে কএক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন! তাহার পর, কাগজখানি কুড়াইয়া, বাহির হইয়া, ঝিকে দিলেন।

ঝি শঙ্কিতস্বরে বলিল,—"হ্যাঁ বউ মা,—বাবু কি রাগ করেছেন?"—বারেন্দায় বসিয়া সে মুক্ত-দ্বারপথে সমস্তই দেখিতে পাইয়াছিল।

গৃহিণী বলিলেন,—"না,—রাগ কর্‌বেন্ কেন?"

ঝির কিন্তু সে কথা বিশ্বাস হইল না!—একটু চিন্তাযুক্ত হইয়াই সে বাড়ী ফিরিল। যাহা কিছু দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল, সমস্তই গিয়া বর্ণনা করিল।

এ দিকে রাজেন্দ্র মাথাটি নীচু করিয়া কোনও মতে ভোজন শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। মনে মনে সে ক্রমাগত বলিতেছিল—'অকৃতজ্ঞ!—স্বার্থপর!—এক মিনিট দেরি সহিল না?—বাড়ী গিয়াই স্ত্রীর কাছে গল্প করিয়াছ?—আনন্দে এতই উন্মত্ত হইয়াছ?'

পরদিন কিন্তু মনে মনে এজন্য রাজেন্দ্রের বড় লজ্জাবোধ হইল। ভাবিল, 'কাল অনর্থক আমি তিনকড়ির উপর রাগ করিয়াছিলাম।—নিজের বহির ভাল সমালোচনা হইয়াছে, স্ত্রীর কাছে তাহা গল্প করিয়া সে এমনই কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছে? আর, স্বামীর প্রশংসাপাঠ করিবার জন্য আগ্রহ তাহার স্ত্রীর পক্ষে ত নিতান্তই স্বাভাবিক। অবশ্য যদি আমার বহির কোনও নিন্দা ঐ সংখ্যায় বাহির হইত—তাহা সত্ত্বেও উহু যদি ওরূপ আচরণ করিত,—তবে আমার রাগ বা অভিমান করিবার কারণ ঘটিত বটে।—ঝি গিয়া যদি বলিয়া থাকে, না জানি তিনকড়ি কি মনে করিতেছে!'

ওদিকে তিনকড়িও যখন শুনিল, কিরণ তাহার অজ্ঞাতসারে "বঙ্গপ্রভা" আনিতে রাজেন্দ্রের বাড়ী ঝি পাঠাইয়াছে, তখন সে মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইল। তাহার পর ঝি যখন আসিয়া সকল কথা বলিল,—তখন সে লজ্জায় ক্ষোভে এতটুকু হইয়া গেল। স্ত্রীর উপর রাগও হইল। তিনকড়ি ভাবিতে লাগিল,—'ছি ছি—বড় অন্যায় হইয়া গিয়াছে। রাজেন্দ্র আমাকে কি স্বার্থপর হৃদয়শূন্য ভাবিতেছে!'—এই চিন্তায় রাত্রে তাহার ভাল ঘুম হইল না—পরদিন আপিসেও মনটা বড় খারাপ রহিল।

সন্ধ্যাবেলা তিনকড়ি আসিলে সহাস্যমুখে রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হে,—গিন্নী কালরাত্রে সমালোচনা প'ড়ে কি বল্লেন?"

তিনকড়ি লজ্জিতভাবে বলিল,—"কি আর বল্‌বে? ব'ল্লে বেশ্ লিখেছে।"

"কিছু অতিরিক্ত পুরস্কার টুরস্কার দিলেন না?—ছটো বেশী ক'রে পান্ টান্—কি—অন্য কিছু?"—বলিয়া রাজেন্দ্র বক্র-হাসি হাসিল।

এইরূপ হাস্য পরিহাসে উভয়ের হৃদয় আবার স্বাভাবিক সুস্থতা-লাভ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ-সভা

দুই দিন পরে চোরবাগানের কালী মিত্রের বাড়ী উভয়েরই বিবাহের নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধ্যার পর তিনকড়ি সাজসজ্জা করিয়া আসিল। রাজেন্দ্রের সঙ্গে, তাহার গাড়ীতেই, চোরবাগানে যাত্রা করিল।

বিবাহ-সভায় বসিয়া গল্প-গুজব চলিতেছে, এমন সময় একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি চারিদিক হইতে—'আসুন্', 'আসুন্' রব উত্থিত হইল। তাঁহাকে স্থান করিয়া দিবার জন্য অনেকেই সসম্ভ্রমে সরিয়া সরিয়া বসিতে লাগিল। "থাক্-থাক্—আপনারা কষ্ট করবেন্ না— আমি এইখানেই বস্‌ছি"—বলিয়া তিনি তিনকড়ির ও রাজেন্দ্রের সান্নিধ্যেই উপবেশন করিলেন।

তিনকড়ি নিকটস্থ একজন পরিচিত ব্যক্তির কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিল,—"ইনি কে?"

"চেনেন্ না?—ইনি মনতোষ বাবু—'আর্য্যশক্তি'র সম্পাদক।—আচ্ছা—আমি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি'"—বলিয়া তিনি ডাকিলেন,—"মনতোষ বাবু—ও মনতোষ বাবু—এদিকে একটু স'রে আসুন্ না।—এই ইনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্চেন্। এঁর নাম তিনকড়ি বিশ্বাস—বেঙ্গল্ আপিসে চাক্‌রি করেন্—আর, একজন কবি। এঁর নাম রাজেন্দ্র বাবু—রাজেন্দ্রনাথ বসু।—ইনি মস্ত-লোকের ছেলে—শ্যামপুকুরের বিজয়কৃষ্ণ বসু মশায়ের নাম শুনেছেন্ ত?—ইনি তাঁরই ছেলে।"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"বেশ্ বেশ্। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি সুখী হ'লাম্। তা,—তিনকড়ি বাবু—আপনি কবি?"

"আজ্ঞে না"—বলিয়া তিনকড়ি হাসিতে লাগিল।

"আপনিই কি 'গুঞ্জরণ' ব'লে বই লিখেছেন?"

তিনকড়ি একটু সলজ্জভাবে বলিল,—"সেটা অস্বীকার করতে পারি নে।"

মনতোষ বাবু বলিলেন,—"অস্বীকার করলে চল্‌বে কেন?—আমাকে সমালোচনার জন্যে পাঠিয়েছেন। আমি আপনার বই পড়েছি।—বইখানি আমার বেশ লেগেছে, তিনকড়ি বাবু। আজ্‌কাল্ যাঁরা সব্ কবিতা লিখ্‌ছেন—কেবল্ শব্দাড়ম্বরই বেশীর ভাগ, ভাবের সাড়া বড় পাওয়া যায় না।—তা, আপনার কবিতায় ভাব আছে—বেশ্ ভাব আছে।"

এই প্রকাণ্ড সভায়, সহস্র লোকের মাঝখানে, সুবিখ্যাত "আর্য্যশক্তি"র প্রবীণ সম্পাদকের মুখে এই প্রশংসাবাদ শুনিয়া, তিনকড়ির দেহ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল,—"আমার সামান্য কবিতা—আপনার—ভাল লেগেছে শুনে—বড় আহ্লাদ হ'ল।"

মনতোষ বাবু বলিলেন—"আস্‌ছে মাসের আর্য্যশক্তিতে সমালোচনা দেখ্‌বেন।"

তিনকড়ি সহসা রাজেন্দ্রের পানে চাহিয়া দেখিল—তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে!

একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনকড়ি বলিল,—"মনতোষ বাবু—আপনি রাজেন্দ্রবাবুর বইখানিও পড়েছেন্ বোধ হয়?—সেখানিও আপনার কাছে সমালোচনার জন্যে গেছে।"

"কোন্ রাজেন্দ্র বাবুর বই? —এঁর বই?"

"হাঁ। ইনিও 'প্রসূনাঞ্জলি' বলে একখানি কবিতার বই ছাপিয়েছেন।"

মনতোষ বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন—"কি জানি, মনে ত পড়্‌ছে না।—আচ্ছা দেখ্‌ব এখন।"

তিনকড়ি বলিল—"আমার কবিতার চেয়ে এঁর কবিতা ঢের ভাল।—এঁর দেখেই এক রকম আমার লিখ্‌তে শেখা।"

"বটে!—বলেন কি?—আচ্ছা আমি দেখ্‌ব।—কি বই বল্লেন্—কুসুমাঞ্জলি?"

"আজ্ঞে না—প্রসূনাঞ্জলি।"

"আচ্ছা—বেশ। তা তিনকড়ি বাবু—কোনও মাসিক-পত্রিকায় ত আপনার কবিতা দেখ্‌তে পাইনে!"

তিনকড়ি বলিল,—"না,—মাসিকে লিখি নে।"

"কেন লেখেন্ না?—লেখা উচিত।—মাসিকে লেখা বেরুলে, অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বহু লোকে তা প'ড়ে ফেলে। আমার আর্য্যশক্তিতে যদি আপনার একটি কবিতা ছাপা হয়, এক সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ দশহাজার লোকের

চোখে সেটা পড়্‌বে। আর আপনি যদি বই ছাপিয়া বের্ করেন্—সে বই হাজার লোকের চোখে পড়্‌তে কত বছর্ লাগ্‌বে বলুন্ দেখি ?"

তিনকড়ি হাসিয়া বলিল,—"দু তিন পুরুষের ত কম্ নয়—যদি ততদিন্ আমার বই বেঁচে থাকে।"

সম্পাদক বলিলেন,—"তবে ?—আপনি আমার আর্য্যাশক্তিতে লিখুন। বেশ্ ভাল দেখে গোটা দশ্ বার কবিতা —বেশ্ বাছা বাছা বুঝেছেন ?—পাঠাতে পার্‌বেন্ ?—কতগুলা আপনার অপ্রকাশিত কবিতা মজুৎ আছে ?"

"বিস্তর কবিতা মজুৎ আছে।—আপনার তিনমাসের আর্য্যশক্তি আগাগোড়া, মায় বিজ্ঞাপনের পাতা সুদ্ধ, ভরিয়ে দিতে পারি।"—বলিয়া তিনকড়ি হাস্য করিতে লাগিল।

"তা বেশ্—পাঠাবেন্ বেশী নয়, গোটা দশ্ বার। সব্‌গুলোই যে একমাসে ছাপাব তা নয়—কোনও মাসে একটি কোনও মাসে দুটি—বুঝেছেন্ ?—পাঠাবেন্ ত ?

"পাঠিয়ে দেব।"

"আগামী সংখ্যা আর্য্যশক্তি এখনও দু ফর্ম্মা ছাপা হ'তে বাকী আছে। যদি কাল্—কি পরশু পাঠান্, তবে এই মাসেই দুই একটা কবিতা যেতে পারে।—পাঠাবেন্ ?"

"বেশ্!—কালই আপনাকে এক ডজন্ কবিতা আমি পাঠিয়ে দেব।"

"আপনি কি আর্য্যাশক্তির গ্রাহক ?"

"আজ্ঞে না"

"আচ্ছা—আপনার নাম, লেখকের তালিকায় আমরা চড়িয়ে নেব এখন্। কবিতাগুলি পাঠাবার সময়—আপনার ঠিকানাটিও অনুগ্রহ করে লিখে দেবেন্।"

"বেশ্—লিখে দেব।"

এই সময় শব্দ শুনা গেল—"ব্রাহ্মণ্ মশায়েরা—গা তুলুন্।"

মনতোষ বাবু উঠিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, ঐ কথা রইল তা হ'লে"—বলিয়া নিজ জুতা অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি নয়নপথের অন্তরাল হইলে তিনকড়ি রাজেন্দ্রকে বলিল,—"লোকটি বেশ্ অমায়িক—না ?"

রাজেন্দ্র কাষ্ঠহাস্যের সহিত বলিল, "হ্যাঁ।"

"মাসিকপত্রে লেখা ছাপান সম্বন্ধে উনি যা বল্লেন্—সেটা কিন্তু খুব্ ঠিক্ ব'লে মনে হয়। অল্পসময়ের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত লেখাটা ছড়িয়ে পড়ে।"

রাজেন্দ্র অন্যদিকে চাহিয়া বলিল,—"হ্যাঁ।"

"দেখ ভাই—আমরা আগে যা মনে কর্‌তাম—মাসিক-পত্র সম্পাদকেরা কাব্যবিচার সম্বন্ধে এক একটি আস্ত গরু —তা কিন্তু নয়। কি বল ?"

রাজেন্দ্র শুধু বলিল,—"হুঁ।"

"আর্য্যাশক্তি খানা আজ্‌কাল্ বেশ্ নাম ক'রে নিয়েছে। আর ঠিক্ পয়লা তারিখে বেরোয়—এইটেই ওর খুব্ বাহাদুরী—নয় ?"

রাজেন্দ্র কষ্টে স্বষ্টে বলিল,—"হ্যাঁ।"

এমন সময় শব্দ শুনা গেল—"কায়স্থ মশায়েরা—বৈদ্য মশায়েরা অনুগ্রহ ক'রে গা তুলুন্।"

রাজেন্দ্র ও তিনকড়ি তখন "গা তুলিয়া"—সকলের সঙ্গে ভোজন স্থান-অভিমুখে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মেঘোদয়

দুইজনের বন্ধুত্বের নির্ম্মল আকাশে এইরূপে একটুখানি মেঘের সঞ্চার হইল।

তিনকড়ি বুঝিতে পারিল,—রাজেন্দ্রের মনে একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ্যে কোনও কথা হইল না, তিনকড়ি মনে মনেই বলিল,—"এ ত বড় জুলুম! আমার লেখা যদি লোকে ভাল বলে—তাহাতে উহার এত অসন্তোষ কেন ?—উহার লেখা যদি পাঁচ জনে ভাল বলে, তাহাতে আমার ত আহ্লাদই হইবে।"

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনকড়ি যেমন রাজেন্দ্রের বাড়ীতে যাইত—সেই রূপই যাইতে লাগিল।—যেমন গল্প গুজব চলিত,—সেইরূপই চলিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি—পূর্ব্বের মত সেরূপ প্রাণ-খোলা হাসি-কথা আর যেন দুই-জনে হয় না!

তিনকড়ি মনে মনে আশা করিতে লাগিল—যদি আর্য্যাশক্তিতে দুইজনের পুস্তকেরই অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে রাজেন্দ্রের মনে আর কোনও দুঃখ থাকিবে না—মেঘ কাটিয়া যাইবে। সেও ত আর বিলম্ব নাই; আজ বাঙ্গলা মাসের ২৮এ—আর তিনটি দিন মাত্র অপেক্ষা।

২রা তারিখে বেলা ৯টার ডাকে আর্য্যাশক্তি আসিল,

মোড়ক খুলিয়া তিনকড়ি দেখিল সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শেষের দিকে তাহার একটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে, গুঞ্জরণের প্রায় এক কলম-ব্যাপী সমালোচনা রহিয়াছে—আর 'প্রসূনাঞ্জলি'র সমালোচনায় কেবলমাত্র লেখা—"এই 'প্রসূন' গুলির না আছে রূপ, না আছে গন্ধ।"

পড়িয়া তিনকড়ি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

ভাবিতে লাগিল,—"ইহা দেখিয়া রাজেন্দ্র একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িবে। তাহার যেরূপ মনের গতি—সেত আমাকে কিছুতেই আর ক্ষমা করিতে পারিবে না। একি হইল! ইহা অপেক্ষা, যদি উভয়ের পুস্তকেরই প্রতিকূল সমালোচনা বাহির হইত, সে যে ছিল ভাল!"

গুঞ্জরণের সমালোচনাটি তিনকড়ি দ্বিতীয়বার পাঠ করিল। বিবাহ-সভায় সম্পাদক-মহাশয় মৌখিক যে প্রশংসা-বাক্য কহিয়াছিলেন—লেখায় তাহার অনেক অধিক রহিয়াছে। কএকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া ভাবের সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। সমালোচনাটি পড়িতে পড়িতে তাহার অঙ্গে যেন মধু-বৃষ্টি হইতে লাগিল—কিন্তু সে যেন কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত-অঙ্গে মধু-বৃষ্টি।

পত্রিকাখানি হাতে করিয়া, মোহাবিষ্ট নয়নে তিনকড়ি ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে অতীত হইলে তাহার স্ত্রী আসিয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"হাঁগা—এখনও স্নান কর্‌লে না, আপিসের বেলা হ'ল যে।"

সে শব্দে চকিত হইয়া তিনকড়ি বলিল,—"অ্যাঁ—কি ব'ল্‌ছ?"

কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়া কিরণ বলিলেন,—"ব'সে ব'সে কি ভাবা হ'চ্ছিল?—হাতে ওখানা কি?"

"আর্য্যশক্তি।"

"এসেছে?—সমালোচনা আছে?—দেখি দেখি"—বলিয়া তিনি কাগজখানি স্বামীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন।

"দেখ।"—বলিয়া তিনকড়ি স্নান করিতে গেল।

তিনকড়ি আহারে বসিলে, পাখার বাতাস করিতে করিতে কিরণ বলিলেন,—"তা এতে রাগ কর্‌লে চল্‌বে কেন বাবু?—ও সমালোচনা তুমি ত আর লেখনি। তা'দের যে বইখানা ভাল লেগেছে—সেখানা তা'রা ভাল ব'লেছে, যেখানা মন্দ লেগেছে, সেখানা মন্দ ব'লেছে। এতে, তোমার দোষ কি?"

তিনকড়ি বিষণ্ণভাবে বলিল,—"সে কথা সে যদি বুঝ্‌বে তাহ'লে আর ভাবনা কি ছিল?"

আপিসে সারাটা দিন তিনকড়ির মনটা খরাপ হইয়া রহিল। সন্ধ্যাবেলা রাজেন্দ্রের নিকট যাইয়া কেমন করিয়া সে দাঁড়াইবে—কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিব? মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, বলিবে—"মাসিকপত্রের সম্পাদকগণ কাব্যবিচারে যে সম্পূর্ণ অসমর্থ—এই দুইটি সমালোচনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর, উহাদের অনুকূল বা প্রতিকূল সমালোচনায় কিছুই যায় আসে না। ভালজিনিসের আদর সর্ব্বসাধারণে করিবেই করিবে—মাসিকের সমালোচনায় তাহারা কখনই ভুলিবে না।—ইত্যাদি ইত্যাদি।"—কিছুতেই কিন্তু তিনকড়ি মনে উৎসাহ পাইল না।—কথায় চিঁড়া ভিজিবার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া, হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া, কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনকড়ি ধীরে ধীরে রাজেন্দ্রের বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইল।

পৌঁছিয়া দ্বারবানের নিকট শুনিল, বাবু আজ দুইটার 'প্যাসেঞ্জার' গাড়িতে সুন্দরগঞ্জে তাঁহার জমিদারীতে চলিয়া গিয়াছেন।—কবে ফিরিবেন, কিছুই বলিয়া যান নাই।

তিনকড়ি, বন্ধুর এই সহসা-অন্তর্দ্ধানের কারণ বুঝিল,—বুঝিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া চুপ করিয়া শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।

স্ত্রী নিকটে আসিলে বলিল,—রাত্রে সে কিছুই খাইবে না—তাহার মাথাটা বড় ধরিয়াছে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অভিভাষণ *

স্বাগত!—হে সাহিত্যরসিক সুধিমণ্ডলী স্বাগত!

আজ 'সাহিত্য-সম্মিলন' আমাকে আপনাদের ন্যায় কৃতী, গুণগ্রাহী, সজ্জনগণকে আদর করিয়া ঘরে আনিবার ভার দিয়াছেন।—আমি সেই আদেশ মাথায় তুলিয়া লইয়া অতি সঙ্কোচের সহিত আপনাদিগকে এই সারস্বত-ক্ষেত্রে সাদরে ডাকিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। আমি অকিঞ্চন—সুতরাং সঙ্কোচ আমার পক্ষে স্বাভাবিক। যেমন বিদ্যাবিভব থাকিলে,—যেরূপ বাক্‌পটুতার অধিকারী হইলে,—আপনাদিগকে ডাকিতে পারা যায়, তাহা আমার নাই। তবু, 'সম্মিলন' কৃপা করিয়া আমাকে এ অধিকার ও অবকাশ দিয়াছেন, বলিয়া একদিকে যেমন আমার ক্ষুদ্র হৃদয় শ্লাঘা ও গৌরবে ভরিয়া উঠিতেছে—তেমনই, অন্যদিকে আমার নিজের দুর্ব্বলতা ও দৈন্য স্মরণ করিয়া, আমি কুণ্ঠিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু যখন মনে পড়িতেছে, আমাদের আশা এক,—আমাদের ভাষা এক,—আমাদের সাধনা এক,—আমাদের পণ ও লক্ষ্য এক;—যেখানে দাঁড়াইয়া আজ আমি আপনাদিগকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিতেছি, সেস্থান ভক্ত ও ভাবুক, কর্ম্মী ও প্রেমিক, কাঙ্গালের সাধনার পুণ্য-তীর্থ,—সাহিত্যসিদ্ধির শোভাশালী শেফালিকুঞ্জ,—পরদুঃখ-মোচনের অশ্রুসিক্ত পবিত্রপীঠ,—তখনই মনে হইতেছে,—

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ভয়?"

মা যখন আমাদিগকে তাঁহার পদ্মহস্তে প্রীতি ও অনুরাগের সোণার বাঁধনে বাঁধিয়াছেন, তখন আমি নিজে অকৃতী হই, অধম হই, আপনাদিগকে ডাকিবার অধিকার আমার আছে। তাই ডাকিতেছি—"এস, এস মায়ের বড় আদরের, বড় গৌরবের সন্তানগণ, মায়ের ঘরে এস!"—আপনাদের শুভসমাগমে, আপনাদের প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতির সহস্র ধারায় সাহিত্যসম্মিলন সফল ও সার্থক হউক!—সাহিত্য সম্মিলনের

কুমারখালি সাহিত্য-সম্মিলন।

* নদীয়া কুমারখালীর সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম বার্ষিক উৎসবে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত।

উৎসাহী, অধ্যবসায়ী উদ্যোগিবর্গ কৃতার্থ হউন!—আপনাদিগকে আদরের মত আদর করি, তেমন সম্বল আমাদের কোথায়?—তবু, এই বুকভরা আশা ও কাঙ্গালের পুণ্যস্মৃতি-মাত্র সম্বল করিয়া, আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি!—আপনারা আমাদের এই দীনা পল্লীলক্ষ্মীর অশ্রুসিক্ত, মমতাস্নিগ্ধ, শ্যামশষ্পপূর্ণ, চেলাঞ্চলখণ্ডে উপবেশন করুন!—আমরা যে সামান্য অর্ঘ্য সাজাইয়াছি, তাহাই লইয়া জননী বাণীর পূজায় অগ্রসর হউন!

আমি দেবী সরস্বতীর একজন ক্ষুদ্র নগণ্য সেবক। তাই, হয়ত আপনারা এই উপলক্ষে, আমার কাছে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে একটা কথা শুনিবার আশা করিয়াছেন। কিন্তু ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না; বড় কথা বলিতেও আমি কোন দিন শিখি নাই! সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি ও পুষ্টির কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈন্য ও তুষ্টির কথা, আমি তুলিব না।—তবে একটা কথা আমার বলিবার আছে। কথাটা এই,—বাঙ্গালাভাষা তাহার বহু ভক্ত সেবকের সেবায় ও সাধনায় ঐশ্বর্য্যময়ী, গৌরবময়ী হইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালাভাষা যে ভাবনায় ও ভাবে, রসে ও রসিকতায়, ধ্যানে ও ধারণায়, সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালা হওয়া উচিত, ইহা ভুলিলে চলিবে না। পরিতাপের বিষয়, সে কথাটা আজি কালি বাঙ্গালাভাষার সেবকদিগের মধ্যে অনেকেই ভুলিয়া যাইতেছেন। স্বীকার করি, বাঙ্গালায় এখনও অনুবাদের যুগ চলিতেছে; এখনও বিদেশের সাহিত্যতীর্থ সমূহ হইতে মায়ের পূজার জন্য কুসুমসম্ভার আহরণ করিতে হইবে, ডালি সাজাইতে হইবে। কিন্তু সেই কুসুমরাজি যাহাতে মায়ের অর্চ্চনার যোগ্য হয়, সেই জন্য বাঙ্গালার ভাব-গঙ্গোদকে সেগুলিকে ধুইয়া মুছিয়া, আন্তরিকতার স্রক্‌চন্দনে পরিলিপ্ত করিয়া, অর্চ্চনার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালাভাষার যাঁহারা নবীন সাধক, তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী হইতে পারেন, নিপুণ হইতে পারেন; কিন্তু প্রায়শঃ দেখিতে পাই, তাঁহারা এদিকে দৃষ্টি রাখেন না। তাঁহাদের রচনা, ভাবে ও ভঙ্গিতে, যাহাতে ইংরেজি হইয়া উঠে, শান্তিপুরের মিহি শাড়ীর নীচে যাহাতে কলালক্ষ্মীর সেমিজ পরিদৃষ্ট হয়, সেই চেষ্টাই তাঁহারা করিয়া থাকেন। মনে রাখা উচিত, বাঙ্গালা শব্দ সাজাইয়া ইংরেজি ভাব ভাষার ভিতর আমদানি করিলেই তাহা বাঙ্গালা হয় না; খাঁটী বাঙ্গালীর কাছে তাহা হৃদ্য হয় না। ইংরেজি খানা সান্‌কিতেই শোভা পাইতে পারে, টেবিলে বসিয়া তাহার রসাস্বাদন করা চলে; কিন্তু আমাদের মায়ের অঙ্গনে প্রকাণ্ড পংক্তিভোজে শুদ্ধ ও সুন্দর কলার পাতে উহা নিতান্ত অশোভন ও অমেধ্য। আমাদের, বড়ই স্নেহ ও প্রীতির পাত্র, নূতন-লেখকগণের মধ্যে অনেকে এই কথাটা বুঝিতেছেন না বলিয়া, তাঁহাদের লেখায় অনেক সময় ভাবের কুজ্ঝটিকা ও ভাষার ব্যাসকূট দেখিতে পাই। সকল দেশেই, সকল সমাজেই, মানুষের হৃদয় ও চিত্তবৃত্তি একই প্রকার; ভিন্নতা কেবল সেই হৃদয়বৃত্তি ও ভাবের অভিব্যঞ্জনার পদ্ধতিতে। ভাবৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধা বাঙ্গালার বাঙ্গালী কবির,—

"বলি বলি আর বলা হ'লনা।
সরমে মরম কথা কহা গেলনা॥"

"সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,—
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমি রইল পতিত, আবাদ কর্‌লে
ফল্‌ত সোণা॥"

"আমি কর্‌ব এ রাখালী কতকাল;
পালের ছটা গরু ছুটে করছে আমায় হাল্‌বেহাল্।"

প্রভৃতি গানে যে ভাবের, যে রসের, যে আবেগের, অনাবিল, শান্ত, শুদ্ধ, প্রবাহ—কখনও অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায়—কখনও বেগবতী ভোগবতীর ন্যায় স্বতঃপ্রবাহিত হইতেছে, সেই রস,—সেই ভাব,—সেই প্রাণভরা আবেগ—য়ুরোপের সাহিত্য-সাধকদিগের কবিতা ও গানে নাই, বা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—এমন কথা বলিলে, বোধ হয়, সত্যের অপলাপ করা হইবে না। যদি তেমন বিদ্যা থাকিত, তাহা হইলে আজ উদাহরণ দিয়া এই কথার যাথার্থ্য আপনাদিগকে দেখাইয়া দিতাম। সে যাহা হউক, এখন কথা এই, ভাষার পুষ্টির জন্য পাশ্চাত্য মনীষিদিগের রচনা হইতে ভাবের আমদানী করিতে হইবে, রসের প্রবাহ বহাইতে হইবে, কিন্তু তাহা বাঙ্গালাভাষার পদ্ধতির সহিত মিল রাখিয়াই করিতে হইবে।—এ বিষয়ে উপেক্ষা প্রকাশ করিলে বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে না; বাঙ্গালাভাষার আবরণে ভাষাটা ষোল আনা বিদেশী হইয়া যাইবে! উহা ইংরেজি-

ওয়ালাদিগের নিকট আদর পাইলেও ইংরেজি-অনভিজ্ঞ রসগ্রাহী ও ভাবুকদিগের নিকট আদরের বস্তু হইবে না।

আর একটী কথা আছে।—অনুবাদ করিতে হইলেই যে, নির্ব্বিচারে যাহা তাহা অনুবাদ করিয়া মাতৃ অঙ্কে নিক্ষিপ্ত করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। য়ুরোপের দর্শন, য়ুরোপের বিজ্ঞান, য়ুরোপের কাব্য, য়ুরোপের মনীষিগণের জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নসকল অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি কর; কিন্তু য়ুরোপীয় সাহিত্যের আবর্জ্জনা-রাশি অনূদিত হইবে কেন?—বর্ত্তমান সময়ে বিলাতী গল্প ও ডিটেক্টিভ উপন্যাস সমূহের অবাধ অনুবাদের দিকে লক্ষ্য করিয়াই অতীব দুঃখের সহিত একথা বলিলাম।

বাঙ্গালা-ভাষাকে যথার্থরূপে চিনিতে ও জানিতে হইলে, বাঙ্গালার প্রাণের কথা প্রাণ ভরিয়া বুঝিবার প্রকৃত ক্ষেত্র বিলাস-বিভ্রমময়ী কৃত্রিম প্রসাধন-পারিপাট্যশালিনী নগরী নহে—তাহা বাঙ্গালার শ্যামশোভাময়ী পল্লীই। বাঙ্গালার ধূলায় যাহারা লুটাইতেছে, বাঙ্গালার বিষণ্ণ ও নিরানন্দময়ী পল্লীতে যাহারা এখনও বাঙ্গালার অতীত উৎসবানন্দের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে, বাঙ্গালার ত্যাগের আদর্শকে এখনও আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে, বাঙ্গালার নদীর বুকে, ধানের ক্ষেতে এখনও ভাবের ও আনন্দের ধারা প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ছড়াইয়া দিতেছে, যাহাদের প্রাণে বাঙ্গালার চেতনা ও বেদনা এখনও নিত্য অনুভূত ও অনুস্মৃত হইতেছে, তাহাদের সহিত মিলিলে মিশিলে, তাহাদের ঘরের খবর লইলে খাঁটি বাঙ্গালার খাঁটি জিনিষের স্বাদ পাওয়া যায়, খাঁটি বাঙ্গালীর হৃদয়

কুমারখালী সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতি।

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের কবিতা ও গান ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত পড়িতে ও বুঝিতে হয়;—বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব কিসে তাহা ভাবিতে ও জানিতে হয়।—বাঙ্গালীর ধর্ম্মকথা ও মর্ম্মকথার আলোচনা ও অনুশীলন করিতে হয়। আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার ফলে যেটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালীকে ষোল-আনা চিনিবার, দেখা যায়; বাঙ্গালার যথার্থ ভাবের রাজ্য সোণার বাঙ্গালার মূর্ত্তি নয়ন-সমক্ষে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। ইহাই আমাদের সম্মিলনের সাধনা!—সেই সাধনা ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার জন্য সম্মিলনের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

এইবার আমার কথা পরিত্যাগ করিয়া কবি দ্বিজেন্দ্র-

লালের ভাষায় মায়ের নাম করিয়া আমার এই অভিভাষণের উপসংহার করিতেছি ! কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যাহা বলিয়াছেন, এই বৃদ্ধ-বয়সে—এই বৈতরণীর খেয়াঘাটে দাঁড়াইয়া আমিও তাহার পুনরুক্তি করিতেছি—

"আজি গো তোমার চরণে জননি !
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান—
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত
শতেক ভক্ত দীনের গান।
মন্দির রচি' মা তোমারি লাগি'—
পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি',
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি,
স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান।
জননী বঙ্গভাষা ! এ জীবনে
চাহিনা অর্থ, চাহিনা মান ;
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টী
অমল কমল চরণে স্থান ॥
জানো কি জননি, জানো কি, কত যে
আমাদের এই কঠিন ব্রত !
(—হায় মা ! যাহারা তোমার ভকত,
নিঃস্ব কি গো মা, তারাই যত)
তবু সে লজ্জা, তবু সে দৈন্য,
সহেছি মা সুখে তোমার জন্য,
তাই দুহস্তে তুলিয়া মস্তে,
ধ'রেছি—যেন সে মহৎ মান !
নয়নে বহেছে নয়নের ধারা,
জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায়,
পাইয়া তোমার বচন-সুধা ;
মরুভূমে সম—যখন তৃষায়
আমাদের মাগো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা
তোমার হাসিটি করিয়া পান !
পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই,
তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি' ;
বাসনা,—তাহাই গুছায়ে যতনে
সাজাব তোমার চরণ দুটি ;
চাহিনা ক কিছু, তুমি মা আমার,
এই জানি,—কিছু নাহি জানি আর ;
—তুমি গো জননি ! হৃদয় আমার ;
তুমি গো জননি ! আমার প্রাণ !"

ইহাই আমার বক্তব্য—ইহাই আমার কথা। ইহার অধিক আমার কিছু বলিবার নাই—ইহার অধিক আমি কিছু বলিতেও পারিব না। তবু আজ আপনাদিগকে দেখিয়া, আপনাদিগকে পাইয়া, আপনাদিগের সঙ্গ ও সাহচর্য্য-সুখ লাভ করিয়া, যেন ছন্দোময়ী ভাষা আমার বক্ষপঞ্জর-কবাটভেদ করিয়া উৎসারিত হইতে চাহিতেছে—যেন আমার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

"আমার জননীর শ্যামল অঞ্চলে
ব'স গো, তোমরা ব'স গো !
যদিও আমার দীনা জননি,
তোমরা সকলে বিদ্বান্ ও জ্ঞানী,
তবুও আমার কাঙ্গালিনী মায়ের,
ছিন্ন-অঞ্চলে ব'স গো !
ওগো তোমরা সকলে ব'স গো !"

শ্রীজলধর সেন।

বঙ্গ-রমণী

বসন্ত—একতালা।

চিরজীব সুখিনী বঙ্গ-রমণী! রমণীকুল-প্রবরা রে!
সুস্মিতা, সুধাধার-মধুরা, কোকিল-মৃদুস্বরা রে!
দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা, বিনত-ভুবন বিজয়ী-নয়না,
ধীরা, মলয়-ধীর-গমনা, স্নেহসিক্ত মধুর-বচনা,
নিবিড়-কেশী, মুক্তা-দশনা, রক্তকমলাধরা রে!

দেবী! গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পুণ্যবতী রে!
সাবিত্রী-সীতানুধ্যায়িনী, বিশ্বপূজ্যা সতী রে!
পতিপ্রিয়া, পতিভকতা সখী পতিসহ পরিহাসে,
দুঃখে দীনা, দাসী, প্রেমিকা, নীরবা নিঠুর-ভাষে,
পীড়নে প্রিয়বাদিনী, সহিষ্ণু সমা এ ধরা রে!

কে বলে কাল' রূপ নয়, যে হেরেছে নীলাম্বুরাশি!
ধবল-তুহিনে চাহে কে মূঢ় মণ্ডিতে বসন্ত-হাসি!
জীব-প্রেম-ভরিত-হৃদয়া, মেঘ-স্নিগ্ধ-শ্যামকায়া,
নিন্দি-তুহিন শুভ্রচরিতে! বঙ্গ-জ্যোৎস্না, বঙ্গজায়া!
কালনয়নে, কালচিকুরে, কালরূপে অমরা রে!

—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্বরলিপি

কথা ও সুর—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়] [স্বরলিপি—শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

| ধ | নর্স — র্সর্সর্র্ র্র্সন ধঙ্ক্ষ-ধ ম--ম--গ--মম মধ নর্স র্সন — |—
| চির | জী-ব সু খি--নী-ব--ঙ্গ র ম ণী র ম ণী-কুল প্রব রা--- -রে — |—

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

ম----গ মধ নর্স --র্স-- র্স-র্গ র্র্স-নর্স র্র- র্সন ন — —
স্থ স্মিতা সুধা ধা--- -রমধুর কো-কি লমৃদু স্বরা ---- -রে — আ

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

ধ--ন--র্স------ ন--ধ--ধনন ন--
দি-বা গঠনা ল-জ্জা ভরণা বিনত ভুবন বিজয়ী নয়না
প তি - প্রিয়া- প-তি ভকতা সখীপ তি সহ প বি হা --সে
জা-ব প্রে-ম ভ বি ত হৃদয়া মে-ঘ স্নি-গ্ধ শ্যা-ম কা-য়া

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

ম-----গ মধনর্স র্স--ম-----গ গমগ গর্র-স
ধী-রা মলয় ধী--র গমনা স্নে-হ সি-ক্ত মধুর বচ-না
দুঃ-খে দী না দা- সী প্রেমিকা নীরবা নিঠুর ভা------ষে
নি-ন্দি তুহিন শু--ভ্র চরিতে ব-ঙ্গ জ্যোৎস্না ব-ঙ্গ জা--য়া

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

ম---গ- মধনর্স র্স-- র্স-র্গ র্র র্স- নর্স র্র- র্সন ন--
নিবিড় কে-শী মু-ক্তা দশনা র-ক্ত কমলা ধরা------রে- আ
পী ড় নে প্রিয় বা--দি নী-- সহিষ্ণু সমা এ ধরা------রে- ”
কা-ল নয়নে কা- ল চিকুরে কা-ল রূপে অমরা------রে- ”

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

স-ম --- --- ম-গ গমম ম-গ গর্রস ---
দে-বী -গৃহ ল-ক্ষ্মী ব-ঙ্গ গরিমা পু-ণ্য বতীরে ---
কে-ব লে কাল রূ-প নয় যে হেরেছে নীলাম্বু রা-শি ---

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

ম---গ মধনর্স র্স--র্সন-ন-ধ ধনর্সন ---
সা-বি-ত্রী সী তা---মু ধাময়িনী বি-শ্ব পূ-জ্যা সতী-রে ---
ধবল তুহিনে চা--হে কে মৃঢ় ম-ণ্ডিতে বস -ন্ত- - হা-সি

উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন ´ রেফ ; কোমলের উপরে ৰ ; কড়ি মধ্যমের ক্ষ। আ-আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

পুস্তক-পরিচয়

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(মূল্য দেড় টাকা মাত্র)

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর-প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় 'রসায়ন-সূত্র' 'ফলিত রসায়ন' 'জল' 'বায়ু' 'খাদ্য' প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, 'শারীর স্বাস্থ্য-বিধান' লিখিয়া সেই খ্যাতি আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। কলিকাতা সহরে বা বাঙ্গালাদেশে অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক আছেন, অনেক শারীর-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আছেন, কিন্তু দুই একজন ব্যতীত আর কেহই তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও গবেষণার ফল জন-সাধারণের হিতার্থে লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত করেন নাই। এই পুস্তকে যে সমস্ত প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইতঃপূর্ব্বে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ বসু মহাশয় সেগুলিকে সংগ্রহ-পূর্ব্বক পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া বড়ই ভাল কাজ করিয়াছেন। এই পুস্তকে প্রাতরুত্থান, স্নান, মুখ-প্রক্ষালন, আহার, পানীয়, মুখশুদ্ধি ও ধূম-পান, কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম, বিশ্রাম ও নিদ্রা, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, সংক্রামক রোগ-নিবারণের ব্যবস্থা এবং সংযম এই কএকটি বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে; শরীরের স্বাস্থ্যবিধানের জন্য এই সমস্ত বিষয়ের নিয়মগুলি পালন করিলেই যথেষ্ট। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য, কোন প্রকার গভীর গবেষণা দ্বারা কোন প্রস্তাব ভারাক্রান্ত করা হয় নাই। যাহারা সামান্য লেখাপড়া জানে, তাহারাও এই পুস্তক পড়িয়া ভাব-গ্রহণ করিতে পারে। শ্রীযুক্ত চুণীলাল বাবুর অন্যান্য পুস্তক যে প্রকার আগ্রহের সহিত পঠিত হইয়া থাকে, আমাদের বিশ্বাস এই পুস্তকখানি ততোধিক আগ্রহ-সহকারে পঠিত হইবে।—এই পুস্তকখানি কি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীতে পরিগৃহীত হইতে পারে না?

মাল্য ও নির্ম্মাল্য

(মূল্য দেড় টাকা মাত্র)

শ্রীমতী কামিনী রায়-প্রণীত।

'আলো ও ছায়া' প্রণেত্রী-প্রণীত। যে বিদুষী মহিলা 'আলো ও ছায়া' লিখিয়া বহুদিন পূর্ব্বে যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন, তিনিই এতকাল পরে 'নির্ম্মাল্যের সহিত মাল্যে'র সমন্বয় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। 'আলো ও ছায়া'র পর, 'মাল্য ও নির্ম্মাল্য'ই ঠিক হইয়াছে। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা মহোদয়ার কবিতাগুলি অতি উচ্চশ্রেণীর, প্রত্যেক কবিতার মধ্যেই পবিত্রতা—স্নেহ—দয়া—প্রেম মূর্ত্তিমতী হইয়া রহিয়াছে। 'মাল্য ও নির্ম্মাল্যে' যতগুলি কবিতা আছে, তাহার সবগুলিই সুন্দর। আমরা নিম্নে একটি কবিতার এক অংশ তুলিয়া দিতেছি, তাহা হইতেই লেখিকার প্রতিভার ও হৃদয়ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে;—

"লক্ষ ঢেউ আসি পড়িছে বেলায়,
কোন্ মায়াবিনী তা' লয়ে খেলায়,
কোথা হতে উঠি, কোথা ফিরে যায়,
কাহার অমোঘ বাণীতে?—
তাহারে হইবে জানিতে।"

এ প্রকার কবিতা 'মাল্য ও নির্ম্মাল্যে'র অনেক স্থলেই আছে।

বড়দিদি

(মূল্য আট আনা)

উপন্যাস—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত।

এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি ১৩১৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকার পৃথক্ দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদিন পরে প্রকাশক ফণীবাবু, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছেন। এমন সুন্দর উপন্যাসখানিকে মাসিক-পত্রিকায় পৃষ্ঠায় আবদ্ধ রাখা লেখক মহাশয়ের কিছুতেই উচিত হইত না। আমাদের মনে আছে, 'ভারতী'-পত্রিকায় যখন এই গল্পটি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন নবীন লেখকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হইয়াছিলেন। সে সময়ে অনেকেই নামটি কল্পিত, এবং আমাদের দেশের কোনও শক্তিশালী ও প্রতিভাসম্পন্ন লেখককে এই উপন্যাসের প্রণেতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পরে যখন শরৎ বাবুর অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইল, তখন সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এতদিন পরে সেই 'বড়দিদি' উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। 'সুরেন্দ্র' মানুষটিকে তিনি এমন সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন যে, তাহার কোন স্থানে অস্বাভাবিকতার লেশমাত্রও নাই,—সম্পূর্ণ চিত্রখানি বেশ উজ্জ্বল হইয়া আমাদের নয়নরঞ্জন করে। আর 'বড়দিদি' সত্য সত্যই বড়দিদি! যাঁহাদের গৃহে এই প্রকার হিতব্রতে উৎসর্গীকৃত-জীবন, আত্মপরভেদবুদ্ধিহীনা, কল্পতরুর মত, বালবিধবা বড়দিদি আছেন, তাঁহারাই এ চরিত্রের মহিমা বুঝিতে পারিবেন। তাই বড়দিদি 'মাধবী' যখন বৃদ্ধ পিতার নিকট কাশী যাওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন, তখন বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, "তা যাও—কিন্তু মা, সংসার চল্‌বে না!" মাধবী উত্তর করিলেন, "আমি ছাড়া সংসার চল্‌বে না?" বৃদ্ধ বলিলেন, "চল্‌বে না কেন মা,—চল্‌বে। হাল ভাঙ্গিয়া গেলে স্রোতের মুখে নৌকাখানা যেমন ক'রে চলে—এও তেমনি চল্‌বে!" সংসার সকলেরই চলে; কিন্তু বড়দিদির হাতে যেমন চলে, তেমন করিয়া চলে না। তাহার পর বিষয়বুদ্ধিহীন যুবক জমিদারকে লইয়া দেওয়ান (ম্যানেজার) ও কর্ম্মচারিবর্গ যে খেলা প্রায়ই খেলিয়া থাকেন, তাহারও

সুন্দর ছবি এই উপন্যাসে আছে ; 'মথুরাবাবু'র মত অনেক ম্যানেজার ছিলেন, এখনও আছেন। সুরেন্দ্রের স্ত্রীর মধ্যে অনন্যসাধারণ কিছুই নাই ; ঘরসংসারে—গৃহস্থালীতে সর্ব্বদা যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের লইয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ গৃহস্থ ঘরকন্না করিয়া থাকেন, 'শান্তি' তাহাদেরই মত একজন। এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানিতে শরৎ বাবু যে কয়টি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সকলগুলিতেই তাঁহার বাহাদুরী প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্যে কিছুদিন শরৎ বাবুর লেখনী একেবারে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিল ; এখন তিনি আবার নবোৎসাহে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি যে একজন শক্তিশালী লেখক,—বাঙ্গালা পাঠকগণ এখন তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইতেছেন। 'বড়দিদি'তেই আমরা শরৎ বাবুর সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাই এতদিন পরে সেই পুস্তকখানি পাইয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি !—শরৎ বাবু সুস্থশরীরে—সংযত-হৃদয়ে—প্রাচ্য আদর্শ অব্যাহত রাখিয়া—একনিষ্ঠভাবে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি-বিধানে ব্রতী থাকুন—ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা !

সাগর-সঙ্গীত

(মূল্য কাপড়ে বাঁধা আড়াই টাকা)

গান সকলেই গায়,—যাহার গলায় সুর আছে, যাহার তালমান-জ্ঞান আছে সেও গান গায়,—আবার যে তালমানের ধার-ধারে না, সেও গান গায়। যে গাহিতে জানে সে ত গাহিবেই, যে জানে না সেও প্রাণের আবেগে—সুখের উল্লাসে—দুঃখের যন্ত্রণায়—হৃদয়ের ভার লঘু করিবার জন্য গান গায়। তবে, কেহ গাহিতে-হয় বলিয়া গায়—রচনা-পাইয়াছে বলিয়া গায় ;—আর কেহ বা না-গাহিয়া থাকিতে পারে না ! তাহার হৃদয়ে যখন পুলকের সঞ্চার হয়—বা সে যখন গভীর বেদনায় কাতর হয়—অথবা সে যখন বিশ্বময় তাহার বাঞ্ছিতকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তখন সে প্রাণখুলিয়া গায়। কেহ শুনুক আর না-শুনুক,—সে গানে তালমান থাকুক আর না থাকুক, সে তখন গাহিয়া যায়—সে তখন আপন মনে গাহিয়া যায়। সে গান, যন্ত্রের অপেক্ষা রাখে না,—শ্রোতার ধার ধারে না। কবিবর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় এই শেষোক্ত শ্রেণীর গায়ক।—তাঁহার গানগুলি 'সাগর-সঙ্গীত' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সমুদ্র দেখিয়া অনেক কবি—অনেক ভক্ত—অনেকবার অনেক গান গাহিয়াছেন। কবি কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুকবি পর্য্যন্ত সিন্ধু-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ দেখিয়া কত দেশের সাধক—কত প্রেমিক—তন্ময় হইয়াছেন, কত জনের প্রাণে কত ভাবের উদয় হইয়াছে ! পৃথিবীর সাহিত্যে কত সাগর-সঙ্গীত-অমর হইয়া রহিয়াছে। 'মালঞ্চের' কবি চিত্তরঞ্জনও সাগর-সঙ্গীত লিখিয়াছেন।—অভিব্যক্তিবাদ যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে 'মালঞ্চের' পর 'সাগর-সঙ্গীত'ই আসিতে পারে।—সে কথা বলিতে গেলে, অনেক কথা কহিতে হয়—অনেক কথার অবতারণা করিতে হয়।—সে সকল এখন থাকু।

সাধক-প্রবর কাঙ্গাল হরিনাথ একদিন গাহিয়াছিলেন—

'সাগরে আছে রতন মনের মতন,
সাধক বিনে তা মিলে না ;
ওরে মন, ডুবে জলে গিয়ে তলে,
পরশ-পাথর তুলে নে না।'

কবি চিত্তরঞ্জন কোন এক শুভমুহূর্ত্তে সাগরতলের মনের মতন রতনের সন্ধান পাইয়াছিলেন ; তাহার পর সাধনবলে জলে ডুবিয়া—একেবারে তলে গিয়া—পরশ-পাথর তুলিয়া আনিয়াছেন। 'সাগর-সঙ্গীতে' সেই পরশ-পাথরের স্পর্শ আছে। কৃপণ কবি পাথরখানি কাহাকেও দেখান নাই, তাহা অতি সংগোপনে হৃদয়ের মণিমন্দিরে রাখিয়াছেন। সে ঠাকুরঘরে কাহাকেও বুঝি প্রবেশ-অধিকারও দেন না ; সুধুই বলেন—

'ও মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ দেখে না রে।'

সেই মন্দিরে নিভৃতে তিনি যে সকল পুষ্পে ইষ্ট-দেবতার আরাধনা করেন,—পরশ-পাথরের পূজা করেন,—তাহারই দুই একটি পুষ্প—দেবতার নির্মাল্য—বাহিরে লইয়া আসেন। সেই নির্মাল্যে এই সাগর-সঙ্গীত গ্রথিত হইয়াছে—সাগর-সঙ্গীত পড়িয়া এই কথাই আমরা বুঝিয়াছি ;—কবিকে এইটুকুই চিনিতে পারিয়াছি।

কেমন করিয়া চিনিয়াছি, তাহারই একটু আভাস দিতেছি। কবি একস্থলে বলিতেছেন—

'সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হ'য়ে ভাসে জলে,
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণতলে।
আমার বক্ষের পরে যোগাসনে যোগিবর,
নিবিড় নিশ্বাসহীন ধীর স্থির আঁখি-কর !
পেয়েছি আভাস আমি—পাইনি সন্ধান তার,
যুক্তকরে বসে আছি—কর মোরে একাকার।'

সাধন-পথে কোন্ স্থানে উপনীত হইলে মানুষ উপরিউক্ত কথা কয়টি বলিতে পারে,—কোন্ সময়ে সমস্ত প্রকৃতি 'পদ্ম'রূপে সাধকের নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়,—কোন্ সময়ে বক্ষের উপর 'যোগিবর'কে যোগাসনে উপবিষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহা যাঁহারা সেই পথে অগ্রসর হইয়াছেন,—সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন,—তাঁহারাই বলিতে পারিবেন। তাঁহারা বলিবেন, পরশ-পাথরের সন্ধান না পাইলে—তাহার স্পর্শসুখ অনুভব না করিলে—কেহ এ কথা বলিতে পারে না। সুধু জ্ঞানসর্ব্বস্ব—সাধনহীন—ব্যক্তির মুখ দিয়া এ তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না,—এ কথা বাহির হয় না।

আর একস্থলে কবি বলিতেছেন—

'আমার পরাণে আজি, কাঁপিছে কেবল
জ্যোৎস্না-তরঙ্গে শত স্মৃতি পুষ্পদল।
শত জনমের যেন হাসি অশ্রুভারে,
পরাণ উঠেছে গাহি গীত-ঝঙ্কারে।

রোমিও-জুলিয়েত

"প্রাণেশ্বরি!

—তা হ'লে এখনি নামি আমি।"—কবিবর ৺হেমচন্দ্র।

চিত্রশিল্পী···শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

[সত্বাধিকারী জমিদার···শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ শীল মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে]

৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট

সকল জনম যেন এক হ'য়ে গেছে,
একটি পুষ্পের মত স্বপ্নে ভাসিতেছে !'

ইহাও সেই একই সুরে বাঁধা, সেই একই ভাবে ভরপুর !—কবির হৃদয়ে যে গীতধ্বনি উঠিয়াছিল, মহাসমুদ্র দর্শনে তাহাই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কবি আর একস্থলে বলিতেছেন—

'সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল,
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল !
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী,
তব গীতে ওগো সিন্ধু ! দিবস-যামিনী।'

সমস্ত 'সাগর-সঙ্গীত' খানিই এই ভাবে পরিপূর্ণ ;—এই একই গান প্রত্যেক কবিতায় ধ্বনিত হইতেছে ;—কবি আত্মহারা হইয়া শুধু গাহিয়া যাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে যখন এই ভাবের মধ্যে আত্মজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছে, তখন কবি বলিতেছেন—

'জানি না কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস,
জানি না গানের সুর, তাল, লয়, মান,
আমার অন্তরতলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছায়া-ভরা আমার পরাণ !
সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলো মাঝে, সাঁজের আঁধার !'

সত্যসত্যই এই 'সাগর-সঙ্গীতে' কথার মোহ বা ভাষার বিন্যাস নাই, গানের সুর বা তান-লয়-মানের দিকেও কবির দৃষ্টি নাই। তিনি সঙ্গীতের মধ্যে সেই মহান্ দেবতার সাড়া পান, তাই তিনি গান করেন ! সুতরাং, 'সাগর-সঙ্গীতের' ভাষার বা ছন্দের দিকে যিনি চাহিবেন, যিনি শুধু বহিরাবরণ দেখিবেন,—তিনি হয় ত কত কথা বলিবেন ! কিন্তু কবি ত সে কথা বলিয়াই দিয়াছেন যে, তাঁহার সকল জ্ঞান নাই !

কবির সর্ব্বশেষ কথা—

'খুঁজেছি তোমারে কত তরঙ্গের মাঝে,
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে ;
তোমার অপূর্ব্ব ওই আলো অন্ধকারে,
প্রতিদিন দিবারাত্রি খুঁজেছি তোমারে !
হে মোর আজন্ম সখা ! কাণ্ডারী আমার !
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার !'

ইহাই কবির প্রার্থনা !—আমরা বলি, তাঁহার প্রার্থনা সফল হউক ! তাহার আজন্ম-সখা তাঁহাকে অপারে লইয়া যাউন !—আর তাঁহার 'সাগর-সঙ্গীত' পাঠ করিয়া যেন আরও দশজন সেই কাণ্ডারীকে ডেকে বলে—

"আমারেও লয়ে যাও অপারে তোমার !"

৫৬

যাত্রী

(মূল্য ৸৹)

স্বর্গীয় নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। অনন্ত পথের যাত্রী নফরচন্দ্রের অনুজেরা জ্যেষ্ঠের আটটি গল্প সংগ্রহ করিয়া 'যাত্রী' নাম দিয়া সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন ; জলধরবাবু পুস্তকের ভূমিকায় 'একটি কথা' লিখিয়াছেন। তাহার একস্থলে আছে,—"আমার মনে পড়ে, আমি যখন নফর বাবুর 'ছাত্র' গল্পটি প্রথম পড়িয়াছিলাম, তখন চক্ষের জল রাখিতে পারি নাই, তাহার পর যতবার ঐ গল্পটি পড়িয়াছি, ততবারই আমার চক্ষে জল আসিয়াছে।" বাস্তবিকই আমরাও যখন তাঁহার ঐ মর্ম্মস্পর্শী গল্পটি প্রথম পড়ি, তখন অশ্রু-সংবরণ করিতে পারি নাই। নূতন-লেখকের প্রথম-চেষ্টায় এমন সুন্দর গল্প বাহির হইতে বড় দেখা যায় না। তাঁহার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, তাহা তখনই বেশ অনুভব করি।

তারপর, ভূতপূর্ব্ব 'বাণী' পত্রিকায় যখন তাঁহার 'বৌদিদি' ও 'তেপান্তরের মাঠ' প্রকাশ করি, তখন বুঝিয়াছিলাম নফরবাবু বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারে স্থায়ী কিছু দিয়া যাইবেন। তাঁহার 'বৌদিদি' ও 'ঠাকুর দাদা'র উজ্জ্বল-চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি 'তেপান্তরের মাঠে', উপকথার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য-জীবনের যে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, শক্তিশালী লেখক, উপকথাকে আপনার প্রয়োজন মত কেমন সুন্দর করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন।—আমরা তাঁহার নিকট অনেক আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু, হায় ! নির্ম্মম কালের কঠোর বিধানে আমাদের সে আশা ফলবতী হইল কই ?—যাহা হউক, তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।—উল্লিখিত তিনটি গল্প ও 'পাগলা পকা'র করুণ কাহিনী তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। আমাদের এই উক্তিকে, গুণমুগ্ধ ভক্তের উৎকট-অত্যুক্তি বলিয়া, কেহ উপহাস করিতে পারেন—কিন্তু ইহা আমাদের প্রাণের কথা।—গল্পগুলির মধ্যে করুণরসের অলকনন্দা তরতর বেগে প্রবাহিত। পাঠ করিতে করিতে অশ্রু নয়ন বহিয়া পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের ভিতর একটা মূর্চ্ছনা জাগিয়া উঠে ! সাহিত্যের আসর হইতে যাঁহারা করুণরসকে দূর করিয়া দিতে চান, তাঁহাদিগের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন,—যেন তাঁহারা এ পুস্তক পাঠ না করেন। 'পাগলা পকা' ও 'ছাত্রের' করুণ মর্ম্ম-স্পর্শিনী কাহিনী পাষাণ-হৃদয়কেও দ্রব করিয়া দেয়। "বুড়ী"র কঠোর আচরণের ভিতর মাতৃভাবের চিত্র বড়ই মধুর। 'বৌদিদি' প্রভৃতি কএকটি গল্প (Idealistic) আদর্শমূলক। (Realism) বাস্তব-বর্ণনেও তিনি বেশ হাত দেখাইয়া গিয়াছেন। 'তেপান্তরের মাঠে' কাজের চিত্র, 'বুড়ীর' গল্পে টোলের ছাত্র ও অধ্যাপকের চিত্র সুন্দর। 'পুনরাগমন' গল্পের রামচরণদাদার চিত্র, পুরাণ-ভৃত্যের চিত্র, পুরাতন হইলেও বাস্তব-আদর্শ। পরলোকতত্ত্বের ছায়াপাতে 'পুনরাগমন'। তবে, 'মাতৃভক্ত', 'জন্মান্তর' প্রভৃতি গল্পগুলিতে কলাকৌশল অন্যান্য গল্পের মত ফুটিয়া উঠে নাই।

মাসপঞ্জী

(পৌষ)—

১লা—কার্ডিনেল রাম পোলার মৃত্যু হয়।

" —বেল্‌ভেডিয়ারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়।

২রা—"আল্‌-হদিস্‌"পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট অমৃতসরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ২০০০্ জামিন চাহেন।

৩রা—মেসার্স পোলক্‌, গান্ধী, ও কালেন্‌ব্যাক্‌কে "প্যারোলে" ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

৫ই—মাদ্রাজ-হাইকোর্টের জজ্‌ মাননীয় সুন্দর আয়ারের মৃত্যু হয়।

৭ই—সম্রাট্‌ মেনিলিকের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গেল।

৮ই—কমে দি ফ্রান্‌কের ডিরেক্টার মিঃ জুল ক্লারেটী ও বিখ্যাত ডাক্তার স্যর জে, টী, লরেন্‌সের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায়।

" —পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেসন্‌ হয়।

৯ই—করাচীতে অল ইণ্ডিয়া ভাটীয়া-কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। রাও সাহেব সম্পদ্‌ সভাপতি ছিলেন।

১০ই—করাচীতে ইণ্ডিয়ান্‌ ইন্‌ডস্‌ট্রীয়াল্‌ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। মিঃ লালু ভাইসমল দাস সভাপতি ছিলেন।

" —করাচীতে অল ইণ্ডিয়া থি-ইস্‌টীক্‌ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। রেঃ জে, টী, সণ্ডার্‌লাণ্ড সভাপতি ছিলেন।

" —কানপুরে অল ইণ্ডিয়া কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক তুলসীদাস মিশ্র সভাপতি ছিলেন।

১১ই—আগ্রায় অল ইণ্ডিয়া মেহোমেডান্‌ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। জজ সাদীন সভাপতি ছিলেন।

" —করাচীতে কংগ্রেসমহাসভার অধিবেশন হয়। নবাব সৈয়দ মামুদ সভাপতি ছিলেন।

" —বারাণসীতে থিওজফিকাল্‌ সোসাইটীর বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

" —পূর্ণিয়ায় বাবু রাসবেহারী লাল মণ্ডলের সভাপতিত্বে গোপ-জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়।

" —মথুরায় কর্ণেল কীর্ত্তিকরের সভাপতিত্বে অল ইণ্ডিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়।

" —এড্‌মিরাল্‌ সাণ্টো ডগ্‌লাসের মৃত্যু হয়।

" —উত্তরপাড়ায় এক কৃষি-ও-শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

১১ই—সুকলকাটীতে বৈশ্য বারুইজাতির সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশন হয়। রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর সভাপতি ছিলেন।

১২ই—আমুরের ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত গভর্ণর জেনারেলের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায়।

১৩ই—কলিকাতায় তিলি জাতীয় সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশন হয়। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতি ছিলেন।

"— আগ্রায় রাজপুত কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। মাননীয় কাশ্মীর নরেশ সভাপতি ছিলেন।

১৪ই—মজঃফরপুরে জমিদার বাভণ-সভার অধিবেশন হয়। মহারাজ কুমার লছ্‌মী প্রসাদ সিংহ সভাপতি ছিলেন।

"— পুরীতে উৎকল ইউনিয়ন্‌-কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। মাননীয় মধুসূদন দাস সভাপতি ছিলেন।

"— করাচীতে ইণ্ডিয়ান্‌ সোসিয়াল্‌-কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। রাও বাহাদুর চন্দারমল্‌ সভাপতি ছিলেন।

"— লিভারপুলের বিখ্যাত সওদাগর মিঃ প্যাণ্ডালী র‍্যালীর মৃত্যু হয়।

"— প্রথম ওন্‌টেরিও পার্লেমেণ্টের অবশিষ্ট জীবিত সভ্য মিঃ রাইকার্টের মৃত্যু হয়।

১৫ই—সুইডেনের কুইন্‌ ডাওয়েজারের মৃত্যু হয়।

"— আগ্রায় অল ইণ্ডিয়া মসলেম-লিগের অধিবেশন হয়। স্যর ই, রহিমতুল্লা সভাপতি ছিলেন।

"— করাচীতে অল ইণ্ডিয়া ব্রাহ্ম সভার অধিবেশন হয়। স্যর নারায়ণচন্দ্রাবরকার সভাপতি ছিলেন।

"— করাচীতে অল ইণ্ডিয়া লেডীজ্‌ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। শ্রীমতী হরদেবী বাঈ সভাপতি ছিলেন।

"— উত্তর ও দক্ষিণ নাইজিরিয়া এক গভর্ণরের শাসনাধীনে থাকিবে, এই সংবাদ প্রচারিত হয়। স্যর ফ্রেড্‌ লুগার্ড যুক্ত-নাইজিরিয়ার গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন, এই সংবাদ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

১৭ই—নব-বর্ষের রাজদত্ত উপাধি-তালিকা প্রকাশিত হয়।

"— বুলগেরিয়ার পার্লেমেণ্ট্‌ স্থগিত হয়।

২১এ—ভারতগভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী স্যর এম্‌, ম্যাক্‌ফার্‌সনের মৃত্যু হয়।

"— বিখ্যাত গ্রন্থকার মিঃ উইয়ার মিচেল্‌, নাট্যকার মিঃ মার্ক মেলফোর্ড, ও মেজর জেনারেল্‌ বাওয়ার্স ইহলোক ত্যাগ করেন।

২৪এ—ভাইকাউণ্ট ক্রসের মৃত্যু হয়।

"— লর্ড কর্ডরের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায়।

২৫এ—আর্য্যসমাজের বিখ্যাত নেতা স্বামী নিত্যানন্দজী ইহলোক ত্যাগ করেন।

"— শিবগিরির জমীদারের মৃত্যু হয়।

২৬এ—চীনের পার্লেমেণ্ট্‌ বন্ধ হয়।

২৮এ—আড্‌মিরাল্‌ বোসান্‌ কোএণ্টের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায়।

য়ুরোপে তিনমাস

পিতার ও জ্যেঠামহাশয়ের পরম-ভক্ত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী জব্বলপুরে আছেন; পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে বোধ হয় কৈলাস বাবু সেইখানে আসিয়া দেখা করিতেন। তিনি জব্বলপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন; পেন্সন্ লইয়াছেন। সংস্কৃত-কলেজের পুরাতন-ছাত্র যে যেখানে আছেন, জ্যেঠতাতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও পিতার পুত্র বলিয়া উত্তর-ভারতের একসীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত যখন যেখানে গিয়াছি, তাঁহাদের নিকট যে আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছি তাহার পরিচয় দিয়া ফুরাইতে পারি না। প্রাচীন-ভারতের গুরুভক্তি জ্যেঠামহাশয়ের বহুসংখ্যক ছাত্রে দেখিয়াছি, এবং চিকিৎসা বা অপর সূত্রে পিতার নিকট যে যেমন উপকার পাইয়াছে, তাহার প্রত্যুপকার তাঁহার বংশধরেরা অজস্র পরিমাণে পাইয়াছে ও পাইতেছে। অনেকের মনে হইতে পারে যে, য়ুরোপ-প্রবাস বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এত ব্যক্তিগত কথার উল্লেখের কারণ কি? কারণ এই যে, জীবনের এই সকল সন্ধিস্থলেই বাল্যস্মৃতির আলোচনার প্রচুর অবকাশ স্বতঃ-প্রবৃত্ত।

এদেশের গাছপালা, মাঠ, ঘাট, খোলার ঘর, মানুষ সবই বাঙ্গালার মত দেখিতেছি। বিলাত-যাত্রার উদ্যোগের মধ্যে WASHINGTON IRVINGএর SKETCH BOOKএর Voyage, R. C. Duttর THREE YEARS IN EUROPE পুনঃ পাঠের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। Voyage নামক অধ্যায় হইতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাধীর গুরু-গম্ভীরস্বরে, তান-লয় ও মস্তক-বিকম্পনযুক্ত সুরে shoals of porpoises সম্বন্ধে বাক্-চিত্র যখন আঁকিতেন, তাহা যেন এখনও মনশ্চক্ষে ও কানে লাগিয়া আছে। হেয়ার স্কুলের ছেলেদের উচ্চারণ ও পাঠের যে কিছু দোষগুণ তাহা নীলমণিবাবু ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দোষগুণে হইয়াছিল। দোষ, কি গুণ, সেকথা বলা আমার মুখে সাজে না। সকল স্কুলের ছেলেরা ১৮৭৭ সালের এন্ট্রান্স পরীক্ষার পর Hand সাহেবের ক্লাসে যখন Presidency Collegeএ সমবেত হইল, তখনই পাঠ ও উচ্চারণ সম্বন্ধে প্রাধান্য সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে হেয়ার স্কুলই যে লাভ করিয়াছিল, তাহা নীলমণিবাবু ও কৃষ্ণবাবুর গুণে। Bengal Councilএর প্রথম Electionএ কৃতকার্য্য হইবার পরদিন স্যর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের পদধূলি লইতে যাইবার পূর্ব্বে পথে কৃষ্ণবাবুর পায়ের ধূলা লইতে গিয়া একবার তাঁহাকে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম।

Voyageএ WASHINGTON IRVING বলিয়াছেন, যে মহাদেশ পর্য্যটনকালে দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে যাইতে যেমন স্পষ্ট দেখা যায় যে ভাষা, লোক, জন, ব্যবহার, আকৃতি, প্রকৃতি—সবই যেন শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দীর্ঘকাল সমুদ্র যাত্রায় তাহা ঘটে না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, পরস্পরের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যেই গণ্য; কিন্তু আর্ভিং-কথিত পার্থক্য বম্বে অঞ্চলে পৌছিবার পূর্ব্বে বড় বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান হইল না। সমুদ্র-যাত্রায় এ প্রভেদ উপলব্ধি করা যায় কি না, জানিবার অবকাশ বহু সাধনার পর আসিয়াছে। আপাততঃ স্থলপথে এতৎসম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহাই বিবৃত হইবে। সমুদ্রের অন্য বিপদ বিভীষিকা অপেক্ষা বমন বিভীষিকাই আপাততঃ প্রবল। যদি গা-বমি বমির হাত হইতে এড়াইতে পারা যায়, তাহাহইলেই আপাততঃ অনেকটা ভরসার কারণ হইবে।

পি এণ্ড ও জাহাজ এরেবিয়া

১০ই মে রাত্রি ৯টায় সন্ধ্যার ভোজন শেষ হইল। ডেকে খানিক বেড়াইয়া ভাল লাগিল না। নিজের ক্যাবিনে গিয়া ধুতি পরিয়া শুধু গায়ে পুরা-বাঙ্গালীবাবু সাজিয়া শয়ন করিলাম—নিদ্রার চেষ্টা বিফল হইল!—নিদ্রার চেষ্টা আজ বোধ হয় বৃথা। শয্যাত্যাগ করিয়া চির-সহচর লেখনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

লেখনীর ইতিহাস লিখিয়া বর্ত্তমান অধ্যায় আরম্ভ করিতে হইতেছে। জি, আই, পি, রেলওয়ের মনমাদ ষ্টেসন পার হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতায় খরিদ Stylographic কলম প্রাণপণে সেবা করিয়াছিল। গয়া হইতে আরম্ভ করিয়া এক কলম কালীর সাহায্যে পূর্ব্ব-কথিত কাহিনী চলন্তি গাড়ীর অজস্র ঝাঁকুনীর মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'আ'কার

'ই'কার 'স'কার 'ব'কার কে কাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। চল্‌তি গাড়ী-জাহাজ-নৌকা-রেলপথেই বর্ত্তমান-কাহিনীর সূতিকাগার। অতএব ইহাতে গুণ-বাহুল্য সন্ধান নিষ্প্রয়োজন ও নিষ্ফল। stylo ক্রমাগত লিখিয়াছে—বিশ্রাম নাই। এরূপ অত্যাচারী প্রভু, অথবা সহচরকে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া, মনমাদ পার হইয়াই, লেখনী ধর্ম্মঘট করিল, যে সে আর চাকরী করিতে পারিবে না। ওজর হইল—খাবার নাই, কাজ করিব কি করিয়া? অর্থাৎ, কালী ফুরাইয়াছে, লিখিব কি করিয়া?—সত্য কথা বটে! বিনা রসদে কে কবে সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, এমন কি পারমার্থিক কাজই বা করিয়াছে?—বাধ্য হইয়া লেখা বন্ধ করিতে হইল। লিখিবার জন্য কালী ব্যাগের মধ্যে শিশিতে ছিল; কিন্তু চল্‌তি রেল-গাড়ীতে লেখার অভ্যাস আয়ত্ত করা হইয়াছে বলিয়া, শিশি হইতে কালী লইয়া কলমে পূরিবার অভ্যাস অচল গৃহমধ্যেও এখনও করিতে পারি নাই! নিজস্ব stylo কলমে লেখার এই সূত্রপাত। ছেলেপুলের কালী-ভরা কলম ধারধোর করিয়া এ যাবৎ বিষয়যাত্রা সম্পন্ন হইয়াছে! ছুরি খুলিতে, দড়ির বাঁধন খুলিতে যাহাকে এখনও পরের সাহায্য লইতে হয়, দুঃসাহস করিয়া সে বিলাত চলিয়াছে কি করিয়া—তাহার পরিচয় কি দিব! যাহা হউক, এই তিন দিন রেল ও জাহাজে স্বায়ত্তশাসনের ও স্বাবলম্বনের যে সাধনা ও সিদ্ধি হইয়াছে, তাহা ত্রিশ বৎসরে হয় নাই। যাহাকিছু বাল্যজীবনে ও প্রথম-যৌবনে ছিল, তাহা বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে। আপিস হইতে আসিলে চাদর খানি হাত হইতে লইয়া এবং—"দশরথ" নামধারী শ্বশুরের নাম ধরিবেনা বলিয়া, "দশটা" বাজার পরিবর্ত্তে "দু-পাঁচ বাজা"-বলা—"মেনোর ঝি"র সাহায্যে বারান্দায় পা ধুইবার জল ও গামছা দেওয়ার ব্যবস্থায় যে কি কুফল হইয়াছিল, এবং সেই অবধি যে কি অপদার্থ হইয়াছি, রেলগাড়ী ও জাহাজের practical classএ পড়িবার সময় তাহা বুঝিবার অবকাশ পাইয়া বুঝিতে পারিতেছি! আফিংএর নেশায় ভোর করিয়া দিতে পারিলে কোথাও পালাইবার যো থাকিবে না—এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, বহুবর্ষব্যাপী এই ফাঁকির আয়োজন। তারপর, কাপড়-খোঁজা, আর চাবি-খোলার বিদ্যাটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি!—এমন লোকের পক্ষে বার্দ্ধক্যে বিলাতযাত্রা যে নিতান্ত দুঃসাহসিক কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই! সেবা-স্নেহ-যত্নের মিষ্টতা যে কত মধুর, ক্রমে তাহা মনে পড়িবার অবকাশ বাড়িতেছে!—প্রথম জীবনের কষ্ট-সহিষ্ণুতাই লোককে মানুষ করিয়া তুলে। যে ছেলেপুলেদের ভাগ্যে সে সুবিধা না ঘটে, তাহাদের মানুষ-হইবার সম্ভাবনা কম। যেসব ছেলে-পুলের জুতা-সাফ করিয়া দিতে, খাবার-জল গড়াইয়া দিতে হয়—আপিসের পোষাক, স্কুল-কলেজের কাপড় বিছানার উপর সাজাইয়া রাখিতে হয়, তাহারা পথের ভিখারী অপেক্ষাও দুর্ভাগ্য। এ মধুর যত্ন-সেবার সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাদ পাইবার অধিকার উপার্জ্জন করিবার তাহারা অবকাশ পায়না—মানুষ হইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারে না।

কথা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে।—রেলওয়েতে চলন্ত গাড়ীতে কালীর বোতল খুলিতে পারিব না, কিন্তু বম্বে পৌঁছিয়াই কালী ভরিয়া পূরা দমে কাজ লইব ভয় দেখানতে লেখনী বম্বে পৌঁছিয়াই অন্তর্ধান হইলেন! সঙ্গে সঙ্গে "রৌদ্র-চশ্‌মা"—লোহিত-সমুদ্রের লোহিত-উত্তাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যাহা যত্ন করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাও—ষ্টেশনের বিষম ভিড়ের মধ্যে অন্তর্ধান হইল!—বম্বে সহরে পদার্পণ করিয়াই এই লাভ! লেখা বন্ধ। দেখা বন্ধ। পুলিশ থানাতল্লাসী পর্য্যন্ত করিয়াও কিছু হইল না!—পরিশেষে, পুনরায় Stylo এবং Sunglass খরিদ করিয়া তবে অন্যকাজ।

বম্বে কথা-প্রসঙ্গের পূর্ব্বে পূর্ব্বকথাটা সারিয়া লই। মনমাদ পার হইয়া মনে হইল যে, Washington Irving এর Voyage প্রবন্ধের কথাটা এই প্রদেশে কতকটা সত্য। এতক্ষণ যে দেশগুলার মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম তাহাদের গাছপালা, পাহাড়, মাঠ, বাড়ী, ঘর, লোকজন প্রভৃতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য মনে হয় নাই। বাঙ্গালায় আছি, কি বেহারে আছি, কি উত্তর-পশ্চিমে আছি তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ হয় নাই। বাঙ্গালা, বেহার, উত্তর-পশ্চিমের ঘর-দ্বার-ক্ষেত্র এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য কতকটা একইরূপ। মনমাদ ছাড়িয়া পার্থক্য লক্ষণ আরম্ভ হইল। গরু-বলদগুলি হৃষ্টকায়, লোকজনগুলি পুষ্ট ও বলবান, ঘর দ্বারগুলিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এমন কি খোলার ঘরের খোলাগুলিতেও যেন বাঙ্গালাদেশসুলভ কৃশত্বের অভাব। কৃষকের পায় জুতা, মাথায় পাগড়ী। চষা-জমি ক্রোশের-পর-ক্রোশ-ব্যাপী যেন সবজী-বাগান করিবার জন্য

যত্ন করিয়া চষিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। যেন ধান-যব-গমের চাষের জমি নয়।—নূতন দৃশ্য বটে! হয়ত, কেহ বলিবেন দশ-শালের বন্দোবস্তে কৃষক ও ভূস্বামীকে অলস অপদার্থ করিবার অবসর বম্বে প্রদেশ পায় নাই তাই এই প্রভেদ!—ভাল!

ক্রমে দূরে মেঘমালার মত সহ্যাদ্রি "নয়ন পথের পথিক" হইল, "নিদাঘ মার্ত্তণ্ডের মরীচিমালার প্রচণ্ড-উত্তাপে সহ্যাদ্রির "উলঙ্গ সৌন্দর্য্য" বড় মনোরম বোধ হইতেছিল না। দারুণগ্রীষ্মে কবি-ভাব,—"প্রত্নতত্ত্বকম্রবিৎ"-ভাব সব যেন তিরোধান পাইতে লাগিল। কোন্ গিরিশিখরে পুণ্যশ্লোক শিবাজীর 'রাজগৃহ' ছিল, কোথায়ই বা বসিয়া সেই 'পার্ব্বত্য মূষিক' মাউলী "দস্যুর" সাহায্যে "রাজযোগী" আওরঙ্গজেবকে জেরবার করিতেন এবং রোশেনাবার Platonic বন্ধুত্ব ঔদার্য্য সহকারে হেলা করিতেন, তৎসম্বন্ধে গবেষণা নন্দদাসের Second-hand FIELD GLASSএর সাহায্যেও বড় সহজসাধ্য হইতেছিল না। পুণ্যভূমি দাক্ষিণাত্য ও মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া অবধি প্রথা-সঙ্গত এবং নবীন-ভাবুক-সুলভ কতকটা উৎসাহ ও ভাবোদ্গমের চেষ্টা যে না হইতেছিল তাহা নয়, তবে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যমুনার রেল-সেতুর উপর দিয়া পলায়ন সময়ে যমুনার লহরী দর্শনে অশ্রু, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি যেসকল লক্ষণের আবির্ভাব হইয়াছিল, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার মৌলিক অভাব। প্রধান কারণ গরম, দ্বিতীয় কারণ তখন গৃহিণী চাইনা বলিয়া পলায়ন হইতেছিল, এখন শরীরিণী "গৃহিণী" ফেলিয়া পলায়ন। বিশেষ প্রণিধানে, চিত্তচাঞ্চল্য ও ভাবের অভাবের সম্পূর্ণ অকারণতা প্রতীয়মান হইবে না।

ইগৎপুর হইতে ঘাট-রেলওয়ের বাহাদুরী আরম্ভ। ইগৎপুর হইতে বম্বে পৌছিতে ১৩টা কি ১৪টা ছোট বড় টনেল। এক মুঙ্গের টনেল, তার পর হাজারীবাগের পথের তিনটা টনেল, আর দার্জ্জিলিংএর খেলাঘরের রেলওয়ের বাহাদুরী লইয়াই বাঙ্গালার অত মান। বম্বের এ সম্বন্ধে দাবী বাঙ্গালার অপেক্ষা অনেক উচ্চ এবং অন্য বাহাদুরীর দাবীও যে উচ্চে তাহা ক্রমশঃ স্বীকার করিতে হইল! এই উপর-পাহাড় দিয়া গাড়ী চলিতেছে, আবার পিছু হটিয়া নীচু-পাহাড় দিয়া যাইতেছে;—এই টনেলের ভিতর দিয়া ঘোর "সূচিভেদ্য" অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী ছুটিয়াছে আবার "উপত্যকার" উপর পুল-পার হইয়া "অধিত্যকা" আরোহণ করিতেছে—দেখিয়া অদম্য "স্বদেশী" ভাব অনেকটা দমিত হইল। সুখ-শয়নে ফার্ষ্টক্লাস গাড়ীতে অনুগ্রহ করিয়া বসিয়া এই শ্রমসাধ্য পথে যাওয়া যাহার এত কষ্টকর বোধ হইতেছিল, তাহার পক্ষে "অসুর দস্যুর" মত এইরূপে রেলওয়ে চালাইবার ভার লইয়া থাকিতে সহজে স্বীকার হওয়া সম্ভব নয়। লেখনী বা জিহ্বার সাহায্যে যৌথ-কারবারের, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের, চিরদিনের মত সর্ব্বনাশ সাধন করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে বল, তাহা বরং কষ্ট স্বীকার করিয়া করা যায়।

দুই ঘণ্টা পাহাড়ে পাহাড়ে চলিয়া, উপত্যকা অধিত্যকা 'অধিরোহণ আরোহণ' করিতে করিতে, সাদা জমিতে বাহির হইবার পর খাস বম্বের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। "থানা" "পারসীক" "পারেল" "বাইকুল্লা" ইত্যাদি ষ্টেসন আসিতে লাগিল। তাহার পূর্ব্বে "নাসিক" ষ্টেসনে গাড়ীর জানালা হইতে নাসিকা বাহির করিয়া দেখি, সূর্পনখা কীর্ত্তির কোন প্রমাণ বর্ত্তমান নাই!—ফলে, পৌরাণিক গবেষণা উদ্যম উত্তাপবলে প্রতিহত হইল! চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করিতেছে মাঠ। দণ্ডকারণ্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও চিরবসন্ত দর্শনে যে বনে রূপসী সূর্পনখা নাক-কাণ পণ করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহার কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। শুনিলাম, তাহার "আধানি" সংস্করণ এইখান হইতে কিছু দূরে,—তথাপি কেমন একটা বীভৎস রসের অবতারণা হইল।—খর-দূষণ স্মরণে, কিংবা খর সূর্য্যকিরণে, তাহা হইল তাহা বলা কঠিন।

এইবার কলকারখানার রাজ্য আরম্ভ। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত বম্বে প্রদেশে নাই, সেইজন্য বম্বের টাকাওয়ালারা জমিতে টাকা না পুতিয়া ইট-লোহা-ইস্পাত পুতিয়াছে ও সেইজন্য বম্বের এই সমৃদ্ধি শুনিতে পাই।—কথাটা প্রামাণিক কি না জানি না; তবে চাষের অবস্থা যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে দাক্ষিণাত্যবাসী কৃষক যে মাতা-বসুন্ধরার সেবায় উদাসীন তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখিলাম না। বম্বে "দ্বীপে" শীঘ্রই পৌছান গেল, না-নদী, না-হ্রদ, না-সমুদ্র, না-খাড়ীর মত স্থির সুবিস্তীর্ণ জলরাশি এদিকে ওদিকে চৌদিকে দেখা যাইতে লাগিল। এখানে নৌকা, ওখানে ডিঙ্গী, সেখানে সালতী, ওখানে আমাদের দেশের

'ডোঙ্গার' মত এক রকম "জলযান"—যেখানে যেমন জল সেখানে তেমনি চলিতেছে। কোথায় Back water বাঁধিয়া নূতন জমি তৈয়ারির চেষ্টা হইতেছে, কোথাও তাহা বাঁধিয়া লবণ-প্রস্তুত হইতেছে। নৌকার মাস্তলে রঙ্গীন নিশান, নাগরিকের মাথায় রঙ্গীন পাগড়ী, নাগরীর রঙ্গীন ঘাগরা, ছেলের গায়ে, পেয়াদা চাপরাসীর গায়ে, ঝাড়ুদার মেথরের পর্য্যন্ত গায়ে, রঙ্গীন জামা। পাগড়ীর রং ঢং এত অধিক যে শিরস্ত্রাণশূন্য বাঙ্গালীর ধাঁধা লাগিয়া যায়। ভিন্ন-সম্প্রদায়ের ভিন্ন-জাতির ভিন্ন-পাগড়ী, ভিন্ন-ত্রিপুণ্ড্রক, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র চতুর্দ্দশ-সংস্করণখানি Kit bagএর ভিতর না লইলে সমজ্ঞান দুষ্কর। অধিকাংশ বাড়ী ঘর সুন্দর পরিষ্কার গঠন। কেমন একটু চাকচিক্য পারিপাট্য আছে, যাহা উত্তর-ভারতের কোথাও দেখি নাই। সামান্য লোকের গৃহেও তাই। দরিদ্র হইতে লক্ষপতির বাড়ীর ছাত—সবই খোলার বটে কিন্তু এমন বাহ্য-চাকচিক্য ও সৌন্দর্য্য জয়পুরে রাজ-আদেশেও বুঝি ঘটে নাই। জয়পুরে বড়-রাস্তাগুলির উপর একটা "আইন-সঙ্গত" নক্সার বশবর্ত্তী হইয়া গোলাপী রংএর এক-ধরণের বাড়ীগুলা নির্জ্জীব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। বোম্বাইতে তাহা নয়। সকল বাড়ীরই একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অথচ পারিপাট্য আছে, "Elevation"এর কেমন একটু সৌন্দর্য্য আছে। আর তার পর প্রতি বারান্দায় রঙ্গীন ঘাঘরি-পরা নাগরীর সারী। সকল শ্রেণীর হিন্দু ও অধিকাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পরদার লেশ মাত্র নাই। অতএব সমাজ-সংস্কারকগণকে পরদা দূরীকরণের ব্যবস্থা করিতে হয় না। পথে ঘাটে বাজারে রেলে সুন্দরীগণ অকুতোভয়ে যাইতেছে, সওদা করিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে। কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, কাহাকেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই। গ্রামে নগরে সর্ব্বত্রই এই ভাব। মুসলমান-দাসত্বের তরঙ্গ এতদূর প্রকটভাবে পৌঁছায় নাই বলিয়াই বোধ হয় এই স্বাধীন ভাবটা রহিয়া গিয়াছে। বম্বে অবস্থানকালে কোনও এক বড় ঘরের সুন্দরী যুবতী মহারাষ্ট্র-রমণী কোন কার্য্যের জন্য আমার সহিত আমার হোটেলে অকুতোভয়ে দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে আসিয়া দেখাশুনা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া জুতা মস্ মস্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সোণার বাঙ্গালাকে তখন আমার মনে পড়িল। অসুখের সময় দড়ির চটি জুতা পায় দিয়া দুই পা রাস্তায় বেড়াইবার অনুরোধ করিয়াও "ইঁহাদিগকে" রাজী করান দুঃসাধ্য।

গাড়ী প্রায় ১॥ ঘণ্টা "লেট" ছিল।—পূর্ব্বপরিচিত বাঙ্গালী বন্ধুগণকে চিঠি দেওয়া ছিল, তাঁহারা সদলে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন; সংবাদ পাইয়া দানবীর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের লোক সাদর-অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, এবং বোম্বাইএর অন্যান্য গণ্যমান্য দালাল-মহাজনও অভ্যর্থনার জন্য সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। বিদেশে, অপরিচিত অথচ আপাততঃ অন্তরঙ্গ হইতেও অন্তরঙ্গ, বহু-সংখ্যক বন্ধুগণের অসম্ভাবিত অভ্যর্থনায় কেমন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে সঙ্গে, এক-যাত্রীকে লইয়া এত পাণ্ডার টানা-টানির চোটে, চসমা কলম গাঁটকাটার জিম্মা হইয়া গেল। অনেকক্ষণ সেই হুজুকে কাটিল, পরিশেষে বাঙ্গালী বন্ধুগণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অন্য অভ্যর্থনাকারিগণকে বিদায় দিয়া যাওয়া গেল।—যত্নের ত্রুটি কিছুমাত্র হইল না, উৎসাহ ও স্নেহের সহিত বাঙ্গালী বন্ধুগণ যতদূর সম্ভব আদর ও আতিথ্য-সৎকার করিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এক মোটর গাড়ী লইয়া সহর দেখিতে যাওয়া গেল। মোটর না হইলে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে এতবড় সহর দেখা শেষ করা যাইত না। কোথায় এপোলো বন্দর, কোথায় ব্যালার্ড পিয়ার, কোথায় কোলাবা-চৌপাঠী, মালাবার হিল্, কোথায় Grand Road, Hornby Road, Queen Street—কিছুই দেখিতে বাকি রহিল না। University, High Court, Elphinstone College, Post Office, Telegraph Office, Tajmahal Hotel, Parsee Tower of Silence, মম্বাই দেবীর মন্দির, মহালক্ষ্মী, ভুবনেশ্বর, বালুকেশ্বর, তুলাপটি—সবই দেখা হইল। বাহিরের চাক্‌চিক্য কোনও ভারতবর্ষীয় সহরের এতদূর আছে কিনা সন্দেহ! তিনতালা চারিতালা পাঁচতালা বাড়ী, ছবির মত সাজাইয়াছে—ছবির মত গড়িয়াছে—ছবির মত রং করিয়াছে। কিন্তু বাড়ীগুলির ভিতরের বন্দোবস্ত তত ভাল নয়। অধিকাংশ বাড়ীতে আলো হাওয়া কম; স্বাস্থ্যেরও সেইজন্য বিশেষ হানি ঘটে। এই বড় বড় বাড়ীতেই প্রথমে ভারতে প্লেগের উৎপত্তি! বাড়ীগুলিকে 'চাল' বলে। কলিকাতায় মাড়ওয়ারীরা যেমন ঠাস-ঘন-বুনান

করিয়া এক এক বাড়ীতে বিস্তর লোক বাস করে, এখানেও তাই। সমৃদ্ধ লোকেরাও কয়েকটা ঘর, কিংবা একটা 'flat', লইয়া বাস করিতে দ্বিধা বোধ করে না। বম্বে সহরের স্থান-সঙ্কীর্ণতাই ইহার প্রধান কারণ! কিন্তু ভিন্ন সমাজ ও জাতির লোকের সহিত একত্র এরূপ "বাসাবাড়ী"তে বাস করা কষ্টকর। এখানে দুএক শ্রেণীর মুসলমান ছাড়া স্ত্রীলোকদের পর্দ্দা আদৌ নাই। সেইজন্য এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পরিবার একটা বড় বাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে থাকিতে আমাদের অপেক্ষা বিস্তর কম অসুবিধা বোধ করে। বম্বে সহরে পাঁচ-তালা ছয়-তালা অনেক বড় বড় বাড়ী আছে যাহার মাসিক ভাড়া হাজার হাজার টাকা। একজন লোক তাহা লইয়া কোন মতেই থাকিতে পারে না। কাজেই একটা flat, বা একটা মহলের কয়েকটা ঘর, শুধু ব্যবসাদারেরা কেন, মধ্যবিত্ত স্থায়ী গৃহস্থেরাও লইয়া থাকে। তবে অনেক জায়গায় এরূপ চলন আছে, যে একটা বাড়ীতে কেবল মহারাষ্ট্রীয়েরা থাকে; কোন বাড়ীতে বা কেবল পার্সীরাই থাকে। এমন কি তাহা হিন্দু-বাড়ীওয়ালার বাড়ী হইলেও সে তাহাতে পার্সী ছাড়া অন্য ভাড়াটিয়া রাখিবে না, কারণ তাহা হইলে অন্য ভাড়াটিয়ার অসুবিধা ঘটে।

এইভাবে গৃহস্থালী করিতে হইলে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া স্বতন্ত্রভাবে করিবার পক্ষে কিছু ব্যাঘাত হয় বলিয়া সে সব ক্রিয়াও কতকটা "দশে মিলিয়া" করে। পরম ভক্ত সকল হিন্দুর বাড়ীতেই যে আমাদের দেশের মত ঠাকুর-ঘর আছে, তাহা নয়। অথচ দুই বেলা ঠাকুর-দর্শন না করিয়া জল-গ্রহণ করে না, বা বিষয়-কর্ম্ম করে না, এরূপ হিন্দুও বিস্তর আছে। তাহারা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা, দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন ঠাকুর-বাড়ীতে গিয়া, দেবতা-দর্শন করিয়া, তবে কার্য্যান্তরে যায়। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে বিখ্যাত দেবতা দর্শনের জন্য যেরূপ নিত্য বিদেশী যাত্রীর ভিড় হয়, এখানে ঠাকুর বাড়ীতে নিত্য-দর্শনের জন্য তেমনই স্থানীয় লোকের ভিড় হয়। কাশীতে গঙ্গাস্নান ও দেবতা দর্শন করিয়া বর্ষীয়সীরা যেমন বাজার হাটের কাজ সারেন, এখানে সকল শ্রেণীর সকল বয়সের স্ত্রীলোকই তাহাই করেন। কেহ পদব্রজে, কেহ বা গাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নিত্য রাস্তায় ব্যবহারের জন্য তাহাদের বেশ-ভূষা উৎকৃষ্ট। নিম্ন-শ্রেণীর স্ত্রীলোক ব্যতীত বাঙ্গালার পথে ঘাটে স্ত্রীলোক দেখা যায় না বলিয়া, বাহিরের লোকের ধারণা যে বাঙ্গালীর স্ত্রীলোক বড় কুৎসিত। যথার্থ সুন্দরী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখি নাই—দেখিবার সৌভাগ্য-সুবিধা আমার ঘটে নাই। কিন্তু তথাপি আমি (অবশ্য ঘরের কথা ছাড়িয়া দিয়া) বলিতে প্রস্তুত নই, যে বাঙ্গালী-স্ত্রীলোক সাধারণতঃ কুৎসিত। কিন্তু বম্বের রাস্তাঘাটে স্ত্রীজনতা দেখিয়া বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে যে ভাটিয়া, গুজরাটি, মারহাট্টা, পার্সী অধিকাংশ স্ত্রীলোকই সুশ্রী। আর কেহই উত্তম রেসমী-কাপড় ঘাঘরা-কোর্ত্তা মোজা-জুতা-অলঙ্কার ছাড়া পথ চলে না! সমুদ্রধারে চৌপাঠীতে সন্ধ্যার সময় এত গাড়ী-মোটর জমায়েৎ হয়, যে আমাদের ইডেন গার্ডনে তাহার এক চতুর্থাংশও হয় না! আমাদের ওখানে এই সকল জনতার মধ্যে অধিকাংশই সাহেব-মেম; এখানে অধিকাংশই ভারতবাসী। ভাল গাড়ী, ভাল মোটর, ভাল কাপড়-চোপড় সবই ভারতবর্ষীয়দিগের। ষ্ট্রাণ্ড ও রেড রোডে বেড়াইবার সময় কলিকাতায় মনে হইবে ইংরাজের সহরে বাঙ্গালী মাথা গুঁজিয়া কষ্টে শ্রেষ্টে আছে। বোম্বাইতে মনে হইবে ভারতবাসীদিগের সহরে ভারতবাসীই অধিক সংখ্যক; ইংরাজও সামান্য আছে। রবিবার দিন চৌপাঠীতে মণিমুক্তা-অলকারের এত সমারোহ হয় যে এক একজন স্ত্রীলোকের গায় লক্ষ টাকার জিনিস দেখা যায়। হীরা-মুক্তার চলনটাই বেশী। যে মুক্তা কলিকাতার লোক চোখেও দেখিতে পায় না, তাহা এখানে অজস্র। কিন্তু কারীগর সব বাঙ্গালী। সূক্ষ্ম জড়ওয়ার কাজ বাঙ্গালী না হইলে হয় না; সেই জন্য জহরতের অনেক বাঙ্গালী কারীগর এখানে অন্ন করিয়া খায়। তা ছাড়া, বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি এখানে বড় নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্য গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি অধিকাংশ স্থানীয় লোকের হাতে, ইংরাজের হাতে অল্প। ভারতের অনেক স্থানেই পারসী ও নাখোদা দোকানদার ইংরাজকে হটাইতেছে। তাহাদিগের নিজের সহরে যে তাহা করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি?

দোকানদারেরা পুরুষকে ধার দিতে ইতস্ততঃ করিবে; কিন্তু স্ত্রীলোক যাইয়া যত টাকার যে জিনিস ধার চাউক, অক্লেশে পাইবে। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদের এত সমাদর যত্ন

বলিয়া বুঝি বম্বেতে এত লক্ষ্মীশ্রী! স্ত্রীলোকেরা এই বিশ্বাসের যোগ্য ব্যবহারও করে। অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে বলিয়াই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, ব্যভিচার এখানে খুবই কম।—পার্শীদিগের মধ্যে ত আদৌ নাই বলিয়াই শোনা যায়।

স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বকার্য্যে যেমন অগ্রণী, সুখদুঃখেও তাই। এক পথে দেখিলাম, বরের বাড়ী তত্ত্ব লইয়া, কিংবা ঐরূপ একটা-কি-কার্য্যে প্রকাণ্ড দল বাধিয়া বাজনা বাদ্য লইয়া সুবেশা সুন্দরীগণ চলিয়াছে। আবার এক জায়গায় দেখিলাম, অধোবদনে এক দল স্ত্রীলোক একটা বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় ভূমি-শয্যায় বসিয়া আছে। শুনিলাম, কাহারও মৃত্যু হইলে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ অশৌচান্ত পর্য্যন্ত প্রতি বৈকালে এইরূপ "পথে বসে"। যে "পথে বসাইয়া" গিয়াছে, তাহাকে স্মরণ করিবার ইহাপেক্ষা আর প্রকৃষ্ট উপায় কি হইতে পারে! সমুদ্র-তীরে প্রাচীর-বেষ্টিত প্রকাণ্ড শ্মশান গৃহ; সেখানে দাহ করিয়া, "মম্বা দেবীর" মন্দিরের পুষ্করিণীতে শুচি হইয়া, পুরুষেরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম্

বিগত ৩রা ও ৪ঠা মাঘ 'কলিকাতা মিউজিয়ামে'র শত-বার্ষিক উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে—১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এই মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ "এসিয়াটিক্ সোসাইটি" নামক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তাহার ত্রিশ বৎসর পরে এসিয়াটিক্ সোসাইটির চেষ্টায় সভাগৃহে ভারতবর্ষের, এমন কি সমগ্র এসিয়া খণ্ডের, প্রথম মিউজিয়াম্ স্থাপিত হইয়াছিল। এসিয়াটিক্ সোসাইটি স্থাপনের পর হইতে উক্ত সভার সদস্যগণ সময়ে সময়ে যথাসম্ভব জীব-জন্তুর মৃতদেহ, ভূগর্ভে প্রাপ্ত জীবাশ্ম এবং প্রত্নতত্ত্ব-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি উপহার প্রদান করিতেন। সর্ব্ব প্রথমে প্রাচীন সুপ্রিম্‌কোর্টের গৃহে এসিয়াটিক্ সোসাইটির অধিবেশন হইত এবং উপহারপ্রাপ্ত দ্রব্যাদি সেই গৃহেই রক্ষিত হইত। স্যর উইলিয়ম্ জোন্স্ যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, ততদিন এসিয়াটিক্ সোসাইটির জন্য স্বতন্ত্র গৃহ-নির্ম্মাণের কোন চেষ্টাই হয় নাই। কিন্তু, ১৭৯৬ সালে সুপ্রিমকোর্টের গৃহে সভার অধিবেশন অসম্ভব হওয়ায়, নূতন গৃহনির্ম্মাণের চেষ্টা আরম্ভ হয়। সদস্যগণের অর্থ-সাহায্যে "চৌরঙ্গী ও পার্কষ্ট্রীটের" সংযোগস্থলে নূতন-গৃহ নির্ম্মিত হয়, এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটির দ্রব্যাদি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সুপ্রিম্‌কোর্ট ভবন হইতে নূতন-গৃহে আনয়ন করা হয়। সুপ্রিম্‌কোর্ট-ভবনই বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা মিউজিয়ামের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বাস-গৃহে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বকথা

নূতন গৃহে আসিবার ছয় বৎসর পরে "মিউজিয়াম"-স্থাপনের প্রথম কল্পনা হয়। এই সময়ে, য়ুরোপে নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টের সহিত ইংরেজগণের দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছিল,—ওলন্দাজজাতি ফরাসিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নেপোলিয়ানের প্রজা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই জন্য ইংরেজগণ পৃথিবীর যাবতীয় 'ওলন্দাজ'-উপনিবেশ-গুলি কাড়িয়া লইয়াছিলেন,—আফ্রিকায় "কেপ কলনী", ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে "যবদ্বীপ" ও "বর্ণিও", এবং ভারতবর্ষে "শ্রীরামপুর" ইংরেজগণ-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। রাজাদেশে "ইষ্ট্‌ইণ্ডিয়া কোম্পানী" যখন "শ্রীরামপুর" অধিকার করেন, সেই সময়ে ডাক্তার নাথানিয়েল ওয়ালিচ্ নামক জনৈক ওলন্দাজ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্-ইংরেজ কোম্পানীর হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় বিচক্ষণ ছিলেন বলিয়াই যথাকালে মুক্তিলাভ করেন, এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটিকে 'মিউজিয়াম্' স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লেখেন। তাঁহার প্রস্তাব যথাকালে গৃহীত হয় এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সোসাইটির

মিউজিয়াম্ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে মিউজিয়ামের দুইটি মাত্র বিভাগ ছিল ;—

(১) প্রত্নতত্ত্ব ও মানবতত্ত্ব,

(২) ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব।

সোসাইটির পুস্তকাধ্যক্ষ, প্রথমোক্ত বিভাগের ও ডাক্তার ওয়ালিচ্, দ্বিতীয় বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অগ্রাহ্য হইলেও সদস্যগণ বারম্বার আবেদন করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে এই অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হন। ডাক্তার পিয়ার্সন্, ডাক্তার ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ড্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ এসিয়াটিক্ সোসাইটির মিউজিয়ামের ভূতত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাণীগঞ্জের কয়লার খনিগুলির আয়-বৃদ্ধি হওয়ায়

এসিয়াটিক্ সোসাইটির গৃহ—১নং পার্ক ষ্ট্রীট—(১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত)।

সোসাইটির সদস্যগণের চেষ্টায় মিউজিয়াম্ অতি সত্বর আয়তনে বৃদ্ধি এবং অবস্থায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কালে ডাক্তার ওয়ালিচ্ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ৫০৲ হইতে ২০০৲ টাকা বেতনে দ্বিতীয় বিভাগের কএকজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। "পামার্ এণ্ড্ কোম্পানী"র আফিসে সোসাইটির টাকা গচ্ছিত থাকিত। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত কোম্পানী দেউলিয়া হওয়ায় সোসাইটির অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থা ঘটে। এই সময়ে সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষগণ তত্ত্বাবধায়কের বেতন দিয়া উঠিতে না পারায়, কোম্পানীর নিকট মাসিক ২০০৲ টাকা অর্থ-সাহায্যের আবেদন করেন। প্রথম-আবেদন ভারত-গবর্ণমেণ্ট ভূতত্ত্বের একটি স্বতন্ত্র মিউজিয়াম্ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই নূতন-বিভাগের দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির গৃহে নীত হয়, ও ইহার একজন স্বতন্ত্র তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নব-গঠিত ভূতত্ত্ব-কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির হস্তে ভূতত্ত্ব-বিভাগ ন্যস্ত হয়, এবং উহা সোসাইটির গৃহ হইতে ১নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। এই বৎসর এসিয়াটিক্ সোসাইটির সদস্যগণ কলিকাতায় একটি সরকারী মিউজিয়াম্ স্থাপনের জন্য কোম্পানীর নিকট আবেদন করেন, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের জন্য আবেদনের কোন সন্তোষজনক

উত্তর পাওয়া যায় নাই। দুই বৎসর পরে সোসাইটির সদস্যগণ পুনরায় এক আবেদন প্রেরণ করেন। তাহার উত্তরে ভারত-গভর্ণমেণ্ট্ জানান যে, অর্থাভাব-বশতঃ তাঁহারা কলিকাতায় মিউজিয়াম্ স্থাপনে অসমর্থ। এসিয়াটিক্

বর্ত্তমান এসিয়াটিক্ মিউজিয়াম্।

সোসাইটির সদস্যগণ অগত্যা বিলাতে—সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের নিকট একখানি আবেদন প্রেরণ করেন, এবং তাহার ফলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভারত-গভর্ণমেণ্ট্ কলিকাতায় সরকারী মিউজিয়াম্ স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। তখন ভারত-গভর্ণমেণ্টের সহিত এসিয়াটিক্ সোসাইটির এই-রূপ বন্দোবস্ত হয় যে,—নগদ দেড় লক্ষ টাকার বিনিময়ে সোসাইটি তাঁহাদিগের মিউজিয়ামের দ্রব্যাদি নূতন সরকারী "মিউজিয়ামে" দিবেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম্ সম্বন্ধে একটি আইন বিধিবদ্ধ এবং মিউজিয়ামের বর্ত্তমান সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। উক্ত আইন, যথাক্রমে ১৮৭৬, ১৮৮৭ ও ১৯১০ সালে সংশোধিত হইয়াছে।

এডিনবরার ফ্রিচার্চ কলেজের প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্যার অধ্যাপক, ডাক্তার "জন্ এণ্ডার্সন্ ১৮৬৬ সালে মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির মিউজিয়ামের দ্রব্যাদি নূতন বাটীতে আনীত হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব ও পক্ষি-বিভাগ সাধারণের পক্ষে উন্মুক্ত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতার (জুবেয়ার্) বিশ্বজনীন প্রদর্শনীর অবসানে, তাহার শিল্প ও ভেষজ-বিভাগে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি মিউজিয়ামে প্রদত্ত হয়, এবং এই সমস্ত দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য একটি নূতন-গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ১৮৮৭ সালে এই গৃহে মানবতত্ত্ব, শিল্প ও কৃষিকার্য্য-সম্বন্ধীয় তিনটি নূতন-বিভাগ স্থাপিত হয় এবং ১৮৯২।৯৩ খৃষ্টাব্দে সাধারণে ইহাতে প্রবেশাধিকার পান। স্থানাভাবে প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প ও মানবতত্ত্ব বিভাগের দ্রব্যাদির ক্ষতি হওয়ায় ভারত-গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ১৮৯১ সালে একটি নূতন গৃহ নির্ম্মিত হয়। ১৯১০ সালে ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম্-সংক্রান্ত নূতন-আইন

মিউজিয়ামের বর্ত্তমান-অধ্যক্ষ ডাঃ এনেণ্ডেল্, বি-এ, ডি-এস্-সি, সি-এম্-জেড্-এস্-এস্, এফ-এ-এস্-বি।

াম্ হইয়া মিউজিয়ামের পাঁচটি স্বতন্ত্র বিভাগ ঠিত হয় ;—

(১) প্রাণী, ও মানবতত্ত্ব,
(২) ভূতত্ত্ব,
(৩) শিল্পতত্ত্ব,
(৪) কৃষি, ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব,
(৫) প্রত্নতত্ত্ব।

শতবার্ষিক-সম্মিলন

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মিউজিয়ামের জন্ম; সুতরাং বর্ত্তমান ৎসরে ইহার বয়স শতবর্ষ পূর্ণ হইল। এতদুপলক্ষে একটি তবার্ষিক সম্মিলনের জন্য, উহার বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ডাক্তার নলসন্ এনেন্‌ডেলের উদ্যোগে ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট ক প্রস্তাব প্রেরিত হয়, এবং ভারত-গভর্ণমেণ্টের আদেশ-অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতায় আসেন :—

১। লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল এ. আর. এস, এণ্ডার্সন,—সিভিলসার্জ্জন, ঢাকা।
২। কাপ্তেন টি, এল. বম্‌ফোর্ড, আই-এম্ এস্ - মীবাট।
৩। কাপ্তেন আর্, বি, সেমুর সিউয়েল,—সামুদ্রিক বিভাগ।
৪। কাপ্তেন এফ্, এইচ্, ষ্টিউয়ার্ট,—লক্ষ্ণৌ।
৫। বি, ঘোষাল, স্কোয়ার, এম্-এ,— এডওয়ার্ড মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ, ভূপাল।
৬। মির অনন্তকৃষ্ণ আয়ার,—কোচিন মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ।
৭। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরা চাঁদ ওঝা,—রাজপুতানা মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ, আজমীর।
৮। বিঠলদাস গিরিজা শঙ্কর ত্রিবেদী—রাজকোট রাজ্যের প্রতিনিধি।
৯। পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী,—লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ।
১০। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গঙ্গানাথ ঝা,—এম্ এ, পি-এচ্ ডি, এলাহাবাদ।
১১। ডাক্তার জে, আর্, হেণ্ডারসন্,—অধ্যক্ষ, মাদ্রাজ মিউজিয়াম্।
১২। আর, জে, ডি, গ্রেহাম্,—অধ্যক্ষ, নাগপুর ঐ।
১৩। লায়োনেল হিথ,—অধ্যক্ষ, লাহোর ঐ।
১৪। সার্ প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লাহোর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি।
১৫। রায় বাহাদুর হীরালাল,—মধ্য-প্রদেশের প্রতিনিধি।
১৬। কর্ণেল এস্, জি, বারাড,—সার্ভেয়ার জেনারেল্।
১৭। টি, ডি, গ্রাফ্ হাণ্টার,—সার্ভে বিভাগের অধ্যক্ষ।
১৮। জি, ই, এস, কিউবিথ্,—অরণ্য-বিভাগ, দেরাদুন্।
১৯। সি, ডুরোজেল্,—প্রত্নতত্ত্ববিভাগ, বর্ম্মা।
২০। এইচ্ হারগ্রিভ্‌স্,— „ লাহোর।
২১। ডাক্তার জে, পিয়ার্সন্,—কলম্বো মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ, সিংহল।
২২। মেজর জে, ষ্টিফেন্‌সন্,—আই-এম্-এস, লাহোর।

২৩। ডাক্তার মরিস্ ডব্লিউ ট্রাভার্স,—এফ্-আর-এস্, ব্যাঙ্গালোর।

২৪। ডাক্তার ই, আর, ওয়াটসন,—ঢাকা কলেজ।

২৫। রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,—রাজসাহী কলেজ, রাজসাহী।

২৬। ডাক্তার ডি, টম্সন্

২৭। রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায়,—রাভেন্সা কলেজ, কটক।

২৮। ডাক্তার কে, এস, ক্যাণ্ডওয়েল,—পাটনা কলেজ, পাটনা।

২৯। রেভারেণ্ড জে, মিচেল, — ওয়েস্লিয়ান্ কলেজ, বাকুড়া।

৩০। অনারেবল্ ডাক্তার সুন্দর লাল,—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর্।

৩১। এল্, ডব্লিউ,মিড্ল্টন্,— সোণাপুর চা-বাগান, আসাম।

৩২। এস, পি, আম্বরকর্,—এলফিন্ষ্টোন কলেজ, বোম্বাই।

এতদ্ব্যতীত ভূতত্ত্ব-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী ও অবৈতনিক কর্ম্মচারিগণ, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ, স্থানীয় অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষগণ, এবং কলিকাতার অনেকানেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

প্রদর্শনী দৃশ্য—১৭ই জানুয়ারী, ১৯১৪।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এসিয়াটিক্ সোসাইটির মিউজিয়াম্ স্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই এই শতবার্ষিক উৎসব হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই বৎসর ১৪ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হওয়ায়, এই সময়েই মিউজিয়ামেরও শত-বার্ষিক উৎসব করা স্থির হয়। ১৫ই, ১৬ই এবং ১৭ই তারিখে এসিয়াটিক্ সোসাইটির গৃহে ভারতীয় বিজ্ঞান-সম্মিলনের প্রথম-অধিবেশন হয়। ১৫ই তারিখে সম্মিলন-অধিবেশনের প্রারম্ভে ও শেষে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মাননীয় লর্ড কার্মাইকেল্ সম্মিলন-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিবস এসিয়াটিক্ সোসাইটির গৃহে একটি সান্ধ্য-সম্মিলন হয়। তাহার পরদিবস অপরাহ্ণে কলিকাতা মিউজিয়ামের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ, ডাক্তার এনেন্ডেল্, শতবার্ষিক সম্মিলনের প্রতিনিধিগণ ও বিজ্ঞান-সম্মিলনের সদস্যগণকে নিমন্ত্রণ করেন। এই নিমন্ত্রণে ডাক্তার পি, সি, রায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাক্তার থিবো প্রমুখ মনীষিগণ উপস্থিত ছিলেন।

তাহার পর দিন, শনিবার—১৭ই জানুয়ারী তারিখে, মিউজিয়ামে এক বিরাট্ সম্মিলনের আয়োজন হয়। ইহাতে অন্যূন সহস্র ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; মিউ-জিয়াম্-হর্ম্ম্য আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। ন্যাস-রক্ষক-সভার সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-সরস্বতী-শাস্ত্রবাচস্পতি, সম্পাদক ডাক্তার এন্, এনেন্ডেল্ ও অন্যান্য ন্যাস রক্ষকগণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের

ডাঃ এনেণ্ডেলের আবাসে সান্ধ্য-সম্মিলন-দৃশ্য —১৬ই জানুয়ারী, ১৯১৪।
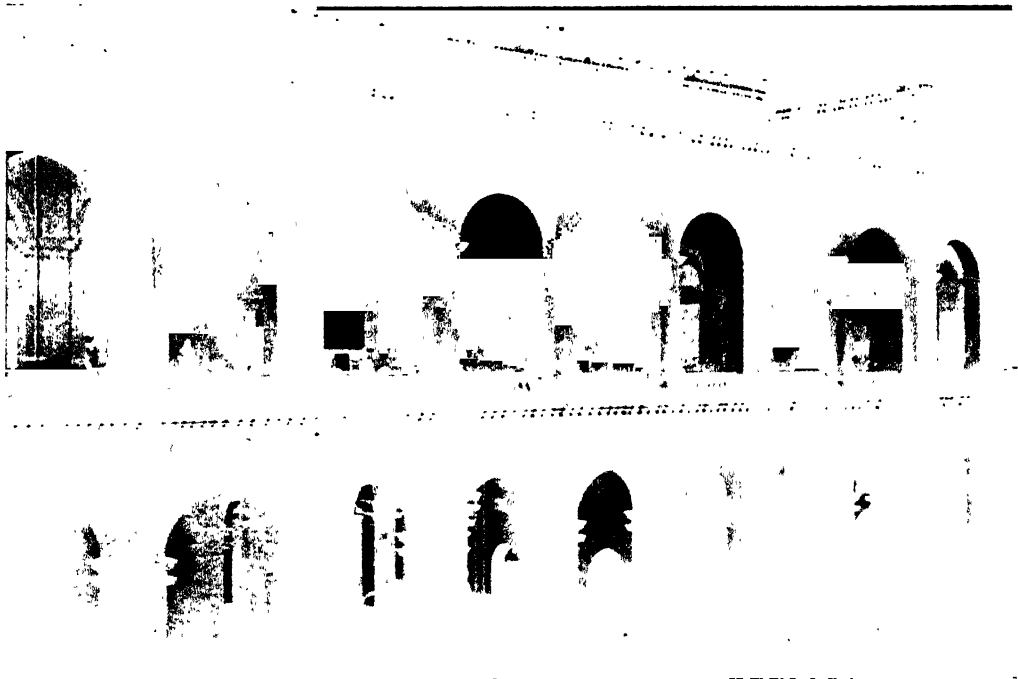
নিশাকালে আলোকমালা-সজ্জিত মিউজিয়াম্-দৃশ্য—১৭ই জানুয়ারী, ১৯১৪।

অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। মিউজিয়ামের দ্বিতলে, পাঁচটি বিভাগের মৌলিক-গবেষণার কতকগুলি নিদর্শন সজ্জিত হইয়াছিল ;—নিম্নে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ত্রিতলে ঐক্যতান-বাদ্য ও জল-যোগের ব্যবস্থা ছিল। মিউজিয়ামের অঙ্গনে ন্যাসরক্ষক-সভার 'শিলমোহর' করিয়াছেন। প্রাচীন-শিল্পী, বুদ্ধদেবের চরণদ্বয় অঙ্কিত করিয়া তাঁহার উপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়াছেন ; পরবর্ত্তী শিল্পী, সেই স্থানে বুদ্ধদেবের পূর্ণাবয়ব অঙ্কন করিয়াছেন। গান্ধারে যবন-শিল্পিগণই সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধদেবমূর্ত্তি-অঙ্কন-প্রথা সূচিত করেন। গান্ধারের শিল্পিগণ ধর্ম্মচক্র, ভূমিস্পর্শ, ধ্যান, অভয় ও বরদ
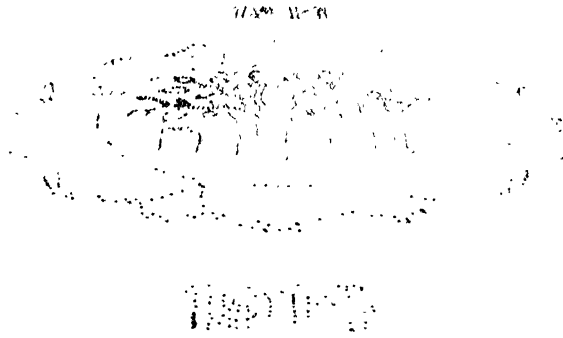
মিউজিয়ামের ন্যাস রক্ষা সভার শিলমোহর – (আলোকমালা গ্রথিত)।

আলোকমালায় অঙ্কিত হইয়াছিল। এই শিলমোহরটিতে প্রাচীর-বেষ্টিত বোধিদ্রুম অঙ্কিত আছে,—ইহা দেখিতে অতি সুন্দর।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ

প্রদর্শনী

(১) বুদ্ধদেবমূর্ত্তির বিবর্ত্তন

খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে মূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত ছিল না। এই সময়ের প্রস্তর-শিল্পে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিল্পিগণ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেন না। ভরহোত, বোধগয়া, বা সাঞ্চির প্রস্তর-শিল্প-নিদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেবচরিতের কোন ঘটনা অঙ্কন করিতে গিয়া শিল্পী, আবশ্যক সত্ত্বেও, গৌতম-বুদ্ধের মূর্ত্তি অঙ্কন করেন নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের শিল্পিগণ, সেই ঘটনা অঙ্কন-কালে, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত

এই পঞ্চবিধ মুদ্রাস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি তক্ষণ করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে মথুরা, বারাণসী, অমরাবতী এবং মগধ, বা বঙ্গের,শিল্পিগণ বুদ্ধদেবমূর্ত্তি তক্ষণকালে গান্ধারের রীতিরই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। এই উৎসব-প্রদর্শনী, এবম্বিধ ভিন্ন ভিন্ন কালের, বিভিন্ন স্থানের বুদ্ধদেবমূর্ত্তি সকল প্রদর্শিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বাহিরে যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, তিব্বতও শ্যামদেশে—গঠিত বুদ্ধমূর্ত্তিচয়ও দেখান হইয়াছিল।

(২) প্রস্তর-শিল্পে বুদ্ধদেবচরিত

গান্ধারের শিল্পিগণই সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তরে বুদ্ধদেবচরিত অঙ্কন করিয়াছিলেন। প্রাচীন-ভারতের শিল্পিগণও প্রস্তরে বুদ্ধদেবচরিত অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সে সকল অঙ্কন কতকটা অবয়বহীন। ললিতবিস্তারে, বা অশ্বঘোষের বুদ্ধদেবচরিতে গৌতম-বুদ্ধের জীবনের যতগুলি ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশগুলিই গান্ধারের

প্রস্তরশিল্পে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব-চরিতকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—জন্ম, সম্বোধি, ধর্ম্ম-প্রচার, মৃত্যু।

(ক) জন্ম

প্রদর্শনীর কএকখানি প্রস্তর-ফলকে বুদ্ধদেব জন্মিবার পূর্ব্বের ও পরের নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি অঙ্কিত ছিল:—

(১) মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, একটি শ্বেতহস্তী তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছে।

(২) মায়াদেবী ও শুদ্ধোদন, ঋষি কালদেবলকে স্বপ্নের কথা বলিতেছেন।

(৩) বুদ্ধদেবের জন্ম ও সপ্তপাদ গমন—

মায়াদেবী শালবৃক্ষ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, বুদ্ধদেব মাতার কুক্ষি ভেদ করিয়া নির্গত হইতেছেন, ও ব্রহ্মা বস্ত্র পাতিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছেন। তাহার পরেই নবজাত শিশু সপ্তপাদ গমন করিতেছেন।

(৪) বুদ্ধদেবের প্রথম-স্নান ও লুম্বিনী হইতে প্রত্যাগমন—

একখানি চিত্রে নবজাত শিশুকে স্নান করান হইতেছে, অপর দুইখানিতে মাতা ও পুত্র রথে আরোহণ করিয়া

মিউজিয়মস্থিত বর্দ্ধমানাধিপতি-প্রদত্ত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

লুম্বিনী উদ্যান হইতে কপিলবাস্তুতে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

(৫) জন্ম-পত্রিকা লিখন—

(মাতা ও পুত্র নগরে ফিরিয়া আসিলে ঋষি অসিতদেবল নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া কহিয়াছিলেন যে,—ইনি ভবিষ্যতে চক্রবর্ত্তী রাজা, অথবা সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন।
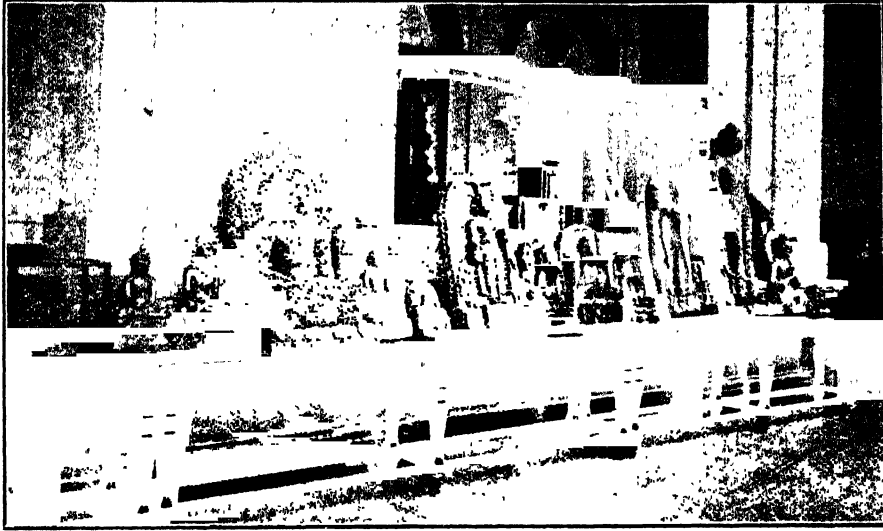
(৬) ছন্দক ও কণ্টকের জন্ম—

(বুদ্ধদেবের জন্মের দিনে তাঁহার অশ্ব কণ্ঠক ও অশ্বপাল ছন্দক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল)।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ—বুদ্ধদেবমূর্ত্তির বিবর্ত্তন।

(গ) মার-ধর্ষণ ও সম্বোধি

(১) গৃহত্যাগ—

মায়া-বলে বুদ্ধদেবের পত্নী ও মহল্লিকাগণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; বুদ্ধদেব গৃহত্যাগের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।
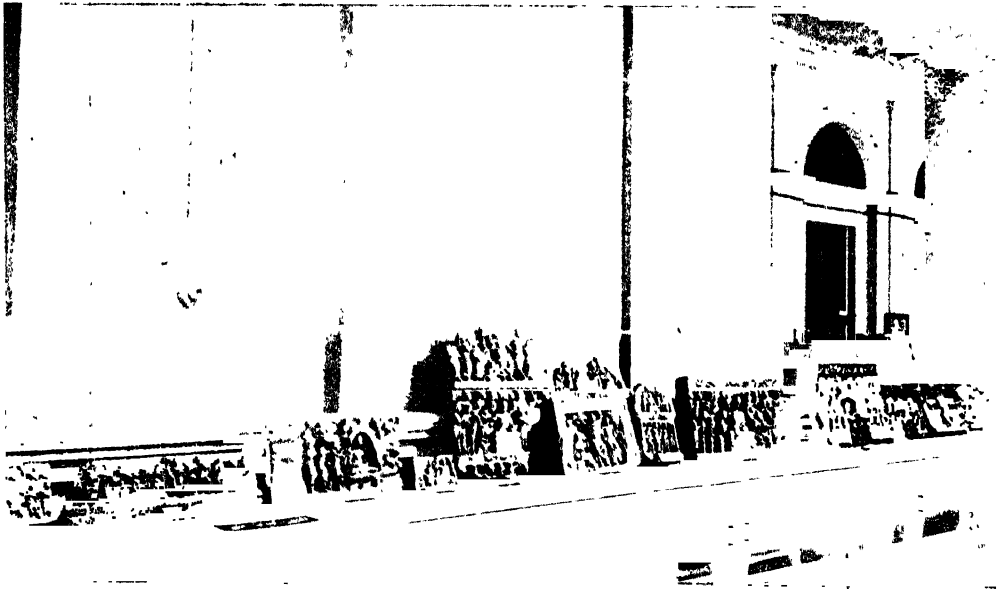
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ— প্রস্তর-শিল্পে বুদ্ধদেব-চরিত।

(২) মহাভিনিষ্ক্রমণ—

বুদ্ধদেব অশ্বপৃষ্ঠে কপিলবাস্তু ত্যাগ করিতেছেন। অশ্বের পদশব্দে নাগরিকগণ পাছে জাগরিত হয়, এই জন্য যক্ষগণ প্রতি পাদক্ষেপে অশ্বের খুর ধারণ করিতেছেন।

তীরে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ-তলে উপনীত হইলে, ভূতপূর্ব্ব বুদ্ধদিগের বজ্রাসন দেখিতে পাইলেন। তিনি আসিবা মাত্র বৃক্ষ-দেবতা আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ—প্রস্তর-শিল্পে বুদ্ধ-চরিত।

(৩) কণ্ঠক-বিদায়—

বুদ্ধদেব রজনীশেষে কণ্ঠককে বিদায় দিতেছেন; বিদায়-কালে অশ্ব তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে।

(৪) বিম্বিসারের প্রথম বুদ্ধদেব-দর্শন—

প্রাসাদের অলিন্দ হইতে রাজগৃহ নগরের পথে পথে বুদ্ধদেবকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, মগধনাথ বিম্বিসার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে পুনঃ-প্রবেশ করিতে বলেন, এবং পরিশেষে সম্বোধির পরে আর একবার তাহার সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করেন।

(৫) তপস্যায় বুদ্ধদেবের ক্লেশ—

দীর্ঘকাল কঠোর-তপস্যা করিয়া বুদ্ধদেব অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর একদিন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন।

(৬) বোধিবৃক্ষতলে আগমন—

নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বুদ্ধদেব অবশেষে নৈরঞ্জন-নদী-

(৭) মারের প্রলোভন—

বৌদ্ধ ধর্ম্মের সয়তান মার প্রথমে তাহার তিনটি যুবতী কন্যাদ্বারা বুদ্ধকে জ্ঞানমার্গ হইতে বিচলিত করিবার চেষ্টা করে, পরে অকৃতকার্য্য হইয়া সানুচরে বুদ্ধকে আক্রমণ করে।

(৮) মার-ধর্ষণ—

মারের অনুচরবর্গ বুদ্ধদেবকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হয়; এই সময়ে তিনি সম্বোধি লাভ করেন। মার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'আপনার সৎকর্ম্মাবলীর সাক্ষী কে?' উত্তরে তিনি মেদিনী-স্পর্শ করিয়া পৃথিবীকে সাক্ষী হইতে অনুরোধ করেন। নারী-রূপিণী পৃথিবী, ভূমি-ভেদ করিয়া উপস্থিত হইয়া সাক্ষী হইয়াছিলেন।

(৯) ভিক্ষা-পাত্র প্রদান—

সম্বোধির পরে, ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ বুদ্ধদেবকে চারিটি ভিক্ষাপাত্র প্রদান করেন। তিনি স্বীয় শক্তিবলে চারিটি ভিক্ষাপাত্রকে এক করিয়াছিলেন।

(১০) দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণ বুদ্ধকে নূতন জ্ঞানের কথা জগতে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

[গ] বুদ্ধদেব-কর্ত্তৃক ধর্ম্ম প্রচার।

(১) ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন—

বারাণসীতে মৃগদাব নামক অরণ্যে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার শাক্যজাতীয় ভূতপূর্ব্ব পঞ্চজন শিষ্যকেই প্রথমে উপদেশ প্রদান করেন। ইহাই তাঁহার 'ধর্ম্মচক্র'-প্রবর্ত্তন—

(২) কাশ্যপগণের সর্পদমন—

উরুবিল্ল কাশ্যপ, গয়-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ নামক তিন
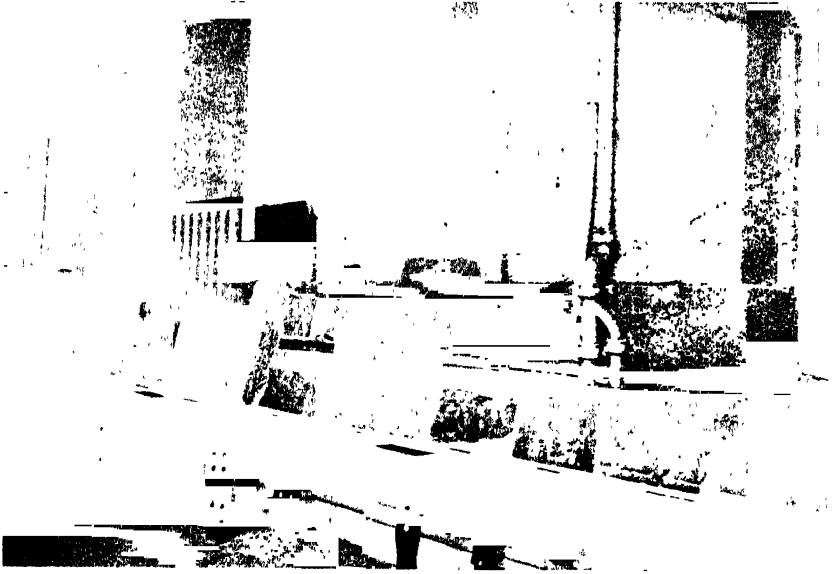
প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ—প্রস্তর-শিল্পে বুদ্ধদেব চরিত ও খোদিত-লিপি।

ভ্রাতা বর্ত্তমান গয়ার নিকটে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞশালায় একটি কালসর্প বাস করিত। ভ্রাতৃত্রয়কে স্বধর্ম্মে-দীক্ষিত করিবার জন্য বুদ্ধদেব তাঁহাদিগের যজ্ঞশালায় রাত্রি-যাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাহাতে

শিল্প-বিভাগ—অশোকের স্তম্ভশীর্ষ (প্রাপ্তিস্থান—রামপুরোয়া —চম্পারণ)।

কাস্যপগণ বলেন যে,—যজ্ঞশালায় বিষধর-সর্প বাস করে; সে তাঁহাদিগের তিন ভ্রাতাকে অর্হৎ জানিয়া হিংসা করে না। কিন্তু সে তাঁহাকে দংশন করিবে, কারণ তিনি অর্হৎ নহেন। একথা শুনিয়াও বুদ্ধদেব যজ্ঞশালায় রাত্রি-বাস করিতে চাহিলে, তাঁহারা সম্মত হন। তিনি স্বীয় শক্তিবলে রাত্রিকালে • কালসর্পকে বশ করিয়া ভিক্ষাপাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং প্রভাতে কাস্যপগণের নিকট উহা প্রদর্শন করেন।

(৩) উরুবিল্ল কাস্যপের সঙ্ঘ-প্রবেশ—

এই ঘটনার পরে একে একে ভ্রাতৃত্রয় সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, উরুবিল্ল কাস্যপ কুটীর-দ্বারে বসিয়া আছেন, বুদ্ধদেব তাঁহাকে বুঝাইতেছেন।

শিল্প-বিভাগ—অশোকের স্তম্ভশীর্ষ (প্রাপ্তিস্থান—রামপুরোয়া —চম্পারণ)

(৪) নন্দের সঙ্ঘ-প্রবেশ

সম্বোধি লাভ করিয়া বুদ্ধদেব যখন কপিলবাস্তুতে গিয়াছিলেন, তখন শাক্যবংশীয় অনেক যুবক সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন; নন্দ তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ভিক্ষু হইয়াও বুদ্ধদেবের কথায় পুনরায় তাহাকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

(৫) ইন্দ্রশিলা গুহা—

এক সময়ে বুদ্ধদেব রাজগৃহের নিকট পর্ব্বত-গুহায়

তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্তে আসিয়া গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

(৬) আনন্দকে অভয়-প্রদান—

আর এক সময়ে—বুদ্ধদেব একটি গুহার মধ্যে তপস্যা করিতে ছিলেন, তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা আনন্দ বাহিরে

আবরদেশের—চর্ম্ম-নির্ম্মিত-পরিচ্ছদ ও কাংস্য মুদ্রা।
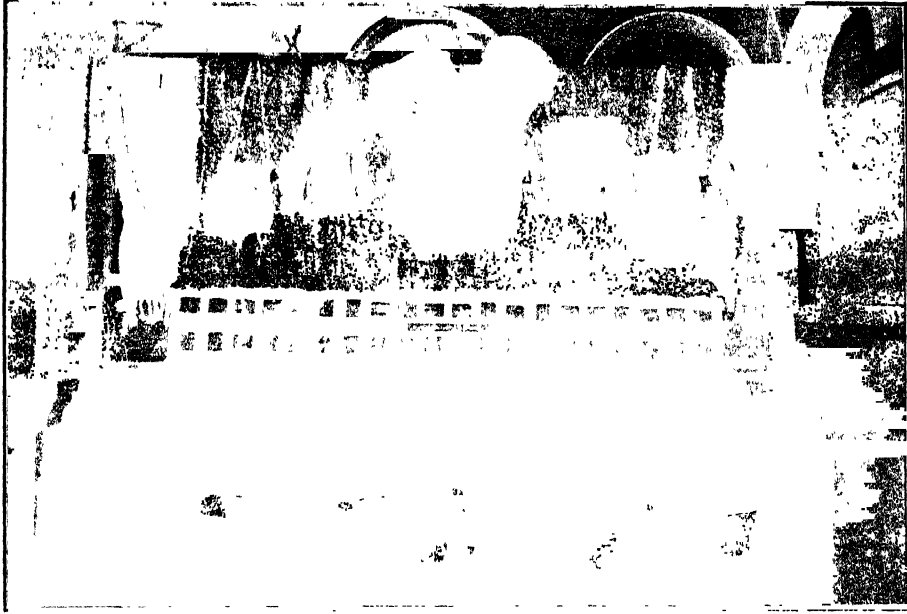
আবরদেশের—টুপি ও অলঙ্কার।

দাঁড়াইয়াছিলেন; এমন সময় মার শকুনির আকার ধারণ করিয়া আনন্দকে আক্রমণ করায় তিনি ভয় পান। বুদ্ধদেব তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য গুহার প্রস্তরের মধ্য দিয়া তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন।

(৭) শ্বেত-কুক্কুরের উপাখ্যান—

একদা শুক নামক রাজগৃহের একজন নাগরিক, বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার গৃহে পদার্পণ করিবা মাত্র, একটি শ্বেতবর্ণ কুক্কুর ডাকিতে আরম্ভ করে। তখন তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'পূর্ব্বজন্মে তুমি শুকের পিতা ছিলে; অত্যন্ত কৃপণস্বভাব ছিল এবং কোন সৎকর্ম্ম কর নাই বলিয়া এই জন্মে কুক্কুর-দেহ লাভ করিয়াছ।' এই কথা শুনিয়া কুক্কুরটি লজ্জিত হইয়া শয্যার নিম্নে পলায়ন করিয়াছিল।

(৮) শ্রাবস্তির আশ্চর্য্য ঘটনা—

একদা শ্রাবস্তিতে বিরুদ্ধবাদী আচার্য্যগণের মত খণ্ডন করিবার জন্য, বুদ্ধদেব একই সময়ে তাঁহার শরীর হইতে জল ও অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন।

(৯) ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—

বুদ্ধদেবের জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। সম্বোধিলাভের পরে, তিনি দেবলোকে গমন করিয়া মাতার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনটি সোপানশ্রেণী বিস্তৃত হইয়াছিল। মধ্যেরটি হীরক এবং অপর দুইটি সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত। বুদ্ধদেব মধ্যের সোপান অবলম্বন করিয়া অবতরণ করেন;—ব্রহ্মা চামর লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

প্রাণিতত্ত্ব-বিভাগ—সাধারণ-দৃশ্য।

(১০) দস্যু-দমন—

দেবদত্ত বুদ্ধদেবের আত্মীয়; তিনি ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করেন। একবার তিনি দস্যুর দ্বারা বুদ্ধদেবকে হত্যা করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দস্যুগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়াছিল।

(১১) হস্তী-দমন—

দেবদত্ত বুদ্ধদেবকে হত্যা করিবার জন্য রাজগৃহের সঙ্কীর্ণ পথে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া একটি মত্ত-হস্তী ছাড়িয়া দিয়া ছিলেন; কিন্তু হস্তীটি বুদ্ধদেবকে দেখিবামাত্র তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়াছিল।

[ঘ] মৃত্যু—মহাপরিনির্ব্বাণ।

(১) কুশীনগরে শালবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার শেষ শিষ্য শুভদ্র তখনও তপস্যা-নিরত ছিলেন।

(২) বুদ্ধদেবের শবাধার

(৩) বুদ্ধদেবের চিতা

(৪) বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ পূজা

(৫) ধর্ম্ম-চক্র

মৃত্তিকা ব্যবহৃত হইত। এই বিভাগে খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্ত-রাজবংশের ঘটোৎকচ গুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পত্নী ধ্রুবস্বামিনীর, গয়ার বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের, ও কাশীর আম্রাতকেশ্বর মন্দিরের, এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কতিপয় রাজকর্ম্মচারীর শিলমোহর প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মৃন্ময়-মূর্ত্তি—

প্রাচীনকালে দরিদ্র তীর্থযাত্রিগণ প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি বা চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিতে অসমর্থ হইলে মৃন্ময়-মুদ্রা
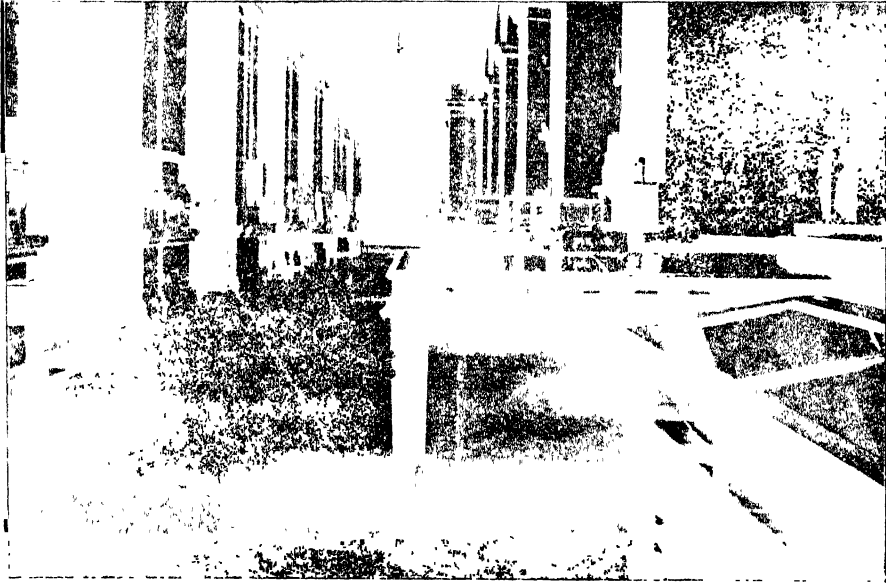
প্রাণিতত্ত্ব—মিঠাজলের মেরুদণ্ডবিহীন জীব।

প্রতিষ্ঠা করিত, এবং তীর্থ-যাত্রাবসানে এইরূপ মৃন্ময়-মুদ্রা ভারতবর্ষ হইতে দেশে লইয়া যাইত; এই সকল মৃন্ময়-মুদ্রায় বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব, তারা-মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। এই বিভাগে বুদ্ধগয়া, পেগু, আরাকান, মলয়-উপদ্বীপ ও শ্যাম-দেশে প্রাপ্ত মৃন্ময়-মুদ্রা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

ধাতু-মূর্ত্তি—

পাল-রাজগণের সময়ের ধাতুমূর্ত্তি এক প্রকার অজ্ঞাত। এই কালের (রংপুরে প্রাপ্ত) বিষ্ণু-মূর্ত্তি, (ভাগলপুরে প্রাপ্ত) বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব, তারা প্রভৃতির মূর্ত্তি ও (নেপালে প্রাপ্ত) শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি এই বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

খোদিতলিপি—

অক্ষরের ক্রম-বিকাশ দর্শনার্থ অশোকের, সমুদ্রগুপ্তের, কুমারগুপ্তের, দেবপালের, বিজয়সেনের, ৩য় গোপালের, লক্ষ্মণসেনের সময়ের খোদিতলিপি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

শিলমোহর—

প্রাচীনকালে শিলমোহর করিবার জন্য গালার পরিবর্ত্তে

প্রাচীন-মুদ্রা—

এই স্থানে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রাচীন স্বুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

(১) ভারতের সর্ব্ব-প্রাচীন মুদ্রা

(২) ভারতের গ্রীকরাজগণের মুদ্রা

(৩) রোমক মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রিত ভারতীয় মুদ্রা

(৪) নূতন ভারতীয় (গুপ্ত সাম্রাজ্যের) মুদ্রা।

(৫) পারস্যের সাসানীয় রাজগণের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রিত ভারতীয় মুদ্রা

শিল্প-বিভাগ

এই বিভাগে নেপালদেশে নির্ম্মিত পদ্মপাণি, তারা, মঞ্জুশ্রী, বোধিসত্ত্ব, বজ্রসত্ত্ব, জলদেবী, মৈত্রেয়, ও বজ্রপাণির মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

আবর দেশের দ্রব্য

(১) **শস্যাদি**—আবরদেশে উৎপন্ন যব, গোধূম, ভুট্টা প্রভৃতি, এবং আবরদেশে "চার" ন্যায় ব্যবহৃত এক প্রকার উদ্ভিদ্ চূর্ণ।

(২) **পরিচ্ছদাদি**—আবরদেশে ব্যবহৃত পশুচর্ম্মনির্ম্মিত বস্ত্র, টুপি, অলঙ্কার এবং মুদ্রা। আবরদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য, বা তাম্র মুদ্রার ব্যবহার নাই। আবরগণ কাংসনির্ম্মিত বৃহৎ-পাত্র মুদ্রার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে, এই ধাতুপাত্রগুলি তিব্বতে নির্ম্মিত; এগুলি তাহাদের নিকট বহুমূল্য। ইহাদিগকে ধনীব্যক্তিরা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখে। বিগত আবর-অভিযানের সময়ে শ্রীযুক্ত এস্, ডব্লিউ, কেম্প্ ও জে, কবিন্-ব্রাউন এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

জীবাশ্মের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের শম্বুক, হস্তিদন্ত ও প্রস্তরীভূত অস্থি প্রদর্শিত হইয়াছিল। লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের ব্যাঘ্রজাতীয় জন্তুর অস্থির সহিত তুলনা করিবার জন্য, একটি আধুনিক ব্যাঘ্রের মস্তকও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

প্রাণিতত্ত্ব

গভীর সমুদ্রের প্রাণী

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নাবিকগণের ব্যবহারোপযোগী "মানচিত্র" প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত 'সামুদ্রিক বিভাগে'র সৃষ্টি হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগের ব্যবহারের জন্য বোম্বাই-বন্দরে "ইন্‌ভেষ্টিগেটার" নামক একখানি কাঠের জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে সমুদ্রতলের জরিপ্ করিবার এবং গভীরজলের জীবজন্তু ধরিবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কাষ্ঠনির্ম্মিত জাহাজের পরিবর্তে একখানি লৌহ-নির্ম্মিত "ষ্টীমার" প্রস্তুত হইয়াছে।

(ক) গভীর সমুদ্রের মাছ—

সমুদ্রের তলদেশে সূর্য্যালোক পৌঁছিতে পারে না, কাজেই তথায় আলোক ও উত্তাপের একান্ত অভাব। এইজন্য সমুদ্রের গভীর তলদেশবাসী যাবতীয় মৎস্যাদির মস্তকে আলোক-উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে।
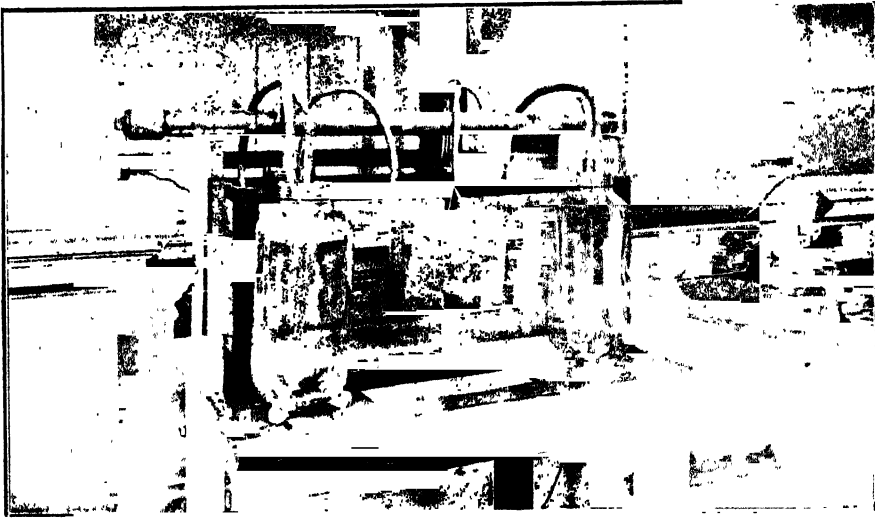
কৃত্রিম উপায়ে ইলিশ মৎস্যের ডিম্ব হইতে শাবক-উৎপাদনের যন্ত্র।

(খ) মেরুদণ্ড-বিহীন জন্তু—

গভীর সমুদ্রে দুই জাতীয় মেরুদণ্ড-বিহীন জন্তু দেখিতে

ভূ-তত্ত্ব-বিভাগ

ডাক্তার গজি, পিল্‌গ্রিম্ বিবিধ জীবাশ্ম, ও শ্রীযুক্ত জে, কবিন্-ব্রাউন্ নানাপ্রকার খনিজ দ্রব্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পাওয়া যায় ;—তন্মধ্যে এক জাতীয় জন্তুর চক্ষু বৃহৎ ও অপর জাতীয় জন্তুর চক্ষু ক্ষুদ্র।

জাপানদেশের বাদ্য-যন্ত্র—জাপ-সম্রাট্ 'মৎসুহিতো'-কর্ত্তৃক রাজা স্যর্ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত উপঢৌকন।
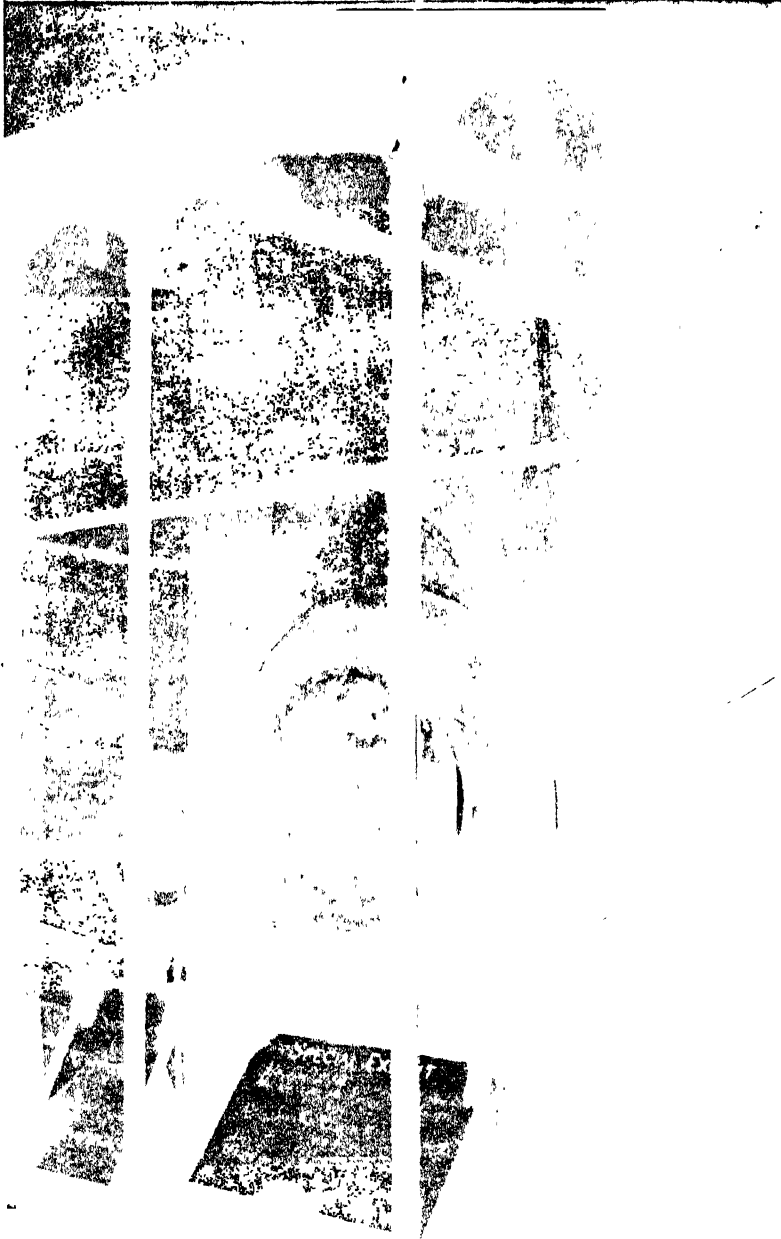
(গ) প্রবাল—

গভীর সমুদ্রের প্রবাল সাধারণতঃ নানাবর্ণ-রঞ্জিত হয়, কিন্তু সাধারণ প্রবালের মত বৃহদাকার হয় না।

মিঠা-জলের মেরুদণ্ডবিহীন জন্তু—

(ক) স্পঞ্জ—

আমাদের দেশের পুষ্করিণীর জলে যে স্পঞ্জ-জাতীয় এক প্রকার জন্তু জন্মায়, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডাক্তার এনেন্‌ডেল্ বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে মিঠা-জলের স্পঞ্জ আবিষ্কার করিয়াছেন।

(খ) চিঙ্‌ড়ি মাছের কাণের পোকা—

এই পোকাগুলি মিঠা-জলের চিঙ্‌ড়ি মাছের কাণে বাস করে এবং সময়ে সময়ে মিঠা-জলের কাঁকড়ার দেহেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই পোকাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব ও জলজ উদ্ভিদ্ আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।

এতদ্ব্যতীত ঘাসের প্রবাল এবং নানাবিধ চিঙ্‌ড়ি মাছ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মিঠা-জলের মাছ—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী কর্ত্তৃক আম্বালা, আল্‌মোরা, গাড়ওয়াল, মীরাট, নৈনিতাল, সারণ, চাম্পারণ, দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দরং, ও মণিপুর প্রভৃতিস্থানে নূতন আবিষ্কৃত বিবিধ মাছ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রাজমহল ও বকস্যারের মধ্যে ধৃত মিঠাজলের "সৌখচ্" মাছ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

এই জাতীয় মৎস্য অশোকের স্তম্ভানুশাসনে "সম্বুজ" মৎস্য নামে অভিহিত হইয়াছে।

গালিলি-হ্রদের জীব-জন্তু—

মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডাক্তার এনেণ্ডেল্ অবসর লইয়া নিজব্যয়ে গালিলি-সমুদ্র, বা টাইবিরিয়াস্-হ্রদ, হইতে পালেস্‌টাইনের জীব-জন্তুর বিবরণ-সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। তৎপ্রদেশ হইতে আনীত স্পঞ্জ, কীট, জোঁক, চিঙ্গ্‌ড়ি মাছ ও কাঁকড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল।

আবরদেশের জীব-জন্তু—

মিউজিয়ামের সহকারী অধ্যক্ষ আবরদেশ হইতে আনীত নূতন পক্ষী, সরীসৃপ, ভেক্, মৎস্য ও কীট প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের মৎস্য—

বাঙ্গালা দেশের মৎস্যকুল নির্ম্মূল হইবার আশঙ্কায় বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট মৎস্য-বিভাগ নামে যে নূতন-বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা হইতে অনেকগুলি মৎস্য ও যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রধান:—

(ক) শিকারী মৎস্য—

বোয়াল, চিতল, সোল ইত্যাদি।

(খ) কৃত্রিম উপায়ে মৎস্য-জনন—

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কৃত্রিম উপায়ে ইলিশ মাছের ডিম হইতে 'পোণা' জন্মাইবার একটি কল আসিয়াছে। ইলিশ মাছের পেট হইতে ডিম্ বাহির করিয়া একটি পাত্রে রাখা হয়। তাহার পর পুংজাতীয় মৎস্যের শুক্র লইয়া তাহাতে নিক্ষেপ করা হয়। ডিমগুলিকে তিন, চারি দিন ধরিয়া গরম জলে রাখিয়া অল্প অল্প উত্তাপ দিতে হয়। এইরূপ করিলে এক সপ্তাহ, বা ৯।১০ দিন পরে ছোট ছোট ইলিশ মাছের ছানা উৎপাদিত হইতে দেখা যায়।

(গ) মৎস্যের পীড়া—

পাঁচ রকম বিভিন্ন পীড়াক্রান্ত মৎস্য এই সম্পর্কে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক চিত্র—

মিউজিয়ামের তিনজন চিত্রশিল্পী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী, শিবচন্দ্র মণ্ডল, ও অভয়চরণ চৌধুরী, প্রাণি-তত্ত্ব-বিষয়ক তিন খানি চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে জীবাঙ্কুরগুলির পরিবর্দ্ধিতাকার দর্শন করিয়া এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র মণ্ডল গভীর সমুদ্রের মৎস্য, শ্রীযুক্ত অভয়চরণ চৌধুরী ভেক, মিঠা-জলের মাছ, ফলের মাছি এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী ভারতীয় কীটপতঙ্গের চিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন।

মিউজিয়মের প্রথম-অধ্যক্ষ ডাঃ জন্ এণ্ডারসন্ (১৮৬৬)

জাপানদেশের বাদ্যযন্ত্র

জাপানের মৃত সম্রাট্ "মৎসুহিতো" পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্ রাজা স্যর শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে জাপানের নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র উপহার দিয়াছিলেন। শতবার্ষিক উৎসবের প্রদর্শনীর কথা শ্রবণ করিয়া রাজা-বাহাদুর সেতার, বীণ প্রভৃতি কতকগুলি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও জাপানদেশীয় বাদ্যযন্ত্র মিউজিয়ামে প্রদান করেন। জাপান-দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে "ঘোষ"-জাতীয় যন্ত্রই অধিক, যথা—ঢকা, ডম্বরু ইত্যাদি।

সাহিত্য-সংবাদ

১। বাখরগঞ্জের জমীদার ৺রোহিণীকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় জীবদ্দশায় বহুপরিশ্রম করিয়া একখানি সুবৃহৎ "বাকলার ইতিহাস" প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়-চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সযত্নলিখিত ইতিহাসখানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। মুদ্রণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিবেন।

২। বিশ্বকোষ-সম্পাদক, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশ্বকোষের একটি হিন্দী-সংস্করণ বাহির করিতেছেন। সম্প্রতি ইহার প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালা বিশ্বকোষের পরিশিষ্টও শীঘ্রই বাহির হইবে। এই পরিশিষ্ট-প্রকাশের জন্য নগেন্দ্রবাবু বিপুল আয়োজন করিতেছেন।

৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" 'কায়স্থ-খণ্ড' অতি-সত্বরই প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থে বঙ্গদেশের অনেক ঐতিহাসিক-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

৪। সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়ের 'পর্ণপুট' নামে একখানি নূতন কবিতাপুস্তক শীঘ্রই বাহির হইবে।

৫। সুকবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের আবার একখানি নূতন কবিতাপুস্তক বাহির হইয়াছে। তাঁহার নবপ্রকাশিত পুস্তকের নাম—"একতারা"।

৬। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়,অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্নতত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের "সমসাময়িক ভারতের" ৫০ খানি গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। সমসাময়িক ভারতের তৃতীয়-খণ্ড একখানি বহুপ্রাচীন মানচিত্রের প্রতিলিপি, দুইখানি হাফ্‌টোন্ ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক-মহাশয়ের সচিত্র গ্রন্থ "ইংরেজের কথা" ও "অর্থনীতি" হিন্দীতে অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। "ইংরেজের কথা" বিহারের ছোটলাট মহোদয়, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব-লাট স্যর উইলিয়ম ডিউক ও মাস্তবর লায়ন্ ও গিলিসেরিওয়র্ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করাতে, উহার ইংরেজি সংস্করণ বিলাতে ছাপা হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

৭। 'HOME UNIVERSITY LIBRARY SERIES'এর অন্তর্গত "The MAKING of the EARTH" নামক পুস্তক অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-লেখককে,চৈতন্ত-লাইব্রেরির কর্ত্তৃপক্ষ "বিশ্বম্ভর সেন পারিতোষিক" হিসাবে একশত টাকা পুরস্কার দিবেন। প্রবন্ধ, মুদ্রিত হইয়া যেন ডিমাই বার পেজি, স্মল পাইকা অক্ষরের অন্যূন পঞ্চাশ পৃষ্ঠা হয়। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, 'চৈতন্ত লাইব্রেরি'র সম্পাদক, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

৮। রাজসাহী-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন" শীর্ষক যেসকল প্রবন্ধ বিবিধ মাসিক-পত্রে আজ ৪।৫ বৎসর যাবৎ বাহির হইতেছে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে "আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে।—উহার কএক ফর্ম্মা ছাপাও হইয়াছে।

অধ্যাপক-নিয়োগীর "বৈজ্ঞানিক জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী যাহা এক বৎসর ধরিয়া 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইতেছে। উহাতে নিউটন্, ফ্যারাডে প্রভৃতি বিদেশীয়, ও সুশ্রুত, বরাহমিহির প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু-বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে।—এই পুস্তকখানিও যন্ত্রস্থ।

তাঁহার Humourous প্রবন্ধগুলি, যাহা নানা মাসিক-পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে,—সেগুলি "তুফান" নাম দিয়া পুস্তকাকারে ছাপা হইতেছে।

৯। এবার পাবনা জেলায় শিবচতুর্দ্দশীর ছুটীতে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন হইতেছে। নাটোরের মহারাজা শ্রীজগদীন্দ্রনাথ রায় এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১০। ঈষ্টারের ছুটির সময় কলিকাতা টাউনহলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সম্মিলনের সাধারণ-সভাপতি হইবেন। এই সম্মিলনে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য এই চারিটি বিভাগ থাকিবে। বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি হইবেন—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; দর্শন-বিভাগের সভাপতি হইবেন—শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল; ইতিহাস-বিভাগের সভাপতি—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়; এবং সাহিত্য-বিভাগের সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

১১। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা "প্রসাদীফুল" শীর্ষক যেসকল প্রবন্ধ "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।—তাঁহার "কুম্ভ-মেলা"ও অচিরে সচিত্র ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বাহির হইবে।—মনোরঞ্জন বাবুর নূতন পুস্তক—"মনোরমার জীবন-চিত্র" নামক একখানি জীবন-চরিতও যন্ত্রস্থ।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
201, Cornwallis Street,
CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH,
—The Emerald Ptg. Works,
12, Simla Street, Calcutta.

কিসা গোতমী

—জীবন-ভিক্ষা—

চিত্রশিল্পী···শ্রীযুত শৈলেন্দ্র নাথ দে] [সত্ত্বাধিকারী···মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, বর্দ্ধমান।

Color Blocks & Printings By K. V. SEYNE & BROS. CALCUTTA

প্রথম বর্ষ | চৈত্র ১৩২০ | দ্বিতীয় খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

জীবন-ভিক্ষা

"দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো দুলালে আগলি' বক্ষে,
বিয়োগ-উৎস উষ্ণ-সরিতে দর-বিগলিত চক্ষে,
শতচুম্বনে মেলে না নয়ন!
চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন",—
অভাগী বিহগী দারুণ আহত মরণ-শ্যেনের পক্ষে।

"স্তন-ক্ষীর-ধার অধরে বাছার আজি কি লেগেছে তিক্ত?
রসনা-প্রসূন কোন্ পরসাদ— মধু-রসে পরিষিক্ত!
মুখ-চম্পকে মরুর বর্ণ,
শুষ্ক অধর-কমল-পর্ণ—
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু সুধার-বিন্দু-রিক্ত!

"স্বর্গ-মাধুরী আধ-আধ বুলি! কুন্দ বৃন্ত-ছিন্ন
দন্ত-রুচিতে কই সে কান্তি, পুণ্য-হাসির চিহ্ন!
জানি, প্রভু, তব পাণির পরশে
ননীর পুতলি জাগিবে হরষে!—
কোন্ পাষাণের বিষ-মাখা বাণে নয়নের মণি ভিন্ন!

ধর্ম্ম। সৌর-বাষ্পপুঞ্জে যে তাপ ছিল, কালক্রমে তাহার ক্ষয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পের কণিকাগুলিও কেন্দ্রের নিকটে ঘন-সন্নিবিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আবর্ত্তনশীল বস্তু সঙ্কুচিত হইয়া আয়তনে ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়াইলে তাহার আবর্ত্তনবেগ বৃদ্ধি পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে আকুঞ্চনজনিত তাপ উৎপন্ন হওয়ায় জিনিসটা পূর্ব্বের তুলনায় গরম হইয়া পড়ে,—ইহাও জড়পদার্থের আর একটা বিশেষ ধর্ম্ম। নীহারিকাবাদীরা বলেন, সৌর জগতের বাষ্পরাশিতে যুগপৎ এই দুটি প্রাকৃতিক কার্য্য দেখা দিয়াছিল। তাপক্ষয়জনিত আকুঞ্চনে উহার কেন্দ্র-স্থান যেমন উত্তপ্ত হইয়াছিল, তাহার আবর্ত্তনবেগও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ভাঁটার ন্যায় গোলাকার কোন কোমল বস্তুকে আবর্ত্তিত করিলে, তাহার আকার ঠিক রাখা যায় না। ইহাতে পূর্ণ বর্ত্তুলাকার জিনিস চেপ্‌টা হইয়া যায়। নীহারিকাবাদীদের মতে আমাদের সৌরজগতের ঘূর্ণমান নীহারিকাস্তূপের দশাও অবিকল তাহাই ঘটিয়াছিল। অবিরাম আবর্ত্তনের বেগে তাহা চেপ্‌টা হইয়া কতকটা স্থূল-মধ্য কাচের (Convex Lens) আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

যাঁহারা আজকাল সৃষ্টিতত্ত্বের নূতন-সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন, নীহারিকাবাদীদের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির সত্যতায় তাঁহারা সন্দেহপ্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ইহার পরেই গ্রহগণের উৎপত্তি-সম্বন্ধে নীহারিকাবাদীরা যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা ইহারা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিতেছেন না। নীহারিকাবাদীরা বলেন, বর্ত্তুলাকার সৌর-নীহারিকা ঐ প্রকার মাঝে মোটা ও প্রান্তে খুব চেপ্‌টা হইয়া পড়িলে, প্রান্তের পদার্থগুলি মূল-নীহারিকা হইতে পৃথক্ হইয়া প্রথমে একটি বিচ্ছিন্ন অঙ্গুরীয়াকার ধারণ করিয়াছিল। এইরূপে মূল-নীহারিকার ক্ষয় হওয়াতে, সেটি আবার তাহার গোলাকৃতি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাপক্ষয়ের বিরাম ছিল না; কাজেই মূল-নীহারিকা আবার সঙ্কুচিত হইয়া প্রবলবেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ইহাতে উহার আকার আবার পূর্ব্ববৎ চেপ্‌টা হইয়া পড়ায় নূতন আর একটি বলয়াকার নীহারিকার উৎপত্তি হইয়াছিল। নীহারিকাবাদীদের মতে মূল-নীহারিকার এই প্রকার আকুঞ্চন-প্রসারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে এক একটি নূতন বলয়ের সৃষ্টি বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। ইঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বিচ্ছিন্ন বলয়াকার নীহারিকাগুলিই কালক্রমে জমাট বাঁধিয়া বুধ শুক্র পৃথিবী বৃহস্পতি প্রভৃতি ছোট-বড় গ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে;—মূল-নীহারিকার যে অংশ কেন্দ্রস্থানে অবশিষ্ট ছিল, তাহাই জমাট-বাঁধিয়া সূর্য্যের আকার গ্রহণ করিয়াছে। উপগ্রহদিগের উৎপত্তি প্রসঙ্গেও নীহারিকাবাদীরা ঐ প্রকার কথাই বলেন। প্রত্যেক বলয়ের পদার্থগুলি উহারই মধ্যে কোনও এক স্থানে জমাট-হইলে, এই নূতন নীহারিকাস্তূপ মূল-নীহারিকার ন্যায় আবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ইহার ফলে ক্ষুদ্র নীহারিকাস্তূপগুলিও পর পর এক একটি বলয় রচনা করিয়াছিল।—এই ক্ষুদ্র বলয়গুলিরই গঠনোপাদান জমাট-বাঁধিয়া উপগ্রহ উৎপাদিত করিয়াছে। সুতরাং আমাদের চন্দ্রের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে বলিতে হয়, মূল-নীহারিকার যে বলয়টি হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি, তাহারই উপাদান জমাট বাঁধিয়া একটি নূতন-নীহারিকাস্তূপ সৃষ্টি করিলে, ইহার কিয়দংশ দিয়া আর একটি ক্ষুদ্রতর বলয়ের রচনা হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় বলয়টিরই জমাট-অবস্থা চন্দ্র।

নীহারিকাবাদিগণের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী, এবং উহা আমাদের কল্পনার ক্ষেত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের এমন একটি গম্ভীর-মূর্ত্তি আনয়ন করে যে, তাহা উপলব্ধি করিলে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। ব্যাপারটা কিন্তু কেবল কল্পনারই বিষয়; ইহার সহিত জড়তত্ত্বের সমস্যা এমন জটিলরূপে মিশিয়া গিয়াছে যে, আধুনিক গণিতের সাহায্যেও উহার সত্যতাটুকু পৃথগ্‌ভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাওয়া যায় না; সুতরাং, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ যেমন ভূস্তরে প্রোথিত জীব-কঙ্কাল অনুসন্ধান করিয়া জীবের অভিব্যক্তির ধারা আবিষ্কার করেন, আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণও অবিকল সেইপ্রকার উপায়াবলম্বনে জ্যোতিষ্কলোকের অভিব্যক্তি-প্রণালী নিরূপণ করিতেছেন। আজকাল বড় বড় দূরবীণের অভাব নাই, অনন্ত আকাশে ছোটবড় নীহারিকাস্তূপও যথেষ্ট আছে। তার পর, এগুলির মধ্যে কোন্‌টি নবীন এবং কোন্‌টিই বা প্রাচীন তাহাও বুঝিয়া লইবার উপায় রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অন্য উপায় না পাইয়া দূরবীণ দিয়া নীহারিকাপুঞ্জগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং

লাপ্লাসের সিদ্ধান্তানুযায়ী তাহাদের গঠনে কোনও বৈচিত্র্য আছে কি না মিলাইয়া দেখিতেছেন। ইহাতে যে, কোন ফল পাওয়া যায় নাই,—একথা বলা যায় না। আণ্ড্রোমিডা (Andromeda) রাশিস্থ বৃহৎ-নীহারিকাটিকে ইহারা সৌর-নীহারিকার প্রাথমিক অবস্থার মতই চেপ্টা-আকারে দেখিতে পাইয়াছেন। বলয়াকৃতি নীহারিকা-পুঞ্জও আকাশের স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে। সুতরাং লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ যে, একবারে মিথ্যা একথা নূতন-'সিদ্ধান্তীরা'ও বলিতে পারিতেছেন না। লাপ্লাস্ কেবল এক নীহারিকাপুঞ্জেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বিবিধ বিচিত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বলিয়াই নূতন সম্প্রদায়ের সন্দেহ দাঁড়াইয়াছে। ইঁহারা বলিতেছেন, হয় ত নীহারিকাপুঞ্জ হইতে, লাপ্লাসের অনুমিত প্রথায়, নব নব বলয়ের উৎপত্তি হইয়াছে ; কিন্তু জ্যোতিষ্কদের অভিব্যক্তির ইহাই একমাত্র উপায় নহে ;—নীহারিকাবাদীদের কথিত উপায়ের সহিত সম্ভবতঃ অপরাপর অনেক উপায় মিলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে।

যাহা হউক, জর্জ ডারুইন্-প্রমুখ নূতন-জ্যোতির্বিদ্-সম্প্রদায় বলিতেছেন,—লাপ্লাসের শিষ্যদ্বয় প্রাথমিক নীহারিকাপুঞ্জকে যে-প্রকার লঘুপদার্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র পদার্থটি একত্র থাকিয়া আবর্ত্তিত হইতে পারে কি না, সন্দেহ হয়। আর, পরে আবর্ত্তিত হইলেও, উহা যে মাঝেমাঝে সম্পূর্ণ-বিচ্ছিন্ন বলয়-রচনা করিতে পারিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ হয়। ঐপ্রকার লঘু-পদার্থ ঐপ্রকার ভীষণবেগে আবর্ত্তিত হইতে থাকিলে, নীহারিকারাশি হইতে কিয়দংশ অবিচ্ছেদেই বাষ্পকারে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িত।

শনি-গ্রহের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া বলয় আছে ; সম্ভবতঃ ইহাই নীহারিকাবাদীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নূতন-সিদ্ধান্তীরা বলিতেছেন,—কেবল শনির বলয় দেখিয়া আমাদের গ্রহগুলি সূর্য্যের চারিদিকের বলয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নয় ; কারণ, বলয়াকার বস্তুর সামগ্রী জমাট-বাঁধিতে গেলে উহার কেন্দ্রেই জমা হইত ; কাজেই বলয়গুলির বাষ্পরাশি শীতল হইলে বলয়ের কেন্দ্রস্থ সূর্য্যকেই পুষ্ট করিত। এই জন্যই, বলয়েরই কোনও অংশে সমগ্র-বাষ্পের সঞ্চয় স্বীকার করিতে হইলে, কেবল বাষ্পেরই অণুপরমাণুর পরস্পর-আকর্ষণকে হিসাবের মধ্যে আনিলে চলে না, বাহিরের কোনও একটি প্রচণ্ড শক্তিকেও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। মহাকাশের একাংশের নীহারিকাপুঞ্জে এই প্রকার কোন্ মহাশক্তি কার্য্যকরিয়া বাষ্পবলয়স্থ সামগ্রীরাশিকে একত্র করিয়া এক একটি গ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিল,—নীহারিকাবাদে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

নীহারিকাবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত আপত্তি-খণ্ডন করিতে গিয়া বলেন যে, নীহারিকার বলয়গুলি ঠিক্ এক সমতলে ছিল, এবং তাহার স্থূল-মূর্ত্তি বলয়ের অনুরূপ হইলেও, হয় ত তাহা স্থানে স্থানে উঁচুনীচু হইয়া তরঙ্গের আকারে বর্ত্তমান ছিল,—এই প্রকার অবস্থায় সমগ্র বলয়টির ভারকেন্দ্র (Centre of Gravity) বলয়েরই ভিতরকার কোনও অংশে থাকা বিচিত্র নয়! এই উক্তিতেই নূতন-সিদ্ধান্তীদের আপত্তি আছে। তাঁহারা বলিতেছেন, মূল নীহারিকা হইতে বিচ্ছিন্ন বলয়গুলিকে অসমান এবং মাঝে মাঝে ভাঙ্গাচোরা বলিয়া স্বীকার করিলেও অনেক সমস্যার মীমাংসা হয় না। এই প্রকার ভাঙ্গা-বলয়দ্বারা যে গ্রহের উৎপত্তি হইবে, তাহার আবর্ত্তনের দিক্ মূল নীহারিকার আবর্ত্তনের দিকের অনুরূপ হওয়াই সম্ভব। আমাদের পৃথিবী ও চন্দ্র প্রভৃতি অনেক গ্রহ-উপগ্রহ ঐপ্রকার-দিকে আবর্ত্তন করে সত্য, কিন্তু সকল গ্রহের আবর্ত্তনদিক একপ্রকার দেখা যায় না। আমাদের পৃথিবী যে পাকে ঘোরে, নেপ্চুন গ্রহটিকে—বিশেষতঃ তাহার উপগ্রহগুলিকে—ঠিক্ তাহারই বিপরীত-পাকে ঘুরপাক্ খাইতে দেখা যায় ; সম্প্রতি শনির নবম উপগ্রহটিকেও ঐপ্রকার বিপরীতদিকে ঘূর্ণন করিতে দেখা গিয়াছে।—নীহারিকাবাদীরা এগুলির ব্যাখ্যান দিতে পারেন না। এইসকল দেখিয়া শুনিয়া নূতন-জ্যোতির্বিদ্-সম্প্রদায় বলিতেছেন,—প্রাথমিক-নীহারিকা হইতে গ্রহদের উপাদান বলয়াকারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই ; খুব সম্ভবতঃ স্ক্রুর প্যাঁচের মতই উহা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রকার প্যাঁচওয়ালা-নীহারিকা আকাশে অনেক দেখা যায়।

এখন নূতন-সিদ্ধান্তীরা গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে কি বলেন দেখা যাউক।—ইঁহাদের মতে, পৃথিবী শুক্র বুধ প্রভৃতির উপাদান সৌর-নীহারিকায় ছিল না। এক

সূর্য্যই হয় ত প্রথমে বিরাজমান ছিল; তা'র পরে ইহাই নিজের প্রচণ্ড-আকর্ষণী-শক্তিতে বাহির হইতে বহুউল্কাপিণ্ড টানিয়া আনিয়া ঐসকল গ্রহ-উপগ্রহদিগের সৃষ্টি করিয়াছে। ইঁহারা বলিতেছেন, এই সিদ্ধান্তের সহিত নীহারিকাবাদের বিরোধ হইবার আশঙ্কা নাই। নীহারিকাবাদীরা বাষ্পস্থ অতিসূক্ষ্ম-কণা লইয়া হিসাব করিয়াছেন, নূতন-সিদ্ধান্তীরা ঐ বাষ্প-কণাগুলিকে না লইয়া বড় বড় উল্কাপিণ্ড লইয়া হিসাব করিতেছেন;—ইহাই একমাত্র পার্থক্য। সুতরাং নীহারিকাবাদীদের কল্পিত সেই বিচিত্র গতিসম্পন্ন বাষ্প-কণিকাগুলি জমাট-বাঁধিয়া যদি গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তি করিয়া থাকে, তবে ঠিক্ সেই প্রকার বিচিত্র গতিবিশিষ্ট এই উল্কাপিণ্ডগুলিও জমাট হইয়া কেন গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি করিবে না;—ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নীহারিকামাত্রই বাষ্পময়; সুতরাং যদি এগুলি সত্যই অসংখ্য উল্কাপিণ্ডের সমষ্টি হয়, তবে তাহাতে বাষ্প আসিল কোথা হইতে?—এই প্রশ্নটি অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে নবীন-জ্যোতিষীরা বলেন,সংকীর্ণস্থানে বিচিত্র-গতিসম্পন্ন বহুউল্কাপিণ্ড আবদ্ধ হইয়া পড়িলে তাহাদের পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহাতে যে উল্কাদেরই দেহ বাষ্পীভূত হইয়া জ্বলিতে থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে, নব-সিদ্ধান্তীরা নীহারিকাপুঞ্জের বাষ্পরাশিকে উল্কাপিণ্ডের দেহজ-বাষ্প বলিয়া স্বীকার করেন;—নীহারিকার জন্মকালে এই বাষ্প তাহাতে ছিল না।

উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর অভিব্যক্তির সূত্র খুঁজিতে গেলে, বৈজ্ঞানিকগণ প্রথমে উহাদের জাতির সন্ধান করেন। এই প্রকারে জাতি-বিভাগ সম্পন্ন হইলে, প্রত্যেক জাতি হইতে কতগুলি উপ-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে সে তত্ত্ব সংগ্রহ করা হয়। নূতন-জ্যোতিষি-সম্প্রদায়, জ্যোতিষ্কদের অভিব্যক্তির সূত্র খুঁজিতে গিয়া, ঠিক এই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। যেপ্রকারেই হউক পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ যে একসময়ে তরল অবস্থায় থাকিয়া প্রচণ্ডবেগে ঘুরিতেছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। এই প্রকারে ঘূর্ণ্যমান তরল-পদার্থকে কল্পনা করিয়া, তাহা বিচিত্র-অবস্থায় পড়িয়া কত বিচিত্র আকার গ্রহণ করিতে পারে জ্যোতিষিগণ প্রথমে তাহার হিসাব করিয়াছেন; পরে, এই সকল বিচিত্র-মূর্ত্তির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি স্থায়িত্ব লাভ করিয়া আমাদের সুপরিচিত গ্রহ-উপগ্রহের মত হইতে পারিয়াছে, তাহার বিচার করিয়াছেন।

মনে করা যাউক, আমাদের সৌরজগতেরই কোন গ্রহ যেন তরলাবস্থায় থাকিয়া অবিরাম আবর্ত্তিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তনের বেগ বাড়িয়া চলিয়াছে। তরল-পদার্থের অণুগুলির মধ্যে বাঁধন স্বভাবতঃই বড় অল্প, তা'র উপর ঐ প্রকার একটা প্রচণ্ড আবর্ত্তন-গতির মধ্যে পড়ায় তাহাদের ভিতরকার ঐ বাঁধন যে আরও শিথিল হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। সুতরাং আবর্ত্তনবেগের ক্রমিক বৃদ্ধিতে গ্রহের তরলদেহস্থ অণুগুলি যে, একসময়ে বন্ধনহীন হইয়া পড়িতে পারে, আমরা তাহাও অনুমান করিতে পারি। নব্য-জ্যোতিষীরা তরল-গ্রহের অণুগুলির এইপ্রকার একটা সাম্য-অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন, এবং উহার পরেও আবর্ত্তনবেগ-বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে জিনিসটার অবস্থা কিপ্রকার হইয়া দাঁড়ায়, তাহাও হিসাব করিয়াছেন। উচ্চ-অঙ্গের গণিতের কথা এপ্রকার প্রবন্ধে আলোচনার চেষ্টা বৃথা, সুতরাং তরল-গ্রহদের অণুগুলির ভিতরকার বন্ধন-ছেদ হইলে এবং এই অবস্থায় তাহাদিগকে প্রবলতর-বেগে আবর্ত্তিত করিতে থাকিলে কিপ্রকার অবস্থা দেখা যাইবে, তাহা গণিতবিদ্-গণের মুখে শুনিয়াই আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে। গণিতবিদ্‌গণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, আবর্ত্তন-বেগের আধিক্যে তরল-পদার্থের যেসকল অণু পরস্পরের মধ্যকার আকর্ষণ হারাইয়াছিল, তাহারাই আবার প্রবলতর আবর্ত্তন-বেগে পড়িয়া পূর্ব্বের আকর্ষণী-শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। কথাটা একটু বিসদৃশ শুনাইল,—কিন্তু ব্যাপারটি গণিতিক হিসাবে প্রাপ্ত, সুতরাং ইহার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। গণিতজ্ঞ পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কোন তরল-গ্রহের আবর্ত্তন-বেগ ক্রমে বাড়াইতে থাকিলে অণুগুলির বন্ধন কেবল কমিয়াই ক্ষান্ত থাকে না।—প্রথমে হ্রাস হয় বটে, কিন্তু এই হ্রস্বতা চরমসীমায় উপস্থিত হইলে আবার ক্রমে সেইরূপই বৃদ্ধি পায়,—এবং এই বৃদ্ধি ও হ্রস্বতা পর্য্যায়ক্রমে চলিতে থাকে।

গণিতবিদ্‌গণের পূর্ব্বোক্ত গণনার কথা শুনিয়া জ্যোতিষীরা বলিতেছেন,—আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলি

তরল-অবস্থায় থাকিয়া যখন ক্রম-বদ্ধমান বেগে ঘুরিতেছিল, তখন তাহাদের দেহের অণুগুলি, কখন আকর্ষণী-শক্তি হারাইয়া এবং কখনও বা সেইশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, বিচিত্র-আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রথম-অবস্থায় উহারা নিজেদের গোলাকৃতি ত্যাগ করে নাই। দ্বিতীয়-অবস্থায় সেই গোলাকৃতিই ডিম্বাকৃতিতে পরিণত হইয়াছিল। ডিম্বকে' টেবিলের উপরে শায়িত রাখিয়া ঘুরাইলে, যে প্রকার দেখায় গ্রহগণ তখন সেই প্রকারে ঘুরিত। তৃতীয়-অবস্থায় উপনীত হইলে ডিম্বাকার গ্রহের এক প্রান্ত একটু স্থূল হইয়া পড়িয়াছিল এবং আবর্ত্তনবেগের বৃদ্ধির সহিত ঐ স্থূলতা বৃদ্ধি হওয়ায় গ্রহটি দ্বিধা-বিভক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহার পরেও আবর্ত্তনবেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, গ্রহের সেই স্ফীত-অংশ মূল গ্রহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। নব্য-জ্যোতিষীদিগের মতে, এই প্রকারে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্কগুলিই আমাদের সুপরিচিত উপগ্রহ। ক্রম-বদ্ধমান আবর্ত্তনবেগেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মূল-গ্রহের আকৃতি-পরিবর্ত্তন করাইয়া উপগ্রহদের জন্ম দিয়াছে।

আবর্ত্তনবেগের বৃদ্ধির সহিত তরল-গ্রহদের আকৃতি পরিবর্ত্তনের যে পরিচয় দেওয়া হইল, জর্জ ডারুইন্ প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বহুগবেষণায় তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। একটি অখণ্ড-বস্তু, কেবল আবর্ত্তনবেগে, দ্বিধা-খণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত! কিন্তু ইহা গণিত সম্মত, কাজেই ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। জ্যোতিষ্কলোকের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ক্ষুদ্র জীবদেহের সূক্ষ্ম জীবকোষগুলির কার্য্য স্মরণ করিলে, সেখানেও এক একটি অখণ্ড কোষকে ক্রমান্বয়ে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। এক হইতে দুই, এবং দুই হইতে বহুর উৎপত্তি প্রকৃতির রাজ্যে পদে পদে লক্ষ্য করা যায়। বিধাতা একই নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া জড় ও জীবকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং যদি কেহ অনুমান করেন যে, যে শক্তিতে এবং যে পদ্ধতিতে বিশাল জ্যোতিষ্কলোকের গ্রহ-নক্ষত্র দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যুগল-নক্ষত্র ও উপগ্রহদের গঠন করিতেছে, জীবদেহের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম কোষগুলিও সেই শক্তিতে বিভক্ত হইয়াই জীবনেরও কার্য্য দেখাইতেছে, তাহা হইলে বোধ হয় অনুমানটা নিতান্ত অন্যায় হয় না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

শোক

দুঃখ দিও আজীবন,—দুঃখ নাই তাতে,
তব শুভ-দৃষ্টি যদি থাকে তার সাথে।
দিও ধৈর্য্য সহিবারে শোকের আঘাত,
প্রণাম করিতে দিও হ'লে অশ্রুপাত।
এমন আলোক-ভরা সুন্দর ধরণী,
বাজে যদি কভু তাহে বিষাদ-রাগিণী ;
তুমি বেঁধে দিও তাহে সান্ত্বনার সুর,
মর্ম্মে মর্ম্মে দিবে তান শান্তি সুমধুর।

এমন আনন্দভরা সংসার আমার,
ঘেরে যদি কভু তাহে মৃত্যুর আঁধার ;
জ্বেলে দিও তুমি তাহে অমৃত-আলোক,
শুভ হ'বে অমঙ্গল, দূরে যা'বে শোক।
অনেক দিয়েছ নাথ! যদি তাহা হ'তে
তুলে লও কভু কিছু—দুঃখ নাই তাতে।
আমি শুধু চাই—সদা তব শুভ্র-হাসি
ফোটে যেন জীবনের অন্ধ তমঃ নাশি'।

শ্রীঅনন্ত নারায়ণ সেন।

যুগল সাহিত্যিক

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমালোচনা ও সম্পাদক

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল—রাজেন্দ্রের কোনও খোজ খবর নাই। তিনকড়ি তাহাদের বাড়ীতে গিয়া মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে—'বাবু কবে ফিরিবেন, কিছু সংবাদ আসিয়াছে কি?'—উত্তর পায়—'কোনও সংবাদ আসে নাই!'

রাজেন্দ্রের ফিরিতে যখন এতই বিলম্ব হইতেছে—তখন তাহাকে একখানা চিঠি লেখা প্রয়োজন। এই ভাবিয়া তিনকড়ি কাগজ-কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল। প্রথমে অন্যান্য কথা লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া শেষে 'পুনশ্চ' দিয়া লিখিল—"আর্য্যশক্তির সে সমালোচনা দেখিয়াছ, বোধ হয়। সে সমালোচনা নিতান্তই অর্ব্বাচীনের মত লেখা—তাহার কোনও মূল্য নাই।"

আবার সপ্তাহ কাটিল—কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না।

একদিন সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে ফিরিয়া তিনকড়ি দেখিল, নূতন "বঙ্গপ্রভা" আসিয়াছে। প্রসূনাঞ্জলির কি সমালোচনা হইল দেখিবার জন্য আগ্রহের সহিত মোড়ক খুলিল; অনেক পুস্তকের সমালোচনা বহিয়াছে—কৈ, প্রসূনাঞ্জলির নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

তিনকড়ি জানে, রাজেন্দ্রের ডাক প্রতিদিন ঠিকানা কাটিয়া সুন্দরগঞ্জে পাঠান হয়, দুই একদিনের মধ্যেই এই সংখ্যার "বঙ্গপ্রভা"খানি তাহার হস্তগত হইবে। সে তখন আবার একটা নূতন আঘাত প্রাপ্ত হইবে।

এই সময় আরও তিনখানি কাগজে তিনকড়ির পুস্তকের প্রশংসা বাহির হইয়া গেল। তাহার মধ্যে কেবল একখানি কাগজ "প্রসূনাঞ্জলি"র উল্লেখ করিয়াছে; সমালোচনায় কেবল মাত্র লিখিয়াছে—"ইহা একখানি মামুলী কবিতাপুস্তক।"—তিনকড়ি জানিত, রাজেন্দ্র এ কাগজখানির গ্রাহক নয়; তাই সে আশা করিতে লাগিল—ইহা রাজেন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়িবে না।

কাগজের পর কাগজে অনুকূল সমালোচনা বাহির হওয়াতে, তিনকড়ির একদল ভক্ত জুটিয়া গেল; তাহারা প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনকড়ির বৈঠকখানায় আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিত। পাঁচ ছয় দিন অন্তর তিনকড়ির এক টিন্ করিয়া চা ফুরাইতে লাগিল।

ইহাদের মধ্যে শরদিন্দুই বাস্তবিক সমঝদার লোক ছিল। তাহার বয়স তিনকড়ির অপেক্ষা অল্প—কিন্তু এক একটি এমন কথা বলিত যে, তিনকড়ি আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। ইংরেজি ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য লোকটার বেশ পড়া ছিল। সে প্রায়ই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত—"তিনকড়িবাবু—নূতন কিছু লিখ্‌লেন্ না কি?" নূতন কোনও লেখা পাইলে তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিত—এবং প্রায়ই যথেষ্ট সুখ্যাতি করিত। এইটি তিনকড়ির চক্ষুষ্মান্ ভক্ত। আর একটি ছিল অন্ধ-ভক্ত—তাহার নাম বিহারীলাল। সে পটলডাঙ্গায় একটি ছাপাখানায় প্রিণ্টারী কর্ম্ম করিত—কিন্তু বাঙ্গলা-কাব্য তাহার বেশ পড়া ছিল। সে, তিনকড়ির কোনও রচনায় কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাইত না। কেহ কোন দোষ বাহির করিলে, তাহার সহিত বিহারী কোমর বাঁধিয়া তর্ক আরম্ভ করিত। তিনকড়ির বাড়ীর অতি নিকটেই তাহার বাসা ছিল। "গুঞ্জরণে"র প্রায় সমস্ত কবিতাই তাহার মুখস্থ। তাহার মতে, রবিবাবুর পর বঙ্গদেশে একটি মাত্র কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছে—সেটি তিনকড়িবাবু।

একমাস কাটিয়া গেল—রাজেন্দ্রের কোনও সংবাদ নাই। পূর্ব্বেও সে মাঝে মাঝে জমিদারীতে যাইত বটে—কিন্তু এতদিন ধরিয়া সেখানে থাকিত না; দুই একদিন অন্তর তিনকড়িকে পত্রও লিখিত। ক্রমে তিনকড়ি একটু দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল।

নূতন "আর্য্যশক্তি" আসিয়াছে—এবার তিনকড়ির দুইটি কবিতা ছাপা হইয়াছে। একটিত একবারে প্রথম পৃষ্ঠায়। সম্প্রতি আবার "বঙ্গপ্রভা"-সম্পাদকও কবিতা চাহিয়া তিনকড়িকে পত্র লিখিয়াছেন।

যশের আস্বাদন পাইয়া বন্ধুবিচ্ছেদ-দুঃখ তিনকড়ি

অনেকটা ভুলিয়া রহিল। তাহার ভক্তগণ ক্রমাগত তাহাকে আরএকখানি বহি প্রেসে দিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। অর্থাভাবের অজুহাৎ দেখাইলে, বিহারী বলিল, "আপনি আমাদের প্রেসে ছাপ্‌তে দিন্—যা বিল্ হবে, ম্যানেজার্‌কে বল্‌ব এখন, আমার মাইনে থেকে মাসে মাসে ১০৲ করে কেটে নিয়ে শোধ কর্‌বে। বই বিক্রী হ'লে তখন আপনি আমার টাকা শোধ কর্‌বেন্।"

তিনকড়ি বলিল,—"তোমার ত চল্লিশ্‌টি টাকা মাইনে—মাসে মাসে দশটি টাকা কাটা গেলে তোমার সংসার চলবে কি করে?"

মহা-উৎসাহের সহিত বিহারী বলিল,—"সে আমি যেমন্ করে পারি চালিয়ে নেব।"

এইরূপে কিছু দিন যায়। একদিন, আফিসের একটি বাবুর হাতে নূতন "রত্নাকর" মাসিকপত্র খানি দেখিয়া, তিনকড়ি চাহিয়া লইল।

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে, শেষদিকে দেখে—প্রসূনাঞ্জলির সমালোচনা রহিয়াছে। বেশ অনুকূল সমালোচনা তিনকড়ির মনে হইল,—তবে প্রশংসাটি একটু যেন মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তা হউক—উহা রাজেন্দ্রের বেদনাতুর হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ করিবে।

বাবুটিকে তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"মশায় এ কাগজ খানি কবে পেলেন্?"

"আজ্‌কেই। আফিসে আস্‌বার পথে, ওদের আফিসে গিয়ে হাতে ক'রে নিয়ে এলাম্।"

"এ কাগজখানি অনুগ্রহ ক'রে আমায় দিন্—আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি কাল আপনাকে আর এক খানি এনে দেব।"

"আচ্ছা বেশ।"

তিনকড়ি ভাবিল,—আজ "রত্নাকর" পোষ্ট হইয়া, কাল প্রাতে রাজেন্দ্রের কলিকাতার বাড়ীতে পৌছিবে। কাল ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইলে, পরশু জমিদারীতে উহার হস্তগত হইবে। এ কাগজখানি আমি আজই তাহাকে পাঠাইয়া দিই—একদিন পূর্ব্বে সে পাইবে। আমার জন্যই বিক্ষত হৃদয়ে সে আজ গৃহত্যাগী—শুশ্রূষাটুকুও আমার হাত দিয়া প্রাপ্ত হউক্।—এই মনে করিয়া, উচ্ছ্বসিত ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া তিনকড়ি তাহার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিল—"রত্নাকর" খানিও পাঠাইয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে বাহির হইয়া, সেই বাবুটির জন্য একসংখ্যা কাগজ কিনিবার অভিপ্রায়ে, বাড়ী-ফিরিবার পথে তিনকড়ি "রত্নাকর" আফিসে গেল। ম্যানেজার্ তখন সমুদায় কাগজ ডেস্‌প্যাচ্ শেষ করিয়া, শ্রান্তদেহ চেয়ারে এলাইয়া দিয়া, সুখে ধূমপান করিতেছেন।—

তিনকড়ি গিয়া একসংখ্যা কাগজ চাহিল।

ম্যানেজার্ বলিলেন,—"বসুন্ মশাই—দিচ্ছি।"

নিকটস্থ বেঞ্চিতে তিনকড়ি উপবেশন করিল।

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মশায়ের নাম?"

"আমার নাম শ্রীতিনকড়ি বিশ্বাস।"

এমন সময় একটি বাবু—ভিতরদিকের দরজায় মুখ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ম্যানেজারবাবু—সুন্দরগঞ্জের কাগজ গুলা পাঠালেন্? দেখ্‌বেন যেন ভুল না হয়।"

ম্যানেজার্ বলিলেন,—"পাঠিয়েছি। ভুলিনি।"

সুন্দরগঞ্জের নাম শুনিয়া তিনকড়ি কিছুতেই কৌতূহল দমন করিতে পারিল না; ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি সুন্দরগঞ্জ জানি। সেখানে আপনাদের কে কে গ্রাহক আছেন্ মশায়?"

ম্যানেজার্ বলিলেন—

"গ্রাহক?—গ্রাহক সেখানে কেউ নেই।"

"তবে—ঐ যে উনি সুন্দরগঞ্জে কাগজ পাঠাবার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্?"

ম্যানেজার্ চুরুটে লম্বা টান্ দিয়া বলিলেন,—"সেখানে খোদ্ কর্ত্তাই যে র'য়েছেন—সম্পাদক-মশায়।"

তিনকড়ি বেশ্ বুঝিতেছিল, এসকল কথা জিজ্ঞাসাবাদ তাহারপক্ষে একান্তই অনধিকারচর্চ্চা; কিন্তু তাহার দুর্নিবার কৌতূহল, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। তাই সে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"সম্পাদক মশায় সেখানে কি কর্‌ছেন মশায়?"

"হাওয়া বদ্‌লাচ্ছেন। পদ্মার উপরেই, সেখানকার জমিদার রাজেন্দ্রবাবুর সুন্দর একটি কাছারিবাড়ী আছে—সেইখানে রয়েছেন।"

"আর কা'র কা'র নামে কাগজ পাঠালেন্?"

"সম্পাদক মশায়ের ভাইপো—করুণা বাবু।—

"তিনি সম্প্রতি সেখানে নায়েবী কর্ম্মে বাহাল্ হ'য়েছেন। আরএকখানা গেল রাজেন্দ্রবাবুর নামে।"

ম্যানেজার্ মহাশয়ের চুরট শেষ হইল। উঠিয়া, আলমারি হইতে একখানি "রত্নাকর" বাহির করিয়া তিনকড়ির হাতে দিয়া বলিলেন,—"এই নিন্—ছ'আনা দাম।"

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কবিতার নমুনা

সপ্তাহপরে তিনকড়ি বহু-আকাঙ্ক্ষিত পত্রখানি পাইল। পোষ্টকার্ডে অতি সংক্ষিপ্ত-ভাষায় লেখা—

"ভাই তিনু, তোমার দুইখানি পত্র পাইয়াছিলাম, আজ একখানি পত্র ও মাঘের 'রত্নাকর' পাইলাম—তজ্জন্য বহুধন্যবাদ। নানাকাজের ভিড়ে পত্রাদি লিখিবার অবকাশ পাই নাই। যাহা হউক, আগামী বুধবারে কলিকাতায় ফিরিব—সাক্ষাতে সমস্ত কথা হইবে। ইতি

তোমার স্নেহের—

রাজেন্।"

দিন গণিয়া গণিয়া অবশেষে বুধবার আসিল। আফিস হইতে ফিরিয়া, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া, তিনকড়ি বাহির হইতে চাহিল।

কিরণ বলিল,—"চায়ের জল চড়িয়েছি।"

"চা আমি সেখানে খাব।"

"ঝি জলখাবার আন্‌তে গেছে—এখনি এল বলে। অন্ততঃ খাবার্টা খেয়ে যাও।"

"না—আমি সেইখানেই খাব", বলিয়া তিনকড়ি বাহির হইয়া গেল।

রাজেন্দ্রের গৃহে পৌঁছিয়া দেখিল—দ্বারের নিকট তাহার গাড়ী জোতা প্রস্তত। উপরে উঠিয়া দেখিলেন—বৈঠক্‌খানা শূন্য। দুইএক মিনিট পরে সাজ-সজ্জা করিয়া রাজেন্দ্র বৈঠক্‌খানায় আসিল।

তিনকড়ি বলিল,—"কি হে—কোথাও বেরুচ্ছ না কি?"

"হ্যাঁ।—কেমন আছ?"

"ভাল আছি।—কোথা চল্লে?"

"এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে।"

"কোথা?"

রাজেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"কৃষ্ণবিহারী বাবুর বাড়ী।"

"কৃষ্ণবিহারীবাবু কে?"

রাজেন্দ্র এই সময় নিজের পকেট হইতে ঘড়ি ও চেন্ বাহির করিয়া খানসামাকে দিয়া বলিল,—"ওরে, আমার সোণার ঘড়ি আর গার্ডচেন্‌টা নিয়ে আয়।"

তিনকড়ি আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ কৃষ্ণবিহারী বাবু?"

রাজেন্দ্র অন্যমনে বলিল—"আঁা?—ঐ যে—কি বলে 'রত্নাকর' কাগজের সম্পাদক কৃষ্ণবিহারীবাবু।"

উভয়ের পরিচিত বন্ধুবর্গের নাম উভয়ে বিলক্ষণ অবগত ছিল। তাই তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"তাঁর সঙ্গে কবে আলাপ হ'ল?"

রাজেন্দ্র একটু যেন বিরক্ত হইয়াই বলিল,—"বেশী দিন নয়।"

এই সময় খানসামা সোণার ঘড়ি ও গার্ডচেন্ আনিয়া দিল।—তাহা গলায় ধারণ করিয়া রাজেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তিনকড়ি বলিল,—"একটু পরেই যেও না-হয়। এই ত মোটে সাড়ে-সাতটা; এরই মধ্যে তোমার পোলাও সেখানে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে না!—বস"।

"বস্‌ব?—আচ্ছা"—বলিয়া রাজেন্দ্র উপবেশন করিল। এক মিনিট—দুই মিনিট—তিন মিনিট—দুইজনেই নীরব। তিনকড়ি মাঝেমাঝে বন্ধুর দিকে দৃষ্টি করিতেছে—সে দৃষ্টিতে বিষাদ এবং আমোদ সমভাবেই মিশ্রিত। রাজেন্দ্রের ভাবটা অন্যরূপ, সে ক্রমাগত উস্‌খুস্ করিতে লাগিল।

তাহার ভাব দেখিয়া তিনকড়ি বলিল—"আচ্ছা, এখন তা' হ'লে উঠি। আর তোমার দেরী ক'রে দেব না।"

রাজেন্দ্র যেন বাঁচিল—তিনকড়ি উঠিবার পূর্ব্বেই সে উঠিয়া পড়িল। বলিল,—"উঠ্‌লে?—আচ্ছা, কাল আবার দেখা হ'বে।"—বলিয়া উভয়ে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। রাজেন্দ্র আর বাক্যব্যয়মাত্র না করিয়া গাড়ীতে উঠিল।

তিনকড়ি বুকের ভিতর একটা ভারী বোঝা লইয়া এক পা এক পা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। সে যে জল

খাবার খাইয়া আসে নাই, চা পায় নাই, সে কথা স্ত্রীকে বলিতে পারিল না।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা, তিনকড়ির গৃহে ভক্ত-সমাগম হইল। তাহাদের সঙ্গে বসিয়া সে গল্প-গুজব করিতে লাগিল।—পূর্ব্বে কোনও দিন সন্ধ্যাবেলা রাজেন্দ্রের বাড়ী যাইতে বিলম্ব হইলে, রাজেন্দ্র দ্বারবান্ পাঠাইয়া দিত। তিনকড়ির মনে সম্পূর্ণ না হউক—একটু ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, হয়ত এখনি রাজেন্দ্রের দ্বারবান্ ডাকিতে আসিবে।—রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল, কেহই আসিল না।

পরদিন সন্ধ্যার পর উপযাচক হইয়া তিনকড়ি রাজেন্দ্রনাথের গৃহে গেল। রাজেন্দ্র তখন একা বসিয়া, সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। তিনকড়িকে দেখিয়া বলিল,—"এস—কাল আসনি যে?"

তিনকড়ি বসিয়া বলিল,—"কাল কএকটি লোক এসেছিলেন—তাঁরা প্রায় রাত্রি সাড়েন'টা অবধি ব'সে রইলেন; তাই আর আসা হল না।"

"ওঃ"! বলিয়া রাজেন্দ্র আবার খবরের কাগজে মন দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাগজ ফেলিয়া রাজেন্দ্র বলিল, "রামধনিয়া দু পেয়ালা চা লাও রে।"

তিনকড়ি বলিল,—"তার পর, সেদিন কৃষ্ণবিহারীবাবুর বাড়ী আর কে কে নিমন্ত্রিত ছিলেন?

"অনেকেই ছিলেন। ঔপন্যাসিক গোবৰ্দ্ধনবাবু, কবি শ্যামাকান্ত, তারপর, তোমার 'বঙ্গপ্রভা'র সম্পাদক গৌরীনাথবাবু—আরও অনেকে ছিলেন।"

"তা হ'লে, বেশ্ দিব্যি সাহিত্যিকের মজলিস্‌টি জ'মেছিল বল!"

"হঁ্যা।"

তিনকড়ি অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কথাবার্ত্তায় আর তেমন জমিল না। চা-পান করিয়া, কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, তিনকড়ি বিদায়গ্রহণ করিল।

এখন হইতে আর তিনকড়ি প্রত্যহ রাজেন্দ্রের বাড়ী যাইত না। দুইদিন চারিদিন অন্তর একদিন যাইত। উভয়ের মধ্যে মৌখিক শিষ্টাচারটুকু মাত্র রহিল, সে প্রাণখোলা বন্ধুত্ব এখন আর নাই।

তিনকড়ি দেখিল, রাজেন্দ্রেরও জনকএক ভক্ত জুটিয়া গিয়াছে। তাহারা প্রায়ই তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া, তাহার প্রসূনাগুলির, "রত্নাকরে" প্রকাশিত নব নব কবিতার অজস্র-প্রশংসাবাদ করে।

একদিন গিয়া দেখিল, তাহার প্রধান ভক্ত অধরচন্দ্র বসিয়া আছে। উভয়ের মধ্যে কি কথোপকথন হইতেছিল, তাহা তিনকড়িকে দেখিয়া বন্ধ হইয়া গেল।

আর একদিন দেখিল, অধরের সঙ্গে বসিয়া রাজেন্দ্র কি কতকগুলা কাগজপত্র দেখিতেছিল, তিনকড়ি প্রবেশ করিতেই রাজেন্দ্র সেগুলা দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিল।

এই রকম দেখিয়া শুনিয়া, তিনকড়ি তাহার যাতায়াত আরও কমাইয়া দিল। কোনও সপ্তাহে দুই একবার যায়—কোনও সপ্তাহে মোটেই যায় না।

একদিন রবিবার প্রাতে ৮টার সময় তিনকড়ি গিয়া দেখিল, অধরচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তগণ রাজেন্দ্রকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। তিনকড়িকে দেখিয়াই অধরবাবু বলিলেন—"আসুন!—আজকাল যে আর আপনার দর্শনই পাওয়া যায় না!"

তিনকড়ি বসিয়া দেখিল—টেবিলের উপর টাট্‌কা "রত্নাকর" পড়িয়া রহিয়াছে। বলিল "এমাসের নাকি?"—বলিয়া কাগজখানি উঠাইয়া লইল।

"রত্নাকর"পত্রে প্রতিমাসে মাসিকপত্রের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সেই সমালোচনাগুলি ছোটবড় অনেক লেখকেরই বিভীষিকা। তিনকড়ি কাগজখানি খুলিয়া প্রথমেই মাসিক-সমালোচনা পড়িতে লাগিল। দেখিল গত মাসের আর্য্যশক্তিতে প্রকাশিত তাহার একটি কবিতাকে সম্পাদক সমালোচনার তীক্ষ্ণ-ছুরিকাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া, তাহার উপর বিদ্রূপের বিষ বর্ষণ করিয়াছেন। পাঠশেষে তিনকড়ি মুখ তুলিয়া দেখিল, রাজেন্দ্র ও অধরচন্দ্র পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া গোপনে অর্থপূর্ণ হাস্য করিতেছে।

ধরা পড়িয়া, অধর একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"ওসব কি প'ড়্‌ছেন, তিনকড়িবাবু! এসংখ্যায় রাজেন্দ্রবাবুর 'ছিদ্রতরী' ব'লে যে কবিতাটি বেরিয়েছে, সেইটি দেখুন্।"

তিনকড়ি সেটি অন্বেষণ করিয়া মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল। অধরচন্দ্র সমস্তক্ষণ সকৌতুকে তাহার মুখের

পানে চাহিয়া রহিল। পাঠ শেষ হইলে বলিল—"কেমন লাগ্‌ল তিনকড়িবাবু?"

নিজের কবিতার অন্যায় সমালোচনার বিষে তাহার মন তখনও জর্জ্জরিত। তথাপি ক্ষীণস্বরে বলিল—"বেশ্ হয়েছে!"

অধর উত্তেজিতভাবে বলিল—"শুধু বল্লেন,—'বেশ্ হ'য়েছে!'—সে কি তিনকড়ি বাবু?—এই বুঝি আপনার বিচার শক্তি?—না—অন্যকোনও গূঢ় কারণ আছে? আমি বল্‌ছি—একবিতাটি কেবলমাত্র "বেশ্" হয়নি—গত দশ বৎসরের মধ্যে এরকম কবিতা একটিও পড়িনি। আহা! কি বর্ণনার ছটা!—কি শব্দের ঝঙ্কার!"—বলিয়া হাতমুখ নাড়িয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া, অধর মুখস্থ বলিতে আরম্ভ করিল

"কূর্চ্চশেখর তুথাঞ্জন
বিকীর্ণ চতুরঙ্গে,
দীর্ঘজঙ্ঘা আয়তচ্ছদা
কম্পিত বায়ুভঙ্গে।
ঘট্টে ঘট্টে দিক্করীগণ
শোভিছে ঘৃষ্টগাত্রী—
জলজিঘৃক্ষু, কেহ পূর্ণিছে
পলঙ্কষক পাত্রী।

কবি তাঁর ছিদ্রতরীখানি বেয়ে, নদী দিয়ে যাচ্ছেন—পথের দুই তীরের এই বর্ণনা!—ভাষার কি জোর!—উঃ—গা যেন শিউরে উঠে! কি তিনকড়িবাবু—কথা কচ্ছেন না যে?"—বলিয়া উপহাসভরে স্বীয় ওষ্ঠ ও চক্ষুযুগল যুগপৎ সঞ্চালিত করিতে করিতে অধর তিনকড়ির পানে চাহিতে লাগিল!

তিনকড়ি বলিল—"বলি কি, বলুন্? আমি ত ওর অৰ্দ্ধেক্ কথার মানেই বুঝ্‌তে পারিনি!"

অধর এবার প্রকাশ্যভাবেই রাজেন্দ্রের পানে চাহিয়া হাস্য করিল। তাহার পর আবার তিনকড়ির দিকে ফিরিয়া, মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"অভিধান মুখস্থ করুন্—অভিধান মুখস্থ করুন্। আজকালকার দিনে কি আর ফাঁকি দিয়ে কবি হওয়া যায়?"

তিনকড়ি অবনতমুখে চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল।

অধর বলিতে লাগিল—"বিশেষ ঐ থান্‌টা বড়সুন্দর হ'য়েছে—'দিক্করীগণ শোভিছে ঘৃষ্টগাত্রী'—চোখের সাম্‌নে যেন ছবিখানি দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

উপস্থিত একজন জিজ্ঞাসা করিল—"'দিক্করী' মানে কি, অধরবাবু?"

অধর বলিল—"দিক্করী মানে জানেন্ না?—অর্থাৎ কি না, যারা দিক্‌করে—বিরক্ত করে;—কাপড় দাও, গয়না দাও, সাবান দাও, এসেন্স দাও—এই সব ব'লে যারা নিত্য আমাদের দিক্‌করে।"

বাবুটি জিজ্ঞাসা করিল—"স্ত্রীলোক?"

"হ্যাঁ—যুবতী। তা'রা আমাদের বড় দিক্ ক'রে কি না, তাই তাদের নাম দিক্করী।"

বাবুটি একটু গোলমালে পড়িয়া বলিল—"দিক্—পার্সী শব্দ ত?"

রাজেন্দ্র বলিল—"আঃ—কি কর অধর? ভাষা নিয়ে ওরকম ঠাট্টা ভাল নয়। উনি তোমার কথা সত্যি ভেবে নেবেন্। না মশায়, অধরবাবুর কথা আপনি শুন্‌বেন না। দিক্করী মানে যুবতী বটে—কিন্তু ওটা খাঁটি সংস্কৃতশব্দ। অভিধান দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন্।"

কিয়ৎক্ষণ এই সকল আলোচনা শ্রবণানন্তর তিনকড়ি গৃহে ফিরিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বন্ধুত্বের সমাধি

মাসখানেক পরে এক শনিবার, বেলা দুইটার সময় তিনকড়ির আফিস বন্ধ হইল। তাহার পূর্ব্বে বেশ জোরে পশ্‌লা-দুই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। রাস্তার মোড়ে তিনকড়ি ট্রামের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। দুই তিন খানা ট্রাম্ আসিল, সমস্তই লোকে বোঝাই। শেষে বিরক্ত হইয়া, কাপড় যথাসাধ্য গুটাইয়া, ছাতা মাথায় দিয়া, পদব্রজেই তিনকড়ি গৃহাভিমুখে চলিল।

লাল্‌বাজারের মোড়ে আসিয়া দেখিল, ছোট বড় লাল ও নীল অক্ষরে একখানি প্ল্যাকার্ড উপরে মারা রহিয়াছে—

"দেশ-প্রসিদ্ধ-কবি

শ্রীযুক্ত-রাজেন্দ্রনাথবসু-প্রণীত

কাব্যামৃতের উৎস-ধারা

নব-গীতি

প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ মাত্র।"

এই বিজ্ঞাপনটি যেন তিনকড়ির বক্ষে সজোরে মষ্ট্যাঘাত করিল। ভাবিল—"একি!—রাজেন্দ্রের একখানি নূতন বহি ছাপা হইয়াছে—আর আমি, আজপর্য্যন্ত তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিলাম না!—আমি রাজেন্দ্রের এত পর হইয়াছি!—কেন? কি অপরাধ করিয়াছি আমি?"

সেইখানে দাঁড়াইয়া, বিজ্ঞাপনটি পড়িতে পড়িতে, তিনকড়ির চক্ষু সজল হইয়া আসিল। পথচারী লোকের ভিড় পশ্চাৎ হইতে তাহাকে ঠেলিতেছে—সে আর দাঁড়াইতে পারিল না—অগ্রসর হইয়া চলিল।

যত অগ্রসর হইতে লাগিল, পথের দুই ধারে সেই প্লাকার্ড দেখিল। কলিকাতা সহরকে কে-যেন এই নব-কাব্যের নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।

যাইতে যাইতে তিনকড়ি একটি বৃহৎ বাঙ্গলা-পুস্তকের দোকানের সম্মুখীন হইল। পকেটে হাত দিয়া দেখিল, টাকা রহিয়াছে। দোকানে প্রবেশ করিয়া বলিল—"মশায়, একখানি নব গীতি দিন্ ত।"

দোকানের এক কর্ম্মচারী বহিখানি বাহির করিয়া দিল। মূল্য দিয়া, পুস্তকখানি হাতে করিয়া, তিনকড়ি দেখিল—বহুমূল্য নীল-রেশমী কাপড়ে বাঁধা মলাট্, সোণায় সোণায় ঝক্‌মক্ করিতেছে। উৎসর্গপত্রে রহিয়াছে—"অভিন্ন-হৃদয়-বন্ধু শ্রীযুক্ত-অধরচন্দ্র-সেন-মহাশয়-করকমলেষু।" উৎকৃষ্ট পুরু চক্‌চকে কাগজে, উজ্জ্বল কালো কালীতে পাইকা অক্ষরে কবিতাগুলি ছাপা, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় চারিদিকে লালকালীর সুন্দর বর্ডার। মুখপত্রে একখানি ত্রিবর্ণ ছবি—ভিতরে, আর্টপেপারে ছাপা, আরও কয়েকখানি একরঙ্গের বিচিত্র ছবি। যেরূপ ধূমধাম করিয়া ছাপান ও বাঁধান হইয়াছে—প্রত্যেক খানি বহিতে ১৲ টাকার অধিক খরচই পড়িয়া গিয়া থাকিবে। বহিখানির বাহ্যসৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনকড়ির চক্ষু ঝলসিয়া গেল।

বাড়ী পৌঁছিয়া, টেবিলের উপর বহিখানি রাখিয়া, কর্দ্দমাক্ত-জুতা ও সিক্ত-বস্ত্র তিনকড়ি পরিবর্ত্তন করিল। তাহার স্ত্রী আসিয়া বহিখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"একি!—রাজেন্দ্রবাবুর বই?"

তিনকড়ি বলিল—"দেখ্‌তেই ত পাচ্চ?"

"বাঃ—বেশ্ সুন্দর হয়েছে ত!—কবে বেরুল?"

"আজই বেরিয়েছে।"

প্রথম দুইতিনপৃষ্ঠা খুলিয়া কিরণ বলিলেন—"প্রণয়োপহার—প্রিয়বন্ধুবরেষু—এ সব কিছু এবার লিখে দেন্ নি?"

অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে তিনকড়ি বলিল—"না।"

গত চারিপাঁচ দিন তিনকড়ি রাজেন্দ্রের বাড়ীতে যায় নাই। বিকালে বৃষ্টি থামিয়া গিয়া আকাশও পরিষ্কার হইয়া গেল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল—"যাই।"—আবার ভাবিল, 'গিয়া কি হইবে?' সন্ধ্যার পর তাহার নির্জ্জন বৈঠকখানা গৃহে আলো জ্বালিয়া বসিয়া "নবগীতি" পড়িতে লাগিল।—প্রায় সমস্ত কবিতাই পূর্ব্বে তাহার পড়া ছিল। সেকালে,—যখন দুইজনের প্রণয়ভঙ্গ হয় নাই তখন—রাজেন্দ্রের খাতাতেই অনেকগুলি পড়িয়াছিল, বাকিগুলি বন্ধুবরে দেখিয়াছে। গোটাকতক নূতন কবিতাও আছে।

পুস্তকখানি, দুজনের মৃত-বন্ধুত্বের সুসজ্জিত সমাধির মত তাহার মনে হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণপরে বিহারীলাল প্রবেশ করিয়া বলিল—"একা ব'সে কি ক'রছেন্?"

"এস।—রাজেনের নব-গীতি পড়্‌ছিলাম্।"—বলিয়া তিনকড়ি বহিখানি নামাইয়া রাখিল।

বিহারী তক্তপোষের উপর বসিয়া বলিল—"হাঁ—রাস্তায় প্লাকার্ড দেখ্‌ছিলাম্। রাজেনবাবু বই ছাপ্‌তে দিয়েছেন, আপনি ত আমায় একদিনও বল্লেন্-নি।"

"আমিই জান্‌তাম্ না।"

"আপনিও জান্‌তেন্ না!—বলেন্ কি? আপনাদের দুজনে এত ভাব!"

তিনকড়ি একটু বিষাদের হাসি হাসিল।

বহিখানি তুলিয়া লইয়া, মলাট্ উঠাইয়া বিহারী বলিল,—"কৈ?—লিখে দেন্-নি?"

"এ বই উপহার নয়।—কিনে এনেছি।"

বিহারী আশ্চর্য্য হইয়া তিনকড়ির মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"কিনে এনেছেন্?—কি রকম?"

তিনকড়ি একটু বিরক্তির স্বরেই যেন বলিল—"দোকান্ থেকে কিনে এনেছি—আর কি রকম?"

বিহারী কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া তিনকড়ির পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল—"ওঃ—বুঝেছি।"

শরদিন্দুবাবু এই সময় প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"তিনকড়িবাবু আছেন্-নাকি?—এই যে বিহারীও এসেছ।"

তিনকড়ি বলিল—"আসুন্, শরদিন্দুবাবু—বসুন।"

শরদিন্দুবাবু বসিয়া বলিলেন—"নব-গীতি এসেছে দেখ্‌ছি। বাঃ—বেশ্ বাঁধাইটি ক'রেছে ত?"

বিহারী বলিল—"ঐ পর্য্যন্ত। ভিতরে কেবল রাবিশ্ ভরা।"

শরদিন্দুবাবু বলিলেন—"না হে—তিনকড়িবাবুর সাম্‌নে ওকথা বোলো না। উনি রাগ করেন্।"

"চা হ'ল কি-না দেখি"—বলিয়া তিনকড়ি উঠিয়া ভিতরে গেল।

বিহারী বলিল—"শরদিন্দু—আজকাল রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তিনকড়িবাবুর কি সেরকম ভাব্‌টি নেই?"

"কেন?—তুমি কি তা' আজ্ জান্‌লে?

"হ্যাঁ—আমি ত কৈ আগে কিছু শুনিনি!"

"দেখনা—আগে তিনকড়িবাবু রোজ সন্ধ্যেবেলা রাজেনের ওখানে যেতেন্—এখন কালে-ভদ্রে যা'ন্! আমি ত রাজেনের ওখানে প্রায়ই যাই-কিনা—আগেও যেতাম্, আজকালও যাই। আগে তিনকড়ির প্রশংসা রাজেনের মুখে ধর্‌ত না—আজকাল গিয়ে শুনি, প্রায়ই তিনকড়ির লেখা নিয়ে অধরবাবুতে-রাজেন্দ্রবাবুতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ চল্‌ছে।"

বিহারী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। রত্নাকরে তিনকড়ির কবিতার সেই সমালোচনাটা—সে ত ঐ অধরেরই লেখা। অধর আজকাল রাজেনের মহা ভক্ত হ'য়ে উঠেছে কিনা—রাজেন্‌কে খুসী কর্‌বার্ জন্যে তিনকড়িকে কি রকম ক'রে অপদস্থ ক'র্‌বে ভেবে পাচ্ছে না।"

বিহারী দন্তে দন্তঘর্ষণ করিয়া বলিল—"উঃ কি নীচ-প্রবৃত্তি! কিন্তু দেখ—আজপর্য্যন্ত তিনকড়িবাবু রাজেনের বিরুদ্ধে—কি তার কবিতার নিন্দা ক'রে—ভুলেও একটি কথাও বলেন্-নি।"

"চটে যান্—চটে যান্।—রাজেনের লেখার নিন্দা ক'র্‌লে তিনকড়িবাবু এখনও চটে যান্।"

"অথচ তিনকড়িবাবুর লেখা—রাজেনের কবিতার চেয়ে ঢের ভাল।"

"তার আর সন্দেহ আছে? তিনকড়িবাবুর লেখায় রীতিমত কবিত্ব আছে—খাঁটি কবিত্ব যাকে বলে। রাজেনের কবিতা কি?—কেবল কতকগুলা দুর্ব্বোধ শব্দ সাজিয়ে দেওয়া।"

"বাস্তবিকই তাই।—দেখ, বই বেরিয়েছে—রাজেন্ একখানি তিনকড়িবাবুকে উপহার দেয় নি! উনি দোকান্ থেকে এক-টাকা খরচ ক'রে কিনে এনেছেন্।—আচ্ছা, কেন বল দেখি? দুজনের এত ভাব ছিল,—হঠাৎ এ রকম হ'য়ে গেল কেন?"

"ঐ যে—তিনকড়িবাবুর কেতাবের ভাল-সমালোচনা হ'তে লাগ্‌ল, ওঁর কেতাবকে কেউ পুছ্‌লেও না—কাজেই ঈর্ষার আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল।"

"কেন,—'রত্নাকরে' ত প্রসূনাঞ্জলির বেশ ভাল সমালোচনা শেষে বেরিয়েছিল?"

শরদিন্দুবাবু হাসিতে হাসিতে চক্ষু মিটি মিটি করিয়া বলিলেন—"সে কি আপ্‌নি—অম্‌নি বেরিয়েছিল?—রাজেন্ জমিদারীতে যাচ্ছিল, ষ্টীমারে রত্নাকর-সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হয়। নিজের কাছারিতে তাঁ'কে নিয়ে গিয়ে, বিস্তর তোয়াজ্ করে, তাঁ'কে পোলাও কালিয়া খাইয়ে, বিনা-জামিনে তাঁর ভাইপোকে নায়েবী চাকুরি দিয়ে, তবে সমালোচনাটি হাসিল্ ক'রেছিল। এখনও সম্পাদক মহাশয়ের জন্যে সুন্দরগঞ্জ থেকে কানেস্তারা-কানেস্তারা ঘি আস্‌ছে,—বস্তা-বস্তা গোবিন্দভোগ চাল্ আস্‌ছে, কত কি আসছে,—তবে ঐ সব্ ট্র্যাশ্ মাসেমাসে রত্নাকরে ছাপা হ'চ্ছে।—অম্‌নি?"

এই সময়ে তিনকড়ি স্বহস্তে দুই পেয়ালা চা আনিয়া দুইজনকে দিল। শরদিন্দুবাবু বলিলেন—"আহা,—আপ্‌নি নিজে কেন কষ্ট ক'র্‌লেন্ তিনকড়িবাবু?"

তিনকড়ি বলিল—"কষ্ট কি? আপনারা খাবেন্—এ আমার কষ্ট না সুখ?—ঝির জর্ হ'য়েছে।"

"আপনার চা কৈ?"

"এই যে আন্‌ছি"—বলিয়া তিনকড়ি আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

বিহারী চা-পান করিতে করিতে বলিল—"আমার যে লেখা আসে না। নইলে এই নব-গীতির এমন এক সমালোচনা আমি লিখ্‌তাম—যে বাছাধন টের পেয়ে যেতেন্। তুমি লেখনা, শরদিন্দু।"

"আরে রামচন্দ্র!—আমার কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই?"

তিনকড়ি নিজের চা ও পানের ডিবা হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। কিয়ৎক্ষণ গল্প-গুজবের পর সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভক্তের আব্‌দার

ইতোমধ্যে বিলাতে রবীন্দ্রবাবুর বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল! বিলাত হইতে তারের খবর আসিতে লাগিল, তথাকার সুধিবৃন্দ বঙ্গীয় কবিবরের মস্তকে প্রশংসার পুষ্প-চন্দন এবং প্রকাশকগণ তাঁহার চরণে স্বর্ণবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন!

রাজেন্দ্রের ভক্তগণ তাহাকে ধরিয়া বসিল—"আপনি রবিবাবুর চেয়ে কিসে কম?—আপনার 'নব-গীতি'-খানি অনুবাদ ক'রে যদি বিলেতে পাঠিয়ে দেন্, তবে আপনারও জয়জয়কার প'ড়ে যায়।"

রাজেন্দ্র ভাবিল, কথাটা মিথ্যা নহে। কিন্তু অনুবাদ করিবে কে?—তাহার নিজের ইংরেজিবিদ্যায় ত কুলাইবে না!

অবশেষে, অনেক পরামর্শ করিয়া, কোনও বে-সরকারী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপকের দ্বারায় অনুবাদ করানই স্থির হইল। অধ্যাপক মহাশয়, প্রচুর দক্ষিণার লোভে এই কার্য্যটি করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

শনৈঃ শনৈঃ অনুবাদ অগ্রসর হইতে লাগিল। উচ্চ মূল্যের পার্চ্চমেণ্ট্ কাগজে, ইংরেজের কারখানায়, পাণ্ডুলিপি টাইপ্‌রাইট্ করান আরম্ভ হইল। শেষ হইলে রাজেন্দ্র সেগুলি রেজিষ্ট্রি-ডাকে ম্যাক্‌মিলান্ কোম্পানির নামে পত্র-সহ প্রেরণ করিল।

"নব-গীতি" প্রকাশের পর হইতে, আর তিনকড়ি রাজেন্দ্রের বাড়ীতে যায় নাই। যদি রাজেন্দ্র স্বয়ং তিনকড়ির বাড়ী আসিয়া তাহাকে একখানি "নব-গীতি" উপহার প্রদান করিত, তাহা হইলেও মিট্‌মাট্ হইয়া যাইতে পারিত—কিন্তু রাজেন্দ্র সে পরিশ্রম স্বীকার করে নাই।—তিনকড়ি বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, সেসংবাদও কোনও দিন সে লয় নাই!—তিনকড়ি যায় নাই বটে—কিন্তু "নব-গীতি" অনুবাদ, বিলাতে-পাঠান প্রভৃতি সকলকথাই সে অবগত ছিল;—শরদিন্দু-বাবু আসিয়া গল্প করিয়াছেন। ইহার ফল যে কি হয়, জানিবার জন্য তিনকড়ির যে কিছুমাত্র আগ্রহ জন্মে নাই—এমন নহে।

এই সময় "রত্নাকরে" "নব-গীতির" এক সুদীর্ঘ সচিত্র সমালোচনা বাহির হইল। চিত্রখানি কবির ফোটোগ্রাফ্ হইতে প্রস্তুত—নিম্নে মুদ্রিত—"বঙ্গের প্রতিভাশালী সুকবি শ্রীযুক্ত-রাজেন্দ্রনাথ বসু।" সমালোচনাটি আগাগোড়া রাজেন্দ্র ও নবগীতির একটি স্তব-বিশেষ। রবীন্দ্রবাবুর নিম্নেই—অত্যল্প-ব্যবধানে—ইহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তিনকড়ি প্রভৃতি অন্যান্য নব্য কবিগণ অপেক্ষা রাজেন্দ্রবাবু যে কত উচ্চে অবস্থিত, তাহা দেখাইবার অভিপ্রায়ে দুর্ভাগ্য প্রথমোক্তগণের কাব্য হইতেও কিছু কিছু উদ্ধৃত ও সমালোচিত হইয়াছে। তিনকড়ির উপরেই সমালোচকের যেন আক্রোশটা বেশী বেশী। বাজারে গুজব, সমালোচনাটি সম্পাদক মহাশয়েরই রচিত—তবে স্থানে স্থানে অধরচন্দ্র বাবুর হাতও যথেষ্ট আছে!

এই সমালোচনা পাঠ করিয়া বিহারীলাল ত একবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল—"লাঠি মেরে আমি সম্পাদকের মাথা ফাটিয়ে দেব।—তারপর যা থাকে আমার কপালে।"

শরদিন্দু বলিল—"তিনকড়িবাবুর বিরুদ্ধে ঐ অংশটা—ওটা সম্পাদকের লেখা নয়। ওটা শুনেছি, রাজেন্দ্রের বৈঠকখানাতেই জন্মগ্রহণ করেছে;—অধর লিখেছে।"

বিহারী বলিল—"তবে ঐ রাজেনের মাথাই ফাটিয়ে দেব।"

বিহারী দুই তিন দিন পথে পথে লাঠি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল।—তিনকড়ি ইহা শুনিয়া তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করাতে তবে সে নিরস্ত হয়।

পরদিন শরদিন্দুবাবুর বাসায় বিহারী উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমি একখানি বই লিখেছি।"

"বল কি!—তুমিও গ্রন্থকার হ'লে?"

"রামা-শ্যামা সবাই যখন গ্রন্থকার হ'ল, আমিই বা বাকি থাকি কেন?"

"বেশ্‌ত—ছাপিয়ে ফেল।"

"ক্ষেপেছ?—এদেশে ছাপাব-না। এদেশে গুণের আদর নেই।"

"তবে?"

"একেবারে বিলেতে।"

শরদিন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন—"দূর্ পাগল্!"

বিহারী বলিল—"সত্যি, অনুবাদও হ'য়ে গেছে। সেই কি কোম্পানি ব'ল্লে, তা'দের নাম-ঠিকানাটা ব'লে দাওত। বিলেতে আমার একটি জানা লোক আছে, তা'র কাছে পাণ্ডুলিপিখানি পাঠিয়ে ব'লে দেব, সে নিজে যেন সেই কোম্পানির কাছে নিয়ে যায়।"

"কে বিলেতে আছে?"

"কেন,—আমাদের সুবোধ। সে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। দাও না—সে কোম্পানির নাম-ঠিকানাটা ব'লে দাও না।"

শরদিন্দুবাবু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বিহারী বুঝি তামাসা করিতেছে। কিন্তু তাহার আগ্রহ দেখিয়া শেষে ভাবিলেন, হয় ত তিনকড়ির পুস্তক অনুবাদ করাইয়াছে, তাহাই পাঠাইবে,—কৌশল করিয়া সেকথাটি গোপন রাখিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি পাঠাবে বল না! তোমার বই নয়, এ আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি।"

"যার বই-ই পাঠাই—তুমি ঠিকানাটা দাওনা বাপু।"

শরদিন্দুবাবু বলিলেন—"ঠিকানা ত আমার মনে নেই। তবে মাসছয় হ'ল, ম্যাক্‌মিলান্‌দের বাড়ী থেকে একখানা দুষ্প্রাপ্য বই আমি চেয়ে পাঠিয়েছিলাম—দেখি দাঁড়াও, তা'দের চিঠি-খানা যদি খুঁজে পাই।"—কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণের পর বলিলেন—"এই নাও—পেয়েছি। এই চিঠিতে তা'দের নাম-ঠিকানা সবই আছে।"

বিহারী চিঠিখানি লইয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

কবি-সম্বর্দ্ধনা

সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ কাটিতে লাগিল, বিলাত হইতে কোনও উত্তর আসে না। রাজেন্দ্রনাথ ও তাহার ভক্তগণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। যাহারা ভক্ত-নয় অথচ এ সংবাদ অবগত ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল—"ম্যাক্‌মিলান্ কি আর পাগল হ'য়ে গেছে যে, সেই রাবিশ্ ছাপ্‌বে?"

অবশেষে, একদিন রাত্রি নয়টার সময় পত্র আসিল। সেদিন শনিবার, বিলাতী-ডাক সন্ধ্যার পর বিলি হইবার সম্ভাবনা আছে ইহা রাজেন্দ্র সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিল। ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া সারা-সন্ধ্যা কম্পিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া কাটাইল। নয়টার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই দ্বারবান্ প্রত্যাশিত পত্রখানি আনিয়া, রাজেন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল।

সকলে ঝুঁকিয়া দেখিল, বিলাতী পত্র বটে—বিলাতী টিকিট রহিয়াছে।

কম্পিত-হস্তে বিবর্ণ-মুখে রাজেন্দ্র পত্রখানি খুলিল। ভক্তগণ অনিমেষ-নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পাঠান্তে,—"এই দেখ" বলিয়া সেখানি টেবিলের উপরে ফেলিয়া, কেদারায় হেলিয়া পড়িয়া রাজেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সকল ভক্তই হস্ত প্রসারণ করিল, কিন্তু অধর বিদ্যুৎগতিতে সেখানি পাঠ করিয়া, ভাবের প্রাবল্যে, "মেরে দিয়েছি—মেরে দিয়েছি"—চীৎকার করিতে করিতে, কক্ষময় উন্মত্তবৎ নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অপর ভক্তগণ তখন আনন্দকলস্বরে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। রাজেন্দ্রনাথ চক্ষু খুলিয়া বলিল—"অধর, ওকি কর্‌ছ?—বস—বস।"

অধর বলিল—"না—আমি বস্‌ব-না।" বলিয়া পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতে লাগিল।

রাজেন্দ্র বলিল—"ওহে অধর—শোন।"

নৃত্য করিতে করিতে অধর বলিল—"কি?"

"এখনি যাও। একখানা সেকেন্-ক্লাস্ গাড়ীভাড়া ক'রে—'বেঙ্গলী' আফিসে যাও—এই চিঠি দেখিয়ে ব'লে এস, কাল-সকালেই যেন একটা 'প্যারা' বেরিয়ে যায়।"

একজন ভক্ত বলিল—"শুধু বেঙ্গলী আফিসে কেন? ইংলিশ্‌ম্যান্, ষ্টেটস্‌ম্যান্, ডেলি-নিউজ, মিরর, অমৃত-বাজার—সবাইকেই খবর দেওয়া উচিত।"

ইহা শুনিয়া অধর স্থির হইয়া দাড়াইল। "আচ্ছা দাও"—বলিয়া চিঠিখানা লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন বেলা নয়টা হইতে রাজেন্দ্রনাথের গৃহে লোক-সমাগম আরম্ভ হইল। আত্মীয়বন্ধু অনেকেই আসিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল।—আসিল না কেবল তিনকড়ি।

অপরাহ্ণে ত পূরা-মজলিস্। অধর বলিতেছিল—"সে হ'বে না রাজেন্দ্রবাবু—সে আমরা কিছুতেই শুন্‌ব-না।"

অন্যান্য ভক্তগণ, সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"কিছুতেই না। এতগুলি লোক্‌কে আপ্‌নি নিরাশ কর্‌বেন্?"

রাজেন্দ্র বিনয়সূচক মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—"কি-এমন একটা কাণ্ড ক'রেছি, যে তার জন্যে সভা ক'রে ধূমধামে আমার সম্বর্দ্ধনা কর্‌বেন্?—সামান্য বিষয়—"

অধর বলিল—"আপনার কাছে সামান্য হ'তে পারে—আমাদের কাছে সামান্য নয়। রবিবাবু বিলেতে গিয়ে যা ক'রেছেন—আপনি শ্যামপুকুর থেকে এক পা না ন'ড়েও তা ক'রে ফেল্লেন্। বাঙ্গালীর মুখ, বাঙ্গালাদেশে ব'সেই আপ্‌নি উজ্জ্বল ক'রে দিলেন্।—অভিনন্দন না ক'রে আমরা কিছুতেই ছাড়্‌চিনে।"

অনেক উপরোধ-অনুরোধ—কাঁদাকাটির পর অবশেষে রাজেন্দ্রনাথ সম্বর্দ্ধনা-গ্রহণ করিতে সম্মত হইল।

অধর অবিলম্বে একটি দল-গঠন করিয়া চাঁদা-সংগ্রহের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। পরবর্ত্তী-শনিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় সম্বর্দ্ধনা স্থির হইয়াছে; সভাপতি হইবেন, 'রত্নাকর'-সম্পাদক কৃষ্ণবিহারীবাবু। সময় অতি অল্প; ইহারই মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। অভিনন্দন-পত্র রচিত হইল,—ছাপিতে দেওয়ার পূর্ব্বে ভক্তগণ রাজেন্দ্রকে সেখানি দেখাইতে লইয়া আসিল।

রাজেন্দ্র বলিল—"চাঁদা কত উঠ্‌ল?

"এই দেখুন্ না"—বলিয়া অধর খাতাখানি খুলিয়া রাজেন্দ্রের সম্মুখে মেলিয়া দিল।

রাজেন্দ্র নামগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল—"তিনকড়িও চাঁদা দিয়েছে দেখ্‌ছি!"

অধর বলিল—"কোন্ লজ্জায় না-দেবে?"

রাজেন্দ্র বলিল—"লজ্জার খাতিরে দেয়্‌নি;—ওটা, নিজের উদারতা দেখাবার জন্যে দিয়েছে।—ভিতরে কিন্তু জ্ব'লে পুড়ে ম'রছেন্।"

অভিনন্দনপত্র পাঠকরিয়া রাজেন্দ্র তাহা মঞ্জুর করিয়া দিল।

* * * * *

* * * * *

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—পান্তির মাঠে—সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছে। তোরণদ্বার পত্রমালায় সজ্জিত—উপরে ফুটন্ত ফুলের অক্ষরে লেখা—"কবি-রাজেন্দ্র জয়!" প্রবেশ করিয়া, বিবিধবর্ণ নিশান-শোভিত বিস্তীর্ণ পটমণ্ডপ। ভিতরে লাল ও সবুজ কাগজের নির্ম্মিত গুচ্ছ গুচ্ছ শৃঙ্খল ঝুলিতেছে। একপ্রান্তে লোহিতবস্ত্রাবৃত ঈষদুচ্চ বেদিকা। তাহার মধ্যস্থলে কারুকার্য্যখচিত রেশমী-আবরণযুক্ত একখানি মাঝারি আকারের টেবিল। তাহার উপর দুইটি রৌপ্যনির্ম্মিত আধারে দুইটি প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া, শোভা ও সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে। টেবিলের অপর পার্শ্বে দুইখানি বড় বড় সুন্দর কেদারা—একখানিতে সভাপতি বসিবেন, অপরখানি কবিবরের জন্য। বেদিকার উপর আরও অনেকগুলি চেয়ার্—গণ্যমান্য-দর্শক ও কবি-বরের খাস-ভক্ত-সম্প্রদায় উপবেশন করিবেন। বেদিকার নিম্নে প্রথমে তিন সারি কুরসি—তাহার পর বহুসারি বেঞ্চ্ চলিয়া গিয়াছে।

প্রভাতকাল হইতে, সারাদিন, পথে পথে, এই সভার সংবাদ দিয়া অসংখ্যবিজ্ঞাপন-বিতরিত হইয়াছিল। পাঁচটা না বাজিতেই অনেকে আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ চেয়ার্, কেহ বেঞ্চি প্রভৃতিতে বসিয়া রহিল; অনেকে বিলম্ব আছে দেখিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া

বিহারী বলিল—"তবে ঐ রাজেনের মাথাই ফাটিয়ে দেব।"

বিহারী দুই তিন দিন পথে পথে লাঠি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল।—তিনকড়ি ইহা শুনিয়া তাহাকে যথেষ্ট ভৎসনা করাতে তবে সে নিরস্ত হয়।

পরদিন শরদিন্দুবাবুর বাসায় বিহারী উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমি একখানি বই লিখেছি।"

"বল কি!—তুমিও গ্রন্থকার হ'লে?"

"রামা-শ্যামা সবাই যখন গ্রন্থকার হ'ল, আমিই বা বাকি থাকি কেন?"

"বেশ্‌ত—ছাপিয়ে ফেল।"

"ক্ষেপেছ?—এদেশে ছাপাব-না। এদেশে গুণের আদর নেই।"

"তবে?"

"একেবারে বিলেতে।"

শরদিন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন—"দূর্ পাগল্!"

বিহারী বলিল—"সত্যি, অনুবাদও হ'য়ে গেছে। সেই কি কোম্পানি ব'ল্লে, তা'দের নাম-ঠিকানাটা ব'লে দাওত। বিলেতে আমার একটি জানা লোক আছে, তা'র কাছে পাণ্ডুলিপিখানি পাঠিয়ে ব'লে দেব, সে নিজে যেন সেই কোম্পানির কাছে নিয়ে যায়।"

"কে বিলেতে আছে?"

"কেন,—আমাদের সুবোধ। সে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। দাও না—সে কোম্পানির নাম-ঠিকানাটা ব'লে দাও না।"

শরদিন্দুবাবু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বিহারী বুঝি তামাসা করিতেছে। কিন্তু তাহার আগ্রহ দেখিয়া শেষে ভাবিলেন, হয় ত তিনকড়ির পুস্তক অনুবাদ করাইয়াছে, তাহাই পাঠাইবে,—কৌশল করিয়া সেকথাটি গোপন রাখিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি পাঠাবে বল না! তোমার বই নয়, এ আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি।"

"যার বই-ই পাঠাই—তুমি ঠিকানাটা দাওনা বাপু।"

শরদিন্দুবাবু বলিলেন—"ঠিকানা ত আমার মনে নেই। তবে মাসছয় হ'ল, ম্যাক্‌মিলান্‌দের বাড়ী থেকে একখানা দুষ্প্রাপ্য বই আমি চেয়ে পাঠিয়েছিলাম—দেখি দাঁড়াও, তা'দের চিঠি-খানা যদি খুঁজে পাই।"—কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণের পর বলিলেন—"এই নাও—পেয়েছি। এই চিঠিতে তা'দের নাম-ঠিকানা সবই আছে।"

বিহারী চিঠিখানি লইয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

কবি-সম্বর্দ্ধনা

সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ কাটিতে লাগিল, বিলাত হইতে কোনও উত্তর আসে না। রাজেন্দ্রনাথ ও তাহার ভক্তগণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। যাহারা ভক্ত-নয় অথচ এ সংবাদ অবগত ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল—"ম্যাক্‌মিলান্ কি আর পাগল হ'য়ে গেছে যে, সেই রাবিশ্ ছাপ্‌বে?"

অবশেষে, একদিন রাত্রি নয়টার সময় পত্র আসিল। সেদিন শনিবার, বিলাতী-ডাক সন্ধ্যার পর বিলি হইবার সম্ভাবনা আছে ইহা রাজেন্দ্র সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিল। ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া সারা-সন্ধ্যা কম্পিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া কাটাইল। নয়টার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই দ্বারবান্ প্রত্যাশিত পত্রখানি আনিয়া, রাজেন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল।

সকলে ঝুঁকিয়া দেখিল, বিলাতী পত্র বটে—বিলাতী-টিকিট রহিয়াছে।

কম্পিত-হস্তে বিবর্ণ-মুখে রাজেন্দ্র পত্রখানি খুলিল। ভক্তগণ অনিমেষ-নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পাঠান্তে,—"এই দেখ" বলিয়া সেখানি টেবিলের উপরে ফেলিয়া, কেদারায় হেলিয়া পড়িয়া রাজেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সকল ভক্তই হস্ত প্রসারণ করিল, কিন্তু অধর বিদ্যুৎগতিতে সেখানি পাঠ করিয়া, ভাবের প্রাবল্যে, "মেরে দিয়েছি—মেরে দিয়েছি"—চীৎকার করিতে করিতে, কক্ষময় উন্মত্তবৎ নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অপর ভক্তগণ তখন আনন্দকলস্বরে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। রাজেন্দ্রনাথ চক্ষু খুলিয়া বলিল—"অধর, ওকি কর্‌ছ?—বস—বস।"

অধর বলিল—"না—আমি বস্‌ব-না।" বলিয়া পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতে লাগিল।

রাজেন্দ্র বলিল—"ওহে অধর—শোন।"

নৃত্য করিতে করিতে অধর বলিল—"কি ?"

"এখনি যাও। একখানা সেকেন্-ক্লাস্ গাড়ীভাড়া ক'রে—'বেঙ্গলী' আফিসে যাও—এই চিঠি দেখিয়ে বলে এস, কাল-সকালেই যেন একটা 'প্যারা' বেরিয়ে যায়।"

একজন ভক্ত বলিল—"শুধু বেঙ্গলী আফিসে কেন ? ইংলিশ্ম্যান্, ষ্টেটস্ম্যান্, ডেলি-নিউজ, মিরর, অমৃত বাজার—সবাইকেই খবর দেওয়া উচিত।"

ইহা শুনিয়া অধর স্থির হইয়া দাড়াইল। "আচ্ছা দাও"—বলিয়া চিঠিখানা লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন বেলা নয়টা হইতে রাজেন্দ্রনাথের গৃহে লোক সমাগম আরম্ভ হইল। আত্মীয়বন্ধু অনেকেই আসিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল।—আসিল না কেবল তিনকড়ি।

অপরাহ্ণে ত পূরা-মজলিস্। অধর বলিতেছিল—"সে হ'বে না রাজেন্দ্রবাবু—সে আমরা কিছুতেই শুন্‌ব-না।"

অন্যান্য ভক্তগণ, সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"কিছুতেই না। এতগুলি লোক্‌কে আপ্‌নি নিরাশ কর্‌বেন্ ?"

রাজেন্দ্র বিনয়সূচক মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—"কি-এমন একটা কাণ্ড ক'রেছি, যে তার জন্যে সভা ক'রে ধূমধামে আমার সম্বর্দ্ধনা কর্‌বেন্ ?—সামান্য বিষয়—"

অধর বলিল—"আপনার কাছে সামান্য হ'তে পারে—আমাদের কাছে সামান্য নয়। রবিবাবু বিলেতে গিয়ে যা ক'রেছেন—আপনি শ্যামপুকুর থেকে এক পা না ন'ড়েও তা ক'রে ফেল্লেন্। বাঙ্গালীর মুখ, বাঙ্গালাদেশে ব'সেই আপ্‌নি উজ্জ্বল ক'রে দিলেন্।—অভিনন্দন না ক'রে আমরা কিছুতেই ছাড়্‌চিনে।"

অনেক উপরোধ-অনুরোধ—কাঁদাকাটির পর অবশেষে রাজেন্দ্রনাথ সম্বর্দ্ধনা-গ্রহণ করিতে সম্মত হইল।

অধর অবিলম্বে একটি দল-গঠন করিয়া চাঁদা-সংগ্রহের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। পরবর্ত্তী-শনিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় সম্বর্দ্ধনা স্থির হইয়াছে; সভাপতি হইবেন, 'রত্নাকর'-সম্পাদক কৃষ্ণবিহারীবাবু। সময় অতি অল্প; ইহারই মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। অভিনন্দন-পত্র রচিত হইল,—ছাপিতে দেওয়ার পূর্ব্বে ভক্তগণ রাজেন্দ্রকে সেখানি দেখাইতে লইয়া আসিল।

রাজেন্দ্র বলিল—"চাঁদা কত উঠ্‌ল ?

"এই দেখুন্ না"—বলিয়া অধর খাতা-খানি খুলিয়া রাজেন্দ্রের সম্মুখে মেলিয়া দিল।

রাজেন্দ্র নামগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল—"তিনকড়িও চাঁদা দিয়েছে দেখ্‌ছি !"

অধর বলিল—"কোন্ লজ্জায় না-দেবে ?"

রাজেন্দ্র বলিল—"লজ্জার খাতিরে দেয়্‌নি;—ওটা, নিজের উদারতা দেখাবার জন্যে দিয়েছে।—ভিতরে কিন্তু জ্ব'লে পুড়ে ম'র্‌ছেন্।"

অভিনন্দনপত্র পাঠকরিয়া রাজেন্দ্র তাহা মঞ্জুর করিয়া দিল।

* * * * *

* * * * *

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে—পাস্তির মাঠে—সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছে। তোরণদ্বার পত্রমালায় সজ্জিত—উপরে ফুটন্ত ফুলের অক্ষরে লেখা—"কবি-রাজেন্দ্র জয়!" প্রবেশ করিয়া, বিবিধবর্ণ নিশান-শোভিত বিস্তীর্ণ পটমণ্ডপ। ভিতরে লাল ও সবুজ কাগজের নির্ম্মিত গুচ্ছ গুচ্ছ শৃঙ্খল ঝুলিতেছে। একপ্রান্তে লোহিত-বস্ত্রাবৃত ঈষদুচ্চ বেদিকা। তাহার মধ্যস্থলে কারুকার্যখচিত রেশমী-আবরণযুক্ত একখানি মাঝারি আকারের টেবিল। তাহার উপর দুইটি রৌপ্যনির্ম্মিত আধারে দুইটি প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া, শোভা ও সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে। টেবিলের অপর পার্শ্বে দুইখানি বড় বড় সুন্দর কেদারা—একখানিতে সভাপতি বসিবেন, অপরখানি কবিবরের জন্য। বেদিকার উপর আরও অনেকগুলি চেয়ার্—গণ্যমান্য-দর্শক ও কবিবরের খাস-ভক্ত-সম্প্রদায় উপবেশন করিবেন। বেদিকার নিম্নে প্রথমে তিন সারি কুরসি—তাহার পর বহুসারি বেঞ্চ্ চলিয়া গিয়াছে।

প্রভাতকাল হইতে, সারাদিন, পথে পথে, এই সভার সংবাদ দিয়া অসংখ্যবিজ্ঞাপন-বিতরিত হইয়াছিল। পাঁচ্‌টা না বাজিতেই অনেকে আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ চেয়ার্, কেহ বেঞ্চি প্রভৃতিতে বসিয়া রহিল; অনেকে বিলম্ব আছে দেখিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া

বেড়াইতে লাগিল। স্থানে স্থানে পাঁচ-সাত-দশজনে জটলা করিয়া নানাপ্রকার বাদানুবাদও করিতে লাগিল। কেহ বলিল—"কে হে এ রাজেন্দ্রবাবু? কখনও নামও ত শুনিনি।—যাহোক্, তামাসাটা দেখে যেতে হচ্ছে।" উহারই মধ্যে যে একটু খোঁজ-খবর রাখিত, সে বলিল,—"হ্যাঁ হ্যাঁ—রাজেন্দ্রনাথ বসুর কবিতা আমি কাগজে প'ড়েছি বটে। তা, সে-কবিতা এমন-ত-কিছু-নয়। কা'রা একে এমন্ ক'রে নাচাচ্ছে?"—অপর একজন বলিল—"শোনেন্-নি?—ম্যাক্‌মিলান্ যে রাজেন্দ্রবাবুর বই তর্জ্জমা ক'রে ছাপাচ্ছে।—পনেরো হাজার টাকা দেবে!"—একজন চশমাধারী-যুবক বলিল—"হুজুগ্—হুজুগ্ মশায়—আর-কিছু-নয়। বিলেৎটি হ'চ্ছে আসল্ হুজুগের জায়গা—একটা নূতন-কিছু পেলে হয়! ন'ইলে এতদেশ থাকতে শেষে রাজেন্ বোসের কবিতা ছাপাতে চায়?" সর্ব্বত্রই আলোচনার মধ্যে হাসি টিট্‌কারীর ভাবটাই যেন বেশী বেশী শুনাযাইতে লাগিল।

ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে,—কিন্তু এখনও কবিবরের দর্শন নাই।—সভাপতিও বিলম্ব করিতেছেন। শীতকালের বেলা—ক্রমে অন্ধকার হইয়া পড়িল! ফরাস্ আসিয়া একেএকে ঝাড়গুলি জ্বালিয়া দিতে লাগিল। উদ্যোগীরা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মাঝেমাঝে ফটকের নিকট গিয়া দাঁড়াইতেছে—উৎসুক-নেত্রে পথের পানে চাহিয়া থাকিতেছে।

সভা এখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। ক্রমে রব উঠিল—"এসেছেন্—এসেছেন্!"—একখানি বৃহৎ মোটর্-কার্ আসিয়া তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিস্ফল রোষেই যেন ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া সভাপতি মহাশয়, কবিবর, অধরচন্দ্রবাবু এবং আরও দুইজন ভক্ত, সভায় প্রবেশ করিলেন। সভাস্থ একজন ভক্ত অমনি "বন্দে মাতরম্" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দুই চারিজন বিদ্যালয়ের বালক ভিন্ন আর কেহ বড় একটা তাহাতে যোগ দিল না।

সকলে উপবেশন করিলে, হার্ম্মোনিয়ম্ যন্ত্রের সহিত একটি অভ্যর্থনা-সঙ্গীত হইল। তাহার পর, যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া, কৃষ্ণবিহারীবাবু সভাপতির আসনে উপবেশন করিলেন;—সম্মুখে ছাপা অনুষ্ঠানপত্র ছিল।

একজন ভক্ত, "কবি-রাজেন্দ্র-জয়"-শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; সভাপতির অনুরোধে তিনি টেবিলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া, তাহা পাঠ করিলেন।

তাহার পর সভাপতি মহাশয় একটু কাসিয়া, গায়ের শালখানি এদিক ওদিক একটু-আধটু টানিয়া দিয়া, এক তাড়া কাগজ হস্তে "অদ্য আমরা—" বলিয়া গম্ভীর স্বরে এক অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করিলেন।

সভাস্থ লোকে কিন্তু মনোযোগ দিল না। সর্দ্দারেরা মাঝে মাঝে—"বড় গোল হ'চ্ছে—ওদিক্‌টায় বড় গোল হ'চ্ছে"—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; তথাপি কেহ বড় গ্রাহ্য করিল না। নিজেদের মধ্যে চাপা-গলায় গল্প-হাসি ইত্যাদি চালাইতে লাগিল।

রাজেন্দ্র বসিয়া বসিয়া সভার ভাবগতি লক্ষ্য করিতেছিল। সভা হইতে একটা অশ্রদ্ধা ও বিদ্রূপের ঢেউ বহিয়া আসিয়া যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শেষ হইলে, কেহই কোনও রূপ উল্লাস-প্রকাশ করিল না; বরং গোল্‌মাল্ আরও বৃদ্ধি পাইল!—দারুণ নিরুৎসাহে রাজেন্দ্রের বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

এইবার অভিনন্দনপত্র পাঠ করিবার পালা।—সভাপতির অনুরোধক্রমে, অধরচন্দ্রবাবু টেবিলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া—প্রথমে ক্ষীণস্বরে—পাঠ আরম্ভ করিলেন; পরে তাঁহার কণ্ঠধ্বনি পর্দ্দায়-পর্দ্দায় উঠিতে লাগিল। ক্রমে যখন বলিলেন—"আমরা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম যে, মহাশয়ের অমরকাব্য নব-গীতিখানির ইংরেজি অনুবাদ, বিলাতের বিখ্যাত প্রকাশক ম্যাক্‌মিলান্ কোম্পানি পরম-আদরে প্রকাশকরিতে উদ্যত হইয়াছেন"—অমনি সভায় এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বজ্রস্বরে বলিল—"মিথ্যা কথা!"

সভাসুদ্ধ লোক সচকিত হইয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। রাজেন্দ্রও চাহিয়া দেখিল—মুখ সম্পূর্ণ-অপরিচিত। সভাপতি-মহাশয় উঠিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"কে তুমি?"

লোকটি বলিল—"আমি যেই হই-না-কেন।—রাজেন্দ্রবাবুর কোনও কাব্যই ম্যাক্‌মিলান্-কোম্পানি প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়-নি। তা'রা অমন্ গাধা-নয়।"

সভাপতি অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"আমাদের প্রমাণ আছে।"

লোকটি উচ্চকণ্ঠে বলিল—"প্রমাণ দেখান্।"

সভাপতি বলিলেন—"কে তুমি?—কেন তোমায় প্রমাণ দেখাব?—এই দণ্ডে সভা থেকে বেরোও—দূর হ'য়ে যাও।"

সভাস্থ অনেকে এইবার চীৎকার করিয়া উঠিল—"প্রমাণ-চাই—প্রমাণ-চাই।"

রাজেন্দ্র তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সভাপতির হস্তে দিল।

সভাপতি বলিলেন "এই শুনুন প্রমাণ"—বলিয়া পত্রখানি, মায় হেডিং, তারিখ, ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন। সভাস্থল একবারে নিস্তব্ধ—সূচটি পড়িলে শব্দ-শোনাযায়।

পত্র-শেষ হইলে পূর্ব্বকথিত ব্যক্তি বলিল—"ও পত্র জাল। কাগজেই অদৃশ্য কালীতে তা'র প্রমাণ লেখা আছে। চিম্‌নির তাপে চিঠিখানি ধরুন্—দেখুন্ ভিতর থেকে কালো কালো কি লেখা ফুটে বেরোয়।"

সভাপতি-মহাশয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ অনেকে চীৎকার করিতে লাগিল—"প্রমাণ চাই—প্রমাণ-চাই।"

সভাপতি, কম্পিত-হস্তে পত্রখানি উত্তাপে ধরিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেখানি নামাইয়া, ঝুঁকিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; অন্য-অনেকেও সেখানে গিয়া দেখিতে লাগিল।

লোকটি বলিল—"দেখুন্ কি লেখা আছে। লেখা আছে কি-না—

'কবি নহ তুমি হে রাজেন্দ্রবাবু
পরন্তু কপিবর।
কলিকাতা ছাড়ি কিষ্কিন্ধ্যা যাও
যেখানে তোমার ঘর।'

যদি লেখা না-থাকে—বুক্-ঠুকে তাও বলুন্।"

সভার-লোক একদৃষ্টে সভাপতি-মহাশয়ের পানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, তিনি পত্রখানি টেবিলে ফেলিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন!—দুইহস্তে নিজ চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া রহিলেন!

তখন সভায় বিষম গণ্ডগোল উঠিল। কেহ কুকুর ডাকিতে লাগিল, কেহ বিড়াল ডাকিতে লাগিল, কেহ শৃগাল সঙ্গীত অনুকরণ করিয়া 'হুক্কা হুয়া' রবে সভা সরগরম্ করিয়া তুলিল।

* * * * * *
* * * * * *

এই সভায় তিনকড়িও উপস্থিত ছিল। অন্যান্য সকলের ন্যায় সেও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।—কি-করিয়া যে কি হইল, কিছুই স্থির করিতে পারিল না! ব্যাপারটা একটা জটিল প্রহেলিকার মত তাহার মনে হইতে লাগিল!

পরদিন জানিতে পারিল, এটি তাহার "ভক্ত" বিহারী-লালের কীর্ত্তি। সেই নিজের প্রেস হইতে ম্যাক্‌মিলনের নামাঙ্কিত চিঠিরকাগজ ছাপাইয়া, আরকদিয়া 'কিষ্কিন্ধ্যার কবিতাটি' তাহার ভিতর লিখিয়া দিয়াছিল। তাহার পর জাল-চিঠিখানি টাইপ্‌রাইট্ করাইয়া, স্বতন্ত্র লেফাফায় ভরিয়া বিলাতে তাহার কোনও এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দেয়। সেইখান হইতে লণ্ডনের মোহরাঙ্কিত হইয়া চিঠিখানি আসিয়াছিল। সভায় দাঁড়াইয়া যেব্যক্তি প্রতিবাদ করিয়াছিল, সে তাহারই প্রেসের একজন কম্পোজিটর। ইহা শুনিয়া, ঘৃণায়, লজ্জায়, দুঃখে তিনকড়ি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতে লাগিল।—সেইদিন হইতে অদ্যাবধি আর সে বিহারীর মুখ-দর্শন করে নাই।

রাজেন্দ্রের কিন্তু আজিও বিশ্বাস, তিনকড়ি নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে ছিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মন্ত্রশক্তি

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—রাজনগরের জমিদার হরিবল্লভ, কুলদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া, উইলসূত্রে তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অধিকাংশ দেবত্র, এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণিকে ও পরে তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে পূজারী হইবার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুকালে তর্কচূড়ামণি নবাগত ছাত্র অম্বরকে পুরোহিত নিয়োগ করেন,—পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ রাগে টোল ছাড়িয়া অম্বরের বিপক্ষতাচরণের চেষ্টা করে। উইলে আরও সর্ত্ত ছিল যে, রমাবল্লভ যদি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে সুপাত্রে অর্পণ করেন, তবেই সে দেবত্র ভিন্ন অপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে;—নচেৎ, দূরসম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি ঐ সকল বিষয় পাইবে—রমাবল্লভ মাসিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিমাত্র পাইবেন ;—কিন্তু মনের মতন পাত্র মিলিতেছে না !

গোপীবল্লভের সেবার ব্যবস্থা বাণীই করিত। অম্বরের পূজা বাণীর মনঃপূত হয় না—অথচ কোথায় খুঁৎ, তাহাও ঠিক ধরিতে পারে না ! স্নানযাত্রায় 'কথা' হয়—পুরোহিতই সে কথকতা করেন। কথকতায় অনভ্যস্ত অম্বর থতমত খাইতে লাগিলেন—ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর একদিন পূজার পর বাণী দেখিলেন, গোপীকিশোরের পুষ্পপাত্রে রক্তজবা !—আতঙ্কিতা বাণী পিতাকে একথা জানাইলেন।—অম্বর পদচ্যুত হইলেন ! টোলে অদ্বৈতবাদ শিখাইতে গিয়া, অধ্যাপক-পদও ঘুচিয়া গেল !—তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বাণীর বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণপ্রায় ! ১৫ দিনের মধ্যে তাহার বিবাহ না হইলে বিষয় হস্তান্তরে যায়। রমাবল্লভের দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় মৃগাঙ্ক—সকল দোষের আকর, গুণের মধ্যে মহাকুলীন ! তাহারই সহিত বাণীর বিবাহের প্রস্তাব হইল—মৃগাঙ্ক প্রথমে সম্মত হইলেও পরে অসম্মত হইল। সে অম্বরের কথা উত্থাপন করিল। রমাবল্লভ ও বাণীর এ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি,—অগত্যা, বিবাহান্তে অম্বর জন্মের মত দেশত্যাগ করিবেন এই সর্ত্তে, বাণী এই বিবাহে সম্মত হইলেন। রমাবল্লভ অম্বরকে আনাইয়া এই প্রস্তাব করিলে, তিনি সেরাত্রিটা ভাবিবার সময় লইলেন। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া অম্বরের সহিত বাণীর সাক্ষাৎ—বাণীও তাঁহাকে ঐ সর্ত্তে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইল। অম্বরের সে রাত্রি অনিদ্রায়—চিন্তায় কাটিল !

অম্বরের ন্যায় সেরাত্রে রমাবল্লভও নিদ্রা যাইতে পারেন নাই ; রাত্রিবেলায়—আহারের সময়—বাণীকে উপস্থিত না দেখিয়া বড়ই চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। কন্যা-স্নেহে তাঁহার সারা-চিত্ত ভরিয়া আছে সত্য, কিন্তু আজ তিনি তাঁহার নিজের সুখের জন্যই তাহাকে কত বড় ব্যথা, কতখানি লজ্জা, দিতে বসিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার বুক যেন শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কোথায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চোপাধিধারী দেশমান্য জামাতা আনিবেন,—যাহাকে দেখিয়া সকলে,বাণীর যোগ্যবর হইয়াছে বলিয়া, কত আনন্দ করিবে,—মেয়ের মুখে সুখের আভাস দেখিয়া তাঁহার পিতৃ-হৃদয় গভীর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে !—তা না হইয়া, হইল কি না একজন মলিন-উত্তরীয়ধারী সংস্কৃত-শিক্ষিত—তাও একটা উপাধি-ধারী নয় এবং এমন বয়স নাই যাহাতে ইংরেজি শিখিয়া মানুষ হয়,—তাঁহারই সংসার হইতে বিতাড়িত পুরোহিত, বাণীর চ'ক্ষের বিষ ;—তাহাকেই খোসামোদ করিয়া ডাকিয়া আনিয়া কন্যাদান করিতে হইতেছে !—অদৃষ্টের একি তীব্র পরিহাস !—কোন্ পাপের এ প্রায়শ্চিত্ত ?

কন্যার দ্বারে গিয়া রমাবল্লভ ডাকিলেন, ।—"বাণী, মা আমার !—উঠে আয় মা।" ভিতর নিঃসাড়। তাঁহার বক্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল,"মা ! দেখ্, তুই ছিলিনি ব'লে আজ কিছু খেতে পার্‌লাম না। আমার মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে র'য়েছে !—তুই উঠে আয়, একবার তোকে দেখি।"

বাণী আর রাগ করিয়া থাকিতে পারিল না ; ঝনাৎ করিয়া দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার ঘর বারান্দার আলো হইতে অল্প আলোকিত হইল। পিতা কন্যাকে দুই হাতে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন ; বাণী নিঃশব্দে পিতার বক্ষে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। রমাবল্লভ ডাকিলেন, "মা ! আমার উপর রাগ করেছিস ?" উত্তর না পাইয়া ব্যাকুলভাবে আবার কহিলেন, বল্—আমি কি করি !—কিছু উপায় আছে কি ?" বহুক্ষণ নীরব থাকার পর বাণী মুখ তুলিয়া বলিল, দাদাবাবু আমায় ভালবাস্‌তেন্ না। রমাবল্লভ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বাস্‌তেন বাণী,—তবে তিনি তাঁর নিজের কুলধর্ম্ম ও আচারকে সকলের চেয়ে বেশি ভালবাস্‌তেন্। আমি পাছে ঐ গুলাকে তেমন ক'রে না মান্‌তে পারি, তাই আমার এখনকার কর্ম্মও ব্যবস্থিত ক'রে দিয়ে গিয়েছেন।—কারও দোষ নয় মা, আমার কপালের দোষ !"

"চল বাবা, আমরা আর চার দিন পরে এসব ছেড়ে অনেক দূরে চ'লে যাই—তাঁর আচার বজায় থাক্।" রমাবল্লভও কি একথা অনেকবার মনে আনেন্ নাই?—আনিয়াছেন বই কি, কিন্তু যতবারই মনের মধ্যে এ চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে, ততবারই তিনি যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন! চিরদিনের এই সংসার-সুখ-সম্পদ্—সবই পিতৃ-পিতামহের—জন্মসূত্রে তিনি এ সকলের অধিকারী হইয়াছিলেন। এসব ছাড়িয়া কোথায় অজ্ঞাতবাসে যাইবেন! বিশেষ বাণীর বিবাহোপলক্ষে তিনি অনেক ভাবিয়াছেন;—সে মন্দির ছাড়িয়া শ্বশুরালয়ে কেমন করিয়া থাকিবে?—মন্দির যে তাহার প্রাণ! এখন কন্যার কথায় তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাহার এই লজ্জা যে কতবড় লজ্জা, তাহা তিনি নিজের ভিতর হইতেই অনুভব করিতে পারিতেছিলেন বলিয়া তাহার জন্য মনটা বড়ই কাতর হইতেছিল। গভীর দুঃখে বলিয়া ফেলিলেন, "তাই চল্ মা!—কাজ নাই আমাদের ঐশ্বর্য্যে,—চল্ কোথাও যাই।"

কণ্ঠস্বরের মৃদু-কম্পনে মনের কি সুগম্ভীর সর্ব্বত্যাগী বাৎসল্য প্রকাশ পাইল! বাণীর সমস্ত চিত্ততাপ, পিতার সহানুভূতি-সূচক কথায় জুড়াইয়া গেল; তখনই আবার স্নেহশীলা কন্যা-প্রকৃতির প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "না বাবা, এসব ছাড়িয়া কোথায় যাইব?—যা হয় হউক,—কোথাও যাইতে পারিব না!"

তথাপি রাত্রে রমাবল্লভ ঘুমাইতে পারেন নাই, মেয়ে না হয় মেয়ের কাজ করিয়াছে; তা বলিয়া ত আর বাপের কর্ত্তব্য বাপ ছাড়িতে পারেন না। সকাল হইলেই কি ঘটনা ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া আকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ-চোখও যেন লাল হইয়া উঠিতেছিল। আবার আরএক ভাবনা—অম্বর যদি বিবাহ করিতে অসম্মত হয়, তবে কি হইবে! যদি অসম্মত হয়, লজ্জায় হয়ত বাণী মরিয়া যাইবে!

যত বেলাহইতে লাগিল, রমাবল্লভের সন্দেহের যন্ত্রণা তত বাড়িতেলাগিল; শেষের দিকে আর সকল ভয় গিয়া ক্রমে একটিমাত্র এই প্রকাণ্ড ভয় জাগিয়া রহিল, পাছে অম্বর আসিয়া বলে,—ভাবিয়া দেখিলাম ইহা অসম্ভব! এই সম্ভাবনার কথা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে রমাবল্লভের হাত-পা-গুলা অসাড় হইয়া আসিতেছিল।—তাহাহইলে পথে বাহির হওয়া অনিবার্য্য—কারণ মৃগাঙ্কর হাতে, সতীনের উপর, মেয়ে দিতে তিনি কিছুতেই পারিবেন না। তিনিও ত জমিদার হরিবল্লভের পুত্র! পিতার মনে কষ্ট দিয়া ও ন্যায়ের অনুরোধে যে শপথ করিয়াছিলেন, আজ অর্থ-বিনিময়ে তাহা ভাঙ্গিতে পারিবেন না,—ততদূর অর্থ-পিপাসা তাঁহার নাই।

মানুষ যদি দুর্ভাবনার হস্তে নিজেকে ছাড়িয়া দেয়, তবে ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সমুদ্রগর্ভে কাণ্ডারীহীন তরণীর মত তাহার ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরিয়া মরা ভিন্ন পথ নাই।—বিজ্ঞ জমিদার, শিশুর মত অস্থিরচিত্তে উঠাবসা, ঘোরাঘুরি করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন!

ভৃত্য আসিয়া জানাইল—'পুরাণ পুরুত ঠাকুর আসিয়াছেন।' রমাবল্লভ চমকিয়া উঠিল। তাহার পাণ্ডু মুখ যেন একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল।—'আসিয়াছে!—কি বলিবে!—যদি বলে, 'না আমি পারিব না'!—গোপীবল্লভ! তা'র চেয়ে আশার আলো লইয়া একটা দিন কাটান যে ভাল ছিল। বিদায় দিব নাকি?' ভৃত্য আদেশ প্রার্থনায় দাড়াইয়া ছিল; সে দেখিল, প্রভুর সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে। বিস্মিত হইয়া সে বলিল, "তেনাকে এখন বিদায় করিয়া দিই?" রমাবল্লভ ব্যাকুলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না।—তাকে ডাক্।"

অম্বর প্রবেশ করিয়া নমস্কারের পরিবর্ত্তে প্রণাম করিল। রমাবল্লভের চিত্ত যদি অতদূর বিচলিত না হইয়া স্বভাবে থাকিত, তাহা হইলে—একরাত্রে এ মানুষটার পরিবর্ত্তনে তিনি বিস্ময় বোধ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। শিশু সহসা যৌবন পাইলে, অথবা ক্ষুদ্র মুকুল অকস্মাৎ পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিলে, যেমন সকলেরই দৃষ্টি সেদিকে পড়িয়া থাকে, সেইরূপ শিশুস্বভাব অম্বরনাথের সরল-মুখে আজ একটা আকস্মিক গাম্ভীর্য্যের ছায়া-পড়ায় সকলের দৃষ্টিই তাহার উপর পড়িতেছিল;—কিন্তু রমাবল্লভ অতদূর সূক্ষ্ম-বোধ দূরে থাকুক, স্থূল প্রত্যক্ষ বিষয়েও দৃষ্টি-হারা হইয়াছিলেন। অম্বরের গৃহ-প্রবেশের পর, বহুক্ষণ তিনি চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতেই সাহস করেন নাই। এই সঙ্কুচিত-স্বভাবের ছেলেটির মুখে যে বজ্র-লেখা মধ্যে মধ্যে ফুটিয়া উঠে, সেইটা যদি হঠাৎ চোখে পড়িয়া যায়! অম্বর কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া দেখিল, রমাবল্লভ কিছু বলিলেন না!—সে মনে করিল, হয়ত ইঁহার মত বদলাইয়াছে

—হঠাৎ কিছু বলা উচিত নয়। এই ভাবিয়া সেও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চিত্ত এখন বেশ স্থির হইয়াছে, ভোরের আলোয় নদীর তীরে শান্ত-আকাশের তলে উদীয়মান রবির স্থিরোজ্জ্বল কিরণ-ধারায় সে যেন দেবা-দেশ লিখিত দেখিতে পাইয়াছিল ;—সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী ইষ্টদেবী প্রসন্নমুখে বলিয়াছেন, "এ বিবাহে তোমার দিক্ হইতে অধর্ম্মাচার নহে, তোমার বধূকে তুমি মানসীরূপে পত্নী—সহধর্ম্মিণী পদ দিতে পারিবে ;—আর তাহার পক্ষে ? তাহার-ধর্ম্ম তাহার-দেবতা তাহাকে শিখাইয়াছেন,—সে ভাবনা তোমার কেন ?"

রমাবল্লভ আসন গ্রহণ করিয়া নতমুখে বলিলেন, "অম্বর, আমি প্রতীক্ষা করিতেছি।" অম্বর মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনার আদেশপালনে আমি প্রস্তুত আছি।" "প্রস্তুত আছ !—সকল সর্ত্তেই !" অম্বর মাথা তুলিয়া বলিল, "হাঁ,—সকল সর্ত্তেই।" একটা বিকল-যন্ত্র অকস্মাৎ লুপ্ত-স্বর ফিরিয়া পাইলে যন্ত্রীর যেমন আনন্দ হয়, রমাবল্লভেরও সেইরূপ আনন্দ হইল।

রাজনগরগ্রামে এত বড় বিস্ময়জনক ঘটনা আর কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জমিদার-কন্যার বিবাহে যে-কাণ্ডটা ঘটিল, স্বর্গীয় জমিদার যখন ওই আশ্চর্য্য মর্ম্মর-মন্দিরে দৈবৈশ্বর্য্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন, তখনও বোধ হয়, তথাকার অধিবাসীরা তত বিস্মিত হয় নাই। স্থানে স্থানে জমায়েৎ হইয়া ছোটবড় স্ত্রীপুরুষ আজকাল কেবল ঐ একমাত্র আলোচনা লইয়া দিন কাটাইয়া দেয়,—উত্তেজনায় তর্কে কাহারও কাহারও ঘরে হাঁড়ি-চড়াইতে, কাহারও ছেলে-পড়াইতে ভুল হইয়া যায়। আগুনাথ তুলসীকে গিয়া বলিল, "এ কি রটনা বৌ-ঠাকরুণ্ ?"

তুলসীর মন আনন্দে ভরা ;—তাহার সখীর একটি সখা জুটিলেই সে খুসী। তা'ছাড়া আড়াল হইতে অম্বর-নাথকে দেখিয়া তাহার বেশ মনেও ধরিয়াছে।—হইলই বা সে গরীব !—সে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।—চোখে বেশ নম্র-দৃষ্টি, অধরপ্রান্তে বেশ একটু স্নিগ্ধ-সকরুণ-হাসি ! এটুকু কয়জনের থাকে ? আগুনাথের কথায় সে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "রটনা আবার কি ঠাকুরপো !—সত্যি কথা।"

আগুনাথের মুখখানা হাঁড়ির মত হইয়া গেল।—এ দেশের, "সবাই পাগল। ভাতরাঁধা-বামুন, হইল দেব-পুরুত ; আবার যা'র পুরুত-গিরিথেকে নাম-কাটা হ'ল, সে-ই হইল জামাই!—কালে কতই দেখ্তে হ'বে!" তুলসী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "পাকা-পুরোহিত দেখিয়া দেখিয়া যদি জামাই করিতে হয়, তবে বিবাহ-সভায় যে আনাড়ি-পুরুতকে মন্ত্র বলিতে ডাকাভিন্ন উপায় থাকে না ! তাই উল্টা পথে চল্‌তে হ'ল।"

আগুনাথ তাহার নিজের প্রতি ইঙ্গিত বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "যাও যাও,—অত হাসি-ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না ; আমি একটা নিমন্ত্রণে শান্তিপুর চলিলাম,—পনের দিন পরে আসিব।"—"সেকি, বিবাহ দিবে কে !" "বড় ত বিয়ে তার দু-পায়ে আল্‌তা ! যেমন বর, তেমনই পুরোহিত খুঁজিয়া আনা হউক না। আমি মরিয়া গেলেও এমন বিবাহের মন্ত্রপাঠ করাইতে পারিব না। জগতের স্থিতিকাল ফুরাইয়া আসিয়াছে, শীঘ্রই সমস্ত উৎসন্ন যাইবে !"

ক্রোধভরে আগুনাথ উঠিয়া গেল ; যাইতে যাইতে তুলসীমঞ্জরীর কলকণ্ঠনিঃসারিত বিদ্রূপ-হাস্য গৃহান্তর হইতেও তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বশরীরে বিষ ছড়াইয়া দিতে লাগিল। সে তাহার দরজাটা সবেগে মুক্ত ও রুদ্ধ করিয়া মনের খেদ কিঞ্চিৎ মিটাইয়া গেল। শব্দ-শুনিয়া তুলসী বলিল, "ঠাকুরপো, গরীবের দ্বারটা ভেঙ্গে বড়লোকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাবে দেখ্‌চি।"

আগুনাথ না-হয় রাগ করিয়া পলাইয়া গিয়া বিবাহের পুরোহিতগিরির দায়-এড়াইল, কিন্তু বাণীর কনে-গিরি বন্ধ করিবার ত কোন-পথ ছিল না ! কাজেই মন্ত্র-নিরুদ্ধ-বীর্য্য বিষধর সর্পের মত সে মনের রুদ্ধ-ক্ষোভে গুমরাইতে ছিল এবং সুবিধা পাইলেই মা'র উপর ছোবল্ দিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেও ছাড়িতেছিল না।

কৃষ্ণপ্রিয়া নিজে এ-বিবাহে তেমন অসুখী নহেন। তিনি বরাবরই অম্বরকে স্নেহ-চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, এবং পিতা-কন্যায় মিলিয়া যখন তাহাকে বিদায় করিয়া দেন, তখন তাহার জন্য তাঁহার প্রাণটা ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তবে এসব বিষয়ে মেয়ের কথাই বড়, তাঁহার পরামর্শের মূল্য নাই বুঝিয়াই চুপ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শেষ-অবলম্বনরূপে আবার তাহার চেয়ে উচ্চ-অধিকার লইয়া সে ফিরিয়া আসিল, তখন নির্দ্দোষের প্রতি অবিচার করার দরুণ তাঁহার যে পাপের ভয়টা হইয়াছিল,

তাহা কমিয়া তাহার স্থানে প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষমা-প্রাপ্ত চিত্তের শান্তির আনন্দ জাগিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলেন, 'বাণীর পাপের এই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত! তা হউক, আমার ইহাতে দুঃখ নাই। মেয়ের যে তেজ!—এমন ভাল মন না হইলে কে সহিত?' বিবাহে ঘটা তেমন না-হইলেও হাজার-হউক, জমিদার-ঘরের যে-সর্ব্বস্ব, তাহারই বিবাহ। নয়-নয়-করিয়াও বড় কম-নয়। গৃহিণী কর্ম্মাবসরে মধ্যে মধ্যে কন্যার নিকট আসিয়া বৈবাহিক অনুষ্ঠানের মঙ্গল-কার্য্যগুলি সম্পন্ন করাইতেছিলেন। সম্মুখে অপর কেহ থাকিলে বাণীও দ্বিরুক্তি না-করিয়া মাতৃ-নির্দ্দেশ পালন করিতেছিল, কিন্তু মাকে একা পাইলেই সে এমনই উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল যে, তিনি তাহার আব্দারে ও অত্যাচারে বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন।

বিবাহের দিন, রাত্রি-থাকিতে মা আসিয়া মেয়েকে জাগাইয়া বলিলেন, "ওঠ—বেলা হইয়া যাইবে, দধি-মঙ্গলটা করিয়া লওয়া যা'ক্"—

বাণী ঘুমায় নাই—বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিল। মায়ের ডাকে প্রথমে উত্তর দিল না, শেষে বারংবার আহ্বানে নিদ্রালস্যজড়িত-কণ্ঠে উত্তর দিল, "দধি-মঙ্গল কি?—সেই দইচিঁড়ে খাওয়া ত? আমার পেটে রাক্ষস ঢোকে নাই ত, যে এই ভোরবেলা পূজাহ্নিক না করিয়াই খাইতে বসিয়া যাইব।"

মা বলিলেন, "বেশি কি খাইবি,—দুটি মুখে ঠেকাইতে হয়, একবার বসিবি আয়।" বাণী পাশ ফিরিয়া ভাল করিয়া বালিস টানিয়া শুইয়া বলিল, "আমার এখন ভারি ঘুম পাইতেছে। তুমি যাও—যাহারা খাইতে বড় ভালবাসে, তাদের পেট ভরিয়া খাইতে দাও গিয়া,—আমি উঠিতে পারি না।"

কৃষ্ণপ্রিয়া একটু রাগ করিয়া বলিলেন, "তোর সকল তাতেই হাঙ্গামা!—নিয়ম-কর্ম্ম করিতে হইবে বৈকি!—উঠে আয়।"

বাণী তাহার স্বভাবসিদ্ধ জেদের সহিত বলিল, "ভারি-ত বিয়ে, তা'র আবার 'নিয়ম-কর্ম্ম!' আমি ঘুমাই—তুমি যাও।"

"কি বাণি! কেবলই তুই ঐ সব কথা বলিস! বিয়ের আবার বড় ছোট কি?"—কৃষ্ণপ্রিয়া এবার তাহার হাত ধরিলেন, "ওঠ্! মনটা ভাল করে নে-দেখি,—শুভকার্য্যে ওরকম করিতে নাই।"

"না,—নাই বই-কি? বড় বিয়ে!—নয়-ত কি? পুরুত-বামুনের সঙ্গে বিয়ে, বুঝি বড্ড-চমৎকার বিয়ে বলিতে হইবে?" "পুরুত-বামুন কি ছোট-লোক? সেকালে সবাই ত পুরুতগিরি করিতেন,—তাঁদের কত মান্য ছিল! তাঁদের চাইতে বড় কে!—ওঠ্ ওঠ্।" বাণী মাতার আকর্ষণে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া তীব্র-ঘৃণার সহিত হাসিল।—"ঠিক্ সেইরকমই বটে।"—তারপর ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, "বাবারে বাবা, আমায় মেরে না-ফেল্লে তোমাদের আর স্বস্তি নাই দেখ্‌ছি। বল, কোথায় যেতে-হ'বে—বল।—দইচিঁড়ে খেয়ে এক্ষণই আমার কলেরা হয় ত খুব হয়,—মজা টের পাও।'

কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, "তোর জ্বালায় আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে। বাণি, ভেবে গ্যাখ্ দেখি—তুই কি হচ্ছিস্!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ হইয়া গেল! বাণী আশা করিতেছিল, কোন না কোন উপায়ে, হয়ত শেষকালে এই দারুণ-লজ্জার হাত হইতে তাহার মুক্তিলাভ ঘটিবে;—কিন্তু তেমন কোন ঘটনাই ঘটিল না! সে ইহাও চকিতের মত ভাবিয়াছে যে, হয়ত দাদাবাবুর আর একখানা গোপন-উইলপত্র কোথায়ও লুকান আছে, বিবাহের ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সেইখানা আবিষ্কৃত হইয়া সকলহাঙ্গামা মিটাইয়া ফেলিবে!—কিন্তু হায়!—পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া—শেষমুহূর্ত্ত-অবধি নির্ব্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত গতিতে যথাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল,—স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কিছুই দেখা দিল না।

কনে-সাজানর সময় তুলসী রত্নালঙ্কারের রাশি আনিয়া কাছে বসিলে, একবার সহসা তাহার মনের মধ্যে আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইবার উপক্রম হইয়াছিল,—কিন্তু সে অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিল। বাড়ীর অন্যসকলে বলাবলি করিতেছিল,—"মেয়ে ত বাণী। বাপ্-মা যেটি বলিতেছেন, তাহাতে হুঁ-হাঁ অবধি নাই। এই যে 'অযুগ্যি'

বিবাহ হইতেছে, তা মুখখানিতে দুঃখের এতটুকু ছায়া আছে।”

তুলসী বলিল,“সই! আজ ভালকরিয়া সাজাই আয়।”—ভালকরিয়া সাজিবে কাহার জন্য?—হায়, কাহার জন্য সে সাজিবে?—বাণীর উভয় গণ্ড গাঢ়রক্তে লাল হইয়া উঠিল;—কিন্তু সে হাসিয়া বলিল, “গঙ্গাযাত্রার সময় ভাল করিয়া সাজিতে হয় নাকি?”

“ছিঃ সই, যা-মুখে-আসে বলিতে আছে কি!—কেন ভাই, তোর কি বর মনে-ধরে নাই?” মনে-ধরা যে সম্ভবই নয়, তাহা তুলসী বেশ ভালই জানিত। কিন্তু এতবড় অঘটনটা যে কেন ঘটিল,সে সংবাদটা উহ্য,—তাই সে ফাঁপরে পড়িয়াছিল। তবে বাণীর ধরণে সন্দেহটা এপর্য্যন্ত ফুটিতে পায় নাই। তাহাকে ত কই এ বিবাহের বিরোধী দেখায় না! শেষকালে নিজে নিজেই মীমাংসা করিয়াছিল যে,পৌরোহিত্যে অযোগ্য অম্বরনাথকে সে স্বামিত্বের অনুপযুক্ত মনে করে নাই। এখন তাই বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, ‘তার বর কি মনে-ধরে নাই?’

বাণী তাহার স্বভাবসিদ্ধ গর্ব্বের দ্বারা মনের ভাব চাপিয়া, রাজরাণীর ধরণে গ্রীবা বাঁকাইয়া, গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, “ধরিবে না কেন?”—“তবে?”—“কি-তবে?”—“ওসব বলিতেছিস্—কার-জন্য সাজিব? এই সব!” বাণী হাসিয়া বলিল, “মনে-ধরিয়াছে বলিয়াই ত বলিতেছি।—মনেই যখন ধরিয়াছে, তখন সাজিয়া আর কি হইবে?”

বিবাহের সময় শুভদৃষ্টি শুভ-ভাবে না-হউক, একরূপ হইয়া গেল। অম্বরের নেত্রতারকা নির্ম্মল সন্ধ্যা-তারকার মতন;—সেদিকে চোখ্ ফিরাইলে অগ্নিকণাও যেন শীতল হইয়া আসে। বিদ্যুতের ন্যায় বারেক চাহিয়া বাণী দৃষ্টি নত করিল, কিন্তু ইহা লজ্জার দরুণ নহে—ক্রোধে! রমাবল্লভ যখন বরের হাতে কন্যার হস্ত দিয়া সম্প্রদান-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন সে মন্ত্রোচ্চারণে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটিতেছিল এবং একটা অপমানের তীব্রজ্বালা পিতা এবং কন্যার সর্ব্বশরীরের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। বাণীর সেই হাতখানা—যেখানা অম্বরের হাতে ছিল—সেখানা যেন তাহার অঙ্গ হইতে খসিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে!—এমনি তাহার অনুভব হইতে লাগিল।—হাতখানা কাঁপিল না, কিন্তু ভিতরের উত্তাপে গরম না হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া আসিল!

যাহার নিকট হইতে লক্ষযোজন দূরে থাকিতে পারিলে প্রাণবাঁচে—সেই মূর্খ-পুরোহিতের সঙ্গে তাহার বস্ত্রগ্রন্থি বাঁধিয়া দিল। বাণী তখনই টানিয়া সেই গ্রন্থি-ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল,—কিন্তু চারিদিকে সহস্রচক্ষু তাহারই দিকে নিবদ্ধ, এখনই একটা তীব্র আলোচনা-উপহাস উঠিবে!—সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে বলিল, “কতক্ষণে এসব বিপদ্‌গুলা শেষ হইবে!—‘ও’ আসামে চলিয়া যাইবে আমি বাঁচিব!”

বাসরে আনন্দনিশি-যাপনের সুপ্রচুর আয়োজন হইয়াছে। কুটুম্বিনী-সখী-নিমন্ত্রিতার অভাব ছিল না। অম্বর ঘরে না-ঢুকিয়া বাসরদ্বারে দাঁড়াইয়া পড়িল! জলধারা দিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া আনন্দসজল-নেত্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন, তিনিও দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইলেন, “এস বাবা, এই খানে বসিয়া একটু জলটল খাও। ওগো, তোরা আমার চাঁদের মতন জামাই দেখেছিস্?”

নারীগণ একসঙ্গে কোলাহল করিয়া কেহ যথার্থ, কেহ মন রাখিয়া, নবজামাতার রূপের প্রশংসা করিয়া উঠিল। সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনতলে সক্রোধ বিদ্রূপে বাণীর অধরে মৃদু অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল,—মনে মনে বলিল, “মা যেন ‘আদেখ্‌লে’, যা পান তাতেই খুসী!—আহা কি অপরূপই রূপ!”

অম্বর কহিল, “মা! আমার শরীর অসুস্থ আছে, একটু ঘুমাতে পারিলে বোধ হয় ভাল হইত। বাহিরে যাইতে পারিব কি?”

সোৎসুকে কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন,—“শরীর ভাল নাই!—কেন বাবা, কি হইয়াছে! বাহিরে ত এখন যাওয়া হয় না। আচ্ছা, আমি এখনই তোমায় জলখাওয়াইয়া ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। ও মা তুলসি! শীঘ্র খাবার লইয়া আয়, দুজনে একসঙ্গে আজ খাইতে হয় না?”—“হয় বই কি সই মা! এক পাতে খাইতে হয় যে। তুমি যাও, আমরা খাওয়াইতেছি। অসুখটসুক কিছু না সই মা,—ওসব তোমার জামাইএর, ঢঙ্! আজ আর তা’ ব’লে কেহ ঘুমাইতে পায় না। আজ রাত্রিটা আমোদ-আহ্লাদ করিতে হয়।”

অম্বর ধীরভাবে কৃষ্ণপ্রিয়ার উৎসুক নেত্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি কিছু খাইতে পারিব না মা, আমায় একটু ঘুমাইতে দিতে বলুন, নহিলে হয় ত বেশি অসুখ করিতে পারে।"

গভীর বাৎসল্যে কৃষ্ণপ্রিয়ার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। নবজাত শিশুর প্রতি যে স্নেহ অকস্মাৎ জোয়ারের জলের মত মাতৃবক্ষে উথলিয়া উঠে, এই নবসম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবল স্নেহ-তরঙ্গ কূলপ্লাবী ভাবে মনের ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছে। অসুখের কথা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "তবে আর কিছু খাইয়া কাজ নাই। ও তুলসি! ওমা সুরবালা! তোরা গোলমাল করিসনে, ওকে রাত্তিটা ঘুমাইতে দে। অসুখবিসুখ করিলে ভাবনায় আমি মরিয়া যাইব।"

অম্বর যখন প্রথম দাঁড়াইয়াছিল তখন গাটছড়া-বাধা,—কাজেই বাণীকেও সেই সঙ্গে দাড়াইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল! সে তখন বিরক্ত হইয়া ভাবিল, "এই প্রভুত্ব আরম্ভ হইল দেখিতেছি!—উনি দাড়াইলে দাড়াইতে হইবে, চলিলে চলিতে হইবে।—আমায় যেন কিনিয়া ফেলিয়াছেন! ভাগ্যে দুদিন পরেই চলিয়া যাইবে, তাই রক্ষা!—নহিলে সর্ব্বনাশ হইয়াছিল আর কি!"

কিন্তু অম্বরনাথ যখন "একপাতে খাওয়ার" প্রস্তাব হইতে একত্র রাত্রি-যাপন অবধি সব কাটাইয়া তাহার মস্ত বড় ভাবনাগুলাকে মুহূর্ত্তে চুকাইয়া দিল, তখন এই প্রথম সে তাহার প্রতি একটু কৃতজ্ঞতা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না। বিশেষতঃ এই বাসর-দৃশ্য কল্পনা করিয়া সে কয়দিন যেন আড়ষ্ট হইয়াছিল। লোকের সম্মুখে মানও বজায় রাখিতে হইবে, অথচ সেখানে বর-কনে লইয়া যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, সে সকল সমর্থন করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! পাছে তাহার স্বভাব-সুলভ মহিমদৃপ্ত সম্রাজ্ঞী-ভাবটা আজ কার্য্যগতিকে হারাইতে হয়, এই ভয়টা তাহার বুকের মধ্যে এতক্ষণ তীব্রবেগে ঘা দিতেছিল।

বাসরসঙ্গিনী মহিলাগণ বর ও তাহার শাশুড়ীর বিবেচনার দোষ দিয়া অনেকেই অভিমানের সহিত ঘর ছাড়িয়া গেল!—নিতান্তই যাহাদের সখ বেশি, তাহারা কেহ মমতাবশে পুষ্পগন্ধামোদিত সুরমা স্বপ্ন-পুরীবৎ বাসর-গৃহের গালিচার উপরেই অঙ্গ ঢালিয়া দিল, তবু ত সেটা বাসর! নব বধূরাণী বাসর গৃহে প্রবেশ করিয়া একপ্রান্তে অবস্থিত সুকোমল-শয্যাবিস্তৃত পালঙ্কোপরি শুইয়া পড়িয়াছিল। বর অম্বরনাথ গাটছড়া-বাধা উত্তরীয় খানা ধীরে ধীরে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া নীচের মসনদ-শয্যায় আসিয়া বসিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ভোরের বেলা যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন বাতির আলো নিবিয়া আসিয়াছে, ঊষার অতি স্নিগ্ধালোক জগতে সুপ্রভাত প্রচারিত করিতেছিল। চোখ মেলিয়া বাণী প্রথম যেন কিছু বুঝিতে পারিল না যে, এ কোথায় সে ঘুমাইয়াছিল। ঘরের চারিদিকে স্তবকে স্তবকে পুষ্পমালা দোদুল্যমান, বড় স্ফটিকাধারে এখনও অনুজ্জ্বল হেমপিঙ্গল-জ্যোতিঃ বর্ত্তিকালোক উৎসব রজনীর সাক্ষ্য দিতেছে, গন্ধদ্রব্যে কক্ষবায়ু যেন উদ্যান পবনের মত সুরভি ভারাকুল। সে ভাল করিয়া চোখ মুছিল,—স্বপ্ন নয় ত? অদূরে বিচিত্র গালিচার উপর নীল মখমলে উজ্জ্বল স্বর্ণ রৌপ্য সূত্রে খচিত বিছানা। সেই বিছানার উপর চারিদিকে তেমনই স্বর্ণ কমলের ভ্রমরগ্রথিত তাকিয়ার সারি। আর এই চন্দ্রাসন-তুল্য বিছানায় কে ঐ শুইয়া। বাণী বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিল। যেন নীল আকাশের মাঝখানে সমুন্নত-শীর্ষ শুভ্র রজতগিরি!—সে সহসা দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। অম্বর তখন ঘুমাইতেছিল, তাহার অনাবৃত বিশাল বক্ষে বাণীর স্বহস্তপ্রদত্ত ফুলের মালাও প্রসুপ্ত! তাহার চন্দন-চর্চ্চিত প্রশস্ত ললাট! নিঃশ্বাসভরে বক্ষস্পন্দনের সহিত সেই সুরভি-সুষমা সমন্বিত ফুলহার তালে তালে উঠিতে পড়িতেছিল, তাহা হইতে মৃদু মৃদু সুগন্ধ উঠিয়া যেন মধুরমন্দ ছন্দে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, বুঝি তাহারই সঙ্কুচিত হৃদয়ের বার্ত্তা সে গোপনে প্রচার করিতেছে। বাণী অবাক্ হইয়া গেল—এই অম্বরনাথ? এই তাহার স্বামী? এই রক্তবস্ত্র-পরিহিত মহাদেবতুল্য সৌম্য সুন্দর কান্তিমান্ পুরুষ—এই কি সেই লজ্জাভয়-বিজড়িত দীন পুরোহিত! কোথা হইতে সে এত সৌন্দর্য্য পাইল!

সুপ্ত অম্বরের মৃদু শ্বাস ঈষৎ দ্রুত বহিল, আরক্ত উপাধানতলে নিপতিত হইয়া হাতখানি ঈষৎ নড়িয়া উঠিল, সেই

সঙ্গে অঙ্গুরীয়স্থিত হীরকগুলা আলোক-সম্পাতে ঝক্‌মকিয়া উঠায় সেই আলো বাণীর চোথে পড়িয়া তাহাকে দৃষ্টি নামাইতে বাধ্য করিল। মুহূর্ত্তেকে অসংযত হইয়া প্রথমে সে লাল হইয়া উঠিয়াছিল, পরক্ষণে তাহার অত্যন্ত হাসি পাইল। সাজিলে গুজিলে কাহাকে না ভাল দেখায়? সাজাইলে পথের দীন-হীন ভিথারীকেও বোধ হয় মন্দ দেখায় না!

প্রভাতে বিবাহের প্রধান-কৃত্য কুশণ্ডিকা সমাধা হইয়া গেল। কুশণ্ডিকাই বিবাহ; কন্যা-সম্প্রদান ও গ্রহণে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। আজিকার ব্যাপার বাণীর পক্ষে সব চেয়ে ক্লান্তিকর; বিরক্তিতে, পরিশ্রমে তাহার মুখ সিঁদূরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এই টুকুই আশ্চর্য্য যে, সে আজ অনেকখানি সহিয়াও যাইতে ছিল। কে জানে কেন, গত কল্যকার সেই সর্ব্বময়ী মহারাণী-সদৃশ সগর্ব্ব চালচলন আজ সে ঠিক রাখিতে পারে নাই। কাল সে-ই যেন চালাইতেছিল, অম্বর চলিতেছিল,—কিন্তু আজ তাহাদের পদ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ তাহার মনে হইল, অম্বর যেন তাহাকে পরিচালিত করিতেছে, আর সে যন্ত্রীচালিতের মত চলিতেছে। সে রাগ করিয়া অপমানিত বোধ করিয়া থামিয়া যাইবে মনে করিল,—পারিল না। অস্পষ্ট অথচ একটা প্রবল অনুভূতি যেন জানাইতেছিল, অম্বরের আজ সে অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে। সে তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ নিকটে আছে ততক্ষণ তাহার ইঙ্গিতমাত্র অবহেলা করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। কে-যেন সেই মুহূর্ত্তে কঠিন একগাছা লৌহশৃঙ্খল দিয়া তাহার সর্ব্বশরীর আঁটিয়া আঁটিয়া বাঁধিতেছে, এমনই একটা রুদ্ধ চাপ সে যেন সমস্ত দেহ ও মনে অনুভব করিয়া হাঁফাইয়া উঠিতে লাগিল! একবার তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রবল আত্মাভিমান জাগিয়া উঠিল; ক্রোধে ক্ষোভে লাল হইয়া সে মনে করিল, এখনই ছুটিয়া চলিয়া যাই। রমাবল্লভের মেয়ে আমি, আমায় লইয়া সে বাঁদর-নাচাইবে? কিন্তু তথনই মনে হইল, তাহার পায়ে বেড়ি পড়িয়া গিয়াছে,—চলিতে গেলে সে যেন হোঁচোট খাইয়া পড়িয়া যাইবে,—চলিবার যো নাই। তখন সে মনে মনে বড়ই অশান্তি উপভোগ করিতে লাগিল। মার প্রতি ভারি রাগ হইল; মাই ত ইহাকে

প্রভাতে বিবাহের প্রধান-কৃত্য কুশণ্ডিকা সমাধা হইয়া গেল।

জুটাইয়াছেন! তখন যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডে প্রত্যক্ষ অগ্নিদেবতা হবির্গন্ধে ঊর্দ্ধশিখ হইয়া প্রসন্ন হাস্য করিতেছিলেন। যজ্ঞধূমে আরক্তগণ্ড বরের মুখে যজ্ঞেশ্বরের মত অনৈসর্গিক সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইতেছিল। সে বারেক চাহিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটীভরে চক্ষু নত করিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে বেদমন্ত্র দেবতার বাণীরূপে বাণীর কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বশরীর নিস্পন্দ নিশ্চল করিয়া দিতে লাগিল,—তাহার সমুদয় ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন সেই মহাশক্তিতে একেবারে আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া গিয়া তাহাকে পাষাণে পরিণত করিয়াছিল। সে তখন মুগ্ধ হইয়া শুনিল, তাহার স্বামী বলিতেছেন,—

"ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্ত মনুচিত্তন্তেহস্তু।
মমবাচা মেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিয়ুনক্তু মহ্যম্।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

শাশুড়ী-বধূ *

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি অবলম্বনে)

'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে † বলিয়াছিলাম যে বাঙ্গালী বধূর নিজের ভগিনী অপেক্ষা স্বামীর ভগিনীর সঙ্গে একত্র বসবাস ও ঘরকরনার সম্ভাবনা বেশী। তখন ঝোঁকের মাথায়, বোধ হয়, কথাটার উপর একটু বেশী জোর দিয়া ফেলিয়াছিলাম। কেননা, আমাদের সংসারে সধবা নারীর বারমাস পিত্রালয়ে বাস করা সাধারণ নিয়ম নহে। এমন কি, বিধবা নারীও পিতা বা ভ্রাতার গলগ্রহ না হইয়া শ্বশুরের, বা শ্বশুর অবর্তমানে, ভাশুরের পরিবারভুক্ত হইয়া থাকেন, ইহাই হিন্দু-পরিবারের স্বাভাবিক ব্যবস্থা।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আখ্যায়িকাবলিতে এ ব্যবস্থার রদবদল করেন নাই। এক 'কপালকুণ্ডলা'তেই ননদ ভাজের একত্র ঘরসংসার করার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি তজ্জন্য কৈফিয়তও দিয়াছেন। 'শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা, কেননা তিনি কুলীনপত্নী।' [কপালকুণ্ডলা,—২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।] 'চন্দ্রশেখরে' সুন্দরী শৈবলিনীর সহিত একপরিবারস্থা নহেন, তিনি 'চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসি-কন্যা এবং সম্বন্ধে ভগিনী। তাঁহার পিতা নিতান্ত অসঙ্গতিশালী নহেন। সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিতেন। তাঁহার স্বামী শ্রীনাথ প্রকৃত ঘরজামাই না হইলেও কখনও কখনও শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকিতেন।' [চন্দ্রশেখর—২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ] 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' শৈলবতীর যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে অনুমান হয়, তিনিও পিতৃগৃহে থাকিতেন। তিনি সধবা কি বিধবা তাহাও ঠিক বুঝা যায় না। ধনিকন্যা বলিয়াই সম্ভবতঃ তিনি 'চন্দ্রশেখরে' বর্ণিত সুন্দরীর ন্যায় পিত্রালয়ে থাকিতেন। এ তিনটি স্থলেই দেখা গেল, বিশেষ বিশেষ কারণবশতঃই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এরূপ ব্যতিক্রমও হিন্দুসমাজে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ‡ 'বিষবৃক্ষে' কমলমণি কলিকাতায় স্বামীর কাছে থাকিতেন, কেবল প্রয়োজন হইলেই ভ্রাতৃগৃহে আসিতেন, এই পর্য্যন্ত। ইহাই হইল ঠিক প্রচলিত প্রথা। 'আনন্দমঠে' নিমাই শান্তির প্রতিবেশিনী, তাঁহার সহিত একপরিবারস্থা নহেন। কি প্রবল কারণে জীবানন্দ পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া, ভগিনীর শ্বশুরালয়ের গ্রামে শান্তিকে অধিষ্ঠিতা করিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থকার আনন্দমঠের পঞ্চম সংস্করণে সংযোজিত একটি পরিচ্ছেদে [—২য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ] আমূল বিবৃত করিয়াছেন।

অতএব, ননদের কথা ছাড়িয়া দিয়া বরঞ্চ এই কথা বলিলে প্রকৃত কথা বলা হয় যে, বাঙ্গালী বধূ সচরাচর শাশুড়ী ও যা লইয়া ঘর করেন। শাশুড়ী বধূতে ও যায়ে-যায়ে স্নেহবন্ধন থাকিলেই সুখের সংসার হয়।

এই দুইটি সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অদ্য সেই প্রশ্নের বিচার করিব।

ননদ ভাজের বেলায় যাহা বলিয়াছি, এখানেও সে কথা খাটে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল আখ্যায়িকার বিবাহে পরিসমাপ্তি, সেগুলিতে শাশুড়ী ও যায়ের কোন প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না। সুতরাং 'দুর্গেশনন্দিনী', 'রাধারাণী' প্রভৃতিতে ইঁহাদিগের সমাগম নাই। 'মৃণালিনী'তে নায়ক-নায়িকার গোপনবিবাহ পূর্ব্বেই সংঘটিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের বিবাহিত জীবনের আরম্ভ আখ্যায়িকার শেষে। এই গ্রন্থে মনোরমার বিবাহ ও 'দেবীচৌধুরাণী'তে হিরণ্ময়ীর বিবাহ যেরূপ রহস্যে জড়িত, তাহাতে তাঁহাদের বেলায় শাশুড়ী ও যায়ের কথা উঠিতেই পারে না। কতকগুলি আখ্যায়িকাতে গ্রন্থকার যেরূপ

---

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটহলে পঠিত।

† 'ভারতবর্ষে'র কার্ত্তিক বা শারদীয়া সংখ্যায় মুদ্রিত।

‡ মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তে ননন্দা পিতৃগৃহবাসিনী কেন তাহা খোলসা করিয়া বলা নাই। 'চন্দ্রশেখরে' বর্ণিত সুন্দরীর মত ধনিকন্যা বলিয়া কি? 'জামাইবারিকে' এই কারণ সুস্পষ্ট। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বৌ'এ ননন্দা জামার অবস্থা 'কপালকুণ্ডলা'র বর্ণিত জামার মতই, অর্থাৎ তিনি কুলীনপত্নী।

গোড়াপত্তন করিয়াছেন, তাহাতে শ্বাশুড়ী লইয়া ঘর করার সম্ভাবনা তিরোহিত। 'মৃণালিনী'তে মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র গ্রন্থারম্ভেই 'ভাগ্যহীন'। 'চন্দ্রশেখরে' চন্দ্রশেখরের মাতা স্বর্গলাভ করিলেন, তবে তিনি সাংসারিক সুবিধার জন্য বালিকা শৈবলিনীর পাণিপীড়ন করেন। রাজসিংহ, সীতারাম, আনন্দমঠের মহেন্দ্রসিংহ, প্রভৃতি ত বহুকাল হইতেই লায়েক। এসব স্থলে গ্রন্থকার আগেভাগেই মুড়ো মারিয়া রাখিয়াছেন। 'রজনী'তে শচীন্দ্রনাথের মাতাপিতা আছেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতা আছেন, অবশ্য ভ্রাতৃবধূও আছেন (যদিও পুস্তকে কোথাও তাঁহার উল্লেখ নাই); কিন্তু শচীন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী কি ভাবে শ্বাশুড়ী ও যা লইয়া ঘর করিয়াছিলেন সে প্রসঙ্গ আখ্যায়িকায় উঠে নাই। রজনীকে দ্বিতীয় পক্ষ করিয়া তিনি স্থানান্তরে বাস করিলেন, সুতরাং লেঠা চুকিল। রজনীকে শ্বাশুড়ী ও যা লইয়া ঘর করিতে হইল না। তবে গ্রন্থকার ইহার অবশ্য সঙ্গত কারণ দর্শাইয়াছেন। 'রজনী ফুলওয়ালী ছিল, পাছে কলিকাতায় ইহাতে লোকে ঘৃণা করে, এই ভাবিয়া তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে বাস করিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতায় বাস করিতেছেন।' [রজনী—৫ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ]।

যায়ের কথায় একটু মজা আছে। অধিকাংশ স্থলেই বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলির প্রধান অপ্রধান পাত্রগণ মায়ের এক ছেলে, সুতরাং তাঁহাদিগের পত্নীদিগের যায়ের বালাই নাই। দৃষ্টান্তস্থলে নবকুমার, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, মহেন্দ্রসিংহ, জীবানন্দ, ব্রজেশ্বর, সীতারাম, প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' হরলালকে বিপত্নীক করিয়া গ্রন্থকার এবিষয়ে আমাদিগকে বেশ ফাঁকি দিয়াছেন—ভ্রমরের যা যুটিবার যো রাখেন নাই। হরলালের পত্নীর জীবদ্দশায় তাঁহার ভ্রমরের সঙ্গে কিরূপ ভাব ছিল, তাহাও পুঁথিতে লেখে না। কনিষ্ঠ বিনোদলাল বিবাহিত কি অবিবাহিত তাহাও জানা যায় না। 'রজনী'র কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'রজনী'তে রজনীর পিতা ও পিতৃব্য (হরেকৃষ্ণ দাস ও মনোহর দাস) সম্বন্ধে যে পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, তাঁহারা একত্র বাস করিতেন না, তবে মনোহর ও তৎপত্নী হরেকৃষ্ণের জন্মান্ধ কন্যার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কার দিয়াছিলেন—আদালতের জোবানবন্দীতে এই কথা জানা যায়। কিন্তু সে বিশেষ কারণবশতঃ। [রজনী—৩য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।] এই একমাত্র স্থলে যায়ের উল্লেখ দেখা যায়।

যে সকল আখ্যায়িকায় নায়িকার বাল্যবিবাহ ঘটিয়াছে ও বিবাহিত জীবনের বৃত্তান্ত আছে, সেইগুলিতেই শ্বাশুড়ীর প্রসঙ্গ উঠিতে পারে। অতএব সেইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। 'ইন্দিরা'য় বিবাহের পর কথারম্ভ হইলেও ইহা বিবাহিত জীবনের ইতিহাস নহে, কেননা ইন্দিরার পতির সঙ্গে প্রকৃত মিলন গ্রন্থশেষে। পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে, গ্রন্থশেষে ইন্দিরার কলঙ্কভঞ্জন হইলে তাঁহার 'শ্বশুর-শ্বাশুড়ী সন্তুষ্ট হইলেন' [২২শ পরিচ্ছেদ] এই কথা মাত্র আছে। কিন্তু পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে ইন্দিরার সখী সুভাষিণীর শ্বাশুড়ীকে লইয়া ঘর করার প্রসঙ্গ আছে। 'রাজসিংহে'র পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে চঞ্চলকুমারীর সখী নির্ম্মলকুমারীর বৃদ্ধা পিস-শ্বাশুড়ীর কথা আছে। 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর শ্বাশুড়ী নাই, সুন্দরী ত পিত্রালয়বাসিনী, রূপসীর শ্বাশুড়ী থাকার কথাও শুনি না। 'বিষবৃক্ষে' সূর্য্যমুখীর শ্বাশুড়ী নাই, কিন্তু কমলমণির শ্বাশুড়ীর উল্লেখ আছে, কুন্দর কুলত্যাগিনী শ্বাশুড়ীর কথাও দুই একবার উঠিয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা'র শ্বাশুড়ীর প্রসঙ্গ গ্রন্থকার দু'কথায় শেষ করিয়াছেন। 'আনন্দমঠে', শান্তির শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ঘর করার কথা পঞ্চম সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের শ্বাশুড়ীর কথা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে শ্বাশুড়ী-বধূ-সম্পর্ক বিশদভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার মধ্যে সাতখানিতে শ্বাশুড়ীর প্রসঙ্গ আছে। এক্ষণে দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্র শ্বাশুড়ী-বধূ-সম্পর্কের কিরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

এই সাতখানি আখ্যায়িকার মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' সর্ব্বাগ্রে রচিত। ইহাতে গ্রন্থকার নিতান্ত সংক্ষেপে সারিয়াছেন—'নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন।' [কপালকুণ্ডলা,—২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।] এ ক্ষেত্রে শ্বাশুড়ী বিধবা। বুঝা গেল, প্রথম আমলে লিখিত গ্রন্থে, গ্রন্থকারের একটু সঙ্কোচের ভাব রহিয়াছে; গ্রন্থকার শ্বাশুড়ীকে আসরে নামাইতে সাহস পাইতেছেন

না, অথচ তাহার জন্য একটা সন্তোষজনক কৈফিয়তও দিতে পারিতেছেন না।

পরবর্ত্তী গ্রন্থ 'বিষবৃক্ষে'ও শ্বাশুড়ী বিধবা কিন্তু এবার একটু রকমফের আছে! এবার গ্রন্থকারের সাহস বাড়িয়াছে। তিনি বলিতেছেন :—'কমলের শ্বশ্রূ বর্ত্তমান, কিন্তু তিনি শ্রীশচন্দ্রের পৈত্রিক বাসস্থানেই থাকিতেন। কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।' [বিষবৃক্ষ—৫ম পরিচ্ছেদ।] এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকার আধুনিক বাঙ্গালীজীবনের একটা বাস্তব দিক্ খোলসা করিয়া দেখাইয়াছেন—কেননা ইহা ঠিক হালের প্রথা। চাকুরীজীবী বাঙ্গালী শাতলা ঘাড়ে করিয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া যান—আর বৃদ্ধা জননী দেশে কুঁড়ে আগলাইয়া থাকেন ও ভিটায় সন্ধ্যা দেন!

উভয় স্থলেই দেখা গেল, শ্বাশুড়ী পদ্মপত্রের জলের মত টলমল করিতেছেন, পুত্র ও বধূর সংসারে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না—তিনি যেন interloper.

কুন্দর কুলত্যাগিনী শ্বাশুড়ীর কথা অনেকে শুনিতে নারাজ হইবেন, কিন্তু সে কথায় একটি সুন্দর তথ্য নিহিত আছে, তজ্জন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে বাধ্য হইলাম। হরিদাসী বৈষ্ণবী কুন্দকে বলিতেছেন :—

" 'তোমার শ্বাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন।.... তোমাকে একবার দেখবার জন্য বড়ই কাঁদিতেছেন—আহা হাজার হোক শ্বাশুড়ী। সে ত আর এখানে তোমাদের গিন্নীর কাছে সে পোড়ারমুখ দেখাতে পারবে না—তা তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়া তাকে দেখা দিয়ে এস না।' কুন্দ সরলা হইলেও বুঝিল যে, সে শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ-স্বীকারই অকর্ত্তব্য। অতএব বৈষ্ণবীর কথায় কেবল ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।" [—৯ম পরিচ্ছেদ।]

এ সমস্তই অবশ্য দেবেন্দ্র দত্তের কারসাজি—কুন্দকে ধোঁকা দিবার জন্য রচা কথা। কিন্তু কথায় বলে, খোসখবরের ঝুঁটোও ভাল। শ্বাশুড়ীর বেটার বৌকে দেখিবার কতটা প্রাণের টান থাকে, কুলত্যাগিনী হইলেও তাহার সে সাধ-আহ্লাদ মিটে না, এই তথ্যটি গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ইহা সত্য জানিয়াই দেবেন্দ্র দত্ত কুন্দকে ওরূপ ছলনা করিতে সাহসী হইয়াছিল।

'রাজসিংহে' নির্ম্মলকুমারীর পিসশ্বাশুড়ী নিতান্ত দূর-সম্পর্কীয়া—নিঃসম্পর্কীয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল এক পিসির ননদের যায়ের খুল্লতাতপুত্রী ছিল। সৌজন্য-বশতঃই হউক, আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক,—মাণিকলাল তাহাকে পিসি বলিয়া ডাকিত।' [রাজসিংহ—৩য় খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ।] সেই 'স্নেহশালিনী পিসি'র স্নেহ মাণিকলাল অপেক্ষা তাহার আশরফির উপরই বেশী ছিল। [রাজসিংহ—৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।] এ অবস্থায় নির্ম্মলকুমারী যে তাহার সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যের সুরে 'একটা পাতান রকম পিসি আছে' বলিল ইহাতে বোধ হয় কোনও দোষ হয় নাই। [রাজসিংহ—৫ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] নির্ম্মলকুমারী অতি অল্প দিনই মাণিকলালের ঘর করিয়াছিল, অতএব এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকার শ্বাশুড়ী-বধূ-সম্পর্ক সংক্ষেপেই সারিয়াছেন।

'আনন্দমঠে' পঞ্চম সংস্করণে সংযোজিত একটি গোটা পরিচ্ছেদ আছে। তাহাতেই শান্তির শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আবির্ভাব হইয়াছে। 'শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভর্ৎসনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল। পীড়াপীড়িতে শান্তি বড় জ্বালাতন হইল। একদিন দ্বার খোলা পাইয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।' তাহার পর—অনেক দিন পরে শান্তি 'শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্বাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না,—জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।' [আনন্দমঠ—২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।]

বুঝিলাম, শান্তি যতদিন শ্বাশুড়ীর সহিত ঘর করিয়াছিল, ততদিন ঠাকুরাণী শান্তিকে বড় শান্তি পাইতে দেন নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্বাশুড়ীকে বৌকাটকী বলিয়া সাব্যস্ত করিলে অন্যায় হইবে। শান্তির অশান্ত স্বভাবই এই ব্যবহারের জন্য দায়ী। শান্তির অসাধারণত্বের মর্য্যাদা সাধারণ শ্বাশুড়ীতে কি করিয়া বুঝিবেন? জীবানন্দ বুঝিয়াছিলেন, তাই 'মাকে বুঝাইয়া, মার কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন' এবং ভগিনীপতি-প্রদত্ত ভূমিতে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া 'শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।' [আনন্দমঠ—২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।]

এখানে শ্বাশুড়ীকে সধবা ও বিধবা দুই অবস্থাতেই দেখা গেল। এবং ইহাও বুঝা গেল যে, তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনই এ ক্ষেত্রে শ্বাশুড়ী-বধূতে মিলমিশ হয় নাই।

পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট চারিখানি আখ্যায়িকাতেই শ্বাশুড়ী-বধূ-সম্পর্কে বাস্তব জীবনের কুৎসিত দিক্‌টাই দৃষ্টিগোচর হইল। এক্ষণে দেখা যাউক, অপর তিনখানিতে এই চিত্র কিরূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ভিত্তি একান্নবর্ত্তি-পরিবারে দায়াদগণের মধ্যে সম্পত্তি-বিভাগ-সমস্যার উপর। অতএব ইহাতে একান্নবর্ত্তি-পরিবারের এই দিক্‌টা (শ্বাশুড়ী-বধূ-সম্পর্ক) কিরূপে চিত্রিত হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। ভ্রমর স্বামীর উপর অভিমান করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য বেচারা শুধু গোবিন্দলালের কাছে কেন, বঙ্গীয় সমালোচকগণের কাছেও, অনেক খোঁটা খাইয়াছে। সে কথার বিচারের এ স্থল নহে। কিন্তু এ কথা জোর করিয়া বলিব, ভ্রমর একদিনের তরেও শ্বাশুড়ী বা জ্যেঠশ্বশুরের অসম্মান করে নাই। এ ক্ষেত্রে ভ্রমর খাঁটি হিন্দুবধূ। এমন কি, উইলচুরি ব্যাপারে রোহিণীর জন্য যখন ক্ষমাভিক্ষার প্রয়োজন হইল, তখন ভ্রমর দয়াবতী হইয়াও 'শ্বশুরকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না—বড় লজ্জা করে, ছি! অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের কাছে গেলেন।' [—১ম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।] বুঝিলাম, ভ্রমর একালের বধূদিগের মত 'ব্যাপিকা' নহে।

যখন গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভুলিবার জন্য বিদেশে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন, ভ্রমর শুনিয়া বাহানা ধরিল, 'আমিও যাইব। কাঁদাকাটি হাঁটাহাঁটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শ্বাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না।' [—১ম খণ্ড, ১৯শ পরিচ্ছেদ।] শ্বাশুড়ীর কথা অমান্য করা তাহার সাধ্য ছিল না। ইহাও খাঁটি হিন্দু ঘরের কথা। শ্বাশুড়ীর কাযটিও অস্বাভাবিক নহে।

গোবিন্দলালের বিচ্ছেদে যখন ভ্রমরের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, তৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—'তাস খেলা বন্ধ করিল—সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শ্বাশুড়ী রাগ করেন।' [—১ম খণ্ড ২০শ পরিচ্ছেদ]। অবশ্য এটা ভ্রমরের ছলমাত্র, কিন্তু শ্বাশুড়ীদের এরূপ টিক্ টিক্ করা একটা রোগ। মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় (—২য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক) এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বৌ'এও দেখা যায় যে শ্বাশুড়ীর সাড়া পাইয়াই বধূ জড়সড় হইয়া তাস লুকাইতে ব্যস্ত। ঝী-বৌরা তাস খেলিয়া কুঁড়ের সর্দ্দার হইয়া যায়, সেই জন্যই ঘরণী গৃহিণীরা তাহাদিগকে কায ফেলিয়া খেলা করিতে দেখিলে টিক্ টিক্ করেন।

কিন্তু এরূপ একটু খিটিমিটি করিলেই তাহাতে শ্বাশুড়ী মন্দ হয় না। ঐ পরিচ্ছেদেই দেখি, ভ্রমর যখন 'জ্বর হইয়াছে' ছল করিল, তখন শ্বাশুড়ী বধূর বাড়াবাড়িতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া স্নেহময়ী জননীর মত 'কবিরাজ দেখাইয়া, পাঁচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন, যে বৌমাকে ঔষধগুলি খাওয়াইবি।' স্বামিসোহাগিনী ভ্রমর তখন অভিমানিনী—হাজার হৌক ছেলেমানুষ—তাই 'ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িয়া লইয়া, জানেলা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।' ইহাতে কেহ কি তাহাকে শ্বাশুড়ীর অবাধ্য বলিয়া নিন্দা করিবেন? রোহিণীর কথা লইয়া ক্ষীরি চাকরাণীর উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াও ভ্রমর বলিয়াছে 'ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব।'

তাহার পর, ভ্রমরের সেই সাংঘাতিক ভুল, গোবিন্দলালের উপর অভিমান করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাওয়া। ইহাতে ভ্রমর বেশ একটু জুয়াচুরি খেলিয়াছিল বটে, কিন্তু এরূপ ফাঁকি গৃহস্থঘরে অনেক বধূই দিয়া থাকে। ইহা বাস্তব চিত্র। ভ্রমরের মাতার 'উদ্দেশে ভ্রমরের শ্বাশুড়ীকে একলক্ষ গালি' দেওয়াও সেই বাস্তব চিত্রেরই অংশ।

গোবিন্দলাল গৃহে ফিরিলে গোবিন্দলালের মাতা বৌমার উপর রাগ করিয়া মাতার কর্ত্তব্য, শ্বাশুড়ীর কর্ত্তব্য, সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। কিন্তু গোবিন্দলাল সে ক্ষেত্রে ভ্রমরকে আনিতে লোক পাঠাইতে 'মাতাকে নিষেধ করিলেন'। [—১ম খণ্ড ২৪শ পরিচ্ছেদ।] সুতরাং তাঁহার মাতাকে নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পরদিনেই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন।' (—১ম খণ্ড ২৬শ পরিচ্ছেদ)।

এ পর্য্যন্ত দেখা গেল, ভ্রমরের শাশুড়ী কখন কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয়েন নাই, পুত্রবধূকে স্নেহ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। তাহার পর নূতন উইলের সূত্রে যখন গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের ব্যবধান আরও বাড়িয়া গেল, সেই সময়ে শাশুড়ীর ব্যবহার নিন্দার্হ সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার নিজেই বিশদ-ভাবে সেটুকু বুঝাইয়াছেন।

'আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন তবে ফুৎকার-মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারে। যদি তিনি এই সময়ে সদুপদেশ, স্নেহবাক্য এবং স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ অন্যান্য সদুপায়ে তাহার প্রতীকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন; কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্নাও হইয়াছিলেন। যে স্নেহের বলে ভ্রমরের ইষ্টকামনা করিবেন, ভ্রমরের উপর তাঁহার সে স্নেহ ছিল না। পুত্র থাকিতে পুত্রবধূর বিষয় হইল, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি একবারও অনুভব করিতে পারিলেন না যে, ভ্রমর-গোবিন্দলাল অভিন্নসম্পত্তি জানিয়া, গোবিন্দলালের চরিত্রদোষ-সম্ভাবনা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত রায় গোবিন্দলালের শাসন জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মনে ভাবিলেন না যে, কৃষ্ণকান্ত মুমূর্ষু অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়াই এ অবিধেয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, পুত্রবধূর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্য হইয়া ইহজীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব সংসার ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন। একে পতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা, তিনি স্বামিবিয়োগকাল হইতেই কাশীযাত্রা কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ পুত্রস্নেহ-বশতঃ এতদিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল।

'তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, "কর্ত্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া আসিল। তুমি পুত্রের কাজ কর; এই সময়ে আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।"

'গোবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।" দুর্ভাগ্য-বশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার ইচ্ছা করিয়া

মা, আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না।

পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করে নাই।' [—১ম খণ্ড ৩০শ পরিচ্ছেদ।]

এবারও ভ্রমরের কাহাকেও না বলিয়া না কহিয়া পিত্রালয় যাওয়া অন্যায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, কি জন্য শ্বাশুড়ী তাঁহার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন; এবং তাহাই শোধরাইবার জন্য অর্থাৎ স্বামীকে সমস্ত বিষয় দেওয়ার দানপত্র প্রস্তুত করাইবার জন্য * তিনি এরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল।

'গোবিন্দলাল মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। শ্বাশুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিল। আসিয়া শ্বাশুড়ীর চরণ ধরিয়া অনেক বিনয় করিল; শ্বাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "মা, আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসার-ধর্ম্মের কি বুঝি? মা সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।" শ্বাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড় ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।" ভ্রমর কিছুই বুঝিল না—কেবল কাঁদিতে লাগিল।' [—১ম খণ্ড, ৩০শ পরিচ্ছেদ।] আমরা দেখিলাম, ভ্রমর মনের এমন অবস্থায়ও শ্বাশুড়ীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য ভুলে নাই।

তাহার পর যখন গোবিন্দলাল বহু বৎসর ধরিয়া নিরুদ্দেশ, তখনও ভ্রমর শ্বাশুড়ীর শরণাগতা, তাঁহাকে চিঠি লেখাইয়া সংবাদ আনিতেন, ইহাও একাধিক স্থলে উল্লিখিত আছে। [—২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]। তিনি স্বর্গগত হইলে সে বন্ধনও টুটিল।

এ ক্ষেত্রেও শ্বাশুড়ী বিধবা, তবে একান্নবর্ত্তি-পরিবারে ভাশুর বর্ত্তমানে তিনিই অবশ্য সর্ব্বময়ী কর্ত্রী নহেন।

'ইন্দিরা'য় (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে) সুভাষিণীর শ্বাশুড়ী লইয়া ঘর করার চিত্রটি বেশ পরিস্ফুট। এ ক্ষেত্রে শ্বাশুড়ী সধবা, কিন্তু কর্ত্তাটি মাটির মানুষ, সুতরাং গৃহিণীই সর্ব্বে-সর্ব্বা। তিনি দোষে গুণে জড়িত মানুষ,—বৌকে স্নেহ করেন, বৌকে যত্ন-আর্ত্তি করিতে জানেন। মাসীর বাড়ী 'সুবো' ইন্দিরাকে শ্বাশুড়ীর পরিচয় দিল—'মাকে লইয়া একটু গোল আছে। তিনি একটু খিট্‌মিটে—তাঁকে বশ করিয়া লইতে হইবে।' [—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] শ্বাশুড়ীর অসাক্ষাতেও যে সুভাষিণী তাঁহাকে 'মা' বলিয়া পরিচয় দিল, (কেন না অসাক্ষাতে রাজার মাকেও ডাইনী বলে), ইহাতে বুঝিলাম সুভাষিণী শ্বাশুড়ীকে ভালবাসে, ভক্তি করে। পর-পরিচ্ছেদে বর্ণিত শ্বাশুড়ী-বধূর কথোপকথনের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

'গৃহিণী ঠাকুরাণী বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে?"

বধূ বলিল, "তুমি * একটি রাঁধুনী খুঁজিতেছিলে, তাই একে নিয়ে এসেছি।"

গৃহিণী। কোথায় পেলে?

বধূ। মাসীমা দিয়েছেন।

গৃ। বামন না কায়েৎ?

ব। কায়েৎ।

গৃ। আঃ তোমার মাসীমার পোড়াকপাল! কায়েতের মেয়ে নিয়ে কি হবে? একদিন বামনকে ভাত দিতে হলে কি দিব?

ব। রোজ ত আর বামনকে ভাত দিতে হবে না—যে কয়দিন চলে চলুক—তার পর বামনি পেলে রাখা যাবে—তা বামনের মেয়ের ঠ্যাকার বড়—আমরা তাঁদের রান্নাঘরে গেলে হাঁড়িকুড়ি ফেলিয়া দেন—আবার পাতের প্রসাদ দিতে আসেন! কেন আমরা কি মুচি?

আমি মনে মনে সুভাষিণীকে ভূয়সী প্রশংসা করিলাম—কালিভরা লম্বা বোতলটাকে সে মুঠোর ভিতর আনিতে জানে দেখিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "তা সত্যি বটে মা,—ছোট লোকের এত অহঙ্কার সওয়া যায় না। তা এখন দিনকতক কায়েতের মেয়েই রেখে দেখি। মাইনে কত বলেছে?"

* 'আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।' এই বলিয়া ভ্রমর একখানি কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন "পড়।" গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন—দানপত্র। ভ্রমর উচিত মূল্যের ষ্ট্যাম্পে, আপনার সমুদায় সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন। তাহা রেজেষ্টারী হইয়াছে।' (১ম খণ্ড, ৩০শ পরিচ্ছেদ।)

* এ 'তুমি' ভালবাসার চিহ্ন, অবজ্ঞার নহে।

এবার কান্না রাখিতে পারিলাম না। কাঁদিয়া উঠিয়া গেলাম। কালির বোতলটা পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"ছুঁড়ী চল্‌লো না কি?"

সুভাষিণী বলিল, "বোধ হয়।"

গৃ। তা যাক্‌গে।

সু। কিন্তু গৃহস্থ বাড়ী থেকে না খেয়ে যাবে? উহাকে কিছু খাওয়াইয়া বিদায় করিতেছি।" [—সপ্তম পরিচ্ছেদ।]

দেখা গেল, শ্বাশুড়ী-বধূর সম্পর্ক কেমন মধুর, কেমন স্নেহময়!

আর একদিনের কথা বলি। গৃহিণী ইন্দিরার রান্না খাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে পাচিকাবৃত্তিতে বাহাল করিয়া সুভাষিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমা দেখো গো, এঁকে যেন কেউ কড়া কথা না বলে—আর তুমি ত বলবেই না, তুমি তেমন মানুষের মেয়ে নও।" [—অষ্টম পরিচ্ছেদ।] আর এক স্থলে ইন্দিরা বলিতেছেন:—"গিন্নী তা'র হাতে কলের পুতুল, কেন না সে রমণের বৌ—রমণের বৌর কথা ঠেলে কা'র সাধ্য?" [—নবম পরিচ্ছেদ।] এই টুকুই খাঁটি কথা। বেটার বৌ বলিয়াই তাহার উপর স্নেহ-মমতা; যে মা সন্তানকে ভালবাসেন, তিনি কি সাধের বৌমাটিকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন? সে যে কত সাধের সামগ্রী! বঙ্কিমচন্দ্র অল্প কথায় এই সুন্দর তথ্যটুকু ফুটাইয়াছেন।

সে কি মা! দেশ শুদ্ধ সব সমস্ত লোক কি মন্দ?

ব। তা আমার সঙ্গে কোন কথা হয় নাই।

গৃ। হায়রে কলিকালের মেয়ে! লোক রাখ্‌তে নিয়ে এসেছ, তার মাইনের কথা কও নাই?

* * *

সুভাষিণী মাঝে হইতে বলিল, "কেন মা, সমস্ত লোকে কি কাজ কর্ম্ম পারে না?"

গৃ। দূর বেটি পাগলের মেয়ে! সমস্ত লোক কি লোক ভাল হয়?

সু। সে কি মা! দেশ শুদ্ধ সব সমস্ত লোক কি মন্দ?

গৃ। তা নাই হলো—তবে ছোট লোক যারা পেটে খায় তারা কি ভাল?

অবশ্য সুভাষিণী শ্বাশুড়ীর প্রকৃতি বুঝে, এবং বুঝে বলিয়াই তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁহার দুর্ব্বলতাটুকুও জানে, তাহা লইয়া তাঁহার অসাক্ষাতে একটু ফষ্টিনষ্টিও করে [পাকাচুল তোলার প্রসঙ্গ,—নবম পরিচ্ছেদে]। কিন্তু ইহাতে অশ্রদ্ধা অভক্তির ভাব নাই; হাস্যময়ী স্নেহময়ী সুভাষিণীর চরিত্রে এটুকু বেশ মানাইয়া যায়। ইন্দিরা স্বামীর সহিত সম্মিলিত হইলে সুভাষিণী তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহাতেও শ্বাশুড়ীর কথা লইয়া একটু রঙ্গ করিয়াছে বটে [—দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ],

কিন্তু তাহা নির্দ্দোষ আমোদ। বাস্তবিক, এই গ্রন্থে গ্রথিত শ্বাশুড়ী-বধূর চিত্রখানি বড় সুন্দর। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্দ্ধিত-সংস্করণ বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সের রচনা।

'দেবী চৌধুরাণী'ও বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সের লেখা। এ গ্রন্থেও শ্বাশুড়ী সধবা, কিন্তু কর্ত্তাটি রাশভারী মানুষ, 'ইন্দিরা'য় বর্ণিত রামরাম দত্তের মত মাটির মানুষ নহেন। সুতরাং এখানে শ্বাশুড়ী সম্পূর্ণ স্বাধীনা নহেন, তাঁহার প্রসঙ্গে শ্বশুরের কথাও তুলিতে হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখিতেছি, দারিদ্র্য-দুঃখক্লিষ্টা প্রফুল্ল বলিতেছে—"শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে যোটে তবে খাইব—নহিলে আর খাইব না।……আমাকে সঙ্গে করিয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আইস। যাহাদের উপর আমার ভরণপোষণের ভার তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব—তাহাতে আমার লজ্জা কি? আমি কেন চেয়ে ধার ক'রে খাব—আমার ত সব আছে?" ইহাই হইল প্রকৃত বাঙ্গালী-বধূর কথা। শ্বশুরের অন্ন মানের অন্ন, শ্বশুরঘর বজায় থাকিলেই সুখ-সৌভাগ্য। শ্বশুরকর্ত্তৃক অকথনীয় অপমানে অপমানিতা হইয়াও প্রফুল্ল এ কথা ভুলে নাই।

মা—আমার কি অসাধ যে তোমায় নিয়ে ঘর করি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা এমন গুণের বধূর শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণীর সাক্ষাৎ পাই। প্রথম দুই বেহাইনে একটু কথা কাটাকাটি হইল—বাঙ্গালীর কুটুম্বিতার বাস্তব-চিত্র—কিন্তু তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। শ্বাশুড়ী-বধূর কথাবার্ত্তার একটু পরিচয় দিই—

"শ্বাশুড়ী বলিল,

"তোমার মা গেল, তুমিও যাও।"

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। নড় না যে?

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। কি জ্বালা! আবার কি তোমার সঙ্গে একটা লোক দিতে হবে না কি?

এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল; চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। শ্বাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বৌ নিয়ে ঘর ক'র্‌তে পেলাম না।" মন একটু নরম হলো।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই।"

গিন্নী। তা কি করিব মা—আমার কি অসাধ যে তোমায় নিয়ে ঘর করি? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে ক'র্‌বে বলে, কাজেই আমাকে ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি তোমার সন্তান নই?

শ্বাশুড়ীর মন আরও নরম হলো। বলিলেন, "কি কর্‌ব মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, "হলেম যেন আমি অজাতি—কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি?"

গিন্নী আর যুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে, তিনি কি বলেন। তুমি এখানে ব'সো মা, ব'সো।" [—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।]

প্রফুল্লর চাঁদপানা মুখ, মিষ্ট কথা ও সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট 'মা' সম্বোধন গিন্নীর মনে যে সুখের ও স্নেহের হিল্লোল তুলিয়াছে তাহা ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 'আমার কি অসাধ যে তোমায় নিয়ে ঘর করি?' এই কথা কয়টিতেই তাঁহার স্নেহশীল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেল। দুইটি পরিচ্ছেদের একটিতে বধূর প্রকৃতি ও অপরটিতে শ্বাশুড়ীর প্রকৃতি কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদে গৃহিণী কর্ত্তার কাছে মোকদ্দমার তদ্বিরে গেলেন, অনেক ওকালতী করিয়াও হারিয়া আসিলেন; কিন্তু এততেও গৃহিণীর যে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বধূকে ঘরে লওয়া, ইহা বেশ বুঝা গেল। তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্বাশুড়ী-বধূর প্রথম সাক্ষাতেই শ্বাশুড়ীর স্নেহ-সম্বোধন 'কোথা ছিলে মা?' ও প্রফুল্লকে মর্ম্মান্তিক সংবাদ দিবার সময়ও করুণামাখান সমবেদনাপূর্ণ কথা! 'আহা;—তোমারই বাড়ী ঘর বাছা—তা' কি কর্‌ব? তোমার শ্বশুর কিছুতেই মত করেন না।'—ইহাতেও শ্বাশুড়ীর মধুর প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেল।

"প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল। শ্বাশুড়ীর বড় দয়া হইল। গিন্নী মনে মনে কল্পনা করিলেন—আর একবার নথনাড়া দিয়া দেখিব। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলেন না—কেবল বলিলেন, "আজ আর কোথা যাইবে? আজ এইখানে থাক। কাল সকালে যেও।" [—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।]

গিন্নী প্রতিজ্ঞামত আর একবার চেষ্টাচরিত্র করিয়া দেখিলেন। কিন্তু কর্ত্তা কিছুতেই বাগ মানিলেন না। শেষে যখন কর্ত্তা পুত্র ব্রজেশ্বরকে ডাকাইয়া 'বাগ্দী বৌ'কে হাঁকাইয়া দিতে বলিলেন, তখনও গিন্নী স্নেহার্দ্র-স্বরে বলিলেন—'ছি! বাবা মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুল না।·· ···তা বাবা ভাল কথায় বিদায় করিও!" [—পঞ্চম পরিচ্ছেদ।]

হরবল্লভ রায়ের ব্যবহার কদর্য্য বলিয়া আমাদের তাঁহার উপর বিজাতীয় ক্রোধ হয় বটে, কিন্তু সে গুরুতর অপবাদগ্রস্তা পুত্রবধূকে তিনি ঘরে লনই বা কি করিয়া?

প্রফুল্ল সাগরকে বলিতেছে—'থাক্‌ব ব'লেই ত এসেছি—থাক্‌তে পেলে ত হয়।' [—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।] ইহাও হিন্দুবধূর কথা।

এদিকে প্রফুল্ল সাগরের কল্যাণে যখন নারীজন্ম সার্থক করিল, তখনও সেই ধীরভাব, সেই বধূচিত নম্রতার পরিচয় দিল। একালের মেয়ে হইলে স্বামীর সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিত, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে ছাটিয়া ফেলিত, ব্রজেশ্বরের আদর পাইয়া মাথায় চড়িয়া বসিত। কিন্তু প্রফুল্ল সেরূপ উল্টা স্বভাবের কোন পরিচয় দেয় নাই। পরন্তু ব্রজেশ্বর যখন রাত্রিবাসের পর বাপের কাছে পত্নীর জন্য আর্‌জী পেশ্ করিতে যাইতে চাহিল, তখন প্রফুল্লই বারণ করিল। সে বলিল, 'তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না। তা'তে আমি সুখী হইব না।' [—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] হিন্দুপত্নী এই ভাবেই শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর মর্য্যাদা রাখেন।

এ ক্ষেত্রে ইহা বলিলেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এত বড় দজ্জাল মেয়ে নয়ান বৌ—সেও সাগরের উপর চটিলে নিজে হাতে তাহার শাস্তির ভার লয় না—বলে 'আমি ঠাকরুণকে গিয়া বলিয়া দিই, তুই বড় মানুষের মেয়ে ব'লে আমায় যা ইচ্ছা তাই বলিস্।' [—চতুর্থ পরিচ্ছেদ।] আবার শ্বাশুড়ীও এমন কটুস্বভাবা পুত্রবধূকেও মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। সাগর বৌ যখন স্বামীর নামে কৈবর্ত্ত অপবাদ দিয়া নয়ান বৌএর সঙ্গে রঙ্গ করিবার জন্য সতীনবাদ সাধিল, তখনও 'নয়নতারা গিন্নীর কাছে গিয়া নালিশ করিল। গিন্নী বলিলেন "তুমি বাছা, পাগল মেয়ে। বামনের ছেলেয় কি কৈবর্ত্ত বিয়ে করে গা? তোমাকে সবাই ক্ষেপায়। তুমিও ক্ষেপ।"' [—২য় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।]

কথাগুলি কত স্নেহমাখান! তাহার পরেই গিন্নী যে কথাগুলি বলিলেন তাহাও বড় দরদের। 'যদি সত্যই হয়, তবে বৌ বরণ ক'রে ঘরে তুল্‌ব। বেটার বৌ ত আবার ফেল্‌তে পারব না।' পাকা কথা। হাজার হউক, এবার তিনি ঠেকিয়া শিখিয়াছেন! দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝেন নাই বলিয়া এখন আপশোষ হইয়াছে।

তাহার পর অদ্ভুত-ঘটনাচক্রে প্রফুল্ল, ওরফে দেবী চৌধুরাণী, যখন স্বামীর দেখা পাইলেন এবং তিনি ডাকাইতি করেন বলিয়া ব্রজেশ্বর ঘৃণা প্রকাশ করিলেন, তখনকার কথা বলি—

"যখন, ব্রজেশ্বরের পিতা প্রফুল্লকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন, তখন প্রফুল্ল কাতর হইয়া শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি অন্নের কাঙ্গাল, আপনারা তাড়াইয়া দিলে—আমি কি করিয়া খাইব?" তাহাতে শ্বশুর উত্তর দিয়াছিলেন, "চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইও।" প্রফুল্ল মেধাবিনী—সে কথা ভুলে নাই। ভুলিবার কথাও নহে। আজ ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ডাকাইত বলিয়া, এই ভর্ৎসনা করিল; আজ প্রফুল্লের সেই উত্তর ছিল! প্রফুল্লের এই উত্তর ছিল, "আমি ডাকাইত বটে—তা এখন এত ভর্ৎসনা কেন? তোমরাই ত চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইতে বলিয়াছিলে। আমি গুরুজনের আজ্ঞাপালন করিতেছি।" এ উত্তর সম্বরণ করাই যথার্থ পুণ্য। প্রফুল্ল সে পুণ্য সঞ্চয় করিল,—সে কথাও মুখে আনিল না।" [—৩য় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।] গ্রন্থকার নিজেই সব কথা বলিয়া দিয়াছেন। টীকা অনাবশ্যক।

ব্রজেশ্বর যখন তাঁহাকে বলিলেন "তোমাকে ঘরণী গৃহিণী করিব, তখনও প্রফুল্ল হিন্দুবধূর মত জিজ্ঞাসা করিল, আমার শ্বশুর কি বলিবেন?" [—৩য় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।]

অতীত-জীবনে শ্বশুরকর্ত্তৃক বার বার লাঞ্ছিতা হইয়াও তাঁহার শ্বশুরের উপর ভক্তি অটল। শেষবারে শ্বশুর গোইন্দাগিরি করিতে আসিলেও তিনি তাঁহার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নিজের—এমন কি প্রাণাধিক স্বামীরও—প্রাণ তুচ্ছ করিলেন। তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত ঘটন-পরম্পরার আমুল উল্লেখ করিয়া আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। কৌশলক্রমে শ্বশুরকে একটু ভয়-প্রদর্শন, তাঁহাকে লইয়া একটু কৌতুক করা, ইত্যাদি নানা ব্যাপার হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সব নিশি ঠাকুরাণীর কীর্ত্তি। শ্বশুরের প্রাণরক্ষার পরেও যখন ব্রজেশ্বর বলিলেন 'তুমি আমার ঘরে চল, ঘর আলো হইবে। তুমি না যাও,—আমিও যাইব না।' তখনও প্রফুল্লর সেই কথা 'আমি ঘরে গেলে, আমার শ্বশুর কি বলিবেন?' [—৩য় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ।] তাহার পর ব্রজেশ্বরের কৈফিয়তে 'প্রফুল্ল সন্তুষ্ট হইল।' দেখা গেল,—শান্তির ও ইন্দিরার বেলায় যে টুকু ত্রুটি ছিল, গ্রন্থকার এবার তাহা সারিয়া লইয়াছেন।

আর একবার শাশুড়ীর কথা তুলিব। শাশুড়ী "বৌ বরণ করিবার সময়ে একবার ঘোমটা খুলিয়া বধূর মুখ দেখিলেন, চিনিলেন, চোখের জল ফেলিলেন—তা'র পরে ব্রজেশ্বরকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন 'বাবা, এ হারাধন আবার কোথা পেলে বাবা?' তখন গিন্নীর চোখে জল পড়িতেছিল।" [—৩য় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।] যথার্থ স্নেহময়ী শাশুড়ী। এবার কর্ত্তাকে রাজি করিবার ভার তিনি লইলেন।

"গিন্নী। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, বাপ, আমিই সব বলিব। বৌভাতটা হইয়া যাক্। তুমি কিছু ভাবিও না। এখন কাহারও কাছে কিছু বলিও না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইল। এ কঠিন কাজের ভার মা লইলেন। ব্রজ বাঁচিল। কাহাকে কিছু বলিল না।

* * *

পাকস্পর্শের পর গিন্নী, আসল কথাটা হরবল্লভকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন যে, "এ নূতন বিয়ে নয়—সেই বড় বউ।"

হরবল্লভ চমকিয়া উঠিল—সুপ্ত ব্যাঘ্রকে কে যেন বাণে বিঁধিল। "অ্যাঁ সেই বড় বউ—কে বল্লে?"

গিন্নী। আমি চিনেছি। আর ব্রজও আমাকে বলিয়াছে।

হর। সে যে দশ বৎসর হলো ম'রে গেছে।

গিন্নী। মরা মানুষেও কখন ফিরে থাকে?

হর। এতদিন সে মেয়ে কোথায় কার কাছে ছিল?

গিন্নী। তা আমি ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসাও করিব না। ব্রজ যখন ঘরে আনিয়াছে, তখন না বুঝিয়া সুঝিয়া আনে নাই।

হর। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গিন্নী। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। তুমি একবার কথা কহিয়াছিলে, তার ফলে, আমার

ছেলে আমি হারাইতে বসিয়াছিলাম। আমার একটী ছেলে। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। যদি তুমি কোন কথা কহিবে, তবে আমি গলায় দড়ি দিব।

হরবল্লভ এতটুকু হইয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না। কেবল বলিলেন, "তবে লোকের কাছে নূতন ঝিয়ের কথাটাই প্রচার থাক্।"

গিন্নী বলিলেন, "তাই থাকিবে।"

সময়ান্তরে গিন্নী ব্রজেশ্বরকে সুসংবাদ জানাইলেন। বলিলেন, "আমি তাঁকে বলিয়াছিলাম। তিনি কোন কথা কহিবেন না। সে সব কথার আর কোন উচ্চবাচ্যে কাজ নাই।"

ব্রজ হৃষ্টচিত্তে প্রফুল্লকে খবর দিল।

আমরা স্বীকার করি, গিন্নী এবার বড় গিন্নীপনা করিয়াছেন। যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি ?" [—৩য় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।]

ইহাই প্রকৃত শ্বাশুড়ী-গিরি—গোবিন্দলালের মাতার সঙ্গে কত প্রভেদ !

তাহার পর প্রফুল্লর কথা বলি। সাগর যখন জিজ্ঞাসা করিল "এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে ? রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা ঘর ঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে ? তখন প্রফুল্ল উত্তর করিল—ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার-ধর্ম্ম ; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে ! এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন ? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য ? আমি এই সন্ন্যাস করিব।" [—৩য় খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।]

"কয়েক মাস থাকিয়া সাগর দেখিল, প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল। শ্বাশুড়ী প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে, প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া, তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুরও প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন। শেষ প্রফুল্ল যে কাজ না করিত সে কাজ তাঁর ভাল লাগিত না। শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রফুল্লকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করিত না, তাহার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর তাঁহাদের এতটাই শ্রদ্ধা হইল।" [—৩য় খণ্ড, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।]

এ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার মধ্যে সাতখানিতে শ্বাশুড়ী-বধূর প্রসঙ্গ আছে, এবং তন্মধ্যে তিনখানিতে পূর্ণায়ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, শেষোল্লিখিত তিনখানিতে যে তিনটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের অভাব নাই।

তথাপি এক শ্রেণীর বিজ্ঞ-সমালোচক সময়ে অসময়ে বলিয়া বসেন যে,—বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে একান্ন-বর্ত্তি-পরিবারের প্রসঙ্গ নাই, শ্বাশুড়ী-বধূর স্নেহসম্পর্ক নাই, মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তির আদর্শ নাই, সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্ত নাই, ঘরগৃহস্থালীর খবর নাই, শিশুর খেলা নাই, মাতৃভাবের বিকাশ নাই, বাস্তব-জীবনের চিত্র নাই—আছে কেবল নায়ক-নায়িকার নভেলী প্রেম ; দুটিতে মুখোমুখি করিয়া কেবল 'ভালবাসি ভালবাসি' বুলি সাধিতেছে—যেন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর প্রহসনের 'বৌমা'। বিজ্ঞ-সমালোচক আরও গলা চড়াইয়া বলেন—বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রীচরিত্রগুলি যেন টবের ফুল, কাশ্মীরী বারাণ্ডায় টবে টবে একা একা ফুটিয়া থাকে, বাগানের ফুলের মত পাঁচটার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে জানে না, খোলা জমির মাটী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া, পাঁচটা গাছপালার সঙ্গে আলো ও বাতাস ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইয়া, বাড়িয়া উঠিতে জানে না।

বিজ্ঞ-সমালোচক গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিবার উদ্দেশে মন্তব্য-প্রকাশ করেন,—এ সব বিলাতী নমুনার (প্যাটার্ণের) হুবহু নকল। ইংরেজি নভেলে ছেলে সাবালক হইলেই নাটার ফলের মত মা-বাপের সংসার হইতে ছট্কাইয়া পড়ে, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয় ; সুতরাং ইংরেজ-নারীর শ্বাশুড়ী বা মা'য়ের সঙ্গে ঘর করা ইংরেজ-সমাজের স্বাভাবিক ব্যবস্থা নহে। বৃদ্ধা বিধবা শ্বাশুড়ীর সঙ্গে বৌরাণীর একত্র বাস করার দৃষ্টান্ত ক্বচিৎ ইংরেজ-সমাজে বা ইংরেজি নভেলে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বিলাতী-সভ্যতার মোহে অভিভূত হইয়া আমাদের একান্নবর্ত্তি-

পরিবারকে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন (কথায় বলে—'কাক উড়ে চিল পড়ে, শঙ্খচিলে বাসা করে')। তিনি আমাদের সামাজিক প্রথাকে হেয় ও অশ্রদ্ধেয়, এবং বিলাতী প্রথাকে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং বিলাতী আদর্শের অনুযায়ী নূতন ধরণের পারিবারিক জীবনের আদর্শ প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সুতরাং একান্নবর্ত্তি-পরিবার-প্রথার প্রতি তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা। তিনি বিলাতী নভেলের অনুকরণ ও অনুসরণে এবং বিলাতী সামাজিক প্রথার অনুমোদনে আমাদের পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্রে বিদেশীয় বিজাতীয় আদর্শ আমদানি করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থপাঠে আমাদের রুচি বিকৃত, প্রবৃত্তি পরাকৃত, প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত এবং সমাজ ও ধর্ম্ম পর্য্যুদস্ত ও বিপর্যাস্ত হইয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

বিজ্ঞ-সমালোচকের কর্দ্দমবৃষ্টিতে বোধ হয় আপনারা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। দেখি, এই ক্ষুদ্রভাণ্ড হইতে নির্ম্মল জল ঢালিয়া কাদা ধুইয়া ফেলিতে পারি কিনা।

প্রতিপক্ষের কথার ভাবে যেন মনে হয়, আমাদের সাহিত্যে আবহমান কাল যে ভাবের ধারা চলিয়া আসিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার জবরদস্তিতে সেই স্রোতের গতি ভিন্ন খাতে ফিরাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক কি তাহাই? কথাটার আনুপূর্ব্বিক বিচার করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথাই তুলি। কৃত্তিবাস বা কাশীরাম, ঘনরাম বা মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ বা কেতকাদাস, রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র, একান্নবর্ত্তি-পরিবারের চিত্র, শ্বাশুড়ী-বধূর স্নেহসম্পর্কের চিত্র, যা'য়ে যা'য়ে সদ্ভাব ও প্রীতিবন্ধনের চিত্র, কি ইহা অপেক্ষা বিশদভাবে আঁকিয়াছেন? যে ভারতচন্দ্রের নামে সেকেলে সম্প্রদায়ের লাল পড়ে, তাঁহার বিখ্যাত কাব্যে পড়িয়াছি বটে 'পাঁচপুত্র নৃপতির সবে যুবজানি।' কিন্তু এই যুবতী বধূদিগের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সদ্ভাব ছিল, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রতি তাঁহাদিগের কিরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল, শ্বশ্রূঠাকুরাণীরই বা তাঁহাদিগের উপর কিরূপ স্নেহ-মমতা ছিল, রায়গুণাকর তৎসম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিয়াছেন কি? প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন, ইঁহারা অপ্রধানা পাত্রী, ইঁহাদিগের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিবৃত করা কবির উদ্দেশ্য নহে। একথা না হয় মানিলাম। কিন্তু নায়িকা 'বিদ্যা' যখন বহুদিন পিত্রালয়ে বাস করার পর শ্বশুরের ঘর করিতে গেলেন, তখন তিনি কি প্রণালীতে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা করিতে লাগিলেন, কবি তাহার কোন বিবরণ দিয়াছেন কি?

'রাজারাণী তুষ্ট হয়ে পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হইলা।'

ইহাতেই কি আমরাও তুষ্ট হইয়া দ্বিজ-ভারত-বর্ণিত মহোৎসবে মগ্ন থাকিব?

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে বৌ-বেটা বরণ করিয়া ঘরে তোলার কথা স্থানে স্থানে আছে বটে, কিন্তু তাহার পরে শ্বাশুড়ী-বধূর একত্র ঘর করার চিত্র কৈ? লহনা-খুল্লনা সপত্নী-দ্বয়ের শ্বাশুড়ীর বালাই নাই। সপত্নী-শঙ্কায় লহনা বলিতেছেন 'একলা ঘরের দারা, আছিলাম স্বতন্তরা, নিতে দিতে আপনি গৃহিণী।' লহনার সখী লীলাবতী ব্রাহ্মণী, গর্ব্ব করিয়া বলিতেছেন 'শ্বাশুড়ী ননদী, ঔষধে ত বান্ধি, আমার বচন ধরে।' কেবল কালকেতু ব্যাধের ঘরে দেখা যায় শ্বাশুড়ী বধূকে লইয়া বড় সুখে আছেন;—

'নিদয়ার বাক্য ধরে ফুল্লরা রন্ধন করে
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন।
খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ ক্ষীরখণ্ড দধিমধু
নিদয়ার সফল জীবন।'

তবে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কিছুদিন পরেই কাশীবাস করিলেন; বধূ একবার মাথাখাড়া দিলে তাঁহাদিগের এ সুখ বরাবর থাকিত কি না জানি না।

মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে চাঁদ সদাগর ও সাহে সদাগরের ঘরে অনেকগুলি পুত্রবধূ ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও যা'য়ে যা'য়ে সদ্ভাব ও শ্বাশুড়ী-বধূতে সদ্ভাবের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে কি? সোনেকা পুত্রশোকে বেহুলাকে অকথা কুকথা বলিয়াছেন। অবশ্য সে অবস্থায় তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শোক সামলাইয়া 'সোনা বলে বধূ তুমি আমার কথা রাখ। লখাইর বদলে মোরে মা বলিয়া ডাক।' এ চিত্রটি বড় করুণ, বড় মধুর! সীতা-সাবিত্রী-দ্রৌপদীর ন্যায় বেহুলার শ্বশ্রূভক্তিও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত।

কবিকঙ্কণচণ্ডীতে 'শ্বাশুড়ী-ননন্দ, কিবা কৈল মন্দ' ও

'শ্বাশুড়ীননদী নাহি, নাহি তোর সতা
কা'র সনে দ্বন্দ্ব কর‍্যা চক্ষু কৈলি রাতা।'

এবং কলির দোষকীর্ত্তনে 'বধূজন হবে বলী, শ্বাশুড়ীর ধরি চুলি, শ্বশুরে করিবে অপমান', ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'সতীনী বাঘিনী, শ্বাশুড়ী রাগিণী, ননদী নাগিনী, বিষের ভরা' এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে জটিলা-কুটিলা, শ্বাশুড়ী-বধূর ও ননদ-ভাজের অপ্রণয়ের পূর্ণপরিচয় দিতেছে। অন্নদামঙ্গলে রতি, সতী, পার্ব্বতী কাহারও শ্বাশুড়ী নাই। হরিহোড়ের বৃদ্ধ মাবাপের প্রতি ভক্তির পরিচয় পাই কিন্তু হরিহোড়ের পত্নীগণের শ্বশ্রূসেবার পরিচয় কৈ পাই? ভবানন্দ মজুমদারের চন্দ্রমুখীর পদ্মমুখীরও ত ঠিক সেই অবস্থা। কেবল শাপমোচনকালে "চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানা ছান্দে। শ্বশুরশাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কান্দে॥" বলিয়া কবি শেষরক্ষা করিয়াছেন।

মেয়েলি ছড়ায় ও ব্রতকথায় 'গুণবতী বৌ চান' 'বৌ-রান্না ভাত খেয়ে চাঁদপানা মু চান', ও 'কৌশল্যা শ্বাশুড়ী পাব, দশরথ শ্বশুর পাব, লক্ষ্মণের মত দেবর পাব' প্রভৃতি সাধ আছে, কিন্তু এ সাধ পূর্ণ হইবার কোনও সংবাদ সেগুলিতেও পাওয়া যায় না। (এগুলিতে যা' সম্বন্ধে কোনও সাধ দেখা যায় না, ইহাও আশ্চর্য্য নহে কি?) বরং দুই একটী ব্রতকথায় বধূকে শ্বাশুড়ী ব্রতপালনে বাধা দিতেছেন, ধমকচমক ও লাগাইতেছেন—কিন্তু শেষে সুশীলা বধূর গুণে শ্বশ্রূর প্রেতাত্মার সদ্গতি হইতেছে এরূপ বিবরণ আছে। যমপুকুর ব্রতে উদ্ধবের মার কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। পক্ষান্তরে শীতলাষষ্ঠীর ও মনসাপূজার কথায় স্নেহময়ী শ্বাশুড়ী ও ভক্তিমতী বধূর চিত্র এবং মনসাপূজার কথায় বেণেগৃহস্থের ঘরে সাত যা'য়ের সদ্ভাব সম্প্রীতির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, দেখা যায়। অনেক রূপকথায় বধূর প্রতি শ্বাশুড়ীর নিষ্ঠুরতার উদাহরণ মিলে। মেয়েলি ছড়ায় 'উড়কি ধানের মুড়কি দিব শ্বাশুড়ী ভুলাতে' এই শেষছত্র দেখিলেই বিদিত হওয়া যায়, শ্বাশুড়ী কিসে ভুলিবে—এই পরম দুশ্চিন্তা তখনও সম্পূর্ণ ছিল।' †

এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের সম-সাময়িক বা ঈষৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, নাটককার ও আখ্যায়িকাকারদিগের রচনার ভিতর সন্ধান করিয়া দেখা যাউক, তাঁহাদিগের তুলিকায় এই শ্রেণীর চিত্র কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে। প্রথমেই বাঙ্গালার শেষ খাঁটি বাঙ্গালী-কবি ৺ঈশ্বরগুপ্তের কথা মনে আসে। তাঁহার পৌষ-পার্ব্বণে 'শ্বাশুড়ী-ননদ কত কথা কয় বৌকে' হইতে সুধামুখী শ্বাশুড়ী-ননদের কথা এবং মুখরা মেঝবৌ শ্বাশুড়ী-ননদীর নামে স্বামিসকাশে চুকুলি কাটিতেছে, ইহা হইতে সুশীলা বধূর কথাও বেশ জাহির হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের কথা পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি। তাহাতে শ্বাশুড়ী, বধূকে ও সঙ্গে সঙ্গে কন্যাকেও গৃহস্থালীর কায ফেলিয়া রাখিয়া তাস খেলার জন্য মৃদুভর্ৎসনা করিতেছেন, এইটুকু গৃহিণীপণার পরিচয় পাওয়া যায়; বধূর ভক্তিমত্তা ও শ্বাশুড়ীর স্নেহবত্তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তেও চিত্র অনেকটা এই প্রকারের। 'লীলাবতী'তে হেমচন্দ্রের মাতা বধূকে নদেরচাঁদের সঙ্গে কথা না কহাতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছেন, দেখা যায়। 'নবীন তপস্বিনী'তে শ্বাশুড়ী ও সপত্নীকর্ত্তৃক বড়রাণীর রীতিমত নির্য্যাতনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। 'জামাইবারিকে' শ্বাশুড়ী-বধূর ও যা'য়ে যা'য়ে পরস্পর কিরূপ ব্যবহার তাহা জানা যায় না। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রায় সকল নাটকে যা'য়ের সমাগম নাই; প্রধান অপ্রধান প্রায় সকল পাত্রই এক মায়ের এক ছেলে। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণালী অন্য সকলের প্রণালী হইতে বিভিন্ন নহে। কেবল ৺দীনবন্ধু মিত্রের একখানি নাটকে—'নীলদর্পণে' শ্বাশুড়ী-বধূ ও যা'য়ে যা'য়ে যে উজ্জ্বল-মধুর স্নেহসম্পর্কের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। ইহা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। নীলদর্পণের বহুবৎসর পরে রচিত ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকে ঠিক একই প্রকার উজ্জ্বল-মধুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে দেখা যায়। পক্ষান্তরে ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'য় সরলার করুণকাহিনীতে ও মধুরচরিত্রে যেমন আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়, তেমনই প্রমদার কদর্য্য ব্যবহারে যা'য়ে অরুচি জন্মিয়া যায়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবৌ'এ স্বয়ং মেজবৌএর চরিত্র অতি সুন্দর, কিন্তু তাঁহার শ্বাশুড়ী ও বড় যা'—এ-বলে আমারে দেখ, ও-বলে আমারে দেখ!

† শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ (সাধনা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩১১।)

তাহা হইলে দেখা গেল, সমসাময়িক সাহিত্যে এক 'নীলদর্পণ' (ও তাহার বহুপরে রচিত) 'প্রফুল্ল' ব্যতীত আর কোথাও শ্বাশুড়ী-বধূর সদ্ভাবের চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। অতএব এক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্যম প্রশংসাযোগ্য, এবং তাঁহার পরমসুহৃদ্ মিত্র মহাশয়ের নীলদর্পণের কথা ছাড়িয়া দিলে, তাঁহার মৌলিকতাও অসাধারণ বলিতে হইবে।

বাঙ্গালী-জীবনে শ্বাশুড়ী-বধূর অসদ্ভাব অসম্প্রীতি বহু স্থলে পরিদৃষ্ট হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী-জীবনের কুৎসিত দিক্‌টা না দেখাইয়া সুন্দর দিক্‌টাই বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। অতএব ননদ-ভাজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, এক্ষেত্রেও তাহা বলিতে পারি—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনন্যসাধারণ কল্পনাবলে, বাঙ্গালী জাতির কল্যাণকামনায়, নূতন আদর্শে সমাজ-গঠন-চেষ্টায়, বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনে ননদ-ভাজের ন্যায় শ্বাশুড়ী-বধূরও স্নেহবন্ধন ঘটাইয়াছেন—ইহা কি তাঁহার কম কৃতিত্ব?

ইংরেজিশিক্ষার হিড়িকে ও ইংরেজি সমাজগত ও সাহিত্য-গত আদর্শের নকলের দাপটে আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের বিশুদ্ধ-আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছি,প্রতিপক্ষগণ এ আক্ষেপও করিয়া থাকেন। তাঁহারা কথায় কথায় সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতির কথা তুলিয়া সূর্য্যমুখী ভ্রমর শৈবলিনী প্রভৃতির সহিত তুলনায় সমালোচনা করিতে বসেন। সে কথার বিচারের এ স্থল নহে। তবে দেখা যাউক সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্বাশুড়ী-বধূর ও যা'য়ের কিরূপ পূর্ণায়ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বক্তব্য-জ্ঞাপনের সুবিধার জন্য, সংস্কৃত-ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর দুইটি বিভাগ ধরিয়া লইতে পারি। প্রথম—রামায়ণ মহাভারত,পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত উপাখ্যান। দ্বিতীয়—মহাকাব্য খণ্ডকাব্য দৃশ্যকাব্য 'কথা' আখ্যায়িকা প্রভৃতি। ইহার প্রথম শ্রেণীর সহিত 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতির তুলনা, সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর পরস্পরের সহিত তুলনা। সংস্কৃত-সাহিত্যের 'কথা' ও আখ্যায়িকাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষাদির সহিত—তথা ইংরেজি নভেল ও রোম্যান্সের সহিত—তুলনীয়। এই সামান্য কথাটা অনেকে ভুলিয়া গিয়া বিষম অনর্থ ঘটান; সেই জন্য কথাটা এখানে বলিয়া রাখিলাম।

যাহা হউক, রামায়ণ-মহাভারতাদিতে বর্ণিত উপাখ্যান সম্বন্ধেও এক্ষেত্রে দুই চারিটি কথা বলিবার আছে। রামায়ণে সীতা উর্ম্মিলা মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তি পরস্পরের যা' ও ভগিনী, খুবই সদ্ভাবে থাকিবার কথা। কিন্তু আর্ষ রামায়ণে ইহার কোনও প্রসঙ্গ আছে কি? মন্দোদরী ও সরমা দুই যা'য়ে কেমন ভাব ছিল, মন্দোদরী ও ইন্দ্রজিৎপত্নীর শ্বশ্রূবধূসম্পর্ক কিরূপ ছিল, ইহা জানার কোন উপায় আছে কি? কৌশল্যাদি শ্বশ্রূগণ সীতাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন, তাহার সন্ধানও সবিশেষ পাওয়া যায় কি? রামায়ণ পড়িতে পড়িতে কত সময় মনে হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্র যখন দুর্ব্বহগর্ভখিন্না জনকনন্দিনীকে নির্ব্বাসনদণ্ড দিলেন, তখন কৌশল্যাদেবী সেই অপূর্ব্ব-কর্ম্মচাণ্ডালের নিকট একটা উপদেশ উপরোধ অনুরোধ অনুযোগ করিয়া মাতারকর্ত্তব্য—শ্বশ্রূরকর্ত্তব্য—পালন করিলেন না কেন? করুণরসের কবি ভবভূতির বোধ হয় এ কথাটা মনে লাগিয়াছিল, তাই তিনি রাজমাতা কৌশল্যাদিকে জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞদর্শনে পাঠাইয়া সাফাই (alibi) দিয়াছেন; এবং, সীতানির্ব্বাসনের অনেকদিন পরে, বাল্মীকির আশ্রমে কৌশল্যাকে আনিয়া তিনি যে নির্ব্বাসিতা সীতার জন্য কাতর,—এ দৃশ্যও দেখাইয়াছেন। ইহা তবু মন্দের ভাল। সীতাদেবী শ্বশুরশ্বাশুড়ীর সেবা না-করিয়া, এবং তাঁহাদিগের অনুমতির অপেক্ষা না-করিয়া, স্বামীর সঙ্গে বনগমন করিলেন, এখানেও ত ঠিক হিন্দুবধূর কর্ত্তব্য-পালন হইল না,—এ কুতর্কও যে তোলা যায় না, এমন নহে। * কেননা হিন্দুস্ত্রীর সম্পর্ক শুধু স্বামীর সঙ্গে নহে—সমস্ত পরিবারের সঙ্গে। যাহা হউক, সীতা শ্বশ্রূদিগের প্রতি যে প্রকৃত ভক্তিমতী ছিলেন, ঋষিকবি নিতান্ত সংক্ষেপে সারিলেও চিত্রের সে অংশটুকু বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, সীতা শুধু আদর্শপত্নী ও আদর্শসতী নহেন, তিনি আদর্শবধূও।

মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র; এই শত পুত্রবধূ কুরুপুরীতে কিরূপ সদ্ভাবে বাস করিতেন। গান্ধারীর সহিতই

* কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, সীতা আধুনিক কুলবধূদিগের মত শ্বাশুড়ীকে ছাটিয়া ফেলিয়া স্বামীর কর্ম্মস্থলে সুখসম্ভোগ করিতে যাইতেছেন না; স্বামীর সঙ্গে চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল বনবাস-ক্লেশ ভোগ করিতে যাইতেছেন। এরূপ বিপৎকালে তাঁহার পক্ষে মহাগুরু স্বামীর সেবাই প্রশস্ত ধর্ম্ম। নতুবা ত বলিতে হয়, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা ছাড়িয়া স্বামীর সহমরণেও পত্নীর অধিকার নাই!

বা তাঁহাদিগের কিরূপ স্নেহসম্পর্ক ছিল, অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতে তাহার বিশদ বর্ণনা আছে কি? কুরুকুল সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, যদুকুল সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যায়। "যা' নাই ভারতে তা' নাই ভারতে"—এ কথা অবশ্য মিথ্যা নহে। সেই জন্য দ্রৌপদী কিরূপে কুন্তীর সেবা করিতেন, একথা মহাভারতে একাধিকস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। (আদিপর্ব্বে ১৯২ অধ্যায়, ও বনপর্ব্ব ২৩২ অধ্যায়—দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ।) সাবিত্রীর শ্বশুর-শ্বশ্রূভক্তিও সুপ্রসিদ্ধ। রামায়ণের সীতার ন্যায় সাবিত্রী ও দ্রৌপদী শুধু আদর্শপত্নী ও আদর্শসতী নহেন, আদর্শ বধূও। দ্রৌপদীও পতিসঙ্গিনী হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা স্বেচ্ছায় নহে-যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় নির্জ্জিত হইয়া সস্ত্রীক ও সভ্রাতৃক বনে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, সে ক্ষেত্রেও দ্রৌপদী ভক্তিভরে শ্বশ্রূ কুন্তীর নিকট পতিগণের অনুগমনে অনুমতি লইয়াছিলেন এবং কুন্তীও সস্নেহ ব্যবহারে তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। (—সভাপর্ব্ব ৭৭ অধ্যায়।)

তাহা হইলে দেখা গেল, রামায়ণ-মহাভারতাদিতে শ্বাশুড়ী-বধূর ও যা'য়ে যা'য়ে একত্র ঘরকরনার পূর্ণায়ত চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করি যে, রামায়ণ মহাভারত শাস্ত্রগ্রন্থ—সুতরাং পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এ গুলিতে প্রদর্শিত হইতে পারে না।

কিন্তু সংস্কৃত ভাষার লৌকিক-সাহিত্যের (Secular literature) কথা জোর করিয়া তুলিতে পারি। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, রাঘব-পাণ্ডবীয়, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত প্রভৃতি মহাকাব্যে, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, হর্ষচরিত, দশকুমারচরিত প্রভৃতি কথা ও আখ্যায়িকায়, রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী, মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, নাগানন্দ প্রভৃতি নাটক-নাটিকা-ত্রোটক-প্রকরণে, শকুন্তলা, পঞ্চরাত্র, বেণীসংহার, ধনঞ্জয়-বিজয় প্রভৃতি মহাভারতাশ্রিত নাটকে, অনর্ঘরাঘব, চণ্ড-কৌশিক, মহানাটক, বীরচরিত, উত্তরচরিত প্রভৃতি রামায়ণাশ্রিত নাটকে, শ্বাশুড়ী-বধূর স্নেহসম্পর্ক ও যা'য়ে যা'য়ে প্রীতিবন্ধনের চিত্র সম্যক্ অঙ্কিত হইয়াছে কি? * এসকল কাব্যেও অনেক স্থলে নায়ক একলা-মায়ের একলা-ছেলে, উদ্বাহবন্ধনে অথবা পুনর্ম্মেলনে আখ্যানের পরিসমাপ্তি, নায়িকার বিবাহিত-জীবনে শ্বশ্রূ অদৃশ্য বা অনুল্লিখিত, নায়ক-নায়িকা প্রণয়মিলনে ব্যস্ত বা বিরহ-ব্যথায় কাতর—ইত্যাদি নভেলী ব্যাপার পরিদৃষ্ট হয় না কি? শকুন্তলা, স্বামিগৃহে যাইবার সময়, গুরুজনদিগকে শুশ্রূষা করিবার উপদেশ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে উপদেশ প্রতিপালন করিবার সুযোগ তিনি নাটকের অন্তর্ভুক্ত অঙ্কসমষ্টির মধ্যে পাইয়াছেন কি? এখানেও কি দেখি না, মৃণালিনী, ইন্দিরা ও যুগলাঙ্গুরীয়ের ন্যায় পুনর্ম্মেলনেই পরিসমাপ্তি? তবে কি বলিব, কালিদাসাদি মহাকবিগণ পারিবারিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত না করিয়া বিকৃত আদর্শ প্রচার করিয়াছেন? তাহা যদি না হয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাধ কোথায়? আমরা কোন্ মুখে বলিব, তিনি আমাদের সাহিত্যের সনাতনী ধারা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন?

বিজ্ঞ-সমালোচক হয়ত প্রাচীন সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত বহুতর নজির দেখিয়াও নিরুত্তর হইবেন না। অধিকন্তু বর্ত্তমান লেখক নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তি, তিনি সমালোচনাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অব্যবসায়ী, সুতরাং গোঁজামিল দিতেছেন বলিয়া, উপহাস করিবেন ও উপেক্ষার তীক্ষ্ণ বাণ ঝাড়িবেন। তিনি যে গোড়ার কথাটা ধরিয়া রাখিয়াছেন, সেইটাই পুনঃ পুনঃ প্রচার করিবেন; এমন কি, ঝোঁকের মাথায়, গৃহলক্ষ্মী, লক্ষ্মী বৌ, লক্ষ্মী মা, লক্ষ্মী মেয়ে, বৌ, মা ও ছেলে প্রভৃতি পুস্তককেও অম্লানবদনে কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বসিবেন! এ কথা বলিয়া তিনি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্য একত্র তুলিত করিতেছেন, তাহা ভুলিয়া যান। অতএব, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যাহা প্রকৃত কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা, আরও একটু খোলসা করিয়া বলি। বিচারের ভার সুধীবর্গের উপর।

বঙ্কিমচন্দ্র, কালিদাস-ভবভূতির ন্যায়, সুবন্ধু-বাণভট্টের

* উত্তরচরিতে ভবভূতির কৃতিত্বের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রঘুবংশে কৌশল্যা ও সীতার স্নেহসম্পর্ক বধূবরণ বা বনগমনকালে বা সীতার গৃহবাসকালে বা সীতানির্ব্বাসন ব্যাপারে বা সীতার পাতালপ্রবেশ-কালে চিত্রিত হয় নাই। কেবল স্বামীর সহিত চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসের পর সীতা গৃহে ফিরিলে শ্বাশুড়ী-বধূর প্রথম-আলাপের সুন্দর একটি চিত্র চতুর্দ্দশসর্গে অঙ্কিত হইয়াছে। নির্ব্বাসিতা সীতা, লক্ষ্মণকে বিদায় দিবার কালে, শ্বশ্রূদিগকে ভক্তি জানাইয়াছেন।

ন্যায়, আর না হয় স্বীকারই করিলাম, ওয়ালটার্ স্কট্-বুলওয়ার্ লিটনের ন্যায়, কল্পনার কল্পলোকে বিচরণ করিয়া জ্যোৎস্নালোকিত কুসুম-সুকুমার রোম্যান্স-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জগতের প্রেমরাজ্যের মধুরমোহন স্বরূপ বিকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রণয়ব্যাপারকে পায়রার বক্‌বকম্ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ইহা ভগবৎশক্তির প্রেরণা, জীবজগতের অনন্ত-অনিন্দ্য রহস্য। মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে যে শক্তির প্রভাবে 'প্রিয়ামুখং কিংপুরুষশ্চুচুম্বে' অথবা 'মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ', নরলোকেও সেই শক্তির প্রভাবে নল-দময়ন্তীর, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার, চারুদত্ত-বসন্তসেনার, অন্যোন্যানুরাগ। অন্যে পরে কা কথা, রাধাকৃষ্ণের বা হরগৌরীর বিচিত্র প্রেম-লীলায়ও এই রহস্য অন্তর্গূঢ়। ইহা শাশ্বত, সত্য ও সুন্দর। তাই, পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ন্যায়, কল্পনাদৃষ্টি তাঁহারও অবলম্বন, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি তাঁহারও অভিলাষ। সেইজন্য তাঁহার আখ্যায়িকাবলীর আকাশ ও বাতাস (Atmosphere) ও পরীবেষ (environment) 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী করা'। ইহা পরীরাজ্যের ন্যায় সুন্দর এবং পরীরাজ্যের ন্যায়ই অপূর্ব্ব, অসাধারণ, অলৌকিক; ইহাকে 'অস্বাভাবিক' বলিলে নিজেরই রসগ্রহণে অসমর্থতা স্বীকার করা হয়।

বাস্তবজীবনের যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করা, যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং করা, তাঁহার প্রতিভার প্রিয় পদার্থ ছিল না। তাঁহার লক্ষ্য Idealism—Realism নহে। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলালে' বা 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় বা 'সধবার একাদশী'তে বা 'স্বর্ণলতা'য় বা 'মেজোবৌ'এ গার্হস্থ্য জীবনের যে কঠোর বাস্তবতা আছে, তাঁহার রচিত আখ্যায়িকায় তাহা আশা করা বাতুলতা।

সত্য বটে, ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' ও তাহার বহুপরে রচিত ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকে গার্হস্থ্যাশ্রমের সুন্দর উজ্জ্বল মধুর পূর্ণায়ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু উভয়ত্রই নাটক-কার বাস্তবজীবন-বর্ণনে অভিলাষী। একের উদ্দেশ্য, গোলকচন্দ্র বসুর মত সম্পন্ন-পরিবার ও সাধুচরণের মত সামান্য-গৃহস্থ পরিবার কেমন সুখের সংসার ছিল, এবং এমন সোণার লঙ্কা নীল-বানরে কি করিয়া ছারখার করিল, তাহা প্রদর্শন করা। অপরের উদ্দেশ্য, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সহোদরের সোণার সংসারের কিরূপে, বিলাতী ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে বিকারগ্রস্ত মধ্যম ভ্রাতা, রমেশচন্দ্র দ্বারা সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইল, তাহাই প্রদর্শন করা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, সুতরাং বর্ণনা-প্রণালীও স্বতন্ত্র।

অবশ্য, রোম্যান্সে নায়ক-নায়িকার চিত্র ফুটাইবার জন্য, পারিপার্শ্বিক হিসাবে অন্যান্য, অপ্রধান, চরিত্রের উল্লেখ থাকিতে পারে। কিন্তু সেগুলি মূল-প্রতিমার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে—চালচিত্তির মাত্র। দিলে ক্ষতি নাই, না দিলেও দোষ নাই। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বাস্তবজীবনের কোন কোন অংশ চিত্রশালার অন্তর্নিবিষ্ট করিবার প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা জানিতেন এবং তিনি তদনুসারে বাস্তব জীবন হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যেখানে যতটুকু ব্যবহার করিলে সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা ঘটে, বা বাস্তবতা (Realism) ও কল্পনা (Idealism) এতদুভয়ের বৈপরীত্যে (Contrast) সৌন্দর্য্য ফুটে, তিনি ঠিক তাহাই করিয়াছেন। তিনি যেখানে যেটুকু বাস্তবজীবনের চিত্র দিয়াছেন, তাহাই সুন্দর ও শোভন হইয়াছে। তিনি সাধারণতঃ অসুন্দর ও অশোভন অংশ পরিহার করিয়াছেন, কেবল যেখানে আখ্যানবস্তুর বিবর্ত্তনে (evolution of the plot) এরূপ অপ্রিয়বস্তুর অবতারণার উপযোগিতা আছে, সেইখানেই তাহা দেখাইয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থকার এই উভয় প্রকার উপকরণের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গিয়া এক শ্রেণীর কিম্ভূত-কিমাকার 'গার্হস্থ্য উপন্যাস' সৃষ্টি করিতেছেন। সেগুলিতে আর্টরূপ গব্যঘৃতের সম্পূর্ণ অভাব, উপদেশ (lecturing, preaching, sermonising) প্রভৃতি কাঁকরের বাহুল্য; সুতরাং এই মিশ্রণে দেবভোগ্য খিচুড়ি না হইয়া রোগীর পথ্য 'ওগড়া'য় দাঁড়াইতেছে। এই সকল গ্রন্থকারের সঙ্গে তুলনা করিলে বুঝা যায়, এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব কতদূর।

মূল কথা, 'গার্হস্থ্য উপন্যাস' লেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। হইতে পারে, রূপকথার রাজপুত্রের ন্যায়, ভারতচন্দ্রের সুন্দরের ন্যায়, শকুন্তলার নায়ক দুষ্যন্তের ন্যায়, কপালকুণ্ডলার নায়ক নবকুমারেরও জননী ছিলেন—হইতে পারে কেন, বাস্তবিকই ছিলেন—কিন্তু, আখ্যান-বর্ণনে তাঁহার স্থান নিতান্ত অল্প। ইহাতে পূজ্যপূজাব্যতিক্রম

ঘটে নাই। সর্ব্বত্রই কবিগণ নায়ক-নায়িকাকে লইয়া ব্যস্ত; কিরূপে রাজপুত্রের কেশবতী রাজকন্যার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে, কিরূপে সুন্দরের বিদ্যালাভ হয়, কিরূপে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে লাভ করিতে পারেন, কিরূপে নবকুমার কপালকুণ্ডলার প্রেমলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন, কবির কেবল সেই ভাবনা। এই শ্রেণীর কাব্যে নায়ক-নায়িকার 'পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, বিরহ, মিলন' প্রভৃতি প্রণয়-ব্যাপারই বর্ণনীয় বিষয়। কবিকুল চিরকালই এই রসের রসিক, অধিকাংশ কাব্যে ইহাই স্থায়িভাব। ইহা দেব-বাণীর অমৃতনিস্যন্দিনী মন্দাকিনী—বিলাতী বন্যার 'লোনা-পানি' নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর মিছামিছি ঝাল ঝাড়িলে চলিবে কেন? তিনি পূর্ব্বসূরিগণের পদবী-অনুসরণ করিয়াছেন, 'একটা নূতন-কিছু' করেন নাই।

নিরন্তর মিষ্ট-ভক্ষণে মুখ মারিয়া আসে। অধিক অমৃত-পানেও নাকি অরুচি ঘটে। তাই আরব্যোপন্যাসের উজ্জ্বল আলোকচিত্র, পরীরাজ্যের স্বপ্নের ফুল, দেখিয়া দেখিয়া কাঙ্গালী বাঙ্গালীর চোখ ঝলসিয়া গিয়াছে। জীবন-সংগ্রামের কঠোর কশাঘাতে, সুকুমার কাব্যপ্রিয়তা, নিরবচ্ছিন্ন ভাবপ্রবণতা, কমলবিলাসীর ভাবের নেশা, আর বাঙ্গালীর ধাতে সহিতেছে না। সুতরাং আমাদের রুচি বদলাইয়াছে, কবিকল্পনারূপা কামধেনুর প্রদত্ত ক্ষীর-সর-নবনীত ছাড়িয়া 'হেঁশেলে'র ভিজা-ভাত বেগুন-পোড়ায় মন বসিয়াছে। ইহার দরুণ আজকাল বাঙ্গালী লেখকেরা, কল্পনার আসমানি লোক ছাড়িয়া, বাস্তবজীবনের সুখ-দুঃখ-বর্ণনা করিতে ব্রতী হইয়াছেন। বিলাতী কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা বিলাতী আখ্যায়িকাকার ডিকন্‌সের ন্যায়, সাধারণ বাস্তবজীবনেও যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পাওয়া যায়, তাঁহারা তাহাই দেখাইতেছেন। (বিজ্ঞ-সমালোচক অবশ্য বলিবেন, ইংরাজীর নেশা কাটিয়াছে, আমরা এখন শাদা চোখে দেখিতে সুরু করিয়াছি।) তাই আমরা অনাথবন্ধু, ধ্রুবতারা, প্রেমের জয়, নাগপাশ প্রভৃতি গ্রন্থে একান্নবর্ত্তিপরিবারের পূর্ণায়ত চিত্র দেখিতেছি—অনেক ছোট-বড়-মাঝারী গল্পে শ্বাশুড়ীর, বধূর, যা'য়ের, ননদ-ভাজের, বৌ দিদির, সুন্দর অসুন্দর শত শত 'ফোটো' দেখিতেছি। ইহা আহ্লাদের কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দ্রজালে বিমুগ্ধ হইয়াও এ কথা অকপটে বলিব যে, আমি নিজে এই শ্রেণীর গল্পের গোড়া। কিন্তু তাই বলিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতির আখ্যায়িকার অযথা নিন্দা করিলে চলিবে কেন? বিকসিত চূতমুকুলে কাঁঠালকোষের অস্তিত্বসম্ভাবনা নাই বলিয়া কি তাহা উপভোগ্য নহে?

এ সম্বন্ধে যথাজ্ঞান নিবেদন করিলাম। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ্রযশে মসীবিলেপন করেন, জানিনা তাঁহারা এই ক্ষীণ চেষ্টাকে 'বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ' ভাবিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিবেন কি না? আর যদি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-প্রতিবিম্বিত কাব্য-সরোবরের পঙ্কোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, যদি সমালোচক-চণ্ডালের গ্রাস হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে মুক্ত করিতে পারিয়া থাকি, তবে সে বঙ্কিম-চন্দ্রেরই গুণে, তাহাতে এই ক্ষুদ্র লেখকের কোন কৃতিত্ব নাই।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

দোঁহা

তোমার

১
তোমার অঞ্চল-বায়,
প্রতি অঙ্গ প্রাণ পায়।

২
তোমার আঁখির দৃষ্টি,
বিরহে মিলন-সৃষ্টি।

৩
তোমার কণ্ঠের গান,
তমসার অবসান।

৪
তোমার হস্তের স্পর্শ,
অন্তরে মূর্চ্ছনা হর্ষ।

৫
তোমার রূপের ছায়,
চন্দ্রমা কিরণ ভায়।

৬
তোমার নিঃশ্বাস লাগি,
অনুরাগ উঠে জাগি।

৭
তোমার সৌন্দর্য্য হাসি,
হৃদিকুঞ্জে বাজে বাঁশী।

৮
তোমার চরণ-রব,
নূপুর-নিক্কণ সব।

৯
তোমার অঙ্গের বাস,
নীলিমায় পরকাশ।

১০
তোমার কঙ্কণ-কণ,
বরষার ঝিল্লী-স্বন।

১১
তোমার প্রণয়-গীতি,
শ্রবণে জীবন নিতি।

১২
তোমার পরশ-দান,
লভি, চিরভাগ্যবান্।

আমার

১
আমার, উৎসবহীন
জীবনের সব দিন।

২
আমার কুটীর-বাসে,
অতিথি কভু না হাসে।

৩
আমার ভগন ঘরে,
ছায়া-চিত্র থরে থরে।

৪
আমার তুষার-শিরে,
কৃষ্ণ পক্ষ নাহি ঘিরে।

৫
আমার ললাট 'পরে,
সিন্দূর না শোভা করে।

৬
আমার চরণ-রেখা,
অলক্তের নাহি দেখা।

৭
আমার নয়ন-জলে,
কজ্জল নাহিক গলে।

৮
আমার দেহের বাস,
রাজহংস-শুভ্র ভাস।

৯
আমার কণ্ঠের হার,
ছিন্ন সূত্র মুকুতার!

১০
আমার কর্ণের মূলে,
রন্ধ্র সুধু, কর্ণ-ফুলে।

১১
আমার কঙ্কণ-শাঁখা,
রিক্ত-করে চিহ্ন আঁকা।

১২
আমার অতীত আজি,
সারা অঙ্গে স্মৃতি-রাজি।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

বুদ্ধদেব-চরিত

গিরিশচন্দ্র যখন 'বুদ্ধদেব-চরিত' নামক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন এড্‌উইন্ আর্ণল্ড-প্রণীত 'লাইট্ অফ্ এসিয়া' নামক গ্রন্থখানি তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল; একথা উৎসর্গপত্রে গিরিশচন্দ্র নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধদেব চরিতের উৎসর্গপত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"কবিবর! আপনার জগদ্বিখ্যাত LIGHT OF ASIA নামক কাব্যখানি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। হে মহাশয়, আপনার কর কমলে কৃতজ্ঞতা-উপহার দিতেছি নিজ গুণে গ্রহণ করুন।

ঋণী—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

গিরিশচন্দ্র আর্ণল্ড-রচিত গ্রন্থের নিকট কতদূর ঋণী আমরা তাহার আলোচনা করিব; সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেব-চরিত নাটকের সৌন্দর্য্য ও মৌলিকতাও প্রদর্শিত হইবে।

নাটকের সূচনায় দেখিতে পাই, ধর্ম্মের নামে যে সকল জীববলিদান প্রদত্ত হইতেছে, তজ্জন্য দয়াদেবী বিষ্ণুর নিকট করুণা ভিক্ষা করিতেছেন। বেদের কর্ম্ম-কাণ্ড-অনুসারে যাগযজ্ঞে বহু পশু নিহত হইত। এই জীব-হিংসা নিবারণ করিয়া অহিংসাধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ, হিন্দুশাস্ত্রে এ কথা আছে। জয়দেব গাহিয়াছেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়, দর্শিত-পশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে"।

[—গীতগোবিন্দ।

বিষ্ণু দয়াদেবীকে অভয় দিয়া বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। গ্রন্থ-সূচনায় গিরিশচন্দ্র বিভিন্ন অবতারের নিগূঢ়-তত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন।* এই সূচনাটি গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব। যে অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা এই সূচনায় স্থান পাইয়াছে, তাহা হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত;—এখানে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুসরণ করেন নাই। গিরিশচন্দ্র "বুদ্ধদেব-চরিত" রচনার সময় বৌদ্ধগ্রন্থাবলী বিশেষরূপে পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আর্ণল্ডের গ্রন্থমাত্রই তাঁহার অবলম্বন ছিল। শেষজীবনে, "অশোক" নামক নাটক-রচনার সময়, তিনি বহুপরিশ্রমে বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করেন। গিরিশচন্দ্র বুদ্ধদেব-চরিতের সূচনায় হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী বিষ্ণুর অবতার-গ্রহণ-স্বীকার বর্ণনা করিয়াছেন; তাহাতে বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে।

বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার জননী মায়া-দেবী স্বপ্ন দেখিলেন—

"হেনকালে নভঃস্থলে খসিল তারকা,
বিমল কিরণে আমোদিত ত্রিভুবন;
হস্তীর আকার, ষড়্দন্ত-শোভিত সুন্দর
তারা মনোহর,
পশিলা মহিষী গর্ভে,
দশনে দক্ষিণ পাশ ভেদি।"

ইহা আর্ণল্ডের 'লাইট্ অফ্ এসিয়া'য় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"Dreamed that a star from heaven
Splendid, six-rayed, in colour rosy-pearl,
Whereof the token was an Elephant
Six-tusked, and white as milk of
Kamadhuk,
Shot through the void; and shining
into her,
Entered her womb upon the right."

[—Book. I.

মায়াদেবী বুদ্ধদেবকে প্রসব করিবেন জানিয়া 'মার, আত্মবোধ ও সন্দেহ' আসিয়া ব্যাঘাত ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এ দৃশ্যটি গিরিশচন্দ্রের স্বকল্পিত। বুদ্ধের ধ্যান-ভঙ্গের জন্য মার অনুচর-সহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল,—'লাইট্ অফ্ এসিয়া'য় এ কথা আছে। কিন্তু, মার মায়াদেবীকে ভুলাইবার বা ভয় দেখাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল,—এ কথা তাহাতে নাই। বুদ্ধের প্রলোভন-কথা যেখানে

বিবৃত হইয়াছে, আর্ণল্ড সেখানে মার, আত্মবাদ ও সন্দেহের উল্লেখ করিয়াছেন—"The Prince o darkness, Mara," "Attabada first, the sin of self," "Then came wan Doubt".—এই 'আত্মবাদ'ই গিরিশচন্দ্রের 'আত্মবোধ'। মার বহু চেষ্টা করিয়া শেষে অকৃতকার্য্য হইল।

তারপর বুদ্ধদেবের জন্ম। হাস্যরস আনিতে গিরিশচন্দ্র দুইজন গণককার সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথম গণককার বলে, "কি বল ভট্‌চাজ্‌,—শনি আছেন কর্কটে" ; —

"The grey dream-readers said 'The dream is good !
The Crab is in conjunction with the Sun'."

[LIGHT OF ASIA.—BK. I.

বুদ্ধের জন্ম হইলে কালদেবল রাজাকে জানাইলেন,—

"বুদ্ধদেবে জঠরে যে ধরে,
সপ্তস্বর্গপরে আবাস নির্ম্মাণ তার,
নিয়োজিত দক্ষ দেবগণ সেবা হেতু,
হেন ভাগ্যবতী ধরায় না রহে মহারাজ।"

[১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

"Queen Maya smiling slept, and waked no more,
Passing content to Trayastrinshas heaven,
Where countless Devas worship her, and wait
Attendant on that radiant Motherhead."

[LIGHT OF ASIA.—Bk. I.

মায়াদেবীর মৃত্যু হইল। দেবগণ নরবেশে আসিয়া বুদ্ধের উপাসনা করিলেন।—(১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।)

"Gods.
Walked free with men that day, though men knew not."

ক্রমে বুদ্ধদেব যৌবনে পদার্পণ করিলে তাঁহার উদাসভাব দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহের উপায় চিন্তা করিলেন ; —

"রাজ্যে যত সুন্দরী রমণী
নিমন্ত্রিয়া নৃপমণি আনিলা ভবনে।
নারীগণে রত্নবিতরণ
করিল নৃপতি-সুত,
কিন্তু কারু পানে ফিরে না চাহিল,
কোনও নারী সাহসে না তুলিল বদন ;
পরে ধীরে ধীরে,
গোপা নামে লক্ষ্মী অংশে নারী
বিস্তারি মাধুরী,
যুবরাজ সমীপে হইল উপনীত।
বিমোহিত উভয় উভয়ে হেরি।
চোখে চোখে প্রেম আলাপন,
প্রাণ বিতরণে
শুভদিনে পরে দোঁহে প্রেমের নিগড়।"

[২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

"The criers bade the young and beautiful
Pass to the palace, for 'twas in command
To hold a court of pleasure, and the Prince
Would give the prizes. ... ...
Thus filed they, one bright maid after another,
The city's flowers, and all this beauteous march
Was ending and the prizes spent, when last
Came young Yasodhara, and they that stood
Nearest Siddhartha saw the princely boy
Start, as the radiant girl approached. ...
... ...
And their eyes mixed, and from the look sprang love."

[LIGHT OF ASIA."—Bk. II.

বিবাহের পর সিদ্ধার্থ কিছুদিন প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিলেন ; কিন্তু দেববালার সঙ্গীত তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।—(২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)।

"জানিনা কেবা, এসেছি কোথায় ?
কেনবা এসেছি, কেবা নিয়ে যায় ?

যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়
এই আছে আর তখনি নাই ॥"

"But Prince Siddhartha heard the Devas play,
And to his ears they sang such words as these :—
... ...
'Wherefore and whence we are, ye cannot know,
Nor where life springs, nor whither life doth go ;
We are as ye are, ghosts from the inane
What pleasure have we of our changeful pain.'"
[—Bk. III.

"অধীর, অধীর যেমতি সমীর
অবিরাম গতি, নিয়ত ধাই ।"

"We are the voices of the wandering wind,
Which moan for rest and rest can never find."

"কর হে চেতন কে আছ চেতন
কতদিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?
যে আছ চেতন ঘুমাও না আর
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ;
কর তমনাশ হও হে প্রকাশ
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই।"

"But thou that art to save, thine hour is nigh !
The sad world waiteth in its misery,
The blind world stumbleth on its round of pain ;
Rise, Māyā's child ! wake ! slumber not again."

বুদ্ধের মনে পৃথিবী-দর্শন স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। নিম্নলিখিত বুদ্ধের উক্তিটি অবিকল "লাইট্ অফ্ এসিয়া'র তৃতীয় সর্গ হইতে গৃহীত ;—

"কতদূর, কতদূর বিস্তার মেদিনী ?
পূর্ব্বভাগে নবরাগে হেরিলে উষায়,
সাধ হয় মনে,
হেরিতে সে নরনারীগণে
তরুণ তপন যাহে প্রথম জাগায় ।
... ...
পশ্চিমে আরক্ত ঘটা নেহারি প্রেয়সি
অভিলাষী অন্তর আমার
যেতে চায় দিনদেব সনে ।...
মনে হয় আছে কত নগরী সুন্দর
বৈসে কত নর ।
তোমায় আমায় যদি প্রিয়ে যাই,
হেরি কত সুন্দর বদন,
ভালবাসি কত জনে ;
পক্ষভরে উঠি শূন্য'পরে
নিম্নে হেরি বিস্তার মেদিনী,
মনোরঙ্গে গিরিশৃঙ্গে বিজন প্রদেশে
বসি দিনশেষে
হেরি তারামালা ফুটে একে একে ।
বদ্ধ আছি প্রমোদভবনে,—
বিশাল বিস্তার স্থান তোরণ-বাহিরে ।"
[২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

পৃথিবীদর্শনসাধ মিটাইতে বুদ্ধদেব নগরভ্রমণে যাইবেন, পিতার নিকট এই অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। রাজা অনুমতি দিয়া মন্ত্রীকে আজ্ঞা দিলেন—

"দেহ শীঘ্র নগরে ঘোষণা,
জরাজীর্ণ আদি পথে নাহি আসে কালি,
আঁখি-সুখকর
সুসজ্জিত করহ নগর ;
হেরি যাহে রাজ্যের লালসা বাড়ে।
দেখ মন্ত্রি, অতি সাবধানে
নিবার কুৎসিত দৃশ্য রাজপথে ত্বরা ।"

"'Yea !' spake the careful King 'tis time he see ;

But let the criers go about and bid
My city deck itself, so there be met
No noisome sight; and let none blind or maimed,
None that is sick, or stricken deep in years,
No leper, and no feeble folk come forth."

[LIGHT OF ASIA.—Book III.

কিন্তু বুদ্ধের সম্মুখে এক বৃদ্ধ উপস্থিত হইল। গিরিশচন্দ্র এখানে নিজে লিখিয়াছেন, "স্বয়ং মহাদেব জরা, রুগ্ন, মৃত ও ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়া বুদ্ধকে দেখা দিয়াছিলেন।"

"পঞ্চানন আসিবেন আপনি ধরায়,
ধরিবারে জরা রুগ্ন মৃত ভিক্ষু বেশ।
আসিছেন বুদ্ধদেব—
পঞ্চানন আসিছেন বৃদ্ধবেশে।
অন্তরালে করি অবস্থান,
হেরি দেবলীলা ধরামাঝে।"

[৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

এই মহাদেবের মূর্ত্তি-গ্রহণের কথা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

বৃদ্ধকে দেখিয়া বুদ্ধ বলিলেন,—

"এ কি ভীষণ আকার সম্মুখে আমার,
নরাকার, কিন্তু নহে নর!
শুষ্কচর্ম্ম অঙ্গে আবরণ;
অবনত যেন মহাভারে—
উন্নত করিতে নারে শির,
কহ হে সারথি, কোন্ জাতি জীব এই!"

"What thing is this who seems a man,
Yet surely only seems, being so bowed,
So miserable, so horrible, so sad?"

সারথি উত্তর করিল—

"নরজাতি শুন হে কুমার,
অবনত বার্দ্ধক্যের ভরে,
অসহায় ভ্রমে ধরাপরে।"

"Sweet Prince,
This is no other than an aged man."

"সিদ্ধার্থ। এ দশা কি হয় সবাকার?
অথবা কি দৈবের বিপাকে
এ দশা ইহার?
নরজাতি সবে কি হে বার্দ্ধক্য অধীন?"
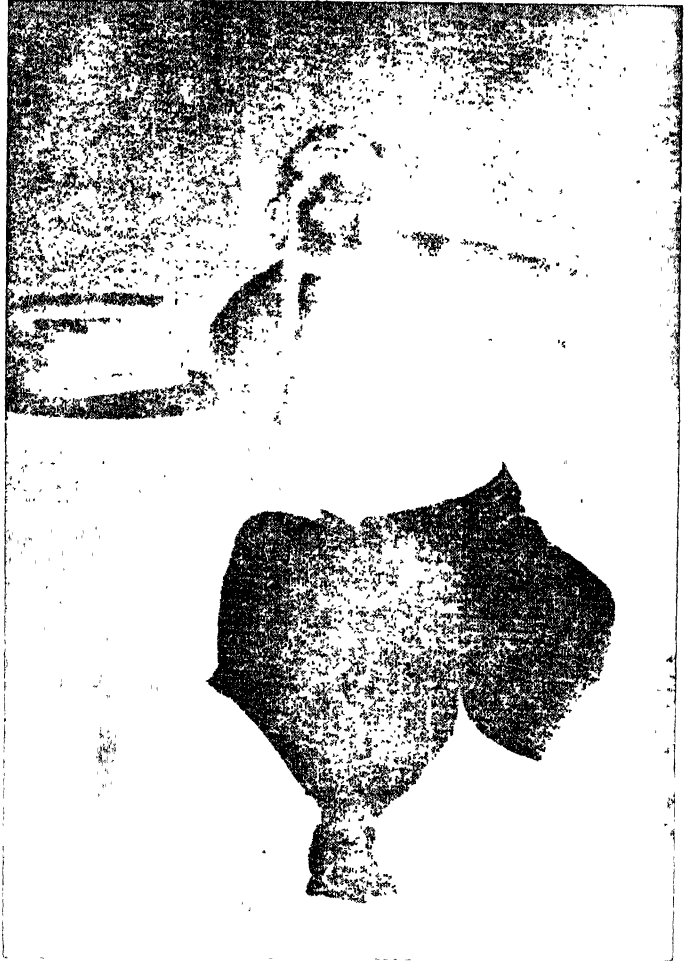
৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

"But shall this come to others or to all,
Or is it rare that one should be as he?"

"সারথি। এ দশা সবার,
নিস্তার নাহিক এতে কার,
দেহীমাত্র বার্দ্ধক্য-অধীন।"

"'Most noble', answered channa, 'even as he
Will all these grow, if they shall live so long.'"

"সিদ্ধার্থ। আমি,—গোপা,—ফুল্লকান্তি সহচরী সবে,
জরাগ্রস্ত হব কি সময়ে?"

"'But' quoth the prince 'if I shall live as long
Shall I be thus; and if Yasodhara
Live fourscore years, is this old age for her,
Jalini, little Hasta, Gautami
And Ganga, and the others?'"

"সারথি। যুবরাজ, সবে সমনিয়ম অধীন;
রাজা কিংবা প্রজা—সমভাবে স্পর্শ করে কালে।"

তারপর জনৈক রুগ্ন বুদ্ধের নয়নপথবর্ত্তী হইল। সে বলিতেছিল,—"আমায় ধর। আমার প্রাণ যায়।"

"Help, masters! lift me to my feet! Oh help"!

তখন পুনর্ব্বার সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এও কি হে দেহের নিয়ম?
এ দশা কি হয় সবাকার?"

"And are there others, are there many thus?
Or might it be to me as now with him?"

তারপর মৃত ও ভিক্ষু দর্শন করিয়া বুদ্ধদেবের চিন্তাস্রোত নূতন পথে ধাবিত হইল। ভিক্ষুদর্শনের কথা "লাইট্ অফ্ এসিয়া"য় নাই।

বুদ্ধ চিন্তা করিতে লাগিলেন—

"কোথা ব্রহ্ম? কোথা তাঁর স্থান?
শুনি ত্রিভুবন সৃজন তাঁহার।
তবে কেন রোগ শোক জরা,
দুখের আগার ধরা?
মৃত্যু কেন জীবনের পরিণাম?......
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা
কেন ব্রহ্ম না করে মোচন?......
কিংবা ব্রহ্ম শক্তিহীন দুঃখের মোচনে?"

"For them and me and all there must be help!
Perchance the gods have need of help themselves,
Being so feeble that when sad lips cry
They cannot save! I would not let one cry
Whom I could save! How can it be that Brahma
Would make a world and keep it miserable,
Since, if all-powerful, he leaves it so,
He is not good, and if not powerful,
He is not God?"

[LIGHT OF ASIA.—Book III.

"লাইট্ অফ্ এসিয়া"য় আছে, বুদ্ধ প্রথমদিনে কেবল জরাগ্রস্ত ব্যক্তি দেখিয়াছিলেন; দ্বিতীয়দিনে রুগ্ন ও মৃত ব্যক্তি দেখিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র এক দৃশ্যেই ঐ গুলির অবতারণা করিয়াছেন। এখানে তিনি বৌদ্ধ-গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন।

বুদ্ধ যেদিন জরাগ্রস্তকে দেখেন, সেইদিন বুদ্ধের পিতা নিশীথে এক স্বপ্ন দেখেন,—আর্ণল্ড এইরূপ লিখিয়াছেন। শুদ্ধোদন জাগ্রৎ-অবস্থাতেই উন্মত্তবৎ এই স্বপ্ন দেখেন,—গিরিশচন্দ্র এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন। আর্ণল্ডের কাহিনীই অধিকতর স্বাভাবিক। এই স্বপ্ন ও তাহার ব্যাখ্যা "বুদ্ধদেব-চরিত" ও "লাইট্ অফ্ এসিয়া"য় অবিকল একরূপ;—

"The first fear of his vision was a flag
Broad, glorious, glistening with a golden sun,
The mark of Indra; but a strong wind blew,

Rending its folds divine, and dashing it
Into the dust; whereat a concourse came
Of shadowy Ones, who took the spoiled silk up
And bore it eastward from the city gates.
The second fear was ten huge elephants,
With silver tusks and feet that shook the earth,
Trampling the southern road in mighty march;
And he who sat upon the foremost beast
Was the king's son—the others followed him.
The third fear of the vision was a car,
Shining with blinding light, which four steeds drew,
Snorting white smoke and champing fiery foam;
And in the car the Prince Siddhartha sate.
The fourth fear was a wheel which turned and turned,
With nave of burning gold and jewelled spokes,
And strange things written on the binding tire,
Which seemed both fire and music as it whirled.
The fifth fear was a mighty drum, set down
Midway beetwen the city and the hills,
On which the Prince beat with an iron mace,
So that the sound pealed like a thunderstorm,
Rolling around the sky and far away.
The sixth fear was a tower, which rose and rose
High o'er the city till its stately head
Shone crowned with clouds, and on the top the Prince
Stood, scattering from both hands, this way and that,
Gems of most lovely light, as if it rained
Jacynths and rubies; and the whole world came,
Striving to seize those treasures as they fell
Towards the four quarters. But the seventh fear was
A noise of wailing, and behold six men
Who wept and gnashed their teeth, and their palms,
Upon their mouths, walking disconsotale.

[LIGHT OF ASIA.—Book III.

"দেখ—দেখ,—ইন্দ্রের পতাকা
উজ্জ্বল বিভায় শোভে ঝলসি প্রদেশ!
হায়! হায়! মহাবাতে বিচ্ছিন্ন হইল।
দিক্‌হস্তী আসিতেছে দশ দিক্ হ'তে
পদভরে কাঁপায়ে মেদিনী।
দেখ—দেখ,
পুত্র মোর করিরাজপরে।
আহা, বিমান সুন্দর,
থরে থরে মণিমুক্তা সাজে!
শ্বেত অশ্ব চারি বহিতেছে রথখান।
কেবা রথে? পুত্র মোর!
আয় বৎস, আয় কোলে।
একি! চক্র ঘোরে অনিবার।
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা থরে থর,
ঘূর্ণ্যমান চক্র করে গান!
একি, ঘোর দামামার রোল!

গম্ভীর নিক্বণে গিরিশৃঙ্গ টল টল !
বজ্রনাদে কেবা বাদ্য করে ?
ওই পুন সিদ্ধার্থ আমার !
দেখ—ধীরে ধীরে ওঠে অট্টালিকা,
মেঘরাশি ভেদিয়াছে চূড়া।
চূড়া'পরে কুমার আমার খেলে।
দুইহাতে ছড়ায় রতন,
জগজ্জন আনন্দে কুড়ায়।
কেবা ছয়জন বিষাদে মগন
দন্তে দন্ত করিছে ঘর্ষণ ?
কার ডরে যায় পলাইয়ে ?"

পণ্ডিত আসিয়া এই স্বপ্ন-ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন, তিনি বলিলেন—

"হয় অনুভব,
জ্ঞানজ্যোতি লভিবে কুমার,
যাহে দগ্ধ হবে ভ্রমাত্মক শাস্ত্র যত।
হেরিল পতাকা-ছিন্ন সেই হেতু ভূপ।
দিক্‌হস্তী সম বলবান্
সত্য হ'বে আবিষ্কার—
প্রভাবে যাহার
রাজপুত্র হবে সর্ব্বজয়ী।
বুদ্ধিরথ আরোহণে নৃপতি-নন্দন
সন্দেহ-সাগর করি অতিক্রম,
লভিবে আনন্দ-স্থান।
বিধিচক্র দেখায়ে মানবে,
কুমার বুঝাবে বিধির নিয়মাবলী।
দুন্দুভিনিনাদে সত্য করিবে প্রচার।
বসি উচ্চ চূড়া'পরে,
জ্ঞানরত্ন বিলাইবে নরে।
শাস্ত্রগর্ব্বে গর্ব্বিত ছজন,
শিক্ষায় যাহার নর শিখে ভ্রম,
বিরস বদনে, পলাইবে কুমারে হেরিয়ে।"

[তৃতীয় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

"Whereof the first, where thou didst see a flag—
Broad, glorious—gilt with Indra's badge, cast down
And carried out, did signify the end
Of old faiths and beginning of the new ;
The ten great elephants that shook the earth
The ten great gifts of wisdom signify,
In strength whereof the Prince shall quit his state
And shake the world with passage of the Truth.
The four flame-breathing horses of the car
Are those four fearless virtues which shall bring
Thy son from doubt and gloom to gladsome light ;
The wheel that turned with nave of burning gold
Was that most precious Wheel of Perfect Law
Which he shall turn in sight of all the world.
The mighty drum whereon the prince did beat,
Till the sound filled all lands doth signify
The thunder of the preaching of the Word
Which he shall preach ; the tower that grew to heaven
The growing of the Gospel of this Buddh
Sets forth ; and those rare jewels scattered thence
The untold treasures are of that Good Law
To Gods and men dear and desirable.
Such is the interpretation of the tower ;

But for those six men weeping with shut mouths,
They are the six chief teachers whom thy son
Shall, with bright truth and speech unanswerable,
Convince of foolishness."

[LIGHT OF ASIA.—Book III.

"লাইট অফ্ এসিয়া"র চতুর্থ খণ্ডে বুদ্ধদেবের গৃহ-পরিত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে এ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মূল-ঘটনাটি ব্যতীত অন্য সমস্ত কথোপকথন গিরিশচন্দ্রের নিজরচিত।

গিরিশচন্দ্র চতুর্থ অঙ্কের প্রথমে যৎকিঞ্চিৎ হাস্যরসের অবতারণা করিতে শিষ্যদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের মুখে বুদ্ধের কঠোর তপস্যার কথা জানিতে পারা যায়। শিষ্যদ্বয় ভণ্ড-সন্ন্যাসী।—এগুলি গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব।

ধ্যানমগ্ন বুদ্ধকে যথার্থ পথে পরিচালিত করিবার জন্য দেববালাগণ গায়িলেন—

"আমার এ সাধের বীণে যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার।
তানে মানে বাঁধলে ডুরি, তারে শতধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে, টানে ছেঁড়ে কোমল তার।
সাধের বীণের মরম যে জানে, সে ত তার বাঁধে না টানে,
দীনের কথা মধুর গাথা শোনে সে প্রাণে
যে জোর ক'রে ডোর বাঁধ্‌বে টানে, বীণা নীরব রবে তা'র।"

এই সুন্দর সঙ্গীতটি বহু-প্রশংসিত। যে ইংরেজি গীতটির অনুকরণে ইহা রচিত, তাহা এই—

"Fair goes the dancing when the sitar's tuned;
Tune us the sitar neither low nor high,
And we will dance away the hearts of men.
The string o'erstretched breaks, and the music flies;
The string o'erslack is dumb, and music dies;
Tune us the sitar neither low nor high."

[LIGHT OF ASIA.—Book VI.

আর্ণল্ড লিখিয়াছেন একজন নর্ত্তকী ঐ গীতটি গায়িতে গায়িতে যন্ত্রীদের সহিত যাইতেছিল। বুদ্ধদেব ঐ সঙ্গীত শুনিয়া বুঝিলেন, অধিক কঠোরতায় তনুক্ষয় হইবে; তিনি মধ্যপথই অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। গিরিশচন্দ্র নর্ত্তকীর সৃষ্টি না করিয়া, দেববালাগণ এই গীত গায়িতেছেন, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সমগ্র নাটকখানিতে বহু স্থলে এই দেববালাগণ গীত গায়িয়াছেন। আর্ণল্ডও অশরীরিমুখোচ্চারিত গীত কখনও কখনও বুদ্ধ যে শুনিতে পাইতেন, এ কথা লিখিয়াছেন; পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

এই তপস্যার পর সুজাতা পায়সান্ন-দ্বারা বুদ্ধদেবকে প্রসন্ন করিলেন। বুদ্ধদেবের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন—

"বুঝি মম পূরাতে বাসনা,
বনদেব উদিত আকার ধরি।
তেজঃপুঞ্জকায় হের কেবা মহাশয়,
মহাধ্যানে নিমগ্ন তরুর মূলে।"

"There is the Wood-God sitting in his place,

*   *   *   *

See how the light shines round about his brow!"

সুজাতার পায়সান্ন ভক্ষণের পর বুদ্ধদেব দেখিলেন, ছাগপাল লইয়া এক রাখাল বিম্বিসারের যজ্ঞস্থলে চলিয়াছে। বিম্বিসার রাজা; যজ্ঞে পশু-বলি দিবেন।—"তাঁর বাড়ী পূজো, বলি দেবেন।"

"Our Lord the king
Slayeth this night in worship of his Gods."

[LIGHT OF ASIA.—Bk. V.

বুদ্ধ বলিলেন, "চল বাপু, আমি তোমার সঙ্গে যাব।"
"Then said the master, 'I will also go'."

যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া বুদ্ধদেব বিম্বিসারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"প্রাণদানে নাহিক শকতি
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণনাশ ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণ
কাতর প্রাণের তরে মানব যেমতি।"

* * * *

"রাজকার্য্য দুর্ব্বল-পালন,
দুর্ব্বল এ ছাগপাল।
হায়, হায়, ভাষায় বঞ্চিত,
নহে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়—
'প্রাণ যায় রক্ষা কর নরনাথ'।"

* * * *

"যদি নৃপ কৃপা নাহি কর,
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ ?
নির্দ্দয় যে জন,
দেবগণ নির্দ্দয় তাহার প্রতি।"

[চতুর্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

"He spake
"Of Life, which all can take but none can give,
Life, which all creatures love and strive to keep,
Wonderful, dear, and pleasant unto each,
Even to the meanest ; yea, a boon to all
Where pity is, for pity makes the world
Soft to the weak and noble for the strong.
Unto the dumb lips of his flock be lent
Sad pleading words, showing how man, who prays
For mercy to the gods, is merciless,
Being as god to those."

[LIGHT OF ASIA.—Bk. V.

বুদ্ধের কথায় বিম্বিসারের অন্তঃকরণের ভাবের পরিবর্ত্তন হইল ; তিনি আজ্ঞা দিলেন—

"রাজ্যে মম সত্বর ঘোষণা দেহ,
জীবহিংসা কেহ নাহি করে। * * *
আজি হ'তে হ'বে রাজ্যে বলিহীন পূজা।"

"Thus the king's will is :—
There hath been slaughter for the sacrifice
And slaying for the meat, but henceforth none
Shall spill the blood of life nor taste of flesh"

[LIGHT OF ASIA.—Book V.

বুদ্ধদেব তখন এই আশ্বাস দিয়া বিম্বিসারের নিকট বিদায় লইলেন—

"পাই যদি দুর্ল্লভ রতন
কহি সত্যবাণী, নৃপমণি
দিব আনি সে রত্ন তোমারে।"

"Yet there is light to reach and truth to win ;
And surely, O true Friend, if I attain
I will return and quit thy love."

তারপর নাটকে কিসাগোতমীর বৃত্তান্ত*। কিসাগোতমীর পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে, তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য শোকাকুলা-মাতা বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন। বুদ্ধদেব তাহাকে যেগৃহে কখনও মৃত্যুর সমাগম হয় নাই, তথা হইতে কৃষ্ণতিল আনিতে বলেন। বহুপর্য্যটনে মৃত্যু-সমাগমহীন-গৃহ না পাইয়া, কিসাগোতমী বুদ্ধের নিকট আগমন করিলেন। তখন বুদ্ধদেব সংসার যে নশ্বর তাঁহাকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিলেন। আর্ণল্ড ও গিরিশচন্দ্র, উভয়েই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।—বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

বুদ্ধ জম্বুতরুমূলে মহাধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। মার অনুচরসহ প্রলোভিত করিতে আসিল। সন্দেহ বুদ্ধকে বলিল—

"জ্ঞান যদি চাও, এই কি রে তার পথ ?"

"Thou dost but chase the shadow of thyself."

কুসংস্কার বলিল—

"বেদবিধি করিয়ে লঙ্ঘন
ত্যজি শাস্ত্রের বচন * *
হবে অধঃপাত, মহা অপরাধে।
দেব দ্বিজ নাহি মানে,

* মুখ-পত্রে চিত্র দ্রষ্টব্য।

না মানে ব্রাহ্মণ গুরু,
হেন অহঙ্কারে নিস্তার কি পাবে কভু ?”

“ ‘Wilt thou dare’, she said,
‘Put by our sacred books, dethrone our gods,
Unpeople all the temples, shaking down
That law which feeds the priests and props the realms ?’ ”

কাম, গোপারমূর্ত্তি দেখাইয়া বুদ্ধদেবকে মুগ্ধ করিতে চাহিল।—সকলের সকল প্রয়াসই কিন্তু ব্যর্থ হইল।

তখন ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বিভীষিকা প্রদর্শিত হইল ;—

“Next, under darkening skies
And noise of rising storm, came fiercer sins.”

অবশেষে বুদ্ধদেবেরই জয়! ধ্যানে ক্রমশঃ তাঁহার প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মীলিত হইল ; তিনি দেখিলেন,—

“জলবিম্বপ্রায়—কত শত বিশ্ব ভাসে
অসীম অনন্ত স্থানে—
উজ্জ্বল উজ্জ্বলতর ক্রমে।
কে করে গণন
ঘূর্ণ্যমান কত শত বিশাল-ভুবন,
রক্ষার কারণ,
কিরণ-শরীরি ফেরে দেবদূতগণ।”

“System on system, countless Worlds and Suns
Moving in splendid measures
He saw those Lords of Light who hold their worlds
By bonds invisible.”

“বিচিত্র নিয়ম !
ফোটে আলো আঁধার হইতে ;
অচেতন সচেতন ক্রমে,
স্থূল শূন্যেতে মিশায়,
শূন্য পুনঃ স্থূল-প্রসবিনী।
মৃত—সঞ্জীবিত,
জীবন—মরণ করে গ্রাস ;
মহাশক্তি ভাঙ্গে গড়ে !
নিয়ত এ শক্তি বহে হ্রাসবৃদ্ধিহীন।”

“That fixed decree at silent work, which will
Evolve the dark to light, the dead to life,
To fulness void, to form the yet unformed
A Power which builds, unbuilds and builds again.”

“দুঃখ ছায়াসম জীবনের সাথী,
অত্যাজ্য জীবনে,
না হবে বারণ, প্রাণ রবে যতক্ষণ ;
জনম, বর্দ্ধন, মৃত্যু, অবস্থা কেবল ;
দ্বেষ বা প্রণয়,
আনন্দ, যন্ত্রণা—মানসিক অবস্থার ভেদ।
যতদিন না ফোটে নয়ন,
মায়াবোধ যতদিন না হয় এ সব,
তদবধি নাহি যায় দুখ-সুখ-ভোগ।
অবিদ্যাজনিত ছল যেই জন জানে,
টুটে তার জীবনমমতা ;
মায়ার ছলনে হয় সংহার উদয়।”

“Sorrow is
Shadow to life, moving where life doth move :
Not to be laid aside until one lays
Living aside, with all its changing states,
Birth, growth, decay, love, hatred, pleasure, pain,
Being and doing. How that none strips off
These sad delights and pleasant griefs who lacks
Knowledge to know them snares ; but he who knows

Avidya—Delusion—sets those snares,
Loves life no longer, but ensues escape."

[LIGHT OF ASIA. Bk.—VI.

"পঞ্চভূত হয়ে সম্মিলন,
জীবজ্ঞান করিছে সৃজন,
জীবজ্ঞানে তৃষ্ণার উদ্ভব,
বেদনা সন্তান তার।
সে তৃষ্ণায় যত কর পান,
না হয় নির্ব্বাণ,
বৃদ্ধি হয়—অগ্নি যথা আহুতি-প্রদানে।
আমোদ-প্রয়াস, উচ্চ-আশ,
ধনলিপ্সা, যশোলিপ্সা আদি
তৃষ্ণানলে ঘৃতাহুতি।
সযতনে জ্ঞানীজন তৃষ্ণা করে দূর ;
কর্ম্মফলে দুখ—সুখভোগ
কর্ম্মগত ভোগ সহে ধৈর্য্যে বাঁধি প্রাণ,
নিগ্রহে ইন্দ্রিয় হয় হত,
ক্রমে তায় হয় কর্ম্মনাশ,
কর্ম্মধ্বংসে পবিত্রতা করে অধিকার।
নির্ব্বিকার, উপাধিবিহীন
স্বপ্নবৎ অবিদ্যা ফুরায়
দেবের দুর্ল্লভ, অতুল বৈভব
জরা মৃত্যুহীন,
নির্ব্বাণ-রতন করে লাভ।"

"And so Vedana grows—
'Sense-life', false in its gladness, fell in sadness,
But sad or glad, the Mother of Desire,
Trishna, that thirst which makes the living drink
Deeper and deeper of the false salt waves
Where on they float, pleasures, ambitions, wealth * *
* * * * * *
* * But who is wise,
Tears from his soul this Trishna * *
And so constraining passion s that they die
Famished ; till all the sum of ended life—
The *Karma* * *
Grows pure and sinless * *
Aroused and sane
As is a man wakened from hateful dreams.
Until—greater than Kings, than Gods more glad !
The aching craze to live ends, and life glides.
Lifeless—to nameless quiet, nameless joy,
Blessed NIRVANA—sinless, stirless rest."

[LIGHT OF ASIA.—Book. VI.

ইহার পরবর্ত্তী অংশটুকু প্রায় সমস্ত গিরিশচন্দ্রের নিজ-রচনা। পঞ্চম-অঙ্কের প্রথম-গর্ভাঙ্কবর্ণিত ঘটনার কোনও উল্লেখ "লাইট অফ্ এসিয়া"য় নাই। বুদ্ধের অনিষ্ট করিবার জন্য এক ব্রাহ্মণ ও এক বণিক ডাকাইতের দলের সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু বুদ্ধের কৃপায় সকলেরই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। তবে এই দৃশ্যে বুদ্ধের মুখে যে উপদেশামৃত প্রদত্ত হইয়াছে, "লাইট্ অফ্ এসিয়া"র অষ্টম সর্গে তাহার অনুরূপ বাক্য বিদ্যমান।

শেষ দুটি দৃশ্যে, নবধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে আসিয়া পিতা, পত্নী ও পুত্রের সহিত মিলিত হইলেন, এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। "লাইট্ অফ্ এসিয়া"র সপ্তম-সর্গেও এই কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই স্থূল মিলনকাহিনী ব্যতীত, আর্ণল্ড আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন ; গিরিশচন্দ্র সে সকলের অনুকরণ করেন নাই।

আর্ণল্ডের নিকট গিরিশচন্দ্রের ঋণের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়। সুন্দর ভাবপূর্ণ সঙ্গীত, কবিত্বময় কথোপকথন, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিন্তাবলী, অধিকাংশই "লাইট্ অফ্ এসিয়া"র অনুকরণে রচিত। গিরিশচন্দ্র যে দুই চারিটি ক্ষুদ্র-চরিত্র নিজে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা নাটকের বিশেষ কোনও সৌন্দর্য্য-বিকাশে সহায়তা করে নাই। তবে, মৌলিকতা

দেখিতে গেলে নাটকের স্থচনা, দ্বিতীয়-অঙ্কের দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক ও পঞ্চম-অঙ্কটির আলোচনা করা উচিত। বিশেষতঃ দ্বিতীয়-অঙ্কের দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্কে সিদ্ধার্থ ও গোপার কথোপকথন গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব ও অতি মনোরম।

বুদ্ধদেব-চরিত নাটক খানির অভিনয়ের ইতিহাস এইরূপ—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ষ্টার থিয়েটার নামে নব-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেন। বর্ত্তমান যেখানে কোহিনুর রঙ্গালয়, পূর্ব্বে সেইখানেই ষ্টার থিয়েটার ছিল। ঐ রঙ্গমঞ্চে ৪ঠা আশ্বিন ১২৯২ বঙ্গাব্দে বুদ্ধদেব-চরিত প্রথম অভিনীত হয়। পরে ষ্টার থিয়েটার হাতীবাগানে স্থানান্তরিত হইলে, সেখানেও ইহার অভিনয় চলিতে থাকে। অনন্তর বহু বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে বহুবার ইহার অভিনয় হয়। তন্মধ্যে ইহার ক্লাসিক্ থিয়েটারে অভিনয় উল্লেখযোগ্য। ২৮এ মাঘ ১৩০৭ বঙ্গাব্দে ক্লাসিক্ থিয়েটারে, ২২এ শ্রাবণ ১৩১১ বঙ্গাব্দে ও ১লা চৈত্র ১৩১৪ বঙ্গাব্দে ষ্টার থিয়েটারে, বুদ্ধদেব-চরিত অতি সুন্দররূপে অভিনীত হয়।

লাইট্ অফ্ এসিয়া-প্রণেতা স্যর্ এডুইন্ আর্ণল্ডও এক দিন বুদ্ধদেব-চরিত-অভিনয়ে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয় দেখিয়া, তিনি পরে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ-কালে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের উল্লেখে বলেন :—

"বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের পোষাক-পরিচ্ছদ বা দৃশ্যপট প্রভৃতি প্রতীচ্য রঙ্গাধ্যক্ষগণের হাস্যোদ্দীপন করিতে পারে, কিন্তু অভিনয়-কৌশল ও গভীরভাবপূর্ণ নাটকদ্বারা বাঙ্গালার রঙ্গালয় বিদেশীয় রঙ্গাধ্যক্ষগণকে বিস্ময়াভিভূত করিবে।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

ভরত

সুশোভিত রাজসভা নন্দিগ্রাম-মাঝে,
করিছেন শাস্ত্রালাপ কত বুধ-জন ;
সুসজ্জিত সেনাদল বীরোচিত সাজে,
নির্ভয়ে প্রকৃতিপুঞ্জ করে আবেদন।
বাজিছে বাদিত্র চারু, গায়িছে সুস্বরে
গায়ক ; বন্দিছে বন্দী রাজেন্দ্র-মহিমা ;
যাচক দরিদ্র তৃপ্ত সদা সমাদরে,
বিরাজে শুভদা শান্তি মঙ্গল প্রতিমা।
অবিচার অকল্যাণ নাহি জানে দেশ,
রাজভক্ত অনুরক্ত যত প্রজাগণ ;
মানবে দেবতারূপে গড়িছে নরেশ
লোকহিতে আপনারে করি' সমর্পণ।
কে সে ভূপ ?—অপরূপ ! রাজ-সিংহাসনে
দু'খানি পাদুকা রাজে চন্দনচর্চ্চিত ;
নিম্নতলে মৃগাজিনে বসি' যোগাসনে,
করিছেন রাজকার্য্য শান্ত সুবিনীত।
উপেক্ষিতা রাজলক্ষ্মী সলজ্জ আননে
বিরাজে সে রাজপুরে ! অরুণী প্রেয়সী
নিরখে গবাক্ষ দিয়া যোগী পতিধনে,
সূর্য্যে চাহে সূর্য্যমুখী ধরাতলে বসি' !
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সাধ দলিয়া চরণে,
মাতৃপাপ-প্রায়শ্চিত্ত করিছে ধীমান্,
রাজা নহে রাজভৃত্য, সদা জাগে মনে ;
অগ্রজের পদাম্বুজ করিছেন ধ্যান !
ধন্য হে ভরত !—তব মহা-তপস্যায়,
জননীর কোটিপাপ-ভস্ম হয়ে যায়।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী

সুসঙ্গ-রাজ

রঘুনাথ ঠাকুর।

সুসঙ্গের ইতিহাসে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, রাজা রঘুনাথ নামে এক ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়। তিনি সুসঙ্গের মালিক জানকীনাথের প্রথম পুত্র।

রঘুনাথের পিতা, পুত্রকে রাজধানী হইতে কিছু দূর-বর্ত্তী—কান্দাপাড়া গ্রামের—একটি চতুষ্পাঠীতে বিদ্যার্জ্জনের জন্য প্রেরণ করেন। সে সময়ে স্কুলপাঠশালা ছিল না; বিদ্যার্থীদিগকে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া পাঠ-গ্রহণ করিতে হইত। রাজপুত্র হইলেও রঘুনাথকে গুরু-গৃহে যাইতে হইয়াছিল।

সেই সময়ে রঘুনাথের একটি কার্য্যে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। এক দিন প্রভাতে, টোল এবং রাজধানীর মধ্যপথে, একটি বৃক্ষের কাণ্ডে একটি তীরবিদ্ধ বৃহৎকায় ব্যাঘ্রকে মৃতাবস্থায় দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তীরচালন-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বীর ব্যতীত এমন শর-সন্ধান করা অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সকলেই সেই অজ্ঞাতনামা বীরের অশেষ প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন; এবং এমন বীর কে, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর এই অব্যর্থ-শরসন্ধানকারী ধরা পড়িলেন; তিনি আর কেহই নহেন,—স্বয়ং রঘুনাথ। প্রকাশ পাইল যে, রজনীযোগে রঘুনাথ স্বীয় পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজধানী অভিমুখে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে একটি ব্যাঘ্র তাঁহার সম্মুখীন হয়;—নির্ভীক রঘুনাথ, হস্তস্থিত তীরদ্বারা ব্যাঘ্রকে বৃক্ষকাণ্ডে নিবদ্ধ করিয়া, স্বীয় গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করেন। ব্যাঘ্র সেই ভীষণ আঘাতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।

রঘুনাথের বিবাহব্যাপারও বীরত্বব্যঞ্জক।—সুসঙ্গের জোয়ারদারগণ রাজ-পরিবারের উপর পূর্ব্ব হইতেই ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাঁহারা বৈরনির্যাতন-মানসে এক অভিনব ষড়্‌যন্ত্র করিলেন। বওনা-গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ-জোয়ার-দারের কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। এই বিবাহ-ব্যাপারের অন্তরালে একটি ভয়ানক পৈশাচিক অভিনয়ের আয়োজন ছিল; —রঘুনাথ বা তাঁহার অভিভাবক ও আত্মীয়গণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই!—রঘুনাথ বরবেশে অল্পসংখ্যক সহচর সমভিব্যাহারে বওনা-গ্রামে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল; তখনও কেহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বিবাহ শেষ হইলে বাসরঘরে উপস্থিত হইয়া রঘুনাথ যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বাসর-গৃহে কোথায় আমোদ-আনন্দ নৃত্যগীত হইবে, তাঁহার নব-পরিণীতা মহিষী আনন্দে উৎফুল্লা হইবেন, তৎপরিবর্ত্তে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার নবপরিণীতা মহিষী নিঃশব্দে রোদন করিতেছেন! রঘুনাথ এই নীরব-রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মহিষী কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।—অবশেষে, উপায়ান্তর না দেখিয়া লজ্জাত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বাসর-ঘরে স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করা লজ্জাহীনতার লক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যখন ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া আপনার পত্নীরূপে গৃহীত হইয়াছি, তখন আপনার সুখদুঃখেরও আমি অংশভাগিনী। সুতরাং, আপনার আসন্ন বিপদের কথা জানিয়া, নীরবে থাকিলে আমার মহাপাপ হইবে। দুষ্ট লোকেরা অদ্য রাত্রিতেই আপনার প্রাণনাশের ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছে; এ সংবাদ পূর্ব্বে আপনার গোচর করিবার কোন সুযোগই পাই নাই।"

তখন রঘুনাথ ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, যথার্থই বাসরগৃহ সশস্ত্র শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়াছে। অগত্যা, তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া, স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা নবপরিণীতা ভার্য্যাকে পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া একখানি বিরাট্ যষ্টি-হস্তে বাসর-গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার ভীম-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, কেহই তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। মহিষীকে পৃষ্ঠে লইয়া তিনি একেবারে স্বীয় রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনার পর হইতে সুসঙ্গ-রাজ-পরিবারের কুমারেরা বিবাহ সভায় সশস্ত্র উপস্থিত হইয়া থাকেন; এই প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

বঙ্গের বারভূঁঞার অন্যতম, ঈশা খাঁর সহিত সুসঙ্গ-রাজের পূর্ব্ব হইতেই জমিদারীর সীমানা লইয়া শত্রুতা ছিল। পিতার মৃত্যুর পর, রঘুনাথ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ঈশা খাঁ, রঘুনাথের প্রবল প্রতাপ দেখিয়া, তাঁহাকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সুযোগক্রমে ঈশা খাঁ রঘুনাথকে কারারুদ্ধ করেন।

রঘুনাথ কারামুক্তির জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঈশা খাঁর ন্যায় প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কোনও চেষ্টাই সফল না হওয়ায়, তিনি অবশেষে কারাগার হইতে পলায়ন করিবার সংকল্প করিলেন। এই সময় সুসঙ্গের জনৈক কর্ম্মচারী "ধলার মাঝি"* নামে কতকগুলি যুদ্ধব্যবসায়ী বলিষ্ঠ মুসলমানসহ রঘুনাথের উদ্ধারের জন্য অদূরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রঘুনাথ কারা-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ঈশা খাঁর পুরী হইতে বহির্গত হইলে, "ধলার মাঝি"গণ রাত্রি-প্রভাতের পূর্ব্বেই একটি খাল কাটিয়া প্রভুকে লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হয়। সেই খাল এখনও বর্ত্তমান আছে। উপরি-উক্ত ঘটনার স্মৃতি-রক্ষার জন্য সেই খাল "রঘুখালী" নামে অভিহিত হইয়াছিল। এখনও সুসঙ্গ-অঞ্চলের লোকেরা 'রঘুখালীর'-প্রসঙ্গে, রাজা রঘুনাথের অতুল বীরত্বের গল্প করিয়া থাকে।

রাজা রঘুনাথের রাজত্বকালের প্রথমাবস্থা বড়ই অশান্তিপূর্ণ ছিল। 'গারো' প্রজাগণ তখন তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। তাহারা সহসা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া রাজার প্রাপ্য স্বর্ণ, রৌপ্য, পশু, পক্ষী, কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রদান বন্ধ করিয়া দিল। পার্ব্বতীয় রাজ্যের সর্ব্বত্র বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল। গারোগণ স্বেচ্ছায় রাজার প্রাপ্য-সামগ্রী না দিলে, বলপূর্ব্বক লওয়া বড়ই কঠিন ছিল। রাজার সৈন্যগণ পাহাড়ে গিয়া কোন ক্ষমতাই পরিচালনা করিতে পারিত না; কারণ গারোগণ উচ্চস্থান হইতে পাথর ও বড় বড় বৃক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সৈন্য-সংহার করিত! রঘুনাথ বলে, বা কৌশলে, কোনপ্রকারেই দুর্ব্বৃত্ত প্রজাদিগকে নির্যাতন করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে ঈশা খাঁর মত প্রবল-শক্তিশালী ভূম্যধিকারীও তাঁহার বিরোধী। তিনি, নানাদিক্ হইতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন! অবশেষে, কোন উপায় নাই দেখিয়া, অগত্যা মোগল-সম্রাটের সাহায্য গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

তখন (১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে) মোগল-কুলতিলক সম্রাট্ আক্বর ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন; সম্রাট্-পুত্র সেলিম ও তৎপুত্র খস্রু, সিংহাসন-লাভের জন্য, পরস্পরের মধ্যে বৈরভাব আরম্ভ করিয়াছেন। মানসিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ প্রথমে খস্রুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে পিতামহের সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সুতরাং, রাজ্যমধ্যে ঘোরতর বিদ্রোহ ঘটিবার সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু শেষে পুত্রকে বন্দী করিয়া, সেলিমই জয়লাভ করেন। আকবরের মৃত্যুর পর তিনিই ভারত-সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, এবং জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারত-সাম্রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। আকবরের মৃত্যু ও জাহাঙ্গীরের সিংহাসনপ্রাপ্তি, এই দুই ঘটনা-উপলক্ষে বাঙ্গলার দ্বাদশ ভূঁঞাগণের মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য কএক বৎসর নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই দেখিলেন,—ইতঃপূর্ব্বে, তাঁহার পিতার রাজত্বকালে, যে সকল মোগল সেনাপতি প্রতাপ-বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়া সেই বঙ্গীয় বীরের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। এই বিক্রান্ত বীরের দমনের জন্য এক্ষণে মানসিংহকে প্রেরণ করাই তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। মানসিংহকে পাঠাইতে পারিলে, তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রথম—মানসিংহ যদি প্রতাপ-কর্ত্তৃক নিহত হ'ন, তাহা হইলে তাঁহার প্রধান অন্তঃ-শত্রুর উচ্ছেদ হয়। কারণ, ভারত-সিংহাসন লইয়া বিরোধের সময় মানসিংহ খস্রুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়—মানসিংহ যদি প্রতাপাদিত্যকে বিনষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে একটা প্রবল বহিঃশত্রু নিহত হয়। এইরূপ স্থির করিয়া জাহাঙ্গীর মানসিংহকে যুদ্ধে যাইতে আদেশ করিলেন। মানসিংহ, প্রতাপাদিত্যের গৃহ-শত্রু কচুরায় ও রূপরাম বসুর পরামর্শে, প্রতাপের গুপ্ত-যুদ্ধনীতিসকল কৌশলে

* ধলার মাঝিদিগের বংশধরগণ অদ্যাপি মহারাজা-বাহাদুরের শরীর-রক্ষকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

জানিতে পারিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু চেষ্টা ও কষ্টের পর, তিনি প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন।

মানসিংহ, প্রতাপ-বিজয়ের পর, বর্ত্তমান বগুড়ার অন্তর্গত করতোয়া নদীতে স্নানার্থ গমন করেন। রাজা মানসিংহ, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী মোগল-সম্রাটের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি স্বধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল; তিনি হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠানে ক্রটী করিতেন না। স্নানান্তে, জনৈক পুরোহিত লইয়া, তথায় পিতৃ-পুরুষদিগের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ায় ব্রতী হইলেন। ব্রাহ্মণ মন্ত্র-পাঠ করাইতেছেন, আর গৈরিকবাস-পরিহিত মানসিংহ একখানি কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিভবে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন; এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রঘুনাথ বলিয়া উঠিলেন—"ব্রাহ্মণ! শাস্ত্রাধ্যয়ন কর নাই? অর্থ-লোভে যাহা-ইচ্ছা বলিয়া যাইতেছ!" মানসিংহ এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং গ্রীবা বক্র করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন যে, এক দৃঢ়কায় সুন্দর ব্রাহ্মণ-যুবক কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছে! তখন মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" যুবক অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আমি একজন শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ।" যুবকের নির্ভীকতায় মানসিংহ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং যথাবিধি মন্ত্রপাঠ করাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। যুবক রঘুনাথ, মানসিংহকে অতি বিশুদ্ধভাবে মন্ত্রপাঠ করাইলেন। ক্রিয়াশেষে নিষ্ঠাবান্ রাজা মানসিংহ অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ্‌জী, কেয়া দক্ষিণা চাহিয়ে?" পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণকে 'মহারাজ্' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণযুবক বলিলেন, "আমি শাস্ত্র-ব্যবসায়ী নহি, সামান্য অর্থেরও প্রত্যাশী নহি।—আমি সুসঙ্গের অধিপতি রঘুনাথ ঠাকুর। আপনি দিল্লীর সম্রাটের প্রধান সেনাপতি ক্ষত্রিয়-বীর মানসিংহ; আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। আমি আপনার নিকট অর্থ ভিক্ষা চাই না। আপনি যদি আমার উপকার করিতে যথার্থই অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে আমাকে যে 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই সম্বোধনটি যাহাতে দিল্লীশ্বর আমাকে বংশানুক্রমিক—চিরস্থায়ীরূপে প্রদান করেন, আপনি তাহার সুব্যবস্থা করিয়া নিজ বাঙ্নিষ্ঠার পরিচয় দিন;—ইহাই আমার প্রার্থনা।" ব্রাহ্মণযুবক জানিতেন, ব্রাহ্মণের প্রতি মানসিংহের প্রগাঢ় ভক্তি; তাই তিনি ঈদৃশ আব্দার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। মানসিংহ রঘুনাথ ঠাকুরকে জানাইলেন যে, দিল্লী গমন করিলে তাঁহার অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা। রঘুনাথ, দিল্লী গমন করিয়া মানসিংহের অনুগ্রহে মহারাজোপাধি লাভ করিলেন।

শ্রীশৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

মশকবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

বসে যথা নভঃস্থলে তারাদল সাথে
শশাঙ্ক, নিভৃতকক্ষে বসিয়া একেলা
বেষ্টিত মশকবৃন্দে আমিও তেমতি,
হে দেবি ভারতি! তব উপাসনারত
নির্ব্বাক্ নিশ্চল;—হেন থাকি কতক্ষণ
সহসা চিত্তের বাঁধ গেল গো টুটিয়া
ভীষণ আরাবময় ভীম-প্রহরণে—
টুটে যথা সেতুবন্ধ প্রাবৃট্-সময়ে
জলাশয়ে,—কিম্বা যথা তপোমগ্ন যোগী,
হয় রে বিকল-হৃদি অপ্সরা-সঙ্গীতে।
চাহিয়া চৌদিকে দ্রুত, হেরিনু পশ্চাতে
অগণন মশাবৃন্দ স্বশস্ত্রে সজ্জিত;—
কি ছার ইহার কাছে, হে কমলাপতি!
সে কৌরব-অনীকিনী কুরুক্ষেত্রে যাহে
অভিমন্যুশূরে তব গোপনে বেড়িলা!
ধ্বনিত হইল দেশ মম উচ্চারিত
উহুরবে মুহুর্মুহু,—উঠিলা ফুলিয়া
গাত্র-কিসলয় মম হইয়া দাগড়া
দদ্রুতে যেমতি,—হায় কি কাজ স্মরিয়া,
স্মরিলেও যেই কথা ক্লেশ হয় মনে!

ক্ষত-মুখে সরিষার তৈলপ্রলেপিয়া
মুহূর্ত্তে মশারি-ব্যূহ রচিয়া কৌশলে
প্রবেশিনু মধ্যে তা'র আমিও সুমতি—
ভীম-পরাক্রান্ত—যথা দুর্য্যোধনবলী
দ্বৈপায়ন হ্রদমধ্যে পাণ্ডবে ছলিতে।
গণি নিরাপদ এবে লাগিনু চিন্তিতে
কেমনে সন্ধান পাবে ক্রূর মশাপতি
আমারে হেথায় পুনঃ, কিন্তু আচম্বিতে—
শ্যামের বাঁশরী যথা বাজে গো বিপিনে,
উদাসিয়া গোপিনীর উতলা পরাণি—
বহিলা স্বরলহরী, সুস্বন-স্বননে।—
কিম্বা যথা বীণাযন্ত্র সুযন্ত্রী তন্ত্রিত
কোমল-কলকাকলী তুলেক শিহরি
উঠিলা সে ধ্বনি!—আমি, হায়রে, কি ক'রে
কহিব সে দুঃখ-কথা!—জানিনু তখন
প'শেছে মশক মোর সূত্র-ব্যূহ মাঝে
পাপিষ্ঠ;—চকিতে বিশ্ব ঘূরিল নয়নে
লাটিমের মত,—জ্ঞান হ'ল মনে হেন
(বিস্ময়-বিহ্বল সব ইন্দ্রিয় যেহেতু)
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদি গর্ব্বমদস্ফীত
আসিছে বিপক্ষ মোরে জিনিবার তরে!
সাহসের তরবারি টানিনু সবলে
কাঁপাইয়া হৃদি-খাপ, যেন ঝন্‌ঝনে
ক্রোধাগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-দীপ্তি দীপিল তাহায়
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখে যেন; উঠিয়া ত্বরিতে
দ্রুত ইরম্মদবেগে আইনু বাহিরে
চীৎকারিয়া ভীমরবে—"রে পাষণ্ডগণ!
ভেবেছিস্ মনে মনে ক্ষীণবাহু আমি
না পারি শাসিতে সবে; দেখিবি নিমেষে
কি ভুজ-বিক্রম হেথা আছে লুকাইয়া
অদৃশ্যে,—যেমতি থাকে দেব বৈশ্বানর
চুল্লীর জ্বলন-হেতু ইন্ধন-মাঝারে।"
এতবলি ক্ষিপ্ত-প্রায় লাগিনু ভ্রমিতে
পাখাহস্তে গৃহমাঝে লম্ফ ঝম্ফ দিয়া
কড়মড়ি ভীমদন্ত;—গেল যে খসিয়া
বসন কাঁকাল হ'তে প্রচণ্ড-তাণ্ডবে!—
কখন দু'হাতে করি পাখা-সঞ্চালন;
আঘাতিয়া পৃষ্ঠদেশে পাড়িনু কাহারে
ভূতলে; মূর্চ্ছিত কেহ পড়িল ঘুরিয়া
চির নিদ্রাতরে; কারে ধরি মুষ্টিমাঝে
নিষ্পেষিনু রক্তহস্তে; মারিনু কাহারে
ভীষণ-ওজন চড়, মিশাইয়া গেল
অস্থিহীন ক্ষুদ্রকায় করতলে,—যথা
মিশায় পেরেক কোন কাষ্ঠের ভিতরে
ছুতোরমুগুরা-ঘাতে। কিন্তু স্বীকারিব,
যুঝিলা মশক সত্য বীরত্ব-বিক্রমে—
নাহি ভঙ্গ দিলা রণে, পরন্তু দ্বিগুণ
উৎসাহে করিয়া ভর দিলেক কামড়
কেহ বক্ষে, কেহ চক্ষে, কেহ পৃষ্ঠদেশে।
কুঞ্চিত কৈশিক-বর্ম্ম কেহ বিদারিয়া
বিঁধিলা শতেক শরে মস্তক-চর্ম্মিকা,
শোষিলা শোণিত-কণা,—কে পারে গুণিতে
বাহি নাসারন্ধ্র কেহ উঠি ভনভনি
হাঁচাইলা মোরে,—আমি হইয়া কাতর,
নিস্তেজ পড়িনু শুয়ে সতরঞ্চ'পরে
ঘুরিয়া,—মারীচ যথা দূর লঙ্কাধামে।
হাঁফাইয়া ঘনঘন জুড়ি করপুটে
মাগিনু নিষ্কৃতি।—হায়! মশকের কাছে
হ'য়ে পরাজিত হেন, কেননা মরিনু
তখনি?—কেননা গেল বাহিরিয়া প্রাণ,
অলক্ষ্যে অম্বরপথে দেহরথ হ'তে
অবসিয়া জ্বালা?—ক্রমে যাইলা রজনী,
সৌরকররাশি আসি পশিলা প্রত্যূষে
আমার আঁধার-কক্ষে,—একে দুয়ে সবে
পলাইলা মশাকুল।—শ্রমক্লান্ত তনু
হেলায়ে তাকিয়া পরে কহিনু চেঁচায়ে—
"মিটাব সমর-আশ কল্য আযোধনে
নিশাগমে",—মনে মনে শুইয়া শুইয়া
করিনু প্রতিজ্ঞা এক অতি-ভয়ঙ্কর
মশকের অত্যাচার প্রতিবিধিৎসিতে।

ইতি 'মশকবধ'-কাব্যে 'প্রতিজ্ঞা'নামো প্রথমসর্গঃ।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

[স্যর্ লরেন্স আল্মা-টাডেমা R.A. কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি হইতে।]

ভাস্কর-মন্দির।

সাঙ্কেতিক স্বরলিপি

"কাব্যালাপাশ্চ যা কাশ্চিৎ গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতদ্ বপুর্বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ॥"

—বিষ্ণুপুরাণম্।

(অর্থঃ—যাহা কিছু কাব্যালাপ, নিখিল গীতশাস্ত্র শব্দমূর্ত্তিধর মহাত্মা বিষ্ণুর অঙ্গ।)

ভারতে ভদ্রসমাজ আবার সঙ্গীতের আদর করিতে শিখিতেছেন, দেখিয়া মনে স্বতঃই হর্ষের উদয় হয়। জন্মিলেই সুখ-দুঃখ আছে; এই তুচ্ছ সুখদুঃখের জন্য আহ্লাদ-আর্ত্তনাদ ত্যাগ করিয়া যাঁহার মন পরাবিদ্যা—সঙ্গীত-রসে ধাবিত হয়, তিনি ধন্য! আজকাল দেশের গণ্যমান্য অনেকেই সঙ্গীতের প্রতি শুভদৃষ্টি করিতেছেন;—অন্ততঃ তাঁহারা সঙ্গীত-সাধনা করিতে লজ্জাবোধ করেন না। জাতীয় শিক্ষা-বিধান-বিষয়ে, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে, সঙ্গীতের মহাপ্রভাব, পাশ্চাত্য সভ্যসমাজের ন্যায়, অধুনাতন ভারত-সমাজে এখনও বিশদভাবে উপলব্ধ হয় নাই সত্য; কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গীতজগত হইতে যে একটা মহাসঙ্কট চলিয়া গেল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়রসে আপ্লুত না হইয়া থাকা যায় না!

এতদিন শ্রীসারদার শোভন-বীণা কেবল কএকজন ব্যবসাদার, তথাকথিত 'কালোয়াৎ' ও বারাঙ্গনার হস্তে, বিরাজ করিতেছিল।—সঙ্গীত ও চরিত্রহীনতার এক বীভৎস মিলন-দর্শনে অনেক সাধু-নিরীহপ্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল। তবলার বাদ্য-তরঙ্গ, তৎসহ মদিরা-প্রবাহ; সঙ্গীতের তাল, তৎসহ গঞ্জিকা-ধূমোদ্গীরণ প্রভৃতি; পরে চরম-পরিসমাপ্তি—ঘৃণ্য-জঘন্য বিলাসে!—এইগুলি যেন একতারে গ্রথিত ছিল। অতএব, সুরপূজ্য সঙ্গীতবিদ্যা, চরিত্রহীনতার অঙ্গ, বিবেচিত হওয়ায় বলিয়া ভদ্রসমাজ হইতে প্রায় একেবারে বিতাড়িত হইতেছিল।

পরে, কোন্ এক শুভ-মুহূর্ত্তে, কএকজন সঙ্গীতরসজ্ঞ শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় সেই বীণাটি সমাজের অধস্তনস্তর হইতে সাদরে কুড়াইয়া যখন নূতন সুরে বাঁধিয়া ঝঙ্কার দিতে লাগিলেন, তখন শিক্ষিত-সমাজ সেদিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই আবার সঙ্গীতের এতই আলোচনা হইল যে, আজ কুলললনাদিগের মধ্যেও সঙ্গীত-আলোচনা দূষ্য বা নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত নহে!

সে যাহা হউক, সঙ্গীতের সেই নবযুগ-আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্য-অনুকরণে মাত্রা-সংযোগে স্বরলিপির প্রচলন আরম্ভ হইল। ইহাদ্বারা যে কি মঙ্গল সাধিত হইল, তাহা সর্ব্বসাধারণে এখনও সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, স্বরলিপিদ্বারা যে দেশীয় সঙ্গীতও লেখা যাইতে পারে, এখন তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। স্বরলিপির উদ্দেশ্য প্রধানতঃ তিনটি; প্রথম—সকল সময়ের সঙ্গীত-সংরক্ষণ মানসে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা; দ্বিতীয়—সহজ-উপায়ে সঙ্গীতানুশীলনের জন্য শিক্ষার্থিগণের সহায়তা করা; তৃতীয়—যে কোন নূতন সুর হউক না কেন, তাহা সুরতাললয়-সংযোগে প্রকাশ করা। এই লিপির অভাব-সম্বন্ধে সঙ্গীতাচার্য্য ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুবিজ্ঞ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য;—"উপযুক্ত গ্রন্থাভাবে প্রাচীন কিংবা আধুনিক কালের কত যে উৎকৃষ্ট গান ও গৎ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? * * * বহুপূর্ব্বকাল হইতেই ঐরূপ হইয়া আসাতে হিন্দুসঙ্গীত বিলক্ষণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কি সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ করা, কি সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তির উন্নতি করা, তাবৎ অবস্থাতেই চিরকাল ওস্তাদের আবশ্যক হয়; ওস্তাদ্ না হইলে একপদ বাড়াইবার শক্তি নাই। এই সকল নানা কারণে এক্ষণে হিন্দুসঙ্গীত-শিক্ষা করা অন্যান্য কঠিনতর শাস্ত্রাভ্যাস করা অপেক্ষাও দুরূহতর হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং, এরূপ অবস্থায়, আমাদের দেশে সঙ্গীতচর্চ্চা যে এত বিরল হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? সঙ্গীত-শিক্ষার সহজ উপায় না থাকাতেই আমাদের সুশিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চার আদর একেবারেই নাই। * * * গ্রন্থ দেখিয়া সঙ্গীত-সাধনা করিতে হইলে, সঙ্গীতের সুর ও তাল লিখিবার নিমিত্ত একজাতি (?) সাঙ্কেতিক অক্ষরের বিশেষ প্রয়োজন।"

প্রবীণ আচার্য্য-কর্ত্তৃক উল্লিখিত অভাব এক্ষণে কিয়ৎ

পরিমাণে দুর হইয়াছে বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের সঙ্গীতাচার্য্যগণ সকলে একমত না হইয়া প্রত্যেকে একএকটি নূতন রকমের স্বরলিপি উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় এক মহাসঙ্কটের সূত্রপাত হইতেছে।

অবশ্য ইহাতে স্বরলিপির প্রথম উদ্দেশ্যসাধনের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই; কেন না, যেরূপ ভাবেই লেখা হউক না কেন, সুরগুলি ত লেখা রহিল। কিন্তু এরূপ অবস্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। দিন দিন নব-স্বরলিপির সৃষ্টি হওয়ায় এক জনের কৃত স্বরলিপিতে অভিজ্ঞব্যক্তি, অপরের স্বরলিপি কিছুই বুঝিতে পারেন না; আবার নূতন-শিক্ষার্থী, ভিন্ন ভিন্ন স্বরলিপি দেখিতে দেখিতে, কোনটাই ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

স্বরলিপি, সুর-তাল-লয়-মাত্রা-বিশিষ্ট সঙ্গীত-প্রকাশক মাত্র। বলা বাহুল্য যে, সেই অক্ষর যতই বিভিন্ন হইবে, ততই শিক্ষার্থিগণের শিক্ষার অসুবিধা-সুবিধা-সৃজন করিতে পারে না।

ন, যদি এক বঙ্গভাষা লিখিতে গিয়া, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতি, কৃতবিদ্য স্বকপোল-কল্পিত এক একটি বিভিন্ন বর্ণমালার করিতেন, তাহা হইলে—ভাষার কোন উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, ইতিহাস-যুগের পূর্ব্বে ব্যাবেলে সংঘটিত উৎপাতের মত এক বিভীষিকাময় ভাষা-সঙ্কট উপস্থিত হইত কি না?—পাঠককেও কি অতিশয় শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইত না?—উক্ত গ্রন্থকারগণের মহামূল্য গ্রন্থগুলি ত কেহ অনর্গল পাঠ করিতে সমর্থ হইতেন না; পরন্তু মুদীর মহাভারত-পাঠের ন্যায় প্রত্যেকপদ 'বানান' করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইত।

আজকাল স্বরলিপির অবস্থাও ঠিক সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে! সেই নিমিত্ত, কেবল স্বরলিপি-দর্শনমাত্রই অনর্গল প্রকাশ করা ত অসম্ভব হইয়াছে; তাহা ভিন্ন, নূতন-শিক্ষার্থীরা এইরূপ বহুবিধ স্বরলিপি আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া, হতাশহৃদয়ে সঙ্গীতানুশীলন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে।

স্বরলিপি প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বসাধারণে সঙ্গীতের যেরূপ প্রচার হওয়া উচিত ছিল, তাহার শতাংশের একাংশও হইল না দেখিয়া আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, নিত্য নূতন-স্বরলিপির উদ্ভবই ইহার একমাত্র কারণ। যে দেশের শিক্ষিত-সমাজ আজ সমস্ত ভারতে, এক ভাষা না হউক, অন্ততঃ এক-বর্ণমালার প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন; সেই দেশের সঙ্গীতের অক্ষর যে কি প্রকারে অবলীলাক্রমে বিনা-আপত্তিতে এখনও নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বুঝিতে পারি না! যদি বিভিন্ন প্রদেশের নানা প্রকার ভাষা একরূপ বর্ণমালা-দ্বারা লেখা সম্ভবপর ও যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়, তবে কেবল এক বঙ্গীয় সঙ্গীত লিখিবার জন্য নানাবিধ অক্ষরসৃষ্টি করা কি যুক্তিসঙ্গত? এক-সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর লিপি ব্যবহার করিয়া কি জটিলতা বৃদ্ধি করা হইতেছে না?

বিভিন্ন রকমের ভাষা যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বর্ণমালা-দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি করিবার অধিকার নাই; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ভিন্ন ভিন্ন জাতির, বা দেশের, নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু সঙ্গীতবিদ্যা যে কোন এক-জাতির, বা দেশের, নিজ-সম্পত্তি নহে;—উহা যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সম্পত্তি! উহার ভাষা (সর্গম) যে জগৎজুড়িয়া এক। তবে, জোর করিয়া, আমরা উহাকে বিভিন্ন প্রকারের অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া কি কেবল আপনাদের অনুদারতার পরিচয় দিতেছি না?

স্বরলিপি, কেবল বঙ্গীয় শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য, এক-ধরণের অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যাহাতে সমগ্র সভ্যজগতে একরূপ স্বরলিপির প্রচার হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে ও তাহার সহায়তা করিতে হইবে।

এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে,—এমন কোন স্বরলিপি হইতে পারে কি, যাহা সমস্ত সভ্যজগৎ মানিয়া লইতে প্রস্তুত? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে,—বহুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সঙ্গীতাচার্য্যগণ যতদূর সম্ভব একপ্রকার সরল-সাঙ্কেতিক স্বরলিপির (staff-notation) উদ্ভব করিয়া গিয়াছেন, যাহা আজ প্রায় সমগ্র সভ্যজগৎ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছেন;—তাহাই আমাদের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল আমরাই, তাহা গ্রহণ না করিয়া, তদপেক্ষা সরল ও সহজ স্বরলিপি উদ্ভাবনে কালক্ষেপ করিতেছি মাত্র!

যদি তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে, আমরা অধিকতর সরল-স্বরলিপি উদ্ভাবনে সমর্থ হইতে পারি,—কিন্তু তাহা সভ্যজগতে প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইব কি ? যে স্বরলিপি, বহুপূর্ব্ব হইতে, সমস্ত সভ্যজগতের উপর বিনা-আপত্তিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে ও সাদরে গৃহীত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদ-সাধন কি এখন সম্ভবপর ?—না, সেরূপ চেষ্টা করা যুক্তিসিদ্ধ ?

আরও যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে,—আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সরল-স্বরলিপি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাই বলিয়া কি আমাদের উদ্ভাবিত সমুদয় স্বরলিপি, প্রচলিত অপরাপর স্বরলিপি অপেক্ষা সরল ?

অতএব, স্ব স্ব পথাবলম্বী না হইয়া যে স্বরলিপি সর্ব্বাপেক্ষা সরল বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, সকলে মিলিয়া তাহারই অনুসরণ করা কি যুক্তিসঙ্গত নহে ?

তবে কথা এই যে,—প্রচলিত স্বরলিপির মধ্যে কাহার স্বরলিপি সর্ব্বাপেক্ষা সরল, তাহা বিচার করিবেন কে ?

আমরা প্রত্যেকেই যে স্ব স্ব প্রধান। আর সঙ্গীত-চর্চ্চার জন্য, যে সকল সঙ্ঘ সমিতি সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার কোনটির দৃষ্টি ত কখন এদিকে পতিত হইতে দেখা যায় নাই। অতএব, এই অবস্থায়, যতদিন কোনএক নূতন স্বরলিপি সরলতম বলিয়া না নির্দ্ধারিত হয় এবং যতদিন না আমরা সে কথা সভ্যজগতের নিকট প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হই, ততদিন "মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ" -নীতি-অবলম্বন করাই কি শ্রেয়ঃ নহে ?

স্বরলিপি-লিখন-প্রথাটি, নবাগত পাশ্চাত্য-সভ্যতা হইতে প্রাপ্ত; ইহা আমাদের দেশে একেবারেই নূতন। অতএব এক্ষেত্রে অনুকরণ অপরিহার্য্য। প্রচলিত বঙ্গীয় স্বরলিপি, পাশ্চাত্য (tonic solfa) টোনিক্ সল্ফা স্বরলিপির অনুকরণে গ্রথিত। অতএব, মৌলিকতা (originality) নষ্ট হওয়ার ধুয়া ধরিয়া একটা আপত্তি উত্থাপন করা কতদূর ন্যায়-সঙ্গত, বলিতে পারি না। যাহা আমাদের নাই—এবং যাহা গৃহীত ও প্রচলিত হইলে প্রভূত কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা—সেই বস্তু কেবল বৈদেশিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা কি বিচক্ষণতার কার্য্য ? পদব্রজে গমনাদি কঠোর-উপায় ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত লৌহযানের আশ্রয়-গ্রহণ যদি শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে এই তথাকথিত মৌলিকতার অছিলায় বহুবিজ্ঞজন-সম্মত কল্যাণপ্রদ প্রথাগ্রহণে আপত্তি হইবে কেন ? আর এক কথা—আমরা চিরকালই বিভিন্ন জাতি হইতে তাহাদের প্রচলিত নূতন ভাব ও কার্য্যাবলী আমাদের উপ-যোগী করিয়া লইয়া চলিয়া আসিতেছি। অতএব পাশ্চাত্য-সভ্যতা-প্রসূত নূতন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট "সাঙ্কেতিক স্বরলিপি" অনুকরণ করিতে লজ্জাবোধ করা যে আমাদের পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নহে, একথা সচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। কোন কোনও স্থলে উদার-অনুকরণ যে মহাপ্রাণতার পরিচায়ক, ইহা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

এই প্রসঙ্গে সঙ্গীতাচার্য্য ৺কৃষ্ণধন বাবুর মত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না ;—"অনেকে আবার এরূপ তর্ক করেন যে, য়ুরোপীয় স্বরলিপি বিজাতীয়, তাহা অবলম্বনে হিন্দুসঙ্গীতের জাতিগৌরব (nationality) লোপ পাইবে। ইহা যে কেবল ভ্রমাত্মক বাগাড়ম্বর মাত্র, তাহা কে না স্বীকার করিবেন ?—আমাদের দেশে কোন কালেই সঙ্গীত-লিখনের প্রথা নাই। সুতরাং তাহার অক্ষরাদিও নাই, এবং সঙ্গীত যে সঙ্কেত-দ্বারা লিখা যাইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে আমাদের বিশ্বাসও ছিল না।—ইদানীং য়ুরোপের সঙ্গীতগ্রন্থাদি দেখিয়াই জানিয়াছি যে, সঙ্গীত লিখা যাইতে পারে, এবং লিখন-প্রথার উপকার ও আবশ্যকতাও বুঝিয়াছি। তখন সেই য়ুরোপীয় প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ না করিলে কি আমাদের অভাব শীঘ্র দূরিত হইতে পারিবে ? আমরা অন্যান্য বিদ্যাবিষয়ে ও তত্ত্বদ্বিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থাদি রচনা-বিষয়ে কি অবিকল য়ুরোপীয় প্রণালী অবলম্বন করিতেছি না ? য়ুরোপীয় ভাষার কমা, সেমিকোলন, ইত্যাদি, টীকা সম্বন্ধীয় অ্যাষ্টারিস্ক্, ড্যাগার প্রভৃতি, এবং গণিতশাস্ত্রের ব্যবহার্য্য যাবতীয় সাঙ্কেতিক-চিহ্ন বঙ্গ-ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে ; তাহাতে কি বঙ্গভাষার জাতিগৌরব নষ্ট হইয়াছে ?"

সঙ্গীতবিদ্যায় যথার্থ মৌলিকতার পরিচয় দিতে হইলে, নব নব সুললিত সুর বা রাগিণীর সৃষ্টি, কিংবা প্রাচীন রাগাবলম্বনে সুমিষ্ট 'উপজ' উদ্ভাবন, অথবা ভারতীয় রাগাদির সহিত যথাযোগ্য 'হারমণি' (ঐক্যতান)-সংযোজন দ্বারা, তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। কেবল নূতন নূতন

ধরণের স্বরলিপি-সৃষ্টিই সঙ্গীতে মৌলিকতার পরিচায়ক নহে।

সরল ও বক্র রেখার সাহায্য পাইলে, অনেকেই নানা রকমের অক্ষর অনায়াসেই সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব আর এই বৃথা কাজে সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে দেশের মঙ্গল সাধিত হয়, তৎপ্রতি সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত।

আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে,—অস্মদ্দেশীয় সঙ্গীতাচার্য্যগণের উপদেশ ও সমবেত-চেষ্টায় সর্ব্বদেশ-সমাদৃত এই "সাঙ্কেতিক স্বরলিপি"তে আমাদের হিন্দু-সঙ্গীত লিপিবদ্ধ হইয়া, অন্যান্য সুদূর সভ্যদেশে উহার গৌরব প্রচারিত হউক! আর, সভ্যজগৎ হইতে সঙ্গীত-বিষয়ক নূতন ভাবাদি আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়া, শিক্ষার্থিগণের শিক্ষার পথ সুগম, এবং প্রত্যেক নীরস-গৃহ শ্রীবাণীর বীণা-ঝঙ্কারে সরস, হইয়া উঠুক। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে দেশে "সাঙ্কেতিক স্বরলিপি" সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তিত করিয়া দেশীয় সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। একটা নূতন-কিছু করার মোহ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার প্রদর্শিত-মার্গ অবলম্বন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। পরিশেষে, আমরা আচার্য্য মহাশয়ের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব;—"ইংলণ্ডের কেহ কেহ (Tonic Solfa) 'টোনিক্ সল্‌ফা'-প্রণালীকে সহজ বলিয়া থাকেন। কিন্তু 'কন্‌টিনেন্‌ট্যাল্', অর্থাৎ য়ুরোপাদির, জাতিরা তাহা স্বীকার করেন না। ঐ প্রণালী কণ্ঠভিন্ন অন্য যন্ত্রের নিতান্ত অনুপযোগী। হিন্দুসঙ্গীতে কখনই খরজ পরিবর্ত্তনের রীতি নাই, অতএব আমাদের ব্যবহারের নিমিত্ত টোনিক্-সল্‌ফা-প্রণালী অপেক্ষা য়ুরোপীয় প্রাচীন সাঙ্কেতিক-প্রণালীর উপযোগিতা অধিক।"

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া।

কালীয়-দমন

গরজে ক্রুদ্ধ ভীম-অজগর আস্ফালি' সহস্র-ফণা,
গরলের সাথে ঝলকে ঝলকে উগারি' অনল-কণা!
বিষমাখা জলে শতযুগ ধরি' বিষধর করে বাস,
সলিলের প্রতি অণুতে অণুতে মিশায়ে গরল-শ্বাস!
আলোড়িছে কেবা আজি হেনরূপে অস্পর্শ্য সেই নীর!—
ক্রুদ্ধ-কালীয়-শির-সহ কাঁপে হ্রদতল সুগভীর!
গরজি' ধাইল ভীম-অজগর তুলিয়া সহস্র-ফণা,
গরলের সাথে ঝলকে ঝলকে উগারি' অনল-কণা!

আকাশে পাতালে পবনে আজিকে বেঁধেছে একি গো রণ!
ভুবন ভরিয়া ফেলেছে সে ভীম-অজগর-গরজন!
বিষে-দহিবারে সকল বিশ্ব, ফেলিছে সে মহাশ্বাস;
জগতেরে ঘিরে পাকে পাকে ঘন-জড়াইছে নাগপাশ!
দংশন-বেগে গরলের সাথে ছুটিছে অনল-কণা,
শুধু মাঝে মাঝে নিষ্ফল-শ্রমে আনত ক্লান্ত-ফণা!
শ্লথ নাগপাশ, বহে ঘন-শ্বাস, বিষহীন দংশন,
তবুও ভুবন ভরিবারে চায় নিষ্ফল-গরজন।

এ বিষম রণে বিষ-প্রহরণে কে হ'ল গো আজ জয়ী;
কোথা সে অন্ধ ভীম-আলোড়ন—অদম্য সে অহি কই?

শতেক যুগের বিষ-নীল-জল সুর-মন্দাকিনী-ধারা
সুধাস্বাদ লভি' অমৃতগন্ধে দিক্ করে মাতোয়ারা।
সহস্রদল-কমল যে ওই ফুটিয়াছে মাঝে তা'র,
প্রতি দলে দলে আঁকা পড়িয়াছে চরণ-চিহ্ন কা'র।
পরশন-গুণ কা'র সে এমন হেরে' অহি হ'ল জয়ী?
প্রতি ফণা তা'র দুলায়ে ফুলায়ে সেই কি নাচিছে ওই?

শতেক-শীর্ষ ঊর্দ্ধে তুলিয়া নাচে সে মত্ত-ফণী!
সুধা বিষজলে, দমনের ছলে কে হ'য়েছে শিরোমণি!
বিষমাখা তা'র শতেক-বৃত্ত, পরশি' রাতুল-পদ,
অমল-কোমল কমলের দল, অহি হ'ল কোকনদ!
এ খেলারি তরে আলোড়ি সে হ্রদ বাহির ক'রেছ তা'রে,
বিষদন্তে তা'র অমৃত দানিতে ভিজাইলে সুধাধারে!
অন্ধ-দর্প দমিয়া দর্প-দমন-ও-পদভরে
নাচগো আমার প্রিয়তম, তা'র প্রত্যেক ফণা'পরে!
প্রতি চরণের তাড়নে অধীর নাচুক মত্ত-ফণী,
এ দণ্ড তা'র মাথার মাণিক,—তুমি যাহে শিরোমণি!

শ্রীনিরুপমা দেবী।

হুণ্ড্রু-প্রপাত

প্রকৃতির লীলানিকেতন পার্ব্বত্যপ্রদেশ ছোটনাগপুরে যতগুলি নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, তাহার মধ্যে 'হুণ্ড্রু-প্রপাত', বা স্থানীয় ভাষায় 'হুণ্ড্রুঘাগ'ই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতে যতগুলি প্রসিদ্ধ জল-প্রপাত আছে, হুণ্ড্রুঘাগ তাহাদের অন্যতম। বহুদিন যাবৎ ছোটনাগপুর লোক-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত ছিল; এখন এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও জল-হাওয়ার কথা শুনিয়া অনেকেই এখানে বেড়াইতে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য ও অন্যান্য ভ্রমণকারীর সুবিধার জন্য, অদ্য আমরা এই জল-প্রপাতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলাম।

রাঁচি, ছোটনাগপুরের প্রধান নগর। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের অনুগ্রহে এখন রাঁচি অনেকেরই নিকট পরিচিত;—অনেকেই এখন ইহার অনুপম স্বাস্থ্য-সম্ভোগাশায় এখানে আসিতেছেন। এই নগরের ১১ মাইল দূরে 'নয়াগড়ি' নামক একটি গ্রাম আছে; ইহার এক মাইল দূরে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের লোহারডাগা-লাইন চলিয়া গিয়াছে। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি স্বাভাবিক প্রস্রবণ হইতে 'সুবর্ণরেখা' নদীর উৎপত্তি; সুবর্ণরেখা প্রাচীনকালে 'কপিশা' নামে খ্যাত ছিল, পুরাণে সুবর্ণরেখা নামও পাওয়া যায়। সুবর্ণরেখা কালিদাসের রঘুবংশে কপিশা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ক্ষীণকায়া সুবর্ণরেখা অন্য কোন নদীর শাখা বা উপনদী নহে।—ইহা আপন মনে চলিতে চলিতে উড়িষ্যার পাদদেশে সমুদ্রের সহিত মিলিয়াছে। যেস্থানে সুবর্ণরেখা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেখানে একটি বন্দর ছিল; এখন কিন্তু উড়িষ্যার সে বন্দর বহুকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুবর্ণরেখা ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য নদী। বর্ষার সময় ইহার গৌরব দেখা যায়; অন্য সময়ে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, ইহা

হুণ্ড্রুর পথে

"রবিপীতজলা", বালুকাময়ী, শুষ্কহৃদয়া হইয়া থাকে। সুবর্ণরেখা, রাঁচি ও হাজারিবাগ এবং রাঁচি ও মানভুম জেলার প্রাকৃতিক সীমা-রেখা; অতএব এক হিসাবে ইহাকে ছোটনাগপুরের অন্যতম প্রধান নদী বলিলেও বলা যায়। বিশালকায় প্রবলপ্রতাপ দামোদর নদও ছোটনাগপুরে

জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এই জন্য সুবর্ণরেখাকে সর্ব্বপ্রধান বলিতে সঙ্কুচিত হইলাম। রাঁচি জেলার মধ্য দিয়া এই নদী যতদূর প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পার্ব্বত্যভূমি; এইজন্য অনেকস্থলেই উহা উপলবাহিনী,—নদীবক্ষ প্রস্তরখচিত। হুণ্ড্রুঘাগে নদীবক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তরসঙ্কুল; ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর রাশির উপর দিয়া নদীর সংক্ষুব্ধ-গতি বড়ই মনোহারিণী। হুণ্ড্রুঘাগ সুবর্ণরেখারই একটি প্রপাত।

অতএব, যাহাতে এখানে রাত্রিবাস করিতে না হয়, এমন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সুতরাং, রাত্রি থাকিতে থাকিতে রাঁচি হইতে 'রিক্‌শ' চড়িয়া রওনা হইয়া, দেখিয়া শুনিয়া পর রাত্রেই রাঁচিতে প্রত্যাবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। 'রিক্‌শ' করিয়া যাইতে হইলে 'আন্‌গাড়া' ও 'গেতল্‌সুদ' নামক দুইটি গ্রাম দিয়া যাইতে হয়। যাঁহারা রিকৃশ না পাইবেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে গুরুভার 'পুশ্‌পুশে' যাইতে বাধ্য হইবেন, তাঁহাদের নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করাই সুবিধাজনক;—রাঁচি

হুণ্ড্রুর পথে

'কোল' ভাষায় জল-প্রপাতকে 'ঘাগ' বলে এবং যে গ্রামে সুবর্ণরেখার এই প্রপাত বিদ্যমান, সেই গণ্ডগ্রামটির নাম 'হুণ্ড্রু', সেই জন্যই এই প্রপাতের নাম 'হুণ্ড্রুঘাগ'। রাঁচি হইতেই হুণ্ড্রুঘাগে যাওয়া সুবিধাজনক; রাঁচি হইতে হুণ্ড্রু ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। যাঁহারা রাঁচিতে আসিয়া হুণ্ড্রুঘাগ দেখিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য এইস্থলে হুণ্ড্রুঘাগে যাতায়াতের উপায় এবং সুবিধা-অসুবিধা বিবৃত করিতেছি। বলিয়া রাখা ভাল যে, হুণ্ড্রু একটি পার্ব্বত্যগ্রাম এবং যাত্রীদিগের পক্ষে এখানে রাত্রি-যাপন করা এককালে নিরাপদ নহে; কারণ এখানে নিশা-যাপন করিলে জঙ্গলীজ্বরে আক্রান্ত হইবার বিশেষ ভয় থাকে।

হইতে প্রাতভোজন সমাপ্ত করিয়া খাদ্যাদি সঙ্গে লইয়া রওনা হইয়া, গেতল্‌সুদ গ্রামে রাত্রিবাস করিবেন; পরে, রাত্রি থাকিতে থাকিতেই সেখান হইতে যাত্রা করিয়া প্রাতঃকালে হুণ্ড্রুঘাগে উপস্থিত হইবেন। সেখানে পঁহুছিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে উপর-হইতে প্রপাতের দৃশ্য দেখিয়া লইবেন। অনন্তর, জলযোগান্তে রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া নামিয়া যাইবেন, এবং প্রপাতের পাদদেশ হইতে দর্শনীয় দৃশ্যসমূহ দেখিয়া উপরে উঠিয়া আসিবেন। অবশেষে, আহার ও বিশ্রামাদি করিয়া, পুনরায় পুশ্‌পুশে চড়িয়া গেতল্‌সুদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এক্ষণে ইচ্ছামত নিশাকালটা এই গ্রামে অতিবাহিত করিয়া, অথবা বরাবর চলিয়া আসিয়া,

রাঁচিতে পঁহুছিতে পারেন। গেতল্‌সুদ হইতে রাঁচি পর্য্যন্ত ঘোড়ার ডাকের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, স্বচ্ছন্দে সেই রাত্রেই রাঁচি পঁহুছিতে পারা যায়; কিন্তু অনেক সময় সে সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। পুশ্‌পুশ্‌ এদেশের নিজস্ব যান; এক সময়ে ইহাই রাঁচি-যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল। ইহা মনুষ্য-বাহিত পশ্চিমের 'ঝাম্পানি'র মত, এক শ্রেণীর দ্বিচক্রযান; ইহার ভিতরে দুইজন ও উপরে একজন, জিনিস-পত্র লইয়া, বেশ যাইতে পারে; এজন্য ইহাই এতদঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক যান বলিলেও চলে। অবশ্য যাঁহারা পুশ্‌পুশে চড়িতে নারাজ, তাঁহারা মাথা-খোলা টমটমের চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু তাহাও এ অঞ্চলে সুদুর্লভ। দর্শনেচ্ছুদিগের সঙ্গে একজন পাচক থাকিলে সুবিধা হয়। হুণ্ডু গ্রামের এক মাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সেই পর্য্যন্ত পুশ্‌পুশ্‌ যাইতে পারে। ইহার পরেই একটি ক্ষুদ্রকায়া পার্ব্বত্য-তটিনী, সেটি পার হইয়া ঘাগ অর্থাৎ প্রপাত। এই পথটুকু হাঁটিয়া যাইতে হয়,—তাহাতে বিশেষ কষ্ট নাই। হুণ্ডু ঘাগে যাইবার ইহাই সহজ উপায়। এতদ্ব্যতীত, যাঁহারা বাই-সাইকেলে চড়িতে জানেন, তাঁহারা তাহাতেই যাইতে পারেন; কিন্তু তাহাও তেমন সুবিধাজনক নহে।

আমরা যে পথের উল্লেখ করিলাম, ইহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা সুগম, কেবল তাহাই নহে—এ পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও অতি রমণীয়। গেতল্‌সুদের পর হইতেই দুই পার্শ্বে অরণ্যানী এবং গিরিশ্রেণী—তাহার মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ চলিয়া গিয়াছে—সে এক বিচিত্র গিরিপথ! উষার অস্ফুট আলোকে পারিপার্শ্বিক প্রসুপ্ত দৃশ্যাবলী যেন চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়; তাহার পর সবিতার প্রথম-কিরণস্পর্শে উদ্বোধিত—পাখীর কোলাহলে মুখরিত—হইয়া যখন বনস্থলী বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গল-সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে, তখন প্রাণে যেন একটি অভিনব—অনাবিল আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া যায়!—মনে হয় যেন, অরণ্যের এমনই আনন্দোদ্বেলিত নির্জ্জনতায় হৃদয় পরিপুষ্ট করিয়া তপস্যানিরত আর্য্যঋষিগণ ওই পাখীর গানের অনুকরণেই বেদগানের প্রথম-সৃষ্টি করিয়া, সমগ্র-ভারতে এক অনির্ব্বচনীয় অমৃত-লহরী প্রবাহিত করিয়াছিলেন! যে সময় কাণের ভিতর দিয়া এই অনিন্দনীয় প্রভাতী-রাগিণী মর্ম্মের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, ঠিক সেই সময়ে চক্ষের সম্মুখে একটি মনোমোহন নয়নাভিরাম দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়। যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন নগরের দৃশ্য দেখিতে অভ্যস্ত তাঁহারা একবার না দেখিলে এ দৃশ্য কল্পনা করিতে

উপত্যকাবাহী সুবর্ণরেখা

পারিবেন না। ধীরে ধীরে প্রকৃতি-সুন্দরীর লজ্জাবস্ত্র-উন্মোচন—কাননকুন্তলা ধরণীর সলজ্জ-জাগরণ—সৌন্দর্য্যের কাম্যকাননে সে যে কি অপূর্ব্ব-সুন্দর লীলা, না দেখিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। যখন তাহার হৃদয় হইতে অন্ধকার-যবনিকা সরিয়া গিয়াছে, যখন তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে, চোখে মুখে বুকে আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, —যেন সে ব্রীড়ানম্রবদন তুলিয়া মৃদুমন্দসঞ্চারিত সমীরণের কোমল-নিঃস্বনে তাহার অদৃশ্য বঁধুর কানে কানে অনুচ্চস্বরে

হুণ্ড্রুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সুবর্ণরেখা

বলিতেছে, "যামিনী না-যেতে জাগালে না কেন!—বেলা হ'ল মরি লাজে"।—ক্রমে ক্রমে তরুরাজিবিশোভিত শৈল-মালা সূর্য্যকিরণ-রঞ্জিত হইয়া উঠিয়া নীল-আকাশের গাত্রে যেন উজ্জ্বল বর্ণ-বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়—চারি-দিকে গাছের পাতায় পাতায় নবীন-তপনের হৈম-প্রভা প্রতিফলিত হইতে থাকে!—কচিৎবা জনসমাগমসন্ত্রস্তা চকিত-হরিণী চঞ্চলদৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে চলিয়া যায়।—এই অরণ্য হিংস্রপশুবিহীন নহে, কিন্তু এমন মধুময় প্রভাতে তাহাদের কোন চিহ্নই দেখা যায় না।—যাহা দেখা যায়, তাহাতে একটি শান্তির ছায়া হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। এহেন সুন্দর-শোভন পথ অতিক্রম করিয়া হুণ্ড্রুঘাগে উপস্থিত হইতে হয়।

বর্ষার অব্যবহিত পরে হুণ্ড্রুঘাগে যাওয়াই প্রশস্ত। সে সময় বর্ষণ-জন্য পথকষ্টও থাকে না, অথচ নদীর বক্ষে জলের বেগও থাকে। বর্ষায় নদীর কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রপাতের ধারাকে মনোরম করিয়া তুলে। কিন্তু বর্ষা থাকিতে প্রপাতে যাওয়া নিতান্তই অসুবিধাজনক। সে সময়ে কেবল যে পথকষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহাই নহে—জঙ্গলী-জ্বরের আক্রমণও একপ্রকার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু যাঁহারা এই সকল বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া বর্ষাকালে প্রপাতটি দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ জন্মে সে বিরাট্-দৃশ্য ভুলিতে পারিবেন না। যে সময়েই যাওয়া হউক, উপরি-উক্ত পথই সকল সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। অপর যে পথটি আছে, তাহা নিতান্তই দুর্গম। রাঁচির লাইনে 'জোনা' বলিয়া যে ষ্টেশন আছে, সেইখানে নামিয়া পদব্রজে আট মাইল পাহাড় জঙ্গল ভাঙ্গিয়া গেলে হুণ্ড্রুঘাগে যাওয়া যায়; কিন্তু এ পথে চলা বড়ই কষ্টকর। হাজারিবাগ জেলার 'গোলা' নামক গ্রাম অতিক্রম করিয়া হুণ্ড্রুঘাগে আসা যায়, কিন্তু

াহারা রাঁচি হইতে যাইবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পথও .ত সুবিধাজনক নহে। অথচ, বোধ হয়, এই পথ কালে কলকেই অবলম্বন করিতে হইবে; কারণ নদীর গতি যে াবে এখন চলিতেছে, তাহাতে কালে উত্তরদিকের শৈলো- রি না উঠিলে প্রপাতটি ভালরূপে দেখা যাইবে না। ইবার প্রপাতটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব :—

ভারতবর্ষের জলপ্রপাতগুলির মধ্যে তিনটিই প্রধান; ন্মধ্যে প্রথম, গায়রসাপা; দ্বিতীয় পাইকারা; তৃতীয় হুণ্ড্রু। চ্চতায় ও জলমোক্ষণের পরিমাণে, হুণ্ড্রুঘাগ ঐ দুই জল- প্রপাতের অব্যবহিত নিম্নেই স্থান পাইতে পারে। ব্যাহত- প্রপাতগুলি (Broken falls) লইয়া ইহার উচ্চতা ৩২০ ীট্ অর্থাৎ নায়গারা-প্রপাতের ঠিক দ্বিগুণ; এবং কেবল- াত্র ইহার অব্যাহত-প্রপাত (Sheer drop) উচ্চে ০০ ফীট্। ইহার জলমোক্ষণের পরিমাণ (volume f water discharged) ঠিক জানা নাই। ইহার ড় পরিসর ২০ ফীটের বেশী হইবে না; কিন্তু বর্ষাকালে তদপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে জলের বগ ও পরিমাণও বাড়িয়া যায়।

সুবর্ণরেখা নদী রাঁচির উচ্চ উপত্যকা হইতে সহসা নিম্ন- ভূমিতে অবতরণ করায়, এই প্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। দীর দুই কূলে শৈলমালা, মধ্যদিয়া সুবর্ণরেখা প্রস্তররাশি অতিক্রম করিয়া কুলুকুলু নিনাদে প্রবাহিতা;—মনে হয় যেন, পার্ব্বতী যাইতে যাইতে হঠাৎ পদস্খলিতা হইয়া নীচে ড়িয়া গিয়াছেন; সে পতনে যেন তাঁহার অন্তস্তল হইতে াক চিরস্থায়ী গভীর আর্ত্তনাদ বাহির হইতেছে—চারিদিকের নরাজিনীলা-প্রকৃতি ভীতা স্তম্ভিতা হইয়া নীরবে এই মর্ম্ম- ভেদী দৃশ্য দেখিতেছে!—"স্ত্রী নদীবৎ" কলাপ ব্যাকরণের ই সূত্রটি এইখানে যেন বর্ণে বর্ণে সপ্রমাণ হইয়া যায়। পাতের পূর্ব্বে যেখানে সুবর্ণরেখাকে দেখা যায়, সেখানে হৃদয়েরই মত তাহার কখনও উচ্ছ্বাস, কখনও ব্রীড়া, খনও মান-অভিমান—তখন যৌবন-সুলভ মদ-গর্ব্ব যেন াহার সর্ব্বাঙ্গে ছাইয়া রহিয়াছে—মুখরার মত, রূপগর্ব্বিতার ত, মোহমত্তার মত যেন সে সকলকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কিয়া ডাকিয়া বলিতেছে—"দেখ দেখি, আমি কত সুন্দর! মার অঙ্গে অঙ্গে কি সুন্দর রূপের তরঙ্গ, আমার য়ে কত ভাবের লীলা!" যেন সে নিজের মনে, প্রাণের আবেগে আকুলকণ্ঠে গাহিয়া যাইতেছে, "আমার এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?" নারী-হৃদয়ের অন্তর্নিহিত রহস্যগুলি নদী-জল দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিল কে?

এইরূপে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া—উঠিয়া-পড়িয়া—বহুবাধা অতি- ক্রম করিয়া—কতকগুলি ক্ষুদ্র-প্রপাতের সৃষ্টি করিয়া— বিভ্রমময়ী নদী প্রপাতের মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পর

শরতে প্রপাত

যেন কঠিনহৃদয়-শৈলমালাকে পরাস্ত করিবার—তাহার নীরসতার, নির্ম্মমতার, প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে উত্তরদিকের উচ্চশৈল-বক্ষের উপর দিয়া হঠাৎ নীচের একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর আছাড়িয়া পড়িয়াছে। এই পর্য্যন্ত স্থানকে ব্যাহত-প্রপাত, বা Broken fall,বলা যায়। তাহার পর সেই ভগ্ন-বিক্ষিপ্ত জলরাশি চূর্ণ তুলাপুঞ্জের মত ধরণীর

বক্ষে নামিয়া আসিয়াছে। এই প্রপাতকেই প্রধান-প্রপাত, অর্থাৎ Sheer drop বা Principal cataract, বলা যায়; ইহার উচ্চতা ২০০ ফীট্। প্রথমে প্রপাতের উপর হইতে এই দৃশ্য দেখিতে হয়। এই স্থান হইতে যে নয়নাভিরাম দৃশ্যপট,—প্রকৃতির যে নব-সৌন্দর্য্য উন্মুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব! উপরে—দিগন্তব্যাপী নীলাম্বরশোভিত ভাস্বর আকাশ—অথবা, বর্ষায় "গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ" এবং নীলাম্বরের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণাম্বরধারী বিরাট্ নভঃস্থল! নীচে—যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর—নিবিড়-নিরন্ধ্র কানন—আর লতাগুল্ম-সমাকীর্ণ গিরিশ্রেণী! এখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য মনুষ্যের কল'-কুশলতার পরিচায়ক নহে—এখানে উদ্দাম-প্রকৃতির বন্যলীলাই দেখিতে পাওয়া যায়;—এখানকার মনুষ্যের প্রকৃতিও ইহারই অনুরূপ! সম্মুখে—প্রপাতের শ্বেতোচ্ছ্বাস, নিম্নে—বহুদূরোচ্চ এক সমরেখ প্রস্তরখণ্ডের (perpendicular rock) নিম্নে—প্রকাণ্ড "দহ", অর্থাৎ নদীর পতনবেগবিদীর্ণা ধরণীর বক্ষে একটি ক্ষুদ্র হ্রদ!—এখান হইতে নিম্নে, সেদিকে, দৃষ্টিপাত করিতে গেলে মাথা যেন ঘুরিয়া যায়! সেই হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া সুবর্ণরেখা—যেন তপস্যা-মানসে দুইপার্শ্বস্থ নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া ক্ষীণকায়া, গর্ব্বহীনা, শান্তহৃদয়া, গৈরিকবসনা ব্রহ্মচারিণীর মত—শিলার আশে পাশে—অন্তরালে ধীরে মন্থরগতিতে বহিয়া চলিয়াছে!—উপর হইতে মনে হয় যেন বনের বক্ষোপরি এক ছড়া সূক্ষ্ম কণক-হার পতিত রহিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পতনোত্থিতা সুবর্ণরেখার এই মূর্ত্তিই দেখা যায়,—তারপর সে বনান্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ষাকালে নদীর জল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রপাতের বিশালত্বও, অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। সহসা একবার বর্ষাস্ফীত প্রপাতের উদ্দামদৃশ্য দেখিবার কল্পনা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না।

সাতদিন পূর্ব্বে কএকদিন ধরিয়া অবিরাম বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে,—পথ দুর্গম, আশঙ্কার হেতুসকলও প্রবলভাবেই বর্ত্তমান, কাজেই অভিভাবকদের সম্মতি পাওয়া একরূপ অসম্ভব বলিয়াই জানিয়াছিলাম। সুতরাং আমরা আমাদের উদ্ধত মনকে সেনাপতিরূপে বরণ করিয়া—ওজর-আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া—মনে মনে আপনাদিগকে ব্যালাক্-লাভার লাইট্ ব্রিগেডের সেনানীপদে অভিষিক্ত করিয়া—যাওয়াই স্থির করিলাম। রাত্রে বস্ত্রাবাস, আহার্য্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া একখানি গোযান পাঠাইয়া দিলাম। পরদিবস সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে, ওয়াটারপ্রুফ জড়াইয়া ও মাথায় হ্যাট চড়াইয়া বাইসাইক্‌ল্ আরোহণে হুণ্ডুঘাগের পথে রওনা হইলাম। যদি সোজা পথে যাই, তাহা হইলে আমাদের তৎকালীন বিভ্রান্ত-হৃদয়বৃত্তির অবমাননা করা হয়; তাই আমরা ঠিক করিলাম যে, সুবর্ণরেখা পার হইয়া, 'সাবাইয়া' নামক গ্রামে এক বন্ধুর বাসায় রাত্রি-যাপন করিতে হইবে।—যাওয়া ঠিক হইয়া গেল, অথচ পূর্ব্বাহ্লে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল না। আমাদেরই মধ্যে একজন হইলেন পথপ্রদর্শক (guide)। আমরা অসীম উৎসাহে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলাম। সাবাইয়া গ্রাম, রাঁচি হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, উপরে দেখিলাম, "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং", চারিদিকে "বনভুবঃশ্যামা"—কিন্তু গন্তব্যস্থানের কোনও সন্ধান পাইলাম না! বুঝিলাম, বন্ধুবর পথ হারাইয়া আমাদিগকে বিপথে আনিয়া ফেলিয়াছেন!—আর সেকি পথ! খাল বিল এবং ধানক্ষেত—তাহারই উপর দিয়া বাইসাইক্‌ল্ বহন করিয়া কোনও ক্রমে যাইতে লাগিলাম। অন্ধকার গাঢ়তর হইতে লাগিল, বজ্রগর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল, কাল' আকাশ বিদ্যুৎস্ফুরিত-নেত্রে যেন আমাদের অসহায় অবস্থা দেখিতে লাগিল; শেষে যেন আমাদের নাকাল করিবারই উদ্দেশ্যে, মুষলধারে বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া বসিল! তখন আমাদের কষ্টের অবধি রহিল না। সেই দুর্যোগ-অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে সহসা এক দু-কূলপ্লাবিনী নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম—বুঝিলাম এই সুবর্ণরেখা, ইহা পার হইয়া আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে। এইখানে বলিয়া রাখি যে, নদী পার হইবার আর কোনও উপায় নাই—একমাত্র "দোলাতরণী", অর্থাৎ cradle ferry সাহায্যে এই নদী উত্তীর্ণ হইতে হয়। উহা যে কি, তাহা বুঝাইবার জন্য একখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। চিত্রখানি সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং বর্ষাকালে নদীর স্ফীত কলেবর ও উদ্দামগতির কিছুই এচিত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। নদীর দুইধারে দুইটি স্তম্ভ,

"তাহাতেই একটি মজবুত তার সংলগ্ন, সেই তারে দুইটি চক্র-সংযুক্ত দোলা (cradle) টাঙ্গান আছে ; তাহারই উপর বসিলে 'পুলি'র সাহায্যে নদীর এপার-ওপার করিতে হয়। সে যে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা, তাহা বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই—এই অন্ধকারে, ঘোর দুর্য্যোগে, 'ফেরি'তে পার হওয়া যে কিরূপ আশঙ্কাজনক, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারিবে ?—কিন্তু এখন সেই cradle ferryই বা কোথায় ?—বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, যেখানে আসিয়া পড়িয়াছি, সেখানে পারের খেয়া-ঘাট

আমাদের কাছে আসিল। তাহারা আমাদিগকে জঙ্গলের মধ্যদিয়া পথ দেখাইয়া খেয়াঘাটে, অর্থাৎ "দোলা-তরণী"র ঘাটে লইয়া গেল, এবং আমরা দুইজন দুইজন করিয়া আকাশের উপর দিয়া প্রাণ হাতে করিয়া নদী পার হইলাম। যখন আমরা সাবাইয়ার বন্ধুর আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম, তখন নূতন প্রাণ পাইলাম ; সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া আবার আনন্দে মাতিলাম—সে রাত্রে গীতবাদ্যাদি আমোদে বন্ধুর নির্জ্জন-ভবনটিকে মুখরিত করিয়া তুলিলাম।

প্রত্যূষে যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।
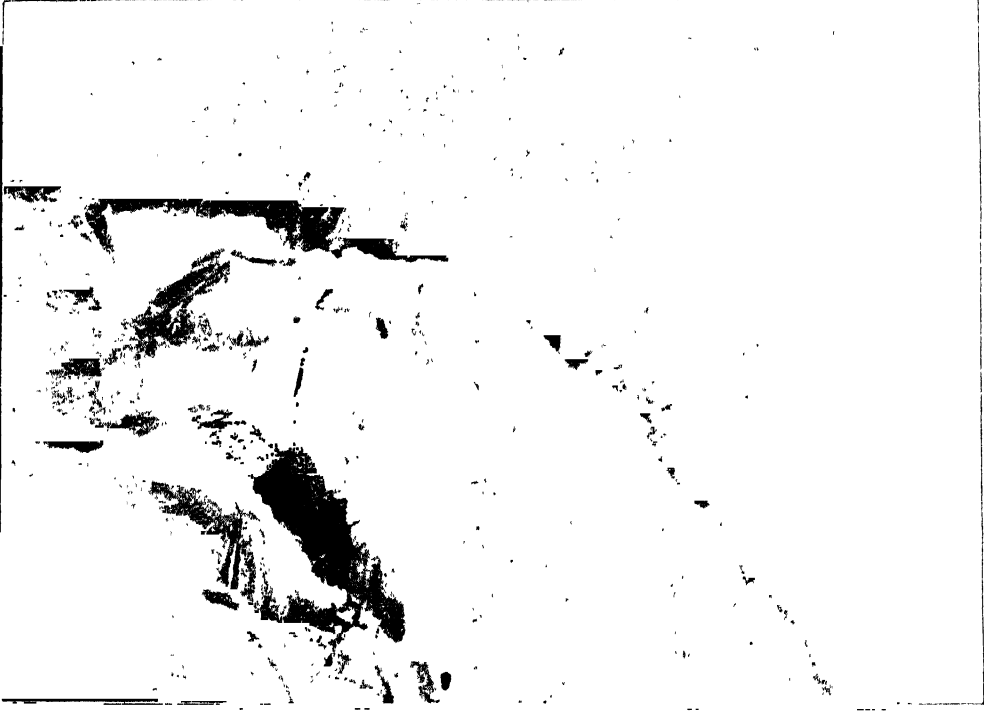
বর্ষায় প্রপাত

নাই। ভাবিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া সেখানে যাওয়া যায় ? হঠাৎ আমাদের গাইড্ মহাশয়ের মস্তিষ্কে একটা বুদ্ধি খেলিল—তিনি তারস্বরে আমাদের সাবাইয়ার বন্ধুটির নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং আমাদিগকেও সেইরূপ করিতে বলিলেন। নদীর এপারে দাঁড়াইয়া আমরা ডাকাতপড়ার মত চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিলাম—ফলও অচিরে ফলিল। অল্পপরে, ওপার হইতে বন্ধুর স্বর শুনিতে পাইলাম—তিনি আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন। আশায় উৎফুল্ল হইয়া, ভিজিতে ভিজিতে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে, চারিজন লোক আলোকহস্তে

আবার সেই দোলাতরণীতে নদী পার হইয়া বাইসাইকল্ বহিয়া পথহাঁটিতে—কাদা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলাম। চলিতে চলিতে দেখি, একস্থানে আমাদের প্রেরিত গোশকট পঙ্কে নিবদ্ধ রহিয়াছে ; সকলে মিলিয়া তাহাকে উদ্ধার করা গেল। এইরূপে, নাকালের একশেষ হইয়া, হুণ্ডু ঘাগের একমাইল দূরবর্ত্তী সেই ক্ষুদ্রতটিনী-তীরস্থ 'বুটুগোড়া' নামক গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই খানেই তাঁবু ফেলিয়া আমাদের রাত্রিবাস হইবে ; কএকজন তাহারই সুবন্দোবস্ত করিতে রত হইলেন। আমরা কএকজন কিন্তু 'ধুল-পায়' প্রপাত-দর্শনের লোভ এড়াইতে পারিলাম না।

যখন প্রপাতের দৃশ্য নয়নগোচর হইল, তখন বুঝিলাম যে সকল কষ্ট সার্থক হইয়াছে!—যেন কোন্ মন্ত্রবলে শরীর হইতে সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া গেল। তখন মেঘ কাটিয়া গিয়া, রৌদ্র উঠিয়াছে; বর্ষায় ক্রন্দনশীলা বনদেবী যেন হাস্যোজ্জ্বলা,—চতুষ্পার্শ্বের শৈলগুলি যেন স্নানবিধৌত,—বৃক্ষসকল ফলফুলে হাস্যমুখী। ক্ষুদ্র গ্রাম-সিক্ত; অতিথি অভ্যাগতের সৎকার করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত—বসিবার স্থানটুকু দিবারও তাহার ক্ষমতা নাই। আমাদের মহাশয় সরকার বাহাদুর যদি এইখানে একটি ডাকবাংলা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহা হইলে দর্শকগণের বড় সুবিধা হয়। এখানে একটি ক্ষুদ্র বাংলার ধ্বংসাবশেষ

দেখা যায়—শুনিতে পাই কোনও এক ইংরেজ নীরব-কবি "মধুচন্দ্রমা" (Honeymoon) যাপন করিবার জন্য এই বাংলা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

কি বিশাল, কি ভীষণ, কি উজ্জ্বল-মধুর এই দৃশ্য!—এদৃশ্য দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়—সংসারের ক্ষুদ্রতা—দীনতা ভুলিয়া যাইতে হয়, এ বিরাট্ দৃশ্য যেন সেই বিরাট্ পুরুষেরই অভিব্যক্তি!

আমরা ইতোপূর্ব্বে হুড্রুঘাগের অল্পসময়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি; বর্ত্তমান অবস্থা কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত। জলধারা এখন-প্রচণ্ড উল্লাসে ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহারা যেন উৎকট উন্মাদগ্রস্ত; পতন-জনিত একটা উদ্দাম আবেগে—অনিবার্য্য আকর্ষণে যেন তাহাদের হৃদয় আকুলিত। ইহারা এখন কুল-বাধা-বিপত্তি কিছুই মানিতে চাহে না। সুবর্ণরেখা যেন পৃথিবী হইতে লালসার তীব্রপঙ্ক নিজের অঙ্গে মাখিয়া—যৌবনে যোগিনী সাজিয়া—চণ্ডীদাসের রাধিকার মত, জগৎ যাহাকে পতন বলে তাহাকেই বরণ করিয়া লইবার জন্য, কোন্ অজ্ঞাত নিয়তির টানে গভীর আবর্ত্তের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে!—জলে যেন মর্ম্মান্তিক ক্রন্দন ফুটিয়া উঠিতেছে!—সে কুল কুল ধ্বনি আর নাই, সে রূপের উচ্ছ্বাস নাই—আছে কেবল প্রেমের ভীষণ-তরঙ্গ এবং কলঙ্ক-সাগরে ঝাঁপ দিবার আকুল-আকাঙ্ক্ষা!—চণ্ডীদাসের উন্মাদিনী শ্রীরাধার মত ইহাতেই যেন তাহার গর্ব্ব, ইহাতেই তাহার আনন্দ, ইহাতেই তাহার সার্থকতা! নদী যেন আজ তাহার সমস্ত আবেগ, সমস্ত বাসনা একত্রিত করিয়া, নিজ প্রেমপরিশুদ্ধ শুভ্র-হৃদয় ধরণীর বুকে ঢালিয়া দিতেছে—এ পতনেও আজ যেন সে গৌরবান্বিতা! প্রপাতের দৃশ্য এখন দ্বিগুণ-বর্দ্ধিত
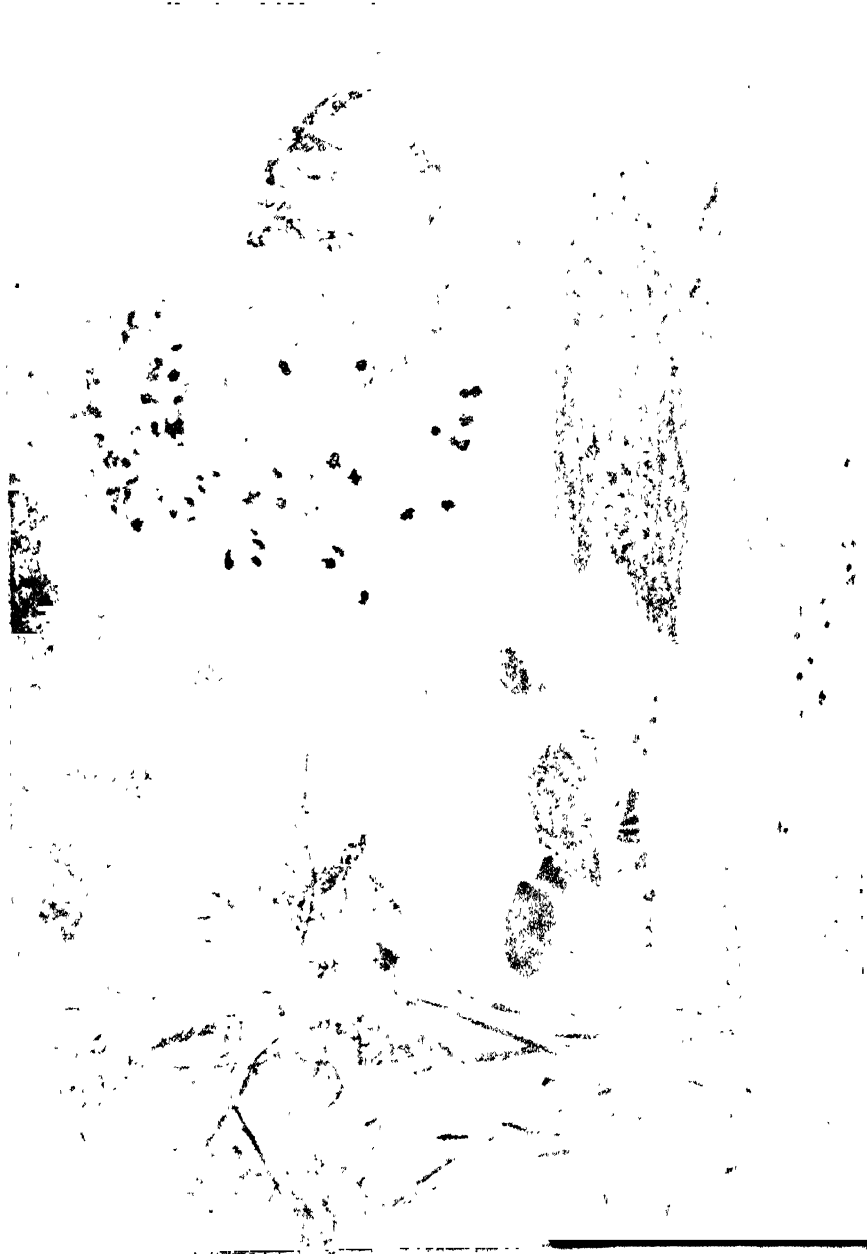
[স্যর্ জে, ই, মিলে, P.R.A. কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি হইতে।]

ওফেলিয়া

—সলিল-শয্যায়—

সমগ্র দৃশ্য ভীমকান্ত, ভীষণে মধুর! দেখিলে আনন্দে ও ভয়ে হৃদয় যেন স্তম্ভিত হইয়া যায়। জগন্নাথদেবের এ এক বিরাট্ কীর্ত্তিমন্দির!—তাই আমাদের 'ধূলপায়' দেখিতে আসা সার্থক হইয়াছে মনে করিলাম।

ফিরিয়া গিয়া, আহারাদি সমাপ্ত করিয়া, সদলবলে আবার প্রপাত দেখিতে আসিলাম। যাহা সুন্দর, তাহা একা দেখিয়া সুখ হয় না; তাই যখন সবসঙ্গীরা আসিয়া জুটিলেন, তখন যেন আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ নদীর জলের মত স্ফীত হইয়া উঠিল। উপর হইতে শুধু যে

প্রপাত-দৃশ্য।

(শ্রীযুত অমিয়কুমার মিত্র-কর্ত্তৃক-গৃহীত আলোক-চিত্র হইতে)

প্রপাতের বিশালতা দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম, তাহা নহে—হৃদয়ের মধ্যে তাহার যে বিরাট্-চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহারই ক্ষীণ প্রতিকৃতিস্বরূপ কতকগুলি আলোক-চিত্র তুলিয়া লইয়াছিলাম—পাঠক-পঠিকাগণকে এতৎসহ সেগুলি উপহার দিলাম। তাহার পর, নীচে নামিয়া প্রধান প্রপাতটির চিত্র লইবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সেখানে এত শীকর-বৃষ্টি, যে আমাদিগকে দূরে সরিয়া যাইতে হইল—প্রপাত তাহার গুপ্ত মর্ম্মকথা কাহাকেও বুঝি জানাইতে চাহেনা—তাহার উদ্দাম উন্মাদিনী-মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে চাহে না—তাই নিকটে যাইতে দিল না। প্রপাতের অবিশ্রান্ত জলকণা-বর্ষণ আমাদিগকে এতদূরে সরাইয়া দিল যে, সেখান হইতে কিছুতেই মনোমত ছবি লইতে পারিলাম না—সেই জলকণা এমন ভাবে বর্ষণ করিতেছিল যে, তাহার ও আমাদের মধ্যে যেন সে একটি কুজ্ঝটিকার ব্যবধান রচনা করিয়া, তাহার ভীষণগম্ভীর মূর্ত্তিখানি আমাদের কৌতূহলী নয়নপথ হইতে অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল। সেই ধূম্রবৎ আবরণ ভেদ করিয়া আমার ক্যামেরা প্রপাতের প্রতিকৃতি-গ্রহণে অসমর্থ হইল।

এইরূপে আমাদের বহুকাল-পোষিত সাধ মিটাইয়া, হৃদয়ে একটা নূতন আনন্দ সঞ্চয় করিয়া, আমরা বস্ত্রাবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। সেদিন সেইখানেই রাত্রি-যাপন করিতে হইবে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল—চারিদিকের অরণ্যানী ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া গেল—আকাশে মেঘ দেখা দিল—তমসাবরণে প্রকৃতি কালী-মূর্ত্তি ধারণ করিল—কবির ভাষায় বলিতে গেলে,

"সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি—
ভীতবদনা পৃথিবী হেরিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি।"

দূরে প্রপাতের ভীম নিনাদ, মাথার উপর মেঘের গুরু-গর্জ্জন, আর তাঁবুর ভিতর আমাদের গীতবাদ্যলহরী—

এই তিনের সমবায়ে, মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতেছিল। কিন্তু আমাদের এ আনন্দোচ্ছ্বাস বড় বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—অরসিক মেঘ, বস্ত্রাবাস শিরে মুষলধারে বৃষ্টি ঢালিয়া দিয়া, অচিরে সব পণ্ড করিয়া দিল। ভয়ে অনিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া গেল, কারণ সে সময়ে হিংস্র-পশুর ভয় ছিল, এবং রাত্রেই সে আশঙ্কার কারণ বেশী।—সে কথা যাক্।

প্রভাতে আর একবার প্রপাতের চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখিয়া, আহার ও কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সোজা-পথে রাঁচি-অভিমুখে যাত্রা করা গেল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই আমরা রাঁচি পঁহুছিলাম। পথের কষ্ট মনে পড়িলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; কিন্তু এত কষ্ট করিয়া যে বিরাট্-দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না—চিরদিনের তরে তাহা হৃদয়পটে আঁকা থাকিবে। তাই, কবির সহিত একস্বুরে আমরাও বলি—"নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে"—"দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে"?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চন্দ্র।

তখন ও এখন

সে কুহক-স্বপ্ন সখি! প্রাণ-মন-হরা,
সে মোহিনী মায়াজাল আপনা-পাসরা,
সেই আধ-তন্দ্রা, আর আধ-জাগরণ,
চকিতে চোখেতে সেই শত-আলাপন,
সেই অধরের শত-অবেকত ভাষ,
ফুটি-ফুটি-ফোটেনা সে চোরা মৃদুহাস,
আকুল সে কেশদামে বকুলের হার,
দুদণ্ড বিরহে সেই তপ্ত অশ্রুধার,
দূরে যেতে শতবার ফিরে ফিরে চাওয়া,
ব্যথাদিতে শুধু চিতে আরো ব্যথা পাওয়া,
চোখে চোখে চেয়ে কভু-হাসি কভু-লাজ,
সবি ফুরাইয়া গেছে—আছে শুধু আজ
দিগন্ত-প্লাবিত-করা প্রেম-সিন্ধু স্থির—
ঊর্ম্মিহারা—নীরধারা—অনন্ত—গভীর!—
সব ফুরাইয়া গেছে ক্ষতি নাই তায়,
অটুট বন্ধন থাক্ তোমায়-আমায়।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।

অকালে দীপালী

কৃষ্ণ-সায়রের নীর উছলি' উজলি'
দীপালী,—না বাণীপদে হৃদি-রক্তাঞ্জলি!
পুলকিত বর্দ্ধমান পূজিছে ভারতী
ভাবে ঢুলু ঢুলু, করে মায়ের আরতি।
অতীত-ধাত্রীর ক্রোড় হ'তে ধীরে ধীরে
উলঙ্গ রূপের শিশু উঠিল কি ফিরে?
পুড়িছে আতস-বাজী—শুনি অলি গুঞ্জে,
আগুনের ফুলদল দোল-খেলে কুঞ্জে।
কৃষ্ণ-সায়রের নীর জ্বলি' হাসি' উঠে,
রাশি রাশি বহ্নিপুষ্প কাল' জলে ফুটে।
সলিলে অনলে এ কি অপূর্ব্ব মিতালী!
বাণী-পূজা,—না, এ দেখি অকালে দীপালী।
এর মাঝে জ্বলিতেছে মাতায়ে হৃদয়—
বিজয়ের অভিনব হৃদয়-বিজয়।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

রামেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন—"হিব্রুরা বাচিয়া গেল।

'চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথপাশে ;
যা'রা চলে যায়, কৃপাচক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে !'—

"কবির এই কথাগুলি হিব্রুর সম্বন্ধে খাটে না। হিব্রু 'ষ্টেট্' নাই, হিব্রু 'নেশন্' নাই, কিন্তু হিব্রু জাতি (People) সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া আছে। একবার তাহার দেবতার সহিত তাহার সম্পর্কটা ভাবিয়া দেখুন দেখি। সে বলিতেছে,—'এ দেবতা আমার, আমিও এ দেবতার ; আমার দেবতার উপর অন্যের অধিকার নাই ; আমার দেবতা অন্য কাহাকেও দিব না ; আমার দেবতার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য যেসকল অনুষ্ঠানের বিধান হইয়াছে, সেগুলি একমাত্র আমাদেরই জাতীয় উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যেই হইয়াছে, অন্য কাহারও নহে ; সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আমরাই জাভের (Jahveh) একমাত্র Chosen people ; আমরাই তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আছি যে অন্য দেবতার উপাসককে নির্ম্মূল ও নষ্ট করিব ; আমাদের ধর্ম্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা নাই ; কেন আমরা বিধর্ম্মীদিগকে Chosen peopleএর অন্তর্ভুক্ত করিব ? ব্যাবিলন্ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে, আমাদের যুডায় ও ইস্রায়েলে বিদেশী Samaritanরা আমাদের অনুপস্থিতিকালে আমাদের আচারানুষ্ঠান গ্রহণ করিয়া, আমাদেরই মত Chosen people হইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিলাম। মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে তাহারা আমাদের সাহায্য করিতে চাহিলে, আমরা তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলাম। আমরা দুনিয়ায় কাহারও সহিত মিশিতে চাহিনা। একবার State হিসাবে, রাষ্ট্রীয় ভাবে, ঘন হইয়া জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, পারিলাম না ; প্রবল State হইয়া পরধর্ম্মের উচ্ছেদ করিতে পারিলাম না ; আমাদের মধ্যেই অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে আমাদের জাতীয়শক্তি পুষ্টিলাভ করিল না ; খণ্ডিত হইয়া গেল। হয় ত আমাদের জাতীয়ইতিহাসে গৃহপতিদিগের এইটিই সর্ব্বপ্রধান ভুল। আমাদের যিনি দেবতা, তিনিই রাজা ; জাভে (Jahveh) ব্যতীত অন্য রাজা আমাদের নাই ও হইতে পারে না ; কিন্তু বোধ হয় অন্যের দেখাদেখি তাঁহারা রাজা করিলেন। এই সকল রাজা জাভের অপমান করিয়া অন্যান্য দেবতার পূজাপ্রচলনের চেষ্টা করিলেন। জাভের কোপদৃষ্টি আমাদের উপর পতিত হইল। রাজাও গেল, রাজ্যও গেল। তদবধি আর আমরা রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা করি নাই ; আপন দেবতাকেই রাজা করিয়া বসিলাম। কিন্তু সেই দেবতার নিকট আমরা পদে পদে অপরাধ করিয়াছি তাঁহার আদেশবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে সম[illegible] হই নাই। আমাদের সমাজতন্ত্রের সামাজিক অনুষ্ঠানে[illegible] তৎপরতা লইয়া আমরা পরস্পর বিসংবাদ করিয়াছি আমরা বিধর্ম্মী গ্রীক্‌কে জাভের মন্দিরে প্রবেশ করিতে[illegible] দিয়াছি ; বিধর্ম্মী রোমান্‌কে গৃহবিবাদ মিটাইবার জ[illegible] আমাদের ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছি। সেই অপরাধের ফ[illegible] ফলিয়াছে ; জাভে আমাদিগকে ক্ষমা করেন নাই আমাদের দেশ হইতে আমরা বিতাড়িত হইয়াছি, আমাদে[illegible] দেবমন্দির বিচূর্ণিত হইয়াছে। আমাদেরই ভিতর হইতে[illegible] একটা নূতন সম্প্রদায় মাথা তুলিল ; তাহারা আমাদে[illegible] পুরাতন ধর্ম্ম (Law) মানিতে চাহিল না, হিব্রুকে[illegible] Chosen people বলিয়া স্বীকার করিল না, Jew [illegible] Gentileকে সমান আসন প্রদান করিল। তাহাদের[illegible] অনুবর্ত্তিগণ এখন পৃথিবীর অধিকারী ; আর আমরা এ[illegible] বড় পৃথিবীর মধ্যে Wandering Jews ! তাহাদের নে[illegible] বলিয়াছিলেন—আমিই ঈশ্বর। সেকথায় হিব্রু কাণে আ[illegible] দিয়াছিল। আজ তাঁহারই দলভুক্তেরা পৃথিবীর ঈশ্ব[illegible] আমাদের গত দুইসহস্র বৎসরের জাতীয়ইতিহাস [illegible] খ্রীষ্টানদেরই অত্যাচারকাহিনীতে পরিপূর্ণ। ইহুদির [illegible] লোপ করিতে ইহারা না করিয়াছে, এমন বর্ব্বরতা না[illegible] অথচ সময়ে অসময়ে রাজা, পোপ, সম্রাট্ আমাদের শরণা[illegible] হইয়াছেন। মুসলমানের হাত হইতে জেরুসালেম্ উদ্[illegible]

করিবার জন্য ক্রুসেডে অভিযান করিতে হইবে; টাকা চাই; রোমের পোপ আমাদের নিকট হাত পাতিলেন। ইটালির নগরগুলির সমৃদ্ধিরক্ষা আমরাই করিয়া আসিয়াছি। ইংলণ্ডের রাজারা বিপদে পড়িলে, আমাদের নিকট টাকা কর্জ লইতেন। খৃষ্টান্ প্রজাপুঞ্জের চোখ টাটাইল। প্রথম এড্ওয়ার্ড্ National King হইবার বাসনা করিলেন; প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য বিনাদোষে আমাদিগকে সাগরপারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। কত শত বৎসর পরে আমরা আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার আদেশ পাইলাম। খৃষ্টান্ য়ুরোপের নগরে নগরে রাজপথ দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া ভূয়োভূয়ঃ আবালবৃদ্ধবনিতা ইহুদির রক্তে কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। এখন আমাদের দেশ নাই, রাষ্ট্র নাই, দেবমন্দির নাই, এমন কি পুরোহিত পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু আমরা স্বধর্ম্মে মরণ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া আমাদের দেবতা, আমাদের আচারানুষ্ঠান, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সাধ্য আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছি। দূর সাইনে পর্ব্বতের শিখরদেশে যে অভয়বাণী ধ্বনিত হইয়া মুসার মুখ দিয়া প্রেরিত হইয়াছিল, আজ তিনসহস্র বৎসর পরেও আমরা তাহা স্বকর্ণে শুনিতে পাইতেছি। খৃষ্টান্ য়ুরোপের অতিকায় কলেবর তাহার মুষ্টিবন্ধনে আবদ্ধ ইহুদি জাতিকে দলিয়া পিষিয়া মারিয়া গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিতে যুগব্যাপিয়া চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু ইহুদি দলিত হয় নাই, পিষ্ট হয় নাই, আত্মরক্ষার জন্য লুকাইতে পর্য্যন্ত বাধ্য হয় নাই; সগর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সে জ্ঞানবিজ্ঞান, কাব্যকলা ও ঐশ্বর্য্যের সমৃদ্ধিতে য়ুরোপের খৃষ্টীয় জনসাধারণের বর্ব্বরতাকে বিদ্রূপ করিতেছে। * * যে দেবতাকে লইয়া সমগ্র মানবসমাজের সহিত আমাদের মর্ম্মান্তিক বিরোধ; যে দেবতা আমাদের, এবং আমরা যে দেবতার; যিনি আমাদিগকে বর ও অভয় দান করিয়াছেন; তাঁহার বাণী কি সফল হইবে না? তবে বসিয়া থাকা যাক্ তাঁহার বাণীর সাফল্যের প্রতীক্ষায়; কর্ম্ম করা যাক্ তাঁহার মহিমার প্রতিষ্ঠাকল্পে; ধৈর্য্যরক্ষা করিয়া পথ চাহিয়া থাকা যাক্ কবে মেশায়া (Messiah) আসিবেন! তিনি আসিবেন; কবে আসিবেন জানি না; নাই বা জানিলাম; তিনি আসিবামাত্রই তাঁহার Chosen peopleকে চিনিয়া লইতে পারিবেন; ইস্রায়েলের সন্তানদিগের ধমনীতে হিব্রুরক্ত নিষ্কলুষভাবে প্রবাহিত হইতে থাকুক;—বিধর্ম্মীদিগের রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও তাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে। দুইসহস্র বৎসর ধরিয়া বিপুল মানবসমাজের সহিত বিরোধ করিয়া যখন আমরা ধর্ম্মে কর্ম্মে আচারে অনুষ্ঠানে আমাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি তখন আমাদের ভাবনা কি? মেশায়া আসিবেন, আমাদিগকেই উপলক্ষ করিয়া জাভের মহিমা আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা যেন সেকার্য্যের অনুপযুক্ত না হই। আবার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে গিয়া একবার আমরা ভুল করিয়াছিলাম; ধর্ম্মের চেয়ে রাষ্ট্রকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম; সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। আমাদের জাতীয় জীবনের সেই বিচিত্র স্বপ্ন "এক রাজ্য, এক ধর্ম্ম, এক নারায়ণ," বিলীন হইয়া গেল! সে কি নিষ্ঠুর জাগরণ! রাজ্য গেল; ধর্ম্ম লইয়া দাঁড়াই কোথায়! মন্দির গেল; দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করি কোথায়! এত বড় বিরাট্ বিশ্বে আমাদের নিজের বলিয়া পরিচয় দিবার একতিল স্থান নাই; Ark of the Covenantকে স্থাপিত করি কোথায়? সেযে আমাদেরই দেবতার সঙ্গে আমাদের চুক্তির নিদর্শন; সেটিকে লইয়া ক্রূর বিধর্ম্মী * * আমাদের অক্ষম আক্ষেপে কি হইবে? সহসা সেই Ark of the Covenant অন্তর্হিত হইল! সেইদিন হইতে আমরা দিন গণিতেছি। জেরুসালেম্ গিয়াছে; নব জেরুসালেম্ প্রতিষ্ঠিত হইবে। একবার ভুল করিয়াছি এবার আর ভুল হইবে না। আমরা বাঁচিতে চাহি We mean to live,—we will to live,—আমরা বাঁচিবই। জাভের আদেশবাণীর নিকট আমরা আমাদের মতামত, আমাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য, সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছি। এই সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনই আমাদের ধর্ম্ম—আমাদের যজ্ঞ—এই যজ্ঞে আমরা আমাদিগকে আহুতি দিয়াছি। ফলে আমরা নবজীবন পাইবই—আমরা বাঁচিয়া আছি এবং বাঁচিবই!'"

রামেন্দ্রবাবু যেন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন বলিলেন—"এমন ব্যাপার আর কোথাও সংঘটিত হইয়াছে কি? জীববিদ্যার মৌলিক তত্ত্বগুলির কথা মনে পড়ে কি? পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত দুইসহস্র বৎসর ধরিয়া বিরোধ চলিয়াছে, অত্যাচার উৎপীড়নের বিরাম নাই

দেশ নাই, রাষ্ট্র নাই; অথচ হিব্রু লুপ্ত হইল না। Biologyর মূলসূত্রগুলি ধরিয়া বিচার করিবার চেষ্টা করিলে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাইবেন না। সর্ব্বত্র মানব-সমাজ একটা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বাতন্ত্র্য ও আত্মরক্ষার জন্য একটা শাসনযন্ত্র, বা Government, গড়িয়া লইয়া দৃঢ়বদ্ধ রাষ্ট্র, বা Stateএ পরিণত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। এই রাষ্ট্রের বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছে; নতুবা সে শত্রুহস্তে দলিত ও পিষ্ট হইয়া জীবন হারাইয়াছে, অথবা পরের দেহে মিশিয়া গিয়া আত্মলোপ করিয়াছে। ইহুদি সেরূপ পারে নাই, অথচ ইহুদি বাঁচিয়া আছে। সাধারণ জীবধর্ম্মের পশ্চাতে মানুষের আর একটা কিছু আছে, যেটা সাধারণ জীববিদ্যায় ধরা পড়ে না। সেইটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।

"এই Will to live কোথা হইতে আসিল, কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার হিসাব দিতে না পারিলে LIFE—জীবের জীবন—কি তাহা বুঝা যাইবে না। জীববিদ্যা ইহার হিসাব দিতে এপর্য্যন্ত পারে নাই; সম্ভবতঃ পারিবেও না। অতি অল্পদিন হইল—আজ বলিলেও চলে—যুরোপের সুধীগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহা ধরিতেছেন। অথচ এই টুকু না বুঝিলে প্রাণি-জীবনের ও উদ্ভিদ্-জীবনের শেষকথা জানা হইবে না;—মানুষের সামাজিক জীবনের, রাষ্ট্রীয় জীবনের, ধর্ম্মজীবনেরও হিসাবনিকাশ মিলিবে না। এই বিচিত্র প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যদি মানুষের সামাজিক ইতিহাসের সেই চরমকথা একটু স্পষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে আমি ধন্য হইব—আমার ক্ষুদ্রজীবনের একটা কাজ হইবে; এবং আপনাকে যে ভূতেরবেগার খাটাইতেছি, আপনারও এই অযথাপ্রযুক্ত পরিশ্রমও হয়ত কতকটা সার্থক হইবে।

"আর একটি জাতিও উল্লেখযোগ্য। মুসল্‌মান আক্রমণে ইহুদির সহিত তুলনায় স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য একদল পার্শী ভারত-বর্ষে আসিয়া হিন্দুরাজার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তাঁহারা নিজের ধর্ম্ম, আচার, অনুষ্ঠান লইয়া একটি ছোটখাটো উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। আজ তেরশত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এবং কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতশির হইয়া বিচরণ করিতেছেন। একত্রিশ কোটি হিন্দুমুসল্‌মান-পরিবেষ্টিত মুষ্টিমেয় পার্শী-সমাজ সগৌরবে স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহুদির মত তাহাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত বিরোধ করিতে হয় নাই। কারণ যে দেশে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার অতিথির পীড়ন কখনই করে না। পরধর্ম্মে বিদ্বে[ষ] তাহাদের নাই। বিরোধ না থাকিলেও এত বৃহৎ ভিন্নধর্ম্মী সমাজের মধ্যে এতকাল বাস করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা জনকতক পার্শীর পক্ষে সাধ্য হইত না। কিন্তু তবুও [সে] প্রবলতর সমাজের মধ্যে আপনাকে লুপ্ত করিয়া দেয় নাই ইহুদির মত সে নিজের ধর্ম্ম, নিজের Culture নিজেই পু[ষ্ট] করিয়া আসিতেছে। তাহাদের বিশিষ্ট রীতিনীতিবিশি[ষ্ট] অনুষ্ঠানগুলিকে অন্ধভাবে জড়াইয়া না থাকিলে, এ[ই] বিস্তীর্ণ আর্য্যভূমি ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির মধ্যে বা[স] করিয়া স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না পার্শী লুপ্ত হইত। তখন পার্শীজাতির ইতিবৃত্ত অন্বেষ[ণ] করিতে হইলে, জরথুস্ত্রের ধর্ম্মের কথা খুঁজিয়া বাহি[র] করিতে হইলে, হেরোডোটসের ইতিহাসের পাতাই একমা[ত্র] অবলম্বন হইত। গ্রীকের সহিত পারসীকের জীবনযু[দ্ধ] পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিচিত্র অধ্যায়। সেই যুদ্ধে কে[হ] কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই। সর্ব্বগ্রাসী ইস্‌লাম্, পারসীক জাতিকে ও পারসীক সভ্যতাকে আত্মসাৎ করিয়াছে; স্বদেশে পারসীকের চিহ্নমাত্রও রা[খে] নাই। ভারতবর্ষের আশ্রয় লইয়াও মুষ্টিমেয় পার্শী বেদ-পন্থী সমাজের বিপুল দেহে আত্মলোপ করে নাই। স্বধর্ম্মকে জড়াইয়া না থাকিলে ইহা সম্ভব হইত কি? নতুব[া] পার্শীর নাম উদ্ধারের জন্য তাহার শত্রু গ্রীকের সাহিত্যে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর থাকিত না।"

একটু চুপ করিয়া রামেন্দ্রবাবু বলিলেন—"গ্রীক্‌দিগে[র] কথা আসিয়া পড়িল; গ্রীক্ সভ্যতার কথা না বলি[লে] মানবের ইতিহাস বুঝা যাইবে না। গ্রীসীয় বা হেলেনী সভ্যতার অর্থ কি? বাহির হইতে একটা নূতনজাতি আসিয়া গ্রীসের আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া নূত[ন] সভ্যতা বিস্তার করিল, পুরাতনের বিশেষ কিছুই রহিল না এইরকম একটা ধারণা ইতিহাসরচয়িতৃদিগের মধ্যে ঊনবিং[শ] শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বদ্ধমূল হইয়া ছিল। গত কয়ে[ক] বৎসরের অনুসন্ধানে, একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব সাগরবংশের ক[থা]

(Mediterranean race) জানিতে পারা গিয়াছে; ইহাদের পর Pelasgian Race, পরে Achæan Race, এই সকল বিভিন্নজাতি ঐতিহাসিকের চোখে অস্পষ্ট ভাবে দেখা দিতেছে। গ্রীসের এই পুরাতন সভ্যতাকে Minoan culture নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহা কোনও সাহিত্য রাখিয়া যায় নাই, কিন্তু সভ্যতার নানা নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। দিন দিন নূতন নূতন নিদর্শন ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া গ্রীক্‌জাতির ইতিহাসের পুনর্গঠনের সাহায্য করিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থির হইয়াছিল যে গ্রীক্‌জাতি আর্য্য-জাতির এক শাখা; ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাংশের আদিম নিবাসীদিগকে দলিত, পিষ্ট ও আত্মসাৎ করিয়া গ্রীক্‌-জাতির স্বতন্ত্র সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন দেখা যাইতেছে, উহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। পুরাতন Minoan ও মাইকিনীয় সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়া, এমন কি তাহারই মালমসলা লইয়া, গ্রীক্‌সভ্যতা পুনর্গঠিত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এইরূপে যে সভ্যতা বিকশিত হইল, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অদ্ভুত পদার্থ; বোধ করি তাহার তুলনা নাই!

"এই অদ্ভুত গ্রীক্‌সভ্যতা—Hellenic culture—বুঝিতে হইলে, এই সভ্যতার বিশিষ্ট ভাব কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। কএকটি বিষয়ে এই বিশিষ্টভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, গ্রীকের জাতীয় ভাব। সে আপনাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠমানব বলিয়া জানিত। তাহার নানা দেবতা ছিল, নানা পৌরাণিক Hero ছিল। দেবতাদিগের সহিত Heroদিগের নিত্যকারবার হইত; সর্ব্বদা আদান-প্রদান চলিত। দেবতারা মানবীর গর্ভে সন্তানউৎপাদন করিতেন; মানুষেরা দেবতাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিত। ঐসকল দেবতা ও ঐসকল মানুষ গ্রীক্‌জাতির প্রতিষ্ঠাতা; তাহাদের সমাজতন্ত্রের ও রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বিধানকর্ত্তা। উহাদের পূজা ও প্রীতিসাধন গ্রীক্‌সমাজের প্রধান অনুষ্ঠান; উহাদের পরামর্শ লইয়া গ্রীকের রাষ্ট্র-তন্ত্র চালিত হইত; উহাদের স্তুতি ও উহাদের অবদান কীর্ত্তন লইয়াই অলৌকিক গ্রীক্‌সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি। ঐ সকল দেবতা ও অতিমানুষ-পুরুষদিগকে (Heroes) অবলম্বন করিয়া গ্রীকের জাতীয়ভাব (Nationalism) স্ফূর্ত্তি পাইল; এক ভাষা, এক সাহিত্য, এক Tradition ও Folklore, এই জাতীয়ভাবের অবলম্বন। সহস্র মন্দির ও Sanctuary অবলম্বন করিয়া এই সকল Tradition মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছিল; উহা সমস্ত গ্রীক্‌জাতির সাধারণ সম্পত্তি। ট্রয়ের লড়াই, হোমর, হিসীয়ড্‌, ডেলফাইয়ের Oracle, অলিম্পীয় ক্রীড়োৎসব, আপোলো দেবের Mysteries, আম্ফিকৃটিয়ন্‌ সভা, এ সমস্তই গ্রীক্‌দিগের জাতীয় সম্পত্তি; সকল গ্রীকের এই সকল বিষয়ে সমান অধিকার। যাহারা এই সমাজতন্ত্রের অধীন, তাহারাই গ্রীক্‌। অন্য সকলে গ্রীক্‌ নহে,—Barbarian, বা ম্লেচ্ছ; তাহাদিগের ভাষা গ্রীক্‌ বুঝে না; গ্রীক্‌ সমাজতন্ত্রে তাহাদের স্থান নাই বা অধিকার নাই; তাহাদিগের প্রতি গ্রীকের কোনও কর্ত্তব্য নাই; তাহারা অবজ্ঞাস্পদ বা হেয়; এত অবজ্ঞাত যে তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিবার কোনও প্রয়োজন নাই! গ্রীক্‌ তাহাদিগকে দয়া করিত না; তাহাদিগকে হিংসা করা ও ধ্বংস করাও নিতান্ত আবশ্যক মনে করিত না! পরজাতিকে ধ্বংস করা যেমন হিব্রুর কর্ত্তব্য ছিল, ম্লেচ্ছকে নিধন করা গ্রীকের তেমন কর্ত্তব্য ছিল না; গায়েপড়িয়া তাহাদিগের সহিত লড়াই করা গ্রীকের কর্ত্তব্য ছিল না; গ্রীক্‌ তাহাদিগকে নগণ্য মনে করিত, ignore করিত মাত্র; তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রে ও রাষ্ট্রিকশাস্ত্রে ম্লেচ্ছের প্রতি কোনও কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই! সে আপনার প্রতিভায়, আপনার শক্তিতে ও মাহাত্ম্যে এত গর্ব্বিত ছিল যে, পরজাতিকে উৎপীড়ন করা সে আবশ্যক বোধ করে নাই। এই জন্যই হিব্রুর তুলনায় গ্রীক্‌ tolerant; কিন্তু এই toleration কোনও রূপ প্রীতি হইতে উদ্ভূত হয় নাই; উহা কেবলমাত্র গ্রীকের আত্মসম্পর্কে উৎকট দম্ভের পরিচায়ক।

"এতবড় গর্ব্বিত ও অসামান্য ক্ষমতাপন্ন জাতির, নেশন্‌-রূপে দলবাঁধিয়া সমাজবদ্ধ হইবার যেমন সুবিধা ছিল, তেমন বোধ হয় ইতিহাসে আর কোনও জাতির ছিল না। ইহারা একদেশে অবস্থান করিয়া এক নেশনে পরিণত হইলে পৃথিবীতে অজেয় ও অধৃষ্য হইতে পারিত; কিন্তু তাহা ঘটিল না। গ্রীক্‌জাতি একটা রাষ্ট্রে পরিণত হইল না। একটা কারণ ছিল,—তাহাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থা। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

দ্বীপে বিভক্ত, গ্রীসদেশটা পাহাড়পর্ব্বতে অসংখ্য উপত্যকায় বিভক্ত। এই সকল দ্বীপ ও উপত্যকা আশ্রয় করিয়া গ্রীকেরা ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সমাজ বাঁধিল; কএক বর্গ-মাইল জমি লইয়া একএকটা নগর বা পুরী প্রতিষ্ঠা করিল। পুরীগুলি পর্ব্বতের ও সমুদ্রের ব্যবধানে জমাট বাঁধিল না; জমাট বাঁধিতে পারিত, কিন্তু তাহার প্রধানঅন্তরায় হইল গ্রীকের চরিত্র। গ্রীক্ আপনাকে খুব বড় বলিয়া জানে; নিজের শক্তিতে ও মাহাত্ম্যে নিজে মুগ্ধ; কিন্তু সেই মোহই তাহার জাতীয়তার বন্ধনে প্রধানঅন্তরায় হইল। সে কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতে জানে না; কাহারও বশ্যতাস্বীকার করিতে চাহে না। স্বজাতির বশ্যতা স্বীকারও তাহার স্বভাব নহে। এমন স্বার্থপর, আত্মসর্ব্বস্ব জাতি আর পৃথিবীতে জন্মে নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে বড় বলিয়া জানে, এবং কিসে নিজে বড় হইবে সেই চেষ্টাই তাহার জীবনের প্রধানচেষ্টা। পরের জন্য স্বার্থত্যাগ গ্রীকের ধাতুতে ছিল না। স্বার্থসংহারের প্রবৃত্তিকে যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলা যায়, সে প্রবৃত্তি জাতীয়স্বভাবরূপে গ্রীকের একেবারে জাগে নাই। তাহার জাতীয়ইতিহাসের গোড়া হইতেই গ্রীকের সহিত গ্রীকের মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরীগুলি কেবলই পরস্পরের শত্রুতাচরণ করিতে লাগিল। কেবল বিবাদ ও রক্তপাত। কেহ কাহাকেও মানিতে চাহে না; সকলেই আপনাকে বড় করিতে চায়, ও অন্যকে নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। গ্রীকের সহিতই গ্রীকের বিরোধ ইতিহাসের আগাগোড়া ব্যাপিয়া দেখা যায়। ম্লেচ্ছের সহিত গ্রীকের বিরোধ প্রথম প্রথম দেখিতে পাওয়া যায় না। ম্লেচ্ছ ত নগণ্য, বিসংবাদের অনুপযুক্ত। গ্রীসের আদিমনিবাসীর সহিতও তাহার বিবাদ নাই; তাহারা ত দলিত হইয়া দাসজাতিতে পরিণত হইয়াছে; তাহাদিগকে কেবল বলদের মত খাটাইয়া লইতে হইবে। গ্রীকের সহিত গ্রীকের এই চিরন্তনবিরোধ, তাহার নেশন্ গড়িয়া উঠিবারপক্ষে প্রধানবিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইল। একটা জমাট নেশন্, একটা Organismএ পরিণত হইল না। গ্রীক্‌ভূমি সহস্র স্বাধীন, স্বতন্ত্র, পরস্পর বিবদমান পুরীতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিল। পরে যখন বিশাল পারসীক সাম্রাজ্যের সমবেতশক্তি সমুদয় পশ্চিমএসিয়া গ্রাস করিয়া গ্রীক্‌ভূমিকে ও গ্রীক্‌জাতিকে গ্রাস করিতে আসিল, তখনও গ্রীক্ পুরীগুলি সেই প্রবল আততায়ীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দলবাঁধিয়া জমাট বাঁধিতে সমর্থ হইল না। দরিয়ায়ুসের সেনা যখন গ্রীসে উপস্থিত, স্পার্টা তখন এথেন্সের সহিত যোগ দিল না; এথেন্স্ প্রায় একাকী দাঁড়াইয়া মারাথনে লড়াই করিল। Xerxesএর বাহিনী যখন জলেস্থলে চারিদিকে আক্রমণ করিয়া গ্রীক্‌জাতিকে অভিভূত করিতে আসিল, তখন বহুগ্রীক্ নগরশত্রুর সহিত যোগ দিল। কতকগুলি নগর একত্রিত হইয়া জলেস্থলে শত্রুকে পরাজিত করিল বটে; কিন্তু বিদেশী ম্লেচ্ছআততায়ী পশ্চাৎপদ হইবামাত্র, গ্রীক্ আবার গ্রীকের সহিত লড়াই আরম্ভ করিয়া দিল। প্রবল পারসীক আবার আসিতে পারে, আসিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, এ সম্ভাবনা স্পষ্টসত্ত্বেও গ্রীকের গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল; সেই রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি, রক্তারক্তি, পরস্পর ছলনা, গুপ্তছুরির চালাচালি চলিল।

"বিদেশের আততায়ীর আক্রমণ, সমাজের দৃঢ়বদ্ধ হইবার প্রধান সুযোগ;—জীববিদ্যানুসারে সমাজবিদ্যার ইহা একটা গোড়ার কথা। আততায়ী হইতে, Environment হইতে, আত্মরক্ষা করিবার জন্য জীবদেহ জমাট বাঁধে; জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপন আপন ক্ষুদ্রস্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া সমগ্র দেহের স্বার্থে আপনাকে সমর্পণ করে, ইহাই হইল Biologyর মূলসূত্র। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বত্র জীব-বিদ্যার এই মূলসূত্রের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীক্ ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে পারে নাই; সাধারণস্বার্থে আত্মস্বার্থ নিমজ্জিত করিতে পারে নাই। উহাদের স্বদেশপ্রীতি (Patriotism) ছিল; কিন্তু তাহাও স্বার্থপ্রণোদিত। নিজের ক্ষতিলাভগণনা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া, কর্ত্তব্যমাত্রবোধে স্বার্থত্যাগ গ্রীক্‌চরিত্রে অপ্রকটিত রহিয়া গেল। গ্রীক্ যজ্ঞার্থে আত্মাহুতি জানিত না।

"আততায়ী পারসীকের ভয়ে গ্রীক্ ডেলস্ দ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া একটা রাষ্ট্রীয় মিত্রসঙ্ঘ (Confideracy) গঠন করিল; কিন্তু সে সন্ধিবন্ধন টিঁকিল না। এথেন্স্ সঙ্ঘভুক্তগ্রীক্-রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাইল; ছোটখাটো একটি সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা

করিতে লাগিল ; অল্পে অল্পে দ্বীপ ও নগরগুলির স্বাধীনতা হরণ করিয়া সেগুলিকে নিজের বশতাপন্ন করিল। পারসীকের সহিত যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে চাঁদা অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, এথেন্স্ তাহা করস্বরূপ আদায় করিয়া নিজের সৌষ্ঠব ও শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই অন্যায় প্রভুত্ব স্বাতন্ত্র্যাভিমানী গ্রীক্ কতদিন সহ্য করিতে পারে ? সমরানল প্রজ্বলিত হইল। সমস্ত গ্রীক্‌ভূমি ব্যাপিয়া মহাকুরুক্ষেত্রের অভিনয় হইল। সেই কুরুক্ষেত্রে গ্রীকের রাষ্ট্রতন্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। অবশেষে দেখিতে পাই যে গ্রীক্, পারস্য সম্রাটের উৎকোচ গ্রহণকরিয়া, স্বজাতিকে ধ্বংসকরিবার চেষ্টা করিতেছে ; পারস্যসম্রাটের ইঙ্গিতে ও অর্থে গ্রীক্‌দিগের পরস্পর সন্ধিবিগ্রহকার্য্য চলিতেছে। গ্রীকের চিরশত্রু ম্লেচ্ছ-পারস্যসম্রাট্ গ্রীক্‌রাষ্ট্রতন্ত্রের ভাগ্যবিধাতা সাজিয়া পারস্যের রাজধানীতে বসিয়া সূত্রচালনা করিতেছেন, এবং গ্রীক্-রাষ্ট্রগুলি সেই সূত্রে চালিত হইয়া পুতুলনাচ নাচিতেছে। গ্রীক্‌রাষ্ট্রতন্ত্র চূর্‌মার্ হইয়া গেল ; গ্রীক্‌সভ্যতা, গ্রীক্ Culture তাহার ভিত্তিহারাইয়া ভূকম্পপাতিত অট্টালিকার মত জীর্ণস্তূপে পরিণত হইল ; এথেন্স্‌কে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানের ও রূপের যে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—যে জ্যোতিতে আজপর্য্যন্ত জগৎমুগ্ধ—সে প্রদীপ নির্ব্বাণ-প্রায় হইল। * * * কোথা হইতে অর্দ্ধগ্রীক্ অর্দ্ধম্লেচ্ছ ম্যাসিডন্‌পতি জোরকরিয়া গ্রীক্‌সমাজতন্ত্রে প্রবেশ করিয়া, গ্রীক্‌রাষ্ট্রতন্ত্রকে দলিত করিয়া, গ্রীক্ Cultureএর মশাল কাড়িয়া লইয়া, গ্রীক্‌জাতির নেতৃরূপে পারসীকসাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়া পূর্ব্বদেশে গ্রীক্‌সভ্যতার আলোক বিকীরিত করিয়া দিলেন। মিশর, সীরিয়, আর্ম্মীনিয়, পার্থিয়, বাকৃত্রিয় প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতি সেই গ্রীক সভ্যতার আলোকে দীপ্ত হইয়া কিছুদিনের জন্য ইতিহাসে জাগিয়া উঠিল। * * * আলেকজান্দ্রিয়ার মত কোনও কোনও নগরে রাষ্ট্রপতিগণের সাহায্যে সময়ে সময়ে গ্রীক্ Culture পুনরুদ্দীপিত হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে পশ্চিমে রোমক সাম্রাজ্যে ও পূর্ব্বে ইস্‌লাম্‌প্রতিষ্ঠিত নূতনসাম্রাজ্যে আত্মবিলোপসাধন করিয়া সে জগতের ইতিহাসে নির্ব্বাণ লাভ করিল। এখন আর গ্রীক্‌জাতি নাই। গ্রীক্ Cultureও নাই একথা বলিতে সাহস করিব না ; গ্রীক্ Culture অবিনাশী, অনশ্বর। অন্যক্ষেত্রে অন্যজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গ্রীক্ Cultureএর বীজ যে শাখাপল্লবে ফুলফলে প্রসারলাভ করিয়াছে, তাহা আজি পৃথিবী ছাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

"গ্রীকের মত আত্মসর্ব্বস্ব, আত্মকেন্দ্র মানুষ পৃথিবীতে জন্মে নাই! এত অসাধারণ ধীশক্তি ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি লইয়া আর কেহ বোধকরি পৃথিবীর পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয় নাই ; কিন্তু এই আত্মকেন্দ্রকতাই, এই individualismই গ্রীকের সর্ব্বনাশের মূল। গ্রীকের মত লঘুচিত্ত, চপলমতি, volatile মানুষ জগতে জন্মে নাই। তাহাকে কিছুতেই সংহত করিয়া জমাট বাঁধিয়া রাখা চলিত না। এত সুযোগ ছিল—অসাধারণ, অনন্যসাধারণ সুযোগ—কিন্তু বৃহৎ গ্রীক্‌নেশন্ ঘন হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিল না, ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গ্রীক্‌রাষ্ট্রও স্থায়ী হইয়া রহিল না। যাহার ভিতর বারুদে ও ডাইনামাইটে পূর্ণ, তাহার স্থায়িত্বের আশা করা যায় না।

"সমগ্র গ্রীক্‌জাতি একটা বিরাট্ রাষ্ট্ররূপে পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু গ্রীক্‌নগরগুলি পরস্পর লড়াই করিবার জন্য রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। গ্রীকের ইতিবৃত্তে আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসের সকল কথাই পাওয়া যায়। প্রত্যেক নগর, আপনার প্রতিবেশীর নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য, Government, বা শাসনযন্ত্র, প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই শাসনযন্ত্র জীবদেহে মস্তিষ্কের অনুরূপ। মস্তিষ্ক জীবদেহকে পরের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য এবং পরকে আক্রমণ করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক ও সচেষ্ট থাকে ; এমন কি জীবদেহকে এইরূপে প্রস্তুত রাখিবারজন্য দেহের অভ্যন্তরীণ সমুদয়যন্ত্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চায়! ইহারই অধীন থাকিয়া জীবদেহ সর্ব্বদা আত্মরক্ষায় উদ্যত থাকে। শ্রেষ্ঠপর্য্যায়ের জীব, এই মস্তিষ্করূপযন্ত্রের সাহায্যে সর্ব্বদা জাগ্রত ও সচেতন থাকিয়া বিচারবিতর্কপূর্ব্বক নূতন নূতন আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে ; এই Conscious effort যে তাহার উৎকর্ষের লক্ষণ, তাহা গোড়ায় বলিয়াছি। মনুষ্যসমাজ যখন শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি ও উদ্ভাবনা করিয়া রাষ্ট্রে, বা Stateএ, পরিণত হয়, তখন উহাও জ্ঞাতসারে :বিচার-পূর্ব্বক (Consciously) নূতনআক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নূতনউপায়—নূতনঅবস্থার প্রতি নূতনব্যবস্থার—প্রয়োগ করিতে পারে। কাজেই জীববিদ্যানুসারে রাষ্ট্রগঠন, সমাজের উৎকর্ষেরই লক্ষণ। এই শাসনযন্ত্র গ্রীক্ নগর-

গুলিতে যেমন পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, তেমন আর কুত্রাপি করে নাই। রাষ্ট্রযন্ত্রের যতরূপ প্রকারভেদ হইতে পারে, Monarchy, Oligarchy, Aristocracy, Democracy, ইত্যাদি যত ভেদ আছে, গ্রীকেরা সে সমস্ত লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন; আবার দল বাঁধিয়া বা আত্মপ্রসার করিয়া আত্মরক্ষার জন্য বলবৃদ্ধির যত উপায় আছে,—Colony, Confederacy, Empire, সমস্তই তাঁহারা উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত Experiment ব্যর্থ হইয়াছিল,—গ্রীক্ State বা রাষ্ট্রগুলি আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। এইখানে গ্রীকের জাতীয় ইতিহাসের গোড়ায় গলদ। কেন পারে নাই, জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব,—ইহার কারণ গ্রীকের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, গ্রীকের মজ্জাগত স্বার্থপরতা, গ্রীক্ Individualism; গ্রীক্ আপনাকে ভুলিতে জানিত না; গ্রীকের ধর্ম্মবুদ্ধি ছিল না। গ্রীক্ পণ্ডিতেরা একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর Theory of State খাড়া করিয়াছিলেন; সেই Theory সর্ব্বাংশে জীববিস্থার অনুগত। রাষ্ট্রই সর্ব্বেসর্ব্বা, রাষ্ট্রই প্রভু; ব্যক্তিগণের স্বার্থ রাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত অভিন্ন; রাষ্ট্রস্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকিতেই পারে না; রাষ্ট্র, ব্যক্তিকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে; ব্যক্তির কোনও স্বাধীনতা নাই। দেহ যেমন আত্মরক্ষার জন্য তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে, তাহার Unit cellগুলিকে রাখিতে বা ছাঁটিতে পারে, রাষ্ট্র সেইরূপ ব্যক্তিকে যথেচ্ছভাবে রাখিতে বা ছাঁটিতে পারে। রাষ্ট্রমধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের স্থান নাই। প্লেটোর Republic ও আরিষ্টটলের Politicsএ এই থিয়োরি পূর্ণপ্রকটিত। এই থিয়োরিমতে রাষ্ট্রের আদেশ চূড়ান্ত-আদেশ; মানবজীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি আচারবিচার ধর্ম্মকর্ম্ম সর্ব্ববিষয়ে রাষ্ট্রের আদেশ চূড়ান্ত-আদেশ। প্লেটো তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রে বিবাহ-প্রণালীর উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—পুরুষেরা পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান-উৎপাদন করিতে পারিবে, স্ত্রীলোকেরা চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিতে পারিবে; উক্ত বয়সের মধ্যে ভূমিষ্ঠ সন্তানই রাষ্ট্রের অনুমোদিত ব্যক্তি হইবে; চল্লিশ বৎসর বয়সের পরে স্ত্রী যদি নিতান্তই স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া গর্ভধারণ করে, তাহা হইলে সেই ভ্রূণকে ভূমিষ্ঠ হইতে দিবে না; যদিই বা ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সন্তানকে বাঁচিতে দিবে না, পালন করিবে না; দুর্ব্বল সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিলে রাষ্ট্রের ক্ষতি বই লাভ নাই। স্পার্টাতে এই আদর্শ রাষ্ট্রনীতি অনুসৃত হইয়া ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য একেবারে নষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছিল! লাইকর্গস্ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না, তাহা লইয়া পণ্ডিতগণ তর্ক করুন; কিন্তু তাঁহার নামে যে সকল সমাজবিধান চলিয়াছিল, তাহাতে মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে একেবারে পিষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ব্যক্তির স্ফূর্ত্তি সেখানে ঘটিতে পায় নাই। জোর করিয়া সেখানে ব্যক্তিগত ভাব নষ্ট করা হইয়াছিল;—স্পার্টান্ ইচ্ছা করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি সাধিত হইয়া– অপর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়াছিল বলিলে, ভুল হইবে। এথেন্সে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য উদ্দাম দেখা যায়—ব্যক্তির উৎকর্ষ সেখানে পরাকাষ্ঠা পাইয়াছিল। কিন্তু উহা ঘটিয়াছিল গ্রীক্থিয়োরির বিরুদ্ধে। এই বিরোধের ইতিহাসটাই গ্রীক্ইতিহাস। এই বিরোধের সমন্বয় করিতে না পারিয়া গ্রীক্রাষ্ট্র ও গ্রীক্ব্যক্তি উভয়ই নষ্ট হইয়া গেল।

"গ্রীক্চরিত্রের গোড়ায় গলদ এইখানে দেখা যায়। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, গ্রীকের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মূলসূত্র কি? আমি বলিব, তাহার কথার সহিত কাজের অসামঞ্জস্য, তাহার Theoryর সহিত Practiceএর বিরোধ। স্পার্টা ও এথেন্স্ উভয়স্থলেই রাষ্ট্রসম্বন্ধে থিয়োরি একই। Theory বলিতেছে, ব্যক্তির কোনওরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না; গ্রীকের চরিত্র বলিতেছে,—আমি আমার স্বাতন্ত্র্য রাখিবই রাখিব; রাষ্ট্র থাকে থাকুক, কিন্তু উহা ত আমাকে রক্ষার জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে; উহাকে যেমন করিয়া পারি, আপন স্বার্থে বিনিয়োগ করিব; ছলেবলে রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমি আপনার অধীন করিয়া লইব। ইহার ফলে রাষ্ট্রমধ্যে দলে দলে, জনে জনে, বিরোধ; এবং রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির চিরন্তন বিরোধ। কোথাও রাষ্ট্রের জয়, কোথাও দলবিশেষের জয়। কোথাও ব্যক্তিবিশেষের জয়; কিন্তু কোনও জয়ই স্থায়ী নহে; কেবলই রেষারেষি, কাটাকাটি। কোথাওবা একজন নানাউপায় অবলম্বন করিয়া ছলেবলে-কৌশলে রাষ্ট্রের একাধিপতি হইয়া Tyrant হইতেছেন; কোথাও একটা দল আর সকলকে জখম করিয়া Oligarchyর প্রতিষ্ঠা করিতেছে; কোথাওবা পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্র-

চালনার ভার ভিন্ন ভিন্ন দলের, বা সমস্ত ব্যক্তির উপর ভাগ করিয়া অর্পণ করা হইতেছে, সকলকেই কিছু কিছু দিয়া আপাততঃ ঠাণ্ডা করা হইতেছে– ইহাই Democracy।

"উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে Individualism ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের জয়জয়কার পড়িয়াছিল। গ্রোট ও ফ্রীম্যান্—এথেন্সের Democracyর মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফ্রীম্যান্ গদ্‌গদ স্বরে বলিতেছেন—এমন কি আর হয়? এথেন্সে সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান; প্রত্যেক ব্যক্তি রাজা, প্রত্যেকে মন্ত্রী, প্রত্যেকে প্রজা, প্রত্যেকে ব্রাহ্মণ, প্রত্যেকে ক্ষত্রিয়, প্রত্যেকে জজ্, প্রত্যেকে ম্যাজিষ্ট্রেট্, প্রত্যেকে জুরর্, প্রত্যেকে উকিল। ফ্রীম্যান্ আরো একটু বলিতে পারিতেন, প্রত্যেকেই এখানে আসামী বা Criminal। এথেন্সের প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রতন্ত্রে প্রভুত্ব করিত, কিন্তু কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না; প্রত্যেকেই অপরকে বাগ্‌বিতণ্ডায়, বাগ্মিতায় পরাস্ত করিয়া ও ভুলাইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাইত; প্রত্যেকেই অপরকে ঠকাইতে প্রস্তুত। এই জন্যই এথেন্সের Oratory, Rhetoric, Sophistry,এবং বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক্ Comedy প্রভৃতির উৎপত্তি ও উৎকর্ষ। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। যে দল বাঁধিয়া বড় হইয়া পড়ে, তাহাকেই রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া রাষ্ট্ররক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। এথেন্সের যত দলপতি, যত প্রধান পুরুষ, সকলকেই এইরূপে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে; কাহাকেও বা হত্যা করা হইয়াছে। অন্যান্য লোকের কথা ছাড়িয়া দিই। যিনি এথেন্সের মুকুটমণি; এথেন্স্‌কে যিনি গ্রীক্ সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিলেন; এথেন্স্‌কে কেন্দ্র করিয়া, সমুদয় গ্রীক্ নগরকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া একটা প্রকাণ্ড গ্রীক্ নেশন্ গঠিত করিবার কল্পনা যাঁহার মস্তিষ্কে উদিত হইয়াছিল; সেই পেরিক্লিসের কথা ভাবুন। তাঁহার চোর অপবাদ ঘোষিত হইল; তিনি নাকি Stateএর তহবিল চুরি করিতেন; তাঁহার প্রিয় শিল্পী ফীডিয়স,—জগতে অতুল্য ফীডিয়স্—নাকি সোণার দেবমূর্ত্তি গড়িতে গিয়া•সোণা চুরি করিয়াছিলেন। তাঁহার আস্পেশিয়ার মানরক্ষার জন্য তাঁহাকে এথেন্সের জনসাধারণের সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া চোখের জল ফেলিতে হইয়াছিল।

"এই তরলপ্রকৃতি স্বার্থপর Patriotism কেবলমাত্র কথার কথা; অতি সহজেই ইহা সমাজদ্রোহে পরিণত হইত। মিল্টিয়াডিস্, থেমিষ্টক্লিস্, পসেনিয়স্, এই তিনটা নামই লওয়া যাক্—আলসিবিয়াডিস্ প্রভৃতির নাম নাই বা বলিলাম! ঐ তিনজন গ্রীসের রক্ষাকর্ত্তা, গ্রীক্ Culture এর রক্ষাকর্ত্তা; ঐ তিনজন না থাকিলে গ্রীক্ নামই হয়ত জগতের ইতিহাসে থাকিত না। দেশের লোকে ইঁহাদিগকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ দেশ পাইল কি? দেশকে তাঁহারাই রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু কি তুচ্ছ স্বার্থের জন্য তাঁহারাই আবার স্বদেশদ্রোহী হইলেন, মনে করিতে হৃৎকম্প হয় না কি? ম্যারাথন্-বিজেতা মিল্টিয়াডিস্; কেন তাঁহার অধঃপতন হইল? ক্ষুদ্র প্যারস্ দ্বীপের বিরুদ্ধে কি আক্রোশে তিনি অভিমান করিলেন? পরাজিত পারসীক বাহিনী ফিরিয়া যাইতে না যাইতেই, কেন তিনি তুচ্ছ স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রের ধনবল সেনাবল নষ্ট করিয়া অপমানিত হইলেন? গৃহের বিজনকক্ষে শয্যাতলে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে যখন তিনি শুনিলেন যে তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে গুরু-অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া জরিমানা করিয়াছে, ম্যারাথন্-বিজেতার প্রাণদণ্ড নিতান্তই অসঙ্গত মনে করিয়া প্রাণদণ্ডের বদলে অর্থদণ্ডে নিষ্কৃতি দিয়াছে, তখন তাঁহার কি মনে হইয়াছিল? সেই একদিন যখন কএকটি অশ্বারোহী শত্রুসৈন্য তীর বেগে ছুটিয়া আসিয়া হেলেস্‌পন্টের সমীপস্থ গ্রীক্ সেনানীগণকে বলিল, 'সসৈন্যে দরিয়ায়ুস ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া আসিতেছে; তোমরা এই সেতুটি ভাঙ্গিয়া দেও; সম্রাট্‌কে আমরা ধ্বংস করিয়া ফেলিব; তোমরাও স্বাধীন হইয়া যাইবে।' একা মিল্টিয়াডিস্ জোর করিয়া বলিয়াছিলেন—'এস, সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া আমরা স্বাধীন হই'। আর সকলে কিন্তু ভয় পাইল। সেতু ভাঙ্গা হইল না। দরিয়ায়ুস ফিরিয়া আসিলেন। তা'র পর গ্রীক্ সেনাপতি মিল্টিয়াডিস্ দরিয়ায়ুসের বিরাট্ বাহিনীকে যে দিন ম্যারাথনে পরাজিত করিলেন, সেদিনকার গৌরবকাহিনী আজ আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া ইতিহাসের Whispering galleryর ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। তিনি গুরু-অপরাধে স্বদেশবাসী-কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত! এথেন্সের অধিবাসিগণ এথেন্সের রক্ষাকর্ত্তাকে প্রাণভিক্ষা দিয়া অপমানিত

করিল। কাহার দোষ? দেশ কি তাঁহার প্রতি অবিচার করিল? ইতিহাস-রচয়িতা বলেন যে, এথেন্সে 'ম্যারাথন্' শব্দটা যেন একটা যাতুমন্ত্রের মত দাঁড়াইয়া গেল—Marathon became a magic word at Athens;—কিন্তু ক্ষুব্ধ এথেন্স্বাসী, সেই যাতুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া স্বজাতিদ্রোহী মিল্টিয়াডিস্কে ক্ষমা করিল না। যেজাতির 'ম্যারাথন্' আছে, সেজাতি কথনই পরাধীন হইতে পারে না;—একজন ইংরাজ এই কথা জোর করিয়া বলিয়াছেন,—

"The mountain looks on Marathon,
And Marathon looks on the sea;
And musing there as I stood alone,
I dreamed that Greece might still be free;
For standing on the Persian's grave,
I could not deem myself a slave."

ইংরাজ কবি কল্পনাবলে নিজেকে গ্রীক্ মনে করিয়া এমন কথা বলিতে পারিয়াছেন; কিন্তু গ্রীক্ পসেনিয়স্ কি করিলেন? গ্রীক্ থেমিষ্টক্লিস্ কি করিলেন? মিল্টিয়াডিস্ আরো কিছুদিন জীবিত থাকিলে তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক হইতেন কি না, জানি না। কিন্তু প্লেটিয়া-বিজয়ী পসেনিয়স্ সমগ্র গ্রীক্জাতিকে পারস্য-সম্রাটের পদানত করিতে চাহিয়াছিলেন কেন? স্পার্টার কর্তৃপুরুষ হইয়া তাঁহার আশা মিটিল না; যে পারসীককে প্লেটিয়াক্ষেত্রে তিনি পরাজিত করিলেন, সেই শত্রুর হস্তে সমস্ত গ্রীক্-রাষ্ট্রগুলি সমর্পণ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমাকে রাজ্য ও রাজকন্যা দাও, সমস্ত গ্রীক্জাতিকে তোমার অধীন করিয়া দিব—এই হীন প্রস্তাব তিনি নিঃসঙ্কোচে পারস্য সম্রাটের নিকট পাঠাইলেন। ঘটনাচক্রে তিনি ধরা পড়িয়া গেলেন। যে স্পার্টান্ বীর প্লেটিয়া-ক্ষেত্রে পারস্যের বিপুলবাহিনী ছিন্ন ও পর্য্যুদস্ত করিয়া গ্রীক্ জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি স্বদেশদ্রোহে ধরা পড়িয়া স্পার্টার দেবমন্দিরে প্রাণের জন্য আশ্রয় লইলেন; স্পার্টানেরা মন্দিরের দ্বারগাঁথিয়া তাঁহাকে অনশনে মারিয়া ফেলিল। আর থেমিষ্টক্লিস্? স্যালামিসে অন্যান্য নৌ-সেনাধ্যক্ষদিগের সহিত ঝগড়া করিয়া গভীর নিশীথে পারস্য-সম্রাটের সমীপে জানাইলেন যে গ্রীক্রা নিজেদের মধ্যে কলহ করিতেছে; সম্রাটের সহস্র নৌকা যদি রাতারাতি আসিয়া গ্রীক্ নৌকাগুলিকে ঘিরিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাঁহার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।—হইতে পারে, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল; তিনি হয়ত জানিতেন, সত্বর সম্মুখযুদ্ধ ব্যতীত গ্রীক্জাতির রক্ষা নাই। ঘটনাচক্রে গ্রীক্যুদ্ধ জিতিল। কিন্তু তিনশত গ্রীক্ নৌকায় একসহস্র পারসীক নৌকা বিধ্বস্ত করিবার সম্ভাবনা ছিল কি? পারস্যসম্রাটের রাজতক্তের সম্মুখে পারসীকের মত বেশভূষাপরিহিত থেমিষ্টক্লিস্ যখন জানু পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন, তখন কি সাগরপারে দূরে স্বদেশের কথা তাঁহার মনে পড়িত না? কি কৌশলে এথেন্স্ ও পিরিয়স্ বন্দরকে বেষ্টন করিয়া সুদৃঢ় প্রাচীর গঠন করাইয়াছিলেন, সেকথা তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইত না কি? কেন তবে 'মজালি সোনার লঙ্কা, মজিলি আপনি'?—রাজা হইবার মোহে? ম্লেচ্ছ পারসীক রাজকন্যার রূপের মোহে?—অৰ্দ্ধেক রাজত্ব ও একটি রাজ-কন্যা কেবলমাত্র রূপকথার জিনিষ নয়! গ্রীসের সিংহদ্বার দিয়া যে শত্রু-প্রবেশ করিতে পারিল না, কেন তাহাকে প্রহরীরা গুপ্তদ্বার দিয়া আনয়ন করিতে চেষ্টা করিল? যে দেশে তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কেন সেখানে অতি মাত্রায় ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির বিরোধ, সমাজের সহিত ব্যক্তির বিরোধ, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দলাদলি মারামারি কাটাকাটি? কি অভিসম্পাত! অমাবস্যার নিশীথে তুব্ড়ি বাজির মত ফুল কাটিয়া গ্রীকজাতির ইতিহাস বিলীন হইয়া গেল। সহস্র বৎসরের দুঃসাধ্য সাধনালভ্য সঞ্জীবনীমন্ত্র লাভ করিয়া কচরূপী গ্রীক্ বিদায়গ্রহণ করিল, রাষ্ট্ররূপিণী দেবযানীর অভিশাপ তাহার শিরে বর্ষিত হইল,—গ্রীক্ Culture তুমি অপরকে 'শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।' কোথায় সে চলিয়া গেল? কোন্ রহস্যপুর হইতে সে আসিয়াছিল; ইতিহাসের ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্যে কোন্ রহস্যপুরে সে ফিরিয়া গেল? কাহাকে সে নিজের সঞ্জীবনীমন্ত্র শিখাইয়াছিল? য়ুরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগে কে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া য়ুরোপকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল? ম্লেচ্ছমুসলমানের হস্ত হইতে খৃষ্টান য়ুরোপ গ্রীক্প্রদীপ গ্রহণ করিয়া আপনার আঁধারঘর আলো করিল, মানবের ইতিহাসে ইহা অদ্ভুত দৃশ্য।

"সে সুন্দরকে ধরিতে চাহিয়াছিল। আজ তাহার 'সকল গীত গান হয়েছে অবসান'; কিন্তু একদিন তাহার সর্ব্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ সঙ্গীতে, চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে হিল্লোলিত

হইয়া গিয়াছিল। তরুণ দেবতার করুণ বংশীধ্বনির তালে তালে তালে ট্রয়্‌নগরী স্তরে স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছিল; আবার মোহিনী নটীর ও নর্ত্তকীর সঙ্গীত নর্ত্তনের তালে তালে তালে এথেন্স্‌ নগরীর প্রাচীর স্তরে স্তরে স্তরে ভাঙ্গা হইয়াছিল। ট্রয়্‌নগরী হেলেন্‌কে বন্দিনী করিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল; এথেন্স্‌নগরী হেলেনীয় সভ্যতার যৌবন-মদিরায় আত্মবঞ্চনা করিয়া নষ্ট হইল।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

উদ্দ্যোতকর

পরিচয়

এসিয়াটিক্‌ সোসাইটীদ্বারা 'ন্যায়বার্ত্তিক' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতার নাম 'উদ্দ্যোতকর'। তিনি আপনাকে 'ভারদ্বাজ' 'পাশুপতাচার্য্য' * বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভরদ্বাজ-গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি 'ভারদ্বাজ' নামে খ্যাতিলাভ করেন। পাশুপত শৈব-সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে 'পাশুপতাচার্য্য' বলিত।

জন্মভূমি

উদ্দ্যোতকর কোন্‌ দেশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি মালবদেশের অন্তর্গত 'পদ্মাবতী' নগরীতে প্রাদুর্ভূত হন। একসময়ে পদ্মাবতী ন্যায়চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত মালতীমাধব নাটকে † দৃষ্ট হয় যে, মাধব স্বীয় সহচর মকরন্দের সহিত আন্বীক্ষিকী (ন্যায়) বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য বিদর্ভ হইতে পদ্মাবতী নগরীতে গমন করেন। পদ্মাবতীর বর্ত্তমান নাম 'নারওয়ার'। এখানে পাশুপত-সম্প্রদায়ের সবিশেষ প্রাধান্য ছিল এবং "উদ্দ্যোতন" ইত্যাদি প্রকারের নামও এদেশে প্রচলিত ছিল। আমার বোধ হয়, উদ্দ্যোতকরের জন্মভূমি বলিয়াই পদ্মাবতী ন্যায়চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

উদ্দ্যোতকর যেখানেই প্রাদুর্ভূত হউন না কেন, তিনি যে শ্রীহর্ষের রাজধানী থানেশ্বরে (স্থাণ্বীশ্বরে) কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রুঘ্নদেশ

ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর একমাত্র শ্রুঘ্নদেশের উল্লেখ করিয়াছেন—

"এষঃ পন্থাঃ শ্রুঘ্নং গচ্ছতি"।—(ন্যায়বার্ত্তিক, ১ অধ্যায়, ৩৩ সূত্র)।

শ্রুঘ্নদেশ থানেশ্বরের ৪০ মাইল উত্তরে, যমুনার পশ্চিম কূলে অবস্থিত। এখান হইতে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে যাইবার প্রশস্তপথ বিদ্যমান আছে। অনুগঙ্গ প্রদেশ হইতে মিরাট্‌, সাহারনপুর ও অম্বালা হইয়া পঞ্জাবের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যাইতে হইলে, শ্রুঘ্নদেশ অবশ্যই অতিক্রম করিতে হইবে। গজনীর মহম্মদ, কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার সময়ে, শ্রুঘ্নদেশের মধ্যদিয়া গমন করিয়াছিলেন। তৈমুরলঙ্গ, হরিদ্বার লুণ্ঠন করিয়া, শ্রুঘ্নের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং বাবর শ্রুঘ্নের পথ দিয়া দিল্লী আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন।

থানেশ্বরে অবস্থিতি

কুরুক্ষেত্র ও থানেশ্বর হইতে সম্ভবতঃ উদ্দ্যোতকর শ্রুঘ্ন যাইবার পথ লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলেন, "এষঃ পন্থাঃ শ্রুঘ্নং

---

* "ইতি শ্রীপরমর্ষি—ভারদ্বাজ—পাশুপতাচার্য্য—শ্রীমদুদ্দ্যোতকর কৃতৌ ন্যায়বার্ত্তিকে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥"—(ন্যায়বার্ত্তিক—পৃঃ ৫৬৮)

"যদক্ষপাদপ্রতিমো ভাষ্যং বাৎস্যায়নো জগৌ।
অকারি মহতস্তস্য ভারদ্বাজেন বার্ত্তিকম্‌॥"
—(ন্যায়বার্ত্তিক—পৃঃ ৫৬৮)

† "তদিদং বিদর্ভরাজমন্ত্রিণা সতা দেবরাতেন মাধবং পুত্রম্‌ আন্বীক্ষিকীশ্রবণায় কুণ্ডিনপুরাদিমাং পদ্মাবতীং প্রহিণ্বতা সুবিহিতম্‌।"
—(মালতীমাধব, প্রথম অঙ্ক)॥

গচ্ছতি"। ইহাদ্বারা সহজেই অনুমিত হয়, থানেশ্বরে বসিয়া উদ্দ্যোতকর 'ন্যায়বার্ত্তিক' লিখিয়াছিলেন। থানেশ্বরের প্রকৃত নাম স্থাণ্বীশ্বর। ইহা কুরুক্ষেত্রের ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে মহারাজ শ্রীহর্ষ বা হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী ছিল। মহারাজ শ্রীহর্ষের সময়ে নানাদেশ হইতে বিদ্বন্মণ্ডলী থানেশ্বরে সমাগত হইতেন। বোধ হয়, উদ্দ্যোতকরও তথায় আসিয়া রাজপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন।

সুবন্ধু ও বাণের সমকালিক

'সুবন্ধু'কৃত 'বাসবদত্তা'-গ্রন্থে, * উদ্দ্যোতকর ন্যায়শাস্ত্রের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আবার কবি 'বাণভট্ট' স্বীয় 'হর্ষচরিত'-গ্রন্থে † লিখিয়াছেন যে, বাসবদত্তার প্রকাশে পূর্ব্বতন কবিগণের দর্পচূর্ণ হইয়াছিল। হর্ষচরিত পাঠে জানা যায়—কবি বাণ, মহারাজ শ্রীহর্ষের সমসাময়িক; অতএব তিনি খৃষ্টীয় ৬০১ হইতে ৬৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, বাণভট্ট খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে (৬৫০ খৃঃ অব্দে) বিদ্যমান ছিলেন। সুবন্ধু তাঁহার সমকালিক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের লোক।—উদ্দ্যোতকর সুবন্ধুর পরবর্ত্তী নহেন।

উদ্দ্যোতকর ও ধর্ম্মকীর্ত্তি

'ধর্ম্মকীর্ত্তি' নামক বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকরের সমসাময়িক ছিলেন। উদ্দ্যোতকর স্বকীয় ন্যায়বার্ত্তিকে ধর্ম্মকীর্ত্তির 'বাদবিধি' ও 'বিনীতদেবে'র 'বাদবিধান-টীকা'র উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়বার্ত্তিকের ১ম অধ্যায়ের ৩৩ সূত্রের টীকায় লিখিত আছে—

"যদপি বাদবিধৌ সাধ্যাভিধানং প্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞালক্ষণম্ উক্তম্।"—(ন্যায়বার্ত্তিক, পৃঃ ১২১)।

"যদপি বাদবিধানটীকায়াং সাধয়তীতি শব্দস্য
স্বয়ং পরেণ চ তুল্যত্বাৎ স্বয়মিতি বিশেষণম্।"
—(ন্যায়বার্ত্তিক, পৃঃ ১২০)।

বাদের লক্ষণ-পরীক্ষাস্থলেও উদ্দ্যোতকর বিনীতদেবের বাদবিধানটীকার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"অপরে তু স্বপরপক্ষসিদ্ধ্যর্থং বচনং বাদ ইতি বাদলক্ষণং বর্ণয়ন্তি।"—(ন্যায়বার্ত্তিক, ১ম অধ্যায় ৪২ সূত্র, পৃঃ ১৫১)।

সংস্কৃতভাষায় লিখিত মূল বাদবিধি ও বাদবিধানটীকা এপর্য্যন্ত আমার হস্তগত হয় নাই। নেপাল হইতে ঐ পুস্তকদ্বয় আবিষ্কৃত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তিব্বতদেশে ঐ দুই গ্রন্থের সুন্দর অনুবাদ বিদ্যমান আছে।

'তেঙ্গ্যুর' নামক সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় শাস্ত্রসংগ্রহের "দো"-বিভাগের "চে"-পরিচ্ছেদে বাদবিধি-গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ লিপিবদ্ধ আছে। আর ঐ শাস্ত্রসংগ্রহের "জে"-পরিচ্ছেদে বাদবিধানটীকার অনুবাদ দৃষ্ট হয়।

বাদবিধি ও বাদবিধানটীকা

উদ্দ্যোতকর যে তিনটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা তিব্বতীয় বাদবিধি ও বাদবিধানটীকায় অবিকল ঐরূপ ভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। আমি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া, তিব্বতীয় পুস্তকে ঐ তিনটি বাক্য মিলাইয়া দেখিয়াছি। ইহাদ্বারা প্রতীত হয়, ধর্ম্মকীর্ত্তি ও বিনীতদেব উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্ববর্ত্তী।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধর্ম্মকীর্ত্তিও উদ্দ্যোতকরের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তির গ্রন্থে উদ্দ্যোতকর "শাস্ত্রকার" নামে অভিহিত হইয়াছেন, যথা—

"স্বয়মিতিবাদিনা যস্তদা সাধনমাহ। এতেন যদ্যপি কচিৎ শাস্ত্রে স্থিতসাধনমাহ। তচ্ছাস্ত্রকারেণ তস্মিন্ ধর্ম্মিণি অনেকধর্ম্মাভ্যুপগমেঽপি যস্তদা তেন বাদিনা ধর্ম্মঃ স্বয়ং সাধয়িতুম্ ইষ্টঃ স এব সাধ্যো নেতর ইত্যুক্তং ভবতি।"—(ন্যায়বিন্দু, তৃতীয় পরিচ্ছেদ—পৃঃ ১১০-১১১)।

"পক্ষ" শব্দের লক্ষণ কি?—ইহা লইয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িকগণের মধ্যে যে কলহ হইয়াছিল, উদ্ধৃতস্থলে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

উভয়ের সমকালিক প্রাদুর্ভাব

যাহা হউক সে বিষয়ে কোনরূপ সুমীমাংসিত সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়াও আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, 'ধর্ম্মকীর্ত্তি' উদ্দ্যোতকরের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং 'উদ্দ্যোতকর'ও ধর্ম্মকীর্ত্তির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন;

* "ন্যায়স্থিতিমিব উদ্দ্যোতকরস্বরূপাম্"।—(বাসবদত্তা—পৃঃ ২৩৫)।

† "কবীনামগলদ্ দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।
শক্ত্যেব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কর্ণগোচরম্॥"
—(হর্ষচরিত, ১ম উচ্ছ্বাস)।

অতএব উঁহারা পরস্পর সমসাময়িক। ধর্ম্মকীর্ত্তি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন; সুতরাং উদ্দ্যোতকরও সেই সময়ের লোক; সুবন্ধুও তাঁহাদের সমকালিক। প্রাচীনতা অনুসারে বিবেচনা করিলে, তাঁহাদের নাম নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে—

ধর্ম্মকীর্ত্তি, উদ্দ্যোতকর, সুবন্ধু, শ্রীহর্ষ, বাণ: ইঁহারা প্রায় সকলেই চীন-পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙের সমসাময়িক।

বৌদ্ধদর্শনে অভিজ্ঞতা

বোধ হয় উদ্দ্যোতকর মহারাজ শ্রীহর্ষের রাজধানী থানেশ্বরে বসিয়া বহু বৌদ্ধ-দার্শনিকের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধদর্শন বেশ ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। 'বসুবন্ধু' ও 'দিগ্‌নাগে'র মত ন্যায়বার্ত্তিকে সমালোচিত ও খণ্ডিত হইয়াছে; 'ধর্ম্মকীর্ত্তি' ও 'বিনীত-দেবে'র চেষ্টা ব্যর্থীকৃত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর 'সর্ব্বাভিসময়' নামক একখানি বৌদ্ধগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, উহা 'মৈত্রেয়নাথ'-কৃত 'অভিসময়ালঙ্কার সূত্রে'র নামান্তর মাত্র। এইগ্রন্থ চীন-ভাষায় 'মহাযানাভিসময়সূত্র' নামে পরিচিত। আমি মূল-সংস্কৃত 'অভিসময়ালঙ্কার সূত্র' পাঠ করিয়া দেখিলাম; উহাতে বৌদ্ধমতে যোগাচার ও আত্মার স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন—

"ন চ আত্মানম্ অনভ্যুপগচ্ছতা তথাগতদর্শনম্ অর্থবত্তায়াং ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যম্। নচেদং বচনং নাস্তি সর্ব্বাভিসময়সূত্রে অভিধানাৎ।"

বলা বাহুল্য, সর্ব্বাভিসময় বা অভিসময়ালঙ্কার সূত্রের প্রণেতা মৈত্রেয়নাথ খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন; সুতরাং উদ্দ্যোতকর তাঁহার পরবর্ত্তী।

'সংযুক্তনিকায়' বা 'সংযুক্তাগম-সূত্রে'র মত উদ্ধৃত করিয়া উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—

"তথা ভারং বো ভিক্ষবে দেশয়িষ্যামি ভারহারং চ। ভারঃ পঞ্চস্কন্ধাঃ ভারহারশ্চ পুদ্‌গল ইতি। যশ্চাত্মা নাস্তীতি স মিথ্যাদৃষ্টিকো ভবতীতি সূত্রম্।"

আবার 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার' বচন উদ্ধৃত করিয়া উদ্দ্যোতকর আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

"নাস্ত্যাত্মেতি চৈবং ব্রবাণঃ সিদ্ধান্তং বাধতে। কথমিতি রূপং ভদন্ত নাহং বেদনা সংস্কারো বিজ্ঞানং ভদন্ত নাহমিতি। এবমেতদ্ ভিক্ষো রূপং নত্বং বেদনাসংস্কারো বিজ্ঞানং বা নত্বমিতি।"—(ন্যায়বার্ত্তিক, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৩৪।)

উদ্দ্যোতকর বৌদ্ধদর্শনে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে পারিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন—

"যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাং
শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ।
কুতার্কিকাজ্ঞাননিবৃত্তিহেতোঃ
করিষ্যতে তত্র ময়া নিবন্ধঃ॥"

—(ন্যায়বার্ত্তিক, প্রারম্ভ)।

'মহর্ষি অক্ষপাদ জগতে শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত (অথবা সংসার-প্রবাহ নিবারণের জন্য) যে শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কুতার্কিকগণের (দিগ্‌নাগাদির) অজ্ঞান-নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে আমি সেই শাস্ত্রের টীকা (বার্ত্তিক) বিরচন করিলাম।'

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

পূজারী

১

গ্রামের বাহিরে গঙ্গার কূলে পোড়ো-মন্দিরে একদিন আলো জ্বলিতেছে দেখা গেল! গ্রামবাসীদের মনে নানা সন্দেহের উদয় হইল!—কেহ কেহ ভাবিল দেবতার তিরোধানে প্রেত-যোনিরা শূন্য-দেউল আশ্রয় করিয়াছে—তাহাদেরই মুখ-নিঃসৃত অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে। আবার কেহ কেহ ভাবিল—নিরালা স্থান পাইয়া দুর্বৃত্তেরা বৈঠক করিয়াছে,—কিন্তু দুর্বৃত্তেরা আলো জ্বালিবে কেন?

পরদিন প্রভাতে দুএকজন কৌতূহলী গ্রামবাসী সেই পোড়ো-মন্দিরের নিকটে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে আরও বিস্মিত—চমৎকৃত হইল!—সেই বহুদিনের পরিত্যক্ত ভাঙা-মন্দিরটি কেমন পরিপাটিরূপে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে—অথচ সেই মন্দির-জাত বণ্য লতাগুল্মের কোনটি আপনার জন্মস্থান হইতে উন্মূলিত—উৎসাদিত হয় নাই!

বহুদিনের অ-পূজিত দেব-বিগ্রহ ভক্তের পুষ্পচন্দনে চর্চ্চিত হওয়ায় ভাঙা দেউলের পূর্ব্বশ্রী আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে! সেই ভাব-বিভোর ধ্যাননিরত অপূর্ব্বদৃষ্ট ভক্তকে যে দেখিল, তাহারই হৃদয় ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল; কিন্তু আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না।

২

সন্ন্যাসী সংযত-বাক্, কিন্তু তাঁহার সেই আয়ত-নয়নের প্রসন্ন-দৃষ্টিতে যে এক বিচিত্র ভাষা ছিল, তাহা আবাল-বৃদ্ধ সকলেই বুঝিত; এবং হৃদয়ের অন্তস্তলের গুপ্তচিত্র দেখিবার অমোঘ-শক্তি ছিল বলিয়া, সেই সহজ-শান্ত দৃষ্টির নিকট মনের মলিনতা লইয়া কেহ আসিতে পারিত না!

দেবার্চ্চনার পর দিনান্তে সন্ন্যাসী যখন তাঁহার বীণা-যন্ত্রটি লইয়া ভাবাবেশে অর্দ্ধনিমীলিতচক্ষে দেব-বন্দনা-গীত গায়িতে আরম্ভ করিতেন, তখন অতিবড় পাষাণেরও চিত্ত দ্রব হইয়া যাইত। শ্রোতৃবর্গের অনেকেই সে গীতের ভাষা বুঝিত না, কিন্তু তাহার মর্ম্ম তাহাদের হৃদয়ে পৌঁছিত!

এইরূপেই দিন যাইতে লাগিল। গ্রামবাসীদের প্রাণে আবার দেবভক্তি জাগিয়া উঠিল—তাহারা জীর্ণ-মন্দিরের সংস্কার করিতে চাহিল! কিন্তু সন্ন্যাসী প্রশান্ত-দৃষ্টিতে জানাইলেন—না, কাজ নাই; তাহাতে অনেক লতাগুল্মের ধ্বংস হইবে! অগত্যা গ্রামবাসীরা নিরস্ত হইল।

৩

সন্ন্যাসীর বন্দনা-গীত—সে এক অপূর্ব্ব মোহ! যে একবার শুনিয়াছে, সে আবার-না-শুনিয়া থাকিতে পারে না। বন্দনা-গীতের সময় মন্দিরে আর তিলধারণের স্থান থাকে না!—ক্রমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রথমপ্রথম সন্ন্যাসী দেবার্চ্চনার নির্দ্ধারিত সময়ের শেষপর্য্যন্ত অবিচলিত চিত্তে দেবসেবা করিয়া, বীণা-বাদন করিতেন এবং তৎপরে ধ্যাননিরত হইতেন। কিন্তু এই পরিমিত সুধাবৃষ্টিতে সমবেত শ্রোতৃহৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে পারিত না! তাহাদের বাসনা,—সন্ন্যাসীর বন্দনা-গীতের উপর সমাপ্তির দৈনন্দিন যবনিকা যেন কখনও না-পড়ে। জনসঙ্ঘের এই অশরীরী বাসনার নির্ব্বাক্-নিবেদন সর্ব্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর হৃদয়ের দ্বারে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না!

শীতের প্রারম্ভে দিনের পরিসর যেমন তিল তিল কমিয়া কমিয়া নিশার পরিসরকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিয়া তুলে, সন্ন্যাসীর ধ্যান-অর্চ্চনার সময়ও তেমনই দিন দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়া বীণাবাদনের সময়টুকুকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে লাগিল!

৪

সহসা একদিন সন্ন্যাসীর চমক ভাঙিল!—হায় হায়, তিনি কি করিতে কি করিয়া বসিয়াছেন!—পূজার পাঠ তুলিয়া দিয়া গানের-ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন!—তিন দিন দেবসেবা হয় নাই—পূজার-ফুল দেবতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া শুখাইয়া গিয়াছে! দেবতার বন্দনা গায়িতে গিয়া ভক্তবৃন্দের প্রীতির-পুষ্পে তিনি নিজের পূজা করিয়াছেন! আত্মগ্লানিতে সন্ন্যাসীর হৃদয় ভরিয়া উঠিল—পাগলের মত হইয়া তাড়াতাড়ি সেই বীণাটি লইয়া চুরমার্ করিয়া ফেলিয়া দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন,—"কি হ'ল দেবতা!—কি করলুম!"

মূর্চ্ছাপগতে সন্ন্যাসীর বদন—ধীর, প্রশান্ত! মনের বেদনা কে যেন ধুইয়া দিয়াছে!—কে যেন তাঁহাকে বলিয়া

গিয়াছে "অবোধ !—কিসের বেদনা ?—কেন বীণা ভাঙ্‌লি? শুধু পাথরের ভিতর আমায় পূরে রাথার চেয়ে আমায় বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলি—ভালইত ক'রেছিলি !—সর্ব্বজীবে প্রীতি—বিশ্বের তৃপ্তি—সেত আমারই পূজা—!"

*   *   *

বীণা ভাঙিয়াছে—সন্ন্যাসীও নাই !—কেবল আঁধারে আকাশে বাতাসে মাঝে মাঝে একটা গীতাংশ ভাসিয়া উঠে—

"ভেঙ্গেছে সোণার বীণা, ছিঁড়েছে সকল তার,
শতসাধনায় বীণা বাজেনা—বাজেনা আর !"

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

বসন্তে

সরসবসন্ত- বিলাস-পুলকিত
সুশীতল যমুনাক কূল।
গুঞ্জৎ মধুকর চুম্বন-চকিত
মঞ্জুল মাধবীমুকুল।

কোমল মলয়ানিল, মৃদু মৃদু কম্পিত
শ্যামল ললিত তমালে,
বিনোদ লতাবলী বিলোল বিলম্বিত
সুন্দর নবফুলজালে।

কালিন্দী কুলু-কুলু কল-কল-কল্লোল
ছল-ছল-উছল-তরঙ্গ,
কোকিল কুহুকুহু মুহুগীতিহিল্লোল,
মনোমাঝে মনোভব-রঙ্গ।

দশদিশি উজ্জ্বল, চন্দ্রমা ঝলমল
মুগ্ধ মধুর পূরণিমা,
নব-বৃন্দাবন, ত্রিভুবন-নন্দন,
নন্দন মাধবীগরিমা।

শোভন উপবন, মাধব রূপবন
সৌরভ-আমোদিত কুঞ্জ,
চিত-প্রহ্লাদন ঘন-বেণুবাদন
মঞ্জীর মধুকরগুঞ্জ।

ঘন-ঘন-নর্ত্তন, সঘন-আবর্ত্তন,
কিশোরী-কিশোর দুঁহু মেলি,
মত্ত সখীজন, ফল্গু-বরিষণ
অপরূপ সুধারসকেলি।

আকুল বনমাল, বিগলিত কুন্তল,
অঙ্গ বিরাজত অঙ্গে,
অধর বিহসিত দোদুল কুণ্ডল,
মনোহর নটন বিভঙ্গে

ঢল-ঢল লোচন, হরষ-সুরঞ্জিত,
ছল-ছল নয়ন-আসার,
ভৃঙ্গ ভকতজন, চির-চিত-বাঞ্ছিত
হরিপদে করু অভিসার।

রাধা-মাধব-লীলা, চির-প্রেমসাগর,
অপরূপ উছাস অতুল,
মাগত দীনজন চরণ কমলবর
তুলহ সুখলাভ মূল।

শ্রীমুনীন্দ্র নাথ ঘোষ।

আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ
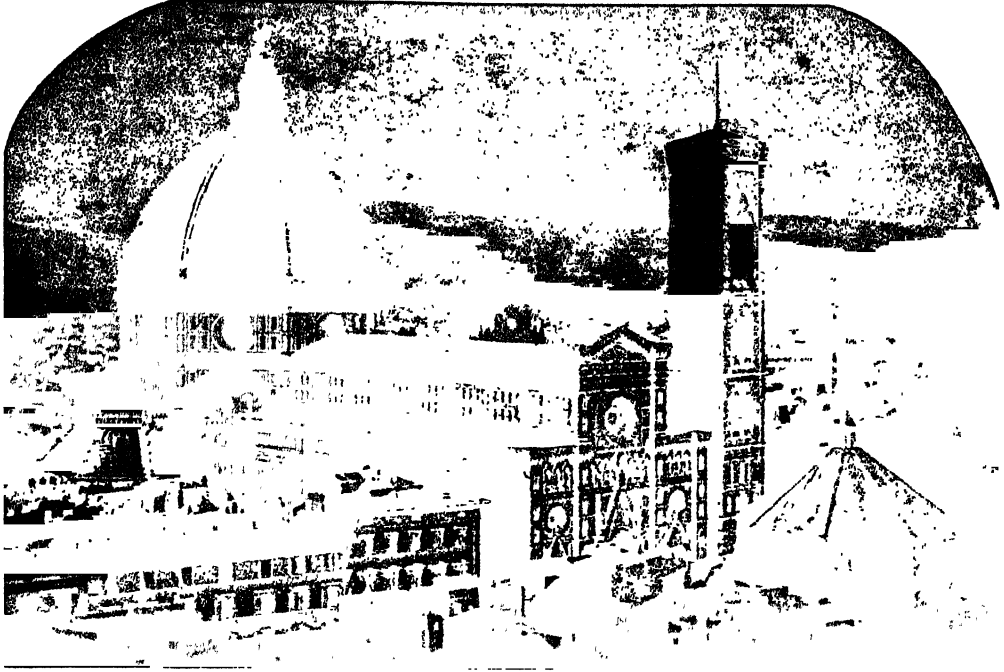
ফ্লোরেন্সের সাধারণ দৃশ্য

(আর্ণল্‌ফোডি ক্যাম্বিও-কর্ত্তৃক ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত 'দুয়োমো'; এবং 'লা কাতাদ্রাল্‌ দি সান্তা মারিয়া দেল্‌ ফিয়োর্')

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফ্লোরেন্স্‌

এইবার আমরা ফ্লোরেন্সে যাইতেছি। রোম ত্যাগ করিবার সময় মনে কত কথা উদিত হইল। অল্প সময়ের মধ্যে রোমের কিছুই দেখিতে পাইলাম না! আবার কবে এখানে আসিতে পারিব, জীবনে আর এখানে আসিতে পারিব কি না,—কে জানে! রোমের ষ্টেশন্‌ হইতে যখন গাড়ী ছাড়িয়াছিল, তখন গাড়ীর মধ্য হইতে নগরের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে সে দৃশ্যও আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল; তখন পল্লীগুলির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

ফ্লোরেন্স্‌ সহরের কথা কত পড়িয়াছি। কবিবর শেলি তাঁহার সুন্দর কবিতায় ফ্লোরেন্স্‌ সহরকে অমর করিয়া গিয়াছেন; সেই কবিতা পুনঃপুনঃ আমার মনে হইতে লাগিল। আজ আমরা সেই ফ্লোরেন্স দেখিব।

যখন আমরা রোম পরিত্যাগ করি, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল; একটু অগ্রসর হইলেই বৃষ্টি থামিয়া গেল। আমরা যে গাড়ীতে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে গাড়ী অনেক রাত্রিতে ফ্লোরেন্সে পৌঁছিল; সুতরাং আমরা অনতিদূর হইতে সহরের দৃশ্য দেখিতে পাইলাম না; পথের মধ্যেও তেমন বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই ছিল না। রেলপথ কিছুদূর টাইবার্‌ নদীর তীর দিয়া অগ্রসর হইল। তাহার পরই আমাদের গাড়ী ট্রাসিমেনো (Trasimeno) হ্রদের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। এই হ্রদের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর খৃষ্টের জন্মের দুইশত সতর বৎসর পূর্ব্বে হ্যানিবল্‌ রোমীয় সৈন্যগণকে পরাজিত ও নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।

রাত্রিতে ফ্লোরেন্সে উপস্থিত হইয়া আমরা হোটেলে গমন করিলাম। পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; সুতরাং হোটেলে আমাদের কোন প্রকার অসুবিধাই হইল না। এই হোটেল্‌টি একেবারে আর্ণো নদীর উপরে অবস্থিত। আমরা যে সময়ে ফ্লোরেন্সে গিয়াছিলাম, তখন নদীতে

অধিক জল ছিল না। রাত্রিতে আর কোথায় যাইব? আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

প্রাতঃকালেই আমরা নগরদর্শনে বহির্গত হইলাম। আমরা দেখিলাম, এই নগরের অট্টালিকা সকল সেই পূর্ব্ব-আমলের ধরণেই নির্ম্মিত; বর্ত্তমান সময়ের স্থাপত্যের নিদর্শন এ নগরে বড়অধিক দেখিতে পাইলাম না। আমরা ভারত-বাসী; আমাদের দেশের নদীসকল যেমন প্রশস্ত, তেমনই বেগবতী; আমাদের দেশের নদীসকলের সহিত তুলনা করিলে য়ুরোপের বড় বড় নদীগুলিকেও নদী বলিয়াই মনে হয় না। এই ফ্লোরেন্সের পার্শ্ববাহিনী আর্ণো নদী ইটালীর মধ্যে একটি প্রধাননদী বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু এই নদী আমাদের ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থিত গঙ্গার খালের অপেক্ষা প্রশস্ত নহে। আর্ণোনদী ফ্লোরেন্স্ নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; এই নদীর উভয় তীরেই ফ্লোরেন্স্ নগর। ফ্লোরেন্সের প্রধান দৃশ্য 'লা কাতাদ্রাল্ দি সান্তামারিয়া দেল ফিয়োর' (La Cattadrale di Santa Maria del Fiore) মন্দির। ইহা মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং ইহা দেখিলে পুরাতন স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্যসত্যই এই মন্দিরের গঠন এবং ইহার কারুকার্য্য বড়ই সুন্দর। তবে ইহার বাহিরের সৌন্দর্য্য যেমন মনোহর অভ্যন্তরভাগে তেমন সৌন্দর্য্যের সমাবেশ নাই; সে বিষয়ে রোমের সেন্ট্‌পিটারের মন্দির অনেকগুণে উৎকৃষ্ট। এই মন্দিরের চত্বরে কএকটি সমাধিস্তম্ভ ও কতকগুলি সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে; এতদ্ব্যতীত সেখানে আর কিছুই নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এই স্থানটি আমার বড়ই ভাললাগিল; কারণ, ভজনালয় ও মন্দিরের জাঁকজমক অধিক হইলে, তাহা ঐশ্বর্য্য ও বিলাসেরই পরিচয় প্রদান করে; কিন্তু ভজনালয় যদি সাদাসিদে রকমের হয়, তাহার মধ্যে যদি ঐশ্বর্য্যের গরিমা প্রকাশের চেষ্টা না থাকে, তাহা হইলে তাহার পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য হৃদয়কে অবনত করে। রোমের সেন্টপিটার্ মন্দির দেখিয়া মনে যতটা পবিত্রতার উদয় না হইয়াছিল, এখানকার এই মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ দেখিয়া তাহার অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। আমরা যখন এই মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন মন্দিরের মধ্যে উপাসনা হইতেছিল। উপাসনার শেষে যে গানটি হইল, তাহা শুনিতে বড়ই ভাল লাগিল।

এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা ক্যাম্পানাইল্, (Campanile) বা ঘণ্টামন্দির, দেখিতে গেলাম। এটিও অতি সুদৃশ্য মন্দির। শুনিতে পাওয়া যায় যে, মহাবীর নেপোলিয়ন্ যখন ইটালীর এই অংশ জয় করিতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি ফ্লোরেন্সের এই মন্দিরটি দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে আমি

ক্যাম্পানিল্ বা গিয়োটোর টাওয়ার্
(গিয়োটোর হস্তরচিত মনোহর কারুকার্য্যখচিত কেথিড্রাল্-সংলগ্ন ক্যাম্পানিল্ বা ঘণ্টা-মন্দির)

এই সুন্দর মন্দিরটি উঠাইয়া পারিস্ নগরে লইয়া যাইতাম, এবং ইহাকে সেখানে একটা কাচের ঘরের মধ্যে বসাইয়া রাখিতাম।" এই মন্দিরের সম্মুখেই, রাস্তার অপরপারে, আর একটি ছোটমন্দির আছে; ইহা পূর্ব্বে রোমীয় 'মার' দেবতার মন্দির ছিল; তাহার পর খৃষ্টানেরা ইহাকে উপাসনালয়রূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই মন্দিরের পিত্তল-নির্ম্মিত কবাটে বাইবেলোক্ত ঘটনা সকলের চিত্র খোদিত আছে। ইটালীর প্রধান ভাস্করদ্বয় 'এণ্ড্রিয়া চাইসানো' ও 'ভিটোরিয়ো ঘিবাবটি' যথাক্রমে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই চিত্রগুলি খোদিত করিয়াছিলেন।

করিয়া মারা হয়। ধর্ম্মের জন্য সে সময়ে যেসকল নৃশংস কার্য্যের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদ্‌কম্প হয়। এই স্থান হইতেই আমরা ফ্লোরেন্সের চিত্রশালা দর্শন করিতে গেলাম; এখানে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। র‍্যাফেল্, তিসিয়ান্, রুবেন্স্, রেম্‌ব্রান্ত, ভেলাস্‌কেজ্ প্রভৃতি অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকরের অসামান্য চিত্র সকল দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যাহারা চিত্রের সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহারা হয় ত এই স্থানে আসিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই স্থানান্তরে চলিয়া যায়, কিন্তু যাহার দেখিবার মত চক্ষু আছে, সে অল্প সময়ের মধ্যে এই স্থান দেখিতে পারে না,—এক
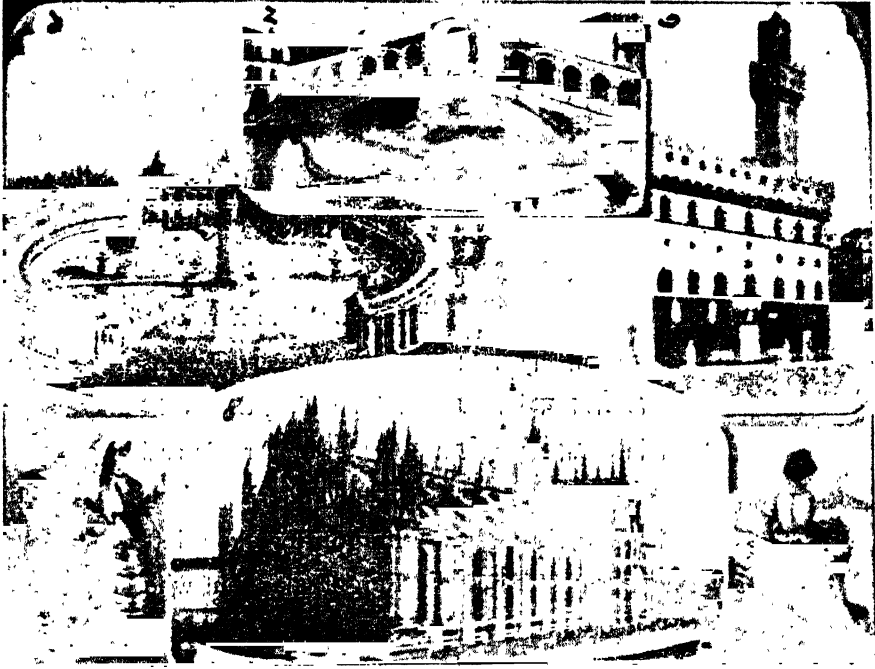
ইতালীর বিভিন্ন স্থানের চিত্র চতুষ্টয়

(১—রোমের সেন্টপীটারের মন্দির ; ২—ভিনিসের রিয়াল্টো-সেতু ; ৩—ফ্লোরেন্সের পিয়াজ্জা দে লা সিনোরিয়া ; ৪—মিলানের গম্বুজ)

এই স্থান হইতে আমরা প্যালাজ্জো ভেশিয়ো (Palazzo Vecchio) প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা অতি-পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ ছিল, এখন ইহা ফ্লোরেন্সের 'টাউন্‌হল্'। ইহারই নিকট পিয়াজ্জা দে লা সিনোরিয়া (Piazza della Signoria) নামক ভ্রমণ-স্থান। এই ভ্রমণস্থানের মধ্যে একখানি তাম্রফলক আছে; তাহাতে লেখা আছে যে, সেই স্থানে স্পেন্‌দেশীয় ধর্ম্মযাজকগণের আদেশে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে (Savonarola) সাভোনারোলাকে দগ্ধ

একখানি চিত্র দেখিতেই তাহার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে পারে। এই চিত্রশালায় যে অনেকগুলি চিত্রই রক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে, এখানে পুরাকালের অনেক মহার্ঘ্য দ্রব্য সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে। ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রভৃতি এই সকল হইতে অনেক তথ্যসংগ্রহ করিতে পারেন। এই সকল দেখিতে দেখিতেই বেলা হইয়া গেল; আমরা তখন হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

অপরাহ্ণ কালে আমরা সান্তা ক্রোসি (Santa Croci)

নামক সুন্দর প্রাসাদ দেখিয়াছিলাম। কবিবর বাইরণ্ এই সান্তা ক্রোসিকে তাঁহার 'Childe Harold's Pilgrimage'এ অমর করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বাইরণের কবিতা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদেরই স্মরণ আছে—

"In Santa Croces's holy precincts lie
Ashes which make it holier.—" ইত্যাদি।

অপরাহ্নকালে আমরা আর অধিক ভ্রমণ করিতে পারিলাম না। সান্তা ক্রোসি দেখিবার পর আনান-জিয়াটার গির্জ্জা ও ফ্লোরেন্সের হাট-বাজার, দোকান প্রভৃতি দেখিয়াই হোটেলে চলিয়া আসিলাম।

পরদিন রবিবার। আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়াই ঘোড়দৌড়ের মাঠ দেখিয়া সাধারণের ভ্রমণ-স্থানে গেলাম। রবিবার ছুটীর দিন; এ দিনে কাহারও কোন কাজকর্ম্ম নাই। সকলেই ভাল পোষাকপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সহরের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। আমরাও সেই দলে যোগদান করিলাম।

আজ প্রাতঃকালে আমাদের একটা বিশেষ কাজ ছিল। এই ফ্লোরেন্স্ নগরে কোলাপুরের মহারাজ রাম ছত্রপতির সমাধি আছে। আমরা আজ সেই সমাধি-দর্শন করিতে যাইব বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলাম। ক্যাসিসইনের এক প্রান্তে আর্ণোনদীর তীরে মহারাজের সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাজ রাম ছত্রপতি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপ ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। ভ্রমণ শেষ হইলে তিনি যখন দেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে ফ্লোরেন্সে আসিয়া তিনি পীড়িত হন এবং এই স্থানেই নিউমোনিয়া রোগে ঐ অব্দের ৩০এ নবেম্বর তারিখে প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর মাত্র। এই নবীন বয়সে নির্ব্বান্ধব স্থানে ভারতের একজন মহারাজ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহারই সমাধিমন্দির দেখিবার জন্য আমরা যাত্রা করিলাম। আমরা মনে করিয়াছিলাম, হয় ত বা এ দেশের লোকের রুচি অনুসারেই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে; কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলাম, সমাধি মন্দিরটি আমাদের দেশের মন্দিরেরই মত। এই সুদৃশ্য ক্ষুদ্র মন্দিরের মধ্যে মহারাজ-বাহাদুরের একটি প্রস্তরময়মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানে যাইবার পূর্ব্বেই আমি আমার ভৃত্যদিগকে বলিয়া গিয়াছিলাম যে, তাহারা যেন কএকটি ফুলের মালা ও স্তবক সংগ্রহ করিয়া সেই স্থানে যায়। আমি আমার স্বদেশবাসী মহারাজের সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইয়াই সেই পুষ্পমাল্য প্রস্তরমূর্ত্তির গলায় পরাইয়া দিলাম এবং স্তবকগুলি মূর্ত্তির নিম্নে রক্ষা করিলাম। সে সময় আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ করিব! একুশবৎসর বয়সে মহারাজা য়ুরোপ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন; কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত বাসনা তাঁহার মনে ছিল; কিন্তু নিয়তি তাঁহাকে এই নবীন বয়সেই কোথায় সরাইয়া লইয়া গেলেন। এই দূরদেশে বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে তাঁহার দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। আমি কোনদিন কবিতা লিখি নাই, সে শক্তিও আমার নাই। তবুও সেইদিন এই সমাধি স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া আমি একটি ইংরেজি কবিতা লিখিয় ছিলাম। হৃদয়ের আবেগে আমি সেসময় যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা আমি নষ্ট করিয়া ফেলি নাই। আমার একটি বন্ধু সেই কবিতাটির বঙ্গানুবাদও করিয়া দিয়াছেন। আমি সেই ইংরেজি কবিতা ও তাহার বঙ্গানুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

No courtiers here thy beck obey,
No beauteous Queens here grace thy side,
Alone, alas, thy ashes stay,
Alone, by Arno's rushing tide.
The wandering winds thy fate bemoan
Forgot, forsaken, left alone.
Forgot, alas, but wherefor mourn
Since such is life, O lonely Chief!
Though thou in life's sweet prime wast torn,
Torn by that cruel, heartless thief,
That thief whom mortals 'Teacher' call,
The Fate that teacheth truth to all.
Thy heart I ween, was filled with love;
With youthful hopes, ambitions high,
What time thy Spirit soared above,
And bade this weeping earth good-bye.
Obeying Him Who thee did call
Perchance to beautify His Hall.

Ah ! Life is but a mocking dream
Fraught with vexation, pain and grief :
And Good and Evil ever seem
Commingled in it, Indian Chief !
What lies beyond—Ah who can tell ?
My countryman, Farewell, Farewell !

(অনুবাদ)

আজ্ঞাবহ অনুচর নাহি কেহ হেতা,
রূপসী রাণীরা আজি নাহি তব পাশে,
ভস্মশেষ একা তুমি, রাজকুল-নেতা !
শিথানে বহিছে আর্ণো উন্মদ উচ্ছ্বাসে !
গায়িতেছে শোকগাথা উদাসী পবন,
বিস্মৃত, বান্ধবত্যক্ত—মরণ-মগন !

বিস্মৃত ! কি খেদ তাহে ? জীবনের গতি
এমনি ত চিরদিন—এ ছার-সংসারে,
ঝঞ্ঝাছিন্ন পুষ্প-সম—ওগো নরপতি !
অকালে জীবনশেষ কালের প্রহারে।
চোর-রূপী মহাকাল—ভাগ্য-নিয়ামক,
সত্যশিক্ষা দেয় নরে, সে মহাশিক্ষক।

কত আশা ভালবাসা, কত কল্পনায়,
পরিপূর্ণ ছিল যবে কোমল পরাণ,
সহসা ফুরাল স্বপ্ন—লইলে বিদায়
ব্যথিতা ধরণী কাছে, করিলে প্রয়াণ
মহেন্দ্র-মন্দির পানে, তারি আবাহনে—
সাজাতে সে পুণ্যধাম—অমৃত-কিরণে।

বিড়ম্বনাময় এই মানব-জীবন,
শোক-দুঃখ যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ নিরন্তর,
ভাল-মন্দ আলো-ছায়া একত্র মিলন,
কে বুঝিবে এ রহস্য ওহে মহাজন !
কি আছে এ সিন্ধুপারে ? কে বলিবে হায় !
হে মোর স্বদেশবাসী, বিদায়, বিদায় !

আমি যখন মহারাজের সমাধির উপর পুষ্পরাশি স্থাপিত করিতেছিলাম, তখন ঐ দেশের অনেকগুলি লোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল। আমার কার্য্য দেখিয়া ভক্তিভরে তাহারা মস্তকের টুপি খুলিয়া ফেলিল এবং সকলেই অবনত মস্তকে আমার এই কার্য্যে যোগদান করিল। কাহারও মুখে একটি কথা নাই ; হঠাৎ সকলেরই হৃদয় যেন বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইল। তাহাদের এই ভাব দেখিয়া, আমি বড়ই প্রীতি অনুভব করিলাম।

আর একটি কথা বলিয়াই আমার ফ্লোরেন্স্-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শেষ করিব। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রাম ছত্রপতি ফ্লোরেন্সে আসিয়া, আমি যে হোটেলে ছিলাম সেই হোটেলেই ছিলেন এবং শুনিলাম আমি হোটেলের যে কক্ষটিতে অবস্থান করিয়াছিলাম, তিনিও সেই কক্ষেই ছিলেন এবং সেই কক্ষেই তাঁহার জীবনদীপ-নির্ব্বাপিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয় চন্দ্ মহ্তাব্।

নালন্দায় চীন-ভিক্ষু

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে হইলে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে তিনটি মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সেই মূর্ত্তিত্রয় যেন কোন অপূর্ব্ব প্রাসাদ-দ্বারের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তাহার সর্ব্বপ্রথম মূর্ত্তি, 'ফা হীয়েন্'। দ্বিতীয় মূর্ত্তি তৎপশ্চাতে, তাঁহার নাম 'সুঙ্গ-ঈয়ুন্'। তৃতীয় মূর্ত্তি, 'য়ুয়ন্-চয়ঙ্'—ইনি আরও পশ্চাতে। ইঁহারা যে সময়ে জীবিত ছিলেন, দেশের তৎকালীন রীতি-নীতি লোকচরিত্র সামাজিক চিত্র স্থান মাহাত্ম্য রাজনীতিক রহস্য নরপতিগণের বিবরণ প্রভৃতির কিয়দংশ তাঁহাদিগের পুস্তকাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু তাঁহারা বৈদেশিক আক্রমণে বারংবার উৎপীড়িত হইলে, বোধ হয় আমরা তাঁহাদের নামের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতাম কি না সন্দেহ। তাঁহাদের বিবরণী-বিবৃত প্রাচীননামগুলির সহিত বর্ত্তমাননামের বহুল পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু তাহাদের ভৌগোলিক বিবরণও বর্ত্তমান বিবরণের সমতুল্য নহে। এই সমুদায় অসুবিধার প্রতিবিধান করিতে হইলে, গভীর গবেষণার আবশ্যক। যে ফা-হীয়েন্ ১৫১৫ বৎসর পূর্ব্বে (৩৯৯ খৃষ্টাব্দে) বিবিধ দেশ-পরিভ্রমণ করিয়া, অবশেষে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ভারতভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; তিনি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র, সন্দেহ নাই। যাঁহার বিবরণীপাঠ করিয়া আমরা ভারতের বহুতথ্য অবগত হইতেছি, তাঁহার বাসভবন কোথায়, একথা কাহার না জানিবার ইচ্ছা হয়? অনেকেই জানেন, তাঁহার পিতৃ-ভবন চীনদেশে; কিন্তু তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইল না। তাঁহাকে আমরা ফা-হীয়েন্ বলিয়া জানি; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব-নাম যে কি ছিল, তাহা জানিবার জন্য কেহই সমুৎসুক নহেন! অনেক সময় তাঁহার বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতপরিচয় যথাসময়ে প্রদান করিবার অবকাশ কাহারও ঘটিয়া উঠে নাই। এক্ষণে আমরা সেই পরিব্রাজকত্রয়ের যথাসম্ভব পরিচয় যথাক্রমে প্রদান করিয়া, পরে আমাদের আলোচ্য বিষয় আলোচনা করিব।

ফা-হীয়েন্ একজন চীন-পরিব্রাজক, যতি এবং পুরোহিত। চীনদেশে একটি অতীব আশ্চর্য্য প্রথা প্রচলিত আছে। কোন চৈনিক, যতি বা পুরোহিত হইতে ইচ্ছা করিলে, গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, "শাক্যপুত্র" নামে অভিহিত হইতে হয়। এই প্রথা পুরাকালাবধি চলিয়া আসিতেছে। এই 'শাক্যপুত্র' শব্দের অর্থ—শাক্যপুত্রস্থানীয়, অথবা শাক্য-শিষ্য। মথুরার অনুশাসনে দৃষ্ট হয়, শাক্যপুত্র শব্দের অর্থ 'শাক্যভিক্ষুণ্যাক', অথবা 'শাক্য-ভিক্ষু'।* বলা বাহুল্য, এই কয়টি শব্দ একই অর্থবাচক। ফা-হীয়েন্ বাল্যকালে 'কুং' (Kung) নামে অভিহিত হইতেন। অতঃপর তিনি পূর্ব্বোক্ত কারণে "সীহ্", অথবা "শাক্যপুত্র", নামগ্রহণ করেন। তাঁহার বাসভবন "উ-ঈয়াঙ্" বা "হ্বূ-ঈয়েঙ্গ্" নামক স্থানে ছিল; ইহা 'শ্যান্‌চী' প্রদেশের 'পিং-ঈয়াঙ' জেলায় অবস্থিত। তিনি অতি শৈশবে, তিনবৎসর বয়ঃক্রমকালে, গৃহত্যাগ করেন। "কো-সাং-চুয়েন্" নামক গ্রন্থে তাঁহার বাল্যজীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত পুস্তক, তদ্দেশের 'লীয়াঙ্' বংশের রাজত্ব-সময়ে লিখিত; এই বংশ 'শূ'-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। প্রবাদ আছে যে, শৈশবকাল হইতেই তাঁহার গ্রন্থাদির প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছিল। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকপঠন-লালসা বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—যে যেরূপ চিন্তা সতত অন্তরে পোষণ করে, তাহার তদনুরূপ কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ ঘটে।

তাঁহার জীবনে এই দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি যে আশাতরু আশ্রয় করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ শাখাপ্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া বিশাল-বিটপীতে পরিণত হইয়াছিল; যথাসময়ে তাহা ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া বহুব্যক্তিকে বিমোহিত করিয়াছিল। কতিপয়

---

* ARCHOLOGICAL SURVEY OF INDIA, Vol. III, pp. 37, 48; also PROF. DOWSON, J.R.A.S., N.S, Vol. V. pp. 182 ff.

পুরোহিতের সঙ্গে তিনি দেশ-পরিভ্রমণে বহির্গত হ'ন। চতুর্দ্দশ বৎসর এইরূপ বহুশারীরিক ক্লেশসহ্য করিয়া তিনি 'নান্‌কিনে' প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় 'বুদ্ধভদ্র' নামক বুদ্ধদেবের বংশীয় একজন শ্রমণের সাহায্যে বহু-ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করিয়া এবং স্বীয় পরিভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া ষড়শীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিভুনির্দ্দিষ্ট মার্গে চির-প্রস্থান করিলেন!

অতঃপর সুঙ্গ্-ঈয়ুন্ নামে একজন চৈনিক পরিব্রাজক ৫১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে শুভাগমন করেন। চীনদেশ ইঁহার প্রকৃত বাসভূমি নহে। ইনি 'তান্-হ্যাঙ্' নামক স্থানের অধিবাসী। ঐ স্থান ক্ষুদ্রতিব্বতের অন্তর্ভুক্ত। মানচিত্রের অক্ষরেখার ৩৯° ডিগ্রী ৩৭ মিনিট উত্তর এবং দ্রাঘিমার ৯৫° ডিগ্রী পূর্ব্বে ইহা অবস্থিত। পরিব্রাজক সুঙ্গ্-ঈয়ুন্ 'লো-ঈয়ুঙ্গ্' (হোনান্ ফু) নামক নগরোপকণ্ঠে বাস করিতেন। ঐ স্থানের অপর নাম 'হ্বান্-আই'। ইনি ৫১৮ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহার্থে উত্তর-'হ্বইঈ' বংশের অজ্ঞাতনাম্নী সম্রাজ্ঞীদ্বারা নিযুক্ত হইয়া পশ্চিম-প্রদেশে গমন করেন। 'হোয়েঈ-সাঙ্গ্' নামক 'শুঙ্গলী' দেবমন্দিরের একজন ভিক্ষু তাঁহার অনুগমন করেন। ঐ মন্দিরটি ক্ষুদ্র-তিব্বতের অন্তর্ব্বর্ত্তী 'লো-ঈয়ুঙ্গ্' নামকস্থানে অধিস্থাপিত। প্রাগুক্ত ব্যক্তিদ্বয় মানবোৎকর্ষোপযোগী আর্যবাক্যপূর্ণ এক শতসপ্ততিসংখ্যক বৃহদ্ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় সংগ্রহ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। ইঁহারা দক্ষিণমার্গ গ্রহণ পূর্ব্বক 'তান-হ্বোয়াঙ্গ্' হইতে খোটানাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। অতঃপর তাঁহারা ভ্রমণকারী ফা-হীয়েন্-গৃহীত পন্থাবলম্বনপুরঃসর ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

ইঁহার লিখিত বিবরণ হইতে আমরা ভারত-সংক্রান্ত বহুবিষয় জানিতে পারি; তজ্জন্য সকলেই কৃতজ্ঞ। তবে এখানে একটি বিষয় প্রকাশ করিলে, অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। বহুভ্রমণকারীর নিকট হইতে প্রচুরতথ্য সংগৃহীত হইতে পারে; কিন্তু সকলগুলিই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অথচ, তন্মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই, ঐ সকল তথ্য অগত্যা গ্রহণ করিতে হয়।

তৃতীয় চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চয়ঙ্ *। ইঁহার নিকট ভারতবাসী বিশেষভাবে ঋণী। ইনি যে উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপ্রসূ ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। হুয়েন্থ সাঙ্গ্ ভারতে ধর্ম্মশিক্ষার্থে বিদ্যার্থী-রূপে আগমন করেন। 'নালন্দা'-বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে প্রকার অভিনিবেশ সহকারে ছাত্রোচিত শিক্ষালাভে বিনিযুক্ত ছিলেন, তাহার ফলে জগদ্‌বাসীকে তিনি এক মহার্হ রত্ন প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার যাহা শিক্ষা, তাহা ভারতেই হইয়াছে বলিতে হইবে। শিক্ষা-লাভেচ্ছা যাঁহার ঈদৃশী বলবতী তাঁহার আশাপূর্ণ না হইবে কেন? আজকাল পথিকগণের পথক্লেশ অনুভবই হয় না; কারণ, অধুনা নানাবিধ শকটাদির সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে সেসকল সুযোগ প্রাপ্ত হইবার উপায় ছিল না; সুতরাং বাধ্য হইয়া পদব্রজে দুরারোহ স্থানসমূহ অতিক্রম করিতে হইত। মধ্যে মধ্যে বন্যজন্তুর প্রবল-তাড়নায়, কুত্রাপিবা অসভ্যজাতির উৎপীড়নে, সেই সকল স্থান এক প্রকার মানবগমনের অযোগ্য হইয়া পড়িত। এবম্প্রকার বহুঅসুবিধা ভোগ করিয়া তাঁহাকে কত নদনদী-পর্ব্বত উপত্যকা অধিত্যকা উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন

* যাঁহাকে আমরা সাধারণতঃ 'হুয়েন্ সঙ্', 'হয়েন্থ সাঙ' ইত্যাদি নামে আখ্যাত করিয়া থাকি তাঁহার প্রকৃত নাম "য়ুয়ন্-চয়ঙ্"। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটার্স্ (Watters) সাহেব দুই খণ্ডে 'য়ুয়ন্-চয়ঙে'র এক সুন্দর অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার ন্যায় গ্রন্থ, পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ, ওয়াটার্সের মত চীনভাষায় সুপণ্ডিত, পূর্ব্বে য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ইনি সবিশেষ যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, 'য়ুয়ন্ চয়ঙে'র নামে সকলে, ভ্রান্তবর্ণযোজনা করিয়া থাকেন। যথা,—

(১।২) JULIEN ও WADEএর মতে ইঁহার নাম, Hiouen Yhsang.

(৩) MAYERSএর মতে, Huan Chwang.
(৪) WYLIEর মতে, Yuen Chwang.
(৫) BEALএর মতে, Hiuen Tsiang.
(৬) LEGGEর মতে, Hsüan Chwang.
(৭) NANJIORর মতে, Hhüen Kwan.
(৮) RHYS DAVIDএর মতে, Yüan Chwang.

(৯) V. A. SMITHএর মতে, Hiuen Tsang ইত্যাদি; কিন্তু, ঐগুলি চীনভাষার বৈয়াকরণ-রীতিবিরুদ্ধ। ওয়াটার্সের বানানই সর্ব্বথা গ্রহণীয়।—ভাঃ সং

করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। মনের, প্রবল বাসনা না হইলে, ঈদৃশ কষ্টকৃচ্ছ্র কার্য্য কেহ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার ধর্ম্মলাভেচ্ছা সকলেরই অনুকরণীয়! এই প্রখ্যাতজন্ম-পুরুষ খৃষ্টীয় ৬০৩ সালে 'হোলান্' প্রদেশের 'চীন্-লিউ' নামক স্থানে জন্মপরিগ্রহ করেন। এইস্থান একপ্রকার সহরতলী বলিলেই হয়। তিনি সহরের অধিবাসী হইয়াও এবংবিধ উন্নতচেতা হইয়াছিলেন তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সাধারণতঃ, সহরের জনগণ যে অল্পাধিক হীনমস্তিষ্ক ও ধর্ম্মজ্ঞানপরিশূন্য হইয়া পড়ে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু তিনি সেরূপ হ'ন নাই। ঐরূপ হইবারও অনেকগুলি কারণ আছে।

নালন্দার বিশ্ব-বিদ্যালয়টি যে কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। তখন ভারতবাসিগণ, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জগদ্‌বাসীর নিকট আপনাদের খ্যাতিপ্রতিপত্তি পরিবর্দ্ধনেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া—শারীরিক, মানসিক আধ্যাত্মিক—কোন বিষয়েই কবিত্ব প্রদর্শন করিয়া অভিমান পরিবর্দ্ধনে যত্নবান্ হইতেন না।—ইহা দোষ কি গুণ তদ্বিষয়ের আলোচনা আমরা করিব না। তবে একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় 'তিলকে তাল' করিবার প্রথা প্রাচীনকালে ছিল না। যাহা হউক, প্রাগুক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে সিদ্ধ হইবার সময়-নিরূপণ কোন প্রকারে করা যাইতে পারে; নিম্নে তাহার হেতুবাদ প্রকটিত হইতেছে। মহারাজ শিলাদিত্য, অধ্যাপক শিক্ষক ও বিদ্যার্থিগণের পরিধেয়-বসন আহার-পাথেয় ঔষধ ও অপরাপর, ব্যয়াদির ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমুদায়কার্য্য পরিদর্শন ও নির্ব্বাহ করিবার জন্য যথোপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগও করিয়াছিলেন। মহারাজ শিলাদিত্য ৬০৬ হইতে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব, তাঁহার সময়ে যে উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ উন্নতাবস্থা ছিল, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎকালে নালন্দা-বিশ্ব-বিদ্যালয় ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। বৌদ্ধদিগের অষ্টাদশটি ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। তন্মধ্য হইতে দশসহস্র বিদ্যার্থী শ্রমণ বা সমণের চারিতল-যুক্ত ষষ্ঠসংখ্যক সুবৃহৎ অট্টালিকায় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কেবল যে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়ই শিক্ষণীয় ছিল, তাহা নহে।—ভারতবর্ষের সমগ্র বিদ্যার অধ্যয়ন এবং পর্য্যালোচনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইত। তন্মধ্যে বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, সাংখ্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বহুশাস্ত্রের সমধিক আলোচনা হইত।—ভারতবর্ষভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য বহুস্থান হইতে বিদ্যার্থিগণ আগমন করিত।—ছাত্রগণের যোগ্যতানুসারে কেহ ছয়, কেহ সাত, কেহ বা বিশ, পঁচিশ বর্ষ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। শুনা যায়, বহু যতি ও ব্রহ্মচারী এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া যাবজ্জীবন ধর্ম্মালোচনায় এবং অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপদেশ-প্রদান করিবার জন্য শতাধিক গৃহ ছিল। তথায় অধ্যাপকগণ ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। এতদ্‌ভিন্ন বহুস্থান হইতে বহুশাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণের শুভাগমন হইত; তাঁহাদিগের সঙ্গে অধ্যাপকগণের শাস্ত্রালোচনা ও তর্কবিতর্কের জন্য, বহুসংখ্যক সুবিশাল গৃহ সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইত। বর্ত্তমান সময়ের একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন—"পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল জনগণ ভারত-পরিদর্শনে আগমন করিতেন, তাঁহারা সকলেই দ্রষ্টব্যস্থানগুলির সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত নগরগুলি পরিদর্শন না করিয়া হিন্দুস্থান ত্যাগ করিতেন না। 'সাবত্থী' যাহাকে 'স্বেতাব্য' বলে, 'কপিলাবস্তু' 'কুশীনগর' 'পাবা' 'হাতীগাঁও' (হল্দীগাম) 'বৈশালী', 'পাটলীপুত্র' এবং 'নালন্দা'!" * তৎকালে নালন্দা জগৎবিখ্যাত ছিল। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ্গের মৃত্যুর পরে, ৬৭১ খৃষ্টাব্দে,' 'ঈটসিঙ্গ' নামক একজন ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন; একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে হুগলীনদীর মোহনায়, তাম্রলিপ্তি সহরে সমুপস্থিত হয়েন। তিনি বহুদেশ-দর্শন করিয়া, বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্রস্থল নালন্দায় আগমন করেন। এই স্থানের বিদ্যাচর্চ্চার প্রসার পরিদর্শনে তাঁহার মন অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন তিনি নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন, এবং এইস্থলে, কতিপয়বর্ষ শিক্ষালাভ করিয়া চলিয়া যা'ন। তিনি বলেন, নালন্দা রাজগৃহ-উপত্যকার পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত।

* R David's 'Buddhist India' p. 103—(Second Impression).

তিনি রাজগৃহ হইতে চারিশত সংস্কৃত-পুস্তক সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হন। সেই সমুদায় পুস্তকে পাঁচ লক্ষ শ্লোক ছিল। তিনি বলেন, ভারতে আগমন করিবার জন্য সুচুয়ান দ্বীপ হইতে অর্ণবপোতযোগে তাম্রলিপ্তিতে আসিতে তাঁহার প্রায় ১৫ দিন লাগিয়াছিল।

এই স্থান মহাবোধি ও নালন্দা হইতে ষষ্টি * যোজন অর্থাৎ ২৪০ ক্রোশ অথবা ৪৮০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই হিসাবে নালন্দা মধ্যভারতে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তাম্রলিপ্তিতে 'তা-চেং-তেঙ্গ্' (Ta-cheng-teng) এর সঙ্গে ঈংসীঙ্গের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উক্ত সাধুপুরুষের নাম মহাজন-প্রদীপ। তাঁহার সঙ্গে ঈং-চিঙ্গ্ বৎসরাবধি অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহারই নিকট তিনি 'ব্রহ্মভাষা' শিক্ষা করেন। সেই ব্রহ্মভাষাই সংস্কৃতভাষা বলিয়া পূর্ব্বে অভিহিত হইত। এখন উহা সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। নালন্দায় অধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে শব্দবিদ্যা ও ব্যাকরণ শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল। তৎকালে বণিক্-সম্প্রদায় ও অপরাপর বহু লোকে ঈং-চিঙ্গ-প্রবর্ত্তিত রাজপথ ধরিয়া মধ্যভারতে গমনাগমন করিত। এই মহাজনপ্রদীপ, হুয়েন্থ সাঙের জনৈক শিষ্য। ইনি বহুস্থান পরিদর্শন করেন। তন্মধ্যে দ্বারাবতী (পশ্চিম-শ্যাম), লঙ্কা, দক্ষিণ-ভারত তাম্রলিপ্তি এবং নালন্দা প্রভৃতি স্থানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাম্রলিপ্তিতে দ্বাদশবর্ষ সংস্কৃত-অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গেই ঈংসিঙ্গ নালন্দা, বৈশালী ও কুশীনগরে গমন করিয়াছিলেন। মহাবোধি বিহার হইতে দশদিনের রাস্তা পর্য্যন্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত—বিশজন যাজক পণ্ডিতমণ্ডলীর অভ্যর্থনার জন্য সর্ব্বদা সমুপস্থিত থাকিতেন। সাধু-সন্ন্যাসী যাত্রী-বিদ্যার্থী অথবা ধনী-দরিদ্র, সকলেই যাহাতে তুল্যাংশে সম্মানপ্রাপ্ত হইতে পারে, তদুপায়বিধানজন্য বহুসুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তৎকালে একটি বিচিত্র প্রথা প্রচলিত ছিল;—যাত্রী বা বিদ্যার্থী যিনিই হউন না কেন, তাঁহাকে মূল 'গন্ধকুটীর' † (Root-Temple) পূজার জন্য গৃধ্রকূট-পর্ব্বতে * আরোহণ করিতে হইত। † যাহা হউক, পরিব্রাজক ঈং-চিঙ্গকে ৬৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ দশ বৎসর—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসবাস করিতে হইয়াছিল। তিনি নালন্দা হইতে ৪৮ মাইল পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত গমন করিয়া ৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান। তিনি নালন্দাকে কখনও কখন 'শ্রীনালন্দা'—বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীনালন্দা ও নালন্দা, দুইটি পৃথক সহর নহে। তিনি নালন্দা হইতে চারিসহস্র মাইল পূর্ব্বভাগে তিব্বতের দক্ষিণ-সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সুবিশাল 'কৃষ্ণ পর্ব্বতে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাকেই 'মহাকাল পর্ব্বত' বলে। এই পর্ব্বতটি ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্ত্তী। এই প্রকারে নালন্দার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরাও যথাক্রমে নালন্দার চতুঃসীমা প্রদান করিয়া কোন্ স্থানে পুরাকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল তাহা দেখাইয়াছি। অতএব তদ্বিষয়ে আর অধিক বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বৌদ্ধ-তীর্থযাত্রিগণকে সাধারণতঃ কতিপয় প্রধান-তীর্থ পরিদর্শন করিতে হইত। তন্মধ্যে 'নালন্দা', রাজগৃহের অন্তর্গত 'কৈত্যজ', বুদ্ধগয়ার 'বোধিবৃক্ষ', ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্ত্তী 'গৃধ্রপর্ব্বত', 'সারনাথ' বা 'মৃগদাব' (Deer Park), বুদ্ধগয়ার সন্নিকটস্থ 'শালবৃক্ষ'। এইগুলি দর্শনীয় স্থান বলিয়া খ্যাত। এই শালবৃক্ষ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র গল্প কথিত আছে,—'যে সময়ে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েন বা নির্ব্বাণ লাভ করেন, তখন তাঁহার সন্নিকটস্থিত শালবৃক্ষশ্রেণী সহসা শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল এবং তাহা মুকুলিত হইয়া উঠিল। তখন যদিও বসন্ত ঋতু নহে, তথাপি দেবানুভাবে বৃক্ষরাজি নবকিশলয়পরিশোভিত হইয়া শ্বেতবর্ণ

* শাভানেক (Chavanne) মতে ৭০ যোজন দূরবর্ত্তী—(*Vide*—Hzi-yu Chiu, Ch I. Mem. p. 97)—ভাঃ সং।

† বুদ্ধদেব যে নির্জ্জন গৃহে থাকিতেন, তাহার সাধারণ নাম 'গন্ধকুটি'। বুদ্ধদেবের সাবস্তির 'গন্ধকুটি' বৌদ্ধদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত।—ভাঃ সং।

* A Cave on the Side of the loftiest of the fine hills, overhanging the beautiful valley of Rājagriha."—R. DAVIDS, p. 78; Cunningham—Arch. Rep.—Map xiv; JULIEN'S Hwen Thsang III 20; BEAL—I. p. 114. —ভাঃ সং।

† Hiuen Thsang, Tom. iii, p. 21: 'Aumilieud'un lorrent, il ya une vaste pierre surlaquelle le Tathagata fit secher son vetement be religieux. Les raies de l'etoffe detachent encore aussi nettement que si elles avaient ete cisilees.'

ধারণ করিয়া মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। এই কারণে উক্ত বৃক্ষপূর্ণ স্থানটি তীর্থে পরিণত হইয়াছিল।' যাহা হউক, তৎকালে সহস্র সহস্র বৌদ্ধযাজক এই বিচিত্র তীর্থস্থান-সমূহ পরিদর্শন করিতেন। ইঁহারা সকলেই যথাক্রমে বিধিপূর্ব্বক দর্শনীয় তীর্থসমূহে গমন করিতেন, এবং ধর্ম্মানুমোদিত মার্গ হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিচ্যুত হইতেন না। পরন্তু, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ান্তর্গত মঠাদি হইতে যে সমুদয় প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত তীর্থদর্শনে বহির্গত হইতেন, তাঁহাদিগের গমনাগমনের উপায়াবলীর সহিত অপরের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা সকলেই 'সিজনচেয়ারে উপবেশন করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতেন। তাঁহারা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া, তাঁহাদের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল। পরন্তু তাঁহারা কোনক্রমেই অশ্বারোহণে কোনস্থানে গমনাগমন করিতেন না। এই পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে 'মহারাগ'-মঠস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর রীতি-নীতির সমতা দৃষ্ট হয়। উহাদের দ্রব্যাদি বালক বা ভৃত্যগণ বহন করিয়া লইয়া যাইত; কোন যানের সাহায্য লওয়া হইত না; ইতর প্রাণিগণকে কষ্ট প্রদান করা তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না। পশ্চিম-ভারতের ভিক্ষুগণের মধ্যেও এই প্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

কেহ কেহ বলেন, "উইলো" বৃক্ষের শাখা দ্বারা বুদ্ধদেব দন্তধাবন কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে; কারণ, ভারতবর্ষে উক্ত বৃক্ষ অতি অল্পই দেখা যায়। অধিকন্তু, নালন্দায় তিনি যে বৃক্ষের শাখাদ্বারা দন্তধাবন করিতেন, তাহা যে "উইলো" বৃক্ষ নহে তাহার আরও প্রমাণ একটি আছে। সংস্কৃত 'নির্ব্বাণ-সূত্রে'র একস্থলে নিম্নলিখিত রূপ উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—"শ্রমণেরা ও যাজকেরা দন্তধাবন-কাষ্ঠদ্বারা দন্ত পরিমার্জ্জন করিলেন।" সুতরাং যদি উইলো বৃক্ষের প্রচলন থাকিত, তবে উক্ত সূত্রে অবশ্যই তাহার নামোল্লেখ দৃষ্ট হইত। যাহা হউক, নালন্দার মঠের নিয়মসমূহ অত্যন্ত কঠোর ছিল। কিঞ্চিদধিক দুইশত গ্রাম লইয়া এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত হইয়াছিল; উক্ত গ্রামগুলি রাজামহারাজগণের দান। অনেকের মত—বিনয়-পিটকের নিয়মাবলী পরিপালন-নিবন্ধন বৌদ্ধধর্ম্মের এতাদৃশী প্রসিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছে। অর্থাৎ— সাম্যের পথ অবলম্বন করিলে জীবের অধোগতি হয় না—তাহাতে আমিত্বের প্রসার লোপপ্রাপ্ত হয়; তখন ষড়্‌রিপু বিপদ্ গণিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে; আর তখন ভগবান্ ভিন্ন হৃদয়-মন্দিরে অন্যকেহই প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না।—এই অবস্থাই সকল ধর্ম্মের মূল।

নালন্দায় একসঙ্গে বহুযাজক বসতি করায়, তাঁহাদের হৃদয়ের আত্মম্ভরিতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি দোষগুলি বিদূরিত হইয়া যাইত।—অন্তরের কুৎসিত ভাবগুলি অন্তরে বিলীন হইয়া মহৎভাবগুলির বিকাশ করিয়া দিত। এই প্রকারে মানসিক প্রবৃত্তির, সদুপদেশ এবং অধ্যয়ন দ্বারা, উন্মেষ এবং পরিবর্দ্ধন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিত। কেবল মানসিক বৃত্তিগুলির পরিবর্দ্ধন করিলেই যথেষ্ট হইত না,—তথাকার কর্ত্তৃপক্ষগণ শারীরিক বৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাতও বিস্মৃত হইতেন না; সেই স্থানের ছাত্র এবং শিক্ষকবর্গের শারীরিক বলাধান জন্য প্রকাণ্ড "আখড়া", বা অঙ্গ-পরিচালন-স্থান, লক্ষিত হইত। তাঁহারা শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ, কায়ার সঙ্গে ছায়ার সম্বন্ধের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। একটি ব্যতীত অপরটির ধ্বংস অনিবার্য্য সন্দেহ নাই। তজ্জন্যই তাঁহারা ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যাজকগণের বাসস্থানসমূহ সুন্দরভাবে রক্ষিত হইত। যে সকল পুরোহিত গৃহশূন্যাবস্থায় চিরস্থায়িভাবে বিদ্বজ্জনপূর্ণ স্থানে বাসাভিলাষী হইয়া আগমন করিতেন, তাঁহাদের দ্বারা এই রক্ষণ-কার্য্য সম্পাদিত হইত! 'কিয়াঙ্' প্রদেশেও এই প্রকার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' জানিয়া বর্ত্তমান সময়েও সেই প্রথার প্রচলন রহিয়াছে।

পূর্ব্বে যে "আখড়ার" কথা বলা হইয়াছে, তাহার একটি সুন্দর বিবরণ প্রদান করিব। তৎকালের ছাত্রগণ ও শিক্ষকগণ বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল বিবিধ শাস্ত্র মন্থন করিলেই চলে না; সেই মস্তিষ্কসিন্ধু যদ্দ্বারা হীনবল এবং বিকৃত হইতে না পারে, তদুপায় বিধান জন্য "আখড়ার" সৃষ্টি হইয়াছিল। তথায় অঙ্গচালনাদির সমস্ত উপকরণাদিই থাকিত। তথায় যুবা, বৃদ্ধ, ছাত্র, শিক্ষক—সকলকেই অঙ্গপরিচালনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইত। অতিরিক্ত

মানসিক পরিশ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রমের নিতান্ত আবশ্যক। এই কথা তাৎকালিক লোকে বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেবল যে নালন্দায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান বলিয়া এখানে, ইহা বর্ত্তমান ছিল, তাহা নহে। পূর্ব্বে পল্লীতে পল্লীতে—ভারতের সর্ব্বত্র "আখড়া" দৃষ্ট হইত। ঈৎ-চিঙ্গ্ তাহার বিবরণও কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছেন। আখড়াগুলি দীর্ঘ প্রাচীরবেষ্টিত থাকিত, তাহা পঞ্চাশ পদ (ধাপ) লম্বা ও ৭ ফিট্ উচ্চ। এই বৃত্তমধ্যস্থ যে স্থান, তাহাতে লোকে অঙ্গচালনা করিত। অধিকলোক হইলে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্থানের আবশ্যক হইত। পূর্ব্বোক্তরূপ স্থাননির্দ্দেশ অত্যল্প লোকের জন্য করা হইত। পূর্ব্বলিখিত স্থানের নাম "কপিথ" বা "শঙ্কাস্য"। —নালন্দাতেও বহু আখড়া দৃষ্ট হইত।

তৎকালে অতিথি-সৎকারের সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। বহু রাজা-মহারাজ ধনী-দরিদ্র তীর্থপর্য্যটনে, কেহবা বিদ্যার্জ্জনার্থে ভারতবর্ষের বহুস্থানে গমনাগমন করিতেন; তন্মধ্যে নালন্দাই একটি প্রধান। সেই সকল অপরিচিত ব্যক্তি-বৃন্দের পরস্পর ভ্রাতৃভাব পরিদর্শনে লোকে বিস্মিত হইত! নৃপতিগণ অপরাপর ব্যক্তিবর্গকে আদর-আপ্যায়ন দ্বারা সন্তুষ্ট করিতেন, এবং পরিতুষ্টি সহকারে ভোজনাদি করাইতেন। তখন শত্রুভাব যেন কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইত না। মহারাজ 'শিলাদিত্য' নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া, 'কুমাররাজ' নামক কোন অপরিচিত ধনীব্যক্তির দর্শন পাইয়া, তাঁহাকে সমগ্র পারিষদবর্গের সহিত আমন্ত্রণ করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন। তিনিও রাজ্যমধ্যে মহা আমোদ-আহ্লাদে কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিলে পর, সহচরবর্গের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন। একালে এরূপ আতিথেয়তা অল্পই দেখা যায়।

নালন্দায় সকলপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রই পঠিত হইত; সুতরাং, তথায় সকলপ্রকার ছাত্রই অধ্যয়নার্থ বহুদেশ হইতে সমাগত হইতেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেবল বৌদ্ধধর্ম্মের পরিপোষণার্থ স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তথায় সকলধর্ম্ম এবং সকলশাস্ত্রই পঠিত হইত, সুতরাং কেহ ঈর্ষাপরবশ হইয়া অপরের ক্ষতি করিত না। এইরূপ নানা কারণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈদৃশী উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তবে, ইহার নাম কেহ নালন্দা, কেহ বা নালণ্ডো বলিত। "বুদ্ধসূত্র সুরঙ্গম" পুস্তক নালন্দায় লিখিত হইয়াছিল।

যে নাগের নামে নালন্দা কীর্ত্তিতা হয় তাহাকে ভূমধ্য হইতে উত্তোলন করিবার সময় মজুরগণ আহত করিয়া ফেলে, একথা বহু পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এই স্থানে কোন কীর্ত্তি স্থাপিত হইলে তাহা জগৎবিখ্যাত হইবে, এইরূপ বাণী শ্রুত হইয়া তথায় একটি প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম স্থাপন করা হয়। সহস্রবৎসর মধ্যে উক্তস্থান বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠে। উক্তস্থান সকলপ্রকার শিক্ষালয় হইতে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠে। সর্ব্ব-প্রকার ছাত্র পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশ হইতে শাস্ত্রাধ্যয়নার্থ এখানে সমাগত হইত। কথিত আছে, কোন ভক্ত সেই নাগদেবের নাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বীয় শরীর হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রীত্যর্থে প্রদান করিয়াছিল। সেই সময় হইতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের প্রকৃত বিদ্যালয় হইয়া উঠিল। সেই নাগের শরীর হইতে রক্তস্রাব হইয়াছিল বলিয়া, প্রতিবর্ষে ভক্তগণ তাঁহার সম্মানার্থে স্বদেহ হইতে শোণিতদান করিত। ভক্তি-প্রবণতাই ইহার কারণ। নালন্দার অপর একটি অর্থ আছে; যথা- -না + অলম্ + দা = নালন্দা ইহার অর্থ—'অধিক কিছুই প্রদান করিবার নাই', অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ যাহা আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক দান করিয়াছেন, তাহাই দান করা যাইতে পারে—তদতিরিক্ত প্রাপ্ত হইতে, বা দান করিতে হইলে বিশেষ সাধনা আবশ্যক।

এই স্থানে মধ্যভারতের জনৈক নৃপতি একটি সঙ্ঘারাম প্রস্তুত করেন, এবং তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর, তাঁহার উত্তরাধিকারী ক্রমে ক্রমে এইসকলকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। এইপ্রকারে ক্রমশঃ এইস্থান বহুদেবালয়ে পূর্ণ হইয়া উঠে। যিনি সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানে সঙ্ঘারাম প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সেই বংশের শেষ-রাজা একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাঁহার ভোগরাগাদি পরিসমাপনান্তে প্রত্যহ চত্বারিংশৎ যাজকের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন।—এই সকল সদাচারী ব্যক্তির খাদ্যাদি তত্ত্বাবধান জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। খাদ্যদ্রব্যাদি কদর্য্য প্রমাণিত হইলে কর্ম্ম-চারিগণকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত।

শ্রীগণপতি রায়, বিদ্যাবিনোদ।

শোক-সংবাদ

৺শরৎকুমার লাহিড়ী

বিগত ১লা ফাল্গুন, শুক্রবার অপরাহ্ন পাঁচটার সময়, শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় লোকান্তর গমন করিয়াছেন! পরলোকগত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের দুইটি পরিচয় দিব;—প্রথমতঃ, তিনি পরলোকগত ঋষিকল্প প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ-পুত্র—ধর্ম্মপ্রাণ পিতার ধর্ম্মপ্রাণ পুত্র; দ্বিতীয়তঃ, তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী পুস্তক প্রকাশকগণের অন্যতম—তিনিই প্রসিদ্ধ 'এস. কে. লাহিড়ী

মহাত্মা ৺রামতনু লাহিড়ী

এণ্ড কোম্পানী'র 'এস. কে. লাহিড়ী। বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমান সময়ে এমন ছাত্র অতি কমই আছেন, যিনি 'এস. কে. লাহিড়ী'র নাম না জানেন। সেই এস. কে. লাহিড়ী, বা শরৎকুমার লাহিড়ী, পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে, সেদিন আত্মীয়বন্ধু-বান্ধবগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন!

মৃত্যুর দিন প্রাতঃকালেও তিনি কোন প্রকার অসুখ বোধ করেন নাই; প্রতিদিন যেমন বেড়াইতে যান, সে দিনও প্রাতঃকালে তেমনই বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় তিনি অকস্মাৎ বক্ষে একটা বেদনা অনুভব করেন; সেই বেদনা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। চিকিৎসকগণ পূর্ব্বাহ্ণেই চিকিৎসা আরম্ভ করেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সমস্ত চেষ্টাযত্ন বিফল হইল।—অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় তাঁহার হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল; তিনি অনন্ত-ধামে চলিয়া গেলেন।—প্রাতঃকালে বন্ধুগণ যাঁহাকে সুস্থ দেখিয়াছিলেন, অপরাহ্ণকালে তিনি রোগ শোকের অতীত স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

শরৎকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-লাভ করেন নাই, কোন উপাধিও প্রাপ্ত হ'ন নাই; কিন্তু তিনি তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের নিকট যে সুশিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার জীবনপথের প্রধান সম্বল ছিল।—শিক্ষার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য সেই ধর্ম্মপ্রাণতা, সেই বিনয়নম্রতা, সেই অবিচলিত অধ্যবসায়, শরৎবাবুতে ছিল, ও সেই সকল গুণেই তিনি সর্ব্বজন-পরিচিত পুস্তক-প্রকাশক 'এস. কে. লাহিড়ী' হইতে পারিয়াছিলেন।

পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া, তিনি অন্যান্য যুবকগণের ন্যায় চাকুরীর সন্ধানে নিযুক্ত হ'ন। এই সময়ে তিনি একদিন শুনিতে পাইলেন যে, আলিপুরের কালেক্টরী আফিসে ৪০৲ টাকা বেতনের একটি কেরাণীগিরিকর্ম্ম খালি আছে; তিনি সেই কর্ম্মের প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু এখনও যেমন হইয়াছে, তখনও তেমনই ছিল—বিনা সুপারিশে চাকুরী হইত না। শরৎবাবু, তাঁহার পিতার পরমবন্ধু পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি সুপারিশ্‌-পত্র পাইবার জন্য, তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় শরৎবাবুকে নিজের পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। তিনি শরৎকুমারকে চাকুরী করিতে নিষেধ করিলেন, এবং তাঁহাকে একখানি পুস্তকের দোকান করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। শরৎবাবুও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই হিতকর উপদেশ গ্রহণ করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে পুস্তক-বিক্রয়ের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন; অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রধান পুস্তক-প্রকাশক-

গণের মধ্যে একজন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কার্য্যের সুখ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইল, অনেক খ্যাতনামা বাঙ্গালী এবং অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ শরৎবাবুকে তাঁহাদের পুস্তকাবলির প্রকাশক করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট অর্থ-উপার্জ্জন করিলেন। পরলোকগত শরৎবাবুর যত্ন ও চেষ্টায় 'বাঙ্গালা পুস্তক-প্রকাশকগণের সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনিই সেই সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরদিন, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, কলিকাতার সমস্ত পুস্তকালয় বন্ধ ছিল। দেশ-বিদেশের যে সকল বাঙ্গালী-ইংরেজ মনীষী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, সকলেই লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহার শোক-সন্তপ্ত-স্বজনগণকে সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। ব্যবসার-বুদ্ধির সহিত সাধুতা, অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বন থাকিলে মানুষ কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারে, শরৎকুমার বাবু তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তাঁহার মৃত্যুতে একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পুস্তক-প্রকাশকের অভাব হইল; সে অভাব সহজে পূর্ণ হইবে না! তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে যে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব খুঁজিয়া পাই না! তবে এইমাত্র বলিতে পারি—ইহা যখন সেই সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতার সর্ব্ববিজয়ী ইচ্ছাপ্রসূত ব্যবস্থা, তখন তাহা মস্তক পাতিয়া লওয়া ভিন্ন আর উপায়ান্তর কি?—আমরা তাঁহাদিগকে প্রাণের একান্ত সহানুভূতি জানাইতেছি!
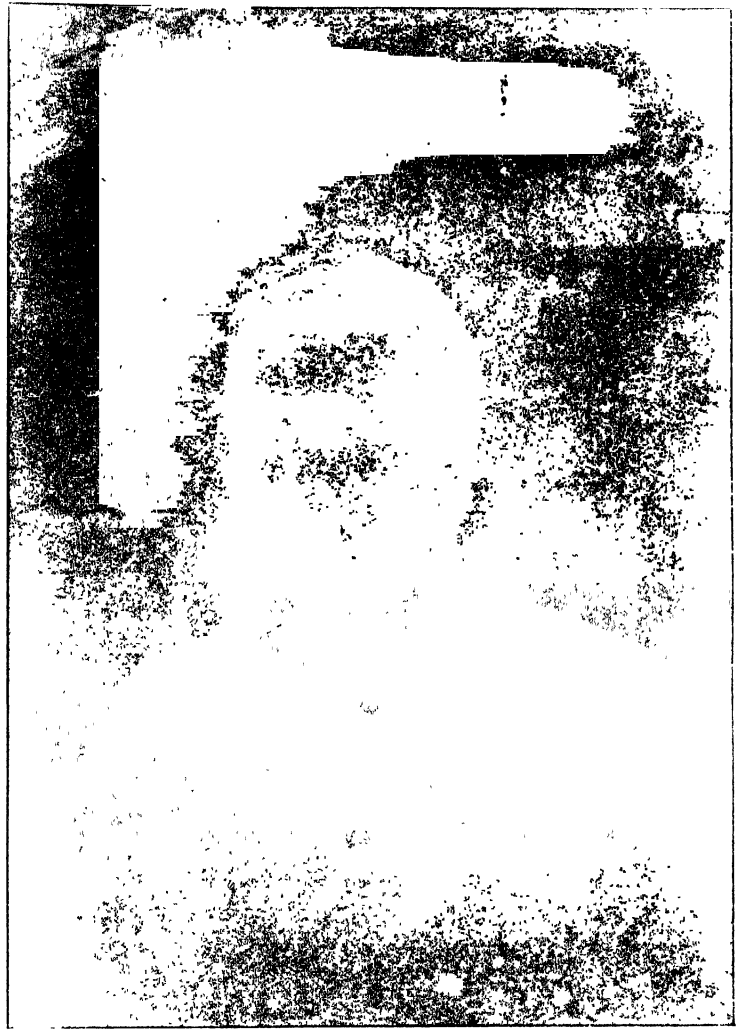
৺শরৎকুমার লাহিড়ী

দুগ্ধসংরক্ষণ-প্রণালী

সকল দেশেই সাধারণতঃ গো-দোহনকার্য্য হস্তদ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে, এবং এই কার্য্য দিবসে দুই বা ঊর্দ্ধসংখ্যায়, তিনবার হইয়া থাকে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাতে একপ্রকার দোহনযন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল ; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যন্ত্র-অপেক্ষা হস্তদ্বারা দোহন করাই অধিকতর সুবিধাজনক ; সুতরাং উহা আর প্রচলিত হইল না। দোহনকার্য্য খুব সাবধানে ও পরিষ্কারভাবে সম্পন্ন করা উচিত, এবং দুগ্ধ না ছাঁকিয়া কখনও ব্যবহার করা সঙ্গত নহে ; কারণ, দোহনকালে বিশেষরূপে সতর্কতা অবলম্বন করিলেও, গাভীর দেহের লোম, ময়লা ও মরামাস প্রভৃতি (Animal Debris) দুগ্ধপাত্রে পতিত হইয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে হানি করে। দুগ্ধপাত্রও উত্তমরূপ পরিষ্কার থাকা উচিত ; নচেৎ পাত্রের কলঙ্ক অথবা কোন প্রকার কাঁচারঙ্‌ বা ময়লা অতি সহজে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া দুগ্ধকে দূষিত করে। কাঁচা-দুগ্ধ ব্যবহার না করিয়া 'জাল'-দেওয়া দুগ্ধ ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ, কারণ জালদিলে দুগ্ধের অনেক দোষ বিদুরিত হইয়া যায়।

সাধারণতঃ, দুগ্ধ আমরা পাঁচ প্রকারে ব্যবহার করি ;—(১) দুগ্ধ, (২) মাখন, (৩) ঘৃত, (৪) ক্ষীর এবং (৫) দধি। দুগ্ধ অধিকক্ষণ কোন পাত্রে রাখিয়া দিলে, দুগ্ধের উপরিভাগে আপনা হইতে কিয়ৎপরিমাণ তরল মাখম (সাধারণতঃ ইহাকে 'মাটা' বলা হয়) সঞ্চিত হয়। কিন্তু "মৌনী", অথবা মাখমতোলা অন্য কোনরূপ যন্ত্র, সাহায্যে অধিক পরিমাণ ও অপেক্ষাকৃত ঘন মাখম পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন, দুগ্ধের 'সর' সঞ্চিত করিয়া, তাহা বাটিয়া এবং শেষে 'মৌনী' বা যন্ত্র সহযোগে গৃহলক্ষ্মীরা তাহা হইতেও মাখম-প্রস্তুত করিয়া থাকেন। মাখম অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ঘৃত প্রস্তুত হয়। দুগ্ধ অধিককাল অবিকৃত রাখা যায় না ; বেশীক্ষণ থাকিলে, ইহার মধ্যস্থ দুগ্ধশর্করা (Milk Sugar or Lactose) পচিয়া (Lactic Acid) একপ্রকার অম্ল-দ্রব্য উৎপন্ন হয় ; এবং ইহাতে এক রূপ বিকৃত অম্ল আস্বাদ অনুভূত হয় ;—চলিত কথায় ইহাকে "নট", বা নষ্ট হইয়া যাওয়া বলে। দুগ্ধে অধিক পরিমাণ Lactic Acid সঞ্চিত হইলে তাহা 'ছানা' কাটিয়া, বা 'জমিয়া', যায়। কৃত্রিম-উপায়ে ('দম্বল্' বা, দ্রাবক সাহায্যে) জমান টক-দুগ্ধকে দধি বলে, এবং 'জাল' দিয়া জমান মিষ্টদুগ্ধকে ক্ষীর বলে।

দুগ্ধ রক্ষা (Preserve) করিবার যতগুলি প্রণালী আছে, তন্মধ্যে (১) দুগ্ধের সহিত ক্ষার (Salts) এবং অন্যান্য পচন-নিবারক পদার্থের (Antiseptic Substances) রাসায়নিক সংমিশ্রণ (Chemical Combination) ; (২) সিদ্ধ-করণ (Boiling), শীতলকরণ (Cooling) প্রভৃতি বাহ্য প্রক্রিয়া ; অথবা (৩) গাঢ়করণ (Condensation) ; এই তিন প্রকারই প্রশস্ত ও উল্লেখযোগ্য। —শেষোক্ত প্রকরণটি আবার দুই দুই প্রকারে সাধিত হইতে পারে ;—(ক) কেবলমাত্র 'জাল' দিয়া দুগ্ধকে গাঢ় করিয়া অথবা (খ) কোনরূপ রক্ষণশীল (Preservative) বস্তুর সংমিশ্রণে গাঢ় করিয়া। শৈত্যসাধন-দ্বারা দুগ্ধ-সংরক্ষণ-প্রণালীটিই সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক এবং আদৌ আপত্তিজনক
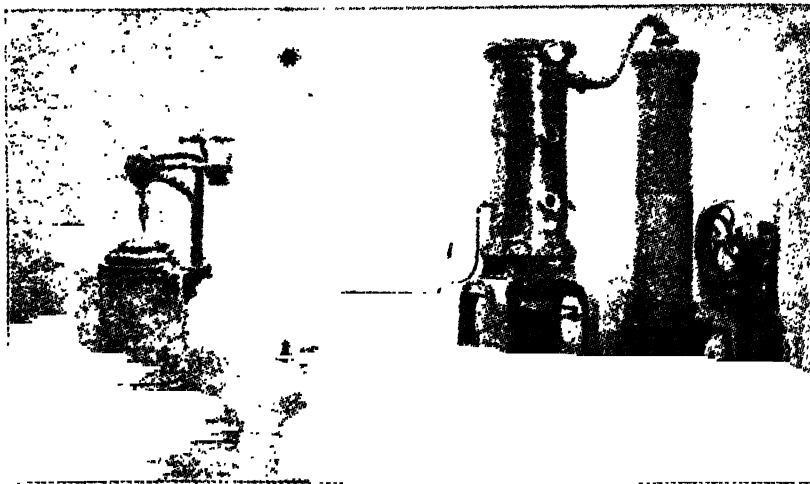
সংরক্ষিত গাঢ়-দুগ্ধ প্রস্তুতোপযোগী সম্পূর্ণ যন্ত্র

নহে। Soxhlet দেখাইয়াছেন যে, বরফজলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে দুগ্ধ-পাত্র বসাইয়া দুগ্ধ শীতল করিলে ১৪ দিন পর্য্যন্ত সুস্বাদু ও অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে। বায়ুর সাহায্যে দুগ্ধ শীতল করিলে আরও অধিককাল স্থায়ী হয়।

দুগ্ধ-রক্ষা করিবার জন্য যে সকল বিমিশ্র রাসায়নিক উপকরণ (Chemical Compound) ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে স্যালিসিলিক্ এসিড্ (Salicylic)ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই এসিড্, দেড়পুয়া দুগ্ধে দুই গ্রেণ মিশ্রিত করিলে, তাহা ফারেন্‌হিট্ থার্মোমিটারের ৬৫ হইতে ৬৮ ডিগ্রি তাপে ১২ ঘণ্টাকাল, এবং ৫৫ ডিগ্রি তাপে ২৪ঘণ্টা কাল, অবিকৃত অবস্থায় থাকে। 'স্যালিসিলিক্' ৪ গ্রেণ ব্যবহার করিলে, অপেক্ষাকৃত অধিকতাপেও ২।৩ দিন পর্য্যন্ত, এবং কমতাপে ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত, দুগ্ধ নষ্ট হয় না। অনেকস্থলে বোরাসিক্ এসিড্ (Boracic acid), অথবা সোহাগা (Borax)ও, ব্যবহৃত হয়। এসকল দ্রব্য কিন্তু একেবারে ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ।

জাল-দেওয়া দুগ্ধের মিষ্টতা অধিককাল স্থায়ী হয়; কিন্তু ইহার স্বাদ ও গুণ পরিবর্ত্তিত হয়। বদ্ধপাত্রে জাল-দিলে দুগ্ধ ঠিক থাকে। জাল-দিবারজন্য, ও পরে, ঢালিবারজন্য, সুপরিষ্কৃত পাত্র ব্যবহার করা উচিত। পাত্রে দ্রাবক-গুণসম্পন্ন (Acidic Property) কোন কিছু থাকিলে, দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়; কারণ গরমদুগ্ধে কোনরূপ টক্ দ্রব্য (Acid) মিশ্রিত হইলেই, তাহা অতি সহজে এবং শীঘ্র জমিয়া যায়।

এপর্য্যন্ত যতপ্রকার বিভিন্ন প্রণালীতে দুগ্ধরক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আধুনিক জমাট্ বা গাঢ় দুগ্ধ (CONDENSED MILK) প্রস্তুতপ্রকরণই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর। নিউ ইয়র্ক (New York)-নিবাসী Mr. Gail Borden এই প্রকরণের উদ্ভাবক। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করিয়া, ক্রমাগত ১০।১২ বৎসর পরীক্ষার পর, তিনি জমাট্-দুগ্ধ প্রস্তুতে কৃতকার্য্য হ'ন, এবং ১৮৬১ খৃঃ অব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকগণকে জমাট্-দুগ্ধসরবরাহ করিয়া তাহাদের প্রভূত উপকারসাধন করেন। কিছু চিনির সহিত জাল দিয়া, দুগ্ধের মোট পরিমাণকে এক-চতুর্থাংশে বা এক-পঞ্চমাংশে পরিণত এবং বায়ুশূন্য টিনের কৌটাতে আবদ্ধ করিয়া এই জমাট্-দুগ্ধ প্রস্তুত করা হয়। আজকাল Switzerland, Ireland, Denmark, Bavaria, Norway প্রভৃতিদেশে অনেক জমাট্-দুগ্ধের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে, এই ব্যবসায়ে Switzerlandই সর্ব্বাগ্রণী। জমাট্-দুগ্ধ প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে নিউইয়র্কস্থিত Cornell-বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য Mr. Willard-কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তিনি বলেন যে, নানাস্থান হইতে প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া, প্রথমতঃ ছাঁকিয়া একটি বড়পাত্রে (Receiving Vatএ) রাখ। এই পাত্র হইতে, ২০ গ্যালন্ ধরিতে পারে এরূপ একটি ধাতুপাত্রে পুনরায় ছাঁকিয়া দুগ্ধ
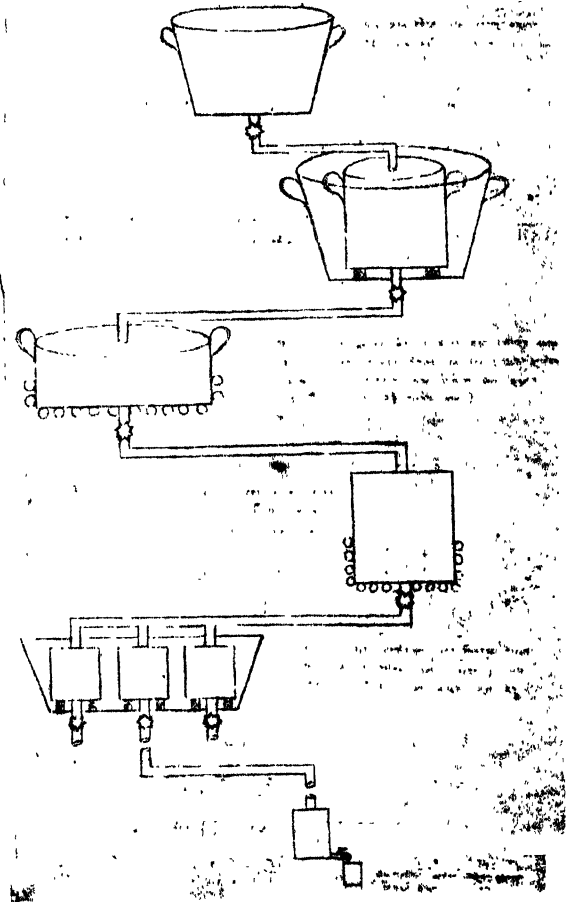
দুগ্ধ গাঢ়-করণ ও সংরক্ষণ প্রকরণ

ঢাল। এই শেষোক্ত পাত্রটি একটি গরমজলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে বসাইয়া, অগ্নি-সংযোগে ঐ গরমজলের উত্তাপ ফারেন্‌হিট্

থারমোমিটারের ১৫০ হইতে ১৭৫ ডিগ্রি তাপ পর্য্যন্ত দুগ্ধ গরম কর। পরে পুনরায় ছাঁকিয়া এই গরমদুগ্ধ একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পাত্রে রক্ষা কর। এই পাত্রের নিম্নদেশ তামার নল দ্বারা বেষ্টিত; এই নলের মধ্য দিয়া বাষ্প (Steam) আসিয়া উত্তাপ দান করে। এই পাত্রে দুগ্ধ ফুটিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে উৎকৃষ্ট দানা যুক্ত চিনি মিশ্রিত কর; প্রতি তিনসের দুগ্ধে আড়াইপুয়া চিনি মিশ্রিত করা উচিত। চিনি ভালরূপ গলিয়া যাইবার পর, শেষোক্ত পাত্র হইতে দুগ্ধ একটি বায়ুশূন্য পাত্রে (Vacuum pan) রক্ষা কর। জমাট্-দুগ্ধ প্রস্তুত করিবার জন্য এই বায়ুশূন্য পাত্র কিনিতে পাওয়া যায়, এবং ইহাতে ৮০০ হইতে ১০০০ মণ দুগ্ধ একসঙ্গে জমান যায়। ইহারও তলদেশ তামার নলদ্বারা বেষ্টিত। এই পাত্রে দুগ্ধ হইতে বাষ্প-সাহায্যে জলীয় পদার্থ দূর করিয়া দুগ্ধকে এক-চতুর্থাংশে পরিণত করিবে। উক্ত কার্য্য-সম্পাদন করিতে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় আবশ্যক। দুগ্ধ এইরূপে গাঢ় হইলে আট দশ মণ দুগ্ধ ধরে, এরূপ পাত্রে রক্ষা কর এবং এই সমস্ত পাত্রগুলি ঠাণ্ডাজলপূর্ণ একটি বৃহৎ কাষ্ঠের টবের মধ্যে বসাইয়া রাখ। পাত্রমধ্যস্থিত দুগ্ধের উচ্চতা এবং টবের জলের উচ্চতা সমান হওয়া আবশ্যক। এই শীতল-জলের মধ্যে দুগ্ধ-পাত্রসকল রাখিয়া দুগ্ধ নাড়িতে থাকিবে, এবং এইরূপে দুগ্ধের তাপ ৭০ ডিগ্রি হইলে, ছোট ছোট পাত্রে রক্ষা কর। এই সকল হাল্কা পাত্রকে Drawing can বলে। এক্ষণে ইহা হইতে অর্দ্ধসের পরিমাণ ছোট ছোট টিনের কৌটাতে পূর্ণ কর। শেষোক্ত প্রকরণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। গাঢ় দুগ্ধের তাপ ও কৌটার তাপ সমান করিবার জন্য কৌটা-গুলি কিঞ্চিৎ গরম করিয়া লওয়া আবশ্যক। দুগ্ধ-পূর্ণ করিবার সময় যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, এই জন্য কৌটাগুলি শীঘ্র শীঘ্র রাং-ঝাল (Solder) দ্বারা বন্ধ করিতে হয়। কৌটা না খুলিলে, এই দুগ্ধ বহুদিন যাবৎ নষ্ট হয় না। ব্যবসায়ীরা এই দুগ্ধকে টাট্কাদুগ্ধের মতই উপকারী ও সমান গুণসম্পন্ন বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; কারণ পুনঃ পুনঃ ছাঁকাতে দুগ্ধের কতক মাটা পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায়। তবে, চিকিৎসকদিগের মতে, রোগী ও শিশুর পক্ষে অধিক-জলমিশ্রিত ভেজাল দুগ্ধ পানকরা অপেক্ষা, এই দুগ্ধ পানকরা শ্রেয়ঃ। *

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

দোল-পূর্ণিমা

[আজু] অমিয়-নিঝর ঝুরিছে মন্দ
বিমল চন্দ-কিরণে,
সুরভি-পবনে প্রেমের কাহিনী
বহিছে মধুর স্বননে,
জগতে বিকাশ মাধবী-মাধুরী
পূরিত পিক-কূজনে,
পাদপের অঙ্কে ঢুলিল লতিকা
শিহরি' প্রেমের পীড়নে,
হৃদয়ে নাচিছে হোরির-দেবতা—
রসঘন-রাস স্মরণে,
বিরহ-বেদনা—স্বপন সমান—
লুকা'ল হিয়ার বিজনে,
ছুটিল প্রবাহ—হোলি লালে লাল—
মেশামিশি প্রেম-মিলনে,
সুখেতে দুলিল হৃদয়-হিন্দোলা
হরষ-রঞ্জিত জীবনে!

শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী।

* JOURNAL OF THE ROYAL AGRICULTURAL SOCIETY—2nd Series, VOL VIII.

ছিন্নহস্ত

(শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত)

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—ব্যাঙ্কার্ মঃ ভরজারস্ বিপত্নীক। এলিস্ তাঁহার একমাত্র কন্যা, ম্যাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভিগ্নরী খাজাঞ্চি, রবার্ট্ কার্ণোয়েল্ সেক্রেটারী, জর্জ্জেট্ বালকভৃত্য; ম্যালিকম্ দ্বারপাল, শাস্ত্রী ডেন্লেভ্যাট্। একরাত্রে তাঁহার বাটীতে ভিগ্নরী ও ম্যাক্সিম্ নিশাভোজে আসিয়া দেখে, মালখাজনার লৌহসিন্দুকের বিচিত্র-কলে কোন রমণীর সদ্য-ছিন্ন বামহস্ত সম্বদ্ধ! তৃতীয় ব্যক্তিকে না জানাইয়া ম্যাক্সিম্ সেটা নিজের কাছে রাখিল।

রবার্ট্, এলিসের পাণি-প্রার্থী; এলিস্ও তদনুরক্ত। বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার কিন্তু ভিগ্নরীকে জামাতা করিতে ইচ্ছুক। তাই তিনি রবার্ট্কে মিশরস্থিত স্বীয় কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন। রবার্ট্ তাহাতে অসম্মত—সেই রাত্রেই তিনি দেশত্যাগ করিলেন।

রুশরাজের বৈদেশিক শত্রু-পরিদর্শক কর্ণেল্ বোরিসফের ১৪ লক্ষ টাকা ও সরকারী কাগজপত্রের একটি বাক্স এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিন বলেন, পরদিন কিছু টাকা চাই।—কথামত কর্ণেল প্রাতেই টাকা লইতে আসিলে ভিগ্নরী দেখেন, খাজানার সিন্দুক খোলা! ভরজারস আসিলে দেখা গেল—৫০ হাজার টাকা ও কর্ণেলের বাক্সটি নাই!—সন্দেহটা পড়িল রবার্টের ঘাড়ে। কর্ণেলের পরামর্শে পুলিশে সংবাদ না দিয়া, গোপনে অনুসন্ধান করা স্থির হইল।

ম্যাক্সিম্, সেই ছিন্নহস্তের অধিকারিণীকে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছিন্নহস্তে একখানি ব্রেস্লেট্ ছিল—ম্যাক্সিম্ তাহা নিজে পরিয়া, ছিন্নহস্ত নদীতে ফেলিয়া দেন। পুলিস তাহা উদ্ধার করে, কিন্তু পরে চুরি যায়। একদিন পথে ম্যাক্সিমের সহিত এক পরিচিত ডাক্তারের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি এক অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখাইলেন; ম্যাক্সিম্ কৌশলে রমণীর সহিত আলাপ করিলেন, সে রমণী—কাউণ্টেস্ ইয়াল্টা। অতঃপর ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্টের সহিতও তাঁহার আলাপ হয়। ইনি তাঁহার প্রকোষ্ঠে ব্রেস্লেট্ দেখিয়া একটু রহস্য করিলেন। কথা-বার্ত্তায় বেশী রাত্রি হওয়ায়, তিনি রমণীকে তাঁহার বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিলেন।

এলিস্ শুনিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কের চুরি সম্পর্কে সকলেই রবার্ট্কে সন্দেহ করিয়াছে! তাঁহার কিন্তু ধারণা সে নির্দ্দোষ। তিনি রবার্ট্কে নির্দ্দোষ-প্রতিপন্ন করিবার জন্য ম্যাক্সিম্কে অনুরোধ করিলে, ম্যাক্সিম্ প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে রবার্ট্, দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার এলিসের সাক্ষাৎকার-মানসে প্যারীতে প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহাকে গোপনে সেই মর্ম্মে পত্র লিখেন। সেই দিনই পূর্ব্বাহ্ণে, কর্ণেল্ ছলক্রমে তাঁহাকে এক বাটীতে আনিয়া বন্দী করিলেন। ম্যাক্সিম্ রবার্টের পত্র দেখিয়াছিলেন; তিনি উহাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের বিরোধী ছিলেন। কার্য্যগতিকে তাহাই ঘটিল।

কর্ণেলের বিশ্বাস, রবার্টের নিয়োজিত কোনও রমণীদ্বারা ব্যাঙ্কের চুরি ঘটিয়াছে। তিনি বন্দী রবার্ট্কেও সেইরূপ বলিলেন, ও জানাইলেন যে, রবার্ট্ সন্দেহমুক্ত না হইলে এলিসের সহিত ভিগ্নরীর বিবাহ ঘটিবে; আর চুরীর গুপ্ততথ্য ব্যক্ত না করিলে, তাঁহাকে আজীবন বন্দী থাকিতে হইবে। রবার্ট্ রাত্রে মুক্তির পথ খুঁজিতেছেন, এমন সময় প্রাচীরের উপরে জর্জ্জেট্কে দেখিতে পাইলেন। সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে মুক্তির আশা দিয়া প্রস্থান করিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যাক্সিম্ অভিনয়-দর্শন করিতে যান। তথায় এক রঙ্গিনীর মুখে শুনিলেন—তাঁহার প্রকোষ্ঠস্থিত ব্রেস্লেট্টির পূর্ব্বাধি-কারিণী ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্, ঘটনাক্রমে সেও সেই থিয়েটারেই উপস্থিত। কথাটা কতদূর সত্য, জানিবার জন্য ম্যাক্সিম্, ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের বক্সে গিয়া হাজির; কথায় কথায় একটু পানভোজনের প্রস্তাব হইল। দুজনে অদূরবর্ত্তী হোটেলে গেলেন। তথায় ব্রেস্লেটের কথা উঠিতে, ম্যাডাম্ তাহা দেখিতে লইলেন। এমন সময়, সহসা ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের রক্ষক সেই অসভ্য ভল্লুকটা সঙ্কেতানুযায়ী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রেস্লেট্ ও ম্যাডাম্কে লইয়া প্রস্থান করিল।—ম্যাক্সিম্ প্রতারিত হইলেন!]

দশম পরিচ্ছেদ।

একমাস চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু ম্যাক্সিম্ এতদিনের মধ্যে একবারও কাউণ্টেস্ ইয়াল্টাকে চক্ষে দেখিতে পান নাই। ব্রেসলেট্-অপহারিকারও কোনও সন্ধান তিনি পান নাই। হোটেলের ঘটনার পরদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত প্রতিযোগীর নিকট হইতে কোনও সংবাদ আসিল না, দেখিয়া তিনি তাঁহার সন্ধানে দুটি বন্ধুকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, সে বাড়ীতে জনপ্রাণীও নাই। ম্যাক্সিম্ পরদিন নিজে গিয়া শুনিলেন যে, লোকটাকে পূর্ব্বদিবস হইতে আর দেখা যাইতেছে না। পল্লীবাসীরা তাহার অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে সন্দিগ্ধ হইয়া পুলিশে সংবাদ দিয়াছিল। পুলিশ আসিয়া সন্দেহজনক কোনও দ্রব্যই তথায় পায় নাই। গৃহের দ্রব্যাদি যেমন ছিল, তেমনই আছে। শয্যায় কেহ একদিনও শয়ন করে নাই। কোনও দ্রব্যই কেহ কোনও দিন ব্যবহার করে

নাই। বাড়ীওয়ালা তিনবৎসরের অগ্রিম ভাড়া বুঝিয়া পাইয়াছিল, সুতরাং সেও পরম নিশ্চিন্ত আছে। কি নামে বাড়ীভাড়া লইয়াছে জানিতে চাহিলে, বাড়ীওয়ালা এমন একটা নাম বলিল যে, সহজে তাহার উচ্চারণ করা যায় না। সমস্ত শুনিয়া ম্যাক্সিম্ ভাবিলেন, "ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্ নামধারিণী অপরিচিতা, তাঁহার নিকট হইতে ব্রেস্‌লেট্‌টি হস্তগত করিবার অভিপ্রায়েই এত আয়োজন করিয়াছিল। এখন কার্য্যসমাধা করিয়া, তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে। চোর তাহার ছিন্নহস্ত ও ব্রেস্‌লেট্ উভয়ই সংগ্রহ করিয়াছে। আর এখন ধরাপড়িবার কোনও আশঙ্কাই নাই।"

আপনার পরাজয়ে ম্যাক্সিম্ অত্যন্ত হতাশ হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু উপায় নাই দেখিয়া মনকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। কাউণ্টেসের সহিত আলাপ হওয়া অবধি,তাঁহার অন্য কোনও বিষয়ে মনও ছিল না। বিশেষতঃ, কাউণ্টেসের দর্শনলাভে বঞ্চিত হওয়ায়,সর্ব্বদা তাঁহারই চিন্তা ম্যাক্সিমের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিত। ম্যাডাম্ ইয়াল্‌টার অত্যন্ত কঠিন পীড়া হইয়াছিল। ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী খাটিয়াছিল। বহুচেষ্টার পর, এখন তাঁহার জীবনের আশা হইয়াছে। দিন দিন আরোগ্যলাভও করিতেছেন। কিন্তু চিকিৎসকের অনুমতি ব্যতীত সাক্ষাৎকার সঙ্গত নহে,—পাছে রোগ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ম্যাক্সিম্ শুভ-অবসরের প্রতীক্ষায় দিনগণনা করিতেছিলেন। কাউণ্টেস্ ইয়াল্‌টা ব্যতীত, অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। ম্যাক্সিমের এক একবার মনে হইত, এতদিন পরে সত্য সত্যই কি কন্দর্পদেব তাঁহার নীরস-শুষ্ক-কঠোর-হৃদয় প্রেমস্পর্শে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছেন!

মসিয়ে ভরজার্‌সের ভবনেও এই একমাসে বহুপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভিগ্‌নরী ব্যাঙ্কারের অংশীরূপে উন্নীত হইয়াছেন। বৃদ্ধ প্রকাশ্যভাবে, কুমারী এলিসের সহিত তাঁহাকে আলাপ-পরিচয়ে সম্মতি দিয়াছেন। এলিস্, এখন তাঁহাকে দেখিলে চলিয়া যান না। কুমারীরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কএক দিবস নির্জ্জনে বাস করিবার পর, তিনি রুদে বোলোর সমুদায় ঘটনা পিতার নিকট বিবৃত করেন। ম্যাক্সিমের ব্যবহারে বৃদ্ধ অত্যন্ত আনন্দিত হন। সমস্ত কথা বলিবার সময় এলিস্ পিতাকে বলেন যে, রবার্ট কার্‌নোয়েলের বিষয় তিনি আর চিন্তা করিবেন না। পিতার আদেশ তিনি একান্তমনে প্রতিপালন করিবেন। ব্যাঙ্কার্ এ সংবাদে আনন্দে অধীর হ'ন। ভিগ্‌নরীকে সোৎসাহে কন্যার মনোরঞ্জন করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ভিগ্‌নরীকে এলিস্ প্রত্যাখ্যান করিলেন না; কিন্তু কিছু সময় প্রার্থনা করিলেন। ভিগ্‌নরীকে তাঁহার কেমন লাগিবে, তাহা পরীক্ষার জন্য কিছু সময় আবশ্যক। পিতাকে শপথ করাইয়া লইলেন যে,—রবার্টের আর যেন কোনও অনুসন্ধান করা না হয়, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কুমারীর সাক্ষাতে কেহ যেন উল্লেখ না করে।

কুমারী এলিসের অনুরোধ মত কাজ হইতে লাগিল। ভিগ্‌নরী প্রত্যহ ভরজার্‌স-ভবনে নিমন্ত্রিত হইতেন। এলিস্ তাঁহার গুণাবলী ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছেন। সকলেই বুঝিল, শীঘ্রই ভিগ্‌নরীর সহিত কুমারীর পরিণয় সংঘটিত হইবে। কর্ণেল্ বোরিসফের সহিত ব্যাঙ্কারের নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা হইয়া স্থির হইল, চোরের আর সন্ধান করিয়া কাজ নাই। বোরিসফ্‌ও অলঙ্কারাধার উদ্ধারের আশায় হতোদ্যম হইয়াছিলেন। কুমারী এলিসের ভাবী কল্যাণই যেন তাঁহার কাম্য হইয়া উঠিয়াছে, ভাবে এই কথাই তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ভরজারস্-ভবনে আর একটি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। জর্জ্জেটের স্থলে আর একটি বালক কাজ করিতেছিল। একদিন সকালে জর্জ্জেট্ কাজে আসে নাই। পরদিন ব্যাঙ্কার্ জর্জ্জেটের পিতামহীর নিকট হইতে পত্র পাইলেন যে, জর্জ্জেট্ মৃত্যুশয্যায় শায়িত! ব্যাঙ্কার্ তৎক্ষণাৎ বালককে দেখিতে গেলেন। বালকের একখানি হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মাথার খুলিও রীতিমত জখম হইয়াছে। বালক যে বাঁচিবে, প্রথমতঃ এ আশা ছিল না। ম্যাক্সিম্ প্রায়ই বালকের তত্ত্ব লইতে যাইতেন। জর্জ্জেট্ শুধু চাহিয়া থাকিত, কিন্তু কোনও কথা বলিতে পারিত না। মস্তিষ্কে প্রবল আঘাত লাগায় তাহার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছে। কিরূপে আহত হইল, তাহাও সে বলিতে পারিত না!

অবস্থা যখন এইরূপ, এমন সময় একদিন প্রভাতে ম্যাক্সিম্ বাহির হইলেন। ম্যাডাম্ ইয়াল্‌টার অবস্থা খুব ভাল, এ সংবাদ জানিয়া ম্যাক্সিমের অত্যন্ত আনন্দ হইল।

তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, ভিগ্‌নরীর সহিত দেখা করিতে চলিলেন। বহুদিন বন্ধুর সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই। ম্যাডাম্ ইয়াল্‌টাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তিনি আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। সেই যে একদিন তুষারপাতের মধ্যে ক্ষণতরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ—সে কথা—সে দিনের কথা—সেই সুন্দরীর কথা তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমানরূপে জাগরূক ছিল। তাহার চিন্তায় তিনি ছিন্নহস্তের কথা এককালেই ভুলিয়াছেন—রবার্ট্ কার্লোয়েল্‌কে বিস্মৃত হইয়াছেন—স্কেটিং-ক্ষেত্রে দৃষ্ট সেই রমণীর চিন্তাও তাঁহার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে! যে বিষয়ের সহিত ম্যাডাম্ ইয়াল্‌টার সংশ্রব নাই, তাহাতে তাঁহার অণুমাত্রও আসক্তি নাই। ভিগ্‌নরী ও এলিসের জন্য তাঁহার ভাবিবার প্রয়োজন কি! ভিগ্‌নরী সুখী হইয়াছে, এলিস্ স্বীয় চিত্তবৃত্তিজাত বেদনা হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাহারা উভয়ে এখন নির্ব্বিবাদে পরিণয়ে সম্মিলিত হইতে চলিয়াছে। রবার্ট্ কার্ণোয়েলের জন্য ম্যাক্সিম্ তত চিন্তিত নহে—কারণ তাহার সহিত তাঁহার অতি সামান্যই পরিচয় ছিল। অধিকন্তু, সে দোষীই হউক, আর নির্দ্দোষই হউক, সন্দেহজনক ভাবে দেশত্যাগ করিয়া অবধি সে নিতান্তই মন্দ আচরণ করিয়াছে! তাহার জন্য কোনও ক্ষোভের কারণ নাই—সে তাহার কার্য্যের উপযুক্ত ফলই লাভ করিয়াছে। দুঃখ কেবল জর্জ্জেট্ বেচারীর জন্য!—তবে সেও সম্প্রতি একটু ভাল আছে।

ব্যাঙ্কের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইয়া ম্যাক্সিম্ মনে মনে বলিল,—"জর্জ্জেট্ আরোগ্য লাভ করিলে,একবার ভিগ্‌নরীর সহিত তাহার একটা উপযুক্ত চাকুরী করিয়া দিবার বিষয় পরামর্শ করিতে হইবে।" ব্যাঙ্ক্ যতক্ষণ খোলা থাকিত, এই তোরণদ্বার ততক্ষণ খোলা থাকিত। আফিসে যাইতে হইলে,এই তোরণ দিয়া প্রবেশ করিয়া থিলান-করা খানিকটা পথের ভিতর দিয়া প্রাঙ্গণে পড়িতে হয়—ঐ প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া কার্য্যালয়ে উপনীত হওয়া যায়। যে রাত্রে ব্যাঙ্কে চুরির চেষ্টা হয়—যে রাত্রে সেই ছিন্নহস্ত পাওয়া যায়—সেইরাত্রে ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম্ এই থিলানতলেই সন্দেহজনক ভাবে দুই ব্যক্তিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। সেই দুই ব্যক্তিই নিশ্চয় দোষী—উহার মধ্যে এক দুর্ব্বৃত্ত ছিল পুরুষবেশী রমণী—যাহার অন্বেষণে তিনি বৃথা চেষ্টায় ফিরিয়াছিলেন। সেরাত্রের সমস্ত ঘটনাটা তাঁহার স্মরণ হইল—তখন সহসা তাঁহার মনে হইল যে, সেই দীর্ঘকায় লোকটা রুজুফ্রয়ের সেই লোকটা হইতে পারে, কিন্তু সেই রমণী ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্ নহে,—কারণ তাহার ত দুইটি হস্তই আছে!

ম্যাক্সিম্ ভাবিতে লাগিলেন,—"এই লোকগুলা অনুচর মাত্র; কিন্তু যে ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার আর কখনও সন্ধান পাওয়া যাইবে না! সেই দুর্ব্বৃত্তটা প্রথম যে স্ত্রীলোকটিকে সহকারিণীরূপে আনিয়াছিল, সেই-ই কার্য্যক্ষেত্রে তাহার বামহস্ত হারাইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়বার—যেবার চুরিকার্য্য সফল হইয়াছিল সেবারেও—সম্ভবতঃ সেই লোকটা আসিয়াছিল; কিন্তু সেই হস্তহীনা রমণী আর আসে নাই। পরে, ঐ ভল্লুকটা সুকৌশলে ব্রেস্‌লেট্‌খানি উদ্ধার করিবার মানসে হয়ত ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্টের সহিত যোগদান করিয়াছিল। সেই-ই ঐ রমণীকে স্কেটিংরিঙ্কে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সেরাত্রে যে আমি সেখানে যাইব, সে কেমন করিয়া জানিল? অপর সকল ব্যাপারের মত ইহাও রহস্যময়! যাহা হউক, ইহারই নিযুক্ত গুণ্ডারা সেরাত্রে আমার পিছু লইয়াছিল; তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, বলে আমার নিকট হইতে ব্রেস্‌লেট্‌খানি কাড়িয়া লওয়া। কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া, অন্য উপায় অবলম্বন করে—আমি সেই ফাঁদে পড়িয়া গেলাম!"

তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হইবার সময়, ম্যাক্সিম্ দ্বারপালের ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ঘরের দ্বারটি খানিকটা খোলা ছিল; তিনি দেখিলেন, গৃহমধ্যে আগুনের কাছে তাঁহার দিকে পিছন করিয়া তিনজন লোক বসিয়া তামাকু সেবন এবং কথোপকথন করিতেছে। দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন যে, একজন শান্ত্রী ডেন্‌লেভেণ্ট্, অপরটি নব বালকভৃত্য জোসেফ্ এবং তৃতীয়ব্যক্তি দ্বারপাল ম্যালিকম্। কার্য্যালয়ের রক্ষিগৃহে তিনজনকে একত্রে এইরূপ জটলা করিতে দেখিয়া তিনি বড়ই বিরক্ত হইলেন, এবং তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে যাইতেছিলেন; এমন সময়ে একটা কথা শুনিতে পাইয়া তিনি চমকিয়া গেলেন। শুনিলেন, জোসেফ্ বলিতেছে,—"আমি আবার বলি—সেক্রেটারী নির্দ্দোষ; তুমি-আমি যেমন নির্দ্দোষ, সেও তেমনই নির্দ্দোষ!"

ডেন্‌লেভ্যান্ট্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে, তিনি পলাইলেন কেন ?"

"কারণ, বৃদ্ধ তাঁহার সহিত কুমারীর বিবাহ দিতে চাহেন নাই। কিন্তু সে ভদ্রলোক লোহার-সিন্দুক স্পর্শও করে নাই—আমি আমার ডাইন্‌ হাতটা বাজি রেখে একথা বল্‌তে পারি !"

ম্যাক্সিম্‌ যেন বজ্রাহত হইয়া গেলেন! তাহা হইলে, কথাটা গোপন রাখিবার জন্য এত সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও চুরির কথা সকলেই জানিয়াছে! আর ইহারা নিতান্ত আত্মীয়জনের মত—সমপদস্থ ব্যক্তির ন্যায়—কুমারীর প্রণয়কাহিনী বিশ্লেষণ করিতেছে! যাহা হউক, ম্যাক্সিম্‌ ক্রোধসংবরণ করিয়া, তাহাদের আর কি কথাবার্ত্তা হয় শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

ম্যালিকম্‌ বলিল, "তবুও, এটা বড়ই আশ্চর্য্য, যে ইঁহারা তা'র পিছু লইবার জন্য পুলিশকে নিযুক্ত করিলেন না !"

"বৃদ্ধ তত আহাম্মক ন'ন—তাহা হইলে যে তাঁ'র কন্যার মনোকষ্টের সীমা থাকিত না। সকলেই জানে যে, কুমারী সেই যুবার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন—ইহাতে তাঁ'র সুবিচার শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। অযথা-গম্ভীর মূর্ত্তি ভিগ্‌নরী অপেক্ষা সে যুবক সহস্রগুণে প্রিয়দর্শন—"

গম্ভীরস্বরে ডেন্‌লেভ্যান্ট্‌ বলিল, "কিন্তু সেই প্রিয়দর্শন সেক্রেটারী যদি নির্দ্দোষ, তবে তা'র কোনও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না কেন ?"

জোসেফ্‌ বলিল, "কেউ কেউ অবশ্য তাঁর সংবাদ পেয়েছিল। কিন্তু একথা ঠিক্‌ যে, আজ একমাস আর তাঁর কোন খবর পাওয়া যায় নি। তার কারণ, আমি একটা অনুমান করেছি। তিনি যে দেখা দিচ্ছেন্‌ না, তার কারণ কোন লোক তাঁকে তফাৎ ক'রে ফেলেছে—হয়ত মেরে ফেলেও থাকতে পারে। এবিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

ম্যালিকম্‌ বলিল, "হয়'ত তিনি আমেরিকা চ'লে গেছেন। কিন্তু আমারও মনে হয় না, তিনি চুরি করেছেন। কে চুরি করেছে শুন্‌বে ?—ছোক্‌রা-চাকরটার এই কাজ !"

"জর্জ্জেট্‌? অসম্ভব! আমাকে সে নানারকমে বিরক্ত ক'র্‌ত বলে যদিও তাকে আমি দেখ্‌তে পারতাম্‌ না; কিন্তু সে যে সিন্দুকে হাত দিয়েছে, তা আমি বিশ্বাস করি না। প্রথমতঃ ধর না কেন, ৬টা বাজ্‌লেই সে চ'লে যেত।"

ম্যালিকম্‌ বলিল, "তা থাকৃত না বটে, কিন্তু ছোঁড়াটা ভারি ধূর্ত্ত! তিনমাস আগে, একদিন আমি তাকে টেবিলের উপর ঘুমাতে দেখে ছিলুম। সমস্ত রাত সে আপিসে শুয়েছিল। আমার চাক্‌রী যাবে ব'লে, সে কথাটা আমি কা'রও কাছে বলি নি।"

জোসেফ্‌ মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে যদি তা ক'রে থাকে, তবে নিজের জন্য নয়। সে আর কা'রও হুকুম-মত কাজ ক'চ্ছিল। সেদিন তাকে আধমরা অবস্থায় রাস্তায় পাওয়া গেছে—জানত? নিশ্চয় কোন লোক নিজের পথথেকে তাকে একেবারে সরাবার জন্য একাজ ক'রেছে !"

ম্যালিকম্‌ বলিল, "কথাটা লাগসই বটে।"

বৃদ্ধ দ্বারবান বলিল, "ছোঁড়াটার জন্য আমার কোন কষ্ট নাই; কিন্তু জোসেফ্‌, তুমি ত অনেক খবর রাখ,—কুমারী এলিসের বিয়ে কি ঠিক্‌ হ'য়ে গেছে ?"

"ব্যাপার যে রকম দেখা যাচ্ছে,তা'তে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বোধ হয় বিয়ে হবে। কিন্তু কুমারীর চেহারা দেখিলে, তাঁকে বিয়ের ক'নের মত দেখায় না। তিনি সাহস ক'রে বল্‌তে পাচ্ছেন্‌ না, যে তিনি বিয়ে করবেন না; কিন্তু তাঁর পরিচারিকার কাছে শুনেছি, তিনি রোজ রাত্রিতে কাঁদেন !"

ম্যালিকম্‌ বলিল, "শীঘ্রই তিনি সান্ত্বনালাভ করিবেন। খাতাঞ্জীরই পোয়া বার! যখন এখানে এসেছিলেন, এক পয়সাও ছিল না;—এখন একেবারে ক্রোরপতি।"

জোসেফ্‌ বলিল, "তা হলে কি হবে ভাই? লোকটা ভারি কৃপণ! আমাদের মনিব কৃপণ বটে, কিন্তু খাতাঞ্জীর মত যক্ষ আমি দেখিনি।"

ম্যাক্সিম্‌ বন্ধুর নিন্দাবাদে ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেককে এক এক মুষ্ট্যাঘাত করেন। কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করিয়া, নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। ভৃত্যদিগের কএকটি মন্তব্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিল।—"রবার্ট্‌ যে নির্দ্দোষ, ভৃত্যদিগের পর্য্যন্ত সেবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। সকলেরই ধারণা, তাহাকে অন্যায়রূপে সন্দেহ করা হইয়াছে।" জোসেফের কথাটা ম্যাক্সিমের মনের মধ্যে ক্রমাগত উঠিতে লাগিল।

"যদি তাহার ধারণা সত্য হয়? তাহা হইলে, আমার দুইটি মস্ত ভুল হইয়াছে! প্রথম ভ্রম, এলিস্‌কে বলিয়াছি, তাহার প্রণয়ী যথার্থই অপরাধী; দ্বিতীয় ভ্রম, বদ্‌মাইস্ ছোঁড়াটার প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু বোধ হয়, কথাটা সত্য নয়। জোসেফ্ এলিস্‌কে ভালবাসে, রবার্টেরও সে অনুরক্ত; তাই তাহার এরূপ অনুমান হইয়াছে। জর্জেট্ ছোঁড়াটা পাজী হইতে পারে; কিন্তু চুরির ব্যাপারে সে লিপ্ত নহে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কাউণ্টেসের সঙ্গে দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিব, বালকটির সততায় নির্ভর করা যায় কি না।"

ম্যাক্সিম্ ভিগ্‌নরীর কক্ষে পৌছিলেন। ঘরের মধ্যে অন্য কেরাণীরাও কাজ করিতেছিল। ম্যাক্সিম্‌কে দেখিয়া ভিগ্‌নরীর অত্যন্ত আনন্দ হইল, কিন্তু কেরাণীদের সাক্ষাতে আনন্দপ্রকাশ শোভন হইবে না ভাবিয়া, ভিগ্‌নরী বন্ধুসহ পার্শ্বস্থ একটি ছোট ঘরে প্রবেশ করিল। এই ঘরে পূর্ব্বে কাগজপত্র থাকিত; এখন সমস্ত পরিষ্কার করা হইয়াছে।

"তা'হলে বন্ধু, তুমি এখন আমার ভগিনীপতি হইতে চলিয়াছ?"

"তুমি সে সংবাদ পাইয়াছ?"

"আমি কোন খবরই জানি না! কিন্তু তোমার ব্যবহার দেখিয়া অনুমান করিতেছি মাত্র।"

"আমি আজ বড় সুখী।"

"কি হ'য়েছে, সব খুলে বল না।"

"কাল খুব সুযোগ পাইয়াছিলাম। কুমারী এলিস্ একা ছিলেন, আমি তাঁহাকে আমার হৃদয়ের কথা বলিতে যাইতে ছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে বলিবার অবকাশ না দিয়া বলিলেন, 'আপনি আমায় ভালবাসেন, জানি। আপনার গুণরাশি আমি বুঝিতে পারিতেছি। সংপ্রতি কোন হতভাগ্য বন্ধুর পক্ষাবলম্বন করায়, আপনার মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে; সেজন্য আমি আপনাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। আমার পিতার ইচ্ছা, আমার সহিত আপনার বিবাহ হয়। আপনি তাঁহার নিকট আমার পাণিপ্রার্থনা করিতে পারেন।'"

"হুঁ! সম্মতি পাইয়াছ বটে, কিন্তু তত আগ্রহপূর্ণ নয়! সে কথার উত্তরে তুমি কি বলিলে? সে প্রস্তাব নিশ্চয়ই গ্রাহ্য করিয়াছ।"

"তাতে আর সন্দেহ আছে!"

"না।—আমার বিশ্বাস তুমি বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমানের মতই কাজ করিবে।"

"কুমারী ভরজার্‌স সুন্দরী; আমি গোপনে তাঁহাকে ভালবাসিতাম। দুই বৎসরের মধ্যে কিন্তু একদিনও সেকথা প্রকাশ করিতে পারি নাই।"

"কিন্তু তুমি-ছাড়া এলিসের আরও প্রণয়-পাত্র আছে, জানত?"

ভিগ্‌নরীর চক্ষু ও মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। ম্যাক্সিম্ কখনও রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিতে জানেন না, বলিলেন—"অবশ্য, আমি তোমাকে নিরুৎসাহ করিতে চাই না। কিন্তু আমি এসম্বন্ধে কি ভাবিয়া দেখিয়াছি, তাহাত তোমার জানা উচিত। আমার ভগিনী যখন বলিয়াছে যে, সে তোমাকে শ্রদ্ধা করে,—ভবিষ্যতে তোমাকে স্বামীরূপেও বরণ করিতে চাহিয়াছে,—তখন আমার বিশ্বাস, কালে সে হয়ত তোমায় ভালবাসিবে। কিন্তু মনে রাখিও, সে সর্ব্বান্তঃকরণে আর একজনকে ভালবাসিত। তিনি বিপদে না-পড়িলে, তাঁহাকে সে বিবাহ করিত!"

ভিগ্‌নরী বলিল, "তা আমি জানি, কিন্তু তজ্জন্য আমার কোন আশঙ্কা নাই!"

"ভালই!—আমি হইলে, আমার মনে কিন্তু একটা ঈর্ষা জাগিয়া থাকিত; তা ছাড়া, সময়ে সময়ে আমার মনে সংশয় হয়,—রবার্ট কার্‌নোয়েল্ অকারণে অভিযুক্ত হ'ন নাই ত?"

এবার ভিগ্‌নরীর আনন বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "নির্দ্দোষ হইলে, সে এতদিন ফিরিয়া আসিত।"

"যদি তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে!"

"মৃত্যু! এ চিন্তা তোমার মনে আসিল কেন?"

"ভৃত্যদিগের ঘরের পার্শ্ব দিয়া যখন আসিতেছিলাম, তখন শুনিলাম, জোসেফ্ ও ম্যালিকম্ ঠিক করিয়াছে যে, কার্‌নোয়েল্ হত হইয়াছেন!"

"ওকথা ঠিক নহে। রবার্ট্ নিশ্চয়ই ফ্রান্স্ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।"

"তুমি কি ঠিক জান?—চুরির পর সপ্তাহে সে প্যারীতে ছিল; আমি স্বচক্ষে তাহাকে গাড়ী চড়িয়া যাইতে

দেখিয়াছি। তাহার পর, অকস্মাৎ সে অন্তর্হিত হইয়াছে। এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার।”

“ও কিছু নয়। রবার্ট্ প্রথমতঃ তাহাদের নিজগ্রামে গিয়াছিল; তুইতিনদিন সেখানে থাকিবার পর, প্যারীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কর্ণেল্ বোরিসফ্ ইহার প্রমাণ দিতে পারেন।”

“ঐ রুশ-ভদ্রলোকটিকে আমার কেমন বিশ্বাস হয় না। তুমি তাঁহার সহিত মিশ নাই ত?”

“আমি? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তিনি সংপ্রতি কর্ত্তার সহিত খুব মেশামিশি করিতেছেন। বেচারী রবার্টের সম্বন্ধে তাঁহার সহিত যে আলোচনা হয়, সেইকথাই বলিতেছি। তোমার ওকথা বলিবার উদ্দেশ্য কি?”

“জুলি, আমার কথার অর্থ এই যে, ঘটনাটা এখন আমার কাছে তত স্পষ্ট ও সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার বিশ্বাস প্রকৃত-চোর এখনও ধরা পড়ে নাই। ব্রেস্‌লেট্‌টা কিরূপে আমার কাছ থেকে অপহৃত হ'য়েছে শুনেছ ত?—ঘোর রহস্যজালে ঘটনাটা আবৃত। মনে কর না কেন, জর্জ্জেট্‌কে ত আমাদের সন্দেহই হয় নাই; কিন্তু ভৃত্যদের বিশ্বাস, সে এই চুরিব্যাপারে লিপ্ত আছে!”

“জর্জ্জেট্?—যা'কে সেদিন তুমি অত প্রশংসা করিয়াছ?”

“চাকরদের কথায় অবশ্য আমি ততটা বিশ্বাস করিতেছি না; কিন্তু আমার বরাবর ধারণা চুরিব্যাপারে, এই বাড়ীর কোন না কোন লোক লিপ্ত আছে। জর্জ্জেট্ সকল সময়ে যাতায়ত করিত; ম্যালিকমের অভ্যাস সে জানিত। সে হয়ত এই বাড়ীর কোন জায়গায় লুকাইয়া ছিল। তারপর, সুবিধা বুঝিয়া, বদ্‌মায়েস্‌দিগকে দরজা খুলিয়া দিয়াছিল।”

“কিন্তু সে লুকাইয়া থাকিবে কোথায়? এই ছোট ঘরটা ছাড়া, আর কোথাও ত লুকাইবার জায়গা নাই! কিন্তু সেসময় এঘরটা কাগজে এত বোঝাই ছিল যে, কাহারও এখানে থাকিবার যো ছিলনা। যাক্—গতকথার আলোচনায় ফল কি? আমি ভাবিয়াছিলাম, শুভসংবাদে তুমি খুব সন্তুষ্ট হইবে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তুমি রবার্টের প্রসঙ্গই উত্থাপন করিতেছ। যতদিন পারিয়াছি, বন্ধুর পক্ষ আমি নিজেই সমর্থন করিয়াছি; কিন্তু এখন সে যে ফিরিয়া আসে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। এ ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক নয় কি?”

“আমায় ক্ষমা কর ভাই।—আমি বড় নির্ব্বোধ। তুমি আমার অপেক্ষা সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ। আমি কেন যে এইসব লোকের বিষয় ভাবি, বলিতে পারি না। যা'ক্ এখন, তার সবই ভাল যার শেষ ভাল। আমি আর কার্‌নোয়েলের বিষয় উত্থাপন করিব না।”

জ্যেঠামহাশয়ের বাটী হইতে বাহির হইয়া, তিনি ডাক্তার ভিলাগ্‌সের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। অল্পক্ষণ অপেক্ষার পরই ডাক্তার চিন্তিত মনে বাহিরে আসিলেন। ম্যাক্সিম্ উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, “কাউণ্টেসের অসুখ আবার বাড়িয়াছে নাকি?”

ডাক্তার বলিলেন, “না।—তিনি ক্রমেই সবল হইতেছেন।— এযাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন।”

“শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম।—আপনার মুখ দেখিয়া আমার আশঙ্কা—”

“তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এখনও আমার মন হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই।”

“আপনি তাঁহাকে সতর্কভাবে থাকিতে বলিবেন। আপনার কথা কি তিনি শুনিবেন না?”

“কাউণ্টেস্, আজই গাড়ী চড়িয়া বাহিরে যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন। আমি ঘোরতর আপত্তি করায়, অগত্যা তিনি সম্মত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই কি একটা চিন্তা করেন। তাঁর কল্পনা সব এমন উদ্ভট! তিনি বোধ হয় আপনার কাছে শুনিয়াছেন যে, আপনার জ্যেঠামহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার সেক্রেটারীর প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে; কুমারী ভর্‌জারস্‌ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত।—সেই জন্যই সেক্রেটারীকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।”

“আমি সেকথা তাঁহাকে বলি নাই।—ম্যাডাম্ ইয়াল্‌টাই প্রথম কথা তুলিয়াছিলেন। আমি কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।”

“কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তাঁহার বিশ্বাস, এই যুবককে অকারণে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। মসিয়ে কার্‌নোয়েলের পিতা কাউণ্টেসের বন্ধু ছিলেন। সেজন্য যুবকের পক্ষাবলম্বন তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। ভর্‌জারস্-

ভবনে কি ঘটিয়াছে, তাহা তিনি জানেন না। মনে রাখিবেন, তিনি দুইটি হতাশ প্রেমিকের কথাই ভাবিতেছেন। কাউন্টেস্ শপথ করিয়াছেন, তিনি উভয়কে সুখী করিবেন।"

"আমার ভগিনী এখন আর রবার্টকে চা'ন না। তিনি আরএকজনকে শীঘ্রই বিবাহ করিবেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, একটি ছোকরার কাছে কতকগুলি বাজে কথা শুনিয়া, কাউন্টেস্ এত বিচলিত হইয়াছেন। আপনি বোধ হয় জানেন, জর্জেট্ এই সমস্ত সংবাদ দিয়াছে।"

"ভবিষ্যতে সে আর সংবাদ দিতে পারিবে না। বেচারীর মাথা খারাপ হইয়াগিয়াছে।—পূর্ব্ব-স্মৃতি কিছু মাত্র নাই!"

"বলেন কি ডাক্তার! এই অবস্থায় সে চিরকাল থাকিবে?"

"সেইরূপ আশঙ্কাই করিতেছি। বালকটির জন্য আমার বড়ই দুঃখ হয়। একটা কথা অনুগ্রহ করিয়া রাখিবেন কি?"

"বলুন।"

"কাউন্টেসের সহিত দেখা হইলে, উত্তেজনাকর কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করিবেন না। সম্ভবতঃ এই প্রসঙ্গেরই আলোচনা তিনি করিতে চাহিবেন; কিন্তু আপনি কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিবেন।"

"নিশ্চয়!—আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, কাউন্টেসের সঙ্গে আমার শীঘ্রই দেখা হইবে।"

"আজ সকালেই তিনি আপনাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন! আপনি প্রত্যহ আসিয়া সংবাদ লইয়া যান, সেকথা তিনি জানেন। নিজেই তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ করিতে চা'ন। আমি আপত্তি করিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি যখন বলিতেছেন, উত্তেজনাকর কোন প্রসঙ্গের আলোচনা করিবেন না, তখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।"

"আপনি সে সময় উপস্থিত থাকিবেন ত?"

"না।—এত দিন অন্যরোগীদের আমি উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। আজ একবার তাহাদের সংবাদ লইব, ঠিক করিয়াছি। তা ছাড়া, কাউন্টেস্ আপনার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিতে চা'ন।"

ডাক্তার, ম্যাক্সিম্‌কে লইয়া কাউন্টেসের কাছে গেলেন। যুবক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, ডাক্তার মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমার উপদেশ মনে রাখিবেন।"

একটি সুসজ্জিত, পুষ্পচিত্রিত কক্ষে ম্যাক্সিম্ প্রবেশ করিলেন। কাউন্টেস্ একখানি কৌচে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়াছিলেন। পীড়ার পাণ্ডুর রাগে ইয়াল্টার আনন ঈষৎ বিবর্ণ; কোমলস্বরে কাউন্টেস্ বলিলেন, "আমি আপনার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

মাক্সিম্ আবেগভরে বলিলেন, "আপনাকে দেখিয়া আমার যে কত আনন্দ হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না।"

"ডাক্তার নিষেধ না করিলে, কবে আমি আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইতাম। ডাক্তারকে কত সময় মনে মনে আমি গালি দিয়াছি।"

"আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া, আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।"

"বাস্তবিক, আমি মরিতে বসিয়াছিলাম; কিন্তু সময় না হইলে কেহ মরে না। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এখন আমি সম্পূর্ণ-আরোগ্যলাভ করিয়াছি!"

"ডাক্তারও আমায় তাহাই বলিতেছিলেন।"

"তিনি কোনও লোকের সঙ্গে আমায় দেখা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কথা শুনি নাই। শুনিলে, আজ আপনাকে দেখিতে পাইতাম না।"

ম্যাক্সিম্ আসনগ্রহণ করিলেন। অতঃপর কি কথার অবতারণা করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় কাউন্টেস্ বলিলেন, "রোগ-শয্যায় শুইয়া, আমি কত কথাই যে ভাবিয়াছি! এরূপ ভাবে জীবনযাপন বড়ই কষ্টকর। আমি ভাবিয়াছি, এবার হইতে নূতন-পথ অবলম্বন করিব।"

"আপনি এখান হইতে চলিয়া যাইবার সংকল্প করিতেছেন না কি?"

"না না,—সে আশঙ্কা করিবেন না।—যদিও যাই, শীঘ্রই ফিরিয়া আসির।

"আমি স্থির করিয়াছি, উচ্ছৃঙ্খল জীবনে সুখ নাই। সাধারণ গার্হস্থ্যজীবনেই সুখ ও তৃপ্তি। আমি এখন গৃহ-সুখের কাঙ্গালিনী।"

হাসিতে হাসিতে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "গার্হস্থ্যজীবনের সুখ যে কি, বোধ হয় তাহা আপনি জানেন না।"

"জানি না বলিয়াই, আমি উহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। যে সম্প্রদায়ের সহিত আমার সংস্রব, তাহারা কেবল আমোদ চাহে।—আমি আর তাহা চাহি না। এখন আপনি সাহায্য করিলে আমি এ সম্প্রদায়ের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারি।"

ম্যাক্সিম্ এই অপূর্ব্ব প্রস্তাবে বিস্মিত হইলেন। তিনি নির্ব্বোধ ন'ন। বুঝিলেন, কাউণ্টেস্ তাঁহার সহিত কোন নির্জ্জনস্থানে অবশিষ্টজীবন যাপন করিতে চাহেন। কাউণ্টেস্ তাঁহার বিস্মিতভাব দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আপনি দেখিতেছি, আমার কথাটা ভালকরিয়া বুঝিতে পারেন নাই। যে উচ্ছৃঙ্খলচরিত্রা কাউণ্টেস্‌কে আপনি দেখিয়াছেন, সে আর এখন নাই!—আমি এখন গৃহস্থ-কন্যার মত থাকিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছি। আপনার সাহায্য চাহিতেছি কেন, জানেন?—আপনাদের মত কোন সম্ভ্রান্ত, অথচ সদ্‌বংশের সহিত আমি সম্বন্ধ পাতাইতে চাই।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "আমাদের বংশের মধ্যে আমি ও আমার জ্যেঠামহাশয়;—তা ছাড়া আর কেহ ত নাই।"

"কেন? ভগিনীও ত আছেন।—তাঁহাদের কথাই বলিতে-ছিলাম। আপনার জ্যেঠামহাশয় আমার ব্যাঙ্কার্; তাঁহার সহিত এতদিন টাকাকড়িরই সম্পর্ক ছিল। ভাল করিয়া তাঁহার সহিত আলাপপরিচয়ও হয় নাই। যাঁহারা আপনার আত্মীয়, তাঁহাদিগের সহিত পরিচিত হইতে আমার একান্ত কামনা। আপনার ভগিনীর প্রতি আমার কেমন একটা টান্ পড়িয়াছে। তাঁহার সহিত আমার আলাপ করিবার একান্ত ইচ্ছা!"

"এলিস্ বড় ছেলেমানুষ।"

"হাঁ—সে কথা ঠিক। আমাদের উভয়ের বয়সে যথেষ্ট পার্থক্য আছে; আমার উনত্রিশ বৎসর বয়স, আপনার ভগিনীর অপেক্ষা আমি দশবৎসরের বড়। আমি জীবনে কত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আর তিনি এখন শুধু কল্পনা-লোকেই বিচরণ করিতেছেন। সেইজন্য তাঁহার সহিত আলাপ করিবার আমার এত আগ্রহ। তাঁহাকে আমি কনিষ্ঠাভগিনীর ন্যায় ভালবাসিব।"

"একথা শুনিলে আমার ভগিনী কতই সুখী হইবে; কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি, আমার ভগিনীর শীঘ্র বিবাহ হইবে। আশা আছে, বিবাহের পর সে সুখে থাকিতে পারিবে।"

"আপনার জ্যেঠামহাশয় বুঝি মসিয়ে কার্‌নোয়েল্‌কে জামাতৃপদে বরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন?"

ম্যাক্সিম্ জিহ্বা-দংশন করিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি কি বলিতে, কি বলিয়া ফেলিয়াছেন! ডাক্তারের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিবেন না। কিন্তু তাই বলিয়া উত্তর ত দেওয়া চাই, সত্যকেও গোপন করা চলে না। "না, কাউণ্টেস্,—আমার ভগিনী তাঁহার পিতার কারবারের অংশী, আমার বন্ধু, জুলস্ ভিগ্‌নরীকে বিবাহ করিবেন!"

"কিন্তু আপনি না বলিয়াছিলেন, তিনি রবার্ট্ কার্‌নোয়েলের প্রতি অনুরক্ত?"

"প্রথমতঃ সে তাহাই ভাবিয়াছিল।—উনিশবৎসরের বালিকার ভ্রম হইবারই সম্ভাবনা।"

কাউণ্টেস্ ম্যাক্সিমের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন; তিনি যেন তাঁহার হৃদয়ের কথা পাঠ করিতে চাহিতে ছিলেন।

ধীরে ধীরে কাউণ্টেস্ ইয়াল্‌টা বলিলেন, "আমি সমস্তই খুলিয়া বলিতেছি।—সেদিন এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার যে কথা হইয়াছিল, তাহা মনে আছে ত? জর্জ্জেট্ আপনাদের বাড়ীর সমস্ত ঘটনা আমাকে বলিয়াছিল।"

"জর্জ্জেট্ ছেলেমানুষ;—সে কি বলিতে কি বলিয়াছে! জর্জ্জেট্ কার্‌নোয়েলের প্রতি অনুরক্ত ছিল, তাই সে মনে করিয়াছিল—এলিসের সহিত রবার্টের বিবাহ হইবে। কার্‌নোয়েল্ এমন সময় হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন!"

"আপনার জ্যেঠামহাশয় ত তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। আপনিই ত বলিয়াছিলেন যে, রবার্ট্ কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। জর্জ্জেট্ আমাকে আরও বলিয়াছিল আপনাদের বাড়ীতে যে চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেকের সন্দেহ কার্‌নোয়েলের উপরেই পড়িয়াছে। তাহার কাছে শুনিয়াছি, অন্য চাবী দিয়া সিন্দুক খুলিয়া কর্ণেল্ বোরিসফের একটা বাক্সও কে চুরি করিয়াছে। জর্জ্জেট্ তখন সেখানে উপস্থিত ছিল; সে সব আমাকে বলিয়াছে। খাতাঞ্জী, মসিয়ে ভর্‌জার্‌স্‌কে চুরির কথা জানান। কার্‌নোয়েল্

বাড়ী ছিলেন না বলিয়া শেষে তাঁহার স্কন্ধেই চুরির অপরাধ পড়ে।—দেখিতেছেন, আমি সব জানি!"

ম্যাক্সিম্ মনে মনে ভাবিলেন, "শুধু ছিন্ন-হস্তের বিষয় অবগত ন'ন,—জানা থাকিলে তাহাও বলিতেন।"

ম্যাডাম্ ইয়াল্টা বলিলেন, "আমার দৃঢ়বিশ্বাস, কার্‌নোয়েল্ অপরাধী ন'ন। রয় দে বোলোঁতে কুমারী এলিসের সহিত রবার্টের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় বলিবেন কি? আপনি সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।—আশা করি, আমার কাছে আপনি কিছুই লুকাইবেন না।"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন যে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন; এখন চুপ করিয়া থাকা, অথবা কথাটা গোপন করিতে যাওয়া, নির্ব্বোধের কাজ হইবে। তিনি বলিলেন, "কার্‌নোয়েল্ নিরূপিত স্থলে দেখা করিতে আসেন নাই।"

কাউণ্টেসের মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। উত্তেজিত স্বরে তিনি বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, সত্য?"

"আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, উহা যথার্থ।"

"তাঁহাকে তাহার পর আর দেখেন নাই, অথবা তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই?"

"না।—এমনকি, আমার ভগিনীকেও পত্র লেখেন নাই।"

"তবে, রবার্টের কোন সংবাদ না পাইয়াই কুমারী ভর্‌জার্‌স্ ভাবিয়াছেন যে, কার্‌নোয়েল্ অপরাধী;—সেই জন্যই তিনি তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন?—কুমারী রবার্টের কথা না শুনিয়াই, তাঁহাকে অপরাধী স্থির করিয়াছেন। কার্‌নোয়েল্ যে আসিতে পারেন নাই, হয় ত তিনি তখন স্বাধীন ছিলেন না বলিয়াই, পারেন নাই!"

"তিনি স্বাধীন আছেন কি না, জানি না;—কিন্তু তিনি যে প্যারীতে আছেন, তাহা আমি জানি। অন্ততঃ ঘটনার দিবসে আমি তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট গাড়ীতে চড়িয়া বুলেভার্দ্ধ ম্যালেসারবেস্ অভিমুখে যাইতে দেখিয়াছি। বোধ হয়, তিনি সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।"

"আমি তাহা বিশ্বাস করি না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, কেহ তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; তাই তিনি স্বয়ং আসিয়া আত্মদোষক্ষালন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে কেহ হত্যা করিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে যাহাদের স্বার্থ আছে, তাহাদেরই হস্তে তিনি পড়িয়াছেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

"অর্থাৎ, আপনার বিশ্বাস, যাহারা যথার্থ-অপরাধী তাহাদেরই এ কাজ।—তাহারা কি তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে?"

"সম্ভব;—কিন্তু কার্‌নোয়েল্ যদি জীবিত থাকেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব। এখন বুঝিয়াছেন, আমি কেন কুমারী ভর্‌জার্‌সের সহিত আলাপ করিতে চাই?"

ম্যাক্সিম্ মৃদুস্বরে বলিলেন, "এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই!"

"আমি এ বিবাহ হইতে দিব না; এ বিবাহে তিনি আজীবন অসুখী হইবেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি কুমারীকে সুখী করিব। আজই হউক, কিংবা দুইদিন পরেই হউক, কার্‌নোয়েল্ নির্দ্দোষ-সাব্যস্ত হইবেন,—তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের ভার আপনার উপর।"

"আমি!—আমি নিজেই যে তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া ভাবি। এ অসম্ভব কার্য্য আমার দ্বারা কিরূপে সম্ভব-পর?"

কাউণ্টেস্ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আপনার এ বিশ্বাস থাকিবে না।"

"অবশ্য কার্‌নোয়েলের বিরুদ্ধে আমার নিজের কোনও বিদ্বেষ নাই; কিন্তু এই বিবাহভঙ্গের আমি বিরোধী। কারণ এলিসের ভাবী-স্বামী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

"তা আমি জানি; কিন্তু এ বিবাহ যাহাতে না হয়, আপনার তাহাই কর্ত্তব্য। আপনার বন্ধু এই পরিণয়ে জীবনে সুখী হইতে পারিবেন না। ভাবিয়া দেখুন, বিবাহ হইয়া গেলে, কার্‌নোয়েল্ যখন নিরপরাধ হইয়া প্যারীতে ফিরিবেন, তখন আপনার ভগিনীর মনের অবস্থা কি হইবে! আপনার ভগিনী, রবার্ট্‌কে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। কার্‌নোয়েল্ একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন ভাবিয়াই হয়ত তিনি তাঁহার আশা ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার স্মৃতি কুমারীর হৃদয় হইতে যায় নাই। আমি নারী, সুতরাং রমণীহৃদয়ের রহস্য আমি বেশ বুঝিতে পারি। হৃদয়ের সহিত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শঙ্কিতা কুমারী, শান্তিলাভের আশায়, অন্যকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন।

—কিন্তু পরে বুঝিতে পারিবেন, তিনি কি ভ্রম করিতেছেন ; তখন প্রতিকারের কোন উপায় থাকিবে না। হৃদয়ের তুষানলে, তখন তিনি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবেন ; সহস্রবার এই বিবাহ-বন্ধনকে তিনি ধিক্কার দিবেন !”

কাউণ্টেস্ যেরূপ উৎসাহের সহিত বলিলেন, তাহাতে ম্যাক্সিমের হৃদয় বিচলিত হইল।—ইয়াল্টার নয়নে কি আলোক জ্বলিতেছিল ! তাঁহার দৃষ্টি কি ভাষাময় !—ম্যাক্সিম্ অভিভূত হইলেন। অবশ্য, তাঁহার ধারণা তখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই ; তিনি ভাবিতেছিলেন, যাহাকে কখনও দেখেন নাই, তাহার রক্ষাকল্পে কাউণ্টেসের এ আগ্রহ কেন ? সহসা তাঁহার মনে হইল,—হয়ত, জর্জ্জেট্ চুরির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছে ; প্রতিপালিকার নিকট, সে হয়ত সমস্ত সত্যকথাই প্রকাশ করিয়াছে। এ অবস্থায় কাউণ্টেসের নিরপরাধের পক্ষাবলম্বনই স্বাভাবিক। জর্জ্জেটের নাম তিনি প্রকাশ করিতে চান না ; অথচ তাহার অপরাধবশতঃ যে মহাক্ষতি হইতে চলিয়াছে, তাহার সংশোধন করিতে চা'ন।

কাউণ্টেস্ বলিলেন, “আপনি আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন কি ?”

ম্যাক্সিম্ সোৎসাহে বলিলেন, “ঐকান্তিক চেষ্টা করিব। আমাকে কি করিতে হইবে বলুন, আপনার আদেশ প্রতিপালনে বিলম্ব ঘটিবে না।”

“প্রথমতঃ মসিয়ে কার্‌নোয়েল্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।”

“কিন্তু অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার সূত্র ত খুঁজিয়া পাইতেছি না !”

“আমি আপনাকে বলিয়া দিতেছি।—জর্জ্জেট্‌কে আপনি চিনেন ত ? ছেলেটি অতি বুদ্ধিমান ও চালাক। মসিয়ে কার্‌নোয়েল্‌কে সে বড়ই ভালবাসিত। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাহার হাতভাঙ্গিয়া না যাইত, তাহা হইলে এতদিনে সে তাঁহাকে নিশ্চয় খুঁজিয়া বাহির করিত ; অন্ততঃ রবার্টের কি হইয়াছে, তাহার সংবাদও জানিতে পারিতাম। যাহা হউক, এখন সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতি এখনও ফিরিয়া আসে নাই। আমার বিশ্বাস অচিরে তাহার স্মৃতি-শক্তি পুনরুদ্দীপিত হইবে, এজন্য আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে।”

ম্যাক্সিম্ সবিস্ময়ে কাউণ্টেসের দিকে চাহিলেন।

ম্যাডাম্ ইয়াল্টা বলিলেন, “আপনি চিকিৎসক ন'ন, তাহা আমি জানি ; চিকিৎসাশাস্ত্র-অনুসারে তাহার চিকিৎসা আপনাকে করিতে হইবে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে যতদূর করিবার, ডাক্তার ভিলাগ্‌স্ তাহা করিয়াছেন। দেহসম্বন্ধে জর্জ্জেট্ নিরাময় হইয়াছে ; এখন যাহা কর্ত্তব্য, আপনাকে করিতে হইবে। জর্জ্জেট্ আপনার খুব অনুরক্ত ছিল, না ?”

“হাঁ।—একদিন রাত্রে কতকগুলি গুণ্ডা আমার পিছু লইয়াছিল, তাহার বুদ্ধিকৌশলে সেযাত্রা আমি রক্ষা পাই।”

“বেশ কথা। এখন তাহা হইলে একবার তাহার সহিত দেখা করুন।”

“তিনবার আমি সেখানে গিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহার পিতামহী কিছুতেই তাহার সঙ্গে আমায় দেখা করিতে দিলেন না।”

“আমার অনুরোধে জর্জ্জেট্‌কে দেখিতে গিয়াছেন, একথা শুনিলে বৃদ্ধা আর আপত্তি করিবেন না। যদি তাঁহার কোন সন্দেহ হয়, এজন্য এই অঙ্গুরীটি দিতেছি, তাঁহাকে দেখাইবেন। ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ অত্যন্ত গর্ব্বিতা, সেজন্য আমার এখানে কখনও আসেন না ; কিন্তু আমি যাহা বলি, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। এই অঙ্গুরীটি দেখিলেই, তিনি আর আপত্তি করিবেন না।”

“বালকটিকে কি বলিব ?”

“যা ইচ্ছা। যাহাতে তাহার স্মৃতি পুনরুদ্দীপিত হয়, সেজন্য যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন। মসিয়ে কার্‌নোয়েল্ ও কুমারীর কথাও স্মরণ করাইবার চেষ্টা করিবেন। প্রথম দিনেই যদি কাজ না হয়, আবার যাইবেন। আমার বিশ্বাস, আপনি একাজ খুব পারিবেন।”

“আচ্ছা, আপনার পরামর্শ মতই কাজ হইবে।”

“দেখিবেন, একথা আপনি ও আমি ছাড়া, আর কেহ যেন জানিতে না পারে। আপনি আমার বন্ধু ; আমার অনুরোধ, জর্জ্জেটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিলম্ব করিবেন না।”

ম্যাক্সিম্ বুঝিলেন, বিদায়-কাল উপস্থিত ; কিন্তু তিনি আরও কিছু শুনিবার, বা দেখিবার, আশা করিতেছিলেন। তিনি শুধু বন্ধুস্থানীয়, একথায় তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই।

কাউণ্টেস্ তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, "আপনি আমার প্রতি অনুরক্ত, না জানিলে কি আমি এভাবে আপনার সহিত কথা কহিতাম?"

কাউণ্টেসের নয়নে যেন আরও কত কথা ফুটিয়া উঠিল। ম্যাক্সিম্ প্রফুল্লহৃদয়ে—জানুপাতিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় একটি পরিচারিকা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কাউণ্টেস্ প্রফুল্লহাস্যে বলিলেন, "এখন বিদায়।—আপনি আবার আমার সহিত অচিরে দেখা করিতেছেন ত?—হয়ত এবার আপনার জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ীতেই আবার আপনার সহিত দেখা হইবে!"

(ক্রমশঃ)

স্নেহলতা

সঙ্গোপনে গৃহের কোণে করলে বিরাট পণ—
'রাখ্‌ব আমি বাপের ভিটায়, লক্ষ্মীর আলিম্পন।'

লুকিয়েছিল যে মর্য্যাদা নারীর হৃদয় তলে,
উঠ্‌লো জাগি' দিগ্বিজয়ী বীরের অটুট বলে।

যুক্তকরে অশ্রু-মাখা দিব্য হাসি হেসে'
কর্‌লে বরণ অগ্নিদেবে নববধূর বেশে।

জন্মভূমির পুণ্যপদে লুটিয়ে দিলে শির,
রক্ত-মাখা ভস্মরাশি উড়্‌লো কুমারীর!

ঝল্‌সে গেল শিউলি কলি নীল আকাশের তলে,
বাঙ্‌লাদেশের ফুলবাগানে উঠ্‌লো আগুন জ্বলে'।

ব্রাহ্মণদের সর্ব্বত্যাগে যে দেশ সমুজ্জ্বল,
দয়ামায়ার গঙ্গা-ধারায় যে দেশ নিরমল,

সেইখানে হায়, সেই সমাজে ভীষণ-প্রথা চলে—
বুদ্ধি-বিবেক-ধর্ম্মনীতি— চরণ-তলে দলে!

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

নরওয়ে-ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিছুক্ষণপরে আমরা সেই নিভৃত কক্ষের নিকট বিদায় লইয়া ক্রমে উর্দ্ধপথে যাত্রা করিলাম। দূর হইতে দেখি, এক সুবৃহৎ সৌধ-সম্মুখে আমাদিগের শকটগুলি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বুঝিলাম, এ স্থানে আমাদের luncheon, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কেননা ক্ষুধার উদ্রেক হইলে শ্বেতাঙ্গগণ স্বর্গের শোভা নিরীক্ষণেও অসম্মত;—অগ্রে উদর-পরিপূর্ত্তি পরে নয়নের পরিতৃপ্তি, ইহাই বোধ হয় ইঁহাদের রীতি। আমাদের ধর্ম্ম-প্রধান হিন্দুস্থানে কিন্তু যেখানেই প্রাণারাম প্রাকৃতিক দৃশ্য, সেখানেই এক একটি তীর্থক্ষেত্র—দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং এই সকল মনোরম ধ্যানধারণা করিবার উপযোগী স্থানে আসিয়াও কেবলই আহারের আয়োজন আমাদের চক্ষে কেমন অশোভন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কি করা যায়!—পাশ্চাত্য-রীত্যনুযায়ী—ভদ্রতার খাতিরে (!) অগত্যা সেই পান্থশালায় প্রবেশ করিলাম। হোটেলবাসিগণ ইতঃপূর্ব্বে বোধ হয় আর কখন আমাদের দেশের লোক দেখে নাই। আমরা কেদারায় উপবেশন করিলাম; সকলেরই কৌতূহলপূর্ণ সাশ্চর্য্যদৃষ্টি আমাদিগের প্রতি নিবদ্ধ হইল;—সকলেই যেন কি একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল! যে ঘরে আমরা বসিলাম, তাহার চতুর্দ্দিকে গরম জলের পাইপ্ থাকায় অত্যধিক শীতের জড়সড় ভাবটা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। এতক্ষণ পদযুগলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত ছিলাম, এখন তাহারা যথাস্থানে আছে বুঝিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইলাম। শীতপ্রধান দেশবাসীদিগের যেন ধ্রুব ধারণা যে, উষ্ণপ্রধান দেশের অধিবাসীরা আদৌ শৈত্যের প্রকোপ সহ্য করিতে পারে না। আমাদের দেশেও যে হিমাচল আছে, এবং তাহারই উচ্চতম প্রদেশে, বসবাস করিতেও যে আমরা অভ্যস্ত, একথা বারংবার নিঃসংশয়িতভাবে বুঝাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও, অনেকের যেন বিশ্বাস জন্মে নাই—মনে কেমন একটু

"ট্রন্টজেম্"—'টুরিষ্ট্ হোটেল্'

নরওয়ে

—সান্ধ্যসূর্য্য—

Printed by K. V. SEYNE & Bros.

সন্দেহ থাকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে যখন দেখিল যে, শীতে তাহারা যতই সঙ্কুচিত—কাতর—হইয়া পড়িতেছে, আমরা ততই—শীত-নিবারণের উপযোগী যথেষ্ট পরিচ্ছেদ না থাকা সত্ত্বেও—সোজা—প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছি, তখন তাহারা, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া, আমাদিগের অচিরে স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার আশঙ্কা করিতে লাগিল। বঙ্গরমণীদিগের উপযুক্ত শীত-বস্ত্রের কোনও অভাব আমাদের ছিল না, কিন্তু শিরস্ত্রাণ লইয়াই যত গোলযোগ!—অবগুণ্ঠনই আমাদের চিরাভ্যস্ত দেশাচার-সম্মত সর্ব্বদা-সর্ব্বত্র-ব্যবহার্য্য শিরস্ত্রাণ; সুতরাং ইহা গুরুভার হইলে চলে না, তাই সম্ভবমত লঘুভার বস্ত্রই তদুদ্দেশ্যে আমরা ব্যবহার করি। ইহজীবনে সূক্ষ্ম-অবগুণ্ঠনাচ্ছাদিত, দুঃখ-দারিদ্র্য-সন্তপ্ত এই মস্তকে—হিমবায়ু সেবন কেন—তুষারপ্রয়োগেও সময়ে সময়ে তৃপ্তিলাভ করি। তবে, শীতকালে—দুর্য্যোগের দিনে—যখন জলো কন্‌কনে বাতাস "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে" থাকে, তখনই কেবল একটু কাতর হইয়া পড়ি। এক্ষেত্রেও আমরা সূক্ষ্ম-অবগুণ্ঠনাচ্ছাদনে মস্তক আবৃত করিয়াই গিয়াছিলাম।—এজন্য অপরজাতীয় সহযাত্রিগণ আমাদের জন্য নিয়ত বিশেষ উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন। যাহা হউক, সহযাত্রীদিগের এত আশঙ্কা-উদ্বেগ সত্ত্বেও আমরা যে এক-দিনের তরেও অসুস্থ হই নাই, সেটা কেবল আমাদের প্রতি বিধাতার বিশেষ করুণার পরিচায়ক বলিতে হইবে!

আহারকার্য্য সমাধা করিতে আমাদের প্রায় ঘণ্টা-খানেক লাগিল। কারণ, তাহাতে চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় সর্ব্ববিধ উপচারেরই আয়োজন ছিল। আহারের অব্যবহিত পরে এদেশেও পানের ব্যবস্থা আছে বটে—কিন্তু তাহা পান-পত্র নহে—পান-পাত্রে স্থিত তরল-পদার্থ; তাহা চর্ব্বণীয় নহে—পেয় বলিয়া আমাদের অস্পৃশ্য। পানের পরিবর্ত্তে আমরা যে সুগন্ধি মসলা ব্যবহার করি, তাহা বাহির করিতে দেখিয়া, কোন কোন বিম্বাধরা তাহার রসাস্বাদনলোভে সকৌতূহলে আমাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু আসব-গুর্ব্ব-গন্ধ মুখে কি আর এলাইচ-লবঙ্গাদি মুখ-রোচক হয়? কাজেই ভদ্রতার খাতিরে তাঁহারা সেগুলিকে সুস্বাদু বলিয়া স্বীকার করিলেও, অন্তরে যে তাঁহারা আমাদের রুচির বিশেষ প্রশংসা করিতেছিলেন,—সেরূপ মনে হইল না। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, কি মনে করিয়া, তাঁহারা সকলেই একবার বাহিরে গিয়া প্রকৃতির শোভা-নিরীক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কি আশ্চর্য্য!—সকল জাতিরই এ কি বিকট ভ্রান্তি—সার্ব্বজনীন অভ্যাস-দোষ! কোনও সুশোভন দৃশ্য দেখিলেই, তাহাকে নশ্বর মানবহস্তপ্রসূত সামান্য চিত্রের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়া উঠে—"আহা! যেন ছবি খানি!" কিন্তু যে সুনিপুণ, নিত্য-নূতনসৃষ্টি-কুশল পুরুষ যাবতীয় অসামান্য নরচিত্রকরকে হাতে ধরিয়া আজীবন কলা-কৌশল শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহার রচিত কারুকলার যথাসম্ভব অনুকরণ-সিদ্ধিতেই যাহাদের কৃতিত্বের চরম-সার্থকতা,—তাহাদের সাধ্য কি যে তাহারা সেই সুমহান্ কারিগরের কারুকার্য্য নিজেদের সামান্য চিত্র-ফলকে ফলাইবে? আজ তিনি নিশ্চল শৈলসমূহে দণ্ডায়মান থাকিয়া, সন্তানবৎসল পিতার ন্যায়, এই স্নিগ্ধ-সূর্য্যালোকে তাঁহার স্নেহদৃষ্টি-বর্ষণ করিতে করিতে, প্রকৃতি-দেবীর পরিচর্য্যা-গ্রহণ করিতেছেন। তাই আজ চারিদিকে কেবলই সেবার আয়োজন। পিতৃচরণ ধৌত করিতে গিয়া ভক্ত-সন্তান জল-ধারায় ধরণীকে যেন প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে,—তবু তৃপ্তি নাই। সারি সারি কেবলই ফুলের সাজি। এ পূজার আরম্ভও নাই শেষও নাই, নিত্য-নিয়ত—অনাদিকাল ব্যাপিয়াই চলিয়াছে। আমার এ ক্ষুদ্রহৃদয় এত নিষ্ঠা বুঝিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, আর ভাবিল, এই সভ্য পাশ্চাত্যদেশেও কি স্রক্‌চন্দনে পৌত্তলিক পূজার প্রথা প্রচলিত আছে! তাইত!—ইচ্ছা ছিল, ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া এই নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্বের কিছু সারসংগ্রহ করিয়া লইব,—কিন্তু তাহা আর পারিলাম কৈ? নিয়মিত সময়ে কাজ করিবার সুখও আছে, দুঃখও অনেক! বিশেষ 'কুক্ কোম্পানী'র হাতে পড়িলে, আমাদের ভাব-প্রবণ বাঙ্গালীরা যেন হাবুডুবু খাইতে থাকে। একেই ত ইহাদের মতে আমাদের সময়ের জ্ঞান আদৌ নাই; তাহাতে যদি আবার চলা-ফিরাকার্য্যে একটু শিথিলতা দেখাই, তবেত দেশ-দেখিবার সখে একেবারেই ইস্তফা দিতে হয়! এরা আর কি আমাদের উঠা-নাবার ভার লইবে? অগত্যা, মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়া, ম্লানমুখে শকটারোহণে তৎপর হইলাম।—এইবার অবতরণ, অতএব অশ্বিনীনন্দনদেরও

ত্বরিতগতিতে গমন আরম্ভ হইল; কিন্তু প্রস্তর-বহুল পার্ব্বত্যপথে অবতরণ নিতান্ত নির্ব্বিঘ্ন নয়, কাজেই মাঝে মাঝে যেন প্রাণটা হাতে করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। যখন আমরা সবেগে অধোগামী হইতেছিলাম, তখনকার নয়নাভিরাম শোভা দেখিয়া মহাকবি কালিদাসের উক্তি মনে পড়িয়া গেল—

"শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে॥"

যোষিৎগণ! আজ বেশভূষার প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য যুবতীরা ঈর্ষাদ্বেষ-উদ্দৃক্ত—প্রৌঢ়াগণ স্ব স্ব 'বয়শ্চোর'-গণকে বাঁধিয়া রাখিবার উপায়-উদ্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত। কিন্তু এ সব বড়ই চতুর চোর—ইহারা সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া সুন্দরী-গণের প্রসাধনার সকল সামগ্রীই বেমালুম গাপ্ করিতে জানে, আবার স্বতঃপ্রণোদনে ধরা দিতে আসিয়াও দণ্ডের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকে—দেখিয়া শুনিয়া প্রবীণারা অন্তর্জ্বালায় অস্থির হইয়া ফিরেন! আমরা কএকজন আজ দর্শকদলভুক্ত, সুতরাং স্থিরচিত্তে এ সকল বিষয় সমালোচনা করা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন কাজ

"ট্রুণ্টজেম্ ফিয়ড্"

ছিল না। আহারের ডাক পড়িতেই নির্দ্দিষ্টস্থানে বসিয়া বরতনুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এবার শ্বেত, লোহিত, হরিৎ, পীত বর্ণসমূহের সমন্বয় দেখা দিল; মাঝে মাঝে আবার, মসিবিনিন্দিত অসিতবর্ণ কোটের আম্‌দানী হইয়া, যেন শশাঙ্কের কলঙ্ককালিমা বিকশিত হইল। তখন ভাবিলাম, যা হউক! বাহ্যজগতে,—এ আলোর দেশে ত এতদিন এসকল দৃশ্য দেখা ভাগ্যে ঘটে নাই; তাই বুঝি সেই চতুর চিত্রকর, কিয়ৎকালের নিমিত্ত আমাদিগের দৃষ্টির শ্রান্তি অপনোদনের জন্য, এরূপ কৌশল করিতেছেন!

ক্রমে আমরা আমাদের ভাসমান বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। শেষে যখন খেয়াপারের উদ্দেশে তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম,—তখন প্রায় প্রদোষ-কাল সমাগত!

আমাদের সেই পুণ্যপুরীতে প্রবেশমাত্র সকলকে কেমন একটু ব্যস্তসমস্ত দেখিলাম; কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, প্রাতেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, আজ আহারান্তে মহাসমারোহে নৃত্যগীতাদি চলিবে। তাই, বিলাসপ্রিয় প্রমোদাগণের আজ এই সমস্তদিনব্যাপী সুদূর পথ-ভ্রমণের ক্লান্তি বোধ করিবার অবসর আর একেবারেই নাই। আপন আপন বেশ-রচনার উদ্যম তাহাদিগকে ক্ষণে উৎকণ্ঠিত ক্ষণে উৎফুল্লিত করিয়া তুলিতেছে;—আশ্বস্ত আছেন শুধু সর্ব্ববাদিসম্মত-সুন্দরী

আহারান্তে ডেকে আসিয়া দেখি, প্রদীপ্ত দীপালোকে এবং কৃত্রিম পত্রপুষ্পে, উহা এক দিব্য নৃত্যশালায় পরিণত

হইয়াছে। একপার্শ্বে জাহাজের বাদ্যকরগণ বাজাইবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইঙ্গিত-মাত্র দলে দলে নর্ত্তক-নর্ত্তকীদিগের আবির্ভাব হইতে লাগিল। পাশ্চাত্যদেশের সকল প্রকার নৃত্যোৎসবেই যুগলরূপে নর্ত্তনের ব্যবস্থা। আমাদের দেশে, কেন জানি না, কিন্তু এবিধি কোনকালেই প্রচলিত ছিল না। তাই, আমাদের দেশের নৃত্যনৈপুণ্যে ললিতলবঙ্গলতাগণের অলক্তচরণ-নিঃসৃত শ্রুতিমধুর নূপুরধ্বনি সংমিশ্রিত; আর এদেশের নৃত্য-চর্চ্চায়, যুগপৎ কোমল-পদপল্লব এবং কঠিন-চরণ-সংশ্লিষ্ট-পাদুকার কঠোর-নিঃস্বনে কর্ণযুগল কিঞ্চিৎ প্রপীড়িত পরদিনান্ত পর্য্যন্ত শয্যায় শায়িত রাখায়ও কোন পরিবাদ নাই।

আজ প্রাতে সাগর ছাড়িয়া যে ফিয়ডে আসিয়া পড়িলাম, তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ। সঙ্কীর্ণ হওয়া দূরে থাকুক,—স্থানে স্থানে ইহার প্রশস্ততা এত অধিক যে, কোথাও আর কূলের সন্ধান পাওয়া যায় না; মধ্যে মধ্যে ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপসমূহ সংস্থিত। এ স্থানটায় কর্ণধার, নিজ কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিতে দিতে, জাহাজখানাকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া চলিয়াছেন। তিনি যখন প্রথিতযশঃ, তখন আমাদের মিথ্যা ভয়-ভাবনা ত আর ভাল দেখায় না! তখন বুঝিলাম,
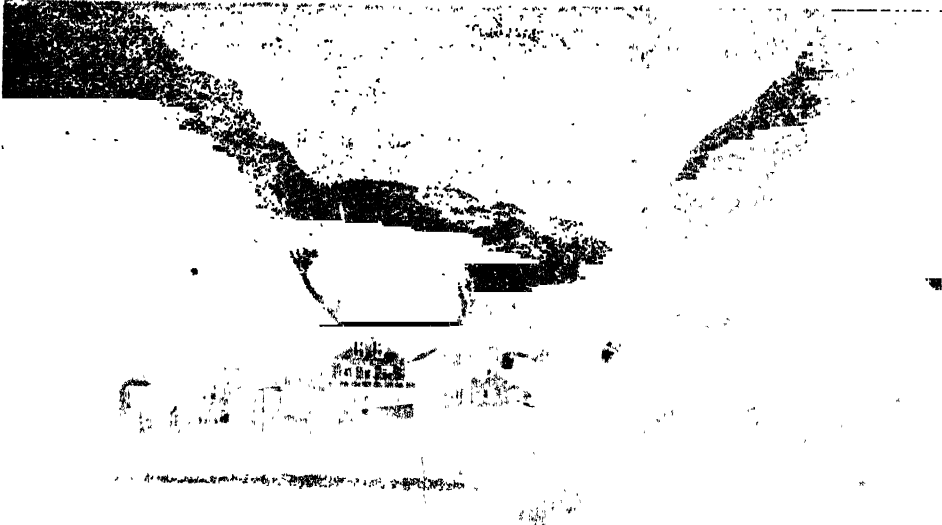
"ফিয়ড্"—পারে

—তুলনায় সমালোচনায় মোটের উপর এই যা প্রভেদ! যুগযুগান্তর হইতে আমরা যুগলরূপের বৈচিত্র্যকে ধর্ম্মের ভিতর দিয়া দেখিয়া আসিতেছি, তাই এইভাবের যুগলরূপ দেখিলে আমাদের শীলতায় কেমন একটু আঘাত করে! হইতে পারে, ইহা আমাদের উচ্চশিক্ষার অভাবের ফল। ফলে, যে কারণেই হউক, বেশীক্ষণ বসিয়া এই কলাবিদ্যা-সম্ভূত-অপার-আনন্দ উপভোগ করিতে অসমর্থ হইয়া, ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রস্থানের ব্যবস্থা করিলাম। সেরাত্রে কতক্ষণ এ আমোদপ্রমোদ চলিয়াছিল, বলিতে পারি না। শুনিতে পাই, এমন সকল ব্যাপারে নিশিভোর করিয়া দেওয়াই নিয়ম। তারপর, যামিনী-জাগরণ হেতু শ্রান্ত দেহকে নির্ভরতার কি মাহাত্ম্য! বুঝিলাম, ভক্তজন কেন দুর্দ্দিনে—"হালে যখন আছেন হরি, তোর কিবা ফাগুন কিবা আষাঢ়" বলিয়া মনকে নির্ভীক নির্বিকার করিয়া রাখিতে সমর্থ হ'ন।

যখন এই ফিয়ডের শেষ-সীমায় আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেলা দশটা। এইবার নোঙ্গর করা হইল। আজকার বিজ্ঞাপনীতে লেখা আছে যে, 'চারিহাজার ফিট্ উচ্চে এক গ্লেসিয়ারের মধ্যে যাইতে হইবে, যাত্রিগণ যেন যথেষ্ট গরম কাপড় সঙ্গে লয়েন।' কথাটা হঠাৎ যেন কাহিনীর মত বলিয়া মনে হইল। আছি আমরা কোথায় নীচে পড়িয়া!—এত উঁচুতে উঠিবই বা কি করিয়া?

Senderএ পার হইয়া দেখি যে, শাদা শাদা "পনি" জোতা ছোট ছোট শতাবধি দুই চাকার টম্ টম্ গাড়ী (Dog-cart) রহিয়াছে; প্রত্যেক গাড়ীতে দুই জনের বেশী ধরে না। আমরা দুই বঙ্গনারী, আমাদের নম্বরমত, একখানি গাড়ী দখল করিয়া বসিলাম। ভ্রাতার ভাগ্যে এক স্থবিরা শ্বেতাঙ্গিনী সহযাত্রী জুটিলেন; দেখিয়া সকলেই খুব আমোদ করিতে লাগিলাম। অশ্বচালক ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ী টানিয়া লইয়া চলিল, কেন না আজকার চড়াই বড় সঙ্কট-জনক। যখন সারি বাঁধিয়া এতগুলি গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন মনে হইল, যেন সুধা-সংগ্রহে নিমন্ত্রিত হইয়া, মর্ত্ত্যধামবাসী আমরা সুরলোকে গমন করিতেছি। তবে, সে কামচারী রথও নাই, আর সে সারথিও সঙ্গে নাই; থাকার মধ্যে আছে, 'কুক্ কোম্পানী'র জনৈক শ্বেতকায় বরবপু ম্যানেজার—তিনিই এক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক! তা' দেখা যাউক্, পাশ্চাত্য প্রণালীমতে দিব্যধামে প্রবেশ-লাভের কি প্রকার ধারা!

লুক্কায়িত করিতেছেন না!—এটা বুঝি দেশাচারের ফল!—অধিকন্তু, কেমন হাসিয়া হাসিয়া অঞ্চল উড়াইয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। তবে, এ বিলাস-বিলোল মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের সহযাত্রী পাশ্চাত্যপ্রদেশবাসিগণের "অন্তরে গুমরি মরে বাসনা-যত"-ভাবটা কিছুমাত্রও দেখিতে পাইলাম না! তাহার অর্থ আর কিছুই নয়—পাশ্চাত্যদেশবাসীদিগের ভাবে ও স্বভাবে, আর আমাদের ভাবে ও স্বভাবে স্বর্গমর্ত্ত-প্রভেদ!—অধিকন্তু, এতদ্দেশীয় পাণ্ডা ও যাত্রিগণ, আমাদের ধারণা-মত স্থান-অস্থান, সময়-অসময়, পাত্র-অপাত্র বুঝিয়া ত চলে না—চলিতে পারেও না—সুতরাং, আমাদিগকেই বিশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে।—আমরা কি তাহাদের মত হাসি-কান্না, হাতের মুঠায় রাখিতে জানি? কখন্ কোন্ ভাবের আবেগে আমাদের প্রাণ বিগলিত হইয়া নয়ন-পথে ধারা-রূপে বাহির হইয়া পড়ে, আমরা কি তাহা রোধ করিতে পারি? না জানি?—না, আমরা তাহার জন্য দায়ী? কাজেই

"রস্‌ডাল" পথে

উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রথমে যখন অগ্রসর হইতে লাগিলাম, চতুর্দ্দিক্ হইতে, হুলুধ্বনির মত, কুলু কুলু রব কর্ণকুহরে যেন অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। ভাবিলাম, এই বুঝি আমাদের যাত্রার মঙ্গলাচরণ! কিন্তু এ কুলবধূগণ যে আগন্তুক দেখিয়াও অবগুণ্ঠনে মুখ

এই পর্য্যটকের দলে মিশিয়া অবধি পোড়া চক্ষু দুটা লইয়া সর্ব্বদাই যেন ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ি!—উপত্যকা ছাড়িয়া যখন আমাদের দল ঊর্দ্ধগামী হইতে লাগিল, তখন এতগুলি গাড়ী এক লাইনে চলা অসম্ভব হওয়ায় ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। বৃক্ষলতা-

শূন্য পাষাণময় পথে চলিতে চলিতে, ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া দেখি,—অগ্রগামী অশ্বগণ ক্রমেই খর্ব্বকায় হইয়া যেন কুকুরের আকার ধারণ করিয়াছে, আর যেন এক এক খানা খেলার গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেছে। নীচে হইতে যে সকল তুষারখণ্ড বহুদূরে—ছোট দেখিয়াছিলাম, এখন দুই পাশে উহাদিগকে ধরিতে—ছুঁইতে পাইতেছি, আর তাহাদিগের বিশালতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি! ইহারা এত জমাট্ বাঁধিয়া আছে, যে সহসা যেন মর্ম্মর বলিয়া ভ্রম জন্মে। কোথাও মনে হইল যেন প্রকাণ্ড লবণের খনি কিঞ্চিৎ শিথিলভাবে পড়িয়া আছে। এইরূপে ক্রমে দুইধারে কেবল হিমগিরি, আর বামে-দক্ষিণে জমাট্-জল দেখিতে দেখিতে আরও ঊর্দ্ধে চলিলাম। এবার, অঙ্গের আবরণের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পড়িল। তখন মোটা কম্বল (Rug) মুড়ি দিয়া, নানাবিধ পশ্মি কাপড়ে নাক কাণ ঢাকিয়া, এক কিম্ভুতকিমাকার জীব হওয়া গেল। এমন সময়, হঠাৎ আকাশে একটু মেঘ দেখা দিল। সূর্য্যদেব আমাদের এহেন দুর্গতি দেখিয়া, যেন খেদে সেই মেঘান্তরালে মুখ লুক্কায়িত করিলেন, আবার বুঝি স্নেহ-পরবশ কাকুতিমিনতি করিয়াও রক্তের বেগ উত্তেজিত করিতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় পড়িয়া, গিরিসঙ্কুল পথ-যাত্রায় গাত্রের আচ্ছাদন যথাস্থানে রাখাও দায় হইল! এখন উপায়?—হস্তের সাহায্য ভিন্ন ত আবরণ-রক্ষার উপায়ান্তর নাই! ভাবিলাম, এই পাংশুলা পাণিকে এখন চর্ম্মাদিতে আবৃত করিয়া—একেবারে ব্রহ্মচর্য্যের বেশে সাজাইয়া—পরহিত-ব্রতে ব্রতী করি; কিন্তু সে, রোমশ-দস্তানার আশ্রয়ে আসিয়া এমনই বিরাগী হইয়া পড়িল যে, একেবারে বাহ্য-জ্ঞান বিরহিত! সে যে কি করিতে কি করিতেছে—কিছুই সাড় নাই। এরূপ বিপাকে পড়িলে মনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাই স্বাভাবিক; কিন্তু না জানি কেন, আজ মন বড়ই প্রসন্ন,—কিছুতেই তার ভ্রূক্ষেপ নাই! আসল কথা, সে এমন স্থানে আর কখনও আসে নাই; এতদিন তাহার পক্ষে যাহা অনুমান ছিল, এখন তাহা প্রত্যক্ষে বিদ্যমান!—এখন সে তাহার বহুপূর্ব্বাবধি নিজাঙ্কিত ছবির সহিত পূরোবর্ত্তী বাস্তবের তুলনা করিতেই ব্যস্ত; কিন্তু, হায়! উভয়ের মধ্যে কোথাও বড় একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছে না। তা নাই-ই হইল, সে জন্য সে দুঃখিত

"নেরোডালেন্"

নয়;—প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান পাইলে, কে আর অনুমানের সাহায্য-প্রত্যাশী হইতে চাহে? এখানে চারিদিকে সবই কেবল শাদা। কবিগণ কেন শুভ্রতার মধ্যে সততই প্রসন্নতাকে পান, আজ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। আবার প্রসন্নতাই যে পবিত্রতার আধার, সে সত্যেও আর সংশয় রহিল
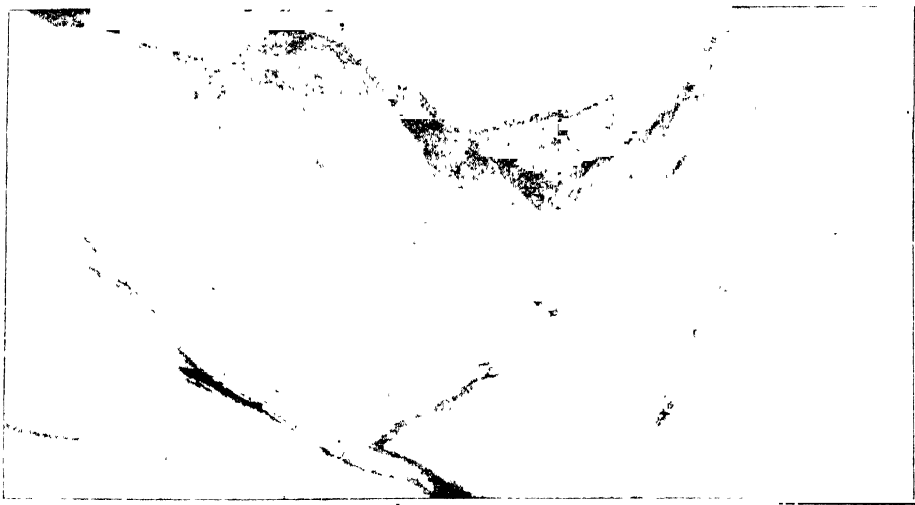
হইয়া পরক্ষণেই সস্মিত-মুখে আমাদিগকে আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে আহ্বান করিলেন।—তখন আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! শরীরের শোণিত-প্রবাহ কোন মতেই আর নাসাগ্র পর্য্যন্ত আসিতে সম্মত নয়,—পদতল পর্য্যন্ত পৌঁছান ত দূরের কথা! করযুগল কত

না।—শরীরটাকে টানিয়া উঁচুতে তুলিয়াছি সত্য, কিন্তু হৃদয়কেও কি অনুরূপ উন্নত করিতে পারিয়াছি? সেও কি সত্যই আশেপাশে এমনই শুভ্রতার মধ্য দিয়া চলিয়াছে?—বুঝি বা তাই! নচেৎ সে এত প্রসন্নতা পাবে কোথায়!

এতক্ষণ সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল; এখন কে যেন আসিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়া গেল—ভয়ে জিহ্বা একেবারে আড়ষ্টপ্রায়। এ শাসন কেন?—প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলাম না। পরে চাহিয়া দেখি, দীর্ঘ জটাধারী যোগনিষ্ঠ যোগিগণ, নিস্পন্দ নিশ্চলভাবে ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এ পুণ্য-স্থানে প্রবেশের পূর্ব্বে সকলেরই বাক্য ও মন সংযত রাখিতে হয়—যেন তাহাদের কোনমতে দাঁড়াইলেন; বুঝিবা কৌতূহলী হইয়া জানিতে আসিয়াছেন যে, সুদূর দেশান্তরে—প্রাচ্যদেশে যাঁহার প্রভূত-প্রতাপে জীবলোক সতত ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া পড়ে, আজ তাঁহার এ সৌম্যভাব কেমন দেখিতেছি!—থাক্ সে কথা। সূর্য্য-দেবের স্বভাব, সকলকে চঞ্চল করিয়া তোলা;—নতুবা তাঁর তৃপ্তি নাই—অথচ সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যে নীরব-নিভৃতে, একান্তে যোগসাধনা চলিয়াছে—কা'র সাধ্য আছে যে, সে সাধনায় বিঘ্ন ঘটায়?—তাই, অচল-অটল জানিয়া, অনাদিকাল হইতেই তিনি শৈলশৃঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং তৎসংক্রান্ত যাহাকিছু, সকলেই তাঁর বিতৃষ্ণা! তা' না হইবেই বা কেন? দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী লোককে বাধ্য

"ষ্ট্যাল্‌হীম্‌স্কে্ভেন্"

যোগভঙ্গ না হয়। আমাদের প্রতি যে ঐরূপ আদেশ হইয়াছিল কেন,—এতক্ষণে তাহা বুঝিলাম। এখন যে চলিয়াছি, সে এক মহান্ সত্তার মধ্য দিয়া,—তাহাতে শৈত্য-বোধ নাই, বা শ্রান্তিক্লান্তিও অনুভূত হয় না। চারিদিকে "আনন্দং রূপমমৃতম্", আর অন্তরে "তত্ত্বমসি"—এই ঋষিবচনের সার্থকতা উপলব্ধি করা—এখন এইমাত্র কার্য্য! অবশেষে, সেই ভুবনমনোমোহিনী যাদুকরীর দিকে তাকাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরি!"—কোনই উত্তর পাইলাম না। এবার আরও দুই একখানা কাল' মেঘ আকাশে দেখা দিল, অমনই ভাস্করও পরম-বন্ধুর মত উহাদের স্কন্ধে ভর দিয়া আসিয়া হইয়া বিনীতভাব ধারণ করিতে হইলেই, আর তার প্রতিপত্তি খাটে না;—কাজেই সেস্থানে বসবাসও তাঁ'র পোষায় না!—তার উপর আবার যোগবল ত আছেই!

আজিকার তাঁর এই তেজশূন্য নিরীহভাব দেখিয়া বস্তুতঃই সেই সূর্য্যের সূর্য্য—পরম-সূর্য্যের মহতী-শক্তির কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া অন্তরে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এমন সময় আচম্বিতে চাহিয়া দেখি, গায়ের কম্বলখানায় সত্য সত্যই তুলাসম তুষার বৃষ্টি হইতেছে। তাইত!—এ দেশের কি এই নিয়ম, যে সকল তরলতাই নষ্ট করিয়া দিবে?—অন্তরে বাহিরে কোথাও ধারা বহিতে দিবে না?—সব জমাট্‌। এবার বুঝি শোণিত প্রবাহও,

এদের দেখাদেখি "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" বলিয়া, জমিয়া বসে;—কিন্তু সে পায়ে পড়িতে একান্তই নারাজ।—কোনরূপে এখন গম্যস্থানে পৌঁছিতে পারিলে হয়! কিন্তু সে গম্যস্থান আর কতদুর? এর চেয়েও সুন্দর কিছু আছে না কি? যখন পথ-চলিতেই এত আনন্দ, তখন যাহার উদ্দেশে এ পথ চলা, না-জানি তাহা কতই সুন্দর!—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—"কে হে তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!"—তিনি যে সৌন্দর্য্যের খনি!—তাঁর ভাণ্ডার কি সহজে ফুরায়? মনে আবার উত্তম উৎসাহ আসিয়া জুটিল। এমন সমতলভূমি পাইয়া অশ্বগণ শুভ্রতার মধ্য দিয়া সানন্দে ছুটে ছিল। হঠাৎ যেমন মোড় ফিরিয়াছে, অমনি যেন চমক্ ভাঙ্গিল—আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম!—এ যে সত্য সত্যই দিব্যধাম মনে হইল—আমি কি জাগিয়া না ঘুমঘোরে আছি?—চারিদিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, এমন সৌন্দর্য্য ত জীবনে আর দেখি নাই!—কবি গায়িয়াছেন—

"যার খুসি রুদ্ধ চখে কর বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ এই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে,
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে॥"

আজ মহাকবির নির্দ্দিষ্ট পথই অনুসরণ করিলাম। ভাবিলাম, ধ্যান-ধারণায় কি এমূর্ত্তি এমন প্রকটিত হয়! ইচ্ছা হইতেছিল, যত প্রিয়জনকে আনিয়া একবার এ দৃশ্য দেখাই।—সৌন্দর্য্য একা উপভোগ করায় সার্থকতা নাই—এমন দৃশ্য একা দেখিয়াত তৃপ্তি নাই। দূরত্ব-জ্ঞান তখন তিরোহিত—ব্যবধান তখন বিলুপ্ত;—স্মরণমাত্রই যেন সকলকে কাছে পাইলাম। কল্পনাবলে প্রিয়জন সনে যখন একই দিব্য-সৌন্দর্য্য উপভোগে বিভোর হইয়া আছি, এমন সময় গাড়ীগুলি এক বিচিত্র ভবনদ্বারে থামিয়া গেল! গাড়োয়ান আসিয়া হাতবাড়াইয়া দিয়া আমাদিগের অবতরণের সহায়তা করিতে আসিল! সভ্যদেশের—কি ধনী কি দরিদ্র, কি শিক্ষিত কি মূর্খ, সকলেই শিশুকাল হইতেই নারীজাতির সম্মান করিতে শিখে; কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই! আমরা কিন্তু প্রথমতঃ একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম—সেটা অবশ্য পাশ্চাত্যদেশীয় রীতিনীতি না-জানা বশতঃ নয়—পথে আসিতে আসিতে যে হস্তে নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া, নানা অস্পৃশ্য দ্রব্য ধারণ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সহসা সেই হস্ত-স্পর্শ করিতে মনে যেন কেমন একটু কুণ্ঠা বোধ হইল।—আর এমনটা হওয়া যে অস্বাভাবিক, তাহাও মনে হয় না।—

তারপর যখন দেখিলাম যে,পায়ের আর স্বেচ্ছায় উঠিবার কোন উদ্যোগই নাই, তখন অগত্যা শুধু সে দিনের নয়,—অনেকদিনের আহার্য্যের চিহ্ন পরিলিপ্ত গাড়োয়ানের সেই রুক্ষ করের আশ্রয়ে, অবতরণ-কার্য্য সমাধা করা গেল। পরে সেই হস্তাধিকারীকে, শিষ্টাচারের অনুরোধে, ধন্যবাদ দিয়া সঙ্গিগণসহ সম্মুখস্থিত ভবনে প্রবেশ করিলাম। সে গৃহাভ্যন্তরে সর্ব্বাঙ্গকে সময়োচিত উত্তাপ দান করিবার সবিশেষ আয়োজন রহিয়াছে দেখিয়া, মনঃপ্রাণ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু আজ ত অন্তরালে বসিয়া থাকিবার দিন নয়। দুই চক্ষুর দৃষ্টি যে কোন মতেই প্রাচীর-সীমায় আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে না; আজ আর মানুষের কারুকলা ভাল লাগিতেছে না।—অন্তর আজ বহির্মুখ। তাই পদদ্বয়, কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র, প্রকৃতি-দেবীর ইঙ্গিতে যেন অমিত-চঞ্চল হইয়া উঠিল!—মুক্ত-বাতায়নে বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিল না! কেবল চলি-চলি-ভাব। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর স্বরে কিশোরীর পাদপদ্মের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, আমার পদযুগলও যেন সেই দশাপ্রাপ্ত!—তাই বলিয়া কেহ মনে না করেন যে, আমি নিজ হেয় পদদ্বয়কে পদ্মের সহিত উপমিত করিতেছি!—সে নিন্দনীয় বৃথা-স্পর্দ্ধা রাখি না!—ঘরের বাহির হইতেই হইবে। তখনও জানিনা যে ঘরের বাহিরে কি আছে। এদিকে আহার্য্য প্রস্তুত, এবং অপরাহ্ণ-ভোজনের সময়ও উপস্থিত। যাই বা কেমন করিয়া? সঙ্গীরা কেহই ত উদর-পরিতৃপ্তি না করিয়া, কিছুতেই এক পাও নড়িবে না! অথচ আমার ত আর দেরী সয় না!—কি করি! যা থাকে কপালে বলিয়া, প্রকৃতি-রাণীর সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।—বেশীদূর যাইতে হইল না। সেই পান্থশালার পাশেই আমার ঈপ্সিত সকল জিনিস একসঙ্গে পাইলাম। কিন্তু সে পাওয়ার হিসাব দিই, এমন ক্ষমতা আমার ছিল না। এ কি পাওয়া! এ পাওয়া চক্ষুকে তৃপ্ত করিল,

মনকে মুগ্ধ করিল, চেতনা বাড়াইয়া ভূমানন্দের আস্বাদ জানাইল। এদেশে আসিয়া অবধি কত আধারে, কত আকারে যে অনন্ত লীলাময়ের কতলীলাই দেখিলাম, তার সংখ্যা নাই; কিন্তু আজ যাহা দেখিলাম,—ইহা যেন লীলাময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলা-বিগ্রহ।

এই পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত প্রদেশে ত যথায় তথায়ই হ্রদ পড়িয়া আছে, সুতরাং শুধু সুবৃহৎ একটি হ্রদ রহিয়াছে, একথা বলিলে এ স্থানটির কোন বিশেষত্বেরই পরিচয় দেওয়া হয় না; অথচ কেবল পাঠকপাঠিকার কল্পনার হাতে ইহাকে ছাড়িয়া দিতেও মন চায় না!—যদিও কল্পনার ধারণায় আসে না, এমন পদার্থ বড় একটা নাই; কিন্তু এমন মোহন-মধুর-বিচিত্র-সৌন্দর্য্য-সমাবেশ বুঝি কল্পনারও অতীত! হ্রদে জল থাকে, এবং স্থানমাহাত্ম্যে তাহা জমাটও হয় জানি, কিন্তু এমন ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র বর্ণ, এমন গুণের পার্থক্য, আর এত অধিক রসের প্রকর্ষ, সর্ব্বত্র থাকে কি? তাই বলিতেছিলাম, কল্পনায় ঠিক ইহাকে আয়ত্ত করা যায় না!—কোন কালে এ জলাশয়ে কেবলই স্বচ্ছ সলিল ছিল, অথবা ইহা নিরবচ্ছিন্ন নীহারে আবৃত থাকিত কি না—আজ দেখিয়া তাহা নিরাকরণ করা সুকঠিন! এককালে যে চতুষ্পার্শ্বস্থ হিমাদ্রি-শ্রেণীর হিমানী-নিচয় বিগলিতধারায় প্রবাহিত হইয়া ইহারই উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিল,—এই হ্রদ যে তাহারই পরিণতি—আজও তার বহুনিদর্শন বর্ত্তমান। কিন্তু তাহারা এখানে আসিয়াও শৈত্যের প্রতাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে না পারিয়া, যেন যেখানে-সেখানে পড়িয়া আতঙ্কে নিস্পন্দ—হৃতচৈতন্য হইয়া পাষাণবৎ পড়িয়া আছে। আবার কোথাও, যেন আপনাদের অন্তর্জ্বালা নিরুদ্ধ রাখিতে না পারিয়া, এই পাষাণ ভেদ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে। কোথাও আবার ফাটে-ফাটে-ফাটেনা গোছ হইয়া রহিয়াছে। তীক্ষ্ণরশ্মির করজালকে এরাজ্যে সততই সংযত রাখিতে হয় বলিয়া, তিনিও এতদঞ্চলে নিষ্ক্রিয়—স্তব্ধ! নচেৎ এমন স্নিগ্ধ কোমল তুষারকে চির-পাষাণে রূপান্তরিত করিয়া রাখিবার সাধ্য ছিল কার?

এদিক্ ছাড়িয়া যখন সেই হ্রদের অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম,—দেখিলাম, নীল-নিভ কি দেখা যাইতেছে। ঊর্দ্ধে—দিগ্বলয় পর্য্যন্ত—আকাশের নীলিমা ব্যতীত, এ বর্ণ ত এরাজ্যে অন্যত্র নয়নগোচর হইবার কথা নয়।—তুষারে আকাশ প্রতিবিম্বিত হইলে ত ওরূপ দৃষ্ট হইত না! ও যে স্বচ্ছসলিল-ক্ষেত্র! কোন্ উত্তাপ তবে এ পাষাণ বিগলিত করিয়া জীবনে পরিণত করিল!—নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ভূধরগর্ভস্থিত কোন গুপ্ত-রহস্য নিহিত আছে! এই আধ-ধবল, আধ-শ্যামল শোভা নিরীক্ষণ করিয়া ত আর আশ মিটে না।—এ কি মাধুর্য্য!—কাহার মধুরিমার এ প্রত্যক্ষ প্রকাশ—এ জাজ্জ্বল্যমান বিকাশ! তখন মনে পড়িল,—আজ যে আমরা এই অমরধামে এই মাধুর্য্যামৃত পান করিয়া ধন্য—কৃতার্থম্মন্য হইবার আশয়েই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি। আহা! কতদিক্ হইতে, কত সৃষ্ট পদার্থে, কত কৌশলে এই নিরবচ্ছিন্ন—নিরবদ্য—মাধুরী-ধারা ঢালিয়া দিতেছে! আমি দুইটি মাত্র চক্ষু লইয়া কেমন করিয়া তাহা উপভোগ করিব? একেই পোড়া নয়নযুগলের শক্তি অতি ক্ষীণ, তাহাতে আবার অশ্রু আসিয়া সময়ে অসময়ে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়,—সে যে যুক্তি মানে না, নিষেধও শোনে না। হায়! আজ চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইলাম। সতৃষ্ণ হইয়া—পেয়-সম্মুখীন, সন্নিহিত থাকিয়াও—আঁখি নিজ আকুল পিপাসা মিটাইতে পারিল না। আজ বুঝিলাম, দিব্যধামে আসিয়া, দিব্যচক্ষু-সম্পন্ন না হইলে, সকল দিব্য-বস্তু-দর্শন সম্ভবপর নহে। অমৃতলাভ করিলাম—কিন্তু সেবনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না—শুধু পাওয়ায় ত অমর হওয়া যায় না। আমরা যখন অমৃতের সন্তান, তখন অমৃতে ত আমাদের অধিকার আছেই, কিন্তু হায়!—পানের রীতি জানি না—শিখি নাই যে!

"ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা, ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদ্ ইচ্ছা।"

এমন পান-পাত্র সঙ্গে আনিয়াছি কি?—সুতরাং, "ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধান-ভানা" ভিন্ন, আর কি হইবে!

(ক্রমশঃ।

শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন

বিগত শিবরাত্রির বন্ধের সময় পাবনায় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। এবার একবৎসরের মধ্যেই দুইবার সম্মিলন হইল;—একবার, জ্যৈষ্ঠমাসে দিনাজপুরে; আর দ্বিতীয়বার, পাবনায়। সম্মিলনের ত আর তিথিনক্ষত্র নাই; এক সঙ্গে দুই তিন দিন ছুটী মিলিলেই সম্মিলন,—তা কে জানে অশ্লেষা-মঘা, আর কে জানে ত্র্যহস্পর্শ! স্বদেশ-সেবাই বল, আর সম্মিলন-সমিতিই বল, চাকুরী বা ব্যবসায় বাঁচাইয়া সকলই করিতে হইবে। তাই একবৎসরের মধ্যেই দুইবার উত্তরবঙ্গে সাহিত্য-সম্মিলন করিতে হইয়াছে। এজন্য যদি ত্রুটী ধরিতে হয়, তাহা সম্মিলনের উদ্যোগকারিগণের নহে, সে ত্রুটী নূতন পঞ্জিকার। হাটবারের পরের দিন শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা না হইলে কি সুবিধা হয়? পঞ্জিকা কিন্তু আমাদের গরজ মোটেই বোঝে না; সে কিছুতেই রবিবারের সঙ্গে পর্ব্বদিন যোগ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেনা বলিয়া আমাদের নানা অসুবিধায় পড়িতে হয়।

একটা মোটামুটি হিসাব দেখাইলেই পাঠকগণ আমাদের অসুবিধা বুঝিতে পারিবেন। আমাদের শিক্ষিতসমাজের নিম্নলিখিত কএকটি পর্ব্ব রক্ষা করিতে হয়; যথা—কন্‌গ্রেস, প্রাদেশিক-সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, মালদহ সাহিত্য-সম্মিলন। এই কয়টি প্রধান; এতদ্ব্যতীত ছোটখাট অনেক আছে। কন্‌গ্রেসের কোন গোল নাই; কার্ত্তিকপূজা কবে হইবে, ইহা যেমন পঞ্জিকা দেখিয়া ঠিক করিতে হয় না, কন্‌গ্রেসও তেমনই বড় দিনের সময় হইবে, ইহার জন্য পঞ্জিকা দেখিতে হয় না। ইংরেজের আমলে দুইটা বড়ছুটী,—এক বড়দিনের ছুটী, আর পূজার ছুটী। বড়দিনের ছুটীটা কন্‌গ্রেসের ইজারামহল, পূজার ছুটীটা ভ্রমণের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট। শুনিয়াছি, সে সময়ে কোন সভা-সমিতি করিলে অনেকেরই আপত্তি হইয়া থাকে; তবুও ঐ সময়ে মালদহ-সম্মিলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর, ছোটছুটীর মধ্যে প্রধান ইষ্টারের ছুটী; সেই সময়ে প্রাদেশিক-সমিতির অধিবেশন হয়, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনও অনন্যোপায় হইয়া সেই সময়েই বৈঠক বসাইয়া থাকেন। ইহাতে অবশ্য অসুবিধা আছে; কারণ দুই স্থানে নিমন্ত্রণরক্ষা ত আর করা যায় না; কাজেই আমাদিগকে দুইভাগ হইতে হয়। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনকে, সুতরাং, পঞ্জিকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সেই পঞ্জিকার কৃপায় এবার শিবরাত্রি সোমবারে পড়িয়াছিল,—তাই এক বৎসরে দুইবার অধিবেশন করা ব্যতীত উত্তরবঙ্গের গত্যন্তর ছিল না; কিন্তু তাহাতেও গোল ছিল। মহামান্য হাইকোর্ট শিবরাত্রির দিন, অর্থাৎ সোমবারে, আদালত খোলা রাখিয়াছিলেন, তাহাদের মঙ্গল-বারে বন্ধ; মফস্বলের দেওয়ানী আদালতগুলি সোমবারে বন্ধ ছিল, ফৌজদারী খোলা; অনেক স্কুল সোমবারে বন্ধ ছিল, কাহারও বা সোমবারে খোলা ছিল। এই গোলে পড়িয়া উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীমহাশয়কে রবিবার রাত্রিতেই পাবনা-ত্যাগ করিয়া কালকাতায় আসিতে হইয়াছিল। আরও দুই পাচজন বড় সাহিত্যিককে চাকুরীর, বা ব্যবসায়ের, মায়ায় রবিবারেই গা ঢাকা দিতে হইয়াছিল। এই অসুবিধার জন্য, পঞ্জিকাই একমাত্র দায়ী। পঞ্জিকাকারগণ যে, এই চাকুরীগত-প্রাণ বাঙ্গালীর হাটের পরদিন পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেন না,—যত পালপার্ব্বণ রবিবারের সহিত মিলাইয়া দেন না, ইহা তাঁহাদের অমার্জ্জনীয় অপরাধ! পঞ্জিকা-সংস্কারের যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, সেবিষয়ে আর মতভেদ হইতে পারে না।

সে কথা এখন থাকুক।—আমরা নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পাবনা-সম্মিলন দেখিবার জন্য গিয়াছিলাম। 'দেখিবার' কথাটা বোধ হয় ঠিক হইল না, আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিভাবে সম্মিলনে গিয়াছিলাম; 'ভারতবর্ষের' তরফ হইতে নিমন্ত্রণরক্ষা করাও হইয়াছিল। মধ্যে একটু গোল উঠিয়াছিল,—আমরা প্রথমে শুনিলাম যে, উত্তরবঙ্গ সম্মিলনে দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যিকদিগের প্রতিনিধি হিসাবে নিমন্ত্রণ হইবে না; কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্য-সভা বা সাহিত্য সম্মিলন নিমন্ত্রণ পাইবেন না; উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণের বাছা বাছা বন্ধুগণই আহূত

হইবেন। এই প্রকার দুই দশজন বন্ধুই প্রথমে নিমন্ত্রণ পাইলেন,—অবশ্য সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ সকলেই নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। এই কথাটা লইয়া একটু গোলও উঠিয়াছিল। যাঁহারা সাহিত্য-পরিষৎ বা সাহিত্য-সভার সদস্য, তাঁহাদের অনেকেই বলিয়াছিলেন যে, যদি পরিষদের নিমন্ত্রণ না হয়, যদি পরিষৎ-প্রতিনিধি-প্রেরণের জন্য আহুত না হ'ন, তাহা হইলে কোন সভ্যই ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যাইবেন না। কথাটা উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তাদিগের কর্ণগোচর হইল; তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে,কাজটা নিতান্তই গর্হিত হইবে,—আবার আর এক মূর্ত্তিতে পার্টিসন হইবে। তাই শেষে, ঢালাও নিমন্ত্রণ হইল; 'পরিষৎ' প্রতিনিধি-প্রেরণের জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন, অভিমান দূর হইল। রবিবারে সম্মিলনের অধিবেশন,—কেহ কেহ শুক্রবার রাত্রির গাড়ীতেই পাবনা যাত্রা করিলেন। মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ, ভ্রাতৃগণ-সহ, শুক্রবারেই যাত্রা করিলেন; সাহিত্য-পরিষদের সহকারী শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীভায়াও শুক্রবারেই গেলেন। সম্মিলনের সভাপতি নাটোরাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়বাহাদুরও শুক্রবারেই যাত্রা করিলেন; প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়াও মহারাজের সঙ্গী হইলেন।

আমরা শনিবারের রাত্রিতে গোয়ালন্দ-মেল গাড়ীতে যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম; কে কে আমাদের সঙ্গী হইবেন তাহা শনিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে পর্য্যন্তও জানিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার সময় শুনিলাম যে, 'মানসী'র বড় একটা দল যাইতেছেন। 'হপ সিং কোম্পানী'র অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র দত্ত ভায়া বলিলেন যে, তিনি পাবনায় যাইবেন; সুতরাং তাঁহার সঙ্গগ্রহণ করা গেল। সন্ধ্যার পর তাঁহার গৃহেই আহারাদি করিয়া, তাঁহারই গাড়ীতে যাত্রা করা গেল। গাড়ীতে উঠিয়া তিনি বলিলেন যে, পথের মধ্যে দুইস্থানে দাঁড়াইতে হইবে। তথাস্তু!—প্রথম, কবিবর শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন বাগচীর গৃহে উপস্থিত হওয়া গেল;—তিনি বলিলেন,তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর অসুখ বৃদ্ধি হইয়াছে; তিনি যাইবেন না। শ্রীমান্ 'সুবোধচন্দ্র' নাছোড়বান্দা; অনেক বাক্যব্যয় করিয়া বাগচী ভায়াকে গাড়ীতে তুলিলেন।—তখন সাড়ে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে; দশটায় ট্রেণ। বুঝিলাম এই সাধুসঙ্গে পড়িয়াই গাড়ী 'ফেল' হইতে হইবে। জীবনে প্রায় সকলব্যাপারেই 'ফেল' হইয়া আসিয়াছি; কিন্তু কোন দিন গাড়ী 'ফেল' হয় নাই;—আজ বুঝিবা সে গর্ব্বটুকুও চূর্ণ হয়, মনে করিয়া একটু বিষণ্ণ হইলাম। তাহার পর শুনিলাম, দপ্তরী-বাড়ী যাইতে হইবে; তখন নিশ্চিন্ত হইলাম। পাবনায় যাওয়া হইবে না বলিয়া দুঃখ হইল না; কিন্তু গাড়ী 'ফেল' হইয়া কোন্ লজ্জায় বাসায় ফিরিয়া যাইব? যাক্, দপ্তরী-বাড়ীতে বাবুদের বিশেষ বিলম্ব হইল না। তখন 'জোর্‌সে হাঁকাও' 'জল্‌দি চলো' প্রভৃতি হুকুম কোচ্‌ম্যানের উপর চালাইতে আরম্ভ করিলাম। গাড়ী, দ্রুতবেগে চলিয়া, দশ মিনিট সময় থাকিতে ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। আমরা তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিয়া গাড়ীর দিকে দৌড়াইলাম।

এবার আমি বুদ্ধিমান হইয়াছিলাম।—ইতঃপূর্ব্বে দিনাজপুর-সম্মিলনে যাইবার সময় রিজার্ভ করি নাই; এবার পূর্ব্বেই চিঠি লিখিয়া রিজার্ভ করিয়াছিলাম। গাড়ীর নিকট যাইয়া দেখি, আমার জন্য একখানি বেঞ্চ রিজার্ভ রহিয়াছে। সেই গাড়ীতে আরও দুইখানি বেঞ্চ দুইজন ভদ্রলোক রিজার্ভ করিয়াছেন; তাঁহারা গোয়ালন্দ যাইতেছেন। আমরা সেই গাড়ীতেই জিনিষপত্র তুলিলাম। একটু পরেই কবিবর বাগচী আসিয়া বলিলেন যে, তিনি তিনখানি বেঞ্চ রিজার্ভ করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন; তাঁহার জন্য আধখানা গাড়ীই রিজার্ভ হইয়াছে। তাঁহারা সেই গাড়ীতে যাইবার জন্য জিনিষপত্র নামাইতে আরম্ভ করিলেন; আমি তখন আমার গাড়ী ছাড়িয়া তাঁহাদেরই সঙ্গী হওয়া স্থির করিলাম। তাঁহারা বাক্স, ব্যাগ, বিছানা লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। আমার কোন বালাই নাই; ব্যাগ, বিছানা, মশারি প্রভৃতি লইয়া দেশভ্রমণে যাওয়া আমার কোনদিনই পোষায় না। নিজের খবরদারীই করিতে পারি না, তাহার উপর আবার 'লগেজ'! আমি একখানি পরিধেয় বস্ত্র ও একখানি গামছা সঙ্গে লইয়াছিলাম; তাহাও একজনের ব্যাগের মধ্যে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। সঙ্গিগণ গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহাদের জিনিষ পত্র গোছাইয়া বিছানা পাতিয়া শয়নের আয়োজন করিলেন; আমি আমার বালাপোষ গায়ে জড়াইয়া যোগাসনে বসিলাম।—সঙ্গিগণ সত্বরেই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

গাড়ীর মধ্যে কোন ঘটনাই ঘটিল না; সুতরাং, ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিবার উপকরণের সম্পূর্ণ অভাবের কথা চিন্তা করিয়া, আমি একটু কাতর হইলাম।

অন্ধকারের মধ্যে গাড়ী চলিতে লাগিল। মেলগাড়ী সকল ষ্টেশনে থামে না; তারপর যে শীত; নিতান্ত গরজে না ঠেকিলে কেহ সাধ করিয়া শীতের সময় গাড়ীর যাত্রী হয় না; যে যে ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইল সেখান হইতেও বেশী যাত্রী উঠিল না। রাত্রি দুইটার একটু পূর্ব্বে গাড়ী পোড়াদহ ষ্টেশনে পৌঁছিল; আমি সেই একাসনে বসিয়াই আছি। পোড়াদহ হইতে গাড়ী ছাড়িলে সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া তুলিলাম, কারণ একটু আগে না উঠিলে তাঁহাদের বিছানাপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব হইবে।

কুষ্টিয়া ষ্টেশনে যখন গাড়ী পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রায় আড়াইটা; আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিলাম। ষ্টেশনে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা প্রতিনিধিগণের জিনিসপত্র নামাইবার সাহায্য করিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ হয় ত মনে করেন নাই যে এই গাড়ী হইতে এত ভদ্রলোক নামিবেন; তাই, তাঁহারা ষ্টেশনে কুলীর ব্যবস্থা করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন প্রতিনিধিগণের সহিত বেশী 'লগেজ' থাকিবে না। দুইদিনের জন্য যাঁহারা প্রবাসে যাইতেছেন, তাঁহারা ছোট একটি ব্যাগ ও সামান্য একটা বিছানাই লইয়া যাইবেন; কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে 'লগেজ'রাশি স্তূপীকৃত হইল, তখন সেই শীতের রাত্রিতে তাঁহারা সত্যসত্যই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। অন্যস্থানের প্রতিনিধি বা দর্শকগণের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু কলিকাতা হইতে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই রথদেখা ও কলাবেচা—উভয় উদ্দেশ্যই ছিল। অনেকের সঙ্গেই বড় বড় প্যাকিং বাক্স ও বড় বড় ব্যাগ-বোঝাই হ্যাণ্ডবিল, প্লাকার্ড্, বিজ্ঞাপন, পুস্তক ও পুস্তিকা ছিল; সম্মিলন-স্থানে এই সকল বিলি করিবার জন্যই তাঁহারা লইয়া চলিয়াছেন। গাড়ী চলিয়া গেল, কুলী আর মিলে না। যে দুইচারিজন কুলী ছিল, তাহারা সুবিধা পাইল; তাহারা হাঁকিয়া বসিল, "চার আনা দিতি হবি!" ষ্টেশন হইতে ষ্টীমারঘাট অতি নিকটে হইলেও পথ বড়ই দুর্গম। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহার উপর নদীতীরের বালুকাপূর্ণ চর অতিক্রম করিতে হইবে; তাহার পর, আবার দুই তিনটা অপূর্ব্ব সেতু পার হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা একটু বেশীমাত্রায় হিসাবী তাঁহারা কুলীদিগের সহিত দরদস্তুর আরম্ভ করিলেন। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র দত্ত হুঁসিয়ার লোক; তাঁহারা দরদস্তুর না করিয়া, কুলীরা যাহা চাহিল তাহাই দিতে স্বীকার করিয়া, ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; অপর লোকেরা কেহবা কুলী পাইলেন, কেহবা পাইলেন না। অনেকেই নিজ নিজ দ্রব্যাদি কোন রকমে বহন করিয়া ষ্টীমারের দিকে চলিলেন; কেহবা কুলীদিগের পুনরাগমন প্রত্যাশায় ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ষ্টেশন হইতে ষ্টীমার ঘাটে যাইতে হইলে, দুইটি সেতু পার হইতে হয়। সেতুগুলির নির্ম্মাণকৌশল অতি সুন্দর; দুই তিনখানি তক্তা বাঁশদিয়া আবদ্ধ করিয়া সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতুর উপর দিয়া চলিবার সময়, তক্তাগুলি দুলিতে থাকে। অন্ধকার রাত্রিতে এই তক্তার সেতু পার হইবার সময়, আমার বহুদিন পূর্ব্বের কথা মনে হইল; হিমালয়ের মধ্যে অনেক সময় আমাকে এইপ্রকার সেতু পার হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সেদিন, আর এদিন! তখন শরীরে শক্তি ছিল, বুকের মধ্যে শ্মশানের চিতা জ্বলিতেছিল, মরণের ভয় ছিল না; আর এখন শরীরে সেশক্তি নাই, পায়ে সেবল নাই, মনের সেঅবস্থা নাই;—এখন সেই সে-কালের আমি সম্পূর্ণ-পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন-একটা মানুষ সেই পূর্ব্বের নাম লইয়া বেড়াইতেছি। তাই, এই সেতুপার হইবার সময়, পা কাঁপিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেতু পার হইয়া, ষ্টীমারে গিয়া উঠিলাম।

আরে সর্ব্বনাশ!—সারারাত্রি জাগিয়া আসিয়াছি, কোথায় ষ্টীমারের উপর হাতপা ছড়াইয়া একটু বিশ্রাম করিব; তা দূরে থাকুক, ষ্টীমারের উপর দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই—একেবারে 'ন স্থানং তিলধারণম্।' আমাদের গাড়ীর পূর্ব্বেই আরএকখানি গাড়ী আসিয়াছিল; সেই গাড়ীতে রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ, নাটোর প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিগণ আসিয়াছিলেন; তাঁহারা ষ্টীমারে উঠিয়া সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। আমরা ষ্টীমারে উঠিয়া, একটা 'বর্গীর হাঙ্গামা' জুড়িয়া দিলাম। তখন যাঁহারা বিছানা পাতিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা

উঠিয়া বসিলেন। আমরা অতি কষ্টে জিনিসপত্রের স্থান করিলাম; কিন্তু তাহাতেই কি রক্ষা আছে! সেই সময় গোয়ালন্দের দিক্ হইতে আরএকখানি গাড়ী আসিল; সেই গাড়ীতে ঢাকা,ময়মনসিংহ,ফরিদপুর অঞ্চলের প্রতিনিধি-গণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কুষ্টিয়া হইতে যাঁহারা পাবনায় যাইবেন তাঁহারাও তখন আসিলেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভায়া পূর্ব্বের গাড়ীতে আসিয়াছিলেন; তিনি ষ্টীমারের অতি ক্ষুদ্র একটা ক্যাবিনের মধ্যে আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকিয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিলেন। রাজসাহীর খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও অধ্যাপক দলকে দেখিয়া অক্ষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা আমাকে সেই ক্যাবিন দেখাইয়া দিলেন। ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুধুই লগেজ-ই দেখি, মানুষ আর দেখি না। শেষে, বহুকষ্টে অক্ষয়কুমারকে আবিষ্কার করিলাম। 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি'র পাণ্ডাগণ বনজঙ্গল খুঁজিয়া, মাটিখুঁড়িয়া, তাম্রশাসন, পুরাতনমূর্ত্তি প্রভৃতি বাহির করিয়া থাকেন;—আর আমি আজ এই লোকারণ্য খুঁজিয়া 'লগেজ'রাশির মধ্য হইতে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কর্ণধারকে টানিয়া বাহির করিলাম! শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তোমাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, আমি একেবারে এই ক্ষুদ্র কোণে আশ্রয় লইয়াছিলাম;—তাহাতেও নিস্তার নাই!" তখন তাঁহাকে ক্যাবিন হইতে বাহির করিলাম এবং 'চা'র ফরমাইস করিলাম। তিনি বলিলেন, "সরঞ্জাম সবই আছে, কিন্তু এত লোকের সরবরাহ করা অসম্ভব ভাবিয়া সে সকল রাখিয়া দিয়াছি।" 'কিন্তু' তাহা বলিলে ত চলে না! এই শীতের দিনে রাত্রিশেষে এক পেয়ালা চা-পান করিতেই হইবে। তখন শ্রীমান্ অক্ষয়ের ভাগিনেয়, শ্রীমান্ অতুল, ষ্টোভ জ্বালাইয়া চা-প্রস্তুত আরম্ভ করিলেন। চা প্রস্তুত হইলে অক্ষয় বলিলেন, "শুধু চা আর কেমন করিয়া খাবে?—এক হাঁড়ি সন্দেশ আছে; আর চা'ল, ডাল, আলু, ঘি আছে। পার ত খিচুড়ী বানাও।" সাধে কি অক্ষয়ভায়া এত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক হইয়াছেন! তিনি সব গোছাইয়া আনিয়াছিলেন। তখন সেই গরম চা ও সন্দেশের সদ্ব্যবহার করা গেল। অবশ্য সকলের অদৃষ্টে জুটিল না, কিন্তু অন্ততঃ পঞ্চাশজন ভদ্রসন্তান চা ও সন্দেশ—পান এবং আহারে পরিতৃপ্ত হইলেন।—ইতি প্র[illegible]ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্কে পাবনা-পর্ব্ব।—প্রত্যূষে ছয়টার সময় আমরা পাবনার নিকটবর্ত্তী বাজিতপুর-ঘাটে পৌছিলাম। এখান হইতে পাবনা সহর মাইল দুই হইবে। ঘাটে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য কেহই উপস্থিত ছিল না; নদী-তীরে একখানি গাড়ী ভাড়ারজন্য দাঁড়াইয়াছিল। এই বন্দোবস্ত দেখিয়া সকলেই বিশেষ বিরক্ত হইলেন; বিশেষতঃ যাঁহাদের সঙ্গে 'লগেজ' ছিল, তাঁহারা ত ভাবিয়াই অস্থির হইলেন। পাবনার 'অভ্যর্থনা-সমিতি' যে ঘাটে কোনই ব্যবস্থা করেন নাই, এমন কি একজন স্বেচ্ছাসেবকও পাঠান নাই, একথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া কেহই মনে করিবেন না; কিন্তু প্রত্যক্ষের বাড়া ত আর প্রমাণ নাই! আমরা সকলে বহুকষ্টে, দুই পয়সার স্থলে কুলী-দিগকে চারি পয়সা দিতে স্বীকার করিয়া, জিনিসপত্র তীরে নামাইলাম।

তাহার পর কেমন করিয়া পাবনায় যাওয়া যায়, এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইল। যাঁহাদের সঙ্গে অল্প লগেজ ছিল এবং যাঁহারা বহুপুণ্যফলে কুলী সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাঁহারা পদব্রজে যাত্রা করিলেন। আমার সঙ্গী শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র কুষ্টিয়াতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এই তিনচারি ঘণ্টামধ্যেই তাহা ভুলিয়া যান নাই। জিনিসপত্র তীরে নামাইয়াই তিনি গাড়ীভাড়া করিতে ছুটিলেন, এবং কোন প্রকার দরদস্তর না করিয়া একখানি পাল্কীগাড়ী ভাড়া করিলেন। আমরা অন্য সঙ্গীদিগের সুবিধা অসুবিধার দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া, বা তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা না করিয়া, "চাচা আপনা বাঁচা" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই, আমাদের গাড়ী 'পাবনা-ইনষ্টিটিউশনে' উপস্থিত হইল।

পথ হইতেই সংবাদ-সংগ্রহ করিয়াছিলাম যে, উক্ত স্কুলপ্রাঙ্গণেই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে এবং স্কুলগৃহেই বিদেশাগত অতিথিগণ আশ্রয়প্রাপ্ত হইবেন। আমরা যখন স্কুলগৃহে উপস্থিত হইলাম, তখন দুইএকজন ভদ্রলোক ও পাঁচসাতজন স্বেচ্ছাসেবক সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা তাড়াতাড়ি আমাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। তাহার পরেই দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং

অতিথিগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন; তখন আর কোন অসুবিধাই রহিল না। পাবনা-ঘাটে বেবন্দোবস্তের কারণ জানিতেও বিলম্ব হইল না। রবিবারে ষ্টীমার চলে না। অভ্যর্থনা-কমিটি সেদিন ষ্টীমার চালাইবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কথা এই ছিল যে, প্রাতঃকালে ছয়টার পূর্ব্বে ষ্টীমার কুষ্টিয়া ছাড়িবে এবং সাড়েআটটার সময় পাবনার ঘাটে আসিবে; আটটার সময় স্বেচ্ছাসেবকদল যান-বাহনাদি লইয়া ঘাটে উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু শুনিলাম, কর্ত্তাদিগের মধ্যে একজন, পূর্ব্বদিন কলিকাতা হইতে আসিবার সময় না জানিয়া শুনিয়া হুকুম দিয়া আসিয়াছিলেন যে, রাত্রি তিনটার সময় ষ্টীমার ছাড়িবে। সেই হুকুমঅনুসারে তিনটার সময় ছাড়িয়া প্রাতঃকালে ছয়টার সময় যখন পাবনার ঘাটে ষ্টীমার উপস্থিত হইল, তখন কেহই ঘাটে উপস্থিত হন নাই; সুতরাং আমাদিগকে এই কর্ম্মভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহার জন্য অভ্যর্থনা-সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সীতানাথ অধিকারী মহাশয় প্রকাশ্যসভায় দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বিদেশীয় প্রতিনিধি ও দর্শকগণের মধ্যে অনেকেই অভ্যর্থনা-সমিতির আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। আমি যতবারই যেখানে গিয়াছি, কোনস্থানেই অভ্যর্থনা-সমিতির আতিথ্যগ্রহণ করি নাই; এবারেও করি নাই। পাবনা আমার বাড়ীর দ্বারে বলিলেই হয়, পাবনায় আমার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব আছেন; আমি তাঁহাদের মধ্যে একজনের গৃহে উপস্থিত হইলাম।

বেলা দুইটার সময় সভা বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; আমরা দুইটার একটুপূর্ব্বেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখি, সমস্ত আসন অধিকৃত হইয়া গিয়াছে। পাবনার সাহিত্যিকগণ টিকিট-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। থিয়েটার্, সার্কাস্ বা বায়স্কোপ্ মফঃস্বলে যাইয়া টিকিট বিক্রয় করিয়া তামাসা দেখাইয়া থাকে,—ইহা জানি এবং দেখিয়াছি; কিন্তু সাহিত্যিক-তামাসা দেখিবার জন্য যে বাঙ্গালাদেশের কোন আসরে টিকিট বিক্রয় হইয়াছে, ইহা ত আমার মনে পড়ে না! সুতরাং পাবনার টিকিট-বিক্রয়ই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা নূতন ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। টিকিটের মূল্য স্থির হইয়াছিল,—দুইটাকা, একটাকা ও আট আনা; কিন্তু আসনের যে কোনরূপ তারতম্য হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মহিলাদিগের বসিবার জন্য, বিদ্যালয়ের কএকটি কামরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শুনিলাম, অনেক গৃহস্থমহিলা টিকিটকিনিয়া এই সাহিত্যিক-তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন;—ক্রমাগত পাল্কী যাতায়াতে তাহার প্রমাণও পাইয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিবার দিন সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, অনেক টাকার টিকিটবিক্রয় হইয়াছিল; স্থানীয় ছাত্রগণের প্রায় অনেককেই টিকিট কিনিতে হইয়াছিল। টিকিটের কথা শুনিয়া, প্রথমে আমি ত বিশ্বাসই করি নাই; টিকিটকিনিয়া যে সাহিত্য-সভায় লোকে আসিবে, একথা কেমন করিয়াই বা বিশ্বাস করি! সভাভঙ্গের পর, সামান্য জলযোগের প্রলোভন বিজ্ঞাপিত করিয়াও যখন অনেক সাহিত্য-সভায় শ্রোতা মিলে না, তখন পাবনার ন্যায় স্থানে যে কেমন করিয়া টিকিটবিক্রয়ের ব্যবস্থা হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পাবনাবাসী একজন বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, কএকবৎসর পূর্ব্বে পাবনায় যে প্রাদেশিকসম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে এত টিকিটবিক্রয় হইয়াছিল যে, সমস্ত খরচপত্র বাদে কমিটীর হাতে তিনচারিহাজার টাকা ছিল; সেবার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি ছিলেন। এবারেও এই সমিতিতে রবীন্দ্রবাবু উপস্থিত থাকিবেন এবং বক্তৃতা করিবেন; সুতরাং এবারও টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে, লাভ নাহউক—খরচা কুলাইয়া যাইবে, এই আশা করিয়াই টিকিটবিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহাদের সে আশা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু এব্যাপারটা বড় কম আনন্দের কথা নহে! সাহিত্য-সম্মিলনের বক্তৃতা শুনিবার জন্য যখন লোকে পয়সা খরচ করিয়া টিকিটকিনিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হে সাহিত্যিকগণ! তোমরা হতাশ হইও না। সেদিন বহুদূরে নহে, যেদিন তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের বক্তৃতা শুনাইবার জন্য টিকিটবিক্রয় করিতে পারিবে। পাবনা সে সম্বন্ধে তোমাদের সম্মুখে আশার আলোক-বর্ত্তিকা ধরিয়াছেন; অতএব তোমরা এখন তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিতে পার। যদি কেহ বলেন যে, রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতা শুনিবার জন্যই লোকে টিকিট কিনিয়াছিল, তাহাহইলে তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করা দায় হইবে! কারণ, আমাদের দেশে এমন এক

দলের সৃষ্টি হইয়াছে, যেদলের লোকেরা রবীন্দ্রবাবুকে আমলই দিতে চান না; তাঁহারা রবীন্দ্রবাবুর মহত্ত্ব স্বীকার করেন না। এ অবস্থায় একথা কেমন করিয়া সর্ব্ববাদি-সম্মত হইতে পারে যে, রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতা শুনিবার জন্যই লোকে টিকিটকিনিয়াছিল। কেন?—আর কি কোন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নাই? আমি বুড়া মানুষ,—এ সকল তর্কের উত্তর দিতে পারিব না। রবি বড়, কি ধূমকেতু বড়, চন্দ্র বড়, কি জোনাকী বড়,—আদার-ব্যাপারী আমরা, সেসকল খবর রাখি না; আর একটুআধটুকু রাখিলেও সেকথা গলা চড়াইয়া বলিবার স্পর্দ্ধাও রাখি না। ওকথা এইস্থানেই বিশ্রাম লাভ করুক।

যথাসময়ে সভা আরম্ভ হইল। তিন চারিজন পণ্ডিত ও কবি মহাশয় মঙ্গলাচরণ, বন্দনা, স্তোত্র পাঠ করিলেন। সেগুলি বেশ লাগিল; কিন্তু তাহার সমস্তগুলি যদি দিতে যাই, তাহাহইলে 'ভারতবর্ষে' কেন—এসিয়া-মহাদেশেও স্থান হইবে না! দুইদিনে যতগুলি কবিতা, অভিভাষণ ও বক্তৃতা পাঠ হইয়াছিল, তাহা পুস্তকাকারে ছাপাইলে এক মহাভারত হয়। সে মহাভারত প্রকাশের স্থান আমাদের নাই। একআধটি দিলেও অবিচার করা হয়, কারণ সকলগুলিই যে শিক্ষাপ্রদ। তবে কবিতা ও প্রবন্ধ-লেখকগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া, আমরা কেবল একটি কবিতার উল্লেখ করিব। এই কবিতাটির নাম 'ফুলের গান'। ফুলের মত সুন্দর চারিটি ছোট ছোট মেয়ে, সুর করিয়া এই 'ফুলের গান'টি গাহিয়াছিল। সকলেই এই গানশুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

তাহারপর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে কোন অভিভাষণ পূর্ব্বে লিখিয়া আনেন নাই; কিন্তু শেষমুহূর্ত্তে সকলেই বলিলেন যে, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির লিখিত-অভিভাষণ পাঠকরিতে হয়। তাই, তিনি তাড়াতাড়ি দুই চারিটি কথা লিখিয়া আনিয়াছেন। এই বলিয়া, তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র অভিভাষণ পাঠ করিলেন; তাহাতে তিনি পাবনার ইতিহাসের কএকটি মোটামুটি কথা বলিলেন।

তাহার পর, স্বনামখ্যাত সুবক্তা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রস্তাবে, ও পাবনার উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমর্থনে, এবং সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে নাটোরাধিপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

রায় বাহাদুর সম্মিলনের সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়া, তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহারাজ একস্থানে বলিয়াছেন—

"বঙ্গদেশে,ইংরাজ-আবির্ভাবের কিছু দিবস পরে,এদেশের শিক্ষা লইয়া বিশেষভাবে আন্দোলন চলিবার পর, দেশীয় লোকের পক্ষে ইংরাজী-শিক্ষায় শুভফল হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া, সেইভাবে শিক্ষা দিবার অনুষ্ঠান করা হয়। বাঙ্গালীর শিক্ষাজগতে সেএক অভূতপূর্ব্ব দিনই গিয়াছে। বহুকালের পরে, স্বাধীন উন্নতিশীলদেশের সাহিত্যের নব নব ভাবসমৃদ্ধির সহিত আমাদের তৃষিত আত্মার প্রথমসম্মিলন হওয়ায়—আনন্দে আমাদের আকণ্ঠপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—উত্তেজনায় আমাদের মনে একটা মত্ততা আসিয়া অধিকার করিয়াছিল,

এবং তাহারই ঝোঁকে আসর জমকাইয়া দিনকতক আমরা মহা সোর্‌গোলে উৎসব করিতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু সে সঙ্গীতের সুর দীপকের ঠাটে বান্ধা, এবং রুদ্রতালে তাহার বাজনা সমগ্রদেশকে শব্দায়মান ও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল! ইংরাজী পাঠশালার রজতগিরিনিভ গুরুমহাশয়ের স্বহস্তপ্রস্তুত সিদ্ধির প্রসাদ পাইয়া, তাহার উন্মাদকর নেশায় তখন আমরা ভরপুর্‌ হইয়া বসিয়াছিলাম, এবং তাহারই ঝোঁকে আমরা দেশময় একটা ভূতের কীর্ত্তন সুরু করিয়া, তাহার সহিত প্রলয়কালের তাণ্ডব নৃত্যের যোগ করিয়াছিলাম। সে যেন কলিযুগে আবার নূতনভাবে দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, আমাদের সনাতন দেবতার পুনরায়-অবমাননার উদ্যোগ। সেই প্রলয়-তাণ্ডবের ভূমিকম্পে আমাদের দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের আচার-ব্যবহার,—সমস্তই ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহাকে আর যাহা হয় বল, কিন্তু কোন মতেই আনন্দোৎসব ইহার নামকরণ করা যায় না! যখন সমগ্র দেশ এই দানবোচিত মত্ত-তাণ্ডবে কম্পান্বিত, তখন একদিকে শ্রীরামপুরের 'কেরী'প্রমুখ পাদরীগণ, এবং অপরদিকে দেশবন্ধু রামমোহন, বাঙ্গালা-সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্য-রচনার একটি ক্ষীণ পথরেখা খুলিয়া দিলেন। ইহা আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সুমহৎ মঙ্গলের প্রথম-সূচনা হইলেও, গদ্যের এই ক্ষুদ্র পথটি অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের যাত্রীরা কোনও এক আনন্দতীর্থে উত্তীর্ণ হইবার আশা তখন মনে আনিতে পারেন নাই; কারণ, অভাবের তাড়নায় এই গদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। অন্ধকে দৃষ্টিদান করিবার জন্য, অজ্ঞানের মনে জ্ঞানসঞ্চার করিবার প্রয়োজন বোধ হইতে, ইহার জন্ম। এরূপ, মুষ্টিভিক্ষার তণ্ডুল সংগ্রহ, করিয়া মানুষের মহোৎসব চলে না। কোন উদ্দেশ্যসাধন জন্য, বা কর্ত্তব্যপালন মানসে, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে সচ্ছলতার সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিত মহাশয়গণও এই গদ্যের পথ বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহা তাঁহাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অভিলষিত-অনুষ্ঠান নহে;—তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায়ানুসারে ফরমাইস্‌ মত গদ্য-সাহিত্য গঠনের অনিচ্ছার উদ্যম! ইংরাজের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার উপযোগী পুস্তক-প্রণয়ন আবশ্যক, তাই পণ্ডিত মহাশয়গণ নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এই কার্য্যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও অভিরুচি ছিল না, বরঞ্চ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিত মহাশয় হইয়া, "বিষয়ী" লোকের ভাষায় গ্রন্থরচনা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্তই লজ্জাকর—অপমানের কথা। সংস্কৃত ভাষার সুরম্য হর্ম্ম্য-প্রাঙ্গণে প্রাকৃতের পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিবার পাপ, বোধ করি তুষানল-প্রায়শ্চিত্তেও ক্ষালন হইবার নহে; তাই, তাঁহারা সেই দুষ্কার্য্যের লজ্জা যথাসম্ভব ঢাকিবার জন্য, সংস্কৃতের সুদীর্ঘ-সমাসখচিত অবগুণ্ঠনে আমাদের সরলা পল্লীবধূটির ললাট, চিবুক, এমন কি বক্ষ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই।

"গদ্যের এই গলিপথের মধ্য দিয়া আমরা তখনও কোন মুক্তির গম্যস্থানের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই;—ইহার একপ্রান্ত সংস্কৃত-টোলে ও অপর প্রান্ত ইংরাজী-স্কুলে গিয়া ঠেকিয়াছিল! যাহা হউক, পাঠশালা নামক পদার্থটির অজস্র নিন্দা করিলে চলিবে না। বর্ত্তমান সজ্জনসঙ্ঘে আমার ন্যায় দুই একজন মাত্র থাকিতে পারেন, যাঁহারা পাঠশালার স্তুতিনিন্দা উভয়েরই অনধিকারী; কিন্তু অধিক সংখ্যক সাধু সুধীই উহার যথেষ্ট উপকারিতা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। তবে, পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মুখচ্ছবি নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় আনন্দই দান করে, প্রাণপাত করিয়াও এতবড় একটা মিথ্যাকথার অবতারণা করিতে পারিতেছি না। মানস-সরোবরের দুর্গম তটদেশে যে নিবিড় শরবন আছে, গুরুমহাশয় যদি বা সেই শরবনের ব্যাঘ্রবিশেষ নিতান্তই না হন,—তিনি যে পদ্মবনের গুঞ্জনশীল, মত্ত মধুব্রতও নহেন, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। এইজন্য প্রায়শতাব্দী কাল পূর্ব্বে, আমাদের গদ্য-সাহিত্য যখন পাঠশালার সাহিত্য ছিল,—যখন সেখানে বীণাপাণি সরস্বতীর আসন বেত্রপাণি গুরুমহাশয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন,—তখন দেশে সাহিত্যরস-পিপাসুদের আনন্দ-গুঞ্জন জাগিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের গদ্য-সাহিত্য, ছাত্র-শিক্ষার সাহিত্যই ছিল; উহাদ্বারা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার কোন উদ্যম কেহই করিতেন

না। সেকালে যিনি যাহা লিখিতেন, মুগ্ধবোধকারের ন্যায় তিনি বলিতেন—"পরোপকৃতয়ে ময়া"; যাঁহারা অজ্ঞানমুগ্ধ, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহারা বই লিখিতেন, কিন্তু যাঁহাদের বোধ আছে তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রতি ঐসকল গ্রন্থকারের কোন লক্ষ্যই ছিল না।"

মহারাজ সভাপতি আর একস্থলে বলিয়াছেন,—

"আমাদের মধ্যে হয়ত অনেকে ভাবেন যে, যাহাকিছু পুরাতন, যাহা কিছু সাবেক, তাহাই কেবল দেশের জিনিষ। কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ আমাদের দেশের পুরাতন পদার্থ। উত্তর কালে যাহাকিছু হইবে, তাহা যদি কৃত্তিবাসী বা কবিকঙ্কণী ছন্দে না হয়, কিম্বা তাহার মধ্যে যদি আমাদের আধুনিক শিক্ষার কোন প্রবর্ত্তনা দেখা যায়, তবে তাহা দেশের জিনিষ হইল না! তাহাকে বিদেশী আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত, এবং তাহাদ্বারা আমাদের আত্মপরিচয়ের খর্ব্বতা ঘটে। জড়বস্তুর সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে বটে, কারণ যাহা তাহার পুর্ব্বের পরিচয়—তাহার উত্তর-পরিচয়ও তাহাই; কিন্তু প্রাণবান্ পদার্থের সম্বন্ধে একথা খাটে না। প্রাণবান্ পদার্থের যথার্থপরিচয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেই প্রকাশ পায়। আমাদের কাব্য-সাহিত্য যদি আবহমানকাল কেবল কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণের পুরাতন বুলিই পুনঃপুনঃ আওড়াইত, তবে তদ্দ্বারা আমরা প্রাণহীন কলের পুত্তলিকারই পরিচয় পাইতাম,—সাহিত্যের সজীব সত্ত্বার পরিচয়ে কখনই নির্ম্মল আনন্দলাভ করিতে পারিতাম না। ইংরাজিসাহিত্যের সঙ্ঘাতে যখন এমনস্থানে আঘাত লাগিল যেখানে আমাদের প্রাণপুরুষ বাসকরে, তখন সে প্রাণপুরুষ জাগ্রত হইয়া উঠিল! এই জাগরণ জানিলাম কিসে?—দেখিলাম ইংরাজীর সাহিত্যরসকে সে সাত্মা করিয়া লইয়াছে। নির্জ্জীবের সহিত বাহিরের পদার্থ সংযোগ করিয়া লওয়া যায়, কিন্তু এক করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। জীবিত মনুষ্যই বাহির হইতে খাদ্যরস গ্রহণ করিয়া তাহার শরীরের পুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ হয়; মৃতের পার্শ্বে নানাবিধ সুস্বাদু পুষ্টিকর আহারীয় রাখিয়া যুগযুগান্ত অপেক্ষা করিলেও সঞ্জীবনক্রিয়া দেখিবার আশা করা যায় কি? এই গ্রহণ-ক্ষমতাই আমাদের প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়, ইহাদ্বারাই আমাদের রসভোগের তৃপ্তি হয় এবং ইহাদ্বারাই আমাদের প্রাণশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া আত্মপরিচয়ের সহায়তা করে। যতদিন ইংরাজি সাহিত্যকে পাঠশালার ছাত্রের ন্যায় গ্রহণ করিতেছিলাম, যতদিন তাহার সত্ত্বাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণকরতঃ নিজের করিয়া লইতে পারি নাই, ততদিন নিজের প্রাণশক্তির অনুভব করিতে পারি নাই। বাহির হইতে এই সাহিত্যের রসধারা নিজের অন্তরের গভীরতলে সঞ্চিত হইয়া উৎস আকারে যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তখন নিজের অন্তরের সেই প্রাণবান্ বেগটিকে অনুভব করিতে পারিলাম। সেই জ্ঞানই আমাদের যথার্থ আত্মপরিচয়ের জ্ঞান। প্রাচীন-বাণীর প্রতিধ্বনিকে যদি চিরদিন বিস্তার করিয়া আবৃত্তি করিয়া চলিতাম, তবে নিজের সজীব-সত্ত্বার পরিচয় তাহাতে পাইতাম না। সকলেই জানেন, ইটালীতে একদিন যখন নব সঞ্জীবন-বেগ (Renaissance) আইসে, এলিজাবেথের রাজত্বকালের ইংলণ্ডও সেই বেগের আঘাতে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই আন্দোলনের ফলে তদানীন্তন ইংরাজী সাহিত্যেও নবজাগরণের আবির্ভাব হয়। এরূপ নাহইলে ইংলণ্ডের প্রাণশক্তির পরিচয় আমরা পাইতাম না। 'সেক্সপিয়ার' যদি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক 'চসর্'প্রভৃতির অবিকল পুনরাবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতেন, তাহা হইলে গুণিগণ-গণনায় আজ তাঁহার নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারিত হইত কি না সন্দেহ। তিনি, তদানীন্তন ইতালির সাহিত্য হইতে তাঁহার বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া, তিনি খাঁটি ইংরাজী কবি নহেন, একথা বলিবার সাহস কি কাহারও হয়? দেশদেশান্তর হইতে উপকরণসংগ্রহ করিয়া নিজের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে, তাহাতে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারবাহীর স্কন্ধে, ঝাঁকার মধ্যে, যে উপকরণ থাকে, তাহা তাহার দৈন্যেরই পরিচয় দেয়; কিন্তু সেইগুলিই আবার ধনীর গৃহসজ্জায় নিয়োজিত হইয়া, তাহার সমৃদ্ধিরই সাক্ষ্যদান করে। উপকরণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলাম,—তাহা লইয়া বিচার করিলে চলিবে না; সেই উপকরণগুলিকে আপনার করিতে পারিয়াছি কি না, তাহাই দেখিতে হইবে।"

সভাপতি মহারাজের অভিভাষণপাঠ শেষহইলে, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভ্যর্থনার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল। সম্মিলনে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ—বিশেষ আগ্রহসহকারে, এই প্রস্তাব অনুমোদন

করিলে, কবিবর রবীন্দ্রনাথ সকলকে ধন্যবাদ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। বোলপুরের অভ্যর্থনা-সভায় উপস্থিত ছিলাম না; সেখানে কবিবর কি বলিয়াছিলেন,তাহা খবরের কাগজেই পড়িয়াছিলাম; কিন্তু পাবনার এই অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রবাবু যাহা বলিলেন, তাহাতে ত বোলপুরের কোন গন্ধই পাইলাম না। তিনি সমাগত ভদ্রলোকগণের নিকট কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিলেন, এবং তিনি যে সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহাতে যে তাঁহার স্বদেশবাসী মহাশয়গণ আনন্দিত হইয়াছেন, ইহাকেই তিনি উচ্চপুরস্কার বলিয়া মনে করেন। শ্রীযুক্ত ঠাকুরমহাশয়ের এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

অবশেষে পাবনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালমহাশয়-রচিত নিম্নলিখিত গানটী 'পাবনা-ইনষ্টিটিউসনে'র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ কালিদাস রায় গায়িয়া উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিল। বালকটির বয়স ১২ বৎসরের অধিক নহে;—

"আজ মায়ের কাছে মায়ের ছেলে আয় সকলে ছুটে যাই।
দেখ সুধার কলস মা এনেছে আয় সকলে লুটে খাই॥
আমাদেরি মায়ের কাছে অমৃত যে রহিয়াছে,
কেন ভুলে ঘুরে ফিরে মরণের মাঝারে যাই॥
নিজে খেলে হবে নারে, ভাইগুলি ঘুমায়ে পড়ে,
জাগায়ে মার সুধা লয়ে তাদের মুখে দেনা ভাই॥
বোনগুলি সব খেলা ঘরে ধূলি লয়ে খেলা করে,—
মার অমৃত খাবে বলি—তাদের ডেকে লওয়া চাই॥
দেশের ভাই আর বোন খেয়েছে, জগৎ যুড়ে ভাই রয়েছে,
তারা মোদের মার পেটের ভাই তাদের কথা ভুল্‌তে নাই।
আয় সহোদর, আয় ভগিনী, মার আদর স্নেহভাগিনী,
মার অমৃতে অমরতা ব্যাকুল হয়ে লই সবাই॥
মা জননী স্নেহখনি,— প্রেমভরে গাই অমনি,
প্রেমময়ী মা আমাদের—এমন মা জগতে নাই॥"

এই গানটি হইবার পরই সে দিনের মত সভার কার্য্য শেষ হইল।

সন্ধ্যার পরেই সভামণ্ডপে মালদহের গম্ভীরার গান আরম্ভ হইল। মালদহ হইতে যে সমস্ত প্রতিনিধি আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গম্ভীরার গানের দল সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এই দল পুরাতন গান বেশী করিলেন না, বর্ত্তমান সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধেই গান করিলেন। আমরা অধিকক্ষণ গান শুনিতে পারিলাম না, কারণ মণ্ডপের পার্শ্বস্থ একটি প্রকোষ্ঠে কার্য্যকরী-সমিতির অধিবেশন হইল; আমাদিগকে সেখানে যাইতে হইল;—গান কিন্তু চলিতেই লাগিল। কার্য্যকরী-সমিতিতে পরদিনের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হইয়া, সেরাত্রির জন্য বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া গেল। আমি অপরএক বন্ধুর গৃহে রাত্রির জন্য আতিথ্য-গ্রহণ করিলাম।

পরদিন সোমবার, পূর্ব্বাহ্ণ আটটার সময়, সভার অধিবেশন হইল। সভাপতি মহারাজবাহাদুরের আগমনে বিলম্ব হওয়ায়—ঠিকে বন্দোবস্তে—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সভাপতির আসনগ্রহণ করিলেন। সে বেলায় তেরটি প্রবন্ধপাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল; সময় তিন ঘণ্টা। প্রত্যেকের প্রবন্ধপাঠের সময় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল; কেহ দশ মিনিট, কেহবা পনর মিনিট, কেহবা কুড়ি মিনিট সময় পাইয়াছিলেন; সুতরাং সকলকেই প্রবন্ধের অনেক অংশ বাদদিতে হইয়াছিল! ইহাতে যে প্রবন্ধের অঙ্গহানি হয়, আগাগোড়া সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু উপায়ান্তর না থাকাতেই এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। আমার ত মনে হয়, এমন করিয়া সভাপতিমহাশয়ের ঘণ্টার দিকে কাণ রাখিয়া প্রবন্ধ পাঠ করার মত বিড়ম্বনা আর নাই। একজন প্রবন্ধপাঠক ত বামহস্তে ঘড়ি খুলিয়া ধরিয়া প্রবন্ধপাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং নির্দ্দিষ্টসময়ের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রবন্ধের কিছুই পড়িতে পারিলেন না! পাবনায় যে কয়টী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিই সুলিখিত, লেখকগণও সুশিক্ষিত ব্যক্তি। সভাপতি মহাশয় কি করিবেন!—তিনি সকলকেই অল্পবিস্তর অতিরিক্ত সময় দিতে লাগিলেন। তাহাতে বিশেষ কোন ফলই হইল না,—প্রবন্ধগুলি হতশ্রীই হইল, অথচ বেলা যখন সাড়েএগারটা বাজিল তখন সবেমাত্র ছয়টি প্রবন্ধপাঠ শেষ হইল। এগারটায় সভাভাঙ্গিবার কথা ছিল, কিন্তু সাড়েএগারটা পর্য্যন্ত সময় দিয়াও ছয়টির অধিক প্রবন্ধপঠিত হইল না। অবশিষ্ট প্রবন্ধকয়টি অপরাহ্ণের অধিবেশনে পঠিত হইবে, এই আশা দিয়া সভাপতি মহাশয় সভাভঙ্গ করিলেন। সম্মিলনের পরমায়ু যখন দুইদিন মাত্র, এবং তাহার একদিন যখন অভিভাষণেই কাটিয়া যায়, তখন প্রবন্ধ পাঠাইবার জন্য অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গের

সাহিত্যিকগণকে প্রবন্ধ-প্রেরণের জন্য ঢালাও নিমন্ত্রণ না করিয়া, ভিন্নভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ দুই এক জনের উপর প্রবন্ধলিখিবার ভারদিলে এমন বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না, প্রবন্ধ-লেখকগণও ক্ষুন্ন হয় না।—অথবা প্রবন্ধপাঠ একেবারে তুলিয়া দিয়া, তিনচারিজন সুশিক্ষিত সুবক্তাকে পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেই ত বেশ হয়! এখনকার বন্দোবস্তে প্রবন্ধপাঠও ভাল হয় না, বক্তৃতাও তাড়াতাড়ি হয়, আর সম্মিলনের প্রধান-উদ্দেশ্য—সকলের দেখাশুনা, আলাপপরিচয়, ভাবের আদানপ্রদান, তাহাও হয় না,—তাহার সময়ই হয় না। কথা কয়টি একটু মুরুব্বী ধরণের হইল, পাঠকপাঠিকাগণ—তথা ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের সম্মিলনের উদ্যোগী মহাশয়গণ—আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

অপরাহ্ণকালে, দুইটার সময় সভার অধিবেশন হইয়া, পাঁচটার মধ্যেই সমস্ত কার্য্য শেষকরিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল,—কারণ, পাঁচটার পরে উদ্যান-সম্মিলন ছিল, এবং তাহারপরেই পলায়নকরিয়া রাত্রি আটটার সময় ষ্টীমারে না উঠিলে, মঙ্গলবারে আফিসে-আদালতে হাজির হওয়া অনেকেরপক্ষেই অসম্ভব। সাড়েএগারটায় সভাভঙ্গ হইলে, আমরা তাড়াতাড়ি আশ্রয়স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলাম, এবং দুইটা বাজিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আবার সভাস্থলে আসিয়া হাজির হইলাম। তখন প্রথমে একটি গান হইল, তাহার পর একটি দীর্ঘ সংস্কৃত-কবিতা পাঠ হইল; ইহাতেই প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল! তাহার পর প্রবন্ধপাঠ আরম্ভ হইল। তিনটি প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে, সভাপতি মহাশয় দেখিলেন যে, আরও চারিটি প্রবন্ধপাঠ করিতে গেলে পাঁচটা বাজিয়া যায়। তখন, সভাপতি মহাশয়ের অভিপ্রায়-অনুসারে রাজসাহী-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীমহাশয় সেই চারিটি প্রবন্ধের সারমর্ম্ম তিনিচারি মিনিটের মধ্যে সকলকে শুনাইয়া দিলেন; বলা বাহুল্য, পঞ্চাননবাবু প্রবন্ধ কয়টি পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিলেন।—প্রবন্ধ চারিটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল, প্রবন্ধলেখকচতুষ্টয়ও বোধ হয় বিশেষ অনুগৃহীত হইলেন!—সভায় দুইটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবার কথা ছিল। সময়সংক্ষেপ করিবার জন্য সভাপতিমহাশয় পাবনার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, বংশতত্ত্ব, ইত্যাদি অনুসন্ধান সম্বন্ধে প্রস্তাব নিজেই উত্থাপন করিলেন, এবং তাহা, যথাসম্ভব সত্বর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। তাহার পরই, পরলোকগত কবি রজনীকান্তের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার ভার এই অধমের উপর অর্পিত ছিল। প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বেই, শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত রজনীকান্তের খাতা হইতে অনেক অংশ পাঠ করিলেন। রজনীর শেষজীবনের কথাগুলি সকলে পরম আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিলেন। শ্রীমান্ নলিনীর কৃপায়, এ অধমের উপর অর্পিতকার্য্য অতি সহজ হইয়া গেল। আমি, একরকম কিছুই না বলিয়া, প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিলাম, এবং রজনীকান্তের স্মৃতিরক্ষার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলাম। সুখের বিষয় এই যে, এ প্রস্তাব অনুমোদনেরও প্রয়োজন হইল না; প্রস্তাবের পরই সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল এবং কএকজন তখনই এই দণ্ডের জন্য নগদ চাঁদা দিলেন, কেহ কেহ বা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এইবার বক্তৃতার পালা। তখন কিন্তু পাঁচটা বাজে বাজে!—তাহা হইলে কি হয়?—বক্তৃতা করিতেই হইবে! বক্তৃতা শুনিবার জন্য কতলোক টিকিট্ কিনিয়া আসিয়াছেন;—বক্তৃতা না হইলে কি চলে? অভিভাষণ, বা প্রবন্ধ, ত পরে মাসিকপত্রে প্রকাশিতই হইবে; সুতরাং বক্তৃতা হওয়াই চাই। বিশেষ যে সভায়—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী (সাহিত্যিক ডাকনাম 'বীরবল্') উপস্থিত আছেন, যে সভায় বিশ্ববিজয়ী কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত আছেন; যে সভার—সভাপতি নাটোরাধিপতি রহিয়াছেন,—সে সভায় বক্তৃতা না হইলে কি চলে? অগত্যা বক্তৃতা আরম্ভ হইল; প্রথমেই শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সাধাগলায় ভাষার ছটা—ভাবের ঘটা—দেখাইয়া বক্তৃতা করিলেন। সকলেই বক্তৃতা শুনিয়া ধন্যধন্য করিল।—তাহার পরই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বক্তৃতা করিতে উঠিলেন; কিন্তু তিনি বেশ এক চা'ল দিলেন। তিনি বলিলেন যে, সভাস্থলে যখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত আছেন, তখন তাঁহার কথা শুনিতেই হইবে; এই বলিয়া তিনি সভার পক্ষ হইতে রবীন্দ্রবাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। চারিদিক্ হইতে সকলেই

হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন এবং ঘন-করতালিদ্বারা তাঁহাদের আগ্রহ ও উল্লাস জ্ঞাপন করিলেন। তখন রবীন্দ্রবাবু আর কি করেন?—তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বক্তৃতা করিবার জন্য দাঁড়াইতে হইল; তখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশে মণ্ডপে আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইল;—ওদিকে উদ্যান-সম্মিলন চাপা পড়িবার যো হইল। যাঁহারা সেই রাত্রির ষ্টীমারেই পাবনা-ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাঁহারা বিষম গোলে পড়িলেন। রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শুনিবার প্রলোভন ত্যাগ করাও যায় না, ওদিকে মঙ্গলবারে চাকুরীও বাঁচাইতে হইবে। তাঁহাদের অবস্থা বর্ণনার বিষয় নহে, ভুক্তভোগী তাহা ভাবিয়া লইবেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু অতি সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় 'সাহিত্যের প্রকৃতি' সম্বন্ধে একটি সারবান্ বক্তৃতা করিলেন। সে কালের মত শক্তি থাকিলে বক্তৃতাটা লিখিয়া লইতে-পারিতাম; অন্য কেহ যদি সে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে একদিন-না-একদিন সে বক্তৃতা ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাইব। প্রায় আধঘণ্টা বক্তৃতার পর রবীন্দ্রবাবু আসন গ্রহণ করিলেন। তখন সভাপতি মহাশয় অতিঅল্প কএকটি কথায় তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া, আগামী বৎসরে সম্মিলনকে নাটোরে নিমন্ত্রণ করিলেন।

এইবার শেষকার্য্য, অর্থাৎ ধন্যবাদ আদানপ্রদান। প্রথমেই প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে আমাকে উঠিতে হইল। আমি কোন দিনই বক্তৃতা করিতে জানি না, দশকথা এক সঙ্গে করিয়া বলিতে গেলে আমার পক্ষে মহা-বিপদ্ উপস্থিত হয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে, পারি আর না পারি, অতিসংক্ষেপে দুইকথা বলিতে হইল। আমি নাটোরাধিপতির সাদর-নিমন্ত্রণটা পুনরায় ঝালাইয়া লইলাম; তাহার পর, প্রতিনিধি-সাহিত্যিকগণকে নাটোরের উৎকৃষ্ট সন্দেশ ও দধির প্রলোভন দেখাইলাম। সর্ব্বশেষে পাবনার ভদ্রলোকগণ, অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ ও স্বেচ্ছা-সেবকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। অতঃপর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদ করিলেন, এবং অভ্যর্থনা-কমিটির সম্পাদক ও অন্যান্য সকলেও ধন্যবাদ লাভ করিলেন। তৎপরে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সীতানাথ অধিকারীমহাশয়, প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ করিলেন, এবং তাঁহাদের নানাক্রটীর কথা উল্লেখ করিয়া বিনয় প্রকাশ করিলেন। তখন, পূর্ব্ব দিনের সেই বালকটী, আর একটা গান করিল। তাহার পর আর কি?—সভা ভঙ্গ, সম্মিলনের শেষ! তখন যিনি যে দিকে পারিলেন প্রস্থান করিলেন। উদ্যান-সম্মিলন আর হইল না! রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটার সময় মণ্ডপ ত্যাগ করিয়া আমরা সহরের মধ্যে চলিয়া গেলাম; সে রাত্রিতে আর পাবনা ত্যাগ করা হইল না।

পরদিন প্রাতঃকালে সাতটার সময় ষ্টীমার;—আমি ছয়টার সময়ই বন্ধুগৃহ হইতে বাহির হইলাম। বন্ধুবর আমার জন্য একখানি টমটম ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতেই আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলাম। একটু পথ যাইবার পরই টমটমখানি ভাঙ্গিয়া পড়িল, ঘোটকবর একেবারে ধরাশায়ী হইলেন,—চালক মহাশয় এমন বেগে নিক্ষিপ্ত হইলেন যে, তিনি রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেলেন! সৌভাগ্যক্রমে, আমি বেশ করিয়া গাড়ীখানি চাপিয়া ধরিয়াছিলাম, তাই দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পঞ্চত্বলাভ করিলাম না; কিন্তু আঘাত পাইলাম। এই দুর্ঘটনার জন্য কাহাকে অপরাধী করা যায়, তাহা বিবেচনার বিষয়; হয় গাড়ীখানিই জীর্ণ ছিল, আর না হয় অশ্বপ্রবরই অবাধ্য হইয়াছিলেন,—ইহাই আমার রায়। সৌভাগ্যক্রমে, সেই সময়ে আর একখানি গাড়ীতে আমার কএকটি বন্ধু ষ্টীমার ঘাটে যাইতেছিলেন; তাঁহারা আমার দুরবস্থা দর্শনে, দয়াপরবশ হইয়া, আমাকে তাঁহাদের গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। ষ্টীমারে উঠিয়া দেখি অনেক প্রতিনিধিই সেই ষ্টীমারে যাইতেছেন;—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি সাহিত্যিক-বন্ধুগণের সঙ্গলাভ করিয়া, হাতেপায়ের আঘাতের বেদনা ভুলিয়া গেলাম।—যথাসময়ে কুষ্টিয়ায় ষ্টীমার পৌছিলে, সকলে তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে যাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন; আমি তিনচারি ঘণ্টা কুষ্টিয়ার এক বন্ধুর গৃহে বিশ্রাম করিয়া, অপরাহ্নকালে বাড়ী চলিয়া গেলাম।

তাহার পর—তাহার পর এই পণ্ডশ্রম,—এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিবার ব্যর্থ চেষ্টা।

শ্রীজলধর সেন।

দক্ষিণমেরু-আবিষ্কার

১৯০৭-৯ সালের মেরু-অভিযানের কয়েকজন নায়ক ;—

মিঃ ফ্র্যাঙ্ক্ ওয়াইল্ড্, স্যর্ আর্ণেষ্ট্ শ্যাকল্‌টন্, ডাঃ মার্শাল্, লেঃ য্যাডাম্‌স্

["স্ফীয়ার"-পত্রিকা হইতে গৃহীত]

সেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, স্যর আর্ণেষ্ট্ শ্যাকল্‌টন্ পুনরায় দক্ষিণমেরু অভিমুখে যাত্রা করিবেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্যাকল্‌টন্ দক্ষিণমেরু আবিষ্কার-অভিপ্রায়ে মেরুর অন্তরে প্রায় ১৫০ মাইল গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; ইঁহার পূর্ব্বে এতদূর পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কাপ্তেন্ কুক্ই সর্ব্বপ্রথমে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণমেরু আবিষ্কার জন্য যাত্রা করেন; কিন্তু দক্ষিণমেরুর ১৩১৮ মাইল অন্তর হইতেই ফিরিয়া আসেন। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরে, আর একজন ইংরেজ-নাবিক আরও একটু দক্ষিণে, অর্থাৎ মেরু হইতে ১১০৮ মাইল অন্তরে পৌছিয়াছিলেন। তৎপরে আরও অনেক বার দক্ষিণমেরু-আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আর একব্যক্তি মেরুর ৫৪০ মাইল নিকটে গিয়াছিলেন। ইঁহার পরই স্যর আর্ণেষ্ট্ শ্যাকল্‌টনের প্রথম নিষ্ফল অভিযান।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ে-অধিবাসী কাপ্তেন্ আমণ্ডুকেন্ সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণমেরু-প্রান্তে মানবের পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া নরওয়ের জাতীয়-পতাকা উড্ডীন করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের পক্ষ হইতে কাপ্তেন্ স্কট্ পুনরায় দক্ষিণমেরু-প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, ইংরেজের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তিত হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না! এই গৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্যই স্যার আর্ণেষ্ট্ শ্যাকল্‌টন্ পুনরায় অভিযানের উদ্যোগ করিতেছেন। এই নূতন অভিযানের নাম হইয়াছে—"The Imperial Trans-Antarctic Expedition." ইঁহার ইচ্ছা, পূর্ব্বগামিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ ছাড়িয়া নূতন-পথে গন্তব্য স্থানে পৌছিবেন। Buenos Aires হইতে যাত্রা করিয়া ও ওয়েডেল্ সমুদ্র

পার হইয়া, তিনি মেরু-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইবেন; এখান হইতে দক্ষিণমেরু-প্রান্ত প্রায় ১২০ মাইল। মেরু-প্রান্ত আবিষ্কার করিয়া, তিনি 'রস' সমুদ্র ও নিউজিলণ্ড পার হইয়া দেশে ফিরিবেন। পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মানচিত্র হইতে দৃষ্ট হইবে যে, মেরু-প্রান্ত হইতে 'রস' সমুদ্র, প্রায় ১০০ মাইল।

স্যর্ আর্ণেষ্ট্ শ্যাকল্‌টন্ (বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর)
["স্ফীয়র্"-পত্রিকা হইতে গৃহীত]

বর্ত্তমান ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরমাসে এই অভিযান-যাত্রা হইবে। সে সময়ে বরফের অবস্থা যদি ভাল থাকে, তাহাহইলে শ্যাকল্‌টন্ আশা করেন যে, নভেম্বর মাসের প্রথমেই ৭৮° অক্ষাংশ দক্ষিণে সমুদ্রতীরস্থ মেরুপ্রদেশে তাঁহারা অবতরণ করিয়া, তথা হইতে দক্ষিণ-মেরু-প্রান্ত অভিমুখে যাত্রা করিবেন। নৈসর্গিক কারণে কোন স্থানে আবদ্ধ হইয়া না পড়িলে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি জগতের সমক্ষে আপনার আবিষ্কার-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে পারিবেন—ইহাই তাঁহার ধারণা।

তবে, যাত্রার প্রথমেই—ওয়েডেল্ সমুদ্রের মধ্যদিয়া যাইবার সময়—অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে; কারণ ওয়েডেল্ সমুদ্রে সকল সময়ে বরফ জমিয়া থাকে; এই সকল বরফ কাটিয়া সমুদ্রের তীরবর্ত্তী মেরুপ্রদেশে পৌছিতে যদি নভেম্বর মাস গত হইয়া যায়, তবে এবৎসর আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না; কারণ, নভেম্বর হইতেই সেখানে ভয়ঙ্কর শীত পড়ে,—তখন মানুষের রক্ত পর্য্যন্ত জমিয়া যায়। তাহা হইলে, এবৎসরের মত একস্থানে শীত-নিবাস নির্ম্মাণ করিয়া, গ্রীষ্ম কালের প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে হইবে।

পাঁচজনমাত্র সঙ্গী লইয়া শ্যাকল্‌টন্ দক্ষিণমেরু-প্রান্ত অভিমুখে যাত্রা করিবেন—পথে, ওয়েডেল্ সমুদ্রতীরে, ছয়জন বৈজ্ঞানিককে রাখিয়া যাইবেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিবেন; অবশিষ্ট তিনজন প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা, ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি আলোচনার উপযোগী নিদর্শন ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিবেন।

তাঁহার এই বিরাট্ অভিযানে তিনি কেবলমাত্র দুইখানি জাহাজ গ্রহণ করিবেন; প্রথমখানি তাঁহাকে ওয়েডেল্ সমুদ্রতীরে পৌছিয়া দিবে এবং দ্বিতীয়খানি তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় 'রস্' সমুদ্রে বসিয়া থাকিবে। প্রথম জাহাজটির নাম "অরোরা"—বরফের মধ্যে যাতায়াতোপযোগী করিয়া এই জাহাজখানি বিশেষভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। উভয় জাহাজের জন্য মোট ৩০ জন কর্ম্মচারী বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।

এই জাহাজ দুইখানির মধ্যে কএকটি পিঞ্জর ও জলাধার নির্ম্মিত হইয়াছে; ফিরিয়া আসিবার সময়, তিনি এই সকল পিঞ্জর ও জলাধারে করিয়া মেরু-প্রদেশ-সম্ভব পেন্‌গুইন্ পক্ষী ও সিন্ধুঘোটক আনিবেন, স্থির করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত কেহই এই সকল আদিম-অধিবাসীদিগকে সভ্য-পৃথিবীর নিকট পরিচিত করাইতে পারেন নাই; শ্যাকল্‌টন্ কিন্তু এই উদ্দেশ্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন, মনে করেন। তিনি যে সকল বিচিত্র

অভিযানের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ ও দ্বিতীয়, অর্থাৎ সহায়ক দলের অবস্থিতি-স্থান
["স্ফীয়ার্"-পত্রিকা হইতে গৃহীত]

আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে লইতেছেন, তাহার মধ্যে যুগল-পক্ষ-বিশিষ্ট চক্রবিহীন গাড়ী (Aeroplane sledge) এবং গুম্বজাকৃতি তাম্বুই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণ Aeroplaneএর মত এই সকল চক্রবিহীন গাড়ীগুলির ছুটি করিয়া পাখা আছে; তবে এগুলি দ্বারা Aeroplaneএর মত

যুগ্মপক্ষ-বিশিষ্ট চক্রবিহীন গাড়ী
["স্ফীয়ার্"-পত্রিকা হইতে গৃহীত]

আকাশে উড়িতে পারা যায়না বটে, কিন্তু এগুলি কদাচ বরফের মধ্যে ডুবিয়া যাইবার সম্ভবনা নাই। এই চক্রহীন গাড়ীগুলি অনায়াসে বরফের উপরদিয়া ঠিক নৌকার মত ভাসিয়া যাইবে। পূর্ব্বের অভিযানগুলিতে যেপ্রকার চক্রহীন গাড়ী লওয়া হইত, তাহা প্রায়ই বরফের মধ্যে ডুবিয়া যাইত; কিন্তু এই নূতন-প্রণালী-নির্ম্মিত চক্রহীন গাড়ীতে আর সে ভয় থাকিবে না। এই সকল চক্রহীন গাড়ী ৫০ মণ জিনিস বহন করিয়া ঘণ্টায় ৫।৬ মাইল অগ্রসর হইতে পারিবে।

এই অভিযানের সহিত তারবিহীন টেলিগ্রাফের সরঞ্জামও আছে। ইহাদ্বারা ৫০০ মাইল দূর পর্য্যন্ত সংবাদ প্রেরণ করা যাইবে। দক্ষিণমেরু-প্রান্ত অভিমুখে যাইতে যাইতে যদি তাঁহারা পথ হারাইয়া যান, কিংবা কোন বিপদে পড়েন, তাহা হইলে অনায়াসেই ইহার সাহায্যে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী লোকদিগকে বিপদের কথা জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। আর, চাতুষ্পার্শ্ব আবিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময়, সঙ্গিগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে, এই তারবিহীন টেলিগ্রাফের সাহায্যে সহজেই সকলে পুনর্মিলিত হইতে পারিবেন।

আলাস্কা, হাডসন্ উপসাগর ও সাইবিরিয়া হইতে আনীত ১২০টি কুকুরও এই অভিযানের সহিত গমন

করিবে; শীত-প্রধান দেশেই ইহাদের জন্ম ও বরফের মধ্যেই ইহারা লালিতপালিত। কাপ্তেন আমণ্ডসেনের অভিযান-বিবরণ পড়িলে জানিতে পারা যায় যে, হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, এই সকল কর্ম্মঠ কুকুরই তাঁহাদিগকে মেরুপ্রান্তে উপনীত করিয়া দিয়াছিল।

বায়ুচালিত গতিশীল জলযান
["স্ফীয়ার্"-পত্রিকা হইতে গৃহীত]

শ্যাকল্টন্ বলিতেছেন, 'ski' পায়ে দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যখন তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, তখন এই কুকুরেরাই তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন ইহারা মাল-পত্রও বহন করিবে।

স্যর্ আর্ণেষ্ট্ শ্যাকল্টনের শেষ-কথা এই যে, মাত্র দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করিয়াই ফিরিয়া আসা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।—তাঁহার সহিত বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক, ডাক্তার প্রভৃতি অনেক বিচক্ষণলোক চলিয়াছেন। সকলেই আপন আপন বিভাগের নূতন-তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া, পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিবেন। এই আশা প্রণোদিত হইয়াই, তাঁহারা অসংখ্য বিপদ্ ও দুঃখকে আনন্দে বরণ করিয়া লইতেছেন। যিনি কৃষিবিজ্ঞানবিদ্, তিনি মেরু-প্রদেশস্থ গাছ-পালা ও কৃষি বিষয়ক নূতন-তথ্য সংগ্রহ করিয়া,—যিনি ভৌগোলিক তিনি দেশের আবহাওয়া, নদনদীর কথা

গুম্বুজাকৃতি তাম্বু
["স্ফীয়ার্"-পত্রিকা হইতে গৃহীত]

প্রভৃতি—এইরূপ প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ, স্বস্ব বিভাগের অভিনব—জ্ঞাতব্য—নানা তত্ত্ব-সংগ্রহ করিয়া, সভ্য-জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে সেই সকল অমূল্য রত্নরাজি উপহার দিবেন। শ্যাকল্টন্ সাহেব জয়যুক্ত হউন, ইহাই আমাদের প্রাণের কামনা!

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

পুস্তক-পরিচয়

ব্রহ্মচর্য্য

(মূল্য দুই আনা)

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি-এ,-প্রণীত। এই ২৯ পৃষ্ঠাব্যাপী ক্ষুদ্র পুস্তিকায় চৌধুরীমহাশয় অতি সরলভাষায় ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন, এ বিষয়ে ছাত্রদিগকে খোলাখুলিভাবে কিছু বলিতে গেলে তাহা অশ্লীল হইয়া পড়ে; কিন্তু শরৎবাবু ঠিক কথাই বলিয়াছেন—'সকল দিকে বুদ্ধির বিকাশ যদি বালকের প্রকৃতিসিদ্ধ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়টা তাহার অভিজ্ঞতা হইতে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থ হইবে।' ব্যর্থ হইবে বুঝিয়াই চৌধুরী মহাশয় সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিয়াছেন। বালকগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া যদি সাবধান হয়, তাহা হইলে যথেষ্ট মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে।

প্রবন্ধাষ্টক

(মূল্য দশ আনা)

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম-এ,-প্রণীত। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় নানা মাসিকপত্রিকায় অনেক সারবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং এখনও লিখিতেছেন। সেই সকল প্রবন্ধের মধ্য হইতে আটটি লইয়া এই প্রবন্ধাষ্টক সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে (১) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি, (২) আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষা সমালোচনা, (৩) ভটিকাব্যের গ্রন্থকার, (৪) কালিদাসের কাহিনী, (৫) কাদম্বরীর উপাদান, (৬) পূর্ণানন্দ গিরি, (৭) ফকির শাহ জালাল, এবং (৮) সুখ ও দুঃখ, এই আটটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলির নাম হইতে তাহাদের পরিচয় জানিতে পারা যায়। ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিতের নিকট হইতে, কালিদাসের কাহিনীমাত্র পাইলেই কেহ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না;—তিনি কালিদাসের কাব্যের সমালোচনা করিবেন, তৎসাময়িক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন, ইহাই লোকে আশা করিয়া থাকে। প্রবন্ধগুলি প্রথম-প্রকাশকালে আমরা বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় পাঠ করিয়াছি। তাহার পর, ভট্টাচার্য্যমহাশয় যখন তাহার কএকটি লইয়া প্রবন্ধাষ্টক করিলেন, তখন আশা করিয়াছিলাম, সেগুলিতে আরও অনেক নূতনতত্ত্ব সংযোজিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহা না পাইয়া আমরা একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম।

শুক্তি

(মূল্য আট আনা)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। ইহা একখানি কবিতা-পুস্তক। কবিতার পুস্তক দেখিলেই আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে;—না জানি তাহার মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতলের কতকি রহস্য বাঁধা পড়িয়া আছে, যাহার সন্ধান স্বয়ং কবি ব্যতীত অপরের পক্ষে পাওয়া একবারেই অসম্ভব। কিন্তু এবইখানি ঠিক তেমন নয়। ইহার মধ্যেও 'নৈশ কুহেলীর হিমলিপ্তকায়', 'বুকভরা-আশা', 'জীবনের তিক্ত মধু' প্রভৃতি কবিত্বের উপকরণ সমস্তই আছে; তবুও 'শুক্তি' একেবারে ঝুটায় পরিপূর্ণ নহে,—এই যা আশার কথা।

সমন্বয়

(মূল্য দুই টাকা)

—আদ্যভাগ।—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বি-এল,-প্রণীত। লেখকমহাশয় কলেজে অধ্যয়ন সময়ে অধ্যাপক-শ্রেষ্ঠ মনস্বী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও পরলোকগত অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয়ের নিকট Ethics বা Moral Philosophy, অর্থাৎ চারিত্র্য বা নৈতিক দর্শন, সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ লাভ করিয়াছেন, তাহাই এই (সমন্বয়) গ্রন্থে বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে ইন্দ্রিয়গ্রাম ও বস্তু, ভাবাঙ্কুর, ঈশ্বরবাদ এবং বিশ্বাস-ভিত্তি, বিশ্বোৎপত্তি, সৃষ্টিপ্রকরণ কালচক্র, যুগপর্য্যায়, অপরা-বিদ্যা প্রভৃতি অনেক গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা এই বুঝিতে পারিলাম যে, লেখকমহাশয় যে তত্ত্ব বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা এই প্রকার একখানি পুস্তকে অসম্ভব; ইহার এক একটি বিষয় লইয়াই সমন্বয়ের ন্যায় চারি পাঁচ খানি পুস্তক লিখিলেও, সকল কথা বিশদ হয় কি না সন্দেহ। তবুও আমরা বলিতে পারি, নরেন্দ্র বাবুর এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। তিনি এই পুস্তকখানি লিখিবার জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, এবং যাহা তিনি বুঝাইতে চাহেন, তাহা যে তিনি বুঝিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গের পালরাজগণ

(মূল্য বার আনা)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর-প্রণীত। এই পুস্তকখানি 'ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত। আজকাল আমাদের দেশের ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহের জন্য বিশেষ একটা চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। যাঁহারা ঘরে বসিয়া, ইংরেজ ও মুসলমানের লিখিত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া, ঐতিহাসিক হইতেন, তাঁহাদের সময় চলিয়া গিয়াছে। এখন অনেকে আমাদের দেশের ইতিহাসের উপাদান, দেশহইতেই সংগ্রহের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার অন্যতম নিদর্শন। শ্রীযুক্ত বসুঠাকুরমহাশয় পূর্ব্ব-বঙ্গের অন্তর্গত

ভাওয়াল, কাশীমপুর, তালিপাবাদ, চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া, এবং অনেক বনজঙ্গল অনুসন্ধান করিয়া, পূর্ব্ববঙ্গের পালরাজগণের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। একদিকে যেমন তাঁহাকে নানাস্থানে ঘুরিতে, নানাপুরাকীর্ত্তির বিবরণ-সংগ্রহ করিতে, নানাস্থানের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিতে হইয়াছে; অন্যদিকে তাঁহাকে আবার বহুপুস্তক অধ্যয়ন, অনেক মত-খণ্ডনের জন্য চেষ্টা, করিতে হইয়াছে। আমরা শ্রীযুক্ত বসুঠাকুর মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার এই পুস্তকে যেসমস্ত উপকরণ-সংগৃহীত হইয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাস-প্রণয়নে তাহা বিশেষ-কার্য্যকরী হইবে।

অপরাজিতা

মূল্য দেড় টাকা।

সচিত্র কাব্য। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী-বিরচিত। ইহাতে মোট ৪০টি কবিতা আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি টেনিসনের কবিতার অনুবাদ। এগুলি মূলের অনুগামী হইলেও, সহজসরল লীলাভঙ্গির অভাবে কতকটা হীনপ্রভ—এগুলিতে মূলের পূর্ণ-সৌন্দর্য্য পাওয়া যায় না। 'ঘুম হারা', 'কালো', 'অভিমান', 'বরাত', 'মুরুব্বি', 'লক্ষ্মীছেলে', 'পাণ্ডা' কবিতা শিশুদিগের চিত্তবিনোদন করিবে; কিন্তু আলোচ্য কাব্যে স্থান না পাইলেই ভাল হইত। ইহাতে তিনটি সুন্দর গাথা আছে—'মঞ্জুর', 'ময়না' ও 'জটায়ু'। এগুলির ভাব পরম্পরা আমাদিগের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করে—করুণরসের বন্যায় হৃদয় তট ধৌত করিয়া দেয়। 'বিধবা' কবিতায় হিন্দু-বিধবার যে পুত-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মর্ম্মস্পর্শী; এচিত্র লালসা বা ভোগের চিত্র নয়—এচিত্র ত্যাগের ও সংযমের চিত্র—সাধন রতা বিধবার রেখা চিত্রখানি ভাব-স্ফুরণে সুন্দর, কিন্তু একটু অতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ায় গ্রীস্-দেশীয় চিত্রপদ্ধতি-অনুকারী বলিয়া মনে হয়। এতদ্ভিন্ন 'আগমনী', 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা', 'সন্ধ্যা মণি', 'পত্র পরিচয়', 'রবীন্দ্রনাথ', 'দ্বিজেন্দ্রনাথ', প্রভৃতি কবিতা সুন্দর হইয়াছে।

কবি, প্রকৃতির শান্ত-স্নিগ্ধ মূর্ত্তির পূজারী, প্রকৃতির কোমল-করুণ ভাবের উপাসক। তাঁহার কবিতায় প্রকৃতির রুদ্র-মূর্ত্তি, বা প্রকৃতির তাণ্ডব-নৃত্যের, পরিচয় নাই। শস্য-শ্যামলা বঙ্গমাতার বক্ষে যেসকল সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তিনি নিজ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। কবি 'আগমনী'র সংবাদ পান,—

"রজনী না হ'তে ভোর
শিশির-আর্দ্র বাতাসের মুখে"—

তিনি 'শুভ্র রোদের সাদা আলিপনা উঠানে পড়িতে দেখিয়া' সন্তান-গৃহে মার আগমন বুঝিতে পারেন; তিনি 'চখার কণ্ঠে' মার সাড়া পান—তাই মাকে বলিতে পারেন, 'সন্ধ্যা-রঙীন্ শিউলির আড়ে লুকাবি কেমন করে?' কবি 'কোজাগর লক্ষ্মীর' উদ্দেশে বলিতেছেন,—

"শঙ্খ-ধবল আকাশ গাঙে স্বচ্ছ মেঘের পাল্‌টি মেলে',
জ্যোৎস্না-তরি বেয়ে তুমি ধরার ঘাটে কে আজ্ এলে?
ক্ষীরোদ সাগর হেঁচে চাঁদের টিপ্‌টি দেখি ললাট পটে,
কুমুদ মালার বরণডালা লুটায় তব চরণতটে,
কাশের কোলে চামর দোলে, ছত্র শোভে ছাতিম ফুলে,
আসন তোমার পাতা দেখি শুক্তি-গাথা নদীর কূলে—"

কি সুন্দর চিত্র!—এ চিত্র দেখিতে হইলে হিন্দুর নয়ন ও প্রাণ লইয়া দেখিতে হইবে; এইরূপ প্রকৃতির আসনের উপর হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

আবার দেখুন, কি নিখুঁত পল্লী চিত্র—

"এল শীতকাল খেজুরের গাছে ভাঁড়টি হয়েছে বাধা,
আঙিনার কোল ভরিয়া ফুটেছে গৃহের দুলাল গাঁদা;
সকালে কুয়াসা বৈকালে ধোঁয়া, সাথে উত্তর বায়,
মাথার উপরে সারি দিয়া সাঁঝে হাঁসেরা উড়িয়া যায়।"

পরে,—

"সূর্য্য তখন অস্তে ব্যস্ত ঝাপ্‌সা মেঘের পারে,
ইক্ষুর আটি লইয়া কৃষক ফিরিছে বনের ধারে;
সারি-দেওয়া-দেওয়া লঙ্কার ক্ষেতে আঁধারে লুকায় লাল,
হিমে ভিজা ধূলা পল্লীর পথে ফিরিছে গরুর পাল।"

কাব্যে উপেক্ষিত, কবিকুলকর্ত্তৃক অনাদৃত, 'কাঞ্চন' পুষ্পকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন,—

"গোলাপ যখন বিদায় নিয়েছে শীতের বাসর থেকে
কুসুমকুঞ্জে ভেঙেছে মাঘের মেলা;
চৈত্রের সভা পাঠায়নি যবে পুষ্পবালারে ডেকে—
গরবী করবী, বিরহিণী বন বেলা;—
ফাগুন-সাঁঝে ধীরে আসে ওসে কে?
সঙ্কোচে নত রাঙা কাঞ্চন যে!"

অন্যত্র—

"দুধের মত রোদ্‌টি আসে সাতটি শালের ফাঁকে",
"ওপারেতে আখের ক্ষেতে শরের কুঁড়ে ঘর
চখাচখীর চিহ্ন আঁকা পাশেই বাঁকা চর;"

এ সকল চিত্র অনবদ্য।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন এ সকল চিত্র ত বাস্তব (Realistic)—ফটোগ্রাফের চিত্রের ন্যায়, মূলের অনুরূপ।—ইহার আবার মূল্য কি? কথাটা আংশিক সত্য হইলেও—এগুলিতে আদর্শের অভাব থাকিলেও—কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। জগতে, যেরূপ চিত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে, ফটোর কি সেরূপ নাই। তাই বলিতেছি, কবির চিত্রগুলি বাস্তব হইলেও মনোরম—এগুলি নয়নের সমক্ষে পল্লীদৃশ্য উদ্ভাসিত করিয়া দেয়—হৃদয়ে আনন্দের লহর ছুটাইয়া দেয়। কিন্তু একটা কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কবি দুএকটি কবিতা ভিন্ন, অন্য কবিতায় প্রকৃতির অন্তঃস্থল পরতে পরতে তুলিয়া সেই চির-সুন্দরের মূর্ত্তি দেখাইতে পারেন নাই!

'দল ও পরিমল' কবিতা কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষায় মস্‌গুল।

এইবার আলোচ্য কাব্যে দুএকটি অসঙ্গতির কথা বলি ;—'সন্তানক' শব্দ দুইবার 'ক্ষুদ্র শিশু' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে! এ অর্থ কবি কোথায় পাইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। কথাটা যৌগিক অর্থেই প্রযুজ্য। এটা কি 'অল্পার্থে' 'ক' প্রত্যয়?—ভাষায় নূতন শব্দ-সম্পদ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু যেশব্দ যেঅর্থে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহার ব্যত্যয় করা কি এতই সহজ!

'বিধবা' কবিতায় কবি 'রচনা তার তব নিপুণ হস্তে'র সহিত মিল করিয়াছেন "কান্তং—নমস্তে নমস্তে"। অন্যত্র 'প্রেম ও মৃত্যু' কবিতায় 'দূরমপসর' ব্যবহার করিয়াছেন ; এরূপ ব্যবহারের আমরা পক্ষপাতী নহি। আমাদের মনে হয়, এই দুই স্থল কবির শব্দ-দীনতার পরিচায়ক! অবশ্য 'বন্দে মাতরং' গানে সংস্কৃত-শব্দের বাহুল্য আছে, কিন্তু মহামনীষী বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই এরূপ করিয়াছিলেন—ভবিষ্যদ্‌-দ্রষ্টা তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, হিমাচল-হইতে-কুমারিকাপর্য্যন্ত ভূভাগস্থ সকল ভারতবাসীর কণ্ঠোচ্চারিত মাতৃ-মন্ত্র রচনা করিতে হইলে, সংস্কৃতের সাহায্য ভিন্ন গতি নাই ;—তাই তিনি ঐরূপ করিয়া গিয়াছেন।

এইবার কবির ছন্দ সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলি।—দুএক স্থলে ছন্দের একটু কৃত্রিমতা থাকিলেও মাত্রিক ছন্দের উপর (Syllablic) কবির অসাধারণ ক্ষমতা আছে ;—এগুলি একটু শ্রুতিকটুও হইয়াছে। যেমন—

'যা-কিছু সেবা, যা-কিছু প্রীতি—মহীয়সী সে যা-কিছু,
সবার সে যে আধার তুমি-জননি ;
কহনা কথা—সাধনরতা নয়ন করিয়া নীচু'।—(৯ পৃষ্ঠা)

অন্যত্র,—

'শোন তবে আজ, শোন মহারাজ—সে কথা বলিনি কা'রে,
বিচারের ভয় করিনা তোমার—সে হবে আরেক দ্বারে ;
শুনিছে যা কাণে, বলি তাহা এখানে—আমি তোর বড় ভাই—'

'বলিতা এখানে' করিলে বোধ হয় ভাল হয়—না?

আবার—

'খোদা নিজে যারে ফকির ক'রেছে,
মজ্‌লিস তারে সাজে কি আর?
অন্ধ নয়নে সুর্ম্মা কে অাঁকে,
তারহীন—কেসে রাখে সেতার?'—(১০৫ পৃষ্ঠা।)

এখানে ২য় পংক্তির 'মজলিসতারে'র পর যতি পড়িতেছে, আর ৪র্থ পংক্তিতে স্বাভাবিক যতি পড়ে 'তারহীন' শব্দের পর ; কবিও তাহাই করিয়াছেন ; কিন্তু ছন্দের খাতিরে 'কেসে'র পরে যতি পড়িবে।

পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, সকলই সুন্দর ; তবে দুএকটি ছাপার ভুল আছে, সেগুলি ভবিষ্যৎ-সংস্করণে সংশোধিত হইতে দেখিলে আনন্দিত হইব। 'গরবিনি' (১ পৃঃ), 'উর্দ্ধে' (৪ পৃঃ), 'রুক্ষ' (৮ পৃঃ), 'বৃদ্ধা পৌষ' (১০ পৃঃ), 'মৎলোভখানা' (১০ পৃঃ)।—কথাটা 'মতলব'? কালো, ভালো, প্রভৃতি শব্দ ওকারান্ত সংযোগে বানান—'কালো পাখা' (৪২ পৃঃ)—এগুলি বোধ হয় স্বেচ্ছাকৃত ; আর ৭২ পৃষ্ঠায় 'অতিথ-গীতি' কথাটা, কি 'অতিথির গীতি'?

আদ্যের গম্ভীরা

[মূল্য ২৲ টাকা]

'আদ্যের গম্ভীরা—বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়'—শ্রীহরিদাস পালিত প্রণীত।

মনস্বী ভূদেববাবু লিখিয়াছেন,—"জাতিভেদে সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য-রচনার রীতি ভিন্ন হয়। ইতিবৃত্ত-প্রণয়নের প্রণালীও স্বতন্ত্র হয়। নিরক্ষর বর্ব্বরজাতীয়েরা আর কিছু না পারুক, কয়েকটী কবিতা বিরচন করিয়া আপনাদিগের জাতিসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি স্মরণ করিয়া রাখে।" বস্তুতঃ, ঐরূপ কবিতাই সকল দেশের ঐতিহাসিক শাস্ত্রের মূল। তৎপরে, তিনি বিভিন্ন জাতির ইতিহাস-প্রণয়ন-প্রণালী আলোচনা করিয়া যে সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহারই ভাষায় বলি,—"চিনীয়দিগের কাল-নিষ্ঠতা, আরবদিগের ঈশ্বর-পরায়ণতা, ইহুদীদিগের ঐহিক-নিষ্ঠতা, ভারতবর্ষীয়দিগের কার্য্য-কারণ-প্রবণতা, এবং গ্রীক্‌দিগের স্বদেশ-বাৎসল্য যেমন ঐ ঐ জাতির বিশিষ্টভাব ব্যক্তকরে, কতক পরিমাণে জর্ম্মণ্‌দিগের অনুসন্ধিৎসা, ফরাসীদিগের নিপুণতা এবং ইংরেজদিগের কার্য্যপরতা তত্তজ্জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থ-গুলিতেও বিশিষ্টরূপেই প্রকট হয়।" কিন্তু এই ইতিহাস জিনিষটা যে কি পদার্থ, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যদি আমরা বিজ্ঞানের মতে ইতিহাস জিনিষটা কি, বুঝিতে চাই (Science of History) তাহা হইলে বুঝিতে পারি, ইতিহাস ঘটনার তালিকা নয়—ইতিহাস পরাক্রমশালী সম্রাট্‌গণের রোজনাম্‌চা নয়—ইতিহাস স্বদেশ-বাৎসল্যের অত্যুৎকট অভিব্যক্তিও নয়—ইতিহাস প্রাক্তনবাদ, পুরুষকারবাদ ও পরকালবাদের অপূর্ব্ব-সম্মেলনফলোৎপন্ন "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ে"র বিজয়-নিশান নয় ;—ঘটনাই ইতিহাসের উপাদান ; কিন্তু সেই উপাদানকে যে কেবলমাত্র সময়ের পূর্ব্বাপরক্রমে দেখিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ইতিহাস দেশের ও দশের সংশ্লিষ্ট ঘটনামালা সত্য ; কিন্তু ঘটনার পশ্চাতে, যে বিরাট্‌ প্রাণ বিরাজ করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে ঘটনার সৃষ্টি করিতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। কেবলমাত্র রাজনীতির নীলবর্ণের কাচের ভিতর দিয়া ঘটনাগুলিকে দেখিলে চলিবে না। প্রাণিবিজ্ঞানের (Biologyর) নিয়মানুসারে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া সমাজধর্ম্ম, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প-নীতি প্রভৃতি মানবের উন্নতির পরিপন্থী বিষয়সমূহের কাহিনী প্রচারই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—"Founded on the SCIENCE of LIFE, HISTORY will be competent

to formulate clear and definite principles about the course of Human Progress, the development of Society and the evolution of Civilisation"—আমাদের দেশে ইতিহাস-আলোচনা-পদ্ধতি, পুরাণ ও ধর্ম্মের ভিতর দিয়া বরাবরই হইয়া আসিতেছে—, তাই ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ইতিহাসের ধারা এদেশে যেরূপ প্রবাহিত হয়, অন্যকোনও দেশে সেরূপ হয় না। আর সেই চিন্তা-স্রোতের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে, আমাদিগকে সেই স্রোতোধারা ধরিয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে হইবে। আর সেইরূপ চেষ্টা করিয়া কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত পালিতমহাশয়।

আজকাল একটা কথা অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের ইতিহাস নাই। কথাটা আংশিকভাবে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর মহাশয়ের সহিত আমরাও বলি,—"আমাদের বিচিত্র সমাজ, সাহিত্য, উৎসব, নিয়ম, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃতই ইতিহাস জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।" কিন্তু এগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রচার করিতে হইবে; এ কার্য্যও কতকটা আরব্ধ হইয়াছে।—যাঁহারা একার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা, পরিশ্রম ও সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠা—সকলই প্রশংসার্হ। আলোচ্য গ্রন্থ-প্রণেতা পালিতমহাশয় তাঁহাদেরই অন্যতম।

পুস্তকখানি খুলিয়া তাঁহার উদ্ধৃত প্রমাণ-পঞ্জীর তালিকা-দৃষ্টে আমরা বিস্মিত হইয়া যাই যে, এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাকে কত পুস্তক ও পুঁথি অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে!

পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রথম বিভাগে, তিনি গম্ভীরার একটি বিবরণ দিয়াছেন; উৎসবের অনুষ্ঠানগুলি বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। পরিশেষে, 'গম্ভীরায় সামাজিকতা' পরিচ্ছেদে সমাজ সংস্কার বিষয়ে গম্ভীরার উপযোগিতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমাজের বিরুদ্ধে কোনরূপ অন্যায় করিলে, তাহাকে গম্ভীরার নিকট আত্মপাপ স্বীকার করিতে হইত। ইহা রোম্যান-ক্যাথলিকদিগের অপরাধ-স্বীকার প্রথার (Confession) মত। কিন্তু মানব-প্রকৃতি স্বভাবতঃই আপনার কালিমাটুকু গোপন করিতে চায়; মানব মনে করে, তাহার দোষটুকু অন্যে দেখিতে পাইবে না, তাই সে সকলসময় গম্ভীরার নিকট আত্মদোষ স্বীকার করে না। এরূপস্থলে গম্ভীরা-গায়কেরা তাহার পাপের সজীব-কাহিনী সকলের সমক্ষে ব্যক্ত করিয়া, তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়। ইহাতে কেবলমাত্র যে অপরাধীর দণ্ড হইয়া থাকে তাহা নহে, অপরাপর ব্যক্তিগণেরও শিক্ষা হইয়া থাকে। 'গম্ভীরায় রাজনীতি' পরিচ্ছেদে সামাজিক অপরাধের বিচার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। গম্ভীরার গীতগুলিদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে একাঙ্গ পুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে; এগুলি মর্ম্মস্পর্শী—পল্লীজীবনের সরল আমোদ-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। গম্ভীরার নর্ত্তন দেখিলে বাস্তবিকই চক্ষু জুড়াইয়া যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের সহজসরল লীলা ভঙ্গের মাধুরী দেখিয়া আমরা কএকবার যে কি আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। ইহাতে অস্বাভাবিকতার লেশমাত্র নাই, বা পাশ্চাত্য-নৃত্য বিদ্যার বিজ্ঞানও নাই; ইহা খাঁটি দেশীজিনিস। গম্ভীরায় কৃত্রিম কাগজের ফলপুষ্পের ও আলিপনার সুন্দর নিদর্শন দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়, গম্ভীরা কলা-বিদ্যারও সহায়তা করিয়াছে।

দ্বিতীয় বিভাগে হরিদাসবাবু 'প্রাচীন সাহিত্যে গম্ভীরা'য় তাঁহার বিদ্যাবত্তার ও অনুসন্ধিৎসার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই পল্লবগ্রাহিতার যুগে দুর্লভ। তবে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, 'বৈদিক সাহিত্যে গম্ভীরা'য় তিনি প্রমাণ-প্রয়োগ কিছুই উদ্ধৃত করেন নাই; 'মহাভারতে গম্ভীরা'ও এই দোষদুষ্ট। মহাভারতের সময় শিব-পূজা প্রচলিত থাকিলেও, যে সেসময় গম্ভীরার প্রচলন ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? 'চীন দেশীয় পর্য্যটকগণের বিবরণে গম্ভীরা' সম্বন্ধেও প্রমাণ নাই! দ্বিতীয় খণ্ডের 'গম্ভীরার ধারাবাহিক ইতিহাস' এক অপূর্ব্ব-বস্তু—বাঙ্গালার শৈব ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের প্রীতিপ্রদ চিত্র; এ চিত্র সুদক্ষ-শিল্পীর মতই অঙ্কিত হইয়াছে।—তবে, এখানেও তিনি পালরাজগণের সময়-নিরূপণের চেষ্টা বিশেষভাবে করেন নাই।

হরিদাসবাবু বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায় লিখিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আশা করি, অন্যান্য কর্ম্মীরা হরিদাসবাবুর প্রদর্শিত পন্থাবলম্বন করিয়া, উহার অপর অপর অধ্যায় লিখিয়া, একখানি সম্পূর্ণ-ইতিহাস প্রণয়নে সহায়তা করিবেন। ফলে, আলোচ্য পুস্তকখানি সাধারণে আদৃত হইতে দেখিলে সুখী হইব।

গিরিশচন্দ্র

(মূল্য এক টাকা, বাঁধান পাঁচ সিকা)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। দ্বিতীয় ভাগ। বঙ্গের নটকুলচূড়ামণি পরলোকগত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যখন জীবিত ছিলেন, তখনই তাঁহার অনুমতিঅনুসারে শ্রীযুক্ত অবিনাশবাবু গিরিশ গীতাবলীর প্রথমভাগ প্রকাশিত করেন, এবং সেই পুস্তকে গিরিশবাবুর জীবনকাহিনীর পূর্ব্বার্দ্ধ লিপিবদ্ধ করেন। এক্ষণে, গিরিশচন্দ্রের পর লোকগমনের পর, অবিনাশবাবু দ্বিতীয় খণ্ড গীতাবলী প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার নামকরণ করিয়াছেন 'গিরিশচন্দ্র'। এই পুস্তকে গিরিশচন্দ্রের অনেকগুলি গান প্রকাশিত হইয়াছে, অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। অবিনাশবাবু কেবল গান ও ছবি দিয়াই গ্রন্থ শেষ করেন নাই; গ্রন্থের প্রায় অর্দ্ধেকের অধিক অংশ গিরিশচন্দ্রের জীবনের অবশিষ্ট কথায় পরিপূর্ণ করিয়াছেন। অবিনাশবাবু বিগত ২০ বৎসরকাল গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন, ছায়ার ন্যায় ছিলেন। গিরিশবাবু নিজে লিখিতে পারিতেন না, অবিনাশবাবু তাঁহার লিপিকরের কাজ করিতেন; গিরিশবাবু যখন যেখানে যাইতেন, অবিনাশবাবু তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, গিরিশবাবুর অন্তিমশয্যার পার্শ্বেও অবিনাশবা[বু]

উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং অবিনাশবাবু,গিরিশবাবুর শেষ-জীবনের কথা, অপরের অপেক্ষা অধিক বলিতে পারেন ;—অবিনাশবাবুর 'গিরিশচন্দ্র' পাঠ করিয়া সকলেই একথা স্বীকার করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশের জন্য গিরিশচন্দ্রের মুখে যে পরিবর্ত্তন হইত, তাহার ফটোগ্রাফ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মোটের উপর পুস্তকখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা এই পুস্তকপাঠে অবগত হওয়া যায়।

সুহৃদ্-পরিষদ ও হেমচন্দ্র লাইব্রেরীতে মহারাজ বাহাদুর

[মহারাজের বামে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মথুর বাবু, তাঁহার বামে বিহারী বাবু (ইঁহারই প্রাসাদ তুল্য গৃহে মহারাজ রাত্রিবাস করিয়াছিলেন), মহারাজের দক্ষিণে সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহারাজ ও নগেন্দ্রনাথের মধ্যে অধ্যাপক সমাদ্দার, মথুরবাবুর সম্মুখে (উপবিষ্ট) শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ, তাঁহার বামে উকীল শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, ফটোর বাম পার্শ্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ মিত্র।]

বাঁকিপুরে মহারাজ

(প্রাপ্ত)

বিগত ১৯এ পৌষ বাঁকিপুরস্থ সুহৃদ্-পরিষদ্ ও হেমচন্দ্র-লাইব্রেরী-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের বিক্রমাদিত্য, মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কাশীমবাজারাধিপতি, বাঁকিপুরে গমন করেন। রেল-ষ্টেশনে মাননীয় মহারাজ বাহাদুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র স্থানীয় হিন্দুমুসলমান, বাঙ্গালী-বিহারীসমাজের প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে প্রবাসী বঙ্গবাসীর অগ্রণী রায়বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে প্রবীণ উকীল বাবু মথুরানাথ সিংহ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়, বিহারী-ভদ্রলোকগণের পক্ষ হইতে মাননীয় খাঁ বাহাদুর সৈয়দ ফকরুদ্দিন, সুহৃদ্-পরিষদের পক্ষ হইতে, পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বিহারী-ছাত্রবৃন্দের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বলদেও লাল, বি-এ, মহাশয়গণ মহারাজবাহাদুরকে মাল্যার্পণ করিয়া অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে শকট হইতে অশ্বদ্বয়কে উন্মুক্ত করিয়া, বাঙ্গালী ও বিহারী ছাত্রবৃন্দ মহারাজকে লইয়া, প্রায় এক

মাইল দূরস্থ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের বাটিতে লইয়া যান। কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে মহারাজ বাহাদুর "সুরোদ্যানে" গমন করেন। সুরোদ্যানের পথে পুরমহিলাগণ মহারাজের উপর লাজ-বর্ষণ করিতে থাকেন;—ধূপধুনার গন্ধে পথ আমোদিত হইতেছিল, এবং সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে উপনীত হইলে মহারাজ-বাহাদুরকে মাল্য, চন্দন ও ধান-দূর্ব্বাদ্বারা অভ্যর্থনা করা হয়। ইহার পরে "সুহৃদ্-পরিষদ্ ও হেমচন্দ্র-লাইব্রেরী"র জনৈক সভ্যকর্ত্তৃক রচিত অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গীত হয়। অতঃপর, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ সিংহ মহাশয় তাঁহার সুলিখিত সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে, পরিষদের সভাপতিরূপে, অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয় পরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া, এক অভিনন্দন পাঠ করেন, এবং মহারাজকে পরিষদের অভিভাবকপদে বৃত করেন। এই অভিনন্দন-পত্র সুন্দর কারুকার্য্য সুশোভিত রৌপ্যাধারে প্রদান করা হয়। আধারের উপর "বঙ্গসাহিত্যের বিক্রমাদিত্য মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কাশিমবাজারাধিপতি বাহাদুরকে সুহৃদ্-পরিষদ্ ও হেমচন্দ্র লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল" উৎকীর্ণ ছিল। অভিভাষণ ও অভিনন্দনের উত্তরে মহারাজবাহাদুর সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতায়, প্রবাসে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি এরূপ ভক্তি দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পরিষদের গৃহ হয় নাই শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ ও তৎসম্বন্ধে সাধ্যমত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন।

দ্বিপ্রহরে মহারাজবাহাদুর অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয়ের গৃহে সপারিষদ মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করেন। অব্যবহিত পরেই অক্লান্ত-কর্ম্মা মহারাজবাহাদুর বাঁকিপুরের নূতন রাজধানীর নির্দ্ধারিত স্থান ও পাটলিপুত্রের যে স্থানে বদান্যবর তাতা মহোদয়ের অনুগ্রহে খননকার্য্য হইতেছে, তথায় গমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তিনি সুহৃদ্ পরিষদ্ পরিদর্শন করেন এবং পরে বিহারী ছাত্রবৃন্দের এক অভিনন্দন গ্রহণ করেন। অভিনন্দনের উত্তরে মহারাজবাহাদুর ছাত্রবৃন্দকে ধীর, সংযত ও রাজভক্ত হইতে উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে তিনি বাঁকিপুরের খোদাবক্স লাইব্রেরীতে গমন করিয়া তথাকার বহুমূল্যবান্, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি দেখেন।

মহারাজবাহাদুরের সহিত যাহাতে স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের পরিচয় হইতে পারে, তজ্জন্য সুহৃদ্-পরিষদের সভ্যগণ এক "ষ্টীমার পার্টি"র আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রকাণ্ড ষ্টীমার পত্রপুষ্পে কদলীবৃক্ষ ও পতাকাদ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। অন্যূন চারিশত বাঙ্গালী ও বিহারী ভদ্রলোক মহারাজবাহাদুরের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এখানে ঐক্যতান বাদ্য, সঙ্গীত ও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। এখানে বাঙ্গালীসমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ ও বিহারী পক্ষ হইতে বিহারী-উকিল শ্রীযুক্ত কালীকুমার সিংহ মহাশয়, মহারাজবাহাদুর যে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া বাঁকিপুরে শুভাগমন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেন। মহারাজবাহাদুরও সারগর্ভ বক্তৃতায় সকলের প্রত্যুত্তর

প্রদান করেন। তখন "মহারাজবাহাদুরের জয়" রবে ভাগীরথী দুই কূল প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

সন্ধ্যার সময় রায়বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের গৃহে এক সান্ধ্যসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য এখানেও প্রভূত জনসমাগম হয়। রাত্রিতে মহারাজবাহাদুর, অন্যতম সরকারী উকিল রায়বাহাদুর বিনোদবিহারী মজুমদার মহাশয়ের গৃহে রাত্রিভোজন শেষ করেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে মহারাজবাহাদুর দিল্লীযাত্রা করেন। পত্রে পুষ্পে মাল্যে মহারাজের গাড়ীখানি সুসজ্জিত করা হয় এবং সমাগত জনমণ্ডলীর মুখে "মহারাজবাহাদুরের জয়" শব্দে ষ্টেশন মুখরিত হয়। তিনিও সকলকে যথাযোগ্য প্রত্যভিবাদন করিয়া আপ্যায়িত করেন।

আমাদের ভরসা, মহারাজের বদান্যে বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থলে যেরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পুষ্টিলাভ করিয়া বাঙ্গালীর অশেষ হিতসাধন করিতেছে, সেইরূপ বঙ্গদেশের বাহিরেও এই পরিষদ্ বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে, এবং সহৃদয়, গুণগ্রাহী, পরোপকারী, বদান্যশ্রেষ্ঠ অগ্রণী, দেশচর্য্যাব্রতী মণীন্দ্রচন্দ্রের শুভাগমনের সার্থকতা বাঙ্গালার প্রান্তবর্ত্তী বঙ্গীয় উপনিবেশে স্পষ্টই অনুভূত হইবে।

য়ুরোপে তিনমাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাসা বাড়ীতে বাস করার জন্য, বিবাহ-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কার্য্য নিজ নিজ বাড়ীতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন বলিয়া, বোম্বাইতে আর এক অভিনব প্রথা দেখিলাম। এক একজন বড় লোক এক একটি সুসজ্জিত "ওয়ারী" অর্থাৎ 'বাড়ী' করিয়া বসিয়াছে। থালা, বিছানা, টেবিল,

ভিক্টোরিয়া টার্মিনস্ ষ্টেশন্—বম্বে

চেয়ার,—সব সেখানে প্রস্তুত আছে। লোক জনও সব প্রস্তুত আছে, কিছু করিয়া দিলেই জিনিস তৈয়ারি পাওয়া যায়। বর বামুন লইয়া উপস্থিত হইলেই, শুভকার্য্য সমাধা হইয়া যায়! কলিকাতার বন্ধু ব্যারিষ্টার মেটা-সাহেবের বিবাহ মহারাজ যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের বাড়ীতে হইয়াছিল। মেটাসাহেব বড়লোক, এবং ক্যানিং ষ্ট্রীটে তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ীও আছে, অথচ এমন কেন হইল তখন বুঝিতে পারি নাই। এমন একটা রীতি বাঙ্গালীর চক্ষে কেমন কেমন লাগে। এখন বুঝিতে পারিলাম, এই প্রথা ইহাদের মধ্যে দোষের কথা নয়।

সাহেবদের গির্জ্জায় বিবাহ;—হোটেলে বিবাহ-ভোজ আছে। ইহারাও আধাসাহের;—বাসা-বাড়ীতে থাকে। পরের বাড়ীতে বিবাহ প্রায়ই হয়, তাহাতে দোষ বা লাঘবের কথা কিছু নাই। আমাদের যে যার কুঁড়েতে যা-হয় করিয়া সব কাজ সারিতে হয়। ভাই-খুড়া-জ্যেঠার বাড়ীতে গিয়া কাজ করিতেও "মাথা কাটা" যায়, তাই আমাদের মাথা এত ক্রমোন্নত! ম্যারাপ্ বাঁধিতে, ভাঁড়-খুরি কিনিতে, বাড়ীবাড়ী মেয়েপুরুষ গিয়া মেয়েপুরুষের নিমন্ত্রণ করিতে ও সেই ওজনে নিমন্ত্রণ রাখিতে, আর মেয়ে-নিমন্ত্রণের ঝঞ্চাট পোহাইয়া যাহাদের হাড় ঝালাপালা হইয়াছে,—বোম্বাইয়ের এই চিত্র তাহাদের চক্ষে, সুন্দর না লাগুক, কার্য্যকর বলিয়া মনে হইবে।

বোম্বাইতে সাহেব পাড়া, বাঙ্গালী পাড়া, বড়মানুষ, গরিব-মানুষ, লইয়া পাড়া আছে। মালাবার পাহাড়ের উপর ও গায়ে এবং সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত ভূখণ্ড—কোলাবার দিকে সব শ্রেণীর বড়মানুষ—সাহেব-পার্শী-হিন্দু-মুসলমানের বাস। মালাবার পাহাড়ের উপর অনেক বাড়ীতেই স্বতন্ত্র পরিবার বাস করে। এখন 'Season' নয় বলিয়াই অনেক বাড়ী রহিয়াছে। বোম্বাইয়ের লাট সাহেবের বাড়ী মালাবার

টাউন-হল—বম্বে

শৈলের শেষ কোণে। মালাবার শৈলের বিপরীতদিকে, যেখানে সমুদ্র অর্দ্ধ বক্রাকারে ঘুরিয়া গিয়াছে, সেইখানে কোলাবা।

ইহার স্থানে স্থানে ব্যাটারী স্থানে স্থানে ব্যারাক্। অদূরে সমুদ্রগর্ভে ছোট ছোট পাহাড়ের উপর বারুদখানা এবং Light House, অথবা সমুদ্রের বাতীঘর, এই বোম্বাইয়ের চারিদিকে দেখা যায়। যেদিক্ হইতে রেলগাড়ী করিয়া যাইতে হয়, তাহা ছাড়া তিনদিকে খোলা-সমুদ্র ও রেল-পথের দিকে সমুদ্রের খাড়ী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বোম্বাই সহর বা বোম্বাই দ্বীপ। কাজেই বোম্বাইয়ের এদিক্ ওদিকে বাড়িবার স্থান, কলিকাতা অপেক্ষাও কম? সমুদ্র-ভরাট্ করিয়া কতক কতক বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে ও হইতেছে। Improvement Trust অনেক নূতন রাস্তা তৈয়ারি করিয়া, বাড়ী করিয়া, জায়গা দীর্ঘ-মেয়াদে ভাড়া দিতেছে। ইহারা জায়গা বিক্রয় করে না; ভাড়া লইয়া বাড়ী করিতে হয়! দীর্ঘ-মেয়াদঅন্তে বাড়ী সব কোম্পানীর হইয়া যাইবে। এই রূপ কড়া-মেয়াদেও লোকে জায়গা লইয়া বাড়ীঘরদ্বার করিতেছে। কাজেই ভাড়াটীয়া বাড়ী করিতে হইলে ৫।৬ তালা বাড়ী না করিলে চলে না। কাঠা-হিসাবে নয়—এখানে গজ-দরে জমি-বিক্রয় হয়।

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজ—বম্বে

এইরূপে, সমুদ্র দুইদিকে দুই বাহু বিস্তার করিয়া আছে—একদিকে মালাবার হিল্, অপর দিকে 'কোলাবা'; আবার বিপরীতদিকে দুই বাহু বাহির হইয়া গিয়াছে—একদিকে মহারাজা গোয়ালিয়র সুন্দর প্রাসাদ-নির্ম্মিত করিয়াছেন; অপরদিকে, তাজমহল গম্বুজের অনুকরণে প্রস্তুত, তাজমহল হোটেল্, সমুদ্রতীর দখল করিয়া এপোলো বন্দরের উপর দাঁড়াইয়া আছে! জাহাজ ছাড়িয়া আসিবার সময় তাজমহল হোটেলের গম্বুজ শেষপর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল।

অদূরে লাইট্ হাউস্ পার হইয়া ছোট ছোট পাহাড়। তাহার বিপরীতদিকে এলিফান্টা-গহ্বর; ৪।৫ ঘণ্টা সমুদ্র-পথে যাইতে হয়। কাজেই, এ যাত্রায় আর যাওয়া সম্ভব হইল না; মনের বড় আক্ষেপ রহিয়া গেল। দেশের যুগযুগান্ত-ব্যাপী অপূর্ব্ব দর্শন এই সকল কীর্ত্তি,—দর্শনের সময় করিতে না পারিয়া বিদেশে দৌড়িয়াছি!—ইহাতে আক্ষেপ ও অপযশ—দুইএরই কথা আছে!

লোক-শিক্ষা সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের নরপতিগণের গুণ ও দান প্রশংসনীয়। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজের একজন ভূত-পূর্ব্ব ছাত্র আট লক্ষ টাকা খরচ করিয়া কলেজের বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে!—আর Presidency College-এর একটা হলের জন্য লক্ষ টাকা প্রেসিডেন্সী কলেজের পুরাতন ছাত্রদিগের নিকট চাঁদা চাওয়া গেল, তাহার হাজার টাকাও

এলফিন্‌ষ্টোন্ কলেজ—সেক্রন্ লাইব্রেরী—সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি—বম্বে

উঠিল না। একশত জন ছাত্র হাজার টাকা করিয়া দিতে পারে, কিংবা হাজার ছাত্র একশত টাকা করিয়া দিতে পারে,—এই দীর্ঘকালে কলিকাতার Presidency College যদি এরূপ ছাত্র প্রসব করিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহার বাঁচাই বৃথা!

বোম্বাইয়ে Grant Medical College, Victoria Jubilee Technical Institution, University Building, Town Hall ইত্যাদি দানবীর আঢ্য পার্শীদের তৈয়ারী সুন্দর সুন্দর অনেক স্কুল কলেজবাড়ী আছে। সময়-সংক্ষেপ বলিয়া এগুলির ভিতরে দেখা হইল না। High Court, Municipal Buildings, Post-Office, Telegraph Office, Byculla Club, Gymkhana ইত্যাদি সবই দূর হইতে দর্শন করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া পড়িল। ক্রমে 'মেও রোড্' ধরিয়া, হাইকোর্ট প্রভৃতি

এস্প্ল্যানেড্—বম্বে

ছাড়াইয়া,—রাশি রাশি তুলার কসা গাঁটের মধ্যে আপলো বন্দরে যাওয়া গেল। কাল সেইখান হইতেই জাহাজে উঠিতে হইবে। অতএব Port Commissioner আপিসে সে বন্দরটার পরিচয় লইয়া আসা আবশ্যক। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার তখন বাড়ীটাকে গিলিয়া রাখিয়াছে। বাড়ীটা ত আমায় যেন গিলিতে আসিল। চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া মনে কেমন একটা ভ্রান্ত ত্রস্ত আসিয়া পড়িল। দূরে

ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী ও ক্লক্-টাউয়ার্—বম্বে

বাইকুল্লা ক্লাব্—বম্বে

সন্ধ্যার আঁধারের মধ্যে ARABIA জাহাজ আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। বৃহৎকায় জলপোত ডাঙ্গার নিকট আসিতে পারে না;—তাই দূরে নঙ্গর করা আছে। ছোট জাহাজে করিয়া গিয়া উঠিতে হইবে। নৌকা করিয়া দেখাইয়া আনিবার উমেদার মাঝি অনেক জুটিল, কিন্তু তাহাতে আর ইচ্ছা হইল না। কেমন একটা ভিজা কম্বল দিয়া প্রাণটাকে চাপা দিয়া ফেলিল।

যে সকল ভদ্রলোক দয়া করিয়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া দেখাশুনা করিলাম—ধন্যবাদ দিলাম। খাওয়াইবার জন্য, থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখিতে যাইবার জন্য, তাঁহারা অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু আজকার দিনে সে সব আর ভাল লাগিল না। মোটর্ গাড়ী যতক্ষণের জন্য ভাড়া করা হইয়াছিল, তাহাপেক্ষা অনেক অল্পসময়ের মধ্যেই বাড়ী ফিরিলাম, এবং আহারাদি করিয়া বিশ্রামের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।—কিন্তু পুরাতন অভ্যাস সহজে যায় না! বম্বের Picture Post-Card লইয়া বাছাগোছা ২০।২৫ খানা চিঠিলেখা ইত্যাদিতে অনেক রাত্রি হইল। কত ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, ভক্তিপূর্ণ কাতরতার সহিত ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে, তন্দ্রা সঞ্চার হইল; কিন্তু সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না।

জিম্‌খানা—বম্বে

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

চিত্রকরের প্রতি

('মহাপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শন'-এর চিত্রকর শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষের উদ্দেশ্যে)

গাঢ় অনুরাগ-রঙে ডুবাইয়া তুলি
হে ভকত চিত্রকর এঁকেছ কি ছবি!
হিয়ার ভকতি তব আঁখি-জলে গুলি'
পেতেছ নয়ন ছুটি,—হেরি কাঁদে কবি।
মনে হয়, ছিলে তুমি দূর-জন্মান্তরে
পুরীর পবিত্র বুকে দামাল বালক,
মন্দিরেতে দাঁড়াইতে ভিড় হ'তে সরে',
'গোরা'পানে চেয়ে র'তে না ফেলি পলক!
কতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ—দরশন-শেষে—
যখন নয়ন মুছি' যাইতেন চলি',
তুমি বহির্বাস তাঁর ধরিতে হে এসে,—
দাঁড়াতেন মহাপ্রভু—"ছেড়ে দাও" বলি',
চম্পক-অঙ্গুলি তাঁর রাখি' তব শিরে
চাহিতেন,—আঁখি পুনঃ ভরে' যেত নীরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আদর্শ সমালোচক

১

পথিকে ডাকিয়া এক বলে গাঁজখোর—
"এ হুঁকাটি কোথা পেলে' ভদ্রবেশী চোর!
হুঁকা মোর চুরি করে'—পাছে হয় গোল—
সেই ভয়ে বদ্‌লেছ 'নলিচা' ও 'খোল'!"

২

রোষভরে ক'ন এক সম্পাদক জ্ঞানী—
"ও কবিটা অতিশয় চোর, আমি জানি'।
'আত্মার বিনাশ নাই' লিখিয়াছে, ভায়া;
আমাদের আবিষ্কৃত ভাবটির ছায়া!"

শ্রীমেঘনাদ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙ্গ্‌লা ধাতুর রূপভেদ

১। পাইলাম, খাইলাম, যাইলাম—ইত্যাদি পদ ;—

এক-বর্ণাত্মক এক-স্বরান্ত ধাতুতে বিভক্তি যোগে যে পদ-গুলি হয়, তাহার অবিকৃত রূপ যশোহরের উচ্চারণে পাওয়া যায় ; যথা,—পা-লাম, খা-লাম, যা-লাম (গে-লাম) ইত্যাদি। যশোহরের উচ্চারণে অন্য ধাতুতে বিভক্তি যোগ করিলেও ঐরূপ অবিকৃত রূপ থাকে ; যথা—আস্‌-লাম, ধর্‌-লাম, কর্‌-লাম, দেখ্‌-লাম, ইত্যাদি ; কিন্তু সাহিত্যে যে রূপ গৃহীত হইয়াছে, তাহা আসল বঙ্গদেশের কথিত রূপই লওয়া হইয়াছে। এক-বর্ণাত্মক ধাতু ব্যতীত অন্য ধাতুতেও তাহাই—অর্থাৎ পা-লাম ইহার মধ্যে বঙ্গের উচ্চারণে যে 'ই' আগম হয়, তাহাই—অন্য ধাতুতে বিভক্তির পূর্ব্বে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ; যথা—আসিলাম, ধরিলাম, করিলাম, দেখিলাম। পাইলাম, খাইলাম প্রভৃতিতে যে 'ই' আসিয়াছে সেটী বিশুদ্ধ 'ই' বর্ণ নহে—বঙ্গের উচ্চারণে 'পা' ধাতুর আকার ও বিভক্তি 'লাম' এর অকারের মধ্যে আকারের পর যে স্বরের একতা ঘটে, তাহার দ্যোতকতা অনেকাংশে এই 'ই' বর্ণের দ্বারাই হইতে পারে, বলিয়া 'ই' দিয়াই তাহা প্রকাশ করা হয়।

ইহা হইতে আমাদের মনে হয়, রচনার ভাষায় যে কোন পদ ধরা যাক্‌, তাহা কোন না কোন প্রদেশের কথ্য ভাষার অবিকৃত পদমাত্র, তবে কোথাও যে বিকৃত হয় নাই, তাহা দৃঢ়ভাবে বলা যায় না।

২। পেনু, খেনু, গেনু—প্রভৃতি পদ ;—কবিতাগ্রাহ্য এই সকল পদ পশ্চিমরাঢ়ের কথ্য-ভাষার ব্যবহৃত অবিকৃতরূপ। এইগুলি যেমন অবিকৃতভাবে কবিতায় গৃহীত হইয়াছে, তেমনই এই গুলিতে সাহিত্যিক ভাষার সমতা রক্ষার্থ—অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দকে বঙ্গের উচ্চারণের সাদৃশ্য দিবার জন্য—ঐ "ই" বর্ণের সাহায্য লইয়া আবার কতকগুলি পদ সৃষ্ট হইয়াছে ; যথা—পাইনু, খাইনু, যাইনু, ইত্যাদি। এগুলিও যে একবারে সাহিত্যক-কল্পনায় উদ্ভাবিত—তাহা নহে ; বঙ্গ ও রাঢ়ের মধ্যবর্ত্তি-স্থানগুলিতে, কথ্য-ভাষায়, ইহাদের বিকৃত-পদের বর্ত্তমানতা দেখা যায়। নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে এইরূপ পদ পাওয়া যায় ; আর নবদ্বীপবাসিগণের প্রাধান্যে যে যে বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রবর্দ্ধিত, তাহাতে এইরূপ পদের আধিক্য দেখা যায়। এই ব্যাপার লক্ষ্য করিলে, এক হইতে অপরের উৎপত্তি হইয়াছে একথা বলাও সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে।

৩। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণই যে সাহিত্যিক ভাষার ভিত্তি ভূমি, তাহার আরও প্রমাণ ভাষার শব্দমালায় দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গেই অন্তঃস্থ 'ব'কারের উচ্চারণ বর্ত্তমান আছে, রাঢ়ে নাই ; আমরা—খাওয়া, দেওয়া, পাওয়া, ইত্যাদিতে তাহার পরিচয় পাই ; রাঢ়ে—খাবা, দিবা, পাবা, ইত্যাদি রূপই চলিত ; যথা—খাবা-মাত্র, দিবা-মাত্র, পাবা-মাত্র। উভয় উচ্চারণের মধ্যবর্ত্তিস্থান, যশোহর ও নবদ্বীপের, কথিত ভাষায় এই পদগুলিতে রাঢ়ীয় রূপের প্রাধান্য দেখা যায় বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু যেখানে উহা স্বতন্ত্র প্রযুক্ত হয়, সেখানে সাহিত্যে পূর্ব্ববঙ্গের রূপই সাধু-প্রয়োগ বলিয়া স্বীকৃত ; যথা—তাঁহাকে 'দিবা'-মাত্র তিনি চলিয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে তাহা 'দেওয়া' হইল না।

এক-বর্ণাত্মক ধাতু ব্যতীত, অন্য ধাতুতেও পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ-সাম্য করিবার চেষ্টাও দেখা যায় ; যথা—(বলা-মাত্র) বলিবা-মাত্র, (দেখা-মাত্র) দেখিবা-মাত্র, (চলা-মাত্র) চলিবা-মাত্র ইত্যাদি। একবর্ণান্ত ধাতুর রাঢ়ীয় রূপগুলিতে আবার এরূপ সংস্কারের চেষ্টা দেখা যায় ; যথা—(পাবা-মাত্র) পাইবা-মাত্র ; (যাবা-মাত্র) যাইবা মাত্র, ইত্যাদি রাঢ়ীয় রচনায় এই পদগুলি বেশমার্জ্জিত বলিয়া অনুমিত হয়।

৪। রাঢ়ের খেচে, যেচে, নিচ্ছে, হ'চে প্রভৃতি পদ সাহিত্যে গৃহীত হয় নাই ; কিন্তু যশোহরাবধি পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য-ভাষার রূপ,—খাইছে, যাইছে, লইছে, হইছে প্রভৃতি—সাহিত্য-গ্রাহ্য হইয়াছে। এইরূপ—খেল, নিল, পল, হল, মল প্রভৃতি রাঢ়ীয় পদের পরিবর্ত্তে—খাইল, লইল, পড়িল (প'ড়্‌ল), হইল, মরিল (ম'র্‌ল) ইত্যাদি বঙ্গীয়কথা রূপ, বা তৎসম রূপ, সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে।

৫। রাঢ়ীয় অনুনাসিক উচ্চারণ পোঁতা, খোঁড়া (খননার্থ), হাঁসা, প্রভৃতির বিন্দু সাহিত্যের ভাষায় অবিশুদ্ধ বলিয়া অনেক সময় পরিত্যক্ত হয়;—গাছ পুঁতিয়াছে, গর্ত্ত খুঁড়িয়াছে, লোকে হাঁসিয়াছে, প্রভৃতি স্থানে 'পুতিয়াছে,' 'খুড়িয়াছে', 'হাসিয়াছে' ইত্যাদি বঙ্গীয় উচ্চারণের পদ বিশুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

৬। পদের প্রথম বর্ণে যুক্ত একারের ও অকারের যে 'অ্যা' ও 'এ' এবং 'অ' ও 'ও'কারের উচ্চারণ-বৈষম্য রাঢ়ে বঙ্গে হয়, তাহা হইতে দেখা যায় যে, বানানের সময়ে সাহিত্যে বঙ্গীয় উচ্চারণ শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; যথা,—দেখ—দ্যাখ, এখন—অ্যাখন, যেমন—য্যামন ইত্যাদি; এবং করিলাম—কোরিলাম, বলিলাম—বোলিলাম, মন—মোন ইত্যাদি; (কেবল—ক্যাবল, একদা—অ্যাকদা বিপরীত হইল)।

৭। ক্রিয়ার্থ প্রকাশে যুগ্মধাতুর প্রয়োগে পূর্ব্ববঙ্গের রীতিই সাহিত্যে গৃহীত—রাঢ়ের রীতি নহে; যথা,—বলা করাবেক—(বলাইবে), খোঁয়া করাবেক—(খাওয়াইবে), মানা করাবেক—(মানা করাইবে) ইত্যাদি। কিন্তু বল্যা দেলাম, কর্যা ফেলালাম, খায়্যা ফেলালাম, ধর্যা দেলাম ইত্যাদি রাঢ়ীয় পদ, এবং বইল্যা দেলাম, কইর্যা ফেলাইলাম, খাইয়্যা ফেলাইলাম, ধরিয়্যা দিলাম ইত্যাদি বঙ্গীয় পদগুলির কোন্‌টিহইতে সাহিত্যিক রূপ—বলিয়া দিলাম, করিয়া দিলাম ইত্যাদি—হইল, তাহা স্থির করা সহজ নয়।

সেল্‌মা লেগের্‌লেফ্‌

সেল্‌মা লেগের্‌লেফ

অনরেব্‌ল্‌ সেল্‌মা লেগের্‌লেফ্‌ একজন সুইডিশ্‌ লেখিকা। সুইডিশ্‌ লেখক-লেখিকাদিগের মধ্যে ইঁহার ন্যায় সর্ব্বসাধারণের প্রিয় কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ নভেম্বর ভার্মলাণ্ডের অন্তঃপাতী মারবাকা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ই, জি, লেগের্‌লেফ্‌ সেনাবিভাগে কার্য্য করিতেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তার উপাধি লাভ করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টক্‌হল্‌মে সাহিত্যবিভাগে ইনি বিশ্ববিশ্রুত নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত হ'ন। ইনি ভিন্ন এপর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোক কখনও নোবেল-পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। ইঁহার গ্রন্থগুলির ভাব ও ভাষা এতই মধুর যে, কেহ এগুলি পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। সেল্‌মা য়ুরোপ, মিসর ও পালেষ্টাইনের প্রায় সমুদয় দেশভ্রমণে কএক বর্ষ অতিবাহিত করিয়া বিশ্বসাহিত্যের উপযোগী বহু-উপাদান সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-সমাজে উপঢৌকন দিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলির নাম ও প্রকাশকাল প্রদত্ত হইল;—

১৮৯১ খ্রীঃ—Gösta Berling.
১৮৯৪ „ —Invisible Links.
১৮৯৭ „ —Miracles of Anti Krist.
১৮৯৯ „ —From a Swedish Homestead.
১৯০১ „ —Jerusalem.
১৯০৪ „ —Legends of Christ.
১৯০৬ „ —The Adventures of Nils.
১৯০৮ „ —The Girl from the Marsh.

আর্ল মিণ্টো

আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি আর্ল মিণ্টো মহোদয়ের মৃত্যু বিগত ১লা মার্চ্চ ঘোষিত হইয়াছে। ইনি মিণ্টোর চতুর্থ আর্ল ছিলেন; ইঁহার পূরা নাম—'গিলবর্ট জন মরে কিনিমণ্ড্ ইলিয়ট্', (Gilbert John Murray Kynymond Elliot)—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৩৬ বৎসর বয়সে ইনি অনরেব্‌ল্ চারল্‌স্ গ্রের কন্যা মেরিকে বিবাহ করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার পিতা তৃতীয় আর্লের মৃত্যু হয়; ঐ বৎসর ৪৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি মিণ্টোর চতুর্থ আর্লরূপে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। ইঁহার দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ কলেজে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি সামরিক বিভাগে Scots Guardsএ নিম্নপদস্থ সেনানীর (Ensign) পদ গ্রহণ করেন; ঐ পদে তিন বৎসর কার্য্য করিয়া মিণ্টো অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রুষ-তুর্কি-যুদ্ধের সময় ইনি তুর্কির সৈন্যভুক্ত হইয়া কার্য্য করেন এবং ১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন আফগান যুদ্ধ আরব্ধ হয়, তখন ইনি সেই যুদ্ধে যোগদান করিয়া লর্ড রবার্টসের অধীনে কার্য্য করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অন্তরীপে লর্ড রবার্টসের প্রাইভেট সেক্রেটরী হন। মিসর-সমরের সময় ইনি একজন স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহাকে কানাডার শাসনকর্ত্তা Marquis of Landsdowneএর মিলিটরী-সেক্রেটরীর কার্য্য করিতে হইয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কানাডা-বিদ্রোহের সময় ইনি অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৯৮—১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি কানাডার শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর ইনি ভারত-শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। পাঁচ বৎসরকাল ঐপদ সমলঙ্কৃত করিয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ নভেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জের হস্তে শাসন-ভার অর্পণ পূর্ব্বক ইনি অবসর গ্রহণ করেন।

মৃতের জীবনদান

কিছুদিন পূর্ব্বে মেডিকেল কন্‌গ্রেস বা চিকিৎসা-মহাসমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে চিকিৎসকপ্রবর সোরেসি (Dr. Soresi) তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী একটি পরীক্ষার ফল বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে, কোন প্রাণীর শরীরে অস্ত্রাঘাত পূর্ব্বক তাহার শরীরস্থ রক্ত বাহির করিয়া, যদি তাহাকে মারিয়া ফেলা হয়, এবং তাহার পর যদি কোন জীবিত প্রাণীর শরীর হইতে উক্ত মৃতপ্রাণীর শরীরে রক্ত প্রবিষ্ট করা হয়, তাহা হইলে মৃতপ্রাণী পুনরায় জীবিত হইতে পারে। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত জন্তুদিগের উপর এই ব্যাপারের পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাই তিনি চিকিৎসা-মহাসমিতিতে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল বিবৃত করিয়া বলেন যে, মৃত জন্তুদিগের শরীরে রক্ত প্রবেশ করাইয়া যদি তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যশরীরের উপরও উক্ত পরীক্ষা অবশ্যই ফলপ্রদ হইবে। তাঁহার বিশ্বাস যে, আততায়ীর হস্তে যেসকল লোক নিহত হইয়া থাকে, শরীরের রক্তবহির্গমনই তাহার একমাত্র কারণ। এই সকল মৃতব্যক্তির শরীরে যদি কোন জীবিত ব্যক্তির রক্ত প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে সেই মৃতব্যক্তি জীবনলাভ করিতে পারে; সুতরাং ডাক্তারেরা এবংবিধ ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া যে মত প্রকাশ করেন, তাহা ঠিক নহে;—তাহারা প্রকৃতপক্ষে মৃত নহে; উপরি-উক্ত উপায়ে তাহাদিগের জীবনদান করা যাইতে পারে। চিকিৎসা-মহাসমিতি এসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

নোটের বাক্‌শক্তি

একসময়ে আমরা যখন শুনিলাম যে, মানুষে গান করিলে সেই গান কলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যাইবে, এবং যখন ইচ্ছা তখনই কল টিপিয়া দিলে সেই গান শুনিতে পাওয়া যাইবে, তখন সাধারণ লোকে কথাটা বিশ্বাসই করে নাই!—এখন সেই কলের গান ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে, এখন সকলেই ঘরে বসিয়া বড় বড় ওস্তাদের গান শুনিতেছেন; সুতরাং এখন এই বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে কোন কথাই হাসিয়া উঠাইয়া দিবার যো নাই;—কোন কথাই অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। সেকালের পুষ্পযানের কথা অনেকেই গাঁজাখুরি বা কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন; এখন সেই পুষ্পযান আকাশে উঠিতেছে,—এখন সকলেই কথাটা বিশ্বাস করিতেছেন। সুতরাং আমরা যদি বলি, সরকারী 'নোট' এইবার কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হইলেও কেহ অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না! সত্য সত্যই এখন পাঁচটাকা, দশটাকা, পঞ্চাশ টাকা প্রভৃতির নোট কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে সে নোট যদি আসল সরকারী নোট হয়, তবেই কথা বলিবে; জাল নোট কথা বলিবে না—নীরব থাকিবে। নোটসকল, আসল কি জাল, তাহাই ধরিবার জন্য নোটের বাক্‌শক্তি প্রদান করা হইয়াছে। 'সারে' প্রদেশের অন্তর্গত সাটন্ (Sutton) সহরবাসী মিঃ আলফ্রেড, ই, বট্রি (Mr. Alfred E. Bawtree) মহোদয় এক যন্ত্র-প্রস্তুত করিয়াছেন। যন্ত্রটি ঠিক গ্রামোফোনের মত; তবে তাহার, কলকারখানা অন্য রকমের। সেই যন্ত্রের মধ্যে একখানি নোট ফেলিয়া দিয়া কল ঘুরাইলে, যন্ত্র হইতে নোটের মূল্য বাজিয়া উঠে; নোট বলিয়া উঠে "পাঁচটাকা" কি "দশটাকা", অর্থাৎ যে মূল্যের নোট কলের মধ্যে দেওয়া হয়, নোটমহাশয় নিজের সেই মূল্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন। আসল সরকারী নোট হইলেই তাহার মূল্য ঘোষিত হয়,—জালনোট হইলে কোন ঘোষণাই হয় না, নোট নীরবে কলের অপর দিক্ দিয়া বাহির হইয়া আসেন। এই যন্ত্র-আবিষ্কৃত হওয়ায় সকলেরই বিশেষ উপকার হইয়াছে; বিশেষতঃ, প্রতিদিন যে সকল মহাজনের হাজার হাজার নোট নাড়াচাড়া করিতে হয়, তাহারা এই যন্ত্রের সাহায্যে জাল-নোট ধরিবার অতি সহজ পন্থা পাইয়াছেন।—বিজ্ঞানের উন্নতিতে আরও কত কি হইবে, কে বলিতে পারে?

মানব-ব্যাঘ্র

সম্প্রতি 'ইভ্নিং ষ্টাণ্ডার্ড' নামক বিলাতী সংবাদপত্রে এক অতি লোমহর্ষক-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পশ্চিম আফ্রিকার সায়েরালিয়োঁ-বাসীদিগের মধ্যে একটা গুপ্ত সম্প্রদায় আছে; তাহার নাম "মানব-ব্যাঘ্র সম্প্রদায়"। কর্ত্তৃপক্ষের প্রাণপণ চেষ্টাসত্ত্বেও, এই নরশোণিতপিপাসু সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এখনও সাধিত হয় নাই। 'ইভ্নিং ষ্টাণ্ডার্ডে'র জনৈক সংবাদদাতা, এই ভীষণ সম্প্রদায়ের বিচিত্র কাহিনীর বিষয় উক্তপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সম্প্রদায়ের সভ্যগণ 'বরফিমা' নামক একটি ঔষধের একান্ত ভক্ত। এই ঔষধটির প্রধান উপাদান মানুষের চর্ব্বি। 'মানব-ব্যাঘ্র'-সম্প্রদায়ের সভ্য হইতে গেলে, অগ্রে তাহাকে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিতে হইবে।—সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার যাহার বাসনা হয়, সে একটি চিতাবাঘের চর্ম্মে সর্ব্বদেহ আবৃত করে; তাহার পর শিকারের উপর পশ্চাদ্দেশ হইতে আপতিত হইয়া, ত্রিশূলাকৃতি একটা অস্ত্র-দ্বারা আক্রান্ত মনুষ্যের স্কন্ধে আঘাত করে। সেই অস্ত্র এমনই তীক্ষ্ণধার যে, উহার আঘাতে হতভাগ্যের কণ্ঠনালী ও মেরুদণ্ড একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত প্রদেশ বৃটীশ-অধিকারভুক্ত হয়। ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি;—বহুবৎসর ধরিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ ছিল যে, হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইতেছে; কিন্তু এমন একটা ভীষণ সম্প্রদায়ের দ্বারা যে এই সকল ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা কেহই অবগত ছিলেন না। অনেক

স্থলে হত্যাকারী ধরা পড়িত না,—হতব্যক্তির দেহও পাওয়া যাইত না; সুতরাং নরহত্যার বিচারও পূর্ব্বে তেমন হইত না।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 'উত্তর সের্‌বো' ডিষ্ট্রীক্টের প্রতিষ্ঠা হয়; মেজর ফার্টলো তখন সেই জেলার কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সহকারী ছিলেন—মেজর উইলান্স। বিগত জুলাই মাসে ইম্‌পেরি নগরে একটা বীভৎস প্রকারের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ ক্ষিপ্রতা সহকারে মৃতদেহ অধিকার করিলেন; হত্যাকারীরা উহা সরাইতে পারে নাই।

মেজর উইলান্স অবিলম্বে কঠোর উপায় অবলম্বন করিলেন; তাঁহার আদেশে তত্রত্য যাবতীয় প্রধান ব্যক্তি ধৃত হইল। তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সরকারপক্ষের সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত হইল। কর্ত্তৃপক্ষের পীড়নে তাহারা গুপ্ত সম্প্রদায়ের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিল। ইহাদের এজাহারে প্রকাশ পাইল যে, এই গুপ্ত সম্প্রদায়ের দ্বারা অসংখ্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে! বহু গণ্যমান্য সর্দ্দার এবং বণিক্ এই সম্প্রদায়ের সভ্য।

তখন একদিক্ হইতে সকলকেই গ্রেপ্তার করা হইল; সে প্রদেশের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত দেশনায়ক-সর্দ্দার সকলেই কারারুদ্ধ হইলেন। কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবহারে দেশের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিবার সম্ভাবনা হইল। অধিবাসিবর্গ ক্রোধে অধীর হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করিল; বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। তখন কর্ত্তৃপক্ষ চারিদিক্ হইতে সেনাদল আনয়ন করিলেন। অতঃপর স্থানীয় লোকমতের দৃঢ়তা দেখিয়া, যাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া মুক্তি দিলেন। এইরূপে অনেকে মুক্তি পাইল বটে, কিন্তু পুনরায় তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অচিরে ধৃত হইল এবং রাজদ্রোহী বলিয়া নির্ব্বাসিত হইল।

এই ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, কর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ড হইতে এক কমিসন্ প্রেরণ করিলেন। স্তর্ উইলিয়ম্ ব্রাণ্ড্‌ফোর্ড গ্রিফিথ্ ঐ কমিসনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। অনুসন্ধানে সপ্রমাণ হইল যে, 'মানব-ব্যাঘ্র সমিতি' একেবারে দেশব্যাপী! আরও জানিতে পারা গেল যে, সমিতির প্রতিসদস্যের পরিবার হইতে প্রায়ই কোন না কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিতে হইত।

অনুসন্ধানের সময়েও এই সমিতির অস্তিত্ব আছে, তাহাও প্রমাণ হইল। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল—

(ক) ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য, মানুষের রক্ত ও মাংস সংগ্রহ।

(খ) সভ্যদিগের বিশ্বাস, মানুষের চর্ব্বি ঐন্দ্রজালিক শক্তি-সম্পন্ন। উহা মুখে মাখিয়া যেকোন সভায় গমন করিলে, বা কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়; সুতরাং সভ্যদিগকে ঐ চর্ব্বি মাখিতে হয়।

(গ) মনুষ্য-মাংস ভক্ষণ।

সাক্ষীদিগের এজাহারে জানা গেল,—হতব্যক্তির মাংস কখনও চাউলের সহিত সিদ্ধকরিয়া, কখনও বা কাঁচা অবস্থাতেই,—আহারকারীর রুচি অনুসারে—ব্যবহৃত হইত। 'বরফিমা' কি কি উপাদানে প্রস্তুত হয়, তাহাও প্রকাশ পাইল; এই ঔষধে মানুষের উষ্ণ রক্ত ঢালিয়া দেওয়া হইত। যাহারা সম্প্রদায়ের নূতনসভ্য হইত, তাহাদের উরুদেশ সূচ্যগ্রদ্বারা ছিদ্রকরিয়া রক্তস্রাব করান হইত; এই রক্ত 'বরফিমার' উপর ছড়াইয়া দিয়া ক্ষতস্থলে অন্য ঔষধের প্রলেপ দেওয়া হইত। ক্ষত শুকাইয়া গেলেও সেখানে একটা দাগ থাকিত; ইহাদ্বারা সে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাহা বুঝিতে পারা যাইত। অন্যউপায়েও সভ্যগণের চিনিবার ব্যবস্থা ছিল; সেটা করকম্পন,—সে করকম্পনে বিশেষত্ব ছিল।

বিচার শেষে, বন্দীদিগের অধিকাংশের প্রাণদণ্ড হইল। অবশিষ্ট অপরাধীদিগের, কেহ নির্ব্বাসিত হইল, কেহ বা কারাগারে অবরুদ্ধ হইল। নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগের অনেকেই সীমান্ত পার হইয়া লাইবেরিয়ায় আশ্রয় লইয়াছে; সেখানেও এই সম্প্রদায় বিরাজিত! সায়েরালিয়োঁতে জনরব যে, সম্প্রতি যেসকল হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, উহা লাইবেরিয়াবাসীদিগের উত্তেজনা ও উপদেশ অনুসারেই ঘটিয়াছে! সায়েরালিয়োঁর জনসাধারণের ধারণা, এবং কর্ত্তৃপক্ষও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে কখনই এই সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ-উচ্ছেদ সাধিত হইবে না।
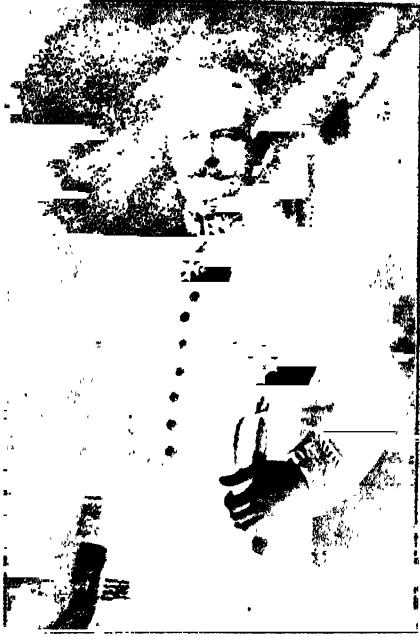
স্যর্ ফ্রেডরিক্ রবার্ট্ অপ্‌কট্,
K. C. V. O., C. S.

[জন্ম—২৮এ আগষ্ট, ১৮৪৭ খৃঃ]

অপ্‌কট্ সাহেব ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে বোর্ড অফ্ ডিরেক্টর্সের সভাপতি; রেলওয়ে বিভাগের এক্ষণে ইনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইনি অনতিবিলম্বে কলিকাতায় আগমন করিতেছেন। রেলওয়ে-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের বিষয় য়ুরোপীয় সাময়িকপত্রাদিতে আলোচিত হইতেছে। ১৮৬৮ খৃঃ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইনি ভারতের সাধারণ পূর্ত্তবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮৯২ খৃঃ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বিভাগে ইনি Consulting Engineer নিযুক্ত হ'ন। ১৮৯৮—১৯০৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি ভারতীয় সাঃ পূর্ত্তবিভাগের সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯৬ খৃঃ ইনি ভারতীয় রেলওয়ের ডিরেক্টর্ জেনেরল্ এবং ১৯০৪ হইতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত ইনি ভারতীয় রেল্‌ওয়ে বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

কর্ণেল রাজরাজেশ্বর নরেন্দ্রশিরোমণি

শ্রীস্যর গঙ্গা সিং বাহাদুর

বিকানীরের বর্ত্তমান মহারাজা। ইনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৩রা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্য-পরিচালনের সম্পূর্ণভার প্রাপ্ত হ'ন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে চীন-যুদ্ধে সুখ্যাতির সহিত ইংরেজ-রাজের পক্ষে কার্য্য করায় কে-সি-আই-ই উপাধিদ্বারা ভূষিত হ'ন। অতঃপর (১৯১১ খৃষ্টাব্দে) জি-সি-এস্-আই; (১৯০৭ খৃঃ) জি-সি-আই-ই; (১৯১০ খৃঃ) সম্রাটের এ-ডি-সি; এবং পরে, ইঁহাকে সম্মানসূচক এল্-এল্-ডি উপাধিও প্রদান করা হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে ইঁহার ন্যায় ক্রীড়াকুশল ব্যক্তি খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। জনসাধারণের হিতার্থে ইনি অনেক সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সম্প্রতি, বিচক্ষণ ও শিক্ষিত প্রজাবর্গ লইয়া ইনি রাজ্য-পরিচালনার্থ এক 'ষ্টেট্ কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এবং হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়া সাহিত্যানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ

সর্ব্বাধিকারী এম, এ, বি, এল; সি, আই, ই।
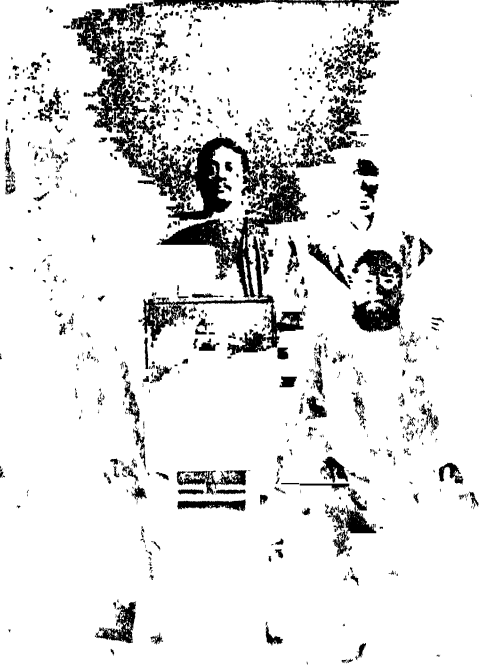
সর্ব্বাধিকারী-বংশের ছয়জন 'ছেলে'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ৺রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হাবড়া—বামুনপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক পরলোকগত রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র। রামেশ্বরপুর মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাহার পর ইনি বহুবাজার ইংরেজীস্কুল, সংস্কৃত-কলেজ, হেয়ার স্কুল ও হাবড়া স্কুলে অধ্যয়ন করেন। পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া এবং ডফ্-বৃত্তি, গোবিন্দপ্রসাদ-বৃত্তি ও অন্যান্য সর্ব্বোচ্চ-বৃত্তিলাভ করিয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইনি কলেজের পাঠ শেষ করেন। ঐ খৃষ্টাব্দেই ইনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্ণী-আফিসে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া এটর্ণী হন। ইনি "মিত্র ও সর্ব্বাধিকারী" নামক এটর্ণী-কোম্পানীর অন্যতর অংশী। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ও ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী-কমিটীর অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্ব্বাচিত হন এবং পরে 'ল-ফ্যাকল্‌টী ও সিণ্ডিকেটে'র সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। দেশ-হিতকর সমস্ত কার্য্যের সহিত—বলিতে গেলে প্রায় সকল সভা-সমিতির সহিত—ইনি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট; আমরা নিম্নে মাত্র কএকটির নামোল্লেখ করিতেছি; যথা—ইণ্ডিয়া ক্লবের সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ামের কোষাধ্যক্ষ, ন্যাশনাল কাউন্সিলের সম্পাদক, Calcutta Temperance Federation সভার সভাপতি, প্রেসিডেন্সি কলেজের কার্য্যকরী-সভার সদস্য ইত্যাদি। ইনি বাল্যবিবাহ-নিবারণী সভা, সুরাপান-নিবারণী সভা, ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্, বৃটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট, জাতীয় সমিতি, সাহিত্য-পরিষদ্, সাহিত্য-সভা প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এত সভার ইনি নামমাত্র সদস্য নহেন; প্রত্যেক সভার কার্য্যেই ইনি প্রাণপণে যোগদান করিয়া থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপে ইনি দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ব্যবস্থাপক-সভায় সে সময়ে তিনি যেসকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সকলেই অবগত আছেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে লণ্ডনের Universities of the Empire Congressএর অন্যতর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মধুপুরে যে আদর্শ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহা দেবপ্রসাদ বাবুরই উদ্যোগের ফল। ইনি মধুপুরের উন্নতিকল্পে অনেক কাজ করিয়াছেন। ইনি তেজস্বী অথচ বিনয়ী, দৃঢ়চিত্ত অথচ কোমল-স্বভাব, আদর্শ-চরিত মহাশয় ব্যক্তি। ইঁহার শিক্ষানুরাগ, ইঁহার স্বদেশ-প্রীতি প্রকৃতপক্ষেই অনুকরণীয়।

বসন্ত-লীলা

ভূপালী—ঢিমেতেতালা।

নব মধুমাস কুসুমময় গন্ধ।
রজনী উজোরল গগনহি চন্দ॥
মলয় পবন বহে সৌরভ মেলি।
কোকিল রাব ভ্রমর করু কেলি॥
ঐছে রজনী হেরি রসবতী রাই।
সহচরী সহ নিজ বেশ বনাই॥
তবহিঁ চললি ধনী কালিন্দী-তীর।
অপরূপ শোভন ধীর সমীর॥
সখীগণ সহ তহি মিলল কান।
দুহুঁ জন হেরই দুহুঁক বয়ান॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে মৃদু মৃদু হাস।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক বিলাস॥

---জ্ঞানদাস।

স্বরলিপি

৩
I গা ঋা গা রা | সা ধ্া সা রা | গা গা গা রা | গা ধা পা পা I
ন ব ম ধু মা ০ স কু সু ম ম য় গ ন্ ধ ০

০ ১ ২´ ৩
I গা গা রা রা | -া গা ধা পা | গা গা গা রা | সা সা সা সা I
র জ নী উ ০ জো র ল গ গ ন হি চ ন্ দ ০

০ ১ ২´ ৩
I সা রা গা রা | সা ধ্া সা রা | গা -া গা গা | গা -া গা -া I
ম ল য় প ব ন ব হে সৌ ০ র ভ মে ০ লি ০

০ ১ ২´ ৩
I পা -া পা পা | ধা -া পা পা | গা গা রা রা | সরা গপা ধর্সা ধপা IIII
কো ০ কি ল রা ০ ব ভ্র ম র ক রু কে০ ০ ০ ০ ০ লি০

০ ১ ২´ ৩
I পা গা পা পা | পা ধা পা ধা | ধর্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -া I
অ ই ছে র জ নী তে রি র স ব তী রা ০ ই ০
স খী গ ণ স হ ত হি মি ০ ল ল কা ০ ন ০

০ ১ ২´ ৩
I র্সা ধা র্সা র্সা | র্সা র্রা র্সর্রর্গা র্গা | র্রা র্সা ধা পা | গা -া গা -া I
স হ চ রী স হ নি০০ জ বে ০ শ ব না ০ ই ০
দু হুঁ জ ন হে ০ র০০ ই দু হুঁ ক ব য়া ০ ন ০

০ ১ ২´ ৩
I গা গা গা গা | গা গা গা গা | রা রা রা রা | সা -া সা -া I
ত ব হিঁ চ ল লি ধ নী কা ০ লি ন্দী তী ০ র ০
দু হুঁ মু খ হে র ই তে মৃ দু মৃ দু হা ০ স ০

০ ১ ২´ ৩
I সা ধ্া সা সা | সা রা সা রা | গা পা গা রা | সরা গপা ধর্সা ধপা IIII
অ প রূ প শো ০ ভ ন ধী ০ র স মী০ ০ ০ ০ ০ র০
জ্ঞা ০ ন দা ০ স ক হে দু হুঁ ক বি লা০ ০ ০ ০ ০ স০

শ্রীরজনীকান্ত রায়-দস্তিদার, এম্,-এ,
এম্,-আর,-এস্,-এ ; এফ্,-আর,-মেট্,-এস্ (লণ্ডন)

সাহিত্য-সংবাদ

১। বীরভূম জেলাস্থিত 'গণপুর বীণাপাণি-লাইব্রেরী'র সম্পাদক, শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে কএকখানি চিত্রও থাকিবে।

২। শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তি-প্রণীত "মণি-মন্দির"—সত্য-ঘটনামূলক উপদেশপূর্ণ সচিত্র-উপন্যাস—শীঘ্রই বাহির হইবে।

৩। গল্পলেখিকা শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবীর ছোট-গল্পগুলি একত্রে প্রকাশিত হইতেছে। পুস্তকখানির নাম "গুচ্ছ"। গুচ্ছের অনেকগুলি গল্প ইতঃপূর্ব্বে 'প্রবাসী', 'মানসী', 'যমুনা' প্রভৃতি মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের বিজ্ঞানমূলক নূতন নাটক "মানস-লীলা" প্রকাশিত হইয়াছে;—মূল্য ৸৹।

৫। সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের নূতন-উপন্যাস "চীনের ড্রেগন্" ছাপা হইতেছে—সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

৬। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের—নূতন সামাজিক উপন্যাস—"অদৃষ্ট চক্র" প্রকাশিত হইয়াছে;—মূল্য ১৷৹ টাকা।

৭। শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদারের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগীতা", ২য় ভাগ, প্রকাশিত হইয়াছে;—মূল্য ৷৹ আনা।

৮। কবি শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর নূতন কাব্যগ্রন্থ "ছায়াপথ" প্রকাশিত হইয়াছে;—মূল্য ১৲; বাঁধাই ১৷৹ টাকা।

৯। 'সোহংস্বামি'-প্রণীত "সোহংসংহিতা" প্রকাশিত হইল;—মূল্য ২৲ টাকা।

১০। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক "চাঁদবিবি"র দ্বিতীয়-সংস্করণ প্রকাশিত হইল;—মূল্য ১৲ টাকা।

১১। নটরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের "নবযৌবন" নামক নূতন নাটক প্রকাশিত হইয়াছে;—মূল্য ১৲ টাকা।

১২। শ্রীরাম শাস্ত্রী-প্রণীত "রহস্যলহরী", ২য় ভাগ, প্রকাশিত হইল;—মূল্য ১৲ টাকা।

১৩। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত নূতন গীতিনাট্য—"মায়াপুরী" প্রকাশিত হইল;—মূল্য ৷৹ আনা

১৪। নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত "বাজীরাও" নামক ঐতিহাসিক নাটক, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশিত হইল;—মূল্য ১৲ টাকা।

১৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিবিধ মাসিকপত্রাদিতে "ভারতীয় অব্দ"গুলি সম্বন্ধে বহুগবেষণাপূর্ণ যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই কতকগুলি পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুস্তক-মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে—সত্বরই প্রকাশিত হইবে। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "ষড়্‌দর্শন-শব্দসূচী" ও "মার্কণ্ডেয় পুরাণের ইংরেজি অনুবাদ," এলাহাবাদ 'পাণিনি কার্য্যালয়ে'র প্রচারিত পুস্তকাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।—তৎসঙ্কলিত "১৭৪৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা"ও ছাপা হইতেছে; অচিরেই 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্'-কর্তৃক প্রকাশিত হইবে।—"ত্রিষষ্টিশলাকা পুরুষ-চরিত্র" নামক জৈন-ধর্ম্ম-পুস্তকের মূল, উক্ত অধ্যাপকলিখিত ভূমিকা ও মূলানুবাদ সম্বলিত হইয়া, SACRED LORE OF THE JAINS পুস্তকাবলীর অন্যতমরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

মাস-পঞ্জী

(মাঘ)

১লা—জাপানী রণতরীর এড্‌মিরাল কাউণ্ট ইটো ইহলোক ত্যাগ করেন।

„—লিডলার ধর্ম্মঘটকারিগণ পুনরায় স্ব স্ব কার্য্য আরম্ভ করে।

„—লাহোরের "জমীদার"-প্রেস সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করেন।

২রা—কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এবং প্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন।—

„—বর্দ্ধমানের বিখ্যাত উকীল শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

৪ঠা—একস্‌ট্রা এসিস্‌টাণ্ট কমিশনর মুন্সী বরকৎআলীকাজী কর্ম্মচ্যুত হ'ন।—

„—রাজপুতানা ব্যাঙ্কের 'সক্কর ব্রাঞ্চ' কারবার বন্ধ করে।

৬ই—স্যর উইলিয়ম লি ওয়ার্ণারের মৃত্যু হয়।

„—ঢাকায় সৈনিকদিগের কুচকাওয়াজ আরম্ভ হয়।

„—ইন্‌স্‌পেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ গুলির আঘাতে মারা যান।

„—লক্ষ্ণৌতে 'অল্‌ইণ্ডিয়া স্যানিটারী কন্‌ফারেন্সে'র অধিবেশন আরম্ভ হয়। স্যর হারকোর্ট বট্‌লার সভাপতি ছিলেন।—

„—ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব ওয়ার মিনিষ্টার জেঃ পিকোয়ারের মৃত্যু হয়।

৭ই—'নাইটস্ অফ্‌ সান্ লীগে'র সভাপতি মিঃ প্রেসান্‌সের মৃত্যু হয়।

৮ই—লর্ড ষ্ট্রাথ কোনার মৃত্যু হয়।

৯ই—বরিশাল-রাজদ্রোহ মামলায় ১২জন আসামী গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

১০ই—ফরাসী তুলাব্যবসায়-সমিতির সভাপতি মিঃ পেলটেরীর মৃত্যু হয়।

১১ই—বাবা প্রেমানন্দ ভারতীর মৃত্যু হয়।

„—জোতির্ব্বিদ্ স্যর ডেভিড্ জিলের মৃত্যু হয়।

১৩ই—চিত্রকর মিঃ জন বেকনের মৃত্যু হয়।—

„—ডর্বানে 'ইণ্ডিয়ান কমিসনে'র অধিবেশন আরম্ভ হয়।

„—দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট ১০ জন লেবর লিডারকে দেশান্তরিত করেন।

„—ভূতপূর্ব্ব-সবজজ রায় লালগোপাল সেন বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

১৫ই—হায়েটীতে প্রজাদ্রোহ হইয়াছে, সংবাদ পাওয়া গেল। প্রেসিডেণ্ট অগত্যা পলায়ন করেন।

১৬ই—ভাইকাউণ্ট কটস্ ফোর্ডের মৃত্যু হয়।

১৮ই—কলিকাতায় 'বেঙ্গল কো-অপারেটীভ্ কনফারেন্সে'র অধিবেশন হয়। মাননীয় লর্ড কার্মাইকেল সভাপতি ছিলেন।

২০এ—বিখ্যাত জুলজিষ্ট ডাঃ এলবার্ট গন্‌থারের মৃত্যু হয়।

২২এ—এড্‌মিরাল জারমিনের মৃত্যু হয়।

„—লণ্ডনের বিখ্যাত ব্যাঙ্কারস্ 'মেসার্স কুঁপো, বারপো, এণ্ড কোং' ফেল হয়।

„—জেনারেল স্যর জে, এফ, টাইটলারের মৃত্যু হয়।

„—পেরুতে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। প্রেসিডেণ্ট বিলিংহার্ষ্ট ধৃত হন ও বিদ্রোহী-সেনাপতি ডাঃ এ, ডুরাণ্ড রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন।

„—খুলনায় শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়।

২৩এ—মার্কিন সেনেট 'ইমিগ্রেসন্ বিল' পাস করেন।

„—পার্সিয়ার সহিত মার্কিন দেশের ৩য় সন্ধি হয়। নিরপেক্ষ কমিসনদ্বারা বিবাদভঞ্জন করাই ইহার উদ্দেশ্য।

„—মজঃফরপুরে 'বেহার প্লাণ্টার্স এসোসিয়েশনে'র বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

২৭এ—লাহোরের নূতন "জমীদার" প্রেসের মালিককে ২,০০০৲ টাকা জামিন্ দিতে সরকার বাহাদুর হুকুম করেন।

„—মাদ্রাজের লোন কোম্পানীর ২০০ কুলী মজুর ধর্ম্মঘট করে।

২৮এ—পার্লেমেণ্ট মহাসভা বন্ধের পর কার্য্যারম্ভ করেন।

„—হায়েটীর প্রেসিডেণ্ট পলায়ন করায় মিঃ জামোর নূতন প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হ'ন।

„—মেজর জেনারেল স্যর বি, বিট্‌সনের মৃত্যু হয়।

„—সিকিমের মহারাজ বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

২৯এ—জেনারেল উইলিয়ম্ ব্যানারম্যানের মৃত্যু হয়।

„—হোতী মর্দ্দনের খাঁ বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

„—বাঁকুড়ার 'ওয়েস্‌লিয়ান্ কলেজে'র অধ্যাপক পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হয়।

—"জগত্তারিণি—জগদ্ধাত্রি !"—

প্রথম বর্ষ	বৈশাখ ১৩২১	দ্বিতীয় খণ্ড ৫ম সংখ্যা

ব্রাহ্মণ

হে ব্রাহ্মণ ! ভারতের প্রাণময় পুরুষ-প্রধান !
মোহ-নিদ্রা পরিহরি—ধরি' কণ্ঠে মহাস্তোত্র-গান
জাগৃহি—জাগৃহি, দেব !—ভারতের জড়স্তূপ মাঝে,
প্রাণের পুলকাবেগ বিতর এ মানব-সমাজে !
লক্ষ পদ্মকর তুলি'—ঊর্দ্ধমুখে করহ বন্দনা ;
দূরে যাক্ ভারতের ললাটের কলঙ্ক-লাঞ্ছনা ।
ত্যাগের বিমলাদর্শে মুছে দিয়ে ভোগের কালিমা,
নীরবে ফুটায়ে তোল যোগের সে শান্ত মধুরিমা ।
হেমময় প্রাচীমূলে অর্দ্ধোদিত-আদিত্যমণ্ডল
কনককিরণ বর্ষে—উদ্ভাসিত করি' জলস্থল ;
শ্বেতবাসা দিগ্বালার কুহেলীর কৌষেয়-গুণ্ঠন
কবোষ্ণ পরশে যথা ধীরে ধীরে করি'ছে লুণ্ঠন,—
তেমতি তোমরা, দেব ! অনলস করি' জনে জনে,
ঘুচাও মালিন্য মোহ প্রীতিপূর্ণ নবীন স্পন্দনে ।

আবার বৈদিক-মন্ত্র ব্যাপ্ত হোক্ গগনে পবনে,—
গম্ভীরে বাজুক্ শঙ্খ পুণ্যময় ভবনে ভবনে ;—
পুনঃ হেরি' বনপথে বিপ্র-শিশু গায়ি' সামগান,
সমিধসম্ভার বহি'—গৃহপানে করি'ছে প্রয়াণ।
হোমধেনু-দোহনের সুমধুর মৃদুমন্দধ্বনি ,—
কুসুমচয়নাসক্তা ঋষিবালা—সারল্যের খনি,—
চন্দন-চর্চ্চিত-ভাল দ্বিজ-শিশু পাঠে রত মন,—
সরিৎসরসীনীরে ব্রাহ্মণের নীরব তর্পণ,—
নীবারকণিকালব্ধ আনন্দের কলগুঞ্জরব,—
যজ্ঞীয় ধূমের সেই সুপবিত্র স্বর্গীয় সৌরভ,—
অতীত কালের কোন মায়াময়-গুপ্তকোষ খুলি'
সঞ্জীবিত কর, দেব ! সে যুগের লুপ্ত দিনগুলি !
বিলাসবাসনাদিগ্ধ এ দেশের নরনারীদলে,
নির্ভরে সঁপিয়া দাও গায়ত্রীর পুণ্য পদতলে।

বিশ্বমানবের মাল্যে মধ্যমণি তোমরা ব্রাহ্মণ !
তোমরা অপাপবিদ্ধ,—ভক্তিময়ী শক্তির নন্দন !
তোমাদেরি মন্ত্রবলে ভর্গদেব স্বর্গ পরিহরি,
নে'মেছিল ভারতের তৃণাস্তীর্ণ মৃত্তিকা উপরি !
দুর্জ্ঞেয় সে সৃষ্টিতত্ত্ব যোগবলে করি' উদ্‌ঘাটন,
তোমরাই চেয়েছিলে করিবারে নবীন-সৃজন !
দেখাও সে মহাবিদ্যা,—ভারতের হে গুরু শিক্ষক !
এ কনকভূমি হ'তে তুলে' ফেল ঈর্ষার কণ্টক !—
শিখাও সে ঋষিদের স্বার্থত্যাগ পরহিতব্রতে,—
ব্যাসের বিচিত্রজ্ঞান,—বশিষ্ঠের শিষ্টতা ভারতে।
ধনুষ্পাণিদ্রোণের সে অতুলন শরক্ষেপলীলা,—
পরশুরামের তেজ,—চৈতন্যের ভক্তি অনাবিলা,—
শুকচরিত্রের সেই সর্ব্বরিক্ত বৈরাগ্য মহান্,—
আবার এ দীনদেশে, হে ভূদেব ! করহ প্রদান !

শ্রীকামিনীকান্ত নিয়োগী।

সৌন্দর্য্যের স্বরূপ

"সত্যং শিবং সুন্দরম্
সচ্চিদানন্দমদ্বৈতম্"

জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্যানুভূতির আবশ্যকতা কি? আত্মরক্ষার জন্য শোভন সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না। আর এই আত্ম-রক্ষা-তত্ত্বটি নিখিল-বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। জড়, উদ্ভিদ্ ও চেতন—সর্ব্বত্রই এই মূল তত্ত্বটি অব্যাহতরূপে ক্রিয়া করিতেছে। ইহার ক্রিয়ার মধ্যে সৌন্দর্য্য বা শোভার স্থান নাই। জীবন-সংগ্রামে হয়ত যাহা সুন্দর, যাহা শোভন, যাহা রম্য তাহাও বিনষ্ট হইতেছে; আবার যাহা কুৎসিত ও কদাকার তাহা টিকিয়া যাইতেছে। অপর যে তত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিকগণ সমস্ত নিসর্গব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন—অর্থাৎ 'বংশ ও সন্ততিরক্ষা' তাহাতেও সৌন্দর্য্যানুভূতির কোন স্থান আছে কি না, তাহাও কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

অনেক পণ্ডিতের মতে—যে 'যৌন-নির্ব্বাচন'-ভিত্তির উপরে এই বংশরক্ষা-তত্ত্বটি স্থাপিত, তাহাতে শোভানুভাবকতার স্থান বা প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে পারে। পণ্ডিতবর ডার্উইনের মতে উদ্ভিদে ও চেতনে, যৌন-নির্ব্বাচন প্রথার ('Sexual selection'এর) অনুসরণ অবিসংবাদী। উদ্ভিদে নব কিশলয় ও পুষ্পের শোভা, পত্র-পুষ্প ও ফলের হৃদয়োন্মাদক সুগন্ধ—এই যৌন-নির্ব্বাচনের একটি প্রধানতম উপায়। আর জীব-জগতের সৌন্দর্য্যের ও সৌন্দর্য্যানুভূতির মূলেও সেই যৌন-নির্ব্বাচন। বিহগের মধুরকাকলী ও সঙ্গীত-ধারা, বিবিধ মনোমোহন নৃত্য-ভঙ্গী, অঙ্গের লাবণ্য, পুচ্ছ ও পালকের বিচিত্র বর্ণ-শোভা—এ সকলই যৌন নির্ব্বাচন ও সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষার ফল। নিম্নজাতীয় পশু হইতে অত্যুচ্চ মানবের মধ্যেও শোভা ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ এই মূলতত্ত্ব-প্রসূত। ইহা হইতেই সর্ব্ববিধ ললিত কলা ও সুকুমার শিল্পের উৎপত্তি; স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, নৃত্য ও নাট্যকলা, সঙ্গীত ও কবিত্বের জন্ম।

বিবর্ত্তনবাদীদিগের মতে সৌন্দর্য্য ও সুকুমার শিল্পের অভিব্যক্তি ও বিকাশের ইহাই ক্রম। বিবর্ত্তনবাদী দার্শনিকপ্রবর হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ললিতকলাসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি অভিনব মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে—শিশুর ক্রীড়াশীলতাই বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে ললিত কলানুশীলনে পরিণত হইয়াছে। জীবন ধারণ ও রক্ষণের জন্য মানুষের যতটুকু শক্তি বা ক্ষমতার ('Energy'র) প্রয়োজন, তদপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতা মানুষের আছে। সেই অতিরিক্ত শক্তি, প্রায়শঃই ক্রীড়া কৌতুকে ব্যয়িত হয় এবং তাহা হইতেই ললিত কলা জন্মলাভ করে। পণ্ডিতবরের এই মত গ্রহণ করিয়া, আমরা সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের ('Aesthetics'এর) কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি কিনা, আপনারা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি যাঁহারা সমর্থন করেন বা সমর্থন করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও আলোচনার ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বটে। অপর দিকে যাঁহারা চৈতন্য হইতে এই নিখিল বিশ্বের ক্রম-বিকাশ বা বিবর্ত্তন দেখাইতে অভিলাষী, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অন্যপ্রকারের। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র হইতে যে বিপুল বিবর্ত্তন-বাদ সংসিদ্ধ হইয়াছে সেই মূল-সূত্রে বা সূত্র-লক্ষীকৃত পদার্থেই তাহাদের সমুদয় তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসার মীমাংসা। যাঁহা হইতে এ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, তাঁহাতে যাহা নাই, বিশ্বে কুত্রাপি তাহা সম্ভব হয় না। সৌন্দর্য্য—পদার্থের গুণই হোক্, আর উপভোক্তার মানস ভাবই হোক, অবশ্যই তাহা সেই আদি ও মূল পদার্থে বিরাজমান।

"সচ্চিদানন্দমদ্বৈতম্" !—সেই অদ্বৈত পদার্থ সচ্চিদানন্দময়। সৎ ও চিতের আলোচনা আমাদের এ প্রবন্ধের বিষয় নহে; তথাপি

পরোক্ষভাবে তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। সেই ব্রহ্ম পদার্থ '**সৎ**' অর্থাৎ আছেন; তাঁহা হইতেই এ অখিল জগতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। 'অহং'-জ্ঞান যেমন আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ, তাহার এই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম-পদার্থও তেমনি আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। এ সম্পর্কে, যুক্তি ও তর্কের অবতারণা অনাবশ্যক। তাহা আবার '**চিৎ**' চিন্ময় বা চৈতন্যময়। এই স্বরূপটিও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ; কারণ, অচেতনের পক্ষে ঈদৃশী আলোচনা আদৌ সম্ভবপর নহে।

তৎপরে সেই অদ্বৈত ব্রহ্মপদার্থই '**আনন্দম্**', তিনিই আনন্দময়। এই আনন্দ-স্বরূপটিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সৌন্দর্য্য-প্রহেলিকার সমাধান হয়, এবং এ তত্ত্বটি সুমীমাংসিত হইয়া যায়। কিন্তু আনন্দ-স্বরূপটিকে উপলব্ধি করা তত সহজ নহে; আর, সেই আনন্দ যে কি, তাহাও বুঝিয়া উঠা নিতান্তই কঠিন। অনেক সময়ে এই আনন্দকে আমরা দৈহিক ও মানসিক সুখানুভূতির সহিত মিশাইয়া ফেলি, এবং তাহাকে দেহজ বা মানস সুখানুভূতি বলিয়াই মনে করি। কিন্তু, আমার বোধ হয়, আনন্দ কেবল তাহাই নয়,—উহার অনেক ঊর্দ্ধে। আনন্দ উপভোগেরই সামগ্রী বটে।—তবে কি, ব্রহ্ম-পদার্থে আমরা এই স্বরূপটির আরোপ করিয়া তাঁহার 'ভোক্তৃত্ব' পরিকল্পনা করিতেছি? এবং তাহাতে কি, নির্গুণকে সগুণ করিতেছি না? নিরাকার, নির্ব্বিকল্প, নির্গুণ, অসম্পৃক্ত, স্বাক্ষীস্বরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যকে এভাবে কি ভোগায়তন—দেহীর গুণবিশিষ্ট করিয়া তোলা হয় না? আমার মতে, তাহা নহে। ব্রহ্ম-পদার্থ যদি শুধু সচ্চিদাত্মক হইতেন এবং আনন্দ-ঘন বা আনন্দময় না হইতেন—তবে "জন্মাদ্যস্যযতঃ" এই সূত্রের কোন অর্থই থাকিত না, জন্ম, জীবন ও মৃত্যু একেবারেই প্রহেলিকা থাকিয়া যাইত,—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কোন বিশদ ব্যাখ্যাই সম্ভবপর হইত না। এই আনন্দস্বরূপ হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। তিনি আনন্দ-ঘন বা আনন্দময় বলিয়া সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস; বিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন; প্রকাশ, বিকাশ ও বিনাশ।

"আনন্দো ব্রহ্মেতিব্যজ্ঞনাৎ, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

বাস্তবিক এই দার্শনিক আলোচনা দ্বারা আমরা আমাদের প্রস্তাবিত, আলোচ্য বিষয় হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছি; এবং অনেকে ইহাও মনে করিবেন যে, যে জটিল ও গূঢ় তত্ত্বের সমাধান কোন দর্শনেই করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার অবতারণা দ্বারা বক্ষ্যমাণ বিষয়ের জটিলতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

কিন্তু যখন আমি বিবেচনা করি যে, প্রাচ্য দর্শনের মতে 'সৌন্দর্য্য-তত্ত্বে'র মূল এই স্থানে তখন এই আংশিক আলোচনা অনিবার্য্য এবং আমার ধৃষ্টতাও মার্জ্জনীয়। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

"তাঁহার আনন্দ-ধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে,
এস সব নর-নারী আপন হৃদয় ল'য়ে!

* * *

সে পুণ্য নির্ঝর-স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃত-ধারা পূরিয়া হৃদয়-প্রাণ!"

আমরা বাস্তবিকই সেই আনন্দ-ঘনের আনন্দ-ধারায় অভিষিক্ত বলিয়া, তাঁহার আনন্দ-ধারার কণামাত্র পান করিতে সমর্থ বলিয়াই, নিত্য সৌন্দর্য্যের উপাসক, সৌন্দর্য্য-উপভোগক্ষম, এবং সুন্দরকে কেবলই সন্ধান করিয়া ফিরি। সেই আনন্দের অভিব্যক্তি সৌন্দর্য্যে,—অথবা আনন্দই সৌন্দর্য্যোপভোগ। এই তত্ত্বটি যে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ উপলব্ধ করিতে পারেন নাই তাহা নহে। তাঁহারাও "The true, The good, The beautiful"—সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। (এই সূত্র অবলম্বন করিয়া অনেক মনস্বী ব্যক্তি—যাহা সত্য তাহাই শিব, এবং যাহা শিব তাহাই সুন্দর বলিয়া, সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যাহা অসত্য,—যাহা অশিব বা অমঙ্গল-প্রসূ, তাহা কখনও সুন্দর হইতে পারে না।

ব্রহ্মের সৎস্বরূপ জগতে অভিব্যক্ত, এবং তাহাই জড়-বিজ্ঞানের আলোচ্য ও উদ্দিষ্ট; চিৎস্বরূপ জীবগণের মনে প্রতিবিম্বিত, সুতরাং সেটি মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত; আর, তাহার আনন্দস্বরূপ তদূর্দ্ধ—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বিবেচ্য।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"—শ্রুতিঃ। যাঁহারা অধ্যাত্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন নহেন

তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-বোধ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইতে পারে না।

"সেষাভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোম্নি প্রতিষ্ঠিতা।"

বাস্তবিকই ললিতকলা ও সুকুমার শিল্পসমূহের উৎপত্তির আলোচনা করিতে গেলেও দেখিতে পাই যে, দেবোদ্দেশ্যেই তাহাদের জন্ম; মন্দির-নির্ম্মাণে স্থাপত্য, দেব-প্রতিমা-গঠনে ভাস্কর্য্য, দেব-মন্দির ও দেব-সান্নিধ্যে আরতি-উপলক্ষে নৃত্য-কলা, দেব-লীলা স্ফুটীকরণে নাট্যকলা, দেব-চিত্র চিত্রণে চিত্র-শিল্প, দেব-মহিমা কীর্ত্তনে সঙ্গীত, এবং দেব-মহিমা ছন্দে গ্রন্থনে কাব্য জন্ম লাভ করিয়াছে। একথাটি আমার মনঃকল্পিত নহে,—বোধ হয় ইতিহাসও এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিবে। প্রাচীন ঋকমন্ত্রসমূহের গ্রন্থন, সাম-গান, ভারতীয়, মিশরদেশীয়, ব্যাবিলোনিয়া ও গ্রীকদেশীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য; এবং সর্ব্বদেশীয় প্রাচীন চিত্রাদি উল্লিখিত বাক্যের সমর্থন করে।

যাঁহারা বিশেষজ্ঞ ও সুকুমার শিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় এই ধারণারই সমর্থক অভিমত দিয়াছেন। গ্রীক ও হিন্দু-দিগের সকল সুকুমার শিল্পেরই এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। হিন্দুদিগের বিশ্বকর্ম্মা হইতে বীণারঞ্জিত-পুস্তক হস্তা ভারতী, এবং গ্রীকদিগের মিনার্ভা হইতে অরফিয়স্ পর্য্যন্ত সকল দেবতাই জগতে ললিতকলার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

মানব-মনে সৌন্দর্য্যের যতটুকু ধারণা এবং মানবের হৃদয়ে আনন্দ-ঘনের যতটুকু আনন্দ বিরাজমান তাহাই নানাপ্রকারে, নানাআকারে, ললিতকলা-মুখে সুকুমার শিল্পে বিকশিত হয়,—অন্তঃসৌন্দর্য্য বাহিরে প্রকট হয়।

অনাবিল সৌন্দর্য্যই ললিতকলার বিষয়। যাহা মলিন, যাহা পঙ্কিল, যাহা কুৎসিত, যাহা জঘন্য, যাহা সর্ব্বতোভাবে জড় ও পশুভাবাপন্ন, তাহা সুকুমার শিল্পে প্রতিভাত হয় না। যাহা উজ্জ্বল, যাহা মধুর, যাহা শান্ত, যাহা পবিত্র, যাহা আধ্যাত্মিক ও যাহা দিব্য তাহাই মুখ্যতঃ ললিতকলার অন্তর্নিবিষ্ট।

আনন্দময়ের আনন্দ বিশ্ব-সৌন্দর্য্যে বিকশিত। আর, মানব-হৃদয়ের আনন্দের বহির্ব্বিকাশই সুকুমার শিল্প ও সাহিত্য। রস-বোধে ও ভোগেই আনন্দ; তাই তাঁহাকে রস-স্বরূপ বলা হইয়াছে। "রসো বৈ সঃ"। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের এই অন্তরঙ্গের বিষয় আলোচনা না করিয়া, অনেক পণ্ডিত নানাপ্রকারের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিবিধ মতের অবতারণা করিয়াছেন। কেহবা উদ্দেশ্য সাধনোপযোগিতাকেই সৌন্দর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; —("Beauty is utility") কেহ বহুত্বে একত্বের —("Unity in variety")—বিশৃঙ্খলে শৃঙ্খলার সমাবেশকে—সৌন্দর্য্য বলিয়াছেন। কোন কোন মনস্বী, রমণীদেহের লাবণ্যকেই সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া কীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই!—বাগ্মিপ্রবর এড্‌মণ্ড বার্ক ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে—যে যে পদার্থ পূর্ব্বানুভূত আনন্দ ও সুখপ্রদ ভাবকে উদ্রিক্ত করিতে পারে তাহাই সুন্দর। লিও টলষ্টয়ের মতেও—ললিতকলাসমূহের উদ্দেশ্য, শিল্পীর অনুভূত ভাবসমূহ নানাউপায়ে অপরে সংক্রামিত করা।—"To transmit the feeling, one has experienced, to others by means of movements lines, colours, sounds or forms expressed in words, is the activity of Art." সৌন্দর্য্য সম্পর্কে এবংবিধ বহুমতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, সৌন্দর্য্য বস্তু বা পদার্থের কোন বিশেষ একটি গুণ নহে। বহুগুণের সমবায়ে মানব-মনে যে আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহাই আমাদের রসবোধ বা সৌন্দর্য্যানুভূতি, এবং সেই গুণসমষ্টিই বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য।

এইরূপ মিশ্র পদার্থের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশের প্রয়াস ব্যর্থ। তবে, সংক্ষেপতঃ সৌন্দর্য্যের কতকগুলি লক্ষণের আলোচনা করা যাইতে পারে। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে নয় কি দশ প্রকার রসের উল্লেখ দেখিতে পাই;

"শৃঙ্গারবীরবীভৎসরৌদ্রহাস্যভয়ানকাঃ।
করুণাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ"॥
—ইতি রত্নকোষঃ।

আবার অন্য মতে—

"শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতহাস্যভয়ানকাঃ।
বীভৎসরৌদ্রৌ বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রসা দশ"॥
—ইতি নামনিধানম্।

ইহার মধ্যে সকল রসের উদ্রেকই যে ললিতকলার উদ্দেশ্য তাহা নহে। ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে বা ইন্দ্রিয়-পথে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জন্মিলেও সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সৌন্দর্য্যা-নুভূতির সহায়ক নহে। নিম্ন শ্রেণীর ইন্দ্রিয় দ্বারা যে রসানুভূতি হয় তাহাকে সৌন্দর্য্যানুভূতি বলা যায় না। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে চক্ষু ও কর্ণ যেমন জ্ঞানলাভের দ্বারস্বরূপ তেমনই আবার বিশেষভাবে সৌন্দর্য্যবোধেরও সহায়ক। দর্শনীয় বস্তু কখনও এক জনের দৃষ্টিদ্বারা নিঃশেষ হয় না, শ্রবণীয় শব্দও কোন এক প্রাণীর শ্রবণ মাত্রেই বিলুপ্ত হইয়া যায় না। কিন্তু, একটি স্বাদু ফল সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য নহে, একটি সুখ-স্পর্শ সামগ্রীও সকলের স্পর্শনীয় নহে। সুতরাং, একটি সুমিষ্ট ফল, বা একটি কোমল পদার্থকে কেহ সুন্দর বলিবেন না।

সুকুমার শিল্পের সাহায্যে যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে, মুখ্যতঃ এই কএকটি লক্ষণ দেখিতে পাই।—

(১) আনন্দোৎপাদনই ললিতকলার প্রধান ফল ও উদ্দেশ্য; কিন্তু পানাহারের উদ্দেশ্য—বেদনা, পীড়া ও মৃত্যুকে দূরীকরণ,—আনন্দোৎপাদন নয়।

(২) যাহা কিছু অপ্রীতিকর তাহা একেবারেই সুকুমার শিল্প হইতে বর্জ্জিত হইবে।

(৩) ললিতকলা-সৃষ্ট সৌন্দর্য্য সকলেরই উপভোগ্য। ব্যক্তিবিশেষের সম্ভোগের জন্য নহে। এই লক্ষণটির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ললিতকলানুশীলনই যে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য, সহানুভূতি ও সামাজিকতা উদ্রেকের প্রধান উপায় তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অনেক লোভনীয় সামগ্রী উপভোগের জন্য পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও কলহের উদ্ভব হয়; কিন্তু তাজমহলের শোভা, অজন্তার চিত্রাবলী, দেখিয়া লক্ষ লক্ষ মানব মুগ্ধ হইয়াছে এবং হইতেছে;—কালিদাসের 'শকুন্তলা' বিশ্ব-মানবের সমক্ষে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছে। এখানে হিংসা, দ্বেষ ও কলহ নাই। তজ্জন্যই ইহাকে সামাজিক ভাবোদ্দীপনের অত্যুৎকৃষ্ট উপায় মনে করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও মনস্বিগণ সুকুমার শিল্পের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বহু মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু সাধারণতঃ সেই মতগুলিকে, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) বাস্তবের বা বস্তুতন্ত্রতার অনুসরণই এক শ্রেণীর লক্ষ্য;—ইঁহারা বাস্তবাদর্শাবলম্বী (Realistic). অপর শ্রেণীর উদ্দেশ্য—(২) ভাব-তন্ত্রতা বা কল্পনাতন্ত্রতা, সামান্য উপায়ে সুমহান্ ভাবের উদ্দীপনা। ইঁহারা কল্পনাদর্শাবলম্বী —(Idealistic)। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়পথে বহির্জ্জগতের রস-টুকু মানবাত্মায় প্রসৃত বা আকৃষ্ট হইয়া আনন্দোৎপাদন করিলে তাহাতেই আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি হয়; এবং সেই অনুভূতির বহিঃ-প্রকাশ বা মানবাত্মার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই ললিতকলায় পরিস্ফুট। নিসর্গ-নিষ্ঠা থাকিলেও কিংবা বাস্তবের অনুসরণ করিতে গেলেও ললিতকলা-মুখে 'বাস্তব' যাহা তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে না;—কলাবিদের বা শিল্পীর অভ্যন্তরীণ আনন্দের 'ছাপ' তাহাতে রহিয়া যাইবেই, এবং তাহা না হইলে উহা শিল্প-পদবাচ্যই নহে। যাহা কুৎসিত, কদাকার বা ঘৃণ্য তাহাও শিল্পীর আত্মায় প্রতিভাত হইলে তাহার কথঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটিয়াই থাকে,—জড়ত্ব বহুপরিমাণে বিদূরিত হইয়া আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হয়।

কথাটা এই—প্রকৃতির যে দ্রব্য বা বস্তু যে প্রকারের, তাহার মানস-প্রতিকৃতি বা প্রতিবিম্ব সেই দ্রব্য বা বস্তু হইতে অনেক বিভিন্ন। সেই মানসী প্রতিকৃতি যখন শিল্পী স্বীয় শিল্পচাতুর্য্যে বাহিরে ফুটাইয়া তোলেন, তখন সেই শিল্প-সৃষ্ট পদার্থে আর বাস্তব পদার্থে অনেক পার্থক্য জন্মিয়া যায়। মানবাত্মার কটাহে, আনন্দের উত্তাপে, বস্তু বা পদার্থের যে পচন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল তাহাতে তাহার অনেক স্থূলাংশ পরিত্যাক্ত ও রূপান্তরিত হইয়া এক অভিনব ও সূক্ষ্ম রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তথা-কথিত এই বস্তুতন্ত্রতাও মুখ্যতঃ ভাব-তন্ত্রতা বা কল্পনা-তন্ত্রতা।

অপরদিকে যাহাকে আমরা ভাব-তন্ত্রতা বলিতেছি তাহাও সর্ব্বতোভাবে 'বস্তু'-নিরপেক্ষ নহে। যতই উদ্দাম, যতই নিরঙ্কুশ হউক না কেন, কল্পনা কখনই 'বস্তুকে' সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন, বা অতিক্রম করিতে পারে না। বিশেষতঃ শিল্পী-সৃষ্ট পদার্থের যখন জনগণের আনন্দোদ্রেকই একমাত্র উদ্দেশ্য তখন যেসৃষ্টি জনগণের বস্তুজ্ঞানকে একেবারেই অতিক্রম করে তাহাতে আনন্দের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব?

দেশ, কাল ও পাত্র,—শিক্ষা, দীক্ষা ও অবস্থাভেদে যে শিল্পের আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রভেদ ও তারতম্য হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? শিল্প-কলার নিয়ম ও প্রণালী (Technique) বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাতে শিল্পীর স্বাধীনতা কিছুতেই খর্ব্ব হইতে পারে না। পৌষ সংখ্যার "প্রবাসী" পত্রে আমাদের শিল্পাচার্য্য, জগদ্বিখ্যাত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমার সহযাত্রী বন্ধু ও শিষ্যবর্গকে এই অনুরোধ যে, শিল্প-শাস্ত্রের বচন ও শাস্ত্রোক্ত মূর্ত্তি-লক্ষণ ও তাহার মান ও প্রমাণাদির বন্ধন অচ্ছেদ্য ও অলঙ্ঘনীয় বলিয়া তাঁহারা যেন গ্রহণ না করেন অথবা নিজের শিল্প-কর্ম্মকে শাস্ত্র-প্রমাণের গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়া স্বাধীনতার অমৃতস্পর্শ হইতে বঞ্চিত না হইয়া পড়েন।

উড়িতে শক্তি যতদিন না পাইয়াছি ততদিনই নীড়ও তাহার গণ্ডি। গণ্ডির ভিতরে বসিয়াই গণ্ডি পার হইবার শক্তি আমাদের লাভ করিতে হয়। তারপর একদিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়াতেই চেষ্টার সার্থকতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। এটা মনে রাখা চাই যে, আগে শিল্পী ও তাহার সৃষ্টি, পরে শিল্প-শাস্ত্র ও শাস্ত্রকার। শাস্ত্রের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্য শাস্ত্র।"

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িলেই বঙ্গদেশের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রসমূহে উদীয়মান শিল্পী ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গের শিল্প-চাতুর্য্যের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে ও হইতেছে তাহার একটু আলোচনা স্বতঃই করিতে ইচ্ছা হয়। ভারতীয় শিল্পকলার যে নবযুগ-প্রবর্ত্তককে পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচক হাভেল্, চেটার্ট্ন্, ব্রাউন্, মিস্ নোবেল্ প্রমুখ মনস্বিগণ ভক্তিভরে আবাহন করিয়াছেন, অস্মদ্দেশীয় অনেক সমালোচকের মতে সেই শিল্প-যুগই ভারতীয় শিল্প-কলার অধঃপতনের সূচনা করিতেছে! আমরা মুখে যতই স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার ভাণ করি না কেন, ইহা অবিসংবাদী যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহ আমরা কিছুতেই কাটাইতে পারিতেছি না। সেই মোহের আবরণ আমাদের গৃহ-সজ্জায়, বসনে ও ভূষণে, শিল্পে ও সাহিত্যে—সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান হইবে। আমাদের রুচিই সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তবে কি পাশ্চাত্য শিল্প ও সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের আদর্শ নাই বা থাকিলেও নিম্ন স্তরের?—আমি তাহা বলিতেছি না। দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে আদর্শের যে বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে তাহারই ভিতরে জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতা। উচ্চশ্রেণীর শিল্প চিরকালই জাতীয়তার গণ্ডি উল্লঙ্ঘন করিয়া, সার্ব্বজনীনতা ও সার্ব্বভৌমিকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে; আর, ইহাও সত্য যে, দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া শিল্প ও সাহিত্য যখন বিশ্বজনীন ও বিশ্বতোমুখী হইয়া উঠে তখনই তাহার চরম সার্থকতা। কিন্তু মানবাত্মা কখনও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই উধাও হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে না। হয়ত গীতার "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ" এই শ্লোকাংশেরও ইহাই মর্ম্ম। সে যাহাই হৌক্, ভারতের জাতীয় শিল্প ও সাহিত্য যে সনাতন জাতীয় বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাকে অতিক্রম করিয়া কখনও আর চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না। সেই বিশেষত্বটুকু কি? ইহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, আধ্যাত্মিকতা, আন্তরিকতা বা অন্তর্মুখীনতাই সেই বিশেষত্ব। ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য বিশেষভাবে কল্পনাদর্শাবলম্বী ও ভাব-তন্ত্র (Idealistic).

কবিবর রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষত্ব প্রকৃষ্টরূপে পরি-স্ফুট হওয়াতেই, আজ পাশ্চাত্য জগৎ তাঁহার শিরে যশের মুকুট পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিশ্ব-সাহিত্যের বিরাট্ রাজ-সভায় বরণ করিয়া লইল। তাঁহার 'গীতাঞ্জলির' ভাব ও ভাষাকে কেহ কেহ বাইবেলের, কেহবা টমাস্ এ-কেম্পিসের আধ্যাত্মিক ভাব ও ভাষার সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু, বস্তুতঃ এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে, পাশ্চাত্য ভাব গ্রহণে, কি পাশ্চাত্য কবিতার ঝঙ্কারোৎপাদনে, রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ হয় নাই,—তাঁহার আত্ম-প্রকাশ ও আত্মোপলব্ধি সেই সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায়, সেই উপনিষৎ ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভাব-প্রকাশে। পাশ্চাত্য জগৎ তাহাতেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া, কবিত্বের "নন্দন-কানন মাঝে, সুরগণ সদনে" তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রগুলির "লম্বা লম্বা, লতানে" আঙ্গুল, শীর্ণ-দেহ-যষ্টি প্রভৃতির প্রতি কতই ব্যঙ্গোক্তি ও বিদ্রূপবাণ্ বর্ষিত হইয়াছে; কিন্তু, তাঁহার

চিত্রিত 'অস্বাভাবিক' বা 'অবাস্তব' চিত্রগুলির মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল যে অপার্থিব সুষমা ও আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত, তাহাই শিল্পীর বিশেষত্ব, এবং তাহাই এই সকল অস্বাভাবিক ও অবাস্তব পত্তনভূমিতে ('Background'এ) ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশেষত্বটুকুই হ্যাভেল্ ও চেটার্টনের ন্যায় বিশেষজ্ঞগণের নিকটে আদরণীয় রূপে গণ্য হইয়াছে। সে দিন বহুদূরে নয়,—যে দিন, আবার পাশ্চাত্য শিল্প-কলা-বিদ্গণও এই ভারত-শিল্পীর কণ্ঠে সাগ্রহে জগৎ-শিল্প-সভার বরমাল্য প্রদান করিবে।

দেখা যাইতেছে যে, আমাদের ধারণা ও স্মৃতির সুবিধার জন্য আমরা যত প্রকার শ্রেণিবিভাগই করিনা কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে কোন একটি বিভাগ বা শ্রেণি অপর শ্রেণি ও বিভাগ-নিরপেক্ষ নহে। বিশ্বের সমস্তই এক সূত্রে গ্রথিত এবং বিশ্ব-যন্ত্র সমগ্রই একই সময়ে স্পন্দিত হইয়া ক্রিয়া করিতেছে। শিল্পে বাস্তবাদর্শানুগামী ও কল্পনা-দর্শানুসারীর মধ্যে বিভেদ অতি সামান্যই।

শিব-তন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার কথা ছাড়িয়া দিয়া, (বলা বাহুল্য যে, শয্যারচনা হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল কর্ম্মই এই চৌষট্টি কলার অন্তর্ভূত,) আমরা যদি প্রধান প্রধান ললিতকলাসমূহের আলোচনা করি, তাহাতেও মানব-মনের মুক্তিমার্গে উড্ডয়নের ইতিহাসই দেখিতে পাইব। অচৈতন্য, জড়ভাব হইতে ক্রমশঃ চৈতন্যে উপনীত হইলেই আত্মোপলব্ধি বা মুক্তি। শিল্প-কলাসমূহেই, জড়ের উপর চৈতন্যের, দেহের উপর দেহীর প্রভাব ও বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করে। এই খানেই জড় পদার্থকে মানবাত্মা আত্মানুরূপ করিয়া তোলে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে বলিতে হয় যে, জড়-পদার্থনিচয়কে মানবাত্মার ব্যবহার ও উপভোগের উপযোগী করিয়া তোলাই শিল্পীর কার্য্য। শিল্পেই, জড় চৈতন্যের ভৃত্য, ও চৈতন্য জড়ের প্রভু।

ললিতকলার মধ্যে স্থাপত্যের স্থান সর্ব্বনিম্নে। ইহাতে জড়-পদার্থেরই আবশ্যকতা অধিক। আর, স্থপতির যে ভাব স্থাপত্য প্রকাশ করিতে চাহে তাহা অতি অসম্পূর্ণ রূপেই পরিস্ফুট হয়।

ভাস্কর্য্যের স্থান তদূর্দ্ধে। মর্ম্মর ও ধাতুর সাহায্যে আধ্যাত্মিক ভাব তত সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত করা যায় না।

চিত্র-কলা আধ্যাত্মিকতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অনেক উর্দ্ধে। ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য সর্ব্বথা জড়-পদার্থের সাহায্যেই আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহে; কিন্তু, চিত্র-শিল্পে জড়পদার্থের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ—এই তিনের একটি গুণকে পরিহার করিয়া,—অর্থাৎ কেবল সমতল ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করে।

তথাপি চিত্র-শিল্প, সঙ্গীতের ন্যায় আধ্যাত্মিক নহে। তাল, মান, লয় ও স্বর সংযোগে আত্মার বিভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করাই সঙ্গীতের কার্য্য। ইহাতে জড়ের সাহায্য অতি সামান্য।

তদূর্দ্ধে কবিত্ব—ললিতকলানিচয়ের শিরোভূষণ। ভাষার সাহায্যে অধ্যাত্মজগতের সকল রস-সম্পৎ বিশ্ব-সমক্ষে উপস্থিত করাই কবিত্বের লক্ষ্য ও কার্য্য। আমি এস্থলে কবিত্বের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করার বৃথা প্রয়াসে সাহসী নই। আনন্দোৎপাদনই কবিতার লক্ষ্য। ভাষা, বাক্য, ছন্দ ইত্যাদি সেই লক্ষ্য সাধনের উপায় মাত্র; এবং ছন্দ ব্যতিরেকেও যে কবিতা হইতে পারে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কারণ, আনন্দোদ্রেকেই—কাব্যকলার চরিতার্থতা। জর্ম্মান্ দার্শনিক হেগেলের মতে কাব্য-কলার চরমোৎকর্ষ নাট্যকলায় ('Dramatic Poetry'তে)। এই মত কতদূর সমীচীন তাহা কবি ও কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিবেন। তাঁহার মতে কাব্য-কলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রের যুগ মহাকাব্যে ('Epic'এ)। ইহাই কবিত্বের শৈশব। ইহাতে শাব্দিকতা, অলঙ্কার, বিস্ময়সূচক চিত্রের সমাবেশ বেশী,—শিশুর কল্পনার ন্যায়। আর সঙ্গীত-কলার যুগ—গীতিকাব্যে। নাট্য-কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত হউক বা না-ই হৌক্, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের তিরোধান ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। আজকাল আর কেহ 'Grand Epics'এর—মহাকাব্যের—উৎপত্তির আশা করিতে পারেন না। কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের কাব্য-কলার বিষয় আলোচনা করিলেও যেন হেগেলের মতই সমর্থিত হয়। 'রঘুবংশ' ও 'কুমার সম্ভব', 'মেঘদূত' ও 'ঋতু-সংহার', 'বিক্রমোর্ব্বশী' ও 'শকুন্তলা'র বিষয় চিন্তা করিলে—সকলে দার্শনিকপ্রবরের মতই সমর্থন করিবেন। 'শকুন্তলা' যে কাব্যজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন তাহা পাশ্চাত্য

পণ্ডিত ও কবিগণও সমর্থন করিয়াছেন। কালিদাস মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য ও নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। কবিত্বের ইতিহাসের সর্ব্বযুগই তাঁহার কাব্যে স্ফুটীকৃত। তাঁহার কাব্যাবলীর মধ্যে "শকুন্তলা"র শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদী, এবং তাঁহার রচনাসমূহ আলোচনা করিলে হেগেলের মতই সমর্থিত হয়।

মানবজীবনেও সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, যেমন সমাজ ও জাতির ইতিহাস পরিব্যক্ত হয়,—অর্থাৎ জীব-জগতের ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে—একজন কবির কাব্য-জীবনেও সেই প্রকার কাব্য-কলার বিবর্ত্তনের সোপানশ্রেণী দেখিতে পাই।

প্রকৃতির অনুসরণ বা অনুকরণই ললিতকলার কার্য্য নহে। অভিনব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই তাহার লক্ষ্য। অনুকরণ বা অনুচিকীর্ষা উপায় হইতে পারে; কিন্তু তাহাই উদ্দেশ্য নহে। নিসর্গ-নিষ্ঠা একেবারে অনুকরণ নহে। এস্থলে একজন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মত আপনাদিগকে উপহার দিতেছি;—"The ideal without the real lacks life; but the real without the ideal lacks pure beauty. Both need to unite; to join hands and to enter into alliance. In this way the best work may be achieved. Thus beauty is an absolute idea and not a mere copy of imperfect nature." বাস্তব ছাড়িয়া কেবল কল্পনার আশ্রয় লইলে, ঠিক জীবনটি পাওয়া যাইবে না। উভয়ের সম্মিলন আবশ্যক, এতদুভয় একত্র হইলেই যথার্থ বিশ্ব-সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হয়। অপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ প্রকৃতি-চিত্রই সৌন্দর্য্য নহে; সৌন্দর্য্য সেই অসম্পৃক্ত ও নির্ব্বিকল্প ভাব।

প্রকৃতিতে যাহা সুন্দর বলিয়া গণ্য হয় না, শিল্পকলার সাহায্যে তাহাও সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের সানুদেশস্থ বন্ধুর উপলখণ্ড পর্ব্বতারোহীর পক্ষে পীড়াদায়ক; লতাগুল্মপাদপাদিবিরহিত প্রান্তর-দৃশ্য কখনও দর্শকের প্রীতিকর নহে; কিন্তু, চিত্রে পর্ব্বতীয় দৃশ্য ও প্রান্তরের ছবি কতই মনোমদ! ইহার কারণ—শিল্প-কলা হইতে সমস্ত পীড়া, বেদনা ও ক্লেশের স্মৃতি বিলুপ্ত ও তিরোহিত হইয়া যায়। আর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিল্প-সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের সর্ব্বপ্রধান উপাদান—শিল্পীর আত্মার আনন্দ ও মহাভাব।

এতদুপলক্ষে একটি গল্প মনে পড়িতেছে।—বিশ্রুত-কীর্ত্তি চিত্রশিল্পী 'গুইদো'কে কোন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি যে আদর্শে তাঁহার অশেষ লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি সেই আদর্শ দেখাইতে পারেন কি না। গুইদো তৎক্ষণাৎ তাঁহার এক দীর্ঘবপু কদাকার ভৃত্যকে ডাকিলেন, এবং তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন—'এই আমার আদর্শ!' ভদ্রলোক ত একেবারেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত! গুইদো তখন বলিলেন, "মহাশয়, সৌন্দর্য্য মানবাত্মা-সম্ভূত; সুতরাং বাহ্যাদর্শ যাহাই হউক, তাহা অবলম্বন করিয়াই সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হইতে পারে। যে ছবিগুলি আঁকি, সেগুলি আমার মানসী-প্রতিমা মাত্র"।

যাহার হৃদয়ে সেই ভূমানন্দের বিন্দুমাত্রও অবভাসিত হইয়াছে, তিনিই এই জড়-প্রকৃতির প্রত্যেক অংশে সৌন্দর্য্য ও শোভা দেখিতে পাইবেন; আর যেস্থলে সে আনন্দের কণামাত্রও উপচিত হয় নাই, সেস্থলে সৌন্দর্য্যানুভূতিও নাই। অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে শোভানুভাবকতা ও শিল্পকলানুশীলনের বড় একটা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদ্বারা সৌন্দর্য্যের "আধ্যাত্মিক স্বরূপ"ই প্রকাশিত হইতেছে। শিল্পকলানুশীলন সুসভ্য জাতির পক্ষেই সম্ভব।

আমি যে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" বাক্যদ্বারা প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, মনীষী কুজেঁর গ্রন্থেও সেই ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছে;—"The true, the good and the beautiful are but forms of the Infinite; What then do we really love in truth, beauty and virtue? We love the Infinite Himself. The love of the Infinite substance is hidden under the love of its forms". সত্য, শিব ও সুন্দর,—এই অনন্তেরই বিভিন্ন প্রকৃতি মাত্র; সত্য, শিব, সুন্দরকে ভালবাসিয়া, আমরা এই অনন্তকেই ভালবাসিয়া থাকি। বিভিন্ন ভাবের ভালবাসার অভ্যন্তরে সেই অসীমের প্রতি প্রেমই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত।

চন্দ্র
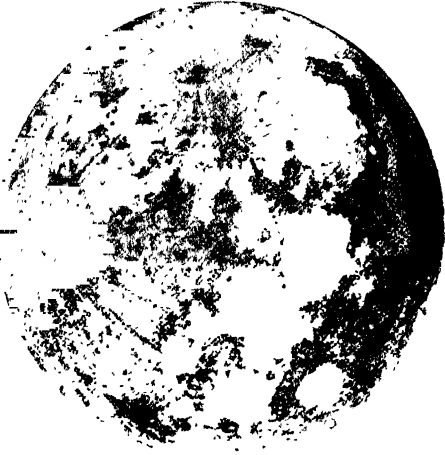
"গরল সহোদর, গুরুপত্নীহর,
রাহুবমন তনুকারা।
বিরহ হুতাশন, বারিদনাশন,
শীল গুণে শশী উজিয়ারা ॥"—বিদ্যাপতি।

চন্দ্র গরলের সহোদর। শাস্ত্রে আছে, সমুদ্রমন্থন-কালে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই সময়ে গরলও উঠিয়াছিল, সুতরাং চন্দ্র গরলের সহোদর ভ্রাতা। চন্দ্র, আপন গুরু, বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করিয়াছিলেন, ইহা পৌরাণিক কথা। রাহু নামক অসুরকর্ত্তৃক চন্দ্র গ্রস্ত হন, এবং কিছুকাল পরে রাহু তাঁহাকে মুখ হইতে বাহির করিয়া দেয়, এজন্য চন্দ্র রাহুর বমন। বিরহি-জনের পক্ষে চন্দ্র অগ্নির স্বরূপ, কেননা জ্যোৎস্নাময়ী নিশায় বিরহীর বড় যন্ত্রণা হয়। চন্দ্রের উদয়ে মেঘঝড় কাটিয়া আকাশ নির্ম্মল হয়, এজন্য চন্দ্র মেঘনাশী। চন্দ্রের এত দোষ, কিন্তু শীলতা-গুণে চন্দ্রের সকল দোষ নষ্ট হইয়াছে। কবিকুল আবার কুমুদ-পুষ্পের সঙ্গে চন্দ্রকে প্রণয় করিতে দেখেন। দক্ষপ্রজাপতির সপ্তবিংশতি কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করিয়াছেন। চন্দ্রের একটা খুব লম্বা বংশও বিদ্যমান আছে, চন্দ্রবংশীয় রাজন্যবর্গের কথা কে না শুনিয়াছেন? চন্দ্রের একটি নাম শশাঙ্ক, কারণ শশকের আকৃতি চন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কথা ছাড়া "আকাশবুড়ী কাটনা কাটিতেছে"—"Man in the moon" প্রভৃতি দেশী বিদেশী কত গল্প, কত 'থিওরি', বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। কোনও শাস্ত্রে "চন্দ্রলোক" নামে এক ভুবনের কথা পাওয়া যায়।

চিত্রকরদিগের পক্ষে চন্দ্র বড় প্রিয়বস্তু। অনেক চিত্রকর জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর চিত্র আঁকিয়াছেন। সুবিস্তৃতা নদী, অথবা সমুদ্রের, জলোপরি যখন চন্দ্র-কিরণ নাচিতে থাকে, তখন কাহার না ভাল লাগে?

আমাদের যতকিছু ধর্ম্মকর্ম্ম, যোগযাগ, এসকল তিথি অনুসারেই হইয়া থাকে। সেই তিথিনক্ষত্রসকল চন্দ্রকেই লইয়া; সুতরাং চন্দ্র আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বেসর্ব্বা। চন্দ্রেরই চালচলন দেখিয়াই আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম হইয়া থাকে। চন্দ্র নিত্যই নূতন মূর্ত্তি ধারণ করেন; নিত্যই নব সজ্জায় শোভিত হইয়া শুক্লপক্ষের ষোলকলায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকেন; মেঘ অথবা আকাশবর্ণে চন্দ্রের শোভা প্রতি রাত্রিকালেই নূতনভাব প্রকাশ করে। চন্দ্রের এই প্রকার বাবুয়ানা এবং ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই দক্ষপ্রজাপতি উঁহাকে সপ্তবিংশতি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ভাবুক কবিগণে আরও কত প্রকার উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, সেসকল উল্লিখিত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে ইচ্ছা করি না। যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, বহুপূর্ব্বকালের ঋষিগণ চন্দ্রের শোভা দেখিয়া ঐসকল গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন।

গ্যালিলিওকর্ত্তৃক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার, এবং নিউটন্‌কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ের সকল তথ্য প্রকাশিত হইলে, পণ্ডিতেরা বুঝিয়াছিলেন যে, চন্দ্র এবং সূর্য্য হইতেই পৃথিবীর উপরিভাগের সমুদ্র এবং নদীসমূহে জোয়ার-ভাঁটা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। চন্দ্র পৃথিবীতে জোয়ার এবং ভাঁটার কারণ-স্বরূপ ত বটেই,—তাহা ছাড়া ঝড় বৃষ্টি, বর্ষা, প্রভৃতিও অনেকটা চন্দ্রাধীন।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, সমুদ্র-মন্থনকালে পৃথিবী হইতে চন্দ্র নির্গত হইয়াছিল। এই সমুদ্র-মন্থন ব্যাপারটা

চন্দ্রালোকের দৃশ্য।

কি, উহাতে ঐতিহাসিক সত্য কিছু আছে কি? আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যাহা এক্ষণে প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean) বলিয়া উল্লিখিত, ঐ মহাসাগর হইতেই চন্দ্রোৎপত্তি হইয়াছে। চন্দ্রের আকৃতি একটা উপগ্রহ, যদি প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে উহা ভরাট্ হইয়া চীন দেশ হইতে এমেরিকা অবধি সমতল ভূমি হইবে। এইজন্য কএকজন বৈজ্ঞানিক অনুমান করিয়াছেন, বহুপূর্ব্বকালে কোনও প্রকার কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি প্রভাবে পার্থিব একটা বিশাল ভূমিখণ্ড আকাশমার্গে ছুটিয়া গিয়া চন্দ্র হইয়াছে! কিন্তু ইহাতেও আমরা পৌরাণিক "সমুদ্র-মন্থন"টা বুঝিতে পারি না। পৌরাণিক সমুদ্র-মন্থনে সুমেরু (Axis of the Earth) মন্থান-দণ্ড, অনন্ত (Space) রজ্জু, কূর্ম্মরূপী নারায়ণ আধার, এবং দেবাসুর সকলে মিলিয়া মজুরি করিয়াছিলেন। এ রহস্যভেদ করিতে আমরা অক্ষম। তবে স্থূলতঃ আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যদি কোনও প্রকারে আমরা পার্থিব আহ্নিকগতিটাকে কতকটা থামাইতে পারি, অর্থাৎ যে কোনও কৌশলে হউক, পার্থিব অক্ষাবর্ত্ত বন্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে, প্রাকৃতিক একটা শক্তি-(Inertia) বশতঃ সমুদ্রের জলরাশি উচ্ছলিত হইয়া পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইতে পারে, এবং হয়ত, আরও দুই একটা চন্দ্রোৎপত্তিও হইতে পারে। বিখ্যাত গ্রীক্ বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন, "আমাকে একটা আধার দাও, আমি তাহা হইলে এই পৃথিবীটাকে তুলিয়া ফেলিতে পারি।" * যাহা হউক, আমরা এক্ষণে পৌরাণিক কথার প্রসঙ্গ আর আবশ্যক বোধ করি না। এক্ষণে চন্দ্রের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

যে সময়ে চন্দ্র এই পৃথিবী হইতে নির্গত হইয়াছিল, সেই সময়ে পৃথিবী প্রায় সূর্য্যের মতই তেজোময়ী ছিল; চন্দ্রও সেই সময়ে পৃথিবীর মতই বহ্নিময় ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু আকৃতিতে পৃথিবীর অপেক্ষা চন্দ্র অনেক ছোট, সুতরাং শীঘ্রই উহা শীতল হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য অথবা জীব-দেহের সহিত পৃথিবীর অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। জীবদেহের অন্তর্বর্ত্তী উত্তাপই তাহাদের প্রাণ-স্বরূপ, সেই দেহাভ্যন্তরস্থ উত্তাপ-বশতঃই তাহাদের দৈহিক সর্ব্বব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে। সেই রূপ, গ্রহ অথবা উপগ্রহ সকলের অন্তর্বর্ত্তী উত্তাপই তত্তৎ

* Archimedes: 'Give me a fulcrum I shall lift the World."

গ্রহাদির প্রাণ-স্বরূপ। "ভর্গো দেবস্য ধীমহি"—এই বৈদিক মহাবাক্যদ্বারা ইহা বেশ নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদিক ঋষিগণ সেই পুরাতন কালেও একথা বেশ বুঝিতেন। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রও একথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে। সূর্য্যদেবের প্রদীপ্ত তেজোরাশিই ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ-স্বরূপ, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু এই তেজঃ অথবা উত্তাপ চিরকাল এক প্রকার থাকে না। একটা লৌহপিণ্ড অগ্নিবৎ করিয়া রাখিয়া দাও, অল্পকাল মধ্যে তাহা জুড়াইয়া শীতল হইবে। ঐ প্রকার একটা একমণ লৌহপিণ্ড জুড়াইয়া শীতল হইতে যে সময় লাগে, একটা একসের লৌহপিণ্ড তাহার অপেক্ষা অল্পসময়েই শীতল হইয়া যাইবে। এই সামান্য উদাহরণদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চতুর্দ্দশলক্ষগুণ বৃহৎ, সুতরাং সূর্য্য জুড়াইয়া শীতল হইবার অনেক পূর্ব্বে পৃথিবী শীতল হইয়াছে। সেইমত, পৃথিবী চন্দ্র অপেক্ষা ত্রয়োদশগুণ বৃহৎ, একারণ পৃথিবীর উত্তাপ অপেক্ষাও চন্দ্রের উত্তাপ অধিকতর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রহ এবং উপগ্রহদিগের তরুণত্ব অথবা প্রবীণত্বের বিচার করিবার আবশ্যক হইলে, উহাদিগের উত্তাপেরই নির্ণয় করিতে হয়। এই হিসাবে আমাদের এই সৌরজগতে সূর্য্যদেবই সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ রহিয়াছেন। পৃথিবী সূর্য্যের অনেক পরে উৎপন্না হইলেও বর্ত্তমানকালে মধ্যবয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর, চন্দ্র পৃথিবীর অনেক পরে উৎপন্ন হইয়াও, বর্ত্তমানকালে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

দূরবীক্ষণ দ্বারা এক্ষণে চন্দ্রের উপরিভাগ যেরূপ দেখা যায়, তাহা দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, চন্দ্রের উপরিভাগে জল অথবা বায়ুর কোনও চিহ্ন নাই; সেই জন্যই উহাতে মেঘ হয় না। অতএব, উহাতে পার্থিব জীবজন্তুগণের মত জলচর, ভূচর, অথবা খেচর কোনও প্রকার প্রাণীও নাই।

চন্দ্রে জল এবং বায়ু না থাকায়, ঐ উপগ্রহটির যে স্থানে সূর্য্যের আলোক পতিত হয়, অল্পকাল মধ্যে তাহা এপ্রকার ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, সেই উত্তাপে পার্থিব কোনও প্রাণী তিষ্ঠিতেই পারে না।

যেই সূর্য্যালোক সরিয়া রাত্রি হয়, অমনি অল্পকালমধ্যে এমন শৈত্য উপস্থিত হয় যে, আমাদের এই পার্থিব মেরু-প্রদেশস্থ নিদারুণ শীত, চন্দ্রলোকের রাত্রিকালীন শীত অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কম।

রাত্রিকালের ভয়ঙ্কর শীত, দিবসের ভয়ঙ্কর উত্তাপ, এই দুইটি প্রাকৃতিক ব্যাপার অনুধাবনপূর্ব্বক বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, চন্দ্রলোকে পার্থিব জীবের মত কোনও জীবের অবস্থান সম্ভব নহে।

এক্ষণে চন্দ্রলোকের দৃশ্যও পৃথিবীর মত নাই। সমুদ্র আছে, তাহাতে জল নাই; পূর্ব্বে নদনদী অবশ্যই ছিল, তাহাতে এক্ষণে জলবিন্দুও নাই। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম অথবা কোনও প্রকার তৃণ পর্য্যন্ত নাই।

আকাশে বায়ু নাই, অদৃশ্য জলীয় বাষ্পও নাই, সুতরাং চন্দ্রলোক হইতে আকাশের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ দেখায়। নক্ষত্র সকল দিবারাত্রি উজ্জ্বল ভাবেই প্রকাশিত থাকে। দূরবীক্ষণদ্বারা বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, চন্দ্রলোকের সর্ব্বত্রই আগ্নেয়গিরিসকল ধাতু-নিঃস্রব উদ্গীর্ণ করিতেছে; এমন কি, ঐ সকল আগ্নেয়গিরির গহ্বরের বিস্তৃতিও যন্ত্রদ্বারা পরিমিত হইতেছে। চন্দ্রলোকের উপরিভাগে কেবল বড় বড় পর্ব্বতশ্রেণী, আগ্নেয়গিরি, পর্ব্বতের ভগ্ন-খণ্ড এবং জলবৃক্ষহীন মরুভূমিসকল দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশের দিকে চাহিলে আকাশ কৃষ্ণ বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। মেঘের লেশমাত্রও নাই। দিবা-রাত্রি তারকা এবং গ্রহ সকল ঝিক্ মিক্ করিতেছে। এই পৃথিবীতে সূর্য্য যেপ্রকার সাম্য মূর্ত্তিতে উদিত হন, চন্দ্রলোকে বায়ু এবং জলীয় বাষ্প না থাকায়, উদয়কালেই সূর্য্যের অতীব প্রচণ্ডমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বিশ্বময় এই বিশ্বমধ্যে কোথায় কি খেলা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা মানুষে কি করিবে? তিনি মানুষকে যেটুকু জ্ঞান দিয়াছেন, মানুষে তাহাই পাইয়াছে। মানুষে যাহা বুঝিতে পারে না, তাহা বিশ্বাস করে না। এই স্থলে ছান্দোগ্য উপনিষৎ, পঞ্চম প্রপাঠক উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইব যে, বৈদিক ঋষিগণ বুঝিতেন যে, চন্দ্রমা আমাদের মত কামক্রোধাদির বশীভূত, হস্তপদবিশিষ্ট জীব নহেন। চন্দ্র একটি 'লোক'; লোক অর্থে তদুপযুক্ত জীবনিবহের আবাসস্থল।

"যে চেমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপইত্যুপাসতে,
তে অর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি।

অর্চ্চিষোঽহঃ অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্।
আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড়ুদঙাদিত্য
এতি মাসাংস্তান্।
মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্।
সংবৎসরাদাদিত্যম্।
আদিত্যাচ্চন্দ্রমসম্।
চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্।
তৎপুরুষো অমানবঃ স এতান্ ব্রহ্মগময়তি।
এষ দেবযানঃ পন্থা ইতি॥"

যে সকল অরণ্যবাসী, শ্রদ্ধা ও তপঃ-সমন্বিত হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের দেহত্যাগান্তর অর্চ্চিরধিষ্ঠাত্রী দেবলোক-প্রাপ্তি হয়। পরে দিবা, উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, সংবৎসর, এবং মাস অতিক্রম করিয়া সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, এবং বিদ্যুল্লোক-প্রাপ্তি হয়। এই বিদ্যুল্লোক-প্রাপ্তি হইলে, এক অমানব পুরুষকর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে তাঁহারা নীত হইয়া থাকেন; ইহাকেই দেবযান-পন্থা কহে।

পুনশ্চঃ—"অথ যে ইমেগ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে,
তে ধূমমভিসম্ভবন্তি।
ধূমাদ্রাত্রিম্। রাত্রেরপরপক্ষম্।
অপর পক্ষাৎ ষড়্দক্ষিণাদিত্য এতি মাসাংস্তান্।
নৈতে সংবৎসর মভিপ্রাপ্নুবন্তি।
মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্।
পিতৃলোকাদাকাশম্।
আকাশাচ্চন্দ্রমসম্॥ ইতি॥"

যাঁহারা গ্রামে গৃহস্থভাবে থাকিয়া ইষ্ট (দেবসেবা ও যজ্ঞাদি), পূর্ত্ত (জলাশয়াদি, সেতু, পথ, দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা), এবং দানাদি কর্ম্ম করেন, তাঁহারা প্রথমতঃ ধূমলোক প্রাপ্ত হইয়া রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন হইয়া পিতৃলোক প্রাপ্ত হন। পরে পিতৃলোক হইতে আকাশ, এবং আকাশ হইতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন।

দেবযান-পন্থায় চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোক প্রাপ্তি হইলে, "ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে।"—অর্থাৎ এই মানবরূপ আবর্ত্তে আর আসিতে হয় না। ধূমাদি মার্গদ্বারা চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হইলে, "অথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে।"—অর্থাৎ পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

বৈদিক ঋষিগণ চন্দ্রলোকেই পিতৃগণের আবাসভূমি স্থির করিয়াছেন। পিতৃগণের দেহ আতিবাহিকী, অর্থাৎ Spiritual সেই প্রকার দেহে জল অথবা বায়ুর স্থূলতঃ আবশ্যক না হইতে পারে। এই কারণেই বোধ হয়, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণাদির ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। পিতৃলোকে গিয়াও সূক্ষ্ম-শরীরেও ক্ষুৎপিপাসা থাকে বলিয়াই, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণাদির প্রয়োজন, ঋষিরা এই প্রকার স্থির করিয়াই পৈত্রকর্ম্ম সকল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

ঐ সকল বেদবচনের দ্বারা কেবল এইমাত্র আমরা বুঝিতে পারি যে, দেবযান এবং পিতৃযান পন্থা দুইটি দুই প্রকার। প্রথমটি আলোকময়, অপরটি অন্ধকারময়। উভয় পথেই একবার চন্দ্রলোকে যাইতে হয়। ব্রহ্মোপাসক জ্যোতির্ম্ময় পথে চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুৎ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করেন; এবং ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা অন্ধকার পথে চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি হইলে, আকাশ অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার এই ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রুতিমূলক দুই মার্গের কথাই বলিয়াছেন।—

"যত্রকালেত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তংকালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩॥
অগ্নির্জ্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪॥
ধূমোরাত্রি স্তথাকৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥২৫॥
শুক্লকৃষ্ণে গতিহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬॥"

বাহুল্যভয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণের ঐ সকল উক্তির অনুবাদ আর দিলাম না। ফলতঃ ঐ সকল শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিরই অনুকূল।

এদেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা যতই হইবে, আমরা ততই বেদাদিশাস্ত্রের গভীর মর্ম্ম সকল বুঝিতে পারিব,—সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানোন্নত হইয়া য়ুরোপীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-মাত্রেই যেন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞান দ্বারা আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের সে প্রকার দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা নাই। "জ্ঞানং বিজ্ঞানসম্মতং"—বিজ্ঞান-সঙ্গত জ্ঞানই ঋষিদিগের লক্ষ্য ছিল, একারণ তাঁহারা চারি-

বেদেই বিজ্ঞানসম্মত কথারই অধিকতর আদর করিয়াছেন। অতএব, বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিলে, ভারতবাসী নাস্তিক হইবে না—আরও শ্রদ্ধাবান্ হইবে।

প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র এই পৃথিবীরই সম্পত্তি। পৃথিবী হইতে নির্গত হইয়া, উহা পৃথিবীর আকর্ষণেই অবস্থিত, এবং একমাসে একবার পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে। পৃথিবী ঐ একমাস মধ্যে রাশিচক্রের ৩০ অংশ অতিক্রম করিতেছে, চন্দ্রও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে সেই পথে ধাবমান হইতেছে। একারণ মহাকাশে (Space) চন্দ্রের পথ ঠিক ইস্কুর, প্যাঁচের মত। এক মাসে চন্দ্র সেই ইস্কুর এক প্যাঁচ ঘুরে। চন্দ্রের এই গতি সত্ত্বেও আরও একটা অঙ্গাবর্ত্ত আছে। সেকথা আমরা পরে বুঝাইব। চন্দ্রের গতি বুঝিতে দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের খুব আবশ্যক নাই।

পূর্ণিমার দিন সূর্য্যাস্তের সময়ই চন্দ্রোদয় হয়। ঐ দিবস চন্দ্র এবং সূর্য্যের মধ্যে ঠিক ১৮০ অংশের ব্যবধান থাকে।

পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণ।
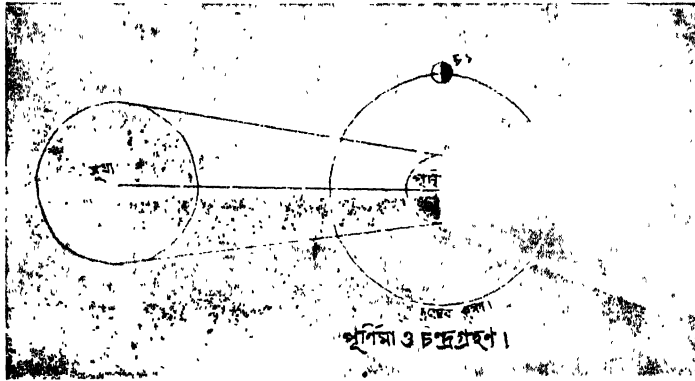
ক্রমশঃই চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে করিতে আপন কক্ষায় আকাশপথের পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয়। এ বিষয়টি বুঝিতে গেলে, আকাশের নক্ষত্রগুলি একটু লক্ষ্য করিতে হয়। পার্থিব দৈনিক অঙ্গাবর্ত্ত হেতু চন্দ্রকে দ্বাদশ ঘণ্টায় পশ্চিমে অস্তমিত দেখায়, ইহা আমরা ভ্রান্তি দর্শন করি। কিন্তু এই যে পশ্চিমাভিমুখী গতি, সাধারণ দৃষ্টিতে ইহাই আমরা চন্দ্রের প্রকৃত গতি বলিয়া মনে করি। এ বিষয়ে আমরা প্রথমতঃ একটা উদাহরণ দিব। মনে করা যাউক, আমরা একটা শকটে আরোহণ করিয়া খুব দ্রুতবেগে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেছি। আমাদের সম্মুখস্থ পথে, বহুদূরে অপর একখানি শকট অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে পূর্ব্বাভিমুখেই অগ্রসর হইতেছে। এই অবস্থায় আমরা দ্বিতীয় শকটখানিকে পূর্ব্বদিকেই দেখিতে পাইব। আমরা যতই অগ্রসর হইব, আমরা দেখিতে পাইব যে, দ্বিতীয় শকটখানি আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। পরে আমরা দ্বিতীয় শকটখানি অতিক্রম করিলে, সেইখানি আমরা পশ্চিমে দেখিতে পাইব। কিন্তু দ্বিতীয় শকটখানি ধীরগতিতে পূর্ব্বাভিমুখেই যাইতেছে, তাহা প্রথমেই বলিয়াছি। দ্বিতীয় শকটখানির পশ্চিমামুখী এই গতি যে প্রকার ভ্রান্তিদর্শন, আকাশপথে রাত্রিকালে চন্দ্রমার পশ্চিমাভিমুখী গতি ঠিক সেই প্রকার ভ্রান্তিদর্শন মাত্র। চন্দ্র ধীরগতিতে পূর্ব্বদিকে যাইতেছে, আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া অতি দ্রুতবেগে পূর্ব্বাভিমুখেই অগ্রসর হইতেছি। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে চন্দ্র দ্বিতীয় শকট-স্থানীয়। চন্দ্রের পশ্চিমাভিমুখী গতি কিছুমাত্রও নাই, উহা বস্তুতঃই আমরা ভ্রান্তিদর্শন করিয়া থাকি।

পূর্ণিমার দিন সূর্য্যাস্তকালে চন্দ্রের উদয় হয়; কিন্তু কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ তিথিতে সূর্য্যাস্তের প্রায় ৫২।৫৩ মিনিট পরে চন্দ্রোদয় হইয়া থাকে। এই বিষয়টি অনুধাবনপূর্ব্বক দেখিলেই চন্দ্রের পূর্ব্বাভিমুখী গতি বেশ বুঝা যায়। ২৪ ঘণ্টা মধ্যে চন্দ্র ১৩ অংশ ২০ কলা পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হয়, একারণ আর্য্য জ্যোতিষে ১৩ অংশ ২০ কলায় এক এক নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছে; এবং এই প্রকার ২৭টি নক্ষত্রে আকাশমণ্ডল বিভক্ত করিয়া, আর্য্যেরা সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের নাম করিয়াছেন। দ্বিতীয়াতিথিতে চন্দ্র ২৬ অংশ ২৪ কলা (অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট) পরে উদিত হন। এই প্রকারে ঠিক সপ্তবিংশতি দিবসে চন্দ্র পুনর্ব্বার পূর্ব্বপূর্ণিমার নক্ষত্রে আসেন। কিন্তু এই একমাস মধ্যে পৃথিবী আপন কক্ষায় ৩০ অংশ অগ্রসর হয়, এই জন্য পূর্ণিমা তিথি হইতে চন্দ্রের আরও প্রায় সার্দ্ধ দুই দিবস অতিবাহিত হইয়া যায়। ইহাকেই এক চান্দ্রমাস কহে। চন্দ্র এই প্রকারে আকাশপথে পরিভ্রমণ করে বলিয়াই মাসে একবার সূর্য্য সমাগম, অর্থাৎ অমাবস্যা হয়।

অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য্য এক নক্ষত্রে থাকে। ঠিক সম-

সূত্রপাতে থাকিলেই সে দিবস সূর্য্যগ্রহণ হইবে। আর একটু উত্তর অথবা দক্ষিণে চন্দ্র থাকিলে, সূর্য্যের প্রদীপ্ত তেজোরাশিবশতঃ চন্দ্রবিম্ব আমরা দেখিতে পাই না। অমাবস্যার দিন সূর্য্যের সঙ্গেই চন্দ্রের উদয়, এবং সূর্য্যাস্ত কালেই চন্দ্রও পশ্চিমদিকে অস্তমিত হইয়া থাকে।
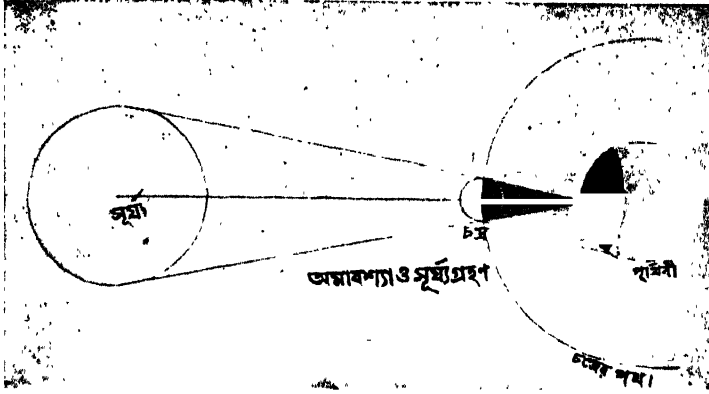
অমাবস্যার পর শুক্লপক্ষ আরম্ভ হয়, কিন্তু ঐ দিবস চন্দ্র সূর্য্যের ব্যবধান ১৩ অংশ ২০ কলা মাত্র, একারণ আমরা প্রতিপদের চন্দ্র দেখিতে পাই না। দ্বিতীয়া তিথিতেও আকাশ বিশেষ পরিষ্কার না হইলেও চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ার দিন চন্দ্র এবং সূর্য্যের ব্যবধান ৪০ অংশ, সেইজন্যই শুক্লা তৃতীয়া তিথিতেই চন্দ্রকে সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিম-গগনে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ তিথি অনুসারে চন্দ্র প্রতিদিনই পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয়, এবং উহার আলোক বৃদ্ধি হইতে থাকে। শুক্লা অষ্টমীর দিন চন্দ্র এবং সূর্য্যের ব্যবধান ৯০ অংশ, এই জন্যই সূর্য্যাস্তকালে ঠিক মাথার উপর অর্দ্ধচন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবে পুনরায় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেণ্ড পরে সূর্য্যের বিপরীতে আসিলে পূর্ণিমা হয়।

পৃথিবী যেমন অহোরাত্রমধ্যে একবার আবর্ত্তন করে, চন্দ্রেরও সেই প্রকার একটা আবর্ত্তন আছে। সেই প্রকার একটা আবর্ত্তন সমাপ্ত করিতেও চন্দ্রের ঠিক ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেণ্ড সময় লাগে। পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে চন্দ্রের যে সময় লাগে, ঠিক সেই সময়েই চন্দ্র একবার আপন অক্ষাবর্ত্ত সমাপ্ত করে; ইহা এক বিচিত্র রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। আমরা এই পৃথিবীতে থাকিয়া চন্দ্রের যে মূর্ত্তি দেখি, যুগযুগান্তকালেও তাহার কিছু ব্যতিক্রম হইতেছে না। ইহাতে প্রথমতঃ আমরা মনে করিতে পারি যে, চন্দ্রের কোনও প্রকার অক্ষাবর্ত্ত নাই; কিন্তু নিম্নস্থ চিত্রদ্বারা এই বিষয়টি সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে।

চিত্রে একটি কীলক দেখান হইয়াছে, এবং ঐ কীলক-সংলগ্ন একটি রজ্জু ধরিয়া এক ব্যক্তি কীলকের দিকে ফিরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি কীলকের দিকে মুখ রাখিয়া যদি চারিদিকে ঘুরিয়া আসে, তাহাহইলে তাহাকেও স্বীয় অক্ষাবর্ত্তে একবার ঘুরিতে হইবে। সর্ব্বদা ঐ কীলকের দিকে চাহিতে গেলে, তাহাকে ক্রমান্বয়ে সকল দিকেই ফিরিতে হইবে। একস্থানে থাকিয়া ঘুরিলে, যেমন একবার পশ্চিম, পরে দক্ষিণ, পূর্ব্ব এবং উত্তর দিকে তাহাকে ফিরিতে হয়, কীলকের দিকে চাহিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে হইলেও চারিদিকে এক একবার সেই ব্যক্তিকে দেখিতে হইবে।
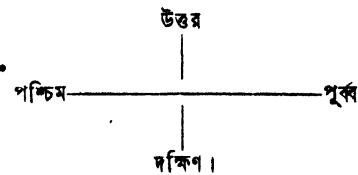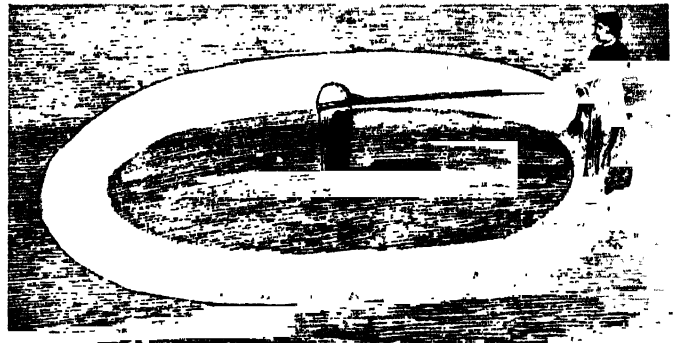
চন্দ্রও ঠিক ঐ ভাবে পৃথিবীর দিকে মুখ রাখিয়া পৃথি-

বীকে বেষ্টন করিতেছে, অতএব চন্দ্র এক চান্দ্রমাসে একবার আপন অঙ্গাবর্ত্ত সমাপ্ত করিতেছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

চন্দ্র এই পৃথিবীর ১ এর ১৩ অংশ। তেরটি চন্দ্র একত্র করিলে, পৃথিবীর সমানাকার হয়।

চন্দ্রের উপরিভাগে জল অথবা বায়ুর কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, কোনও প্রকার বৃক্ষলতা ইত্যাদিও চন্দ্রলোকে নাই। যে সকল প্রাণীর শ্বাসপ্রশ্বাস অথবা ক্ষুৎপিপাসা আছে, এমন কোনও জীব চন্দ্রলোকে থাকিতে পারে না।

এক্ষণে পৃথিবীর যে প্রকার অবস্থা, চন্দ্রেরও একদিন এপ্রকার জীবনিবহের বাসোপযোগী অবস্থা গিয়াছে, সন্দেহ নাই। চন্দ্রলোকের উপরিভাগে যে সকল গভীর খাদ এখনও দৃষ্ট হইতেছে, কোন সময়ে নিশ্চয়ই উহা জলরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু হায়, কাল সহকারে তাহা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। চন্দ্রলোকের সমুদ্রের জল কোথায় গেল ?

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, চন্দ্রের দিবাকালে (আমাদের এক পক্ষকাল) চন্দ্রের উপরিভাগের পর্ব্বতসকল ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত হইয়া উঠে। যেই সূর্য্যাস্ত হয়, অমনই নিদারুণ শৈত্য আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ প্রকার অত্যন্ত উত্তাপের পর অকস্মাৎ অতি প্রচণ্ড শীত হইলে, চন্দ্রলোকের উপরিভাগের, পর্ব্বতসকল ফাটিয়া বড় বড় গহ্বর হওয়া বিচিত্র নহে। ঐ প্রকার গহ্বরমধ্যে সমুদ্রের জল প্রবিষ্ট হইয়া উপরিভাগ একেবারেই জলহীন হইতে পারে। সমুদ্রের জল ঐ ভাবে গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু চন্দ্রের বায়ুমণ্ডল কোথায় গেল? চন্দ্রে যে বায়ুমণ্ডল নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে বুঝি? প্রথমতঃ তাহাই বলা প্রয়োজন। এই পৃথিবী হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা অন্যান্য গ্রহ যে প্রকার দেখা যায়, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র, এবং বুধ গ্রহে বায়ুমণ্ডল, মেঘ প্রভৃতি আছে। বড় বড় মেঘসকল ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে, এই পৃথিবীর মতই বায়ু-স্রোতে ভর করিয়া মেঘসকল ভাসিয়া যায়, তাহা বেশ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। দুই এক ঘণ্টা লক্ষ্য করিলেই ঐ সকল গ্রহের উপরিভাগের কিছু পরিবর্ত্তন বুঝা যায়। এই পৃথিবীতে আমরা নির্ম্মল আকাশে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘন ঘটা দেখি; আবার পরক্ষণেই হয়ত, মেঘ সকল বিদূরিত, এবং নির্ম্মল আকাশ প্রকাশিত দেখি; সুদূরস্থ বৃহস্পতি, শনি অথবা, মঙ্গলাদি গ্রহের ঐ প্রকার মেঘমালা অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্র অপেক্ষাকৃত অনেক নিকটে থাকিলেও ঐ প্রকার মেঘের চিহ্ন চন্দ্রের উপর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। জল অথবা জলীয় বাষ্প চন্দ্রে থাকিলে, অথবা কোনও প্রকার বায়ু থাকিলে, নিশ্চয়ই মেঘ হইত, এবং বৃহদাকার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে নিশ্চয়ই ঐ সকল মেঘ দেখিতে পাওয়া যাইত।

দূরবীক্ষণের আবিষ্কার হইতে এ পর্য্যন্ত কোনও জ্যোতির্ব্বিদ্ যখন চন্দ্রে ঐ সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, অতএব, চন্দ্রলোকে জলবায়ু আদৌ নাই, বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

চন্দ্রের বায়ুশূন্য অবস্থার আরও প্রমাণ আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, চন্দ্রের গতি আকাশ মার্গে প্রতিদিন প্রায় ১৩ অংশ, সুতরাং চন্দ্রের পথে যে সকল তারকা থাকে, উহার প্রায়ই চন্দ্রকর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হয়, এবং অল্প পরে আবার প্রকাশিত হয়। যদি চন্দ্রের উপরিভাগে কোনও প্রকার বায়ুমণ্ডল থাকিত, তাহা হইলে, যে সময়ে ঐ সকল তারকা চন্দ্র-পরিধির নিকটস্থ হয়, সেই সময় উহাদের ক্রমশঃ অন্তর্ধান দৃষ্ট হইত। বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া কোনও জ্যোতিষ্ক দেখিতে হইলে, জ্যোতিঃ-রেখার কিছু বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে রিফ্রাক্সন্ (Refraction) বলেন। জ্যোতিঃ-রেখার ঐ প্রকার বিকৃতও দেখা যায় না।

অন্যান্য তারকাগুলি যে সময়ে চন্দ্র পরিধির নিকটস্থ হয়, সেই সময়ে ঐ সকল তারকার জ্যোতিঃ কিছু মাত্রও বক্রভাবাপন্ন দেখায় না; আর তারকাগুলি ক্রমশঃ অন্তর্ধান না হইয়া, একেবারেই চন্দ্রের পার্শ্বে ডুবিতে দেখা যায়। চন্দ্রের উপরিভাগে বায়ুর স্তর থাকিলে কখনই ঐ প্রকার দেখা যাইত না।

চন্দ্রের বর্ত্তমান অবস্থা যে প্রকার, তাহা দেখিয়া আমরা এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দুরবস্থার আভাসও পাইতেছি। চন্দ্র যে প্রকার জলবায়ুশূন্য হইয়া জীববাসের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে, এই পৃথিবীও কোনও সুদূরকালে নিশ্চয়ই

ঐ প্রকার জলবায়ুহীন হইবে,—একথা চন্দ্র দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি।

চন্দ্রের বায়ুমণ্ডল কোথায় গেল? জল-সমুদ্রের মত বায়ু-সমুদ্রও কি চন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। প্রোক্‌টার নামক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, কোনও প্রকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইয়া উপরিস্থ বায়ুর উপাদান-সকল অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে। —উদাহরণ স্থলে মনে করা যাউক, চন্দ্রের বায়ুতে অক্সিজেন্ বাষ্প ছিল; চন্দ্রের একটা আবর্ত্ত হইতে একমাস লাগে। সুতরাং আমাদের ১৫ দিন পরিমাণ কাল চন্দ্রের দিবা, এবং ১৫ দিবস ব্যাপিয়া রাত্রি হইয়া থাকে। এক-পক্ষকাল ধরিয়া প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে চন্দ্রের উপরিভাগ ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত হয়; আমাদের এই পৃথিবীর উপরিভাগে চৈত্র বৈশাখ মাসে যদ্যপি একটা লৌহকটাহ রৌদ্রে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহার উত্তাপ ১৫০° f হইতে পারে। চন্দ্রের উপরি-ভাগে যদি সেই লৌহকটাহ এক পক্ষ ধরিয়া ক্রমাগত সেই প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই লৌহকটাহের উত্তাপ ১৫০° × ১৫ = ২২৫০° f হইতে পারে। আরও অধিক হইবারই কথা; আমরা কম করিয়াই ধরিলাম। চন্দ্রমণ্ডলস্থিত সর্ব্বপ্রকার ধাতু ঐ প্রকার উত্তাপে তরল হইয়া যাইবে। এই প্রকার তরল অবস্থায় সীস, রঙ্গ, দস্তা প্রভৃতি ধাতু বায়ুর উপাদান অক্সিজেন্ গ্রহণ করিয়া অক্সাইড্ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। অনন্তকাল এই ভাবে চন্দ্রমণ্ডলস্থিত সকল ধাতুর অক্সাইড্, নাইট্রেট্, এবং কার্ব্বনেট্ সকল প্রস্তুত হইয়া, বায়ু-সমুদ্র ক্রমশঃই পাতলা হইয়া পড়িয়াছে।

বায়ু উত্তপ্ত হইলে ক্রমশঃ পাতলা হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় উহার উপাদান সকল বিযুক্ত হইয়া নানা-প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

এক পক্ষকালব্যাপী দিবসের পর যখন ঐ প্রকার দীর্ঘরাত্রি আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময়ে ভয়ঙ্কর একটা শৈত্য আসে। আমরা এই পৃথিবীতে নিয়তই দেখিতে পাই, প্রস্তরাদি উত্তপ্ত করিয়া অকস্মাৎ শীতল করিলে তাহা ফাটিয়া যায়। চন্দ্রমণ্ডলেও ঐ ব্যাপার নিয়তই ঘটিতেছে। দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপের পর রাত্রিকালের অত্যধিক শৈত্যবশতঃ চন্দ্রমণ্ডলের পর্ব্বত সকল ফাটিয়া নূতন নূতন আগ্নেয়গিরি উদ্ভূত হইতেছে। চন্দ্রমণ্ডলের উপর সেই কারণেই অনেক আগ্নেয়পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রলোকের দৃশ্য (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের আগ্নেয়-পর্ব্বতশ্রেণী)।

উপরোক্ত চিত্রে চন্দ্রলোকের একটা দৃশ্য দেখান হইয়াছে। সূর্য্যের আলোকে পর্ব্বতসকল উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে, কিন্তু আকাশমণ্ডলে বায়ু না থাকায়, আকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণের দেখাইতেছে, এবং দিবাকালেও নক্ষত্র সকল উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট রহিয়াছে।

অন্যান্য গ্রহাদির দূরত্বের তুলনায় চন্দ্র আমাদের খুব নিকটে অবস্থিত। বড় বড় দূরবীক্ষণে চন্দ্রমণ্ডল যে প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, উপরোক্ত চিত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

চন্দ্রলোক হইতে আমাদের এই পৃথিবী কি প্রকার দেখায়?—এই বিষয় ভাবিলে আরও চমৎকৃত হইতে হয়। অবশ্য একটা কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি, চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইয়া কোনও মানুষ পৃথিবীর আকৃতি দেখে নাই; জ্যোতিষতত্ত্বের আলোচনা, যুক্তি এবং অনুমান দ্বারাই এই সকল কথা বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন।

চন্দ্রের অপেক্ষা পৃথিবী প্রায় ত্রয়োদশ গুণ বৃহৎ। আমরা পূর্ণিমার নিশাকালে পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে যত বড় আকারের দেখিতে পাই, চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবী তাহার অপেক্ষা তের গুণ বৃহৎ দেখায়। সূর্য্যের আলোক চন্দ্রের উপর হইতে প্রতিভাত হইয়া যেমন আমাদের নিশাকালে জ্যোৎস্না হয়, পৃথিবীর উপর হইতেও সূর্য্যের আলোক সেই ভাবেই প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডল ১৩ গুণ জ্যোৎস্নাময়ী হইয়া থাকে।

যে ভাবে আমরা চন্দ্রমণ্ডলের উপর "কলঙ্ক রেখা" দেখিতে পাই, চন্দ্রলোকে যদি বর্ত্তমানকালে কোনও জীব থাকিত, তাহারা ভূমণ্ডলের আকৃতি ঠিক মানচিত্রের ন্যায় দেখিতে পাইত। এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, এবং আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশসকল, অথবা হিমালয়াদি পর্ব্বতশ্রেণীসকল চন্দ্রলোক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

আমরা পৃথিবী হইতে চন্দ্রের যে সকল কলা-চিহ্ন দেখি, চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীরও সেই প্রকার কলা-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী হইতে যে সময়ে পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক সেই সময়ে চন্দ্রলোকের অমাবস্যা; অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে সেই সময়ে পৃথিবীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের অমাবস্যা তিথিতেই চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীর আকৃতি সম্পূর্ণ আলোকিত দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ২৩৪, ৭৯৩ মাইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চন্দ্রের অর্দ্ধাংশ (অর্থাৎ অপর দিক্) আমরা দেখিতে পাই না। সুতরাং সেই দিক্ হইতে পৃথিবীও দেখা যায় না। চন্দ্রের যে দিক্‌টা আমরা দেখিতে পাই না,সে দিকে যে কি আছে, তাহাও উপস্থিত আমাদের জানিবার উপায় নাই। চন্দ্রলোকের রাত্রিকালে পৃথিবীর আলোক (Earth shine) দ্বারা সেই দিকের অন্ধকার নাশ হয় না; বার-মাসই অমাবস্যার মত অন্ধকার থাকে।

পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যন্ত্রাদির সাহায্যে চন্দ্রলোক সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছেন, আমরা তাহার বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে, এই স্থলে অপর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

এইসকল জ্যোতিষিক প্রবন্ধে আমাদের যে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের বর্ণনা করিতেছি, ঐ সকল বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রমতসকল কোনও কোনও স্থলে বিরোধী হইতেছে। যাঁহাদের হিন্দুশাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা এইসকল প্রবন্ধের অনেক কথা শাস্ত্রবিরোধী মনে করিবেন; এবং সপ্তদশ খ্রীষ্ট শতাব্দীতে ইটালি দেশে গ্যালিলি কর্ত্তৃক দূরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হইলে খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক-মহলে যে প্রকার সর্ব্বনাশের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এইসকল তথ্য সাধারণের গোচর করিলে, হয়ত তাহাদের শাস্ত্রবিশ্বাস কমিবার আশঙ্কা হইবে; সুতরাং এই সকল বৈজ্ঞানিক কথা প্রচার করিলে, নাস্তিকতা, অথবা শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধার বিস্তৃতি পক্ষে সহায়তা করা হয়;—যাঁহাদের ঐ প্রকার ধারণা, আমরা তাঁহাদের কিছুই বলিব না।

বৈজ্ঞানিক কথাসকল আমাদের আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে কি প্রকার রূপক মিশ্রিত হইয়া আছে, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণদ্বারা বুঝিতে পারা যায়। মহাভারতের পৌষ্য পর্ব্বে আছে;—

"উতঙ্ক এইরূপে সর্পদিগকে স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডল-দ্বয় লাভ করিতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, দুটি স্ত্রীলোক সুচারু বাপদণ্ডযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে। সেই তন্ত্রের সূত্র সকল শুক্ল এবং কৃষ্ণ বর্ণ; এবং দেখিলেন, দ্বাদশ অরযুক্ত একখানি চক্র ছয়টি শিশু কর্ত্তৃক ভ্রামিত হইতেছে। আর একজন পুরুষ ও অতি মনোহর একটি অশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন।"

—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

উহা দেখিয়া অবধি উতঙ্ক উহার বিষয় ভাবিতেছিলেন; পরে তাঁহার গুরুসন্নিধানে উহার অর্থ জিজ্ঞাসু হইলে, উপাধ্যায় বুঝাইতে লাগিলেন,—

"বৎস, তুমি যে দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, উহা সংবৎসর। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যে তন্তু দেখিয়াছিলে, উহা দিবা-রাত্র। ছয়টি কুমার ছয় ঋতু। যে পুরুষ দেখিয়াছিলে, তিনি পর্জ্জন্য, আর অশ্বটি অগ্নি।" ইত্যাদি।

উক্ত উদাহরণদ্বারা মহামুনি ব্যাস কি স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন না যে,—শাস্ত্রকথার গভীর ভাবার্থ আছে?

আমরা ইহা স্বীকার করি যে, সংস্কৃত ভাষায় ঐ প্রকার গভীর অর্থ থাকিলেই সেই রচনার আদর হইত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত 'আনন্দলহরী', এবং পুষ্পদন্ত প্রণীত 'মহিম্নস্তব' এই কথার সম্যক্ উদাহরণ। কিন্তু একথাও না বলিয়া পারিতেছি না যে, শাস্ত্রে এমন কথাও অনেক আছে যাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। চন্দ্র উপগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের ভ্রম এই স্থলে দেখাইতে বাধ্য হইলাম।—পৌরাণিকেরা বলেন, (১) চন্দ্র সূর্য্যাপেক্ষাও বড়, এবং সূর্য্যাপেক্ষাও দূরে অবস্থিত; (২) চন্দ্র জলময়; (৩) সেই জলের উপর হইতে সূর্য্যবিম্ব প্রতিভাত হইয়া জ্যোৎস্নারূপে পৃথিবীতে নৈশ-অন্ধকার

দূর করে।—এই সকল উক্তিতে কি মহাভ্রম লক্ষিত হইতেছে না?

বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা পৃথিবীস্থ সকল জাতির উন্নতি হইতেছে, আর আমাদের দেশে শ্রদ্ধা-ভক্তির চর্চ্চা করিতে গিয়া আমরা ভ্রান্তবিশ্বাসরূপ কাচের ঘরে বসিয়া আছি!—কাচের ঘর পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়েই আমরা ব্যতিব্যস্ত! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

শ্রীআদীশ্বর ঘটক।

অভিমান

সকল কাজে, সকল ভাবে,
কেমন করে' তোমায় পা'বে
পরাণ মম—
তুমিই যদি এমন করে'
ধরাই না দাও সকল হরে'—
হৃদয়-রম?
দিচ্ছ কতই নিত্য নব;
সে সব নিয়েই মুগ্ধ র'ব,—
এমন নহি।
দিচ্ছ বলে'ই কচ্ছি দাবী;
পাচ্ছি বলে'ই প্রেমিক ভাবি'
মর্ম্মে দহি!
দিনের পরে দিন চলে যায়;
আর যে ঠাকুর, আশায় আশায়
বাঁচতে নারি।
বাঁচাও যদি, দাও হে দেখা;
সইতে নারি,—বড়ই একা
তোমায় ছাড়ি!
শুধুই দানের বাহার দেখে,'
রইব ভুলে'—এসব যে কে
দিচ্ছে মোরে,—
তেমন ভোলা নইগো আমি।
থাকৃতে নারি দিবস-যামি'
নেশার ঘোরে!
মায়ার মাঝে মজিয়ে রেখে'
পালিয়ে যাবে কেবল ডেকে,
—এসব রীতি
অনেক হ'ল; আজকে খেলায়
সাধ হ'য়েছে বন্ধু, তোমায়
বারেক জিতি।
হার তো আমার অনেক হ'ল;
এখন হেরে' মাতিয়ে তোল
দয়াল নামে!
'দয়াল' নামে কাঁপুক্ গগন,
দুলুক্ সিন্ধু, নাচুক্ পবন
বিশ্ব-ধামে!
অসীম টানে আকুল করে,'
মাতিয়ে যদি না দাও মোরে
দুঃখে সুখে,
—প্রেমের তবে ধার ধারিনে;
আজো যদি না লও ছিনে'
অভয় বুকে!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

মন্ত্রশক্তি

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—রাজনগরের জমিদার হরিবল্লভ, কুলদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া, উইলসূত্রে তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অধিকাংশ দেবত্র, এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণিকে ও পরে তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে পূজারী হইবার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুকালে তর্কচূড়ামণি নবাগত ছাত্র অম্বরকে পুরোহিত নিয়োগ করেন,—পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ রাগে টোল ছাড়িয়া অম্বরের বিপক্ষতাচরণের চেষ্টা করে। উইলে আরও সর্ত্ত ছিল যে, রমাবল্লভ যদি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে সুপাত্রে অর্পণ করেন, তবেই সে দেবত্র ভিন্ন অপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে;—নচেৎ, দূরসম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি ঐ সকল বিষয় পাইবে—রমাবল্লভ মাসিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিমাত্র পাইবেন;—কিন্তু মনের মতন পাত্র মিলিতেছে না!

গোপীবল্লভের সেবার ব্যবস্থা বাণীই করিত। অম্বরের পূজা বাণীর মনঃপূত হয় না—অথচ কোথায় খুঁৎ, তাহাও ঠিক ধরিতে পারে না! স্নানযাত্রায় 'কথা' হয়—পুরোহিতই সে কথকতা করেন। কথকতায় অনভ্যস্ত অম্বর থতমত খাইতে লাগিলেন—ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর একদিন পূজার পর বাণী দেখিলেন, গোপীকিশোরের পুষ্পপাত্রে রক্তজবা!—আতঙ্কিতা বাণী পিতাকে একথা জানাইলেন।—অম্বর পদচ্যুত হইলেন! টোলে অদ্বৈতবাদ শিখাইতে গিয়া, অধ্যাপক-পদও ঘুচিয়া গেল!—তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বাণীর বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণপ্রায়! ১৫ দিনের মধ্যে তাহার বিবাহ না হইলে বিষয় হস্তান্তরে যায়! রমাবল্লভের দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় মৃগাঙ্ক—সকল দোষের আকর, গুণের মধ্যে মহাকুলীন! তাহারই সহিত বাণীর বিবাহের প্রস্তাব হইল—মৃগাঙ্ক প্রথমে সম্মত হইলেও পরে অসম্মত হইল। সে অম্বরের কথা [illegible]পন করিল। রমাবল্লভ ও বাণীর এ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি,—অগত্যা, বিবাহান্তে অম্বর জন্মের মত দেশত্যাগ করিবেন এই সর্ত্তে, বাণী এই বিবাহে সম্মত হইলেন। রমাবল্লভ অম্বরকে আনাইয়া এই প্রস্তাব করিলে, তিনি সেরাত্রিটা ভাবিবার সময় লইলেন। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া অম্বরের সহিত বাণীর সাক্ষাৎ—বাণীও তাঁহাকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল। অম্বরের সে রাত্রি অনিদ্রায়—চিন্তায় কাটিল!

রমাবল্লভেরও তথৈবচ। পরদিন প্রাতে অম্বরনাথ রমাবল্লভকে জানাইল—সে বিবাহে সম্মত। অগত্যা যথারীতি বিবাহ, কুশণ্ডিকা সুসমাহিত হইয়া গেল।]

বিংশ পরিচ্ছেদ

বাণীর বিবাহ চুকিয়া গেলে আরও দু'চার দিন রাজনগরে কাটাইয়া মৃগাঙ্কমোহন নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেল। অত বড় সম্পত্তিটা যে তাহার বুদ্ধির দোষে হস্তগত হইল না, সে জন্য কিন্তু সে কিছুমাত্রও অনুতপ্ত হইল না। তাহার প্রকৃতির এটা একটা বিশেষত্ব।

দুপুর বেলা রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে —বাড়ী নিস্তব্ধ। কেবল রান্নাঘর হইতে হাতাবেড়ির শব্দ আসিতেছিল। মৃগাঙ্কমোহন রোয়াকে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—'দিদি!' সাড়া না পাইয়া, রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া, ভিতরে উঁকি মারিল; দেখিল, গন্‌গনে কয়লার চুল্লির উপর কড়া চাপাইয়া একমনে অজা দুধে জ্বাল দিতেছে। মাথায় কাপড় নাই, চুলগুলি পিছনে ফেলা, লম্বাচুলের শেষপ্রান্তে একটি গ্রন্থি দেওয়া। কাপড়ের আঁচলখানি কোমরে জড়ান। পদশব্দে সে চকিত হইয়া চাহিল;—হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া গাল দুটি একটু লাল হইয়া উঠিল, আঁচল টানিয়া মাথায় তুলিয়া দিয়া সে আবার নতমুখে ফুটন্ত দুগ্ধের মধ্যে ঘন ঘন হাতা চালাইতে লাগিল; দুধ তখন উর্দ্ধে উথলাইয়া উঠিতেছিল। মৃগাঙ্ক একটুখানি দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিল; তারপর একটু হাসিয়া বলিল,—"ওগো, একবার চাহিয়া দেখিলে তোমার দুধ পড়িয়া যাইবে না! এতদিন পরে ফিরিলাম,—লক্ষ্যই নাই যে!"

অজা আঁচল দিয়া কড়া নামাইয়া, বাটিতে গরম দুধ সাবধানে ঢালিতে ঢালিতে, মৃদু হাসিল; কিন্তু কথা কহিল না। মৃগাঙ্ক বলিল,—"দিদি কোথায়?—তুমি রাঁধিতেছ কেন?—বামুনঠাকুরের কি হইয়াছে?"

অজা, কড়া-হাতা সরাইয়া রাখিয়া, বলিল,—"চলিয়া গিয়াছে।"

"কে?—দিদি?"

"না, তিনি উপরে শুইয়া আছেন;—বামুনঠাকুর চলিয়া গিয়াছে।"

"কেন? দিদি ঝগড়া করিয়া বামুনঠাকুরকে তাড়াইয়াছেন বুঝি?

অজা, রান্নাঘরের তাকে মসলা-পাতি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে, একটু হাসিয়া উত্তর করিল,—"না সে নিজেই গিয়াছে! দিদির কলেরা হইয়াছিল;—সেই সময়ে ভয়ে—সে, আর সেই নিতাই চাকরটা, দু'জনেই পলাইয়া গিয়াছে।"

"দিদির কলেরা হইয়াছিল!—খবর দাও নাই কেন? সারিয়াছেন ত?"—"সারিয়াছেন", বলিয়া অজা জলের ঘটি তুলিয়া হাত ধুইবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রসন্নময়ী ভীষণ রোগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সবেমাত্র জয় লাভ করিতেছেন,—এখনও জয়পরাজয় অনিশ্চিত! মৃগাঙ্ক-মোহন আসিয়া, তাঁহার শীর্ণ-শরীরে হাত বুলাইয়া বলিল,"কি হইয়া গিয়াছ দিদি!—খবর দাও নাই কেন?" প্রসন্নময়ীর কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর এখন ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে; মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তুই এসে আর কি কর্‌তিস্? খারাপ অসুখ; না আসাই ভাল! তা' যাই হ'ক মৃগু! বাঁচি, না-বাঁচি, একটা কথা বলিয়া রাখি, বউকে আর অযত্ন করিস্‌নে—ও বড় ভাল মেয়ে; অসুখের সময় আমার যা' করিয়াছে, মায়েও তেমন পারে না—পেটের মেয়েও অমন পারে না।" মৃগাঙ্ক বলিয়া উঠিল, "তবু আমায় লেখা উচিত ছিল, যা'হ'ক বাঁচিয়া উঠিয়াছ—এই যথেষ্ট!" "বাঁচি, না-বাঁচি, একই কথা! থাকিতেও আপত্তি নাই, যাইতেও নারাজ নই;—যাহা হউক, মানুষের মেয়ে ঘরে আসিয়াছে বটে!—বিপদ্ নহিলে যে বন্ধু চেনা যায় না, এবার প্রত্যক্ষ দেখিলাম!"

গিলাকরা পাঞ্জাবীর উপর কোঁচান চাদর ফেলিয়া মৃগাঙ্ক-মোহন বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল; হঠাৎ কি ভাবিয়া রান্নাঘরের দিকে ফিরিল। দালানে বসিয়া অজা পান সাজিয়া স্তূপাকার করিয়াছে; বাবু বাড়ী আসিয়াছেন, মজলিস্ বসিবে, পানের প্রচুর আয়োজন রাখা দরকার। মৃগাঙ্ককে দেখিয়া, সে মাথার কাপড় টানিয়া দিল! মৃগাঙ্ক হাসিয়া বলিল,—"কি বন্ধু! বন্ধুর কাছে ঘোমটা কেন? দু' চারিটা পান দাও দেখি। একি! কত পান সাজিয়াছ! আজ কি বাড়ীতে কোন ক্রিয়া-কলাপ আছে?"

অজা কিছু বলিল না; ডিবার খোলে পান রাখিয়া সুপারি কাটিতে লাগিল। মৃগাঙ্ক বলিল, "হতশ্রদ্ধার জিনিষ লই না!—হাতে দিলে কি তোমার মান কমিয়া যাইত?"

অজা জাঁতি রাখিয়া, চুণ-মাখা পানের উপর অঙ্গুলির ক্ষিপ্রগতিতে কেয়াগন্ধিখয়ের ফেলিয়া যাইতে লাগিল; মৃগাঙ্কের কথার কোনরূপ জবাব দিল না, অথবা হাতেও পান দিল না। অগত্যা মৃগাঙ্ক নত হইয়া ডিবা হইতে পান তুলিয়া লইল। অজা নতনেত্রে কাজ করিতেছিল,—মৃগাঙ্ক কিছুক্ষণ নীরবে তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, অজা ত বেশ! সেই ত বাণী; অতবড় সুন্দরী—বাণীকেও দেখিয়া আসিলাম, তাহার চেয়েই বা অজা মন্দ কি?—বরং তাহার অহঙ্কারে আদুরে ধরণের কাছে, এর নম্র সলজ্জভাব যেন বেশি সুন্দর! আমি স্ত্রী ভালবাসি না,—তবে অমন বন্ধুটি নেহাৎ মন্দ নয়। আর একটু ভাব করিয়া চলিতে হইবে, কারণ অজার সঙ্গে আমার ব্যবহারটা বোধ হয় তেমন ভাল হয় না।

সেরাত্রে বন্ধুবান্ধব আসিয়া সারেঙ্গ, তবলা লইয়া বসিতেই প্রসন্নময়ীব দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সেই সুর-বেসুরের শব্দ-লহরী-পীড়িত হইয়া উঠিল। অজা 'অডিকোলোন'-জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া মাথায় কপালে পটি বসাইতেছিল, কাতর হইয়া প্রসন্নময়ী বলিলেন—"বাঁচালি ত।—মৃগু হতভাগাই আমায় খুন করিবে! হতচ্ছাড়া বাড়ী ছিল না, ভালই হইয়াছিল। আবার বলেন,—'খবর দাও নাই কেন?' খবর দিলে, বোধ হয় সেইদিনেই আসিয়া আমাকে শেষ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইত!"

অজা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার কোমল শান্ত মুখ অকস্মাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। সে নিজের প্রতি শতঅত্যাচার নীরবে সহিতে পারে, কিন্তু অন্যের প্রতি এতটুকু অন্যায় তাহার প্রাণে সহে না। তখন সে ভৃত্যকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল—'দিদির অসুখ বাড়িয়াছে, শীঘ্র ভিতরে আসিতে হইবে।' সে দিন 'জোহরাবাই' মুজরা করিতে আসে নাই, বন্ধুর দল মাত্র ছিল। মৃগাঙ্ক ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল। দিদির প্রতি তাঁহার ভক্তির অভাব ছিল না। সে মনে করিয়াছিল, 'দিদি ত অনেক সারিরাছেন, একটু গান-বাজনা করিতে ক্ষতি কি? কতদিন পরে আসিলাম!' অন্দরের দ্বারের নিকটে অজা দাঁড়াইয়াছিল। মৃগাঙ্ক শশব্যস্তে প্রবেশ করিবামাত্র সে কঠিনস্বরে কহিয়া উঠিল,—"বাজনার শব্দে দিদির মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়া গিয়াছে!—এই কি গান-বাজনার সময়?"

যে কখনও মুখ তুলিয়া একটা কথা কহে না, সে যদি অকস্মাৎ তীব্র ভর্ৎসনা করে, তাহা হইলে সেটা বড়ই প্রাণে লাগে—বড়ই লজ্জা দেয়! অজার সময়োচিত তিরস্কারে আজ মৃগাঙ্কমোহনের নিজ উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের প্রতিবিম্ব যেন তাহার মানসনেত্রে মুহূর্ত্তে ফুটাইয়া তুলিল;—'সত্যই ত! আমোদ-

আহ্লাদ ভিন্ন তাহার জীবনে যেন আর-কোন গুরুতর কায সাধিবার নাই! বড়বৌ মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া আছে, আর সে বন্ধু লইয়া বাহিরে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া নিশি যাপন করিতে ব্যস্ত!' লজ্জায় তাহার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। একটা ক্ষুদ্র বালিকা—এসংসারে যে দু'দিনের আগন্তুকমাত্র —সেও তার চেয়ে তার শ্রদ্ধেয় দিদির জন্য বেশি ভাবে! —এই চিন্তায়, লজ্জায় সে মর্ম্মাহত হইল।

এই ঘটনার পরদিন, সে বন্ধুবান্ধবদিগের সন্ধ্যার মজলিসে আমোদ করিতে গেল না। প্রাত্যহিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া বাবুর খানসামা বিস্মিত হইয়া রান্নাঘরের ঝি নিস্তারকে ডাকিয়া বলিল,—"বাবু মামার ঘর হইতে এমন গোঁয়ার হইয়া আসিল কেন রে? দিব্য গান-বাজনা খাওয়া-দাওয়া হইত, আমাদেরও কিছু প্রসাদ মিলিত; বেশ থাকা গিয়াছিল!"

মৃগাঙ্ক স্ত্রীর কাছে তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—'দিদি একেবারে না সারিয়া উঠিলে, আর বন্ধুদের এখানে আনা হইবে না।' বন্ধুদের সে কথা বুঝাইয়া বলায়, ক্ষুণ্ণ সহচরবৃন্দ অনেক বিদ্রূপ করিল। কেহ বলিল, "বুঝিয়াছি, বউ তোকে তুক্ করিতেছে।" 'বউ যে তুক্' করে নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অগত্যা সে রাত্রিটা তাহাকে বন্ধু-গৃহেই, বন্ধুদের সঙ্গে, যাপন করিতে হইল। প্রভাতে, নিদ্রা ও নেশা ছাড়িয়া গেলে, যখন ঘরে ফিরিল, তখন হঠাৎ বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। ঘরে রোগী; রাঁধিবার লোক অবধি নাই; একটি বালিকার ঘাড়ে সমুদয় ভার;—আর সে নিশ্চিন্তমনে পরগৃহে আমোদে মত্ত হইয়া রহিল! কোন দিকে না চাহিয়া, তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। প্রসন্নময়ীর সাক্ষাতে যাইতে ভয় হইতেছিল, কিন্তু না গেলেও নয়।—কি করিবে!—কাজেই দু'চারিবার ইতস্ততঃ করিয়া, চোরের মত সসঙ্কোচে, গৃহে প্রবেশ করিল! অজা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল; তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া সরিয়া বসিল। তারপর, মৃগাঙ্ক পাখা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস আরম্ভ করিতেই, সে সেথান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। প্রসন্নময়ী মুখ ফিরাইয়া ছিলেন; মৃগাঙ্কের গৃহপ্রবেশ জানিতে পারেন নাই।— পাশ ফিরিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া যথাসাধ্য গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"সারারাত কোথায় ছিলি, বল্ ত?" মৃগাঙ্ক মাথা নত করিয়া, বাতাস করিতে লাগিল। "না-আস্‌বি ত, বলে গেলিনে কেন? কচি মেয়েটা মুখে রক্ত উঠে মরিয়া যায়!—তোর প্রাণে একটু দয়া মায়া নাই? অর্দ্ধেক রাত হাঁড়ি-হেঁসেল্ লইয়া বসিয়া বসিয়া সে হায়রাণ! আমি মরিলে, ওকে তুই খুন ক'র্‌বি দেখিতেছি! এমন যদি ক'র্‌বি, তবে বিয়ে করেছিলি কেন? কে তোকে মাথার দিব্য দিয়াছিল!" মৃগাঙ্ক দেখিল, চুপ করিয়া থাকিলে দিদি বাড়াইয়াই তুলিবেন। আজকাল তাঁহাকে এই এক নূতন রোগে ধরিয়াছে! সে, ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া ফেলিবার চেষ্টায়, হাসিয়া বলিল,—"তা বিয়েও ত আর নবাব খান্‌জাখাঁর বোন্‌কে করি নাই! কানায়ে ঠেলাটা ওঁর সেখানেও বেশ অভ্যাস ছিল। আচ্ছা, আমি তবে স্নানটা সারিয়া লই;—মাথাটা বড় গরম হইয়া উঠিয়াছে; বেলাও হইয়া গিয়াছে।"

নীচে নামিয়া চাকরকে স্নানের জল দিতে বলিয়া, রান্নাঘরের দিকে আসিতেই দেখিল,—অজাও গৃহে প্রবেশ করিতেছে; বড় ব্যস্ত ভাব। নিকটে আসিয়া দেখিল, চুল্লির উপর ভাতের হাঁড়িতে টগ্‌বগ্ করিয়া ভাত ফুটিতেছে। সে আসিয়া একটা ভাত টিপিয়া দেখিল, ও তৎক্ষণাৎ সেই প্রকাণ্ড হাঁড়িটার গলায় এক গাছা বেড়ি দিয়া ধরিল। মৃগাঙ্ক ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "আহা কর কি,—কর কি! পারিবে না,—পুড়িয়া খুন হইবে যে!" সে তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল; সাগ্রহে বলিল, "থাম,—আমি নামাইয়া দিতেছি।" অজার হাত হইতে শশব্যস্তে বেড়ি টানিয়া লইতে গেল। অজা, তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল,—"না না তুমি ছুঁয়োনা; সব নষ্ট হইয়া যাইবে;— আমি নামাইতেছি।"

মৃগাঙ্ক একটু থতমত খাইয়া বলিল,—"কেন,—আমি ছুঁইলে নষ্ট হইবে কেন?"

"তা হইবে! তুমি সর, ভাত ধরিয়া যাইতেছে; শেষ-কালে কেহ মুখে করিতে পারিবে না।"

"তুমি কি ফুটন্ত ভাতশুদ্ধ অত বড় হাঁড়ি নামাইতে পারিবে?"—মৃগাঙ্ক করুণাপূর্ণ নেত্রে তাহার সুললিত ক্ষুদ্র হাত দুখানির প্রতি চাহিয়া দেখিল, সে অবলীলাক্রমে হাঁড়িটা বেড়ির জোরে নামাইল! হাঁড়ির মুখে ফেন গালিবার সরা চাপাইয়া অজা কহিল, "আমি ত আর নবাব খাঞ্জাখাঁর

বোন্ নহি,--আমার ভাত টাত রাঁধা অভ্যাস আছে।" এই বলিয়াই সে নত নেত্রে সাবধানে হাঁড়িটাকে গামলার উপর কাৎ করিয়া ধরিল।

মৃগাঙ্ক এক মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, কণ্ঠস্বর ও কথাগুলি তাহার নিজের; কিন্তু কেমন করিয়া সেগুলা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না! তবে এই খোঁচটুকু যে তাহার অঙ্গে বিঁধিয়াছে, ইহা না বুঝিতে দিয়াই কথা উল্টাইয়া ফেলিল। "কাল রাত্রে না আসিয়া বড় অন্যায় করিয়াছি;—না! রাগ করিয়াছিলে?"

"আমি!" এমনই সুরে অজ্ঞা উত্তর দিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল যে, মৃগাঙ্ক তাহাতে বড়ই লজ্জিত হইল! এই একটি 'আমি'! কথায় বলিল—'তুমি রাত্রিতে বাড়ী ফের নাই; তাহার জন্য অজ্ঞার রাগ করিবার কি কারণ আছে যে, রাগ করিব? তুমি বাড়ী থাক,—বাহিরে যাও,—তাহাতে আমার লাভ লোকসান কি?' মৃগাঙ্ক ইহা বুঝিয়াই চুপ করিয়া চলিয়া গেল।

সেই দিন আহারকালে, অজ্ঞা ভাত আসনের নিকটে ধরিয়া দিয়া যখন ফিরিতেছিল, মৃগাঙ্ক হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"উঃ! যা গরম ভাত; একি খাওয়া যায়!" অজ্ঞা তাড়াতাড়ি একখানা পাখা আনিয়া ভাতের উপর বাতাস দিতে লাগিল। এমন করিয়া কখন স্বামীর সম্মুখে সে বাহির হয় নাই বলিয়া, প্রথমে তাহার লজ্জা বোধ হইয়াছিল। কিন্তু তখনই সে মনে মনে ভাবিল,'আহা! খাইতে বসিয়াছে, কষ্ট হইবে যে; না করিয়া কি করি?' ধীরে ধীরে আহার করিতে করিতে মৃগাঙ্ক বলিল,—"বেড়ে রাঁধিয়াছ ত! অনেক দিন এমন মাছের ঝোল খাই নাই;—চড়চড়ি, অম্বল, সবই বেশ হইয়াছে। কবে এত শিখিলে!"

"আমাদের বাড়ী মা ও আমি রাঁধিতাম, দেখিয়া থাকিবে। সেখানে রাঁধুনি বামন ত নাই, বরাবর আমরাই রাঁধি। আমি যখন দশ বছরের, তখন হইতেই একবেলা রান্না চালাইতাম।"

"আহা কর কি, কর কি! পারিবে না, পুড়িয়া খুন হইবে যে!"

মৃগাঙ্ক হঠাৎ আহার বন্ধ করিয়া, অজ্ঞার মুখের দিকে চাহিয়া, বলিল,—"ঘামে কপালে চুলগুলি ভিজে গেছে যে"! বলিতে বলিতে সে বাম-হস্ত দিয়া ললাট-সংলগ্ন কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিতে গিয়া—তাহার চমৎকার কোঁকড়ান চুল দেখিয়া—বলিয়া উঠিল,—"বা! বা! অজ্ঞা, তোমার এমন চুল ত কখনও—" দ্রুত বেগে মাথা সরাইয়া লইয়া অজ্ঞা মাথার কাপড় একটু খানি টানিয়া দিল। তাহার উভয় গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে পাখা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

মৃগাঙ্কমোহনের সেদিন মনের ভিতর কি যেন একটা

পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। সে নানা অছিলায় বারংবার রান্না ও ভাঁড়ারের দ্বারে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। যতবার অজ্ঞাকে দেখিল,ততবারই দেখিল—এক বাক্যহীনা যন্ত্রের পুতুল ঘরের মধ্যে ঘুরিতেছে! আবার দিদির ঘরে গিয়া দেখে,—সেই মূর্ত্তি নিপুণ-হস্তের সেবাদ্বারা দিদির কাতরশীর্ণ মুখে শান্তির প্রসন্নতা ফুটাইয়া তুলিতেছে! একসঙ্গে এমন ভাবে একই নারীকে—গৃহিণী, জননী, সেবিকা রূপে—সে আর কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। তাই, অজ্ঞায় এই তিনের মিলন দেখিয়া,অবাক্ হইয়া গেল। অনাদৃতা পত্নীর স্বামীর প্রতি অভিমান পোষণ করাই স্বাভাবিক, কিন্তু অজ্ঞার মুখে ত অভিমানের চিহ্নমাত্র নাই;—অত্যধিক গাম্ভীর্য্য আসিয়া, তাহার অপরূপ লাবণ্যময়ী শ্রীকে ত ম্লান করে নাই! 'এ কি মূর্ত্তি! এতদিন ইহাকে লইয়া সকলের সম্মুখে হাস্য-পরিহাস করিয়াছি; এক দিনের জন্যও ত ইহাকে যত্ন করি নাই!' তখন তাহার নিজের উপর বড় অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। চটুল-চাহনি বিলাস-হাস্য-লীলারঙ্গে রঙ্গময়ী জোহরাকে ইহার পার্শ্বে কল্পনা করিতে লজ্জায় আকণ্ঠ-ললাট লাল হইয়া আসিল। ভাবিতে লাগিল—"ছিঃ! আমি কি মানুষ!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার প্রলোভন বড় প্রবল; কিন্তু আজ, নবজীবনের সূচনায়, কঠিন শপথ করিয়া সে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এ কাল-সন্ধ্যাকে প্রত্যাখ্যান করিতেই হইবে; কিন্তু ভাবিতেছে, কেমন করিয়া সময় কাটে! দিদি ঘুমাইতেছেন,—ঘর নিস্তব্ধ। সেখান হইতে সরিয়া আসিল। রান্নাঘরে নূতন রাঁধুনি আসিয়াছে; সেখানটাকে যেন একান্ত শ্রীহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। চারিদিকে—ঘরে বাহিরে—ঘুরিয়া, অবশেষে সে ছাদের উপরে উঠিয়া গেল। সেখানে অস্তগত সূর্য্যের বিদায়-অভিনন্দন গোলাপী অক্ষরে সাজাইয়া প্রকৃতি দেবী বিষণ্ণনেত্রে চাহিয়াছিলেন; চারিদিকে ধীরে ধীরে আঁধারের নীরব বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠিতেছিল;—সে দৃশ্য তাহার ভাল লাগিল না। ছাদ হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে অজ্ঞার কক্ষে প্রবেশ করিল। কয়দিনের দিবারাত্র প্রাণান্ত পরিশ্রমে ও অনিদ্রায় অজ্ঞার শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। শুধু মনের জোরে সে কলের মত শরীরটা টানিয়া চালাইয়া ফিরিতেছিল; আজ একটুখানি ছুটি পাইবামাত্র, বাঁধ-ভাঙ্গা জলের মত, তাহার বহুদিনের সঞ্চিত অবসাদ তাহাকে ভাসাইয়া দিল। ক্লান্তভাবে বিছানায় পড়িয়া সে চোখ মুদিয়াছিল। তাহাকে নিদ্রিত বোধে মৃগাঙ্ক একটু সাহসের সহিত শয্যার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

অজ্ঞা ঘুমায় নাই; সে কয়দিনপরে অবসর পাইয়া নীরবে নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিল। আজ, এত দিন পরে, সে তাহার স্বামীকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছে। নিজের হাতে ভাত বাড়িয়া, কাছে বসিয়া, খাওয়াইয়াছে। শুইয়া সে এই সব কথাই ভাবিতেছিল। স্বামী—স্বামীর কথা মনে পড়িতেই একটা আকুল নিঃশ্বাস তাহার বক্ষ মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসিল। স্বামীই বা কে তাহার? বন্ধু—শুধু বন্ধুমাত্র! কিন্তু বন্ধু কি ইহাকে বলে? বরং শত্রু বলিলেও বলা যায়। অজ্ঞা আবার স্পষ্ট গভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বিবাহের সময় সে তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে কত আশাই করিয়াছিল;—ভাবিয়াছিল, ওই সুন্দর দেহের মধ্যে অমনই একটি সুন্দর হৃদয় লুকান আছে,—সে হৃদয় তাহার সহিত বিনিময় হইয়া সে তাহারই হইবে। নিতান্ত আপনার ভাবিয়া, তাই সে তাহার লজ্জানত নেত্রের গোপন কটাক্ষে দু'এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই ভালবাসিবার মত মুখখানি দেখিয়া লইয়াছিল; অমনই সেই সঙ্গে তাহার কুমারী-হৃদয়ের প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার দু'খানি পায়ের নীচে নিবেদনও করিয়া দিয়াছিল। তারপর, সেই দুদিন কতবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সে ভীতিস্পন্দিত হৃদয়ে, লজ্জা-জড়িত নেত্রে, সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে। লজ্জায় মুখ তুলিতে পারে নাই, কিন্তু তা বলিয়া দেখার সুখেও বাধা ছিল না; পা দু'খানি ত চোখের সম্মুখেই বিদ্যমান ছিল। সে ক'টাদিন তাহার বালিকা-হৃদয় কি অপূর্ব্ব পুলকভরে কম্পিত হইত—কি আশার রাগিণী কর্ণমূলে ঝঙ্কার করিত।—নূতন জীবনের একটা হর্ষ, নূতন সাজে—নূতন আনন্দে জীবন-প্রান্তে ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছিল। নববসন্তের সমাগমে প্রকৃতির বুঝি এমন পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে! তারপর, বসন্ত আসিবার পূর্ব্বেই, তাহার সাজান বাগানে কাল-

বৈশাখীর একটা ঝাপ্‌টা আসিয়া সব যেন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া গেল! সে বুঝিল, তাহার আশা দুরাশা মাত্র! যে সুন্দর হৃদয়খানির প্রতি সে লুব্ধনয়নে চাহিয়া ছিল, তাহা সুন্দর ত নহেই; এমন কি হৃদয় বলিয়া সেখানে কিছু বর্ত্তমান আছে কি না—সে বিষয়েও তাহার ঘোর সন্দেহ হইয়াছিল।

সে এতদিন তাহার যে পরিচয় পাইয়া আসিয়াছে, রমণীর পক্ষে স্বামীর সে পরিচয় অতি ভয়াবহ! বেশি আশা তাহার নাই; কিন্তু এত বড় নিষ্ঠুরতাও বোধ হয় আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। স্বামীর এই ঘোর অধঃপতন নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া, নিতান্ত পরের মত, দুইটি খাইয়া পরিয়া শুধু, এই ঘরে তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইবে! জোর করিয়া একটা কথা বলিবারও অধিকার নাই! সংসারে একটু স্থান থাকিলে, সে এত-খানি সহিতে পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু পিত্রালয়ে তাহার মা ছিল না,—মমতাহীনা বিমাতার সংসারেই বা কোন্ সান্ত্বনার সুখে ফিরিয়া যাইবে?

সে স্থির করিয়াছিল, কাজকর্ম্ম ও স্বামীর সেবা করিয়া, তাহার প্রাণের সেই স্ফুটনোন্মুখী আশার রাগিণী চাপিয়া এ জীবনটা কাটাইয়া যাইবে;—তবুত সে দিনান্তে তাহার দেবতার শ্রীচরণ দেখিতে পাইবে—পিত্রালয়ে ত তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে আজ কিসের সাড়ায় তাহার হৃদয়ে আবার আশা-নিরাশার সঙ্ঘাত বাধিয়া উঠিয়াছে? কেন আবার নব-বর্ষার আকুল জল-কল্লোলের মত কামনা-রাশি তাহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। 'গরীবের মেয়ে কি শুধু দু'টি খাইতে—দু'খানা পরিতে পাইলেই সুখী? তাহার পিতা কি শুধু এই দু'টি দায় হইতে উদ্ধার পাইবার উদ্দেশ্যেই কন্যাদান করিয়া-ছিলেন?' সহসা কি একটা মৃদু শব্দে সে চমকিয়া চোক মেলিয়া দেখিতে পাইল, কে একজন তাহার বিছানার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যার অস্ফুট আলোকে বুঝিতে পারিল,—সে পুরুষ! তাহার ঘরে এমন সময় কে আসিবে? ভয়ে তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল 'মাগো!'

মৃগাঙ্কমোহন তাহার বিস্ময় বুঝিয়া তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"আমি,—অজ্ঞা আমি।" অজ্ঞা অতি-মাত্র বিস্ময়ের সহিত উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তুমি? বেড়াইতে যাও নাই যে?" "না! তোমার অসুখ করিয়াছে বলিয়া বেড়াইতে যাই নাই। ডাক্তার ডাকিয়া আনি?" "ডাক্তার! না—না ডাক্তার কি হইবে?" "ডাক্তার কি হইবে? আমি অনেকক্ষণ হইতে দেখিতেছি, তুমি চোক বুজিয়া শুইয়া আছ,অথচ ঘুমাও নাই। মুখখানাও বড্ড শুকাইয়া গিয়াছে!"

অজ্ঞা লজ্জায় মুখ নত করিল। তবে অনেকক্ষণ সে এখানে দাঁড়াইয়া আছে? ভাগ্যে মনের কথা মুখে বাহির হইয়া পড়ে নাই! অসুখ ভিন্ন যে মানুষ চুপ করিয়া শুইয়া সময় কাটাইতে পারে—ইহা মৃগাঙ্কমোহনের ধারণা ছিল না। সে অজ্ঞার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিতে গেল; বলিল,—"জ্বর হয় নাই ত?" "না"—বলিয়া অজ্ঞা মাথাটা তাহার স্পর্শ হইতে সরাইয়া লইল! মৃগাঙ্কের মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"তবে অসুখ করে নাই?" "না"। "ঠিক বলিতেছ?" "সামান্য মাথা ধরিয়াছে।" "তাহা হইলে ডাক্তার ডাকা ভাল।" না—না, মাথা-ধরায় ডাক্তার ডাকা আমাদের সেখানে অভ্যাস ছিল না; খুব বেশি জ্বর হইলে তখন ডাক্তার আসিত।" মৃগাঙ্ক একটু বিরক্তির সহিত হাসিয়া কহিল,—"এখন ত সেখানে নাই! এখন এখানের মতই ব্যবস্থাটা হউক।"

অজ্ঞার চোকমুখ দিয়া উত্তাপ বাহির হইতে লাগিল। হৃদয় অভিমানে ভরিয়া গেল, কিন্তু একটি কথাও তাহাকে বলিল না; কারণ ব্যথা পাওয়াই তাহার অভ্যাস,—কাহাকেও ব্যথা দেওয়া তাহার স্বভাব নয়। উথলিত অভিমান সযত্নে হৃদয়ে রোধ করিয়া—মৃদু হাসিয়া বলিল,—"দরকার নাই! ও এখনই সারিয়া যাইবে। যাই দেখি, দিদি কি করিতেছেন।" সে খাট হইতে নামিতে গেল। মৃগাঙ্ক সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"দিদি ঘুমাইতেছেন, আমি দেখিয়া আসিয়াছি। দেখ, আজ বেড়াইতে গেলাম না!—খুসী হইয়াছ কিনা?—কই কিছুই বলিলে না ত?"

অজ্ঞা মাথার বালিসের ঝালরগুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল; তদবস্থাতেই মুখ না তুলিয়া বলিল,—"তারা এখানে আসিবে ত?" "যদি না আসে?" অজ্ঞা অবি-শ্বাসের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিল; "একদিনও

না ?” “যদি একদিনও না আসে ?” অজ্ঞার দুই নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; “বেশ হয় !” মৃগাঙ্কমোহন একটু সরিয়া আসিলেন ; “শুধু বেশ হয় ; তুমি খুসী হও না ?” “হই।”—“কেন ?” অজ্ঞার নেত্রে আনন্দের লহর ফুটিল ; সে ঘাড় নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “তা জানিনা,—বোধ হয়—” মৃগাঙ্ক ঈষৎ আগ্রহে খাটের ডাণ্ডা ধরিয়া সম্মুখে একটু ঝুঁকিয়া পড়িল ; “থামিলে কেন ? বোধ হয় কি ?” “বন্ধু তাই।” “বন্ধু !—বন্ধু কি বলিতেছ, বুঝিলাম না।” অজ্ঞা মৃদু হাসিল ; “আমরা বন্ধু নই ?”—“ওঃ !—সেই কথা বলিতেছ !” বলিয়া মৃগাঙ্ক হা হা করিয়া হাসিয়া প্রায় তাহার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল। অজ্ঞা একটু সরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল,—“কেহ শুনিতে পাইবে ; আমি যাই।” এই বলিয়া ব্যস্তভাবে সে নামিয়া দাঁড়াইল। মৃগাঙ্ক আরও শব্দে হাসিতে লাগিল এবং তাহাকে গমনোন্মুখ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে পথরোধ করিয়া বলিল,—“শুনিতে পাইলেই বা ক্ষতি কি ? যাইবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ? একটু দাঁড়াইলে ক্ষয়ে যাবে না ! আমি ত বাঘ নই, যে খাইয়া ফেলিব। শুনিতে পাইলে লোকে বলিবে কি ?”

অজ্ঞা তাহার রকম দেখিয়া অপ্রতিভও হইল—একটু ভীতও হইল। ‘হঠাৎ এতটা ঘনিষ্ঠতার অর্থ কি ? সহজ অবস্থা ত ?’ সে সঙ্কোচে সরিয়া জড়সড় হইয়া বলিল,—“লোকে ভাবিবে না যে, ইহারা সন্ধ্যা বেলা অনর্থক এত হাসিতেছে কেন ?”—“বন্ধু বন্ধুর সহিত হাসে না ? আচ্ছা, হাসিলে যদি তোমার নিন্দা হয়, তবে আর হাসিয়া কাজ নাই। একটা কাজের কথা বলি শোন, মনে করিতেছি, দিনকত একটু হাওয়া খাইয়া আসা যা’ক্।” অজ্ঞা দুই স্বচ্ছ-সরল-নেত্র তাহার কৌতুক দৃষ্টির সহিত মিলাইয়া কহিল,—“আচ্ছা আমি সব গুছাইয়া রাখিব ;—কি কি চাই বলিয়া দিও।”

“শুধু ত আমি যাইব না ; সবাইকেই যাইতে হইবে।” “সবাই !” অজ্ঞা বিস্ময়ের ভাবে তাহার দিকে চাহিল। “হাঁ,—সবাই অর্থাৎ তুমি, দিদি, বামুনঠাকুর, নিস্তারিণী, জগা, নিতাই, সব।” অজ্ঞার নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে স্থির কণ্ঠে কহিল,—“আমি যাইব না।” “কেন ?” “না !” “কেন ?” “আমার ইচ্ছা নাই।”—“কেন ইচ্ছা নাই ?” অজ্ঞা উত্তর দিল না ;—ঈষৎ আরক্ত মুখে সে দৃষ্টি নত করিয়া রহিল। “আমার উপর রাগ করিয়াছ অজ্ঞা ?” বলিয়া মৃগাঙ্ক তাহার হাত ধরিল। “চল, দিনকত বাহিরে ঘুরিয়া আসি ; বাহিরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরেরও পরিবর্ত্তন করিয়া আসি। যাবে না ?” ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া, অজ্ঞা দু’পা পিছাইয়া গেল ; তাহার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল ; তথাপি সে জোর করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—“বন্ধুর উপর কি বন্ধু রাগ করে ?” মৃগাঙ্কের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ; “তবে যাইবে না কেন ?” এবারও সে উত্তর দিল না। “বুঝিয়াছি, আমার জঘন্য চরিত্র বলিয়া তোমার আমার সঙ্গে যাইতে ঘৃণা হয় !” “ঘৃণা ! না—না, ঘৃণা নয় !—ও কি কথা ! ও কথা বলিও না।” অজ্ঞার আর্ত্তস্বরে মৃগাঙ্কের অভিমান দূর হইয়া গেল। সে ত্বরিত গতিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। “সত্য অজ্ঞা, সত্য বলিতেছ—ঘৃণা হয় না ?”—“একটুও নয়।—ঘৃণা হয় না।” “তবে কি,ভয় হয় ?” অজ্ঞা ঘাড় নাড়িল, “বন্ধুর উপর বন্ধুর কি কেবল ঘৃণা আর ভয় হয় ? আর কিছু হয় না !” মৃগাঙ্কের মুখে অনুশোচনাপূর্ণ বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল ; তাহার উপর একটা সলজ্জ আনন্দের মৃদু আলো দেখা দিল। সে তখন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কি কষ্ট !” সঙ্গে সঙ্গে নিকটে দণ্ডায়মানা স্ত্রীর একখানা হাত হাতে ধরিয়া, তাহাকে নিজের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া বলিল, “অজ্ঞা !” অজ্ঞা স্বামীর হস্তমুক্ত হইয়া অনেকখানি দূরে গিয়া দাঁড়াইল ; হাসিয়া কহিল,—“হাঁ, কষ্ট হয় না ? বন্ধুর জন্য বন্ধুর কি কষ্ট হয় না ?” মৃগাঙ্কের আকণ্ঠ-ললাট রাঙা হইয়া উঠিয়া ছিল ; সে সক্রোধে ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, “বন্ধু—বন্ধু ! কে তোমার বন্ধু ? অমন বন্ধুত্বে আমার দরকার নাই। ওছাই বন্ধুত্বের খবর আমায় চব্বিশ ঘণ্টা আর শুনাইও না ;—আমি তোমার বন্ধু নই।” সবেগে দ্বার ঠেলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। অজ্ঞা গভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। “দেবতাদের পক্ষেও বোধ হয় এ চরিত্র বুঝা ভার ! নিজেই বলিলে বন্ধু ! এখন আবার বন্ধুত্বটুকু-পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। বেশ, তবে কাজ নাই। আর বন্ধুত্বের ভাণ না করাই ভাল। হায় দুর্জ্ঞেয় মানব-চরিত্র ! তুমি যে কি—তা আজও বুঝিলাম না ! কখনও মনে হয়, এমন ভাল আর জগতে নাই। কখনও এমন—দূর হউক—বন্ধুই হউন আর শত্রুই হউন, উনি আমার স্বামী—আমার হৃদয়দেবতা ! আমি কোন্ হিসাবে উঁহার কার্য্যের

সমালোচনা করিতে বসি? নরকে পচিয়া মরিব যে। আজ না—আজ যেন কি বদল হইয়াছে! আমার কাছে কি যেন আশা করিতেছিলেন। আমি কি কিছু অন্যায় করিলাম? না, উনি ত নিজেই বলিয়াছেন, 'শুধু আমার বাপকে কন্যাদায় উদ্ধার করিয়া নিশ্চিন্ত।' আমায় উনি চাহেন না। তবে? আজ সহসা এত কাছে টানা কেন?—বুঝিয়াছি!" অকস্মাৎ অজ্ঞার বালিকা-চিত্তের মধ্যে একটা সম্ভাবনার সলাজ স্মৃতি জাগিয়া তাহার গোলাপী কপোল দু'টি রঞ্জিত করিয়া দিল। সেই মধ্যাহ্নের স্বেদজড়িত অলকদামে মৃদু স্পর্শ—আর সেই প্রশংসাসূচক বাক্য তাহার মনে পড়িয়া গেল। আত্মসম্মান-জ্ঞান আসিয়া বুঝাইয়া দিল, সে তাঁহার স্বামীর লালসাবহ্নির ইন্ধন হইবে না—ক্ষণিকের মোহ-পাশে নিজেকে বাঁধিয়া দিবে না।—যদি কখনও যথার্থ স্ত্রী—সহ-ধর্ম্মিনী হইতে পারে, তবেই তাহার এ দেহ মন প্রাণ—সর্ব্বস্ব তাহার হৃদয়-দেবতার শ্রীচরণ তলে সমর্পণ করিয়া—তাহার নারী-জীবন সার্থক করিবে।—নচেৎ নহে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

হিসাবের খাতা

হিসাবের খাতা শেষ হয়ে গেল কালির আখর আঁকি,
জমাখরচের নিকাশ মিলায়ে "চেক" করা সুধু বাকি।
চোখ বুলাইয়া দেখে নেব শুধু উলটি' জীর্ণ পাতা;
নববৎসরে বেঁধে নেব পুনঃ নূতন ধরণে খাতা।
দিবসের আলো মিলাইয়া গেল গ্রামের সীমার পর;
ধান্য ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠিল ঝিঁঝির করুণ-স্বর।
শ্যাম-অঞ্চলে আবরি' আনন, সন্ধ্যা আসিল নেমে;
মন্দির-দ্বারে আরতি-অন্তে, কাঁসর গিয়াছে থেমে।
সিক্ত বসনে কলসী ভরিয়া, বধূরা ফিরেছে ঘরে;
তন্দ্রা-কাতর শ্রান্ত-পল্লী সারা দিবসের পরে।
শ্যাম-প্রান্তরে বালু-চত্বরে, জ্যোৎস্না প'ড়েছে লুটি—
শান্তি-শয়নে সবাই শুয়েছে, আমারি নাহিক ছুটি।
চঞ্চল বায়ে মৃন্ময় দীপ নিবু নিবু থাকি' থাকি'—
আমি বসে' আছি তন্দ্রা-বিহীন খাতায় বদ্ধ আঁখি।
হিসাবের খাতা উলটি' উলটি' কোথা চ'লে গে'ছে ঘুম;
আঙ্গিনার ধারে কেরোসীন দীপ পুঞ্জী করিছে ধূম।
শেষ হয়ে গেল শেষ-পাতাখানি, বাহিরে দেখিনু চেয়ে—
সজিনা ফুলের মদির-গন্ধ ভুবন ফেলেছে ছেয়ে।
শিশির-সিক্ত দূর্ব্বার 'পরে নিমমুকুলের রাশি;
অশোক গুচ্ছে রঙ্গণের ফুলে তরুণ রবির হাসি—
উষার আলোকে নিশার আঁধার চলেছে বিদায় মাগি'।
সবুজ গাছের শাখায় শাখায় পাখীরা উঠেছে জাগি'।
মৃদু উচ্ছ্বাসে, তটের প্রান্তে উচ্ছল নদীজল;
বিশ্বেরে ঘেরি' জাগিয়া উঠেছে কর্ম্মের কোলাহল।
ললাটের স্বেদ মুছিয়া ফেলিয়া বন্ধ করিনু পাতা;
মসী-চিহ্নিত জীর্ণ মলিন, মোর সে পুরাণ' খাতা।
ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ীর ভিতরে ফেলে দিনু তারে আনি';
সুধু খরচের খাতে হিসাব রেখেছে, জমায় শূন্য টানি।

শ্রীস্বরূপা দেবী।

মহাকবি ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় *

(মহাকাব্য)

জগতে শ্রুতিমধুর, মনোমদ পদার্থ অসংখ্য থাকিলেও কাব্যের তুলনায় অন্য সকল বস্তুই নিকৃষ্ট। মধুলুব্ধ ভ্রমরের গুঞ্জনই হউক, আর বসন্তে মদমত্ত কোকিলের কলকণ্ঠ-গীতিই হউক, কবিতার নিকটে সকলেই পরাভূত। একজন কবি বলিয়াছেন ;—

"দ্রাক্ষা ম্লানমুখী জাতা
শর্করা চাশ্মতাং গতা।
সুভাষিতরসস্যাগ্রে
সুধা ভীতা দিবং গতা ॥"

কবিতা-রসের নিকটে দ্রাক্ষার মুখ মলিন, শর্করা ত প্রস্তরচূর্ণে পরিণত, এমন কি সুধা যে তিনিও ভয় পাইয়া সুরলোকে পলায়ন করিয়াছেন!

অপর এক কবি বলেন ;—

"অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ
কর্ণেষু কিরতি মধুধারাম্।
অনধিগতপরিমলাপি হি
হরতি দৃশং মালতীমালা ॥"

সৎ-কবির, কবিতার মর্ম্ম না জানিলেও পাঠমাত্র উহা কর্ণে যেন মধুধারা বর্ষণ করে,—মালতীকুসুমের মালার সৌরভ অনুভবের পূর্ব্বেই উহা নয়ন আকর্ষণ করে।

একজন আলঙ্কারিক লিখিয়াছেন ;—

"চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ
সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন
তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে ॥"

সরলমতি বালকদিগেরও সৎকাব্যপাঠে আনন্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ, লাভ হয়। অর্থাৎ, কাব্য পাঠ করিয়া পাঠক বুঝিতে পারেন—নায়কের চরিত্রের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রতিনায়কের পদবীর অনুসরণ করা কখনই উচিত নহে। যিনি রামায়ণ কাব্য পাঠ করেন, তিনি রামচরিত্রের অনুসরণেই যত্নবান্ হন, কিন্তু রাবণের কার্য্যাবলীর পরিণাম লক্ষ্য করিয়া সে পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন না; সুতরাং পাঠক নীতিমান্ হন। কাব্যপাঠে ভাষাজ্ঞান জন্মে; ভাষায় অধিকার হইলেই বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ব্যবহার-শাস্ত্র প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন হওয়া যায়। ঐ সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি অর্থ প্রাপ্ত হন, এবং অর্থ দ্বারা কাম্য বস্তু লাভ স্বতঃসিদ্ধ। এমন কি, কাব্যপাঠে পরম্পরাক্রমে ধার্ম্মিকজীবনের প্রধান লক্ষ্য—মুক্তিপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি ভাষায় সমধিক ব্যুৎপন্ন, তিনিই মোক্ষলাভের উপায় উপনিষদাদি পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং ভগবানের ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি দ্বারা মোক্ষ-পথের পথিক হন।

বলা বাহুল্য, এতক্ষণ আমরা কাব্য, সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, সংস্কৃত কাব্যই তাহার লক্ষ্য। এই কাব্যরসের আস্বাদন সকলের ভাগ্যে ঘটে না; তজ্জন্য একজন আলঙ্কারিক লিখিয়াছেন ;—

"সবাসনানাং সভ্যানাং,
রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ।
নির্ব্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ,
কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ ॥"

সহৃদয় ব্যক্তিদেরই রসের অনুভব হয়; অর্থাৎ যাঁহারা প্রাক্তন—সংস্কার—বশে কাব্যে হৃদয় অর্পণ করিতে পারেন, তাঁহাদেরই রসের আস্বাদন ঘটে; কিন্তু যাঁহাদের প্রাক্তন-সংস্কার নাই, এবং যাঁহারা কাব্যে চিত্তনিবেশ করিতে পারেন না, তাঁহারা কাব্য-আলোচনার স্থানে কাষ্ঠ-খণ্ড, গৃহভিত্তি, অথবা পাষাণের ন্যায় অবস্থিতি করেন। আলঙ্কারিকদিগের এই সকল মন্তব্যের আলোচনা করিয়া মনে হয়, যাঁহারা ঘোর সংসারী, কেবল পার্থিব লাভ-ক্ষতি গণনার জন্য সংসারে আসিয়াছেন, কাব্য সেই সকল অরসিক ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে পারে না; যাঁহারা যথার্থ হৃদয়বান্ তাঁহারাই কাব্যরসের আস্বাদনে অধিকারী।

* এই প্রবন্ধটি বিগত ৪ঠা পৌষ (১৯এ ডিসেম্বর) কলিকাতা কলেজস্কয়ার 'ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে' লেখক-কর্ত্তৃক পঠিত।

এদেশের যেরূপ প্রাকৃতিক সংস্থান—এখানে বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ঋতুগণ যেমন পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করে—এখানে কানন যেরূপ সৌরভময় বহু কুসুমের আকর—এদেশের মৃদুমন্দ মলয়-সমীরণ যেরূপ উন্মাদক—তাঁহাতে ভারতবর্ষই কাব্য-আলোচনার প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া মনে হয়। তাই বলিয়া কি এদেশে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাহা নহে। এদেশেও বহু দর্শনকার, জ্যোতির্ব্বিৎ এবং পৌরাণিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তথাপি এদেশে যে কবি ও কবিতার বাহুল্য লক্ষিত হয়, সুষমাময়ী প্রকৃতি-দেবীর প্রসন্নতাই উহার প্রধান কারণ। আদিকবি বাল্মীকি, ব্যাস, এবং কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনা জীবিত কবিগণ পর্য্যন্ত গণনা করিলে দেখা যায়—এদেশে যত কাব্যকলাবিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তত নহে।

অদ্য আমরা যে মহাকবির কাব্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়-প্রদানের নিমিত্ত অগ্রসর, তাঁহার নাম ভারবি। এই কবির আবির্ভাবকাল ও জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলাম তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে *। অদ্যকার প্রবন্ধের বিষয়, ভারবির মহাকাব্য "কিরাতার্জ্জুনীয়।" আলঙ্কারিকগণ কাব্যের অনেক শ্রেণীভেদ করিয়াছেন; তন্মধ্যে কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যের শ্রেণী-ভুক্ত। এই কাব্যের আখ্যান-বস্তু, মহাভারতীয় বনপর্ব্বের ষড়্‌বিংশ অধ্যায় হইতে একচত্বারিংশৎ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত বৃত্তান্ত হইতে পরিগৃহীত। কবি, মহাভারতের সমস্ত ঘটনা অবিকল পরিগ্রহ করেন নাই; তিনি স্বকীয় প্রতিভা অনুসারে উহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। কিরাতার্জ্জুনীয়ের বৃত্তান্তটি এইরূপ;—

পাণ্ডবগণ অনর্থকর পাশক্রীড়ায় হৃত-রাজ্য হইয়া বনে আসিয়াছেন; তাঁহারা দ্বৈতবনে বাস করিতেছেন। প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠির, প্রতিপক্ষ দুর্য্যোধনের রাজ্যশাসন-প্রণালী সন্দর্শনের নিমিত্ত একজন বনেচরকে গোপনে হস্তিনাপুর রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে প্রত্যাগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত নিবেদন করিল। বনেচর প্রথমেই ভূমিকায় বলিল;—

"ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ চারচক্ষুষো
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ॥" ১।৪

'মহারাজ! গুপ্তচরগণই রাজাদের চক্ষু; প্রভুদিগকে প্রতারিত করা তাহাদের পক্ষে কখনই উচিত নহে। অতএব, আমার বর্ণিত সংবাদ আপনার পক্ষে প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, আমাকে উহা বলিতেই হইবে; কেন না, হিতকর অথচ মনোহর বাক্য একান্ত দুর্লভ।'

তাহার পর, সেই গুপ্তচর যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্য্যোধনের সুনীতি-সঙ্গত রাজ্য-শাসনের একটি সুন্দর বর্ণনা করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল। তাহার পর, যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ করিয়া অনুজগণের সন্নিধানে সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তেজস্বিনী দ্রৌপদী, শত্রুগণের কৃতকার্য্যতার বার্ত্তা সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল ক্রোধোদ্দীপক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা বীররমণীর পক্ষে একান্ত সমুচিত। আমরা উহার কএকটি শ্লোক ও তাহার মর্ম্ম এখানে উদ্ধৃত করিলাম। দ্রৌপদী বলিলেনঃ—

"ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোদিতং
ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনম্।
তথাপি বক্তুং ব্যবসায়য়ন্তি মাং
নিরস্তনারীসময়া দুরাধয়ঃ॥" ১।২৮

'আপনার ন্যায় মনীষিব্যক্তির নিকট প্রমদাজনের উপদেশবাক্য যদিও তিরস্কার-তুল্য; তাহাহইলেও, দারুণ অপমানে হৃদয়ে যে ব্যথা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মনোবেদনাই আমাকে কিছু বলিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতেছে।'

তাহার পর দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সরলতা এবং তজ্জন্য রাজ্যনাশ, ভীমের অতুল বাহুবল, অর্জ্জুনের বিক্রম ও যুদ্ধ-কৌশল, রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্ব্বে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক দিগ্‌বিজয়, ইদানীং বনবাসের দারুণ ক্লেশ, নিজের মানসিক কষ্টের

* বিগত শ্রাবণ-সংখ্যা ভারতবর্ষ-পত্রের "মহাকবি ভারবি' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কথা সবিস্তর বর্ণনা করিয়া, অবশেষে বলিতে লাগিলেন ;—

"দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশা ততঃ
সমূলমুন্মূলয়তীব মে মনঃ।
পরৈরপর্য্যাসিতবীর্য্যসম্পদাং
পরাভবোঽপ্যুৎসব এব মানিনাম্ ॥" ১।৪১

'শত্রুর জন্য তোমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে বলিয়াই আমি অতীব দুঃখিত; কেননা শত্রু যাঁহাদের বাহুবল অতিক্রম করিতে পারে না, তাদৃশ মানী ব্যক্তিদের দুরবস্থাও উৎসব-বিশেষ।'

"বিহায় শান্তিং নৃপ ধাম তৎপুনঃ,
প্রসীদ সন্ধেহি বধায় বিদ্বিষাম্।
ব্রজন্তি শত্রূনবধূয় নিঃস্পৃহাঃ,
শমেন সিদ্ধিং মুনয়ো ন ভূভৃতঃ ॥" ১।৪২

'হে রাজন্! শমগুণ পরিত্যাগ করুন, শত্রুবধের নিমিত্ত উদ্যোগী হউন, প্রসন্নতা লাভ করুন। নিঃস্পৃহ মুনিগণই শমগুণের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন; কিন্তু রাজারা কখনই শমগুণ অবলম্বন করেন না।'

"পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাঃ,
সুদুঃসহং প্রাপ্য নিকারমীদৃশম্।
ভবাদৃশাশ্চেদধিকুর্ব্বতে রতিং,
নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা ॥" ১।৪৩

'তেজস্বিগণের অগ্রগণ্য এবং যশোধন, আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিরাও যদি পরাভব প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, হায়! মনস্বিতা আশ্রয়শূন্য হইয়া চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইতে চলিল!'

"অথ ক্ষমামেব নিরস্তবিক্রম
শ্চিরায় পর্য্যেষি সুখস্য সাধনম্।
বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষ্ম কার্ম্মুকং
জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্ ॥" ১।৪৪

'আর যদি বিক্রম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমাকেই চিরকালের জন্য সুখের সাধন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আর রাজচিহ্ন ধনুর্ধারণ কেন? (উহা পরিহারপূর্ব্বক) জটাধারী হইয়া অগ্নিতে হোম করুন!'

"ন সময়পরিরক্ষণং ক্ষমং তে
নিকৃতিপরেষু পরেষু ভূরিধাম্নঃ।
অরিষু হি বিজয়ার্থিনঃ ক্ষিতীশা
বিদধতি সোপধি সন্ধি-দূষণানি ॥" ১।৪৫

'শত্রুগণ যখন অবমাননার জন্য উদ্যত, তখন তোমার সেই ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত সময় প্রতীক্ষা করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। শত্রুবিজয়ার্থী নরপতিগণ, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, কোনও ছলে সন্ধিভঙ্গ করিয়া থাকেন।'

দ্রৌপদীর কথা শেষ হইলে, ভীম, অতিশয় বীরত্ব ও উৎসাহসূচক বাক্যে দ্রৌপদীর প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া, যুদ্ধের পক্ষেই মত প্রদান করেন। তিনি, অনেক কথার পর, যুধিষ্ঠিরকে বলেন ;—

"অভিমানবতো মনস্বিনঃ
প্রিয়মুচ্চৈঃ পদমারুরুক্ষতঃ।
বিনিপাত-নিবর্ত্তন ক্ষমং
মতমালম্বনমাত্মপৌরুষম্ ॥" ২।১৩

'যাঁহারা অভিমানী, মনস্বী, এবং একান্ত প্রিয় উন্নতপদ লাভের অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে পুরুষকারই বিনিপাত হইতে রক্ষার একমাত্র উপায়।'

"বিপদোঽভিভবন্ত্যবিক্রমং
রহয়ত্যাপদুপেতমায়তিঃ।
নিয়তা লঘুতা নিরায়তে
রগরীয়ান্ ন পদং নৃপশ্রিয়ঃ ॥" ২।১৪

'বিপদ্, পৌরুষহীন ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। বিপন্ন ব্যক্তির ভাবি উন্নতির আশা থাকে না; ক্ষয়শীল ব্যক্তির লঘুতা নিশ্চিত; একান্ত লঘুব্যক্তি, রাজলক্ষ্মীর আশ্রয়স্থল হইতে পারে না।'

"তদলং প্রতিপক্ষমুন্নতে
রবলম্ব্য ব্যবসায়বন্ধ্যতাম্।
নিবসন্তি পরাক্রমাশ্রয়া
ন বিষাদেন সমং সমৃদ্ধয়ঃ ॥" ২।১৫

'অতএব উন্নতির অন্তরায় উদ্যমহীনতাকে অবলম্বন করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। কারণ, পরাক্রমের নিত্যসঙ্গিনী সম্পদ্ কখনও উদ্যমহীনতার সহিত বাস করিতে পারে না।'

"অথ চেদবধিঃ প্রতীক্ষ্যতে,
কথমাবিষ্কৃতজিহ্মবৃত্তিনা।

ধৃতরাষ্ট্রসুতেন সুত্যজা
শ্চিরমাস্বাদ্য নরেন্দ্রসম্পদঃ॥" ২।১৬

'যদি ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষাই করেন, তাহা হইলেও কি সেই কপটাচারী ধৃতরাষ্ট্র-তনয় সুদীর্ঘকাল রাজ্যসম্পদের সুখ অনুভব করিয়া সহজে উহা পরিত্যাগ করিবে?'

"দ্বিষতা বিহিতং ত্বয়াথবা
যদি লব্ধা পুনরাত্মনঃপদম্।
জননাথ তবানুজন্মনাং
কৃতমাবিষ্কৃতপৌরুষৈর্ভুজৈঃ॥" ২।১৭

'অথবা, শত্রুগণ যদি ত্রয়োদশ-বর্ষান্তে রাজ্যসম্পদ্ প্রত্যর্পণও করে, তাহা হইলে আপনার অনুজগণের পরাক্রমশালী এই বাহুর আর কি প্রয়োজন?'

"মদসিক্তমুখৈর্মৃগাধিপঃ
করিভির্বর্ত্তয়তে স্বয়ংহতৈঃ।
লঘয়ন্ খলু তেজসা জগ
ন্ন মহান্ ইচ্ছতি ভূতিমন্যতঃ।" ২।১৮

'পশুরাজ সিংহ স্বয়ং মদস্রাবী হস্তিগণকে বধ করিয়া, তদ্দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে; মহীয়ান্ ব্যক্তি, জগতের সকলকে নিজের অপেক্ষা লঘু মনে করেন; তিনি কখনও অন্যের অনুগ্রহপ্রদত্ত সম্পদ্ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না।'

"অভিমানধনস্য গত্বরৈ
রসুভিঃ স্থাস্নু যশশ্চিচীষতঃ।
অচিরাংশুবিলাসচঞ্চলা
ননু লক্ষ্মীঃফলমানুষঙ্গিকম্॥" ২।১৯

'অভিমানী ব্যক্তি ক্ষণভঙ্গুর জীবনদ্বারা কল্পান্তস্থায়ী যশ কামনা করেন; ক্ষণপ্রভার ন্যায় অচিরস্থায়িনী সম্পদ্ লাভ, তাঁহারা আনুষঙ্গিক ফল মনে করেন।'

অতএব, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়াই কর্ত্তব্য। ভীমের বাক্য শেষ হইলে, দূরদর্শী ধার্ম্মিক নরপতি যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী এবং ভীমের ক্রোধোদ্দীপক বাক্যে তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না; তিনি স্থির ধীর এবং প্রশান্ত চিত্তে ভীমের বাক্পটুতার প্রশংসা করিয়া, এখন যে যুদ্ধের সময় নহে,—কাল প্রতীক্ষা করা একান্ত উচিত তাহাই যুক্তি ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন। তিনি ভূমিকা শেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন;—

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া
মবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।
বৃণতে হি বিমৃশ্যকারিণং
গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥" ২।৩০

'সহসা কোন কার্য্য করিবে না; অবিবেক সর্ব্ববিধ বিপদের কারণ; গুণলুব্ধ সম্পদ্ স্বয়ং আসিয়া বিবেকী ব্যক্তিকে বরণ করে।'

"অভিবর্ষতি যোঽনুপালয়ন্
বিধিবীজানি বিবেকবারিণা।
স সদা ফলশালিনীং ক্রিয়াং
শরদং লোকইবাধিতিষ্ঠতি॥" ২।৩১

'কৃষক যেমন বীজ-বপন ও তাহাতে জলসেক করিয়া শস্যশালিনী শরৎকে লাভ করে, সেইরূপ যিনি কর্ত্তব্যের সূত্রপাত করিয়া বিবেচনার সহিত কালপ্রতীক্ষা করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।'

"শুচি ভূষয়তি শ্রুতং বপুঃ,
প্রশমস্তস্য ভবত্যলংক্রিয়া।
প্রশমাভরণং পরাক্রমঃ
সময়াপাদিতসিদ্ধিভূষণঃ॥" ২।৩২

'পবিত্র বিদ্যাধ্যয়নে দেহ ভূষিত হয়, ক্ষমাই বিদ্যাবিভূষিত ব্যক্তির অলঙ্কার; অবসর ও শৌর্য্য প্রকাশ করাই ক্ষমার ভূষণ, এবং নীতিলব্ধ সম্পদ্‌ই বিক্রমের আভরণ।'

"স্পৃহণীয়গুণৈর্মহাত্মভি
শ্চরিতে বর্ত্মনি যচ্ছতাং মনঃ।
বিধিহেতুরহেতুরাগসাং
বিনিপাতোঽপি সমঃ সমুন্নতেঃ॥" ২।৩৪

'উদারচরিত মহাত্মারা যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথ অবলম্বন করিয়া চল; সে পথ আশ্রয় করিলে কখনও কোন অপরাধ হইবে না; তবে যদি দৈববশতঃ বিনাশ ঘটে তাহাও উন্নতির সমান মনে করিও।'

"ক চিরায় পরিগ্রহঃ শ্রিয়াং
ক চ দুষ্টেন্দ্রিয়বাজিবশ্যতা।
শরদভ্রচলাশ্চলেন্দ্রিয়ৈ
রসুরক্ষা হি বহুচ্ছলাঃ শ্রিয়ঃ।" ২।২৯

চিরকালের জন্য রাজ্য-লক্ষ্মীকে বশে রাখাই বা কোথায়? আর দুষ্ট ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের বশীভূত হওয়াই বা কোথায়? শরৎকালের মেঘের ন্যায়, চঞ্চল রাজ্যলক্ষ্মী বহুচ্ছলে মানুষকে পরিত্যাগ করেন; তাঁহাকে সহজে বশে রাখা যায় না।

"মতিমান্ বিনয়প্রমাথিনঃ,
সমুপেক্ষেত সমুন্নতিং দ্বিষঃ।
সুজয়ঃ খলুতাদৃগন্তরে
বিপদন্তা হ্যবিনীত সম্পদঃ॥" ২।৫২

'প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, দুর্বিনীত শত্রুর উন্নতিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন; কারণ, তাদৃশ শত্রুকে কোন অবসরে অতি সহজে জয় করা যায়; যেহেতু, অবিনীত ব্যক্তির সম্পদ্, কোন না কোন সময়ে নিশ্চয়ই বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।'

তাহার পর, যুধিষ্ঠির ক্রোধোন্মত্ত ভীমকে বুঝাইয়া দিলেন, এখন আমাদের বলপ্রকাশের সময় নহে; এখন সহিষ্ণু হইয়া কালপ্রতীক্ষা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। পর ক্ষণেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, নানাবিধ স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। মহর্ষি যুধিষ্ঠিরের অনুষ্ঠিত নীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, শেষে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকে একটি মন্ত্রের উপদেশ দিয়া বলিলেন—"সশস্ত্র হইয়া জপ এবং উপবাস দ্বারা এই বিদ্যার সাধন কর; নিজের পদ কাহাকেও প্রদান করিও না, এবং ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে পাশুপতাস্ত্র লাভ করিতে পারিবে। যে যক্ষ তোমাকে তপস্যার স্থান প্রদর্শন করিবে, সে এখনই তোমাকে লইতে এখানে আসিবে।" এই কথা বলিয়া মহর্ষি প্রস্থান করিলে, এক যক্ষ অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন, দ্রৌপদী এবং ভ্রাতৃগণের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া, তাহার অনুসরণ করিলেন। ঐ সময় শরৎকাল উপস্থিত, তিনি গন্তব্য পথের উভয়পার্শ্বে রমণীয় প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে হিমালয়-পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। বনরাজিশোভিত তুষারশুভ্র নগরাজকে অবলোকন করিয়া, তাঁহার মনে হইল যেন বলদেব নীলাম্বরে আবৃত হইয়া উন্নতমস্তকে বিরাজ করিতেছেন! যক্ষ দূর হইতে ইন্দ্রকিল-পর্ব্বত দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলে, অর্জ্জুন একাকী সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পর্ব্বতবাসিগণ বিস্মিত হইল। তাহার পর, অর্জ্জুন দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রকিল-পর্ব্বতের বনরক্ষকেরা, অর্জ্জুনের ঐরূপ কঠোর তপস্যা দর্শনে ভীত হইয়া, ইন্দ্রের নিকটে গিয়া সমুদয় নিবেদন করিল। দেবরাজ, এই নবীন তাপসের তপোবিঘ্ন উৎপাদনের নিমিত্ত অপ্সরোগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহারা, গন্ধর্ব্বগণের সহিত আসিয়া, অর্জ্জুনের আশ্রম-সন্নিধানে শিবির-সন্নিবেশ করিল। সেখানে তাহারা পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ, জলক্রীড়া, পানগোষ্ঠী প্রভৃতি দ্বারা অর্জ্জুনের চিত্তাকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু অর্জ্জুন অচল অটল থাকায় তাহাদের সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাহার পর, অপ্সরারা স্বয়ং অর্জ্জুনের নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া লজ্জায় প্রস্থান করিল।

অনন্তর, ইন্দ্র স্বয়ং মুনিবেশে অর্জ্জুনের আশ্রমে আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি প্রথমে অর্জ্জুনকে এই তরুণ বয়সে তপস্যাকরার জন্য প্রশংসা করিয়া মোক্ষপথের অতিশয় সুখ্যাতি আরম্ভ করিলেন, এবং অর্জ্জুনের এই তপস্যার উদ্দেশ্য-বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। অর্জ্জুন, কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া, বৈর-নির্যাতনই যে এই তপস্যার লক্ষ্য অকপট ভাবে তাহা ব্যক্ত করিলেন। দেবরাজ, ক্রোধ এবং তজ্জনিত বৈরভাবের অনেক নিন্দা করিয়া, উহা পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুনের হৃদয়ে উহা স্থান প্রাপ্ত হইল না! তিনি মানসিক আবেগের সহিত বলিলেন;—

"বিচ্ছিন্নাভ্রবিলায়ং বা বিলীয়ে নগমূর্দ্ধনি।
আরাধ্য বা সহস্রাক্ষমযশঃশল্যমুদ্ধরে॥"

বায়ু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মেঘ যেমন লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই পর্ব্বতে লয় প্রাপ্ত হইব; অথবা সহস্রনয়ন দেবরাজকে আরাধনা করিয়া, অযশরূপ শল্য উদ্ধার করিব।'

ইন্দ্র, অর্জ্জুনের ধৈর্য্যগুণ সন্দর্শনে, পরিতুষ্ট হইয়া স্নেহে আলিঙ্গন করিলেন, এবং মহাদেবের আরাধনার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর, অর্জ্জুন পুনরায় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনের দেহের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, মুনি সিদ্ধ এবং তাপসগণ

মহাদেবের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে প্রেরণ করিলেন। ঐ সময়ে মূক দানব অর্জ্জুনকে পরাভব করিবার নিমিত্ত আসিতেছিল; মহাদেব অর্জ্জুনের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-মানসে মূক দানবের বধের জন্য ধনুর্ব্বাণ হস্তে কিরাতরাজ-বেশে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন।

এদিকে মূক দানব বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি মুনি, আমাকে আবার কে হিংসা করিবে —এ অভিমান মঙ্গলদায়ক নহে; কেন না পরের উন্নতিতে যাহারা মাৎসর্য্যসম্পন্ন, তাহাদের অসাধ্য কি আছে?" তাহার পর, কিরাতবেশ মহাদেব এবং অর্জ্জুন, উভয়েই এককালীন সেই বরাহের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন; বরাহ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অর্জ্জুন যখন বরাহের দেহ হইতে বাণ উদ্ধার করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সেই সময়ে কিরাতবেশ মহাদেবের অনুচর সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রথমে অতিবিনীত-ভাবে অর্জ্জুনের সহিত আলাপ করিয়া শেষে বলিল, "যে শরটি আপনি গ্রহণ করিয়াছেন, ঐ শর আমার প্রভুর; আমার প্রভুর বাণে বিদ্ধ হইয়া এই বরাহ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যাহা হউক, আপনার ভ্রম হইয়া থাকিবে, বাণটি আপনি অর্পণ করুন।" তাহার পর, সে নানা বাগ্‌-ভঙ্গীতে তাহার প্রভুর ঐশ্বর্য্য, দয়ালুতা, মহত্ত্ব প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইলে, অর্জ্জুনও তাহার প্রত্যুত্তরে অনেক শিষ্টতা প্রকাশ করিয়া বাণ যে কিরাতপতির নহে, তাঁহার নিজের, তাহাই প্রতিপন্ন করিলেন এবং বাণ-প্রদানে অসম্মত হইলেন। তাহার পর, সেই কিরাত প্রভুর নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। অনন্তর, কিরাতরূপী মহাদেব সসৈন্যে অর্জ্জুনকে জয় করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। প্রথমে কিরাতসৈন্যের সহিত, তাহার পর, কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত, অর্জ্জুনের তুমুল সংগ্রাম হইল। অবশেষে, মহাদেবকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের চাপভগ্ন হইলে, উভয়ের বাহুযুদ্ধ উপস্থিত হইল।

একবার মহাদেব, একবার অর্জ্জুন, জয়লাভ করিতে লাগিলেন; অবশেষে মহাদেব লম্ফ-প্রদান করিলে, অর্জ্জুন সবলে তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিলেন। সেই সময়ে মহাদেব অর্জ্জুনকে বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ করিয়া নিষ্পেষিত করিতে গিয়া জানিতে পারিলেন, অর্জ্জুন কিরূপ অসাধারণ বল ধারণ করেন। তিনি এত কাল অর্জ্জুনের তপস্যায় যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার অলৌকিক শক্তি-সন্দর্শনে তদপেক্ষা অধিক পরিতোষ লাভ করিলেন।

পরক্ষণেই মহাদেব, কিরাত-মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, হিমশুভ্র-ভস্মবিভূষিত চন্দ্রশেখর-মূর্ত্তিতে অর্জ্জুনকে দেখা দিলেন; তখনই সেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণের আবির্ভাব হইল। অর্জ্জুন ভক্তিভরে মহাদেবকে স্তব করিয়া বরপ্রার্থনা করিলে, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া অর্জ্জুনকে পাশুপত অস্ত্রের সহিত ধনুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করিলেন; এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও মহাদেবের আজ্ঞায় অর্জ্জুনকে বর ও স্বস্ব অস্ত্র প্রদান করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রতিগমন করিলেন। তাহার পর, মহাদেবের আদেশে সফলকাম, অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন।

সংক্ষেপে কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের ঘটনা বর্ণিত হইল, এইবার কাব্যের অন্যান্য বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই কাব্যের নায়ক মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন, নায়িকা দ্রৌপদী এবং প্রতিনায়ক কিরাত-রাজরূপী মহাদেব। আলঙ্কারিকগণ কাব্যে যে চারিপ্রকার নায়কের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কাব্যের নায়ক অর্জ্জুন "ধীরোদাত্ত"-গুণান্বিত। যাঁহার গর্ব্ব নাই, যিনি ক্ষমাশীল, গম্ভীর, অতিশয় বলবান্‌, বিপদেও স্থির, যাঁহার আত্মগৌরব-বোধ প্রচ্ছন্ন, তিনিই ধীরোদাত্ত-নায়ক। অর্জ্জুনে এই সমস্ত গুণই বিদ্যমান ছিল। তপস্যার নিমিত্ত যাত্রাকালে দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে বলেন;—

'দুঃশাসন যখন আমার কেশ আকর্ষণ পূর্ব্বক অবমানিত করিয়াছিল, আমি অনাথার ন্যায় সভামধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলাম, লোকে তোমাদের বাহুবলের নিন্দা করিতেছিল; তুমি কি সেই ধনঞ্জয়? যে ক্ষৎ—বিপদ্—হইতে ত্রাণে সমর্থ সেই ক্ষত্রিয়, কর্ম্মে যাহার শক্তি আছে সেই কার্ম্মুক (ধনু); যিনি নিষ্ফল ক্ষত্রিয় নাম এবং কার্ম্মুক বহন করেন, তাঁহাদ্বারা শব্দের প্রকৃত অর্থ দূষিত হইয়া থাকে। অতএব শীঘ্র মহর্ষির আজ্ঞাপালন করিয়া আমাদের মনোরথ সকল সফল কর; তুমি কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইলে, তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিব; এই

আশায় প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। ধনঞ্জয় দ্রৌপদীর কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন, মনে হইল শত্রুগণ যেন তাঁহার সম্মুখে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু তাঁহার মুখে একটি কথাও ফুটিল না। তিনি পুরোহিত ধৌম্য-কর্ত্তৃক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, নীরবে যাত্রা করিলেন। কি সুন্দর গর্ব্বহীনতা! অন্য কোন সাধারণ নায়ক হইলে হয় ত তাহার মুখে কত অহঙ্কার,কত আস্ফালনের কথা,শুনা যাইত; কিন্তু অর্জ্জুন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—ধীর—স্থির। আবার অর্জ্জুন যখন বরাহরূপী দানবকে বধ করিয়া—শর লইয়া—প্রত্যাগত হইতেছেন, সেই সময়ে কিরাতরাজরূপী মহাদেবের অনুচর সেখানে উপস্থিত; তাহার সহিত অর্জ্জুনের অনেক বাগ্‌-বিতণ্ডা হইল, কিরাত অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিল, এমন কি সে বলিল—"আপনি যে শুধু অন্যের বাণ অপহরণ করিতেছেন, তাহা নহে; অপরের বিদ্ধ মৃগকে বধ করিতে গিয়া আরও দোষ করিয়াছেন; এজন্য আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত!" অর্জ্জুন ইচ্ছা করিলে ঐ কিরাতের তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি সামান্য অপ্রিয় বাক্যও প্রয়োগ করিলেন না, বরং শিষ্টতা সহকারে তাহার কথার উত্তর প্রদান করিলেন। ইহা তাঁহার ক্ষমাশীলতার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

অর্জ্জুনের গাম্ভীর্য্য অসাধারণ; তিনি ইন্দ্রকিল-পর্ব্বতে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে, দেবরাজের প্রেরিত গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ আসিয়া তাঁহার আশ্রমের সন্নিধানে নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক আরম্ভ করিল; অর্জ্জুন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। অবশেষে, পরম লাবণ্যবতী কিন্নর-তরুণীরা অর্জ্জুনের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল; গন্ধর্ব্বেরা বীণার মধুর ঝঙ্কারে বনভূমি মুখরিত করিয়া তুলিল; জাতী-কুসুম মুকুলিত হওয়ায় সমীরণ তাহার সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিতে লাগিল; পরিণত জম্বুফলের রস পান করিয়া কোকিলা সুমধুর কুহরবে অনুরাগী জনের চিত্তে মত্ততা আনয়ন করিল। কিন্তু কোন কারণেই অর্জ্জুনের সমাধি ভঙ্গ হইল না দেখিয়া, অবশেষে সুরললনারা অযাচিতভাবে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার মৌনভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল; তাহারা বলিল, "ওহে তাপস যুবক! মনের কাঠিন্য পরিত্যাগ কর, কথা বল! কেন, মুনিদের চিত্ত ত বড় করুণামৃদু; অভব্য ব্যক্তিরাই গৃহাগতকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু মুনিরা কখনও ঐরূপ আচরণ করেন না।" আর একজন বলিল, "ওহে শঠ! তোমার মনে যদি শান্তি বিরাজ করিত, তাহা হইলে ঐ ধনুর্দ্ধারণ করিতে না; সংসারের ভোগ্য-বস্তুই তোমার প্রিয়, মুক্তি নহে। নিশ্চয়ই তোমার হৃদয়ে কোন হৃদয়েশ্বরী বিরাজ করিতেছে, সেই অন্য কামিনীদের অবকাশ প্রদান করিতেছে না।" তাহার পর, তাহারা নিরুপায় হইয়া, লজ্জা ত্যাগপূর্ব্বক, অশ্রুমোচন করিতে করিতে কাতরবাক্যে অর্জ্জুনকে অনুনয় করিতে লাগিল—কারণ রমণীদের উহাই শেষ-অস্ত্র; কিন্তু অর্জ্জুনের তিলমাত্রও গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইল না! যাঁহার হৃদয়ে শত্রুবিজয়ের বাসনা নিরন্তর বিরাজমান, তাঁহার আবার সুখাভিলাষ কোথায়? অর্জ্জুনের আত্মগৌরব-বোধ কেমন সুন্দর! কিরাত-রাজরূপী মহাদেবের দূত আগমন করিলেন; অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন—"ওহে দূত! তুমি প্রভুর কার্য্যভার লইয়া এখানে আসিয়াছ; তুমি যেরূপ বাক্যবিন্যাসে প্রবীণ, তাহাতে মনে হইতেছে, তুমি বনেচর হইলেও একজন প্রধান বাগ্মীর পদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। তুমি তোমার প্রভুর ঐশ্বর্য্য এবং দয়ার পরিচয় প্রদান করিয়া কখনও আমাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছ—কখনও আমার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য ভয়-প্রদর্শনেও পশ্চাৎপদ হও নাই; ইহাতে মনে হইতেছে, তুমি কেবল বাণের প্রার্থী কিন্তু ন্যায়ের প্রার্থী নহ। তোমার প্রভু, সিদ্ধির বিরোধী কার্য্যে প্রবৃত্ত; তুমি যখন তাঁহার কার্য্য-ভার প্রাপ্ত হইয়াছ, তখন মঙ্গলার্থী হইয়া তাঁহাকে নিষেধ করা তোমার উচিত। তোমার প্রভুর বাণ নিশ্চয়ই অপহৃত হইয়াছে, অতএব পর্ব্বতে গিয়া তাহার অন্বেষণ করা ন্যায়সঙ্গত; কোন সজ্জনের প্রতি দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে—কারণ সজ্জনের অতিক্রমে বিপদ্‌ ঘটিবার সম্ভাবনা।" এই অংশে অর্জ্জুনের বিনয়বিভূষিত আত্মগৌরব প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু গর্ব্বের লেশও প্রকাশ পায় নাই। তাহার পর, অগণিত কিরাত-সৈন্য, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, মহাবেগে আগমনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল; অসহায় অর্জ্জুন সেই অসংখ্য ভীষণ কিরাত-সেনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিরাতেরা নানা-ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রয়োগে অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ অর্জ্জুন কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত

হইলেন না। পরক্ষণে কিরাত-রাজবেশে মহাদেব রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, অর্জ্জুনের সহিত সমরে তাঁহার ধনুর্ভঙ্গ করিলেন; তাহাতেও অর্জ্জুন ভীত বা বিরত হইলেন না। তিনি সেই ছদ্মবেশী মহাদেবকে বাহুযুদ্ধে পরাভূত করিয়া জয়লক্ষ্মী হস্তগত করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। এই ঘটনাদ্বারা কবি দেখাইয়াছেন যে, অর্জ্জুন বিপদেও স্থির। অর্জ্জুনের মহাসত্বতার কথা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; মহাদেবের সহিত বাহুযুদ্ধেই উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

'কাব্যাদর্শ'রচয়িতা দণ্ডী বলেন;—প্রতিনায়কের গুণের উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া, তাহার পরাজয় দ্বারা নায়কের গৌরব বৃদ্ধি করা উচিত *। আমরা কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে তাহাই দেখিতে পাই; কবি প্রতিনায়ক কিরাতরাজরূপী মহাদেবের সর্ব্বাংশে উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া, নায়ক অর্জ্জুনের গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কাব্যে অন্যান্য রস আনুষঙ্গিকরূপে বর্ণিত হইলেও, বীররসই প্রধানরূপে প্রকটিত হইয়াছে; দ্রৌপদী ও ভীমের বাক্যাবলীতে, এবং কিরাতসৈন্য ও কিরাত-রাজরূপী মহাদেবের সহিত সংগ্রামে, বীররসের বর্ণনা সমুজ্জলরূপে দেদীপ্যমান। তাহার পর, বন, শৈল, ঋতু প্রভৃতির বর্ণনা মহাকাব্যের একটি প্রধান অঙ্গ; এই কাব্যে তাহারও অপ্রাচুর্য্য নাই। কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের চতুর্থ সর্গের শরদ্বর্ণনা মনোরম। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঐ বর্ণনা উদ্ধৃত করা অসম্ভব, তথাপি দুই একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি;—

"পতন্তি নাস্মিন্ বিশদাঃ পতত্রিণো
ধৃতেন্দ্রচাপা ন পয়োদপঙ্‌ক্তয়ঃ।
তথাপি পুষ্ণাতি নভঃ শ্রিয়ঃ পরাং
ন রম্যমাহার্য্যমপেক্ষতে গুণম্॥"

শরৎকাল উপস্থিত, আকাশমণ্ডল মেঘমুক্ত এবং নির্ম্মল নীলিমায় অলঙ্কৃত। কবি তাই বলিতেছেন;—

'নভোমণ্ডলে আর শুভ্র বকশ্রেণী সঞ্চরণ করে না, মেঘের পার্শ্বে আর ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয় না—তথাপি ইহার কি অপূর্ব্ব শোভা! স্বভাবসুন্দর পদার্থ প্রযত্নসাধ্য গুণের অপেক্ষা করে না।'

* কাব্যাদর্শ (দণ্ডিকৃত) প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

আবার হিমগিরির বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন;—

"আমত্তভ্রমরকুলাকুলানি ধুন্বন্,
উদ্ধূতগ্রথিতরজাংসি পঙ্কজানি।
কান্তানাং নগনদীতরঙ্গশীতঃ,
সন্তাপং বিরময়তিস্ম মাতরিশ্বা॥"

'এই হিমবৎপ্রদেশ বিলাসিনীগণের পক্ষে কিরূপ সুখদ দেখুন। এখানে নির্ঝরিণীতরঙ্গে সুশীতল সমীরণ আমত্তভ্রমরকুল-পরিব্যাপ্ত পরাগশোভিত পঙ্কজসমূহকে ঈষৎ কম্পিত করিয়া প্রমদাগণের শারীরসন্তাপ বিদূরিত করে।'

মহাকবি ভট্টি তাঁহার প্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের শরদ্বর্ণনা প্রসঙ্গে, এবং দ্বাদশ সর্গের রাজনীতির আলোচনায়, কিরাতার্জ্জুনীয়ের অনেক ভাব ও পদবিন্যাসের অনুকরণ করিয়াছেন †।

ভট্টি অপেক্ষা মহাকবি মাঘকর্ত্তৃক তাঁহার ভাব ও ভাষা সমধিক অনুকৃত হইয়াছে। কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের তৃতীয় সর্গে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন, এবং শিশুপালবধ কাব্যের প্রথম সর্গে দেবর্ষি নারদ ও দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন, পাঠ করিলে মনে হয়, মহাকবি মাঘ ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যখানি সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার শিশুপালবধ কাব্য লিখিয়াছিলেন।

ভাবের অনুকরণ ত আছেই, স্থানে স্থানে পদবিন্যাসেও ঐক্য দেখা যায় †।

অতঃপর আমরা ভারবির ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিব। এ বিষয়ে প্রাচীন পণ্ডিতগণের একটি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত আছে। যথাঃ;—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥"

এই মন্তব্যে উল্লিখিত "ভারবেরর্থগৌরবং" কথাটি অতি সত্য, এবং অন্যান্য কবি সম্বন্ধে উক্তি অপেক্ষা অধিক সারগর্ভ। প্রকৃতপক্ষে ভারবি ভাষা সম্বন্ধে বড়ই চিন্তাশীল ছিলেন; তিনি নিজেই লিখিয়াছেন;—

† ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের ৪র্থ সর্গ ও ভট্টিকাব্যের ২য় সর্গ, কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের ২য়, ৩য় সর্গ ও ভট্টিকাব্যের ১২শ সর্গ মিলাইয়া পাঠ করুন।

"বিবিক্তবর্ণাভরণা সুখশ্রুতিঃ
প্রসাদয়ন্তী হৃদয়ান্যপি দ্বিষাম্।
প্রবর্ত্ততে নাকৃতপুণ্যকর্ম্মণাং
প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী ॥"

এই কবিতাটিতে ভারবি বাগ্দেবীর সহিত বাণীর উপমা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যাহারা সুকৃতিশালী নহে, তাহাদের মুখ হইতে, অথবা লেখনী হইতে, মূর্ত্তিমতী বাগ্দেবীর ন্যায় বাণী কখনই আবির্ভূত হন না। বাণী-বিবিক্তবর্ণা সুস্পষ্ট-উচ্চারিতা, বাগ্দেবীও বিশদ-আভরণা; বাণী সুখ-শ্রুতি সুশ্রাব্যা, বাগ্দেবীও মঞ্জুভাষিণী; বাণী এবং বাগ্দেবী উভয়েই শত্রুর হৃদয়েও প্রসন্নতা প্রদান করেন; বাণী প্রসাদগুণবিশিষ্টা অথচ গুরু-অর্থ-সূচক পদে সুশোভিতা, বাগ্দেবীও মৃদুমন্দগামিনী। অতএব, মনোজ্ঞ ভাষা-প্রয়োগের শক্তিও সুকৃতিসাধ্য। তিনি ভাষা সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন ;—

"ভবন্তি তে সভ্যতমা বিপশ্চিতাং
মনোগতং বাচি নিবেশয়ন্তি যে।
নয়ন্তি তেষ্বপ্যুপপন্ননৈপুণা
গভীরমর্থং কতিচিৎ প্রকাশতাম্ ॥"

'বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহারাই সমধিক নিপুণ, যাঁহারা মনোগত ভাব বাক্যে নিবদ্ধ করিতে সমর্থ। সেই সকল বক্তার মধ্যে আবার তাঁহারাই কুশলী, যাঁহারা নিগূঢ় অর্থ শ্রোতাদিগের সন্নিধানে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করিতে পারেন।,

"স্তুবন্তি গুর্ব্বীমভিধেয়সম্পদং,
বিশুদ্ধিমুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ।
ইতি স্থিতায়াং প্রতিপুরুষং রুচৌ
সুদুর্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ ॥"

'কেহ কেহ বাক্যের গভীর ভাবকে প্রশংসা করেন, কোন কোন মনীষী বাক্যের বিশুদ্ধিকেই সমধিক পছন্দ করেন। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যখন রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তখন সকলের মনোরঞ্জনকারী বাক্য নিতান্ত দুর্লভ।'

টীকাকার মল্লিনাথও ভারবির অর্থগৌরবের কথা প্রকারান্তরে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"নারিকেলফলসম্মিতং বচো
ভারবেঃ সপদি তদ্ বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং
সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্ ॥"

'ভারবির বাক্য নারিকেল ফলের ন্যায় প্রচ্ছন্নরস-বিশিষ্ট; সম্প্রতি তাহা ভগ্ন করিতেছি। কাব্যরসজ্ঞগণ ইহার রসপূর্ণ সারের ইচ্ছামত আস্বাদন করুন।'

মল্লিনাথের এই উক্তিদ্বারা ভারবির কবিতার রসের অতিশয় প্রাচুর্য্য ও গূঢ়তা বর্ণিত হইয়াছে। "অর্থগৌরব" এই পদদ্বারাও ঐ কথাই সূচিত হয়; কেন না, একই বাক্যে চমৎকারজনক রসের আধিক্য হইলে, উহা ঈষৎ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অতএব অর্থগৌরব পদদ্বারা ও রসের অতিশয় প্রাচুর্য্য ও গূঢ়তার বোধ হয়; কিন্তু কবি নিজে বলিয়াছেন ;—

"স্ফুটতা ন পদৈরপাকৃতা,
ন চ ন স্বীকৃতমর্থগৌরবম্ ॥"

'পদসমূহের বিশদার্থতা পরিত্যক্ত হয় নাই, অথচ উহাতে যথেষ্ট অর্থগৌরব আছে।'

তাঁহার রচনায় শব্দ-নির্ব্বাচনের এমনই নৈপুণ্য যে, তাঁহার প্রযুক্ত বিশেষণ পদগুলি অধিকাংশ স্থলে উপমান উপমেয় উভয়স্থলেই প্রযুজ্য হইয়া থাকে; যেমন ;—

"অপবর্জ্জিতবিপ্লবে শুচৌ,
হৃদয়গ্রাহিণি মঙ্গলাস্পদে।
বিমলা তব বিস্তরে গিরাং
মতিরাদর্শ ইবাভিদৃশ্যতে ॥"

এই স্থলে প্রথম চরণদ্বয়স্থিত বিশেষণ পদগুলি উপমান উপমেয় উভয়ের পক্ষেই প্রযুজ্য। এইরূপ উদাহরণ কিরাতার্জ্জুনীয়-কাব্যে যথেষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

আরও একটি কারণে তাঁহার কাব্যে অর্থগৌরব লক্ষিত হয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত বিচারসমূহে তিনি এক একটি যুক্তি-জালের এমন এক একটি স্থল ধরিয়া বর্ণন করিয়াছেন যে, আদি ও অন্ত স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু যে টুকু বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইতে আদি-অন্ত-মধ্য সমস্তই বিশদভাবে অবগত হওয়া যায়। ইহাতে তাঁহাকে অতি অল্পই বর্ণন করিতে হইয়াছে, কিন্তু সেইটুকু হইতে বহু অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "মদসিক্তমুখৈঃ"

ইত্যাদি কবিতাদ্বারা ভীম নিম্নলিখিত নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বাহুবল প্রয়োগদ্বারা রাজ্যোদ্ধারের পক্ষপাতী; কিন্তু তাঁহার বিপক্ষে 'সাম দান এবং ভেদ দ্বারা যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়, তবে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন কি?' —এই নীতি বর্ত্তমান। কারণ, মনু বলিয়াছেন;—

"সাম্না ভেদেন দানেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
বিজেতুং প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন॥"

"রাজা সাম দান এবং ভেদ, এককালীন অথবা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে, প্রয়োগদ্বারা শত্রুকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন; কিন্তু যুদ্ধের দ্বারা কখনই নহে"।

এই যুক্তি যে অবলম্বিত হইতে পারে না, এবং মনুবচন যে পৌরুষহীন রাজাদের পক্ষেই প্রযুজ্য, তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করিয়াও প্রকারান্তরে প্রকটিত করিয়াছেন। এইরূপে শব্দ-নির্ব্বাচন ও অর্থ-নির্ব্বাচনের চাতুর্য্যদ্বারা ভারবির কবিতার অর্থগৌরব প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মাঘ, ভট্টি প্রভৃতি কবিগণ ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের বহু শব্দ ও ভাবের অনুকরণ করিয়াছেন; কিন্তু ভারবিও যে একেবারে কাহারও অনুকরণ করেন নাই, তাহা বলা যায় না। ভারবির কাব্যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবি কালিদাস ও অশ্বঘোষের কবিতার অনুকরণ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্যের সহিত ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্য মিলাইয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারা অনেক স্থলেই ইহার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। ভারবি, বুদ্ধচরিত-প্রণেতা মহাকবি অশ্বঘোষের কবিতারও যথেষ্ট অনুকরণ করিয়াছেন।* মহাকবি কালিদাস ও অশ্বঘোষ খ্রীঃ পূর্ব্ব ১ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ভারবি খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে, অথবা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, আবির্ভূত হন।

বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাদ আছে, 'মহাকবি অশ্বঘোষ শকনরপতি কনিষ্কের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। তিনি উক্ত রাজার রাজধানী পুরুষপুরে (পেষোয়ারে) অবস্থিতি করিতেন'।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

* সুজাতজালাবততাঙ্গুলীমৃদূ নিগূঢ়গুল্ফৌ বিষপুষ্পকোমলৌ।
বনান্তভূমিং কঠিনাং কথং নু তৌ সচক্রমধ্যৌ চরণৌ গমিষ্যতঃ॥
বিমানপৃষ্ঠে শয়নাসনোচিতং মহার্হবস্ত্রাগুরুচন্দনার্চ্চিতম্।
কথং নু শীতোষ্ণজলাগমেষু তচ্ছরীরমোজস্বি বনে ভবিষ্যতি॥
শুচৌ শয়িত্বা শয়নে হিরণ্ময়ে প্রবোধ্যমানো নিশিতূর্য্যনিস্বনৈঃ।
কথং বত স্বপ্স্যতি সোঽদ্য মে ব্রতী পটৈকদেশান্তরিতে মহীতলে॥
(অশ্বঘোষ-কৃত "বুদ্ধ-চরিত" ৮ম সর্গ।)

পরিভ্রমল্লোহিতচন্দনোচিতঃ পদাতিরন্তর্গিরিরেণুরূষিতঃ।
মহারথঃ সত্যধনস্য মানসং দুনোতি নঃ কচ্চিদয়ং বৃকোদরঃ॥
বনান্তশয্যা কঠিনীকৃতাকৃতী কচাচিতৌ বিষ্বগিবাগজৌ গজৌ।
কথং ত্বমেতৌ ধৃতিসংযমৌ যমৌ বিলোকয়ন্নুৎসহসে ন বাধিতুম্॥
পুরাধিরূঢ়ঃ শয়নং মহাধনং বিবোধ্যসে যঃ স্তুতিগীতিমঙ্গলৈঃ।
অদভ্রদর্ভামধিশয্য স স্থলীং জহাসি নিদ্রামশিবৈঃ শিবারুতৈঃ॥
(ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় ১ম সর্গ।)

শাস্ত্রের দোহাই

ব্রাহ্মণকন্যা স্নেহলতার নিষ্ঠুর আত্মহত্যার সংবাদে আজ বঙ্গ-সমাজের নেতাদিগের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে!—এ এক ভীষণ বিষ সমাজের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; ইহার প্রতিষেধক চাই—একথা সকলেই অল্প-বিস্তর বুঝিতেছেন; এবং অনেকেই আপন আপন প্রতি-ষেধক প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতেছেন।

এই কুপ্রথার আমূল প্রতিকার হইতে পারে,—যদি কন্যার পিতা মনে করেন, যতদিন সৎপাত্র না পাইব বা যতদিন নিজের সঙ্গতিমত মূল্য ব্যতীত সৎপাত্র ক্রয় করিতে না পারিব, ততদিন কন্যার বিবাহ দিব না। শুধু মনে করিলেও চলিবে না—সেই সংকল্পকে যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তবেই এই কুপ্রথা বঙ্গদেশ হইতে দূর হইতে পারে।—এই ভাব যদি বঙ্গদেশের প্রত্যেক পিতা হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহা হইলে এই পণ-প্রথার দোষসমূহ সমাজ হইতে যে নির্দ্দোষরূপে তিরোহিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু বঙ্গদেশের কন্যার পিতা এরূপ ভাবিতে পরাঙ্মুখ; দীর্ঘকালের সংস্কারই ইহার একমাত্র কারণ। দীর্ঘকাল হইতে আমাদের এইরূপ একটা সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, যদি উপযুক্ত বয়সে কন্যাকে পাত্রস্থ করা না যায়, তবে কন্যার পিতার নামে বড় অখ্যাতির কথা; অধিক বয়স পর্য্যন্ত কন্যা অনূঢ়া থাকিলে পিতার জাতি যায়, তিনি সমাজে 'এক ঘরে' হ'ন। কেননা, শাস্ত্রে আছে যে—কোনও নির্দ্দিষ্ট বয়সের পূর্ব্বে কন্যাকে পাত্রস্থ না করিলে পাপ হয়। আজ স্নেহলতার চিতার আলোকে বাঙ্গালীর সমাজের কএকটি অতি অন্ধকারময় পূতিগন্ধ পরিপূর্ণ কোণ আলোকিত হইয়াছে।—এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পূর্ব্বে অনেকেই কুণ্ঠিত হইত; কিন্তু আজ তাহারা অনায়াসে অনেক কথাই বলিতেছে। তবু ইহার ভিতরও কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাইতেছি—"'কন্যার বিবাহ নাই বা হইল।' এমন কথা বলিতে নাই, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ—হিন্দুর ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ!"

শুধু এই ব্যাপারে নহে; যাহা কিছু চলিয়া আসিতেছে, যে কোনও প্রথা অলক্ষ্যে সমাজের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দোষারোপ করিতে গেলে—বা তাহার বিপরীত বা অতিরিক্ত কোনও কার্য্য করিতে গেলেই—একদল লোকের মুখে শুনিতে পাই যে, এ সকল শাস্ত্রবিরুদ্ধ—ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কোনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত একবার একথা মুখের বাহির করিলেই, চারিদিক্ হইতে ফেরুপালের ন্যায় বঙ্গসমাজের রাম-শ্যাম-যদু চীৎকার করিয়া উঠে—"সর্ব্বনাশ হইল, হিন্দু-সমাজ ছারেখারে গেল, শাস্ত্র গেল, ধর্ম্ম গেল!" আর দেখিতে পাই, যাহারা শাস্ত্রের চতুঃসীমায় কখনও প্রবেশলাভ আবশ্যক বা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করে নাই, তাহারাই এইরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিবার জন্য অতিমাত্র ব্যাকুল!

ইহা হওয়াও স্বাভাবিক।—যিনি প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে যাঁহার প্রকৃত অধিকার ও অনুরাগ আছে, তিনি এত সহজে ও এত নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারেন না যে, অমুক-কার্য্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা অমুক-কার্য্য শাস্ত্র-সম্মত। শাস্ত্র বলিতে সাধারণ লোকে যাহা বুঝে—যাহা লোকাচার ও দেশাচার ভিন্ন আর কিছুই নয়—প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞের নিকট তাহাও শাস্ত্রপদবাচ্য হইতে পারে না। হিন্দুজাতির যুগযুগান্ত-ব্যাপী ইতিহাসের নানাস্তরে, দেশকালপাত্রভেদে, নানারূপ পরস্পরবিরুদ্ধ সামাজিক অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছিল। হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র সেই সমুদয় অনুষ্ঠানের বিধি-নিষেধপূর্ণ; সুতরাং যে সমুদয় ঋষিদিগকে আমরা আপ্ত বলিয়া গণনা করি, তাঁহাদিগের মধ্যেও যে যুগভেদ, দেশভেদ প্রভৃতি নানা কারণে নানারূপ মতবৈষম্য হইবে, ইহা স্বাভাবিক। যে কেহ কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র বা নিবন্ধ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছে, সেই জানে যে কত শত শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যাপারে স্মৃতি-কর্ত্তৃগণের গুরুতর মতবৈষম্য আছে, এবং কত ব্যাপারে শ্রুতির পরস্পর বিরোধ এবং শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি প্রামাণিক গ্রন্থের ভিতরে পরস্পর বিরোধ আছে। একথা সত্য যে, হিন্দু এ বিরোধকে স্বীকার করিতে চাহে না। আমাদিগের আধুনিক ধর্ম্ম ও ব্যবহারের একটি মূল-সূত্র এই যে, এই শ্রুতি-স্মৃতি-আচার প্রভৃতির দৃশ্যমান বিরোধ,—প্রকৃত বিরোধ নহে; সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে এই সমুদয় পরস্পর বিবদমান শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যের ঐক্য

উপলব্ধি হইবে। নিবন্ধকার ও টীকাকারগণ এই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া সমুদয় শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের সমন্বয়পূর্ব্বক এক ধর্ম্ম নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বহুপূর্ব্বে ভগবান্ জৈমিনি, তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসা-সূত্রে পরস্পর বিবদমান শ্রুতি-স্মৃত্যাদির বিরোধ নিরাকরণ করিয়া, তাহাদের প্রতিপাদ্য এক সত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জৈমিনি-কৃত ব্যবস্থাকে প্রমাণ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়াই—ভাষ্যকার, টীকাকার ও নিবন্ধকারগণ তাহার সাহায্যে শাস্ত্রবাক্য-সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন।

ধর্ম্ম এক; কিন্তু তাহার আনুষ্ঠানিক বিধানগুলি, সকল ঋষিই যে একরূপ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে, আমরা যদি তাহাদের অর্থ প্রকৃতরূপে বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ দেখিতে পাইব না—আপাতবৈষম্যের ভিতর সাম্যের উজ্জ্বল-রেখা ফুটিয়া উঠিবে—ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। অথচ কার্য্যতঃ চারিদিকেই ইহার বৈপরীত্য দেখিতে পাই; কিন্তু জৈমিনির মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের সমন্বয়ের একমাত্র উপায়। আবার সেই মীমাংসা-সূত্রসমূহের অর্থ গ্রহণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই, ভাষ্যকার শবরস্বামী এবং বার্ত্তিককার কুমারিলস্বামীর মধ্যে কতকগুলি গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিরোধ হইলে, ভাষ্যকারের মতে শ্রুতিই প্রমাণ—স্মৃতি হেয়; কিন্তু কুমারিলভট্ট বলিতেছেন, "এমন কথা বলিতে আমার মন চায় না। জৈমিনির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হইলে, উভয়ই তুল্যকক্ষ প্রমাণ; সুতরাং এস্থলে বিকল্প অনুমান করিতে হইবে;—তোমার যে বিধি ইচ্ছা, তাহাই অনুসরণ করিতে পার।" ইহা ছাড়া স্মৃতি ও আচারের বিরোধ, শিষ্টাচারের প্রামাণ্য প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারে গুরুতর মতভেদ, অন্যান্য ক্ষুদ্র বিষয়ের ত কথাই নাই। তাহা ছাড়া, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি মাননীয় মীমাংসকদিগের সহিতও পূর্ব্বাচার্য্যগণের নানাস্থানে গুরুতর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

যে মীমাংসার সাহায্যে শাস্ত্রের বিরোধ নিরাকরণ করিব, তাহার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আচার্য্যদিগের মতভেদ; সুতরাং ইহাদ্বারা যে সমন্বয় করা হইবে তাহাতে যে আরও গুরুতর মতবৈচিত্র্য লক্ষিত হইবে, তাহা স্বাভাবিক। প্রকৃত-প্রস্তাবে যে কোনও দুইখানি নিবন্ধ বা টীকা লইয়া মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই সমুদয় প্রামাণিক শাস্ত্রব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে বহুতর বিষয়ে কি গুরুতর মতভেদ! জীমূতবাহন, রঘুনন্দন, বিজ্ঞানেশ্বর, কমলাকর, বা মাধবাচার্য্য, কেহই অশাস্ত্রজ্ঞ নহেন—সকলেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। অদ্যাবধি লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাদিগের মত প্রমাণ বলিয়া মানিয়া, ধর্ম্মানুশীলন করিতেছে; কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় মতভেদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে! সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যবিষয়ের একত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের মত যতই সুদৃঢ় হউক না কেন,—শাস্ত্রের বিরোধ সমাধানবিষয়ে আমরা মীমাংসাদর্শনকে যতই অভ্রান্ত বিবেচনা করি না কেন,—শাস্ত্রের বিরোধ থাকিবে; তাহা আমরা কিছুতেই দূর করিতে পারি না। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, আজীবন অনুশীলনফলে, শাস্ত্রের কোনও বিরোধ-বিহীন একমাত্র ব্যাখ্যায় উপনীত হইতে পারেন নাই। মাধবাচার্য্য বলিতেছেন, 'মাতুলকন্যা বিবাহবিষয়ক আচার-শাস্ত্রমতে ধর্ম্ম্য বলিয়া গণ্য'; কুমারিলস্বামী বলিতেছেন, 'ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং অধর্ম্ম।' রঘুনন্দন বলিতেছেন, 'সমুদ্রযাত্রার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে নাই,' বিজ্ঞানেশ্বরের নিকট সে মত অনাদরণীয়। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজের মতকেই বিরুদ্ধশাস্ত্রের একমাত্র সত্য-সমাধান বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, এবং অপর ব্যাখ্যাকারের মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যখন এমন মহারথী উভয় পক্ষকে বিবাদ করিতে দেখিতে পাই, তখন ক্ষুদ্রবুদ্ধি অপণ্ডিত আমরা কেমন করিয়া সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, শাস্ত্র এক এবং তাহার সেই এক অর্থ বাহির করিবার কোনও একটি অভ্রান্ত বিধান আছে। যদি সেরূপ বিধান থাকে,—সে কোন্‌টি?—সেকথা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? যদি না বুঝিব, তবে কোনও বিষয় সম্বন্ধে কেমন করিয়া সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, ইহাই শাস্ত্রের অভ্রান্ত সমাধান মতে একমাত্র ধর্ম্ম।

যখন আমরা বলিতে যাই, ইহাই শাস্ত্র,—ইহার বিরুদ্ধ যাহা কিছু তাহা শাস্ত্রীয় নহে, তখন আমরা অসমসাহসের কার্য্য করি; কারণ হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র যুগযুগব্যাপী জাতীয়

ইতিহাসের অভিব্যক্তি-স্বরূপ ;—তাহা অনন্ত সাগরের সহিত উপমেয়। ক্ষুদ্র বিদ্যা লইয়া সেই শাস্ত্র-সাগরের তীরে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া আমরা মনে করিতে পারি যে, সাগর লঙ্ঘন করিয়াছি ; কিন্তু যাহার চক্ষু উন্মীলিত, সে আমাদিগকে বাতুল বলিয়া জানিবে। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি-নিষেধের মধ্যে এমন অল্পবস্তুই আছে, যাহার সম্বন্ধে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারা যায় যে, কোথাও ইহাদের মতভেদ নাই ; সুতরাং কোনও একটি কার্য্য শাস্ত্রসঙ্গত কিনা, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, দীর্ঘকাল ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে হয়। এইরূপস্থলে যখন আমাদের সমাজের ধুরন্ধরেরা কোন সামাজিকপ্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বলিয়া বসেন—'ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ,' তখন প্রকৃত শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ তাহাতে হাস্য-সংবরণ করিতে পারেন না।

প্রকৃত-প্রস্তাবে শাস্ত্রের দোহাই দিবার সময় আমাদের দেশের জনসাধারণ, এমন কি সাধারণ পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি, এত কথা ভাবেন না,—বা বুঝিতে চেষ্টা করেন না যে, প্রকৃত শাস্ত্রপদবাচ্য বস্তুর স্বরূপ কি ; এবং তাহার মধ্যে কতটুকু আমাদিগের পরিজ্ঞাত ; আর কতটুকুই বা অপরিজ্ঞাত—অপঠিত—অপ্রাপ্তব্য। যাহা কিছু দেশাচারে ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত, তাহাকেই সকলে শাস্ত্রীয় বলেন ; এবং তদ্বিরুদ্ধ যাহা কিছু, তাহাই অশাস্ত্রীয়। আবার সেই দেশাচারের সপক্ষে যদি কোনও শাস্ত্রীয় বচন থাকে, তবে ত কথাই নাই! তাঁহারা প্রায়ই হিসাব রাখেন না যে, ঠিক সেইরূপ বা ততোধিক প্রামাণিক আরও কত বচন থাকিতে পারে। আর পণ্ডিত বলিয়া যাঁহাদের অভিমান আছে, তাঁহারা যখন শাস্ত্রের দোহাই দেন, প্রায়ই দেখা যায় যে, তখন তাঁহারা শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অপেক্ষা রঘুনন্দনের শাস্ত্রকেই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এটা তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, রঘুনন্দন অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে এমন বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হয় ত তাহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়াছেন,—হয় ত প্রদেশান্তরে শাস্ত্রসম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উপরেই দেশাচার প্রতিষ্ঠিত।

রঘুনন্দন যাহা বলিয়াছেন—তাহাই যে শাস্ত্র, একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে অগ্রসর হইবেন না। রঘুনন্দনের প্রামাণ্যের মূল—শ্রুতি, স্মৃতি এবং শিষ্টাচার ; একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে সেই সমুদয় মূল প্রমাণাদির উপর তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার বিরোধী-সিদ্ধান্ত করি[বার] চেষ্টা আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া গণ্য করিয়া তাঁহারা বিনা-বিচারে রঘুনন্দনের মতকে প্রমাণ বলিয়া গণনা করিবেন। এ যুক্তি সারগর্ভ হইতে পারিত, যদি রঘুনন্দনে[র] সমকক্ষ পণ্ডিতের কোনওরূপ বিরুদ্ধ ব্যবস্থা না থাকিত। কিন্তু যেখানে রঘুনন্দন একরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এব[ং] বিজ্ঞানেশ্বর বা কমলাকরভট্ট অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—সেখানে কি রঘুনন্দনের মত শাস্ত্রের একমাত্র সমীচীন ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়া ধৃষ্টতা বলিয়া পরি[গ]ণিত হইতে পারে? আবার, যেস্থলে এইরূপ বিরোধ আছে সেখানে শাস্ত্রের যে কোনও এক নিশ্চেতব্য ব্যবস্থা আছেই অথবা থাকিলেও এই সমুদয় আচার্য্যগণের মধ্যে কোন একজন তাহা নিশ্চয় করিয়া অবধারণ করিয়াছেন,—এবিষয়ে যদি কোনও শ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অস্বীকার করি তবে কি শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইবে?

অতএব যেস্থানে এরূপ বিরোধ বর্ত্তমান, সেস্থলে যে কোনও একটি শ্লোক বা সূত্র আবৃত্তি করিয়া তাহাই শাস্ত্র বলিলেই চলিবে না। শাস্ত্রসম্বন্ধে সেই মত, রঘুনন্দন বা অপর কোনও আচার্য্যের অনুমোদিত বলিলেও চলিবে না। শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রের সেবিষয়ে যদি বিন্দুমাত্রও বিরোধ থাকে, তবে তাহা লইয়া নানারূপ মতভেদ সম্ভব এবং নানারূপ বিধি সেই মতভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ;—কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারে না যে, তাহার মতটিই শাস্ত্রীয়, অপর সমুদয় মত অশাস্ত্রীয়। তাহাই যদি হইল, তবে শাস্ত্র, প্রকৃতপ্রস্তাবে এক হউক বা না হউক, কোনও একটি ব্যবস্থা যে একমাত্র শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা—এরূপ সাহস করিয়া বলাও একরূপ অসম্ভব।

যদি বলা যায়, যাহা দেশাচারসম্মত তাহাই শাস্ত্রসম্মত, এবং শাস্ত্রের যে মত বঙ্গসমাজে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, বঙ্গদেশে শাস্ত্র বলিয়া তাহাই গ্রাহ্য হইবে ;—অপর প্রদেশের আদৃত ব্যাখ্যা এপ্রদেশে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাজ্য—তাহা হইলেও গোল মিটিবে না। দেশাচার কোন্‌স্থলে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য, তাহা লইয়া গুরুতর মতভেদ আছে। তাই, যেস্থলে মাধবাচার্য্য মাতুলকন্যা-বিবাহের আচার ধর্ম্ম্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেস্থলে কুমারিল-ভট্ট তাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া নিন্দনীয় জ্ঞান করিয়াছেন।

দেশাচার হইলেই যে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না, এ বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই। তবে সে আচার কিরূপ হইলে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, সে সম্বন্ধেও পুর্ব্বসূরিগণ একমত ন'ন। ইহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া কেহ বা বলিয়াছেন, "বেদবিদাং শীলঃ", কেহ বা বলিয়াছেন,—"শিষ্টাচারঃ", কেহ বা বলিয়াছেন,—"সদাচারঃ" বা "সাধূনাম্ আচারঃ"। জৈমিনি যাহা বলিয়াছেন,—ভাষ্যকার তাহার একরূপ অর্থ করিয়াছেন, বার্ত্তিককার তাহার ত্রিবিধ অর্থের অবতারণা করিয়াছেন। যে শিষ্টের আচার প্রমাণ, তাহাদিগের পরিচয়ে বৌধায়ন বলিয়াছেন,

"শিষ্টাঃ খলু বিগতমৎসরা নিরহঙ্কারাঃ কুম্ভীধান্যা অলোলুপা দম্ভদর্পলোভমোহক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ।

ধর্ম্মেণাধিগতো যেষাং বেদঃ সপরিবৃংহণঃ

শিষ্টাস্তদনুমানজ্ঞাঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতব ইতি"

সদাচার ব্যাখ্যায় মনু বলেন, "তস্মিন্ দেশে (ব্রহ্মাবর্ত্তে) য আচারঃ স সদাচারঃ, উচ্যতে।" সুতরাং যেকোনও দেশের যেকোনও ভালমানুষের আচার যে শিষ্টাচার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, ইহাই স্মৃতিকারদিগের অধিকাংশের অভিমত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এইরূপ অনুসন্ধানে কোনও শিষ্টাচার স্থাপিত হইলেও তাহা যদি শ্রুতি বা স্মৃতিবিরুদ্ধ হয়, তবে তাহা কতদূর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে,—সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। টীকাকার ও নিবন্ধকারগণের আচারের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বিবিধ সিদ্ধান্তগুলি, এই প্রবন্ধে বিবৃত করা অসম্ভব।

এখন বিবেচ্য এই যে, আমাদের আধুনিক বঙ্গদেশে এপ্রকার শিষ্টাচার—যাহা বৌধায়নের বিধান মতে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে—তাহা কোথায় পাইব? কুমারিলস্বামী ও অপরাপর আচার্য্যগণের মতে যাহা বেদপরায়ণ শিষ্টগণ ধর্ম্মবুদ্ধিতে করেন, সেই আচার শিষ্টাচার বলিয়া গণ্য হইবে।—কিন্তু সে বেদপরায়ণ শিষ্ট বঙ্গদেশে কোথায়? কোথায় সে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, যে বেদ জানে বা স্বাধ্যায় রক্ষা করে, এবং বেদার্থের অনুসারে স্বকীয় জীবন পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে?—একথা কি সত্য নহে যে বঙ্গদেশে যুগযুগান্ত হইতে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক আচার একরূপ লুপ্ত হইয়াছে? একথা আজিকার কথা নহে; বঙ্গদেশের এই অবস্থা অন্ততঃ রঘুনন্দনের আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাই তিনি বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের মান-রক্ষার জন্য বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কেবলমাত্র গায়ত্রী জপ করিলেই স্বাধ্যায় রক্ষা হয়; কিন্তু আমাদের দেশের এই সমুদয় অনুকল্পবিধানোপজীবী জন্মমাত্রব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণব্রুবগণের ব্যবস্থা, বেদহীন ব্রাত্য ও বৃষলগণের আচার, কি বশিষ্ঠ-বৌধায়নাদিপ্রোক্ত শিষ্টাচার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে?—ইহারই খাতিরে, শাস্ত্র-প্রমাণে আপ্ত বলিয়া গ্রাহ্য স্মৃতিকারদিগের মত উপেক্ষা করিতে হইবে? ইহারই বা কারণ কি, তাহাও ত বুঝিতে পারি না!

দেশাচারে গৃহীত শাস্ত্রার্থকেই খাঁটি শাস্ত্রার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে,—এমন কথা ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। শাস্ত্রবচনের যাহা সত্য অর্থ, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কোনও পণ্ডিত বা কোনও দেশীয় আচার তাহার অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছে বলিয়া, ভ্রান্ত হইলেও সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এমন ব্যবস্থা আর্য্যঋষিগণ করেন নাই। এ কথা সত্য যে—এরূপ শাস্ত্রার্থ, লোকাচারবিরুদ্ধ হইলে, অনুসরণের অযোগ্য বলিয়া কোনও কোনও স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। "অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নতু"। অসহায়ের ব্যাখ্যামতে নারদও বলিয়াছেন যে, ব্যবহারে বিগীত ধর্ম্ম গ্রাহ্য নহে, কেন না "ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্ম্মস্তেনাবহীয়তে।" এ কথা অবিসংবাদী নহে। পক্ষান্তরে শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, শ্রুতি-স্মৃতির অবিরুদ্ধ হইলেই কেবল আচার গ্রাহ্য হইতে পারে। কুমারিলস্বামী বলিয়াছেন,—

"শিষ্টং যাবৎ শ্রুতিস্মৃত্যোস্তেন যন্ন বিরুদ্ধ্যতে।

তচ্ছিষ্টাচরণং ধর্ম্মে প্রমাণত্বেন গম্যতে॥

যদি শিষ্টস্য কোপঃ স্যাদ্বিরুধ্যতে প্রমাণতা।

তদকোপাত্তু নাচারঃ প্রমাণত্বং বিরুধ্যতে॥"

যাহা হউক, আচারের দ্বারা স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হউক বা না হউক,—তাহার দ্বারা স্মৃতির প্রকৃত অর্থের কোনও বিপর্য্যয় ঘটে না, ইহা নিশ্চিত।

এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমরা রঘুনন্দন বা অপর কোনও আচার্য্যকৃত শাস্ত্রব্যাখ্যা সবসময় মাথা পাতিয়া মানিয়া লইব কেন? যেখানে আচার্য্যগণের মধ্যে ব্যাখ্যা-বৈষম্য আছে, সেখানে নিজে যে অর্থ সমীচীন জ্ঞান করিব, সেই অর্থই গ্রহণ করিব না কেন? শাস্ত্রার্থ যেখানে অস্পষ্ট বা পরস্পরবিরুদ্ধ, সেখানে শাস্ত্রমতে "যুক্তিযুক্তো-

বিধিঃ স্মৃতঃ", এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই নিবন্ধকার এবং টীকাকারদিগের মত আদৃত হইয়া থাকে। ইঁহাদিগের কোনও মত যদি যুক্তিবিরুদ্ধ বিবেচিত হয়, তবে কেন না তাহা পরিত্যাগ করিব ? যদি ইহাই ব্যবস্থা হয়, তবে রঘুনন্দনের ব্যবস্থাবিরুদ্ধ কার্য্য হইলে—তাহা শাস্ত্রযুক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও—আমাদিগের পণ্ডিতগণ তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন কেন ?—কেহ বলিতে পারেন কি ?

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-বিষয়ক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, টীকাকার বা নিবন্ধকারগণ কেহই পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া যান নাই। বিশ্বরূপ, বীরেশ্বর প্রভৃতি সর্ব্বজন-সমাদৃত প্রাচীন গ্রন্থকারগণের মত বিধ্বস্ত করিতে জীমূতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বরাদি কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি জীমূতবাহনেরই টীকাকার—রঘুনন্দন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার—তাঁহার মত স্থানে স্থানে খণ্ডন করিয়া আসিয়াছেন। যতদিন আমাদের দেশে প্রকৃত শাস্ত্রচর্চ্চা ছিল, এবং হিন্দুসমাজের বিধানে সততা ছিল, ততদিন কোনও শাস্ত্রব্যাখ্যাকার শ্রুতি-স্মৃতিকে অভিভূত করিয়া রঘুনন্দনের মত আপনার অখণ্ডনীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। কএক শতাব্দী পূর্ব্বে কোনও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর কোনও বিধান চলিতে পারে না, এবং তাঁহার মতের বিন্দুমাত্র অবহেলা হইলে হিন্দুত্ব লুপ্ত হইবে,—এইরূপ ধারণা আমাদের সামাজিক অবনতি এবং শাস্ত্রজ্ঞানের বিলুপ্তির সহিতই সম্ভব হইয়াছে।

সকল যুগের হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া এই এক অবিসংবাদী সত্য দেখিতে পাই যে, শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বদাই দেশকালভেদে ভিন্ন ব্যবস্থা করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। এই জন্যই শ্রুতি-স্মৃতির ধৃত বচনের ভিতর এত তারতম্য ; সেই জন্যই শাস্ত্রব্যবস্থার বিবিধ বৈষম্য জন্মিয়াছে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, দেশাচারের বিপর্য্যয়ের সঙ্গে, ধর্ম্ম-ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। ভারতের ইতিহাসের দুই সুদূর অতীত যুগে, এই সমুদয় বিধি-নিষেধকে সমন্বয় করিয়া, হিন্দুর এক জাতীয় শাস্ত্র-গঠন করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই। প্রথম চেষ্টার পরিচয়—মীমাংসা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-গ্রন্থগুলি এবং দ্বিতীয় চেষ্টার পরিচয়—মন্বাদিস্মৃতি, নিবন্ধ, ও টীকাতে দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই যে, শ্রুতির মত এক এবং অভ্রান্ত ;—প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রেই বিপ্রকীর্ণ, বা লুপ্ত-শ্রুতিবাক্যগুলি, সমন্বয় করিয়া এই এক অভ্রান্ত ধর্ম্মব্যবস্থা প্রকটিত করিবার চেষ্টা। মীমাংসা-দর্শনেরও মূলসূত্র তাহাই ;—মীমাংসাশাস্ত্র লুপ্ত-শ্রুতি উদ্ধার ও বিরুদ্ধ শ্রুতি-সমন্বয়ের জন্য নানাবিধানে পূর্ণ। কোন্ যুগে প্রথম এই ধারণার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বলা অসম্ভব ; কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলে এই তথ্য নিহিত আছে।

বিভিন্ন শ্রুতি সমন্বিত করিয়া, এই এক জাতীয় ধর্ম্ম নিরূপণ করিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। শ্রুতিবাক্য ব্যাখ্যা ও প্রামাণিক আচারের উপর এই এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া—স্মৃতিকর্ত্তৃগণ আপনারাই, দেশকালভেদে বিভিন্ন, এবং সময় সময় পরস্পর বিরুদ্ধ সমাধানে উপনীত হইয়াছিলেন। ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে, নানাদেশে ও নানা-সমাজে আর্য্যগণের ধর্ম্মবিধি এবং ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত আচার, বিভিন্ন স্মৃতির ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে গিয়া, বিভিন্ন রূপ হইয়া পড়িয়াছিল। এক শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত, নানা-স্মৃতির নানামত থাকা সমীচীন নহে ; সুতরাং স্মৃতিসমূহের মত সমন্বয় করিয়া ধর্ম্মের সমীকরণের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা স্বাভাবিক। এইরূপ সমন্বয়ের চেষ্টা আমরা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ও পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিকারের গ্রন্থে, এবং কোনও কোনও পুরাণেও দেখিতে পাই। ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবক্তাদিগের নাম দিয়া ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্র-কর্ত্তাই এক সনাতন ধর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন,—তাঁহাদিগের মধ্যে কোনও প্রকৃত মতভেদ নাই ; সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাঁহাদিগের মতবিরোধকে সমন্বয় করিয়া এক ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। এই বিশ্বাসের ফলেই, টীকাকার ও নিবন্ধকারগণ সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয় করিয়া, এক অভ্রান্ত ধর্ম্মমত আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; মীমাংসা তাঁহাদিগের সমন্বয় চেষ্টার প্রধান অস্ত্র।

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের এই দ্বিতীয় চেষ্টাও সফল হয় নাই। প্রত্যেক টীকাকার এবং নিবন্ধকারই, ধর্ম্মকে এক জানিয়া, তাঁহার মতানুসারে যাহা একমাত্র সত্য ধর্ম্মব্যাখ্যা, তাহাই দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদের এইরূপ চেষ্টার

ফলে, ধর্ম্মব্যবস্থার পদে পদে কিরূপ মতবৈষম্য দাঁড়াইয়াছে, তাহা অনায়াসেই আমরা দেখিতে পাই।

বৈষম্যকে অস্বীকার করিয়া, একধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার এরূপ চেষ্টা—এত বড় একটা জাতিকে নানা যুগে এক সামাজিক নিয়মে বাঁধিয়া রাখিবার আয়োজন যে বিফল হইবে, তাহাতে কি অণুমাত্র সন্দেহ আছে? সুতরাং, প্রকৃত ধর্ম্মব্যাখ্যা লাভ করিতে হইলে, যে বৈষম্য আমাদিগের ধর্ম্মব্যাখ্যাতৃগণ অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়াই আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দুর ধর্ম্মব্যবস্থা যে নানাদেশে এবং নানাকালে নানারূপ হইয়াছে এবং প্রতি যুগান্তরে ইহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই কঠিন সত্যটাকে আমরা—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যতই অস্বীকার করিতে চেষ্টা করি না কেন—ধুইয়া ফেলিতে পারিব না; আমাদিগের স্মৃতিসাহিত্যে ইহা সুস্পষ্টরূপে জাজ্জ্বল্যমান। গৌতম, বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, আপস্তম্বাদি ঋষিগণ যে নানাব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমসাময়িক সমাজের অবস্থার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। রঘুনন্দনও যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গসমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই রচিত হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই যে, সমগ্র বেদাধ্যয়ন যেখানে স্মৃতিতে পুনঃপুনঃ ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, বেদহীন ব্রাহ্মণকে যেখানে কোনও কোনও স্মৃতিতে শূদ্রের ন্যায় গণনা করা হইয়াছে, বেদবিহীন বঙ্গসমাজের মুখ চাহিয়া, সাময়িক অবস্থার মানরক্ষা করিবার জন্য, রঘুনন্দন সেখানে ব্যবস্থা করিতেছেন যে, গায়ত্রী থাকিলেই সমস্ত বেদ থাকিল; সুতরাং, যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রীহীন নহে, সে বেদহীন নয়,—গায়ত্রীরূপেই স্বাধ্যায়ের বিধি রক্ষিত হয়।

রঘুনন্দনের কাল পর্য্যন্ত যে, সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ও শাস্ত্রব্যাখ্যার পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে না। ঠিক সেই সময়েই যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার পূর্ণপরিণতি হইয়া গিয়াছে, তাহার পর যে সাময়িক পরিবর্ত্তনের সহিত আর শাস্ত্রব্যবস্থা বা শাস্ত্রব্যাখ্যার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না, এরূপ কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। রঘুনন্দন মহাপণ্ডিত হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী যুগেই যে পাণ্ডিত্য একেবারে লোপ পাইবে, এমন কেহ জন্মাইবে না যে তাঁহার কৃত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে, এমন কথা বলা চলে না। রঘুনন্দনের সময়ের বঙ্গসমাজ হইতে আজ কালকার বঙ্গসমাজ নানা বিষয়ে ভিন্ন—তাঁহার আমলে যে ব্যবস্থা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, তাহা আজ কঠিন ও অসম্ভব; তিনি যাহা সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই, আজ তাহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সমাজের এত গুরুতর পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও রঘুনন্দনকৃত ব্যবস্থার যে কোনও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না—একথা কে বলিতে পারে? বর্ত্তমান সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বর্ত্তমান আচারাদির গৌরবরক্ষা করিয়া, যদি শাস্ত্রের কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়, তবে তাহা কেন না করিতে হইবে? অতীত যুগে যেমন দেখিতে পাই যে, শাস্ত্রকার ও শাস্ত্রব্যাখ্যাতাগণ শ্রুতি বা স্মৃতির নানা ব্যবস্থা তাৎকালিক সমাজে অপ্রযুজ্য ও অনাদরণীয় বিবেচনা করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, আজ কেন আমরা সেইরূপ বর্ত্তমানযুগে অপ্রযুজ্য শাস্ত্রব্যবস্থা বর্জ্জন, ও আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তন, করিতে না পারিব?

একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সমাজের গতি আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারিব না।—সমাজের উত্তরোত্তর অভিব্যক্তি আমরা যতই কেন অস্বীকার করি না, পরিবর্ত্তন সমাজের জীবনে আসিবেই। নূতন নূতন অবস্থার নিষ্পেষণে প্রাচীন সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হইবে, নূতন নূতন সামাজিক প্রথার প্রতিষ্ঠা হইবে;—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের সমাজ, যদি এই সমুদায় পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া, তাহার উপযোগী কোনও সদ্ব্যবস্থা না করিতে পারে, যদি আমরা সমাজকে অন্ততঃ দুইশতাব্দীর পূর্ব্বের পুরাতন ব্যবস্থা-বন্ধনে কঠিনভাবে আবদ্ধ রাখিতে চাই, তবে সমাজের লোক সে ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিবেই করিবে! আমরা যদি অন্ধের মত এ সকল দেখিয়াও না দেখি,—তবে, হয় সমাজে গুরুতর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতে হইবে; না হয়, যে কেহ এই স্থবির সমাজব্যবস্থার চতুঃসীমা বিন্দুমাত্রও লঙ্ঘন করিবে, তাহাকেই সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে!—আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে হইতেছেও তাহাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজব্যবস্থা অবহেলার জন্য লোকে

আমাদের সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেলে, তাহাতে যদি কোনও গুরুতর ক্ষতি না থাকিত, তবে আমাদিগের এবিষয়ে অলস থাকা সম্ভবপর হইতে পারিত;—কিন্তু যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, হিন্দুসমাজের তথাকথিত নেতাদিগের অপরিণামদর্শিতার ফলে ও হঠকারিতার জন্য, হিন্দুর কত অমূল্য জাতীয় সম্পদ্ আমাদিগের সমাজের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে, তখন আমরা কি মর্ম্মাহত হই না? সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারি,—দর্শন, শাস্ত্র, সামাজিক আচার ও সংস্কারের ভিতর দিয়া অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় যে বিমল জ্যোতির্ম্ময়ী আধ্যাত্মিকতার ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই আমরা হারাইতে বসিয়াছি!—তখন আর আমরা উদাসীন থাকিতে পারি না।

জাতিবিচার বল, খাদ্যবিচার বল, সংস্কার বল,—হিন্দুর সমুদয় অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থার মূলে এক মহৎ উদ্দেশ্য ও এক অত্যুচ্চ আদর্শ অন্তর্নিহিত আছে,—ইহাই হিন্দুত্বের সার বস্তু, হিন্দুয়ানির আচারসকল এই আদর্শ লাভের উপায় মাত্র। ভারতবাসী ধনসম্পদে দরিদ্র; কিন্তু আমাদিগের আর্য্য-পিতৃগণ আমাদিগকে এই যে আধ্যাত্মিকতা দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগের অমূল্য সম্পদ্!—এই সম্পদ্ যদি আমরা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে পারি, তবে দরিদ্র হইলেও ভারতবাসী লক্ষ্মীর সকল বরপুত্রকে অনায়াসে অবহেলা করিতে পারিবে।

কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, আমাদের এই নিত্য সত্য বস্তু কি,—কিসের উপর আমাদের হিন্দুত্বের প্রকৃত গৌরব প্রতিষ্ঠিত!—জগতে কোথাও হিন্দুজাতির ন্যায় প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রবণ জাতি,—যাহারা ধর্ম্মকে তাহাদিগের দৈনিক জীবনে সহজভাবে আয়ত্ত করিয়াছে এমন জাতি, নাই। এখানে, অতি পণ্ডিত হইতে অতি মূর্খ পর্য্যন্ত, সকলেই জানে, এবং কোনও না কোনও সময়ে হৃদয়ঙ্গম করে যে,—যাহা কিছু লইয়া জগৎ মত্ত, তাহা সার নহে।—একমাত্র সার আত্মা, তাহার একমাত্র সম্পদ্ ধর্ম্ম;—সে সম্পদের কাছে ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ—নগণ্য। হিন্দুর উপাসনা-পদ্ধতি বা ধর্ম্মমতে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, তাহাদিগের মধ্যে একবিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে যে, জগতের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা কোনও দূর বস্তু নহেন,—তিনি আমাদিগের নিত্য-জীবনের মধ্যে ওত-প্রোতভাবে অনুস্যূত, এবং আমাদিগের জীবনের যাহা কিছু সার—যাহা কিছু সত্য, সকলের মূল এবং সত্যস্বরূপ। এই সকল উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, কেবলমাত্র ভারতের দার্শনিক ও পণ্ডিতের সম্পদ্ নহে—ইহা কুটীরবাসী দীন-দরিদ্র-অজ্ঞ কৃষকেরও সম্পত্তি। এই আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বর-সান্নিধ্য হারাইয়া, আজ আমরা হিন্দুর সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছি। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার প্রতি পাশব অত্যাচার নিবারণ করিবার ব্যবস্থায় আমরা গগন বিদীর্ণ করিয়া আন্দোলন করিয়াছি যে, হিঁদুয়ানী গেল!—কিন্তু এত বড় একটা বৃহৎ সর্ব্বনাশ, আমাদিগের গোঁড়া হিন্দুসমাজ নিঃশব্দে স্বীকার করিতেছে।—কি দারুণ অন্ধতা আমাদিগের!

আমাদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে যে,—যাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ হইতে বাহির করিয়া দেই, তাহাকে ও তাহার উত্তরপুরুষদিগকে আমরা এই অমূল্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করি।—এত বড় অভিশাপ তাহাদিগকে দিবার পূর্ব্বে, সমাজের ভালরূপে বিবেচনা করা উচিত যে তাহাদিগের অপরাধের গুরুত্ব কতটুকু।—লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিলে চলিবে কেন? আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত, শাস্ত্রের সমুদয় সামাজিক বিধান কোন মৌলিকতত্ত্বলাভের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উপায় মাত্র। যদি কেহ তাহার আচারদ্বারা হিন্দুত্বের সেই মৌলিক সত্য অস্বীকার করে, তাহাকে আমরা বর্জ্জন করিতে পারি; কিন্তু সকল সামাজিক বিধানই সে মূলতত্ত্বের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে।—যে কোনও বিধির অবহেলা করিলেই লোকে সেই মূল-পদার্থ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না।

আমাদিগের ব্যবহারে বা শাস্ত্রে যদি এমন বিধান থাকে যে, বহুশতাব্দী পূর্ব্বের সমাজে তাহা উপযোগী হইলেও বর্ত্তমান সমাজে তাহা অসম্ভব; এবং সে বিধান যদি এরূপ হয় যে, তাহা বর্জ্জন করিলে আমাদিগের জাতীয় আধ্যাত্মিকতার কোন ক্ষতি হয় না;—তবে আমাদিগের সে বিধান বর্জ্জন করা আবশ্যক। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা সামাজিক জীবনে অলক্ষ্যে তাহা নিত্যই করিতেছি। বহুতর শাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধান বর্ত্তমানকালের জীবন-সংগ্রামের দিনে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং সেই বিধান কেহ অমান্য করিলেও, সমাজের ধুরন্ধরেরা তাহাকে বিশেষ অপরাধ বলিয়া গণনা করেন না;—কিন্তু কএকটি বিষয়ে আমাদিগের [illegible] নেতৃবর্গ এ নিয়ম মানিতে
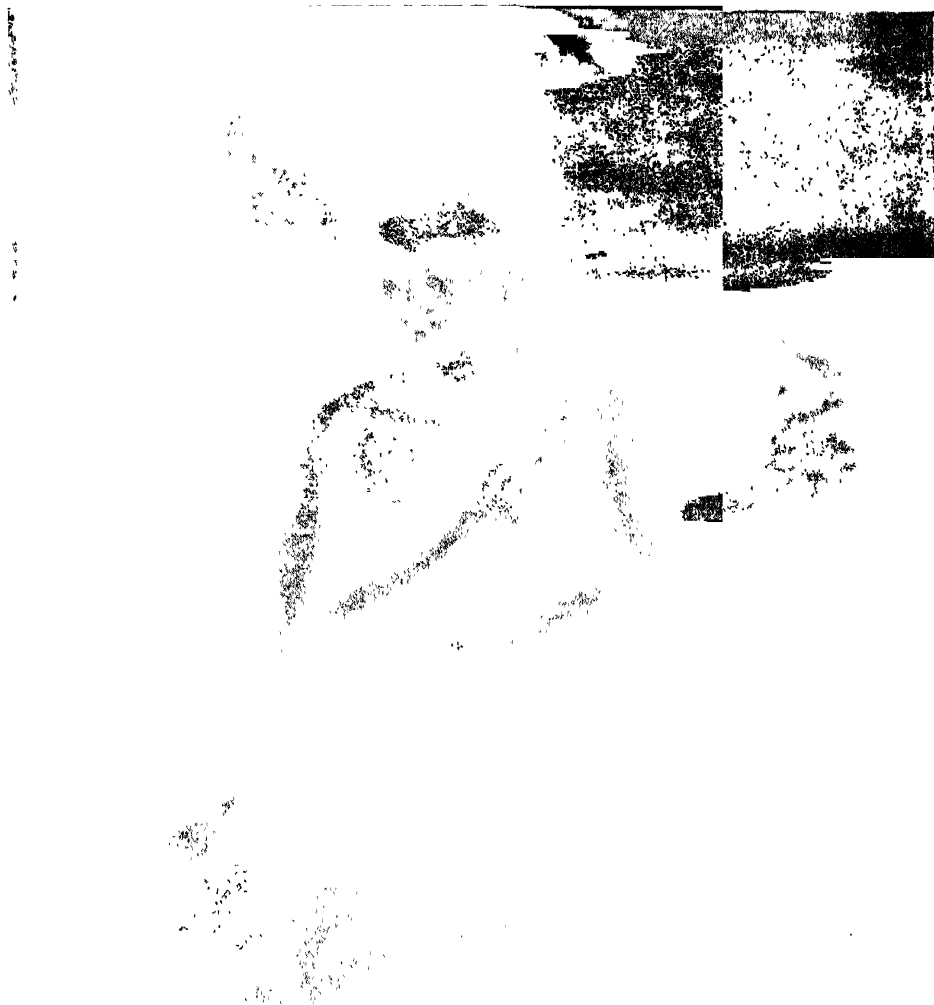
শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু ।

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র পালিত ।]

কিছুতেই সম্মত নহেন। সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধীয় বিধান তাহার মধ্যে একটি। সমুদ্র-যাত্রা বিহিত কি না, এ বিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের বাক্যের ব্যাখ্যা লইয়া গুরুতর মতভেদ আছে; এবং সমুদ্র-যাত্রাও যে হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ নহে, এ প্রকার শাস্ত্র-প্রমাণেরও অভাব নাই। আর যখন দেখা যাইতেছে যে, সমুদ্র-যাত্রার উপর আমাদিগের আধ্যাত্মিক-জীবন বিশেষরূপে নির্ভর করে না, তখন সমুদ্র-যাত্রায় দোষ কি হইতে পারে? কিন্তু এস্থলে আমাদিগের গোঁড়াসমাজের নেতৃগণ কিছুতেই আচারের বিধি পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। এইরূপ অপেক্ষাকৃত সামান্য নিয়ম সম্বন্ধে এমন দৃঢ়তা রক্ষা করিতে গিয়া, এক পক্ষে, আমরা সমুদয় সমুদ্র-যাত্রী বঙ্গসন্তানকে বিজাতীয় আচারের হস্তে সমর্পণ করিয়া হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস করিতেছি;—অপর পক্ষে, ক্ষুদ্র সামাজিক ব্যবস্থা লইয়া এত বেশী মারামারি করিতে গিয়া, আমরা প্রকৃত বস্তুটির দিকে ভালরূপে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছি না। সেইরূপ কন্যার বিবাহ বিষয়ে, আমরা অল্পবয়সে বালিকার বিবাহ দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছি। শাস্ত্রে যদিও এ বিষয়ে নানাবিধ বিধান আছে, তবুও আমরা তাহার কতকগুলি বিশিষ্ট বিধিমাত্র লইয়া দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি—যে ইহা পালন না করে, সে হিন্দু নয়। যদিও কন্যার উপযুক্ত বয়সে বিবাহ না দিলে পতিত হইবার কোনও বিধান শাস্ত্রে নাই, তথাপি ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, যে কেহ যে কোনও বিশেষ কারণে কন্যাকে অধিককাল অনূঢ়া রাখিতে ইচ্ছা করে, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে সে কলঙ্কিত ও অভিশপ্ত হইবার আশঙ্কা রাখে। হিন্দুধর্ম্মের সার বস্তুর উপর তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেও—হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থাকে সে মোটের উপর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অনুসরণ করিলেও—এই সামান্য বিষয়ে সামাজিক নিয়ম অবহেলা করিলে, তাহাকে অপাংক্তেয় হইতে হইবে—সমাজের নিকট হেয় হইতে হইবে। কিন্তু কন্যাকে অল্পবয়সে পাত্রস্থ করিবার বিধি যে হিন্দুধর্ম্মের অত্যাজ্য অঙ্গ নহে, তাহার প্রমাণ এই যে—ইহার বিপরীত বিধি সম্ভবপর বলিয়া শাস্ত্রে স্বীকৃত এবং স্থানে স্থানে হিন্দুসমাজে আচরিত হইতেছে। অপর পক্ষে, কন্যার বিবাহ-বয়স সম্বন্ধে এই অতিরিক্ত পীড়াপীড়ির ফলে, সমাজে এমন একটা কুৎসিত কদাচার বর্দ্ধিত হইতেছে,—প্রত্যেক হিন্দু-যুবক বিবাহে পাতিত্যকর পণগ্রহণ প্রথার দাসত্ব করিতেছে;—হিন্দুর বিবাহসভা হইতে শাশ্বত আধ্যাত্মিক ভাব বিলুপ্ত হইয়া, তাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মূল্যনিরূপণের জন্য উচ্চ কোলাহলে মুখরিত হইতেছে!—সে দিকে আমাদিগের সমাজের দৃষ্টি নাই।

এইরূপ, যে সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা লইয়া আমরা বড় অধিক নাড়াচাড়া করি, তাহা প্রায়ই হিন্দুর আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে অল্পবিস্তর অনাবশ্যক আয়োজন মাত্র। অথচ, সে সকল বিষয়ে আমরা কিছুতেই সূচ্যগ্র স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহি না। ইহার ফলে, পরের চক্ষে এবং কতকটা নিজের চক্ষেও, আমরা ইহাই দাঁড় করাইতেছি যে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবন কেবল এই সমুদয় অসার ধর্ম্ম-নিয়মে পর্য্যবসিত। হিন্দুসমাজ-মন্দিরের দ্বারে, "বজ্র আঁটুনী" দিতে গিয়া, "ফস্কা গেরো" দিয়া বসিয়া আছি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারপথে শক্ত পাহারা রাখিতে গিয়া, মন্দিরের প্রশস্ত তোরণদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি; কড়ির হিসাব মিলাইতে গিয়া, মোহর হারাইতে বসিয়াছি!—হিন্দুর উপর হিন্দুধর্ম্মের যে ন্যায্য অধিকার আছে, আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ-মূলক যে দাবী আছে, তাহা কঠোর সমাজশাসনের রোষ-কষায়িত দৃষ্টির অন্তরালে একেবারে লুকাইয়া গিয়াছে।

ইহার জন্য হিন্দুসমাজ দায়ী। অতীতকালে লোকের ধর্ম্মশিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা ছিল, এবং যাহার ফলে এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতা সমাজের সকল স্তরে অনুস্যূত হইয়াছিল, সে শিক্ষাপদ্ধতি তিরোহিত হইয়াছে—সমাজের অবস্থা এবং রুচিভেদে—এখন সে প্রণালীর পুনঃস্থাপনায় কোনও ফললাভ হইতে পারে কি না সন্দেহ; কিন্তু সে শিক্ষাপ্রণালীর স্থলে আমরা কোনও নূতন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করি নাই। সামাজিক জীবনে আজ কোনও এমন ব্যবস্থা নাই, যাহাতে অধিকারভেদে নানাভাবে হিন্দুধর্ম্মের সার-সত্য হিন্দুকে শিক্ষা দেওয়া হয়; কাজেই সে সত্য ক্রমে লোকের চিত্ত হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। অপর পক্ষে, হিন্দুসমাজের কঠোর শাসন, সমগ্র জীবনের দৈনন্দিন সহস্র কার্য্যকলাপব্যাপী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধি-নিষেধ, প্রত্যেক হিন্দুসন্তান শৈশব হইতেই শিখিতে থাকে —শিখিতে থাকে কোন্ জিনিস খাইতে বা দেখিতে নাই, কোন্ দিকে মাথা দিয়া শুইতে হয়, বা হাঁচিলে কি বলিয়া

আশীর্ব্বাদ করিতে হয়। এমন সমাজে বর্দ্ধিত মানব যে হিঁদুয়ানিকে নিরবচ্ছিন্নরূপে এই সমুদয় ক্ষুদ্র-বিধানে পর্য্যবসিত বিবেচনা করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? তাঁহার চক্ষে, হিন্দুধর্ম্মের সার-সত্য অন্তর্হিত হইয়া, এই সমুদয় আচার-অনুষ্ঠানই যে ধর্ম্মের সার বলিয়া প্রতীয়মান হইবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

হিন্দুসমাজ, প্রকৃত-প্রস্তাবে, এখন বিকারের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে! বুদ্ধিমানের ন্যায় হস্তপদ সঞ্চালন করিলেও, ইহাতে সারভূত সেই বুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছে ;—ইহার অন্তর্নিহিত সেই সুষুপ্তি-মগ্ন আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।—শুধু নিষেধমার্গ অবলম্বন করিলে, জাতীয়-জীবন শীঘ্রই জড়ত্ব প্রাপ্ত হইবে। কোনও অঙ্গে যদি ক্ষত হয় ; তবে সুচিকিৎসক সেই অঙ্গ একেবারে কাটিয়া ফেলেন না; শরীরের ভিতর যে জীবনীশক্তি আছে, তাহাকে জাগরিত ও পুষ্ট করিয়া তাহার দ্বারা ক্ষত নিবারণ করেন। সমাজের যেখানে ক্রিয়াকলাপের ত্রুটি, বা আধ্যাত্মিকতার অভাব, দেখিয়া আমরা এতদিন সেইখানটা তৎক্ষণাৎ ছাঁটিয়া ফেলিয়া মনে করিয়াছি—সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার হইল; কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই—সামাজিক ব্যাধির ত উপশম হয় নাই। তাই বলিতেছি, হিন্দুর আধ্যাত্মিক জীবন-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে,—বিধি-নিষেধের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া, উদার ধর্ম্মমতের উপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে ; নচেৎ হিন্দুর যে অমূল্য সম্পদ্, তাহা অচিরে বিলুপ্ত হইবে,—সমুদ্রযাত্রা ও পলাণ্ডুভোজন লইয়া শত তর্ক দ্বারাও তাহাকে আমরা জীবিত রাখিতে পারিব না।

অন্ধের মত হিন্দুসমাজ সর্ব্বনাশের পথে চলিয়াছে ;—অমূল্য সম্পদ্ পথে ফেলিয়া, শূন্য অঞ্চলে কঠিন গ্রন্থি বাঁধিতেছে! এখন ফিরিবার সময় হইয়াছে—নিমীলিত চক্ষু খুলিবার প্রয়োজন হইয়াছে—হিন্দুর সর্ব্বস্ব রক্ষার জন্য প্রাণপণ আয়োজন করিবার একান্ত আবশ্যকতা জন্মিয়াছে। এখন শাস্তকর শাস্ত্রের ক্ষুদ্র-অনুশাসন লইয়া তর্ক, ক্ষান্ত কর—কর্ম্মকাণ্ডের অসংখ্য ক্ষুদ্র-বিবাদ, নিত্য-সত্য যাহা তাহার রক্ষার জন্য সকলে যত্নবান্ হও। চক্ষু বুজিয়া কেবল "এটা নয়" "ওটা নয়" করিও না ;—যেটা ধ্রুব-সত্য তাহার দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হও। শাসনের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া, জ্ঞানের আলোক উদ্দীপ্ত কর। না জানিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিও না,—শাস্ত্রের সদর্থ জানিয়া, তাহার অন্তর্নিহিত যে মহা-সত্য, তাহাকেই সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা কর। তবেই দেখিতে পাইবে,—হিন্দুসমাজ এখনও মরে নাই ; ব্যাধিহীন নীরোগ অবস্থা সমাজে আবার ফিরিয়া আসিবে,—হিন্দুধর্ম্ম প্রাণ পাইয়া জগতের ইতিহাসের নূতন পৃষ্ঠায়, নূতন নূতন গৌরবময়ী কাহিনী বিবৃত করিবে। স্বপ্নাবিষ্টের মত পথে তুচ্ছ জিনিস হাতড়াইও না,—চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সম্মুখে যে অমূল্য সম্পদ্ তাহার দিকে স্থির পদে অগ্রসর হও।*

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

---

* এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের আলোচনার জন্য আমরা পণ্ডিতমণ্ডলীকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা আলোচ্য বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত হওয়া সকলেরই বাঞ্ছনীয়।—ভাঃ সঃ।

য়ুরোপ ভ্রমণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
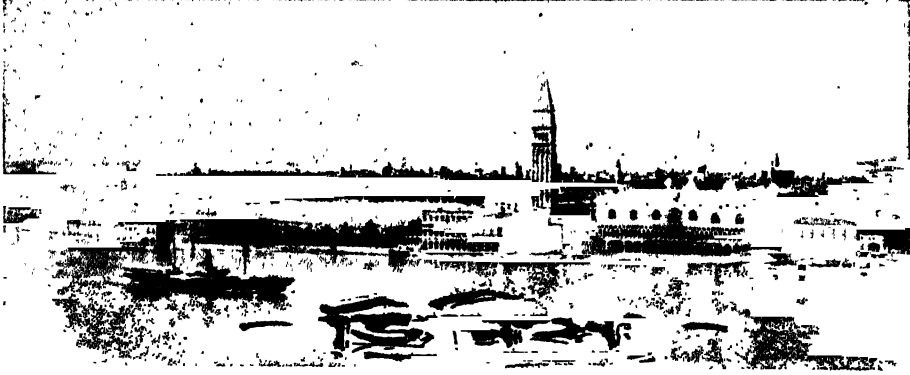
ফ্লোরেন্স্ হইতে আমরা ভিনিসে চলিলাম। রাত্রি প্রায় আটটার সময়, সান্ধ্য-ভোজনের একটু পূর্ব্বেই, আমরা ভিনিস সহরে উপস্থিত হইলাম। সে দিন ১৪ই মে। ভিনিস যাইবার পথে, আমরা ইটালীর প্রধান নদী 'পো' অতিক্রম করিয়া গেলাম। পথের মধ্যে আরও দুইটি প্রধান সহর পড়িয়াছিল; য়ুরোপ ভ্রমণ করিতে হইলে এই দুইটি সহর,—বোলোনা ও পাডুয়া—দেখিতেই হয়; কিন্তু এমন দেখিতেই হয় ত অনেক! অথচ সে সব দেখিবার সময় কোথায়? সুতরাং, আমরা ঐ দুইটি সহরের ষ্টেসন্, এবং গতিশীল গাড়ীর জানালা দিয়া যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই, দেখিয়া দর্শন-শেষ করিলাম; ষ্টেসন্ দুইটিতে আর নামিবার অবকাশ হইল না!

রাত্রি আটটা বলিলে, আমাদের দেশে বুঝি যে, প্রায় দুইঘণ্টা রাত্রি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ভিনিসে যখন আমরা পৌঁছিলাম, তখন ঘড়িতে ঠিকই আটটা বাজিয়াছিল, অথবা বাজিবার দুই দশ মিনিট বিলম্ব ছিল; কিন্তু তখনও সেখানে রাত্রি আসিবার সূচনা দূরে থাকুক—তাহার পূর্ব্বাভাস পর্য্যন্ত দৃষ্টহয় নাই, অর্থাৎ, তখন গোধূলি সময়! সুতরাং, আমরা অন্ধকারের মধ্যে ষ্টেসনে উপস্থিত হই নাই,—গোধূলি সময়ের আলোকে সহরটি আমরা বেশ দেখিতে পাইলাম।

এড্রিয়াটিকের রাজ্ঞী—এই ভিনিস্ সহরে প্রবেশ করিবামাত্রই একটি দ্রব্য সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টিগোচর হয়;—তাহার নাম (Gondola) 'গণ্ডোলা'। নামটা শুনিলে হয়ত প্রথমেই কাহারও, বিশেষতঃ ঔদরিকের মনে হইবে, ইহা হয়ত রসগোল্লা, বা ঐ রকম কিছু মিষ্টান্ন, এবং তাহাতেই ইহা সর্ব্বপ্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে 'গণ্ডোলা' মিষ্টান্ন নহে,—নৌযান-বিশেষ। এদেশে একটি প্রবাদ আছে—'Horse, Venice has never seen,' অর্থাৎ 'ভিনিস কখন ঘোড়া দেখে নাই।' কথাটা ভারি সত্য; ভিনিসে গো-যান, অশ্ব-যান, বাইসিকল, মোটর, এ সকল কিছুই নাই—চলিবার পথ নাই, কাজেই এ সকল নাই।—তবে কি লোকে আকাশ দিয়া চলে? তাহাও নহে; ভিনিসের লোকেরা জলপথে যাতায়াত করে; দেশে রাস্তা নাই, আছে খাল আর ঘাট। ভিনিস যে জলের সহর;—সেখানে 'গণ্ডোলা' ব্যতীত কোথাও যাইবার অন্যগতি নাই; এই 'গণ্ডোলা'ই সেখানকার সমস্ত প্রকার যানের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। এই গণ্ডোলাগুলির উপর একটা করিয়া আবরণ থাকে। সেই আবরণটা তুলিয়া ফেলিলেই নৌকা ও নৌকার মধ্যে বসিবার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটা ব্যাপার দেখিলাম; গণ্ডোলা সকলগুলিই কালরংএ মণ্ডিত, কোন খানিতে কাল ব্যতীত অন্য রং দেখিলাম না। ইহার কারণ শুনিলাম দুইটি। কেহ কেহ বলেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এখানকার লোকেরা এমন বাবু ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল

যে, তাহারা নিজেদের গণ্ডোলাগুলিকে অধিক চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া নানাবর্ণে, নানাপ্রকার কারুকার্য্যে, সুসজ্জিত করিত। এই অনর্থক অর্থব্যয় নিবারণ করিবার জন্য সে সময়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই আদেশ প্রচার করেন যে, কেহ গণ্ডোলা কাল ব্যতীত অন্য কোন রঙে সুশোভিত করিতে পারিবে না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কাল রং শোকচিহ্ন প্রকাশক,

দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতু

গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক; তাই দেশের লোকে কাল রংটাই পসন্দ করে। সেইজন্য এখানকার গণ্ডোলাগুলি নিরবচ্ছিন্ন কাল রঙে মণ্ডিত হইয়া আসিতেছে; বহুকালাগত প্রথা বলিয়া কেহ আর উক্ত রঙের পরিবর্ত্তন করেন না।—শেষোক্ত কারণটাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

ষ্টেসন্ হইতে বাহির হইয়াই আমরা এই গণ্ডোলায় চড়িয়া বসিলাম। তাহার পর যেটি প্রধান খাল, অর্থাৎ Grand Canal, তাহাতে গিয়া পড়িলাম। খানিক দূর এই বড় খাল দিয়া গিয়া, ছোট খালে পড়িলাম; এই রকমে অনেকগুলি ছোট খাল অতিক্রম করিতে হইল। এ ভ্রমণ মন্দ নহে, সহরের ভিতর দিয়া নৌকায় চড়িয়া যাওয়া—এও এক আনন্দ। শুনিয়াছি পূর্ব্বে নাকি যখন খুব বৃষ্টি হইয়া কলিকাতার পথে জল দাঁড়াইত, তখন অনেক সৌখীন বাবু সেই সকল রাস্তায় পান্সী চালাইতেন। আমরা ভিনিসে আসিয়া রাজপথে—না, না, রাজখালে—পান্সী চালাইলাম। সেই সবে আটটা বাজিয়াছে; কিন্তু তখনই সহরের গোলমাল শান্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইল; কারণ, নৌকার দাঁড়ের আঘাতে জলের শব্দব্যতীত, আর কিছুই আমাদের কর্ণগোচর হইল না। তবে মধ্যে মধ্যে গতিশীল নৌকার মাঝিরা উচ্চৈঃস্বরে 'ডাইনে—বাঁয়ে' প্রভৃতি বাক্যোচ্চারণে অপর নৌকাগুলিকে সতর্ক করিয়া সেই নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। ছোট ছোট খালের মধ্যদিয়া এই সকল গণ্ডোলা অবিশ্রান্ত যাতায়াত করিতেছে, অথচ সংঘর্ষ হয় না; ইহা দেখিয়া মাঝিদিগের নৌ-চালন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়। আমি ত ভয়েই সারা হইতে লাগিলাম—পাছে সহসা আর একখানি নৌকার সহিত ধাক্কা লাগাইয়া আমাদের কর্ণধার সেই রাত্রিতে আমাদিগকে নাকানি চুবানি খাওয়াইয়া তুলেন! খালের দুই পার্শ্বে অসংখ্য ঘাট; আর সেই সকল ঘাটের গায়ে বাড়ীর নাম বড় বড় সাইনবোর্ডে লিখিত আছে। বাড়ীগুলির গায়েও নানাবর্ণে চিত্রিত সাইনবোর্ডগুলি ছাদের মধ্য হইতে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। সকল বাড়ীর সম্মুখেই একটি করিয়া ঘাট। আমাদের হোটেলে পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই, আমরা সেই বিখ্যাত সেতু 'Bridge of Sighs' অর্থাৎ 'দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতু' পার হইয়া গেলাম। ইহার নাম দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে কেন, তাহা আমি বলিতে পারি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, হোটেলের সম্মুখে যখন আমরা গণ্ডোলা হইতে নামিলাম, তখন আমরা ত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করি নাই—এই নৌভ্রমণ বাস্তবিকই আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল।

আমরা যে হোটেলে গেলাম, সেটীতে পূর্ব্বে হোটেল ছিল না, তাহা একটি রাজপ্রাসাদ ছিল; এখন তাহা পান্থশালা হইয়াছে। বাড়ীটি দেখিতে বেশ; কিন্তু ইহার একটা অসুবিধা আছে। এই হোটেলের পশ্চাৎভাগ দিয়া একটা অতি সরু গলিপথ আছে; সেই পথদিয়া দিনরাত্রি লোকজন চেঁচামেচি ও গান করিতে করিতে যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহাতে নবাগত পান্থের প্রথম প্রথম বড়ই বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়; কিন্তু বেশীদিন থাকিলে, ক্রমে সকল গোলমাল সহিয়া যায়।

পিয়াজ্জেটা।

সেণ্ট্ মার্কের গির্জ্জা।

রাত্রিতে আর কোথায় যাইব,—বা কি দেখিব! পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই, হাতমুখ ধুইয়া, আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমাদের হোটেলের অতি নিকটেই ভেনিসের বিখ্যাত পিয়াজ্জেটা (Piazetta), বা সেণ্ট মার্কের স্কোয়ার বা ভ্রমণ-স্থান। আমরা পদব্রজেই এই ভ্রমণস্থানে গমন করিলাম। যদিও ভিনিস সহরটার অষ্ট পৃষ্ঠে খাল; তবুও সেটা সহরের কেন্দ্রস্থল, সেখানে পদব্রজে যাওয়া যায়; কিন্তু এই সামান্য পথটুকুও যাইতে হইলে কতগণ্ডা খালের সেতু পার হইতে হয়! সহরের অভ্যন্তর ভাগটা যেন একটা দ্বীপ—তাহার সব দিকই খালের দ্বারা বেষ্টিত। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি এই সহরের সর্ব্বত্রই পদব্রজে যাইতে পারেন; তবে দুই চারি পা গেলেই, এক একটা সেতু পার হইতেই হইবে। এই সেণ্ট্ মার্কের স্কোয়ারের তিনদিকে পুরাতন রাজ-প্রাসাদ, আর একদিকে বাইজেণ্টাইন্ স্থাপত্য-শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের অন্যতম—সেণ্ট্ মার্কের গির্জ্জা। বৃত্ত, গম্বুজ এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান—এই গুলিই গ্রীক্‌দিগের এই বাইজেণ্টাইন্ স্থাপত্য-শিল্পের বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর শিল্পের আর একটি মাত্র আদর্শ এখনও আছে—সেটি ইস্তাম্বুলের সেণ্ট্ সোফিয়ার গির্জ্জা। এই গির্জ্জা দুইটি দেখিলে মুসলমানদিগের মস্‌জিদ বলিয়া মনে হয়! সেণ্ট্ মার্কের পরেই প্রাসাদ। ভিনিসের বিখ্যাত

ক্যাম্পানৃহিল্ কএক বৎসর পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইতেছিল। এই স্কোয়ারের চারিপার্শ্বে যে সমস্ত খিলান আছে, তাহাতে অনেকগুলি দোকান বসিয়াছে; আমরা বিশেষ আগ্রহের
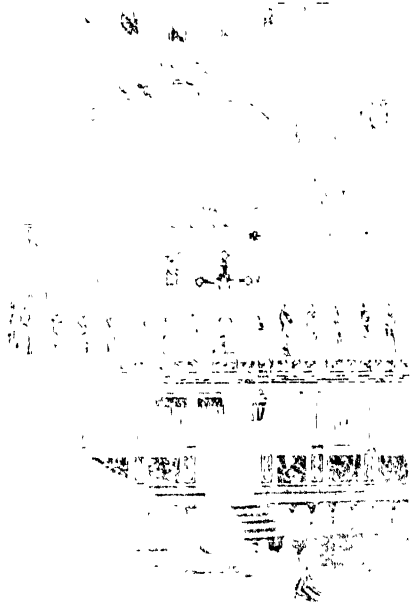
সেণ্ট্ মার্কের গির্জ্জার অভ্যন্তরভাগ।

সহিত দুইটি প্রধান দোকান দেখিলাম; একটি কাচের দোকান, আর একটি চামড়ার দোকান। এই দোকানগুলি পূর্ব্বতন প্রাসাদের নিম্নতলে অবস্থিত; ইহার দ্বিতলের কতকটা এখনও রাজপ্রাসাদ রূপে ব্যবহৃত হয়, অবশিষ্টভাগে সরকারী আফিস্-আদালত স্থাপিত হইয়াছে। অতঃপর আমরা সাল্ ভিয়াটি জেস্থরামের লেস্, বা চিকণের কারখানা দেখিতে গেলাম। এখন, সুধু য়ুরোপ কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রমণী ও বালকবালিকাদিগের পোষাকে লেস্ ব্যবহার হইয়া থাকে; সুতরাং, যাহারা লেসের ব্যবসায় করে, তাহারা বিশেষ লাভবান্ হয়। ভিনিসের লেস্ নির্ম্মাণের কারখানাগুলি দেখিবার উপযোগী। শত শত স্ত্রীলোক এই কারখানায় কাজ করিতেছে; তাহাদের কার্য্য-প্রণালী, কার্য্যকুশলতা এবং পরিচ্ছন্নতা, সর্ব্বোপরি শিল্প-নৈপুণ্য, দেখিবার মত বটে। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই কারখানার কাজ দেখিলাম। এই সকল কারখানায় যে সুধু লেস্ই নির্ম্মিত হয়, তাহা নহে; এখানে পর্দ্দা, কার্পেট্ প্রভৃতিও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। খাল হইতে রাজপ্রাসাদ দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু এই প্রাসাদের বাহ্য-সৌন্দর্য্যই যে মনোরম, তাহা নহে—ইহার অভ্যন্তর ভাগও অতি সুদৃশ্য। প্রাসাদের মধ্যে আমরা অনেক অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য, অনেক ভাস্কর্য্য ও চিত্র দেখিয়াছিলাম। প্রাসাদের মধ্যে অনেকগুলি ঐতিহাসিক স্থানও দেখিলাম, যথা—যে যে স্থানে 'দশজনের সমিতি' (Council of Ten), 'তিন জনের সমিতি' (Council of Three) ইত্যাদি সমবেত হইত। আরও একটা কৌতূহলজনক ব্যাপার দেখিলাম,—প্রাসাদের অনেক স্থানে দেয়ালের মধ্যে বাক্সের মত স্থান রহিয়াছে,—আমাদের দেশে রাজপথপার্শ্বে বাড়ীর দেওয়ালে যেমন ডাকের বাক্স থাকে, এগুলি ঠিক সেই রকমের! যাহারা বিনামী দরখাস্ত দিতে চাহিত, তাহারা লোকের অজ্ঞাতসারে এই সকল বাক্সে তাহাদের চিঠিপত্র ও দরখাস্ত দিয়া যাইত; তাহারপর, রাজপুরুষেরা সেই সকল দরখাস্ত লইয়া তাহাদের সত্যমিথ্যা অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা করিতেন!—এই রাজপ্রাসাদ দেখিলে, সেকেলে জিনিস সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারা যায়। এই প্রাসাদ যাঁহারা দেখিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন এখানকার সেকেলে কারা-কক্ষগুলি
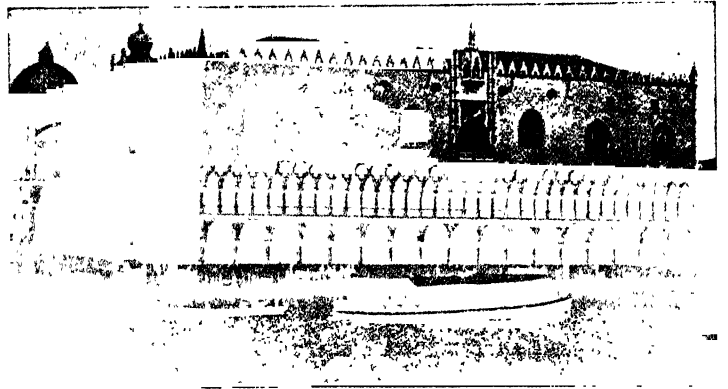
পুরাতন (ডজেদের) রাজপ্রাসাদ।

দেখিয়া আসেন; দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতুর (Bridge of Sighs) পার্শ্বস্থ এই কক্ষগুলি দেখাইবার সময়, আমাদের পথপ্রদর্শক একটি কক্ষ দেখাইলেন, যেখানে মেরীনো ফ্যালীরোর

(Marieno Faliero) মস্তক দেহচ্যুত করা হইয়াছিল। আর একটি কারাকক্ষ দেখিলাম ;—পথপ্রদর্শক বলিলেন যে, ভিনিসের কারাকক্ষগুলি কেমন, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডের কবিবর বায়রণ্ ঐ কক্ষে একবার ২৪ ঘণ্টা আবদ্ধ ছিলেন। রাজনৈতিক অপরাধীদিগের জন্যই এই সকল কারাকক্ষ ব্যবহৃত হইত ; দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সেতু পার হইয়া, অপর পারে যেসকল কারাকক্ষ আছে, সেগুলি এখন দেওয়ানী কয়েদীদিগের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারাগারগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, কেন সেতুর নাম 'দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতু' হইয়াছে! পূর্ব্বে যখন এই সেতুর উপর দিয়া বন্দীদিগকে নির্জ্জন কারাগারে লইয়া যাওয়া হইত, তখন তাহারা বুঝিতে পারিত যে, তাহারা আর জীবিতকালে বহুদিন বাহির হইতে পারিবে না, আর পৃথিবীর মুখ দেখিতে পাইবে না, আর লোকালয়ে আসিতে পারিবে না! তাই, তাহারা এই সেতুর উপর দাঁড়াইয়া, জন্মের মত ধরণীর শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইত, এবং তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কারাগারে চলিয়া যাইত ; সেই জন্যই, হয়ত, এই সেতুর উক্তবিধ নামকরণ হইয়াছে।—প্রাতঃকালের মত সহর-দেখা শেষ করিয়া, আমরা হোটেলে আসিলাম।

অপরাহ্ণকালে আমরা জলপথে ভ্রমণে বাহির হইলাম। এবার আমরা এড্রিয়াটিক্ সাগরের একটি শাখা, রিভা ডেগ্‌লি শিয়াভেনি (Riva degli Schiavoni), দিয়া ভিনিস হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী মুরাণো দ্বীপ দেখিতে গেলাম। এই দ্বীপের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্যই যে আমরা সেখানে গিয়াছিলাম,—ঠিক তাহাই নহে ; এখানকার গ্লাসের কারখানা একটা প্রধান-দ্রষ্টব্য। কেমন করিয়া গ্লাস প্রস্তুত হয়, কেমন করিয়া তাহা হইতে সুন্দর সুন্দর দ্রব্য, পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে,—তাহাই দেখিবার জন্য আমরা এখানে গিয়াছিলাম। ভিনিসে অনেকগুলি কাচের কারখানা আছে ; কিন্তু এই দ্বীপে যেটি আছে, সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এখানে যাহারা কাজ করিতেছে, তাহারা অতি সামান্য বেতন পাইয়া থাকে ; কিন্তু এই সামান্য পারিশ্রমিকেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা এখানে কাজ করিয়া থাকে। এখানে একটা গির্জ্জা ও যাদুঘরও আছে। এই সকল স্থান যাহারা দেখিতে গিয়াছে, তাহারা সকলেই একখানি পরিদর্শন-পুস্তকে স্ব স্ব নামধাম লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। ভিনিসের অনেক প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য-স্থানেই এই প্রকার পরিদর্শন-পুস্তক দেখিয়াছি। এই সকল পুস্তকের পাতা উল্টাইলে, অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির স্বাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় ;—দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুধু য়ুরোপের নহে, পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যদেশের লোকেরাই এই সকল স্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন।
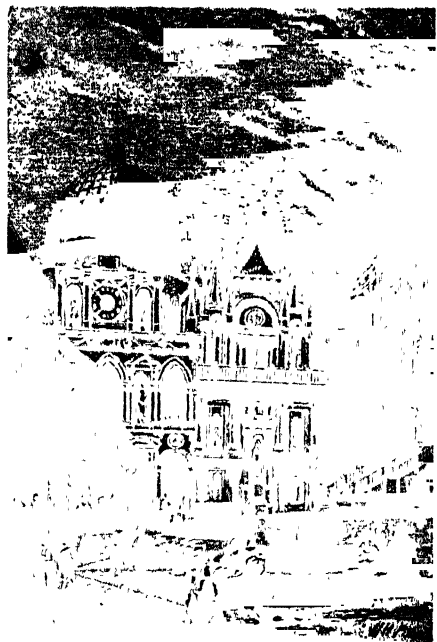
রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ।

এইস্থান হইতে আমরা লীডো দ্বীপ (Isle of Lido) দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানে আমরা ঘোড়া দেখিতে পাইলাম ; এখানে অশ্ববাহিত ট্রাম্ আছে। এই দ্বীপটি ভিনিসবাসীদিগের স্নানের স্থান। এখানে স্নানের নানা আয়োজন ও নানা সরঞ্জম দেখিলাম। গ্রীষ্মকালে এখানে একেবারে লোকারণ্য হইয়া পড়ে। এই লীডো দ্বীপ ভিনিস হইতে দেড় মাইল দূরে। এখান হইতে ফিরিবার সময়, আমরা স্যালা ডেল্ ম্যাগিয়োর ভজনালয় দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তৎপরে আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া, রাত্রি আটটার পর আহারাদি শেষ করিয়া, পুনরায় গণ্ডোলায় চড়িয়া নৈশভ্রমণে বাহির হইলাম। এবার আমরা গান শুনিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। ভিনিসে আসিলাম,

অথচ গান শুনিলাম না,—তাহাও কি হয়? তাই আমরা গান শুনিবার জন্য শান্তি গিয়োভ্যানি ই পেওলো নামক ভজনালয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম, অনেকগুলি নৌকা সেখানে একত্র রহিয়াছে; সকল নৌকাতেই আলোক জ্বলিতেছে, নৌকাগুলিও সুসজ্জিত করা হইয়াছে; নৌকার উপর চিনে লণ্ঠনে অনেক বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাত্রিকালে খালের মধ্যে এই আলোকোজ্জ্বল নৌকাগুলি বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে এড্রিয়াটিক্ সাগরের বন্দরে অবস্থিত জাহাজগুলির প্রচণ্ড আলোক-রশ্মি (Search light) এই স্থানের উপর পাতিত হইয়া সহসা অন্তরিত হইতেছিল। এই আলোকের সাহায্যে প্রাসাদগুলি ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং আরব্য-উপন্যাসের আলাদিনের রাজপ্রাসাদের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছিল। অনেকগুলি নৌকায় গান চলিতেছিল। একখানি নৌকায় একটি বালিকা অতি সুন্দর গান গায়িতেছিল। আমরা অনেকক্ষণ তাহার গান শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরেই সকল নৌকারই গান থামিয়া গেল, নৌকাগুলিও সেস্থান ত্যাগ করিয়া যাহার যেদিকে ঘর, সেইদিকে চলিয়া গেল; চাঁদের হাট ভাঙ্গিল।—আমরাও হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রামের আয়োজন করিলাম।

স্কালা ডেল্ ম্যাগিয়োর্।

পরদিন প্রাতঃকালে একখানি গণ্ডোলা লইয়া আমরা (Royal Academy of Fine Arts) রাজকীয় প্রধান শিল্পাগার দেখিতে গেলাম। সেখানে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখিলাম; তাহাদের বিশেষ বিবরণ দিতে গেলে প্রকাণ্ড একখানি পুঁথি হইয়া পড়ে। এখান হইতে আমরা পুনরায় সেণ্ট্ মার্কের ভজনালয়ের দিকে গেলাম। পূর্ব্বদিন যদিও এই ভজনালয় দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে উপর উপর। একবেলায়, কএক ঘণ্টার মধ্যে, কি এসকল স্থান ভাল

শান্তি গিয়োভ্যানি ই পেওলো।

করিয়া দেখা যায়!—তাই আমরা আজ আবার সেই ভজনালয় দেখিতে গেলাম; এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানাস্থান ঘুরিয়া, সে বেলার মত ভ্রমণ শেষ করিলাম।

অস্ত্রাগার।

অপরাহ্নে আমরা রিয়াল্টো সেতু (Rialto Bridge) দেখিতে গেলাম। রিয়াল্টো নামটা শুনিয়াই আমাদের মহাকবি সেক্সপীয়রের 'মার্চ্চেণ্ট্ অব্ ভিনিসে'র কথা মনে হইল; কবিবর এই সেতুটিকেই তাঁহার নাটকের পাত্রপাত্রীদিগের অনেকের মিলনস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, এই সেতুই মিলনস্থান নহে; সেতুর নিকটবর্ত্তী একটি স্থান আছে, সেক্সপীয়র সেই স্থানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সেই স্থানে এখন একটা বাজার বসিয়া থাকে। এখান হইতে বড়খাল দিয়া যাইবার সময় আমাদের পথপ্রদর্শক অস্ত্রাগারের পার্শ্বে একটি বাড়ী দেখাইলেন; সেই বাড়ীতে 'ওথেলো'র 'ক্যাশিও' বাস করিতেন। এই খালের পার্শ্বে অনেকগুলি অট্টালিকা দেখিলাম; শুনিলাম, সেগুলি পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ ছিল—এখন সেগুলি অযত্নে পড়িয়া আছে; কোন কোন প্রাসাদে এখন দোকান বসিয়াছে। এইবার আমরা সেণ্ট্ নাজেরাস্ দ্বীপের উপর অবস্থিত আরমাণী গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। এই দ্বীপটি আরমাণীদিগের অধিকারভুক্ত, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা ইটালিয়ান্ রাজ্যের অন্তর্গত। এখানকার আরমাণী গির্জ্জার অবস্থা খুব ভাল। এখানে একটা প্রকাণ্ড পুস্তকালয় আছে; আমরা সেই পুস্তকালয়ে বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুঁথি দেখিলাম। এই পুস্তকালয়ে একখানি টেবিল দেখিলাম; আমাদের গাইড মহাশয় বলিলেন যে, কবিবর লর্ড বায়রণ্ যখন এখানে আসিয়া আরমাণী ভাষা শিক্ষা করিতেন, তখন তিনি এই টেবিলখানির সম্মুখে বসিতেন। এই গির্জ্জার পাদরী মহাশয়েরা এখানে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করিয়াছেন; সেই মুদ্রাযন্ত্রে ধর্ম্মপুস্তকাদি ছাপা হইয়া থাকে। এই গির্জ্জার প্রধান পাদরী মহাশয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে একখানি আরমাণী বাইবেল দিলেন; খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে ১৬টি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ রহিয়াছে। এই গির্জ্জার সংসৃষ্ট একটা মানমন্দিরও আছে; দেখিলাম সেখানে মানমন্দিরের জন্য ব্যবহারোপযোগী অনেক যন্ত্র রহিয়াছে। তৈমুর লঙ্গের পূর্ব্বপুরুষ মহাবীর জেঙ্গিস্ খাঁয়ের একখানি চেয়ার এখানে রক্ষিত হইয়াছে! ভারতলুণ্ঠিত দ্রব্যরাশির মধ্য হইতে এই চেয়ারখানি যে কেমন করিয়া সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া এখানে, এই ভজনালয়ে, আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাত বুঝিতে পারিলাম না! শুনিলাম, এখানকার পুস্তকালয়ে বসিয়াই
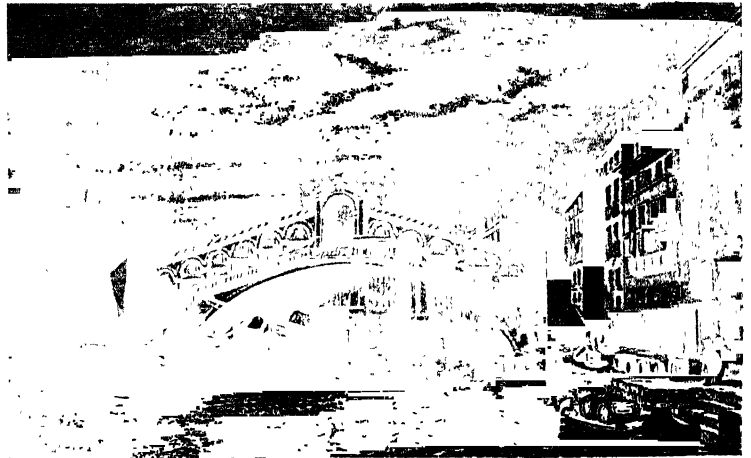
রিয়াল্টো সেতু।

কবিবর লর্ড বায়্‌রণ্‌ তাঁহার জগদ্বিখ্যাত কাব্য চাইল্ড্‌ হ্যারল্ডের (Childe Harold) চতুর্থ সর্গ লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকালয় দেখিতে এতাবৎ যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই পরিদর্শন-পুস্তকে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া গিয়াছেন। আমি সেই পুস্তকের পাতাগুলি উল্‌টাইয়া দেখিলাম, সম্রাট্‌ তৃতীয় নেপোলিয়ন্‌, রাজ্ঞী ইউজিনি, আমাদের রাজা ও রাণী ও গ্লাডষ্টোনের নাম স্বাক্ষর রহিয়াছে; আরও অনেক বিখ্যাত লোকের হস্তাক্ষর দেখিলাম।

ছুইদিন ভিনিসে থাকিব বলিয়া আসিয়াছিলাম; দেখিতে দেখিতে ছুইদিন হইয়া গেল।—পরদিনই আবার এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া না রাখিলে, এ সকল দেশে চলা যায় না; নানা অসুবিধায় পড়িতে হয়। সুতরাং ভিনিসের আরও অনেক দৃশ্য দেখিবার থাকিলেও, আমরা আর এখানে থাকিতে পারিলাম না।—পরদিন প্রাতঃকালেই আমরা ভিনিস ত্যাগ করিয়া মিলান্‌ যাত্রা করিলাম।

শ্রীবিজয় চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌।

আছে

কে বলে সে চ'লে গেছে ?—কে বলে সে নাই ?
সে আছে এ বিশ্বমাঝে, শত দিকে শত কাজে
আমি যে সতত তারে দেখিবারে পাই!
কে বলে সে চ'লে গেছে ?—এ জগতে নাই ?
অনলে অনিলে জলে, অনন্ত অম্বরতলে,
চন্দ্রসূর্য্য তারাদলে—আছে সর্ব্বঠাঁই!
কে বলে সে চ'লে গেছে ?—কে বলে সে নাই ?
পবিত্র স্বর্গীয় সাজে সে আছে এ হৃদি মাঝে,
মনঃ-প্রাণ-চিত্ত ভ'রে আছে সর্ব্বদাই!
কে বলে সে চ'লে গেছে ?—কে বলে সে নাই ?
নীরব নিঝুম রাতে, শান্ত সুপবিত্র চিতে,
ধ্যাননেত্রে তারি পানে চেয়ে থাকি তাই,—
মিশে আছে মনে প্রাণে !—কে বলে সে নাই ?
কে বলে সে চ'লে গেছে ?—এ জগতে নাই ?

শ্রীঅনুরূপা দেবী

তন্ময়

জানি না কোথায় তুমি, জানি না সে কত দূর,
জানি না পশে কি সেথা প্রাণের আকুল সুর!
তবু তো বুঝে না হৃদি, তবু তো মানে না প্রাণ,
সারা দিন সারা নিশি গায় শুধু তব গান!
একদিন ছিলে হেথা, দিয়েছিলে ভালবাসা,
সুখে দুখে জাগাইলে কত সাধ—কত আশা!
সকলি ফুরায়ে গেছে, আজ আর কিছু নাই;—
আঁধার—আঁধার শুধু আবরিল চারি ঠাঁই!
মনে হয় একদিন দগধ মরুর বুকে
বহা'লে কি সুধা-ধারা তুমি দেবী, সকৌতুকে!
তাহারি স্মৃতির রেখা এখনো উজ্জলতর,—
আকাশে বাতাসে বুঝি ভাসে তা'রি কল-স্বর!
আপনা হারায়ে তাই মগন তোমারি ধ্যানে,
যদি কভু দেখা দাও তৃষিত তাপিত প্রাণে!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

প্রতিদান

হরিশকে আমি দেখিতে পারিতাম না, অথচ তাহাকে ছাড়া আমার চলিতও না। আমি চিরদিনই নিজেকে—একটা খুব উচ্চদরের লোক বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছি; আমার ধারণা ছিল,—রাম-শ্যাম-যদুর বহুউর্দ্ধে আমার স্থান!—আমার লক্ষ্য উচ্চ,—আদর্শ মহান্,—আকাঙ্ক্ষা অপরিমেয়।—আমাদ্বারা পৃথিবীতে এমন একটা অভিনব কিছু সংসাধিত হইবে, যাহাতে আমার নাম, অনন্ত কাল ধরিয়া স্বর্ণাক্ষরে প্রোজ্জ্বল রাখিবে। কিন্তু আমার আদর্শটা যে কি,—পৃথিবীটা যে কেন আমার আবির্ভাবে ধন্য হইবে,—তাহা আমার নিকট কখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

ধূমকেতু যতই ক্ষিপ্রের মত ছুটিয়া চলুক না কেন, পুচ্ছটা তাহার পেছনে লাগিয়াই থাকে। আমি যতই নিজেকে দেশ ও সমাজের কাজে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছিলাম, হরিশ ততই আমার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। আমি প্রবন্ধ লিখিতাম, হরিশ তাহা ছাপাইবার নিমিত্ত দ্বিপ্রহর রৌদ্রে সম্পাদকের বাড়ীতে হাঁটিয়া পা ফুলাইয়া ফেলিত; আমি বক্তৃতা করিতাম, হরিশ "হিয়ার, হিয়ার" শব্দে গলা ফাটাইয়া, হাত-তালির চটাপট্ শব্দে কর্ণ বধির করিয়া আসর জমাইয়া তুলিত; আমি নির্ব্বিবাদে কলিকাতার হাড় জ্বালা গরমে,—মেসের দ্বিতলে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতাম বা লেম্‌নেড্ ও ডাব ধ্বংস করিতাম, আর হরিশ একটু ধন্যবাদ বা এক গ্লাস লেম্‌নেডেরও প্রত্যাশা না রাখিয়া, যত্রতত্র আমার গুণকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইত। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।

হরিশ আমার সহপাঠী। আমি, 'ইউনিভার্সিটি'র পরীক্ষা-সমুদ্র সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া, আইনপাঠে মনঃসংযোগ করিয়াছি। ভক্ত যেমন নির্নিমেষ-নয়নে দেবতার দিকে চাহিয়া থাকে, হরিশও তেমনই মুগ্ধ চিত্তে—প্রশংসমান দৃষ্টিতে—আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার এই নিষ্কাম পূজায়,—এই নীরব স্তুতিবাদে—আমার যে একটু গর্ব্ব না হইত, তাহা নয়; কিন্তু এজন্য হরিশের নিকট নিজেকে একটুও কৃতজ্ঞ মনে করিতাম না! কারণ, আমি ভাবিতাম হরিশের এই ভক্তির অঞ্জলি আমার প্রাপ্য,—ইহাতে তাহাকে প্রশংসা করিবার কিছুই নাই। বরঞ্চ, আমার দুঃখ হইত যে, আমার মত লোকের পার্শ্বচর হরিশের মত একটা নির্ব্বোধ জীব।

ফাল্গুনের সন্ধ্যা। রৌদ্রতপ্ত মহানগরীর উপর দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া সান্ধ্য-বাতাস বহিয়া যাইতেছে। আমি ছাদের উপর, একখানি খাতা ও একটি পেন্সিল লইয়া, একটা কিছু লিখিবার আশায় বসিয়াছিলাম। পাশের বাড়ীর বাগানের প্রস্ফুটিত কুসুমদামের গন্ধে মদির-বাসন্তী হাওয়া, আমার বক্ষের উপর কোমল স্পর্শ বুলাইয়া যাইতেছিল।—পশ্চিম-আকাশের খণ্ড-মেঘের কোলে বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস, আমার চিত্তে একটা অপূর্ব্ব পরীরাজ্যের সৃষ্টি করিতেছিল। আমি লেখার কথা ভুলিয়া, কি যেন একটা অজানা ভাবের হিল্লোলে দোলা খাইতেছিলাম। কুসুম-গন্ধে, বর্ণ-বৈচিত্র্যে, সমাহিত নিস্তব্ধতায় সান্ধ্য-প্রকৃতি যতই মহিমান্বিতা হইয়া উঠিতেছিল, আমার হৃদয় ততই যেন একটা অপূর্ব্ব-অনুভূত পুলক-সঞ্চারে শিহরিয়া,—রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। আমার নিঃসঙ্গ-জীবন, আমার নিরর্থক—উদ্দেশ্যবিহীন বিক্ষিপ্ত—প্রচেষ্টা, এই নীরব শান্ত ফাল্গুন-সন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধের মহোৎসবের মধ্যে নিতান্ত খাপ-ছাড়া বলিয়া মনে হইতেছিল। একটা রুদ্ধ বেদনায়, একটা ব্যর্থতার পীড়নে, একটা অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষায়, আমার কম্প্র বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিল। দূরে রক্তিম সৌধ-শীর্ষগুলি খণ্ড মেঘের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। কেবল পশ্চিমাকাশে একটা ম্লান আলোকদীপ্তি তখনও জাগিয়া রহিল। তখন পুঞ্জ পুঞ্জ তারকামালায় আকাশ ভরিয়া গিয়াছে, নিম্নেও মহানগরী আলোকমালায় সজ্জিতা হইয়া স্বপ্নপুরীর মত দেখা যাইতেছে। চারিদিক্ নিস্তব্ধ,—যানবাহনের অস্ফুট কলরব, বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে।

পাশের বাড়ীতে 'হার্ম্মোনিয়ম্' বাজাইয়া সুকোমল নারী-কণ্ঠে কে গায়িয়া-উঠিল :—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী—
'সখি জাগো, সখি জাগো !
মেলি রাস-অলস আঁখি—
সখি জাগো—জাগো !'
আজি চঞ্চল এ নিশীথে—
জাগো ফাল্গুন-গুণ-গীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে,
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি
'সখি, জাগো, জাগো !' "—

গান কখন্ থামিয়া গিয়াছে, জানিতে পারি নাই। গানের এক একটি পর্দ্দা যেন আমার অন্তরের এক একটি তন্ত্রীকে ঝঙ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। আমার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া বাজিতেছিল,—"জাগো, জাগো সখি, জাগো।" ক্ষুব্ধ, স্ফীত বক্ষ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সঙ্গীতের হিল্লোলে সমস্ত নৈশ-প্রকৃতি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। উর্দ্ধে তারকাখচিত অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে গুঞ্জন-মুখরা কৃষ্ণাম্বরা নিখিল ধরণী—সকল জুড়িয়া উন্মাদ বায়ু-প্রবাহ যেন অনাদিকালের নিখিল জাগরণ-কাহিনী বহিয়া আনিতেছে।

ক্ষুব্ধ, স্ফীত বক্ষ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

হঠাৎ পাশের বাড়ীর একটি খোলা জানালার দিকে চোখ পড়িল। দেখিলাম—একটি অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী অর্গানের পাশে বসিয়া, ধীরে ধীরে একখানি পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইতেছে। কক্ষের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া তাহার ঈষৎ নত কমনীয় নিটোল মুখখানি ঝলমল করিতেছিল। কপালের উপর দুই গুচ্ছ ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ, মৃদু বায়ুপ্রবাহে ক্রীড়া করিতেছিল। তাহার আনত আয়ত চোখ দুটি পুস্তকে নিবদ্ধ। বাতাসে সঞ্চরমান গানের রেস্-টুকুর সহিত তখনও যেন তাহার অন্তরে বাজিতেছিল,—"জাগো, জাগো !" তাহার কপোলের পক্ষ্মের, ললাটের, অরুণিমা তখনও অপসারিত হয় নাই ; বাসন্তী সমীরণ তখনও তাহার সুন্দর নাসাগ্রভাগের বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি বিলুপ্ত করিতে পারে নাই।

আমি তন্ময় চিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার মনে হইতেছিল,—যেন উদার নীলাকাশ ও অন্তহীনা ধরণীর মাঝখানে, আজ এক শুভ্রপ্রভাত আমার নিকট কোন অপরূপ জাগরণ চাঞ্চল্য বহিয়া আনিয়াছে ; আমার উদ্বুদ্ধ অন্তর যেন প্রভাত-পূজার পুষ্পাঞ্জলির মত ভাব-সমাহিতা দূর-দৃষ্টার অদৃশ্য চরণদ্বয়ে লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছে।

হঠাৎ পশ্চাতে কাহার নিঃশ্বাস শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, হরিশ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।—কেন বলিতে পারি না, তাহাকে

দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল; তাহাকে একটা অত্যাচারী নিষ্ঠুর দস্যুর মত মনে হইতে লাগিল। হরিশ একটু অগ্রসর হইয়া বলিল,—"তোমার 'বর্ণ-সমস্যা' 'প্রকাশে' বেরিয়েছে, নরু!—এই নাও।"—বলিয়া, একখানি কাগজ আমার সম্মুখে ধরিল। আমার ইচ্ছা হইল, হরিশের গলাটা ধরিয়া—কাগজখানা সমেত—ছুড়িয়া নীচে ফেলিয়া দিই! রাগে ফুলিতে ফুলিতে—গম্ গম্ করিয়া নীচে নামিয়া গেলাম; হরিশ নীরবে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই দিন হইতে, নিয়মিত সময়ে ছাতে সান্ধ্য-ভ্রমণ আমার প্রাত্যহিক ব্যাপার হইয়া উঠিল। হরিশ দু'একদিন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া, আমাকে ছাতের উপর অন্ধকারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, নীরবে ফিরিয়া গেল। মেসে অনেকে কাণা-কাণি ও চোখ-ঠারাঠারি আরম্ভ করিল; কিন্তু কিছুতেই আমার প্রাত্যহিক মৌন-পূজার ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিল না।

কিছুদিন যাবৎ হরিশের আর দেখা নাই। আমি মনে মনে একটা আরাম অনুভব করিতে লাগিলাম;—কিন্তু কিছুদিন পরে কেমন যেন একটু ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল।—হরিশ যে ক্রমশঃ আমার পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ভাবিয়া তাহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল। সে যে আমার সহস্র-ভক্তের মধ্যে নগণ্য এক জনমাত্র, তাহার স্থান যে বহুনিম্নে—রাম-শ্যামের মধ্যে; এই অত্যন্ত মোটা কথাটা যে সে কেন সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারে না, ইহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম! এমন সময় ঘরের দরজার কড়া ধরিয়া কে নাড়িল;—বুঝিলাম, হরিশ আসিয়াছে। সেদিন আর অনিচ্ছা-প্রকাশ, বা দরজা খুলিতে অযথা-বিলম্ব, করিলাম না। আমার এই অনাদৃত ভক্ত-বন্ধুর দৈনিক সাক্ষাতের দীর্ঘ অভাব, আমার অন্তরকে অজ্ঞাতসারে একটু চঞ্চল করিয়া তুলিয়া-ছিল;—তাই, সে দিন তাহার আগমনকে আমি তত বিরক্তি, বা অবহেলার, চক্ষে দেখিতে পারি নাই।

দরজা খুলিতেই সহাস্যমুখে হরিশ, ও তাহার পশ্চাতে পিতৃদেব, আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শশব্যস্ত হইয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, এবং তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে কতকটা উৎকণ্ঠা ও কতকটা বিস্ময়—কৌতূহলের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম!

পিতা উপবেশন করিয়া, দু'একটি কুশল প্রশ্ন ও দু'চারিটি একথা-সেকথার পর, বলিলেন যে, 'সম্প্রতি তোমার একটি খুব ভাল সম্বন্ধ উপস্থিত।—মেয়েটি শিক্ষিতা ও সুন্দরী;—আমার ও গৃহিণীর ইচ্ছা, এই মেয়েটিকেই বধূরূপে গৃহে আনি;—তবে তোমার মত জানা আবশ্যক।'

পিতৃদেব নব্যতন্ত্রের লোক,—সে-কেলে রীতিনীতির তিনি বড় একটা ধার ধারিতেন না।

এই অপ্রত্যাশিত ও অচিন্তাপূর্ব্ব প্রস্তাবে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। সাহিত্য, সমাজ ও দেশের হিতোদ্দেশে ব্যাপৃত থাকিয়া—বিবাহ বলিয়া যে একটা কিছু কখনও ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিতে পারে, একথা

'মেয়েটি তোমাদের এই পাশের বাড়ীর ভবনাথবাবুর কন্যা'

আমার মোটেই মনে উদয় হয় নাই;—সুতরাং এই অতর্কিত মত-জিজ্ঞাসায় আমি কি উত্তর দিব, ভাবিয়া না পাইয়া নীরব রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া একটু কাশিয়া পিতা বলিলেন,—"মেয়েটি তোমাদের এই পাশের বাড়ীর ভবনাথবাবুর কন্যা। ইচ্ছে ক'র্‌লে হরিশকে নিয়ে অনায়াসেই তা'কে একবার দেখে আস্‌তে পার।"—এই বলিয়া তিনি যেন একটু মনোযোগের সহিত আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

অজ্ঞাতসারে আমি একটু চমকিয়া উঠিলাম;—পিতার মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার প্রত্যেক কথাটির মর্ম্ম অবধারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার মুখ-চোখে অকস্মাৎ দীপ্তি দেখিয়াই হউক—অথবা আমার মৌনভাবকে সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়াই হউক, কিয়ৎকাল পরে পিতা উঠিয়া বলিলেন, "এই সাড়ে সাতটার ট্রেণেই আমায় বাড়ী যেতে হবে। আস্‌চে শনিবার,—একবার বাড়ী যেও; বিশেষ দরকার আছে।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তখন প্রভাত-সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ-ধারায় জগৎ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে; শিশির-স্নাত মসৃণ বৃক্ষপত্রগুলি কিরণ-সম্পাতে চিক্‌মিক্‌ করিতেছে; দু'একটি শেফালিকা তখনও শিথিলকেশা সুন্দরীর স্রস্তরত্নাভরণের মত পত্রান্তরালে আসিয়া পড়িতেছে। আকাশ সুনীল, উদার, উজ্জ্বল; লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি মুক্তপক্ষরাজহংসের ঝাঁকের মত ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে।—বিশ্ব জুড়িয়া এই দৈনন্দিন কিরণোৎসব, আমার চোখে আজ এক অপূর্ব্ব শোভার মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। এই নিখিল আলোক-প্লাবনের মাঝখানে, সরোবরস্থিত পদ্মফুলটির মত একখানি আলোক-সমুজ্জ্বল ভাব-বিহ্বল মুখ একান্তে ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল। আমি তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

হঠাৎ হরিশের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম, এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার-সংঘটনে, বোধ হয়, তাহার কিছু হাত আছে।—ফিরিয়া দেখিলাম, সে কখন্‌ চলিয়া গিয়াছে!

* * *

শুভদিনে—শুভলগ্নে—ইন্দুর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। ভবনাথবাবুর কন্যার নাম ইন্দুলেখা। আমার স্বপ্ন-লোক-বাসিনী বাঞ্ছিতা মানসীপ্রতিমা যে আমার নিকট কত ঘনিষ্ঠ, কত সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ভাবিতেও আমার অন্তর ভরিয়া উঠিতেছিল।—সে সকল কথা বলিয়া আজ আর পুঁথি বাড়াইব না। আমার নিমন্ত্রিত সতীর্থ বন্ধুবান্ধবগণ কত হাসিঠাট্টা করিলেন, উপহারে—অভিনন্দনে—বিবাহমণ্ডপ পূর্ণ হইয়া গেল। আমার অন্তরের আনন্দ আমি আর লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না; কিন্তু ইহার মধ্যেও নিতান্ত অকারণে মনের একটি কোণে একটু ব্যথা বাজিতে ছিল।—সারাদিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও হরিশের দেখা পাই নাই;—উৎসব কোলাহলের মধ্যে তাহার হাস্যপ্রদীপ্ত মুখখানির অভাব বড়ই অশোভন বোধ হইতেছিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সমস্ত দিন খাটিয়া সন্ধ্যার পর সে অসুস্থদেহে গৃহে চলিয়া গিয়াছে। মনে মনে একটু অভিমান হইল।

নাটক-নভেলাদি পড়িয়া, বাসরঘর-সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, আমার নিজের অভিজ্ঞতায় তাহা তেমন সরস ও সরল মনে হইল না। প্রবেশ করিতেই শিহরিয়া দেখিলাম,—দস্তুরমত একটি নারী-ফৌজ, বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া, আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। অকস্মাৎ একটি বিপুলদেহা বর্ষীয়সী রমণী আমার কর্ণদ্বয় ধারণ করিয়া উপবেশন করাইলেন;—আমি ইচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্রোহভাব প্রদর্শন করিতে সাহসী হইলাম না। অপর একজন অগ্রসর হইয়া 'শ্যালক'-সম্বোধন করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঘটক চূড়ামণিকে কোথায় রেখে এলে?—তা'কে সঙ্গে আন্‌তে সাহস হয় নি বুঝি!" আমি এই কথার মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া, কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত নিরুপায়ভাবে ফ্যাল্‌ ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলাম;—চারিদিকে হাসির গুঞ্জন উঠিল।—অগত্যা বুঝাইয়া দিলাম যে, সম্প্রতি কোনও ঘটকের সহিত আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নাই। আরও বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল যে—বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, "আর্য্যদর্শন", "প্রকাশ", "মঞ্জরী" প্রভৃতি সুবিখ্যাত মাসিক-পত্রের নিয়মিত লেখক, সুবক্তা, সমাজ-সংস্কারক, 'টাউন ফুটবল ক্লাবের' কাপ্তেন, 'প্রেত-তত্ত্ব (Spiritual সভার' সম্পাদক—মাদৃশ ব্যক্তির কর্ণ-ধারণটা একেবারেই সমীচীন নহে; অধিকন্তু, স্ত্রীলোকের 'শ্যালক'-সম্বোধন নিতান্তই ভ্রম, সুতরাং বর্জ্জনীয়;—কিন্তু, চতুর্দ্দিকে পুনরায়

হাসির শব্দ শুনিয়া, আর ভরসা হইল না,—মনের কথা মনেই রহিয়া গেল।

পূর্ব্বকথিতা বিপুলদেহা পুনরায় অগ্রসর হইলেন,—আমি সভয়ে একটু সরিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন,—"দেখিস্ শালা,—ইন্দুকে নিয়ে তুই বন্ধুতে মিলে আবার সুন্দউপসুন্দের যুদ্ধ বাধিয়ে দিস্ নে। এত ক'রে, শেষকালে বেচারা হরিশের ভাগ্যে কেবল মিঠাই খাওয়াই সার হ'ল।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম!—কক্ষের উজ্জ্বল আলোক যেন আমার চক্ষে ম্লান হইয়া আসিল,—একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা আমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

গভীর রাত্রিতে, এই নারীব্যূহ রণস্থল পরিত্যাগ করিলে পর, আমি উদ্বেগ আকুল চিত্তে আমার বড় শ্যালিকাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। উজ্জ্বল কক্ষটিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, সচল আলেখ্যের মত, তিনি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলাম,—বৎসরাধিক কাল যাবৎ হরিশ তাহার অন্তরের সমস্ত প্রেম দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া, একান্তে আমারই মানস প্রতিমাকে পূজা করিয়া আসিয়াছে। ভক্তের ধ্যানের মত সে পূজা-রীতি শান্ত,—নিষ্কম্প দীপশিখাটির মত তাহা অচঞ্চল।

তাহার পিতা এখানেই তাহার সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়াছিলেন,—কেমন করিয়া তিনি পুত্রের নিভৃত-পূজার আভাষ পাইয়াছিলেন,—কিন্তু হরিশ অকস্মাৎ একদিন অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত গিয়া আমার সহিত সম্বন্ধের উল্লেখ করে! যদিও ইহাতে সকলে বিস্মিত হইয়াছিল,—বলা বাহুল্য, কেহ ইহাতে অমত করে নাই।

তীব্র-বেদনায় আমার বক্ষের শিরা যেন ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।—হায় হরিশ!—হায় আমার চির-অনাদৃত অচপল সুহৃৎ!—সহস্র অবহেলা, সহস্র অনাদর, সহস্র বেদনার এ কি প্রতিদান!!

সারারাত্রি ঘুম হইল না।—প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া হরিশের বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। তখন আকাশে দু'একটি তারা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে; পূর্ব্বাকাশে স্বর্ণদীপ্তি তখনও ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই, রাজপথগুলি তখনও নীরব। স্নিগ্ধ প্রভাত বায়ু ধীরে ধীরে আমার উত্তপ্ত-মস্তকে পরশ বুলাইয়া যাইতেছিল।

হরিশদের ঝি তখন সবেমাত্র সদর-দরজা খুলিয়াছে।

"এঁর কাছে আমরা এত ঋণী যে— সে ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না।"

আমি একেবারে দ্রুতপদে গিয়া হরিশের ঘরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, হরিশ খোলা জানালার পাশে—পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া—যোড়করে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে।

পূর্ব্বগগনের স্বর্ণকিরণ তাহার শান্ত মুখখানিকে অপরূপ দীপ্তিতে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমি নীরবে—মুগ্ধ-নেত্রে—তাহার সেই ব্যাকুল-আরাধনা দেখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া, আমাকে দেখিয়া, সে বিস্মিত-ভাবে বলিয়া উঠিল,—"কি হে? এত সকালে যে?—ব্যাপার কি?"

আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম—"আমার সঙ্গে চল।"—পরক্ষণেই তাহাকে একরূপ টানিয়া লইয়া চলিলাম।

সারাপথ কোন কথা হইল না;—আবেগে আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।—একবার ভগ্নস্বরে বলিলাম,—"এ কি কর্‌লে হরিশ?"—হরিশ কোন উত্তর দিল না।

হরিশকে লইয়া একেবারে বাসর-কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলাম।—উৎসব-ক্লান্ত গৃহখানি তখনও ভাল করিয়া জাগিয়া উঠে নাই।—ইন্দু তখনও একা বসিয়াছিল; আমাদিগকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম,—"শোন ইন্দু! এই যে হরিশবাবুকে দেখ্‌ছ, এঁর কাছে আমরা এত ঋণী যে—সে ঋণ কখনও শোধ ক'র্‌তে পার্‌ব না!—একথা চিরদিন আমরা মনে রাখ্‌ব।"

ইন্দু সম্ভ্রমে মাথা নত করিয়া রহিল।

* * *

হরিশ আর বিবাহ করে নাই। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"দরকার কি?" তাহার পিতামাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। * সহরে একটি স্কুলমাষ্টারী লইয়া সে তাহার নিঃসঙ্গ জীবন কাটাইতেছে। আমি ডেপুটীগিরি পাইয়া *সদরে বদলী হইয়াছি। হরিশ প্রায়ই, দম্‌কা হাওয়ার মত, এক একদিন আসিয়া—গৃহিণীকে ঠাট্টা করিয়া—পুত্রটিকে স্কন্ধে চড়াইয়া—বাসা তোলপাড় করিয়া—চলিয়া যায়!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

রাজা ও সাধু

(কবি সাদীর মূল পার্শি হইতে)

কৌতূহল বশে সম্ভ্রমে নৃপতি
কহিলা সাধুরে ডেকে,—
"কহ সাধুবর, কভু কিহে তব
আমারে হৃদয়ে জাগে?"
সাধু কহে, "যবে নিখিলের রাজা
মন ছেড়ে যায় চলি',
তখনি কেবল তোমারে রাজন্
হৃদয়ে জাগায়ে তুলি!"

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

পদচিহ্ন

কতবার এসে সে যে গিয়াছে চলিয়া—
আছিনু ঘুমায়ে আমি দুয়ার রুধিয়া!
কতবার ডেকে গেছে বাঁশরীর তানে—
আমি ছিনু আনমনে—পশে নাই কাণে!
সহসা—প্রভাতে আজি—খুলিয়া দুয়ার
হেরিতেছি চারিদিকে পদচিহ্ন তাঁর।—
উঠিতেছে প্রাণ মোর কাঁদিয়া কাঁদিয়া—
অভিমানে বুঝি গো সে গিয়াছে ফিরিয়া!

শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন।

ভারত-কথা

অনন্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের একাধার ভগবদবতার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীত পঞ্চমবেদ "মহাভারতে"র কতিপয় সুদুপদেশপূর্ণ কবিতা ও উপাখ্যান "ভারতবর্ষে"র গ্রাহক-গণকে মধ্যে মধ্যে উপহার প্রদান করিব ;—আশা করি, তাঁহারা ঐ সকল প্রবন্ধের সার গ্রহণ করিয়া, অনেক বিষয়ে কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন।

মহাভারতেই উক্ত হইয়াছে—

"যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ।"

(স্বর্গাঃ। ৫ অঃ। ৫০)

অর্থ—"যা আছে ভারতে, তা আছে ভারতে।
যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে ॥" (প্রবাদ বচন)

প্রশ্ন।—কাম্যকবনে অবস্থিতিকালে মহামুনি মার্কণ্ডেয় কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

"ইহ বৈকস্য, নামুত্র, অমুত্রৈকস্য নো ইহ।
ইহ চামুত্র চৈকস্য, নামুত্রৈকস্য নো ইহ ॥"

(বন। ১৮৩ অঃ।৮৮)

অর্থ—"এখানে আছে, সেখানে নাই (১)।
সেখানে আছে, এখানে নাই (২) ॥
এখানেও আছে, সেখানেও আছে (৩)।
এখানেও নাই, সেখানেও নাই (৪) ॥" (প্রবাদ বচন)

উত্তর।—"ধনানি যেষাং বিপুলানি সন্তি,
নিত্যং রমন্তে সুবিভূষিতাঙ্গাঃ।
তেষাময়ং শক্রবরম্নলোকো,
নাসৌ সদা দেহসুখে রতানাম্ ॥

যে যোগযুক্তাস্তপসি প্রসক্তাঃ,
স্বাধ্যায়শীলা জরয়ন্তি দেহান্।
জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণিবধে নিবৃত্তা,
স্তেষামসৌ নায়মরিঘ্নলোকঃ ॥

যে ধর্ম্মমেব প্রথমং চরন্তি,
ধর্ম্মেণ লব্ধা চ ধনানি কালে।
দারানবাপ্য ক্রতুভির্যতন্তে,
তেষাময়ঞ্চৈব পরশ্চ লোকঃ ॥

যে নৈব বিদ্যাং ন তপো ন দানং,
ন চাপি মূঢ়াঃ প্রজনে যতন্তি।
ন চানুগচ্ছন্তি সুখান্ ন ভোগান্,
তেষাময়ং নৈব পরশ্চ লোকঃ ॥" (৮৯—৯২)

নিষ্কৃষ্ট অর্থ—

"রাজপুত্র চিরং জীব (১),
মা জীব মুনিপুত্রক (২)।
জীব বা মর বা সাধো (৩),
ব্যাধ মা জীব মা মর (৪) ॥" (প্রবাদ-বচন)

(১) হে রাজপুত্র! তুমি চিরকাল বাঁচিয়া থাক।—যে হেতু তোমার এখানে আছে, সেখানে নাই (অর্থাৎ, তুমি ইহলোকে আহারবিহারাদি বিষয়ে ইহ পরম সুখভোগ করিতেছ; কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ধনমদে মত্ত হইয়া নিরন্তর বাসনাসক্ত হওয়ায় পরলোকে তোমার কোনও সুখ হইবে না)।

(২) হে মুনিপুত্র! তোমার বাঁচিয়া কাজ নাই।—যেহেতু তোমার সেখানে আছে, এখানে নাই (অর্থাৎ, ইহলোকে তুমি ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে কষ্টভোগই করিতেছ; কিন্তু তৎফলে পরলোকে তুমি পরম সুখভোগ করিবে)।

(৩) হে সাধু! বাঁচ বা মর ;—তোমার দুইই সমান। যেহেতু তোমার এখানেও আছে, সেখানেও আছে (অর্থাৎ, তুমি ইহলোকে বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরম সুখভোগ করিতেছ; এবং তৎফলে পরলোকে অক্ষয় সুখভোগ করিবে)।

(৪) হে ব্যাধ! তোমার বাঁচিয়াও কাজ নাই, মরিয়াও কাজ নাই ;—তোমারও দুইই সমান।—যে হেতু তোমার এখানেও নাই, সেখানেও নাই (অর্থাৎ, তুমি যাবজ্জীবন মৃগয়া-কার্য্যে আসক্ত থাকিয়া সমস্ত দিন অনশনে অরণ্য-পর্য্যটন, জীবহিংসা প্রভৃতির অনুষ্ঠানে ইহলোকে অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছ; তৎফলে পরলোকেও অনন্ত-দুর্গতি-ভোগ করিবে)।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।

কাব্যের অস্ফুট সৌন্দর্য্য

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

অস্ফুট সৌন্দর্য্যের দ্বারা কাব্যের বহিঃসৌন্দর্য্য যে কতদূর সুপরিস্ফুট হয়, তাহা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে আলোচিত হইয়াছে। "জমিন্", বা পত্তন-ভূমি (back-ground) ভাল না হইলে—প্রকৃতির অনুকূল না হইলে,—তাহাতে যত সুন্দর ছবিই অঙ্কিত কর না কেন, তেমন সুন্দর হইবে না;—সে চিত্র দেখিয়া নিপুণ দর্শকের তৃপ্তি জন্মিবে না। নীল সরসীর মৃদু তরঙ্গ-কম্পিত বক্ষের উপর যখন আকণ্ঠ-মগ্ন কমল ফুটিয়া থাকে,—তখন তাহার যে অনুপম শোভা জন্মে, সে শোভা কমলের একেবারে নিজস্ব নহে;—তাহাতে সরসীরও দাবি আছে;—একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না। সরসীর সহিত কমলের সম্পর্কে সে অস্ফুট সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়,—তাহারই আবরণের মধ্য দিয়া কমলের স্ফুট-সৌন্দর্য্য আরও স্ফুটতররূপে প্রকাশিত হয়—প্রকৃতির মোহন-রঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া কমল বিশ্ববিমোহন হয়। অস্ফুট সৌন্দর্য্যের এই আনুকূল্য ব্যতিরেকে স্ফুট-সৌন্দর্য্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। স্ফুট-সৌন্দর্য্যের 'জমিন্', অস্ফুট সৌন্দর্য্যই চিত্রের প্রাণ।

কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের নায়িকা শকুন্তলার চিত্রটির সবটুকুই স্ফুট-সৌন্দর্য্য—উহাতে অসুন্দর কিছুই নাই; কিন্তু ঐ স্ফুট-সৌন্দর্য্য ফুটাইতে গিয়া, কবিকে বেশ প্রয়াস পাইতে হইয়াছে—ছোট ছোট অনেক অস্ফুট সৌন্দর্য্য আঁকিতে হইয়াছে;—সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ফুট সৌন্দর্য্যের মালার মধ্যে, শকুন্তলা "দ্যুতিময় মধ্যমণি"র ন্যায় শোভা পাইতেছেন। শকুন্তলার আভায় সেই মণিগুলি যেমন উজ্জ্বল হইতেছে, তাহাদের সমবেত সৌন্দর্য্যের সম্পর্কে শকুন্তলাকেও তেমনই সুন্দর দেখাইতেছে। মুক্তার হারের মধ্যে নীল মধ্যমণি বড় সুন্দর দেখায়, সত্য; কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের উপর ক্ষুদ্র মুক্তা-সমষ্টির দাবিই অধিক;—মুক্তাগুলিকে বাদ দিলে, কেবল নীলকান্ত মণির আর সে সৌন্দর্য্য থাকে না। সেইরূপ, শকুন্তলা-চিত্রের "জমিন্"—অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রগুলি—বাদ দিলে শকুন্তলামূর্ত্তির আর তত সৌন্দর্য্য থাকে না। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, গৌতমী, কণ্ব, সানুমতী, বনজ্যোৎস্না, হরিণশিশু—প্রভৃতির অস্ফুট সৌন্দর্য্যের আভায় শকুন্তলা আভাময়ী। শকুন্তলাকে দেখিতে হইলে—শকুন্তলাকে দেখিয়া রসানুভব করিতে হইলে—শকুন্তলা-চিত্রের পশ্চাদ্ভাগবর্ত্তী ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রগুলিকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। উহাদের লইয়াই শকুন্তলা, উহাদিগকে বাদ দিলে চলিবে না; ঐ চিত্রাবলী "কাব্যের উপেক্ষিতা" নহে, সম্পূর্ণ অপেক্ষিতা। ইহাদের রস-প্রেরণায় শকুন্তলা রসময়ী—ইহাদিগকে বেষ্টন করিয়াই শকুন্তলালতা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। অনসূয়া বা প্রিয়ংবদা যে কাব্যের উপেক্ষিতা নহে—সম্পূর্ণরূপে অপেক্ষিতা—এ কথা কালিদাস নিজেই ইঙ্গিতে বলিয়া দিয়া গিয়াছেন।—"বৎসে! ইমে অপি প্রদেয়ে" (মা! ইহাদিগকেও ত সম্প্রদান করিতে হইবে?)—বলিয়া রসজ্ঞ সামাজিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।—অনসূয়া-প্রিয়ংবদার নিখুঁত চিত্রের অস্ফুট সৌন্দর্য্যেই শকুন্তলা-চিত্র অত ফুটিয়াছে। মহাভারতের প্রগল্ভা শকুন্তলাকে—অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সাহায্যে—মুগ্ধতমা, ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী করিয়া, কালিদাস সাধারণের সমক্ষে ধরিয়াছেন। একবার মিলাইয়া দেখ,—বুঝিবে, অনসূয়া-প্রিয়ংবদায়, শকুন্তল-প্রতিমা কেমন মানাইয়াছে!—অস্ফুট সৌন্দর্য্যের প্রভায়, স্ফুট-সৌন্দর্য্য কত স্ফুটতর হইয়াছে! এই প্রকার 'উত্তর-চরিতে'র 'আলেখ্য-দর্শন' প্রস্তাবে—উর্ম্মিলাদৃষ্টির অস্ফুট সৌন্দর্য্যে—সীতা-ও-লক্ষ্মণ-চিত্রের সৌন্দর্য্য কত উজ্জ্বল হইয়াছে। আলেখ্যদর্শনের সময়ে, লক্ষ্মণ একে একে অনেক ছবিই রামসীতাকে দেখাইলেন,—নিজেদের বিবাহের ছবি দেখাইতে গিয়া,—ইনি সীতা, ইনি মাণ্ডবী, আর ইনি শ্রুতকীর্ত্তি, বলিয়া তিনটি প্রতিমূর্ত্তি দেখাইলেন,—উর্ম্মিলার নামটিও করিলেন না! সীতা অমনই দেবরের বিদ্যা ধরিয়া ফেলিলেন;—লক্ষ্মণ যে লজ্জায় স্বীয় ভার্য্যার প্রতিমূর্ত্তি দেখাইলেন না, বা নামও করিলেন না, তাহা সীতা অনেকক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন;—তবে লক্ষ্মণের বুঝা দরকার, তাই অমনই প্রসন্নমুখী সীতা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন যে, "বৎস! যেটিকে বাদ দিলে, ঐটি কে? উঁহার নাম কি?"—এই এক উর্ম্মিলাচিত্রে লক্ষ্মণের চিত্র স্ফুটতর হইল। প্রকাশে

যতটা না হইত,—উর্ম্মিলার নাম গোপনে লক্ষ্মণ-চিত্রের সৌন্দর্য্য অনেকটা বাড়িয়া গেল। আমাদের নিকট উর্ম্মিলা "উপেক্ষিতা" হইতে পারেন; কিন্তু উত্তরচরিতের কবির নিকট তিনি সম্পূর্ণরূপে অপেক্ষিতা।

আর্য্যা জানকী, লক্ষ্মণকে রামের সমক্ষে লজ্জা দিবার যোগাড় করিতেছেন দেখিয়া, লক্ষ্মণ মনে মনে বলিলেন—'তাইত! উর্ম্মিলার কথা তুলিয়া আমাকে জব্দ করিবার চেষ্টা; আচ্ছা, দেখাইতেছি!' ভাবিয়াই বলিলেন,—"আর্য্যে! এই ছবিখানি দেখুন; ইহা দেখিবার মত ছবি;—এই হইলেন পরশুরাম।" যেমন পরশুরামের কথা, অমনই সীতার ভয় হইল!—সেই বিবাহের পর, অযোধ্যায় ফিরিবার সময়, পথিমধ্যে পরশুরাম যে বিক্রম-প্রকাশপূর্ব্বক রামসীতার গতিরোধ করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। মুগ্ধা সীতা চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "ভয় হচ্ছে"! —অর্থাৎ 'থাম; ওছবিখানা গুটাইয়া ফেল।' যেমন উর্ম্মিলাকে লইয়া লক্ষ্মণকে 'অপ্রস্তুত' করিতে গিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ তা'র তেমনই ঔষধ প্রয়োগ করিলেন!—এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবির সমবায়ে, নাটকের প্রতিপাদ্য রামসীতার চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে; অস্ফুটসৌন্দর্য্যের আভায় স্ফুটসৌন্দর্য্যের পূর্ণ-বিকাশ হইয়াছে!

এইরূপ সর্ব্বত্র। কালিদাস, এবং—তাঁহার কল্পিত ও অঙ্কিত চিত্রের চিরপক্ষপাতী—ভবভূতির কাব্যের সর্ব্বত্রই এই প্রথা বর্ত্তমান। এই উপায়ে জমিন্ প্রস্তুত করিয়া, তাহার উপর ঐ দুই মহাকবি চিত্র-অঙ্কন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কবিকুল তাঁহাদের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সত্য;—কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বিবেচ্য।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

যমুনা

কূলে কূলে দুলে বহিছে যমুনা,—
আপন বিলাস-লাস্যে শিথিল, বিহ্বল;
বুকে তা'র গগনের নীল-প্রতিচ্ছায়া—
কালো জলে নীল-ছায়া অস্পষ্ট—চঞ্চল!
কোথা সে ব্রজের কালা—কাননবিহারী—
করে বেণু, গলে মালা, শিরে শিখি-চূড়া,
নূপুর চরণে তা'র—সস্মিত বদন,—
অঙ্গে বিজড়িত তা'র সেই পীতধড়া?

কই তা'র পার্শ্বে সেই মানসমোহিনী—
ব্রীড়ামুগ্ধা, প্রেমময়ী, নবীনা কিশোরী?—
সে অভিসারিকা কোথা—কোথা সেই দূতী?—
বৃথায় কাটিয়া যায় দীর্ঘ-বিভাবরী!—
কোথা মান, হাসি-গান,—কোথা সে কামনা?—
যমুনে লো! তোর বক্ষে বাজে কি বেদনা?

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষাসম্বন্ধীয় দুএকটী কথা

'ভারতবাসীদের কেম্ব্রিজে অধ্যয়নার্থ যাওয়া কতদূর সঙ্গত ?' তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, 'এথেনিয়ম' পত্রে (The Atheneum) সম্প্রতি কেম্ব্রিজ হইতে জনৈক ইংরেজ-লেখক একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

লেখকের মনের ভাব এই যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবাসীদের আর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নহে!—অনেকদিন হইতেই আমাদের দেশের ছাত্রেরা কেম্ব্রিজে অধ্যয়নার্থ যাইতেছেন; অথচ লেখক যেসকল প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, সেসকল কথা ইতঃপূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই! তাঁহার মতে, আজকাল যেসকল ভারতীয় ছাত্র কেম্ব্রিজে যাইতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্বকার ছাত্রদিগের মত মেধাবী ও 'মিশুক' নহেন।—কথাটায় কতটুকু সত্য আছে, এক্ষণে দেখা যাউক।—বিগত পনের বৎসরের হিসাব লইলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, মেধাবী-ছাত্রের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমে নাই। কারণ, এই পনের বৎসরের মধ্যে একজন সিনিয়র র‍্যাঙ্গলার হইয়াছেন, দুইজন (Moral Science) নীতি বা চরিত্র বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যান্য Triposএ—কএকজন (Natural Science Tripos) প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত (Historical Tripos) ইতিহাস ও (Mechanical Science Tripos) ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক পরীক্ষাতে ভারতীয় ছাত্রেরা বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আর 'মেশামিশি' সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে, আমরা নিজেই এমন অনেক ভারতীয় ছাত্রের কথা জানি, যাঁহারা কেম্ব্রিজে ইউরোপীয় ছাত্রগণের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেন। লেখক বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা ইংরেজ-ছাত্রদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহেন। এই মন্তব্য পাঠ করিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, লেখকের মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। মানুষকে আপনার করিতে হইলে, তাহাকে ভালবাসিতে হয়,—তাহার সুখেদুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে হয়। আদর-যত্ন পাইলে মানুষ কেন, জীবমাত্রেই স্বতঃই আদর-যত্ন-কারীর আত্মীয়—অন্তরঙ্গ—হইয়া উঠে। ভারতবর্ষীয়েরা যে কেম্ব্রিজে গিয়া, মাত্র নিজেদের দলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চেষ্টা করেন, সে দোষের জন্য কি মাত্র তাহারাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী ? ইংরেজ-ছাত্রগণ তাহাদিগকে 'আপন' করিতে চেষ্টা করা সত্বেও যে, তাহারা ইংরেজ-ছাত্রগণের সহিত মিশিতে অস্বীকৃত হয়েন—এমন কথা ত কখনও শুনা যায় নাই! এস্থলে আমরা একটি কৌতুকজনক সত্য-ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। —আমাদের এক বন্ধু, কেম্ব্রিজ প্রবাসকালে, তাঁহার সহপাঠী একজন ইংরেজ-ছাত্র-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাদের ড্রয়িংরুমে বসি আছেন, এমন সময় একটি কুকুরের চীৎকার শুনা গেল। কথায় কথায় সেই ইংরেজ-ছাত্রটি আমাদের বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা বোধ হয় কুকুরের ডাক অধিক দূর হইতেই শুনিতে পাও ?' বন্ধুবর একটু আশ্চর্য্য হইয়া, এইরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা করিবার অর্থ কি, জানিতে উৎসুক হ'ন। ইংরেজ-ছাত্র উত্তরে বলিলেন, 'আমরা অনেক পুস্তকে পড়িয়াছি যে, অসভ্যেরা অনেক দূর হইতেই জীবজন্তুর চীৎকার শুনিতে পায়!' আমাদের বন্ধুটি ত শুনিয়াই অবাক্! এখানে টীকা-টীপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। উক্ত ইংরেজ-ছাত্রটির মতে—ভারতবর্ষীয়েরা সকলেই ভীল, সাঁওতাল, মিসমী, নিগ্রো, জুলু প্রভৃতি অসভ্য-সম্প্রদায়ের অনুরূপ। যখন শিক্ষিত ইংরেজেরই মনের ভাব এইরূপ, তখন অশিক্ষিত ইংরেজেরা যে ভারতবর্ষীয়কে নিতান্ত অসভ্য কল্পনা করিবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে! যদি ইংরেজ-ছাত্রদের মনের ভাব এই রকম হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃ তাহারাই ভারতবর্ষীয়দের সহিত মিলিতে কুণ্ঠিত হইবে! সুতরাং, এরূপস্থলে ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা যে ইংরেজের সহিত না মিশিয়া—নিজেদের জাতীয়দিগের সহবাসে থাকিয়া—আত্মোন্নতি করিবার চেষ্টা করিবে,—ইহাতে আর বিচিত্র কি আছে ?

লেখক আরও বলিয়াছেন,—এখন ভারত-গভর্ণমেণ্টের বেশ ভাবিয়া দেখিবার প্রশস্ত সময় আসিয়াছে যে,—'অতঃপর ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড প্রভৃতি ইংরেজী-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে অধ্যয়নার্থ উৎসাহান্বিত করা উচিত কি না ?'—কারণ, লেখকের মতে ভারতবর্ষীয়েরা বিলাতী-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ কিছু লাভ করিতে

পারেন না, এবং বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয় না।—লেখকের মস্তিষ্কে কেন এই দুর্ভাবনা ঢুকিল, তাহার কারণ নিশ্চয় করা কঠিন! ভারতীয় ছাত্রেরা যদি বুঝেন যে, ইলংণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজের সংসর্গ—পাশ্চাত্য মনীষিগণের সাক্ষাৎকার লাভ, সামাজিক রীতি-নীতি—ইংরেজজাতির জ্ঞান-সাধনা প্রভৃতি দেখিবার মত ও শিখিবার মত, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা কতদূর যুক্তিসঙ্গত—তাহাও বিবেচ্য। আর তাঁহাদের নিকট হইতে বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি কোনরূপ উপকৃত না হয়,—তাহাতেও ক্ষোভের কোন কারণ আছে কি? ফলে, লেখকের অপূর্ব্ব যুক্তিপ্রণালী আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। মানুষ হইতে হইলে, প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে হইলে, সম্মুখে আদর্শ চাই। ভারতীয় ছাত্রেরা যদি ইংরেজকে আদর্শ করিয়া লয়, তাহাতে কাহারও কি ক্ষতি হইতে পারে?—ইংরেজ-লেখকের এরূপ প্রলাপবাক্যে অবশ্য সদাশয় ভারত-গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিবেন না।

অবশ্য 'এথেনিয়মে'র এই লেখক যে কেম্ব্রিজের কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তি, এরূপ মনে হয় না। কারণ, আমরা কেম্ব্রিজের অনেক বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিকে (Don) জানি, যাঁহাদের মত এরূপ সঙ্কীর্ণ নহে; যাঁহাদের উদার-হৃদয় দেখিয়া—বিশ্বমানবের পূজা দেখিয়া—ভারতীয় ছাত্রেরা তাঁহাদের পদতলে বসিয়া জ্ঞানলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে ও হইতেছে। এখানে, সকলের নাম উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমরা একজনের কথা বলিতে পারি, যিনি তাঁহার স্বদেশীয় বিদেশীয় সকল ছাত্রকেই সমান স্নেহচক্ষে দেখিতেন।—সেই নিরপেক্ষ ঋষি-প্রতিম আচার্য্য মেটল্যাণ্ড (Prof. Maitland) আজ জীবিত নাই!—জীবিত থাকিলে, আজ এই অর্ব্বাচীন লেখকের হস্ত-কণ্ডূয়ন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেন! মেট্‌ল্যাণ্ড, সার জর্জ্জ ষ্টোকস্‌, লর্ড এক্‌টন্‌, প্রভৃতি মনীষীদের মতন উদারহৃদয় মহোদয়গণ বোধ হয় এথিনিয়মের এই বর্ত্তমান লেখকের মত সমর্থন করিতেন না।

আরও একটা কথা,—লেখকের বোধ হয় জ্ঞান নাই যে, * বিলাতী রীতিনীতি শিখিয়া আসিয়া ভারতবর্ষে তাহার প্রচলন করা, ভারতীয় ছাত্রদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।—সমাজসংস্কার আবশ্যক; কিন্তু সে সংস্কার বিশেষ বিশেষ সমাজের জনসঙ্ঘের উপযোগী করিয়া লওয়া চাই। কারণ, লেখকের অবশ্যই জানা আছে যে, সমাজ জিনিষটা একটা অবিচ্ছিন্ন জীবনীশক্তিসম্পন্ন-যন্ত্র বিশেষ;—তাহার জীবনীশক্তি যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্যই অপ্রতিহত ভাবে কাজ করিতেছে। আমেরিকার চলন্ত প্রাসাদের মত, সমাজের রীতিনীতিকে এক স্থান হইতে অকস্মাৎ তাহার অপর কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উপস্থাপিত করা যায় না! বিদেশী রীতিনীতির কলম করিয়া অন্যত্র চারা করিতে হইলে, তাহাও সময়-সাপেক্ষ। ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা একথাটি আজকাল বেশ বুঝিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা বিলাতী সমস্ত রীতিনীতির অখণ্ড-শাসনের পক্ষপাতী নহেন।

ইংরেজের PUBLIC SCHOOL ও বিলাতী বিশ্ব-বিদ্যালয়-জীবন (UNIVERSITY LIFE) ইংরেজের পক্ষেই সাজে; ভারতবর্ষের পক্ষেও ও যদি সেই ধরণের বিদ্যালয়, সেই ধরণের কলেজ, উপযোগী হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষ 'ইংলণ্ড' হইত—'ভারতবর্ষ' থাকিত না। কাজে-কাজেই, লেখকের আদর্শ, ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম দেখিয়া তিনি যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দুঃখিত। আমাদের শিক্ষাসম্বন্ধে আন্দোলন, বিলাতে ত বহুকাল হইতেই চলিতেছে;—এপর্য্যন্ত আমরা এদেশে এবিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, এবং অগ্রসর হইবার জন্য এখনও কিরূপ চেষ্টা করিতেছি,—বোধ হয় তাহার একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মনস্বী মেকলে যখন স্থির করেন যে, ইংরেজী ভাষার সাহায্যভিন্ন, এদেশের উচ্চ শিক্ষা বর্ত্তমান-সভ্যতার অনুযায়ী হইতে পারে না,—সেই সময়েই এদেশে ইংরেজী-শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

১৮৫৭ সালে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়; সেই সময় হইতে পঞ্চাশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত নানারূপ পরীক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়া শিক্ষাপ্রদান প্রণালী চলিতে লাগিল; লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে শিক্ষা ও পরীক্ষা-প্রণালী চলিতে লাগিল। কিন্তু কর্ম্মবীর লর্ড কর্জ্জন্‌ যখন দেখিলেন, প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী আশানুরূপ ফলদায়ক হইতেছে না,—শুধু কেরাণী-ও-উকীল-প্রসবের যন্ত্র মাত্রে পরিণত হইয়াছে—জ্ঞান সাধন-পরায়ণ উপযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের সৃজন করিতে

পারিতেছে না, তখন শিক্ষার পূর্ণতা-বিধান করিবার জন্য—শিক্ষা-বিস্তারের জন্য—শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য—একটি শিক্ষা-কমিশন্ বসিল ; তৎফলে বিশ্ববিদ্যালয়-আইন বিধিবদ্ধ হইল।

আজকাল এই আইন-অনুসারেই বিশ্ববিদ্যালয় চলিতেছে। এই সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য, শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ-উন্নতিসাধন! শিক্ষকগণকে অধ্যাপনা-কৌশল শিখাইবার জন্য—উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে—'এল-টি', ও 'বি-টি' দুইটি নূতন উপাধি-সৃষ্টি হইয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে Reader ও Professor—দুই জন নূতন কর্ম্ম-চারী নিযুক্ত হইয়াছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার্ স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অদম্য উৎসাহবলে—অসাধারণ প্রতিভা ও নিপুণতা প্রভাবে—কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয় এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত—গঠিত হইয়াছে—যাহাতে লর্ড কর্জ্জনের উদ্দেশ্য অনেকটা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এখন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ য়ূরোপ হইতে Reader ও Professor নিযুক্ত হইতেছেন। আমাদের দেশীয় ছাত্রেরাও শিক্ষাবলে পাশ্চাত্য-শিক্ষার স্বরূপ দেখিবার সুবিধা পাইতেছেন। যে সব মহাশয়গণ OXFORD, CAMBRIDGE BERLIN, PARIS প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ গবেষণা করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের দেশীয় ছাত্রদের গবেষণা-প্রণালী শিখাইতেছেন। এই সঙ্গে, যাহাতে মহামান্য অধ্যাপকগণের বক্তৃতা, জন-সাধারণ বিনাব্যয়ে শুনিতে পারে, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। স্যর আশুতোষের এবংবিধ অশেষ-মঙ্গলজনক কার্য্যাবলী যে আমাদিগকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, সেকথা কি আর কাহাকেও বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে ?

এইস্থলে আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী দুইজন দান-বীর —তারকনাথ পালিত ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ—বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যে পঁচিশ লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন, তাহার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই দানের প্রধান উদ্দেশ্য, ভারতীয় শিক্ষকদের দ্বারা ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষা-বিধান। ইতঃপূর্ব্বে সাধারণের একটা ধারণা ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেই শিক্ষার চরম হইল ;—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে তখনই শিক্ষার সূত্রপাত—শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিবার উপযোগী নানা সত্যের আবিষ্কার করিবার পক্ষে যে সেই শুভ-মুহূর্ত্ত—যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা সেই শুভ-মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করিলে, তবেই যে শিক্ষার পরিণতি ঘটে—শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়—লোকে এখন একথা বুঝিতেছে। আর এই শুভ-সূচনার সহায়ক স্যর্ আশুতোষও এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পেই প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষাফলে আমাদের দেশের বহু সংখ্যক ব্যক্তিই সুশিক্ষিত হইয়াছেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই নূতন কোন মৌলিক গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন—নূতন কোন ভাব-পরম্পরা উদ্ভাবন করিয়া জগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন! অথচ, প্রতিবৎসরই অসংখ্য এম-এ,ও দু'একজন রায়চাঁদ প্রেম-চাঁদ-বৃত্তিধারী ছাত্র, উপাধি-ভূষিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছেন!—কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ নিস্ফল উপাধির কোন মূল্যই নাই! বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষা-সাগর কোনরূপে সম্মানে পার হওয়াই বিদ্যাবত্তার একমাত্র পরিচায়ক নহে।—য়ূরোপের লোকেরা অনেক পূর্ব্বেই একথা বুঝিয়াছিলেন ; আশুবাবুও সেই কথাটা রবীন্দ্রবাবুকে 'ডাক্তার'-উপাধি দেওয়ার সময় বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিয়া-ছিলেন।—রবীন্দ্রনাথ, আজীবন সাধনার ফলে, শিক্ষা যে কি জিনিস—তাহা আজ বাঙ্গালীকে বুঝাইতেছেন।—শিক্ষার উদ্দেশ্য, জীবনের ভাব-পরম্পরাকে আপনার করা—তাহাদের জানা ; ইংরেজীতে ইহাকে 'REALISITION OF LIFE' বলে। কেবল শব্দের প্রতিশব্দ বসাইতে পারিলেই শিক্ষা হয় না ;—শিক্ষার সম্পূর্ণতা হইবে তখনই, যখন আমরা অপরের চিন্তা ও ভাবকে সত্যরূপে জানিয়া, জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিব—যখন আমরা সাধনার বলে, নূতন সত্যে উপনীত হইয়া, জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারিব!

বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃতরূপে শিক্ষামন্দির করাই আশুবাবুর উদ্দেশ্য! যাহাতে—ডিগ্রী-অর্জ্জন ও জ্ঞান-আহরণ—দুই হয়, তাহার জন্যই আশুবাবু এখন পাশ্চাত্য-মনীষীদিগকে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (Professor), পাঠক (Reader), ও শিক্ষক (Teacher) শ্রেণীভুক্ত করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নূতন বিধান আশুবাবুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে নূতন শ্রী দান করিতেছে—জগতের

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে।—একথা অবশ্য সত্য যে, অধুনা-নির্ব্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকগণের মধ্যে সকলেই সমান পণ্ডিত নহেন; তথাপি একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য।

• প্রকৃত জ্ঞানলাভ, শুধু পরের ভাষার সাহায্যে হয় না;—একথা প্রাণে প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়াই, আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষায় পর্য্যন্ত মাতৃভাষাকে স্থান দিয়াছেন—এম-এ পরীক্ষা কল্পে (COMPARATIVE PHILOLOGY) বঙ্গভাষা তুলনায় পঠিত হইয়া থাকে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের জন্য একজন পাঠক (Reader)ও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।—আশুবাবুর কাছে আমরা বিশেষরূপ কৃতজ্ঞ যে, তিনি বাঙ্গালীদ্বারাই বাঙ্গালাভাষা অধ্যাপনার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।—বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালাভাষা-প্রচালনের জন্য আশুবাবু বাঙ্গালাভাষী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ!

উপসংহারে, একটা পুরাতন-প্রসঙ্গের আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।—কোমলমতি প্রথম-শিক্ষার্থী বালকদিগের শিক্ষার গুরুভার যাঁহাদের উপর অর্পিত, উপযুক্ত অর্থাগমের অভাবে তাঁহাদের অন্নচিন্তা দূর হয় না; সুতরাং জ্ঞানালোচনায়ও সম্যক্ মনোনিবেশ করিবার অবসর তাঁহাদের থাকে না। তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার নিমিত্ত মাসিক ২০।৩০ টাকা উপার্জ্জন করেন;—তাহাতে তাঁহারা এই মহার্ঘ্যগণ্ডার সময়ে ভদ্রভাবে স্ব স্ব পরিবার-প্রতিপালনেও অক্ষম! ফলে, অভাবের পীড়নে, উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃই ক্ষীণতেজঃ হইয়া পড়ে!—কাজেই তাঁহারা, ইচ্ছাসত্ত্বেও, সুচারুরূপে কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিতে পারেন না। আর, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায়ই যদি বালকেরা এইরূপ শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালাভ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ-শিক্ষার অবস্থা কিরূপ হওয়া সম্ভবপর, তাহা সহজেই অনুমেয়!—বাল্যকালেই শিশুর মানসক্ষেত্রে শিক্ষার বীজ-উপ্ত হয়; এই অবস্থায় তাহাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাই উচিত। বিদ্যালয়ের এই জন্য প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতনবৃদ্ধি করা যে কতদূর যুক্তি সঙ্গত, সে বিষয় প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অনু-ধাবন করিয়া দেখা উচিত। শিক্ষা-বিভাগে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ শিক্ষকগণকে ত্যাগ-স্বীকার করিতে দেখিলে, একথা উল্লেখ না করিলেও চলিত। সাধারণতঃ শিক্ষা-বিভাগে যে সমস্ত ব্যক্তি কার্য্যভার লইয়াছেন—তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, অর্থার্জ্জনই শিক্ষকতার চরম উদ্দেশ্য নহে। অর্থার্জ্জনই যাঁহাদের লক্ষ্য, ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া সর্ব্বোচ্চ-সম্মানে সম্মানিত—তাঁহারা 'ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টে' কেরাণীগিরী লাভ করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকেন, ও কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন;—তাঁহারা শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন না, কারণ সে বিভাগে বেতনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষা-বিভাগে শতকরা ৯৯ জন গ্রাজুয়েট্‌কে পরিণত বয়সে গড়ে ৮০৲ বেতনে কার্য্য করিয়া, বার্দ্ধক্যে ৪০৲ পেন্‌সনেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের অন্যসকল বিভাগেই গ্রাজুয়েটগণের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন গড়ে ১৫০৲ টাকা বেতনে কার্য্য করিয়া ৭৫৲ টাকা পেন্সন্ পাইয়া কার্য্য হইতে অবসর লইয়া থাকেন। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাশালী ছাত্রেরা শিক্ষা-বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা ও গুণপণাদ্বারা দেশের ভাবী-আশার স্থল, সুকুমার-মতি বালকগণের শিক্ষা বিধান বিষয়ে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ। কাজেকাজেই যাঁহারা Under-Graduate, তাঁহারাই সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শিক্ষাদাতা!—তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিলে, প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিই মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারেন না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন—অরণ্যে রোদন—বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র বাগ্‌চী।

ভারতবর্ষের অদ্বৈতবাদ

আমরা পাঠক ও পাঠিকাবর্গকে, ঋগ্বেদের বহুস্থানে ব্যবহৃত "মায়া" শব্দটি, কি অর্থে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে, অদ্য তাহাই বলিব। নিম্নোদ্ধৃত স্থল কএকটি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, একই বস্তু যে বিবিধ রূপ ও আকার ধারণ করিয়া ক্রিয়া করে,—এই অর্থেই ঋগ্বেদে "মায়া" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আমরা নিম্নে সংস্কৃত মন্ত্র তাহারও অর্থও দেখাইতেছি। বিষয়টি বড় গুরুতর। অনেকের ধারণা আছে যে, ঋগ্বেদে মায়াশব্দ বা মায়া-বাদ নাই। এই ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক; তজ্জন্যই মূল বৈদিক মন্ত্র উদ্ধৃত করাও আবশ্যক বিবেচিত হইতেছে;

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব,
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো 'মায়াভিঃ' পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তাঃ হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ ॥"—৬।৪৭।১৮

"রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি
"মায়াঃ" কৃণ্বানঃ তন্বং পরি স্বাং।
ত্রি র্যদ্দিবঃ পরিমুহূর্ত্তমাগাৎ
মন্ত্রৈ রনৃতুপা ঋতা বা ॥"—৩।৫৩।৮

বিভিন্ন মণ্ডলোক্ত একই ভাবের এই শ্লোক দুইটির সায়ন-সম্মত অর্থ ও তাৎপর্য্য এইরূপ;—

'ইন্দ্র—দেবতাবর্গের সর্ব্বপ্রকার রূপের প্রতিনিধি। ইন্দ্র আপন মাহাত্ম্যদ্বারা সকল দেবতার আকার বা রূপ ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন। ইন্দ্র আপনার মায়াদ্বারা বহু রূপ, বহু আকার ধারণ করিয়াছেন। সাধারণ লোক মনে করে বটে যে, ইন্দ্রের রথ দুইটি অশ্বদ্বারা চালিত; কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। ইহার অশ্ব সহস্র-সহস্র-অপরিমিত। ইন্দ্র—মায়াদ্বারা বহুরূপ ধারণ করিয়া, বিশ্বের তাবৎ পদার্থের আকারে অবস্থিত হইয়া, ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন (ঈয়তে=চেষ্টতে)। কেন তিনি এই সকল রূপ ধারণ করিলেন?—তাঁহার নিজের স্বরূপ-বিকাশের জন্যই, তাঁহার এই বহুরূপধারণ। জীবের নিকটে তিনি আপনার বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবেন বলিয়াই (প্রতি-চক্ষণায়), তিনি বিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছেন। ইনি অসংখ্যপ্রকার-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব-রূপে প্রকটিত রহিয়াছেন। তিনি জীবাকারে ও বিবিধ পদার্থাকারে অবস্থান করিতেছেন।

যখন যখনই যে রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি সেই রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি আপনার শরীর হইতে বহু শরীর গ্রহণের সামর্থ্য প্রকটন করেন (মায়াঃ=অনেকরূপ-গ্রহণ-সামর্থ্যোপেতাঃ)। ইনি অন্ত-রীক্ষ হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে সকল যজমানের যজ্ঞে যুগপৎ প্রাদুর্ভূত হন। ইনি সত্য-কর্ম্মা। এই প্রকার ইঁহার সামর্থ্য।'

তবেই আমরা দেখিতেছি যে, একই ইন্দ্র, স্বীয় সামর্থ্য-প্রভাবে, নিজের স্বরূপপ্রকাশের নিমিত্ত, সূর্য্য-চন্দ্রাদি বহু আকার ধারণ করিয়া, জগতের ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন। "মায়া" শব্দটির এই অর্থই পাওয়া যাইতেছে। উপনিষদে ও শঙ্কর-ভাষ্যে এই অর্থেই মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আরও দুই একটি স্থল দেখুন্:—

"ধর্ম্মণা মিত্রাবরুণা! বিপশ্চিতা,
ব্রতা রক্ষেথে অসুরস্য 'মায়য়া'।
ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ
সূর্য্য, মাধথো দিবি চিত্র্যং রথং।
'মায়া' বাং মিত্রাবরুণা! দিবি শ্রিতা
সূর্য্যো জ্যোতিশ্চরতি চিত্রমায়ুধং।
তমভ্রেন বৃষ্ট্যা গূহয়ো দিবি
পর্য্যন্য দ্রপ্সা মধুমন্ত ঈয়তে ॥"—৫।৬৩।৭, ৪।

'হে মিত্রাবরুণ! তোমরা জ্ঞানবিশিষ্ট স্বীয় ধর্ম্ম দ্বা[illegible] এবং আত্মসামর্থ্যের "মায়া" দ্বারা, স্বীয় ক্রিয়া পালন করিয়া থাক। তোমরা নিয়ম-বলে, আকাশে বিচিত্র-গতিশীল সূর্য্যকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, এবং সমগ্র ভুবনকে প্রদীপ্ত করিতেছ। যৎকালে বিচিত্র সূর্য্য, আকাশে জ্যোতি দান করিয়া বিচরণ করিতে থাকে, তৎকালে তোমাদেরই "মায়া" আকাশে প্রকাশ পায়। আবার, মেঘের দ্বারা যখন তোমরা সেই সূর্য্যকে আবৃত করিয়া দাও, তখনও তোমাদেরই মায়া আকাশে প্রকটিত হয়। যখন মধুময়ী বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে থাকে, তখনও তোমাদেরই মায়া প্রকটিত হয়।'

"স প্রাচীনান্ পর্ব্বতান্ দৃংহদোজসা
অধরাচীনমকরোদপামপঃ।
অধারয়ৎ পৃথিবীং বিশ্বধায়সং
অস্তভ্নাৎ 'মায়য়া' দ্যামবস্রসঃ॥"—২।১৭।৫

'ইন্দ্র, পুরাতন পর্ব্বতসকলকে আপন বল দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন; মেঘস্থ জলরাশিকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করিতেছেন; বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; দ্যুলোককে পতন হইতে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। এ সকলই ইন্দ্রের "মায়া" দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে।'

পাঠক-পাঠিকা দেখিতে পাইতেছেন যে, একই শক্তি বা সত্তা যে বিবিধ রূপান্তর ধারণ করিয়া, বিবিধ প্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন,—ঋগ্বেদে এই অর্থেই উপরি-উদ্ধৃত মন্ত্র-গুলিতে "মায়া" ব্যবহৃত হইয়াছে।

আমরা নিম্নে আরও কএকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"মূর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিঃ
ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।
'মায়া' মূতু যজ্ঞিয়ানামেতাং
অপো যত্তূর্ণিশ্চরতি প্রজানন্॥"—১০।৮৮।৬

"পূর্ব্বাপরং চরতো "মায়য়ৈ"তৌ
শিশূ ক্রীড়ন্তৌ পরিযাতো অধ্বরং।
বিশ্বানি অন্যো ভুবনাভিচষ্টে
ঋতূন্ অন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ।
নবো নবো ভবতি জায়মানঃ
অহ্নাং কেতু রুষসামেতি অগ্রম্।
ভাগং দেবেভ্যো বিদধাতি আয়ন্
প্র চন্দ্রমা স্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ॥"—১০।৮৫।১৮-১৯

রাত্রিকালে যিনি ভূলোকের মস্তকরূপে দেখা দেন, প্রাতঃকালে আবার তিনিই সূর্য্যরূপে উদিত হন। আবার যাজ্ঞিকগণের বিবিধ ক্রিয়া তিনিই শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহারই "মায়া"। এই যে দুইটি শিশু, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগ্‌ভাগে ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করেন, এই যে ইঁহাদের মধ্যে একটি (সূর্য্য) সমগ্র ভুবনকে দর্শন করেন এবং অপরটি (চন্দ্র) ঋতুবর্গের বিধানকর্ত্তৃরূপে উৎপন্ন হন —এই সমুদয় কার্য্যই "মায়া" দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। প্রভাতকালে প্রতিদিন নূতন নূতন হইয়া ইনি জন্মগ্রহণ করেন, এবং উষার অগ্রে আসিয়া দিবসের কেতু বা প্রজ্ঞাপক হন। ইনিই আবার অগ্নিরূপে দেবতাবর্গকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়া থাকেন এবং ইনিই চন্দ্ররূপে আসিয়া দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। এই সমুদয় কার্য্য "মায়া" দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়।

আর আমরা অধিক উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি না। উপনিষদে যে "মায়া"-শব্দ দৃষ্ট হয়, শঙ্কর যাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা স্বীয় ভাষ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—এই "মায়া" শব্দটি ঋগ্বেদেরই সম্পত্তি। ঋগ্বেদেও সেই একই অর্থে এই শব্দটি বহু স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। দেবতাবর্গ যে মূলে একই সত্তা মাত্র,—দেবতাবর্গ যে সেই মূল-সত্তারই বিবিধ বিকাশ,—এই তত্ত্বটিই "মায়া"-শব্দ অনিবার্য্যরূপে আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। দেবতারা একই কারণ-সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ক্রিয়া-নির্ব্বাহক মাত্র।

তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে, ২২টি মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষ চরণটি এই যে,—"মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং"। ঋগ্বেদের 'অসুর' শব্দের অর্থ—বল বা সামর্থ্য। সুতরাং চরণটীর অর্থ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতাবর্গের মূলগত মহৎ অসুরত্ব বা সামর্থ্য একই। অর্থাৎ, যদিও দেবতাবর্গের আকার বা মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু উহাদের মূলগত সামর্থ্য বা উহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট শক্তি একই, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নহে; সুতরাং আমরা এই জগদ্বিখ্যাত সূক্ত হইতেও বুঝিতেছি যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার এক মৌলিক সামর্থ্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই সূক্তটির অন্তর্গত শ্লোকগুলির শেষ চরণগুলি হইতে এবং ঋগ্বেদের নানাস্থানে ব্যবহৃত "মায়া" শব্দ হইতে আমরা, বহুত্বের মূলে একত্বের ধারণাই সুস্পষ্ট-রূপে পাইতেছি। কার্য্যবর্গের মূলে যে একই কারণ-সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছে, কার্য্যবর্গ যে কারণ-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে,—এই মহাতত্ত্বই ঋগ্বেদ আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন। মূলগত সত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ঋগ্বেদে, দেবতাবর্গের কার্য্যের ও নামেরও প্রকৃত স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হয় নাই। এই গুরুতর বিষয়টিও লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। দেবতা-বর্গের কার্য্যে ও নামে যে ভিন্নতা লক্ষিত হয়, প্রকৃতপক্ষে সে ভিন্নতাও কথার কথা মাত্র। ঋগ্বেদ আমাদিগকে তাহাও বলিয়া দিতে ভুলেন নাই।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

একখানা পুরাতন জমাখরচ

(৪৭ বৎসর পূর্ব্বের)

বিগত আশ্বিনমাসে (১৩২০) পূজনীয় শ্বশুরমহাশয়ের সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য যাত্রা করি, এবং দুইদিন পরে তথায় উপস্থিত হই। আমার শ্বশুরালয় নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত তালবাড়িয়া গ্রামে। আমি যাইবার এক দিন পরেই শ্বশুর-শ্রীনাথ অধিকারী মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না। আমরা (জামাতৃ-গণই) তাঁর পুত্রস্থানীয়; তাঁর শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের ভারও আমাদের উপরই পড়ে। সেই সময়, প্রয়োজনবশতঃ শ্বশুরমহাশয়ের হিসাবপত্রাদির কাগজাত দেখার আবশ্যকতা উপস্থিত হওয়ায়, আমাদিগকে তাঁহার দপ্তর অনুসন্ধান করিতে হয়। এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে, একখানি ফর্দ্দ আমার হস্তগত হয়; উহা শ্বশুর মহাশয়ের নিজের বিবাহের সময়কার ফর্দ্দ—তাঁহার পিতার হস্তের লিখিত। উহাতে শিরোনাম লিখিত আছে—

"শ্রীমান্ শ্রীনাথ অধিকারীর

শুভ-বিবাহের জিনীশ তালিকা

সন ১২৭৪ সাল তারিখ ৬ বৈশাখ।"

ফর্দ্দখানি পাইয়া ঔৎসুক্যের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, এবং দেখিলাম যে, উহা হইতে দেশের তদানীন্তন অবস্থার একটা সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। অনধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে খাদ্যাদির মূল্য কিরূপ ছিল, আর এখনই বা কিরূপ হইয়াছে, তাহার তুলনায় দেশের সমৃদ্ধি বা অবনতির বিচার করা যাইতে পারে; সুতরাং, সাহিত্যের হিসাবে, এই সামান্য ফর্দ্দখানির যথেষ্ট মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি। সেই জন্যই আজ 'ভারত-বর্ষে'র পাঠকগণকে ইহা উপহার দিতেছি।—আশাকরি, পাঠকগণ ইহার সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রামে ঐ সব জিনিসের বর্ত্তমান-মূল্য কি, তাহা মিলাইয়া দেখিবেন যে, এই অল্পসময়ের মধ্যেই জিনিসের মূল্য কত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে :—

আসামী	জিনিস	দাম
হরিদ্রা	⁄৭॥	॥⁄০
আতপ চাউল	৩⁄	৬৲
উসনা (সিদ্ধ) চাউল		
পূরবী (ভাল)	৫⁄	১০৲
মোটা চাউল	১০⁄	১৫৲
মটরের দাইল	১⁄	১৸০
মুগের দাইল	॥০	১।০
কলাইর দাইল	১⁄	১॥০
বুটের দাইল	।০	॥০
অড়হরের দাইল	॥০	১৲
তৈল	৩⁄	২৪৲
লবণ	৸০	২৸০

(লবণের পরিমাণ এত বেশী হওয়ার কারণ, বোধ হয়, এই যে উহা নষ্ট হইবে না; একেবারে সংসারখরচও অনেক দিন চলিয়া যাইবে।)

আসামী	জিনিস	দাম
লঙ্কা	⁄৫	॥০
চিড়া	৪⁄	১২৲
খয়েন ধান্য	১⁄	২।০

(ধান্যের মাপ ঐ সব অঞ্চলে 'কাঠা'র দ্বারা হয়, এখানে ঐ কাঠায় 'মণ'ই বুঝিতে হইবে।)

আসামী	জিনিস	দাম
মাৎগুড়	৸০	২৲
ময়দা	।০	১৲
ঘৃত	॥০	৯৲
দুগ্ধ	৩⁄	৬৲
দধি—খাসা	৫⁄	১৫৲
ঐ—খরা (মধ্যম)	৫⁄	১০৲
ঐ—রাশি (সাধারণ)	৩⁄	৪৲
ছানা	⁄৫	১৲
মাখন	⁄২॥	১৲
ক্ষীর	।০	২৲
মৎস্য	১ দফা	৫৲

তরকারী	১ দফা	৩৲
সুপারি	৷৷০	৩৲
তামাক	৷৫	২৲
চিটাগুড়	৷৫	১৲
চিনি (ভাল)	৷৷০	৫৲
মোটাচিনি	৸০	৫৲
সন্দেশ	৷৷০	৬৲
বাতাসা	⁄৫	১৲
ভাল গুড়	৩⁄	৮৲

ফর্দ্দের স্থানে স্থানে আমি বাদ দিয়াছি। ফর্দ্দ আলোচনায় দেখা যায় ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে তেলের মণ ৮৲, ঘৃতের মণ ১৮৲ টাকা, দুধের মণ ২৲, ভাল চাউলের মণ ২৲, মোটা চাউল ১৷৷০, ভাল দধির মণ ৩৲, ছানার মণ ৮৲, দাইলের মণ ১৷৷০ হইতে ২৲ র মধ্যে ছিল। এক্ষণে ঐ সব স্থানেই ঐ সব জিনিসের মূল্য দেড় গুণ, দুই গুণ, বা তদপেক্ষাও বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের বাল্য-কালেও আমরা আমাদের দেশে ঘৃত ২০৷২২৲ মণ দেখিয়াছি। একটা বিবাহের ন্যায় বৃহৎ ব্যাপারে ৫৲ টাকার মাছ ও ৩৲ টাকার তরকারীই যথেষ্ট হইয়াছিল! আজকাল কত লাগে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। ভাল গুড় ২৸০ মণ ছিল, এখন ৫৲ টাকা মণ কিনিতে হয়। দেখা যায়, লবণের মূল্য সে সময় এখন অপেক্ষা বেশী ছিল। তামাক পাতার সের ৵৫ ছিল, এখন ৷০ র কম নহে। তার পর মজুরাণ খরচ মোট ৫৲ ধরা হইয়াছে; এখন এইরূপ বিবাহ-ব্যাপারে মজুরাণ খরচ উহার তিন গুণের কম ত কিছুতেই হয় না।

দেশের নিত্যব্যবহার্য্য জিনিসের দাম, এই ৪০৷৪৫ বৎসরের মধ্যেই কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা ঐ তালিকা হইতে বিশেষরূপেই বুঝিতে পারা যায়। কুষ্টিয়া মহকুমার অনেক স্থানেই দুধ, ঘি ও মাছ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও সুলভে পাওয়া যাইত; এক্ষণে তাহার মূল্যও যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করাও তেমনই কঠিন হইয়াছে;—যাঁহার বিবাহের ফর্দ্দ উপরে দেখান গেল, তাঁহারই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমি নিজে সকল জিনিসের জোগাড় করিতে গিয়া তাহার পরিচয় বিশেষরূপেই পাইয়াছি। দেশের পল্লীগ্রামের সুখসুবিধা সকলই গিয়াছে; অদ্য পানীয়াদির কষ্ট, মজুরের অভাব, তারপর পীড়া—এইগুলি পল্লীর নিত্য সহচর! বেশী আর কি বলিব!

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের

তরুলিপি-যন্ত্র

[আ]মাদের ভারতবর্ষের গৌরব এবং বঙ্গের সুসন্তান [আ]চার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় গত ষোল সতের বৎসরের [অক্লান্ত?]ীরব গবেষণায় প্রকৃতির যে সকল রহস্য আবিষ্কার [ক]রিয়াছেন, তাহা পাঠক অবশ্যই অল্লাধিক অবগত [আ]ছেন। বৈজ্ঞানিকেরা এপর্য্যন্ত উদ্ভিদ্ ও প্রাণীকে [পৃ]থক্ গুণসম্পন্ন জীব বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতে-[ছি]লেন; মূলে ইঁহারা যে পৃথক্ নয়, আচার্য্য বসুমহাশয় [উ]ভয়ের জীবনের ক্রিয়ায় নানা ঐক্য নির্দ্দেশ করিয়া তাহা [প্রতি]পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা পুরাতন কথা। [অল্প]দিন হইল আচার্য্য বসুমহাশয় প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের ক্রিয়ার যে একটি একতা আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা "ভারতবর্ষে"র পাঠকদিগের নিকট তাহাই বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব। প্রাণিদেহের স্নায়ুজাল (Nerves) একটি অদ্ভুত বস্তু। ইহা দেহের সর্ব্বাংশ অধিকার করিয়া বর্ত্তমান। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, এই স্নায়ুজালই আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে চেতনার যোগ-রক্ষা করে। তা' ছাড়া বাহির হইতে আমাদের দেহে যখন, কোনও প্রকার আঘাত-উত্তেজনা লাগে, তখন ঐ স্নায়ুজালই

আঘাতের কোনও প্রকার কার্য্য বহন করিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয়, এবং ইহাতে আমরা আঘাতের মর্ম্ম বুঝি। আলোক যখন আমাদের চক্ষুতে আসিয়া পড়ে, তখনই দৃষ্টিজ্ঞান প্রকাশ পায় না; দেহের স্নায়ুমণ্ডলীই আলোকপাতের এভাব কোনও রকমে আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয় এবং ইহারই ফলে দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে। কিন্তু প্রাণিদেহের ন্যায় উদ্ভিদ্-দেহেও এপ্রকার স্নায়ুমণ্ডলী থাকিতে পারে, পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও বৈজ্ঞানিকের মনে একথা একবারও উদিত হয় নাই। প্রাণীদের ন্যায় উদ্ভিদেরাও যে স্নায়ুজালের সাহায্যে আঘাত-উত্তেজনা বোধ করে, তাহা আচার্য্য বসুমহাশয় সম্প্রতি নানা পরীক্ষার সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই আবিষ্কারের বিবরণ ইংলণ্ডের 'রয়াল সোসাইটি' প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞান-সভায় বিবৃত হইয়াছে; বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারে বিস্মিত হইয়াছেন। মানুষ প্রভৃতি প্রাণিগণ যেমন বাহির হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং শেষে বংশবিস্তার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, উদ্ভিদেরাও জীবনে এই সকল কার্য্য করে, বৈজ্ঞানিকেরা প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জীবনের এই ঐক্যটুকুর কথাই জানিতেন। এগুলি ছাড়া জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও যে একতা থাকিতে পারে, তাহা ইঁহাদের মনে কখনই স্থান পায় নাই; উদ্ভিদের জীবনের ক্রিয়া, প্রাণীর জীবনের ক্রিয়া হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক্,—বরং এই ভেদ বুদ্ধিটাই বৈজ্ঞানিক মহলে প্রবল হইয়া চলিতেছিল। এই প্রকার অবস্থায় আচার্য্য বসুমহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত অভেদজ্ঞাপক মহাবিষ্কারটি আধুনিক জীবতত্ত্বে এক নূতন আলোকপাত করিতে বসিয়াছে।

আচার্য্য বসুমহাশয়ের আবিষ্কার-বিবরণ বুঝিতে হইলে, কি প্রকারে তিনি উদ্ভিদ্-দেহের অতি মৃদু সাড়াগুলি লিপিবদ্ধ করেন, তাহা জানা আবশ্যক। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার এই সাড়ালিপি-পদ্ধতির আলোচনা করিব।

কোনো প্রকার আঘাত উত্তেজনা পাইলে, প্রাণিদেহের পেশী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া সাড়া দেয়। এই সাড়ার পরিমাণ ও সময় ইত্যাদি অঙ্কন করা কঠিন নয়; কারণ প্রাণিদেহের সাড়া নিতান্ত মৃদু নয়। প্রাণীর চঞ্চল অঙ্গের সহিত কোন লেখনী সংযুক্ত করিয়া দিলে, এই লেখনীই কাগজের উপরে, বা অপর কিছুতে, আকুঞ্চন-প্রসারণের ইতিহাস লিখিয়া যায়। কিন্তু লজ্জাবতী, বা বন-চাঁড়ালের (Desmodium Gyran), ন্যায় দুর্ব্বল গাছ পাতা উঠাইয়া নামাইয়া যখন মৃদু সাড়া দিতে থাকে, তখন পাতায় লেখনী বাঁধিয়া কাগজে বা ভুষা-মাখান কাচে সাড়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা চলে না। পাতা, লেখনীর ভার বহন করিতে পারে না; কাজেই,খুব লঘু লেখনী বাঁধিয়া দিলেও, সাড়া বন্ধ হইয়া যায়। তার পর আবার, লেখনী কাগজের উপর দিয়া, বা ভুষামাখান কাচের উপর দিয়া, চলিবার সময়ে ঘর্ষণে যে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহাও গাছের ক্ষীণ-সাড়া বন্ধ করিয়া দেয়।

যে উপায়ে সাধারণতঃ লজ্জাবতী প্রভৃতি স্পন্দনশীল উদ্ভিদের সাড়া লিপিবদ্ধ করা হয়, প্রথম চিত্রে তাহার পরিচয় প্রদান করা হইল।
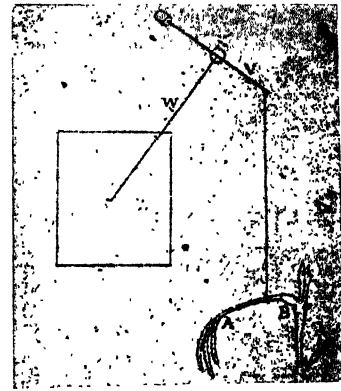
চিত্রের x-চিহ্নিত স্থানে v-চিহ্নিত দণ্ডটি আবদ্ধ আছে; উহা চারিদিকে খেলিয়া বেড়াইতে পারে। দণ্ডের এক প্রান্তে সূতা বাঁধা আছে; এই সূতারই অপর প্রান্ত লজ্জাবতী-লতার পত্রযুক্ত ডগায় বাঁধিয়া রাখা হইয়া থাকে। চিত্রের w-চিহ্নিত অংশটি লেখনী; v-নামক দণ্ডের সহিত ইহাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রাখা হয়, এবং ইহারই মুক্ত-প্রান্তটির বাঁকান-অংশ লিপিফলকে, পাতার উঠানামার সঙ্গে, রেখাঙ্কন করিতে থাকে।

পূর্ব্বোক্ত চিত্র-পরিচয় হইতে বুঝা যাইবে, পাতা নামিলেই সূতার টান্ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে v-নামক দণ্ডটি নীচে নামিয়া যায়, এবং w-চিহ্নিত লেখনী লিপিফলকে একটা ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কন করে। তা'র পর পাতা প্রকৃতিস্থ হ

নে উঠিয়া দাঁড়ায়, তখন সুতার টান্ কমিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডটিও ঋজুভাবে আসিয়া পড়ে; ইহাতে লেখনীটি একটি নিম্নগামী রেখা আঁকিয়া ফেলে। এই প্রকারে, লিপিফলকের তরঙ্গিত রেখা দেখিয়া, পাতার উঠা-নামার একটা স্থূল বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। লিপিফলক খানিকে স্থির রাখা হয় না; একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে সেখানি যন্ত্র-বিশেষের সাহায্যে লেখনীর সম্মুখে উঠিতে বা নামিতে থাকে। এই ব্যবস্থায় লেখনীর উঁচু নীচু রেখাগুলি উপর্য্যুপরি অঙ্কিত হয় না; অধিকন্তু, কত সময়ে পাতাটি পড়িয়া একটা উর্দ্ধরেখা অঙ্কন করিল, এবং কত সময়েই বা সেটি আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, তাহাও সাড়ালিপি দৃষ্টে বুঝা যায়।

সাড়ার মোটামুটি অঙ্কন পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্রের সাহায্যে একরকম চলিয়া যায় সত্য; কিন্তু যখনই অতি ক্ষীণ সাড়া-অঙ্কনের প্রয়োজন হয়, অথবা অতি ক্ষুদ্র সময়ে পাতার কি পরিবর্ত্তন হইল জানিবার আবশ্যক হয়, তখন ঐ যন্ত্রে আর কাজ চলে না। এই অবস্থায় ক্ষীণ-সাড়া সুতা টানিয়া দণ্ডটিকে নড়াইতে পারে না, এবং লিপিফলকের সহিত লেখনীর যে ঘর্ষণ হয়, তাহাও অতিক্রম করিতে পারে না; কাজেই, সাড়া অঙ্কিত হইতে পায় না।

বৃক্ষের দেহে, বাহিরের আঘাত উত্তেজনা কিরূপ বেগে ধাবিত হয়, এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় ঐ বেগের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, এই প্রকার বহু-সূক্ষ্ম ব্যাপারের অনুসন্ধানে রত হইয়া আচার্য্য বসু মহাশয় পূর্ব্বে একটি সুব্যবস্থিত তরুলিপি যন্ত্র উদ্ভাবনে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার এই চেষ্টা সার্থক হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লেখনী ও লিপিফলকের মধ্যে যে ঘর্ষণ হয়, তাহাই ক্ষীণ-সাড়া-প্রকাশের প্রধান অন্তরায়। আচার্য্য বসু মহাশয় মনে করিয়াছিলেন—লেখনীর মুখটা, সকল সময়েই লিপি-ফলকের সংস্পর্শে না রাখিয়া, যদি কোন উপায়ে উহাকে মাঝে মাঝে নিমেষ-কালের জন্য ফলকে স্পর্শ করান যায়, তাহা হইলে ঘর্ষণের উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে; অথচ, ইহাতে লিপি-অঙ্কনের কোন অসুবিধা হইবে না; কারণ, লেখনী অল্পক্ষণের জন্য স্পর্শ করিয়া লিপি-ফলকে যে সকল বিন্দু রচনা করিবে, তাহা হইতে পাতার উঠানামার পরিচয় সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। এই প্রথায় যন্ত্রনির্ম্মাণের আরও একটা সুবিধার কথা, আচার্য্য বসু মহাশয় বুঝিয়াছিলেন। ইনি মনে করিয়াছিলেন, ঠিক্ কত সময় অন্তরে লেখনীটি এক এক বার লিপিফলক স্পর্শ করিতেছে, ইহা যদি জানিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃক্ষদেহ বহিয়া উত্তেজনা কত দূরে যায়, তাহা সাড়ালিপিতে অঙ্কিত বিন্দুগুলিকে গণিয়াই নির্ণয় করা যাইবে।

আমাদের দেশে সূক্ষ্ম-যন্ত্রনির্ম্মাণের যে সকল অসুবিধা আছে, তাহা পাঠকের অবিদিত নাই। সকল সময়ে প্রয়োজনীয় মাল-মসলা হাতের গোড়ায় পাওয়া যায় না; এবং, বুঝাইয়া দিলে, ঠিক্ মনের মত করিয়া নমুনা-প্রস্তুত করিতে পারে, এমন শিল্পীও সহসা মিলে না। কিন্তু আচার্য্য বসু-মহাশয় এই সকল অসুবিধাকে গ্রাহ্য করেন নাই; যে যন্ত্রটির কথা তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, আমাদের দেশেরই নিরক্ষর মিস্ত্রির সাহায্যে তিনি তাহার গঠন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং শেষে নিজের পরিকল্পিত যন্ত্রের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।
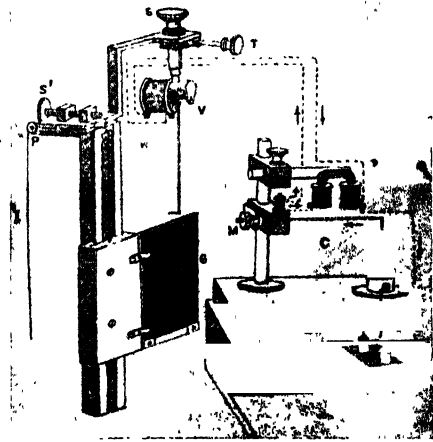
দ্বিতীয় চিত্রখানি, আচার্য্য বসুমহাশয়ের তরুলিপি যন্ত্রের একাংশের ছবি। এই যন্ত্রটির কার্য্য বুঝিতে হইলে, একটা সোজা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। মনে করা যাউক, দড়িতে বাঁধা একটা দোল্না দুলিতেছে। দোদুল্যমান পদার্থ-মাত্রেরই নিয়ম এই যে, যত জোরে তাহাকে ধাক্কা দাও না কেন, সেটি এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূর্ণান্দোলন শেষ করিবে। আবার দড়ি যত লম্বা হয়, আন্দোলনের সময় ততই দীর্ঘ হয়। দোদুল্যমান পদার্থ

মাত্রই এই নিয়ম মানিয়া চলে বলিয়াই, দোলকের সাহায্যে ঘড়িতে সময়রক্ষা করা চলে। যাহা হউক, মনে করা যাউক যেন আমাদের দোলনাটি দুই সেকেণ্ডে একবার পূর্ণান্দোলন শেষ করিতেছে। এখন যদি কোন ব্যক্তি দোল্‌নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তালে তালে উহাতে দুই সেকেণ্ড অন্তর এক একটা ধাক্কা দিতে পারেন, তাহা হইলে দোল্‌নাটি খুব জোরে দুলিতে আরম্ভ করিবে। ইহাতে আন্দোলনের পথ স্পষ্ট বাড়িয়া যাইবে বটে, কিন্তু পূর্ণান্দোলনের কাল ঠিক্ পূর্ব্ববৎ দুই সেকেণ্ডই থাকিবে।

আচার্য্য বসুমহাশয়, দোদুল্যমান পদার্থের ঐ ধর্ম্মটিকে মনে রাখিয়া, তাঁহার তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় চিত্রের V-চিহ্নিত স্থানের পাত্‌লা ও লঘু লৌহশলাকাটিই লেখনী; ইচ্ছাক্রমে ইহার দৈর্ঘ্য ছোট বড় করিবার উপায় আছে; কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষায় দৈর্ঘ্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, এবং তাহার একপ্রান্ত আট্‌কাইয়া রাখা হয়। কাজেই পূর্ব্ব-উদাহরণের দোল্‌নার ন্যায়, ইহার মুক্ত প্রান্তটি এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূর্ণান্দোলন শেষ করিতে থাকে, এবং, এক একটি আন্দোলনের শেষে, G-চিহ্নিত কৃষ্ণ লিপি-ফলকটিকে স্পর্শ করিয়া এক একটি বিন্দু লিখিয়া যায়। P-চিহ্নিত স্থানে একটি কপিকল আছে। ইহার উপরকার দড়ি গাছটি, ঘড়ির কলের ন্যায় কোন কলের নিয়মিত টানে, ফলকটিকে নিয়মিতভাবে উপরে উঠাইতে থাকে; কাজেই লেখনী ফলকের একই স্থানে দুইবার স্পর্শ করিতে পারে না। তা ছাড়া আবার, লেখনীটি একবার পূর্ণান্দোলন করিতে কত সময় লয়, তাহাও জানা থাকে। কাজেই, লিপি-ফলকে পর পর দুইটি বিন্দুপাতে কত সময় অতিবাহিত হয়, তাহাও আমরা জানিয়া লইতে পারি।

দোল্‌নাকে যদি অবিরাম সুশৃঙ্খলার সহিত দোলাইতে হয়, তাহা হইলে, নিয়মিত ধাক্কা দিয়া চালাইবার জন্য, কোন সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়। কোন দোল্‌নাই আপনি দোলে না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনীটিকে সর্ব্বদা আন্দোলিত রাখিবার উপায় কি? আচার্য্য বসুমহাশয় যে উপায়ে তাঁহার যন্ত্রের লেখনীটিকে আন্দোলিত রাখিয়াছেন, তাহা বড়ই আশ্চর্য্য-জনক।

দ্বিতীয় চিত্রে V-চিহ্নিত স্থানে কৌটার ন্যায় যে বস্তুটি দেখা যাইতেছে, তাহা একটি বিদ্যুৎ চালিত চুম্বক (Electro-magnet)। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্যই জানেন, এই শ্রেণীর চুম্বকের লৌহাকর্ষণ-শক্তি স্থায়ী নয়। উহার চারিদিকে জড়ান তারের ভিতর দিয়া যতক্ষণ বিদ্যুৎ চলে, ততক্ষণই উহার চুম্বকত্ব থাকে; বিদ্যুৎ-চালনা রোধ করিলে, উহার চুম্বক-ধর্ম্মও রোধ পাইয়া যায়। আচার্য্য বসুমহাশয়, তাঁহার যন্ত্রের লেখনীর নিকটবর্ত্তী এই চুম্বকে বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ চালনা করিয়া থাকেন। কাজেই ক্ষণে ক্ষণে উহা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং ক্ষণে ক্ষণে সেই লৌহময় লঘু লেখনীকে টানিতে থাকে। একবার টানিয়া ধরিয়া রাখিলে কোন জিনিস কম্পিত হয় না, বার বার টানিয়া ছাড়িয়া দিতে থাকিলেই কম্পন সুরু হয়।—কাজেই চুম্বকের সবিরাম টানে লেখনী অবিরাম কম্পিত হইতে থাকে। লেখনীর একটা পূর্ণান্দোলন শেষ হইতে কত সময়ের প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই আন্দোলন-কালের সহিত তাল রাখিয়া যাহাতে বিদ্যুৎ পরিচালিত হয়, এবং সেই তালে তালে চুম্বক চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে লৌহ-লেখনীকে আকর্ষণ করে, তাহার ব্যবস্থা এই যন্ত্রে রাখা হয়। কাজেই লেখনীর কম্পনের সহিত যোগ ও তাল রাখিয়া চুম্বকটি লেখনীকে কাঁপাইতে থাকে। যে দোল্‌না দুই সেকেণ্ড অন্তর একটা পূর্ণান্দোলন সমাপন করে, তাহাতে দেড় সেকেণ্ড অন্তর ধাক্কা দিলে সেটি খুব এলোমেলো ভাবে দুলিতে আরম্ভ করে। যদি কেহ দোল্‌নার আন্দোলন অক্ষুণ্ন রাখিতে চাহেন, তবে তাহাতে ঠিক্ দুই সেকেণ্ড অন্তরই তালে তালে ধাক্কা দেওয়াই প্রয়োজন। আচার্য্য বসুমহাশয়, লেখনীর এলোমেলো আন্দোলন নিবারণ করিবার জন্যই, আকর্ষক চুম্বকটিতে লেখনীর আন্দোলনের তালে তালে বিদ্যুৎ-চালনা করিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থায় তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনীটি একটি অপূর্ব্ব যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময় পর্য্যন্তও উহা লিপি-ফলকে অভ্রান্তরূপে আঁকিয়া দিতেছে।
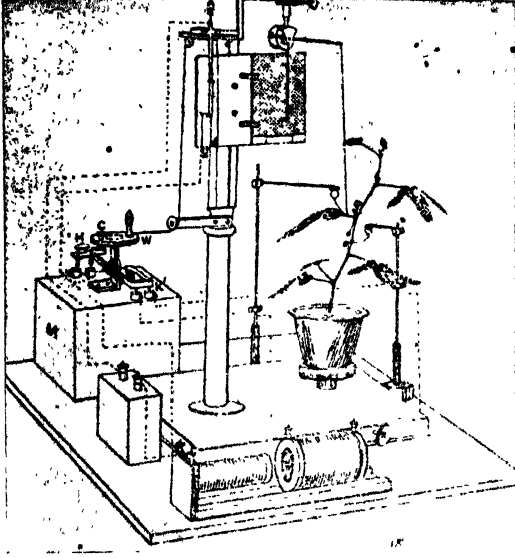
তৃতীয় চিত্রখানি তরুলিপি-যন্ত্রের একটি সম্পূর্ণ ছবি। ইহার M-চিহ্নিত অংশটি গ্রামোফোনের কলের মত একটা কল। ইহাই চাকা ঘুরাইয়া তৎসংলগ্ন সূতাকে নিয়মিতভাবে টানে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সূতায় আবদ্ধ লিপিফলকখানি লেখনীর সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। চিত্রস্থ টবে একটি লজ্জাবতীর গাছ রহিয়াছে; উহারই পাতার ডালের সহিত আর একটি সূতা বাঁধা আছে, এবং ইহার অপর প্রান্ত সেই লেখনীর দণ্ডে আবদ্ধ রহিয়াছে। পাতা গুটাইয়া নামিয়া পড়িলে, সূতায় টান পড়ে এবং এই টানে কম্পমান লেখনীটি লিপিফলকে বিন্দুময় রেখা অঙ্কন করিতে থাকে। এই ব্যবস্থায় লেখনীর মুখ সর্ব্বদাই লিপিফলকে সংযুক্ত থাকে না; কাজেই ঘর্ষণের উপদ্রব অনেক কমিয়া আসে, এবং যে সকল ক্ষীণ-সাড়া সাধারণ-যন্ত্রে ধরা পড়ে না, তাহাই এই তরুলিপি-যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া যায়।

উদ্ভিদ্‌-দেহে কিরূপ বেগে উত্তেজনা সঞ্চরণ করে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, ঠিক্ কোন্ সময়ে উদ্ভিদের দেহে আঘাত দেওয়া হইল, তাহা লিপিবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। ইহা চোখে দেখিয়া লিখিয়া রাখিলে, অনেক সময়েই ভুল ভ্রান্তি উপস্থিত হয়; বলা বাহুল্য, ইহাতে গণনা ঠিক্ হয় না। উত্তেজনা-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে এই সময়টা লিপি-ফলকে লেখা হইয়া যায়, বসুমহাশয় যন্ত্রে তাহারও সুব্যবস্থা রাখিয়াছেন; সুতরাং দেখা যাইতেছে এই যন্ত্রে পরীক্ষা আরম্ভ করিলে পরীক্ষককে কোনই চিন্তা করিতে হয় না। যন্ত্রটিকে সাজাইয়া দিলে ক্ষণিক উত্তেজনা আপনা হইতেই গাছে আসিয়া লাগে এবং কোন্ সময়ে উত্তেজনা লাগিল, তাহাও আপনা হইতে লিপিফলকে অঙ্কিত হইয়া যায়। তা'র পর, উত্তেজনার কার্য্য সুরু হইতে এবং উত্তেজনা প্রবাহিত হইতে কত সময় লাগিল, পরীক্ষক—লিপির প্রতি একবার দৃষ্টি-পাত করিলেই —সকলই জানিতে পারেন।

সূক্ষ্ম-গণনার জন্য, এমন স্বয়ং-লিপি-যন্ত্র, সত্যই কেহ এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই।

আচার্য্য বসুমহাশয়, তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রের সাহায্যে, উদ্ভিদ্ তত্ত্ব-সম্বন্ধে যে সকল নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা বারান্তরে তাহার আভাষ দিব।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পয়লা বৈশাখ

এই বৈশাখমাসটা আমার বড়ই স্মরণীয় মাস। হিন্দু-বৎসরের প্রথম-মাস বলিয়া আমি একথা বলিতেছি না; বৈশাখমাসের সঙ্গে আমার অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক বিয়োগযন্ত্রণার সম্বন্ধ আছে। এই বৈশাখ-মাসে আমি যাহা হারাইয়াছি, তাহা আর কখনও ফিরিয়া পাইব না; এই বৈশাখমাসে যাহাদিগকে শ্মশান-শয্যায় রাখিয়া আসিয়াছি, তাহারা আমার জীবনের প্রধান-অবলম্বন ছিল, তাহারা আমার বড়ই আপনার জন ছিল। তাই—এই বৈশাখমাস মনে হইলেই, এই বৈশাখমাস আসিলেই, আমি শিহরিয়া উঠি;—ভাগ্য-দেবতা আমার অদৃষ্টে আর কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া শঙ্কিত হই।

আবার এই বৈশাখমাসেই—এই বৈশাখের প্রথম দিবসেই—বহুদিন পূর্ব্বে আমি যাহা পাইয়া ছিলাম, তাহাও আর এ জীবনে পাইব না। শোকের কথা, দুঃখের কথা, বিয়োগযন্ত্রণার কথা, চিতাভস্মের কথা, যখন তখনই বলিয়াছি, এই সুদীর্ঘ জীবনকাল ভরিয়াই বলিয়াছি, এখনও বলিয়া থাকি; কিন্তু বৈশাখমাসের প্রাপ্তির কথা আমি ইতঃপূর্ব্বে কাহাকেও বলি নাই। সকল কথাই কি সকলে সকল সময় বলে,—না বলিবার ইচ্ছাই হয়। জীবনের অনেককথা অনেকে গোপন রাখিয়াই চলিয়া যান।—আমার জীবনেরও অনেককথা আমার সঙ্গে সঙ্গেই চিতায় উঠিবে—কিন্তু এখন; এই জীবনের আসন্ন হিসাব-নিকাশের সময়,—দুই একটি পুরাতন কথা, কি জানি কেন, বলিতে ইচ্ছা করে! তাই এতকাল পরে এই কথাটি বলিতেছি।—

অনেক দিন পূর্ব্বে—সাল বলিতে পারিব না—তবে অনেক দিন পূর্ব্বে—আমি যখন দেশের মায়া, আত্মীয় স্বজন-গণের মমতা, কাটাইয়া নিরুদ্দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, সেই সময়ের কথা বলিতেছি। আমি তখন পশ্চিমে পাহাড়ের মধ্যে থাকিতাম। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত যখন যেদিকে দুই চোক যাইত, সেই দিকেই চলিয়া যাইতাম। বাধা দিবার কেহ ছিল না, ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের প্রয়োজন ছিল না, কি খাইব সে ভাবনাও ছিল না। যিনি কোটী কোটী জীবজন্তুর আহার দিতেছেন, তিনিই আহার দিয়া বাঁচাইবেন; আর তিনি যদি আহার না দেন, তাহা হইলে রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীও আমাকে খাওয়াইতে পারিবেন না;—এই বিশ্বাস অন্ততঃ তখন আমার পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তাই, অমন করিয়া বেড়াইতে পারিতাম, কোন ভবিষ্যতের ভাবনাই মনে উঠিত না; সে ভাবনার ভার না পাইয়া আমি সমস্ত ভাবনা ভূতভাবনের উপর ছাড়িয়া দিয়া ছিলাম।

এই রকম যখন অবস্থা, এমনই যখন মনের ভাব সেই সময়ে চৈত্রমাসের শেষে একদিন, হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় স্নান করিবার জন্য, দেরাদুনের আবাসগৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমি যতদিন হিমালয়ের মধ্যে ছিলাম, ততদিন যখনই যেখানে থাকি না কেন, চৈত্র মাসের শেষদিনে হরিদ্বারে যাইতাম। যাঁহারা আমার পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু, তাঁহারা বলিতেন আমি মুখে যাহাই বলি না কেন, অন্তরে আমি ঘোর-হিন্দু;—তাই আমি চৈত্র-সংক্রান্তিতে হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করিতে যাই। আবার যাঁহারা ব্রাহ্ম, তাঁহারা বলিতেন আমি হরিদ্বারে লোকারণ্য দেখিতে যাই। আমার একটি থিয়সফিগ্রস্ত বন্ধু ছিলেন, তিনি বলিতেন, আমি মহাত্মাদিগের দর্শন করিতে যাই। আমি তখন কাহারও কথায় সায়ও দিতাম না, প্রতিবাদও করিতাম না; এখন সে কথা বলিবার প্রয়োজন দেখি না। যে জন্যই হউক, আমি প্রতিবৎসর চৈত্রমাসের শেষে হরিদ্বারে যাইতাম, এবং গঙ্গাস্নানও করিতাম; দুই তিন দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া, যেদিকে হয় চলিয়া যাইতাম! যেবার সেই খুব বড় কুম্ভ-মেলা হয়, সেবারও আমি হরিদ্বারে গিয়াছিলাম।

পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়াছিলাম যে, হরিদ্বারে সেবার এত যাত্রীর সমাগম হইবে যে, কিছুতেই লোকের স্থান হইবে না; এমন কি বাহিরে, গাছের তলায় বা অনাবৃত স্থানেও, লোকে বসিবার স্থান পাইবে না। আমার তাহাতে কোন ভয়েরই কারণ ছিল না; আমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি, আরও সহিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলাম। তাই, বন্ধুগণ যখন সেবার বলিলেন, "ভায়া, এবার যদি হরিদ্বারে যেতে হয়, তা

আব্দার।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র দে ।]

K.V. SEYNE & BROS.

হ'লে আগে থেকে একটা আড্ডা ঠিক কর।"—আমি সে কথায় কর্ণপাত করি নাই, কর্ণপাত করিবার প্রয়োজনও অনুভব করি নাই। তাহার পর, যথাসময়ে হরিদ্বারে চলিলাম। পথে যাত্রীর সংখ্যা দেখিয়া বুঝিলাম যে, লোকারণ্যই হইবে। মনে বড়ই আনন্দ হইল।

আমি দেরাদুন হইতে হরিদ্বারে যাইতেছিলাম। তখন দেরাদুনের রেল হয় নাই। রেলে যাইতে হইলে দেরাদুন হইতে ৪২ মাইল এক্কা বা ডাকগাড়ীতে সাহারণপুরে গিয়া, সেখান হইতে রেলে চড়িয়া লুক্‌সার-জংসনে গাড়ী বদল করিয়া, হরিদ্বারে যাইতে হইত। এত ঘোরা পথে কেহই যাইত না; সকলেই হরিদ্বারে যাইতে হইলে অরণ্যপথে কেহ বা এক্কায়, কেহ বা গো-যানে, আমার মত লোকে পদব্রজে,—যাইত। এবারও আমি পদব্রজেই গিয়াছিলাম।

হরিদ্বার হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, রাস্তার পার্শ্বে, একটি দেবালয় আছে। দেবালয়টি কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহা অতি সুন্দর। চারিদিকে বাগান, বাগানের মধ্যে মন্দির, মন্দিরটিও ছোট নহে, আশে পাশে আরও পাঁচ সাতখানি ঘর আছে। আমি যখন সেই মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা হইবার অধিক বিলম্ব নাই। সেখানেই দেখিলাম, রাস্তার পার্শ্বে যেখানে একটু স্থান আছে, সেখানেই যাত্রীরা আড্ডা করিয়াছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, হরিদ্বার একেবারে লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; এখন যাহারা আসিতেছে, তাহারা রাস্তার মধ্যে, যেখানে স্থান পাইতেছে সেইখানেই, অবস্থিতি করিতেছে। আমি তখন মনে করিলাম, রাত্রিটা এই দেবালয়েই কাটাইয়া দেওয়া যাউক; পরদিন হরিদ্বারে গিয়া স্নানান্তর যদি কোথাও থাকিবার ব্যবস্থা ভগবান না করিয়া দেন, তাহাহইলে দেরাদুনেই ফিরিয়া যাইব। এই মনে করিয়া আমি দেবালয় চত্বরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সেখানেও অনেক হিন্দুস্থানী সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যে কয়খানি ঘর ছিল, তাহা যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; অনেকে বাগানের মধ্যে, অনাবৃত আকাশতলে, আশ্রয়লাভ করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছে। আমি ধীরে ধীরে দেবালয়ের মধ্যে, মন্দিরের নিকট, উপস্থিত হইলে এক সন্ন্যাসীবেশধারী ব্যক্তি আমার দিকে অগ্রসর হইয়া হিন্দী-ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এখানে থাকিতে চান?" আমি বলিলাম, "ইচ্ছা ত তাই ছিল, কিন্তু এখানে যে একেবারেই স্থানাভাব দেখিতেছি!" সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ, স্থানাভাব ত বটেই; তবে আপনার জন্য একটু স্থান করিয়া দিতে পারিব। সঙ্গে কি লোক আছে?" আমি বলিলাম, "এক লোকনাথ ব্যতীত আর কেহ ত সঙ্গী নাই; আর সঙ্গী মিলে নাই বাবা!" আমার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইলেন; তিনি বলিলেন, "মন্দিরের বারান্দায় আপনি আমারই সঙ্গী হইবেন।" আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনিই কি এই দেবালয়ের সেবাইৎ।" তিনি বলিলেন, "সেবা ত জানি না, সেবা যে করিতে পারি তাহাও মনে হয় না; তবে আমার উপরেই সে ভার আছে।" এই বলিয়া, তিনি মন্দিরের বারান্দার উঠিলেন; আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনার সঙ্গে কোন আসন আছে কি?" আমি বলিলাম, "ভগবান এত আসন বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন!—আমি আসন বহিয়া মরিব কেন? এই কাপড়খানি, আর গামছাখানি ব্যতীত আমার সঙ্গে একটী লোটা পর্য্যন্তও নাই।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "বহুত খুব!" এই বলিয়া বারান্দার পার্শ্ব হইতে একখানি ছোট কম্বল আনিয়া, আমাকে আসন করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম যে, "এই ধরাসনই আমার রাজাসন, আমার অন্য আসনের প্রয়োজন নাই।" তখন সন্ন্যাসী রাত্রির আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "সেজন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না, আমার আহার যাহা হয় হইবে।" তখন, আরতির সময় হইল দেখিয়া, সন্ন্যাসী নিকটবর্ত্তী ইন্দারার দিকে চলিয়া গেলেন, এবং একটু পরেই আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই অন্যলোকে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়াছিল, এবং আরতির আয়োজন করিতেছিল। মন্দিরমধ্যে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি; আর কোন মূর্ত্তি নাই। আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, যাত্রীরা যে যেখানে ছিল, সকলেই মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইল; আরতি আরম্ভ হইল, যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল, কেহ বা ভজন গায়িতে লাগিল। একটু পরেই আরতি শেষ হইল; যাত্রীদের অনেকেই, দেবাদিদেবকে প্রণাম করিয়া, স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল; দুই চারিজন বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় মন্দিরের বারান্দায় উপবেশন

করিলেন। সন্ন্যাসীও আসিয়া সেখানেই বসিলেন। তখন ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ হইল; আগন্তুকগণের মধ্যে অনেকে সন্ন্যাসীকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; সন্ন্যাসীও তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর কথা বার্ত্তায় বুঝিতে পারিলাম, তিনি খুব পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি; সাধারণ পুরোহিতের মত নহেন। আমি এই ধর্ম্মালোচনার মধ্যে কোন কথাই বলিতেছি না দেখিয়া, সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন, "লেড়্কা! তুমি যে কোন কথাই বলিতেছ না! ক্ষুধা পাইয়াছে?" আমি বলিলাম, "বলিবার কথা ত বেশী নাই বাবা, শুনিবার কথাই বহুত। আপনাদের কথাই শুনিতেছি; আমি আর কি বলিব?" আমার কথা শুনিয়া, সেখানে উপবিষ্ট একটি বৃদ্ধ আমার দিকে ফিরিয়া বসিলেন, এবং আমার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।—আমার আবার পরিচয় কি? আমি অতি সংক্ষেপে আমার দুঃখময় জীবনের কাহিনী বলিলাম। বৃদ্ধ, আমার কথা শুনিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর, ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাবা, তোমার কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে। এই অন্ধকারে তোমার মুখখানি দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু তোমার স্বর শুনিয়া আর এক হতভাগ্যের কথা আমার মনে হইতেছে!" এই বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইলেন। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য যদিও আমার কৌতূহল হইল, কিন্তু আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না; চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

একটু পরেই বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! রাত্রিতে তোমার কি আহার হইবে?" আমি বলিলাম, "কিছু না।" বৃদ্ধ বলিলেন, "সে কি কথা? তুমি অনাহারে থাকিবে? ওবেলায় কি খাইয়াছ?" আমি বলিলাম "চারিটি ভুজা।" বৃদ্ধ বলিলেন "কি তুমি আজ তামাম দিন ভুজা খাইয়া আছ! রুটী বানাও নাই?" আমি বলিলাম, "বিশেষ প্রয়োজন মনে করি নাই!" আমার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি আহারটাকে কি কোন প্রয়োজনের মধ্যেই ধর না?" আমি বলিলাম, "ক্ষুধা-নিবারণের প্রয়োজন আছে বই কি; কিন্তু যাহা হয় কিছু হইলেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। রুটীই যে খাইতে হইবে,—এমন কোন কথা নাই।" সন্ন্যাসী হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন; তিনি বলিলেন, "তা হবে না। আমরা সকলেই খাইব, আর তুমি ভুখা থাকিবে;—তা কি হয়! আমার সঙ্গে মহারাজ (রসুয়ে ব্রাহ্মণ) আছে, তোমার আহার আমাদের সঙ্গেই হইবে; আমি বলিয়া আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ বাগানের এক পার্শ্বে চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার লোকনাথ আহার মিলাইয়া দিলেন!" তাহার পর নানাকথা হইতে লাগিল; বৃদ্ধও ফিরিয়া আসিয়া আমাদের কথায় যোগদান করিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে একটি লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, 'আহার প্রস্তুত হইয়াছে।' বৃদ্ধ আমাকে সঙ্গে লইয়া, বাগানের এক পার্শ্বে, তাঁহার আড্ডায়, উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, সেই স্থানে দুইটি বস্ত্রাবাস রহিয়াছে; একটি ছোট, অপরটি অপেক্ষাকৃত বড়। আমরা সেই বড় বস্ত্রাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই বস্ত্রাবাসের মধ্যে একটি 'হারিকেন্' লণ্ঠন জ্বলিতেছে। সেই আলোকে দেখিলাম, এক পার্শ্বে একটি বিছানার উপর দুইটি মহিলা বসিয়া আছেন; একজন বর্ষীয়সী, অপর জন যুবতী। সম্মুখেই মৃত্তিকাসনে আর একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে; বুঝিতে পারিলাম সেটি দাসী। বৃদ্ধ বস্ত্রাবাসের অপর পার্শ্বস্থ একটি বিছানায় আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি সেই বিছানায় উপবিষ্ট হইলে, বৃদ্ধও আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। একটি ভৃত্য তামাক লইয়া আসিল। বৃদ্ধ আমাকে তামাক খাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম, 'আমি তামাক খাই না'। ভৃত্য তখন একটা আল্‌বোলার উপর কলিকাটি চড়াইয়া দিল; বৃদ্ধ তামাক সেবন করিতে লাগিলেন, এবং ঘন ঘন আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন; আমি তাঁহার এ দৃষ্টির কোনই অর্থ বুঝিতে পারিলাম না! একটু পরেই বৃদ্ধ উঠিয়া গেলেন, এবং, পূর্ব্ব-কথিত বর্ষীয়সীর নিকট যাইয়া, তাঁহাকে চুপে চুপে কি বলিলেন। বৃদ্ধ তখনই আবার আসিয়া, আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, বলিলেন, "বাবুজি! যাঁহার সঙ্গে আমি এই মাত্র কথা বলিলাম, উনি আমার পরিবার; আর যিনি পার্শ্বে বসিয়া আছেন, তিনি আমার পুত্রবধূ। আমি উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গা স্নানে আসিয়াছি। এবার আমার আসিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু আমার পুত্রবধূ নিতান্ত জিদ্ করায়

আমাকে বাধ্য হইয়া আসিতে হইল। এখন কা'ল উঁহাদের স্নান করাইয়া আনিতে পারিলেই বাঁচি। যে রকম লোক-সমারোহ হইয়াছে, তাহাতে কাল যে কি হইবে, বলিতে পারিনা! একবার ত—অনেক দিন আগে—বহুত খুন জখম দাঙ্গা ফরিয়াদ্ হইয়া গিয়াছিল; এবার তা না হয়।" আমি বলিলাম, "এবার গবর্ণমেণ্ট খুব ব্যবস্থা করিয়াছেন, কোন গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন, "বড় ভীড় হইবে মনে করিয়া, বাড়ী হইতে দুইজন বরকন্দাজ ও দুইজন চাকর সঙ্গে আনিয়াছি।" আমি তখন বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! আমার পরিচয় ত আপনি পাইয়াছেন; কিন্তু আমি এখন যাঁর অতিথি, তাঁর পরিচয় ত পাইলাম না!" তিনি বলিলেন, "আমার পরিচয় কি? আমি সামান্য একজন জমিদার; * * তহসিল্ আমার বাড়ী। আমার আয় অতি সামান্য, এই পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে। সংসারে আমার আর কেহ নাই;—আছেন সুধু ওঁরাই দুইটি মহিলা!" এই বলিয়া বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমি ইহা হইতে স্থির করিলাম,—বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র ছিল; সেই পুত্রটী মারা গিয়াছে; এখন সংসারে তাঁহার স্ত্রী ও বিধবা পুত্রবধূ আছেন, আর কেহ নাই। আমি তখন বলিলাম, "আপনার পুত্রটি কতদিন হইল মারা গিয়াছে?" আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধের মুখ মলিন হইয়া গেল; তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নেহি—নেহি বাবুসাব্,—লেড়্কা মর্ নেহি গিয়া; ফেরার্ হো গিয়া।"—আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম; বলিলাম, "আমাকে ক্ষমা করিবেন; আমি আপনার কথা না বুঝিয়া অন্যায় কথা বলিয়া ফেলিয়াছি।" তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন; এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, দ্বিতীয়-বস্ত্রাবাসে আহারের স্থান হইয়াছে। বৃদ্ধ তখন আমাকে লইয়া আহারের স্থানে গেলেন। লোকনাথ আমার জন্য সে রাত্রিতে সে পাহাড়ের মধ্যে রাজভোগই মাপাইয়া রাখিয়াছিলেন! আহার করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিলেন "বাবুজি! আমার যে ছেলেটী ফেরার্ হইয়াছে, তাহার চেহারার সহিত আপনার চেহারার অনেকটা মিল আছে। আমি সেই কথাই আমার পরিবারকে বলিতে-ছিলাম; তিনিও তাহাই বলিলেন!" ভাল কথা!—আমি কোথাকার বাঙ্গালী, আর তিনি লুধিয়ানা জেলার একজন জমিদার; আমি পথের ভিখারী, তিনি একজন রইস্!—আমার চেহারা, তাঁহার পলাতক পুত্রের চেহারার মত! যাক্,—এই পাহাড়ের মধ্যে যদি পিতামাতার স্নেহ পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি!

আহার শেষ হইলে আমি বলিলাম, "আমি তাহা হইলে মন্দিরে যাই।" বৃদ্ধ আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তা' হইবে না; তোমার সঙ্গে বিছানাপত্র কিছুই নাই! তুমি আমাদের তাম্বুতেই শয়ন করিবে, চল।"—একই তাম্বুর মধ্যে একপার্শ্বে স্ত্রীলোকেরা থাকিবেন; আর তাহারই মধ্যে সম্পূর্ণ-অপরিচিত আমি, কেমন করিয়া রাত্রি কাটাই! এই কথাটাই একটু ঘুরাইয়া তাঁহাকে বলিলাম। তিনি আমার কোন আপত্তিই মঞ্জুর করিলেন না; কাজেই আমাকে সেই বস্ত্রাবাসেই রাত্রি কাটাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। আমার জন্য তখনই পৃথক্ একটা শয্যা-রচনা হইল; কিন্তু তখনই নিদ্রাদেবীর শরণ গ্রহণ করা হইয়া উঠিল না! বৃদ্ধ তখন নিজের দুঃখের কথা আরম্ভ করিলেন।—

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার মত হতভাগ্য আর এ দুনিয়ায় দু'টী নাই। আমার জমি জেওরাৎ যাহা আছে, তাহাতে সংসার বেশ চলিয়া যায়, দুপয়সা স্থিতিও হয়;—কিন্তু এ বিষয় কে খাইবে? সংসারে আমার একটি মাত্র পুত্র, সেও আজ চারি বৎসর ফেরার্!—কোথায় যে গেল!—বাঁচিয়া আছে,—কি মরিয়াছে; কিছুই জানি না!" এই বলিয়া বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমি বলিলাম, "সে সকল কথা বলিতে যদি মনে কষ্ট হয়, তাহা হইলে আর সে খবর আমাকে দিয়া কাজ নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন, "না,—না; কষ্ট হয় বলিয়া কি করিব? যদিও তোমার সঙ্গে অল্পক্ষণের পরিচয়, তবুও তোমার উপর আমার বড়ই স্নেহ জন্মিয়াছে। বলিয়াছি ত, তোমার চেহারা অনেকটা আমার ছেলের মত; তোমাকে দেখিয়া, তাহার কথা আমার মনে হইতেছে!—তুমি আমার দুঃখের কথা শোন;—গ্রামের মধ্যে আমারই অবস্থা ভাল, তাহার উপর লছমনপ্রসাদ আমার একমাত্র সন্তান; সুতরাং তাহাকে ছেলেবেলা হইতে সকলেই বেশী আদর করিত। তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করি

নাই ; কিন্তু—বড়-মানুষের ছেলেদের যেমন হয়—সে পড়া-শুনায় মন দিত না ; সারাদিন খেলা করিয়া, আমোদ করিয়া, কাটাইত ! পনর বৎসর বয়সের সময়ই সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল। আমি কি করিব ? একমাত্র পুত্র, তাড়না করিতে পারি না। তখন তাহাকে বিষয়কর্ম্ম দেখিতে বলিলাম। সে তাহাতেও মন দিলনা ; তাহার কতকগুলি কুসঙ্গী জুটিল। দশজন আত্মীয় পরামর্শ দিলেন যে, বিবাহ দিলে ছেলেটা ভাল হইবে। সেই ভাল বিবেচনা করিয়া, অনেক অনুসন্ধানে বড়-মানুষের ঘরের সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনিলাম ; কিন্তু কিছুই হইল না ; লছমনপ্রসাদ ক্রমেই খারাপ হইয়া যাইতে লাগিল। মদখাওয়া আরম্ভ করিল, অন্যান্য কুক্রিয়াতেও আসক্ত হইল। একমাত্র ছেলে ; তাহার অসদ্ব্যবহারের কথা শুনিয়াও শুনিতাম না,—নানা জনের নানা কথায় কর্ণপাত করিতাম না। ক্রমেই সে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। তাহার অত্যাচারে গরিব-লোকের স্ত্রী কন্যা লইয়া গ্রামে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আঠার বৎসর বয়সের ছেলে যে এমন বদ্ হইয়া যাইতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না! শেষে একদিন শুনিলাম, আমার প্রতিবেশী এক গৃহস্থের বিধবা-কন্যাকে সে পাপপথে লইয়া গিয়াছে ! এতদিনও আমি সহিয়াছিলাম ; কিন্তু এ সংবাদ শুনিয়া আমি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া অনেক ভর্ৎসনা করিলাম, দুর্ব্বাক্যও বলিলাম। সেই রাত্রিতেই সে ঐ বিধবা-মেয়েটিকে কুলের বাহির করিয়া কোথায় চলিয়া গেল ;—আমি লজ্জায় ঘৃণায় গ্রামে মুখ দেখাইতে পারিলাম না ; তাহার কোন অনুসন্ধানও করিলাম না ! কিছুদিন পরে, আর একটি হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইলাম ; সে কথা মনে করিতেও ঘৃণা হয় ;—আমার ছেলে না কি চুরীর অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছে ! যে মেয়েটিকে সে কুলের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিছুদিন পরে তাহাকে পরিত্যাগ করে ;—মেয়েটি বাজারে আশ্রয় লইয়াছে। হতভাগা যদি তখনও বাড়ী ফিরিয়া আসে, তাহা হইলেও হয় ;—সে তাহা করিল না, কুসঙ্গে পড়িয়া অর্থাভাবে চুরী আরম্ভ করিয়া দিল। পুলিস তাহাকে যখন গ্রেপ্তার করে, তখন আমি সংবাদ পাই ; কিন্তু আমার তখন এমন রাগ হইয়াছিল যে, আমি তাহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিলাম না। আমি ভদ্রলোক ; দেশে আমার মানসম্ভ্রম আছে ; জেলার উপর দশজন আমাকে জানে, চেনে ;—আমার ছেলে কি না চুরী করিল ! আমি তাহার জন্য কিছুই করিলাম না। আমার পরিবার অনেক কাঁদাকাটি করিলেন ; কিন্তু আমি সে হতভাগাকে কোন প্রকার সাহায্য করিলাম না। সে যেকার্য্য করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত দণ্ড সে ভোগ করুক। তাহার পরেই শুনিলাম, তাহার তিন মাসের জেল হইয়াছে ! এ সংবাদ শুনিয়া মনটা বড়ই কাতর হইল।—হাজারও হউক সন্তান ত বটে ! তখন অনুশোচনা উপস্থিত হইল ; মনে হইল, চেষ্টা করিলে হয় ত তাহাকে বাঁচাইতে পারিতাম।—কিন্তু তাহা আর হইল কৈ ! তাহার পর ভাবিলাম, এই শাস্তির পর, তাহার স্বভাব হয়ত ভাল হইবে ; সে বাড়ীতে আসিয়া ঘরসংসার করিবে। তিনমাস পরে, যে দিন তাহার কারামুক্তি হইবার কথা, সেইদিন, আমার এক গোমস্তাকে পাঠাইয়া দিলাম। সে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে,—জেলের মধ্যে বেশ ভালভাবে থাকায়, সরকার বাহাদুর তাহাকে তিনদিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমার গোমস্তা সেখানে তাহার অনুসন্ধান করিল ; কিন্তু কোন খোঁজই পাইল না ! আমার পরিবার বলিলেন যে, মনের দুঃখে এবং লজ্জায় সে দেশত্যাগী হইয়াছে ;—আর সে বাড়ীতে আসিবে না ! কেনই বা তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম ;—এখন বধূমাতার মুখ দেখিলে, আমার বুক ফাটিয়া যায়! তাহার বাপ ভাই, কতবার তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল ; কিন্তু বধূমাতা যাইতে চাহেন নাই ! জিজ্ঞাসা করিলেই বলেন, 'তিনি যদি হঠাৎ আসেন, আর বাড়ীতে আমাকে না দেখেন, তাহা হইলে কি মনে করিবেন !' এমন মেয়ে হয় না। মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ! এমন মেয়ের অদৃষ্টেও ভগবান এত কষ্ট লিখিয়া ছিলেন ! আজ চারিবৎসর তাহার উদ্দেশ নাই ;—বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়া গিয়াছে, তাই বা কে বলিবে ? বৌ-মা আমায় কোনদিন কিছু বলেন না ; নীরবে চক্ষের জল ফেলেন ; শরীরের উপর যত্ন নাই, কোন সাধ-আহ্লাদ নাই। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে আমার বুক ফাটিয়া যায় ; কিন্তু তাঁহার এ বেদনা দূর করিবার ত কোন উপায়ই দেখি না। তাঁহাকে কত ব্রত-নিয়ম করিতে বলি ;—তিনি একই কথা বলেন, 'তিনি আসুন,—তখন সব করিব।'

"এমনই করিয়া চারিবৎসর গেল ; তাহার ত কোন খোঁজই পাই নাই। এবার এখানে কুম্ভমেলা।—আমি কখনও কোন তীর্থে যাই নাই ; আমার পরিবারও কখন তীর্থে যাইবার কথা আমাকে বলেন নাই।—সেদিন বধূমাতা আমার পরিবারকে বলিলেন যে, 'এবার গঙ্গাস্নানে গেলে ভাল হয়।' আমার পরিবার তাহাতে বলেন যে,—'এবার হরিদ্বারে যাওয়া বড়ই কষ্টকর হইবে ;—এবার সেখানে অনেক লোক হইবে, থাকিবার স্থান মিলিবেনা।' বধূমাতা তাহাতে বলেন, 'এবার সেখানে চলুন ; আমার মনের মধ্যে কে যেন বলিতেছে,—সেখানে গেলে তাঁহার দর্শন মিলিবে! আজ কয়দিন হইতেই আমার মনের মধ্যে ঐ কথা জাগিতেছে ; কে যেন যখন তখনই বলে, "মেলায় যা, সেখানে তোর স্বামী মিলিবে।"' আমার পরিবারের নিকট যখন এই কথা শুনিলাম, তখন আমি সকলকে লইয়া এখানে আসিবার সঙ্কল্প করিলাম। বধূমাতা কখনও কোন কথা বলেন না ; আজ চারিবৎসর কোন কিছুই বলেন নাই। এবার যখন তাঁহার এখানে আসিবার ইচ্ছা হইয়াছে,—আর তাঁহার মনে যখন কথাটা উঠিয়াছে যে, এখানে এলে লছমনপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে,—তখন যতটাকা লাগে, যত অসুবিধাই হউক,—আমাকে আসিতেই হইবে।—তাই, তাড়াতাড়ি যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিয়া, এখানে আসিয়াছি। এই মন্দিরের সেবাইৎ সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে আমার গরিবখানায় পদধূলি দিয়া থাকেন ; তাই এখানে তাঁহারই আশ্রয়ে আসিয়াছি।—বধূমাতার কথা সম্পূর্ণ না ফলুক, কিছু ফলিয়াছে ;—আমরা তোমাকে ত পাইয়াছি। তুমিই এখন আমাদের ছেলের মত ; তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। সংসারে ত তোমার কেহই নাই ; যে কয়দিন আমি বাঁচিয়া থাকি, তুমি আমার কাছে থাকিও ; তার পর যার অদৃষ্ট যা থাকে, তাই হইবে!"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল, আমি বলিলাম, "আপনি নিরাশ হইতেছেন কেন? তিনি অবশ্যই ফিরিয়া আসিবেন। সতী-রমণীর কথা বৃথা হয় না। এত কাল ত আপনার পুত্রবধূ কোন প্রকার খোঁজ-খবরের জন্যও অনুরোধ করেন নাই। এবার তিনি অনুরোধ করিলেন কেন? এতকাল পরে তিনি এখানে আসিতে চাইলেন কেন? তাঁহার মনের মধ্যে কে ডাকিয়া বলিয়াছে, 'এখানে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।' আমার বিশ্বাস, এবারই তার সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাৎ হবে!" বৃদ্ধ বলিলেন, "এমন অদৃষ্ট কি হবে? বিশেষ সে যতই অপরাধ করুক, তাকে আমার ক্ষমা করা উচিত ছিল ;—অন্ততঃ বৌমার দিকে চাহিয়াও তাহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা উচিত ছিল ; কিন্তু কি জান বাবা, সময়ে উচিত-অনুচিত জ্ঞান থাকে না! আমার তখন বড়ই রাগ হইয়াছিল ; তাহার ফল ভোগ করিতেছি!—আরও কতকাল ভুগিতে হইবে, ভগবানই জানেন!—যাক্, রাত্রি অনেক হয়েছে ; কা'ল আবার খুব-ভোরে উঠ্‌তে হবে।—তুমি বাবা আমাদের সঙ্গ ছেড়োনা।"

তাহার পর আমরা শয়ন করিলাম ; বিছানায় শুইয়াও অনেকক্ষণ নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। পূর্ব্বদিক্ আলো হইবার পূর্ব্বেই, যাত্রীরা মহাকলরব করিয়া, হরিদ্বারে স্নান করিবার জন্য বাহির হইল ; আমরাও তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম।—বৃদ্ধের পটমণ্ডপ রক্ষার জন্য একজন চৌকীদার থাকিল।

তাহার পর গঙ্গাস্নান! সে এক অভিনব দৃশ্য! তাহার তুলনা আর দিব না, সে কথা বলিবার জন্যও এ প্রস্তাব নহে। সরকার-বাহাদুর যেপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও স্নানের অসুবিধা হয় নাই। আমরা সকলে স্নানশেষ করিয়া উপরে উঠিলাম। বৃদ্ধ সেই বাগানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমি বলিলাম, "আপনারা যান, আমি একবার চারিদিক ঘুরিয়া আসি।" বৃদ্ধ বলিলেন, "এখন বাসায় চল, আহারাদির পর বেড়াইতে আসিও।" আমি বলিলাম, "না,—আপনারা যান। আমি, সারাদিন এই লোকারণ্যের মধ্যে বেড়াইয়া, সন্ধ্যার সময় আপনার ওখানে যাইব।" আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "বিলম্ব করিও না, সন্ধ্যার মধ্যেই যাইও। কালই আমরা চলিয়া যাইব,—মনে থাকে যেন।" আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি-প্রকাশ করিলাম।

তাঁহারা চলিয়া গেলেন ; আমি তখন সেই জনসমুদ্রে ডুবিয়া গেলাম। আমাকে যেন সেদিন ভূতে পাইয়া বসিল। সাধুসন্ন্যাসীদিগের সহিত দেখাশুনা করিব,—এ দিক ওদিকে বেড়াইব ;—কিন্তু আমার তাহা হইল না। আমার মাথার মধ্যে কেমন করিয়া এই কথাটা প্রবেশলাভ

করিল যে, 'লছমনপ্রসাদকে আজ, এই লোকারণ্যের মধ্য হইতে, খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।' স্নান করিতে আসিবার সময় লছমনপ্রসাদের স্ত্রীর সেই ব্যাকুল-দৃষ্টি,—সেই মৌন-কাতর প্রার্থনা,—সেই মলিন-মুখ আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি পথে চলিবার সময় অনেকবার তাঁহার দিকে তাকাইয়াছিলাম; যুবতী আমার দিকে একবার চাহিয়াছিলেন;—সে কাতরতাপূর্ণ-দৃষ্টি,—সে আকুল-প্রার্থনা আমার হৃদয়কে মোহাবিষ্ট করিয়াছিল।

আমি সেদিন যেন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলাম। সেই বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত—আমি একটুও বসি নাই, কিছুই আহার করি নাই, জলবিন্দু পর্য্যন্তও

"তার পর গঙ্গাস্নান।"

একবার তাঁহার দৃষ্টি আমার উপরও পড়িয়াছিল;—সেই দৃষ্টির মধ্যে কি ব্যাকুলতা, কি প্রাণের বেদনা! আমি যেন তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, 'লছমনপ্রসাদকে,—তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্বকে, তাঁহার হারাণো-রত্নকে—খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার, তিনি সেই এক কাতর-দৃষ্টিতেই আমার উপর সমর্পণ করিলেন।' আমি সেই সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, 'আজ সারাদিন, এই হরিদ্বারের জনসমুদ্র-মন্থন করিয়া, যুবতীর সেই রত্নের অনুসন্ধান করিব—এবার এই মেলায় ইহাই আমার একমাত্র-কর্ত্তব্য কার্য্য হইল।' আমারই মত তাহার চেহারা; সুতরাং যদি তাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে চিনিতে পারিব। বৃদ্ধ যখন সকলকে লইয়া চলিয়া যান, তখন গ্রহণ করি নাই, এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেও পারি নাই! হরিদ্বার, মায়াপুর, কনখল, গঙ্গার অপর পারের পাহাড়, পাহাড়ের উপর চণ্ডীর মন্দির আশ-পাশের গ্রাম-মাঠ,—আমি সে সমস্ত স্থানে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আর সকলের মুখের দিকে চাহিয়াছি! হায় অদৃষ্ট! সারাদিন খুঁজিয়াও সেই মুখখানি দেখিতে পাইলাম না,—কেহই আমাকে জিজ্ঞাসাও করিল না যে, আমি এই লোকারণ্যের মধ্যে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি! সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে আমি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; কাহারও সহিত কথাপর্য্যন্ত বলি নাই। সন্ধ্যার সময় আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তখন আমাকে কাতর করিল; যে পা দুইখানি হিমালয়ের কত

চড়াই-উৎরাই আমাকে অনায়াসে পার করিয়া দিয়াছে, তাহারা আজ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আমি তখন মায়াপুরের নিকট, একটা বাগানের মধ্যে, এক বৃক্ষতলে, একেবারে শুইয়া পড়িলাম। সেই বৃক্ষতলে অনেকগুলি সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়াছিলেন; আমি একবার তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলাম,—কিন্তু লছমনপ্রসাদের মত কাহাকেও সেখানে দেখিলাম না। বৃদ্ধের বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া যাইবার তখন শক্তিও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। ফিরিয়া গেলে লছমন প্রসাদের স্ত্রী যখন সতৃষ্ণনয়নে আমার দিকে চাহিবেন, তখন, তাঁহার প্রাণে আশার সঞ্চার করিবার জন্য, আমি কি বলিব? আমাকে ত বলিতে হইবে যে, তাঁহার স্বামীকে খুঁজিয়া পাইলাম না! তখন সেই দেবীরূপিণী সতী যে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবেন, তাহা আমার সহ্য হইবে না। কোথাকার কে আমি,—কেমন করিয়া একরাত্রিতে সহসা সেই হিন্দুস্থানী পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হইয়া পড়িলাম!—এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে সেই বৃক্ষমূলে, সেই ধরাসনে, নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না; হঠাৎ কাহার করস্পর্শে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল,—আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম; তখন পূর্ব্বাকাশ লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আমি চাহিয়া দেখি,—আমার সম্মুখে দীর্ঘজটাজূটধারী অপূর্ব্ব-জ্যোতিঃবিমণ্ডিত গৈরিক-বসনপরিহিত কমণ্ডলুহস্ত এক বৃদ্ধসন্ন্যাসী দণ্ডায়মান! তাঁহার দক্ষিণ-হস্তে কমণ্ডলু, বামহস্তে একটি যুবক সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া আছেন।—সন্ন্যাসীর দিকে চাহিবা-মাত্রই তিনি আমাকে বলিলেন, 'বাবা! তুমি যাকে কা'ল সারাদিন খুঁজিয়া বেড়াইয়াছ, তাহাকে আমি লইয়া আসিয়াছি।'—"**এই লে বেটা তেরা লছমন্ প্রসাদ।**"

কথাগুলি আমার কাণে গেল; সম্মুখে যে দুইটি মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাও দেখিতেছি!—কিন্তু ব্যাপার কি সত্য?—আমি ত স্বপ্ন দেখিতেছি না?—মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আমি চক্ষুর্মুদ্রিত করিলাম!—পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি, সেই বৃদ্ধ-সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন; আর সেই যুবক-সন্ন্যাসী আমার সম্মুখে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি তখন এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং সেই যুবক সন্ন্যাসীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "লছমনপ্রসাদ!—স্বামীজি কাঁহা গিয়া?" সন্ন্যাসী অবাক্! সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না—আমার দিকে চাহিয়া রহিল! আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "স্বামীজি কাঁহা গিয়া ভাই?" যুবক-সন্ন্যাসী বলিল "কোন্ স্বামীজিকা বাৎ বোল্‌তে হাঁয়? কোই স্বামীজি তো হিঁয়া নেহি আয়েঁ!" আমি তখন বলিলাম, "এই যে এখনই তোমার হাত ধরিয়া এক স্বামীজি—এক মহাপুরুষ—দাঁড়াইয়া ছিলেন; আমাকে ডাকিয়া তুলিলেন, তোমার পরিচয় আমাকে দিলেন। তুমি ব'ল্‌ছো কেহই তোমার সঙ্গে ছিলেন না!—তোমারই নাম ত লছমন প্রসাদ?" লছমনপ্রসাদ বলিল, "হাঁ—আমারই নাম লছমন প্রসাদ। আমি সারারাত্রি লোকের গোল্‌মালে ঘুমাইতে পারি নাই; আমিও এই বাগানের মধ্যেই একটা গাছতলায় শুইয়াছিলাম। ঘুম হইল না দেখিয়া, বাগানের মধ্যে বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম; বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া দেখি, আপনি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। স্থান্‌টা কতক্‌টা নির্জ্জন দেখিয়া আমি একটু দাঁড়াইয়াছিলাম।—আমাকে ত কেহ এখানে ডাকিয়া আনেন নাই,—কোন সন্ন্যাসী ত এখানে ছিলেন না।—সে কথা যাক্, ও সব আপনার খেয়াল!—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমার নাম জানিলেন কেমন করিয়া?—আমাকে চিনিলেন কেমন করিয়া?" আমি বলিলাম, "তুমি এইখানে বোসো। আমাকে একটু প্রকৃতিস্থ হইতে দাও; তোমাকে সব বলিতেছি।" লছমনপ্রসাদ আমার পার্শ্বে বসিল। আমি নিজকে অনেকটা সংযত করিয়া লইলাম; তাহার পর সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত তাহাকে বলিলাম। লছমন প্রসাদ আমার কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল! এমন কথা সে কখনও শোনে নাই! সে বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন শুভ পয়লা বৈশাখের সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকের চণ্ডীর পাহাড়ের ওপার হইতে মাথা তুলিতেছিলেন। আমি লছমনপ্রসাদের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভাই! সমস্ত কথা ত শুনিলে; এখন বাড়ী চল।—দেখিতে পাইতেছ, ইহা মহাপুরুষের আদেশ। তিনি আমাকে স্পষ্ট বলিয়াছেন 'এই লে বেটা তেরা লছমন্ প্রসাদ।' তিনিই তোমার হাতধরিয়া আমার কাছে

পৌঁছাইয়া দিয়াছেন; নতুবা কাল সারাদিন খুঁজিয়া ত তোমাকে পাই নাই! তোমাকে ঘরে যাইতে হইবে; তাই, মহাপুরুষ তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন। আর, তোমার স্ত্রী—সেই দেবীরূপিণী সতী—যে তোমার পথ চাহিয়া আছেন; চল ভাই,—আমার সঙ্গে চল।" লছমনপ্রসাদ একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে চলুন।"—সে আর কোন কথা বলিল না। আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সে মহাপুরুষের আর সাক্ষাৎ পাইলাম না! শুভ পয়লা বৈশাখে সেই একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম।—আমার পুণ্যবলে দেখি নাই,—আমার সুকৃতির বলে আমি সেই দেববাণী শুনি নাই; যে সতী রমণীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আমি হরিদ্বারের সেই জনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, তাঁহারই সতীমহিমায়—তাঁহারই কৃপায়—আমি সেই পয়লা বৈশাখের অরুণোদয়কালে মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলাম। এ সকল তাঁহারই লীলা, তাঁহারই খেলা!—আমি তখন সেই বৃক্ষমূলে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম; ঠিক সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষতল হইতে একজন সন্ন্যাসী গায়িয়া উঠিল,—

"সেবা, বন্দন্, আউর্ অধীনতা, সহজে মিলায়ে গোঁসাই।"

তাহারপর?—তাহারপর আর কি!—তাহারপর সোজা কথা;—লছমনপ্রসাদকে তাহার বৃদ্ধ পিতামাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিলাম। বাগানের মধ্যে আমরা যখন প্রবেশ করিলাম, তখন বেলা হইয়াগিয়াছে। আমি লছমন প্রসাদের হাতধরিয়া, একেবারে বৃদ্ধের পটমণ্ডপের দ্বারে উপস্থিত হইলাম; উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "মায়ি! এই লেও তেরা লছমনপ্রসাদ।" আমার কথা শুনিয়াই বৃদ্ধ ও তাঁহার স্ত্রী দৌড়িয়া বাহির হইয়া আসিলেন;—মাতা ত একেবারে পুত্রকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। বস্ত্রাবাসের দ্বারের পার্শ্বে সেই দেবীমূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি সেইদিকে চাহিলাম; তাঁহার দৃষ্টিতে তখন যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা এজীবনে আর কখনও দেখিনাই, আর কখনও বুঝি দেখিব না! তাহা অবর্ণনীয়,—তাহা স্বর্গীয়! মানুষের নয়নে এমন শান্ত পবিত্র কোমল জ্যোতিঃ কখনও দেখি নাই!—শুভ পয়লা বৈশাখে আমার সেই আর একটি লাভ!—সেই মহাপুরুষের দর্শনলাভই অধিক মূল্যবান?—অথবা, এই সতী-রমণীর হাস্যোৎফুল্ল পবিত্র বদন ও জ্যোতির্ম্ময় নেত্রদ্বয়নিঃসৃত আশীর্ব্বাদলাভই সমধিক মূল্যবান?—তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না!

শ্রীজলধর সেন।

মুক্ত-দ্বার

তোমারি তো গৃহ এযে, আপনার করে
দ্বার খুলে রেখে গেছ, তাই তো এ আমি
নারি বন্ধ করিবারে। সবে মোর ঘরে
পশিয়াছে, মুক্ত পেয়ে। হে জীবনস্বামি!
বসে' আছি সেই আশে তোমার লাগিয়া,
দেবে এবে বন্ধ করি আপনি আসিয়া।
যত দিনে ফিরে তুমি না আসিবে, নাথ!
ততদিন সকলেরি হবে যাতায়াত!

শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন।

প্রভেদ

পুরুষেরা—সুগন্ধ কুসুম
নারী—তার মধু, রেণু, সার।
নর—শুধু, সঙ্গীত মহান্,
রমণী—সে সুর-লয় তা'র।
নর—দেহ সুঠাম সুন্দর,
নারী—তার আত্মা-বধু—প্রাণ।
বিশ্বমাঝে মধুচক্র—নর,
নারী—মধু—দেবতার দান!

শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

মঙ্গলকোট সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

বর্দ্ধমান জেলার অধীন মঙ্গলকোট গ্রাম অতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সম্পৎ-সম্ভারে পরিপূরিত। কএকখানি প্রাচীন ফারসী পুস্তকে মঙ্গলকোটের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। কবিকঙ্কণের লিখিত 'চণ্ডী'তেও মঙ্গলকোট সসম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে।—তাহা না হইবে কেন? 'চণ্ডী'-বর্ণিত শ্রীমন্ত সওদাগর ও খুল্লনাদির লীলাক্ষেত্র উজানী যে মঙ্গলকোটের উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থান। প্রাচীন বৈষ্ণব কবি লোচনদাসেরও জন্মভূমি ঐ উজানী। উজানী, এক্ষণে কোগ্রাম আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। বাঙ্গলার কৃতবিদ্য সুসন্তানগণ মঙ্গলকোটের প্রাচীনত্বের দিকে মনোযোগী হইলে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদান লাভ করিবেন। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের দৃষ্টিতে পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পাটনা ও রাজমহল প্রভৃতি প্রাচীন-নগরাবলীর যেরূপ মূল্য, মঙ্গলকোটের প্রাচীন-কীর্ত্তিগুলিও সেইরূপ মূল্য পাইবার অধিকারী। মঙ্গলকোটে যে সকল পুরাতত্ত্বের নিদর্শন এবং প্রাচীন-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে, সেগুলির সংখ্যা অল্প নয়, বরং অনেক অধিক। ঐ সকল নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ লইয়া মস্তিষ্ক-আলোড়ন করিলে, ঐতিহাসিকগণ নিশ্চয়ই পুঞ্জ পুঞ্জ মূল্যবান্ সামগ্রী লাভ করিবেন; তাঁহাদের শ্রম সুফলপ্রসূ হইবে, এবং সেই সঙ্গে বঙ্গের ইতিহাসে এক মূল্যবান্ ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দদায়ক উপাদান সংগৃহীত হইবে—তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। মঙ্গলকোট সম্বন্ধে আমার যে সকল বিষয় জানা আছে, তাহাদের মধ্যে যে সকল কথা খাঁটি সত্য ও একেবারে নির্ভুল বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই সকল কথাই এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, মঙ্গলকোট প্রাচীন-স্থান। বহুকাল পূর্ব্বে এই গ্রাম বিক্রমকেশরী নামক কোন প্রবলপ্রতাপশালী নৃপতির রাজধানী ছিল; মঙ্গলকোটের কোন কোন স্থানের দৃশ্য দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পোদ্দারপাড়ার পূর্ব্বদিকস্থ বিস্তৃত ও উন্নত ভূখণ্ড, ঐ রাজার অন্দরমহলরূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মঙ্গলকোটবাসীদিগের বিশ্বাস। স্থানটি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ঐ বিশ্বাস অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। এখনও, বৃষ্টির পর অনেক লোক ঐ স্থানে গিয়া মোহর, স্বর্ণখণ্ড, ও প্রাচীন-রৌপ্যমুদ্রা কুড়াইয়া পায়—এরূপ শুনা গিয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, রাজার অন্দরমহল ও ধনাগার এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। তাহা ছাড়া, মঙ্গলকোটের অন্যান্য কএক স্থানকে স্থানীয় লোকে রাজার 'হাতীশাল', 'ঘোড়াশাল', ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত করিয়া থাকে; ঐ সকল স্থানের বাহ্য দৃশ্যও ঐ সকল অভিধানের অনুকূল। এই গ্রামের কএকটি ক্ষুদ্রাকৃতি পুষ্করিণীর বিষয়েও স্থানীয় লোকে নানারূপ বর্ণনা করিয়া থাকে; কোনটিকে রাজার তৈলকুণ্ড, কোনটিকে ঘৃতকুণ্ড, আবার কোনটিকে দুগ্ধকুণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। শুনিতে পাই, রাজার অন্দরমহলের মধ্যে জীবকুণ্ড নামক আর একটি কুণ্ড ছিল—তাহাতে মৃত-জীবকে ডুবাইলে সে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিত! যখন প্রবল-প্রভঞ্জনের ন্যায় চিরবিজয়ী মোসলেম সৈন্য মঙ্গলকোট অধিকারের জন্য আগমন করে, তখন প্রথম কএক দিনের যুদ্ধে মোসলেম শক্তি জয়লাভ করিতে পারেন নাই; কারণ, মোসলেম দলের যে সকল সৈন্য যুদ্ধে বিনষ্ট হইত, পুনঃ তাহাদিগকে পাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, এবং আহত সৈন্যগণও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইত; অন্যদিকে রাজার নিহত ও আহত সৈন্যদিগের সকলেই প্রোক্ত জীবকুণ্ডের প্রসাদে বিনষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইতে পাইত না। জীবকুণ্ডের জল পাইলেই নিহত সৈন্যগণ নবজীবন ও নববল লাভ করিত, এবং আহত সৈন্যগণ সম্পূর্ণ সুস্থকায় ও সবলদেহ হইয়া উঠিত। এই জন্য, রাজার সহিত মোসলেম শক্তি কিছুতেই আঁটিতে না পারিয়া, বড়ই বিব্রত ও চিন্তিত হইলেন। কএকদিন পরেই, তাঁহারা কোন গুপ্তচরের নিকট পরাজয়ের কারণ আবিষ্কার করিয়া, যে কোন উপায়ে ঐ কুণ্ডে গোমাংস-খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া কুণ্ডের সঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট করিলেন; এবং তৎপর দিবস, মহা উল্লাস ও উদ্যমের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া, মঙ্গলকোট অধিকার করিলেন। এই সকল কিংবদন্তীর মূলে কতটুকু সত্য আছে,—তাহা আবিষ্কার করা প্রবীণ পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের কার্য্য; আমাদের নহে। মঙ্গলকোটের হিন্দু রাজত্ব কালের ইতিহাস বড়ই অন্ধকারে পড়িয়া আছে। তবে, একথা নিশ্চয় যে, মঙ্গলকোটস্থিত প্রাচীন

কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ও পুরাবৃত্তসংক্রান্ত জীর্ণ নিদর্শনগুলির সাহায্যে, পুরাবৃত্তবিদ্ গবেষকগণ অল্পায়াসেই সেই অতি প্রাচীনকালের কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির করিতে পারিবেন। আমরা, কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া, এইটুকু বলিতে পারি যে,—রাজা বিক্রমকেশরী পরাক্রান্ত, সুশাসক, প্রজাবৎসল ও পুণ্যবান্ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার পুণ্যবলে একদিন একরাত্রি মঙ্গলকোটে স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছিল। মঙ্গলকোট-অঞ্চলের অনেকের বিশ্বাস যে, ভারতের ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত নবরত্ন সভাধিষ্ঠিত মহারাজ বিক্রমাদিত্যই মঙ্গলকোটে রাজত্ব করিতেন। নবরত্ন-পরিবেষ্টিত বিক্রমাদিত্যকে আনিতে হইলেই উজ্জয়িনীর আবশ্যক; সুতরাং এই বিশ্বাস পোষণকারী ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোল্লেখিত উজানীকে উজ্জয়িনী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আবার বীরভূম জেলার অধীন, বোলপুর চৌকীর অন্তর্গত, শিঙ্গান ও শ্রীরামপুর নামক গ্রামদ্বয়ের দুইটি বৃক্ষতলকে উল্লিখিত বিক্রমাদিত্যের তালবেতাল-

মৌলানা হামেদ্ দানেশমন্দের সমাধি

সিদ্ধির স্থান বলিয়া ঘোষণা করিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। এই বিশ্বাস সমীচীন ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু, তাই বলিয়া, এই সকল বিশ্বাস যে একেবারেই ভিত্তিশূন্য ও উপহাসযোগ্য, তাহাও বলিতে সাহস হয় না। বঙ্গের ঐতিহাসিক-সমিতির স্কন্ধে এই তথ্যানুসন্ধান-ভার ন্যস্ত করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

যাহা হউক, মোসলেমবিজয়ের পর হইতেই, মঙ্গলকোট হইতে চিরদিনের জন্য হিন্দু-প্রাধান্য লুপ্ত হইয়াছে। তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিদ্যা, বুদ্ধি, আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য প্রতাপ, প্রতিপত্তি, সম্ভ্রম, সদাচার ও জনসংখ্যা—সকল বিষয়েই মোসলেমগণই এখানে নিরবচ্ছিন্ন আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। মঙ্গলকোটের মোথাদেমগণ বঙ্গদেশে সকল বিষয়েই বরেণ্য ও সুপরিচিত। এখানে বহুসংখ্যক মোসলেম-সাধুপুরুষের সমাধি আছে; তন্মধ্যে মঙ্গলকোটের বাজার নামক স্থানের সুপ্রসিদ্ধ সমাধি মন্দিরটি পরলোকগত মৌলানা মখদুম হামেদ দানেশের মন্দির। মখদুম হামেদ দানেশমন্দ, হিজরীর দ্বিতীয় সহস্রের, সমগ্র মোসলেম-জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আউলিয়া, ও এমাম-তরিকাজনাব হজরৎ সেখ আহমদ সর্হিন্দী মরহুম মগফুরের প্রিয়শিষ্য ছিলেন। এই মখদুমের নিকট তৈমুরবংশাবতংস দিল্লীশ্বর সম্রাট্ সাহাবদ্দিন মহম্মদ শাহজাহান দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুপবিত্র সমাধিমন্দিরের নানাস্থানে স্থাপিত আরবী অক্ষর-ক্ষোদিত প্রস্তরফলকগুলি পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, ধর্ম্মপ্রাণ সম্রাট্ শাহজাহান স্বীয় ধর্ম্মগুরুর শুভাশীর্ব্বাদ লাভেচ্ছায় মণিময় ময়ূর-সিংহাসন ও ভূস্বর্গ দিল্লী ত্যাগ করিয়া একবার মঙ্গলকোটে শুভাগমন করিয়াছিলেন; এবং ধর্ম্মগুরুর অতিথিশালা ও মাদ্রাসার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রভৃত জায়গীর দিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল জায়গীর বহুকাল পর্য্যন্ত মখদুমের স্থলাভিষিক্তগণের ভোগ-দখলেই ছিল। এক্ষণে, বৃটিশ আইনের আবর্ত্তে পতিত হইয়া, ঐ সমুদয় সম্পত্তি মুড়াগাছির বাবুদিগের অধিকারে আসিয়াছে। সম্রাট্ শাহজাহান মঙ্গলকোটে আসিবার সময় মঙ্গলকোটের দুই ক্রোশ পশ্চিমে জাহানাবাদ নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন; এবং, আধ্যাত্মিক ধনে ধনবান্ গুরুর নিকট পার্থিব আড়ম্বরের সহিত গমনকরা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বুঝিয়া, জাহানাবাদ হইতে

দীনহীনভাবে পদব্রজে মঙ্গলকোটে আগমন করেন। বলা বাহুল্য যে, জাহানাবাদে তখন কোন লোকজন বাস করিত না, এবং তখন উহার জাহানাবাদ আখ্যাও ছিল না; তখন উহা নদীতীরস্থ নিবিড় জঙ্গলময় স্থানমাত্র ছিল। সম্রাটের শিবির-সংস্থাপনের পর হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীদিগের যত্নে ঐস্থানে গ্রাম বসিয়াছে ও জাহানাবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এই গ্রাম নীল-ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্র-স্থান ছিল; নীলকর সাহেবদিগের কুঠী ও কারখানা প্রভৃতি এখনও এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে; অবশ্য তাহাদের আর সে পূর্ব্বাবস্থা নাই।

সে যাহা হউক, মখদুম সাহেবের পবিত্র-সমাধিমন্দির এক্ষণে, নিতান্ত জীর্ণ ও ভগ্ন অবস্থা লইয়া, অতীতের সাক্ষীস্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে। যে বাটীতে সমাধি-মন্দির বিদ্যমান, সেই বাটীটি খুব প্রকাণ্ড ও চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত; বাটীটি ৭।৮ বিঘার কম হইবে না। এই বাটীর মধ্যে পুস্তকাগার, মাদ্রাসা, অধ্যাপকদিগের আবাসভবন, অতিথিশালা নহবৎখানা, অন্দরমহল ও মস্‌জিদ্‌—এই সমস্ত পুণ্যকীর্ত্তি বিরাজিত ছিল; অধুনা ঐ সমুদায় পুণ্যকীর্ত্তির চিহ্নগুলি মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে ঐ প্রকাণ্ড বাটীতে দিবাভাগে প্রবেশ করিতেই ভয় হয়। চারিদিকেই প্রাচীর; বাটীর মধ্যে যেখানে সেখানে দালানগুলির পর্ব্বতাকৃতি অর্দ্ধভগ্ন বা সম্পূর্ণ প্রাচীর; ঐ সকল প্রাচীরের গাত্রে উৎপাদিত বৃক্ষ; বাটীর যেখানে সেখানে ইষ্টকস্তূপ, কোথাও বা নিবিড় জঙ্গল; এ সকল দৃশ্য দর্শকদিগের হৃদয়ে যুগপৎ শোক ও বিস্ময় উৎপাদন করে। মঙ্গলকোটের বর্ত্তমান মোথাদেমগণ ও কাশিয়াড়াবাসী সুবিখ্যাত নবাব আব্দুল জব্বর খান্ বাহাদুর, সি-আই-ই, মহোদয় অনেক অর্থব্যয় করিয়া সমাধিবাটীর মস্‌জিদ্‌টিকে যেনতেন-প্রকারেণ আজান-নমাজের উপযুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এই সমাধিবাটির নৈর্ঋত কোণে পীরপুকুর নামক একটি জলাশয় আছে; তাহার জলে অবগাহন করিলে ক্ষিপ্ত শৃগালকুক্কুরদষ্ট ব্যক্তিগণ নিরাময় হইয়া থাকে এবং এখনও হইতেছে। ইহা কথার কথা নয়, লক্ষ লক্ষ লোকের জানা-শুনা সুপরিচিত বিষয়। আমরাও এরূপ ২০।২৫টি পরিচয় পাইয়াছি। আবার, এই সমাধি বাটীর ঈশান কোণে একটি নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী আছে; তাহার উপর হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত পাকা ও চতুর্দ্দিকেই সোপানাবলী দ্বারা সুশোভিত। এই পুষ্করিণীর তলদেশে কি আছে দেখিবার জন্য, সম্প্রতি গ্রামের লোক মিলিয়া কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে, ইহার জল 'ডুনী' দ্বারা মারিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা সেই সময় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছি, চতুর্দ্দিকের সোপানশ্রেণী উপর হইতে নিম্নদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়া হঠাৎ শেষ হইয়াছে। যেখানে সোপানগুলি শেষ হইয়াছে, সেইখান হইতেই চারিদিকের ইঁটের গাঁথনী ঠিক্ খাড়াভাবে নিম্নমুখী হইয়া তলদেশে স্পর্শ করিয়াছে; এই খাড়াভাবের গাঁথনীর উচ্চতা ৪।৫ হাত। আবার এই খাড়াগাঁথনীর গায়ে, মাঝে মাঝে চারিদিকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকোটের কএকজন লোকের মুখে শুনিলাম যে, ঐ সকল প্রকোষ্ঠ মখদুম সাহেবের ও তাঁহার নিকট দীক্ষিত শিষ্যগণের গুপ্ত ভজনাগার। তাঁহারা, মধ্যে মধ্যে ৪০ দিনের জন্য পার্থিব জনকোলাহল ও সাংসারিক চিন্তা হইতে অবসর লইয়া, উপযুক্ত খাদ্যাদিসহ ঐ সকল প্রকোষ্ঠে সুস্থিরচিত্তে জগদীশ্বরের আরাধনায় লিপ্ত থাকিতেন; তখন পুষ্করিণীতে জল জমিতে পাইত না, পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকের সুড়ঙ্গ দিয়া গ্রামের বাহিরে গিয়া পড়িত,—অদ্যাপি সুড়ঙ্গের চিহ্নও রহিয়াছে। মঙ্গলকোটবাসীদিগের এই কথায় যোল-আনা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। তবে, পুষ্করিণীটী যে বিপুল-রহস্যপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ করিতে পারি না।—শুধু এই পুষ্করিণীটি কেন?—সমগ্র মঙ্গলকোটই অনন্ত-রহস্যময় স্থান! ঐ সমুদয় প্রকোষ্ঠে আমরা ২১৪টি মাজকাঠ দেখিলাম, যাহা বহুকাল জলমধ্যে পড়িয়া থাকায় নিতান্ত লঘু হইয়া গিয়াছে। একটা মাজকাঠের অর্দ্ধাংশ লইয়া আমি অনায়াসে একস্থান হইতে স্থানান্তরে ছুড়িয়া ফেলিলাম; স্থানীয় লোকে তামাক খাইবার জন্য কয়লা করিবে বলিয়া ভগ্নাংশগুলি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল। (এইরূপেই আমরা প্রাচীনের সম্ভ্রম রক্ষা করি!)

এই সমাধিক্ষেত্রে কেবল যে মখদুম সাহেবই সমাহিত আছেন—তাহা নয়; তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি বংশধরগণ, শিষ্য-প্রশিষ্যাদি স্থলাভিষিক্তগণ, এই মহাশ্মশানে সমাহিত হইয়া আছেন। মঙ্গলকোটে সমাধিমন্দির, বা সমাধিক্ষেত্রের সংখ্যা, একটি নয়—অনেকগুলি। তন্মধ্যে

মৃত শচীনন্দনরাজের ভদ্রাসন বাটীর পশ্চিমদিকস্থ মেদিনীপুরের কাদরিয়া খান্দানের সাধুপুরুষদিগের সমাধি স্থানটীই এক্ষণে বেশ সুসংস্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এখানেও মস্‌জিদ্‌, খানকাহ, অতিথিশালা প্রভৃতি সৎকীর্ত্তি বিদ্যমান আছে; এখানকার সকল কীর্ত্তিগুলিই মেদিনীপুরের বর্ত্তমান হজরৎ সাহেবদিগের যত্নে সংস্কৃত হইয়াছে। তবে গ্রামের অন্যান্য সমাধিক্ষেত্র, মসজিদ বা অন্যান্য মহনীয় কীর্ত্তির অবস্থা অতি শোচনীয়। মঙ্গলকোটের আধ মাইল উত্তরে বড়বাজারের নিকটে পাঠানবংশীয় ভারত সম্রাট্‌-

বড়বাজার—নূতন-হাটের মস্‌জিদ্‌

দিগের আমলের যে প্রকাণ্ড মসজিদ আছে, তাহার ভিতর ও বাহিরের দিকের প্রাচীরে সুন্দর লতাপাতা ও ফলফুলাদি কারুকার্য্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ভিত্তি হইতে উপর পর্য্যন্ত সমস্তই কারুকার্য্যমণ্ডিত ইষ্টক ও প্রস্তরদ্বারা মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকার নিম্ন হইতে ৫।৬ হাত প্রাচীর বড় চতুর্ভুজাকৃতি প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত; তৎপরে ৫।৭ খানি ইটের গাঁথনী; তৎপরে আবার সেইরূপ প্রস্তর দিয়া গাঁথনি;—এইরূপ ভাবে সমস্ত মস্‌জিদ্‌টি বিনির্ম্মিত হইয়াছে। মস্‌জিদ্‌টির মেঝ্যাও এইরূপ প্রস্তরদ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মস্‌জিদ্‌টির ছাদ গুম্বুজশোভিত। ইহার পশ্চিমদিকের প্রাচীরে আরবী অক্ষর-ক্ষোদিত অনেকগুলি বড় বড় কৃষ্ণবর্ণের চতুষ্কোণ প্রস্তর সন্নিবেশিত আছে। তদ্ভিন্ন ঐরূপ আরও কতকগুলি প্রস্তর মস্‌জিদের মেঝ্যাতে ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। সেগুলি পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু আরবী ভাষায় আমার তাদৃশ ব্যুৎপত্তি নাই বলিয়া, সকল প্রস্তরের পাঠকার্য্য সমাধা করিতে পারি নাই; এবং যাহা পাঠ করিয়াছিলাম তাহারও সমুদয় মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হই নাই। এই বিরাট্‌ মসজিদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিলে অশ্রুসংবরণ করিতে পারা যায় না। প্রাচীন ভারতের ভাস্করদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রোজ্জ্বল প্রমাণস্বরূপ এই সকল মস্‌জিদ্‌ ও সমাধিমন্দির কি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না? মধ্যে একবার শুনিয়াছিলাম, গবর্ণমেন্টের পুরাতত্ত্ব-বিভাগ হইতে কএকজন প্রবীণ গবেষক মঙ্গলকোটে আসিয়া ঐ সকল স্থানের ফটো লইয়া গিয়াছেন * এবং আরবী অক্ষরে মুদ্রিত কএকটি প্রস্তর পাঠ করিয়া মঙ্গলকোটের প্রাচীন-ইতিহাস রচিত হইবে বলিয়া স্থানীয় লোকদিগকে আশা দিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা এখানকার পুরাকীর্ত্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া চমৎকৃত না হইয়াও থাকিতে পারেন নাই; কিন্তু কৈ আজ পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে আর কিছুই ত শুনিতে পাইলাম না!—কারণ কি? মঙ্গলকোটের অতিবৃদ্ধ পৌরাণিক নিদর্শনগুলি ত প্রত্নতত্ত্বামোদীদিগকে নিরুৎসাহ বা বিফল মনোরথ করিবার জিনিস নয়। তবে এরূপ হয় কেন? গভর্ণমেণ্টের কার্য্য বড়ই মৃদুভাবাপন্ন,—বোধ হয়, সেই জন্যই এরূপ হইয়াছে!

মঙ্গলকোটের সাধারণ অবস্থা লইয়া এইবার আলোচনা করা যাউক। গ্রামটি পূর্ব্বে অতি বৃহৎ ছিল। ইহার পরিসর ও আকৃতি এখনও এত প্রকাণ্ড

* গবর্ণমেণ্ট 'আর্কিয়লজিক্যাল্‌' সর্ভে বিভাগের যশামধন্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ-কর্ত্তৃক গৃহীত সেই 'ফটো' গুলির প্রতিলিপি হইতে আমাদের এই প্রবন্ধান্তর্গত চিত্রগুলি প্রস্তুত হইল।

যে, গ্রাম না বলিয়া ইহাকে ক্ষুদ্রনগর বলাই যুক্তিসঙ্গত। দেউলিয়া জহরপুর, কামালপুর, মলিকপুর, মনোহরপুর, সৈয়দহাটী বা সিধাটী, আড়াল, কোগ্রাম বা উজানী, বড়বাজার, সদিমপুর, ও বক্‌সিনগর, এই সকল পল্লীগ্রাম মঙ্গলকোটের এত নিকটে অবস্থিত যে, ইহাদিগকে মঙ্গলকোটের একএকটি অংশ বলাই কর্ত্তব্য; বাস্তবিক পক্ষে বটেও তাহাই। মঙ্গলকোটের মত চিরগৌরব-শালী জনপদের অংশ হইলও ইহাদের অগৌরব কিছুই

মঙ্গলচণ্ডী-মন্দির ও মন্দিরমধ্যে প্রাপ্ত বুদ্ধদেব-মূর্ত্তি

নাই। এই সকল উপকণ্ঠবর্ত্তী গ্রামগুলির মধ্যে কোগ্রামটিই পাশ্চাত্যবিদ্যায় সমুন্নত। অজয়-তীরবর্ত্তী এই ক্ষুদ্রপল্লীতে কএকজন ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি বাস করেন; এখানকার অধিবাসিগণ সকলেই হিন্দু; কুনুর নামক একটি ক্ষুদ্র নদী কোগ্রামের পূর্ব্বে অজয় নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই কোগ্রামের দেবী মঙ্গলচণ্ডী ও ভৈরব কপিলাম্বর এই দুই দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন। হিন্দুশাস্ত্রমতে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র দ্বারা সতীর মৃতদেহ ৫২ (?) খণ্ডে খণ্ডিত হইলে দেবীর কণুই এই কোগ্রামে পতিত হয়; এখানে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে একটি মেলা বসিয়া থাকে। নূতনহাট মঙ্গলকোটের অতি নিকটে—মাত্র ১ মাইল উত্তরে অজয় নদের তীরে অবস্থিত; নূতনহাট বৰ্দ্ধিষ্ণু বন্দর। এতদঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য নূতনহাটেই সম্পাদিত হয়; নূতনহাটে সাব্ রেজিষ্টারী ও পোষ্ট আফিস স্থাপিত আছে, এবং এখান হইতে বৰ্দ্ধমান, কাটোয়া ও গুস্‌করা যাইবার জন্য ভাল ভাল পাকা রাস্তা আছে। শুনিতেছি, কাটোয়া হইতে একটি শাখা রেলপথ বহির্গত হইয়া নূতনহাটের নিকট দিয়া গুস্‌করা বা ভেদিয়া পর্য্যন্ত গমন করিবে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মঙ্গলকোট অঞ্চলের অনেক পরিবর্ত্তন হইবে;—তখন এখানকার উন্নতি হওয়াও বিচিত্র নহে।

মঙ্গলকোট জনপদের পূর্ব্বের দশা অতিশয় উন্নত ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে ইহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। পূর্ব্বের তুলনায় এক্ষণে এখানে এক-চতুর্থাংশ বসতি আছে কিনা সন্দেহ। গ্রামের মধ্যে বহুস্থান পতিত ও জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে নানাবিধ বৃক্ষলতা জন্মিয়া মনুষ্যবাসের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। গ্রামের মধ্যে বড় বড় খালের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল খালে দাঁড়াইয়া নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিলে নানাবিধ স্তর, প্রাসাদাদির ভগ্নচিহ্ন, কূপ ও পোতের ভগ্নাবশেষ এবং জরাজীর্ণ সোপানাবলীর ভগ্নাংশ দেখিলে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইতে হয়; সেই সকল খাল দিয়া রাত্রিতে যাইতে বড়ই শঙ্কা বোধ হইয়া থাকে। সুখের বিষয় খালে জল জমিতে পায় না; কারণ খাল হইতে জল বহিয়া গিয়া গ্রামের বাহিরে নদী ও মাঠে পতিত হয়, এই সকল খালের তলদেশ অপেক্ষা মাঠ নিম্ন;—পাঠক ইহাতেই বুঝিয়া লউন, মঙ্গলকোট কিরূপ উচ্চস্থান ছিল। গ্রামের মৃত্তিকা ইট-ভাঙ্গা, 'খোলামকুচি' ও কাঁকরে পরিপূর্ণ এবং বড়ই কঠিন। কে কোন্‌কালে ঘর করিয়াছিল, সেই সকল ঘরের অধিবাসীদিগের নামগন্ধ পর্য্যন্ত এক্ষণে কেহ

অবগত নহে—অথচ সেই সকল ঘর চাল-ছপ্পর-বিহীন হইয়া কতকাল হইতে পড়িয়া আছে, দেওয়ানের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই।

আর্‌বী ও ফার্‌সী ভাষা এবং মোসলেম-শাস্ত্র আলোচনার জন্য মঙ্গলকোট বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। হিন্দুদিগের পক্ষে ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ যেরূপ স্থান, বঙ্গদেশের মোসলেমদিগের নিকট মঙ্গলকোটও সেইরূপ স্থান,—তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। বহুপূর্ব্বকালের শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের নাম জানি না; তবে দেড় শত- পৌণে দুই শত বৎসরের কথা বলিতেছি, মৌলানা ফজলল করিম, মৌলানা কামেল, মোল্লা আকমল, কাজি মহম্মদ তাহা, কাজি মহম্মদ শাহ, খোন্দকার বেকাতুল্লা, খোন্দকার এহসানোল্লা, খোন্দকার মহাম্মদ মোকতাসেদ, প্রভৃতি বঙ্গবিখ্যাত আরবী শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ মঙ্গলকোটে জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে যশঃপ্রভা বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম-ভারতের রায়বেরেলির সুপ্রসিদ্ধ সাধু সৈয়েদ আহমদের সহিত মোসলেমবিদ্বেষী পঞ্জাবাধিপতি রাজা রণজিৎ সিংহের যে ধর্ম্মযুদ্ধ হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মযুদ্ধে উক্ত খোন্দকার মহাম্মদ মোকতাসেদের পুত্র খোন্দকার মহাম্মদী সৈয়েদের পক্ষে যোগদান করিয়া শিখরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধেই খোন্দকার মহাম্মদীর প্রাণবিয়োগ হয়। সৈয়েদের জীবনচরিতে এই যুদ্ধের বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। যাহা হউক, ঐ ক্ষণজন্ম মহাপুরুষদিগের পর মঙ্গলকোটে মওলানা জেল্লেরহীম চৌধুরী মমতাজ হোসেন, চৌধুরী এম্‌দাদল হকখোন্দকায় আহম্মদ হোসেন, মোল্লা মনসু আহমদ, মোল্লা ইয়াসুবদ্দিন মহম্মদ, প্রভৃতি আলেন ফাজেলগণ—, ও কাজি খোদান ওয়াজ নামক একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী চরিত্রবান্ ধনাঢ্য ব্যক্তি আবির্ভূত হন। এতদঞ্চলে তৎকালে যে সকল আলেম ফাজেল নাজেম ও মুন্সীগণ বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই উক্ত মহাত্মাদিগের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। মৌলানা জোল্লের্ রহীম তো এতদঞ্চলের সমুদায় আলেমদিগের গুরু ছিলেন। পশ্চিম-ভারত হইতেও অনেক লোক মঙ্গলকোটে আসিয়া তাঁহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সামসোল ওল্মা মৌলানা লোতফর্ রহমান, ঢাকা গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক মৌলানা ফজলল করীম, কৃষ্ণনগর জেলার রহমৎপুরের মৌলুবী খাজে আহমদ, বীরভূম নবস্তার মৌলুবী সেয়েদ আসেদোল্লা, মঙ্গলকোটের বর্ত্তমান প্রধান আলেম মৌলুবী কাজি মমেজলহক, বড় পাণ্টিয়ার মৌলুবী সৈয়দ আতাওল অজিজ, প্রভৃতি চিরস্মরণীয় মোসলেম-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ মৌলানা জোল্লের্ রহীমের ছাত্র ছিলেন। উক্ত কাজি খোদানওয়াজ বর্দ্ধমানাধিপ মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্ বাহাদুরের প্রাণপ্রিয়বন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন; ইঁহার প্রতাপে বাঘে ছাগলে একঘাটে জল খাইয়াছে। ইনিও মৌলানা জোল্লের্ রহীমের নিকট আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ঠিক এই সময়েই মঙ্গলকোটের রাধাকান্ত বর্দ্ধন নামক একজন সুবর্ণ বণিক্ বর্দ্ধমান রাজবাটীতে চাকরী করিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জন করেন। তাঁহার দোতলা পাকা বাড়ী ও দেবালয়, জরাজীর্ণ অবস্থায় এখনও মঙ্গলকোটে বিদ্যমান রহিয়াছে। শুনিতে পাই, মঙ্গলকোটে দোতলা বাটী তৈয়ার করিতে নাই;—কারণ নিয়ে ঈশ্বরানুগৃহীত সাধুপুরুষগণ সমাহিত রহিয়াছেন। বর্দ্ধনমহাশয় ধনমদে মত্ত হইয়া, এই প্রাচীন নিষেধ-বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক, বিপুলকায় দোতলা বাটী নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন; সেই পাপে তাঁহার দ্রুত অধঃপতন হইয়াছে। একথা সত্য কি মিথ্যা জানি না, তবে মঙ্গলকোটে হিন্দু ভিন্ন অপর কাহারও বাটীতে দোতলা ঘর নাই। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী জমিদার কাজি খোদানওয়াজ মরহুমের ইন্দ্রালয়-তুল্য বাটিতেও দোতলা ঘর দেখিতে পাওয়া যায় না। মঙ্গলকোটের শচীনন্দন রাজেরও না-কি এই পাপে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। রাজমহাশয় সঙ্গতিশালী ও সাংসারিক বিষয়ে খুব পোক্ত লোক ছিলেন। সন ১৩১৮ সালে তাঁহার অপমৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার পুত্র ললিলা (?) মোহন রাজ, মিষ্টভাষী সদালাপী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী; পিতার মৃত্যুর পর ইনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন।

সে যাহা হউক, মৌলানা জোল্লের্ রহীমের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, মৌলানা মহম্মদ, পিতৃগৌরবের অধিকারী হন। ইনি নিজের সময়ে বঙ্গদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় আলেম বলিয়া স্বীকৃত, কীর্ত্তিত ও পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। জৌনপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৌলানা হেদায়েতুল্লা, দিল্লীর ক্ষণজন্মা মহাদ্দেশ হাফেজ মৌলানা নজির হোসেন, মওলানা

মঙ্গলকোটের প্রান্তস্থিত 'হাউজ' ঘর

মহাম্মদের শিক্ষক ছিলেন, এবং স্বীয় পিতার নিকটেও মৌলানা মহম্মদ আরবী শাস্ত্র ও আরবী ভাষার অনেক পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তফসির, হদিস, ফেকা ওসুল, আসমায়েরেজাল, মনতক ও তেব প্রভৃতি আরবী শাস্ত্রের সকল বিভাগেই ইহাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ভূপালেশ্বরী সাহজাহান বেগমের দ্বিতীয়-স্বামী এবং ভূপাল রাজ্যের প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তা পণ্ডিতপ্রবর মৌলানা সৈয়েদ সিদ্দিক হোসেন খান, ভূপালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেম মৌলানা বসির আহম্মদ, নিজাম-দরবারের ভূতপূর্ব্ব সভাপণ্ডিত পণ্ডিতকুলতিলক হাফেজ হাজি মৌলানা আবুল হাসনাৎ মহম্মদ আব্বলহাই লক্ষ্বী, দিল্লীর সামসুল ওল্মা মৌলানা আব্দল হক্ হক্কানী, প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ মহম্মদ মরহুমের গুণমুগ্ধ ও অকপট-বন্ধু ছিলেন। সামসল ওলমা মৌলানা লোতফর রহমান ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যাপক মৌলানা ফজলল করীম, বারাণসী মাদ্রাসার অধ্যাপক মহাদ্দেশ মৌলানা মহম্মদ সৈয়দ, ও ভূপালেশ্বরীর দ্বিতীয়-স্বামী উক্ত মৌলানা সৈয়েদ সিদ্দিক-হোসেন খান ইহাঁরা মওলানা মহম্মদের সহপাঠী ছিলেন। এই ক্ষণজন্মা মহাত্মা সন ১৩১৪ সালে যোগাধামে প্রস্থান করিয়াছেন। মৌলানা মহম্মদ এসহাক (যিনি এক্ষণে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের অন্যতম অধ্যাপক), মওলানা মহম্মদ মরহুমের প্রিয়শিষ্য। এখনও মঙ্গলকোটের বিদ্যা-গৌরব অন্তর্হিত হয় নাই। ফারসী ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত মৌলবী জহুরল হক ও সুফি নেয়াজ আহ্‌মদ্ অল্প দিন হইল প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এতদঞ্চলের ফারসী ভাষাবিদ্ যাবদীয় ব্যক্তি ইঁহাদের ছাত্র ছিলেন। এই সকল ব্যক্তি-দিগের মধ্যে অনেকেই জীবিত আছেন। পূর্ব্বোক্ত কাজি মৌলুবী মমেজলহক ও মৌলুবী খোন্দেকার মহম্মদ ইসমাইল এক্ষণ মঙ্গলকোটের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ফলকথা, মঙ্গল-কোট বহুপূর্ব্বকাল হইতেই আরবী ও ফারসী ভাষা আলো-চনার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে মঙ্গল-কোটে ৫০০জন বিদ্যার্থী অন্নবস্ত্র ও পুস্তক পাইয়া আরবী ও ফারসী ভাষা অধ্যয়ন করিত। ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলানা বহরল ওলুম আব্দুল আলি লক্ষ্বী একবার (অষ্টা-দশ শতাব্দীর শেষে) মঙ্গলকোট আসিয়া এখানকার বিদ্যার্থী সংখ্যা, অধ্যাপকদিগের পাণ্ডিত্য ও চরিত্র গৌরব, বিদ্যা-চর্চ্চা, এবং এখানকার মোখাদেমদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিদ্যোৎসাহিতা, দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে আনন্দাশ্রুপাত করিয়া গিয়া-ছিলেন। মঙ্গলকোটের আলেমদিগের স্বাক্ষরিত ও প্রদত্ত বিধিব্যবস্থা বঙ্গদেশের মোসলেম-সমাজে সাদরে গৃহীত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে। শুধু কি বিদ্যা বিষয়েই মঙ্গল-কোট বঙ্গদেশে বরেণ্য হইয়াছিল? তাহা নয়,—সামাজিক রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সাজসজ্জা, আদবকায়দা ও শিষ্টাচার প্রভৃতি, সকল বিষয়েই বঙ্গের মোসলেম-সমাজ মঙ্গল-কোটকে আদর্শস্থানীয় ভাবিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে এখানে ৩।৪ শত ঘর মোখাদেমদিগের বাস ছিল। এতদঞ্চলের অন্যান্য যে সকল গ্রামের মোখাদেমদিগের সহিত মঙ্গলকোটের মোখাদেমদিগের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না, তাঁহারা সমাজে মোখাদেম বলিয়া গ্রাহ্য হইতেন না। সুতরাং আভিজাত্য ও কুলগৌরবেও এখানকার মোখাদেমগণ বঙ্গে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সায়ের, রোল, কুসুম গ্রাম, চোথরিয়া, ব্রাহ্মণ পুষ্করিণী, পাণ্ডুয়া, হোসেনপুর, আড়োয়ার ও ঝিলু প্রভৃতি স্থানের বনিয়াদী মোখাদেমকুলতিলকগণ সকলেই মঙ্গল-

কোটের মোথাদেমদিগের সহিত নানাসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এথানে যতঘর মোথাদেম আছেন, তাঁহাদের মধ্যে থোন্দকার বংশ, মোল্লাবংশ, চৌধুরীবংশ ও কাজিবংশ, এইগুলিই প্রধান। প্রাচীন-রীতিনীতি ও আরবী-ফারসী ভাষার আধিপত্য থাকায় পাশ্চাত্য বিলাস-বিভ্রম ও ইউরোপীয় সভ্যতা মঙ্গলকোটে প্রবেশ করিতে পারে নাই;—কিন্তু বোধ হয় আর তাহা থাকে না। সন ১৩১৮ সালে প্রাচীনতার লীলাভূমি মোসলেমীন শাস্ত্র ও মোসলেম-সভ্যতার মহাপীঠ মঙ্গলকোটে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে একটী জুনিয়র মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বের মত এখন আর মঙ্গলকোটের জলাশয়গুলির সানবাঁধা ঘাটে বসিয়া বিদ্যার্থীদিগকে শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত দেখা যায় না, মোথাদেমদিগের বৈঠকথানায় বা মসজিদে বসিয়া সকাল-সন্ধ্যায় বিদ্যার্থিগণ এখন আর তেলাওতে কোরাণে ব্যাপৃত থাকে না।

মাদ্রাসাটির অবস্থা শোচনীয়; শুনিতেছি, সেই প্রাচীন ওলি আউলিয়া সাধু সিদ্ধপুরুষদিগের বংশধর মঙ্গলকোটের বর্ত্তমান মোথাদেমগণ মাদ্রাসাটির শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ইহাকে হাইস্কুলে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

এক্ষণে মঙ্গলকোটের মোথাদেম-সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে; যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাও পূর্ব্বের মত উন্নত নাই। তবে অবশ্য তাঁহাদের সম্ভ্রম প্রতিপত্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গ্রামে হিন্দুর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ হিন্দু। কএক জন সঙ্গতিপন্ন হিন্দু ও এথানে আছেন, কিন্তু মোসলেম অধিকারের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এথানে মোসলেমগণই সকল বিষয়ে প্রবল ও প্রধান। তথাপি এথানকার মোসলেমদিগের সহিত হিন্দুদিগের কথন বিবাদবিসম্বাদ হইয়াছিল, বা প্রবল মোসলেম দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হিন্দুগণ কথনও উপদ্রুত হইয়াছিলেন, বলিয়া শুনা যায় নাই;—ইহা বড়ই আনন্দের কথা। এথানকার সাধারণ মোসলেমীনগণের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয় সত্য, কিন্তু শিক্ষা ও নৈতিক বিষয়ে তাহারা বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। গুণের মধ্যে ইহারা কৃষিকার্য্যে পরিশ্রমশীল এবং বিদ্যার্থীদিগকে পুস্তকের দাম ও ভাত-কাপড় যোগাইতে মুক্তহস্ত ও চিরঅভ্যস্ত; অতিথিঅভ্যাগত-দিগের প্রতিও ইহারা যার পর নাই সমাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহারা শিক্ষা ও নৈতিক বিষয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও স্থানীয় মোথাদেমগণ ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না;—ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা। আশাকরি, যাহাতে ইহারা ধর্ম্ম-শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সুনীতিপরায়ণ, সদাচার-নিরত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়,—মোথাদেমগণ তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। কএক বৎসর হইল মঙ্গলকোটে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং গ্রামের বাহিরে একটি সরকারী ডাক-বাঙ্গলা নির্ম্মিত হইতেছে; গ্রামে থানাও আছে।

শ্রীএস, এস্, এম্, আন্ওয়ারুল্ মজিদাল্ হুসেন্

যমালয়ে ধর্ম্মলাভ

(উপনিষৎ)

বাজশ্রবস নামক ঋষি পুণ্য ও পবিত্রতা লাভের জন্য আপনার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। অন্ধ, খঞ্জ, দীন, হীন, ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণাদি নানা দরিদ্র চারিদিকে সমাগত হইল। পুণ্যকাম ঋষি অকাতরে যাহা কিছু সকলই দান করিলেন। অবশেষে বৃদ্ধ পশুগণকেও দান করিলেন।

তাহার পুত্র নচিকেতা পিতার ন্যায় সাধুচিত্ত ছিলেন। পিতার এই পুণ্য-সঙ্কল্প নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে পুণ্যভাব সঞ্চারিত হইল। তিনি ভাবিতেছিলেন, যে বৃদ্ধ ধেনুগণ,—যাহাদের জলপান, তৃণভক্ষণ ও দুগ্ধ-দান করিবার শক্তিও অন্তর্হিত হইয়াছে, যাহাদের আর বৎস হইবে না,—এরূপ গাভীদানে কোন ফল নাই; সুতরাং দাতা এজন্য স্বর্গলাভ না করিয়া, বরং নিরানন্দ লোকেই গমন করিবেন।

তখন তিনি পিতার নিকট গমন করিলেন; কারণ তিনিমাত্রই তখন দানে অবশিষ্ট ছিলেন। পিতার পুণ্য-লাভে কোন বিঘ্ন ঘটে—তাহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। বিশেষতঃ অযোগ্য-বস্তুদানে, পিতার ফললাভ দূরে থাকুক,—প্রত্যবায় আছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার আত্মবিসর্জ্জনের কামনা হইল। তাই তিনি পিতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আমাকে কাহার নিকট দান করিবেন?" প্রথমবার পিতা কোন উত্তর দিলেন না; দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন, "তোমাকে যমের নিকট দান করিব।"

নচিকেতা চিন্তিত হইলেন;—তাঁহার সরল অকপটহৃদয় কখনও মনে করিতে পারে নাই যে, পিতা ক্রোধচ্ছলেও মিথ্যাকথা বলিতে পারেন। তাই পবিত্রহৃদয় নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি পিতার পুত্র, কিংবা শিষ্যরূপে, প্রথম স্থানীয়;—আর না হয় মধ্যমই হইলাম;—আমি ত কিছুতেই অধম নহি। তবে মৃত্যুর নিকট এমন কি প্রয়োজন আছে, যাহা পিতা আমাদ্বারা সম্পাদন করিবেন? কিন্তু পিতৃআজ্ঞা অমোঘ,—আমাকে মৃত্যুর নিকট যাইতেই হইবে।'

নচিকেতা পিতার নিকট গমন করিয়া পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ, আপনি যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পালন করিতে অনুমতি দিন। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুগণ সত্যপালনের জন্য কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিয়াছেন, ও করিতেছেন। এক্ষণেও আমরা দেখিতেছি, সত্যের জন্য লোকে কত ত্যাগস্বীকার করিতেছেন। তখন আপনার মুখ দিয়া যে বাক্য বাহির হইয়াছে, তাহার অন্যথা করিবেন না। মানুষ এজগতে চিরকাল থাকিবার জন্য আসে নাই, চিরকাল থাকিবেও না; সুতরাং মিথ্যা আচরণে প্রয়োজন কি? আপনার সত্যপালন করুন। আমি যমালয়ে গমন করি।"

পিতা তাহা শুনিয়া বলিলেন, "যাও বৎস! যম ধর্ম্মরাজ, পরমজ্ঞানী—তাহার নিকট তুমি অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। যাও;—আশীর্ব্বাদ করি, অনেক সত্য লাভ করিয়া পুনরাগমন কর।"

নচিকেতা যমগৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, যমরাজ গৃহে নাই। তিনদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন, কেহই অভ্যর্থনা করিল না; অনাহারে অনিদ্রায় তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল।

তিন দিন পরে যমরাজ গৃহে আগমন করিলেন। তিনি আসিলে তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার গৃহে অতিথি তিনদিন উপবাসী আছেন। ব্রাহ্মণ অতিথি পূজনীয়;—অতিথি দেবতার ন্যায় মান্য, অতএব তাঁহার প্রক্ষালনের জন্য জল আনয়ন কর। অতিথির উপযুক্ত সৎকার কর।

"যদি অতিথি গৃহে আসিয়া অভুক্ত থাকেন, সে গৃহ মহাপাপে নিমগ্ন হয়। তাহার দান, মান, পূজা, যজ্ঞ, হোম, বাপীখনন, কূপদান সকলই বৃথা; অতএব অতিথির উপযুক্ত সমাদর কর।"

যম তখন নচিকেতাকে বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ-বালক, তোমাকে নমস্কার! তুমি আমায় মঙ্গল কর। তুমি আমার পূজনীয় অতিথি হইয়াও তিন রাত্রি আমার

গৃহে বাস করিয়া অনাহারে রহিয়াছ, ইহাতে আমার অতিশয় দোষ হইয়াছে; এ জন্য তুমি আমার সৎকার গ্রহণ কর। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ, আমি তোমাকে তিন বর দিতেছি; গ্রহণ কর।”

নচিকেতা বলিলেন, “যমরাজ! আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমার পিতা যেন আমার প্রতি বিগতক্রোধ হ'ন, এবং যখন আমি তোমার গৃহ হইতে প্রত্যাগত হইব, পিতা যেন আমায় চিনিতে পারিয়া স্নেহ-সহকারে আমায় গ্রহণ করেন!”

যম বলিলেন, “আমার বরে তোমার পিতা তোমাকে ক্ষমা করিবেন, ও তোমাকে পাইয়া স্নেহসহকারে গ্রহণ করিবেন; এবং এক্ষণে তোমার অভাবেও তিনি চিন্তাশূন্য হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিবেন।”

নচিকেতা—“স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, তথায় জরা নাই, তোমার প্রভাব মৃত্যুও তথায় নাই। তথায় ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, তথায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। হে যম! স্বর্গলোক লাভের জন্য যে অগ্নিদ্বারা সাধনা করে, তাহা তুমি অবগত আছ; আমাকে তাহাই বল। আমি দ্বিতীয় বরদ্বারা এই যজ্ঞের অগ্নির তত্ত্ব তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করি।”

যম যজ্ঞীয় অগ্নির কথা নচিকেতাকে বলিয়া দিলেন; এবং বলিলেন, “এই অগ্নি তোমার নামেই অভিহিত হইবে।

“নচিকেতা! তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।”

নচিকেতা বলিলেন, “লোকে বলে, মৃত্যু হইলে মানবের আর কিছুই থাকে না; কেহ বলে, আত্মা জীবিত থাকেন। এ বিষয়ে তুমিই আমার সন্দেহ অপনোদন করিতে পার; অতএব এ বিষয়ে তুমি আমাকে উপদেশ দাও।”

যম বলিলেন, “এ তত্ত্ব দেবগণও অবগত নহেন; এ বর আমি তোমাকে দিতে পারিব না;—তুমি অন্য প্রার্থনা কর।” নচিকেতা বলিলেন, “দেবতারা এ বিষয় সম্যক্ জানেন না; অথচ মানবজীবনের ইহাই প্রধান-প্রশ্ন; সুতরাং তুমি কেন বলিতেছ, ইহা সুবিজ্ঞেয় নহে! এ বিষয়ে তোমার তুল্য বক্তা কেহই নাই; অতএব এই বরই আমায় প্রদান কর।”

যম বলিলেন, “হে নচিকেতা! তোমার বহু পুত্র ও পৌত্র লাভ ঘটিবে; পশু পক্ষী, হস্তী অশ্ব, স্বর্ণ রৌপ্য, রাজ্য প্রদান করিব; কিন্তু তুমি অন্য বরপ্রার্থনা কর।

“বহুবিত্ত, চিরজীবিকা প্রার্থনা কর, প্রশস্ত রাজ্যের রাজা হও, সমুদয় কামনাই তোমার পূর্ণ হইবে।

“যে সকল বস্তু মর্ত্ত্যলোকে দুর্লভ,—রথ, পরমাসুন্দরী ও নরলোকে দুর্লভ গুণবতী গানবাদ্যপারদর্শিনী রমণীগণ গ্রহণ কর এবং পার্থিব সুখ সম্ভোগ কর, কিন্তু এ প্রশ্ন করিও না।”

নচিকেতা বলিলেন, “যমরাজ! তোমার প্রদত্ত এই সুখ আজি আছে, কালি থাকিবে না; অথচ আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তেজঃ ক্ষয় করিবে। জীবন অল্পস্থায়ী, সুতরাং এ সকল নশ্বর সুখ আমি চাহি না।

“যখন তোমায় দেখিয়াছি, তখনই ত বিত্ত পাইয়াছি; কিন্তু চিত্ত-বিত্তে পরিতৃপ্ত হয় না। আমায় প্রার্থিত বর প্রদান কর। তোমার ন্যায় দেবতার সমীপে এই সকল মহৎ-তত্ত্ব অবগত না হইয়া কোন্ মনুষ্য অসার কামনা করে? পরলোক-সম্বন্ধীয় দুর্লভ জ্ঞান ভিন্ন, আমি অন্য জ্ঞান চাহি না।”

দ্বিতীয় অধ্যায়

যম বলিলেন, “হে নচিকেতা! জগতে আপাত-মধুর পরিণামে বিষ, ও আপাত-অপ্রিয় পরিণামে সুখকর, বস্তু সকল বিদ্যমান আছে; অল্পবুদ্ধি যে, সেই আপাত-রমণীয় বস্তু প্রার্থনা করে। আর জ্ঞানীব্যক্তি, শ্রেয়কেই গ্রহণ করিয়া থাকে।”

“নচিকেতা! তুমি আপাতমধুর বস্তু গ্রহণ না করিয়া, সারবস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তুমি অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যার প্রার্থী হইয়াছ। যাহারা মূর্খ, তাহারাই আপনাকে পণ্ডিত মনে করে; এবং যেমন এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পরিচালনা করিলে কুটিল পথ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপই হইয়া থাকে।

“চিন্তা ও বিবেকহীন লোকেরা মনে করে, এ লোক ভিন্ন আর অন্য লোক নাই, সুতরাং বার বার মৃত্যুর অধীন হয়।

“এই দুর্লভ তত্ত্ব—যাহা জানা কঠিন, বুঝা আরও অতি কঠিন,—তাহার বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। হীন মনুষ্য, আত্মা বিষয়ে উপদেশ দিতে পারে না। অতিশয় শ্রেষ্ঠ

লোক ভিন্ন তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে না; কারণ ইনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, ও তর্কের দ্বারা অপ্রাপ্য।

"হে নচিকেতা! তুমি যে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তর্কের অতীত; উৎকৃষ্ট আচার্য্যকর্তৃক শিক্ষা দানেই তাহা প্রাপ্তব্য। তুমি স্থিরসঙ্কল্প ব্যক্তি; আমরা যেন তোমার মত শিষ্য পাই।

"সংসারকে আমি অনিত্য বলিয়া জানিয়াছি, সংসারকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। তাই এই নিত্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

"তুমি বুদ্ধিমান্, তাই কামনার অসারতা, জগতের প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞের ফল, অভয়প্রদ স্থান, প্রশংসনীয় গতি, আত্মার বিশ্রামস্থল, এই সকল সংসারের সুখ ত্যাগ করিয়াছ।

"সেই সুদুর্লভ, ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান, হৃদয়নিধি, ইন্দ্রিয়াতীত পুরাতন দেবতাকে আত্মার সহিত মিলিত দেখিয়া জ্ঞানিগণ সুখদুঃখের অতীত হয়েন। এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা আনন্দময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। আমার বোধ হয়, স্বর্গ নচিকেতার প্রতি মুক্তদ্বার হইয়া রহিয়াছে।"

নচিকেতা বলিলেন, "ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কার্য্য কারণ, ভূত-ভবিষ্যৎ হইতে পৃথক্ এমন কোন্ বস্তু দেখিতেছ,—তাহা আমায় বল।"

যম বলিলেন, "সমুদয় বেদ যে পূজনীয়কে কীর্ত্তন করে, তপস্যা যাহাকে ব্যক্ত করে, যাহাকে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানি-গণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি—ওঁ।

"এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ, এই অক্ষরকে জানিয়াই সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়েন না, ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাতন। শরীর বিনষ্ট হইলে ইহার বিনাশ হয় না।

"যদি কেহ মনে করে—আত্মাকে বিনাশ করিব, কিংবা যদি কেহ মনে করে—আমি হত হইলাম, তাহারা উভয়েই ভ্রান্ত; কারণ তাহারা জানে না, আত্মা হতও হয়েন না, এবং কেহ তাঁহাকে হনন করিতে পারে না।

"মহৎ হইতেও মহীয়ান্, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, এই আত্মা জীবশরীরে অবস্থান করেন; কামনাহীন সুখদুঃখাতীত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই আত্মার মহিমা-দর্শন করেন।

"আত্মা স্থির ও শয়ান হইয়াও দূরে গমন করেন। এই বিপরীত গুণময় দেবতাকে, আত্মাভিন্ন কেহই জানিতে পারেন না।

"শরীর অনিত্য; কিন্তু শরীরী অর্থাৎ আত্মা দেহহীন, মহৎ, এবং সর্ব্বব্যাপী। এজন্য জ্ঞানিগণ আত্মার জন্য শোক করেন না।

"শাস্ত্রজ্ঞান,—কি স্মৃতিশক্তি;—কি বহু জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। সেই সপ্রকাশ যাঁহাকে বরণ করেন, তাহাদ্বারাই তিনি লভ্য।

"চরিত্র সংশোধিত না করিলে, শান্ত সমাহিত না হইলে, অস্থির চিত্ত হইলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

"জীব ও ব্রহ্ম ছায়াতপের ন্যায় জীবের হৃদয়াকাশে বিরাজ করেন।

"আত্মাকে রথী, বুদ্ধিকে সারথী ও মনকে রশ্মি করিয়া ব্রহ্ম-সাধন করিবে।

"ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া, তাহাদিগকে পথস্বরূপ করিয়া, আত্মাকে রথী করিয়া, ব্রহ্মরাজ্যে গমন করিবে।

"ইন্দ্রিয়াসক্ত অবিবেকিগণের ইন্দ্রিয় দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বিপজ্জনক; বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের হৃদয় ও ইন্দ্রিয়াদি দান্ত অশ্বের ন্যায় বশীভূত।

"অসমাহিতমনা, অবিবেকী ও অশুচিহৃদয় ব্যক্তিগণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না; সংসার গতিই প্রাপ্ত হয়।

"বিবেকী, সমাহিতচিত্ত, শুদ্ধমনা ব্যক্তিগণের ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়; আর সংসারে ফিরিয়া আইসে না।

"ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ।

"মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—শেষ ও পরাগতি।

"আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইহাকে তীক্ষ্ণবুদ্ধিদ্বারা অবগত হন।

"দেহমধ্যে দুই আত্মা, দুই পক্ষীর ন্যায় এক বৃক্ষে, অবস্থিতি করে। একজন ফলদাতা, একজন ফলভোক্তা; একজন নিষ্কাম হইয়া ফল প্রদান করেন, আর একজন প্রেমে বিহ্বল হইয়া সেই ফলভোগ করেন। একজন পরমাত্মা, আর এক জন জীবাত্মা।

যিনি, শব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, নিত্য, রসহীন, গন্ধ-হীন ও অনাদি, অনন্ত বুদ্ধি নামক মহৎ-তত্ত্ব হইতে পৃথক্ ও ধ্রুব, তাঁহাকে জানিয়া সাধক মৃত্যু-মুখ হইতে বিমুক্ত হন।

"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনে বাক্যকে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে, জ্ঞানকে জীবাত্মাতে এবং মহান্ আত্মাকে সর্ব্ববিকার শূন্য সমস্ত-আত্মাতে সংযত করিবে।

"হে জীবসকল উত্থান কর! জাগরিত হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যগণের নিকট গিয়া পরমাত্মাকে জ্ঞাত হও। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরের ন্যায় দুরতিক্রমণীয় বলিয়াছেন।"

যমগৃহ হইতে জীবাত্মা-পরমাত্মা সম্বন্ধে এই অমূল্য তত্ত্ব লাভ করিয়া, নচিকেতা পিতৃগৃহে আগত হইয়া পিতার নিকট সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। পিতাও আনন্দিত চিত্তে সন্তানকে গ্রহণ করিলেন। যমগৃহাগত নচিকেতা এইরূপে পরম জ্ঞান ও পরলোক-তত্ত্ব জগতে প্রচার করেন।

আমাদের গৃহ হইতেও সন্তানগণ যমগৃহে গমন করে; আমরা বিমূঢ় হইয়া শোকে আচ্ছন্ন হই। কবে নচিকেতার ন্যায় সেই সন্তানগণ তাহাদিগের নির্ব্বাক্ রসনা দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে এইরূপ পরলোক-তত্ত্ব প্রকাশিত করিবেন! আত্মার অনন্ত অস্তিত্ব, পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ, অবগত হইয়া নশ্বর বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আমরা পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইব!—এই প্রাচীন মনস্বী মুনিগণ আবার কবে ভারতে আগমন করিয়া অপূর্ব্ব জ্ঞান শিক্ষা দিবেন!

শ্রীপ্যারীশঙ্করদাসগুপ্ত।

সাঙ্কেতিকশব্দ

আমাদের জ্যোতিষ-গ্রন্থাদি পদ্যেই রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থে বৎসর ও তারিখ বুঝাইবার জন্য কতকগুলি সাঙ্কেতিকশব্দ ব্যবহৃত হইত। জ্যোতিষ-গ্রন্থের অনুকরণে ক্রমশঃ অন্যান্য কাব্য গ্রন্থাদিতে ঐ সমস্ত সাঙ্কেতিকশব্দ প্রযুক্ত হইতে লাগিল। এক্ষণে সংস্কৃত কবিতায়, বৎসর ও তারিখ বুঝাইতে হইলে, উল্লিখিত সাঙ্কেতিক শব্দপ্রয়োগ করিতে হয়। অনেক সময় শব্দগুলির অর্থ-নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কোষগ্রন্থে দুই চারিটি এইরূপ সাঙ্কেতিক-শব্দের অর্থমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট সাঙ্কেতিক-শব্দগুলির ব্যাখ্যার জন্য গুরুপরম্পরালব্ধ জ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। সকল সময়, সকল সাঙ্কেতিকশব্দের অর্থও স্থির করিতে পারা যায় না। আমরা বহুপ্রাচীন জ্যোতিষ-গ্রন্থ, দানপত্র, শিলালিপি, প্রাচীন-কাব্য প্রভৃতি হইতে সাঙ্কেতিকশব্দগুলি সংগ্রহ করিয়া একটি যথাসম্ভব তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

০। শূন্য; খ; গগন; বিয়ৎ; আকাশ; অম্বর; অভ্র; অনন্ত; ব্যোম; অন্তরিক্ষ; নভঃ, পূর্ণ, রন্ধ্র, ইত্যাদি।

১। আদি; শশী; ইন্দু; ক্ষিতি; উর্ব্বরা; ধরা; পিতামহ; চন্দ্র; বিধু; শীতাংশু; রূপ; রশ্মি; পৃথিবী; ভূ; তনু; সোম; নায়ক; বসুধা; শশাঙ্ক; ক্ষ্মা; ধরণী; পরমাত্মা; গণেশদন্ত; শুক্রচক্ষু; সুধাংশু; অব্জ; ভূমি; গো; বসুন্ধরা; পৃথ্বী; ক্; ইলা।

২। যম; অশ্বিনৌ; রবিচন্দ্রৌ; লোচন; অক্ষি; দস্র; যমল; পক্ষ; নেত্র; বাহু; কর্ণ; কুটুম্ব; কর; দৃষ্টি; নদীকূল; অসিধারা; হস্ত; স্তন; নাসত্য।

৩। ত্রিকাল; ত্রিজগৎ; ত্রি; ত্রিগুণ; লোক; ত্রিগত; পাবক; বৈশ্বানর; দহন; তপন; হুতাশন; জ্বলন; অগ্নি; বহ্নি; ত্রিলোচন; ত্রিনেত্র; রাম; সহোদর; শিখী; গুণ; কাল; ভুবন; গঙ্গামার্গ; শিবচক্ষু; গ্রীবারেখা; কালিদাসকাব্যং; বলি; সন্ধ্যা; পুর; পুষ্কর; বিষ্ণু; জ্বরপাদ।

৪। বেদ; সমুদ্র; সাগর; অব্ধি; দধি; দিশ্; জলাশয়; কৃত; জলনিধি; যুগ; কোষ্ঠ; বন্ধু; উদধি; ব্রহ্মাস্য; বর্ণ; হরিবাহু; স্বর্দন্তিদন্ত; সেনাঙ্গ; উপায়; যাম; আশ্রম; বৃত্তপাদ।

৫। শর; অর্থ; ইন্দ্রিয়; সায়ক; বাণ; ভূত; ইষু; পাণ্ডব; তত; রত্ন; প্রাণ; সুত; পুত্র; বিশিখ; কলম্ব; মার্গন; শিবাস্য; স্বর্গ; ব্রতাগ্নি; মহাপাপ;

মহাভূত; মহাকাব্য; মহামখ; পুরাণলক্ষণ; অঙ্গ; বর্গ; ইন্দ্রিয়ার্থ।

৬। রস; অঙ্গ; ঋতু; মাসার্দ্ধ; রাগ; অরি; দর্শন; তর্ক; মত; শাস্ত্র; বজ্রকোণ; ত্রিশিরোনেত্র; চক্রবর্ত্তী; কার্ত্তিকের মুখ; গুণ; জ্বরবাহু; রূপ।

৭। অগ; নগ; পর্ব্বত; মহীধর; অদ্রি; মুনি; ঋষি; অত্রি; স্বর; ছন্দঃ; অশ্ব; ধাতু; কলত্র; শৈল; পাতাল; ভুবন; মুনি; দ্বীপ; বার; সমুদ্র; রাজাঙ্গ; ব্রীহি; বহ্নিশিখা।

৮। বসু; অহি; গজ; দন্তী; মঙ্গল; নাগ; ভূতি; ইভ; সর্প; যোগাঙ্গ; শিবমূর্ত্তি; দিগ্‌গজ; সিদ্ধি; ব্রহ্মশ্রুতি; ব্যাকরণ; দিক্‌পাল; অহি; কুলাদ্রি; ঐশ্বর্য্য।

৯। গো; নন্দ; রন্ধ্র; ছিদ্র; পবন; অন্তর; গ্রহ; অঙ্ক; নিধি; দ্বার; ভূখণ্ড; ক্রতু; সুধাকুণ্ড; ব্যাঘ্রীস্তন; রস।

১০। দিশ্‌; আশা; কেন্দু; রাবণশর; অবতার; কর্ম্ম; হস্তাঙ্গুলি; শম্ভুবাহ; রাবণমস্তক; চন্দ্রাশ্ব; কৃষ্ণাবতার; বিশ্বদেব; অবস্থা; পঙ্‌ক্তি।

১১। রুদ্র; ঈশ্বর; মহাদেব; অক্ষৌহিণী; লাভ; দুর্য্যোধনসেনাপতি।

১২। সূর্য্য; অর্ক; আদিত্য; ভানু; মাস; সহস্রাংশ; বায়; রাশি; সংক্রান্তি; গুহবাহু; সারিকোষ্ঠ; গুহনেত্র; রাজমণ্ডল; সাধ্য।

১৩। বিশ্ব; মন্মথ; কামদেব; তাম্বূলগুণ।

১৪। মনু; লোক; ইন্দ্র; বিদ্যা; যম; ভুবন; ধ্রুবতারক।

১৫। তিথি; পক্ষ; অহঃ।

১৬। অষ্টি; নৃপ; ভূপ; কলা; ইন্দুকলা; মাতৃকা।

১৭। জলদ; অত্যষ্টি।

১৮। ধৃতি; দ্বীপ; বিদ্যা; পুরাণ; স্মৃতি; ধান্য; যূপ।

১৯। অতিধৃতি।

২০। নখ; কৃতি; রাবণবাহু; অঙ্গুলি।

২১। উৎকৃতি; স্বর্গ।

২২। জাতি।

২৪। জিন; তত্ত্ব; সিদ্ধ।

২৫। তত্ত্ব।

২৭। নক্ষত্র

৩২। দন্ত; রদ।

৩৩। দেব।

৩৬। তুষিত।

৪৯। বায়ু; তান।

৬৪। আভাস্বর।

১০০। ধার্ত্তরাষ্ট্র; শতভিষাতারা; পুরুষায়ুষ; রাবণাঙ্গুলি; পদ্মদল; ইন্দ্রযজ্ঞ; অব্ধিযোজন।

২২০। মহারাজিক।

১০০০। জাহ্নবীবক্ত্র; শেষশীর্ষ; পদ্মচ্ছদ; রবিকর; অর্জ্জুনবাণ; বেদশাখা; ইন্দ্রবৃষ্টি।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়

উপাধিদানের সভা

বিগত ২৮এ মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার সেনেট-হলে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদানের সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল। প্রতিবৎসরই এইসময়ে উপাধি-প্রদানের সভা হইয়া থাকে, প্রতিবৎসরই শত শত ছাত্র স্বস্ব যোগ্যতা অনুসারে উপাধি ও প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া থাকেন, প্রতি বৎসরই এই উপাধি-প্রদান-সভায় বক্তৃতা হইয়া থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর্ মাননীয় রাজপ্রতিনিধি মহোদয় সভায় উপস্থিত থাকিলেও প্রতিবৎসরই প্রধান-বক্তৃতার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলর্ মহোদয়ের উপরই অর্পিত হইয়া থাকে;—প্রতিবৎসরই আমরা ভাইস্-চেন্সেলর্ মহোদয়ের সারগর্ভ ও সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া আসিতেছি। সুতরাং, অন্যান্য বৎসরে এব্যাপারে কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয় নাই; বাঁধা নিয়ম অনুসারেই সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে; এমন কি ভাইস্-চেন্সেলর্ মহোদয় যে কি বক্তৃতা করিবেন, তাহাও এতকাল শুনিয়া শুনিয়া সকলেই একপ্রকার ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এবারের অধিবেশনে একটু বিশেষত্ব আছে;—বিশেষত্ব আছে বলিয়াই আমরা এবার এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

এবার এই কন্‌ভোকেশনে চেন্সেলর্ মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর উপস্থিত হইতে পারেন নাই; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেক্টর্ বাঙ্গালার গভর্ণর্ মাননীয় শ্রীযুক্ত কারমাইকেল্ বাহাদুর, চেন্সেলরের প্রতিনিধিরূপে, সভা-পতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সমস্ত কার্য্যই যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইয়াছিল; প্রায় দুই হাজারের অধিক ছাত্র উপাধি-লাভ করিয়াছিলেন।

তাহার পরেই বক্তৃতা। সেই বক্তৃতার কথা বলিবার জন্যই আমরা এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এবার বক্তৃতায় বিশেষত্ব ছিল; সে বিশেষত্ব এই যে, যে অক্লান্তকর্ম্মা মহারথ বিগত আট বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-পরিচালনা করিয়াছেন, যাঁহার একনিষ্ঠ চেষ্টায়, যাঁহার প্রাণগত আগ্রহে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি হইয়াছে, সেই ভাইস্-চেন্সেলর মাননীয় বিচারপতি স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই আট বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলরের পদ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক গণ্যমান্য কৃতবিদ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলরের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তাঁহারাও যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন; কিন্তু একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, মাননীয় স্যর্ আশুতোষ যেভাবে এই কার্য্য-পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা কেহই করেন নাই। স্যর্ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার পর, তিনি যেটুকু সময় পাইতেন, তাহাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়াছেন; তিনি, বলিতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয়-ময়-জীবন হইয়াছিলেন। পথেঘাটে, স্বজনে নির্জ্জনে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির কথাই চিন্তা করিয়াছেন। এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ একনিষ্ঠ সাধক অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কতদিক হইতে তাঁহার উপর অজস্র নিন্দা, ভর্ৎসনা, বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি অটল-অচলভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাই কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় আজ এত উন্নত হইয়াছে,—তাই কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ এমন সমৃদ্ধি। সেই স্যর্ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে অবসরলাভ করিলেন এবং বিগত অধিবেশনে কনভোকেশনে সেই বক্তৃতাই হইয়াছিল। সেই কথাগুলিই এবারকার কনভোকেশনের বিশেষত্ব। স্যর্ আশুতোষ এতদিন যে কথা স্পষ্টবাক্যে বলেন নাই, অথচ তাঁহার যেকোন কথার মধ্যেই যাহার আভাস পাওয়া যাইত, এই বিদায়ক্ষণে তিনি সে কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন, বিগত আট বৎসর যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইয়াছিল, যাহার জন্য তিনি নিন্দকগণের নিন্দা, বিদ্রূপ, উপহাস মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ-অদৃষ্টের কথা

ভাবিয়া তিনি চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইয়াছেন,—এ কথা তিনি সে দিন কন্‌ভোকেশন্‌-সভায় সরলভাবে বলিয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষেপে সেই কথা কয়টির মর্ম্ম পাঠক-পাঠিকাগণের গোচর করিব; কিন্তু সেকথা বলিবার পুর্ব্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চেন্‌সেলর্‌ মহামতি শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর এই উপলক্ষে বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুরের নিকট যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম প্রদান করা সঙ্গত মনে করিতেছি।

আমাদের মাননীয় গবর্ণর শ্রীযুক্ত কারমাইকেল মহোদয় কন্‌ভোকেশনের কার্য্য আরম্ভ করিবার পরই শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের পত্র পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের কথা।

"আমি আজ আপনাদের সভায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আমার দুঃখিত হইবার বিশেষ কারণ আছে। এইবার স্যর্‌ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস্‌-চেন্‌সেলর্‌ভাবে শেষবক্তৃতা করিবেন। বিগত আট বৎসর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এবং ইহা বলিলে বোধ হয় অধিক বলা হইবে না যে, তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহার নিজের করিয়া লইয়া ছিলেন ('It is not too much to say that he has made the University his own.') আমি আমার নিজের পক্ষ হইতে এবং ভারত-গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে স্যর্‌ আশুতোষকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি বিগত আট বৎসর যেভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য সুপরিচালিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেই হইবে।"

ইহার পরই মাননীয় বড়লাট বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ভারত-গভর্মেণ্ট্‌ স্যর আশুতোষের পদে যাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন, তিনি আপনাদের সকলের নিকটেই সুপরিচিত; তিনি আপনাদের এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত বহুদিন হইতে বিশেষভাবে সংসৃষ্ট হইয়া আছেন,—তিনি ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়। বোধ হয় আমার একথা ঠিক যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সর্ব্বপ্রথম বেসরকারি-ভাইস্‌-চেন্‌সেলর্‌ হইলেন। সে যাহাই হউক, আমি আমার পক্ষ হইতে, এবং গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে, তাঁহাকে বলিতেছি যে, পুর্ব্ববর্ত্তী যেসকল মহাশয়ব্যক্তি এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি যেভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য সুপরিচালিত করিয়া গেলেন, তিনিও সেইভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধন করিয়া এই পদের গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন ("I can assure him, on behalf of myself and the Government of India, of our earnest desire that his period of Office may be fully as useful and distinguished as that of the most illustrious of his predecessors.")
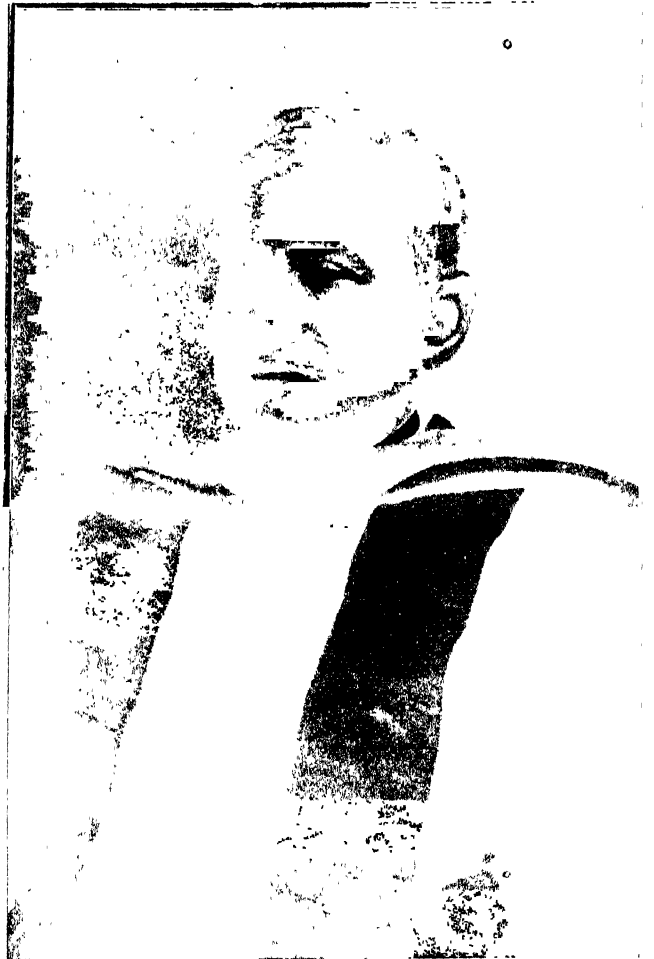
ডাক্তার—শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
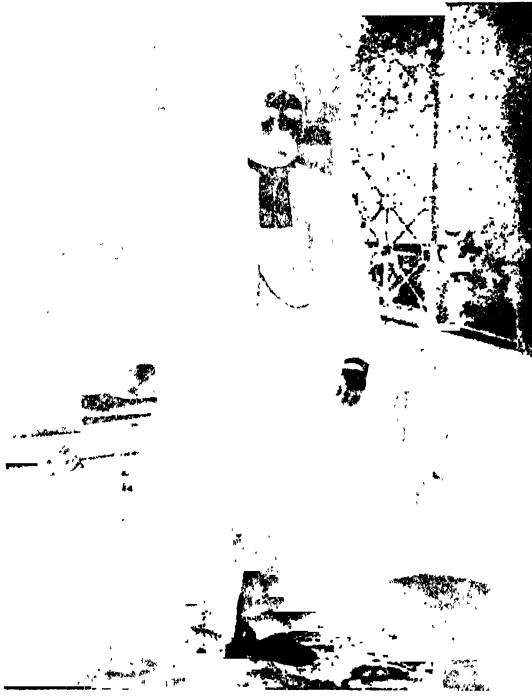
ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এইবার শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষের বক্তৃতার কথা—

স্যর্ আশুতোষের বক্তৃতা

বিগত বৎসরের বিবরণ বিজ্ঞাপন করিয়া তিনি বলিলেন, "এইবার আমি আর একটি কথার অবতারণা করিব। এই কথাটি আমি না বলিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না, কারণ কথাটি বিশেষ প্রয়োজনীয়; আমি কর্ত্তব্য-প্রণোদিত হইয়াই কথাটি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। পূর্ব্বে অনেকবার আমি এই কন্‌ভোকেশন্‌-উপলক্ষে বক্তৃতা করিয়াছি, কিন্তু কোনবারেই আমি সেকথার উল্লেখ করি নাই! কথাটি সর্ব্বদাই আমার মনে হইত, এবং একাধিকবার আমি তাহা প্রকাশ করিবার জন্য প্রলুব্ধও হইয়াছি; কিন্তু আমি আমার সেইচ্ছা এতদিন সংবরণ করিয়া আসিয়াছি। এবার আমি কথাটি বলিব, কারণ এবার আমি আমার পদ হইতে অবসর-লাভ করিতেছি। এই সময়ে কথাটি স্পষ্টভাবে মনখুলিয়া বলা, আমি আমার পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। কথাটি এই যে,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান অবস্থার কতটা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অধিকার দাবী করিতে পারে। এই কথাটি বহুদিন হইতেই আমি ভাবিতেছি; ইহা আমার হৃদয়কে বিশেষভাবে আন্দোলিত করিতেছে;—তাই আমি এই কথা সভাস্থলে উপস্থিত করিতেছি। ('The question which agitates my mind is that of the degree and measure of ultimate independent authority which a Corporation such as the University of Calcutta is entitled to claim.') বিশ্ববিদ্যালয়মাত্রেই রাজকীয় বিধি-ব্যবস্থার অধীন হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে; প্রধান-রাজপুরুষেরা যেসমস্ত বিধান করেন, তদনুসারেই ইহার কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় কি করিবে না করিবে, তাহাও বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কিভাবে বিধি-ব্যবস্থার অনুগত হইয়া কার্য্য-পরিচালনা করিতেছেন,—প্রধান-রাজপুরুষগণ তাহা দেখিয়া থাকেন, এবং সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কেই দায়ী করেন। এমনও হইতে পারে যে, কোন বিশ্ববিদ্যালয় যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-কার্য্যে ত্রুটী প্রদর্শন করিতেছেন, বা বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিতেছেন; সেস্থলে গভর্মেণ্ট্‌ তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, এবং যথাযোগ্য উপায় ও প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এপ্রকার স্থলে গভর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণ সঙ্গত; কিন্তু যেখানে এপ্রকার কোন কার্য্য-শৈথিল্যের প্রমাণ নাই, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার সম্মান রক্ষা করিয়া কার্য্য-পরিচালনা করেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির ব্যবস্থা করেন, সেস্থানে রাজপুরুষগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-সঙ্গত কার্য্যের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করাই যে শ্রেয়ঃ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এমনও হইতে পারে যে, গভর্মেণ্ট্‌ কোন বিশ্ববিদ্যালয়সম্বন্ধে এমন অনেক ত্রুটীর কথা জানিতে, বা বুঝিতে পারিয়াছেন, যাহা বিশ্ববিদ্যালয় জানিতে বা বুঝিতে পারেন নাই; এঅবস্থায় গভর্মেণ্ট্‌ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করেন, এবং তাঁহাদের ত্রুটীর কথা বুঝাইয়া দিয়া প্রতীকারের ব্যবস্থা করেন, তাহাও যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। এই সকলস্থলে, কেহই গভর্মেণ্টের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করিতে পারেন না; কারণ ইহা সম্পূর্ণ সঙ্গত। কিন্তু যখন আমরা বিশেষ কোন ব্যাপারের কথা চিন্তা করি, তখনই গোল

বাধিয়া উঠে,—তখনই অসুবিধা উপস্থিত হয়,—তখনই আমরা বুঝিতে পারি না যে, গভর্মেণ্টের কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য, কোন্ স্থানে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত,—কতদূর পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে ন্যায়তঃ অধিকারী, কারণ ইহারই উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। ("The doubts and difficulties begin when we come to concrete cases, and try to define the exact line which separates the sphere within which, what for the sake of brevity I will call Government interference, is justified from the sphere within which the University authorities in the interest of efficient discharge of duty, should be allowed absolutely free-hand.) আমি কথাটা খুলিয়াই বলিতেছি,—এই তিন বৎসরের মধ্যে গভর্মেণ্ট্ আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কএকটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যাহা অকারণ বলিয়া অভিহিত না করিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না।"

তাহার পর স্যর্ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট্ ও সিণ্ডিকেটে যে সমস্ত শিক্ষিত ও দেশের শীর্ষস্থানীয় ভদ্রলোক ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, এবং তাঁহাদের কার্য্য-কুশলতা ও দায়িত্ব-বোধ সম্বন্ধে সকলেই উচ্চ-ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। সেনেট্ ও সিণ্ডিকেটে যেসকল সদস্য আছেন, তাহার মধ্যে শতকরা নব্বইজনই গভর্মেণ্টের মনোনীত ব্যক্তি।' এই কথা বলিয়াই স্যর্ আশুতোষ বলিতেছেন, "এই সেনেট্ ও সিণ্ডিকেটের সদস্যগণ যে গভর্মেণ্টের বিশ্বাস-ভাজন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না; সুতরাং তাঁহারা স্বাধীনভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে, বিধিসঙ্গত ব্যবস্থা করিবার সম্পূর্ণ-অধিকারী, একথা অস্বীকার করিবার উপায় আছে কি? কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে কি?—বিগত দশ বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-পরিচালনার ইতিহাস আলোচনা করিলে সকলেই বলিবেন,—সে সুবিধা, বা সে অধিকার, প্রদত্ত হয় নাই। অবশ্যই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যমহোদয়গণ আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন—আমি যাহা অনুভব করিতেছি, তাঁহারাও তাহা অনুভব করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে সাতবার আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলর্ রূপে এই উপাধি-প্রদান-সভায় বক্তৃতা করিয়াছি। আট বৎসর পূর্ব্বে ভারত-গভর্মেণ্ট্ আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ গৌরবের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; আর কএকদিন পরেই আমি সে পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিব। আট বৎসর বড় কম সময় নহে; কিন্তু দিন-মাস সময়ের পরিমাপক নহে,—কার্য্যই সময়ের পরিমাপক!—এই আটবৎসরে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় অনেক কাজ করিয়াছেন; আমি ত মনে করি, এই আট বৎসরে বহুবৎসরের কাজ হইয়াছে। এই আট বৎসর আমি প্রাণপণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছি। আমি—একা আমি নহি,—আমরা সকলে মিলিয়া এই দীর্ঘকাল ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়াছি; দিবানিশি অক্লান্তভাবে খাটিয়াছি;—আমরা প্রচুর ফলের আশায় আশান্বিত হইয়াছি। যাহাতে আমাদের ছাত্রগণ সর্ব্ববিষয়ে স্বাস্থ্যলাভ করে, তাহার জন্য আমরা একাগ্রচিত্তে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি; আমরা এই ফল-লাভের জন্য সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া ভূমি-কর্ষণ করিয়াছি। এখন তাহার প্রথম ফল ফলিতেছে!—কিন্তু যখনই আমি বিগত কএক বৎসরের কথা মনে করি, তখনই আমার হৃদয়ে এই চিন্তার উদয় হয় যে,—ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কি হইবে? ইহা কি সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবে?—ভাবিয়া আমি সত্যসত্যই ভীত হইয়া পড়ি। এতদিন যে সকল প্রতিকূলতার বাধা আমরা কাটাইয়া আসিয়াছি, সেসকল এখনও দূর হয় নাই, এখনও প্রতিকূলাচরণের যথেষ্ট ভয় রহিয়াছে। আরও অধিক ভয়ের কারণ এই যে, প্রতিপক্ষ হয় ত অনেক সময়ে অন্ধকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিতেও পারেন। যে অঞ্চল হইতে আমরা সম্পূর্ণ সহানুভূতির আশা ও দাবী করিয়াছিলাম,—সেথান হইতে তাহার বিপরীতই পাইয়াছি। আরও ভয়ের কারণ এই যে,—হয়ত, ভবিষ্যতে দৃঢ়তার অভাব এবং দুর্ব্বলতার প্রভাব হইলে, নিতান্ত কাপুরুষের মত কেহ কেহবা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া, ন্যায় ও বিধি ব্যবস্থার মর্য্যাদা-রক্ষার

জন্য অকুতোভয়ে অগ্রসর না হইয়া, কোন রকমে একটা রফা-নিষ্পত্তি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অকল্যাণ সাধন করিতে পারেন্।

"এই সকল ভবিষ্যৎ বিপদ ও আশঙ্কার চিত্র আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। মাঠে শস্য পাকিয়া উঠিতেছে, এমন সময়ে আকাশে মেঘের সঞ্চার ও আড়ম্বর দেখিলে কৃষকের হৃদয় যে প্রকার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে, আমারও অবস্থা তাহাই দাঁড়াইয়াছে। তবে এখন আমার আর কোন উপায় নাই!—আমি এখন সুধু আশা করিব, সুধু বিশ্বাস করিব, সুধু ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করিব। আমি দেখিতেছি,—একটা নবভাবের উদয় হইয়াছে; আমার মনে হইতেছে, এভাবের নির্ব্বাণ হইবে না;—ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনার ও আশার সূত্র। আমি এখন আমার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিব; যাঁহাদের সহিত মিলিয়া এতকাল কার্য্য করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যদিও আমি চিন্তিত হইয়াছি, তবুও এতকাল যে কার্য্য করিয়াছি, তাহার বর্ত্তমান সাফল্য-দর্শনে আমি মনে মনে সন্তোষ লাভ করিতেছি। অবশেষে, আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে প্রার্থনা করি,—আমাদের এই শিক্ষা-জননীর যেন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। যাহার জন্য আমি এতকাল প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি, তাহার শ্রীবৃদ্ধি যেন দেখিয়া যাইতে পারি। সকল মঙ্গলালয় মহাশক্তির নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, তদপেক্ষা গরীয়সী আমার জন্মভূমির যেন কল্যাণ সাধিত হয়।"

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষ আসন গ্রহণ করিলে,

মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল

বলিলেন,—"যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছিলাম, তাহা শেষ হইল। আর এক মিনিট পরেই কন্‌ভোকেশনের বর্ত্তমানবর্ষের কার্য্য পরিসমাপ্ত হইবে। এই সুযোগে আমি, আপনাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষকে ধন্যবাদ করি, এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত চেন্‌সেলর্ মহোদয় স্যর্ আশুতোষ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, যে ভাবে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ দিই। মাননীয় শ্রীযুক্ত চেন্‌সেলর্ বাহাদুর তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে ও ভারত-গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন; কিন্তু সুধু তাঁহারাই কৃতজ্ঞ নহেন। আমি বলিতে পারি যে, সুধু গভর্মেণ্ট কেন?—সুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ কেন? বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিই স্যর্ আশুতোষের নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়। এই আট বৎসর তিনি যেভাবে কার্য্য করিয়াছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি যেপ্রকার পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন,—সেকথা স্মরণ করিয়া তিনি সত্যসত্যই গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন। অতি কম লোকেই তাঁহার মত পরিশ্রম করিতে পারেন,—তাঁহার কার্য্য-কুশলতা অসাধারণ! তিনি হাইকোর্টের একজন বিচারপতি;—কিন্তু কেহই বলিতে পারিবেন না যে, তিনি সেই গভীর দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার কার্য্যে কোন ত্রুটী প্রদর্শন করিয়াছেন; এই গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার পরও তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে অপর কোন ব্যক্তিকে সমস্ত সময় নিয়োজিত করিতে হইত।"

তাহার পর শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষকে উদ্দেশ করিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত গভর্ণর বাহাদুর বলিলেন, "ভাইস্-চেন্‌সেলর্ মহোদয়, আপনি আপনার বক্তৃতায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিলেন, এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও গরিয়সী আপনার মাতৃভূমির মঙ্গল-কামনা করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট যে প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে আমরা সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং এই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়।"

স্যর্ আশুতোষ ও ডাক্তার দেবপ্রসাদ

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ

করিলেন এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় সেই পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীযুক্ত স্যর্ আশুতোষ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কি করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীকে আবার কি নূতন করিয়া বলিতে হইবে? আজ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার জন্য সকলকেই একবাক্যে স্যর্ আশুতোষকে ধন্যবাদ করিতে হইবেই। তিনি আট বৎসরে যাহা করিয়াছেন, আর কেহ তাহার দ্বিগুণ সময়েও তাহা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। এজন্য তিনি গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন। আমরা স্যর্ আশুতোষের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। যতদিন কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে, ততদিন স্যর্ আশুতোষের নাম স্বর্ণাক্ষরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে লিখিত থাকিবে।

তাহার পর, আমরা শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়কে অভ্যর্থনা করিতেছি। ডাক্তার দেবপ্রসাদের পরিচয় দিতে হইবে না। বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীকে জানেন না। আমরা বিগত সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' ডাক্তার দেবপ্রসাদের সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিয়াছি। মাননীয় স্যর্ আশুতোষের পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইবেন, এই জনরব শুনিয়া আমরা তখন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখন আমরা তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আমরা জানি, আমাদের বিশ্বাস আছে,—স্যর্ আশুতোষ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যে প্রকার যত্নচেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন,—আশা করা যায় ডাক্তার দেবপ্রসাদও তদনুরূপ করিতে পারিবেন। আমাদের স্থির ধারণা, তাঁহার হস্তে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

পল্লীবাসিনী

এলো-খোঁপা, লালপাড় বেগুণি বর্ণের তব সাড়ি।—
হে পল্লীবাসিনী! তুমি গিয়া কোন্ অমৃত-সরসে,
রভসে হরষে সুধা-ভরিয়াছ আনন্দ-কলসে?
চমকি' থমকি' কেন দাঁড়াইয়া? চুড়ি বেলোয়ারি,
মণি-মাণিক্যের মত ঝলকিছে, ধরিত্রী উজ্জারি,
মোহন শ্রীহস্তে তব!—ভাল তব, সিন্দুর-পরশে,
কি সুন্দর! কি সুন্দরী পদ্মরাস চৌদিকে বরষে
যেন আবিরের ধারা! জয় জয়, অয়ি বরনারি!
অঞ্চলে রেখেছ বাঁধি' বুঝি বিশ্ব-রহস্যের চাবি?—
যাও যাও গৃহমণি! গৃহে ফিরি,—চাবি দিয়া তব
খুলি' গুপ্ত-রত্নাগার দেখাও ঐশ্বর্য্য নব নব;—
সৌরভে ভরিয়া দাও, খুলি' হৃদয়ের মৃগনাভি।
হে জাগ্রত বঙ্গলক্ষ্মী! উচ্চে শঙ্খবাজাইয়া, সতি!
প্রীতি-বিশ্বদেবতার কর কর সধূপ আরতি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

য়ূরোপে তিনমাস

১৯শে মে শনিবার—অতিপ্রত্যুষে পূর্ব্বকথিত সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মহিলাটি দেখা করিতে আসিলেন। সুশ্রী, সুগঠন ও সুবেশ। অচঞ্চল স্বাধীনতা স্ত্রীজনোচিত অপ্রগল্ভ, ও সুকুমার সলজ্জ ব্যবহার অতি মনোরম। পুরুষ-অভিভাবকের বিনা সাহায্যে অপরিচিত পুরুষের নিকট অসঙ্কোচে আসিয়া নিজ প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া ও যথাযথ ব্যবস্থা লইয়া চলিয়া গেলেন। ইনি কোন সর্দ্দার-বংশের মহিলা। ষ্টেট্ সেক্রেটারীর সহিত বহুদিনব্যাপী পত্র-সংগ্রামেও বংশাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হইয়া, অপরিচিতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমার মহারাষ্ট্রী জানা নাই, তিনিও ইংরেজি জানেন না। ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে কথাবার্ত্তা এক প্রকার শেষ হইল।

বিদায়ের প্রাক্কালে স্থানীয় বাঙ্গালী ও বম্বে-নিবাসী বন্ধুগণ আমায় যে কতদূর যত্নআত্মীয়তাতে আপ্যায়িত করিলেন, তাহা বলিবার নয়। বাড়ীর মায়া কাটাইয়া আসিয়াও আবার এই দূরদেশস্থ নূতন পুরাতন বন্ধুদিগের মায়া—নূতন করিয়া—কাটাইতে, বিদায়-যাতনা ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ইঁহারা Ballard Piers পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিলেন। স্থানীয় পদ্ধতি অনুসারে বহুমূল্য জরি ও ফিতা দিয়া সুসজ্জিত ফুলের মালা, তোড়া দিয়া কত যে সম্মান-যত্ন করিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদের মধুর আপ্যায়নে আমি যেন মুগ্ধপ্রায় হইয়া গেলাম। বিদায়দান, ও প্রত্যাবর্ত্তনকালে সমুদ্রগামী বন্ধুবান্ধবগণকে মাল্যবিভূষিত করার প্রথা এখানে প্রচলিত খুব অধিক দেখিলাম। বন্দরদ্বারে লোকে লোকারণ্য। ফটকের উপরেই এই শ্রেণীর মালা ও তোড়ার রীতিমত হাট বসে। যাহার বন্ধুসংখ্যা যতবেশী, তাহার মাল্যসংখ্যাও তদনুরূপ। ইংরেজ ও ভারতবাসী সকলেই এ সম্মান পান। আমার ভাগ্যেও পূর্ণমাত্রায় এ সম্মান পাইলাম। যাত্রী অপেক্ষা যাত্রীদের এইরূপ বন্ধুবান্ধব—লোকজন—দশগুণ; কিন্তু বন্দরের নিয়ম অনুসারে তাহাদের ভিতরে যাইবার অধিকার নাই। কতক জিনিসপত্র ষ্টেশন্ হইতে গত কল্যাই 'কুক্ এণ্ড সন্স্'এর জিম্মা করিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতে খরচ কিছু অধিক হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা তাহাই সুবিধা। বাকী জিনিসপত্র কুকেদের লোকের জিম্মা করিয়া দিলাম। সঙ্গে রহিল,—কেবল ছাতা ও বেদনাযুক্ত পায়ের অবলম্বন লাঠি; আর রহিল—ফুলমালার রাশি। চারিদিকের লোক চাহিয়া দেখিয়া বোধ হয় ভাবিতে লাগিল যেন এই একটা অপরিচিত নগণ্য বিদেশী-লোককে এত ফুলমালায় বিভূষিত করিল কে?

বন্দরে প্রবেশ করিবার সময় ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষার অভিনয় হইল। প্লেগ-আবির্ভাবের পর হইতে এই অভিনয় অব্যাহত রহিয়াছে; কিন্তু এখন তাহা মারাত্মক নহে। সভ্য-ভদ্র-ভাবে একবার হাত দেখিয়া, আর "কেমন আছেন?" জিজ্ঞাসা করিয়া ডাক্তার-সাহেব প্লেগ বসন্ত ওলাউঠা ইত্যাদি সার্ব্বজনীন মহামারী সম্বন্ধে অনুসন্ধান-শেষ করিয়া সভ্য য়ূরোপকে মাভৈঃ বলিয়া অভয় দিলেন। একখানা ছাপা সার্টিফিকেট্ দিয়া তাঁহার কাজ শেষ হইল। "কালা" চাকরচাকরাণীর ব্যবস্থা অন্যরূপ। "অদল বদলের" ভয়ে তাহাদের হাতে একটা রবার ষ্টাম্পের ছাপ দিয়া মোহর করিয়া দেওয়া হয়। Government of Indiaর Finance Member, Sir Guy Fleetwood Wilson এই জাহাজে যাইতেছেন। তিনি পরে গল্প করিলেন যে, ডাক্তারপুঙ্গবের তিনি প্লীহা চমকাইয়া দিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। "কেমন আছেন?" কথার উত্তরে Sir Guy ডাক্তারকে রহস্য করিয়া অথচ গম্ভীরভাবে বলেন, "It is my duty, Doctor, to inform you that I am suffering from a loathe-some and incurable disease." ডাক্তার চমকিয়া লাফাইয়া উঠিয়া অ্যাঁ—অ্যাঁ—করিতে লাগিলেন। Sir Guy স্বয়ং এই কবুল জবাব দিলেন, অথচ তাঁহার মত লোককে আটকান যায় কি প্রকারে! ডাক্তারের বিষম-সমস্যা দেখিয়া Sir Guy হাসিয়া বলিলেন, "And that disease is, old age."—তখন ডাক্তার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। Sir Guy অবিবাহিত;—নতুবা যযাতির মত পুত্রের যৌবন-ঋণ লইতে উপদেশ দিলেও দেওয়া যাইত!

জাহাজ তীরের নিকট আসিতে পারে না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তীর হইতে প্রায় একমাইল দূরে নঙ্গর করিয়া

আছে। ছোট 'টেণ্ডার্' জাহাজ কএকবার যাতায়াত করিয়া যাত্রী পৌঁছিয়া দিতেছে। দুইটি পরিচিত মুসলমানের পুত্র ব্যারিষ্টার হইবার জন্য চলিয়াছে। তাহারা আগ্রহ করিয়া আসিয়া আলাপ করিল। Second classএ যাইতেছে বলিয়া, পরে তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা হইবে না বলিয়া, দুঃখ প্রকাশ করিল। জাহাজে জাতিভেদ নাই বটে, কিন্তু "শ্রেণীভেদ"টা খুব গুরুতর! জাহাজের দূরস্থ ভিন্ন ভিন্ন পৃথক্ অংশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থান। পরস্পরের সহিত দেখাশুনা প্রায় অসম্ভব।—টেণ্ডার্ ডাঙ্গা ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় আঁতুড়ের ছেলে লইয়া এক য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক আসিয়া পড়িলেন। নিয়মের এমনই বাঁধাধরা যে, এক সেকেণ্ড বিলম্বের অপরাধে, তাহার জন্য জাহাজ ফিরিল না। রৌদ্রে ছাতা মাথায় দিয়া ছেলে কোলে লইয়া পুনরায় টেণ্ডার্ ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। ডাক্তার সাহেব ছেলেখেলার যে সার্টিফিকেট্ দিয়াছিলেন, তাহা পুলিসকে দেখাইয়া তবে সকলকেই টেণ্ডারে উঠিতে হয়। Sir Guy Fleetwood-কে পর্য্যন্ত তাহা দেখাইতে হইল।—ইংরেজদের যেখানে যেমন!—এইরূপ Sense and Spirit of Discipline—ইহাতেই সব দোষ শোধরাইয়া যায়। ইহার প্রয়োজনীয়তা আমরা সকলে এখনও বুঝি নাই, তাই "মেকী"-স্বাধীনতার এত চলন, ও তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা!—শিক্ষার ও সংযমের যথার্থ অভাব এইরূপেই প্রকাশ পায়!

টেণ্ডার্ ছাড়িয়া দিল। কত কথা মনে হইতে লাগিল। কত অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল,—লেখনী বা জিহ্বা কখন তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারিবে না। ভুক্তভোগী ব্যতীত সে বিষয়ে যথার্থ সহানুভূতি কেহ করিতে পারিবে না। তাই আবার Byron, Washington Irving-কে মনে পড়িল। কাতর সতৃষ্ণনয়নে ভারতের শেষরেখার দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে চলিলাম। যতক্ষণ টেণ্ডার্ বড়জাহাজের নিকট যাইতে লাগিল, ততক্ষণ বড়জাহাজের দিকে লক্ষ্য বা ভ্রূক্ষেপ করি নাই! কারাদণ্ডের অনুমতির পর, জেলের গাড়ীর দিকে রক্ষী যখন হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কয়েদী তখন Black Mariaর বীভৎস রূপের দিকে লক্ষ্য করেনা। যাহাদের ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের সম্পর্কীয় যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহারই দিকে শেষপর্য্যন্ত চাহিয়া থাকে; এমন কি, আদালতের দরজার দিকে পর্য্যন্ত সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকে। বম্বের ও বম্বের লোকের সহিত আমার পরিচয় ২৪ ঘণ্টা মাত্র! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা, বধূ, বন্ধু ও অন্যান্য প্রিয়জন সব দূরে—কতদূরে রহিয়াছে! নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবার মত লোক, বম্বেতে কেহ উপস্থিত নাই! বম্বের বন্ধুগণ—যাঁহারা বিদায় দিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা—বন্দরের ফটকের বাহিরে। তথাপি বন্ধুশ্রেণী বম্বেবাসীর উপর হইতে চোখ পালটাইতে পারিলাম না; নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম।—বিদায় ভারতবাসী!—বিদায় ভারত! ম্লানিম্লান-নয়নে "Arabia" জাহাজের প্রতি দৃষ্টিমাত্র অমঙ্গলচিহ্ন নয়ন গোচর হইল; শিহরিয়া উঠিলাম! মাস্তুলের অদ্ধপথে জাহাজের নিশান উড়িতেছে! এই আর্ত্ত-চিহ্ন যেন আমারই গুরুভার হৃদয়ের অস্ফুট অভিব্যঞ্জনা মাত্র। এই অমঙ্গলচিহ্নের কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম যে, গত কল্য ডেনমার্কের রাজার মৃত্যু হইয়াছে। আত্মীয় ইংরেজ-রাজ তাঁহার স্মৃতির প্রতি,—বন্দরে বন্দরে সম্মান দেখাইতেছেন। জাহাজের সিঁড়ি লাগাইতে, লোক উঠিতে, কিছু বিলম্ব হইল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন-পথে যাইতেছি না, যে ব্যস্ততার প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত মুসলমান যুবক দু'টি নূতন-উদ্যমে যাইতেছে। তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। যত্ন ও ভক্তিভরে ফুলের তোড়া তাহাদিগকে উপহার দিলাম। ফুলমালার সে উজ্জ্বল-হাস্য যেন তখন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। কলিকাতায় Seekers' Club, Shakespeare Society, Anti-smoking Union, রায় বাহাদুর যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাটী প্রভৃতি স্থানে আমায় বিদায় দিবার জন্য বন্ধুগণ যে সব সভাসমিতির আয়োজন করিয়াছিলেন, সেখানেও ফুলরাশির ছড়াছড়ি হইয়াছিল; আমার প্রিয়-জনেরা যত্ন-আহ্লাদ আদর করিয়া সেগুলি তুলিয়া গুছাইয়া রাখিত; তাহাতে ফুলের শোভা ও মূল্য দ্বিগুণ হইত। মালা-তোড়ার প্রাচুর্য্যে প্রাণাধিক সেই সকল প্রিয়জনকে বার বার মনে পড়িতে লাগিল। স্মরণচিহ্নস্বরূপ মালা গাঁথার ফিতাগুলি তাহাদের জন্য রাখিয়া ফুলগুলি সমুদ্র-দেবের পূজায় ক্রমে ক্রমে অঞ্জলি দিলাম।

জাহাজে উঠিবামাত্র কর্ম্মচারীরা ফার্ষ্টক্ল্যাস্ এইদিকে, সেকেণ্ডক্ল্যাস্ এইদিকে, বলিয়া পথনির্দ্দেশ করিতে লাগিল। আমার Cabinএর নম্বর বলিতেই Cabin Steward আমার কামরায় লইয়া গেল। তাহাদের যত্নভক্তি নমস্কার, আর প্রতিপদে "মহাশয়" "মহাশয়" (Sir) উক্তি শুনিয়া, আমাদের চাকর-মহাশয়দের সহিত তাহাদের প্রভেদ বুঝিলাম। ইহাদের বেতন অধিক বটে, আর মার-গালাগালি-কটূক্তিও ইহারা সহ্য করে না; কিন্তু "ঠোঁটে ঠোঁটে" কাজ যোগায়, কোন কথা বলিতে হয় না, ধমকাইতে হয় না। বিছানারচাদর, বালিস, তোয়ালে, সাবান, প্রয়োজনীয় সমস্ত আস্‌বাব্, মায় (Springএর) খাট, কার্পেট, চেয়ার, আলমারী, আলনা, দিয়া ঘরসাজান। এক ঘরে তিনজন লোক থাকার নিয়ম। জাহাজের সম্মুখভাগ বেশী দোলার জন্য গা-বমি করিবার ভয়ে, আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরা ছাড়িয়া, আমি জাহাজের মাঝামাঝি একটা ঘর চাহিয়াছিলাম; কিন্তু জিনিসপত্র লইয়া দুইজন অপরিচিত লোকের সহিত ১৫ দিন ক্রমাগত একত্র থাকার মহা অসুবিধা। এইসব কথা ভাবিতেছি, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে স্বতন্ত্র একটি ঘর আমার একেলার দখলেই থাকিবে। Steward জিনিস-পত্রগুলি নূতন ঘরে আনিল। অসুরের মত কি অক্লান্ত পরিশ্রমে Steward, যাত্রীদের জিনিসপত্র যথাস্থানে নিমেষের মধ্যে রাখিয়া, তাহাদের সকল রকমের সুবিধা করিয়া দেয়, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না! আমার এক চাকর আছে, তাহাকে যেকাজ করিতে বলা যায়, সে তখনই উত্তর করিয়া বসে,—"আমরা তাঁতিমানুষ, ওসব আমাদের কাজ নয়"; একথাটা যে কিছুদিন শুনিতে হইবে না, ইহা পরম লাভ—ইহাতে নিরানন্দের মধ্যেও কিছু আনন্দ বোধ হইল। জুতা সাফ্‌করা, কাপড় গুছান, জল দেওয়া, বিছানা করা, ঘরঝাড়া, ইত্যাদি Cabin Stewardএর কাজ। Table Steward, যে যেমন খাইতে চায় তাহার বন্দোবস্ত করিতেছে; Deck Steward ডেকের উপর চেয়ারটি খুঁজিয়া যথাস্থানে পাতিয়া রাখিতেছে; খাবার জল, Lemonade, প্রভৃতি যে যাহা চায়, অম্লান বদনে সত্বর যোগাইতেছে; খেলাধুলার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। যেন কলে কাজ চলিতেছে। ভুলিয়া একটা কল টিপিয়া ধরিতে Bell Steward আসিয়া হাজির; সেই ঘণ্টায় ঘা দিলেই তাহাকে উপস্থিত হইতে হইবে। একদিন অনেক রাত্রে খাবার জল না থাকাতে, জলের জন্য এই বালকটিকে ডাকিয়া তাহার ঘুমঘোর চোখ দেখিয়া দুঃখ হইয়াছিল।

R. M. S. MANTUA
First Class. Dining Saloon.

কথায় কথায়, চাকরবাকরদের কথা বলিতে বলিতে, আসল কথা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কএকবার টেণ্ডার যাতায়াত করাতে সব যাত্রী ও মাল জাহাজে আসিয়া পৌঁছিল; কিন্তু Punjab মেল দুই ঘণ্টা "লেট" ছিল, সে মেল আসিয়া না পৌঁছিলে জাহাজ ছাড়িতে পারে না। বেলা ৪টার সময় সে মেল আসিয়া পৌঁছল; তখন আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন, অপরাহ্ন জলযোগ এবং চা-পান হইয়া গিয়াছে। আহারের নিয়ম,—সকাল ৬টার সময় চা, বেলা ৮টার সময় প্রাতর্ভোজন, ১২টার সময় এক বাটী সুপ্, ১টার সময় রীতিমত জলযোগ (Lunch), ৪টার সময় চা, ৭টার সময় সায়ং ভোজন (Dinner), রাত্রি ১১টার সময় ইচ্ছা করিলে কিছু (Supper); দিন রাত্র আহার, নিদ্রা-গল্প, অপদার্থ-নভেলপাঠ, মাঝে মাঝে জালদিয়া ঘিরিয়া

ক্রিকেট্-ক্রোকেট্ ইত্যাদি খেলা, কখন কখন নাচগান এবং জাহাজ প্রতিদিন কতবার চলিতেছে তৎসম্বন্ধে বাজী-রাখা, সাধারণ সাহেব-মেমদের কাজ। জাহাজের কর্ম্মচারীদের "Duty"র সময় এই সকল আমোদপ্রমোদে যোগদান করা নিষিদ্ধ; আহারের সময় কাপ্তেন্ সাহেব প্রধান আসনে বসিলেন, Sir Guy Fleetwood তাঁহার দক্ষিণে, তার পর যে যার নির্দ্দিষ্টস্থানে বসিলেন। আমাদের প্রথম-নির্দ্দিষ্ট আসনের নিকট দুইজন মাতাল গ্রীক্ ও দুইজন অভদ্র মুসলমান ছিল বলিয়া, আমরা ক্রমশঃ যোগাড় করিয়া স্বতন্ত্র টেবিলে নিজেদের আবশ্যক ও মনের মত যোগাড় করিয়া লইলাম।

Punjab Mail আসিয়া পৌছিবামাত্র জাহাজ ছাড়িয়া দিল। E. I. R.এর Agent Sir William Dring সেই সঙ্গে আসিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর, তাঁহার অকালমৃত্যু বন্ধুমাত্রেরই বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। কলিকাতার প্রধান সওদাগর Sir George Sutherland ও Sir Arthur Allen পরিচিত লোক। Sir Guy Fleetwood ও এই সকল উপাধিপ্রাপ্ত বড় বড় সাহেব এত যত্ন-খাতির করিয়া কথা কওয়াতে, সাধারণ Anglo-Indian-দলকে বিশেষ নরমভাবাপন্ন দেখিলাম। জাহাজে বাঙ্গালীবাবুর উপর সাহেবের অত্যাচার-অপমানের গল্প যত শুনিয়াছি, তাহার ত কিছুই দেখিলাম না! যাহারা নিজের মান রাখিতে পারে না, যাচিয়া অগ্রসর হইয়া আলাপ করিতে চায়, অথচ ভদ্রব্যবহার পর্য্যন্ত জানে না,—তাহারা যে মাঝে মাঝে নরপশুগণের নিকট অপমানিত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? নিজের মান নিজে রাখিয়া, পিছাইয়া থাকিলে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া ত অধিক সহজ, এবং পশু-সান্নিধ্য সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। মানুষের সহিত মানুষের সদ্ভাব হইতে অধিকক্ষণ লাগে না; চামড়ার রং এর তফাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আর নরপশু কৃষ্ণকায় হউক—শ্বেতকায় হউক—সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য; প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাদের দিকে পিছু ফিরিয়া থাকিলে, তাহারা মাথায় উঠিবার অবকাশ পায় না। এ সম্বন্ধে একটু নাড়ীজ্ঞান প্রয়োজন।—জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সান্ধ্যঅন্ধকার ক্রমশঃ বম্বে সহর, তাহার গির্জ্জা বন্দর Light House তাজমহল হোটেলের ঈষৎ সবুজবর্ণ গম্বুজ, আক্রমণ ও গ্রাস করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভারতের ক্রোড় হইতে দূরাদপি দূরে পড়িতে লাগিলাম। বাহিরে আঁধার ভিতরেও আঁধার; আঁধারে জগৎ ছাইয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে সব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল। আকুল প্রাণের ব্যাকুল নিঃশ্বাস বিদায় প্রার্থনা করিয়া ভারত-বায়ুস্তরের নিকট বিদায় লইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

ছিন্নহস্ত

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—ব্যাঙ্কার্ মঃ ডরজারস্ বিপত্নীক। এলিস্ তাঁহার একমাত্র কন্যা, ম্যাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভিগ্‌নরী খাজাঞ্চি, রবার্ট্ কার্ণোয়েল্ সেক্রেটারী, জর্জ্জেট্ বালকভৃত্য; ম্যালিকম্ দ্বারপাল, ডেনলেভ্যাণ্ট্ শান্ত্রী। একরাত্রে তাঁহার বাটীতে ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম্ নিশাভোজে আসিয়া দেখে, মালখাজনার লৌহসিন্দুকের বিচিত্র কলে কোন রমণীর সদ্য-ছিন্ন বামহস্ত সম্বদ্ধ! তৃতীয় ব্যক্তিকে না জানাইয়া, ম্যাক্সিম্ সেটা নিজের কাছে রাখিল।

রবার্ট্, এলিসের পাণি-প্রার্থী; এলিসও তদনুরক্ত। বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার্ কিন্তু ভিগ্‌নরীকে জামাতা করিতে ইচ্ছুক নন্। তাই তিনি রবার্ট্কে মিশরস্থিত স্বীয় কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন। রবার্ট্ তাহাতে অসম্মত—সেই রাত্রেই তিনি দেশত্যাগ করিলেন।

রুশরাজের বৈদেশিক শত্রু-পরিদর্শক কর্ণেল্ বোরিসফের ১৪ লক্ষ টাকা ও সরকারী কাগজপত্রের একটি বাক্স এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিন বলেন, পরদিন কিছু টাকা চাই।—কথামত কর্ণেল্ প্রাতেই টাকা লইতে আসিলে ভিগ্‌নরী দেখেন, খাজনার সিন্দুক খোলা! ডরজারস্ আসিলে দেখা গেল—৫০ হাজার টাকা ও কর্ণেলের বাক্সটি নাই!—সন্দেহটা পড়িল রবার্টের ঘাড়ে। কর্ণেলের পরামর্শে পুলিশে সংবাদ না দিয়া, গোপনে অনুসন্ধান করা স্থির হইল।

ম্যাক্সিম্, সেই ছিন্নহস্তের অধিকারিণীকে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছিন্নহস্তে একখানি ব্রেস্‌লেট্ ছিল—ম্যাক্সিম্ তাহা নিজে পরিয়া, ছিন্নহস্ত নদীতে ফেলিয়া দেন। পুলিস তাহা উদ্ধার করে, কিন্তু পরে চুরি যায়। একদিন পথে ম্যাক্সিমের সহিত এক পরিচিত ডাক্তারের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি এক অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখাইলেন; ম্যাক্সিম্ কৌশলে রমণীর সহিত আলাপ করিলেন, সে রমণী—কাউণ্টেস্ ইয়াল্‌টা। অতঃপর ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্টের সহিতও তাঁহার আলাপ হয়। ইনি তাঁহার প্রকোষ্ঠে ব্রেস্‌লেট্ দেখিয়া একটু রহস্য করিলেন। কথা-বার্ত্তায় বেশী রাত্রি হওয়ায়, তিনি রমণীকে তাঁহার বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিলেন।

এলিস্ শুনিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কের চুরি সম্পর্কে সকলেই রবার্ট্কে সন্দেহ করিয়াছে! তাঁহার কিন্তু ধারণা সে নির্দ্দোষ। তিনি রবার্ট্কে নির্দ্দোষ-প্রতিপন্ন করিবার জন্য ম্যাক্সিম্কে অনুরোধ করিলে, ম্যাক্সিম্ প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে রবার্ট্, দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, একবার এলিসের সাক্ষাৎকারমানসে প্যারীতে প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহাকে গোপনে সেই মর্ম্মে পত্র লিখেন। সেই দিনই পূর্ব্বাহ্ণে, কর্ণেল্ ছলক্রমে তাঁহাকে এক কুঠীতে আনিয়া বন্দী করিলেন। ম্যাক্সিম্ রবার্টের [illegible] ছিলেন; তিনি উহাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের বিরোধী ছিলেন। কার্য্যগতিকে তাহাই ঘটিল।

কর্ণেলের বিশ্বাস, রবার্টের নিয়োজিত কোনও রমণীদ্বারা ব্যাঙ্কের চুরি ঘটিয়াছে। তিনি বন্দী রবার্ট্কেও সেইরূপ বলিলেন, ও জানাইলেন যে, রবার্ট্ সন্দেহমুক্ত না হইলে এলিসের সহিত ভিগ্‌নরীর বিবাহ ঘটিবে; আর চুরীর গুপ্ততথ্য ব্যক্ত না করিলে, তাঁহাকে আজীবন বন্দী থাকিতে হইবে। রবার্ট্ রাত্রে মুক্তির পথ খুঁজিতেছেন, এমন সময় প্রাচীরের উপরে জর্জ্জেট্‌কে দেখিতে পাইলেন। সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে মুক্তির আশা দিয়া প্রস্থান করিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যাক্সিম্ অভিনয়-দর্শন করিতে যান। তথায় এক রঙ্গিণীর মুখে শুনিলেন—তাঁহার প্রকোষ্ঠস্থিত ব্রেস্‌লেট্‌টির পূর্ব্বাধি-কারিণী ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্; ঘটনাক্রমে সেও সেই থিয়েটারেই উপস্থিত। কথাটা কতদূর সত্য, জানিবার জন্য ম্যাক্সিম্ ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের বক্সে গিয়া হাজির; কথায় কথায় একটু পানভোজনের প্রস্তাব হইল। দুজনে অদূরবর্ত্তী হোটেলে গেলেন। তথায় ব্রেস্‌লেটের কথা উঠিতে, ম্যাডাম্ তাহা দেখিতে লইলেন। এমন সময়, সহসা ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের রক্ষক এক অসভ্য ভল্লুক সঙ্কেতানুযায়ী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রেস্‌লেট্ ও ম্যাডাম্‌কে লইয়া প্রস্থান করিল।—ম্যাক্সিম্ প্রতারিত হইলেন!

একমাস গত;—ভিগ্‌নরী এখন ব্যাঙ্কারের অংশীদার এবং এলিসের পাণিপ্রার্থী; জর্জ্জেট্ দৈব-দুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী—তাহার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত! ম্যাডাম্ ইয়াণ্টা আজ একটু ভাল আছেন—ম্যাক্সিম্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। ইয়াণ্টা বলিলেন, ভিগ্‌নরীর সহিত এলিসের বিবাহ হইতে দিবেন না; রবার্ট্ নির্দ্দোষ, তাহার সহিতই এলিসের বিবাহ হওয়া বিধেয়। ম্যাক্সিম্‌কে তিনি জর্জ্জেটের নিকট হইতে যথাসম্ভব রবার্টের সংবাদ-আহরণ করিতে বলিলেন। অচিরে ব্যাঙ্কারের বাটীতেই হয়ত ম্যাক্সিমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে—এই আশ্বাস দিয়া ইয়াণ্টা ম্যাক্সিম্‌কে বিদায় দিলেন।]

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার রম্যভবন হইতে বাহির হইয়া ম্যাক্সিম্ আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। প্রেমমুগ্ধ প্রণয়ীর মত, ভাববিহ্বল কবির মত—তিনি আপন মনে কথা কহিতে লাগিলেন। কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার মনোমোহিনী রূপপ্রভা, দূরপ্রসারিণী বুদ্ধি তাঁহাকে মোহাবিষ্ট করিয়া ছিল। যে মুহূর্ত্তে কাউণ্টেস্ যদি তাঁহাকে সাগরের অতল
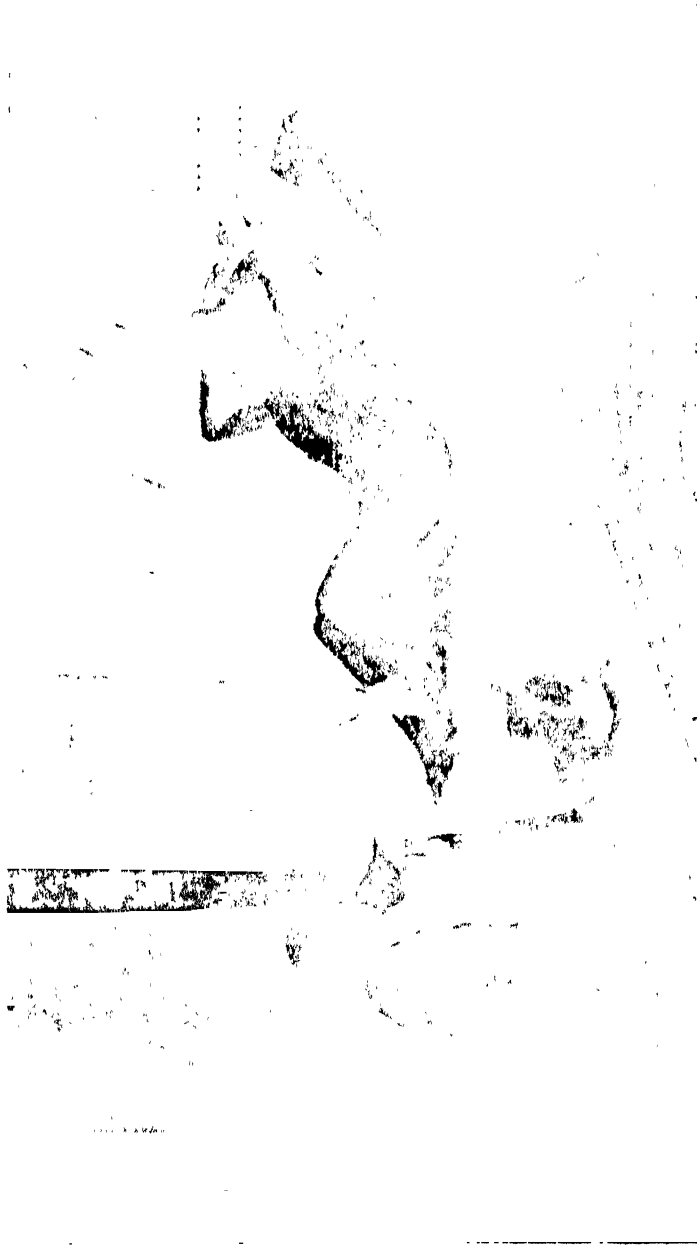
“নূর-মহল”

চিত্রশিল্পী—ফ্রেডরি

জলে ঝাঁপ দিতে বলিতেন, ম্যাক্সিম্ দ্বিধাশূন্য মনে তাহাই করিতেন।

কাউণ্টেসের অনুরোধে ম্যাক্সিম্ ম্যাডাম পিরিয়াকের গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে সংকল্প তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল, তাহা স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল। তিনি যেকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা যে বন্ধুজনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর মাত্র, ইহা জানিয়াও তাঁহার মনে লেশমাত্র অনুতাপের সঞ্চার হইল না। নবীন অনুরাগের অরুণ-প্রভায়, বিগলিত তুষার-কণিকার সে বন্ধুত্বের কর্ত্তব্য, সে সৌহৃদ্যের গৌরব, দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইল।

ইহার উপর এই অদ্ভুত ঘটনা অপূর্ব্ব রহস্য-কুজ্ঝাটিকায় আচ্ছন্ন,—এ অবস্থায় মানুষমাত্রেরই পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা। ম্যাক্সিম্ সিদ্ধান্ত করিলেন, "কুমারী এলিসের প্রণয়াস্পদ যদি সত্যসত্যই নিরপরাধ হয়, তবে আজ এই মুগ্ধহৃদয় কিশোরী, মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া, অন্য ব্যক্তির কণ্ঠে প্রেম-মাল্য পরাইয়া, চিরদিনের মত সন্তাপ-সাগরে ঝাঁপ দিবে কেন? আমি নিরীহ ব্যক্তির নির্দ্দোষতা প্রতিপাদন করিলে, মসিয়ে ডরজার্স কেনই বা আমার প্রতি রাগ করিবেন? আর ভিগ্‌নরী?—ভিগ্‌নরী ত এলিসের প্রণয়লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা স্বপ্নেও মনে স্থান দেয় নাই; রবার্ট বিপদে পড়িয়া নিরুদ্দেশ না হইলে, ভিগ্‌নরী কখনই এলিস্‌কে পাইবার আশাও করিতে পারিত না—তবে সেই বা আমার প্রতি বিমুখ হইবে কেন?

মনে মনে এই প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া, ম্যাক্সিম্ অনেকটা শান্তিলাভ করিলেন। তাহার পর, পথিপার্শ্বস্থ একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বুলোভার্দ মালেসহার্ব্বিতে গাড়ী পৌছিলে, তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া—ম্যাডাম্ পিরিয়াকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কাচমণ্ডিত বাতায়ন-পথে দেখিতে পাইলেন, জর্জ্জেটের পিতামহী গৃহ-কোণে বসিয়া সেলাইয়ের কাজ করিতেছেন। ম্যাক্সিম্ অসঙ্কোচে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জর্জ্জেটের পিতামহী তাঁহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রবীণার ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন ম্যাক্সিম্‌কে তাঁহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ম্যাক্সিম্ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন,—"বিনা অনুমতিতে গৃহে প্রবেশ করিয়াছি, অপরাধ ক্ষমা করিবেন;—কিন্তু জর্জ্জেট্‌কে দেখিবার জন্য যতবার আমি এখানে আসিয়াছি, ততবারই আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করেন নাই। আজ আমি বিশেষ কারণ-বশতঃ এখানে আসিয়াছি; বোধ করি, সে কারণ শুনিতে আপনি অস্বীকৃত হইবেন না।" ম্যাক্সিম্ সম্ভ্রমব্যঞ্জকস্বরে কথা কহিতেছিলেন। বর্ষীয়সী বুঝিলেন, ম্যাক্সিম্ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবার উদ্দেশ্যে আসেন নাই; তিনি আত্মমনোভাব গোপন করিয়া দীনতাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিলেন;—"আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, আমার গৃহদ্বার সকলের নিকট অবারিত। চিকিৎসকের পরামর্শে লোকের সহিত জর্জ্জেটের আলাপ ও সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ হইয়াছিল, বলিয়াই আপনি তাহাকে দেখিতে পান নাই; পীড়া বড়ই কঠিন, বালক এখনও কথা কহিতে পারে না।"

"কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার সঙ্গেও কথা কহিতে পারিবে না?"

কাউণ্টেসের নাম শুনিয়া ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলেন, "তিনি কখনই এখানে আসিবেন না। জর্জ্জেটের প্রতি তাঁহার যতই অনুগ্রহ থাকুক, তিনিও আজ স্বয়ং বালককে দেখিতে চাহিলে আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইতাম না।"

"কাউণ্টেস্ নিজে আসেন নাই বটে, কিন্তু আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।"

"আপনার সহিত যে কাউণ্টেসের পরিচয় আছে, তাহা আমি জানিতাম না।"

"এই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার কথা হইতেছিল। তিনিই আমাকে জর্জ্জেটের সহিত দেখা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। তাহাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতেও বলিয়া দিয়াছেন।"

"জর্জ্জেট্ অজ্ঞান—অভিভূত হইয়া আছে, কাউণ্টেস্ তাহা জানেন না; চিকিৎসকেরা তাহাকে ঘরের বাহির করিতে বারণ করিয়াছেন।"

"এ আপত্তি যে হইবে কাউণ্টেস্ তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়া, ছিলেন,—তাই আপনাকে দেখাইবার জন্য এই অঙ্গুরীয় দিয়াছেন।"

অঙ্গুরীয়-দর্শনে ম্যাডাম্ পিরিয়াকের মুখ পাণ্ডুরচ্ছবি ধারণ করিল। তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে যুবকের প্রতি চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনার প্রতি কাউন্টেসের অগাধ বিশ্বাস; তাই অঙ্গুরীয় দিয়াছেন। কাউন্টেসের অভিপ্রায় কি? তিনি আমাকে কি করিতে বলেন?"

"একমাস পূর্ব্বে রবার্ট কার্নোয়েল্ নামক যে যুবা পুরুষ নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য কাউন্টেস্ বড় ব্যগ্র হইয়াছেন।"

"মসিয়ে ডরজার্সের কর্ম্মচারী? তিনি জর্জ্জেট্‌কে বড় ভালবাসিতেন। জর্জ্জেটের মুখে কতবার তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি, জর্জ্জেট্ কাউন্টেসের কাছেও তাঁহার কথা বলিয়াছে।"

"সেই জন্য ঐ যুবকের অনুসন্ধান কার্য্যে কাউন্টেস্ জর্জ্জেটের সাহায্যগ্রহণ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।"

"জর্জ্জেটের স্মরণশক্তি লোপ পাইয়াছে; একথা বোধ করি, কাউন্টেস্ ভুলিয়া গিয়াছেন।"

"তাহার স্মরণশক্তি ফিরিয়া আসিবে, ইহাই তাহার আশা। কোন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিলেই তাঁহার স্মৃতিশক্তি জাগিয়া উঠিবে। আপনি যদি তাহাকে আমার সঙ্গে যাইতে দেন, আমি তাহার স্মৃতিশক্তি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে পারি; কএকটি বিশেষ স্থান ও কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিকে দেখিলে তাহার স্মরণশক্তি কি ফিরিয়া আসিবে না?"

ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিবার পর বলিলেন,—"মসিয়ে ডরজার্স, কাউন্টেসের অভিপ্রায় অবগত আছেন?"

"না। আমিও তাঁহাকে এ বিষয়ে কোন কথাই বলিব না।"

"কাউন্টেস্‌কে অঙ্গুরীয়টি কে দিয়াছে, আপনি শুনিয়াছেন কি?"

"আংটি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না; আমি যে কাউন্টেসের প্রতিনিধিস্বরূপ এখানে আসিয়াছি, তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ তিনি আমাকে অঙ্গুরী দিয়াছেন।"

"আপনার কথা সত্য, আপনি মহৎ ব্যক্তি, আমাকে কখনই বঞ্চনা করিবেন না। আপনার নিকট একটি ভিক্ষা আছে; প্রতিজ্ঞা করুন, অনুসন্ধানের ফল যাহাই হউক, তাহাতে জর্জ্জেটের কোন অমঙ্গল হইবে না।"

"প্রতিজ্ঞা করিলাম; এই ঘটনার সহিত জর্জ্জেটের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি ও কাউন্টেস্ ভিন্ন আর কেহ জানে না।"

ম্যাক্সিমের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া প্রবীণা বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্বধনকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম,—অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি জর্জ্জেট্‌কে ডাকিতেছি।"

জর্জ্জেটের নাম প্রবীণার মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে—বালক তীরবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং ম্যাক্সিম্‌কে দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি মসিয়ে ম্যাক্সিম্ যে!"

ম্যাক্সিম্ আদরে বালকের চিবুকস্পর্শ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "হাঁ বাপু, আমি আসিয়াছি। তুমি বুঝি আমাকে আজ এখানে দেখিবার আশা কর নি?—না?"

"হাঁ;—কিন্তু আপনি কেন এসেছেন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমি কাল কাজে যাইনি ব'লে, মসিয়ে ডরজার্সের কথায়, আপনি আমার কাণ মলিয়া দিতে আসিয়াছেন।"

ম্যাক্সিম্ বালকের রোগশীর্ণ করুণ মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, তাহার সে কোমলকান্ত স্নিগ্ধশ্রী আর নাই; কিন্তু বালকের নয়ন দুইটি তেমনই উজ্জ্বল, তেমনই হাস্যরঞ্জিত। একখানি হাত বন্ধনীযুক্ত না থাকিলে সে যে রোগ-শয্যা হইতে উঠিয়াছে, মূর্ত্তি দেখিয়া তাহা কেহই বুঝিতে পারে না।

ম্যাক্সিম্ বলিলেন,—"কাণের জন্য কোন ভয় নাই, তোমাকে তিরস্কার করিবার জন্য জেঠা আমাকে পাঠান নাই। তুমি যে নিজের দোষে একমাস আফিস কামাই কর নাই, তাও তিনি জানেন।"

সবিস্ময়ে বালক বলিল, "বলেন কি—একমাস? সেই ঝড়বৃষ্টির দিন থেকেই আমি বিছানায় পড়িয়াছিলাম! নূতন বৎসরের উৎসবও, বোধ করি, শেষ হইয়া গিয়াছে!"

"যাক্। তার জন্য ভাবিও না, তোমার পাওনা উপহার তোমাকে দিব। উপহার-দ্রব্য কিনিবার জন্যই আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি।"

"আপনার বড় অনুগ্রহ,—আমি কতবার ঠাকুরমাকে আপনার অনুগ্রহের কথা বলিয়াছি। আমি মিছরির মিঠাই কিনিব। মিছরির মিঠাই খেতে বড় মজা,—না ঠাকুরমা? এখন একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়। একটা ছেলে আমাকে মারিবে বলিয়া শাসাইয়াছে, মারিয়া তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া দিব।"

ম্যাক্সিম্ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কি? মারপীঠ করিবে? ওকথা মুখে আনিলে তোমার দু'টি কাণ মলিয়া দিব। এই সেদিন কোন মতে বাঁচিয়া উঠিয়াছ, আবার মারামারির কথা। দাঙ্গা করিতে গিয়াই বুঝি হাতপা ভাঙ্গিয়াছ?"

জর্জ্জেট্ বলিল, "সত্য বলিতেছি,—মসিয়ে ম্যাক্সিম্, কি হ'য়েছিল, আমার কিছুই মনে নাই।"

ম্যাডাম্ পিরিয়াক্ বলিলেন,—"জর্জ্জেট্ সত্য কথাই বলিয়াছে, কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি;—ও কোন কথাই বলিতে পারে নাই। ডাক্তার বলিয়াছেন, পড়িয়া গিয়াই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে; কিন্তু কোথায় পড়িল, কেমন করিয়া পড়িল, তাহা আমরা জানি না। জর্জ্জেট্ পড়িয়া গিয়া মাথায় বিষম আঘাত পাইয়াছিল, তাহাকে অজ্ঞানাবস্থায় বাড়ীতে আনা হয়; দশঘণ্টার মধ্যে তার জ্ঞান হয় নাই।"

"খোলা হাওয়ায় বেড়াইলে শরীর অনেক ভাল হইবে,—আপনি অনুমতি করিলে জর্জ্জেট্‌কে বেড়াইতে লইয়া যাই।"

"আপনারা একটু শীঘ্র শীঘ্র ফিরিবেন।"

"কোন চিন্তা নাই, আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিব।"

বালকের পিতামহী আর কোন আপত্তি করিলেন না। বালক বাহিরে আসিয়াই আনন্দভরে বলিয়া উঠিল "আজ কি মজা! ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়া—দিন আর ফুরাইত না; যখন বড় বিরক্তি ধরিত, ছুটিয়া গিয়া এক একবার ছেলেদের সঙ্গে খেলিয়া আসিতাম। ঠাকুরমা এ সব জানেন না, তাঁকে কিছু বলিবেন না, বুঝিলেন; কিন্তু মসিয়ে ভিগ্‌নরী একথা জান্‌লে"—

"সে একথা জানিলে কিছুই বলিত না, সে বড় ঠাণ্ডা মেজাজের লোক।"

"কিন্তু তাঁর মুখে বড় একটা হাসি দেখা যায় না। আপনার কাছে,—কি মসিয়ে রবার্টের কাছে—থাকিলে আমার একটুও ভয় করে না।

ম্যাক্সিম্ সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি অনেক দিন রবার্টকে দেখনি,—না?"

"না—তা নয়,—দাঁড়ান্ বলিতেছি। শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় সে—ওই যা! ভুলিয়া যাইতেছি,—"

ম্যাক্সিম্ মনে মনে ভাবিলেন, "যাহা মনে করিয়াছিলাম, বালকের অবস্থা দেখিতেছি, সেরূপ নহে। ইহার স্মরণশক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছে।"

অকস্মাৎ জর্জ্জেট্ বলিয়া উঠিল,—"দাঁড়ান, এই না আমরা বুলোভার্দ মালেসহার্ব্বিতে আসিয়াছি? ঐ আগে খান কএক মদের আড্ডা দেখা যাইতেছে। নববর্ষের আর বিলম্ব নাই।"

গম্ভীরমুখে ম্যাক্সিম্ বলিলেন,—"নববর্ষের উৎসব শেষ হইয়াছে। এর মধ্যে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছ? তোমাকে উপহার দিব বলিলাম? তোমার মাথা এখনও ঠিক হয় নাই।"

"হুঁ—মাথার মধ্যে কেমন করিতেছে, বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছি না।"

"একবার চেষ্টা করিয়া দেখ দেখি।"

"দেখুন মসিয়ে ম্যাক্সিম্,—আমার মগজ যেন এক একবার অসাড় হইয়া যায়। ভাবিতে কত চেষ্টা করি, তবু ভাবনা আসে না। তখন নিজের নাম পর্য্যন্ত মনে থাকে না। যেন একেবারে দশবারটা ভাবনা আসিয়া মাথার মধ্যে ঠোকা-ঠুকি করিতে থাকে। কখন কখন বোধ হয় যেন থিয়েটারে গিয়াছে। যবনিকা উঠিয়া গিয়াছে, দৃশ্যপটের পর দৃশ্যপট খুলিয়া যাইতেছে; কত চেনা লোক দলে দলে চলিয়া যাইতেছে। হঠাৎ সব অন্ধকার হইয়া যায়। মনে পড়ে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কিন্তু সে কি স্বপ্ন কিছু মনে নাই।"

ম্যাক্সিম্ সাগ্রহে বালকের কথা শুনিতেছিলেন;—বুঝিলেন, তাহার স্মৃতি কিয়ৎ পরিমাণে বিনষ্ট হইলেও মাঝে মাঝে এক একবার সেই লুপ্ত ও সুপ্ত স্মৃতির পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। পূর্ব্বপরিচিত স্থান ও ব্যক্তি-দিগের সহিত বালকের সাক্ষাৎকার ঘটিলে তাহার লুপ্তস্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত হইতে পারে ম্যাক্সিম্ জর্জ্জেট্‌কে

রুদে সুরেস্‌নেজে লইয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। সম্মুখে রু-জুঁফ্রে দেখিয়া ঐ পথে গমন করিবার ইচ্ছা ম্যাক্সিমের মনে বড় প্রবল হইল। বালক এই পল্লী চিনিতে পারে কি না। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। বুলোভার্দ মালেসহার্ব্বি পরিত্যাগ করিয়াই, তিনি বালককে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; বলিলেন;—"সে দিন তুমি স্কেটিং ক্রীড়া ভূমি হইতে কোথায় গিয়াছিলে?"

"স্কেটিং ক্রীড়াভূমি! আমি ত কখনও সেখানে যাই নি।"

"সেখানে তুমিই ত আমাকে বলিয়াছিলে, সন্ধ্যার পর সেখানে থাকিয়া ভদ্রলোকদিগের খবর দেওয়া লওয়া কর।"

"তবে মিছাই ব'লেছি। কিন্তু আমার যেন মনে হইতেছে, একবার সেখানে গিয়াছিলাম।"

"হাঁ, গিয়াছিলে; রিঙ্ক হইতে বাহির হইবার পর তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছিলে। সেই যে, আমি একটি মহিলার সহিত ক্রীড়াভূমি হইতে বাহির হইলাম, তুমি আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এভিনিউ-দে-ভিলিয়া ও রু জুঁফ্রের কোণ পর্য্যন্ত গেলে,—মনে নাই? রু জুঁফ্রে তুমি খুব চেন,—না?"

"চিনি বোধ হয়, বাঁ ধারের ঐ রাস্তাটা না? এখান থেকেই রাস্তার নাম দেখা যাইতেছে।"

"এইখানটাতেই আমি গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, তুমি গাড়ী দেখাইয়া দিয়াছিলে। আর সেই তিনটা বদমায়েস্ বোকা বনিয়া গিয়াছিল।"

"হাঁ তিনজনই বটে, আপনি সদর রাস্তায় দাঁড়াইলে তারা আপনাকে ধরিত।"

"কেমন করিয়া বুঝিলে ধরিত?"

"তা জানি না। তবে মনে পড়িতেছে, তাহাদিগের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিব বলিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করি। আমি এখনও খুব বড় হইনি। তারা আপনার গায়ে হাত তুলিবার পূর্ব্বেই আমি একে একে তিনটাকেই কাৎ করিতে পারিতাম।"

"আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন, তাঁর কথা মনে পড়ে?—সেই আয়তলোচনা সুন্দরী,—সেই ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্?"

"কৈ চিনি না ত, কি উদ্ভট নাম!"

রুদে জুঁফ্রেতে প্রবেশ করিয়া ম্যাক্সিম্ ঔদাস্তের ভাণ করিয়া বলিলেন,—"তুমি অনেক সময় এই পথ দিয়া আফিসে যাও,—না?

জর্জ্জেট্ বলিল, "মালেসহার্ব্বি দিয়া যাইতে হইলে এইটাই সোজা পথ; কিন্তু আমি অনেক সময়েই—আমি অনেকটা ঘুরিয়া, এভিনিউ-ডি-ভিলার বুলোভার্দ-দে কোর-সেলি দিয়া যাই। পথে ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয়,—আমরা খেলা করি।"

"তা হ'লে উহারই কোন একটা স্থানে তুমি পড়িয়া গিয়াছিলে?"

"হবে!"

"চল, তোমাকে ঐ দিকে লইয়া যাই; জায়গাটা দেখিলে চিনিতে পারিবে ত?"

"তা' কেমন করিয়া বলিব? ঠাকুরমা বলেন, লোকে আমাকে কোরসিলি হইতে তুলিয়া আনিয়াছিল। আমি ট্রাম্ লাইনের উপর পড়িয়াছিলাম। আমি ত নিজে ট্রাম্ লাইনের উপর যাই নি,—কে বুঝি আমাকে ফেলিয়া রাখিয়াছিল।"

এই সময়ে উভয়ে ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্টের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ম্যাক্সিম্ একটু দাঁড়াইয়া বাড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চমৎকার বাড়ী! বাড়ীটা বন্ধ। বোধ করি, ভাড়া দেওয়া হবে। তুমি ত এদিকে থাক, বলিতে পার—বাড়ীটা কাহার?"

জর্জ্জেট কথা কহিল না। সে নিবিষ্টচিত্তে বাড়ীটি দেখিতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া সে একবার ললাটের উপর হাত বুলাইল;—যেন বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রগুলি সম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল। শেষে বলিল,—"না, না, ও বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে না। বাড়ীটা বন্ধ আছে বটে, কিন্তু ভিতরে লোক থাকে।"

"কে থাকে?"

'লেডি সল্যাস্—লাল-ঘোড়ার সওয়ার। যে লোকটা মহিলাটির ঘোড়া সায়েস্তা করে।"

"কোন্ মহিলার ঘোড়া?"

জর্জ্জেট্ মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিল, তাহার পর মাথা হেঁট করিয়া বলিল—"এখন আর বলিতে পারিতেছি না।"

ম্যাক্সিম্ হতাশহৃদয়ে নূতন করিয়া কথাটা পাড়িলেন,—

বলিলেন, "তুমি বোধ হয়, লেডি সল্যাস্‌কে চেন, তুমি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলে ?"

"তার সঙ্গে আমার তেমন আলাপ নাই। তবে দুই তিনবার তাহাকে দেখিয়াছি,—লোকটা জানোয়ার-বিশেষ।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "তুমি তার সঙ্গে কেন দেখা করিয়াছিলে ?"

বালক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আর জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই হইবে না, সব ভুলিয়া গিয়াছি।"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, বালককে আর প্রশ্ন করা বৃথা ;—মেঘমণ্ডলে বিদ্যুদ্বিকাশবৎ এক একবার তাহার স্মরণশক্তি জাগিয়া উঠে, আবার অন্তর্হিত হইয়া যায়। এভিনিউ-দে-ভিলার অভিমুখে যাইতে যাইতে, তিনি জর্জ্জেট্‌কে বলিলেন, —"তুমি কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টাকে চেন ?"

বালক বলিল, "বোধ হয় যেন চিনি ; তিনি ঠাকুরমার পরম-হিতৈষিণী।"

"তুমি বোধ হয় তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলে ?—না ?"

"অনেকবার গিয়াছি ; বড় সুন্দর বাড়ী, সে বাড়ীতে কত ছবি,—অত ছবি বোধ করি যাদুঘরেও নাই ; আর চাকরদের বেশভূষা কি জমকাল, দেখিলে তাহাদিগকে রাজসচীব বলিয়া ভ্রম হয়। এত ঐশ্বর্য্য—তথাপি কাউণ্টেসের মনে একবিন্দু অহঙ্কার নাই।"

বালকের কথা শুনিয়া ম্যাক্সিম্ একটু হাসিলেন। তার পর, আবার পূর্ব্ববৎ কথা আরম্ভ করিলেন,—"আচ্ছা কাউণ্টেসের সঙ্গে তোমার দেখা হইলে, তোমাদিগের কি কথাবার্ত্তা হয় ?"

"কত রকম কথা জিজ্ঞাসা করেন ;—'ঠাকুরমা কেমন আছেন,—মসিয়ে ডরজার্সের কাজ আমার কেমন লাগিতেছে,—কুমারী এলিস্ ও মসিয়ে কার্‌নোয়েল্ কেমন আছেন,—কি করিতেছেন ?' শেষবার যখন তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন তাঁহার বড় অসুখ ; সেবার তিনি আমাকে মসিয়ে কার্‌নোয়েলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।"

"তোমাকে তিনি কার্‌নোয়েলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?"

"ক'রেছিলেন ; আমি বলিয়াছিলাম, তাঁর কোন সংবাদ আমি জানি না, তিনচারি দিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই।"

"কার্‌নোয়েল্‌কে তোমার দেখিতে ইচ্ছা করে ?"

"করে বৈ কি !"

"তবে চল, জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে যাই,—সেখানে ভিগ্‌নরী হয়ত তাঁর খবর বলিতে পারিবে।"

ম্যাক্সিম্ একবার অপাঙ্গদৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিলেন ;—দেখিলেন, তাহার মুখ গম্ভীর ; সে লুপ্তস্মৃতির পুনরুদ্দীপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কার্‌নোয়েলের নাম শুনিয়া তাহার স্মৃতি-শক্তি বিস্রস্তভাবে আবার জাগিয়া উঠিয়াছে।

দুইজনে অনেকক্ষণ নীরবে চলিতে লাগিলেন। রুদে-সুরেসনেজে পৌঁছিয়া তাঁহারা ব্যাঙ্ক্‌ওয়ালা ডর্‌জার্সের বাটীর সন্নিহিত হইবামাত্র জর্জ্জেট্ বলিয়া উঠিল,—"ঐ দেখুন, আমার মত আর একটা ছোকরা, আমার পোষাক পরিয়া বেড়াইতেছে। অত সাজ-গোজ তবু উহাকে হাবার মত দেখাইতেছে।"

ম্যাক্সিম্ কথা কহিলেন না। বালকের হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, ভিগ্‌নরী সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কে ! জর্জ্জেট্ যে !—এখন আরাম হইয়াছ ত ?—আরাম হইলে কি করিয়া ? তোমার হাতে যে এখনও পটিবাঁধা !"

"একখানা হাত বাঁধা। এখন একটা পাখার ভর দিয়া উড়িতেছি ; কিন্তু তাহাতে যায়-আসে না। কোন কাজ কর্ম্ম আছে ?"

"কর্ত্তা তোমার জায়গায় নূতন-লোক লইয়াছেন, তাহা বুঝি তুমি শোননি ?"

"যা'কে দরজায় দেখিলাম,—সেই ধেড়ে ছোঁড়াটা বুঝি ? তাহাকে দেখিয়াই আমি সব বুঝিয়াছি। এই লোকটাকে কাজে লইয়া, মসিয়ে ডর্‌জার্স জিতিয়াছেন বলিয়া ত বোধ হয় না।"

কথা কহিতে কহিতে বালক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুক্তাধার সিন্দুকটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ; "যে শব্দে সিন্দুক খুলিত,—আপনারা দেখিতেছি, সে শব্দটা বদলাইয়াছেন। আগে ত কুমারী এলিসের নাম অক্ষরে সাজান ছিল। এখন——"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

"নামটি পড়িয়াছিলাম বলিয়াই জানি।"

"কবে ?"

"তা' আমার মনে নাই। সিন্দুকের কবাটের উপর আর একটা শব্দ সাজান ছিল।"

ম্যাক্সিম্ ও কোষাধ্যক্ষ পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন।

জর্জ্জেট্ বলিলেন, "সিন্দুকের কলটা আগেকার মতই আছে ?"

ভিগ্‌নরী বলিলেন, "সিন্দুকের কল ? কি বলিতেছ ?"

"জানেন না, চোর ধরিবার কল। ঐ যে—কলটা তেমনই রহিয়াছে।"

ম্যাক্সিম্, জর্জ্জেটের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ভিগ্‌নরীর ন্যায় বিচলিত হইলেন। বালকের হাত ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বস্থ কুঠরীর মধ্যে লইয়া গেলেন। কুঠরীটি মসিয়ে ডরজার্সের নূতন বখরাদার মনের মত করিয়া সাজাইয়াছিলেন। ভিগ্‌নরী তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালক ধীরে ধীরে বলিল,—"আপনি এই ছোট কুঠরীটি ত চমৎকার সাজাইয়াছেন। ঘরটা পূর্ব্বে পুরাতন কাগজপত্র এমন বোঝাই হইয়াছিল যে, কর্ত্তার বড় কুকুরটা ইহার মধ্যে শুইবার জায়গা পাইত না।"

ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "কিন্তু তুমি ঘরটার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতে ?—না ?"

"ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না; আমার স্মরণ-শক্তি আবার চলিয়া যাইতেছে।"

ম্যাক্সিম্ "হাত ছানি" দিয়া ভিগ্‌নরীকে ডাকিয়া তাঁহাকে কুঠরীর অপরপ্রান্তে লইয়া গেলেন। জর্জ্জেট্ দরজার নিকট একখানি চেয়ারে বসিয়া রহিল। ম্যাক্সিম্ অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "এ সব দেখিয়া শুনিয়া তোমার কি মনে হইতেছে ? আমি বলিয়াছিলাম, জর্জ্জেট্ এই ব্যাপারের ভিতরে আছে;—আমার ধারণা কি ঠিক নহে ? এখন বেশ বুঝিয়াছি,—সিন্দুকের কল কেমন করিয়া খুলিতে হয় এবং সাজাইয়া রাখিতে হয়, তাহা জর্জ্জেট্ এই কুঠরীর মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিয়াছিল। সে যে সঙ্কেতকথাটি জানিত, তাহাও এখনই শুনিয়াছ।"

ভিগ্‌নরী বলিলেন,—"তোমার কথাই ঠিক; পাজি বেটা চোরদের সব খবর দিয়াছে।"

"কিন্তু কার্‌নোয়েল্ যে নির্দ্দোষ,—ওর কথায় ত তাহা বুঝা গেল না।"

"তোমার অনুমান, তিনি বালকের সহায়তায় এই কাজ করিয়াছেন; সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বালক তাঁহাকে বড় ভক্তি করে।"

"রবার্ট্ এখন কোথায়, জর্জ্জেট্ সে সংবাদ জানে কি ?"

"বোধ করি, সে খবর জর্জ্জেট্ জানিত;—কিন্তু অন্যান্য কথার মত, ওকথাটাও সে ভুলিয়া গিয়াছে।"

"তাহা হইলে তোমার বিশ্বাস, সত্যই বালকের স্মরণশক্তি লোপ পাইয়াছে ?—ওটা ভাণ নয় !"

"ভাণ হইলে সে নির্ব্বোধের মত গুপ্তকথা ব্যক্ত করিত না; পরের কাছে এমন করিয়া ধরাদিবারও তাহার কোনপ্রয়োজন ছিল না। বালক সরলভাবে সব কথা বলিয়াছে; দেখ না কেমন নিবিষ্টমনে কাগজের টুপি গড়িতেছে। আম্‌লারা যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহার একটা কথাও ওর মনে নাই। ও জর্জ্জেট্ ! কি ভাবিতেছ হে ?"

"কিছুই না; মসিয়ে ভিগ্‌নরী কাজে পাঠাইবেন বলিয়া বসিয়া আছি।"

"আজ তিনি তোমায় কোন কাজে পাঠাইবেন না,—বুঝিলে ?"

"তবেই মুস্কিল ! এক জায়গায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বড় বিরক্তি ধরে;—তা'র চেয়ে পথে খানিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান ভাল। আমি এক এক সময়ে বিশ্রাম-ঘরে,—বুড়া-মক্কেলদের দেখিতে দেখিতে বড় মজা করি।"

"তুমি তাহাদের মুখ-ভেঙ্‌চাও,—না ?"

"কখনই না। নিশ্চয়ই সেলিকম্ মিছা করিয়া আপনার কাছে—আমার নামে এ সব লাগাইয়াছে।"

"সেলিকম্ লাগাইয়াছে, কি করিয়া বুঝিলে !"

"সে আমাকে দেখিতে পারে না; লোকটা নিরেট বোকা; আমি ইচ্ছা করিলে তা'কে তাড়াইতেও পারিতাম।"

"তুমি ?"

"হাঁ, আমি! একবার কর্ত্তার কাছে বলিলেই হইত,—সেলিকম্ নিয়মমত পাহারা দেয় না,—সন্ধ্যার পর যে খুসী ব্যাঙ্কের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে।"

"তুমি কি করিয়া জানিলে ?"

"আমি নিজেই একদিন সন্ধ্যার সময় ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিয়াছিলাম।"

"পাগল আর কি! ছয়টা বাজিলেই ত তুই বাড়ীমুখো দৌড় দিস্।"

"ঠিক বলিয়াছেন। আমার সঙ্গে খেলিবার জন্য জন কতক ছেলে পথে দাঁড়াইয়া থাকে; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়িতেছে; আমি একদিন ব্যাঙ্কের ভিতর গিয়াছিলাম, তখন সেখানে কেহ পাহারায় ছিল না। আমার ভারি ভয় করিতেছিল।"

"কিসের ভয় রে ?"

"কিসের ভয় সে আর কত বলিব! রাত্রে আফিস ঘরে ঘোরঅন্ধকার, কেবল রাস্তার ওপাশের গ্যাসের আলো একটু একটু ঘরের ভিতর আসে; সেই অন্ধকারে মস্ত সিন্দুকটা একটা প্রকাণ্ড কা'ল দৈত্যের মত দেখায়; পায়ের চারিধারে ইন্দুরগুলা কিচ্-কিচ্ করিয়া বেড়ায়; তাহাতেই গায়ের রক্ত জল হ'য়ে যায়।"

"তুমি বোধ করি, ঘুমাইয়া পড়িবার পর আফিসের দরজা বন্ধ করা হইয়াছিল।"

"বোধ করি, তাই হবে।"

"তুমি দরজা খুলিয়া দিবার জন্য ডাকাডাকি কর নাই ?"

"আমার মনে নাই।"

"কাহাকেও আফিসে দেখিতে পাও নি ?"

"কাহাকেও না।"

"তবে কেমন করিয়া বাহির হইলে ?"

"আমার মনে পড়ে না।"

ম্যাক্সিম্ বালকের কথা শুনিয়া এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কেশাগ্র হইতে চরণের নখাগ্র পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, এইবার চুরির সকল রহস্য তিনি জানিতে পারিবেন, কিন্তু বালকের "মনে নাই" কথাটা তাহার সকল উদ্যম ব্যর্থ করিতেছিল। ভিগ্নরী বালকের কথা শুনিয়া ভ্রূভঙ্গি করিলেন। ম্যাক্সিম্, তীব্রকণ্ঠে বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কর্ণেল্ বরিসফ্কে চেন ?"

"কর্ণেল্ বরিসফ্? কম হইলেও তিনবার আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি যখন কর্ত্তার নিকট হইতে বাক্সটা লইতে আসেন, তখন আমি এখানে ছিলাম। রুশীয়ার লোক বলিয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে পারি না; রুশীয়ার লোক ঠাকুরমারও দুই চক্ষের বিষ।"

"তারা তোমাদের কি করিয়াছে, বাপু ?"

"ওঃ! সেসব কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। ওই কসাক্টার গলার আওয়াজ শুনিলেই আমার গায়ে জ্বর আসে;—লোকটা কথাকয় যেন মুরভাঁজে। কর্ণেল্ যখন দরজায় ঘা দিতেছিল, তখন আমি তাহাকে ভেঙ্গাইয়া কেমন মজা করিয়াছিলাম! সে আমাকে দেখিয়া রাগে গোঁ গোঁ করিতেছিল;—ঠিক সেই সময় মসিয়ে ভিগ্নরী এলেন।"

ভিগনরী বলিলেন, "তখন কর্ণেল তোমাকে ঘা কতক বসিয়ে দিলেই—ঠিক হত। মক্কেলদের উপহাস করিবার জন্য, দরজার পাশে লুকাইয়া তাঁহাদিগের কথা শুনিবার জন্য, মাহিনা দিয়া মসিয়ে ডর্জার্স তোমায় রাখেন নাই।"

ম্যাক্সিম্ দেখিলেন, ভিগ্নরী যেরূপ বিরক্ত হইয়াছেন তাহাতে বালক তাঁহার ধমকে ভয় পাইলে, সমস্ত রোজটা মাটি হইবে! তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"একটু আমোদ করিলে এখন কি দোষ? তোমার মত কর্ণেল্ বরিসফের জন্য আমার অত মাথাব্যথা হয় নাই। বরিসফ্ কি বাক্সটা পাইয়াছিলেন ?"

জর্জ্জেট্ অসঙ্কোচে বলিল, "না। বাক্সটা সিন্দুকের ভিতর ছিল না।"

"তবে নিশ্চয়ই কেহ বাক্সটা লইয়া গিয়াছিল ?"

"নিশ্চয়ই।"

"কে লইয়াছিল ?"

"দাঁড়ান একটু মনে করিয়া দেখি, বোধ করি—নাঃ, আবার গোলমাল হইয়া গেল,—নামটা মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু আবার ভুলিয়া গিয়াছি।" ম্যাক্সিম্ বলিলেন,—"লেডি সল্যাস্ ?"

জর্জ্জেট্ আনন্দে করতালি দিয়া বলিল,—"হাঁ—হাঁ, সেই লোকটাই বটে।" "রুদে-জুঁফ্রেতে যে থাকে—সেই ?"

"সেই পাজী বুড়াটাই বটে, বরিসফের মত আমি লোকটাকে ঘৃণা করি।"

"যে মহিলার ঘোড়া সে সায়েস্তা করে, তিনিও বুঝি তাহার সঙ্গে ছিলেন?"

জর্জ্জেট্‌ ভাবিতে লাগিল; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি সে মহিলাকে দেখি নাই, সে একাকী আসিয়াছিল।"

"আচ্ছা, তবে লেডি সল্যাসের কথাই কওয়া যাক্‌, লোকটা নিশ্চয়ই বরিসফের শত্রু। নহিলে বাক্সটা চুরি করিত না।"

"বরিসফ্‌টা ডাকাত।"

"কিন্তু সে লেডি সল্যাসের অনিষ্ট করিল কি করিয়া?"

জর্জ্জেট্‌ হতাশভাবে ললাটে হাত বুলাইয়া বলিল, "আমি বলিতে পারি না। সব ভুলিয়া গিয়াছি।"

ম্যাক্সিম্‌ মনে মনে বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন;—বুঝিলেন, তাঁহার বন্ধু ব্যাপারটাকে নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক বলিয়া মনে করিতেছেন। বালকের সরলতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়াছেন। ভিগ্‌নরী বন্ধুকে এক পাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন,—"তুমি অনুসন্ধান করিয়া কি বাহির করিবে? দেখিতেছি, এই পাজী ছোঁড়াটা চোরদের চেনে;—নিজেও তাহাদিগের সহায়তা করিয়াছিল। তাহাতে আমাদিগের কি আসিয়া যায়? বরিসফ্‌ বাক্সের আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। তবে তাহার জন্য আমরা খাটিয়া মরি কেন? যাহা হইবার হইয়াছে,—ওসব ছাড়িয়া দাও।"

ম্যাক্সিম্‌ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা যাইতেছি;—আয় রে!" ম্যাক্সিম্‌ জর্জ্জেট্‌কে দরজার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য, ম্যাক্সিম্‌ ভিগ্‌নরীর কথার অনুমোদন করিতে পারেন নাই। জর্জ্জেট্‌ সকল কথা খুলিয়া বলিতে না পারায়;—সত্য-নির্ণয়ের ইচ্ছা তাঁহার মনে আরও প্রবল হইয়াছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন, সেগুলি রবার্টের পক্ষে অনুকূল।

ফটকের কাছে আসিতেই কুমারী এলিসের সহিত ম্যাক্সিমের সাক্ষাৎ হইল। ম্যাডাম্‌ মার্টিনোও ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। ম্যাক্সিম্‌ ও জর্জ্জেট্‌কে দেখিয়া তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই মধুর মুগ্ধ মুখ তেমনই সুন্দর, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুর। এলিস্‌ সাদরে ম্যাক্সিমের করমর্দ্দন করিলেন। সস্নেহে বালকের মুখচুম্বন করিলেন। তাহাকে রুগ্ন ও শীর্ণ দেখিয়া, সে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। পাছে জর্জ্জেট্‌ অবোধের মত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে—এই আশঙ্কায় ম্যাক্সিম্‌ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ও বেশ আছে। আমি ওদের বাড়ী গিয়া ওর ঠাকুরমার কাছথেকে—ওকে বেড়াইতে লইয়া আসিয়াছি।"

"খুব ভাল কাজ করিয়াছেন; বাবা বারণ না করিলে, আমি নিজে গিয়া জর্জ্জেট্‌কে দেখিয়া আসিতাম।"

"তোমরা এখন কোথায় যাইতেছ?"

এলিস্‌ বলিল,"—এটি গোপনীয় কথা, কিন্তু আপনার কাছে বলিতে বাধা নাই। আমি আমার একখানি ছবি আঁকিয়া লইতেছি। ছবিখানি বাবাকে দেখাইয়া—বাবাকে খুব ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিব। রুদে-লিসবনির শেষে—চিত্রকরের বাসা। আপনি যদি জর্জ্জেট্‌কে এখন বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যান, ত ওপথ দিয়া গেলে বেশী ঘুরিয়া যাইতে হইবে না। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন?"

"ম্যাডাম্‌ মার্টিনোর কোন আপত্তি না থাকিলে, আমি তোমাদিগের সহিত যাইতে রাজি আছি।"

এলিসের সঙ্গিনী বলিলেন, "আপনার কেবল কথায় কথায় তামাসা; কিন্তু আপনি জিতিয়া যাইতে পারিবেন না। এলিস্‌ আমাকে বেশ জানে;—আপনাকে এই বিদ্রূপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে; কেবল তাহাও নহে, যে মহিলাটি আমাদিগের এলিসের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছেন, সেই কাউণ্টেস্‌ ইয়ান্টার কথাও আমাদিগকে বলিতে হইবে—

"কাউণ্টেস্‌ ইয়ান্টা!"

ম্যাঃ মার্টিনো বলিলেন,—"হাঁ, এই ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে তিনি আপনার জ্যেঠার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। এলিসের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য তাঁহার কি আগ্রহ! কিন্তু মসিয়ে ডরজার্স কিছুতেই তাঁহাকে এলিসের সঙ্গে দেখা করিতে দিলেন না। তিনি বলেন, যিনি বিদেশিনী পরি—ঘোড়ার-গাড়ী চড়িয়ে বেড়ান, তিনি তাঁহার কন্যার উপযুক্ত সঙ্গিনী নহেন। কাউন্টেস্‌ আপনার জ্যেঠাকে এমন পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়াছিলেন যে, শেষটা আপনার জ্যেঠা তাঁহাকে একটা ফাঁকা জবাব দিয়া, তাঁহার হাত

এড়াইয়েছেন। তবু কাউণ্টেস্ যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, তিনি আবার এলিসের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। এলিসের প্রতি তাঁহার এত অনুরাগ কেন হইল, বুঝিতে পারিতেছি না! আপনার সঙ্গে তাঁহার আলাপ আছে;—আপনি কিছু জানেন?

"জ্যেঠার কাছে বুঝি তিনি আমার নাম করিয়াছিলেন?"

"তিনি আপনার কথা অনেক বলিয়াছিলেন। জর্জ্জেট্‌কে উপলক্ষ্য করিয়াই তিনি আসেন। দুই চারি কথার পর এলিসের সঙ্গে দেখা করিবার কথা পাড়েন। বলেন—'আপনিও ঐরূপ আলাপের খুব পক্ষপাতী।' আপনার জ্যেঠাত তাঁহাকে কতকটা পাগল ঠাওরাইয়াছেন।"

ম্যাক্সিম্ কাউণ্টেসের স্বভাব জানিতেন; কিন্তু তিনি ডাক্তার ভিলাগোসের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার প্রস্থানের পরই রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া, উঠিবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নই। তিনি বড়ই বিস্মিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ এবিষয়ে সংকল্প স্থির করিলেন। বলিলেন, "ম্যাডাম্ মার্টিনো, আমি মুক্তকণ্ঠে মনের কথা খুলিয়া বলিতেছি, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন; এলিস্ তুমিও আমাকে ক্ষমা করিও; কিন্তু আমি চুরি সম্বন্ধে যে সকল কথা জানিয়াছি, তাহা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। জর্জ্জ ভিগ্‌নরী আমার পরম বন্ধু; তাহার তিল মাত্র অনিষ্ট হউক,—এ কামনা আমি মনেও স্থান দিতে পারি না; কিন্তু আমি সাধুতার অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে, কাউণ্টেস্ মসিয়ে কার্‌নোয়েলের অপকলঙ্ক ভঞ্জন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তিনি দেখাইবেন, রবার্ট্ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

ম্যাক্সিমের কথা শুনিবামাত্র এলিসের কুসুমকোমল গণ্ড পাণ্ডুরচ্ছবি ধারণ করিল। সে কোন কথা কহিল না। ম্যাডাম্ মার্টিনো অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন; আজ ম্যাক্সিমকে রবার্টের পক্ষাবলম্বী দেখিয়া তাঁহার কথা ম্যাডাম্ মার্টিনোর কাণে যেন কেমন শুনাইল!

"আমি রবার্টের পক্ষসমর্থন করিতেছি না; কাউণ্টেস্ নিজেই সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আমি কেবল সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। কাউণ্টেস্ জর্জ্জেটের মুখে সকল কথা শুনিয়াছেন। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি, এই বালক চুরির ব্যাপারে লিপ্ত,—দুর্দ্দৈব-বশতঃ পড়িয়া গিয়া যদি তাহার স্মৃতিভ্রংশ না ঘটিত, তাহা হইলে এতক্ষণ প্রকৃত অপরাধীর নাম জানিতে পারিতাম। কাউণ্টেসের দৃঢ়বিশ্বাস—রবার্ট্ নিরপরাধ। তিনি বন্দি-দশায় প্যারীনগরেই আছেন। শত্রুহস্তে পড়িয়াই তিনি একমাসের মধ্যে কাহারও সহিত দেখা করিতে পারেন নাই।

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন,—"সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

ম্যাক্সিম্, কাউণ্টেসের অনুরোধে কিভাবে এবিষয়ে অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বলিলেন,—"আমার স্থির বিশ্বাস, জর্জ্জেটের স্মৃতি ফিরিয়া আসিলে, সকল রহস্য প্রকাশ পাইবে।"

এলিস্ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "সে কি মসিয়ে কার্-নোয়েল্‌কে অপরাধী মনে করে?"—"জর্জ্জেট্ কাউণ্টেস্‌কে বলিয়াছে, এই ব্যাপারের সহিত কার্‌নোয়েলের কোন সংস্রব নাই। তাই কাউণ্টেস্ তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এখন তুমি সব জানিলে, তোমার যেরূপ অভিরুচি করিতে পার। আমি যখন কাজে একবার হাত দিয়াছি, তখন শেষ না দেখিয়া ছাড়িব না। ভিগ্‌নরীকেও একথা বলিয়াছি; শুনিয়া সে অসন্তুষ্ট হয় নাই।"

ম্যাডাম্ মার্টিনো বিরক্তভাবে বলিলেন,—"আপনি অবিবেচকের কাজ করিতেছেন; একথা শুনিলে আপনার জ্যেঠা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

"জ্যেঠা রাগ করেন ক্ষতি নাই, এলিস্‌কে কাউণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন না; কিন্তু আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। যাক্, সন্ধ্যা হইয়াছে; আমি চলিলাম।" ম্যাক্সিম্ এলিসের করমর্দ্দন এবং ম্যাডাম্ মার্টিনোকে অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইলেন। জর্জ্জেট্ তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল, ম্যাক্সিম্ তাহার নিকট গিয়া স্নেহস্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কেমন বাপু, বাহিরে বেড়াইয়া খুসী হইয়াছ ত?"

"বাহিরে বেড়াইলে বড় আনন্দ হয়। আমাদিগের বাড়ীতে দিনেই অন্ধকার; ঠাকুরমা বেলা তিনটার সময় প্রদীপ জ্বালেন।"

"কাল্ আবার আমি তোমাদের বাড়ীতে যাইব; তুমি, বোধহয়, কাল্ কাউণ্টেস্‌কে দেখিতে যাইবে?"

"কোন্ কাউণ্টেস?"

"এভিনিউ দে ফ্রায়েদ্‌লাণ্ডে যাঁর সুন্দর বাড়ী আছে।"

"হাঁ হাঁ নাদেজ্।"

"নাদেজ্?—নাদেজ্ কি কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার নাম?"

"ঠাকুরমা ত ঐ নামই বলেন, আপনি বরং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।"

ম্যাডাম্ পিরিয়াকের সহিত কাউণ্টেসের এরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে, দেখিয়া ম্যাক্সিম্ বিস্মিত হইলেন। তিনি কাউণ্টেসের ডাক-নাম জানিতেন না। চলিতে চলিতে উভয়ে রুদে-ভিগনীতে উপস্থিত হইলে সহসা জর্জ্জেট্ বলিয়া উঠিল,—"এই—এই পথে আমরা কত খেলা করিয়াছি। ঐ বড় বাড়ীটার পাশে একটা পথ দেখা যাইতেছে না? ঐ পথটি দেখিলেই, বোধ হয়, মারবেল্ খেলিবার জন্য পথটা তৈয়ার হইয়াছে। যেদিন পড়িয়া আমার হাত ভাঙ্গিয়া যায়, সেদিন ওখানে দুই ঘণ্টা খেলা করিয়াছিলাম।"

"জায়গাটা তুমি বেশ চিনিতে পারিতেছ?"

"খুব চিনেছি; সে যেন কালকার কথা; আফিসে যাইতে দেরি হইয়া গিয়াছিল, তাই আর আফিসে গেলাম না; ভাবিলাম, সকলে মনে করিবে আমার অসুখ হইয়াছে।"

"তুমি বোধ করি, সমস্ত দিন একলা ছিলে না?"

"না, আমি গড় দেখিতে গিয়াছিলাম;—তবে এখানে যে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে আছে; কিন্তু কেন যে আসিয়াছিলাম, সেকথা মনে পড়ে না।

"মনে করিবার চেষ্টা কর দেখি।"

"দাঁড়ান্; ঐ বাড়ীটাকে একটু দেখিয়া লই।"

"বাড়ীটা অতি চমৎকার। কি মজবুত ফটক, কতবড় আঙ্গিনা, বাড়ীর পশ্চাতে নিশ্চয় একটা বাগান আছে।"

"বাগান?"—ম্যাক্সিমের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বালক বলিল, "পাঁচিল ঘেরা একটা বাগান?"

"হাঁ, তুমি যদি দেখিতে চাও ত তোমাকে বাড়ীর পশ্চাতে লইয়া যাই। বাগানের নিকট একটিও বাড়ী নাই। এ বাড়ীটা কা'র তুমি জান?"

"না; তবু বোধ হইতেছে বাড়ীটার ভিতর যেন আমি একবার গিয়াছিলাম।"

ম্যাক্সিম্ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন, 'কাহার বাড়ী একবার জিজ্ঞাসা করিতে হ'বে।' তাহার পর তিনি জর্জ্জেট্‌কে বলিলেন, "ও বাড়ীতে তুমি কেন গিয়াছিলে? পত্র লইয়া গিয়াছিলে বুঝি?"

"না, না, পত্রটত্র নিয়ে যাই নি';—ওসব কাজেই নয়! আমি সে দিন আফিসেও যাই নাই।" ম্যাক্সিম্, জর্জ্জেট্‌কে রাজপথের প্রান্তে লইয়া গেলেন।

"এই বুলোভার্দ-দে-কোরসিলি, এখান থেকেই তোমাকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়।"

রাজপথের মোড় ফিরিবামাত্র বালকের মুখ উজ্জ্বল ও তাহার নয়নদ্বয় জ্যোতিষ্মান্ হইল। সে বলিয়া উঠিল,—"এই মনে পড়িয়াছে! এ জায়গাটা আমি চিনি—আপনাকে সব দেখাইতেছি।" কএক পদ অগ্রসর হইয়া জর্জ্জেট্ থামিল। "ঐ—ঐ পাঁচিলটা দেখিতেছেন?—ঐ পাচিল থেকেই আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম। পড়িবার সময় আমার পায়ের কাছে এই পাথর খানায় আমার মাথা ঠুকিয়া গিয়াছিল।"

"তুমি পাচিলে উঠিয়াছিলে কেন?"

"পাচিলের ওপাশে কি আছে দেখিবার জন্য।"

"কি দেখিয়াছিলে?"

"কিছুই না—আবার সব আঁধার হয়ে গেল!"

ম্যাক্সিম্ অধীরভাবে অঙ্গোৎক্ষেপণ করিলেন, কিন্তু তখনই আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলেন, "তুমি পাচিলের উপর উঠিলে কি করিয়া?"

"বোধকরি দড়ী—হাঁ হাঁ—একটা গাঁটওয়ালা দড়ী ধরিয়াই উঠিয়াছিলাম। দড়ীর মুড়োয় একটা হুক বাঁধা ছিল।"

"দড়ী কোথায় পেলে?"

"মনে হইতেছে না, দড়ি ধরে' উঠেছিলাম তা মনে আছে। নামিবার সময় হয়ত দড়ীটা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।"

"পাচিলে উঠিলে কেন, নিশ্চয়ই তোমার কোন উদ্দেশ্য ছিল।"

"ছিল, আমি কিন্তু সেটা ভুলিয়া গিয়াছি।"

"আমি পীড়াপীড়ি করিতেছি বলিয়া, ভয় পাইও না। খানিক ভাবিয়া দেখ, আমি ভিগ্নরী নই যে তোমার উপর হুকুম চালাব; কার্নোয়েলের মত আমিও তোমার বন্ধু।"

আশ্চর্য্য-প্রদীপের দৈত্যকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া, আলাদীনের বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না; কিন্তু জর্জ্জেট্ যখন বলিল, "মসিয়ে কার্নোয়েল্? হাঁ তিনিই ত,—

পাঁচিলে উঠিয়া আমি ত তাঁহারই খোঁজ করিতেছিলাম।" তখন ম্যাক্সিমের বিস্ময়ের অবধি রহিল না!

তখন একে একে জর্জ্জেট্—মসিয়ে কার্নোয়েলের কর্ণেল্ বরিসফের গৃহে প্রবেশ এবং বন্দিদশার পরিচয় দিল। শেষে বলিল, "যে গাড়ীতে মসিয়ে কার্নোয়েল্ ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই গাড়ী বাহির হইলে দেখিলাম, তিনি গাড়ীতে নাই। ভাবিলাম, এরা তাঁকে বিপদে ফেলিবার জন্য আটক করে রেখেছে; আমি তাঁহাকে ইহাদের হাত থেকে উদ্ধার করিব। তারপর, একটা ছেলের সঙ্গে জুটে তাহার বাপের কুস্তির আখড়া থেকে দড়ী আনিলাম। রাত্রি এগারটার সময়, এপথে লোকের যাতায়াত বন্ধ হইলে, দড়ীটা পাচিলের উপর ছুড়িয়া দিলাম; অমনই ধারাল হুকটা পাচিলের মাথায় আটকাইয়া গেল। দড়ী ধরিয়া পাচিলের মাথায় উঠিয়া দেখি—"

"মসিয়ে কার্নোয়েল্।"

"হাঁ, তিনি বাতি হাতে একটা বড় জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিয়াই তাঁকে চিনিলাম, তিনিও বোধ করি আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; তিনি যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিত করিতেছিলেন।"

"তারপর?"

"তারপর, আমি পড়িয়া গেলাম; আর আমার কিছু মনে নাই।—সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। আমি এখন ঠাকুরমার কাছে যাইব।"

ম্যাক্সিম্ জর্জ্জেট্‌কে লইয়া চলিয়া গেলেন।—এতদিন যাহার সন্ধান করিতেছিলেন, আজ তাহার সন্ধান মিলিল।

(ক্রমশঃ)

নোবেল্ পুরস্কার

ডাঃ রিচে

এবৎসর চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির জন্য ফ্রান্সের ডাক্তার চার্লস্ রিচে 'নোবেল্' পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফ্রান্সের চিকিৎসকদিগের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-প্রসূত ফলদ্বারা চিকিৎসা জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইনি International Arbitration Society ও Psychical Research Society দ্বয়ের সভাপতি। ইনি Revieu Scientifique নামক সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রের সম্পাদক।

মিঃ ইলিউরুট্

জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে যাঁহারা সহায়তা করিয়া যুদ্ধাদি নিবারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মিঃ ইলিউরুট্ অগ্রণী। বিবেচিত হইয়া এবৎসর এই বিভাগে 'নোবেল্' পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে নিউফাউণ্ডলণ্ডে মৎস্য চাষ ব্যপদেশে যখন দু'একটি স্বাধীন-জাতির মধ্যে যুদ্ধ একরূপ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ইনি হেগের শান্তিসভা কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। তাঁহার মধ্যস্থতায় সকল বিবাদ-ভঞ্জন হইয়া যায়। ইঁহারই অদম্য-উৎসাহে ও যত্নে ১৯০৬ সালে দক্ষিণ-আমেরিকার ও ১৯০৭ সালে মেক্সিকোর সহিত যুক্ত-রাজ্যের সখ্য বদ্ধমূল হইয়া তৎতৎপ্রদেশে শান্তি স্থাপিত হয়। ইঁহার বয়স এখন ৬৯ বৎসর।

সত্য-পরীক্ষক যন্ত্র

আর মিথ্যা কথা বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই! কেহ আর সত্য গোপন করিয়া রাখিতে পারিবেন না। আদালতে, মামলা-মোকদ্দমায়, শামলাধারী মহাপ্রভুগণকে আর সাক্ষীর জেরা করিয়া হয়রাণ হইতে হইবে না। আর অকারণ বাগ্‌-বিতণ্ডায় আদালতের সময় নষ্ট হইবে না। যে আশ্চর্য্য-যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে আর কোন কথা গোপন রাখিবার উপায় থাকিবে না;—মিথ্যা-বাদী হাতে হাতে ধরা পড়িবে।

কথাটা কল্পনা নহে, বা গঞ্জিকার বৈঠক হইতেও আমদানী করা নহে। সত্য সত্যই,—সত্য-মিথ্যা ধরিবার জন্য যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। মিঃ সার্টরিল্ বার্ট নামক এক মনস্তত্ত্ববিদ্ সাহেব একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; সেই যন্ত্রের সাহায্যে কেহ কোন কথা গোপন করিতেছে কি না, কোন কথার প্রকৃত উত্তর দিতেছে কি না,—তাহা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িবে! আমরা নিম্নে এই যন্ত্রের পরীক্ষা সম্বন্ধে দুই চারিটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি;—

এখন আদালতে কোন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের সময় বিচারক অথবা উকিল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "তুমি অমুক ব্যাপার দেখিয়াছ কি না?" অতঃপর আর এত কথা বলিতে হইবে না। মনে করুন, এক ব্যক্তি খুন হইয়াছে, তাহার মৃতদেহ একটা রাস্তার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য-প্রদানের জন্য একটি লোককে উপস্থিত করা হইয়াছে; সে লোকটি রাস্তার মধ্যে মৃতদেহ রক্ষিত হইবার সময়, সেই স্থানে উপস্থিত ছিল এবং সে সমস্তই দেখিয়াছে, এই কথাটি তাহার নিকট হইতে জানিয়া লইতে হইবে। এখনকার নিয়ম-অনুসারে উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করিবেন,—"মৃতদেহ যখন রাস্তার মধ্যে রাখা হয়, তখন তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে?" কিন্তু অতঃপর আর তাহা করিতে হইবে না। সাক্ষীর সম্মুখে যন্ত্রটি বসাইয়া তাহাকে সুধু বলিতে হইবে "রাস্তা" এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই ক্রণমিটার যন্ত্রের চাবি টিপিয়া দিতে হইবে। সাক্ষী যদি প্রকৃতপক্ষেই ঘটনা দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই মৃতদেহের কথা তাহার মনে হইবে, এবং সে যদি সত্যবাদী হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই সে বলিবে "মৃতদেহ"। কিন্তু তাহার যদি কথাটা গোপন করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, ঐ 'মৃতদেহ' কথাটা সে বলিবে না। তাহার ফলে এই হইবে যে, তখন সে চিন্তা করিবে, অর্থাৎ তাহার মনের মধ্যে একটা ভাবনার উদয় হইবে। এই ভাবনা তাহার মস্তিষ্কের কার্য্য: সে যখন ঐ কথাটা ভাবিতেছে তখন, তাহার মুখ চক্ষু প্রভৃতির ভাবান্তর হইয়াছে; সে যতই কথাটা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে, ততই তাহার মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, এবং তাহার সম্মুখস্থিত যন্ত্র তাহার ভাবের প্রত্যেক পরিবর্ত্তন অঙ্কিত করিয়া লইবে, তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে আন্দোলন চলিতেছে,—সত্য-মিথ্যার যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে—তাহা যন্ত্রের নিকট গোপন থাকিবে না। অবশেষে হয় সে সত্য কথা বলিবে, আর না হয় সে মিথ্যা কথা বলিবে, অথবা একেবারেই চুপ করিয়া থাকিবে। মনস্তত্ত্ববিদ্ বিচারক, যন্ত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিবেন, সাক্ষী সত্য কি মিথ্যা বলিতেছে।

মিঃ বার্ট বলিয়াছেন যে, সুধু যে এই যন্ত্রের সাহায্যেই মিথ্যাবাদীকে ধরিতে পারা যায় তাহা নহে; তিনি আরও একটি সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন। তিনি বলেন,—কোন ব্যক্তিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে যদি সেই প্রশ্নের ঠিক উত্তর না দিয়া অন্য কথা বলে, তখন তাহাকে একটু ভাবিতেই হইবে। সত্য কথা, প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া পড়ে; কিন্তু মিথ্যা উত্তর দিতে গেলেই, যত বড় মিথ্যাবাদী হউক না কেন, তাহাকে একটু ভাবিতেই হইবে। এই ভাবনার জন্য তাহার যেটুকু আয়াস স্বীকার করিতে হইবে, তাহার প্রমাণ গোপন থাকিবার যো নাই; তাহার দেহের একটি প্রত্যঙ্গ তাহার মিথ্যা কথন ধরাইয়া দিবে। সেই প্রত্যঙ্গ তাহার হস্তের তালু। মিঃ বার্ট বলিয়াছেন, কোন কথা গোপন করিতে গেলে যে আয়াসটুকু স্বীকার করিতে হয়, তাহার ফলে মানুষের হাতের তালু ঘামিয়া উঠে; তবে কাহারও বা অধিক ঘামে, কাহারও বা কম ঘামে।

ইহা জানিবার জন্য সাক্ষীর হাত দুইখানি এক পাত্রে জলের মধ্যে ডুবাইয়া ধরিতে হয় এবং সেই পাত্রের মধ্যে তাপমান যন্ত্র রাখিতে হয়। তাহার পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে লোকটি যদি সত্যকথা বলে, তাহা হইলে পাত্রস্থ জলের শৈত্য বা উত্তাপের কোনপরিবর্ত্তন হয় না, সুধু শরীরের উত্তাপের জন্য যেটুকু হইবার তাহাই হয়; কিন্তু সে যদি মিথ্যা বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার হাতের তালু অল্পাধিক ঘামিয়া উঠিবেই এবং তাহার ফলে জলের পরিবর্ত্তন হইবে—এবং তাপমান যন্ত্র তৎক্ষণাৎ সে কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তখন বিচারক ও জুরীমহাশয়গণকে আর মাথা ঘামাইতে হইবে না; তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন সাক্ষী সত্য কথা বলিতেছে কি না।

মিঃ বার্ট্ অনেক পরীক্ষা করিবার পর, এই যন্ত্রের কথা সুধী-সমাজে প্রকাশিত করিয়াছেন, কিন্তু আমরা যতদুর জানি, তাহাতে এখনও এই যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং, মিথ্যাবাদী "বব্বলেরা" আরও কিছুকাল নির্ভয়ে আদালতে বিচরণ করিতে পারিবে, এবং উকিলমহাশয়গণও সাক্ষীদিগকে জেরা করিবার সময় নিজেরা গলদঘর্ম্ম হইতে, এবং সাক্ষীদিগকে নাকেরজলে-চোখেরজলে এক করিতে থাকুন।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী দেবীর
প্রথম-উদ্ভবস্থান

অদ্বৈতধাম শান্তিপুরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে, ভাগীরথী-সন্নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মশাসন নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামখানি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে, নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপিতামহ, রুদ্রদেব রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এই সদাশয় নৃপতি একখানি আদর্শ-ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম সংস্থাপন-মানসে, একশত-আট ঘর নিষ্ঠাবান্ ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ মনোনীত করিয়া, তাঁহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহার্থ ভূসম্পত্তি প্রদানপূর্ব্বক, এই গ্রামখানি সংগঠিত করেন। ব্রহ্মণ্যের সুপ্রতিষ্ঠা হেতু, গ্রামখানি "ব্রাহ্মণ-শাসন", বা সংক্ষেপতঃ "ব্রহ্মশাসন", নামে অভিহিত। বহুদিন ধরিয়া ঐ ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ, ব্রহ্মনিষ্ঠা ও সাধনা দ্বারা, গ্রামের 'ব্রহ্মশাসন' নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম, সাধক চন্দ্রচূড় তর্কপঞ্চাননের সাধনা-প্রভাবে এই গ্রামে জগদ্ধাত্রী দেবীর আবির্ভাব ও পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপরে নবদ্বীপ-রাজবংশের চেষ্টায় এই পূজা সাধারণ্যে প্রচলিত হয়।*

কিন্তু কালমাহাত্ম্যে ব্রহ্মশাসনের আর সেদিন নাই! একশত-আট ঘর ব্রাহ্মণের মধ্যে এখন অষ্টাদশ ঘরও অবশিষ্ট নাই। যে গ্রাম হইতে প্রতি গৃহে মায়ের পূজা হইত,—সেই ব্রহ্মশাসন হইতে মায়ের পূজা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। মায়ের উদ্ভবভূমি ব্রহ্মশাসনে মায়ের পূজা প্রচলিত রাখা ব্রহ্মশাসনবাসিগণের যেমন কর্ত্তব্য, মায়ের অন্যান্য সন্তানগণের পক্ষেও তদপেক্ষা অল্প কর্ত্তব্য নহে। যদি ভাগীরথীসেবকের পক্ষে তদুৎপত্তি স্থান হরিদ্বার তীর্থ স্বরূপ হয়, তাহা হইলে মাতার সন্তান-দিগের পক্ষে ব্রহ্মশাসনও তীর্থস্থান। এক্ষণে ব্রহ্মশাসন গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এই গ্রামে এ বিষয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য গ্রামে এক জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি-স্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছেন; আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের এই শুভ-উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

* "Krishnachandra himself established the festival called the *Jagadhatri Puja*.—Hunter's Statistical Account of Nadia (1875).—p. 156.

"নদীয়াকাহিনী"র লেখকের মতে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্রের সময় ইহা প্রচলিত হয়।

আকৃতির সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ

বৈদেশিক গুরুগণের নিকটে শুনিতে শুনিতে—আত্ম-নির্ভরতাবিহীন আমাদের একরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিলেও বিজ্ঞানের বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই ; সাধারণ শিল্প ও জ্যোতিষশাস্ত্র তাঁহারা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গ্রহ-গণনাদি-সংশ্লিষ্ট গণিত-জ্যোতিষ প্রামাণ্য হইলেও, তাঁহা-দিগের ফলিত-জ্যোতিষ "গাঁজাখুরী" মাত্র!—হস্তপদাদির রেখা, কপালের বলী, বাহুর দৈর্ঘ্য, গাত্রস্থিত তিল ইত্যাদির সহিত মানুষের বল, সুখ, দুঃখ, দারিদ্র, ঐশ্বর্য্য, মূর্খতা ও পাণ্ডিত্যের কখন নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি?—আমাদিগের ন্যায় তথা-কথিত শিক্ষিত-সমাজে, এসকল বিষয়ে বিশ্বাস করার কথা প্রকাশ করা অজ্ঞতার পরিচয় মনে হইত। কিন্তু, অধুনা পাশ্চাত্য-জগতে যখন এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া, এগুলিকে একটা বিজ্ঞান-সঙ্গত শাস্ত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে, —তখন এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করায় দোষ কি ?

প্রকৃতির কার্য্য অপরিবর্ত্তনীয় ও অবশ্যম্ভাবী। অগ্নির দাহিকা-শক্তি, জলের শৈত্য, সূর্য্য-চন্দ্রাদির উদয় ও অস্তের কখনই ব্যতিক্রম হইবার নহে; এই নিশ্চয়তার উপরেই বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর উপরিস্থ সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার উৎপত্তি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে শরীরে রস, ও রোগীর রোগ বৃদ্ধি, মৃত্যু-সংখ্যার আধিক্য, রৌদ্র-প্রধান গ্রীষ্মমণ্ডলে অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি সুবৃহৎ বৃক্ষ, এবং সৌরতাপবিহীন মেরু-প্রদেশে শৈবালাদি ক্ষুদ্র-উদ্ভিদের উদ্ভব, ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনা দর্শন করিয়াও, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব পৃথিবীস্থ মনুষ্যের উপরে থাকিতে পারে না,—এরূপ অনুমান করা বাস্তবিকই যুক্তিসঙ্গত নহে। আজ গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব এক ব্যক্তির উপরে যেরূপ ফল প্রকাশ করিল, কাল যে উহা অনুরূপ করিবে,—তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বহুসংখ্যক লোকের উপরে পরীক্ষা করিলে যেসকল ফল পাওয়া যায়, তাহা আপাততঃ পূর্ণমাত্রায় বৈজ্ঞানিক ধ্রুব সত্য না হইলেও, একেবারে মিথ্যা হইবার নহে। আমরা মেয়ে-ডাক্তার ব্ল্যাক্‌ফোর্ড (Dr. Katherine M. H. Blackford) এর পর্য্যবেক্ষণ-ফল প্রথমে লিপিবদ্ধ করিয়া, পরে আমাদের দেশীয় ফলিত-জ্যোতিষের কিঞ্চিৎ আলচোনা করিব।

ভারতে—সন্ন্যাসীদলমধ্যে—ডাঃ ব্ল্যাক্‌ফোর্ড্

গত ১৫ বৎসরে, তিনি বারহাজার ব্যক্তি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক উহা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্ত-রাজ্য, ক্যানাডা এবং মেক্সিকো দেশে বহুকাল পরীক্ষার পর, তিনি ১৮টি বৈদেশিক রাজ্য ভ্রমণ করিয়াছেন; অনেক আফিসে তিনি পরামর্শ-দাতা-রূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন; তাঁহার পরামর্শ-অনু-সারে বহুসহস্র—পুরুষ ও স্ত্রী—উমেদার, উপযুক্তপদে (কার্য্যে) নিযুক্ত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল দেশে এক একটা কল ও আফিসে ৮।১০ হাজার লোক কাজ করিয়া থাকে। তিনি উমেদারদিগের আকৃতি ও পরিচ্ছদাদি বাহিকলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক প্রকৃতি-নির্ণয় করিয়া, যে ব্যক্তি যেপদের উপযুক্ত, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করি-বার একটি নূতন-শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রের প্রধান প্রধান লক্ষণ বাহিরেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেহই আপনাকে প্রকৃতপক্ষে গোপন

রাখিতে পারে না। আমাদিগের স্বভাব-চরিত্র, আমাদিগের প্রবৃত্তি, কখন গোপনে থাকিবার জিনিস নহে। আমাদের চলা-ফেরা ও নানাবিধ মুদ্রাদোষ, শরীরের প্রত্যেক রেখা ও মুখের প্রত্যেক ভঙ্গী, বিশেষজ্ঞের নিকটে আমাদিগকে ধরাইয়া দেয়।

উমেদার নির্ব্বাচন প্রণালী

নিয়োগ-পরিদর্শক (Employment Supervisor) অদূরবর্ত্তী নিজ আফিসে সহকারিদিগের সহিত—উপস্থিত-উমেদার ও অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের—আবেদনপত্র পরীক্ষা করেন। এই সময় তিনি বহুবিধ প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বিভিন্ন শক্তি, বুদ্ধি, শ্রমশীলতা, মিতাচার, নির্ব্বুদ্ধিতা, অপব্যয়, চরিত্র-হীনতা, প্রভৃতি নানাপ্রকার বিষয় অল্পাধিক পরিমাণে উহাদিগের মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেহ হয় ত স্বাধীন-ব্যবসায়দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া অগত্যা চাকুরী গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, কেহ বা জীবনে এই প্রথম ইহার আস্বাদ লইবেন, অভিভাবক-হীন কোন যুবক পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উহার জন্য ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছেন, কেহ বা সখের জন্য উহা গ্রহণ করিবেন; ফলতঃ, প্রত্যেকেরই মুখে মনোভাব অল্পাধিক পরিমাণে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক উমেদার, পরীক্ষা-গৃহে প্রবেশকরতঃ, পরিদর্শক বা তাঁহার সহকারীদিগের সম্মুখে আসন-গ্রহণ করিবার সময় —তিনি যে কেবলমাত্র উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত ব্যক্তি, তাহাই শুধু প্রকাশ পায়, এরূপ নহে,—তিনি কোন্ বিশেষ কার্য্যের উপযুক্ত, তাহারও বাহ্যিক-লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। মেয়ে-ডাক্তার ব্লাক্‌ফোর্ডের মতে—স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, সততা এবং শ্রমশীলতা কর্ম্মপ্রার্থীর পক্ষে প্রধানগুণ। ইহাদের কোন একটির বিশেষরূপ অভাব হইলে, তিনি উমেদারকে বিদায় দিয়া থাকেন। পরীক্ষক আগন্তুকের চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই তাহার স্বাস্থ্যের সমুদায় জ্ঞাতব্য বুঝিয়া লন; কারণ জ্যোতিঃহীন (dull), নিস্তেজ (leaden), চঞ্চল এবং হরিদ্রাবর্ণ চক্ষু খারাপ-স্বাস্থ্যের চিহ্ন। অঙ্গুলির অগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নখের নিম্নে রক্তের লাল চিহ্ন দেখা যায় কি না, তাহাই পরীক্ষা করেন। এতদ্ভিন্ন, অত্যধিক ফ্যাকাশে-ভাব, খারাপ দন্ত, বসাগলা (ভাঙ্গাস্বর), ফ্যাকাশে বা নীল ঠোঁট, প্রভৃতি আরও বহু-সংখ্যক বাহ্যিক লক্ষণ অত্যুৎকৃষ্ট শারীরিক শক্তির, বা কর্ম্ম-কুশলতার, পরিচায়ক নহে। বায়ুগ্রস্থ (nervous) ব্যক্তিকে দেখিবামাত্রই বুঝিতে বাকী থাকে না। যাঁহার তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের অগ্রভাগ হরিদ্রাভবর্ণযুক্ত, তিনি যে সিগারেট্ খাইয়া থাকেন, ইহা কি বুঝিতে কাহারও বাকি থাকে?

চক্ষু দেখিলে, লোকটী বুদ্ধিমান কি না, তাহা অনেক পরিমাণে স্থির করা যায়। চালাক লোকের চাহনি স্বতন্ত্র ধরণের, যেন চোখমুখদিয়া কথা বাহির হইতেছে। এইরূপ লোক প্রশ্নের উত্তর দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে না, উত্তর গুলিও "লাগসই" বা সঙ্গত হইয়া থাকে।

সততা-নির্ণয় করা বাস্তবিকই বড় কঠিন-ব্যাপার। কারণ, যাহার উদ্দেশ্য সৎ, তিনিই যে সৎ লোক হইবেন, তাহার কোন অর্থ নাই। ন্যায়-অন্যায়বোধ, সদুদ্দেশ্য-পালনের উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা, এবং ফলা-ফল ভোগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শারীরিক ও নৈতিক সাহসের উপরে, লোকের সততা নির্ভর করে। তথাপি লোকের চাহনি (দৃষ্টি), মুখের ভাব, গৃহে প্রবেশের সময় চলা ফেরার "রকমসকম", কথাবার্ত্তা, ও অঙ্গভঙ্গী, প্রভৃতির সাহায্যে উহা অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

শ্রমশীলতা, লোকের শারীরিক শক্তি (energy) এবং কষ্টসহিষ্ণুতার উপরে নির্ভর করে। শারীরিক-শক্তি, আবার ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরস্থ অক্সিজেন্-বাষ্পের উপরে নির্ভর করে। সুতরাং, দেখিতে কদর্য্য হইলেও, প্রশস্ত-ছিদ্র বিশিষ্ট দীর্ঘনাসিকা, প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন্-গ্রহণে সহায়তা করে বলিয়া, শারীরিক-শক্তির পরিচয়প্রদান করে। স্নায়বিক বল, এবং হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য, পরীক্ষা করিলে কষ্ট-সহিষ্ণুতা স্থির করা যায়। পরিদর্শকের অভ্রান্ত চক্ষু, অপরাপর সকল বাহ্যিক চিহ্ন দর্শনে, এই গুণটি সহজেই নির্ণয় করিয়া থাকে।

ডাক্তার ব্লাক্‌ফোর্ডের মতে, মানুষের বাহ্যিক আকার-প্রকার এবং কার্য্য-কলাপের কোনটিই অগ্রাহ্য নহে। প্রত্যেকটিই চরিত্রের স্বভাবজ, বা উপার্জ্জিত, গুণের চিহ্ন। সুতরাং, সমুদায়গুলি একত্র করিয়া, সঙ্গতরূপব্যাখ্যা করিলে, লোকটির প্রকৃতিসম্বন্ধে সঠিক ধারণা না জন্মিবে কেন?

এই উপায়েই কোন্ ব্যক্তি আপন স্বভাব ও শিক্ষার প্রভাবে, কোন্ কার্য্যের উপযুক্ত—তাহা তিনি স্থির করিয়া থাকেন।

শ্রেণী-বিভাগ

ডাক্তার ব্লাক্‌ফোর্ড ও তাঁহার শিষ্যগণ, আগন্তুক উমেদারদিগের, নিম্নলিখিত ৯টি গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন; যথা,—ধরণ (Stature), আয়তন (Size), চেহারা (Form), বর্ণ (Color), গঠন (Structure), সামঞ্জস্য (Proportion), সঙ্গতি (Consistency), আকৃতি (Expression) এবং অভিজ্ঞতা (Experience.)।

কতকগুলি লোক দেখা যায়, যাহাদিগের মুখ হাল্‌কা ধরণের * মনে হয়; অপর কতকগুলি লোকের মুখ মোটা ধরণের দেখা যায়।

যাহাদিগের মুখ হাল্‌কা ধরণের তাহারা—অভিমানী হইয়া থাকে, তাহারা প্রত্যুৎপন্নমতি, মুহূর্ত্ত-মধ্যে উত্তর দেয়,—এইরূপ আকৃতি-বিশিষ্টব্যক্তি সৌন্দর্য্য-প্রিয় হইয়া থাকে,—কদর্য্য, অপ্রিয় ও নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এরূপ লোক আনন্দের সহিত কার্য্য করিতে পারে না; ভোঁতা, ভারি, কদাকার দ্রব্য-ব্যবহার করিতে ইহারা নারাজ; ইহারা রেশম ও সাটিনের কাজ করিতে মজবুত; মণি-মাণিক্য, স্বর্ণ-রৌপাদির সুকুমার-শিল্প, ইহাদের প্রিয় হইয়া থাকে।

আর মোটা ধরণের লোকগুলির, মুখ দেখিলেই "ভোঁতা" বলিয়া মনে হয়। ইহাদের চুল-চর্ম্ম-আকৃতি-হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি পোষাক-পরিচ্ছদ ও কথাবার্ত্তা, সমস্তই মোটা ধরণের হইয়া থাকে।—ইহারা অভিমানী নহে; চট-কল, কয়লার খনি, প্রভৃতিতে ধূলা ও ময়লার মধ্যে আনন্দের সহিত কর্ম্ম করিতে সক্ষম। এরূপ লোকেরাই কর্ম্মকারের ন্যায় কদাকার বৃহৎ বৃহৎ হাতুড়ী, গুরুভার দণ্ড, ষ্টীমার ও জাহাজের অতিকায় যন্ত্রসকল, উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে।

দেহের গঠন দেখিয়া মোটামুটি শারীরিক বল অনুমান করা যাইতে পারে। সুদীর্ঘ শিখ-পলোয়ানের দেহে যে পরিমাণ বল থাকিতে পারে, দুইহস্ত-পরিমিত বামনের শরীরে সে পরিমাণ শক্তি থাকা কখনই সম্ভবপর নহে।

কতকগুলি লোক স্বভাবতঃ কৃশ, আবার আর কতক লোক মাংসল; কাহার কাহার সূক্ষ্মাগ্র দীর্ঘ-নাসা যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে, অথচ চিবুক ও কপাল যেন পিছাইয়া গিয়াছে। এইরূপ সকোণ (Angular) মুখকে ব্লাক্‌ফোর্ড মৃদঙ্গমুখ (Convex face) আখ্যা দিয়াছেন,

'মৃদঙ্গ' ও 'ডমরু' মুখ

যাহাদিগের মুখ গোলাকার বা ভোঁতাধরণের, যাহাদিগের কপাল উচ্চ এবং চিবুক সম্মুখদিকে বাহির করা, নাসিকা বসা, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট তাহাদিগকে বাঁদর বা 'ডমরু'-মুখ (Concave face) যুক্ত বলিয়াছেন।

মৃদঙ্গ-মুখ-ব্যক্তি ঝগ্‌ড়াটে ছট্‌ফটে ও সকল বিষয়েই তৎপর হইয়া থাকে। 'গড়িমাসি বা ঢিলেমি' করা ইহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইহারা স্বার্থপর হয়;—নিজের বিষয়টি ষোলআনা বুঝিয়া লয়, তাহাতে অন্যের অসুবিধা হইলেও দৃক্‌পাত করে না। এই সকল 'ব্যস্ত-বাগীশ্' লোক, ফলাফল ভালরূপ বিচার না করিয়াই কার্য্য করিয়া বসে। ইহারা, একটা না একটা কিছু কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে। ইহারা কাজের লোক (Practical men), কবিত্ব-বিহীন নীরস প্রকৃতির, সূক্ষ্মবুদ্ধি, ও সতর্ক হয়। এই সকল বায়ুগ্রস্ত এবং 'হোঁৎকা' বা ব্যস্তবাগীশ্ লোক সরল-প্রকৃতির হইয়া থাকে; মনের কথা গোপন রাখা, ইহাদের কার্য্য নহে। ইহারা লোকের "আঁতে ঘা" দিয়া কথা বলিতেও নারাজ নহে। ব্যস্তবাগীশতার জন্য ইহাদের কার্য্যে প্রায়ই ভুল

থাকে ;—কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারে না ; ইহাদের "ধনস্থানে শনি" দেখা যায়। এইরূপ লোক কলহপ্রিয় হয় এবং সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করে। ইহাদের উল্লিখিত গুণগুলি ও 'চটা'-মেজাজের জন্য, ইহারা প্রায়শঃ কার্য্যক্ষম হয় না। মানুষ একাধিক প্রকৃতি পায় বলিয়াই, সমুদায় দোষ একই ব্যক্তিতে অবশ্য বর্ত্তমান থাকে না ;— একথা সর্ব্বদা মনে রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

যাহার মুখ যত কম সূক্ষ্ম (Angular), তাহার গুণও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা তত অল্প। ডমরু বা বাঁদর-মুখবিশিষ্ঠলোকের অধিকতর দায়িত্ব-বোধ দেখা যায়। ইহাদিগের উপরে সহজে নির্ভর করা যায়। কোন কাজে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, ইহারা উহার সবদিক্ ভাবিয়া দেখে ;—হঠাৎ কোন একটা কাজ করিয়া বসে না। বাচালতা ইহাদিগের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ; ধীরে ধীরে অল্প কথা বলে বটে, কিন্তু উহা দার্শনিক ও কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের প্রকৃতি নম্র ও মধুর, মেজাজ ধীর, চরিত্র সৎ, এবং স্বভাব বড় কোমল ও শান্তিপ্রিয়। বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে স্থির থাকিয়া মধ্যস্থতা করা, গৃহ-বিচ্ছেদ নিবারণ করা, ইহাদের প্রকৃতিগত। মৃদঙ্গমুখ-লোকের ন্যায়, ইহাদের "সুন্দর চেহারা", বা চোখে-মুখে বুদ্ধি না থাকিলেও, ইহাদের দায়িত্ববোধ বড় প্রবল।
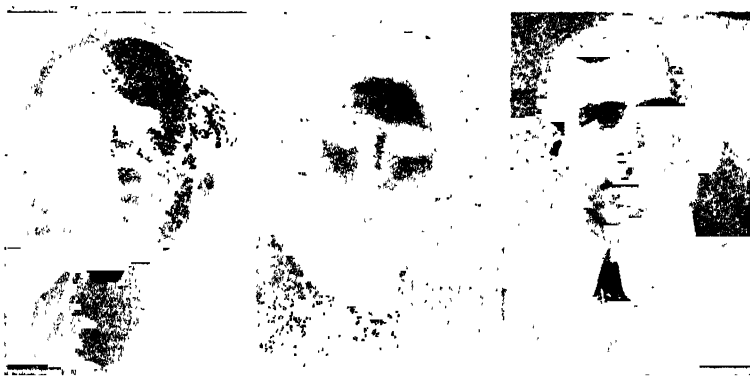
বিভিন্ন মুখের চিত্র

বর্ণ

বর্ণের সহিত, শারীরিক ও মানসিক কতকগুলি গুণের সম্বন্ধ আছে বলিয়া ব্লাক্‌ফোর্ডের বিশ্বাস। ক্ষুদ্র-চক্ষু, রক্ত-হীন, শ্বিত-রোগী জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কম স্থির-প্রকৃতির হইয়া থাকে ; কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীজাতি, শান্তস্বভাব ও বশ্যতার জন্য বিখ্যাত ; এই জন্যই উহারা সহজে দাস-বৃত্তিতে সম্মত হইয়া থাকে।

যাহার গৌরবর্ণের মাত্রা যতই অধিক, তাহার চঞ্চলতা, ঝগ্‌ড়াটেভাব, বদ্‌রাগ, অহঙ্কার, এবং ঘন-পরিবর্ত্তনশীলতা ততই বেশী ; কিন্তু যে লোকের রং যত কাল', তাহার ততই স্থিরপ্রতিজ্ঞা ও শাদাসিদে-ভাব বাড়িয়া যায়। সুন্দরী স্ত্রীলোক দশজনের প্রশংসাবাদ, ও উচ্চপদ উপভোগ করিয়া থাকে ; কিন্তু কাল' ব্যক্তি, গতানুগতিক দশজনের প্রশংসা-প্রাপ্তি অপেক্ষা সার-পদার্থ, জীবজন্তু ও প্রকৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়। ইহাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা কম হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু উহারাই প্রকৃত বন্ধুত্বের-পাত্র। এরূপ ব্যক্তি গোঁড়ামি-ভক্ত হয়, এবং তাহার কার্য্যে স্বভাবতঃই একটা শৃঙ্খলা থাকে, 'এলোমেলো' ভাব দেখা যায় না। সুন্দর ব্যক্তি, বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তন-প্রিয় হইয়া থাকে ; একই সময়ে বিভিন্ন ধরণের অনেকগুলি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে, কিন্তু কাল' ব্যক্তি ঘন-পরিবর্ত্তন পছন্দ করে না, এবং বৈচিত্র্য-প্রিয় হয় না ; বরং মনোমত বিষয়ে স্বীয় সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট মস্তিষ্কের লক্ষণ

যে অঙ্গের ব্যবহার যত অধিক হয়, তাহা ততই পুষ্ট হইয়া থাকে। এই-জন্যই যাহাদিগের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল অত্যধিক পুষ্ট দেখা যায়, তাঁহারা বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল। ইঁহাদিগের উদ্ভাবনী-শক্তি তীক্ষ্ণ ;—নূতন নূতন বিষয়-সৃষ্টি করা ইঁহাদিগেরই মস্তিষ্কের কার্য্য। এইরূপ লোকের মস্তক বৃহৎ, বিশেষতঃ কপাল ও কর্ণের উপরিভাগ প্রশস্ত ; এবং চিবুক ও স্কন্ধের পশ্চাৎভাগ অপরিসর হয় ; অস্থি ও মাংসপেশী অপেক্ষাকৃত নাতিস্থূল এবং কোমল হইয়া থাকে। এক কথায় তাহার কৃশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অথচ বৃহৎ মস্তক দেখিলে, যশোহরের রুগ্নদেহ মাথা-মোটা কৈ-মাছের কথা মনে পড়ে ! কারণ, মস্তক বৃহৎ হইলেও তাহার দেহ
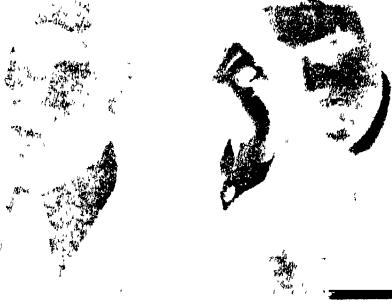
বিভিন্নাকৃতির মুখ

যথোচিত পুষ্ট নহে। গাত্রচর্ম্ম বিবর্ণ, মুখমণ্ডল অনেকটা ত্রিভুজাকৃতি, তীক্ষ্ণ ও সুচাল; চেহারা ও গঠন কোমল। এইরূপ লোক আত্মনির্ভরশীল হইয়া থাকে; পরান্নে প্রতি-পালিত হওয়া ইহার প্রকৃতি-বিরোধী।

এইরূপ চেহারার লোক যে দিগ্‌গজ্ পণ্ডিত বা দার্শনিক হইবেই, এরূপ নহে; তবে ইহারা "মাথাওয়ালা" লোক। হিসাবনবিশ, খাজাঞ্চী, বক্তা, লেখক, প্রাইভেট্-সেক্রেটারী, প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীর কাজ ইহারাই করে,—আড়তের গদিয়ান্, উকীলের মধ্যে প্রধান, ও পরামর্শদাতা, ডাক্তারী করিলে বৈজ্ঞানিক-ডাক্তার হইয়া থাকে। তবে, এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভাল বিচারপতি দেখা যায় না!

কাজের-লোকের লক্ষণ

কাজেরলোকের চেহারা অন্যরূপ;—ইহাদের হাড়-মোটা ও মাংস-পেশী অধিকতর পুষ্ট মনে হয়; মুখ দেখিতে ত্রিভুজাকৃতি না হইয়া বরং তুকোণ-বিশিষ্ট মনে হয়। ইহাদের শরীরে অতিরিক্ত মাংস থাকে না; স্কন্ধদেশ বিস্তৃত; নিম্নাঙ্গ ক্রমে সরু হইয়া পা পর্য্যন্ত পৌঁছে। নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রমসাধ্য-কার্য্য করা ইহাদিগের কাজ। ব্যবসায়বুদ্ধির যোগ থাকিলে ইহারাই উৎকৃষ্ট ফেরিওয়ালা হইতে পারে। চাষ, "কারুগিরি", আমদানি-রপ্তানী এবং নির্ম্মাণ কার্য্যে ইহারা সুদক্ষ হয়। ইহারাই উৎকৃষ্ট অস্ত্র-চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, ও আবিষ্কারক হইয়া থাকে। 'মোটর'-গাড়ীর পাল্লা (race), 'এরোপ্লেনে' আকাশে উঠা, কুস্তিগিরি, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি করা, এই শ্রেণীর লোকের কাজ। জল ও স্থল সৈন্যের 'অফিসার্' (নায়ক), জাহাজের কাপ্তেন্, এবং দেশ আবিষ্কারক, এই শ্রেণীর লোককেই ইহতে দেখা যায়।

ডাক্তারী মতে, যাহার পরিপাকশক্তি যত উৎকৃষ্ট, তাহার জীবনিশক্তি ও ক্ষতিপূরণ-ক্ষমতা তত অধিক। পরিপাক-ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া, ভুক্তদ্রব্য রক্তে পরিণত হইবার পূর্ণমাত্রায় সুবিধা পাইলে, লোকের মুখমণ্ডল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুপরিণত হইয়া উঠে। এরূপ ব্যক্তির উদরদেশের পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। দেখিলেই মনে হয়, যেন উদরদেশ স্ফীত; পদদ্বয় দৃঢ় ও মাংসল; মুখ গোলা-কার ও নিটোল; 'থুৎনি' যেন ডবল্। 'দৌড়ঝাঁপ'করা ইহাদের প্রধান লক্ষণ নহে;—ইহারা ধীরে ধীরে চলে, ব্যায়ামে অভ্যস্থ নহে, ডেস্কের সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া কর্ম্মচারীবর্গকে হুকুম করিতে ভালবাসে; শিকার করা বা পাহাড়ে চড়া ইহাদিগের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যায়াম। সম-প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের প্রিয়পাত্র ও গল্পপ্রিয় হওয়া, এবং উচ্চহাস্য করা, ইহাদিগের লক্ষণ। এইরূপ বলিষ্ঠ লোকেরা যে অকেজো হইয়া থাকে, তাহা নহে; ইহারাই বরং বড় বড় জজ, ব্যাঙ্কের কর্ত্তা, সভাসমিতির অধ্যক্ষ, হাকিম, প্রভৃতি হয়; ইহারাই আবার কসাই, এবং মুদিও হয়। কচ্ছপের ন্যায় মন্দগতিযুক্ত হইলেও, ইহারা স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে।

অন্যান্য গুণের লক্ষণ

ব্ল্যাক্‌ফোর্ডের মতে উচ্চ-মস্তক ও উন্নত-কপাল—কল্পনাপ্রিয়, উচ্চাভিলাষী লোকের চিহ্ন। প্রশস্ত-মস্তক লোক 'গায়েপড়া' বা ঝগ্‌ড়াটে, এবং হত্যাকারী হইয়া থাকে। চতুষ্কোণ-মুখ, বিজ্ঞ এবং হিসাবী লোকের চিহ্ন। যে লোকের মস্তক-গোলাকার, সে হঠকারী এবং অবিবেকী হয়। দীর্ঘ-মস্তক লোক-দূরদর্শী; এবং ক্ষুদ্র-মস্তক লোক, অদূরদর্শী হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তির শরীরের গঠন শক্ত, সে—নির্দ্দয় হৃদয়, উৎসাহশীল, ও স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে; যাহার শরীরের গঠন কোমল, সে—বিশ্বাসী, ও চঞ্চল—সন্দেহে-দোদুল্যমান হয়; কিন্তু যাহার দেহ স্থিতিস্থাপক ধরণের, সে ব্যক্তি সকল বিষয়েই স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

চাল-চলন দৃষ্টে লোকের চরিত্র অনেকটা নির্ণয় করা

যায়। আত্মনির্ভরতা-বিহীন ব্যক্তি চোরের ন্যায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়; স্থির-পাদবিক্ষেপ তাহার পক্ষে অসম্ভব। মূর্খ ও "গোঁয়ার্-গোবিন্দ" ব্যক্তি মেদিনী কাঁপাইয়া চলে; কিন্তু ধীর-প্রকৃতির লোক নিঃশব্দে, অথচ দ্রুতবেগে, চলিয়া যায়।

পোষাক-পরিচ্ছদ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দৃষ্টেও লোকের চরিত্র-অনুমান করা যায়। পোষাক ও চুলের পারিপাট্য বিশিষ্টশক্তির পরিচায়ক নহে; ঘোড়ার সইস্, মেথর্ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্ট অনুমান করা যায়। পারিপাট্যহীন পরিচ্ছদ,—পরিশ্রমী ও গোছালো (Systematic) লোকের লক্ষণ। কার্য্যের দ্বারাই 'পাকা কর্ত্তা'র পরিচয় পাওয়া যায়। জুতার মস্‌মসি শব্দ, জাঁক-জমকশালী পোষাক, অদ্ভুত 'নেক্‌টাই' বা গলাবন্ধ, ও বাহারে ওয়েষ্টকোট্' ইত্যাদি 'ফাজিল ও ছেব্‌লা' প্রকৃতির চিহ্ন। দ্রুত-লিখন ও 'ত্বরিত জবাব', শিক্ষা ও সতর্কতার পরিচায়ক। টিয়াপাখীর ন্যায় বক্রাগ্র নাসিকা, বিশেষতঃ (Bridge) উচ্চ-হাড়যুক্ত নাসিকা উৎসাহ ও শক্তির চিহ্ন বটে; কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতা, দুর্ব্বলতার লক্ষণ। কোমল-হস্তবিশিষ্ট ব্যক্তি দুর্ব্বল-প্রকৃতির হইয়া থাকে। একই ব্যক্তিতে পূর্ব্বোক্ত অনেকগুলি লক্ষণ থাকা অসম্ভব নয়। চিহ্নের নানারূপ সমবায় (Combination) প্রায়ই দেখা যায়। হস্ত কিঞ্চিৎ কোমল, স্বাস্থ্য মাঝারী-রকমের, কিন্তু নাসিকা উচ্চ ও উন্নত, হইলে লোকটিকে যথেষ্ট শক্তিশালী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

হস্ত-রেখা-চিত্র

বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের হস্তরেখা :—

১ম জোড়া হস্ত।—সরল ও কর্ম্মশীল (Active nature) ব্যক্তির হস্ত। এইরূপ হস্তশালী লোক অন্যের মৎলব্ (plan) লইয়া কাজ করিতে সক্ষম।

২য় জোড়া হস্ত।—এইরূপ হস্ত-সমন্বিত লোক চিন্তাশীত, সমালোচক, বুদ্ধিমান ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইয়া থাকে।

৩য় জোড়া হস্ত।—ইহা উৎকৃষ্ট শিল্পীর হস্ত; এরূপ লোক উৎকৃষ্ট স্পর্শ-শক্তির জন্য বিখ্যাত হইয়া থাকে।

৪র্থ জোড়া হস্ত।—ক্ষুদ্র অঙ্গুলিযুক্ত ও চৌকোণা হস্ত-বিশিষ্ট লোক অপরের দ্বারা নিজের মৎলব (plan) হাসিল্ করিয়া লইতে ভালবাসে।

৫ম জোড়া হস্ত।—এইরূপ হস্ত দানশীল, অথবা খরচে লোকের হইয়া থাকে। এইরূপ হস্তশালী ব্যক্তি উপার্জ্জনক্ষম হয় না, এবং ইহাদের দূরদৃষ্টি (foresight) থাকে না।

৬ষ্ঠ জোড়া হস্ত।—এইরূপ হস্ত, দার্শনিক প্রকৃতির লক্ষণ; এহেন হস্ত সম্পন্ন ব্যক্তির বর্ণনা-শক্তি সবিশেষ প্রবল হইয়া থাকে।

এপর্য্যন্ত আমরা ব্লাক্‌ফোর্ডের পর্য্যবেক্ষণ ফল মোটামুটি লিপিবদ্ধ করিলাম; এইবার আমাদের জ্যোতিষীদিগের পর্য্যবেক্ষণফল কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ব্লাক্‌ফোর্ড্ অপেক্ষা বরাহমিহির প্রভৃতি হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ হস্তের রেখা, দেহের উপরিস্থিত তিল ও মস্তক, প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া সেই সকল সাহায্যে সামুদ্রিক শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

রেখাতত্ত্ব

১। হস্তের যে রেখা 'মাতৃরেখা' বলিয়া আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহা মাতৃরেখা ত বটেই, আরও (Outlines of Palmistry) নামক ইংরেজী-গ্রন্থে, উহা 'আয়ুরেখা' বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তর্জ্জনীর নিম্নদেশ হইতে ইহা কনিষ্ঠার নিম্নদেশ অভিমুখে বিস্তৃত হইয়া থাকে।

(ক) যাহার এই রেখা বিস্তৃত ও সুদৃশ্য, সে ব্যক্তি পীড়িত; কিন্তু দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

(খ) এই রেখা যাহার ক্ষীণ, সংকীর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, সে ব্যক্তি দুর্ব্বল-দেহ, রুগ্ন ও স্বল্পায়ু হয়।

(গ) ঐ রেখা যাহার উপরিস্থিত রেখার সহিত মিলিত হইয়া একটি কোণের সৃষ্টি করে, সে নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হয়।

(ঘ) যাহার ঐ রেখায় কোন সূক্ষ্ম রেখা সকল সম্মিলিত থাকে, সে বাল্যে অতি রোগী হয়।

৫। 'আয়ু-রেখা' ও 'পিতৃ-রেখা'কে (মাতৃ ও পিতৃ রেখা) যে রেখা ত্রিকোণ করে, তাহার নাম 'ভাগ্য ও যশঃ-রেখা'।

বাহুল্য ভয়ে এই সকল রেখার লক্ষণ দেওয়া গেল না।

তিলতত্ত্ব

১। ললাটের দক্ষিণপার্শ্বে—নাসার উপরে, তিল থাকিলে দৈবধন ও যশোলাভের সম্ভাবনা।

হস্ত-রেখা-চিত্র

(ঙ) যাহার ঐ রেখা কোনস্থানে ভগ্ন হয়, তাহাকে চিরজীবন বিপদে কাটাইতে হয়।

২। কনিষ্ঠা-অঙ্গুলির উপর হইতে কব্জিরদিকে যে অতি সূক্ষ্ম-রেখা থাকে, তাহা 'বুদ্ধি ও জ্ঞান রেখা'।

(ক) যাহার রেখা স্থূল এবং সুদৃশ্য সে, সুবুদ্ধি ও দেশমান্য হয়।

(খ) যাহার ঐ রেখা অন্যকোনও রেখার সহিত মিলিত হইয়া কোণ উৎপাদন করে, সে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হয়।

(গ) যাহার ঐ রেখা বক্র বা ভগ্ন, সে চঞ্চল, অস্থির-বুদ্ধি, ও মন্দভাষী হয়।

(ঘ) যাহার ঐ রেখা দক্ষিণদিকে (কোণে) থাকে সে মূর্খ; ও যাহার পশ্চিমদিকে থাকে সে বুদ্ধিমান হয়।

৩। নিম্ন হইতে যে রেখা মধ্যমা-অঙ্গুলির মূলপর্য্যন্ত ধাবিত, যাহা হিন্দু-সামুদ্রিকশাস্ত্রমতে 'আয়ুরেখা' নামে অভিহিত,—তাহাকে ইংরাজীতে 'কার্য্য, উপার্জ্জন ও ধনরেখা' বলে।

৪। যে রেখা বৃদ্ধ ও তর্জ্জনীর ব্যবধানমধ্য হইতে বামভাগে লম্বিত, ঐ স্থূল-রেখার নাম 'পিতৃ-রেখা'। 'মাতৃ-পিতৃ-রেখা' পরস্পর সম্মিলিত না হইলে, সে ব্যক্তি তাহার পিতার ঔরসজাত সন্তান নহে।

২। নেত্রের নিম্নের তিল—অধ্যবসায়ীর চিহ্ন।

৩। গণ্ডস্থলে তিল থাকিলে, কখনই ধনশালী হয় না।

৪। নিম্ন ও উপর ওষ্ঠের তিল—বিলাসিতা ও প্রেমপ্রবণতার চিহ্ন।

৫। কণ্ঠের তিল—বিবাহদ্বারা ধনলাভ প্রকাশ করে।

৬। বক্ষস্থ তিল—সুস্থদেহ ও ভাগ্যের পরিচায়ক।

৭। দক্ষিণ পঞ্জরস্থ তিল—হীন-বুদ্ধির চিহ্ন।

৮। উদরের তিল—পেটুক, অর্থলোলুপ, পরিচ্ছদ-প্রিয়তার চিহ্ন।

৯। হৃদয়ের বিপরীত দিকস্থ তিল—নৃশংসতার লক্ষণ।

১০। দক্ষিণ-বাহুস্থ তিল—দৃঢ়দেহ ও ধৈর্য্যশীলতার চিহ্ন।

১১। কণ্ঠস্থ তিল—ধৈর্য্যশীলতা, বিশ্বাস ও ভক্তিমানের চিহ্ন।

১২। ভ্রূ-নিম্নস্থ তিল—জীবনব্যাপী দুঃখ-দারিদ্র্যের চিহ্ন

১৩। ললাটের বাম-পার্শ্বস্থ তিল—(কেশের নিকটবর্ত্তী দুঃখ ও অসচ্চরিত্রতার চিহ্ন।

১৪। ললাটের বামপার্শ্বের (কর্ণের দিকের) তিল—অপব্যয় নিন্দা ও অখ্যাতি ঘোষণা করে।

১৫। নাসিকার দক্ষিণপার্শ্বস্থ (চক্ষুর দিকের) তিল—দীর্ঘজীবী, ধনবান্, অধ্যয়নশীল প্রকাশ করে।

১৬। নাসিকার বামপার্শ্বের তিল—নির্ধন, অপব্যয়ী ও মূর্খতার পরিচায়ক।

১৭। বক্ষস্থলের মধ্যস্থ সলোম তিল—বিদ্বান্ ও কবিত্ব-শক্তির চিহ্ন।

১৮। দক্ষিণ পদের তিল—জ্ঞানের পরিচায়ক।

১৯। বাম গণ্ডের তিল—দাম্পত্য প্রেমে সুখী ও অসৌভাগ্যের চিহ্ন।

২০। কর্ণমধ্যস্থ তিল—ভাগ্য ও যশের লক্ষণ।

যতুক তত্ত্ব

১। মুখের বামভাগে যতুক থাকিলে—জাতক ধীর ও সুখী হয়।

২। „ দক্ষিণভাগে „ „ —সম্মান ও রাজ্যসুখে সুখী হয়।

৩। বাম হস্তের কনুয়ের উপরে „—দুঃখী;

৪। „ „ „ নীচে „—অতিভাষী;

৫। দক্ষিণ হস্তের কনুইয়ের উপরে থাকিলে—নিন্দিত-চরিত্র;

৬। „ „ „ নীচে „ —কামুক;

৭। বাম বক্ষে „ „ —পরধনলাভে গর্ব্বিত;

৮। দক্ষিণ „ „ „ —মূর্খ ও পাপী;

৯। নেত্রে—দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও দাতা;

১০। করতলে—অধনী ও অপ্রবাসী;

১১। পদতলে—ধন-নষ্টকারী ও অর্দ্ধমূর্খ;

১২। গুহ্যে—পীড়িত ও অসুখী;

১৩। জননেন্দ্রিয়ে—কামুক ও নিন্দিত-চরিত্র;

১৪। উরুতে—নষ্ট-চরিত্র ও পরদার-লোভী;

১৫। বাম পাদমূলে—অজ্ঞ ও অশিক্ষিত;

১৬। দক্ষিণ— „ ভ্রমণশীল;

১৭। কর্ণে (বাম ও দক্ষিণ)—শ্রুতিধর ও সুভাষী;

১৮। কটিদেশে—দৈহিক পীড়ার যন্ত্রণায় কাতর ও সর্ব্বদা অসুখী;

১৯। নিতম্বে—অস্বাভাবিক-অভিগমনপ্রিয়;

২০। পৃষ্ঠে—জাতক দাতা, ধীর ও শান্ত;

২১। জানুতে—বলিষ্ঠ, ভোক্তা ও পরোপকারী হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ লক্ষণ রহিয়াছে। যথা,—লোমশ লোক, দুঃখী; দীর্ঘবাহু, বলের লক্ষণ; "ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু মহাভুজ" বীরোচিত দেহ; বেঁটে-মানুষ, সয়তান; কাল'-ব্রাহ্মণ ও কটা-শূদ্র, বদ্‌রাগী; "কানা খোঁড়ার নানাদোষ, কুঁজোর নাই সন্তোষ।" গজদন্ত, ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন; দন্তের উপর দন্ত, ক্রূর-প্রকৃতির লক্ষণ; মস্তকের পশ্চাতের স্ফীত অংশ, কামাধিক্যের চিহ্ন; উচ্চহাস্য, সরলতা প্রকাশ করে। স্ত্রীলোকের কপালের ক্ষুদ্রচুল, বা হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বাচুল; অধিকলোম, থড়ম-পা, বড়নাক,—বিধবার লক্ষণ। কিন্তু পুরুষের খড়্গা নাক—সুলক্ষণ; কৃশব্যক্তি, ক্রূর প্রকৃতির হইয়া থাকে—তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। ইত্যাদি বহুলক্ষণ প্রচলিত আছে। এগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত উচিত। কারণ, প্রকৃতির কার্য্য, দুর্ব্বোধ্য হইলেও সুনিয়ন্ত্রিত; কিছুই নিরর্থক হইবার নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

কলাবস্তু এবং অঙ্কন-পদ্ধতি

দু'খানি ছবি দেখিলাম,—প্রথমখানি তাপসের ও দ্বিতীয়খানি, "সেণ্ট জেরোমে"র চিত্র। প্রথমখানির চিত্রশিল্পী জন্ স্যার্জেণ্ট,—একজন বিখ্যাত আধুনিক শিল্পী! অপরটির চিত্রকর, স্বনামধন্য টিসিয়ান্। অন্য কোন কথা তুলিবার পূর্ব্বে, ছবি দু'খানির পরিকল্পনা লইয়া কিছু বলিব। তাহার পর—প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ে সংক্ষেপে দুচারি কথা বলিব।

লিওনার্ডো বিস্টলফি-কর্তৃক গঠিত গ্যারিবল্ডির প্রস্তর-মূর্ত্তি

১। তাপস,—

ঊর্দ্ধে প্রদীপ্ত সূর্য্যকর,—মধ্যে দুর্গম অরণ্য, নিম্নে বন্ধুর ভূমি এবং সান্ধ্য অন্ধকার। পাদপপত্রাবকাশ দিয়া নিম্নগতি রশ্মিরেখাগুলি সেই বিজন অরণ্যের তিমির-নিবিড়-বক্ষ ভেদ করিয়াছে। পার্শ্বদেশে অবিতত শৈল,—আধা ছায়া, আধা আলোর সম্মিলনে রহস্যময়। পর্ব্বতগাত্র কোথাও বিদীর্ণ, কোথাও অতি কর্ক্কশ, এবং কোথাও বা অস্পষ্টতাহেতু ভয়াবহ। সর্ব্বত্র চুম্বিতমৃৎ ছিন্ন-পর্ণ, শৈল-স্খলিত কীর্ণ উপল, এবং সাচীকৃত দীর্ঘ তৃণদল। এই অপূর্ব্ব সমাবেশ, উদ্দাম বন্য-প্রকৃতির একটা আত্মমগ্নভাব, একটা রুদ্রপেলব শ্রী জাগ্রৎ করিয়া তুলিয়াছে।

প্রথম দৃষ্টিতে, ছবির এইটুকু নজরে পড়ে। কিন্তু প্রাণের সহিত ছবির দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলে আর একটি বিষয় ধরা পড়িবে,—যাহার জন্য চিত্রের নাম হইয়াছে, 'তাপস'।

শৈল-পৃষ্ঠে দেহভার অর্পণ করিয়া তাপস উপবিষ্ট। তাঁহার তনু নিরাহারজন্য হতলাবণ্য,—শীর্ণ বিশীর্ণ। ক্ষীণ ত্বক্-প্রচ্ছাদন ভেদ করিয়া তাঁহার গণ্ডের,—কণ্ঠের ও বক্ষের অস্থি প্রকট। মস্তকে দীর্ঘ-রুক্ষ কেশ-ভার, আননে অযত্নবর্দ্ধিত শ্মশ্রু। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত এবং মুখবিবর উন্মুক্ত,—পরম-ধ্যেয়ের ধ্যানরত তাপসের দর্শনেন্দ্রিয় নিমীলিত থাকায়, অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাম—মুখবিবর অনাবৃত—শিল্পীর এ পরিকল্পনা তাঁহার ভূয়ঃপর্য্যবেক্ষণ-প্রসূত। এটি মনোবিজ্ঞান-সম্মত সত্যের যথাযথ প্রতিকৃতি। কবির ভাষায় বলিতে গেলে,—তাপস যেন একান্ত মনে, ব্যাদিত বদনে—উদার আকাশ এবং নির্ম্মল বাতাসকে, আত্মমধ্যে গ্রহণ করিতেছেন।—যেন তিনি সসীমের ভিতর—আপনার হৃদয়ের ভিতর—অসীমের সত্তা উপলব্ধি করিয়া—আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। মহিমময় বিরাট্ পুরুষের বিভূতি দেখিয়া বিস্ময়ে মুখবিবর অনাবৃত—কিন্তু নয়ন ত উন্মীলিত করিতে পারিতেছেন না,—ভয়—পাছে আর না দেখিতে পান; এবং সেই চিত্তবৃত্তিনিরোধী তাপসমূর্ত্তির সম্মুখে—নির্ভয়ে ক্রীড়ারত মৃগমিথুন।

বলিয়াছি, প্রথমদৃষ্টিতে চিত্রের এই প্রধান বিশেষত্ব ধরা পড়ে না। চিত্রকর এহেন কৌশলে এই যোগিমূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছেন যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, তাহা পাহাড়ের একটি অংশমাত্র। এই লুকাচুরি, পটুয়ার স্বেচ্ছাকৃত,—তাঁহার অক্ষমতার পরিচায়ক নহে।

২। সেণ্ট্ জেরোম,—

প্রথম পট-লেখকের মত টিসিয়ান্‌ও তাঁহার চিত্র-পটে প্রকৃতির ভীমকান্ত বন্যলাবণ্য প্রস্ফুট করিবার প্রয়াস

পাইয়াছেন। সেই শ্যামল তরুশ্রেণী, এবং ধূমধূসর অচল; সেই ছায়ালোকমণ্ডিত আত্মসমাহিত নিরালা গাম্ভীর্য্য। অধিকন্তু, এখানে জলদমৌলী অম্বরের নীলাঞ্জনীল শোভা, গাছের আশ পাশ দিয়া একটু একটু দেখা যাইতেছে। পরন্তু, ইহার প্রকৃতিও বন্য বটে,—কিন্তু এ উদ্দাম আরণ্য-প্রকৃতিতেও একটু শৃঙ্খলা আছে।

রোডিন্-কর্তৃক গঠিত একটি মূর্ত্তি

শৈল-চূড়ায় 'ক্রুশ'বদ্ধ মহাপুরুষের মূর্ত্তি। সাধু জেরোমের দৃষ্টি তৎপ্রতি বদ্ধ। সাধুর দেহ এখানে কৃশ নয়; পরন্তু, সবল, মাংসল, এবং পেশীও সতেজ। মূর্ত্তির দেহদর্শনে মনে হয়, একটা উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ যেন, শরীরী হইয়া সর্ব্বত্র লীলাভঙ্গে, খেলিয়া বেড়াইতেছে।

সাধুর সম্মুখে একটা বিরাট্‌বপু সিংহ নিশ্চেষ্টবৎ শায়িত রহিয়াছে, এবং তাঁহার পশ্চাতে খণ্ড-শিলার উপরে একটা নরকপাল, আপনার বৃহৎ অক্ষি-কোটরে কি এক ভীষণ শূন্যতা লইয়া, যেন চিরস্তব্ধতার অসীমতার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

প্রথম চিত্রকর, আমাদিগকে কি দেখাইতেছেন? বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতির সুন্দর সমাহার।

যোগী, সঙ্কীর্ণ সংসার ছাড়েন, প্রকৃতির বিরাট্ পুরুষকে—সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্তকে—অন্তরমধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য। তিনি ধ্যানে বসিয়া মুক্ত প্রকৃতির গভীরতার ভিতরে ডুবিয়া যান,—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন বল্মীক আসিয়া তাঁহার গায়ে বাসা বাঁধিলেও, তিনি কিছুই টের পান না।

চিত্রকর, এখানে এই বিষয়টি আঁকিয়াছেন। এখন, কলাসম্মত পরিমাপ, মাংস-পেশীর খুঁটিনাটি এবং নির্দ্দোষ স্বাভাবিক গড়ন্ লইয়া তাঁহার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই। তিনি ততটুকু লইয়াছেন,—যতটুকুতে মানুষকে মানুষ বলিয়া চিনিতে ভ্রম না হয়। তিনি ততটুকু লইয়াছেন,—যতটুকুতে স্বভাবকে অবহেলা না করিয়াও, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হয়। তাই তাঁহার আলেখ্যে মাইকেল্ এঞ্জিলোর সুডৌল শ্রী নাই, বোটিসেলির চমৎকার রেখাপাত নাই; কিংবা টিসিয়ানের হৃদয়বৃত্তির বহিঃস্ফুট লীলা নাই। কারণ, তিনি বিশ্ববিধানের একটি সত্যকে চিত্রমধ্যে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। তাপস যেন আর মানবদেহী নন,—তাঁহার ব্যাদিত বদন দিয়া বহিঃপ্রকৃতি তদীয় অন্তঃস্থ হইয়াছে,—বনের হরিণও তাঁহাকে দেখিয়া আর ভয় পায় না;—তিনি যেন ঐ গাছপালা পাথরেরই মত একটা কিছু জড়বস্তু; ফলে তাপসের ধ্যান-তন্ময়তা ফুটিয়াছে ভাল।

দ্বিতীয় চিত্রকরের কাছে, বহিঃপ্রকৃতি একটা উপলক্ষমাত্র;—তাহা কেবল সাধুর মানসোত্তেজনার সহিত সহমর্ম্মিতা-জ্ঞাপনার্থ সৃষ্ট। এখানে, প্রথম চিত্রকরের মত আকারহীনতার মাঝে মূর্ত্তি-অঙ্কনের চেষ্টা নাই। এখানে শিল্পীকে ফুটাইতে হইবে—মানুষের মানসিক-চাঞ্চল্য। অতএব, যেরূপ দৈহিক অবস্থান, যথেষ্ট ভাব-প্রকাশের সহায়ক, মাংস-পেশীর যেরূপ সঙ্কোচ ও প্রসারণে অন্তর্নিহিত উত্তেজনার বহির্বিকাশ সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক, সেদিকে শিল্পীর নজর বেশ আছে।—ফলে, যদিও এখানে ধ্যানের মূর্ত্তি ফুটে নাই, কিন্তু মনোবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত ঠিক ফুটিয়াছে।

দুইখানি ছবি লইয়া উপরে যে কথাগুলি বলিলাম,

চিত্রকলার যথার্থ শ্রী (Beauty) বুঝিবার পক্ষে কতকটা সহায়তা করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সকলরূপ কলার বিচার করিতে হইলেই বিচারের একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকা দরকার। অতএব, বিচারে চিত্রকলার ধীমৎ বিভাবনা (Intelligent Appreciation) করিতে হইলে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে, চিত্রকর্ম্মার অঙ্কন-বস্তু কি? যেহেতু, বিষয়-বিভেদে অঙ্কন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

রোডিন্-কর্ত্তৃক গঠিত অসম্পূর্ণ "গতিশীল মানব"

ইতালীয় ভাস্কর, লিওনার্ডো বিস্‌টল্‌ফি, এই রহস্য তাঁহার শিল্পকর্ম্মে বেশ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। একালে ইতালীতে তাঁহার সমান প্রতিভাবান্ ভাস্কর আর দ্বিতীয় নাই। এখানে তৎকর্ত্তৃক অবলম্বিত পদ্ধতি, আমাদের উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া দিবে।

স্বদেশ-প্রেমিক গ্যারিবল্‌ডিকে আমরা সকলেই জানি। দেশের জন্য তিনি অস্ত্র ধরিয়াছিলেন,—তিনি বীর, তিনি যোদ্ধা, তিনি সাহসী।

অতএব, ইতালী দেশের পথে পথে এই রণবীর গ্যারিবল্‌ডির প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সে মূর্ত্তি, অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্ত্তি! বীর গ্যারিবল্‌ডির যে অন্য মূর্ত্তি সম্ভাব্য, ইতালীয়দের নিকটে তাহা অজ্ঞাত ছিল।

বিস্‌টল্‌ফি, সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন। তিনি দেখাইলেন, গ্যারিবল্‌ডি যোদ্ধা বটে,—কিন্তু তাহাই তাঁর আসল রূপ নয়। পরণে বর্ম্ম, আর হাতে কৃপাণ দিলেই, তাঁর বীরবেশ মানান-সই হইবে না। অতএব, শিল্পী এখানে রণোৎসাহ-প্রদীপ্ত বাহিরের উত্তেজনা ছাড়িয়া, ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দেখিলেন কি?—শান্ত, শুদ্ধ, দেশভক্তি। যাহার বলে বলীয়ান্ হইয়া তিনি অস্ত্র ধরিয়াছিলেন, সেই দেশভক্তি। গ্যারিবল্‌ডির রণোৎসাহ ত দেশভক্তি জাগায় নাই,—দেশভক্তিই তাঁহার রণোৎসাহ জাগ্রৎ করিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী বিস্‌টল্‌ফি ঠিক্ গোড়ার কথাটা তলাইয়া বুঝিলেন। এই গোড়ার কথাটা ধরাই শিল্পীর পক্ষে বড় শক্তকথা। যাঁরা এটি পারেন, তাঁরাই প্রকৃত প্রতিভাবান্ শিল্পী।

বিস্‌টল্‌ফি মনীষী। আপনার প্রতিভা-বলে গ্যারিবল্‌ডির এক কোমল-কঠিন, শান্ত-গম্ভীর মূর্ত্তি-গঠন করিলেন; তাহা মানস-রহস্যের বহির্বিকসিত শতদল। যাহার বলে তিনি জন-নায়ক, তিনি মহাবীর, তিনি বিশ্ব-নমস্য, তাহা সেই পুরুষকারের মূর্ত্ত-উচ্ছ্বাস।

এখানে শিল্পী 'বস্তুগতিক' নন,—কারণ, বাস্তববাদ তাঁহার আদর্শের পরিপন্থী। এখানে তিনি Idealist—ভাবুক। সাধারণে, এ 'ভাবুকতা'র 'শ্রী' সহজে বুঝিতে

পারিবেন না বটে,—কিন্তু রসজ্ঞেরা বুঝিবেন, শিল্পীর কি অতুল মনীষা!

এ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর রোডিন্‌ও ঠিক এই কথাটি বুঝাইয়াছেন। বিস্‌টল্‌ফি, গ্যারিবল্‌ডির মূর্ত্তি-গঠনে যে শ্রেণীর ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন,—রোডিন্‌ও সেই এক ভাবের ভাবুক। তৎকৃত "রুসো" ও "ভল্‌টেয়ার" প্রভৃতি অসংখ্য ভাস্কর-কর্ম্মে ঐ একই নিয়ম অনুস্যূত: 'ফটো'র সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে, রোডিনের 'রুসো' প্রভৃতির চেহারা মিলিবে না,—মিলিবে, মনের সঙ্গে। দেখিবেন, হৃদয়ের গভীর ধ্বনি, মূর্ত্তিগুলির মুখে নীরব রেখায় অনুরণিত হইতেছে!

বিগত কার্ত্তিকের 'সাহিত্যে' অশ্বিনীবাবু রোডিন্‌কে লইয়া বেশ 'একচোট্' নাড়াচাড়া করিয়াছেন, অথচ যাহার জন্য রোডিনের এত আদর, সেই গোড়ার কথাটাই বলেন নাই। রোডিন্‌কে যদি বুঝিতে হয়, তবে ঐ ভাবুকতা আশ্রয় করিয়াই তাঁহার শিল্পধর্ম্মের গায়ত্রী বুঝিতে হইবে।

য়্যুলো আগার-কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র—"দিবা-স্বপ্ন"

রোডিনের "La Pensee" নামে স্ত্রীমূর্ত্তিতে, শিল্পীর এই দেহাতিরিক্ত ভাবুকতা পরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। মূর্ত্তির হাত নাই, পা নাই। দেহের নিম্নাংশও সম্পূর্ণ নয়। মুখখানি তাহার বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, যেন গভীর চিন্তায় সে আত্মমগ্ন—বাহ্য-জগৎ তাহার নিকট লুপ্ত!

একজন দর্শক, মূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন, "ইহা অসম্পূর্ণ।"

রোডিন্, আকাশ হইতে সদ্যঃপতিতের মত, বিস্ময়াভিভূত হইলেন। বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন? দেখিতেছেন না, মূর্ত্তির এই অবস্থা আমার স্বেচ্ছাকৃত? এ মূর্ত্তিতে যে চিন্তার স্বরূপ ফুটান হইয়াছে! তাই, ইহার কাজ করিবার জন্য হাতও নাই, আর চলিবার জন্য পাও নাই।"

রোডিনের অবলম্বিত পদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব এই—তাহার মধ্যে কোমল-প্রকৃতি কোথাও প্রখর হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। এমন কি, বহিঃপ্রকৃতি তাঁহার মতে শিল্পীর আদেশপালনরত যন্ত্রমাত্র; শিল্পী কেবল তাহাকে দিয়া দরকারমত কাজটুকু করাইয়া লইবেন।

রোডিন্ স্পষ্ট বলিতেছেন:—

"আলোক-চিত্রের মত বাহিরের রূপমাত্র লইয়া যে শিল্পীর কাজ, এবং যিনি মানব-মুখ-শ্রী যথাযথ নকল করিয়া যান, অথচ মানুষের চরিত্রের কোন ধার্ ধারেন না, এমন নকলকারী কস্মিন্‌কালেও বাহবা পাইবেন না। যে প্রতিরূপ তাঁহার অঙ্কনীয়,—তাহা আত্মার। আত্মার প্রতিবিম্ব তাঁহার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। ভাস্করই বল, আর চিত্র-শিল্পীই বল,—উভয়েরই জন্য বহিরাবরণের গুণ্ঠন-তলে লুক্কায়িত ভাবের অন্বেষণ ও মূর্ত্তিতে ও চিত্রে তাহারই স্ফুরণ প্রধান কার্য্য।"

এতক্ষণে বুঝা গেল, ভাবুক শিল্পী রোডিন্‌ উপযুক্ত ভাব-প্রকাশের অতিরিক্ত, উৎকট স্বাভাবিকতা কেন সযত্নে বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কন-বস্তু,—প্রকৃতি ঠাকুরাণীর গোপন অন্তঃপুর-মানস-বৃত্তি, এক কথায়—আত্মা; সুতরাং, অন্তঃপুরকে সদর-মহল করিয়া তুলিলে, শুদ্ধান্তের ব্রীড়াবনত শুচি একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিবে।

এখানে অনেকের মনে সন্দেহের উদয় হইতে পারে যে, আমাদের দেশীয় চিত্র-পন্থার (আজকাল যাহার ইংরেজী নাম Indian Art, তাহার) আচার্য্যগণও ত ঠিক এই রীতি-অনুসরণ করেন!—আমাদের বোধ হয় তাহা নয়;

দেশীয় চিত্রশিল্পিগণ ঠিক এই পথানুসারী নন।—আত্মার সারূপ্য—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, উভয় শিল্পেরই অন্বেষ্য বটে; কিন্তু প্রতীচ্যের শিল্পী যে আবশ্যকমত বহিঃপ্রকৃতিকে গ্রহণ করেন—এককালে বর্জ্জন, বা বিকৃত করেন না, কারণ, তাঁহাদের মতে সদরমহলে পদার্পণ না করিয়া অন্দরমহলে যাওয়া যায় না! তাঁহারা কেবল বাহিরের খুঁটিনাটিকে প্রাধান্য দেন না। অন্যদিকে, প্রাচ্যের শিল্পী, বহিঃপ্রকৃতিকে বিকৃত করেন;—সেরূপ করিয়া ভাল করেন—কি মন্দ করেন, সে বিচারের স্থান এ নয়।

বহিঃপ্রকৃতিকে প্রাধান্য না দিয়া, কিরূপে অন্তঃপ্রকৃতিকে প্রস্ফুট করা যায়, তাহার প্রমাণ, বিখ্যাত স্পেন্‌দেশীয় শিল্পী 'য়্যলো' আগারের চিত্রাবলীতে পাওয়া যায়। * ইঁনি বলেন,—

"যখন আমি অঙ্কন কর্ম্মে সদ্যঃব্রতী হইয়াছিলাম, তখন আমি 'বস্তু-গতিক' ছিলাম; এখন আমি বাস্তববাদকে ঘৃণা করি। ললিতকলা অর্থে, 'অবিকল নকল' (Literal transcription) নয়।

"একটি স্বাভাবিক আপেলের কি মূল্য আছে? আলোকচিত্রে, শীঘ্রই যাহা রঙ্গীন হইবে—আলেখ্য অপেক্ষা তাহাতে স্বভাবসঙ্গত বস্তু থাকিবে। হয়ত আলোক-চিত্রের আপেল ফল এমন সুন্দর হইবে যে, তাহাতে আমি একটা 'কামড়' দিবার সাধ করিলেও করিতে পারি। তবুত ললিতকলা-হিসাবে তার কোন দাম থাকিবে না! * * অবশ্য শিল্পীর এমন শিক্ষা থাকা চাই, যাহাতে করিয়া তাঁহার প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, এবং দৃষ্ট-বস্তুর স্বরূপ-প্রদর্শনের ক্ষমতা জন্মে। বাহিরের চোখে তিনি যে বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখেন, চিত্রপটে তাহা নির্দ্দোষরূপে প্রস্ফুট করিবার এবং তাহা যথাযথভাবে আঁকিয়া তুলিবার শিক্ষাও তাঁহার থাকা উচিত; কিন্তু তাহার ভিতরে, কাহাকেও বিশেষত্ব হারাইতে বলি না,—সকলকেই স্ব স্ব পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে!"

ললিতকলার এই নীতি সর্ব্বত্র অনুকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের গিরিশচন্দ্রও একস্থলে বলিয়াছেন,—"কলাবিদ্যা ও স্বভাব, এক নয়;—কলাবিদ্যা, স্বভাব-ছবি হৃদয়ে উদয় করিয়া দেয় মাত্র!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

* "If the artist only reproducs Superficial Features, as Photography does, if he copies the lineaments of a Face exactly, without reference to Character, he deserves no admiration. The resemblance, which he ought to obtain, is that of the Soul; that alone matters; it is that which the Sculptor or Painter should seek beneath the mask of Features."

"পণ্ডিত মশাই"

কুঞ্জ বোষ্টমের ছোট বোন্ কুসুমের বাল্য-ইতিহাসটা এতই বিশ্রী যে, এখন সেসব কথা স্মরণ করিলেও, সে লজ্জায় দুঃখে মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। যখন সে দু'বছরের শিশু তখন বাপ মরে, মা ভিক্ষা করিয়া ছেলে ও মেয়েটিকে প্রতিপালন করে। যখন পাঁচ বছরের, তখন, মেয়েটিকে সুশ্রী দেখিয়া, বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস অধিকারী, তাহার পুত্র বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ দেয়; কিন্তু, বিবাহের অনতিকাল পরেই কুসুমের বিধবা মায়ের দুর্নাম উঠে, তাহাতে গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া ছেলের পুনর্ব্বার বিবাহ দেয়। কুসুমের মা, দুঃখী হইলেও, অত্যন্ত গর্ব্বিতা ছিল। সেও, রাগ করিয়া কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, সেই মাসেই আর একজন আসল বৈরাগীর সহিত কন্যার কণ্ঠী-বদল ক্রিয়া সম্পন্ন করে; কিন্তু ছয়মাসের মধ্যেই এই আসল বৈরাগীটি নিত্যধামে গমন করেন। তবে ইনি কে, কোন্ গ্রামে বাড়ী, তাহা, একা কুসুমের মা ছাড়া, আর কেহই জানিত না; কুঞ্জও না। তাহার মা, কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই। কণ্ঠী বদল ব্যাপারটা সত্য, কিংবা শুধুই রটনা, তাহাও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত না। এতকাণ্ড কুসুমের সাতবৎসর বয়সেই শেষ হইয়া যায়! সেই অবধি কুসুম বিধবা। সংক্ষেপে এই তাহার বাল্য-ইতিহাস। এখন সে ষোল বৎসরের যুবতী,—তাহার দেহে রূপ ধরে না। তেমনই গুণ, তেমনই কর্ম্মপটুতা, আবার লেখা-পড়াও জানে। খুব বড়লোকের ঘরেও বোধ করি তাহাকে বে-মানান্ দেখাইত না।

এদিকে বৃন্দাবনের বাপ মরিয়াছে, দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়াছে; তাহার বয়সও পঁচিশ ছাব্বিশের অধিক নয়। এখন সে কুসুমকে ফিরিয়া গ্রহণ করিতে চাহে। সে কুঞ্জকে পঞ্চাশ টাকা নগদ, পাঁচজোড়া ধুতিচাদর; এবং কুসুমকে পাঁচভরি সোণা, ও একশ' ভরি রূপার অলঙ্কার, দিতে স্বীকৃত। দুঃখী কুঞ্জনাথ লোভে পড়িয়াছে। তাহার বড় ইচ্ছা কুসুম সম্মত হয়; কিন্তু কুসুম সে কথা কাণেও তোলে না। কেন তাহা বলিতেছি;—ইহাদের বাপ-মা নাই। ভাই-বোন যে দুখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে, তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণ-পাড়ার ভিতরেই। শিশুকাল হইতে কুসুম ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, একত্র প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালে লিখিয়াছে, খেলাধূলা করিয়াছে; আজিও তাহারাই তাহার সঙ্গী-সাথী। তাই, এই সব প্রসঙ্গেও, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া উঠে। ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে বিধবা হইতে বিলম্ব হয় না। তাহার বাল্যসখীদের অনেকেই, তাহার মত হাতের নোয়া ও সিঁথীর সিন্দূর ঘুচাইয়া, আবার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে; ইহারা কেহ তাহার মকর গঙ্গাজল, কেহ সই মহাপ্রসাদ। ছি—ছি, দাদার কথায় সম্মত হইলে, এ কালামুখ কি ইহজন্মে আর এগ্রামে সে দেখাইতে পারিবে!

কুঞ্জ কহিল, "দিদি, রাজী হ'। ধর্‌তে গেলে বৃন্দাবনই তোর্ আসল বর।" কুসুম অত্যন্ত রাগিয়া জবাব দিল, "আসল নকল বুঝিনে দাদা; শুধু বুঝি আমি বিধবা। কেন? একি কুকুর-বেড়াল পেয়েছ, যে, যা ইচ্ছে হবে তাই করবে! এই বিয়ে, এই কণ্ঠী-বদল; আবার বিয়ে, আবার কণ্ঠী-বদল যাও, ওসব কথা আমার সুমুখে তুল'না। বাড়লের উনি আমার কেউ নয়; আমার স্বামী ম'রেছে, আমি বিধবা।"

নিরীহ কুঞ্জ আর কথা-কহিতে পারে না। তাহার এই শিক্ষিতা তেজস্বিনী ভগিনীটির সুমুখে, সে কেমন যেন থত-মত খাইয়া যায়। তথাপি, সে ভাবে আর এক রকম করিয়া। সে বড় দুঃখী; এই দু'খানি কুটীর, এবং তৎসংলগ্ন অতিক্ষুদ্র একখানি আম-কাঁঠালের বাগান, ছাড়া আর তাহার কিছুই নাই। অতএব, নগদ এতগুলি টাকা, এবং এত জোড়া ধুতিচাদর, তাহার কাছে সোজা ব্যাপার নহে। তবুও, এই প্রলোভন ছাড়াও, সে তাহার একমাত্র স্নেহের সামগ্রীকে এই ভাল জায়গাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে সুখী দেখিয়া, নিজেও সুখী হইতে চাহে।

কণ্ঠী-বদল্ তাহাদের সমাজে 'চল্' আছে, তাহাই তাহার মা, ওকাজ করিয়া গিয়াছিল; কিন্তু, সে যখন মরিয়াছে এবং বৃন্দাবন, কুসুমের স্বামী, যখন এত সাধাসাধি করিতেছে, তখন, কেন যে কুসুম এতবড় সুযোগের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেছে

না, তাহা সে কোন মতেই ভাবিয়া পায় না! শুধু, সমাজের ফৌজদার ও ছড়িদারের মত লইয়া, কিছু মালসা-ভোগ দেওয়া। ব্যয়ভার সমস্তই বৃন্দাবন বহিবে; তারপর, এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া, একেবারে রাজরাণী হইয়া বসিবে। কুসুম কি বোকা! আহা, সে যদি কুসুম হইতে পারিত!—এমনই করিয়া কুঞ্জ প্রতিদিনই চিন্তা করে।

কুঞ্জ ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে। একটি বড় ধামায় ঘুন্‌সি, মালা, চিরুণি, কৌটা, সিঁদূর, তেলের মস্‌লা, শিশুদের জন্য ছোটবড় পুতুল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য, এবং কুসুমের হাতের নানাবিধ সূচের কারুকার্য্য, ইত্যাদি মাথায় লইয়া পাঁচসাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরিকরিয়া বেড়ায়। সমস্ত দিন বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, দিনান্তেসেই পয়সাগুলি বোন্‌টির হাতে আনিয়া দেয়। ইহাদ্বারা কেমন করিয়া কুসুম, মুলধন বজায় রাখিয়া যে সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া দেয়, ইহা সে বুঝিতেও পারে না,—পারিবার চেষ্টাও করে না।

আজ সকালে সে ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়লে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পথে বৃন্দাবনের সহিত দেখা; সে মাঠে কাজে যাইতেছিল, আর গেল না। স্বজাতি এবং কুটুম্বকে মহাসমাদরে বাড়ীতে ধরিয়া আনিল; হাত-পা ধুইতে জল দিল, এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া খাতির করিল। দ্বিপ্রহরে, তাহার মা, নানাবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা, কুঞ্জকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইলেন, এবং এত রৌদ্রে কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ ঘরে ফিরিয়া, হাত পা ধুইয়া, মুড়ি মুড়কি চিবাইতে চিবাইতে, সেইসব কাহিনী ভগিনীর কাছে বিবৃত করিয়া, শেষ কহিল,—"হাঁ, একটা গেরস্ত বটে। বাগান পুকুর, চাষ-বাস, কোন জিনিসটির অভাব নেই;—মা লক্ষী যেন উথ্‌লে পড়চেন!" কুসুম চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কথা কহিল না। কুঞ্জ ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিয়া, বৃন্দাবনের মা কি কি রাঁধিয়াছিলেন, এবং কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিয়া কহিল,—"খাইয়ে দাইয়েই কি ছেড়ে দিতে চায়! বলে, এত রোদ্দুরে বেরুলে মাথাধরে' অসুখ কর্‌বে।" কুসুম দাদার মুখের দিকে চাহিয়া, একটুখানি হাসিয়া, কহিল, "তাহ'লে, দাদা বুঝি সারাদিন এই কর্ম্মই করেচ? খেয়েচ আর ঘুমিয়েচ?" তাহার দাদাও সহাস্যে জবাব দিল, "কি করি বল বোন্! ছেড়ে না দিলেও ত আর জোর ক'রে আস্‌তে পারিনে?" কুসুম কহিল, "তাহ'লে ও গাঁয়ে আর কোন দিন যেও না।" কুঞ্জ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল, "যাবনা?—কেন?"

"পথে দেখা হ'লেই ত ধরে' নিয়ে যাবে? তারা বড়লোক, তাদের ক্ষতি নেই; কিন্তু, আমাদের তাহ'লে ত চল্‌বেনা দাদা!" ভগিনীর কথায় কুঞ্জ ক্ষুণ্ণ হইল। কুসুম, তাহা বুঝিতে পারিয়া, হাসিয়া বলিল, "সেকথা বলিনি দাদা, সে কথা বলিনি; দু'একদিনে আর কি লোক্‌সান্ হ'বে! তা নয়; তবে তারা বড়মানুষ, আমরা দুঃখী; কাজ কি দাদা, তাদের সঙ্গে বেশী মেশামিশি ক'রে?"

কুঞ্জ জবাব দিল—"আমি তাদের ঘরে ত যেচে যাইনি' কুসুম!"

"তা যাওনি বটে; তবু ডেকে নিয়ে গেলেই বা যাবার দরকার কি দাদা?"

"তুই যে এই বামুন-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিস্। তারাওত সব বড়লোক, তবে যাস্ কেন?" কুসুম, দাদার মনের ভাব বুঝিয়া, হাসিতে লাগিল। বলিল, "তাদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই খেলা করি; তাছাড়া, তারা আমাদের জাতও নয়, সমাজও নয়। এখানে আমাদের লজ্জা নেই; কিন্তু ওদের কথা আলাদা।"

কুঞ্জ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, "সেখানেও লজ্জা নেই। মা লক্ষ্মী তাঁদের দয়া করেচেন, দুপয়সা আছে সত্য; কিন্তু এতটুকু দেমাক্ অহঙ্কার নেই—সবাই যেন মাটীর মানুষ। বৃন্দাবনের মা, আমার হাতদুটি ধরে' যেমন করে"—

কথাটা শেষ হইল না। মাঝখানেই কুসুম বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"আবার সেই সব পুরোণ কথা উঠ্‌ল! মায়ের নামে ওরা যে অতবড় কলঙ্ক তুলেছিল, দাদা বুঝি ভুলে বসে' আছ!" কুঞ্জ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "তারা একটা কথাও তোলেনি। বদ্‌লোকে হিংসেক'রে বদ্‌নাম দিয়েছিল।" কুসুম কহিল, "তাই ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করেছিল;—কেমন?" কুঞ্জ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তা' বটে, তবে কিনা তাতে বৃন্দাবন বেচারীর একটুকুও দোষ ছিল না—বরং তার বাপের দোষ ছিল।" কুসুম একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া

শ্রান্তভাবে বলিল, "যার দোষই থাক্ দাদা—যা হয় না হবার নয়,—দরকার কি একশবার সেই সব কথা তুলে? আমি পারিনে আর তর্ক করতে।" কুঞ্জ প্রথমটা জবাব দিতে পারিল না, পরে একটু রুষ্টস্বরেই বলিল, "তুইত তর্ক করতে পারিস্‌নে; কিন্তু আমাকে যে, সবদিক দেখতে হয়! আজ আমি ম'লে, তোর দশা কি হবে, তা' একবার ভাবিস্? কুসুম বিরক্ত হইয়াছিল, কথা কহিল না। কুঞ্জ গম্ভীরমুখে কহিতে লাগিল, "আমি আমাদের মুরুব্বিদের সবাইকে জিজ্ঞেস্ করেচি, তোর শাওড়ী সেদিন, নলডাঙার বুড়ো বাবাজীর মত পর্য্যন্ত জেনে এসেছে। সবাই খুসী হয়ে মত দিয়েচে, তা' জানিস্?" কুসুমের মুখের ভাব সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সংক্ষেপে "জানি বৈ কি!" বলিয়াই চুপ করিয়া গেল। তাহার কথা লইয়া, তাহার মায়ের কথা লইয়া, তাহার কণ্ঠী-বদলের কথা লইয়া, তাহাদের সমাজে আলাচনা চলিতেছে, গণ্যমান্যদিগের মত জানা-জানি চলিতেছে,—এ সম্বন্ধে তাহাকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল; কিন্তু এভাব চাপা দিয়া, সহসা জিজ্ঞাসা করিল, এ বেলা কি খাবে দাদা?" কুঞ্জ বোনের মনের ভাব বুঝিল; সেও মুখ ভারী করিয়া বলিল—"কিচ্ছুনা। আমার ক্ষিদে নেই।" কুসুম অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল; কিন্তু তাহাও সম্বরণ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কুঞ্জ এক কলিকা তামাক সাজিয়া লইয়া, সেইখানে বসিয়া তামাকটা নিঃশেষ করিয়া, হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া, ডাক দিল, "কুসুম!" কুসুম তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া সিলাই করিতে বসিয়াছিল; সাড়া দিল—"কেন?"

"বলি, রাত্তির হ'চ্চেনা? রাঁধ্‌বি কখন্?" কুসুম তথা হইতে জবাব দিল, "আজ আর রাঁধ্‌ব না।" "কেন?—তাই জিজ্ঞেস্ কচ্চি।" কুসুম চেঁচাইয়া বলিল, "আমি একশবার বক্‌তে পারিনে।" বোনের কথা শুনিয়া কুঞ্জ, দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া, ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। চেঁচাইয়া বলিল—"জ্বালাতন্ করিস্‌নে কুসী! অমন ধারা করলে যেখানে দুচোখ্ যায় চলে' যাব,—তা'বলে দিচ্চি।"

"যাও—এক্ষনি যাও। বাড়ীর মধ্যে আমি, হাড়ি-ডোমের মত, অমন করে' হাঁকা-হাঁকি করতে দেবনা। ইচ্ছা হয়, যাও, ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যত পার চেঁচাওগে।" কুঞ্জ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"পোড়ারমুখী, তুই, ছোট বোন্ হয়ে, বড় ভাইকে তাড়িয়ে দিস্!" কুসুম বলিল—"দিই। বড় বলে' তুমি যা'ইচ্ছে তাই করবে না কি?" বোনের মুখের পানে চাহিয়া, কুঞ্জ মনে মনে একটু ভয় পাইল। গলা নরম করিয়া বলিল—"কিসে যা'ইচ্ছে তাই কল্লুম—শুনি?" "কেন তবে আমাকে না বলে' ওখানে গিয়ে খেয়ে এলে?" "কেন, তাতে দোষ হয়েছে কি?" কুসুম তীব্রভাবে বলিল, "দোষ হয়েচে?—ঢের দোষ হয়েছে। আমি মানা করে' দিচ্ছি, আর তুমি ওখানে যাবে না।" কুঞ্জ বড় ভাই, কলহের সময় নতি স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা করিল, "তুই কি বড় বোন্? যে, আমাকে হুকুম করবি? আমার ইচ্ছে হলেই সেখানে যাব।" কুসুম তেমনই জোর দিয়া বলিল—"না, যাবে না। আমি শুন্‌তে পেলে, ভাল হবে না বলে দিচ্চি দাদা।" এবার কুঞ্জ যথার্থ ভয় পাইল। তথাপি মুখের সাহস বজায় রাখিয়া বলিল, "যদি যাই;—কি করবি তুই?" কুসুম সিলাই ফেলিয়া দিয়া তড়িদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"আমাকে রাগিয়োনা বল্‌চি দাদা—যাও আমার সুমুখ থেকে—সরে যাও বল্‌ছি।"

কুঞ্জ শশব্যস্ত ঘর হইতে বাহিরে গিয়া কপাটের আড়ালে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তোর ভয়ে সরে' যাব? যদি যাই কি করতে পারিস্ তুই?" কুসুম জবাব দিল না; প্রদীপের আলোটা আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, সিলাই করিতে বসিল। আড়ালে দাঁড়াইয়া কুঞ্জর সাহস বাড়িল, কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া বলিল—"লোকে কথায় বলে 'স্বভাব যায় মলে'।—নিজে রাক্ষসীর মত চেঁচাবি, তাতে দোষ নেই; কিন্তু আমি একটু জোরে কথা কইলেই—"বলিয়া কুঞ্জ থামিল; কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে প্রতিবাদ আসিল না দেখিয়া, সে মনে মনে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। উঠিয়া গিয়া, হুঁকাটা তুলিয়া আনিয়া নিরর্থক গোটা দুই টান দিয়া, গলার সুর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল—"আমি যখন বড়, আমি যখন কর্ত্তা, তখন আমার হুকুমেই কাজ হবে।" বলিয়া পোড়া তামাকটা ঢালিয়া ফেলিয়া, নূতন সাজিতে সাজিতে, এবার রীতিমত জোরগলায় হাঁকিয়া কহিল—

"চাইনে আমি কারো কথা! একশবার 'না—না' শুনতে আমি চইনে! আমি যখন কর্ত্তা—আমার যখন বাড়ী—তখন, আমি যা বলব তাই—"বলিয়া সে সহসা পিছনে

পদশব্দ শুনিয়াই ঘাড় বাঁকাইয়াই স্তব্ধ হইয়া থামিল। কুসুম নিঃশব্দে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল; বলিল, "বসে' বসে' কোঁদল্ কর্‌বে, না, যাবে এখান থেকে ?"

ছোট বোনের তীব্রদৃষ্টির সুমুখে বড়ভায়ের কর্ত্তা সাজিবার সখ উড়িয়া গেল!—তাহার গলাদিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। কুসুম তেমনই ভাবে বলিল, "দাদা, যাবে কিনা ?" এখন সে কুঞ্জনাথও নাই, সে গলাও নাই; চিঁ চিঁ করিয়া বলিল—"বল্লুম ত, তামাকৃটা সেজে নিয়েই যাচ্চি।"

কুসুম হাত বাড়াইয়া, "দাও আমাকে" বলিয়া কলিকাটা হাতে লইয়া চলিয়া গেল। মিনিট খানেক পরে, ফিরিয়া আসিয়া, সেটা হুঁকার মাথায় রাখিয়া দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "স্যাক্‌রাদের দোকানে যাচ্চ ত ?" কুঞ্জ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ।" কুসুম সহজভাবে বলিল, "তাই যাও। কিন্তু, বেশি রাত ক'র না, আমার রান্না শেষ হতে দেরী হবে না।"

কুঞ্জ হুঁকাটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

(২)

সে দিন কুঞ্জ ভগিনীর কাছে বৃন্দাবনদের সাংসারিক পরিচয় দিবার সময় অত্যুক্তি মাত্র করে নাই। সত্যই তাহাদের গৃহে লক্ষ্মী উথ্‌লাইয়া পড়িতেছিল; অথচ, সে জন্য কাহারও অহঙ্কার অভিমান কিছুই ছিল না।

এ গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। বৃন্দাবন ছেলেবেলা নিজের চেষ্টায় বাঙ্‌লা লেখাপড়া শেখে, এবং তখন হইতেই একটা পাঠশালা খুলিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু তাহার পিতা গৌরদাস পাকা লোক ছিলেন; বৃন্দাবন এক-মাত্র সন্তান হইলেও, এই সব অনাসৃষ্ট কার্য্যে পুত্রকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সে নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিনা-বেতনের একটা পাঠশালা খুলিয়া সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করে।

পাড়ায় একজন অবসর-প্রাপ্ত প্রাচীন শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাকে সে নিজের ইংরেজী-শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করে। তিনি রাত্রে পড়াইয়া যাইতেন; তাই, কথাটা গোপনেই ছিল। গ্রামের কেহই জানিতে পারে নাই,—'বেন্দা বোষ্টম' ইংরাজি শিখিয়া ছিল। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে, স্ত্রীবিয়োগের পর, সে এই লেখা-পড়া লইয়াই থাকিত। প্রায় সমস্ত রাত্রি পড়িত; সকালে গৃহকর্ম্ম, বিষয় আশয় দেখিত; এবং দুপুর বেলা স্ব-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালে কৃষক-পুত্রদিগের অধ্যাপনা করিত। বিধবা জননী তাহাকে পুনরায় বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে, তাহার শিশু পুত্রটিকে দেখাইয়া বলিত, "যে জন্য বিয়ে করা তা আমাদের আছে; আর আবশ্যক নেই মা।" মা কান্নাকাটি করিতেন, কিন্তু সে শুনিত না।—এমনিই করিয়া বছর দুই কাটিল।

তারপর, হঠাৎ একদিন সে কুঞ্জ বোষ্টমের বাড়ীর সুমুখেই কুসুমকে দেখিল। কুসুম, নদী হইতে স্নান করিয়া কলস-বক্ষে, ঘরে ফিরিতেছিল; সেই তখন সবে মাত্র যৌবনে পা দিয়াছে। বৃন্দাবন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল; কুসুম গৃহে প্রবেশ করিলে, সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। এ গ্রামের সব বাড়ীই সে চিনিত; সুতরাং এই কিশোরী যে কে, তাহাও সে চিনিল।

এক-সন্তান হইলে মাতা-পুত্রে যে সম্বন্ধ হয়, বৃন্দাবন ও জননীর মধ্যে সেই সম্বন্ধ ছিল। সে ঘরে ফিরিয়া, মায়ের কাছে কুসুমের কথা অবাধে প্রকাশ করিল। মা বলিলেন, "সে কি হয় বাবা ?—তাদের যে দোষ আছে।"

বৃন্দাবন জবাব দিল, "তা' হউক মা, তবু সে তোমার বৌ। যখন বিয়ে দিয়ে ছিলে, তখন "সে কথা ভাবনি কেন ?" মা বলিলেন, "সে সব কথা তোমার বাবা জান্‌তেন। তিনি যা' ভাল বুঝেছিলেন—ক'রে গেছেন।" বৃন্দাবন অভিমান-ভরে কহিল—"তবে, তাই ভাল মা। আমি যেমন আছি তেমনই থাকি; আমার বিয়ের জন্যে আর তুমি পীড়াপীড়ি ক'র না।" বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল। তখন হইতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৃন্দাবনের জননী, কুসুমকে ঘরে আনিবার জন্য, অবি-শ্রাম চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ফল হয় নাই,—কুসুমকে কোন মতেই সম্মত করান যায় নাই। কুসুমের এত দৃঢ় আপত্তির দুটো বড় কারণ ছিল। প্রথম কারণ,—সে তাহার নিরীহ, অসমর্থ ও অল্প-বুদ্ধি ভাইটিকে একা ফেলিয়া আর কোথাও গিয়াই স্বস্তি পাইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর কোনরূপ সামাজিক ক্রিয়া না করিয়া সে যদি সহজে গিয়া স্বামীর ঘর করিতে পাইত, হয়ত, এমন করিয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন দাদার অনুরোধ

ও পীড়াপীড়ির বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত না; কিন্তু, ঐ যে আবার কি সব করিতে হইবে, রকমারি বোষ্টমের দল আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার মায়ের মিথ্যা কলঙ্কের কথা, তাহার নিজের বাল্য-জীবনের বিস্মৃত-ঘটনা, আরও কত কি ব্যাপারের উল্লেখ হইবে, চেঁচা-চেঁচি উঠিবে, পাড়ার লোক কৌতুহলী হইয়া দেখিতে আসিবে, তাহার সঙ্গিনীদের সকৌতুক-দৃষ্টি বেড়ার ফাঁক দিয়া নিঃসংশয়ে উঁকিঝুঁকি মারিবে, শেসে ঘরে ফিরিয়া গিয়া সোজা-ভাষায় হাসিতে হাসিতে বলিবে—'হাড়ি-ডোমের মত কুসুমেরও নিকা হইয়া গেল'—ছি ছি, এ সব মনে করিলেও সে লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠে। যে সব ভদ্র কন্যাদের সহিত সেও লেখাপড়া শিখিয়াছে, একসঙ্গে একভাবেই এত বড় হইয়াছে, দরিদ্র হইলেও আচার-ব্যবহারে তাহাদের অপেক্ষা সে যে ছোটো—একথা সে মনে ঠাঁই দিতেও পারে না।

কাল সন্ধ্যায় দাদার সহিত কুসুমের কলহ হইয়াছিল, রাগ করিয়া কাঠের সিন্দুকের চাবিটা সে দাদার পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সরোষে বলিয়াছিল, 'আর সে সংসারের কিছুতেই থাকিবে না।' আজ প্রভাতে, নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া, দেখিল,—দাদা ঘরে নাই, চলিয়া গিয়াছে। তাহার ধামাটিও নাই! কুসুম মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, "কাল বকুনি খেয়েই দাদা আজ ভোরে উঠে পালিয়েচে।" কল্যকার ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্যই সে যে পলাইয়াছে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু, কুসুম যাহা অনুমান করিল, তাহা নহে—সে ত্রুটি আর একটা।—খানিক পরেই তাহা প্রকাশ পাইল।

কুসুমকে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে হইত। ঘর-দুয়ার গোময় দিয়া নিকাইয়া, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া, নদী হইতে স্নান করিয়া, জল আনিয়া, তবে দাদার জন্য রাঁধিয়া দিতে হইত। কুঞ্জ, ভাত খাইয়া, ফেরি-করিতে বাহির হইয়া গেলে সে পূজা-আহ্নিকে বসিত। যেদিন কুঞ্জ না খাইয়া যাইত, সেদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ফিরিয়া আসিত। তাহার এখনও অনেক দেরি মনে করিয়া কুসুম ফুল তুলিতে লাগিল। উঠানের এক-ধারে কএকটা ফুলের গাছ,—গোটা কএক মল্লিকা ও জুঁয়ের ঝাড় ছিল, ইহারাই তাহার নিত্যপূজার ফুল জোগান দিত। ফুলতুলিয়া, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া লইয়া, সবে মাত্র পূজায় বসিয়াছে, এমন সময়ে সদরে কএকখানা গো-যান আসিয়া থামিল, এবং পরক্ষণেই একটি প্রৌঢ়া নারী কপাট ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কুসুম ইঁহাকে আর কখনও দেখে নাই; কিন্তু নাকে তিলক, গলায় মালা দেখিয়া বুঝিল, ইনি যেই হোন্, স্বজাতি। প্রৌঢ়া কাছে আসিয়া, হাসিমুখে বলিলেন, "তুমি আমাকে চেননা মা; তোমার দাদা চেনে।—কুঞ্জনাথ কৈ?" কুসুম জবাব দিল, "তিনি আজ ভোরেই বাইরে গেছেন। ফিরতে বোধ করি দেরি হবে।" আগন্তুক বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, "দেরী হবে কি গো? কাল, সে তার ভগিনীপতিকে, আরও চার পাঁচটি ছেলেকে—তারাও আমাদের আপনার লোক—সম্পর্কে ভাগ্নে হয়—সবাইকে খেতে বলে' এল—আমিও তাই, আজ সকালে বল্লুম,—'বৃন্দাবন, গরুর গাড়ীটা ঠিক করে আন্‌তে বলেদে বাছা; যাই, আমিও বৌমাকে একবার দেখে আশীর্ব্বাদ করে' আসি'।"

কথা শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইয়া গেল; কিন্তু, পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, মাথার আঁচলটা আরও খানিকটা টানিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল, এবং ঘরের ভিতর হইতে আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কুসুম বুঝিল, ইনি শাশুড়ী। তিনি আসনে বসিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "কাল খাওয়া দাওয়ার পরে বৃন্দাবন তামাসা করে বল্লে—আমি এমনই হতভাগা, যে কুঞ্জদা, বড় ভায়ের মত হয়েও, কোন দিন ডেকে একঘটি জলপর্য্যন্ত খেতে বল্লেন্ না। ক'দিন থেকে আমার ননদের ছেলেরাও সব এখানে আছে; —কুঞ্জনাথ হাস্‌তে হাস্‌তে তাই, সকলকেই নেমন্তন্ন করে' এল—তারা সবাই এল' বলে'।" কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল। বৃন্দাবনের মা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মত ছিলেন না—তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল; কুসুমের ভাব দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল, কি যেন একটা গোলমাল ঘটিয়াছে। সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "হাঁ বৌ মা, কুঞ্জনাথ কি তোমাকে কিছু বলে' যায় নি?" কুসুম, ঘোমটার ভিতরে ঘাড় নাড়িয়া, জানাইল, 'না'। কিন্তু, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বরং মনে করিলেন সে বলিয়াই গিয়াছে। তাই, সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তবু ভালো।" তার

পরে কুঞ্জনাথকে উদ্দেশ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "ভয় হয়েছিল,—আমার পাগ্‌লা ছেলেটা বুঝি সব ভুলে বসে' আছে! তবে, বোধকরি, সে কিছু কিন্‌তে টিন্‌তে গেছে,—এক্ষনি এসে পড়্‌বে। ঐ যে—ওরাও সব হাজির।"

বৃন্দাবন, 'কুঞ্জদা' বলিয়া একটা হাঁক দিয়া, উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে তাহার আরও তিনটি ছেলে;—ইহারাই তাহার মামা'ত ভাই। তাহার মা বলিলেন, "কুঞ্জনাথ এইমাত্র কোথায় গেল। বৌমা, ঘরের ভেতর এক্‌টা সতরঞ্চি টতরঞ্চি পেতে দাও বাছা,—ওরা বসুক্‌।" কুসুম ব্যস্ত হইয়া, তাহার দাদার ঘরের মেঝেতে একটা কম্বল পাতিয়া দিয়া, কলিকাটা হাতে লইয়া তামাক সাজিয়া আনিতে, রান্নাঘরে চলিয়া গেল। বৃন্দাবন দেখিতে পাইয়া সহাস্যে কহিল, "ও থাক্‌।—তামাক আমরা কেউ খাইনে।" কুসুম, কলিকাটা ফেলিয়া দিয়া, এইবার রান্না ঘরের একটা খুঁটি-আশ্রয় করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ অগ্রজ, অকস্মাৎ এ কি বিপদের মাঝখানে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল! ক্রোধে, অভিমানে, লজ্জায়, অবশ্যম্ভাবী অপমানের আশঙ্কায়, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কাল হইতেই তাহার ভাঁড়ারে সমস্ত জিনিস 'বাড়ন্ত' হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকালে, স্নানে যাইবার পুর্ব্বেও সে ভাবিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়াই দাদাকে হাটে পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া, আর দাদার সন্ধান পায় নাই। দোষ-অপরাধ করার পরে, ছোট বোন্‌কে কুঞ্জ যথার্থই এত ভয় করিত, যে,সচরাচর মানুষ দুষ্ট মনিবকেও এত করে না। যে বড়লোকেদের ঘরে শুধু খাইয়াআসিবার অপরাধে কুসুম অত রাগ করিয়াছিল, ঝোঁকের মাথায়,—সেই বড়লোকদিগকে সদলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার গুরুতর অপরাধ মুখফুটিয়া বলিবার দুঃসাহস, কুঞ্জ, কোনমতেই নিজের মধ্যে সংগ্রহকরিতে পারে নাই।—পারে নাই বলিয়াই সে সকালে উঠিয়াই পলাইয়াছে, এবং কিছুতেই যে রাত্রির পূর্ব্বে ফিরিবে না, ইহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াই, কুসুম আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সবচেয়ে বিপদ এই হইয়াছিল, যে সিন্দুকটির ভিতরে তাহাদের সঞ্চিত গুটিকএক টাকা ছিল, তাহার চাবিটাও কাছে নাই; অথচ, হাতেও একটি পয়সা নাই! এমন নিরুপায়ভাবে মিনিট পাঁচেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হঠাৎ তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বৃন্দাবনের উপরে; বাস্তবিক, সমস্ত দোষত তাহারই। কেন সে তাহার নির্ব্বোধ নিরীহ ভাইটিকে পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গেল, কেনই বা এইসব পরিহাস করিল!—'উনি কে? যে, দাদা ওঁকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইবে?'

এই তিন বৎসর, কত ছলে, কত উপলক্ষে, বৃন্দাবন এদিকে যাতায়াত করিয়াছে; কত উপায়ে তাহাদের মন পাইবার চেষ্টা করিয়াছে; কতদিন সকাল সন্ধ্যায়, বিনা প্রয়োজনে, বাটির সুমুখের পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে। তাহাদের দুঃস্থ অবস্থার কথা সে সমস্ত জানে;—জানে বলিয়াই, তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার এই কৌশল সৃষ্টি করিয়াছে!

কুসুম, কাঠের মূর্ত্তির মত, সেইখানে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে বড় অভিমানিনী; এখন, একা সে কি উপায় করিবে!

বৃন্দাবনের মা ঘরের ভিতরে উঠিয়া গিয়া ছেলেদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন; কিন্তু তাঁর ছেলের চোখ্‌, ঘরের বাহিরে, ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে দৃষ্টি, রান্নাঘরের ভিতরে, কুসুমের উপর পড়িল। চোখোচোখি হইল, মনে হইল, সে সঙ্কেতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল। পলকের এক-অংশের জন্য তাহার সমস্ত হৃৎপিণ্ড, উন্মত্তের মত লাফাইয়া উঠিয়াই, স্থির হইল। সে বুঝিল, ইহা চোখের ভুল;—ইহা অসম্ভব! দৈবাৎ কখন দেখা হইয়া গেলে, যে মানুষ মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়াছে, যাহার নিদারুণ বিতৃষ্ণার কথা সে অনেকবার কুঞ্জনাথের কাছে শুনিয়াছে, সে যাচিয়া তাহাকে আহ্বান করিবে—এ হইতেই পারে না! বৃন্দাবন অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া লইল; কিন্তু থাকিতেও পারিল না। যেখানে চোখোচোখি হইয়াছিল, আবার সেইখানে চাহিল। ঠিক তাই!—কুসুম তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, হাত নাড়িয়া ডাকিল। ত্রস্তপদে বৃন্দাবন উঠিয়া আসিয়া,রান্নাঘরের কপাটের কাছে দাঁড়াইয়া, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্‌ছিলে আমাকে?" কুসুম তেমনই মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হুঁ"। বৃন্দাবন আরও একটু সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" কুসুম এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, ভারী চাপা গলায় বলিল, "জিজ্ঞাসা কচ্চি তোমাকে, আমাদের মত দীন দুঃখীকে জব্দ করে' তোমার মত বড়

লোকের কি বাহাদুরি বাড়্‌বে?" হঠাৎ একি অভিযোগ! বৃন্দাবন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কুসুম অধিকতর কঠোর ভাবে বলিল, "জাননা, আমাদের কি করে দিন চলে? কেন তবে তুমি দাদাকে অমন তামাসা করতে গেলে? কেন, এত লোক নিয়ে খেতে এলে?" বৃন্দাবন প্রথমে ভাবিয়া পাইল না এ নালিশের কি জবাব দিবে। কিন্তু, স্বভাবতঃ সে ধীর প্রকৃতির লোক। কিছুতেই বেশী বিচলিত হয় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শেষে সহজ শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কুঞ্জদা' কোথায়?" কুসুম বলিল—"জানিনে। আমাকে কোন কথা না বলেই তিনি সকালে উঠে চলে গেছেন।" বৃন্দাবন আর একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, "গেলই বা। সে নেই, আমি আছি। ঘরে, খেতে দেবার কিছু নেই নাকি?" "কিচ্ছু না। সব ফুরিয়েছে, আমার হাতে টাকাও নেই।" বৃন্দাবন কহিল, "এ গাঁয়ে, তোমাদের মত আমাকে'ও সবাই জানে। আমি মুদির হাতে সমস্ত জিনিস কিনে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমাকে একটা গামছা দাও,—আমি, একেবারে স্নান করে' ফিরে আস্‌ব। মা জিজ্ঞেস করিলে বল' আমি নাইতে গেছি। দাঁড়িয়ে থেকনা—যাও।" কুসুম ঘরে গিয়া তাহার গাম্‌ছা আনিয়া হাতে দিল। সেটা মাথায় জড়াইয়া লইয়া, বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, "কুঞ্জদার তুমি বোন্ হও, তাই সে পালাতে পারচে, আর কিছু হলে বোধ করি এমন করে' ফেলে যেতে পার্‌ত না।"

কুসুম চুপি চুপি জবাব দিল—"সবাই পারেনা বটে, কিন্তু, কেউ কেউ তাও বেশ পারে।" বলিয়াই সে বৃন্দাবনের মুখের প্রতি আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, কথাটা তাহাকে বাস্তবিক কিরূপ আঘাত করিল। বৃন্দাবন যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, থামিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, "তোমার এ ভুল হয়ত, একদিন ভাঙতেও পারে। ছেলে-বেলায় তোমার মায়ের অন্যায়ের জন্য যেমন তুমি দায়ী নও, আমার বাবার ভুলের জন্যেও তেমনই আমার দোষ নেই। যাক্, এসব ঝগড়ার এখন সময় নয়, যাও—রাঁধ্‌বার যোগাড় করগে।"

"রাঁধবার কি যোগাড় করব শুনি? আমার মাথাটা কেটে রেঁধে দিলে যদি তোমার পেট ভরে, না হয়, বল, তাই দিইগে।" বৃন্দাবন দু'একপা গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া এ কথার জবাব না দিয়া কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে যা ইচ্ছে তাই বল্‌তে পার, আমাকে তা' সইতেই হবে, কিন্তু, রাগের মাথায় তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে যেন কটু কথা শুনিয়ে দিওনা। তিনি অল্পেই বড় আঘাত পান।" কুসুম ক্রুদ্ধ চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আমি জন্তু নই, আমার সে বুদ্ধি আছে।" বৃন্দাবন কহিল, "সেও জানি, আবার বুদ্ধির চেয়ে রাগ তোমার ঢের বেশী তাও জানি। আর একটা কথা কুসুম! মা স্নান করেই চলে এসেছেন, এখনও পূজা আহ্নিক করেন নি। তাঁকে জিজ্ঞেসা করে, আগে সেই জোগাড়টা করে দাওগে। আমি চল্লুম।"

"যাও, কিন্তু, কোথাও গল্প করতে বসে যেওনা যেন।" বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া বলিল, "না। কিন্তু, দেরী করে' বকুনি খাবারও ভারী লোভ হচ্চে। আর এক দিনের আশা দাওত, আজ না হয়, শীগ্‌গীর করে' ফিরে আসি।"

"সে তখন দেখা যাবে।" বলিয়া কুসুম রান্নাঘরের ভিতরে যাইতেছিল, সহসা বৃন্দাবন একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আশ্চর্য্য! একবারও মনে হলনা যে, আজ তুমি এই প্রথম কথা কইলে। যেন কত যুগযুগান্তর আমাকে তুমি এমনই শাসন করেই এসেছ—ভগবানের হাতে বাঁধা কি আশ্চর্য্য বাঁধন, কুসুম!"

কুসুম দাঁড়াইয়া শুনিল, কিন্তু জবাব দিল না। বৃন্দাবন চলিয়া গেলে এই কথা স্মরণ করিয়া হঠাৎ তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, সে রান্নাঘরের ভিতরে আসিয়া স্থির হইয়া বসিল। নিজের শিক্ষার অভিমানে, যাহাকে সে এতদিন অশিক্ষিত চাষা মনে করিয়া গণনার মধ্যেই আনে নাই, আজিকার কথা বার্ত্তা এবং এই ব্যবহারের পর, তাহারই সম্বন্ধে, এক নূতন আনন্দে নূতন তৃষ্ণায় সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

(৩)

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটী ফিরিবার পূর্ব্বে বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে কাছে ডাকিয়া অশ্রু-গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "বৌমা, কি আনন্দে যে সারাদিন কাটালুম, তা মুখে বল্‌তে পারিনে। সুখী হও মা!" বলিয়া তিনি অঞ্চলের ভিতর হইতে একজোড়া মোটা সোণার বালা বাহির করিয়া স্বহস্তে তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন। আজিকার সমস্ত আয়োজন

কুসুম, গোপনে বৃন্দাবনের সাহায্যে নির্ব্বাহ করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ইহাতেই তাঁহার হৃদয় আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কুসুম গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্বশ্রূবধূতে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া তিনি বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কুঞ্জনাথের সঙ্গে দেখা হ'ল না, মা পাগ্‌লা কোথায় সারাদিন পালিয়ে রইল, কাল তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।" কুসুম ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবনের পিতামহ বাটিতে গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। এইঘরে বসিয়া বৃন্দাবনের মা প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মালা জপ করিতেন। আজিও করিতে-ছিলেন। তাঁহার শিশু পৌত্র কোলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহারা যেখানে বসিয়াছিলেন, সে স্থানটায় প্রদীপের ছায়া পড়িয়াছিল। সেই হেতু বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিয়া ইঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে বেদীর সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া জানু পাতিয়া বসিল, এবং কিছুক্ষণ মনে মনে প্রার্থনা করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই এইবার মায়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল, "অমন আব্‌ছায়ায় বসে' কেন মা?" মা সস্নেহে বলিলেন, "তা' হোক্। আয় তুই আমার কাছে এসে একটু বোস্।" বৃন্দাবন কাছে আসিয়া বসিল। তাহার লজ্জা পাইবার কারণ ছিল। তখন রাত্রি এক প্রহরের অধিক হইয়াছিল। এমন অসময়ে কোন দিন সে ঠাকুর প্রণাম করিতে আসে না। আজ আসিয়াছিল; যে আশাতীত সৌভাগ্যের আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, দিনটা সার্থক বোধ হইয়াছিল, তাহাই নম্র হৃদয়ে, গোপনে, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া দিতে। কিন্তু, পাছে মা তাহার মনের কথাটা অনুমান করিয়া থাকেন এই লজ্জাতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। খানিক পরে মা নিদ্রিত পৌত্রের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে উচ্ছ্বসিত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা-মরা আমার এই এক ফোঁটা বংশধরকে ফেলে রেখে কোথাও আমি এক পা নড়িতে পারিনে, তাই, আজ মনে হচ্ছে, বৃন্দাবন আমার মাথা থেকে কে যেন ভারী বোঝা নাবিয়ে নিয়েচে। তাকে শীগ্‌গীর ঘরে আন্ বাছা; আমি মায়ের হাতে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে একটু ছুটী নিই—দিনকতক কাশী বৃন্দাবন করে' বেড়াই।" আজ বৃন্দাবনের অন্তরেও আশা ও বিশ্বাসের এমনই স্রোতই বহিতেছিল, তথাপি সে সলজ্জ-হাস্যে কহিল, "সে আস্‌বে কেন মা?" মা নিঃসন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আস্‌বে বৈকি! সে এলে তবে ত আমার ছুটি হবে। আমারই ভুল হয়েছে, বৃন্দাবন, এতদিন আমি নিজে যাইনি। আসবার সময় নিজের হাতের বালা দুগাছি পরিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ কল্লুম, বৌমা পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়ালেন। তখনই বুঝেছি আমার মাথার ভার নেবে গেছে। তুই দেখিস্ দেকি, প্রথম যেদিন একটা ভালদিন পাব, সেই দিনেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আন্‌ব।" বৃন্দাবন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু এসে তোমার বংশধরটিকে দেখ্‌বে ত?" মা, তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "দেখ্‌বে বৈকি! সে ভয় আমার নেই।"

"কেন, নেই মা?" মা বলিলেন, "আমি সোনা চিনি, বৃন্দাবন! অবশ্য, খাঁটি কি না, এখন বল্‌তে পারিনে, কিন্তু, পেতল নয়, গিল্‌টি নয়, একথা তোকে আমি নিশ্চয় বলে' দিলুম। তা'নইলে আমার এমন সংসারে তাঁকে আন্‌বার কথা তুলতুম না। হাঁরে বিন্দাবন, বৌমা কি তোর সঙ্গে বরাবরই কথা ক'ন?"

"কোন দিন নয় মা! তবে আজ বোধ করি বিপদে পড়েই—" বলিয়া বৃন্দাবন একটু খানি হাসিয়া চুপ করিল। মা, একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সে ঠিক কথা বাছা। তার দোষ নেই; সবাই এমনই। মানুষ বিপদে পড়িলেই, তখন যথার্থ আপনার জনের কাছে ছুটে আসে। আমি ত মেয়ে মানুষ বৃন্দাবন, তবুও সে তার দুঃখের কথা আমাকে জানায়নি, তোকেই জানিয়েচে।" বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। তিনি পুনরায় কহিলেন, "আমার আর একটা কাজ রইল, সেটা কুঞ্জনাথকে সংসারী-করা," বলিয়াই তিনি নিজের মনে হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, "সে বেশ লোক। পাড়া শুদ্ধ নেমন্তন্ন করে' বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল—তারপর যা হয় তা হোক্।" বৃন্দাবনও নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। মা বলিলেন, "শুনলুম, বৌ-মাকে সে ভারী ভয় করে—ভাই, বড় হয়েও ছোট ভাইটির মত আছে। এক এক জন রাশভারী মানুষ আছে, বৃন্দাবন,

তাদের ভয় না করে' থাক্‌বার যো নেই—তা বয়সে বড়ই হোক্‌। আমার বৌমাও সেই ধাতের মানুষ—শান্ত, অথচ শক্ত। এমনি মানুষই আমি চাই যে, ভার দিলে ভার সইতে পারিবে। তবেইত, আমি সংসার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার বেরিয়ে পড়্‌তে পার্‌ব।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া তখনি বলিয়া উঠিলেন "একটি দিনের দেখায় তাকে কি যে ভালবেসেচি তা আমি তোকে মুখে বল্‌তে পার্‌বনা—সারা সন্ধ্যাবেলাটা আমার কেবলই মনে হয়েচে কত ক্ষণে ঘরে নিয়ে আন্‌ব, আবার কতক্ষণে দেখ্‌ব।" বৃন্দাবনের মনে মনে লজ্জা করিতে লাগিল; সে কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "কুঞ্জদার কথা কি বল্‌ছিলে মা?" মা বলিলেন, "হাঁ, তার কথা। বৌমাকে নিয়ে আসার আগে কুঞ্জনাথকে সংসারী করাও আমার একটা কাজ। কাল খুব ভোরে তুই গোপালকে গাড়ী আন্‌তে বলে দিস্‌, আমি একবার নলডাঙ্গায় যাব। ওখানে গোকুল বৈরাগীর মেয়েটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়। দেখ্‌তে শুন্‌তেও মন্দ নয়, তাছাড়া—"কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বে বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, "তাছাড়া ঐ এক মেয়ে, বৈরাগীও কিছু বিষয় আশয় রেখে মরেচে, না, মা?" মাও হাসিলেন। বলিলেন, "সে কথা সত্যি বাছা। কুঞ্জর পক্ষে ওটা সব চেয়ে দরকার! নইলে, বিয়ে কর্‌লেই ত হয় না, খেতে পর্‌তে দেওয়া চাই। আর, মেয়েটিই বা মন্দ কি বৃন্দাবন, একটু কাল', কিন্তু, মুখশ্রী আছে। যাই হোক্‌, দেখি কাল কি করে আস্‌তে পারি।"

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া বলিল—"আমিও দিনক্ষণ দেখাইগে, মা! তুমি নিজে যখন যাচ্চ, তখন শুধু যে ফির্‌বেনা, সে নিশ্চয় জানি।"

৪

কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা, দেনা পাওনার কথা, খাওয়ান দাওয়ানর কথা, সমস্তই প্রায় স্থির করিয়া পরদিন অপরাহ্ণে বৃন্দাবনের জননী বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তখন, চণ্ডীমণ্ডপের সুমুখে, সারি দিয়া দাঁড়াইয়া পোড়োরা নাম্‌তা আবৃত্তি করিতেছিল; বৃন্দাবন, একধারে দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছিল। গরুর গাড়ী সুমুখে আসিয়া থামিতেই তাহার শিশুপুত্র চরণ গাড়ী হইতে নামিয়া চেঁচামেঁচি করিয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল, মাতুলানী পছন্দ করিতে, সেও আজ পিতামহীর সঙ্গে গিয়াছিল। বৃন্দাবন তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মা তখন নামিতেছিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, "কবে দিন স্থির করে এলে মা?"

"এই মাসের শেষে। আর দিন নেই, তুই ভিতরে আয়—অনেক কথা আছে—" বলিয়া তিনি হাসিমুখে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাঁর নিজের ঘরে বউ আস্‌বে এই আনন্দে তাঁহার বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তা'ছাড়া, ঐ একটি দিনে ঘরকন্নায় গৃহিণীপনায় কুসুমকে তিনি সত্যই ভালবাসিয়াছিলেন। নিজে সুখী হইবেন, একমাত্র সন্তানকে যথার্থ সুখী করিবেন, তাহাদের হাতে ঘর সংসার সঁপিয়া দিয়া তীর্থ ধর্ম্ম করিয়া বেড়াইবেন—এই সব সুখ-স্বপ্নের কাছে, আর সমস্ত কাজই তাঁর সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছিল। তাই গোকুলের বিধবার সমস্ত প্রস্তাবেই তিনি সম্মত হইয়া, সমস্ত ব্যয়ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

ও-বেলায় তাঁহার খাওয়া হয় নাই। সহজে তিনি কোথাও কিছু খাইতে চাহিতেন না, বৃন্দাবন তাহা জানিত। সে পাঠশালের ছুটি দিয়া ভিতরে আসিয়া দেখিল সে দিকের কোন উদ্যোগ না করিয়াই তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বৃন্দাবন বলিল,—"উপোস করে' ভাব্‌লে সমস্ত গোল্‌মাল হয়ে যায়। পরের ভাব্‌না পরে ভেব মা, আগে সেই চেষ্টা কর।"

মা বলিলেন, "সে সন্ধ্যার পরে হবে। না রে তামাসা নয়, আর সময় নেই—সে পাগলের না আছে টাকা কড়ি, না আছে লোক জন, আমাকেই সব ভার বইতে হবে—মেয়ের মা দেখ্‌লুম বেশ শক্ত মানুষ—সহজে কিছুতেই রাজী হতে চায় না। তবে আমিও ছাড়বার লোক নই—ওরে ঐ যে! সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক্‌ বাবা, তোমার কথাই হচ্ছিল—এস বোস। হঠাৎ এ সময়ে যে?"

বাস্তবিক গ্রামান্তর হইতে পরের বাড়ী আসার এটা সময় নয়। কুঞ্জনাথ বাড়ী ঢুকিয়াই এ রকমের সম্বর্দ্ধনা পাইয়া প্রথমটা থতমত খাইল, তারপর অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিল।

বৃন্দাবন পরিহাস করিয়া কহিল—"আচ্ছা, কুঞ্জদা, টের পেলে কি করে'। রাতটাও কি চুপ করে থাক্‌তে পার্‌লে না, না হয় কাল সকালে এসেই শুন্‌তে?"

মা একটু হাসিলেন, কুঞ্জ কিন্তু এদিক্ দিয়াও গেল না। সে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "বাপ্‌রে, ! বোন্ নয়ত, যেন দারোগা।"

বৃন্দাবন ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল; মা, মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউমা কিছু বলে' পাঠিয়েছেন বুঝি ?"

কুঞ্জ সে প্রশ্নেরও জবাব না দিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল,—"আচ্ছা, মা, তোমার এ কি রকম ভুল ? ধর, কুসুমের চোখে না পড়ে' যদি আর কারও চোখে পড়ত, তা' হলে কি সর্ব্বনাশ হত বলত ?"

কথাটা তিনি বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্নমুখে চাহিয়া রহিলেন। বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি কুঞ্জদা ?"

ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজেকে হাল্কা করিতে চাহিল না, তাই, বৃন্দাবনের প্রশ্ন কাণেও তুলিল না। মাকে বলিল, "আগে বল কি খাওয়াবে, তবে বল্‌ব।" মা এবার হাসিলেন; বলিলেন, "তা বেশ ত বাবা, এ তোমারই বাড়ী, কি খাবে বল ?"

কুঞ্জ কহিল, "আচ্ছা, সে আর একদিন হবে—তোমার কি হারিয়েচে আগে বল ?"

বৃন্দাবনের মা চিন্তিত হইলেন। একটু থামিয়া, সন্দিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "কৈ কিছুইত হারায়নি !"

কথা শুনিয়া কুঞ্জ হো-হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; পরে, নিজের চাদরের মধ্যে হাত দিয়া এক জোড়া সোনার বালা মেলিয়া ধরিয়া বলিল, "তা হলে এটা তোমার নয় বল ?" বলিয়া মহা আহ্লাদে নিজের মনেই হাসিতে লাগিল।

এ সেই বালা যাহা কাল এমনই সময়ে পরম স্নেহে স্বহস্তে তিনি পুত্রবধূর হাতে পরাইয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আজ সেই অলঙ্কার, সেই আশীর্ব্বাদ সে নির্ব্বোধ কুঞ্জ'র হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবন একমুহূর্ত্ত সে দিকে চাহিয়া, মায়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া ভীত হইয়া উঠিল। মুখে এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। অপরাহ্নের ম্লান আলোকে তাহা শবের মুখের মত পাণ্ডুর দেখাইল। বৃন্দাবনের নিজের [illegible] যে কি করিয়া উঠিয়াছিল সে শুধু অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু, নিজেকে সে প্রবল চেষ্টায় চক্ষের নিমিষে সাম্‌লাইয়া লইয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া সহজ শান্ত ভাবে বলিল, "মা, আমার বড় ভাগ্য যে, ভগবান্ আমাদের জিনিস আমাদেরই ফিরিয়ে দিলেন। এ তোমার হাতের বালা, সাধ্য কি মা যে-সে পরে ? কুঞ্জদা', চল আমরা বাইরে গিয়ে বসিগে"—বলিয়া কুঞ্জর একটা হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ সোজা মানুষ, তাই, মহা আহ্লাদে অসময়ে এতটা পথ ছুটিয়া আসিয়াছিল। আজ দুপুর বেলা, তাহার খাওয়া দাওয়ার পরে যখন, কুসুম, ম্লান মুখে বালা জোড়াটি হাতে করিয়া আনিয়া শুষ্ক মৃদু কণ্ঠে বলিয়াছিল, "দাদা, কাল তাঁরা ভুলে ফেলে রেখে গেছেন, তোমাকে একবার গিয়ে দিয়ে আস্‌তে হবে ;" তখন আনন্দের আতিশয্যে সে তাহার মলিন মুখ লক্ষ্য করিবার অবকাশও পায় নাই।

ঘোরপ্যাঁচ সে বুঝিতে পারে না, তাহার বোনের কথা সত্য নয়, মানুষ মানুষকে এত দামী জিনিস দিতে পারে, কিংবা দিলে আর একজন তাহা গ্রহণ করে না—ফিরাইয়া দেয়,—এ সব অসম্ভব কাণ্ড তাহার বুদ্ধির অগোচর। তাই, সারাটা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এই হারাণো জিনিস অকস্মাৎ ফিরিয়া পাইয়া, তাঁহারা কিরূপ খুসী হইবেন, তাহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিবেন—এই সব। কিন্তু, কৈ সে রকম ত কিছুই হইল না ? যাহা হইল, তাহা ভাল কি মন্দ, সে ঠিক ধরিতে পারিল না; কিন্তু, এত বড় একটা কাজ করিয়াও মায়ের মুখের একটা ভাল কথা, একটা আশীর্ব্বচন না পাইয়া তাহার মন ভারী খারাপ হইয়া গেল। বরং, বৃন্দাবন তাহাকে যেন, তাঁহার সুমুখ হইতে, বাহিরে তাড়াইয়া আনিয়াছে, এমনই একটা লজ্জাকর অনুভূতি তাহাকে ক্রমশঃ চাপিয়া ধরিতে লাগিল। সে লজ্জিত বিষণ্ণ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তাহার পাশে বসিয়া বৃন্দাবনও কথা কহিল না। বাক্যালাপ করিবার অবস্থা তাহার নহে—তাহার বুকের ভিতরটা তখন অপমানের আগুনে পুড়িয়া যাইতেছিল। অপমান তাহার নিজের নয়—মায়ের।

নিজের ভালমন্দ, মান-অপমান আর ছিল না। মৃত্যু-যাতনা, যেমন অপর সর্ব্বপ্রকার যাতনা আকর্ষণ করিয়া একা বিরাজ করে, জননীর অপমানাহত বিবর্ণ মুখের স্মৃতি

ঠিক তেমনই করিয়', তাহার সমস্ত অনুভূতি গ্রাস করিয়া, একটি মাত্র নিবিড় ভীষণ অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল। সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হইয়া আসিল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে কহিল, "বৃন্দাবন, আজ তবে যাই ভাই।" বৃন্দাবন, বিহ্বলের মত চাহিয়া দেখিয়া, বলিল, "যাও; কিন্তু আর একদিন এস।"

কুঞ্জ চলিয়া গেল; বৃন্দাবন সেইখানে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, জননীর কি আশা কি ভবিষ্যতের কল্পনাই এক নিমিষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল! এখন, কি উপায়ে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে—কাছে গিয়া কোন্ সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করিবে!

আবার সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যে এমন করিয়া সমস্ত নির্ম্মূল করিয়া দিয়া, তাহার উপবাসী শ্রান্ত অবসন্ন সন্ন্যাসিনী মাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারিল,—সে তাহারই স্ত্রী, তাহাকেই সে ভালবাসে!

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মূলী বা মূরলী বংশ

উপরের চিত্রটী দেখিলেই পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা কোন প্রত্নতত্ত্বের, বা ঐতিহাসিক রাজ-বংশের, বিবরণ প্রদান করিয়া পণ্ডিতগণের বাক্‌বিতণ্ডার উপকরণ উপস্থিত করিতেছি না। আমাদের মূলী বা মূরলী বংশ কোন রাজার বা সম্ভ্রান্তব্যক্তির বংশ নহে—ইহা খাঁটি বংশ, যাহাকে সাধারণলোকে 'বাঁশ' বলিয়া থাকে।

বংশ, বা বাঁশ, নানাজাতীয় আছে। উপরে যে বাঁশের ছবি দেখিতেছেন, তাহার নাম মূলী বা মূরলী বাঁশ। সভ্য-দেশে ইহা Melocanna, Bamdusoides, বা Bambusa, Baccifera নামে অভিহিত হয়। বাঁশ যে প্রকার গৃহস্থের উপকারী, তাহাতে তাহার নামটা একটু জাঁকাল রকম হইলেই শোভা পায়; তাই এই নামটা উল্লেখ করিলাম। এই বাঁশ বেশ সরলভাবে বর্দ্ধিত হয়, কোন স্থানে বক্র হয় না। বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই জাতীয় বংশ সরলই আছে, বক্রতা শিক্ষা করে নাই,—ইহা তাহার মহত্ত্বের পরিচায়ক। ইহার দেহের উপরিভাগ অতিশয় মসৃণ। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশেই ইহার আদিম-নিবাস বলিয়া উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিশারদগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহার কোন প্রতিবাদও হয় নাই। তবে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশেই ইহার আদি জন্মভূমি হইলেও, ইহারা আদিম-আর্য্যজাতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, আদি-বাসস্থান হইতে কেহ কেহ বাহির হইয়া, পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে, এবং ব্রহ্মদেশেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কতদিন পূর্ব্বে তাহারা আদিস্থান ত্যাগ করিয়াছিল, উদ্ভিদ্-পুরাণে তাহার কোন সঠিক প্রমাণ নাই;—ভবিষ্যতেও যে হইবে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না।

উদ্ভিদ্-পুরাণে কথিত আছে যে, এই বংশজাতীয় উদ্ভিদ্ আদিম-কালে সামান্য তৃণমাত্র ছিল। তাহার পর, অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারে এবং মনুষ্যজাতির চেষ্টায়, ইহারা ক্রমোন্নতিলাভ করিয়া, সেই আদিম ক্ষুদ্র-তৃণত্ব হইতে, এখন

বংশতে উন্নীত হইয়াছে। এখন বাঁশের ঝাড় দেখিলে কেহই বলিতে পারিবেন না যে, ইহাদের আদিম পিতামাতা সামান্য তৃণমাত্র ছিলেন।

অনেকে বলেন যে, বংশজাতির মধ্যে এই মূলী বা মূরলী-বংশ দীর্ঘকায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইহারা ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ ফিট দীর্ঘ হইয়া থাকে, এবং ইহার বেষ্টনীও বার তের ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা পল্লীবাসী তাঁহারা বংশের কার্য্যকারিতা বিশেষ ভাবে জানেন; গৃহ-নির্ম্মাণে বংশ প্রধান সহায়, দরিদ্রের কুটীরের আগাগোড়াই বাঁশ,—বাঁশের খুঁটি, বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত দরমার বেড়া, ঘরের চালের সরঞ্জাম সবই বাঁশের;—তা' ছাড়া কুলা, ধুচুনি, 'পেতে'—কতশত ছোট-বড়, আবশ্যক সৌখীন তৈজসাদি নির্ম্মাণে—এমন মায় "ব্যাম্বু-কার্ট্" প্রভৃতি যান-নিম্মাণেও ইহা ব্যবহৃত হয়; তাহার পর, ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিস্তার-লাভ করিয়া যখন বৈতরণীপারে যাত্রা করিতে হয়, তখন সেই বাঁশের-দোলাই সম্বল। আবার শ্মশানে, সমস্ত শেষ হইয়া গেলে, আত্মীয়-স্বজনগণ চিতাস্থানের উপর বংশদণ্ড প্রোথিত করিয়া আসেন! গোপী-বল্লভ 'কানু'র 'বাঁশের বাঁশি'—মূরলীও বুঝি, এই বাঁশেরই;—সুতরাং বংশের কার্য্য-কারিতা অসীম!

আর একটা সংবাদ দিয়াই এই গবেষণা-মূলক প্রবন্ধের উপসংহার করিব। চট্টগ্রামের এই মূলী-বাঁশের ছোট ছোট ফল হয়; সে ফল নাকি সেদেশের লোক খাইয়া থাকে। তবে এ কথাও জানিতে পারা গিয়াছে, এই বংশফল আম-কাঁঠালের মত সুখাদ্য নহে। যখন ভাত মিলে না, অন্য ফল মিলে না, ক্ষুধার জালায় দরিদ্রব্যক্তিরা যখন ছট্‌ফট্ করে,—তখন তাহারা এই ফল খাইয়াই ক্ষুধার জ্বালা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিয়া থাকে! ইহার আকৃতি দেখিতে অনেকটা সাপুড়েদের "তুম্বা"-মূরলীর মত। এই স্থানেই বংশবিবরণ শেষ করিলাম।

পাটলিপুত্র

(প্রাচীন-কাহিনী)

দেহত্যাগের-সময় আসন্নপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, ভগবান্ গৌতমবুদ্ধ যখন কপিলাবস্তু অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন, পথিমধ্যে গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে, পাটলিগ্রাম অবস্থিত দেখিয়া, সবিস্ময়ে কহিয়াছিলেন;—"এই পাটলি গ্রাম একদিন রাজধানী হইবে।" তখন রাজগৃহ ও উত্তরাপথের রাজধানী, হস্তিনাপুর, কৌশাম্বীর ও কান্যকুব্জের অধঃপতন হইয়াছে। গিরিবেষ্টিত গিরিব্রজ নগরে বসিয়া নন্দবংশীয় মগধরাজগণ আর্য্যাবর্ত্ত শাসন করিতেন। প্রাচীন রাজগৃহ-নগরী,—মানববাসের অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, নন্দ-বংশীয় রাজগণ ইহাকে পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহারা মহামারীপীড়িত নাগরিকগণকে দুর্গন্ধময় উপত্যকার বাহিরে আনিয়া, গিরিব্রজের উত্তরতোরণে নূতন-রাজগৃহ স্থাপন করিলেন। মগধরাজগণ যখন গঙ্গানদীর পরপারে অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, তখন, শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত, পাটলিগ্রামের দুর্গ মগধরাজ্যের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্থান হইয়াছিল। বুদ্ধদেব যখন মগধের নানাস্থানে ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছিলেন, তখন রাজগৃহই মগধের রাজধানী। কিংবদন্তী আছে যে, অজাত-শত্রুর পুত্র উদয়ী বা উদয়িভদ্র, নূতন-রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, পাটলিপুত্রে নূতন-রাজধানী স্থাপন করেন।

বিশ্ববিজয়ী যবনরাজ "সেকেন্দর্‌সা" যখন ঈরাণের প্রাচীন সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন পাটলিপুত্রই আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী। নন্দরাজ নিহত হইলে যখন, চন্দ্রগুপ্ত নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন পাটলিপুত্র, আর্য্যাবর্ত্তের পরিবর্ত্তে, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী হইল। পরাজিত হইয়া—যখন যবনরাজ "সিলি-উকাস" ভারতবর্ষের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া, মগধ-রাজের সভায় দূত প্রেরণ করেন, তখনও পাটলি-

পুত্রই ভারতবর্ষের রাজধানী। এই পাটলিপুত্র দেখিয়াই যবন সম্রাটের প্রতিনিধি বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে ইহার শোভা-সমৃদ্ধির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যখন বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, মহারাজ প্রিয়দর্শী চীবর-ধারণ করিলেন, তখন এই পাটলিপুত্র নগরের পথে পথে সেই নূতন ধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইয়াছিল। সম্রাট্ অশোকের মৃত্যুর পরে, যখন একে একে প্রান্তস্থিত প্রদেশগুলি

ভিথ্না কঁয়াব (গৃধ্রকূট-পর্ব্বতের মৃণ্ময় প্রতিকৃতি)

মৌর্য্য সম্রাট্‌গণের হস্তচ্যুত হইতেছিল, তখনও রাজধানী বলিতে ভারতবাসী পাটলিপুত্রই বুঝিত। সদ্ধর্ম্মের ঘোর দুর্দ্দিনে, যখন বলপ্রদর্শনচ্ছলে পুষ্যমিত্র শেষ মৌর্য্য-সম্রাট্ বৃহদ্রথকে নিহত করিলেন, তখনও এই পাটলিপুত্রই রাজধানী ছিল।

পঞ্চনদ যখন যবনসম্রাটের পদানত, চোল ও পাণ্ড্যবংশীয় রাজগণ যখন দাক্ষিণাত্য পুনরধিকার করেন, তখনও পাটলিপুত্রে শুঙ্গ ও কাণ্ববংশীয় রাজগণ, শূন্যগর্ভ সম্রাট্-উপাধি ধারণ করিয়া, আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেন। ছায়ার ন্যায় ধীরে ধীরে অনার্য্যবংশসম্ভূত অন্ধ্রভৃত্যগণ, যখন আর্য্যাবর্ত্ত অভিমুখে অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন, তখনও এই পাটলিপুত্র রাজধানী নামে পরিচিত। অন্ধ্ররাজগণ যখন মগধ অধিকার করেন, তখন হইতেই পাটলিপুত্রের অবনতি আরম্ভ হয়। উত্তর-কুরুর মরুবাসী লক্ষ লক্ষ শক, যখন আর্য্যাবর্ত্তের সমতলভূমি অধিকার করিয়াছিল, পঞ্চশতবর্ষ পরে, তখন কিছুকালের জন্য, পাটলিপুত্রের গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছিল।

যিনি, ঐকান্তিক চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে উত্তরাপথের পুনরুদ্ধার করিয়া, সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, সুধীগণের অভিমতে, তিনি এই পাটলিপুত্রেরই জনৈক নাগরিক। বিশাল শক সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ লইয়া উত্তরাপথে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যগুলি গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের শকজাতীয় অধিপতিগণকে পরাজিত করিয়া বৈশালীর লিচ্ছবী-রাজ-জামাতার প্রথম চন্দ্রগুপ্ত যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার রাজধানী পাটলিপুত্রেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরী হইতে বিজয়বাহিনী লইয়া মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। এই পাটলিপুত্র নগরেই তাঁহার বিখ্যাত অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের সহিত চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবী পুনরায় পাটলিপুত্রে আসিয়া অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্র আবার সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী হইয়াছিল। প্রতীচ্য-জগৎ যখন ধীরে ধীরে তমসাবৃত হইতেছিল, রোমক-সম্রাট্ যখন হূণের ভয়ে কম্পিত হইতেছিলেন, তখন প্রাচ্য-জগতেও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও স্কন্দগুপ্ত হূণ-প্লাবনে বাধা দিতে সক্ষম হন নাই; কিন্তু সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত যখন হূণরাজের করতলগত, তখনও পাটলি-

পুত্র মগধের রাজধানী—সমুদ্রগুপ্ত বংশধরগণ তখনও, এই পাটলিপুত্রে বসিয়া, শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন। কবে—কোন্ সময়ে অলক্ষিতে লক্ষ্মীদেবী চিরদিনের মত পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করেন, তাহা এখনও ঐতিহাসিকগণের অজ্ঞাত। স্থাণ্বীশ্বরে যখন প্রভাকরবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নূতন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছিলেন, তখন ধীরে ধীরে এই প্রাচীন মহানগরী জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইতেছিল। চীনদেশীয় ভিক্ষু যখন তীর্থোদ্দেশে ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন পাটলিপুত্র ধ্বংসোন্মুখ,—হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য পূর্ব্বদিকে প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় এই মহানগরী অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছিল; তাহার পর আর্য্যাবর্ত্তবাসী পাটলিপুত্রের কথা ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হন। এইরূপে চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের রাজধানী,—সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী, লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়া গেল। হস্তিনাপুর, কোশাম্বী, তক্ষশিলার যে দশা হইয়াছিল, পাটলিপুত্রেরও সেই দশাই ঘটিল,—কালে লোকে ইহার অবস্থান পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গেল। হর্ষবর্দ্ধনের তিরোভাব হইতে মুসলমানবিজয় পর্য্যন্ত, এই সুদীর্ঘ ছয়শতাব্দী কালের, উত্তরাপথে যে সকল খোদিত-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে পাটলিপুত্রের নাম বড় একটা উল্লেখ নাই। ধর্ম্মপালদেব তাঁহার, ৩৩ রাজ্যসংবৎসরে প্রদত্ত, তাম্রশাসনে বলিয়া গিয়াছেন যে, উক্ত তাম্রশাসন পাটলিপুত্র সমবাসিত শ্রীমজ্জয়-স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার পর, পাটলিপুত্রের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

বিনষ্টপ্রায় আফ্‌গান্-বল সংগ্রহ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপ্রান্তে অসীম সৌভাগ্যশালী 'ফরিদ খাঁ' যখন 'সের শাহ' নামে নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তখন জলাভূমি-বেষ্টিত অলঙ্ঘ্য, দুর্জ্জেয় প্রাচীন পাটলিপুত্র-দুর্গের অবস্থান, তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অপভ্রংশ হইয়া, পাটলিপুত্র-পত্তনের নাম তখন পাটনায় পরিণত হইয়াছে। ফরিদুদ্দিন সের শাহের অনুগ্রহে, ও অসীম দূরদর্শিতার ফলে, সহস্রবৎসর পরে প্রাচীন পাটলিপুত্র নগর পুনরায় মগধ—বা বিহারের—রাজধানী হইয়াছিল। মুসলমান বিজয়ের সময়ে উদ্দন্তপুর, বা বর্ত্তমান বিহার, মগধের রাজধানী ছিল; জৌনপুরের মহমুদ শাহ ও বাঙ্গালার

ছোট্-পাহাড়ী (অশোক-নির্ম্মিত বৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ—সম্মুখের দৃশ্য)

হুসেন শাহ যখন বিহার প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, তখনও বিহারে মগধের রাজধানী। সেরশাহের ক্ষণস্থায়ী পাঠান-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলেও মগধের রাজধানী আর পাটনা হইতে স্থানান্তরিত হয় নাই। আকবরের রাজত্বকালে, ভারত-বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ যখন 'সুবা' নামে পরিচিত হয়, তখন এই পাটনা নগরই সুবে-বিহারের রাজধানী ছিল। মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ দশায় বৃদ্ধ সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব্

যখন দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকালব্যাপী মহারাষ্ট্রযুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন এই প্রাচীন নগরের নাম আরএকবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বাদশাহের পৌত্র সুলতান আজিম-উস্-শান্ তখন সুবে-বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা; তাঁহার নাম অনুসারে পাটলিপুত্র বা পাটনার নামানুকরণ হইয়াছিল—'আজিমবাদ'। দীনহীন ভিখারী সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ আলম্ এই আজিমাবাদেরই দুয়ারে দাঁড়াইয়া অন্নভিক্ষা করিয়াছিলেন। এই আজিমাবাদেই নবাব কাসেম্ আলি খাঁর নবাবীর শেষ-অঙ্ক অভিনীত হইয়াছিল। মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী-গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে রামনারায়ণ সিতাবরায় কল্যাণমাল্ প্রভৃতি বাদশাহী কর্ম্মচারিগণ, এই আজিমাবাদ হইতেই সুবে-বিহার শাসন করিতেন। যতদিন রাজস্ব-সংক্রান্ত কাগজপত্র পার্শীভাষায় লিখিত হইত, ততদিন, আজিমাবাদ নামেই পাটনা পরিচিত ছিল। ইহাই পাটলিপুত্রের প্রাচীন-কাহিনী।

ইংরেজ-অধিকারের প্রারম্ভে, অনুসন্ধিৎসু বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনিস্-লিখিত পাটলিপুত্রের বর্ণনা পাঠ করিয়া, তাহার ধ্বংসাবশেষ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখকগণ, পাটলিপুত্রের অবস্থান-নির্ণয় করিতে না পারিয়া, কেহ এলাহাবাদে—কেহবা ভাগলপুরে—ইহার অবস্থান-নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে পরলোকগত স্যর আলেক্‌জাণ্ডার্ কানিংহাম, ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পরলোকগত ডাক্তার উইলিয়াম্ ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল্, ডাক্তার শ্রীযুক্ত এল্. এ. ওয়াডেল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের চেষ্টায় স্থির হয় যে, বর্ত্তমান পাটনা নগরই প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে। কানিংহাম্ ভাবিয়াছিলেন যে, পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে; কিন্তু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ওয়াডেল্ ও ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল্ বহুপরিশ্রম করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও ভূগর্ভে নিহিত আছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ওয়াডেল্ "পাটলিপুত্র আবিষ্কার" নামক ক্ষুদ্র-পুস্তিকায় দেখাইয়াছেন যে, চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিওয়েন্‌থ্‌সং উক্ত প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি সেই অবস্থায় বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রোক্ত পরিব্রাজকবর পাটলিপুত্রের নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

ছোট্-পাহাড়ী (অশোক-নির্ম্মিত বৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ—পশ্চাতের দৃশ্য)

"পাটলিপুত্র নগর গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত; ইহার বেষ্টনের দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ক্রোশ। এখন ইহা জনশূন্য এবং

বড়ি-পাহাড়ী—সজ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ

এই স্থানে প্রাচীরের ভিত্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উত্তরে একটি শিলাস্তম্ভ আছে, এই স্থানে সম্রাট্ অশোক তাঁহার "নরক" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শত শত দেবমন্দির, স্তূপ ও সজ্ঘারামের অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে দুই একটি মাত্র অভগ্ন আছে। প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের উত্তরে গঙ্গাতীরে এখন একটি ক্ষুদ্র নগর আছে, তাহাতে প্রায় সহস্র গৃহ আছে। সম্রাট্ অশোকের নরকের দক্ষিণে একটি স্তূপ আছে, তাহাও সংস্কারাভাবে বিনষ্টপ্রায়। সম্রাট্ অশোকই, এই স্তূপটি নির্ম্মাণ করিয়া, ইহার গর্ভগৃহে ভগবান্ তথাগতের ভস্মাবশেষের কিয়দংশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্তূপের পার্শ্বে, অনতিদূরে, একটি বিহারে একখানি বৃহৎ শিলাখণ্ড রক্ষিত আছে। তথাগত ইহার উপরে চলিয়া বেড়াইতেন [illegible]লিয়া, পাষাণে এখনও তাঁহার পদাঙ্ক দেখিতে পাও[illegible]। পূর্ব্বকালে মহা-পরিনির্ব্বাণলাভের আকাঙ্ক্ষায় [illegible]খন মগধ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে কুশী নগ[illegible]গ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি এই শিলাখ[illegible] দাঁড়াইয়া আনন্দকে কহিয়াছিলেন, "আমি [illegible] মগধে দাঁড়াইয়া এই পাষাণখণ্ডে চরণ-চিহ্ন [illegible]তেছি। শতবর্ষ পরে অশোক নামক এক[illegible]হণ করিবেন; তিনি এই স্থানে, রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া, "ত্রিরত্ন" রক্ষা করিবেন। অশোক এই শিলাখণ্ডের চারিদিকে বেষ্টনী নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক, বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশের চেষ্টায়, যখন এই স্থানে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি এই শিলা-খণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু ভাঙ্গিবামাত্র ইহা অলৌকিক শক্তিবলে পুনরায় জুড়িয়া গিয়াছিল। বারংবার অকৃতকার্য্য হইয়া শশাঙ্ক অবশেষে ইহাকে ভাগীরথীর জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরদিন ইহাকে পুনরায় যথাস্থানে দেখা গিয়াছিল। এই শিলাখণ্ডের পার্শ্বে একটি স্তূপ আছে।—এই স্থানে গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন ভিক্ষু উপবেশন করিতেন। যে বিহারে শিলাখণ্ড রক্ষিত আছে, তাহার অনতিদূরে খোদিত-লিপিযুক্ত একটি শিলাস্তম্ভ আছে; তাহাতে লিখিত আছে যে "সম্রাট্ অশোক তিনবার জম্বুদ্বীপ রত্নত্রয়ে অর্পণ করিয়াছিলেন।" প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের উত্তরে একটি পাষাণ-নির্ম্মিত প্রাসাদ আছে, দূর হইতে ইহাকে পর্ব্বত বলিয়া অনুমান হয়। সম্রাট্ অশোকের ভ্রাতা 'মহেন্দ্র', প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া, পাটলিপুত্র নগর পরিত্যাগ করিয়া, রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অশোক তাঁহাকে রাজধানীতে পুনরানয়ন করিবার জন্য, একটি কৃত্রিম-শৈল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; মহেন্দ্র এই কৃত্রিম-শৈলের উপরে বাস করিতেন। প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের উত্তরে, এবং এই পর্ব্বতের দক্ষিণে,

একটি বৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্র আছে; সম্রাট্ অশোক এই পাত্রে নিত্যনিমন্ত্রিত ভিক্ষুগণকে আহার্য্য প্রদান করিতেন। প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, তাহার উপরে অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়; সম্রাট্ অশোক, উপগুপ্ত ও অন্যান্য আর্হৎগণের বাসের জন্য সেগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমে পাঁচটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে, দূর হইতে এইগুলিকে পর্ব্বত বলিয়া ভ্রম হয়; এগুলিতেও তথাগতের শরীরাংশ রক্ষিত হইয়াছিল। মতানুসারে ইহাই প্রাচীন মহেন্দ্র-পর্ব্বত। এই মৃৎস্তূপের উপরিভাগে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃধ্রকূট-পর্ব্বতের একটি প্রতিকৃতি আছে। এই প্রতিকৃতিটি পূর্ব্বে মৃৎস্তূপের সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিছু দিন পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক ঐ স্থানে গৃহনির্ম্মাণ করায় উহা এক্ষণে স্থানান্তরিত হইয়াছে। নাগরিকগণ এখনও দুগ্ধ, তণ্ডুল, পুষ্প ও কৌষেয়-সূত্র দ্বারা এই মৃণ্ময়ী প্রতিকৃতির উপাসনা করিয়া থাকে। পাটনা নগরের এই অংশের নাম ভিখ্না কুঁয়াব (অর্থাৎ ভিক্ষু রাজকুমার)।

ছোট্-পাহাড়ীর নিকটস্থ মৃত্তিক্‌ স্তূপ—মন্দিরে, শিলাগাত্রে চরণ-চিহ্ন, ও শিবলিঙ্গ স্থাপিত

প্রাচীন নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে সম্রাট্ অশোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত কুক্কুট-সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ আছে। এখন ইহার ভিত্তি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্ঘারামের পার্শ্বে আমলক-স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে।”

চীনদেশীয় ভিক্ষু-বর্ণিত ধ্বংসাবশেষ-সমূহের মধ্যে ডাক্তার ওয়াডেল্ নিম্নলিখিত কয়টি স্থান আবিষ্কার করিয়াছিলেন ;—

(১) **মহেন্দ্র বা মহেন্দ্র-পর্ব্বত**—পাটনা নগরের মধ্যে একটি উচ্চ মৃৎস্তূপের উপরে নির্ম্মিত; নগরাংশের বর্ত্তমান নাম মহেন্দ্রু। ডাক্তার ওয়াডেলের

(২) **প্রাচীন রাজ-প্রাসাদ**—ইহা বর্ত্তমান গুল্‌জারবাগ রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে অবস্থিত। ইহার উপরে জনৈক মুসলমানের ইষ্টকনির্ম্মিত সমাধি আছে।

(৩) **বুদ্ধের ভস্মাবশেষের উপর নির্ম্মিত স্তূপ**—ইহা কুমরাহার গ্রামের নিকটে অবস্থিত; ডাক্তার ওয়াডেল্ ইহার কিয়দংশ খনন করিয়াছিলেন।

(৪) **অশোক-নির্ম্মিত পাঁচটী স্তূপ**—ইহার বর্ত্তমান নাম পাঁচ-পাহাড়ী। সম্রাট্ আকবর, বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে, পাটনা অবরোধকালে, এই পাঁচ-পাহাড়ীর উপরে উঠিয়া

অবরুদ্ধ দুর্গ দর্শন করিয়াছিলেন। তবকাৎ-ই-আক্‌বরী-প্রণেতা বক্‌শী নিজাম্ উদ্দীন্ এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "সম্রাট্ আকবর, হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়া, দুর্গ ও নগরোপকণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি পঞ্জ-পাহাড়ীর উপরে উঠিয়াছিলেন। এই পঞ্জ-পাহাড়ীতে পাঁচটি গম্বুজ আছে, এবং পূর্ব্বকালে কাফেরগণ ইহা ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল।" ডাক্তার ওয়াডেল্ এই স্থানও খনন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ কিছু ফললাভ করিতে পারেন নাই।

বিগত শতবর্ষের মধ্যে পাটনায় বহু প্রাচীন-মূর্ত্তি ও প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ক্রিণ্ডেল্ পাটনার দুইএক স্থান খনন করিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত নগর-প্রাকারের অবশেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাঁকিপুর হইতে সাত মাইল দূরে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভূপৃষ্ঠের ১২ হইতে ১৫ ফুট নিম্নে, সোম-মিঠীয়াগড়ী নগরাংশে একটি দীর্ঘ ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই প্রাচীরের সম্মুখে, এবং ইহা হইতে অনতিদূরে সমান্তরালে স্থাপিত, একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বেষ্টনীও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাটনাবাসিগণ কূপ বা দীর্ঘিকা খননকালে নানাবিধ প্রাচীন-মূর্ত্তি, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রাকারের অংশ, প্রভৃতি পাইয়া থাকেন। ডাক্তার ওয়াডেলের চেষ্টায় ইহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে। ডাক্তার

পাঁচ-পাহাড়ী—অশোক-নির্ম্মিত পাঁচটি শরীরগর্ভ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ

ডাক্তার টাইট্‌লার দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত যক্ষমূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। তিনি ইহা এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রদান করিয়াছিলেন এবং এখন এই মূর্ত্তিদ্বয় কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ ডাক্তার মার্শাল, মূর্ত্তিদ্বয়ের গঠন-প্রণালী দেখিয়া, অনুমান করেন যে, উহা খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু এই মূর্ত্তিদ্বয়ের পৃষ্ঠস্থিত খোদিত লিপিদ্বয় হইতে, বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ব্লক্ প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, মূর্ত্তিদ্বয় খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার ম্যাক্ ওয়াডেল্ স্বয়ং খননকালে একটি সুন্দর, গ্রীসদেশীয় স্তম্ভশীর্ষের অনুকরণে খোদিত, স্তম্ভশীর্ষ পাইয়াছিলেন; তাহা এক্ষণে পাটনা-বিভাগের কমিসনারের গৃহে রক্ষিত আছে। কলিকাতা মিউজিয়মে পাটনার ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত যে সমস্ত নিদর্শন রক্ষিত আছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বেষ্টনীর অংশ বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য।

বহুদিনযাবৎ পাটলিপুত্র খনিত হয় নাই। ডাক্তার ওয়াডেল্, খননে অর্থব্যয়ের অনুরূপ, ফললাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই, গভর্মেণ্ট পাটলিপুত্রের খননে অর্থব্যয় করিতে

কুণ্ঠিত হইতেছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের দানবীর শ্রীযুক্ত রতন টাটা পাটলিপুত্র ও তক্ষশিলা খননের ব্যয়ভার-বহনে স্বীকৃত হওয়ায়, এই দুইস্থানে খনন কার্য্য আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ সঙ্ঘারামদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে সমস্ত যবন-শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব।

প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ ডাক্তার জে. এইচ্. মার্শালের নির্দ্দেশানুসারে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের

মৌর্য্য সম্রাট্গণের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—খননে প্রাপ্ত স্তম্ভশ্রেণীর ভগ্নাবশেষ—(পার্সিপলিসের দরায়ুসনির্ম্মিত বিখ্যাত প্রাসাদের অনুকৃত)

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ডি. বি. স্পুনার ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে পাটলিপুত্র-খননে প্রবৃত্ত হন। ডাক্তার স্পুনার মার্কীণবাসী, তিনি কালিফোর্ণীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ-উপাধিধারী; এতদ্ব্যতীত তিনি জর্ম্মাণীর গটিন্জেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ও টোকিয়োর বিশ্ববিদ্যালয়ে পালী ও সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম্ম, ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে খনন করিয়া নানা স্থানে অত্যদ্ভুত আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে ও অধ্যবসায়ে কএক বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশাওর) নগরের নির্দ্দেশে সম্রাট্ কনিষ্ক-নির্ম্মিত বৃহৎ স্তূপমধ্যহইতে বুদ্ধের শরীরাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কএক বৎসর পূর্ব্বে, তিনি শহর-ই-বহলোল ও তজ-ই-বাহাই নামক বৌদ্ধ দক্ষিণদিকে কুমারাহার গ্রামে এবং উত্তরদিকে বুলন্দীবাগ নামক স্থানে খনন আরম্ভ হয়। এই বুলন্দীবাগেই ডাক্তার ওয়াডেল গ্রীসাঙ্কৃত স্তম্ভশীর্ষটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনিই কুমারাহারে খনিত স্থানটিকে প্রাচীন রাজ-প্রাসাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবং খননকালে অশোকের শিলাস্তম্ভের অনুরূপ একটি স্তম্ভের কএকখণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কুমারাহারে সম্রাট্ অশোককর্তৃক খোদিত লিপিযুক্ত শিলাস্তম্ভ পাওয়া যায় কিনা, তাহাই দেখিবার জন্য খনন আরম্ভ হইয়াছিল। গত বৎসর ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এইস্থানে তিনটি শিলাস্তম্ভের ভগ্নাবশেষের স্তূপ আবিষ্কৃত হয়। ডাক্তার স্পুনার মাপ করিয়া দেখেন যে, এই তিনটি স্তূপ পরস্পরের সমান্তরালে এবং সরল রেখায় স্থাপিত। ইহা হইতে তিনি বুঝিতে পারেন যে,

এই স্থানের চতুষ্পার্শ্বে সমান দূরে হয় একটি স্তম্ভ, না হয় এক একটি ভগ্নাংশের স্তূপ পাওয়া যাইবে। এই স্থানের সমদূরবর্ত্তী স্থানসমূহ খনন করিয়া তিনি বহু শিলাস্তম্ভের ভগ্নাবশেষের স্তূপ আবিষ্কার করেন। এই সকল আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়া তিনি স্থির করেন যে, এই স্থানে একটি বৃহৎ স্তম্ভসমন্বিত গৃহ ছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের খননে আটটি স্তম্ভযুক্ত দশটি শ্রেণী, অর্থাৎ মোট আশীটি স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খনিত স্থানের চতুর্দ্দিকে মনুষ্যের আবাস এবং আম্র ও তালবৃক্ষ। এই সকল স্থান ক্রয় না করিলে খনন করা অসম্ভব; তবে খনিত স্থান দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই স্তম্ভশ্রেণী-সমন্বিত বিশাল গৃহের ধ্বংসাবশেষ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের নিম্নে লুক্কায়িত আছে। এই বিশাল গৃহের গৃহতল ভূপৃষ্ঠের ১৮ফুট নিম্নে অবস্থিত ছিল। স্তম্ভসমূহের ভগ্নাংশগুলি কিন্তু গৃহতলের ৮ হইতে ১০ফুট উচ্চে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্তম্ভের ভগ্নাংশগুলি সাধারণতঃ ভস্মের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই ভস্মরেখা ও গৃহতলের রেখার মধ্যে পলিমাটী ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। তবে যে যে স্থানে স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ আছে, সেই সেই স্থানে এক একটি ভস্মের স্তম্ভ গৃহতলের রেখা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ডাক্তার স্পুনার অনুমান করেন যে, মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সমসাময়িক এই গৃহ, খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জলপ্লাবনে হীনবল হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে গৃহতলের উপরে নয় ফুটের অধিক পলিমাটী জমিয়াছিল। গৃহতলটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল বলিয়াই অনুমান হয়, এবং কালে উহা ক্ষয় হইয়া লোপ পাইয়াছে। এই স্থানের ভূমি অত্যন্ত কোমল এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহতল নষ্ট হইলে, স্তম্ভগুলি ক্রমশঃ কোমল মৃত্তিকায় বসিয়া গিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বেই গৃহের কাষ্ঠনির্ম্মিত ছাদ অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া যায়। এই অগ্নিদাহে পলিমাটির স্তরের উপরে ভস্মের একটি স্তর পড়িয়াছিল এবং স্তম্ভসমূহের যে অংশগুলি পলিমাটির বাহিরে ছিল, তাহাও দারুণ উত্তাপে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। স্তম্ভসমূহের উপরে তাম্রকীলকে স্তম্ভশীর্ষগুলি সংলগ্ন ছিল, উত্তাপে কীলকগুলি আকারে বর্দ্ধিত হওয়ায়, স্তম্ভশীর্ষ ও স্তম্ভগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্তম্ভগুলি যখন কোমল মৃত্তিকায় বসিয়া যাইতে লাগিল, তখন কোমল মৃত্তিকায় ইহারা অধোগমনকালে যে গোলাকার কূপ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ভস্ম ও ভগ্নাবশিষ্টে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একটি ব্যতীত অপর সমস্ত স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে ডাক্তার স্পুনার এই গৃহের মানচিত্র প্রস্তুত
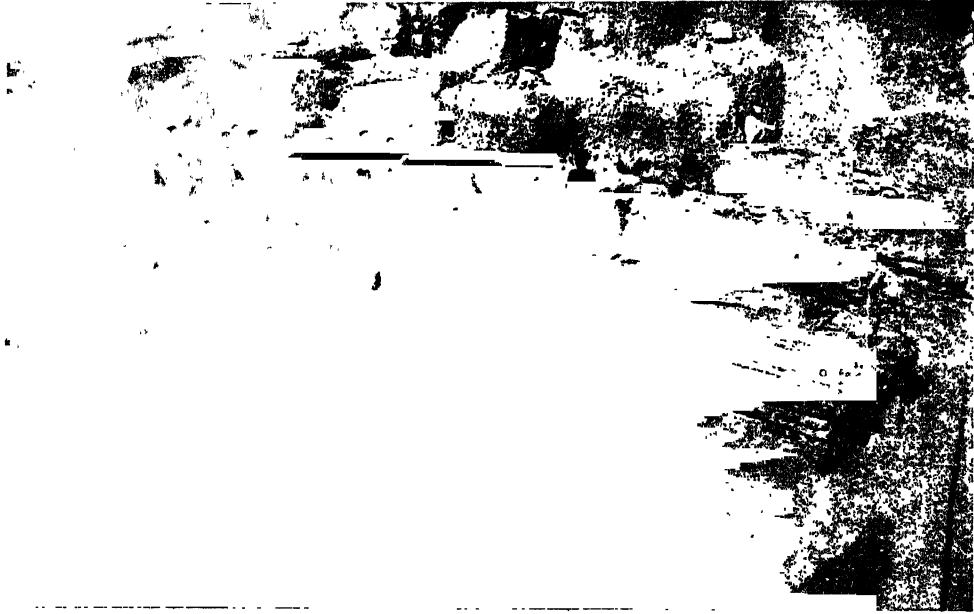
মৌর্য্য-সম্রাট্‌গণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ—খননে প্রাপ্ত দারুময়-মঞ্চ

করিয়াছেন। এই চিত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৌর্য্যাধিকার কালের স্তম্ভশ্রেণী-সমন্বিত এই বিশাল গৃহের অনুরূপ কোন গৃহই অদ্যাবধি ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা দেখিলে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই মনে হয় যে, এই গৃহটি পারস্যের প্রাচীন রাজধানী পর্সিপলিস্ নগরের সম্রাট্ 'ডরাউস্'-নির্ম্মিত শতস্তম্ভ-সমন্বিত বিশাল গৃহের অনুরূপ। ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, ভারতের প্রস্তর-শিল্প প্রাচীন পারস্যের প্রস্তর-শিল্পের নিকট যতটুকু ঋণী বলিয়া অদ্যাবধি অনুমিত হইয়াছে, ঋণ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। যে একটি স্তম্ভ ভূগর্ভে বসিয়া যায় নাই, তাহার নিম্নে প্রস্তরশিল্পীদিগের কএকটি চিহ্ন আছে। প্রাচীনকালে শিল্পিগণ পাষাণের গৃহনির্ম্মাণকালে ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি এইভাবে চিহ্নিত করিতেন। যেরূপ চিহ্ন পাটলিপুত্রের নবাবিষ্কৃত স্তম্ভে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইরূপ চিহ্ন ডরাউসের প্রাসাদের স্তম্ভেও পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এই প্রাসাদ-নির্ম্মাণকালে মৌর্য্যসম্রাট্গণ ঈরাণ হইতে প্রস্তর-শিল্পী আনয়ন করিয়াছিলেন।

এই গৃহের দক্ষিণপার্শ্বে সাতটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মঞ্চ খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মঞ্চগুলি ত্রিশফুট দীর্ঘ, ছয় ফুট প্রস্থ এবং সাড়ে চারি ফুট উচ্চ। এইগুলি অসমান্তরালে এক শ্রেণীতে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিন্যস্ত। ইহার মধ্যে পাঁচটি পাষাণ-স্তম্ভসমূহের অবস্থিতি স্থানের সমরেখায় অবস্থিত। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এই মঞ্চগুলি স্তম্ভশ্রেণীর ভিত্তিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডাক্তার স্পুনার বলেন যে, এই অনুমানের বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রমাণ আছে। বর্ত্তমান বর্ষে, এইস্থান পুনরায় খনন হইতেছে এবং নূতন আবিষ্কার না হইলে কাষ্ঠমঞ্চের রহস্য বোধগম্য হইবে না। মঞ্চগুলি আবিষ্কৃত হইলে জনরব হয় যে, ঐগুলি মৌর্য্যসম্রাট্গণের ধনাগারের আধার, কিন্তু একটি মঞ্চ ভাঙ্গিয়া দেখা হয় এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐগুলি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মঞ্চ, আধার নহে,—কারণ উহা শূন্যগর্ভ নহে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক পরিচয়

সচিত্র তীর্থভ্রমণ কাহিনী (প্রথম ভাগ)

(মূল্য এক টাকা চারি আনা)

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত। এই ভাগে কালীঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদ্যনাথ, গয়া, সীতাকুণ্ড, কাশী, সারনাথ, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থান এবং বর্দ্ধমান, দিল্লী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের পথঘাটের কথা বলিয়াই লেখক নিরস্ত হন নাই, তীর্থের মাহাত্ম্য, কোন্ তীর্থে কি কি কার্য্য করিতে হয় এবং তাহা কি প্রকার সুলভে করা যাইতে পারে, সে সমস্ত কথাই বলিয়াছেন; এমন কি তীর্থযাত্রীকে বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় কি কি দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে, তাহারও তিনি একটা ফর্দ্দ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধর মহাশয় নিজে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। রেলপথের সুবিধা হওয়ায় এখন অনেকেই তীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন; এই পুস্তকখানি তাঁহাদিগের 'সেথুয়ার' কাজ করিবে। পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য ধর-মহাশয় যত্নচেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই। আরও একটি কথা; এই তীর্থভ্রমণ-কাহিনীতে অকারণ বর্ণনার বাহুল্য নাই, যাহা প্রয়োজন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে; কোন দৃশ্য দেখিয়া ধর-মহাশয়ের মনে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই, তাহা তাঁহার উদ্দেশ্যও নহে। এই ভ্রমণকাহিনীখানি বেশ হইয়াছে; ছবিগুলিও সুন্দর।

সচিত্র আরব ইতিবৃত্ত

(মূল্য দুই টাকা)

হাফিজল হাসান প্রণীত। আমরা সর্ব্বপ্রথমেই হাফিজ সাহেবকে অভিনন্দন করিতেছি। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এই সুন্দর ইতিবৃত্ত-

খানি লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। পুস্তকখানি অতি সহজ সরল ভাষায় লিখিত এবং গ্রন্থকার মহাশয় এই গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যত্ন চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ক্রটী করেন নাই। ইহাতে অতি আদিম সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আরব দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আরব দেশ সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য কোন কথাই বোধ হয় এ পুস্তকে বাদ পড়ে নাই। শ্রীযুক্ত হাফিজল হাসান মহোদয়ের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য শিক্ষিত মুসলমান মহোদয়গণ যদি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষেই ভাল কাজ করা হয়। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আরব ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিলাম। আরব-তীর্থযাত্রীদিগের নিকট এ পুস্তকখানি অমূল্য। হাসান সাহেব আরব দেশের প্রধান প্রধান ধর্ম্মালয় সমূহের চিত্র এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং পথঘাটের কথাও বলিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাস পড়িবার জন্য যাঁহাদের আগ্রহ আছে, মহামান্য হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। পুস্তকখানির ভাষা সুন্দর, ছাপা উৎকৃষ্ট, কাগজ ও বাঁধাই ভাল; তাহার পর ইহাতে অতি সুন্দর ৬৩ খানি ছবি আছে।

আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব

(প্রথম খণ্ড—মূল্য দেড় টাকা)

শ্রীবসন্তকুমার সেন কাব্যভূষণ প্রণীত। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ, এলাপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি মতে শারীর-তত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, রোগ নির্ব্বাচণ, চিকিৎসা-তত্ত্ব ও ভৈষজ্য-তত্ত্ব অর্থাৎ ঔষধ প্রস্তুত ও লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বিশেষ লাভবান হইবেন বলিয়া মনে হয়। পুস্তকখানি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অজন্তা

(মূল্য এক টাকা)

শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রণীত। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই মহোদয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হালদার মহাশয় অজন্তা গিরিগুহা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। দশ জনে যেমন দেখিতে যান, তেমন ভাবে তিনি যান নাই; তিনি দুই বৎসর, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ঐ স্থানে যাইয়া, বহু কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া, অজন্তা-গুহার চিত্রাবলি চিত্রিত করিয়া আনিয়াছিলেন; এক্ষণে সেইগুলি বিবরণসহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বেশ মনোরম; তবে তাঁহার ভাষাটা অনেকের পসন্দ হইবে না। সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াও আপাততঃ কোন লাভ নাই। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর; চিত্রগুলিও ভাল হইয়াছে। গ্রন্থকার অজন্তা গুহা সম্বন্ধে 'ভারতী' পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন।

আরতি

(মূল্য চারি আনা)

মহাম্মদ আমিনউল্লা প্রণীত। এখানি কবিতা পুস্তক। সাধারণতঃ আজ কালকার কবিতা পুস্তকে যে সকল মামুলী প্রেম, বিরহ প্রভৃতি থাকে, এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহা নাই; ইহাই প্রথম সুখের কথা। দ্বিতীয় সুখের কথা এই যে, একজন শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোক বঙ্গভাষার সেবা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তৃতীয় সুখের কথা এই যে, এই ক্ষুদ্র সংগ্রহে যে কএকটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। কবিতা যে সকলগুলিই ভাল হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না; তবে লেখকের হৃদয় আছে—তিনি যে ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি, একথা তাঁহার এই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

আমোদ।

(মূল্য বার আনা)

শ্রীরসময় লাহা প্রণীত। শ্রীযুক্ত রসময়বাবুর কবিতা পাঠ করিয়া আমরা অনেক সময়েই আমোদ উপভোগ করিয়া থাকি; ভারতবর্ষের পাঠকগণের নিকটও রসময়বাবুর রসময়ী কবিতা অজ্ঞাত নহে। তিনি তাঁহার কবিতার কএকটি সংগ্রহ করিয়া, স্থায়ী আমোদ প্রদানের জন্য, এই 'আমোদ' প্রকাশিত করিয়াছেন; 'আমোদ' পাঠ করিয়া সকলেই আমোদ পাইবেন। আমরা 'আমোদ' হইতে একটি কবিতার সামান্য এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; ইহা হইতেই পাঠকগণ 'আমোদের' রকমটা বুঝিতে পারিবেন—

"কইছ তুমি, সহজ কথা সরস,
ভাব্‌ছে লোকে রহস্যময় ঠাট্টা;
যখন তুমি দিচ্ছ ঢেলে—পায়স,
ভাব্‌ছে বুঝি পেলেম্ এবার থাট্টা।"

সেবা

(মূল্য এক টাকা)

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, বরিশাল-শাখা-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বরিশাল-শাখার প্রথমবর্ষের মাসিক অধিবেশন সমূহে যে সমস্ত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কএকটি সংগ্রহ করিয়া এই 'সেবা' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কএকটি ইতঃপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও

সুলিখিত। ইহাতে যে সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া লেখকগণকে ধন্যবাদ করিতে হয়। কঠোর দার্শনিক তত্ত্ব সকল, তাঁহারা যথাসম্ভব সরল ভাষায়, ও সাধারণের বোধগম্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অনুপ্রাস

(মূল্য আট আনা)

এই বইখানি যখন পড়িয়া শেষ করিলাম, তখন অনুপ্রাসের অফুরন্ত আমদানি দেখিয়া এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, বইখানির সমালোচনাও অনুপ্রাসেই করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। কিন্তু বইখানির টাইটেল পেজেই দেখিলাম গোড়ায় গলদ্; দুই তিনটি স্থান ছাড়া আর কোথাও অনুসন্ধান করিয়া অনুপ্রাসের 'অণু' পর্য্যন্ত দেখিলাম না। এই দেখুন না—'বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম.এ-কর্ত্তৃক প্রণীত ; দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মেছুয়াবাজার স্বর্ণপ্রেসে মুদ্রিত।' ইহার মধ্যে অনুপ্রাস আর কয়টা? এক অনুপ্রাস আছে 'এম. এ'তে আর কোন রকমে আছে বন্দ্যোপাধ্যায়-বিদ্যারত্নে ; আর প্রণেতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কি না,—তাই দক্ষিণার দিকে দারুণ দৃষ্টি; সেই জন্য দক্ষিণায় অনুপ্রাস ছাড়িতে পারেন নাই, যথা—আট আনা। এহেন, অনন্য-প্রাসিক নাম ও উপাধিধারী লেখকমহাশয়ের, পুস্তক অনুপ্রাসে সমালোচিত হইতেই পারে না ; তাই সে পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রচলিত পথেরই পথিক হইতে হইল।

অধ্যাপক – না, না—প্রোফেসার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে একজন বহুদর্শী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, বিশেষজ্ঞ (আর অনুপ্রাস খুজিয়া পাইলাম না) ব্যক্তি, তাহা আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না ; তাঁহার অনন্য সাধারণ ক্ষমতা এই যে, তিনি নীরস বিষয়ের মধ্যেও রসসঞ্চার করিতে পারেন। তাঁহার 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'তেও কেহ ভয় পান নাই 'বানান-সমস্যা'ও তিনি চিনির রসে ডুবাইয়া দিয়াছেন; আর 'ফোয়ারা'ত একেবারে ফোয়ারা।—সুতরাং অনুপ্রাসের আসরে তিনি যে কতকগুলি কটমট কঠোর দ্রব্য উপস্থিত করিতে পারেন না ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। অথচ তিনি হাসিতে হাসিতে, হাসাইতে হাসাইতে তামাসা করিতে করিতে, যাহা পরিবেষণ করিয়া গেলেন, তাহা পরম উপাদেয়, অতীব সুস্বাদু। যাঁহারা আলোচনা করিবেন, তাঁহারা এই অনুপ্রাসের মধ্যে অনেক মালমসলা সংগৃহীত দেখিতে পাইবেন আমরা মাসিকপত্রাদিতে ও সভাসমিতিতে যখন ললিতকুমার বাবুর অনুপ্রাস সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলি পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি, তখন কেবল পুলকিতই হইয়াছি, এবং ললিতবাবুর রসিকতার প্রশংসা করিয়াছি। এখন দেখিতেছি, রসরসিক লেখক এই অনুপ্রাস লিখিয়া সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আর, কি সুন্দর সংগ্রহ! কোথাও কষ্টকল্পনা নাই, কোন স্থানে কথা যোগাইবার জন্য প্রয়াসের চিহ্নমাত্র নাই। ইহা কি কম বাহাদুরী! তিনি সত্য বলিয়াছেন, "কটুকষায়স্বাদ ভাষাতত্ত্বের কথা একটু মিষ্টরসে পাক করিয়া বাজারে বাহির করিয়াছি।" 'একটু মিষ্টরসে' নহে, প্রচুর মিষ্টরসে আগাগোড়া পাক করা হইয়াছে। রন্ধনকারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাকের তারিফ করিতেই হইবে। অনুপ্রাসের সম্বন্ধে যত কথা বলা যাইতে পারে, ললিতবাবু তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই, বলিয়া মনে হয়। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল-প্রচার দেখিতে চাই।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-প্রণীত "সতী জয়মতী" যন্ত্রস্থ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য-বিদ্যাবিনোদ, এম-এ, মহোদয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পূর্ণবাবুর "বিক্রমাদিত্য"ও অচিরে প্রকাশিত হইবে।

"বীরভূমি" সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি-এ, এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ,র উদ্যোগে এই বৈশাখ মাস হইতে "বীরভূমি অনুসন্ধান-সমিতির" কার্য্যালয় হইতে "পল্লীবন্ধু" নামক একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কথা।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয়ের নূতন কবিতা পুস্তক "উর্ম্মিকা" সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু, বঙ্গদেশের খ্যাতনামা জমীদার-বংশের ইতিহাস ও জীবনী সম্বলিত "ভারত গৌরব" নামক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছেন। ইহার প্রথম খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর সম্পাদিত "কেশব-জননী সাধ্বী সারদাদেবীর আত্মকথা" নামক পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ;—সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি, নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য কএক বৎসর যাবৎ চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত কার্য্যটী অসম্পন্ন রহিয়াছে। সম্প্রতি নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, মুখার্জ্জি মহোদয় কৃত্তিবাস-সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করায়, সমিতি নূতন উদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত সচিত্র তীর্থভ্রমণ-কাহিনী—৪র্থ ভাগ, প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৷৹ পাঁচসিকা।

বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুরের নূতন ইতিহাসমূলক নাটক "কমলাকান্ত" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১্ টাকা।

আনিয়াছ.
...ির "পঞ্চদশী" নামক আর একখানি আধ্যাত্মিক
করিয়াছেন। তাঁহ.
...ত হইয়াছে; মূল্য ১্ টাকা।
ভাষাটা অনেকের পসন্দ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের 'সাবিত্রীসত্যবান'—৪র্থ সংস্করণ, 'শৈব্যা' তৃতীয় সংস্করণ ও কুললক্ষ্মী—পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের 'সীতাদেবীর' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল;—মূল্য ১্ টাকা।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়-প্রণীত "পর্ণপুট" প্রকাশিত হইল;—মূল্য ১্ টাকা।

বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী-প্রণীত 'সীতানির্ব্বাসন' নাটক প্রকাশিত হইল—মূল্য ১্ টাকা।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র-প্রণীত নূতন কবিতা পুস্তক 'ধূলিকণা' প্রকাশিত হইল;—মূল্য ১্ টাকা।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত নূতন নাটক 'নিয়তি' যন্ত্রস্থ এবং মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে।

"আলোচনা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সচিত্র আট খানি উপন্যাস একত্রে গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার-প্রণীত বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস—"সারস্বত কুঞ্জ" ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে;—ইহার সাধারণ সংস্করণ আট আনা, রাজ-সংস্করণ এক টাকা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম,-এ, মহোদয়ের "ব্যাকরণ-বিভীষিকা"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বহু নূতন উদাহরণ এবং দুইটী নূতন পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মন্ত্রশক্তি-রচয়িত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "বাগ্‌দত্তা" উপন্যাস, (যাহা ১৩১৯ ও ১৩২০ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়াছিল), সম্প্রতি যন্ত্রস্থ, এবং শীঘ্রই স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে।

মাসপঞ্জী

(ফাল্গুন)

১লা—বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ীর মৃত্যু হয়।—

„—পূর্ব্ব-বাঙ্গালা 'সারস্বত সমাজের' বাৎসরিক অধিবেশন হয়। মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর সভাপতি ছিলেন।

„—লাহোর মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করেন।

„—ফ্রান্সের 'ক্রিমিনাল্ আইডেন্‌টিফিকেসন্ ডিপার্টমেণ্টে'র ডাই-রেক্টার মিঃ বার্টিলোঁর মৃত্যু হয়।

„—এডমিরাল স্যর জর্জ্জ কিংহল পেন্‌সন্ গ্রহণ করিয়াছেন, সংবাদ পাওয়া গেল।

৩রা—পাবনা জেলার 'কো-অপারেটিভ্ কন্‌ফারেন্‌সে'র অধিবেশন হয়। মাননীয় শ্রীআশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি ছিলেন।

„—মেহেরপুরে এক 'শিল্প ও কৃষি-প্রদর্শনী' খোলা হয়।

৪ঠা—মেলবোর্ণের কশাইগণ ধর্ম্মঘট করে।

৫ই—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কন্‌ভোকেসন্' হয়। লর্ড উইলিংডন্ সভাপতি ছিলেন।

„—মিঃ সি, এইচ্, রবার্টস্ 'অণ্ডার-সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্‌স্ ফর্ ইণ্ডিয়া' নিযুক্ত হইয়াছেন সংবাদ পাওয়া গেল।

৬ই—সরকার বাহাদুর লুধিয়ানার "নুর আফ্‌গান" পত্রের নিকট হইতে ১৫০০৲ জামিন চাহেন।

৭ই—লাহোরের 'জমীদার' কাগজ পুনরায় প্রকাশিত হয়। উহার মালিক, সরকার বাহাদুরকে, ২০০০৲ জামিন দিতে বাধ্য হ'ন।

„—আগ্রা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রীগণ ধর্ম্মঘট করে।

„—ত্রিবাঙ্কুর পপুলার এসেম্ব্লীর ১০ম অধিবেশন আরম্ভ হয়।

„—বাঙ্গেটীয়ার 'কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী' খোলা হয়।

„—বিখ্যাত লেখক আর, এল, ষ্টিভেন্‌সনের বিধবা-পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন।

৮ই—মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান মিঃ ভি. পি. মাধবরাও বরোদার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন, সংবাদ পাওয়া গেল।

„—বরোদায় এক 'কো অপারেটিভ্ কন্‌ফারেন্‌সে'র অধিবেশন হয়।

৯ই—রেঙ্গুনের রিক্সাওয়ালারা ধর্ম্মঘট করে।

„—ইউ, পির ছোটলাট বাহাদুর আলিগড়ে এক কৃষি-শিল্পপ্রদর্শনী খোলেন।

„—মদনপল্লীতে নর্থআর্কট জেলা কন্‌ফারেন্‌সের অধিবেশন হয়; মাননীয় রামানুজ চারীয়ার সভাপতি ছিলেন।

„—কলিকাতায় সংস্কৃত পরীক্ষা-বোর্ডের কন্‌ভোকেশন্ হয়। মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর সভাপতি ছিলেন।

„—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম, মধ্যম, ও শেষ আইন পরীক্ষার ফল বাহির হয়।

১০ই—পাবনায় উত্তর-বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়।

„—প্রিন্স উইড্, আলবেনীয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

„—লর্ড উই-মবোর্ণের মৃত্যু হয়।

„—কাসিমবাজারের রাণী অন্নাকালী দেবীর মৃত্যু হয়।

„—বিখ্যাত বারিষ্টার ডাঃ এ. এস্ গৌরের মৃত্যু হয়।

১১ই—আগ্রা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রীগণের ধর্ম্মঘট ভঙ্গ হয়।

„—উৎমালখেল্ ও বনেরওয়াল্‌দিগকে শাস্তি দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের দেশে ফৌজ পাঠান; তাহারা আপাততঃ শান্ত হইয়াছে।

„—শ্রীরামপুরে এক 'শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী' খোলা হয়।

„—রায়পুরের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ জে. এন্. সরকারের মৃত্যু হয়

১২ই—শ্রীরামপুরের ধনকুবের লালমোহন সাহার মৃত্যু হয়।

„—কলিকাতায় 'স্কুল অফ্ ট্রপিকেল মেডিসিনে'র ভিত্তিস্থাপন হয়।

১৩ই—বোম্বাই চেম্বার অফ কমার্সের বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

১৪ই—রেঙ্গুন-বর্ম্মা চেম্বার অফ কমার্সের বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

„—বিখ্যাত আর্টিষ্ট্, স্যর্ জন্ টেনীয়ালের মৃত্যু হয়।

১৫ই—কলিকাতা বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্সের বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

„—চীনের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী চাওপিংযুনের মৃত্যু হয়।

১৬ই—তুরস্কের বিখ্যাত বিমানচারী ফতীবের মৃত্যু হয়; ইহা তুরস্কের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

১৭ই—ভূতপূর্ব্ব ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো বাহাদুর ইহলোক ত্যাগ করেন

„—কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর শ্যামলচন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যু হয়।

„—ক্যানাডার অন্যতম মন্ত্রী মিঃ চার্লস্ ডেভ্‌লিনের মৃত্যু হয়।

১৮ই—সৈয়দ্ পাশার মৃত্যু হয়।

„—গুজরাট ব্যাঙ্ক্ ফেল হয়।

„—লাহোর মেডিকেল কলেজের যে সকল ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছি তাহারা পুনরায় কলেজে প্রবেশ করে।

„—বোম্বে চেম্বার অব কমার্সের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ এ. কুম্ মৃত্যু হয়।

১৯এ—নাগপুরের বিখ্যাত উকীল রাও বাহাদুর বাপুরাও দাদা কিনৃথ মৃত্যু হয়।

„—মিঃ জগ্রাফস্, ইপাইরসের, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

„—দিল্লীতে করদ-রাজগণের এক কন্‌ফারেন্স বসে।

„—যোধপুরে জৈন সাহিত্যিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়; মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সভাপতি ছিলেন।

২০এ—ব্রসলসের প্রিন্স বিশপ কার্ডিনেল কপের মৃত্যু হয়।

„—পুটিলফ্ আর্‌মস্ ফ্যাক্টরীর ১৫০০০ কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট করে।

২১এ—মহারাজা আসফ্ নাওয়াজান্তও রাজা মুরলী মনোহর বাহাদুর ইহলোক ত্যাগ করেন।

„—কর্ণেল্ হানার মৃত্যু হয়।

„—মেসেজারী এস্ ষ্টীম কোম্পানীর ইষ্টার্‌ন্ সার্ভিসে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ ধর্ম্মঘট করে।

২১—ইণ্ডিয়ান্ ফাইনান্‌সিয়াল্ কমিসনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

„—পার্লেমেণ্ট মহাসভায় হোমরুল্ বিল ও প্লুর্যাল ভোটীং বিল্ " পুনরায় পেস হয়। সিয়ারা (ব্রেজিলে) রাজদ্রোহ উপস্থিত হয়।—

২২এ—কলিকাতার ঐতিহাসিক সভাকে "পুনর্জ্জীবিত" করা হয়।

২৩এ—কর্ণেল স্যর চার্লস বক্‌স্ অলবিলি দক্ষিণ-আফ্রিকার সি, আই, ডি সার্ভিস্ গঠন করেন; স্যর উইলিয়ম সিউল, ও মিঃ ওয়েব্ (বোম্বায়ের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্) ইহলোক-ত্যাগ করিয়াছেন; সংবাদ পাওয়া গেল।

„—স্যর বি, ডফ্ ভারত-সৈনিকগণের কমাণ্ডার ইন্ চীফ্ নিযুক্ত হ'ন। স্যর্ ওমুর ক্রিয়া পদত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। মিরটে ইউ, পির বাৎসরিক "ঘোটক প্রদর্শনী" শেষ হয়।

২৫এ—অদ্য হইতে "বোম্বাই গেজেটে"র প্রকাশ স্থগিত হয় (এই পত্রিকা ইং ১৭৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়)।

„—স্যর আর্থর ম্যাক্‌ওয়ার্থের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়।

„—কলিকাতার "এংলো-ইণ্ডিয়ান" নামক পাক্ষিক-পত্রিকার প্রকাশ স্থগিত হয়।

২৬—বিখ্যাত ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মালিক মিঃ ই ড্রেসডেনের মৃত্যু হয়।

„—কলিকাতায় 'ব্রাহ্মণ' মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ সভাপতি ছিলেন।

২৮এ—মাননীয় জর্জ্জ নেপীয়ার ইহলোক ত্যাগ করেন।

„—"এয়ার ব্রকের" আবিষ্কারক, জর্জ্জ ওয়েষ্টীংহাউস, ইহলোক ত্যাগ করেন।

২৮এ—ফরিদপুরের কো-অপারেটীভ্ ব্যাঙ্কস্ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়; মিঃ উড্‌হেড্ সভাপতি ছিলেন।

„—হরিদ্বারের গুরুকুলের ১২শ বাৎসরিক অধিবেশন হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ৫০,০০০৲ টাকা সভাস্থলেই সংগৃহীত হয়।

৩০এ—তুরস্কের সহিত সার্ভিয়ার সন্ধিপত্র সহি হয়।

Publisher--Sudhanshusekhar Chatterjee,
201, Cornwallis Street,
CALCUTTA.

Printer--BEHARY LALL NATH,
—The Emerald Ptg. Works,—
12, Simla Street, Calcutta.
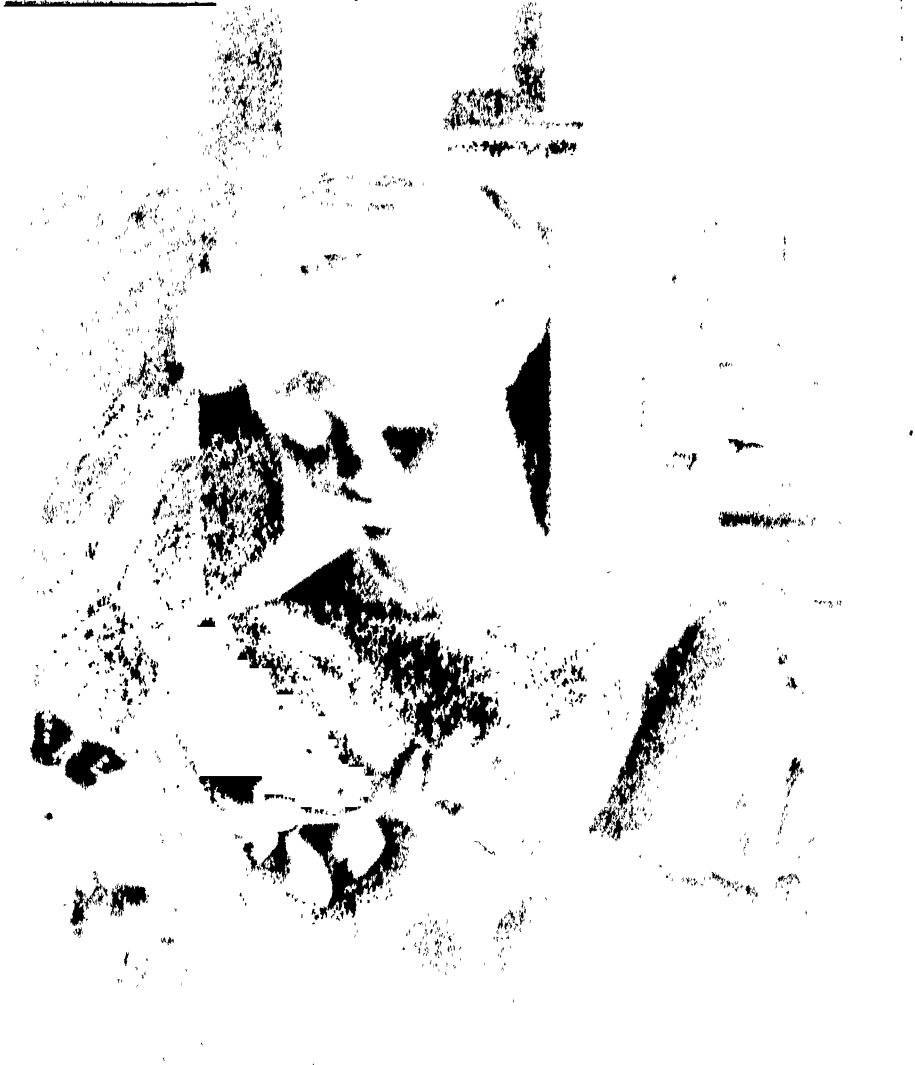
[মূলচিত্র-শিল্পী—স্যর্ ই, পইণ্টর্ Bart P R A.]

মন্মথ-মন্দিরে 'সাইকী'

প্রথম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ | দ্বিতীয় খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্মৃতি

মৃত্যু ? সে ত নির্ব্বাপিত ! উদ্ভাসিত জন্ম-মহোৎসব ;—
নব-প্রভাতের দীপ্ত-নভস্তলে জাগে কলরব।
সুসজ্জ—উজ্জ্বল মঞ্চে লক্ষ যুবা, পরি' চারু বেশ,
স্ফীত বক্ষে—স্মিত মুখে, গাহে ওই—রে "আমার দেশ" !
অম্বরের নীল বক্ষ,—শান্তিপূত বিশ্রান্ত বিস্তৃত—
বিচ্ছিন্ন বিশদ শুভ্র অপরূপ চন্দনে চর্চ্চিত।
ঊর্দ্ধে ভাতে নীলিমায় সৌর-কর-গরিমা ভাস্বর,
নিম্নে নির্ঝরিণী-অঙ্গে রত্নরেণু ঝরিছে ঝর্ঝর ;
মধ্যভাগে লঙ্ঘি' সানু শত শৈলশৃঙ্গ তরঙ্গিত,
পুষ্প-পুঞ্জ-ভরা কুঞ্জ বিহঙ্গের গীতিকরম্বিত।
উল্লাসে জাগিল বিশ্ব ; সে গরিমা—সে মাধুরী চুমি'
জাগে অতুলন বিশ্বে হাস্যময়ী শ্যামা জন্মভূমি।
অন্ধকার অস্তমিত, নাহি মেঘ,—প্রভাত উদিত ;
গরিমার—মহিমার শুভ্র-দীপ্তি ললাটে স্ফুরিত !
তুমি প্রিয় জন্মভূমি !—ধন্য তুমি,—ধন্য পরমেশ !
হেরিলাম—সাধনার চিরারাধ্য আমার স্বদেশ !
গাহ সবে—কলরবে—উৎসবের মন্দির ধ্বনিয়া !
হের দেবী—হের স্বর্গ,—লভ সিদ্ধি চরণে নমিয়া।
উতরিনু দৈন্য—লজ্জা, গেছে দুঃখ—নাহি আর ক্লেশ ;
নবীন প্রভাতে তুমি হাস্যময়—হে "আমার দেশ" !

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর চলিয়া গেল। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন 'ভারতবর্ষ' প্রথম প্রকাশের আয়োজন হইতেছিল, তখন কে জানিত যে—যিনি এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক, যিনি 'ভারতবর্ষে'র কর্ণধার হইবেন, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যে উৎসাহ, যে উদ্যম লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সে উৎসাহ, সে উদ্যম কালের সামান্য ফুৎকারে এক নিমেষের মধ্যে নিবিয়া যাইবে—দ্বিজেন্দ্রলাল অকস্মাৎ অকালে সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইবেন!

বিগত বৎসর এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩রা তারিখে দ্বিজেন্দ্রলাল পুত্রকন্যার, আত্মীয়স্বজনের মায়া কাটাইয়া, তাঁহার বড় সাধের 'ভারতবর্ষের' প্রথম সংখ্যার প্রচার পর্য্যন্তও না দেখিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর, এই এক বৎসর চলিয়া গেল; আবার সেই জ্যৈষ্ঠ মাস আসিল, আবার সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩রা তারিখ আসিবে; কিন্তু সে সদা-প্রফুল্ল, সদানন্দ দ্বিজেন্দ্রলালকে আর আমরা পাইব না।

এক বৎসর অতীত হইয়া গেল; কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে, এঁ যেন সেদিনের কথা;—মনে হইতেছে, এই ত সেদিন আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে দেখিয়াছি, তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছি, তাঁহার সুমধুর কবিতার আবৃত্তি শুনিয়াছি, তাহার প্রাণমনোমোহকর গান শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। সকলই ত সে দিনের কথা বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু ইহার মধ্যে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল, ইহারই মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের দিন পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

গত বৎসর, এই জ্যৈষ্ঠ মাসে, বাঙ্গালী যে অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে, তাহা ত আর ফিরাইয়া পাইবে না। বাঙ্গালা দেশে, দ্বিজেন্দ্রলালের অভাব কিছুতেই পূর্ণ হইবে না—হইতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলাল খাঁটি মানুষ ছিলেন—মানুষের মত হস্তপদবিশিষ্ট জন্তু ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় ছিল, তিনি হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন। এখনকার এই মেকির দিনে তেমন লোক কি আর পাওয়া যায়? তেমন বন্ধুবৎসল, স্বদেশপ্রেমিক, দেবহৃদয় মানুষ আর কি মিলে? তেমন প্রাণভরা হাসি আর ত শুনিতে পাই না; তেমন বুকভরা স্নেহ ও প্রীতি আর ত দেখি না; 'আমার দেশ', 'আমার জন্মভূমি' বলিয়া তেমন স্পর্দ্ধা করিতে আর কাহাকেও ত দেখি না; আর ত কেহ তেমন করিয়া কাহাকেও হাসাইতে পারে না; আর ত তেমন করিয়া কেহ চোখে আঙ্গুল দিয়া কাহারও ক্ষতস্থান দেখাইয়া দিতে পারে না, তেমন সহানুভূতিপূর্ণ রহস্য আর ত কেহ করে না! বিগত জ্যৈষ্ঠমাসে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সঙ্গেই সে সকল ফুরাইয়া গিয়াছে! যে গিয়াছে,—ভাগীরথীর তীরে যে মানুষকে শ্মশানভস্মে পরিণত করিয়া আমরা সাশ্রুনয়নে গৃহে ফিরিয়াছিলাম, সে মানুষটিকে ত আর আমরা পাইব না। তাই, এই এক বৎসর পরে, সেই কাল ৩রা জ্যৈষ্ঠের কথা স্মরণ করিয়া, আমরা সেই পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছি, আর তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু হইতে পারে, তাহাই করিতেছি।

মানুষ চলিয়া যায়, থাকে তাহার কীর্ত্তি! কীর্ত্তিই মানুষকে অমর করিয়া রাখে। দ্বিজেন্দ্রলালের পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে, ততদিন দ্বিজেন্দ্রলালের নাম অমর হইয়া থাকিবে। যদিও আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, তাঁহার মুখের কথা শুনিতে পাইব না, তবুও তাঁহার গ্রন্থরাশি, তাঁহার গীতাবলি প্রতিদিন তাঁহার কথা আমাদের স্মরণ করিয়া দিবে; তিনি দেশের জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহারই মধ্যে তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিয়া আমরা সান্ত্বনা লাভ করিব।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের পর দেশময় একটা হাহাকার উঠিয়াছিল; তাঁহার অকালমৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কত সভাসমিতি

হইয়াছিল, কিন্তু এই ত এক বৎসর চলিয়া গেল, স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা, কোন আয়োজনই ত দেখিতেছি না! এমনই করিয়া কি আমাদের দেশের লোক দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতির সম্মান করিবে?

আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' সম্পাদন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি; এই এক বৎসর তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। তিনি জীবিত থাকিলে 'ভারতবর্ষ'কে যে সকল অমূল্য ভূষণে অলঙ্কৃত করিতেন, দরিদ্র আমরা, সে সব কোথায় পাইব? দ্বিজেন্দ্রলালের অক্ষয় ভাণ্ডারে যে সকল রত্ন সঞ্চিত ছিল, তাহা 'ভারতবর্ষে'র শোভাবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইবে বলিয়া আমরা কত আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের কোন আশাই পূর্ণ হইল না; দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার বড় সাধের 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যা পর্য্যন্ত দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। আমাদের এ আক্ষেপ রাখিবার আর স্থান নাই! তাহার পর, এই এক বৎসর আমরা তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিতে চেষ্টা করিয়াছি অবশ্য আমাদের অনেক ত্রুটী হইয়াছে; কিন্তু আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, আমাদের যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই আমরা সাধ্যানুসারে 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিয়াছি যাহাতে পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতির অবমাননা না হয়, তাহার জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছি 'ভারতবর্ষ'কে সুশোভিত করিবার জন্য যথাশক্তি আয়োজন করিয়াছি। বর্ষশেষে আমরা আমাদের গ্রাহক ও পাঠকবর্গকে অভিবাদন করিতেছি এবং যিনি এই ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলালের নাম স্মরণ করিতেছি। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান্ আমাদের সহায় হউন; আমরা যেন দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় দেশের ও দশের সেবা করিয়া ধন্য হই!

"হারা আমি"

আলাইয়া—আড়া

"তুই কি ঘরে এলিরে রামধন"—সুর।

যা ধরি তাই কি যেন কি বলে গো।
সবারি ভিতরে, সবারি অন্তরে,
কে যেন কে ব'সে গো।

সজীব অজীব ভেদ নাই,
(সবাই) কি যেন কি বলে, ভাই,
(যেন) চেনা চেনা চেনা স্বর,
খুব্‌ই মনে জাগে গো।

কত কালের কত কথা,
ধীরে ধীরে তোলে মাথা,
লুপ্ত গুপ্ত স্মৃতি কত,
ছায়ার মত ভাসে গো।

আমারি বুঝি ভোলা সুর,
আমারি ভাবে ভরপূর,
হারা আমি আমাতে ফের
এনে যেন দেয় গো।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত

সাহিত্যের সমাজ-গঠন-শক্তি

ইংরাজী ও জার্ম্মান-সাহিত্যের লক্ষ্য

আমরা পাশ্চাত্যসমাজকে অনুকরণ করিতে শিখিয়াছি ; কিন্তু পাশ্চাত্যসমাজকে ভাবিতে গিয়া আমরা উহার গণ্ডী অত্যন্ত ছোট করিয়া লইয়াছি। আমরা একটিমাত্র পাশ্চাত্য ভাষা জানি—তাহা ইংরাজী। ইংরাজী পুস্তকের ভিতর দিয়া আমরা সাধারণতঃ ইংলণ্ডের সমাজসম্বন্ধেই পরিচয় লাভ করিয়া থাকি। ফলে, অনেক সময়েই পাশ্চাত্য-সমাজের কথা বলিতে গেলে আমরা, জার্ম্মানী ফ্রান্স রুস প্রভৃতি দেশের কথা একবারেই ভুলিয়া গিয়া, ইংলণ্ডকেই আমাদের চিন্তাজগতের—শুধু কেন্দ্র নহে,উহাকে—সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলি।

এরূপ ভুলে আমাদের যে অনেক সময় খুব ঠকিতে হয় এবং এরূপ ঠকিয়া এখনও যে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, তাহা নিঃসন্দেহ। একটি উদাহরণ দিতেছি। আমরা এখন মনে করিতেছি, আমরা যদি ইংলণ্ডের মত বড় বড় কারখানা না ফাঁদিয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতি অসম্ভব। এরূপ মনে করিয়া, আমরা বড় বড় কারখানা খুলিতেছি। এদিকে গ্রামের পারিবারিক শিল্পগুলির সর্ব্বনাশ হইতেছে। শুধু গ্রাম্যশিল্প নহে, গ্রাম্য-কৃষির উপরও আমাদের বিশেষ নজর নাই। জার্ম্মানী অথবা ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা থাকিলে আমরা উল্টাদিক্ হইতে আমাদের কার্য্যারম্ভ করিতাম না। বিশেষতঃ, জার্ম্মানী বড় কারখানা গ্রাম্য-শিল্প ও কৃষি সমানভাবে চালাইতেছে। ইংলণ্ডের মত জার্ম্মানী, তাহার নাগরিক-জীবনের পুষ্টিসাধন করিতে গিয়া, পল্লী-জীবনকে বিসর্জ্জন দেয় নাই। জার্ম্মানী, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া, গ্রাম্য পারিবারিক শিল্পগুলির বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছে এবং কৃষিকর্ম্মও উন্নত প্রণালীতে চালাইতেছে। ইংলণ্ড তাহার খাদ্যের জন্য যে অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া, আমরা ভাবিতেছি, আমরা ইংলণ্ডের মত কারখানা স্থাপন করিয়াই ধনী হইতে পারিব।

আমরা, এতকাল ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়া, যে সাহিত্যের আদর্শ সমাজে আনিয়াছি, তাহাতেও একটা বিশেষ ভুল হইয়াছে ! সমাজে একটা ভুল আদর্শ প্রতিপত্তি-লাভ করিলে যে তাহা বিশেষ অনিষ্টকর হয়, তাহা বলা বাহুল্য। ইংলণ্ডের সাহিত্যকে অনুকরণ করিয়া, আমরা একটা ভুল আদর্শকে মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছি ; আমাদের ভাবিবার কারণ বা অবসর নাই যে, পাশ্চাত্য জগতে ইংরাজী সাহিত্যের স্থান ও অধিকার কিরূপ, তাহার দোষ ও গুণ সেখানে কিরূপভাবে বিচারিত হইয়াছে, এবং আমরাও, গুণগুলি অনুকরণ করিয়া, দোষগুলি কি প্রকারে ত্যাগ করিতে পারিব।

ইংরাজী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিব—ইংরাজী সাহিত্য রাজা, রাজার পারিষদবর্গ, ভূম্যধিকারী, ধনী, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে বাড়িয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে, সবদেশের সাহিত্য এরূপভাবে গঠিত হয় নাই। বিশেষতঃ, জার্ম্মান-সাহিত্য একবারে জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ লইয়াই বিকাশলাভ করিয়াছে। জার্ম্মান-সাহিত্য যে ভাবে কৃষক ও শ্রমজীবি-গণের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে, ইংরাজী সাহিত্য তাহা করিতে পারে নাই। আমাদের সাহিত্য, ইংরাজী সাহিত্যের সাহায্যে, আধুনিক কালে উন্নতিলাভ করিতেছে। ইংরাজী ভাষা আমাদের রাজার ভাষা, ইংরাজী সাহিত্যের মত আমাদের সাহিত্যও জনসাধারণের হৃদয় হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া,—দেশের হৃদয়ের স্বর্ণ-সিংহাসন ত্যাগ করিয়া—নিজেই নূতন রাজ্য সৃষ্টি করিয়া, স্বনির্ম্মিত সিংহাসনে প্রভুত্ব করিতেছে।

Anglo-Saxonএর King's English, জার্ম্মানের Minnesang.

Chaucer এই "King's English," "Nine Royal" আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনিই ইংরাজী সাহিত্যের জন্মদাতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাই, শিল্পকলাকৌশলে মণ্ডিত

হইয়া, অবশেষে Shakespeareএর হাতে পৌছিয়াছিল। Germany তে Chaucer এর মত কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। Germanyর ইতিহাসের মধ্যযুগে, Nebelungen ও Gurdrun এর গানের সহিত Boewulf এর তুলনা হয় না। Germanyর চারণ Walter Von der Vogweide যদিও রাজসভার কবি ছিলেন, তবুও তাঁহার গানগুলিতে পল্লীগ্রামের সুরই শুনিতে পাওয়া যায়। সেগুলি এত সরল ও অকৃত্রিম, যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের হৃদয়কেই উহারা সমানভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। ইহাদিগের তুলনায়, ইংরাজী সাহিত্যের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গানগুলি অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজকবিদিগের মধ্যে যাঁহারা এ সময়ে বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে Walter Map ল্যাটিন্ ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন, এবং Langland যদিও একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন, তবুও উহা অত্যন্ত দীর্ঘ ও অসম্বদ্ধ বলিয়া দেশের প্রাণকে বিশেষরূপে স্পর্শ করে নাই। অপরদিকে Germanyতে Wolfram যে Romaunt of the Graal -এর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই বোধগম্য হইয়া, সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ করিয়াছিল। Wolfram মধ্যযুগের Teutonদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কবিতা—'The greatest Teutonic poem of the middle ages,'—মধ্যযুগে Teutonদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি Germany তে কোন Chaucer জন্মগ্রহণ করেন নাই। যখন Chaucerএর অনুবর্ত্তী কবিগণ Chaucerএর Nine Royal ও King's English এর পুষ্টিবিধান করিতেছিল, ঠিক সেই যুগেই জার্ম্মানীতে "Minnesang," "Master Song"এ পরিণত হইতেছিল। জার্ম্মানীতে সাহিত্যের উপর জনসাধারণের প্রভাব আমরা প্রথম হইতেই দেখিলাম।

WARS OF THE ROSES ও ইংরাজী সাহিত্যের দুরবস্থা

Chaucerএর পর হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর ইংরাজী সাহিত্যের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীদেশ হইতে ইংরাজগণ বিতাড়িত হয়। সমগ্র জাতি এই অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছিল। সাহিত্যের উন্নতি এ সময়ে অসম্ভব। কোন জাতি যদি একেবারেই বিধ্বস্ত হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের অশ্রুবিগলিত ধ্বনি শুনা যাইতে পারে। Ireland ও Walesএর সাহিত্য জার্ম্মানীর উপর ফরাসীর প্রভাব-বিস্তারের সময়ে জার্ম্মান-সাহিত্য, Polandএর সাহিত্য ও আমাদের সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য দেয়; কিন্তু যখন শুধু অপমান হইয়াছে, জাতিকে একবারে দাসখৎ লিখিতে হয় নাই, তখন জাতির এমন একটা দুঃসহ শোক হয় না যাহা সাহিত্যের ভিতর দিয়া ক্রন্দন-ধ্বনিতে ফুটিয়া উঠিবেই;—কাজেই সাহিত্যের সেরূপ পুষ্টি হয় না। ইংলণ্ডের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঠিক তাহাই হইয়াছিল। তাহার পরই প্রায় ত্রিশ বৎসরব্যাপী গৃহবিচ্ছেদ ও যুদ্ধ,—Wars of the Roses.—ধনী ও ভূম্যধিকারিগণ যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত, কবিগণকে উৎসাহ দিবার তাঁহাদের অবসর ছিল না। কবিগণ জনসাধারণের সুখ-দুঃখকে অবজ্ঞা করিতেন; সাহিত্যে তাঁহাদিগের নূতন কিছু বলিবার ছিল না। শুধু Scotlandএ Dunbar, Gawain Douglas, Lyndsay ও Hennyson Chaucerএর সম্মান রাখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে Surrey ও Wyal Daub, Aridsto ও Petrarchকে অনুকরণ করিয়া দুই চারিটি সুন্দর প্রণয়-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী নহে—ইতালীয় সাহিত্যের প্রভাবই তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়।

নবশিক্ষা ও ধর্ম্মসংস্কার

তাহার পর, Renaissance ও Reformation. য়ুরোপের সাহিত্য ও ধর্ম্মজগতে নবযুগের সূচনা। France, England ও Germany একই সঙ্গে Florence ও Rome নগরী হইতে প্রাচীন সাহিত্যের আলোক পাইয়াছিল। Luther প্রথম স্বদেশী ভাষায় Bible অনুবাদ করিলেন। Englandএ William Tyndale, Lutherএর অনুবাদের আদর্শ অবলম্বন করিয়া Bibleএর ইংরাজী অনুবাদ করিলেন। জার্ম্মানদিগের প্রার্থনা ও পদাবলী অনূদিত হইয়া Edinburg ও Londonএর গির্জ্জায় ব্যবহৃত হইত। জার্ম্মানজাতি Reformation ধর্ম্মসংস্কার-প্রবর্ত্তনে অগ্রণী হইয়াছিল; কিন্তু Renaissanceএ Germany সেরূপ-

ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই। ইতালীর Ariosto ও Tasso, Franceএর Mosot ও Rabelais, Portugalএর Camoeons,—এমন কি Spainএর Ercillaর নিকট Germanyর সাহিত্যিকগণ একেবারে হতপ্রভ।

Englandএরও সেই এক দশা। Englandএর বিশ্ববিদ্যালয়ে Colet, More এবং Erasmus যে প্রাচীন জ্ঞানের আলোক জ্বালাইয়াছিলেন, তাহা সমাজের ধর্ম্মান্দোলনের ব্যস্ততার মধ্যে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। তাঁহার জাতভাই জার্ম্মানের মত শিক্ষাসংস্কার ও প্রাচীন বিদ্যা ছাড়িয়া ধর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত হইল। অবশেষে Elizabeth যখন ধর্ম্মের গোলমাল থামাইলেন, যখন সমাজে শান্তি আনিলেন, যখন—

"...........Every man shall eat in safety
Under his own vine, what he plants and sings
The merry songs of peace to all his neighbours."

সমাজের শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে অবশেষে Renaissanceএর সুফল ফলিল;—এমন ফলিল, যে য়ুরোপের অন্য দেশে সেরূপ ফলে নাই। কিন্তু সেই একই কথা,—কবিগণ সকলেই রাজসভার কবি—১৫৯০ হইতে ১৬১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে George Chapman, Daniel, Drayton, William Shakespeare এবং Raleigh লণ্ডনের রাজসভায় আসিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া Donne, Spenser ও Bensen লণ্ডন সহরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলেই রাজভক্ত, রাজার দয়ার পাত্র,—Courtiers. ইহাদের মধ্যে অনেকেই যে শুধু রাজভক্ত ছিলেন তাহা নহে,—Elizabethএর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যাঁহারা কোন কথা বলিতেন, তাঁহাদের উপর ইঁহাদের বিশেষ আক্রোশ ছিল। Puritanদিগকে Edmund Spenser পশু বলিয়াছিলেন,—'Blatant beast'. Raleigh রাণীর নিকট তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন। রাণী তাঁহাকে pension ও Irelandএ জমি দিয়াছিলেন। রাণীর অনুগ্রহ পাইয়া এরূপে অনেকেই Puritanদিগকে খুব বিদ্রূপ গালাগালি করিয়াছিলেন; কিন্তু Spenser, Shakespeare, Ben Jonson প্রমুখের প্রতিভা ইংলণ্ডকে অবশেষে সেই 'Blatant beast' Puritanদিগের গভর্ণমেণ্ট হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারিল না। Spenser, Shakespeare যুগের পরবর্ত্তী যুগেই—রাজা ও পিউরিটানদিগের মধ্যে যুদ্ধ। শেষে Cromwellএর দলই জয়লাভ করিল। Elizabeth-যুগের সাহিত্য যদি সার্ব্বজনীন হইত, তবে প্রজাবিদ্রোহ ও প্রজার অভ্যুত্থান অসম্ভব হইত।

অপরদিকে জার্ম্মান-সাহিত্য renaissance হইতে বিশেষ পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। জার্ম্মান-সাহিত্যে কলাকৌশল ছিল না। Sir Philip Sydneyর সহিত জার্ম্মানীর Hans Sachsএর তুলনা করিলে, রাজপুরুষ ও মুচীর সহিত তুলনা করা হয়। নাট্যকারদিগের মধ্যে দুই একজন স্বদেশী ভাষা ছাড়িয়া লাটিন্ ভাষায় লিখিতেন। দুই চারিখানি Shakespeare-নাট্য স্বদেশী ভাষায় অনূদিত হইল; কিন্তু সেগুলিতে কাহারও মন উঠিল না। জার্ম্মান জাতি কলাকৌশলের বিশেষ পক্ষপাতী নহে, বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াও তাহা হজম করিতে পারিল না।

Thirty Years War ও জার্ম্মান-সাহিত্যের হীনাবস্থা

সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীতে সাহিত্যের ঘোর দুর্দ্দশা। জার্ম্মানী এই সময়ে Thirty years warএ বিধ্বস্ত হইল, Lutherএর দেশে ধর্ম্মের স্বাধীনতা থাকিল না। Peace of Westphaliaতে জার্ম্মানী তাহার রাষ্ট্রনৈতিক একতা হারাইল। Louis XIVএর প্রভাবে স্বাধীনতা লুপ্ত হইল। জাতীয় জীবনের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও অবনতি হইল। জার্ম্মানীর ছোট ছোট রাজগণ ফরাসীদিগকে অনুকরণ করিতে লাগিল। ফরাসী সাহিত্যের অনুকরণে এক প্রাণহীন কৃত্রিম সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। শেষে ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শ, জার্ম্মান জাতিকে তাহার নিজের আদর্শের দিকে ফিরাইয়া আনিল। Lessing, Corneille, অথবা Racine অপেক্ষা Shakespeareএর প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। গ্রীক ও ফরাসী নাট্যের অনুকরণের স্রোত

হইতে তিনি জার্ম্মান-সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। Heine তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'Lessing was the literary Arminius who freed our theatre from foreign rule.'

উন্নতির সূচনা

Klopstock ও Weiland সেই সময়ে কবিতা লিখিলেন। উভয়েই বিদেশীয় প্রভাব স্পষ্ট বুঝা যায়,—Weilandএ ফরাসী ও Klopstockএ ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব; কিন্তু বিদেশীয় প্রভাবের ভিতর দিয়া দুই জনের স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশের আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষিত হয়। দুই জনের গানগুলি সার্ব্বজনীন। Milton-এর Paradise Lost ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণের পক্ষে একখানি Æenead অথবা Inferno; কিন্তু Paradise Lostএর অনুকরণে লিখিত Klopstockএর মহাকাব্য সার্ব্বজনীন হইয়াছিল। Miltonএর মহাকাব্যের রচনা-পদ্ধতির পরিণতি, Goetheর Hermann und Dorothea। জার্ম্মানজাতিকে ইহা গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল,—'The revolutionary song of paradise inspiring the song of a village during the great revolution'—Hermann সম্বন্ধে একজন আধুনিক সমালোচক ইহা বলিয়াছেন।

STURM UND DRUNG-প্রবর্ত্তক HERDERএর লোকসাহিত্যালোচনা

তাহার পর জার্ম্মানীর সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা—Sturm und drung. বিপ্লবের পূর্ব্বে অশান্তি ও ব্যাকুলতা লক্ষিত হয়। Herder এই বিপ্লবের প্রবর্ত্তক, Goethe ইহার কেন্দ্র, এবং Schillerএ ইহার সমাপ্তি।

তিন জনেরই কবিতা, নাট্য ও কাব্য সার্ব্বজনীন;—তিন জনেরই সাহিত্যে জনসাধারণের সহিত সহানুভূতি, জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের প্রতি ভক্তি লক্ষিত হয়। Percyর Reliques of Ancient Poetry পাঠ করিয়া Herder ও যুবক Goethe,—Alsatia কৃষকগণের নিকট হইতে গান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। Herder, সাহিত্যিকগণকে সবজাতিরই লোকসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বলিয়া, কবিতার ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তাঁহার কল্পনাশক্তি অসাধারণ ছিল; তাই তিনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক-সাহিত্য ও প্রাচীন কাহিনীগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রশংসা করিতে পারিয়াছিলেন। Herderএর প্রতিভা, লোক-সাহিত্য-চর্চ্চায় নিযুক্ত হইয়া, জার্ম্মানসাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি উহার সহানুভূতি ও অকৃত্রিমতাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। Herder য়ুরোপে লোকসাহিত্যের প্রধান-ভক্ত।

GOETHE ও SCHILLERএর সার্ব্বজনীন সাহিত্য

Herder—Goetheর প্রথম বয়সের শিক্ষক। Schiller, Goethe অপেক্ষা দশবৎসরের ছোট। Goethe ও Schiller দুই জনেরই নাট্যে Shakespeareএর রচনাকৌশল লক্ষিত হয়; কিন্তু Goethe ও Schillerএ রাজভক্ত Shakspeareএর স্থান নাই। রাজভক্ত Shakespeare জনসাধারণকে শুধু বিদ্রূপ করিবারই জন্য তাঁহার রঙ্গমঞ্চে আনিতেন। Shakespeare তাঁহার A Midsummer Nights Dreamএ Theseus এবং তাঁহার পারিষদবর্গ ও Bottomপ্রমুখ প্রজাবৃন্দের শিক্ষা ও আদব-কায়দার যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন, তাহা রাণী ও তাঁহার মুষ্টিমেয় Courtier-গণের মনোরঞ্জক হইতে পারে; কিন্তু সমগ্রজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার পক্ষে উহা অন্তরায় হয়? Goetheর Gotz von Berlichengen ও Schiller এর Robbersএ, Shakespeare জার্ম্মানীর আবহাওয়ায় প্রজাভক্তে পরিণত হইয়াছেন। প্রজাশক্তির উপর ভক্তি না থাকিলে Goethe ও Schiller কখনই Germanyতে সকলেরই পাঠ্য হইতেন না। এসম্বন্ধে একজন আধুনিক সমালোচক লিখিয়াছেন,—

"No poem of their great English contemporaries,neither of Wordsworth and Coleridge, nor of Byron and Shelley, has ever been chanted by children in London Streets, by peasants in English hamlets, remoulded in their mouths, as several of Goethe's and Schiller's are.

Goethe এবং Schillerএর কবিতার মত Wordsworth ও Coleridgeএর কবিতা রাস্তায় রাস্তায়, অথবা গ্রামের কুটীরে কুটীরে, গীত হয় নাই। আমরা Goethe ও Schillerএর সাহিত্যের শক্তিসম্বন্ধে, পরে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিব। এক্ষণে ইদানীন্তন ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি।

ফরাসী সাহিত্য ও রাষ্ট্রবিপ্লব

ফরাসী বিপ্লব, য়ুরোপে এক যুগান্তর আনিয়াছিল। Herder, ইহাকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার ও Reformation-এর সহিতে তুলনা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মনুষ্যের আত্মার মহিমা প্রচার করিয়াছিল। মধ্যযুগের ধর্ম্ম-সংস্কার, মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে আর কোন ব্যক্তি বা অনুষ্ঠানকে মধ্যস্থ বলিতে অস্বীকার করিল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব, সকল লোকের ঐক্য প্রচার করিল। চিন্তা হিসাবে Rousseau এই বিপ্লবের নেতা। তাঁহার Social Contract এর প্রথম বাক্য এই,—সকল মনুষ্য স্বাভাবিক ঐক্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে সকল ক্ষেত্রেই সে পরাধীন—শৃঙ্খলাবদ্ধ। Rousseauর সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে ফরাসী জাতি নবজীবন লাভ করিয়াছিল। Rousseau অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি যাহাই বলিয়াছিলেন, তাহা এমন সহজ সরল স্পষ্ট ও সোজা কথায় বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র য়ুরোপীয় সমাজে তাঁহার প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ROUSSEAUর প্রভাব

আমরা Rousseauর এই প্রভাব সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিব। Rousseauর মত জগতে কোন লেখক সমাজ ও জাতীয় জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই ক্ষমতা কি হইতে হইল? Voltaire তাঁহার জীবনেই অতিপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহার কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজের সাহিত্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই স্বদেশের সব লোক সেই সময় ভাবিতেছিল; তাহাদের চিন্তাই তাঁহার সাহিত্যে ভাষা পাইয়াছে বলিয়াই তিনি অত শীঘ্র সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া পড়িলেন।" Rousseauর সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি দেশের চিন্তা শুধু নহে, ফরাসীজাতির শুধু অভাব ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সাহিত্যে যে ভাষা দিয়াছেন তাহা নহে, সমগ্র ফরাসীজাতির বহুবৎসরের সঞ্চিত দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা, সজীব হইয়া তাঁহার লেখনীকে চালাইয়াছে; লেখককে চিন্তা করিতে, ধীরভাবে যুক্তির সাহায্য লইতে অবসর দেয় নাই। এই কারণে Rousseauর সাহিত্য অযৌক্তিকতায় পরিপূর্ণ; তবুও Voltaire-এর যুক্তি অপেক্ষা Rousseauর অযুক্তিতেই সমগ্র সমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল। নিজে দারিদ্র্যের অসহ্য পীড়া যন্ত্রণা অনুভব করিয়া, তিনি দীনদরিদ্রদের বাণীই জগতে প্রচারিত করিয়াছেন। Voltaire ধনী ছিলেন, রাজদরবারে তাঁহার সম্মান ছিল, বিভিন্নদেশের রাজাদের সহিত তাঁহার চিঠি-পত্র চলিত; Voltaire সৌখীন, বিলাসী; Voltaire theatre-ভক্ত,—তিনি একজন তথাকথিত সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী,—তিনি কেন দেশকে মাতাইতে পারিবেন!—দেশকে যিনি মাতাইয়াছেন, তিনি একজন রাস্তার লোক, ঘড়িওয়ালার ছেলে, চিরজীবনই কষ্টে কাটাইয়াছেন, যিনি ধনী ও বড় লোক মাত্রেরই নিকট অসম্মান ভিন্ন সম্মান পান নাই; কিন্তু গরীবলোক—রাস্তার লোকের নিকট হইতে যিনি অযাচিত প্রেম ও ভালবাসা পাইয়াছেন, যিনি বুঝিয়াছেন জগতের পবিত্র মহত্ত্ব—সেই তথাকথিত সভ্যসমাজ কর্ত্তৃক যাহারা ঘৃণিত, যাহারা পদদলিত—সেই অত্যাচারপীড়িত জনসমাজের মধ্যেই সুপ্ত আছে।

চরিত্রের এই মহত্ত্ব কি উপায়ে জাগ্রত করিতে হইবে?—শিক্ষার দ্বারা। Voltaire যে শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাদ্বারা নহে। Voltaireএর শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে—সমাজের কতিপয় লোক খুব উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনাদ্বারা আপনাদের মনোবৃত্তির উন্নতিসাধন করিয়া, দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন; কিন্তু সমগ্র জাতি যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই থাকিবে। তাই, Rousseau সে শিক্ষা চাহিলেন না। Rousseauর Emile ধনীলোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে শিক্ষা লাভ করিল, সে শিক্ষা অত্যন্ত দীন দরিদ্র রাস্তার লোকও পাইতে পারে—তাহা ব্যয়সাধ্য নহে—তাহা প্রকৃতির অযাচিত দান। তাই, Joseph Chenier—Rousseauর প্রণালী-অবলম্বন

করিয়াই সমগ্র দেশবাসিগণের জন্য সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন। সে শিক্ষা যে শুধু সার্ব্বজনীন ও অল্প ব্যয়সাধ্য হইবে তাহা নহে,—সে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, প্রত্যেক ব্যক্তিতে এরূপ ভাব ও গুণ উদ্বুদ্ধ করা, যাহার ফলে সে যাবজ্জীবন সমাজের উপযুক্ত সেবা করিতে সমর্থ হইবে। অত্যাচারপীড়িত সমাজে, অনৈক্যের মধ্যে এরূপ সেবা-ধর্ম্ম-মৈত্রীর বাণী-প্রচার দেশে প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। সে সময়ে অসাম্য অনৈক্যেই ফরাসী-সমাজের গোড়াপত্তন ছিল। প্রথমে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অনৈক্য, gentilehomme (ভদ্রলোক), routerne (ছোটলোক)-এ অনৈক্য; বিচারালয়ে অনৈক্য—ভূম্যধিকারী ও পাদরীদিগের জন্য এক প্রকার বিচার, জনসাধারণের জন্য আর এক প্রকার বিচার; করস্থাপনে অনৈক্য—ভূম্যধিকারী ও পাদরীদিগকে কর দিতে হইবে না, জনসাধারণে রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যয় বহন করিবে,—মাঠের ঘাস খাইয়া, কাপড় এমন কি দরজার খিল পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া কর দিবে। সমাজে শুধু অনৈক্য নহে—অনৈক্যের উপর নির্য্যাতন। ফরাসী ভূম্যধিকারীর ভূমি নাই, বিলাসভোগের জন্য তিনি কৃষককে ভূমি বিক্রয় করিয়াছেন, অথচ তাঁহার ভূমিস্বত্ত্ব রহিয়াছে; তাহার জন্য তিনি কৃষককে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইয়া লইতেছেন, কৃষকের ক্ষেত্রে তিনি পাখী শিকার করিতেছেন ও তাহার শস্য নষ্ট করিতেছেন। ফরাসী ভূম্যধিকারীর রাজদরবারেও বিশেষ সম্মান নাই; তিনি পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রামের first citizen মাত্র; তবুও তিনি অধিকাংশ সময়ে গ্রামে থাকেন না। তাঁহার দাবী পূরা মাত্রায় আছে; অথচ সমাজে তাঁহার কোন কর্ত্তব্য নাই। তাহার পর ফরাসী কৃষককে চার্চ্চকে tithe দিতে হইবে; Voltaire দেখাইয়াছেন, চার্চ্চ তখন পবিত্রতা নহে, পাপের প্রতিমূর্ত্তি। এই অনৈক্য ও অত্যাচারের মধ্যে Rousseau তাঁহার সাম্যবাদ প্রচার করিলেন; তিনি বলিলেন,—মানুষে মানুষে প্রভেদ নাই, সকলেই সমান, সকলেই স্বাধীন, ধনী-নির্ধনে অনৈক্য, রাজাপ্রজায় অনৈক্য—তাহা আধুনিক সভ্যতার কুফল; রাজা—প্রজার চাকর মাত্র, প্রজাশক্তির অনুমোদনই রাজার শক্তি; প্রজাশক্তি রাষ্ট্রের একমাত্র শক্তি, প্রজাশক্তির বিকার নাই, তাহার বিনাশ নাই, তাহা চিরন্তন, অবিনাশী, অনশ্বর। Le Contract Social-এ Rousseau এই প্রজাশক্তির উদ্বোধন-মন্ত্র গায়িলেন। অমনই গ্রামের কৃষক লাঙ্গল ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিল, গাছের পাতা ছিঁড়িয়া Cockade তৈয়ারী করিল, কৃষকপত্নী যুদ্ধের পোষাক ও তাম্বু-শেলাই আরম্ভ করিল, বালকবালিকাগণ আহত-দিগের জন্য lint তৈয়ারী করিতে লাগিল; যাহারা রুগ্ন অথবা বৃদ্ধ, অস্ত্র ধরিতে অক্ষম, তাহারা গ্রামে গ্রামে ক্ষেত্রের কৃষকগণকে উৎসাহ দিতে লাগিল, অথবা গ্রামের কামারশালায় অস্ত্র তৈয়ারী আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে ৩ কোটি লোক মাঠ ঘাট হইতে বাহির হইল। অতীতের সমস্ত অপমান-অত্যাচারের হলাহল গণ্ডূষ করিয়া, ত্রিস্রোতা সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতার ভাব-গঙ্গা মস্তকে ধরিয়া দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্যপীড়িত সর্ব্ব-স্বান্তের জীর্ণ কন্থা পরিধান করিয়া, ফরাসী কৃষক প্রলয়ের মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার বিষাণ—la marseillaise, ডমরু Vive la nation. কুমারী Jeanne d'Arcএর আত্মা প্রজাশক্তির রাক্ষসী স্মৃতি লইয়া রণরঙ্গে ছুটিয়া আসিল। Bastile, Castle Archeve, Church চূরমার হইল। দক্ষ প্রজাপতি Louis XVI-এর মস্তক ভূমিবিলুণ্ঠিত হইল। ধনমান-গর্ব্বিত পাদরী ভূম্যধিকারীদের অহঙ্কার চূর্ণ হইল। দেশের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে প্রলয়-অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নিতে Feudalism, Despotism ও Priestcraft ভস্মীভূত হইল। তাহার পর Reign of Terror, মৃত্যুর বিভীষিকা—Guillotine, মরণের উন্মত্ত কোলাহল, ধ্বংসের মহানন্দ। নিজ শক্তির মৃতদেহ স্কন্ধে ধরিয়া, Rights of man লইয়া ফরাসীজাতি সমগ্র য়ুরোপের সমর-ক্ষেত্রে ক্ষিপ্তের মত বাহির হইল। তাহার Viva la Republique ধ্বনিতে Czar, monarch, Emperor-এর সিংহাসন টলিল। এসিয়া, য়ুরোপ, আমেরিকা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মহাপ্রলয়ের সূচনা হইল। জগতে যিনি সংহারিণী লীলার প্রতিরোধ করেন, তিনি শেষে প্রলয়াবতারকে নিরস্ত করিলেন। ফরাসীজাতি যে Rights of man, যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা—প্রজাতন্ত্রের অধিকারের জন্য পাগল হইয়া জগৎকে তোলপাড় করিতেছিল, প্রজাপুঞ্জের সে মহাশক্তি

ভগবান্ খণ্ডবিখণ্ড করিলেন, মৃতদেহের বিভিন্ন অংশ জগতে ছড়াইয়া পড়িল। বিশ্বজগৎময় প্রজাশক্তির পীঠস্থান স্থাপিত হইল। যেখানে দক্ষরাজের অত্যাচার ও প্রজাশক্তির অপমান ও লাঞ্ছনা হইয়াছে, সেখানেই শক্তির উদ্বোধন হইয়াছে, প্রজাশক্তির পুরোহিত Rousseauর প্রভাব প্রতীয়মান হইয়াছে।

কৃষককবি Burns

Rousseau-কে অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়াছি। তাঁহার 'Rights of man'-তত্ত্ব, সমাজ ও রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তির প্রভাব-ঘোষণা য়ুরোপে যুগান্তর আনিয়াছিল।

ফ্রান্সে শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রজগতে যুগান্তর আনিল। ফরাসী-বিপ্লবের প্রারম্ভে ইংলণ্ডেরও যুগান্তর আসিবার উপক্রম হইল। Rousseau যে ঐক্যমন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বপ্রথম কৃষক-কবি Burns-এর ভাঙ্গা ভাষায় Scotlandএ উচ্চারিত হইল। "A 'man's a man for a' that', the rank is but the guinea's stamp, the man's the good for a' that"—ইহা Rousseauর 'All men are born equal'-এর স্কটলণ্ডীয় সংস্করণ। Burns মেঠো সুর ধরিয়া লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে তাঁহার গান রচনা করিতেন। তাঁহার গান রচনার সময় অসময় ছিল না, তিনি কোন নিয়ম-কানুন আদবকায়দার ধার ধারিতেন না। মানুষ যেমন আপনার হৃদয়ের কথা সহজভাবে ব্যক্ত করে, কোন নিয়ম তাহার ভাবপ্রকাশকে বাধা দেয় না, Burns সেরূপ-ভাবে আপনার হৃদয়ের ভাবগুলি ব্যক্ত করিতেন। Burns নিজেই বলিয়াছেন, তিনি যখন গান ধরিতেন, তখন তাঁহার মনের ভাবগুলি এক সঙ্গে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিত, যতক্ষণ তিনি সেগুলিকে কোন রকমে কবিতায় সম্বদ্ধ না করিতেন, ততক্ষণ যন্ত্রণার সীমা ছিল না। Burns-এর গান শুনিলে আমরা একটি সরল ও নির্ভীক হৃদয়ের পরিচয় পাই, মানুষের কথা ভুলিয়া গিয়া তাহার আত্মার সন্ধান পাই, রূপ ছাড়িয়া ভাবের খেলায় মুগ্ধ হই। একজন ফরাসী সমালোচক Burns-এর কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'At last after so many years, we escaped from the measured declamation,we hear a man's voice ! Much better, we forget the voice in the emotion which it expresses, we feel this emotion reflected in ourselves, we enter into relations with a Soul. Then form seems to fade away and disappear. I will say that this is the great feature of modern poetry ; Burns has reached it'. 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ','ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ', —রূপ ও ভাবের এই নিত্যসম্বন্ধ যিনি ক্ষণেকের জন্যও ঘুচাইতে পারেন, যাহার নিকট আমরা ভাবের খেলা, আত্মার রূপ দেখিতে পাই, তিনিই প্রকৃত কবি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, Burns কৃষকের ভাষায় গান-রচনা করিয়াছিলেন। Scotlandএর কৃষকের ভাষাই তিনি ব্যবহার করিতেন এবং কৃষকের দৈনন্দিন জীবন হইতে তিনি তাঁহার উপমা ও বিষয় নির্দ্ধারণ করিতেন। তাই তিনি কৃষকের প্রাণকে এমন গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন। কৃষকের সুখদুঃখের কথা বলিয়া,

> See yonder poor, o'erlabour'd night
> So abject, mean, and vile,
> Who begs a brother of the earth
> To give him leave to toil ;
> And see his lordly fellow-worm
> The poor petition spurn
> Unmindful, though a weeping wife
> And helpless offspring mourn.

Man was made to mourn, কৃষকের ক্রন্দন প্রকাশ করিয়া, তাহার মহত্ত্ব প্রচার করিয়া, তিনি জন-সমাজকে অনুপ্রাণিত করিতে পারিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে Romanticism ও আত্মসর্ব্বস্ব সাহিত্য

Burns-এর মত Wordsworth. Coleridge ও Southey ফরাসী-বিপ্লবের ফলে প্রজাশক্তির উন্মেষের সূচনায় প্রথমে অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু Burke যাহা

আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ফরাসী-বিপ্লবের নেতৃগণ যখন সেই হত্যা ও লুণ্ঠন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাদের মন ফিরিল। কিন্তু ফরাসীবিপ্লব চিন্তাজগতে যে ব্যক্তির স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিল, সমাজ বা রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি ব্যক্তির পদতলে মস্তক অবনত করিবে বলিয়া, যে ব্যক্তি-পূজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাতে Wordsworth, Coleridge ও Southey এবং বিশেষতঃ Byron এবং Shelley মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কেহই দেশের তখনকার সমাজ এবং সাহিত্যের আদর্শ ও রচনাপ্রণালী আর মানিলেন না। সকলেই নিজেদের নূতন নূতন আদর্শ, নূতন নূতন মাপকাঠি তৈয়ারী করিলেন। কবি কোন বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতির বন্ধনে আপনাকে আর শৃঙ্খলিত করিবেন না। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে যুগান্তরের ফলে ব্যক্তিপূজা প্রতিষ্ঠিত হইল,—সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি, নিয়ম, আইন, কানুন ব্যক্তিকেই কেন্দ্র ও ব্যক্তিত্ববিকাশকেই উদ্দেশ্য করিয়া নিয়ন্ত্রিত হইল, সাহিত্যক্ষেত্রেও সেই যুগান্তরের প্রভাব লক্ষিত হইল। আপনার ভাবপ্রকাশই কবির প্রধান লক্ষ্য হইল, এমন কোন রচনাপদ্ধতি, কোন নিয়মকে তিনি মানিবেন না, যাহা তাহাদের এই আদর্শের নিকট না পৌছাইয়া দেয়। কবির ভাবের সমাদর আরম্ভ হইল, ভাষার আদর কমিল। অতীন্দ্রিয় তুরীয়ের প্রতি ভক্তি বাড়িল, রূপ—ইন্দ্রিয়ের প্রতি ঘৃণা জন্মিল। ইহার নামই Romanticism.

Wordsworth প্রচার করিলেন, কবিতার ভাষা কৃষকের দৈনন্দিন ভাষার মত সহজ ও সরল হওয়া চাই; কবির কাজ—প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও দৈনন্দিন ঘটনাবলী হইতে অন্তঃকরণের নিগূঢ় ভাবশক্তি প্রকাশ করা। Byron-এর নিকট কবিতা—অস্ত্রস্বরূপ, সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য একটি ব্যক্তিকে সমাজের কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিবার উপযোগী শাণিত তরবারি-স্বরূপ। Shelleyর নিকট কবিতা একটা সুন্দর অপরূপ ভাবরাজ্য গঠন করার উপায় মাত্র—সে রাজ্যে সমাজের বন্ধন—সুখদুঃখ নাই, আছে, শুধু স্বাধীনতা, পবিত্র প্রেম ও বন্ধুত্ব। তিন জনই প্রতিভাবান্, কবি, তিনজনই বর্ত্তমানের অসংখ্য অসম্পূর্ণ বন্ধনকে দূরে নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনজনই ব্যক্তিপূজার পুরোহিত। কিন্তু ইঁহাদের সকলেরই সাহিত্যের সহিত জাতীয় জীবনের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাঁহাদের সাহিত্য ব্যক্তিগত ছিল,—সমগ্র সমাজের চিন্তা ও কষ্টের উপর উহার প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। আমরা এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য ও সমাজের বিয়োগ

তাহার পর একযুগ চলিয়া গিয়াছে। Shelley ও Byron-এর কবিতার আবেগ ও জ্বালার পরিবর্ত্তে এখন ধীর চিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণ আসিয়াছে। Landor ও Keatsএ যে শিল্প ও কলানৈপুণ্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা Mrs. Browning, Hood, Mathhew Arnold ও Proctor এর কবিতা-জীবনের ভিতর দিয়া অবশেষে Tennysonএর নিকট চরম উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছে। সকলেরই মধ্যে Wordsworthএর কল্পনা ও আত্মচিন্তা রহিয়াছে। Browning ও Swinburneএ গভীর চিন্তা-বিশ্লেষণের উৎকর্ষ-সাধন, Swinburneএ সমাপ্তি দেখা গিয়াছে। কবিতা যে পথে এতকাল ধীরভাবে অগ্রসর হইয়াছে, এখন তাহা সে পথের সীমানায় আসিয়া পৌছিয়াছে। আর ক্রমবিকাশের কারণ ও আয়োজন নাই। 'ততঃ কিম্' নাই। তাই এখন যাহা কিছু নূতন, দেশের এখনকার চিন্তা-জীবনের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ নাই, যাহা কিছু বিদেশের সরস নবীনতাপূর্ণ, তাহাই আদৃত হইতেছে। পুরাতন নিয়মে পুরাতন ধারায় ইংরাজী কবিতা আর বিকাশলাভ করিবে না।

আমরা যে সকল কবির নাম উল্লেখমাত্র করিলাম, তাঁহাদের সকলেরই কবিতা, নাট্য ও কাব্য ব্যক্তিগত ছিল, সমাজকে গভীরভাবে আন্দোলিত করিতে পারে নাই। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে poet-laureate-গণ রাজার সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপার তাঁহারা কেহই প্রচার করেন নাই। যখন Parliamentএর বক্তৃতায়, বড় বড় সহরের মহাসভায়, খবরের কাগজপত্রে, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বহুবৎসর ধরিয়া চলিল, তখন Rudyard Kipling তাঁহার কলম ধরিলেন। অথচ ইংরাজ সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় আদর্শ—সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দ্বারা জগতে শিক্ষা ও ধর্ম্মবিস্তার;

—সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা সাম্রাজ্য-রক্ষার দ্বারা জগতে নিজেদের গৌরব অটুট রাখা।

জার্ম্মান জাতীয় জীবনের উপর Goethe ও Schillerএর প্রভাব—Aufklarung

জার্ম্মান-সাহিত্যে এ অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয় না, কারণ জার্ম্মানীতে সাহিত্যজাতির জীবন্তভাবের—প্রাণের প্রতিমূর্ত্তি। সেখানে জাতীয় আদর্শের সহিত সাহিত্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। সেখানে সাহিত্যের গতি সমাজের অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জার্ম্মান-সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের মত রাজসভায় ধনিগৃহে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিপুষ্ট হয় নাই। জার্ম্মান-সাহিত্যের প্রাণ জার্ম্মানজাতির হৃদয়ে। তাই যখন জার্ম্মান-সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবজীবন লাভ করিয়াছিল; তখন সমগ্র সমাজে এমন একটা আন্দোলন হইয়াছিল, যাহাতে জার্ম্মানজাতি একবারে নূতন প্রাণ পাইয়াছে। Schillerএর Robbers সমাজে একটা অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন আনিয়াছিল। Byronএর Childe Harold ও Walter Scottএর Waverly নভেলের প্রভাবের তুলনা উহার সহিত করা যায় না। Schillerএর সহিত সমগ্র জার্ম্মানজাতি ভাবিল যে, স্বাধীনতা সহর হইতে এখন বনে নির্ব্বাসিত, এবং সকলেই দস্যু Karl Moorএর ন্যায় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। Schillerএর Cabale und liebeএ যখন তাহারা পড়িল, তাহাদের ঘৃণিত রাজা কিরূপে দুর্ভাগ্য সৈন্যদিগকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইবার জন্য ইংলণ্ডের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন, তখন তাহারা রাষ্ট্র-সংস্কার জাতির প্রধান প্রয়োজন বলিয়া বুঝিল। তাঁহার Don Carlosএ যখন Marquis Posa বলিয়া উঠিল, Sire, give us freedom of Speech, তখন সমগ্র জাতির অন্তঃস্থল হইতে সে বাণী উচ্চারিত হইল। Schiller প্রভৃতি কবিগণই তখন জার্ম্মানজাতির হৃদয়ে জার্ম্মান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দুই জন নেপোলিয়নের বীরত্ব ও বাহুবল জার্ম্মানজাতির নিকট হইতে সে রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারেন নাই। Schillerএর আত্মাই অলক্ষ্যে Waterloo ও Sedon যুদ্ধক্ষেত্রে জার্ম্মান সৈনিকগণের জয়লাভের সহায় হইয়াছিল। প্রথমে নেপোলিয়ন, তাহারপর, দেশীয় রাষ্ট্রের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সমগ্র জার্ম্মান জাতি স্বাধীনতার যুদ্ধে যে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ—জার্ম্মান-সাহিত্যের সার্ব্বজনীন, এবং জাতীয় জীবনে এই সার্ব্বজনীন সাহিত্যের প্রভাব।

WEIMARISM.

তাহার পর এক যুগ চলিয়া গিয়াছে। Goethe ও Schillerএর যৌবনকালের নাট্যের আবেগ ও জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে কলা ও শিল্পনৈপুণ্য আসিয়াছে। Goethe ও Schiller, Weimarএ গিয়াছেন। Schlegel সুন্দরভাবে Shakespeareএর অনুবাদ করিলেন। এদিকে Goethe ও Iphigenia ও Faust রচনা করিলেন। জার্ম্মান-কবিতায় কারুকার্য্য, শিল্পনৈপুণ্য ও অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যের পরিচয় পাওয়া গেল।

গ্রীক সাহিত্যের সৌন্দর্য্য জার্ম্মান-সাহিত্যে Goethea Hermann and Dorothea ও Schillerএর William Tellএ "classicism"এর পরাকাষ্ঠা প্রতিফলিত হইল। Weimarএ এই গ্রীকসাহিত্য পুনর্জ্জীবিত হইল। কিন্তু বিপরীত দিকে স্রোত ফিরিতে বিলম্ব হইল না। জাতীয় জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যে সম্বন্ধ শিথিল হইতেছিল, তাহার প্রতিরোধ হইল।

আধুনিক য়ুরোপের সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ

আমরা পূর্ব্বে ইংরাজী সাহিত্যে Romanticism সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি,—Wordsworth, Shelley, Byron প্রভৃতি সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছিলেন, প্রচলিত রচনাপদ্ধতি ও আদর্শ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা সমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নূতনভাবে সম্বন্ধস্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সাহিত্যে নূতন ভাব ও নূতন আদর্শ আনয়ন করিয়াছিলেন, রূপের মোহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ভাবের খেলায় মুগ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন, ভাষার পারিপাট্য অপেক্ষা ভাবের মাধুর্য্যকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের সাহিত্য ব্যক্তিগত ছিল, কারণ তাঁহারা যে ভাবের রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন তাহার সহিত জাতীয় জীবনের কোন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। Burnsএর সাহিত্যে

সে সামঞ্জস্য ছিল, Sturm und drungএর জার্ম্মান-সাহিত্যে সে সামঞ্জস্য ছিল; Wordsworth, Shelly ও Byron-এর কবিতায় সে সামঞ্জস্য ছিল না। Goethe ও Schiller-এর প্রথম যুগের কাব্যে ও নাট্যে সে সামঞ্জস্য ছিল, কিন্তু Goetheর Hermann and Dorotheaতে, Schiller-এর William Tellএ, তাঁহাদের Weimanismএ সে সামঞ্জস্য ছিল না। ইংলণ্ডে সে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা হইল না। বরং অসামঞ্জস্য আরও বৃদ্ধি পাইল। পরের যুগের সাহিত্য Mathew Arnold, Browning or Swinburneএর সাহিত্য দুই কারণে জাতির হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই,—প্রথমতঃ নবযুগের প্রারম্ভের কবিগণ ভাষার পারিপাট্য উপেক্ষা করিয়া যে সাহিত্যস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, শেষে তাহার প্রতিরোধ হইল, ইংরাজী সাহিত্যে পুনরায় ভাষার সমাদর, রূপের প্রতি অনুরাগ—classicism ফিরিয়া আসিল। দ্বিতীয়তঃ যে ভাবের রাজ্য তাঁহারা গঠন করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ স্বপ্নের রাজ্যে পরিণত হইল, ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি সে রাজ্য-গঠনের একমাত্র উপাদান ছিল না, বাস্তব-জীবনের বন্ধন ও সম্পূর্ণতা ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই তাহা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বাস্তব-জীবনের বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল, অথচ মুক্তি অসম্ভব বলিয়া, নিরাশার অন্ধকার, অবশেষে Mephistophelesএর হৃদয়ের অন্ধকারের মত, সে রাজ্যকে ঘিরিয়া ফেলিল। নেতি নেতি, অবশেষে Scepticism, Nihilis in Pessimism, Social revolt—ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রে অবিশ্বাসে পরিণত হইল। আমরা সাহিত্য ও সমাজের বিয়োগের চূড়ান্ত শেষে পাইলাম।

Hegel কর্ত্তৃক Weimanismএর আত্মসর্ব্বস্বতার প্রতিরোধ

Goethe ও Schiller শেষ বয়সে জার্ম্মান-সাহিত্যে যে ভাষার পারিপাট্য, ও কারুকার্য্য—যে রূপের আদর—Classicism, আনিতেছিলেন, "Romantiker"গণ তাহা হইতে সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। Schlegel Novalis, Eichendorff ও Heine এই নূতন আন্দোলনের নেতা—Sturm und drung সাহিত্যিকগণের উত্তরাধিকারী। এই নূতন আন্দোলন অবশেষে—Heineএর সাহিত্যে তাঁহার নিজের দোষ নিজেই প্রকাশ করিল। অত্যধিক আত্মম্ভরিত্বের ভারে সাহিত্য পঙ্গু হইয়া পড়িল। ব্যক্তির প্রবৃত্তির তাড়নায় সাহিত্য জর্জ্জরিত হইল। তখন Hegel তাঁহার বিশ্ব-বিজ্ঞান লইয়া সাহিত্যজগতে অবতীর্ণ হইলেন। ব্যক্তি নহে, ব্যক্তির প্রবৃত্তি নহে,—সমগ্র মনুষ্যজাতি, বিশ্বজগৎ,—বিশ্বমানবের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বিশ্ব-বিজ্ঞানের কেন্দ্র। Fichte ও Schellingএর যুগ চলিয়া গেল। ব্যক্তি এখন ভাবরাজ্যের কেন্দ্র হইবে না। Romanticismএর কুফল হইতে জার্ম্মান সমাজ ও সাহিত্য রক্ষা পাইল। দার্শনিক Hegel চিন্তা-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন। সমাজ, জাতি, ও বিশ্বমানবের আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

আধুনিক জার্ম্মান-সাহিত্য

তাহার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানী সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দেশে নূতন নূতন সমস্যা আসিয়াছে। সাহিত্যেও পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মান-সাহিত্যের জন্ম হইতে যে একটা সার্ব্বজনীন ভাব ছিল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। এখনও জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষাই সাহিত্যে প্রকাশিত হইতেছে; শুধু ভাষা ও রচনাপ্রণালী, classicism আন্দোলনের ফলে, আরও মার্জ্জিত হইয়াছে; রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ফলে বর্ণনা আরও গভীর হইয়াছে। Realism আরও বিচিত্র হইয়াছে। আর এক বিশিষ্টতা বিশেষ লক্ষিত হইতেছে। জার্ম্মানীর ছোট ছোট রাজ্যে সাহিত্যের বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তজ্জন্য জার্ম্মান-সাহিত্যের বৈচিত্র্য আছে। ইংলণ্ডের সাহিত্য ও চিন্তায় সেরূপ বৈচিত্র্য নাই। লণ্ডনই দেশের সমগ্র চিন্তা ও সাহিত্যের আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, মফঃস্বলের সমস্ত বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য মুছিয়া ফেলিতেছে। জার্ম্মানীর ছোট ছোট রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য-হেতু জার্ম্মান-সাহিত্য সতেজ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু মফঃস্বলের সাহিত্যের বিশেষত্ব সাহিত্যের রাজধানী Weimarকে অবজ্ঞা করে নাই।

Suddermann ও Hauptmannএর সাহিত্যে দরিদ্রের ক্রন্দন ও জাতীয় সমস্যা

এদিকে রাষ্ট্রীয় রাজধানী Berlinএ শ্রমজীবীদিগের সহিত ধনিগণের সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদিগণ

Berlinএই তাঁহাদের মত প্রচার করিতেছেন। কবি ও নাট্যকারগণ সেই খানেই দরিদ্রের নির্যাতন, খৃষ্টান জগতে ধনীর অভিমান সমাজকে দেখাইতেছেন। Suddermann তাঁহার "Ehre und Heimat"এ তাহা সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন; Hauptmann "Weaver"দিগের দুঃখ-কাহিনী গায়িয়াছেন; মাতালের কন্যা "Hunnele"র করুণ ক্রন্দন সমাজকে শুনাইয়াছেন। জার্ম্মান-সাহিত্য দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এখন Social democrat-গণ খুব প্রবল হইতেছে।

জার্ম্মান-সাহিত্য—সার্ব্বজনীন

সমাজের সহিত—জাতীয় জীবনের সহিত জার্ম্মান-সাহিত্যের বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে Luther সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া Schlegel বলিয়াছিলেন,—

"No other country in modern Europe has possessed so many remarkable, comprehensive,. powerful and intellectually important *popular* writers as Germany. How inferior soever the higher classes of Germany may have been during same ages and those of other lands, or how late soever they may have attained to a fair standard of refinement : in no other country did *the people as a whole*, evince so great a degree of general mental power from the earliest times on record, or so much of that natural energy which lies in the depths of humanity."

ইহার যথার্থতা আরও প্রতীয়মান হইতেছে। একজন আধুনিক সমালোচক সম্প্রতি বলিয়াছেন, Germany presents the grandest example of what popular literature can do for a nation.

বাঙ্গালা সাহিত্যে Romanticism

য়ূরোপীয় সাহিত্যে Romanticism এর মত আমাদের সাহিত্যেও যুগান্তর আসিয়াছে। সাহিত্যে নূতন চিন্তা নূতন আদর্শ পৌঁছিয়াছে। জার্ম্মান-সাহিত্যে Sturm und drungএর কবিতার মত, ইংরাজী সাহিত্যে Wordsworth, Shelley, Byron এর কবিতার মত, বাঙ্গালা সাহিত্যের গীতিকাব্যে সমাজ-জীবনের সহিত ব্যক্তিগত চিন্তার বিরোধ, ও তাহার ফলে অশান্তি ব্যাকুলতা—Sturm and drung—বিপ্লবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই বিপ্লব-সাধনের ফলে, বাঙ্গালার সাহিত্য পর্ব্বত-গুহায় সুপ্ত নির্ঝরের মত নূতন আলোক পাইয়া স্বপ্নের মোহ ত্যাগ করিয়াছে, এখন সে নূতন প্রাণে নূতন আশায় সমস্ত সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিতেছে

"আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা
আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।"

কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" আমরা সাহিত্য-জগতে এই যুগান্তরের চিত্র প্রতিফলিত দেখিতে পাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা Sturm and drungএর অশান্তি ও ব্যাকুলতার পরিচয় পাই, Goethe র Werther ও Schillerএর Robbersএর অশান্তি ও ব্যাকুলতা পাই, Wordsworthএর মত ক্লিষ্ট মানবাত্মার প্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণ পাই,—What man has made of man পাই,—Byron ও Shelleyর বিপ্লববাদ পাই, নূতন করিয়া জগৎ গড়িবার আকাঙ্ক্ষা পাই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের আত্মসর্ব্বস্বতা

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা ভাবের রাজ্য তাহার সহিত বাস্তবজীবনের সামঞ্জস্য নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাবের রাজ্য স্বপ্নের রাজ্য, Shelleyর মত একটা Utopia। তাহার সবই সুন্দর, সবই মহৎ, শুধু তাহা সজীব নহে। রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। "প্রকৃতির পরিশোধ," "অচলায়তনে" তিনি এক অপরূপ জগৎ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন; Goethe ও Schiller, Novalis ও Heine যে বস্তুর জগৎ গড়িয়াছেন, তিনি সে জগৎ গড়িতে পারেন নাই; তাঁহার জগৎ স্বপ্নের জগৎ, তাহা তাঁহার কল্পনায় ধারণা হইয়াছে মাত্র, জাতির হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহার "গোরায়" আমরা একটি সজীব বস্তুর জগৎ-গঠনের উপাদান পাইয়াছি মাত্র; সে উপাদানগুলি ব্যবহার করিয়া একটি সম্পূর্ণ বাস্তব-জগৎ এখনও গঠিত হয় নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা

আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য ও নাট্যের এই অসম্পূর্ণতার জন্যই ভাষা ও রচনা-প্রণালী জটিল হইয়া পড়িতেছে, ইংরাজী সাহিত্যে Romanticismএর একজন নেতা Wordsworth, যে দৈনন্দিন জীবনের ভাব ও ভাষা কবির লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহার উল্টা আমরা করিতেছি। দৈনন্দিন জাতীয় জীবন হইতে দূরে থাকায় আমাদের সাহিত্য কৃত্রিম, পঙ্গু হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতার প্রধান কারণ,—কবিগণের ভাবপ্রবণতা, আত্মসর্ব্বস্বতা, সাত্মকেন্দ্রকতা Egoistic subjectivity. বাস্তব-জগতের অভাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজেদের কল্পনার তৃপ্তিসাধন, অথবা উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, ইহার কারণ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থাহেতু আমাদের কর্ম্ম-প্রবণতার অভাব। তাই আমাদের সাহিত্য চিন্তার সহিত বাস্তব-জীবনের বিরোধ কিছুতেই ঘুচাইতে পারিতেছে না। দেশে কর্ম্মপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে, সাহিত্যক্ষেত্রে আর একবার যুগান্তর আসিবে। তখন আমাদের সাহিত্য Shelley, Byron এর সাহিত্যের মত শুধু একটা অশান্তি, একটা ব্যাকুলতা, একটা নূতন সমাজ গড়িবার আকাঙ্ক্ষা, প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না; তখন সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লববাদের সহিত অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে, তখন চিন্তার সহিত বাস্তবজীবনের অতিসুন্দর সমন্বয়-সাধন হইবে, একটা নূতন জগৎ সৃষ্ট হইবে; জার্ম্মান-সাহিত্যের মত আমাদেরও সাহিত্য Goethe ও Schiller, Suddermann ও Hauptmann প্রভৃতির ন্যায় কবিগণ-সমন্বিত হইয়া একটা সজীব বাস্তব-জগৎ গড়িবেন; সে জগতে সমগ্র সমাজের দীন দরিদ্র ধনী মধ্যবিত্তদের অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রতিফলিত হইবে; তখন আমাদের সাহিত্য সার্ব্বজনীন হইবে, দেশের হৃদয় দেশের প্রাণকে আন্দোলিত করিবে, মাতাইতে পারিবে এবং তখনই আমাদের কবিগণ "স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তি"-স্বরূপ আমাদের "বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের" পুষ্পাঞ্জলি পাইবেন।

স্বদেশে নূতন কর্ম্ম ও নূতন চিন্তার সূচনা হইয়াছে; স্বদেশাত্মার বাণীমূর্ত্তির স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠার আর বিলম্ব হইবে না।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

ভক্তের আহ্বান

ভোমরা, তুই কত মধু আজ পিবিরে,
প্রাণভরা মধু, কত নিবি,
নে, নে, নে।
বায়ু আজ বহে মধুরে,
চাঁদে আজ কত মধু ঢালেরে,
মধুনদী বহে পরাণে,
ও মধু তুই কত নিবি,
নে, নে, নে।
মধু পিয়ে, ভোমরা আমার, নাচিবি,
মধুমাঝে, মধুকর, তুই ডুবিবি,
বিভোল হবি মধুপানে রে,
ও ভোমরা, তুই কত নিবি,
নে, নে, নে।
প্রাণে, দেখ্ কত মধু উথলে,
আয়রে, ভোমরা, তুই আয়রে সদলে,
নিমাই নিতাই সবে নিয়ে রে,
ও মধু তুই কত নিবি,
নে, নে, নে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত

উদ্ভিদের স্নায়বিক উত্তেজনা
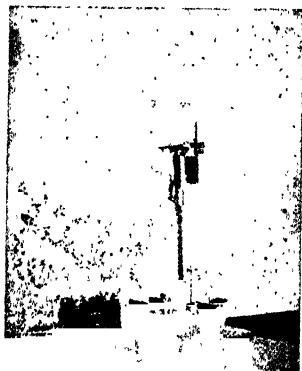
তরুলিপি যন্ত্র

লজ্জাবতী-লতার ছোট ডালে আঘাত করিলে কিছুক্ষণ পরে সেই আঘাতটা বাহিত হইয়া নিকটস্থ পাতার গোড়ায় গিয়া পৌঁছে এবং পাতাটিকে গুটাইয়া দেয়। প্রাণীর দেহে আঘাত করিলেও কিছুক্ষণ পরে আঘাতের উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছে এবং তাহাতেই প্রাণী বেদনা অনুভব করে। অবশ্য উদ্ভিদের দেহে উত্তেজনা-পরিবাহণে যে সময় যায়, প্রাণিদেহে তাহা লাগে না; কিন্তু একটু যে সময় লাগে তাহা বহু পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে স্থির হইয়াছে। ভেকের পায়ে চিম্‌টি কাটিলে এই উত্তেজনার প্রবাহ তাহার মস্তিষ্কে পৌঁছিতে এক সেকেণ্ডের এক শত ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। সময়টা খুবই অল্প বটে, কিন্তু ইহা অল্প বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

যাহা হউক, কি প্রকারে প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে উত্তেজনা প্রবাহিত হয়, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ যাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইঁহারা প্রাণিদেহের উত্তেজনা-বহনের যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, উদ্ভিদ্-সম্বন্ধে তাহা প্রয়োগ করিতে চাহেন না। যে স্নায়ুজাল প্রাণিদেহকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তাহাই উত্তেজনার বাহক। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ বৃক্ষাদির দেহে স্নায়ুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কাজেই উত্তেজনা-বহনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া অপর

স্পন্দনলিপি-যন্ত্র

কথার অবতারণা করেন। ইঁহারা বলেন, আঘাত করিলে বৃক্ষের আহত স্থানের জলীয় অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, এবং ইহাতে যে জলের প্রবাহ হয়, তাহাই কোন গতিকে লজ্জাবতী প্রভৃতি বৃক্ষের পত্রমূলে পৌঁছিয়া পাতা গুটাইয়া দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উদ্ভিদে উত্তেজনার প্রবাহ বাহিরের ব্যাপার, জীবনের ক্রিয়ার সহিত তাহার যোগ নাই। কিন্তু প্রাণিদেহে উত্তেজনার প্রবাহ একটা শারীরিক ব্যাপার; দেহের ক্রিয়ার সহিত ইহা একবারে জড়িত। উদাহরণ চাহিলে ইঁহারা বলেন, প্রাণীর কোন অঙ্গ ঈথর বা ক্লোরোফরম্ প্রয়োগে অবশ করিয়া তাহাতে চিম্‌টি কাটিতে আরম্ভ কর, চিম্‌টির উত্তেজনা প্রবাহিত হইবে না, কাজেই বেদনাও অনুভূত হইবে না। লজ্জাবতী বা অপর কোন লাজুক গাছের শাখা পোড়াইয়া বা ক্লোরোফরম্ দ্বারা অবশ করাইয়া, উত্তেজনা প্রয়োগ কর, দেখিবে উত্তেজনা সেই সকল মৃত বা মৃতপ্রায় অংশের ভিতর দিয়া চলিতেছে এবং দূরবর্ত্তী পাতাগুলিকে গুটাইয়া দিতেছে।

আমাদের স্বদেশবাসী পরমপণ্ডিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু-মহাশয় উদ্ভিদে উত্তেজনার পরিবাহণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে সন্দিহান হইয়াছিলেন। কএক বৎসর এসম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি সম্প্রতি প্রাণী ও উদ্ভিদের উত্তেজনা-বহনে যে সকল সুন্দর ঐক্য দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। প্রাণীর দেহে স্নায়ুজাল যেমন উত্তেজনা বহিয়া বেড়ায়, উদ্ভিদ্‌দেহেও যে, সেই

স্নায়ুই উত্তেজনা বহন করে, আচার্য্যবর তাঁহার তরুলিপি-যন্ত্র * দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আঘাত দিলেই জীব-দেহ সাড়া আরম্ভ করে না। আঘাত-প্রাপ্তির পরে উহা কিছুক্ষণ নিস্পন্দ অবস্থায় থাকে, শেষে উত্তেজনাটা এক নির্দ্দিষ্ট বেগে দেহের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করে। প্রাণী ও উদ্ভিদ্ উভয়েই এই নিয়মের অধীন। বিজ্ঞানের ভাষায় এই নিস্পন্দ কালটিকে Latent period বলে।

আমরা উহাকে "অনুভূতির কাল" নামে অভিহিত করিব। বৃক্ষের স্নায়বিক উত্তেজনার কাল-নির্দ্ধারণ করিতে "অনুভূতি-কাল" অগ্রে জানা প্রয়োজন।

১ম চিত্র

প্রথম চিত্রখানি একটি লজ্জাবতীর শাখার অনুভূতি-কাল জ্ঞাপন করিতেছে। তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনী যাহাতে প্রতি সেকেণ্ডে এক শত বার আন্দোলিত হয়, লিপি-গ্রহণের পূর্ব্বে আচার্য্য বসু মহাশয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। কাজেই চিত্রে যে সকল বিন্দু সজ্জিত রহিয়াছে, তাহাদের ব্যবধানগুলি এক সেকেণ্ডের এক শত ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় সূচনা করিতেছে। লম্বভাবে অবস্থিত রেখাটি উত্তেজনা-প্রয়োগের সময় জ্ঞাপন করিতেছে।

এখন পাঠক চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিবেন, উত্তেজনা-প্রয়োগের অব্যবহিত পরে লজ্জাবতী সাড়া দিতে আরম্ভ করে নাই; স্পন্দনশীল লেখনীটি লিপিফলকে একে একে দশটি বিন্দু অঙ্কিত করিলে গাছ সাড়া সুরু করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এক সেকেণ্ডের এক শত ভাগের এক ভাগ সময়ে এক একটি বিন্দু অঙ্কিত হয়। কাজেই এখানে ঐ দশটি বিন্দু অঙ্কিত হইতে $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছিল। সুতরাং বলিতে হয়, পরীক্ষিত লজ্জাবতীর শাখাটির অনুভূতি-কাল $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড।

এই হিসাবটি ঠিক্ হইল কি না নিঃসন্দেহে স্থির করিবার জন্য শাখাটিকে কুড়ি মিনিট বিশ্রামের অবকাশ দিয়া বসু-মহাশয় তাহারই দ্বিতীয় সাড়া অঙ্কন করিয়াছিলেন। চিত্রের নিম্নস্থ সাড়ালিপিটি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখানেও অনুভূতি-কাল $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড দেখা গিয়াছিল।

অনুভূতি-কাল নির্ণয়ের জন্য কেবল দুইটা পরীক্ষা করিয়াই আচার্য্য বসুমহাশয় ক্ষান্ত হন নাই; শত শত লজ্জাবতী-লতার নানা অবস্থার সাড়ালিপি অঙ্কন করিয়া তিনি অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাণীর দেহের উপরে ঋতুর প্রভাব যথেষ্ট আছে সত্য, কিন্তু উদ্ভিদের দেহের উপরকার প্রভাবের তুলনায় তাহা যে, অনেক কম, বসুমহাশয় ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। গ্রীষ্মকালে গরমের দিনে লজ্জাবতীর অনুভূতিকাল খুব অল্প থাকে, কিন্তু শীতকালে যখন দেহের কোষগুলি আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, তখন আঘাত-প্রাপ্তির অনেক পরে লজ্জাবতীর সাড়া পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া উত্তাপের দিনে, অবসন্ন করিলে বা উত্তেজক ঔষধাদি প্রয়োগে জাগ্রত করিলে অনুভূতি-কালের যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাও আচার্য্য বসুমহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন। অবসাদ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি দেখিয়াছেন, লজ্জাবতীকে একবার আহত করিলে আঘাতের প্রভাব তাহার দেহে গ্রীষ্মকালে কুড়ি হইতে পঁচিশ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। এই কারণে প্রত্যেক আঘাতের পরে বিশ্রামের অবকাশ না দিলে লজ্জাবতী প্রকৃতিস্থ হয় না। অবসন্ন লজ্জাবতীর দেহে ক্রমাগত আঘাত করিতে থাকিলে তাহার সাড়া দিবার শক্তি কমিয়া আসে এবং শেষে তাহা অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়ায়।

তাপ-প্রয়োগ করিলে আঘাত-অনুভূতির কাল কিপ্রকার দাঁড়ায়—আচার্য্য বসুমহাশয় তাঁহারও পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে দেখা গিয়াছে, তাপের পরিমাণে অনুভূতি-কালের

* এই যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ "বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের তরুলিপি-যন্ত্র" নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পরিমাণ কমিয়া আসে। একটি পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে ২৩ ডিগ্রি উচ্চতায় আঘাত পাইয়া যে শাখা ·১৬৫ সেকেণ্ড পরে সাড়া দিয়াছিল, তাহাই ৩৩ ডিগ্রি উচ্চতায় সাড়া দিতে ·৫৬৫ সেকেণ্ড অতিবাহন করিয়াছিল।

নানা ইতর-প্রাণী ও মানুষের দেহের স্নায়ুজাল কিপ্রকার বেগে উত্তেজনা বহন করে, মোটামুটি তাহা আমাদের জানা আছে। আচার্য্য বসুমহাশয় লজ্জাবতীর ন্যায় উদ্ভিদের দেহে কিপ্রকারে উত্তেজনার বেগ অবধারণ করিয়াছেন, এখন তাহা আলোচনা করা যাউক।

হিসাবটা অতি সহজ। মনে করা যাউক, যেন লজ্জাবতীর কোন ডালের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উত্তেজনা প্রয়োগ করা গেল এবং এই স্থান হইতে ডালের নিকটতম পাতার দূরত্ব যেন ছয় ইঞ্চি। এখন যদি উত্তেজনা-প্রয়োগের তিন সেকেণ্ড পরে ঐ পাতাটি বুজিয়া আসে, তবে বুঝিতে হইবে উত্তেজনাটি ছয় ইঞ্চি পথ গমন করিতে তিন সেকেণ্ড কাল ক্ষয় করিয়াছে; অতএব উত্তেজনার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে দুই ইঞ্চি মাত্র। কিন্তু ঠিক্‌ এই হিসাবে প্রকৃত বেগ-নির্ণয় হয় না। কারণ উত্তেজনা-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহা বৃক্ষদেহে চলিতে আরম্ভ করে না; প্রত্যেক গাছেরই যে একটা "আঘাত-অনুভূতির" (Latent Period) কাল আছে, তাহা অতিবাহিত হইলে উত্তেজনা চলিতে সুরু করে। এই কারণে উত্তেজনার বেগ-নির্ণয়ের চেষ্টার পূর্ব্বে আচার্য্য বসুমহাশয় তাঁহার তরুলিপি-যন্ত্র দ্বারা গাছটির আঘাত-অনুভূতির কাল স্থির করিয়া রাখেন। তা'র পর কোন নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে পৌছিতে উত্তেজনাটি যে সময় ব্যয় করিল, তাহা হইতে অনুভূতি-কাল বাদ দিয়া উত্তেজনার যথার্থ বেগ নির্দ্ধারণ করেন। দূরত্বকে সময়ের পরিমাণ দিয়া ভাগ দিলেই বেগের পরিমাণ পাওয়া যায়। ডাক্তার বসু এখানেও সেই হিসাব করেন। উত্তেজনা-প্রদান ও সাড়া-প্রাপ্তির মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান থাকে, তাহা হইতে অনুভূতির কাল বাদ দেওয়া হয়; তা'র পরে, আহত স্থান ও সাড়া-প্রদানের স্থানের ভিতরকার ব্যবধানটিকে সময় দিয়া ভাগ দিলে, উত্তেজনার যথার্থ বেগ-নির্দ্ধারণ করা হয়।

বলা বাহুল্য, এই বেগ-নিরূপণ-ব্যাপারে গাছের নড়াচড়া পরীক্ষককে মোটেই লক্ষ্য করিতে হয় না এবং কাগজ কলম লইয়া প্রকাণ্ড হিসাবেও বসিতে হয় না। তরুলিপি-যন্ত্রের কম্পমান লেখনী লিপিফলকে যে সকল বিন্দুপাত করিয়া যায়, তাহা গুণিয়াই বৃক্ষের আঘাত-অনুভূতির এবং উত্তেজনা পরিবাহণের কাল অতি সূক্ষ্মরূপে জানা গিয়া থাকে।

একটি লজ্জাবতী-বৃক্ষের উত্তেজনার বেগ-নির্ণয়ের সময়ে বসুমহাশয় যে ছায়ালিপি পাইয়াছিলেন, দ্বিতীয় চিত্রখানি তাহারই অবিকল প্রতিলিপি। এই পরীক্ষায় নিকটবর্ত্তী পত্র হইতে ত্রিশ মিলিমিটার অর্থাৎ প্রায় সওয়া ইঞ্চি দূরে উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং তরুলিপি যন্ত্রের লেখনী যাহাতে প্রতি সেকেণ্ডে দশবার করিয়া লিপি-ফলক স্পর্শ করে, তাহার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল, অর্থাৎ যাহাতে দুইটি বিন্দুপাতের মধ্যে এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় ব্যয়িত হয়, যন্ত্রে তাহার ব্যবস্থা ছিল। চিত্রস্থ তিনটি সাড়ার মধ্যে সর্ব্বনিম্ন সাড়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক দেখিবেন, উত্তেজনা-প্রয়োগের পর লেখনীটি ষোলটি বিন্দু অঙ্কন করিলে গাছের সাড়া সুরু হইয়াছে। চিত্রস্থ

২য় চিত্র

দ্বিতীয় সাড়াটি ঐ বৃক্ষেরই আর একটা সাড়ালিপি। প্রথম উত্তেজনা-প্রাপ্তির পর গাছটিকে পনের মিনিট বিশ্রামের অবকাশ দিয়া এই সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। দুই সাড়া-লিপির মধ্যে কি প্রকার সূক্ষ্ম ঐক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, পাঠক চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিবেন।

এই চিত্রের সর্ব্বোপরি সাড়া লিপিটি সেই বৃক্ষের একবারে পত্রমূলে আঘাত দেওয়ার সাড়া জ্ঞাপন করিতেছে। আঘাত পাইবামাত্রই পাতা সাড়া দিতে আরম্ভ করে নাই। লেখনীটি ১/২ ম সেকেণ্ডে একবার বিন্দুপাত করিয়া পুনরায় অর্দ্ধপথে আসিবার সময়ে পাতা সাড়া সুরু করিয়াছিল। কাজেই এই ·১২ সেকেণ্ড সময়কে আঘাত-অনুভূতির কাল বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। সুতরাং সাড়া-প্রদানের মোট সময় ১·৬২ সেকেণ্ড হইতে আঘাত-অনুভূতির এই ·১২ সেকেণ্ড বাদ দিলে যে ১·৫ সেকেণ্ড অবশিষ্ট থাকে, সেই সময়েই উত্তেজনাটি ত্রিশ মিলিমিটার দূরত্ব অতিক্রম করিয়াছিল বুঝা যায়। এই হিসাবে উদাহৃত লজ্জাবতী-লতার উত্তেজনা-পরিচালন-বেগ সেকেণ্ডে কুড়ি মিলিমিটাব হইয়া দাঁড়ায়।

আচার্য্য বসুমহাশয় লজ্জাবতী-লতাকে বিচিত্র অবস্থায় ফেলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শত শত পরীক্ষায় তাহাদের উত্তেজনার বেগ-নির্ণয় করিতেছেন, এবং প্রত্যেক গাছের বিচিত্র পরীক্ষায় একই ফল পাইতেছেন। কিন্তু নানা ঋতুতে একই গাছের উত্তেজনার বেগ পরীক্ষা করিতে গিয়া ফলের মধ্যে ঐক্য দেখিতে পান নাই। শীতকালে গাছ আড়ষ্ট অবস্থায় থাকে, কাজেই এই অবস্থায় উত্তেজনা সহজে দেহের ভিতর দিয়া চলিতে পারে না। এই প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় কোন কোন গাছের উত্তেজনার বেগ কুড়ি মিলিমিটারের স্থলে চারি মিলিমিটারে নামিতে দেখা গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে গাছ সতেজ থাকে, এই অবস্থায় কোন কোন গাছ প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ মিলিমিটার বেগে উত্তেজনা বহন করিয়াছে।

উত্তেজনার হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত পরিচালন-বেগের কোনও পরিবর্ত্তন হয় কি না তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আচার্য্য বসু-মহাশয় অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, দুর্ব্বল ও নিস্তেজ গাছ মৃদু উত্তেজনা অপেক্ষা প্রবল উত্তেজনাই দ্রুত বহিয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রবল উত্তেজনার পুনঃপুনঃ তাড়নায় তাহাদের দুর্ব্বল দেহ সতেজ হইয়া পড়িলে, যে মৃদু উত্তেজনায় পূর্ব্বে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই, তাহাই সাড়া দেওয়াইতে আরম্ভ করে।

বৃক্ষদেহের ভিতর দিয়া উত্তেজনার পরিচালনা যদি শারীর-ক্রিয়ার সহিত জড়িত থাকে, তবে শরীরের অবস্থান্তরের সহিত উত্তেজনার পরিচালন-বেগের হ্রাসবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। উত্তেজনার পরিচালন যে সত্যই শারীর ক্রিয়ার সহিত জড়িত, পূর্ব্বের পরীক্ষাগুলির বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাপ-প্রয়োগে বৃক্ষের উত্তেজনা-পরিবাহণ-বেগের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া আচার্য্যবর এই ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট করিয়া দিতেছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আধুনিক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ গাছের ভিতর দিয়া উত্তেজনার প্রবাহকে বৃক্ষের রসের পরিচালনা বলিয়া থাকেন। যদি এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তাহা হইলে তাপের ন্যূনাধিক্যে উত্তেজনা-বেগের কোনও পরিবর্ত্তন না হইবারই কথা; কারণ কেবল বৃক্ষের জীবনের ক্রিয়ার উপরেই তাপের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষায় তাপদ্বারা পরিবাহণ-বেগের সুস্পষ্ট হ্রাসবৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। শীতকালে ২২ ডিগ্রি উত্তাপে যে লজ্জাবতী গাছ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় সাড়েতিন মিলিমিটার বেগে উত্তেজনা বহন করিয়াছিল, ৩১ ডিগ্রি উত্তেজনায় তাহাকেই প্রতি সেকেণ্ডে ৯ মিলিমিটার বেগে উত্তেজনা পরিবাহণ করিতে দেখা গিয়াছে। আচার্য্য বসুমহাশয় তাপবৃদ্ধির সহিত পরিবাহণ-বেগের বৃদ্ধির এই সম্বন্ধটা শত শত পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন।

আচার্য্য বসুমহাশয় পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাগুলি দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেও যে, উত্তেজনার চলাচল দৈহিক ক্রিয়ায় হইয়া থাকে, তাহা তিনি আরও অনেক পরীক্ষাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠকের বোধ হয় অবিদিত নাই, প্রাণিদেহের স্নায়ু ও পেশীতে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত (Cathode) সংলগ্ন করিবামাত্র দেহে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু ব্যাটারির অপর প্রান্তের স্পর্শে এই প্রকার উত্তেজনা দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, এই উত্তেজনাকে কখনই যান্ত্রিক উত্তেজনা বলা যাইতে পারে না। যাহা যন্ত্রবৎ চলে তাহা ধন (Positive) বা ঋণ (Negative) বিদ্যুতের খবর রাখে না; কিন্তু যখন প্রাণী বা উদ্ভিদের মত বস্তু বিচার-আচার করিয়া প্রযুক্ত শক্তিতে সাড়া দেয়, তখন বুঝিতেই হয়, এই ব্যাপারের সহিত জীবনের ক্রিয়া বর্ত্তমান। যাহা হউক প্রাণীর স্নায়ু ও পেশীর উপরে বিদ্যুতের যে-

সকল ক্রিয়া আমাদের সুপরিচিত রহিয়াছে, আচার্য্য বসুমহাশয় উদ্ভিদেও সেই সকল কার্য্য দেখিয়াছেন।

উদ্ভিদের দেহে স্নায়ুজাল নাই এবং আঘাতের প্রভাবে জলের প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পাতাগুলিকে গুটাইয়া দেয়, এই প্রচলিত সিদ্ধান্তটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, মৃদু আঘাতে লজ্জাবতীর মত লাজুক বৃক্ষ সাড়া দিতে পারে না। কারণ মৃদু আঘাতে উদ্ভিদের দেহে জলের প্রবাহ উৎপন্ন হয় না, কাজেই পাতায় জলের ধাক্কা পৌছায় না। কিন্তু আচার্য্য বসুমহাশয় শাখায় অতি মৃদু বৈদ্যুতিক আঘাত প্রদান করিয়া লজ্জাবতীকে সাড়া দিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার এই পরীক্ষায় প্রযুক্ত বিদ্যুতের প্রবাহ এত অল্প ছিল যে, সাধারণ উপায়ে তাহার অস্তিত্ব বুঝা যায় নাই, অথচ তাহাই বৃক্ষে প্রয়োগ করিবামাত্র সাড়া আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাণিদেহের ন্যায় উদ্ভিদ্‌দেহেও স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা যে উত্তেজনা প্রবাহিত হয়, ইহা দেখিয়া আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি।

প্রাণিদেহে Induction Coil প্রভৃতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যুতের আঘাত দিতে থাকিলে তাহাতে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি দেহটিকে গরম করা যায়, তাহা হইলে উত্তেজনার পরিমাণ বাড়িয়া চলে, এবং ঠাণ্ডা দিলে তাহা কমিয়া আসে। বৈদ্যুতিক আঘাত অবিচ্ছিন্ন হইলে কিন্তু এই কার্য্য দেখা যায় না; তখন তাপ প্রয়োগে উত্তেজনা কমিয়া আসে এবং ঠাণ্ডায় তাহাই বাড়িয়া যায়। এই ব্যাপারটিকে প্রাণিদেহেরই বিশেষত্ব বলিয়া জানা ছিল, এবং ইহার সহিত জীবনের ক্রিয়া যে জড়িত আছে তাহা প্রত্যক্ষ বুঝা যায়। তাপ ও শৈত্য প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক তাড়না দিলে উদ্ভিদে কি ফল উৎপন্ন হয়, তাহা জানিবার জন্য আচার্য্য বসুমহাশয় পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং পরীক্ষায় তিনি উদ্ভিদ্‌দেহকে প্রাণিদেহেরই মত সাড়া দিতে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং উত্তেজনার পরিবাহণ-ব্যাপারটা প্রাণী ও উদ্ভিদে যে মূলে এক, তাহা আর অস্বীকার করা যাইতেছে না।

প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌ তত্ত্ববিদ্‌গণ লজ্জাবতীর শাখায় বিষপ্রয়োগ করিয়া তাহাতে উত্তেজনা-পরিবাহণ-শক্তির হ্রাস দেখিতে পান নাই। বিষপ্রয়োগে দেহ বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও উদ্ভিদে উত্তেজনার পরিবাহণ দেখিয়াই তিনি মনে করিয়াছিলেন, উদ্ভিদে উত্তেজনার পরিবাহণ একটা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাপার অর্থাৎ উদ্ভিদের দৈহিক ক্রিয়ার সহিত ইহা একবারে সম্বন্ধ-বর্জ্জিত। সম্বন্ধ থাকিলে বিষপ্রয়োগে উদ্ভিদের দেহের বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে উহার উত্তেজনা-পরিবাহণ-শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটিত। প্রাণীর কোমল দেহে বিকৃতি আনিতে হইলে, যে পরিমাণ বিষপ্রয়োগের প্রয়োজন, কঠিন বর্ম্মে আবৃত উদ্ভিদ্‌দেহকে বিকার-গ্রস্ত করিতে হইলে যে, আরও অধিক বিষের প্রয়োজন, একজন বৈজ্ঞানিক এই কথাটি হিসাবের মধ্যে আনেন নাই। আচার্য্য বসুমহাশয় লজ্জাবতীর দেহে অধিক পরিমাণে তুঁতে (Copper Sulphate), পোটাসিয়ম্‌ সাইনাইড এবং মার্কিউরিক্‌ ক্লোরাইড প্রভৃতি বিষ প্রয়োগ করিয়া তাহাতে প্রাণীর দেহের অনুরূপই কার্য্য দেখিয়াছেন।

তুঁতের জল প্রয়োগ করায় লজ্জাবতীর উত্তেজনা-পরিবাহণ-শক্তি কি প্রকারে কমিয়া শেষে একবারে লয়-

৩য় চিত্র

প্রাপ্ত হইয়াছিল, তৃতীয় চিত্রে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। পত্রবৃন্ত হইতে ত্রিশ মিলিমিটার দূরে উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং পত্র ও উত্তেজনা-প্রয়োগের স্থানের ঠিক মধ্যদেশে তুঁতের জল দেওয়া হইয়াছিল। তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনী যাহাতে প্রতি সেকেণ্ডে লিপিফলকে এক শতটি বিন্দু অঙ্কন করে, আচার্য্য বসুমহাশয় পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন।
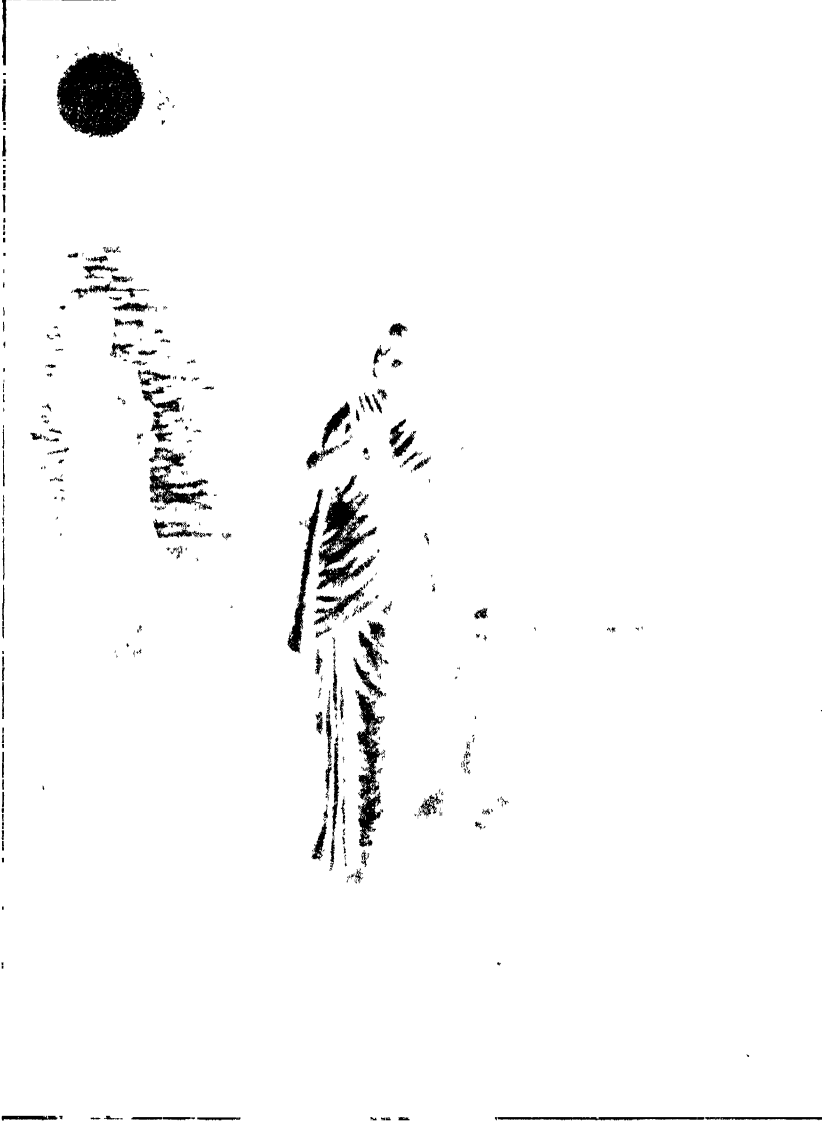
"হেরিল কে ছায়াময়ী লুটাইছে তাহারি চরণে !"

—জয়দেব ।

চিত্রশিল্পী—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র কুমার গোস্বামী]

কাজেই চিত্রের দুইটি পাশাপাশি বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী স্থান টুকু এক সেকেণ্ডের এক শত ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় জ্ঞাপন করিতেছে। বিষপ্রয়োগের পূর্ব্বে গাছটি যে প্রকারে উত্তেজনা বহন করিত, চিত্রের (১) চিহ্নিত অংশটি তাহাই প্রকাশ করিতেছে। চিত্র দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন, উত্তেজনা-প্রয়োগের পর সাতাইশটি বিন্দু অঙ্কিত হইলে সুস্থ উদ্ভিদ্‌টির পাতার গোড়ায় উত্তেজনা পৌঁছিয়াছিল। কুড়ি মিনিট কাল তুঁতের জল প্রয়োগ করার পরে, সেই শাখা দিয়া উত্তেজনাটি কিপ্রকারে পরিবাহিত হইয়াছিল, চিত্রের (২) চিহ্নিত অংশে তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পাঠক দেখিবেন এখানে পরিবাহণ-শক্তি কমিয়া আসিয়াছে। সেই ত্রিশ মিলিমিটার পরিমিত দূরে যাইতে উত্তেজনাটি এখন দশ ঘর অধিক সময় গ্রহণ করিতেছে। আরও কুড়ি মিনিট ধরিয়া তুঁতের জল প্রয়োগে পরিবাহণশক্তি কি প্রকার হইয়াছিল, পাঠক তাহা চিত্রের (৩) চিহ্নিত অংশে প্রত্যক্ষ করিবেন। এই অবস্থায় তরুলিপি-যন্ত্রের লেখনী কেবল সরল রেখা-ক্রমে বিন্দুপাত করিয়াই চলিয়াছিল, উত্তেজনা পত্রমূলে পৌঁছায় নাই।

পূর্ব্বোক্ত তুঁতের পরীক্ষার ন্যায় পোটাসিয়ম্—সাইনাইড প্রভৃতি বিষ প্রয়োগ করিয়াও আচার্য্য বসুমহাশয় উত্তেজনা পরিবাহণের পরীক্ষা করিয়াছেন এবং সকল গুলিতেই পরিবাহণ-শক্তির ক্রমিক ক্ষয় এবং শেষে তাহার সম্পূর্ণ লোপ দেখিয়াছেন।

পিচ্‌কারির হাতলে ঠেলা দিলে তাহার ভিতরের জল যেমন চাপ বহন করিয়া লইয়া যায়, উদ্ভিদের উত্তেজনা বহনটাও সেই প্রকার চাপের বহন, এই প্রচলিত সিদ্ধান্তটি যে, কত ভ্রমপূর্ণ আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাসিদ্ধ আবিষ্কারগুলির সাহায্যে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। প্রাণিদেহে যে প্রকারে উত্তেজনা বাহিত হয় উদ্ভিদ্‌দেহেও যে, সেই প্রকারেই উত্তেজনা চলা ফেরা করে, তাহা এখন স্বীকার করিতেই হইতেছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

জয়দেব

উত্তরিল স্বর্গ-দ্বারে গৌরকান্ত সুন্দর কিশোর
দণ্ড কমণ্ডলুধারী ব্রহ্মচারী তরুণ ভাস্কর;
বারীন্দ্র উন্মাদ শঙ্খে উদ্বেলিয়া নন্দিল তাহারে
ইন্দ্রনীল হিন্দোলাতে দিল দোল ফেন পুষ্পহারে—
অন্তর-মন্থন সনে মিশে গেল জগৎ-মন্থন,
ডাকিয়া এনেছে তারে কে অজানা আপনার জন!

বিরাট্ মন্দির-চূড়া, ছায়া যা'র পড়ে না ভূতলে,
ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মচারী লুটাইল সিংহদ্বার তলে;
রুদ্ধ তার বহির্নেত্র, মৃত্যুমুক্ত অনন্ত-জীবন—
বরণ-বেদীর'পরে অন্তরঙ্গ পূর্ণ সনাতন,
নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরূপোত্তম,—
অপত্য নিখিল প্রাণী তরুলতা স্থাবর জঙ্গম।—

কিশোর সেদিন হ'তে রহিল সে দেব-পুরীমাঝে,
হরিবাসরের বীণা সদা তার সুধাকণ্ঠে বাজে।

সে এক বরদা রাত্রি, পদ্মাসনে ধ্যান-নিরুচ্ছ্বাস
বসে' আছে ব্রহ্মচারী—নিমীলিত নয়ন-পলাশ—
আচম্বিতে পার্শ্বে তার উঠে বাণী দেউল-প্রাঙ্গণে—
কে ওই কহিছে ধীরে, কণ্ঠ-স্বর কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে—
"থাক, বৎসে, পদ্মাবতি, খোলা হেথা মুক্তির দুয়ার,
হেথা তোর চিরপ্রিয় হরিপূজা কর্ মা আমার।"

কোথা সে পরশমণি? শ্রান্ত প্রাণ পিপাসা-কাতর-
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস চেতনার উদ্বেল সাগর
মিশে গেল তন্দ্রাঘোরে—পদ্মাবতী হেরিল স্বপন—
মরুৎ-ডমরু-মন্দ্রে উতরোল অম্বুধি-গর্জ্জন,

পরিব্যাপ্ত জলে স্থলে নিশীথের নয়ন-কজ্জল,
ক্ষিপ্ত নভে জলস্তম্ভ, সংজ্ঞাহারা জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
সে প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে অর্দ্ধমগ্না উন্মাদিনী প্রায়
একান্ত আগ্রহভরে প্রাণ তা'র কা'র পানে ধায় ?—
সহসা ও কার মূর্ত্তি ? ঘিরিয়াছে জ্যোতির বলয় —
পদ-ক্ষেপে ফেনবিম্বে ফুটে উঠে লক্ষ কুবলয়।

স্বপ্নভঙ্গে দেখে বালা—শেষ রাত্রি রত্ন-তারকিতা
অলকে চন্দ্রের লেখা চেয়ে আছে যেন চিত্রার্পিতা ;
নিস্পন্দ মন্দির ব্যোম উথলিছে রজত তুফান,
অদূরে পড়িল চক্ষে ব্রহ্মচারী—মূর্ত্ত যেন ধ্যান—
না না এত স্বপ্ন নয়, ভালতটে মূর্চ্ছিত চন্দ্রিকা—
অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ দেবনেত্রে ব্রহ্মতেজঃ শিখা
বিস্ময়ে শুনিল পদ্মা দিব্য বাণী ভরে দেবালয় —
'ভক্ত ব্রহ্মচারী সনে কর, বৎসে, চিত্ত-বিনিময়।'

রজনী প্রভাতকল্পা—উদয়ের দেবতার পানে
চেয়ে আছে পদ্মাবতী—কুন্দকলি লুটায় পাষাণে !
ঘিরি' তারে প্রশ্ন করে জনতার নীরব রসনা
অকস্মাৎ পুরী মাঝে ওঠে রাজতূরীর ঘোষণা—
নবীনা কুমারী মূর্ত্তি নিরখিয়া মন্দির-দুয়ারে,
বিস্মিত অন্তরে রাজা সসম্ভ্রমে সুধাইল তা'রে—
"কাহার দুলালী তুমি ? হে নলিনি, কোন্ কূল হ'তে
নিশি শেষে, বৃন্ত ছিঁড়ে, ভেসে এলে নীল সিন্ধু-স্রোতে ?"

উত্তরিল পদ্মাবতী—নত করি সজল নয়ান—
"জনক জননী মোর যতদিন ছিল নিঃসন্তান
করিল মানসখণ পরশিয়া আরাধ্য-চরণ
'পুত্র হোক্, কন্যা হোক্ দেবতারে করিব অর্পণ—
তার পরে, রাত্রিশেষে হেথা বসি' শুনি স্বপ্নবাণী
দেবতা কহেন মোরে 'ধর বৎসে, ব্রহ্মচারি-পাণি।

কিছুই বুঝি না আমি—শঙ্কা ভরি সঙ্কল্পের নীরে
আনন্দের ধূপগন্ধে বসে আছি ধ্যানের মন্দিরে।
শুনিয়া পদ্মার কথা পুরীরাজ ভাবে মনে মনে—
'আজিও জানিনি বালা লুকাইতে লাজের বসনে,
মানস-বসন্তোদয়ে বিকশিত প্রসূন-পসরা—
অচেনার বাহুপাশে অকুণ্ঠিতা দিতে চায় ধরা—
তরঙ্গিয়া অঙ্গরাগে যৌবনের অনঙ্গ অনল
রূপের গোলাপ-বাগে ব্রহ্মচর্য্য করিবে নিষ্ফল!

কহে রাজা—"হে কুমারি র'বে তুমি দেবপুরী মাঝে,
সেবাব্রতে মনঃপ্রাণ নিবেদিয়া দেবতার কাজে।"
রাজাদেশে পদ্মাবতী রহে সেথা—কিন্তু তার চিতে
ব্রহ্মচারি-মুখকান্তি জাগে নিত্য জাগ্রতে সুপ্তিতে।
নিরজনে আঁখিজলে ভেসে যায় পূজা-আয়োজন—
কোথা কূল, কোথা ফুল কারে দেয় তুলসী-চন্দন!
জপমন্ত্র ভুলে গিয়ে ঝাঁপ দেয় সিন্ধুর খেলায়,
বারে বারে কূল পানে ফিরে আসে বেলা-বালুকায়,
উদ্‌ভ্রান্ত চাহিয়া দেখে দূরান্তরে নিখিল উৎপলে
প্রভাতী গায়ত্রী মূর্ত্তি অর্দ্ধোদিত বালার্কমণ্ডলে!
কি ভাবিছ পদ্মাবতী? কা'র কোলে এমনি করিয়া
বিশ্ব-মানবের ঊর্ম্মি রাত্রিদিন পড়ে আছাড়িয়া?
পারে কি গো পঁহুছিতে ধ্রুবকূলে মেরু-পরপারে—
ফিরে আসে নিরুপায় কামনার অন্ধ কারাগারে!

খুলে গেছে 'স্বর্গদ্বারে' সর্ব্বরীর স্বপন-তোরণ,
গাহি' উঠে ব্রহ্মচারী, ছায়াপথে শিহরে মূর্চ্ছন—
"প্রলয়-পয়োধি-জলে জয় জয় জগদীশ হরি,
মগ্নপ্রায় বেদত্রয় উদ্ধারিলে মীনরূপ ধরি'।
মহাকূর্ম্ম অবতারে সুবিপুল পৃষ্ঠে আপনার
গৌরবে বহিলে প্রভু সসাগরা ধরণীর ভার।—"
গাহিতে গাহিতে কবি অকস্মাৎ চাহিল পিছনে,
হেরিল কে ছায়াময়ী লুটাইছে তাহার চরণে,
গল-লগ্নীকৃতবাসে শতবার করিছে প্রণতি—
অদূরে দাঁড়ায়ে আছে চিন্তা-মৌনী পুরীর নৃপতি।

ডাকে রাজা—'হে কিশোর'—ধ্যান-ভঙ্গ! খুলিল নয়ন
নীরবিল কবি-কণ্ঠ—রোষে সিন্ধু করিল গর্জ্জন
"এই যে ললিতা লতা' তব কল্প-স্বপন-মানসী,
"হে কবি, দিয়াছে দেখা শরীরিণী তরুণী রূপসী,
জানি আমি কুলে-শীলে অনিন্দ্যা এ বিপ্রের কুমারী
আলয়-কমলা-রূপে ধর্ম্মপত্নী হোক্ সে তোমারি।"

চমকি উঠিল কবি, অধরের স্মিত হাস্য-রেখা
উজলিয়া বর-কান্তি ফুটে যেন নব জ্যোৎস্নালেখা,—
"চাহিনি মুহূর্ত্ততরে আশৈশব নারী-মুখ-পানে"
উত্তরিল ব্রহ্মচারী—"যে শাশ্বত সত্যের সন্ধানে
এসেছি শ্রীক্ষেত্রদ্বারে, চূর্ণ করি' ভোগের অর্গল,
যেই আলোকের লাগি' মুক্ত মোর চিত্ত-শতদল,
যে মধুর যোগানন্দে অহর্নিশ আছি নিমগন,
ধ্যানের রসনা মম করে নিত্য যে রস-গ্রহণ
তুমি কি বুঝিবে রাজা! —ফিরিতেছ নিষাদের সাজে
বিষয়ের বন-পথে!"

কহে রাজা—"এ বিশ্বের মাঝে
যোগ শিখিয়াছ শুধু—বুঝনাই নারীর মহিমা,
নারী দেবী, নারী শক্তি নিখিলের মোহিনী প্রতিমা—
এ নহে বৈরাগ্য তব বাসনার বিচিত্র বিকার,
কপট সন্ন্যাসি-বেশে রুধিতেছ মোক্ষের দুয়ার।"
শুনিতে শুনিতে বাণী অকস্মাৎ অশ্রুবাষ্প মেঘে
ব্রহ্মচারী-মুখশ্রীতে রুদ্র ক্রোধ-বজ্র ওঠে জেগে—

"রাজা, তুমি জানি তাহা, কহ কিন্তু কোন্ অধিকারে
আজন্ম তপস্যা মম, ব্রহ্মচর্য্য চাহ ভাঙ্গিবারে?
রাজা তুমি কিন্তু জেনো—নহি তব আদেশের দাস,
বর্জ্জিলাম আজি হতে তব সখ্য, তব সহবাস।"
"কি বলিছ হে কপট"—ক্ষিপ্ত কণ্ঠ গর্জ্জিল রাজার—
"পদ্মাবতী-পাণি কিংবা তব ভাগ্যে অন্ধ কারাগার।"

"বসিয়াছ স্বর্ণাসনে রক্তস্রোতে সিক্ত করি মহী"
উত্তরিল ব্রহ্মচারী—"কে আমি? তোমার প্রজা নহি—
কারে দাও কারাদণ্ড? দেহপিণ্ড বন্দী করিবার
জানি জানি হে দাম্ভিক আছে তব তুচ্ছ অধিকার!
কিন্তু মোর দেহাতীত শুদ্ধ বুদ্ধি মুক্তি-অবন্ধন-
অজেয়-অকুতোভয়—সাধ্য কি সে তোমার রাজন্
নিগ্রহে দলিবে তারে? এ চিত্তের তপোহুতাশন
মুহূর্ত্তে ভস্মিতে পারে শত রাজ্য রাজ-সিংহাসন

পরিণয়—জেনো রাজা—এ জীবনে করি যদি আমি
করিব আদেশে তাঁরি—যিনি বন্ধু, যিনি অন্তর্যামী ;
প্রবাহিত যাঁহা হতে নিরুপাধি পুরুষপ্রকৃতি,
যিনি ধর্ম্ম, যিনি ঋদ্ধি, যিনি সৌখ্য, অভিসার-প্রীতি ;
কল্পান্তের পুণ্ডরীকে মরুদ্ব্যোম-সিন্ধু-হিন্দোলায়
নিখিল-বিহারে যাঁর গৌরব-তরঙ্গ উথলায়।
কহে নৃপ—"বন্দী তুমি, ভক্তি যদি থাকে অকপট
ডাক সেই ভক্তাধীনে, এড়াইবে সংশয়-সঙ্কট।"

ক্ষুদ্র কক্ষ রুদ্ধদ্বার—অন্ধকার অকূল রজনী—
বন্দী হেথা ব্রহ্মচারী—অসম্বৃত বসনে অবনী
তিমির মেরুতে তার নিশীথের রবিরশ্মি ধরি'
ছুটিছে তারার পথে আপনারে নিরুদ্দেশ করি'
ডাকিতেছে ব্রহ্মচারী—"কোথা প্রভু বিপদ্-ভঞ্জন
দেখা দাও, কথা ক'ও, কতদিন করিব ক্রন্দন!

হে আদি-অনাদি-নাথ, পালিব গো তোমারি আদেশ,
মঙ্গল অঙ্গুলি তব যেই পন্থা করিবে নির্দ্দেশ,
সে পথে হইব পান্থ। শুভাশুভ বুঝিতে না চাহি—
তোমা হ'তে ভ্রষ্ট হয়ে এই দ্বন্দ্বস্রোতে অবগাহি'
কাঁদিব না বারেবারে।

—কেন পশে পূজা গৃহে মোর
পদ্মাবতী? কেন আসে? চেয়ে থাকে ব্যাকুল বিভোর!
আচম্বিতে কার ছায়া গাঢ়তর করিল আঁধার,
কারার গবাক্ষ-পথে অশ্রুপূত মূর্ত্তি করুণার—
করযোড়ে কহে ছায়া—"লহ, প্রভু, দাসীর প্রণতি,
মোর পাপে তব প্রতি অত্যাচার করিল নৃপতি ;
বিনা দোষে রাজরোষে সহিতেছ যন্ত্রণা ভীষণ,
ঝাঁপ দিব সিন্ধুজলে রাখিব না এ ছার জীবন।
প্রভাতে শুনিবে রাজা অভাগীর মরণ-বারতা,
তোমার ধ্যানের বেদী বেড়িবে না কণ্টকের লতা।
আসে মৃত্যু মহোৎসবে—সেবিকায় দাও পদধূলি,
সুদূর মিলনানন্দে সর্ব্বপ্রাণ উঠিছে আকুলি'।
"আবার এসেছ পদ্মা ফিরে যাও"—কহে ব্রহ্মচারী—
"এ পাপ সঙ্কল্প হতে ফিরে যাও, উন্মাদিনি নারি,
কহিছ মুক্তির কথা? মুক্তি কোথা? কারাক্লেশ হ'তে
পার বটে মুক্তি দিতে—কিন্তু যেই মহাদুঃখ-স্রোতে

প্রাক্তন কর্ম্মের বশে জন্ম মৃত্যু-পুনর্জ্জন্ম সহি'
কভু ধরি' তরু-রূপ, কভু পশু, কভু হয়ে নর,
ফুটিছে বুদ্বুদ সম আশাবদ্ধ-বেদনাকাতর,
অন্তহীন আর্ত্তনাদে লুটাইছে অদৃষ্ট বেলায়—
সে গভীর দুঃখ থেকে কোন্ পথে মুক্তির উপায়?
অক্ষয় আনন্দ মুক্তি বাঞ্ছা যদি করহে কুমারি,
ডাক সে অনন্ত রূপে, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী,
মুক্তির বিধাতা যিনি, বিশ্ব যাঁর ভক্তের প্রয়াগ,
ঊর্দ্ধশিখ যাঁরি পানে চতুর্দ্দশ ভুবনের যাগ।

ফিরে যায় ছায়াময়ী, অন্তরের অন্তরে তাহার
মহাপদ্ম সহস্রারে ওঠে ছন্দ রাগিণী ঝঙ্কার।
হেরে অন্ধকার নাই, দুঃখ নাই, মৃত্যুশোক নাই,
নাহি নৃপ, নাহি ভিক্ষু, নাহি মিত্র রিপুর বালাই,—

রুধিয়া গবাক্ষ-দ্বার—ব্রহ্মচারী নাম-সঙ্কীর্ত্তনে
ধ্বনিল নিদ্রিত পুরী ; নেহারিল মানস-নয়নে
নবীন বাসর-কুঞ্জে হাসিছেন প্রেমের ঠাকুর,
মধুর মন্দিরা বাজে, রুণু রুণু মণির নূপুর,
বিহরে বাঁশীর ধ্বনি কদম্বের কেশরে কেশরে,
নাচিছে চন্দ্রক-মালা যমুনার উজান লহরে,
মদনমোহন রূপ মিলেছেন কিশোরীর রূপে,
ঢেকে গেছে রাকা শশী অনুরাগ-আবীরের স্তূপে।
নদীগিরি ছায়া পথে মিলনের পৌর্ণমাসী ভায়,
বাজিছে উতল বাঁশী ব্রহ্মচারী আঁখি তুলে চায়।—
সুর সে প্রতিমা ধরে, ফুটে ওঠে করতলে তার
স্বরগ-করবী-রাগ, ঝরে কণ্ঠে অশ্রুমোতি-হার ;
ভুবনমোদিনী তন্দ্রা, ইন্দ্রজাল-মঞ্জু-জাগরণ
একি স্বপ্ন! একি সত্য! ফুকারিছে মুরলী স্বনন—
'ধর গো অঞ্জলি তার, সে তোমার দ্বিতীয়-জীবন,
বরনারী পদ্মাবতী ধরাতলে অমরা-স্বপন।
সে করপল্লব-তলে পাবে মোর মধুর পরশ,
নির্ম্মল অধরপুটে পিবে মম পরসাদ-রস।'
তন্ময় হইয়া কবি শোনে সেই বাঁশরী-আদেশ
কহিল প্রসারি' বাহু—"এতদিনে এসেছ প্রাণেশ,
তুচ্ছ গণি খেলাধুলা, বাঁশীরবে হইয়া আকুল,
পাশরিয়া হাসিভরা কেন্দুবিল্ব অজয়ের কূল,

পশিনু গহন বনে, বসিলাম সাগর-সৈকতে,
তৃষিত কাতর প্রাণে নিশিদিন ঘুরি পথে পথে ;
আমিত্বের অভিমানে, বৈরাগ্যের কঠোর পন্থায়
পেতে দিলে পুষ্পশয্যা, কি রহস্য কে বুঝিবে হায় !

খুলিয়া কারার দ্বার পথে রাজা নাহি রাজবেশ—
ধন্য আমি, শুনিলাম শ্রীহরির বাঁশীর আদেশ,
"ক্ষমা কর সাধুত্তম, কর দয়া এ অধম জনে,"—
শিরস্ত্রাণ রাখে রাজা, সিদ্ধতপা ভক্তের চরণে—

"কি আর কহিব তোমা, মহাদানে করিয়াছ ধনী—
দাও মহামন্ত্র দীক্ষা, খুলে দাও মোহের বন্ধনী।"
বাঁশী শুনে আসে পদ্মা, আলুথালু উড়িছে কুন্তল,
এনেছি পূজার অর্ঘ্য দাও প্রভু চরণ যুগল,
মানবের ছদ্মবেশে দেখা দেছ জীবনবল্লভ,
ছাড়িবনা প্রাণবন্ধু, হে মোহন আনন্দ-মাধব।—
বসুন্ধরা চতুর্দোলে মহাসিন্ধু শঙ্খধ্বনি করে
জগন্নাথ-পুরদ্বারে পরিণীত নব বধূবরে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাধা-শ্যাম-চতুষ্টয়

১

আধ তনু কিবা তড়িত-দণ্ড,
আধ অভিনব নীরদ-খণ্ড,
আধেক বরণ হিরণ কিরণ,
আধ নীল মণি আলা !

২

আধ শিরে উড়ে শিখি-শিখণ্ড,
আধ দোলে বেণী চুম্বি' গণ্ড,
আধ গলে তার গজ-মতি-হার,
আধ গলে বনমালা !

৩

দুঁহু ভুজে বাঁধা দোঁহার অঙ্গ,
দুঁহু অঙ্গুলী মুরলী সঙ্গ,
দোঁহার বদন রন্ধ্র-লগন
দুঁহু-নাম করে গান ;

৪

চরণে চরণে বাজে মঞ্জীর,
নয়নে নয়নে খেলা বিজলির,
পরাণে পরাণে দুঁহু দোঁহা টানে,
কি মিলন প্রাণারাম !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

মন্ত্রশক্তি

[পূর্ব্বাবৃত্তি :—রাজনগরের জমিদার হরিবল্লভ, কুলদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া, উইলসূত্রে তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অধিকাংশ দেবত্র, এবং অধ্যাপক জগন্নাথ তর্কচূড়ামণিকে ও পরে তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে পূজারী হইবার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুকালে তর্কচূড়ামণি নবাগত ছাত্র অম্বরকে পুরোহিত নিয়োগ করেন,—পুরাতন ছাত্র আদ্যনাথ রাগে টোল ছাড়িয়া অম্বরের বিপক্ষতাচরণের চেষ্টা করে। উইলে আরও সর্ত্ত ছিল যে, রমাবল্লভ যদি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ১৬ বৎসর বয়সের মধ্যে সুপাত্রে অর্পণ করেন, তবেই সে দেবত্র ভিন্ন অপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে —নচেৎ, দূরসম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি ঐ সকল বিষয় পাইবে—রমাবল্লভ মাসিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিমাত্র পাইবেন ;—কিন্তু মনের মতন পাত্র মিলিতেছে না !

গোপীবল্লভের সেবার ব্যবস্থা বাণীই করিত। অম্বরের পূজা বাণীর মনঃপূত হয় না—অথচ কোথায় খুঁৎ, তাহাও ঠিক ধরিতে পারে না ! স্নানযাত্রায় 'কথা' হয়—পুরোহিতই সে কথকতা করেন। কথকতায় অনভ্যস্ত অম্বর থতমত খাইতে লাগিলেন—ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর একদিন পূজার পর বাণী দেখিলেন, গোপীকিশোরের পুষ্পপাত্রে রক্তজবা !—আতঙ্কিতা বাণী পিতাকে একথা জানাইলেন।—অম্বর পদচ্যুত হইলেন ! টোলে অদ্বৈতবাদ শিখাইতে গিয়া অধ্যাপক-পদও ঘুচিয়া গেল !—তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বাণীর বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণপ্রায় ! ১৫ দিনের মধ্যে তাহার বিবাহ না হইলে বিষয় হস্তান্তরে যায় ! রমাবল্লভের দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় মৃগাঙ্ক—সকল দোষের আকর, গুণের মধ্যে মহাকুলীন ! তাহারই সহিত বাণীর বিবাহের প্রস্তাব হইল—মৃগাঙ্ক প্রথমে সম্মত হইলেও পরে অসম্মত হইল। সে অম্বরের কথা উত্থাপন করিল। রমাবল্লভ ও বাণীর এ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি।—অগত্যা, বিবাহান্তে অম্বর জন্মের মত দেশত্যাগ করিবেন এই সর্ত্তে, বাণী এই বিবাহে সম্মত হইলেন। রমাবল্লভ অম্বরকে আনাইয়া এই প্রস্তাব করিলে, তিনি সে রাত্রিটা ভাবিবার সময় লইলেন। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া অম্বরের সহিত বাণীর সাক্ষাৎ—বাণীও তাঁহাকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল। অম্বরের সে রাত্রি অনিদ্রায়—চিন্তায় কাটিল !

রমাবল্লভেরও তথৈবচ। পরদিন প্রাতে অম্বরনাথ রমাবল্লভকে জানাইল—সে বিবাহে সম্মত। অগত্যা যথারীতি বিবাহ, কুশণ্ডিকা সুসমাহিত হইয়া গেল।

বাণীর বিবাহের দুচারদিন পরেই মৃগাঙ্ক বাড়ী ফিরিয়া গেল। এতকাল সে নিজ ধর্ম্মপত্নী অভার দিকে ভালরূপে চাহিয়াও দেখে নাই—এবার ঘটনাক্রমে সে সুযোগ ঘটিল ;—মৃগাঙ্ক তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজের বর্ত্তমান জীবন-গতি পরিবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইল। এতদুদ্দেশে সে সপরিবারে দেশভ্রমণে যাত্রা করিবার প্রস্তাব করিল।]

বিবাহের পরদিনের রাত্রি কালরাত্রি। সে দিন স্বামী-স্ত্রীর মিলনে স্ত্রীর দুর্ভাগ্য সূচিত হয়। সে রাত্রিটা বাদ দিয়া পরদিন ফুলশয্যা হওয়াই বিধি। বাণীর মনে হইল, আমার যখন সৌভাগ্যদুর্ভাগ্যের ভয়ডর নাই, তখন তাহার জন্য এ বিধি-নিষেধ প্রতিপালন না করিলেই ভাল হইত, তাহা হইলে অম্বরের আসামযাত্রার কাল আরও একদিন নিকটবর্ত্তী হইত।

পাকস্পর্শ প্রভৃতির লেঠা নাই। ক'নেকে বরের ঘরে যাইতে হইবে না, কারণ বরের ঘরই নাই। কৃষ্ণপ্রিয়ার সাধ, মেয়ে অন্ততঃ একদিনের জন্যও শ্বশুরঘর করিতে যায় ; তিনি খুব ঘটা করিয়া ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাইয়া পাঠান। তাই তিনি জামাইকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার ভাজ বাণীকে একবার দেখিবেন না ? ইচ্ছা হয় ত ওকে একদিনের জন্য সেখানে লইয়া যাইতে পার।" অম্বর একটু চুপ করিয়া থাকিল। সে সাধ ক্ষণেকের জন্য তাহার চিত্তকে প্রলোভিত না করিয়াছিল, এমনও নয় ; কিন্তু সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, বাণী সেই পল্লীকুটীরে দরিদ্রা আত্মীয়ার নিকটস্থ হইতে নিজেকে অপমানিতা জ্ঞান করিবে। তাই মুহূর্ত্তের সে লোভ সে সংবরণ করিয়া উত্তর দিল, "এখন থাক।" কৃষ্ণ-প্রিয়া আর কিছু বলিলেন না ; ভাবিলেন, "হয় ত ভাজ তেমন নয় ; জামাই মেয়েকে সেখানে লইয়া যাইবার মত করিলেন না।"

সেদিন ফুলশয্যা। বাবুদের বাগানের যে ফুলে মন্দিরের পূজা হয়, সে সকলে হাত দিবার কাহারও হুকুম নাই। তথাপি ফুলে ফুলে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছিল। ফুলের গোড়ে, ফুলের তোড়া, সকল নিমন্ত্রিতাই উপহার পাইয়াছেন। বাড়ীর ছোট মেয়েরা বিচিত্র সাজে সাজিয়া আতর, পান ও ফুল বিলাইয়া বেড়াইতেছে। সেদিন যেন রাজনগরের জমিদার গৃহে রাজপুতানার রাজগৃহের বসন্তোৎসবের অতীতস্মৃতি পুনরুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বাণী গা ধুইয়া

পট্টবাস পরিয়া, পূজা-আরতি সমাধা করিয়া দেব-প্রণামান্তে নিরানন্দচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। টোল বাড়ীর একটি ছাত্র এখনও পুরোহিত। আগুনাথ হঠাৎ সেই বড় ভারি রকম নিমন্ত্রণটা পাইয়া কোথাকার ধনিগৃহে আগুশ্রাদ্ধ মহাসভায় চলিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে এখনও সে ফিরিয়া আসে নাই; কাজেই নূতন পুরোহিতকে লইয়া কোন মতে বাণী পূজার কাজ সারিতেছে।

সেদিনও তুলসী তাহাকে সাজাইতে বসিল। বাণী আজ তেমন বাধা দিল না; সে জানিত বাধা দেওয়াও বৃথা; তুলসী ছাড়িবার পাত্রী নয়। রত্নের সঙ্গে ফুল মিলাইয়া এক অপূর্ব্ব সাজে সে বাণীকে সাজাইল! মেঘাভায় নীলাভবসনের কিনারায়—স্বর্ণরৌপ্য মধ্যে মোতি-মুক্তা-চুণির বাহার খুলিয়া, পত্রপুষ্পফল ধরিয়া,—স্বপ্নপুরের সোণার লতার মত লতাইয়া গিয়াছে! মধ্যে মধ্যে নীলাকাশে তারকার ন্যায় চুম্‌কি গাঁথা ফুল,—আলোক-সম্পাতে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে। তুলসী নির্ব্বাক্ প্রশংসায় সেই মর্ম্মর-গঠিত শারদ প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল। এ কি রূপ! এ-রূপ নারীরই মন মুগ্ধ করে, পুরুষ এ সৌন্দর্য্যে বুঝি সংজ্ঞাহারা হইয়া যাইবে! বাণী অন্যমনস্ক হইয়াছিল, হঠাৎ চোখ ফিরাইতেই সখীর মুগ্ধদৃষ্টি চোখে পড়িয়া গেল, তাহাতে দু'জনই একটু হাসিল। সে তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া ঈষৎ লজ্জায় বলিয়া উঠিল,—"একি খেয়ে ফেল্‌বি নাকি। অমন ক'রে চেয়ে রইলি কেন?" তুলসী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। তখন সে সুর করিয়া গান ধরিল

"সাধে কি চাহিয়া থাকি!—
হেরিয়া ও রূপরাশি ফেরে না এ পোড়া আঁখি!
যে সাজে সেজেছ আজ,
এ যে গো সমর-সাজ!"

বাণী হাসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, বলিল—"কথায় কথায় গান! কবি হয়ে উঠেছেন আর স্তবগানে কাজ নাই, ঢের হয়েছে। এখন থাক্।" হাসি ম্লান হইয়া আসিয়া ধীরে ধীরে একটা নিঃশ্বাস বহিয়া গেল। মঞ্জরী চাহিয়া দেখিল,—কিছু বলিল না। কোথায় ব্যথা বাজিতেছে, তাহা সেও বুঝিয়াছিল, তাই সহানুভূতিপূর্ণ চিত্তে, মনে মনে বলিল—"রাজার রাণী হইলেই যোগ্য হইত! এ কি ভট্টাচার্য্যি বামুনের স্ত্রী হইবার মত মেয়ে? বিধাতার কি বিড়ম্বনা!"

ফুলশয্যায় অনেক রকম মেয়েলি আমোদ দেশ-প্রচলিত। বাসর-সঙ্গিনী মহিলাগণ বিবাহ-রাত্রির ব্যর্থ সাধ আজি মিটাইবার সুযোগ পাইয়া, প্রসন্নচিত্তে প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন। সেসব দেখিয়া শুনিয়া বাণী মনের মধ্যে গুমরাইয়া গর্জ্জিতেছিল। শেষে থাকিতে না পারিয়া মাকে গিয়া বলিল "ওসব অসভ্য কাণ্ড করা হইবে না।

সে গান ধরিল—"সাধে কি চাহিয়া থাকি!—

তুমি ওদের বারণ করিয়া দাও।" কৃষ্ণপ্রিয়া মৃদু হাসিলেন; সস্নেহে কহিলেন, "বারণ শুনিবে কেন মা? তা বিয়ের সময় সকলেই ওইরূপ করিয়া থাকে। উহাতে কিছু লজ্জা নাই।"

"সকলের যা হয়, আমার কি ঠিক্ সেইরূপই হইতেছে,

যে সব সেই মতই হইবে?—সকলের কথা ছাড়িয়া দাও, তাদের কাহারও বাড়ীর চাকর বামুনের সঙ্গে বিয়ে হয় না! যার যেমন কপাল, তার তেমনই ব্যবস্থা। আমি স্পষ্টই বলিয়া দিতেছি মা!—ওসব চলিবে না। তা হইলে আমি বাবার কাছে গিয়া শুইয়া থাকিব; কে আমায় সেখান হইতে উঠাইয়া আনিবে? না হয় বাবাকে সব বলিয়া দিব; বাবা নিশ্চয় মানা করিবেন।" কৃষ্ণপ্রিয়া বিরক্তস্বরে কহিলেন, "ওই আদরেই ত তোর পরকাল খাইয়া ফেলিল! আচ্ছা বাবু, বারণই করিব; যদি না শোনে আমি জানি না। কিন্তু একটা কথা বলিয়া দিই, বাণী, জামাইকে অযতন অপমান করিস্‌নে। ও যে কি রত্ন, তা এখন না বুঝিস্, এর পর বুঝিবি। আর যদি তা নাই হয়, তবুও স্বামী। স্বামীর চেয়ে বড়,—জগতে মেয়ে মানুষের আর কে আছে? দেখ্‌ছিস্ ত, আমি কখনও আজ পর্য্যন্ত ওঁর কাছে মুখ তুলে একটা কথা কয়েছি বা মুখের উপর একটি জবাব করেছি?"

"ওঃ! কিসে, আর কিসে! তোমার যেমন তুলনা দেওয়া!—চাঁদে আর বামনে! আমার বাবার সঙ্গে আর"—কৃষ্ণপ্রিয়ার নেত্রে ক্রোধাভাষ জাগিয়া উঠিল, "কেনই বা নয়? বড় লোক গরীব ব'লে সম্বন্ধও বদ্‌লে যায় না কি? এই ধর, আমরা যদি গরীব হইতাম, তোর কি বাপমার প্রতি ভালবাসা কম হইত নাকি?"—"সে কথা আলাদা।" বলিয়া বাণী উঠিয়া গেল।

ফুলশয্যার প্রতীক্ষায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, বর আসিল না। বারংবার লোক পাঠান হইতেছিল; প্রত্যেকবারই শোনা যাইতে লাগিল, "এখনও বাড়ী ফেরেন নাই।" রাগ করিয়া—অভিমান করিয়া অনেকেই ঘরে ফিরিলেন। কেহ কচি ছেলের কান্নায় তাহাকে লইয়া শয়ন করিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িলেন। দু' চারজন শুধু অনাদৃত উপকরণ লইয়া জাগিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; বলা বাহুল্য, তাহার মধ্যে তুলসীই প্রধান।

অবশেষে বর আসিল। কৃষ্ণপ্রিয়া অম্বরকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া কহিলেন—"ওগো, তোরা আর দেরি করিস্‌নে, বাছা বড় ক্লান্ত হ'য়েছে। ওপাড়ার নিমাই পণ্ডিতের মেয়েটির কলেরা হয়, বাড়ীতে পুরুষ নাই, ও তাহার দেখা-শুনা করিতেছিল! একটু কমিয়াছে, আর পণ্ডিতও ঘরে ফিরিয়াছেন দেখিয়া ও এইমাত্র চলিয়া আসিয়াছে। শরীর খারাপ। এতরাত্রে কিছু খাইতে চাহে না। থাক্ কাজ নাই, সূতাটা খুলিয়া ঘুমাইতে দাও।"

শাশুড়ী, চলিয়া গেলে চারিদিক্ হইতে একবার শ্লেষ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষিত হইয়া অম্বরের গাম্ভীর্য্য-বর্ম্মে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া গেল; ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ নারীগণ অপ্রসন্ন বিষণ্ণতার মধ্যে নিয়মকার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেল; বাণীর একবার ইচ্ছা হইল,—সেও তাহাদের সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু অনেক কষ্টে এই ইচ্ছা রোধ করিয়া যথাস্থানেই বসিয়া রহিল। সুসজ্জিত গৃহে কোমল শুভ্র শয্যাতলে অপূর্ব্ব সুন্দরী ষোড়শী পত্নী পার্শ্বে উপবিষ্ট। অম্বরকে আজ পৃথিবীর সম্রাট্‌ও বোধ হয় ঈর্ষাপূর্ণচক্ষে দেখিতে পারে। এত সুখ মানুষের ভাগ্যে কখনও দৈবাৎ ঘটে! আলোক-প্রতিফলিত বৃহৎ দর্পণে বাণীর সর্ব্বশরীরের যে বিম্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার যেন কোথাও তুলনা নাই; মর্ম্মর-রচিত জীবন্ত প্রতিমা, কিংবা নন্দন-বাসিনী অপ্সরা, এমনই কি একটা পরলোকের অতীত সৌন্দর্য্যে ঘরখানা যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজ প্রতি-বিম্বে নেত্রপাত করিয়াই সহসা বাণী শিহরিয়া উঠিল। তুলসী ভাল কাজ করে নাই, কেন এমন করিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়া দিল? সে একটু ভয় পাইল, যদি সে যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঘটে,—অম্বর তাহার দিকে চাহিয়া হয়ত নিজের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া যাইবে। এখন ইচ্ছা করিলেই সে তাহা করিতে পারে, না বলিবার ক্ষমতা ত কাহারও নাই। এ "সমর-সাজে" কেন সে সাজিতে রাজী হইল?

কিন্তু ইহাও সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, অম্বর গৃহে প্রবেশ করিয়া পর্য্যন্ত একবারও তাহার দিকে চাহিয়া দেখে নাই। তাহার নেত্র প্রায় আনতই রহিয়াছে। যখন তাহার হাতের সূতা খুলিয়া দেওয়া হইল, তখনও সে সেই গ্রন্থিটি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার দুর্ভাবনা একটু কমিয়া আসিল; তথাপি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে বুকটা দুপ্ দুপ্ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ এ গৃহের সম্রাজ্ঞী সে হইলেও এ ব্যক্তি তাহার স্বামী! তাহার উপর যেন ইহার একটা "দখলী-স্বত্ব" জন্মিয়া গিয়াছে!

যখন সকলে চলিয়া গেল, এই নির্জ্জন গৃহে নববিবাহিত

দম্পতী একা হইল, এবং সেই মুহূর্ত্তেই অম্বর একটু নড়িয়া বসিল, অমনই একটা অসহায় ক্রোধে ও আতঙ্কে বাণীর সর্ব্বশরীর ঝিন্‌ঝিন্‌ করিয়া উঠিল, সে বিদ্যুচ্ছটার মত তাহার বিপরীত দিকে মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই নিজের আচরণে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সে দেখিল, তাহার ভয় অমূলক; অম্বর তাহার পার্শ্বে নাই, সে খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে; সে ঈষৎ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিল। তাহার দিকে না চাহিয়াই অম্বর কহিল, "অনেক রাত হইয়া গিয়াছে, তুমি ঘুমাও। আমার খাটে শোওয়া অভ্যাস নাই, ঘুম হইবে না। আমি নিজের ঘরে যাইতেছি।" এই কথা বলিয়া সে গমনোদ্যত হইলে, হঠাৎ বাণীর কি মনে হইল;—সে তখন একটু ব্যগ্রভাবে কহিয়া উঠিল, "এখনই বাহিরে গেলে, লোকে হয়ত দেখিয়া কি মনে করিবে। একটু পরেই যাইও"—সকলে আসিয়া যে এখনই চারিদিক্ হইতে তাহাকে কৌতূহল-নিবারণের জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিবে, তাহা মনে করিয়া সে এই অপ্রত্যাশিত মুক্তির আনন্দ ভালরূপে উপভোগ করিতে পারিল না। একথা শুনিয়া গমনোন্মুখ অম্বর থামিল, কিন্তু সে ফিরিয়া আর খাটে বসিল না, নিকটস্থ একখানা মখমলমণ্ডিত আসন সরাইয়া লইয়া তাহাতেই উপবেশন করিল। তাহা দেখিয়া বাণীর বুকের মধ্যটা অত্যন্ত হাল্কা হইয়া গেল, এবং কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। যেটুকু চাহে—যাহা ইচ্ছা করে, ঠিক যেন সেই মনের লেখাটি পাঠ করিয়া এই নীরব উপাসক সেইটুকু নিঃশব্দে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে! ইহাতে তাহার বিদ্রোহী চিত্ত একটুখানি নরম হইয়া আসিয়াছিল। তাই সে নিজের ব্যবহারের অসঙ্গতি হঠাৎ বুঝিতে পারিল, এবং এইসঙ্গে মায়ের উপদেশটা বুঝি তার মনে পড়িয়া গেল,—চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, অম্বর তাহার দিকে চাহিয়া নাই, সে ঘরের দেওয়ালে একখানা বৃহৎ তৈলচিত্রে পঞ্চবটী-কানন-কুটীরে সুখাসীন রামসীতার মূর্ত্তির দিকে নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া আছে। তাহার ঠিক সম্মুখে সেই বৃহৎ আয়নাখানা দাঁড় করান। সেই আয়নার মধ্যে তাহারই স্ত্রীর ভুবনমোহন মুখবিম্ব ফুটন্ত পদ্মের শোভায় বিকশিত হইয়াছে। অদূরে শরীরিরূপে সে নিজে বিদ্যমান। তথাপি কোনদিকে অম্বরের ভ্রূক্ষেপ নাই। বাণী নীরবে অধর-দংশন করিল। একটু রাগ হইল, ঈষৎ হাসি আসিল, আর অনেকখানি কৌতূহলও তাহার মনকে নাড়াইতে লাগিল। অদ্ভুত মানুষ! এ রকম কখনও দেখি নাই!—শুনিও নাই! সে বারংবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। সেই বাসরের রাজপুত্র! প্রশস্ত ললাটে শিথিল কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ স্তবকে স্তবকে স্বতঃই সজ্জিত। শুভ্র গৌরকান্তি, আয়ত নেত্রের শান্ত দৃষ্টি মহিমা-ব্যঞ্জক। এ বোধ হয় সে অম্বর নয়। মলিনবসন ম্লান কুণ্ঠিত মুখ—সেকি এই রাজার মত পুরুষ!

ঢং করিয়া একটা বাজিয়া গেল। বাহিরে লোকজনের সাড়া কমিয়া আসিতেছিল। অম্বর দৃষ্টি ফিরাইতেই বাণীর উৎসুক দৃষ্টির সহিত তাহা মিলিত হইল। সে মুহূর্ত্তে নম্রভাবে চক্ষুর তারা নত করিল, বাণীর গাল একটুখানি লাল হইয়া উঠিল, কেন তাহা বলা যায় না। তাহার এই প্রথম সান্নিধ্য তাহাকে যেন একটুখানি লজ্জিত করিল। প্রথম মনে হইল, হয়ত তাহার এ সহজভাব বেহায়াপনার মত দেখাইতেছে, কিন্তু সে মনোভাবের সে প্রশ্রয় দিল না, লজ্জা করিয়াছিল বলিয়াই জোর করিয়া লজ্জা ত্যাগ করিতে চাহিল; কুণ্ঠা ছাড়িয়া নিজেই স্বামি-সম্ভাষণ করিল, বলিল "তুমি কবে আসাম যাইবে?"

অম্বর একটু নীরব থাকিয়া কহিল, "কাল।" "কাল! কই বাড়ীতে কেহ শুনে নাই ত?" বাণী বিস্ময় প্রকাশ করিল। অম্বর ধীরস্বরে কহিল, "কাহাকেও বলা হয় নাই, বাবা শুধু জানেন। তিনি বাড়ীতে নিজেই কাল বলিবেন বলিয়াছেন।" "ওঃ", বাণী একটু বিশ্বস্তভাবে নিঃশ্বাস লইল, তাহার পর বলিল, "মা হয়ত বাধা দিবেন; বলিবেন, এখন যাইতে নাই।"

অম্বর মনের মধ্যে এই মন্তব্যে কোন প্রকার আঘাত পাইল কিনা তাহার মুখে তাহা ব্যক্ত হইল না। সে তেমনই সম্ভ্রমপূর্ণ সহজ স্বরেই কহিল, "তাঁহাকে একটু বুঝাইয়া বলিতে হইবে, না গেলেই চলিবে না। কথা দেওয়া হইয়া গিয়াছে, তাহারা আমার প্রতীক্ষা করিবে। যাওয়া চাই।" যেমন অন্যের সহিত তেমনই তাহার সঙ্গেও কথার ইঙ্গিতে তাহার সহিত কোন প্রকার ভিন্নভাব বা ব্যবধান আছে ইহা সে প্রকাশমাত্রও করিতেছে না, বাণী ইহা লক্ষ্য করিল। অম্বর সর্ব্বের প্রতি ইঙ্গিতটুকু পর্য্যন্ত

কড়াক্রান্তিতে পালন করিয়া চলিয়াছে! এই কি সেই মূর্খ পুরোহিত—যাহাকে অজ্ঞ, আহাম্মক বলিয়া সে লাঞ্ছনা করিয়া বিদায় দিয়াছিল? বাণীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় অম্বর উঠিয়া কহিল "আমি এখন যাই, অনেক রাত হইয়া গিয়াছে; তুমি ঘুমাও।" আর কিছু না বলিয়া কিংবা কিছু শুনিবার প্রত্যাশা পর্য্যন্ত না দেখাইয়া স্বাভাবিক ধীরপদে সে চলিয়া গেল।

অম্বর উঠিয়া কহিল, "আমি এখন যাই, অনেক রাত হইয়া-গিয়াছে;

বাণী তখন মাথার কাপড় খুলিয়া বালিসে হেলিয়া পড়িয়া মনে মনে বলিল, "আঃ বাঁচিলাম, এতদিনে বিয়ে চুকিল! রাত পোহাইলে ও চলিয়া যাইবে। জন্মের মত নিশ্চিন্ত হইব। আর কতক্ষণই বা।" তার পর কিছুক্ষণ নিমীলিত নেত্রে শুইয়া থাকিয়া সে একবার চোক চাহিল, সম্মুখেই সেই দর্পণ,—দর্পণে মায়াপুরীর রাজকন্যার মত সেই প্রতিবিম্বও সেই সঙ্গে অলসনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। সে চাহিয়া অকস্মাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। "সকলে বলে আমি সুন্দর! এই ছবিটাও ত খুব মন্দ নয়! আচ্ছা এ কি রকম লোক? একবার ভাল করিয়া চাহিয়াও ত দেখিল না? যেন গ্রাহ্যই করে না এমনই উদাস ভাব!"

মানুষের চরিত্র অতি দুর্জ্জেয়! যদি অম্বর তাহার ঔদাসীন্য, গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া,—বেশি কথা কি তাহার কাছে একটু ঘেঁসিয়া বসিত, অথবা তাহার উপর মুগ্ধ দৃষ্টি মাত্র নিবদ্ধ করিত, তাহা হইলে সে ধৃষ্টতাটুকু সে কত বড় করিয়া দেখিত এবং তাহার প্রতিফল দিতেই বা কতটুকু দ্বিধা করিত, তাহা বলা যায় না; কিন্তু তাহা না হইয়া যেমন ব্যাপারটা অন্য রকম হইল, অমনই মনও বদলাইয়া গেল। অম্বরের আচরণে মন এক-দিকে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিতেছিল, অন্যদিকে আবার তাহার অত্যধিক সতর্ক—সাবধান চেষ্টা সেই সঙ্গে যেন নিজের আত্মাভিমানে ঈষৎ আঘাত দিতেও আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল; মন যেন ভিতর হইতে বলিতে চাহিতেছিল, 'আমি কি এতই নগণ্য যে আমার দিকে—আমার স্বামী একবার চাহিয়া দেখিল না?' তা বাণীরই বা দোষ কি? মানুষ মাত্রেরই অমন হয়। মহাদেব যখন মদনভস্ম করিয়া তপস্যাবিঘ্ন দূর করিতে অন্যত্র গমন করেন, তাঁহাকর্ত্তৃক অনীক্ষিতা উমার মনোভাব লইয়া কবি কহিয়াছেন—

"নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী,
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলাহি চারুতা।"

বাণী উঠিয়া অঙ্গের পুষ্পাভরণ একে একে খুলিয়া ফেলিল, রত্নাভরণ মোচন করিল, তারপর বহুমূল্য বসন পরিবর্ত্তন করিয়া দীপ নিবাইয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না, কোন কারণ নাই, তথাপি অকারণেও রাগে অভিমানে তাহার

মনের ভিতরটা কেমন কেমন করিয়া উঠিতেছিল। একবার আত্মগত অস্ফুটস্বরে কহিয়া উঠিল, "কাল চলিয়া যাইবে বেশ হইবে, তাতে আমার কি!" তারপর তন্দ্রাজড়িত অর্দ্ধজাগ্রত স্বপ্নে দেখিল, লাল মখমলের শয্যায় নাল উত্তরীয় মালা-ভূষিত উজ্জ্বল ভাস্বরমূর্ত্তি, আর দুই কর্ণ ভরিয়া এক গম্ভীর বেদমন্ত্র তাহার সকল শরীর অবশ করিয়া মেঘমন্দ্রে বাজিয়া উঠিতে লাগিল,

"ওঁ মমব্রতেতে হৃদয়ং দধাতু মমচিত্ত মনুচিত্তন্তেঽস্ত।"

(২৩)

দ্বারে গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ির ছাদে বিছানার মোট ষ্টীলট্রাঙ্ক বাসন বোঝাই করা কাঠের সিন্দুক, আরও কত কি। যাত্রার আয়োজন হইলে গৃহিণী সংবাদ পাইলেন, জামাই চলিয়া যাইতেছে! কথাটা বিশ্বাসের নয়, কিন্তু যখন স্বয়ং কর্ত্তা আসিয়া বলিলেন,—"একটা রাঁধুনী একটা চাকর সঙ্গে লইতে বলিতেছি, ও কিছুতেই রাজী হয় না। ছেলেটির আর সব ভাল, কেবল ঐ একটি দোষ, বড় এক রোখা। নিজের জন্য একটা মাসিক খরচ অবধি লইবে না; বলে, এত দিন যে ভাবে চলিয়াছে,—এখনও সেই ভাবেই চলিবে; একি অনাসৃষ্টি কথা! এখন তুমি জমিদার হরিবল্লভের নাত্ জামাই,—তোমার এখন সেই মত থাকা চাই ত!"

তখন অবিশ্বাসের আর স্থান নাই। গৃহিণীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল; তিনি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন—"সেকি! অম্বরকে আজ আমি যাইতে দিতে পারিব না। এ দুদিন কোথা রহিল, কি খাইল, তার ঠিক নাই! শরীর খারাপ যাইতেছে—তাহার এখনও বিয়ের আট দিন কাটে নাই, এখনই কোথা যাইবে? সে হইবে না, বারণ কর।"

রমাবল্লভের জামাইএর প্রতি একটু খানি যে টান হয় নাই, এমন বলা যায় না। তবে কৃষ্ণপ্রিয়ার তুলনায় তাহা অতি সামান্যই বলিতে হইবে। কারণ ইহার ভিতর ধনী দরিদ্রের মানাপমান পূর্ণমাত্রায় মিশ্রিত আছে, মাতৃ-হৃদয়ের ঐকান্তিক স্নেহ ইহার মধ্যে বিদ্যমান নাই। তাঁহার ইচ্ছা, আপাততঃ দরিদ্র পুরোহিত দিন কত দূরেই সরিয়া থাকুক। তারপর সেখানে থাকিতে থাকিতে একটু উচ্চজীবনে অভ্যস্ত হইয়া যখন ফিরিয়া আসিবে, ততদিনে লোকেও পূর্ব্ব কথা একটু ভুলিয়া যাইবে। তাহার অবস্থা ও মেয়ের মন উভয়ই একটু খানি বদল হইয়া আসিলে সকল দিকেই একটা সামঞ্জস্য হইয়া যাইবে। তাঁহার প্রথমকার অপমানের ধাক্কাটার সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্ব্ব বিদ্বেষভাবের সহিত সহানুভূতিটা কতক কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে যখন খরচের জন্য টাকাকড়ি কিছু লইতে রাজী হইল না, বিনয়নম্র অনমিত দৃঢ়তায় পুনঃপুনঃ তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল, তখন তাঁহার মন এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যশাকাঙ্ক্ষাহীন, ঐশ্বর্য্যে কুণ্ঠিত; যে অর্থ জগতে সারাৎসার তাহাতে স্পৃহাশূন্য, নিষ্কাম, নির্লিপ্ত! এমন ত কাহাকেও দেখা যায় না; মাসিক দুইশত টাকা! একজন কপর্দ্দকহীন দরিদ্রের পক্ষে এ কিছু সামান্য নয়! তাহার জন্য পরিশ্রম নাই, অসদুপায়ে তাহা উপার্জ্জন করিতে হইবে না, স্বেচ্ছাদত্ত, আত্মীয়জনের উপহার। বিরক্ত হইলেও তাহার উপর তাঁহার মনে মনে শ্রদ্ধা জন্মিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া অনেক কাঁদিলেন, অনেক নিষেধ করিলেন, অবশেষে চোখ মুছিয়া নানা আপত্তির মধ্যেও যাত্রার উদ্যোগে ছোটখাট ঘটা বাধাইয়া তুলিলেন। ইচ্ছা থাকিলেও অম্বর তাঁহার দত্ত বহুমূল্য আসন, বসন শয্যা আভরণ ত্যাগ করিয়া যাইতে সমর্থ হইল না। লজ্জায় কপোল আরক্ত করিয়াও তাহাকে 'জামাই' সাজিয়াই বিদায় লইতে হইল। ভাগ্যে হাঁটিয়া ষ্টেশনে যাইতে হইবে না,—তাই রক্ষা; নহিলে হয় ত ছেলের দল ক্ষেপাইত এবং পরাণে মহেশা প্রভৃতি তাহার বন্ধুবর্গ তাহাকে দেখিয়া সঙ্কোচে পথ ছাড়িয়া দিত, কিংবা বাবুদের জামাই ভিন্ন সে যে তাহাদেরই সেই অম্বর, তাহা কল্পনাও করিতে পারিত না।

কৃষ্ণপ্রিয়া ক্রমাগত অশ্রু মুছিয়া চোক মুখ লাল করিয়া তুলিয়াছিলেন, এখনও সে অশ্রু থামে নাই। প্রণত জামাতার মাথায় হাত দিয়া মৃদু ভগ্নস্বরে অর্দ্ধস্ফুট আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া পাশের দ্বার দেখাইয়া কহিলেন, "ঐ ঘরে যাও"; বলিয়াই অধরে আঁচল চাপিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মাতৃ-হৃদয় তখন কাঁদিয়া লুটাইতেছিল। একি কাণ্ড! এ যেন অভিষেকের দিন রামের নির্ব্বাসন হইতেছে; কিন্তু শাশুড়ী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও অম্বর সহসা সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রথমটা আদেশের মর্ম্মও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু ক্ষণপরেই গৃহমধ্য হইতে মৃদু অলঙ্কার-

বাণী জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

সিঞ্জন তাহার সন্দেহকে সত্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। সে আশাপূর্ণনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। ঈষৎ মুক্ত দ্বারপথে পুঞ্জরক্ত মেঘের মত খানিকটা গোলাপী বসন দেখা যাইতেছে, আর তাহার মাঝখানে একখানি সুললিত হস্ত বিশ্রামশয়ান। সে চিনিল,—এই ক্ষুদ্র রক্তোৎপলসন্নিভ হাতখানিই সে কতদিন দেব-অঙ্গে চামরব্যজননিরত দেখিয়াছে। মন একবার অগ্রসর হইয়া আবার পিছাইয়া গেল! কাজ নাই। জন্মের শোধ দেখা,—তাহাকে নাই দেখিলাম!—

ঈষৎ-মুক্ত দ্বার আর একটু খুলিয়া গেল। তাহার মধ্য দিয়া একখানা মুখ মেঘান্তর-প্রকটিত চন্দ্রের মত বাহিরে উঁকি দিয়া চাহিল। তখন সেখানে কেহই ছিল না, কেবল অদূরে মোহিনী দাসী ঝাঁটাহস্তে দালান ঝাঁট দিতেছিল, বাণী দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া খিল লাগাইয়া দিয়া জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। সে জানালা দিয়া নীচে বাগান ও বাগানের সীমানায় বৃহৎ দেউড়ি দেখা যায়। অল্পক্ষণ পরেই সে দেখিল উদ্যান-পথ বাহিয়া একখানি বোঝাই গাড়ি ফটকের দিকে চলিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি

বন্ধু,

এক বৎসর হইতে চলিল তুমি স্বর্গারোহণ করিয়াছ। তোমার মৃত্যুর পর, শোক-প্রকাশের নিমিত্ত, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সভাসমিতি হইয়াছে। দেশের কত কবি, কত লেখক, লেখিকা তোমার সম্বন্ধে কবিতা এবং প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমি এ পর্য্যন্ত একটি কথাও লিখি নাই। কৃষ্ণনগরের শোক-সভায় দু'টি কথা বলিয়াছিলাম। আজ অসুস্থ শরীর—তোমার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষে দু'টি কথা লিখিতে বসিলাম।

তোমার কথা লিখিতে গেলে প্রবন্ধে কুলায় না। ইংরাজী ১৮৮০ সালে উভয়ের পঠদ্দশায় তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এবং বন্ধুত্বের সূত্রপাত। ইহার পর তুমি যে কএক বৎসর বিলাতে ছিলে, তাহা ছাড়া প্রায় প্রতি বৎসরেই তোমার সহিত দু'একবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তুমি ডেপুটি হইবার পর তোমাকে কত স্থানে কত ভাবে * দেখিয়াছি, এমন দিন গিয়াছে যে তুমি আমি একত্র, আর তোমার স্ত্রী এবং আমার স্ত্রী একত্র, রেল গাড়িতে বা ষ্টীমারে, একস্থান হইতে অন্যত্র গিয়াছি। এক এক জায়গায় তুমি আমার বাসায় বসিয়া সন্ধ্যা হইতে রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত গান গায়িয়াছ। সুতরাং লেখক হিসাবে ক্ষুদ্র হইলেও আমি তোমার বন্ধু হিসাবে সামান্য নহি।

এই জন্যই অনেকে আমাকে তোমার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ফলতঃ তোমার কথা আমি যাহা জানি, এবং যাহা সকলকে জানাইতে পারি, তাহা গুছাইয়া লিখিলে একখানি বই হইয়া পড়ে।

ভাই, তুমি কত বড় কবি, কত বড় লেখক, কত বড় গায়ক ছিলে, সে সম্বন্ধে আমি আজ কিছুই বলিব না। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কোনও স্থানের শিক্ষিত-সমাজে এমন কেহ আছেন কি, যিনি তোমার কবিতা, তোমার নাটক, তোমার হাসির গান, তোমার প্রেমসঙ্গীত এবং তোমার স্বদেশ-সঙ্গীতের সহিত অপরিচিত? জগতে তুমি যে যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে তোমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে স্বতঃই কেমন একটা গৌরব, কেমন একটা স্পর্দ্ধা অনুভব করি। সম্মুখে তোমার মৃত্যুর দিন—৩রা জ্যৈষ্ঠ। তোমার মৃত্যুর কথাই মনে আসিতেছে। আজ সেই সম্বন্ধেই দু'টি কথা বলিব।

* সেটল্‌মেণ্ট অফিসার, আবকারী বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর ইত্যাদি।

ভাই, তুমি বাণীর এমন একনিষ্ঠ উপাসক হইয়াছিলে কেন? এত সরল, এত কোমল, এত মধুর প্রকৃতির লোক ছিলে কেন? বিলাত-ফেরত হইয়াও তুমি দেশী রীতিনীতি "জবাই" কর নাই কেন? তুমি তোমার দেশকে এত ভালবাসিতে কেন? দেশের লোকের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে কেন? তুমি এত বন্ধুবৎসল ছিলে কেন? অন্যের অনুরোধ উপেক্ষা করিবার শক্তি তোমার ছিল না কেন? তোমার স্বভাবই ত তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, আর তাহাতেই তুমি অকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে।

চিকিৎসক তোমাকে লঘু আহার করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, শরীর যত দুর্ব্বল হইবে, তত অধিকদিন বাঁচিবে। তিনি তোমাকে নিমন্ত্রণ খাইতে, গান গাইতে এবং মস্তিষ্ক চালনা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। * ভাই তুমি কি এই নিয়ম পালন করিতে পারিতে না?

১৩১৯ সালের ২৪এ ফাল্গুন শনিবার—তোমার সুরধামে শেষ গিয়াছি। আমি ডাকিতেই তুমি খালি পায়ে, আলগা গায়ে, উপর হইতে নামিয়া আসিলে। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার সহিত কথা কহিলে। তোমার স্বাস্থ্যের কথাই অধিক হইল। বলিলে, "ভাই, ছ'মাস সাত মাস হিন্দু-

* Dr. Calvert এর কথাগুলি তোমার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা এই:—

"You must live upon simple diet—the diet of a Hindu widow.—The weaker you grow, the longer you live. Do not partake of a feast—Do not exercise your brain. You may allow yourself to be entertained, but never try to entertain others."

বিধবার খাদ্য খাইতেছি, কিন্তু গান গাওয়া বা লেখা একবারে বন্ধ করিতে পারি নাই।" অমি বলিলাম, "ঐ ত তোমার রোগ। সে বার সন্ধ্যার সময় একদিন তোমার বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম তুমি টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া গান ধরিয়াছ। বন্ধুবান্ধবকে গান শুনাইবার জন্য তুমি যে ভাবে গান করিতেছিলে, বোধ হয় কোন ব্যবসাদার গায়ক অর্থলোভেও সে ভাবে গান গায়িতে রাজি হয় না। এখন যখন শরীর ভাঙ্গিয়াছে তখন ও স্বভাব ছাড়। তুমি কহিলে কলিকাতার কোলাহল আর সহ্য হয় না। শীঘ্রই কৃষ্ণনগর যাব। একটু নির্জ্জনে থাক্‌লে খড়েয় স্নান করলে শরীরটা বোধ হয় ভাল হবে। মনে করেছি খড়ের ধারে একটা বাড়ী করিব।

আমি কৃষ্ণনগরে ফিরিলাম। সাত দিন পরে অর্থাৎ ২রা চৈত্র শনিবার তারিখে তুমি এখানে আসিলে। দু'তিন দিন সকালে বিকালে হাঁটিয়া এবং জলঙ্গীর জলে স্নান করিয়া শরীর বেশ একটু সুস্থ বোধ করিলে,কিন্তু তাহার পরেই বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে নিয়ম ভঙ্গ করিলে! আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া—তোমার কথা শুনিয়া—তোমার শরীরের অবস্থা বুঝিয়া—অনুরোধ না করিয়াই ফিরিয়া আসিলাম। তিন চারি দিন তোমাকে আমার বাড়ীতে পাইয়া এবং আমার পুত্রকন্যাগণ তোমার একটি গান শুনিবার জন্য পাগল জানিয়াও তোমাকে গান গায়িতে বলিলাম না। কিন্তু তুমি দু'তিন্‌জন বন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে, দু'একটি গানও গায়িলে। আবার তোমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আমি তোমায় এবং আমার সেই বন্ধুদিগকে অনুযোগ করিলাম।

একদিন তুমি আমি একত্র এখানকার ক্লাবে গেলাম। সহরের অনেক ভদ্রলোকই সেখানে ছিলেন। সকলে তোমাকে একটি গান গায়িতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, "ডাক্তারের নিষেধ।" আমার কথা টিকিল না। তুমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান ধরিলে "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে।" আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম। তুমি তাহা লক্ষ্য করিলে, কিন্তু গান ছাড়িতে পারিলে না।

১০ই চৈত্র, রবিবার, প্রাতঃকালে তুমি যখন জন্মের মত জন্মভূমি কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিলে,—তখন—ইহজগতে তোমার সহিত আমার সেই শেষ সাক্ষাতের দিনে—তুমি কহিলে, ভাই চন্দ্রশেখর, আমার পক্ষে কলিকাতা কৃষ্ণনগর দুই-ই সমান। ভাবিয়াছিলাম এখানে আসিয়া একটু নির্জ্জনে থাকিব—তাহা হইল না, যদি সকলেরই তোমার মত জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে এত শীঘ্র কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া যাইতাম না। বিলাতে "ডাক্তারের নিষেধ" এ কথা শুনিলে কেহ কখনও নিষিদ্ধ কাজ করিতে অনুরোধ করে না—এ দেশে আমাদের এখনও সে জ্ঞান হয় নাই। এ কথা কটি কি ভুলিবার? মৃত্যুর মাসাধিক পুর্ব্বে তুমি তোমার জন্মভূমিতে আসিয়াও নিজের ইচ্ছামত—চিকিৎসকের উপদেশ মত—থাকিতে পারিলে না, ইহা কি কখনও ভুলিতে পারিব?

কিন্তু ভাই, কলিকাতা, কৃষ্ণনগর কেন—তুমি বোধ হয় বাঙ্গালার কোন স্থানেই নির্জনে বাস করিতে পারিতে না। তুমি যে দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পরিচিত। আর কোথায় তোমার বন্ধু না ছিল? তুমি যেখানে যাইতে সেখানেই তোমাকে লোকে খুঁজিয়া বাহির করিত। "নরত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।" রত্ন সকলেই খোঁজে। তুমি যে ভাই মহামূল্য রত্ন ছিলে।

তাই বলি ভাই, তুমি যদি বন্ধুবৎসল না হইতে, বাল্যবন্ধু-দিগকে ভুলিয়া যাইতে, লোকের অনুরোধ গ্রাহ্য না করিতে, তাহা হইলে তোমার এত বন্ধুবান্ধব হইত না, লোকেও তোমাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিত না।

আবার ভাবি, বন্ধুবান্ধবের হাত এড়াইলে না হয় তোমার গান গাওয়া এবং নিমন্ত্রণ খাওয়া বন্ধ হইত, কিন্তু মস্তিষ্ক-চালনা তুমি একবারে বন্ধ করিতে পারিতে কি? তোমার স্বভাব না বদ্‌লাইলে ত তাহা হইত না। সাহিত্য এবং সঙ্গীতই যে তোমার জীবনের মুখ্য ব্রত এবং জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। সাহিত্যে নব নব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার শক্তি তোমার যথেষ্ট ছিল। কাজেই একাকী বসিয়া থাকিলে—স্বভাবের তাড়নায়—হয় কিছু ভাবিতে, না হয় কিছু লিখিতে। এই জন্যই মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বাণীর সেবায় নিযুক্ত ছিলে। ভাই, ইহাতে তোমার দোষ দিতে পারি কি? সামান্য রূপ লিখিবার অভ্যাস আছে বলিয়া নিজেই এ রোগ, স্বভাবের এ তাড়না—বেশবুঝি,এবং অবসর-সময়ে বিলক্ষণ অনুভব করি। শত চিকিৎসকের উপদেশেও ত ইহার হাত এড়াইবার উপায় নাই। তাই

বলিয়াছি তুমি যে চিকিৎসকের উপদেশ পালন করিতে পার নাই সে দোষ তোমার নহে। দোষ কতকটা তোমার স্বভাবের, আর কতকটা আমাদের। তুমি অসুস্থ ভাবিয়াও আমরা তোমাকে অসঙ্গত অনুরোধ করিতে ছাড়ি নাই, ইহা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব?

ভাই, তোমার পুত্র-কন্যার কথা মনে পড়িলে বুক ফাটিয়া যায়। তুমি ত বালক-বালিকা মাত্রকেই বড় ভালবাসিতে, এবং "শিশুর হাসি"তে স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতে। একদিন তোমার কলিকাতার বাড়ীতে বসিয়া কহিয়াছিলে— বাড়ীর জন্য যে জমি কিনিয়াছিলাম, তা'র অৰ্দ্ধেকটায় বাড়ী করিয়াছি, দেখিতেছ। বাকি অৰ্দ্ধেকখানি পড়িয়া আছে। জমির দর যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহাতে ঐ অৰ্দ্ধেক ছাড়িয়া দিলেই পূরা জমির দামটা পাওয়া যায়। গ্রাহকও অনেক। অনুরোধও বিস্তর হইতেছে। কিন্তু, ভাই, জমিটুকু ছাড়ি নাই। ঐ জমিটিতে প্রত্যহ বিকাল বেলা পাড়ার ছেলেমেয়েগুলি খেলা করে, ছুটাছুটি করে। আলিপুরের আপিস হইতে আসিয়া তাহাদের দেখিয়া দিনের অবসাদ ভুলিয়া যাই। বালক-বালিকার মুখ দেখিলে আমি বড় আনন্দ পাই।

পরের ছেলে মেয়ের প্রতি এত টান্, তাহাদের মুখ দেখিয়া এত আনন্দ, আর তুমি নিজের মাতৃহীন পুত্রকন্যা দু'টিকে পিতৃহীন করিয়া চলিয়া গেলে! তোমার সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর পর তুমিই যে তাহাদের মা, বাপ দুই-ই হইয়াছিলে। তাহাদিগকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিলে। ক্ষণেকের জন্য তাহাদিগকে চক্ষুর অন্তরাল হইতে দিতে না। তুমি কি ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে পার?

ভাই, যে যাহাই বলুক না কেন, তুমি কখনই মৃত্যুকে ডাকিয়া আন নাই। তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছিল—এ জন্মের মত সাহিত্য-সাধনা শেষ হইয়াছিল—তুমি চলিয়া গিয়াছ। আর লিখিতে পারি না। ১৯১০ সালের শেষে আলিপুরে আমার পৃষ্ঠব্রণ হইলে তুমিই আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলে, এবং তোমার এই নগণ্য বন্ধুর মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত হইয়াছিলে। আমি ভাঙ্গা শরীর লইয়া এখনও বসিয়া আছি। আর তুমি—দেশপূজ্য, তুমি জন্মভূমি কৃষ্ণনগরের গৌরব—তুমি আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছ। আর আমাকে তোমার মৃত্যুর কথা লিখিতে হইল, আর তাহাই ভারতবর্ষে তোমার বড় সাধের ভারতবর্ষেই লিখিলাম।

ইহাতে তোমার সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। যদি শরীর সুস্থ হয়, মস্তিষ্কের বল পাই, তাহা হইলে তোমার কথা বিস্তৃতভাবে দেশের সকলকে শুনাইব, তোমার ভালবাসার ঋণ কিয়ৎপরিমাণে শোধ করিবার চেষ্টা করিব। ভগবান্ এ আশা পূর্ণ করিবেন কি না জানি না।

তোমার "বন্ধুবর"

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

মন্ত্র-মুগ্ধা

পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিজয়নগরের রাজ্যপাটে তখন শক্রদমন সমাসীন।

রাজরাজড়ার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা রটে; শক্রদমনের সম্বন্ধেও অনেক জনশ্রুতি ছিল। কেহ কেহ বলেন, '—পিতা রুদ্রপ্রতাপ তাঁহার একমাত্র বংশধর পুত্র ভীমসেনের সংশয়াপন্ন পীড়িতাবস্থায়, তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া তাঁহার ঘনকেশমণ্ডিত শিরোদেশে খালিত্য আনিয়াও যখন কোন ফল পাইলেন না, তখন একদিন, শুভ কি অশুভক্ষণে জানি না, বংশলোপাশঙ্কায় তিনি পিশাচ-সাধনা করিলেন। ফলে, তার কিছুদিন পরে শক্রদমনের জন্ম হয়।' ইহাও কিংবদন্তী ছিল যে, 'সূতিকাগারে ষষ্ঠরজনীর দ্বিপ্রহরে, বিধাতাপুরুষ যখন তাঁহার তুলিকা ও ভাণ্ড লইয়া তাঁহার ললাটলিপি লিখিতে বসেন, তখন না কি চারিদিকে পিশাচের অট্টহাসি শোনা গিয়াছিল।' কথাটার মূলে কতকটা সত্য থাকিতে পারে, পাঠকপাঠিকা তাহার বিচার করিবেন; কিন্তু এটা ধ্রুব সত্য যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্রদমন তাহার পিতামাতার, আপনার এবং রাজ্যের অভিসম্পাতস্বরূপ হইয়া উঠিতেছিলেন। এদিকে ভীমসেনও ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাজ্যাধিকারী;—উভয়ের চরিত্র-তুলনায় প্রজাবর্গ তাঁহারই পক্ষপাতী ছিল, সুতরাং তাহারা নিশ্চিন্ত হইল।—বৃদ্ধপ্রতাপের মৃত্যুর পর কিন্তু ভীমসেন অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, এবং শক্রদমনই সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। অবশ্য, সাধারণে সহজেই বুঝিল যে, কনিষ্ঠ, বিষপ্রয়োগে জ্যেষ্ঠকে মর্ত্ত্যধাম হইতে অপসৃত করিয়া নিজের জন্য সিংহাসনের পথ উন্মুক্ত করিলেন। কিন্তু সে কথার প্রকাশ্যে আলোচনা করে, এমন সাহস কাহারও ছিল না। দেখিয়া শুনিয়া লোকে তাঁহার নামকরণ করিল—'পিশাচ শক্রদমন'। শক্রদমনের কাণে সে কথা গিয়াছিল;—শুনিয়া; তিনি গম্ভীরভাবে মৃদু হাস্য করিলেন।

কিন্তু রাজার সম্বন্ধে যাহাই রটুক, কৃষক রঘুবীরের সম্বন্ধে সে সব কথা খাটিত না,—তথাপি রাজার ন্যায়ই সে দুর্দ্ধর্ষ ছিল—সহজে কেহ তাহাকে উত্যক্ত করিতে সাহস করিত না। তাহার বজ্রের ন্যায় কঠিন দেহে অসুরের ন্যায় অমিত বল ছিল; স্বভাবতঃই সে ক্রোধনস্বভাব কিন্তু স্বল্পভাষী ছিল,—এমন কি, সময়ে সময়ে, সপ্তাহ—পক্ষান্ত পর্য্যন্ত জনপ্রাণীর সহিত সে বাক্যালাপ করিত না। এমনই এক ঝোঁকের মুখে,—একদিন সে শালবনীর গহন কাননে গিয়া পড়িল।—সেটা রাজার খাস বন, তাঁহার বিনানুমতিতে কাহারও সেখানে শিকার করার অধিকার ছিল না। রঘুবীর সে কথা জানিয়াও, ইচ্ছা করিয়াই সেখানে আসিয়াছিল।—কি, কৃষক বলে', কি তার দেহে রক্তমাংস নেই? না, ভগবানের কাছ থেকে রাজারা এমন কোন সনদ নিয়ে এসেছে যে, বনের জীবজন্তুর উপর একমাত্র তাদেরই অধিকার থাক্‌বে? আব্দার মন্দ নয়! সম্ভব হ'লে, হয়ত তারা একদিন এ হুকুমও চালাত যে, তাহাদের বিনাহুকুমে কেউ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও ফেল্‌তে পাবে না। তাই ত, গরীবেরা ভেসে এসেছে না কি?

হস্তে ধনুঃ, পৃষ্ঠে তূণ, কটিতে ভোজালি লইয়া রঘুবীর নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল।—দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া একটা শৃগাল ছুটিয়া পলাইল, মস্তকের উপর বিকৃত কণ্ঠে পেচক ডাকিয়া উঠিল,—তবু তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রহরব্যাপী চেষ্টার ফলে অবশেষে একটা বৃহৎ হরিণ শিকার করিয়া সে যখন প্রশংসমাননেত্রে মৃতমৃগের বিশাল দেহ এবং লতাতন্তুবৎ সুদৃশ্য শৃঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছিল, তখন সহসা বনজঙ্গল ভেদ করিয়া এক বৃদ্ধ অশ্বারোহী তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন;—তিনি জয়সেন—রাজার বিশ্বস্ত অমাত্য ও পার্শ্বচর।

"আরে, একি?—কে ও, রঘুবীর না? হাঁ, রঘুবীরই ত!"

এমন 'হাতে পাতে' ধরাপড়ায় রঘুবীর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মুখে যে যাহাই বলুক, শক্রদমনের ক্রোধকে ভয় করিত না, তখনকার কালে এমন লোক ছিল না।—রঘুবীর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" নীতির অনুসরণ করিতে যাইতেছিল,—হাসিয়া জয়সেন বলিলেন—"আরে যাও কোথা ভাই? তোমার এত বড়

বুকের পাটা, রাজার হরিণ শিকার কর,—আগে শূলে চড়, তার পর যেও এখন। এত ব্যস্ত কেন?

রঘুবীর ফিরিয়া দাঁড়াইল। গর্জ্জন করিয়া বলিল—"শূলে দেয় কে? এত চোখ রাঙানি কিসের? এ বন তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি না কি?"

"আমার না হয়, যাঁর, তিনি ঐ আস্ছেন—ওই চেয়ে দেখ, দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

ঘনলতাগুল্ম ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দেখিতে দেখিতে এক ভীমকায় অশ্বারোহী সেখানে আসিয়া পড়িলেন।—তাঁহার অঙ্গে পীতবর্ণের মৃগয়ার বেশ, মস্তকে রাজ-উষ্ণীষ, বন্ধনমুক্ত সজারুকণ্টকলাঞ্ছিত দু'একটি কেশগুচ্ছ স্কন্ধদেশে পড়িতেছিল; দৃষ্টি তীব্র, জ্বালাময়,—সে দিকে চাহিলে চক্ষু ঝলসাইয়া যায়, অন্তরাত্মা কাঁপিয়া ওঠে।

"কি জয়সেন, কি শিকার ক'র্‌লে?" বলিয়া একলম্ফে ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইলেন।

"এই দস্যুটাকে জিজ্ঞাসা করুন, মহারাজ! এ বনের পশুগুলো কি এদের শিকারের জন্যই আছে?"

শত্রুদমন একবার কৃষকের প্রতি আর একবার হত মৃগের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।—"শূলে চড়্‌বার বড় সাধ যে দেখ্‌ছি!" বলিয়া, ভাল করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন—"তোমারই নাম রঘুবীর না?—তুমিই না কি কুস্তি লড়্‌তে গিয়ে কোন এক নামুজাদা পালোয়ানের ভবলীলা সাঙ্গ করে' দিয়েছিলে? আচ্ছা, আজ তোমায় আমায় বল-পরীক্ষা হ'ক্।—জানই ত, কত যাগযজ্ঞ, কত দানধ্যান ক'র্‌লাম—এই ভাবটা,—এই মারামারি কাটাকাটির ঝোঁকটা আমার কিছুতেই গেল না। এ যাবার নয়। জন্মে আমার অভিসম্পাত আছে।"

রঘুবীর নির্ব্বাক্—হতমৃগনিবদ্ধদৃষ্টি।

"কি বল? ভাব্‌ছ, রাজার সঙ্গে লড়াই ক'র্‌বে কি করে'? বেশ, না লড়—শূলে যাও। আর লড় যদি,—জিততে পার, ভাল; হার—তোমার অদৃষ্ট, শাস্তি পাবে; আমার চেয়ে যার গায়ে বেশী বল নেই, তেমন লোকের আমার বনে শিকার ক'র্‌তে আসাই ধৃষ্টতা।"

শত্রুদমনের সম্বন্ধে এত সব উদ্ভট জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে, তাঁহার এ 'খামখেয়ালি' প্রস্তাবে অপর দুইজন তেমন বিস্মিত হইল না। জয়সেন কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হইতেছিলেন,—'একটা মাত্র বাঁশীর ফুঁতে যখন সহজে কাজ মেটে, তার জন্য এ কি রাজার ছেলেমানুষি!' কিন্তু প্রতিবাদে কোন ফল হইবে না বুঝিয়া, তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন;—কৃষকে ও রাজায় ভীষণ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কেহ কম নয়;—এক দণ্ড—দুই দণ্ড—অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া সে মল্লযুদ্ধ চলিল; দু'জনেই পরিশ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত-শরীর,—অবশেষে শত্রুদমন কৌশলে প্রতিপক্ষকে আয়ত্ত করিয়া, গোলকের ন্যায় তাহাকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিলেন।—রঘুবীর অবশের ন্যায় লুটাইয়া পড়িল; তাহার শরীরের সব অস্থি বুঝি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল! কিন্তু সে শোণিতলোলুপ নৃপতির হস্তে তবু ত তার নিস্তার ছিল না। চক্ষের নিমেষে শত্রুদমন তাহার বক্ষের উপর বসিয়া পড়িয়া কটি হইতে ভোজালি নিষ্কাশিত করিলেন। আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে ব্যাকুল হইয়া রঘুবীর রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মহারাজ, আমার প্রাণ-ভিক্ষা দিন। আপনার মহাশত্রু দুর্দ্দান্ত রতনচাঁদ দস্যুর সন্ধান দেব।"

শত্রুদমন কিয়ৎক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিলেন, অবশেষে বলিলেন—

"আমি কারও পরিহাস বা মিথ্যা কথা ক্ষমা করিনে, তা জান ত?—কি বল্‌বে, শুনি।"—বলিয়া তিনি ঈষৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শত্রুদমনের পেষণে রঘুবীরের কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দু'একবার ঘড়ঘড় করিয়া, অতি কষ্টে সে উত্তর করিল—"মহারাজ, তার নির্ব্বাসনদণ্ডকে উপহাস কর্‌বার জন্যই প্রতিমাসেই সে একবার ক'রে সন্ন্যাসীর বেশে সহরে এসে থাকে;—এখনও লোকের কাছে কর আদায় করে; শুধু তার ভয়ে লোকে আপনাকে কিছু জানাতে পারে না।—বিশ্বাস না হয়, কাল সন্ধ্যার সময় আমার বাড়ীতে যাবেন, তার আসবার কথা আছে।"

শত্রুদমনের মুখমণ্ডল প্রাবৃট্‌ঘনচ্ছায়বৎ গম্ভীর হইল,

হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল,—প্রতিহিংসায় তিনি ভীষণতম হইয়া উঠিলেন;—রঘুবীর শিহরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

শক্রদমন রঘুবীরকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"জয়সেন, এ লোকটার পিঠে হরিণটাকে বেঁধে একে দূর করে' দাও;—এর চেয়ে বড় শিকার জুট্‌ল বোধ হয়।—ফে'র—" বলিয়া নিমেষে ঘোটকারোহণ করিয়া চকিতে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। জয়সেনও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"রঘুবীর, বড় ভাগ্যের জোর তোমার, তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলে। আর এ অঞ্চলের ছায়া মাড়িও না।"

রঘুবীর আরও কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া, অবশেষে, ধূলি ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। দাঁড়াইবে কি?—বিশালকায় পার্ব্বত্য সর্পের পেষণে হরিণীর যে দশা হয়, তাহারও তাহাই হইয়াছিল;—চলিতে সে টলিয়া পড়িতেছিল। তবু সে আপন শক্তিলব্ধ শিকার পরিত্যাগ করিল না। কোনরূপে সেটাকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ধনু-যষ্টির উপর ভর দিয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল—"বেটা পিশাচ, শরীরে আর কিছু রাখে নি।—ভগবান্ একে যমপুরীর রাজা করেন নি কেন?"

চক্ষের নিমেষে শক্রদমন তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া কটি হইতে ভোজালি নিষ্কাশিত করিলেন

(২)

"মহারাজ, শুধু একটা হুকুমের অপেক্ষা। বলেন ত এখনই বাড়ী ঘেরাও করে সে ডাকাতটাকে পাকড়াও করে' নিয়ে এসে, সঙ্গে সঙ্গে লট্‌কে দিই। তার জন্য আপনার নিজের যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন?—এ ছদ্মবেশই বা কেন?"

শক্রদমন হাসিলেন। পিশাচের হাসি—শূন্যগর্ভভাণ্ড-নির্গত ঝটিকাশব্দবৎ।

"জয়সেন, তুমি শুধু লোককে লট্‌কাতেই জান,—কিন্তু আমি সে কাপুরুষতা ভালবাসিনে। আমিও এ মৃত্যুর খেলা ভালবাসি; কিন্তু মানুষের মত শিকার করে' শোণিত-পাত ক'র্‌তে চাই; মৃগয়ার পশুর মত তাদের খেলিয়ে নিয়ে মারতে চাই।—কে জানে আজ হয়ত জীবনের সবচেয়ে বড় শিকার মিল্‌বে।"

শক্রদমন তখন তার যথার্থ অর্থ বুঝেন নাই—সে

ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি পান নাই।—শালবনীর অরণ্যে ভাগ্য-দেবী তাঁহার যে অদৃষ্ট-গুটিকা হইতে তন্তু বাহির করিতেছিলেন, এতক্ষণে তাহা হইতে বয়নকার্য্য আরম্ভ হইতেছিল। তাই কৃষক-তনয়া রঘুবীর-দুহিতা পার্ব্বতী ইন্দারায় জল তুলিতে আসিয়া ভাবিতে লাগিল—আগে জল তুলিবে, না বিল হইতে গোটা দুই পদ্ম ছিঁড়িয়া আনিবে? শেষে ভাগ্য-দেবীরই জয় হইল। পার্ব্বতী ইন্দারার পার্শ্বে গাগরী রাখিয়া—পদ্ম আনিতে চলিল।

শক্রদমন ও জয়সেন ইত্যবসরে সেই ইন্দারা অতিক্রম করিয়া গেলেন।

জয়সেন বলিতেছিলেন—"মহারাজ, সেটা আপনার পক্ষে শিকার হ'তে পারে, কিন্তু প্রতিপক্ষের পক্ষ নয়। কণ্ঠদেশে আপনার ও বজ্রমুষ্টির পেষণ অপেক্ষা মৃত্যুও স্পৃহণীয়। যাই হ'ক আমরা এসে পড়েছি, ঐ রঘুবীরের বাড়ী।"

পথে আর তখন কেহ ছিল না। শক্রদমন জয়সেনকে সঙ্গে লইয়া একেবারে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে ছোট একটু উঠান,—এবং একচালে দুইখানি উত্তরদ্বারী ঘর,—একখানি বড়, একখানি ছোট। দু'জনে বড় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।—ভিতরে অন্ধকার, এককোণে একটি আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল, আর এককোণে রঘুবীরের অতিকষ্টলব্ধ মৃগমাংস উনানের উপর শিক হইতে ঝুলিতেছিল। বাড়ীতে কেহ আছে বলিয়া বোধ হইল না।

শক্রদমন অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"যা হ'ক্, রঘুবীরটা ধূর্ত্ত বটে। সে-ই যে তাকে ধরিয়ে দিচ্ছে, এ কথাটা সে তাকে জানাতে চায় না। অথচ 'যা শক্র পরে পরে।' কে আসছে বুঝি? জয়সেন, দস্যুটা, না আমাদের কোন অনুচর? যাই হ'ক্, হুঁসিয়ার।"

সন্ধ্যার সময় যখন কথামত রতনচাঁদ আসিয়া তাহার বাটীতে পৌছিল না, তখন রঘুবীর কাজেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল,—বিশেষতঃ শক্রদমনের শ্রীকরলাঞ্ছিত নীলিমারেখা তখনও তাহার কণ্ঠদেশ হইতে মিলাইয়া যায় নাই। অবশেষে সে গ্রামের অপরপ্রান্তে গিয়া পথপার্শ্বে তাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রতনচাঁদ প্রায়ই সেই পথেই আসিত।

শক্রদমন ও জয়সেন উভয়ে একটু 'গা ঢাকা' হইয়া উৎকর্ণভাবে আগ্রহদৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভাগ্যদেবীর চরকা তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বহির্দ্দেশ হইতে কাহার মৃদু পদাঘাতে দ্বার খুলিয়া গেল।—দ্বারদেশে এক বালিকা,—কক্ষে গাগরী, স্কন্ধে বিসর্পিত পদ্মনাল, কপোলে শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু!—দুইজন অপরিচিত পুরুষকে অভ্যন্তরে দেখিয়া বালিকা স্থির দৃষ্টিতে তাঁহাদের প্রতি চাহিল, তাঁহারাও কতকটা বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

পার্ব্বতী সাধারণ কৃষককন্যা, বেশও তাহার তদুপযুক্ত; অপূর্ব্ব সুকোমল সৌন্দর্য্য তাহার কোন কালে ছিল না বরঞ্চ তাহার মুখভাবে একটা দৃপ্ত পৌরুষভাব মিশ্রিত ছিল। সুদৃঢ় নিটোল দেহাবয়ব, প্রোজ্জ্বল দীর্ঘ-চক্ষুদ্বয়, ঘন নয়নপল্লব এবং সুচিত্রিত ভ্রূযুগে তাহার দৃঢ়চিত্ততা এবং স্থিরসঙ্কল্পের ভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকিত।—বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া, সে ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া যথাস্থানে গাগরী রাখিল,—তার পর দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, ঈষৎ অপ্রসন্নভাবে সুধাইল—"কি চান আপনারা?"

শক্রদমনের ইঙ্গিতে জয়সেনই উত্তর দিলেন,—পরুষভাবে বলিলেন—"তোর সে কথায় দরকার কি, ছুঁড়ি? আমাদের কাজ আছে।"

পার্ব্বতী স্থিরভাবে একবার তাহার প্রতি চাহিল; তার পর ফিরিয়া, নিতান্ত নির্ব্বিকারভাবে আপনার কাজে মন দিল। শক্রদমনের প্রশংসমান চক্ষু তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। অবশেষে কৌতূহলী হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি বড় কম কথা কও দেখ্‌ছি। আমি জান্‌তাম স্ত্রীলোক মাত্রেই বাচাল—পরের কথা জানবার জন্য তারা ছট্‌ফট্ ক'রতে থাকে,—কিন্তু তুমি আমার সে ধারণা বদলে দিলে দেখ্‌ছি। আমরা কে, কি জন্য এসেছি—সে কথা জান্‌তে তোমার একটুও আগ্রহ হ'ল না?"

শিক হইতে মাংসখণ্ডটাকে নামাইতে নামাইতে পার্ব্বতী উত্তর করিল—"আপনারা নিজে থেকে সে কথা না বল্‌লে কি আমি জোর ক'রে আপনাদের বলাতে পারি? না, আপনারা আমাদের বাড়ী চড়াও ক'র্‌লে আমি তা আট্‌কাতে পারি? আপনারা বড় লোক, আপনাদের

ওপর কি আমরা কথা কইতে পারি?—এ সব জায়গায় আমাদের চুপ করে' থাকাই ভাল।"

শত্রুদমন বালিকার কথায় আকৃষ্ট হইলেন; বলিলেন—"ভাল, যখন তোমাকে বল্‌লে প্রকাশ হবার ভয় নেই, তখন না হয় বলছি।—আমরা রাজার লোক, তাঁর কাজে এসেছি। রাজাকে তুমি কখনও দেখেছ?"

পার্ব্বতী, গ্রীবা ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া বলিল—"হাঁ, সে পিশাচ-রাজাকে একবার দেখেছি। কিন্তু তখন তিনি কোন্ যুদ্ধে যাচ্ছিলেন—সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মে আঁটা ছিল। তিনি আপনার সমানই উঁচু—খুব জোয়ান।"—পার্ব্বতী শত্রুদমনকে চিনিতে পারে নাই।

শত্রুদমন মনে মনে হাসিলেন; বলিলেন;—"বেশ, তা হ'লে তুমি তাঁকে তেমন চেন না দেখ্‌ছি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সব গল্প শুনেছ ত? লোকে বলে, পিশাচের বরে তাঁর জন্ম, তিনি পিশাচসিদ্ধ।"

পার্ব্বতী ঘৃণাভরে উত্তর করিল—"হাঁ, শুনেছি বটে,—কিন্তু তার বেশীরভাগই রূপকথা—ছেলেভোলান ছড়া।" তার পর কি ভাবিয়া বলিল—"বিয়ে ক'র্‌লে তাঁর মতিগতি ভাল হবে; তিনি বিয়ে করেন না কেন?"

জয়সেন বালিকার জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য দু'একবার তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু বালিকার চক্ষু অন্যদিকে ছিল,—না থাকিলেও, সে সরলা;—সে চাহনির অর্থ বোধ হয় বুঝিত না।

"বিয়ে করেন না কেন? তাঁর চরিত্র ত কারও অগোচর নেই। কোন্ রাজকন্যা প্রাণের মায়া ভুলে তাঁর গলায় মালা দেবে?"

পার্ব্বতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"দুঃখের কথা বটে। কিন্তু সে পিশাচ-রাজার গলায় মালা দেওয়ার চেয়েও অনেক দুঃখ কতজনকে সইতে হয়।—দুর্দ্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল লোককে বশে আনা, এমন কিছু শক্ত নয়;—একটু ধৈর্য্য, একটু কৌশল থাক্‌লে, সে কাজ খুবই সহজ হয়।"

দুর্দ্দান্ত শত্রুদমন, যাঁর নামে রাজ্যের লোকের হৃৎকম্প হইত, এক বালিকার কথায় তিনি নতশির হইলেন;—ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বটে? আচ্ছা, তোমার সঙ্গে যদি তাঁ'র বিয়ে হত, তা হ'লে তুমি কেমন ব্যবহার ক'র্‌তে?"

পার্ব্বতী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল,—শেষে উত্তর করিল—"দেখুন, মানুষ সবই সমান। পিতার সঙ্গে যেমন ব্যবহার ক'রে থাকি—তাঁর সঙ্গেও তা হ'লে তেমনই ব্যবহার ক'র্‌তাম। ক্ষুধা পেলে, খেতে দিতাম; ভালমনে থাক্‌লে, যাতে তাঁর মনের সুখ বাড়ে তাই ক'র্‌তাম; রাগ ক'র্‌লে, তাঁর কথার ওপর কথা না বলে', আপনমনে সংসারের কাজ করে' যেতাম। কিন্তু তিনি যে ভাবেই থাকুন, কথা তাঁর সঙ্গে যত কম পার্‌তাম কইতাম," বলিয়া সে অর্দ্ধদগ্ধ মাংসখণ্ডটাকে ভাল করিয়া শিকের উপর বসাইয়া দিল।

ছদ্মবেশী শত্রুদমন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হাঁ, সে মন্দ ব্যবস্থা নয়। কিন্তু তুমি ত জান না, তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়া মানে কি?—কত লোককে সে গাড়ীর চাকায় বেঁধে এনেছে, কত লোককে ঘোড়ার পায়ে বেঁধে উর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে, তাদের দেহ নিয়ে ময়দার তাল পাকিয়েছে,—কত শত্রুকে দম বন্ধ করে' মেরেছে!—তোমার সঙ্গেও যদি সে ঐ রকম ব্যবহার ক'র্‌ত, তখন?"

নির্ব্বিকার বালিকা, অবজ্ঞার ভরে উত্তর করিল—"তাতে কি এসে যেত? একদিন ত মর্‌তেই হবে।—যদি জানতা'মও যে ভোরবেলায় আমায় বিষ খাইয়ে মার্‌বে, তা হ'লেও তার আগের রাত্রিতে আমার ঘুমের কোন ক্ষতি হ'ত না। জানি আমি, তাঁর ভাইকেও তিনি এমনই ভাবে মেরে—"

"চুপ্ কর, সর্ব্বনাশী"—বৃদ্ধ জয়সেন রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—"চুপ্ কর্।"

কিন্তু বালিকা চকিত হইয়া ফিরিতে না ফিরিতে, একলম্ফে শত্রুদমন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন;—তাঁহার হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ, চক্ষুদ্বয় দীপ্ত—রক্তবর্ণ, অস্পষ্ট আলোকে সে ক্রোধস্ফীত বিশাল দেহ এবং সে প্রচণ্ড মুখভাব পিশাচের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল।—নিক্ষিপ্ত ছদ্মবেশ ধূলায় লুটাইতেছিল।

বালিকা হটিল না। অন্ধকারে বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ চকিতে সে সব বুঝিয়া লইল; বলিল—"বুঝেছি, আপনি কে? কিন্তু পার্ব্বতী শুধু শুধু ভয় পায় না। মার্‌তে ইচ্ছা হয়, মারুন। এ'ত আমার বানান' কথা নয়,—এর মূলে

তাঁহার বিশাল মুষ্টি, বালিকার গ্রীবার প্রতি প্রসারিত হইল।

যে কঠোর দৃষ্টি শত্রুর অন্তরাত্মাকে শিহরিত করিয়া তুলিত, সেই দৃষ্টি সামান্যা এক কৃষক-দুহিতাকে দগ্ধ করিতে পারিল না!—অজেয় শত্রুদমন আজ এক গ্রাম্য বালিকার নিকট জীবনে সর্ব্বপ্রথম পরাজয় মানিলেন।

শত্রুদমন বিস্মিত হইলেন। কতক্ষণ সেই ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সে বাটী ত্যাগ করিলেন।—দস্যুর কথা আর মনে পড়িল না, মনে পড়িলেও, তিনি আর ফিরিতেন না।—তাঁর মনে তখন কি ভাবের লীলা, কিসের সংগ্রাম চলিতেছিল,—কেমন করিয়া বলিব?

জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া দুইটি প্রাণী অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে, দুইটি ছায়ামূর্ত্তির ন্যায়, নিঃশব্দে পাশাপাশি অগ্রসর হইতেছিল। ঝিল্লিরবে সমস্ত প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল,—সন্ধ্যার শীতল বাতাস, করুণার হস্ত-লেপের ন্যায় ধরণীর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বহিতেছিল; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শত্রুদমন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—"হায় পার্ব্বতী, এক তুমি যদি এ রুদ্রে শিবত্বের প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে পার!"

যদি কিছু সত্য না থাকবে, তবে দেশে সকলের মুখে মুখে একথা রটে কেন?"

আষাঢ়ের আসন্নবর্ষী মেঘের ন্যায় শত্রুদমনের মুখমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বালিকাকে নিমেষে চূর্ণ করিবার জন্য, তাঁহার বিশাল মুষ্টি, বালিকার গ্রীবার প্রতি প্রসারিত হইল;—বালিকা তবু অচল অটল, নির্ব্বাক্,—তাহার শঙ্কা নাই, উদ্বেগ নাই,—স্থির প্রশান্তভাবে সে শুধু শত্রুদমনের প্রতি চাহিয়া রহিল।—

যে দৃঢ়মুষ্টি হইতে কেহ কখনও পরিত্রাণ পায় নাই, সেই দৃঢ়মুষ্টি আজ ক্রমশঃ শ্লথ হইয়া পড়িল; যে ক্রোধ শোণিতপাত ব্যতিরেকে কোন দিন শান্ত হয় নাই—সেই ক্রোধ আজ আহুতি না লইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া পড়িল;

(৩)

তাহার পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে।—পার্ব্বতী পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিদিন গাগরী লইয়া গ্রামপ্রান্তে ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া আনিয়াছে,—পদ্ম আনিতে গিয়া বিলের জলে গা ভাসাইয়াছে,—কিন্তু তাহার চিত্তের সে প্রশান্তি, সে নির্ব্বিকার ভাব আর তেমন নাই। রাজৈশ্বর্য্য ধূলায় ফেলিয়া, দীনভাবে শত্রুদমন তাহার কাছে প্রতিদিন যেন তাঁর 'জীবন কাঠির' ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন!—অন্নপূর্ণে, বিশ্বেশ্বর তোমার দ্বারে ভিখারী,—জীবনের সুধা দিয়া তার শূন্যভাণ্ড পূর্ণ করিয়া দিবে না?

পার্ব্বতী ক্রমশঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। তথাপি তাহার মন ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠিত।—কে জানে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন বন্ধন সুখের হইবে কি না? দরিদ্রা বালিকা সে, রাণীর সুখ-ঐশ্বর্য্য লইয়া সে কি করিবে? কে জানে ইহাতে দেবতার অভিসম্পাত আছে কি না!

বালিকা অনেক কথা ভাবিল। ভাবিয়া ভাবিয়া সে মনে মনে এক উপায় নির্দ্ধারণ করিল,—নবকূটগিরির সন্ন্যাসী মহাপুরুষ, ত্রিকালদর্শী, তাঁর উপদেশই শিরোধার্য্য।

গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া ধূর্জ্জটীর ত্রিশূলের ন্যায় পর্ব্বত-শৃঙ্গ আকাশের দিকে মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে,—তাহার কটিদেশে লতাগুল্মবেষ্টিত সাধুর আশ্রম। অন্যূন পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া তিনি সেখানে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহাবয়বে (এই সুদীর্ঘ কালেও) এ পর্য্যন্ত কেহ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে নাই। সে-ই তপঃক্ষীণ সুদীর্ঘ দেহ, সে-ই তেজোব্যঞ্জক দৃষ্টি, সে-ই প্রশান্ত মুখ-শ্রী,—সে যেন কালস্পর্শাতীত কিছু। কত লোক জীবনের সন্ধিক্ষণে তাঁহার উপদেশলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে।

পার্ব্বতী সাধুর ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিল। হায়, তাহার জীবনের এই সংগ্রামের,—অন্তরের এই তীব্র জ্বালার নিরসন কি সাধু করিতে পারিবেন!

ধ্যানভঙ্গে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। পার্ব্বতী দুইটি সুপক্ক আম্র লইয়া গিয়াছিল, সে ফল তাঁহার চরণপ্রান্তে রাখিয়া বলিল—"দেব, আপনার জন্য এনেছি।"

সন্ন্যাসীর দৃষ্টি সম্মুখের জটাজূটমণ্ডিত অটবীসমাচ্ছন্ন কাননের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, সে দৃষ্টি বালিকার প্রতি ফিরিল না।

"দেব, এ সামান্য উপহার নিয়ে আমায় কৃতার্থ করুন।"

সাধু নিশ্চল, নির্ব্বাক্,—আপনার ভাবে আপনি বিভোর।

প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড এইরূপে কাটিল। শেষে পার্ব্বতী বলিল,—"আমি পার্ব্বতী। পিশাচ-রাজা আমায় বিয়ে ক'রে, তাঁর অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে চান। যাব কি যাব না, বুঝ্‌তে পারছি নে; তাই আপনার উপদেশ নিতে এসেছি।"

অনেকক্ষণ পর সন্ন্যাসী কথা কহিলেন—সংসারের সুখ দুঃখ হইতে বহুদূরে থাকিলেও, গভীর লোক-সংসার-চরিত্রাভিজ্ঞান তাঁহার সে উত্তরে পরিস্ফুট ছিল; বলিলেন —"বালিকা, আমার কথা কি তুমি মান্‌বে?—তবে আমার এ দু'টি প্রশ্নের উত্তর দাও:—মাটীর খেলনার মত কি তুমি তোমার রূপ বিলা'তে চাও? তোমার ঐ ঢল ঢল চোখে দু'টি দিন প্রেমের আলো ফুটিয়ে কি, তার পর নিরাশার জলে চিরদিনের মত তাকে ডুবিয়ে রাখ্‌তে চাও? অন্তরের ধারাস্রোত শুকাতে চাও? নারীত্বের সম্মান পুরুষকে দিয়ে পদদলিত করাতে চাও? রাজ-অন্তঃপুরে যাবার দুরাশা মানে এই।" সন্ন্যাসীর চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল;—"যদি তা চাও,—তবে যাও,—রাজাকে বরণ কর।"

পার্ব্বতী বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বক্ষঃস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল, বিশাল চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—বুঝি সে ছদ্মবেশী মহেশ্বরের বাক্যে পর্ব্বতদুহিতা পার্ব্বতীরও একদিন এই ভাব হইয়াছিল!—স্থিরভাবে সে উত্তর করিল—"প্রভু, আমি সামান্যা বালিকা, আমার অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌বেন। আমার হৃদয়—মন—রূপ—নারীত্বের গর্ব্ব সবই আছে,—তবু যদি সবই জলাঞ্জলি দিতে হয়, তবুও আমি তাঁকে ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌ব না। সে সবই পদদলিত ক'রে, যদি তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর সে গ্লানির যন্ত্রণা ভোলেন, তাতেও আমি আমার জীবন সার্থক হ'ল বলে' মনে ক'র্‌ব। আমার সর্ব্বস্ব যে আমি—তাঁরই চরণে দিয়েছি, তিনি যাই হ'ক্—তিনি আমার দেবতা।" বলিয়া পার্ব্বতী, সন্ন্যাসীকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সে আশ্রম ত্যাগ করিল।

বৃদ্ধ স্থির-করুণ-নেত্রে যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ বালিকার প্রতি চাহিলেন,—সে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস নীরবে তাঁহার বক্ষোমধ্যে মিলাইয়া গেল।—হায় বৃদ্ধ, বহুযুগ সংসারের সুখদুঃখাতীত তুমি তোমার বক্ষে এ দীর্ঘশ্বাস কেন?—নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু কেন?

(৪)

সন্ধ্যার প্রক্কালে পার্ব্বতী গ্রামে ফিরিল।—পিতার আহার্য্য প্রস্তুত হয় নাই, কাজেই সে দ্রুত চলিতেছিল; তবে মধ্যে মধ্যে তাহার গতি-বেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল, কারণ সুদূর দিক্‌চক্রবালশীর্ষে সুদীর্ঘ অরণ্যের অপর প্রান্তে গোধূলির বিচিত্রাভাচিত্রিত রাজ-প্রাসাদের সু-উচ্চ সুবর্ণচূড়া মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টিপথে পড়িতেছিল।—ওই খানে!—ওই স্বর্গলোক হইতে যে তার দেবতার আহ্বান আসিয়াছে! তাই পার্ব্বতী গ্রামে প্রবেশ করিয়া কাহারও প্রতি না চাহিয়া আপন মনে অগ্রসর হইতেছিল—প্রতিবেশী রমণীবৃন্দের ভ্রূকুটি এবং শ্লেষদৃষ্টির প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল না।

কয়দিন হইতেই, সকলে তাহার সম্বন্ধে কাণাকাণি করিতেছিল, কিন্তু আজ অপরাহ্ণ হইতেই কথাটা পথে ঘাটে বিশেষরূপে আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। মৃত যুধাজিতের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী রমা ই সে দিন অপরাহ্ণে দীঘিকায় অঙ্গসংস্কার করিতে গিয়া ধূমায়িত বহ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া দিল। সে-ই নাকি কয়দিন পূর্ব্বে পার্ব্বতী ও রাজাকে হাতধরাধরি করিয়া বনের পথে আসিতে দেখিয়াছিল,—এ কয়দিন প্রকাশ করে নাই;—আরও কত কি! রমার এ অন্তর্জ্জালার কারণ ছিল। বহুদিন পূর্ব্বে, যৌবনের প্রথম উন্মেষকালে একদিন সে পিতা ও জননীর সহিত রাজান্তঃপুরে নিমন্ত্রণে যায়। তাহার পিতা এক্ষণে মৃত, তখন রাজ-সরকারে কাজ করিতেন। সেই দিন মুহূর্ত্তের জন্য চারিচক্ষুর মিলন হয়—সে মুহূর্ত্ত আজিও রমার জীবনে অনন্ত মুহূর্ত্ত হইয়া আছে; আজিও রমা শত্রুদমনের বিদ্যুদ্দামস্ফুরণবৎ সে তীব্র রূপ ভুলিতে পারে নাই। চিরদিনের মত জীবনে হলাহল ঢালিয়া,—স্বামীর স্মৃতি, বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবাইয়া, হতভাগিনী বিধবা রমা আজিও তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিল।—যে প্রাংশুলভ্য ফল তাহার স্পর্শের অতীত হইয়া ছিল, সেই ফল আজ অন্যে আহরণ করিবে? যার একটিমাত্র স্নেহ-সম্বোধনের জন্য তাহার চিত্ত, মরুভূমে তৃষ্ণায় কণ্ঠাগতপ্রাণ জীবের ন্যায় উন্মত্তভাবে ফিরিয়াছে, তার সপ্রেম সম্ভাষণ তাহারই প্রতিবেশিনী এক কৃষক-তনয়া শুনিবে?—রমার জীবনের জ্বালায় আজ নূতন করিয়া ইন্ধন পড়িয়াছিল—পার্ব্বতীর বিরুদ্ধে সে সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

সহসা দীর্ঘিকার বেষ্টনী-পথে পার্ব্বতী দেখা দিল?—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। রমা তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আ মরণ! ঢের ঢের বেহায়া মেয়ে দেখিছি মা, এমন নির্লজ্জ বেহায়া আর দু'টি দেখি নি। কুলে কালি দিয়েও মাগী আবার লোককে মুখ দেখাতে আসে!—নরকে যা,—পচে মর্!—"

আর এক যুবতী—তিনি কিছু রসিকা, ব্যঙ্গেও নিপুণা—বলিলেন,—"আহা, তা কেন বাছা—ও কি বল? রাজার ভোগের জিনিস—সোণার খাটপালঙ্কে বস্‌বে, দাসদাসীরা বাতাস ক'র্‌বে, উঠ্‌তে সোণা—বসতে হীরে ঝর্‌বে;—ফুলের মধু চাঁদের সুধা পান কর্‌বে,—আদরে সোহাগে ঢলে' পড়্‌বে;—বালাই, মরবে কি দুঃখে? কিন্তু সেকি,—পাল্কী নেই চতুর্দ্দোল নেই, আগে পাছে চোপদার নেই—এ কি রকম রাজার আদর বাছা? তাইত, দুদিন যেতে না যেতেই কি—'ফুরাল ফুলের মধু, ভ্রমর-বঁধু উড়ে গেল!' কে জানে বাছা, বড়র পীরিতি, কেমন ধারা!"

সকলে হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। রমা কিন্তু ক্রোধে ঈর্ষায় অভিমানে ফুলিতেছিল; সে আর থাকিতে পারিল না; সম্মুখেই একখণ্ড ইষ্টক ছিল, তাহাই লইয়া উন্মত্তের ন্যায় পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। ইষ্টকখণ্ড সশব্দে ঘুরিতে ঘুরিতে পার্ব্বতীর ললাটে আসিয়া প্রতিহত হইল,—কপাল ফাটিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল,—পার্ব্বতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিত হইল। তখন সকলের চৈতন্য হইল; পিশাচ-রাজের প্রতিহিংসার কথা ভাবিয়া সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া, কেহ তাহার ক্ষত স্থানে জল দিয়া, কেহ তাহাকে অঞ্চল দ্বারা বীজন করিয়া, ক্রমশঃ তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। সৌভাগ্যক্রমে, দুরন্তের জন্য আঘাত বেশী গুরুতর হয় নাই;—পার্ব্বতী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তার পর, কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া, বরাবর গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। রমণীর দলও, আসন্নবিপদাশঙ্কায় 'বিপত্তৌ মধুসূদন' স্মরণ করিতে করিতে গৃহাভিমুখী হইল। রমা কিন্তু মনে মনে গজরাইতেছিল, আর অনুচ্চকণ্ঠে বলিতেছিল—"মাগীর দেমাক্ দেখ্‌লে? একটা কথাও কওয়া হ'ল না। বলে—

আ মরণ! ঢের ঢের বেহায়া মেয়ে দেখিছি মা, এমন নির্লজ্জ বেহায়া আর দু'টি দেখি নি।

শেষ করিয়া উনানের পাশে বসিয়াছিল। ক্ষিপ্রভাবে সে পিতার পাদপ্রক্ষালনের জল আনিয়া দিল। হস্তপদ ধৌত করিয়া রঘুবীর আহারে বসিল। —এ পর্য্যন্ত সে কন্যার সহিত কোন কথা কহে নাই, পার্ব্বতী তাহাতে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয় নাই, কত সময় পিতাপুত্রীর মধ্যে উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন এরূপ ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। পার্ব্বতী পিতার স্বভাব জানিত, আপনা হইতে তাহাকে কোন প্রশ্ন করিল না। আহারান্তে, তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে রঘুবীর জিজ্ঞাসা করিল—

"তোর কপালে ও কাটা কিসের?"

প্রশ্নের ভাবে বালিকা বুঝিল, পিতা সব শুনিয়াছেন; তথাপি ধীর স্বরে উত্তর করিল—"মেয়েরা আমায় ইঁট ছুড়ে মেরেছিল, তাই।"

নিমেষে রঘুবীর গর্জ্জন

'ও রূপসী গরব এত রাখ্‌বি লো কোথায়?
আজকে সোণার খাটপালঙ্কে, কালকে যে ধুলায়!"

পার্ব্বতীর মনের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। গৃহে ফিরিয়া, প্রতিবেশিনীদের কথা ভাবিয়া সে একবার ভ্রূকুটি করিল; তার পর রন্ধনকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। ক্ষতস্থানে মধ্যে মধ্যে বেদনানুভূতি হইতেছিল বলিয়া, সে এক একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছিল, নতুবা তাহার মুখভাবে অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বের সে অপমানানুভূতির চিহ্নমাত্র ছিল না।

প্রহরাতীত রাত্রে, রঘুবীর, দিবসের কর্ম্ম শেষে গ্রামান্তর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। পার্ব্বতী তখন রন্ধন

করিয়া উঠিল—"কেন ছুড়েছিল? সর্ব্বনাশী, বংশের মুখে তুই এমনই করে কালি দিলি!—এ অপবাদও আমায় শুন্‌তে হল?"

পার্ব্বতী বলিল—"লোকে যদি মিছামিছি কোন অপবাদ দেয় ত আমি কি ক'র্‌তে পারি?"

শিলাহতগতি স্রোতোবেগের ন্যায় রঘুবীর মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া দ্বিগুণবেগে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"কি ক'র্‌তে পারি? তাদের হাড়গুলো গুঁড়ো করে দিয়ে আস্‌তে পারিস্ নি? দোষী যদি নাই হবি, তবে অপমান খেয়ে কুকুরের মত পালিয়ে এলি কেন?—সত্যিই কি তুই সে পিশাচের"—

"স্ত্রী। এখনও নই, হ'তে পারি। শুধু আমার মুখের একটি কথার অপেক্ষা।"

"সেই পিশাচ-রাজার স্ত্রী? সকালে যে আমার রক্তপান ক'র্‌তে চায়, সন্ধ্যায় যে তোকে আদর ক'র্‌তে আসে—সেই পিশাচের স্ত্রী?—আজ যে তোকে সিংহাসনে বসিয়ে, কাল পায়ে ঠেলে দূর ক'রে দেবে—সেই অমানুষের স্ত্রী?—পার্ব্বতী, তুই আমার মেয়ে ন'স্।"

"তাঁর মনে যদি তাই থাকে, তাই ঘট্‌বে।"

"না, তা ঘট্‌বে না। তার আগে আমি তোকে আপন হাতে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাট্‌ব"—বলিয়া রঘুবীর উন্মত্তের ন্যায় কাটারির অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

পার্ব্বতী স্থির, অচঞ্চল;—সপ্তাহ পূর্ব্বে এই কক্ষে সংহারোদ্যত শক্রদমনকে যে উত্তর দিয়াছিল, আজ পিতাকেও সেই উত্তর দিল—"মার্‌তে ইচ্ছা হয়, মার। আমি মরণের ভয় করিনে।"

রঘুবীর নিশ্চলভাবে কিয়ৎক্ষণ তাহার প্রতি চাহিল, তার পর সজোরে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"তবে সেই পিশাচের কাছেই যা'—তার দু'দিনের খেলার পুতুল হয়ে থাক্; সকলের ঘৃণাঠাট্টার বোঝা নিয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল কর্। কিন্তু তা যদি হয়, স্থির জেনে রাখিস্ এ বাড়ীতে আর তোর ঠাঁই নেই। তোর ও পোড়ামুখ যেন ভুলেও আর আমাকে দেখ্‌তে না হয়। ভিখারী আমি, কিন্তু সম্মানের গর্ব্ব রাখি।—তুই যা', আমি জান্‌ব—আমার কেউ নেই,—যে ছিল—সে মরেছে।"

পার্ব্বতী কোন উত্তর করিল না;—পিতার উচ্ছিষ্ট বাসনাদি লইয়া মাজিয়া ঘষিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। সে রাত্রে সে কিছুই আহার করিল না; ধীরে ধীরে আপন শয্যায় গিয়া শয়ন করিল।

(৫)

অপরাহ্ণের ঘটনার কথা সেই রাত্রেই শক্রদমনের কর্ণগোচর হইল।

জয়সেন বলিলেন—"মহারাজ, গ্রামের জনকতক মাতব্বর লোককে ধরে' এনে লট্‌কে দিলেই ঠিক শিক্ষা হবে এখন।" উত্তেজিত কণ্ঠে শক্রদমন বলিলেন,—"জনকতক মাত্র? তাতে কি হবে? যে যেখানে আছে সবাইকে বেঁধে এনে শূলে চড়াব। সমস্ত 'গাঁ' খানা ধূলিসাৎ ক'রে পার্ব্বতীর নামে জায়গাটা দানপত্র লিখে দিলেও আমার রাগ যাবে না। এত বড় আস্পর্দ্ধা তাদের?"—গ্রামবাসিগণের সৌভাগ্যক্রমে তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, নহিলে কি হইত বলা যায় না। অন্ততঃ সে রাত্রির মত, তাহারা বাঁচিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে শক্রদমন কথাটা ভাবিয়া দেখিলেন। সে সমৃদ্ধ গ্রাম ধূলিসাৎ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না,—কারণ তাহাতে তাঁরও সমূহ ক্ষতি, সে গ্রাম হইতে তাঁর যথেষ্ট আয় ছিল। জয়সেনকে বলিলেন—"দেখ, তার চেয়ে আমি বলি কি, তাদের ওপর একটা কর বসিয়ে সেই টাকাটা পার্ব্বতীকে দিই। শূলে দিলে ত তারা শুধু প্রাণেই মরবে; কিন্তু যখন জানবে যে তাদের এত কষ্টের টাকায় পার্ব্বতীর গহনাপত্র ফরমাস হচ্ছে, তখন হিংসায় অন্তরের জ্বালায় তারা তিল তিল ক'রে নরকের আগুনে পুড়ে মরবে। শুধু তাই নয়, পার্ব্বতী যদি আমার অন্তঃপুরে আস্‌তে চায়, ত' রাণীর মতই সসম্মানে তাদের বুকের উপর দিয়ে তাকে নিয়ে আসব। দেখি তারা কি করে।"

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই গ্রামবাসীদের প্রায়শ্চিত্তের অর্থ আদায় হইয়া গেল। সে অর্থ পার্ব্বতীর নামে রাজ কোষে জমা রহিল।

সে দিনও অপরাহ্ণে, অন্য দিনের মতই পার্ব্বতী ইন্দারায় জল তুলিতে আসিয়াছিল। রাজার ভালবাসা, সাধুর উপদেশ, পিতার কঠোর বাণী, প্রতিবেশীগণের নির্যাতন—কিছুতেই যেন তাহার ধৈর্য্য টলে নাই, সংসারের যেন কোথাও কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটে নাই, এতদিন সব যেমন চলিতেছিল, আজও যেন সবই ঠিক তেমনই চলিতেছে!—অন্ততঃ, তাহার মুখভাবে ইহাই বুঝাইতেছিল।

ইন্দারার পার্শ্বে শূন্য কুম্ভ রাখিয়া পার্ব্বতী কৃষ্ণতার চক্ষু দিয়া নিথর অতলস্পর্শ সে বারিরাশির প্রতি চাহিয়াছিল; সহসা কাহার কোমল আহ্বানে চকিতা হইয়া ফিরিয়া চাহিল।—অদূরে শক্রদমন, সাগ্রহ সস্নেহ-দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন।

"পার্ব্বতী, তোমার কপালে ও কিসের কাটা?"—সেই একই প্রশ্ন; তবু প্রশ্নভাবে কত পার্থক্য।

পার্ব্বতী ক্ষতস্থানে একবার হস্তস্পর্শ করিয়া বলিল—

"ও কিছু নয়। আপনার জন্য এর চেয়ে অনেক সহ্য ক'র্‌তে পারি।"

পার্ব্বতী এ পর্য্যন্ত এমন মন খুলিয়া শক্রদমনের সহিত একদিনও কথা কহে নাই। শক্রদমনের বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন—"পার্ব্বতী, আমি তোমার উত্তর নিতে এসেছি। সবাই যাকে দেখে ঘৃণায় ভয়ে সরে যায়, তাকে তুমি স্বামী বলে' বরণ ক'র্‌বে?

আনত শিরে ধীরে ধীরে বালিকা উত্তর করিল—"'আমি' বলে' আর আমার কিছু নেই। আপনি প্রভু—আমি পদাশ্রিতা দাসী মাত্র। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।"

"আমার আদেশ?—পার্ব্বতী, অনেককাল শাসনদণ্ড ধরে' এসেছি—তাই চিত্ত আজ এত বিক্ষিপ্ত। দণ্ড দিয়ে শান্তি নেই, নিয়ে বুঝি শান্তি মেলে! তাই আজ তোমায় মাথায় করে' নিতে এসেছি। তুমি চল। তোমার শাসন মেনে আমি আজ থেকে নূতন জীবন গড়্‌ব।"

পার্ব্বতী কথা কহিল না।

"বল পার্ব্বতী, যদি আজ তোমায় নিয়ে যেতে লোক পাঠাই তুমি যাবে? বিয়ের সমস্ত আয়োজন আমি ঠিক করে রেখেছি।"

"আমার অনুমতির অপেক্ষা কেন? আমি ত আমার বলে' আর কিছু রাখি নি।"

দৃপ্ত পার্ব্বতীর পক্ষে এতটা আত্মবিস্মৃতি শক্রদমনকে মুগ্ধ করিল।

"পার্ব্বতী, এমন কথা আর কেউ ব'ল্‌তে পার্‌ত না। সত্যই কি তবে তুমি পিশাচরাজের সঙ্গিনী হয়ে তার উদ্দাম-গতি পথে, শান্তির ধারা সেচন ক'র্‌বে? নিঃশব্দে তার সকল নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, হয়ত মৃত্যু পর্য্যন্তও সহ্য কর্‌'বে? পার্ব্বতী, ধন্য তোমার সাহস! কিন্তু জেন' পার্ব্বতী, ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ ক'র্‌ছি—আমা হ'তে কখনও কোন দিন তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। আর সকলের কাছে আমি যাই হই, তোমার সম্মান আমি চিরদিন রাখ্‌ব।"

"সে আমার ভাগ্য। যদি তা নাই হয়, তা হলেও আপনার হাতে মৃত্যু সেও আমার ভাগ্য! নিজের স্বার্থের আশায় ত আমি আপনার কাছে যেতে চাহি না।"

"পার্ব্বতী, আগে তোমায় বুঝিনি, আজ ভাল ক'রে আমার চোখ ফুটছে; দেখ্‌ছি—তবু সবটা তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। আমায় তুমি আকণ্ঠ সুধাপান করালে! একবার আমার স্ত্রী বলে,—আমারই আপন বলে' পাই, তার পর তোমার এ করুণার মর্য্যাদা রাখ্‌ব।"

অনিমেষ সে চারিটি চক্ষুর দৃষ্টির মাঝে বিশ্বজগৎ বিলীন হইয়া গেল।—ধীরে ধীরে গাগরী উঠাইয়া পার্ব্বতী নিঃশব্দে আপন কুটীরে ফিরিয়া চলিল।

পার্ব্বতী সঙ্গিনীর টেক্কা বাঁচাইতে গিয়া, আপনার হাত পাঁচের রঙ্‌খানিও ত্রুপ করিয়াছিল;—শেষ পিটের জন্য কোন ফ্রিও রাখে নাই; এ পারে আসিতে আসিতে স্বহস্তে সেতুতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল—সে সেতু পশ্চাতে দগ্ধ হইতেছিল—পরপারে আর তার ফিরিবার উপায় ছিল না। আজ হইতে যাহাই ঘটুক, আজীবন সে পিশাচরাজের ক্রীতদাসী ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিপদ্? দুঃখ কষ্ট? সে ত জানিয়া শুনিয়াই স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। পিতা? আজন্মকাল হইতে মাতৃহারা বালিকাকে যিনি লালনপালন করিয়া আসিয়াছেন, সেই পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার চিন্তায় সে কতকটা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল বটে,—অন্তর তাহার ধিক্কার দিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই শক্রদমনের সে মুখ—বাহিরের মিথ্যাবরণমণ্ডিত তাহার অন্তরের সে মর্ম্মন্তুদ জ্বালা, তাহার জীবনের সে পুঞ্জীভূত দৈন্যগ্লানি, তাহার চরণে আসিয়া লুটাইতে লাগিল; শক্রদমনের কাতর কণ্ঠ যেন তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল—'জীবনের এ নরকাগ্নিশিখা আমার দূর ক'রে দাও,—আমায় নবজীবন দাও!'—পার্ব্বতী সব ভুলিল,—পিতা, আবাল্যের সংসার, আপন অস্তিত্ব,—সব ভুলিল; তাহার কর্ণে শুধু ধ্বনিত হইতে লাগিল—'দেবি, আমায় নবজীবন দাও!' ব্যাঘ্রী যেমন শাবককে রক্ষা করিতে ভীষণমূর্ত্তিতে শত্রুর সম্মুখীন হয়, পার্ব্বতীও আজ সেই জ্বলন্ত আগ্রহে শক্রদমনকে তাহার অন্তর্দ্দাহ হইতে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। পার্ব্বতী আপনার মৃণ্ময় কুটীরে দীপ জ্বালিয়া একা বসিয়াছিল। পিতা আজ রাত্রে গ্রামান্তর হইতে ফিরিবেন না, শুধু আপনার জন্য রন্ধন করিতে তাহার আগ্রহ ছিল না।—স্থির নেত্রে আপন মনে সে কত কি ভাবিতেছিল।—এই কয়দণ্ড মাত্র—তার পর

চিরদিনের মত এই গৃহ হইতে বিদায়!—এ পুরাতন জীবন কোথায় পড়িয়া থাকিবে, কে জানে!—এ জীবনে অবিচ্ছিন্ন সুখ সে পায় নাই, সে কথা সত্য,—কিন্তু তবু যে ইহার সহিত তার আজন্মের জানাশোনা, সুখে দুঃখে যে ইহার সহিত তাহার একটা অচ্ছেদ্য মায়ার বন্ধন জন্মিয়া গিয়াছে! তাই আজ ইহাকে ছাড়িতে তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছিল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, কে জানে?—আর যাই থাক, শান্তি যে নাই, সে তাহা বুঝিল।

প্রহরাতীত রাত্রে, দূর—বহুদূর—হইতে একটা গম্ভীর অস্পষ্ট ধ্বনি তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতে লাগিল। সে ধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া তাহাদের কুটীরের সম্মুখে আসিয়া সহসা নীরব হইল। স্বয়ং রাজমন্ত্রী এবং জয়সেন প্রভৃতি রাজার অমাত্যবর্গ কুটীরে প্রবেশ করিয়া সসম্ভ্রমে তাহাকে অভিবাদন করিলেন। পার্ব্বতী তাহার অর্থ বুঝিল;—প্রত্যভিবাদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজা আপনার জন্য তাঞ্জাম পাঠিয়েছেন।—আপনার অভিপ্রায় হ'লে, আপনাকে সসম্মানে নিয়ে যাবার জন্য তিনি আমাদের উপর হুকুম দিয়েছেন।"

বিনাবাক্যব্যয়ে পার্ব্বতী অগ্রসর হইল। দুই পার্শ্বে রাজ-অমাত্য এবং রাজ-অনুচরবৃন্দের সারি মধ্যস্থলে স্বল্পপরিসর পথ; পার্ব্বতী কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ধীরপাদক্ষেপে তাহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া তাঞ্জামে আরোহণ করিল। অমনই শত দামামা একসঙ্গে ঘনঘোর রোলে বাজিয়া উঠিল; ধীরে ধীরে, গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া, মিছিল প্রাসাদাভিমুখে ফিরিয়া চলিল। গৃহদ্বারে, গবাক্ষে, আর তিলধারণের স্থান ছিল না; সহস্র চক্ষু বিস্ময়ে সে শোভা-যাত্রা দেখিতে লাগিল; হিংসায় ক্ষোভে সহস্র অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। আর, পার্ব্বতী?—কোনও দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। এক একবার তার মনে হইতেছিল—এত আড়ম্বর কেন? আবার পরক্ষণেই সে ভাবিতেছিল—'এতে যদি তাঁর তৃপ্তি বোধ হয়, ত এই ভাল।' কিন্তু দামামার সে ঘনঘোর রোল, পঞ্চশতাধিক সেনার পাদক্ষেপধ্বনি, সকলই ডুবাইয়া একটিমাত্র কাতর করুণ বেদনার কণ্ঠস্বর তাহার "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছিল'—"দেবি, আমায় নব-জীবন দাও!—"

প্রাসাদের চূড়া নক্ষত্রালোকে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল; পার্ব্বতীর বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল, কিন্তু মুখভাব তাহার স্থির—উদ্বেগলেখাশূন্য। জয়সেন বিস্মিত হইয়া অমাত্য চন্দ্রচূড়কে বলিলেন—"হাঁ, রাণী হবার যোগ্য বটে! যথার্থ রাজার মেয়েও এ সময় এমন অচঞ্চল থাক্‌তে পার্‌ত না।"

প্রাসাদের ফটক পার হইয়া, মিছিল অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। অমনই সহস্র নাকাড়া এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিয়া, দামামার গভীর ধ্বনির সহিত মিশিল। শঙ্খের তরঙ্গায়িত গম্ভীর শব্দ এবং পুরনারীর হুলুধ্বনি তাহার সহিত গম্ভীরে-মধুরে মিশিল; উন্মুক্ত রাজকোষ হইতে কাঞ্চন-রৌপ্য-বৃষ্টি এবং অন্তঃপুরচারিণীর লাজ-গন্ধ-বর্ষণ তাহার সহিত উজ্জ্বলে-মধুরে মিশিল; তোরণে তোরণে সহস্রদীপাবলি-বিচ্ছুরিত আলোক-চাঞ্চল্য এবং মেঘনির্ম্মুক্তাকাশে কোটি তারকার স্নিগ্ধালোকতারল্য তাহার সহিত সুন্দরে-ললিতে মিশিল; সহস্র উৎসনিঃসৃত সুরভিবারি এবং কণ্ঠে কণ্ঠে দোদুল্যমান যূথিকামাল্যের গন্ধটুকু তাহার সহিত উচ্ছ্বাসে অচঞ্চলে মিশিল; আর তাহার মাঝে, হোমাগ্নি-শিখা সম্মুখে, সে দু'টি চির-পরিচিত-অপরিচিত জীবন, ধর্ম্মের বন্ধনে জীবনে-মরণে মিশিল।

(৬)

তাহার পর আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দারুণ গাত্রদাহে যাহারা পার্ব্বতীর আশু দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিল, তাহাদের সে আশা ফলবতী হয় নাই। নিঃশেষিত-রস পুষ্পবৎ পার্ব্বতীকে রাজপরি-ত্যক্তা দেখিয়া উপহাসে বিদ্রূপে তাহার হৃদয়-ক্ষত লবণাক্ত করিবার আশায় যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতজন ইহারই মধ্যে সংসারের দোকানপাট তুলিয়া মহাযাত্রার পথিক হইয়াছে। তবু পার্ব্বতী আজও রাজ্যের রাণী—রাজার প্রেয়সী মহিষী। কিন্তু এতবর্ষের প্রভুত্বসম্মানানু-ভূতির ফলেও তাহার চিত্তে একদিনও লেশমাত্র গর্ব্বের ছায়াপাত পড়ে নাই। অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের চূড়ায় তাহার বাস, তাহা সে বুঝিত;—কখন্ যে নিমেষে তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না! চরম অমঙ্গলের কথা ভাবিয়াই, হৃদয়কে বজ্রকঠিন করিয়াই,—সে, সে প্রাসাদে পদার্পণ করিয়াছিল;—নিজের সুখের জন্য নয়,—তাহার

নারীহৃদয়ের স্নেহশীতলছায়াভিক্ষু তার দেবতাকে সান্ত্বনা—শান্তি দিতেই সে আসিয়াছিল। সে সান্ত্বনা তিনি যতদিন চান—ভাল; যদি আর না চান, তাহাকে দূর করিয়া দেন—সেও ভাল।—ক্ষোভশূন্য চিত্তে, দ্বিধাশূন্য অন্তঃকরণে পার্ব্বতী তাহার দেবতার আদেশ নতশিরে গ্রহণ করিবে। কে সে?—দাসী মাত্র,—সেবিকা মাত্র। যতদিন সেবাধিকার পায়—তার সৌভাগ্য; যদি কখনও বিদূরিতা হয়—এই অষ্টমবর্ষব্যাপী সৌভাগ্যের স্মৃতি, আমৃত্যু তাহার জীবনসঙ্গিনী হইয়া থাকিবে। দারিদ্র্যের ভয়? অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও এক দিনও ত সে ঐশ্বর্য্যের চিন্তা করে নাই,—স্বামীর আগ্রহে সে আপনাকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতা করিয়া রাখিত মাত্র; দারিদ্র্যের অনাড়ম্বর শ্রীই তাহার অন্তরতম অন্তরে, আপন শান্ত মহিমা বিস্তার করিয়া থাকিত। সম্রাজ্ঞীর অতুল সম্মান?—সে সম্মানে সে কোন দিন সুখী হয় নাই। স্বার্থান্বেষীর চাটুবাক্য?—অন্তরের সহিত সে তাহা ঘৃণা করিত। রাজঅমাত্যবর্গের আন্তরিক শ্রদ্ধা-সহানুভূতি?—তাহা সে গ্রাহ্য করিত না; আবশ্যক হইলে, স্পষ্ট নির্ভীকভাবে তাহাদের অন্যায় কার্য্যের সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করিয়া বসিত।—সুতরাং সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া চলিত; কথঞ্চিৎ ঈর্ষার চক্ষেও দেখিত; কাজেই যথার্থ সহানুভব বা বন্ধু তাহার তেমন কেহ ছিল না।—ছিল একজন; যাহার বাঁশরীরবে মুগ্ধ আত্মবিস্মৃতা হইয়া সে কুরঙ্গিণী এ আলয়ে প্রবেশ করিয়াছিল।—সে সুর যদি থামিয়াই যায়, সে বাঁশরী যদি ছুরিকায় রূপান্তরিত হইয়া তাহার হৃদয়-শোণিত পান করে,—ক্ষতি কি? যজ্ঞেরই আহুতি যে সে,—তার বলিদানে দেবতার যজ্ঞ যদি পূর্ণ হয় তাহা অপেক্ষা তাহার কার্য্য আর কি আছে? তাই পার্ব্বতী—স্নেহকরুণারূপিণী অথচ বজ্রবৎকঠোরা, ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতা অথচ দীনদরিদ্রা, আত্মনিবেদিতা অথচ দূরসঞ্চারিণী, অপূর্ব্ব মহিমময়ী তেজস্বিনী পার্ব্বতী শত্রুদমনকে এমন মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিল। তাই, যে উদ্দামগতি কখনও কোথাও প্রতিহত হয় নাই;—তাহা আজ পার্ব্বতী-গিরিপাদমূলে আসিয়া মৃদু কলধ্বনিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল।—যে জীবন এতদিন কোন প্রতিবন্ধক মানে নাই, আজ তাহা শান্ত প্রেমের মধুর বন্ধন শৃঙ্খলকে স্বেচ্ছায় গলার হার করিয়া তাঁহার অষ্টবর্ষ পূর্ব্বের সে অনুরাগ, আজ 'উপচিতরস' হইয়া গভীর প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, এবং শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান মিলিয়া সে প্রেমকে এক অপূর্ব্ব মহিম-শ্রী প্রদান করিয়াছিল।

পলে-পলে দণ্ডে-দণ্ডে দিনে-দিনে পার্ব্বতীও শত্রুদমনের মাঝে আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিতেছিল।—তাহার জীবন মরণ, স্বর্গ মর্ত্ত্য, সত্য মিথ্যা, ইহকাল পরকাল, সবই স্বামীর মাঝে একে একে মিশিতেছিল।—ভালবাসিয়াই তাহার সুখ—ভালবাসা সে চাহিত না; আত্মবিসর্জ্জনেই তাহার তৃপ্তি;—দেবতাকে আপনার প্রতি টানিয়া আনিতে সে লালায়িত হইত না; নীরব সেবাতেই তাহার সুখ—প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে সে লজ্জিতাই হইত। পার্ব্বতী ধীরে ধীরে প্রেমের শ্রেষ্ঠ সাধনার অধিকারিণী হইতেছিল। তাহার জীবনের যথার্থ সুখ—যথার্থ শান্তি এই খানেই ছিল;—ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগে নয়, রাণীর প্রভুত্ব লইয়াও নয়;—লোকে এই টুকুই ভুল বুঝিত।

আট বৎসর পরে একদিন তাহার নির্ম্মল আকাশে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিল। পার্ব্বতী তাহাতে ক্ষুব্ধা হইল না।—আট বৎসরের সাধনার ফলে,—সে আজ আপন তুচ্ছ সুখ দুঃখের অতীত পথে গিয়া দাঁড়াইয়াছে,—গভীর নিষ্কাম প্রেম—মিলনে যাহা আত্মহারা হয় না, বিরহে যাহাকে কাতর করিতে পারে না—সেই প্রেমের আস্বাদ সে ক্রমশঃ লাভ করিতেছিল; তাই মণিপুররাজদূত যখন শত্রুদমনের সহিত মণিপুররাজদুহিতার বিবাহ প্রস্তাব লইয়া আসিল, তখন সে বিচলিতা হইল না। অমাত্যবর্গ সাগ্রহে সে প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ মণিপুররাজের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে কে না লালায়িত হইত?—সে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আজ যখন স্বেচ্ছায় আসিতে চাহিতেছেন, তখন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন হইবে না। বিশেষতঃ, বিজয়নগর ক্ষুদ্র রাজ্য, বিশাল মণিপুররাজ্যের সহিত সম্বন্ধস্থাপনে তাহার রাজ্যবল বৃদ্ধিই পাইবে, ইত্যাদি অনেক কথা মন্ত্রণা-সভায় উঠিল। অবশেষে সভাভঙ্গ করিয়া, শত্রুদমন বলিলেন—"কাল দরবারে দূতকে আমার অভিপ্রায় জানাব।"

পরদিন প্রকাশ্য রাজসভায় দূত উপঢৌকনাদি লইয়া আসিয়া আপন আগমনোদ্দেশ্য বিবৃত করিল। প্রতিনিধি, অমাত্য এবং সভাসদ্বর্গ সোৎসুকে রাজার মুখের প্রতি

চাহিয়া রহিলেন—এমন সৌভাগ্য-সুযোগ কি রাজা গ্রহণ করিবেন না?

শক্রদমন, মৃদু হাসিয়া দূতকে সম্বোধন করিয়া, উত্তর দিলেন—"দূত, তোমার কথায় এবং মণিপুররাজের বন্ধুতায় আমি খুব প্রীত হয়েছি; কিন্তু তোমার প্রস্তাব আমি স্বীকার ক'র্‌তে পার্‌লাম না! তোমার রাজাকে আমার সম্ভাষণ জানিয়ে বলো যে, তাঁর দুর্দ্দিনে, যুদ্ধবিগ্রহের সময়, আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাঁর সাহায্য ক'র্‌ব, কিন্তু তাঁর কন্যাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ পিশাচকে বশে রাখা,—সে রাজকন্যার সাধ্য হবে না। যেটা অসম্ভবেরও অসম্ভব, তা কেবল একজন মাত্র স্ত্রীলোককে দিয়ে সম্ভবপর হয়েছে;—সে আর কেউ নয়, আমার একমাত্র স্ত্রী—রাণী পার্ব্বতী। তাই সে আজও বেঁচে আছে; এ উন্মাদের হাতে আজও তার অপমৃত্যু ঘটে নি। তার ঋণ আমি এ জীবনে শেষ ক'র্‌তে পার্‌ব না, তার আসনে আর কারও বস্‌বার অধিকার নেই—মণিপুর-রাজ যেন আমাকে ক্ষমা করেন।"

সভাস্থ জনমণ্ডলী নিস্তব্ধ—নির্ব্বাক্। মহার্ঘ্য প্রত্যুপঢৌকন লইয়া ব্যর্থ-মনোরথ দূত মণিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মণিপুররাজ সব শুনিয়া, শক্রদমনের স্পষ্টবাদিতায় সন্তুষ্টই হইলেন; 'শাপে বর' হইল বুঝিয়া, কন্যার কথা ভাবিয়া মনে মনে সর্ব্বমঙ্গলময়ের চরণে প্রণত হইলেন।

মধ্যাহ্নে, অন্তঃপুরে উভয়ের নিভৃত সাক্ষাৎকালে, পার্ব্বতীর দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল;—স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া সে কতক্ষণ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিল;—সে অশ্রুর মাঝে কত কৃতজ্ঞতা—কত সুখ—কত বেদনার ধারা বহিতেছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব? জীবনের সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়া যে আবার সব ফিরাইয়া পাইয়াছে—সে কি তার আভাষ দিতে পারে? হায় পার্ব্বতী, শুধু দেবতার নিষ্কাম সেবার জন্যই যদি আসিয়াছিলে, তবে আজ তোমার উদ্বেল বক্ষ হইতে এ আকুলতা ওঠে কেন, কপোল বহিয়া এ অশ্রু ঝরে কেন?—আজও নারীহৃদয়ের এ চিরন্তন দুর্ব্বলতা কেন?

(৭)

সে মেঘ কাটিল বটে, কিন্তু পশ্চিম আকাশে ধীরে ধীরে প্রলয়ের মেঘ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। পার্ব্বতী প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই। শক্রদমনের ক্রমশঃ উন্মাদ লক্ষণ দেখা দিতেছিল। পার্ব্বতী উদ্বিগ্ন হইল বটে, কিন্তু ভরসা ছাড়িল না; প্রতি দিন প্রতি দণ্ডে সে, প্রাণপণে সেই নিষ্ঠুর দৈত্যের সহিত যুঝিতে লাগিল;—একদিকে পার্ব্বতী, একদিকে উন্মাদ দৈত্য, আর মধ্যস্থলে শক্রদমন—একটা প্রবল আকর্ষণ,—সংগ্রাম চলিতে লাগিল; কে জিতিবে কে বলিতে পারে? কিন্তু তিলে তিলে পার্ব্বতীর শক্তির হ্রাস হইতেছিল,—পার্ব্বতী তাহা বুঝিয়াই, জীবনের শেষ শক্তি, প্রাণের গাঢ়তম প্রেমের আকর্ষণ—আত্মার গভীরতম প্রার্থনা লইয়া প্রাণপণে স্বামীকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে কঠোর দৈত্যের বজ্রমুষ্টি ক্ষীণমাত্রও শ্লথ করিতে পারিল না। সে প্রমাদ গণিল।

দুর্দ্দান্ত শক্রদমন দিনে দিনে আপন রাজ্যাধিকার বিস্তৃত করিতেছিলেন। কত রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, কত রাজার এবং রাজপুত্রের ছিন্ন শিরে বিজয়মালা গাঁথিয়া, কত দেশদেশান্তর ভস্মীভূত করিয়া, আপনার 'পিশাচ' নামের সার্থকতা রক্ষা করিতেছিলেন। কত জনপদ জনশূন্য হইল, কত সহস্র গৃহের সুখশান্তির দীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—তবু তাঁহার তৃপ্তি ছিল না। এক প্রচণ্ড উন্মত্ত তাড়নার বশে তিনি ছুটিতেছিলেন,—কে তাঁহার গতিরোধ করিবে?

ভ্রাতার অন্তিম-শয্যার ছবি এখন হইতে শয়নে-স্বপনে ছায়ার ন্যায় যেন তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এক একদিন ঘুমঘোরে তাই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিতেন—"ক্ষমা কর প্রভু, এ নরকাগ্নিশিখা থেকে আমায় উদ্ধার কর, শান্তি দাও। আমি ত তাকে শেষে বাঁচাতে গিয়েছিলাম, পারি নি,—তার আগেই তারা কাজ শেষ ক'রেছিল,—সে কি আমার দোষ? জীবন ত পুড়ে ছারখার হয়ে গেল প্রভু,—আজও কি তার প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না?"

জাগ্রতাবস্থায় পুনরায় সে উন্মাদনা তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিত। তখন তিনি দানবের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিতেন।—সেখানে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায়, যুদ্ধের ভেরীনিনাদে, শোণিতের তপ্তধারাস্রোতে তাঁহার উন্মত্ততা কতকটা শমতা প্রাপ্ত হইত। যুদ্ধ যখন না থাকিত, তখন গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া, জনপদ জনশূন্য করিয়া, কাহাকেও শূলে দিয়া, স্বহস্তে বা কাহারও শিরশ্ছেদ করিয়া

তাঁহার সে উন্মাদনা-বহ্নির বুভুক্ষু শিখায় আহুতি প্রদান করিতেন। লোকে সে নাম স্মরণ করিয়া সভয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করিত, বিশালকায় ভীষণমূর্ত্তি পিশাচরাজের ছবি যখন তখন তাহাদের মানস-চক্ষে জাগিয়া উঠিয়া বিভীষিকার সৃষ্টি করিত। সভাসদেরা ভয়ে ভয়ে থাকিতেন, জনসাধারণ তাঁহার সহস্র হস্ত দূর দিয়া চলিত; সমগ্র রাজ্যের মধ্যে কেবলমাত্র একজন ছিল, যে তাঁহাকে ভয় করিত না,—সে পার্ব্বতী। সে তাঁহাকে সেই উন্মাদনার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আপনার জীবন ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল।

সে অনেক করিয়াছিল। তাহার অধিকার, স্থৈর্য্য, বিচক্ষণতা, বাক্-সংযম প্রথম প্রথম শক্রদমনকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত। কিন্তু সে ভাব অধিক দিন রহিল না। অতঃপর শক্রদমন, একবার নয় দুইবার নয়, বহুবার তাহাকে নির্য্যাতন—এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়াও, পার্ব্বতী পূর্ব্বের ন্যায়ই ধীর প্রশান্তভাবে উত্তর দিয়াছে—"মার্‌তে হয় মার, এজীবন ত তোমাকেই দিয়েছি।"—এ সকল অত্যাচারের পর প্রায়ই প্রতিক্রিয়া আসিত। তখন অনুতপ্ত শক্রদমন প্রবল আবেগে তাহাকে বক্ষের মাঝে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করিয়া তাহার ওষ্ঠপুটে কপোলে ললাটে অজস্র চুম্বনধারা বর্ষণ করিতেন, তাহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার অমানুষিকতার জন্য অশ্রুপূর্ণনেত্রে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। পার্ব্বতী ধীরে ধীরে তাঁহাকে উঠাইত; কোন কথা না বলিয়া, শুধু তাঁর হাতখানি আপনার হাতের উপর লইয়া, কত দণ্ড প্রহর ব্যাপিয়া—নীরবে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। অপমানের ক্ষোভ বা ক্ষমার গৌরব—কিছুই তাহার মনে হইত না; দেবতার কাছে তার কিসের গর্ব্ব বা অভিমান?—কিন্তু তবুত পার্ব্বতী সে উদ্দাম গতিরোধ করিতে পারিল না। সে স্পষ্ট বুঝিল, —এমন তীব্র উন্মাদনা, এমন অনুশোচনার গ্লানি—যাহার মনে, তাহার মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকার ঘটিতে অধিক বিলম্ব হয় না;—ভাবিয়া সে শিহরিল।

তাহার অধিক বিলম্ব হইলও না। যে মেঘ এতদিন ধরিয়া পুঞ্জীভূত হইতেছিল, সহসা একদিন তাহা হইতে ভীষণ গর্জ্জনে বজ্রপতন হইল,—সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ের ঝটিকা উঠিল। কিসে তাহা ঘটিল, বলিতেছি।

এতদিন পরে প্রবল দস্যু রতনচাঁদ ধরা পড়িয়াছিল। সাতদিন ধরিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, বন হইতে বনান্তরে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, অবশেষে তাহাকে বন্দী করিয়া মহোল্লাসে শক্রদমন রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে দস্যুর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইল। সে রাত্রে রাজ্যের প্রধান অমাত্যবর্গ প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইলেন,—সমস্তরাত্রি ব্যাপিয়া পানভোজনের উৎসব চলিতে লাগিল। মধ্যরাত্রে শক্রদমন সহসা জয়সেনের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাতদিন ত আমি রাজধানী ছাড়া। রাজ্যের নূতন খবর কি?"

"নূতন খবর আর নেই, মহারাজ! তবে সেদিন একটা চাষা শালবনীতে শিকার ক'র্‌ছিল—মহারাজের বিচারের অপেক্ষায় সে বন্দী আছে।"

অকস্মাৎ বহুদিনের পুরাতন এক স্মৃতি—সদ্যঃছিন্নকণ্ঠ মৃগরাজ-পার্শ্বে বিশালকায় এক প্রৌঢ় কৃষকের কথা—শক্রদমনের মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে, সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে দৃষ্ট এক কিশোরীর ছবি—কক্ষে গাগরী, স্কন্ধে বিসর্পিত পদ্মনাল, কপোলে শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু—তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—"জয়সেন, আজ এর কথায় সে দিনের কথা মনে পড়েছে। সে ঘটনা না ঘট্‌লে ত আজ আমি রাণীকে পেতাম না!—এ লোকটাকে আমি শাস্তি দিতে চাইনে, একে ছেড়ে দাও।" তারপর, কি ভাবিয়া, বলিলেন—"আচ্ছা, তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এস; আগে তাকে শূলে দেবার ভয় দেখিয়ে, একটু রঙ্গ করে, তার পর কিছু বকশিস্ দিয়ে বিদায় ক'র্‌ব।"

অন্ধ শক্রদমন! এ রহস্যের পরিণাম কি, যদি তখন বুঝিতে!

জয়সেনের ইঙ্গিতে দুইজন প্রহরী, শৃঙ্খলাবদ্ধ হতভাগ্য বন্দীকে রাজার সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইল। কঠোর কণ্ঠে শক্রদমন জিজ্ঞাসা করিলেন—"বন্দী, তোমার অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড, তা জান? কি ভাবে মর্‌তে চাও?"

প্রাণের মমতায় বিকৃত আর্ত্তস্বরে সে হতভাগ্য চীৎকার করিয়া উঠিল, ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল—"দোহাই, মহারাজ! পেটের জ্বালায় শুধু এ কাজ ক'র্‌তে

গিয়াছিলাম—জীবনে আর কখনও ক'র্‌ব না। আমার প্রাণভিক্ষা দিন।"

"ভাল।—জয়সেন, কাল সকালে এ চোরটাকে বাঘের খাঁচায় ফেলে দিয়ো।"

আর এক মুহূর্ত্ত পরেই সে প্রহসন শেষ হইত; কিন্তু মুহূর্ত্তে দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রলয়ের ঝটিকা উঠিল। সদ্যঃ-মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কৃষক তীব্রশ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"মার্‌বে বই কি পিশাচ? নিজে সোণার খাট পালঙ্কে শুয়ে হীরে মাণিকে ঘর বোঝাই ক'র্‌বে, আর গরীব প্রজারা একমুঠো খুঁদকুঁড়ার অভাবে পেটের জ্বালায় তোমার বনে শিকার ক'র্‌তে এলেই তাদের রক্ত খাবে? তা নইলে তুমি আর ভাইকে বিষ খাওয়াও? নাস্তিক, পিশাচ,—তোর ইহকালও নেই, পরকালও নেই।"

প্রলয়ধারা বর্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন সহসা একবার নিস্তব্ধভাব ধারণ করে,—মুহূর্ত্তের জন্য সে সভা, সে উৎসব-কোলাহল সেইরূপ স্তব্ধ হইল। তারপর চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে আহার্য্যপানীয়সজ্জিত সুবৃহৎ মেজ সশব্দে কক্ষ-তলে নিপতিত হইয়া শতধা ভগ্ন হইল; নিমেষে শত্রুদমন বজ্রমুষ্টিতে কৃষকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া কটিস্থ ভোজালি নিষ্কাশিত করিলেন,—পর মুহূর্ত্তেই হতভাগ্যের ছিন্ন শির উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

জয়সেন অগ্রসর হইলেন।—"মহারাজ, উৎসবের দিনে অনর্থক রক্তপাত হল। যা হবার তা হ'য়েছে, এখন সবাইকে নিয়ে অন্য কক্ষে চলুন।"

শত্রুদমনের চক্ষু তখন জ্বলিতেছিল, বিশাল কায় ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া বিশালতর হইয়া উঠিয়াছিল,—কক্ষস্থ দীপালোকে তাঁহার করস্থ রক্তপৃষ্ঠ শাণিতাস্ত্র স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল। তীব্রকণ্ঠে তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বটে?—কিন্তু এ লোকটার এত ধৃষ্টতা কি করে হল?—নিশ্চয়ই আপনারা কেউ তাকে এ সাহস দিয়াছিলেন,—কে সে বলুন, নইলে সবারই শির আজ এখানে লুটোবে।"—বলিয়া, গর্জ্জন করিয়া তিনি তাহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন। সকলে প্রমাদ গণিয়া, সন্ত্রস্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। আর মুহূর্ত্তমাত্র—এমন সময় চকিতে পার্ব্বতী অন্তঃপুর হইতে ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অমাত্যবর্গকে বলিল—"এখনো দাঁড়িয়ে? —পালান সব, চলে যান।"

দ্বিতীয়বার আর সে অনুরোধ করিতে হইল না। আসন্নমৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া অমাত্যবর্গ ত্রস্তভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। একজন শুধু নড়িলেন না—তিনি জয়সেন। পার্ব্বতী রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—"আপনার ভীমরতি ধরেছে দেখ্‌ছি। ক্ষুধার্ত্ত বাঘের সুমুখে থেকে কি লাভ? চলে যান।"—সে দৃপ্তা অথচ মহিমময়ী মূর্ত্তি, সে তীব্র অথচ মমতাপূর্ণ কণ্ঠস্বর জয়সেনকে চকিত করিল; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অবশেষে তিনিও সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের আলয়ে রহিল—একা পার্ব্বতী।

"মহারাজ, ও ভোজালি আমায় দিন।"

অমাত্যবর্গের পলায়নে শত্রুদমন ক্রোধে ক্ষোভে ফুলিতেছিলেন।—"সবাই আমাকে ছেড়ে গেল? তা যাবেই ত! তারা যে জানে আমার সর্ব্বাঙ্গ গলিত কুষ্ঠে ভরা, আমার ইহকালও নেই, পরকালও নেই, ভগবান্‌ও নেই! আমার রাজ্যের চাষারাও তা জানে!"—সহসা তিনি নিস্তব্ধ হইলেন—দীপচ্ছায়ার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে, সভয়ে কক্ষের চতুর্দ্দিকে একবার চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"হাঁ পার্ব্বতী, তারাও জানে। কেন জানে, তা জান না? ভীমসেনের প্রেতাত্মা যে প্রতিরাত্রে নগরের পথে পথে ঘুরে সবাইকে ডেকে বলে যে, 'আমারই হুকুমে কেমন ক'রে আমার লোক তাকে বিষ খাইয়েছে, তারপর কি অসহ্য যন্ত্রণায় সে মরেছে! নগরের লোক তা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠে।—তবু সে প্রেতাত্মা থামে না,—ছায়ার মত নিঃশব্দে রাজপথ দিয়ে সে বরাবর চলে আসে।—প্রাসাদের প্রহরী তাকে আট্‌কাতে পারে না,—বরাবর সে চলে আসে;—খোজাদের পার হয়ে এঘর সেঘর দিয়ে পা টিপে টিপে শেষে সে আমার শোবার ঘরে—আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়"—সহসা গৃহকোণে তাঁহার সভয় দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল, চীৎকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ওই দেখ,—ওই—ওই কোণে,ঝাড়ের ছায়ার মধ্যে থেকে—ওই দেখ তার চোখ জ্বলছে—ওই দেখ আমার দিকে চাইছে! —হা ভগবান্! পরকে খুন ক'রে বেড়ালে কি হবে?—আত্মহত্যা নইলে যে আর এ জ্বালা থামবে না!—"

সহসা তাঁহার ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করে সদ্যঃশোণিতসিক্ত সেই ভোজালি দীপালোকে স্ফুরিত হইয়া উঠিল,—সে অস্ত্র অধঃপতিত হইবার পূর্ব্বেই, পার্ব্বতী ব্যাঘ্রীর ন্যায় তাঁহার উপর পড়িয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার সে হাত চাপিয়া ধরিল। চীৎকার করিয়া শত্রুদমন বলিলেন—"সরে যাও—কেন মর্‌বে?"

পার্ব্বতী তবু সে দৃঢ়মুষ্টি শ্লথ করিল না, বলিল—"আমি মরি বাঁচি কিছু এসে যায় না। আগে আপনি অস্ত্র ফেলুন,—তবে ছাড়্‌বো, নইলে নয়।"

পার্ব্বতী জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া, তাঁহার সহিত যুঝিতে লাগিল; কোথা হইতে তাহার দেহে এক অমানুষিক শক্তির সঞ্চার হইল।—যতবার শত্রুদমন তাহার মুষ্টি হইতে আপনাকে মুক্ত করেন, ততবারই নিমেষে আবার তাহা পূর্ব্ববৎ দৃঢ়-নিবদ্ধ হয়,—তাহাকে আর আঘাত করিবার সুযোগ পান না। অবশেষে অকস্মাৎ, বিক্ষিপ্ত আহার্য্য-পানীয়-পিচ্ছিল পথে তিনি নিপতিত হইলেন, করস্থ অস্ত্র হস্তচ্যুত হইয়া দূর কক্ষকোণে নিক্ষিপ্ত হইল।

সে দৃপ্তা অথচ মহিমময়ী মূর্ত্তি, জয়সেনকে চকিত করিল।

কতক্ষণ সেইভাবে শত্রুদমন পড়িয়া রহিলেন। পার্ব্বতী—শ্রান্ত ক্লান্ত পার্ব্বতী স্থির নেত্রে সেই ভূপতিত বিশাল দেহের প্রতি চাহিয়া রহিল। সহসা সে দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল; পার্ব্বতী প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তাহার সে সাবধানতার আবশ্যক হইল না!

"পার্ব্বতী!"—ক্ষীণ বেদনাব্যঞ্জক স্বরে শত্রুদমন ডাকিলেন—"পার্ব্বতী!"

চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে ছুটিয়া গিয়া, স্বামীর শিরোদেশ আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়া, উৎকণ্ঠাজড়িত দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া সে সুধাইল—"লেগেছে?"

শত্রুদমন উত্তর দিলেন না, শুধু তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পর শত্রুদমন উঠিলেন। তার পর, চারিদিকে একবার চাহিয়া, অসংযতপাদক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কুলদেবতা ধূর্জ্জটির মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পার্ব্বতী দূর হইতে তাঁহার অনুসরণ করিল।—মন্দিরপ্রাঙ্গণ তথন জনহীন নিস্তব্ধ; উদ্‌ঘাটিত মন্দির-দ্বারের অবকাশ পথে ঘৃতদীপালোকে বিগ্রহের হেমসিংহাসন এবং শিরস্থ রত্নমুকুট দীপ্তি পাইতেছিল। শ্রান্ত অবসন্ন উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত শত্রুদমন মন্দিরদ্বার-

সম্মুখে—সেই চত্বরের উপর সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

পার্ব্বতী অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এতদিন সে যাহার আশঙ্কা করিতেছিল, আজ তাহা ঘটিয়াছে; যতদিন সে এ পূর্ণ উন্মত্ততার গতিরোধ করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল, ততদিন তবু আশা ছিল,—আজ আর কোন আশা নাই!

এ বজ্রপাত রোধ করিবার জন্য সে কি না করিয়াছে! রমণীর স্নেহ মায়া কোমলতা, সব বিসর্জ্জন দিয়া, স্বামীর ন্যায়ই আপনাকে সে ক্রমশঃ কঠিন করিয়া তুলিয়াছে; কত যুদ্ধ বিগ্রহ সে স্বেচ্ছায় অনুমোদন করিয়াছে;—কত দেশের গৌরব, সতীর স্বামী, জননীর নয়নের মণি সেই সব যুদ্ধে অন্তিমশয্যা লাভ করিয়াছে;—সে চিন্তায় পার্ব্বতী বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই, স্বামী যে, সে সকল ক্ষণে তাঁহার অন্তর্জ্বালা কতক বিস্মৃত হইয়াছেন, সেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট,—তাহাতে স্বামীরই বা পাপ কি?—সূর্য্যের তেজে শুষ্ক লতাপত্র শুকায় বলিয়া কি সূর্য্যকে পাপী বলিতে পার? যাহাতে তাঁর চিত্তের শান্তি, তাহার কিছুই পাপের নয়। তার জীবন লইয়া যদি তাঁহার এ উন্মত্ততা দূর হয়, তাহা অপেক্ষা পূর্ণ তৃপ্তি তাহা হইলে তাহার জীবনে বুঝি আর কিছুতেই হইবে না।—কিন্তু আজ যে তিনি আপন জীবন হনন করিতে উদ্যত হইয়াছেন—একবার পার্ব্বতী তাঁহার সে সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছে; কিন্তু কতক্ষণ—কত দিন সে তাঁহাকে বাধা দিতে সক্ষম হইবে? সে বুঝিল যে, তাহার আপন চিত্ত বিক্ষিপ্ত—উদ্‌ভ্রান্ত; ধীরভাবে চিন্তা করিবার শক্তি তাহার লুপ্ত হইয়াছে।—এ দুর্দ্দিনে কে তাহাকে পরামর্শ দিবে? কে তাহাকে এ বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার করিবে? অমাত্যবর্গ?—তাহারা ত লোষ্ট্রাহত কুকুরের ন্যায় দূরে পলায়ন করিয়াছে।—জয়সেন?—পার্ব্বতী সমীচীন বিবেচনা করিল না। কুলগুরু?—তিনি ত আপাততঃ তীর্থে তীর্থে ফিরিতেছেন। তবে উপায়?—অকস্মাৎ বহুদিন পূর্ব্বের এক স্মৃতি, নব-কূট-পর্ব্বতের সেই সন্ন্যাসীর কথা, তাহার মনে পড়িল; অকূল সমুদ্রে পার্ব্বতী যেন কূল দেখিতে পাইল।

বাহিরে ঘনান্ধকার,—মেঘের উপর মেঘ জমিয়া একটা প্রবল ঝটিকাবৃষ্টির সূচনা করিতেছিল। সে সময় সে পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করা আদৌ যুক্তিযুক্ত ছিল না। কিন্তু পার্ব্বতী মনঃস্থির করিয়া লইল। এ ঝটিকা-বৃষ্টি হয়ত শেষ রাত্রে থামিতে পারে; কিন্তু কে জানে, কাল প্রভাতে রাজার এই উন্মত্ততা ফিরিয়া আসিবে কি না?—পার্ব্বতী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল. তার পর একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া, অন্তঃপুরের বিশ্বস্ত খোজা অনুরুকে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া, বহির্দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল। দ্বারের প্রধান প্রহরী তাহার গতিরোধ করিতেই চকিতের মত অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া দৃপ্তা সিংহীর ন্যায় সে দাঁড়াইল;—বিস্মিত প্রহরী,আভূমি-প্রণত হইয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল;—পার্ব্বতীর বাল্যকালে তাহাকে সে অনেকবার দেখিয়াছিল; কিন্তু রাণীকে এ ভাবে একাকিনী যাইতে দেখিয়া, সে ঈষৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিবার সঙ্কল্প করিতেছিল, ইতোমধ্যে অনুরু আসিয়া পৌঁছিল। প্রহরীর সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে সে মাত্র আপন ওষ্ঠপুটে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংস্থাপিত করিয়া দ্রুতবেগে সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া গেল। প্রাসাদে তাহার আগমনির্গম সর্ব্বদা অব্যাহত ছিল।

সহসা পার্ব্বতী দুই করে চক্ষু আবৃত করিয়া বসিয়া পড়িল,—দিগন্ত ব্যাপিয়া যেন বাড়বাগ্নি জ্বলিয়া বিদ্যুদ্দাম স্ফূরিত হইয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের অরণ্যে ভীষণ নিনাদে বজ্রপতন হইল। চক্ষু মেলিয়া পার্ব্বতী দেখিল—সম্মুখের এক সুদীর্ঘ বৃক্ষশির ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে! পরমুহূর্ত্তেই মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল;—বাতাসও প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। তবে নবকূট পর্ব্বতের পথ তাহার একেবারে অপরিচিত নয়, দীর্ঘও নয়,—তাই পার্ব্বতী ক্ষণবিদ্যুদালোকে পথ চিনিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।—পিচ্ছিল পথে কতবার তাহার পদস্খলন হইতে লাগিল, কণ্টকে গুল্মে তাহার দেহ এবং পদ কতস্থলে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল,—তবু তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, বেদনানুভূতি নাই; একটি মাত্র স্থির লক্ষ্য শুধু তাহার মনে জাগিতেছিল;—বহির্জগতের কোন বিষয়ে আর তাহার চৈতন্য ছিল না। সাবিত্রী যেমন স্বামীর জীবন ফিরাইয়া আনিতে আত্মহারা হইয়া যমরাজের অনুসরণ করিয়াছিলেন, আজ পার্ব্বতীও তেমনই বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট হইতে স্বামীর জীবন-রক্ষার উপায়-সন্ধান জানিতে চলিয়াছে!

বিশ্বস্ত অমুরু প্রভুভক্ত কুকুরের ন্যায় সতর্কদৃষ্টিতে দূর হইতে তাহার অনুসরণ করিতেছিল।

প্রায় দণ্ডাধিককাল অবিশ্রাম চলিয়া অবশেষে পার্ব্বতী, সন্ন্যাসীর গুহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গুহাভ্যন্তরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন,—অষ্টবর্ষ পূর্ব্বের সে-ই ক্ষীণ সুদীর্ঘ দেহ, সে-ই তেজোব্যঞ্জক দৃষ্টি, সে-ই প্রশান্ত মুখ-শ্রী! পার্ব্বতী সে মুখে কালের ক্ষীণতম রেখা-পাতও দেখিতে পাইল না।

সেই দারুণ দুর্য্যোগে, গভীর নিশীথে, তাহাকে তদবস্থায় একাকিনী উপস্থিত হইতে দেখিয়াও—(অমুরু গুহার বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতেছিল)—সন্ন্যাসীর মুখে বিন্দুমাত্র বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকটিত হইল না। পার্ব্বতী, বামহস্তের অঙ্গুলি হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে রক্ষা করিয়া, নতজানু হইয়া তাঁহার প্রশ্নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।—শত সহস্র ব্যক্তি যাহা লাভের জন্য অনায়াসে আপনাদের জীবন বিপন্ন করিতে পারিত, সে অঙ্গুরীয় সন্ন্যাসীর পদতলে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল। ষোড়শীর চকিত অপাঙ্গদৃষ্টির ন্যায় মুহুর্মুহু তাহা অগ্নিকুণ্ডের আলোকরশ্মিতে স্ফুরিত হইয়া উঠিলেও, সন্ন্যাসীকে তাহা ক্ষণমাত্রও মুগ্ধ করিতে পারিল না।—বহু-যুগব্যাপী সাধনার ফলে আজ তিনি আপন অন্তরে যে পরম জ্যোতির সন্ধান পাইয়াছেন—তাহার কাছে কত তুচ্ছ না এ হীরকখণ্ড!—অমুরু কিন্তু দূর হইতে তাহা দেখিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল—"বাঁদরে আবার মুক্তোর কদর কি বোঝে?—রাণীর যেমন!"

পার্ব্বতী গুহায় প্রবেশ করিয়াই আচ্ছাদনবস্ত্র অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়াছিল; অগ্নিকুণ্ডের কম্পিত শিখালোক তাহার পরিধেয় বহুমূল্য বসনভূষণে এবং অলকগুচ্ছ-নিবেশিত হীরকখণ্ডগুলির উপর পতিত হইয়া শতধারে চূর্ণিত হইতেছিল, তাহার বিশাল নয়নের উদাস অথচ স্থির দৃষ্টিতে কোন্ কুহকের সৃষ্টি করিতেছিল। পার্ব্বতীর তখনকার সে গম্ভীর এবং মহিমময়ী মূর্ত্তিখানি অমুরু দূর হইতে শ্রদ্ধাবিষ্ট এবং অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পার্ব্বতী বলিল—"প্রভু, আট বছর পরে আবার আজ আপনার কাছে এসেছি। আট বছর ধরে স্বামীর পাশে পাশে থেকে, যতদূর পেরেছি,—তাঁকে শান্তি দিয়ে এসেছি। কিন্তু আর ত অদৃষ্টের গতিরোধ ক'র্‌তে পারিনে। রাজার উন্মাদের পূর্ণ লক্ষণ দেখা দিয়েছে,—আমি দুর্ব্বল, অসহায়,—বলে দিন কিসে তিনি ভাল হন, কি ক'র্‌লে তাঁকে বাঁচাতে পারি। আমার প্রাণ দিয়েও যদি তাঁর উপকার হয়, তাও বলুন।"

সন্ন্যাসী নিমেষহীন দৃষ্টিতে অগ্নিশিখার প্রতি চাহিয়া ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, পার্ব্বতীর দিকে না চাহিয়াই, ধীর স্বরে তিনি উত্তর করিলেন—"বৎসে, এ পরীক্ষায় তোমায় একদিন পড়্‌তে হবে, আমি তা আগে হতেই জান্‌তাম; তাই তোমায় সেদিন ফেরাতে চেয়েছিলাম। যে পথে আজ তুমি দাঁড়িয়েছ, সে সাধন-পথ বড় বন্ধুর, বড় জটিল; তবু আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন তা পার হয়ে যেতে পার।—কিসের সমস্যা আজ তোমার?—এতদিন তাঁকে যে শান্তি দিয়েছ, আজ আর তা দিতে পার্‌ছ না, এই ত? দুঃখ করো না বৎসে, সংসার যাকে সৌভাগ্য বলে—তার দিন তোমার ফুরিয়ে এসেছে। পুরুষ মানুষ চিরদিন শুধু একটা জিনিস নিয়ে থাক্‌তে পারে না। এত-দিন তুমি যে আসন অধিকার করেছিলে, সেই আসন আজ অন্য কাউকে ছেড়ে দিতে হবে। কে সে?—অন্য কোন সৌভাগ্যবতী রমণী-রত্ন?—হাসিমুখে তাকে স্বামীর কোলে তুলে দাও। অন্য কোন কামনা?—জীবনের—আত্মার বিনিময়ে তাঁকে তা এনে দাও।—এই-ই এখন তোমার কর্ত্তব্য।" বলিয়া সন্ন্যাসী নীরব হইলেন।

ধীরে ধীরে পার্ব্বতী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিল; তার পর নিঃশব্দে সে গুহা ত্যাগ করিল।

কুলদেবতার প্রাঙ্গণে যখন সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল তখনও শত্রুদমন পূর্ব্ববৎ নিশ্চল নিস্পন্দদেহে সাষ্টাঙ্গ-প্রণতানত। নিঃশব্দে সে তাঁহার চরণপ্রান্তে যাইয়া বসিয়া তাঁহার চরণ দু'টি আপন অঙ্কে তুলিয়া লইল। সাধুর শেষ বাণী তখনও তাহার কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছিল—"জীবনের—আত্মার—বিনিময়ে তাঁকে তা এনে দাও।"

কি সে জিনিস;—পার্ব্বতী হইতেও আজ যাহা তাঁর কাছে প্রিয়তর? কি সে শক্তি,—পার্ব্বতীর গাঢ়তম প্রেমের অপেক্ষাও আজ যাহা গরীয়সী? কি সে চেতনা—মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে তাহার দেবতাকে আজ যাহা উদ্ধার করিতে সক্ষম? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পার্ব্বতী মনে মনে

বলিল—"কি সে প্রভু, বলে দাও। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল খুঁজেও পার্ব্বতী তা তোমায় এনে দেবে।—কি সে তোমার শান্তি, বলে দাও।"—আবার সাধুর সেই কথা মনে পড়িল—"পুরুষ মানুষ শুধু একটা জিনিস নিয়ে চিরদিন থাক্‌তে পারে না।' পার্ব্বতী ভাবিয়া দেখিল;—সত্যই ত! এই এত কাল পর্য্যন্তও প্রতি যন্ত্রণা গ্লানির ভারে লুটাইয়া, শ্রান্ত শিশুর ন্যায়, স্বামী তাহারই বক্ষের মাঝে শান্তির জন্য ছুটিয়া আসিয়াছেন,—আজ কই তার প্রেম ত স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না; নহিলে, তাহাকে দূরে রাখিয়া, স্বামী আজ নিতান্ত নিঃসহায়ের ন্যায় কুলদেবতার চরণে লুটাইবেন কেন? ভাবিতে ভাবিতে, সেই গভীর তমসার মাঝে অকস্মাৎ পার্ব্বতী একটা ক্ষীণ আলোকসম্পাত দেখিতে পাইল।—দেবতা—স্বর্গ—ভগবান্! কোথায় সব? পার্ব্বতী আপন দেবতার সেবায় সে সব কথা যে অনেকদিন ভুলিয়াছিল! তাহার ইহ-পরকাল স্বর্গ-মর্ত্ত্য যে সবই দুইটিমাত্র চরণপ্রান্তে একাকার হইয়া গিয়াছে!—আজ সে তাই ভাবিতে লাগিল—কোথায় সে স্বর্গ, কোথায় সে স্বামীর স্বামী, দেবতার দেবতা?—উর্দ্ধে?—সে যে বহু দূরে! মর্ত্ত্যে কি কিছুই নাই? কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল—"আছে বই কি। তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীধাম,—স্বয়ং বিশ্বেশ্বর যেখানে জগন্মাতার সঙ্গে বিরাজ করেন;—সে-ই ত স্বর্গ।"—'কাশীধাম?' 'বিশ্বেশ্বর?'—পার্ব্বতী এতক্ষণে যেন অকূল পাথারে কূল দেখিতে পাইল। সাধু কি ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন? ইহাই কি তাহার দেবতার একমাত্র উদ্ধারোপায়?

পার্ব্বতী কতক্ষণ ধরিয়া কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল। ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে সেই সিক্তবস্ত্রেই নিদ্রিতা হইয়া পড়িল;—নিদ্রাবস্থায়ও তাহার মানস-চক্ষে কাশীধামের বিশ্বেশ্বরের ছবি ফুটিয়া উঠিল।

প্রত্যূষে দারুণ শীতানুভূতিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল,—শক্রদমন তখনও নিদ্রাভিভূত। ধীরে ধীরে তাঁহার চরণ দু'খানি আপন অঙ্ক হইতে নামাইয়া, পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পর আপন কক্ষে ফিরিয়া গিয়া সিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল।

সমস্তদিন শক্রদমন সে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন না। পার্ব্বতী সমস্তদিন অভুক্ত থাকিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল;—স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সে নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতে সে সাহসী হইল না, তাহা সমীচীনও বিবেচনা করিল না। সন্ধ্যার সময় শক্রদমন—উদ্‌ভ্রান্ত—অনুতপ্ত—বেদনা-কাতর-দৃষ্টি শক্রদমন—দীনভাবে তাহার কক্ষ-দ্বারে আসিয়া ডাকিলেন—"পার্ব্বতী!"

সে কণ্ঠস্বরে—জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি বিজড়িত, অনন্তের সুখদুঃখ বেদনাহর্ষ গ্রথিত; সে কণ্ঠস্বরে—পার্ব্বতী চকিতা হইল; মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃতা হইয়া, ছুটিয়া স্বামীর বক্ষে আসিয়া, ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অস্ফুট গভীর স্বরে সে ডাকিল—"প্রভু, আমার জীবন-দেবতা!" আষাঢ়ের বর্ষণোন্মুখী মেঘের ন্যায়, তাহার অশ্রু-ভার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু হইতে—শেষে পূর্ণ ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। জননীর স্নেহ-সম্বোধনে শ্রান্ত শিশুর ন্যায়, উদ্বেলিত চিত্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া সে কাঁদিল;—কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার অন্তরের ভার ক্রমশঃ লঘু হইয়া আসিল, নিরুদ্ধবায়ু কক্ষের মধ্যে পুনরায় সে বায়ুর সঞ্চালন অনুভব করিল।

শক্রদমনের চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় কই তিনি ত আজ পার্ব্বতীকে আকুল আগ্রহে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন না। পার্ব্বতী তাঁহার প্রতি চাহিল,—আপনার দীনতা বুঝিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তবে কি এখন হইতেই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে? যাই হউক, পার্ব্বতী পাষাণে মন বাঁধিয়াছিল;—রমণীর দুর্ব্বলতায় সে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিতা হইয়া পড়িয়াছিল বটে,—স্বামীর এ উদাস ভাব পুনরায় তাহাকে তাহার সঙ্কল্পে সুপ্রতিষ্ঠিতাই করিল। তাহার সে সঙ্কল্পের অঙ্গ কি, তাহা সে বুঝিল।—সমস্ত পৃথিবীর সহিত সংগ্রাম করিয়া এতদিন যে রত্ন, সে সযত্নে আপন ভাণ্ডারে রক্ষা করিতেছিল, এখন হইতে তাহা বিসর্জ্জন দিতে হইবে! আর সে চরণ দু'টি সে বক্ষে ধারণ করিতে পাইবে না,—সে অযাচিত সাগ্রহ চুম্বনে আর তাহার ধমনীতে ধমনীতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বহিবে না, সে আদর-স্পর্শে সমস্ত দেহে আর পুলকরোমাঞ্চ উঠিবে না, নয়ন ভরিয়া আর সে কান্ত রূপ দেখিতে পাইবে না! জীবনের সূর্য্য অস্তাচলে ডুবিয়া যাইবে,—হয়ত চির-তমসার মাঝে জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহন করিয়া, কোন্ চিরন্তন অন্ধকারে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে! জীবনের নিশীথ-রাত্রে, সে সূর্য্যের প্রতিফলিতালোক,

শান্ত জ্যোৎস্নারূপে যে তাহার জীবনে জাগিয়া থাকিবে, এ কথা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে?—সবই সে ভাবিয়াছে, বুঝিয়াছে—তবু তাহার সঙ্কল্প টলে নাই। ত্যাগেই তাহার প্রেমের সাধনা, তাহা সে বুঝিয়াছিল; সবই ত সে ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেও;—তবে, বৈতরণীর কূলে দাঁড়াইয়া, শেষ খেয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে, আজ আবার পরিত্যক্ত স্বার্থ-পুঁটুলির প্রতি মায়াবিজড়িত সকাতর দৃষ্টিপাত কেন?

সে রাত্রে, স্বহস্তে পাক করিয়া, স্বামীকে সযত্নে আহারাদি করাইয়া, পার্ব্বতী, শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছিল। বলি বলি করিয়াও কথাটা উত্থাপন করিতে পারিতেছিল না। কতক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল,—দূরে সিংহদ্বার হইতে প্রহরের ঘণ্টা বাজিয়া গেল,—প্রান্তরে শৃগালের দল একবার সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিয়া আবার থামিয়া গেল;—শক্রদমন তন্দ্রাভঙ্গে পার্ব্বতীর প্রতি চাহিলেন। আজ আর পার্ব্বতী, সে চোখে চোখে চাহিতে পারিল না; আনত মুখে ধীরে ধীরে বলিল—"কাশী যাবে—বিশ্বেশ্বর দেখ্‌তে?"

"কাশী?—বিশ্বেশ্বর?"—শক্রদমনের মস্তিষ্ক তখনও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই।

পূর্ব্ববৎ গাঢ়স্বরে পার্ব্বতী বলিল—"যে অতীত পাপের জন্য তোমার এত গ্লানি, সেখানে গেলে তা থেকে তুমি মুক্তি পাবে। তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশী—সেখানে বিশ্বেশ্বরের চরণে বসে জীবনের শান্তি আবার ফিরে পাবে।"

সে কথার মর্ম্ম এতক্ষণে শক্রদমনের হৃদয়ঙ্গম হইল,—তাঁহার সে ভীতিকাতর তীব্র নিরাশাব্যঞ্জক দৃষ্টি ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল,—আশার অস্পষ্ট ছায়ালোক তাঁহার মুখমণ্ডলে খেলা করিতে লাগিল। অকস্মাৎ তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—সে মুখে বিস্ময় আগ্রহ আনন্দ প্রকটিত হইয়া উঠিল।—হা ভগবন্‌,—এ কি সত্য?—অপরিচিতের হস্তে নির্য্যাতিত শিশু আপন জননীকে দেখিবামাত্র যেমন ফুকারিয়া ওঠে,—জলমগ্ন আসন্ন-মৃত্যু- ব্যক্তি সহসা অকূলে কূল দেখিতে পাইয়া যেমন প্রাণের মায়ার শেষ অমানুষিক শক্তিবলে তৎপ্রতি ধাবিত হয়,—শক্রদমনের আজ এখন সেই ভাব হইয়াছিল। মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"এ কি সত্য, না স্বপ্ন? এতদিনের এ গাঢ় অন্ধকার কি সত্যই দূর হয়ে যাবে?—তাই কর বিশ্বেশ্বর।—এ তুচ্ছ রাজসম্পদ, সিংহাসনের মোহে আর আমায় বেঁধে রেখ না। চির-দারিদ্র্য বরণ করে, সন্ন্যাসীর বেশে পথে পথে ফিরে শেষে যথার্থ যেন তোমার চরণে গিয়ে পৌঁছাতে পারি। হে রুদ্র, জীবনের এ তীব্র উন্মাদনা, এ বাড়বাগ্নিশিখা পদদলিত করে, চরম শান্তি দিয়ে, এ অভাগার কাছে, তোমার শান্ত-মূর্ত্তিতে এসে দেখা দিয়ো!" দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। পার্ব্বতী ধীরে ধীরে তাঁহাকে শয্যার উপর শায়িত করাইয়া, সে মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। জীবনের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়া, আজ সকলই সে বক্ষের মাঝে চাপিয়া ধরিতে চাহিতেছিল; তাহার সঙ্কল্প শিথিল হইয়া পড়িতেছিল; রমণীর দুর্ব্বলতায় সে মুহুর্মুহু বিচলিতা হইয়া পড়িতেছিল। কে সে ভিখারী বিশ্বেশ্বর, যে তাহার একমাত্র রত্নখানি ভিক্ষার ছলে অপহরণ করিতে চায়? তত্রাচ একটা তীব্র তৃপ্তি ত তাহার ছিল,—নিদ্রিত স্বামীর মুখে শান্তির মাধুরী-ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে উদ্বেগ সে উন্মত্তভাব আর এখন নাই! তাই সে কৃতজ্ঞভাবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"আমি ত শুধু নিমিত্তমাত্র হয়ে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, কিন্তু যে শান্তি আমি দিতে পার্‌লাম না,—তুমি ত তা দিয়েছ ভগবান্‌!"

(৯)

শক্রদমনের তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প প্রচারিত হইলে, সে দুর্দ্দান্ত রাজার নিত্য নূতন অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ভাবিয়া কেহ কেহ নিশ্চিন্ত হইল; কেহ কেহ আবার রাজ্যরক্ষার কথা ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিল, কারণ, শক্রদমন যাহাই হউক, স্বীয় অপরিমিত বাহুবলে তিনি এতদিন বহু রাজশক্তি খর্ব্ব করিয়া, দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহীদের শান্ত করিয়া, আপন রাজ্যে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন—এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিত না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজ্যের অবস্থা কিরূপ হইবে, কে বলিতে পারে? কে তাঁহার হইয়া রাজ্য শাসন করিবে?—পার্ব্বতীর প্রতি জনসাধারণের ঈর্ষা ও অসূয়া এতদিনেও ত যায় নাই, শক্রদমনের অবর্ত্তমানে তাহার শিশুপুত্র সূর্য্য-

রায়কে কখনই সিংহাসনে বসিতে দিবে না। পার্ব্বতীও তাহা চাহিত না।

শক্রদমনও কয়দিন হইতে সে কথা ভাবিতেছিলেন। অবশেষে একদিন মনে মনে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সহসা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি এখন প্রায়ই হাসিতেন। যে রাত্রে পার্ব্বতী তাঁহাকে বিশ্বেশ্বরের কথা শুনাইয়াছিল, সেই রাত্রি হইতে পাপের অনুশোচনা আর তাঁহাকে তেমন ভাবে পীড়িত করিত না; আবার যেন পূর্ব্বের মতই সব ফিরিয়া আসিয়াছিল; কতকটা পূর্ব্বের মতই সোৎসাহে তিনি রাজকার্য্যে যোগদান করিতেছিলেন। আট বৎসর পূর্ব্বে পার্ব্বতী যখন প্রথম তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে,—তাঁহার তখনকার সেই বীরত্বব্যঞ্জক ছবি, সেই তেজ, সেই উৎসাহোন্মাদনা—আবার যেন তাঁহাতে ফুটিয়া উঠিতেছিল; আবার পার্ব্বতীর প্রতি তাঁহার পূর্ব্বের অনুরাগ ফিরিয়া আসিতেছিল। পার্ব্বতী স্বামীর এ পরিবর্ত্তনে একটা তৃপ্তির শান্তি অনুভব করিতেছিল; কিন্তু কার্য্যে বা বাক্যে তাহার মনোভাব একদিনও প্রকাশিত করে নাই।

শক্রদমনের তীর্থযাত্রা সঙ্কল্পের প্রতিকূলে প্রতিদিন প্রজাদের আবেদন-নিবেদন আসিয়া স্তূপীকৃত হইতেছিল। শেষে একদিন শক্রদমন, অমাত্যবর্গ এবং শিশুপুত্র সূর্য্যরায়কে সঙ্গে লইয়া এক অনন্যজ্ঞাত উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন; পার্ব্বতী তাঁহাকে আপনা হইতে কোন প্রশ্ন করিল না, অন্তঃপুরে একাকী আপন কক্ষে বসিয়া বসিয়া দিন গণিতে লাগিল।

মাসাধিক কালের পর শক্রদমন প্রত্যাগমন করিলেন। আনন্দে—উচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সাগ্রহে পার্ব্বতীকে আলিঙ্গনাবদ্ধা করিয়া, তাহার বিম্বাধরে প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া বলিলেন—"পার্ব্বতী, খুব সুখবর। কাজ সফল না হলে তোমাকে জানাব না বলে, আগে বলিনি। আমি মণিপুরে গিয়াছিলাম; মণিপুররাজ প্রকাণ্ড এক দরবার করে', তাঁর সামন্ত সমস্ত রাজাদের—প্রতিনিধিদের কাছে আমার অবর্ত্তমানে সূর্য্যরায়কে রাজা বলে স্বীকার ক'র্‌তে প্রতিজ্ঞা করেছেন,—প্রতিনিধিরাও তাতে মত দিয়েছেন। যদিই আমি তীর্থ থেকে আর না ফিরি, তা হলে মণিপুর-রাজই, সূর্য্যরায় সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত, তার নামে রাজ্য চালাবেন। তোমার সন্তান নিঃশত্রু হয়ে রাজতক্তে বস্‌বে —পার্ব্বতী এর চেয়ে আর সুখের কি আছে?"

পার্ব্বতী শুধু বলিল—"তোমার সুখেই আমার সুখ।"

তাহার পরীক্ষা এখনও তবে শেষ হয় নাই! নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তাহাকে কেবলমাত্র স্বামী হইতে বঞ্চিতা করিয়াই ক্ষান্ত হইতে চাহিল না; তাহার নয়নের মণি, প্রাণসম পুত্র সূর্য্যসিংহ,—যাহার ক্রমবর্দ্ধমান দৃপ্ত সুঠাম দেহে প্রতিদিন স্বামীর প্রতিচ্ছায়া স্পষ্টতররূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল —স্বামীর সেই শেষ মর্ত্ত্য স্মৃতিচিহ্ন, অতীতের সেই জ্বলন্ত প্রেমের স্ফুলিঙ্গাবশেষ—তাহারও প্রতি অদৃষ্টের দৃষ্টি পড়িল! ভাল, তাহাই হউক। কে সে?—সামান্যা কৃষক-বালিকা; রাজ্যাধিকারী যুবরাজের উপর তাহার কি অধিকার? সে ত তার নয়, সে যাঁর—তাঁরই গৌরব বৃদ্ধি করুক।

যাত্রার দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। অমাত্যবর্গ এবং সামন্ত রাজগণের মধ্যে কে কে তাঁহার অনুগমন করিবে, তাহাও স্থির হইতেছিল। পার্ব্বতী তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটির সন্ধান লইতেছিল। সহযাত্রিগণের মধ্যে জয়সেনকে না দেখিয়া সে একদিন তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। জয়সেন আসিয়া যথারীতি অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল, পার্ব্বতী বলিল—"শুন্‌ছি, আপনি মহারাজের সঙ্গে যেতে চান না। আপনার উদ্দেশ্য জানবার জন্যই আপনাকে ডেকেছি।"

অবনতমুখে জয়সেন উত্তর করিলেন—"আপনি সঙ্গে চলুন, আমিও যাব', কিন্তু আপনাকে এমন নিঃসহায়ভাবে এখানে ফেলে আমি যেতে পারবো না। আপনি কি জানেন না, বোঝেন না যে, চারিদিকেই আপনার শত্রুরা 'ওৎ' পেতে বসে আছে,—রাজা একবার পিছু ফির্‌লেই, তাদের এতদিনের প্রতিহিংসা নেবার জন্য তাহারা চক্রান্ত ক'র্‌বেই। তখন এ নির্ব্বান্ধব পুরীতে কে আপনাকে দেখ্‌বে?—না, মহারাণী, এ অনুরোধ ক'র্‌বেন না। তা নইলে এ বৃদ্ধ সহজে বিশ্বেশ্বর-দর্শনের লোভ ত্যাগ করেনি।"

"আমার জন্যই এখানে থাক্‌বেন? আমি কে?—সূর্য্যালোক-প্রতিফলিত চন্দ্র মাত্র; রাজা যতদিন রাজ্যপাটে থাকেন, ততদিনই আমি রাণী,—নইলে সামান্যা কৃষককন্যা বইত আমি আর কিছুই নই! আমি রাজার সঙ্গে যাই না কেন? আমি তাঁকে জানি; আমি সঙ্গে থাক্‌লে মনের

সে একাগ্রতা তাঁর হবে না,—তাঁর বিশ্বেশ্বর দর্শনও সফল হবে না। পৃথিবীর সমস্ত জিনিস থেকে মনকে টেনে ক্রমে বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে তাঁকে অর্পণ ক'র্‌তে হবে,—তা নইলে সবই তাঁর নিস্ফল হবে। আমার আবার তীর্থদর্শন কি?—তাঁর পুণ্যেই আমার পুণ্য, তাঁর ধর্ম্মেই আমার ধর্ম্ম; তাঁর চরণ-তীর্থই আমার সার তীর্থ। কিন্তু আপনার ত তা নয়; আমার জন্য আপনি তীর্থদর্শনের আশা ত্যাগ ক'র্‌বেন কেন? বিশেষতঃ—" পার্ব্বতীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—"আপনি না রাজার অমাত্য? আপনি না সবার চেয়ে তাঁর বিশ্বাসের পাত্র—বন্ধু? আর আপনি তাঁকে এই দূরপথে একা ছেড়ে দেবেন?—কত বনজঙ্গল নদনদী পাহাড় পার হয়ে, কত বিদেশী বিধর্ম্মী রাজার রাজ্য দিয়ে, তাঁকে যেতে হবে; পথে কত বিপদ্ ঘট্‌তে পারে, কত ছোট খাট যুদ্ধ বাধ্‌তে পারে—কে তা বল্‌তে পারে? সে সময় আপনি তাঁর পাশে থাক্‌বেন না? যুদ্ধে যদি তিনি আহতই হন—অসুখেই যদি পড়েন—আপনি কাছে থেকে তাঁর সেবা ক'র্‌বেন না?—আমি যে কি জিনিষ আজ ত্যাগ ক'র্‌ছি তা যদি আপনি বুঝ্‌তেন, তা হ'লে তাঁকে ছেড়ে আমাকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য আর এখানে থাক্‌তে চাইতেন না।"

এতদিন পরে বৃদ্ধ আজ সেই কৃষক-কন্যার উদার আত্মোৎসর্গ বুঝিলেন, তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, গাঢ়স্বরে তিনি উত্তর করিলেন—"মা, এতদিন আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম, আপনারই আদেশ শিরোধার্য্য।"

যাত্রার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় শক্রদমন পার্ব্বতীর সহিত একান্তে বসিয়া ছিলেন; তাহার নিকট শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহর রাত্রি হইতে প্রত্যূষ পর্য্যন্ত ধূর্জ্জটীর মন্দিরে থাকিয়া, আরাধনা ও ধ্যানধারণায় তাঁহাকে মনঃস্থির ও চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে; তার পর, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্নানান্তে যথারীতি পূজা হোম সম্পন্ন করিয়া সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ ধারণ করিতে হইবে। তাহার পর হইতে প্রত্যাগমন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে; বাক্যে—মনে কোনরূপ অসংযমতা, স্ত্রী-সঙ্গ, এমন কি স্ত্রীলোকের—বিশেষতঃ প্রেমপাত্রী পার্ব্বতীর মুখদর্শন পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। তাই শক্রদমন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে, জীবনের একমাত্র প্রেমাস্পদা পার্ব্বতীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন।—কত হাস্য পরিহাস করিয়া তিনি পার্ব্বতীর মন প্রফুল্লিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন;—এ যেন ক্ষণিকের বিদায়, অপরাহ্ণে কয় দণ্ডের জন্য অবকাশ মাত্র;—সে অপরাহ্ণ যেন 'সম্মুখে গম্ভীর নিশা বিস্তার করিয়া' তাঁহার সংসারের কনককান্তি সুখশান্তিটুকু গ্রাস করিবার জন্য লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া নাই! বক্ষের মাঝে তাহাকে টানিয়া আনিয়া স্নেহস্বরে তিনি পার্ব্বতীকে বলিলেন—"পার্ব্বতী, আমি চলে গেলে আমার জন্য ভাব্‌বে? ভয় কি, আমি ত শীঘ্রই ফির্‌ব, আবার এসে তোমায় বুকে ধর্‌ব, কত অজানা দেশের গল্প ক'র্‌ব, বিশ্বেশ্বরের মহিমার কথা ব'ল্‌ব। তখন যে আমি নূতন মানুষ হব; অনুতাপগ্লানির যন্ত্রণা সব তখন আমা' থেকে ধুয়ে মুছে যাবে!—সে সুখ—সে গর্ব্ব তোমারই হবে,—তুমিই আমাকে সে মহাধনের অধিকারী করাবে!"

"আমার কাছে কৃতজ্ঞতা কেন? আমি ত শুধু স্ত্রীর কর্ত্তব্যই ক'রেছি। আমাকে লজ্জা দিয়ো না। তুমি যে শান্তির সন্ধানে তীর্থে যাচ্ছ,—এই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

শক্রদমন পার্ব্বতীর মুখচুম্বন করিয়া, উঠিলেন; বলিলেন—"তবে আসি রাণী! মনে করো আমি কোথাও যাই নি, তোমার কাছে কাছেই আছি; এ বসনভূষণ খুলে ফেলে, অনাথার মত থেক না; আমায় ভুলো না। যতদিন না ফিরি, আমার কল্যাণ প্রার্থনা করো।"

পার্ব্বতী উত্তর দিল না; মনে মনে বলিল—"তোমায় ভুল্‌ব? আপনার ধ্যানের মন্ত্র কে কবে ভোলে প্রভু?"

শক্রদমন দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন; আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন,—চারিচক্ষে মিলিল,—সমস্ত জীবনের ঘনীভূত সুখদুঃখ, জন্মান্তরের স্মৃতি, ভবিষ্যতের কুজ্ঝটিকাময় ঘটনার ইঙ্গিত, জীবনের মায়া, মৃত্যুর তৃষা,—নিমেষের মধ্যে যেন তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় তিনি ফিরিলেন, গভীর আগ্রহে সে দেহলতাকে আবার আপন বক্ষের মাঝে টানিয়া আনিয়া সে তৃষিত অধরপুটে আবার প্রগাঢ় চুম্বন করিলেন।—তার পর অশ্রু-ভার চক্ষে ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করিলেন।

অদৃষ্ট চিরদিনই অ-দৃষ্ট, তাই ভগবানের সৃষ্টি কখনও লোপ পায় না।

প্রভাতে, সিংহদ্বারে প্রথম প্রহরের ঘণ্টা পড়িল; অমনই দোলমঞ্চ হইতে সহস্র নাকাড়া একসঙ্গে

বাজিয়া উঠিল, শত শঙ্খ নিনাদিত হইল, লাজপুষ্প-মাল্য চারিদিক্ হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল।—নব বেশে শত্রুদমন মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পার্ব্বতী বাতায়ন হইতে শত্রুদমনের সে অপূর্ব্ব শ্রী দেখিল;—সে গৈরিক বসন, গৈরিকোত্তরীয়, নগ্ন পদ, করধৃত বেত্রদণ্ড, সে ভূমি-সংলগ্ন আনত দৃষ্টি নয়ন ভরিয়া সে দেখিতে লাগিল। —এই কি তাহার আদর আব্দারের প্রেমাস্পদ? তাহার মান-অভিমানের স্বামী?—না ইনি ত তা নন,—ইনি যে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ!—সুখদুঃখাতীত, ত্রিকালজয়ী, মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বর! ভ্রান্ত পার্ব্বতী ইঁহারই অন্তর-গ্লানি দূর করিতে চাহিয়াছিল?—ইঁহাকেই সে আপনার গণ্ডীর মাঝে ধরিয়া রাখিতে লালায়িত!—পার্ব্বতী আপন অকিঞ্চিৎকরতায় আপনি লজ্জিতা হইল। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন যেমন লজ্জিতান্তঃকরণে নতজানু হইয়া বলিয়াছিলেন—

"—সখেব সখ্যঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াইসি দেব সোঢ়ুম্"—

তাহারও মনের ভাব তখন সেইরূপ।

ধীরে ধীরে সে তীর্থযাত্রীর দল অগ্রসর হইল;—সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া, রাজপথ বাহিয়া বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। রাজ্যসীমার প্রান্ত পর্য্যন্ত একদল রাজ-সৈন্য তাহার অনুগমন করিল।—প্রথমে শত্রুদমন, পশ্চাতে জয়সেন, তৎপশ্চাৎ অন্যান্য সামন্ত রাজা ও অমাত্যবর্গ এবং সর্ব্বশেষে রাজসৈন্য ও উচ্চনীচ প্রজাবৃন্দের জনতা লইয়া সে মিছিল চলিতে লাগিল। পার্ব্বতী আর কিছুই দেখিতেছিল না—তাহার অনিমেষ দৃষ্টি তাহার দেবতার সেই সমুজ্জল দীপ্ত ছবির প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল;—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সেই এক মূর্ত্তি,—বিশ্বের অনন্ত সঙ্গীতের মাঝে সেই এক সুর, নিখিলের অনন্ত রূপের মেলার মধ্যে সেই এক রূপ-জ্যোতিঃ—তাহার অতৃপ্ত নয়নে তৃষিত শ্রবণে আসিয়া মিশিতেছিল।—প্রতিহিংসালোলুপ প্রজাগণের অন্তঃপুরাভিবর্ষী তীব্র-দৃষ্টি-শর, জয়সেনের উৎকণ্ঠাপীড়িত মুহুর্মুহু চকিত পশ্চাৎচাহনি,—কিছুই সে লক্ষ্য করিল না।—ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর, অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া সে ছবি ক্রমশঃ সুদূর দিক্চক্রবালে মিলাইয়া গেল;—তখনও পার্ব্বতী আত্মহারা হইয়া বাতায়ন-পার্শ্বে দণ্ডায়মানা!—পুত্রও এতক্ষণ জননীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল। অনেকক্ষণ পর সে ডাকিল—"মা, কি দেখ্ছিস্? বাবাও চলে গেল।"—পার্ব্বতীর চমক ভাঙ্গিল; পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"হাঁ বাবা,—চলে গেছেন।—"পার্ব্বতী বলিতে যাইতেছিল "আবার আস্বেন"; কিন্তু পারিল না,—কে যেন আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

তখনকার কালে বিদেশের সংবাদ এত সহজলভ্য ছিল না। মাসান্তে বা পক্ষান্তে সময়ে সময়ে যাত্রীর দল ফিরিলে, মুখে মুখে কতক সংবাদ পাওয়া যাইত,—কখন কখন আবার তাহাও মিলিত না, হয়ত দৈবক্রমে পথমধ্যে উভয়দলের সাক্ষাৎ ঘটে নাই।—যাহাই হউক, শত্রুদমনের সংবাদ বিজয়নগরবাসীরা মধ্যে মধ্যে পাইতেছিল।—একবার বুঝি কোন্ এক সরাইখানায় কোনও দ্বাররক্ষকের সহিত তাঁহার অঙ্গস্পর্শ ঘটে; ফলে, বেচারা কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া সাষ্টাঙ্গাধরণীস্পর্শসুখ লাভ করে,—চকিতের মধ্যে উঠিয়াই কিন্তু সে প্রহরীপুঙ্গব তাঁহার গণ্ডে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক প্রকাণ্ড চপেটাঘাত বসাইয়া দেয়।—অনুযাত্রিবর্গ প্রমাদ গণিয়া ছুটিয়া আসিতে, শত্রুদমন তাদের দিকে ফিরিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"ঠিকই করেছে। এ সামান্য চাকর নয়, এ আমার শিক্ষাগুরু। আজও যদি অভিমান বা গর্ব্ব মনে রাখ্‌ব, তবে এ তীর্থ-যাত্রায় বেরিয়েছি কেন?" —ছিন্নশিরের পরিবর্ত্তে প্রহরীর একটা সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলি লাভ লইল।

এইরূপে আরও কত সংবাদ একে একে বিজয়নগরে আসিতে লাগিল। পার্ব্বতী নিঃশব্দে সব শুনিত,—কোন উত্তর দিত না, বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিত না; শত্রুদমনের যাত্রার দিন হইতেই সে একরূপ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। আপনার শয়নকক্ষে বসিয়া বসিয়া সে স্বামীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রতিদিন স্বহস্তে সযত্নে পরিষ্কার করিত, আর মধ্যে মধ্যে বাতায়নপার্শ্বে বসিয়া সুদূর দিক্চক্রবালের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত; দণ্ডের পর দণ্ড অতিক্রান্ত হইত, অবশেষে অমুক বা সূর্য্যসিংহ আসিয়া তাহার সে মোহ ভঙ্গ করিত।—রমার নেতৃত্বে নগর-বাসিনীরা তাহার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রচার করিয়া আপনাদের অন্তর্দাহে তৃপ্তির প্রলেপ দিতেছিল, তাহাও তাহার কর্ণে

প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে সম্বন্ধে তাহার মনে কোনরূপ ভাবান্তর হয় নাই। রাজা যদিই প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা হইলেও পার্ব্বতীর আর সে সৌভাগ্য ফিরিবে না;—এই ত? এ আর নূতন কথা কি? ক্ষতিই বা তাহাতে কি? নিজের বলিয়া তাহার কি আছে?—মহা-যজ্ঞে সে ত সবই আহুতি দিয়াছে। সে যজ্ঞ পূর্ণ হউক—এই মাত্র তাহার এখন কামনা; আর ত সে কিছু চাহে না।

দিন যায়।—ক্রমে ক্রমে প্রায় ছয়মাস কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ একদিন শত্রুদমনের পথমধ্যে সাংঘাতিক পীড়ার কথা প্রচারিত হইল; তবে ঠিক সংবাদ কেহ দিতে পারিল না; কথাটা নানাভাবে রটিল,—কেহ বলিল—পাহাড়ীদের রাজ্য দিয়ে যাবার সময় তারা বিষ-মাখান তীর ছুড়ে, কেহ বলিল—কোন বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুখে পড়েছেন, কেহ বলিল—'পাহাড়ে' জ্বরে ধরেছে। যাই হউক জনসাধারণে বুঝিল, তিনি সত্যই অসুস্থ; বুঝিয়া, তাহারা উদ্বিগ্ন হইল।

আরও একমাস কাটিলে, বিজয়নগরের এক বৃদ্ধ অধিবাসী তীর্থান্তর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মুখে লোকে শুনিল যে, রাজা পীড়িত হইলেও শিবিকারোহণে যথাসম্ভব দ্রুত কাশী-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার অনুচরবর্গও বিপদাশঙ্কচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। বৃদ্ধকে দেখিয়া শিবিকার গতিরোধ করাইয়া তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনাকে আমি চিনেছি; কিন্তু আমার এ নূতন বেশে আপনি আমায় চিন্‌তে পারেন? পারেন, ভাল; যা হ'ক্ আপনি ত বাড়ী ফির্‌ছেন? আমার কথা প্রজারা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে তাদের বল্‌বেন—'তোদের রাজা আটটা প্রেতের ঘাড়ে চড়ে স্বর্গে যাচ্ছে, দেখে এলাম।'"

পার্ব্বতী এ কথাও শুনিল; আরও গম্ভীরা হইল। স্তব্ধ রজনীর নির্জ্জনতায় তাহার সে আকুল মর্ম্মবেদনা—যাঁহার চরণে গিয়া লুটাইতে থাকিত, একমাত্রই তিনিই বুঝি তাহাকে আশ্বাস দিতেছিলেন।

সংশয়-সন্দেহের অনিশ্চয়তার মধ্যে আরও একমাস কাটিয়া গেল। একদিন অপরাহ্ণে অনুরু আসিয়া পার্ব্বতীকে সংবাদ দিল—"এক সন্ন্যাসী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে চান।"

সন্ন্যাসীর সর্ব্বত্র অব্যাহত গতি। পার্ব্বতী বলিল—"অন্তঃপুরে নিয়ে এস।" তাহার ধমনীস্রোত দ্রুততর প্রবাহিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী?—তিনি কি তীর্থের সংবাদ জানেন?

সন্ন্যাসীকে কক্ষান্তরে বসাইয়া, রাণীকে সে সংবাদ দিয়া, অনুরু পুনরাদেশ প্রতীক্ষায় দূরে—অন্তরালে দণ্ডায়মান রহিল। পার্ব্বতী কক্ষে প্রবেশ করিতেই সন্ন্যাসী তাহার কৃত্রিম শ্মশ্রুজটাজাল উন্মোচন করিয়া বলিল—"মহারাণি, আমি জয়সেন।—যে জন্য ছদ্মবেশে এসেছি, ব'ল্‌ছি।"

"জয়সেন!—রাজা কই? আপনি একা কেন? তাঁর দুর্দ্দিনে তাঁকে পথের মাঝে কোথায় ফেলে এলেন!—কোথায় রাজা, বলুন।"

ধীরে ধীরে জয়সেন উত্তর করিলেন—"আমার বা আপনার সেবার আজ তিনি অতীত। যাত্রীর দল ফির্‌ছে,—আর প্রহর দু'য়ের মধ্যেই তারা সব এসে পড়্‌বে। এ সংবাদ আর সবার আগে আপনারই পাওয়া উচিত, তাই আমি প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আগে চলে এসেছি।—মহারাণি, রাজা আর নেই!"

পার্ব্বতীর মুখমণ্ডল মর্ম্মরপ্রস্তরবৎ কঠিন, পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।—কোন ধ্বনি তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল না, তাহার শুষ্ক চক্ষুতে অশ্রুর সঞ্চার হইল না; শুধু সে ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইয়া আসিল, বক্ষ উদ্বেলিত এবং চক্ষুর দৃষ্টি তীব্র হইয়া উঠিল। যথাসম্ভব সংযতস্বরে সে বলিল—"আমায় সব ঘটনা বলুন।"

জয়সেন সংক্ষেপে সে বৃত্তান্ত আবৃত্তি করিলেন।—কিরূপে সহসা একদিন রাজা পীড়িত হইয়া পড়েন,—বৈদ্যেরা, কিছুদিনের বিশ্রামের পরামর্শ দিয়া, তাঁহাকে সুস্থ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেও, কিরূপে তিনি তাহাদের সকল উপদেশ উপেক্ষা করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন,—অবশেষে কি অবস্থায়, কবে তিনি কাশীধামে পৌঁছান—সে সব কথা জানাইয়া, শেষে বলিলেন—"কি ক'র্‌ব, মহারাণী মা,—নিজের দোষেই তিনি প্রাণ হারালেন! যা ঝোঁক ধর্‌তেন—তাতে ত আর কেউ 'না' বলাতে পারত না।—বিদ্যুৎকে কে বাঁধিতে পারে, বজ্রের গতি কে আট্‌কাতে পারে?"

"তাঁর কাজের ভালমন্দের বিচার করবার আমরা কেউ

"ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ঐ ভেসে আসে ?"
-- ৺দ্বিজেন্দ্রলাল।

চিত্রশিল্পী···শ্রীক্ষীরোদ কুমার রায় ।

(K. V. SEYNE & Bros.)

নই। তিনি আমাদের সবারই প্রভু ছিলেন।—"তার পর ?"

"তার পর কাশীধামে পৌছে, 'একমাস ধরে' বিশ্বেশ্বরের আরাধনা ক'রে,—তিনি যেন নূতন মানুষ হ'য়ে গেলেন। তার পর একদিন আমাকে ব'ল্লেন—'জয়সেন, আমি যে জন্য এসেছিলাম, তা সফল হয়েছে; বিশ্বেশ্বর যেন আমায় কা'ল স্বপ্নে ব'ল্লেন—'তোর সব পাপের ভার আমি নিলাম, তুই মুক্ত; যা',—আর পাপ করিস্ নে, এই মন চিরদিন রাখিস্।' আর কেন তবে জয়সেন? এবার বাড়ী ফিরে চল।' আমি উত্তর দিলাম—'সে জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন মহারাজ? আপনার শরীর এখনও ভাল করে সারে নি, এখন পথের কষ্ট সহ্য হবে না। ফের অসুখে পড়লে তখন আপনাকে বাঁচানো দায় হবে, আরও দিনকতক বিশ্বেশ্বরের সেবা করুন, শরীর সারুক,—তখন ধীরে সুস্থে ফিরলেই হবে।' তাতে রাজা হেসে ব'ল্লেন—'জয়সেন, তুমি বুড়ো হয়েছ, বোঝ না। যার জন্য আমি এ নূতন জীবন পেলাম, যে আমার জন্য রোজ উৎকণ্ঠায় দিন' কাটাচ্ছে, তাকে আর সন্দেহের মধ্যে ফেলে রাখতে পার্‌বো না, তার জন্য মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তুমি ফেরবার উদ্যোগ কর। রাণী আমায় যমরাজার মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে—আমি মর্‌বো না, সে ভয় নেই!'"

একটা অস্ফুট বেদনার ধ্বনি পার্ব্বতীর কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল। জয়সেন নীরব হইলেন। চকিতে আত্মস্থা হইয়া পার্ব্বতী গাঢ় স্বরে প্রশ্ন করিল—"তার পর?"

"তার পর আর কি মহারাণি, সেই যাত্রাই মহাযাত্রা হল। ফেরবার পথে, গয়া থেকে বিশ যোজন দূর এক জায়গায় তাঁর মৃত্যু হল—"বৃদ্ধের সংযম-বাধ আর বাধা মানিল না; উচ্ছ্বসিত বারিরাশি দুকূল প্লাবিয়া তীব্র বেগে ছুটিয়া চলিল—বালকের ন্যায় তিনি ক্রন্দন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তিনি পিশাচই হোন্,—আর মানুষই হোন—ভগবান্ জানেন, তিনি আমার কত প্রিয় ছিলেন।"

দূরে—বহু দূরে—অরণ্যবেষ্টিত নগরোপকণ্ঠ বাতায়নের অবকাশপথে, দৃষ্টি-পথে পড়িতেছিল; আশ্বিনের সংযতোচ্ছ্বাস পরিপূর্ণ 'ঝিল' দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া শয়ান ছিল;—সবই অষ্টবর্ষ-পূর্ব্বের প্রথম প্রণয়ের স্মৃতি পার্ব্বতীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। অনেকক্ষণ পর পার্ব্বতী কথা কহিল, —"এখন তাঁর শিশু পুত্র এ রাজ্যের রাজা। আপনি তার সহায় থাক্‌বেন?"

"মণিপুর-রাজের সভায় ও তাঁর অন্তিম-শয্যায় ত সেই প্রতিজ্ঞাই করেছি।"

"ভাল, তা হলে বিদায়। আর আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে না।"

জয়সেন বিস্ময়চকিতভাবে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তর করিলেন—"সে কি? কোথায় আপনি যাবেন? আপনি রাজ-মাতা, শিশু-রাজাকে ছেড়ে আপনি কোথায় যাবেন?"

পার্ব্বতী ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালিত করিল।—বলিল—"আমি তাঁর দাসীই ছিলাম; রাণীর অধিকার একদিনও তাঁর কাছ থেকে চাই নি।—আজ আমি শিশুর জননী, কিন্তু রাজ-মাতা নই—আমি থাক্‌লে বরং তার অপকারই হবে। আমার ত আলো নিবে গেছে, তবে আর এ শূন্য দেউলে আমাকে বেঁধে রেখে কি লাভ?"

জয়সেন কথাটা বুঝিলেন; বলিলেন—"সমীচীন কথা বটে। আপনার বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করি। ভাল, এখানে না থাকুন, আমার বাড়ীতে চলুন; তাঁর আদরের পাত্রী আপনি—যার সঙ্গে সমান করে চিরদিন শ্রদ্ধায় সম্মানে আপনাকে রাখ্‌ব। আর, সেখানে থেকে, আপনিও আপনার পরামর্শে বিচারবুদ্ধিতে নূতন রাজাকেও সময়ে অনেক সাহায্য ক'র্‌তে পার্‌বেন।"

"তা হয় না জয়সেন! তাতে স্বামীর সম্মানের লাঘব হবে। আপনি ফিরে যান।"

"কিন্তু আপনি এখানে না থাক্‌লে আর কোথায় যাবেন? কথাটা ভেবে দেখুন; কাল সকালে আমি আস্‌ব।"

"আপনার কল্যাণ হোক্" বলিয়া পার্ব্বতী তাঁহাকে বিদায় দিল।

শয়ন কক্ষে, তাহার শিশুপুত্র—নিদ্রা যাইতেছিল; উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কিরণ-রেখা গোধূলি-ললাটে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ করিতেছিল;—নিদ্রিত শিশুর মুখের উপর সে আলোক প্রতিফলিত হইয়া তাহার রহস্যময় ভবিষ্য-জীবনের কথা ব্যক্ত করিতেছিল,—পার্ব্বতীর মাতৃ-হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; একবার সে শিশুকে বক্ষে ধরিয়া চিরজীবনের মত তাহার অরুণ অধরপুটে

জলন্ত গাঢ় শেষ চুম্বন করিবার জন্য সে আকুলিতা হইল। অতি কষ্টে আপনাকে সংযতা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অশ্রুভার নেত্রে সেদিক্ হইতে সে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল। কক্ষগাত্র-বিলম্বী মুকুরে তাহার দেহের রূপ প্রতিফলিত হইতেছিল,—একবার তাহার প্রতি সে চাহিয়া দেখিল; তারপর একে একে অঙ্গের বহুমূল্য বসনভূষণ উন্মোচিত করিতে লাগিল।—কর্ণের কুণ্ডল,বক্ষের দোদুল্যমান মোতির হার, বাহুর কেয়ুর, অঙ্গুলির হীরকাঙ্গুরীয়ক—একে একে স্তূপীকৃত হইতে লাগিল; উন্মুক্ত কেশদাম হইতে স্বর্ণ-হীরক-জাল বিশ্রস্ত হইয়া পড়িল; স্বর্ণসূত্র-গ্রথিত বক্ষের কাঁচুলি, এবং সূক্ষ্ম রেশমী নীলাম্বরী সাটী অপগত হইল;—বহুদিনের পরিত্যক্ত এক সিন্দুক হইতে, অষ্টবর্ষ-পূর্ব্বের প্রথম রাজান্তঃ-পুর প্রবেশের সেই বেশ সে বাহির করিল;— একবার তাহার প্রতি চাহিয়া, কি ভাবিল; তার পর, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, সে অষ্টবর্ষ পূর্ব্বের সেই অনাড়ম্বরবেশা কৃষক-কন্যা সাজিল।

একটা আচ্ছাদনী-বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, কোন দিকে না চাহিয়া, পার্ব্বতী অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিল; তখনও রাত্রি হয় নাই, সুতরাং দেউড়ীতে কেহ তাহাকে বাধা দিল না।

ঝিল্লিমুখরিত জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া পার্ব্বতী দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। একদিন সে যে পথ শিবিকারোহণে রাজসম্মানে অতিক্রম করিয়াছে, আজ সেই পথে চলিতে চলিতে বিগত ধবা পার্ব্বতীর চরণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত-ধারা ছুটিতে লাগিল; সহস্র শাস্ত্রী সসম্ভ্রমে যে পথ বাহিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, আজ আর সে পথে জনমানব নাই।—সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই প্রান্তর, সেই ঝিল্লিরব, সেই ঘনকৃষ্ণ বারিরাশির দিগন্ত বিস্তার,—সবই ত তাই আছে;—তবু সে দিনে আর আজিকার এ দিনে কত প্রভেদ!—সে দিন জলে স্থলে যে মোহ-মাধুরী, যে মূর্চ্ছনা ছিল, আজ তাহা কই!

প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পার্ব্বতী গ্রাম-সীমায় পদার্পণ করিল।—অদূরে সেই চির-পরিচিত ইন্দারা;—একটা ভগ্ন কলস পরিত্যক্ত হইয়া পার্শ্বে পতিত ছিল,—পার্ব্বতী সে দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে,—গৃহে গৃহে তুলসীতলে মৃণ্ময় দীপগুলি প্রজ্বলিত হইয়াছে; পথে তখন বড় একটা লোকজন ছিল না,—থাকিলেও, পার্ব্বতী সে সামান্য বেশ দেখিয়া তৎপ্রতি কেহ লক্ষ্য করিল না।—পরিশ্রান্তা দীনা পার্ব্বতী আপন পিতৃগৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল;—একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; তার পর বাহির হইতে শিকল খুলিয়া, কম্পিত পদে ধীরে ধীরে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

সপ্তমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল; এখানে আবর্জ্জনার স্তূপ, ওখানে নির্বাধা-বর্দ্ধিত কণ্টকগুল্ম, তৃণজঙ্গলপূর্ণ প্রাঙ্গণ;—যে শিশু তরুগুলি সমসূত্রভাবে গৃহবেষ্টনী প্রাচীরের পার্শ্বে সে রোপিত করিয়া গিয়াছিল, আজ অষ্টবর্ষ পরে তাহারা শাখাপল্লবযুক্ত সুবৃহৎ বৃক্ষশ্রেণীতে রূপান্তরিত হইয়া প্রাঙ্গণের অন্ধকার গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছিল। পার্ব্বতীর বক্ষ হইতে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস উঠিল, চিন্তা-ভারাক্রান্ত মনে সে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। অগ্নিকুণ্ডে তখনও আগুন ছিল, পার্ব্বতী ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দিল। তার পর প্রদীপ জ্বালিয়া কক্ষের চতুর্দ্দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। পার্ব্বতী বিস্মিতা হইল,—কিছুরই ত পরিবর্ত্তন হয় নাই,—সে যেমন ভাবে যে জিনিস রাখিয়া গিয়াছিল, আজও সবই যেন ঠিক সেই ভাবেই রহিয়াছে। পার্ব্বতী ভাবিতে লাগিল—তবে এ আট বৎসর, এ কি শুধু একটা স্বপ্নের ঘোর? ক্ষণিকের জন্য সে বাহিরে গিয়াছিল মাত্র, তার আবাল্যের গৃহেই সে চিরদিন রহিয়াছে!

পার্ব্বতী উদ্যোগ আয়োজন করিয়া লইয়া, রন্ধন করিতে বসিল। দরিদ্রের শাক অন্ন—দরিদ্র-কন্যার মত করিয়াই সযত্নে রাঁধিল। তার পর, অন্নস্থালীর মুখ আবৃত করিয়া, পাত্রে ব্যঞ্জনাদি সজ্জিত করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, উনানের পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্দ্দেশে গুরু পদক্ষেপ শ্রুত হইল,—পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাদৈকমাত্র কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়াই, রঘুবীর, পার্ব্বতীকে দেখিয়া, অস্ফুটধ্বনি করিয়া সচকিতে পশ্চাতে হটিয়া আসিল।—বহুবর্ষের পুঞ্জীভূত ক্রোধ এবং নিষ্ফল-প্রতিহিংসাসাধনপ্রয়াস তাহার মুখমণ্ডলে একটা ভীষণতার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল; অকালে প্রৌঢ়ত্ব আসিয়া তাহার উপর আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছিল;

গ্রহের নিগ্রহে জীবনটা তাহার কাছে গলগ্রহরূপ হইয়া পড়িয়াছিল।

পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় রঘুবীর নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে পার্ব্বতী মুখ তুলিতে পারিল না,— আনতমুখে, আসন বিছাইয়া, থালিখানি তাহার সম্মুখে রাখিয়া, পূর্ব্বের অভ্যাসমত অদূরে যাইয়া বসিল। মন্ত্রমুগ্ধবৎ রঘুবীর তাহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দীপালোকে কক্ষগাত্রবিলম্বী শাণিত ছুরিকা স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল; রঘুবীর একবার সে ছুরিকা আর একবার পার্ব্বতীর প্রতি চাহিল,—তাহার চক্ষু জলিয়া উঠিল!— কিন্তু মুহূর্ত্তে সে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল। অবশেষে পার্ব্বতীর মুখমণ্ডলে আসিয়া সে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। কতক্ষণ সেইভাবে সে চাহিয়া রহিল;—ক্রমশঃ সে দৃঢ়বদ্ধমুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, সে প্রখর দৃষ্টি মমতাকরুণাপূর্ণ হইয়া উঠিল, মন্ত্রমুগ্ধবৎ ধীরে ধীরে রঘুবীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া আহারে বসিল।

আহারান্তে সহসা রঘুবীর জিজ্ঞাসা করিল—"তোর পিশাচ,—কোথায় সে?"

উচ্ছিষ্ট বাসনাদি ধৌত করিতে করিতে পার্ব্বতী উত্তর দিল—"স্বামী? তীর্থ থেকে ফের্‌বার পথে তাঁর মৃত্যু হয়েছে —এখনও লোকেরা সব জানে নি, দু'এক দণ্ডের মধ্যেই জান্‌বে।"

একটা আকস্মিক তীব্র আনন্দের দীপ্তি, পরিতৃপ্ত ঈর্ষার প্রসাদ রঘুবীরের চক্ষে নৃত্য করিয়া উঠিল। বলিল— "ভাল।—কিন্তু সে ছেলেটা—তার কি হল?"

ধীর সংযত স্বরে পার্ব্বতী উত্তর দিল—"আমার ছেলে নেই। শিশু রাজা এখন প্রাসাদে; কাল তার অভিষেক হবে।"

সহসা বহুদূর হইতে দ্রুত-ধাবিত অশ্বক্ষুরধ্বনি উভয়ের শ্রবণে আসিয়া পশিল; পার্ব্বতী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল;—সে শব্দ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছিল;—আকস্মিক বিপদাশঙ্কায় গ্রামবাসীরা রাজপথে ছুটিয়া আসিতে না আসিতে, সে অশ্বারোহী তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া নক্ষত্রবেগে রাজপ্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইল,—চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল—"রাজা নেই—রাজা নেই, তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে।"

সে শব্দ দূরে মিলাইয়া গেলে রঘুবীর পার্ব্বতীর দিকে ফিরিল।

"কেমন, আমি বলেছিলাম না যে, সে পিশাচের কাছে গেলে, আবার একদিন সর্ব্বস্ব হারিয়ে তোকে পথে লুটোতে হবে? তা হয়েছে ত?—সে আজ নরকে, তুই আজ পথের ধূলোয়;—আমি অনেকদিন এ কথা ভেবে রেখেছি।"

পার্ব্বতী নিঃশব্দে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। রঘুবীরও উত্তরের প্রত্যাশী হইয়া সে প্রশ্ন করে নাই। স্থির পাদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া সে চৌকিখানা সরাইয়া সিন্দুকটা বাহির করিয়া আনিল, তারপর 'ঘুনশী' হইতে চাবিটা লইয়া সিন্দুক খুলিয়া তাহার সঞ্চিত অর্থ বাহির করিয়া, ভাল করিয়া গণিয়া, একটা থলিতে পুরিয়া কোমরে জড়াইয়া লইল।—অকস্মাৎ পার্ব্বতীর সদ্যঃপরিত্যক্ত গাত্রাবরণের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল।—এ জিনিস ত কখনো সে পার্ব্বতীকে দেয় নাই! ক্রোধে তাহার চক্ষুতে স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,—ক্ষিপ্রহস্তে সেটাকে উঠাইয়া লইয়া সজোরে অগ্নিকুণ্ডমুখে নিক্ষেপ করিল;—নিমিষের মধ্যে তাহা, ভস্মীভূত হইয়া গেল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে রঘুবীর বহুদিনের পরিত্যক্ত কৃষ্ণবর্ণ একখণ্ড গাত্রাবাস বাহির করিল, পার্ব্বতী মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চলনেত্রে সে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের প্রতি চাহিয়া দেখিল, তার পর বিনাবাক্য-ব্যয়ে সেটা তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা আপন অঙ্গ আবৃত করিল।

"আমার সঙ্গে আয়"—বলিয়া রঘুবীর কুটীরদ্বারের প্রতি অগ্রসর হইল;—"যে দেশে আমাদের নাম ধাম কেউ জানে না,—যে দেশের লোক আর কখনও এ মুখ দেখেনি—চ,' সেই দেশে চলে যাই।"

নিঃশব্দে, ছায়ার ন্যায়, পার্ব্বতী পিতার অনুগমন করিল।—রাজপথে তখন বিষম জনতা, তুমুল কোলাহল,— 'রাজার মৃত্যুতে গ্রামবাসীরা চকিত, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত; কখন্ যে দুইটি প্রাণী নিঃশব্দে তাহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, তাহা তাহারা লক্ষ্যও করিল না।

বন্যবরাহের ন্যায়, রঘুবীর, স্থিরপাদক্ষেপে সম্মুখদিকেই চলিতেছিল। সহসা রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, দূর রাজপ্রাসাদের বহির্তোরণে বিশালশিখাগ্নি জলিয়া উঠিল,—

বিজয়নগরের প্রতি রাজার মৃত্যুতে সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত; সে আলোকে রাজ-প্রাসাদ আবছায়ার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল,—পার্ব্বতী চলিতে চলিতে ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার প্রতি চাহিতেছিল। সহসা সে যেন দেখিল—সে গগনচুম্বী অগ্নিশিখার শিরোদেশে, ধৃত-দণ্ড, গৈরিকোত্তরীয় বসন, ভস্মানুলিপ্ত সাষ্টাঙ্গ তাহার দেবতা—কোন্ এক অপার্থিব আলোকের মাঝে বসিয়া আছেন,—তাঁহার নয়নে অনন্ত করুণা, অধরে চির আশ্বাসবাণীর কম্পন, মুখে চরমশান্তির ছায়া বিরাজমান!—পার্ব্বতী বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইল; আত্মবিস্মৃতা হইয়া, সমস্ত জীবন মন নয়ন দিয়া আরাধ্যের সে ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল।

চলিতে চলিতে রঘুবীর অকস্মাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল।—তখনও পার্ব্বতী স্থিরভাবে অগ্নিশিখাভিমুখিনী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বজ্রকঠোরকণ্ঠে সে হাঁকিল—"পার্ব্বতী"—প্রান্তরে প্রান্তরে সে স্বর বিকৃতভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। শিহরিয়া, পার্ব্বতী ফিরিল।—"হাঁ ক'রে আবার এখনও কি দেখ্‌ছিলি? ও প্রাসাদের সঙ্গে আর তোর সম্বন্ধ কি?"

পার্ব্বতী কোন উত্তর দিল না। নীরবে পিতার অনুবর্ত্তিনী হইল; পশ্চাতে আর ফিরিয়া চাহিল না।

চলিতে চলিতে রঘুবীর অকস্মাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল।—তখনও পার্ব্বতী স্থিরভাবে অগ্নিশিখাভিমুখিনী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দেখিতে দেখিতে সপ্তমীর চন্দ্র সুদূর পর্ব্বতান্তরালে অস্তগমন করিল,—নক্ষত্রের দীপ্তি ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিল;—রজনীর গাঢ় অন্ধকার সে দু'টি যাত্রীকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।
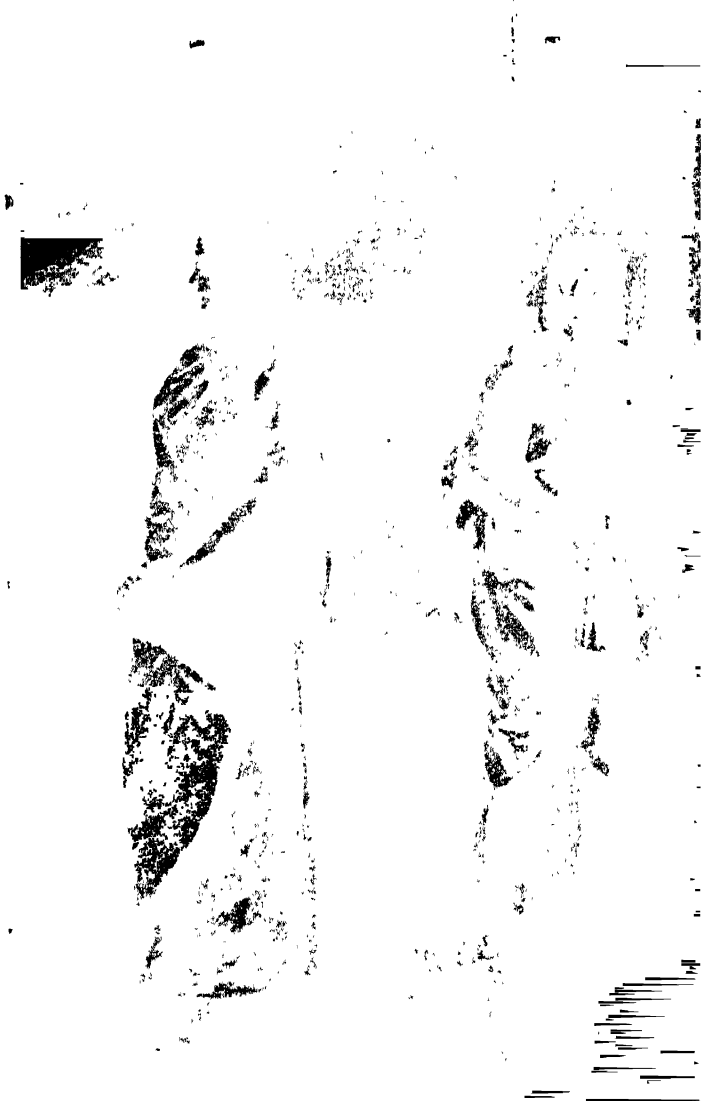
আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ.

মিলান
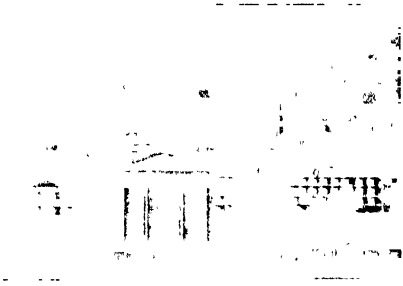
সাধারণ দৃশ্য

ভেনিস ত্যাগ করিয়া ১৭ই মে তারিখে আমরা মিলানে পৌঁছি। মিলান লম্বার্ডি প্রদেশের প্রধান নগর; রাজধানী। এই সহরটি দেখিলে এখন পুরাতনের কোন ভাব মনে উদিত হয় না,—এটি ঠিক যেন একটা একালের নূতন সহর; ইটালীর কোন সহরের সহিতই ইহার বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই।

এতদিন এদেশে আসিয়া, রেলপথে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এ যাবৎ গাড়ীর মধ্যে এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, যাহার কথা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। এবার কিন্তু ভেনিস হইতে মিলানে যাইবার সময়, গাড়ীর মধ্যে একটা সামান্য ঘটনা হইয়াছিল; ব্যাপারটা সামান্য হইলেও লিপিবদ্ধ করিলাম। পথের মধ্যে একটা ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়াছে, আমরা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া ষ্টেশনটি দেখিতেছি। এমন সময়ে ষ্টেশনের বড় কর্ত্তা ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় একটি যাত্রীকে আমাদের গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিতে আসিলেন। আমাদের গাড়ীখানি রিজার্ভ করা ছিল; তাহাতে অন্য কাহারও উঠিবার অধিকার ছিল না; কিন্তু ষ্টেশনমাষ্টার সে কথা না ভাবিয়া যাত্রীটিকে আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিলেন। আমি বলিলাম,—আমার এ গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছে; ইহাতে অন্যের প্রবেশের অধিকার নাই। ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহার হুকুমই বহাল রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তখন একটু কড়া মেজাজে তাঁহার এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, তাঁহার এই বিধিবিরুদ্ধ ব্যবহার আমি সহজে পরিপাক করিব না; এই কথা বলায়, তিনি বোধ হয়, তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং যাত্রীটিকে লইয়া অন্য গাড়ীর উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

আমরা যখন মিলানে পৌঁছিলাম, তখন প্রকৃতি-দেবী আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উল্‌টা আয়োজন করিয়াছিলেন। কোথায় মনে করিয়াছিলাম, প্রকৃতির হাস্যময়ী শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা মিলানে পদার্পণ করিব; তাহা না হইয়া আমাদের মিলানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল। প্রকৃতির এই অপ্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতেই আমরা মিলানে গাড়ী হইতে নামিলাম। তাহার পর মিলানে যে সামান্য সময় ছিলাম, সে সময়ের মধ্যে একবারও সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইলাম না—সুধু বৃষ্টি—আর বৃষ্টি!

তাই বলিয়া মিলান সহরটি যে একেবারে কিছুই নহে, তাহা বলিতে পারিব না। মিলান উত্তর ইটালীর একটি সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যাও কম নহে, প্রায় পাঁচলক্ষের উপর। তবে মিলান জমিটি কিন্তু নূতন; এই রাজধানীর বহু পূর্ব্বে রোমান নাম ছিল, মিডিওলেনাম (Mediolanum) তাহা হইতে ইটালিয়ান নাম হইয়াছে;—মিলানো (Milano); তাহার পর ওকারটাকে ফেলিয়া দিয়া, সোজা নাম হইয়াছে, মিলান। আমার কিন্তু মনে হয়, সেই পূর্ব্ব রোমান নামটা রাখিলেই ভাল হইত; তাহাতে এই সহরের যেন একটা গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হইত; আর মিডিওলেনাম নামটা শুনিতেই বা এমন মন্দ কি?

আমাদের যে হোটেলে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত; সুতরাং ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া অনেকগুলি বড় বড় রাস্তা ও ভজনালয় পার হইয়া আমরা হোটেলে উপস্থিত হইলাম। আমরা অপরাহ্নকালে মিলানে পৌঁছিয়াছিলাম। হোটেলে গিয়া বাসা পাতিয়া বসিবার পর দেখিলাম, তখনও বেলা

আছে। এ সময় টুকু আর বৃথা কাটাই কেন? দেশ দেখিতে আসিয়াছি, অবস্থানের সময়ও অল্প; সুতরাং এই অপরাহ্ণকালেই সহরের খানিকটা দেখিয়া আসা মন্দ কি! এই মনে করিয়া আমরা অল্প একটু বিশ্রাম করিয়াই ভ্রমণে বাহির হইলাম।

আমরা প্রথমেই প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। আমাদের মিলানে পৌছিবার ১৬ দিন পুর্ব্বে ইটালীর রাজা এই প্রদর্শনী প্রথম খুলিয়াছিলেন; সুতরাং এখনও এই প্রদর্শনী পুরাদমে চলিতেছে; এখনও প্রদর্শনীর দ্রব্যজাত অপসারিত হয় নাই। আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, প্রদর্শনীটা আর কত বড়ই হইবে; এই অপরাহ্লেই দেখা শেষ করিয়া ফেলিব। কিন্তু প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা নহে; এই প্রদর্শনীক্ষেত্র অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে; অনেক দেশের অনেক দ্রব্য এথানে প্রদর্শনার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে; সুতরাং সামান্য দুই এক ঘণ্টায়, ইহা দেখা শেষ করা যাইবে না, এবং শেষ করা কর্ত্তব্যও নহে। তাই আমরা প্রদর্শনীর তালিকাপুস্তক দেখিয়া, সে দিনের মত কএকটা বিভাগ দেখিবার ব্যবস্থা করিলাম। যাহা যাহা দেখিলাম, সংক্ষেপে তাহার সামান্য বিবরণ দিতে গেলেও,—একথানি মহাভারত হইয়া পড়ে; সুতরাং সে চেষ্টা আমি করিব না। এক কথায় বলিব যে, সেই দিন অপরাহ্ণকালে এবং পরদিন আমি এই প্রদর্শনী দর্শন করিয়াছিলাম, এবং অনেক ভাল ভাল জিনিস দেখিয়াছিলাম।

মিলান সহরে আমাদের দুইদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই দুই দিনের মধ্যেই যতদূর দেখিতে পারা যায়, দেখিয়া লইতে হইবে। তাই পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই আমরা ডুমো (Dumo) নামক ভজনালয় দেখিতে গেলাম। এই ভজনালয়ের বাহিরের শোভা অতি সুন্দর—ভজনালয়টি ঠিক যেন একখানি ছবি। নানা কারুকার্য্যে শোভিত,—মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত,—এই মন্দিরটি একটি প্রধান দর্শনীয়। কিন্তু এই মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রবেশ-বারান্দাটি একেলে ধরণে নির্ম্মিত বলিয়া মূলমন্দিরের শোভা ও সৌন্দর্য্যের সহিত তাহা মিশ খাইতেছে না, একটু যেন অশোভন দেখাইতেছিল। শুনিলাম, মিলানবাসী সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিগণ মন্দিরের এই ক্রটী দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা সে জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন এবং সত্বরই ঐ ভাগটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মূলমন্দির যে আদর্শে গঠিত, সেই আদর্শ অনুসারে এই ভাগটিও নির্ম্মিত করিবেন। তাহা হইলে মন্দিরটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। এই মন্দিরের মধ্যে সেণ্ট্ বারথলো মিউর (St. Bartholomew) একটি প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। এই মহাপুরুষের শরীরের ত্বক্ ছাড়াইয়া লইয়া ইঁহাকে মৃত্যুকবলে প্রেরণ করা হয়, এ কথা সকলেই জানেন। ত্বক্‌বিহীন দেহের মূর্ত্তিই এই মন্দিরে রহিয়াছে। যে ভাস্কর এই প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। আমি শারীর-বিদ্যায় পারদর্শী নহি; তবুও যে টুকু জানি, দেখিলাম যে, দেহের অস্থি মজ্জা শিরা উপশিরা প্রভৃতি একেবারে নিখুঁতভাবে গঠিত হইয়াছে; যে সমস্ত চিকিৎসক এই বিদ্যায় পারদর্শী তাঁহারা এই মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন এবং ভাস্করের প্রশংসা তাঁহাদের মুখে ধরে নাই। আমার মনে হয়, এই মূর্ত্তিটি এখানে না রাখিয়া কোন মেডিকেল কলেজে রাখিয়া দিলে, শিক্ষার্থীদিগের যথেষ্ট উপকার হয়। এই মন্দিরের মধ্যে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে একটি সমাধি দেখিলাম। এটি সান কারলো বরোমিয়োর (San Carlo Borromeo) সমাধি। তাঁহার দেহটিকে এখানে আরকের সাহায্যে রক্ষা করা হইয়াছে। আমরা রৌপ্যনির্ম্মিত শবাধারের নিকট উপস্থিত হইলে, একজন ধর্ম্মযাজক একটা কলটিপিয়া দিলেন এবং শবাধার উন্মুক্ত হইল। আমরা তাহার মধ্যে দেহটি দেখিতে পাইলাম; দেহটি ঠিক যেমন, তেমনই রহিয়াছে, একটুও বিকৃত হয় নাই।
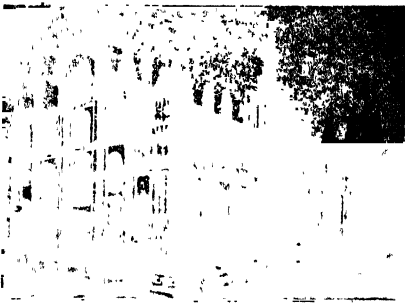
ভজনালয়

তাহার পর আর দুই একটি ভজনালয় দেখিয়া, আমরা সান এমব্রোজিওরা (San Ambrogio) মন্দির দেখিতে
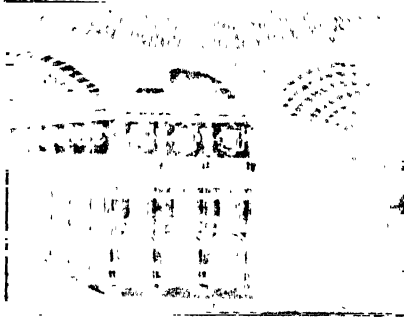
ইমানুয়েল কাস্কেড

গেলাম। এই মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নির্ম্মিত; সুতরাং ইহাকে অতি পুরাতন মন্দির শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য করিতে হইবে। তাহার পরেই আমরা জাতীয় চিত্রশালা (National Gallery) দেখিতে গেলাম। এখানে অসংখ্য উৎকৃষ্ট চিত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। এখানে সেই বিশ্ববিখ্যাত রাফেলের খ্যাতনামা চিত্র "কুমারীর বিবাহ" (Marriage of the Virgin) দেখিলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রথম নেপোলিয়নের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম। এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা কাষ্টেলো ফরজেস্‌কো (Castello Sforzesco) দেখিতে গেলাম। এখানেও অনেক চিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে; এটি যাদুঘর। ইহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক উপকরণ সংগৃহীত রহিয়াছে! আমার সঙ্গী—ডাক্তারবাবু এই প্রকাণ্ড মিউজিয়মের গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হারাইয়া গিয়াছিলেন।—আমরা আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাই না। বাহিরে আসিয়া তাঁহার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম; শেষে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি ইটালীর দুই চারিটি কথা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, পথ হারাইয়া তিনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাহার পর যে প্রহরীর সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহাকেই বলেন—"uscita" "উসিটা"; তাহারা এই অপরূপ মানুষটির অপরূপ প্রশ্ন শুনিয়া যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিয়াছিল এবং শেষে অনেক কষ্টে, অনেক ইশারা ইঙ্গিতের পর তিনি বহিরাগমনের দ্বার পাইয়াছিলেন।

মিলানে পুরাতন আমলের ভগ্নাবশেষ বিশেষ কিছুই নাই; থাকিবার মধ্যে সেকালের একটা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ স্তূপীকৃত হইয়া আছে; তাহার নাম কলোনেড্‌স্ অব্ সান লোরেঞ্জো (Colonnades of San Lorenzo) ইহা রোমান মিনার্ভার মন্দির। প্রাতঃকালে এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই, আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

সান লোরেঞ্জো

অপরাহ্ণকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রথমেই আমরা মিলানের বিখ্যাত সমাধিস্থান দেখিতে গেলাম। ইটালীর মধ্যে মিলানের এই সমাধিস্থান দ্বিতীয় স্থানীয়; এই সমাধিস্থানের উৎকৃষ্ট ভাস্করকীর্ত্তি ও সমাধি-মন্দিরগুলির সৌন্দর্য্য-দর্শনের জন্য বহুস্থান হইতে দর্শকগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। সমাধিস্থানের কথা মনে হইলে হৃদয়ে যে গম্ভীর ও পবিত্র ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক আমি তাহাই ভাবিয়া এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি ব্যথিত হইলাম। ইহা ত সমাধিস্থান নহে, এ যেন একটা সৌন্দর্য্যের হাট; এখানে যেন লোকে তাহাদের ধনগরিমা প্রদর্শন করিবার জন্যই মন্দিরাদি নির্ম্মিত করিয়াছে; ইহার মধ্যে শোকের চিহ্ন ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না—দেখিলাম শুধু, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব; দেখিলাম শুধু, ভাস্করের নৈপুণ্য; দেখিলাম শুধু, মন্দিরের পারিপাট্য। যেখানে আসিলে, প্রাণে শান্তি অনুভূত হইবে; যেখানে আসিলে, মানবের নশ্বরতা মনে করিয়া হৃদয় অবনত হইবে; যেখানে আসিলে, মৃতব্যক্তিগণের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে হইবে, নীরবে দুইবিন্দু অশ্রুমোচন করিতে হইবে; সেখানে এ সকল কি? এই অন্তিম শয্যার পার্শ্বে ধনগরিমা, বংশমর্য্যাদা—আড়াআড়ির ভাব দেদীপ্যমান দেখিলাম। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করি না যে, পিতা মাতা পুত্র কন্যা স্ত্রী ভগিনী

আত্মীয় স্বজনের দেহাবশেষের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে, সকলেই ইচ্ছা করে এবং যাহার অবস্থায় কুলায় সে ভাল করিয়া মন্দিরও নির্ম্মাণ করাইয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে। কিন্তু এখানে যেন তাহা দেখিলাম না। এখানে দেখিলাম, প্রতিযোগিতা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। শোকের লেশমাত্রও এখানে নাই, আছে শুধু, উহার নির্ম্মিত মন্দির হইতে—'আমার নির্ম্মিত মন্দির লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক', তাহারই চেষ্টা, তাহারই জন্য আগ্রহ, তাহারই জন্য অকাতরে অর্থব্যয়। অনেক মন্দিরের উপর নানা ভাবের প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিলাম। কোথাও দেখিলাম, স্বামীর সমাধির পার্শ্বে স্ত্রীর প্রস্তর-মূর্ত্তি রহিয়াছে। স্ত্রী বদনে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন করিতেছেন; কোথাও দেখিলাম, পিতার সমাধির পার্শ্বে শিশুপুত্র মলিনবদনে দাঁড়াইয়া আছে; কোথাও দেখিলাম, পুত্রের সমাধির নিকট নতজানু হইয়া পিতা বা মাতা ক্রন্দন করিতেছেন। ছবিগুলি সুন্দর; কিন্তু তাহা দেখিয়া ত আমার মনে পবিত্র ভাবের উদয় হইল না। মনে হইল, শোকভারাবসন্ন মাতাপিতা ভাই ভগিনী স্ত্রী পুত্র কেমন করিয়া, দিনের পর দিন ভাস্করের সম্মুখে বসিয়া এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণের সহায়তা করিল? ইহার মধ্যে ত শোকের চিহ্ন দেখিলাম না; দেখিলাম, আত্ম-প্রচারের বাসনা। আরও এক কথা; মনে করুন, একটা সমাধিতে দেখিলাম, একটি যুবক সমাধিস্থ হইয়াছেন; তাঁহার পার্শ্বেই তাঁহার যুবতী পত্নী—শোকভারে কাতর হইয়া স্বামীর সমাধির উপর পুষ্পরাশি সাজাইতেছেন। তাহার পর—হয়ত কিছুদিন পরেই সেই যুবতী অন্য একজনের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধা হইলেন এবং তাহার পর তাঁহার পূর্ব্ব-স্বামীর সমাধি-মন্দির দেখিতে আসিলেন। এখন ভাবিয়া দেখুন দেখি, এ চিত্র কেমন বোধ হয়। ইহাকে অভিনয় না বলিয়া আর কি বলিব? মিলানের এই সমাধি-স্থান দেখিয়া আমার মনে ত এই ভাবেরই সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার পর আর এক কথা। এখানে প্রতিদিনই যেন হাট বসিয়া থাকে। লোকে এখানে শোক করিতে আসে না, ছবি দেখিতে আসে; এটা যেন একটা ভাস্কর্য্য-প্রদর্শনী। নানা দেশ হইতে ভাস্করগণ এখানে আসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি দর্শন করে;—কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, তাহার সমালোচনা করে, সৌন্দর্য্য ও ত্রুটীর বিচার করে। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে যাঁহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি কেহ একবারও চিন্তা করিয়া দেখিবার অবকাশ গ্রহণ করিয়া থাকে! এ সৌন্দর্য্যের হাটে, এ শোভার ক্ষেত্রে সমাধির গাম্ভীর্য্য মোটেই দেখিলাম না। আমি সত্য সত্যই নিরাশ হৃদয়ে, এই সমাধিস্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম; অধিকক্ষণ এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। সেদিন আর কোথাও যাইতে ইচ্ছাই হইল না; আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সাতটার সময় আমরা কোমো সহরের সুন্দর হ্রদ এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। রাস্তা বড় কম নহে, প্রায় দুইশত মাইল পথ, সেদিন আমাদিগকে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। আমরা একখানি দ্রুতগামী মোটর লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। এখানে আসিয়া যে দুই দিন ছিলাম, তাহার মধ্যে বৃষ্টি কোন দিনই ছাড়ে নাই। আমরা বৃষ্টির মধ্যেই বাহির হইলাম। প্রথমে আমরা কোমোতে গেলাম; সেখান হইতে ভারেসি হইয়া লাভেনোতে গেলাম; লাভেনোতে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া, মোটর লইয়াই একখানি ষ্টীমারে উঠিলাম। এই ষ্টীমার হ্রদের মধ্যে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে আমাদিগকে ইন্‌ট্রা (Intra) নামক ক্ষুদ্র একটি স্থানে নামাইয়া দিল। এখান হইতে মোটরে চড়িয়া, আমরা হ্রদের তীর দিয়া অনেক দূর ভ্রমণ করিলাম। তাহার পর পালাঞ্জা, বাভেণো, ষ্ট্রেসা, আরোণা প্রভৃতি স্থান দেখিয়া নোভারীর পথে মিলানে ফিরিয়া আসিলাম। এই সকল স্থানে কি কি দেখিলাম, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। কোমোতে দেখিলাম, একটা খুব বড় রেশমের কারখানা;—আর সেখান হইতে হ্রদের অপর পারে দূরবর্ত্তী আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের তুষারময় শৃঙ্গ। লাভেনোতে দেখিলাম, সুন্দর মর্ম্মর-প্রস্তরের শৈল। এই শৈল হইতে মর্ম্মর-প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া ইতালীর অনেক সহরের অট্টালিকার শোভাবর্দ্ধন করা হইয়া থাকে। ষ্ট্রেসা-সহরটি খুব গুল্‌জার স্থান। এখানে নানাস্থান হইতে ভ্রমণকারীরা আসিয়া আড্ডা করিয়া থাকে। হোটেলগুলিও সেই জন্য খুব সুন্দর। প্রাতঃকালে সাতটার সময় মিলান হইতে বাহির হইয়াছিলাম, আর রাত্রি সাতটার পর হোটেলে ফিরিলাম। সারাদিন শুধু ভ্রমণ, কখনও বা

মোটরে, কখনও বাষ্পীমারে, কখনও বা পদব্রজে। ক্লান্ত শরীরে হোটেলে আসিয়া, পদদ্বয়কে সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম প্রদান করিলাম।

এই মিলানই এবারকার মত আমার ইটালীর শেষ সহর-দর্শন। মিলান হইতেই আমি ইটালীর নিকট বিদায়-গ্রহণ করিব। পাঠকগণ, হয় ত এই স্থানে ইটালী সম্বন্ধে আমার মনের ভাব,—যাহাকে ইংরাজীতে Impression বলে, তাহাই শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন। আমি অতি অল্প কথায় ইটালী সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিব। ইটালীর যে কয়টি সহরে গিয়াছি, সেই সহরগুলির রাস্তা প্রায়ই পাকা; কাঁচা রাস্তা অতি কমই দেখিয়াছি; কিন্তু এই সকল পাকা রাস্তার দোষ এই যে, গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দে কাণ যেন ঝালাপালা হইয়া যায়। তাহার পর দেখিলাম, ইটালীর নগর, সহর কেন, সামান্য পল্লীতেও বৈদ্যুতিক আলো ও ট্রামের ব্যবস্থা আছে। ইটালীর গাড়োয়ানেরা অভদ্র নহে; তবে নেপল্‌স সহরের গাড়োয়ানেরা ভাড়ার জন্য ভারি গোলমাল চীৎকার করিয়া থাকে। ইটালীর নরনারী দেখিতে অতি সুন্দর; আমি ত বলিতে পারি, ইটালীর কোন স্থানেই কুৎসিত পুরুষ বা রমণী দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। তাহারা সুস্থ সবলকায়। ভদ্রলোকেরা বেশ ভাল মানুষ; কিন্তু এখানকার ছোটলোকেরা সত্য সত্যই ছোটলোক; তাহাদের অসাধ্য কার্য্য নাই। চুরী ডাকাতি, রাহাজানি এখানে খুব বেশী; কারণ আমার মনে হয়, নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে আলস্যপরায়ণের সংখ্যা একটু অধিক। এখানকার লোকেরা যেমন বন্ধুত্ব করিতে জানে, তেমনই শত্রুতাও করিতে জানে; তাহারা পরম বন্ধুও হইতে পারে, আবার পরম শত্রুও হইতে পারে। ইটালীর লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এখানকার ভূমি খুব উর্ব্বরা। দেশের লোকের অবস্থা খুব উন্নত না হইলেও অনেকেরই স্বচ্ছল অবস্থা। ইটালীর চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য পৃথিবীবিখ্যাত; ইহার তুলনা সভ্য-জগতে মিলিবার উপায় নাই;—এ বিষয়ে ইটালী অদ্বিতীয়। ব্যাধিপীড়া এখানেও আছে।—আর সকলে শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে, ইটালীতেও, আমাদের দেশের মত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব আছে। ম্যালেরিয়া এখন সর্ব্বব্যাপী হইয়াছে। এই স্থানেই আমি ইটালীর কথা শেষ করিলাম; অতঃপর অন্য দেশের কথা বলিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মহ্‌তাব।

নস্যের গান

নস্যের শিশি রাখি দিবানিশি ফিরে দিশি দিশি সঙ্গে মোর;
নাকে ঘন ঘন না ঠাসিলে নয়, প্রাণ আইঢাই, চক্ষু ঘোর।
দুর্ব্বল দেহে বল বেড়ে যায় এক টান যদি নস্য পাই;
নস্যের বাড়া কি আছে আবার—শয়নে স্বপনে নস্য চাই।

কোরাস্—

বিড়ি বার্ডসাই কিছু নাহি চাই, সেবনে সবাই বকাটে কয়;
নস্যের জয় গাও প্রাণ খুলে গাও সঙ্গীত ভারতময়।

সর্দ্দির চোটে সদা ফোঁস্ ফোঁস্ ডাকুক নাসিকা দিবসরাতি;
নস্য টানিয়া টেক্কা মারিয়া ঘুরিব ফিরিব আমোদে মাতি'।
গন্ধা বলিতে গগ্‌গা বেরোয়, ফুলবাস আর পাইনে নাকে;
শঙ্কা করিনা ডঙ্কা মারিব টঙ্কা খরচ হোক্‌না লাখে।

কোরাস্—

নস্যের মত জ্ঞানদাতা আর খুঁজে নাহি পাই ভুবন মাঝে;
এক টান দিলে মাথা খুলে যায় টীকা টীপ্পনী কর্ণে বাজে।
মাইকেল রবি হেম নবীনের সব কথা যেন চক্ষে ভাসে;
স্কট মিল্‌টন বায়রণ শেলী বেড়ে বোঝা যায়—ভয় কি পাশে?

কোরাস্—

টোল পাঠশালা স্কুল কলেজেতে সবাই এখন নস্য টানে;
নস্যের মান হাল ফ্যাসনের আবালবৃদ্ধ সবাই জানে।
নস্য না হ'লে এক পা চলেনা, পেট থেকে প'ড়ে নস্য চাই;
নস্যের তোড়ে দুনিয়াটা ঘোরে, আমি তুমি আর কি ক'ব ভাই!

কোরাস্—

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

প্রেম-বৈচিত্ত্য*

বৈষ্ণব কবির কাব্য বিকশিত পদ্মবৎ মনোহর। পদ্মের বর্ণ-মাধুরী, গন্ধ-সম্পদ্ চিত্তাকর্ষক হইলেও, তাহার হৃদয়-মধ্য-সঞ্চিত একবিন্দু মধুই যেমন মধুকরের ক্ষুৎ-পিপাসা দূর করে, তেমনই বৈষ্ণব মহাজনদিগের রচিত বিচিত্র পদাবলীর মধ্যে প্রেম-বৈচিত্ত্য নামক ক্ষুদ্র অধ্যায়টি ভাবুক জনের সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য। সংখ্যায় ইহা অতিঅল্প হইলেও, ভাবের ঘনতায়, প্রেমের মিষ্টতায়, চিত্তের উন্মাদনায়, অনুরাগের তন্ময়তায় এই সঙ্গীতগুলি এক অপূর্ব্ব সামগ্রী।

পূর্ব্ব সংস্কারবশে, অথবা শ্রবণদর্শনাদি দ্বারা প্রীতি হেতু, শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত-সংলগ্ন হওয়ার নাম রতি। বিঘ্নসত্ত্বেও ঐ রতির হ্রাস না হইলে, উহা প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে চিত্তের সংলগ্নতা যখন কুল, শীল, মান, লজ্জা, ঘৃণাভয় প্রভৃতি বিপুল বিঘ্নের বিপরীত আকর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমবর্দ্ধিত দৃঢ়তা অর্জ্জন করে, অনাদরে অটলতা, সোহাগে পুষ্টতা, বিরহে ব্যাকুলতা এবং মিলনে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, চিত্তের তদানীন্তন অবস্থার নাম সুলীনতা। জন্মজন্মান্তরের বহু পুণ্যফলে ভক্ত-হৃদয় যখন এইরূপে ভগবানের চরণে ক্রমশঃ আকৃষ্ট, লগ্ন এবং লীন হইয়া যায়, পূর্ব্বরাগ, অনুরাগে বিরহ, মিলন সর্ব্বাবস্থার ভিতর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মধুর রসপানে সর্ব্বদা ভরপুর হইয়া থাকে, তখন তাহার অন্তরে যে আত্ম-হারা ভাব উপস্থিত হয়, বৈষ্ণব কবির অপূর্ব্ব সঙ্গীতে তাহাই **প্রেম-বৈচিত্ত্য** নামে গীত হইয়াছে। সে অবস্থায় এক অভূত-পূর্ব্ব ভ্রান্তি, অঘটন-ঘটনপটু চিন্তা, স্বপ্ন সাগরের বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গিমা, বাস্তব-কল্পনার অপূর্ব্ব মিশ্রণ—একে একে লক্ষিত হয়। তখন চিত্তের বিগত-চিত্ততা বা বি-চিত্ততা, বোধ-শক্তির বিহ্বলতা, স্মৃতিতে বিস্মৃতি, মিলনে বিরহ-ব্যথা, বিরহে মিলনানন্দ, দিবসে নিশাভ্রম, রজনীতে দিবা-বুদ্ধি, সুখে দুঃখ, এবং দুঃখে সুখ প্রভৃতি বিবিধ অ-সমঞ্জস অনুভূতির প্রাবল্য ঘটিতে থাকে। কিন্তু এত যে অনুভবে বৈচিত্র্য, চিত্তের বৈচিত্ত্যে তবু সর্ব্বভাবের অভ্যন্তরে সেই এক প্রেমময়ের প্রেমামৃ গূঢ় প্রবাহে সঞ্চিত থাকে। ইহার লক্ষণ-বর্ণনায় ক বলিতেছেন :—

"অঞ্চলে বাঁধিয়া রত্ন চাহি' ফিরে ঘরে।
কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে॥"

* * * *

নিস্তব্ধ রজনী! জ্যোৎস্না-স্নাত কুঞ্জে, চম্পক-শয্যা **প্রেম** যুগলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত।

"শ্যামক কোরে যতনে ধনী শূতল
মদন মদালসে ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন,—
জনু কাঞ্চন-মণি-জোড়॥"

মিলনের এই সুখ দেহ-সর্ব্বস্বের পক্ষে সর্ব্বস্ব হইতে পারে; কিন্তু দেহের অতীত, মনের অগম্য কৃষ্ণ-প্রেমে যিনি উন্মাদিনী, যাঁহার পবিত্র দেহের অণু-পরমাণুও শ্যামসুন্দরের অকৈতব প্রেমে অনুপ্রাণিত, চির-সুন্দরের নির্ম্মল রূপ-রসে রসিত,—জড়দেহের স্থূল মিলনে কি তাঁহার মিলনাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত, একাত্ম-যোগ-সাধন সংসিদ্ধ হইতে পারে? যে মিলনের জন্য শ্রীমতী বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ বোধ করিয়াছেন, কুলে শীলে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, সমাদরে কলঙ্ক-গরল কণ্ঠে ধরিয়াছেন, কণ্ঠালিঙ্গনে তাহার তৃপ্তি কোথায়? বাহু-বন্ধনে তাহার সফলতা কোথায়? তাই—

"কোর হি শ্যাম,—চমকি' ধনী বোলত—
'কব মোহে মীলব কান?
হৃদয়ক তাপ কবহুঁ মধু মীট্টব,
অমিয়া করব সিনান?

---

* ১৩২০ সালের চৈত্রমাসে কলিকাতায় অধিষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের সাহিত্য-শাখায় পঠিত।

সো মুখ-মাধুরী,　　বঙ্ক নেহারন

সোঙারি সোঙারি মন ঝূর।

সো তনু-সরস-　　পরশ কব পাওব?

তব হি মনোরথ পুর।"

সে কেমন কানু—যাহার অঙ্কে শয়ন করিয়াও মনে হয় কানু মিলল না? সে কেমন তনু—যাহার শিরীশ-পেলব চন্দ্র-চন্দন-শীতল স্পর্শ-নদীতে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইলেও হৃদয়ের তাপ নিবারিত হয় না? অগাধ সিন্ধুর অমৃত-নীরে অনন্ত কাল ধরিয়া অবগাহন করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে? সে কেমন প্রেম—যাহার কুহকে দেহ সত্ত্বেও দেহ-বুদ্ধি বিসর্জ্জিত হয়, ধৃতি সত্ত্বেও বিষয়ের ধারণা বি-শৃঙ্খল বিগলিত হইয়া যায়?

বৃন্ত যখন শিথিল হইয়া পড়ে, পুষ্প তখন শাখা চ্যুত হয়। আসক্তি যখন রস-পরিপাকে-শুষ্ক হইয়া পড়ে, প্রেম তখন আর দেহে নিবদ্ধ থাকে না। বাহ্য বিষয়ের সার-ভূত রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ হইতে, ধীরে ধীরে ভক্তের বা যোগীর মন বিশ্লিষ্ট হইয়া, প্রেম-সাধনায় বা জ্ঞান-যোগে এক সনাতন বস্তুতে যখন লীন হইতে থাকে, তখন দেখিতে দেখিতে দেহ-বুদ্ধি ক্ষীণ ক্ষীণতর হইয়া যায়, চিত্ত অপূর্ব্ব দৃষ্টি পাইয়া অলৌকিক দর্শনে অভ্যস্ত হয়। তখন, যে স্থূল দেহের মিলনাকাঙ্ক্ষা সূক্ষ্ম মানস-মিলনাশায় পরিণত হইয়াছিল, তাহাও দেখিতে দেখিতে ধ্যান-গম্য সু-লীনতায় পর্য্যবসিত হইয়া যায়, আনন্দ-সাগরের নিঃশব্দ গম্ভীরতায় নিহিত হইয়া যায়। কবি বুঝি নিম্ন শ্লোকে তাহারই আভাষ দিতেছেন:—

"এত কহি' সুন্দরী　　দীঘ নিশাসই,

মূরছন হরল জেয়ান।

আকুল রাই　　শ্যাম পরবোধই,

গোবিন্দদাস পরমাণ॥"

এই রস-সিন্ধুর আর দুইটি তরঙ্গ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

স্বজনি! প্রেমক কহবি বিশেষ।

কামুক কোরে　　কলাবতী কাতর,

কহত—'কানু পরদেশ।' ॥

চাঁদক হেরি　　সূরয করি' ভাখই,

দিন হি রজনী করি মান।

বিলপই, তাপে　　তাপাওত অন্তর

পিয়ার বিরহ করি ভাণ॥

'কব আওব হরি'　　হরি সঙে পুছই

হসই, রোই খেণে ভোরি।

সো গুণ গাই　　শাস খেণে বাঢ়ই,

থণহি থণহি তনুমোড়ি॥" (বল্লভদাস।)

অন্যত্র:—

"নাগর সঙ্গে　　রঙ্গে যব বিলসই

কুঞ্জে শুতল ভুজ-পাশে।

'কানু—কানু' করি'　　রোঅই সুন্দরী

দারুণ বিরহ-হুতাশে॥

এ সখি! আরতি কহনে না যাই।

আঁচলক হেম　　আঁচলে রহু—যৈছন

খোঁজি ফিরত আন ঠাঁই॥"

(গোবিন্দদাস।)

প্রেম-বৈচিত্ত্যের এই অপূর্ব্ব ভাব, কৃষ্ণ-অঙ্কে আলিঙ্গনাবদ্ধা শ্রীরাধিকার এই অভূতপূর্ব্ব বিরহানুভূতি **নবদ্বীপে** এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে এই পবিত্র লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপের কি পরম সৌভাগ্য! নবদ্বীপের কি পুণ্যফল! বৈকুণ্ঠে যাহা কল্পনা, বৃন্দাবনে যাহা স্বপ্ন, নবদ্বীপে তাহা সত্য হইয়াছিল। আদি-পুরুষ এবং আদি-প্রকৃতি, অনাদি চিৎ-স্বরূপ এবং অনন্ত আনন্দ-স্বরূপিণী প্রেমের পূর্ণাদর্শ কৃষ্ণরাধা—হর-গৌরী—এই নবদ্বীপের বক্ষে একাঙ্গ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং একই দেহে অবস্থান করিয়া প্রেম-বৈচিত্ত্যের এই অপূর্ব্ব লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি আর কেহ নহেন, তিনি কলি-কলুষ-ভঞ্জন, একাধারে জ্ঞান ও প্রেমের, চিদানন্দের প্রকট মূর্ত্তি আমাদের **শ্রীগৌরাঙ্গ**। তিনি আপনাকে কৃষ্ণাঙ্কশায়িনী রাধা ভাবিয়া কখনও কৃষ্ণালিঙ্গনের স্পর্শ-সুখে পুলকিত হইয়া উঠিতেছেন, আবার কি জানি কেন স্বীয় অঙ্গের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তথায় কৃষ্ণ নাই ভাবিয়া, কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন! কখনও বা আপনাকে কৃষ্ণ-বোধে, নিজ দেহের গৌরকান্তিদর্শনে শ্রীমতীর স্বর্ণময়ী রূপ-নদীতে অবগাহন করিতেছেন ভাবিয়া, আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেছেন; পরমুহূর্ত্তে চিত্ত, দেহ-স্তরের অতি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া স্থূল শরীরে আর কিশোরীর সূক্ষ্ম মানসী মূর্ত্তির দর্শন পাইতেছে না, এবং অদর্শন-জনিত দারুণ দুঃখে নেত্রদ্বয় অবিরল অশ্রুমোচন করিতেছেন।

"হরি! হরি! গোরা কেন কান্দে?

নিজ সহচরগণ পুছই কারণ,
হেরই গোরামুখ-চান্দে॥

অরুণ লোচন প্রেম ভরে ভেল দুন,
ঝর ঝর ঝরে প্রেম-বারি।

যৈছন শীথিল গাঁথল মতি-ফল
খসি' পড়ে উপরি উপরি॥

সোঙরি বৃন্দাবন নিশসই পুন পুন
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।

দুই হাত বুকে ধরি' 'রাই—রাই' করি'
ধরণী পড়ল মুরছিয়া॥

তাঁহি প্রিয় গদাধর ধরিয়া করল কোর,
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া

পুন অট্ট অট্ট হাসে, জগজন-মন তোষে,—
বাসুদেব মরমে ঝুরিয়া॥"

প্রেম-বৈচিত্ত্যের এই বিচিত্র লীলা জগতের এক অপূর্ব বস্তু। কৃষ্ণ-প্রীতি ইহার ভিত্তি, চিত্তের একাগ্রতা ইহার মূল, হৃদয়ের দ্রবভাব ইহার রস, দেহদ্বয়ের একীভাব ইহার কাণ্ড, সুখে দুঃখানুভব এবং দুঃখে সুখানুভব ইহার কিশলয়, দেহ বুদ্ধির বিসর্জ্জন ইহার পুষ্প, এবং দেহমনের অতীত বাহ্যজ্ঞান লোপী মহা-ভাব-সমাধি ইহার সুপক্ক ফল। কল্প-বৃক্ষের ফল ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ; এই রস-তরুর ফল—**আনন্দ**। স্বয় শ্রীগৌরাঙ্গ জীব-দেহ ধারণ করিয়া যাচিয়া যাচিয়া জনে জনে এই ফল বিতরণ করিতেছেন। কে আছ প্রেমিক! উহ করায়ত্ত করিয়া ধন্য হও!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

বলিদান

বাঙ্গালীর কন্যাদান আজ কাহার অভিশাপে এ দশায় পরিণত,—কে জানে? নিদাঘে, প্রাবৃটে, হেমন্তে—যখন শত শত যন্ত্রে মোহন বাদ্য বাজিয়া উঠে, সুরভি কুসুম-পরিমলে সমীর যখন অবসন্ন, প্রাঙ্গণতলে নূতন জীবনের সূচনায় যখন বরবধূ দণ্ডায়মান, তখন অন্তরালে কন্যার পিতামাতার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায়। বিবাহের সামগ্রীর আয়োজন দেখি, সুসজ্জিত দ্রব্যসম্ভারের সৌন্দর্য্য দেখি, কিন্তু বিরলে কন্যার পিতামাতার অশ্রুসিক্ত নয়ন, বুকভাঙা হাহাকার, কেহ কি দেখিয়া থাকি? বাহিরে কত আলোকমালা, কত বাদ্য, কত হাসি,—কিন্তু বিবাহের আয়োজনে রিক্তসর্ব্বস্ব পিতার মর্ম্মে মর্ম্মে কি নিদারুণ বেদনা! মর্ম্মের সে হাহাকার চাপা দিতেই বুঝি, অত উচ্চকণ্ঠে হুলুধ্বনি ও মেঘমন্দ্রে শঙ্খনিনাদ। উদ্বেলিত শোকোচ্ছ্বাস ঢাকিতেই বুঝি, নিমন্ত্রিতগণের হাস্য পরিহাস, কৌতুক-কলহ।—আমরা যে বাঙ্গালী,—সমাজ যে আমাদের আদর্শ!

আর বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে, যেখানে রবির কিরণ সঙ্কোচে প্রবেশ করে, সেখানে বাঙ্গালীর বধূর জীবন কি সুখের! লাঞ্ছনায়, গঞ্জনায়, পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, আঘাতে আঘাতে, বধূহৃদয় চূর্ণ হইতেছে, তাড়নায়, যাতনায় আত্মহত্যা করিয়া বধূ সকল জ্বালা জুড়াইতেছে।—কেহ বা গৃহ পরিত্যাগিনী উন্মাদিনী।—আমরা যে বাঙ্গালী,—সমাজ যে আমাদের আদর্শ!

নটকবি গিরিশচন্দ্রের তুলিকায় এই বাঙ্গালীর সংসারের চিত্র অমর হইয়াছে। কবিবর!—বাঙ্গালীর দুঃখিনী কন্যার হৃদয়-বেদনা তুমিই বুঝিয়াছ;—বাঙ্গালীর কন্যাদানের বিপদ্ তুমিই অনুভব করিয়াছ! বাঙ্গালী কন্যার পিতার মর্ম্মভেদী করুণ রোদন তোমার প্রাণেই পশিয়াছে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের দুরবস্থা তোমারই হৃদয় দ্রবীভূত করিয়াছে! যে সামাজিক ঘটনা তোমার "বলিদানের" উপাখ্যান, তাহা বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নয়।—প্রতি অক্ষরে প্রতি বর্ণ সত্য।—কিন্তু কবির [illegible] পারে, [illegible]

'বলিদান'-নাটকে, বাঙ্গালীর বিবাহ-প্রথার বিচার। শাস্ত্রে বলে,—বাঙ্গালীর বিবাহ-বন্ধন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রে বলে,—অর্থ লইয়া কন্যা বা পুত্রের বিবাহ দিলে নিরয়গামী হইতে হয়। বাঙ্গালী তন্ত্র, সংহিতা, বেদ, স্মৃতি পাঠ করে, বাঙ্গালী শাস্ত্র মানে বলিয়া দম্ভ করে,—কিন্তু বাঙ্গালী আজ এ কি করিতেছে! চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছে,—অর্থপণে—বিবাহে গৃহে গৃহে সর্ব্বনাশ, চারিদিকে নিরন্ন জনগণের হাহাকার?—তবুও চৈতন্য নাই; এ পৈশাচিক প্রথা তবুও লুপ্ত হয় না!—আমরা যে শাস্ত্রানুসারী হিন্দু,—আমরা যে বাঙ্গালী!

বলিদানের প্রথম উদ্দেশ্য বাঙ্গালীর কন্যার বিবাহে অর্থপণ-দানরূপ ব্যাপারের বীভৎসতা প্রদর্শন। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"এই দোষে সমাজ উৎসন্ন যাচ্ছে, বড় ঘর দেনদার হচ্ছে, গৃহস্থ ফকির-হচ্ছে, বালিকা-হত্যা হচ্ছে, কন্যার জন্ম ঘোর অমঙ্গল বলে গণ্য হচ্ছে—এই কন্যাদায়ে দেশে সর্ব্বনাশ হচ্ছে।......পুত্রের বিবাহ, আসুরিক সন্তান বিক্রয় নয়। পুত্রের পুত্র, বংশের স্তম্ভ, পিণ্ড-অধিকারী। সেই পুত্রের মাতা তার মাতামহের সর্ব্বনাশের হেতু হবে? এ কি সাধারণ পরিতাপের বিষয়! এই কুপ্রথাতে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার সকলই নষ্ট হচ্ছে।"

[চতুর্থ অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

"আমাদের সমাজে কন্যার পিতার এই পরিণাম! ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা! কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা, কোথাও কন্যা পরিত্যক্তা! প্রতি গৃহে দরিদ্রতা! সকলের চক্ষের উপর এই শোচনীয় দৃশ্য গৃহে গৃহে নিত্য বিরাজমান! তথাপি আমরা পুত্রের শুভবিবাহে কন্যার পিতাকে পীড়ন ক'র্‌তে পরাঙ্মুখ হই না। পবিত্র উদ্বাহ আমাদের সমাজের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি—জগতে এক নূতন রহস্য! বাঙ্গালায় কন্যা-সম্প্রদান নয়—বলিদান।"

[পঞ্চম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

[illegible] বলিদানের [illegible]

বলিদানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—বাঙ্গালীর বধূর দুঃখময় জীবন-কাহিনীর পরিচয়-প্রদান। গিরিশচন্দ্র তাঁহার "পূজার তত্ত্ব" নামক গল্পে শ্বশ্রূর গঞ্জনায় বধূর উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বলিদানেও শ্বশ্রূর নিদারুণ অত্যাচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—জোবী ও কিরণময়ী। যখন এই দু'টি রমণীর চরিত্র নাটকে পড়ি, যখন রঙ্গমঞ্চে ইহারই অভিনয় দেখি, তখনই কবির কথায় কাঁদিয়া বলি,—

"পোড়া বে কি বাঙ্‌লা দেশ থেকে উঠ্‌বে না?… মধুসূদন! দুঃখের ভার ব'বার তোমার কি আর কেউ নাই? তাই বাঙ্গালীর মেয়ের মাথায় সব দুঃখ চাপিয়েছ?"

[৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

বলিদানের তৃতীয় উদ্দেশ্য—বাঙ্গালী গৃহস্থপরিবারের শোচনীয় অবস্থা প্রদর্শন। গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের দারুণ কষ্টের কথা গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। নিজে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান,—যৌবনে দারিদ্র্য-পীড়নে বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালী গৃহস্থের কি নিদারুণ যাতনা। তাই তাঁহার সামাজিক নাটকগুলিতে গৃহস্থ পরিবারের এই মর্ম্মভেদী ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"আমার বিবেচনায় কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী। এই পাড়ায় দেখ, চাকরী বাকরী ক'রে আন্‌ছে, নিচ্ছে, খাচ্ছে;—যেই একজন চোক বুজ্‌লো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল। কি খায়, তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা ব'ল্‌বো কি!…আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।"

[প্রফুল্ল, ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

"চারদিকে হাহাকার! চারদিকে হাহাকার! গৃহস্থ-লোক কেন বেঁচে থাকে? 'আমি ভদ্রলোক' বলে কেন ভদ্রয়ানা জাহির করে?"

[বলিদান, ৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, করুণাময়ের পরিণামই বাঙ্গালী গৃহস্থের অবস্থার জীবন্ত নিদর্শন।

এখন দেখা যাক্, গিরিশচন্দ্র এই কন্যাদায় সমস্যার কি মীমাংসা করিয়াছেন।

হিন্দু সমাজে আজকাল সভা করিয়া, এই কন্যাদায়-সমস্যা নিরাকরণের চেষ্টা করা হইয়াছে। কায়স্থেরা এ বিষয়ে অধিকতর উদ্যোগী। কিন্তু সভা করিয়া যে, এ সমস্যা নিরাকরণে বিন্দুমাত্র সাহায্য হইবে না, গিরিশচন্দ্র বলিদানে তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন। বলিদানে তিনি লিখিয়াছেন—

"যাঁরা যাঁরা বক্তৃতা দেন, যাঁরা মেয়ের বেতে খরচ কমাবার সভা করেন, তাঁদের ছেলেটির সঙ্গে মেয়ের বে দিতে চাইলে বলেন, "আমার ছেলের এখন বে দেবার সময় নয়।" ঘটক পাঠিয়ে খুঁজ্‌ছেন, কে দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়্‌বে।"

[প্রথম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

সমাজের সংশোধন-চেষ্টা যে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল, তাহা উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। গিরিশ-চন্দ্র নিজে কন্যাদায়-সমস্যার সমাধান করিতে, নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন।

প্রথম উপায়—উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ না করা। দারিদ্র্যই বাঙ্গালীর এই বিপদের মূল। উপার্জ্জন করিতে না করিতেই বাঙ্গালী বিবাহ করে, তাহাতেই এই সর্ব্ব-নাশ। যদি প্রত্যেক যুবক প্রতিজ্ঞা করে যে, উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করিবে না, তাহা হইলে কন্যাদায়ের বিভীষিকা শীঘ্রই অন্তর্হিত হইয়া যায়। গিরিশচন্দ্র করুণা-ময়ের মুখ দিয়া এই উপদেশ দিয়াছেন—

[তৃতীয় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

"ঘরে ঘরে বংশরক্ষা হচ্ছে! ছেলে না চোদ্দয় পেরুতে বে'র ধূম পড়ছে। কুড়িতে না পা দিয়েই পালে পালে বংশবৃদ্ধি। হাঁ আছে,—আহার নাই, দেহ আছে—বস্ত্র নাই। ঘরে ঘরে কাঙ্গালীর পল্টন। কি সুখের সমাজ!"

[তৃতীয় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

এইবার দ্বিতীয় উপায়ের কথা বলিব, প্রথম উপায়ের কথা শুনিয়া পাঠক বলিতে পারেন, এ ত পরের কথা, এখন উপস্থিত কন্যাদায়গ্রস্তদের উপায় কি? তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র দুইটি প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথম, সমাজের সঙ্কীর্ণতা-দূর।

"মস্ত এক কুসংস্কার যে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থকে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের বাড়ীতেই বিবাহ দিতে হবে। এতেও পাত্রের অনেকটা অভাব হয়েছে, আমাদের ভিতরে উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র যে চারটি কায়স্থ সমাজ আছে, তাদের ভিতর যদি আদান প্রদান করা হয়, তা হ'লে বোধ

হয়, অনেকটা সুবিধা হ'তে পারে।......Physically ও সন্তান ভাল হয়। Fresh blood infused হয়।”

[৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয়, বিবাহ-পণ-গ্রহণ-নিষেধ-ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

“মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁদের জাতের মধ্যে বেশ একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কেন হয় না, কে জানে?”

[৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

তৃতীয় উপায়—উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া গেলে, কন্যাকে অনূঢ়া রাখা। অনেকের নিকট ইহা বড় সাহসের কথা বলিয়া বোধ হইবে। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন;—

“পাত্র না জোটে অবিবাহিতা থাক্‌লেই বা, তাতে কি এলো গেলো?”

যদি কেহ আশঙ্কা করেন, তাহাতে সমাজে অধর্ম্মের স্রোত বহিবে, তাহার উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন—

“যদি পিতামাতা কন্যাকে সুশিক্ষা দেন, সৎকার্য্যে নিযুক্ত রাখেন, যদি আপনার দৃষ্টান্তে দেখান যে, দৈহিক স্পৃহা অনায়াসে বর্জ্জন করা যায়, যদি ছেলেবেলা থেকে রাঙা বর হবে, হেন হবে তেন হবে, এ সব না শোনান, যদি কন্যা বুঝ্‌তে পারে যে, তার পিতামাতা তার জন্যে দৈহিক ভাব পরিত্যাগ করে, বন্ধুভাবে কালযাপন কচ্ছেন, যদি আগে পুত্রের বিবাহ দিয়ে বংশরক্ষার তাড়া না করেন, তা হলে কি, মনে করো দুর্ঘটনা ঘটে? আর যদিও দু' একটা হয়, এমন তো বিধবা কন্যা নিয়ে ঘট্‌ছে, সে দুর্ঘটনা কন্যা বধ হওয়া অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।”

[৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

এই মত স্বামী বিবেকানন্দও প্রকাশ করিয়াছিলেন। [উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ দ্রষ্টব্য]। আমেরিকার মহিলাগণের প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “ভারতের মহিলাগণের অল্পবয়সে বিবাহ দিবার এত আয়োজন কেন? না হয় নাই বিবাহ হইল।” সমাজের সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার কথা, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র প্রভৃতি কায়স্থের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের কথাও বিবেকানন্দ তুলিয়াছেন, Heredityর কথাও বিবেকানন্দের মন্তব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের সেবক বিবেকানন্দের নিকট তর্ক-প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে এই সকলে মতামত দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। শুধু এই খানে নয়, আর একটি স্থলেও “বলিদানে” বিবেকানন্দের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশে দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য বিবেকানন্দ যে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী যুবক-মণ্ডলী দ্বারা আশ্রয় গঠিত করেন, “বলিদানে” বান্ধব-সমিতির কার্য্যকলাপে তাহার প্রতিচ্ছায়া।

বলিদানে প্রধান চরিত্র করুণাময়। কন্যার বিবাহ দিতে বাঙ্গালী গৃহস্থ ভদ্রলোকের কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হয়, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত করুণাময়ের জীবন। এই চরিত্রটি যেরূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, সেইরূপ অতি সুন্দর-রূপে রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র নিজে এ অংশের অভিনয় করিয়াছিলেন। জলমগ্না তনয়ার সন্ধান-প্রাপ্তির সময় গভীর শোক ও উদাস আশ্বস্তভাবের একত্র সমন্বয়, রূপচাঁদের গৃহে টাকা লইবার সময় অর্দ্ধক্ষিপ্তের ন্যায় অবস্থা, আত্মহত্যার উদ্যোগকালীন বিকৃত মস্তিষ্কের ন্যায় ব্যবহার প্রভৃতির অভিনয় অতুলনীয়। দর্শকগণের হৃদয়ে এ ছবি চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

করুণাময় বড় অভিমানী। অভিমান-প্রবণ চরিত্রাঙ্কন গিরিশচন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল। গিরিশচন্দ্র নিজেও বড় অভিমানী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি গল্প শুনিতেছিলেন, “শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম ছাড়িয়া মথুরাপুরী চলিয়া গেলেন।” গিরিশচন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন “আবার আসিলেন?” উত্তর হইল “না।” তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনবারই এক উত্তর। গিরিশচন্দ্র কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন। গিরিশ-চন্দ্র নাটকগুলিতেও বহু অভিমান-প্রবণ চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে করুণাময় প্রধান।

সরস্বতী বলে, “মরি, মরি, বড় দুঃখ পেয়েছ। কারো কথা সইতে পারো না, বড় অভিমানে চলে গিয়েছ।” এই কথাগুলিতেই করুণাময়ের চরিত্রের মূলসূত্র ধরিতে পারা যায়। করুণাময়ের অভিমান পুনঃ পুনঃ আঘাত প্রাপ্ত হইতে লাগিল। প্রথম কন্যার বিবাহে, বিবাহ-সভায় নীচ রমানাথ দালালের গঞ্জনা সহ্য করিতে হইল। এ যন্ত্রণা তাঁহার কতদূর বাজিয়াছিল, তাহা তাঁহার কথাতেই প্রকাশ “এমন অপমান আমার জন্মে হয় নাই।...... অপমানের একশেষ! রমা দালাল সভার মাঝে হাত নেড়ে

জোচ্চর বল্লে। আমি মনিবের একদিন একটা কথা সই নাই ;—পাঁচদোরের কুকুর সে আমায় জোচ্চর বল্লে।" [১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]। এই বিবাহের পরই উপর্য্যুপরি অপমানের সূত্রপাত। জ্যেষ্ঠ জামাতা মাতাল হইয়া উঠিল। দুইটি মেয়ের বিবাহ দিতে চারিদিকে দেনা, পাওনাদারেরা বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছনা করিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ জামাতা ফৌজদারী আসামী হইয়া দাঁড়াইল। জ্যেষ্ঠা কন্যার নামে মিথ্যা অপবাদ রটিল। একমাত্র পুত্র সিগারেট চুরি করিতে গিয়া সিগারেটওয়ালা কর্ত্তৃক প্রহৃত হইল। আফিসে যাইবার পথে বেলিফ্‌ কর্ত্তৃক করুণাময় ধৃত হইল। উপর্য্যুপরি শমন বাহির হওয়ায় চাকরী গেল। মধ্যমা কন্যা জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। শেষে রূপচাঁদের বিদ্রূপে মর্ম্মাহত হইয়া, করুণাময় আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন। তাঁহার জীবনে কি শোক ও বিপদের অবিরাম প্রবাহ! পদে পদে তাঁহার অভিমানে আঘাত—জামাতার দুশ্চরিত্রে, কন্যার মিথ্যা-অপবাদে, পুত্রের দুর্ব্যবহারে, পাওনাদারের তাগাদায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ-প্রায়। যে কখনও একটা কথা সহিতে পারে না, তাহার উপরই অপমানের পর অপমান পুঞ্জীভূত হইল। তাহার উপর শোক,—কন্যার বৈধব্য ও আত্মহত্যা। এত ক্লেশ কার সহ্য হয়? আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরীভূত হৃদয় করুণাময় শেষে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। এই অবস্থাতেই রূপচাঁদের সঙ্গে লেখাপড়া। এই অবস্থাতেই শেষে তাঁহার আত্মহত্যা।

করুণাময়ের চরিত্র ও কথোপকথন অতি স্বাভাবিক। হীন নাট্যকারগণের মত, গিরিশচন্দ্র করুণাময়ের মুখে অস্বাভাবিক শোকোচ্ছ্বাস বা বক্তৃতা দেন নাই। এক একটি ছোট ছোট কথায়, তাঁহার মানবচরিত্রাভিজ্ঞতা ও কবিত্বের পরিচয় সম্পূর্ণরূপে দিয়াছেন। মানসিক বৃত্তির প্রবল বৈলক্ষণ্য, বিরোধী মানসিক ভাব সকলের দ্বন্দ্ব, শোক, ক্ষোভ, নৈরাশ্য, ব্যঙ্গ প্রভৃতির একত্র সম্মিলন করুণাময়ের চরিত্রে উজ্জ্বল। চতুর্থ অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক, পঞ্চম অঙ্ক, ১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৯ম গর্ভাঙ্কে করুণাময়ের মানসিক অবস্থার বর্ণনার তুলনা নাই। কত উদ্ধৃত করিব? একটিমাত্র উদাহরণ দিই।

জলামগ্না হিরণের মৃতদেহ উত্তোলিত হইয়াছে। এতক্ষণে সকলে "হিরণ কোথায়" "হিরণ কোথায়" বলিয়া খুঁজিতেছিল। খিড়কীর পুষ্করিণীর জলে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গেল, পিতার গঞ্জনায়, অভাগিনী আত্মহত্যা করিয়াছিল। করুণাময় সংবাদ পাঠাইলেন, হিরণকে পাওয়া গিয়াছে—কিন্তু কি অবস্থায়! তখন তাঁহার মুখে এই কথা "এই যে খুঁজে পাওয়া গেছে। তাইত' বলি, আমার শান্ত মেয়ে—রাস্তায় যাবে না, লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না। মা-মা অন্ন দিতে পারি নি, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছ! আহা, জল খেয়ে কি শীতল হয়েছ? ওমা, বড় জ্বালা পেয়েছ, বড় জ্বালা পেয়েছ! এখন কি জুড়িয়েছ! ও-মা!" (বসিয়া পড়িলেন) [৪র্থ অঙ্ক, শেষ দৃশ্য]

কন্যাদানের বিবিধ দিক্‌ 'বলিদানে' প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোকের কন্যাদানের প্রথম দৃষ্টান্ত কিরণময়ীর বিবাহ। করুণাময় বাড়ী বন্ধক দিয়া দু'হাজার টাকা কর্জ্জ করিলেন। সে ঋণ আর শোধ হইল না। বিবাহ-সভায় বরপক্ষ আরও তিনশত টাকার দাবী করিয়া বসিল, নহিলে বর উঠাইয়া লইয়া যাইবে। সে টাকা দেওয়া হইল। ফুলশয্যার তত্ত্ব করিতে কিরণময়ীর মাতার অলঙ্কার বন্ধক পড়িল। এই ঋণের উপর করুণাময়ের দ্বিতীয় কন্যা হিরণ্ময়ীর বিবাহের ঋণ। হিরণ্ময়ীর বিবাহ বাঙ্গালীর বিবাহের আর একটা দিক্‌ দেখাইতেছে। হিরণ্ময়ীর স্বামী দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিতেছেন। বয়স হইয়াছে, প্রথম পক্ষের দুই উপযুক্ত পুত্রও বর্ত্তমান, তাই আর অধিক কিছু দাবী করেন নাই। তাহার পরিণামে হিরণময়ী অল্পদিনের মধ্যেই বিধবা হইয়া আশ্রয়হীনা হইল।

ধনাঢ্যের কুরূপ বিকলাঙ্গ পুত্র দুলালচাঁদ টাকার লোভ দেখাইয়া সুন্দরী পত্নী পাইবার চেষ্টা করিতেছে—বাঙ্গালীর বিবাহের এ এক দিক্‌। আবার যথার্থ উদারহৃদয় ধনাঢ্য সন্তান—কিশোর দরিদ্র করুণাময়ের তৃতীয় কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীকে বিবাহ করিতে অগ্রসর—বাঙ্গালীর বিবাহের এও এক দিক্‌। এই শেষোক্তরূপ নিঃস্বার্থ দাম্পত্যবন্ধন আজকাল সমাজ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে বলিয়াই, গিরিশচন্দ্র এ আদর্শ দেখাইয়াছেন। যতদিন না বঙ্গীয় যুবকগণ কিশোরের আদর্শ অনুকরণ করিতে কৃতসংকল্প হইবেন, ততদিন বাঙ্গালার মঙ্গল নাই।

বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বধূর দুর্ব্বহ জীবনের আরম্ভ।

দরিদ্র ঘরের বধূর চিত্র দেখুন, মধ্যবিত্ত ঘরের বধূর চিত্র দেখুন, ধনাঢ্য গৃহের বধূর চিত্রও দেখুন। বলুন, সুখ কোথায়? গিরিশচন্দ্র জোবি, কিরণময়ী ও ভাবিনীর চরিত্রে এই তিন প্রকার বধূজীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রথম দরিদ্রের কন্যা জোবি। "সরকারদের মেয়ে ছেলেবেলায় জবুথবু ছিল ব'লে জোবি বলে।" তাহার বিবাহ হইল। শ্বশুরবাড়ী গেল। তাহার মুখ দেখিয়া তাহার শ্বাশুড়ী ঠোনা মারিল, বরণের সময় কপালে বরণডালা ঠুকিয়াদিল। রক্ত পড়িতে লাগিল—সে দাগ আর মিলাইল না। অনেক কাজ করিতে দিত। পারিত না। হাত ব্যথা করিত। মাথা ঘুরিত। তাই বেড়ির ছাঁকা দিয়াছিল, চুল কাটিয়া দিয়াছিল। অঙ্গে প্রত্যঙ্গে তাহার নিষ্ঠুর প্রহারচিহ্ন। নারীর একমাত্র আশ্রয় স্বামী,—সে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া, জোবিকে পদাঘাত করিত। জোবি পলায়ন করিল। অত্যাচারে উন্মাদিনী হইয়া গেল।

দ্বিতীয় মধ্যবিত্তের কন্যা কিরণময়ী। ফুলশয্যার দিন সে জোবিকে বলিতেছে, "আমায় মেরে ফেল্‌বে। সমস্তদিন ঠোনা মার্‌ছে। খেতে বসেছিলুম, টেনে তুলেছে। বিষম লেগেছিল, মাথায় চড় মেরেছে। ঘুরে পড়েছিলুম।" (১ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক) শ্বাশুড়ী ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল, স্বামী ক্ষীর মুড়কীর বাটি তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র স্বামী মোহিত কিরণময়ীকে লইয়া দুলালচাঁদকে দিতে গেল। কি ঘৃণিত—জঘন্য এই ব্যবহার। কিরণ পলাইল, কিন্তু পাড়ায় তাহার মিথ্যা কলঙ্ক প্রচারিত হইয়া গেল।

তৃতীয় ধনাঢ্যের কন্যা ভাবিনী। গহনাপাতি দিয়া, তত্ত্ব-তাবাস করিয়া ভাবিনীর পিতামাতা তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। ভাবিনী শ্বশুর-বাড়ীতে আটকা পড়ে। বাপের বাড়ীতে তাহাকে আর যাইতে দেওয়া হয় না। "উঠ্‌তে বস্‌তে খোঁটা, চক্ষের জল ফেলে তার দিন যায়।" তত্ত্ব পছন্দ না হইলে ফেরৎ দেয়। অভিমানে ভাবিনী আফিং খাইয়াছিল। বহুকষ্টে তাহার জীবনরক্ষা হয়।

অত্যাচার-পরায়ণা শ্বাশুড়ীর দৃষ্টান্ত মাতঙ্গিনী। এই জীবন্ত চরিত্রটি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিচিত। সঙ্কীর্ণতা, নীচতাপূর্ণ তাহার হৃদয় নিজ স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই দেখে না। বধূকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা, বেহাইকে গালাগালি—তত্ত্ব ফেরৎ দেওয়া প্রভৃতি তাহার কার্য্য। এই একটি চরিত্রে গিরিশচন্দ্র অত্যাচারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই ত বাঙ্গালা দেশে বিবাহের অবস্থা। এখনও যে সমাজ এত আঘাত সহ্য করিয়া বর্ত্তমান আছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহার একমাত্র হেতু পূতচরিত্রা পতিব্রতা রমণীগণের অপূর্ব্ব প্রভাব। জোবি উন্মাদিনী—স্বামি-পরিত্যক্তা, তবু সে তাহার দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর সেবা করিয়া বেড়ায়। স্বামী তাহাকে প্রহার করে, তবু ভিক্ষা করিয়া তাহাকে খাওয়ায়। এ চিত্র বাঙ্গালীর সমাজেই সম্ভব। কিরণময়ী উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র মদ্যপ স্বামীর সেবারতা। নিজহস্তে এই দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর বমন পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। এ চিত্র অন্য কোনও দেশে নাই। এই সাধ্বী আত্মত্যাগশালিনী মহিলাদের পুণ্যপ্রভাবেই আজও বঙ্গসমাজ নিজ অস্তিত্ব রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

বলিদানের অন্যান্য চরিত্রগুলি সকলই স্বাভাবিক ও নাটকের সহায়ক। একটিও অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র নাই। অর্থপিশাচ সার্থকনামা রূপচাঁদ, পাপসহচর রমানাথ ও কালীঘটক, মুকুন্দের দুর্ব্বৃত্ত পুত্রদ্বয়, করুণাময়ের পত্নী সরস্বতী প্রভৃতি সবগুলিই জীবন্ত চরিত্র। বাঙ্গালা ভাষায় শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে 'বলিদান' অন্যতম। ইহার প্রতি চরিত্রই নিপুণভাবে আলোচনার যোগ্য—বিশেষতঃ দুলালচাঁদের অদ্ভুত চরিত্র ও জোবির উপদেশে, তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালা সামাজিক নাটকে অতি সাবধানে সঙ্গীতের অবতারণা করিতে হয়। গান না থাকিলে (অধিকাংশ) বাঙ্গালী পরিতৃপ্ত হন না। গিরিশচন্দ্র তাঁহার সামাজিক নাটকগুলিতে অতি অল্পসংখ্যক গীতই সংযোজিত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর গৃহে সঙ্গীতের প্রাচুর্য্য কিরূপে সম্ভব? অস্বাভাবিক হইবে বলিয়া প্রফুল্ল, মায়াবসান, হারানিধি প্রভৃতি সামাজিক নাটকে অতি অল্পসংখ্যক গীত সংযোজিত হইয়াছে। বলিদানেও জোবির মুখে কতকগুলি মাত্র সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে।

"বঙ্গীয়-নাট্যশালা" নামক গ্রন্থে জোবির এই সঙ্গীত-গুলির উপর তীব্র আক্রমণ করা হইয়াছে। জোবি উন্মাদিনী

সে এরূপ সঙ্গীত গায়িবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? কিন্তু "বঙ্গীয়-নাট্যশালা"-রচয়িতা এ গানগুলিকে যতদূর সম্ভব হেয়, প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত যে, গিরিশচন্দ্রের মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতার সহিত তাঁহার অভিজ্ঞতার তুলনাই হাসির কথা। তিনি বোধহয় জানেন না, জোবি নামে এক পাগলিনী সত্য সত্যই ভাত খাইতে গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিত ও গীত শুনাইত। পাগলিনীর মুখের গানের ভাষা রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বময় সঙ্গীতের ভাষার মত হওয়া সম্ভবপর নয়। সমালোচক যদি তাহার প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি মহাভ্রান্ত। দুই একটি গ্রাম্য শব্দ বা অপভাষা এই সঙ্গীতের মধ্যে থাকিলে তাহা গীতের স্বাভাবিকতা বৃদ্ধি করিয়াছে। গীতগুলি সবই বিবাহ ও বধূজীবন-সংক্রান্ত। জোবি শোচনীয় বিবাহের পরিণামে উন্মাদিনী, তাহার মুখে এ গান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। জোবির "খা লো ক'নে আফিং কিনে" ইত্যাদি গানটি উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু জোবি শাশুড়ীর নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছিল তাহাতে যে শাশুড়ীকে গালি দিবে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সামাজিক নাটকের সমালোচনার সময় স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা প্রথম আবশ্যক। "বঙ্গীয় নাট্যশালা"-প্রণেতা মনে রাখিবেন যে, আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ বা কবিত্বপূর্ণ সঙ্গীত জোবির মুখে শোভা পায় না। নহিলে শত সহস্র শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রচয়িতা গিরিশচন্দ্র অনায়াসেই তাহার মুখে অন্য সঙ্গীত দিতে পারিতেন।

'বলিদান' বাঙ্গালীর বিবাহ-সম্বন্ধীয় নাটক। বাঙ্গালীর বিবাহের সকল দিক্ই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। কন্যার বিবাহ দিতে রিক্তসর্ব্বস্ব পিতার দৃষ্টান্ত, করুণময়; অত্যাচার-পরায়ণা শাশুড়ীর দৃষ্টান্ত, মাতঙ্গিনী; বধূর যন্ত্রণাময় জীবনের সাক্ষী—দরিদ্রের গৃহে জোবি, মধ্যবিত্তের গৃহে কিরণময়ী ও ধনাঢ্য গৃহে, ভাবিনী; উচ্ছৃঙ্খল জামাতার দৃষ্টান্ত, মোহিতমোহন; দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহোদ্যত বরের উদাহরণ, মুকুন্দলাল, বিকলাঙ্গ চরিত্রহীনের বিবাহ-প্রয়াসের উদাহরণ, দুলালচাঁদ ও উদারহৃদয় আদর্শ বর, কিশোর। এমন কি বিবাহের ঘটক, কালীচরণ পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই। বিবাহের সুখের দিক্ও আছে, বধূ-জীবনেরও সুখের দিক্ আছে। কিন্তু সে চিত্র-অঙ্কনে প্রয়োজন কি? সমাজের সংশোধনার্থ বিবাহ ও বধূজীবনের দুঃখের দিক্‌টাই গিরিশচন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কেবল একটি সমুজ্জ্বল উচ্চ আদর্শ দেখাইতে কিশোরের বিবাহ বর্ণনা। এই একটি সুখের বিবাহ ব্যতীত বলিদানের আর সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর সংসারের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার। প্রতি পত্রে, প্রতি পংক্তিতে শোকের উচ্ছ্বাস, উন্মাদিনী জোবির সঙ্গীতেও বিবাহের শোচনীয় দৃশ্য নয়নসম্মুখে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে।

জগতের সর্ব্বত্র উপন্যাস নাটক প্রচারে সমাজের বহু কুপ্রথা সংশোধিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ কি এতই হতভাগ্য যে, কিছুতেই ইহার জনগণের চৈতন্য হইবে না। পিতামাতাকে ভার হইতে মুক্তি দিবার জন্য, আজ কন্যা স্নেহলতা অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব কি কেবল বক্তৃতামঞ্চেই পর্য্যবসিত হইবে? নহিলে শত শতবার রঙ্গালয়ে অভিনীত 'বলিদান' আজও বাঙ্গালীকে জাগাইতে পারিল না কেন? কে বলিতেছে জাগাইবে? কবে?

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

হিমালয়ের ওপারে ও এপারে

সমস্ত জম্বুদ্বীপ (এসিয়াখণ্ড) যদিও একই মহাদেশ বলিয়া অভিহিত, তথাপি হিমালয়ের এপারে এবং ওপারে বিবিধ বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অভ্রভেদী হিমালয় যেমন এসিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে ভারতবর্ষকে একটা ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়াছে, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, সমাজ ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সেই সকল বিষয়ের সেইরূপই একটা অভ্রভেদী ব্যবধান আছে। যদিও জম্বুদ্বীপই জগতের সমস্ত ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান, তথাপি হিমালয়ের এপারে এবং ওপারে ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সামাজিক ও নৈতিক আচার-ব্যবহারেরও পার্থক্য ঘটিয়াছে।

ইহুদী জাতির ঈশ্বর জেহোবা (Javeh) এব্রাহিমের বংশের রক্ষী দেবতা (Guardian Spirit), উক্ত বংশের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি ইব্রাহিমের সন্তানগণের বিশেষ পক্ষপাতী, তিনি বিপদে তাহাদের পরামর্শ-দাতা, তাহাদিগকে শত্রুর ষড়্‌যন্ত্র হইতে রক্ষা করেন এবং তাঁহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদের শত্রু-দমন করেন। ঈশ্বর (God) শব্দ "জেহোবা" শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ কি না বলিতে পারি না। ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থের যে ইংরাজী অনুবাদ আমরা পাঠ করিয়া থাকি, তাহাতে দেখিতে পাই যে, জেহোবা বিশেষভাবে এব্রাহিমের বংশেরই দেবতা।

জেহোবা বলিয়াছেন, "আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঈশ্বর (?) বলিয়া মানিও না।" তিনি সুধু ইহুদী জাতিকে এই আদেশ করিয়াছেন, অথবা সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে এই উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সুমীমাংসা হওয়া সু-কঠিন।

জেহোবা ইহুদী জাতির সর্ব্বময় কর্ত্তা অথবা রাজ-চক্রবর্ত্তী। পঞ্চম জর্জ্জকে ছাড়িয়া আমরা যদি অন্যকে সম্রাট্ বলি, অথবা রাজার উপাধি কিংবা রাজযোগ্য সম্ভ্রম অন্যকে প্রদান করি, তবে যেমন আমাদের প্রাণদণ্ড হয়, সেইরূপ এব্রাহিমের সন্তানগণের মধ্যে কেহ যদি জেহোবাকে ছাড়িয়া অন্যকে ঈশ্বর বলে অথবা জেহোবার প্রাপ্য সম্মান ও উপাধি অন্যকে প্রদান করে, তবে জেহোবা তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন।

জেহোবার আধিপত্য পূর্ব্বে সুধু ইহুদী জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তাহার পরে ইহুদী বংশে সূত্রধরের ঘরে জন্ম-গ্রহণ করিয়া একটি যুবক জেরুজেলেমে এক নবীন ধর্ম্মের প্রচার করিলেন। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া সকলেই বলিতে লাগিল যে, "এ ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণই নূতন তত্ত্ব।" বস্তুতঃ এই নবীন-ধর্ম্ম-প্রচারকের সাধ্য-সাধনার সহিত ইহুদী জাতির সাধ্য-সাধনার কিছুতেই মিশ্ খাইতেছিল না। জল দ্বারা অভিষেক, গুরুদীক্ষা, দীক্ষান্তে স্বর্গরাজ্য দর্শন, পিতাপুত্র পবিত্রাত্মা, একে তিন—তিনে এক এবং পিতা ও পুত্র একই ইত্যাদি তত্ত্বগুলি ইহুদী জাতির নিকট একান্তই নূতন ঠেকিয়াছিল এবং এই জন্য তাহারা তাঁহাকে একটা চোরের সঙ্গে একত্র বিষম যাতনা দিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিল।

এই নবীন-ধর্ম্ম-প্রচারকের ক্রুশারোহণের পরে তাঁহার অনুগত ভক্ত শিষ্যগণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রমাণিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে জাতীয় প্রাচীন-ধর্ম্ম-গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল, কেন না প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত না হইলে কোন নবীন ধর্ম্ম জাতীয় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না।

ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, কালে একজন মেসায়া (Messiah) আসিবেন, এই "মেসায়া" শব্দটি অবতার অথবা পরিত্রাণকর্ত্তা অর্থে গৃহীত হইয়াছিল। এখন এই অবতারকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ভবিষ্যৎ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, নবীন প্রচারকের কার্য্যাবলীর সঙ্গে মিলাইবার চেষ্টা করা হইল; সুতরাং বাধ্য হইয়া নবীন ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থকে সমগ্রভাবে আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লইলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধর্ম্মের জেহোবা নূতন ধর্ম্মের "স্বর্গস্থ পিতা"র আসনে দখল পাইলেন। সেই হইতে "আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিও না" জেহোবার এই রাজাদেশ নব-প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টান রাজ্যে গৃহীত হইল এবং বিদেশে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশ-বাক্য ইহুদী জাতির বাহিরে ইজিপ্ট

ও য়ুরোপে প্রবেশলাভ করিল। যাহারা ইহুদী জাতিকে ঘৃণা করে, বিদ্বেষ করে এবং তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়া সুখী হয়, তাহারাও খৃষ্টকে গ্রহণ করিতে গিয়া ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে এবং জেহোবার দশটি আদেশের মধ্যে "আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিও না", এই আদেশটিকে খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিয়াছে।

নবীন-তর ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানগণ যদিও খৃষ্টকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং যে কারণেই হউক, ইহুদী ধর্ম্ম-গ্রন্থকে মানিয়া লইয়াছেন। মুসলমানগণ এব্রাহিমের বংশকে আদি পুরুষ বলিয়া সম্ভ্রম করেন * এবং মুসা পয়গম্বর ঈশা পয়গম্বর প্রভৃতিকে মান্য করিয়া থাকেন। মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যেও জেহোবার আজ্ঞা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং "আমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিও না" এই আদেশ বাক্য, মুসলমান ধর্ম্মের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশলাভ করিয়াছে। জাতীয়তা বস্তুটি সর্ব্বত্রই প্রাচীনের সহিত নূতনকে সংযুক্ত করিয়া রাখিতে চায়, প্রাচীনের সহিত সম্পর্ক-শূন্য হইলে নবীন শূন্য-লতার ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে।

আমি এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, জেহোবা হইতে সাম্প্রদায়িক ভাব সংক্রামিত হইয়া হিমালয়ের ওপারের ঈশ্বর রাজচক্রবর্ত্তীর মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার নাম করিয়া যদি তুমি অন্যকে সম্বোধন কর, তাঁহার প্রাপ্য বিশেষণগুলির মধ্যে যদি তুমি অন্যকে একটিও প্রদান কর, তাহা হইলে তুমি ভয়ানক শাস্তি পাইবে, এমন কি তিনি তোমাকে অনন্তকালের জন্য অগ্নিকুণ্ডময় নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন।

ইহাতে ফল এই ফলিয়াছে যে, পরধর্ম্ম নষ্ট করাই স্ব-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার এক প্রধান উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাবীর সেনাপতির ইঙ্গিতে অনুগত সৈন্যগণ যেমন মহা বিক্রম প্রকাশ করিয়া, মারমার-রবে বিপক্ষ-দলনে প্রবৃত্ত হয়, হিমালয়ের ওপারের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা সেই রূপে পরধর্ম্ম-দলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যখন কোন সামান্য আহুতি পাইয়া ধর্ম্ম-বিদ্বেষ একবার জ্বলিয়া উঠে, তখন দাবানলের ন্যায় উহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া, দাউ দাউ করিয়া—দিগ্‌বিদিক্ দগ্ধ করিতে থাকে। যে আগুন সাকার উপাসকদিগের বিরুদ্ধে জ্বলিয়াছিল, তাহা সামান্য খুঁটিনাটি মতান্তর লইয়া, ইহুদী ও পার্শি জাতিকে দগ্ধ করিয়া—দুইশত বৎসর ব্যাপী "ক্রুসেড ও জেহাদে"র নামে য়ুরোপ ও এসিয়াকে ভস্মীভূত করিয়াছিল।

একজন ফরাসী ইতিহাস-লেখক লিখিয়াছেন যে, কোন একটি ধর্ম্মযুদ্ধের অবসানে সমর-নিহত শত্রুর মাংস দ্বারা আনন্দভোজ চলিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নামে মানুষ কতদূর নৃশংস হইতে পারে, ইহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

মুসলমানগণ যে আমাদের দেশের দেব-মন্দির ও দেব-বিগ্রহ চূর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতি-পালনই তাহার কারণ এবং জেহোবার আদেশই এই সকল কারণের মূল কারণ। খৃষ্টানগণ যে "হিদেন" বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করেন এবং মুসলমানগণ যে "কাফের" বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহার কারণও জেহোবার আদেশ। আমরা যে সকল বিগ্রহ পূজা করিয়া থাকি, ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমানের মতে উহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুর পূজা,—সুতরাং উহা দর্শন করা অথবা উহাকে দমন না করা, তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য। রাজভক্ত হইয়া রাজ-বিদ্রোহিতার প্রশ্রয় দেওয়া, কখনই ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে।

হিমালয়ের ওপারে ঈশ্বর জেহোবা বলিতেছেন, "আমা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে না,—সেরূপ করিলে তুমি আমার বিদ্রোহী দল-ভুক্ত হইবে এবং আমি তোমাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিব, তোমার আর উদ্ধারের উপায় থাকিবে না। সয়তান আমার বিদ্রোহী, তাহাতে আমাতে চিরবিরোধ চলিতেছে, আমার উপাধি অথবা প্রাপ্য-সম্মান অন্যকে প্রদান করিলে, চিরকালের জন্য তুমি সয়তানের দলভুক্ত হইবে। মনে রাখিও—আমি "Jealous God."

---

* এদেশের মুসলমানগণও অনেকস্থলে এব্রাহিমের বংশীয়গণের নামানুসারে আপনাদের সন্তানগণের নাম-করণ করিয়া থাকেন।

হিমালয়ের এপারের ঈশ্বর বলেন,—"আমি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বত্রই পূর্ণ, এমন কোন স্থান নাই, এমন একটি কুশাগ্র নাই, বালুকাকণা নাই, যেথানে আমি পূর্ণরূপে বিরাজিত নই, সুতরাং তুমি যাহাকে প্রণাম কর, যাহাকে পূজা কর, তাহাই আমি পাইতেছি। আমি ভাব-গ্রাহী, সুতরাং তুমি বাক্য দ্বারা, স্তুতি দ্বারা, সঙ্গীত দ্বারা, মন্ত্র দ্বারা, অথবা পত্রপুষ্প ও ধূপচন্দনের দ্বারা,—যাহা দ্বারা আমার অর্চ্চনা কর, তাহাই আমি গ্রহণ করিতেছি। যাহাকে অবলম্বন করিয়া, যে কোন নাম করিয়া, ঈশ্বর ভাবিয়া অর্চ্চনা কর তাহাই আমি পাইয়া থাকি; কেননা আমি অন্তর্যামী। আমার সম্ভ্রম কিংবা উপাধি কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে আরোপ করিলে আমি অসন্তুষ্ট হই না; কেননা সমস্ত বস্তুই আমাকে অবলম্বন করিয়া আছে এবং আমি সকলের মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি। কাহারও সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা নাই, কেহই আমাকে অপদস্থ বা পদচ্যুত করিতে পারে না; সুতরাং আমার রাগ নাই—হিংসা নাই।

হিমালয়ের ওপারের ধর্ম্ম বলিতেছেন যে, এই যে ক্ষণস্থায়ী মানুষজন্ম, এই জন্মের কর্ম্মফলের উপর তোমার অনন্ত জীবনের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে। যদি আমার অনুগত হও, তবে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, আর যদি না হও, তবে অনন্ত কালের জন্য অনির্ব্বাণ-অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। নরক হইতে উদ্ধারের আর কোনই উপায় নাই।

হিমালয়ের এপারের ধর্ম্ম বলিতেছেন,—"হে মানব, হে জীব, আশ্বস্ত হও। তোমরা কেহই অনন্ত নরকে যাইবে না, অনির্ব্বাণ-অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না, এ জন্মে কিংবা জন্মজন্মান্তরে, ইহকালে কিংবা পরকালে সকলেই পরিত্রাণ পাইবে, সকলেই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইবে। এই জন্মের কএক দিনের কার্য্যাকার্য্যের জন্য কখনই অনন্তকাল ক্লেশভোগ করিবে না। জীবমাত্রই ব্রহ্মময়ীর সন্তান, তিনি কাহাকেও বিনষ্ট করিবেন না"।

বাঙ্গালী কবি গায়িয়াছেন,—

"জীব-জন্মে ভয় কিরে জগদম্বা জননী"।

হিমালয়ের ওপারের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্থূল দ্বৈতবাদই প্রকাশমান্। এই সৃষ্টি যেন একটা প্রকাণ্ড জমিদারী, ঈশ্বর ইহার রাজা। তিনি অসাধারণ শক্তিশালী রাজা বটেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যাধিকার একেবারে নিরঙ্কুশ নহে, সয়তান নামে একজন প্রবল শক্তিশালী সর্ব্বদাই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে, সময় সময় আধিপত্য বিস্তার করিতেও সমর্থ হয়। সেই দুরন্ত বিদ্রোহী, ঈশ্বরের বহু প্রজাকে হস্তগত করিয়া লয়। সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর এবং সৃষ্টি রাজা এবং রাজ্যের ন্যায় সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র বস্তু।

যদিও যীশুখৃষ্ট পিতা ও পুত্রকে এক বলিয়া কিঞ্চিৎ অদ্বৈতবাদের আভাস দিয়াছেন, তথাপি উহা সাধকের ব্যক্তিগত অনুভূত অবস্থা-বিশেষ। সৃষ্টির সহিত উক্ত একতার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। সৃষ্টি স্বতন্ত্র, ঈশ্বর স্বতন্ত্র, কাজেই কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর-জ্ঞানে ভজনা করিলে, কিংবা ঈশ্বরের প্রাপ্য উপাধি প্রদান করিলে, উহা ঈশ্বরের বিদ্রোহিতা হইয়া পড়ে। বাইবেলের ভাষায় উহাকে Blaspheme অর্থাৎ ঈশ্বর-নিন্দা বলে।

হিমালয়ের এপারের ধর্ম্মগ্রন্থের শিক্ষা ও উপদেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উপনিষদে যে বীজ উপ্ত আছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এবং শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে তাহা বিশাল বৃক্ষরূপে ফুলে ফলে পরিশোভিত হইয়াছে। যথাসাধ্য সংক্ষেপে তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব।

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ"। (ঈশোপনিষদ্)

তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন। তিনি এই সমুদয়ের অন্তরে আছেন এবং বাহিরেও আছেন।

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ

প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" (কেনোপনিষৎ)

জ্ঞানিগণ সমস্ত বস্তুতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমর হন।

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব॥ (কঠোপনিষৎ)

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া, দাহ্যবস্তুর রূপভেদে—সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ একই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নানা বস্তু ভেদে—সেই সেই বস্তুর রূপ হইয়াছেন।

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বম্ ঈশঃ।" (শ্বেতাশ্বতর)

ঈশ্বর এই পরস্পর-সংযুক্ত ক্ষর ও অক্ষর, ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমুদয় বিষয় ধারণ করিয়া আছেন।

"যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্‌সু
যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ"। (শ্বেতাশ্বতর)

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি সমুদয় জগতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ
সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে
সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ (শ্বেতাশ্বতর)

সেই পরমেশ্বর সমুদয় মুখ, মস্তক ও গ্রীবাযুক্ত অর্থাৎ সমুদয় মুখ, মস্তক ও গ্রীবা তাঁহারই। তিনিই সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত ও সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং তিনি সর্ব্বগত, শিব (মঙ্গলদাতা)।

ভগবান্ যে সৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছেন, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য, উপনিষদ্ হইতে আরও বহুস্থান উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ করা অনাবশ্যক।

একটা লৌহ গোলার মধ্যে যখন অগ্নি প্রবেশ করে, তখন যেমন গোলা হইতে অগ্নিকে এবং অগ্নি হইতে গোলাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিন্তা করা যায় না;—সেইরূপ তাঁহাকে ছাড়িয়া এই সৃষ্টিকে চিন্তা করাও সাধকের পক্ষে অসম্ভব।

উপনিষদে দুই প্রকার সাধন-প্রণালীর বীজ রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়াদি নিরোধ করিয়া যোগবলে অন্তরে অব্যক্ত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা এবং এই সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্ত-ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা। দ্বিতীয় প্রণালীর সাধন-সঙ্কেত "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই জগতের সমস্ত পদার্থকে ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত বলিয়া ধ্যান কর, ইহাই উপনিষদে ভক্তি-পথের ও সাকার-উপাসনার মূল-মন্ত্র।

এই মূল, গীতায় কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, আজকালকার অনেকেই তাহা জানেন;—কেন না অনেকেই গীতা পড়িয়া থাকেন;—তাই রাশিকৃত শ্লোক তুলিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" এবং
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

এই দুইটি কথায়ই গীতার মত স্পষ্ট বুঝা যায়। উপনিষদে যাহা নিরাকার উপদেশরূপে ছিল, গীতায় তাহা সাকার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি বৃক্ষরূপে, গ্রহরূপে, ছন্দরূপে, অক্ষররূপে, মাসরূপে, ঋতুরূপে, মকররূপে, গরুড়রূপে, পর্ব্বতরূপে, সাগররূপে, ঋষিরূপে, কবিরূপে, অর্জ্জুনরূপে এবং বাসুদেবরূপে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বস্তু ও ভাবরূপে বিরাজিত। সুধু বলা নয়, অর্জ্জুনকে জ্ঞান-নেত্র দান করিয়া—বিশ্বরূপ দেখান হইল। আরও বলা হইল যে, মূঢ় ব্যক্তিরা মনুষ্যরূপধারী আমাকে জানে না। অবশেষে বলা হইল,

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥"

আমি বাসুদেবই যে সর্ব্ব (সমস্ত চরাচর), বহু বহু জন্মের পুণ্যফলে কদাচিৎ কোন জ্ঞানী মহাত্মা তাহা জানিতে পারেন।

উপনিষদে ঈশ্বরের যেরূপ স্বরূপ বর্ণনা আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, ভক্তিপথাবলম্বী সাধক যে অবতারবাদ ও সাকার-উপাসনায় উপস্থিত হইবেন, তাহা একান্তই স্বাভাবিক এবং সেরূপ না হওয়াই অস্বাভাবিক। গীতা এবং ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ উপনিষদেরই বিকাশ। যাঁহারা সুধু মত লইয়া বিচার করেন, তাঁহারা মনে করেন যে, সকল ধর্ম্মগ্রন্থ উপনিষদের বিকার। উপনিষদ্ প্রকাশের পরে সহস্র সহস্র বৎসর হিন্দু কি ব্যর্থ তপস্যা করিয়াছে? হিন্দুর এমন কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, যাহা পাঠ করিয়া মনে হইতে পারে যে, গ্রন্থকার উপনিষদের তত্ত্ব—কি সাধন-প্রণালী জানিতেন না?

ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে, অবতারবাদী সাকার-উপাসক হিন্দু কাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু

সে পুরাণ ও তন্ত্রসমুদ্র আলোড়ন না করিয়া সুধু চণ্ডী হইতে কএকটি স্থান তুলিয়া দিতেছি।

মাটি খড় দড়ি ও রং দিয়া সাধক একখানি মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ধ্যানবলে তাহাতে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কেন না তিনি সর্ব্বগত; এখন কি বলিয়া সেই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির স্তব করিতেছেন, তাহা শুনিবার বিষয়।

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপাত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে
তথা সংহৃতি রূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

তুমিই চরাচর ধারণ করিয়া আছে, জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ, জগতের পালন করিতেছ, এবং জগৎ সংহার করিতেছ। হে জগন্ময়ে, তুমিই সৃষ্টিকালে সৃজ্যবস্তু-স্বরূপা, সৃষ্টিক্রিয়া তোমারই স্বরূপ; পালন ও সংহার বিষয়েও তুমিই যথাক্রমে পাল্য, পালন ও সংহার্য্য এবং সংহার-ক্রিয়া-স্বরূপা।

—"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদবাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"

হে অখিলাত্মিকে (ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা স্বরূপা) এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তই তোমার স্বরূপ,—আবার উহাদের শক্তিও তুমি!

অতএব তোমাকে আমি কি (কি বলিয়া) স্তব করিব?

—"সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতা
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥"

তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের (সর্ব্ব চরাচরের) আধার স্বরূপা—আবার অনন্তজগৎও তোমারই অংশ-স্বরূপ, কিন্তু তোমার অংশভূত জগতের পরিণতি হইলেও তুমি অবিকৃতা, তাই তুমি পরমা আদ্যা-প্রকৃতি, সুতরাং তোমার কখনই উৎপত্তি হয় না। (ত্বমাদ্যা)।

"যা মুক্তি হেতুরবিচিন্ত্য মহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্ম্মুনিভিরস্ত সমস্তদোষৈ-
র্ব্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমাহি দেবি॥

তুমিই মুক্তির কারণ, পরমা বিদ্যা স্বরূপা,—তাই মোক্ষেচ্ছু মুনিগণ রাগ-দ্বেষাদি সমস্ত দোষ পরিহারপূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় এবং ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া তোমাকে চিন্তা করেন। দেবি, তুমি একমাত্র চিন্তাগম্য বস্তু, তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শালিনী তুমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ।

"নমস্তস্যৈ" স্তব অনেকেরই মুখস্থ আছে। তাহাতে প্রতিমাপূজক কি বলিয়াছেন কএকটি কথা শুনুন, সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা (ইত্যাদি)
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

অবশেষে,

"চিতিরূপে যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

যে দেবী ভূত ভৌতিক সমস্ত পদার্থে চেতনারূপে সংস্থিতি করিতেছেন, সেই তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। *

উপনিষদ্, গীতা ও চণ্ডী হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল, সে সকলের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থে যে প্রকারের সাকার-উপাসনা নিষিদ্ধ, হিন্দু কখনই সেরূপ সাকার-উপাসনা করে নাই এবং করে না;—অধিকন্তু হিন্দু কখনই ঈশ্বরের প্রতিযোগী কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী স্বীকার করে নাই। ঈশ্বরের প্রাপ্য পূজা কিংবা তাঁহার উপাধি অন্যকে প্রদান করে নাই এবং একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারই পূজা করে নাই। হিন্দু সমস্ত সৃষ্টিই ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের কোন বস্তুই অন্যকে অর্পণ করে নাই। কি জড়-বস্তু, কি ভাব-বস্তু, সমস্তই ঈশ্বরময়, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মত। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ অসিদ্বারা, মসিদ্বারা, বাক্যদ্বারা, অর্থদ্বারা এতকাল যে হিন্দু-বিগ্রহ ধ্বংস ও হিন্দুধর্ম্ম বিনষ্ট করার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন,

* চণ্ডীর ও উপনিষদের শ্লোকগুলির অনুবাদে আমি যথাক্রমে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি এবং শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয়দ্বয়ের অনুবাদের অনুসরণ করিয়াছি।—লেখক।

সেটি সম্পূর্ণই বুঝিবার ভুলে। আমাদের দেশের সাকার-উপাসনা ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীকে উলঙ্গ দেখিয়া, কেহ যদি তাঁহাকে নেংটা ফকীর স্বজাতি বা সমশ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করে, তবে সেরূপ সিদ্ধান্ত যেমন হাস্যোদ্দীপক হয়, আমাদের সাকার-উপাসনার বহিরাবরণ দেখিয়া, উহাকে অসভ্য জাতির সাকার-উপাসনার সঙ্গে এক শ্রেণীস্থ মনে করাও, সেইরূপই হাস্যোদ্দীপক মীমাংসা। এই ভ্রান্তিতেই হিন্দুর সম্বন্ধে খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে বিষম বিরুদ্ধ ভাব ও ভ্রান্তধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

সচরাচর ত্যাগ অপেক্ষা ভোগের প্রতিই লোকের অধিকতর অনুরাগ জন্মিয়া থাকে ; সেই জন্য ধর্ম্মের মধ্যেও ত্যাগের উপদেশ অপেক্ষা—ভোগের উপদেশই লোকেরা সহজে গ্রহণ করে। "আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিও না" ধর্ম্মশাস্ত্রের এই উপদেশ পালন করিতে গিয়া পরধর্ম্ম-দলনের সঙ্গে সঙ্গে পররাজ্য লুণ্ঠন ও বিধর্ম্মীকে ধ্বংস করা যেমন সহজ কার্য্য, "নরহত্যা করিও না, পরস্বাপহরণ করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, মদ্যপান ও কুসীদগ্রহণ করিও না, কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না, এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে, অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিবে" ইত্যাদি ত্যাগের ধর্ম্ম পালন করা,—সেরূপ সহজ নহে ; অথচ এ সমস্তগুলিও সেই একই ধর্ম্মশাস্ত্রেরই উপদেশ। সকল দেশের লোকেরই এইরূপ স্বভাব। আমাদের দেশেও দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া ধ্যান-ধারণা দ্বারা ভগবতীর পূজা করা অপেক্ষা, শত শত পশুবলি দিয়া নানাপ্রকারের মসলা সংযোগে প্রসাদরূপী মাংস উদরস্থ করার দিকে অধিকাংশ লোকের অনুরাগ অত্যন্ত অধিক। মানবীয় দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে কোনও দেশের লোকই সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না। ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে যদি সেই দুর্ব্বলতার সহায়ক কোন কথা বাছিয়া বাহির করিয়া লওয়া যায়, তবে সোণায় সোহাগা মিলিল। "বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই অত্যুৎকৃষ্ট শ্লোকার্দ্ধ লইয়া "বৈষ্ণব" আখ্যাধারী সম্প্রদায়-বিশেষ "বহুকান্তা" লইয়া চাঁদের হাট মিলাইয়া বসিয়াছে। যিনি প্রৌঢ়া সাধ্বী তপস্বিনী মাধবীর সহিত বাক্য-সম্ভাষণ-জন্য, প্রিয়তম সহচর ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শ্রেণী বিশেষের বৈরাগীগণ "বহুকান্তা" রক্ষা করাই,—ধর্ম্মলাভের পরম-সাধন মনে করিতেছে। ভোগবাসনা অনলের ন্যায়, সে যদি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আপনার মনোমত আহুতি বাছিয়া লইতে পারে, তবে দিগ্‌বিদিক্ দগ্ধ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

একজন সুযোগ্য ইংরাজ লেখক (Mr. H. Filding Hall) ব্রহ্ম দেশের বিবরণ লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, য়ুরোপীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ, পরদেশদলন কিংবা অধিকার করিতে সৈন্যসজ্জা করিলে, পাদ্রী সাহেব আসিয়া জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু যীশুখৃষ্টের "স্বর্গস্থ পিতার" নিকট কথনই সেই প্রার্থনা করা যাইতে পারে না, "জেহোবা" সে প্রার্থনা গ্রহণ করিতে পারেন।

বস্তুতঃ জেহোবার প্রভাব এখনও খৃষ্টান জগতে ভিতরে ভিতরে অনেক কার্য্য করিতেছে। কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞান এবং দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি ও চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে এই গোঁড়ামি অনেকটা কমিয়া যাইতেছে। জর্ম্মাণ, ফরাসী ও ইংরাজ জাতির সংস্কৃত-চর্চ্চাও এই উদারতা প্রসারণের এক বিশেষ কারণ বলিতে হইবে। সংস্কৃতের চর্চ্চা দ্বারা বিদেশীয় সুধিবর্গ বুঝিতে পারিতেছেন যে, পুর্ব্বে তাঁহাদের স্ব-দেশীয়গণ ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ হিন্দুরা "হিদেন" নহেন।

প্রায় হাজার বৎসর হইতে চলিল, মুসলমানগণ এদেশে প্রবেশলাভ করিয়াছেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহারা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা (আকবর প্রভৃতি দুই একজন বাদশা ভিন্ন) করেন নাই, বলিলে অত্যুক্তি হয় না,—মুসলমান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগের অভিজ্ঞতাও অতিশয় শোচনীয়। বিষম ধর্ম্মবিদ্বেষ এতকাল আমাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। এখন সময় উপস্থিত, বাঙ্গালা দেশের মুসলমানগণের মধ্যে অনেক শিক্ষিত যুবক, সুধু যে বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা নহে—অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে সাদরে সংস্কৃত সাহিত্য গ্রহণ করিতেছেন। আশা করি, ইঁহারা কালে বুঝিতে পারিবেন যে, হিন্দুর সাকার-উপাসনা—মুসলমান

ধর্ম্মের বিরোধী নহে,—হিন্দু একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনা করে না।

হিন্দু যে "হিদেন" কিংবা "কাফের" নহে, একথা না বুঝিতে পারায়, এবং হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি কি তাহা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর অজ্ঞাত থাকায়, পৃথিবীর প্রভূত অকল্যাণ হইয়াছে ও হইতেছে। যাহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে অনন্ত নরকের যাত্রী মনে করে, সেই নরকযাত্রী দলের সহিত স্বর্গযাত্রীদিগের হৃদয় মধ্যে একটা সমভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব ;—যদি কোথায়ও হয়, তবে উহা-নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। এইজন্য ক্ষমা, দয়া, মৈত্রী প্রভৃতিও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ভাগ্যে সমপরিমাণে ঘটে না, ইহাতে পৃথিবী সংকীর্ণতার আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে।

হিন্দু সামাজিক হিসাবে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত পান-ভোজন করে না (স্বধর্ম্মীর মধ্যেও সকলের সহিত সকলে করে না); কিন্তু একটি অশিক্ষিত হিন্দুও একথা বিশ্বাস করে না যে, খৃষ্টান কিংবা মুসলমানগণ অনন্তকালের জন্য নরকে যাইবে। সকল শ্রেণীর হিন্দুই জানে যে, সকলেই ইহকালে কি পরকালে, ইহজন্মে কি পরজন্মে—স্বর্গবাসের অধিকারী হইবে, মুক্তিলাভ করিবে। "ঘটে ঘটে নারায়ণ" হিন্দু মাত্রেই ইহা বিশ্বাস করে। এইজন্য জগতের সমস্ত জীবের সহিতই হিন্দুর একটি পরিষ্কার একাত্ম বোধ আছে, এবং সহস্র সামাজিক বন্ধনের মধ্যেও এই একাত্মবোধ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বিধাতার ইচ্ছায় ভারতবর্ষে সর্ব্ব-ধর্ম্মের মহামেলা মিলিয়াছে, নিরর্থক এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই। এখানকার মাটির গুণে—এখনই অনেক হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান গলা ধরাধরি করিয়া চলিতে শিখিয়াছেন। যখন ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্র প্রকৃষ্টরূপে প্রচারিত হইবে, তখনই এই মিলন পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইবে। প্রকৃতির কার্য্য অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়, ব্যস্ত হইয়া কেহ ইহাকে দ্রুততর গতি প্রদান করিতে পারে না। ইংরাজরাজ্য না আসিলে, মুসলমানগণও ভাল করিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন না,—সকলই বিধাতার বিধান।

জগতের সকল ধর্ম্মই যে ধর্ম্ম, এই মহাতত্ত্ব প্রচারের অগ্রদূত হইয়া মহাশক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবক—স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গিয়াছিলেন ;—বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই, সেই সেই দেশের অনেক নরনারী, এই উদার ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া, নবীন জীবন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতক্ষেত্রই এই ধর্ম্মের বিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র। আশা করি, এই ক্ষেত্রেই সমস্ত ধর্ম্মের মিলন হইয়া, সহস্র বিচিত্রতার মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সমতল ক্ষেত্রেই হিমালয়ের এপারের এবং ওপারের ধর্ম্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। মধ্যস্থলে হিমালয়ের ব্যবধান সত্ত্বেও,—যেমন গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ভারতের সমতল ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, সেইরূপ শত বাধা ব্যবধান সত্ত্বেও ভারতক্ষেত্রেই হিমালয়ের এপারের এবং ওপারের মহাসম্মিলন সাধিত হইবে। সেই শুভদিনে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর বাসভূমি এই ভারতবর্ষ হইতেই, সমস্ত পৃথিবীতে নবীন সভ্যতার রপ্তানি হইবে এবং ভগবান্ মনুর এই প্রাচীন বাক্য পুনরায় প্রতিধ্বনিত হইবে যে,—

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য শকাসাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥"

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

দীনের ভিক্ষা

দাও গো যত পার ধূলা ও মাটি ছাই
আঁচলে ভরি লব যতনে ;
রাখ গো রাখ মোরে, ভিখারী দীন ক'রে
লুটায়ে রব শুধু চরণে।

দিও না অহমিকা, ধনে ও যশোমানে,
মিত্র দিও না হে ভগবান্ !
শত্রু দাও মোরে, লইব তার কাছে
বিপদ্ ঘৃণা আর অপমান।

শ্রীমতী জীবনবালা দেবী।

কাঙ্গাল হরিনাথের প্রতি

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

(১)

যুগ যুগান্তরব্যাপী আর্য্যদের স্বর্গীয় সাধনা
ঢাকিয়াছে তমঃ পৃথিবীর ;
সে পবিত্র দীপ্ত প্রভা করিতেছে ম্লান হ'তে ম্লান
তিমিরের উপরে তিমির।
পুণ্য তাই আর্ত্তকণ্ঠে, পাপের প্রবল উৎপীড়নে,
মেগেছিল বিভুপদে সহায় তোমার,
ছাড়ি ধরণীর স্পর্শ—গিয়েছিল সেই আবেদন
অতি ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ-পায়।
তাই বুঝি, ভেদি এই অধর্ম্মের 'স্বচ্ছ অন্ধকার'
দেখা দিলে নব দিবাকর,
আপনার রশ্মিজালে উদ্ভাসিয়া মুক্ত মুক্তিপথ
দীপ্ত করি ভারত-অম্বর।

(২)

সংসারের রথচক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে চলি যায়,
রুদ্ররন্ধ্র, অবিরত-গতি ;
তারি পাশে বসি তুমি করিয়াছ সাধনা তোমার,
হে সাধক প্রশান্তমূরতি!
লোকালয় হ'তে দূরে, সমাহিত শান্ত তপোবনে
যাও নাই, ঋষিবর! অন্বেষণে তাঁর,
পঙ্কিল আবর্ত্তমাঝে বহে যেই ক্ষীণ পূতধারা,
তারি মাঝে পাইয়াছ দর্শন তাঁহার।
আপনার চারিদিকে গড়িয়া দুর্ল্লঙ্ঘ্য আবরণ,
ভোগেরে রাখনি তুমি দূরে,
"সম্মুখে ভোগেরে রাখি, জাগিবে প্রকৃত-পরিত্যাগ
অন্তরের শান্ত অন্তঃপুরে।"

(৩)

দেশের দুর্দ্দশা হেরি জেগেছিল হৃদে হাহাকার,
দূরিতে সে দুঃখদৈন্য-তাপ
করিলে অপূর্ব্ব তপঃ,—স্বার্থহীন কঠোর সাধনা,
তুচ্ছ করি শত মনস্তাপ।
শাক্যসিংহ, শ্রীচৈতন্য যে অনলে করেছিলা হোম,
সে শিখায় জ্বালাইয়া প্রদীপ তোমার,
অন্ধ তিমিরের মাঝে বিস্মৃত, গোপন দেবালয়ে
করেছিলে আরাধনা দেশ-মাতৃকার।
তাই আজ মানবের গাঢ়নিদ্রাবিজড়িত হৃদে
আসিয়াছে শুভ উদ্বোধন,
চলেছে অগণ্যলোক, অনুসরি পদাঙ্ক তোমার,
শুভতীর্থ অনন্ত-সদন।

(৪)

আজ তুমি চলে গেছ বাঙ্গালার 'কাঙ্গাল' সন্তান
বঙ্গমার ক্রোড় খালি করি,
উঠিছে সহস্র কণ্ঠে অশ্রুসিক্ত বন্দন-গীতিকা
পুণ্যময় দেবমূর্ত্তি স্মরি।
আবার আসিবে তুমি যবে ভীম ভৈরব হুঙ্কারে
গর্জ্জিয়া উঠিবে পাপ, হত পুণ্যবল ;
যুগে যুগে নাশি পাপে, বিতরিয়া শুভ বরাভয়
জগতে শিখাবে তুমি সত্য নিরমল।
সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে স্নেহময় পুণ্যহস্ত তব
দেখাইবে মানবেরে পথ,
অনন্ত মঙ্গলালোক, নিখিল জগৎ পূর্ণ করি,
করিবে সাধক, তব পূর্ণ মনোরথ।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত।

গুলিস্তানের মূলানুবাদ

নবম গল্প

আরবদেশের এক রাজা বৃদ্ধ বয়সে পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের কোন আশা ছিল না। এমন সময়ে একজন অশ্বারোহী আসিয়া বলিল :—"মহারাজের জয় হউক! মহারাজের সৌভাগ্যে আমরা সকল দুর্গ জয় করিয়া শত্রুবর্গকে বন্দী করিয়াছি। সেই সকল স্থানের সৈন্য ও প্রজাপুঞ্জ সকলে আপনার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। রাজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন ;—এ সুসংবাদ আমার জন্য নয়—আমার শত্রুদের জন্য অর্থাৎ আমার উত্তরাধিকারীদিগের জন্য।"

কতকাল কাটাইনু হায়! এ জীবনে,
আশা করি এই শত্রু আনিব দমনে ;
সেই আশা শেষে মম হইল পূরণ,
কিন্তু আর তা'তে মম নাহি প্রয়োজন ;
ভবলীলা সব সাঙ্গ হয়েছে আমার,
অতীত জীবন দেহে ফিরিবে না আর।
নিজকরে যম ঢাক করিছে বাদন,
দেহে আর নাহি রবে এ হত জীবন,
হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, সকলে এখন,
পরস্পর সবে করে বিদায়-গ্রহণ।
কৃতান্তের হাতে আজি নাহিক নিস্তার,
বন্ধুগণ! কর মোর দোষের বিচার ;
মূঢ়মতি আমি ছিনু নিতান্ত অজ্ঞান,
আমার দৃষ্টান্তে সবে হও সাবধান।

দশম গল্প

আমি একদিন ডামাস্কাস্ নগরের প্রসিদ্ধ উপাসনা মস্জিদের সংলগ্ন ইয়ায়ার কবরের পার্শ্বে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। সেই সময়ে আরব-দেশের একজন রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই রাজাকে সকলে অবিচারক বলিয়া জানিত। রাজা উপাসনা করিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট সকল অভাব-পূরণের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

ধনী কি নির্ধন সবে মস্‌জিদে ভিক্ষুক,
সকলেই চায় তার বাসনা পূরুক।
ধনীর অভাব কিন্তু পূরাণ না যায়
যত ধন বৃদ্ধি হয় তদধিক চায়।

রাজা তাহার পর আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন ;—"দরবেশগণ স্বভাবতঃ সদাশয় ও সরল, তাঁহাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট সমধিক গ্রাহ্য হয়। আপনি আমার প্রার্থনার সহিত যোগদান করুন, কারণ আমার একজন পরাক্রমশালী শত্রু আছে, যাহাকে আমি বড় ভয় করি।" আমি তাঁহাকে বলিলাম :—"আপনার হতভাগ্য, অসহায় প্রজাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন, তাহা হইলে প্রবল শত্রুর নিকট আর কোন ভয় থাকিবে না।"

বলবীর্য্যহীন জনে দলিলে চরণে,
বিক্রমশালীর পাপ হয় সে কারণে,
বিপন্ন দেখিয়া পরে দয়া নাহি কর,
তোমার বিপদে কেহ তুলিবে না কর।
শুভ কামনায় মন্দ যে করে সাধন,
বৃথা সব চিন্তা তার, সমান স্বপন।
কর্ণে তূলা দিওনা'ক, কর সুবিচার,
তা' না হ'লে শেষে দণ্ড হইবে তোমার।

একই ঈশ্বর সবে করিল সৃজন,
ভ্রাতৃভাবে সব নর বদ্ধ সে কারণ,
এক অঙ্গে ব্যথা যদি লাগে দৈবযোগে,
সর্ব্বাঙ্গ কাতর হয়, সে যন্ত্রণা ভোগে,
পরদুঃখে কভু নাহি হয়েছে ব্যথিত,
তাহাকে মানব বলা না হয় উচিত।

একাদশ গল্প

একজন দরবেশের সকল প্রার্থনা ঈশ্বর পূরণ করিতেন। তিনি একদিন বাগদাদ নগরে উপস্থিত হইলে,

ইরাক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে নিজ সমীপে আনয়ন করিয়া বলিলেন ;—"মহাশয়! আমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।" তিনি বলিলেন ;—"হে ঈশ্বর! ইহার প্রাণনাশ করুন।" বিস্মিত শাসনকর্ত্তা বলিলেন ;—"ঈশ্বরের দোহাই! এ কিরূপ প্রার্থনা ?" উত্তরে তিনি বলিলেন ;—"এই প্রার্থনা আপনার ও যাবতীয় মুসলমানের মঙ্গলের জন্য।" অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শাসনকর্ত্তা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দরবেশ বলিলেন ;—"আপনার মৃত্যু হইলে প্রজাবর্গ আপনার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে ও আপনিও পাপ হইতে রক্ষা পাইবেন।"

পীড়ন করিছ নৃপ! প্রজা বারংবার,
কতকাল এ ব্যবসা চলিবে তোমার ?
কি ফল তোমার রাজ্য করিয়া শাসন ?
পীড়ন অপেক্ষা ভাল তোমার মরণ।

দ্বাদশ গল্প

একজন অত্যাচারী রাজা একদা এক সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"ঈশ্বরারাধনার কোন্ অঙ্গ ভাল ?" সাধু বলিলেন ;—"আপনার পক্ষে মধ্যাহ্নে নিদ্রা যাওয়া ভাল, কারণ সেই সময়টুকু আপনি প্রজা-পীড়ন করিতে পারিবেন না।"

একদিন দ্বিপ্রহরে, দেখিলাম অকাতরে
অত্যাচারী নৃপ সুখে নিদ্রা যায়।
ভাবিলাম মনে মনে, বৃথা এর জাগরণে,
দেশের মঙ্গল—যদি এ ঘুমায়।

ত্রয়োদশ গল্প

একজন রাজা একদিন আমোদপ্রমোদে রাত্রিকে দিন করিয়া, আনন্দে বিভোর হইয়া এই কথা বলিতেছিলেন ;—

এমন সুখের কাল হবে না আমার,
ভাল মন্দ নাহি চিন্তা—ভাবনা কাহার!

বহির্দেশে বস্ত্রবিহীন, শীতার্ত্ত, ভূতলশায়ী এক সাধু এই কথা শুনিয়া বলিলেন ;—

তোমার অভাব নাই তুমি ভাগ্যবান্,
এ জগতে কেহ নাই তোমার সমান ;
তা বলে কি দেখিবে না এই দীনজনে
কি হ'বে ইহার দশা ভাবিবে না মনে ?

এই কথা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হস্তে করিয়া বাতায়ন হইতে বলিলেন ;—"আঁচল পাত"। সাধু বলিলেন ;—"আঁচল কোথায় পাইব ? আমি যে বস্ত্রহীন।" রাজার আরও দয়া হইল ; তিনি মহামূল্য পরিচ্ছদের সহিত সেই সুবর্ণ মুদ্রাগুলি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সাধু সমস্ত মুদ্রা ব্যয় করিয়া পুনরায় সেই স্থলে আসিলেন।

সংসারের কোন ধার রাখে না যে আর,
টাকাকড়ি হাতে কভু থাকে না তাহার,
যেমন না ধরে ধৈর্য্য প্রেমিক হৃদয়,
চালুনির মধ্যে জল যেমন না রয়।

রাজা সাধুর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পারিষদবর্গ সাধুর দুর্দ্দশার কথা রাজাকে জানাইলে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন ও ভ্রূকুটী করিতে লাগিলেন। এই জন্যই বহুদর্শী বিজ্ঞ-জনেরা বলিয়াছেন ;—"নৃপগণের চিত্ত সর্ব্বদা অস্থির, তাঁহাদের সহিত লোকের অতি সাবধানে ব্যবহার করা উচিত, তাঁহাদের অনেক সময় গুরুতর রাজকার্য্যে যায়, সামান্য বিষয়ে মন দিবার অবসর থাকে না ; হয়ত এক সময়ে কেহ অভিবাদন করিলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হ'ন, আবার কখন কেহ কটু কথা বলিলেও তাহাকে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ দান করেন।

ভাব, গতি, না বুঝে যে করে আবেদন,
রাজ-অনুগ্রহ হ'তে বঞ্চিত সে জন,
নাহি যদি পাও পূর্ব্ব হইতে সন্ধান,
বৃথা কহিও না কথা—হারাইবে মান।

রাজা শুনিয়া বলিলেন ;—"এই মূর্খ, অপরিমিত-ব্যয়ী ভিক্ষুকটাকে দূর করিয়া দাও, এ দেখ কত অল্প সময়ে প্রচুর অর্থ নষ্ট করিয়াছে। রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত ধন দরিদ্রের জন্য ইহার মত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ভূতদিগের জন্য নয়।"

যে মূঢ় দিবসে জ্বালে কর্পূরের বাতি,
তৈলহীন দীপ লয়ে সে কাটায় রাতি।

রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী একজন মন্ত্রী বলিলেন ;—"মহারাজ! আমার বিবেচনায় এই সকল লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য সময়ে সময়ে কিছু কিছু দানের ব্যবস্থা করিলে উহারা আর সে দানের অপব্যয় করিতে পারে না! কিন্তু উহাদিগকে এখানে আসিতে না দেওয়া কিংবা উহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়া আপনার মত সদাশয় উদারস্বভাব রাজার উচিত হয় না। একবার বহু অর্থ দান করিয়া এই লোকের আশা বর্দ্ধন করিয়াছেন, সে আশা করিয়া পুনরায় আসিয়াছে, এখন তাহাকে রিক্তহস্তে, বিফলমনোরথ করিয়া প্রত্যাখ্যান করা ভাল নয়।"

আপন ইচ্ছায় খুলি ভাণ্ডারের দ্বার,
করিও না ভিক্ষুকের আশার সঞ্চার।
একবার খুল যদি, হ'ও না কৃপণ,
ফিরে না বিমুখ হ'য়ে যেন ভিক্ষুগণ।
যে খানে তণ্ডুলকণা অনায়াসে পায়,
পক্ষিগণ সেই স্থলে দলে দলে যায়;
যথায় তাহারা কিন্তু না পায় আহার,
কভু নাহি সেই স্থানে যায় একবার।
হ'লেও হিজাজ-যাত্রী তৃষায় আকুল,
নাহি যায় লবণাক্ত সমুদ্রের কূল।
সুমিষ্ট বারির ধারা যথা বহে যায়,
তথা পশু, পক্ষী, নর, পিপীলিকা ধায়।

চতুর্দ্দশ গল্প

পুরাকালে এক রাজা ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিতেন না। সৈন্যগণ বেতনাভাবে বড় কষ্ট পাইত। এমন সময়ে একদল প্রবল শত্রু উপস্থিত হইল। প্রজাপুঞ্জ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

নাহি যদি পায় সেনা সমরে বেতন,
না যায় তাদের অস্ত্রে হাত দিতে মন;
কেমনে সাহস, বল, দেখাবে সমরে,
হাতে অর্থ নাই যার, যে ক্ষুধায় মরে।

এইরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে আমার এক জন বন্ধু ছিল। আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলাম ;—"সামান্য অবস্থান্তর হইয়াছে বলিয়া যাহারা পূর্ব্ব-সৌভাগ্য ভুলিয়া গিয়া পুরাতন প্রভুকে পরিত্যাগ করে, তাহারা কি প্রকার কৃতঘ্ন ও নীচ, তাহা বলা যায় না! সে বলিল ;—"ভাই! ক্ষমা কর, আমি কোন অন্যায় আচরণ করি নাই, আহারাভাবে আমার অশ্ব মৃত-প্রায় হইয়াছিল; পেটের দায়ে আমি জিনটাও বন্ধক দিয়াছিলাম। যে রাজা সৈন্য-দিগকে বেতন দিতে এত কৃপণ, সৈন্যগণ তাহার জন্য কেমন করিয়া প্রাণ সংশয়াপন্ন করিতে পারে?"

সেনাগণে অর্থ দিলে তারা দিবে প্রাণ,
না দিলে সকলে তারা করিবে প্রস্থান।
পেটে অন্ন থাকে যদি করিবে সমর,
রণ হ'তে পলাইবে কাঁদিলে উদর।

পঞ্চদশ গল্প

কোন রাজমন্ত্রী পদচ্যুত হইয়া দরবেশের দলে মিশিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদে তিনি মনে শান্তিলাভ করিলেন। রাজা কিছুদিন পরে মন্ত্রীর প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রী স্বীকার পাইলেন না, বলিলেন ;—"চাকুরি করা অপেক্ষা না করাই ভাল।"

সংসার ছাড়িয়া সদা বিজনে যে রয়,
লোক-নিন্দা হ'তে নাহি তার কোন ভয়।
নিন্দকের হাত থেকে এড়াইতে চাও,
কাগজ, কলম সব দূরে ফেলে দাও।

রাজা বলিলেন ;—"রাজ্যশাসন করিবার জন্য আমার একজন বুদ্ধিমান্ লোকের আবশ্যক"। মন্ত্রী বলিলেন ;—"এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

সে জন্য পক্ষীর মধ্যে হুমাই প্রধান,
হাড় খেয়ে তুষ্ট, নাহি বধে কার প্রাণ।

ষোড়শ গল্প

একটা বন বিড়ালকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কেন সিংহের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। সে বলিল ;—"আমি

সিংহের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করি এবং তাহার আশ্রয়ে থাকি বলিয়া আমার সহিত কেহ শত্রুতা করিতে পারে না।" তাহারা বলিল ;—"যখন তুমি তাহার আশ্রয়ে আছ তখন তুমি তাহার নিকটে যাওনা কেন ?" বিড়াল বলিল ;—পাছে সে ক্রুদ্ধ হয় এই ভয়ে আমি নিকটে যাই না, একটু দূরে থাকি।"

শতবর্ষ জ্বলে অগ্নি যদিও গিবার†
তাহারো পড়িলে তাতে নাহিক নিস্তার।

সুলতান কোন সময়ে যে মন্ত্রীকে সুবর্ণ দান করেন, আবার কোন সময়ে তাহারই মস্তক ছেদন করেন, সেই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন ;—"রাজার মনের অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করা উচিত, কারণ তাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল। হয়ত কোন সময়ে কেহ অভিবাদন করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হ'ন, আবার কখন কেহ কুবাক্য বলিলেও তাহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ পুরস্কার করেন। লোকে সেই জন্য বলে, অমাত্যবর্গের মধ্যে বাক্‌চাতুরী গুণের কথা, কিন্তু পণ্ডিতের পক্ষে তাহা দোষাবহ।

চাটুকারে রসরঙ্গ, করি প্রদর্শন,
আপন মর্য্যাদা-মান করিবে রক্ষণ।

সপ্তদশ গল্প

একদা আমার এক বন্ধু আমার কাছে নিজ অদৃষ্টের বহু নিন্দা করিয়া আমায় বলিলেন ;—"আমার সংস্থান অল্প অথচ পরিবার বৃহৎ, অন্নাভাবে মারা পড়িতে বসিয়াছে ; আমি অনেক সময়ে মনে করি দেশান্তরে গিয়া জীবিকার কোন উপায় করি, তাহা হইলে আমার ভাল মন্দ অবস্থার বিষয় কেহ কিছু জানিতে পারিবে না।"

কত লোক প্রাণত্যাগ করে অনশনে,
তাহার বারতা অন্য কেহ নাহি জানে ;
ওষ্ঠাগত হয় মম এ হত জীবন
তাহে অশ্রুবিন্দু কেহ করে না মোচন।

আমার আশঙ্কা, আমার শত্রুগণ আমার কষ্টে হর্ষান্বিত হইয়া আমাকে পরিহাস করে ; আর আমি যে পরিবারের জন্য এত কষ্ট করিতেছি তাহা বিস্মৃত হইয়া মনে করে আমি বড় নির্দ্দয় ও আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলে ;—

"দেখ ! দেখ ! লজ্জাহীন কেমন এ জন,
আপনার পরিবার না করে পালন ;
আপন স্বচ্ছন্দ সুখ জন্য চলে যায়,
স্ত্রী পুত্র স্বজন গৃহে—না ভাবে কি খায়।"

আপনি জানেন, আমি কিছু কিছু হিসাবপত্র রাখিতে জানি ; যদি আপনার সাহায্যে কোনরূপে জীবিকা ধারণ মত উপার্জ্জন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার মন সুস্থির হয় ও আমি যাবজ্জীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকি। আমি তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম ;—"ভাই ! রাজসেবার দুই দিক্ আছে ; উহাতে আহারের সংস্থান যেমন সহজে হয় আবার প্রাণনাশের ভয়ও তেমন। বিজ্ঞলোকের মতে উপজীবিকার জন্য জীবনকে সংশয়াপন্ন করা উচিত নয়।"

দরিদ্র এড়ায়ে যায় রাজ্যেশ্বর দায়,
কেহ তার গৃহে আসি কর নাহি চায়।
কষ্টে, শ্রমে কর ভাই জীবনধারণ,
না হয় মরিয়া হও কাকের ভোজন।

তিনি বলিলেন ;—"এই সকল কথা আমার পক্ষে ঠিক সঙ্গত নয় ; আপনি আমার প্রার্থনার উত্তর দেন নাই। আপনি কি শুনেন নাই, যে বিশ্বাসঘাতক নয়, সে হিসাব দিতে ভয় পায় না।"

সৎপথে থাকিলে কেহ বিপন্ন না হয়,
সদাচার জনে তুষ্ট বিভু দয়াময়।

আরও দেখুন ! পণ্ডিতগণ বলেন ;—চারিজন লোক চারিজনের হাতে মহা কষ্টে পড়ে ; যথা—করগ্রাহীর হাতে সুলতান্, প্রহরীর হাতে চোর, গোয়েন্দার হাতে লম্পট, নগর-কোটালের হাতে বারবনিতা। যাহার হিসাব ঠিক থাকে তাহাকে কাহারও কাছে জবাব দিতে হয় না।

কর্ম্মক্ষেত্রে নাহি যদি কর অত্যাচার,
পদচ্যুত হ'লে শত্রু রবে না তোমার,
পবিত্র থাকিলে ভয় কেবা কারে করে,
রজক মলিন বস্ত্র আছাড়ে পাথরে।

আমি বলিলাম ;—"একটি শৃগালের গল্প আছে, সেটি আপনার পক্ষে বেশ খাটে ; গল্পটি শুনুন ;—একদা এক

---

† (Geuber)—পারস্য দেশীয় অগ্নি-উপাসক-সম্প্রদায়।

শৃগাল প্রাণভয়ে পলাইয়া যাইতেছিল। একজন তাহাকে তাহার ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল ;—"আমি শুনিয়াছি যুদ্ধের জন্য উট সংগ্রহ হইতেছে।" সে ব্যক্তি বলিল ;—"তুমি ত বড় নির্ব্বোধ! তোমাতে আর উটে কি সম্বন্ধ আর কি সাদৃশ্যই বা আছে।" শৃগাল বলিল ;— "ভাই! চুপ কর, যদি কোন হিংসক কোন অভিসন্ধি-সিদ্ধির জন্য বলে যে এটা ছোট উট, তখন আমাকে কে রক্ষা করিবে? ইরাক হইতে ঔষধ আনিতে না আনিতে সর্পদষ্ট মনুষ্য মারা পড়িবে। এ জন্য পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা আবশ্যক।" আপনার কার্য্যদক্ষতা, সাধুতা, নির্ভীকতা ও ধর্ম্মভীরুতা সকলই আছে, কিন্তু এদিকে খলও আপনার অনিষ্ট-চেষ্টায় নির্জ্জনে বসিয়া আছে, যদি সে আপনার সকল গুণের বিপরীত কথা রাজার কাছে বলে, রাজা আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন, আর তখন কেহই আপনার জন্য একটি কথাও বলিবে না। সেই জন্যই আপনাকে কাজ কর্ম্মের আশা ত্যাগ করিয়া সন্তোষরূপ মহাধন রক্ষা করিতে বলি। পণ্ডিতেরা বলেন ;—

সাগরের গর্ভে সত্য আছে কত ধন,
তুলিতে চাওগো যদি সে সব রতন,
হ'লেও হইতে পারে প্রাণ-বিনাশন ;
তাই বলি কূল ছেড়ে যেওনা কখন।

এই কথা শুনিয়া আমার বন্ধু অসন্তুষ্ট হইলেন ও ভ্রূকুটি করিয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন ;—আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার কি সংস্রব আছে? আমি দেখিতেছি পণ্ডিতদিগের কথা আজি সাব্যস্ত হইল অর্থাৎ সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু রাজদ্বারে যে বন্ধু সেই যথার্থ বন্ধু।

সম্পদে যে বন্ধু বলি দেয় পরিচয়,
সে জন বান্ধব নয় জানিও নিশ্চয় ;
শোকে দুঃখে সমভাবে যে তব সহায়,
যথার্থ বান্ধব বলি জানিও তাহায়।

আমি দেখিলাম বন্ধুর ক্রোধ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, আর আমি যেন স্বার্থপর হইয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছি এইরূপ তাঁহারই মনে ধারণা হইতে লাগিল ; এই ভাব নিরাকরণের জন্য আমি ধনাধ্যক্ষের কাছে গেলাম ; তিনি আমার পরিচিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে আমার বন্ধুর গুণের ও যোগ্যতার কথা বলাতে তিনি তাঁহাকে একটি সামান্য কর্ম্ম দিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার শান্ত স্বভাব ও কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ পাইলে তাঁহার পদোন্নতি হইল। ক্রমে তাঁহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, শেষে তিনি সুলতানের এত বিশ্বাসী ও প্রিয় হইলেন যে সুলতান তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্য করিতেন না। বন্ধুর অভ্যুদয়ে আমার মহা আনন্দ হইল। উপদেশচ্ছলে আমি তাঁহাকে বলিলাম ;—

হতাশ হ'ওনা কার্য্য দেখি গুরুতর,
সঞ্জীবনী-সুধা আছে আঁধার ভিতর। *
শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হ'ওনা সংসারে,
আছে কত দয়া গুপ্ত বিভুর ভাণ্ডারে।
দুর্দ্দিন পড়েছে বলি বিষাদে মগন,
মানবের নাহি হয় উচিত কখন ;
ধৈর্য্য ধর যদি অতি কষ্টকর হয়,
শেষে কিন্তু ফল তার হয় সুধাময়!

এই সময়ে আমি কতিপয় বন্ধুর সহিত হিজাজ যাত্রা করিয়াছিলাম। মেক্কা হইতে প্রত্যাগমনকালে আমার সেই বন্ধু কিছু দূর অগ্রে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন। তাঁহার বাহ্য আকার দেখিয়া আমার মনে হইল যেন তিনি কষ্টে পড়িয়া দরবেশের বেশ ধারণ করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?" তিনি বলিলেন :—আপনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। একদল লোক আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে সুলতানের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করিল। সুলতান কোন অনুসন্ধান করিলেন না। আমার আত্ম-বন্ধু ও সহচরগণ বহুদিনের বন্ধুত্ব বিস্মৃত হইয়া—আমার পক্ষে কোন কথা বলিলেন না। কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

সম্পদ দেখিলে তব চাটুকার যত,
দুই কর জোড় করি শির করে নত।
আবার যখন তব যায় মান, পদ,
সমস্ত জগৎ দেয় তব শিরে পদ।

---

* মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে একটি অমৃতকুণ্ড আছে যাহার একবিন্দু পান করিলে লোকে অমর হয়। এই কুণ্ড ঘোর অন্ধকারাবৃত; অশেষ শ্রম করিলে সেই কুণ্ডে যাওয়া যায়।

অধিক কি বলিব, আমাকে অনেক দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। অতঃপর মক্কা হইতে যাত্রিগণ ফিরিয়া আসিতেছে এই সংবাদ পৌছিলে তাহারা আমার সমস্ত পৈতৃক বিষয় আত্মসাৎ করিয়া আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। আমি বলিলাম ;—"আপনি আমার কথা পূর্ব্বে গ্রাহ্য করেন নাই। আমি বলিয়াছিলাম রাজ-সেবা ও সাগর মধ্যে প্রবেশ উভয়ই সমান ; উভয়ই যেমন লাভজনক, তেমনই শঙ্কাজনক। আপনি অগাধ ধন অর্জ্জন করিতে পারিবেন, না হয় সমুদ্রের তরঙ্গ-সঙ্ঘাতে আপনার প্রাণ বিনষ্ট হইবে।

বণিক সাগরে ডুবে হয় মুক্তা পায়,
কিংবা মৃত দেহ তার তটেতে লুটায়।

ক্ষতস্থানে লবণ দিবার ন্যায় ভর্ৎসনা করিয়া আমি সেই হতভাগ্যের কষ্ট বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা না করিয়া কেবল মাত্র নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম ;—

হিতকারী বন্ধু যবে করিল বারণ,
তাহার সে কথা নাহি করিলে শ্রবণ।
জান নাই, ভাব নাই, হায়! কি তখন,
একদিন হবে পদ শৃঙ্খলে বন্ধন ?
বৃশ্চিক দংশন যদি পার সহিবারে,
অঙ্গুলি দিও গো তবে তাহার বিবরে।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।

প্রার্থনা

সাহস সাহস চাই, দেহে চাই বল ;
উদার হৃদয় চাই—নাহি কোন ছল।
অত্যুগ্র আগ্রহ চাই, সদা ফুল্লপ্রাণ,
ত্যাগ চাই, ভক্তি চাই—হৃদে ভগবান্।
কঠোর কর্ত্তব্য পথে হও অগ্রসর,
ভেদাভেদ ভুলে যাও, নাহি আত্মপর।
শুধু এক ব্রত—সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম,—
ওই শোন বাণী তাঁর—"এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।"

সম্পদে বিপদে মন স্থির রাখ সদা
পূর্ণ তেজে দীর্ণ কর যত বিঘ্ন বাধা।
নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ তুমি, স্বাধীন প্রধান,
"তত্ত্বমসি" এই বাণী শুধু কর ধ্যান।
ছিঁড়িবে মায়ার ডোর, বন্ধন সকল,
লভিবে আনন্দ সদা, আনন্দ কেবল।

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।
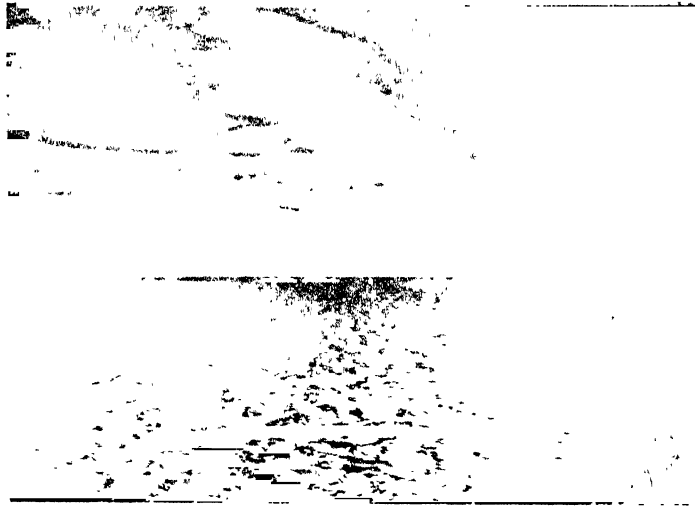
(৩)

এইরূপে বাহিরে যখন নীরব নিস্তব্ধ ভোজের ব্যাপার চলিতেছিল, তখন ঘরের ভিতরে আসিয়া তাহার বিপরীত দেখিলাম। এখানে স্বয়ং অপ্‌সরোগণ স্বহস্তে সুধা বণ্টন করিতেছেন। ইহারা সপ্তসহোদরা,—সুরুয়া হইতে সুরু করিয়া তালিকা মত, নিপুণতাসহকারে পরিবেষণ করিয়া যাইতেছে। ইহাদের পরিধেয়-বস্ত্র অতীব শোভন ও পরিচ্ছন্ন এবং চেহারাও বেশ প্রসন্ন। শুনিলাম, বেশভূষা-বিষয়ে নরওয়েবাসীরা সকলেই য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণ করিয়া থাকে, কেবল পরিচারিকার দল নাকি অদ্যাবধি তাহাদের স্বদেশের পরিচ্ছদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেছে। তাহাদের পরণে একটি সাদা ঘাঘরা, আর গায়ে সাদা জামার উপরে জরীর কাজ করা, লাল মকমলের একটি জোয়ার্ক। স্কন্ধের দুইপাশে দুইটি বেণী লম্বমান, আর মস্তকোপরি একটি লেসের টুপি বর্ত্তমান। স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ইহাদের গণ্ডস্থল আরক্তিম, আর রংটি যেন দুধে আল্‌তায় মিশান। নেত্রযুগল নীল-পাটল, আর কেশকলাপ কনকোজ্জ্বল, তাহাতে এই সুরুচি-সম্পন্ন বেশ বিরচনা, আমাদের চোখে কেমন একটু চমকা লাগাইয়া দিল। আমরা যেমন এদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছি, এদের চক্ষুও তেমনই আমাদেরই মুখের উপর পড়িয়া আছে। তাহারা পরিবেষণের স্থলে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই আমাদিগের দিকেই আসিতে লাগিল। তখন বুঝিলাম যে, আমরা এ দেশে আসিয়া, যেমন একদিকে দর্শক, তেমনই আর একদিকে দর্শনীয় পদার্থ রূপেও পরিণত হইয়াছি।

এবার প্রস্থানের আয়োজন। কে বলিতে পারে, হয়ত জন্মের মত এই "Lake Dyupvand in Merock" এর লীলাখেলা সাঙ্গ করিয়া বিদায় লইলাম। বিদায়-কালে শুনিলাম, এই সপ্তভগিনীর জননীই নাকি, এই পান্থশালার স্বত্বাধিকারিণী। প্রতি বৎসর তিনি এপ্রেল মাসে কন্যকা-গণ সহ এখানে আগমন করিয়া সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত আপন কার্য্য সাধন করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। তখন আর এখানে থাকা চলে না, বরফে সব ঢাকিয়া যায়।

এখন যার যার গাড়ীতে চড়া। এবারে আবার সেই আদবকায়দা-দুরস্ত, দুইটি প্রশস্ত হস্ত প্রসারিত হইল। এবার হস্তদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে, আর আমাদের পূর্ব্বের মত দ্বিধা-জড়িত ভাব নাই। ভাবিলাম, তাইত! "রূপেতে কি করে বাপু! গুণ যদি থাকে।" হউক না অমসৃণ অপরিচ্ছন্ন,—বিপন্নের বন্ধু ত বটে!

সকলেই বলিয়া থাকেন, ওঠায় আর নামায় স্বর্গ মর্ত্ত্য তফাৎ;—সেটা কেবল কথার কথা নয়, কাজেও তাই। ওঠায় অনেক সময় অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়, নামায় তাহা না হইলেও চলে। নামার মুখে অশ্বগণ, তাহাদিগের চালকদিগকে আরোহীদের পশ্চাতে আপন আপন স্থানে

বসিতে অনুমতি দিল, কেন না স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে নামিতে তারা নিজেরাই বেশ পটু। তবু যদি "নাম্‌কা ওয়াস্তে" একটা লাগাম রাখা দরকার হয়, তাতে তাদের আপত্তি নাই; কিন্তু সে লাগাম ঢিলা রাখা চাই। হ'ক্ না হ'ক্ কেইবা এসংসারে কেবল চালকের চালমত চলিতে চায়? গাড়ীতে বসিয়া, পরোক্ষ আর সমক্ষের ভেদবিচারে মনটা ব্যস্ত রহিল। ভাবিলাম, প্রত্যক্ষের মহিমা আর কতক্ষণ! দেখিতে দেখিতে ত সকলই স্মৃতির ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত হয়। স্মৃতিও আবার কয়দিন পরে কিছু চাপা দেয়, কিছু ছাঁটিয়া ফেলে, এবং যাহা সার মনে করে, তাহা ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখে। কিন্তু এই সার বোঝা লইয়াই যাহা কিছু বোঝাপড়া, যতসব বিবাদ-ঝগড়া। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে চাহিয়া দেখি, চারিদিকে কেমন একটা ছুট্ পাট্ লাগিয়া গিয়াছে। অশ্বগুলি কেবলই সর সর, ছাড় ছাড় ডাকহাঁক করিতে করিতে চলিয়াছে। তা পথ সরে ত পাহাড় ছাড়ে না, পাহাড় ছাড়ে ত, শৈলরাজি শোনে না, ভারি মুস্কিল। সত্যি এদের অতিথিসৎকারকে বলিহারি যাই। আমরা তখন ইঁহাদের শিষ্টাচারে মহা তুষ্ট হইয়া, আমরা যে নিতান্তই কুক্ কোম্পানীর হাতে বাঁধা আছি, সে কথা জানাইলাম; এবং আর বৃথা পথশ্রম স্বীকার না করিতে করযোড়ে অনুরোধ করিলাম। তখন সজ্জনের মত ইহারা অগত্যা বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন দেখিয়া, ভানুরাজ ভারি খুসী। এমন তেজস্বী জনের কি আর, নিস্তেজ নিরীহের মত থাকিতে ভাল লাগে? বাকি রাস্তা তিনি বেশ একজন মুরুব্বির মতই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আমরাও পুরাতন বন্ধুকে পুনরায় পূর্ব্ব হালে পাইয়া পরম প্রীত হইলাম।

ট্রলহাটান

বাসস্থানে আসিয়া নিত্য নৈমিত্তিক সবই চলিল, সবই মিলিল, কেবল কারও কারও মনের সন্ধান পাওয়া গেল না। বুঝি বা সেটা সেই স্বপ্ন-রাজ্যে পড়িয়াই হিমসীম খাইতেছে। শরীরটা এক রকম চৈতন্যরহিত হইয়া আরাম-কেদারায় পড়িয়া আছে। তা যার যাবার তার গিয়াছে, অন্যের অত মাথাব্যথার প্রয়োজন কি?

এখন হইতে নাকি নূতন নূতন স্থান দেখিয়া আর 'বার-দিন পরে লণ্ডনে পৌঁছিব, এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। যত দক্ষিণে ফিরিতেছি, ততই শীত কমিয়া আসিতেছে, আর অন্ধকার দেখা দিতেছে, দস্তুরমত সন্ধ্যাকেও পাওয়া যাইতেছে।

বিজ্ঞাপনের তালিকামত আজকার যাবার জায়গার নাম Trollhattan. সেখানে এক প্রখ্যাত প্রস্রবণ আছে। ঘাটে আসিয়া রেলগাড়ীতে চড়িয়া যাইতে হইবে। যাই আমরা আসিয়া, আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাষ্পীয়-শকটে আরোহণ করিয়াছি, অমনই সে গা ঝাড়া দিয়া ছুট দিল। আমাদের দেশের মত এদের ত ভয়ে ভয়ে চলা নাই। ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল যাওয়া চাই। গাইড্ মহাশয় আমাদের সঙ্গী হওয়াই সঙ্গত মনে করিয়া আমাদের গাড়ীতেই আসিয়া বসিলেন। কুবেরের ঐশ্বর্য্যকেও আমরা অতিক্রম করিয়াছি, হয় ত বা তাহার অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশীর মনের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে উভয় পক্ষকেই ভারি ভোগায়। যাঁরা দূরদেশভ্রমণে বাহির না হইয়াছেন, সে দুঃখ তাঁদের বোঝান সম্ভব নয়। সে বেচারা আমাদের অবগতির জন্য হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া কত যে নিবেদন করিতে লাগিল, সে সব স্মরণ রাখিতেও শক্তির প্রয়োজন দেখিলাম। এইরূপ প্রায় প্রহরেক এক তরফা প্রলাপের পর, আমরা যেন নিস্তার পাইলাম। গাড়ী থামিয়াছে, লোকজন নামিতেছে এবং হাঁ করিয়া দেখিতেছে, কোথা হইতে বা সেই প্রখ্যাত নির্ঝরিণী নামিয়া আসিতেছে?

ট্রলহাটানের প্রস্রবণ

তখন আমাদের পথপ্রদর্শকের নিকট শুনিলাম যে, সে নাকি এখনও আরও ঘণ্টা আধেকের পথ বাকি। ফের ঘোড়ার গাড়ীতে চড়া। আবার গাড়ীর ঘড়ঘড়ী, এক পান্থপুরীর পুনর্দর্শন, এবং তন্মধ্যে প্রবেশ এবং পরিবেষণের হুড়াহুড়ি, তৎসঙ্গে কাণে শোনা সেই মহা ঝরণার ঝরঝরি, তারপর সকলে উদরজ্বালা সম্বরণ করিয়া, পদদ্বয়েই ভর দিয়া, বেশ একটু তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়া এক সুন্দর সেতু-বন্ধের উপরে দাঁড়াইলাম। এই টুকু আসিতে দুই চক্ষে কি দেখিলাম, কিছু জ্ঞান নাই। জানি কেবল একটা নীরব নদী আমাদের সঙ্গে চলিয়াছিল। খানিক পরে হঠাৎ তার ভাবগতিক বদ্‌লাইয়া গেল। কি মনে করিয়া সে ক্ষণেকের জন্য তার তীরস্থিত তরুরাজির অভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিল—তারপর একেবারে এই উন্মত্ত অবস্থায় আসিয়া দেখা দিল। এ কিসের উচ্ছ্বাস! কে একে এমন পাগল করিয়া দিল? প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তারপর সে যখন আপন মনে আত্মকাহিনী কহিয়া যাইতে লাগিল, তখন কাণ পাতিয়া শুনিলাম যে, সে অতি উচ্চ-কুলোদ্ভবা, কোন শৈলেশ্বরের আত্মজা। শৈশবে বড় সুখে পালিতা, নিশিদিন পিতামাতা দুহিতাকে আপন বক্ষে আঁকড়িয়া রাখিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না। বড় ভয়, পাছে কোথাও গেলে হারাইয়া যায়, তাই ঘরের বাহির হইতে দিতেন না। সর্ব্বদাই বদ্ধাবস্থা। খেলার সাথী সঙ্গী অনেক জুটিয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ এক আঙ্গিনার মধ্যে যা কিছু আমোদ আহ্লাদ করা। ক্রমে যখন সে শৈশব ছাড়িয়া কৈশোরে পদার্পণ করিল, তখন আর তার এসব শিশুখেলা ভাল লাগিল না। যখন তখন তার গণ্ডস্থল বহিয়া দু'চার ফোঁটা চক্ষের জল গড়াইয়া পড়ে, আর ভাবে, এভাবে দিন কেমন করিয়া কাটিবে। পিতা দেখিলেন, সন্তানের অবস্থা শোচনীয়, মায়েরও আর পাষাণে বুক বাধিয়া থাকা চলে না, তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অবসর বুঝিয়া কন্যাও এদিক্ ওদিক্ একটু আধটু উঁকিঝুঁকি দেয়। কিন্তু একে রাজার ঝি, তাতে এতকাল এক রকম বন্দী; এই বন্ধুর ভূমিতে বেশী দূর পা চলে কি? একটু চলিতেই থম্‌কিয়া দাঁড়ায়, আর চারিদিকে চায়। আশে পাশের সঙ্গিনীরা আসিয়া

ট্রলহাটানের নীরব নদী

তখন হাতে ধরিয়া লইয়া যায়। এই ভাবে সে দিন কাটায়। এক দিন কেমন উন্মনা হইয়া, পিতার পায়ে পড়িয়া লুটা-লুটি, আর মায়ের বক্ষে পড়িয়া কাঁদাকাটি,—"আমায় ছাড়িয়া

দাও, আমি আর ঘরে রইতে নারি। আমায় ডেকেছেন আমার শ্রীহরি।" কিশোরীর কাণে যখন প্রিয়তমের ডাক প্রথম পৌছায়, এবং সে ডাকে প্রাণে সদ্য প্রেম জাগায়, তখন সে অগ্রপশ্চাৎ ভাবে না, ভালমন্দ বোঝে না, যুক্তিতর্ক মানে না। তার মুখে শুধু এক বুলি "ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে"। মা বাপ তখন নিরুপায়, সাধ্যমত তাহারই কথায় সায় না দিলে, হিতে বিপরীত হইয়া যায়, এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া যোগনিষ্ঠ জনকজননী, শান্ত সমাহিত চিত্তে—সন্তানের শুভ-কামনায়, নীরব নিশ্চল থাকিয়া, তাহার যাত্রায় অনুমতি দিলেন। এ যাওয়া যে সে যাওয়া নয়! একেবারে জন্মের মত জন্মস্থান হইতে বিদায়, আর প্রত্যাবর্ত্তন নাই। তবে অন্তরের যোগ? সে ত থাকিবেই। এ যোগাযোগ ভিন্ন এই সরল কোমল প্রাণে এত বল যোগাইবে কে? মায়ের নাড়ী ছাড়িয়া সন্তানের পুষ্টি কোথায়? ক্ষুণ্ণ মনে ক্ষীণ প্রাণ লইয়া সে বালিকা বিদায় হইল। সঙ্গে স্বজনগণ প্রহরী চলিল। ক্রমে যখন সে রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল, তখন পর্ব্বতরাজ দুহিতার পিত্রালয় পরিত্যাগের বার্ত্তা শ্রবণে কৌতূহলী হইলেন, এবং কত কত তরুণী গিরিতরঙ্গিণী তাহার সঙ্গ লইল দেখিয়া, শৈলস্বগণ সকলেই সসম্ভ্রমে সরিয়া পড়িলেন। কেননা অকারণ, কুল-কামিনীগণের পথ-অনুসরণ, তাঁহারা শিষ্টচারবিরুদ্ধ আচরণ বলিয়া জানিতেন। মাতা ধরিত্রীর হাতে ইহার সংরক্ষণের ভার রহিয়াছে জানিয়া, তাঁহারা আর কোন উদ্বেগ অনুভব করিলেন না। এই যে অজানা, অচেনা পথ দিয়া সে চলিয়াছে, কিছুতেই তার ভয় নাই—ভ্রূক্ষেপ নাই। মুখে কেবল —"সর সর—পথ দাও" "আমায় কেহ বাধা দিতে আসিও না, কেহ আমায় বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না"। এখন আর তার ক্ষীণ দেহ ক্ষুদ্র প্রাণ নাই। প্রেম তাহাকে ক্রমেই ফুটাইয়া তুলিতেছে, তার শক্তি বাড়াইয়া দিতেছে। তাহার এই উদ্দাম রূপযৌবনে বিমুগ্ধ হইয়া, কোথাও বৃষস্কন্ধে কোন উপলখণ্ড, বুক পাতিয়া তাহার পথ-

টুলহাটানের নদীর উন্মত্ত অবস্থা
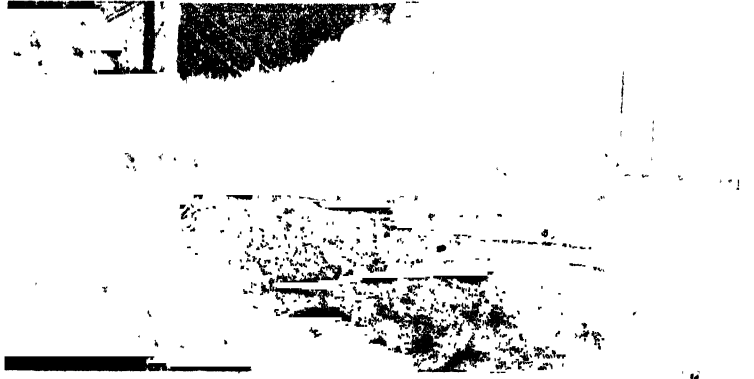
রোধের চেষ্টা করিতেছে, দেখিয়া, গর্ব্বিণী অমনই পাশ কাটাইয়া, তাহার আশায় বাসায় বালি ছড়াইয়া দিয়া, অট্টহাসি হাসিয়া চলিয়াছে। কোথাও আবার কোন সাহসী সেতু-বন্ধে এ যাত্রার বিঘ্ন ঘটাইবার নিমিত্ত দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জানে না যে, প্রেমময়ী, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সেই প্রেম-মহাজনের আশ্রয়ে আসিয়াছে। কিন্তু এবারে অনুনয় বিনয়, এখানে গরবের কাজ নয় "নম্র হৃদয়ে নয়নেরি জলে" লতার মত বেড়িয়া বেড়িয়া চরণ চুমিয়া ভিক্ষা চাহিতে হইবে, তবেই পথ পাওয়া। "শরণাগত জন ক্ষুদ্র হইলেও উচ্চাশয় ব্যক্তি তাহাকে কখনও বিমুখ করেন না" এই মহাবচন শৈলজার স্মরণে ছিল। এবারে দ্রুতপদ-সঞ্চালন। বাধায় বাধায় সব গতিরই নাকি বেগ বাড়ায়, তারপর আরও আনন্দে মাতায়। এবারে উচ্ছ্বসিত প্রাণ কূল ছাপাইয়া উঠিতেছে, তখন তীর-ভূমিও আহ্লাদে আটখানা হইয়া ইহারই গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। আবার আগুয়ান। পথে পতি-দর্শনে পরাঙ্মুখী কএকটি দুর্ব্বলা গিরিবালা, তাহাদের বিরহ-কাতর শীর্ণদেহকে ভূগর্ভে বিলীন করিতে যাইতেছে দেখিয়া, উদারচেতা এই রাজসুতা, উহাদিগের প্রিয় সম্মিলন ঘটাইবেন বলিয়া—প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং সস্নেহে ডাকিয়া লইয়া, আপন বক্ষোমাঝে স্থান দিলেন। কারণ আপন প্রিয়তমকে বহুবল্লভ দেখিতে, যথার্থ পতিপরায়ণার প্রাণে দ্বেষহিংসার লেশ থাকে না,—মান-অভিমান স্থান পায় না, বা তার একনিষ্ঠত্বে প্রতিষেধ জন্মায় না। বরং সপত্নীজন দ্বারাও যে পতি-সেবার সার্থকতা

অনুভব করা সম্ভব হয়, তাহা আপন জীবনে প্রতিফলিত দেখাইতে চান। বুঝি বা এতদ্দর্শনেই সেই মহানুভব

টিলহাটানের সেতু

মুনিবর, দুহিতা শকুন্তলার প্রতি "কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে" এই সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

এই ভাবে কল্লোলিনী, দলে বলে কলেবর বাড়াইয়া মহোল্লাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর গিরিগহ্বর, ইহাদিগকে গ্রাস করিবার অপেক্ষায় আছে দেখিয়া, স্নেহশীলা ধরিত্রী আপনার সুবিশাল ক্রোড় বিস্তার পূর্ব্বক ইহাদিগকে বিনাশের পথ হইতে রক্ষা করিলেন। ইহারাও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তন্মধ্যে শয়ান রহিল। তাই ইতঃপূর্ব্বে ইহাদের সেই নীরব প্রশান্ত ভাব দেখিয়াছিলাম। অকস্মাৎ এ মূর্ত্তি কেন? সে সুকোমল ক্রোড় ছাড়িয়া আসা কেন? তাইত! প্রেমে পাগল প্রাণকে কোন্ জননী উৎসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছেন? যেমন ক্রোড় ছাড়া, আর অমনই পাষাণের গায়ে পড়া—তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহারা হইয়া একগতির মুখে আপনাকে ঢালিয়া দেওয়া। এ গতির গতিবিধি জানা নাই, তবু চলা চাই। সে তিমিরাচ্ছন্ন বিকট মুখব্যাদান দেখিয়া, কখনও ভয়ে থরথর, ত্রাসে জড়সড়, আবার অভিমানে থরতর, দৃঢ়তায় মহত্তর—কখনও বা বিষাদে ছল ছল, উচ্ছ্বাসে উচ্ছৃঙ্খল, আনন্দে টলমল, বিস্ময়ে ঢল ঢল ভাব! এদিকে গিরিগুহার ধারণা ছিল যে, তরলমতি অবলা-জাতিকে সে অক্লেশে কবলসাৎ করিয়া রাখিতে পারিবে; কিন্তু কার্য্যে তার বিপরীত দেখিল। সময়ে যাহাকে সামান্য গণ্ডূষের মধ্যে পুরিয়া রাখা যায়, অবস্থাভেদে তারই আবার দুর্জ্জয় পরাক্রম প্রকাশ পায়। বিশেষ প্রেম যখন মনে জাগে, তখন দুর্ব্বলা তরলা জনে, কিই না অসাধ্য সাধন করিতে পারে; তাহা জগজ্জনেই জানে। এই যে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া ঝাপটিয়া পড়িতেছে, আর সেই গুহার গণ্ডস্থল লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া, চণ্ডী হুঁ হুঁ শব্দে ঝটিতি চলিয়া যাইতেছে; কে এর গতিরোধে কাহারও ত ক্ষমতায় কুলাইতেছে না। আজ গিরিগুহা দেখিলেন, যে হাল্কা পালেও যখন দম্‌কা হাওয়া লাগে, তখন তার তড়িৎ-গতি সামাল করা—কেবল সামর্থ্যের কাজ নয়। অতএব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভূধর-গহ্বর, সংগ্রামে ইস্তফা দেওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। তখন কলনাদিনী কলকণ্ঠে তাহার স্তুতিবাদ করিতে করিতে পথ চলিল। শুনিলাম, এ রাজ্যে নাকি সচরাচর, সরিৎপতি স্বয়ং আসিয়া নিকটবর্ত্তিনী প্রণয়িনীগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন না। তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর ফিয়ড্‌কেই ইহাদিগের আনয়নের ভার দিয়া থাকেন। আমরা তখন ফিরিয়া গিয়া এই প্রিয়-সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিব,—সংকল্প করিলাম। ফিয়ড্ বেচারার ঘাড়ে আজ বোঝা ভারি। একে আমরা এত-

রমস্‌ডাল
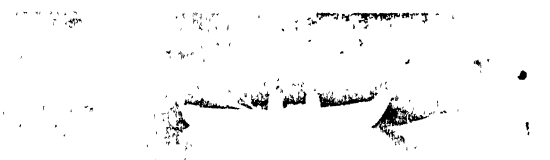
গুলি নরনারী তার বক্ষের উপরে ত আছিই, তাতে এত সব সখীসমেত শৈলকুমারীও সঙ্গে। দেখিলাম, দূর হইতে চিরবাঞ্ছিত বল্লভের দর্শনমাত্র সেই প্রেমবিহ্বলার নবীন প্রাণ সমগ্র মাধুর্য্য-রসের আতিশয্যে যেন সংজ্ঞা-হারা, আর সুহৃদ্‌বর ফিয়ড্‌ অমনই হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক, উভয়পার্শ্ববর্ত্তী কৌতূহলী মহীধর দর্শকমণ্ডলীকে যেন বলপূর্ব্বক সরাইয়া দিয়া, আপনি তাঁহাকে সম্মানে আপন বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

রমস্‌ডালের তৃতীয় দৃশ্য

আর আর সীমন্তিনীরা মন্থর-গমনে তাহার পথ অনুসরণ করিতেছে। তারপর ইহাকে প্রিয়সখার অঙ্কশায়িনী করিয়া দিয়া আপনি অদৃশ্য হইলেন। সেই অঙ্গস্পর্শে সিন্ধুরাজ কি বলিতেছেন—

"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা,
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণঃ,
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সমুন্মীলয়তি চ॥"

আর শৈলসুতার "মনঃ সান্দ্রানন্দং স্পৃশতি ঝটিতি ব্রহ্ম পরমম্‌" একেবারে চিন্ময়ে লয়। ভাবিলাম, এ দেখা ত শুধু দেখা নয়, কত শেখা। আজ দেশভ্রমণের সখ্‌ সার্থক মনে হইল! এজন্য এই অর্থ-ব্যয়, আর অনর্থক ভাবিতে পারিলাম না। এমন ভাবে সেই মহান্‌ অস্তিত্বে আপনাকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে, কেবল প্রেমিক ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণই পারিয়াছিলেন। তাই রসজ্ঞ কবি-চূড়ামণি—

"চণ্ডীদাস কহে, সেত এক হয়ে
হয় বা না হয় ভিন্ন।
বিরলে বসিয়া, দুহুঁ মিশাইয়া
গড়ল একই তনু॥"

নয়ত এমন কথা আর কে বলিতে পারে?

পরদিন (Romsdal) রমসডাল নামক স্থান পরিদর্শন। প্রাতেই হাস্যবদনে আর এক ফিয়ড্‌ ভাইয়া আসিয়া হাজির। আমাদিগকে তাঁর জন্মভূমির চারিদিকের যা-কিছু শোভা-সম্পদ, দেখাইবেন বলিয়া, নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আমাদের বিপুল যানকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁর অনুসরণ করিতে আদেশ দিলেন। পথে ছোট বড় কতকগুলি দ্বীপ গ্রাম্যবধূদের মত জলে গা ঢাকা দিয়া, মাথা তুলিয়া—লীলাভরে এই অজ্ঞাতকুলশীল জলযানকে নিরীক্ষণ করিতেছিল;—দেখিয়া সে, চতুরালী করিয়া, উহাদের মাথায় জল ছিটাইয়া দিয়া একটু রসিকতা করিল। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, আমাদের মতে ইনি "শি" নন,—"হি", সুতরাং এ মতিভ্রমে ইঙ্গ-বঙ্গদল হাসিবেন না! কিন্তু কাপ্তান

রমস্‌ডালের দ্বিতীয় দৃশ্য

সাহেবের, এ বেয়াদবি বরদাস্ত হইল না; তিনি এর কাণ মলিয়া দিয়া, একে অন্য পথে লইয়া চলিলেন। আমাদের ফিয়ড্ গাইড্ এই কাণ্ড দেখিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। তার পর থেকে আর সোজা পথে যাওয়া নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া কোথা হইতে কোথায় যে চলিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কখনও দেখি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ মাথার উপরে, আবার কখনও কেবল পথের দুই ধারে ঘন তরুরাজি। এই ভাবে ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই চারিদিকের শ্যামল শোভায়, আর ফিয়ডের জন্মভূমির নীলাভায়, চক্ষু যেন এক অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, যদি স্বয়ং ভগবানের কখনও মর্ত্তাধামে অবতরণ আবশ্যক হয়, তবে এমন স্থানেই তিনি অবতীর্ণ হইবেন। এবারে, পারে যাইতে আর বিলম্ব নাই দেখিয়া, ফিয়ড্ মহাশয়, আমাদের বৃহত্তরীকে তার তড়িৎ-গতিকে একটু সামাল করিতে অনুনয় করিলেন; কিন্তু অন্যমনস্কতা তার এক মস্ত দোষ। কেহ হুঁস না করিয়া দিলে, কখন যে কোন্ অপথে গিয়া অসময়ে প্রাণটা বিসর্জ্জন দেয়—তার খেয়ালই নাই। একা হইলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সর্ব্বদা বহু লোক-লস্কর লইয়া চলাই যে তার ব্যবসা। এস্থলে সেই আবার যখন সকলের ভরসা, তখন অমন হাল-ছাড়া গোছ চলা চলে কি? ভাগ্যি কাপ্তান হেন বিচক্ষণ জন,—সদাই এর তত্ত্বাবধানের ভার লন, তাই বিপত্তির দিনেও এর বাঁচিবার আশা থাকে।

দূরে যাইতে হইবে না বলিয়া, পারে আসিয়া আর গাড়ীঘোড়ার বড় একটা হাঙ্গামা দেখিলাম না। সখ রক্ষা করিবার জন্য কেবল, দুই একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

এখানে একটী নরওইজীন্ পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমরা একখানা পরিচয়-পত্র সঙ্গে আনিয়াছিলাম। একটী গাইড্ও সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহাকে ঠিকানা বলাতে, সে একখানা গাড়ী ডাকিয়া আমাদিগকে লইয়া গিয়া, ঠিক সেই বাড়ীর সদর দরোয়াজায় হাজির করিল। আমাদের নাম লেখা কার্ড পাঠাইবামাত্র একটি তরুণবয়স্কা
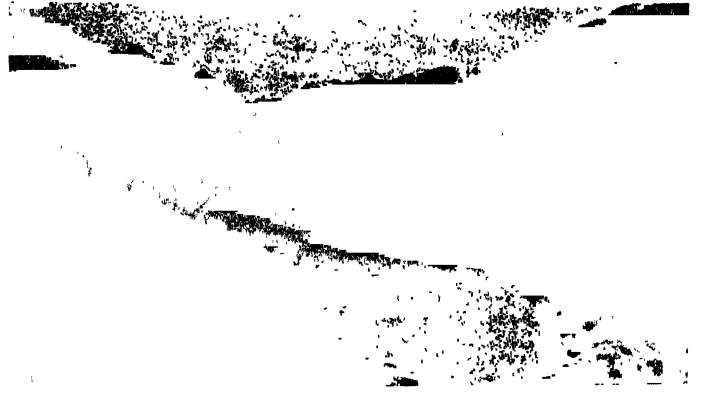
রম্‌সডাল্—রম্‌সডালের শৃঙ্গ

রমণী আসিয়া সাদরে আমাদিগকে ঘরের ভিতরে লইয়া গেল। মেয়েটী দেখিতে যে বড় সুন্দরী তা নয়, তবে তার স্বভাবের একটি মাধুর্য্য যেন সকল মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রথম দর্শনেই সে আমাদিগকে কেমন একটু আপনার করিয়া ফেলিল। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজীতে সে এমন মিষ্ট স্বরে কথা বলিতেছিল যে, ভাল ইংরাজী বলা মুখের কথায় আমাদিগের মনকে এতদিন এমন মুগ্ধ করিতে পারে নাই। খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বুঝিলাম যে, এর মা বাপ নাই, খুল্লতাতের সঙ্গে থাকে; তাই এর প্রতি আরও মায়া হইল। ঘর-বাড়ী ভারি ফিট্‌ফাট্ দেখিলাম। সে একাই সব তত্ত্বাবধান করে। আমাদিগকে ইণ্ডিয়ার বিষয় কত কি প্রশ্ন করিল এবং আমাদের উত্তর শুনিয়া—সেদেশ দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য জানাইল; কিন্তু সে আশা যে কোন দিনও পূর্ণ হইবার নয়, তাও সে জানে—বলিল। তারপর, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, বল দেখি তোমাদের যদি দৈবাৎ ঘড়ী বন্ধ হইয়া যায়, তবে তোমরা বেলার ঠিক পাও কি করিয়া?" মৃদু হাস্য করিয়া সে উত্তর করিল, "তা কি জানেন, আমরা কাজ-সারা দিয়া সময়ের ঠিকানা করি। ঘড়ীর কাঁটার মত আমাদের কাজ চলে; কাজেই ঘড়ী দেখিবার দরকার হয় না। এই আলোর ক'মাস আমরা দুই তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমাই না। তারপর যখন আবার অন্ধকারের দিন আসে, তখন আমাদের বাকি ঘুমটা পোষাইয়া নেই। তখন যদি আমাদের দুরবস্থা দেখেন, ত' আপনাদের দুঃখ হবে। সকল সময়েই কৃত্রিম-আলোর সাহায্যে ঘরের বাইরে যাইতে হয়। তখন, লোকজনের সঙ্গে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করা ভারি দুর্ঘট

হইয়া পড়ে। তাই যে যার বাড়ী বসিয়া, নিপুণ কাজে দিন কাটায়। গাড়ীঘোড়া তখন রাস্তায় চলিতে পরে না। পায়ে চলাও দায়, কেননা দুই চার ফুট বরফ রাস্তায় সর্ব্বদা থাকে, কখনও আবার তার চেয়েও বেশী। তাই Slegde নামক একরকম কাটের গাড়ী, হরিণে টানিয়া যায়—তাতে ক'রেই, নেহাৎ যাদের ঘরের বাহির না হইলে নয়, তাদের কাজ চালাইতে হয়। তখন গৃহপালিত জীবজন্তু কেহই চরিয়া খাইতে পায় না, সব ঘরের ভিতরে বাঁধা থাকে; আর এদের ছমাসের খাদ্যের যোগাড় আগে হইতেই রাখিতে হয়। আমাদের খাওয়ার জিনিষ তখন কিছুই মিলে না। শিকারের পশুপক্ষীর মাংস নুন দিয়া শুকাইয়া রাখি। যথেষ্ট যব, রুটীর জন্য মজুত রাখা চাই; আর আলু ত অপর্য্যাপ্ত রাখিতেই হয়। তাজা কোন দ্রব্য খাওয়া, তখন আর আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। এই যে এত সব শস্য দেখিতেছেন, এর চিহ্নও থাকিবে না; এই সবুজ রঙই আর দেখা যাবে না। জুন হইতে সেপ্টেম্বর অবধি, আমাদের যত কিছু সুখসুবিধা, সব তখন যাবে। তবে বিধির এমনি মঙ্গলবিধান যে, এই তিন মাসের ভিতরই শস্য বোনা, পাকা, কাটা সব শেষ করা যায়।"—বলিয়াই আমাদিগকে লইয়া সে ঘর হইতে হল ঘরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমরাও ধীরপদে তাহার পশ্চাৎগামী হইলাম। সে ঘরে অনেক দ্রব্যজাত বেশ বিশিষ্ট মত সাজান ছিল। তার ভিতর হইতে এক খানা পুরাণ পাদুকা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের কাছে আসিয়া বলিল—"জানেন;—এইটি আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহীর পায়ের পরিত্যক্ত চিহ্ন বলিয়া এত যত্নে রক্ষা করিতেছি, ইহা দেড়শত বৎসরের পুরাতন"। আমরাও তখন, সেই বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে সম্মান জানাইতে, উহা হাতে ছুঁইলাম এবং তারপর যথাস্থানে স্থাপন করিলাম। এতক্ষণ অবধি খুল্লতাত মহাশয় বড় একটা মুখ খোলেন নাই, সেটা তার ইংরেজী ভাষার অজ্ঞতা নিবন্ধন নিশ্চয়ই। আমরা ভদ্রতার খাতিরে দুই চার কথা তাঁকে বলিতেই, তিনি মাথা নাড়িয়া, হাতের দিকে আকার ইঙ্গিতে একটা মস্ত "না"র সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে সে কথা বিনা কথায়ও বেশ স্পষ্টই বুঝাইয়া দিলেন। তারপর, যতটুকু সময় আমরা সেখানে ছিলাম, তিনি কখনও মৃদুমন্দ হাসিতে—কখনও একটু কৃত্রিম কাসিতে—আমাদিগের কথায় যোগদিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বিদায়ের বেলা আমাদের নাম ধাম লিখিয়া আসিতে হইল; যদি কালে ভদ্রে আবার আসি, তবে খবর পাইলেই দেখা করিবেন বলিয়া। আর, কচিৎ ভবিষ্যতে; যদি তাঁদেরই সুদূর ভারতবর্ষে যাইবার সুযোগ ঘটে, তবে আমাদিগকে স্মরণ করিবেন, নিশ্চয়;—এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া, এবং আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া—বাহিরে আসিলাম। তাঁরা দুই জনে সঙ্গে আসিয়া আমাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন।

গাইড্ ভাবিল, 'যখন বিদেশীকে হাতে পাইয়াছি, তখন বক্‌সিস্‌টা একটু ভারি হাতে নেওয়াই যাক্ না কেন!' মনে মনে এই ফন্দী আঁটিয়া, আমাদিগকে একটু এদেশ্‌টা ঘুরিয়া দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। আমরা মহা তুষ্ট হইয়াই তাহার এই আবেদন মঞ্জুর করিলাম। আর তাহাকে পায় কে? অনবরত, আশে পাশের ঘর বাড়ী, গাছ পালা, রাস্তা ঘাট সমুদায়েরই ইতিহাস—সেই 'ডিকি বক্সে' বসিয়া, বলিয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে আবার গাড়ী থামাইয়া স্থানবিশেষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করাইতেছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে সকল কথা সবই যে আমাদের কাণের ভিতর প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল, এমত বলা যায় না। কেন না বাহিরের এই স্নিগ্ধশ্যামল শোভা নানা কথা মনে জাগাইয়া তুলিতেছিল। ভাবিতেছিলাম—"তাইত! এ দেশের লোকেরাও কি সেই 'শস্যশ্যামলাং মাতরম্'কে দেখিতে পায়? এদের মাও কি তেমনই সন্তানবৎসলা? এরা কি মায়ের সুসন্তান!—না কুসন্তান? মায়ের দেওয়া—খাবার, কাপড়েই এরা মানুষ?—না আমাদের মত পরমুখাপেক্ষী দীনদুঃখী নিতান্তই বেহুঁস্। যাইতে যাইতে কত ভাবে কত লোককে চলাফিরা করিতে দেখিলাম, সকলেরই সমান প্রসন্নমূর্ত্তি। তাহাতেই মনে হইল যে, এরা আদৌ দুঃখের বার্ত্তা জানে না, নিশ্চয়ই বড় সুখী। এমন সময় গাইড্ বলিল, 'আর বেশী দূরে গেলে দেরী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, অতএব প্রত্যাবর্ত্তনে আমাদের সম্মতি আছে কি না?' আমরা ফিরে যাওয়াই ঠিক করাতে, কালবিলম্ব বিনা ভিন্নপথে ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাণীহিসাবে বক্‌সিসের ব্যবস্থা হইলে, আমাদের পথপ্রদর্শকের আজ প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক পাওয়া উচিত।

হার্ডাঙ্গর্—ক্রডেফোর্ড্

অনর্গল বাক্যব্যয়ে বেচারা যেন কিছু বেহালও হইয়া পড়িয়াছিল। এমত স্থলে, দস্তুর মত দিতে গেলে, দয়া-দাক্ষিণ্য ব'লে কিছু থাকে না, বাক্যের হিসাবটা না হয় এখন ছাড়িয়াই দিলাম। ইতি চিন্তায় কারুণ্য রসে কিঞ্চিৎ অভিভূত হইয়া, দানক্রিয়া সুসম্পন্ন করা গেল। সে ব্যক্তিও আশাতীত ফললাভে, হৃষ্টচিত্তে আমাদিগের ইষ্ট কামনা করিতে করিতে বিদায় লইয়া অদৃশ্য হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমলা দাস গুপ্তা।

বাজিকর

আস্‌ত হেতায় নবান্ন শেষ হ'লে
থুরথুড়ে এক বৃদ্ধ বাজিকর,
ঢোলটি ছোট দুল্‌ত সদাই গলে,
কাঁধে ঝুলি, লাগ্‌ত দেখে ডর।

ভোজবাজি সে জান্‌ত শতশত,
ফল ধরা'ত সদ্য আমের ঝাড়ে,
উড়িয়ে দিত পয়সা টাকা কত,
শুধু দু'খান বনমানুষের হাড়ে।
ভিক্ষা ক'রে সারা জীবন ধ'রে
ক'রে ছিল দুইটি 'গিনি' পুঁজি';
কোমরেতে রাখ্‌ত গেঁজেয় ক'রে,—
অন্য কেহ জান্‌ত না আর বুঝি।

চাসাদের ওই নোংরাদেরই বাড়ী
বাজি কর্‌ছে ফাগুন মাসের দিনে,
দেখ্‌লে—তা'দের গাইটি দুজন কাড়ি'
যাচ্ছে ল'য়ে ঋণের দায়ে টেনে!—
পনেরটি টাকা ঋণের দায়ে
গোয়াল থেকে গাইটি নিল বাঁধি',
বুড়ী কতই ধর্‌ল তাদের পায়ে,
বাধা দিল বালক কতই কাঁদি';—
গাইটিও হায় নড়্‌তে নাহি চাহে,
আগ্‌লে আছে বালক বাহু মেলি'!—
পাইক-দু'জন টল্‌ল না ত তাহে,
নে যায় গরু শিশুর বাহু ঠেলি'।

দিদিমা তা'র ভোলায় পয়সা আনি',
ছেলে কিন্তু কেঁদেই 'রসাতল';—
দেখে' বুড়া বাজিকর, কি জানি',
টস্‌টসিয়ে ফেল্‌লে আঁখিজল।

তা'র পরে, ভাই, ঢোল বাজিয়ে দিয়ে
বুড়া ঢেকো মোড়লের নাম করে',
শিশুটিকে কোলের কাছে নিয়ে,
বল্‌লে, 'দেখ্ তোর দিচ্ছি গরু ফিরে!'

অবাক্ হ'ল শিশুর দিদিমাতা!—
ভাব্‌লে, গরু মন্তরে কি মেলে?
বিস্ময়েতে থাম্‌ল বারেক ক্রেতা
আনন্দেতে ভাস্‌তে লাগ্‌ল' ছেলে।
বুড়া আবার 'ওস্তাদের নাম করে'
ডুগ্ ডুগিয়ে বাজিয়ে দিলে ঢোল,
ছেলের হাতের পয়সা গেল সরে,
বল্‌লে, 'বেটা হাতখানি তোর খোল'।

অবাক্ হয়ে দেখ্‌লে সবাই চেয়ে—
পয়সাটি তার 'গিনি'ই হ'য়ে গেছে,
পাইকদেরে বল্‌লে, 'এইটি নিয়ে
লওগে টাকা সেক্‌রা ঘরে বেচে।'
ইন্দ্রজালের মোহরখানি নিতে
হয় না রাজি পাইক পাওনাদারে;
শেষে, অনেক কাতর মিনতিতে,
নিল টাকা গিয়ে সেকরা ঘরে।
গাইটি পেয়ে বালক কেবল হাসে—
সবার চক্ষে অশ্রু দিল দেখা!
ধন্য—ধন্য—ধন্য—বাজিকর! এ
ধন্য বাজি যাহার কাছে শেখা!

বাজিকর গো সর্ব্বস্বটি তব
শিশুর দুখে ফেল্‌লে দিয়ে আজি;
এযে তোমার ধরার মাঝে নব
একেবারে তাক্‌লাগান বাজি!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ছিন্নহস্ত

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত

[পূর্ব্বাবৃত্তিঃ—ব্যাঙ্কার্ মঃ ডর্জ্জারস্ বিপত্নীক। এলিস্ তাঁহার একমাত্র কন্যা. ম্যাক্সিম্ ভ্রাতুষ্পুত্র. ভিগ্‌নরী খাজাঞ্চি, রবার্ট্ কার্ণোয়েল্ সেক্রেটারী,জর্জ্জেট্ বালকভৃত্য, ম্যালিকম্ দ্বারপাল. ডেন্‌লেভ্যাণ্ট্ শাস্ত্রী। একরাত্রে তাঁহার বাটীতে ভিগ্‌নরী ও ম্যাক্সিম্ নিশাভোজে আসিয়া দেখে, মালখাজনার লৌহসিন্দুকের বিচিত্র কলে কোন রমণীর সদ্য-ছিন্ন বামহস্ত সম্বদ্ধ! তৃতীয় ব্যক্তিকে না জানাইয়া, সেটা ম্যাক্সিম্ নিজের কাছে রাখিল।

রবার্ট্, এলিসের পাণি-প্রার্থী; এলিস্‌ও তদনুরক্ত। বৃদ্ধ ব্যাঙ্কার্ কিন্তু ভিগ্‌নরীকে জামাতা করিতে ইচ্ছুক নন্; তাই তিনি রবার্ট্‌কে মিশরস্থিত স্বীয় কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন। রবার্ট তাহাতে অসম্মত - সেই রাত্রেই তিনি দেশত্যাগ করিলেন।

রুশরাজের বৈদেশিক শত্রু-পরিদর্শক কর্ণেল্ বোরিসফের ১৪ লক্ষ টাকা ও সরকারী কাগজপত্রের একটি বাক্স এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল। তিনি ঐ দিন বলেন, পরদিন কিছু টাকা চাই।—কথামত কর্ণেল্ প্রাতেই টাকা লইতে আসিলে ভিগ্‌নরী দেখেন, খাজনার সিন্দুক খোলা! ডর্জ্জারস্ আসিলে দেখা গেল—৫০ হাজার টাকা ও কর্ণেলের বাক্সটি নাই!—সন্দেহটা পড়িল রবার্টের ঘাড়ে। কর্ণেলের পরামর্শে পুলিশে সংবাদ না দিয়া, গোপনে অনুসন্ধান করা স্থির হইল।

ম্যাক্সিম্, সেই ছিন্নহস্তের অধিকারিণীকে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছিন্নহস্তে একখানি ব্রেস্‌লেট্ ছিল—ম্যাক্সিম্ তাহা নিজে পরিয়া, ছিন্নহস্ত নদীতে ফেলিয়া দেন। পুলিস তাহা উদ্ধার করে, কিন্তু পরে চুরি যায়। একদিন পথে ম্যাক্সিমের সহিত এক পরিচিত ডাক্তারের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি এক অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখাইলেন; ম্যাক্সিম্ কৌশলে রমণীর সহিত আলাপ করিলেন; সে রমণী—কাউণ্টেস্ ইয়াল্টা। অতঃপর ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্টের সহিতও তাঁহার আলাপ হয়। ইনি তাঁহার প্রকোষ্ঠে ব্রেস্‌লেট্ দেখিয়া একটু রহস্য করিলেন; কথা-বার্ত্তায় বেশী রাত্রি হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিলেন।

এলিস্ শুনিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কের চুরি সম্পর্কে সকলেই রবার্ট্‌কে সন্দেহ করিয়াছে! তাঁহার কিন্তু ধারণা— সে নির্দ্দোষ। তিনি রবার্ট্‌কে নির্দ্দোষ-প্রতিপন্ন করিবার জন্য ম্যাক্সিমকে অনুরোধ করিলে, ম্যাক্সিম্ প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে রবার্ট্, দেশত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, একবার এলিসের সাক্ষাৎকার-মানসে প্যারীতে প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহাকে গোপনে সেই মর্ম্মে পত্র লিখেন। সেই দিনই পূর্ব্বাহ্নে, কর্ণেল্ ছলক্রমে তাঁহাকে এক বাটীতে আনিয়া বন্দী করিলেন। ম্যাক্সিম্ রবার্টের পত্র দেখিয়াছিলেন; তিনি উঁহাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের বিরোধী ছিলেন। কার্য্যগতিকে তাহাই ঘটিল।

কর্ণেলের বিশ্বাস,—রবার্টের নিয়োজিত কোনও রমণীদ্বারা ব্যাঙ্কের চুরি ঘটিয়াছে। তিনি বন্দী রবার্ট্‌কেও সেইরূপ বলিলেন; ও জানাইলেন যে, রবার্ট্ সন্দেহমুক্ত না হইলে এলিসের সহিত ভিগ্‌নরীর বিবাহ ঘটিবে; আর চুরীর গুপ্ততথ্য ব্যক্ত না করিলে, তাঁহাকে আজীবন বন্দী থাকিতে হইবে। রবার্ট্ রাত্রে মুক্তির পথ খুঁজিতেছেন, এমন সময় প্রাচীরের উপরে জর্জ্জেট্‌কে দেখিতে পাইলেন। সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে মুক্তির আশা দিয়া প্রস্থান করিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যাক্সিম্ অভিনয় দর্শন করিতে যান। তথায় এক রঙ্গিণীর মুখে শুনিলেন—তাঁহার প্রকোষ্ঠস্থিত ব্রেস্‌লেট্‌টির পূর্ব্বাধি-কারিণী ম্যাডাম্ সার্জ্জেণ্ট্!—ঘটনাক্রমে সেও সেই থিয়েটারেই উপস্থিত। কথাটা কতদূর সত্য, জানিবার জন্য ম্যাক্সিম্ ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের বক্সে গিয়া হাজির। কথায় কথায় একটু পানভোজনের প্রস্তাব হইল; দুজনে অদূরবর্ত্তী হোটেলে গেলেন। তথায় ব্রেস্‌লেটের কথা উঠিতে, ম্যাডাম্ তাহা দেখিতে লইলেন। এমন সময় সহসা ম্যাঃ সার্জ্জেণ্টের রক্ষক এক অসভ্য ভল্লুক সঙ্কেতানুযায়ী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রেস্‌লেট্ ও ম্যাডাম্‌কে লইয়া প্রস্থান করিল;—ম্যাক্সিম্ প্রতারিত হইলেন!

একমাস গত;—ভিগ্‌নরী এখন ব্যাঙ্কারের অংশীদার এবং এলিসের পাণিপ্রার্থী; জর্জ্জেট্ দৈব-দুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী—তাহার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত! ম্যাডাম্ ইয়াণ্টা আজ একটু ভাল আছেন—ম্যাক্সিম্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। ইয়াণ্টা বলিলেন, ভিগ্‌নরীর সহিত এলিসের বিবাহ হইতে দিবেন না; রবার্ট্ নির্দ্দোষ, তাহার সহিতই এলিসের বিবাহ হওয়া বিধেয়। ম্যাক্সিম্‌কে তিনি জর্জ্জেটের নিকট হইতে যথাসম্ভব রবার্টের সংবাদ-আহরণ করিতে বলিলেন। অচিরে ব্যাঙ্কারের বাটীতেই হয়ত ম্যাক্সিমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে—এই আশ্বাস দিয়া ইয়াণ্টা ম্যাক্সিম্‌কে বিদায় দিলেন।

কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার অনুরোধমত ম্যাক্সিম্ ম্যাঃ পিরিয়াকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া জর্জ্জেট্‌কে সঙ্গে লইয়া পথ-ভ্রমণে নির্গত হইলেন। আশা,—পূর্ব্বপরিচিত স্থানগুলি দেখিলে, জর্জ্জেটের লুপ্তস্মৃতি পুনরাবির্ভূত হইবে। কার্য্যতঃ কতকটা সফল-কামও হইলেন,—জর্জ্জেটের পূর্ব্বস্মৃতি কতক কতক পুনঃপ্রদীপ্ত হওয়ায়, সে প্রসঙ্গতঃ রবার্ট্ কার্ণোয়েল্ এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক আভাষ জ্ঞাপন করিল; যে বাটীতে রবার্ট্‌কে বন্দীভাবে থাকিতে দেখিয়াছিল, তাহাও নির্দ্দেশ করিল; পরে সেই প্রাচীরের উপর হইতে নামিতে গিয়া হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় সে হতচেতন

হয়—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আবার তাহার স্মৃতি-শক্তি লোপ পাইল।]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যখন ম্যাক্সিম্ ‧ জর্জ্জেটের সঙ্গে প্যারীনগরীর রম্য রাজপথে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে কর্ণেল বোরিসফ্ নিজ কক্ষস্থ কুসুম কোমল সোফায় অঙ্গ হেলাইয়া প্রধান পরিচারকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। দুইজনে নিম্নলিখিত কথোপকথন চলিতেছিল;—"ফরাসীটা এখন কি করিতেছে ?"

"ঘুমাইতেছে।"

"ও কপটনিদ্রা। সকালে তোমাকে সে কিছু বলিয়াছে ?"

"আজ কয়দিন ধরিয়া সে কোন কথাই কহে না, জিজ্ঞাসা করিলেও কথার জবাব দেয় না।"

"সে শারীরিক ভাল আছে ত ?"

"বেশ আছে। হুজুর, ঘরে আটক থাকিয়াও তাহার চেহারার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। লোকটার মন লোহার মত কঠিন, কিছুতেই দমিবার নহে।"

"তা' নয় হে, লোকটা বিষম একগুঁয়ে। নিজের অবস্থা ভাবিয়া, চুপ করিয়া থাকাই সার মনে করিয়াছে। যে পথটা সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্কণ্টক, সেই পথই ধরিয়াছে।"

"আপনি তা'কে সাইবিরিয়ায় পাঠাইলে, তার দুর্দ্দশার একশেষ হইবে; ইহার চেয়ে অমঙ্গল আর তা'র কি হইবে ?"

"ভেসিলি,—তোমার ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই।"

"একটা কথা বলি হুজুর, কসুর মাপ করিবেন। সঙ্গীদের নাম বলিলেই যখন লেঠা চুকিয়া যায়, তখন নাম বলিতে তা'র আপত্তি কি ? নাম প্রকাশ না করিলেও যে নিস্তার নাই, এ কথাটাও ত সে বুঝে।"

"হাঁ; কিন্তু যাহাদিগের নাম প্রকাশ করিবে, তাহারা অতি ভয়ানক লোক; বিশ্বাসঘাতককে কঠোর শাস্তি না দিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইবে না, একথাও সে বুঝে। সাইবিরিয়ায় লইয়া গিয়া, তাহার নাককাণ কাটিলেও তাহার ক্ষতি নাই। সেখানে যাইতে সে ভয় পায় না।"

"বোধ করি, সে ভাবিয়াছে—আপনি মুখে যাহা বলিতেছেন, কাজে তা' করিবেন না।"

"এই ফরাসীগুলা ভাবে,—সেণ্টপিটার্সবর্গে লোকের উপর যে সব পীড়ন অনায়াসে চলে, প্যারী নগরে তাহা অসম্ভব; কিন্তু আমি তা'র ভুল ভেঙ্গে দেব। তুমি গাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখিও, গাড়ী দেখিলে তার মুখ খুলিতেও পারে।"

ভেসিলি ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমার বোধ হয়, সে কোন কথাই জানে না।"

"তোমার মনেও ঐরূপ সন্দেহ হইয়াছে নাকি ?"

"হুজুরের সঙ্গে আমার মতভেদ হয় নাই; কিন্তু আপনি যদি অভয় দেন, মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি।

"বলই না।"

"নিহিলিষ্টদিগের সহিত তাহার যদি ঘনিষ্টতাই থাকিবে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধরিবার জন্য যে ফাঁদ পাতিয়াছিলাম, সে ফাঁদে সে কখনই সহজে পড়িত না। আমার বোধ হয় লোকটা অত্যন্ত সরল,—সে কোন নিহিলিষ্ট রমণীর কুহকে ভুলিয়া এই বিপাকে পড়িয়াছে। এই যুবকটি মসিয়ে ডর্জেরেসের কন্যাকে ভালবাসে, তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছাও ইহার ছিল; কিন্তু হুজুর কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন।"

"সেই জন্য ব্যাঙ্কওয়ালা যে দিন তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন, তাহাকে কন্যাদান করিবেন না বলিলেন, সেই দিনই সে আমার কাগজ পত্র চুরি করিল, উপপত্নীর কুপরামর্শ শুনিল। স্ত্রীলোকটি হয়ত তাহাকে বিদেশে সাহায্য করিবে বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিল, তাই চুরি করিবার সময় রাহাখরচের জন্য কেবল পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক লইয়াছিল।"

"যদি সতসত্যই চিঠি সমেত টাকাটা কেহ তাহার নিকট না পাঠাইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ অনুমান সত্য হইতে পারে।

"পত্রে যে কাহারও স্বাক্ষর নাই! সে নিজেও অমন একখানা চিঠি লিখিতে পারে। তাহার পিতার টাকা ধার দেওয়ার কথাটা, একটা রচা গল্প।"

"আপনি যে ব্যাঙ্কে আপনার দলিলের বাক্স রাখিয়াছিলেন, কোন্ কৌশলে নিহিলিষ্ট নারী সে কথা জানিতে পারে,—এইটি সকলের চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার।"

"সম্ভবতঃ কার্নোয়েল্ এসংবাদ দিয়াছে। এই বিষয়ের অনুসন্ধান আদৌ সন্তোষজনক নহে। তৃতীয় দল

এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারে নাই। পারীনগরে অনেক রমণী গোপনে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে, ইহাদিগের খবর কেহ রাখে না? পদগৌরবেও এই স্ত্রীলোকেরা অতি উচ্চ। সম্ভবতঃ ইহাদিগের মধ্যেই কেহ আমার বাক্সের সন্ধান পাইয়াছিল।"

"হুজুর ত জানেন, আমি এই যুবকের চরিত্র ও জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে সমস্ত খবর লইয়াছি। আমি জানিয়াছি, কোন রুশীয়ানের সঙ্গে ইহার মৌখিক আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না। কাউণ্টেস্ ইয়াণ্টার সহিত যুবকের পরিচয় আছে কিনা, সে খোঁজও আমি লইয়াছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার সহিত যুবকের কখনই সাক্ষাৎ হয় নাই।"

"কাউণ্টেসের সহিত নিহিলিষ্টদিগের কোন সংস্রব নাই। আমারই কথায় আমাদিগের বিভাগের লোক কাউণ্টেসের উপর নজর রাখিয়াছিল। কাউণ্টেস্ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহই নাই। কাউণ্টেস্ একজন সার্‌কেসিয়ান্ প্রিন্সের কন্যা। বিবাহের অল্পদিন পরেই বিধবা হন। তাহার পর ফ্রান্সে আসিয়া আমোদ-প্রমোদ লইয়াই আছেন।—যাক্, এখন এই ফরাসীটার সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। আমি তাহাকে ভাবিয়া কাজ করিবার জন্য একমাস সময় দিয়াছিলাম; কাল সে মিয়াদ ফুরাইবে। আমার কথা সে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?"

"কিচ্ছু না। সে খায় দায় ঘুমায়,—বাস্।"

"তার সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিয়া অন্যায় করিয়াছি। ডরজরেসের কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে; কাল তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাটা পাড়িব, দেখি যদি কিছু ভাঙ্গে।"

"আজ্ঞে, হুজুর ত ধরিয়াই রাখিয়াছেন;—নিহিলিষ্টদিগের ভয়ে সে কোন কথাই বলিবে না। তবে আবার ও কথা কেন? লোকটাকে আটক না করিলেই উহার সঙ্গীদের ধরা যাইত,—ইহাই আমার বিশ্বাস।"

কর্ণেল মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে গিয়া, আমরা হয়ত ভুল করিয়া বসিয়াছি; কিন্তু এখন আর সে ভুলের সংশোধন চলে না। কার্‌নোয়েল্ সাবধান হইয়াছে; এখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেও সে আর সঙ্গীদের সহিত দেখা করিবে না।"

"আমি ত ব্যাপারটাকে বেশ ঠাহরিয়া দেখিয়াছি, কার্‌নোয়েলের কেহ সহকারী আছে বলিয়া ত বোধ হয় না; তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। কোনরকম মামলা-মোকদ্দমা করিবে না বলিয়া, তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলে,—সে কোন কথাই প্রকাশ করিবে না। একবার কথা দিলে, তাহার কথার নড়চড় হইবে না।"

"ফরাসীটাকে যখন এ বাড়ীতে আনা হয়, একটা ছেলে তাহাকে দেখিয়াছিল;—মনে নাই?"

"ওঃ! আপনি সেই ছেলেটার কথা বলিতেছেন? সেত পাঁচিলে উঠিতে গিয়া পড়িয়া যায়। আমি তা'র সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি, পড়িয়া তার মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! বাঁচিলেও আজীবন তাহাকে হাবা হইয়া থাকিতে হইবে।"

"তা'র মাথা যে সারিবে না,—একথা কে বলিতে পারে? তাহার মত বালকের পক্ষে ঐরূপ আচরণ বড়ই অদ্ভুত; হয় ত ছেলেটা চুরির ভিতরও আছে।"

"ছেলেটি একটি দুঃখিনী বিধবার পৌত্র। সে কার্‌নোয়েলের বড় অনুগত; কার্‌নোয়েল্ নিরুদ্দেশ হইলে, সহসা সে তাঁহার সন্ধান পাইয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য পাঁচিলে উঠিয়াছিল; কিন্তু একথা লইয়া গল্পগুজব করিবার পূর্ব্বেই পড়িয়া গিয়া তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া যায়। এপর্য্যন্ত কার্‌নোয়েল্‌কে উদ্ধার করিতে—কি তাহার সংবাদ লইতে—কেহ চেষ্টা করে নাই। তাই বুঝিয়াছি, কার্‌নোয়েলের সংবাদ কেহ জানে না।"

"ঠিক বলিয়াছ;—আমি তোমার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

এই সময়, রূপার রেকাবে একখানি কার্ড লইয়া, একজন ভৃত্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণেল বিরক্তভাবে বলিলেন "কে এল?—আমি ত তোমাকে বলিয়াই রাখিয়াছি, কাহারও সঙ্গে দেখা করিব না।"

"তিনি বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; বলিলেন, তাঁর বড় জরুরি কাজ আছে।"

কর্ণেল বরিস্‌ফ কার্ডে আগন্তুকের নাম পড়িয়া, বড়ই বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, তাঁহাকে বৈঠকখানায় লইয়া যাও।" তাহার পর প্রধান ভৃত্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"লোকটা কে জান? মসিয়ে ডরজরেসের

ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার সঙ্গে আমার মোটেই আলাপ নাই বলিলেই হয়। ইনি আবার এলেন কেন?"

"বোধ করি তার জ্যেঠা তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন।"

"সম্ভব, কিন্তু লোকটা এখন এল কেন? যাও, সর্দ্দার সহিসকে আমার গাড়ী তৈয়ার রাখিতে বল গিয়া; আমি বন্দীকে ছাড়িয়া দিব কি না, কিছুই স্থির নাই।"

কর্ণেল বরিসফ পার্শ্বস্থ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ম্যাক্সিমডরজরেস গম্ভীরমুখে বাতায়নপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। ম্যাক্সিমের অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন, সংবাদ শুভ নহে। কর্ণেল ম্যাক্সিমকে সৌজন্য-মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "কি উপলক্ষে আজ আপনার এখানে আগমন হইয়াছে? আপনাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আপনার কথা পূর্ব্বে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আপনার সহিত আমার আলাপ ছিল না;— মসিয়ে ডরজরেস ভাল আছেন ত? তাঁহার সুশীলা কন্যার মঙ্গল ত? শুনিতেছি, তাঁহার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, কথাটা কি সত্য?

ম্যাক্সিম্ পরুষভাবে বলিলেন, "আমি জানি না, আমি অন্য কাজে আপনার নিকট আসিয়াছি।"

ম্যাক্সিমের গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে এবং তাঁহার তীব্র কণ্ঠস্বর শ্রবণে তৎক্ষণাৎ কর্ণেল বরিসফের ভাবান্তর ঘটিল। তিনি উদ্ধতভাবে বলিলেন, 'এখানে আপনার কি কাজ শীঘ্র বলুন।" ম্যাক্সিম্ স্থিরদৃষ্টিতে কর্ণেল বরিসফের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "মসিয়ে কারনোয়েলের কি হইয়াছে, আমি জানিতে চাহি।"

কর্ণেল, ম্যাক্সিমের কথা শুনিয়া অটল রহিলেন, তাঁহার মুখের একটি পেশীও কাঁপিল না, ললাটে একটি রেখাও অঙ্কিত হইল না। তিনি স্থির কণ্ঠে বলিলেন—"আপনার প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না,—ক্ষমা করিবেন। মসিয়ে কারনোয়েলের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? তাঁহাকে আপনার জ্যেঠার আপিসে একবার দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ পর্য্যন্ত হয় নাই।"

"কিন্তু পরে তাঁহার বিষয়ে আপনার খুব আগ্রহ দেখিয়াছি।"

"কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিবেন কি?"

"মসিয়ে কারনোয়েল কোথায় আছেন বলুন।"

"নূতন খবর আমি কোথায় পাইব? বাক্স চুরির পর হইতে ত তাঁহাকে দেখিতেছি না, বোধ করি, তিনি দেশান্তরে গিয়াছেন।"

"আমি এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে এই পারি নগরে দেখিয়াছি।"

"এক মাসের মধ্যে কি ফ্রান্স হইতে অন্যদেশে যাওয়া যায় না।"

"আমি তাঁহাকে একখানি গাড়ীতে আপনাদিগের এদিকে আসিতে দেখিয়াছিলাম।"

"তবে গাড়ীর অনুসরণ করিলে না কেন? সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইত?"

"আমি গাড়ীর অনুসরণ করি নাই বটে, কিন্তু সে গাড়ী আপনার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল।"

"কি! আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল? আপনি হিসাব করিয়া কথা কহিবেন,—আপনার মত লোকের এরূপ অদ্ভুত কথায় বিশ্বাস করা উচিত হয় নাই।"

"অদ্ভুত কথা নহে, যে আমাকে এই সংবাদ দিয়াছে, সে ঠিক সংবাদই জানিয়াছে।"

কর্ণেল উচ্চ হাস্য দমন করিবার ভাণ করিয়া বলিলেন, "আপনার দেখিতেছি,—বিশ্বাস হইয়াছে, এই মুন্সীটি পদচ্যুত হইবার এবং চোর দায়ে পড়িবার পরেই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সম্ভবতঃ চোরাই বাক্সটা ফেরত দিতেই আসিয়াছিল।"

"তিনি ইচ্ছা করিয়া আসেন নাই।"

"তবে আমি দিনের বেলা,—এই পারি সহরের বুকের উপর দিয়া তাঁহাকে এখানে ধরিয়া আনিয়াছি। আপনি আমাকে এই খবর দিয়া আমার যথেষ্ট মান বাড়াইলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া আমার কি লাভ?"

"লাভালাভ আমি জানি না। আমি জানি, তাঁহাকে এখানে ধরিয়া আনা হইয়াছে। এখনও তিনি এই বাড়ীতে আছেন। আর যদি তিনি এখানে না থাকেন, আপনিই তাঁহাকে সরাইয়াছেন। তাঁহাকে এ বাড়ীতে ধরিয়া আনা হইয়াছিল, এ কথা আপনি অস্বীকার করিতে পারেন?

"স্বীকার করা দূরে থাকুক, আমি ইহার বিন্দু বিসর্গও জানি না।"

"আপনি অস্বীকার করিতেছেন, কিন্তু আমি বলিতেছি, আপনারা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছেন।"

কর্ণেল কএক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর অপমান-বেদনা-বিধুর-কণ্ঠে ধীর ও গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"আমার যে বয়স, যেমন পদগৌরব তাহাতে লোকত ধর্ম্মত এখনই আমি এই অভদ্র ব্যবহারের প্রতীকার করিতে পারি। কিন্তু মসিয়ে ডরজরেস আমার বন্ধু,—সেই জন্যই আমি ক্ষান্ত হইলাম। আপনার সহিত আমার আর কথা নাই, আশা করি, আপনি আমাকে আর কোন কথার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন না।"

"না। আমি অন্য উপায় অবলম্বন করিব, প্রয়োজন হইলে পুলিশের সহায়তাও গ্রহণ করিতে পারি।"

কর্ণেল সগর্ব্বে বলিলেন, "অসহ্য! অনেকক্ষণ আপনার প্রলাপ শুনিয়াছি, কিন্তু আর কোন কথাই শুনিব না। আপনি এখনই এখন হইতে দূর হউন।"

ক্রোধরক্তমুখে ম্যাক্সিম্ বলিলেন, "ইহাই আপনার শেষ সিদ্ধান্ত?"

"হাঁ, একথা আরও পূর্ব্বে বলিলেই ভাল করিতাম।"

"আচ্ছা, আমিও আপনার অভদ্র ব্যবহার নীরবে সহ্য করিব না, দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইহার প্রতিফল দিব,—কাল আমার সহকারী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

"আমি প্রস্তুত রহিলাম।"

এতক্ষণ বরিসফ কেবল বাহিরে ধীরতা প্রকাশ করিতেছিলেন। সর্দ্দার খানসামা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিল, ঝড় উঠিতে আর বিলম্ব নাই। বরিসফ বলিলেন, "লোকটা কেন আসিয়াছিল জান? সে কারনোয়েলের সন্ধান পাইয়াছে, সে আমার মুখের উপর বলিয়াছে, কারনোয়েল এই বাড়ীতে আছে। কেহ তাহাকে এক মাস পূর্ব্বে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে।"

"তিনি বোধ করি, সেই ছেলেটার মুখেই এই সংবাদ পাইয়াছেন। কিন্তু তাহাই বা হইবে কি করিয়া, তাহার যে স্মরণ-শক্তি লোপ পাইয়াছে।"

"খবর যাহার কাছেই পাইয়া থাকুক, তাহাতে কি আসে যায়। লোকটা আমাকে পুলিশের ভয় দেখাইয়া গেল, ফরাসীদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, বন্দীর মুক্তি এখন অসম্ভব, তাহাকে এখানে রাখাও নিরাপদ নহে। আজ সন্ধ্যাকালেই তাহাকে সরাইতে হইবে, যাও,—তার করিয়া আমাদিগের কর্ম্মচারীদিগকে ষ্ট্রাস্‌বার্গ পর্য্যন্ত ডাক গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে বল। এখনই আমি একবার বন্দীর সহিত দেখা করিব। যাও—তাহাকে খবর দাও।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। বরিসফ ক্রোধে—ক্ষোভে অধীর হইয়া গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "কুক্ষণে পারীনগরে আসিয়াছিলাম,—কুক্ষণে এই পাপীয়সীদিগের চক্রান্ত-জাল ভেদ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম, রুসিয়ার সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোককে অনায়াসে গ্রেপ্তার করা যায়, কিন্তু এখানে সবই বিপরীত;—আমার চেষ্টা বিফল হইলে, কর্ত্তারা আমাকে নির্ব্বোধ ঠাহরাইবেন, কারনোয়েলকে দেখিতেছি,—পরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

বরিসফ চিন্তাকুলভাবে পুস্তকাগারাভিমুখে চলিয়া গেলেন। এক মাস পূর্ব্বে রবার্ট্ কারনোয়েল ঐ গৃহে বন্দী হইয়াছিলেন।

রবার্ট্ নীরবে কক্ষমধ্যে বসিয়াছিলেন, বন্দিদশায় নিদারুণ মনঃপীড়ায় দিন কাটাইতেছিলেন। প্রথম প্রথম কর্ণেল তাঁহাকে ভিগনরীর প্রেম-কাহিনী বলিয়া, তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতেন। তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়া কর্ণেল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু রবার্ট অটল ধৈর্য্যে এই সকল উৎপীড়ন সহ্য করিতেন, সন্তাপ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আকারেঙ্গিতে তাহা প্রকাশ করিতেন না। এই সময়ে নিশীথে সহসা জর্জ্জেটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে,—হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু মায়াবিনী আশা তাঁহাকে প্রতারণা করিল; দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইল, তথাপি সেই সৌম্য-সুন্দর বালকের মুখচ্ছবি আর তাঁহার নয়নপথে পড়িল না। ক্রমে কর্ণেল বরিসফের যাতায়াত বন্ধ হইল, আশার দীপ নিবিল। তিনি হতাশ ব্যথিত-হৃদয়ে, ধ্যানমৌনবৎ নিস্তব্ধ হইয়া পরিণামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্থিরমূর্ত্তি, অটলধৈর্য্য দেখিয়া ভৃত্যবর্গ বিস্মিত হইল।

এই সময়ে কর্ণেল বরিসফ রবার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আজ অনেক দিনের পর আপনার সহিত দেখা হইল, আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য আপনাকে এক মাস সময় দিয়াছিলাম, কাল সে মিয়াদ ফুরাইবে। মনে

রাখিবেন, আপনার সহচরদিগের নাম প্রকাশ করিলেই আপনি মুক্তি পাইবেন। আমার চেষ্টায় আবার মসিয়ে ডরজরেসের প্রীতি-ভাজনও হইবেন।"

"আপনার প্রস্তাব খুব লোভনীয়। কিন্তু আমি নির্দ্দোষ, আমার কেহ সহচর নাই, মিথ্যা একরার করিয়া আমি মুক্তি লাভ করিতে চাহি না।"

"আপনি মনে করিতেছেন, কুমারী এলিস্ চিরদিনের মত আপনার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু সেরূপ মনে করিবেন না, আমি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতেছি—"

"আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না। আপনি যাহাই বলুন না কেন, আপনি আমার নিকট হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিবেন না।"

"তা হ'ক, তবু সমস্ত কথা শোনা ভাল। মসিয়ে ডরজরেস, ভিগনরীকে কন্যা দান করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, ইহা আপনি জানেন। এতদিন পরে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, এলিস্ ভিগনরীকে বরমাল্য দিতে সম্মত হইয়াছেন। আপনার অনুপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে। যদি আমার পরামর্শ শুনিতেন, তাহা হইলে এই বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইত।"

"আমার উপর এই প্রকার জুলুম করিয়া আপনার কি লাভ? ফলে প্রভাতে যদি আমি মুক্তিলাভ করি, তাহা হইলেও বিবাহ বন্ধ থাকিবে না, আমি বিবাহ বন্ধ করিবার কোন চেষ্টাও করিব না।"

এখনও সময় আছে, এখনও বিবাহ বন্ধ হইতে পারে, কুমারী এলিস্ নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহে সম্মত হইলেন।"

"তিনি বহুদিন ধরিয়া আপনার হৃদয়ের সহিত যুঝিয়াছেন, আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছেন; ভাবিয়াছিলেন, যাহারা আপনার নামে কলঙ্ক রটাইয়াছে, আপনি গিয়া তাহাদিগের মুখ বন্ধ করিবেন;—কিন্তু সে আশা যখন বিফল হইল, তখন তিনি হতাশ হৃদয়ে অদৃষ্টের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কেন আপনি এতদিন নীরব ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহা সহজেই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। আপনি বলিতে পারেন, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা শুনিবার পূর্ব্বেই আপনি হতাশহৃদয়ে দেশত্যাগ করিয়াছিলেন—এখন এই লোকের কথা শুনিয়া কলঙ্ক-ভঞ্জন করিতে আসিয়াছেন। আপনার কোন বন্ধু—কোন হিতৈষী—ধরুন, জর্জ্জেস বা জর্জ্জেট বলিয়া এই বালকটাই, আপনাকে এই অপবাদ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছে।"

জর্জ্জেটের নাম শুনিয়া কারনোয়েল ঈষৎ চমকিত হইলেন। কর্ণেল বলিলেন, "এই বালক আপনার হিতৈষী বলিয়া তাহার নাম করিলাম। সে আপনাকে গাড়ীতে দেখিয়া আপনার খোঁজে আসিয়াছিল, অনেক কষ্টে তাহাকে তাড়াইতে হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দিনই পড়িয়া গিয়া তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জন্মের মত তাহার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছে, সুতরাং তাহার সহায়তায় মুক্ত হইবারও আশা আপনার নাই।"

জর্জ্জেটের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া কারনোয়েলের মুখ বিবর্ণ হইল, তিনি কর্ণেলকে বলিলেন, "আপনি এ ব্যর্থ আলোচনা কেন করিতেছেন? আমি আপনাকে হাজার বার বলিয়াছি,—আবার এখনও বলিতেছি, আপনি আমার কাছে কোন কথা পাইবেন না। আপনি যতই প্রলোভন দেখান, প্রণয়সুখের যতই মোহময় ছবি অঙ্কিত করুন, আপনার মনোরথ সফল হইবে না। যদি বাস্তবিক কোন কথা বলিবার থাকিত, তাহা হইলে ইতস্ততঃ করিব কেন? প্রেমের কাছে জীবন তুচ্ছ, ষড়্‌যন্ত্রের সহচরেরা ত ছার। যদি আমি আপনার বাক্স চুরি করিয়া নিহিলিষ্টদিগকে দিতাম, তাহা হইলে মরু-হৃদয়-প্রেমার্থিনী এলিসের জন্য সেই বাক্স আবার কাড়িয়া আনিয়া আপনাকে দিতাম। আপনি আমাকে যে সুখের প্রলোভন দেখাইতেছেন, সেই সুখলাভের জন্য নিহিলিষ্টদিগের শত্রুতা তুচ্ছ করিতাম,—সহস্রবার মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করিতাম। আমি কিছুই জানি না, আমাকে পীড়ন করিয়া কিছুই জানিতে পারিবেন না। আমি আমার প্রাণের কথা বলিয়াছি। এখন যাহা অভিরুচি হয় করুন। প্রাণে মারিলেও আমার মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইবে না।" কর্ণেল ভ্রূভঙ্গী করিলেন, দশনপ্রান্তে গুম্ফাগ্রদংশন করিতে করিতে ভাবিলেন, "কারনোয়েলকে বন্দী করিয়া বুঝি যথার্থই ভুল করিয়াছি।"

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষ

(ভারতবর্ষের প্রচ্ছদ-পট দর্শনে)

নীলমণি হারে গাথা, আলো করি বসুমতী
জলধি-মেখলা পরি কে তুমি মা পুণ্যবতি ?
প্রসারিয়া কটিতট নীল জল কল কলে,
নীরময় মেখলায় ; কোটী নীলমণি জ্বলে।
কে তুমি মা বসে আছ,—রত্ন-সিংহাসন 'পরি
রাজরাজেশ্বরীরূপে ত্রিভুবন আলো করি ?
শ্যাম আভা মেঘরাশি মাখিয়া কনকাসারে ;
হাসিলে মধুরে ঊষা পূর্ব্বাসার হেমদ্বারে ;
অরুণের প্রেমমুখ, সলাজে বসন তুলি,
দেখে যথা পঙ্কজিনী প্রফুল্ল নয়ন খুলি।
সেই মত কে তুমি মা, অমরার দেবরাণি,
আবরিত শ্রীমুখের তুলিয়া বসন খানি ;
পরিপূর্ণ চন্দ্রমুখে ত্রিদিবের প্রভা মাখি,
দেখিতেছ একমনে খুলিয়া কমল-আঁখি !
মত্ত গজপৃষ্ঠে পাতি হিরণ্যের সিংহাসন,
বিশ্ববিজয়িনীরূপে চমকিয়া ত্রিভুবন,
বসিয়াছ রাজেন্দ্রাণী তেজোদৃপ্ত মহিমায় ;
শিথিল কোমল বাস লুণ্ঠিত কমল পায়।
শারদ মল্লিকা ফুল্ল কমনীয় কলেবর,
কি লাবণ্যে পূর্ণতায় প্রস্ফুটিত মনোহর।
প্রভাত ফুটনোন্মুখ জিনি নব শতদলে,
অম্লান যৌবন-কান্তি শোভে মুক্ত বক্ষঃস্থলে।
ম্লান করি তারকার অমল রজত-ভাতি,
রতনের সিঁথী শিরে দীপ্ত মণি পাঁতি পাঁতি।
কামিনী বকুল যুথি পদ্ম চামেলির বাসে,
চন্দনের গন্ধানিলে বরাঙ্গের গন্ধ ভাসে।
এত শ্রীসম্পদ নিয়ে, তুলিয়া বদন খানি
কে তুমি মা বসিয়াছ ভুবন-মোহিনী রাণী ?
তুমি মা ভারতরাণী, নহিলে জগতে আর
এত শ্রীসম্পদরাশি কোথা আছে সুষমার।
সভ্যতায় এ জগতে তুমি যে মা বিজয়িনী,
বিদ্যা-বুদ্ধি-অধিষ্ঠাত্রী তুমি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।

আসি বাণী তব গৃহে ধরি বীণা অবিরত,
গায়িল মা কবি কণ্ঠে তোমার মহিমা শত।
পদ্মরাগ মরকত হিরণ্য-হীরকহার,
তব কণ্ঠে আসি রমা পরাইল অনিবার।
স্বর্গ হতে মন্দাকিনী ঝরি স্রোত-জলে চুমি,
করিয়াছে পুণ্যময় মা তোমার দেবভূমি।
বালার্ক-কিরণে মাখি বিশপিত শ্যামকায়,
পুণ্য-জলে তব অঙ্কে কৃষ্ণতোয়া বহে যায়।
তোমার আকাশ বিনা কোথায় মা নীলাকাশে,
নির্ম্মল রজতে মাখা হেন ফুল্ল চন্দ্র হাসে !
কোথায় মা হেন দেশ, যেথানে লাবণ্য ধাম।
মনোময়ী প্রকৃতির চারুচিত্র অভিরাম।
কোথায় মা আসি বল আপনি প্রকৃতি-রাণী,
সাজাইল নানা রূপে শ্যাম বিধু মুখখানি।
সেই মা ভারত তুমি যেথানে মা নিরন্তর ;
খরতর তাপে বিভা নিত্য ঢালে প্রভাকর।
যেথানে নীরদ শ্যাম করে মৃদু গরজন,
দামিনী চমকি রূপে আলো করে ত্রিভুবন।
ময়ূর-চন্দ্রকে যথা শত চন্দ্র-পরকাশ,
কোকিলের কুহুকণ্ঠে জাগে প্রাণে অভিলাষ।
সুগন্ধি নিদাঘে যথা নিদাঘ রমণী হাসে,
মৃদু হাসি মাখা মুখে ইন্দু অব্দ পরকাশে।
যেথানে রমণী শ্যামা সুকোমলা নিরুপমা,
পদ্ম-চক্ষে কৃষ্ণ-বিভা, শ্যাম-রূপে অতুলনা।
এ নহে নীরদ শ্যাম কাল' রূপে অভিরাম,
এ যে হেমে প্রতিভাত পদ্ম-পলাশের শ্যাম।
আমরণ যথা নারী সতী সাধ্বী পতিব্রতা,
পতি-সঙ্গে হাসিমুখে হয় মাগো অনুমৃতা।
যথা গৃহ-অন্তরালে নারী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী,
মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা চির ধর্ম্ম-সহায়িনী।
যথায় কামিনী চাঁপা কুমুদ কহ্লার হাসে
বার মাস সমীরণ বহে শত ফুল-শ্বাসে।

গৃহ-লক্ষ্মী

শিল্পী-শ্রীযুক্ত সারদা চরণ উকিল] [স্বত্বাধিকারী শ্রীমন্মহারাজ

বর্দ্ধমানাধিপতির অনুমত্যনুসারে।

সেই মা ভারত তুমি, দীপ্ত শত মহিমায় ;
নহিলে মা এ ঐশ্বর্য্য আছে কার বসুধায় ?
তোমারি মা দেবভূমে আসি হরি দয়াময়,
কত বিধ রূপ ধরি করিল মা জ্যোতির্ম্ময়।
প্রথমে ভাসিল মহী প্রলয়-পয়োধি জলে,
মীন-রূপে চতুর্ব্বেদ উদ্ধারিল কুতূহলে।
কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠদেশে আনন্দে মন্দর ধরি,
মন্থিল মা তব সিন্ধু দেবাসুরে যত্ন করি।
মহাকায় বরাহের দংষ্ট্রে ধরি বসুমতী,
জলমগ্নে মা তোমায় রাখিল যে পুণ্যবতী।
তোমারি মা পুণ্যক্ষেত্রে নরহরি রূপ ধরি,
রক্ষিলা যে ভক্তে হরি অসুরে বিদীর্ণ করি।
কোটি চন্দ্রপ্রভা মুখে, মা তোমার পুণ্য দেশে,
আপনি আসিয়া হরি অতি খর্ব্বতর বেশে।
মাগিয়া ত্রিপাদ-ভূমি, নভঃস্থল বসুধায়,
ব্যাপিল কমল-পদে, পূর্ণব্রহ্মমহিমায়।
ভৃগু-রূপে তব বক্ষ কোটি নররক্ত জালে,
বহিল মা প্রবাহিণী খরতর করবালে।
বুদ্ধরূপে রুদ্ররূপ সম্বরিয়া পুনর্ব্বার,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" প্রচারিলে অনিবার।
রাম-রূপে দেখাইলে প্রেম প্রীতি-ভক্তিচয়,
পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণরূপে দেখাইলে ধর্ম্মে জয়।
কোথা হেন দেশ আছে জগতের অভ্যন্তরে,
যথায় মা চিরধর্ম্ম বিরাজিত ঘরে ঘরে।
কোন্ দেশ আছে মাগো হেন ধর্ম্ম পরায়ণ,
কোথা আছে বিশ্বভূমে হেন ধর্ম্ম সনাতন।
ঐশ্বর্য্য সম্পদ নিয়ে বসিয়াছ মহীতলে,
মানস-সৃজন তুমি বিধাতার সুনির্ম্মলে।
কত রাজ্যপাত হ'ল, হ'ল কত বিপ্লাবন,
দুরন্ত কালের করে সহিলে নিপীড়ন।
তুচ্ছ করি দম্ভভরে ভাসি আজি শান্তিজলে,
হাসিতেছ মৃদু হাসি কি মধুরে সুনির্ম্মলে।
আছ তুমি চির দিন, থাকিবে মা চিরদিন,
শত যুগে তব মুখ হইবে না বিমলিন।
বন্দিত অমর নর তুমি মা ভারত-রাণী,
কমল চরণে তব লুটে শত দেবেন্দ্রাণী।
শ্রীমুখের আবরণ নীরবে যতনে তুলি,
কি দেখিছ বল মাগো কমল-নয়ন খুলি ?

শ্রীহরিশচন্দ্র নিয়োগী।

বসন্তের টীকা

টীকা দেওয়ার উপকারিতা:—টীকা দেওয়ার সপক্ষে চিকিৎসাগ্রন্থে এবং সাময়িক পত্রাদিতে এত অধিক কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং নিত্য হইতেছে যে, স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট লোকেও এখন উহার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকে; সুতরাং সে বিষয়ে কোন কথা লিখিয়া প্রবন্ধ-কলেবর বৰ্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করি না। অধিকন্তু, জগতের প্রায়ই সমুদায় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক উহা "অবশ্য প্রতিপাল্য" (compulsory), এবং অবহেলা করিলে বিশেষভাবে শাস্তিভোগ করিতে হইবে, বলিয়া বিঘোষিত থাকায়, উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিবার জন্য কেহই তেমন আগ্রহ করে না। কিন্তু অধুনাতন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-যুগে শিক্ষিতমণ্ডলী কোন প্রকার অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে চাহেন না।—ইহা যে খুবই সুখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই! এ প্রকার অনুসন্ধিৎসা বর্ত্তমান না থাকিলে কি জগতে কখন সত্য প্রকাশিত হইতে পারিত? তাই, আজকাল চিকিৎসা-বিদ্যার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কর্তৃক, এই টীকার উপকারিতা জগতে প্রচারিত হইতেছে!

টীকা দেওয়ার কুফল সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দেহ করেন, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য কএক বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ষ্টেট্স্‌ম্যান্ (Statesman) পত্রিকায় এসম্বন্ধীয় একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; লেখকের মত বিশেষ যুক্তিযুক্ত।

বিরুদ্ধ মত,—যে সুস্থকায় শিশুর শরীরস্থ শোণিত জন্ম গ্রহণের পর হইতে এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রহিয়াছে—আশঙ্কিত বসন্ত পীড়া হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কেন যে পীড়িত গোরুর ক্ষত হইতে গ্লিসারিনসংযুক্ত পূয় দ্বারা তাহা বিষাক্ত করিতে আইন অনুসারে বাধ্য করা হইতেছে, তাহার সদুত্তর আজও কেহ দিতে পারেন নাই।

সকলে বলিয়া থাকেন যে, এই গো-বীজদ্বারা টীকা দেওয়া প্রথার আবিষ্কর্ত্তা এবং মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা ইষ্টবিধানকর্ত্তা হইতেছেন—জেনার (Jenner) নামক একজন সাহেব; কিন্তু ডাঃ জিফোর্ড (Gifford) আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্যারিস সহরে ১৮৯৯ সালের মহতী আন্তর্জাতিকসভায় (International Congress) বলিয়াছিলেন, "এডওয়ার্ড জেনারের স্মৃতিরক্ষার্থ যে বৃহৎ স্তম্ভ (monument) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা তাহার গাত্রে এই কথা কয়টি লিখিয়া রাখিবে:—

'Accursed be the man by whose cunning device The blood of all Nations has been poisoned'. অর্থাৎ যাহার আবিষ্কৃত পন্থায় জগতের সর্ব্ব জাতির শোণিত দূষিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে শত অভিশাপ!!!

টীকাদান প্রথার আবিষ্কর্ত্তা কে?—প্রকৃতপক্ষে মিঃ জেনার টীকাদান প্রথার আবিষ্কর্ত্তা নহেন। তিনি তৎকালে প্রচলিত এই প্রথাটির একজন বিশিষ্ট পরিপোষক মাত্র।

জেনারের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই ইংলণ্ডের গ্লাষ্টার সায়ারে, এবং অশ্বশালার অপরিচ্ছন্ন লোকেদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, গো-বসন্তের সংস্রবে যাহারা আসিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে বসন্ত-পীড়ার প্রকোপ লক্ষিত হয় না! এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই মিঃ জেষ্টে (Jestes) নামক কৃষক তাহার নিজ পরিবার মধ্যে (বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য) গো-বসন্তের বীজ প্রত্যেকের শরীরে প্রবেশ করাইয়া, গো-বসন্ত (cow-pox) উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা জেনার-কৃত আবিষ্কারের ২০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই উহা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে জেনারের শিক্ষাদাতা বৃদ্ধ ডাঃ জন হাণ্টার (John Hunter) যখন এই প্রথাটি সাধারণে প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন অশিক্ষিত গো-বৈদ্যেরা (Cow-doctor) উহা দেখিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারে নাই। পরিশেষে, স্বয়ং জেনারও যখন বিধিমতে উহার প্রচালন জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তখনও এবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ—পূর্ব্বোক্ত গো-বৈদ্যেরা ঐ প্রথার অকৃতকার্য্যতার বহু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিয়াছিলেন। জেনার কিন্তু তাহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একটি কৌশলের অবতারণা করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, এই গো-বসন্ত

দুই প্রকারের আছে,—(১) প্রকৃত ও (২) অপ্রকৃত। অধুনা, সেই কৌশলের দোহাই দিয়াই কর্তৃপক্ষীয়েরা আমাদের জন্য গো-বীজ (calf-lymph) রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

জেনার বলিলেন যে, ইহার প্রকৃত বীজ কেবলমাত্র অশ্বের খুরের মধ্যস্থিত চর্ব্বিযুক্ত পদার্থেই পাওয়া যায়; তিনি পূর্ব্বোক্ত গো-বৈদ্যগণের সহিত একমত হইয়া স্বীকার করেন যে, গো-বসন্তের বীজ দ্বারা প্রকৃত বসন্তরোগ নিবারিত হইতে পারে না। পরিশেষে কিন্তু জেনার সাহেব নিজেই অশ্বের খুরস্থ চর্ব্বি হইতে নীত পদার্থের বীজ প্রচলিত না করিয়া, যে গো-বীজের কথা পূর্ব্বে অফলদায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাই প্রচলিত করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অধুনা প্রচলিত গো-বীজ (লিম্ফ) থিয়রি তাহার আবিষ্কর্ত্তা-কর্তৃকই অফলদায়ক বলিয়া পূর্ব্বে স্বীকৃত হইয়াছিল!! তবেই বুঝুন উহার রোগ-দূরীকরণের ক্ষমতা কতদূর।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, যাহাদের টীকা দেওয়া হয় নাই (unvaccinated) তাহাদের দ্বারা টীকাগ্রহণকারি-(vaccinated) গণেরও মধ্যে রোগাক্রান্তের আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে ডাঃ ক্রেটন্ (Dr. Creighton) ভ্যাক্‌সিনেশন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টতঃই উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, টীকাগ্রহণকারী ব্যক্তিই সর্ব্বপ্রথমে এই পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হয় এইরূপ দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ডের বসন্ত-রোগাক্রান্ত রোগীর তালিকায় দেখা যায়, যে শতকরা—৩০ জনই টীকাগ্রহণকারী। তবে আর টীকা লওয়ার আবশ্যকতা, অথবা উপকারিতা কি? যখন সাধারণলোক অশিক্ষিত এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল, যখন isolation, অর্থাৎ সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত রোগীকে পৃথক্ করিয়া রাখার প্রথা, প্রচলিত ছিল না, তখন নিশ্চয়ই এই ভ্যাক্‌সিনেশনের আবশ্যকতা ছিল এবং উপকারিতাও দেখা গিয়াছিল। যে সময়ে টীকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখনকার সহিত এখনকার সকল অবস্থাই—বিশেষতঃ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী—সকল দেশেই অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে দেখিতে পাই, সুতরাং এখন আর ঐ ভ্যাক্‌সিনেশনের প্রয়োজনীয়তা তেমন দেখি না।

বিরুদ্ধ মতের পোষকগণ—টীকা দেওয়ার বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের (Anti-vaccinationist) ভিতর যে সব বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক-ধুরন্ধরদিগের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জনের মাত্র নাম নিম্নে প্রকাশ করা গেল:—Alexander M. Ross (এম্, ডি ; এম্, এ ; এফ, আর, এস্ ; লণ্ডন) ; George Gregory (লণ্ডনের বসন্ত-রোগীর হাঁসপাতালের ৫০ বৎসর যাবৎ ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ) ; W. T. Collins (২৫ বৎসর যাবৎ লণ্ডনের পব্লিক্ ভ্যাক্‌সিনেটার) ; Dr. John Epps (২৫ বৎসর যাবৎ লণ্ডনের জেনেরিয়ান হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ) ; Dr. Stowel, M. R. F. S. (৩০ বৎসর যাবৎ লণ্ডনের টীকার চিকিৎসক) ; Sir James Paget (মৃত মহামান্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অতিরিক্ত অস্ত্র-চিকিৎসক) ; Thomas Skinner, M. D., L. R. C. S (লিবারপুল) ; T. M. Kenzir, M. D., F. R. C. S. (স্কটলণ্ড) ; Sir Joseph Pease Bart M. D. M. P. (ইংলণ্ড) ; Robert Liking, M. D., F. R. C. S. (মিড্‌লসেক্স হাঁসপাতালের চর্ম্মরোগ-বিভাগের চিকিৎসক) ; Walter R. Hadman, M. D. (লণ্ডন) ; Charles Creighton, M. D. (লণ্ডন) প্রভৃতি। উল্লিখিত সকলেই বসন্তরোগের চিকিৎসার সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞান মত যাহা সত্য বিবেচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন্ ব্যক্তি অবিশ্বাসী হইতে পারেন?

স্যর টমাস্ চেম্বার্স এক সময়ে বিলাতের পার্লামেন্টে বলিয়াছিলেন, "টীকাদ্বারা যে কোন লোকের জীবন রক্ষা হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত কেহই স্পষ্টতঃ দেখাইতে পারিবে না!" অধিকন্তু ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অধ্যাপক আল্‌ফ্রেড রসেল ওয়ালেস্ (২০ বৎসর যাবৎ যিনি ভ্যাক্‌সিনেশনের গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন) বলেন, "টীকাদ্বারা একটি জীবনও যে রক্ষা পাইয়াছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না—কিন্তু, সম্ভবতঃ, বসন্ত-রোগ অপেক্ষা ইহাই যে মৃত্যুর সমধিক কারণ, তাহা সুন্দররূপেই দেখান যাইতে পারে!"

টীকার পক্ষ সমর্থনকারিগণের মধ্যে, আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক (Gaunda) গণ্ড এবং ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ডাঃ থর্ণ (Thorn), উভয়কেই যখন "রয়াল কমিশনে" প্রশ্ন করা হয় যে,—"ভ্যাক্‌সিনেশন্" কি ? তখন তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে, "তাঁহারা বিশেষ অবগত নহেন !"

টীকা দেওয়া কেন বাঞ্ছিত নহে ঃ—টীকা দেওয়ার প্রধান মন্দ ফলগুলি আমরা ৩টি প্রস্তাবে দেখাইব ;—(১ম) টীকা দেওয়ায় বসন্তরোগের আক্রমণ প্রায়ই প্রতিরোধ করিতে পারে না ; (২য়) টীকাদ্বারা মনুষ্যদেহে নূতন রোগের সৃষ্টি হয় এবং পুরাতন গুপ্তযাপ্য পীড়াদি পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে ; (৩য়) টীকা দেওয়ার ফলে, সময়ে সময়ে, মৃত্যু পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে।

আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ত্রয়ের প্রথমটির সত্যতা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠেই জানিতে পারা যাইবে ; উহার পরিসর-বৃদ্ধিকল্পে আর বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না—কেবল জাপানের—যে দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা পুনঃ পুনঃ টীকা লইতে আইনানুসারে বাধ্য এবং আজ পর্য্যন্ত যাহারা কেহ তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে নাই—গবর্ণমেণ্ট-স্বাস্থ্য-বিবরণী হইতে কএকটি ভয়াবহ সত্য (grim truth) দেখাইতে চাহি—"পুনঃ পুনঃ টীকা দেওয়া সত্ত্বেও এখানে প্রতি বৎসর অসংখ্য লোক বসন্তরোগে মারা যায় ; ১৮৮৬-৯২ সালের মধ্যে ৩৮৯৭৯টি টীকা-গ্রহণকারী লোকের বসন্ত-পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে,—এই রোগাক্রান্তের সংখ্যা মোট ১৫৬১১৭৫ ; অর্থাৎ শতকরা ২৫ জন মারা গিয়াছে। এখানে প্রতি শিশুকে ১ বৎসরের মধ্যেই টীকা দেওয়া হয় ; উহা যদি ভাল ভাবে না উঠে, তবে ঐ বৎসরের মধ্যেই আর একবার টীকা দেওয়ার নিয়ম আছে ;—পরে ৫।৭ বৎসর অন্তর আবার দিবার নিয়ম। ইহা ব্যতীত, বসন্ত দেখা দিলেই, সকলকেই নূতন করিয়া টীকা লইতে হয়। কিন্তু তাহাতেই বা ফল কি হইতেছে ? ১৮৯২-৯৭ সালের মধ্যে ১৪২০৩২ জন বসন্ত-রোগাক্রান্তের মধ্যে ৩৯৫৩৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে"! ১৯০৭ সালে জাপানে এই বসন্ত-পীড়ায় মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৪২ জন ; জানিতে পারা গিয়াছে—১৯০৮ সালে তাহা শতকরা ৩২ জনে পরিণত হইয়াছিল !

টীকা দেওয়া সত্ত্বেও বসন্তরোগে মৃত্যুর হার ঃ—জগতের কোন দেশই জাপানের ন্যায় এই টীকাদান প্রথার পক্ষপাতী নহে—তথায় একটি প্রাণীও unvaccinated থাকে না – কিন্তু তথাপি ঐ স্থানে এই রোগে এত অধিক মৃত্যুসংখ্যা কেন দৃষ্ট হয় ? এই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াও কি বুঝিতে হইবে যে, "পুনঃ পুনঃ টীকা দেওয়ায় আর বসন্তরোগ হইতে পায় না" ? অন্যান্য দেশের হাঁসপাতাল বিবরণী হইতে নানা তালিকা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার আর আবশ্যক কি ? এক জাপানের দৃষ্টান্তই কি যথেষ্ট নহে ? লণ্ডনের বসন্ত-রোগের হাঁসপাতালের বিবরণী হইতেও দেখিতে পাই যে, সমুদয় বসন্তরোগীর মধ্যে টীকা-গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে ; যথা :—

১৮২৬ সালে	...	...	শতে "	৩৮
১৮৩৫-৪৫ "	...	...	"	৪৪
১৮৪১-৫৫ "	...	...	"	৬৪
১৮৫৫-৬৫ "	...	...	"	৭৮
১৮৭৮-৭৯ "	...	...	"	৯৩
১৮৮৫ "	...	...	"	৯৩
১৮৮৮-৯১ "	...	...	"	১০০

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, উপরোক্ত কোন তালিকাই টীকা দেওয়ার বিরুদ্ধবাদিগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত নহে !

নবরোগের সৃষ্টি ঃ—এইবার টীকা দেওয়ার ফলে শরীর-বিধানে যে সমস্ত রোগের নবসৃষ্টি হইতে পারে, সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিব। ডাঃ ক্রেটন বলেন—"গো-বসন্তের সাদৃশ্য প্রভৃতি বসন্তের মত না হইয়া বরং উপদংশের (syphilis) সহিতই সমান হইতে দেখা যায়"। মোস্‌লি ও বার্ড (Mosely and Bird), জেনারের সমসময়েই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং ১৮৬৫ সালে ডাঃ Auzius Tuerenneও এ বিষয়ের (অর্থাৎ উপ-দংশের সহ সাদৃশ্যের) পোষকতা করিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়। বেল্‌জিয়াম্ মেডিকেল একাডেমীর অধ্যক্ষ ডাঃ হিউবার্ট বিউয়েন্‌স্‌ও (Hubert Buens) টীকা দেওয়া হইতে যে উপদংশরোগের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা গবেষণাদ্বারা (Research) নিরাকরণ করিয়াছিলেন।

অধিকন্তু জার্ম্মানির ভ্যাক্সিনেশন-কমিশনে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৮৮০—৮৪ সালের মধ্যে, টীকা দেওয়ার ফলে ৭৫০ জনের উপদংশ-পীড়া হইতে দেখা গিয়াছিল। ফরাসী দেশীয় অধ্যাপক ফর্‌নিয়ার্ (Fournier) বলেন যে, "টীকা দেওয়ার ফলে প্রত্যেকেরই জীবনে এক বা ততোধিকবার তৎফল-প্রসূত উপদংশ-পীড়া হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।" এইরূপ নানা পণ্ডিতের গবেষণার ফল আমরা উল্লেখ করিয়া টীকা-জনিত বিভিন্ন রোগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। উপদংশ পীড়ার বীজ শারীর-বিধানে প্রবেশের ফলে যতপ্রকার রোগের বিকাশ হইতে পারে, তাহার আলোচনা-সূত্রেই আমাদের মধ্যে ক্যান্সার, ক্ষয়কাশ, পক্ষাঘাত, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডীয় পীড়াদি এবং মনুষ্যদেহের অস্থির ধ্বংস ও ক্ষত প্রবণতা এক্ষণে কেন এত অধিক লক্ষিত হইতেছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, উক্ত প্রকারে আমরা স্বাস্থ্য ও জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া প্রতিদানে পাইতেছি কি? "টীকা দেওয়ার ফলে বসন্তপীড়ার—যাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ের উন্নতি-সাধনে কদাচিৎ লক্ষিত হইয়া থাকে—আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে—(*may escape*)"—ইহার অধিক আর কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন কি? স্বাস্থ্য-বিষয়ের উন্নতিসাধন, সংক্রামক-রোগীকে পৃথক্‌করণ (isolation), ইত্যাদিদ্বারা যদি এই বসন্ত-পীড়ার গতি প্রতিরোধ করিতে না পারাই যায়, তাহা হইলে বরং ঐ পীড়ায় আমাদের মৃত্যু শ্রেয়ঃ;—তথাপি আপাতঃশান্তির আশায় বংশের দুলালগণের কচি শরীরে নীচ গোপালকগণের ঘৃণ্য রোগবীজ প্রবেশ করিতে দেওয়া সমীচীন নহে। বলা বাহুল্য যে, প্রায়ই গোপালক-গণের ঘৃণ্য উপদংশীয় ক্ষতাদিসংসৃষ্ট গো-বসন্তের বীজ হইতে টীকা দেওয়ার ফলেই উপদংশ-পীড়ার আক্রমণ হইয়া থাকে। ডাঃ বুয়েন্‌স্ বলেন যে—"যখনই টীকা-বীজ বালক-শরীরে উত্তমরূপে প্রকাশমান হইয়াছে, তখনই অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে যে, যে-গরুর গাত্র হইতে বীজ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার রাখালগণের শরীরে উপদংশীয় ক্ষত বর্ত্তমান ছিল।"

টীকা দেওয়ার ফলে মৃত্যু:—উপদংশ-বিষে শোণিত কলুষিত করা ব্যতীত, টীকা দেওয়ার ফলে নিম্নলিখিত পীড়াদি হইতে মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে:—

১। 'টেক্‌সাস্ নগরে ১৫ই মে একটি বালক টীকা দেওয়ার ফলে ধনুষ্টঙ্কার লক্ষণযুক্ত হইয়া মারা যায়; ৪ঠা ও ৬ই জুন আরও দুইটি বালক উইস্‌কন্‌সিন্ ভিন্নার পার্কে মারা যায়।'—১৯০৯ সালের ভ্যাক্‌সিনেশন এন্‌কোয়ারার।

২। 'চার্লস্ ব্রুম্‌ফিল্ড নামক ১টি ৮ মাসের বালকের এরিসিপেলসে মৃত্যু ঘটায় চিকিৎসক অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, ঐ বিষ টীকা দেওয়ার ক্ষত দিয়া বালকের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল—অবশ্য টীকা দেওয়াই যে উহার উৎপত্তির কারণ, তাহা নহে; তবে এরিসিপেলাসের বীজ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার পক্ষে উহা সহায়ক ছিল।'—১৯০৯ সালের অক্টোবর মাসের ঐ পত্রিকা।

৩। 'টীকা দেওয়ার ফলে শরীরে উপদংশের বীজ প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকিতে দেখা যায়।'—রয়েল কমিশন রিপোর্ট।

৪। 'টীকা দেওয়ার ফলে স্বাস্থ্যবান্ শিশুকেও অকালে শুকাইয়া মারা যাইতে আমি দেখিয়াছি।'—ডাঃ টর্‌নবুল।

৫। 'টীকা দেওয়ার ফলে শরীর নিশ্চয়ই অসুখগ্রস্ত হয়; অধিকন্তু দেখা গিয়াছে, ঠিক দেওয়ার জন্য না হইলেও তাহার পরিণাম (sequale) ফল হইতে (প্রধানতঃ এরিসিপেলাস্ দ্বারা) বহু লোক মারা যায়।'—ব্রিটিশ্ মেডিকেল জর্ণাল।

৬। 'টীকা দেওয়ার ফলে নেটিভ-(তদ্দেশীয়)গণের মধ্যে অনেক শিশুই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।'—নেটাল্ উইট্‌নেস্।

৭। 'ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, যখন টীকা দেওয়া না দেওয়া সাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত (১৮৪৭—৫৩), তখন ১ বৎসর বয়স্ক শিশুগণের চর্ম্মরোগে মৃত্যু সংখ্যা ১০ লক্ষের মধ্যে ১৮৩ জন মাত্র ছিল; পরে, যখন (১৮৫৩—৬৭) উহা সম্পূর্ণরূপে আইনানুসারে বাধ্যতার ভিতর আনা হয় নাই, তখনও, মৃত্যু-সংখ্যা পূর্ব্ব অনুপাতে ২৫৩ ছিল; কিন্তু আইনের দৃঢ়-বন্ধন প্রবর্ত্তিত করিবার পর, (১৮৬৭—৭৮) ঐ অনুপাতে মৃত্যু-সংখ্যা ৩৪৩ জনে দাঁড়াইতে দেখা গিয়াছে! এইরূপ তুলনায় স্ক্রফুলায় মৃত্যু-সংখ্যা ৩৫১—৬১১—৯০৮;

কিন্তু উপদংশে উহা যথাক্রমে ৫৬৪, ১২০৬ এবং ১৭৩৮—দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত পীড়ায় মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ৩০ জন হিসাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।'—'টীকা দেওয়ার কুফল'—জোসেফ কলিন্‌সন্।

৮। ক্যান্সার এবং 'ফুট্ ও মাউথ্' পীড়ার উৎপত্তি অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে যে, এগুলিও টীকা দেওয়ার ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত তালিকা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে যে, উল্লিখিত পীড়াদি হওয়ার সম্ভাবনা ব্যতীত টীকা দেওয়ার ফলে শরীর মধ্যে নৈদানিক পরিবর্ত্তনে প্রদাহ ও পূয় সঞ্চারিত হয়; সুতরাং উহার পরিণাম-ফলে আরক্ত-জ্বর, ডিপ্‌থিরিয়া, মেনিন্‌জাইটিস্, পেরিকার্ডাইটিস্, এণ্ডো-কার্ডাইটিস্, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, এপেণ্ডিসাইটিস্, ক্যান্সার, এরিসিপেলস্, পায়িমিয়া, টিটানস্, টাইফয়েড জ্বর, বাত, ব্রাইট্‌স্ পীড়া, এবং টুবারকুলোসিস্ পীড়াদি দেখা দিতে পারে। এই সমুদয় পীড়া শিশুগণের পূর্ব্বে বড় একটা হইত না, কিন্তু এখন বহুল পরিমাণেই সর্ব্বদেশে দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে, "টীকা দেওয়াই" উহার মূল কারণ। আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক সহরের ১৯০৪ সালের স্বাস্থ্য-বিবরণী হইতে পূর্ব্বোক্ত রোগাদিতে শিশুগণের মৃত্যু-সংখ্যা দেখাইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।—আরক্ত-জ্বরে ৩০৩; ডিপ্‌থিরিয়ায় ৪৭০; যক্ষ্মাকাশ-জাত তরুণবাতে ১২০; মেনিন্‌জাইটিসে ১১৯৭; হৃৎপীড়ায় ৩১৩; নিউমোনিয়ায় ৭১৭; এপেণ্ডিসাইটিসে ১৮৩; ব্রাইট্‌স্ পীড়ায় ১১২; নিফ্রাইটিসে ১০০; ক্যান্সারে ২৫; এরিসিপেলসে ৫; পায়িমিয়ায় ৫; টিটনাসে (ধনুষ্টঙ্কার) ১১;—এই মৃত্যুর উল্লিখিত হার সমুদয়ই ৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে জানিবেন।

ইহার উপরও কি কেহ এই টীকা দেওয়ার প্রথার অনিষ্টকারিতার বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারিবেন? টীকা দেওয়ার সপক্ষীয়েরা বলিয়া থাকেন যে, পুনঃপুনঃ টীকা দেওয়াই (revaccinations) বসন্তরোগের একমাত্র প্রতিষেধক; কিন্তু জাপানের স্বাস্থ্য-বিবরণী হইতে টীকা-গ্রহীতাদিগের মধ্যে বসন্ত-রোগে মৃত্যুসংখ্যা দেখাইয়া, ঐ যুক্তি যে অসার, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। টীকা দেওয়ার বিরুদ্ধে যে সমুদয় যুক্তিদ্বারা ঐ প্রথার অসারতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা আমরা করিয়াছি, তাহার সত্যতার বিষয়ে কাহারও সন্দিহান্ হইবার উপায় নাই; কেননা তৎসমুদয়ই অফিসিয়াল (official) অর্থাৎ সরকারী স্বাস্থ্য-বিবরণী এবং রয়াল কমিশনের সাক্ষ্য হইতে সংগৃহীত। এখানে আমরা আরও তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইংলণ্ডের লিষ্টার সহরেই সর্ব্বপ্রথমে বসন্ত-রোগ প্রতিবিধানের জন্য, জেনারের মতানুযায়ী টীকা দেওয়া ব্যতীত, অন্য উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। সে উপায়টি আর কিছুই নহে—মাত্র সহরের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া এবং যথাসাধ্য বসন্ত-রোগের উদ্ভবের কারণগুলি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করা। ইহার ফল যে কতদূর উৎসাহবর্দ্ধক এবং আশাজনক হইয়াছিল, ডাঃ স্কট টেব, M. A., M. D., D. Ph. সাহেবের অনূদিত উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইবে। তিনি বলেন যে, "১৮ বৎসর যাবৎ সমুদয় ভূমিষ্ট শিশুর টীকা দেওয়ায় ১৮৭০-৭২ সালের এপিডেমিকে (ক্লেণ্টসায়ারে) মোল্ড সহরে দেখা গিয়াছিল যে, প্রতি ১০ লক্ষের মধ্যে ৩৬৩৭ জনের বসন্ত-রোগে মৃত্যু হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৯২ সালের এপিডেমিকে লিষ্টার সহরে (—তথায় প্রায় কাহাকেও টীকা দেওয়া হয় নাই) বসন্তরোগে মৃত্যু-সংখ্যা ১০ লক্ষে মাত্র ১১৪ জন!!!

বিভিন্ন দেশীয় স্বাস্থ্য-বিবরণী পাঠে সকলে আমাদের কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া, এখানে আর তালিকা দেওয়া হইল না। যাবতীয় সভ্যদেশেই এখন ইহার বিরুদ্ধে একটি প্রবল-আন্দোলন চলিতেছে—এবং দিন দিন শিক্ষিতমণ্ডলী টীকা না দেওয়ার পক্ষপাতীই হইয়া পড়িতেছেন; কিন্তু যতদিন দেশের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উহা উপলব্ধি না করিতেছেন, ততদিন ইহার প্রতিকার সম্ভাবনা সুদূরপরাহতই থাকিয়া যাইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র।

সাহিত্য-সম্মেলনে

(আলোকচিত্র)

মুখবন্ধ

উত্তম শুক্রবারের (Good Friday—তর্জ্জমা ঠিক হইল কি না বিশ্বপরীক্ষকগণ বিচার করিবেন) সাহিত্যিক গাওনার পালা শেষ হইয়াছে। এখন সকলের মুখ বন্ধ হইবার সময়। অপরের মুখ বন্ধ করিবার পূর্ব্বে নিজের মুখের লাগামও একটু কষিয়া ধরিতে হয়, এজন্য বর্ত্তমান মুখবন্ধের অবতারণা। আমরা চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, কর্ণে যাহা শুনিয়াছি, এবং মনে যাহা ভাবিয়াছি, (কেন না মনের অগোচর পাপ নাই) সে 'সকল কথাই প্রকাশ করিয়া বলিব'—বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। অতএব স্বীকার করিয়া যাইতেছি যে, কোন কোন বিষয়ে আমাদের মুখ বন্ধ থাকিবে।

উদ্যোগপর্ব্ব

শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সাহিত্য-সম্মেলনের (সম্মিলন, না সম্মিলনী?) নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন?" আমি শূন্যবাদীদিগের ন্যায় ঔদাসীন্য দেখাইয়া বলিলাম—"না"। তিনি বলিলেন, "সে কি? আপনি 'সভ্য' হইয়াছেন, চাঁদা দিয়াছেন,—নিমন্ত্রণ পান নাই? আচ্ছা, আমি আজ সেখানে যাইতেছি, যতীন্দ্র বাবুকে বলিয়া কালই যাহাতে নিমন্ত্রণ পান তাহা করিব।" পরদিনই ডাকযোগে একখানা খামের চিঠি আসিল। অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখি, তাহাতে একখণ্ড মুদ্রিত পত্র—উহাই মহতীমণ্ডলীর মহা-আহ্বান। আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে সমুত্থিত অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা-বিমিশ্রিত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নীরবে—উদ্দেশ্যে—বন্ধুর চরণে সমর্পিত হইল। আমি ধন্য, আমার বন্ধুবান্ধব ধন্য, আমার প্রিয় জন্মভূমি ধন্য, যে আমি আজ বহুবর্ষবাঞ্ছিত সাহিত্যসেবার সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হইলাম! সঙ্গে সঙ্গে একটু তৃপ্তিবোধ হইল যে, সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষেরা, ক্রটী দেখাইয়া দিলে, সংশোধন করিতে নারাজ নহেন।

আনন্দোচ্ছ্বাস একটু প্রশমিত হইলে, আমি নিমন্ত্রণ-পত্রখানা সাবধানতার সহিত, এমন—অযত্নের—ভাবে রাখিয়া-দিলাম যে আমার নিকট যিনি আসিবেন তাঁহারই দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমার উদ্দেশ্য ও আয়োজন ব্যর্থ হয় নাই।

প্রথমদিনের পালা

শুক্রবার অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় টাউনহলে সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্যারম্ভ হইবার কথা। দুইটার সময়েই স্থান পূর্ণ হইবে—অতএব একটার সময় সাজসজ্জা করিয়া বহির্গত হইয়া নুতনতম ব্যয়ে হ্রস্বতম পথে ডালহৌসী স্কয়ারে উপনীত হইলাম। ডিস্পেপ্‌টিক্ চরণযুগল যথাশক্তি দ্রুতবেগে বহন করিয়া আমাকে বিরাটকায় সভামণ্ডপের দ্বারদেশে পৌছাইয়া দিল;—কিন্তু হায়! ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর বিজয়ী-বীর ওয়েলিংটনের প্রতি স্যর ওয়াল্‌টার স্কট্ যেমন নির্ব্বাক্ সম্ভ্রমদৃষ্টি করিয়াছিলেন, রাজধানীর জনতাপূর্ণ, সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মে কেহইত আমার ন্যায় সাহিত্য-সেবকধুরন্ধরের প্রতি সেরূপ দৃষ্টি-পাত করিল না। দ্বারদেশেই বা সে সংবর্দ্ধনা কোথায়? কল্পনানেত্রে মোহনচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলাম,—অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া প্রসারিত বাহুযুগলে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া আপ্যায়িত করিবেন; কিন্তু কি পরিতাপ! এখানে দেখি, সাহিত্যমন্দিরে স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ-অধিকার। শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সাহিত্যসম্মেলনের অনুষ্ঠাতা ও উদ্যোগিগণ যে এত পরিপক্ক, তাহা পূর্ব্বে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। সৌভাগ্যক্রমে সোপানাবলীর অধোভাগে বিদ্যাগুরু ললিতকুমার, সতীর্থ বিপিনবিহারী, মধুরপ্রকৃতি গৌরহরি, ও শ্লেষসমালোচনাপটু হেমেন্দ্রপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা সদলবলে সভায় প্রবেশোদ্যত হইলাম। নিমন্ত্রণপত্রের পাদটীকায় লিখিত ছিল, "এই পত্র দ্বারদেশে দেখাইতে হইবে।" কাহাকে দেখাইতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণের 'round table'এ' গিয়া তাহা 'পেশ' করিলাম। তাঁহারা আমার নাম লিখিয়া লইয়া একটি পীতবর্ণের রেশমচিহ্ন—সম্মেলনের ভাষায় 'নিদর্শন' (badge)—প্রদান করিলেন। আমি আপত্তি

করিয়া বলিলাম, "আমার বোধ হয় কোনও প্রকার চিহ্নের প্রয়োজন হইবে না।" তাঁহারা বলিলেন, তথাপি "একটা-লইয়া যাওয়া ভাল।" আমি "তথাস্তু" বলিয়া চিহ্নিত হইয়া বন্ধুদিগের সঙ্গে মণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, সেই চিহ্নবিভ্রাট্ আমাকে ডেলিগেট্ বা প্রতিনিধিসদস্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিয়াছে। ললাটলিপি কেহ খণ্ডাইতে পারে না;—অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালী তাহা বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনের সারমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

বন্ধুদিগের বক্ষে আস্মানী রঙ্গের চিহ্ন। আমরা, ভলাণ্টিয়ারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, মঞ্চোপরি পশ্চাদ্ভাগে বেত্রাসন গ্রহণ করিলাম। মঞ্চের উপর—পুরোভাগে সাঙ্গোপাঙ্গ মহামান্য শ্রীযুক্ত গভর্ণর বাহাদুরের সিংহাসন; তাঁহার পার্শ্বে সভাপতির আসন; পশ্চাতে বেত্রাসন এবং সুকোমল শয্যাসমন্বিত খট্টাসন;—তাহাতে "মহিলাদিগের জন্য" বলিয়া টিকিট মারা ছিল। আমাদিগের পশ্চাতে, সুশোভিত স্তম্ভাবলীতে, লিখিত ছিল—"নিমন্ত্রিতদিগের জন্য", "সদস্যদিগের জন্য"। সুতরাং আমরা কতকটা নিরুদ্বেগেই ছিলাম; কিন্তু ইতোমধ্যে ব্যূঢ়োরস্ক নধরকান্তি শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া ভয় দেখাইয়া গেলেন, 'লাটসাহেব আসিলে আপনাদিগকে হয়ত এখান হইতে উঠিয়া পিছনে যাইতে হইবে, যেহেতু তাঁহার সঙ্গী দলবলের জন্য স্থান করিয়া দিতে হইবে।' আমরা ভয়ে ভয়ে ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে সরিতে আরম্ভ করিলাম; আর আমাদের ত্যক্ত রিক্ত আসনসকল অপর যাঁহারা অধিকার করিতে লাগিলেন—জানি না তাঁহারা কোন্ লাটের পার্শ্বচর! মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট (reserved) আসনে ক্রমে এক একজন 'বাবু-মহিলা' প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম আসিলেন—গুম্ফ-শ্মশ্রু-বিহীন শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়;—তাঁহাকে লইয়া আমরা একটু রসিকতা করিয়া বলিলাম, "আপনার ঐস্থানে বসিবার অধিকার আছে বটে।" তৎপর আসিলেন—বঙ্গবাসীর বিহারী। এই সকল সুন্দরী মহিলা-বৃন্দের আবির্ভাবে আমাদের ক্ষুদ্র বৃত্তে হাসির রোল উঠিল। অনন্তর তালপত্রের সিপাহীর বেশে ব্যোমকেশ প্রবেশ করিলে, তাঁহার প্রতি সকলে 'চোকা চোকা' ব্যঙ্গ-শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। বেচারী তখন যেরূপ ব্যস্ত, সে সকল বাক্যবাণ তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল কি না কে জানে?—কিন্তু তাঁহাকে দ্রুত চলিয়া যাইতে দেখিয়া—আমরা যুদ্ধজয়ী হইয়াছি, বেচারী রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল, বুঝিয়া একবার হাসিয়া লইলাম। হঠাৎ চটপটি করতালি-ধ্বনি শুনিয়া—'লাট, লাট' সাড়া পড়িয়া গেল! আমরা দণ্ডায়মান হইলাম; চাহিয়া দেখি—প্রিয়দর্শন রবীন্দ্র-নাথ মঞ্চে আরোহণ করিতেছেন। তালবৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে ভূমিতলে পতিত হইলে যেরূপ শরীরে একটা আকস্মিক ধাক্কা লাগে, মহামান্য লাটের পরিবর্ত্তে কবি রবীন্দ্র-নাথকে দেখিয়াও মনে সেইরূপ একটা ধাক্কা বোধ করিলাম। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের অনুরাগের অভাববশতঃ নহে—ব্যাহত আশার পরিণামবশতঃই এরূপ হইল। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে বাল্যবন্ধু সহপাঠী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন একদিন গল্প করিতেছিলেন যে, য়ুরোপে ভ্রমণকালে গতবৎসর তাঁহার কোন ইটালীয় বন্ধু বাঙ্গালীজাতির সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "You not only throw bombs but also win the Nobel Prize"! যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের মঞ্চে আরোহণের পর—স্খলিত দন্ত, পলিত কেশ, জ্ঞানে ও চরিত্রে ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাদের নয়নগোচর হইলেন। তখন বুঝিলাম, করতালিধ্বনি বৃথা হয় নাই—অদ্যকার সভাপতি দেবচরিত্র দ্বিজেন্দ্রনাথকেই অভ্যর্থনা করিতে সমবেত জনমণ্ডলী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া করতালি বাদ্য করিয়াছে!

যাঁহারা অগ্রণী হইয়া রবিবাবুর সহিত আলাপ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পাঁচকড়িবাবুর নাম বিশিষ্টভাবে উল্লেখ-যোগ্য; তাহা দেখিয়া কেহ কেহ বিস্ময়প্রকাশ করিলেন। জনৈক বন্ধু বলিলেন, "তাহাতে আর আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? পাঁচকড়ি বাবুর গাল দিতেও বেশীক্ষণ লাগে না, আলাপ করিতেও আটকায় না। আমার সঙ্গেও তিনি মিষ্টালাপ করেন।"

'বসুমতী'র 'কালোশশী'কে আমরা বহুচেষ্টায় সংগ্রহ করিলাম; কিন্তু অনেকেই 'হিতবাদী'র 'সংক্রান্তি-ঠাকুরে'র দর্শনাভিলাষে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া, বিফলমনোরথ হইলেন। একজন ভ্রমক্রমে মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়কে দেখিয়া, 'সংক্রান্তি' মনে করিয়া, অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিলেন; কিন্তু আমি তাঁহার ভ্রম অপনোদন করিয়া দিলাম। আসিয়াছিলেন অনেকে, আসেনও নাই

অনেকে ; কিন্তু এই মহতী সভায় অনেকেই খুঁজিতেছিলেন —স্যর আশুতোষকে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে এবং পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে।

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় করতালিধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে সভ্যগণ দণ্ডায়মান। বুঝিলাম, এইবার সত্যসত্যই লাট সাহেব সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। আমরাও দাঁড়াইলাম ; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সকলে আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত গভর্ণরসাহেব তাঁহার জনৈক পার্শ্বচর মাননীয় মিঃ মনাহান্, বর্দ্ধমানের মহারাজ, দিনাজপুরের মহারাজ, কাশীমবাজারের মহারাজ, সুসঙ্গের মহারাজ, নাটোরের মহারাজ, নসীপুরের মহারাজ, জজ বরদাবাবু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ প্রভৃতি দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। আমাদিগের পরিত্যক্ত স্থানের নবাগত কাহারও প্রয়োজন হইল না। মহিলাদিগের আসন যদু, মধু, রামু, শ্যামু অধিকার করিলেন। এই বিরাট-সভার বিপুলজনতার মস্তকের উপর দিয়া যে দুই এক ব্যক্তি আপনাদিগের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা মূর্ত্তিমান্ সাহিত্য-পরিষৎ—ব্যোমকেশ, জলযোগের একাধিপতি—মন্মথ, সাহিত্য-সভার—সরোজরঞ্জন, এবং পূর্ব্বোক্ত—রাখালদাস।

রাজা-মহারাজদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই রাজবেশে আসিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান সাদাসিধে জাফ্রাণ রঙের কোট ও ঢিলে পায়জামা পরিয়া আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পোষাকের মান রক্ষা করিয়া, সৎসাহস দেখাইয়াছিলেন কেবল ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও নাটোরের মহারাজ।

প্রথমেই উদ্বোধন-সঙ্গীত। গানটি ডি, এল্, রায়ের সুরে গীত হইল। সে সঙ্গীতে বঙ্গবাণীর সেবকদিগের মধ্যে 'বিদ্যাপতি', 'কৃত্তিবাস' 'কাশীরাম," ও **ডি, এল, রায়ের**, নামোল্লেখ নাই ; কিন্তু 'লোচন', 'রায়গুণাকর', 'গিরিশ', ও 'রবি'র নাম আছে। ইহা কেবল অনুকরণ বা চুরি নহে—রাহাজানি। সঙ্গীতের পর আশীর্ব্বচন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, হিন্দুস্থানী পণ্ডিত, ঠাকুরপ্রসাদ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সভার মঙ্গলানুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার কথা কেহ শুনিল, কেহ বা শুনিতে পাইল না। অনেকে ঋষিদেব শাস্ত্রীমহাশয়কে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপর, কে একজন পঞ্চানন পণ্ডিত, সংস্কৃত-শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে শ্লোকের আদি নাই অন্ত নাই, একঘেয়ে, একটানা নদীর স্রোতের ন্যায়—কাঁসির বাদ্যের ন্যায়—তাহা ক্রমাগত চলিল। লোকের বিরক্তি, টিট্‌কারী, বিদ্রূপ-হাসি উপেক্ষা করিয়া—মহোৎসাহে ক্রমেই কণ্ঠস্বর চড়াইয়া দিয়া—তিনি কবিতাপাঠ করিতে লাগিলেন ; বন্ধুরা হাসিয়া কুটিকুটি।

এই অঙ্কের অভিনয় হইয়া গেলে, লর্ড কার্‌মাইকেল্ ইংরাজিতে কিছু বলিলেন। আমরা সকলেই বুঝিতে পারিলাম তিনি কিছু বলিতেছিলেন, নতুবা মাঝেমাঝে করতালিধ্বনি পড়িতেছিল কেন?—কিছু শুনিতে না পাইলেও, সকলেই লাট সাহেবের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিবার নিমিত্ত নীরব ছিলেন। লাটসাহেবকে গুরুদাসবাবু ইংরাজিতে যে ধন্যবাদ দিলেন, তাহা সমর্থন করিতে গিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ তাঁহাকে 'সাহিত্যসেবী' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। একজন বলিলেন, "বর্দ্ধমান শাদা বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া, ও লাটসাহেবকে সাহিত্যসেবীর দলভুক্ত করিয়া, বাহাদুরী দেখাইল হে!"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন। পুস্তকাকারে মুদ্রিত অভিভাষণ বিতরিত হইতেছিল, আমরাও একখণ্ড সংগ্রহ করিলাম। তাহা

বৈশাখের 'মানসী' হইতে পুনর্মুদ্রিত। আমরা ক্ষীণবুদ্ধি; সুতরাং বুঝিতে পারিলাম না,—মানসীর প্রবন্ধই সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত হইল, কিংবা চৈত্রের সাহিত্য-সম্মেলনের অভিভাষণ বৈশাখের মানসীতে পূর্ব্বেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল! শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালা জানিতেন, বাঙ্গালায় কথা কহিতেন"! এটি তাঁহার প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণার একটি নূতন আবিষ্কার! আমরা উত্তর-বঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতদিগের হস্তে একথার বিচারভার সমর্পণ করিতেছি। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "আজিও আপনারা দেখিলেন তিনি (বঙ্গেশ্বর লর্ডকারমাকেইল্) বাঙ্গালা ভাষাতেই সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন"! আমাদের কর্ণে যাহা ইংরাজি বলিয়া বোধ হইল, বঙ্গভাষানুরাগী সাহিত্যসেবী শাস্ত্রী মহাশয়ের কর্ণে তাহাই বাঙ্গালার আকার ধারণ করিল,—ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই।

অনুমানে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে গেলে, সেকালের ত্রিকাল-দর্শী শাণ্ডিল্যের বংশধরকে এইরূপ বিড়ম্বনাই ভোগ করিতে হয়। মনে রাখা উচিত ছিল, এবং শশধরবাবুও আমাদের একথার সমর্থন করিবেন, যে শাণ্ডিল্য যখন চতুষ্কালদর্শী ছিলেন না, তখন heredityর অভাবে শাস্ত্রী মহাশয় কলিযুগের ভবিষ্যদ্দর্শন-শক্তি পাইতে পারেন না।

শেষকালে, তাঁহার দিদিমা ও ঠাকুরমার উপকথা, ও ২৪-পরগণার প্রত্নতত্ত্বের পীড়নে, শ্রোতৃমণ্ডলী অধীর হইয়া জৃম্ভণ করিতে আরম্ভ করিলেন,—আমরাও অধীর এবং চঞ্চল হইলাম বটে; কিন্তু ধন্য লর্ড কারমাইকেল্ সাহেব!—তিনি পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে এই সকল বক্তৃতা ও অভি-ভাষণের উৎপাত অম্লানবদনে সহ্য করিলেন! চারিদিকে কোলাহল হইতে লাগিল। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মাষ্টার মহাশয়ের মত, "এঃ! বড্ড গোল হ'চ্চে!", বলিয়া মধ্যে মধ্যে হাঁকিয়া উঠিলেন। সকলে অভিভাষণের অকূল-পাথারে হাবুডুবু খাইতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ কূল দেখা গেল; শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের মূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইলে, সকলেই আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আর ভয় নাই। বক্তৃতা সংক্ষেপ করিতে সারদাবাবু, এবং ব্যয় সংক্ষেপ করিতে দুর্গানারায়ণ শাস্ত্রীর, ন্যায় দ্বিতীয় আর কেহ এ ভূভারতে নাই।"—কার্য্যতঃও তাহাই হইল। জজসাহেব বরদাবাবুর শিবস্তোত্র' কবিতাপাঠ, সভার আর এ বিড়ম্বনা। কেহ কেহ মন্তব্য করিলেন, "এবার কার মাইকেল সাহেব হয়ত মনে মনে ভাবিতেছেন,—'আমা জজ আদালতের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি এবং শুষ্ক আইনে বিচারেও যাহার কবিত্ব শক্তি নষ্ট করিতে পারে নাই, সে ব্যক্তি কবি বটে!" এরূপ সভায় 'শিবস্তোত্র' পাঠে চতুর্দ্দিকে যে অশিবনিনাদ উঠিয়াছিল, প্রবীণজজ মিত্রজ যদি তাহা বুঝিয়া না থাকেন, তবে তাঁহার বিচারক পদ হইতে অবসর লইবার যে সময় হইয়াছে,—ইহা বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হইবে না।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের গতবর্ষের অভিভাষণের পুনরাবৃত্তি শ্রোতৃগণের অন্যতম অগ্নিপরীক্ষা। অক্ষয়বাবুর বিপুল বপু নীলগিরির ন্যায় জনতা-সাগর-প্রান্তে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, যখন অভিভাষণ-পাঠের উদ্যোগ করিতেছিল, তখন চারিদিকে ভীতি ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার হইয়াছিল। অনেকেই 'ম্যালেরিয়া'র আশঙ্কায় স্তিমিত নয়নে অবস্থান করিলেন। অদম্য উৎসাহে, অশ্রাব্য স্বরে, উচ্ছ্বাসের চক্ষু জলপূর্ণ করিয়া সারদাবাবুর ইঙ্গিত অনুরোধ না মানিয়া অক্ষয়বাবু ম্যালেরিয়া-মহিম্ন গায়িয়া যাইতে লাগিলেন! অক্ষয়বাবুকে সারদাবাবুর আয়ত্তের বাহিরে অবস্থিত দেখিয়া বন্ধুগণ হতাশে ম্রিয়মাণ হইলেন; কিন্তু অন্তিম অবস্থায় উপনীত হইলে 'স্লিপ' যাইতেছে দেখিয়া, সকলেই জয়োল্লাস করিয়া উঠিলেন। তৎপরে সভাপতি বরণের প্রস্তাব করিলেন—সুসঙ্গের মহারাজ, সমর্থন ও অনুমোদন করিলেন,—কাশীমবাজারের মহারাজ। দিনাজ-পুরের মহারাজ তাহার সমর্থন করিলে পর, সভা দেখিলেন এত বড় ব্যাপারে একটা 'তেমন' বক্তৃতা না হইলে মানাইতেছে না, তাই পরিপোষকরূপে রাজসাহীর উকীল সুবক্তা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রকে আহ্বান করিলেন। তিনি মঞ্চে আসিয়া আপনাকে ভাট বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন এবং একার্য্যে ঐতিহাসিকের অধিকার স্বীকার করিয়া, আপনাকে—কিঞ্চিৎ বিনয়ের সহিত—ঐতিহাসিক বলিয়া প্রচার করিলেন। পশ্চিমদেশে ভাট-ব্রাহ্মণদিগকে লোকেরা হীন চক্ষে দেখিয়া থাকে; আমাদের দেশের কুলীন বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ, উকীল-ব্যবসায়ী হইয়া, আপনাকে ভাট বলিয়া পরিচিত করিতে গৌরব বোধ করিতেছিলেন;—ইহা

কালধর্ম্ম! অক্ষয়বাবুর সজীব-ঢাক সশরীরে বর্ত্তমান থাকিতে, তিনি নিজের ঢক্কা নিজে না বাজাইলেই পারিতেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তৎপর জয়মাল্য বিভূষিতকণ্ঠ দার্শনিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তাঁহার কথা লোকে দূর হইতে স্পষ্ট শুনিতে ও বুঝিতে না পারিলেও সভায় কোলাহল গণ্ডগোল উপস্থিত হয় নাই। অভিভাষণের প্রায় অর্দ্ধাংশ পঠিত হইলে, সভাপতি মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ রবীন্দ্রনাথ, জ্যেষ্ঠের কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, অবশিষ্টাংশ স্বয়ং পাঠ করিবার প্রস্তাব করিলেন। রবিবাবু, সঙ্গীতের সুধাকণ্ঠে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিয়া, অভিভাষণ পাঠ করিলে, আমরা 'আশ্চর্য্য' না হইলেও পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম। যেহেতু তিনি "ওঁ শান্তি; শান্তি; শান্তি!" বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলেন।—কে একজন মন্তব্য করিলেন, "আজকাল রবিবাবুর চেহারাটা বেশ্ খুলেছে!" জনৈক দুষ্টলোকে উত্তর দিলেন—"নোবেল প্রাইজ পাইবার পর হইতে।" এ সকল লোকের কথায় আমরা আদৌ কাণ দিলাম না।

সভাপতির অভিভাষণ শেষ হইলে, লাটসাহেব সভা পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক আসন শূন্য হইয়া গেল। তখন, অনেকে পশ্চাৎ হইতে উড়িয়া আসিয়া, সম্মুখে জুড়িয়া বসিল। আমরা আর এমন প্রলোভন পাইলাম না, যাহার জন্য সভাপতির পশ্চাৎ ঘেঁসিয়া বসিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

লাটসাহেব সভামঞ্চ পরিত্যাগ করিবার পর, সভায় কিছু গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। আমরা তখন, কি হইতেছিল তাহা স্পষ্ট শুনিতে না পাইয়া, পরনিন্দায়—সমালোচনায়, ও ব্যঙ্গবিদ্রূপে মজিয়া গেলাম,—সঙ্গে সঙ্গে ভুলিয়া গেলাম, আমরা 'সভায়' আসিয়াছি,—'সভ্য' হইয়া সভার কাজে আমরা সাহায্য করিতে বাধ্য। তখনও, থাকিয়া থাকিয়া, মহারাজ মণীন্দ্র উচ্চকণ্ঠে শাসন করিলেন, তাহাতেও বড় কেহ কর্ণপাত করিল না। কে একজন পশ্চাৎ হইতে ফরমাইস করিলেন—'এই সময় বিহারী বাবুর একটা গান হউক।' এইরূপে যখন আমরা আমাদের সভাজনোচিত কর্ত্তব্যের পরিচয় দিতেছিলাম, তখন কাশিমবাজারের মহারাজ সভ্যগণকে রবিবার অপরাহ্লে—৭টায় তাঁহার ভবনে সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণজ্ঞাপন করিলেন। মহারাজের কথা মঞ্চের বাহিরে শুনা গেল না দেখিয়া, অকূলে-কাণ্ডারী বিশালবপু সুরেশচন্দ্র তারস্বরে ঘোষণা করিলেন, "আপনাদের তিন তিনটা নিমন্ত্রণ! একটা আজ সন্ধ্যা ৭৷৷০ টার সময় সাহিত্য-পারিষদ মন্দিরে, সার্কুলার রোডে, গেলেই বুঝিতে পারিবেন; ২য় আগামী কল্য রাত্রি ৮৷৷০ টায়, য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে "চন্দ্রগুপ্তের" অভিনয়; ৩য় পরশু সন্ধ্যা ৭টায় মহারাজবাহাদুরের সার্কুলার রোডের বাটীতে।" তাঁহার ঘোষণা সকলেই বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল বটে, কিন্তু তাহা এত 'অসাহিত্যিক' ভাবে পেশ করা হইল যে, তাহাতে অনেকে ঘোষণাকারীর রুচি (taste) সম্বন্ধে একটু টিপ্পনী করিতে ছাড়িল না।

সে দিন সাহিত্য-পারিষদ "টাকায় তিন সরা"র যে জলযোগের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার রস-গ্রহণে আমরা ললাটের ফেরে অসমর্থ হইয়াছিলাম। সম্মেলনের নিমন্ত্রণ-পত্র করতলগত হইলে, আমার মনে যেরূপ 'ডন কুইক্সোটে'র ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, সভামণ্ডপের stern reality দেখিয়া তাহা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিনের পালা

১২ টার সময়—মধ্যাহ্নে সভা বসিবার কথা। অধ্যাপক ললিতকুমারের সহিত একত্র, ১১ টার পর আমরা যাত্রা

করিলাম। ট্রামে সম্মেলনের বিভিন্ন শাখার যুগপৎ অধিবেশনের কথার আলোচনা হইল। এরূপ অধিবেশনের সমীচীনতা সম্বন্ধে আমরা উভয়েই সন্দিহান—সুতরাং একমত হইলাম। সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া, 'বাঁশবনে ডোমকাণা' হইতে হইল! আমরা যাইতে চাই দক্ষিণে, স্বেচ্ছাসেবকগণ দেখাইয়া দেন পূর্ব্বে। সভামঞ্চ, সুসজ্জিত বেদী, গদিওয়লাসোফা, আরাম কেদারা, তাড়িত-ব্যজনী, প্রশস্ত হল—'ইতিহাস-শাখা' অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। 'সাহিত্য-শাখা'কে দক্ষিণের মধ্যস্থলের হলে set back করা হইয়াছে।—সেখানে তখনও

ডাঃ পি, কে, রায়।

জনমানবের অস্তিত্ব নাই। 'দর্শনে'র কক্ষে ডাঃ পি, কে, রায় ও খগেন্দ্র বাবু কএকটি প্রাণী লইয়া তপোবনে ঋষিগণের ন্যায় ধ্যানস্তিমিত নয়নে উপবিষ্ট। 'বিজ্ঞান'কে ভিতর হইতে টানিয়া বাহিরে আনিবার প্রয়াস হইতেছে, সেখানেও জনবাহুল্য নাই। প্রাচীন সাহিত্যসেবী অধ্যাপক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া, জনৈক বন্ধু বলিলেন, "এই অভিভাষণ তাঁহার Swanএর সঙ্গীত অথবা Chathamএর শেষ বক্তৃতা না হয়!" রামেন্দ্রবাবু অসুস্থ বলিয়া অধ্যাপক-নিয়োগী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ইতিহাসের আসর জমকাইয়া উঠিল। ইতিহাসের শাখায় খবর পাওয়া গেল, বরেন্দ্র-সমিতি দীঘাপতিয়ার কুমার বাহাদুরের নেতৃত্বে গৌড়ের ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন; অক্ষয়বাবু ইঁহাদিগের অগ্রণী। স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গাঙ্গুলী উড়িষ্যার তক্ষণী-শিল্পসম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। ইঁহারা অনেকটা সাবধান। বিক্রমপুরের ও ঢাকার পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ, ততটা যেন সাবধান নহেন;—তাঁহারা কল্পনার পশ্চাতে একটু বেশী ছুটিয়া থাকেন। এই প্রাসাদে বীরবল হাসিতে হাসিতে সে কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবুর সভায় তিনি বলিলেন যে, মোটামুটী ধরিয়া লওয়া যায় যে, বরেন্দ্র-দল ঐতিহাসিক—অন্যদল পৌরাণিক। রাখালবাবু, অভিমানচ্ছলে, পরে এই কথার উল্লেখ করিলে অক্ষয়বাবু "না, না" করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও সাহিত্য-শাখার সভাপতি আসিলেন না। আমরা, 'সাহিত্য'-সম্পাদক বিদ্যাসাগর-দৌহিত্র, সুরেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়! 'সাহিত্য' আপনার নিজস্ব; এখানে তাহা কোণ ঠেসা হইল কেন?' তিনি বলিলেন, 'কি করিব বলুন? আমি তাহার কিছুই জানি না!' কিন্তু তাহার কিছুক্ষণ পরেই দেখি সুরেশবাবু সাহিত্য কক্ষে প্রস্তাব করিতেছেন;—'সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, নির্ব্বাচিত সভাপতি মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন কখন্ আসিবেন, জানিতে পারা যায় নাই। অতএব, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সাহিত্য-বিভাগের সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।' সাহিত্য-বিভাগে কার্য্যারম্ভ হইল। আমরা বিস্ময়-বিজড়িত মনে বুঝিয়া লইলাম, সুরেশচন্দ্র সাহিত্যের বাজারে বেশ Deplomat হইয়াছেন—বেশ সুকৌশলে, বিনয় দেখাইবার, অথবা কৈফিয়ৎ এড়াইবার, ফিকির করিয়াছেন।

সাহিত্যশাখায় একরাশি মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ছিল; তাহাদের যোগ্যতা নির্ণয়ের ভার ব্যোমকেশবাবুর উপর ন্যস্ত ছিল। সভাপতি মহারাজবাহাদুর, ব্যোমকেশবাবুর মীমাংসা মানিয়া লইয়া, কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন; ইত্যবসরে পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজ, তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া, আসন দিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই আসনগ্রহণ করিতে চাহিলেন না। শ্লেষপটু পণ্ডিতচূড়ামণি, ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন—"তবু মহারাজ আছেন বলিয়া দুইচারি জন লোক আছে, আমি ওখানে বসিলে তাহাও থাকিবে না!" মহারাজ আসন ছাড়িয়া দিলে, পণ্ডিতমহাশয় মহারাজকে অন্ততঃ সেইঘরে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিলেন; সুসঙ্গের মহারাজ পণ্ডিতমহাশয়ের দক্ষিণে উপবেশন করিলেন। কাশীমবাজার, আর একখানি কেদারা শূন্য করাইয়া,

তাঁহার দক্ষিণে বসিলেন। সুরেশ আসিয়া একেবারে ভক্তিভরে পণ্ডিত মহাশয়ের চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি প্রত্নতত্ত্বের মায়া কাটাইয়া সাহিত্যের গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। বঙ্কিমবাবুর মন্ত্রে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষায়, 'সাহিত্যে'র সাধনায়, এবং আজকাল ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ-কামনায় প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগের

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

সঞ্চার হইয়াছে। যাদবেশ্বর অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, বঙ্গবাসীর বিহারী আসিলেন; কিন্তু তাঁহাদের জন্য টেবিলের পার্শ্বে ঠিক সম্মুখে স্থান ছিল না। তিনি, তথাপি হাতড়াইতে হাতড়াইতে সকলের চেয়ারের ভিতর দিয়া, সম্মুখে যাইবার চেষ্টা করিলে, সুরসিক অধ্যাপক ললিতকুমার বলিলেন, "আপনি টেবিলের উপর, অথবা মহারাজের সঙ্গে এক চেয়ারে, গিয়া বসুন; সম্মুখে আর স্থান নাই।" আমরা হাস্য করিয়া উঠিলাম; বুদ্ধিমান্ বিহারীবাবু, অপ্রতিভ না হইলেও যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়া, পশ্চাতে যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, পূর্ব্বদিনের সাঙ্গোপাঙ্গদল পুষ্ট হইয়াছে; কেবল গৌরহরির অভাব। তখন আমরা, নির্ভয়ে তর্করত্ন মহাশয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, পরিতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলাম। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ, সভাপতির পুরোভাগে বসিয়া, নিবিষ্টমনে বোধ হয় তাঁহার তখনকার কাজের জমাখরচ অর্থাৎ Programme লিখিতেছিলেন; তাহাতে উগ্রপ্রকৃতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় তর্করত্নমহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; তিনি, অকস্মাৎ হস্তস্থিত প্রবন্ধ টেবিলের উপর সবলে নিক্ষেপ করিয়া, সরোষে চীৎকার করিয়া, বলিয়া উঠিলেন, "যদি এই রকম করেন, তাহা হইলে আমি একাজ করিতে পারিব না!—এই থাক্‌ল আপনাদের সব। একে ত অপমানের একশেষ হয়ে এখানে আসা;—না ছিল গাড়ীর বন্দোবস্ত, না কিছু! কোথায় যাই,—কোথায় থাকি। তারপর, যদি বা পড়িতে আরম্ভ করিলাম,—তা ক্রমাগত কেবল কি লিখ্‌ছেন!" ভীমঝটিকাবর্ত্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকৃতি যেরূপ নিস্তব্ধভাব ধারণ করেন, অত্র সভাস্থলে রোষবার্তার অব্যবহিত পরেও, মুহূর্ত্তের জন্য সেইরূপ নিস্তব্ধভাব (pin drop silence) বিরাজ করিল। তখন ললিতবাবু কাণ্ডারী হইয়া মগ্নোন্মুখ তরীর বক্ষঃকল্পে অগ্রসর হইলেন; তিনি ঠাণ্ডা মেজাজ বহাল রাখিয়া, সহজ ব্যঙ্গস্বর ঈষৎ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, বলিলেন, "ওর কথা ধ'র্‌বেন্ না; লেখাটা উঁহার মুদ্রাদোষ,—উনি ইচ্ছা করিয়া কিছু করেন নাই।" চারিদিকে বিষাদ-ভীতিমেঘাচ্ছন্ন গগনমণ্ডল দন্তচ্ছটায় যেন পুনরায় উদ্ভাসিত হইল। সভাপতি মহাশয়ও কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিলেন—'উঁহাকেই জানি;—উঁহাকে বলিব না, ত কাহাকে বলিব?' তাহার পর, কাগজ তুলিয়া লইয়া পুনরায় অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্ব্বিকার—নির্ব্বিকল্প—মহাযোগী ব্যোমকেশ বাহ্যজ্ঞানশূন্য,—বহিঃপ্রকৃতির ভ্রূকুটী-ভঙ্গী তিনি কিছুই যেন জানিয়াও জানিলেন না; তাঁহার অদম্য লেখনী ক্রমাগত চলিতে লাগিল। ললিতবাবুর মন্তব্য সপ্রমাণ হইল! তাহা দেখিয়া আমার বন্ধুবর বিপিনবিহারী মনেমনে তাঁহাকে 'admire' করিতে লাগিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের অভিভাষণও বৈশাখ মাসের 'মানসী' হইতে পুনর্মুদ্রিত। মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয়ের বক্তৃতার প্রায় অর্দ্ধাংশ পঠিত হইলে—মাননীয় মণ্ডিতমস্তক মিঃ মনাহান্ সাহেব প্রবেশ করিলেন। তিনি, মহারাজ নন্দী বাহাদুরের দক্ষিণপার্শ্বে, উপবেশন করিলে সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। সভাপতি-মহাশয় রাজপুরুষগণের পরিচিত—'Political-পণ্ডিত' বলিয়া খ্যাত—এস্থলেও

তাঁহার সেদিনকার politeness বাদ গেল না,—তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজশাহীর কমিশনার সাহেবকে দেখিয়া, পাঠে ভঙ্গ দিয়া, চট্ করিয়া একটা সেলাম করিয়া লইলেন! তর্করত্ন মহাশয় যখন তাঁহার ওজস্বিনী রচনায় বীররসের অবতারণা করিয়া মাইকেলের কবিত্বের বর্ণনা (১৮ পৃঃ) করিতেছিলেন, সেই সময় মনাহান্ সাহেব সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন! পণ্ডিত মহাশয়ের বাক্য সমাপ্ত হইলে, তিনি দক্ষিণপার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনাহান্ সাহেব কি চলে গিয়াছেন ?" তখন তাঁহার মুখশ্রীতে যেরূপ বীর ও করুণ রসের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেরূপ রসের সমাবেশ আমরা জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। বক্তব্য শেষ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় যখন "উৎসীদামি" বলিয়া 'বসিয়া' পড়িলেন তখন আমিও "রাজশালা" ও "পণ্ডিতশালার" অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া ও "মহারাজ-মহিষীর" দুগ্ধপান দেখিয়া সরিয়া পড়িলাম।—তৎপর, যতক্ষণ প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল, আর সাহিত্যকক্ষে উঁকি মারিতে সাহস হয় নাই!

তর্করত্ন মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের পর—কাজ আরম্ভ হইল। একটি মহিলা-রচনা ছিল। হীরেন্দ্রবাবু তাহাতে দর্শনের গন্ধ পাইয়া, নিজে তাহার পাঠের ভার লইয়াছিলেন। সেইটিই প্রথম পড়া হইল। তাহার পর একে একে সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্যবিষয়ে নানা প্রবন্ধ পড়া হইতে লাগিল। অন্যান্য শাখায় প্রবন্ধপাঠের পর আলোচনার জন্য কিছু কিছু সময় রাখা হইয়াছিল, এ বিভাগে তাহা হইল না। এতক্ষণে বুঝিলাম,—মা বীণাপাণি কি হেতু পরিষদে—বঙ্গ-সাহিত্যের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাসের পক্ষপাতিনী হইয়াছেন। আমরা আর অধিকক্ষণ সেখানে থাকা আবশ্যক মনে করিলাম না!

সাহিত্য হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়া 'প্রেততত্ত্বে'র আড্ডায়, অর্থাৎ ইতিহাস-শাখায়, উপবেশন করিলাম;—আমাদের ন্যায় সাহিত্য-সেবী অনেকেরই সেই দশা। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতাদ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন,—'কবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন না, তিনি উজ্জয়িনীরই নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানের অধিবাসী ছিলেন।' ইহাতে সভাপতি মহাশয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসায় আঘাত লাগিল;—তিনি তাঁহার পদোচিত গাম্ভীর্য্য বিস্মৃত হইয়া চাপল্যের সহিত মন্তব্য করিলেন, "যদি কেহ অনুযোগ করেন—বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা নাই, তাহারা কেবল সকল তথ্যই নিজেদের জাতীয় ভাবের ও জাতীয় গৌরবের অনুকূল ভাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহে, তাহা হইলে আমরা ইঁহাকে তুলিয়া দেখাইব। ইনি বহু অর্থব্যয় করিয়া—বহু দেশভ্রমণ করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন না।"

অতঃপর দুইটার সময় সভা,—পনর মিনিটের জন্য জলযোগের নিমিত্ত অবসর প্রাপ্ত হইল। আমরা তিন চারি জনে সকলের আগে ভাণ্ডারের দিকে ছুটিলাম। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখি একটি প্রকাণ্ড Dinner Table পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘভাবে পড়িয়া আছে; তাহার উভয় পার্শ্বের সকল আসনগুলিই অধিকৃত। কএকটি অজাতশ্মশ্রু বালককে সম্মুখের চেয়ারেই উপবিষ্ট দেখিলাম; তাহাদের মধ্যে একজনকে সাহিত্যসেবা-সমিতির প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বলিয়া জানিতাম। জলযোগের বন্দোবস্ত অতি চমৎকার! তিনচারিটি বালকের হাতে ভার,—তাহারা 'থা' পাইয়া উঠিতেছিল না;—সেখানে কোন তত্ত্বাবধায়ক কর্ত্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন না। আগে থাকিতে সরা সাজান ছিল না;—আমাদের মাত্র ১৫ মিনিট সময়। সেবকেরা হালে পানি না পাইয়া চা'য়ের সরঞ্জাম লইয়া বাহিরে পালাইতেছিল, দরজার নিকট বাধা পাইয়া, ফিরিয়া আসিল, এবং ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। একটি কলা, একটা পানতুয়া, একখানা নিম্‌কী ও এক পেয়ালা চা—অনেক উমেদারী করিয়া পাওয়া গেল।

পান আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা বলিল, "ক্ষমা করিবেন;—পান আনিতে গিয়াছে।" কি চমৎকার Organisation! এই সময় দেখি মন্মথবাবু, আপ্যায়িত করিয়া, পাঁচকড়ি বাবুকে বলিতেছেন, "গাল দিবেন না কিন্তু!" আমি, পাঁচকড়ি বাবুর মুখ হইতে কথাটা লুফিয়া লইয়া, বলিলাম, "গাল দেবার লোক যথেষ্ট পাওয়া যাইবে; তজ্জন্য চিন্তা নাই।"

'দর্শন' বিভাগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা গেল। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি বারংবার বাধা দিতেছিলেন; যেস্থানে তাঁহার সহিত মতের মিল হইতেছিল না, সেখানেই তিনি বাধা দিতেছিলেন।

জাপানী ছাত্র শ্রীমান্ আর, কিমুরা বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; সময় সংক্ষেপ বলিয়া তিনি স্থূল স্থূল বিষয় বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার বক্তৃতায়ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ক্রমাগত বাধা দিতেছিলেন; যেখানে তিনি শুনিতে বা বুঝিতে পারেন না, সেখানেই নানা প্রকারে বক্তাকে বিব্রত করিতেছিলেন। ডাঃ রায় তাঁহাকে কিছুতেই থামাইয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। শুনিলাম, ইনি একজন রায় বাহাদুর; কাজেই ডাঃ রায় সাহেবের উপর উক্ত রায় বাহাদুরী করিয়া নিজের মন্তব্য জাহির করা ছাড়িতেছিলেন না। দর্শনের আলোচনা ৫টায় শেষ করা হইল। তাহার আধঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে, স্বেচ্ছাসেবকেরা আসিয়া, ফটো তুলিবার জন্য ক্রমাগত ডাঃ রায় ও যতীন্দ্রবাবুকে উত্যক্ত করিতেছিলেন। পাঁচটার পরই আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম;—অন্যান্য বিভাগের আলোচনা তখনও চলিতেছিল।

তৃতীয় দিনের পালা।

রবিবার, ১ টার সময়, সাধারণ-সভার কার্য্যারম্ভ হইবে স্থির ছিল;—১১টা হইতে পূর্ব্বদিনের আলোচনা-সভার অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা হইবার কথা। আমরা প্রায় সাড়ে এগারটায় বাহির হইলাম। সভামণ্ডপে আজ আমরা ছিন্ন ভিন্ন।—আমি দর্শনে মনোনিবেশ করিলাম। ডাঃ রায় অনুপস্থিত; মহোমহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার পরিবর্ত্তে সভাপতির পদে আসীন ছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম;—ইহার নাম পর্য্যবেক্ষণ বা পরিদর্শন। ললিতবাবু ও শশীবাবু, উভয়ের সঙ্গে জুটিয়া জলযোগের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, বন্দোবস্তের অনেকটা উন্নতি হইয়াছে; স্বয়ং মন্মথবাবু মন্মথবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সংবাদদাতাদিগের মনোরঞ্জনে তৎপর রহিয়াছেন। সুদীর্ঘ টেবিলের পরিবর্ত্তে তিনটি ছোট ছোট পৃথক্ পৃথক্ টেবিল সাজান আছে, সরা আগে থাকিতে সাজাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে, টেবিলের উপরও সরা সাজাইয়া দেওয়া হইতেছে, ললিতবাবু ও শশীবাবুকে যথেষ্ট খাতিরদারি ও আপ্যায়িত করিয়া বসান হইল। সকল বিভাগের আলোচনা শেষ হইল,—ইতিহাসের আসর টুটিল না। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল—তাহাদের যেন আরও জমাট বাঁধিয়া গেল। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী একটু অগ্রসর হইয়া মনোযোগ দিলেন। আমি ভায়াকে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, "কিহে!—বড্ড interesting হইতেছে?" তিনি মুচ্‌কী হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বড্ড"। এই সময় এক পক্ষে রাধাকুমুদবাবু প্রভৃতি ও অপরপক্ষে রমাপ্রসাদবাবু প্রভৃতির মধ্যে বৈদিকযুগে সম্রাটের অস্তিত্ব লইয়া বিষম বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছিল, সভাপতি অক্ষয়বাবু ঐ তুমুল সংগ্রামে, উকীলের ন্যায় মুন্সিয়ানা দেখাইয়া, আমাদিগকে মোহিত করিতেছিলেন।

প্রত্নতত্ত্বের বাগ্‌বিতণ্ডা থামিয়া গেলে, সেই আসরে সাধারণ-সভার অধিবেশনের অবকাশ প্রাপ্ত হওয়া গেল। পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। পরলোকগত সাহিত্য-সেবকগণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে গিয়া, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা ইঁহাদের জন্য সভা করিয়া একটু কাঁদিয়া লউন।" সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়াও—যাহারা দূর হইতে তারবার্ত্তায় ও পত্রযোগে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ হইল। গৌহাটীর পদ্মনাথ নূতনত্ব দেখাইয়া ইংরাজি অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষায় টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ তার-বার্ত্তা ব্যোমকেশাদি তিনব্যক্তি কষ্টে উদ্ধার করিলেন। সভায় যে সকল মন্তব্য উত্থাপিত ও পরিগৃহীত হইল, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির, দুইজন সভ্য ব্যতীত, মফঃস্বলের সভ্যগণের মধ্যে তেমন একটা উৎসাহ, আগ্রহ, সজীবতা ও স্ফূর্ত্তির লক্ষণ দেখা গেল না। কলিকাতার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের ন্যায়, মফঃস্বলের সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত অবসর দিয়াছেন বলিয়া, আমাদের মনে হয় না। যাহাদের শক্তি নাই—অথচ বক্তৃতা দিবার সাধ আছে, তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইল; আমাদিগের বন্ধুদিগের টিপ্পনী ও হাসির হাওয়ায় তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল! স্বয়ং পাঁচকড়ি ও সুরেশ আজ প্রচ্ছন্ন সমালোচকদলের অগ্রণী। একটি বালকের maiden speech-এর প্রতি আমরা উপযুক্ত সম্মান করিতে শৈথিল্য করি নাই।

'আর্য্যাবর্ত্তের' হেমেন্দ্র resolution move করিবার জন্য গম্ভীরভাবে মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিপিন বিজন-বিপিনে অদৃশ্য! দক্ষিণ আফ্রিকার হিপোর মত বিশালবপু, কালোশশী ও 'ভারত'-স্নিগ্ধকারী জলধর সভাপতির পশ্চাতে হিমাচলের মত অবস্থান করিতে-ছিলেন। হীরেন্দ্র, পাঁচকড়ি, বিপিনচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের বক্তৃতা তৃতীয় দিনের অপরাহ্নে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গের কবি রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করিয়া সুইডিশ সোসাইটি বাঙ্গালীজাতিকে ও বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও রবীন্দ্রনাথকে ডাক্তার উপাধি দান করিয়াও বঙ্গভাষাকে সম্মানিত করিয়াছেন;—এজন্য সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ হইতে ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ-দানের প্রস্তাব করা হইল। অনেকগুলি প্রস্তাব সমর্থন ও অনুমোদন করিবার লোকা-ভাবে 'নগদামুটে' (পাঁচকড়ি বাবুর ভাষাতে) ধরিয়া কার্য্য-সম্পাদন করা হইল।

হীরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায়, তাঁহার গিরি-গম্ভীর প্রকৃতি ভেদ করিয়া, ব্যঙ্গ ও রসিকতার পার্ব্বতাউৎস উচ্ছ্বসিত হইতে-ছিল। সাহিত্য এই সময় নানা 'শাখায়' বিভক্ত হওয়াতে, এবং সর্ব্বত্র বায়ুসঞ্চালনের যথোচিত বন্দোবস্ত না থাকাতে, যে সকল অসুবিধা হইয়াছিল, তিনি তাহা বিবৃত করিতে গেলে পাঁচকড়িবাবুর ও সুরেশবাবুর ব্যঙ্গে তাঁহাকে বিরত হইতে হইল। তিনি দুইটি (দর্শন ও সাহিত্য) বিভাগে যোগ দিয়াছিলেন বলিতে উদ্যত হইলে, পাঁচকড়ি বাবু 'দুই শাখায় আসান' বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন; তিনি হাস্যমুখে তাহাই গ্রহণ করিয়া লইলেন। তৎপর হীরেন্দ্রবাবু সাহিত্যের রসধারার কথা বলিবার উপক্রম করিলে, সুরেশবাবু দীনবন্ধুর লীলাবতীর অতি পুরাতন ইয়ারকি "চরসের" নাম করিয়া শ্লেষের কণ্ডুতি নিবারণ করিলেন। তাহাতে হীরেন্দ্র-বাবু, সুরেশবাবু "চরস" আমদানীর প্রস্তাব করিতেছেন জানাইয়া, সভাপতি মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। সভাপতি মহাশয় "চ—রস" শব্দ সংস্কৃতের ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া রস ও চরসের অভিন্নতা সপ্রমাণ করিলেন; তখন সাহিত্যমণ্ডপ যেন পরিহাস-রসিকতা-মুখরিত বাসরঘরে পরিণত হইয়াছিল।

বাগ্মী বিপিনবাবু বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইলেও সুরেশবাবু, বাধা দিতে গিয়া মুখের মতন জবাব পাইয়া, অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। বিপিনবাবু বলিলেন, 'সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় অতীতে, ভবিষ্যতে ও বর্ত্তমানে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি, উন্নতি, বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা থাকা উচিত ছিল।' বিপিনবাবু যুগপৎ চারি শাখার অধিবেশনের প্রতিবাদের ছলে বলিলেন, 'সখীরা প্রাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পতি লইয়া বিলাস করুক এবং মধ্যাহ্নে আবার একত্র হইয়া এক পতির অধীনে প্রাতঃকালীয় পরিচয় দিয়া সবাই সকলের মনোরঞ্জন করুক!' পাঁচকড়ি বাবু মফঃস্বলের প্রতিনিধিসভ্যগণের নিকট অভ্যর্থনার, আদরের, যত্নের, পরিচর্য্যার ক্রুটী স্বীকার করিতে গিয়া বলিলেন, "কাশী যেমন সৃষ্টিছাড়া শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত, কলিকাতাও সেইরূপ সৃষ্টিছাড়া ইংরাজের কামানের উপর অবস্থিত। এখানে সকলেই উচ্ছৃঙ্খল, কেহই আদর, আপ্যায়ন, আচার, ব্যবহার, নীতি জানে না। তোমরা 'নিজ গুণে ক্ষমাকর অধীন জনে।'" অক্ষয়বাবু মফঃস্বলের প্রতিনিধি-সভ্যগণের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিতে আসিয়া পাঁচকড়ি বাবুকে গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া "ব্রাহ্মণের ছেলে" হইয়া সুধীজনসমাজে ব্রাহ্মণের সমক্ষে এতবড় মিথ্যাকথা বলিয়াছেন, তজ্জন্য গালির সুরে উল্টা চাপ দিলেন। তিনি পাঁচকড়িবাবুকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভ্যর্থনার ক্রুটীর জন্য নহে,—বাচালতার জন্য।

সুরেশবাবু সভাপতিদ্বয়কে (ঠাকুর ও তর্করত্নকে) ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া, সংস্কৃত শব্দজাত সাধু বাঙ্গালায় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া, ইতিহাসের পক্ষেই মিঃ নর্টনের মত, জাঁদরেলী ওকালতী করিয়া বলিলেন, কেহ কেহ 'শাখাবিভাগকালে ইতিহাসকে শ্রেষ্ঠ আসর দেওয়া' হইয়া-ছিল বলিয়া, অভিযোগ করিয়াছিলেন। সুরেশবাবু সেটাকে হিংসা-প্রণোদিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অক্ষয়বাবু প্রভৃতি রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কতিপয় ব্যক্তি 'সাহিত্যের' প্রধান লেখক বলিয়া কি, সুরেশবাবু আজকাল এতদূর ইতিহাসের পক্ষপাতী হইয়াছেন? আমরা আশা করি অচিরাৎ তাঁহার 'সাহিত্যের' নাম 'ইতিহাসে' পরিবর্ত্তিত হইবে।

আগামী বৎসর সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন কোথায়

হইবে তাহা লইয়া বেশ একটু অভিনয়—'Tempest in a Teapot'—হইয়া গেল। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রস্তাব করিলেন,—'আগামী বৎসর বর্দ্ধমানের মহারাজ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, যশোহর হইতে রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার প্রভৃতিও নিমন্ত্রণ করিতেছেন; এমতাবস্থায় যদি আপনাদের অভিমত হয়, তাহা হইলে এবৎসর বর্দ্ধমানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাই বোধ হয় সঙ্গত হইবে।' অনেকেই মহারাজ বাহাদুরের কথায় সায় দিয়া মহারাজাধিরাজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাই উচিত মনে করিলেন; কিন্তু ইতোমধ্যে হেমেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে অশুভক্ষণে মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা সভা-স্থলে পাঠ করিতে বাধ্য হইলেন। পত্রের এবারৎ শুনিয়া, কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বসিলেন। এই সময়ে বৃষস্কন্ধ 'সমাজপতি' ভীম-বিক্রমে অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন, 'অন্যান্য বৎসর উপযাচক হইয়া, নিমন্ত্রণ করিতে চাহিলেও কেহ নিমন্ত্রণ করিবেন না। অন্য কোথাও নিমন্ত্রণের যোগাড় হয় নাই বলিয়া, এবার কলিকাতায় সভা করা হইয়াছে। আগামী বৎসর সম্মিলনের স্থান যোগাড় করিতে পাঁচকড়ি বাবু ও আমি, বর্দ্ধমানের মহারাজের নিকট গমন করিয়াছিলাম; মহারাজ বাহাদুর আমাদের প্রস্তাবে ও অনুরোধে সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এরূপ-ক্ষেত্রে বর্দ্ধমানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করা অসৌজন্য-প্রকাশক। বর্দ্ধমানের পত্র মহারাজের নিজস্ব; সম্মিলন-সভার উদ্দেশ্যে লিখিত নহে; সুতরাং উহার ভাষা-বিচার আমাদের অকর্ত্তব্য। আর উহার অর্থও আমরা যেমন করিতেছি, তেমন নহে। যদি যশোহর ইচ্ছা করেন, তৎপর বৎসর সম্মিলনের অধিষ্ঠান তথায় হইতে পারে এবং তাহা এই সময়ই স্থিরীকৃত হইতে পারে।' ফুটন্ত সলিলে তৈলবিন্দুর ন্যায়, এই বক্তৃতা সকল গোল ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিল। 'All's well that ends well.' রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, রায় যতীন্দ্র নাথের চাপে পড়িয়া, সুরেশচন্দ্রের এই সুসামঞ্জস্যকর প্রস্তাব স্বীকার করায় করতালির চটাপট্ ধ্বনিতে এই আসরেই দুই বছরের নিমন্ত্রণের চুক্তি করিয়া স্মিতবদনে সভা সকল গোল মিটাইয়া ফেলিল। তৎপর জলধর বাবু, প্রস্তাব সমর্থন করিতে আহূত হইয়া, এই সকল গোলমালে থেই হারাইয়া, শেষকালে 'কাঁটালের বীচি ভাতে ভাত খাইতে হইবে' বলিয়া ভয় দেখাইয়া আগামীবর্ষে বর্দ্ধমানে সম্মিলনের অধিবেশন সমর্থন করিলেন।

টাউনহলে প্রায় ৬টার পর সভাভঙ্গ হইল।

উপসংহার

সাহিত্য-সম্মিলন শেষ হইয়াছে। আমরা সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষকে দুইচারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। কলিকাতায় হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকাংশ সাহিত্য-সেবক সভ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। এবার কলিকাতার হিন্দী-সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ও প্রধান প্রধান হিন্দী-সাহিত্যসেবিগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল কি?

হিন্দী, মরাঠী, গুজরাতী, ওড়িয়া, পঞ্জাবী, অসমীয়া, সিন্ধী, নেপালী প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান সংস্কৃতমূলক ভাষা সমূহের সহিত আদান-প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, বাঙ্গালা ভাষাকে পরিপুষ্ট করিতে, সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষ হইতে এযাবৎ কি কোন চেষ্টা করা হইয়াছে?

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়নের সৌকর্য্যার্থ, একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর খাঁটি বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলনের নিমিত্ত, এপর্য্যন্ত সম্মিলন কি কোন প্রকার উদ্যম করিয়াছেন?

বাঙ্গালা ভাষায় প্রবাদ ও Idiom, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য হইতে, সংগ্রহ করিয়া তাহার মূল অর্থ ও প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া, কোন কোষ প্রণয়ন করিতে সাহিত্য-সম্মিলন কি কোন প্রকার উদ্যোগ করিয়াছেন?

ইংরাজী-বাঙ্গালার পরিভাষা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, এক রসায়নের পরিভাষা ব্যতীত, ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যক্তিগত মতানুযায়ী শব্দ-সংগঠন ব্যতীত, কোন পণ্ডিতমণ্ডলী গঠন করিয়া, সম্মিলন বা পরিষৎ কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি?

ইংরাজীভাষা, জগতের যাবতীয় ভাষার রত্নরাজি অনুবাদ দ্বারা আয়ত্ত করিয়া, সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদিও ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে; আমরাও আমাদের কোন কোন গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করাইয়া দিয়া, যেন আমাদের এক প্রধান-কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম বলিয়া মনে করি; কিন্তু যে সকল

পুস্তক প্রবন্ধ বা রচনা ইংরাজী ভাষার গৌরবস্বরূপ, তাহাদের বঙ্গানুবাদ করিতে, বিনয় বাবু ভিন্ন, সাহিত্য-সম্মিলন এযাবৎ কি করিয়াছেন? এপর্য্যন্ত পরিষদের 'বিশেষজ্ঞ' সভ্যেরা Astronomy, Statics, Dynamics, Conic Section, Differential and Integral Calculus, Trigonometry, Physics, Chemistry, Logic, Mental and Moral Philosophy, Political Economy, Sociology, Ethnology, Geology, Biology, Zoology, Anatomy, Physiology, Materia Medica, Physiography, Minerology প্রভৃতি শাস্ত্রের কয়খানি গ্রন্থ বাঙ্গালায় রচনা বা অনুবাদ করিয়াছেন! এই সকলশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সম্মিলনের ব্যয়ে মুদ্রিত না হইলে, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রকাশিত হইবার আশা খুব কম। কারণ, আমাদের দেশে, ঐ সকল পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা মুদ্রণব্যয়ের সঙ্কুলান হইয়া, গ্রন্থকারের পারিশ্রমিক লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, সম্মিলনের কোন স্থায়ী ভাণ্ডারস্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে কি?

জগতের বিভিন্ন জাতির, অতীতের ও বর্ত্তমানের, ইতিহাস ইংরাজীতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত কয়টি প্রাচীন ও আধুনিক জাতির ইতিহাস অনূদিত বা সঙ্কলিত হইয়াছে? কেবল পাথর ভাঙ্গিয়া, লিপি উদ্ধার করিয়া, ভিন্সেণ্ট স্মিথ ও রিস ডেভিড্‌সের ঘণ্ট-চচ্চড়ী ঝোল-অম্বল করিয়া, পরস্পর গা-চাটাচাটি করিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া, সাহিত্য-সম্মিলন কর্ত্তব্য শেষ করিবেন কি? এখন, কেবল মহাপদ্ম ও সমুদ্রগুপ্ত লইয়া মারামারি করিলে, আমাদিগের চলিবে না। অতীতে আমাদের বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস থাকুক আর নাই থাকুক, পশ্চাতে আর্য্যজাতির গৌরব লইয়া—বর্ত্তমানের অসংস্কৃত উপাদান লইয়া—আমাদিগকে ভবিষ্যতে উজ্জ্বল ইতিহাস প্রণয়নের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যে জাতি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করিয়াছে, সে তাহার অতীতের আভিজাত্যের অনুসন্ধান, করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে—করুক। আমাদের অতীতের, পশ্চিম-ভারতে ভুজবীর্য্য-শৌর্য্য-শিল্প-সভ্যতার, কত গাথা এখনও আমাদের গৌরব ও স্পর্দ্ধার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। তাহা বিদেশীয় বিজেতাদিগের মুখে গীত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিতেছে; কিন্তু সে স্মৃতি এতদিন আমাদের প্রাণে নবজাগরণ, নূতন-প্রেরণা, নূতন-অনুভূতি ও নূতন-আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে পারে নাই। এখন ইংরাজের আদর্শে য়ুরোপীয় জাতি সকলের সহিত তুলনায় জাপানের ও চীনের আদর্শে,—অপরের দুর্দ্দশা ও অভ্যুদয় দেখিয়া—আমাদের অবসন্ন প্রাণেও চেতনার সঞ্চার হইতেছে। অতএব সেই আত্মবোধ ও আত্মোন্নতি-চিকীর্ষা আমাদের চিত্তে স্থায়ী করিতে হইলে, আমাদিগকে জগতের অন্যান্য জাতি সকলের—অতীতে ও বর্ত্তমানে—অভ্যুদয় ও অধঃপতনের কারণ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। চক্ষের সম্মুখে দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া, কেবল উপদেশ-ধারা বর্ষণ করিলে, এবং মোহনিদ্রাভিভূত অন্ধজাতির নিদ্রালস কর্ণে অতীতের সুমধুর সঙ্গীত-ঝঙ্কার মৃদুমন্দ গুঞ্জরিত করিলে, সে সুখনিদ্রায় আরো অধিকতর অভিভূত হইবে—বদ্ধকটি হইয়া, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া, জীবন-সংগ্রামের জন্য দণ্ডায়মান হইবে—আশা করা যায় না।

সাহিত্য-পরিষৎ সম্মেলন-মণ্ডপে, স্থায়ী সভার অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী সম্পাদন করিবার জন্য, এত স্বদেশী বিদেশী রাজা মহারাজা উপস্থিত থাকিতে, অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন না কেন? এই যে সাত বৎসর নানাস্থানে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গেল, এপর্য্যন্ত সাহিত্য সেবকগণের মধ্যে পরস্পর পরিচয় ও আলাপ-আপ্যায়নের কোন প্রকার চেষ্টা হইয়াছে কি?—সকলেই নিজের নিজের ভাবে 'মশ্‌গুল্' থাকিলে, অপর চিন্তাশীল—প্রাচীন ও নবীন—লেখকদিগের সহিত ভাবের আদান প্রদান দ্বারা আমরা লাভবান্ হইবার আশা করিতে পারি না এবং সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পণ্ড হইয়া যায়।

সম্মেলনের মধু আস্বাদ করিয়াছেন অনেক মধুকর; কিন্তু আমাদের ন্যায় নিমন্ত্রিত, রবাহুত, দর্শক, ও কোন কোন মফঃস্বলের প্রতিনিধি-সদস্য রূপ মক্ষিকারা কেবল ব্রণমিচ্ছন্তি। অবৈতনিক কার্য্যেও যে একটা দায়িত্ব আছে, তাহার ত্রুটী, ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলার জন্যও আমাদিগকে যে দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়, সে জ্ঞান বোধ হয়, আমাদের এখনও সম্পূর্ণভাবে উন্মেষিত হয় নাই। বৃহদ-নুষ্ঠানে, গোলযোগ বিশৃঙ্খলা হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু তাই বলিয়া কর্ত্তব্যের অবহেলাতে, পরিদর্শনের শৈথিল্যে,

সুব্যবস্থার অভাবে, আয়োজনের ক্রটীতে, কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কাহারও কাহারও অহঙ্কার ও অভিমানের হেতু, বিনায়াসে নাম কিনিবার চেষ্টাতে, বড়র নিকট খোসামোদ ও ছোটর নিকট দম্ভ প্রকাশ করাতে, কর্ম্মচারীর অযোগ্যতা নিবন্ধন, গত সাহিত্য সম্মেলনে যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, সেগুলি আমাদের জাতীয় কলঙ্ক ও সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। আশা করি, স্বদেশবাসিগণ আমাদিগের এই তীব্র মন্তব্য-জনিত অপরাধ ক্ষমা করিবেন, এবং ভরসা করি, কর্ত্তাভজার দল ভবিষ্যতে কেবল নামের জন্য লালায়িত না হইয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া, সুচারুরূপে কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিয়া, সকল কার্য্যে শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা স্থাপন করিয়া, সাহিত্য-সম্মেলনের ও স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।*

শ্রীরসিকলাল রায়।

* লেখক মহাশয় সাহিত্য-সম্মেলনকে যে উপদেশ অনুগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ আছে। ভাঃ সঃ

বৈদ্যনাথ দর্শনে

এত মধুর শোভার মাঝে
এসে আমার মন,
কি এক মহা-পুলকভরে
ভাস'ছে অনুক্ষণ!

কি সুষমায় এদেশখানি
ভরিয়েছে গো স্বভাবরাণী,
আবার তা'তে পরিয়েছে গো
কতই আভরণ!

কোথাও উঁচু কোথাও নীচু
ধানের ক্ষেতগুলি,
ওই সুদূরে রয়েছে সব
অসীম শোভা খুলি

খোলা মাঠে—খোলা হাওয়ায়,
কি মহাভাব প্রাণে জাগায়,
লুটিয়ে পড়ে আমার এই
ক্ষুদ্র হৃদয়-মন।

ঢেউখেলান পাহাড়গুলি
ঐ দেখা যায় দূরে,
দাঁড়িয়ে আছে নিথর হয়ে
কতই শোভা ধরে'।

সামনে আবার 'দীঘাড়িয়া'
দাঁড়িয়ে বিশাল দেহ নিয়া,
হরষ মনে ওই নীলিমা
কর্‌ছে পরশন;

আবার হেথা পূরব পাশে
'ত্রিকুট' মাথা তুলি
আস্‌ছে যেন দীঘাড়িয়ায়
কর্‌তে কোলাকুলি।

তাহার মাঝে 'নন্দন গিরি'
দাঁড়িয়ে মধুর শোভা ধরি
দেখ্‌ছে যেন গিরিদ্বয়ের
মধুর-সম্মিলন।

মোহন হ'তে মোহনতর
'ত্রিকূট'-ছবিখানি,
কি সুষমায় সাজিয়েছে গো
আহা, স্বভাব-রাণী !

মাথায় মাথায় তরুলতা
জড়িয়ে সবে দাঁড়িয়ে হেথা,
আবার তা'তে ঝরণা-ধারা
বইছে অনুক্ষণ ;

রবির আলো—হেথায় মূলে
প্রবেশ নাহি করে,
দিবস রাতি—ইহার মাঝে
কি সুষমাই করে !

স্নিগ্ধ-মধুর মোহন স্থানে
এসে কি ভাব বইল প্রাণে,—
অবাক্ হ'য়ে রইল চেয়ে
আমার দু'নয়ন !

আবার হেথা 'তপোবনে'র
মোহন শোভা হেরি'—
গিয়াছে মোর হৃদয়খানি
অসীম সুখে ভরি'।

দেখে এমন শোভার ধারা
হ'য়েছে প্রাণ আপন-হারা,
পুলক মনে চতুর্-ধারি
কর্‌ছি নিরীক্ষণ।

নীলআকাশে কেমন ভাসে
ধবল মেঘগুলি,—
নিরখি এই অসীম-শোভা
যাই আপনা ভুলি।

মাঠের মাঝে বিহ্বল মনে
দাঁড়িয়ে চাহি আকাশ পানে,
মাথার 'পর বইতে থাকে
উদাস সমীরণ।

ঘনিয়ে আসে সান্ধ্য-আঁধার
দিবস ব'য়ে যায়,
মাঠ হ'তে সব গরুগুলি
ঘরের পানে ধায়।

ঐ দেখা যায় সুদূর মাঠে,
কৃষকগুলি লাঙ্গল পিঠে,
তাড়িয়ে যাচ্ছে বলদ
নিজের নিকেতন।

আবার হেথা 'বাবার মঠে'
গিয়া হৃদয়খানি
কিএক ভাবে বিভোর হয়
কিছুই নাহি জানি !—

"বোম্"—"বোম্"—সে মহান্ নাদে
কি মহাভাব জাগায় হৃদে,—
সেই ধ্বনিতে চায় ডুবিতে
আমার এ জীবন !

শ্রীমতী সুষমারাণী হালদার।

য়ুরোপে তিনমাস

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিবার পূর্ব্বে জাহাজের পার্শ্বে একটা জনতা ও গোল হইল। গিয়া দেখি, পাইলট্ সাহেব জাহাজ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। বন্দর হইতে কূল-সন্নিধি বিপদাপদের পথ কাটাইয়া পথাভিজ্ঞ পাইলট্ কতকটা দূরে জাহাজ পৌছাইয়া দিয়া যায়। তাহার পর কাপ্তেন সাহেব ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের প্রতি সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ে। সম্প্রতি English Channel-এ Oceania জাহাজের যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, নাবিক কাপ্তেন ও পাইলটের মত-বিভেদই তাহার কারণ। যে সীমানা পর্য্যন্ত পাইলটের রাজ্য, তাহার মধ্যেই সেই বিপদ্ ঘটিয়াছিল। কাপ্তেন পাইলটের ভুল সংশোধন করিবার চেষ্টা করিলেও সফল হয় নাই, কারণ সে স্থানে পাইলট্ই প্রধান। পরে যে অনুসন্ধান হয়,তাহাতে এই কথা প্রকাশ হইয়াছিল। পূর্ণজ্ঞানে কাপ্তেনকে চক্ষের পলক না ফেলিয়া নির্দ্ধারিত বিপদ্মুখে প্রবেশ করিতে হইল। সাধ্য নাই পাইলটের কথার উপর কথা কয়; কারণ পাইলট্ সেখানে একেশ্বর।

বহুদিন পূর্ব্বে Punch-এ "Dropping of the Pilot" নামে একখানা মর্ম্মস্পর্শী ছবি দেখিয়াছিলাম—তাহার কথা মনে পড়িল। নানা উপলক্ষে অনেকবার সে ছবির কথা মনে পড়িয়াছে, আজও পড়িল। নবীন জার্ম্মান-সম্রাট্ উইলিয়ম প্রাপ্তবয়স্ক ও নিজজ্ঞানে কৃতকর্ম্মা,—যখন বিজ্ঞ প্রাচীন জার্ম্মান প্রাধান্যগত-প্রাণ "লৌহ সচিব" বিস্মার্ককে ক্ষমতা-চ্যুত ও অধিকারভ্রষ্ট করিয়া নিজ কোমল-কঠিন হস্তে পূর্ণক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন সেই ছবির সৃষ্টি হয়। ব্যঙ্গশিল্পি-শ্রেষ্ঠ সার্ জন টেনিয়লের তাহা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; জার্ম্মান সাম্রাজ্য-পোতের কাণ্ডারী উইলিয়ম জাহাজের ধারে দাঁড়াইয়া তাচ্ছিল্যভরে কৈশোরের কর্ণধার বিস্মার্কের ধীর ক্লান্ত অথচ গম্ভীর পদবিক্ষেপে নৌসোপান-পথে অবরোহণ দেখিতেছেন। অবনতমস্তক বিস্মার্ক শেষ-সোপান-রজ্জু ধরিয়া আস্তে আস্তে সমুদ্রের বক্ষে নৃত্যশীল পাইলট্ বোটের উপর নামিতেছেন। জার্ম্মান সাম্রাজ্যের চিরকর্ণধার স্বাধিকারপ্রার্থী কাপ্তেনের হস্তে নিজাধিকার প্রদান করিয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। চিত্রখানি মর্ম্মে মর্ম্মে করুণ-কঠিন ভাব পূর্ণ।

"ড্রপিং দি পাইলট্"—"*Punch*" হইতে গৃহীত।

বিশেষ ও পরিদৃশ্যমান কারণ অভাবেও ছবির কথা মনে পড়িল। আমাদের পাইলট্ বিস্মার্কের সম্পূর্ণ অসদৃশ; রজ্জু-সোপান-অবলম্বনে নামিয়া গেল। একথা কেন মনে পড়িল, তাহার কারণ বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও নিষ্ফল। তরঙ্গবক্ষে পাইলটের বোট নাচিতেছে। পাইলট্ নামিয়া আসনগ্রহণ করিবা মাত্র নাবিকগণ বোটখানিকে জাহাজের নিকট হইতে অদূরে—"পাইলট্ জাহাজে" লইয়া চলিয়া গেল। অচিরে সে তাহার স্থায়ী আবাস জাহাজে, আপন জনের সহিত মিলিত হইবে। তাই আপন জন ছাড়িয়া প্রবাসগামীর তাহার প্রতি দৃষ্টি নিতান্ত ঈর্ষাশূন্য মনে হয় না। আহারের পর ডেকের উপর আসিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইলাম—ভাল লাগিল না। ক্যাবিনে

গিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিলাম তাহাও হইল না। অগত্যা "ভ্রমণ-কথা" লিখিতে বসিলাম। শ্রান্তিতে যখন চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিতে লাগিল, তখন শয্যার আশ্রয় লইলাম। নিদ্রার পরিবর্ত্তে চিন্তা সহচরী হইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহাকে একাধিপত্য করিতে দিয়া অবশেষে নিদ্রাদেবী দয়া করিলেন। এইরূপে সে রাত্রি কাটিল। পাইখানা স্নানাগারের বন্দোবস্ত ভিড়ে সুবিধা অসুবিধা কত দূর হইবে, অপরিচিতের পক্ষে এ সকল বিষয় বিশেষ ভাবিতে হয়—বিশেষতঃ যে পূরা মাত্রা "বাঙ্গালীয়ানা" বজায় রাখিবে, তাহার ভাবনা আরও বেশী। পূর্ণ পরিচয় হইলে কি হইবে জানি না। আপাততঃ রাত্রি-শেষের পূর্ব্বেই প্রাতঃকৃত্য সারিয়া লওয়াই সুবুদ্ধির কাজ বোধ হইল।
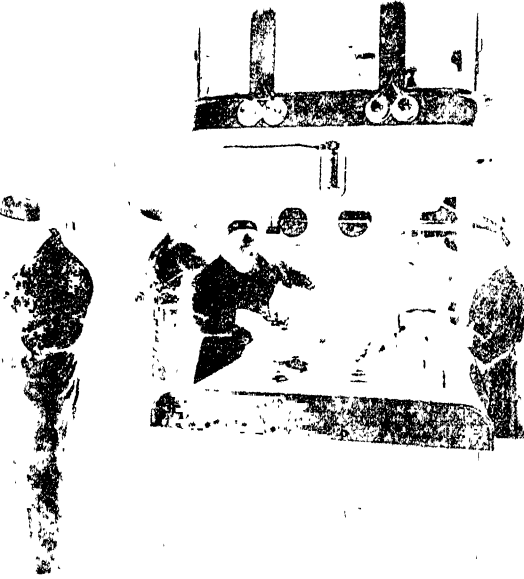
রান্নাঘর।

মগ্, গামছা, ধুতি কিছুই ছাড়ি নাই। বড় বিছানার চাদরের অন্তরালে সকল জোগাড়ই ছিল। প্রাতঃকৃত্যান্তে সভ্যতা-সম্মত বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া শয্যাগৃহ ত্যাগ করিলাম। "সবস্ত্র" না হইয়া শয্যাগৃহ ত্যাগ সভ্যতানুমোদিত নহে মনে করিয়া, এত কষ্ট স্বীকার করিতে হইল। "ক্রম-বিস্তৃতায়" জানিলাম যে, প্রাতরাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ নিয়ম বলবান্ নহে। অল্পাদপি অল্পমাত্রায় বস্ত্রভার প্রাতরাশের পূর্ব্বে জাহাজের প্রকাশ্যাদপি প্রকাশ্য স্থানেও মার্জ্জনীয়। মহিলাগণ তখনও প্রকাশ্য স্থানে আবির্ভূত হইবেন না এবং অযাচিত মহিলা-সান্নিধ্যে ডেকের উপর প্রাতঃকালে অবাধ বিচরণ ও আচরণ জাহাজের "অলিখিত বাণীর" অন্তর্ভূত।

জাহাজের প্রতিদিনের দৈনন্দিন ঘটনার বৈচিত্র্য ও পার্থক্য বড় অধিক নয়। ষ্টুয়ার্ড প্রত্যুষেই শয্যাগৃহে চা বিস্কুট ফল দিয়া যায়। তার পর নগ্নপদে রাত্রিবাস-বস্ত্রে বিচরণ, উল্লম্ফন ইত্যাদি; তৎপরে স্নান। আহারগৃহে ৮৷৷০ টার সময় প্রচুর পরিমাণে প্রাতরাশ (Breakfast), ১ টার সময় জলযোগ (Lunch), ৪টার সময় পুনরায় চা ও সাতটার সময়—Dinner, মধ্যে একবার ডেকের উপর বসিয়াই একবাটী-সুপ, মধ্যে মধ্যে রুচি ও আর্থিক অবস্থা-ভেদে আইসক্রীম, Lemon Syrup ইত্যাদি (ইহার স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়)। এইরূপ অনবরত আহারেই জাহাজে বিরহীবিরহিণীরা কোনমতে কায়ক্লেশে "দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি"। দুই বার চার সহিত যে ফল-মাখন-মিষ্টান্ন দেয়, তাহাতে আমাদের ভাল-রূপেই দৈনিক ভোজন হইয়া যাইতে পারে। আর আর "প্রধান আহার" তিনটাও তদনুরূপ। মৎস্য, মাংস, মিষ্টান্ন, ও ফল, "স্থলচর" পেটুক-প্রধানেরও ভীতি উৎপাদন করিতে পারে। "লবণাম্বুরাশির বেলা" ত্যাগ করিয়া কিছু দূর যাইতে না যাইতেই অর্ণবপোত-বক্ষে ভীমকুম্ভকর্ণেরও চমকপ্রদ আহার্য্য-সম্ভার দেখিতে দেখিতে প্রতি "খানা ঘণ্টার" পর টেবিল হইতে আত্মারাম সরকারের যাদুবিদ্যা-বল-সদৃশী কোন মহাশক্তি-বলে কোথায় যে তিরোধান হয়, তাহা আমি নিরূপণ করিতে পারিলাম না। আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া উঠিবার পর মনে হইল যে, আজ সমস্ত দিন কেন, কালও বোধ হয়, কিছু "চলিবে না"। কিন্তু দ্বিতীয় ঘণ্টার পর যথাসময়ে "ক্ষুধারূপেণ
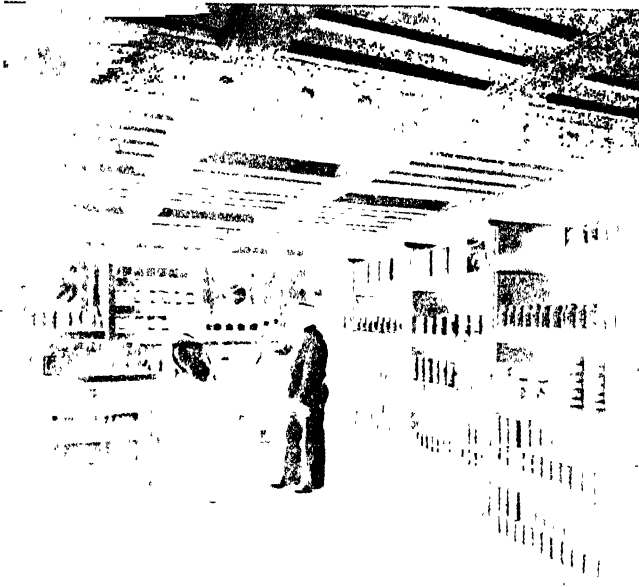
ভাঁড়ার ঘর।

সংস্থিতা মহাদেবী"র আবার দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশের আসামীর মতই পূর্ণতেজে আবির্ভাব হওয়া বাস্তবিক অঘটন-ঘটন। জাহাজে যাওয়া আসায় যাঁহাদের "দেশে" থাকিবার অধিক সময় থাকে না, তাঁহারাও বিলাত-ফেরত অবস্থায় গণ্ডদ্বয়ে সুপক্ক আপেল শোভার অধিকারী কি'সে হন, সে তথ্যের মীমাংসার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

যথাশক্তি আহার্য্য-অন্তর্ধান-সাহায্য চেষ্টায় বিরত ছিলাম বলিতে পারি না। ইচ্ছা ও সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবারেই চলিয়াছে। বিশেষতঃ আপেল, আপ্রিকট, আনারস, বোম্বাই আম, আঙ্গুর, ফিগ, পেঁপে, ফুটী, প্রুণ, আইসক্রীম, চিজ, নানা রকমের নিত্যনূতন সমুদ্রমৎস্য এবং নানা গঠনের নানা বর্ণের নানা আস্বাদনের পুডীং ও কেকের সঙ্কটাপন্ন সান্নিধ্যে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহিলেও অনিচ্ছাক্রমেও ধৈর্য্য নষ্ট করে;—সুন্দরী প্রতিবেশিনীগণের সহিত কথা কহিতে কহিতে মনের বিনা অনুমতিতে অনেক সময় হাত কাঁটাচাম্‌চেকে কিছু না কিছু তোলাইয়া মুখবিবরে উপস্থিত করে। তখন আর—'না' বলা যায় না।

এক একটি টেবিলে দুই জন "কেতা দোরস্ত" বিনীত সুবর্ণ-মুদ্রা বক্‌সীস্-প্রত্যাশী ভৃত্য মোতায়েন। নিঃশব্দে সকলের মন যোগাইতেছে। ভোক্তাকে কষ্ট করিয়া, কাটা চামচে স্থাপনের সাঙ্কেতিক ভাষাটা আয়ত্ত করিতে হয়। তাহারই সাহায্যেই নিঃশব্দে কলের মত আদান-প্রদানের কাজ চলিয়া যাইতেছে। এতলোক যদি গল্প-কথিত ইংরাজী অনভিজ্ঞ 'হোটেল আহারী' বাবুর মত তারস্বরে ক্রমাগত আমাদের সনাতন প্রথা-অনুসারে বলিতে থাকে, "ও খানসামা এই পাতে আর একটু 'অখাদ্য' দাও" তাহা হইলে Dining room-এর দৃশ্য যে কিরূপ হইয়া উঠে তাহা অনুভবনীয়। 'দীয়তাংভুজ্যতাং' কথার উল্লেখ নাই; কিন্তু চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়—কিছুর অভাব নাই।

"বরফের ঘরে" ফলমূল, মৎস্য, মাংস সব রাখা আছে, শোনা যায়। কিন্তু সত্য কথা "বরফের ঘরে" বরফের নাম মাত্রও নাই। বরফ দিয়া মাংস, মৎস্য, ফল তাজা রাখা নিতান্ত পুরাতন প্রথা। ইদানীন্তন বিজ্ঞান-শিল্প-সাহায্যে, যে Refrigenater এর উদ্ভাবন হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানরসায়নের সমবায়ের সুকৌশল মাত্র। কল-কব্‌জা আরক সাহায্যে অদ্ভুত "ঠাণ্ডা ঘরের" আয়োজন; প্রয়োজনীয় সব জিনিসই সেই শীতল ভাণ্ডারে রক্ষিত হয়। নিত্য প্রয়োজনমত তাহাই খরচ হয়। আহারের পাত্রাদি ও ভৃত্যাদিগের হাত পা ও পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন। দ্বিধা করিবার কোন কারণই নাই। যে খাইতে চায় না তাহার কোন 'অখাদ্য' খাইবার প্রয়োজন' নাই। উপরোক্ত দীর্ঘ তালিকা হইতে বোঝা যাইবে যে ফলমূল আহার্য্যেও সহজে জীবন-যাপন অসম্ভব নহে। প্রথম দিন দুইজন মুসলমান ও দুইজন মদ্যপ্রিয় গ্রীক্ আমাদের টেবিলে থাকাতে বড় অসুবিধা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনে বড় খানসামার শরণাগত হইয়া 'আমরা সম্ভবতঃ হিন্দুধরণের একটা আলাদা টেবিল যোগাড় করিয়া লইলাম;—সকল আহারই সেই টেবিলে চলিতে লাগিল। তবে চাটা যে যেখানে পায় পান করিয়া লয়।

এলাহাবাদের স্কুল ইনস্‌পেক্টার রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার কন্যা,—বম্বের প্রধান মারহাট্টা ডাক্তার রাওএর স্ত্রী, গোয়ালিয়ার মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও ল-মেম্বর এই কয়জন আমাদের টেবিল-সহচর। এক রকম চলিয়া যাইতেছে মন্দ নয়। জাহাজে লোক নিতান্ত কম নয়—অথচ অযথা ভিড়ও নয়। অতএব পাইখানা এবং স্নানাগারের দ্বারে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করিয়া থাকার গল্প যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা দেখিতে পাইলাম না। সাবান তোয়ালে প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্য লইয়া স্নানাগারে ভৃত্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে। মানুষপ্রমাণ মার্ব্বেল বা মার্ব্বেলের মত রঙ দেওয়া Bath tub সমুদ্রজল ও গরম জল মিশাইয়া—নিমেষের মধ্যে পূর্ণ করিয়া দিতেছে। পরমানন্দে স্নান করিয়া পরে ভাল জলে গা ধুইয়া নিজের কেবিনে আসিলাম। সান্ধ্য-আহারের পূর্ব্বে ফার্ষ্ট ক্লাসের সমস্ত যাত্রীকেই Evening dress পরিতে হয়। কখন কখন কাপ্তেন সাহেব টেবিলের প্রধান আসনে বসেন। আবার কখনও বা অন্যান্য উচ্চ কর্ম্মচারীরাও বসেন। সাহেব-মেমদের সান্ধ্য-পোষাকের সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি ভারতবাসীর পক্ষে সহজ না হইলেও অভ্যাসক্রমে ও শীলতার খাতিরে সহিয়া যায়; এখন clinging short skirtএর রাজ্য, এখনকার ত কথাই নাই।

বোট ডেক্‌।

আমাদের Arabia জাহাজের মোটামুটি বর্ণনাটা এইখানে হইয়া থাকুক। এ জাহাজখানার চারিটি তলাতেই লোক আছে। সর্ব্বোপরি Boat Deck, কাপ্তেন ও কর্ম্মচারীরা তথায় থাকেন, "Bridge" হইতে জাহাজ-চালান'র কাজ পর্য্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি হয়। যাত্রীদের তথায় উঠা নিষেধ। তার নীচে Hurricane Deck; এইখানে ভ্রমণের বিশ্রামের, ক্রীড়ার, এবং কদাচিৎ গ্রীষ্ম-প্রখর রজনীতে শয়নেরও যথেষ্ট স্থান আছে। এখানে কিন্তু ঝড়-ঝটিকার আধিক্যও যেন কিছু বেশী। এই ডেকেই ক্রিকেট, কোয়েট প্রভৃতি খেলা ও Sports, Ball Danceও মাঝে মাঝে হয়। এখানে কএকটি Cabinও আছে; কিন্তু সেগুলি তত সুবিধার বোধ হইল না।
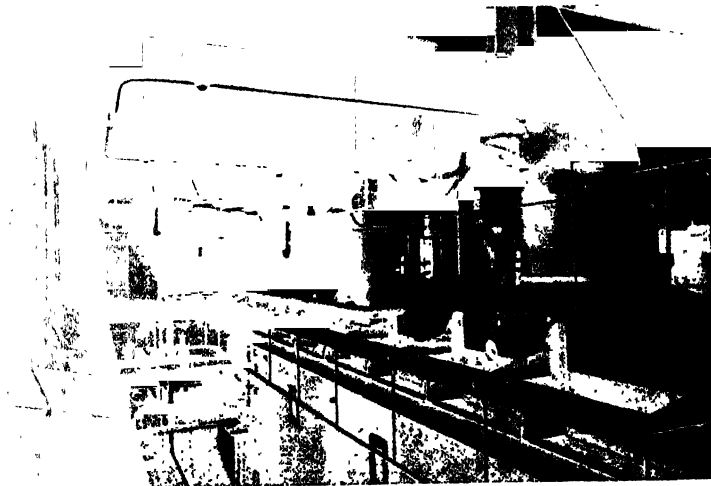
এঞ্জিন ঘর।

এই ডেকের একদিকে ধূমপানের ও তাস খেলিবার প্রকাণ্ড সাজান ঘর, আর একদিকে তদপেক্ষা বৃহৎ—সুন্দর সুসজ্জিত Music room ও বৈঠকখানা ঘর। এই সকল ঘরের

অপেক্ষা ডেকের উপরই প্রায় অনেকে সর্ব্বদা থাকেন। কেবিনের মধ্যে আমার মত একাকী অল্প লোকেই থাকেন। কিন্তু চিন্তা-সহচরীকে লইয়া, এবং অতিরিক্ত ১৫৲ পনের টাকা ব্যয়করা ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার দাম আদায় করিবার অছিলায়, আমার সময় অনেকের অপেক্ষা ক্যাবিনেই অধিক কাটে। Hurricane Deck এর নীচে Spar Deck; এখানেও অনেক ক্যাবিন আছে। এই ডেকেই আমার প্রথম স্থান হইয়াছিল। Purser, অর্থাৎ কেরাণী সাহেবের আপিস, ডাকঘর, নাপিতের দোকান ইত্যাদি এই ডেকে। তার নীচে Main Deck; আহার ও শয়নগৃহ এই ডেকে, অধিকাংশ শয্যাগৃহও এই ডেকে। আমার শয্যাগৃহ স্নানাগার প্রভৃতির নিকট, এইস্থান আমি পছন্দ করিয়া লইয়াছি। কোন অসুবিধা নাই। অসুবিধা হইলেও "নালিসের কারণ আদৌ নাই।" তার নীচে Hold. জিনিস পত্র কলকারখানা সমস্ত এই থানে। যাত্রীদের সেখানে যাইবার নিয়ম নাই। সেকেণ্ড ক্লাস ক্যাবিনগুলি জাহাজের পশ্চাদ্‌ভাগে—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানে। সে দিকটা দেখিবার, কিংবা সর্ব্বদা যাইবার, সুবিধা হয় না। সম্মুখের দিকে স্বতন্ত্র উচ্চস্থানে একজন Look-out man সর্ব্বদা সম্মুখে নজর করিয়া আছে। উচ্চ কর্ম্মচারিগণকে কিছু জানাইবার থাকিলে Speaking Tube দিয়া কথা কয়।

প্রমোদ-ডেক্।

জাহাজের সকল কর্ম্মচারী ও ভৃত্যই আনন্দিত মনে কাজ করে, বক্সীসের প্রত্যাশা করে ও পায়, এবং কাজ হইয়া গেলে স্বাধীনের মত অকুতোভয়ে মনিবমণ্ডলীর চক্ষের সম্মুখে
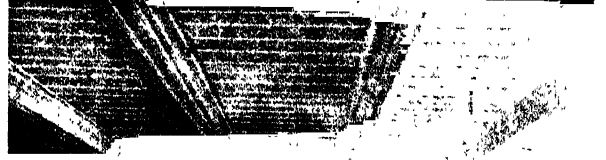
হুইল ঘর।
এইখান হইতে জাহাজ চালান হয়।

নিজেরা আনন্দ করে ও মনিবমণ্ডলীরও আনন্দের সাহায্য করে ও পায়। Cabin Steward এক পাউণ্ড; Table Steward দশ শিলিং; Bath Steward, Deck Stewardকে পাঁচশিলিং করিয়া বক্সীস আমার ন্যায় নিঃস্ব আরোহিগণের পক্ষে এক রকম নিয়মই আছে। ধনকুবেরদের নিয়ম অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু ইহারা প্রকাশ্যভাবে কিছু প্রার্থনা করে না। সকলেই তাহাদের গুণে বশীভূত হইয়া ইচ্ছাক্রমে বক্সীস দেন। ঘর হইতে তাহাদের দ্বারা জিনিস-পত্র চুরি বা নষ্ট হয় না। কোন কোন বন্দরে আগন্তুক অন্য লোক উঠিয়া কখন কখন চুরি করে। তদ্বিষয়ে যাত্রীদিগকে সাবধান করিবার জন্য ঘরে ঘরে নোটীস দেওয়া আছে। সকল স্থানেই সকল কার্য্যের সম্বন্ধে নোটীস টাঙ্গান আছে, সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই জানান আছে। তাই চক্ষুকর্ণবুদ্ধিসাহায্যে, সহজে সকল কাজ সুসাধিত হওয়া সতত সম্ভব। নিজ ক্ষৌরকর্ম্ম যে স্বয়ং সম্পন্ন করিতে অক্ষম, সে ছয় আনা দর্শনী দিয়া ক্ষৌরকার মহাশয়ের ইন্দ্রপুরী তুল্য সুসজ্জিত কক্ষে গিয়া কার্য্য সমাধা করিয়া আসে। আমার মত অলস অকর্ম্মণ্য অথবা আভিজাত্যাভিমানী অনেক লোক আছেন, যাঁহারা নিজে নিজের

ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে পারেন না। এই অভ্যাসে পূরা সাহেবীয়ানায় অভ্যস্ত না থাকায় প্রথম প্রথম লজ্জিতপ্রায় হইতেছিলাম; কিন্তু পরে দেখি নাপিত সাহেবের বৈঠকখানা নিত্য প্রাতঃকাল হইতে লোকে লোকারণ্য। রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিয়াও তাহার কাজ ফুরায় না। তখন নিশ্চিন্ত হইলাম।

জাহাজে ডাক্তার সাহেব আছেন। তাঁহাকে ডাকিলে পাঁচ শিলিং ফী দিতে হয়। কিন্তু ঔষধের দাম দিতে হয় না। হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতিদিনের আহারেই প্রত্যহ প্রায় ৬।৭ টাকা পড়ে; অন্যান্য বাবুগিরির আসবাবেও খরচ আছে। বিছানা তোয়ালে প্রায় নিত্য বদলাইয়া দেয়। দাম দিলে জাহাজে কাপড় পর্য্যন্ত কাচাইয়া লওয়া যায়। বৈঠকখানায় বসিয়া যত ইচ্ছা চিঠির কাগজে চিঠি লেখায় বারণ নাই। খেলা ধূলারও যোগাড় জাহাজে যথেষ্ট আছে। ইচ্ছা করিলে জাহাজ ভাড়ার টাকাটি এইরূপে বোধ হয় কতকটা তুলিয়া লওয়া যায়।

বৈঠকখানা।

কেবিন।

জাহাজ প্রতিদিন কত মাইল যাইতেছে, তাহার একটা চার্ট প্রত্যহ দেওয়া হয়। তা লইয়া বাজী খেলাও হয়। জুয়া খেলিবার অবকাশ পাইলে, একশ্রেণীর লোক সে অবকাশ কখন ছাড়িতে পারে না। প্রত্যহ প্রায় ৩৭৫ মাইল হিসাবে আমরা চলিতেছি। প্রতিবার ঘণ্টার পর জাহাজের ঘড়ীর কাঁটা অর্দ্ধঘণ্টা হিসাবে পিছাইয়া দেওয়া হইতেছে। তবে জানা যায় যে, ঘড়ির নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক চলিতেছে। এই উপায়ে স্থানীয় সময়ের নির্দ্দেশ হয়। চন্দ্রতারার সাহায্যে জাহাজ দিনরাত্র চলিয়াছে। সুয়েজ খালে যাইবার সময় রাত্রে Search Light জ্বালিয়া চলে। সোমবার চতুর্থীর চন্দ্র দর্শন করিয়াছিলাম; মঙ্গলবার Southern Cross দেখিলাম। ক্রমশঃ যেন কোন অজানা অচেনা জায়গায় অগ্রসর হইতেছি। সময় এক রকমে কাটিয়া যাইতেছে। তবে দিনরাত্রই পোষাক পরিয়া থাকিতে হয়, ইহাই যন্ত্রণা। যে, আপিসে পর্য্যন্ত মোজা খুলিয়া চটি জুতা পরিয়া থাকে, তাহার কি এ সকল পোষায়। তবে পরের চাকর, পরের সাবান, পরের তোয়ালে, আর অজস্র সমুদ্রজল পাইয়া বাবুগিরি কিছু বাড়িয়া যে না যাইতেছে তাহা নয়। অসীম সমুদ্র, অনন্ত আকাশ, ও

কর্ম্মচারী।

মধ্যে মধ্যে জাহাজের উপর নানা ভাবের লোকলীলা দেখিয়া সময় এক রকম কাটিয়া যাইতেছে, মন্দ নহে। যতটুকু বাকি থাকিতেছে, তাহা অনন্ত চিন্তার সাহায্যে বেশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে উড্ডীয়মান পক্ষী সারি গাঁথিয়া যাইতেছে। শ্রেণী-বিশেষের মৎস্য কখন কখন লাফাইয়া এখান হইতে ওখানে পড়িতেছে। আর নীলাম্বরের উপর সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া মাঝে মাঝে বড় সুন্দর রামধনুর অবতারণা হইতেছে। ভাবুকের নিকট এই অনন্ত মণ্ডলীর শোভার আদর যে শ্রেষ্ঠতম,—তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাবুক হইবার সময় ও অবসর বড় পাইলাম না। কারণ—চিন্তা আমায় কিছুতেই ত্যাগ করিল না। অত্যন্ত গরম ও বমনোদ্রেক হইবে ইত্যাদি কত ভয় করিয়াছিলাম; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ত তাহার চিহ্নও দেখিতে পাই নাই। তবে এখনই ও গর্ব্ব করা উচিত নয়। পথ এখনও অনেক বাকী। ধীর স্থির স্বচ্ছ দর্পণের মত সমুদ্র কাল রাত্রে ও আজ প্রাতে, ক্ষণকালের নিমিত্ত কিছু অধীর হইয়া, দৃপ্ত মানবকে মনে করাইয়া দিয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে সে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। অনেকে যাহা "সমুদ্রপীড়া" বলে, তাহা হইয়াছিল; কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমি এ পর্য্যন্ত অব্যাহতি পাইয়াছি। "You are a good sailor",—"You have nothing to fear",—"You have stood the first part of your first journey well" ইত্যাদি অভিনন্দন অনেকের নিকট পাইয়াছি। শুনিলাম, বৃহস্পতিবার রাত্রি ২টার সময় এডেনে পৌঁছিব; অন্ধকার রাত্রে ডাঙ্গায় নাবিতে ভরসা বা সুবিধা হইবে না। জাহাজ হইতেও সহর দেখা যাইবে না। কেবল কয়লা ও মাল লইবার হাঙ্গাম—গোলমাল। ভোরবেলা এডেন ছাড়িবার সময় কিছু দেখা যাইতে পারে। ৪টা ৫টার মধ্যে ভারতবর্ষে যাইবার মত চিঠিপত্র ডাকে দিতে হইবে বলিয়া সকলে প্রস্তুত হইতেছেন।

গত সোমবার পর্য্যন্ত আমাদের জাহাজ বঙ্গের সহিত বিনা-তারের বিদ্যুৎ-সংবাদ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। সে সীমা
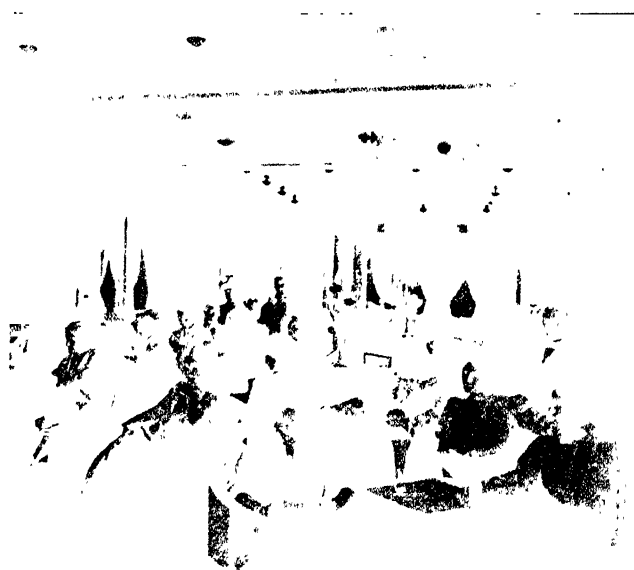
লিখিবার পড়িবার ঘর।

অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে বাড়ীতে একটা Marconigram দিয়া সে শৃঙ্খল কাটাইলাম। কাল মঙ্গলবার Salsette ষ্টীমার অনতিদূরে গৃহগামী Indian Mail লইয়া গেল। তাহাতেও Wireless Telegram আছে। মনে করিলাম, আর একটা Marconigram-এ কিছু অর্থব্যয় করা যাউক; কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলাম যে Salsette হইতে বম্বেতে Marconigram বৃহস্পতিবারের পূর্ব্বে যাইবে না। তাহার পর বম্বে হইতে কলিকাতা। ততক্ষণ এডেন হইতে রীতিমত টেলিগ্রাম করিতে পারিব। অতএব Marconigram আর করা হইল না।

তারহীন টেলিগ্রাফের ঘর।

চিঠিপত্র সমস্ত শেষ করিয়া ভ্রমণ-কথার কতকটা লিখিয়া ডাকে পাঠান গেল। এই দেবাক্ষর ভেদ করিয়া কেহ যে পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবে, তাহার ভরসা করিয়া লিখিলাম না। তবে কাহারও কখন কাজে আসিতে পারে, মনে ছিল। 'ভারতবর্ষ' পাঠকপাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতির ইহা কারণ ঘটিবে, তখন তাহা জানিতাম না। জানিলে অন্ততঃ পঞ্চানন্দের ভয়ে—ভাষা, ভাব ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে সংযত হইতাম। কিন্তু এ সকল পত্র-রচনার সময় সাহিত্য-সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি ছিল না। ক্ষমতাও বুঝি ছিল না। পিপাসী প্রাণ ও উন্মুক্ত চক্ষুকর্ণ যাহা পাইয়াছে, তাহাই ধরিয়া রাখিয়াছে।

বৃহস্পতিবার ২৩শে মে—কাল বৈকাল হইতে গরম কিছু অধিক পড়িয়াছিল; কিন্তু যে গরম আমাদের গ্রীষ্মকালে সহ্য করিতে হয়—যে গরমের মধ্য দিয়া কলিকাতা হইতে বম্বে পৌছিয়াছিলাম, ইহা তাহার তুলনায় বিশেষ কিছুই নয়। আজও বেশ গরম আছে; সাহেব-মেমেরা হাঁপাইয়া জামাকাপড় হাতে করিয়া সভ্যতানুমোদিত বস্ত্র-হীনতার চরমসীমায় পৌছিয়া জাহাজময় হা হুতাশ করিয়া বেড়াইতেছে। কোথায় দাঁড়াইলে একটু অধিক বাতাস পাওয়া যাইবে, তাহার সমীচীন পরীক্ষা বর্ত্তমান জীবনের যেন একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য;—এইভাবে "দাঁড়ুড়িয়া" বেড়াইতেছে। ইহাই তাহাদের বল,—ইহাই তাহাদের দৌর্ব্বল্য। হুজুগ বাহির করিবার "একটি"; কিছু—একটা রাগ গোসা অভিমান করিয়া কথা কহিবার জিনিস পাইলেই যেন বাঁচে। অভিযোগের কিছু বিষয় না থাকিলে ইহাদের যেন পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। আর দেখাদেখি, যাঁহারা অনভিপ্রেত বিষয়েও সাহেবানুকারী হইয়াছেন, তাঁহাদেরও এই সংক্রামক রোগে ধরিয়াছে। পথে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও Sea Sickness-এর ভয় সকলে আমায় যেরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহার ত চিহ্নমাত্র নাই। যে "কষ্টকে কষ্ট বোধ করিব না" একবার মনে করিতে পারিয়াছে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, তাহার দুঃখ কষ্ট ভয় কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই। নগদ ১৫৲ টাকা খরচ করিয়া ইলেক্‌ট্রিক পাখা শয়নকক্ষে লওয়া হইয়াছিল, কারণ জাহাজ কোম্পানী এ বিলাসটা বিনা-পয়সায় দেন না,—তাহার দাম আদায় এ কয় দিন আদৌ হয় নাই। কাল ও আজ সামান্য কিছু হইয়াছে মাত্র। অতএব প্রতিদিন পাঁচ টাকা করিয়া হাওয়া খাওয়ার উপযোগিতা সন্দেহের বিষয়। জাহাজে জামা, রুমাল, কলার প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হইবে,—এ পরামর্শ দিয়া যাঁহারা ঐ সব জিনিষে বাক্স বোঝাই করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও দেখিতেছি, বিশেষ ভুল হইয়াছিল। প্রত্যহ দুইবার কাপড় বদল করা প্রয়োজন বটে; কিন্তু একদম উৎপরীক্ষায় ফিটফাট হইতেই হইবে, নিত্য বারেবার কামিজ-কলার বদল চাইই চাই, এমন কথা কিছু
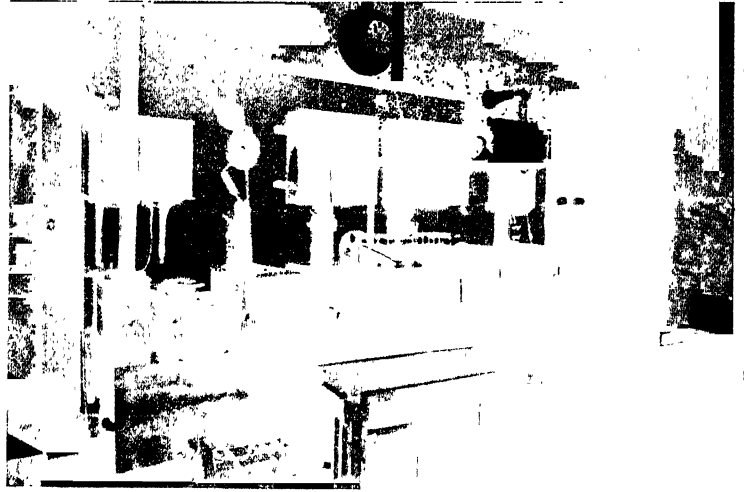
নাই। এ সম্বন্ধে এত কথা বলিবার প্রয়োজন এই যে, ফ্যাসানের দায়ে সঙ্গে বোঝা বাড়াইয়া—ভূতের বোঝা বহিয়া, এই দীর্ঘ পথে ভবিষ্যৎ যাত্রিগণ অকারণে কষ্ট না পান। ফ্রান্সে রেলে করিয়া প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক দুইটি লইয়া যাইতে "ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি" গোছের ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা। অতএব এক সপ্তাহের মত প্রয়োজনীয় অল্প কাপড় জামা 'Hold all'তে লইয়া মার্সেল ও প্যারিসে ব্যবহার্য্য সামান্য জিনিস সঙ্গে রাখিয়া ভারি মালপত্র বরাবর জাহাজে পাঠাইলেই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা।

কাল বৈকাল হইতে "কখন্ এডেন্ পৌছান যাইবে" এই সমস্যা লইয়া ক্রমাগত কথাবার্ত্তা—আলোচনা চলিতেছে। এইরূপে একটা যাহা হয় আলোচ্য বিষয় পাইলেই জাহাজের সকলেই যেন উন্মত্ত হয়। কিন্তু স্থির অচল থাকে, জাহাজের কর্ম্মচারিগণ। তাহাদেরই স্থির অচঞ্চল বুদ্ধির উপরেই জাহাজের ও যাত্রীর রক্ষা নির্ভর করে। প্রশ্ন পরম্পরায় তাহাদিগকে এই উদ্দাম যাত্রীরা ব্যস্ত করিয়া তোলে, তাহারাও কিন্তু তদুপযুক্ত। ভদ্র ও নম্র ব্যবহার তাহাদের যেন স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু কর্ত্তব্য-পালন-সময়ে যাত্রীদের সহিত গল্পগুজব করা বা আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিবার তাহাদের অনুমতি নাই। সে নিয়ম অতিক্রম করিলেই বিপদ্। নিম্নকর্ম্মচারীরা দিবারাত্র অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছে। কোম্পানির নিকট ইহারা বেতন কম পায়। কিন্তু যাত্রীদের "বক্সীসে" পোষাইয়া যায়। সেইজন্য যত্নও অত করে। প্রত্যেক বার ক্যাবিনে গিয়া দেখি যে, বিছানা জুতা কাপড়গুলি পুনরায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। একটি জিনিস স্থানচ্যুত বা অযত্নে রাখা নয়, কাজেই কোন জিনিস হারায় না। এডেনে নাকি আরব-দেশীয় চোরেরা উঠিয়া চুরি করে। জাহাজ বন্দরে লাগিলে সকলকে সাবধান করিবার জন্য, জাহাজের প্রকাশ্য স্থানে নোটিশ লাগান আছে।

তাই খাজাঞ্চী সাহেবের নিকট টাকা কড়ি রাখিতে দিলাম। ঘরের জিনিসের 'হেফাজৎ' ক্যাবিন-ষ্টুয়ার্ডই করিবে। মাথা ঘামাইবার কোন অবকাশই দেয় না। এ শ্রেণীর যুরোপীয় ভৃত্য সাধারণতঃ সাধু চরিত্র। কালে-ভদ্রে কখন দুই একজন অসাধু ভৃত্য সমস্ত সম্প্রদায়কে কলঙ্কিত করে।

মিসেস্ রাওয়ের, লাল পাতলা বেনারসী সাড়ী ধার করিয়া নানা ছাঁদে পরিয়া এক ফরাসী রমণী রঙ্গ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। এ উপলক্ষ পাইয়াও জাহাজ খুব সরগরম। বাস্তবিকই সেই মহিলাকে ভারতরমণী বেশে মানাইতেছিল ভাল। বিলাতী হাওয়া স্ত্রীপুরুষে বিলাতী পোষাকের দাসত্বের জন্য এক শ্রেণীর লোক যেন পাগল হয়, ইংরাজেরাই তাহা বুঝিতে পারে না। তবে এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা আমাদের রমণীগণের বুদ্ধি বিবেচনা বিচার অনেক অধিক। তাঁহারা সহজে বিলাতী পোষাকের জালে পড়েন না।

প্রায় রাত্রি ১ টার সময় এডেনে জাহাজ পৌছিল। নোঙ্গর ফেলার হাঙ্গামে আরবীয় ভীমকায় ভীমতর-কণ্ঠ কুলীদের কয়লা তোলার গোলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সকালে যখন হয় সহর দেখা যাইবে মনে করিয়া পাশ মোড়া দিলাম। কারণ ভোর না হইলে জাহাজ ছাড়িবে না শুনিয়াছিলাম। তত রাত্রে কে আবার উঠিয়া মাফিক দস্তর কাপড় পরে বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইল না। দিবারাত্র এইরূপ সাহেব বল বাবু বল—সাজিয়া বেড়াইতে হয়, জাহাজের ব্যবস্থাই তাই। কিন্তু সকালে স্নানের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষ সকলেই রাত্রের কাপড়েই ডেকে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে কিংবা ডেকের উপর ঘুমাইতেছে, তাহাতে কোন দোষ বিবেচনা নাই। আমাদের অনভ্যস্ত চক্ষে—কিছু 'ঠেকে'। কিন্তু মেমেদের সান্ধ্য-বেশও ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীর সাহেবদের পর্য্যন্ত লজ্জা জন্মাইতেছে, এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতির আশু কোন সম্ভাবনা আছে বোধ হয় না। অথচ এ প্রশ্ন জাতির শ্রেষ্ঠতম নরনারীকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। বিলাতী ছবির কাগজে যে সকল হাসিঠাট্টার কথা বা ছবি বাহির হয়, বাস্তবিক তাহা শুদ্ধ হাসিঠাট্টার জন্য নয়। লোক-চরিত্র ও সমাজরীতি সংশোধন পক্ষে,—এই রূপে তীব্র বিদ্রূপ ও পরিহাস সময়ে সময়ে বিশেষ সহায়। সেদিন এক ছবির কাগজে প্রভু ও দাসীর মধ্যে সান্ধ্য-কথোপকথনের একটু আভাস দিলে, কথাটা একটু পরিষ্কার হইবে। গৃহস্বামিনীকে দেখিতে না পাইয়া প্রভু সদ্য-গ্রাম-প্রত্যাগত অল্পবুদ্ধি দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঝি তোমার মা'ঠাকুরাণী কোথায়"। কিছু ব্রীড়ানম্র স্বরে অনিচ্ছার সহিত দাসী উত্তর করিল,

"সান্ধ্য ভোজের জন্য প্রস্তত হইবার জন্য মা'ঠাকুরাণী বিবস্ত্র হইতেছেন"। "My lady is striping for dinner." ফ্যাসানি জগতের অধিস্বামী গৃহস্বামীর কথাটা হঠাৎ বুঝিতে একটু কষ্ট হইল। বুঝিবার পরে লজ্জা হইল। পল্লী-নিয়মে অভ্যস্ত দাসীর চক্ষে সান্ধ্য-বেশ-পরিধান প্রায় বিবস্ত্র হইবারই তুল্য,—একথা ফ্যাসান-পুঙ্গবের মনে লাগিল। ক্রমশঃ সুফল ফলিতে পারে। সাহেবেরা শুনিয়াছি, আমাদের তামাসা করিয়া বলেন, "We dress for dinner, but you undress for dinner"। সেটা দেশের সমাজের ও গৃহের নিয়ম মত পুরুষ মহলে হয়ত হয়, কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে সে কথা আদৌ খাটে না। অতএব এ বিষয়ে আমরা ভাল কি সহেবেরা ভাল ভাবিবার বিষয়। সহসা নিজ পথ ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি বা ভরসা হয় না। কোন কোন অসংযত পরিবারে ফ্যাসান তাড়নার বলে আংশিক "বুক কাটা" জ্যাকেটের আবির্ভাব হইয়াছে বটে। কিন্তু গায়ে সেমিজ বডির উপর "ঘোর-বেড়" সাড়ী, কোথায় বা 'ভেল' কিংবা চাদরে ভারত-মহিলার মহা মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। দিনের বেলার প্রচণ্ড গরমেও কিন্তু কাপড় কাহারও একটু কম করিবার যো নাই। আজ কেহ কেহ কোট খুলিয়া শুধু কামিজ গায়ে দিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু মেম দেখিলেই কোটটি টানিয়া লইবার ভাণ করিতে হইতেছে। কিন্তু স্নানের পূর্ব্বে সকলে পাতলা স্লিপিং সুট পরিয়া দুই ঘণ্টাকাল শুধু পায়ে জাহাজ ধোয়া জলের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে দোষ হয় না। আশ্চর্য্য etiquette!

যাহা হউক উঠিতে না চাহিলেও উঠিতে হইল। জাহাজ বন্দরে লাগিবার কিছুক্ষণ পরে "মহাশয় আপনার টেলিগ্রাম" শব্দে চমকিত হইয়া উঠিয়া পড়িলাম। বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না, তবু টেলিগ্রাম কেন আসিল—মনে করিয়া কেমন আতঙ্ক হইল। বেলা ১১টার সময় টেলিগ্রাম এডেনে পৌছিয়াছে। রাত্রি তিনটার সময় আমার হাতে পৌছিল। ছেলেরা বুদ্ধি করিয়া বম্বে ও এডেনে টেলিগ্রাম করিয়া ভালই করিয়াছে। ভাল সংবাদ পাইয়া মনে একটু অধিক বল স্বভাবতঃ হইয়াই থাকে।

উপরে ডেকের উপর আসিলাম। বন্দরে অসংখ্য অবুদ্ধি-গম্য লাল নীল আলো রহিয়াছে। প্রকাণ্ডকায় বলশালী আরব, সোমালী কুলীরা তাহাদের ভীষণ শ্রমবিনোদন সঙ্গীত গায়িতে গায়িতে নিমেষের মধ্যে দুই জাহাজ (Lighter) কয়লা আমাদের জাহাজে তুলিয়া দিল। অদ্ভুত অস্পষ্ট আলোক জলের উপরে ছায়া ফেলিয়া অন্ধকারকে বাস্তবিক 'পরিদৃশ্যমান' করিতেছিল। তাহা ভেদ করিয়া সেই মহাকায় শ্রমজীবিগণের ঘর্ম্মাক্ত অর্দ্ধনগ্ন কলেবর দেখিয়া Milton, Dante, মধুসূদনের অন্ধকার-পুরীর অধিবাসি গণের কথা মনে পড়িল। অসুরোচিত কার্য্য করিতে করিতে যে ঘনান্ধকারতুল্য ধূলার বৃষ্টি করিতে, লাগিল তাহার তরঙ্গে কবিকল্পনা ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া ঝটিতি পলায়ন করিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিয়া—শয্যায় আশ্রয় লইলাম। প্রত্যূষে জাহাজ ছাড়িবার উপক্রম হইতেছে, বুঝিয়া,—আবার ডেকের উপর গেলাম। তৃণপল্লবহীন নগ্নসৌন্দর্য্য পর্ব্বত পরুষকঠিন একাকিত্বের সমুদ্রের মাঝখান হইতে উঠিয়াছে। জাহাজ হইতে নাবিয়া সহর প্রদক্ষিণের সময়ও ছিল না, আর দেখিবার যোগ্য বিশেষ কোন বস্তুও নাই বলিয়া সে চেষ্টা করা গেল না। অনেক জিনিস দূর হইতে দেখিলে বরং কিছু ভক্তি থাকে। এডেন সহর সেই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যশালী।

ভারতবর্ষের পথে এসিয়ায় ইংরাজের প্রধান দুর্গ এই এডেন। সুয়েজখাল ইংরাজের হাতে সম্পূর্ণ নাই। ফরাসী ও অন্যান্য জাতিরও ইহাতে অধিকার আছে। কিন্তু ইংরাজের তাহাতে আসিয়া যায় না। এডেন ও পেরিন্ এই দু'টি তাহাদের হস্তগত। লোহিত-সমুদ্র দিয়া আরব সাগরে যাইতে হইলে, এডেন পেরিণের সুসজ্জিত কামানের সম্মুখ দিয়া যাইতেই হইবে। ইংরাজকে পরাভব না করিয়া কিংবা তাহার অনুমতি না লইয়া কেহ এই পথে প্রবেশ করিতে পারে না।

দক্ষিণ পথ দিয়া গিয়াও ভারতসমুদ্র প্রবেশ করা কঠিন। পুরাকালে এক সময় পেরিন্ ফরাসীরা লইবার উদ্যোগ করিতেছিল। রাত্রে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ফরাসী নৌসেনাপতির সহিত আহার-সময়ে অসতর্ক কথাচ্ছলে তাহার সংবাদ পাইয়া নিশাযোগে পেরিন্ দখল করিলেন। প্রাতে যখন ফরাসী-জাহাজ দ্বীপ দখল করিতে গেল, তখন বৃটীশ নিশান তথায় গর্ব্বভরে—বুঝিবা কতক বিদ্রূপভরে—উড়িতেছে। ইংরাজ এইরূপে

সর্ব্বত্র আট ঘাট বাঁধিয়াছেন ও ভারতের বিদেশী আক্রমণ-শঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে। Mediterraneanএর সদর ফটক Gibralterটি দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঘটিয়া উঠিতেছে না।

সুয়েজ খাল।
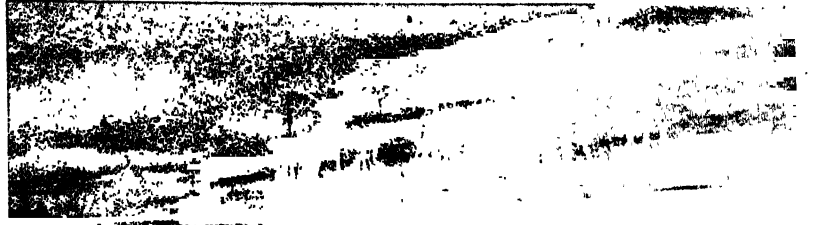
এডেন বন্দর ছাড়িয়া পেরিণের সংকীর্ণ পথে পোত-চালনা কিছু কঠিন। অতি সাবধানে যাইতে হয়। "পাঁচ বাম মিলে না" বলিয়া দেশী খালাসী সুর করিয়া জল মাপে না। জাহাজের দুই দিকে বাহির করা কাষ্ঠ-মঞ্চের উপর হইতে জল মাপিবার সরঞ্জাম লইয়া দুইজন ইংরাজ নাবিক পূর্ব্বশ্রুত সুরের অনুরূপ সুরে অথচ নূতন বুলিতে "A half and six" গাহিয়া জল মাপিতে মাপিতে জাহাজ লইয়া চলিল। স্থান-বিপর্য্যয়ের লক্ষণ ক্রমশঃ নয়ন-গোচর হইতে লাগিল। দুই চারিটা এসিয়ার অনভ্যস্ত ভিন্ন-জাতীয় পাখী দেখা গেল, আর মাছি ফড়িং এর জাতি ও আকারের পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হইতে লাগিল। দুই দিকেই কূলের নিকটে নিকটে ছোট বড় পাহাড়। উচ্চ-নীচ জমি। মাঝে মাঝে সংকীর্ণকায় লোকালয় দেখা যাইতে লাগিল। যেন বড় নদীর উজান বহিয়া যাইতেছি, মনে ধাঁধা লাগিতে লাগিল। স্থান অল্পপরিসর বলিয়া বিপরীতগামী অনেক জাহাজ আসেপাশে দেখা গেল। অসমুদ্রগামী ছোট ছোট নৌকাও পালভরে যাইতেছে। বেলা ১টার সময় পেরিণ উত্তীর্ণ হইয়া লোহিত-সমুদ্রে প্রবেশ করা গেল। লোহিত-সমুদ্রের লোহিত অপবাদ কেন হইল, বুঝিতে পারিলাম না। ভারত ছাড়িয়া যে নীলিমা-সাগরে এ কয়দিন ভাসিয়া আসিতেছি, সেই নয়নমনোরম নীলই বরাবরই এখনও দেখিতেছি। দিগন্তবিস্তারী সেই নীল সাড়ীতে হীরক-চূর্ণ-মণ্ডিত আঁচলার "বাহার" এখনও চলিয়াছে। তফাৎ এই যে, গরম কিছু বেশী। যে দিকে আমরা যাইতেছি, বায়ুর গতিও সেই দিকে, সেই জন্য সম্মুখ বায়ুর অভাবে এত গরম বোধ হইতে লাগিল। নতুবা দুই দিকে বহুদূরে মরুদেশ থাকাতে গরম বেশী বলিয়া যে লোক-সংস্কার আছে—তাহা অমূলক বলিয়াই মনে হয়। সংকীর্ণ পথে অনেক জাহাজ যাতায়াত করি-তেছে। আকাশ ও সমুদ্রের মিলন-স্থলে অস্পষ্ট ধুম্রাকার একটা ছায়ার মত দেখা গেল। যতই

সুয়েজ।

অগ্রসর হইতে লাগিলাম, অল্পে অল্পে সেই ছায়া একটা জাহাজের আকার ধারণ করিল। ক্রমশঃ সেই জাহাজ আমাদের নিকটবর্ত্তী জাহাজ হইতে বিপরীত মুখগামী অপর একখানি জাহাজের দৃশ্য হইয়া অবশেষে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অল্পে অল্পে বিপরীত দিকের সীমান্ত-রেখায় মিলাইয়া গেল। ভূগোলের প্রথম পাঠের প্রত্যক্ষ প্রমাণ-পরিচয় বিস্তীর্ণ সমুদ্র-পথেই পাইলাম। বিলাতী টেলিগ্রামে দেখা গেল যে, প্যারিসের নিকট রেল সংঘর্ষণে ৫১ জন মানুষ মারা গিয়াছে। জলে স্থলে কি সংহার-মূর্ত্তির এবার অবতারণা! টাইট্যানিক ব্যাপারের পর স্নেহবশে বিপদভয়ে যাঁহারা আমার সমুদ্রযাত্রার বিরোধী তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিবেন জাহাজে না চাপিয়া—রেলে চাপিয়াও ত পরিত্রাণ নাই। সম্পদ্‌বিপদ্ যাঁহার পূর্ণাধীন—সেই বিপদ্‌ভঞ্জন সাহায্য ব্যতীত নিস্তার-সম্ভাবনা কোথায়।
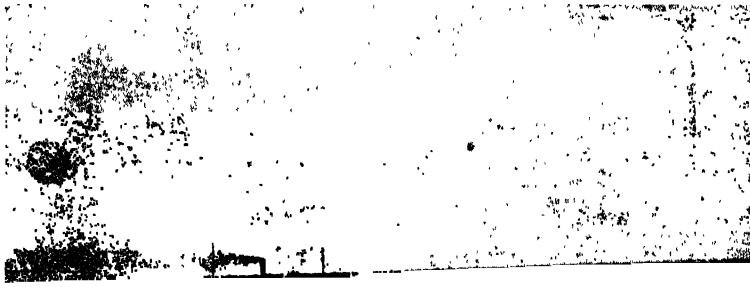
জাহাজ হইতে বিপরীত মুখগামী অপর জাহাজের দৃশ্য।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে জিবুল টেয়ার (Jebul Terre) নামক পার্ব্বত্য দ্বীপ দেখা গেল। সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র এই দুই দ্বীপ তুরস্কের অধিকারভুক্ত। একটার উপর বাতিঘর (Light House) আছে। আজ কাল তুরস্ক ও ইটালির মধ্যে যুদ্ধের ওজরে বাতি জ্বলে না। পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে — ইটালিয়ান রণতরী এই সকল প্রদেশও আক্রমণ করিবে। সে কথা যথার্থ হইলে সাক্ষাৎ যুদ্ধের ঘোরতর ব্যাপারের আন্দাজ কতক পাওয়া যাইত। কিন্তু যুদ্ধস্রোত এতদূর এখনও বিস্তৃত হয় নাই।

কিছুদূরে আফ্রিকার উপকূলাংশ দেখা যাইতে লাগিল। ছোট বড় সারি সারি কএকটা পাহাড় দেখা গেল। নাবিকেরা ইহার নাম Twelve apostles বা দ্বাদশগোপাল দিয়াছে। এইরূপ অকারণ স্বেচ্ছামত ধর্ম্মের বিদ্রূপাত্মক নামকরণের—আমাদের দেশেও অভাব নাই। সন্ধ্যায় শীতল বাতাসে দিবসের উত্তাপ-স্মৃতি ক্রমশঃ কমিয়া আসিল।

২৪শে মে শুক্রবার।—লোহিত-সমুদ্রে লোহিত মূর্ত্তি ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সময় সময় সূর্য্যাস্ত সময়ে নাকি তীরভূমি ও তীরবর্ত্তী নিম্ন পাহাড়গুলি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হয়, তাই লোহিত-সমুদ্র এই খ্যাতি। রঞ্জিত সমুদ্র-কীটাণুর গল্প কল্পনায় প্রসূত। গ্রীষ্মের বিশিষ্ট লোহিত ভাব দেখাও আমার সৌভাগ্যক্রমে হইল না। বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর কথায় রাশীকৃত যে "ঠাণ্ডা" কাপড় লোহিত-সমুদ্রে ব্যবহারের জন্য আনিয়াছিলাম, তাহার ত আবশ্যকই হইল না। আর কলার কামিজ পারিপাট্য ও বৈচিত্র্য দেখাইবার অবকাশ বা প্রয়োজনও বিশেষ দেখা গেল না। দুইবেলা কামিজ বদলাইতে হইবে, এমন ব্যবস্থা বড়লাট কাউন্সেলের মেম্বরেরও ত দেখিলাম না। পশ্চাদ্‌গামীরা আমার ন্যায় ভুল না করেন বলিয়া একথা বারংবার উল্লেখ করিতেছি। তবে খাস সাহেবদের পক্ষে একথা খাটিতে পারে না।

রীতিমত সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সমুদ্র বক্ষে ভালরূপে এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই বলিয়া, আজ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ডেকের উপরে আসিলাম। "Lookout man" যে ডেকে জাহাজের মুখের নিকট দাঁড়াইয়া সম্মুখে দেখিতেছে, সে ডেকে উঠিয়া তাহার নিকট পর্য্যন্ত গেলাম। সেখানে যাইতে কোন বাধা নাই। কেবল তাহার সহিত কথা কহিয়া তাহাকে অন্যমনস্ক করা নিষেধ। নিকটে গেলেও বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়, অতএব না যাওয়াই ভাল। আমার পদশব্দে একবার ফিরিয়া—চকিতের মত আমাকে একবার দেখিয়াই—আবার নিজ পর্য্যবেক্ষণ-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতর্কতার উপর জাহাজের মঙ্গলামঙ্গল অনেকটা নির্ভর করে। বিশেষতঃ

লোহিত-সমুদ্রে এখন রাত্রিকালে বিপদ্ অপেক্ষাকৃত অধিক। তুরস্ক, ইটালী উভয়েরই Light House যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া অবধি বন্ধ রহিয়াছে। কেবল আমাদের রাজার যাইবার আসিবার সময় তাহারা উভয়ে অনুগ্রহ করিয়া আতিথ্য-সৎকার স্বরূপ বাতিঘর জ্বালাইয়া ছিল। এখন সে সুবিধা বন্ধ। কাজেই রাত্রে অন্যান্য জাহাজকে অতি সাবধানে যাইতে হয়। আকাশ আজ মেঘশূন্য। তাই রাত্রি বড় পরিষ্কার, চন্দ্রদেবও মাঝে মাঝে দেখা দিতেছেন। এমন চমৎকার রাত্রে উন্মুক্ত আকাশের সৌন্দর্য্য উপভোগ বহুকাল ঘটে নাই। তাই স্তব্ধ প্রাণে কিছুক্ষণ নিজেকে সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবাইয়া রাখিলাম। প্রাণে বড় তৃপ্তি—বড় শান্তি পাইলাম।

পেরিণ পাহাড়ের নিকট "চায়না" (China) জাহাজ ডুবিয়াছিল। এখনও তাহা তুলিতে পারে নাই। এখনও তাহার মাস্তুলের অংশ দেখা যায়। ক্রমশঃ পূর্ব্বাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে—"আমাদেরই আপন" সূর্য্যদেব রক্তিম-বরণ নিজ তনু প্রকাশিত করিলেন। চারিদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কি মহান্ —কি অপূর্ব্ব সে দৃশ্য!—ভক্তিপূর্ণ প্রাণে নতমস্তকে তাঁহার বন্দনা করিলাম। প্রভাসের কবি যে মহাগীত গায়িয়াছিলেন—ইহা তাহার বিপরীত। "But Eastward look, the sky is aglow with light" ইংরাজ কবির কথা পাল্টা বলিবার কিন্তু প্রয়োজন নাই। অজপার কবি গায়িয়াছিলেন, "বর্ণরূপং নমামি"। এই মূর্ত্তি গায়ত্রীর পূর্ণ বিকাশ। অজপা-জপে ভগবৎ-শক্তিকে বর্ণরূপে কেন বর্ণনা করিয়াছে,—ভক্তমণ্ডলের অন্তরের চক্ষু বহিশ্চক্ষুর সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যের সুধাময় ফল আজ তাহা বুঝিতে পারিলাম। সমুদ্রের জলে লাল, নীল, সবুজ রঙ্গের মেলা, তাহার উপর শ্বেত উর্ম্মিরাশির অবিশ্রাম চঞ্চলতা যেন রঙ্গের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে। সীমাশূন্য নীল আকাশেও পীত লোহিত রঙ্গের খেলা পলে পলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলাইতেছে; প্রকৃষ্ট বিপর্য্যয় পলকে পলকে। কাহার সাধ্য তাহা কথায় বা তুলিকায় বর্ণনা করে। জীবন্ত গায়ত্রী সম্মুখে। বিশ্ব-মন্দিরের এই মহান্ গরীয়ান্ চিত্রের মধ্যে বিশ্বনাথের অপূর্ব্ব ছবি নির্নিমেষ-নয়নে মুগ্ধ স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। সে দৃশ্য ভুলিবার নয়। বৈদিক কবি ধর্ম্মজ্ঞ, ভাবজ্ঞ ও রসজ্ঞ ছিলেন।

ডেকে অনেকগুলি পরিচিত উচ্চপদস্থ ইংরাজ ছিলেন। তাঁহাদের সহিত কথায় কথা বাড়িল—আলোচনার তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ভাবুক-চক্ষে—কবিচক্ষে আমার চক্ষে দেখিবা মাত্র এই দৃশ্যে আত্মহারা হইলেন। ভারতে দীর্ঘ দিন যাপন করিয়া এ সকল অপূর্ব্ব মহান্ ব্যাপার সম্বন্ধে ভারতের অন্তস্তরের কথা—যাঁহারা জানিয়া আসেন নাই, ইংলণ্ডোন্মুখ ভারতবাসীর মুখে তাঁহারা সামান্য আলোচনাতেই যেন কৃতার্থমন্য হইলেন, যেন নূতন আলোক দেখিতে পাইলেন। বিচিত্র ব্যাপার এই যে, বৈষয়িক-সংঘর্ষ-ব্যস্ত পরস্পরের পার্শ্ববর্ত্তী ইংরাজ বাঙ্গালী কখন পরস্পরের আভ্যন্তরীণ সত্তার অনুভবের অবকাশ পান না। এই আলোচনার ফলে "অসভ্য আদিম" হিন্দু ইংরাজের নিকট সর্ব্ব-শিক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য, তাহা ক্ষণকালের জন্য বলিতে—বুঝি বা ভাবিতেও ভুলিয়া গেলেন।

তাহার পর প্রাত্যহিক কার্য্য। ক্ষৌরকার-মন্দিরে প্রথমে উপস্থিত হইয়াও ১৫ মিনিটের কমে নিস্তার নাই। নানা ছাঁদি কথায় সময় নষ্ট করে। নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে ক্ষৌরকর্ম্ম করে। দশটা জিনিস বিক্রয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু অন্যলোক উপস্থিত থাকিলে দোকানে উপস্থিত হইবার ক্রম অনুসারে পরপর যদি কাজ সারিতে হয়, তাহা হইলে সময় ক্ষেপের ত কথাই নাই। যাঁহারা ক্ষৌর-কার্য্য-অনুরোধে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা ভদ্রলোক হইলে কথা-বার্ত্তা চলে। নতুবা সংবাদপত্র পাঠ কিংবা Picture Post Card দেখা ইত্যাদি কার্য্যে ক্ষৌরকার মন্দিরে সময় সংহারের উপায়। স্নানাদি কার্য্যেও প্রায় তিন কোয়াটার। তিনবার আহারে নয় কোয়াটার। দুইবার চা খাওয়ায় আধ ঘণ্টা। সময় "খুন" করিবার এত অবকাশ পাইয়াও সময় যেন কাটে না। ভোরে ডেকের উপর নিদ্রিত সাহেবদিগের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ও মুখভঙ্গী দেখিয়া দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন, কতকগুলা, জ্ঞান জন্মিয়াছে। আমার কৌতুকপ্রিয় দৌহিত্র "দাদাবাবুর" নাসাধ্বনি-সংযুক্ত নিদ্রার উপলক্ষ করিয়া যে ব্যঙ্গ করে তাহাতেই আমি মরিয়া আছি। তার উপর ডেকশায়িত

নাপিতের দোকান।

সাহেববৃন্দের সনাসাগর্জ্জন মুখভঙ্গীর সদৃশ মুখভঙ্গী পাছে ডেক চেয়ারের উপর বসিয়া মেম ঠাকুরাণীদিগকে দেখাইয়া ফেলি, এই ভয়ে আমি ডেকে নিদ্রার দিক্ দিয়াও যাই না।

মুখভঙ্গী-সম্বন্ধে আমার গুরুতর ভয় ব্যক্ত করাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "আপনার মুখভঙ্গীর কথা অমন করিয়া কেন বলিতেছেন, আপনার ত বেশ সুন্দর মুখ"। শুনিয়া সজোরে তাঁহার হাতটা নাড়িয়া দিলাম। বলিলাম, আপনি চিরজীবী হউন, "দারোগা হউন"। এমন মনোরম কথা ত কেহ কখন বলে নাই। নিকটে 'সতার' কিংবা 'বিনা-তারের'ও টেলিগ্রাম করিবার উপায় থাকিলে সর্ব্বস্ব খরচ করিয়া এখনই এসোসিয়েটেড্ প্রেস-সাহায্যে সমগ্র ভারতে এই শুভসংবাদ প্রচার করাইয়া দিতাম। চক্রবর্ত্তী পরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতাটা বাড়িতেছিল—এত মধুর ভাবব্যক্তির পর সে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইবার সম্ভাবনা।

ডেকে বেড়াইতেছি, এমন সময়—নবপরিচিত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ম্যাকিন্টায়ার সাহেব আসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। দেশের কথা—বিলাতের কথা হিন্দু ইংরাজের দোষগুণের ধারাবাহিক সেরেস্তা বাঁধা—নানা কথা হইল। সে সব কথার সবিস্তার বর্ণনা করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। জেনারেল সাহেব লণ্ডনে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত জেদ করিলেন এবং ঠিকানা দিলেন। ভারতে ইংরাজ-বাঙ্গালী সম্বন্ধ-সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাই। সামান্য কাপ্তেন লেফ্‌টেনাণ্টেরা মদগর্ব্বে ভদ্রভাবে কথা কয় না—কিন্তু তাহাদের উচ্চতর কর্ম্মচারীরা কয়। সামান্য collector সাহেবও তদ্রূপ অপরাধে অপরাধী, কিন্তু লাট কৌন্‌সেলের মেম্বরগণ ও স্বয়ং লাট সাহেব দেশীয়গণকে আদর করেন, ইহা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। ভাবিবার বিষয়ও বটে। বয়োবৃদ্ধির সহিত লোকাভিজ্ঞতা বোধ হয় বাড়ে এবং তাহাতেই সাধারণ ইংরাজের উন্নতি সাধিত হয়। নিজেদের দেশেও ইহারা সহজে সাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইতে অনেক সময় লয়।

বদাওনের Collector Sherring সাহেবের সহিত আলাপ হইল। আমার বি, এ, পরীক্ষায় Shakespeare paperএ তাঁহার পিতা Rev. Mr. Sherring পরীক্ষক ছিলেন। তখন পরীক্ষায় প্রতি প্রশ্নের নম্বর সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি ছিল না। পরীক্ষার পূর্ব্বরাত্রে Her Bandmanএর অপূর্ব্ব হ্যামলেট অভিনয় দেখিবার পর দিন শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। তৎসম্বন্ধে ভয়ও স্পষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে Elezabethan Theatre সম্বন্ধে এক প্রশ্ন ছিল। Bandmanএর অভিনয়ের উত্তেজনা তখন মস্তিষ্ক অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছিল। অন্যান্য প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না লিখিলে বিপদের সম্ভাবনা, ইহা ভুলিয়া গিয়া এক Elizabethan Theatre সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর উন্মাদের মত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিয়া প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহন করিয়া দেখিলাম যে, বাকি প্রশ্নের উত্তর লেখা হয় নাই এবং সময়ও নাই। পরীক্ষায় নিশ্চয় অকৃতকার্য্যতা স্থির করিয়া বাড়ী আসিলাম। পরীক্ষার ফল-প্রকাশের পূর্ব্বে কলেজের প্রিন্সিপাল টনি সাহেবের মারফৎ শেরিং সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার যে ছাত্র এই অভিনয়োন্মত্ততা প্রকাশ করিয়াছে সে কখন ইংলণ্ডে গিয়াছিল কি না। প্রিন্সিপাল নিজের ঘরে ডাকিয়া যখন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা

করিলেন, তখন আত্মা ত উড়িয়া গেল ;—কবুল জবাব দিতে পারিলাম না। কারণ ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা বহুদিন বলবতী হইলেও যাওয়া ঘটে নাই—কেবল ব্যাণ্ডম্যানের অভিনয় দেখিয়া হয়ত এই উন্মাদ-লক্ষণ ঘটিয়াছিল জানাইলাম। টনি সাহেব ছাত্রদিগের নিকট সহসা ও সহজে হাস্যমুখ ধরা দেওয়া ভালবাসিতেন না ; সস্নেহে বলিলেন যে, শেরিং সাহেব আমার অভিনয়োন্মাদে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার জন্য তাঁহার মারফৎ এ প্রশ্ন করিয়া পাঠান নাই। এক প্রশ্নের উত্তরেই তিনি সমস্ত প্রশ্নের পূর্ণ সংখ্যা দিয়া আমায় সম্মানিত করিয়াছেন এবং কৌতূহল-ক্রমে আমার ইংলণ্ডের থিয়াটারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এই প্রশ্ন করিয়াছেন ;—বলিলেন, আজ Shakespeareএর Englandএ যাইবার সময় তাহা মনে পড়িল, এবং কৃতজ্ঞার সহিত শেরিং পুত্রকে এ পুরাতন গল্প বলিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

প্রেমের জয়

বহুদূর হ'তে গোয়ালিয়রের রাজার প্রাসাদ-তলে,
তরুণ ভিখারী আসিয়াছে এক, কা'রে কিছু নাহি বলে।
রাজারে হেরিবে, বলিবার যাহা রাজারে বলিবে সবি,
কহে, "ছাড় দ্বার প্রহরী, তোমায় দিব যাহা কিছু লভি।"
রাজা কহে, "ওগো তরুণ ভিখারি, অর্থ চাহ কি তুমি ?
চাহ কি কর্ম্ম, চাহ কি খাদ্য ?—কোথায় জনম-ভূমি ?"
যুবক কহিল, "চাহি না অর্থ, নাহি মোর তৃষা ক্ষুধা ;
গোয়ালিয়রের প্রাসাদে এলাম, পি'তে সঙ্গীত-সুধা ;
বহুদূর হ'তে শুনেছি মহিষী মৃগয়নার নাম,
শুনিতে তাঁহার সঙ্গীত-রস এসেছি তোমার ধাম !"
মন্ত্রীরা কহে,"ওহো, কি স্পর্দ্ধা !"—সেনাপতি কহে, "মারো।"
রাজা কহে,"রহ ; তরুণ ভিখারী তুমি কি গায়িতে পারো ?"
রামতনু কহে, "পারি কিছু কিছু,—অনুরাগ আছে বড়।"
রাজা কহে,"ভাল, দু'একটা গাও'—ভাল ভাল রাগ ধরো।"
রামতনু গান ধরিল যখন, নৃপতির সভাতলে,
'মল্লারে' তা'র বারি ঝরি' পড়ে, 'দীপকে' আগুন জ্বলে।
ফণানত করি' মুগ্ধ ফণিনী লুটিয়া পড়িছে পায়,
রাজার সভার সকল গায়ক করিতেছে হায় হায় !
রাজা কয়,"ওগো ধন্য গায়ক ! কিবা দিব উপহার ?
বাহুপাশে তোমা করিনু বন্দী, কোথায় পলা'বে আর ?
যোগ্যতর যে শ্রোতা তোমা হ'তে নাহি মহিষীর মম ;
ওগো কিন্নর ! আলোকিয়া রও মম সভা মনোরম।"

* * *

রাজপারিষদ্ রাঘবসিংহ সুন্দরী তনয়ারে
ভাবিতেছে—দিবে কোন্ নরনাথে, মহারাজা সুবাদারে।
সুকুমার কলাবিদ্যা নিপুণা করিয়া তুলেছে তায়,
তাহার মধুর কণ্ঠের কাছে কোকিলও লজ্জা পায়।
রামতনু কহে, "ললিত-কলায় এখন শিষ্যা তার
হেন পণ্ডিতা, জীবনে কখনো মিলেনিক কভু আর।"
রামতনু তা'র সকল বিদ্যা তাহারে করিল দান,
বাজিতে লাগিল একসুরে দু'টা হৃদি-তন্ত্রীর তান।
দিল গুরু গুরু মন্ত্রের সনে প্রেমবারি বরিষণ,
ভ্রমরের সাথে হৃদয়-কুসুম-গন্ধিত সমীরণ।
শস্যের সাথে দিল সে মৃগীরে শ্যামল শষ্পদল,
আকুল কোকিল-কণ্ঠের সাথে তৃষার রসাল ফল।
কথাভরা তান নিবে আসে ক্রমে দু'টা কণ্ঠের মাঝে,
ব্যথাভরা অনুরণনের বাণী দু'টী হৃদিবীণে বাজে।
ভ্রমরের গান নিবে আসে ক্রমে মধুভরা বনফলে,
বিহগের বাণী তিয়াসা জুড়ায় রসাল মুকুল-মূলে।
কলতরঙ্গ নিবে যায় কোথা হিয়া তটে তটে ফিরে,
ডুবিল মরাল মানস-সরের অগাধ গহন নীরে।

* * *

চলে রামতনু দিল্লীর পথে আনমনা ম্রিয়মাণ,
নিরাশার ঘন কালিমার ছায়ে মলিন হ'য়েছে প্রাণ।
ভাবিতে ভাবিতে চলে রামতনু,—সমব্যথী আছে কেবা ?
ব্যর্থ এমন তন্ত্রী-ধারণ, ব্যর্থ বাণীর সেবা।—
নাহি বংশের গৌরব মম, পদ-গৌরব নাই,
দীন অভাজনে দিল না কন্যা রাঘব সিংহ তাই !
হায় ! বাগ্‌দেবী দিবে বরমালা যক্ষপতির গলে,—
কাঁদিবে জানকী মম রক্ষের অশোক তরুর তলে !
কোন্ কিরাতের গলে পড়িবেরে বীণা সে সপ্তস্বরা ?
গা'বে কি সারিকা সোণার খাঁচায় সেই গীতি মনোহরা ?
সোণা-মুক্তার শক্ত আহারে কোকিলা কি বেঁচে রবে ?
রূপার-খনিতে কমল রোপিলে, কমল ফুটেছে কবে ?

সোণার চাবিতে খুলিবে কি আর প্রেম-দেউলের দ্বার ?
ললিত মৃণাল কেমনে সহিবে রথচক্রের ভার ?

* * *

সেই রামতনু আজি 'তানসেন'—নহে সে ভিখারী দীন ;
দিল্লীপতির সভায় আজিকে বাজা'তেছে তা'র বীণ।
গায় 'খাম্বাজ, ভৈরবী কাফি'—ঢালে সঙ্গীত-সুধা
শুনিতে শুনিতে দিল্লীর নাথ ভুলে' যায় তৃষা ক্ষুধা !
কভু চোখে জল, কভু দেয় কোল, কভু কণ্ঠের হার,
কভু কহে, "গুণী ! সুধা দে' কি গড়া তোমার বীণার তার ?
কণ্ঠে ঝরি'ছে, জাহ্নবী নদী, তুলি কল কল তান ;
রাজার কর্ম্ম-ক্লান্তি হরিছে নৃপ করি' তা'য় স্নান।
কিছুদিন পরে কহে তানসেন,—"একটি মাসের লাগি'
জাঁহাপনা ! তব চরণের তলে কাতরে বিদায় মাগি।
সঙ্গে লইব হস্তী, অশ্ব, রাজোচিত লোকজন,
একটি রাজ্য জিনিতে আমার অবকাশ প্রয়োজন !"
সম্রাট্ কহে মৃদুল হাস্যে—"জয়ী হয়ে' এস ফিরে' !
বরসাজে কবে কে দেখেছে কোথা সমরে যাইতে বীরে ?
ভেরীর বদলে বীণাতানে রণ বাধিবে যে ঘোরতর,
চন্দন-চূয়া বর্ম্মে বারিতে পারিবে কি ফুলশর ?"
চাহে রাঘবের সুন্দরীসুতা গুজরাট্-সুবাদার ;
ভীরু দুর্ব্বল রাঘব তাহাতে কথাটি কহেনি আর।
তা'রি ইচ্ছায় রাঘবসিংহ পুত্রকন্যাসহ,
আপন ধর্ম্ম ত্যজি' নেছে পরধর্ম্ম সে ভয়াবহ।
ইতিহাস বহে কালীর আখরে কালিমা-কলুষবাণী
শতেক হিন্দুরমণী হ'য়েছে মুসলমানের রাণী,—
ধর্ম্মের সাথে আপন কন্যা বাদসা' নবাব পা'য়
সঁপিতে হিন্দু গৌরব বড় ভেবেছিল হায় হায় !
এল সুবাদার রাঘবের গৃহে রাজপুরুষের সাজে,
লয়ে যাবে আজি কন্যাকে তা'র নিজ অন্দর মাঝে।
প্রেম-কুমারী সে সঁপেছে পরাণ তাহার গুরুর পায়
পরিণয় তা'র হয়ে গেছে,—কেন পরিণয় পুনরায় ?
কহিল দেখা'য়ে জহরাঙ্গুরী, "দূরে রও মূঢ়মতি,—
এখনি জহর ভখিয়া মরিবে তেজস্বিনী এ সতী।"
নিঃশ্বাস ত্যজি' হটিল নবাব ; কিশোরী চাহে গো তা'য়
কুমারী-জীবন করি'ছে যাপন যা'র পদভরসায় !

গৌরবভরে এলো তানসেন রাঘবের দ্বারদেশে,
ভাবী শ্বশুরের চরণে নমিয়া প্রবেশিল হেসে হেসে।—
তা'র পর সে গো অনেক বার্ত্তা, মস্ত সে ইতিহাস,
প্রথমে গায়ক চমকিল শুনি'—ছাড়িল দীর্ঘশ্বাস,
তা'র পর কত কাঁদিল গায়িল তুলিয়া বীণার তান,
সেই পুরাতন কণ্ঠে আবার শুনিল অনেক গান ;
দশদিন দশ রাত্রি ধরিয়া করিয়া চিন্তা ক্ষয়
শেষে হ'ল স্থির—"যাহউক সমাজে, প্রেমের হউক জয় !"
গোয়ালিয়রের রাজা কহে "সখা ! একি শুনিতেছি কথা,—
প্রণয়িনী লাগি' ত্যজিলে ধর্ম্ম শুনে' মনে পাই ব্যথা !
তানসেন কহে "ওগো মহারাজ ! হৃদয় হ'য়েছে জয়ী ;
হৃদি-ধর্ম্মের অধিপতি ছাড়া অন্যের প্রজা নহি।
স্বামীর ধর্ম্ম ল'য়েছে পত্নী' বিশ্বে দেখেছ তাই ;
প্রিয়ার ধর্ম্ম লইয়াছে স্বামী,—কেহ কি বিশ্বে নাই ?
স্বামী যদি হয়—নর সামান্য,—প্রিয়া যদি হয়—দেবী,
কি করিবে নর তবে, সে দেবীর ধর্ম্মেরে নাহি সেবি ?
প্রিয়া যদি হয়—তমসাবৃত জীবনে পুণ্য-আলো,
সে আলো যে পথে, তাহারে তেয়াগি' কোন্ পথ তবে ভালো ?
কেন রচে বিধি দু'টী হৃদি যা'র অণুতে অণুতে মিলে,
ধর্ম্মই হ'বে যদি তাহাদের ব্যবধান বিরচিলে ?
প্রিয়ারে আমার হিন্দুসমাজে ফিরে লও মহারাজ,—
এখনি ত্যজিব ছলনায় ভরা এই পরদেশী সাজ !
সমাজ ধর্ম্ম করিছে দ্বন্দ্ব—সিন্ধু-ঝঞ্ঝা মেঘে,
সব ভেদি' প্রেম-শৈল-শৃঙ্গ তা'র মাঝে আছে জেগে।
ধাতার আসন তলে পরশিছে তুঙ্গ শীর্ষ তা'র,
তথা হ'তে মোরা দেখেছি বিশ্বে সবই সম—একাকার।
সৌরভপূত মোরা বিধাতার করুণার পরিমলে,
দুইটী শিশির-বিন্দু মিলেছে চরণকমল-দলে !
যে চরণতলে সকল জাতির সব সন্তানগুলি
ত্যজি' ভেদদ্বেষ করিবে প্রণয়ে একদিন কোলাকুলি,
'পিতার কণ্ঠে প্রেমফুলহার সাম্যের সুষমায়,
আমাদের প্রেম-রক্ত গোলাপ দিয়াছি দুলায়ে তা'য়।
মানবের মন তুষিতে পরে'ছি পরধর্ম্মের সাজ,
আমার ধর্ম্ম জানি'ছে হৃদয়-রাজ্যের মহারাজ !
হে রাজন্ ! আমি করেছি যা'—তা'ত বিচিত্র কিছু নয়,
চির-গৌরবী বিশ্বজয়ী সে প্রেমের হ'য়েছে জয় !

শ্রীকালিদাস রায়।

বিবিধ

বিগত কএক মাসে কতকগুলি পত্র ও প্রবন্ধ-আমাদের হস্তগত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের আলোচ্য-বিষয়ের আংশিক গুরুত্ব এবং মনোহারিত্ব থাকিলেও স্থানাভাব এবং সম্পূর্ণ অনুমোদনাভাববশতঃ সেগুলিকে আমরা পূর্ণাবয়বে মুদ্রিত করিতে পারিলাম না;—সংক্ষেপে তাহাদের মর্ম্ম ও তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ

১। বীরভূম 'রতন লাইব্রেরী' হইতে শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় একখানি পত্র লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য যেরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং বাঙ্গালা পুস্তকপুস্তিকার দিন দিন যেরূপ ভূরি প্রচার হইতেছে, তাহার অনুপাতে বাঙ্গালা ভাষায় জীবনীগ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিয়া,—তিনি তাঁহার পত্রে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। বিগত শ্রাবণ সংখ্যার "ভারতবর্ষে" মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন জীবন-চরিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত, বাঙ্গালার সাহিত্যসেবী মণ্ডলীকে ইঙ্গিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎপক্ষে সহায়তাকল্পে উক্ত মৃত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে তাঁহার পরিজ্ঞাত কএকটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

যে সমুদায় পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকায় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের কোন প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে, "ভারতবর্ষে" যথাজ্ঞান সেই সকলের উল্লেখ করা হইয়াছে। পত্রলেখক মহাশয় তদতিরিক্ত আরও কএকখানি সাময়িক পত্রের নাম ও তন্মধ্যে উল্লিখিত ৺সিংহ মহাশয়ের প্রসঙ্গ তাঁহার পত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীমতী প্রভাসুন্দরী দেবী সম্পাদিত 'পুণ্য' নামক মাসিক পত্রের দ্বিতীয় বর্ষের পৌষ-মাঘ যুগ্ম সংখ্যায় 'তম্বরু ও ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে যে, সিংহ মহাশয় কেবল যে সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, তাহা নহে; সঙ্গীত-বিদ্যায়ও তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ ছিল। তাঁহার আবাস বাটীতে তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় সঙ্গীত-সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলাবতী-বীণার তম্বুরার জন্য, অলাবুর পরিবর্ত্তে, কাগজের তুম্বা নির্ম্মাণ করাইয়া সফলকাম হইয়াছিলেন।" এতদ্ব্যতীত ১৩০৮ সালের 'সাহিত্য পত্রিকা'র "বঙ্গে নীল" শীর্ষক প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ" নামক পুস্তক এবং স্বয়ং পত্রলেখক মহাশয়ের স্বসম্পাদিত, ১৩১২ সালে মুদ্রিত, বঙ্গের পরলোকগত বাঙ্গালা সাহিত্য সেবকগণের চরিতাভিধান গ্রন্থ "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" পুস্তকেও সিংহ মহাশয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়।

স্বর্গীয় সিংহ মহোদয়,—পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী প্রকাশিত "পরিদর্শক" পত্রিকার, এবং পরে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক মাসিকপত্রিকার সম্পাদন করিয়াছিলেন; পত্রলেখক মহাশয়ের পত্রে সে কথারও উল্লেখ আছে।

২। কোন অপ্রকাশিত স্থান হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয় একখানি পত্র লিখিয়াছেন। রতনবাবুর মত ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জীবনী-প্রসঙ্গ তাঁহার পত্রেরও মুখ্য আলোচ্য বিষয়। সিংহ মহাশয়ের মত একজন সাহিত্যানুরাগীর যে একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন জীবনীগ্রন্থ নাই, এজন্য তিনিও রতনবাবুর মত অনেক আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন। রতন বাবু যে কয়খানি পত্রিকা ও পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, যোগেশবাবু তাহা ছাড়া আরও দুই এক খানির নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রথমোক্তগুলির অতিরিক্ত নূতন তথ্য কিছুই পাওয়া যায় না—একথাও বলিয়াছেন। তবে একটি কথা তিনি বলিয়াছেন, কথাটি বেশ মূল্যবান্ বলিয়াই মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "যে কএকখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া জলধর বাবু ৺সিংহ মহাশয়ের জীবন-বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কোন খানিতেই মৃত মহাত্মার জন্ম-মৃত্যুর তারিখ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সুতরাং জলধরবাবুকেও বাধ্য হইয়া সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে; কিন্তু আমি অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিলাম যে 'দেবগণের মর্ত্ত্যে-আগমন' নামক পুস্তকের এক স্থানে উল্লেখ আছে যে "১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইঁহার মৃত্যু হয়', ইহা হইতে

আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের জীবনী-আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জয়রাম বসাক মহাশয়ের বাটীতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটক", আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাটীতে "শকুন্তলা নাটক", এবং সিংহ মহাশয়ের নিজবাটীতে "বেণীসংহার" ও "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকদ্বয়ের অভিনয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি আরও অনেক প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন ;— বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া এ স্থলে সেগুলির আর কোন উল্লেখ করিলাম না। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই কিন্তু যোগেশবাবু আমাদিগকে একটা বড় ধাঁধায় ফেলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই মহাত্মার (কালীপ্রসন্ন সিংহের) সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় আমার ছাত্রজীবনে। সে আজ ১০।১২ বৎসরের কথা"!

পাণ্ডুয়া কাহিনী।

৩। চট্টগ্রাম, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর আফিস হইতে শ্রীযুক্ত আবদুল করিম "অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত" শীর্ষক একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। বিগত আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' "পাণ্ডুয়া কাহিনী" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এ প্রবন্ধ তাহারই প্রতিবাদ। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই প্রবন্ধকার মহাশয় মধুর তিরস্কার বাক্যপূর্ণ আক্ষেপোক্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, "কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দু সাহিত্যিকগণের অনেকেই মুসলমানজাতি সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ প্রণয়ন বা প্রবন্ধ রচনা করিলে মুসলমানজাতিকে ঘৃণিত 'যবন' প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক অভিধানে অভিহিত করিয়া, যেন যে কোন প্রকারে হউক, জগতে মুসলমানজাতির কলঙ্ক রটনা করাই তাঁহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য এবং তাহাতেই তাঁহাদের লেখনী-ধারণের সার্থকতা—তাহার পরিচয় প্রদান করিতেন। মুসলমানজাতির সম্পর্কে কিছু লিখিতে গেলে তাহাদের সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কিছু লিখিতেই হইবে, এইরূপ মুসলমান-বিদ্বেষের ভাবটা তাঁহাদের মধ্যে বড়ই প্রবল ছিল। অবশ্য অনেক সময়, বিদ্বেষ-বুদ্ধিবশে না হইলেও সাধারণতঃ মুসলমানজাতির আচার-ব্যবহার ও সামাজিক প্রথাদি সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃও, অনেকে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটাইতেন। এখন দেশের সে হাওয়াটা অনেক পরিমাণে ফিরিয়াছে। মুসলমানসমাজে এখন অল্পে অল্পে বঙ্গ সাহিত্যানুশীলন প্রসার লাভ করিতেছে এবং হিন্দুগণও ইস্‌লাম-শাস্ত্রাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এটা যে একটা সুখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা কেবল সাহিত্যেরই যে উন্নতি হইবে এমন নহে, 'বাঙ্গালীর জাতীয়তা গঠনের পথও অনেকটা সুগম হইয়া আসিবে।' কিন্তু একটা রোগের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হইতেই, অপর একটা কুৎসিত রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।"

প্রবন্ধকার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "আমরা প্রায়শঃ দেখিয়া থাকি, প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্ত্তিনিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, কোন কোন লেখক ঐ সকল কীর্ত্তিকে যে কোন রূপে হিন্দু-কীর্ত্তিরূপে প্রমাণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। কুকীর্ত্তি যতই থাকুক না কেন, মুসলমানেরা যে ভারতের বুকের উপর অনেক সুকীর্ত্তিও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু কোন কোন হিন্দু লেখকের চক্ষে সে দৃশ্যটা যেন অসহ্য। মুসলমানের কোন পুরাকীর্ত্তি দেখিলেই, উহাকে তাঁহারা হিন্দুপ্রভাবান্বিত বা হিন্দুকীর্ত্তির নূতন সংস্করণ বলিয়া অবধারণ করিতে কুণ্ঠিত হন না!" ইত্যাদি, ইত্যাদি। "পাণ্ডুয়া কাহিনী" লেখকের সিদ্ধান্তকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এই অনুযোগ করিয়াছেন।

"পাণ্ডুয়া কাহিনী" লেখক তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থানে পাণ্ডুয়ার মন্দির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "মুসলমানদিগের মতে ইহা 'খুয়াজিমের' জন্য, অর্থাৎ বিশ্বাসী মুসলমানদিগের প্রার্থনায় যোগদান করিবার নিমিত্ত, ব্যবহৃত হইত।" হিন্দুদিগের মতে ইহা "বিজয়ী পাণ্ডুরাজদিগের জয়স্তম্ভ।" আর এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্বে ইহা হিন্দুর মন্দির রূপে ব্যবহৃত হইত। * * * ইহার মধ্যস্থলে পশ্চিম দিকের দেওয়ালের অতি সন্নিকটে একটি উচ্চ বেদী আছে; এখানে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিতে হয়। যদি এই মস্‌জিদ মুসলমানদ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে পশ্চিমমুখ হইয়া বসিবার ব্যবস্থা থাকিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয়ী মুসলমানদিগের মধ্যে রণোন্মত্ত অশিক্ষিত তুর্কীর সংখ্যাই অধিক ছিল। প্রার্থনার জন্য মস্‌জিদের আবশ্যক হওয়ায়, তাহারা, হিন্দুদিগের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া, দেবদেবীর

মূর্ত্তিগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া, তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে কোরাণ হইতে শ্লোকাবলী সংযোগ করিয়া মন্দিরকে মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছিল।"

প্রতিবাদী—শ্রীযুক্ত আবদুল করিম—মহাশয় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদচ্ছলে তিনি লেখকের প্রতি তীব্র ভাষায় অনেক বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। শেষে,—"কোন প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতিরেকেই শুধু লেখনীর জোরেই মুসলমানের একটা কীর্ত্তিতে স্বজাতির ভাগ বসাইবার চেষ্টা করা, তাঁহার ন্যায় অভূতপূর্ব্ব ঐতিহাসিকের মোটেই উপযুক্ত কাজ হয় নাই।" এই বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অনেক স্থলেই ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া দুরূহ। সুতরাং প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে অনুমান ও যুক্তির সাহায্য লইতে হয়। পাণ্ডুয়া সম্বন্ধে কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই। প্রবন্ধকার যদিও একটিরও উল্লেখ করেন নাই বটে; কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থ যে যথেষ্ট আছে, প্রতিবাদী করিম সাহেব একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন। প্রবন্ধকার তাঁহার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, করিম সাহেব তাঁহার সেই যুক্তি খণ্ডন করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, "মুসলমানদের প্রত্যেক মসজিদেই পশ্চিম দেওয়ালের সংলগ্ন একটি উচ্চ বেদী থাকে; সেই বেদীতে পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মান হইয়া ইমাম খোৎ (Sermon) পাঠ করিয়া থাকেন। তাহাতে কদাপি পশ্চিমাস্য হইয়া বসিবার ব্যবস্থা থাকে না।"—যুক্তির বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাকে খাড়া করিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। কিন্তু "কাহিনী" লেখক কোন প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া কেবল "গায়ের জোরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন" বলিয়া, যেমন তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি যদি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজ মতের পোষক দুই একটা ঐতিহাসিক প্রমাণের উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিবাদের যে জোর হইত, প্রমাণাভাবে সে জোরটুকু দাঁড়ায় নাই;—অধিকন্তু "কাহিনী" লেখকের প্রতি তিনি যে অপরাধের আরোপ করিয়াছেন, তিনি নিজেও সেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।

"ভারতবর্ষ।"

৪। 'মাথাভাঙ্গা' হইতে শ্রীযুক্ত সত্যবন্ধু দাস মহাশয়, "ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার নামগন্ধ নাই, এবং ইহা, অন্যান্য অনেক সাময়িক পত্রিকার মত, কোনরূপ সাম্প্রদায়িক দোষ দুষ্ট নহে; সুতরাং ইহা সকল শ্রেণীর লেখকের অবাধ মিলনক্ষেত্র হইয়াছে"—বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, দুই একটি ত্রুটিও দেখাইয়াছেন;—

আষাঢ় সংখ্যা "ভারতবর্ষে" দুইটী পল্লী-যুবতীর একখানি রঙ্গিন ছবি বাহির হইয়াছে। তাহার নিম্নে—

"ত্বমারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে কৃষকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসন্ত্যঃ।"

এই কবিতাটি সংযোজিত আছে। সত্যবন্ধুবাবু লিখিয়াছেন যে, 'পূর্ব্বমেঘ,' ৮ম শ্লোকে এইরূপ আছে;—

"ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিক বনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসন্ত্যঃ।"

'উদ্ধৃত শ্লোকের "ত্বাম্" স্থানে "ত্বম্" এবং "পথিক বনিতাঃ" স্থানে "কৃষক বনিতাঃ" লেখা ভুল হইয়াছে এবং তাহাতে মূল কবিতার সৌন্দর্য্য হানি ঘটিয়াছে। অধিকন্তু চিত্রে বাঙ্গালীর মেয়ের বেশভূষা অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু, মূল কবিতাটির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, মালবী রমণীর বেশভূষা অঙ্কিত হওয়া উচিত ছিল।' শেষে তিনি নিজেই "ছবিতে এরূপ এক আধটু অমিল হওয়া অনিবার্য্য বলিয়াই মার্জ্জনীয়"—বলিয়া আরোপিত দোষক্ষালনও করিয়াছেন।

উপমা কালিদাসস্য

শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "উপমা কালিদাসস্য" শীর্ষক প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রবন্ধ-লেখক কালিদাসের সূক্তিগুলি "ভারতবর্ষে"র পাঠকগণকে এমনই ভাবে উপহার দিয়াছেন, যেন এ পথে তিনিই অগ্রণী; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আজ প্রায় ৯।১০ বৎসর হইল স্বর্গীয় ৺রাধানাথ রায় মহাশয় "কালিদাস সূক্তয়ঃ" নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রচার করিয়াছিলেন; ঐ গ্রন্থে কালিদাসের কাব্য ও নাটকাবলী হইতে সূক্তি সমূহ

সংগৃহীত হইয়াছিল। উহার দুইটী সংস্করণ হইয়াছিল; একটি বঙ্গাক্ষরে ও বঙ্গানুবাদ সহ—কেবল বঙ্গ দেশের জন্য, অপরটি মূলাংশ দেবনাগর অক্ষরে এবং ইংরেজী অনুবাদ-সহ—সমগ্র ভারতের জন্য। মজুমদার মহাশয় স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের পরিচিত, সুতরাং এ তথ্য তাঁহার অজ্ঞাত না থাকিবারই কথা। এতদ্ভিন্ন মজুমদার মহাশয় অনেক সূক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। "নির্ণয় সাগর" প্রেস হইতে প্রচারিত "শ্রীসুভাষিত রত্নভাণ্ডাগারম্" নামক গ্রন্থে সেগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকেশব শাস্ত্ররত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "শ্রাবণের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'উপমা কালিদাসস্য' কথাটার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা মোটামুটি বুঝিয়াছি যে,—

(১) অলঙ্কার-শাস্ত্রবিচারে কালিদাসের উপমাগুলি, অন্য কবির অপেক্ষায় বেশি সুপ্রযুক্ত নহে। (২) উক্ত স্থলে 'উপমা' শব্দের অর্থ সাদৃশ্য নহে, অর্থাৎ উপমা অলঙ্কার নহে। (৩) পণ্ডিতেরা উদাহরণ-স্বরূপ যে কবিতাগুলি আবৃত্তি করিয়া থাকেন, সেই সুভাষিতগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া "উপমা কালিদাসস্য" শ্লোকটী রচিত হইয়াছে।" শাস্ত্ররত্ন মহাশয় এই মীমাংসাগুলির প্রতিবাদ করিয়াছেন।

দেশী ও বিলাতী শব্দের উচ্চারণ

৬। ঢাকা—চারিগাঁ-নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় প্রতিবাদচ্ছলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। "বিগত ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুত অনাথকৃষ্ণ দেব মহাশয় 'দেশী ও বিলাতী শব্দের উচ্চারণ' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধের সারবত্তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই; কিন্তু তিনি যে এই মিলনের যুগে ঈর্ষাবিজৃম্ভিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে প্রসঙ্গক্রমে টিট্‌কারি প্রদান পূর্ব্বক বিচ্ছেদ মন্ত্রের প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই নিতান্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইবেন। লেখক পূর্ব্ববঙ্গকে বিদ্রূপ না করিয়াও অনায়াসে নিজের বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিতে পারিতেন; অধ্যাপক ললিতবাবু তাঁহার 'বানান সমস্যা' ও 'সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামক পুস্তক দুইখানিতে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যপূর্ণ কত কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু কৈ কোথাও ত কাহার নিন্দা করেন নাই।

"প্রবন্ধকার বলেন, পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও 'শ', 'স' স্থলে 'হ', 'হ' স্থলে 'অ', 'ট' স্থলে 'ড' প্রভৃতি উচ্চারণ করেন, এবং এই অপরাধে তিনি তাঁহাদের কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন। ইহাতে স্বতঃই মনে হয়, প্রবন্ধলেখক পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; —দুই একটি নিরক্ষর বা ইতর লোকের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার মতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্যই, পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চারণের অনেক ত্রুটী আছে, একথা অস্বীকার করিলে, সত্যের অপলাপ করা হয়; কিন্তু তাই বলিয়া সেখানে শিক্ষিত ভদ্রলোকেও 'শ' ও 'স' স্থানে 'হ' প্রভৃতি আদেশ করেন, এরূপ বলা যায় না;—ঐ সমুদয় ইতর লোকের ভাষা। নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য প্রবন্ধকার যে দুই চারিটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের রচনার উদ্দেশ্য ও ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেই আমাদের কথার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

"প্রবন্ধলেখকের বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গের ভাষা তেমন দোষাবহ নহে,—যত দোষ পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায়। জানি না তিনি পশ্চিমবঙ্গের ভাষাকে বঙ্গভাষার আদর্শ মনে করেন কিনা; আর পশ্চিমবঙ্গ দ্বারাই বা কতটা স্থান বুঝাইতে চাহেন। তাঁহার পশ্চিমবঙ্গ কি কলিকাতার গুটিকএক শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ?—না, উহার বাহিরেও কতকটা জায়গা ব্যাপিয়া?—আমরা ত জানি, সমস্ত প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এখন, যদি খুলনা, যশোহর বা বর্দ্ধমানের ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তবে বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার স্থান কোথায় গড়াইয়া পড়িবে, তাহা নির্ণয় করিতে আমরা একান্ত অক্ষম। 'গেয়েলাম', 'ক্যাম্বালায়', 'আম্বল', 'কান্তি কান্তি', 'আই' (আয়ু) 'লদী', 'লতুন', 'নেপ', 'ন্যাথাপড়া', 'কল্‌তে' কি পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা?—না, পশ্চিমবঙ্গের?

"প্রবন্ধকার পশ্চিমবঙ্গবাসী; সুতরাংই যেন তিনি নিজেদের ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পশ্চিমবঙ্গের ভাষা কি সর্ব্বত্রই দোষবর্জ্জিত? পূর্ব্ব-

বঙ্গবাসীদিগের কি জানিতে ইচ্ছা হয় না যে, পশ্চিমবঙ্গের কৃতবিদ্য ভ্রাতৃগণ কোন্ হিসাবে 'আ' স্থলে 'এ' বা 'ও' (ইচ্ছে, বিদ্যে, নেই, মুক্তো, ধুলো, জুতো), 'ই' স্থলে 'এ' (শেখী, নেশা, দেবে, ভেতর), 'অ' স্থলে 'ই' (সত্যি, অবিশ্যি), 'নাই' স্থলে 'নি' (যাওনি, থাওনি), 'ন' স্থলে 'ল' (লদী, লিতাই), 'ল' স্থলে 'ন' (নক্ষী, ন্যাথাপড়া), 'ট' স্থলে 'ড' ও 'স' স্থানে 'হ' (কেড়া, হপ্তা), 'ম' স্থলে 'ব' (তাবা, আঁব;—কালে মা ও মামার গতি কি হইবে বলা যায় না) উচ্চারণ করেন? তবু ও তো 'ঘেন্নায়', 'মর্চ্চে', 'ক্যাদা', 'গেন্নু', 'বক্তিমে', 'দিকিনি', 'হাটেনি', 'উধোইছে', 'আসিদ্দে', 'বে'চাক', 'শিগ্‌গির', 'দিতি', 'বাস্‌ক', 'রাত্তির' 'গক্কে' এর কথা 'কম্লামনা' এবং 'বোশেথ' মাসে 'গুড়েদার ঘাট' 'পেরিয়ে' এ 'বচ্ছর' 'কৈলেত্তায়', 'অলপ্‌প্যায়ে' 'শোর,' 'বেরাল' ও 'বামুন' 'পুরুতের' 'নেমন্তন্নের' 'অকেজো' 'হিসেব' 'দিইনি'ক। প্রবন্ধলেখকের 'করদাবাবুর' অন্তর্নিহিত কোন গুপ্ত-রহস্য ইহার ভিতর নাই ত? বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধ হইতে কেবল মাত্র গুটি কএক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল: সাধারণ কথিত ভাষা খুঁজিলে ভূরি ভূরি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত।

"আমাদের নিজেদের ভিতর কি দোষ রহিয়াছে, তৎ-প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমরা অনেক সময় অপরের ছিদ্রানু-সন্ধানে ব্যস্ত থাকি। পশ্চিমবঙ্গবাসিগণের জানিয়া রাখা উচিত, তাঁহাদের 'কাল যাব এখন' কথাটির কালনির্ণয় করিতে পূর্ব্ব বঙ্গবাসীদের কতটা বেগ পাইতে হয়; আর উঁহারা যখন তাকিয়া ঠেসিয়া টানা পাথার হাওয়া খাইতে খাইতে 'আয়েস' করেন, তখনও তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে পূর্ব্ববঙ্গবাসীর কিরূপ 'আয়াস' হইয়া থাকে।

"পূর্ব্ববঙ্গ 'চন্দ্রবিন্দুকে ধলেশ্বরীতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন' আর পশ্চিমবঙ্গ নিজেই চন্দ্রবিন্দুর গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছেন; কাজেই উভয়কেই সমান দোষী করা চলে। 'ড়' ও 'ঢ়' কেবল পূর্ব্ববঙ্গ কেন, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই কম বেশী নিজেদের প্রভাব হারাইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই; পশ্চিমবঙ্গের 'বেরাল' কি ইহার সাক্ষ্য দেয় না?

"যাহা হউক, কথা ফেনাইয়া লাভ নাই। পশ্চিমবঙ্গ যদি নির্ব্বিবাদে শব্দের বিকৃতি ঘটাইতে পারে, তবে পূর্ব্ববঙ্গ সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় কেন? একের মতের সহিত অপরের মত না মিলিলেই যে তাহা নিন্দনীয় হইবে, এরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, পূর্ব্ববঙ্গ ভাষা সম্পদে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা উন্নত না হইলেও কোন অংশে হীন নহে। ফলতঃ, দোষগুণ উভয়েরই আছে—একে অপরের নিকট অনেক শিখিতে পারে; শুধু এই কথা এ একটি মনে রাখিলেই গোল মিটিয়া যায়।

"পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ নিজ নিজ গৃহে পরিবারের মধ্যে অষ্ট-প্রহর যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন, প্রকাশ্য সভা-সমিতি বা লেখ্য ভাষায় তাহা যথাসাধ্য সাজাইয়া ও গুছাইয়া ব্যবহার করিতে চেষ্টা করেন। সমাজের ইহাই চিরন্তন রীতি যে, আমরা আপনগৃহে সর্ব্বদা যেরূপ পোষাক পরিয়াই থাকিনা কেন, দশের সম্মুখে বাহির হইবার বেলা তাহার পারিপাট্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখি। অনাথবাবু পূর্ব্ব-বঙ্গের পারিবারিক ভাষাকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন,—লেখ্য ভাষার কাছও ঘেসেন নাই। আমাদের পশ্চিম-বঙ্গের ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে খুব উদার, তাঁহারা প্রাদেশিক ভাষা মাত্রই বিনা বিচারে নিঃসঙ্কোচে দশের নিকট ব্যক্ত করিতে পারেন। অবশ্যই, ঐ ভাষাটি নির্দ্দোষ হইলে আমাদের কিছু বক্তব্য ছিল না;—তাঁহারা কাচ ও কাঞ্চন এক দরেই চালাইতে চাহেন।

"প্রবন্ধকার আর একটি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি বলিতে চাহেন যে, কথিত ভাষা পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্রই একরূপ,—'যাবা', 'খাবা' প্রভৃতি সকল স্থানেই বলে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা সত্য নহে। ঢাকা বা ময়মনসিংহের ভাষায় মিল নাই; এমন কি, এক ঢাকা জেলারও ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে।

"বঙ্গের বহুবিধ উচ্চারণ পদ্ধতি দেখিয়া অনাথবাবু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু যেখানে এক ভাই আর এক ভাইকে টিট্‌কারি দিতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ হয়—যেখানে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণও বিনাবিচারে প্রাদেশিক ভাষামাত্রেই গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক ও প্রাদেশিক উচ্চারণের অনুরূপ নূতন বানান সৃজন পূর্ব্বক ভাষাগত একতা বিনষ্ট করিতে অতি-মাত্র ব্যগ্র, সেখানে আর মিলনের আশা কোথায়?—উহা

বাস্তবিকই 'আকাশ কুসুম'। লিখিত ভাষার একতা রক্ষিত হইলে, শিক্ষা বিস্তারের সহিত কালক্রমে কথিতভাষা ও তাহার উচ্চারণ-বৈষম্যও দূরীভূত হইত।

"আজ আর আমাদের কিছু বলিবার নাই। উল্লিখিত কথা কএকটি পাঠ করিয়া, যদি একজন লোকের হৃদয়েও মিলনের ভাব জাগিয়া উঠে, তবেই কৃতার্থ হইব।

"উপসংহারে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে কএকটি কথা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না,—"দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণ জন্য, লিখিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য আবশ্যক। যদি কলিকাতার কথিত 'গেলুম' লিখিত রচনায় স্থান পায়, তবে শ্রীহট্টের 'গ্যাছলাম্' কি 'যাইবাম' সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন? স্বদেশ-বৎসলগণ তাহাও চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারেন। বঙ্গভাষা তাহা হইলে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পৃথক্‌ভাব অবলম্বন করিয়া, বহুরূপী হইয়া দাঁড়াইবে। লিখিতভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষা সেই জন্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু লেখনী লইয়া বসিলেই যে সাধারণ ভাব বুঝাইতে, ও ভাষার কুজ্ঝটিকাপূর্ণ আভিধানিক ঘোর সমস্যা প্রস্তুত করিতে হইবে; ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে।"

কোন ক্রুদ্ধ সমালোচকের প্রতি

মানি আমি, হে বিদ্বান! আমার কবিতা অভাগিনী,
কাশ্মিরী-সুন্দরী সম নহে তপ্ত-কাঞ্চন-বরণা!
পল্লী-নিবাসিনী সে গো,—হাবভাব-কটাক্ষ-মগনা
নহে উজ্জয়িনী-নারী,—বাজায়ে সিঞ্জিনী রিণি রিণি,
নীলাম্বরী শাড়ী পরি, ঝঙ্কারিয়া মর্ম্মের রাগিণী,
নীল-কালিন্দীর তীরে, কঙ্কন-কিঙ্কনী বিভূষণা,
শিহরিয়া শিহরিয়া, লালসায় মদির-লোচনা,
করেনা—করেনা ধনী পুলকিতা পূর্ণিমা-যামিনী!

এলোখোঁপা শিরে তার; বর্ণ নয় জিনি স্বর্ণ চাঁপা;
পড়েনা পারশী শাড়ী; শিরে নাই স্বর্ণ-প্রজাপতি!
রূপবতী—সভা-মাঝে কভু তার হয় না আরতি
বিলাতি এসেন্স্ নাই; গালাভরা দুটি বালা ফাঁপা
গর্ব্বহীন হস্তে তার; ভালে শুধু কাঁচপোকা-টীপ্!
রূপ-রত্নাকর-মাঝে তুচ্ছ শ্বেত শস্যময় দ্বীপ!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সর্ব্বাধিকারী

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী রায় বাহাদুর, সি-আই-ই মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলর্ পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনিই কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বে-সরকারী ভাইস্ চেন্সেলর্। তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য কলিকাতা-ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ সেদিন একটি সভার আয়োজন করেন। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এই সংবর্দ্ধনা-সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব-অনুসারে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ বাবুকে এই পদে নিযুক্ত করার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাহার পর, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় সংস্কৃত-ভাষায়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাঙ্গালাভাষায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ শ্রমণ মহাশয় পালি ভাষায় এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিনন্দন পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়-প্রকাশ করিয়া, এই কএকটি অভিনন্দনের উত্তর প্রদান করেন। তিনি এই বক্তৃতায় বলেন যে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট বে-সরকারী ভাইস্-চেন্সেলর্ নিয়োগের জন্য যত্ন করিতেছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির উপর এই ভার প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বাধিকারীমহাশয়, বিনয় প্রকাশের জন্যই, নিজেকে 'অযোগ্য' শব্দে বিশেষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্টও জানেন, দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তিনিই 'যোগ্য ব্যক্তি'। তাহার পর, চারিটি ভাষায় যে অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা উপলক্ষে তিনি বলেন, "এমন একদিন আসিবে, যখন সকল সভাসমিতিতেই বাঙ্গালীর নিজের ভাষায় বক্তৃতা চলিবে।" ইহা যে তাঁহার মুখের কথা নহে, তিনি যে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার প্রমাণ আমরা দুই তিন দিন পরেই পাইয়াছি। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত চেতলায় একটি উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পারিতোষিক-প্রদানের সভায় সভাপতি হইবার জন্য, সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আহূত হন। একে ইংরাজী-বিদ্যালয়, তাহাতে আবার ইংরাজীভাষায় কৃতবিদ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলর্ মহোদয় সভাপতি! এ অবস্থায় সভাপতি মহাশয় যে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবেন, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু সভাপতি সর্ব্বাধিকারী মহোদয় এই সভায় বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এ সভায় কোন সাহেব উপস্থিত নাই; যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন; সুতরাং এ সভায় ইংরাজীভাষায় বক্তৃতা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।" এই বলিয়া তিনি সুললিত বাঙ্গালা ভাষাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা উপলক্ষে তিনি একটি অতিশয় সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার বিনয় ও মহত্ত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী বলিয়া 'সর্ব্বাধিকারী' নহি, আমার সে সকল পারদর্শিতা নাই। আমি 'সর্ব্বাধিকারী' কেন জানেন?—'সর্ব্বসাধারণের আমার উপর অধিকার আছে', তাই আমি সর্ব্বাধিকারী!"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক-সমিতি

বর্ত্তমান বৎসরে ইংরাজী 'গুড্‌ফ্রাইডে'র অবকাশে, যখন কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়, সেই সময়ে ঢাকায় 'বঙ্গীয় মোস্‌লেম-শিক্ষাসমিতি'র অধিবেশন হয়, এলাহাবাদে 'ভারতীয় কায়স্থসম্মিলনে'র অধিবেশন হয়, ত্রিপুরার কুমিল্লা সহরে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির'ও অধিবেশন হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় যে সমস্ত রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমাদের আলোচনার অবকাশ নাই; তবে সভাপতি শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়, বঙ্গের পল্লীসমাজের কথা তুলিয়া, যে কয়টি কথা বলেন, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ প্রকাশ করিলাম। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামগুলিতে যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা, রাজস্ববিভাগ ও পুলীশ-বিভাগের প্রতিষ্ঠা, রেল প্রভৃতিতে যাতায়াতের সুবিধা, এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসারের ফলে সেই স্বায়ত্ত-শাসন লোপ পাইয়াছে।—তথাপি পল্লীসমাজ বাঁচিয়া আছে; এই পল্লীসমাজেই শাসনসংরক্ষণের বীজ পুনরায় উপ্ত হইতে পারে। এখনও হাজার করা ৯৭৬ জন লোক পল্লীবাসী। তবে, নানা কারণে পল্লীগুলি ক্রমেই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। আমার মনে হয়, 'চৌকিদারী ইউনিয়ন্' ও 'ইউনিয়ন্' কমিটি-গুলি একত্র করিয়া একটি "পঞ্চায়েৎ ইউনিয়ন্" গঠন করা যাইতে পারে। এই পঞ্চায়েৎ, বর্ত্তমান 'রুরাল্ বোর্ডে'র কাজ করিবেন। এই 'বোর্ডে'র হাতে এখন যে টাকা আছে তাহাতে, পথ-করের টাকা যোগ করিয়া, করদাতৃগণের সুবিধার জন্যই, প্রধানতঃ, ব্যয় করিতে হইবে। গ্রাম্য চৌকিদারের খরচ যাহাতে 'গ্রাম্য-সমিতি'কে বহন করিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। গভর্ণমেণ্ট যদি অস্ত্র-আইনের কঠোরত্ব কমাইয়া দেয়, তাহা হইলে, চৌকিদার রাখিবারও প্রয়োজন হইবে না।"

কৃষির কথা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় কএকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

"'যৌথ-ঋণদান-সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করিয়া গভর্ণমেণ্ট সত্য সত্যই এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গদেশের পরিমাণ ফল অনুমান (৮০,০০০) আশি হাজার বর্গ মাইল; ইহার মধ্যে শতকরা (৭০) সত্তর ভাগ জমি কৃষির উপযুক্ত; কিন্তু এতদিনে শতকরা মাত্র (৫০) পঞ্চাশ ভাগ জমিতে আবাদ আরম্ভ হইয়াছে! কৃষিবিষয়ক ঋণ এবং কৃষির জন্য উপযুক্ত মূলধনের অভাবই হইতেছে, এদেশের কৃষির উন্নতির পথে প্রধান পরিপন্থী। 'যৌথঋণদান-সমিতি'র প্রতিষ্ঠায় এপক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে; কিন্তু ইহাতেই কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই;—এখনও অনেক বাকী। অনেক সময় এমন অভিযোগ শুনা যায় যে, আমরা 'সাবুর কৃষি-কলেজ' হইতে কোনরূপ সাহায্য লই না। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, ইহাদ্বারা এদেশের কৃষিবিষয়ে কোনরূপ সাহায্যই হয় না! সেখানে এখনও পরীক্ষার কাজ চলি-তেছে; বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাটির, সারের, গাছপালার নানা প্রকার হিসাব করিয়া দেখা হইয়া থাকে! আমরা গরীব-লোক, অশিক্ষিত এবং অনাহারক্লিষ্ট;—আমাদের ওরূপ বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণে পোষাইবে কিরূপে? যাহাতে অল্প খরচে এবং সহজে সকলে কৃষি শিখিতে পারে, এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে;—ইহার জন্য ছোট ছোট আদর্শ-কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। যাহাতে আমাদের গোরুগুলি মারা না পড়ে, যাহাতে তাহারা রোগভোগ না করে, এবং যাহাতে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে পারে,—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে, কোন ফলই হইবে না;—'কৃষি-ব্যাঙ্কে'র সুফল ফলিবে না। আর কৃষি-বিভাগের উন্নতি যে কেবল যোগ্য বাঙ্গালী-কর্ম্মচারী নিয়োগেই হইতে পারে, 'যৌথ-ঋণদান-সমিতি'র কার্য্যে তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।"

মাসপঞ্জী

(চৈত্র)

১লা—মান্দ্রাজের পব্‌লিক্ প্রসিকিউটর্ মিঃ জন্ আডামের মৃত্যু হয়।

২রা—"ক্রিমিয়া ভেটারন্" জেনারেল ব্রাড্‌ফোর্ড ইহলোক ত্যাগ করেন।

৩রা—দিল্লীতে লেডীহার্ডিঞ্জ মহোদয়া স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তি স্থাপনা করেন।

৪ঠা—মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান জজ মিঃ প্লুমারের মৃত্যু হয়।

৫ই—'বীভর্'-'গার্জ্জিয়ান্' প্রভৃতির পরিচালক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কর্ম্মাটারে মৃত্যু হয়।

৬ই—পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

৮ই—ভূতপূর্ব্ব "প্রতিবাসী"র অন্যতম পরিচালক ও "বঙ্গবাসী" কলেজের প্রোফেসার শশিভূষণ সরকার ইহলোক ত্যাগ করেন।

৯ই—বোম্বায়ের "কটন্ গ্রীনে" আগুন লাগিয়া প্রায় এক কোটী টাকার তুলা নষ্ট হইয়া যায়।

১০ই—স্যর টি, এ, গর্ডন ("মিউটিনি ভেটারন্")এর মৃত্যু হয়।

„—বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া রসিক চন্দ্র দাস বৈরাগীর মৃত্যু হয়।

১১ই—বিখ্যাত ফরাসী কবি এফ. মিস্‌ট্রালের মৃত্যু হয়।

১১ই—পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের মৃত্যু হয়।

১৩ই—কলিকাতায় বিজ্ঞানকলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

১৩ই—কলিকাতার ঘোড়ার ডাক্তার" স্পুনার হার্টের মৃত্যু হয়।

১৪ই—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন, মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষের বিদায় এবং তৎস্থলে শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারীর দুই বৎসরের জন্য ভাইস্-চেন্‌সেলার নিয়োগ হয়।

„—মেদিনীপুরে এক "কোঅপারেটীভ্ কন্‌ফারেসন্" বসে। শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী সভাপতি ছিলেন।

১৬ই—কর্ণেল সিলি পদত্যাগ করেন ও মিঃ এসকুইথ্ 'সেক্রেটারী অফ্ ওয়ার' নিযুক্ত হ'ন।

১৭ই—বিখ্যাত চিত্রকর স্যর্ হার্ব্বার্ট ভন্ হার্ কোমারের মৃত্যু হয়।

১৮ই—কর্ণেল্ গোয়েথালস্ পানামা "জোনের" শাসনকর্ত্তা হইলেন।

১৯এ—বিখ্যাত জার্ম্মান ঔপন্যাসিক পল্ হেসীর মৃত্যু হয়।

২০এ—"বেঙ্গল মেডিকেল বিল্ পাস হয়।

„—বিখ্যাত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নবকুমার চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হয়।

২২এ—বিখ্যাত মার্কিন ধনকুবের এফ্ ও এ আর হসারের মৃত্যু হয়।

২৩এ—স্যর্ ফজিলভয় করিমভয় বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল সভাপতি হন।

২০এ—বিডন্ ষ্ট্রীট্ নিবাসী স্মার্ত্ত পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্করত্নের মৃত্যু হয়।

২৫এ—ইন্সপেক্টার নৃপেন্দ্র ঘোষকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত নির্ম্মলকান্ত রায় হাইকোর্টের বিচারে খালাস্ পায়।

২৬এ—"এডুকেশনিষ্ট" মিস্ লিলা ষ্টংএর মৃত্যু হয়।

২৭এ—লক্ষ্ণৌতে ব্রাহ্ম "নববিধান কন্‌ভেন্‌শনের" অধিবেশন হয়। মহারাণী সুনীতি দেবী সভাপতি ছিলেন।

„—বাঁকিপুরে "বেহার প্রভিন্‌সিয়াল কন্‌ফারেন্সের" অধিবেশন হয়। মাননীয় ব্রজকিশোর প্রসাদ সভাপতি ছিলেন।

„—কলিকাতায় "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের" সপ্তম অধিবেশন হয়। শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর সভাপতি ছিলেন।

২৮এ—কলিকাতায় "অল্ বেঙ্গল মোক্তার্স কনফারেন্সের" অধিবেশন হয়।—শ্রীরাসবেহারী সেন সভাপতি ছিলেন।

„—জাপানের ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের বিধবা রাণীর মৃত্যু হয়।

„—বাঁকিপুরে "বেহার ইন্‌ডষ্ট্রীয়াল্ কন্‌ফারেন্স" হয়। রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ সভাপতি ছিলেন।

„—লাহোরে "অল ইণ্ডিয়া ক্ষেত্রী কনফারেন্সের" অধিবেশন হয়। বাবা গুরুবকস্ সিং বেদী সভাপতি ছিলেন।

„—কুমিল্লায় "বেঙ্গল প্রভিন্‌শিয়াল্ কনফারেন্সের" অধিবেশন হয়। শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতি ছিলেন।

„—ঢাকায় "বেঙ্গল মহমেডান্ এডুকেশন্ কন্‌ফারেন্সের" অধিবেশন হয়। নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী সভাপতি ছিলেন।

„—পাথানকোটে, রাজপুত প্রান্তিক, সভার অধিবেশন হয়। ঠাকুর উদয় বীরসিংহ সভাপতি ছিলেন।

২৯এ—এলাহাবাদে "অল ইণ্ডিয়া কায়স্থ কন্‌ফারেন্সের" অধিবেশন হয়। দিনাজপুরের মহারাজা সভাপতি ছিলেন।

৩০এ—"ঢাকা মোসলেম লিগের" অধিবেশন হয়। মাননীয় মৌলবী ফজলল্ হক সভাপতি ছিলেন।

„ — কুমিল্লায় "বেঙ্গল সোসিয়াল কন্‌ফারেনসে"র অধিবেশন হয়।

সাহিত্য-সংবাদ

দ্বিতীয়বর্ষে, যাঁহারা আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে 'ভারতবর্ষে'র অগ্রিমমূল্য জমা দিবেন, তাঁহারা ৬৲ টাকা স্থলে ৫৲ টাকায় পাইবেন। বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপনের ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন।

'বড়দিদি' প্রভৃতি উপন্যাস-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎকৃষ্ট উপন্যাস 'বিরাজ বৌ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নূতন নাটক 'নিয়তি' প্রকাশিত হইয়াছে এবং উক্ত পুস্তক রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতেছে। মূল্য আট আনা মাত্র।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়া মাসিকপত্রাদিতে যে সমস্ত ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, সেগুলি 'গুচ্ছ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'গুচ্ছে' অপূর্ব্ব প্রকাশিত দুই তিনটি গল্পও আছে। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য দেড় টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ গল্পলেখক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের 'রূপসী বোম্বেটে' নামক ঘটনা-বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আরও একখানি গল্পপুস্তক যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। 'রূপসী বোম্বেটে'র মূল্য বার আনা মাত্র।

সুলেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; একখানির নাম 'গল্পের তুফান', মূল্য আট আনা; অপর খানির নাম 'আক্কেল গুড়ুম' (প্রহসন) মূল্য চারি আনা মাত্র।

সুলেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল সাধু মহাশয়ের 'অবকাশ-কাহিনী' নামক সংগ্রহপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সর্ব্বাংশেই সুন্দর হইয়াছে। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ দত্ত মহাশয় 'যোগবল' নামে একখানি উপন্যাস প্রকাশিত করিয়াছেন। এখানির মূল্য বার আনা।

যশোহর নড়ালের উকিল শ্রীযুক্ত হীরালাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'যশোহর ও খুলনার ইতিহাসে'র প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিস্তৃত ইতিহাসখানি তিন চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। প্রথম খণ্ডের মূল্য বার আনা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রমাসুন্দরী' নামক উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়ের 'পর্ণপুট' নামক কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে কএকটি অপূর্ব্বপ্রকাশিত কবিতাও আছে।

সুলেখক শ্রীযুক্ত সেখ ফজলল করিম-প্রণীত 'লয়লা মজনু' নামক উৎকৃষ্ট গল্পপুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ; জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই এই সুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

বরিশাল শাখা-সাহিত্য-পরিষদে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়া 'সেবা' (দ্বিতীয়খণ্ড) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন পঞ্চাঙ্ক নাট "ক্ষত্রবীর" জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
201, Cornwallis Street
CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH,
—The Emerald Ptg. Works,—
12, Simla Street, Calcutta

চিত্র-কথা

পূর্ব্বার্দ্ধ

প্রথম সংখ্যা—আষাঢ়ে

বিশ্বাস—আশা—বদান্যতা—(চিত্র-শিল্পী —H. Zataka) বহুবর্ণ চিত্র। এই চিত্রে 'বিশ্বাস', অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের নিদর্শন, খৃষ্টধর্ম্ম-পরিচায়ক "ক্রুশ"—'আশা', নাবিকদিগের সর্ব্বপ্রধান ভরসাস্থল (Sheet anchor) "নঙ্গর"—এবং 'বদান্যতা', গৃহস্থদিগের "শিশু-সন্তান"রূপে ("Let them learn first to show piety at home."—Tim. V. 4) পরিকল্পিত হইয়াছে।

মেঘদর্শনে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীদ্বিজেন্দ্র কুমার গোস্বামী) বহুবর্ণচিত্র। মেঘদূত—পূর্ব্বমেঘ ৮ম শ্লোকের ভাব-গ্রহণে এই চিত্রখানি পরিকল্পিত। শ্রদ্ধেয় দাদামহাশয় চিত্র-তলে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতে গিয়া একটু ভুল করিয়া বসিয়াছেন। যাহা হউক, উদ্ধৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ এই—

"তুমি হে জলদ, উদিলে গগনে,
পল্লীবধূগণ—আশার ভরেতে—
হেরিতে তোমায় ঊরধ নয়নে,
অলকের দাম সরায়ে করেতে।"

শিল্পী—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী) একবর্ণ চিত্র। চিত্রখানি একখানি প্রতীচ্য চিত্রানুকরণে পরিকল্পিত হইলেও, ইহার বিশেষত্ব এই যে এখানি তুলিকা-চিত্র নহে—আলোক-চিত্র। এক্ষেত্রে "শিল্পী" স্বয়ং আর্য্য-কুমার। অধুনা আলোক-চিত্রণে যে সকল শিল্পী কৃতিত্ব দেখাইতেছেন,—আর্য্যকুমার তাঁহাদেরই অন্যতম অগ্রণী।

স্নেহময়ী—বহুবর্ণ চিত্র।

পরিহার—২৩৮পৃঃ—একবর্ণ চিত্র

কন্যা-বেশ—১৯৮ পৃ:—একবর্ণ চিত্র।

আহুত-জীবন—২৪৯ পৃ:—একবর্ণ চিত্র।

উল্লিখিত চারিখানির বিবরণ, ২৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানী চরণ লাহা) বহুবর্ণ চিত্র। চিত্রখানির পরিকল্পনা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, মূল-চিত্র খানির বর্ণ-বৈচিত্র্য, প্রতিলিপি খানিতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নাই—সেজন্য শিল্পীর নিকট আমরা অপরাধী।

মহাপ্রস্থান—(চিত্র-শিল্পী—সিসার্ট) বহুবর্ণচিত্র, চিত্রের বিষয়—যিশুখৃষ্টের শিষ্যগণ তাঁহার শবদেহ সমাহিত করিবার জন্য বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। বর্ণগৌরবে চিত্রখানি যেমন অনুপম, ভাব-সম্পদে তেমনই শোকাবহ।—চিত্রস্থিত ব্যক্তিমাত্রেরই মুখে চোখে যে সকরুণভাব সুপ্রকাশিত, তাহা নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞানহীনেরও মর্ম্মস্পর্শী!

দ্বিতীয় সংখ্যা—শ্রাবণে

ঘাটে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার) বহুবর্ণ চিত্র। সদ্যঃস্নাতা কিশোরী, জলপূর্ণ কলসী পার্শ্বে রাখিয়া, গাত্রাদি-মার্জ্জন-নিরতা। এদৃশ্য নূতন না হইলেও, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব-পরিব্যঞ্জনায় শিল্পীর কৃতিত্ব দৃষ্ট হয়।—রমণী, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-জঙ্ঘা হইলেও, সুন্দরী বটে!

পাষাণী—বহুবর্ণ চিত্র। জলপাত্রকক্ষে সুন্দরীর অনবদ্য গঠন-সৌন্দর্য্য সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শনকল্পে, শিল্পী—তাহার হস্তাদি সুকৌশলে বিন্যাস করিয়াছেন—ফলে, শিল্পীর রেখা-ও বর্ণ-সম্পাত, উভয়ই বিশেষ প্রশংসার্হ। রমণীর অঙ্গ সৌষ্ঠব যেমন পরিপাটি—হাব-ভাব চাহনিও তেমনই চিত্তাকর্ষী। ইহার নামকরণে এবং পাদদেশে উদ্ধৃত শ্লোকাংশে রসগ্রাহিতা ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়।—"বিধাতা ইন্দীবরে যুগল নয়ন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অম্বুজে ঐ সুন্দর আনন গড়িয়াছেন, শুভ্র কুন্দে মোহন দশনপাঁতি, নবীন পল্লবে অধর রচিয়াছেন, চম্পকের দলে অঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কেবল হৃদয় কেন কঠিন পাষাণ?"

কলসীকাঁখে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা) বহুবর্ণ চিত্র। পল্লীবাসী বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট এ চিত্র চির পরিচিত! পুরাঙ্গনা কাঁখে কলসী ও হস্তে ঘটী লইয়া, ব্রীড়াবনত আননে, পথি-নিবিষ্টনেত্রে—জলাশয়ো-

দ্দেশে চলিয়াছেন। পারিপার্শ্বিক বস্তু-সন্নিবেশে, তুলিকা-পরিচালনায় শিল্পীর যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশমান।

পুষ্প-চয়ন—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী) [২০০ পৃষ্ঠা] একবর্ণচিত্র। আলোক-চিত্রণে 'আর্ট' সন্নিবেশ করা—স্বভাবে শিল্প-সৌন্দর্য্য সন্নিবেশিত করিয়া চিত্রখানিকে মনোহারী করাই শিল্পীর বিশেষত্ব।

সাগর-তরঙ্গে—[২০৫ পৃঃ] সিমলা 'ফটো-গ্রাফিক্ প্রদর্শনী'তে উচ্চ পারিতোষিক প্রাপ্ত একবর্ণ চিত্র। এই চিত্রখানি পুরী-সৈকতের একটি দৃশ্য।

মিলন—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার) বহুবর্ণ চিত্র; নায়িকার প্রতি নায়ক—"পৃথিবীতে নবেন্দুকলা প্রভৃতি স্বভাব-মধুর অনেক পদার্থ আছে, যাহা লোকের মনোহরণ রে; কিন্তু আমার লোচনানন্দকারিণী তুমিই আমার জীবনের একমাত্র মহোৎসব।"

শৃঙ্খলিতা—বহুবর্ণ চিত্র। অঙ্কন-চাতুর্য্য ও বর্ণ-সম্পাতে চিত্রখানি যেমন প্রভাময়, মুখমণ্ডলের অন্তর্যাতনা-প্রকাশক ভাবও তেমনই চিত্তস্পর্শী!—২৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় সংখ্যা-ভাদ্রে

জন্মাষ্টমী—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা) বহুবর্ণ চিত্র। "ভাদ্রে মাসি অসিতে পক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ যস্যাং জাতো জনার্দ্দনঃ"। বাসুদেব সদ্যোজাত কৃষ্ণচন্দ্রকে মথুরার কংশ-কারাগার হইতে, যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে লইয়া যাইতেছেন। দেবকার্য্যে দেব-সহায় নিয়োজিত—দুর্য্যোগ, দৈবী আলোক, দেব-প্রেরিত শিবা!—কথা হইতে পারে, 'যে কারাগারে জাত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে এত অলঙ্কার আসিল কোথা হইতে?'—সে কথারও সেই একই সদুত্তর—'দেবলীলা!'

কন্দর্পের শাসন—(চিত্র-শিল্পী—এল্.ক্রেশিও) [৩০২ পৃঃ] একবর্ণ চিত্র। বিলাতী মদন অন্ধ; কবি বলিয়াছেন—'Love is blind and Lovers cannot see.' আবার "Love sees not with eyes—but with the mind, And therefore is winged Cupid painted blind." চিত্রে, শিল্পী তাহাই দেখাইয়াছেন—যুবতরী চক্ষুর্দ্বয় প্রণয়দেবতা রুদ্ধ করিয়া দিতেছেন।

দ্বন্দ্ব—শূর ও শমন—(চিত্র-শিল্পী—লর্ডলেটন্) —[৩১৬ পৃঃ] একবর্ণচিত্র।—৪৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মিশর-দেবী ইসিস—[৩৩৬পৃঃ]। একবর্ণচিত্র।—৪৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিদাঘশশী—(চিত্র-শিল্পী লর্ড লেটন্)—[৪০৪ পৃঃ] একবর্ণ চিত্র। নিদাঘের অলস-মাধুর্য্যময় চন্দ্রমণ্ডলে চিত্তবৃত্তিরূপিণী অপ্সরোগণ নিদ্রাভিভূতা!—৪৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সেণ্ট হিউবার্ট—বহুবর্ণচিত্র।—৪৪৮পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রাগ-রঙ্গ—বহুবর্ণচিত্র।—৪৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তরঙ্গ ভঙ্গে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল) বহুবর্ণ চিত্র। সমুদ্রবেলায় উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাজি আসিয়া আছাড়িয়া পড়ে, পরক্ষণেই যখন সেই ভগ্ন-তরঙ্গ-স্রোত সবেগে সমুদ্রাভিমুখী হয়, সেই টানের মুখে তিনখণ্ড-কাষ্ঠ-সমন্বয়ে-নির্ম্মিত-ভেলা ভাসাইয়া দিয়া সমুদ্রোপকূলবাসীরা খেলা করে! ইহাই চিত্রের বিষয়।

কুটীর দৃশ্য—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়) বহুবর্ণ চিত্র। কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাংশ—"উজল করিয়া আছে দূরে সেই—আমার কুটীর খানি"—ইহার ভাব লইয়াই এই চিত্রখানি পরিকল্পিত।

দৃষ্টি-বিভ্রম—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার গোস্বামী) বহুবর্ণ চিত্র। ষট্‌পদ তাড়াইবার ছলে শকুন্তলা অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে দুষ্মন্তকে দর্শন করিতেছেন।

চতুর্থসংখ্যা—আশ্বিনে

কৈলাসে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা) বহুবর্ণ চিত্র। হরপার্ব্বতী আসীন—দূরে নন্দী দণ্ডায়মান। পিতৃগৃহে গমনের কাল সমাগতপ্রায়, পার্ব্বতী তাই স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিতেছেন।

আরব-উপকূলে—(চিত্র-শিল্পী—আর্থার জি. বেল্) বিলাত হইতে আনীত এই চিত্রখানির শিল্পকুশলতা, বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলেই প্রতীত হইবে!

দাভিঞ্চীর চিত্রাবলী—বহুবর্ণ-চিত্র। কীর্ত্তিমান্ শিল্পী লিওনার্ডো দাভিঞ্চির—লুক্রেশিয়া ক্রির্ভোল মনালিসা, গিরিগুহা-সন্নিহিতা কুমারী এবং সুরা-দেবতা ব্যাকস্—এই চিত্রচতুষ্টয়ের বিবরণী বাগ্‌চী মহাশয়ের "প্রতীচ্য চিত্রপরিচয়"—প্রবন্ধে (৪৫৫ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য)।

মন্দিরে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল) বহুবর্ণ চিত্র। মঠ প্রাঙ্গণে পূজা-নিরতা মঘ-রমণীগণের এই চিত্রখানিতে ব্রহ্মবাসিনীদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পূজা প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্ষেপা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়) বহুবর্ণ চিত্র। চিত্রের পাদদেশে উদ্ধৃত রবিবাবুর কবিতাংশ হইতেই চিত্রখানি পরিকল্পিত।

সেণ্ট্ সিব্যাষ্টিয়ান্—বহুবর্ণ চিত্র। খৃষ্ট-শস্য সাধু সিব্যাষ্টিয়ান্‌কে তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্য খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী রাজাদেশে একটি বৃক্ষমূলে বাঁধিয়া শর-প্রয়োগে তাঁহাকে নিহত করা হয়। শরবিদ্ধ হইয়াও সাধুর মুখমণ্ডলে যাতনার ছায়াপাত মাত্রও হয় নাই—অনাবিল শান্তি এবং দৃঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাস-জ্যোতিতে তাঁহার মুখখানি উদ্ভাসিত!

পঞ্চম সংখ্যা—কার্ত্তিকে

প্রাবৃট—[৬১৫ পৃঃ]

গিরেণিতম্বে মরুতা বিভিন্ন—[৭০৫ পৃঃ]

বিগলিতঃকরুণা—[৭১৫ পৃঃ] এই তিনখানি একবর্ণ চিত্র শিল্পী শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ব্ব শিল্পোৎকর্ষ-সমন্বিত আলোক চিত্রণের প্রতিলিপি।

গঙ্গাবক্ষে—(চিত্রশিল্পী-শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী) [৬৭২ পৃঃ] একবর্ণ চিত্র। উদীয়মান আলোক-চিত্রণ-শিল্পী আর্য্যকুমারের ইহা আর একখানি শিল্পোৎকর্ষ-নিদর্শন।

অন্ধ মিল্টন্—(চিত্র-শিল্পী—মুন্‌কাসী) [৬১৭] একবর্ণ চিত্র। ইহা সেই সর্ব্বজনবিদিত চিত্রের প্রতিলিপি অন্ধমিল্টন্ মুখে মুখে তাঁহার কাব্য-রচনা করিয়া দিতেছেন, আর কন্যারা লিখিয়া লইতেছে।

আরাধনা—(চিত্র-শিল্পী—এ. এচ. Schram) [৬৯৭ পৃঃ] একবর্ণ চিত্র। চিত্রখানির আর একটি নাম—'পুষ্পরাণী'; ফুল্লকুসুমপ্রিয় জাপ-ললনাগণ পুষ্প-সম্ভারে বুদ্ধদেব-মূর্ত্তির শৃঙ্গারবেশ রচনা করিতেছেন।

নব-বসন্ত—(চিত্র-শিল্পী এচ্. জ্যাটাকা) [৭৩৮ পৃঃ] একবর্ণ চিত্র। ইহার অন্যতম নাম 'বাসন্তীস্বপ্ন'—ঋতুকালের মোহন সহচর—পুষ্প ও পাখী, পাখী আর ফুল্লমুখী ললনা, এই সকল চিত্রের সর্ব্বস্ব।

দিবাবসান—(চিত্র-শিল্পী—সি. জ্যাক্) [৭৬৯ পৃঃ] একবর্ণচিত্র। সন্ধ্যাকালে প্রতীচ্য-প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

গৃহে জাপানী-রমণী—(চিত্র শিল্পী—এ. এচ্. শ্রাম্) [৭৬০ পৃঃ]—একবর্ণচিত্র। নৃত্যপরা জাপরমণী সঙ্গিনাসমক্ষে বিলোল হাবভাবের পরীক্ষা দিতেছে।

নিডিয়া—(চিত্র শিল্পী—এল্. ক্রসিও) [৭ ... একবর্ণ চি...। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বুল্বর লিটন্, "Last days of Pompeii" নামধেয় উপন্যাসে ... ফুলওয়ালী "নিডিয়া"-চরিত্র শব্দচ্ছটায় অঙ্কিত ক... স্বনামধন্য শিল্পী ক্রসিও তুলিকাসাহায্যে তাহাই ফুটা...

ভারতবর্ষ—(চিত্র-শিল্পী —পিঃ ঘো...) ...বর্ণ চিত্র। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা যে সূচনা-সঙ্গী... অন্তর্দ্ধান হয়েন, সেই সঙ্গীত মূর্ত্তিমান্ করিবার ... এই চিত্রখানি পরিকল্পিত।

বদ্রি-নারায়ণের পথে—(চি... শ্রীফণীভূষণ বাগ্‌চী) বহুবর্ণ চিত্র। শিল্পীর ... পার্ব্বত্য প্রদেশের যথাযথ চিত্র।

বিচার—প্রচলিত ধর্ম্মবিরোধী মতবাদ প্রচা... যিশুখৃষ্ট বিচারার্থে মঞ্চোপরি—পাইলট্-সমক্ষে আনী...

রাজকুমারী পদ্মাবতী—(চি... —শ্রীচারুচন্দ্র রায়) বহুবর্ণ চিত্র। "বেতাল-পঞ্চবিংশ... প্রথম উপাখ্যানে বর্ণিত—"রাজকুমারী পদ্মাবতী, ... মুকুটকে নয়নগোচর করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া শি... হস্তে লইলেন।"—এইটুকু লইয়াই চিত্রখানি পরিকল্পি...

খুল্লনা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ) ... চিত্র। স্বর্গের অপ্সরা রত্নমালা, দুর্গার অভিশাপে ... বণিকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন;—ইনিই খুল্লনা। ইহার সহিত ধনপতি সদাগরের বিবাহ হয়। ধনপতি বাণিজ্যার্থে বিদেশে গমন করিলে, খুল্লনা সপত্নীর হস্তে নিগৃহীতা হয়েন, সেই সময়ের অবস্থাই পরিকল্পিত হইয়াছে।

প্রসাধন—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার গোস্বামী) বহুবর্ণ চিত্র।—মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমনান্তে যখন দৈববাণীতে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন তাঁহাকে ভর্ত্তৃসন্নিধানে পাঠাইবার উদ্‌যোগ করিলে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলার যথাসম্ভব বেশভূষাসমাধানে প্রবৃত্ত। চিত্রে, পুষ্পরচিত অলঙ্কারযোগে সেই প্রসাধন

ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনজনেরই মুখে চোখে সেই অবস্থাসম্ভব হাবভাব অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

বিভোরা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়) বহুবর্ণ চিত্র। চিত্রের পাদদেশে উদ্ধৃত রবিবাবুর কবিতাংশের ভাব ফুটাইয়া তুলিতে কৃতযত্ন হইয়াছেন—আশাতীত সফলকামও হইয়াছেন।

ষষ্ঠ সংখ্যা—অগ্রহায়ণে

মেঘ ও রৌদ্র—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বল্লভ) একবর্ণ-চিত্র [৯১৫ পৃঃ]। ইহাও সেই আলোক চিত্রণে শিল্প-সমাবেশের অন্যতম নিদর্শন।

গোপা ও সিদ্ধার্থ—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীপ্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়) বহুবর্ণ-চিত্র। সিদ্ধার্থের মন যখন মুক্তির চিন্তায় অনুক্ষণ বিলোড়িত, সেই সময় একদা নিশাকালে গোপাকে বলিলেন, "প্রাণাধিকে! আমার আর কিছুতেই সুখ নাই, তুমি জীবনের মহাব্রতে আমার সহায় হও;—প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য কর।"—চিত্রে এই দৃশ্যটিই পরিকল্পিত হইয়াছে।

অনামাদ্রিপার্শ্বে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীশ্রীশচন্দ্র পালিত) বহুবর্ণ-চিত্র। ইহার মূল-চিত্রখানি মার্গারেট্ মারে কর্ত্তৃক পরিকল্পিত, পালিত মহাশয় তাহার প্রতিলিপি মাত্র অঙ্কন করিয়া বর্ণ-যোজনা করিয়াছেন। বিয়োগ-বিধুরা রমণীর মুখমণ্ডলের সকরুণ ভাব হৃদয় স্পর্শ করে।

লক্ষ্য-শিক্ষা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীশ্রীশচন্দ্র পালিত) বহুবর্ণ-চিত্র। বাল্মীকির নিকট কুশ ও লব ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।

দাসবিপণি—(চিত্র-শিল্পী—এল, ক্রশিও বহুবর্ণ-চিত্র। সাধারণ পণ্যের ন্যায় বিবস্ত্রবেশা সুন্দরী যুবতী বিক্রয়ার্থ পণ্য-বীথিকায় নীতা হইয়াছে। যুবতীকে লইয়া ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়াছে—রমণী লজ্জায়, মর্ম্মপীড়ায় অন্তর্দাহে হেঁটমুণ্ডে অবস্থান করিতেছে।

নিশীথে সূর্য্যালোক—বহুবর্ণ-চিত্র। নরওয়ের নামই "LAND OF THE MIDNIGHT SUN" ইহার বিবরণ "নরওয়ে ভ্রমণ" প্রবন্ধে [৯০৩ পৃঃ] দ্রষ্টব্য।

মুমূর্ষু দশরথ (চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা) বহুবর্ণ-চিত্র। দশরথ মৃত্যুশয্যায়। কৈকেয়ী শয্যা-তলে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতেছেন, ইহাই চিত্রে পরিকল্পিত হইয়াছে। দশরথের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল প্রায় —বদনমণ্ডলে মৃত্যুচ্ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে—শিল্পী এই ভাবগুলি অতি পরিস্ফুটরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

উত্তরার্দ্ধ

প্রথম সংখ্যা—পৌষে

ম্যাডোনা—(তিশিয়ান্ অঙ্কিত) দুই খানি বহুবর্ণ চিত্র। এই দুই মাতৃ-মূর্ত্তির বিবরণ অধ্যাপক বাগ্‌চী মহাশয়ের "টিশিয়ান্" প্রবন্ধে [১০৭ পৃঃ] দ্রষ্টব্য।

সান্ত্বনা—(চিত্র শিল্পী—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়) বহুবর্ণ চিত্র। বিরহিণী রাধিকাকে ব্যথার ব্যথী ব্রজগোপী সান্ত্বনা করিতেছেন। এক জনের মর্ম্মবেদনা যথার্থ সমব্যথী কতদূর অনুভব করেন, শিল্পী উভয়ের মুখ মণ্ডলে তাহা সুচারুরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

পার্শনাথের শোভাযাত্রা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল) বহুবর্ণ-চিত্র। বড়বাজার হইতে রায় বদরীদাসের বাগানে কলিকাতার জৈন্য সম্প্রদায়ের দেবতা পরেশনাথের যে শোভাযাত্রা হয়, তাহারই একটি দৃশ্য।

ঊষা—(চিত্র-শিল্পী—বামড়াধিপতি সামন্তরাজ রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব বাহাদুর-কর্ত্তৃক অঙ্কিত বহুবর্ণ-চিত্র ঊষার অরুণ-কিরণ-সম্পাতে জলস্থলময়ী প্রকৃতি যে অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, রাজা বাহাদুর নিজ রচনায় তাহা বিশেষ কবিত্বব্যঞ্জকভাবে প্রকটিত করিয়াছেন।

বংশী-শিক্ষা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ) দ্বিবর্ণ-চিত্র। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতীকে বংশীবাদন শিক্ষা দিতেছেন —শিক্ষকের আগ্রহ তাঁহার মুখে স্পষ্টভাবে বিরাজমান, শিষ্যার মুখেও শিখিবার জন্য একটা আকুলতা পরিদৃষ্ট হইতেছে; দূরে—মাঠে—গোপাল চরিতেছে!

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ) দ্বিবর্ণ-চিত্র। নিমাই, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে

পর, তাঁহার যুবতী পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া অহর্নিশ তদনুধ্যানে—তন্ময়চিত্তে তদীয় পাদুকাযুগল-পূজা-নিরতা থাকিতেন। এই পরিকল্পনা প্রকটনই চিত্রের উদ্দেশ্য।

ভারবাহী—একবর্ণ-চিত্র। জনৈক ফরাসী শিল্পী কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অঙ্কিত এই চিত্র খানিতে কথোপকথন নিরত সগর্দ্দভ দাক্ষিণাত্যের রজক এবং ভারশিরঃ রজকিনীর আদর্শ প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাড়ী—একবর্ণ চিত্র। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'বোর্ড অব্ ডাইরেক্টর্স', যে বাড়ীতে সমবেত হইয়া ভারতের তাৎকালিক এবং পরবর্ত্তী ভাগ্য বিধান—পরিচালনা করিতেন, এখানি তাহারই প্রতিকৃতি।

দ্বিতীয় সংখ্যা—মাঘে

গৃহহীনা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়) বহুবর্ণ-চিত্র। সন্তানসন্ততি লইয়া রমণী পথে বসিয়াছে! রমণীর মুখে যে দৈন্য, লজ্জা, সন্তাপ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা নিরীক্ষণ করিলে বুঝি পাথরও ফাটিয়া যায়!—আর সন্তান দুইটি?—তাহারা চিন্তালেশ শূন্য হইলেও যে ক্ষুধায় উৎপীড়িত, তাহা দেখিলেই বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়।—সুদক্ষ শিল্পীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ধ্বজাস্বরূপ এই চিত্র খানির আর বিশদ পরিচয় অনাবশ্যক।

ওথেলো—পূর্ব্বরাগ—বহুবর্ণ-চিত্র। মূর ওথেলো স্বীয় বীরত্ব-কাহিনী বর্ণনা করিতেছে—ডেসডিমোনা পিতৃ-পার্শ্বে বসিয়া তন্ময়-চিত্তে তাহাই শ্রবণ করিতেছে। ফলে, বর্ণিত কাহিনী কত মনোহারী, বর্ণনা-প্রণালীও কেমনই চিত্তাকর্ষী, এবং বক্তার ভাষা ও ভাব কি অপরূপ বীরত্বব্যঞ্জক ও আশ্চর্য্যজনক, তাহা শ্রোতৃদ্বয়ের বিস্ময়-বিহ্বল মুখচিত্র দৃষ্টেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

নিধুবনে—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা) বহুবর্ণ-চিত্র। বিরলে—বিজনে—বিপিনে রাধাকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন।—প্রেমানন্দে উভয়েই বিভোর শ্রীরাধিকা নৃত্যপরা, কৃষ্ণচন্দ্রও তথৈবচ—উভয়েরই হাবভাবে—মুখেচোখে মিলনের অনাবিল হর্ষ পূর্ণ-প্রকটিত! শিল্পীর ইহাই কৃতিত্ব।

চন্দ্রাপীড় ও মহাশ্বেতা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীফণীভূষণ বাগচী) বহুবর্ণ-চিত্র। যুবরাজ চন্দ্রাপীড় অনেক দেশ জয় করিয়া একদা মৃগয়ার্থ নির্গত হন এবং এক অদৃষ্টপূর্ব্ব কিন্নর-মিথুন দৃষ্টে, তাহাদিগের পশ্চাদনুধাবন করিয়া অবশেষে চন্দ্রপ্রভ পর্ব্বতের পাদদেশে স্থিত শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখেন—অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক কন্যা শঙ্খখণ্ডের মত অমলশুভ্র অঙ্গুলি দ্বারা বীণাবাদন পূর্ব্বক তান লয় বিশুদ্ধ মধুর স্বরে মহাদেব-স্তুতি গান করিতেছেন।

নারব-ভাষা—(চিত্র-শিল্পী — শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়) একবর্ণ চিত্র। এখানিও আলোকচিত্রণে অপূর্ব্ব শিল্প-সমাবেশের অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শিল্পী, দুইটি মহারাষ্ট্রীয় যুবকযুবতীকে, যথাযথ pose দিয়া, এই চিত্রখানি তুলিয়াছেন।

ইংরাজ-রাজদূত শার্লি—(চিত্র-শিল্পী —তারুবী বেগ)—একবর্ণ চিত্র। ইংরাজরাজ ১৬২৭ পারস্য-সম্রাট্ শা আব্বাসের দরবারে 'শার্লি ব্রাদার্স'কে দূতরূপে প্রেরণ করেন। পারস্য রাজ-শিল্পী তুর্কী তারুবী বেগ তাহাদের যে চিত্র অঙ্কিত করেন, এখানি তাহারই অন্যতমের প্রতিলিপি। চিত্রখানি অতি প্রাচীন।

মহাপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শন—(চিত্র-শিল্পী —শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ) একবর্ণ চিত্র। চিত্রের পাদদেশে উদ্ধৃত কবিতাংশ পরিস্ফুট করণোদ্দেশেই চিত্রখানি পরিকল্পিত। কবিবর কুমুদরঞ্জনের কবিতা (৬১৩ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

রামমোহন-স্মৃতি-পুস্তকাগার—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল) একবর্ণ চিত্র। ৩০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় সংখ্যা—ফাল্গুনে

সঙ্কেত-বর্ত্তিকা—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ) বহুবর্ণ-চিত্র। যুবতী, পিতৃবৈরী জনৈক যুবকের প্রতি আসক্তা—পিতা ঝালিম সিংহ কিন্তু অপরের সহিত বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প। প্রণয়পাত্রের আগমন প্রতীক্ষায় বালা প্রতি রাত্রে উৎকণ্ঠাবসন্ন হৃদয়ে একটি সঙ্কেত-বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া নিশাযাপন করিতেছেন!

রোমিও-জুলিয়েট্—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) বহুবর্ণ-চিত্র। ভাবব্যঞ্জকতায় ও বর্ণসম্পদে চিত্র খানি অপূর্ব্ব। ইহার মূল চিত্রের অধিকারী কলিকাতা—জোড়াসাঁকো নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত [illegible] শীল।

দেবী দ্বারে-সন্ধ্যা—(শ্রীযুক্ত বাঙ্গালাধিপতি

সামন্তরাজ সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব বাহাদুর-কর্ত্তৃক অঙ্কিত) বহুবর্ণ-চিত্র। "উষা" পরিকল্পনায় যে কৃতিত্ব সূচিত, "সন্ধ্যা"য় তাহার পূর্ণপরিণতি !

কপাল-কুণ্ডলা—(চিত্র-শিল্পী শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ) দ্বিবর্ণ-চিত্র। প্রথম সাক্ষাৎকালে উভয়ের সাশ্চর্য্য ভাব এবং [illegible] দৃশ্যচয়, ঠিক বর্ণনার অনুরূপ অঙ্কিত হইয়াছে।

চতুর্থ সংখ্যা—চৈত্রে

[illegible] **গোতমী**—(চিত্র-শিল্পী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ [illegible] চিত্র। "THE INDIAN SOCIETY OF [illegible] ART" প্রদর্শনীর সপ্তম অধিবেশনে যে [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছিল, এখানি তাহারই অন্যতম। [illegible] শ্রদ্ধেয় কবি করুণানিধান "জীবন-ভিক্ষা" [illegible] ৭ পৃঃ] বিশদভাবে প্রকটিত করিয়াছেন।

[illegible]**-মন্দির**—(চিত্র-শিল্পী-আল্‌মা ট্যাডিমা) [illegible] গুরু, স্বীয় শিল্পশালায় সমাগত শিষ্যবর্গকে [illegible] দিতেছেন, গৃহভিত্তিতে সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ—নানা [illegible] সজ্জিত। গুরুর মুখমণ্ডলে পদোচিত গাম্ভীর্য্য [illegible]র বদনে ঐকান্তিক আগ্রহ ও একনিষ্ঠা [illegible] -খানির বিশেষত্ব !

ওফেলিয়া—(চিত্র শিল্পী স্যর্‌জন্ এভরেট্ মিলে) [illegible] 'হ্যাম্‌লেটে'র প্রণয়পাত্রী 'ওফেলিয়া' [illegible] ইয়া নিরাশ প্রেমভরে সরোবরে আত্ম-বিসর্জন [illegible] জল-শয্যা-শায়িতা প্রেমবিড়ম্বিতা শবমুখেও [illegible] কাতরতার পূর্ণ অভিব্যক্তি বিরাজমান !

[illegible] **সূর্য্য**—বহুবর্ণ-চিত্র। নরওয়ের সন্ধ্যাকালীন [illegible] "নরওয়ে-ভ্রমণ" [৮৭৭ পৃঃ] প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম সংখ্যা—১৩২১—বৈশাখে

জগদ্ধাত্রী—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা) বহুবর্ণ চিত্র। "সিংহবাহিনী" রূপে।—উজ্জ্বল বর্ণরাজির সু-কৌশল বিন্যাসে চিত্রখানি অমিত গৌরবময়ী !

আব্দার—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীবিপিনচন্দ্র দে) বহুবর্ণ চিত্র। শিল্পী শিক্ষানবিশ—কিন্তু এই পরিকল্পনাটিতে একটু নূতনত্ব এবং মূর্ত্তিগুলিতে ভাব-সমন্বয় আছে।

শ্রীশ্রী**মহাপ্রভু**—(চিত্র শিল্পী—শ্রীশ্রীশচন্দ্র পালিত) বহুবর্ণ চিত্র। নদীকূলাবস্থিত তরুমূলে ধ্যাননিবিষ্ট চৈতন্যদেবের মুখে যে দিব্যপ্রভা বিকশিত—যে অনবদ্য শান্তি বিরাজিত—তৎসমাবেশেই শিল্পীর অমিত নৈপুণ্য।

নূর-মহাল্—(চিত্র-শিল্পী—ফ্রেড্‌রিক্ গুড্ অল্) বহুবর্ণ চিত্র। রঙ্গমহালের শিরোভূষণ বেগম-সাহেবার নবপ্রসূত-শিশু, সম্রাটান্তঃপুরে নবজ্যোতি বিকিরণ করিয়াছে ! প্রসূতি, আলস্যে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, গর্ব্বোৎফুল্ল অপাঙ্গ দৃষ্টিতে শিশুকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ক্রীতদাসী পারাবত দেখাইয়া শিশুকে "খেলা দিতেছে" !

ষষ্ঠ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠে

জয়দেব—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার গোস্বামী) বহুবর্ণ চিত্র। কবি করুণার গাথা (১০৫ পৃঃ) পাঠে চিত্রের পরিকল্পনা ও ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মন্মথ-মন্দিরে সাইকী—(চিত্র-শিল্পী-স্যার্ ই, জে, ওয়েণ্টার্) বহুবর্ণ চিত্র। প্রণয়-বিড়ম্বিতা সাইকী 'ডায়ানা'র মন্দিরে অজ্ঞাতবাসকালে একদিন নিষ্কর্ম্মা-ভাবে পদচারণা করিতেছেন, সময়ে একটি প্রজাপতি আসিয়া তাঁহার করস্থিত পল্লবে বসিতেছে ;—ইহাই চিত্রের বিষয়।

পার-যাত্রী—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়) —বহুবর্ণ চিত্র। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, বৃদ্ধ পারযাত্রী ঘাটে আসিয়া দেখে যে, খেয়ার নৌকা চলিয়া গিয়াছে !—চিত্রে বৃদ্ধের মুখের সে সময়ের কাতর—নিরাশ ভাব যেরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে, দেখিলেই প্রাণ আকুল হইয়া উঠে !

গৃহ-লক্ষ্মী—(চিত্র-শিল্পী—শ্রীশারদাচরণ উকীল) বহুবর্ণ চিত্র। পুরাঙ্গনা সন্ধ্যাসমাগমে ঘরে দ্বারে ধূপ দিতে চলিয়াছেন।—ধূপবাহিকার মুখমণ্ডল, ধূপাগ্নি-আভায় উদ্ভাসিত হইয়া, কি পবিত্রতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে !

শ্রীনসীরাম চিত্রগুপ্ত।